লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ গ ॥	
× × ×	গানের জলসা ৯২৮, ১০০৯,
শ্রীগিলডা করডোরা কার্ণাপেন্ডো	আমার বিয়ে (এশিয়ার গল্প) ২৫৩;
শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য	জাতীয় কল্যাণে চলচ্চিত্র (আলোচনা) ৬৯৬; ক্লোজ আপ (আলোচনা) ৪৪২;
শ্রীগৌতম গুহ	কানাগলির মুখে (কবিতা) ১৭০;
শ্রীগৌতম বসু	ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য (আলোচনা) ২২৯;
॥ চ ॥	
শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	সাতপাঁচ ৩১৬;
× × × ×	চিঠিপত্র ৪, ৮৪, ১৬৪, ২৪৪, ৩২৪, ৪০৪, ৪৮৪, ৫৬৪, ৬৪৪, ৭২৪, ৮০৪, ৮৮৪, ৯৬৪;
শ্রীচিত্ররসিক	শিল্প পরিচয় ২২৭, ৬২৪;
শ্রীচু ইয়ো সুপ	আমার নতুন কাকা (এশিয়ার গল্প) ২১৭;
॥ জ ॥	
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী	তুম্বুনিতে সারা দুপুর (কবিতা) ৭৪২;
× × × ×	জানাতে পারেন ৭২, ১৪৮, ২২২, ২৯৮, ৩৯৮, ৪৬০, ৫৩০, ৬২৮ ৭৮৪, ৮৫২, ৯৬০, ১০৩২;
শ্রীজোস ডি আরেলা	চাকা (এশিয়ার গল্প) ৩৩৩;
॥ ত ॥	
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বিচিত্র চরিত্র ৬, ৮৬, ১৬৬, ২৪৬, ৩২৬, ৪০৬, ৪৮৬, ৫৬৬ ৭২৬, ৮০৬, ৮৮৬, ৯৬৬ সাহিত্যের ধর্ম (আলোচনা) ৭০৯;
শ্রীতারাপদ রায়	ভ্রমণ কাহিনী (গল্প) ৫৯; ডাক বিনিময় (কবিতা) ৮১০
শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায়	যাওয়া যায় না (কবিতা) ৩৩০;
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ	মানুষ লালবাহাদুর (আলোচনা) ৯৭২;
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	আচার্য দীনেশচন্দ্র : স্বপ্ন ও সাধনা (আলোচনা) ৮৯;
॥ দ ॥	
শ্রীদর্শক	খেলাধুলা ৪৫, ১২৫, ২০৭, ২৮৭, ৩৬৮, ৪৪৭, ৫২৮, ৬০৭ ৭৬৩, ৮৪৮, ৯৩১, ১০১১;
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	আলো যেন চোখে (কবিতা) ১২, আত্মচরিতে সমাজচিত্র (আলোচনা) ৯৭৭;
শ্রীদিপালী ঘোষ	যাদের নাম কোরাওল (আলোচনা) ৪৬৯;
শ্রীদিলীপ মালাকার	ফরাসী সংস্কৃতির দিকপাল (আলোচনা) ১৫৩, '৬৬ সালের গফুর পুরস্কার (আলোচনা) ৫৫৮, নিগ্রো আর্ট (আলোচনা) ৭৮১;
শ্রীদীপ্তিময় দে	দুধের আতঙ্ক (আলোচনা) ৩৮০;
শ্রীদেবাংশু সেন	একটি ভয়ংকর সমস্যা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ (আলোচনা) ৮১১;
× × ×	দেশে-বিদেশে ২৭, ১১১, ১৭১, ২৬৫, ৩৫০, ৪২৯, ৫০৭, ৫৮৯ ৭১৮, ৭৪৬, ৮২৯, ৯১৩, ৯৯৫;
॥ ধ ॥	
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	মহাত্মা শিশিরকুমার স্মরণে (আলোচনা) ৪৯২;
শ্রীধ্রুব রায়	বিশ্বজয়ের পথে বোলিংয়ের ভূমিকা (আলোচনা) ৬৫৫;
॥ ন ॥	
শ্রীনমিতা চক্রবর্তী	লিফ্‌ট্‌ (গল্প) ৯৪৯;
শ্রীনারায়ণ দত্ত	শনিবারের ওয়ারেন হেস্টিংস (আলোচনা) ৬৩;
শ্রীনির্মল দত্ত	রাজস্থানের শিল্প নিদর্শন (আলোচনা) ৮৬৮;
শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন কে জি)	চিত্রচিন্তা (আলোচনা) ৬৮৯;
শ্রীনির্মলাশিস সেন	অতল জলের আহ্বান (আলোচনা) ৫৩৮;

৭ম বর্ষ

১ম খণ্ড

১ম সংখ্যা

মূল্য

৪০ পয়সা

Friday, 5th May 1967. শুক্রবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৭৪ **40 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

'ধনভাণ্ডার বাঁকে' প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার ৪৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিশ্বনাথ বসু মহাশয়ের 'ধনভাণ্ডার বাঁকে' রোমাঞ্চকর কুমীর শিকার কাহিনীটির জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত রচনাটির জন্য লেখক নিশ্চয়ই 'অমৃতে'র পাঠকবর্গের কাছে ধন্যবাদভাজন হবেন বলে আশা রাখি।

ডাঙার নর-খাদক ব্যাঘ্র বা অসীম সাহসী প্রতিষ্ঠাবান ব্যাঘ্রশিকারীর কথা অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু জলের কুমীর বা কুমীরশিকারীর বিষয়ে বেশীর-ভাগ লোকই বোধহয় অনভিজ্ঞ।

১৯২৪ সালে যশোহর জেলার নদীবক্ষে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় করে তুলেছিল, সেই সত্য কাহিনী শ্রীবসু মহাশয় 'অমৃতে' পরিবেশন করেছেন।

উক্ত শিকার-কাহিনীটিতে তিনি যে তিনজন কুমীরশিকারীর একনিষ্ঠতা, সাহস ও মনোবলের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তা যেমনি-ভাবে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, তেমনি ভাবিয়েও তোলে।

ডাঙার ভয়ঙ্কর জন্তু নর-খাদক বাঘের কবলিত হয়েও মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত বা উদ্ধার করার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু জলজ নর-খাদকের (বিশেষ করে কুমীরের) কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা ভাবা যায় না।

এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে নিজের পরিণতির কথা ভুলে কৃতসংকল্প শিকারী তেইশ বছরের বাঙালী যুবক শ্রীকালীপদ নাথ মহাশয়ের রোমাঞ্চকর সাহসিকতার কথা ভাবলে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মহৎ দুর্ধর্ষ শিকারীকে 'গভর্ণমেন্ট-হান্টার' পদে অভিষিক্ত করে শিকারীর যথাযোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

দীপক সেন
কাঠমাণ্ডু, নেপাল।

"ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল একাল" প্রসঙ্গে

'প্রতিবেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি (৪৯শ) সংখ্যা' অমৃত পত্রিকায় শ্রীনিখিল সেনের 'ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল ও একাল' প্রবন্ধের জন্য লেখককে ও আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। স্বল্প কথায় লেখক ওড়িয়া সাহিত্য ও ওড়িশী সাহিত্যিকদের যে সুষ্ঠুভাবে পরিচয় দিয়েছেন তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। ওড়িশা ছাড়াও তার প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ উক্ত প্রবন্ধের জন্য অশেষ উপকৃত হবে। তবে লেখক এক জায়গায় কিছু তথ্য ভুল পরিবেশন করেছেন তা সকলের অবগতির জন্য আমরা লিখে জানাচ্ছি। তিনি লিখেছেন যে 'লাবণ্যবতী' উপেন্দ্র ভঞ্জের শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু আমরা জানি—উপেন্দ্র ভঞ্জের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বৈদেহী বিলাস' মহাকাব্য। বৈদেহী অর্থাৎ সীতার করুণ কাহিনীই উক্ত মহাকাব্যের মূল উপজীব্য বা সারবস্তু। ভাষার লালিত্যে, উপমায়, অর্থগৌরবে—তুলসী-দাসজীর 'রামচরিত মানস', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' ভারবী কবির 'কিরাতার্জ-নীয়ম', মাঘের 'শিশুপাল বধম', মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' এবং কালিদাসের 'কুমার সম্ভবম'—বৈদেহী বিলাস মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে—সে বিষয়ে কোনো অত্যুক্তির প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ—ওড়িশার অধিবাসিগণ উপেন্দ্র ভঞ্জকে মহাকবি এবং বৈদেহী বিলাসকে মহাকাব্য বলে স্বীকার করেন এবং উড়িয়া ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে বর্তমানকাল পর্যন্ত মেনে আসছেন। তবে, 'লাবণ্যবতী'ও একটি উৎকৃষ্ট কাব্য।

বৈদেহী বিলাসের আর একটি শ্রেষ্ঠ গুণের কথা এখন পর্যন্ত বলিনি। তা হচ্ছে—তার অপরূপ ছন্দের তরঙ্গ-ভঙ্গিমা। বিশাল সমুদ্রবক্ষের বিশাল তরঙ্গসমূহ যেমন নাচতে নাচতে গুরু-লঘু-ধ্বনি-সহকারে বেলাভূমিতে গিয়ে আছাড় খেয়ে শেষ হয়ে আবার ফিরে আসে—শেষ হয়েও শেষ হয় না—তেমনি ওর (বৈদিহী বিলাসের) ছন্দ-মাধুর্য এবং ছন্দ-বৈচিত্রতা!

উক্ত মহাকাব্য নিজে পাঠ না করলে কিংবা নিজের কানে না শুনলে—বলে বোঝানো খুব শক্ত! 'বৈদেহী বিলাস' শুধু ওড়িশা বা ভারতবর্ষেরই নয়, সমস্ত পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ,—প্রতিটি নারীর হৃদয়ের কথা!

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত,
সান্ত্বনাকুমারী গুপ্তা,
ধুরুআ, রাঁচী।

প্রতিবেশী সাহিত্য

"অমৃতের" ৪৯ সংখ্যার প্রতিবেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংখ্যায় "প্রতিবেশীকে জানতে চাই" সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ রায়ের "বিহারের সাহিত্য"; শ্রীবাহুল বর্মণের "অসমীয়া সাহিত্য কথা"; শ্রীচিদানন্দ গোস্বামীর "বিশ শতকে ত্রিপুরার সাহিত্য" ও শ্রীযুত নিখিল সেনের "ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল একাল" যথেষ্ট সুখপাঠ্য। প্রত্যেক জাতিই বেঁচে থাকে তার নিজ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার মাধ্যমে। কোন ভাষা বা সংস্কৃতিই বিচ্ছিন্ন বা নিরাবলম্ব নয়। নিজের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে গেলে প্রতিবেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসতে হবে। বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্বসংস্কৃতি জানতে গেলে সবচেয়ে আগে জানতে হবে প্রতিবেশী সাহিত্যকে। প্রতিবেশী সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করতে না পারলে নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি চিরকালই আমাদের প্রতিবেশীদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সহমর্মিতার ও সহধর্মিতার পক্ষপাতী। এই ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আছে আমাদের মৌলিক ঐক্য। বাংলা, ভোজপুরিয়া, অসমীয়া, ও ওড়িয়া, হিন্দী ও মৈথিলী ভাষা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে একটার থেকে আর একটাকে বাদ দিলে আমাদের মূল সূত্র হারিয়ে যাবে। এ বিষয়ে যে রচনাগুলি আপনাদের "অমৃত" পত্রিকায় স্থান পেয়েছে তা বিশেষ মূল্যবান ও সুন্দর ভাবধারা বহন করে এনেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনের দরজা জানলা বহুপূর্বেই খুলে দিয়েছেন। আমাদের উত্তরসূরীরা সেই ভাবধারা বহন করে নিয়ে চলেছেন। এই প্রতিবেশীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা সম্যক অবগত হতে পারবো আমাদের ও তাঁদের মনোজগতকে। আমাদের প্রতিবেশীরা এর মাধ্যমে হবে আমাদের অনেক নিকটতর। এ জগতে সব কিছু ধুয়ে মুছে যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোন দিন নষ্ট হয় না। আজ আমাদের আরও বিশেষভাবে চেষ্টা করে এই সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের প্রতি-বেশীদের আরও নিকটতর করতে হবে। তাতেই ফিরে পাব আমাদের ঐক্য এবং ঐতিহ্যের পথ।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলিকাতা-৩৯।

ক্রিকেটের যাদুঘর

আমাদের দেশের কোন বিশিষ্ট স্থানে একটি স্মৃতিমন্দির করে তাতে বিশ্ব-ক্রিকেটের চিত্র ও অন্যান্য স্মৃতিসম্বলিত দলিল দস্তাবেজ নিয়ে একটা ক্রিকেটের যাদুঘর করা খুবই সময়োচিত ও সঙ্গত হবে। সেই যাদুঘরের নাম হবে ফ্রাঙ্ক মার্টিমোর ওরেল মিউজিয়াম। যার মূলকক্ষে থাকবে ফ্রাঙ্ক ওরেলের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াভঙ্গীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও তার ক্রীড়া-ইতিহাস।

পত্রিকা ও সাধারণ্যে অনুরোধ, তাঁরা যেন যথোচিত কর্তৃপক্ষকে আমাদের দেশের মাটিতে যাতে এরকম একটা মহান স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হয় সেই জন্যে আবেদন জানান। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও সব রকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

শিশির বিশ্বাস,
কলিকাতা—৭।

অমৃত

আমাদের নববর্ষ

বর্ষচক্রের আবর্তনে অমৃতের যাত্রাপথে আরেকটি শুভদিন ফিরে এল। সপ্তম বর্ষের এই দিনটিতে আমরা সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। ছয় বৎসর সময়ের হিসাবে খুব বেশি নয়, প্রথম জন্মদিনের আবেগ-চঞ্চল স্মৃতি এখনও আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায় এই ছয় বৎসরে অমৃত সাহিত্যানুরাগীদের কাছ থেকে যে সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে, তাতে প্রথম পদচারণার দ্বিধা কেটে গিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ নিশ্চিত ও প্রশস্ত করে দিয়েছে। লেখক, পাঠক ও অনুগ্রাহকই সাহিত্য-পত্রিকার চলার পথের পাথেয়। আমাদের ত্রুটি ভুলে গিয়ে তাঁরা আমাদের সৎপ্রচেষ্টার সহযোগী হয়েছেন, এটাই আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করি। বাংলাদেশের মানুষ সাহিত্যপ্রিয়, তাঁরা সংস্কৃতিচর্চায় আত্মনিবেদিত। এই ভরসাতেই আমাদের যথাসাধ্য সম্বল নিয়ে সাহিত্যের দরবারে সেবকের ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এই ছয় বৎসরে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকরা যেমন অকৃপণভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, তেমনি সোৎসাহে সহযোগিতা করেছেন তরুণ সাহিত্যিকরা। সর্বোপরি আমরা লাভ করেছি পাঠক ও অনুগ্রাহকদের অকুণ্ঠ সমর্থন। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা এই প্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা শুরু করছি যে, অমৃত সকলের আশীর্বাদ ও সমর্থনধন্য হয়ে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক অগ্রগতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতে পারবে।

শিক্ষা ও ভাষার প্রশ্ন

ডঃ ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভারতের শিক্ষানীতি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা শুরু হয়েছে। গত ষোল বছরে ভারতবর্ষে "শিক্ষার বিস্ফোরণ" ঘটেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমাজের যে স্তরে কোনোদিন শিক্ষার আলোক পৌঁছুতো না আজ সেখানেও শিক্ষার কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু প্রসার যতটা হয়েছে সে অনুপাতে শিক্ষার মানোন্নয়ন হয়নি। কেন হয়নি তা নিয়ে শিক্ষা-কমিশন বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তাঁরা শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ রক্ষার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রথমেই বলেছিলেন যে, তিনি শিক্ষার্থীদের ওপর একগাদা ভাষা শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিতে চান না। সম্প্রতি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য এম. পি-দের নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরা সুপারিশ করেছেন যে, তিন ভাষার ফর্মুলার বদলে স্কুলের ছাত্রদের দুইটি ভাষা শিক্ষা দেওয়াই বাস্তবতাসম্পন্ন। রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সেন দুই ভাষার স্বপক্ষে যে জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করেছেন আশা করি তা শিক্ষার স্বার্থে সকলেরই গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষামন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের ছাত্রদের পাঠ্যসময়ের অর্ধেকেরও বেশি সময় চলে যায় তিনটি ভাষা শিখতে—মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজি। তার উপরে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অসাধারণ চাপ। শিক্ষাকে যদি অর্থপূর্ণ করে তুলতে হয়, তাহলে ভাষার অরণ্যে সুকুমারমতি বালকদের ঠেলে না দিয়ে যাতে তারা তাদের পাঠের সময় যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারে, তা দেখা আমাদের উচিত। আমরা মনে করি, তিন ভাষার ফেরের মধ্যে আর না গিয়ে দুই ভাষা শিক্ষাই বর্তমান সময়ের পক্ষে উপযোগী হবে। স্কুলের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষাতে শিক্ষালাভ করবে, তারপর থেকে তাদের শিখতে হবে হিন্দী অথবা ইংরেজি। যাদের হিন্দীই মাতৃভাষা তারা অষ্টম শ্রেণীর পর শিখবে ইংরেজি এবং যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি তারা হিন্দী শিখে এই দুই ভাষার সূত্রকে কাজে লাগাবে। এতে হিন্দী নিয়ে অযথা বিরোধ সৃষ্টি হবে না এবং ছেলেরাও আরও একটি অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষার দায় থেকে মুক্তি পাবে।

শ্রীমোরারজী দেশাই জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে পুরনো তিন ভাষার ফর্মুলার পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, ভাষা-সমস্যা জাতীয় সংহতির মূলেই আঘাত করছে। জোর করে কাউকে ভাষা শেখানো যায় না। অথচ আমাদের আর সময় নষ্ট করাও উচিত নয়। ইংরেজি অথবা হিন্দী শেখার যে সুযোগ এই সূত্রে আছে, তা ভারতীয় সংহতির পক্ষে সহায়ক হবে এবং আমরাও এই সংযোগরক্ষাকারী ভাষা পাব। যদি দশ কি বিশ বছর পর দেখা যায় যে, ছাত্ররা ইংরেজির চেয়ে হিন্দীই শিখছে, তাহলে বিনাবাধ্যতায় হিন্দী সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হয়ে উঠবে। তবে নৈষ্ঠিকভাবে ইংরেজি বর্জনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইংরেজি ভাষার আধিপত্য থাকবে কিনা তা বলা যায় না, কিন্তু আমাদের দেশের স্বার্থেই এই এই আন্তর্জাতিক ভাষা আমাদের আয়ত্তে থাকা দরকার। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও একটি সংযোগের ভাষা দরকার। বর্তমানে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা সে-স্থান দখল করতে যে পারবে না তা বলাই বাহুল্য।

মোট কথা শিক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষে এতদিন যে গোঁজামিল চলছিল, তার অবসান হওয়া দরকার। শিক্ষার বিষয় শুধু ভাষাজ্ঞান নয়, তার আসল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন এবং সময়ের ও সমাজের উপযোগী বিদ্যা। তিন ভাষার পাঁচিল খাড়া করে তাকে যেন আমরা দূরে সরিয়ে না রাখি।

চিরজীবী পঁচিশে বৈশাখ
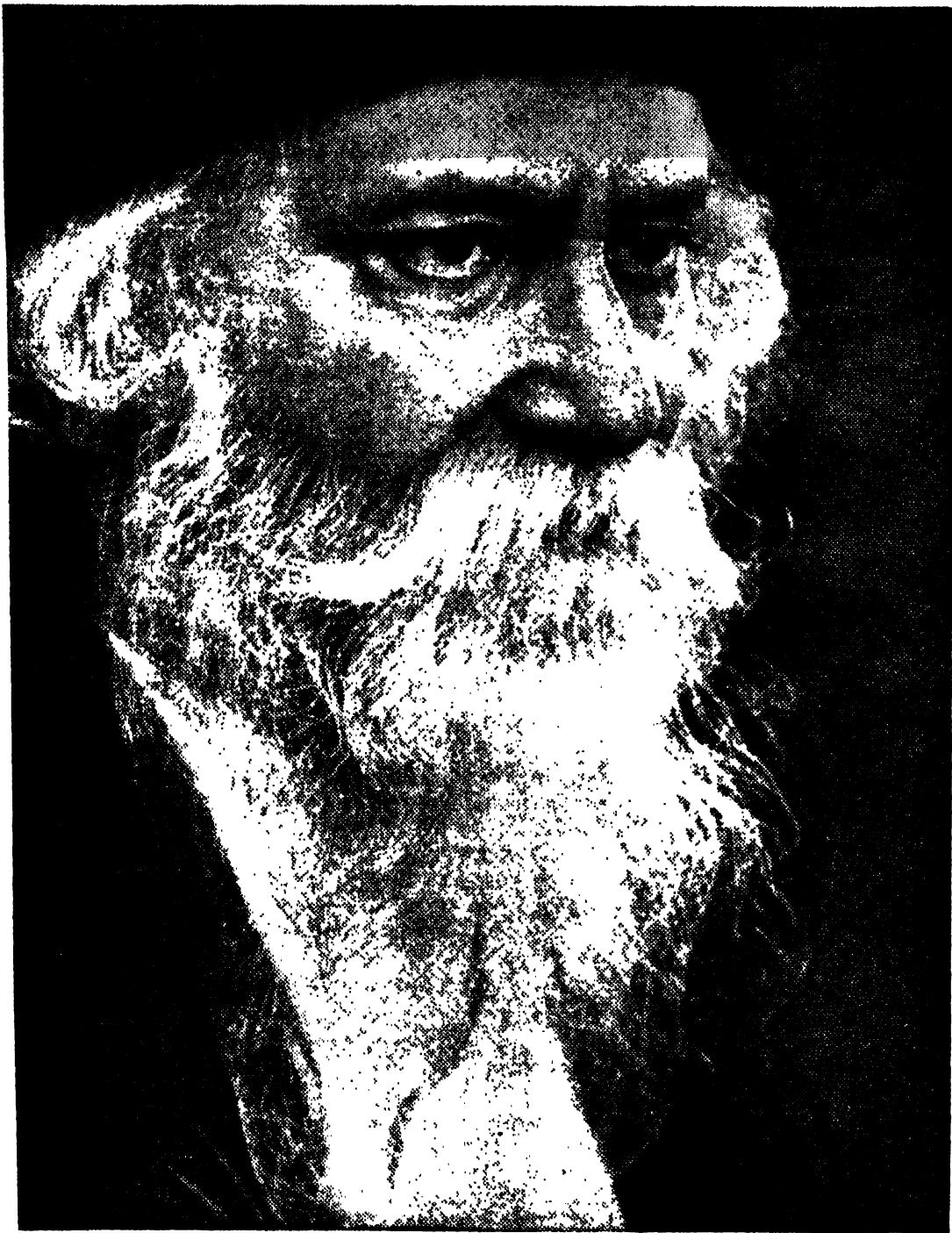
উপন্যাসের স্বাদ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(কপালকুণ্ডলা ও চোখের বালি)

আমার জীবনে প্রথম উপন্যাসের স্বাদ ও আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের স্মৃতি স্মরণ করতে বসে সুরুতেই বলে রাখি যে, জীবনে প্রথম যে-উপন্যাসের মধ্যে থেকে এই আশ্চর্য স্বাদ উপন্যাসের স্বারা পেয়েছিলাম, সে উপন্যাসখানির নাম কপাল কুণ্ডলা, সেখানি আমি পড়ি নি, শুনেছিলাম। এবং রবীন্দ্রনাথের যে-উপন্যাসের স্বাদ প্রথম গ্রহণ করেছি, তার নাম হল চোখের বালি। সেখানি পড়েছিলাম।

সে-স্বাদ কেমন যদি এ কেউ প্রশ্ন করে, তবে সে স্বাদের স্বরূপ সঠিক বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারব না। এমন কি যদি বলি নিজে স্বাদগ্রহণ করে দেখ, যেমনটি তোমার লাগবে, বা যদি তুমি সে স্বাদ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করে থাক—তবে তোমার যেমন লেগেছে ঠিক তেমনিই লেগেছিল বললেও ভুল বলা হবে। কারণ প্রথম আস্বাদনের সে অপরূপত্ব অনেক বই পড়ার পরে তুমি নাও পেতে পার। একটা কথা মনে পড়ছে।

আমার মনের মধ্যে একটি কালো মেয়ের ছবি আছে। মুখখানা অস্পষ্ট কিন্তু তার চোখ দুটি ডাগর এবং এক রাশ চুল আছে তার। কিশোরী মেয়ে। সে যে কে? এবং কোন শৈশবে আমার সামনে এসে কিভাবে আমার অবচেতনে ছায়া-ছবির মত ছায়াছাপ ফেলে গেছে, তা জানি নে, কিন্তু সময়ে-অসময়ে জাগ্রত বা নিদ্রিত যে অবস্থাই হোক আমার তার মধ্যেই সে এসে আমার চিত্তলোকে একটি শিহরনের সাড়া তুলে দিয়ে যায়।

কপালকুণ্ডলার প্রথম আস্বাদনের স্মৃতি ঠিক ওই মেয়েটির ছবির মত। তবে তফাৎ এই যে, কপালকুণ্ডলার স্বাদ আরও কয়েকবার গ্রহণ করেছি। সে মেয়ে আমার মানসবিহারিণী হয়েই রইল তার সঙ্গে চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ পরিচয় কখনও হল না। তার জন্য আক্ষেপ নেই, তাই হয়তো ভাল।

প্রথম উপন্যাসের স্বাদের সঙ্গে আমার মনের ওই ছবিরূপিণীর স্মৃতির তুলনা করে ভুল করলাম কিনা জানি নে, তবে অসম্মান যে কাউকেই করি নি, তার প্রধান সাক্ষী আমার অন্তরাত্মা। আমার সাহিত্য-প্রেম ও আমার জীবনপ্রেমের নাম নিয়েই একথা বলতে পারি। আমার উপন্যাসে কটি কালো মেয়ে আছে সে হিসাব আমি করব না এখানে, তবে কপালকুণ্ডলার রূপের কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে লজ্জাভয়ে কোনও অন্ধকার কোণে সে লুকিয়েছিল এই কথাটা আগেই বলে রাখছি।

আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস, আমি পড়ি নি, আমি শুনেছিলাম। আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন আমার মা। প্রথম উপন্যাস আমার কাছে ঠিক সেই বালিকাটির মত। ঝাপসা হলেও একটি অবিস্মরণীয় ছাপ মনে এঁকে রেখেছে।

তখন আমার বাল্যাবস্থা। বয়স খুব বেশী হলে নয়-দশের বেশী নয়। উপন্যাস বুঝবার কথা বিবেচনা করতে গেলে ওই শিশু অবচেতনের ওই মেয়েটির ছবির ছায়াপাতের তুলনাই মনে জেগে ওঠে। তাই ওই কথা দিয়েই ভূমিকা করেছি। সে এক গ্রীষ্মকালের রাত্রি। এবং রাত্রি তখন অনেক। খোলা জানলা দিয়ে বাড়ীর পশ্চিম দিকে ঠাকুরবাড়ীর শিবমন্দিরগুলির চূড়ার উপর অনেক ঊর্ধ্বলোকে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। এখানে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

ছেলেবেলা আমি মানুষ হয়েছি, এক-দিনে স্বামীসন্তানহারা আমার পিসীমার কাছে। তিন বছর বয়স থেকে তাঁর কোলের কাছটিতে শুতাম। না-হলে আমার ঘুম আসত না। সে-সময় তিনি কোথায় কোন তীর্থস্থানে গিয়েছিলেন। সম্ভবত দশহরায় গঙ্গাস্নানে, আমি বাধ্য হয়ে শুয়েছিলাম মায়ের কাছে। কিন্তু ঘুম আসে নি। বা একচটকা ঘুম এসেই সেটা ভেঙে গেছে, আমি চোখ মেলে খোলা জানলার ওপারে মন্দিরের চূড়ার ঊর্ধ্বলোকে তারাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। রাত্রি অনেক হয়েছিল। এরই মধ্যে কখন উঠে বসেছিলাম, একান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে। এবং একটি নিবিড় বেদনাবোধে অধীর হয়ে উঠেছিলাম। এই অধীরতায় কিভাবে কোন শব্দ করে বা নাড়া দিয়ে মাকে জাগিয়ে তুলেছিলাম মনে পড়ছে না, তবে মা জেগে উঠেছিলেন এবং আমি জেগে বসে আছি দেখে তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—ঘুম আসছে না?

বলেছিলাম, না। একটা গল্প বলো।

গল্পে কোন ছেলের না রুচি থাকে, তবে রুচিরও প্রকারভেদ আছে, আকর্ষণের কম-বেশী আছে। যেমন গল্প এবং মিষ্টান্নের মধ্যে কারও মিষ্টান্ন প্রিয় হয়, কেউ মিষ্টান্ন ছেড়ে গল্প শুনতে চায়। কোন ছেলের হাতে মোয়া দিয়ে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় — আমাকে গল্প বলে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত অনায়াসে। পিসীমার অভাবে আমার ঘুম আসছিল না, কিন্তু পিসীমাকে ভোলাতে পারত একমাত্র গল্প অন্য কিছু নয়। সে সত্য মা জানতেন ও মানতেন বলেই আমার গল্পের অনুরোধটা প্রত্যাখান না-করে ঈষৎ হেসে বলেছিলেন—গল্প?

—হ্যাঁ, গল্প।

—পিসীমাকে ভোলাতে পারে এমন গল্প! এ্যাঁ?

হ্যাঁ, মুখে বলিনি কিন্তু সর্বাঙ্গ নিঃশব্দে তাতে সায় দিয়ে হ্যাঁ শুনেছিল।

মাও উঠে বসেছিলেন এবং আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, গল্প! খুব ভাল গল্প!

আমার মা ছিলেন এক অসাধারণ মা। অন্য বিষয়ে অসাধারণত্বের কথা থাক, গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণত্ব এমনি ছিল যে, প্রতিদিন গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীর উঠোনে এবং শীতের দিন আমাদের রান্না-ঘরের উনোনের আগুনের উত্তাপ-তপ্ত বারান্দায় পাড়াঘরের বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী বালিকা-দের একটি ভিড় এসে তাঁকে ঘিরে বসত। গরমের সময় আমাদের দেশের নিজস্ব পাখা যাকে আমরা 'পাখা' বলে থাকি, তাই যুবত বয়স্কা শ্রোত্রীদের হাতে তার একটা কাঁচ-কাঁচ শব্দ উঠত, মধ্যে কারও কোলে শিশু কেঁদে উঠত, নইলে আর কোন শব্দ উঠত না। কখনও-কখনও অন্য বাড়ী থেকে কেউ এসে ডাকত, "ওগো বউঠাকরুণ, তোমাকে ডাকছে যে গো! বলি শুনছ!" কিন্তু উত্তর কেউ দিত না। আর মধ্যে-মধ্যে সমবেত শ্রোতাদের বুক চিরে বেরিয়ে আসত কতক-গুলো ধ্বনি। কখন আঃ! হায়! হায়! কখনও বেরিয়ে আসত 'আচ্ছা হয়েছে'। অর্থাৎ বৃদ্ধা থেকে আমার তখনকার বয়সের বালক-কে পর্যন্ত সমান মুগ্ধ করে রাখতেন তিনি।

সে রাত্রে খুব ভাল গল্প শুনবার জন্য যখন প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিলাম, তখনই কিন্তু মা আমাকে নিরাশ করে বলেছিলেন, তাহলে গল্প পড়ে শোনাই। শোন।

বলে ঘরের কোণ থেকে হ্যারিকেনের আলোটা তুলে নিয়ে উস্কে উজ্জ্বল করে নিয়ে আলমারি খুলে একখানা বই বের করে এনেছিলেন। বইখানার চেহারা আমার আজও মনে আছে। লাল মার্বেল পেপার দিয়ে বাঁধানো বই, পুষ্ট এবং দুই মলাটের চারটে কোণ মোম দিয়ে মাজা, নীলচে কাপড় দিয়ে মোড়া। বইগুলি ছিল আমার বাবার। আমার বাবা তখন গত হয়েছেন। মা স্বামীর পুস্তকসংগ্রহটিকে যত্ন করে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। সেই বইখানা বের করে এনে লণ্ঠনটা সামনে রেখে বলে-ছিলেন, শোন, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা।

প্রস্তাবটা প্রথম আমার ভাল লাগে নি। মনে হয়েছিল মায়ের গল্পের চেয়ে কি ভাল গল্প হয়?

"প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল: কিন্তু এই নৌকা সঙ্গীহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রি শেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্তব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিক নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছিল।"

প্রথমেই মন আকৃষ্ট হয়ে প্রত্যাশা করে বসেছিলাম, দস্যুরা এসে নৌকা আক্রমণ করবে। এবং নবকুমারকে পেয়ে ভেবেছিলাম—নবকুমার ঘোরতর যুদ্ধ করবে। নবকুমারের সংস্কৃত শ্লোক বুঝতে পারি নি। এবং পরিচ্ছেদ শেষে ডাঙা পেয়ে—যখন ডাঙায় নৌকো বেঁধে রান্না করা শুরু হল—তখন মনটা কেমন যেন ম্লান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নবকুমার যখন কুড়ুল কাঁধে নিয়ে কাঠের সন্ধানে বনের মুখে চলতে শুরু করলে তখন মন আবার সজীব, সজাগ এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে বালিয়াড়ি ভেঙে উপরে উঠেছি। বালিয়াড়ির উপর সেই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অগ্নি-কুণ্ডের সামনে সেই কাপালিককে বসে থাকতে দেখেছি। তার সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন—কস্ত্বং যেন সত্য-সত্য শুনলাম। যেন আমিই উত্তর দিলাম। ব্রাহ্মণ। কাপালিক বললেন—তিষ্ঠ!

তারপর নবকুমারের পিছনে-পিছনে এসে সমুদ্রতটে দাঁড়ালাম। সমুদ্রকে দেখলাম। সে সমুদ্র কেমন আজ আর মনে নেই। কারণ সমুদ্রজলের নীল রঙ না-দেখা পর্যন্ত কল্পনায় তাকে বাস্তবের সঙ্গে মেলানো যায় না।

নবকুমারের সঙ্গে পথ হারালাম। বুকের ভিতর একটা উদ্বেগ গাঢ় হয়ে উঠল। পীড়িত করতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে অবাক হয়ে গেলাম।

"ফিরিবামাত্র দেখিলেন—অপূর্ব মূর্তি। সেই গাম্ভীর্যনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি। কেশভার—আবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত রাশীকৃত, আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের মত দেখা যাইতেছে।"

শৈশবে কোন কালো মেয়ে আমার মনে যে ছায়াপাত করে থাক তবুও সে সে-দিন তার কালো রূপ নিয়ে আমার মনে কপালকুণ্ডলা রূপিণী হয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। ওই যে আশ্চর্য বর্ণনা—

কেশভার — অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন...। মূর্তি মধ্যে যে একটি মোহিনী-শক্তি ছিল তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ...... !"

এই বর্ণনার মধ্যে ব্যবহৃত অবেণী-সংবদ্ধ সংসর্পিত প্রভৃতি শব্দগুলির আক্ষরিক মানে না বুঝেও সমস্ত বর্ণনাটুকুর মধ্য থেকে এমনভাবে একটি নারী-মূর্তি রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল যে, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা রাশিকৃত রুখু এলোচুল পিঠে ফেলা, লাল পেড়ে শাড়ীকাপড় পরা (কেন জানি না) গৌরাঙ্গিনী কপালকুণ্ডলাই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং অবাক হয়ে আমি তার ডাগর চোখ দুটির পানে তাকিয়েছিলাম। কপালকুণ্ডলা আমাকে প্রশ্ন করেছিল—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?

"এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠিল।"

শুধু নবকুমারের নয়, আমার মনের মধ্যেও বীণা বেজে উঠেছিল সেদিন। ধ্বনি থেকে যেমন বিচিত্র প্রাকৃতিক সংস্থান ও ভৌগোলিক অবস্থান শব্দকে প্রতিহত করে, প্রতিধ্বনি তুলে থাকে, তেমনিভাবেই আমার অন্তরলোকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠেছিল।

আজও সে ছবি মন থেকে মুছে যায় নি। আজও চোখ বুজলে মনের মধ্যে হঠাৎ ভেসে ওঠে ধু-ধু-করা জনহীন বালুচর, কিছু-কিছু ঝাউগাছ, তারপরে সমুদ্র; সেই দিগন্তে অস্তমান সূর্যের শেষ-রশ্মি কিছুটা আছে আকাশে, কিছু সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে মাথায়-মাথায় নাচছে, কিছু জলে গলিত হয়ে মিশে গেছে, তারই রঙ মুখে মেখে দাঁড়িয়ে আছে "অপূর্ব নারী মূর্তি। কেশভার অবেণী-সংবদ্ধ, সংসর্পিত রাশিকৃত আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন।" সে গৌরাঙ্গিনী, আয়তলোচনা। পরনে তার লাল পেড়ে শাড়ী।

আশ্চর্য সে গল্পের আচ্ছন্নতা।

সম্ভবত মা আমার সেদিন অবশিষ্ট রাত্রির সময়টা অনুমানে মেপে নিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসেছিলেন; হয়তো ছেলের সঙ্গে তিনিও অবশিষ্ট রাত্রিটা ওই গল্পের আচ্ছন্নতার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। বই শেষের সঙ্গে রাত্রি শেষ হবে। রাত্রি চলছিল পাখায় ভর দিয়ে।

মা আমার সপ্তর্ষি মণ্ডলের পাক-খাওয়া দেখে রাত্রি অনুমান করতে পারতেন। সপ্তর্ষি মণ্ডল পাক খেয়ে ঘোরে। তিনি বারেকের জন্য আকাশের দিকে তাকান নি. পড়ে যাচ্ছিলেন। কপালকুণ্ডলা খড়্গ অপহরণ করে বুনো লতায় বাঁধা নবকুমারকে মুক্ত করে নিয়ে বনহরিণীর মত লঘু পদ-ক্ষেপে ছুটে চলল পথ দেখিয়ে; নবকুমার অনুসরণ করলে। তার সঙ্গে আমিও ছুটেছিলাম। তারপর অধিকারীর কালী-মন্দিরে এসে মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে মায়ের সম্মতি নেওয়া হল। ওদিকে একটা খাড়া বালিয়াড়ি ভেঙে মাথায় চড়তে গিয়ে বালিয়াড়ি ধসে কাপালিক নীচে এসে পড়ল বনমহিষের মত।

সেদিন সেই রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা আমার মনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটে-ঘটে চলেছিল. ভাব থেকে ভাবান্তরে. চলেছিল আমার মন। সে যেন এই বাস্তব জগতের চেয়েও এক অধিকতর বাস্তব ও বিচিত্র জগতে মন আমার পরিভ্রমণ করে ফিরছিল পথিকের মত, যাত্রীর মত; শুধু তাই নয়, আমার মন, আত্মিক সত্তা যেন কপালকুণ্ডলার সংঘটনের কালটা জুড়ে বেড়ে বড় হয়ে উঠছিল। যেন অঙ্কুরের মত দুটি পাতা তারপর চারটি পাতা, তারপর ছটি, তারপর দুটি ডাল মেলে মাথা তুলে বড় হয়েও উঠছিল।

ক্ষণে-ক্ষণে উৎকণ্ঠিত চমকে চমকে উঠছিলাম। অন্ধকার সন্ধ্যায় আকাশে ঝড় উঠল।

"শীতকালে অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।" নবকুমারের সঙ্গে দ্রুতবেগে আমিও চলেছিলাম। হঠাৎ নব-কুমারের সঙ্গে আমিও চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালাম।

"অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণস্পর্শ হইল।" সেটা ভগ্ন শিবিকা। নবকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কেহ জীবিত আছে?" মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, আছি। নবকুমার কহিলেন, কে তুমি? উত্তর হইল, তুমি কে? নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কপালকুণ্ডলা না কি? স্ত্রীলোক কহিল, কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না. আমি পথিক আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

আশ্চর্য! মনের মধ্যে যেন অলাতরূপ একটা বিপদ-বিপর্যয় মাথায় করে কে যেন হেসে উঠল। সে এক আশ্চর্য মেয়ে। সমস্ত মন চনমন করে ওঠে, চমকে উঠে। প্রশ্ন জাগে কে এই রহস্যময়ী? মনে প্রশ্ন জাগে কে বড়? কপালকুণ্ডলা, না এই রহস্যময়ী। এ প্রশ্নের উত্তর বইখানি জুড়েই দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখনও রহস্যময়ীর পরিচয় পাই নি। তবু বুঝতে বিলম্ব হয় নি, নব-কুমারকে মাঝখানে রেখে দুটি বিচিত্র নারীর যে দ্বন্দ্ব হবে, সে দ্বন্দ্ব আরও বিচিত্র, বহু বিচিত্র।

সে সংগ্রামের আরম্ভ অতিবিচিত্র। চটীতে তাকে পৌঁছে দিয়ে কপালকুণ্ডলার সংবাদ নিয়ে যখন নবকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন সেই রমণীর দিকে তাকিয়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন, বিভ্রান্ত হলেন, "নবকুমার নিমেষশূন্য চক্ষে" তাকিয়ে রইলেন। রমণীর "মুখকান্তি মধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্বত্রগামিনী

বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মপরিচয়। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন; তখন সহজেই বোধ হইত তিনি রমণীকুল রাজ্ঞী।" "সুন্দরী" নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ? নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন, "আপনি কি কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

● ● ●

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল। তিনিও সগর্বে কহিলেন—একটিও না; এমত বলিতে পারি না।

উত্তরকারিণী কহিলেন, তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী?

নব—কেন? গৃহিণী ভাবিতেছেন কেন?

স্ত্রী—বাঙালীরা আপন গৃহিণীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।"

এরই মধ্য দিয়ে যখন প্রশ্ন হল, "মহাশয় বাগবৈদগ্ধে আমার পরিচয় লইলেন। আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?"

এ বাকভঙ্গিমা অদ্বিতীয় এবং সম্পূর্ণ রূপে বিদগ্ধ ও নাগরিক। কিন্তু সেই রাত্রির শেষপ্রহরে এমনই একটি মহিমান্বিত লেখকের লেখার দীপ্তি আমার অন্তরকে আলোকিত করে তুলেছিল যে, বুঝতে এতটুকু বাধা হয় নি।

তারপর?

তারপর সে বিচিত্র বাক্যালাপ, সে বিচিত্র সংঘটন আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। হয়তো বা উপন্যাস রচনার বীজটি সেদিন সেইক্ষণে আমার মনের মধ্যে ঝরে পড়েছিল।

অথবা সেই যে দীপ্তি, সেই দীপ্তি আমার মনে দিয়েছিল আলো জেলে, মনে করিয়ে দিই কথোপকথনগুলি।

"নবকুমার কহিলেন, আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?

নবকুমার কহিলেন, নবকুমার শর্মা।

কিন্তু সে শিখা আর একটি প্রদীপের সলতের মুখে আলো জ্বালিয়ে দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে মতিবিবি বঁধু দিয়ে নিজের হাতে উজ্জ্বল করে তোলা আলোয় শিখা নিভিয়ে দিলে কিন্তু সেদিন তৎক্ষণে বোধহয় আর এক স্থানে আর একটি নতুন প্রদীপে সেই শিখা থেকে আলো নিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল কেউ। অথবা আমি নিজেই জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম। মানুষের জীবন, বিশেষ করে যাঁরা কীর্তিমান, তাঁর জীবন কীর্তির আলো দিয়ে দীপান্বিতার মালা সাজিয়ে দিয়ে যায় এই সর্বগ্রাস-করা, সবমুছে-দেওয়া মহাকালের পিছনে ফেলা নিবিড়তর অন্ধকারের মধ্যে। মহাকালের সামনের দিকে তার ললাটের তেজের দীপ্তিতে বর্তমানের আলো। তার পিছনে ভূত-কালে তাঁরই দেহের ফেলা অন্ধকার। তাতে সব ডুবে যায়। মুছে যায়। কিন্তু এই কীর্তিমানের কীর্তির অমৃতপ্রদীপগুলি সেদিনের রাত্রির আকাশের নক্ষত্ররাজির মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে। বর্তমানের কালের মানুষকে নিজের প্রদীপে ওই আলো থেকেই জ্বালিয়ে নিতে হয়। আমি বোধ করি সেই রাত্রে ওই আলো জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম।

তারপর—। বয়স বাড়ল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় হতে দেরী হয়েছিল। আমাদের দেশে বইয়ের অভাব ছিল। যখন বয়স হল ষোল-সতেরো বছর, যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, তখন পরিচয় হল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সঙ্গে। তার আগে তাঁর 'কথা ও কাহিনী' এবং 'কল্পনা', 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এবং কথা ও কাহিনী কাব্য হলেও ছন্দে গাঁথা ছোটগল্প বা কাহিকা। তার স্বাদ পেয়েছি, সে স্বাদ বঙ্কিমের মধ্যে পাই নি। বিন্দুতে সিন্ধুকে দর্শন করার একটা সাধনা আছে। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর গাথাগুলির মধ্যে পাঠকের বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন হয় বিনা সাধনায়। সে সিন্ধু লবণাক্ত নয়, সে সিন্ধু অমৃতসিন্ধু।

যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, তখন আমাদের ওখানে লাইব্রেরী স্থাপিত হল। সেই লাইব্রেরী থেকে প্রথম পড়লাম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তারপর উপন্যাস।

প্রথম উপন্যাস পড়েছিলাম—"চোখের বালি"।

নিষিদ্ধ ফলের মত। অপহরণ করে কোনমতে গলাধঃকরণের মতই তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করতে হয়েছিল। এইটুকু মনে পড়ে—বিনোদিনীর জন্য চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছিল।

মহেন্দ্র হতে আমি চাই নি। বিহারী হতে চেয়েছি কিন্তু তাতেও অতৃপ্তি ছিল। আমি পেতে চেয়েছিলাম বিনোদিনীকে। আজও বিনোদিনীর জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। আমার মনের কালো মেয়েটি অভিমান করে—কোনদিন কোনদিন অকৌতুকে ...।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জ্ঞান হবার পর থেকেই ত আবিষ্কারের পালা সুরু। সেই আবিষ্কার করতে করতেই চলা।

আবিষ্কার সব কিছুকে, নিজের আপনজন থেকে যেমন অজানা অচেনাকে, নিজের সীমানাটুকু ছাড়িয়ে তেমনি দূর দিগন্ত।

সমতল দেশে যে বেড়ে উঠেছে সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে একদিন উত্তুংগ পাহাড়ের মহিমা। পাহাড় ছাড়া যে কিছু চেনে না সে বোঝে প্রায় অসীম সমুদ্র-বিস্তারের বিহ্বল করা সাক্ষাৎ।

এই সব আবিষ্কারের বিস্ময় উত্তেজনা আর প্রভাব প্রতিক্রিয়াতেই আমাদের চেতনা বিস্তৃত হয়, কাঠাম তৈরী হয় আমাদের সত্তার।

এ সাক্ষাৎ সংঘর্ষ আবিষ্কার কিন্তু শুধু বাইরের জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা আরো বেশী করে আমাদের মনের জগতেরই ঘটনা। হাওয়ায় যেমন বজ্র-বিদ্যুৎ ভরা ঝোড়ো মেঘ কি দূর বনের সুগন্ধ, তেমনি কোথা থেকে আমাদের মনের আকাশে কখন আচমকা অজানা সব ভাবনা কল্পনা এসে আমাদের সত্তাকে আমূল নাড়া দিয়ে যায়।

আবিষ্কার করবার এই যে আরেক আশ্চর্য জগৎ, তা আমাদের জন্যে কোনো দূর দিগন্তে অপেক্ষা করে থাকে না, থাকে আমাদেরই চারিধারে বলতে গেলে একেবারে হাতের কাছে অক্ষরের রহস্যপুরীতে।

একটু কাব্য করলাম বটে, কিন্তু তাতেও সাহিত্যের জগতের সংগে আমাদের জীবনের গভীর গহন সম্পর্কের রহস্যবিস্ময় ঠিক মত বোঝাতে পারলাম কি না সন্দেহ।

সেই আদি যুগে কি হত জানি না, কিন্তু এই বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের মনের ভাবনা চিন্তা কল্পনার অর্ধেক উপাদান ও প্রেরণা যোগায় অক্ষরবন্দী সাহিত্য। জীবনের স্বরূপ খোঁজবার বোঝবার পাঠ আমরা বারো আনা সাহিত্য থেকেই পাই।

সে সাহিত্যের সংগে প্রথম পরিচয় জীবনের একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিশেষ করে সে সাহিত্য যদি মহৎ কোন স্রষ্টার হয়।

আমার প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের যে গল্পটির সঙ্গে, এক এক সময়ে মনে হয়, আমার জীবন-বোধ জাগ্রত করা ও সাহিত্য-বিচারের নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে সে গল্পটির যেন নিয়তির ভূমিকাই একটু আছে।

গল্পটির নাম রাসমণির ছেলে। অপেক্ষাকৃত পরিণত মন নিয়ে সত্যকার সাহিত্যের গল্প সেই আমি প্রথম পড়ি।

ইতিপূর্বে বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের কিছু পড়িনি এমন নয়। বেশীর ভাগই তা উপন্যাস জাতীয়। শরৎচন্দ্রের তখনও আবির্ভাব হয়নি। 'যমুনা' কাগজে হয়ত তাঁর লেখা তখন প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। আমার চোখে তা পড়বার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ত বটেই বাংলায় পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যকাহিনীও বোধহয় বাদ যায়নি। ইংরাজিতে জুল্ ভার্ন তখন আমার প্রিয় লেখক।

এ সমস্ত লেখা শুধু গল্পের কৌতূহলেই পড়েছি। কাহিনীর জগতের সংগে সত্যকার জগতের কোনো সম্পর্কের কথা মনে ওঠেনি। জীবন-ভাবনা যাকে বলে কোন কাহিনীই তা আমার মধ্যে জাগায় নি।

হঠাৎ একদিন কি ভাবে মনে নেই রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি হাতে পড়ার পর তন্ময় হয়ে পড়ে ফেলে এক বেলায় যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। এক হিসেবে ছেলেমানুষ থেকে মানুষ হলাম সেই দিনটিতে।

গল্পটি পড়বার পর কেমন যেন একটা হতাশ বেদনায় অভিভূত হয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু সেই হতাশ বেদনার এমন এক অদম্য আকর্ষণ থাকতে পারে কে জানত! সেই নিরুপায় কাতরতাটুকু ভোগ করবার জন্যেই সেইদিনই আরো কয়েকবার যে গল্পটি পড়েছিলাম মনে আছে। পড়েছি তারপরেও অনেকবার।

মনের হতাশ বেদনা থেকেই তারপর অদ্ভুত সব প্রশ্ন উঠতে সুরু করেছে। সেই প্রথমে শুধু জীবন সম্বন্ধেই অমন তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হয়েছি।

রাসমণির ছেলে কালীপদর প্রতি এ গল্পের গোড়ার দিকে তেমন মনোযোগ দিইনি। স্বয়ং লেখকই তাকে যেন অবহেলা করেছেন। তারপর পাখার হাওয়া খাওয়া মেমপুতুলের প্রতি কালীপদর দারুণ লোভের কথা যখন জানা গেল তখনও বালক-চরিত্র-

টিকে অমন নিষ্ঠুর পরিণামের দিকে লেখক যে নিয়ে চলেছেন তা ভাবতে পারিনি।

কলকাতায় একটি মেসের নিচের তলার স্যাতসেঁতে একটি ঘরে শুধু নিজের পড়াশুনায় একান্তভাবে সমর্পিত কালীপদর প্রতি তাঁর সহানুভূতি যখন জেগেছে তখন কাহিনী জগতের চিরন্তন বিধিতে গল্পের সমাপ্তিতে তার একটা মধুর সাফল্য অবধারিত বলে বিশ্বাস করেছি। যে বিশ্বাস কল্পনাতীত আঘাতে চূর্ণ করে শেষ কটি ছত্রে লেখক আমাকে শুধু বেদনাকাতর নয় বিমূঢ় বিহ্বল করে দিয়েছেন।

এ কি অন্যায় অযৌক্তিক আঘাত! এ কি প্রবঞ্চনা আমার সরল বিশ্বাসী পাঠক মনের সঙ্গে।

কিন্তু এ প্রবঞ্চনা কার? শুধু কি লেখকের! প্রথম সেই অনুভব করেছি যে লেখকের কলমের ভেতর সঙ্গোপন থেকে জীবনই যেন মোহভঙ্গের নিষ্ঠুর আঘাত আমাকে দিয়েছে।

প্রবঞ্চনা যদি হয়, এ প্রবঞ্চনা জীবনের, যা আমাদের সাজানো গল্পের জগতের কোনো আইনকানুনের তোয়াক্কা রাখে না। সাহিত্যের কলমে লেখা গল্প যে জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পৌঁছে দিয়েছে তার মধ্যেই অসামান্য স্রষ্টার কৃতিত্ব।

সাধারণ কারো লেখা হলে কালীপদর এ ধরনের পরিণামও সাময়িক একটু বিক্ষোভ বেদনা জাগানো ছাড়া আর কিছুই বোধহয় করত না। কল্পিত চরিত্র হিসেবে তা অচিরে মনের অস্পষ্ট কুয়াশায় মুছে যেত কোনো জ্বলন্ত প্রশ্ন সেখানে না রেখে।

কিন্তু কালীপদর প্রতি লেখক ও ভাগ্যের অন্যায় অবিচার বলে না মনে করে যা পারিনি সেই পরিণাম একটি কল্পিত চরিত্রের ট্র্যাজিডি থেকে ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা সমস্ত জীবনের প্রশ্নে প্রসারিত করে দিয়েছে।

জীবনের লাভ ক্ষতি পুরস্কার শাস্তি সবই কি এমনি অযৌক্তিক অর্থহীন কোনো স্রষ্টার খেয়াল মাত্র।

রাসমণির ছেলে গল্পে এ প্রশ্নের উত্তর নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সমস্ত লেখায় এ প্রশ্ন ত বটেই আরো অনেক গভীর ও কঠিন প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার সংকেত সার বেঁধে আছে।

গল্প শোনার বিলাসকে জীবন-জিজ্ঞাসার ক্ষুব্ধ অস্থিরতায় পৌঁছে দেবার জন্যে বিহ্বল বিমূঢ় মনে সেই প্রথম দিনেই তাঁকে কৃতজ্ঞতা বোধহয় জানাইনি, কিন্তু গল্প লেখা ব্যাপারটাকে একটু নতুন দৃষ্টিতে দেখার সূত্রপাত সেদিনই হয়েছিল।

জীবনের দুর্জ্ঞেয় গতিপ্রকৃতির কথা ভাবাবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেদিন গল্প সাহিত্যের শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধেও মনকে সচেতন করেছিলেন।

রাসমণির ছেলে গল্পটি বার বার পড়তে পড়তে সমস্ত কাহিনীটির বিন্যাস পংক্তিতে পংক্তিতে তারপর অনুসরণ করেছি।

তখন যা মনে হয়েছিল তা থেকে আজকের দিনের নতুন করে পড়ার ধারণা হয়ত বেশ একটু আলাদা, তবু সেদিনকার মনের প্রতিক্রিয়াটা যতদূর স্মরণ আছে একটু বর্ণনা করা বোধহয় নিরর্থক হবে না।

ছাপার অক্ষরে গল্পকে একটা শিরোনামা সবার আগে সামনে ধরতে হয়। রাসমণির ছেলে নামটা তাই গল্প পড়া শুরু করবার আগেই যেন মনটাকে তৈরী করে নেবার নোটিশ দেয়।

ছাপা গল্প না হলে লেখক বোধহয় এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নাম বিজ্ঞাপিত করে গল্প সুরু করতে রাজী হবেন না, অন্ততঃ রাসমণির ছেলের মত গল্পের বেলায় ত নয়ই। কারণ একবার প্রথম লাইনে একটু উল্লেখ ছাড়া বেশ কয়েক পাতা এগিয়ে যাওয়ার পরও রাসমণির ছেলের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় হয় না। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মানুষের লোভ নীচতা ও শঠতার এবং সেই সঙ্গে সরলতা ও মহত্ত্বেরও একটি জটিল বিবরণ সহজবোধ্য করে প্রকাশ করার উৎসাহে লেখক যেন রাসমণির ছেলের কথা ভুলেই গেছেন মনে হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পাই বটে কিন্তু রচয়িতা তখনও ছেলের পিতা ভবাণীচরণকে নিয়েই ব্যস্ত। এমন কি যার ছেলেকে নিয়ে গল্প সেই রাসমণির কথা একটু বলবার অবসরও তিনি তখনও পাননি।

সত্যি কথা বলতে গেলে রচয়িতাকে আমার একটু অন্যমনস্কই তখন মনে হয়েছিল। কাহিনীর একটি সূত্র ধরে কোথায় তিনি যাবেন তা যেন তাঁর নিজেরই ঠিক জানা নেই। উইল চুরির ব্যাপারে শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা, বিরজাসুন্দরীর হতাশা, ভবানীচরণের সরল বিশ্বাস, এইসব ফুটিয়ে তোলার চেয়ে সুদূর লক্ষ্য তাঁর কিছু নেই বলেই মনে হয়। এঁদের পালা শেষ হলে রাসমণি ও ভবানীচরণকে নিয়ে পড়বার পরও তিনি যেন একটা বড় উপন্যাসের ভূমিকা ফাঁদতে চান বলে সন্দেহ জাগে। রাসমণির চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাঁর যে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ রূপরেখা লেখক আমাদের সামনে মেলে ধরেন ছোট বা বড় গল্পের সীমাবদ্ধ প্রয়োজনের কোন শাসন তা মানে না।

কাহিনী এরপর নিজের মেজাজ আর মর্জিমাফিক যেন ইচ্ছামত বাঁক নিয়ে নিয়ে অলস মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে। কখনো মনে হয় সরল নিরীহ অক্ষম দরিদ্র ভবানীচরণের বাৎসল্য ব্যাকুল-তার করুণ ট্র্যাজিডি ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই এতক্ষণের বিস্তারিত আয়োজন! কখনো বা রাসমণির মমতা করুণা ও কঠিন কর্তব্যবুদ্ধির কোমলে কঠোরে মেশানো চরিত্রের পুত্রস্নেহ ও পতিভক্তির বিচিত্র প্রকাশেই গল্পের সার্থকতা বলে অনুমান হয়। গল্প কিন্তু তবু থামে না। চুরি হওয়া উইলের কথা এক আধবার ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কাহিনীকার রাসমণির ছেলেকে শুধু বয়সে নয় শুভবুদ্ধি বিচক্ষণতা ও দায়িত্ববোধে বড় করে তুলে কলকাতায় উদাসীন জনারণ্যে জীবনের সাফল্যের জন্যে কঠোর সাধনা করতে পাঠান। সেখানে তার অকারণ নির্যাতনের বিবরণে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হতে হতে আমরা এক আশ্চর্য ঘটনা সন্নিপাতের কথা জানতে পারি। কিন্তু সে ঘটনা সন্নিপাত যে শেষ পর্যন্ত অমন নিষ্ঠুর দুঃসহ পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্যেই উদ্ভাসিত তা তখনও কল্পনা করতে পারি না বোধহয়।

কাহিনীকার রাসমণির ছেলে কালীপদর দুর্ভাগ্য নিয়ে আরো কিছুক্ষণ সময় কাটান আশা নিরাশার দোলায় আমাদের দুলিয়ে রেখে। চুরি হয়ে যাওয়া উইলের প্রসঙ্গ আরো একবার উঁকি দিয়ে যায় কলকাতার মেসে কালীপদর নির্যাতনে যে নাটের গুরু সেই শৈলেন্দ্রর যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটনের ভেতর দিয়ে। যে শ্যামাচরণ উইল চুরি করে বৈমাত্র ভ্রাতা ভবানীচরণকে ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল শৈলেন্দ্র তারই পৌত্র।

আত্মগ্লানিতে শৈলেন্দ্রর এক মহৎ রূপান্তর এরপর আমরা দেখি কিন্তু তা শুধু ভাগ্যের শেষ তিক্ত পরিহাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়।

আমাদের গভীর বেদনাবিমূঢ়-বিহ্বল করে রাসমণির ছেলে কালীপদই মারা যায়, আর অনুশোচনায় দগ্ধ শৈলেন্দ্র রাতের অন্ধকারে তাদের পরিবারের চুরি করা উইল ভবানীচরণকে ফেরৎ দিয়ে যায়।

সত্যি কথা আজ স্বীকার করছি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই পাওয়া সাহিত্য-বোধে গল্পের এ পরিণতি সেদিন সমর্থন করতে পারি নি।

মনে হয়েছিল একটা চুরি যাওয়া উইল নিয়ে ভাগ্যের পরিহাস তীব্র তিক্ত করে তোলবার জন্যে লেখক বড় বেশী অন্যায় স্বাধীনতা নিয়েছেন। কালীপদকে না মেরে শেষ পরিচ্ছেদে ভবানীচরণকেই তাঁর আশা পূরণের কিনারায় এনে মেরে ফেললে একই উদ্দেশ্য সাধিত হত না কি এত ব্যাকুল প্রত্যাশার উইল পাওয়াকে নিরর্থক করে দিয়ে?

আজ কিন্তু মনে হয় তা বোধহয় হত না।—

গল্প যেখানে সাজানো ছকের বাইরে জীবনের আদল অনুসরণ করে দুর্বোধ গতিতে চলে সেখানে ভাগ্যের পরিহাসের চেয়ে আরো গভীর দুর্জ্ঞেয় কোন তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলতে রাসমণির ছেলেকেই মরতে হয়।

বাল্যস্মৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধদেব বসু

একবার, আমার বয়স যখন বছর নয়েক, নোয়াখালি জেলায় জলপথে নৌকোতে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলুম। আঁকাবাঁকা সরু খাল, দু-পাশে গাছপালা এত ঘন যে দুপুরবেলাতেও আধো-অন্ধকার হ'য়ে থাকে। মাঝে-মাঝে গ্রাম, খড়ের চাল, টিনের ঘর, উলঙ্গ শিশু, ঘাটে বাসন মাজতে বা নাইতে-আসা মেয়ে, 'হ' ও 'খ' ব্যঞ্জনের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ্য উচ্চারণসমন্বিত নোয়াখালির গ্রাম্য ভাষা, জলের গন্ধ, জলজ উদ্ভিদের গন্ধ, নৌকোর দুলুনি—এই সবের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি ঘণ্টা ধ'রে যেতে-যেতে আমি যে-চামড়ায় বাঁধানো বইখানা পড়ছিলুম, তারই জন্যে এই ভ্রমণ, যা অন্য কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়, আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। আমি তখনও এতদূর পর্যন্ত সারল্য হারাইনি যে কোনো বই খোলার আগে প্রথমেই তার লেখকের নামটা লক্ষ করি। 'ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'—আমার ভ্রমণসঙ্গীর এই মলাটলিখন হয়তো আমার চোখে পড়েছিলো, কিন্তু তার কোনো বিশেষ মূল্য ছিলো না আমার কাছে; যদিও জানি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' একটি বিখ্যাত নাম, যে-কোনো মাসিকপত্র খুললেই চোখে পড়ে, তবু সেই নাম যেন কোনো-মতেই বইটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না, বইটা আমাকে এমনভাবে ভ'রে তুলছে, শাঁখের মধ্যে ফুঁয়ের মতো এমনভাবে ব'য়ে যাচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে যে সেটা যে কোনো-একজন মানুষ কলম নিয়ে ব'সে-ব'সে লিখেছিলেন, এই তথ্যটিতে আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। বাড়ি ফিরেও কয়েকদিন পর্যন্ত বইটার সম্মোহন আমি কাটাতে পারিনি—আমি যেন আবিষ্ট হ'য়ে আছি, দুলছি এখনো নৌকো চলার তালে-তালে, আমার চোখে-দেখা দৃশ্যের সঙ্গে মিশে-মিশে যাচ্ছে অন্য এক নৌকো, নদী, খাল, চৈত্রের দুপুর, বটগাছের মর্মর, আর শব্দ শব্দযোজনা, বাক্যবন্ধ—ছিপছিপে, সহাস্য, চঞ্চল, মার্জিত কথ্য বাংলা, তার রশ্মি-বিকিরণ, তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। কোনটা বইয়ে-পড়া ব্যাপার আর কোনটা আমার চোখে-দেখা, তার ভেদরেখা অস্পষ্ট হ'য়ে গেলো, যেন এই নোয়াখালির খাল বেয়ে-বেয়েই আমি চ'লে গিয়েছিলাম পতিসরে, শিলাইদহে, সাজাদপুরে—যে-সব স্থানের ভূগোল বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার; আর জলের উপর দাঁড় পড়ার শব্দের স্মৃতিতে আমি যেন একগুচ্ছ বাংলা কথারই ছলছলানি শুনতে পাচ্ছি।

এমনি ক'রে, জল এবং নৌকোর সমবায়ে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যে আমার প্রবেশিকা ঘটালো 'ছিন্নপত্র'। এই বইটির বিষয়ে আমার বাল-মুগ্ধতা আমাকে এতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলো যে বড়ো হ'য়েও তৎসম্পৃক্ত তথ্যের জন্য আমার কৌতূহল জাগেনি চিঠিগুলো কাকে লেখা, বা আদৌ ডাকে-পাঠানো চিঠি কিনা, সেই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অন্য কোন-কোন গদ্যগ্রন্থ ও কবিতা লিখেছিলেন, এ-সব জানার পরেও 'ছিন্নপত্র' বিষয়ে আমার মৌলিক অনুভূতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী'র স্বর্ণযুগ, তাঁর কবিজীবনে তাঁর পদ্মাবাসের বিরাট ভূমিকা, তাঁর জীবনীর উপাদান, কবিতার ভাষ্য—এই সব-কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন স্বয়ম্ভু, অন্ততপক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ, মন্তব্যের অতীত—এমনি একটি বই আমার কাছে 'ছিন্নপত্র'। আমি অন্য কোনো বই জানি না যা অমন নিবিড়-ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের গন্ধে ভরপুর, যার পাতায়-পাতায় অতি সহজে বিম্বিত হয়েছে বাংলাদেশের ঋতু রৌদ্র জল আকাশ বৃষ্টি। হয়তো এইজন্যেই, প্রথমবার বিদেশযাত্রার সময়, আর কখনো বা অন্য প্রদেশে প্রবাসকালে, আমি যে-একটি বই সঙ্গে নিতে ভুলিনি, তা হ'লো 'ছিন্নপত্র'. 'ছিন্নপত্র'ই আমার জীবনে সর্বাধিকবার পঠিত গদ্য বই। কিন্তু না—পুরো সত্য বলা হ'লো না, আমি তো অশ্রুপ্লাবিত দেশপ্রেমিক নই যে বাংলার ছবি দেখার জন্যই একখানা বহুবার-পড়া মলাট-ছেঁড়া বই হাজার-হাজার মাইল সঙ্গে ব'য়ে বেড়াবো—আসলে আমার কাছে বাংলাদেশের অর্থ তার ভৌগোলিক প্রকৃতি নয়, বাংলা ভাষা। "ছিন্নপত্রে' আমাকে যা আনন্দ দেয় তা ওর গদ্যের স্বাদ। অমন সহজ সরল সজল অথচ জোলো নয়, কখনো বা বিদগ্ধ নারীর কটাক্ষপাতের মতো চতুর, যেন একপাত্র স্নিগ্ধ শীতল সুগন্ধি তরমুজের রস, যার মধ্যে, আমাদের না-জানিয়ে, কেউ মিশিয়ে দিয়েছে কয়েক বিন্দু দুর্লভ মদিরা, যার আকর্ষণে আমরা ফিরে-ফিরে চুমুক দিতে লুব্ধ হই, আর যার প্রভাবে দীন বাংলার সমতল বৈচিত্র্যহীন মন-খারাপ-করা পল্লী-প্রকৃতি ঠাণ্ডা কালো ছাপার অক্ষরে অমন মনোরমা হ'য়ে উঠতে পেরেছে। হয়তো সমালোচককেও মানতে হবে যে 'ছিন্নপত্রে'র গদ্য এত বছর পরেও যে-রকম টাটকা তাজা প্রফুল্ল থেকে গেছে, রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও তার তুলনা খুব বেশি পাওয়া যায় না।

আর একটি বইয়ের উল্লেখ ক'রে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ শেষ করবো, যা আমি প্রথম পড়েছিলুম 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামায় 'প্রবাসী'র পাতায়, আর তার পরে 'যাত্রী' গ্রন্থের আকারে আরো অনেকবার পড়েছি। এই রচনাটির 'প্রবাসী'তে প্রকাশ-কালে আমি ম্যাট্রিকের বেড়া টপকেছি; দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির রাজধানীর নাম আমার মুখস্ত; ভ্রমণের অন্য এক রোমাঞ্চে জুল ভের্ন আমাকে দীক্ষিত করেছেন। আর্জেন্টিনা, রজতময় : বুয়েনস, এয়ারিস, সুবাতাস : বিষুবরেখার দক্ষিণে, আণ্ডেস পর্বত পেরিয়ে। কিন্তু সেই সুদূরে স্বপ্নতুল্য দেশের কোনো গন্ধ, কোনো স্পর্শ রবীন্দ্রনাথ আমাকে পৌঁছিয়ে দিলেন না, অথচ আমার মনে হ'লো না আমি বঞ্চিত হয়েছি, যৌবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ আমাকে শেখালেন যে মানুষ শুধু অনুভব

কালবৈশাখী

ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

করে না, চিন্তাও করে, এবং সাহিত্য এই উভয় বৃত্তিরই বাহন। পরে আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য 'যাত্রী' একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য; এতে তাঁর যৌবনের রচনার অব্যবধান নেই, অথচ এটি 'রাশিয়ার চিঠি'র মতো প্রায় পুরোপুরি আলোচনাধর্মী হ'য়ে ওঠেনি—হয়েছে সম্ভোগ্য রস-সাহিত্য। যিনি 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' লিখেছিলেন, তিনি ছিলেন এক অজানা অনামী স্বচ্ছন্দ-বিহারী ভ্রাম্যমাণ, যাঁর জাগ্রত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংকলিত হয়েছিলো বৈদেশিক জীবন ও দৃশ্য; আর 'যাত্রী'র লেখক এমন এক পুরুষ, যিনি বহু ভ্রমণ ও বহু দেশে অভিনন্দনলাভের ফলে নতুন দেশ দেখা বিষয়ে ঔৎসুক্য হারিয়েছেন, এবং যশের বোঝা বইতে গিয়ে যাঁকে স'রে যেতে হয়েছে সাধারণের জীবন থেকে দূরে, যিনি, রাজা-বাদশাদের মতো, স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ হারিয়েছেন. আর ফলত, ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসলে, যাঁর কলমে আসে—ভ্রমণ নয়, কোনো কাহিনীও নয়— পরম্পর তাঁর আত্মগত চিন্তার সূত্র, যার গ্রন্থি-গুলিকে ধীরে-ধীরে তিনি মোচন করছেন, নিজেরই সংগে কথা বলার ধরনে। যদিও জাতে এত আলাদা, স্বাদে প্রায় বিপরীত, তবু একদিক থেকে 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে 'যাত্রী'র সাদৃশ্য আছে : উভয় গ্রন্থই 'বিষয়-নিরপেক্ষ, একটিতে যেমন যখন যা চোখে পড়ছে তা-ই লিখছেন, তেমনি অন্যটিতে লিপিবদ্ধ করছেন তাঁর দৈনন্দিন আকস্মিক চিন্তাসমূহ, যখন যা মনে হচ্ছে তা-ই তাঁর লেখনীর যাত্রাস্থল। 'ছিন্নপত্রে' ও যৌবন-কালীন ভ্রমণ-কাহিনী দুটিতে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে আমরা কাছে পাই; আর 'যাত্রী'তে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ (এই শব্দটিও ঐ গ্রন্থেই তিনি উদ্ভাবন করেন)—ঐ প্রৌঢ় বয়সের স্মৃতি, রুচি, ভাবনা ও দূরকল্পনার সমন্বয়ে যা রচিত, অর্থাৎ তাঁর চরিত্র, তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য। 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি মানবিক, অনেক বেশি 'অন্যদের মতো', আর 'যাত্রী'তে তিনি মনস্বী, তিনি স্বতন্ত্র। অথচ (আর এখানেই তাঁর উত্তরজীবনের অন্যান্য ভ্রমণ-গ্রন্থের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠতা), 'যাত্রী'তেও এক ধরনের অন্তরঙ্গতা আছে; যেহেতু তিনি এখানে সচেতন উপদেষ্টা বা বিচারক নন, তাঁকে কোনো রায় দিতে হচ্ছে না, কোনো সুস্পষ্ট মত দাঁড় করাতে হচ্ছে না, যেহেতু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার দায়, যা কোনো কবির পক্ষে অপ্রিয় না-হ'য়ে পারে না, তা থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত ক'রে নিয়েছেন, তাই এখানে আমরা শুনতে পাই তাঁর চিন্তার বিশুদ্ধ ছন্দ। বিতর্ক নয়, তত্ত্বকথা নয়, সুপরামর্শ নয়, তাঁর নির্জন মুহূর্তের স্বগতোক্তি, তাঁর দ্বিধা, তাঁর যৌবন হারাবার বেদনা, তাঁর খ্যাতি-প্রসূত নিঃসঙ্গতা — যেন দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর নিজেরই মুখো-মুখি, অসুস্থ, ঝাট উত্তীর্ণ আটলাণ্টিকের উত্তাল বুকে ভাসমান এক ভেলায়, এক শান্তিহীন মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে, অনুচর-সমেত, সহচরহীন, একা।

রবীন্দ্রনাথ : আমার জিজ্ঞাসা

বিষ্ণু দে

"There was a last day with his mother. Looking with her across the Channel, he repeated a favourite passage from Rabindranath Tagore : When I go from hence, let this be my word; that what I have seen is unsurpassable" — The Poems of Wilfrid Owen, ed. by E. Blunden.

"ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে যখন আসি তখন নিজেকে মনে হয় যেন একটা বর্বর পরনে জানোয়ারের ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র, মোটা ভারী কাঁটাওয়ালা গদা।"

(সাহিত্যপত্র ১৩৬৮)

আমরা যারা অন্ততঃ বয়সের গুণে ভাবতে পারি যে আমরা রাবীন্দ্রিক বাংলার তথা ভারতবর্ষের লোক, আমরা একটু আশ্চর্য হই বৈকি যখন শুনি যে, আমাদের নবাগত বন্ধুবান্ধব অনেকেই ঐ জগতে নিজেদের বহিরাগত মনে করেন। তাই কি তাঁরা বাংলাদেশকে, বাংলা সাহিত্যকে দুশো বছর অথবা পাঁচশো বছরেরই প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন এবং এক কাল্পনিক ইংরেজি-মার্কা দশক নামক ঐতিহাসিক যুগসংখ্যায় নিজেদের চিহ্নিত করেন। সে কারণেই কি তাঁরা ঐতিহ্যকে পুষ্টিময় করতে চান না পদে-পদে নবার্জিত চেষ্টার-চেষ্টায়?

অবশ্য স্বদেশী যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অবধি—অথবা ১৯৪৭ অবধি বাংলার বৃহৎ ও গভীরভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়তো ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে না হলেও নিজের-নিজের শক্তিমত্তাকে ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত করার অভিজ্ঞতা তো বাংলার লেখক-পাঠকের থাকবার কথা। অবশ্য এখন বোধহয় রাবীন্দ্রিক কালান্তরের পরে—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু—এঁদের প্রয়াসের পরে, সাহিত্য বা কাব্যচর্চা অনেক সহজ হয়ে গেছে বলে যে কোন লেখককে প্রথম থেকে বেশী প্রশ্রয় দিতে পারে।

নাকি নিজেদের বয়স্কতার সুযোগে আমরা ভুলে যাই ঐ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড বাস্তবতা? এমন কি রবীন্দ্রনাথের সশরীরে উপস্থিতির মাহাত্ম্য, আমাদের চোখের সামনে আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে? যে মাহাত্ম্যের কাছে এসে এজরা পাউণ্ড যাঁর বয়স হল একাশি, তিনিও লিখেছিলেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে :

"ঊর্ধ্বগতির জন্য যে কবিতাই তুমি লেখো তা পড়ে ভাবি যেন ভুল করলাম। ঠাকুরমশায়ের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর তুলনা মেলাতে চাই না, কিন্তু এক্ষেত্রে দুই-য়ের সম্পর্ক এত নিকট যে, আমি দুটো কথা যে [illegible] না বলেই [illegible]:

তাই, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আটাশি বছরের খেয়ালী আত্মপ্রতিষ্ঠ কবি রবার্ট ফ্রস্ট বলেছিলেন :

"আমার জীবনে আমি পেয়েছি দুটি-তিনটি জাতির রচয়িতা বা পুনস্রষ্টাদের সঙ্গে মহা বন্ধুত্বের সৌভাগ্য। সে মেলা-মেশার ফলে আমিও হয়ে উঠেছি এক রাষ্ট্র-নেতা বা রাজনীতিবিশারদ — স্টেটসম্যান। আজকাল আমার স্বদেশে আরো বেশী রাজনৈতিক রাষ্ট্রনেতা হয়ে উঠেছি যার জন্য আমার বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ যাঁদের রাজনীতি শব্দটাতেই বিরাগ তাঁরা আমার বিষয়ে চিন্তিত। যাক, ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

"আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার মনের যোগাযোগ অনেক দিন ধরে, আয়ারল্যাণ্ডকে যে সব কবি গড়লেন তাঁরা আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁদের আমি ভালরকম জানতুম। এবং সবচেয়ে ভাল জানতুম এক ভারতীয়কে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। শুনে ভাল লাগল যে, তিনি আজও ভারতবর্ষে এক জীবন্ত শক্তি. সংবাদটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে। আমি জানতুম যে যাকিছু আগে ঐ দেশে ঘটেছিল সে সবকিছুর মধ্যে তাঁর নেতৃশক্তি জাগ্রত ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা হয়েছিল যথেষ্ট, তাই আমি বুঝতে পারি কি করে তা সম্ভব হয়েছিল—তাঁর অক্লান্ত মৈত্রী প্রীতি, বহুবিধ কর্মে ঐশ্বর্যময় তাঁর জীবন।"

ফ্রস্ট আরও বলেন : "এখন এই যে ব্যাপারটা, ঠাকুরের এ ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ছিল, তাঁর সত্তার স্বরূপটিকে দেখতে পাওয়া। তিনি দুই-ই ছিলেন, একথাটা আমি বলব : প্রথমত তাঁকে ভাবতে হয় এক বিরাট রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনেতারূপে এবং তারপরে আমরা তাঁকে এমন এক মানুষের রূপে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন একজন আর্টের-ই-জন্য-আর্টিস্ট বলে। এটা করতে তিনি ভয় পান নি।"

ফ্রস্টের কথা বলার রীতি যতই অন্তরঙ্গ আপন প্রতিভার খেয়ালে মশগুল হোক, তাঁর কথাটা আমাদের এখনও ভাববার মত। এবং আমাদেরই পক্ষে ভাবাটা সার্থক হতে পারে। শ্রম স্বীকার করলে আমরাই উপলব্ধি করতে পারি, 'কবি কাহিনী'র আশ্চর্য বালকটি কি ক্লান্তিহীন মননে নিজের ঐ উদ্ভত বিকাশে ক্রমান্বয়ে গভীরতা ও বিস্তার অর্জন করে গেছেন, প্রত্যক্ষ জীবনের সব দিকের সমস্যায় ও সমাধান কর্মে বিরাট রাষ্ট্রনেতার মতই মগ্ন হয়ে, আবার ক্রমান্বয়ে শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি মোচড়কে আঘাতকে রূপায়িত করে বিজেত নীড়ের মূর্ছনার শিল্পকীর্তিতে।—ক্রমান্বয়েই, কোন সিদ্ধিতে আবদ্ধ না থেকে সমানে উত্তরণ ও বিকাশব্যাপ্তির মধ্যে দিয়ে মৃত্যু অবধি। সেই প্রসঙ্গেই মনে পড়ল ফ্রস্টের কথা,—বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের স্পষ্ট-অস্পষ্ট ঐতিহ্যকে নিজের বিশিষ্ট শিল্পীসত্তার সন্ধানের সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন-রূপান্তরের অক্লান্ত সমন্বয়সাধনায় তিনি কিভাবে আমাদের উত্তরাধিকার রচনা করে গেছেন, সে বিষয়ে আমাদের নিরলস মনন দরকার। অমৃতর নির্দিষ্ট বিষয়ে লিখতে বসে এই কথাই ভাবছি।

নিশ্চয়ই তরুণ শিল্পকর্মীদের কাছে এই শ্রমসাপেক্ষ মনন দুরূহ মনে হতে পারে, কালের হ্যাণ্ডিক্যাপ তাঁরা পান নি। কিন্তু নিছক শিল্পসাহিত্য রচনাতে জীবন্ময়তা অর্জনের গরজেই, মুখ্য-গৌণ বিচারের জন্যই এ বিষয়ে সজ্ঞানতা কি আবশ্যিক নয়? তরুণ বয়সে প্রতিবাদপ্রবণতা স্বাভাবিক, এমন কি হয়তো সময়বিশেষে প্রতিবাদীর পক্ষে প্রয়োজনও। কিন্তু রবীন্দ্র-কীর্তিকে নস্যাৎ করে কি রচনার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করা যায়? যেমন বার্নার্ড শ' শেকসপিয়রকে তাঁরই স্বাভাবিক কারণে ধরতে না পেরে শ-বনাম-শেকসপিয়রের লড়াই-এ নামেন, যদিও শেকসপিয়রের রচনাবলীর প্রকৃত মূর্তি মল্লাঙ্গনের চৌহদ্দিতে ছিল না। বার্নার্ড শ'রই রচনাবলী পড়লে বোঝা যায় কেন। এই রসরাজ সংস্কারকের কোন মুখোরচক নাটকেই বোধহয় মানবনাট্যের কাব্যোৎসারী প্রাণস্পন্দন নেই—এক হয়তো 'ক্যাণ্ডিডা' ছাড়া। কম বয়সে দেখেছি বন্ধুবর বুদ্ধদেব বসুর মত বিদ্রোহী তরুণ এই রকম প্রতিবাদ বা অস্বীকারে মেতেছিলেন, নিশ্চয়ই আত্মবিকাশের বা সাবালক হবার তাগিদে আমাদের মনো-জগতের রবীন্দ্র মূর্তি ভাঙতে গিয়েছিলেন গোবিন্দ দাস বা যতীন্দ্রনাথের মতো প্রকৃত কিন্তু নির্দিষ্ট কবিদের অঙ্গনে টেনে এনে। খানিকটা নিশ্চয়ই তারুণ্যের স্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসচাপল্যে, কারণ অবিলম্বে তাঁরা রবীন্দ্র-বিলাসী হয়ে গেলেন ঘোরতরভাবে, শেষের কবিতা পাঠ করে,—গোরা নয়, চতুরঙ্গ নয়, ঘরে-বাইরে নয়।

বর্জন গ্রহণের ঘড়ির পেণ্ডুলামে না দুলে বরং জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স-এর মত কবিতা রচনার সমস্যায় ঐতিহ্য বিচার কি আরও সার্থক নয়? হপকিন্স তাঁর মামুলী কবি বন্ধু ব্রিজেসকে লিখেছিলেন যে, তিনি ব্রিজেসের চেয়ে কিছুমাত্র কম মিলটন-ভক্ত নয়, কিন্তু তাঁর মনীষাসম্পন্ন ভক্তি উপলব্ধির যথার্থ্য পায় মিলটনের ইংরেজি ভাষার মর্মবিরোধী ভারি রীতিতে লেখার চেষ্টায় নয়, ভিন্ন বাক-রীতির সাধনায়।

মনে আছে, স্নেহভাজন বন্ধু সমর সেন যখন কিশোর বয়সে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি রামায়ণ-মহাভারত না পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত, তখন তিনি বিচলিতই বোধ করেন এবং অচিরে বিরাট মহাভারতও আদ্যন্ত পড়ে ফেলেন। তাই খুব ভাল লাগল সেদিন যখন এক অতিতরুণ সাহিত্যকর্মী বললেন,—রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ব্যক্তি-স্বরূপ যদি দেখবার জানবার সুযোগ নাই পেয়ে থাকি, তাই বলে কি আমরা শুধু বসে-বসে কফি খাব, মাঝে-মাঝে পেঙ্গুইন বা পেপারব্যাক পড়ব বা অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াব? দীর্ঘ রাজপথও, ট্রাঙ্ক রোডও অতিক্রমনীয়।

—বিনিদ্র শতাব্দী বোপে

দিন-রাত্রি বেঁধে যে সুরের
দীর্ঘ আয়ু একাধারে বাঁশি ও তূর্যের,
কুসুমে ও বজ্রে তীব্র যার
সদা ছন্দায়িত প্রাণ,
ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে
বিধুর যার গান,
সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের
কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
প্রাবল্যে চেয়েছে ফলফুলে আর
আউশ আমন,
যেখানে সবার হতে অধম ও
সর্বহারা দীন,
চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী
সর্বতোভদ্রের
সর্বত্র সকলে হোক
সচেতন সচ্ছল ও সুখী।

হে বন্ধু, তোমরা বলো
কেন তবু বলিষ্ঠ মননে
আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও
সৌন্দর্যে স্বাধীন
সর্বদা উদ্‌গ্রীব নই,
লক্ষ-লক্ষ চিত্ত সূর্যমুখী?
ওয়েনের মত আমরাও কেন কি জীবন,
কি মৃত্যুর ক্ষেত্রে যাবার আগে ঐ কথা
ভুলতে পারব না?

রথীন্দ্রনাথ রায়

জীবনচরিত সম্পর্কে কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাঁর একটি সুপরিচিত কবিতায়ঃ

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আমার গানের মাঝেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

কবি টেনিসনের পুত্র তাঁর পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের এই সুবৃহৎ জীবনী পড়ে খুশি হতে পারেন নি। তিনি বলেছেনঃ 'ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানব হৃদয় সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন। কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে।'

প্রত্যক্ষগম্য ও বহিরাশ্রয়ী ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে কবির জীবনী অনুসন্ধান করা যে বিরাট ব্যর্থতা, উদ্ধৃত দুটি অংশ থেকে কবির এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুভূতি ও সংবেদনের গুহাচারী রহস্য-গূঢ়তা বাইরের ঘটনা দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কবির চিত্তসমুদ্রের কোন অতলে কেন কী বিচিত্র স্পন্দন জাগে এবং সেই স্পন্দন যে কীভাবে শিল্পমূর্তি লাভ করে, তার কার্যকারণ সূত্রে বহির্ঘটনানির্ভর তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির অন্তর্জীবনের সেই দুর্গম উৎসের কথা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে উল্লেখ করেছেন।

তবু রবীন্দ্রজীবনী গবেষণাকর্মের অন্তর্ভূত হয়েছে, জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। আবার অন্তরঙ্গদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রচরিতের নানা অংশ উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বহুবিস্তৃত সাধনার ইতিহাস কোনো একজন শ্রমনিষ্ঠ গবেষকের তথ্যবহুল জীবনীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেখানে যেমন পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রয়োজন আছে, তেমনি আছে স্মৃতিকথা, ডায়ারি প্রভৃতির সাহায্যে কবিচরিতের অংশ-বিশেষ উদ্ঘাটনের। কবির সৃষ্টিরহস্যের গহনে প্রবেশ না করলে যথার্থ কবিচরিত রচনা সম্ভব নয়, 'তেমনি মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে' তারও ইতিহাসরচনার প্রয়োজন আছে। অন্তরঙ্গ মানসলোকের সঙ্গে বহিরঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত মিলিয়ে দেখারও তাৎপর্য কম নয়। বাইরের ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে কবির মানসলোকের অভিপ্রায়কে হয়তো সব সময় মিলিয়ে দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু একথাও সত্য যে কবির জীবন-নিয়তির সঙ্গে কাব্য-নিয়তির বিচিত্র-লীলা অনেক সময় নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছিল মহাকবি দান্তের কথাঃ "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া ওঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে, জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।'

দান্তের জীবন-প্যাটার্ন ও রবীন্দ্রজীবন প্যাটার্ন এক নয়, কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভাবজীবন বাস্তব জীবনের যে একেবারে সম্পর্কশূন্য, একথা বলাও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মনিষ্ঠ শিল্পীর শিল্প-জীবনকেও অন্তর-বাইরের সংযোগ সূত্রের মধ্য দিয়ে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য-সমৃদ্ধ জীবনীর মধ্যে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের বাইরের কাঠামো ও সৃষ্টিকৌশলের মাল-মশলা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তার সামগ্রিক রূপ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে না। স্মৃতিকাহিনী-গুলি এক হিসেবে জীবনীর পরিপূরক—কারণ সেখানে খণ্ড বিচ্ছিন্ন পার্শ্বচিত্রগুলির মধ্যে আরো অন্তরঙ্গভাবে কবিব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হয়, যা জীবনীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। জীবনী, স্মৃতিকাহিনী ও রচনা-সম্ভার মিলিয়ে হয়তো একদিন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতর পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে।

সৌভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অনেকগুলি স্মৃতিকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এ যুগের বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনা ও কর্মসাধনা। আত্মজীবনী ও স্মৃতিকাহিনী রচনা করতে গিয়ে তাই অনেকেই রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। কবিপুত্র রথীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বাধুনিক সংযোজন।* রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনী অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু কবিপুত্রের 'পিতৃস্মৃতি'র একটি স্বতন্ত্র আস্বাদন আছে। প্রবীণবয়সে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনস্মৃতি প্রকাশ করে-ছিলেন। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, বিশ্ব-ভারতী নিউজ, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের একত্রিত করে রথীন্দ্রনাথ On the Edges of Time (ওরিয়েন্ট লংম্যানস, জুন ১৯৫৮) প্রকাশ করেন। 'বন্ধুজনের অনুরোধে' রথীন্দ্রনাথ ইংরেজি গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলায় একটি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বসুধারা' পত্রিকায় কিয়দংশ প্রকাশের পর গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। ইংরেজি গ্রন্থ থেকে অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করেছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে বাংলা গ্রন্থে 'সংযোজন' ও 'ডায়ারি' অংশ সংযোজিত হয়েছে। এই রচনাগুলিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়েছে। 'পরিচয়' অংশে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মকৃতির ইতিহাস সংযোজিত হয়ে গ্রন্থটির মূল্য ও মর্যাদা বেড়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'পিতৃস্মৃতি' ঠিক On the Edges of Time এর অনুবাদ নয়। মূলের বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে রথীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দভাবে অনুবাদ করেছেন। ইংরেজি বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা বাংলা বই পড়তে ক্লান্তি অনুভব করবেন না। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীক্ষিতীশ রায়ের অনুবাদও সংগতি রক্ষা করেছে। শ্রীপুলিনবিহারী সেনের রচনাংশটি থেকে রথীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ ও তাঁর নীরব কর্মসাধনার ইতিহাস জানা যায়। জগদ্বিখ্যাত পিতার বিচিত্র কর্মসাধনা তাঁকে কীভাবে তরুণ বয়স থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল, তা উপযুক্ত তথ্যসহযোগে বর্ণিত হয়েছে। পিতার কর্মযজ্ঞশালায় এই নীরব কর্মী কীভাবে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন, তার মহিমান্বিত ইতিহাস উদ্ঘাটিত করে আত্মপ্রকাশবিমুখ কবিপুত্রের ব্যক্তিত্বকে উন্মোচিত করা হয়েছে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের রচনায়।

(২)

স্মৃতিকাহিনী হিসেবে 'পিতৃস্মৃতি' বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সংযোজন। বিবৃতি ও বর্ণনায় কোথাও অতিরঞ্জন বা অতিকথন নেই। সহজ ও স্বচ্ছন্দ কথকতার মধ্যে এক শান্ত, সংযত ও সুভদ্র মেজাজ

*পিতৃস্মৃতি। জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো কলিকাতা-৯। মূল্য বোলো টাকা।

আত্মপ্রকাশ করেছে। নিজেকে রাঙিয়ে রসিয়ে জাহির করার উগ্র প্রচেষ্টা আত্মজীবনীমূলক রচনার একটি প্রধান দুর্লক্ষণ। 'পিতৃস্মৃতি' এই দুর্লক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আত্মজীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে লেখক নিজেকে বড়ো করে তুলতে চান নি। গ্রন্থটির প্রথমদিকের সামান্য অংশই রথীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী। তারপর পিতার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহৎ কর্মসাধনার স্রোতে আত্মবিসর্জন করেছেন, সেখানে তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাঁর ব্যক্তি জীবন ও আত্মজীবনী একই সুরে বাঁধা। পুত্রের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি যেমন ব্যক্তি রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সত্য, তেমনি সত্য আত্মজীবনীর লেখক রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কেঃ

> তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিল সমর্পিতে
> আমারি খ্যাতিতে।
> তোমার সকল চিত্তে,
> সব বিত্তে
> ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে
> তার লাগি যশ নাহি পেলে।

কবি যে নির্মম সত্যের কথা বলেছেন, সেই সত্যই 'পিতৃস্মৃতি' পাঠের চরম ফলশ্রুতি!

'পিতৃস্মৃতি'-তে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও আকর্ষণযোগ্য। পিতা সম্পর্কে পুত্রের দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ এই স্মৃতিকাহিনী যেমন আত্মনিষ্ঠ, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ। পিতার অন্তরঙ্গ রূপকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু অতিমানব করে তুলতে চাননি। পিতার 'আশ্চর্য প্রাণশক্তি' ও তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র উৎস তাঁকে 'বিস্ময়ে অভিভূত' করেছে, অথচ সে বিস্ময়কে প্রকাশ করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। রথীন্দ্রনাথের রচনাপ্রণালীর এই ভারসাম্য ও অনুগ্র সংযত রূপ পাঠককে বিস্মিত করবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে অনেকেরই উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ঘটে, কিন্তু কবির নিত্যপার্শ্বচর পুত্র তাঁকে কত সহজেই না দেখেছেন! পিতৃস্নেহ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মনে রেখেও তিনি পিতাকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে রেখেও দেখতে পেরেছেন। তাই কোনো ভাবোচ্ছ্বাসের কুয়াশা তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ঝাপসা করতে পারে নি। 'পিতৃস্মৃতি'র এই সংযত পরিচ্ছন্ন বাহুল্যবর্জিত অথচ স্মৃতিমন্থর কথাচিত্রগুলির অনন্য আস্বাদন পাঠককে তৃপ্ত করবে।

'পিতৃস্মৃতি'-র প্রথমদিকের কয়েকটি অধ্যায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'ছেলেবেলা' অধ্যায়টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনী মিলিয়ে পড়লে ঠাকুর পরিবারের একটি শতাব্দীব্যাপী পরিবেশ ও পটভূমিকার অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। 'পারিবারিক খাতা'য় রথীন্দ্রনাথের জন্মকালীন মন্তব্যগুলি কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক। হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও সরলাদেবীর মন্তব্যগুলি এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রথীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করে-

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পী মুকুল দে অঙ্কিত চিত্র : পিতৃস্মৃতি গ্রন্থথেকে গৃহীত

ছিলেন, 'বাড়ির ঐশ্বর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু ঐতিহ্য জাজ্বল্যমান।' উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সুবৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলির মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষয়িষ্ণুতার পিঙ্গল ছায়া। তবুও গোটা কাঠামো তখনো ভেঙে পড়েনি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলির সময় মহারাণীর পরিবারই বড়ো, না মহর্ষির পরিবারই বড়ো—এই জাতীয় তর্ক উঠতে বলেন্দ্রনাথ 'গণতি করে মহাউল্লাসে সবাইকে জানালেন মহারাণীর পরিবারের সংখ্যা টেনেটুনে মাত্র একশত। মহর্ষির পরিবারের শতাধিক আত্মীয়স্বজন এই একখানা বাড়িতেই বাস করছে।' বর্তমান যুগে এ কাহিনী অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যে পারিবারিক জীবনকে দেখেছিলেন, তারই অস্তগমনোন্মুখ অধ্যায়কে দেখেছেন রথীন্দ্রনাথ।

বৃহৎ ঠাকুর পরিবারের ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের পার্শ্বচিত্রগুলি লেখকের স্মৃতিদর্পণে যে ছায়াপাত করেছে, তাদের রমণীয়তা অনস্বীকার্য। এই স্মৃতিকাহিনীতে যে চিত্র ও চরিত্র আছে, তা এর অসামান্যতার অন্যতম কারণ। কর্তাদাদামশাই মহর্ষির প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ বিস্ময় বালক রথীন্দ্রনাথকে কীভাবে অভিভূত করেছিল স্বল্প-সংক্ষিপ্ত রেখাবিন্যাসে তাকে রূপ দিয়েছেন। দূরের সমুচ্চ হিমালয়ের দিকে চেয়ে মর্তের তৃণখণ্ডের যে বিস্ময় কর্তাদাদার দিকে চেয়ে বালক পৌত্রের বিস্ময়ও অনেকটা সেই জাতীয়।

সংক্ষেপে বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র বড়ো জ্যাঠামহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বিচিত্র-চরিত্রের এই আপনভোলা মানুষটির কৌতুককর চিত্র অনেকেই এঁকেছেন। তত্ত্ব-বিদ্যা ও অঙ্কের জটিল সমস্যা নিয়ে যিনি মগ্ন থাকতেন, ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিতান্তই শিশু, মাত্রাজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের ছিল অভাব। বন্ধুদের খাবার নিমন্ত্রণ করে, নানা আলোচনা করতে করতে আসল ব্যাপারটাই ভুলে যেতেন। তাঁর শিশুসুলভ সারল্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নানাকাহিনী প্রচলিত আছে। রথীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে এমন একটি গল্প বলেছেন, যা শুনে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। একবার বিদ্বজ্জন-সভার জন্য তিনি একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কাউকে পড়ে শোনানো দরকার—'লেখা যখন শেষ হল, বাড়িতে কাউকে খুঁজে পান না। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল এক বুড়ি দাসী, আর কেউ তখন ছিল না। দেখা গেল ঐ দাসী দ্বিজেন্দ্র-নাথের সামনে ঘোমটা টেনে মেঝেতে বসে, আর উনি 'সার সত্যের আলোচনা' আগা-গোড়া পড়ে শোনাচ্ছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, লোকেন পালিত, চিত্তরঞ্জন দাশ, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, প্রমুখ অনেকের চিত্রই এখানে রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত এই চিত্রগুলির মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য বলেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন দাশের চিত্র। বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি ও কবিপত্নীর স্নেহসম্পর্ককে ও বলেন্দ্র-নাথের উপর রবীন্দ্রপ্রভাবকে এখানে স্বল্পাক্ষরে বর্ণিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাশের যে আন্তরিক ছবি এখানে আছে, তা অত্যন্ত উপভোগ্য। তখনো তিনি রাজ-নীতিতে নামেন নি। তরুণ ব্যারিস্টার ও কবি চিত্তরঞ্জন দাশের এই চিত্রটি দুর্লভ। এই চিত্রগুলির ফাঁকে ফাঁকে বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রস-রুচির আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্র-নাথ এই আবহাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন তাঁদের স্মৃতিকাহিনীতে। বৈঠক-খানা ঘরে দ্বিপেন্দ্রনাথের গানের আসর, রাধিকা গোস্বামীর ধ্রুপদ গান, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের পিয়ানো বাজানো, রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তিহীন সংগীতচর্চা প্রভৃতি দুর্লভ মুহূর্তগুলির কথা বলতে বলতে কথকের কণ্ঠ স্মৃতিমন্থর হয়ে উঠেছে। অতীতের কথা বলতে বসে তিনি যেন সে যুগের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন:

"কতরকম গানই না হত সেই ছাদের উপর। গানের এর চেয়ে উপযোগী পরি-বেশই বা মিলবে কোথায়। এক প্রাচীন শিমুলগাছ ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে। দিনান্তে বসন্তের মৃদু বাতাস থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তার কচি পাতা। চাঁদের ঝাপসা আলো অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করেছে সেই সান্ধ্য আসরে। হঠাৎ কবি গেয়ে উঠলেন—

চিত্ত পিপাসিত রে
গীতসুধার তরে।

গানের ফোয়ারা খুলে গেল। কখনো বা ইমনের মিঠে সুরে ধরলেন—

তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম অসীম-গগন-বিহারী।

কবি গানের পর গান গেয়ে চলেছেন। গানের সুরধুনী নেমে এল আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ির ছাদের উপরে।"

সান্ধ্য মজলিশ, মাঘোৎসব ও খাম-খেয়ালি সভার মনোজ্ঞ বিবরণ থেকে রবীন্দ্রজীবনীর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যায়। খামখেয়ালি সভায় রবীন্দ্রনাথের যেবার নিমন্ত্রণ করার পালা পড়ল, সেবার-কার বিস্তৃত বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় বহু ঘরোয়া মজলিশ ছিল। সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা, শিল্পীরা এখানে মিলিত হতেন। এই আনন্দ-মিলনের মধ্যে পরস্পরের ভাব-বিনিময় হতো। স্বল্পায়ু খামখেয়ালি সভা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। এই সভা উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গান, কবিতা ও ছোটগল্প রচনা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী রথীন্দ্রনাথ এই সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেমন জীবন্ত তেমনি হৃদয়গ্রাহী।

(৩)

'পিতৃস্মৃতি'র প্রথম অধ্যায়টিকেই রথীন্দ্রনাথের আত্মজীবনস্মৃতি বলা যায়। কিন্তু এরপরে যা বলেছেন, তা মূলত পিতৃস্মৃতিই হয়ে উঠেছে। পিতার কর্ম-বহুল জীবনের নিত্যসহচর ও ভ্রমণসঙ্গী হিসেবেই এরপর তাঁকে দেখা যায়। গোটা বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো শিলাইদহ ও পদ্মার স্মৃতিকাহিনী। এই অংশে স্মৃতিচারী রথীন্দ্রনাথ যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য আছে। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-বৈচিত্রের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রচুর মাল-মশলা আলোচ্য স্মৃতিকাহিনী থেকে পাওয়া যাবে। কলকাতার কল-কোলাহলময় জীবন থেকে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে কবির পারিবারিক জীবন ও শিল্পজীবন কীভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে-ছিল তারও কয়েকটি রসোজ্জ্বল ছবি আছে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজের এমন নিপুণ ও আন্তরিক ছবি আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাগলাটে সাহেব মিস্টার লরেন্স, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের রেশম চাষের উৎসাহ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আলু চাষের এক্সপেরিমেন্ট, লোকেন পালিতের সিগারেট খাওয়ার কৌতূহলো-দ্দীপক কাহিনী, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের

হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব প্রভৃতি টুকরো কাহিনীগুলি শিলাইদহের স্মৃতিকে রমণীয় করে তুলেছে। এই অংশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আচার্য জগদীশচন্দ্রের চিত্রটি। জগদীশচন্দ্র জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু দুরূহ বৈজ্ঞানিক রহস্য জিজ্ঞাসার নেপথ্যে তাঁর যে একটি রসস্নিগ্ধ সহজ মন ছিল, তার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি ছোটদের সংগে গল্প করতে ও খেলতে ভালবাসতেন। সবচেয়ে কৌতুককর কাহিনী হলো পায়ের দাগ অনুসরণ করে গর্তের মধ্যে কচ্ছপের ডিম আবিষ্কারের গল্প। কবি ও বৈজ্ঞানিকের এই বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার কাহিনী অক্ষয় হয়ে আছে। কিন্তু এমন সহজ ছবি যথার্থই দুর্লভ।

পদ্মা ও গোরাই নদীর মোহানায় অবস্থিত শিলাইদহের প্রাকৃতিক আকর্ষণ কবিচিত্তকে কীভাবে সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলেছিল, তার প্রমাণ আছে সোনারতরী-চিত্রাপর্বের বহু কবিতায়, গল্প-গুচ্ছে ও ছিন্নপত্রের পত্রাবলীতে। পদ্মালালিত বাংলাদেশের নিসর্গসম্পদ ও জনপদজীবন কবিমনের বিচিত্র তন্ত্রীতে যে সুর তুলেছিল, তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। খরস্রোতা পদ্মার তরঙ্গকল্লোলে, অনন্ত-প্রসারিত বালুচরের পাণ্ডুরতায়, পদ্মা-লালিত জনপদজীবনের সুখ-দুঃখের আলপনায়, নীলাকাশের মেঘ-রৌদ্র খেলায় কবির মন ভরে উঠেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সংগে এমন নিবিড় সান্নিধ্য রবীন্দ্রজীবনে পরবর্তীকালে কদাচিৎই ঘটেছে। রবীন্দ্র-জীবনে প্রকৃতির এমনি নিভৃত নির্জন পরিবেশের একটি প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির এই মুক্ত পরিবেশে ও নির্জন প্রাঙ্গণে কবিচিত্তমুক্তির পরম মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে। পরবর্তীকালেও পদ্মাতীরের এই রমণীয় স্মৃতি কবির বহু রচনায় ছায়াপাত করেছে। এই যুগের রবীন্দ্ররচনাবলীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্য রচিত হয়েছে পদ্মার তরঙ্গলীলায় ও পদ্মালালিত গ্রামজীবনের আলো-ছায়ায়। কবির পারিবারিক জীবনের সুখপরিতৃপ্ত মুহূর্তগুলি রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিদর্পণে অনন্যমহিমায় মুকুরিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনীকার ও রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকরা এই যুগের অসামান্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কবিজীবনের অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তগুলি প্রত্যক্ষদর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটেছিল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের।

রথীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের স্মৃতি-কাহিনীর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম বছরের ছাত্র রথীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ ও স্মৃতিকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তবুও এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রটির মুখে পুরনো দিনের শান্তি-নিকেতনের গল্প শোনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন পরি-বেশ, রীতিনীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলাধুলো প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলি উপভোগ্য। এই যুগের কয়েকজন অধ্যাপকের চিত্র ও চরিত্র উল্লেখ-যোগ্য। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, উপাধ্যায়-শিষ্য শিবধন রেবাচাঁদ, সতীশচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্র সান্যাল, বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ প্রথম যুগের অধ্যাপকবৃন্দের টুকরো ছবি স্মৃতিরসে সমুজ্জ্বল। অপূর্ণ-সম্ভাবনায় কবি সতীশচন্দ্র রায়ের প্রসংগটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কাব্যমুগ্ধ সতীশ-চন্দ্রের হৃদয়াবেগ ও নির্মল রসবোধের যে পরিচয় এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনীর অন্যতম সম্পদ। বাইশ বছরে এই তরুণ কবি কাব্য ও গদ্য উভয়ক্ষেত্রে যে রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার খুব বেশি আলোচনা হয়নি। ভবিষ্যতের কৌতূহলী সমালোচক এই স্মৃতিকাহিনী থেকে সতীশচন্দ্রের সমৃদ্ধ ভাবজীবনের একটি দুর্লভ পরিচয় পাবেন।

রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনকে বলেছিলেন 'রাজনীতিক বৈরাগ্য', অথচ স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য তাঁর উদ্যমের অভাব ছিল না, এমন কি শান্তিনিকেতন পর্যন্ত তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রসংগে রথীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'স্বদেশপ্রেম আমা-দের বাড়ির সকলের মধ্যেই মজ্জাগত ছিল। তাই বাংলায় যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তার সাড়া পড়তে বাধা পায়নি, সকলেই এই আন্দোলনে পুরোমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যদি কেবলমাত্র রাজ-নৈতিক আন্দোলন হত তা হলে জ্যাঠা-মহাশয়রা বা বাবা তত উৎসাহ পেতেন কিনা সন্দেহ। বাঙালির অন্তরে যে স্বদেশ-প্রেম জেগেছিল, দেশসেবার যে একান্ত ইচ্ছা দেখা গিয়েছিল, তার মধ্যে ভাবপ্রধান আদর্শের যথেষ্ট লক্ষণ ছিল বলেই তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল—দেশের লোকের সঙ্গে এই আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পেরেছিলেন।'

বিচিত্রা ক্লাব ও শিল্পচর্চার সেই উদ্দীপ্ত প্রহরের স্মৃতিরোমন্থন করেছেন রথীন্দ্রনাথ। ভারতশিল্পের এই নব-জাগরণের অধ্যায়টি উনিশ শতকীয় বাঙালির চিত্তমুক্তির ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। সদ্য আমেরিকা ফেরত রথীন্দ্রনাথের কাছে এই আয়োজন অভিনব মনে হয়েছিল। ইয়োরোপীয় শিল্পীদের বোহেমীয় আচার-আচরণের সংগে এর মিল ছিল না কোথাও। সুবিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দায় বসে গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্র ছবি আঁকছেন, অনুগত শিষ্যদের দিচ্ছেন নানা নির্দেশ, অম্বুরির তামাকের গন্ধে চারদিক মুখর হয়ে উঠছে। এই আবহাওয়ার মধ্যেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের জন্ম। বিচিত্রা ক্লাবের ভিতর দিয়ে শিল্পপ্রতিভার এই ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হল। বিচিত্রা ক্লাবের আয়ু দীর্ঘ নয়। কিন্তু এই ক্লাব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। শুধু শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানটির দান নগণ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য লেখা এই ক্লাবেরই বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত হয়। সবুজপত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চলতি-ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলনও এই বিচিত্র ক্লাব থেকেই গড়ে ওঠে—এই প্রয়োজনীয় তথ্যটিও রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনী থেকে বাদ পড়েনি। জোড়াসাঁকো ও শান্তি-নিকেতনের নাটক, অভিনয়কলা ও মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে বাংলা নাটকের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় আলোকিত হয়েছে। এমন বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে যা দিয়ে বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসকে পূর্ণতর করে তোলা সম্ভব। স্মৃতিরোমন্থনের ফাঁকে

ফাঁকে লেখকের দু-একটি সংক্ষিপ্ত বিদগ্ধ মন্তব্য সূক্ষ্ম রসবোধ ও পরিশীলিত মনের পরিচয় দেয়।

(৪)

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শেক্সপীয়র বিষয়ে যেমন এক বিশেষ আলোচনা ধারা গড়ে উঠেছে, তেমনি একদিন শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এক বিপুল রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা গড়ে উঠবে। কিন্তু কবিপত্নী সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি? বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে কবিপত্নীর স্থান অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। 'স্মরণ' কাব্যে কবিপত্নীর যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বাস্তবজীবনের মানবীসত্তার কতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়? শোকের প্রবল আঘাতে যে অশ্রুগম্ভীর আবেগ উৎসারিত হল তাতে এক চিরন্তনীর ভাবমূর্তিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি-পত্নী আইডিয়ারূপিণী হয়ে উঠেছেন। চিঠিপত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে পত্নীর কথা থাকলেও তার স্থান সংকুচিত। এই অভাব পূরণ করেছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে।

কবিপত্নী ছিলেন কল্যাণী গৃহিণী। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'বাড়ির ছোটোবউ হলে কি হয়, জোড়াসাঁকো-বাড়ির তিনিই গৃহিণী ছিলেন। কাকিমার কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে-দুঃখী, সকলের সুখে-সুখী। তাঁকে কোনোদিন কর্তৃত্ব করতে হয়নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন।' বলেন্দ্রনাথ কবিপত্নীর সবচেয়ে স্নেহাস্পদ ছিলেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁকে সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা বই পড়ে শোনাতেন। এইভাবে এই তিন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। শিলাইদহের সুখতৃপ্ত পারিবারিক জীবনে ও শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে কবিপত্নীর নীরব ভূমিকাটিকে স্মরণ করেছেন তাঁর পুত্র। রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনে তাঁর সহযোগিতা ও আনুকূল্য যে কত বড়ো ছিল সে কথা আমরা ভেবে দেখি না। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কবির আদর্শবাদ ও ত্যাগের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, থাকবেও। কিন্তু সেখানে কবিপত্নীর সহযোগিতা ও সমর্থন যে স্বামীর জীবনব্রতের কতখানি সহায়তা করেছিল, তার উল্লেখ করেছেন কবিপুত্র... "তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তার জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েক গাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারি গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল।... আমাদের আত্মীয়েরা মাকে এইজন্য ভর্ৎসনা করতেন, বাবাকে তো তাঁরা কান্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন।"

পুত্রের স্মৃতিদর্পণে কবিপত্নীর যে চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তা শুধু চিত্র নয়, চরিত্রও বটে। তাঁর কল্যাণী গৃহিণীসত্তা ও স্বামীর নীরব কর্মসঙ্গিনী হিসেবে যে ভূমিকাটি ফুটেছে, তা অবিস্মরণীয়। প্রৌঢ় রথীন্দ্রনাথের এই মাতৃস্মৃতিচারণায় এমন এক করুণ মাধুর্য আছে, যা পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে। সাহিত্য-গবেষকদের কাছে কবিপত্নীর একটি প্রসঙ্গ কৌতূহলোদ্দীপক। স্বামীর নির্দেশে পন্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্য নিয়ে তিনি রামায়ণ তর্জমা করতে শুরু করেছিলেন, প্রয়োজনমতো কবি 'পরিবর্তন বা সংশোধন' করে দিতেন। কিন্তু কাজটি শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। খাতাটি হারিয়ে গেছে; না হারালে কবিপত্নীর রচনার একটি নমুনা থাকত।

'পিতৃস্মৃতি'র কেন্দ্রীয় ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের। 'মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে' তার জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যে যে কবিকে পাওয়া যায় না, এ সম্পর্কে কবি আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। তবু কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথের সত্যমূর্তি উদ্ঘাটনের জন্য সমালোচক তথা জিজ্ঞাসুদের মনে কৌতূহলের অন্ত নেই। বিদ্যাসাগরের কোনো বসওয়েল ছিল না, এ জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক সময় আক্ষেপ করেছেন। কবি-জীবনের সহচর ও ভ্রমণসঙ্গী রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার বহু খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ঘটনা, ঘড়িতে দম দেওয়া, সান্ধ্য-মজলিশে ছাদের উপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গান গাওয়া, নতুন ধরনের রান্নার ফরমাস, গোরাই নদীতে সাঁতার দিয়ে এপার-ওপার করা, জমিদারী পরিচালনা ও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, জলে-পড়া কটকি চটির উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপ দেওয়া; কবির আজনব শিক্ষণ-পদ্ধতি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস ও সামাজিকতা, সংগীতচর্চা ও অভিনয় প্রভৃতি বহু ঘটনার সরস ও অন্তরঙ্গ বিবৃতির মধ্যদিয়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের সহজ রূপ ধরা পড়েছে। 'বাবাকে যেমন দেখেছি' অধ্যায়টিতে রবীন্দ্র-জীবনীর বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্বামী, পিতা, বন্ধু ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের এতো বাস্তবধর্মনিষ্ঠ ছবিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।
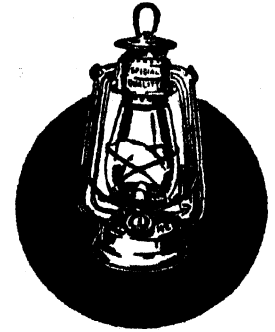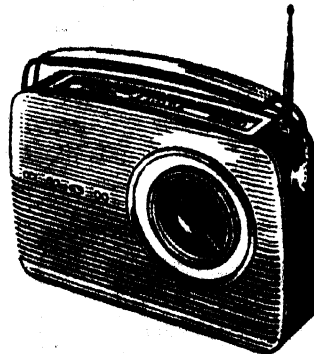
গ্রন্থটির শেষার্ধে কবির বিদেশযাত্রার ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে রথীন্দ্রনাথ বহু অজ্ঞাতব্য তথ্য সরস করে বলেছেন। টিউব থেকে নামবার সময় এটাচি-কেসে ভর্তি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলা ও লস্ট-প্রপার্টি অফিস থেকে ভাগ্যক্রমে ফিরে পাওয়া, ইয়োরোপের গুণীসমাজের আন্তরিকতা, আঁদ্রে জীদ্ ও রমাঁ রলাঁর সঙ্গে পরিচয়, ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চমকপ্রদ বিবরণ, স্টকহলমে নোবেল-কমিটির সম্বর্ধনা প্রভৃতি ঘটনা ও চরিত্রগুলি সজীব হয়ে উঠেছে। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু নীরস ঘটনাপঞ্জীতে পরিণত হয়নি, বর্ণনার গুণে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর চিঠিও মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ইয়োরোপীয় গুণীসমাজে কেমন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিঠি হল কবি উইলফ্রিড ওয়েন-এর মায়ের লেখা চিঠিখানা। কবি ওয়েন যুদ্ধে মারা যান। তার মৃত্যুর পর যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তা রবীন্দ্রনাথকে পড়ে দেখার জন্য ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই চিঠির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল ওয়েন-এর ডায়ারিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি অংশ।

On the Edges of Time থেকে মূল ইংরেজি অংশ উদ্ধৃত হল—ওয়েনের মা লিখেছেন :

> It is nearly two years ago, that my dear eldest son went out to the war for the last time and the day he said Good-bye to me—we were looking together across the sun-glorified sea — looking towards France, with breaking hearts — when he, my poet son, said those wonderful words of yours — beginning at 'when I go from hence, let this be my parting words' — and when his pocket book came back to me—I found these words written in his dear writing — with your name beneath. Would it be asking too much of you, to tell me what book I should find the whole poem in?

মূল বাংলা কবিতাটি হল : 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই। যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' বিদেশে রবীন্দ্রনাথ কি রকম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন, চিঠিখানা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রথীন্দ্রনাথ স্মৃতি-কাহিনীই লিখেছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা বা ব্যাখ্যা করতে বসেন নি। কিন্তু স্মৃতিচারণার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে-সব টুকরো টুকরো মন্তব্য করেছেন, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যাখ্যাতারা এই মন্তব্যগুলির আলোকে নতুন করে ভাবতে পারবেন। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'গবেষক জীবনচরিত-লেখকরা সঠিক খবর দিতে পারবেন, তবে সাধারণভাবে আমার ধারণা, বাবার গদ্য ও পদ্য দু'রকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে, এমন আর কোথাও হয়নি। ... শিলাইদহের যে-রূপবৈচিত্র্য, তার মধ্যে পেয়েছিলেন তিনি লেখার অনুকূল পরিবেশ।' শিলাইদহের প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিকল্পনার বন্ধনহীন জয়যাত্রার উদ্দীপ্ত প্রহর। সহজ জীবন-রস পিপাসা ও কল্পনার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে মিলিত হল প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য—কবিচিত্তের এই মহৎ জাগরণের কথাই বলেছেন রথীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের মনে এক সময় একটি প্রশ্ন জেগেছিল। চিঠি লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে : 'আমি বুঝতে পারি না, আমার মধ্যে কোন্ ভাবটা প্রবল—সুখদুঃখ-বিরহপূর্ণ ভালোবাসা না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা?' রবীন্দ্রজীবনবিধাতা যে টানা-পোড়েনে কবির জীবন বয়ন করেছেন, তা নানা আপাত-বিরোধী ভাবের সমন্বয়ে বিচিত্র। সীমা-অসীম, খণ্ড-অখণ্ড, জনতা-নির্জনতা প্রভৃতির নানা বৈপরীত্য কবি-জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'জীবনের প্রথমাংশে বাবা শিলাইদহের নির্জনতায় কাটিয়েছিলেন, তারপর শেষাংশ তাঁর থাকতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনের জনতার মধ্যে। শিলাইদহের শ্যামলতা ও শান্তিনিকেতনের ধূসরতা এই দুই পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত।' এই বৈপরীত্য সত্ত্বেও শিলাইদহের পদ্মালালিত শ্যামল প্রকৃতি ও শান্তিনিকেতনের 'দগ্ধতৃণদিগন্ত' রবীন্দ্রকাব্যের মহাভাষ্য রচনা করেছে।

'নাটক ও অভিনয়' অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্র-নাট্যের যে পর্যায়-বিভাগ করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্পূর্ণ নতুন দিক থেকে রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেণীনির্ণয় করেছেন। এতে লেখকের রসদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় আছে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অভিনয়ের যোগ্য কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন কবি। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "এগুলিকে শান্তিনিকেতন পর্বের নাটক বলা চলতে পারে। এর আগে লেখা নাটকগুলির মূলরস ছিল রোম্যান্টিক ঘাত-প্রতিঘাত। শান্তিনিকেতন-পর্বের তিনটি নাটক — 'শারদোৎসব' 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'র রস ছিল পূর্ব-রচিত নাটক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' লেখা হয়েছিল পরিচিত প্রচলিত আঙ্গিকে। পরবর্তী যুগের 'ডাকঘর' 'রাজা' প্রভৃতি নাটককে বলা চলে রূপক নাট্য অথবা তত্ত্বধর্মী নাটক। মাঝখানের এই তিনটি নাটক যেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র—এগুলিতে নাটকের বিষয়-বস্তু সহজ ও সংহত হয়ে এসেছে, কিন্তু রূপক নাট্যের কিছু কিছু লক্ষণ এদের মধ্যে স্পষ্ট।" কালানুক্রমিকতার দিক থেকে এই আলোচনার কিছু ত্রুটি আছে—যেমন, 'ফাল্গুনী' 'রাজার' পরে লেখা হয়েছিল। কিন্তু নাটকের আঙ্গিক ও রূপকর্ম বিচারের দিক থেকে রথীন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্মরসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা অনুধাবনযোগ্য। রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা করতে বসেননি, কিন্তু স্মৃতিরোমন্থনের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রমানস ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচকদের পথনির্দেশ করবে।

৫

স্মৃতি রোমন্থনের যেমন একটি বিশেষ রস আছে, তেমনি আছে এর এক নিজস্ব শিল্পরূপ। বিগতদিনের চিত্র, চরিত্র ও কাহিনীকে শুনিয়েছেন প্রৌঢ় রথীন্দ্রনাথ। তাঁর স্মৃতিচারী মনের রসাবেশ ও অতীতের অলস রোমন্থন কাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছে এক বিরল মাধুর্য। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রখর করে তুলে কাহিনীকে
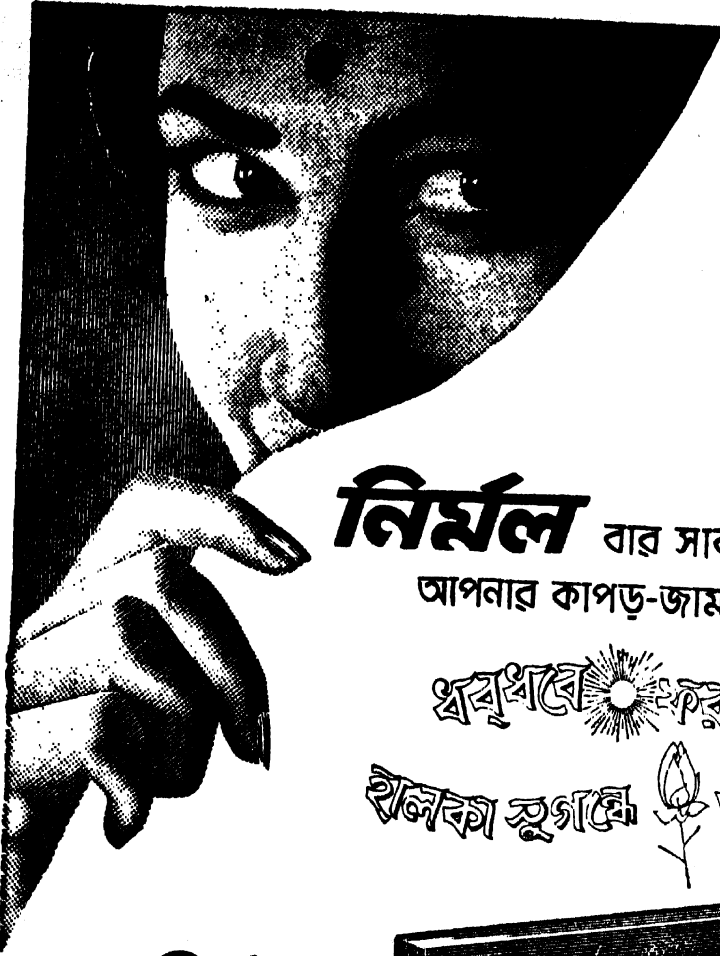
নির্মল বার সাবানে কাচালে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
নির্মল
Nirmal
BAR SOAP
নির্মল
বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে
ঝকঝকে পরিষ্কার হয়,
আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে ওঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট ফেনায় ফেনা হয় আর সেই ফেনায়
তেলকালি ও ধুলোময়লা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা
ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুবাসে ভরে থাকে।
নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি
শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
হুগলী প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
আদৃত সবার ওপরে

নিরস্তপ করতে চাননি, বরং নিজের হাতে কিছু না রেখে নিজের সর্বকিছু ঢেলে দিয়েছেন স্মৃতিরসের মন্থর প্রবাহে। অথচ এই স্মৃতিকথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে কথকের ব্যক্তিত্ব। নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার কোনো সচেতন প্রয়াস না থাকলেও তাঁর মধ্যে কথকের নীরব সান্নিধ্য অনুভব করা যায়। উচ্ছ্বসিত ও উচ্চকণ্ঠ হবার তাগিদ নেই কোথাও, বর্ণনার অতিনিবদ্ধতার ভিতর দিয়ে কোনো কিছুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াও হয়নি। কাহিনীর সহজ-মসৃণ প্রবাহে তিনি যেন লীলাচ্ছলে ভেসে চলেছেন।

'পিতৃস্মৃতি' সুখপাঠ্য হয়েছে এর প্রকাশরীতির সাবলীলতায় ও সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ স্টাইলের গুণে। মেজ জ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসতেন গভীর রাত্রিতে, তখন গ্যাস-ল্যাম্পের আলোছায়ায় তাঁর বালকমনে যে-সব সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা জেগে উঠত, সেই অনুভূতির চমকপ্রদ বর্ণনা আছে : "রাস্তার গ্যাস-ল্যাম্পের আলোতে গাছপালার ছায়া একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে পাশ ফিরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে—তার বিরাম নেই। সেই অন্ধকার রাত্রে আলোছায়ার এই অবিশ্রান্ত মোড়-ফেরা দেখতে দেখত কত-না ভূতপরীর দেশের কথা মনে পড়ত। তারপর ঘুমিয়ে পড়তুম মায়ের কোলে। চিরপরিচিত জোড়াসাঁকোর গলিতে ঢুকতেই মায়ের স্নেহকণ্ঠের ডাকে আবার ঘুম ভেঙে যেত।" পড়তে পড়তে মনে হবে যেন রবীন্দ্রনাথের শিশু-সম্পর্কিত কোনো কবিতার গদ্যভাষ্য পড়ছি।

পদ্মাতীরের নিসর্গবৈচিত্র্য ও সুখালস্যময় স্বপ্নাতুর অনুভূতি পিতার মতো পুত্রকেও যে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসরাজ নিয়ে বসতেন, কবিকণ্ঠে রচিত হত সুরের ইন্দ্রজাল। এক বিমুগ্ধ বালকের শ্রবণ-দর্শনের বিচিত্র পিপাসা রূপ পেয়েছে তার স্মৃতিচারী মনের অলস ছন্দে : "আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত অবারিত জলরাশি, গানের সুরগুলি তার উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে গিয়ে কোন্ সুদূরে যেন মিলিয়ে যেত, আবার ওপারের গাছপালায় ধাক্কা খেয়ে তার মৃদু প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে ফিরে আসত।...গানের আসর ভাঙবার আগেই আমি মার কোলে ঘুমিয়ে পড়তুম। সে-সব রাত আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু আজও যখন

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে...

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার
সাধের সাধনা...

প্রভৃতি গান শুনি, সেইসব রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়—যে-রাত্রে গানের সুর জলের কলধ্বনি ও ঝুরঝুরে দাক্ষিণা হাওয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেত, যে-রাত্রে চাঁদের আলোর বন্যায় নদীর জলে ও নদীর চরে অপূর্ব এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করত।" স্মৃতি-বেদনার এই জাতীয় নম্র-সুন্দর কথারস 'পিতৃস্মৃতি'-কে রমণীয় করে তুলেছে।

আলোচ্য স্মৃতিকাহিনীর বহু অংশেই কথকের সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বপ্রকৃতি রথীন্দ্রনাথকে কীভাবে আকর্ষণ করেছিল, তার বহু প্রমাণ এখানে আছে। শিলাইদহের স্মৃতি সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন : "সেখান থেকে দেখা যেত একদিকে কাঁচা সোনার বরণ সরষের খেত, অন্যদিকে বিশীর্ণা পদ্মার রজতরেখা; তার ওপারে আবার দিগন্ত-জোড়া ঢেউ-খেলানো চর—রোদ্রে বালি চিকচিক করছে।" অন্যত্র বলেছেন : "খরস্রোতা পদ্মানদী একদিকে, অন্যদিকে সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালুরাশি, নদীর সীমানা ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে বনরাজিনীলা একেবারে পৃথিবীর বুকের উপর নত হয়ে এসেছে। একমাত্র সঙ্গী জলচর পাখির কলধ্বনি। অপরূপ শান্ত নিভৃত পরিবেশ।" বর্ণনাগুলিকে স্বভাবোক্তির এক-একটি লিরিক মনে হয়। শিলাইদহ বা পতিসরের ল্যান্ডস্কেপ বর্ণনাগুলি এক-একটি রেখাচিত্রের মতো মনে হয়—রেখাগুলির লঘুস্পর্শ সূক্ষ্মতা, সামঞ্জস্য ও সুষমা বর্ণনাকেই শুধু পূর্ণ মহিমা দেয় না, এক অনির্বচনীয় ও অনির্দেশ্য আকূতির ইংগিত দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-এর অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে এই স্টাইলের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। রথীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটি কবিমন ছিল, কোথাও কোথাও তার অকুণ্ঠিত প্রকাশ ঘটেছে। 'রামগড় পাহাড়' অধ্যায়ে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণে গিয়ে রথীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমনের পরিচয় দিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয় :

"মুগ্ধ হয়ে ফুলবাগানের বাহার দেখছি এমন সময় মেঘের আবরণ ছিন্ন হয়ে চোখের সামনে একটি অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠল। আমরা পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলুম, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, কাতারে কাতারে মেঘ সমুদ্রের মতো চলে গেছে যতদূর দৃষ্টি যায়, পশ্চিম সীমান্তে সূর্য অস্তমিত, তারই বর্ণচ্ছটা মেঘপুঞ্জের উপর ছিটিয়ে পড়েছে, সোনালি, গোলাপি, বেগুনি কতরকমের রঙ। মনে হল আমরা রয়েছি যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে কোনো দেবলোকে। মর্তের সব চিহ্ন বিলুপ্ত। কেবল দেখা যাচ্ছে মেঘসমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে উঠেছে দ্বীপের মতো কয়েকটি পাহাড়ের চূড়ো।"

স্নিগ্ধ-রমণীয় স্মৃতিরোমন্থনে, সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ রূপচেতনায়, ভারসাম্যময় সুকর্ষিত স্টাইলের গুণে 'পিতৃস্মৃতি' তথ্যপঞ্জী না হয়ে সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের প্রকাশকুণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের কথা মনে হলে স্বভাবই বেদনা জাগে। পিতৃ-পরিচয়ই যে তাঁর একমাত্র গৌরব, এ-কথা মনে করলে ভুল হবে। তিনিও গুণী ছিলেন—এই অসামান্য পরিবারের বহু মহৎ গুণ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু সে-গুণের প্রকাশ ছিল কুণ্ঠিত। তাঁর নিজস্ব ভূমিকাটি লোকলোচনের বহির্ভূত এক নেপথ্যলোকের কাহিনী। মহৎ পিতার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বিশাল কর্মসাধনাকে তিনি নানাভাবে জয়যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কারুশিল্পে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য, প্রৌঢ় বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কনেও উৎসাহী হয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের শ্রীবিধানেই তার শিল্পপ্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠা নিয়োজিত হয়েছিল। পিতার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণতর করার দিকেই ছিল তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি, এর বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করার কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। বিদেশ থেকে তিনি বিজ্ঞান শিখে এসেছিলেন। সহজবোধ্য ভাষায় বাংলায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় তাঁর যে কতখানি দক্ষতা ছিল, তার দুটি বিশিষ্ট প্রমাণ আছে 'প্রাণতত্ত্ব' (১৩৪৮) ও 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২) গ্রন্থদ্বয়ে। ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত দুখণ্ডে অনুবাদ করে তিনি একটি বড়ো অভাব মোচন করেছেন।

On the Edges of Time পড়লে রথীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার দক্ষতার কথা মনে হবে। অনুশীলন করলে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষার রচনাতেই যে তিনি স্থায়ী সম্পদ দিতে পারতেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভূমিকায় এলমহার্স্ট রথীন্দ্রনাথের অপূর্ণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : "মাতৃভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিমাণের বিষয় মন্তব্য করতে আমি অধিকারী নই, কিন্তু এ-বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে, চর্চা করলে ইংরেজিতে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল।" শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন 'পরিচয়' অংশে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রথীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তার জীবনাদর্শের মূলমন্ত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির মধ্যেও পুত্রের জীবনের অপূর্ণ সম্ভাবনার কথা এক গভীর বেদনানুভূতির সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। গ্রন্থটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, সুসম্পাদিতও বটে।

মহৎ পিতার প্রতিভাবান পুত্রের পিতৃকৃত্যে আত্মদান যেমন এক অসামান্য কীর্তি, তেমনি খ্যাতিহীন অন্ধকার নেপথ্যলোকের কাহিনীও কম বেদনাদায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবন ও কর্মসাধনা অতিকায় বনস্পতির মতো—মৃত্তিকার গূঢ়রসে তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি, উত্থিত শাখাবাহুতে অনির্বাণ সূর্যতপস্যা। মৃত্তিকার গভীর গোপনের ইতিহাস অলিখিত—রথীন্দ্রনাথের জীবনসাধনাও রবীন্দ্রজীবন মহাকাব্যের এক অলিখিত অধ্যায়। কবির আশীর্বাণীর সঙ্গেই তাই কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয় :

মানবের ইতিহাসে
যে সকল খ্যাত নাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকর
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নিশিখায়
লাগায় রক্তের দীপ্তি সে নাম-লিখায়।
প্রগল্‌ভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠদান নিভৃতে নীরব বিধাতার।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার একটি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গানে। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন তিনি কলম ধরেছেন, সেদিন থেকে শুরু করে তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষদিন (মৃত্যু তিন মাস পূর্বে) পর্যন্ত তিনি গান রচনা করে গেছেন অনায়াস ভঙ্গীতে, অক্লান্তভাবে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্যে কোনো সুস্থ মানুষের যেমন কোনো আয়াসের প্রয়োজন হয় না, ঠিক সেই রকম অনায়াস ভঙ্গীতেই তিনি লিখেছেন গান—রাশি রাশি গান। অফুরন্ত তাঁর গানের প্রবাহ। ১৩৪৮-এর মাঘ মাসে প্রকাশিত 'গীতবিতান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের এবং ১৩৫৭-র আশ্বিনে প্রকাশিত 'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ডের সমস্ত গানের সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় ২,২০৮; এছাড়াও তাঁর রচিত কিছু গান এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে বলে শোনা যায়। এই যে অজস্র গান, এর বিষয়বৈচিত্র্যই বা কি আশ্চর্যভাবে সীমাহীন! প্রেমের গানের ত কথাই নেই; নর-নারীর প্রেমের এমন কোনো অবস্থার কথা কল্পনাই করা যায় না, যে অবস্থা সম্পর্কে কবি কোনো-না-কোনো গান রচনা করেননি। তাঁর গানগুলিকে যদিও তিনি নিজেই স্বদেশ, সাধনা ও সংকল্প, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, প্রার্থনা, দুঃখ, আত্মবোধন, জাগরণ, আনন্দ, পথ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ভেদে ভাগ করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিষয়বস্তুর কথা আগে ভেবে তিনি অতি অল্প গানই বেঁধেছেন। তাঁর কোনো প্রিয় পাত্র বা পাত্রীর বিবাহ কিংবা কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু অথবা কোনো অনুষ্ঠান—বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের বিবিধ উৎসব—উপলক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক গান রচনা করেছেন বটে, কিন্তু প্রধানত তিনি গান লিখেছেন আপন খেয়ালে, প্রাণের আবেগে। এবং তাঁর রচিত গানের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। সকলেই এ বিষয়ে এক-মত হবেন যে, প্রকৃতির ও মানবজীবনের এমন কোনো মুহূর্তের কথা চিন্তা করা যায় না, রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো গান যে মুহূর্তের উপযোগী করে গাওয়া যায় না। বাংলার চলচ্চিত্রকারদের কাছেও এ-তথ্য অজানা থাকবার কথা নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, একথাই যদি সত্য হয়, তাহলে বাংলা সবাক চলচ্চিত্রের জন্মক্ষণ থেকেই তাতে কবি রচিত গানের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না কেন? এর উত্তরে দুটি কথা বলা যায়। এক, বিশেষ একশ্রেণীর বিদগ্ধ মহলে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন থাকলেও এর জনপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত ইদানীংকালের। জনসাধারণের এক অংশ 'বুঝি না' বলে কবির গানকে পরিহার করে চলতেন এবং অপর এক অংশ একঘেয়ে ন্যাকা-ন্যাকা সুর বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতেন। দুই, ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রদর্শিত নিউ থিয়েটার্সের 'ভাগ্যচক্র' ছবির আগে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে প্লেব্যাক প্রথার প্রবর্তন হয়নি। অথচ সে-যুগের কোনো অভিনেত্রীর রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে এমন দক্ষতা ছিল না যে, তাঁকে দিয়ে কবির কোনো গান সুষ্ঠু সার্থকভাবে গাওয়ানো যেতে পারত। অবশ্য এছাড়াও আর একটি প্রায় অনতিক্রম্য বাধার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত কাহিনী বা নাটক অবলম্বনে গঠিত চলচ্চিত্র ছাড়া অপর কোনো ছবিতে কবির গান ব্যবহার করবার অনুমতি দিতে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের গুরুতর আপত্তি ছিল।

যতদূর মনে হয়, ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'মুক্তি' ছবিতেই রবীন্দ্র-সংগীতের প্রথম সার্থক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। স্মরণ রাখা উচিত, এই ছবিতেই পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রথম সঙ্গীত-পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিউ থিয়েটার্সে যোগদানের পরে এইটিই হচ্ছে শ্রীমতী কাননের প্রথম ছবি। যদিও এক সময়ে পঙ্কজ মল্লিককেই উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমার গানের ওপর রোড-রোলার চালানো হয়', তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করবার মূলে রয়েছেন একক এবং অনন্য পঙ্কজকুমার মল্লিক। বাংলার চল-চ্চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী কাননই একমাত্র সার্থক রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা। 'মুক্তি'তে তাঁর মুখের 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে' আজও আমার কানে বাজছে। এই ছবিতেই পঙ্কজ মল্লিক গেয়ে-ছিলেন: দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ। উল্লেখ্য যে, 'গীতবিতান'-এ এই গানখানি সন্নিবেশিত হয়নি কেন, তার কারণ দর্শিয়ে বলা হয়েছে: 'রবীন্দ্রনাথ সুর না দেওয়াতে এটিকে রবীন্দ্রসংগীত বলিয়া গণ্য করা বা গীতবিতানে সংকলন করা সম্ভবপর হয় না।' পাঠকদের অবগতির জন্যে বলি, 'খেয়া'র এই প্রথম কবিতাটিতে সুরযোজনা করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক স্বয়ং এবং বর্তমান লেখকেরই আগ্রহ এবং অনুরোধক্রমে। 'চিত্রাসংসদ' নামে একটি স্বল্পায়ু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে এক সময়ে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' অভিনীত হবার কথা

হয়। সেই নাটকের শেষ দৃশ্যে জীবানন্দ আহত হয়ে শয্যাগত অবস্থায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় থাকাকালীন নেপথ্য সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হবার জন্যে এই কবিতাটিতে ঐ প্রতিষ্ঠানকক্ষেই সুরযোজনা করেন পংকজ-কুমার মল্লিক। নিজেই গাইবার জন্যে। পরে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় 'আনন্দ পরিষদ'-এর কোনও মঞ্চাভিনয়ে তিনি এই নব রূপায়িত গানখানি গেয়েছিলেন এবং তারও অনেক পরে 'মুক্তি' ছবির একটি নাটকীয় পরিস্থিতিতে নেপথ্য সঙ্গীতরূপে গানখানিকে গেয়ে তিনি গায়করূপে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন; শুধু তাই নয়, প্রথম আত্মপ্রকাশেই সার্থক সঙ্গীত-পরিচালক রূপে তিনি অভিনন্দিত হন 'আকাশে চাঁদ ছিল যে', 'ওগো সুন্দর, তোমার মুরতিখানি' প্রভৃতি প্রীতটি গানকেই সুরযোজনা গুণে জনপ্রিয় করে তোলার ফলে।

অবশ্য 'মুক্তি'র আগে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত ও কবি রচিত 'নটীর পূজা' ও 'চিরকুমার সভা' চিত্রে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছিল; কিন্তু এগুলি কোনোদিনই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

স্মৃতির ছেঁড়া পাতা উল্টে দেখতে পাচ্ছি, ১৯৩৭ সালে প্রদর্শিত 'মুক্তি'র পরে ১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং প্রমথেশ বড়ুয়াই পরিচালিত 'অধিকার' চিত্রে পংকজকুমার মল্লিক ছবিটির অন্যতম শিল্পীরূপে গেয়েছিলেন 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' সম্ভবত চিত্রাভিনেতা রূপে এই ছবিতেই পংকজ মল্লিকের প্রথম অবতরণ। এর পরে দেখি, ঐ '৩৯ সালেই প্রদর্শিত নীতীন বসু পরিচালিত 'জীবন-মরণ' ছবিতে কুন্দনলাল সায়গলের মুখে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' এবং তানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে 'তোমার বীণায় গান ছিল, আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো' উচ্চারণের কিছুটা আড়ষ্টতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও অ-বাংগালী শিল্পীর মধুর সুরেলা অথচ আশ্চর্য খাদে বলা কণ্ঠনিঃসৃত গানখানি বাংগালী দর্শকবৃন্দকে একটি নতুন আস্বাদ দিয়ে খুশী করতে পেরেছিল। ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে যখন হেমচন্দ্র চন্দ্র পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স চিত্র 'পরাজয়' মুক্তি পেল, তখন তাতে দেখা গেল, কানন দেবী গাইছেনঃ প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একী তোর দুস্তর লজ্জা। ছবির একটি বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে গাওয়া এই গানখানি সে-যুগের তরুণ-তরুণীর মুখে মুখে ফিরেছিল গানখানির জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য স্বরূপ। কিন্তু ঐ ১৯৪০ সালেরই ৩১-এ আগস্ট তারিখে মুক্তিপ্রাপ্ত ফণী মজুমদার পরিচালিত 'ডাক্তার' ছবির নায়করূপে পংকজ মল্লিক সুপ্রযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক-যুগে তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মুখের 'কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি' গানটি প্রেক্ষাগৃহে যে চরম বিষাদের সুর ধ্বনিত করত, তাতে দর্শকবৃন্দের মন নিদারুণ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

পরিচালক ফণী মজুমদার যখন ১৯৪২ সালে নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে এসে মুভী টেকনিক সোসাইটির হয়ে 'অপরাধ' নামে ছবি করলেন, তখন তাতে সংগীত পরিচালক হরিপ্রসন্ন দাসের নির্দেশে হেমন্ত-কুমার মুখোপাধ্যায় প্লেব্যাক আর্টিস্ট হিসেবে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেনঃ ওগো বধূ সুন্দরী নব মধুমঞ্জরী। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত পি আর প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং বর্তমান লেখক পরিচালিত 'পরিণীতা' ছবিতে শেখর-ললিতার প্রণয়ের পথে বাধাটির গ্রামসঙ্গ হিসেবে কবি রচিত 'এ পারে মুখর হোলো কেকা ঐ' গানখানি ব্যবহৃত হয়েছিল এবং আকাঙ্ক্ষিত আবহের সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। ১৯৪৩ সালে সৌমেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স চিত্র 'প্রিয় বান্ধবী'তে সুপ্রযুক্ত দুখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে 'পথের শেষ কোথায়' গানখানি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং 'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে'টি গেয়েছিলেন পরিচালকেরই স্বনামধন্যা ভগ্নী সুচিত্রা মিত্র; মনে হয়, চলচ্চিত্রে নেপথ্যকণ্ঠদান তাঁর জীবনে এই প্রথম। ১৯৪৪ সালে প্রদর্শিত, নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত এবং বিমল রায় পরিচালিত প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে' ছবিতে নায়িকা বিনতা বসু (পরে রায়) গেয়েছিলেন কবির দুখানি গানঃ (১) চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে এবং (২) মালতী লতা দোলে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত লেখক পরিচালিত চিত্রভারতীর ছবি 'শেষরক্ষা' কবি-রচিত ঐ নামের প্রহসন অবলম্বনে তোলা হলেও ছবিখানির উল্লেখ করতে হচ্ছে এই কারণে যে, মূল প্রহসনে যে-সব গান সংযোজিত আছে, তাদের কয়কটির পরিবর্তে নায়িকা ইন্দুমতীর কণ্ঠে দেওয়া হয়েছিল 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো' আর কমলমণির মুখে ছিল 'আমার যায় নিয়ে যায় আপন গানের টানে' এবং 'ওরে যায় না কি জানা'। নিউ থিয়েটার্সের নীতীন বসু পরিচালিত 'পরিচয়' চত্রে 'খেলা-ভাঙ্গার খেলা' ও 'রাত পোহালো শারদ প্রাতে' গান গেয়েছিলেন কে এল সায়গল।

আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাদের অনেকগুলিতেই সংগত ও স্বাভাবিক কারণেই কবির গান ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র রচনানির্ভর নয়, এমন বাংলা ছবিতে তাঁর রচিত গানের ব্যবহার অতীতেও যেমন মাঝে মাঝে দেখা গেছে, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে সৃষ্ট বাংলা ছবিতেও তেমন কালেভদ্রে লক্ষ্য করা যায়। এই সেদিন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি' ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের ('ওহে সুন্দর, মরি মরি' 'সুন্দর হে সুন্দর' ইত্যাদি) প্রশংসনীয় ব্যবহার দর্শকদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আবার এমনও ছবি দেখা গেছে, যেখানে কবিগুরুর কোনো সুন্দর গানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নিতান্ত অকারণেই। স্মৃতিকে সাহায্য করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো রকম উপকরণ না থাকায় আবহ-সঙ্গীত রূপে রবীন্দ্র সুরের ব্যবহার সম্পর্কে কোনো রকম আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব হল না। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি)

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিবিড়। তাই অতি-উগ্র আধুনিক চলচ্চিত্র প্রতিভাধর ছাড়া অন্য সব চিত্র-নির্মাতারাই—তা তাঁরা প্রযোজক, পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার যাই হোন্—ভাল একটি ছবি তৈরী করার কাজে হাত দিয়ে সর্বাগ্রেই চিন্তা করেন একটি ভাল সাহিত্যধর্মী কাহিনীর কথা। অবশ্য তাঁদের সন্ধানী চোখ ও মন দিয়ে তাঁরা এ তথ্যও সঙ্গে সঙ্গেই বিচার করে দেখেন যে সেই নির্দিষ্ট সাহিত্যাশ্রয়ী কাহিনীটির চলচ্চিত্র রূপায়ণের উপযোগিতা আছে কিনা।

যাই হোক, বেশীর ভাগ সফল প্রমোদ-চিত্রের নির্মাণেতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন একটি বিখ্যাত কথাসাহিত্যের বস্তুকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রোপযোগী স্বকীয় গঠনপদ্ধতি অনুসরণে নতুনরূপে সাজিয়ে করা হয়ে থাকে। অবশ্য সে গঠনপদ্ধতির সময়ে মনে রাখতে হয়, কী ভাবে তার মর্মরসটুকু সাহিত্য ও আঙ্গিকের সংমিশ্রণে একটা নতুন প্রাণশক্তিতে ও স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গীতে বিকশিত হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে বলা যায় সাহিত্যরসোত্তীর্ণ কাহিনীকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে তার ওপরে একটি প্রাণবান চলচ্চিত্র-নাটকের সৌধস্থাপনার পরিকল্পনাকে মূলনীতি হিসাবে অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রজগত অদ্যাবধি চলে এসেছে। এর দ্বারা একথা আদৌ প্রমাণিত করতে চাইছি না যে কথাসাহিত্যের রচনাকে পরিহার করে ভাল এবং চিরায়ত চিত্রশিল্পকর্ম সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু একথা সত্য যে রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে বিখ্যাত সাহিত্যবস্তুর তাৎক্ষণিক লোকবেদনের জন্যই হোক বা অন্য বহুবিধ কারণের সমষ্টিগত সুবিধার জন্যই হোক, কথাসাহিত্যের তৈরী উপাদানকে অবলম্বন করে চিত্রনির্মাণের জন্য স্পষ্ট প্রবণতা চলচ্চিত্রজগতের, অন্তত তার ব্যবসায়ীমনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্মনায়কদের আছে এবং দূরকাল পর্যন্ত থাকবেও। এবং এই কারণেই প্রতি দেশের যশস্বী কথা-সাহিত্যিক বা নাট্যকারদের জনসমাদৃত রচনাবলীর চিত্রস্বত্ব অভিব্যাপ্ত রূপে উচ্চমূল্যে ক্রয় করে তাদের চিত্ররূপদানের প্রথা চিত্রশিল্পের সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত নীতি। এর সবচাইতে ব্যবসায়গত সুবিধা হল যে ঐসব বিখ্যাত কাহিনী বিপুল পাঠকসমাজের মনে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাদের চিন্তা-জগতকে বা কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই সেইসব কাহিনীর চিত্ররূপান্তরের সাহায্যে তাদের প্রত্যক্ষ আবেদন দিয়ে দর্শকমন অভিভূত করা বহুলাংশে সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। এমনি করেই বিখ্যাত ও জনচিত্তআলোড়নকারী সুসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকেই চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের শিল্প-কর্মের প্রাথমিক খোরাক সংগ্রহ করে থাকেন।

চলচ্চিত্র যেদিন থেকে সবাক হল, সেদিন থেকে তার কথাসাহিত্যের ও নাট্য-সাহিত্যের ওপর নির্ভরতা অপরিমেয় রূপে বৃদ্ধি পেল। বাণীর সঙ্গে চলমান দর্শন-বস্তুর মিলনসাধনে চলচ্চিত্রের আবেদন বৃদ্ধি পেল শতগুণ, কেননা পাত্র-পাত্রীর রক্তমাংসের সজীব আবেদন তাদের ভাষার মাধ্যমে হয়ে উঠল বাস্তবতার গুণে প্রাণময়। এই জন্যে চলচ্চিত্রকারদের কাছে প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক ও নাট্য-সাহিত্যিকদের প্রয়োজনীয়তা প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠল।

বাংলা ছবির নির্বাক যুগেও দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক সকল বিখ্যাত রচনাগুলি চলচ্ছবির কাহিনীরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে চলচ্চিত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে লাগল অন্যান্য যশস্বী ঔপন্যাসিকদের, বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের লিখিত কাহিনীগুলির একের পর এক চিত্ররূপ।

বাংলাছবির জগতে রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যের প্রবেশও ঘটেছিল বহুকাল আগেই। তাকে প্রায় ছবির আদিযুগ বলা চলে। আমরা অবশ্য এখানে নির্বাক যুগের আলোচনা বাদ দিয়ে সবাক চিত্রযুগের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রপটে রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেই আমাদের পর্যালোচনাকে নিবদ্ধ রাখব। এবং বোঝবার চেষ্টা করব যে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-ভিত্তিক ছবিগুলি আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পকে মোটামুটি কতখানি প্রভাবান্বিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে বা ভবিষ্যতেও করতে পারে। অবশ্য একদিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে বলা যায় যে সে আলোচনা হবে অনেকখানি নিরর্থক। কেননা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কালাতীত আসন অধিকার ক'রে আছেন যার ফলে আপন আলোকেই সভ্যমানব-মনে অতুলপ্রভায় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে দেখলে এ কথাও নিশ্চয় বলা চলে যে রবীন্দ্রকাহিনীর ছায়াছবির জগতে পদক্ষেপ কোন আপন তাগিদে বা প্রেরণায় সংঘটিত তো হয়নি বটেই, এমনকি বহুকাল যাবৎ চলচ্চিত্রনির্মাতারা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একরকম পরিহার করেই চলতেন। তাঁদের মতে, বিশ্ববরেণ্য লেখকের দুচারটি কাহিনীর চিত্ররূপদানের মধ্য দিয়ে তাঁরা নাকি নিঃসংশয়ে অনুধাবন করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের মননশীল রচনার আবেদন ও তার সংস্কৃতিমূলক গভীর অন্তর্মুখী রসসৃষ্টির সঠিক উপলব্ধি সাধারণ দর্শকের বোধ-শক্তির নাগালের বহু ঊর্ধ্বে বা অনেক বাহিরে। তাই দেখি যে শিশিরকুমার বা শ্রীমধু বসু বা শ্রীনরেশ মিত্র প্রমুখ দু-একজন ব্যতিক্রমরূপ পরিচালকের কথা বাদ দিলে বেশীর ভাগ চিত্রনির্মাতাই রবীন্দ্রনাথকে নমস্কারান্তে সসম্ভ্রমে বা সভয়ে তাকে তুলে রাখতেন। হয়তো কোন কোন পরিচালক মাঝে মাঝে কুণ্ঠিতভাবে প্রস্তাব করতেন রবীন্দ্ররচনার চিত্ররূপ দিতে। কিন্তু প্রযোজকদের কুটিল ভ্রূকুঞ্চনে তাঁদের প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনাশ পেত।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে 'কাবুলিওয়ালা'-র প্রথম মুক্তিলাভ ঘটল। এর পূর্বে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের যে কাহিনীটি চিত্রায়িত হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের মহৎ সাহিত্যের ফলশ্রুতিরূপ 'শেষের কবিতা', মধু বসুর পরিচালনার গুণে। এই 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন এক মনোধর্মী অপরূপ সৃষ্টি যার চিত্ররূপদানের কল্পনা

প্রায় অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য মনে হত। কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য যে 'শেষের কবিতা' তৎকালীন বিদগ্ধসমাজে বেশ কিছু আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। যাকে বলে সার্থক বক্স-অফিসের অবদান, তা এই ছবিখানিও হতে পারেনি। তবুও রবীন্দ্র-সাহিত্যের যোগ্য চিত্রসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুলতে এই ছবিটির অবদান অনস্বীকার্য। একথা বললে হয়তো খুব অত্যুক্তি হবে না যে 'শেষের কবিতা' পথকে অনেকখানি সুগম করে তুলেছিল। দর্শকের মনকে অনেকখানি রবীন্দ্রকাহিনীধরণের ব্যাপারে প্রস্তুত করে তুলেছিল।

ইতিহাসের ক্রমিক ধারাবদ্ধতার আলোচনায় অবশ্য দেখা যাবে যে বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্রকাহিনীমূলক আরো কয়েকটি ছবি ইতিপূর্বে নির্মিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরেশ মিত্র পরিচালিত 'গোরা', নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক চিত্রায়িত 'চিরকুমার সভা' ও 'শোধবোধ' ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'শেষরক্ষা'। যার নায়িকা ছিলেন অধুনা বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিত রায়ের পত্নী শ্রীমতী বিজয়া দাস। আরো যে কয়েকটি ছবি হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ্য নীতিন বসু পরিচালিত 'নৌকাডুবি'। সে আলোচনায় পরে আসব।

যে যুগে এই ছবিগুলি মুক্তিলাভ করেছিল তখন যে এদের কোনটি বিশিষ্ট জনসমাদৃতি লাভ করতে পারেনি তার কয়েকটি কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। মোটামুটি বলা চলে—যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—তৎকালীন দর্শকসমাজ রবীন্দ্ররচনাবস্তুকে উচ্চতর গ্রামে বাঁধা মননশীল, দর্শনতত্ত্বমূলক সাহিত্য বলে গণ্য করতেন। দর্শকসমাজের অভীপ্সাতে উত্তেজনা, আনন্দ ও নাট্যোন্মাদনার সহজ অবদান রবীন্দ্ররচনায় অসম্ভব ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথকে প্রযোজকেরা 'বক্স্ অফিসের বিষ' বলে গণ্য করতেন। সাধারণ দর্শকসমাজ, যাঁরা চলচ্চিত্রব্যবসায়ের ভিত্তিমূলে তাঁরা সাধারণভাবে রবীন্দ্রকাহিনী রচিত চিত্রগুলিকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথ নমস্য দূরের বস্তুই রয়ে গেলেন।

অবশ্য ১৯৪৭ সাল বা ঐরকম সময়ে মুক্ত 'নৌকাডুবি'র কথা একটু স্বতন্ত্র। এই ছবিটি আঙ্গিক ও অভিনয়শৈলী বা পরিচালনানৈপুণ্যের বিচারে অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়েছিল বলেই বোম্বাইতে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে মোটামুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া অন্য কোন রবীন্দ্রকাহিনীমূলক চলচ্চিত্র জনচিত্তে কোন আগ্রহ সঞ্চয় করতে পেরেছিল বলে মনে পড়ে না। তবুও এইটুকু উপকার 'নৌকাডুবি' ও 'শেষের কবিতা' করেছিল নিশ্চয় যে রবীন্দ্রনাথকে আর চিত্রনির্মাতারা পুরোপুরি ভিন্নলোকের বস্তু বলে সভয়ে পাশ কাটাতেন না। বরঞ্চ মোটামুটি একটা এই ধরণের ভাব দেখা দিল যে এই চিরকীর্তিমান লেখকের কোন কোন রচনা বোধ করি সাহস করে চিত্রায়িত করতে পারলে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে।

অবশ্য এখানেই আসে চিত্রপরিচালকের রসজ্ঞান ও রুচির কথা। যে কয়েকজন চিত্রস্রষ্টার কথা বললাম তাঁরা এবং আরো কেউ কেউ তাঁদের সাহিত্যরসজ্ঞান ও উপলব্ধি দিয়ে কোথায় যেন একটা গভীর বেদনা ও লজ্জা এবং পরাজয় বোধ করতেন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বাঙালী হয়েও সভয়ে পরিহার করার পলায়নী মনোবৃত্তিতে। তাই তাঁরা অসমসাহসে ভর ক'রে ঐ দুঃসাধ্য ব্রতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তেমন একটা উল্লেখ্য সাড়া দর্শকমনে সৃষ্টি করবার অক্ষমতাটাকে তাঁরা তাঁদের বাস্তববোধ দিয়ে নীরবে ও হতাশার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। কেননা, বাংলা চলচ্চিত্রের তখন খুব বড় জোর কৈশোর দশা।

আরো একটা কথা অপ্রিয় হলেও এখানে বলতে হয়। যেসব পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অগ্রগামীমনা প্রযোজকদের নামিয়েছিলেন রবীন্দ্ররচনায় চিত্ররূপায়ণের ব্রতে, তাঁদের আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতপ্রমাণ বাধা ছিলেন রবীন্দ্রকাহিনীর স্বত্বগত উত্তরাধিকারীরা। তাঁরাই নাকি মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসেছিলেন,—কোন্ পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের কোন্ রবীন্দ্রকাহিনীর কোন অবদান রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিমহিমাকে অক্ষুন্ন রেখে চিত্ররূপান্তরের যোগ্য অধিকারী তা নির্ণয়ের ব্যাপারে। এ' এক বিচিত্র ব্যাপার যা অন্য দেশের সাহিত্যলোকে এক অশ্রুতপ্রায় দাবী। এই বিচারকমণ্ডলীর হাতে অনেক পরিচালক-প্রযোজক-চিত্রনাট্যকার যে অশেষ অসুবিধা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকটগ্রস্ত হতেন বলে শোনা গেছে তার ফলে চলচ্চিত্রনির্মাতাদের রবীন্দ্ররচনার ওপর অনুরাগ বা আগ্রহ অনেকাংশেই লোপ পেত। যাঁরা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের জনচিত্তে প্রসার ও রসোপলব্ধির বিস্তৃতি ঘটুক তাঁরা বোধ করলেন যে অবস্থাগুণে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ রসিকসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ রইলেন। আমি এখানে কোন পক্ষেরই যুক্তির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলতে চাই না। শুধু সবিনয়ে এইটুকু নিবেদন করি : জাতির চিত্র-প্রতিনিধিদের কেন অবাধ অধিকার থাকবে না চিত্রস্বত্ব ক্রয়ের পর তাঁদের আপন বিচারবুদ্ধি ও রসপ্রবৃত্তির নিয়োগে রবীন্দ্রনাথকে চিত্রপটের মাধ্যমে জাতির মনোজগতে আরো বহুধা প্রসারের চেষ্টা করবার।

যাই হোক, 'নৌকাডুবি' ও 'শেষের কবিতা' দর্শকমানসকে রবীন্দ্রকাহিনীর যে রসাস্বাদ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুতি দিয়েছিল এবং রবীন্দ্রধারাকে চিত্রপটে আরো কিছুটা প্রবহমান করে তুলেছিল সেটাকে পূর্ণগ্রাহ্য করে তুলল তপন সিংহ পরিচালিত ও অসিত চৌধুরী প্রযোজিত 'কবুলীওয়ালা'-র চিত্ররূপ। এদিক থেকে কাবুলীওয়ালা অসাধ্যসাধন করলো রবীন্দ্রনাথকে দর্শকের মানসলোকে একটা অনুপম আরাধ্য বস্তুরূপে তুলে ধরে। এজন্য তপনবাবু ও অসিতবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার। হয়তো 'কাবুলীওয়ালা' একটা চিরায়ত চিত্রসৃষ্টির কোন অনবদ্য অবদান আজকের উন্নত চিত্রমানের তুলনায় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কে অস্বীকার করতে পারে যে তার সরল, সহজ ও মধুর চিত্ররূপ এই অতুল হৃদয়মাধুর্যে-আলিপ্ত কাহিনীর সর্বজনীন হৃদয়াবেদনকে প্রতিটি নরনারীর মনে অদ্ভুত প্রাণস্পর্শে স্পন্দিত করে তুলেছিল? 'কাবুলীওয়ালা' নিয়ে পরবর্তী যুগে অনেক তথাকথিত চিত্রধুরন্ধরদের অনেক বঙ্কিম কটাক্ষ বা পরিহাস শুনেছি, কিন্তু শুনে ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু যে ছবিটির প্রাণরসে চঞ্চল মানবিক অনুভূতি সমগ্র দর্শকসমাজকে আকুল করে তুলল তার সার্থকতাকে যাঁরা সবুজচক্ষু দেবতার দৃষ্টিতে ভস্মীভূত করতে চাইলেন তাঁদের রসিক অমানুষিকতাকে ঠিক সমর্থন করা বা শ্রদ্ধা জানানো মুশকিল।

'কাবুলীওয়ালা' প্রমাণ করল যে রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক সাহিত্যকীর্তি আছে যার আবেদন সহজ, সরল মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধুর সুরে রচিত, ফুলের মত বিকচ যার শুভ্রদীপ্তি। মানবমনের এইসব সুন্দর, শাশ্বত, সহজবোধ্য অনুভূতিগুলি যে অফুরন্ত প্রাচুর্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের অলিগলিতে ছড়িয়ে আছে তাকে আহরণ করাও যে চিত্রনির্মাতাদের এক মহৎ সাধনার বস্তু, সে সত্যের প্রতি 'কাবুলীওয়ালা' আমাদের চোখ খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক বিচিত্র ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর প্রতি সতর্ক-সন্ধানী দৃষ্টি পড়ল আমাদের। আর কাবুলীওয়ালার অনুপম কীর্তিগৌরবে ও সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তপন সিংহ আর এক বিরাট সাফল্যের সৃষ্টি করলেন, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মর্মস্পর্শী চিত্ররূপদানের মধ্যে। কাবুলীওয়ালা যেমন প্রমাণ করল যে মানুষের মনের মধ্যে জাগ্রত যে পিতা সে সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন, তেমনি ক্ষুধিত পাষাণও প্রমাণিত করল যে মানুষের চর্মচক্ষুর বাইরে, অতীতের পাথরপুরীর শিলাময় নির্জনতার মধ্যে সংগুপ্ত থাকতে পারে মানবহৃদয়ের বিচিত্র, চিরন্তন প্রণয়বুভুক্ষার হাহাকার। প্রমাণ করল যে কাহিনীর বাইরের আকার যেমন সত্য ও প্রয়োজনীয়, এর গভীরে প্রবেশ করতে পারলে তেমনি এক অনির্বচনীয়, অ-দৃষ্ট সুন্দরের সাক্ষাৎ ঘটে।

সত্যজিত রায়ের 'তিনকন্যা' আর একটি বিশিষ্ট, হৃদয়রসোত্তীর্ণ চিত্রসৃষ্টি। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উৎসব এর সৃষ্টিপ্রেরণা। পোস্ট মাস্টার, মণিহার এবং সমাপ্তি; রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি মুক্তামালার মত ছোট গল্পের সংকলিত চিত্ররূপ 'তিনকন্যা'। যে রবীন্দ্রকাহিনী-

ধারার প্রবর্তন বাঙালী দর্শকসমাজকে নতুন এক সহজগ্রাহ্য ভাবজগতের সন্ধান দিয়েছিল, 'তিনকন্যা' করল তাকে আরো সুসমঞ্জস, সংহত। এই তিনটি কাহিনীর প্রত্যেকটির মধ্যে ছিল বিভিন্ন সূক্ষ্ম-রসের সুচারু সংকলন। যার সমন্বিত রূপটি দর্শককে দিল গভীর তৃপ্তি। মনে রাখতে হবে যে ছোট ছোট গল্পকে একত্রে গ্রথিত ক'রে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে এই চিত্ররূপচিন্তা বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রজগতের এক অসাধ্যসাধন, যা সত্যজিতের মতো সার্থকস্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনাস্বাদিত রস-মাধুর্যকে 'তিনকন্যা' নতুন ক'রে সঞ্জীবিত করে তুলল। এ রস শরৎসাহিত্য থেকে পৃথক বটে, কিন্তু তেমনি নিবিড় ও মধুর তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ। যে বাঙালী দর্শক একমাত্র শরৎসাহিত্যকে নির্ভরযোগ্য চিত্রকাহিনীর ভিত্তি বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল, সেই বাঙালী অকুণ্ঠ সমাদরের মাল্যচন্দনে ভূষিত করল রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর চলচ্চিত্রের বিচরণ-ক্ষেত্রকে করল বিস্তৃততর।

এর পরই এল সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকীর্তি, 'চারুলতা' ছবিটি সত্যজিতের চিত্রমানসকে এক অপরূপ মহিমা ও লাবণ্য বিস্তৃতি ছিল। এ যেন হল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশিষ্টের অতি সুষ্ঠু যোগসূত্র রচনা। দুটি চিন্তাধারার প্রাণ-স্পর্শী আলেখ্য। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পরূপে সুখ্যাতই ছিল। কিন্তু চারুলতার যে নিঃসঙ্গ বেদনা ও আকুতিকে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত করলেন, শিল্প-অভিব্যক্তির দিক থেকে তা অসাধারণ। মূল কাহিনী থেকে কিছু সরে আসা সত্ত্বেও দেশে-বিদেশে একবাক্যে স্বীকৃত হল যে রবীন্দ্রনাথের কোন কাহিনী আধুনিককালে ফুলে, ফলে, রসে, গন্ধে এমন অসামান্য সৃজনরসে টলমল করে ওঠেনি। সত্যজিত আর একবার প্রমাণ করলেন যে অন্তর্নিহিত বৈভব এত অমিত ব'লেই রবীন্দ্রকাহিনীর আবেদন যোগ্যহস্তে এত দুর্বার হয়ে উঠতে পারে।

দেশের ও শিল্পের দুর্ভাগ্য যে বার বার প্রয়াস সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'ঘরে-বাইরে'র চিত্ররূপদান কল্পনাকে সত্যজিত বাস্তব করে তুলতে পারলেন না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সেটা সম্ভব হলে চিত্ররাস করা আরো সুদুর্লভ রসবৈভবের সন্ধান পেতেন।

রবীন্দ্রনাথের আরো কটি কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে বিভিন্ন পরিচালকদের হাতে। দেবকী বসু-কৃত 'চিরকুমার সভা'। অগ্রদূত-পরিচালিত 'খোকাবাবুর প্রত্যা-বর্তন' ও অগ্রগামী-র 'নিশীথে'। আরো হয়েছিল যেমন 'কঙ্কাল'-এর চিত্ররূপ। সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যেই এদের আবেদন নিহিত ছিল, মনে পড়ে। নিশীথে ছবিটির চিত্রনির্মাণশৈলী একশ্রেণীর সমালোচককে মুগ্ধ করেছিল। আর একশ্রেণী তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমকারী, কিছুটা কাঁচা-হাতের কার্যফল বলে মনে করেছিলেন। আর একটি মহৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের হত্যা-সাধন ঘটেছিল, 'যোগাযোগ' চিত্রে এমন দুর্যোগ চিত্রে কমই দেখেছি।

সামগ্রিক বিচারের দৃষ্টিতে আজ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ আজ আর চলচ্চিত্রের পরিহার্য বিভীষিকার নন। অনেকাংশে তিনি আজকের যুগের চিত্রনির্মাতাদের আকর্ষণের সামগ্রী। যদিও তাঁর উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পই বেশী আকর্ষণীয় তবুও আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে ঘরে-বাইরে', 'গোরা' প্রভৃতির চিত্ররূপ দেখব। অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের বহু সুন্দর ছোটগল্পকে পরিবর্ধিত আকারে অনেক ছবি নিশ্চয় হবে। তাহা যেমন হয়েছিল কিছুকাল আগে তৈরী তপন সিংহের কুশলী পরিচালনার প্রসাদগুণে স্নিগ্ধ 'অতিথি'র চিত্ররূপ। ইদানীংকালের বাংলা ছবির মধ্যে 'অতিথি' এক বিশিষ্ট দান। একটি বালকচিত্তের বাঁধনছেঁড়া কিন্তু শান্তসমাহিত সাধককল্প রূপটুকু তিনি অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এরকম পরিচ্ছন্ন চিত্রভাবনার মধ্যে আমরা অনায়াসে কল্পনা করবার সাহস সঞ্চয় করি ভবিষ্যতের বৃহত্তর, মহত্তর আমাদের অফুরন্ত চিত্রসম্ভাবনার এক উজ্জ্বল রূপ। রবীন্দ্রসাহিত্যের সেই সার্থকরূপটি কবে অনির্বচনীয় মাধুর্যে ও শোভায় ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বচলচ্চিত্রকে বাংলা ছবির মাধ্যমে নতুন মহিমায় মণ্ডিত করবে, এই স্বপ্ন দুচোখে নিয়ে চেয়ে রইলাম ভবিষ্যতের দিকে।

আবহাওয়া ॥ দিনেশ দাস

আকাশ মাঝে মাঝে দেশলাইয়ের কাঠি জবালছিল,
আর বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পোকার মত
ছুটে আসছিল দূর-দূরান্তর থেকে।
বাতাসের চাবুকে ঝ'রে পড়ছিল বিষণ্ণ রং,
কালো রং ছড়িয়ে পড়ছিল কালো মাটিতে।
আবহাওয়া ছলনা করেছিল।

হঠাৎ মেঘগুলো আকাশকে খুলে দিল ঃ
সকাল যেন তার কোঁচড় থেকে
শাদা আলোর খই ছড়াতে ছড়াতে নেমে এল ঃ
গাছের ডাল থেকে
শেষ ঘুম ঝ'রে পড়ছে শিশিরের দুধ হ'য়ে ঃ
নতুন পাতাগুলো অনর্গল কথা কইছে আলোর সঙ্গে।
চেয়ে দেখো, বাতাসের জবর ছেড়ে গেছে,
সে এখন ঠিকই বইছে স্বচ্ছ মেঘের ভিতর দিয়ে ঃ
প্রকৃতি পরিচ্ছন্ন।

আমার দেহটাকে কে যেন এতদিন কম্বলের মত গুটিয়ে রেখে
মনটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল নিরাশ্রয় আত্মার মত।
এখন আমার ছায়াতে আর অন্ধকার নেই,
আমার ভাবনাতেও আর ছায়া নেই।।

অর্জুন বিষাদ ॥ যুগান্তর চক্রবর্তী

চিরসখা, বহুদূরে বহা গেল সাধের প্রতিমা।
চতুর্দিক স্মৃতিরেখা, চালচিত্রে বিস্মৃত পুরাণ।
অচ্ছোদতমসাকুলে নিরঞ্জন হবে যে প্রয়াণ
কোথা স্তোত্রমালা, কোথা শোকরাগ! এ-চিরপূর্ণিমা
এ-চির প্রকাশ, যারে অমরতা দানে তেজোময়
নশ্বর নশ্বর রেখা চতুর্দিকে সমুখে, প্রখর,
একি নয় প্রত্যক্ষের আক্রমণ, নয় রূপান্তর
তোমার রূপের, তুমি এ-বিরহে কোথা জগন্ময়।

তোমার নিয়ত বাঁশি বেজে যায়, কিন্তু সে-নিঃস্বর
ক্ষমাহীনতারে ভুলে থাকা জানি আরো ক্ষমাহীন।
কোথা তব শূন্যতার শাদা ক্রোধ পরিণামহীন
কেন নাম, কোথা নামহীন কবি, আলাপ অক্ষর।

তোমার শৃংখল অই পড়ে আছে, অই অভিজ্ঞতা
আজো নাম ধরে ডাকে। মাথা তোলে দিব্য অক্ষমতা।

এখানটা অন্ধকার, এখানটা স্টেজের পিছন দিক। এখানে বাঁশের খুঁটির গায়ে জড়ানো দড়ির শেষপ্রান্তগুলো কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত পড়েছিল।

আলোর মালা পরানো, জনারণ্য সামনের দিকটা দেখলে কে বলবে এত কাছাকাছি এমন একটা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন জায়গা রয়েছে।

তবু রয়েছে ওটা।

আর রয়েছে রীতা সেখানে দাঁড়িয়ে, বিমূঢ়ের মত।

কিন্তু কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থেকেছে ? বড়জোর কয়েক সেকেন্ড।

তারপরই রীতা তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে গেল, আর সেই সময় শুকনো শুকনো ঘাসজমির উপর পড়ে থাকা ওই চকচকে জিনিসটা চোখে পড়ে গেল রীতার। কী ও ?

রীতা থমকে দাঁড়ালো, একটু ইতস্ততঃ করলো, তারপর জিনিসটায় হাত না ঠেকিয়ে আস্তে চটির আগায় করে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল। এ জায়গাটায় প্যান্ডেলের ছাউনীর কোণ থেকে কেমন করে যেন এক ফালি আলো এসে পড়েছে।

সেই আলোর ফালির উপর জিনিসটাকে ঠেলে দিল রীতা।

তারপর আর সন্দেহ থাকল না। সোনা !

পৃথিবীর পরমতম আকর্ষণীয়, চরমতম পাপ ! রীতা বুঝতে পারলো কোনো অসাবধানী মেয়ের কান্ড !

হয়তো এখুনি ছুটে আসবে খুঁজতে।

আর রীতাকে এমন একা একা প্রায় চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠবে, 'তুমি এখানে কী করছো ?'

তখন রীতার কি বলবার থাকবে ?

বেড়াতে এসেছিলাম এদিকে ?

খুঁজতে এসেছিলাম কাউকে ?

না কি বলবে, হঠাৎ গুন্ডার হাতে পড়ে গিয়েছিলাম। সে আমাকে এদিকে টেনে এনে—

কিন্তু কাউকে এত কথা বলার কী দরকার ? রীতা তো এখুনি ছুটে পালাতে পারে ? যেমন বসে অভিনয় দেখছিল তেমনি গিয়ে দেখতে পারে, মার পাশে যে চেয়ারটায় বসেছিল এতক্ষণ সেই চেয়ারটায় বসে।

মা অবশ্যই বলবে, 'এত দেরী করলি যে ?'

বলবেই। কারণ রীতা দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ কিছুদিন থেকে রীতা সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে মা।

রীতার গতিবিধিকে যেন নখদর্পণে রাখতে চায়, রীতার মনের ভিতরটা যেন দর্পণ ফেলে ফেলে দেখতে চায়।

তাই যখন তখনই মা অত্যুগ্র প্রশ্নে তীব্র হয়. 'এখন ছাতে গিয়েছিলি যে ? এতক্ষণ নীচে কি করছিলি ? ...স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হলো কেন ? জানলায় দাঁড়িয়ে কথা কইছিস কার সঙ্গে ?'

প্রশ্নগুলো সাধারণ, ভঙ্গীটা সাধারণ নয়।

স্থির নিশ্চিন্ত, এখনও মা সেই ভঙ্গীতেই বলে উঠবে, 'এত দেরী করলি যে ?'

এমনিতেই তো যখন রীতা নাটক দেখতে দেখতে হঠাৎ উঠে-পড়ে বলেছিল, 'আসছি এখুনি।' তখন মা চাপা বিরক্তির গলায় বলেছিল, 'এখন কেন? ইনটারভ্যালের সময় যাস।'

তার মানে তখন মা নিজেও ধাওয়া করবে মেয়ের পিছু পিছু। যেন নিজেরও দরকার বাথরুমে। কিন্তু এখন নাটকের এক মহা-মুহূর্ত চলছে, তাই মার পক্ষে ওটা সম্ভব নয়।

মা অতএব শুধু চাপা বিরক্তির গলায় বলেছিল, 'এখন কেন ?'

তা সত্ত্বেও চলে এসেছিল রীতা।

কিন্তু এদিকে কেন এসেছিল রীতা ? এখানে ওর কী কাজ ?

ওকি দেখতে এসেছিল এদিকটা এত অন্ধকার কেন ? না কি আলো খুঁজতেই এসেছিল বিভ্রান্ত হয়ে ? আর সেটা খুঁজতে এসেই অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল রীতার উপর দিয়ে ?

আর রীতা তাই হাওয়াটা সরে গেলেও বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

'কিন্তু ও কেন এখানে এসেছিল?' রীতা ভাবলো, 'ওই মেয়েটা ? অথবা মহিলাটি ? ঝকঝকে জমজমে নেকলসখানা হারিয়ে যে এখন অস্থির হয়ে উঠেছে ! অথবা এখনো টের পায়নি হারিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক নেকলেসটা নিঃশব্দে কণ্ঠচ্যুত হয়ে ওই শুকনো ঘাস জমিটার উপর পড়ে আছে অন্য কারো কণ্ঠলগ্ন হবার বাসনায়।'

তার মানে, একা রীতাই নয়, আরো মেয়ে আছে যারা রীতার মত গোলমালের সুযোগে নির্জনতা খোঁজে।

কি জানি কী জুটেছিল বেচারার ভাগ্যে ? স্তব্ধ প্রতীক্ষা ? না আচমকা ঝড় ?

অথবা রীতারই মত একটার পর আর একটা।

সেই বিপর্যয়ের ধাক্কায় গলা থেকে মালা খসে যাওয়া বিচিত্র নয়।

রীতার মনে হলো গহনাটা হারিয়েছে রীতার মতোই কোনো একটা মেয়ে। 'মহিলা' কেন হতে যাবে ? মহিলার এদিকে কী দরকার ?

আহা না জানি আজ বেচারার কপালে কী আছে !

রীতার হাতটা এগিয়ে গিয়েছিল সেই চরমতম আকর্ষণীয়ের দিকে, তবু রীতা

কুড়িয়ে নিতে ইতস্ততঃ করছিল। কি জানি যদি একটু পরে ওই গহনা-হারানো মেয়েটা হারানো বস্তু খুঁজতে আসে? রীতা ওটা কুড়িয়ে নিলে, পাবে না সে। হয়তো কত বকুনি খাবে। হয়তো তার মাও রীতার মার মত প্রশ্নে তীব্র হবে, 'হারালো কী করে? কোথায় গিয়েছিলি?'

আর বেচারী মেয়েটা শূন্যে উত্তর খুঁজবে।

কিন্তু সত্যিই কি শুকনো শুকনো ঘাসের উপর পড়ে থাকা চকচকে ওই জিনিসটা পড়েই থাকবে? রীতা চলে যাবে?

তা রীতা গেলেই কি জিনিসটা পড়ে থাকতে পারে? কেউ আসবে না? খপ করে কুড়িয়ে নেবে না?

রীতা কুড়িয়ে নিয়ে বরং—রীতা আর একবার চারিদিকটা অবলোকন করে নিল, তারপরই খপ্ করে তুলে নিল বস্তুটা।

আর তুলে নেবার পরই মনে এসে গেল রীতার, আরে আমি কী বোকা! এটাকে সোনা ভেবে চিন্তিত হচ্ছি, যার হারিয়েছে তার দুঃখে বিগলিত হচ্ছি, অথচ একথা ভাবছি না এটা আদৌ সোনা কিনা।

নাঃ সোনা নয়, পিতল।

এরকম অবিকল সোনার গহনার মত দেখতে কেমিকেলের গহনায় তো ছড়াছড়ি বাজারে।

ঠিক ঠিক, কেমিকেলই!

তাছাড়া আর কিছু নয়।

যারা সখের থিয়েটারে অভিনয় করতে এসেছে, তাদের দলেরই কারো জিনিস। কীভাবে হঠাৎ সাজঘর থেকে ছিটকে এসে পড়েছে।

আর কিছু নয়, আর কিছু হতে পারে না।

পিতলটাকে সোনার ভেবেছিল বলে, আর ভয়ে ভয়ে চটি দিয়ে এগিয়ে আনবার সময় চিরসংস্কারের বশে মনে মনে একবার নমস্কার করেছিল বলে, নিজের উপর যেন অনুকম্পা এল রীতার।

তারপর ভাবল, চকচকে করলেই সোনা হয় না। আর আসলের চাইতে অধিক চকচক করে নকল!

অন্ধকারের দিক থেকে উজ্জ্বল আলোর দিকে চলে এল রীতা সেই নেকলেসটাকে মুঠোয় চেপে! আলোর নীচে একবার মুঠো খুলে মেলে ধরে দেখবার বাসনা দুর্দমনীয় হচ্ছে, তবু বাসনাটা দমন করতে হলো। কি জানি বাবা—যদি কেউ চোর ভাবে রীতাকে!

হয়তো এই সময়টুকুর মধ্যেই জিনিসটার খোঁজ পড়ে গেছে, হয়তো কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার হাতে যদি পড়তে হয় রীতাকে?

তার থেকে নিয়ে গিয়ে মার হাতে তুলে দেবে রীতা, মা অভিনয় ভাঙার পর সাজ-ঘরে গিয়ে খোঁজ করবে, 'কারুর কিছু হারিয়েছে?'

হোক পিতলের, তবু অভিনয়ের দলের ওদের তো দরকারি।

কিন্তু—

আলোর দিকে আসতে আসতে ভাবলো রীতা, মা যদি জিগ্যেস করে 'কোথায় পেলি?'

রীতা অবশ্যই বলবে, সেই বাথরুমের দরজার কাছে'—কিন্তু মা কি সন্তুষ্ট হবে তাতে? মা কি বিশ্বাস করবে সে কথা? রীতাকে সন্দেহ করাই তো এখন রোগ হয়েছে মার।

মা অতএব জেরা করবে।

জেরা করে করে বিচলিত করে ফেলবে রীতাকে। আর সেই বিচলিত হয়ে যাওয়া রীতা হয়তো বলে ফেলবে সত্যি কোথায় পেয়েছে।

মার ওই জেরাকে বড় ভয় রীতার।

ওই জেরার সময় কত সময় অকারণ মিছে কথা বলে বসে।

তবে আজ একটা মস্ত ভরসার জিনিস হাতে রয়েছে। মা এই নকল নেকলেসটাকে নিয়েই ব্যস্ত হবে। জিনিসটাকে প্রকৃত মালিকের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে এদিক-ওদিক করবে। রীতা বাঁচবে।

তবে—

খুব সাবধানে কথা বলতে হবে মার সংগে। মা যেন কিছুতেই না টের পায়, রীতা সেই দিকটায় গিয়েছিল, যেদিকটা অন্ধকার।

অথচ ওই অন্ধকারটার দিকে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না রীতার, যেমন—উপায় থাকে না পোকাদের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আলোর দিকে যাওয়া ছাড়া।

পাড়ার বারোয়ারি পুজো উপলক্ষে পুজোর পর এই অভিনয়ের আয়োজন করেছিল ছেলেরা, আর পাড়াশুদ্ধ 'মাসীমা' আর 'দিদি বৌদি'দের আমন্ত্রণপত্র দিয়েছিল।

কাজে কাজেই রীতার মাও পেয়েছিল।

একটা থিয়েটারে আসার সুযোগ পেয়ে আসবে না রীতার মা এমন নির্বোধ নয়। বলবে, 'যা হবে তা বুঝতেই পারছি। ছেলেদের কান্ড তো! হবে সাপ ব্যাং একটা কিছু!'

তবু আসতে ছাড়বে না।

অগত্যা রীতাকেও আসতে হবে।

মার ওই 'রীতা বাতিক' হাওয়া থেকেই ওটাও একটা নীতি হয়ে গেছে। রীতার যতই না কেন পড়ার ক্ষতি হোক।

'না না, বাড়িতে একা থাকতে হবে না, চল আমার সংগে।' বলে টেনে নিয়ে যাবে মা যত্রতত্র। মামার বাড়িতে কি মাসীদের বাড়িতে, বাজারে কি দোকানে, এবং থিয়েটারে সিনেমায়। অর্থাৎ মা নিজে যে যে জায়গায় না গিয়ে থাকতে পারে না।

অথচ এই কিছুদিন আগেও উল্টো অবস্থাই চলেছে। মার সঙ্গে কোথাও যেতে চাইলে মা ঝংকার দিয়ে বলেছে, 'পড়তে হবে না? যাব বলে নাচলে চলবে?' বলেছে, 'এই বয়সে সিনেমা থিয়েটার দেখার এত নেশা কেন? যেতে হবে না। জানো—আমরা বিয়ের আগে কখনো সিনেমা থিয়েটার দেখিনি!'

মা দের—মানে রীতার মা এবং মাসীদের, কোন বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সে প্রশ্ন করবার সাহস অবশ্য হত না রীতার।—

মাকে তার ভারী ভয়।

যমের মত!

বাঘের মত!

উন্মত্ত ষাঁড়ের মত!

কেন, তা জানে না রীতা।

শুধু জানে ভয় করতে হয়।

আসন্ন পরীক্ষার মুখেও তাই মায়ের সঙ্গে দোকান ঘুরতে হয় মাসীর নতুন নাতনীর জন্যে বেবি ফ্রক কিনতে।

যদি রীতা পড়ার ক্ষতির কথা তোলে, নস্যাৎ করে দেয় মা সেই ক্ষীণ প্রতিবাদ।

'পড়ার ক্ষতি? নিজে যখন বসেবসে রাত্তির বারো পর্যন্ত পড়?'

তা' সিনেমা কি থিয়েটার সম্পর্কে অবশ্য আপত্তি তোলে না রীতা। নিজের আগ্রহেই তোলে না। আজও তোলেনি। কারণ বারোয়ারী পুজোর গোলমালে কোনো এক সময় কোনো একজনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রীতা আসবেই আজ।

আর ওই অন্ধকারের দিকটার উল্লেখটাও ছিল সেই অলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে। রীতা অতএব টেরই পায়নি নাটকটা ভাল হচ্ছে কি হচ্ছে না। প্রথম থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে থেকেছে, আর চিন্তা করেছে কোন ছুতোয় একবার উঠে যেতে পারবে।

তা' ছুতো আবিষ্কার করে ফেলেছিল রীতা, গিয়ে পৌঁছেও ছিল, এবং যখন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দশ মিনিটকে দশ ঘণ্টা মনে করে চলে আসতে যাচ্ছিল, তখন রীতার উপর একটা ঝড় এসে পড়ে বিস্ময়-বিমূঢ় করে তুলেছিল রীতাকে।

এটা রীতার হিসেবের মধ্যে ছিল না। ছিল না আশংকার মধ্যে। রীতা শুধু জানতো কয়েকটা কথা শুনতে হবে তাকে।

রীতা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

তবু রীতা ঘাসের উপর পড়ে থাকা ওই চকচকে জিনিসটার দিকে উদাসীন অবহেলায় তাকিয়ে দেখে চলে আসতে পারেনি।

চকচক করলেই সোনা হয় না জেনেও রীতা থমকে দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিল, আর শেষ অবধি খপ করে তুলেও নিয়েছিল জিনিসটা।

চকচকানিটাই যে পৃথিবীর পরমতম আকর্ষণীয়। ছেলেমানুষ রীতা সে আকর্ষণের হাত এড়াবে কি করে? রীতা তারপর সেই কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটা মুঠোয় চেপে চলে এসেছিল পরে মাকে দেবে বলে।

জেরা আর বকুনির আশংকা সত্ত্বেও।

তা রীতার আশংকাটা অমূলক নয়।

ইত্যবসরে একবার ইন্টারভ্যালের সময় এসে গিয়েছিল। আর সেই সাময়িক যবনিকা-পাতের অবকাশে রীতার মা আসন ছেড়ে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল রীতার জন্যে।

আবার ঢোকবার মুখেই মুখোমুখি।

রীতার মা তীব্র চাপা গলায় বলে উঠলো 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

রীতা ঢোক গিলে বলল, 'বলে গেলাম তো?'

'তার জন্যে এত দেরী?' রীতার মা যেন ফেটে পড়ে, 'বাড়ি গিয়েছিলি নাকি?'

রীতার গলা শুকিয়ে আসছিল, তবু রীতা সাহস সংগ্রহ করে বলে ফেললো, 'একটা ব্যাপার হয়েছে—'

'কী ব্যাপার?' মা আরো তীব্র হলো।

রীতা বললো, 'এসো একটু এদিকে—'

বলে একটা আলোর পোস্টের দিকে সরে গেল, তারপর মৃদু গলায় বললো, 'এটা কুড়িয়ে পেলাম।'

রীতা হাতের মুঠোটা খুললো, আর রীতার হাতের জিনিসটা ঝলসে উঠলো তার শোভা-সৌন্দর্য সুষমা আর মূল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

বলতে কি রীতাও এই প্রথমই দেখলো এত স্পষ্ট করে। এতক্ষণ তো রীতা ঘাম ঘাম হাতে শুধু অনুভবই করছিল। আর ভাবছিল, আচ্ছা কেমিক্যালই তো? না সত্যি সোনার?

তবে মার কাছে কোনো সন্দেহ ব্যক্ত করল না রীতা। শুধু হাতের মুঠোটা খুলে ধরলো মার সামনে।

দেখলো শুধু তার হাতের জিনিসটাই নয়, মার চোখ দুটোও প্রায় তেমনিই চকচক করে উঠলো।

মা রীতার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল, খপ করে বটুয়ার মুখটা খুলে পুরে ফেললো তার মধ্যে, ফিসফিস করে বললো, 'কোথায় কুড়িয়ে পেলি?'

রীতা আর একবার ঢোক গিললো, 'বললাম তো!'

'দেখিয়েছিস কাউকে?'

'না!' রীতা আস্তে বলে, 'ভাবলাম তুমি এনকোয়ারি অফিসে জমা দিয়ে দেবে—'

মা ব্যস্ত গলায় বলে, 'থাক সে পরে হবে। এখুনি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ও একবার প্রচার হলে শুনবি প্যান্ডেল ভর্তি মেয়েমানুষের সকলেরই গলার হার হারিয়েছে।'...

রীতা বললো না, এটা বোধহয় সোনার নয়। কারণ রীতার ভয় হলো এ সন্দেহ ব্যক্ত করলেই হয়তো সাজঘরের পিছনের অন্ধকারটার কথা এসে পড়বে।

রীতার মা-ই তাই আবার কথা বললো, 'যার জিনিস হারিয়েছে, সে নিজেই খোঁজ করবে, গোলমাল উঠবে। তোমার কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।'

তারপর রীতার মা আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলো মেয়েকে সংগে করে।

বটুয়ার মুখটা মুঠোয় চেপে কোলের উপর রাখলো, আবার ফিসফিস করে বললো, 'বলতে হবে না কাউকে। তোর বাবাকেও বলবি না, এই নিয়ে একটা হৈচৈ করবে। জানিস তো মানুষকে!'

মেয়েকে জেরা করতে ভুলে গেল রীতার মা, আবার মঞ্চের দিকে চোখ ফেললো।

আবার পর্দা উঠেছে। পাত্র-পাত্রী ভালো ভালো আর জোরালো জোরালো কথা বলছে।

গহনাটার একটা সূক্ষ্ম কোণ হাতের তালুতে বিঁধে গিয়েছিল, তালুটা জ্বালা করেছিল সেদিন রীতার। কিন্তু এখন রীতার সারা মনটাতেই যেন তেমনি একটা অনুভূতি। যেন পুরোপুরি গহনাটাই বিঁধে রয়েছে সেখানে।

রীতা এখন বুঝতে পারছে ওটা নকল নয়। নকল হলে মার চোখটা অমন চকচক করে উঠতো না, আর বটুয়ার ভেতর পুরে ফেলে অমন গেপে ফেলতো না মা।

কারুকার্য করা সেই অলংকারটার সমস্ত খোঁচাগুলো তাই এখন রীতার মনের মধ্যে বিঁধছে। কারণ রীতার সেই ঘাম ঘাম হাতের অনুভূতিটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

রীতা যদি না কুড়োতো!

রীতা যদি চলে আসতো সেই অন্ধকার দিকটা থেকে।

প্যান্ডেল থেকে বেরোবার মুখে একবার ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করেছিল মাকে, 'জমা দেবে না এনকোয়ারি অফিসে?'

মা প্রায় ধমকে উঠেছিল, 'না! এখন এই গোলমালের মধ্যে দিলে কোথায় লোপাট হয়ে যাবে তার ঠিক আছে? সব ছেলেই তো চেনা, পরে জিগ্যেস করবো নেকলেস হারানোর কথা উঠেছে কিনা।'

কিন্তু সব চেনা ছেলেই তো অভিনয়ের পর এলো—একে একে, দুইয়ে দুইয়ে। মাসীমা আর দিদি বৌদিদের অভিমত সংগ্রহ করে ধন্য হতে অভিযান চালালো কিনা।

কই রীতার মা তো তুললো না সে কথা?

রীতা ভেবেছিল মা ভুলে গেছে, তাই রীতা মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু মা চোখের ইসারায় থামিয়ে দিয়েছে।

তারপর ওরা চলে যাবার পর মা বিরক্ত গলায় বলেছে, 'সব সময় সর্দারী করতে আসো কেন? আমি কি খেয়ে ফেলছি ওটা? হবে, যখন বুঝবো বলবো।'

রীতা মাকে ভয় করে।

যমের মত, বাঘের মত, উদ্যত খাঁড়ার মত! তাই রীতা চুপ করে যায়।

কিন্তু রীতার বুক ফেটে যায় বাবাকে পর্যন্ত বলতে না পেরে। রীতার উপর দিয়ে একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেছে, তাই রীতা যেন গুটিয়ে গেছে, বাবার কাছে মুখ তুলতে পারছে না।

ক্রমশঃ যেন ধূসর হয়ে যাচ্ছে সেই চকচকে বস্তুটা। মার বটুয়ায় ঢুকে পড়ার পর সেটাকে আর কোনোদিন কি দেখেছে রীতা?

তাই ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, সত্যিই কি আমি কুড়িয়েছিলাম কিছু?

রীতার উপর দিয়ে যে সেদিন ঝোড়ো হাওয়াটা বয়ে গেল, তার স্মৃতিটাও বুঝি ধূসর হয়ে যাচ্ছে ওই সোনাটার চাপে।

সোনা!

যার মধ্যে নিহিত পৃথিবীর সমস্ত পাপের মূল! রীতার অপরাধবোধটাই মুছে মুছে নিচ্ছে সে।

আর শুধু অপরাধ বোধটাই মুছে নিচ্ছে না, বুঝি সাহসেরও জন্ম দিচ্ছে।

নইলে রীতা কেন এখন মাঝে মাঝেই দেখছে, মাকে আর ভয় না করলেও চলে। দেখছে, এতদিন শুধু অকারণ বোকামি করে এসেছে।

এখন মার প্রশ্নের সেই অত্যুগ্র তীব্রতাকে উপেক্ষা করে যেন বলা যাচ্ছে, 'ছাতে গিয়েছি তো কী হয়েছে?......নীচে আবার করবো কি, নীচে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিল।......জানলায় দাঁড়িয়ে কথা কইবো কার সঙ্গে? স্বপ্ন দেখছো না কি?'

মা হঠাৎ মিইয়ে যাচ্ছে, বলছে, 'খুব মুখ হয়েছে বাবা আজকাল তোর!'

মার গলায় কি কোনো অসুখ করেছে? তাই গলার জোরটা এত কমে গেল কেন? রীতার মাসীর ভাসুরঝির বিয়েতে নেমন্তন্ন খাবার সময় যখন রীতা বললো, 'আমি যাব না, আমার ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ইচ্ছে নেই—', তখন রীতার মা চেঁচিয়ে বলে উঠলো না, 'যাবি না তো কি একলা থাকবি না কি?'

মা বললো, 'না গেলে ওরা পাঁচবার জিগ্যেস করবে। স্বপ্না, শোভা, কুলু, মিন্টি, ওরা সবাই আসবে—'

'আসুক!'

'তোর বাবা তো আবার আমাকে আনতে যাবে—'

'যান না, আমায় কি ভূতে খেয়ে ফেলবে?'

'জানি না বাবা!'

বলে মা চলে যায়।

আর মা যখন গাড়ীতে ওঠে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রীতা এতদিন পরে হঠাৎ সেই নেকলেসটাকে দেখতে পায়। বটুয়া থেকে বেরিয়ে মার কণ্ঠলগ্ন হয়েছে সে।

কণ্ঠলগ্ন!

ওই শব্দটাই মনে এল রীতার।

রীতার বাবা ক্লাব থেকে ফিরে মাকে আনতে যাবে। এখন অনেকক্ষণের মত রীতা স্বাধীন মুক্ত! রীতা এখন ছাতে উঠতে পারে, জানলায় দাঁড়াতে পারে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে পারে, পাড়ার ছেলেদের ডেকে গল্প করতে পারে।

কিন্তু রীতা কি সেই অনেকক্ষণের স্বাধীনতাটুকু পেল?

কই আর?

রীতার মা কার যেন গাড়ীর সুবিধে পেয়ে বাবা নিতে যাবার আগেই সাত তাড়াতাড়ি চলে এল।

রীতার মা চাকরকে ছুটি দিয়ে গিয়েছিল, তাই দরজার কড়া নাড়তে রীতাকেই দোর খুলে দিতে হল,

আর মা এত তাড়াতাড়ি দোর খোলাতে পেরে যেন থমকে গিয়ে বললো, 'নীচে ছিলি নাকি?'

রীতা বললো 'হুঁ!'

মা বসবার ঘরটার দিকে উঁকি দিল, বললো, 'ঘরে আলো জ্বলছে যে?'

রীতা অগ্রাহ্যের গলায় বললো, 'মানুষ থাকলেই আলো জ্বলে।'

'কেন কি হয়েছে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?'

মা ভুরু কোঁচকালো, 'কেউ এসেছে বুঝি?'

রীতা গম্ভীর গলায় বললো 'হ্যাঁ।'

মা বেজার গলায় বললো, 'কে আবার এল এখন?'

রীতা মার সেই বেজার মুখের দিকে তাকালো, রীতা মার আঁচল ঢাকা দেওয়া গলার দিকে তাকালো, তারপর স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বললো, 'নীপুদা!'

নীপুদা!

মানে রীতার মার সবচেয়ে বিরক্তির পাত্র।

মা রুদ্ধ গলায় বললো, 'ও আবার কি করছে এখন?'

রীতা আরো স্থির গলায় বললো 'চা খাচ্ছে।'

'চা খাচ্ছে!'

রীতার মা যে ভঙ্গীটা প্রায় হারাতে বসেছিল, সেই পুরনো তীব্র ভঙ্গীতে বলে উঠলো, 'এই একলা বাড়িতে নীপুকে ডেকে চা খাওয়াচ্ছো তুমি?'

রীতা আর এ ভঙ্গীতে ভয় খেল না, রীতা মার দিকে খোলা চোখে তাকালো। রীতার মার সাড়ে পনেরো বছরের মেয়ে সেই খোলা চোখে তাকিয়ে উদ্ধত গলায় বললো, 'কেন, কী হয়েছে তাতে? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?'

রীতা বুঝে ফেলেছে মাকে আর ভয় না করলেও চলবে।

রীতা জানে রীতার এই ঔদ্ধত্যের কাহিনী বাবাকে বলে দিতে পারবে না মা। ভয়ের বাসাটা জায়গা বদল করেছে। শাসন করবার ক্ষমতা হারিয়েছে মা।

কে জানে আজকের এই দুঃশাসন যুগের রহস্যও ওই একই কিনা।

তরফদার বংশের আদি-পিতামহ জুতো পায়ে দেওয়ার বিষয়ে যে পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন, তার কোনো কোনো অংশ আজ পর্যন্ত রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক এবং উল্লেখযোগ্য।

শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য বা বিলাসিতার জন্যই যে জুতো ব্যবহার নয়, জুতোর যে আরো একুশ রকম ব্যবহার এবং তেইশ রকম উপকার আছে, স্বর্গীয় সিদ্ধুগোবিন্দ তরফদার একথা বিশদভাবে বোঝাতে মোটেই কসুর করেন নি।

যদি আপনার গেঁটেবাত থাকে তবে একাদশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ করে রাত্রিকালে কিছুতেই জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাঁটিবেন না। সিদ্ধুগোবিন্দ তরফদার মহাশয়ের ভাষায়ঃ—

> আমাদের দেহমধ্যস্থ একপ্রকার জলগ্রন্থিতে জলের শুষ্কতা দেখা দিলে শরীর টান টান হইয়া গেঁটেবাত নামক গ্রন্থি-যন্ত্রণার সঞ্চার করে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং একাদশী তিথিকালে সুদূর অন্তরীক্ষ হইতে চন্দ্রদেবতা নদী, নালা, খাল, পুষ্করিণী এমন কি গভীর সমুদ্র ও গঙ্গায় পর্যন্ত জল আকর্ষণ করিয়া জোয়ার-ভাটার আয়োজন করেন। আমাদের দেহমধ্যেও সেই জোয়ার-ভাটার আয়োজনে জলে টান পড়িয়া গেঁটে বাতের অসহ্য কনকনানি দেখা দিয়া থাকে।
>
> এই সময়ে অর্থাৎ এই সকল তিথিকালে যদি নিউ তরফদার সু হাউসে'র গাইড স্পেশাল ব্রাউন বা ব্ল্যাক কালার (Govt. special —Brown or Black colour) পাদুকা দিয়া পদদ্বয় ঢাকিয়া রাখিলে জোয়ার-ভাটার টান কিছুতেই শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থি-যন্ত্রণার সঞ্চার করিতে পারিবে না।

এর পরে বিশেষ করে রাতের বেলাতেই কেন জুতো পায়ে দেওয়া দরকার সে বিষয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা ছিলো। পঞ্জিকা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের এমন বিচিত্র মিশ্রণ আর কোথাও সম্ভব হয়েছে বলে জানি না।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য অংশ ছিলো ঐ পুস্তিকাতে এই গেঁটে বাত অধ্যায়েই, যেখানে তিনি গেঁটে বাত ও তরফদার সু হাউসের চর্মপাদুকার সঙ্গে টাইটানিক জাহাজ-ডুবির ঘটনাটিও জড়িয়েছিলেন। সেকালে টাইটানিক জাহাজ ডোবার ব্যাপারটি খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলো। তাই হয়তো স্বর্গীয় তরফদার মহাশয় টাইটানিকের উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। কিন্তু এই বিশাল বিষয়টি জুতো ও গেঁটেবাতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন যা তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই হয়তো সম্ভব। দ্রষ্টব্যঃ—

> আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে টাইটানিক জাহাজ কেন ডুবিয়াছিল, সে বিষয় সাহেব বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে জোয়ার-ভাটার টান-ই ইহার জন্য দায়ী। বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ঐরূপ প্রাসাদোপম তরীর কিছু ক্ষতি হওয়াই সম্ভব নহে, আসলে জোয়ার-ভাটার টানেই উহা তলাইয়া গিয়াছে।
>
> লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি মহানগরের সাহেবেরা বহু গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে টাইটানিক জাহাজটি আগাগোড়া চর্মাবৃত থাকিলে এই জোয়ার-ভাটার টানে উহার কোনোই ক্ষতি হইত না।
>
> চর্মাবৃত থাকিলে অতবড় টাইটানিক জাহাজ রক্ষা পাইত, আপনার চরণ-দ্বয়ও রক্ষা পাইবে।
>
> শুধু একটিমাত্র নিবেদন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা একাদশীর দিন এবং রাতে পাদুকা ব্যবহার করিয়াও যাঁহারা গেঁটেবাতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন না তাঁহারা ইহার পর হইতে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জুতা পায়ে দিবার আগে দুই পায়ে উত্তমরূপে এস. জি. টি পাউডার (S. G. T. Powder) মাখিয়া লইবেন, অপ্রত্যাশিত ফল হইবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এস, জি, টি, সিদ্ধুগোবিন্দ তরফদারের নামের ইংরেজি বানানের বর্ণারম্ভে তিনটি অক্ষর এবং এই পাউডার স্বর্গীয় তরফদার মহোদয়ের স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-প্রসূত।

নিউ তরফদার সু হাউসের জুতো অবশ্যই কিছু কিছু বিক্রি হতো, তা না হলে তিনপুরুষ ধরে দোকানটি চলা সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু ঐ 'এস, জি, টি' অর্থাৎ 'সিদ্ধুগোবিন্দ তরফদার পাউডার?' সে খবর পরের বার বলব।

—তারাপদ রায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ভারতের মানুষ, ভারতীয় সাধনার ধারা তাঁর মর্মলোকে, ভারতীয় চিন্তা ও আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গোরার মুখে কবি বলেছেন—

"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কোনো সমাজের বিরোধ নাই। আজ ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত। আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

রবীন্দ্র-মানসে সেদিন স্বদেশের এই পবিত্র ছবি জেগেছিল। তিনি ভারতপ্রেমিক, তাই বলতেন : 'সারা ভারতের সঙ্গে আমি একাত্ম, তার সমস্ত অধিবাসী আমার আপন-জন, আমি জানি তাদের সকলের মধ্য দিয়ে ভারত-আত্মার বাণী গোপনে নিরন্তর প্রবহমান।' তাই ভারতকে বৃহৎ ও মহৎ করে তুলতে কবি স্বয়ং যে শুধু নিরলস সংগ্রাম করেছেন তা নয়, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেও প্রেরণা জাগিয়েছেন। তবু তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন—"সত্যই কি আমাদের দেশকে মহৎ করার প্রয়োজন আছে? আমাদের দেশের মত মহৎ দেশ আর কোথায়? আমাদের নিজের জীবনকেই মহৎ করে তুলতে হবে।"

শুধু ভারতবর্ষ তাঁর চোখে এক বিস্ময়কর জগৎ নয়, সমগ্র ভারতবাসী তাঁর কাছে বিস্ময়ের বস্তু। কত সহস্র সহস্র বৎসরকাল ধরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে আমাদের দেশকে মহত্তর করে তোলার এই প্রক্রিয়া চলেছে, আমাদের দেশ যেন সকল দেশকে অতিক্রম করে যেতে পারে এ চেষ্টা অনেক কালের। কত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে এই মাটিতে। কত বৃহৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে এই ভূমিতে, আবার কত বিস্ময়কর সত্য উচ্চারিত হয়েছে এই দেশের মানুষের কণ্ঠে। কি আশ্চর্য কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন এ-দেশের মানুষ—কত বিচিত্র দৃষ্টিকোণে ধর্মের বিচার হয়েছে—আর জীবনরহস্যের কত জটিল সূত্রের সমাধান ঘটেছে এই মহামানবের সাগরতীরে।

এই আমাদের ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর স্বদেশবাসীদের বলেছিলেন—দেশকে জানো, স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু। দেশকে যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে, অবহেলার ভঙ্গীতে দেখো না। সমস্ত ভারতীয়ের পক্ষে এই অনুভূতি থাকা প্রয়োজন যে, এক মহৎ দেশের মাটিতে তার জন্ম। আর সেই স্বদেশের জন্য কায়মনোবাক্যে তাকে কাজ করে যেতে হবে—আর সেই বস্তু আহরণ করতে হবে, যার নাম অর্থ নয়, যা আমাদের জীবন, সেই জীবনকে আবিষ্কার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে, তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে বঞ্চিত করিয়া দেখে, তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতবর্ষ এক বাস্তব ক্ষেত্র। তাঁর দিবারাত্রের ধ্যানের ধন। এই চিন্তা তাঁর সমুদ্রগামী জাহাজের পরিচালকের মত। জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রপথে যখন ভাসমান, তখন তার সমগ্র চিত্ত পড়ে থাকে সমুদ্রপথের বন্দরে—কর্ম এবং অবসরের মুহূর্তে এই এক তার চিন্তা। রবীন্দ্রনাথের চিত্তও তেমনই সদাই ভারতের মাটিতে আবদ্ধ।

কিন্তু এই ভারতবর্ষ কোথায়? ইতিহাসের পাতায় নয়, এই ভারত তাঁর হৃদয়ের গহনে। রবীন্দ্রনাথ কি কোনো বিশেষ বন্দরের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর জবাব দিয়েছেন :

"I may miss my task, I may sink and drown, but that Port of a great Destiny is always there. That is my India in its fullness—full of wealth, full of knowledge, full of righteousness. Do you mean to say that such an India is no where? Is there nothing but this falsehood on everyside!"

যা মিথ্যে তার বেসাতি করা কি ঠিক? আমরা কি মিথ্যের মোহে জড়িয়ে ভ্রান্তপথে চলব! বাস্তব জগতের দিকে তাকাবো না! এই সব নয়, এই মিথ্যেটুকু নিয়ে আমাদের জগত রচিত নয়। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে। মিথ্যের জগত অতিক্রম করে তাই যেতে হবে অন্যলোকে—

"There is a true India, rich and full, and unless we take our stand there, we shall not be able to draw upon the sap of life either by our intellect or by our heart. Therefore I say forget everything — book-learning, the illusion of titles, the temptations of servile livelihood; renounce the attractions of all these and let us launch the ship towards its port. If we must sink, if we die, let us it is because it is so vital for us that I at least can never forget the true and complete image of India."

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল তাঁর স্বদেশবাসী ভারতের এই প্রতিমূর্তি অন্তরে উপলব্ধি করবে। আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে কৃচ্ছ্রসাধনে পাওয়া যাবে আনন্দ। যাঁরা সখের স্বদেশপ্রেমিক তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল না সত্যে। তাই তাঁদের দাবীর পিছনে ছিল না উপযুক্ত শক্তি। তাঁরা সেই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন, স্বয়ং ধনপতি কুবের এসে যদি বলেন—বৎস! বর প্রার্থনা করো। আমার ত মনে হয় ওঁরা তাহলে বড়লাটের আর্দালীর ঐ গিলটিকরা তকমা ছাড়া আর কিছু চাইতে পারবে না। ওদের নেই বিশ্বাস, তাই আশাও নেই। আমাদের কর্তব্য তাই কঠিন, যারা সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে আছে তাদের চিত্তে স্বদেশী বস্তুর প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করতে হবে, দ্বিধাহীন চিত্তে নিজস্ব মনোভাব অপরের ওপর আরোপ করতে হবে। যা কিছু আমার স্বদেশের সম্পদ তার প্রতি চাই অবিচল শ্রদ্ধা। স্বদেশের যা কিছু তার জন্য নিরন্তর লজ্জানুভব করে মানসিকতা দাস মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা প্রত্যেকে যদি সেই বিষক্রিয়াকে অতিক্রম করতে পারি তবে অবিরাম আমাদের কর্মের ক্ষেত্র খুঁজে পাব। এ পর্যন্ত স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসে অপরে যা করেছে তাই অনুকরণের জন্য আমরা সচেষ্ট। এইভাবে আমরা শুধু ধ্বংসের পথে নেমে যাব।'

রবীন্দ্রনাথ তাই তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, ভারতবর্ষ বিদেশীর দরবারে বিদেশী আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী নয়। বিদেশী মাপকাঠি অনুসারে আমাদের জাতীয় গৌরব বা লজ্জার বিচার করা অনুচিত। প্রতি পদে পদে বিদেশীর সঙ্গে তুলনা করা অর্থহীন। আমাদের জন্মভূমি সম্পর্কে কুণ্ঠিত বোধ করার কিছু নেই। আমাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, সংস্কার, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অপরের সঙ্গে তুলনায় আপনাকে হীন ভাবার কোনো যুক্তি নেই। তেমনই অপরকে ছোট করাও উচিত নয়। আমার মাতৃভূমির ওপর যে গুরুভার চাপানো আছে সেই ভার বহনে আমি পুরুষোচিত দৃঢ়তায় যেন অগ্রসর হতে পারি, আমাদের সকল সামর্থ্য ও গৌরব

নিয়ে স্বদেশজননীর সেবা করাই আমাদের কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জনসাধারণের কাছে গিয়ে পড়েছিলেন. অতি কাছে থেকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রত্যক্ষ সংবাদ আহরণ করেছেন। যে আছে মাটির কাছাকাছি তার জন্য তিনি সত্যই কান পেতেছিলেন। ভারতের অধিকাংশ মানুষ যে দরিদ্র এবং ভারতের সেই অধিকাংশ যে শহরবাসী নয়, পল্লীবাসী—এই সত্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। তাদের আনন্দ-বেদনায় তিনি শরিক হয়েছেন। এই সব মানুষ রোগ-যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য চিকিৎসক না ডেকে হাতুড়ের টোটকা ব্যবহার করছে দেখে তিনি অতিশয় ক্লেশ বোধ করেছেন। সারা রাত ধরে উদ্ভট মন্ত্রোচ্চারণ করে লোহার শলাকা আগুনে পুড়িয়ে রোগীর অঙ্গে ছেঁকা দিয়ে রোগ তাড়ানোর যে উৎকট প্রয়াস তা রবীন্দ্রনাথকে বেদনাহত করেছে। তার ফলে তিনি বলে উঠেছিন :—

> "The torments inflicted by that Charlaton are torturing me, they are torturing whole of my country. I can not look upon this as a trivial or isolated even—. Whatever wounds my country, no matter how serious it may be, has its remedy— and that remedy is in my own hands. Because, I believe this, I am able to bear all the sorrow and distress and insult that I see around me. I shall never bring myself to believe that misery is eternal.."

রবীন্দ্রনাথ একাই কি তাঁর স্বদেশবাসীর দুর্দশা লক্ষ্য করেছিলেন? নির্বোধ মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় কি শুধু রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আরো হাজার হাজার মানুষের নজরে এমনই কত কিছু পড়ে থাকবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি তাঁদের ছিল না। প্রতিদিনের ঘটনা তাঁর মনে নতুন করে প্রতিদিন বহন করে এনেছে বেদনার ভার। যা অনেক দিনের পুরাতন ব্যাধি আর যে ব্যাধি সাম্প্রতিক, এই উভয়বিধ ব্যাধিই সমাজজীবনে প্রবেশ করে কি জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে তা কবি অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বদেশ নয়, উত্তরকালে তিনি স্বদেশভুবনস্বয়ং এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে সারা ভুবনকেই আপন দেশ বলে স্বীকার করেছিলেন। দেশ শুধু মাটির দেশ নয়, সে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের ভৌগোলিক সীমানাটাই সব নয়, দেশ মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই মানুষের দেশ অন্তহীন, তার সীমানা মহাকাশ। সারা বিশ্বই সব মানুষের দেশ, সবাই একই হাসি-কান্নার অংশীদার। তাই কবি ভৌগোলিক সীমায়, জাতীয় অহংবুদ্ধির সীমানায় দেশকে বেঁধে রাখতে চাননি। তিনি জানতেন যে দেশের সমৃদ্ধি ততই বাড়বে যতই তার সীমানা দিগন্ত প্রসারিত হবে। দেশের সীমানা চিরন্তনের সীমানা। তিনি তাই বলেছেন—'ভারতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান।'

এই সমন্বয়ের বাণী কবির অন্তরে জেগেছিল। সমন্বয়ের মধ্যে সমৃদ্ধি, সমন্বয়ের মধ্যে শক্তি। সঙ্কীর্ণতা, সংস্কার, সব ধুয়ে মুছে যেখানে বিরাট বিশ্ব বাহু মেলে আছে তার মধ্যে আপনাকে ধরা দিলেই তবেই ভারতসভ্যতার যথার্থ সার্থকতা ঘটবে। এই ভারতবর্ষের ভূমি বিশ্ব-মানবের মিলনতীর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে সর্ব-জাতীয় রাষ্ট্রীয় সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থ সাধন সম্ভব, কেননা পরস্পর নির্ভরতাই মানবের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্য-সাধনার ক্ষেত্র হবে।'

রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা তাই শুধু ভারতের নয় বিশ্বজগতের মানুষের চিন্তা। স্বদেশের মানুষে যে চিন্তার সূত্র-পাত উত্তরকালে সেই চিন্তা সকল দেশের মানুষের চিন্তায় পরিণত হয়েছে, সেখানে ভারত ও বিশ্বজগৎ একাকার।

—অভয়ঙ্কর

রবীন্দ্র-প্রদর্শনী ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডুলিপি, চিঠি-পত্র এবং ছবির একটি প্রদর্শনীর সম্প্রতি উদ্বোধন হয়েছে 'বিড়লা আকাদমি অব আর্ট এন্ড কালচার' ভবনে। ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সাধারণের জন্য খোলা ছিল। প্রদর্শনীতে যে ৭৪টি বিষয় প্রদর্শিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি সত্যই অভিনব। চিঠিপত্রের মধ্যে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট হুড' উপাধি প্রত্যাখ্যান করে যে ঐতিহাসিক চিঠিটি দিয়েছিলেন, তা এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়াও গীতাঞ্জলির একটি ফটোস্ট্যাট কপিও প্রদর্শিত হয়েছে। এরকম একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আকাদমি সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

কমনওয়েলথ কবিতা সংকলনে ভারতীয় কবিতা ॥

ভারতীয় কবিতা সম্বন্ধে বিদেশীদের অজ্ঞতার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে সত্যই স্তম্ভিত হতে হয়। সম্প্রতি কমনওয়েলথ কবিতার একটি সংকলন দেখে কথাটি নতুন করে মনে পড়ল। সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন হাওয়ার্ড সার্জেণ্ট। এতে ২৩টি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের কবিতা সংকলিত হয়েছে। সংকলিত ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। বারটি ভারতীয় কবিতা সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও আর পার্থসারথির 'আন্ডার এ্যানাদার স্কাই' কবিতাটির অংশও এতে স্থান পেয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে দেবকুমার দাসের 'অন ডিসকোভারিং এ টু হান্ডরেড বি সি সিটি ইন বেঙ্গল', রেজিনাল্ড মেসের 'তাজমহল' নিসিম ইজিকিয়েল, কমলা দাস, পি লাল, ডোম মোরেস, এ কে রামানুজম, প্রদীপ সেন ও মোহন সিং-এর কবিতা সংকলিত হয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এই কি ভারতীয় কবিতা? যাঁদের নাম করা হল, তাঁরা অনেকেই আধুনিক ভারতীয় কবিতার ইতিহাসে কোন পর্যায়ের কবি ঠিক জানি না। অথচ আধুনিক ভারতীয় কবিতার ইতিহাস কত সমৃদ্ধ। বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ভারতীয় তরুণ কবিরা ইংরেজিতে কবিতা লিখেছেন—কেবল তাঁদের কবিতাই সংকলিত। কিন্তু সংকলনটিকে অনূদিত কবিতাও আছে। আর যখন অনূদিত কবিতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে, তখন উল্লেখ-যোগ্য ভারতীয় কবিতা কেন সংকলিত হল না। আসলে ভারতের হিতৈষী নাম করে অনেকেই ভারতীয় সাহিত্যকে এইভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। যেমন, বাউকবিদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের কয়েকজন বাউল বর্তমানে আমেরিকায় গেছেন। সেখানে বাংলাদেশ এবং বাংলা সংস্কৃতির নামে এ'দেরকেই জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হবে। আসল বাংলাসাহিত্যের কোনও প্রচারের ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় সাহিত্যেরও একই অবস্থা। এখন এ-বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ॥

২১—২৩ এপ্রিল, সিউড়ির রবীন্দ্র-সদনে "বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে'র ৩৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মে-লনের মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীমনোজ বসু এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ কালিপতি ব্যানার্জি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এবারের সম্মেলনে হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলা আকাদমি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিনে কাব্য-শাখার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীশম্ভুসত্ত্ব বসু। শ্রীকৃষ্ণ ধর আধুনিক কাব্যধারার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। বিকেলে কথা-সাহিত্যের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) বলেন, "সাহিত্যের মোড় ফেরার জন্য উদ্বেগের কারণ নেই। তবে চিন্তিত হবার কারণ ঘটেছে। অনেকে সাহিত্যকে সমাজবিজ্ঞান আখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মূলেই পার্থক্য আছে। সাহিত্যের সম্পর্ক হৃদয়ের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে নয়। মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিই মানুষের কাজ।" স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় দর্শন শাখার অধিবেশনে সভানেত্রী ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী।

পরলোকে অন্ধ্রের বিশিষ্ট কবি ॥

গত ১৯ এপ্রিল অন্ধ্রের অন্যতম কবি কাশী কৃষ্ণাচার্য গান্টুরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বৎসর। এই শতকের প্রারম্ভে সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মাত্র ১০ বৎসর বয়সেই তিনি সংস্কৃতে সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন। সংস্কৃতে তাঁর একাধিক গ্রন্থ আছে। গান্টুরের জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর এই অপরিসীম আগ্রহ দেখে তাঁকে সোনার মুকুট দিয়ে বরণ করেন। অন্ধ্রের সাহিত্য আন্দোলনেও কৃষ্ণাচার্যের অবদান অপরিসীম। তাঁর মৃত্যুতে অন্ধ্র যে একজন সত্যিকারের সাহিত্য প্রেমিককে হারাল, তাতে সন্দেহ নেই।

পশ্চিম দিনাজপুরে সংস্কৃতি পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ॥

গত সাতই, আটই ও নয়ই বৈশাখ, ২১শে, ২২শে ও ২৩শে এপ্রিল '৬৭ পশ্চিম দিনাজপুরে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের কামাখ্যা-গোপাল হল-এ। প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বাংলা শিশু-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীঅরুণা দাশ ও ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ভাষণ দান করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। (বিষয় : বাংলা সাহিত্যে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য) ও রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুনাথ রায় (বিষয় : পাশ্চাত্য সাহিত্যের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্য)। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে 'কবি-সম্মেলন' হয়।

পরিষদের উদ্যোগে 'মধুপর্ণী' নামক ত্রৈমাসিক সাহিত্য (দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পত্রটিও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়।

কুমারণ আসান : একজন উল্লেখ-যোগ্য মালায়ালম কবি ॥

আধুনিক মালয়ালম সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে কবিতায় যে নামটি প্রথমেই মনে আসে, তা হলো কুমারণ আসানের নাম। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের সাহিত্যে তাঁর প্রভাবই সর্বাধিক।

দক্ষিণ কেরলের কয়িক্কারা গ্রামে ১৮৭৩ খৃঃ কুমারণের জন্ম। তিনি যে-পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন, আর্থিক দিক দিয়ে তারা খুব স্বচ্ছল ছিল, বলা যায় না। শৈশবে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ করে, পরে উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য কলকাতায় আসেন। কলকাতায় থাকাকালে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং বিবেকানন্দের ধর্মমতের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। তিনি ইংরেজি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ইউরোপীয় সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম পাঠ করেন। আসানের সাহিত্য রচনায় এই পটভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মালয়ালম ভাষা তখনও তেমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেনি। তাঁর সময়ের অধিকাংশ লেখকই সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করতেন। আসান সে-পথে না গিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে মালয়ালম ভাষায় গীতিকবিতা রচনা শুরু করলেন। আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর 'ভিন্না পোভু' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুত-পক্ষে আধুনিক মালয়ালম কবিতার সূত্রপাত। 'নলিনী' নামক গ্রন্থটি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। একে কাহিনী কাব্যও বলা যায়। একজন যোগীর সঙ্গে একজন 'নানে'র প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। "দুরবস্থা" গ্রন্থে ভারতীয় নারী ঐতিহ্যের কথা বর্ণিত। তাঁর বন্ধু এ কে রাজাভার্মার মৃত্যুতে 'প্রেরোদানম' গ্রন্থটি রচিত হয়।

'চৈনতভৈসটায়স্ন সীতা' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ; একটি দীর্ঘ কবিতা। সীতা চরিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছন্দ এবং চিত্রকল্প রচনাতেও তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক মালয়ালম কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রমাণিত হয় এডওয়ার্ড আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে। বিবেকানন্দের "রাজা যোগ" গ্রন্থটিও তিনি মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করেন।

অতি আধুনিক মালয়ালম কবিতায় যে বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত, আসানের কবিতায় হয়তো, তার অভাব আছে। কিন্তু নতুন যুগের সূচনায় তাঁর প্রভাব অপরিসীম। সম্প্রতি তাঁর সংকলিত কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ চলছে।

ষাটের গল্প কবিতা ॥

গত শনিবার ১৫ই এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার গান্ধী বিচার পরিষদ ভবনে এই দশকের গল্প ও কবিতাবিষয়ক একটি আলোচনা সভা বসে। অনুষ্ঠানটি মোটামুটিভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল একাধিক কবি ও গল্প-কারের অংশগ্রহণের জন্য। তুলনামূলকভাবে গল্পের চেয়ে কবিতাবিষয়ক আলোচনাই জমেছিল বেশি।

বিতর্কিত ফরাসী ঔপন্যাসিক ॥

রেইস্ সেণ্ড্রার্স হালে ফরাসী দেশের সবচেয়ে নিন্দিত ও প্রশংসিত লেখক। সম্প্রতি তাঁর যে উপন্যাসটি পাশ্চাত্য দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সে-বইটির নাম হচ্ছে 'টু দি এন্ড অব দি ওয়ার্লড'। বইটি সম্পর্কে ফ্রান্স ও বৃটেনের গোঁড়া সম্প্রদায়ের প্রধান অভিযোগ : 'বইটি অত্যন্ত অশ্লীল।'

রেইস্ সেণ্ড্রার্স ঔপন্যাসিক হিসেবে ফরাসী দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করা সত্ত্বেও এবং এপর্যন্ত মোট ২২টি উপন্যাসের রচয়িতা হলেও এবারেই সর্বপ্রথম তাঁর একটি বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে পৌঁছুবার ছাড়-পত্র পেলো। উপন্যাস রচনায় আদর্শের দিক থেকে তিনি হেনরী মিলারের পথানুসারী। তাই উপন্যাসের সূচনা থেকে শেষপর্যন্ত যৌনতাই তাঁর বিষয়বস্তু। যৌনবিগত ও

আত্মিসম্প্রোশ্নের ধাপে পৌঁছেও এক ফরাসী মহিলার জীবনের যৌন অতৃপ্তি ও যৌনসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা কত তীব্র হতে পারে, সেপ্তিয়ার্স তার উপন্যাসটিতে তার বিতর্কিকামর চিত্র বর্ণনা করেছেন। অনেকে এ-উপন্যাসটির মধ্যে হেনরী মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যান্সারের' বৃদ্ধ চরিত্রটির মিল খুঁজে পেয়েছেন। তবে মিলারের সংগে যেখানে অমিল, তা হচ্ছে বৃদ্ধা মহিলাটি অর্থাৎ থেরেসা এগলানটাইনের তিনজন স্বামী বর্তমান।

উক্রেনিয়ান কবিগোষ্ঠী ॥

উক্রেনিয়ায় গত পাঁচ বছরের সাহিত্য-ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এখন রুশ সাহিত্য দ্বারা তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন আর নিয়ন্ত্রিত নয়। উক্রেনিয়ায় বর্তমানে মৌলিক রচনায় উত্তরোত্তর সাহিত্যচর্চার একটি ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্রেনিয়ায় সাহিত্যগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে রুশ ভাবধারা থেকে মুক্ত হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। বিশেষত অতি সম্প্রতিকালে এরেনবুর্গ, নেক্রাসভ, এভতুশেঙ্কো এবং ভোজনেসেনস্কি যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন উক্রেনিয়ার সাহিত্যসেবীরা এখন সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সবচেয়ে প্রয়োজন বলে মনে করছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন উক্রেনিয়ার বর্তমান দশকের কবিগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীটি 'শেসতিদেসিয়াৎনিকি' নামে পরিচিত। এ গোষ্ঠীর সকলেই ষাটের দশকের তরুণ এবং তরুণতর কবি। ছাত্রমহলে এবং বয়স্য যুবকদের কাছে এঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সম্মানিত। এই গোষ্ঠী 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানুষের মুক্তিতে বিশ্বাসী। উক্রেনিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসে ষাটের দশকের এই কবিকুল নিজেরাই যে এক দিগন্ত সৃষ্টি করলেন তা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আইভান দ্রাখ (১৯৩৬), ভিটালি কোরোতিথ (১৯৩৬), মাইকোলা ভিনগ্র্যানোভস্কি (১৯৩৬), ভ্যাসিল সিমোনেনকো (১৯৩৫-৬৪) এঁরা প্রত্যেকেই ষাটের বিখ্যাত কবি। সিমোনেনকো মাত্র ২৯ বছর বয়সে রক্তের কর্কটজনিত রোগে মৃত্যু বরণ করেছেন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা হলো এই কবিরা প্রত্যেকেই ১৯৬০-৬২ সালের মধ্যে তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। প্রায় সকলেরই একটি বা একাধিক কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে এ পর্যন্ত।

'পপ্' নভেলের আর এক পর্ব ॥

ইতিপূর্বে আমেরিকার 'পপ নভেল' বা জনপ্রিয় উপন্যাস সম্পর্কে এই বিভাগে আমরা কয়েকটি সংবাদ জানিয়েছিলাম। 'পপ্ নভেল'-এর রচয়িতারা বেশিরভাগই কখনও জে ডি সেলিংগার, জোসেফ হেলার এবং টমাস পিংখন-এর প্রবর্তিত ধারায় পরিচালিত। অবশ্য মৌলিক ভাবে এই ধারার রচয়িতা হিসেবে জেমস্ জয়েসের 'চেতনা-প্রবাহ' রীতিকেই এঁরা অনুসরণ করেছেন। এবং তাঁর নিকট ঋণী। এই পর্বের প্রথম স্তরে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে উত্তরসূরী হিসেবে জেমস্ মসম্যান, চার্লস পোর্টিজ, চার্লস নিউম্যান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ধারায় এ-রীতি থেকে আহৃত 'পপ্'নভেলের এক নতুন অধ্যায় কিছুটা চতুর ভূমিকার দ্বারা চিহ্নিত। এই পর্বে ডন জনপ্রিয় ও বহু-আলোচিত ঔপন্যাসিক। নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান আমেরিকায় এঁরা সকলেই এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহু-আলোচিত উপন্যাসিক। এঁদের বই ঘণ্টায় ৩০,০০০ কপি বিক্রয় হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই বিক্রয়-ব্যবস্থা নিতে হয় যেহেতু মানুষের দ্বারা ঘণ্টায় এতোগুলি বই বিলি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পর্বের এই চতুর পপ্ নভেলিস্টদের (ক্লেভারেস্ট পপ নভেলিস্টস্) মধ্যে অ্যাশারে 'দি পিয়ানো স্পোর্ট', হেনটকের 'কল দি কীপার' প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একজন ফরাসী সমালোচক কৌতুক করে বলেছেন, 'যোধকরি এইসব চতুরেরা মহিলা মহলেই সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।'

ওয়েসলিয়ান সিরিজ ॥

ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস হালের ইংরেজী ভাষার তরুণ কবিদের যেসব কবিতার বই প্রকাশ করছেন সেগুলিই হচ্ছে ওয়েসলিয়ান সিরিজ। আর যাঁরা এই সিরিজের কবি হিসেবে স্বদেশে এবং বিদেশে পরিচিত হচ্ছেন, তাঁরা 'ওয়েসলিয়ান কবি'। গত ছ' বছর ধরে ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস আমেরিকার ও বৃটেনের তরুণ এবং তরুণতর কবিদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁদের প্রতি এবং কবিতা অনুরাগীদের প্রতি যে নিঃস্বার্থ দাক্ষিণ্য দেখিয়ে চলেছেন, তার ফলে যে কোন বিবেকবান মানুষ তাঁদের সাধুবাদ জানাবেন। এ পর্যন্ত ওয়েসলিয়ান সিরিজ একুশজন কবির সেট তিরিশটি ভলিয়ুমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। পেপারব্যাকের এই কাব্যগ্রন্থগুলির প্রতিটি ১·৮৫ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। হালের কবিতাকে জনপ্রিয় করার জন্য, পাঠকের কাছে তরুণদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সাধারণের সংগে কবির অন্তরঙ্গ সহযোগ স্থাপনের জন্য ওয়েসলিয়ান প্রেস এই দায়িত্ব নিয়েছেন। কবিদের উচ্চহারের পারিশ্রমিকও তাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের কবিকর্মের জন্য। প্রতিটি বইয়েরই পেছনের কভারে খ্যাতমান সমালোচকের সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য বই-গুলোর মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আজকের দশকে ষাটের কবিরা যে আর অবহেলিত নন, তাঁদেরও যে একটি স্বতন্ত্র চিহ্নিত কণ্ঠস্বর অন্তর্নিহিত আছে বিশেষভাবে সেইদিকে জোর দেওয়ার জন্যই ওয়েসলিয়ান প্রেসের কবিপরিচিতির এই ভূমিকাটি অভিনন্দনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভার বিকিরণ ঘটেছে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ওপর। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা এখনও পর্যন্ত না হলেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনা চোখে পড়ে কখনও কখনও। সম্প্রতি শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাভিজ্ঞ এবং কৃতী সমালোচক। বর্তমান গ্রন্থখানিতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানস্পৃহা রসবোধ এবং বিচারশক্তির পরিচয় স্পষ্ট।

মোট সাতটি পরিচ্ছেদে সমগ্র আলোচনা বিস্তৃত। 'প্রাগাধুনিক ভারত সংস্কৃতি বাংলার ভূমিকা' নিয়ে সর্বপ্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার সংগে অন্যান্য অঞ্চলের যোগ, চর্যাপদ ও কবীর, হিন্দী বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যদেব, কবীর বিদ্যাপতি, গোপীচাঁদ ময়নামতী কাহিনীর সর্বভারতীয় রূপ, চৈতন্যদেব ও নানক, হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্য ও বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের যোগ, মীরাবাঈ ও চৈতন্য সম্প্রদায়, তুকারাম ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি বিষয়ে এই পরিচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাংলার ভূমিকা ও রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য দুটি সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। মারাঠী গুজরাতী, তামিল তেলেগু, কানাড়, মলয়লম ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ প্রসংগে আলোচনা করেছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য পর্যায়ের আলোচনাগুলি মূল্যবান।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ভাষাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও অপরিসীম। এই ভাষার সাহিত্য সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় আলোচনা থেকে। শেষ পরিচ্ছেদের আলোচনায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেছেন : 'ভারতীয় কাব্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাদর্শ হিন্দী-বাংলা-ওড়িয়া-আসামীকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর স্বরূপ বিচার করলে ভাষাতাত্ত্বিক নিশ্চয়ই দেখবেন একটি বিশিষ্ট কাব্যভাষা সৃষ্টিক্ষেত্রে একজন মানুষ

কি অপরিসীম একীকরণ করতে পারেন। একদিন জয়দেব বিদ্যাপতি যে একীকরণের পথ দেখিয়েছিলেন তা বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টিতে বিহার, বাংলা, আসাম, ওড়িষ্যাকে অনেক কাছাকাছি করেছিল।...রবীন্দ্র-ভাষাদর্শের প্রভাবে কবিতাক্ষেত্রে হিন্দীর যেরূপ সংস্কার হয়েছে তার ফল সুদূর-প্রসারী হতে পারে।' —গ্রন্থখানি সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। তাঁর পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চয়ই তিনি পাবেন। গ্রন্থ-খানির মুদ্রণ পারিপাট্য সম্পর্কে আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য (আলোচনা) — সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম সাড়ে চার টাকা।

বাংলা ভাষায় পূজার্চনা

বাংলা ভাষায় পূজার্চনা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা ভাষায় পূজার্চনা' গ্রন্থে যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে এই জটিল বিতর্কের আলোচনা করে বাংলা ভাষায় পূজার্চনার স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন।

বাংলা ভাষায় পূজার্চনা (আলোচনা)। সুরেশচন্দ্র দত্ত। আই ব্লক, ৩৫, বাঘা যতীন পল্লী। কলকাতা-৪৭।

হরিদাস জীবনী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং পরিকর যবন হরিদাসের পুণ্যজীবন কথা চয়ন করেছেন দীন রামকিঙ্কর দাস। উপাদান সংকলিত হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ দুখানি থেকে। ইতিপূর্বে হরিদাস ঠাকুরের যে জীবনী গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বর্তমান গ্রন্থ-খানি ব্যতিক্রম বিশেষ। গ্রন্থের বিশটি পরিচ্ছেদে সংকলন-কর্তার ভগবৎ প্রেম এবং তীব্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে সুন্দরভাবে। সহজ সরল ভাষায় মহামানবের মানবলীলা সাধনানুভূতিসমৃদ্ধ ভাবের সংবেদনে সঞ্জীবিত। হরিদাস জীবনী বাঙলা সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহু রঙীন ও একরঙা চিত্র আছে।

ঠাকুর হরিদাস (জীবনী)— দীন রাম-কিঙ্কর দাস সংকলিত। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাস্ট। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ। স্বর্গদ্বার। পুরী। দাম পাঁচ টাকা।

●

লাদাক

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রকাশন বিভাগ থেকে 'লাদাক' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই জেলাটির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায় এর থেকে। ভূমি, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, জনসাধারণ, পোষাক, আচার-ব্যবহার, অর্থ-নীতি, ইতিহাস, ধর্ম, শিল্প, রাস্তাঘাট, বন-জঙ্গল, জলসেচ ব্যবস্থা, কৃষি, পশু-পালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, যোগাযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

লাদাক —পাব্লিকেশন ডিভিশন। মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রড-কাস্টিং, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট। দিল্লী-৬।

●

॥ অন্যান্য বই ॥

অন্তর্দশী বা উত্তরা (কাব্য)—সঞ্জীব চৌধুরী। বিশ্ব-কংগ্রেস অফিস। ৪৩, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট। কলকাতা-১৪। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

কলঙ্কলেপচিত্ত ও আত্মা (কাব্য)—তাপস শীল। নান্দীমুখ প্রকাশনী ও ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি, আগরতলা। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা (সুলভ) ও তিন টাকা (শোভন)।

শুধু প্রেমিকার জন্য (কাব্য)—প্রভাত চৌধুরী। নন্দ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ৭৮, কালীঘাট রোড। কলকাতা-২৬। দাম দু টাকা।

চূর্ণী (কাব্য)—গুরুপদ দাস। চিনরসি। ১৭, ভুবনমোহন সরকার লেন। কলকাতা-৭। দাম দু টাকা।

শতাব্দী শেষের কবিতা (কাব্য)—সম্পাদনা: মুক্তি দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু চৌধুরী ও করুণা সেন। পশ্চিমবঙ্গ লেখক সমবায় সংস্থা। এস বি গড়াই রোড। আসানসোল। বর্ধমান। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর থেকে প্রকাশিত 'সংগঠন' পত্রিকায় লুইস আলেকজাণ্ডারের 'শেক্সপীয়রের আত্মজীবনী' অনুবাদ করছেন হেমদাকান্ত চৌধুরী। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন শারদেন্দু মুখোপাধ্যায়, মনোজিৎ ভট্টাচার্য, বিনয় দে সরকার, নচিকেতা ভরদ্বাজ, কানাইলাল ঘোষ, বোম্মানা বিশ্ব-নাথন, গৌরহরি কর্মকার, জগদীশচন্দ্র বক্সী, শঙ্কর সেন এবং আরো অনেকে।

সংগঠন (মাঘ।। ১৩৭৩)—সম্পাদক: নীতিশচন্দ্র মজুমদার। বেঙ্গলী ক্লাব বিল্ডিং। বিলাসপুর। আর এস। মধ্যপ্রদেশ দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

শিল্পসাহিত্য ও সমালোচনা সংক্রান্ত 'বিচিত্রা'র বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণ-শঙ্কর সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, দীপক রুদ্র এবং অন্যান্য কয়েকজন। দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়তিক দেহাত্ম-বাদ', অভীক দাশগুপ্ত 'সাময়িক সংলাপ', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্যামুয়েল জোসেফ অ্যাগনন', মানফ্রেড ফেল্ডাসিপারের 'বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান কবি গর্টফ্রেড বেন' ও ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক রোজনামচা' এবং সুব্রত রাহার গল্প 'বিষণ্ণ প্রত্যয়' অনেকেরই ভাল লাগবে।

বিচিত্রা (দ্বিতীয় বর্ষ।। পঞ্চম সংখ্যা)—সম্পাদক: নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা, জীবন ভৌমিক। ৬৫, তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালি, হাওড়া। দাম এক টাকা।

●

'অন্বীক্ষণে' গল্প কবিতা, প্রবন্ধ ছড়া প্রভৃতি লিখেছেন তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখো-পাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুচিত্রা মিত্র, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, যোগব্রত চক্রবর্তী, প্রভাত চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

অন্বীক্ষণ (১ম বর্ষ। ৪র্থ সংকলন) সম্পাদক—সোমেন ঘোষ। ১১।১বি, মল্লিক লেন, কলকাতা-২৫ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

●

একমাত্র গল্পের ত্রৈমাসিক 'শুকশারী'র বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন বাসুদেব দেব, কুমার মিত্র, গৌতম গুহ, নির্মলেন্দু গৌতম, মতি দাস, অনিরুদ্ধ চৌধুরী, দেবী রায়, বিরূপাক্ষ সাহা, রণজিৎ ভট্টাচার্য। ই, এম, ফরস্টারের একটি গল্পের অনুবাদ করেছেন কবীর আলুহেলাল। ওড়িয়া গল্প 'এক শনিবারের অপরাহ্ন' (ইন্দুভূষণ দাস লিখিত) অনুবাদ করেছেন দুর্গারাম কর।

অদ্রীশ বর্ধন

উইলিয়াম শার্লক স্কট হোম্‌স!

শুধু খটমট নয়, নামটা অত্যন্ত দীর্ঘও বটে। নামের অধিকারী মানুষটিও ছিলেন যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি রোগা। পরবর্তীকালে লম্বা নামটা কেটে ছোট করে এনে যে নামে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন, তা শুধুই শার্লক হোমস।

হ্যাঁ, শার্লক হোম্‌স! ডক্টর ওয়াটসন যাঁকে বার-বার বিশ্বের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা আখ্যা দিয়েছেন, যাঁর নাম আজ পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলেও পৌঁছেছে, যাঁর আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষুরধার যুক্তিবুদ্ধি আর অসমসাহসিক কীর্তিকলাপের কাহিনী অগণিত নর-নারীকে অনুপ্রাণিত করেছে—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সেই ডিটেকটিভ শার্লক হোম্‌সের গোয়েন্দাগিরির কলাকৌশল জনসাধারণের সামনে হাজির করার সময় আজ এসেছে।

সময় এসেছে গবেষণা এবং তদন্ত করে বহু অপ্রকাশিত কাহিনীতে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার। সবশুদ্ধ তেইশ বছর সক্রিয় গোয়েন্দাগিরি করেন শার্লক হোম্‌স। তার মধ্যে সতেরো বছর ডক্টর ওয়াটসন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। ডক্টর ওয়াটসন একাধারে ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং অনুগত সাগরেদ।

শার্লক হোম্‌সের অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপ বিশ্বের সর্বত্র কোনোদিনই পৌঁছোতো না যদি না ডক্টর ওয়াটসন লেখনী ধরতেন। বন্ধুবরের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তিনিই লিখেছেন এবং বিস্মিত করেছেন বিশ্ববাসীকে।

অথচ নিরাপত্তার খাতিরে বহু তথ্য গোপন করে গেছেন ডক্টর ওয়াটসন। বহুক্ষেত্রে অনেক অ্যাডভেঞ্চারের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, কিন্তু দুনিয়ার সামনে সে সব কাহিনী প্রকাশ করার সময় এখনো আসেনি বলে বেমালুম চেপে আছেন। বহুবার তিনি পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত নাম, ধাম, ঘটনাস্থল গোপন করেছেন, তারিখ পরিবর্তন করেছেন, এমন কি পুরো ঘটনাটাও আড়ালে রেখেছেন। পাছে কেসে জড়িত নিরীহ কিন্তু সম্মানিত ব্যক্তি বিশেষের নামে ঢি-ঢি পড়ে যায়, তাই এত গোপনতা অবলম্বন করেছেন ডক্টর ওয়াটসন।

কিন্তু পেরেছেন কি? শার্লক হোমস যাঁদের অনুপ্রাণিত করেছেন, যাঁরা তাঁর কাহিনীর একনিষ্ঠ এবং সিরিয়াস পাঠক—তাদের পক্ষে প্রকৃত ঘটনার বৃত্তান্ত জানা খুব কষ্টকর হয়নি। বহু অপ্রকাশিত কেসের চাঞ্চল্যকর বিবরণ এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে হোমস অনুরাগীদের কাছে।

আজ সময় এসেছে সেই সব কাহিনী বলার। শুধু তাই নয়। শার্লক হোমসের অবরোহ প্রণালী (Deductive Method) তাঁর গোয়েন্দাগিরির বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল এবং তাঁর প্রাইভেট ও পাবলিক জীবন সম্বন্ধেও বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করাই হবে এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শার্লক হোমসের বাবা সাইগার হোমস ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লেফটেন্যাণ্ট। ঘোড়ার গাড়ী উল্টে যাওয়ায় তাঁর কোমরের হাড় সরে যায়। কাজেই খোঁড়া অবস্থায় তাঁকে ফিরে আসতে হল ইংল্যাণ্ডে।

এসে দেখলেন দাদা মাইক্রফট মারা গেছেন ঘোড়া থেকে পড়ে। দাদা ছিলেন জমিদার। তাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে নতুন জমিদার হলেন সাইগার হোমস।

দাড়ি রাখলেন। বউয়ের খোঁজে বেরিয়ে আলাপ করলেন ভায়োলেট শেরিন ফোর্ডের সঙ্গে। দীর্ঘতনু, রোদেপোড়া, তেজোদৃপ্ত, তীব্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিন্তু খোঁড়া মানুষটিকে ভাল লাগল ভায়োলেটের। ১৮৪৪ সালের ৭ই মে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের।

১৮৪৫ সালে ভূমিষ্ঠ হল তাঁদের প্রথম পুত্র শেরিন ফোর্ড হোমস; ১৮৪৭ সালে মাইক্রফট এবং তারও বছর সাতেক পরে ১৮৫৪ সালে উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমস।

সেদিনটি ছিল শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী। সকালের দিকে নবজাত শিশুর কান্নায় মুখর হয়ে উঠল ইয়র্কশায়ার জেলার নর্থ রাইডিংয়ের মাইক্রফট ভিলা। ধরার আলো প্রথম চোখে দেখল উত্তরকালের বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ শার্লক হোমস।

শার্লক হোমস। কত ছোট্ট নাম, অথচ যেন জাদুকরের সম্মোহনী শক্তি লুকোনো ঐ দুটি শব্দের মধ্যে। যদিও শৈশবে ক্ষুদে শার্লককে বৃহৎ নামের বোঝা বইতে হল বাবা-মা'র ইচ্ছায়।

বাবা ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ঈশ্বর-তত্ত্বের পণ্ডিত উইলিয়াম শার্লকের পরমভক্ত। আর মা ছিলেন স্যার ওয়াল্টার স্কটের একনিষ্ঠ পাঠিকা। তাই এই বিদঘুটে নাম উইলিয়াম শার্লক স্কট হোমস।

ভারী মাদুলির মতই বিপুল নামটিকে দীর্ঘদিন বহন করার পর যখন তা সংক্ষেপিত করলেন শার্লক হোমস, তখন মায়ের স্মৃতি রাখলেন প্রথম শব্দে। প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় শার্লক শব্দের অর্থ 'ঝিকমিকে সুন্দর চুল'। ভায়োলেট হোমসের চুল ছিল এমনি সুন্দর। শিশু শার্লক মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই কেশসৌন্দর্য।

শার্লক হোমস যখন এক বছরের শিশু, তখন গোটা পরিবার নিয়ে ইউরোপ পর্যটনে বেরুলেন সাইগার হোমস। মাছধরা আর শিকার করা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। বই পড়াও আর ভাল লাগছিল না।

তাই ১৮৫৫ সালে 'লারডো' জাহাজে সপরিবারে রওনা হলেন সাইগার। দক্ষিণ ফ্রান্সে কয়েক বছর কাটালেন গ্র্যাণ্ড প্যালেসে। শার্লকের বয়স যখন চার, তখন একটা ঘোড়ার গাড়ী কিনে বেরোলেন ভবঘুরের মত।

চার বছর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মানলেন না সাইগার হোমস। গোটা ইউরোপের গ্রামে গ্রামে নগরে-নগরে গেলেন হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে। বালক শার্লক হোমসের সারা জীবন জুড়ে ছিল ইউরোপ ভ্রমণের এই প্রভাব। গোটা ইউরোপ ছিল তাঁর নখদর্পণে. ইউরোপের গ্রাম-নগর পথ-প্রান্তর সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত ব্যবহারিক।

এ হেন অসাধারণ শৈশব যাঁর, বালক হিসেবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ, তাই বড় হয়ে অসাধারণ মানুষ হিসেবেই বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন তিনি।

কল্পনার চোখে আমরা দেখতে পারি বালক শার্লক হোমসকে। রাস্তা কাঁপিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে ধেয়ে চলেছে ঘোড়ায় টানা গাড়ী। কোচোয়ানের আসনে বসে শপশপ শব্দে চাবুক ঘোড়াচ্ছেন বাবা সাইগার হোমস। হাওয়ায় উড়ছে তাঁর লম্বা দাড়ি।

আর, গাড়ীর মধ্যে তিন ছেলেকে নিয়ে সংসার পেতেছেন মা ভায়োলেট। ছোট ছেলে শার্লক বড় বড় চোখ মেলে জানলা-পথে তাকিয়ে আছে বাইরে।

১৮৬৪ সালে আচম্বিতে ভবঘুরে জীবনে যতি টানলেন সাইগার। জার্মানী থেকে এসে পৌঁছোলেন কেনসিংটনে। ছোট্ট একটা বাড়ী লীজ নিলেন। তারপর শুরু হল ছেলেদের লেখাপড়ার চিন্তা।

বেজায় কড়াধাতের মানুষ ছিলেন সাইগার হোমস। ছেলেদের শিক্ষিত করার ব্যাপারেও তাঁর নিজস্ব কতকগুলো দৃঢ়মূল ধারণা ছিল। প্রথমত উনি বিশ্বাস করতেন, শিশুমনকে ধবধবে শাদা কাগজের মতো ছাপমুক্ত রাখা দরকার। ফলে, সে মনে যা লেখা হবে তাই চিরস্থায়ী হবে। দ্বিতীয়ত, মুখস্তবিদ্যাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। এর ফলে বালক বয়েসেই মৌলিক চিন্তাক্ষমতা লোপ পায়, মানুষ আর মানুষ থাকে না—তোতাপাখী হয়ে যায়। তৃতীয়ত, কল্পনাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না সাইগার। এই তিন থিওরীর ভিত্তিতেই ছেলেদের মানুষ করতে চেয়ে-ছিলেন তিনি—কতখানি সাফল্য লাভ করছেন, তা চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয়।

বড় ছেলেকে দেওয়া হল অক্সফোর্ডে। জ্যেষ্ঠ সন্তান সে, সুতরাং ইয়র্কশায়ারের জমিদারী দেখা-শুনার ভার তাকেই নিতে হবে।

মেজ ছেলে মাইক্রফটের অংকে দারুন মাথা ছিল। তাই সাইগার স্থির করলেন, সরকারী দপ্তরে বই-টই অডিট করাই হবে তার জীবনের লক্ষ্য। অতএব আঠারো বছর বয়েসে তাকেও যেতে হবে অক্সফোর্ডে।

সবশেষে পালা এল শার্লক হোমসের। স্থির হল, রীতিমত গাণিতিক প্রশিক্ষণের পর—ছোট ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ার করা হবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোটদের পাঠানো হল নোংরা এক বোর্ডিং স্কুলে। অস্বাস্থ্যকর সেই পরিবেশে মাইক্রাফট ছিল এক বছর, শার্লক হোমস দু বছর।

অতীব দুঃখের বিষয়, এই দুবছরের স্কুলজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য জানা যায়নি।

ইউরোপের পথে-প্রান্তরে ঘোড়ার গাড়ীতে পর্যটনের সময়ে ছেলেদের হাতে-খড়ি এবং বর্ণপরিচয় পরিচিতি মায়ের কাছেই হয়েছিল। তাই বড় ছেলে একদিনের জন্যেও যায়নি স্কুলে, মেজছেলে গেছে মাত্র বছরখানেকের জন্যে, আর শার্লক হোমসের মোট তিনটি বছর কেটেছে ইংলিশ স্কুলে।

স্কুলে খুব নাম করতে পারেনি শার্লক। কিন্তু তখন থেকেই ইংলিশ স্কুলের ওপর একটা শ্রদ্ধা জেগেছিল তাঁর বালক মনে।

অনেক বছর পরে পোর্টসমাউথ ট্রেনে লণ্ডনে ফেরবার সময়ে ক্ল্যাপহ্যাম জাংসন পেরোতে পেরোতে ওয়াটসনকে বলেছিলেন শার্লক হোমস:

"উঁচু-উঁচু এই সব লাইন দিয়ে লণ্ডনে আসার মত মনমাতানো আর কিছুই নেই। নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে বাড়ীগুলো।"

ওয়াটসন ভাবলেন ঠাট্টা করছেন বন্ধুবর। কেননা, দৃশ্যটা মোটেই নয়নাভি-রাম ছিল না।

গোয়েন্দাপ্রবর তখন বলে চলেছেন—'দ্যাখো, দ্যাখো, বাড়ীগুলো দ্যাখো। যেন স্লেটের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বাড়ী-ঘর-দোরের কতকগুলো বিচ্ছিন্ন স্তূপ। ঠিক যেন সীসে রঙের সমুদ্রে ইঁটের দ্বীপ।'

'বোর্ডিং স্কুল', জবাব দিয়েছেন ওয়াটসন।

'লাইটহাউস, মাই বয়! উত্তরকালের আলোকস্তম্ভ! শত-শত ঝকঝকে ছোট্ট বীজেভরা এক-একটি ক্যাপসুল। এদের মধ্যে থেকেই একদিন মাথা তুলবে আরও জ্ঞানী, আরও ভবিষ্যৎ—ইংল্যান্ড।' (ন্যাভাল ট্রীটি)

নিরানন্দ স্কুলজীবনে শার্লক হোমসের একমাত্র আনন্দের উৎস ছিল একজন ট্যাক্সিডারমিস্ট। মরা পাখীর উদরে খড়কুটো ঠেসে বিক্রী করাই ছিল তার পেশা। উদগ্র কৌতূহল নিয়ে হামেশাই পিনসিং লেনের বুড়ো শেরম্যানের দোকানে যেত ছোট্ট শার্লক হোমস। মনের চোখে আমরা দেখতে পারি দুই চোখে আগ্রহের রোশনাই জেবলে শীর্ণকায় এক বালক সাহায্য করছে বৃদ্ধকে, প্লাস্টার অভ প্যারিসে পশু-পাখীর পদচিহ্নের ছাপ তুলছে, বিষাক্ত সাপ আর জোঁক সম্বন্ধে হাজারো প্রশ্ন করে চলেছে।

১৮৬৫-৬৬ সালের শীতকালে বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়ল শার্লক।

সেরে উঠলে ইয়র্কশায়ারে ফিরে এলেন সাইগার। শার্লককে ভর্তি করে দিলেন গ্রামার স্কুলে। এক বছর ভালই কাটল। তারপরেই আবার শরীর ভেঙে পড়ল শার্লকের। বড় ডাক্তারকে দেখালেন সাইগার। স্যার জেমস অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দিলেন, এ ছেলে নেহাতই ক্ষীণজীবী।

কিন্তু রোগাপটকা এই ছেলেই যে বড় হয়ে লৌহকঠিন কাঠামোর অধিকারী হয়ে-ছিলেন, তা ওয়াটসনের লেখাতেই জানা যায়। অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে বছরের পর বছর হাড়ভাঙা খেটেছেন শার্লক হোমস—কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বছরের মধ্যে মাত্র দুবার তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙেছে—তাও রীতিমত চমকপ্রদ পরিস্থিতির দরুণ।

প্রথমবার ঘটে 'দি রেইগেট স্কোয়ার' অ্যাডভেঞ্চারের সময়ে। ডক্টর ওয়াটসন লিখেছেন—'৮৭র বসন্তকালে দেহেমনে অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে ভেঙে পড়েছিল আমার বন্ধু শার্লক হোমস। তাঁর অমন লোহার মত মজবুত কাঠামোতেও চিড় ধরে পাকা দু' মাস একটানা পরিশ্রমের জন্য। এই সময়ে নাকি প্রতিদিন কম করে পনেরো ঘন্টা তাঁকে খাটতে হয়েছে এবং কখনো-সখনো একটানা পাঁচদিন পর্যন্ত টেবিলে বসে থাকতে হয়েছে মাথা গুঁজে। অমানুষিক এই পরিশ্রমের ফলে বিজয়মাল্য তাঁর গলায় দুলেছে, সারা ইংল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে শোনা

গেছে তাঁর নাম, অভিনন্দন টেলিগ্রামের স্তূপে তাঁর ঘরে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেছে। কিন্তু অত অত্যাচার সয়নি—শরীর ভেঙেছে। নিঃসীম নৈরাশ্যে ঝিমিয়ে পড়েছেন শার্লক হোমস। তিন দেশের পুলিশ যখন ব্যর্থ হয়েছে, শার্লক হোমস তখন ইউরোপের সবচাইতে ধড়িবাজ জুয়াচোরকে পদে পদে টেক্কা মেরেছেন। বুদ্ধির যুদ্ধে জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু এ-হেন বিজয়গৌরবও তাঁর স্নায়বিক অবসাদ আর বিষাদ কাটাতে ব্যর্থ হয়েছে।"

কর্নেল হেস্টার ছিলেন ডক্টর ওয়াটসনের পুরোনো বন্ধু। ভদ্রলোক সারে অঞ্চলের রেইগেটে একটা বাড়ি কিনেছিলেন। ওয়াটসনকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছেন। বন্ধুবর শার্লক হোমসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় সেখানেই রওন হলেন ওয়াটসন। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে। তাই দুদিন যেতে না যেতেই একটা খুনের মামলায় ডাক পড়ল শার্লক হোমসের।

কানিংহামদের কোচোয়ান উইলিয়ামকে এক খুনে চোর গুলী করে মেরে ফেলেছে। এর আগেও চুরি-চামারি হয়ে গেছে গ্রামে। গাঁয়ের মাতব্বর বুড়ো অ্যাকটনের লাইব্রেরী তছনছ করে নিয়ে গেছে একটা 'হামার', গিলটি করা দুটো শামাদান, একটা হাতীর দাঁতের পেপার-ওয়েট, কাঠের ব্যারোমিটার আর টোন সুতোর একটা গোলা। কিন্তু চুরি করতে এসে খুন করা এই প্রথম।

বুড়ো কানিংহামের ছেলে অ্যালেক রাত বারোটা নাগাদ চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে যায়। গিয়ে দেখে ধস্তাধস্তি করছে দুজনে। তার পরেই একজন গুলী ছুঁড়তে আর একজন পড়ে গেল। চোরটা দৌড়ে বেড়া টপকে চম্পট দিল।

পুলিশ গিয়ে মৃত ব্যক্তির হাতের মুঠো থেকে একটা চিরকুটের ছেঁড়া টুকরো উদ্ধার করে। সম্ভবত চোরের হাত থেকে কাগজটা সে ছিনিয়ে নেয়, অথবা চোরই পালাবার সময়ে উইলিয়ামের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবার বলতে অ্যাকটন আর কানিংহামরা। কাজেই তাঁদের বাড়ীতে চোর আসাটা বিচিত্র ছিল না। কিন্তু মনিবের সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়েই প্রাণ দিয়ে উইলিয়াম কেস জটিল করে তুলল।

স্থানীয় দারোগা ফরেস্টারকে নিয়ে কানিংহামদের বাড়ী গেলেন হোম্‌স। বাগান-টাগান দেখার পর কানিংহাম বাপ-বেটার সংগে কথা বলছেন ইন্সপেকটর, চিরকুটের টুকরোটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে গোঁ-গোঁ করতে করতে চোখ কপালে তুলে আছড়ে পড়লেন হোম্‌স। পড়েই অজ্ঞান। দারোগা-মশাই যা বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর বলা হল না। হোমসকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন সবাই। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফেরানো হল তাঁর। সামলে নিয়ে লজ্জিত মুখে হোম্‌স বললেন—"ওয়াটসন জানে, সম্প্রতি রোগভোগ করে উঠেছি আমি। সেই কারণেই এই স্নায়ুদুর্বলতা।"

'কি ঝামেলা করলে বলো তো ওয়াটসন!'

কথায় কথায় শার্লক হোম্‌স প্রস্তাব জানালেন কাগজে চোর ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হোক। বুড়ো কানিংহাম রাজী হতে হোম্‌স নিজেই লিখে ফেললেন ঘোষণাটা। কিন্তু বৃদ্ধ তা দেখে বললেন—ভুল আছে লেখায়। আপনি লিখেছেন 'পৌনে এগারোটায়'। আসলে চোর এসেছিল 'পৌনে বারোটায়।'

লজ্জারক্তিম মুখে ভুল স্বীকার করলেন হোম্‌স। তাঁর অনুরোধে বৃদ্ধ কানিংহাম নিজেই কলম নিয়ে শুদ্ধ করে দিলেন ঘোষণাটা।

তারপর কানিংহামদের ঘর-দোর দেখতে লাগলেন হোম্‌স। বুড়ো কানিংহামের ঘরে গিয়ে পিছিয়ে পড়লেন হোম্‌স, সঙ্গ দেওয়ার জন্যে ওয়াটসনকেও পেছুতে হল। আর ঠিক তখনি একটা কাণ্ড করে বসল শার্লক হোম্‌স।

পালংকের কাছে একটা টেবিলে এক ডিস কমলালেবু আর কাঁচের সোরাই ভর্তি জল ছিল। আচমকা ইচ্ছে করেই টেবিলটাকে উল্টে ফেলে দিলেন হোম্‌স। দিয়েই এক চীৎকার—"কি ঝামেলা করলে বলো তো ওয়াটসন। কার্পেটটা একেবারে নষ্ট করে দিলে!"

ঝন-ঝন শব্দে কাচের বাসনপত্র ভেঙে গেল, ফলগুলো গড়িয়ে গেল এদিকে-সেদিকে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে কুড়োতে লাগলেন ওয়াটসন। বুঝলেন, বন্ধুর নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। অন্যেরাও হাত লাগালেন।

তারপরেই হঠাৎ দেখা গেল, শার্লক হোমস অদৃশ্য হয়েছেন।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কানিংহাম পিতা-পুত্র।

আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আর্ত আর্তনাদ—"বাঁচাও! বাঁচাও! খুন!"

আর্ত চীৎকার করছেন শার্লক হোমস!

পাগলের মত দৌড়ে নেমে যাওয়া হল। গিয়ে দেখা গেল, দুহাতে শায়িত শার্লক হোমসের গলা টিপে ধরেছেন ছেলে, আর বাবা মুচড়ে ধরেছেন একটা হাতের কব্জি।

সবলে ছাড়িয়ে আনা হল হোমসকে। তাঁরই নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে বাপ-বেটাকে গ্রেপ্তার করা হল কোচোয়ান উইলিয়ামকে খুন করার অপরাধে।

শেষ মুহূর্তে রিভলবার বার করেও সুবিধে করতে পারলেন না অ্যালেক।

পরে শার্লক হোমস জানালেন কেন তিনি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন কানিংহাম ফ্যামিলিকে। প্রথমত, বাগানের যে বেড়া টপকে চোরকে তাঁরা পালাতে দেখেছেন, সেখানে ভিজে কাদার ওপর কারও পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। সুতরাং চোরের গল্প সর্বৈব মিথ্যা। তাছাড়া রাত বারোটার সময়ে ঘরে আলো জেলে বাপ-বেটা জেগে ছিলেন—সে অবস্থায় নিশ্চয় চোরেরা গেরস্ত বাড়ীতে আসে না। ছেঁড়া চিরকুটের হস্তাক্ষরও যথেষ্ট সন্দেহজনক। কেননা চিরকুটটা ইচ্ছে করেই দুজন ব্যক্তি লিখেছেন। প্রথমে একজন একটা একটা শব্দের জায়গা রেখে ফাঁক ফাঁক করে লিখেছেন। তারপর আর একজন সেই ফাঁকে লিখে চিরকুটটা সম্পূর্ণ করেছেন। ছেঁড়া টুকরোটায় 'বারোটা' শব্দটা হাতে লেখা ছিল। বুড়ো কানিং হ্যামকে দিয়ে কায়দা করে 'বারোটা' শব্দটা লিখিয়ে নিয়ে হোমস দেখলেন দুটো 'বারোটা' শব্দই একজনের হাতে লেখা। অর্থাৎ চিরকুট লিখে উইলিয়ামকে যে দুজন ডেকে এনেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বুড়ো কানিংহাম। এই জন্যেই যখন ইনস্পেক্টর ফরেস্টার চিরকুটের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেফাস কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন মূর্ছা যাওয়ার ভান করে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন হোমস। চিরকুটটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা কানিংহামরা জানতে পারলে তাঁরা হুঁশিয়ার হয়ে যেতেন। হোমস বিশেষ সুবিধা করতে পারতেন না।

সুতরাং অবরোহ প্রণালী মতে ভেবে দেখলেন হোমস যে চিরকুটটা উইলিয়ামসের হাত থেকেই ছিনিয়ে নিয়েছেন বুড়ো কানিংহাম। নিয়ে রেখেছেন কোথায়? অত রাত্রে নিশ্চয় গাউন পরেছিলেন। অতএব রেখেছেন গাউনের পকেটে।

টেবিল উল্টে সবাইকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে হোমস তাই গাউনের কাছে গিয়ে পকেট থেকে চিরকুটের বাকী অংশটা বার করে ফেলেন। আর তাই দেখে মরিয়া হয়ে তাঁকে খুন করেই কাগজটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন কানিংহামরা।

পরে জানা গেল, অ্যাকটনদের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল কানিংহামদের। তাই বাপ-বেটায় রাতে গিয়েছিলেন কাগজপত্র চুরি করতে। না পেয়ে চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে আজেবাজে কিছু জিনিস নিয়ে আসেন।

এদিকে কোচোয়ান উইলিয়াম তাঁদের পেছন পেছন গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে বাপ-বেটাকে। তাই তার মুখবন্ধ করার জন্যে চিঠি লিখে রাত্রে তাকে বাগানে এনে খুন করে অ্যালেক। সেই চিঠিরই খানিকটা অংশ থেকে যায় উইলিয়ামের হাতে এবং এই অংশ না পাওয়া গেলে কোনোদিনই ধরা পড়ত না কানিংহামদের কুকীর্তি।

ওপরের কাহিনী থেকেই বোঝা যায়, অপরিসীম শক্তির অধিকারী শার্লক হোমস কতখানি কাহিল হয়েছিলেন রোগভোগের পর। যার ফলে, তাঁর মত ইস্পাত-কঠিন মানুষকে পেড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও শার্লক হোমসের বিশ্লেষণী শক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি, চাতুরী এবং অভিনয়ক্ষমতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই ঘটনায়। সাইগার হোমস কল্পনাকে একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না। এ মামলার শুরুতেও হোমস কিছু কল্পনা করেননি—করলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছাতে পারতেন না। তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'দারোগামশাই প্রথম থেকেই ধারণা করেছিলেন, গ্রাম্য জমিদাররা এ জাতীয় ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারেন না। কিন্তু আমি কখনই আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে কাজ করি না। ঘটনাস্রোতকে আমি অনুসরণ করি, পর্যবেক্ষণ করি—দেখি তারা আমায় কোথায় নিয়ে যায়।'

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাইগার হোমসের শিক্ষাপদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছিলেন বালক শার্লক হোমস।

(চলবে)

প্রমীলা

মনের কথা

সবকিছু গুছিয়ে চিন্তা করার শক্তি বোধহয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি। চিন্তার ক্ষেত্রে এই দৈন্য অনেকদিন থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল এবং সম্প্রতি তা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। একে চিন্তার সংকট ছাড়া আর কি বলা যায়। বিশ্বাসের তরী লগ্ন থাকে নির্দিষ্ট বন্দরে। পুরনো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে তখনই তরী ভাসিয়ে নতুন বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে হয়। এইভাবে বিশ্বাসের সংকট এড়ানো যায় বৃহত্তর উপলব্ধিতে। কিন্তু চিন্তার সংকট উৎরানোর পথ কি? এ সম্পর্কে সঠিক হদিশ পাওয়া বেশ কণ্টকর। বিশেষতঃ যেভাবে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। আমাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে এমন বৈপরীত্য এবং পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটছে যা বিস্ময়ের অতলের সংকেত নির্দেশ করছে। সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই এগুলি লক্ষ্য করেছেন কিন্তু বহুজনের নজরে আনার প্রয়োজন মনে করেননি। কুলুকুলু রবে যে বিপুল জলস্রোত গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে তারা এতে অভ্যস্ত। তাই মুষ্টিমেয়ের চেষ্টা সেই বিপুল জলতরঙ্গে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যেতে বাধ্য। ঘটনাগুলি এমন নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের ঘষামাজায় নজরে পড়ার মত জৌলুষটুকু হারিয়ে ফেলেছে। প্রথমেই জামা-কাপড় এবং সাজ-পোষাকের কথা ধরা যাক। এব্যাপারে আমরা আর এখন সুরুচি-কুরুচির তোয়াক্কা করি না। ব্যাপারটা এমন গা-সওয়া হয়ে গেছে যে এজন্য আর কেউ সময় খরচ করতে রাজী নয়। বিকৃতিকেই সম্ভবত আমরা এখন স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। না হলে এটা কখনো সম্ভব হতো না। এছাড়া চলন-বলনে, আচার-ব্যবহারের সর্বত্র এমন একটা উৎকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে যে প্রতি মুহূর্তে আশংকা হয় পরিণতির কথা চিন্তা করে। অথচ এসম্পর্কে আমাদের গঠনমূলক চিন্তাধারার নিতান্ত অভাব। নেহাৎ চায়ের আড্ডা উত্তপ্ত করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে আমরা রাজী নই।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির জন্য অনেকেই অতীতকে দায়ী করেন। তাদের মতে আজকের অধঃপতনের বীজ নাকি নিহিত রয়েছে অতীতের বুকে অর্থাৎ পূর্বসূরীদের কার্যকলাপে। এর সত্য মিথ্যা যাচাই করবার ভার বিশেষজ্ঞদের। অতটা মাথা না ঘামিয়েও আমরা এটুকু বলতে পারি যে, বর্তমানের জন্য যদি অতীত দায়ী হয় তবে আমাদের আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত নয় কি? কারণ আমরা চিরকাল ধরে বর্তমান থাকবো না। একদিন অতীত হব এবং পৃথিবীতে আবার নতুন বর্তমানের আবির্ভাব ঘটবে। সেদিন কি আমরা উত্তরসূরীদের কাছ থেকে রেহাই পাব? আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য কি আরো বেশি তিরস্কৃত এবং ধিক্কৃত হব না? অথচ সেকথা আমরা কেউ ভাবছি না—একটু সচেতন পদক্ষেপে চলবার প্রয়াস পাচ্ছি না।

শ্রীমতী লুরেন ওয়ালেশ

সংহতির প্রশ্নে আলবামা

তিন মাস হলো আলাবামার গভর্ণর পদে নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী লুরেন ওয়ালেশ। কিন্তু এখনও সাংবাদিকদের সামনে তিনি 'এক্সটেম্পো' বক্তৃতা করেননি। সাধারণতঃ তিনি তাঁর বক্তব্য উচ্চৈস্বরে পড়ে যেতেন। এতে আলবামার প্রশংসার কথাই বেশি থাকতো। আর এ সমস্ত বক্তৃতার অধিকাংশই লিখে দিতেন তাঁর স্বামী জর্জ ওয়ালেস এবং অন্যান্য সহকারীরা।

কিন্তু গত কয়েকদিন আগে হঠাৎ কোর্টে উপস্থিত হয়ে তিনি সকলকে ঘাবড়ে দিয়েছেন। তিনি যে 'এক্সটেম্পো' বক্তৃতায়ও রীতিমত দক্ষ সেদিন কোর্টে সে কথাটাই প্রমাণ হয়ে গেল। সাংবাদিকরা এতদিন শুধু তাঁর মিষ্টি কথার সঙ্গেই পরিচিত ছিল। তিনি যে অগ্নিগর্ভা ভাষণ দিতে পারেন তা অনেকেরই জানা ছিল না। এবার দেখা গেল তিনি বক্তৃতার উভয় শাখায়ই সমান পারংগম। সম্প্রতি ফেডারেল কোর্ট এক রায়ে জানায় যে, আসন্ন বর্ষ থেকে আলবামার স্কুলে আর কোন রকম পার্থক্য থাকবে না। এর বিরুদ্ধেই তিনি সেদিন বক্তব্য রাখতে কোর্টে হাজির হয়েছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে এই নীতির বিরোধী। আলবামার বর্তমানে শতকরা ২·৪ জন নিগ্রো ছেলে কয়েকটি স্কুলে

প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং অন্যান্য স্কুলগুলি এখনও এ সম্পর্কে সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। শ্রীমতী ওয়ালেস এজন্য নিজের হাতে স্কুল পরিচালনার ক্ষমতা তুলে নিতে চেয়েছেন। এসব স্কুল পরিচালনা করেন স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। নিজের হাতে ক্ষমতা পেলে তিনি ফেডারেল কোর্টের এই পরোয়ানার বিরুদ্ধে শক্ত হাতে রুখে দাঁড়াবেন। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এই পার্থক্যহীনতাকে রুখতে হলে যা প্রয়োজনীয় সবই করা হবে। এজন্য সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করতেও তিনি দ্বিধা করবেন না। শ্রীমতী ওয়ালেস বলেছেন, ও'রা ও'দের কাজ করেছেন। কিন্তু তা কাজে পরিণত করার দায়িত্ব নিতে আমরা নিশ্চয়ই রাজী হব না। একাজও তাঁদেরই করতে হবে। এদ্বারা তিনি শুধু আলবামার ফেডারেল কোর্টকেই অস্বীকার করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারবিভাগের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। দক্ষিণের ছয়টি প্রদেশেই স্কুলে বর্ণবিদ্বেষ রদ করা হচ্ছে এই আইনের উদ্দেশ্য। দক্ষিণীদের মতে এর ফলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

প্রথমদিকে মনে হয়েছিল যে, আইনসভা শ্রীমতী ওয়ালেসের বাঞ্ছা পূরণ করবে। এর ফলে প্রদেশ এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নতুন বিতণ্ডার সৃষ্টি হতো। সংহতির বিরুদ্ধে আলবামার এই জেহাদ হয়তো নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতো। কিন্তু কয়েকজন এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। আলবামার কাগজগুলিও শ্রীমতী ওয়ালেসের এহেন জেহাদের নিন্দাবাদ করেছেন। 'মন্টেগোমারী আফটারনুন' তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, গভর্ণরের বক্তৃতা হচ্ছে অর্থহীন উক্ত ঝড়।

কিন্তু এসম্পর্কে ওয়াশিংটন অন্য কথা ভাবছে। তাঁরা ভাবছেন যে, এর ফলে হয়তো দক্ষিণের সম্পর্কে নতুন করে তিক্ততার সৃষ্টি হবে। অবশ্য দুর্ভাবনা যতই থাকুক না কেন বিভিন্ন বর্ণবৈষম্যের ক্ষেত্রে ফেডারেলের জয় অবশ্য অন্য দিক নির্দেশ করছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফেডারেল অবশ্য শ্রীমতী ওয়ালেসের বক্তৃতার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেদিনই আবার আলবামার স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কোর্টে হাজির হয়ে আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিবৃতি পেশ করেছেন। ফেডারেল অবশ্য এক্ষুনি শ্রীমতী ওয়ালেসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী নয়। কারণ অতীতেও এরকম বিসম্বাদের ক্ষেত্রে প্রদেশের চীফ এক্সিকিউটিভকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। পরিবর্তিত ব্যবস্থানুসারে আলবামা আইনসভার যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা ফেডারেলের রয়েছে। একই ব্যাপারে লুইসিয়ানার ক্ষেত্রেও এই দশকের প্রথমার্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বিচারকরা অবশ্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছেন আলবামার স্বাভাবিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শ্রীমতী ওয়ালেসের বক্তৃতার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসা না পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাই ও'দের মতে সবচেয়ে নিরাপদ। বিশেষভাবে স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক্ষুনি কিছু বলতে রাজী নন।

আচার-জেলি-চাটনি

তেঁতুলের ছড়া—এক কিলো আন্দাজ বেশ শাঁসযুক্ত পাকা তেঁতুল কেনা দরকার। তেঁতুলগুলিকে একটা একটা করে আলাদা করে একটা কুলো অথবা কলাইকরা থালাতে সাজিয়ে রেখে দেখুন তেঁতুলে ময়লা আছে কি-না। পাতা কাঠি থাকলে বেছে ফেলে দিতে হবে। পাকা তেঁতুলগুলি বোঁটাশুদ্ধ ও বীচিশুদ্ধ থাকবে। তারপর সামান্য গুঁড়ো হলুদ ও একটু নুন মাখিয়ে ছড়াগুলিকে উল্টে-পাল্টে রোদ খাইয়ে নিন কিছু সময়। খুব বেশী রোদে না দেওয়াই ভাল। তাহলে ছড়াগুলি শুকিয়ে চিমশে হয়ে যাবে। এরপর দেড় কিলো আন্দাজ গুড় (বেশ পরিষ্কার আঁট মত গুড়) চাই। ঐ ছড়াগুলিতে গুড়টা মাখিয়ে বড় বাটিতে করে রোদে দিন। দু-একদিন রোদ দেওয়ার পর দেখা যাবে গুড় গলে তেঁতুলগুলি বেশ গুড়ের পাতলা রসে ডুবে গেছে। পরপর পাঁচ-ছদিন রোদে দেবার পর দু-চারদিন আর রোদে না দিয়ে ঢেকে রাখুন। আবার সপ্তাখানেক রোদে দিন পরপর। এরপর দু-তিনদিন রোদে না দিয়ে রাখুন। একটা কথা রোদে দেবার সময় অথবা রোদে দেবার পর বেশ বুঝতে পারা যাবে গুড়ের গন্ধটা চলে গেছে এবং রোদ দিতে দিতে বেশ চটচটে ভাব ধারণ কোরছে। এই রকমটি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু রোদে দেওয়া হবে। এবং দু-চারদিন থেমে ফের রোদ খাওয়াতে হবে। এইবার আচারের পরিমাণ মত কিছু পাঁচফোড়ন ও তার সঙ্গে আস্ত শুকনো লঙ্কা ভেজে বেশ মিহি করে গুঁড়িয়ে ছড়া তেঁতুলে মিশিয়ে নেড়েচেড়ে দিন। তারপর কাঁচের বোয়ামে তুলে রাখুন। কিছুদিন রাখার পর তবে খাওয়া উচিত। দিনকতক থাকলে মশলাটা ভালভাবে মিশে গিয়ে মজে উঠবে গন্ধটাও সুন্দর হবে।

অনেক সময় আগুনে ফুটিয়েও ছড়া তেঁতুলের আচার করা যায়। ভাল একটি সিলভারের পাত্রে গুড় দিয়ে সামান্য জল দিয়ে উনানে চাপিয়ে দিন। গুড় বেশ ফুটে গেলে গলে আসবে। তারপর একটি করে ছড়া তেঁতুল ছাড়তে হবে। কিছুক্ষণ ফুটে যাবার পর দেখা যাবে গুড় ঘন হয়ে আসছে। নাবিয়ে ঠাণ্ডা করে দু-চারদিন রোদে দিয়ে মশলা মিশিয়ে কিছুদিন রাখার পর খাওয়া যায়। তবে রৌদ্রপক্ক আচার কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয়। বেশ কড়া রোদে বেশীদিন ধরে আচার রাখতে হয়। রৌদ্রপক্ক আচারের স্বাদ খুব সুন্দর হয়।

তেঁতুলের জেলি—এক কিলো মত তেঁতুল বড় একটি কলাই-এর পাত্রে পরিমাণ মত জল ভিজিয়ে রাখুন। বেশ শাঁসালো তেঁতুল হলে ভাল হয়। জল যেন খুব বেশী দেওয়া না হয়। বেশ ঘণ্টা-তিনচার পর দেখা যাবে জলেতে তেঁতুল নরম হয়ে এসেছে। এইবার হাতে করে চটকে চটকে মাড় বের করে নিতে হবে। একটি শক্ত পাতলা জালিদার কাপড়ের সাহায্যে মাড়টিকে ছেঁকে কলাই অথবা পাথরের পাত্রে রাখুন। দেড় কিলো ভাল দানাযুক্ত গুড় ঐ পাতলা জেলিটির মধ্যে দিয়ে একটা কলাই অথবা কাঠের চামচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। পরপর বার-তের দিন খুব করে রোদে দিয়ে দিয়ে দেখতে হবে গুড়ের গন্ধ চলে গেছে কি-না। আর গুড়টি মিশে বেশ গাঢ় হয়েছে কি-না। হাতে করে তুলে দেখলে বোঝা যাবে বেশ চটচটে হয়েছে। জেলিটি তৈরীর জন্য খুব কড়া রোদ দরকার। যদি দেখা যায় ঐ সময়মত রোদ দিয়েও জেলিটি ঠিক দাঁড়াচ্ছে না তাহলে আরো চার-পাঁচ দিন রোদে দিয়ে ঠিকমত করে নিন। রোদে দেওয়ার আগে চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেওয়া দরকার।

এছাড়া মাড় বার করে গুড় মিশিয়ে আগুনে পাক করেও করা যায়। কিছুক্ষণ ফুটে যাবার পর আঠাআঠা অবস্থায় এলে নাবিয়ে নিতে হবে। জেলিটি ফুটবার সময় কলাই-এর চামচ দিয়ে নাড়তে হয়, রোদেও তিন-চার দিন দিতে হয়। তবে রোদে দিয়ে দিয়ে আচার তৈরী সবচেয়ে ভাল হয়। স্বাদও ভাল হয়। তারপর শেষে আন্দাজমত পাঁচফোড়ন, লঙ্কা ভেজে গুঁড়িয়ে জেলিটির সঙ্গে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করা দরকার। কিছুদিন রেখে খাওয়া দরকার। তাহলে মশলাটা টক-মিষ্টির সঙ্গে মিশে জেলিটা সুন্দরভাবে মজে উঠবে, অনেকে একে বেঙ্গলী চাটনি বলে। রুটি লুচি ও ভাত দিয়ে মেখে খেতে বেশ ভাল লাগে।

পাকা তেঁতুলের আদার চাটনি—দেড়শো গ্রাম আন্দাজ আদা, আড়াইশো গ্রাম গুড় অথবা চিনি, দুশো গ্রাম পাকা তেঁতুল, দেড়শো গ্রাম কিসমিস্। আদাটার খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিয়ে বেশ করে সিলেতে বেটে নিতে হবে। বাটাটি যেন বেশ মিহি হয়। একটি কলাই অথবা এনামেলের পাত্রে দেড় কাপ আন্দাজ জল দিয়ে গুড়টিকে ফুটতে দিন। এইবার পাকা তেঁতুল জলে ভিজতে দিন। ভিজে গেলে বেশ করে চটকে মাড়টিকে বার করে একটি পাতলা কাপড়ে ছেঁকে আলাদা একটি পাত্রে রাখতে হবে। ছয়-সাত মিনিট গুড় ফুটে যাবার পর ঐ তেঁতুলের মাড়টি গুড়ে ঢেলে দিন। এবং চামচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশ ভাল করে একটু ফুটতে দিন। এইবার আদাবাটাটি দিয়ে বেশ ভাল করে নাড়তে থাকুন। কিসমিসগুলিও দিয়ে দিন। আর একটু ফুটে যাবার পর নাবিয়ে রাখুন। চাটনিটি একটু পাতলা মত হবে। ইচ্ছা হলে সামান্য জিরে ভেজে গুঁড়িয়ে চাটনিটাতে দেওয়া যায়। খেতে খুবই মুখরোচক। টাটকা তৈরী করে খাওয়া যায়। আবার ঘরে রেখেও খাওয়া যায়। লুচি রুটি দিয়ে খেতে খুব ভাল লাগে। সিঙ্গাড়া, কচুরি দিয়ে খেতেও ভাল লাগবে।

—হেমপ্রভা মল্লিক

(উপন্যাস)

(৫)

জোন্সকে দেখে প্রথমে কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি; তার কারণ তার সবুজ চোখ। একেবারে সবুজ, বেড়ালের চোখের মতোও নয়, পান্নার মতো, চোখের তরলতা যেন কঠিন হ'য়ে গেছে ঐ রঙের জন্য। আমার মনে হয়েছিলো অস্বাভাবিক, অমানুষিক, কোনো মনুষ্যাকৃতি শরীরের মধ্যে ও-রকম চোখ সত্যি ব'লে বিশ্বাস হয়নি; অস্বস্তি হচ্ছিলো তার দিকে তাকাতে। অথচ অন্য কোনো বিষয়ে জন-বুল্-বংশোদ্ভূত তাকে মনে হয় না: মাঝারি লম্বা, চুলের রং কালচের দিকে ব্রাউন, গায়ের রং ভয়াবহভাবে টকটকে লাল নয়, বোধগম্য কথার বদলে গাঁ-গাঁ আওয়াজ বেরোয় না তার গলা দিয়ে। বসার ঘর ভর্তি ছিলো লোকজনে; অনাদিবাবু আমাকে জোন্সের পাশে বসিয়ে দিলেন, জোন্স আলাপ শুরু করলে, পাৎলা ঠোঁটে হাসলো—আস্তে-আস্তে তার সবুজ চোখ সহনীয় মনে হ'লো আমার, অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেলো, তাকে মনে হ'লো সুশ্রী, ব্যবহার ভারি ভদ্র, ভাবটা যেন লাজুকমতো। ভালো লাগলো তার নিচু, নরম কথা বলার ধরন, তাছাড়া এক-একটা ইংরেজি শব্দ সে যে-ভাবে উচ্চারণ করে তাতেও আমার কৌতূহল জেগে উঠলো। আমি সাহিত্যের ছাত্র শুনে সে আমাকে জিগেস করলে ইংরেজিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো জীবনী আছে কিনা, শরৎচন্দ্রের গল্প আমার কেমন লাগে, রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে আমার মত কী। বাংলা ভাষা নিয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলে দু-একটা। যেমন: 'তুমি তাকে এ-কথা বলবে' আর 'তুমি তাকে এ-কথা বোলো'—এই দুটোতে তফাৎ কী। প্রশ্নটা শুনে আমি একটু অবাক হলাম (কেননা মাছের পক্ষে যেমন জল আমাদের পক্ষে মাতৃভাষা ঠিক তেমনি, তার অনেক অদ্ভুত আচরণ আমরা লক্ষ করি না); একটু ভাবতে হ'লো জবাব দেবার আগে। 'তফাৎ বোধহয় এই যে প্রথমটায় আদেশ বোঝায়, বা ভবিষ্যৎ বচনে কোনো সাধারণ উক্তি, আর পরেরটায় আছে অনুরোধের সুর।' 'দিনের ঠিক কোন সময়টাকে "ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর" বলে?' এটার জবাব দিতে বেশ বেগ পেতে হ'লো আমাকে, আর তখনই আমি প্রথম বুঝলাম যে বাংলাভাষার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে চোখে-দেখা ছবি হ'য়ে বেরিয়ে আসার: ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর খাঁ-খাঁ নির্জন।

আমি জিগেস করলাম সে দেশে থাকতেই বাংলা শিখেছিলো কিনা। 'খানিকটা—চাকরির জন্যেই শিখতে হয়েছে—কিন্তু সে আর কতটুকু। এখন ভালো ক'রে শিখতে চাই, কিন্তু আপনাদের ভাষা বড়ো শক্ত।' 'আমাদের পক্ষে ইংরেজি যতটা, তার চেয়ে বেশি নয়।' 'আপনাদের ভাষা শেখায় দক্ষতা আছে, আমাদের তা নেই। জগৎ ভ'রে আমাদের দুর্নাম সেজন্য।' তার এই কথাটা খুব পছন্দ হ'লো না আমার, মনে হ'লো আসল কথাটা সে এড়িয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'কিন্তু আমরা তো ছেলেবেলা থেকে বাধ্য হই ইংরেজি শিখতে, সে-রকম কোনো দায় থাকলে আপনারাও কি পারতেন না?' 'তা সত্যি,' জোন্স হাসলো একটু। 'সেটাও একটা অসুবিধে আমাদের যে আপনারা অনেকেই ইংরেজি বলেন, এ-দেশের কোনো ভাষা না-শিখেও দিব্যি চ'লে যায়। জানি এ-জন্যে আমরাই দায়ী,' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি জুড়ে দিলে সে, 'কিন্তু মোটের ওপর এটা লজ্জার কথাই যে হাজার-হাজার ইংরেজ ভারতবর্ষে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, অথচ তাদের ভাষাজ্ঞান কয়েকটা হিন্দুস্থানি শব্দেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-কথা কি সত্যি যে প্রথম বাংলা গদ্য বই একজন ইংরেজ মিশনারি লিখেছিলেন?' আমি জবাব দিলাম, 'তা ঠিক নয়, একজন বাঙালির বইও বেরোয় একই বছরে, তাছাড়া আপনাদের কাছে যেমন "বাবু-ইংলিশ" আমাদের কাছে তেমনি মিশনারির বাংলা।' জোন্স প্রতিবাদ করলো তক্ষুনি, 'না, না, নিশ্চয়ই ভারতীয় ইংরেজি অনেক ভালো।' তার এই কথাটা একটু কপট শোনালো আমার কানে।

আমি কিপলিঙের কথা তুললাম। জোন্সের কি ভালো লাগে কিপলিংকে?

আমার? জিগেস করাই বাহুল্য, কোনো ভারতীয়ের পক্ষে কি কিপলিং-ভক্ত হওয়া সম্ভব? একটু সচেতনভাবে বললাম কথাটা, জোন্সের সবুজ চোখে ঈষৎ যেন কৌতুক ফুটলো। 'কিপলিংকে ঠিক ভারতবিদ্বেষী বলা যায় না কিন্তু, লোকটা লেখেও মন্দ না—তবে বড্ড সেণ্টিমেণ্টল।' 'ভারতবিদ্বেষী নয়!' আমি উত্তেজিত হলাম, 'আপনার মনে আছে "গঙ্গা দীন" কবিতা? সেই মহাপ্রাণ ভিস্তিওলা, নিজে মরার আগে এক বৃটিশ টমিকে জল দিয়েছিলো ব'লেই যে পুণ্যাত্মা?

"For all 'is dirty hide, 'E was white, clear white inside"!

ভারতবর্ষকে এমন অপমান আর কে করেছে?' জোন্স তক্ষুনি জবাব দিলো, 'আমি ওকেই সেণ্টিমেণ্টল বলছি। কিন্তু কবিতার বক্তা কী-রকম অদ্ভুতচরিত্রের অশিক্ষিত মানুষ, তাও মনে রাখবেন।' 'কিন্তু ভারতের প্রতি ঘৃণাটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না?

"Ship me somewhere East of Suez where the best is like the worst—"

আমি একটু থামতেই জোন্স পরের লাইনটা আওড়ালো,

"Where there aren't no Ten Commandments an' a man can raise a thirst!"

আপনার মনে হয় এতে ভারতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে?' 'নিশ্চয়ই!' নিজের অজান্তেই আমার গলার আওয়াজ চ'ড়ে গেলো, 'আর কত স্পষ্ট করে বলা যায় যে ভারতবর্ষ বর্বরের দেশ!' একটু চুপ ক'রে থেকে জোন্স বললে, 'বোধহয় ঠিকই বলছেন আপনি—' আন্তরিকভাবে, না ভদ্রতা ক'রে, ঠিক বুঝলাম না, 'তবে কী জানেন, একটা নস্টালজিয়া আছে, এক ধরনের রোমাণ্টিক ছবি এ-দেশের, এশিয়ার, যা আসলে চারশো বছর ধ'রে—বা আরো বেশি—মার্কো পোলোর পর থেকেই—চলতি ছিলো য়োরোপে, সেটাই শেষ ধরা পড়লো কিপলিঙের লেখায়। বাসি রোমাণ্টিসিজম, তার স্বর্গীয় সুবাস আর নেই, একটু ট'কে গেছে বলতে পারেন, তবে তারই মধ্য দিয়ে কিপলিং কিন্তু ভারতবর্ষকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে। আমি ছেলেবেলায় তাঁর লেখা প'ড়েই প্রথম ভারতের দিকে ঝুঁকেছিলাম।' আমি সজোরে ব'লে উঠলাম, 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিপলিঙের ছবি কত মিথ্যে!' 'হ্যাঁ, অনেক ব্যাপারেই মিথ্যে, তবু—এই রোদ, এই আকাশ—তা তো বটেই!' জোন্সকে কথা শেষ করতে দিলাম না আমি—'রোদ, আকাশ, গাছপালা জীবজন্তু—সবই ভালো। কলকাতায় ব'সেই একজন বিশপ লিখেছিলেন না—

"Where every prospect pleases and only man is vile"?

একটু লাল হ'লো আর্যায় জোন্স, আস্তে আস্তে বললো, 'হ্যাঁ, আমি ভারতীয় হ'য়ে জন্মালে আমারও অসহ্য মনে হ'তো কিপলিংকে। তবে অন্য একটা দিকও আছে। ভেবে দেখুন লণ্ডনের ঠাণ্ডা, ধোঁয়া, কুয়াশা, বরফ—তারই মধ্যে কোনো ব্যাঙ্কের কেরানি, ফ্যাক্টরির মজুর, অশিক্ষিত, কুলো, জগতের কোনো খবরই রাখে না—হঠাৎ ভারতবর্ষের আকাশ দেখে সে কী-রকম চমকে উঠবে তা তো বোঝেন। সেই চমকটা কিপলিং বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তা কিন্তু মানতেই হবে। তাঁর দোষটা এই যে ভারতবর্ষকে স্বপ্ন ক'রে তুলতে গিয়ে তিনি বাস্তবকে বিকৃত করেছেন—তবু—আপনি হয়তো হাসবেন শুনে—সেই স্বপ্নটা আমাদের মনে সাড়া দিয়েছিলো।'

আমার আরো অনেক তর্ক ছিলো, কিন্তু জোন্সের শেষ কথাটা শুনে আমি একটু থমকালাম। ইংলণ্ডের 'অশিক্ষিত, কুলো' লোকেদের কাছে ভারতবর্ষ যে একটা স্বপ্ন হ'য়ে উঠতে পারে, এই কথাটা নতুন শোনালো আমার কানে। আমিও মনে-মনে পোষণ করছি এক স্বপ্নের ইংলণ্ডকে, টুকরো-টুকরো সাহিত্যের স্মৃতি গেঁথে তৈরি করেছি এক অলৌকিক লণ্ডন—টেমস নদী বললেই স্পেনসারের লাইন মনে পড়ে আমার, ফ্লীট স্ট্রীট বললেই জি, কে, চেস্টার্টনকে, হ্যামস্টেড মানে কীটস, চেলসী মানে রসেটি—এক-এক সময় এও মনে হয়েছে যে সেই দেশকে আমি এতদূর পর্যন্ত আপন ক'রে নিয়েছি যে কোনোমতে সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে 'তাদেরই একজন' হ'য়ে যেতে পারবো। কিন্তু জোন্সের কথা শুনে আমার উপলব্ধি হ'লো যে আমার এই ইংলণ্ড তেমনি অলীক, যেমন কিপলিঙের ভারতবর্ষ। আমি আঁকড়ে ধরেছি ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে, যাতে ব্যাঙ্কের কেরানির, কারখানার মজুরের, কোটি-কোটি মানুষের কিছুই এসে যায় না—সেই যারা সেপাই হ'য়ে আমাদের দেশে আসে, অবাক হ'য়ে যায় আলো আকাশ আকাশ-ভরা ঝকঝকে তারা দেখে—ফিরে গিয়ে ঠাণ্ডা বরফে স্বপ্ন দ্যাখে আমাদের নারকোল গাছের। আমাদের এই জীবন—মলিন, গরিব, দম-আটকানো—সে বিষয়ে কিছুই জানে না তারা, যেমন আমি পারি না কোনো গোরা টমিকে গোরা টমি ছাড়া আর-কিছু ব'লে ভাবতে পারি না তার স্ত্রী, সন্তান, সংসার কল্পনা করতে, আমার স্বরচিত ইংলণ্ডে তার জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও আমি রাখিনি। আমার তখনও এতটা বোঝার মতো বুদ্ধি হয়নি যে সব স্বপ্নেরই নিভর হ'লো আংশিক সত্য, (সেখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কবিতার তফাৎ) প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন ভারত, উজ্জয়িনী, রোম, রেনেসাঁসের ফ্লোরেন্স—সবই তা-ই; স্বপ্নগুলো অনর্থক নয় তবু, তারা যে-সব ফুল ফোটায়, ফল ফলায় তাতেই তাদের মূল্য। কিন্তু ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় স্বপ্নে বিস্তর ভেজাল ছিলো—সাম্রাজ্য, অর্থলোভ, আমাদের সকলকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চাওয়ার পাগলামি—আর তাই সেই ডিম ফুটে বেরোলো—লোটের ইণ্ডীয় বা শাতোব্রিয়াঁর আমেরিকা নয়, সেহাৎই একটি 'জাঙ্গাল্-বুক' মাত্র, সেহাৎই একমুঠো সেপাই-ব্যারাকের ছড়া।

যেহেতু ছেলেবেলায় কিপলিঙের কবিতা আমার প্রিয় ছিলো, অনেক লাইন এখনো মুখস্ত আছে, সেইজন্যেই কিপলিঙের উপর এখন আমার আক্রোশ একটু বেশি, মনে হ'লো সেই অজ্ঞান বয়সের বোকামির কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে, যদি একদিন জোন্সের কাছে প্রমাণ করতে পারি যে কবি হিশেবে কিপলিং অকিঞ্চিৎকর, এমনকি ইংরেজি সাহিত্যের একটি কলঙ্ক। মনে-মনে একটা প্রশ্ন তৈরি ক'রে বলতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ চোখে পড়লো জানলার কাছ থেকে ফটিক-মামা হাত নেড়ে ডাকছেন আমাকে, চোখে চোখ পড়তেই আরো স্পষ্ট ইশারা করলেন। 'মাপ করবেন, একটু আসছি' ব'লে উঠে গেলাম আমি, ফটিক-মামা আমাকে কাঁধের নিচে ধ'রে দূরে নিয়ে গেলেন। নিচু গলায় বললেন, 'এই তোর চমৎকার সুযোগ, রঞ্জু, জোন্সের কাছে সব তুকতাক জেনে নে।' আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'কিসের তুকতাক?' 'তুই আই, সি, এস, দিবি তো—ও-ছোকরা টাটকা পাশ ক'রে এসেছে, অনেক ভালো-ভালো টিপ্ দিতে পারবে তোকে।' 'আমি আই, সি, এস, দেবো কে বললো?' 'যদি না-ও দিস, তবু জোন্সের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো—কাজে লাগতে পারে।' —ব'লেই, আমাকে ফেলে, ফটিক-মামা হঠাৎ ছুটে গেলেন অনাদিবাবুর কাছে, বোধহয় কোনো বৈষয়িক আলাপ শুরু করলেন তাঁর সঙ্গে: 'শাই ক্যাপিটেল', 'শেয়ার', 'সিক্স পার্সেন্ট', এই ধরনের কয়েকটা কথা আমার কানে এলো।

এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিলো না যে জোন্স একজন জলজ্যান্ত আই, সি, এস, চাকুরে, ঢাকার অ্যাডিশনেল ম্যাজিস্ট্রেট—অর্থাৎ, তাদেরই একজন যাদের আমরা 'হর্তাকর্তা' ব'লে থাকি, মনে-মনে কখনো বিশ্বাস করি না, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রার্থী হ'য়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এমন একটা পরিবেশে, যে ও-সব মনে থাকার কথাও নয়। জোন্সের সঙ্গে আমার যে বন্ধুতা কয়েক মিনিট আগে সম্ভবপর হ'য়ে উঠেছিলো, সেটাতে হঠাৎ একটু ঝাঁকুনি দিয়ে গেলেন ফটিক-মামা। চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'লো অতিথিদের মধ্যে অনেকেই জোন্সের উপস্থিতির জন্য আরাম পাচ্ছে না [illegible]

হয়তো গৌরবান্বিত হচ্ছে মনে-মনে)—যেন ভুলতে পারছে না আজকের এই প্রীতি-সম্মেলনে ঐ মানুষটা কী-রকম বিজাতীয়, অনাত্মীয়, অবান্তর। প্রতাপান্বিত বৃটিশ রাজ, দুর্গম ইংরেজি ভাষা, কিছু ভয়, কিছু ভক্তি, কিছু সন্দেহ—এই সব তাকে শত যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছে। 'মিশ্চয়ই জোন্স নিজেও বোঝে যে আমাদের মধ্যে তার সত্যিকার কোনো জায়গা নেই, হবেও না কোনোদিন, যতদিন ইংরেজ রাজত্ব আছে এ-দেশে; তাহ'লে তাদের ঢাকা ক্লাবে না গিয়ে, টেনিস গল্‌ফ্‌ বল্‌ নৃত্যে সময় না-কাটিয়ে, এখানে আসে কেন? শুধু গান ভালোবাসে ব'লে?

'এই যে রঞ্জু, কী ব্যাপার?' আমার পিছনে একটি মৃদু গলার আওয়াজ পেলাম সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে দেখে পুলকিত হ'তে পারলাম না। অমূল্য, আমারই মতো য়ুনিভার্সিটির ছাত্র, এটুকু ছাড়া তার সঙ্গে কিছুই মিল নেই আমার। পুষ্ট গালে হাসির ভাঁজ ফেলে সে বলতে লাগলো, 'জানতাম না তো তুমি জোন্স-সাহেবের ফ্রেন্ড, একটা কাপ্তান লোক! বাপ্‌স্‌, কী-রকম ইংরেজি চালাচ্ছিলে এতক্ষণ! একেবারে ফায়ার!'

আমার খুব লজ্জা করলো অমূল্যর কথা শুনে, কিন্তু তার ধরনধারন আমার অচেনা নয়, যেন তার কোনো কথাই আমার কানে ঢোকেনি এমনি সুরে, ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তোমার কী-খবর? কেমন আছো?' 'আর আছি!' মুখভঙ্গি ক'রে ব'লে উঠলো অমূল্য, 'পিতার আদেশে ধর্মবিজ্ঞানে পাঠ নিচ্ছি, কিন্তু আচার্যগণের উপদেশ আমার মনে হচ্ছে যেন প্রপঞ্চের মতোই প্রহেলিকা। অথবা যেন মহাষ্টমীর দিনে ছাগশিশুর করুণ আর্তনাদ। বুঝেছো রঞ্জু, কোনোমতে একটা চাকরি বাগাতে পারলে আর নগেন চাটুয্যের ধ্যা-ধ্যা শুনতো কোন শালা! কিন্তু কোথায় চাকরি? দ্যাখো নাই খা পোলার চাই তা। দণ্ডকারণ্যে রামের মতো অবস্থা আমাদের, "হা সীতা, হা সীতা" ব'লে বিলাপ করছি। সীতা মানেই চাকরি বুঝেছো তো—ও-দুটো একই আসলে—হোক না বথা, ফাংরা ছেলে, চাকরি পেলেই ছুকরি মেলে!' আমি বললাম, 'তোমার বেশ স্বভাবকবিত্ব আছে দেখছি!' 'কী যে বলো! আমি তো আর তোমার মতো পোয়েট নই, ছড়াফড়া বানাই আরকি মাঝে-মাঝে, আর সুরও দিই সেগুলোতে। শুনবে একটা?' অমূল্য নিচু গলায় গুনগুন করলো:

'গেণ্ডারিয়ার ছেমরিগুলি
আইল যেদিন সারিন্দায়,
লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হৈল
ঢোলগোবিন্দের বারান্দায়,
ঢোলগোবিন্দের কপালটা পোড়া—

—থাক, বাকিটা পরে শোনাবো তোমাকে।' স্বরচিত অনবদ্য লাইনগুলিকে যেন জিভের উপর চেখে নিয়ে গিলে ফেললো সে, তারপর বললো, 'জানো, আমার আসল লাইন বোধহয় গান-বাজনা, খাঁ সাহেবের কাছে গলাও সাধছি, কিন্তু আমার গলা দানাদার নয়, খেয়াল হবে না আমাকে দিয়ে, ধরো এই মিশুর এক-একটা তান আমি কিছুতেই আনতে পারি না গলায়। মিশুর গান কেমন লাগে তোমার?' 'ভালো?' 'মাইরি, শুধু ভালো! সুপার্ব, ডিভাইন, ওয়াণ্ডারফুল—' পর পর অনেকগুলো ইংরেজি বিশেষণ আউড়ে গেলো অমূল্য—'আমি, জানো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান শুনতাম, তারপর বুক ঠুকে ঢুকে পড়লাম একদিন। মিশুর কাছে নওরোজের গান শিখছি এখন—তোমাদের সেই দিলদার নওরোজের গান' (কী অর্থে দিলদার নওরোজ 'আমাদের' হলেন আমি তা বুঝলাম না), ঠুংরি-গজল-ভজনের 'লাইনে চ'লে যাবো কিনা ভাবি মাঝে-মাঝে। কিন্তু আসল কথা, ভাল-ভাত আসবে কোত্থেকে? ঐ যে, ওস্তাদজী এলেন—আমি যাই।' আমার হাত ধ'রে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে আরো দূরে নিয়ে এলো অমূল্য, একেবারে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিশফিশে গলায় বললো, 'শোনো রঞ্জু, আমার একটা উপকার করবে? জোন্সের কাছ থেকে একটা সুপারিশ এনে দেবে আমাকে? সাহেব এক ছত্তর লিখে দিলে আমাকে আর পায় কে? আমার তো আবার ইংরিজি বলতে গেলেই কাশি ওঠে—তুমি একটু বলো যদি আমার হ'য়ে! কেমন, বলবে তো? আর শোনো—' এবার আমার কব্জিটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলো অমূল্য, কেমন একটু বাঁকা চোখে তাকালো আমার দিকে—'একটু সাবধানে কথা বোলো কিন্তু জোন্সের সঙ্গে, দেখছো তো দিব্যি ভালো-মানুষ, কিন্তু আসলে সাংঘাতিক টিকটিকি! মনে রেখো কথাটা। কেউ না একদিন বোম-ফট্টাশ ক'রে দেয় ওকে, তার আগে একটা সুপারিশ যদি বাগাতে পারি—আচ্ছা—পরে কথা হবে।' আমাকে মুক্তি দিয়ে অমূল্য ছুটে গেলো দরজার কাছে, ওস্তাদ ইব্রাহিম খাঁকে অভ্যর্থনা করতে, ঘরের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হ'লো। অমাদিবাবু ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগলেন, 'আসুন আপনারা, আসুন সবাই—ওস্তাদজী—জোন্স—রঞ্জু, এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন—চলো, চা তৈরি।'

—আমাদের লাঞ্চও প্রায় তৈরি মনে হচ্ছে, দূতী সমাগত। ইনি গায়ত্রী গ্রেগরি, আমার হাউসকীপার। ওয়াইন কোনটা দেবে? বলুন আপনি, আপনার কী পছন্দ? আপনার অভ্যেস নেই? আচ্ছা, একটু শাব্লি চেখে দেখুন, বিশুদ্ধ দ্রাক্ষারস, মশাই, কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক আছে, গায়ত্রী, আমরা আসছি এক্ষুনি।...... কী বললেন? গায়ত্রী গ্রেগরি নামটি বেশ সুন্দর? হ্যাঁ—সুন্দর নাম, মানুষটিও অসুন্দর নয়। কল্কাতার মেয়ে, গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ব্রাহ্মণ। নামের মধ্যেই দুই ধর্মের অনুপ্রাস। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। গায়ত্রী বিধবা, দ্বিতীয়বার জাত-ধর্ম মিলিয়ে পাত্র জোটানো গেলো না। আমার কাছে আছে, ভালোই আছে। চমৎকার সেবাপরায়ণা মেয়ে, আমিও ওর সব রকম প্রয়োজন মিটিয়ে চলি। ঐ লাঞ্চের ঘণ্টা। আসুন।

(ক্রমশঃ)

অন্নদাশঙ্কর রায়

সদর মহলে সারাদিন কাটানোর পরে স্বভাবতই মন চায় অন্দর মহলে যেতে। বাইরের সঙ্গে তো পরিচয় ঘটল, এবার দেখতে হবে ভিতরে কী আছে।

রূপ রস গন্ধের জগৎ, ঘটনার পর ঘটনার জগৎ, তথ্যের ও যুক্তির জগৎ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ — এর কি কোথাও শেষ আছে না সীমা আছে? হয়তো আছে, কিন্তু সেই সব নয়। জানতে ইচ্ছা করে এর আড়ালে কী আছে, ভিতরে কী আছে। হয়তো কিছু নেই, কিন্তু কোন্ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে বলব যে, নেই? সদর মহল থেকে অন্দর মহলের আন্দাজ করা যায় না। ভিতরে না ঢুকে ভিতরের সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে আর এগোতে পারে না, ইনটেলেকট যেখানে গিয়ে আর কূল পায় না, শিল্পীর ইনটুইশন সেখানকার রহস্য ভেদ করতে পারে। শিল্পীর দৃষ্টি কেবল বহির্দৃষ্টি নয়, বহির্দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপূরক অন্তর্দৃষ্টি।

শুধু অন্তর্দৃষ্টিও নয়। সেটা হয়তো যোগী ঋষির। তাঁদের চোখ মেলে তাকাতে হয় না। তাঁরা ধ্যানেই বহির্বিশ্ব দেখতে পান। কিন্তু শিল্পী সেকথা বলতে পারে না। তার চোখ কান সব সময় খোলা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে তার চোখ কান সৃষ্টি করা হয়েছে। তার বহির্দৃষ্টিতে সব কিছুই পড়ে। অধিকন্তু তার অন্তর্দৃষ্টিও আছে। তা দিয়ে সে বহির্জগতের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

সে জগৎ থেকে ফিরে এসে যে ভাষায় সে কথা বলে সে ভাষা রূপকথার ভাষা, রূপকের ভাষা, সাংকেতিক কাব্যের ভাষা, অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষা। এমনও হতে পারে যে তার মুখে কথাটি নেই, সে শুধু আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করে সে কী দেখেছে, কী জেনেছে। কোনো মানবিক শব্দই তার বাহন হবার যোগ্য নয়।

যুগপৎ সদরে ও অন্দরে যার চলাফেরা সে মানবিক শব্দ পরিহার করতেও পারে না। তাকে দুই ভাষায় কথা বলতে হয়। সেই-জন্যে তার সৃষ্টি অমন দুর্বোধ্য মনে হয়। কতক বুঝি, কতক বুঝিনে। ভাবি অভি-ধানের সাহায্যে বুঝতে পারব। কিন্তু অভি-ধানের সহজতম শব্দও দুর্বোধ্য হতে পারে। অনুভূতিটাই দুরূহ।

ভাষা আসলে তৈরি হয়েছে বহির্জগতের প্রয়োজনে, তার ঘটনা ও তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে। একই ভাষায় অন্তর্জগতের প্রয়োজন মেটানো যায় না, অথচ সেই চেষ্টাই করতে হয়। আরেক সেট শব্দ খুশিমতো বানানো যদি বা সম্ভব হয় তবে সাধারণে সেটা নেয় না, তার পরমায়ু বেশীদিন নয়। শব্দের জন্যে যেতে হয় সাধারণের ভাণ্ডারে। নতুন অর্থ দিয়ে তাকে ভাণ্ডারে ফেরৎ পাঠাতে হয়।

যতক্ষণ বহির্জগতের কথা হচ্ছে ততক্ষণ শব্দের একপ্রকার অর্থ, চেনা অর্থ, বহুজনের ব্যবহৃত অর্থ। কিন্তু অন্দর মহলের কথা বলতে গেলে অর্থান্তর ঘটে, অচেনা অর্থ উড়ে আসে, বহুজনের ব্যবহারে দোলা লাগে। ক্রমে সেটাও গাসওয়া হয়ে যায়।

বাইরের জগতে জরা আছে, ব্যাধি আছে, মরণ আছে। আছে অন্যায় ও অপরাধ ও পাপ। অসত্য ও হিংসা। কতরকম দুঃখ আর দুর্দৈব। প্রকৃতির কত না উৎপাত, মানুষের কত না স্খলন ও পতন। তেমনি এর প্রত্যেকটির বিপরীত বা সংশোধন বা ক্ষতিপূরণও আছে। যৌবন আর স্বাস্থ্য আর পরমায়ু। ন্যায় আর পুণ্য, সত্য আর প্রেম। প্রকৃতির রাজ্যে কিসের অভাব? মৃত্যুও প্রাণের অভাব নয়। প্রকৃতির রাজ্যে যদি কোনোকিছুর অভাব থাকেও বিধাতার রাজ্যে নেই। সেখানে চির পরিপূর্ণতা। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

শিল্পীরা সুন্দরের ঘরানা, তাদের কার-বার সৌন্দর্য নিয়ে। কিন্তু অন্দর মহলের বাইরে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কোথায়? বহিঃ-সৌন্দর্যের উপর দৃষ্টিপাত করলেই সেই-সঙ্গে অসুন্দরের উপরেও দৃষ্টি পড়ে। সেই ভয়ে যদি দৃষ্টি রুদ্ধ করি তবে সুন্দরকেও দেখা হয় না। অসুন্দরকে এড়াতে গেলে সুন্দরকেও এড়াতে হয়। এমন কোনো কৌশল কি কেউ জানে যা দিয়ে পানি না ছুঁয়েও মাছ ধরা যায়, পাঁক না ছুঁয়েও পদ্ম তুলে আনতে পারা যায়?

অন্দর মহলে সুন্দর ছাড়া আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে সেখানে যাওয়া যায়, কিন্তু দিনরাত সেখানে থাকতে পারা যায় না। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য যেন বিশুদ্ধ আত্মা। আমরা দেহও চাই। দেহসুখও চাই। সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও আসে। জন্মালেই মরতে হয়। যৌবনের সূর্যাস্ত জরা। একটাকে চাইলে আরেকটাকেও চাওয়া হয়ে যায়। দেহ যার আছে তাকে দেহের সুন্দর অসুন্দর মেনে নিতে হয়। তেমনি বহির্জগতের সুন্দর অসুন্দর। সুন্দরের কারবারীকেও অসুন্দরের ব্যাপার করতে হয়, করতে না হোক বুঝতে হয়। শিল্পীর মার্গ ছুঁৎমার্গ নয়। যেটা তোমার ভালো লাগে না সেটার অস্তিত্ব তা হলে নাস্তিত্ব হয়ে যায় না। শাদা আছে, কালো আছে, আছে আরো কতরকম রং। তোমার যেটা ভালো লাগে না অপরের হয়তো সেটা ভালো লাগে, অন্তত সত্যের খাতিরে ভালো লাগে। সমগ্রকে নিয়েই সত্য। সমগ্র নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ প্রীতিকর নয়। তা বলে নিছক প্রীতিকরকে নিয়ে সৃষ্টি চলে না। না বিধাতার সৃষ্টি, না প্রকৃতির সৃষ্টি, না মানুষের সৃষ্টি। তেমনি নিছক অপ্রীতিকরকে নিয়েও সৃষ্টি নয়। যদিও সেটাই নাকি হাল ফ্যাশন।

বৈজ্ঞানিক তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। কবির তেমন কোনো গবেষণাগার নেই। কিন্তু কবির আছে অন্দর-মহল। সেখানে গিয়ে তিনি চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হন, অন্তঃসৌন্দর্যের সঙ্গে বহিঃসৌন্দর্যকে মিলিয়ে নেন, যাচাই করেন। এই যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর অন্তঃপুরে যাওয়া ও প্রবেশ পাওয়া এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। কারো কারো জীবনে এ সৌভাগ্য আপনি আসে। অন্যদের এর জন্যে সাধনা করতে হয়। ইনটেলেকটের বিকাশ না হলে যেমন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হওয়া যায় না তেমনি কবি বা চিত্রকর হওয়া যায় না ইনটুইশনের বিকাশ না হলে।

সূর্যের আলোর মতো আরো একরকম আলো আছে যার উদয় পূব আকাশে নয়, চিদ্ গগনে। কবিদের সে আলোর জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। সূর্যের আলো যেমন পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে তেমনি যে আলোর কথা বলছি সে আলো আসে সদর মহলের বাইরে থেকে। আমাদের সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর সে আলো যখন পড়ে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যা দেখেছি অথচ দেখিনি তা যেন নতুন চোখে দেখি, নতুন আলোয় দেখি। আর এই যে নতুন আলোয় দেখা একে দেখানোই হয় আমাদের

কাজ, আমাদের সৃষ্টিকর্ম। একের সৃষ্টি অপরকে দৃষ্টিদান করে।

কবিদের যে দ্রষ্টা বলা হয় সেটা এই কারণেই। দ্রষ্টা, অপিচ দৃষ্টিদাতা। বলা বাহুল্য নিছক বহুদর্শিতার জন্যে কেউ দ্রষ্টা বা দৃষ্টিদাতা বলে অভিহিত হন না। নিছক বহুদর্শিতার মূল্য আছে নিশ্চয়। কবিরাও কবিরাজের মতো বহুদর্শী হলে অভিজ্ঞতাসম্পদে সমৃদ্ধ হন। কিন্তু কোন্ আলোর দেখেছেন তারই উপর নির্ভর করে অন্তিম মূল্য। দেয়ালির রাতে হাজার হাজার পিদিমের আলোয় আমরা বহুদর্শী হতে পারি, কিন্তু তার পরের দিন সূর্যের আলোয় যা হই তার নাম দ্রষ্টা। একই দৃশ্য দিনের আলোয় দেখতে আরেক রকম।

জীবন এত ছোট যে সদর মহলের সব ক'টা ঘর একজীবনে দেখা হয়ে ওঠে না। শতবর্ষ পরমায়ুও তার জন্যে যথেষ্ট নয়। আমাদের সকলেরই দৌড় পরিমিত। কিন্তু অন্দর মহলে যাবার দুয়ার সব বয়সেই খোলা থাকে। কিশোরবয়সীও হয়তো বর্ষীয়ানের আগে সেখানে প্রবেশ পায়। পঁচিশ বছরের কীটস যা দেখেছেন তার তুলনা তাঁর দ্বিগুণবয়সীদের অনেকের জীবনে নেই। কীটসের গৌরব শুধু তার অনবদ্য কাব্য-দেহের জন্যে নয়। তাঁর কাব্যচিত্ত কোন্ সূর্যের সৌরালোকে উদ্ভাসিত। সূর্যের হলেও তা ভিতরের।

বাইরের রিয়ালিটির মতো ভিতরের রিয়ালিটিও আছে। চোখ খুলে গেলে ইনার রিয়ালিটির দর্শন মেলে। তখন সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ হয়। কবি তখন তার নিজের সৃষ্টি-লীলাকেও বিধাতার সৃষ্টিলীলার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

বাইরের রিয়ালিটিকে আমি মায়া বলিনে। তা যদি বলতুম তবে সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সবই মায়া। কিন্তু ইনার রিয়ালিটির আলোয় না দেখলে, না দেখতে জানলে, দেখার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার ফলে সৃষ্টিকর্মেও অসম্পূর্ণতা আসে। একরাশ লিখলে হবে কী, দৃষ্টি ও সৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে একটি কবিতাই যথেষ্ট হতে পারে। সে কবিতা এতটুকুও হতে পারে। কী দেখলুম তা দেখানোর জন্যে মহাকাব্য লিখতে হয় না প্রত্যেক কবিকে। মহাকাল তেমন কোনো দাবীও করেন না কালজয়ীর কাছে। দুচার পংক্তিও কালজয়ী হয়েছে।

সদর মহলে যেমন সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন শিবের সঙ্গে অশিবও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন আনন্দের সঙ্গে নিরানন্দও আছে অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন প্রেমের সঙ্গে অপ্রেমও আছে, সত্যের সঙ্গে অসত্যও আছে, অন্দর মহলে তেমন নয়। সদর মহলে যেমন জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও আছে, যৌবনের সঙ্গে জরাও আছে, অন্দর মহলে তেমন নয়। একদিক থেকে অন্দর মহল বৈচিত্র্যহীন। মানুষ বৈচিত্র্য চায়। তাই অন্দর মহলে চিরবসন্ত উপভোগ করতে রাজী নয়। যে মুখে যাই বলুক না কেন সদর মহলের বৈচিত্র্য ছেড়ে অন্দর মহলে বৈকুণ্ঠ-সুখ চায় না।

হাসি আর কান্না, জন্ম আর মরণ, পাপ আর পুণ্য, মিলন আর বিরোধ, সুন্দর আর অসুন্দর, ভালো আর মন্দ এই নিয়ে বাইরের রিয়ালিটি। এর বৈচিত্র্যের শেষ নেই। সেইজন্যে সাহিত্যেরও শেষ নেই, সঙ্গীতেরও শেষ নেই, ললিতকলারও শেষ নেই। একদল বিদায় হবার আগে আরেক দল এসে হাজির হয়। সৃষ্টির কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়। সৃষ্টিপ্রবাহ বহতা থাকে। সদর মহলে লোকারণ্য। তারই মাঝখানে দু'চারজনকে দেখি যারা ভিতরের রিয়ালিটির সন্ধান রাখেন। তারই আলোয় পথ চলেন। তাঁদের সৃষ্টি আভ্যন্তরিক আলোকে উদ্ভাসিত।

না, দু'চারজন নয়। অনেকেই মাঝে মাঝে ভিতরের বার্তা পান, মুহূর্তের জন্যে অন্দরে উঁকি মেরে আসেন, ইনার রিয়ালিটির আভাস বয়ে আনেন। কিন্তু বাইরের রিয়ালিটি তাঁদের অভিভূত করে রাখে। যেমন অভি-ভূত করে আফিস বা দোকান। দোকানদারের কাছে দোকানই পরম সত্য আর আফিস-ওয়ালার কাছে আফিস। অবশ্য যদি নিজের দোকান বা নিজের আফিস হয়ে থাকে।

অন্দর মহলের তাতে কিছুই আসে যায় না। সে তার চিরবসন্ত নিয়ে অপেক্ষা করে। যে চায় সে পায়। আর যে পায় সে তার প্রাপ্তির সৌরভ বিতরণ করে।
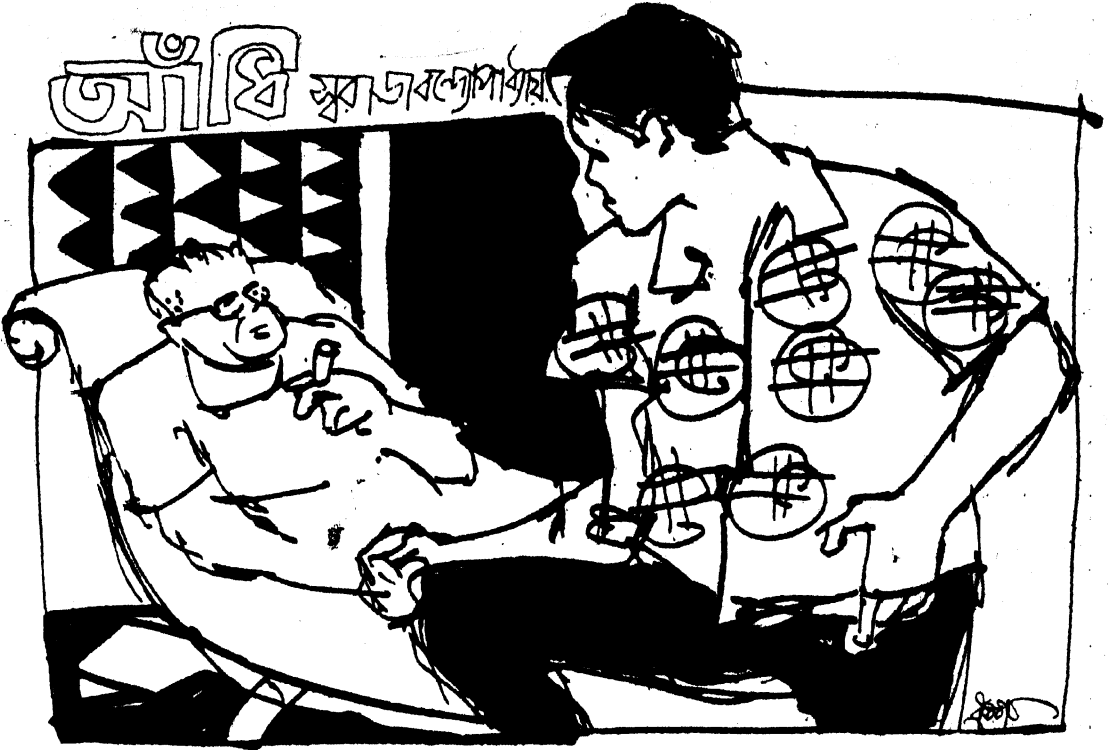
[উপন্যাস]

।। চার ।।

সমস্ত রাত ঘুম হোল না। ওর জীবনে এই দ্বিতীয়বার বিনিদ্র রাত কাটাল দীপু।

আর একবার মাত্র তার রাত্রে ঘুম হয় নি, বছর ছয়-সাত আগে একটা মারপিট করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল দীপু। তার পকেটে বা প্যান্টের ভেতরে ভাগ্যিস সেদিন গজ বা নেপালা কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও তাকে বেদম মার মেরেছিল পুলিশ। শুধু চড়-চাপড় নয়, বেটনের ধোলাই। আড়ং ধোলাই দিয়ে ফেলে রেখে-ছিল হাজতে সমস্ত রাত। সেই রাত্রিটা ভয়ে ঘুম হয় নি ওর। তখন এই মস্তানীর লাইনে নোতুন। ঘাটঘোট জানা ছিল না। রাতটা তার ভীষণ ভয় করেছিল, জেলের ভয়।

যদিও জেল ফাঁসি কিছু হয় নি। পরের দিন সামান্য কিছু টাকা খরচা করে টোনা তাকে ছাড়িয়ে এনেছিল। তবু সেই ঘুমহীন রাত্রিটার কথা আজও মনে আছে।

আর আজ রাত্রে ঘুম নেই ওর চোখে। সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরে ছাতে বসেছিল চুপচাপ। বাবা তাকে দেখেছে, কথা বলে নি। ছোট ভাই পড়ছিল, পড়তেই লাগল। বাড়ির রাঁধুনি রান্না সেরে রাত সাড়ে নটা নাগাদ খেতে ডাকল। তাকেও খেতে ডাকল। বাড়িতে আর কেউ নেই। ভাই আর বাবা। কেউই ওর সঙ্গে কথা বলল না। যে যার খাওয়া সেরে উঠে গেল।

দীপু দেখল, বাবা তাকে একবার জিজ্ঞেসও করল না, সে রাত্রে থাকবে কিনা। খাওয়ার পর একবার ভাবল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু প'ড়ো ঘরে যেতে ওর কোন মতেই ইচ্ছে হোল না। কিছুতেই নয়।

ও বাবার ঘরে ঢুকল। বাবা একটু অবাক হয়ে তাকাল। চোখ দুটি গাঢ় বিষণ্ণ, মুখখানি ম্লান গম্ভীর। বাবা যেন আরও কিছুটা রোগা হয়ে গেছে। কোন কথা বলল না বাবা।

দীপুও কোন কথা বলল না। একটা বালিশ হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল। বাইরের ঘরে একটা তক্তাপোষ পাতা ছিল, তার ওপর একটা মাদুর পাতা ছিল।

বালিশটা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল দীপু। মাথার দিকে জানলা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছিল। এমন ক্লান্ত দেহে এই পরিবেশে ঘুম আসবার কথা। কিন্তু ঘুম এল না। কিছুতেই ঘুমোতে পারল না ও।

বার-বার মালার টানা-টানা চোখের টেরচা চাউনিটা তাকে বিদ্ধ করছিল।

ইতর—ছোটলোক!

অথচ মাত্র দিন কুড়ি আগে মালা তার বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠেছে ওই মুখ, ওই চোখ। মাত্র কুড়ি দিন আগে মালা তার সঙ্গে এক শয্যায় শুয়েছে। তখন তো ঘৃণা ছিল না! সংসারটা কি মাত্র কয়েক দিনে বদলে গেল?

প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, মালার সঙ্গে তারপর মাত্র দিন দশেকের ভেতরেই আলাপ হয়ে গেল। অচেনা কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে যে পরিমাণ সাহস দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশী সাহস দীপুর ছিল। আলাপের জন্যে দুটি জিনিস প্রয়োজন হয়, একটি—সাহস, আর একটি—পরস্পরের আলাপ করবার বাসনা। এ দুটোই ছিল পুরোমাত্রায়। তাই আলাপটা কোন সমস্যা বলেই মনে হোল না।

স্কুল থেকে একা ফিরছিল মালা। পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল দীপু। দুদিন তিনদিন দাঁড়িয়ে থেকে ও দেখেছে, মালা একদল মেয়ের সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরে। সেদিন মালা একা। অন্য মেয়েরা যে ছিল না তা নয়। সেদিন ইচ্ছে করেই মালা একটু আগে একা একা বেরিয়েছে। দীপুকে একটু সুযোগ দেবার জন্যে। তাকে একা পেয়ে দীপু একটা কিছু করুক, এটা ও চেয়েছিল। মনেপ্রাণে চেয়েছিল। যদি দীপু কিছু না করতে পারত তবে মালা নিশ্চয় আহত হোত, দীপুকে মনে মনে ভীতু বলত, বোকা বলত। তা কিন্তু হোল না।

দীপু সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ গ্রহণ করল। সটান মালার দিকে এগিয়ে এসে ফস্ করে বলে বসল,—সেদিন জানলায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলে যে?

সরাসরি 'তুমি' বলে বসল। দীপুর কাছ থেকে এই রকম দুর্দান্ত কিছুই আশা করা যায়। মালা ভীষণ খুশী হোল। মুখটা

টকটকে লাল হয়ে উঠল। চোখেমুখে তীব্র বিরক্তির রেখা প্রকাশ পেল। কপট রাগও যেন ফুঁসে উঠল—বেশ করেছি, তাতে আপনার কি!

—আমার কি! বারে বা! আমার দিকে হাসবে আর আমার কি?

—আমার হাসি পেয়েছে, হেসেছি।

—বেশ করেছ। চলো, একটু পার্কে যাসি।

কি ডেঞ্জারাস ছেলে রে বাবা! মালা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। মুখে বলল,—না।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভয় ভয় করছিল মালার। যেন সাত-জন্মের চেনার মত কথা বলছে।

ও বলল,—কথা আবার কিসের? আমার সঙ্গে কারুর কথা নেই।

এতগুলো কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলছিল। ও ইচ্ছে করলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারত। দীপু ধরে রাখত না। কিন্তু যাচ্ছিল না। যেতে পারছিল না। পা-দুটো যেন বেঁধে রেখেছে। বার বার চারদিকে তাকাচ্ছিল। কেউ দেখে ফেলে কিনা, কেউ এসে পড়ে কিনা! অন্য মেয়েরা আসতে কিছু দেরী আছে। সে আজ প্রায় মিনিট কুড়ি আগে স্কুল থেকে একা বেরিয়ে পড়েছিল। এই রকম একটা কিছু আশা করে বেরিয়েছিল। আশা সফল হোল।

তবু ভয় ভয় করছিল মালার। প্রথম দিকের পক্ষে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে।

একটু একটু করে এগোল মালা।

—চললে? কাল আবার এসো। মাইরী না এলে—

বলতে গিয়ে থেমে গেল দীপু। এতক্ষণ চেষ্টা করে ও ভাল ভাষায় কথা বলছিল। ফস্ করে এবার মাইরী বেরিয়ে পড়েছিল। আরও দু' চারটে বুলি হয়তো বেরিয়ে পড়তো, ভাগ্যিস থেমে গেল!

মালা হনহন করে চলে গেল এবার।

দীপু সেইদিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ খুশীতে জিভের তলায় আঙুল পুরে সিটি মারল।—শালা গাড্ডোর রেলা। মার কৈলাস।

প্রায় নৃত্য করতে করতে সেদিন পোড়ো ঘরে এল দীপু। এসে সরস্বতী পুজোর ভাসানের দিনে টুইস্ট নাচের মত দু' পাক নেচে বললে,—থাট্টু লাগাও, মৌজ লাগাও। আ বে, টোনা, থাট্টুর বোতল লিয়ে আয়।

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দেয় টোনার দিকে?

মদ নিয়ে আয়। থাট্টু খেয়ে মৌজ করবে আজ। বোম্ হয়ে বসে থাকবে, মাঝে মাঝে সিটি মারবে—গাড্ডোরী রেলা! বলা যায় না ফুর্তির চোটে এমনি এমনি দুটো পেটো ঝেড়ে আওয়াজ তুলতে পারে দীপু। ও সেদিন ভীষণ উত্তেজিত।

—কিরে, কি হোল, ফেহেড হয়ে গেলি? ভুতো বললে দীপুর হালচাল দেখে।

দীপু বসে সিগ্রেট ধরাল,—শালা, এক ফুলটুসিকে লেপটেছি।

—মাইরী।

—জব্বর।

সেদিন রাত্রে রীতিমত একটা উৎসব শুরু হয়ে গেল। মদ, কসা, পরোটা, সিগ্রেট চালাও ব্যবস্থা। টাকা দিলে দীপু। ধেনো মদ বলেই অল্প টাকায় হোল। বেশী যদি লাগত তাতেই বা কি আসে যায়। দীপুর দিল তখন দরিয়া।

বেশীদিন লাগল না। দীপুর এখনো স্পষ্ট মনে আছে। আগ্রহ তার ছিল সত্যি, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল মালার। মালা যেন ইচ্ছে করেই দিন দিন তার ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল।

ভয় কাকে বলে দীপু জানত না। পরোয়া করত না কাউকে। তাই ও অল্পদিনে যা পেরেছিল, অন্য কোন ছেলে বোধহয় তা পারত না। স্কুলে যাবার পথে ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মালা বই নিয়ে স্কুলে আসছে দেখেই এগিয়ে যেত। ওকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোনদিন ডায়মণ্ডহারবার, কোনদিন সোদপুর। যে কোন একদিকে চলে যেত। সমস্ত দিন কোন মাঠে বা বাগানে কাটাত। সঙ্গে সব সময় একটা গজ থাকত, কেউ কিছু বলতে এলে, তাকে বাধা দিতে এলে গজখানা পেটে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকত ও।

দুর্দান্ত সাহসের জন্যে মালা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে।

মাঝে মাঝে বলত, কি ডেঞ্জারাস তুমি! একটু ভয় করে না?

হাসত দীপু। গজটা বার করে পাশে রাখত। প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে ছোরা।

ভয়ে ভয়ে ওটায় হাত দিয়ে মালা বলত,—এটা দিয়ে কাউকে মেরেছ?

দীপু হাসত। ওকে জড়িয়ে ধরে বলত,—অনেক।

এখনো দীপু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, মালা কেন তাকে এত বেশী পছন্দ করেছিল। বাপ ভাই থেকে শুরু করে সংসারের সব মানুষের কাছ থেকে ও গাল আর ঘৃণা পেয়েছে। ও নাকি নষ্ট, বদমাইস, খচ্চর, উল্লুক একটা আস্ত জানোয়ার। এমন একটা আস্ত জানোয়ারকে বনেদী দত্তবাড়ীর নিরঞ্জন দত্তর একমাত্র কন্যা মালা কি করে পছন্দ করেছিল, কি করে এত ভালবেসেছিল ও আজও ভেবে পায় না।

এমন একটা অসম্ভব ঘটনা কি করে ঘটল কে জানে!

মালা কি তবে ওর সঙ্গে শুধুমাত্র অভিনয় করেছিল? সাময়িক একটা মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিল?

অসম্ভব। হতে পারে না।

তা যদি হোত, তবে দীপুর এক কথায় মালা দশ হাজার টাকার গয়না নিয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারত না।

বেরিয়ে এসেছিল। দত্তবাড়ির ফুটফুটে আদুরে মেয়ে মালা এক অন্ধকার রাত্রে নিঃসঙ্কোচে ওর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। একটা মেয়ে কতখানি ভালবাসলে এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে বসতে পারে!

—আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

দীপু বিষণ্ণ মুখে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করত,—তুমি তো জান, আমি মারপিট করি, ছেনতাই মেনতাই করি। আমি খুব নষ্ট হয়ে গেছি।

মালা তখন একরোখা।—কে বললে? তোমার মত সাহস ক'টা ছেলের আছে শুনি, তোমার এই বুকে কত জোর, তোমার এই হাতে কত শক্তি!

দীপু শেষের দিকে যেন কিছুটা বিমর্ষ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। ও যেন বুঝতে পারছিল, কাজটা ভাল হচ্ছে না। একটা সত্যিকারের ভাল মেয়ের এমন করে সর্বনাশ করতে সে পারে না। তাকে ভালবেসে মেয়েটার কি লাভ হবে। সারাটা জীবন কষ্ট পাবে।

—কিন্তু আমার তো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। আমি ব্যবসা জানি না, চাকরি জানি না, মারপিট করতে জানি। তুমি বরং আমার কাছে আর এসো না।

মালা ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠেছে,—ও সব কথা বোল না। আমাকে বিয়ে করো। তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচব না। দেখবে শেষকালে একদিন আমি বিষ খাব।

সর্বনাশ! সত্যিই বিষ-টিষ খেয়ে মরবে নাকি? এমন ফুলের মত নরম মেয়েটা তার জন্যে মরে যাবে!

একটা ক্ষীণ মমতার জন্ম হচ্ছিল ওর মনে। মালার জন্যে মমতা অনুভব করছিল। মমতার স্বাদ ওর জীবনে এই প্রথম। জীবনে কখনো কারও জন্যে বিন্দুমাত্র মমতা অনুভব করেনি। একটা নিরীহ মানুষের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে অক্লেশে তারপর তার পেটে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ গোটা কতক লাথি মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছে। না, কোন নরম অনুভূতি ওর মনকে কখনো আচ্ছন্ন করেনি। তার ঘণ্টা খানেক পরে হাসতে হাসতে গিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছে।

এই তো সেদিন সিনেমার লাইনে দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল। লোকটার ডাঁট যদিও খুব অসহ্য লাগছিল, বেশী কিছু বলেনি দীপু। মনে মনে ভোম হয়ে রইল। লোকটার পাশে বসে ধীরে ধীরে তাকে জমিয়ে নিল। এ সব ঝুটঝামেলা করে কি লাভ দাদা। ভাই ভাই ঝগড়া করে কেন ফয়দা আছে বলুন। আসুন স্যার, সিগ্রেট খান। কোথা থাকেন? টালীগঞ্জ? আমি তো ও সাইডে যাব। চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

লোকটাকে পটিয়ে পটিয়ে টালীগঞ্জের রেললাইনের ধারে নিয়ে এসে ঝাঁ করে পকেট থেকে চার ইঞ্চি ফলার ছুরিখানা বার করে চোখের পলকে লোকটার পেটে বসিয়ে দিলে। বাপ্‌রে বাপ্—বলে লোকটা পড়ে গেল। ব্যস্, ওখান থেকে হাওয়া। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে চাপাকলে ছুরির রক্ত ধুয়ে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। খোসমেজাজে একটা চপ খেল, এক-কাপ চা খেল, তারপর শীষ দিতে দিতে পোড়ো ঘরে চলে গেল।

মমতা, দয়া, মায়া—কিস্‌সু নেই। ও সব কথাগুলো ওর জীবনের অভিধানে তখনো ছাপা হয়নি।

মালার জন্যে কেন যে এমন একটা অনুভূতি তার হচ্ছে সে জানে না।

কিছুদিন পরে মালার বাড়িতে একটা সন্দেহ করেছিল। কে নাকি এসে বলেছিল, মালা মাঝে মাঝে স্কুলে যায় না, মাঝে মাঝে স্কুল থেকে আগে বেরিয়ে যায়।

বাড়িতে হুকুম হোল, মালাকে রোজ গাড়ি করে স্কুলে পেঁছে দেয়া হবে। গাড়ি করে নিয়ে আসা হবে।

মালা জানাল দীপুকে, মুখ শুকনো করে বললে,—তবে কি করে আমাদের দেখা হবে?

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল দীপু। —ঠিক আছে। দেখে নোব। ভেব না তুমি।

দিন দুয়েক পরে মিত্তিরবাড়ির গাড়ির ড্রাইভার গোপাল কাঁড়ারকে রাস্তায় ধরলে একদিন দীপু,—আবে এই চাট্টিওলা, শোন এদিকে।

টেনে একটা গলির কাছে নিয়ে এসে একটা নেপালা বার করে ওর পেটে ঠেকিয়ে বললে,—চিনিস আমাকে?

গোপাল কাঁড়ার মোটা বেঁটে ড্রাইভার। চোখ কপালে তুলে বললে,—আমি কি করেছি বাবাজী।

গোপাল কাঁড়ারের গলার দোফেট্টা মালাটা ধরে টেনে দাঁতে দাঁত চেপে বললে দীপু,—শোন, আমি যা বলব শুনবি, না শুনলে তোর জান খতম করে হাতে রক্ত মাখব। দেখবি যেন বিলা হয় না।

—যা বলবে তাই করব বাবাজী। ওই ছুরিটা সরাও।

নেপালার ডগায় ওর ভুঁড়িতে একটা খোঁচা মেরে দীপু চলে গেল।

পরদিন মালা স্কুল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল, দীপু উঠে ওর পাশে বসল।

গোপাল ড্রাইভার ভয়ে ভয়ে তাকাল ওর দিকে। —চোপ, কেউ জানতে না পারে। বুঝলি? গাড়ি নিয়ে টালীগঞ্জ ডিপো ছাড়িয়ে চ'।

গোপাল ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাল। সোজা টালীগঞ্জ ডিপোর দিকে চলল।

ড্রাইভারকে শুনিয়ে দীপু মালাকে বলল,—দেখো, এ শালা যদি কাউকে কিছু বলে আমায় বলে দেবে। ওর জান খতম করে দোব।

মালা মুচকি হেসে ওর হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললে,—না, না, মেরো না ওকে। ও অনেক দিনের লোক আমাদের। কাউকে কিছু বোল না গোপাল, তোমায় দশ টাকা বকশিশ করব।

একদিকে বখ্‌শিশের লোভ আর একদিকে জান যাবার ভয়। গোপাল সেই থেকে আর কোন কথা বলেনি। দীপু প্রায় প্রত্যেক দিন স্কুলের পরে মালাকে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক বেড়িয়েছে। গোপাল ড্রাইভার ঘুণাক্ষরে কাউকে কিছু বলেনি।

কিন্তু দীপু কোনমতেই মালার এই ভয়ঙ্কর ভালবাসাকে মেনে নিতে পারছিল না। বার বার ওর মনে হচ্ছিল, এমন সুন্দর মেয়েটাকে নষ্ট করে কি লাভ হবে তার। যদিও মালাকে না দেখে থাকা ওর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মালার কথা, মালার স্পর্শের জন্যে দিনরাত উন্মুখ হয়ে থাকতে হচ্ছিল, তবু এটা ওর খুব ভাল লাগছিল না। ও বেশ বুঝতে পারছিল, ও যেন এক অদৃশ্য জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছিল। তেমন করে আর ঘুমোতে পারে না, তেমন করে আর হাসতে পারে না। নিজেকে যেন খানিকটা বন্ধ বন্ধ মনে হয়। নিজেরই অজ্ঞাতে এ জাল থেকে দীপু মুক্ত হতে চায়।

কিন্তু উপায় নেই। মালা যেন ওর চতুর্দিকে এক কুয়াশার বিস্তার করেছে। ও আচ্ছন্ন হয়ে বন্ধ জন্তুর বার বার সেই কুয়াশার নেশায় ছুটে ছুটে যায়। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

এ অবস্থা বেশী দিন থাকতে পারে না। থাকলেও না।

(ক্রমশঃ)

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

কল্যাণকুমার বসু

(৪)

আজ কি বলত অতুল? দাদা এসে সেদিন বললে।

ও বললে, আমার মনে আছে আজ তপসির * অন্নপ্রাসন।

দাদা বললে, আমাদের কিছু দিতে হবে আমাদের ছোট বোনটিকে। একেবারে নতুন কিছু। কি দেয়া যায় বলত। অতুল তুমি একটা কবিতা লিখে দাও ওর নামে তাহলে খুব ভাল হয়।

দাদা বলল, কবিতা লিখতে। নগেন্দ্র কতদিন বলেছে আমার কবিতা লেখা দেখে তোর কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় নারে অতুল? ইস্কুলের মাঠে তাদের ছোট্ট আসরে কতদিন নগেন্দ্র কবিতা পড়েছে উৎসাহভরে। পড়তে-পড়তে থেমে পড়ে বলেছে, আমার কবিতা কেমন লাগছে রে তোদের। অতুল তোকে কবিতা শুনিয়ে আমার বেশ ভাল লাগে তুই কেন কবিতা লিখিস না অতুল?

বিনয়মামা মাঝে-মাঝে বিনুক বসন্তেন কাগজে পেন্সিলে আঁকিবুকি কেটে অতুলের টেবিলে রেখে বলতেন, এই যে ছবি এঁকে দিলুম এই ছবি দেখে কবিতা লিখতে দেখি 'কবি'। একটা সুন্দর 'বাঁধানো খাতা' উপহার দিয়েছিল বিনয়মামা।

অতুল রাগ করে বলত, বিনয়মামা তোমার ছবি তুমি নিয়ে যাও। তোমার খাতা তুমি ফেরৎ নাও, আমি কবিতা লিখতে পারব না, আমায় কবি বলবে না।

বিনয়মামা খাতা ফেরৎ নিত না হাসত।

কিন্তু কবিতা লেখার প্রেরণা ওর ঠাকুরদা। ঠাকুরদা গান লিখতেন, কবিতা লিখতেন ওদের সকলকে ডেকে পাশে বসিয়ে নিজেই গান গাইতেন। ঠাকুরদা কত হোলির গান লিখেছেন।

আজ সকালে মনটা যেন কেমন অন্য-রকম হয়েছিল। বিনয়মামার দেয়া খাতাটা পড়ার বইয়ের মাঝে লুকিয়ে রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সে। হঠাৎ ছেলে-বেলার মিত্রাতায়ের বাড়ির বাগানে দাদার সঙ্গে প্রজাপতি ধরার কথা মনে পড়ে গেল। আরো মনে পড়ল বাবার সৌম্য-শান্ত মুখ-খানির কথা। রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগে বাবার সেই স্তব-গান যেন শুনতে পেল সে। এখানে এসে অনেকদিন ভোরের সূর্যকে প্রণাম করা হয় নি......

কার যেন পায়ের শব্দ হল অতুল তাড়াতাড়ি কবিতার খাতা রেখে এদিক-ওদিক মুখ তুলে চাইল আর তখনই দেখল জানলার বাইরে বকুলগাছের ডালে ছোট্ট হলুদ-লাল পাখিটা পুচ্ছ নাচাচ্ছে মনের আনন্দে। অতুলের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ডেকে উঠল—যেন কথা বলে উঠল। দু-একবার ডাকলো তারপর বকুলগাছের ডাল থেকে উড়ে চলে গেল। অতুল ছোট্ট পাখিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর কবিতার খাতা টেনে নিল বুকের কাছে, কলম কালিতে ডুবিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করল। যতক্ষণ না বিনয়মামা এসেছিল ততক্ষণ লিখেছিল। বিনয়মামা ও দাদা এসে পড়ার ঘরে দাঁড়াতেই অতুল খাতা লুকিয়ে নিল, ততক্ষণে বিনয়মামার হাতে কবিতার খাতাখানা চলে গেছে অতুল লজ্জিতবোধ করল।

বিনয়মামা সুর করে পড়তে শুরু করল—

"তোমার উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ
সব বন্ধন টুটিয়া।
আজি মন চায়, অঞ্জলি লয়ে
ধায় তার প্রাণে ছুটিয়া
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে
স্নেহের সাগর মথিয়া
সে নামের সাথে তব পুত নাম
থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়া এবে করগো পালিত
তব স্নেহকোলে রাখিয়া
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ি,
প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে
যায় না কুসুম ঝরিয়া।
রাখিও নাথ, তোমার বক্ষে
সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখ প্রভু দেখ চালাইয়ো এবে
তুমি নিজ হাতে ধরিয়া,
মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো
পরাণ পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু
সকলের প্রেমে বাঁচিয়া
সে জীবনে প্রভু, যেন কোথা কভু
না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

পড়া শেষ করে বিনয়মামা বললে, বাঃ অতুল চমৎকার কবিতা লিখেছিস। তারপর আবার পড়ল তপসি ছোট্ট বোনটির অন্ন-প্রাসন উপলক্ষে রচিত অতুলদাদা ও সত্য-দাদার স্নেহের উপহার।

পড়া শেষ করে কবিতার খাতাখানি হাতে খুলিয়ে বিনয়মামা বললে, যাই কবিতাটা সকলকে দেখিয়ে আসি।

অতুল বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও বিনয়-মামা খাতাটা দিয়ে যাও তোমার পায়ে পড়ি বিনয়মামা কবিতাটা দেখিও না কাউকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিনয়মামার সঙ্গে ছুটে পারা কি সহজ কথা।

একদিন বিনয়মামা এসে খবর দিল, অতুল সত্য শুনেছিস...তোরা যে ইস্কুলে পড়তিস দুর্গাবাবুর ইস্কুল সেই ইস্কুল উঠে গেছে।...

অমনি অতুলের মনে পড়ল দুর্গাবাবুর ইস্কুলের কথা, আমাদের সেই মডেল হাই-স্কুল! মনে পড়ল মডেল ইস্কুলের বন্ধুদের মনা-মতা-ভুতো বোসেদের আর সেই সব দিনগুলো। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক দুর্গাদাসবাবুরা উপাসনা শেষে আসতে দেরী করতেন ইস্কুলে কি গোলমালই না হত তখন। মনা, মতা, ভুতো শেষ পর্যন্ত পড়েছিল সেই ইস্কুলেই। অতুল বলল, জান বিনয়মামা দুর্গাদাসবাবু বড় ভাল লোক...আমরা তাঁর ক্লাসে বড় গোলমাল করতাম এখন সত্যি দুঃখ হয়।

বিনয়মামা বললে, আরো একটা খবর আছে জানিস—পানিদার সঙ্গে দুর্গাদাস-বাবুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

অতুল বললে তাই বুঝি, বিনোদমণি আমাদের মেজমাসী হবেন?

এর কিছুদিন পরে পানিমামার সঙ্গে বিয়ে হল বিনোদমণির। তারপর কিছুদিনের মধ্যে পানিমামা কলকাতা শহরে চাকরী নিয়ে চলে গেলেন। কলকাতায় চলে গেলেন বড়-মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। হঠাৎ দাদুও সকলকে কাঁদিয়ে এক রাত্রে বিদায় নিলেন। লক্ষ্মীর বাজারের বাড়িটা ধীরে ধীরে একেবারে শূন্য হয়ে গেল। অতুল সত্যরা সে বছর এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিল।

কলকাতা যাওয়ার আগে প্রায়ই পানি-মামা বলতেন, অতুলবাবু, বড় হয়ে তোমার কি হওয়ার ইচ্ছে?

অতুল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এক-বার হেসে মামার কথার উত্তর দিত কিন্তু তার আগে মাকে প্রশ্ন করত, বলত মা বড় হয়ে আমি কি হলে তুমি খুশী হও।

মা বলতেন, আমি চাই তুমি উকিল-ব্যারিস্টার হও। তোমাকে ব্যারিস্টার হতে হবে অতুল। আমি তোমাকে বিলেত পাঠাব। ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমাকে সেরা মানুষ হতে হবে।

পানিমামা বলতেন, তোমার অতুল গায়ক হবে, ছবি আঁকিয়ে হবে—দেখছ না অতুলের চোখদুটো।

মা আপন ভাইয়ের কথায় হেসে বলতেন, আমার মনের ইচ্ছে তুমি রাখবে না?

অতুল হেসে বলত, মা আমি ব্যারি-স্টারও হবো কবিও হবো। তোমার ছেলে

---

* তপসি (ইলা সেন) স্যার কে জি গুপ্তর ছোট্ট মেয়ে।

গ্রামের পথ ফটো : অসিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইচ্ছা আমি রাখবো না এ কখনো হতে পরে!

বাবাকে হারাবার পর মা-ই একাধারে বাবা ও মা। মাকে এক মুহূর্তে ভুলে থাকা এক দুঃসহ অতুলের পক্ষে। তবু বড়মামার সঙ্গে মা একদিন কলকাতায় চলে গেলেন। ভাই-বোনদের ঢাকায় মামার বাড়িতে রেখে। সত্যি মা-র শরীরটা বড় খারাপ হয়েছিল। বাবা মারা যাবার পর মার শরীরটা ভেঙে পড়েছে। মা শরীরটাকে মোটেই যত্ন করেন নি, খাওয়া-দাওয়া না করে, দিনরাত সংসারের কাজ করে। শরীরটায় আর কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি। দিদিমা কতদিন বলেছেন হেম তোমায় সংসারে এত কাজ না করলেও চলবে —আমার বাড়িতে কাজ করার জন্যে লোকের অভাব কিছু নেই।

মা বলেছেন, তবু আমার ত কিছু সময় কাটে।

দিদিমা বলেছেন, তোমার কাজ তোমার অতুলকে এবং তোমার মেয়েদের মানুষ করা। এদের মানুষ করাই তোমার জীবনের ব্রত।

কিন্তু মায়ের শরীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার বললেন, ঢাকা থেকে অন্য কোথাও যাওয়া উচিত। চেঞ্জে।

বড়মামা লিখলেন, হেমন্ত আমার কাছে চলে আয় কলকাতায়। বড়মামা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। অতুল আর তার বোনেরা ঢাকাতেই রইল—পড়াশোনা বন্ধ করে ত আর তাদের যাওয়া চলে না। তাই ভাই-বোনরা সকলেই ঢাকাতেই রইল।

আবার মা ফিরে এলেন। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে পনের দিন পরেই। কি করে তোদের চোখের আড়ালে রেখে থাকি বল—মা বলেন, আমার ঢাকাই অনেক ভাল স্বাস্থ্য-কর। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর কটা এখানে পার করেও মায়ের শরীর এবং স্বাস্থ্য ঢাকায় ভালো থাকছিল না। আবার তাঁকে ফিরে যেতে হল দাদার কাছে চিকিৎসার জন্যে। আবার ফিরে এলেন। আবার তাঁকে চলে যেতে হল। এই বোধহয় শেষ যাওয়া।

পরীক্ষা তখন হয়ে গেছে। অতুলের অফুরন্ত অবসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বিনয়মামা দাদার সঙ্গে রোজ যেত ও। উপাসনা সভায় উপাসনা সঙ্গীত গাইতে হোত তাকে। মাঝে মাঝে ও নিজে কয়েকটি প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়ে গান গাইত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে উপাসনা শেষে ফিরে এল সেদিন বিনয়, সত্য এবং অতুল। কিন্তু এ কোথায় এল অতুলরা—চারিদিকে সকলে শোকে মুহ্যমান। দিদিমা কাঁদছেন, মাসিরা-মামীমারা কাঁদছেন তার বোনেরা কাঁদছে......তবে কি তার মা আর ইহজগতে নেই, অতুল তাড়াতাড়ি ছুটে গেল দিদিমার কাছে......দিদিমা আমার মা, আমার মা কেমন......আছেন!

দিদিমা কোন কথা বললেন না। দিদিমার হাতে একটা চিঠি ধরা ছিল। বিনয়মামা দিদিমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পাঠ করলেন। অতুলের বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের চিঠি। তিনি লিখেছেন হেমন্তশশী দ্বিতীয়বার দুর্গামোহন দাসকে বিবাহ করেছেন।

সংবাদ এতই মর্মান্তিক অতুল ফুঁপিয়ে কাঁদল। ......কে যেন বললে, তোমার মা......তোমার মা নয়! কে যেন কানে কানে বললে তোমার মা পর হয়ে গেছেন; তোমাদের তিনি আর ভালোবাসেন না......আসলে তাঁর ভালোবাসা মিথ্যে! চোখ দুটি জল ভরে এল। অতুল ছুটতে ছুটতে পড়ার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। ততক্ষণে ওর চোখের জল বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোতে দুকূল ছাপিয়ে গেল।

• • •

অতুল তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। তুমি ভালোভাবে পাশ করবে আমি জানি। তোমার বোধহয় ছুটি হয়ে গেছে এখন। তুমি যতশীঘ্র পার হিরণ-কিরণ ছুটকিকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে কলকাতায় চলে এসো। তোমাদের জন্যে পথ চেয়ে থাকবো। ভালোবাসা নিও। মা।

সেদিন ছোট্ট একখানি চিঠি কলকাতা থেকে মা লিখেছিলেন। ছোট বোন ছুটকি এসে দিয়ে গেল হাতে বললে, দাদা আমরা মা-র কাছে যাব। হিরণ - কিরণ দুই বোন বললে দাদা আমরাও মা-র কাছে যাব। মা-কে কতদিন দেখিনি। বড় মন কেমন করছে। অতুল বললে তোমরা যাও আমি যাব না। তোমাদের আমি মার কাছে পেঁাছে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।*

অশ্রুপূর্ণ চোখে বিদায় নিল ও খেলার সাথী সত্যদাদা বিনয়মামা সুবলামাসিদের কাছ থেকে। মামার বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্ক শেষ হল। বোনেদের নিয়ে কলকাতার পথে রওয়ানা হয়ে গেল অতুল। স্টীমারে পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দ এসে ট্রেন ধরে ওরা। যতদূর ট্রেন এগিয়ে চলে তত যেন মায়ায় টানে ঢাকা। মনে পড়ে যায় লক্ষ্মীর বাজারের কৈশোরের সেই দিনগুলি ......আরো দূরে শৈশবের মির তারের বাসা-বাড়ি। আরো অস্পষ্ট মনে পড়ে বাবা-মার সঙ্গে বজরায় পদ্মা পার হয়ে দেশের বাড়িতে যাওয়া কিরণপ্রভা তখনও হয়নি হিরণটা এই এতটুকুন। কত কি ঘটনা। চলন্ত রেলগাড়ীর জানলায় যেন ভেসে ওঠে আর মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। কৈশোর শেষ করে অতুলও এগিয়ে চলেছে: ওর লক্ষ সামনে বহুদূরে চলতে হবে।

(ক্রমশঃ)

---

* "ইংরেজী ১৮৯০ জুন মাসের এক রবিবার আমি অতুল বিনয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখি সেখানে সকলেই শোকে মুহ্যমান। শোকাতুরা অতুলের মাতামহী ঠাকুরাণী। অনুসন্ধানে জানিলাম যে খুড়িমাতা ঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে পরিণীতা হইয়াছেন। এ সংবাদ কে জি গুপ্ত লিখিয়াছেন কলিকাতা হইতে। এ সংবাদে সকলেই বিচলিত। হিরণ প্রভৃতি কাঁদিতেছে। আমরা খুব কাঁদিতে লাগিলাম। আমি তো নিজেকে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন মনে করিতে লাগিলাম। অতুলের মাতুলালয়ের সঙ্গে আমার সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। আমি এখন দাঁড়াই কোথা? সেদিনকার আঘাত আমার খুবই প্রাণে লাগিয়েছিল। সে শোকাবহ দৃশ্য আজও আমার স্মরণ হয়। অতুল ভগ্নিদের লইয়া কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় চলিয়া গেল। ভগ্নিরা গেল মায়ের কাছে। অতুল রহিল মাতুল পানীবাবুর কাছে। তখন কে, জি, গুপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার আর পানীবাবু, চীফ ইনকাম ট্যাক্স এসেসার কলিকাতার।" সত্যপ্রসাদ সেনের ডাইরি থেকে।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ডঃ ত্রিগুণা সেন আলোচনারত।

রাজস্থানে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা

গত ১৩ই মার্চ থেকে রাজস্থানে যে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছিল তা অবশেষে প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং রাজ্যপাল শ্রীহুকুম সিংহের নির্দেশে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়া সেখানে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

রাজস্থানের বিধানসভায় কোন্ পক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করেছেন, সেটা স্থির করার জন্য এবার রাজ্যপাল হুকুম সিং যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার দ্বিতীয় কোন নজীর সম্ভবতঃ আর নেই। এর আগে রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দ যখন সেখানে কংগ্রেস দলকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিতে চেয়েছিলেন তখন জয়পুর শহরে হাঙ্গামা বেধে গিয়েছিল এবং সংযুক্ত দল অর্থাৎ কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষ রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন।

এইবার রাজ্যপাল শ্রীহুকুম সিং গোড়া বেঁধে কাজে নেমেছিলেন। তিনি কংগ্রেস ও সংযুক্ত দলের কাছে তাঁদের সমর্থকদের নামের তালিকা চেয়ে পাঠালেন। সংযুক্ত দলের নেতা ডুঙ্গারপুরের মহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিং একটি সীল-করা খামে তাঁর পক্ষের সদস্যদের নামের তালিকা রাজ্যপালের কাছে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্ত দিলেন যে, এই খাম খোলার আগে রাজ্যপালকে কথা দিতে হবে যে, দুই পক্ষের শক্তি যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়ার সুপারিশ করে তিনি তাঁর বিবেচনায় যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহবান জানাবেন—যাতে কংগ্রেস তাঁদের পক্ষের সদস্যদের ভাঙিয়ে নেবার সময় না পায়। রাজ্যপাল এই সর্ত মেনে নিলেন। কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়ার কাছ থেকেও তালিকা এল।

রাজভবনে দুটি খাম খোলা হল। দেখা গেল, সংযুক্ত দলের তালিকায় আছে ১০১টি নাম, কংগ্রেস দলের তালিকায় ৯৪টি। উভয় তালিকায় আছে এমন নাম ১৩টি। রাজ্যপাল এই তের জনের ঠিকানা সংগ্রহ করলেন, প্রত্যেকের বাড়ীতে রাজভবন থেকে গাড়ী পাঠালেন এবং একজন একজন করে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি যখন কথা বলছিলেন তখন সংযুক্ত দলের কাছ থেকে নূতন আরও ৮টি নাম এল। এই আটজনের মধ্যে একজনের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেল না। বাকী সাতজনের কাছে রাজভবনের গাড়ী গেল। সেই রাত্রে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত রাজ্যপাল মোট ২০ জন বিধানসভা সদস্যের ইন্টারভিউ নিলেন। যে সদস্যকে সেদিন খুঁজে পাওয়া গেল না তিনি পরদিন সকালে রাজভবনে এসে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। সবগুলি ইন্টারভিউয়ের শেষে রাজ্যপাল হুকুম সিং ঘোষণা করলেন, তিনি এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, যে একুশজন সদস্যের নাম দুই তালিকাতেই ছিল তাঁদের সকলেই কংগ্রেসের সমর্থক। তাঁরা সকলেই শুধু যে তাঁকে মুখে একথা বলে গেছেন তা নয়, লিখিতভাবেও তাঁকে একথা জানিয়ে গেছেন।

অর্থাৎ রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, সংযুক্ত দলের সমর্থকের সংখ্যা ৮৮ আর কংগ্রেস দলের সমর্থকদের সংখ্যা ৯৪। অর্থাৎ রাজস্থান বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৬ জনের। রাজস্থান বিধান-সভায় কংগ্রেস দলের টিকেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন ৮৭ জন। পরে যাঁরা কংগ্রেস দলকে সমর্থন জানিয়েছে তাঁদের মধ্যে ৩জন বিদ্রোহী কংগ্রেসী, ২জন স্বতন্ত্র দলের ও দুইজন জনসঙ্ঘের টিকেটে নির্বাচিত সদস্য।

২৫শে এপ্রিল তারিখে রাজ্যপাল বিশেষ বার্তাবহের মারফৎ রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পাঠালেন যে, রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি হয়েছে। ২৬শে এপ্রিল তারিখে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণান প্রায় দেড় মাসব্যাপী দিল্লীর শাসন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং তার
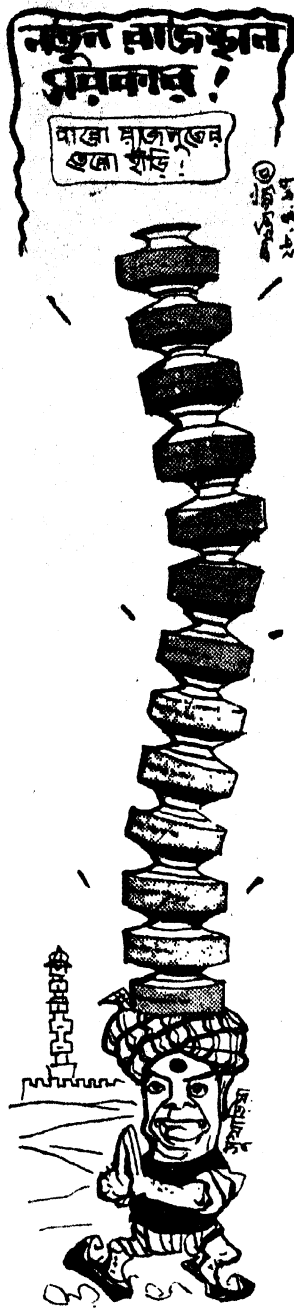
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীসুখাড়িয়াকে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করালেন। ২৯শে এপ্রিল তারিখে সুখাড়িয়া মন্ত্রিসভার ৮জন মন্ত্রী ও তিনজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলের শক্তি যাচাই করার জন্য এত আটঘাট বাঁধা সত্ত্বেও রাজ্যপাল হুকুম সিং অবশ্য সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি। সংযুক্ত দলের নেতা মহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিং বলেছেন যে, সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সেখানে সংযুক্ত দলের একজন প্রতিনিধিকে থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। সংযুক্ত দলের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র দলের দুজন ও জনসংঘের একজন সদস্যকে "জোর করে" কংগ্রেস দলে টেনে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল শ্রীহুকুম সিং বলেছেন যে, তিনি সদস্যদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা নির্ভয়ে তাঁদের মত দিতে পারেন। কেউ যদি জোর-জুলুমের আশংকা করেন তাহলে তিনি তাঁকে রাজভবনে আশ্রয় দিতেও প্রস্তুত আছেন।

সংযুক্ত দলের শ্রীকুম্ভরাম আর্য বলেছেন যে, তাঁরা প্রথম সুযোগেই কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী সুখাড়িয়া বলেছেন যে, ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালে কংগ্রেস দল রাজস্থানে একজনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছেন। এবার ছয়জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেসের সরকার চালাতে না পারার কোন কারণ নেই। অন্য পক্ষ থেকে দল ভেঙ্গে এসে কোন সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিলে বিরোধী পক্ষ "ছি ছি" করেন; কিন্তু তাঁরা উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানায় কংগ্রেসত্যাগীদের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

শ্রীসুখাড়িয়ার মন্ত্রিসভা গঠনে রাজস্থানে একটা পর্ব শেষ হল, পরবর্তী পর্বে কি আছে কে জানে?

আদেনয়ারের মৃত্যু

৯১ বৎসর বয়সে পশ্চিম জার্মানীর ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর ডাঃ কনরাড আদেনয়ারের মৃত্যুতে পৃথিবী একজন জ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিককে ও পশ্চিম জার্মানী তার আধুনিক স্রষ্টাকে হারাল।

পশ্চিম জার্মানীর কলোন শহরের ভূতপূর্ব মেয়র, হিটলারের আমলে কয়েকবার জেলখাটা এই ক্যাথলিক নেতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন রণবিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানীর নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ৭০ বৎসর পার হয়ে গেছে। পরবর্তী ১৫ বৎসরে তিনি শুধু পশ্চিম জার্মানীর এই নূতন সাধারণতন্ত্রকে একটা স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান নি, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর দাবীকে তিনি বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ ইয়োরোপের আদর্শকেও বাস্তবের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন। হিটলারের আমলে জার্মানীতে ইহুদীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল সেটা প্রধানতঃ তাঁরই নেতৃত্বে আজকের পশ্চিম জার্মানী স্বীকার করে নিয়েছে এবং ইহুদীদের প্রতি সেই অবিচারের ঋণ শোধ করার নীতি গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ডাঃ আদেনয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে। কেননা, ডাঃ আদেনয়ারের নেতৃত্বেই যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানী পশ্চিমী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং প্রেসিডেন্ট দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্স যখন ঐক্যবদ্ধ ইয়োরোপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে তখনও এই ডাঃ আদেনয়ারই পশ্চিম জার্মানীকে দৃঢ়ভাবে আমেরিকার সঙ্গে বেঁধে রাখেন।

নববর্ষ সাহিত্য-বাসর

যদিও বাণিজ্য-বোধ বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে আছে, তবুও বলা যেতে পারে স্বাধীন ভারতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস বন্ধ্যাত্বের ইতিহাস নয়। গত বিশ বছরে বাংলা কবিতার বহু বন্ধনমুক্তি ঘটেছে, ছোটগল্পের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে এবং নাট্য-রচনায় নব-যুগের সূচনা হয়েছে।'—কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এবারের নববর্ষ সাহিত্য বাসরে বিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা কালে শ্রীঅন্নদাশংকর রায় একথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবারের সাহিত্য বাসরে উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম ও গবেষণাকার্যের স্বীকৃতি হিসাবে সাতজনকে পুরস্কৃত করা হয়। শ্রীঅশোককুমার সরকার স্বাগত ভাষণ দেন।

অমৃতবাজার, যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদীপক চৌধুরী। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীবিমল কর। এই চারটি পুরস্কার প্রতিটি ১০০০ টাকার। মৌচাক পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায় এবং উল্টোরথ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীরাম বসু ও মন্মথ রায়। এই তিনটি পুরস্কার প্রতিটি পাঁচশ টাকার।

পুরস্কার বিতরণের পর (পেছনে বামদিক থেকে) সর্বশ্রী অশোককুমার সরকার, তুষারকান্তি ঘোষ, বিমল কর, রাম বসু, (উপবিষ্ট বামদিক থেকে) মন্মথ রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায় এবং দীপক চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে। —ফটো : অমৃত

সভাপতির ভাষণে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকাসমূহ দেশবাসীর পক্ষে সাহিত্য-সেবীদের কাজের স্বীকৃতি জানিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। তিনি বলেন, কবিতার সম্পর্কে মন্তব্য না করে বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্য বিদেশী সাহিত্যের তুলনায় পেছিয়ে নেই। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সাহিত্য-সেবীদের স্বীকৃতি দেবার এ-ধরনের উদ্যমকে স্বাগত জানিয়ে অন্যান্য সংবাদপত্র, পুস্তক প্রকাশন সংস্থাকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান।

ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। চিত্রের বামদিকে উপবিষ্ট শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার এবং শ্রীঅশোককুমার সরকার —ফটো : অমৃত

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, নববর্ষের এ প্রীতি সম্মেলনে স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

নববর্ষের এই প্রীতি সম্মিলনীকে আরও ব্যাপক করবার আবেদন জানিয়ে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর সাহিত্য-কর্ম ও গবেষণা কার্যের জন্য যে-কটি স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার দেওয়া হয়, তার টাকার অংকটা বড় নয়, মর্যাদাই বড় কথা। পুরোধা সাহিত্যিকরা এইসব পুরস্কারের বিচারক। কাজেই যোগ্য ব্যক্তিদেরই প্রতি বছর এভাবে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। সাহিত্যের সংগে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদেরও এইরূপ পুরস্কার দেওয়া সংগত বলে তিনি মনে করেন। প্রসংগত শ্রীঘোষ দেশ-বিদেশের সাহিত্য পুরস্কারের বিষয় উল্লেখ করেন এবং এই বে-সরকারী পুরস্কার বিতরণী উৎসবকে বাংলা নব-বর্ষের শ্রেষ্ঠ মিলনোৎসব বলে অভিহিত করেন। উপসংহারে অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন সংস্থাকে এইভাবে সাহিত্য-সেবী, গবেষক ও শিল্পীদের উৎসাহিত করতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমতী সুমিত্রা সেন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

—সাংবাদিক

প্রেক্ষাগৃহে

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চিড়িয়াখানা চিত্রে শৈলেন মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার ও শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়।

[illegible] কথা ঃ

বাঙলা চলচ্চিত্র প্রযোজকের সমস্যা ঃ

সারাভারত চলচ্চিত্রসমিতি সম্মেলনের শেষের দিনের শেষতম অধিবেশনে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কে কে শাহ্ ভাষণদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন ঃ [illegible], বাঙলা ছবি অত্যন্ত সংকটের ভিতর দিয়ে চলেছে। এই সংবাদে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ বাঙলা ছবিকেই যদি দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে (ভারতের অপরাপর ভাষায় গঠিত) অন্য ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি চিন্তা করতে পারছি না। তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর মুখ থেকে বাঙলা ছবি সম্বন্ধে এত বড়ো সার্টিফিকেট পেয়ে অধিবেশনে উপস্থিত সকল বাঙালীরই মন গর্বে ভরে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। তার ওপর তিনি যখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট সত্যজিৎ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমার ভাগ্য ভালো যে, আমি সত্যজিৎ রায়ের মতো একজনকে আমার কাছে পেয়েছি; তাঁর ওপর আমার বিশ্বাস আছে, তিনি আমার দুর্ভাবনার অংশীদার হবেন।... আমি কি আশা করতে পারি না, ছবির সাফল্যের জন্যে জনপ্রিয় অভিনেতার চেয়ে ভালো চিত্রনাট্যের প্রয়োজনীয়তা ঢের বেশী, এই কথা আবার করে প্রমাণ করে তিনি আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার পথ দেখাবেন? তখন তো সারা প্রেক্ষাগৃহ আনন্দে উত্তরোল হয়ে উঠল।

কিন্তু এতে বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রযোজকদের সমস্যার কোনো সমাধান হল কি? শ্রীশাহ বাঙলাদেশের সংস্কৃতির প্রশংসা করলেন, বর্তমান ভারতের সংস্কৃতির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি গাইলেন, কবির শতবার্ষিকী স্মৃতিমন্দির রবীন্দ্র-সদনে এই প্রথমবার আগমনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন বললেন, কিন্তু বাঙলা ছবির সামনে ক্রমেই যে বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে, তার থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে একটিও কথা বললেন না। অনুমান করা কঠিন নয় যে, কোনো সমাধানের কথা চট করে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বললেন না। বাঙলা ছবির প্রযোজকদের পর্যায়ক্রমিক বহুবিধ সমস্যার একটিও কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর — সে তথ্য ও বেতারমন্ত্রীই হোক, বা অর্থমন্ত্রী কিংবা বাণিজ্যমন্ত্রীই হোক,—কারুরই দ্বারা সমাধান হতে পারে বলে আমরা মনে করি না। তাঁরা বাঙলা ছবির প্রযোজকদের দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু তার বেশী নয়। অবশ্য অর্থমন্ত্রী প্রযোজকদের করভার লাঘবের কিছুটা ব্যবস্থা করলেও করতে পারেন। কিন্তু [illegible] ধার্য করবার ব্যবস্থার পরিবর্তন [illegible] ভারতীয় ভিত্তিতেই হতে পারে, বিশেষ-

করে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের জন্যে কিছু করা সম্ভব নয়।

টাকার আন্তর্জাতিক মূল্যে হ্রাসের ফলে চলচ্চিত্র প্রযোজনাক্ষেপে অত্যাবশ্যক কাঁচা ফিল্ম এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় অংশের মূল্য শতকরা প্রায় ষাটভাগ বেড়ে গেছে। ঐ সংগেই বেড়েছে স্টুডিওভাড়া, রসায়নাগারের পরিস্ফুটনাদির ব্যয়, শিল্পী ও কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক, এমন কি ছবি প্রোজেক্সনেরও ব্যয়। অর্থাৎ প্রযোজনার প্রতিটি পর্যায়ে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র ব্যয়ের শতকরা অন্তত পঁচিশ ভাগ বর্ধিত হারে খরচ করতে হচ্ছে। এবং এর থেকে পরিত্রাণ লাভের কোনো আশু উপায় নেই।

কিন্তু শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী ব্যয় করে ছবি নির্মাণের পরে প্রযোজকদের ছবির মুক্তি নিয়ে যে অভাবিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার থেকে অব্যাহতি পাবার কোনো পথ অচিরেই আবিষ্কৃত না হলে আমাদের আশংকা হচ্ছে, বাঙলাদেশে বাঙলা ছবি তৈরী হওয়া অন্তত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে! পূর্ব-পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে বাঙলা ছবির প্রদর্শনীক্ষেত্র যে অর্ধেকেরও বেশী সংকুচিত হয়ে গেছে, একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আজ পশ্চিমবংগের লাগোয়া রাজ্যগুলিতে ভোজপুরী, অসমীয়, ওড়িয়া প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় বেশী করে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে; ফলে ঐসব রাজ্যে বাঙলা ছবির বাজার ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু তার চেয়েও যা ভয়ের কথা, তা হচ্ছে পশ্চিমবংগেরই বিভিন্ন শহরে—যেখানেই চিত্রগৃহ আছে, সেখানেই

মেহেরবান চিত্রে সুনীল দত্ত

বাঙলা ছবির চাহিদা দ্রুত কমে আসছে। একথা শুধু কলকারখানা বা কয়লাখনি অঞ্চলে স্থাপিত চিত্রগৃহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, সম্পূর্ণভাবে বাঙালী-অধ্যুসিত এলাকাস্থিত চিত্রগৃহ সম্পর্কেও সত্য। দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, খাস কলকাতা শহরের বনেদী বাঙালীপাড়া শ্যামবাজার অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে বাঙালী মালিকের অধীন মিত্রা (পূর্বতন চিত্রা) ও দর্পণা নিয়মিতভাবে হিন্দী ছবি দেখিয়ে চলেছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি বহু মফস্বল শহরের কথা বলতে পারি, সেখানকার বাঙালী অধিবাসীরা ধীরে ধীরে হিন্দী ছবির ভক্ত হয়ে উঠছে এবং বাঙলা ছবির প্রতি সমানভাবে ঔদাসীন্য প্রকাশ করছে। বাঙলা ছবির প্রতি বাঙালী দর্শকদের এই বিরূপতা শুধু যে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের পক্ষে আশংকার কথা,

তাই নয়; বাঙালীর বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিও এর ফলে নিদারুণভাবে বিপন্ন হতে চলেছে। বাঙলা ছবির প্রযোজকদের চরমতম বিপদ এসেছে ছবির মুক্তিসমস্যাকে ঘিরে। অনেকদিন ধরেই চলে আসছে, যে-কোনোও বাঙলা ছবি একযোগে কলকাতা শহরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলের তিনটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। এবং এই ধরনের ত্রয়ী চিত্রগৃহ হচ্ছে : (১) উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা; (২) রূপবাণী, অরুণা, ভারতী; (৩) মিনার, ছবিঘর, বিজলী এবং (৪) শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা। এ-ছাড়া রাধা ও পূর্ণ—এই দুটি চিত্রগৃহেও একযোগে বাঙলা ছবি মুক্তি পেয়ে থাকে। প্রাচী চিত্রগৃহটি কোনো কোনো সময়ে শেষোক্ত চিত্রগৃহ দুটির সঙ্গে যোগ দেয়। দেখা যাচ্ছে, গেল ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির সংখ্যা ২৭টি: বাঙলাভাষার সংলাপ মূল তামিল সংলাপের পরিবর্তে পাত্রপাত্রীদের মুখে বসানো হয়েছে, এমন আসলে তামিল ছবি 'পান্ডবের বনবাস'টিকে বাঙলা বলে ধরা যায় না। ১৯৬৫টিতে এই সংখ্যা ছিল ৩১টি (১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে এত কম বাঙলা ছবি আর কোনো বছরই মুক্তি পায়নি। এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে, যদি বাঙলা ছবির মুক্তির জন্যে চিত্রগৃহের সংখ্যা শীঘ্রই না বাড়ানো যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙলা ছবি আরও কম মুক্তিলাভের সুযোগ পাবে। এতো গেল এক-দিকের সমস্যা। অপর দিকের সমস্যা হচ্ছে আরও ঘোরালো। এবং এই সমস্যা সম্পর্কে কাগজেপত্রে কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়। শোনা যাচ্ছে, একটি বাঙলা ছবির মুক্তির চুক্তিপত্রে সই দেবার সময়ে ত্রয়ী চিত্রগৃহের মালিকদের প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা আগাম দিতে হচ্ছে কোনোওরকম রসিদ ছাড়াই। এই ব্যাপারটা বর্তমানে এমনই চালু হয়ে গেছে যে, শহরতলীর চিত্রগৃহের মালিকরাও এই দুষ্টপ্রথা দ্বারা সংক্রামিত হয়ে পড়েছেন এবং আজ বাঙলা ছবির প্রযোজককে তাঁর ছবির দশটি বা বারোটি প্রিন্ট একযোগে কলকাতার তিনটি এবং শহরতলীর সাতটি চিত্রগৃহে মুক্তি দেবার জন্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা 'কালোবাজারে' চালান করতে হচ্ছে। প্রযোজনার সময়েও তাঁকে বহু হাজার টাকা 'কালো'ভাবে দিতে হয় বড়ো বড়ো শিল্পী ও কুশলীদের। এই মারাত্মক অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে অনিচ্ছুকতাই যথার্থ ব্যবসায়ীভাবাপন্ন ধনীকে বাঙলা ছবির প্রযোজনায় অর্থ লগ্নী করতে বাধা দিচ্ছে। এবং এই অন্যায় প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে বাঙলা ছবির অপমৃত্যু অসম্ভব নয়।

চিত্রসমালোচনা

ছোটীসী মুলাকাৎ (হিন্দী) : আওয়ার মুভীজ-এর নিবেদন; ৪৫১৫·৩৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : উত্তমকুমার; পরিচালনা : আলো সরকার; কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী; চিত্রনাট্য : শচীন ভৌমিক; সংলাপ : আব্রার আল্ভি; সঙ্গীতপরিচালনা : শঙ্কর জয়কিষণ; গীতরচনা : শৈলেন্দ্র ও হসরৎ; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : কানাই দে; শব্দানুলেখন : ওয়ার্লিকার ও জাভেরী; সঙ্গীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক; নৃত্যপরিচালনা : গোপীকিষণ ও পি এল রাজ; শিল্প-নির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : ডি কে নায়েক; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, রাজেন্দ্র-

নাথ, তরুণ বসু, বদরীপ্রসাদ, সঞ্জীব, বৈজয়ন্তীমালা, শশিকলা, বীণা, প্রতিমা দেবী, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, পিণ্টু প্রভৃতি। ছায়ালোক (প্রাঃ) লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ২৮-এ এপ্রিল শুক্রবার থেকে জ্যোতি, ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী. বীণা, প্রাচী, পূর্ণশ্রী, নাজ এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

১৯৫৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে অগ্রদূত পরিচালিত এবং উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত "অগ্নিপরীক্ষা" ছবিটির মুক্তিলাভ বাঙলার চলচ্চিত্রেতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, এই ছবিটি থেকেই রোমান্টিক জুটী হিসেবে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং এ'দের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হয়। সেই "অগ্নি-পরীক্ষা"রই রঙীন হিন্দী রূপায়ণ "ছোটীসী মুলাকাৎ'-এর মুক্তির তারিখটি হিন্দী চিত্রজগতে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে হিন্দী ছবিতে নায়করূপে উত্তম-কুমারের প্রথম আত্মপ্রকাশের দিনরূপে। বাঙলার 'ম্যাটিনী আইডল' উত্তমকুমারকে ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত ছবির মাধ্যমে প্রায় জীবন্ত দেখতে পাবার আগ্রহ বাঙলার লক্ষ লক্ষ চিত্ররসিক দর্শকের মধ্যে যে অকল্পনীয় উন্মাদনার সঞ্চার করেছে, তা উত্তমকুমারের সম্মোহনী জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন।

প্রায় তেরো বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত "অগ্নিপরীক্ষা" চিত্রের কাহিনীটি আজকের দিনের পাঠককে নতুন ক'রে বিস্তারিতভাবে জানাবার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। তবু সংক্ষেপে কাহিনীটি হচ্ছে এই ঃ দুটি আধুনিক তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। এই প্রেমের পরিণতি স্বরূপ যখন উভয়ের মধ্যে বিবাহ প্রস্তাব পাকাপাকিভাবে ঘোষিত হয়, ঠিক তখনই প্রকাশ পায় যে, বাল্যকালে মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল এবং তার স্বামী আজও জীবিত। যে-অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে মেয়েটির আধুনিকা মা এতদিন ধ'রে তাঁর স্নেহের দুলালীকে মানুষ ক'রেছিলেন, সেই অবাঞ্ছিত অতীত তার সমস্ত কদর্যতাকে নিয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত হওয়ায় মেয়েটি মরমে ম'রে গেল এবং তার একান্ত প্রেমাস্পদের কাছ থেকে লজ্জা ঢাকবার জন্যে তার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। কিন্তু যখন সে দেখল, তাকে পাবার জন্যে ছেলেটি যে-কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে চায়, তখন সে নিজের প্রেমিককে কলঙ্ক থেকে মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে অতীতের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে ছুটে যায়; কিন্তু বাল্য-বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়ে যখন সে নিজেকে তার স্বামীর সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হয়, তখন বিস্ময় এবং আনন্দের সঙ্গে সে দেখে, তার স্বামী আর কেউ নয়, তারই একান্ত প্রার্থিত প্রেমাস্পদ।

একই কাহিনীর বাঙলা ও হিন্দী চলচ্চিত্র রূপের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়তে বাধ্য। এবং সেদিক দিয়ে বলব, 'ছোটীসী মুলাকাৎ"-এর চিত্রনাট্য থেকে "অগ্নিপরীক্ষা"র চিত্রনাট্য অনেক বেশী সুসংবদ্ধ ছিল। বাঙলাতে নায়িকার জীবনের অতীত ঘটনাটিকে কাহিনীর যথাস্থানে ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে বিবৃত করায় কাহিনীর নাট্য-কৌতূহল, সাসপেন্স ও চমৎকারিত্ব ঢের বেশী পরিস্ফুট এবং উপভোগ্য হয়েছিল। হিন্দী সংস্করণে বাল্যের ঘটনাকে ছবির আরম্ভ ভাগেই সোজা-সুজি দেখিয়ে দেওয়ায় ছবির সাসপেন্স অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে। ছবির গতি হয়েছে শ্লথ এবং পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে। এ-ছাড়া বর্তমান যুগের অধিকাংশ হিন্দী ছবির মতোই "ছোটীসী মুলাকাৎ-এর নায়ক অশোককে নায়িকা রূপার বিরক্তি উৎপাদন করে প্রায় উপরপড়া হয়ে অনেকখানি গায়ের জোরে তার প্রতি প্রেম নিবেদন করানোর দৃশ্যগুলি আমাদের চোখে অশোভন ঠেকেছে। মনে হয়, হিন্দী ছবির চিত্রনাট্য-

ছোটিসী মুলাকাত চিত্রের প্রিমিয়ার শোতে ছবির শিল্পী বীণা ও শশীকলা। ফটো : অমৃত

কারণ নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভদ্র, শোভন ও সুস্থভাবে প্রেমের সঞ্চার এবং উভয়ে ক্রমেই ঘনিষ্ট হওয়ার মধুর চিত্র কল্পনা করতেই ভুলে গেছেন।

বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর কাছে ছবির আবেদনকে তীব্র ও ব্যাপক করবার উদ্দেশ্যে "ছোটীসী মুলাকাৎ"কে দৃশ্য ও বর্ণ-সুষমায় এবং নৃত্য-গীতে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করা হয়েছে অত্যন্ত সার্থক ভাবেই। বোম্বাই ও মাদ্রাজে নির্মিত বৃহৎ হিন্দী ছবির ঝলমলে ভাব এই ছবিতেও পুরোপুরি বর্তমান।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় নায়ক অশোক বা রাজুরূপে উত্তমকুমারের কথা। বলা বাহুল্য, হিন্দী ছবির রাজ্যে এই প্রথম পদার্পণেই তিনি দর্শকবৃন্দকে জয় করেছেন। চলচ্চিত্রে বহু-দিন ধ'রে অভিনয় করবার ফলে যে আত্ম-প্রত্যয় ও ব্যক্তিত্ব তিনি লাভ করেছেন, তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি এই চিত্রে। তাঁর বাচন পরিষ্কার ও জড়তাশূন্য। এবং হিন্দী ছবির সার্থক নায়করূপে তিনি রূপা-রূপিণী বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে

আধুনিক টুইস্ট ও শেক্-নৃত্য করছেন অবলীলাক্রমে। হিন্দী চিত্রজগৎ উত্তমকুমারের মধ্যে একজন নতুন প্রাণবন্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়ককে পেয়ে ধন্য হল। নায়িকা রূপারূপে বৈজয়ন্তীমালা নাচে, গানে (যথাযথভাবে ভাব-অনুযায়ী ঠোঁট নাড়ায়) এবং অভিনয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। ঈর্ষা-কাতর ও প্রেমের-জন্যে লালায়িত সোনিয়াকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন শশিকলা। শাম্মি কাপুর (কুপার) বেশে রাজেন্দ্রনাথ ছবির হাল্কা দিকে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় তরুণ বসু (রূপার বাবা শঙ্কর চৌধুরী), বীণা (রূপার মা মিসেস মৈত্র চৌধুরী), বদরীপ্রসাদ (রায় সাহেব), প্রতিমা দেবী (রূপার ঠাকুরমা) এবং সুলোচনা চট্টোপাধ্যায় (অশোক বা রাজকুমার মা) স্ব-স্ব ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন। বালিকা রূপা রূপে পিঙ্কি অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর; তার বড়ো বড়ো চোখের চাহনি ভাব-প্রকাশক।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। বহির্দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণে কানাই দে অধিকাংশ স্থলেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পরিচালনাও খুবই চমৎকার। এতে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর দেখে খুশি হওয়া গেল। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। ছবির শিল্প-নির্দেশনার কাজের জন্য সুধেন্দু রায় অভিনন্দনযোগ্য। ছবিতে মোট সাতটি গান আছে। এর মধ্যে "মৎ যা, মৎ যা, মৎ যা," "তুসে দেখা, তুসে চাহা", "জীবন কে দো রাহে পে" প্রভৃতি গান সুন্দর সুর-সমৃদ্ধ। বিশেষ ক'রে মনে রাখবার মতন হয়েছে ছবির আবহ-সঙ্গীত। ছবির শব্দ-পুনর্যোজনা কি একটু বেশী চড়া পর্দায় করা হয়েছে? কিংবা বসুশ্রীর অপারেটাররা সেদিন একটু উঁচু ফেডারে ছবিটি চালিয়েছিলেন?

উত্তমকুমার প্রযোজিত আওয়ার মুভীর-এর "ছোটিসী মুলাকাৎ" উত্তমকুমার অভিনয়দীপ্ত হয়ে হিন্দী ছবির দর্শকসমাজকে মুগ্ধ করবে।

—নান্দীকর

কলকাতা

'গৃহদাহ' চিত্রের শুভমুক্তি

উত্তমকুমার ফিল্মসের 'গৃহদাহ' এ সপ্তাহের ৫ই মে থেকে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। বহুপঠিত শরৎচন্দ্রের এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল ও প্রদীপকুমার। ছায়াবাণী ছবিটির পরিবেশক।

শহরে "দুষ্টু প্রজাপতি"

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে "দুষ্টু প্রজাপতি" [illegible] কয়েকটি চিত্রগৃহে আত্মপ্রকাশ করছে। কৌশল চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত শশিত চিত্রমের মিষ্টি ছবি 'দুষ্টু প্রজাপতি'র প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—কিশোরকুমার, তনুজা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, তরুণকুমার, কানু রায়, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, নবাগতা সুরেখা পণ্ডিত, মাঃ শান্তনু এবং কেষ্ট মুখোপাধ্যায়। বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন—শ্যাম চক্রবর্তী। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-বহুল ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন—কিশোরকুমার, হেমন্ত-কন্যা রাণু মুখোপাধ্যায়, নীলিমা চট্টোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বাণীশ্রী পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

গৃহদাহ চিত্রে অচলা ও মহিমের ভূমিকায় সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র 'পাল্কি'

পুণম পিকচার্সের রঙিন ছবি 'পাল্কি' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। এ ছবির কাহিনী এবং সুরসৃষ্টি করেছেন সংগীত-পরিচালক নৌশাদ। মহেশ কাউল পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, রেহমান ও জনি ওয়াকার।

কাশ্মীর বহির্দৃশ্যে 'দুনিয়া'র চিত্রগ্রহণ

গত ২রা মে থেকে একপক্ষকালব্যাপী 'দুনিয়া' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক টি. প্রকাশ রাও কাশ্মীর অঞ্চলে। নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে এই বহির্দৃশ্যে উপস্থিত আছেন দেব আনন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা। অমরজিৎ প্রযোজিত এ ছবির সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুরকার শঙ্কর-জয়কিশণ।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

নতুন 'এইচ-এম-ভি' এবং কলাম্বিয়া রেকর্ড

গত ২৩শে এপ্রিলের সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সরোবরের রঙ্গমঞ্চে রেকর্ডের জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি জলসায় মিলিত হয়েছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এবং এ বছর রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে সব শিল্পীরা রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন তাঁরা একের পর একটি [illegible]

সমবেত সাংবাদিকবৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথি-বর্গকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

এ বছর যে সব রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে তার শিল্পী নির্বাচনে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের সমাবেশ লক্ষ্য করবার মত। যে সব গান প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে—**অনুপ গুহের** কণ্ঠে—"এ মোহ আবরণ" এবং "এখনো গেল না আঁধার"। **শ্যামল মিত্রের** কণ্ঠে—"কেন জাগে না জাগে না" এবং "আঁখিজল মুছাইলে, জননী"। **পূর্বা সিংহ** গেয়েছেন—"শুধু যাওয়া আসা" এবং "বসন্ত সে যায়তো হেসে"। **গীতা সেন** গেয়েছেন—"আকাশে দুই হাতে" এবং "তোমার হাতের রাখীখানি"। **শৈলেন দাস** নবাগতের মধ্যেও বিশিষ্ট। তিনি গেয়েছেন—"যখন তুমি বাঁধছিলে তার" এবং "ওরে জাগায়ো না"। সাগর সেন গেয়েছেন—"ঐ মালতীলতা দোলে" এবং "আমার নয়ন তব নয়নের"।

রবীন্দ্র সরোবরে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এবং কলাম্বিয়া রেকর্ডের শিল্পীরা জাতীয় সঙ্গীত গাইছেন।

সুমিত্রা সেন গেয়েছেন—"আমার সকল দুখের প্রদীপ" এবং "শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও"। **প্রতিমা মুখোপাধ্যায়** গেয়েছেন—"ডাকবো না ডাকবো না" এবং "পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে"। **অর্ঘ্য সেন** গেয়েছেন—"এবার অবগুণ্ঠন খোলো" এবং "আসা যাওয়ার পথের ধারে"। **দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়** গেয়েছেন—"ভরা থাক স্মৃতি সুধায়" এবং "যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা"। **পূরবী মুখোপাধ্যায়** গেয়েছেন—"তুমি তো সেই যাবেই চলে", এবং "পুষ্প বনে পুষ্প নাহি"। **বাণী ঠাকুর** গেয়েছেন—"সখি প্রতিদিন হায়" এবং "এই যে তোমার প্রেম"। **আরতি মুখোপাধ্যায়** গেয়েছেন—"আজি বার বার মুখর" এবং "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা"।

তিনখানি ই, পি, রেকর্ড বেরিয়েছে—**চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের** কণ্ঠে—"আমার পরাণ যাহা চায়", "সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে", "মন যে বলে চিনি চিনি" এবং "আকাশে আজ কোন্ চরণের"। **সুচিত্রা মিত্র** গেয়েছেন—"তুমি যে আমারে চাও," "একদিন চিনে নেবে তারে", "রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী", "কাঁদার সময় অল্প"। **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** গেয়েছেন—"ডেকো না আমারে ডেকো না," "হায় গো ব্যথার কথা যায় ডুবে যায় যায় গো", "ক্লান্ত বাঁশীর শেষ রাগিণীর" এবং "দীপ নিভে গেছে"।

এবারের রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডগুলি সত্যই মনোরম হয়েছে। কবিগুরুর জন্মদিনে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য।

এইচ-এম-ভি'র নতুন রেকর্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের একটি নতুন রেকর্ড (এন ৩৮০২)। গেয়েছেন তরুণ শিল্পী শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। গান দুটি লিখেছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও শ্রীঅতীন মজুমদার। সুর দিয়েছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। গানদুটি সুখশ্রাব্য।

গীতালির ২য় মাসিক সঙ্গীতাসর

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন 'গীতালির' ২য় মাসিক সঙ্গীত-আসর ৩বি, ললিত মিত্র লেন (কলিকাতা-৪) সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রথমে 'মুলতানী' রাগে কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী চায়না ব্যানার্জি, রাগ পরিবেশন ইনি সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। এঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন এঁর সঙ্গীত-গুরু অধ্যক্ষ পংকজ সাহা। তারপর 'মালকোশ রাগে কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমল বিশ্বাস। আসরের শেষ শিল্পী ছিলেন নিতাই রায়। ইনি সেতারে 'পিলু-বারোয়া' ও একটি 'ঠুংরী' বাজিয়ে সকলের প্রশংসা লাভ করেন। তবলায় ও হারমোনিয়ামে ছিলেন যথাক্রমে মন্মথ রায়, সুনীল সেনগুপ্ত ও শান্তা সাহা।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে 'গীতালির' তৃতীয় আসরটি কবিগুরুর জন্মোৎসব

শ্রীনিতাই রায়কে সেতার বাজাইতে দেখা যাইতেছে

হিসাবে পালিত হবে আগামী শনিবার ১৩ই মে। উদীয়মান কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিল্পীরা যে কোন শনি, রবি, সোম ও বুধবার বেলা ৪টা থেকে ৯টার মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় 'গীতালির' পরিকল্পনালয়ে যোগদানের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলাকুশলীদের সম্মেলন

গেল ২৬-এ এপ্রিল রবীন্দ্রসরোবরে পশ্চিমবঙ্গ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কলাকুশলীদের সম্মেলন হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে।

স্টকহোমে অনুষ্ঠিত ২৯তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ৬টি বিভাগের পুরস্কারসহ জাপানের খেলোয়াড়বৃন্দ

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিসে জাপান

টকহোমের সদ্য সমাপ্ত ২৯তম বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের সাফল্য এবং একাধিক বিভাগের লে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য এশিয়া মহা- পক্ষে যেমন গৌরবের কারণ, এশিয়ার অন্যান্য দেশের অনুপ্রেরণা ও পাথেয়। এই বিশ্ব প্রতি- গার তালিকায় ছিল মোট ৭টি —দুটি দলগত এবং পাঁচটি ব্যক্তিগত। এই সাতটি বিভাগেই যোগদান করে র্যন্ত ৬টি বিভাগের ফাইনালে তাব জয়ী হয়েছে—দলগত বিভাগের এবং ব্যক্তিগত বিভাগের চারটি একমাত্র পুরুষদের ডাবলস ব তারা যা উঠতে পারেনি। জাপান ট ব্যক্তিগত বিভাগে খেতাব জয়ী তার প্রতিটির ফাইনালে কেবল । খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতি- করেছিলেন। অর্থাৎ জাপান ছাড়া কান দেশের খেলোয়াড়দের মুখ ট বিভাগের ফাইনালে দেখতে ায়নি। একটি দেশের পক্ষে প্রতি- । একই আসরে এরকম নিরঙ্কুশ নজির অনন্য। পুরুষদের দলগত ফাইনালে (সোয়েথলিং কাপ) বিপক্ষে এসিয়া মহাদেশেরই দেশ উত্তর কোরিয়া খেলেছিল। দলগত বিভাগের ফাইনালে ান কাপ) জাপানের বিপক্ষে এবং পুরুষদের ডাবলসের

ফাইনালে সুইডেন এবং রাশিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে ইউরোপের মান বা রক্ষা করেছিল।

যুগোশ্লাভিয়াতে অনুষ্ঠিত ২৮তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজা- তন্ত্রী চীন এবং জাপানের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলোয়াড় কোন বিভাগেরই ফাইনালে ছিল না। ১৯৫২ সালের ১৯তম আসরে জাপানের ৪টি বিশ্ব খেতাব জয়ের সূত্রে এশিয়া মহা- দেশের যে জয়যাত্রার উদ্বোধন হয় ২৮তম আসরে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল—এই সময়ে যে ১১টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছে তার মোট ৭৭টি খেতাবের মধ্যে এশিয়া মহাদেশই ৫১টি খেতাব জয়ী হয়—জাপান ৩৯টি এবং প্রজাতন্ত্রী চীন ১২টি খেতাব। মনে রাখতে হবে রাজ- নৈতিক কারণে ১৯৫৩ সালে জাপান এবং ১৯৬৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীনের পক্ষে এই বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান সম্ভব হয়নি। নতুবা এশিয়ার পক্ষে বর্তমান খেতাব জয়ের সংখ্যা (৫১) নিঃসন্দেহে আরও বৃদ্ধি পেত।

জাপানের সাফল্য

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের প্রথম যোগদান ১৯৫২ সালে। ১৯৫৩ সালে তারা যোগদান করেনি। ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এ পর্যন্ত জাপান ১০টি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ৭০টি খেতাবের মধ্যে ৩৯টি খেতাব (শতকরা ৫৫·৫৫) জয়ী হয়েছে।

১৯৫২ : ৪টি খেতাব। দলগত বিভাগ : মার্শেল কোর্বিলোন কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের ডাবলস।

১৯৫৩ : জাপান রাজনৈতিক কারণে যোগদান করেনি।

১৯৫৪ : ৩টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৫ : ২টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৬ : ৪টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস।

১৯৫৭ : ৫টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস।

স্টকহোমে আয়োজিত ২৯তম বিশ্বটেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালে বিজয়িনী জাপানের সাচিকো মোরিসাওয়া (বামে) এবং সাঙ্কো হিরোতা (মাঝে)। ছবির ডানদিকে জাপানেরই নোরিকো ইয়ামানাকা (মিক্সড ডাবলসের বিজয়িনী)।

১৯৫৯ : ৬টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং কাপ (উপর্যুপরি ৫ বার—হাঙ্গেরী এবং জাপানের রেকর্ড) এবং কোর্বিলোন কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস।

১৯৬১ : ৩টি খেতাব। দলগত বিভাগ : কোর্বিলোন কাপ।
ব্যক্তিগত বিভাগ : পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস।

১৯৬৩ : ৪টি খেতাব। দলগত বিভাগ : কোর্বিলোন কাপ (উপর্যুপরি ৪ বার জয়লাভের সূত্রে প্রতিযোগিতায় রেকর্ড)। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস।

১৯৬৫ : ২টি খেতাব। ব্যক্তিগত বিভাগ : মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস।

১৯৬৭ : ৬টি খেতাব। দলগত বিভাগ : সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ। **ব্যক্তিগত বিভাগ :** পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্যাঙ্ককে আয়োজিত নবম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্রায়েল ৩-০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে এই জয়লাভের পুরস্কার 'পুত্রা' কাপ জয়ী হয়েছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতায় ইস্রায়েল এবং ব্রহ্মদেশ যুগ্মভাবে এই কাপ জয়ী হয়েছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় ব্রহ্মদেশ ৪-০ গোলে সিঙ্গাপুরকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ব্রহ্মদেশ এবারের এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ান এবং চারবারের এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার যুগ্ম-বিজয়ী।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ১৪টি দেশ যোগদান করে প্রথমে লীগ প্রথার খেলেছিল। লীগের খেলায় চারটি গ্রুপ ছিল এবং প্রতি গ্রুপের লীগ তালিকার প্রথম দুটি দলকে নিয়ে নক-আউট পর্যায়ের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল।

লীগ খেলার তালিকা

এ গ্রুপ : ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কোরিয়া এবং হংকং।

বি গ্রুপ : ইস্রায়েল, ভারতবর্ষ এবং মালয়েশিয়া।

সি গ্রুপ : থাইল্যান্ড, সিংহল এবং ফিলিপাইন।

ডি গ্রুপ : ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, জাপান এবং তাইওয়ান।

লীগ পর্যায়ের খেলা

এ গ্রুপ থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, বি গ্রুপ থেকে ইস্রায়েল এবং ভারতবর্ষ, সি গ্রুপ থেকে থাইল্যান্ড এবং সিংহল এবং ডি গ্রুপ থেকে ব্রহ্মদেশ এবং সিঙ্গাপুর লীগ পর্যায়ের খেলার শেষে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। বি গ্রুপের লীগের খেলায় ইস্রায়েল এবং ভারতবর্ষ সমান ৩ পয়েন্ট করে পেয়েছিল। দুই দেশই খেলায় অপরাজেয় ছিল। ভারতবর্ষ বনাম ইস্রায়েলের লীগের খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। প্রথমার্ধের খেলায় ভারতবর্ষ ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। লীগের অপর খেলায় ভারতবর্ষ ৪-১ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে।

কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী হয়েছিল ইস্রায়েল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর। ইন্দোনেশিয়া ৬—২ গোলে ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। অথচ প্রথমার্ধের খেলায় ২-১ গোলে ভারতবর্ষ অগ্রগামী ছিল।

সেমি-ফাইনাল

সেমি-ফাইনাল খেলায় ইস্রায়েল ১-০ গোলে ব্রহ্মদেশকে এবং ইন্দোনেশিয়া ১-০ গোলে সিঙ্গাপুরকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফুটবল প্রসঙ্গ

কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার মরসুম শুরু হয়ে গেছে। এই ফুটবল খেলাই কলকাতার খেলার আসরে প্রধান আকর্ষণ। তবে যা নিয়ে দর্শক-সাধারণের উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং মাতামাতি সীমাবন্ধ সেই প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে আগামী ৯ই মে। ঐদিন দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ খেলাও শুরু হবে। প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলের প্রথম খেলা পড়েছে কালীঘাটের বিপক্ষে ১৯শে মে এবং গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ১৬ই মে হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে।

আই এফ এ'র নূতন সভাপতি

আই এফ এ-র নবগঠিত পরিচালনা মণ্ডলীতে শ্রীস্নেহাংশু আচার্য বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে

১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর দল। ফটো : অমৃত

মবঙ্গ রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা গঠনের আই এফ এ-র সভাপতির আসনে ন অকংগ্রেসী নেতার নির্বাচন অনেকেই মান করেছিলেন। কারণ, এর আগে সী শাসনকালে একজন কংগ্রেস-নেতা তিন বছর ধরে আই এফ এ-র পতি ছিলেন। আই এফ এ-র বর্তমান পতি শ্রীযুক্ত আচার্য একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্টার এবং সুপরিচিত রাজ- জ্ঞ। তাছাড়া তিনি অতীত দিনের য়াড় এবং আই এফ এ-রই প্রাক্তন সভ্য। দেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে আচার্য রের অবদানও যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ খেলাধুলার মতিগতি সম্বন্ধে তিনি য ওয়াকিফহাল। সভাপতির গুরু- সম্পর্কে তিনি যে খুবই সচেতন, তা সভা-সমিতি এবং আলাপ-আলো- প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতি আই এফ এ-র সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী, কলকাতার পুলিশ ার এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল ক্লাবের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব- মে গৃহীত হয়েছে :

) মাঠে ফ্লাড-লাইটের ব্যবস্থায় সায়া র ফুটবল খেলার অনুশীলন এবং (২) ইডেন উদ্যানে গুরুত্বপূর্ণ খেলার ব্যবস্থা, (৩) শুধু ময়দানের টবল খেলা সীমাবদ্ধ না রেখে র উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য এবং ল ফুটবল খেলার ব্যবস্থা, (৪) ঠ দর্শকদের আসনের সম্প্রসারণ, (৫) আরও দুটি মাঠ ঘেরার ব্যবস্থা, (৬) ছোট ক্লাবগুলিকে বেশী সুযোগ-সুবিধা দান, (৭) বিভিন্ন মাঠে খেলার সময় আই এফ এ-র স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন, (৮) লাউডস্পীকারের সাহায্যে বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তাদের তরফ থেকে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আবেদন প্রচারের ব্যবস্থা এবং (৯) রেফারিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

১৯৬৬ সালের অর্জুন পুরস্কার

খেলাধুলায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে নিম্নলিখিত ১৪জন খেলোয়াড় ১৯৬৬ সালের অর্জুন পুরস্কার লাভের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই সরকারী অর্জুন পুরস্কারের সূচনা ১৯৬১ সালে।

এ্যাথলেটিকস : আজমীর সিং এবং ভুবনেশ্বর বড়ুয়া ; **ক্রিকেট :** চাঁদু বোরদে ; **ফুটবল :** ইউসুফ খাঁ ; **হকি :** ভি জে পিটার এবং গুরুবকস সিং; **হকির মহিলা বিভাগ :** সুনীতা পুরি ; **টেবল টেনিস :** শ্রীমতী উষা সুন্দররাজ ; **ভারোত্তোলন :** মোহনলাল ঘোষ ; **কুস্তি :** ভীম সিং ; **মুষ্টিযুদ্ধ :** হাওয়া সিং, গলফ : পি জে শেঠী, **টেনিস :** জয়দীপ মুখার্জি এবং **সাঁতার :** রিমা দত্ত।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

বি এন রেলওয়ে ১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ১৯টি খেলায় ৩৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৬৫-৬৭) অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে। তবুও তাদের যথেষ্ট আক্ষেপ থেকে গেছে। কারণ গতবারের রানার্স-আপ মোহন-বাগানের বিপক্ষে তাদের লীগের শেষ খেলাতেই তারা প্রথম পয়েন্ট নষ্ট করে এবং এ-বছরের লীগের খেলায় একমাত্র গোলটি খায়। গত চার বছরের রানার্স-আপ মোহন-বাগান এবারও রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছে, যদিও তাদের একটা খেলা এখনও বাকি।

লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৬৫	১৯	১৮	১	০	৬৫	৭	৩৭
১৯৬৬	১৯	১৭	২	০	৫৩	২	৩৬
১৯৬৭	১৯	১৮	১	০	৪১	১	৩৭

১৯৬৭ সালের লীগ তালিকা

প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বি এন আর	১৯	১৮	১	০	৪১	১	৩৭
মোহনবাগান	১৮	১৫	৩	০	৩৫	২	৩৩
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৪	৪	১	৪১	২	৩২

প্রদর্শনী ফুটবল

স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের সাহায্যার্থে আগামী, ৭ই মে, রবিবার রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল বনাম ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলের মধ্যে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতা ফুটবল লীগ খেলার অব্যবহিত পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী এই দল দুটির বহিরাগত খেলোয়াড়সহ পূর্ণশক্তির সমাবেশ খেলায় যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।
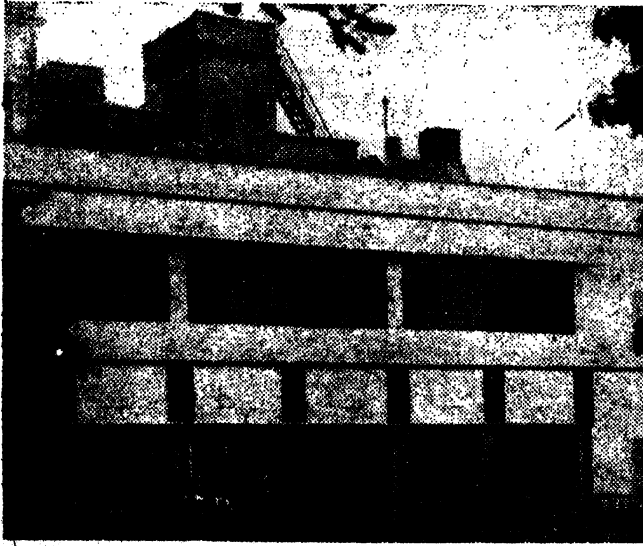
কুমারটুলী ক্লাবঃ নতুন ভবন

কমল ভট্টাচার্য

একটা খেলার ঘটনা বলেছিলেন কুমার-বাবু। কুমারটুলী ক্লাবের নতুন ক্লাব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে এসে মনে পড়ল সেই ঘটনা। কুমারবাবু হলেন অতীত দিনের মোহনবাগান ক্লাবের দিক্‌পাল ফুটবল খেলোয়াড় ইউ কুমার। গত বছর কুমারবাবুর সঙ্গে আকাশবাণীতে সেকালের স্মৃতি-কথা নিয়ে আলোচনাকালে ঘটনাটি বলেছিলেন। ১৯২০ সালের কথা। মোহনবাগানের সঙ্গে কুমারটুলী ক্লাবের খেলা। আই-এফ-এ শীল্ডের সেমি-ফাইনাল। কুমারবাবু বললেন—'জান কমল, ১৯১১ সালে মোহন-বাগান শীল্ড পাবার পর থেকে প্রত্যেক ক্লাবই আমাদের দলকে বেশ সমীহ করে চলতো। এমনকি বিদেশী দলগুলোও তেমন সুবিধে করতে পারত না। কিন্তু সেবার আমরা হারলাম কুমারটুলীর কাছে। বলতে গেলে কুমারটুলী হল আমাদের প্রতিবেশী। তাদের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমাদের নতুন কিছু জানবার ছিল না। তবুও আমরা অনেক চেষ্টা করেও জিততে পারিনি।"

বললাম, "কুমারবাবু, আপনাদের দলে তো তখন অনেক দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়!"

কুমারবাবু জোর গলায় বললেন—"সেই কথাই ত বলছিলাম। তখন গোষ্ঠ পালকে ডিঙ্গিয়ে গোল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তেমনি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল কুমারটুলীর ফরোয়ার্ড হুইটলীকে নিয়ে। যেমন তার ড্রিব্লিং, তেমনি নিখুঁত আক্রমণ রচনা।

একটু দ্বিধায় পড়ে বললাম—"কুমার-টুলী দলে একজন অবাঙালী খেলোয়াড়?"

কুমারবাবু সে কথায় বললেন—"হ্যাঁ, একজন অবাঙালী খেলোয়াড়। খেলার মধ্যে একবার গোষ্ঠ পাল হঠাৎ পা পিছলে একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। বললে বিশ্বাস করবে না, হুইটলী সেই সুযোগেই আমাদের বিরুদ্ধে গোল করে বসল।"

অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেই দেখলাম কুমার-টুলী ক্লাবের অতীত দিনের খেলোয়াড় তুলসী দত্তকে। দেখা হওয়া মাত্রই তিনি উপস্থিত প্রবীণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন। সেদিনের খেলার কথা বলতে গিয়ে কুমারবাবু সেই খেলার ঘটনার কথাটি উল্লেখ করলাম। ঘটনাটি শুনে তুলসীবাবু বললেন—"কথাটা খুব সত্যি। জান কমল, সেদিন মোহন-বাগানের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে আমাদের জান্ কবুল করতে হয়েছিল।" সত্যি ভাই, গোষ্ট পালকে ডিঙ্গিয়ে গোল করা বড় সোজা কথা ছিল না।" উপস্থিত প্রবীণ খেলোয়াড়েরা সে কথায় সায় দিলেন।

অনুষ্ঠান সুরু হতে তখনও বাকী। কাজেই আমাদের মজলিস জমাবার কিছুটা সুযোগও মিলে গেল। আলোচনার প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম। বললাম—"আচ্ছা তুলসীদা, এত সত্ত্বেও সেদিন কুমারটুলী ক্লাবের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি কেন?"

অনেক চিন্তা করে বললেন তুলসী দত্ত—"কি জান ভাই। আমাদের ক্লাবের ব্যবস্থা-পনায় তেমন বাঁধন ছিল না। সে সময়ে আমরা যে কিভাবে খেলতাম, সে কথা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।"

"সেই গল্প শুনবো বলেই ত' এত উৎসাহিত হয়ে পড়েছি।"

"কিন্তু রোগভোগের পর আমার যেন স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। অনেক কষ্ট করেও সে সব কথা বিশেষ মনে করতে পারি না।"

প্রসঙ্গটা বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। কেননা তুলসীবাবু সম্প্রতি দু'-দুবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডাক্তারের নিষেধের কথা মনে করেই বুঝি তিনি নিজেকে উতলা করতে চাইছেন না। তাই প্রসঙ্গটায় যাতে ভাঁটা না পড়ে তার দিকে দৃষ্টি রেখেই বললাম—"দেখুন তুলসীদা, আজকের আসরে আপনার কিছু বলার প্রয়োজন। কেননা কুমারটুলী ক্লাবের গৌরবময় ইতিহাসের কথা আপনার চেয়ে কেউ বেশী বলতে পারবে না।"

আমার কথায় কাজ হ'ল। অতি সন্ত-র্পণে, ধীরে ধীরে তুলসী দত্ত নিজের মনেই বলে চললেন—"একে ত' সব ঘরকুনো ছেলে। তার ওপর অভিভাবকদের কড়া শাসন। কাজেই খেলার নামে সবাই নাক সিঁটকাত। তবুও চেষ্টার অবধি ছিল না। কিন্তু ঐ যে বললাম, ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় তেমন বাঁধন ছিল না। সেদিক দিয়ে মোহনবাগান ক্লাব খুব হুঁসিয়ার ছিল। তাদের মধ্যে বিরাট আশা ছিল, ছিল নতুন নতুন পরিকল্পনা। সবকিছু বাঁচিয়ে তারা যে বাড়ির ছেলেদের মাঠে আনতে পারত, সেটা কম বড় কথা নয়।"

বললাম—"তারপর?"

"তারপর যা হয় তাই হলো।" তুলসী দত্ত যেন হতাশ সুরে বললেন—"কতক-গুলো উঠতি খেলোয়াড় ক্লাবের দুরবস্থা দেখে সরে পড়ল। মনে পড়ছে, কিছু অঘটনও ঘটেছিল। দু'-তিনজন দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের হঠাৎ মৃত্যু হল।"

"বলেন কি, এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

িকন্তু যে তুলসী দত্ত হাজার অনু-
াধেও মুখে তা কাটতেন না। সেদিন যেন
কে কথায় পেয়ে বসেছিল।

বললেন—"জান কমল, তা সত্ত্বেও আমরা
িছয়ে পড়িনি। লড় করে হাল ধরবার
ষ্টা করেছিলাম। কিন্তু হ'লে কি হবে।
ধু মিঠে কথায় চিড়ে ভেজে না কমল।
দর এমন কোন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না,
তে করে তাদের ধরে রাখতে পারি।"
াত্তর বছরের শীর্ণকায় বৃদ্ধ বুড়ো
দাড় নাড়িয়ে বললেন—"ঐ তৈরী হচ্ছে
র চলে যাচ্ছে।"

বললাম—"যাচ্ছিল কোথায়?"

"কেন? মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর
ায়ান্স ক্লাবে। তাইরে, বড় মাঠের তাঁবুর
া সেই তখন থেকেই। লুকোনো হাতে
ওঠে? কখনই না?"

"কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অস্তিত্ব
। ছিল না বলেই মনে হয়। তাই না?"

হঠাৎ যেন তুলসী দত্ত সম্বিত ফিরে
নন—বললেন— "আমাদের কুমারটুলী
ই খেলত ক্যালকাটা ইউনিয়ন ক্লাব।"

ক্লাবের কর্তৃপক্ষরাই ইস্টবেঙ্গল
র সূত্রপাত ঘটায়। বিখ্যাত ভাগ্যকুলের
বংশের তড়িৎ রায় ও বনয়ারীলাল
র অক্লান্ত পরিশ্রমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
ষ্ঠিত হয়। নগরপুরের সুরেশ
ীর অবদানও কিছু কম ছিল না।"

এক্ষণে অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'লো।
ক্লাব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতে এসে
ন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ক্লাব কর্তৃ-
পক্ষদের উদ্দেশ্য করে বললেন,—"আপনারা
সাধারণ ও পাঠ্যপুস্তকের পাঠাগার খুলে-
ছেন। স্বাস্থ্যচর্চার সুযোগ করে দিয়েছেন।
সবই গঠনমূলক কাজ।"………

বলাবাহুল্য এই ক্লাবের গঠনমূলক কাজ
দেখে মনে আশা জাগছে, হয়তো কুমারটুলী
ক্লাবের সেই গৌরবময় দিন আবার ফিরে
আসবে। এই ক্লাব ভবনটি গড়তে কম করে
পঁয়ষট্টি হাজার টাকা খরচ পড়েছে সে কথা
বললেন ক্লাবের সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লকান্তি
ঘোষ। তিনি একথাও বলেন যে, প্রায় কুড়ি
হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে ভারত সর-
কারের কাছ থেকে শ্রীঅশোক সেনের
উদ্যমে।

সবচেয়ে খুশী হলাম ক্লাবে জিমনা-
সিয়াম বিভাগ দেখে। আধুনিক যুগে
প্রকৃত খেলোয়াড় গড়তে শরীরচর্চার
প্রয়োজন খুব। আর তার জন্যে চাই সুষ্ঠু
ব্যবস্থা, শিক্ষার সামগ্রী এবং উপযুক্ত
শিক্ষক। যে কোন খেলাতেই এই শিক্ষার
প্রয়োজন। বেশ মনে পড়ে, রাশিয়ান ফুট-
বল দল এসেছিল ভারতীয় সফরে। তাদের
তরুণ খেলোয়াড়েরা খেলায় বিশেষ পাকা
পোক্ত ছিল না। কিন্তু যেটা ছিল সেটা হ'ল
শরীরের ফিট্‌নেস্। আর এই ফিট্‌নেস্
আসে জিমনাসিয়াম ক্লাব থেকেই। বিশ্বের
সব জায়গাতেই এই একই ব্যবস্থা। খেলার
আগে থাকে উপযুক্ত জিমনাসিয়াম শিক্ষা।

সেকালের দিনে এ-রকম ধরনের ব্যবস্থা
ছিল না বটে। কিন্তু তখনকার দিনের
অভিজ্ঞ কোচরা বিকল্প উপায়ে সে কাজ
সেরে নিতেন। স্যার দুখীরাম মজুমদারের
শিক্ষার কথা মনে পড়ল। বৃষ্টির জলে
আমাদের খেলোয়াড়দের খালি পায়ে খেলতে
হবে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী খিদ্রাট
দালানের ওপর সাবান-জল ছিটিয়ে খেলো-
য়াড়ের দৌড়-ঝাঁপের অভ্যাস করাতেন।

উত্তর কলকাতায় কলকাতার খেলো-
য়াড়দের ছিল আসল ঘাঁটি। কি ক্রিকেট, কি
ফুটবল। এমনকি হকির আসর নিয়ে নাড়া-
চাড়া সুরু করেছিল। একালের উত্তর কল-
কাতায় খেলার নামে সবাই তেমন হুঁসিয়ার
নয়। এই প্রসঙ্গে বললেন তুলসী দত্ত।
—"দ্যাখ কমল, এর কারণ আছে। কেননা,
খেলার বড় আসরগুলো অনুষ্ঠিত হ'ত
এইখানেই। অর্থাৎ স্থানীয় খেলোয়াড়দের
সীমানায়। শ্যাম স্কোয়ার, কুমারটুলী পার্ক,
আর দেশবন্ধু পার্কে বড় আসর এখন
কোথায়? যে ধরনের খেলা হয় তাতে ছেলে-
দের মন ভরে না। আর মাঠের আবহাওয়ার
অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এমনকি মাঠগুলো
খেলার উপযুক্ত নয়।"

"বুঝি তুলসীদা, এ অভাব আমাদেরই
পূরণ করতে হবে। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা
যদি তরুণ ছেলেদের শিক্ষা না দেয়, তা'হলে
সে কাজ বরাবরই অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই
নয় কি?"

বললেন তুলসী দত্ত,—"এ কথা মন্দ
বলনি। এস না আমরা একবার চেষ্টা করে
দেখি। সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে
তুলতে আমরা মনপ্রাণ সমর্পণ করি।"

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

কালন গুহ
(ইস্টবেঙ্গল)

শ পরম্পরায় আমরা ঘড়ির
া, যে ঘড়ির কাঁটা সামনে ঘোরে
র না পেছনেও, সে ঘড়ির আমরা
াম দেই না। ব্যক্তিগতভাবে আমি
মনি দাম দেই না ওঠানামা
 এই কলকাতা ফুটবল লীগের।'
নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলছিলেন
র নিজের বাড়ীতে বসে কালন
কলকাতা ময়দানে ফুটবলের আসরে
াজ এক গভীর প্রত্যাশাপূর্ণ নাম।
দ সাধনার সূত্রে কালন সম্প্রতি
থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন,
সোপানে রেখেছেন সুদৃঢ়
নিজের কথা বোলতে বোলতে
ওঠানামা বিবর্জিত লীগ ফুট-
প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলেন তিনি।
ধারণা এই ধরনের খেলায় নীচের
লি দলগুলির ভেতর 'লড়াইয়ের'
উঠে যায়। পরীক্ষায় যদি কোন
তংক না থাকে তবে ছাত্র যেমন
ল' পড়ে না, নামার ত্রাস না
থাকায়—খেলোয়াড়রাও তেমনি সর্বপ্রযত্নে
খেলে না। অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার পথে
শংকার কারণ নেই যেখানে সেখানে
ঢিলেঢালা ভাব আসবেই।'

কিন্তু সে প্রসঙ্গ রেখে কালনের
নিজের প্রসঙ্গেই আসা যাক। মাথায় পাঁচ
ফুট হবে কি হবে না, রোগা ডিগডিগে
চেহারা, ছোটখাটো মানুষটি দেখে মনেই
হয় না কালনের ভেতরে এতো প্রাণশক্তি
লুকিয়ে। ফুটবল সুরু করেছিলেন যাদব-
পুর তরুণ সংঘে, তারপর যাদবপুর
এসোসিয়েশনে শ্রীসুকুমার মজুমদারের
তত্ত্বাবধানে। কৈশোরের কথা স্মরণ করে
কালন বোল্লেন : 'প্রথম খেলতাম লেফট
আউটে; হঠাৎ একদিন আমাদের লেফট-
হাফ এলেন না, সুকুমারদা আমাকে
পেছিয়ে দিলেন, সেই পেছনেই আছি।
বি এন আর-এর শিবাজী আমাকে
'৫৯ সালে তৃতীয় ডিভিশনের সীমানা-

আগামী সংখ্যায়
সীতেশ দাস
(মোহনবাগান)
ও
তপন সাগরায়
(এরিয়ান)

কালন গুহ (ইস্টবেঙ্গল)

পুকুরের মাঝখানে নিয়ে গেলেন—সেখান থেকে প্রথম ডিভিসনের স্পোর্টিং ইউনিয়নে। একদিকে নবাগত, তারওপর এমন লিলিপুট চেহারা, নজরেই পড়লাম না কারও। প্রথম ডিভিসনে খেলা হোল না সেবার।' হাসতে হাসতে কালন বল্লেন। 'তারপর ইস্টবেঙ্গল জুনিয়রে (১৯৬২-৬৩)। সেবার ইস্টবেঙ্গল পাওয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৬৩ সালে কলকাতা কলেজ লীগে খেলার সূত্রে (সেবার আমি বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু) বাঘাদার নজরে পড়লাম। বাঘাদা নিয়ে তুললেন ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটের মাঠে—ইস্টার্ণ রেলের ডেরায়। বাঘাদার হাতে আমার সংস্কার ঘটলো। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত খেলেছি ইস্টার্ণ রেলে, লীগে, শীল্ডে, ডুরান্ড, রোভার্স, কলিঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপে। ১৯৬৩—৬৫—৬৬ সালে আন্তঃরেল ফুটবলে। এর আগে ১৯৬২ সালের স্কুল ক্রীড়ায় বাঙ্গলা রাজ্য ফুটবল দলের নেতৃত্বও করেছি ইন্দোরে। জাতীয় ফুটবলে (১৯৬৬—৬৭) প্রতিনিধিত্ব করেছি রেলওয়ের।'

ফুটবলকে কালন মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। সে ভালবাসা, আসক্তি যে কত গভীর তার ছোট্ট একটি নজীর দেখেছিলাম ১৯৬৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে সন্তোষ ট্রফি উপলক্ষে। সার্ভিসেসের সঙ্গে ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে আহত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠ ছাড়লেন তিনি। খেলার পর ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেখি নিজীব কালন স্ট্রেচারে শুয়ে। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা কোরলাম : 'খুব ব্যথা হচ্ছে কালন?' উত্তর—'না'; তবে?

'কাল যে আমি রেলের হয়ে খেলতে পারবো না বিপুলদা।' কালনের দুঃখ কোথায় বুঝতে দেরী হোল না। দেবার মত উত্তর কিছু খুঁজে পাইনে সেদিন তাই চুপ করে বেরিয়ে এসেছিলাম ড্রেসিং রুম থেকে। কালনের পোষাকী নাম—শ্রীমানবেন্দ্র গুহ। জন্ম ১৯৪২ সালে ময়মনসিংহে। আসল বাড়ী ঢাকা বিক্রমপুরের দেওঘরে। কথায় খাঁটি ঢাকার টান, সেই টান পুরো বজায় রেখেই কালন বল্লেন : 'ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের মস্তো নাম। জানি না সে দলের যোগ্য হবে কিনা।'

বিমান লাহিড়ী

(মোহনবাগান)

সাফ কথা, পরিশ্রমী, চটপটে। প্রতিদ্বন্দ্বীর রক্ষণব্যূহে ফাটল ধরাতে বিমান অত্যন্ত সপ্রতিভ।

আজকের মোহনবাগানের ইনসাইড বিমান লাহিড়ীকে একেবারে কাছ থেকে দেখলাম এ বছরের গোড়ার দিকে হায়দরাবাদে সন্তোষ ট্রফির আসরে। দেখেছি, আর মনে হয়েছে এমন নির্বিরোধী ছেলে ফুটবল খেলোয়াড় হোল কি করে? হৈ চৈ করে না, বোলচাল ছাড়ে না—বই মুখে নিয়ে বসে থাকে, এ যে একেবারে অন্য গোত্র!

অন্য গোত্রই বটে বিমান। দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে বিমান যে ফুটবলকে তাঁর একমাত্র আরাধ্য করে নিয়েছে সে পরিচয় পদে পদে। স্বল্পভাষণের বড়াই নেই এতোটুকু; নিজেকে সারা সময় গুটিয়েই রেখেছেন বিনয়ের বেড়া দিয়ে। কোলকাতা ময়দানে বিমান এসেছেন এই তো সেদিন—১৯৬৩ সালে। গায়ে তখন হাওড়া ইউনিয়নের জামা। পরের বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নে।

বিমান লাহিড়ী (মোহনবাগান)

বুদ্ধিদীপ্ত, পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াধারার সঙ্গে বিমান দ্রুত ওপরের তলায় উঠতে লাগলেন। স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে এরিয়ান এবং সেখান থেকে মোহনবাগানে। এই মোহনবাগান থেকেই তিনি গেছেন ব্যাংককে এবারের এশীয় যুব ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে।

হায়দরাবাদে একদিন কথায় কথায় বিমান জানিয়েছিলেন : 'বাপ ঠাকুর্দার বাড়ী পদ্মার ওপারে হোলেও সে জায়গা দেখিনি কখনও। জন্মেছি ১৯৪৬ সালে বীরভূমের মুরাই গ্রামে। ছোটবেলা থেকে ফুটবল আমায় টেনেছে।' বিমানের প্রথম ফুটবল গুরু জঙ্গীপুরের শ্রী[illegible] চ্যাটার্জি এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বহরমপুরের শ্রীরাধারমণ সাহা। স্কুলজীবন কেটেছে সোমড়া বাজার এবং গুসকুরায়। কলেজ জীবন বহরমপুরে। হেরম্ব শীল্ডে খেলেছেন কে এন কলেজের হয়ে। বিমানের তখন কতটুকু বয়সই বা। ১৯[illegible] থেকে ১৯৬২ সাল আন্তঃজেলা ফুটবলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মুর্শিদাবাদের। ১৯৬৩-৬৪ সালে হুগলীর। এই বছরই জুনিয়র বাঙ্গলা দল গঠনের ট্রায়ালে এবং টোকিও যুব ফুটবল উপলক্ষে ভারতীয় দল গঠনের ট্রায়ালে ডাক এসেছিল বিমানের।

খেলাধুলার মত লেখাপড়ায়ও ছেলে বিমান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক তিনি। কমপ্লেল এ জি বেঙ্গল। ফুটবল বিমানের নেশা, নেশা আর একটা আছে, সেটা হোল মাথা গুঁজে বই পড়া।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অঙ্গে-অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্য...
চলার ছন্দে অপরূপ ভঙ্গিমা...
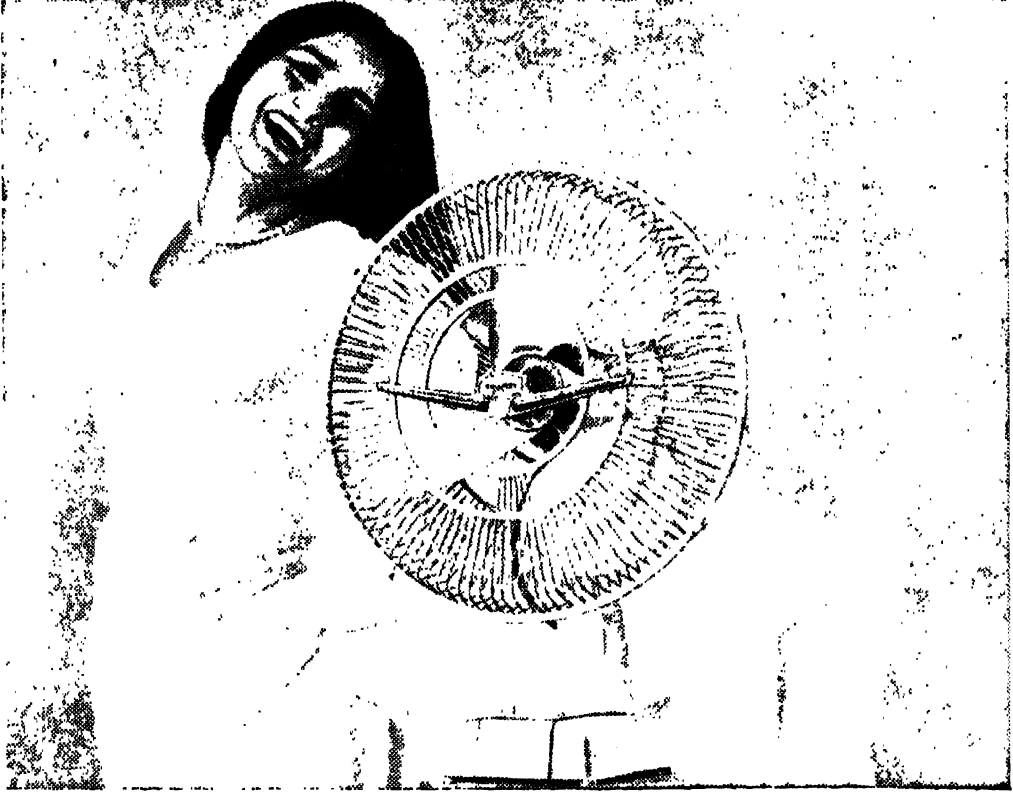
সুঠাম গড়ন···সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব···অতি সুন্দর—র‍্যালিফ্যান! যে কোন দিক থেকেই দেখতে চমৎকার, দিব্যি স্ট্রীমলাইনড্‌। শান্ত সহজ ছন্দে চলে···ঘরের সবাইকে শীতল রাখে। দিব্যি হাল্কা···বেশ সহজেই ঘোরানো-ফেরানো যায়···ওর বিশেষধরণের হাতলটি দিয়ে। অপরূপ স্টাইলের র‍্যালিফ্যান আপনি চাররকমের আরামের রঙে পাবেন—নীল, সবুজ, হাতীর দাঁতের মত সাদা ও ধূসর।
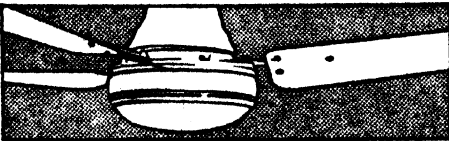
আপনাকে অনেক বেশী শীতল রাখে!

র‍্যালি গ্রুপের তৈরী

র‍্যালিফ্যানের রকমারিতে পাবেন সিলিং, পেডেস্টেল, দেয়ালে লাগাবার ও এক্সহস্ট ফ্যান।

র‍্যালিফ্যান সম্বন্ধে **বিনামূল্যে** বর্ণরঞ্জিত সচিত্র পুস্তিকার জন্য সঙ্গের কুপনটি ভ'রে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন—
র‍্যালিস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২১ র‍্যাভেলিন ষ্ট্রীট, বোম্বাই-১।
নাম ______________________
ঠিকানা ______________________
মনে রাখবেন, প্রত্যেক র‍্যালিফ্যানের জন্য তৈরীর খুঁত সম্পর্কে ২ বছরের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

Bensons 278 A-24 Ben.

বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পরিবেশক : **র‍্যালিজ ইণ্ডিয়া লিমিটেড**, ১৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, পোষ্ট বক্স ১৯৮, কলিকাতা। আসামের পরিবেশক : **কিলবার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড**, উলুবাড়ী, গৌহাটি ও তেজপুর।

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
পা গলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, নিমেষেই
বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী।
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মসৃণ চামড়া!
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে।
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও
চপ্পলের নতুন মনোজ্ঞ ফ্যাশান।
শ্যামল ৭.৯৫
Bata
অলোক ৯.৯৫
প্রীতীশ ৭.৯৫
এয়ারলাইট ১৮.৯৫
এয়ারকুল ১৬.৯৫
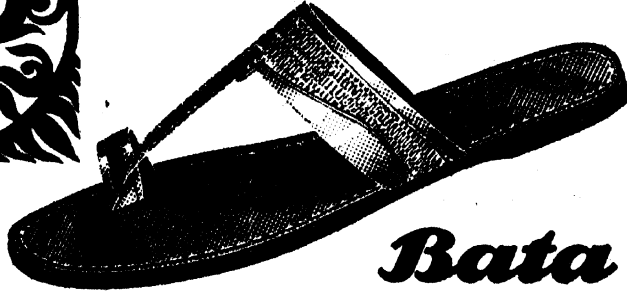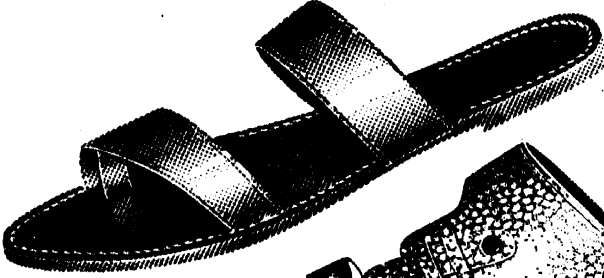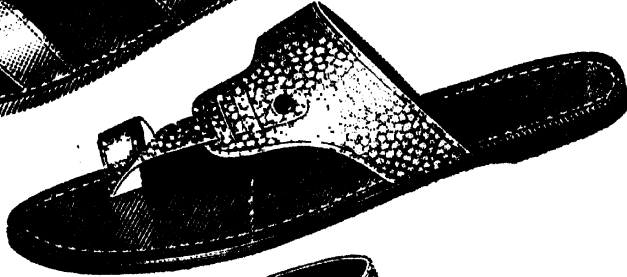
৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

২য় সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 12th May 1967. শুক্রবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

বিনা স্বদেশী ভাষা সম্পর্কে

বাংলা দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য নির্লিপ্ত ভাব দেখা যায়। ফ্রান্সে কি আমেরিকায় কি বই লেখা হচ্ছে তা নিয়ে প্রায়ই মাথা ঘামানো হয় কিন্তু আমাদের চারিপাশে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য নিয়ে কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে না বললেই চলে। সেজন্য 'অমৃতে' বিভিন্ন ভাষার ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে চর্চা বিশেষভাবে অভিনন্দনীয়। প্রতিবেশী সাহিত্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি তথ্যবহুল ও সুলিখিত।

শুধু ভারতীয় ভাষার সাহিত্য নয়, ইংরাজিতে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক বাংলা আলোচনাও অমৃতের পাতাতেই প্রথম দেখলাম। আমি ১৭ই ও ২৪শে চৈত্র প্রকাশিত অভয়ংকরের লেখা 'বিনা স্বদেশী ভাষা—' শীর্ষক লেখাটির কথা বলছি। আলোচকের সঙ্গে সবক্ষেত্রে আমার মতৈক্য না হলেও আমি স্বীকার করবো তাঁর মতামত সুচিন্তিত, এবং অধিকাংশ যুক্তিই অকাট্য। তবে কয়েকটি বিষয়ে আমার অভয়ংকরের সঙ্গে মতভেদ আছে। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সেগুলি আমি তাঁকে জানাতে চাইঃ—

১। প্রথমত, আমার মনে হয় ইংরাজিতে কবিতা লেখার সঙ্গে তথাকথিত সাহেবীয়ানার (অভয়ংকরের মতে "'টেরিলিনের শার্ট, ছুচলো প্যান্ট", "ডিনার, ডাইনিং টেবল, ফ্রিজ, ড্রিংক"এর) সত্যি কোন সম্পর্ক নেই। কবিতা লেখাটা নেহাতই একটা ফ্যাশন মাত্র নয়। যদি কেউ ফ্যাশন মনে করে ইংরাজীতে কবিতা লেখেন তবে তাঁর কবিতা সীরিয়স আলোচনার যোগ্য হতে পারে না। কলেজ ম্যাগাজিনের বাইরে তার কোন স্থান নেই এবং এই কবিতা নিয়ে বিতর্ক বা বিশ্লেষণ সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়।

২। ইংরাজিকে বিজাতীয় ভাষা বলে পরিত্যাগ করা যে যাবে না সে তো দেখাই যাচ্ছে। যতই না কেন স্টেশন ও খাম পোস্টকার্ডে ইংরাজি বর্জন হোক, ইংরাজি ভাষা ভারতবর্ষে কায়েমী স্থান গড়ে নিয়েছে, আর সে স্থান বিদেশী ভাষা হিসাবে নয় ভারতীয় ভাষা হিসাবেই। এটা সুখের কথা না দুঃখের কথা সে প্রশ্ন অবান্তর। কলকাতায় বসে অতটা বোঝা যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে যথেষ্ট লোক আছেন যাঁদের কাছে ইংরাজি ভাষাটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সহজ। তাঁরা সংখ্যালঘু সন্দেহ নাই—এবং তাঁদের অবস্থা অভয়ংকর যাকে বলেছেন "বেদনাদায়ক", হয়তো তাই, কিন্তু তাঁদের অস্তিত্বটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি এ'দের মধ্যে কেউ আত্মপ্রকাশের তাগিদে কবিতা লেখেন, তবে তিনি কি ভাষায় লিখবেন? তাছাড়া কোন ভাষায় লিখলে তিনি পরে 'মেজর' কবি হতে পারবেন এই ভেবে কি কেউ কবিতা লিখতে শুরু করেন?

৩। সেইজন্য আমি বলি কি, কবি কোন ভাষায় কবিতা লিখবেন না লিখবেন সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। এলিয়ট বা রাজারাও যে যাই বলুন, যে ভাষায় যাঁর আত্মপ্রকাশের সুবিধা তিনি সেই ভাষাতেই লিখবেন। তিনি সেই ভাষায় কেমন লিখলেন সেটাই বিচার্য, কেন লিখলেন সেটা নয়।

৪। আর বিচ্ছিন্নতা বা 'এলিয়েনেশনের' প্রশ্ন যদি ওঠে, কোন কবি বা শিল্পী আজকের যুগে এই অনুভবের শিকার নন সেটা ভেবে দেখা দরকার। এক এক সময় মনে হয় 'এলিয়েনেশন' বিংশ শতাব্দীর সব ভাষারই কবি, লেখক ও শিল্পীর সাধারণ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা ছাড়া বোধহয় সৃষ্টিই অসম্ভব।

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়,
পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি বিভাগ।

'বিহারের সাহিত্য' প্রসঙ্গে

৩১শে চৈত্র '৭৩র 'অমৃত'এ প্রতিবেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধ (রথীন্দ্রনাথ রায় লিখিত) 'বিহারের সাহিত্য' পড়লাম। প্রবন্ধটি সুলিখিত সন্দেহ নেই, তবে একস্থানে তিনি বলেছেন—চম্পারণ, শাহাবাদ, পালামৌ, রাঁচি প্রভৃতি জেলাগুলিতে ভোজপুরী ভাষা বলা হয়—একথা ঠিক নয়। বিহারের সর্বত্র দেখেছি খাঁটি হিন্দী যা উর্দুমিশ্রিত, বলেন খুব কম লোকেই। মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার প্রাধান্যই এখানে বেশী। ভোজপুরী সর্বত্রই কথিত হয়, এবং এই ভাষায় নাটক বা গানই শুধু জনপ্রিয় হয়নি, বিভিন্ন ছায়াচিত্রও সারা দেশে এনেছে আলোড়ন। আসলে ভোজপুরী ভাষা এসেছে উত্তরপ্রদেশের থেকে। বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে এই ভাষার প্রসার বেড়ে গেছে। বর্তমানে এই রাঁচিতেও এক-তৃতীয়াংশ লোক ভোজপুরী ভাষায় কথা বলে এবং আমরা তা বুঝতে পারি। এগুলো অবশ্য সবই মূল সংস্কৃত থেকে আমদানীকৃত মনে হয়। আমি নিজে ভোজপুরী লোক-সঙ্গীত গেয়ে বাঙালী ও অবাঙালীদের চমৎকৃত করেছিলাম। কারণ এর তাল, লয় সুরের একটা মাধুর্য আছে। তাই 'কলো-কুয়াল' ভাষা হিসেবে মৈথিলী বা ভোজ-পুরী এবং পাঠ্যপুস্তকে দেবনাগরী হিন্দীর প্রচলন এদিকে বেশী এবং এসব ভাষার সঙ্গে এ অঞ্চলের দেহাতী ভাষার কোনও মিল নেই, একে অন্যের ভাষা ঠিকমত বুঝতে পারে না।

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক ঃ 'কাঁচাহাতের কাগজ',
রাঁচি-৪।

সার্কুলার রেলওয়ে প্রসঙ্গে

'অমৃত' (৪র্থ খণ্ড) ৫০শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশিশির নিয়োগীর 'সার্কুলার রেলওয়ে' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে তৃপ্তি পেলাম। পরিবহন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রবন্ধ লেখকের সংগে আমিও সম্পূর্ণ একমত।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সংগে আমাদের নিত্যকার রোমাঞ্চময় জীবন-ধারার পরিবর্তন হ'তে থাকলেও নিত্য-নতুন সমস্যা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আদিম যুগে পরিবহন সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের আজকের ইঞ্জিনীয়ারদের মত অত ভাবতে হয়নি। কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকতে পারাটাকে তারা বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু আজ সেই পুরাতনের স্মৃতিকে আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না। পা ফেলতে হবে বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সমতালে। আগেকার দিনে জনসংখ্যাও ছিল নিতান্ত অল্প। আজ বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে জন-সংখ্যাও যেন পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই খাদ্যাভাব ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছে। এরপর আছে শিক্ষা, সংস্কৃতি। এগুলিরও সম্যক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে। পরিবহন সমস্যা আজ বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। স্থাপিত হয়েছে রেলপথ, বিমান, জলপথ। কিন্তু এত সব করেও যেন পরি-বহন সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। আমাদের ভারতবর্ষে রেলপথের ক্রমোন্নতির হিসাব সকলেই রাখেন আশা করি। বহু অর্থ ব্যয় করেও যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগের অন্ত নেই। আকাশ রেল, পাতাল রেল সম্পর্কে কিছুদিন আগে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখনও আশার ক্ষীণ আলোটুকু দেখতে পেলাম না। শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাই সার্কুলার রেলওয়ের কথা বলেছেন। তিনি যেভাবে মানচিত্র এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর প্রবন্ধে কলকাতার পরিবহন সমস্যার কথাই আলোচনা করেছেন। সি, এম, পি, ও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনেক ইঞ্জিনীয়ার এখনও এব্যাপারে বেশ ভাবছেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রবন্ধ তাঁদের চিন্তাধারার উপর আলোকপাত করবে।

হিল্লোল রায় 'আর্গোসি'
হিজলপুকুরিয়া, ২৪-পরগণা।

অমৃত

কবিপক্ষের প্রণতি

বৈশাখের খরতাপের মধ্যেই আমাদের উৎসব। এই মাসে জন্মেছিলেন আমাদের কবি। শুধু জন্মদিনে, সেই পঁচিশে বৈশাখেই, আমাদের প্রণাম শেষ হয় না। আমরা এই উৎসবের দিনটিকে বাড়িয়ে দিয়েছি, এখন তাই চলছে কবিপক্ষ। এই উৎসব আমাদের আনন্দের, আমাদের স্মৃতির এবং উজ্জীবনের। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা যত স্বপ্ন দেখি অন্য কোনো মানুষকে ঘিরে আর কোনো জাতির বোধ হয় এমন তন্ময়তা নেই। তিনি সকলকে ছাপিয়ে উঠেছেন। আমরা তাঁর সাহিত্য বা দর্শনের কতটা চর্চা করি তা নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সংশয় আজ আর নেই যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের আধুনিকতার সাক্ষাৎ প্রতিভূ। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের চিন্তা ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়েই আমাদের চিন্তার জড়ত্ব ঘুচেছে, সংস্কার দূর হয়েছে, মুক্তি ঘটেছে মনের।

আমরা ভাবপ্রবণ বলেই হয়তো তাঁর স্মরণ উৎসবে আবেগেরই প্রাধান্য থাকে। তিনি যে সুন্দরের কথা বলেছেন সেই চিরসুন্দরকেই আমরা তাঁর কবিতায় ও গানে আবাহন করে আনি। আমবা উৎসব করি দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য। তিনি আমাদের দুঃখ-দাহন, আমাদের আনন্দদাতা। এর প্রয়োজনই ছিল বেশি। অথচ তিনি নিজে তাঁর দীর্ঘজীবনে নানা দুঃখের মুখোমুখি হয়েছেন, নানাবিধ মূঢ় প্রতিবাদে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে খুব অল্পসময়েই দেখা গেছে বিচলিত হতে। অন্তত তাঁর রচনায় আমরা এক চিরজীবি ও চিরজয়ী যৌবনেরই অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি। আমাদের সমাজনীতি, আমাদের রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানাবিষয়েই তাঁর নিজস্ব অভিমতের সঙ্গে তৎকালীন ধারণার পুরোপুরি মিল ছিল না। তিনি শিক্ষাদাতারূপে সত্যপথ আমাদের দেখাতে চেয়েছেন। সব সময় তাঁর কথা আমরা বুঝি নি। আজ আমরা ভাবতেই পারি না, তাঁর কবিতারও বলশালী প্রতিবাদীপক্ষ ছিল। অনেকে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে, সমালোচনা করেছে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। আজকের যুগে সাহিত্যের যে রক্তশূন্য প্রশস্তি সমালোচনা বলে স্বীকৃত, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তা জোটে নি। তাঁর অনুভবের প্রগাঢ়তা নিয়ে অনেকসময় নির্মম আঘাত করা হয়েছে স্বয়ং কবিকেই। এর বেদনা তাঁর মনে কতখানি বেজেছিল তা আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কারণ তিনি তাঁর রচনায় সেই অধ্যায়ের কোনো চিহ্ন রেখে যান নি। সোনার তরীর মতো অসামান্য কবিতা, চার অধ্যায় কিম্বা ঘরে বাইরে উপন্যাস নিয়ে এই মহানুভব ব্যক্তিটিকে যে-সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা থেকে একটা বিষয়ই প্রমাণ হয় যে, আমাদের সাহিত্যসমালোচনার ধারা রবীন্দ্রনাথের সমান বয়স্ক হতে কত দেরী লাগল।

অথচ সারাজীবন তিনি আমাদের এই দেশ নিয়ে যেন মুগ্ধ-মাতাল হয়ে ছিলেন। এই দেশ, এই মাটি, এই আকাশ ও নদী জলধারার স্নিগ্ধতা তাঁর অস্তিত্বে এমনভাবে জড়িয়েছিল যে, দূরবিদেশে বসেও তিনি যখন কবিতা লিখেছেন, গদ্য লিখেছেন তাতে ছড়ানো থাকতো বাংলাদেশের শিউলি-বকুলের গন্ধ। এই একনিষ্ঠ তন্ময়তার জন্যও, আমরা বাঙালিরা, তাঁর কাছে এ জন্মের মতো ঋণী হয়ে থাকবো। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমরা যা জানি তা তিনি যতটুকু বলে গেছেন ততটুকুই। তিনি খুব বেশি বলেন নি নিজের বিষয়ে। যা বলেছেন তা সবটুকু রবীন্দ্রনাথ নয়। তাঁকে আরও বিশদভাবে খুঁজতে গেলে আমাদের কাব্য সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে হবে তাঁর চিঠিপত্রে, আলাপ-চারিতায়, ছবির বর্ণে ও রেখার ঋজু গাম্ভীর্যে। এইভাবেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে উৎসবের রবীন্দ্রনাথকে শুধু নয়, গোটা রবীন্দ্রনাথকে—এক মহাশিল্পী ও মহত্তর মানবসন্তানকে। এই আবিষ্কার যতদিন না সম্পূর্ণ হবে ততদিন আমাদের রবীন্দ্র-সন্ধান থাকবে অপূর্ণ। উৎসবের দীপালোকে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রতিমূর্তির দৃষ্টি হয়ে থাকবে নৈর্ব্যক্তিক।

আজকের যুগে আমরা কবিকে স্মরণ করি তাঁর মুক্তদৃষ্টি ও জীবনবোধের অসামান্যতার জন্য। তাঁর সাহিত্যের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছে এইভাবেই। শিল্পের সুক্ষ্ম বিচারের দায়িত্ব তার নয়, সে শুধু রবীন্দ্রনাথ নামক একজন মহাপুরুষকে উৎসবের অধিপতিরূপে লাভ করেই তুষ্ট থাকতে চায়। কিন্তু কবির আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয় না। আমরা পঁচিশে বৈশাখে সেই কবিকেই আনন্দের দীপালোকে এবং অশ্রুরেখায় স্মরণ করেছি। আনন্দ তাঁর আবির্ভাবের সত্য উপলব্ধির জন্য, অশ্রু তাঁর সামগ্রিকতার অনাবিষ্কারের জন্য।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পাঁচ)

সেদিন মণিবউদির বাড়ী থেকে ফিরতে কিছু রাত্রি হয়েছিল। সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। মণিবউদি সেদিন যে-বিচিত্র রূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চুম্বক এবং আমি হয়ে উঠেছিলাম লোহা।

গোটা বাড়ীটা সেদিন নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল এবং তাইই ছিল বাড়ীতে কেউ ছিল না। অমৃতদা দিল্লী গেছেন। দরজাতে লেখা আছে এ এল মুকুরজী—আউট, মিসেস মুকুরজী—আউট। এছাড়াও একটা ছোট কার্ডজাতীয় কাগজে লেখা আছে 'উ, ভেল্‌ হি'।

মিস্টারের সঙ্গে মিসেস বাইরে যান—এইটেই তাদের নিয়ম বলে সকলে জানলেও মিসেস মুকুরজী সব সময় যান না। কিন্তু ওই রকম লেখা থাকে। কমলকুমারও নেই। সে অর কাকার সঙ্গে গেছে।

বউদি ভিতরদিকের একটি ঘরে আমাকে বসিয়ে বলেছিলেন, বসুন—চা করতে বলি—খাবার আনি।

চা নয় কফি খেয়েছিলাম। মণিবউদি কফির পট নিয়ে বসেছিলেন। বেশ বড় পট, আমাকে প্রায় আড়াই কাপ খাইয়েছিলেন। নিজে দেড় কাপ।

অন্তরঙ্গতার জন্ম হয় জীবনে-জীবনে কাছে আসার মধ্যে। আড়াল নেই, বাধাবন্ধ নেই এমন যেখানে মিল বা কাছে আসা—সেখানেই অন্তরঙ্গতা বর্ষার বীজের মত উপ্ত হয়—পাতা মেলে ডালপালা মেলে ফুল ধরায় ফল হয়। তবে তাতেও একটা সময়ের প্রয়োজন হয়, প্রকৃতির তাই বিধান। কিন্তু এমন বাজীকর আছে যে—এখানি আমের আঁটী পুঁতে, একটু জল দিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই যাদুবৃক্ষকে বড় ক'রে বাড়িয়েই তোলে না—তাতে ফল ধরায় এবং সে ফল দর্শকদের নাকি আস্বাদনও করায়। আমি এমন আম কখনও আস্বাদন করিনি কিন্তু সেদিন আমাদের অন্তরঙ্গতার যে বীজটি কিছুদিন আগে পুঁতেছিলাম সেদিন সেটি যাদুবৃক্ষের বা লতার মতই বেড়ে উঠল এবং তার ফুল ফুটে তার সর্বাঙ্গ পুষ্পিত করে তুললে।

সেদিন দুজনে আমরা সেই বাজীকরের বিধানের আওতায় এসে পড়েছিলাম। ওই যে গাড়ীতে অর্থাৎ ট্যাক্সিতে দুজনে এসেছি, সেই সময় যদিও দুজনে খানিকটা আড়ষ্টভাবে যথাসম্ভব স্বল্প কথা কয়েছি এবং সে-কথাগুলোও নেহাৎ ফৌজদারী আদালতের জেরাধর্মী প্রশ্নোত্তরের মত—তবুও এরই মধ্যে কোন যাদু ছিল জানি না—আমরা ওই বাজীকরের ভেল্কীর মধ্যে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় হয়ে উঠেছিলাম।

না; কথাটা ঠিক হল না। জানি না কেন বলছি—? জানি, কোনখানে কোন কথার মধ্যে যে ওই যাদু বা ভেল্কী লুকনো ছিল তা বেশ অনুমান করতে পারি। ওই যে—যে-মুহূর্তে আমি বলেছিলাম—'আমি জানি—আমি দেখেছি যে আপনাকে বাগবাজার স্ট্রীটে এবং বাগবাজারের বাজারে সেই যে কে একটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার ঐ-ই বায়—'দন্তমনোরঞ্জিণী সুহাসিনী টুথ পেস্ট' হাঁকাটির কথা পর্যন্ত বলেছিলাম সেই মুহূর্তে পরস্পরের কাছে দুই চোরের মত মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র যাদুর মায়ায় পরস্পরের নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম।

মণিবউদির কিন্তু এতে কোন লজ্জার হেতু ছিল না। বড় জোর কোন মডার্ণ বড়লোক বন্ধুর কাছে কথাটা প্রকাশ পেলে একটা লজ্জার হেতু আছে,—সেটা হল কোষ্ঠীমানা দেবতামানা ধর্ম মানার জন্যে লজ্জা; কিন্তু সেটা আর এমন কি? লক্ষ্মীর ঘর, একটু আড়াল—পুজোর ঠাঁই এ শতকরা নিরেনব্বুইয়ের আজও আছে। কোষ্ঠীও—থাক। মোট কথা মণিবউদির এতে লজ্জার হেতু বা চুরি করার দায়ের মত কোন দায় ছিল না। আমার বরং ছিল; অন্ততঃ ওই যে ছোঁড়াটার সুহাসিনী টুথ পেস্টের হাঁক শুনে উনি হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন—সেই সুহাসিনীর মুখ দেখবার জন্য যে একটি অশোভন আগ্রহ আমি দেখিয়েছিলাম তার জন্য লজ্জার আমাকে স্পর্শ করা উচিত ছিল। কিন্তু মণিবউদি যখন ট্যাক্সি বিদায় করে আমাকে বসিয়ে—কফির পট এবং জলখাবারের ডিস নিয়ে এসে সামনে বসলেন তখন কোন লজ্জারই কোনদিক থেকে লম্বা ঘাড় বাড়িয়ে আমাদের মধ্যবর্তী স্থলটুকুর মধ্যে মুখ দেখাবার কোন সুযোগই ছিল না—বা তেমন স্থানটুকুও ছিল না। আমরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম।

কথায় কথায় সেদিন সন্ধ্যায় মণি-বউদি তাঁর সমস্ত অন্তরটাই আমার কাছে খুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—জানেন ভাই, জীবনটা আমার আশ্চর্য! একলা থাকলে কথাগুলো মনে পড়ে। ভাবি আর নিজেই যেন কূলকিনারা হারিয়ে ফেলি। হাঁপিয়ে উঠি। বুঝতেই পারি না কেন আমি—এই লোকটিকে বিয়ে করলাম। কেন আমি—এমন—।

চুপ ক'রে গিয়েছিলেন মণিবউদি। যেন ওই 'কেন' প্রশ্নটির উত্তর কি—যা সহস্রবার ভেবে পাননি, একাধিক সহস্রবারের জন্য আবার একবার ভেবে দেখলেন।

তারপর আবার হঠাৎ মুখ খুললেন—জানেন—ও'কে আমি একজনের কাছ থেকে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছি? এবং তিনি যে-সে নন—তিনি ও'র প্রথম যৌবনের ভালবাসার জন। এবং—।

একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন—এবং তিনি আমার মাসীমা হতেন। আপন মাসীমা। ওঃ—সে যুদ্ধ একটা ভীষণ যুদ্ধ। নুটুকে নিয়ে বিমলা আর কল্যাণীর যুদ্ধ আর কি —কতটুকু? কল্যাণী তো আপনার মরা মানে বিদেহিনী প্রতিদ্বন্দ্বিণী। হিন্দুর ঘরের বিধবাকে টেনে এনেছেন—এর থেকে আর কতটুকু প্রজ্জ্বলিতা দেখাতে পারতেন?

আমার মনে পড়ছে—'বিদেহিনী' এবং প্রজ্জ্বলিতা শব্দদুটি—মণিবউদির মুখে শোনা শব্দ। শব্দদুটি শুনে পঁচিশ বছর আগে ১৯৪২ সালে চমকে গিছলাম; গিছলাম বলেই মনে আছে—শব্দ দুটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়েছিল যে, মণি-বউদির মতই শব্দদুটি হয়েছে। তারই যোগ্য কারণ—মণি-বউদি সে আমলের বি-এ পাশ। এবং কিছুকাল মাস্টারীও করেছিলেন বিয়ের আগে। এবং এই বাড়ীতে যেদিন প্রথম এসেছিলাম ও'দের আমন্ত্রণে সেদিন মণি-বউদি নাটক নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তাতে এ শব্দদুটো আমার কাছে একটু অভিনব প্রয়োগ বলে মনে হয়েছিল এবং মনে মনে তারিফ করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে অসঙ্কোচেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—মনে হয়েছিল তাঁর মনের-মহলের খোলা জানলা দিয়ে—মহলের ভিতরের বিদ্যা ও বুদ্ধির মণি-দীপের আলোর ঝলকানি যেন বেরিয়ে এসে আমার চোখের উপর টর্চের ছটার মত পড়ছে।

* * *

বলতে বলতে মণি-বউদি তাঁর নিজের কথা প্রায় সবটাই বলে ফেলেছিলেন সেদিন।

মণি-বউদির বাপ ছিলেন সে আমলের 'রেবেল' অর্থাৎ বিদ্রোহী। নাম ছিল গোপীজনবল্লভ চাটুজ্জ্যে কিন্তু প্রকৃতিতে ছিলেন ত্রিশূলধর রুদ্র। ১৯১৬ সালের ওধারের কথা। সুতরাং অনায়াসে বিনা ডিটেলসেই বিশ্বাস করতে এতটুকু বাধা হয়নি যে, মণি-বউদির বাবা একটি গোঁড়া হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে সে-আমলের একটি প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়েটা কিন্তু হয়েছিল হিন্দুমতে। কারণ মণি-বউদির বাপের প্রথমা স্ত্রী ওদিকে বাড়ীতে বাড়ী দখল ক'রে

বসেছিলেন। এবং তা অগোচর ছিল না মণি-বউদির মার কাছে। সুতরাং রেজেস্ট্রী করে বিয়ের উপায় ছিল না। যার জন্য এ-বিয়ের ফলে পাত্র কন্যা উভয়কেই উভয়ের পিতৃপক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।

মণি-বউদির বাবা ছিলেন গোঁয়ার মানুষ তিনি স্ত্রীকে নিয়ে অকূলে ভাসার মত—বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বেহার অঞ্চলে। বেহারশরিফের কাছাকাছি একখানা গ্রাম—সে গ্রামে বুন্দেলা রাজপুতদের বাস এবং তাদের কুলপতি হিসেবে একঘর জমিদার তাঁদের দৌলতখানা গড়ে তুলেছেন। এই গ্রামে এসে সাঁতারজল থেকে একহাঁটু জল পেয়ে—ডাঙগায় উঠলেন এবং প্র্যাক্-টিসের জন্য চেপে বসলেন।

মণি-বউদির সে গল্প আমার মনে আছে। তিনি বসেছিলেন—সে আমলটাই অন্যরকম ছিল—মানুষগুলোও আলাদা ধরণের ছিল। বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের বয়স হয়েছিল নাকি সোত্তর বছর—সেই বয়সে হয়েছিল অসুখ। ওঁদের ছিল কবিরাজ আর হাকিম। তারা খাওয়ার ধরা-কাটা করেছিল বলে ডাক্তার আনবার হুকুম হয়েছিল, আমার বাবা প্রথম কিছুদিন 'বাঢ়'-এ ছিলেন। বাঢ় থেকে বক্তিয়ারপুর, সেখান থেকে বিহার-শরিফে এসে মাস-দুদিন বসেছেন—এই সময় এল এই ডাক। গেলেন দেখতে। গিয়ে বিছানার পাশে বসলেন—তা ঠাকুরসাহেব হুকুম করলেন—শোন-হে ডকডর সাব,—তুমি তো দেখি নেহাৎ ছোকরা হে! চিকিৎসার কিছু জান? শোন—আমাকে সারাতে হবে। এ বেটারা বুড়বুকের দল বলছে—বলে উপোস করতে হবে। আরে বাবা ভুখেসে মারে তো ভূত-পিরেত ভাগতা হ্যায়—ই তো বেমার আর বুখার। খেতে না পেলে তো আপনিই সারবে। হাকিম কবরেজ ডাগডরে কি জরুরৎ। আমি খাব। তুমি ওষুদ দাও। দিয়ে সারাও, তবে তুমি ডাগডর।

ঠাকুরসাহেব খেতেন ঘি সার্বাড়, মিঠাই, হালুয়া, আর সে-সব ব্যঞ্জনের ফিরিস্তি কি দেব? ওদের ঠাকুরবাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখেছি—সত্যি সত্যি এক-অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একুনে একান্ন পদ ছাড়া ওদের ভোজনের পর্ব সুশেষ হয় না। তা সেই খাওয়া। সেই খাওয়া তিনি খাবেন আর তাঁকে সারিয়ে তুলতে হবে ডগডর সাহেবকে। সারিয়ে দিলে বহুৎ ইনাম শিরোপা মিলবে। না-সারলে ডগডরের জান থাকবে ঠাকুর-সাহেবের জিম্মাদারীতে।

বাবা বলতেন—হয়েছিল আজাপর। শেষ কি করবেন—ভেবে চিন্তে বললেন—হ্যাঁ খেতে আমি নিশ্চয় দেব—কিন্তু ওই ধরণের খাওয়া নয়—ঠাকুরসাহেবকে শিকারের পাখীর গোস্ত খেতে হবে। টাটকা। হোয়াইট মীট! আর মাংসে আমাশয় সারায়।

মণি-বউদি হঠাৎ খুব হেসে উঠে-ছিলেন।

আমি একটু চমকে উঠেছিলাম।

মণিবউদি বলেছিলেন—রোজ ক'টা পাখীর মাংস খেতেন জানেন? বালিহাঁস জানেন তো সেই বালিহাঁস—মিনিমাম আটটা দশটা। খেতে খেতে আপশোষ ক'রে বলতেন, একি খাব ডাগডর সাব, আমি যে আমি বুঢ্যা আদমী—আমার দাঁতে তোড়নে কো লায়েক এক হাড্ডি নেহি ইসমে।

যাই হোক—মণিদির বাবার ভাগ্য ভাল, ঠাকুরসাহেবের সে অসুখ দিন-তিনের মধ্যে সেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরসাহেব বললেন—ডগডর ভাই, তুমি হামারা হিঁয়া আ যাও ভাই। এখানে লোকেদের চিকিৎসা কর। আচ্ছা ডগডর তুমি।

এক কোঠী অর্থাৎ ইঁটের দেওয়াল—খাপ-রার চাল বাড়ী, অন্দরটা দোতলা—আর সাম্-নের বাহার মহলটা একতলা, চৌকা থামওয়ালা অংশটা ডগডরখানা, এর উপর মাসে দু মন খুব মিহি চাল—এক মন ঘরে পেশাই আটা, আর পচাশ রুপেয়া নগদ এই বরাদ্দ হল—ঠাকুরসাহেবের কাছাইরী থেকে।

এছাড়া একটা ছোটখাটো দাওয়াইখানা রইল।

এর পরিবর্তে ডগডর সাহেব ঠাকুর-সাহেবের বাড়ীর বাঁধা ডাক্তার হলেন। ঠাকুরসাহেব থেকে চাকরবাকর সকলকে দেখতে হবে। এরপর মণিবউদির বাপের প্র্যাকটিস্ জমে উঠতে দেরী হয়নি। মাস-কয়েকের মধ্যেই পদাতিক ডাক্তারবাবু শুধু অশ্বারোহী পদেই উন্নীত হন নি—বাইসাইকেলারোহী হয়েও পাকা শড়কে কাপড় ও কোটের সঙ্গে শোলাহ্যাট মাথায়

দিয়ে [illegible] পরিণত হয়ে উঠেছিলেন।

এইখানেই হয়েছিল মণিবউদির জন্ম। বছর তিনেক পর—১৯১৪ সালে।

এর বছর দুয়েক পর মণিবউদির মা মারা গেলেন। মণিবউদির বাবা আর বিয়ে করলেন না; ঠাকুরসাহেব তখনও বেঁচে—তিনিই মেয়েটিকে মানুষ করতে এবং ডাগডর সাহেবের যত্নআত্তি করতে দেখে দিলেন এক যুবতী দাসী। নাম ছিল তার 'সরবতিয়া'। জাতে কি ছিল তা জানেন না মণিবউদি। জাত তার ছিল না থাকলে সে ছিল জাতেই ঝি।

মণিবউদি বলেছিলেন, খুব বেশী খুলে তো বলার দরকার নেই। বুঝতেই তো পারেন। তবে যেটা বুঝতে পারবেন না সেটা বলে দি—সেটা হ'ল এই যে মেয়েটা ছিল ঠাকুরসাহেবের বাড়ীর কেনাদাসীর পেটের মেয়ে। লোকে বলত সরবতিয়ার দেহে ছিল ঠাকুরসাহেবদের বংশের রক্ত।

সরবতিয়া খুব সম্ভ্রমের এবং তরিবতের মেয়ে ছিল......বাবু। তার সহবৎ ছিল কুল-বধূর মত। সরবতিয়ার বিয়ে একটা দিয়ে-ছিলেন ঠাকুরসাহেব কিন্তু সরবতিয়া বছর কয়েকের মধ্যেই পূর্ণযৌবনকে বুকে ধরে বিধবা হয়ে ফিরে এল। মেয়েটার একটা ছেলে হয়েছিল সেটা গেল কিছুদিন পর। সাগাইয়ের কথা ভাবছিলেন ঠাকুরসাহেব। ওদিকে বাড়ীর ছেলেপিলেরা সরবতিয়ার উপর ঝুঁকে পড়ল। ঠিক সেই সময় ঘটল ঘটনাটা। ঠাকুরসাহেব ডাগডর সাহেবের হাতে সরবতিয়াকে দিয়ে বলেছিলেন—ডাগডর, সাদী যখন করবে—করবে—এখন একে নিয়ে যাও—তোমার মেয়েকে দেখবে তোমাকে দেখবে। মেয়েটারও ছেলে মরেছে—ও তোমার মেয়েটাকে পেয়ে খুশী হবে।

মণিবউদির বাবা তখন পত্নীশোকে প্রায় সতীহারা শিবের মত হয়ে উঠেছেন। মণিবউদির মা মারা গিছলেন হঠাৎ। হার্ট-ফেল করেছিলেন। মণিবউদির বাবা শেষ-সময়ে বাড়ী ছিলেন না। ডাকে বেরিয়ে-ছিলেন রোগী দেখতে। এর ধাক্কাটা তিনি সামলাতে পারেন নি। মদ ধরলেন সেই-দিনই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেই হয়।

মণিবউদির বয়স ছিল তখন বছর দুয়েক তার মনে নেই. শুনেছিলেন। শুনেছিলেন ওই সরবতিয়ার কাছে। ডাগডরবাবুর বউ মরে গেছে খবরটা নিয়ে বুড়ী দাঈটা ছুটে গিয়েছিল ঠাকুরসাহেবের বাড়ী। ঠাকুরসাহেব নিজে এসে বসে-ছিলেন। এদিকে মণিবউদি তখন ছোট দু বছরের মণিমালা কাঁদতে শুরু করেছে। ঠাকুরসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন—যা সর-বতিয়াকে ডেকে আন। বিধবা সরবতিয়ার ছেলেও মরেছে—কাঁচ ছেলে—তার বুকে দুধ আছে—দুধ দিয়ে ডাগডরের মেয়েটিকে ঠান্ডা করুক।

মণিবউদির বাপ ফিরে এসে মরা স্ত্রীকে দেখে কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়েই থাকলেন। একবার শুধু নেড়ে-চেড়ে দেখে উঠে গিয়ে বসলেন তাঁর রোগী দেখবার ঘরে। ঠাকুরসাহেব যে ঠাকুরসাহেব তাঁর ডাকেও সাড়া দেননি।

শ্মশানে গেলেন—মুখাগ্নি করলেন। শবসংকার করে ফিরে এলেন—স্তম্ভিত বাক্যহারা এক মানুষের মত। তখনও পর্যন্ত ঠিক রইলেন। তারপর কখন যে রাত্রে ডিসপেনসারির আলমারি থেকে ব্র্যান্ডির বোতল খুলে সুরু করেছিলেন মদ্যপান। মদ খাওয়ার একটা অভ্যাস তাঁর ছিল—সেটা ছিল পরিমাণে পরিমিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত। রাত্রে খাবার সময় এক পেগ ক'রে ব্র্যান্ডি তিনি খেতেন। সেইদিন থেকে পরিমাপ এবং নিয়ম এ দুটো উঠে গেল:

মাসখানেক পর আবার সবই যথানিয়মে চলতে লাগল—সব মানে ডাক্তারী আর আহার নিদ্রা—শুধু মদ্যপানটা আর পরি-মিতি ও নিয়মের বেড়ায় ঘিরে ফেলা গেল না।

ঠাকুরসাহেব ডাগডরকে ডেকে বলে-ছিলেন—সাদী কর ডাগডর।

ডাগডর মদ খেয়েই ছিলেন—বলেছিলেন—কভি না। এ কথা বলবেন না। তাহলে চলে যাব আমি।

—তোমার মেয়ে? তার কি হবে?

—কেন? ওই তো একটা মেয়ে ওকে নিয়ে থাকে—দুধ পিলায় দেখেছি; ওইই মানুষ করবে। মেয়েটা সুশ্রী এবং নোংরা নয়। স্বাস্থ্যও ভাল—। ওকে মাইনে দেব আমি।

ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—তা তুমি পেতে পার। কিন্তু তলব দিয়ে ওকে পাবে না তুমি। ও হ'ল ঠাকুরসাহেবের ঝিয়ের মেয়ে; নিজের মেয়ের মত ভালবাসি ওকে। ও বিধবা হয়েছে—ওকে সাগাই কর না কেন?

—না। এ বাত অন্যে বললে আমি তার সঙ্গে লড়াই করতাম ঠাকুরসাব।

—বেশ তবে ওর খাওয়াপরার আজীবন ভার তোমাকে নিতে হবে! সে নেবে তো।

সে ভার নিতে রাজী হয়েছিলেন—মণিবউদির বাপ।

মণিবউদি একটু হেসেছিলেন এবং বিচিত্র অর্থদ্যোতক একটি হাসি তাঁর মুখে ফুটিয়ে তুলে বলেছিলেন—কিন্তু যখন থেকে আমার মনে পড়ে ঘটনাগুলো; সে ধরুন পাঁচ ছ'বছর বয়স হবে, তখন থেকে আমি সরবতিয়া মাঈজীকে—মা ব'লেই ডেকেছি এবং আমাদের বাড়ীর গিন্নী হিসেবে দেখেছি। কাপড়চোপড় যা পরতো তা অবিশ্যি ঘাঘরি কাঁচোলী ওড়না হলেও সেসব ছিল যেমন রুচিসম্মত তেমনি দামী। হিসেবের অঙ্কে সরবতিয়া মাঈজীর দাম—ঝিয়ের দাম ছিল না। নাকে একটা হীরে ছিল—সেটা এমন ঝকমক্ করত! আরও একটা কথা বলি। সরবতিয়া মা সিঁথিতে সিঁদুর পরতেন তখন আর সন্ধ্যেবেলা পাউডার মাখতেন। ঠাকুরসাহেবের বাড়ীর মেয়েরা তাকে পরিহাস করে বলত'—"ডগডর-গিন্নী"।

বাংলা-কথাটা বেহারী জিভে একটু-খানি বেঁকে যেত। আমাদের জিভে যেমন হিন্দীভাষার বাঁকা তেরচা চালগুলো সরল আকারান্ত বা অন্তস্থ'য়' বা ব-এর উচ্চারণ যেমন এলিয়ে সোজা হয়ে যায়—তেমনি ভাবে

মণিবউদির মনের এবং বোধের এই সূক্ষ্ম এবং পাতলা পরিচয়জ্ঞাপক কথা-গুলোর মধ্যে সেদিন আর এক মণিবউদিকে পাচ্ছিলাম।

"সরবতিয়া মাঈজী বাবুজীকে কেমন ক'রে জয় করেছিল সে কথা আমি শুনেছি ভাই—আমি জানি—কিন্তু সে আমাকে বলতে নেই। ও বলবার অধিকার আছে এক-মাত্র কালিদাসের মত মহাকবিদের। বাক্য এবং অর্থের মত পার্বতী এবং পরমেশ্বরের মত বাবা এবং মাকে যারা অভিন্ন একাত্ম না ভাবতে পারে—তাদের অধিকার নেই বলেই আমি মনে করি।"

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

মণিবউদি কি? এ বলছে কি? কানের পাশে কে যেন আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছিল—বাগর্থ বিবসংপৃক্তো বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌঃ।"

সংসারে মনের মধ্যে একটা গোপন কুঠরী আছে—সেটার মধ্যে থাকে মনের কথা। শুধু কথা কেন? মনের কথা থাকে, মনের মধু থাকে, সবশেষের স্তরে থাকে যাদু। ও কুঠরীর দরজা সহজে খোলে না। কেননা ওই ঘরের দরজা কোন চাবিতে খোলেও না বন্ধও হয় না। কারণ ও দরজায় চাবি নেই। কোথায় আছে ওর চোরা-বোতাম, যে-বোতামে হাত পড়লে আপনি খুলে যায়। আবার একটু অসতর্ক হলেই আপনি বন্ধ হয়। তখন মশাল জেলে বিস্ফারিতচোখে ওই বোতামটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর পাওয়া যায় না।

সেদিন মণিবউদির ওই মনের ঘরে বন্ধ-দরজার চোরাবোতামে কেমন করে তাঁর বা আমার হাতের চাপ পড়ে খুলে গিয়েছিল—তা বলতে পারব না তবে সেই খোলা দুয়ারের মধ্য দিয়ে মনের কথাগুলি মনের মধুতে অভিষিক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল এবং তিনিও যেন সেই গঙ্গাস্নান করে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মত উজাড় ক'রে দিচ্ছিলেন নিজেকে।

হয়তো উচ্ছ্বাস একটু বেশী হয়ে গেল। কিন্তু না। উচ্ছ্বাস যদি হয়েই থাকে তবে বলব যে, এর থেকে কম উচ্ছ্বাসে সেদিনের মণিবউদিকে বা আমার নিজেকেও ঠিক বুঝাতে পারব না। উচ্ছ্বাসের এ গভীরতায় যদি নিজেরা না হারিয়ে যেতাম, যদি আমরা বাস্তব বুদ্ধিতে সজাগ থাকতাম—তাহলে আমরা নারী-পুরুষ হয়ে যেতাম এবং তখন আর ওইভাবে ওই নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসে থাকবার অধিকারই আমাদের থাকত না।

সে থাক। এখন মণিবউদির জীবনের যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন সেগুলি বলি।

এরপর ন বছর চলে গিছল।

মণিবউদি এগারো বছরের হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে সরবতিয়া মাঈজীর হাতে মানুষ হয়ে মণিবউদিও একরকম হিন্দুস্থানী মেয়ে হয়ে পড়েছিলেন। তবু মণিবউদির বাবার বাংলা ভাষার উপর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল—সেকালের ব্রাহ্মমেয়ে বিয়ে-করা বাঙালীর ছেলে হিসেবে।

হিন্দু বাঙালী যাঁরা প্রবাসী হয়ে অন্য-প্রদেশে বাস করতেন তাঁদের বাংলাভাষার উপর কোন আকর্ষণই ছিল না—তাঁরা গোড়া থেকে ইংরিজীকে মাথায় করতেন আর মাটির বুলি হিসেবে হিন্দী শিখতেন আপনা থেকে। বাংলা বলতেন ভুল—লিখতে আরও বেশী ভুল করতেন। যা বলতেন তাও হিন্দীর ছাঁচে ফেলে বলতেন—ইংরিজী রাজভাষা হচ্ছে এবং ইংরিজী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা হচ্ছে সুতরাং বাংগালী ভাষা নিয়ে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ বল!—কিন্তু ব্রাহ্ম যাঁরা তাঁরা বাংলা ভাষাকে পরিস্ফুট করেছেন এবং বাংলাকে ভোলে নি—কোন-খানে গিয়েই। প্রবাসী পত্রিকা তার প্রমাণ। মণিবউদির বাবা গোপীবাবু প্রবাসীর গ্রাহক ছিলেন এবং শুধু মণিকে নয়—সরবতিয়াকেও বাংলা বলতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। তবে মণিবউদি কাপড়-চোপড় পরতেন হিন্দুস্থানী মেয়ের মত। খাওয়াদাওয়ার চালেও হিন্দুস্থানী স্বাদ-গন্ধ প্রবল ছিল। হয়তো বাংলা শিক্ষাটাও কাজে আদৌ লাগত না যদি পরপর কতক-গুলো ঘটনা না ঘটত।

প্রথম ঘটনা ঠাকুরসাহেবের মৃত্যু:

দুর্দান্ত ঠাকুরসাহেব—বিরাশী বছরে মারা গেলেন—তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে লাগল মামলা। ঠাকুরসাহেবের বিয়েকরা বউ পাঁচজন—এছাড়া কেনা দাসী তার সংখ্যা কম না। ঠাকুরসাহেব উইল করে সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। তাতে সরবতিয়াও কিছু পেয়েছিল। কিন্তু মামলা বাধল ছেলেদের সংগে নাতিদের। অর্থাৎ ঠাকুর-সাহেবের যেসব ছেলে মারা গেছে তাদের সংগে ঠাকুরসাহেবের জীবিত ছেলেদের: উইলও একখানা নয় তিনখানা। তার দুখানাতেই সাক্ষী ছিলেন মণিবউদির বাপ। পক্ষ দাঁড়িয়েছিল চারটে। মণি-বউদির বাপ যে সাক্ষীই দিন—তিন বিপক্ষের রোষবহ্নিতে পড়তে হবেই। কালটা ১৯২২ সাল। গোপীবল্লভবাবু সে গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন পাটনায়। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর প্রাণই শুধু বিপন্ন নয়—আরও অনেককিছু বিপন্ন—এরা তাঁর সম্পত্তিটা কেড়ে নিতে চায়, এদের মধ্যে আবার দুজন হাত বাড়িয়েছে সরবতিয়ার দিকে। সরবতিয়া মণিমালিনীকে যখন কোলে তুলে নেয় তখন ওর বয়স ছিল বিশ বছর; দশ বছর পর এখন তার বয়স ত্রিশ; যাকে বলে যৌবন-গংগার ভরাভাদর। এবং বাঙালী ডাক্তার-বাবুর শিক্ষায় এবং সহবতে সে রূপসজ্জিত হয়ে এমনই অপরূপ হয়ে উঠেছিল যে তারা ঠাকুরসাহেবের ছেলে হয়েও এদিকে হাত বাড়াতে সংকোচবোধ করেনি।

এসব কথা অনায়াসে অসঙ্কোচে বলে যাচ্ছিলেন মণিবউদি।

—জানেন ঠাকুরজামাই—তখন বারো বছরের আমি পশ্চিমে বড় হয়ে বেশ একটু হাপালো হয়ে উঠেছি এবং দেখতেও মন্দ নই; তার উপর আমার এই উঁচু দাঁত-দুটোতে তো আমাকে চব্বিশঘণ্টাই দেখন-হাসি ক'রে রেখেছে। সুতরাং বুন্দেলাদের সবাই বলে—আমায় দেখে ছোক্‌রী হাসে। সুতরাং আমার দিকে পর্যন্ত হাত, সে একখানা দুখানা নয়—ঠাকুরসাহেবের চার-নাতির এক ছেলের এই পাঁচজনের পাঁচ দুগুণে দশখানা হাত উদ্যত হয়ে উঠল। বাবা ছিলেন গোঁয়ার মানুষ; ভীষণ জেদী। সে গোঁয়ারতুমি জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগে আরও মজবুত হয়ে হাতীর দাঁত হ'য়ে উঠেছিল এবং মদ বেশী বেশী খাওয়ার জন্যে সংগে সংগে বেশী প্রগল্‌ভ হয়েও উঠেছিলেন। প্রথমটা তিনি বেশ খানিকটা হাঁকডাক ক'রে লড়াই দেবার জন্য খুঁট

পেতে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বুঝলেন, আজকাল স্ফটিকস্তম্ভ ফাটিয়ে নৃসিংহঅবতার বের হন না, সাবিত্রীর সতীত্বকেও যম এতটুকু সমীহ করে না: এবং সত্য বা নীতি ইত্যাদির এমন কোন শক্তিই নেই যা নিছক পশুশক্তিকে বা বস্তুশক্তিকে হঠাতে পারে হারাতে পারে।

আমার তখন এগারো বারো বছর বয়স, দিব্যি মনে আছে তখনকার কথা; বাবা মদ খেতে খেতে সরবতিয়াকে বলছিলেন—আমি হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম হয়েছিলাম। আজ থেকে নাস্তিক হলাম। কুছ নেহি হ্যায়—কুছ নেহি হ্যায়—। অবাঙমনসোগোচর মানে কুছ নেহি হ্যায়।

কিছু থাক বা না থাক—আমাকে নিয়ে বিপদ তখন এমন ঘনীভূত হয়েছে যে—দিনকয়েকের মধ্যেই বাবা, আমাকে আর সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে, পালিয়ে এলেন বেহারশরীফ। কিন্তু বিহারশরীফও ১৯২২-২৩ সালে এমন নিরাপদ ছিল না যে—বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবদের সংগে বিবাদ করে নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং শেষ-পর্যন্ত মাস দুয়েক পর চলে এলেন পাটনায়। পাটনায় বসে মামলা জুড়লেন বুন্দেলাবাবুদের বিরুদ্ধে। তাতে টাকারই শ্রাদ্ধ হল, ফল কিছু হ'ল না। এই সময়ে একদিন এলেন—আপনার এই দাদাজী।

দাদাজী! পরক্ষণেই বুঝলাম—।

প্রায় তার সংগে সংগে একটু হেসে—মণিবউদি বলেই দিলেন—মদীয় স্বামী, পতি, আপনার শ্যালক!

অর্থাৎ অমৃতদা!

*

মণিবউদির বয়স তখন বারো বছর। ১৯১৪ সালে জন্ম—সুতরাং সালে সেটা ১৯২৬ সাল। অমৃতবাবু তখন ১৯২১ সালে ক'মাসের জেলের পালা সেরে বেরিয়ে এসে গঠনমূলক কাজে মন দিয়েছেন। অর্থাৎ ওই তুলোর চাষের জন্য নেওয়া জমিটাতে ফায়ার ক্লে'র খোঁজ পাওয়া গেছে। পতিত ব্রহ্মডাঙ্গা। বেনামীতে পড়ে ছিল। হঠাৎ বের হল মাটি। পূর্ব মালিকরা বিষয়ীর প্যাঁচ ক'ষে জমিটাকে ঘুড়ির মত অমৃত-বাবুর লাটাইয়ের সুতোর বাঁধন থেকে কেটে নিজের লাটাইয়ের সুতোয় লটকে নেবার আয়োজন করলেন। লেখাপড়াজানা অবিষয়ী লোকদের প্রতি বিষয়ী লোকদের গভীর শ্রদ্ধা এই কারণে যে—এ'রা সুবোধ বালকের মত 'যাহা পান তাহাই লইয়া' ঘরে ফিরে যান। কিন্তু অমৃতবাবু ঠিক তা না করে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নেমেছেন। জায়গাটা বেহারের সীমানার মধ্যে। সুতরাং বেহারের হাইকোর্ট দেখতে এসেছেন তিনি। সেই সূত্রে আলাপ হয়ে গেছে মণিবউদির বাবার সংগে। কথায়-কথায় আলাপ গিয়ে পেঁাচেছে সম্পর্কের বা আত্মীয়তার দোর-গোড়ায়।

অমৃতবাবু বলেছেন— বিহারশরীফে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন—তাঁরও নাম গোপীজনবল্লভ চ্যাটার্জী—

চমকে উঠে গোপীজনবল্লভ ডাক্তার বলেছিলেন—চেনেন তাঁকে? কি ক'রে চিনলেন?

—চিনি না। তবে নাম শুনেছি।

—কি ক'রে? কার কাছে?

*

অমৃতবাবুর এক বান্ধবীর নাম রত্নমালা। সেই রত্নমালার দিদির নাম ছিল পুষ্পমালা। পুষ্পমালা এন্ট্রান্স ফেল ক'রে নার্সের কাজ শিখছিল—ক্যাম্‌বেল ইস্কুলের হাসপাতালে। সে ওই ইস্কুলের একটি হিন্দু ছাত্রের সংগে প্রেমে পড়ে তাকে

বিয়ে করেছে। নাম গোপীজনবল্লভ চ্যাটার্জী। ব্রাহ্ম মেয়ে পুষ্পমালাকে হিন্দু-মতে বিয়ে করে সে গোপীবল্লভও বেহারে এসেছে। আর দেশে ফেরেন নি। শোনা যায় বেহারশরীফে তার এখন অনেক পসার।

গোপীজনবল্লভবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন—আপনার নাম তো বললেন অমৃতলাল মুখুজ্জে। গন্ধে অবশ্যি জাত বোঝা আজকাল আর যাচ্ছে না। কিন্তু ঠিক ব্রাহ্ম বলেও তো মনে হচ্ছে না! অবশ্য গান্ধীজীর ছকটার সঙ্গে ব্রাহ্ম ছকটা অনেক জায়গায় বেশ মিশে গেছে তবু-ও—তা যেন মনে নেয় না। তামাকু খান না চুরোটও খান না কিন্তু পান খান—মাথায় তেল মাখেন—। কান ফোড়ার দাগ রয়েছে। কর্ণবেধের দাগ।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—না ব্রাহ্ম আমি নই, তবে জাত আমি মানি না।

—না মানুন। রত্নমালা তো গোঁড়া ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে। পুষ্পকে নিয়ে তো বেগ কম পাইনি আমি। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন খোঁটা দিয়েছে। আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেপারে সেন্ধ করেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে রত্নমালার সম্পর্ক কতদিনের?

সেদিনের অমৃতবাবু আজকের অমৃত-বাবু ছিলেন না। সোজা মানুষ—এম-এ পাশ—দেশসেবক, চোখে অনেক স্বপ্ন, অকুণ্ঠ বা সর্বপ্রকার কুণ্ঠাবিমুক্ত সোজা খাপ-খোলা তলোয়ারের মত মন। একবিন্দু মরচের দাগ পড়েনি। তার গড়নে-দীপ্তিতে উদ্দেশ্য গোপনের এতটুকু চেষ্টা ছিল না। সোজাসুজি বলেছিলেন—রত্নমালাদের ইস্কুলে বছর দুয়েক মাস্টারী করেছিলাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড-মাস্টার ছিলাম। রত্নমালা ক্লাস টেনে উঠল সেবার। ক্লাসে ভাল মেয়ে ছিল। টেস্টের পর কিছুদিন কোচও করেছিলাম। তারপর ও পাশ করে আই-এ পড়তে গেল আমি চাকরি ছেড়ে নেমে পড়লাম—দেশের কাজে।

—তারপর—?

—তারপর আর কি? রত্না এখন চাকরী মানে ইস্কুলে মাস্টারী করে—বাড়ীর সঙ্গে একরকম আলাদাই সে। স্কুলবোর্ডিংয়ের সুপারইনটেণ্ডেণ্ট।

—কিন্তু বিয়ে করেননি কেন?—অবস্থার জন্যে?

—অনেকটা তাই বটে। মানে অবস্থা পাল্টানো তো সোজা নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া চাই। মানে এ-জীবনে বিয়ে আমরা করব না।

শুনে খুশী হয়েছিলেন—গোপীজন-বল্লভবাবু। বাড়ী এনেছিলেন অমৃতবাবুকে।

মণিবউদি বলেছিলেন, জানেন—সেদিন মানুষটিকে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। ১৯২৬ সাল—তখন ওর বয়স বত্রিশ বছর। লালচে চুল—লালচে টকটকে রঙ, কটা চোখ। বাবা বলেছিলেন—লোকটা খাসা লোক—ক্যাটস আই লোকটার। খুব পুশিং হবে। সে আমলে বারো বছরের মেয়েও প্রেমে পড়তে পারত।' আপনার সঙ্গে ননদের বিয়ে যখন হয়, তখন তার বয়স তো শুনেছি এগারো ছিল।

হেসে বললাম—হ্যাঁ।

মণি-বউদি বললেন—আমি তখন বারো, কিন্তু আপনার দাদার প্রেমে আমি সেদিন ঠিক পড়িনি। পড়লাম পরে। ওই মাসী রত্নমালার সঙ্গে বিবাদ বাধল। সেই বিবাদে আমি জোর ক'রে এঁর প্রেমে পড়লাম—এঁকে ছিনিয়ে নিলাম মাসীর কাছ থেকে। মাসীর উপর একটা আক্রোশ আমার গোড়া থেকে—একেবারে সেই প্রথম দেখা থেকেই জন্মে গেল। ওর চোখে আমি দেখলাম আমার শত্রুকে—আমার চোখের মধ্যেও সে বোধহয় ঠিক তাই দেখেছিল—নিজের জীবনের সবথেকে বড় শত্রুকে দেখতে পেয়েছিল।

—ওর বাড়ীতে যে মুহূর্তে নামলাম,—সেই মুহূর্তে। আমার সঙ্গে এসেছিল সরবতিয়া। বাবা মারা গেছেন—পনের দিনও হয়নি। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। অ্যাকসি-ডেন্টে মারা গেলেন। ওই ঘটনার আরও মাসছয়েক পর।

মণি-বউদি বললেন—বাবা মানুষটা ছিলেন দিল-দরিয়া মানুষ। সত্যবাদী মানুষ। সেটা এঁর বেশ ভাল লেগেছিল। বাবারও ভাল লেগেছিল—দেশসেবক—প্রেমিক লোক। বলেছিলেন—তুমি আমার এখানে এসে উঠবে এবার থেকে। আরে আমার শালীর সঙ্গে প্রেম করেছ। বিয়ে করনি, করবে না। ওয়ান্ডারফুল। এখানে এসে উঠবে। অনেক জায়গা এখানে। বুঝেছ? এবং আমার উপার্জন মন্দ নয়।

উনি উঠতেন তাই।

মাস ছয়েক পর। সেবার বোধহয় তৃতীয় বার উঠেছেন। দিন পাঁচেক আছেন। সেবার ঠিক মামলার জন্যে যাননি। গিয়েছেন রাজগীর, নালান্দা যাবেন বলে। মাসীকেও নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু মাসী যাননি। মাসী যাননি সরবতিয়ার জন্যে—সেটা পরে বুঝেছিলাম। যাকগে। বাবা কলে বেরিয়ে-ছিলেন; একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল—, বাবা সেইটেতে চড়ে কলে বেরুতেন। সেদিন উনিও সঙ্গে বেরিয়ে-ছিলেন। কথা ছিল কল সেরে বাবা ওঁকে নিয়ে পাটনা সিটি দেখিয়ে আনবেন। পথে গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগে গাড়ীখানার পিছনের একটা চাকা ভাঙল। সেই দিকের কোণে বসেছিলেন বাবা। বাবা বসেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত খানিকটা বেরিয়েছিল এই পর্যন্ত। হাসপাতালে নিয়ে গেল সেই অবস্থায়। অবস্থা দেখে ডাক্তারেরা বললে মারা গেছেন। সেরিব্রেল হেমারেজ হয়েছে।

বাবা রেখে যা গিছলেন তা খুব খারাপ ছিল না। বরং ভালই বলতে হবে।

উনি মানে আপনার শ্যালক আমাকে নিয়ে এসে তুলে দিলেন রত্নমালা মাসীর কাছে। আমার সঙ্গে সরবতিয়া এল।

মাসীর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল। নাকের পাশে ঠোঁটের ভঙ্গিতে এমন একটা বিষ ফুটে উঠেছিল আপনাকে কি বলব।

মাসী বলত—আমার জন্যে নয়। সরবতিয়া মাঈজীর জন্যে। কিন্তু আমার মুখে আমার চোখে নাকি তা থেকে বেশী বিষ ফুটে উঠেছিল।

মাসী আমাকে বলেছিল—ওকে ছেড়ে এদিকে এস। গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, তাও জান না? ছি-ছি-ছি। জানবে কি করে? শেখাবে কে?

তারপর ওঁকে বলেছিলেন—তুমি কি বলে ওই দ্যাট উয়োম্যানটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে বল তো? আমি ওকে ঠাঁই দিতে পারি না। উইদাউট টেকিং মাই কনসেন্ট—এ কি করলে তুমি? ও-তো একটা প্রস্টিটিউট—সরবতিয়া মা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার কাছে সে দশ বছর ছিল—বাবা তাকে গড়ে-পিটে তৈরী করেছিলেন নিজের পছন্দমত ক'রে। ইংরিজী শব্দ প্রক্ষেপ দেওয়া কথা সে মোটামুটি বুঝত। দিন সাতেক সে বহু জ্বালা, বহু উত্তাপ সহ্য করেও ছিল আমার জন্যে। সাতদিন পর সে আমাকে বললে—বেটিয়া—আমি চলে যাই-রে। তুই কাঁদিস নে। আমার জন্যে ভাবিস নে। আমাকে যা তোর বাপ দিয়ে গেছে, তাই দিয়েই চলে যাবে। বাকী দিনগুলো। আমি কাশী চলে যাবো।

তাই সে গিছল।

বাবা তাকে গয়নাই শুধু দেননি—তার নামে পাঁচ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টি-ফিকেটও কিনে দিছলেন।

মণিবউদি বলেছিলেন—আরও একটা জিনিস দিয়েছিলেন বাবা। সেটা তত্ত্ব—জীবনে একটা বিচিত্র বোধ। যে বোধে মানুষ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সরবতিয়া মাই তার ক্যাশ সার্টি-ফিকেট তার নিজের কাছে রাখত। কারুর হাতে সে দেয়নি। বাবা তাকে খানিকটা লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। হিন্দী, বাংলা দুটো ভাষাই সে বলতে পারত। লিখতে পারত' পড়তে পারত।

সুতরাং মাসীর কাছে আমাকে রেখে একলা চলরে বলে কাশী চলে যেতে কোন বাধা হয়নি। এতটুকু ভয়ও সে পায়নি। তবে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে যে কষ্ট সে পেয়েছিল—সে-কষ্ট পাবার কথা শুধু নিজের মায়ের।

(ক্রমশঃ)

আগের দিন অবহেলা করেছি, বাজার কারনি—আজকে শনিবার সারাদিন উপোস থাকতে হল। সন্তানদের নিয়ে স্ত্রী বিদেশে ঘুরছেন, আমি একা, বাড়ী খালি। সংসারের ঝঞ্ঝাট নিজে পোহান এক দুর্ভোগ! কুড়েমির দোষে রান্না হয় না, রেস্তরায় খেতে যেতেও অনিচ্ছা তাই অনেক সময় জঠরে অনাহারের খেদ ও খিদের আগুন চাপা দিতে বাধ্য হই। এই শনিবার ভেবেছিলাম সরাইখানায় পান করবো। কিন্তু রোদের ঝাঁজে বাতাস তপ্ত অগ্নিকুণ্ডের তাপমানে পৌঁছে গেল, আমারও মত বদলাতে হল! সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম বাইরে রাস্তায় উত্তাপের সম্মুখীন হওয়ার থেকে ঘরের মধ্যে ক্ষুধার আগুন সহ্য করা বরং ভাল। তবে সত্য বলতে নিজের আস্তানার মধ্যেও রক্ষা নেই। ছাদ থেকে আগুনের ঝলক নামছে, মেজেয় জ্বরের উত্তাপ, দেওয়ালের থামগুলো যেন উদ্যত অগ্নিশিখা! সর্বনাশা আগুনের হল্কায় ঘরের শমবার সব শুকিয়ে গেছে। আগুনের শিখা আগুনে মিশছে। এ দহন-কাণ্ড দ্বিগুণ ভয়ানক। দেহের উত্তাপ ঘরের উত্তাপের সঙ্গে জোট করে অসহ্য অবস্থা দাঁড় করিয়েছে। তবু নিজের ঘরে রয়েছি, স্নান করে জল ঢেলে ঠাণ্ডা হতে পারি, পরিধেয় দূরে ফেলে হাল্কা করতে পারি শরীর।

সন্ধ্যাবেলা প্রখর অগ্নিবান নিস্তেজ হয়ে এলো, উঠে পড়লাম, সেজেগুজে বের হলাম রাত্রি-ভোজের চেষ্টায়! এবার সাদা চাদরে ঢাকা, প্রাচুর্যে ভরা খাবার টেবিলের সামনে বসবো। এই চিন্তায় মন স্ফূর্তিতে ভরে উঠলো—চারদিকে তৎপর পরিচারকরা ঘুরছে, আমি নিশ্চিন্ত মনে সুস্বাদু ভোজের

গল্পটি অনুবাদ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু

গত বছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন যে দুজন কবি-সাহিত্যিক, স্যামুয়েল যোসেফ আগনন হলেন তাঁদেরই একজন। বলাবাহুল্য এর আগেও তিনি যে সব পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন তার মধ্যে ১৯৩৫ সালে হিব্রু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান বিয়ালিক পুরস্কার অন্যতম।

আগনন আজ থেকে প্রায় উন-আশি বছর আগে, ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তি-প্রিয় এই লেখক একুশ বছর বয়সেই শান্তির খোঁজে স্বদেশ ছেড়ে এলেন প্যালেস্টাইনে। কিন্তু ১৯২৪ সাল থেকেই স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করেন। তাঁর রচনার ভিত্তি হল প্যালেস্টাইনের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। হিব্রু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আগনন ইহুদী সংস্কৃতির প্রবক্তা হলেও বিশ্বমানবতাই তাঁর সাহিত্যের মূল সুর।

রসগ্রহণ করবো—যা সব অন্যে রেঁধে রেখেছে। নিজের রান্নায় প্রত্যহ নিজেকে তুষ্ট করতে হয়—তার স্বাদহীনতা আর যেন সহ্য করা যাচ্ছে না।

ফুরফুরে হাওয়া উঠছে—সব রাস্তা লোকে ভর্তি হয়ে গেল। জাফা বন্দরের

ইহুদীমহল থেকে সকলে সার বেঁধে শহরের দিকে চলেছে, বুড়োবুড়ী, ছেলে, মেয়ে সকলের বনেট টুনী, ক্যাসকেট পাগড়ী-রুমলে, দলেদলে এগোচ্ছে, মধ্যে মধ্যে মাথা ভরা একরাশ চুল বা বিরাট টাকও দেখা যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন মাথা জুটছে—রাবে কথ সড়ক বা শান্তি-সরণী—ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠা মার্গ, সাত ওয়ারিশন বা নবীর রাস্তা থেকে, তাছাড়া আরও অনেক রাস্তা বয়ে লোক চলেছে—সব পথের নাম কর্তৃপক্ষ দেবার আজও সুযোগ পান নি। রাত হয়ে এলো, সূর্যের শেষ রশ্মিও প্রায় চলে গিয়েছে।

গরমের ভয়ে সব লোক সারাদিন ঘরে বসেছিল, এখন ছুটে বেরিয়েছে—সাবাথ শেষে বায়ু সেবন করতে। ইডেন উদ্যানের শান্তির যে অবশেষ আজও জেরুশালেমের ভাগ্যে রয়ে গিয়েছে, সন্ধ্যাবেলা তার অংশ গ্রহণ করতে। আমি বিজয়-চারণ পথ পর্যন্ত জনতাকে অনুসরণ করলাম। স্রোতে ভেসে চলেছি এমন সময় এক বন্ধ জানালায় টোকা মারলে, ঘাড় ফিরিয়ে প্রফেসর জ্যাকতিল নাহমান জানলার পেছনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে ছুটলাম। মহাজ্ঞানী ইনি, আবার মিষ্টভাষীও বটে। কয়েক মুহূর্ত, আবার অন্তর্হিত হলেন, আমি তাঁর ঘরে একলা দাঁড়িয়ে। ফিরে এলেন, পরস্পর অভিবাদন করলাম আমরা—ভাবছি নতুন কথা শুনবো, তা হলো না। প্রফেসর আমার পরিবারের কুশল জানতে চাইলেন।

"আপনার প্রশ্ন শুনে নানা ভাবনা উঠেছে মনে। স্ত্রী ও সন্তানেরা এখনো বিদেশেই রয়েছেন।' 'কেন ফিরছেন না তারা? এলেই খুশি হবে।' 'তবে নানা বাধার সৃষ্টি হয়েছে' বলে পুনরায় আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। 'বাধা আবার কি? তোমার সদিচ্ছা খাটাও না, তাই এই সব।' তারপর তিরস্কারের সুরে বললেন, — 'স্ত্রী-পুত্র যে বিদেশে অনাথের মত ঘুরছে তার জন্য তোমার আলস্য ও অবহেলাই দায়ী। নিজের দোষেই তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত রয়েছো।" একথার উত্তর নেই, লজ্জায় মাথা হেট করলাম। একটু পরে উঠেছি, এবার লাঞ্ছনার কিছু শুনবো বলে প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়েছি। দেখলাম চাপা তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাঁর আধখোলা ঠোঁট দুটি কাঁপছে, সেই সম্ভ্রান্ত দাড়ি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেরই মত কাঁপছে, উঠছে পড়ছে তখনও। তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করেছি—কষ্ট হলো মনে, তবু তুচ্ছ আমার ব্যবহারেও যে তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন—এতে অন্তর স্পর্শ করলো। ভাবলাম এ দোষের প্রতিকার করতে হয়। তাঁর বইয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম। এই বইয়ের লেখক কে! সমালোচকরা সকলে একমত নন। কেউ বলছেন কোন মহাপুরুষের নির্দেশে এটি লেখা হয়েছে, জ্যাকতিল শুধু কথাগুলি বসাচ্ছেন। অতিরিক্ত কিছু নেই যাদও কিছু পড়ছে না। (প্রোফসর নিজে একথা বলেন)। বিরোধীপক্ষ বলছে, সত্য লেখক প্রফেসর নিজে—কোন মহাপুরুষের বাণী সাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন বলেন—এ ছলনামাত্র—মহাপুরুষ কেউ নেই—কখনও ছিলেন না। এই বইয়ের মূল্যায়ন এখনো করা চলে না, তবে প্রকাশের সঙ্গে বিশ্ব যে এগিয়েছে কিছুদূর তা বোঝা যায়। স্বভাব বদলেছে কতক লোকের, ভাল হয়েছে, এমন কি কেউ কেউ বইয়ের নির্দেশমতো শরীরকে সংযমের বশে এনেছেন। প্রফেসরকে খুশি করবো—বইয়ের প্রশংসা করলাম—বললাম সকলে বলে প্রধান গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি অতুলনীয়। কোন কথা না বলে জ্যাকতিল কিন্তু পেছন ফিরে চলে গেলেন। নিরর্থক কথা বলার লজ্জায় অনুতাপ করতে আমি একলা রয়েছি। তবে আমার নির্বুদ্ধিতায় জ্যাকতিল মনে কোন বিরাগ পোষণ করেন নি। প্রস্থানের চেষ্টা করছি তিনি আবার এলেন, এক তাড়া দাঁড়ান সন্ধ্যার প্রার্থনা করতে—আমিও পুন্যোহের শেষকৃত্য চুকিয়ে ডাকঘরের দিকে দৌড়লাম। বাজারের সব দোকান খুলে গেছে। চারদিকে ভিড় — সকলে দৌড়াচ্ছে। পানীয়ের দোকানের সামনে ঠেলাঠেলি। এক গ্লাস সোডা বরফ খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করতে আমারও ভাল লাগতো, তবু অবিলম্বে প্রফেসরের চিঠিগুলি রওয়ানা করার তাগিদে সে ইচ্ছা দমন করলাম, তৃষা দমন হলো, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো। স্থির করলাম সব কাজ ফেলে খেতে যাই। মুহূর্ত বাদেই মত বদলালো। খাবার আগে চিঠিগুলি ডাকে দেওয়া চাই। শেষে এই স্থির হলো, তবু আবার দ্বিধা জুটলো মনে—যদি নাহমান জানতেন আমি

"......সবগুলি রেজিস্টারী করে ডাকে ছাড়ি"

চিঠি দিয়ে আমায় অনুরোধ করলেন, সবগুলি যেন রেজিস্টারী করে ডাকে ছাড়ি। পকেটে রাখলাম চিঠিগুলো বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম—যথাবিধি এ কাজ করে—নিজেকে বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রতিপন্ন করবো।

পথে চলতে আমি এক প্রার্থনা মন্দিরে ঢুকেছি। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবছে, তখনও পুরুতে বাতি জ্বালে নি। ভক্তেরা বসে গান গাইছে, আবৃত্তি করছে বা ধীরে ধীরে সাম পাঠ করছে। বাইরে আকাশে তারার ঝিকিমিকি—ভেতরে অন্ধকার। অবশেষে চেরাগ জ্বালালো পুরুত। সকলে উঠে উপোষ করে আছি—তাহলে তিনিই জোর করতেন—যেন অবিলম্বে খেয়ে নিই—এই ভাবনা যেই মনে উঠলো আমিও আবার সরাইখানার দিকে মোড় ঘুরলাম। পথে যেতে যেতে কল্পনা জেগে উঠে নানা সুক্ষ্মজাল বিস্তার করলে—নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হলো। রোগীর ঘরের ছবি ভেসে উঠলো মনে—দেখলাম ডাঃ নাহমান ও যাদের তিনি চিঠি পাঠাচ্ছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রোগীদের ব্যবস্থাপত্র রয়েছে—পাঠাতে দেরী করা চলে না। মাটি থেকে পা তুলে আবার ছুটলাম ডাকঘরের দিকে।

দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছি—ভাবতে ভাবতে আবার থামলাম। প্রফেসর নাহমান কি

এ শহরের একমাত্র বৈদ্য? তাও যদি স্বীকার করি, তবু ঔষধগুলিতে ফল হবে তার প্রমাণ কি? আবার তাদের কার্যকারিতা মেনে নিলেও আমার খাবার সময় পেছবার পক্ষে সেটি কি উপযুক্ত কারণ বলে জানা যাবে! একবার ভাবি চব্বিশ ঘণ্টা কিছুই খাই নি, পা দুটি পাথরের মত ভারি ঠেকছে যে। শক্তিহীন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কল্পনা খেতে যেতে বাধা দিচ্ছিল, এবার যুক্তি ডাকঘরের রাস্তা রোধ করে দাঁড়াল।

নৈর্ব্যক্তিকভাবে অবস্থার পূর্ণ আলোচনা শুরু করলাম। যুক্তির দুই তুলায় বিরুদ্ধ মতামত চালান হলো। এদিকে খিদের তাগিদ বেড়ে চলেছে। অবশেষে পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল। ডাকঘরের আগেই রেস্তোরাঁয় হাজির হওয়া স্থির। ফিরে সেই দিকে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি চলেছি! যুক্তি ভাবনাকে গণ্ডগোল করার সময় দেওয়া হবে না। মনে ভাবনা, যত কাজের ত্বরায় বিঘ্ন ঘটায়। এই ফাঁকা যুক্তি দিয়ে দ্বিধা দমিয়ে সুখাদ্যের মোহিনী চিন্তায় মন ভরান হলো। মনে মনে দেখছি রেস্তরাঁয় বসে পূর্ণ তৃপ্তিতে খাচ্ছি—পান করছি। আমার মত মিতাহারীকে তৃপ্ত করতে যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত ভোজ্য কল্পনায় চিত্তপটে ফুটে উঠছে প্রত্যেক প্লেট খাদ্য স্বাদে বিচিত্র, প্রত্যেক সুরাপাত্রে অপূর্ব সু-তার। আমাকে আনন্দ দিতে কল্পনা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তবে ক্ষুধার্ত শুধু নানা খাদ্য পানীয়র কল্পনায় তৃপ্তি পায় না—সেগুলি উপভোগের সম্ভাবনা সর্বাগ্রে দরকার। যে লোক সম্পূর্ণ সজাগ তাকে (যত সুন্দরই হোক) কোন স্বপ্ন কি মোহিত করতে পারে?

সুতরাং দৌড়ে সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম। কার্ডের তালিকা থেকে নিজের জন্য বাছাইও হয়েছে। অভ্যাগত অতিথির মত সুদর্শন নানা লোকজনে পরিবেষ্টিত হয়ে সুসজ্জিত টেবিলের পাশে বসে পান-ভোজনের যে আনন্দ তার তুলনা নেই। হয়তো এখানে কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। তাহলে চটুল কথাবার্তায়, তৃপ্তিতে, মন প্রফুল্ল হবে, আত্মার অবসাদ দূর হবে। (প্রফেসর নাহমানের ব্যাপার এখনও বিবেককে পীড়া দিচ্ছে এ বাঁকার্য)। প্রফেসর! তাঁর কাছে কি অঙ্গীকার করেছি আমি? চিঠিগুলির কথা মনে হলো। যদি রেস্তোরাঁয় দেরী হয়ে যায়। তর্কের গরমে যদি ডাকঘরে যেতে ভুলে যাই। এ ব্যাপারের এখুনি হেস্তনেস্ত করতে হয়। আবার ডাকঘরে যাই এই বোঝা মন থেকে নামিয়ে তবে সুস্থির হয়ে বসব (টেবিলে), চিঠির ভাবনা থেকে রক্ষা পাব। সে সময় পায়ের তলায় মাটি যদি কেঁপে উঠতো একটুও দ্বিধা না করে তক্ষুনি কিছু করতাম। তবে মাটি একটুও নড়লো না। পূর্বের মত ডাকঘর পর্যন্ত রাস্তা পার হওয়া কষ্টকর ঠেকছে। আবর্জনার, পাথরের টুকরায় দেখছি রাস্তা ভর্তি। আবার পৌঁছলেই শুধু চলবে না।

ডাক-কর্মচারীদের তাড়া দিতে হবে। কোন কাজ তাড়াতাড়ি করা তাদের স্বভাব নয়। গড়িমসি করবে—আমার অপেক্ষা করতে হবে, এদিকে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যখন বের হয়ে আসবো, তখন কেউ গরম খাবার দিতে চাইবে না। আরও একদিন এইভাবে খিদের কাটবে। তবুও নিরুৎসাহ হলাম না। পা তুলে চললাম—আবার ডাক-ঘর। দুই রাস্তার মধ্যে একটি মানুষকে বাছতে হবেই। এক পথ ধরলে অন্যটির জন্য প্রাণ কাঁদবে। সহজে বেছে নেওয়া হয় না। নানা টাল-বাহনার পর শেষ অবধি একটি বেছে নিলে কি আনন্দ ভাবো! দায়িত্ব এড়াবার জন্য এতক্ষণ কত ভ্রান্তির আলেয়ার পেছনে ঘুরেছি। আশ্চর্য মনে হলো, আমার নীচ বাসনা কিভাবে জ্যাকভিল নাহমানের ইচ্ছার উপরে উঠে পড়েছিল। যাক, এবার কয়েকটি লম্বা পা ফেলে ডাকঘরের সামনে পৌঁছে গেলাম। ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার—রাস্তার শেষে এক ফিটন গাড়ী দেখা যাচ্ছে। সে সময় জেরুশালেমে ঘোড়া দেখা যেত না—ঘোড়ার নালও নয়। কে তাহলে দু' ঘোড়ার গাড়ী করে ঘুরছে। কৌতূহল বেড়ে চলেছে। এ চালক দেখছি লোক দেখিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে সন্তুষ্ট নয়। রাস্তায় ভিড় করে লোক হাঁটছে, তাদের উপর ঘোড়াদের ঠেলে দিচ্ছে—এত সাহস। এ এক খেলা! একি সম্ভব। মিঃ গ্রাসলারকে চিনেছি—এ যে ডিয়াস্ফোরার কৃষি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। বিদেশে ঘোড়া চড়েই সন্তুষ্ট হতেন। এখানে ইস্রায়েলে দেখছি তার গাড়ী দুটো ঘোড়ায় টানছে। সেদেশে চাষার মেয়ে বা সরল গ্রাম্যদের সঙ্গে মস্করা হতো— এখানে দেখছি সকলের সঙ্গেই রসিকতা করছেন। উচ্চবংশীয় এই গ্রাসলার মার্জিতরুচি, ব্যবহারে শিষ্ট, সভ্য—তার মেদ ও থলথলে শরীরের কথা ভুলে যেত লোকে। গ্রাসলারের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কাজে এলেই আকর্ষণ করে, বশ করে ফেলে। আমাকেও তিনি মোহিত করেছেন, এতো স্বাভাবিক। এই যে আরামে বসে ফিটনে—হাতের লাগাম যেন অবহেলায় ঘোড়ার জানু পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। বেচারী পথিকদের যন্ত্রণা গভীরভাবে উপভোগ করছেন। তিনি ঠেলে দিচ্ছেন লোক এগোচ্ছে, পেছনে সরছে-ঘুরছে-লাফাচ্ছে জন্তুদের চারদিকে—এ যে কি গণ্ডগোল কথায় বোঝান যায় না। মানুষের পায়ের সঙ্গে ঘোড়ার পা সাদ ধুলো মেখে একাকার—পাগলের মত হাসি ছুটছে—যেন এই ভাবের নির্যাতনে জনতার আমোদ বৃদ্ধিই গ্রাসলারের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ গ্রাসলারকে আমি ভাল করেই চিনি। বহু-দিন তার কাছে গিয়েছি। ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল আজ আর মনে নেই। তবে সে হয়তো সেই অতীতে—যখন সবে আমাতে অহংবোধ জেগেছে। সেইদিন থেকে বরাবরই আমার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ কখনও বিলুপ্ত হয়নি বললে অতিবাচন হবে না। তখন আমার মনে হতো সে আমাকেই বেশি চাইতো সকলের থেকে। যদিও সকলেই তাকে কম-বেশি মিত্রভাবে দেখতো। সব সময় আমাকে নিয়েই সে ব্যস্ত। সব রকম বাসনার উজ্জ্বল চরিতার্থতা তারই কাছে আমার শেখা। আবার যে অবসাদ ও বিতৃষ্ণা এই-ভাবে (চললে) শেষ অবধি আসবেই তাকে দূর করতে এবং মনকে প্রবোধ দিতে উচ্চাঙ্গ চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের আনন্দের সঙ্গে সেই আসরে পরিচয় করিয়ে দিয়ে-ছিল। বুদ্ধি তার খুব উঁচুদরের সেই জ্ঞানের অধিকার বলে অন্য সব জ্ঞানে সে সংশয় জাগাতো। অন্যসব আচার্যের শিক্ষাকে সে নৈতির পর্যায়ে নামিয়ে দিত। এর বদলে দেয় কিছুই নেই। প্রতিদানে কিছু চাইতো না—প্রশংসার মাল্য তার কাম্য ছিল না। উদার মনে জ্ঞান ছড়াতো—সে দান গ্রহণ করছে লোকে—তাই দেখে নিজেই ধন্য মনে করতো। অতীতে-যৌবনে-তখনও ইস্রায়েলে আমি আসিনি—কি নিপুণতার সঙ্গে আমাকে ভুলিয়েছিল সে—তবে একরাত্রি পর্যন্ত......যে রাতে আমার

বাড়ী পুড়লো এবং আমার যথাসর্বস্ব অগ্নি গ্রাস করলো।

সেই রাতে গ্রাসলার আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে তাস খেলছিল। প্রতিবেশী টিসুর ব্যবসায়ী, রাস্তার ধারে একতলায় সে থাকে মালপত্র নিয়ে আর আমি দোতলায় বই নিয়ে থাকি। সে রাতে গ্রাসলার খেলছে—আমার প্রতিবেশী তার অবস্থার জন্য দুঃখ জানাচ্ছে। তার এবার কোন মতে উদ্ধার নেই। কেউ তার জিনিষ চায় না। যুদ্ধের মধ্যে তৈরি সব জিনিসের মত তার টিসুও সব নকল মাল। যুদ্ধ-শান্তির পর আসল সিল্ক, লিনেন, সুতী সব বাজারে ফিরে এসেছে। কে এমন বোকা আছে বলো, যে ভাল জিনিস ফেলে নকল টিসুর পোষাক পরবে—যা কয়েক ঘন্টা পরলেই ফেটে-ছিঁড়ে যায়। গ্রাসলার জিজ্ঞাসা করলো, সবরকম আকস্মিক লোকসান ঠেকাতে বীমা করেছ তো? প্রতিবেশী উত্তর দিলে, নিশ্চয়,। কিছুক্ষণ ধরে নানা আলোচনা হলো। গ্রাসলার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, কাঠিটা এবার তোমার টিসুর গাদায় ফেল আর বীমার টাকা টেনে নাও। সেই মতে সায় দিল প্রতিবেশী। সারা বাড়ীতে আগুন লাগলো। সব থেকে বাঁচাতে বীমা করে রেখেছিলেন তিনি। সব টাকা তিনি ফেরত পেলেন। আমার বীমা করা ছিল না—সর্বনাশ হলো। অল্প যা কিছু এ বিপদ থেকে বাঁচলো তাও পরে পৌর-সংস্থার নামে মোকদ্দমা করে হারিয়ে বসলাম।

গ্রাসলার বোঝালো, আগুন নিভাতে যারা এসেছিল তাদের গাফিলতিতেই এই ক্ষতি হয়েছে। সুদশুদ্ধ ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করো মিউনিসিপ্যালিটির নামে। সে এক উৎসবের দিন ছিল। পাম্প নিয়ে নেভাতে যারা এসেছিল সব মদ ও বিয়ার খেয়ে একেবারে বেহেড। আগুন তো নেভাতে পারলো না বরং অনিপুণ খোঁচা-খুঁচিতে আগুন বেড়ে গেল। অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছিল।

সেইদিন থেকে গ্রাসলারকে এড়িয়ে চলি। বাড়ি হারিয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারিনি। তাছাড়া জ্যাকভিল নাহমানের লেখায় ডুবে আছি—ভাবলাম চিরদিনের মত গ্রাসলারকে বিসর্জন দেব। ইস্রায়েলে গিয়ে বসতি করবো মনে হয়েছে তখন। আমোদ-প্রমোদে বিরাগ জন্মেছে। যতই সেসব ছাড়ছি গ্রাসলারও আমাকে ছাড়ছে।

(ক্রমে) সমুদ্রযাত্রার দিন এলো! জাহাজে প্রথমেই গ্রাসলারের সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে একই জাহাজে চলেছে—আমি গরীব তৃতীয় শ্রেণীতে চলেছি। সে বড়-লোকের মত প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশি হলাম—বলতে পারি না। বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি—আবার ভয়ও হচ্ছে অতীতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সে আমায় না মনে করিয়ে দেয়! সেও বুঝলে, জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে অপ্রতিভ করলে না। একই জাহাজে যাচ্ছি—আমরা তবে বহুদিন ভিন্ন পথের পথিক। তাই ভাবলাম বন্দরে পৌঁছে একেবারে ছাড়া-ছাড়ি—কখনও আর দেখা হবে না দুজনে। নেমেই কিন্তু কাস্টমস থেকে মাল খালাস করার ব্যাপার উঠলো—অফিস চাইছে মাল রেজিস্টারি করে ধরে রাখবে। গ্রাসলার এবার এসে ছাড়িয়ে দিলে! পরে নানা কাজে, জেরুশালেমে স্থায়ী বসতি হবার আগে পর্যন্ত তার সাহায্য পেয়েছি—তাই দেখাশোনা আবার আরম্ভ হলো! আমি যাই মাঝে মাঝে সেও আসে আমার বাড়ি—কে বেশি আসে বলতে পারি না! তবে উত্তরোত্তর ভালো লাগছে তার সঙ্গ!

স্ত্রী বিদেশে যাবার পর প্রায়ই আমাদের দেখা হয়। আমার এখন কোন কাজ নেই, সে যখন আসে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে যায়! তার বন্ধুত্ব ক্রমশ মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে যা ঘটছে সবের খবর তার কাছে—যা ঘটবে তাও আগের থেকে সে বলতে পারে!

তবু কেমন যেন ভয় করে আমার—যেন কিছু একটা টেনে নিচে নামাচ্ছে আমাকে, তবু সাবধান হতে ইচ্ছাও হয় না!

ডাকঘরের সামনে গ্রাসলারকে ইশারা করে ডাকলাম! ফিটন থামিয়ে আমাকে পাশে উঠে বসতে নিমন্ত্রণ করলে! সঙ্গে সঙ্গে চিঠি, খিদে সব ভুলে তার সঙ্গে যাত্রা করলাম আমি। স্বীকার করবো—এসব মনে ছিল—তবে হিসেবের মধ্যে রাখিনি। গ্রাসলারের সঙ্গে কথাবার্তায় খুব আনন্দ পাচ্ছি—এমন সময় কয়েক পা দূরে দেখি চার্ফান!! গাড়ির মোড় ঘুরোতে বললাম গ্রাসলারকে! বেজায় বিরক্ত করে এই চার্ফান—মহামারীর মত এর সংসর্গে—আমার ভয়। কবে, এক ইঁদুর-ধরার নতুন ফাঁদ আবিষ্কারের পর থেকে, প্রতি হপ্তায় ২।৩ বার—চার্ফান আসে আমার বাড়ি—শুনিয়ে যায় আমাকে তার বিষয়—তার আবিষ্কার নিয়ে কোথায় কি ছাপা হলো! (হায়, আমার দুর্বল মন) একই কথা দুবার শুনতে কি কষ্ট যে হয় আমার!

ইঁদুর মানুষের ক্ষতি করছে—তাকে ধরতে যন্ত্র-আবিষ্কারে আমরা সত্যই প্রগতির পথে এগিয়েছি—সবই মানা যায়—তবু যখন চার্ফান এসে কানের কাছে কিচকিচানি শুরু করে—তখন ভাবি—এই মূষিক-শত্রুর থেকে মূষিকের সঙ্গ অনেক বেশি কাম্য।

গাড়ি না ঘুরিয়ে—গ্রাসলার কিন্তু কাছে গিয়ে—চার্ফানকে চড়ে বসতে ইশারা করলে! কি ভাবলে সে? বোধহয় আমাকে শেখাতে চাইল ধৈর্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ! অথচ আমাকে নিছক ঠাট্টা করলো—এই-ভাবে! আমি হার মানলাম না—উঠে তার হাত থেকে লাগাম কেড়ে নিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গাড়ি ঘোরাতে চাইলাম! তবে আমার তো গাড়ি হাঁকাবার অভ্যাস নেই! লাগাম নিয়ে জড়িয়ে পড়লাম! গাড়ি উল্টে-ছিটকে পড়লাম—দুজনে রাস্তায় আমি আর গ্রাসলার। চিৎকার করি—অনুনয় করছি আমাকে বাঁচাও কিন্তু সবই বৃথা! গ্রাসলার ভান করলে যেন শুনছে না—গলা ছেড়ে হাসি আরম্ভ করলে! যেন ধুলোয় লুটোপুটি খেতে খুব মজা! আমার ভয় হচ্ছে! হঠাৎ কোন মোটর গাড়ি এসে আমাদের না চাপা দেয়! তার অট্টহাসিতে আমার চিৎকার চাপা পড়ে গেল। জন্তুদের খুরের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছি আমি—দেখে সে পাগলের মত বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে হাসতে লাগলো! আমার ভয় শেষ অবধি ক্রোধে পরিণত হতে চলেছে। এমন সময় কপালগুণে এক বুড়ো গাড়োয়ান এসে আমাদের বাঁচালে।

হাড় ক'খানা সামলে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম! পায়ের তলা মাড়িয়ে গেছে—হাতের কব্জি মচকে গিয়েছে—শরীর পিষে গিয়েছে—সর্বাঙ্গে আঁচড়ের ঘা! তবু উঠে গন্তব্য পথে চললাম। যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে মনে হচ্ছে কাল থেকে কিছুই খাইনি! যেতে প্রথমে যে রেস্তোরাঁ পেলাম ঢুকে পড়লাম। খাবার ঘরে পৌঁছবার আগে ঘা সব পরিষ্কার করে হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক ব্রাশ করা হলো! স্থানটি যথার্থই সুখ্যাতির দাবি করতে পারে! এখানে বড় বড় সুসজ্জিত ঘরের চারিদিকে, ভদ্রজনের সমাবেশ দেখছি। সযত্নে তৈরি ভোজ্যসামগ্রী ও বাছাইকরা পানীয় পরিবেশনে তৎপর সেবকেরাও উপস্থিত! চারপাশ একবার দেখে নিলাম! সুপুরুষ অতিথিরা সব টেবিল জুড়ে বসেছে, খাওয়ার সঙ্গে ফুর্তির নানা গল্প-গুজব চলেছে। কয়েক সেকেন্ড আলোর তেজে অন্ধকার দেখছি—খাদ্য থেকে নিঃসৃত সুঘ্রাণে মনে হচ্ছে মূর্ছা যাব!

অবচেতনার ঝোঁকে মনে হলো প্রথমেই এক টেবিলে দৌড়ে গিয়ে সুস্বাদু কিছু তুলে মুখে পুরি!! ক্ষুধা-শান্তি করি! এর থেকে বেশি স্বাভাবিক কি হতো? তবে ভদ্রসমাবেশের খাতিরে এ মতলব ত্যাগ করতে হলো! এক টেবিলে স্থান করে বসলাম! অপেক্ষা করে আছি কখন ছোকরা এসে আমার আদেশ লিখে নেবে! নিজের অধৈর্য দমন করতে তালিকায় লেখা নিরীক্ষণ করছি। ২।৩ বার আগাগোড়া পড়লাম। মিনিটগুলি শেষ হতে চায় না! এদিকে ক্ষুধা বর্ধক জিনিস চারিধারে। ক্ষুধার্তকে এ কী প্রলোভন! প্রতি মুহূর্তে ঢোক তুলে সেবক-সেবিকার যাওয়া-আসা লক্ষ্য করছি। এদের সব রাজা-রাণীর মত বেশভূষা! মনে মনে ভাবছি, তৈরি হচ্ছি কোন ভাষায় এদের সঙ্গে কথা বলবো—কারণ যদিও ইস্রায়েলে আমরা এক জাতি তবু প্রত্যেকেই গোটা দশেক ভাষা বুঝি! এক ঘন্টা বা তার কিছু কম এইভাবে কাটলো। শেষে আমার কাছে এসে—এক ছোকরা খুব নিচু হয়ে কুর্ণিশ করে জিজ্ঞাসা করলে কি ইচ্ছা করেন স্যার! এতো জিনিসে ইচ্ছা জমে আছে যে কি বলবো জানি না! তার হাতে কার্ড দিয়ে বললাম—এ সবের যা পারো আনো! পরে ভয় হলো আমাকে চাষা না ঠাওরায় আমার কোন পছন্দ নেই—যা দেবে তাই খাবো ভাববে!

তাই সঙ্গে সঙ্গে নবাবী কায়দায় বললাম—আমার কিন্তু আস্ত ছোট গোল রুটি একখানা চাই!

ছোকরা সম্মতি জানালে বললে—সাহেব এখনি আনছি—এক্ষুনি! বসে আছি—কখন আমার পালা ও খাবার আসবে! একটু পরেই ছোকরা এলো হতে প্রকাণ্ড এক পাত্রে ভর্তি সুস্বাদু সব ভোজ্যদ্রব্য।

আমি লাফিয়ে উঠেছি—কিন্তু লোকটা টেবিলে আমার পাশে বসা লোককে পরিবেশন করতে লাগলো! যত্নে ও সাবধানে প্রত্যেক প্লেটটি যথাস্থানে রাখলে—এক মুহূর্ত রসিকতা হলো খদ্দেরের সঙ্গে—তারপরে নোট বুকে অর্ডার-করা পানীয়ের তালিকা লিখলে—শেষ করে, আমার দিকে ফিরে বললে—আপনি রুটি চেয়েছেন? ব্যস্ত হবেন না, এখনি নিয়ে আসছি—এক্ষুনি আসছি! বেশ অনেকক্ষণ বাদে হাজির হলো সে—এবার ডিশ অনেক বেশি জিনিসে ভর্তি। নিশ্চয়ই আমার জন্য এসব! সুদীর্ঘ কালের ধৈর্যের পুরস্কার আছে বৈকি! আমি লাফিয়ে উঠছি ছোকরা আমার ব্যস্ততা থামিয়ে দিলে। সাহেব, একটু ক্ষমা করুন আপনার জন্যে এখনি আসছি বলে পাশের টেবিলে প্লেটগুলো আগের মত যত্ন করেই সাজালে! আমার ইচ্ছা হলো প্রতিবেশীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাদ্য কেড়ে নিই। তবু সংযত করলাম নিজেকে। আমি যখন অন্যের খাবার কাড়ছি না, তখন অপরেও আমার কিছু নেবে না, এই ভেবে প্রবোধ দিলাম নিজেকে।

অন্যের জিনিসে হাত দিতে মানা! অপেক্ষা করলেই হবে। শীঘ্রই আমার প্রাপ্য পাবো। ঘরের সকলে যেমন পাচ্ছে! যে যার সময় পায়—এই তো সুবিচার! ছোকরাটি ফিরে এলো—এই কি সে? আমার মনে হল অন্য কেউ! এদিকে খিদেয় প্রাণ যায়—সে একই ব্যক্তি ভেবে উঠে কাছে ডাকলাম! কাছে এসে প্রকাণ্ড এক কুর্ণিশ—যেন এই প্রথম আমায় দেখলে সে! ভাবলাম—এ ছোকরা তবে কে? একেই কি খাবারের অর্ডার দিয়েছি! যদি সে না হয় তো আবার আগের থেকে শুরু করতে হবে আমায়। যদি সেই হয়—একটু তাড়া দেওয়া দরকার—ইতস্তত করছি—সে অন্তর্ধান করলে। যখন বোতল ও খাবার নিয়ে পুনরায় এলো— সেগুলি আমার ডাইনে-বাঁয়ে খদ্দেরদের জন্য। যারা আমার পরে এসেছে তারা কিন্তু খেতে, পান করতে শুরু করলো। লোক চারদিকে দৌড়চ্ছে অতিথিদের দাবী মেটাতে। আমার পরে এসেছে অথচ এর মধ্যেই সব পেয়ে গেল ওরা। কেন সকলের পিছে আমি পড়ে গেলাম? পুরো রুটি একখানা চাওয়ার জন্য নয় তো? সেটা কি এখনো পাওয়া যায়নি? বোধহয় রুটিওয়ালার কাছ থেকে পরের চালানের জন্য অপেক্ষা করছে। তিক্তভাবে নিজেকে তিরস্কার করছি কেন পুরো রুটির গোলা চাইলাম! কাটা টুকরো পেলেই তো খুশী হ'তাম। যা করেছি তার অনুশোচনায় ফল কি? এইভাবে নিজের মনে জ্বলছি। দেখলাম ছোট্ট সোনালী কেকরুটি এক ছেলের হাতে। মা আমার (চিরশান্তিতে থাকুন) তিনি ঠিক এই রকম রুটি 'পুরিম'-এর উৎসবের জন্য তৈরী করতেন! স্মরণ করে জিবে জল এলো! সেই কেকের এক কামড় পেলে আজ সারা বিশ্বের ঐশ্বর্য দিতে পারতাম—কলিজার ধুকধুকানি থেমে গেল—ছেলেটি কামড়ে চিবিয়ে গুঁড়ো ছড়িয়ে খাচ্ছে—আমি তার থেকে চোখ সরাতে পারছি না। পরিচারক আবার ডিস্ হাতে হাজির।

এবার আমি একেবারে নিঃসন্দেহ—আমার জন্য এসেছে—বসে রইলাম শান্তভাবে—শিক্ষিত লোক খাবারের উপর হুমড়ে পড়ে না! হায় সে ভোজও আমার নয় অপরের জন্য এসেছে!

কারণ খুঁজছি, বোধহয় কারবারী রুটি এখনো পাঠায় নি। এইবার স্থির করেছি—পরিচারককে ডেকে বলবো—রুটির গোলা আমার চাই না। কিন্তু উপবাসে এতদূর দুর্বল হয়েছি যে, গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হল না। হঠাৎ ঘড়ি বাজলো। জেব থেকে টেনে দেখি—সাড়ে দশটা। সবের মত একটি ক্ষণ—এত ভয় পাবার কিছু নেই। তবু কেন কাঁপুনি ধরলো আমাকে? এ কি প্রফেসরের চিঠিগুলির জন্য যা ছাড়তে এত দেরী হ'লো। ভয়ে পাগল হ'য়ে ঠিক করছি—এইক্ষণে দৌড়াই ডাকঘরে—উঠেছি, এক ছোকরার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। প্রকাণ্ড এক ডিস ভর্তি সুপের বাটি—সস্, সালাডের বোতল—প্লেটের বোঝা—কত বোতল নিয়ে চলেছে। চাকর পা পিছলে ডিস ফেলে দিলে। আবার পাত্র, বোতল নানা দিকে গড়াতে লাগলো। খাবার পানীয় মাটিতে ছড়ানো। ঘরের সব সেই দিকে ফিরে দেখছে—হয়ত বিস্ময়ে—হয়ত একটু ঠাট্টা করে—কত যে ক্ষতি হ'লে—সকলে ভাবে। কর্তা দৌড়ে এলেন, আমাকে শান্ত করে বসে বললেন—অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন, আপনার জন্য আবার সব তৈরি করে নিয়ে আসছে! এ কথায় শুভবুদ্ধির উদয় হলো—আমার খাবার আসছিল—উল্টে পড়েছে। আবার শীঘ্র তৈরী হ'বে।

সাহস পেয়ে অপেক্ষা করে আছি। মন আমার একবার রান্নাঘরে—যেখানে আমার খাবার তৈরি হ'চ্ছে, একবার ডাকঘরে—যেখানে চিঠি ছাড়ে, উড়ে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ডাকে যাবার কোন মানেই নেই—এই সময় সব জানলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ডাকঘরে, তবু ভাবনা উড়ে বেড়ায়—মায় যেখানে শরীর তাকে অনুসরণ করতে পারবে না। আমার খাবার এলো না! সময় কি এখনো হয়নি! ছোকরারা শুধু অন্য খদ্দেরদের মন জোগালে? ইতিমধ্যেই অনেক টেবিলের লোক সন্তুষ্টমনে পেট ভরিয়ে চলেছে। কেউ বা দাঁত খুঁটছে, কেউ বা হাই তুললে। নিষ্ক্রমণের পথে কেউ কেউ আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকায়, তবে বেশীর ভাগ আমায় দেখছে না যেন আমি বলে ব্যক্তিই কেউ সেখানে নেই!

শেষ খদ্দেরও চলে গেছে—রেস্তরাঁর সর্দার-চালক এসে সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে। শুধু একটা ছোট পেট্রোল বাতি জ্বলছে তখনও। টেবিলের চাদরে উচ্ছিষ্ট আর চর্বির দাগ, খালি তোতস-হাড়ের টুকরো, ফলের খোসায় উপর ভর্তি। আমি একা তখনও ভোজের অপেক্ষায় বসে রয়েছি। হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল উঠলো। গ্রাসলারের সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দেবার সময় চিঠিগুলো হারাই নি তো! পকেট খুঁজি! সবই রয়েছে—তবে কি অবস্থায়—ভাঁজে কোঁকড়ান—ভিজে গেছে—সর্বত্র কাদা ও মদের দাগ!! ঘড়ি আবার বাজলো! এ শব্দ শুনে শুনে কান এলিয়ে পড়েছে। আলোর চিমনী ধোঁয়ায় কালো—ঘর ভরে আবার নীরবতা। নীরবতার বুক চিরে চাবি ঘোরানর কর্কশ শব্দ আমার দেহে যে পেরেক ঠুকে দিলে! বুঝলাম কেউ খেয়াল করেনি—আমি ভেতরে রয়েছি—এদিকে দরজা বন্ধ হল! ভোর পর্যন্ত এইখানেই থাকতে হবে। চোখ বুজিয়ে চেষ্টা করছি ঘুমোতে—হয়ত এক মিনিট ঘুমিয়েছি। খড় খড় শব্দ হ'লো, দেখি ইঁদুর একটা টেবিলে লাফিয়ে উঠে খাচ্ছে—হাড় চিবোচ্ছে! পরে হয়ত চাদর কাটবে, চেয়ার কাটবে, শেষে উপর লাফিয়ে আমার জুতো, মোজা—ঠ্যাং, জানু হয়ত সারা শরীর খেয়ে ফেলবে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছি। মনে আশা বাজনার শব্দে আমাকে ছোঁবার আগেই ইঁদুর পালাবে। এবার একটা বিড়ালের আবির্ভাব—ভাবলাম বেঁচে গেছি! তবে ইঁদুর বেড়াল দুই অবাধে খেয়েই চললো! আলো নিভে গিয়েছে। বিড়ালের চোখ জ্বলছে—ঘরে সবুজ আলো!! ভয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলাম! শব্দে ইঁদুর বেড়াল চমকে আমাকে দেখছে! এবার গাড়ীর শব্দ, ঘোড়ার টগবগানি কানে আসছে। বুঝেছি গ্রাসলার ফিরছে—তাকে ডাকলাম, কোন উত্তর পেলাম না।

অবসন্ন হয়ে মাটিতে লম্বা হ'লাম—নিদ্রা এলো, পরে গভীর সুষুপ্তি! প্রত্যূষে দোকানে চাকরদের চেঁচামেচিতে জেগে উঠেছি! তারা সব পরিষ্কার করছে—আবর্জনা দূর করে ঘর পুনরায় সাজাচ্ছে! আমায় দেখে শিউরে উঠলো ভয়ে—এক মুহূর্ত নিশ্চল রইল সকলে। ঝাড়ু হাতে আমাকে দেখছে—তারপর হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই।

কে রে মাটিতে শুয়ে রয়েছে', একজন জিজ্ঞাসা করছে—ও'রে, সেই, যে রুটির গোলা চেয়েছিল' একজন উত্তর দিলে! আমি উঠে পড়লাম—ঘোর কেটেছে, সম্বিত ফিরেছে। পোষাক ছেঁড়া, মাথা ভার—পা চলছে না যেন পক্ষাঘাত! ঠোঁট ফেটে জ্বাল উঠছে, গলা শুকিয়ে কাট, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, বহু ঘণ্টার উপোষে মুখ টকে বিস্বাদ!! রেস্তোরাঁ ছেড়ে শহরের নানা রাস্তা পার হয়ে বাড়ী পৌঁছলাম। পথ চলছি, কিন্তু প্রোফেসর নাহমনের চিঠিগুলি ভুলি নি! রেজিস্টারী করে পাঠাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আজ রবিবার! বিশেষ জরুরী না হ'লে ডাকঘরে কাজ হয় না—রবিবারে! কর্মচারীরা বেগুলি গুরুত্বহীন বিবেচনা করবে, তাদের পক্ষে সব বন্ধ! স্নান, পরিষ্কার হয়ে, বেশভূষা করে বাজার করতে বের হলাম। স্ত্রী, পুত্ররা বিদেশে! ঘরে আমি একলা আছি!!

বারোঠাকুরের মেলা

নির্মল দত্ত

কৃষ্ণনগরের বারদোলার মেলা। বাংলা দেশের বহু মানুষের কাছেই সুপরিচিত নাম। সেই কোন্ প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এই মেলা।

বাংলার সমাজজীবনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড়। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, মেলা-উৎসব, ব্রত-অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই পালিত হ'য়ে থাকে এই ধর্মানুষ্ঠান। উৎসব উপলক্ষে মেলা—এও বাঙালীর সংস্কৃতির একটি সুন্দরতম বিকাশ। আর সমাজ ও আর্থিক জীবনে এই মেলার বিশেষ ভূমিকাও রয়েছে।

দোল পূর্ণিমার পর শুক্লা একাদশী। সেই তিথিতে বারদোল উৎসব। বারদোল উৎসব হোল বারো ঠাকুরের মেলা। এককথায় বিগ্রহ-সম্মেলন। দ্বাদশটি বিগ্রহকে একসঙ্গে দোলমঞ্চে বসানো হয় ব'লেই 'বারদোল'। আর এই বিগ্রহ-সম্মেলনকে কেন্দ্র ক'রেই হোল উৎসব। বিগ্রহগুলি নদীয়ারাজের জমিদারীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের। জমিদারী আর নেই। কিন্তু বছরান্তে একবার শুক্লা একাদশীতে ঘটা ক'রে যোগ দিতে আসেন বিগ্রহরা সম্মেলনে।

নদীয়ারাজের কুলদেবতা হচ্ছেন 'বড় নারায়ণ'। এই কুলদেবতার সঙ্গে বছরে একবার অন্যান্য বিগ্রহদের একত্রিত করার জন্যেই এই উৎসবের সূত্রপাত। তাই রাজত্ব না থাকলেও রাজবিগ্রহের সম্মান অটুটই রয়েছে। রাজবিগ্রহের সন্দর্শনে তাই অন্যান্য বিগ্রহদের আগমন। দোল-পূর্ণিমার পর শুক্লা একাদশীর শুভলগ্নে দোলমঞ্চে এসে ওঠেন বড় নারায়ণের সঙ্গে বলরাম, শ্রীগোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোটনারায়ণ, ব্রহ্মণ্যদেব, গড়ের গোপাল, গোপীনাথ, নদীয়া গোপাল, কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দদেব ও মদনগোপাল।

মদনগোপাল, বলরাম ও শ্রীগোপীমোহন বিরাহীর, গড়ের গোপাল শান্তিপুরের, গোপীনাথ অগ্রদ্বীপের, নদীয়ার গোপাল নবদ্বীপের, লক্ষ্মীকান্ত বাহিরগাছির আর কৃষ্ণরায় তেহট্টের। নদীয়ার বিভিন্ন স্থানের হলেন এই বিগ্রহগুলি।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর চক্। চকের দু'পাশ দিয়েই প্রবেশপথ। অগণিত নরনারী ঢুকছে সেই পথ দিয়ে। গাড়ী ঘোড়ারও অন্ত নেই। চকের পরেই নহবৎখানা। নহবৎখানার মাথার ওপরে লেখা—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" নহবৎখানা আর চকের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে সারি সারি সাইকেল রিক্সা, বাস আর গরুর গাড়ী। কেউ যাত্রী এনেছে—কেউ বা যাত্রীর আশা অপেক্ষমান। নহবৎখানা পেরুলেই মেলা শুরু। তবে আসল মেলা আরও বাঁদিকে। এদিকে রাজবাড়ীর পূজোমন্ডপের দোলমঞ্চে অবস্থিত বিগ্রহ দেখার পথ। মহিলা হলে নহবৎখানার পাশ দিয়ে শাখাপটির ভেতর দিয়ে চলে যেতে হবে পূজোমন্ডপের ফটকের দিকে। আর পুরুষ হ'লে সোজা চ'লে যাবেন নহবৎখানা পেছনে রেখে রাজবাড়ীর প্রধান ফটকের পথে। ফটকের সামনেই চোখে পড়বে পলাশীর যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদত্ত কামানটি। সেটি ফটকের সামনেই রয়েছে। ডান দিকে ফিরলেই পূজোমন্ডপ বা দোলমঞ্চ।

পরপর তিনদিন দেখতে পাওয়া যাবে দোলমঞ্চে বিগ্রহগুলিকে তিনটি বেশে। শুক্লা একাদশী থেকে তিন দিন। বিগ্রহগুলির বেশ বদলায় তিনদিনই। প্রথম রাজবেশ, তারপর ফুলবেশ, সব শেষদিন রাখালবেশ। সারি সারি দু'টি করে থামের মাঝে সাজানো বিগ্রহগুলি। কোন্ সেই আদিকালে পূজোমন্ডপ তৈরী হয়েছিল যেন এই উদ্দেশ্যেই। উৎসুক যাঁরা—তাঁরা হয়ত জিজ্ঞেস করবেন কৃষ্ণরায়ের পাশে শ্রীরাধার মূর্ত্তি নেই কেন? সত্যিই নেই। সে এক কাহিনী। শোনা যায়, কোনও একসময় শ্রীরাধিকার দেহ থেকে যবনজাতীয় দস্যুরা অলঙ্কারাদি অপহরণ করে নিয়ে গেলে পূজারী ব্রাহ্মণরা তাঁকে মন্দিরের কাছে এক দীঘিতে বিসর্জ্জন দিয়ে দেন। সেই থেকে কৃষ্ণরায় একক।

গোপীনাথ সম্বন্ধেও এমনি এক আখ্যান আছে। অগ্রদ্বীপের জনৈক গোপের সন্তান না হওয়ায় সে মানত করল দেবতার কাছে। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখল সে। কে যেন
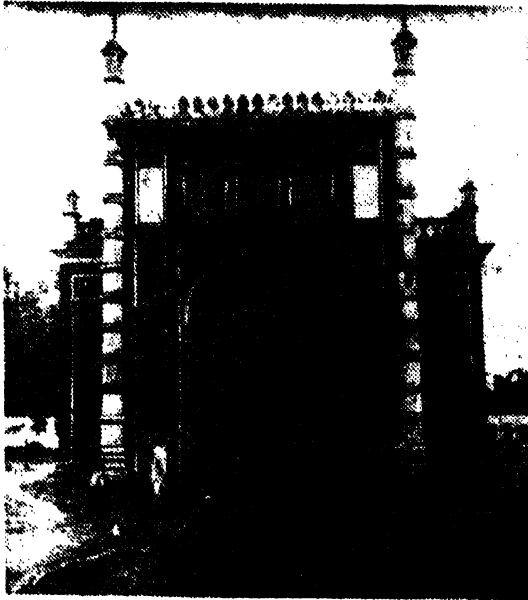
রাজবাড়ীর নহবৎখানা

উৎসবের তিনদিন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর এই পূজোমন্ডপের প্রতি দু'টি থামের মাঝে এক একটি বিগ্রহ পৃথক পৃথক দোলমঞ্চে বসেন।

তার শিয়রে ব'সে বলছে—কাল তুমি স্নান করতে গিয়ে গঙ্গার জলে একখানি পাথর পাবে। সেই পাথর এনে তা দিয়ে কৃষ্ণমূর্তি তৈরী ক'রে বিগ্রহ স্থাপন করলে পুত্র হবে তোমার। গোপন্টি ঘুম ভাঙতেই ছুটল গঙ্গার দিকে। সত্যি সত্যিই সে পেল একটি উজ্জ্বল ও নীলবর্ণ পাথর। তা দিয়ে কৃষ্ণমূর্তি তৈরী করিয়ে পুজো আরম্ভ করল। এই মূর্তিই হোল গোপীনাথ। আবার জানা যায়, অগ্রদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই গোবিন্দর সেবার জন্যে গোপীনাথ মূর্তি স্থাপন করিয়েছিলেন।

বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে কৃষ্ণনগরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই গৌরবোজ্জ্বল হয় নদীয়ার নাম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ফলে, তাঁর রাজসভায় সাধক রামপ্রসাদ, গোপালভাঁড়, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিদের ন্যায় গুণী-জ্ঞানী পন্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল। এই সময় বাঙালীর ধর্মজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে।

কৃষ্ণনগরের পূর্বনাম ছিল 'রেউই'। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরই পূর্বতন পুরুষ মহারাজ রুদ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে রেউয়ের নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। কিন্তু এরও আগের ইতিহাস আছে। নদীয়ার রাজারা আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা কান্যকুব্জ প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার পুত্র ভট্টনারায়ণের বংশজ। এঁর একাদশ পুরুষ পর্যন্ত সম্পত্তি ভোগদখল করেন মোট ৩২২ বছর। এই একাদশ পুরুষে জন্ম হয় কামদেবের। কামদেবের পুত্র বিশ্বনাথ ও বিশ্বনাথের পর রাজা কাশীনাথ। বিশ্বনাথ দিল্লী দরবার থেকে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র আর রামচন্দ্রের পুত্র দুর্গাদাস। এই দুর্গাদাসই হলেন ভবানন্দ মজুমদার। ভবানন্দ দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে কয়েকটি পরগণা লাভ করেন, সম্রাটকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার পুরস্কারস্বরূপ। ভবানন্দের পর গোপাল—গোপালের পুত্র রাঘব। রাঘবই নদীয়ার অন্তর্গত মাটিয়ারিতে ভবানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানী স্থানান্তর করেন রেউইয়ে। রাঘবের পুত্র রুদ্র। এমনি ক'রে চ'লে আসে বংশের ইতিহাস। মহারাজ রুদ্রের প্রপৌত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে বারদোল উৎসবের সূত্রপাত।

বারোঠাকুরের মেলার বিস্তার ও আকর্ষণও বড় কম নয়। প্রথম তিনদিন মেলা থাকে বেশ জমজমাট। প্রথম দিনের চেয়ে মাঝের দিনই যেন ভিড় বেশী। শেষ দিনেও কম নয়। নরনারীর বিপুল স্রোত। একেবারে ঠাসাঠাসি, ঘেষাঘেষি। তিন দিন ছাড়াও মেলা থাকে। প্রায় আরও এক মাস। তখন বিগ্রহগুলিও পুজামন্ডপ থেকে এসে থাকেন রাজবাড়ীর ঠাকুরবাড়ীতে। শেষের ভাঙা মেলায় চলে তখন কেনাকাটার পালা।
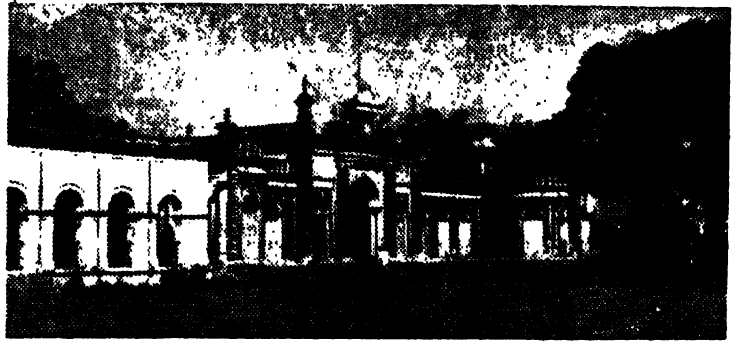
কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর প্রবেশপথ

মেলায় ঢুকে চোখে পড়বে লোহালক্করের তৈরী ঘরকন্নার জিনিষ, মাটির হাড়ি-কুড়ি, সরাই। তারপর সামনের দিকে সারি সারি খাবারের দোকান। থরে থরে সাজানো সব রং-বেরংএর খাবার! দোকানের সামনে বাঁশের খুঁটির ওপর তক্তাপাত। বেঞ্চির ওপরে, তৈরি হচ্ছে গরম গরম পরটা! ঠাকুরবাড়ীর গা বরাবর—দীঘির দিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে সারি সারি পুতুলের দোকান। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। কি ভিড় সেখানে! সব যেন জীবন্ত! মাটির চিংড়িমাছটা পর্যন্ত! মাটির বিস্কুট, বাদাম, কাঁঠাল—সব যেন আসলই মনে হয়। ওপাশে দীঘির গা-ঘেঁষে ধামা-কাঠা, পাথরের বাটি-ঘটি-থালার দোকান। এখানে মেয়ে-ক্রেতার সংখ্যাই বেশী! এ পাশে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড়। সেখানেও লোক জমেছে কিছু।

বাঁশের বাঁশী, বেলুন, লাল-কালো ফিতে বাঁশের গায়ে ঝুলিয়ে কাঁধে ক'রে ঘুরছে কেউকেউ। একেবারে পেছন দিকে জামা-কাপড়, জুতোর দোকান। আর এদিকে মণিহারী, সরবৎ-চপ-মাংস, বাদাম-পাঁপড়, পাটি-মাদুর, খেলনা, কাঠের পুতুল, বেঞ্চ-চৌকি, ফলমূল, এমন কি মায়,পাঞ্জাবী হোটেলপর্যন্ত—বাদ নেই কিছুই। সারি সারি চুড়ির দোকানে শুধু মেয়েদেরই ভিড়। মেলার প্রধান তিনদিন পুরুষদের ঢোকবার অধিকার নেই সে লাইনে। অমনি আটকাবে স্বেচ্ছাসেবকরা। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের দোকান একালের ঝিলিমিলি মেয়েদের গলার মালা বা এম্ব্রয়ডারি দোকানেও মেয়েদের ভিড়।
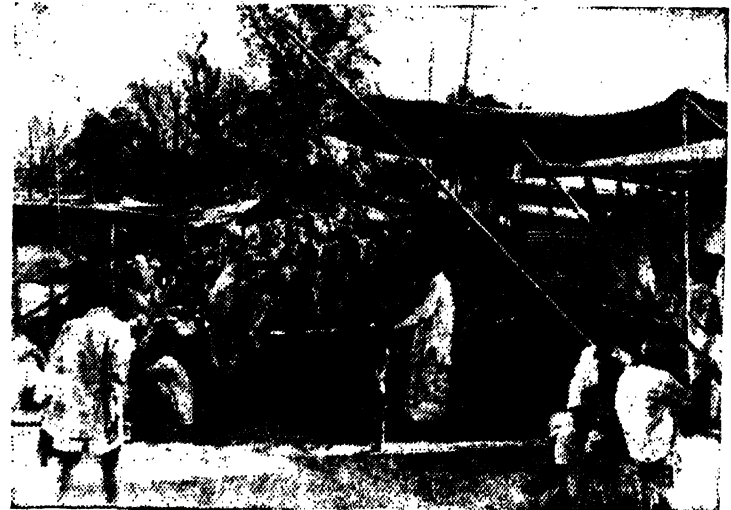
নাগরদোলা আর চরকি পাকেরও অভাব নেই। এরই পাশ ঘেঁষে সারি সারি ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন-মার্কা জন্তু-জানোয়ার, ম্যাজিক, পুতুলনাচ প্রভৃতির তাঁবু। আর তাঁবুর সামনেই মাইকে কর্ণবিদারক হিন্দী গান চলেছে অনর্গল—আর তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁবুর সামনের মঞ্চ থেকে সং সেজে হয়ত কেউ কেউ চেঁচাচ্ছে—এই যে আসুন, তিন আনা টিকিট!

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, বারদোল উৎসব কি শাস্ত্রসম্মত? বারদোল নদীয়াধিপতিরই স্বপরিকল্পিত। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই শুক্লা একাদশী তিথিতে দোল উৎসবের কথা উল্লেখ আছে। তাই নদীয়াধিপতির প্রবর্তিত এই উৎসবকে একেবারে অশাস্ত্রীয় ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বারোদোলের মেলায় একাংশ

পাঠক মৈত্রী

স্বর্গে আমার মিত্র আছে—

উপন্যাস লেখক হিসাবে ম্যাকস্ ক্যাটো তেমন সুপরিচিত নাম নয়। এদেশে তাঁর খ্যাতি পৌঁছেছে বলে জানা নেই। কিন্তু সম্প্রতি এই লেখকের একটি আশ্চর্য উপন্যাস পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। আঙ্গিক, বর্ণাভঙ্গী, লিপিকুশলতা এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে উপন্যাসটি চমকপ্রদ। উপন্যাসটির নাম "আই হ্যাভ ফ্রেন্ডস ইন হেভেন"। স্বর্গরাজ্যে মিত্র থাকার অনেক সুবিধা, বিশেষ করে মর্তলোকে যখন মিত্ররাও শত্রুর আচরণ করে থাকেন। দুষ্ট চক্রান্ত এবং বিদ্বেষ পোষণে মাটির মিত্রদের অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় আশেপাশেই পাওয়া দুর্লভ নয় যে যুগে সে যুগে দেবলোকে সহৃদয় সুহৃদ থাকা পরম সৌভাগ্য। ক্যাটোর উপন্যাসের শেষ কথা তাই—

> "He heard Sister Ursula call after him, "God go with you", and he thought, why not? It helps to have friends in heaven".

ম্যাক্স ক্যাটো ম্যানচেসটার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক, পরে লণ্ডনে এসে আঠারো মাস একটি চাকরী করার পর পুরোপুরিভাবে লেখকবৃত্তি অবলম্বন করেন। পরপর কয়েকটি নাটক সাফল্যলাভ করল, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা হল নাট্যকার হিসাবে। কিন্তু মহাযুদ্ধের কালে রয়্যাল এয়ার ফোর্সে যোগ দিতে হয়। তারপর আবার যখন বে-সামরিক জীবনে ফিরে এলেন তখন নাটকের ধারা পাল্টে গেছে। গিরিশের দশকের আঙ্গিক যুদ্ধোত্তরকালে অচল। ক্যাটো নাটক লেখা ছেড়ে দিয়ে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন, প্রথমটা সাইমন কেন্ট এই ছদ্মনামে, তারপর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন স্বনামে। উপন্যাস-গুলি জনপ্রিয় হল। সাতখানি উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি হয়েছে ক্যাটোর উপন্যাস থেকে। সংক্ষেপে লেখকের এই পরিচয়। তিনি আত্মপ্রচারবিমুখ, নিজের ছবি পর্যন্ত ছাপতে অনুমতি দেন না।

তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস "আই হ্যাভ্ ফ্রেন্ডস ইন হেভেনের" পটভূমি ইতালীর এক গ্রামে। এই উপন্যাসের নায়ক একটি বারো বছরের বালক, কাহিনীটি 'সেকস্' বিবর্জিত। এ যুগে যে 'সেকস্' বাদ দিয়েও ভালো গল্প ও উপন্যাস লেখা যায় তার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেছে যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্যে। সেই ধারা ম্যাকস্ ক্যাটোর মত কিছু শক্তিমান লেখক অনুসরণ করে চলেছেন। এবং বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন।

উপন্যাসটি অনেকদিক থেকে বিচিত্র। একটি নতুন দৃষ্টিকোণে একটি অনাথ বালকের জীবনের কয়েকটি দিন মাত্র উপন্যাসে রূপায়িত। এই কয়েকটি দিন ঘটনাবহুল, এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

উপন্যাসের প্রথম দৃশ্য আদালত কক্ষ। ইতালীর এই লোরেঞ্জো গ্রামটি এমনই দরিদ্র যে পনের দিন অন্তর সেখানে আদালত বসে, সুদূর সানকাশিমো শহর থেকে হাকিম এসে বিচার সেরে চলে যান। হাকিম লোকটি সহৃদয়, বৃত্তিতে তিনি স্কুলমাস্টার, তাই হৃদয়ে করুণা ও মমতার অভাব নেই। তাঁরই সামনে পাহারাওলা হাজির করল অনাথ বালক সীজারকে আসামী করে। শীর্ণ মার্জারের মত আকৃতি ছেলেটির, সে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে হাকিমের দিকে তাকায়, আর হাকিমও ভাবেন এ আবার কেমন আসামী। এইটুকু ছেলে কি এমন অপরাধ করল! ছেলেটার চেহারা কেমন দো-আঁশলা গোছের, খাঁটি ইতালীয় নয়। হাকিম হাতুড়ি ঠুকে যেই ঘোষণা করলেন যে আদালতের কাজ শুরু হল, তখন একটা গোলগাল লোক উঠে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে চেঁচায়—হুজুর সুবিচার চাই! লোকটির দিকে একটা শীতল দৃষ্টি মেলে হাকিম বললেন : —তাই হবে। তিনি ওকে জানতেন। লুইজী পিয়েত্রী, প্রাচীন শিল্প-দ্রব্য নিয়ে তার কারবার, লোকটা ঠক। হাকিম নিজেই একবার একটা চেয়ার কিনে ঠকেছেন। লুইজীর চীৎকারে বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন—তুমি বসো। সময় হলেই ডাক হবে। লুইজী বলে—হুজুর। আমার রক্তপাত করেছে, আমাকে খুন করেছে! হাকিম জানতে চান কে সেই আততায়ী। লুইজী চীৎকার করে বলে ওঠে—ঐ দানবটা!

হাকিম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন : ওতো দুধের বালক। ওর নাম দানব! তিনি ছেলেটির নাম জানতে চাইলেন। পাহারাওলা বলল—ওর নাম সীজার। নামগোত্রহীন সীজার, ওর জনক একজন ইংরেজ সৈনিক, মা মারা গেছেন যখন ওর বয়স পাঁচ, তাই সে নিরুপাধিক সীজার মাত্র। ছেলেটা জারজ, তাই সবাই তাকে ঘৃণা করে। এমন কি গাঁয়ের পাদ্রী সাহেবেরও নিদারুণ বিতৃষ্ণা ওর প্রতি। তিনিও আদালতে হাজির।

হাকিম বললেন—তাহলে থাকে কোথায়?

লুইজীর বাড়ির পাশে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে, তাতে আবার দুচারখানা ছবিও টাঙিয়েছে। কারিগরিকর্মে ছেলেটার মাথা পরিষ্কার। করুণাভরা কণ্ঠে হাকিম তার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না। উদাসীন ভঙ্গীতে সীজার বলে ওঠে—আমার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি সক্ষম।

হাকিম এই উক্তি সয়ে গেলেন। সীজার তখন বলল—আমার এই উক্তিতে অপরাধ নেবেন না। একথায় খুশি হলেন হাকিম। কিন্তু আজ এমন উৎকট আবহাওয়া কেন। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়। পাহারা-ওলাকে প্রশ্ন করেন—আজ ব্যাপার কি কিছু জানো? পাহারাওলা বলল—না, তবে আজ বেজায় গরম।

সীজার বলল—পাখিরা গান থামিয়ে দিয়েছে, কোনো পশুপাখির গুঞ্জন শোনা যায় না।

হাকিম তার এই উক্তিতে মাথা নেড়ে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—তোমার ধারণা একেবারে নির্ভুল।

সীজার বলল—হয়ত আমার কারাবাসের কালে এসব কাজে লাগবে, অন্তত যদি সাত বছর গারদে রাখেন।

তাই রাখব নাকি? হাকিম প্রশ্ন করেন।

সীজার সেই দীপ্ত ভঙ্গীতে জানায়—আশা করি তা হয়ত হবে না। আমার অনেক কাজ, এতটুকু সময় নষ্ট করার নেই।

হাকিম বিস্মিত হয়ে বললেন—তাই নাকি! তা এত তাড়া কিসের?

সীজার বলে, আমি এখন বারো বছরের, তেরোয় পা দেব। আমাকে তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে, আমাকে পৃথিবীতে নাম করতে হবে।

এইবার অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখলেন হাকিম। তিনি হুকুম দিলেন, ওকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে আমার সামনে নিয়ে এসো, দেখি ভালো করে।

ছেলেটা কাঠগড়া থেকে নেমে এলো। ছেঁড়াতালি দেওয়া প্যান্ট পরা। পা দুটি বেশ দৃঢ়তায় ভরা। হাকিম ভাবলেন—আমার অনুমান ঠিক। তিনি বললেন : আমি এখনও জানি না কি ভয়ঙ্কর অপরাধ তুমি করেছ!

লুইজী বলে উঠল—আঘাত ও রক্তপাত।

হাকিম এই নাটকীয়তায় বিরক্ত হন। আবার জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকান।

বাতাসে যেন বিদ্যুৎভরা। একটা পাতাও নড়ছে না। আকাশটা তামাটে।

এমন সময় সেই পাদ্রী সাহেব বলে উঠলেন—ছোঁড়াটা নাস্তিক! গির্জায় পর্যন্ত যায় না।

হাকিম বললেন—বিচার্য অপরাধটা গির্জায় না যাওয়া নিয়ে নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে যে কান্ডটা ঘটে গেল তা যেন বাইবেলের ঘটনা। মাটি কেঁপে উঠল। একটা কিসের ক্ষীণ আওয়াজ। দেওয়ালে টাঙানো গারিবল্ডির ছবির কাঁচটা ফেটে গেল, সবাই সেদিকে তাকায়। তারপর বিচার যখন শুরু হল তখন হাকিম সীজারকেই বললেন তার অপরাধ সম্পর্কে বলতে। ছেলেটি বলল—আমি নাকি স্বামার মাথাটা চুরি করেছি। লুইজী বলে—আমার মাথা। পাহারাওলা একটি মোড়ক থেকে খুলে একটা পাথরের মূর্তির অংশ বার করে দেয়, একটা ছোট তরমুজের মত আকৃতি। অনেকদিন মাটিতে পড়ে থেকে তার গায়ে একটা সুন্দর পাতলা রঙ জেগে উঠেছে। দৃষ্টিহীন সেই পৌরুষদীপ্ত মুখের দিকে তাকাতেই বিচারক মূর্তিটি চিনলেন। অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে "সীজার ইম্‌পারেটে—" শেষের অক্ষরটুকু ভেঙে গেছে। ছেলেটি জানালো পাহাড়ের ওপর ছাগল চরাবার সময় সে এই মূর্তিটা আবিষ্কার করেছে, কিভাবে পেয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। সে বলে সবচেয়ে আশ্চর্য শিহরন তার মনে জাগে যে এই নামটার অধিকারী সে—মূর্তিটাকে স্পর্শ করে একটা অপূর্ব চেতনায় সে আকুল হয়, এই মুখের সঙ্গে তার মুখেরও ত সাদৃশ্য রয়েছে। এই সময় হাকিম একবার সীজারের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যই কি কোনো সাদৃশ্য বর্তমান।

> "And then even stranger thought entered Ceaser's mind. It is me. He thought quite simply, I am the child of this man. He has lain there in the darkness, century after century, waiting patienily for my hand, my hand, only. It is me".

দৃঢ়তায় ভরা এই মুখখানির দিকে হাকিম তাকান। তাকে বাধা দিতে পারেন না, আরও শুনতে চান। সীজার এই পাথরের মুণ্ডটি তার সার্টে ঢেকে সযত্নে বুকে করে নিল। তার মনে হল তার সারা জীবনের ধারা যেন রূপান্তরিত হয়েছে। বাড়ি ফিরে এসে তার ঘরের এক কোণে সে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করে। লুইজী এই মূর্তিটি দেখে লুব্ধ হয় এবং বলে যেহেতু আমার ছাগল পাহাড়ে চরে এবং মূর্তিটি পাহাড়ে পাওয়া গেছে ঐ মূর্তির অধিকারী আমি। এই হল আইন। তার ফলে তর্কাতর্কি এবং হাতাহাতি। লুইজীকে সীজার বলে, ওটা আমার মাথা, ওর গায়ে আমার নাম লেখা। লুইজী বলে—পাগল নাকি! ও নাম একজন মস্ত সেনানায়কের। সীজার বলে—আমিও একদিন তাই হব। আদালতকক্ষে সীজার তার হতাশা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হাকিম বললেন, তোমার কাজটা হিংসাত্মক। সীজার বলে—এ জগতে আমার কেউ নেই, মাঝে মাঝে একটু হিংসাত্মক কর্ম না করলে বাঁচি কি করে?

এই সময় আবার সব কেঁপে উঠল। গির্জার ঘণ্টাটাও আপনা আপনি বেজে উঠল।

হাকিম বললেন, গির্জায় কেউ আছে? পাদ্রী সাহেব বললেন, কেউ নেই। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাই।

হাকিম মনে মনে ভাবেন ঈশ্বরের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, একটা বারো বছরের বালককে সস্তার থিয়েটারি প্যাঁচ দেখিয়ে ভীতিপ্রদর্শন করবেন। তিনি বললেন—মামলা মুলতুবী রইল। আবার আগামীকাল বিচার হবে। আজ বড় গরম।"

তিনিও জানতেন না, পাদ্রী সাহেবও নয়, যে তাঁদের জন্য আর আগামীকাল নেই, আগামীকাল তাঁরা আর এ জগতে থাকবেন না। তিনি দেখলেন ছেলেটা পাথরের মুণ্ডটির দিকে গভীর আগ্রহভরে তাকাচ্ছে। তিনি ভাবলেন, ও মূর্তিটা পরে ভালো করে দেখবো। আদালতকক্ষের এক প্রান্তেই তাঁর শয়নকক্ষ। তিনি হাতমুখ ধুয়ে মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কি ব্যঞ্জনাময় সুদৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন মুখ। পৃথিবীর পক্ষে একটি সীজারই যথেষ্ট।

কাহিনীর অংশ সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন তাই আগামী সংখ্যায় এর পরবর্তী অংশ আলোচিত হবে।

—অভয়ঙ্কর
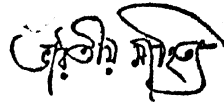
মিথিলি সাহিত্য সভা ॥

সিন্দ্রির বিদ্যাপতি পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে পৌরোহিত্য করেন শ্রী বি পি সিংহ, এম-এল-সি। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবাবুসাহেব চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপ্রবোধনারায়ণ সিংহ। পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ ঝা সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে পরিষদের বিগত বৎসরের কার্যক্রমের ইতিহাস বিবৃত করেন। অধ্যাপক বিশ্বম্ভর ঝা সকলকে মৈথিলী ভাষাকে সেবার জন্য আহ্বান জানান। ধানবাদের শ্রী বি এন দাস মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং প্রসঙ্গত মৈথিলী-ভাষীদের মিথিলার সাহিত্যকে আরও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নেবার জন্য আহ্বান জানান। সর্বশ্রী রতিকান্ত ঝা, জ্ঞানেন্দ্র ঝা, রাজেন্দ্র ঝা, বালকৃষ্ণ ঝা, দেবেন্দ্র মিশ্র, এস এন চৌধুরী, দীননাথ ঝা প্রমুখ ব্যক্তিরা বিদ্যাপতি এবং মৈথিলি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন শ্রীজয়দেব ঝা। তিনি মৈথিলি তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীমতী রামকলা ঝা।

পুস্তক প্রদর্শনী ॥

দীর্ঘ আট বৎসর পর এবার আবার হাওড়া জেলা পাঠাগারে একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এতে পুস্তক প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোস্যাল এডুকেশন বিভাগ সাহায্য করছেন। সোস্যাল এডুকেশনের চীফ ইনস্পেকটর শ্রীঅমিয় সেন গত ৬ মে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

শঙ্কর কুরুপের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ॥

মালয়ালাম কবি শ্রীশঙ্কর কুরুপ ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ-বছর তিনি যে-গ্রন্থের জন্য 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন, তার নাম 'ওটাক্কুজল' (বাঁশি)। ১৯৫০ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং ৫৮টি কবিতা এতে সংকলিত হয়। সম্প্রতি ডঃ ভি শি মেনন এই গ্রন্থ থেকে ১৪টি নির্বাচিত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই চৌদ্দটি কবিতার দাম দশ টাকা।

এর আগে শ্রীকুরুপের কবিতার উপর একাধিক আলোচনা এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এখানে আলোচ্য অনূদিত 'কবিতাগুলির সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথম কবিতাটির নাম 'আজ আমি ঃ কাল তুমি'। এতে মৃত্যুর রহস্য প্রতিভাত হয়েছে। 'কফিনে'র বিবর্ণ চেহারা দেখে কবির মনে হয়েছে—

> "নক্ষত্রের মিট মিট আলোতে
> প্রতিভাত সেই ভয়
> এখনও আলোড়িত।"

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর কথা থাকলেই 'ভয়'র রহস্যকেই যেন কবি ফুটিয়ে তুলতে চান। 'সূর্যমুখী' কবিতাটি এই গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং শ্রীকুরুপেরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এখানে সাংকেতিক অর্থে ভালবাসার মহান দিকটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ফুল ফুটছে। এবং কে

মুহূর্তে তার সমস্ত মাধুরী নিয়ে প্রতিভাত হতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণ বাতাসে গেল হারিয়ে। অনিবার্য মৃত্যুর পদধ্বনি যেন সে শুনতে পেলো এবং সূর্যমুখী মৃত্যুর সংকেতে জানাল।

"And then, seeing my face
He might suddenly turn pale
And slowly wiping his eyes
With a blue cloud
Well might he lament:
"Ah! had I not met
That bashful flower!
Had we not loved so dearly."

'জিজ্ঞাসা' কবিতাটিও এই গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা। এতদিন শ্রীকুরূপের নামই শোনা যাচ্ছিল। এই অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার ফলে তাঁর কবিতার স্বাদ আস্বাদন করার পথ সহজতর হয়ে উঠবে আশা করি। ভবিষ্যতে শ্রীকুরূপের সমস্ত কবিতার এবং অন্ততপক্ষে আরও বেশি কবিতার অনুবাদ প্রত্যাশা করছি।

কাশ্মিরী সাহিত্যের ইতিহাস ॥

কাশ্মীরি সাহিত্য ও তার পরিবর্তনশীলতার ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেকেরই। বেশ কিছুকাল ধরেই এ-বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য এ কে বাহাদুর ব্যাপৃত আছেন। বহু পরিশ্রমের পর ১৯৬৫ সালে এর প্রথম খণ্ডটি বেরিয়েছিল। আগামী বছরের মধ্যে এর দ্বিতীয় খণ্ডটি বেরুবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই ইতিহাস-গ্রন্থটিকে শ্রীবাহাদুর তিনটি খণ্ডে শেষ করবেন বলে জানা গেছে। প্রথম খণ্ডে কাশ্মীরি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। কাশ্মীরি ভাষার প্রাচীন রূপটি সে-সময়কার শ্রেষ্ঠ গবেষকদের আলোচনা থেকে উদ্ধৃতিসহকারে লেখক প্রমাণ করেছেন। এমনকি ভাষার ইতিহাসের এই 'কাল' সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যগুলিও অত্যন্ত জরুরী।

দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে ১২০০ থেকে ১৫৫৫ শতকের সাড়ে তিনশ' বছরের ইতিহাস। এই যুগটি কাশ্মীরি সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান। এ-সময়েই লালেশ্বরী এবং নন্দঋষির মতো শ্রেষ্ঠ লেখককে পাওয়া যায়। সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক জয়নুল আবেদিনও এই সময়কার।

তৃতীয় খণ্ডে ১৫৫৫ থেকে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনা করা হবে বলে জানা যায়। এই সময়টিকে বলা হয় কাশ্মীরি সাহিত্যের 'মধ্যমকাল' বা মধ্যযুগ। এ-সময়ে 'ওয়াৎসুন' নামে এক বিচিত্র কাশ্মীরি গীতিকবিতার উদ্ভব হয়। হাবা খাতুন এবং আরেনিমাল নামে এ-সময়ের দু'জন শ্রেষ্ঠ মহিলা কবির জীবন ও সাহিত্য নিয়ে লেখক আলোচনা করবেন। এছাড়া হবিবুল্লা নওশেহ্রি, জুমা বিবি, সাহিব কাউল, রূপ ভবানী, নন্দ দর এবং অন্দ আকমল প্রভৃতি কবিদের আলোচনা স্থান পাবে বলে জানা যায়।
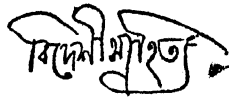
জাঁ জেনের সাম্প্রতিক উপন্যাস ॥

সম্প্রতি জাঁ জেনের একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। বইটির নাম 'টু হর্সমেন অব দি স্টর্ম।' ফরাসী দেশের পাঠক মহলে বইটি আবার আলোড়ন তুলেছে। 'এটি একটি সাংঘাতিক বিভীষিকার কাহিনী'—বলেন জনৈক ইংরেজ সমালোচক। ইতিপূর্বে 'দি হাসার অন দি রুফ' উপন্যাসটিতেও জেনে অনুরূপ বিভীষিকার কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই পরিপূরক বলে জানা গেছে। জেনের সেই শিচত্র ভাষা ব্যবহারও বর্তমান গ্রন্থটির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত বাস্তবতাবোধ কাহিনীর স্বাভাবিক গতিকে কিছুটা ব্যাহত করলেও প্রকৃতি বর্ণনায় লেখকের কাব্যিক শ্রুতি পাঠকদের বিমোহিত করবে।

ডোনাল্ড ডেভির কাব্যগ্রন্থ ॥

ডোনাল্ড ডেভি বৃটেনের বর্তমান দশকের একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কবি। ১৯৬১ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নিউ অ্যান্ড সিলেক্টেড পোয়েমস্' প্রকাশিত হয়। তাঁর হালের কাব্য-গ্রন্থটির নাম 'ইভেন্টস্ অ্যান্ড উইজ্ডমস্'। নর্মান ফ্রিডম্যান ডেভির প্রথম কাব্য-গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে উক্তি করেছিলেন—'ওয়র্স...ফরমাল পোয়েট্রি'। কিন্তু হালের কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, ডেভির কাব্য-মনস্কতা এতে পরিবর্তনশীল ও পরিণত। সমালোচক জেমস্ টিউলিপ মনে করেন যে, আমেরিকান কবিদের মতো তিনি ফর্মাল নন: বর্তমান কাব্য-গ্রন্থটির এর অভিনবত্বের গুণে পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

রুমানিয়ায় বিদেশী গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ॥

আজকের রুমানিয়ায় বিদেশী সাহিত্যের চাহিদা যেভাবে দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, তা ভাবতে গেলে বেশ তাজ্জব মনে হতে হয়। বর্তমানে সেখানে প্রায় পনেরোটি প্রকাশক সংস্থা জনপ্রিয় বিদেশী লেখকদের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের মধ্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, আঁদ্রে মরিস্, জে বি প্রিস্টলে এবং জন স্টেইনবেক, রুমানিয়ায় প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। ব্রেখট্ এডিসনের ৮০,০০০ হাজার বই একদিনের মধ্যে বিক্রী হয়ে যাওয়ার রেকর্ডও উল্লেখযোগ্য। টমাস মান-এর একটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রকাশ।

পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ১৯৬৬ সালে বুখারেস্টে যে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, তা রুমানিয়ার সাহিত্যপিপাসুদের আরো আগ্রহী করে তোলে এবং এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য যে সাফল্যলাভ করেছে, তার প্রমাণ পশ্চিমী সাহিত্যের জন্য এদের অপরিসীম আগ্রহ। রুমানিয়ার স্বল্পায়তন জার্মানভাষী অঞ্চলে জেমস্ জয়েস, ফ্রানজ কাফ্কা, গাস্থার গ্রাস প্রভৃতি লেখকরা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর ফলে জার্মান সাহিত্যের প্রতিও তাঁরা অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। জার্মানীর হেইনরিখ্ বেল্, হ্যান্স ম্যাগনাস্ এনজেনস্ বার্জার, অ্যালফ্রেড অ্যানড্রেথ প্রভৃতি লেখকও সেখানে দারুণ জনপ্রিয়।

কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান ও রেকর্ডে কবিকণ্ঠ ॥

কবিতাকে জনপ্রিয় করা, সাধারণ ও সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনের কাছাকাছি অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য নানারকম চেষ্টাই আজ প্রায় একযুগ ধরে চলেছে। কবিতার কাগজ বা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ছাড়াও কবিতা পাঠের আসর তাই আজকাল হামেশাই হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, ইদানীং কবিকণ্ঠকে রেকর্ড-যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচারিত করার পরিকল্পনাও দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কিন্তু একটি সমগ্র কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানকে রেকর্ড মাধ্যমে যন্ত্রস্থ করার ঘটনা বোধহয় এই প্রথম। এই অসম্ভব ও দুরূহ কাজটি সম্পাদনা করেছেন আমেরিকার একটি নব-প্রতিষ্ঠিত কবিতা-সংসদ 'নিউ ওয়েভ পোয়েট্রি সোসাইটি।' এর উদ্যোক্তা ডঃ এইচ ম্যাক্সওয়েল বলেন : 'কবিতার আসরকে জনপ্রিয় করতে পারলেই কবিতা মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারবে।' নবীন, প্রবীণ ও তরুণতর কবিরা অনেকেই এ-আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন। কবিরা সংখ্যায় ছিলেন মোট ষোলোজন। একটি বা দুটির বেশী কবিতা পড়া হয়নি। ডঃ ম্যাক্সওয়েল এই রেকর্ডগুলি খুব স্বল্প দামে বাজারে ছাড়ার পক্ষপাতী, কেননা তার ফলে কবিতার প্রতি আগ্রহ অনেকটা বেড়ে যাবে। জেমস্ রিট্, যার্ড লিলি, পিটার পোর্টার, সিলভিয়া উইলকিনসন, ওয়াটকিন্স, ডম মরেস্, ডরোথি কার, ডোনাল্ড ডেভি, লুই সিম্পসন প্রভৃতি কবি এতে অংশগ্রহণ করেন।
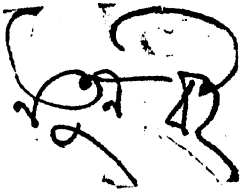
লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ

বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ রচনায় ব্রতী আছেন প্রসিদ্ধ লোকসাহিত্য গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' নামক বাংলা লোকসঙ্গীতের কোষ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে 'জ—ন' অন্তর্ভুক্ত। জ—ন' আদ্যাক্ষরবিশিষ্ট লোকসঙ্গীতগুলি এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। পরিকল্পনানুসারে আরো দুটি খণ্ড প্রকাশিত হলে এই কার্যটি সম্পূর্ণ হবে। আলোচ্য খণ্ডটিতে লোকপ্রিয় ঝুমুর সঙ্গীতের সংগ্রহ প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজে ঝুমুর গান অতিশয় লোকপ্রিয়। ঝুমুর গান বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে পাঁচালী গান, পালা গান প্রভৃতির সঙ্গে সমশ্রেণীতে আসনলাভের মর্যাদা পেয়েছে। এই গানগুলির সুর যেমন বিচিত্র, কথাও তেমনই অপরূপ। অতি সহজ এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে গানগুলি রচিত। লেখক বিষয় এবং বৈচিত্র্য অনুসারে গানগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। ঝুমুর শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইভাবেই ঝুমুরকে গ্রহণ করা হয়েছে। সুচিন্তিত ভূমিকায় ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"বাংলার সঙ্গীতসাধনায় ঝুমুরের একটি বিশেষ স্থান আছে, সে সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্যক অবহিত হইতে পারি নাই। মধ্যযুগে যে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার উৎস এবং পরিণতি সন্ধান করিতে গেলে ঝুমুরের মধ্যেই তাহা সম্ভব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর যে একটি লৌকিক ধারা প্রচলিত ছিল, তাহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার প্রচলিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নামক গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারা যায়। একটি ধারা অনুসরণ করিয়াই 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহা অনুসরণ করিয়াই পদাবলী সাহিত্য রচনার যুগেও 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র ঐতিহ্য অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহা ঝুমুর গানগুলি হইতেই জানিতে পারা যাইবে।"

অযোধ্যা পাহাড়-পুরুলিয়া, সারগাছি-মুর্শিদাবাদ, বাঁশবেড়িয়া-মেদিনীপুর, বেল-পাহাড়ী-মেদিনীপুর, হাতিবাড়ি-মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন কালে সংগ্রহশিবির স্থাপনা করে ডঃ ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লোক-সাহিত্য শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এই বিপুল-সংখ্যক গান সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া প্রচলিত অন্যবিধ উপকরণও তিনি সংগ্রহ করেছেন।

বাংলাদেশের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জীবনে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তার অভিব্যক্তি ঝুমুর গানে প্রকাশিত। জনসাধারণের হাতে পুরাণের কাহিনী একটা নতুন আকৃতি লাভ করেছে, সরল হয়েছে এবং স্বাভাবিকত্ব লাভ করেছে। লেখক বলেছেন—'ইহাদিগকে তাহারা নিজেদের মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে।'

গানগুলির মধ্যে জন্মকালীন সঙ্গীত, জলভরার সঙ্গীত, জাগরণী গান, জেলের গান, জোলার গান, জারি গান ইত্যাদি যেমন পাওয়া যায় তেমনই আবার ঝুমুর গানে সমগ্র কৃষ্ণলীলাও পাওয়া যায়। 'ঝ' অংশে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের গান আছে, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, মানভঞ্জন, কলহান্তরিতা, নৌকাবিলাস, বালকসজ্জা-বিপ্রলব্ধা, বিরহ খণ্ডিতা, ইত্যাদি সামগ্রিক-ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। টপ্পা, টুসু, ঢাড়গান, ঢপকীর্তন, ঢপযাত্রার গান, ত্রিনাথের গান, ত্রিনাথের পাঁচালী, দক্ষিণ রায়ের গান। দধিমঙ্গলের গান, দেহতত্ত্বের গান। নৌকাবিলাস, নেটোগান, নীলপূজার গান, দুর্গাপূজার গান, দেহতত্ত্বের গান প্রভৃতি কিছুই প্রায় বাদ পড়েনি। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করে ডঃ ভট্টাচার্য বাংলা-সাহিত্যের একটি অভাব পূরণ করেছেন। প্রথম খণ্ডটির মত দ্বিতীয় খণ্ডটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করবে আশা করা যায়। তেত্রিশ ফর্মার এই বিরাট গ্রন্থের দাম ছ' টাকা বেশ সুলভ বলা চলে।

বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর (কোষগ্রন্থ—২য় খণ্ড)—আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ৩২, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা—৩৪। দাম—ছ' টাকা মাত্র। পরিবেশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা।

ভিন্ন স্বাদের রচনা

ইবনে ইমামের 'মীনাবাজার'এর পটভূমি হোল মধ্যপ্রাচ্যের এক মধু-অধ্যুষিত নগরাঞ্চল। চড়া সুরে গ্রন্থের আরম্ভ, সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থেকেছে সেই সুরটি। বিচিত্র পরিবেশ ও মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা মিলে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে, তার মধ্যমণি দুজন বিদেশী। একজন ভারতীয় অপরজন ইউ-রোপীয়। জনসন সাহেবের ইতিহাস-প্রীতি এবং কয়েকজন আরবের চরম বিরুদ্ধতা কাহিনীর আবহাওয়াকে করে তুলেছে রোম-হর্ষক। বিচিত্রচরিত্র মহম্মদ আলী, বেয়াজিদ, মহম্মদ ইব্রাহিম, আবদার রহমান, ঘোমটা পরা আরব মেয়ে আমিনা, আব্বাস আলীর যে রূপ তুলে ধরা হয়েছে, তা মনকে বিস্মিত করে। মরুভূমির মধ্যে পুরাবস্তু সংগ্রহ করতে গিয়ে জনসন সাহেব যে বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং কয়েকটি আরব জাতির দুর্ধর্ষ জীবন, পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঈর্ষা, খুন ও ভয়ংকর দ্বন্দ্ব গ্রন্থের অন্তিম পরিবেশকে করে তুলেছে চরম আকর্ষণীয়।

এই গ্রন্থখানি উপন্যাস নয়, ভ্রমণ-কাহিনীও নয়। ইবনে ইমাম যে নতুন জগতের সন্ধান বাঙলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা সমাদৃত হবে নিশ্চয়ই। গ্রন্থকার নিপুণ মুন্সীয়ানার সঙ্গে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে তাঁকে আরো সচেতন হতে হবে। শব্দবিন্যাস সুষ্ঠু না হলে 'বেলে লেটার্স'-ধর্মী এই ধরণের রচনা পুরোপুরি মন ভরাতে পারে না। রচনাও ঝরঝরে বা তীক্ষ্ণও হয় না। গ্রন্থকার যদি এবিষয়ে সচেতন হন তাহলে লেখক হিসাবে আত্মবিকাশের পথ আরও সুগম হবে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ।

মীনাবাজার (রম্যরচনা)—ইবনে ইমাম। ৮৮, বিধান সরণী। কলকাতা—৪। দাম সাত টাকা।

নতুন ধরণের নাটক

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'সুইসাইড' নাটকটি রচনা করেছেন সাংবাদিক সহকর্মী-দের অভিনয়ের জন্য। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রকেই বেশ সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। ঘটনা-বিন্যাসে এবং সংলাপের উপযুক্ত ব্যবহারে নাটকখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। হাস্যরসের মধুর সমাবেশে নাটকের আবেদন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নাট্যকার বর্তমান সমাজকে বিদ্রূপ করেছেন, আর প্রেমের সুন্দর পরিণতি নিয়ে অনাবিল রসিকতায় নিজেও মেতেছেন, অপরকেও মাতিয়েছেন। সেই সঙ্গে বর্তমানে চোরাকারবারী এবং কালোবাজারীদের প্রভাব ও ভেজালের দৌরাত্ম্য নাট্যকারকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে,

তিনি এসম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। ভাবনার দায়িত্বটা অবশ্য আমাদের সকলের।

রসস্নিগ্ধ এরকম একখানি নাটকের সকলেই সমাদর করবেন। অফিস-ক্লাবে অভিনয়ের পক্ষে নাটকটি বেশ যুতসই। এজন্য নাট্যকার সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন।

সুইসাইড (নাটক) **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। অরুণিমা পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১। দাম ১·৭৫।**

সহজ সুরের কবিতা

আধুনিক কবিতাকে যাঁরা এখনো সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, তাঁদের কাছে 'বাউরি বাতাস' গ্রন্থটি নিঃসন্দেহেই ভালো লাগবে। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই খুব সরল এবং স্পষ্টভাবে কবি উচ্চারণ করেছেন, ফলে 'বাউরী বাতাসে'র বেশির ভাগ লেখাই এক ঝলকে বুঝে ফেলা যায়, চিন্তা-ভাবনার কোন দরকার হয় না। অর্থাৎ আধুনিক কবিতার সঙ্গে এই গ্রন্থের লেখাগুলোর ফারাক দুস্তর—তা বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি থেকে শুরু করে প্রায় সর্বদিক দিয়েই। পরিক্রমা, প্রাপ্তি, রূপনদীতে, জীবনদেবতা উপেক্ষিত, সান্নিধ্যে, রূপায়ণ, দীঘা, বাউরী বাতাস কবিতাগুলো ভালো। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

●

অন্যান্য অনেকের মতো সুদর্শন সাহার কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাবল্য বেশ স্পষ্ট। প্রেম ও যৌবনোচ্ছ্বাস তাঁর কবিতায় বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে। কবি যখন বলেন 'প্রেম ভিন্ন এ-জীবন অর্থহীন ভেবে। যে কিশোর চলে যায় সমুদ্র সৈকতে/তাকে আমি কি বলে ফেরাই' (তুমি) তখন আত্মমগ্ন কবির রূপটি আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারি। আর এজন্যই 'উক্তি', 'কুড়ালের শব্দ', 'মৃত রমণীরা' প্রভৃতি কবিতাগুলি সুপাঠ্য। কোন অনুভূতির অনুশাসনে কবি বাঁধা পড়েননি।

শ্রীসুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায় 'চেরী' কাব্যের প্রারম্ভে বলেছেন, 'আমি যেন হতে পারি, আমারই দরিতার, অনাবিল নিরুদ্দেশ হাসি'। কামনা তিনি ঠিকই করেছেন কিন্তু এই অনাবিল হাসির ছোঁয়াটুকু পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারেননি। তবুও স্থানে স্থানে কবির দক্ষতা বেশ সুন্দরভাবে উপস্থিত। ভাবের দ্যোতনায় কবির ব্যর্থতা আমাদের পীড়িত করে।

বাউরী বাতাস (কাব্যগ্রন্থ) **: প্রশান্ত চৌধুরী, ১৩৯, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৪। দাম : তিন টাকা:**

●

অনভিজাত (কাব্য) — **সুদর্শন সাহা। পাক্ষিক কবিতা প্রকাশনী। ১৪।৫ পঞ্চাননতলা রোড। কলকাতা—১৯। দাম তিন টাকা।**

●

চেরী (কাব্য) — **সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়। বিদ্যুৎকুমার হালদার প্রকাশিত। বর্ণনাগার। ৪৭, হালদারপাড়া লেন। কলকাতা—২৬। দাম দু-টাকা।**

একটি সাংঘাতিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার

হঠাৎ হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে মৃত্যু সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাংঘাতিক ব্যাধিতে আমাদের দেশের কয়েকজন মনীষী ও জননেতাকে আমরা অকালে হারিয়েছি। বিদেশেরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ব্যাধিতে হঠাৎ মারা গেছেন। সাধারণত এই ব্যাধি 'করোনারী থ্রম্বসিস' নামে প্রচলিত, কিন্তু ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র এই ব্যাধিকে 'করোনারী অকলুশন' নামে অভিহিত করেন। তিনি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, স্নেহঘটিত পুষ্টিকর খাদ্য এবং আধুনিক সভ্যতার ক্লেদস্বরূপ রাজনীতি ও শিক্ষাবৃত্তিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যাধির কারণ। তিনি এই পুস্তিকায় করোনারী থ্রম্বসিস ও করোনারী অক্লুশনের পার্থক্যও দেখিয়েছেন। অক্লুশনের দশটি কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রই এই পুস্তিকা পাঠে উপকৃত হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এই মূল্যবান পুস্তিকাটি প্রকাশ করায় ধন্যবাদার্হ।

করোনারী অকলুশন (আলোচনা) **: ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।**

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের ২১তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক-পত্রিকাটি বিভিন্ন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। এই সুমুদ্রিত স্মিতশ্রী সংকলনটিতে লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, স্বামী অভেদানন্দ, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, অজয় বসু, শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় রাণা বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কণপ্রভা ভাদুড়ী এবং আরো কয়েকজন।

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার—সম্পাদক : অনিলকুমার বসু, **২৬।৮এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯।**

●

নতুন সাহিত্য ত্রিমাসিক নীরাজনার প্রথম সংখ্যাটিতে লিখেছেন নীরেন্দ্র গুপ্ত, সতীশচন্দ্র মাইকাপ, প্রণয় গোস্বামী, সুনীল জানা, বলরাম বসাক এবং আরো অনেকে। পাণ্ডুলিপি পরিচয় বিভাগটি আকর্ষণীয়।

নীরাজনা (১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা) সম্পাদক **: প্রিয়লাল মৌলিক, ৩৫সি, মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা-২৯। দাম : এক টাকা।**

●

'সপ্তদ্বীপা'র বর্তমান সংকলনে লিখেছেন জীবনময় দত্ত, মলয় রায়চৌধুরী, শিবনাথ রায়, মহাবীর নন্দী, সমীর সেনগুপ্ত, রবীন দত্ত, সুশীলকুমার বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

সপ্তদ্বীপা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) সম্পাদক **:** রবীন দত্ত, ৪১১।এ, নবকিশোর রোড, পাটনা, দাম : ৫০ পয়সা।

সীমান্ত কবিতা পত্রটি বাংলা লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যে সব কবিতা এবং কবিতা-আলোচনা এই পত্রিকাটিতে প্রকাশ করা হয় তার পিছনে একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা বর্তমান। এলোমেলো রচনা প্রকাশ না করে এই ধরনের বিশেষ রচনা আধুনিককালে অতিশয় মূল্যবান। এই সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন মণীন্দ্র রায়—বাংলা কবিতা ও ষাটের কবি। বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ, এ ছাড়া আলোচনা অংশে 'কাব্য সমালোচনা ও একালের বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে' আলোচনা করেছেন—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায়, আশিস সান্যাল, মণীন্দ্র রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিবৃন্দ। কবিতা লিখেছেন—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায়, তরুণ সান্যাল, প্রসূন বসু, মৃণাল দত্ত, শিবশম্ভু পাল, চিন্ময় গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। অলোক রায় লিখিত 'আধুনিক কবিতা ও ছন্দ প্রসঙ্গে' নামক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য।

সীমান্ত পত্রিকাটির সর্বাঙ্গসুন্দর সম্পাদনার জন্য সম্পাদকদ্বয় অভিনন্দনযোগ্য।

সীমান্ত—(কবিতা, ত্রৈমাসিক) — **চতুর্থ** সংকলন—চৈত্র, ১৩৭৩, **সম্পাদক—** তরুণ সান্যাল। **প্রসূন বসু। দাম—** একটাকা মাত্র।

(৬)

এই ছবিটা? এটা নেলির হস্তশিল্প—আমার স্ত্রীর কথা বলছি।......ভালো? মশাই, আমি সে-রকম লোক নই যে আপনি আজ আমার বাড়িতে অতিথি ব'লেই আপনার মুখে স্তোক শুনতে চাইবো। খোলাখুলি কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে। আমাকে দেখে চলনসই গোছের রুচিবান লোক ব'লে মনে হচ্ছে, অথচ এই ছবি ঝুলিয়ে রেখেছি কেন খাবার ঘরে—এই তো আপনার মনের কথা? তা মশাই, নেলি মারা যাবার পরে একটু কষ্ট হ'লো ওর জন্যে, ওর আঁকা গাদা-গাদা ছবি থেকে এই একটা বের ক'রে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখলুম। স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে। অন্যগুলো প'ড়ে আছে কোথাও, ধুলোর জিনিশ ধুলোয় ফিরে যাচ্ছে।...না, উটকামণ্ড নয় জব্বলপুরের দৃশ্য এটা। সেখানকার বন-জঙ্গল ঝর্না ইত্যাদি দেখার ফলে নেলির স্কন্ধে চিত্র-সরস্বতী ভর করলেন। সকালে দুপুরে ছবি আঁকে ব'সে-ব'সে, কেউ-কেউ বেড়াতে এসে তারিফও করে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই নেলির, বার-বার আমার মত জানতে চায়। একটা নির্দোষ আমোদ ভেবে আমি অনেকদিন চুপচাপ ছিলুম, কিন্তু যখন দেখলুম নেলির প্রায় ধারণা হ'য়ে গেছে সে ছবি আঁকতে পারে, তখন এক-দিন বলতে বাধ্য হলাম, 'এসব দৃশ্য তো তৈরিই আছে, এগুলো আবার আঁকছো কেন?' 'মানে?' 'মানে হ'লো—তোমার ছবিতে পাহাড়টা পাহাড়ই, ঝর্নাটা ঝর্না, অন্য কিছু নয়, তুমি নতুন কিছু যোগ করোনি।' ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়, বুঝতে পর্যন্ত পারে না কী বলছি—হাঃ! প্যাস্টেল ছেড়ে পিয়ানো ধরলো এর পরে, সামনে স্বরলিপি রেখে কসরৎ ক'রে রোজ, একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের কাছে নতুন গৎ তুলে নেয় মাঝে-মাঝে—আমাকে আবার শোনাতেও চায়। ছবিটা তবু নীরব থাকে মশাই, চোখ দুটোকে সরিয়ে নিলেই মুশকিল আসান, কিন্তু কান দুটোর তো আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই—ঐ পিয়ানো-বাদ্য ঝালাপালা ক'রে তুললো আমাকে। কোনো ভুল নেই বাজনায়, কোনো রসও নেই—অসহ্য। একদিন ঐ ফিরিঙ্গি মেয়েটির সামনেই নেলিকে বললুম, 'এখানে বড্ড গোলমাল, আমি বরং ওপরে গিয়ে কোনো বইটই পড়ি।' এমনি ক'রে ছুঁচোর কেত্তন থামালুম।

ও-রকম ক'রে তাকালেন কেন আমার দিকে? বলতে চান আমার কাজটা ঠিক স্বামীজনোচিত হয়নি? নেলিকে উৎসাহ দেয়া উচিত ছিলো আমার? কিন্তু আমি যে বড়ো দুর্ভাগা, মশাই—আমি নির্বোধ নই, হ'তে পারিনি কোনোদিন। অন্তত এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিলো যে নেলির কোনো ট্যালেন্ট নেই—না ছবিতে, না গান-বাজনায়, না অন্য কিছুতে। আর তা যার নেই তাকে তা বুঝিয়ে দেয়াই সৎকর্ম, সে আপনার বক্ষলগ্ন সহ-ধর্মিণী হলেও। বা সেইজন্যেই, আরো বেশি সেইজন্যেই। সেটাই স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি। নলিনী ব্রোকার যে আর-একজন মিতু বর্ধন নয় তা বুঝতে কি আমার আধ মিনিটের বেশি সময় লেগেছিলো ভেবেছেন? তা হ'তেই বা হবে কেন বলুন, আমি তা চাইওনি, ও-সব বাজে বাবুগিরি নেই আমার। কিন্তু নেলি ভাবে, ওর ও-সব গুণপনা দেখে আমি বুঝি ওকে আরো বেশি ভালোবাসবো। কী ছেলেমানুষ বলুন তো! কখনো ওকে সাবালক ক'রে তোলা গেলো না, খুকি হ'য়েই কাটিয়ে দিলে জীবনটা। তাছাড়া, মশাই, গুণপনাই যথেষ্ট নয়, ভাগ্যও চাই। ঐ মিতুর কথাই ধরুন না: কিছুর মধ্যে কিছু না, হঠাৎ খপ ক'রে ধ'রে হিজলি ক্যাম্পে চালান দিলে। কোথায় গেলো তার গান, কোথায় বা ভক্তের দল।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটিতে ভবিষ্যৎ কোনো ছায়া ফ্যালেনি। ওয়াড়িতে, লামিনি স্ট্রিটের বকুলতলায়, সেই ভাদ্র মাসের সন্ধ্যায়। আকাশ ছিলো সূর্যাস্তে রঙিন, আর আমার মনে যেন পা টিপে-টিপে কুমারী উষা উঠে আসছেন। এক নতুন জগতে ছাড়পত্র পেয়েছি, যেখানে কেউ আমাদের মাসিমার ভাসুর-পো না-হ'লেই

'পর' ব'লে গণ্য হয় না। যেখানে স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে সব সময় একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে নেই—সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য দেয়াল। বসার ঘর পেরিয়ে পিছন দিকে একটা চওড়া খোলা বারান্দা, ছোটো-ছোটো টেবিলে ভাগ হ'য়ে চায়ের ব্যবস্থা সেখানে। সকলের পিছনে আমি যখন এলাম তখনও অমূল্যর কথাগুলো ঝিমঝিম করছে আমার মাথার মধ্যে, মুখটা যেন তেতো হ'য়ে আছে—কিন্তু বারান্দায় এসে দাঁড়ানোমাত্র আমার মনের অবস্থা বদলে গেলো। হঠাৎ মিতুকে দেখতে পেলাম আমার মুখোমুখি। মিতুই প্রথম কথা বললো, 'এই যে আপনি।' ব'লেই থমকালো একটু, কেননা ও-রকম অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলার মতো চেনা-শোনা তার সঙ্গে আমার হয়নি এখনো, এই তো সবে তৃতীয়বার দেখা। 'আপনি এদিকে আসুন, এই কোণের টেবিলটায়। আমি আপনাকেই—' হয়তো বলতে চেয়েছিলো, 'আপনাকেই খুঁজছিলাম', কিন্তু এক সেকেন্ড থেমে বদলে দিলো কথাটা, 'আমি আপনাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।' 'কী, বলুন?' 'মহুয়া' বইটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু কাজল-মামির হাত দিয়ে কেন?' আধ ঘণ্টা আগে জোনেসের কাছে যে-বাগ্মিতার পরিচয় দিচ্ছিলাম তা সে-মুহূর্তে ত্যাগ করলো আমাকে; আমার মনে প'ড়ে গেলো এই নিমন্ত্রণে আসার আগে আমি কত সময় নষ্ট করেছি, কত দুশ্চিন্তা ভোগ করেছি, যার ফলাফল বেশি কিছু নয়—শুধু ঐ 'মহুয়া' বইটা। অনাদিবাবু আমাদের বাড়িতে ফী নেন না, হয়তো তারই প্রতিদান-স্বরূপ আমার মা কিনেছিলেন মিতুর জন্য একখানা জামদানি শাড়ি, কাজল কিনেছিলো ওয়াটারম্যান কলম, আর আমার মনে হ'লো আমারও কিছু উপহার দেয়া উচিত, কেননা আমার আলাদা উপার্জন আছে, স্কলার্শিপ পাই। কিন্তু ইসলামপুর থেকে নবাবপুর পর্যন্ত সব ক'টা বড়ো-বড়ো মনোহারি দোকানে ঘুরে-ঘুরে আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না, যা মিতুর যোগ্য। তাছাড়া জিনিশটাও এমন হওয়া চাই যাকে বলা যেতে পারে নৈর্ব্যক্তিক, গায়ে-পড়া নয়, গা-ঘেঁষা নয়, যাতে প্রকাশ পায়—কোনো-রকম 'ভাব করার' ইচ্ছে নয়, শুধু সাধারণ সৌজন্য। আট-কোনা শিশিতে ফরাশি সেন্ট, বাক্সবন্দি হেলিওট্রোপ রঙের বিলেতি চিঠির কাগজ—এই ধরনের শৌখিন জিনিশ সেই কারণেই বাদ দিতে হ'লো। অগত্যা সেই গতানুগতিক বই কিনতেই বাধ্য হলুম, সেই সনাতন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কিন্তু তারপর আর-এক চিন্তা আক্রমণ করলো আমাকে: কী ক'রে দেবো বইটা মিতুর হাতে? কী বলবো? 'একটা বই আনলুম আপনার জন্যে।' 'একটা ছোট্ট উপহার এনেছি—' 'এই কবিতার বইটা—' নাঃ! প্রত্যেকটাই বোকা শোনাচ্ছে, আর এমন কী ব্যাপার যে ঘটা ক'রে ঘোষণা করতে হবে? বইটা আছেও হয়তো মিতুর, হয়তো আমার পক্ষে আলাদা কোনো উপহার দেয়াটাই অশোভন। শেষ মুহূর্তে কাজল-মামিকে বললুম, 'এটা তোমার কলমের সঙ্গে দিয়ে দিয়ো।'

আপনি হাসছেন? বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি লাজুক ছিলুম তখন—মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড লাজুক, মনে-মনে এখনো আছি। না, শুধু আমার বয়স বা সময়ের জন্য নয়, ঢাকা শহরের বাঁধাবাঁধি আবহাওয়ার জন্যও নয়—আমার স্বভাবই ঐ। আমি চিন্তাশীল, আমি দ্বিধান্বিত; জগতের সঙ্গে আমার ব্যবহারে তাই স্বাচ্ছন্দ্য নেই। ......অবাক হচ্ছেন? তা শুনুন, আমি চেষ্টা ক'রে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিলুম, মনের জোরে, প্রায় গায়ের জোরে—উপড়ে দিয়েছিলুম ঐ সব লতাপাতা যা গাছটাকে বেড়ে উঠতে দেয় না, বুঝেছিলুম যে অন্য একটা মুখোশ না-আঁটলে কৃতী হ'তে পারবো না জীবনে। আমার চাকরি, আমার বিয়ে, নেলির স্ত্রীধন, এই বাড়ি, বাগান যা-কিছু দেখছেন সবই আমার মুখোশ।

কিন্তু সেদিন কোনো ঢাকনা ছিলো না আমার, খোলশ ছিলো না, আমার দুর্গ গ'ড়ে ওঠেনি তখনও, জগতের সব বৃষ্টি রোদ বাতাসের সামনে একেবারে খোলা প'ড়ে আছি, অসহায়। আমাকে কাজল-মামির সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়ে দি[য়ে] মিতু চ'লে গেলো। বারান্দায় প[রে] পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা বাগান—'সাজা[নো] বাগান নয়, কয়েকটা পুরোনো আ[ম] কাঁঠাল গাছ, কিছু ফুলের চা[রা,] বর্ষায় ঘাস লম্বা হয়েছে। মেঘ ছি[ল] পশ্চিমের আকাশে—লাল, সোনালি, গোলাপি, হলদে, আর সেই মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে এক ঠান্ডা নরম গভী[র] নীল ফুটে উঠছে। আমি দেখ[ছি] সেই মেঘ আর আকাশ, কিন্তু মাঝে-মাঝে আকাশ আর আমার চোখের মধ্যে, সমুদ্রের তলা থেকে কোনো আশ্চর্য প্রাণীর মতো ভেসে উঠছে এক তরুণীর মূর্তি, স'রে-স'রে যাচ্ছে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে, সবুজ শাড়ি, হলদে ব্লাউজ, যে[ন] আকাশের আর বাগানের রঙের সঙ্গে মেলানো, বাতাসের মতো হালকা। হঠা[ৎ] কাজল-মামিকে বলতে শুনলাম, 'মিতু[কে] সুন্দর দেখাচ্ছে—না?' আমার চোখ স'[রে] এলো কাজলের দিকে, তার ঠোঁটের কো[ণে] ঝাপসা একটু হাসি দেখলাম। নরম গলায় ঘুমেল সুরে কাজল আবার বললো 'তোমার উপহার মিতুকে দিয়েছি আমি হাতে নিয়ে তক্ষুনি উল্টেপাল্টে দেখলে বইটা, তারপর বললো, "অদ্ভুত, লি[খে] দেয়নি তো।" সত্যি—লিখে দাওনি কেন? আমি একটু লাল হলাম বোধহয়, লজ্জা চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্য কথ[া] পাড়লাম, 'এই বাগানটুকু বেশ লাগছে আমার।' তারপর, কাজল-মামির সঙ্গে আলাপ করার জন্যই আবার বললাম 'কলকাতায় ফটিক-মামার ফ্ল্যাটে নাকি ঘরের সঙ্গেই ছাত আছে? তুমি গিয়ে টবে বাগান করতে পারবে।' 'তুমি কি আমাকে বাগান-বিশারদ ঠাওরালে?' 'না, তা নয়—আর তাছাড়া ঐ চারতলায় ঠিক বোধহয় সুবিধেও হবে না তোমার।' জানো, আমি মনে-মনে অন্য একটা বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি তোমাদের জন্য।' 'আমাদের জন্য? মানে?' আমি সেই হেশাম রোডের টু-লেট-ঝোলানো একতলা বাড়িটার কথা বললাম, একদিন হাঁটতে-হাঁটতে দৈবাৎ যেটা চোখে পড়েছিলো আমার, বেলা দশটার ঝকঝকে রোদ্দুরে। ভেবেছিলাম, কাজল হাসবে আমার ছেলেমানুষিতে, কিন্তু তার মুখে কোনো রেখা পড়লো না। আর তখন আমি ঠিক তা-ই বললাম, যা কাজলের কাছে কখনো বলা উচিত ছিলো না, যা আমি ফটিক-মামাকে বা আমার মা-কেও বলিনি কখনো, শুধু নিজের মনে অনেকবার ভেবেছি। 'আচ্ছা, বলো তো, ফটিক-মামা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন তাঁর কাছে? তোমরা কলকাতায় থাকলে চমৎকার হয়, আমি মাঝে-মাঝে—' আমার কথা শেষ হ'লো না, কাজল-মামির চোখে ফু[লকি] জ্বলে উঠলো হঠাৎ, একটি গভীর [হাসি] ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সারা মুখে। আ[র] সেই মুহূর্তে কাজলকে আমি আবিষ্কার করলাম।

আমার কাছে তখন জগতের স্ত্রীলোকেরা দুই অংশে বিভক্ত: 'মেয়ে' ও 'ভদ্রমহিলা'। 'মেয়ে' তারাই, যারা আমার কাছাকাছি বয়সী (সাধারণত দু-পাঁচ বছরের ছোটো), আর 'ভদ্রমহিলা'দের সরিয়ে রেখেছি আমার মায়ের দলে—তাঁরা আলাদা একটা সম্প্রদায়। 'মেয়েরা' আমার মনোযোগের যোগ্য (তাদের কোনো-একটিকে আমি বিয়েও করতে পারি কোনো-একদিন), কিন্তু অন্যদের সঙ্গে (আমার প্রাপ্য সেবাটুকু ছাড়া) কোনো সম্পর্ক নেই আমার। এই ধারণার জন্য আমি চেহারা দেখে মহিলাদের বয়স ঠিক বুঝতে পারি না, বিবাহিত হ'লেই আমার কৌতূহলের সীমানার বাইরে ঠেলে দিই তাদের, আর কেউ যদি 'কাকিমা', 'মাসিমা', 'মামিমা' ব'লে আখ্যাত হয় তাহ'লে তার দিকে ঠিক তাকিয়েও দেখি না, বা তাকালেও দেখতে পাই—বাস্তব মানুষটাকে নয়, 'মাসিমা' বা 'মামিমা' নামাঙ্কিত একটা চিহ্নকে। তাছাড়া আমি কাজলকে এতদিন দেখেছি শুধু বাড়িতে, সেই বকুলবাজারের অত্যন্ত চেনা দেয়াল ক'খানার মধ্যে—সেখানে সে ফটিক-মামার স্ত্রী, আমার মা-র অনুগত ছায়া, মা-কে আর মামাকে বাদ দিয়ে তার যেন অস্তিত্বই নেই। যদিও প্রায় এক বছর ধ'রে কাজল আমাদের পরিবারভুক্ত, আমার মনে পড়ে না তার সঙ্গে আজকের আগে আলাদা ক'রে গল্প করেছি কখনো, সে যে আমার গেঞ্জি

কেড়ে দেয়, আমার নিজেরই দোষে হারিয়ে-যাওয়া বই কিংবা জুতোর পাটি খ'জে বের ক'রে, তারও বিশেষ মূল্য দিইনি আমি, ধ'রে নিয়েছিলুম এ-সবই তার কাজ, এইভাবেই দিন কাটাবে সে যতদিন না ফটিক-মামা তাকে কলকাতায় নিয়ে যান। সে কলকাতায় সংসার পাতলে আমার সুবিধে হবে, বাড়ির বাইরে আর-একটা বাড়ি হবে—আমার মনে এটাই ছিলো বড়ো কথা, কাজলের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা ও পরিচয়। কিন্তু সে-মুহূর্তে, বকুল-ভিলার বারান্দায় যখন মেঘের রং মিলিয়ে যাবার আগে গাঢ় হ'য়ে উঠছে আর সন্ধেবেলার বাতাস যেন হলদে-সবুজ আঙুরের মতো গোল হ'য়ে উঠে কাঁপছে আমার চোখের সামনে, তখন আমি 'মামিমা'টা বাদ দিয়ে তাকে শুধু 'কাজল' ব'লে ভাবলাম, আর তখনই দেখতে পেলাম সে বয়সে খুব বড়ো নয় আমার চাইতে, আর তার মুখে বসানো আছে একজোড়া কালো, তরল, গম্ভীর চোখ, যা ফোলা-ফোলা পাতার তলার সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে, ঘুমের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, আমার দিকে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিলো।

টেবিলে-টেবিলে চা আর খাবার যখন পরিবেশন করা হচ্ছে তখন একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠলো, আমি ফিশফিশে গুঞ্জন শুনলাম— 'বিভাবতী— বিভাবতী দত্ত।' তাকিয়ে দেখি একজন সুশ্রী খদ্দর-পরা মহিলা দরজার ধারে দাঁড়িয়েছেন, মিতুর মা-বাবা এগিয়ে গেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে, অনেক চোখ তাঁর দিকে ফেরানো। সকলের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার করলেন মহিলাটি, তারপর মিতুকে বললেন, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, তোমার গান শোনাও আজ আমার ভাগ্যে নেই, তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম এই শুভদিনে।' মিতু আনন্দে লাল হ'লো, অনাদিবাবু বললেন, 'আপনি এখানে বসবেন আসুন। মিস্টার জোন্সের সঙ্গে চরকা নিয়ে তর্ক হচ্ছিলো আমার, আপনার মতটা জানতে চাই।' 'যদি অপরাধ না নেন, আমি বরং মিতুর সঙ্গে একটু গল্প করি—আমাকে এক্ষুনি চ'লে যেতে হবে।' মহিলাটির সঙ্গে একটি মেয়েও এসেছে, দু-জনকে আমাদেরই টেবিলে নিয়ে এলো মিতু, আলাপ করিয়ে দিলো। 'আমার বন্ধু বুলবুল চৌধুরী, স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম আমরা। আর এ'কে নিশ্চয়ই চিনিস, বুলবুল?' 'ঠিক চিনি বলা যায় না, মুখ চিনি'। ব'লে বুলবুল ঈষৎ মাথা নোয়ালো আমার দিকে। 'আর ইনি আমাদের কাজল-মামি।' 'আমাদের' কথাটা শুনে আমার আবার মনে হ'লো যে মিতু ভুলে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে তার আলাপ কত নতুন। 'বসুন, বিভা-দি, বুলবুল বোস। রণজিৎ, আপনি বিভা-দিকে চেনেন তো?' আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি বরং ওদিকটায় গিয়ে বসি।' বুলবুল নামের মেয়েটি তক্ষুনি ব'লে উঠলো, 'কেন, এটা মহিলা-দের জন্য রিজার্ভড নয় আশা করি, মিতু, তুই একটা চেয়ার টেনে আন না এখানে।' এমনি করে চারজন মহিলার মধ্যে ব'সে আমাকে চা খেতে হ'লো সেদিন।

বিভাবতী দত্তঃ নামটা আমার মগজের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু বিশ্রাম পেলো প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে, যখন 'মহিলা-বিদ্যালয়', আর 'স্বদেশী মেলা', এই কথা দুটো আমার কানে এলো। আমার অবাক লাগলো যে নামটা শোনা-মাত্র আমি বুঝতে পারিনি যে ইনিই সেই বিভাবতী দত্ত, ঢাকা শহরে মিতু বর্ধনের চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত যিনি, যিনি প্রায় একটা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছেন। বুঝতে পারিনি, তার কারণ আমার মন তখন ব্যাপৃত ছিলো একটা নতুন দেশের পথঘাট চিনে নেবার চেষ্টায়, যে দেশে আমি একটু আগে অতিথির মতো ঢুকেছি, কিন্তু যার বাসিন্দা হওয়া হয়তো বা অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। আর এক কারণঃ বিভা-বতীর খ্যাতির সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিলো না, অন্তত আমার চোখে ছিলো না; ঢাকা য়ুনিভার্সিটির একজন প্রথমতম মহিলা এম-এ; বিয়ে করেননি। তাঁরই স্থাপিত মহিলা-বিদ্যালয়, স্বদেশী মেলা, 'মুক্তধারা' পত্রিকা, এই সব নিয়ে 'দেশের কাজে উৎসর্গিত' তাঁর জীবন। ঢাকায় তিনিই বোধহয় একমাত্র মহিলা যিনি বেরিয়ে এসেছেন পুরোপুরি অন্তঃপুর থেকে, আর তিরিশের কাছাকাছি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকেও এড়িয়ে গেছেন লোকনিন্দা;—ঢাকার মতো শহর, যেখানে মেয়েদের নামে কুৎসা রটানো লোকেদের একটি প্রধান ব্যসন, সেখানেও বিভাবতীর বিষয়ে কোনো ছায়াচ্ছন্ন উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কেউ করেনি কোনো-দিন। আমি তাই ধ'রে নিয়েছিলুম তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা দূরত্ব থাকবে—রুক্ষ চুল, তীক্ষ্ণ চোখ, শরীরটি ছিপছিপে, প্রায় শীর্ণ, এক কথায়, একজন 'ইন্টেলেকচুয়েল' মহিলা ব'লে তাঁকে কল্পনা করেছিলুম। কিন্তু আমার এই মানসমূর্তিকে সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় আস্তে-আস্তে অন্য একজনকে বসাতে আমি বাধ্য হলাম—যাঁর চেহারাটি নারীত্বমণ্ডিত, গোল ধাঁচের মুখ, একটু ভারি শরীর, যাঁকে কাজলের পাশে দেখে আমার মনে হচ্ছিলো যেন কাজলেরই এমন কোনো দিদি, যিনি দৈবাৎ কোনো পূর্ব-পুরুষের ফর্সা রঙ পেয়েছেন। শাদা খদ্দরের শাড়ি-জামা তাঁর পরনে, কিন্তু এতেই বেশ সুসজ্জিত দেখাচ্ছে তাঁকে—যেন তাঁর মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য যে-কোনোরকম সাজগোজ বা তার অভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। আমার কল্পনায় তখন তিরিশ বছর বয়স যদিও প্রায় প্রাচীনতার শামিল, তবু বিভাবতীর মধ্যে আমি সেই সব লক্ষণই দেখতে পেলুম যা এতদিন শুধু আমারই কাছাকাছি বয়সী মেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ ব'লে ভেবেছি আমি। 'মেয়ে' ও 'মহিলা'র মধ্যে যে-ভেদরেখা আমি বানিয়ে নিয়েছিলুম, একটু আগে যা টলিয়ে দিয়েছিলো কাজল, এবার তা চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

পাকিস্তানের অস্ত্রসজ্জা

ইরানের কাছ থেকে পাকিস্থান অস্ত্র পাবে কি পাবে না, শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে বিতর্ক বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা সম্প্রতি ইরান থেকে সুস্পষ্ট আভাস নিয়ে এসেছিলেন যে সেখানকার সরকার ভারত-পাকিস্থান সংঘর্ষ বাধলে পাকিস্থানকে কোনো অস্ত্রসাহায্য দেবে না। কিন্তু চাগলা দেশে ফেরার সংগে সংগেই এই সংবাদ খণ্ডিত হয়েছে। প্রথমে পাকিস্থানে ইরানী দূত এবং পরে ইরানী পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকৃত হয়েছে। ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র অবশ্য এই ব্যাপারে অত্যন্ত বাক্-সংযম অবলম্বন করে বলেছেন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ইরান সরকারের সংগে তাঁদের যে বোঝাপড়া হয়েছে তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট।

কিন্তু এই প্রসংগে স্বতঃই একটা প্রশ্ন মনে আসবে। ইরান নিজে কোনো অস্ত্র তৈরী করে না। মোটামুটি মার্কিন অস্ত্রেই সে সজ্জিত। সামরিকভাবে সে এতো দুর্বল যে অস্ত্রের মেরামতী কারখানাও তার নেই, যে জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির কাছ থেকে পাওয়া কতকগুলো মার্কিন জংগী বিমান বাহ্যতঃ মেরামতের জন্য সে পাকিস্থানে পাঠিয়েছিল। সেই ইরানের সামরিক সাহায্য নিয়ে পাকিস্থানের এতো আশা এবং ভারতের এতো আশংকা কেন?

এই প্রসংগে ভারত ও পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নে আমেরিকার সাম্প্রতিক ঘোষণাও স্বভাবতই মনে আসবে। আমেরিকা বলেছে যে ভারত-পাক সংঘর্ষের আশংকা হ্রাসের জন্য সে কাউকেই আর নতুন অস্ত্র দেবে না, তবে পূর্বে সরবরাহ করা অস্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করবে। পাকিস্থান এই ঘোষণার উত্তরে দাবী করে যে আমেরিকা না দিলেও 'তৃতীয় দেশ' থেকে মার্কিনে তৈরী বা তাদের পেটেন্ট করা অস্ত্র আমদানীর অধিকার তার আছে। এবং এর পরেই আমেরিকা তার পূর্ব ঘোষণার এক ভাষ্য প্রকাশ করে বলেছে যে, ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই 'তৃতীয় দেশ' থেকে মার্কিন অস্ত্র সংগ্রহের অধিকার রাখে।

এ ব্যাপারে কৌতূহলের বিষয় এই যে, পাকিস্থান ও আমেরিকা উভয়েরই 'তৃতীয় দেশ' নিয়ে এতো আড়ম্বর করছে কেন? পৃথিবীতে বছরে ৩১,৫০০ কোটি ডলারের (১৯৬৫'র হিসেব) অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হয় এবং এর একটা বিরাট অংশ বিক্রি হয়, কিছু প্রকাশ্যে, বহু গোপনে। বিক্রেতাদের মধ্যে আমেরিকাই সকলের শীর্ষে। এ ছাড়া,

আমাদের নতুন রাষ্ট্রপতি

ডঃ জাকির হোসেন

অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়মে ঐ মহান শিল্পীর ব্যবহৃত ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি এবং তাঁর চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জামাদির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। চিত্রে শ্রীঠাকুরকে শিল্পীর মূর্তিতে মাল্যদান করতে দেখা যাচ্ছে। পিছনে রবীন্দ্রভারতীর ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন।

১৯৫০ থেকে '৬৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকা পৃথিবীর ৬৪টা দেশকে কম্যুনিজম রোখে ৩৩০০ কোটি ডলারের অস্ত্র খয়রাত করেছে। কাজেই, অস্ত্র বিক্রিতে 'তৃতীয় দেশের' অভাব নেই। এই 'তৃতীয় দেশে'র ব্যাপারে আমেরিকার পরোক্ষ কোনো ভূমিকা আছে কিনা সেইটাই এখানে প্রশ্ন। এবং এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা জ্যাক রেমন্ডের একটি প্রবন্ধের (নিউইয়র্ক টাইমস ইণ্টারন্যাশনাল, ৩০ মে, '৬৫) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রেমণ্ড এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ ভূমিকা আছে। 'প্রকাশ্যভাবে দেখা না দিয়েও সে পশ্চিম জার্মানীর মারফৎ কতকগুলো দেশকে অস্ত্র যোগায়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে পঃ জার্মানী অন্তত ন'টা রাষ্ট্রকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে।'

বর্তমান বিতর্ককে রেমণ্ডের এই উক্তির পটভূমিকায় রাখলে 'তৃতীয় দেশ' রহস্যের একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গেছে যে ইরান মেরামতীর জন্য পাকিস্থানে যে বিমানগুলো পাঠিয়েছিল সেগুলো আর ফেরত যায়নি। এবং আশ্চর্য নয়, পাকিস্থানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে এখন এই 'তৃতীয় দেশগুলো'ই হয়ত মুখ্য ভূমিকা নেবে।

গ্রীসে ক্ষমতা দখল

গত সপ্তাহে গ্রীসে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলো তা রাজার নামে হলেও রাজার কোনো হাত ছিল না। রাত দুটোর সময় সৈন্যরা অকস্মাৎ গ্রীসের সমস্ত শহরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। স্টেশন, বেতারকেন্দ্র, বিমানবন্দর প্রভৃতি দখল করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ক্যানেলোপোলাস সমেত প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক নেতাই দলনির্বিশেষে বন্দী হন। গ্রীসের সমস্ত সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, বিমান ও জাহাজের আগমন-নির্গমন বাতিল হয়। সকালে সমরনায়করা যখন রাজার কাছে গিয়ে অভ্যুত্থানের সংবাদ পেশ করে ঘোষণায় তাঁর স্বাক্ষর চান তখন রাজা প্রথমে তাতে সম্মত হননি। কিন্তু তাঁর পক্ষে তখন উপায়ও ছিলো না, কারণ অসম্মতির পরিণতি সম্ভবত ছিলো সিংহাসনচ্যুতি। শেষ পর্যন্ত রাজা কনস্টান্টাইন এই 'প্রাসাদ-প্ররোচিত অভ্যুত্থানে'র অনিচ্ছুক নায়ক হতে বাধ্য হন।

২৮শে মে গ্রীসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ছিলো। এই নির্বাচনে রাজতন্ত্রের পরমশত্রু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাপেন্দ্রুর দলের জয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলেই পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছিলেন। পাপেন্দ্রু সোজাসুজি ঘোষণা করেছিলেন যে নির্বাচনের ফল যদি তাঁর দলের পক্ষে যায় তা হলে তা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট বলে গণ্য করা হবে। রাজতন্ত্রের এই সম্ভাব্য বিপদ সামরিক বাহিনীকে আতঙ্কিত করে তোলে, কারণ রাজার সঙ্গে গ্রীসের সামরিক বাহিনীর স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। রাজাই ছিলেন তাদের বড়ো পৃষ্ঠপোষক।

কাজেই এর পরের পর্যায়ে এলো মধ্যরাত্রের নাটক। প্রায় হাজার দশেক লোক কারাগারে বন্দী, সংবিধান কার্যতঃ বাতিল, সভাসমাবেশ, ধর্মঘট বে-আইনী, স্কুল, ব্যাঙ্ক, দোকানপাট বন্ধ, সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ। প্রাচীন গণতন্ত্রের পীঠস্থান এথেন্সে গণতন্ত্রের শবশয্যা রচিত হলো।

বিদ্রোহের নায়ক কর্নেল জর্জ পাপাদোপোলাস অবশ্য একথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, "নতুন সরকার হচ্ছে ডাক্তার, রোগীকে আমরা অস্ত্রোপচারের টেবিলে বেঁধেছি তার রোগ সারাবার জন্য।" নির্বাচন অবশ্য হবে, 'তবে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পরে।'

ইস্পাতের বন্ধনমুক্তি

দীর্ঘ ৩৫ বছর নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকবার পর ভারতীয় ইস্পাত বন্ধনমুক্ত হয়েছে। ভারত সরকার এক ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, ১৯৬৭ সালের ১ মে থেকে সরকারের অনুমতি বা কোটা সার্টিফিকেট ছাড়াই যে-কেউ যে-কোন ধরনের ইস্পাত কিনতে বা বেচতে পারবে। ইস্পাতের দামের ওপরেও আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না।

ক্রমপর্যায়ে ইস্পাতের বন্ধনমুক্তি ঘটাবার নীতি ভারত সরকার ১৯৬৪ সালেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় রাজ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কয়েক ধরনের ইস্পাতের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের মে মাসে লোকসভার বর্তমান ডেপুটি স্পীকার শ্রী আর কে খাদিলকরের নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ইস্পাতের বিতরণ ও মূল্যের ওপর থেকে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ তুলে নেবার জন্যে সুপারিশ করেন।

কমিটির যুক্তি ছিল এই যে, সাধারণভাবে ইস্পাতের এবং বিশেষভাবে অনেকগুলি নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীর সরবরাহের অবস্থা এখন যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। কাজেই এখন "নিয়ন্ত্রিত বিনিয়ন্ত্রণ" কিংবা "রক্ষাকবচসহ নিয়ন্ত্রণের" একটা ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা চালান যেতে পারে।

এই দুটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই এখন ইস্পাত বিনিয়ন্ত্রিত করা হল। এর দ্বারা সরকার বাস্তব অবস্থাকেই স্বীকার করে নিলেন। বর্তমানে ইস্পাতের ক্ষেত্রে যে মন্দা অবস্থা যাচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। কয়েক ধরনের ইস্পাত দ্রব্যের—যেমন রেল লাইনের—উৎপাদন এত বেশী হয়ে গেছে যে, সেটাই এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে এই বিনিয়ন্ত্রণ সুফল আনবে এটা ধরে নেওয়া যায়। সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন যে, যে কয় ধরনের ইস্পাত দ্রব্যের সরবরাহ এখনো পর্যাপ্ত নয় সেই সব ক্ষেত্রে ছাড়া তাঁরা বিতরণের ব্যাপারে কোন পর্যায়ক্রম কিংবা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে দেবেন না। সহজে ইস্পাত পাবার সুযোগ এইভাবে হওয়ার নির্মাণমূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে উৎসাহের সঞ্চার হবে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষভাবে লাভবান হবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। ইস্পাত সরবরাহের অনিশ্চয়তার দরুণ এই শিল্প সাম্প্রতিককালে চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ইস্পাত বিনিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই শিল্পের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা দূর হল। সরকারের তরফ থেকে জানান হয়েছে যে, ইস্পাত কিনতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলির পড়তা যাতে বেশী না পড়ে সেজন্যে তাঁরা প্রয়োজনমত সাবসিডি দেবেন।

মস্কোয় রেড স্কোয়ারে মে দিবসের প্যারেডেরকালে সোভিয়েটের এই বিরাট বিমানধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শিত হয়।

তবে বিনিয়ন্ত্রণের সমগ্র উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে যদি এর পর ইস্পাতের দাম যুক্তি-সঙ্গত সীমার মধ্যে না রাখা যায়। প্রকাশ, বিনিয়ন্ত্রণের ঘোষণার ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই কোন কোন ধরনের ইস্পাতের দাম প্রতি মেট্রিক টন ৩২ টাকা থেকে ৩২৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ান হয়েছে। ইস্পাতের দাম ও বিতরণ ব্যবস্থার ওপর নজর রাখবার জন্যে ভারপ্রাপ্ত জয়েন্ট প্ল্যান্ট কমিটি এই বৃদ্ধি অনুমোদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা এর ফলে বড় রকমের কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। কারণ বার, স্ট্রাকচারাল স্টীল, রাউণ্ড স্টীল প্রভৃতি দ্রব্যের দাম মাত্র ৩২ টাকা বাড়ান হয়েছে এবং এই সব দ্রব্যই ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। সবচেয়ে বেশী যে বৃদ্ধি (৩২৫ টাকা) তা ঘটেছে গ্যালভানাইজড শীটের বেলায়, এবং এই ধরনের শীট মোট ইস্পাত উৎপাদনের এক শতাংশেরও কম। কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক থাকার দরকার আছে।

উদারতর আমদানী নীতি

ভারত সরকার ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্যে যে আমদানী নীতি ঘোষণা করেছেন তাতে অগ্রাধিকারসম্পন্ন ৫৯টি শিল্পের আমদানীর প্রয়োজন সম্পূর্ণ এবং অব্যাহতভাবে মেটাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শিল্প ইউনিটগুলি যতবার খুশি লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত করতে পারবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ বলে কিছু থাকবে না।

এই প্রয়োজন-ভিত্তিক লাইসেন্স প্রথায় রপ্তানী শিল্পগুলির স্বার্থের দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া হবে। এই সব শিল্পের প্রয়োজন কেবল সম্পূর্ণ মেটান হবে না, রেজিস্ট্রীভুক্ত রপ্তানীকারকরা যাতে সবচেয়ে সস্তা সূত্র থেকে সরবরাহ পেতে পারেন তারও সুযোগ করে দেওয়া হবে।

গত বছর জুন মাসে ভারত সরকার আমদানী উদারতর করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন বর্তমান নীতিতে তারই সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। এইড ইণ্ডিয়া ক্লাব গত বছরের মত এবছরেও প্রকল্প-বহির্ভূত খাতে ৯০ কোটি ডলার সাহায্য দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সরকারের পক্ষে এই নীতি অব্যাহত রাখা সহজ হয়েছে। সরকার আশা করছেন, এর ফলে শিল্প ইউনিটগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে। স্পেয়ার পার্টস, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানীতে অসুবিধা থাকার দরুণ এতদিন এই ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় নি।

এই নীতি ঘোষণা সম্পর্কে এক বেতার বিবৃতিতে বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং প্রসঙ্গক্রমে একটি সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এত উদার সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও যদি সরকার দেখতে পান যে, রপ্তানী বাড়ানোর দিকে তেমন কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না এবং যদি দেখা যায় যে, এই সব সুযোগ-সুবিধা আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে তাঁরা এই নীতি পুনর্বিবেচনা করে দেখতে দ্বিধা করবেন না।

মধ্যপ্রদেশ থেকে বাঙালী বাস্তুহারারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছেন। মেয়র বাস্তুহারাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন।

বাণী-বন্দনা ॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জাগো, জেগে ওঠো বাণী, আজ অন্ধকার, আজ
বড় বেশী প্রবাসী আঁধার, অসময়—
এই তো জাগার সময়।
ওরে বিষের পুত্তলী, তোর এত ঘুম?
পয়োমুখে বিষের ছুরির মতো জিভ, ঐ বিষ দৃষ্টি
ঐ দেহ বল্লরীর বিষ ঘাম, সাম্প্রতিক বিহ্বল কল্পান্তে
মানুষের মন চায়:
বাণী, কুহকিনী, এইবার জেগে উঠে
আচমকা দুয়ার খুলে প্রেমিক ও পূজারীকে নীল করো,
কবির দু' কানে ঢালো প্রার্থিত গরল;—
শ্রেষ্ঠী কিংবা রাজপুরুষের
ব্যাকুল ওষ্ঠে ও মুখে হেনে দাও মোহিনী ছোবল,—
লুব্ধ প্রতিহারী
যেন ঐ বক্ষে এসে মুখ গুঁজে পায় শুধু গুপ্ত বিষ,
বিষ, বিষ, অন্ধকারে জেলে দাও বিষের লণ্ঠন।

বাণী, অয়ি বিষকন্যা, তোমার ও শরীরের লচক ঠমকে
একদিন
অ্যারিস্টটলও মুখ গুঁজে নিয়ে সেজেছিল অশ্বতর,
সেই লাস্যে আজ
শিরোপা লোভীকে দুই পদাঘাত উপহার দিয়ে
নাচের উৎসব শুরু হোক এই প্রগাঢ় তামসে।
আজ বারবার মনে হয়,
বাণী, তোর জেগে ওঠা সভ্যতার একমাত্র সূচিকাভরণ।

কবিতাহীন দিনযাপন ॥

বাসুদেব দেব

কবিতাহীন দিনযাপন কবিতাহীন
বুকের মধ্যে ধ্বনিগুলি হয় প্রাচীন
বুকের মধ্যে দুঃখগুলি দুঃখ পায়
ঘুঙুর বাঁধা পায়ের চিহ্ন সুক্ষ্মতায়
অচিন মাঠের বুকে হচ্ছে ক্রমাবলীন।

রাখাল বালক চাইছে হতে গৃহস্থ
বাঁশী আমার কী ভুল মাঠে ফেলে এলাম
জল দোলানো কার সে-কোমল শ্রী হস্ত
ঘর ভেঙে দেয়। মন ভোলায় যে গোলাম
শরৎ রোদে রইতে চায় না পরাধীন।

বুকের মধ্যে দুঃখগুলি প্রবীণ হয়
ধ্বনিরা সব শরীর বেচে খাচ্ছে মদ—
তবুও ভোরে উঠলে হঠাৎ সূর্যোদয়
অবুঝ পাখির পাখাকে আর বশংবদ
থাকতে দেয় না। অম্ল দ্রাক্ষা প্রতিটি দিন।
কবিতাহীন দিনযাপন কবিতাহীন।।

সেন্ট হেলেনার নাগরিক

নারায়ণ দত্ত

সে এক রবিবারের কথা। অক্টোবর মাসের পনরই। আঠার শ' পনর। 'নর্দাম্বারল্যান্ড' জাহাজটি ধীরমন্থরগতিতে নোঙর ফেলল যে দ্বীপটির অদূরে সেটি সেই বিখ্যাত সেন্টহেলেনা। ফরাসী সম্রাট নেপোলিঅন যেখানে জীবনের শেষ কটি-দিন গভীর দুঃখ ও রোগভোগের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। দূরে দ্বীপটির অস্পষ্ট তটরেখা দিগন্তের বুকে সিসে পেন্সিলে আঁকা একটা আবছা ল্যান্ডস্কেপের মত মনে হয়। জাহাজ তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। জাহাজের মেট এসে খবর দিলে ক্যাপ্তেনকে। ক্যাপ্তেন ভ্রূ কুঁচকে একবার মেটের দিকে তাকিয়ে খবরটি সম্রাটের কর্ণগোচর করতে গেলেন।

কথাটা বোধকরি তিনি স্বয়ং সম্রাটকে বলতে পারেননি। হয়তবা সাহস করেননি। সম্রাটের সহগামী কোন কাউন্টকে সবিনয়ে বলেছিলেন। এবং এক সময় কথায় কথায় সংবাদটা সম্রাটের কানে উঠেছিল। নির্বিকারভাবে শুনেছিলেন তিনি। তাঁর গম্ভীর মুখখানায় চকিতে একটা কালো ছায়া পড়েই যেন মিলিয়ে গেল। আসন ছেড়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা টপ করে নিয়ে একেবারে জাহাজের রেলিঙ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দূরবীক্ষণের কাচের মধ্য দিয়ে কি দেখেছিলেন নেপোলিঅন বোনাপার্ট? দেখেছিলেন কি যে দ্বীপটিতে তিনি তাঁর নির্বাসনের উষর দিনগুলি কাটাতে যাচ্ছেন, সেখানেই একদা তাঁর কবর রচনা হবে? এখানেই একদিন তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়বে দীর্ঘদিনব্যাপী অসুস্থতা ও অসহ্য যমযন্ত্রণা ভোগ করার পর? সেই বেদনাক্লিষ্ট ভবিষ্যৎ কি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি? কে জানে! কিন্তু তাঁর মুখের রঙ একটুও বদলায়নি। সামান্য কুঞ্চনও লক্ষ্য করা যায়নি তাঁর ছেচল্লিশ বছরের স্বভাবগম্ভীর রুক্ষ মুখখানায়।

পরদিন সম্রাট পা দিলেন সেন্টহেলেনার তটভূমিতে। সম্রাটের জন্য যে বাড়ীটা ঠিক করা হয়েছিল, সেটার সারাই, চুনকাম-রঙ করার কাজ তখনও শেষ হয়নি। কাজেই সাময়িকভাবে 'দি ব্রায়ারস' নামে অতি নগণ্য একটি বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে তোলা হ'ল। বাড়ীটা যারপরনাই ছোট্ট। সম্রাটের ত দূরের কথা, সাধারণ লোকেরও থাকতে কষ্ট হ'ত। একটিমাত্র ঘরের এই পর্ণশালাটি এতই ছোট যে ঘরদোর পরিষ্কার করার দরকার হ'লে সম্রাটকেও বাইরের উঠানে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ত।

সুখের কথা, এই অসহনীয় অবস্থায় সম্রাটকে মাস দেড়েক-এর বেশী থাকতে হয়নি। সে বছর ডিসেম্বর মাসেই নেপোলিয়ন অপর একটি কাউন্টি বাড়ীতে উঠে এলেন। দুর্ধর্ষ ফরাসী সম্রাটের শেষ কটা করুণ দিনের নীরব সাক্ষী এই বাড়ীটির নাম 'লঙ্ উড'। হ্যারী পেনারের আঁকা বাড়ীটির একটি ছবি দেখে মনে হয় সেন্টহেলেনার শান্ত প্রকৃতির বুকে বাড়ীটি হয়ত বেমানান নয়, কিন্তু যে অশান্ত মানুষটিকে নীড়ের নিবিড় আস্বাদ দিতে প্রতিশ্রুত ছিল 'লঙ উড', তাঁর পক্ষে বাড়ীটি বাস্তবিকই বনবাস।

এবং এই বনবাসেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন এককালের য়ুরোপের দন্ডমুন্ডের কর্তা, বহু সিংহাসনের উত্থান-পতনের নিয়ামক—ফরাসী সম্রাট নেপোলিঅন বোনাপার্ট। কখনও অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে, কখনও বা কোন বই-এর পাতায় মুখ গুঁজে, কখনও বা খুরপি নিয়ে একটু বাগানের কাজ করে—এবং কখনও, বললে বিশ্বাস করা শক্ত—ইংরিজী শিখে। নেপোলিঅন কোনদিনই নাকি ভুল করেও ইংরিজীতে কথা বলেননি। কিন্তু ইংরিজী তিনি জানতেন ভালোই।

লঙ-উডের দেহাতী বাড়ীতে সম্রাট মোটামুটি ছিলেন একরকম। ব্রিটিশ সরকার তাঁর স্ত্রীর বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে দিত না। খাবারের ব্যবস্থাও ভালো ছিল না সেন্টহেলেনায়। কিন্তু তবু দিনগত পাপক্ষয় হচ্ছিল কোনরকমে। কিন্তু তাতেও বাদসাধলেন সেন্টহেলেনার নতুন গভর্ণর স্যর ডেসন লো। আঠার শ' ষোল সালের এপ্রিল মাসে তিনি এলেন অ্যাডমিরাল ককবার্ণের জায়গায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই ঐতিহাসিক দ্বীপটির ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে।

লো সায়েব ককবার্ণের ঠিক উল্টো। ককবার্ণ ছিলেন অনেকটা দিলখোলা মানুষ। লো স্বভাবসন্দিগ্ধ। সম্রাটের সব কাজ ও কথাবার্তার মধ্যেই তিনি গোপন ও গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেখে চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। নির্বাসিত সম্রাটের প্রতিটি ভ্রূ-ভঙ্গী তাঁর কাছে পলায়নের উপক্রমনিকা বলে মনে হতে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত সেন্টহেলেনার ব্রিটিশ গভর্ণর একদিকে লন্ডনের বড়কর্তাদের কাছে তাঁর ডেসপ্যাচের বোঝা ভারী করে তুলতে লাগলেন আর একটু একটু করে খর্ব করতে লাগলেন নির্বাসিত ফরাসী সম্রাটের সীমিত স্বাধীনতা!

প্রথমেই সান্নিধ্য ও স্নেহধন্য মঁসিয়ে লে ক্যাসেসকে বহির্-পৃথিবীর সঙ্গে সম্রাটের হ'য়ে গোপন পত্র আদান-প্রদানের অজুহাতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হ'ল। তারপরই কোপ পড়ল সম্রাটের ব্যক্তিগত ডাক্তার ও'মিআরার ওপর। এমনি করে একটির পর একটি প্রিয়ভাজন বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লো সায়েব নেপোলিয়অনের শেষ দিনগুলিকে দুর্বিসহ করে তুলতে লাগলেন।

এবং এই মানসিক যন্ত্রণাই খুব সম্ভব তাঁর পৈত্রিক রোগ ক্যান্সারের আক্রমণ ত্বরান্বিত করে। দ্রুত স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে তাঁর। ১৮২১ সালের মার্চ মাসে তাঁকে একেবারে বিছানা নিতে হয়। স্যর ডেসন লোর ব্যবহার তাঁর কাছে এতই বেদনাদায়ক হয়েছিল যে এপ্রিল মাসে উইল লেখবার সময় তিনি স্পষ্টতঃই তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য স্যার লোকে দায়ী করে যান। উইলে বলা হয়—'আমার কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। নিষ্ঠুর শাসকবৃন্দ (oligarchy) ও তাদের ভাড়াটে ঘাতক আমাকে খুন করল।' ঘাতক বলতে, ঐতিহাসিকরা মনে করেন, তিনি নিঃসন্দেহে স্যার ডেসন লোকেই মনে করেছিলেন।

পাঁচই মে নেপোলিঅন মারা যান। তাঁর শেষ ইচ্ছা—তাঁর নিজের দেশের মাটিতে, সীনে নদীর তীরে তাঁকে কবর দেওয়ার শেষ আবেদন নিষ্ঠুরভাবে অগ্রাহ্য করে সেন্টহেলেনার নির্জন এক প্রস্রবনের ধারে দুইটি উইলো গাছের ঘন ছায়ার তলে তাঁকে অন্তিম শয্যায় শয়ন করান হয়। সমাধিপ্রস্তরে লেখা ছিল—'এখানে শয়ান আছেন'—। কিন্তু কে? যাঁরা সমাধি দিয়েছিলেন তাঁরা বোধ করি সে নাম লেখবার সাহস করেননি!

সেদিনের মৃত সম্রাটের নিরাড়ম্বর শবযাত্রার সঙ্গে কি সেন্টহেলেনার বিবেকহীন দুর্বলচিত্ত ব্রিটিশ গভর্ণর স্যার ডেসন লো ছিলেন? খুব সম্ভব। কেননা সেটা অবশ্যই তাঁর সরকারী দায়িত্বের মধ্যে পড়েছিল। সেদিনে সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত একদা বিশ্বের ত্রাস, য়ুরোপের জনগনমন অধিনায়ক, রোগজীর্ণ ফরাসী সম্রাটের বিবর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে স্যার ডেসন লো কি বিন্দুমাত্র বিবেকদংশন অনুভব করেছিলেন? — তিলমাত্র অনুশোচনা?

সে সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলবার মত প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় নেই। কিন্তু লক্ষ করা যায় যে ফরাসী সম্রাটের স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করার জন্য সেকালের যেসব ইংরাজ ও ফরাসী উজির-আমীরদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা দিয়েছিল, হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে স্যার ডেসন লো ছিলেন। নিহতের স্মৃতির প্রতি ঘাতকের এই বিস্ময়কর অনুরাগ—ইতিহাসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনালোকিত বহু রহস্যের অন্যতম।

ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার। নেপোলিঅনের মৃত্যুর ঠিক বাইশ দিন পরে তাঁর সঙ্গে যাঁরা স্বেচ্ছায় নির্বাসন-জীবন যাপন করেত এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে ইংলন্ডে রওনা করে দেওয়া হ'ল। সেই বছরই পঁচিশে জুলাই স্যার ডেসনও তল্পী-তল্পা গুটিয়ে দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন।

নেপোলিঅনের ব্যবহৃত আসবাবপত্রের মধ্যে কিছু আনা হয়েছিল ফ্রান্স থেকে। বেশীর ভাগই দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার। সেগুলির আর কোন প্রয়োজন না থাকায় সেগুলি নিলামে তুলে দেওয়া হ'ল। সেন্টহেলেনার জেমস টাউনে ১৮২২ সালের

আম্বিলে মার্চ ও ফেসরা জুনে পর পর দু'দিন এই নিলাম হয়। তত্ত্বাবধান করেন সহকারী কমিশারী জেনারেল। কিন্তু সরকারী এই নিলামের আওতা থেকে বেশ কয়েকটি জিনিষ বাদ পড়েছিল। আর তার কারণ, শুনেতে অবাক লাগে, স্যার ডেসন লো'র নেপোলিঅন প্রীতি!

নেপোলিঅনের ব্যবহৃত আসবাবপত্র থেকে এগারটি পেটি স্যার লো নিজের জন্য আলাদা করে রাখেন। এ'বিষয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তর তাঁকে ঐসব জিনিষগুলি বাজার দামে কিনে নেবার অনুমতি দেন। সেকালের কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, দ্রব্যগুলির দাম ঠিক হয়েছিল 'তনশ' বাহান্ন পাউন্ডের মত। এইসব আসবাবপত্রের মধ্যে সবচেয়ে দামী ও সুন্দর ছিল 'শাপ উড়ে' থাকবার সময় নেপোলিঅনের নিত্য ব্যবহৃত মেহগনী কাঠের একটি লাইব্রেরী টেবিল। সেটারই দাম ছিল শুধু চল্লিশ পাউন্ড।

স্যার লো পাকা লোক। যে মাসে যে জাহাজে তিনি স্বদেশ রওনা হয়ে গেলেন, ঠিক ছিল, সেই জাহাজেই তাঁর এগার পেটি মাল তিনি দেশে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ঠিক জাহাজ ছাড়বার আগেই বিমর্ষ সেক্রেটারী এসে খবর দিলে —জাহাজে স্থানাভাব। স্বভাবসন্দিগ্ধ স্যার ডেসন লো এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন। উষ্মিশনকণ্ঠে ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন, 'ডাকো কাপ্তেনকে'। কাপ্তেন টুপি তুলে অভিবাদন করে বল্লে, 'ইয়েস গভর্ণর'। লো তাঁর সমস্যার কথা বলে থাকবেন। ব্যক্ত করে থাকবেন তাঁর বাসনার কথা—নেপোলিঅনের ব্যবহৃত এইসব আসবাবপত্র তিনি এই জাহাজেই দেশে নিয়ে যেতে চান।

কাপ্তেন সবিনয়ে বলে থাকবেন যে সম্ভব হলে গভর্ণরের নতুন করে বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না। গভর্ণরের ইচ্ছা-পূরণের সাধ তারও কম নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা জাহাজে মাল নেবার আর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। ন স্থানং তিল ধারণং। কাজেই—' কাপ্তেন বোধ হয় আর তাঁর কথা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

লো কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁর বোধ করি সন্দেহ হয়েছিল যে জিনিষগুলি সঙ্গে না নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাজেই কাপ্তেনকে আবার তিনি অনুরোধ করলেন। নিদেনপক্ষে মেহগনীর টেবিলটা যেন জাহাজে তুলে দেওয়া হয়।

কাপ্তেন আর কথা বাড়ালেন না। বোধ হয় ভেবেছিলেন যে সোজাসুজি না বল্লে এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া শক্ত। কাজেই দেখি কি করতে পারি গোছের একটা স্তোকবাক্য দিয়ে যথারীতি অভিবাদন করে কাপ্তেন গভর্ণরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আর স্যার লোর খুঁতখুঁতে মন কেবলই খোঁচা দিতে লাগল তাঁর এত সাধের জিনিষগুলি বুঝি হাত ছাড়া হয়ে গেল।

স্যার ডেসন লোর আশঙ্কা আদপেই অমূলক নয়। কেননা ফরাসী সম্রাটের এই মূল্যবান স্মারকবস্তুগুলির একটাও স্যার লোর জাহাজে শেষবেশ তোলা যায়নি। এবং লোর জায়গায় সেন্টহেলেনার যে যে নতুন গভর্ণর এলেন স্কচ জেনারেল এ-ওয়াকার, তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল স্যার লোর ফেলে যাওয়া সেই স্মৃতিচিহ্ন-গুলির ওপরে। ওয়াকার সায়েব জবরদস্ত ব্যক্তি। কানু সেরেস্তাদার। সরকারী মালখানা 'ইনসপেকসন' করতে করতে এক সময়ে স্যার ডেসন লোর নির্বাচিত স্মারকবস্তুগুলির ওপর তাঁর নজর পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সেগুলি তাঁর কুক্ষিগত করতে মনস্থ করলেন। নিজের সে সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনা করে কোম্পানীর দপ্তরে তিনি জানিয়েছিলেন—

> 'hardly possible to avoid a participation in the general sentiment of possessing some article which had been the property of that extraordinary personage.'

অর্থাৎ—সেই অসাধারণ মানুষটির ব্যবহৃত সম্পত্তির কয়েকটি মাত্র সামগ্রী অধিকার করবার সাধারণ প্রবণতা থেকে অব্যাহতি পওয়া কদাচ সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকার সায়েব ঐ জিনিষগুলি কেনবার বাসনার কথাও জ্ঞাপন করেন কোম্পানীকে।

ওয়াকার বিষয়ী ব্যক্তি। এ'সব ব্যাপারে না আঁচালে যে বিশ্বাস নেই, এই সদুক্তি তাঁর জানা ছিল। বোধহয়, এ'ও তাঁর অজানা ছিল না যে জিনিষগুলি ন্যায়তঃ ডেসনের প্রাপ্ত। কিন্তু সরকারী অফিসের অজ্ঞাতচক্রে বহু অসম্ভবই যে সম্ভব করা যায়, এটুকুও তিনি জানতেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি সেই মেহগনী কাঠের লাইব্রেরী টেবিলটি আর দুটো সুদৃশ্য 'বুককেস' সোজা প্যাক করে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে। সঙ্গে সঙ্গে অসাধুতার চরম নিদর্শন দেখিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কাউন্সিলের দু'জন সভ্য—ব্রুক আর গ্রীনাট্রি সায়েবের সম্মতির শিলমোহর আদায় করে নিলেন। সরকারী ফাইলে এই ধরণের জালিয়াতির দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই খুব বিরল।

কিন্তু পাপ কোনদিনই চাপা থাকে না। এখানেও থাকল না। খবরটা একসময়ে স্যার ডেসন লোর কানে গিয়ে উঠল। তিনি এই নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরে জোর তদ্বির তদারক সুরু করে দিলেন। এবং সেন্টহেলেনার প্রাক্তন ও বর্তমান গভর্ণরের মধ্যে সুরু হয়ে গেল—ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জনের ভাষায় যাকে বলা যায়—'ভার্বেল ডুয়েল'—চিঠিপত্রের দ্বৈরথ সংগ্রাম!

কেউই কম যাবার নয়। দু'পক্ষের তূণেই শায়ক বড় কম নেই। তাদের তীক্ষ্ণতাও বড় কম নয়। কাজেই দীর্ঘ দু'বছর ধরে এই কাগজের লড়াই পড়ে দেখবার মত। কম কাদা এ নিয়ে ছোড়া হয়নি। অভিযোগ প্রত্যাভিযোগের যেন অন্ত নেই। কেউই মাথা নোয়াবে না। কলমের জোর কারও কম নয়। একজন যদি দুনে ধরে, অপর জন চৌগুনে জবাব দেয়। যেমন 'চাপান' তেমন 'উতোর'। শেষ বেশ ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অবশেষে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টররা ঔপনিবেশিক দপ্তরের কাছে লেখা সতেরই মার্চের এক চিঠিতে স্যার ডেসন লোর পক্ষে রায় দিয়ে বলেন যে, নেপোলিঅনের লাইব্রেরী টেবিলটা স্যার ডেসন লোকে যথাযথ মূল্যে কিনে নেবার ব্যাপারে কোম্পানী আগেই রাজী হয়েছিল। অন্যান্য সামগ্রীগুলিও কিনে নেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বছরখানেক পরে। কাজেই এই হুকুম বাতিল করবার কোন কারণই নেই। কাজেই —"এতদ্দ্বারা কোর্ট অব ডিরেক্টরস জেনারেল ওয়াকারকে ইহাই নির্দেশ দিতেছেন যে তিনি যেন সমস্ত স্মারক-বস্তুগুলি মায় ইংলন্ডে যেগুলি পাঠান হইয়াছে—সেগুলি সমেত স্যার ডেসন লোকে প্রত্যর্পণ করেন। স্যার লো সেন্ট-হেলেনার কোম্পানীর রাজকোষে মূল্যাদি জমা দিলে তবেই এই সামগ্রীগুলির তিনি অধিকার লাভ করিবেন।" এই সঙ্গে কোম্পানীর কর্মকর্তারা বাদী-প্রতিবাদী উভয়কেই তাঁদের আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ আলোচনায় ঔচিত্যবোধের অভাবের জন্য তিরস্কার করেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে নাটকের এইখানেই যবনিকা পড়লেও ডেসন সায়েব আরও কিছুকাল নাটকের 'সাসপেন্স' জিইয়ে রাখেন। কোম্পানীর সুবিচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে লো আরও একটি নাটকীয় কাজ করে বসলেন। ওয়াকারের দেশে পাঠান সেই মেহগনী টেবিল ও বুককেস দুটো ছাড়া অন্যান্য সব আসবাবপত্রের ওপর তাঁর স্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন। কিন্তু নাটকের যবনিকা তখনও পড়তে দেরী ছিল। কেননা এই ব্যাপারে দু'শো আটাশ পৃষ্ঠার যে পান্ডুলিপিটি লর্ড কার্জন উদ্ধার করেন জেমস টাউনের সরকারী ভবনে রক্ষিত পুরনো দলিলপত্রের মধ্য থেকে তাতে দেখা যায় যে, আঠার শ' পঁচিশ সালের দশই এপ্রিলের একটি চিঠিতে স্যার লো নেপোলিঅনের ব্যবহৃত এই ঐতিহাসিক মেহগনী টেবিল ও বুক-কেস দুটোর অধিকারও ত্যাগ করেছেন! সেই তিনটে জিনিষ তাঁর বন্ধু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কফিনকে দিতে অনুরোধ করছেন কোম্পানীকে। যাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যক্ষতঃ তিনি দায়ী তাঁরই স্মৃতি-পূতঃ সামগ্রী নিজের ঘরে রাখতে কি শেষে ভীত হয়েছিলেন স্যার ডেসন লো?

বলা শক্ত। বলা শক্ত, এই বাঞ্ছিত ধনের অধিকার যদি শেষবেশ ত্যাগই করবেন তবে কি উদ্দেশ্যেই বা স্যার ডেসন লো এই দীর্ঘ 'ভার্বেল ডুয়েল' চালিয়েছিলেন? উদ্দেশ্য যাই থাক, বহু যুদ্ধের নায়ক নেপোলিঅনের স্মৃতিবাহক কয়েকটি সুদৃশ্য আসবাব নিয়ে অন্ততঃ একটা কাগজের লড়াই না চললে বুঝি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান দেখান হত না। ডেসন লো সেই শেষকৃত্যটুকু অন্ততঃ করে গেছেন।

প্রেক্ষাগৃহে

চিত্র-সমালোচনা :

গৃহদাহ (বাংলা) : উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড-এর নিবেদন; ৪,২৬২-২০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : উত্তমকুমার; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুবোধ মিত্র; কাহিনী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ (এদিন আজি কোন্ ঘরে গো) এবং প্রণব রায়; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু; সম্পাদনা : কালী রাহা; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কালিপদ চক্রবর্তী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, গীতালি রায়, ইরা চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছায়াবাণী প্রাঃ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ৫ই মে, শুক্রবার রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় যখন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বিদগ্ধসমাজে কম উত্তাপের সৃষ্টি হয়নি। একেই ত 'দয়াল'-এর মতো চরিত্র সৃষ্টি সত্ত্বেও ব্রাহ্মবিরোধী বলে শরৎচন্দ্রের একটা অখ্যাতি ছিলই তার ওপর ব্রাহ্মপরিবারের বিদুষী তরুণী অচলাকে কুমারী এবং বিবাহিত অবস্থায় মহিম উকীল ও সুরেশ ডাক্তার—এই বন্ধুর মাঝে তিনি যেভাবে ভাঁটা খেলিয়েছেন, তাকে রুচিবান ও নীতিজ্ঞ পাঠকেরা সন্তুষ্টচিত্তে সমর্থন করতে পারেননি। মৃত্যুপথযাত্রী সুরেশ মহিমকে বলেছে, 'অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝনি,—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। —এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম।' —কিন্তু এই সাফাই গাওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-এর প্রতি বিরূপতা আজ পর্যন্ত যে অনেকাংশে অব্যাহত রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য।

এই বিরূপতার কথা জেনেই পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া 'গৃহদাহ'-এর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে অর্থাৎ আজ থেকে তিরিশ বছরেরও বেশী আগে। এবং এই বিরূপতার জন্যেই বড়ুয়ার পরিচালন-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও 'গৃহদাহ'-চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তা তথা ব্যবসায়িক সাফল্যলাভে বঞ্চিত হয়েছিল।

প্রযোজক উত্তমকুমার যখন 'গৃহদাহ'-এর এই নতুন চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি এই বিরূপতার কথা মনে

জীবন সংগীত চিত্রে রিণা ঘোষ। ফটো : অমৃত

রেখেছিলেন কিনা, জানি না। হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন, স্বাধীন ভারতে যখন আমাদের সমাজ বহুরকম সংস্কারমুক্ত হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদকেও মেনে নিয়েছে, তখন 'গৃহদাহ' বর্ণিত মহিম-অচলা-সুরেশ-এর প্রণয়লীলাকেও অবলীলাক্রমে উপভোগ করবে, সুরেশের কামনার আগুনে মহিম-অচলার শান্তির নীড় পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করবে। লালসামত্ত সুরেশের প্রতি নিক্ষিপ্ত মহিমের অম্লমধুর বচনগুলিকে দর্শকরা যেভাবে উপভোগ করেছেন, তাই যদি সমগ্র ছবির উপভোগ্যতার নিদর্শন হয়, তাহলে উত্তমকুমারের ভাবনা সার্থক হয়েছে বলতে হবে।

চিত্রনাট্যরচনায় সুবোধ মিত্র ছবির প্রথম ও শেষ দৃশ্য ছাড়া প্রায় সর্বত্রই মূল উপন্যাসটির অনুগামী। মূলের প্রতি আনুগত্য ছবিটিকে অতি মাত্রায় সংলাপ-প্রধান করে তুলেছে। অচলা ও মহিমের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখাবার জন্যে ছবির প্রথম দৃশ্যটির উপস্থাপনা সুপরিকল্পিত, কিন্তু দৃশ্যটির সংলাপ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের রীতিকে অনুসরণ করেনি। ছবির একেবারে শেষ 'শট'-এ মহিমের ফিরে এসে ভূলুণ্ঠিত অচলাকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরা শরৎসৃষ্ট চরিত্রের পরিপন্থী—এটা সম্ভবত দর্শকদের মুখ চেয়ে করা হয়েছে।

বর্তমান 'গৃহদাহ' চিত্রের সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হচ্ছে পাল্কী চেপে অচলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি। 'ও দেখে যা তোরা কন্যাবৌ যায় রে শ্বশুরবাড়ী' গানের সঙ্গে পাল্কীর ভিতরে অচলার প্রথমে উৎসুক স্মিত দৃষ্টি এবং পরে দোদুল্যমান পাল্কীতে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকার দরুণ আড়ষ্টতা ও বেদনাভোগের অভিব্যক্তি মিলে দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। ট্রেনের দৃশ্যগুলির

উপস্থাপনাও পরিচালকের দক্ষতার পরিচায়ক।

অভিনয়ে মহিমের ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ, অথচ শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীর সাহায্যে চরিত্রটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কামনা ও লালসার দাস এবং অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ সুরেশের ভূমিকায় প্রদীপকুমার সাধ্যমত সুঅভিনয় করেছেন; উত্তেজনার মুহূর্তগুলিতে তাঁর দ্রুত বাচন আরও কিছুটা স্পষ্ট শ্রুতিগ্রাহ্য হতে পারত। নায়িকা অচলা বেশে সুচিত্রা সেনকে আশ্চর্যরকম কৃশাংগী বলে বোধ হল। অচলা সম্পর্কে সুরেশের বর্ণনা হচ্ছেঃ 'শুকনো কাঠপানা চেহারা'। এই বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যেই কি শ্রীমতী সেন চেষ্টা করেছেন? অচলার চরিত্র-চিত্রণে শ্রীমতী সেন অসামান্য নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শহরের আবহাওয়ায় বর্ধিতা, শৈশবে মাতৃহারা, অসচ্ছল সঙ্গতি-বিশিষ্ট পিতার স্নেহে পালিতা, ব্রাহ্ম-পরিবারের বিদুষী তরুণী অচলার মনো-বৃত্তিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তিনি তাকে সুষ্ঠুভাবে পর্দার ওপর প্রকাশিত করেছেন। ঝড়-জলের রাত্রে ডিহরীতে সুরেশের শয়নকক্ষে প্রবেশের পরে দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেল, তারপর থেকে ছবির শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর চেহারায়, হাবে, ভাবে যে সর্বহারার ছবি পরিস্ফুট করে তুলেছেন, তা দর্শককে বেদনায় অভিভূত করে। কন্যার বিবাহিত জীবনকে সুখী দেখবার জন্যে সমুৎসুক কেদারবাবুর ভূমিকাটিকে চমৎকার বিশ্বাস্য রূপ দিয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল। পল্লীগ্রামের পরিহাসপ্রিয়া, সারল্যের প্রতিমূর্তি মৃণালের চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অপরাপর ভূমিকায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ডিহরীর রামবাবু), গীতালি রায় (বীণাপাণি), পদ্মা দেবী (পিসিমা), কালিপদ চক্রবর্তী (খাতক), ইরা চক্রবর্তী (অচলার ঝি) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পনির্দেশনা বাস্তবানুগ। ছবিতে গানের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। মহিমের রোগে অচলার অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার পরে মহিম যখন সুস্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে একটা সহজ প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত বলে বোধ হল, তখন রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের ক্ষণে ঘরের জানলা খুলতে খুলতে অচলার মুখে 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি সুপ্রযুক্ত। 'কলাবৌ যায় রে শ্বশুরবাড়ী' গানখানির কথা আগেই বলা হয়েছে। আবহসঙ্গীত ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি। এবং শব্দপুনর্যোজনা অনেক স্থলে সংলাপকে শ্রুতিগ্রাহ্য হতে দেয়নি।

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রযোজিত এবং সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি কৃতী শিল্পীর অভিনয়দীপ্ত 'গৃহদাহ' জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—নান্দীকর

'মেহেরবান' চিত্রের শুভমুক্তি

এ ভি এম-এর রঙিন চিত্র 'মেহেরবান' ১২ মে থেকে নিউ এম্পায়ার, কৃষ্ণা, লোটাস, প্রিয়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তিলাভ করছে। এ. ভীমসিং পরিচালিত এই সামাজিক চিত্রটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন অশোককুমার, সুনীল দত্ত, নূতন ও মেহমুদ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবি।

এ কে বি ফিল্মসের 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ'

দীপক গুপ্ত পরিচালিত এ কে বি ফিল্মসের 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ'র চিত্র-গ্রহণ বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর-এ সুসম্পন্ন হচ্ছে। সম্প্রতি এ ছবির প্রযোজক এ কে ব্যানার্জী এবং পরিচালক শ্রীগুপ্ত বোম্বাইয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করতে। এ ছবির সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। ছবিতে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত যুক্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ এবং রজনীকান্ত রচিত গান ছাড়াও ছবির কয়েকটি বিশেষ পরিবেশে গান থাকবে। গানগুলি রচনা করেছেন সুখ্যাত গীতিকার সুনীলবরণ। বিদেশ

বসুশ্রীতে অনুষ্ঠিত ত্রাটিনী মুলাকাত চিত্রের প্রিমিয়ার শো-তে সর্বশ্রী বাগীশ্বর ঝা, পরিচালক আলো সরকার, ক্যামেরাম্যান কানাই দে এবং সহকারী ক্যামেরাম্যান মধু ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

সফর শেষ করেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বোম্বাই এবং কলকাতায় এ ছবির গানগুলি গ্রহণ করবেন। দেশাত্মবোধক এ গানগুলি ছবির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়। ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন দিলীপ রায়।

রাধারাণী পিকচার্সের 'বালুচরী'

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত রাধারাণী পিকচার্সের 'বালুচরী'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শুরু করেছেন প্রযোজক কার্তিক বর্মন। আশাপূর্ণা দেবী রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল ও লিলি চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাজেন সরকার।

বি কে প্রোডাকসন্সের 'মহাশ্বেতা'

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বি কে প্রোডাকসন্সের 'মহাশ্বেতা' চিত্রটির দৃশ্যগ্রহণ বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জরাসন্ধ রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়। সুরসৃষ্টি করেছেন রাজেন সরকার।

'কালোর পরে আলো'র শুভ মহরৎ:

আজ ১২ই মে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে নিউ থিয়েটার্স ২ নম্বর স্টুডিওতে সিদ্ধেশ্বরী চিত্র মন্দিরের প্রথম ছবি 'কালোর পরে আলো'র শুভ মহরৎ ও চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। সূর্যমুখী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন— বিনায়ক। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ নায়ক ও সুনীল সরকার। চরিত্র-চিত্রণে থাকছেন—বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই।

কলকাতার স্টুডিওতে নির্মীয়মান হিন্দী ছবি 'নয়ে রাস্তে':

বি পি প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'নয়ে রাস্তে' কলকাতার স্টুডিওতে নির্মীয়মান একটি হিন্দী ছবি। বর্তমানে চলচ্চিত্রশিল্পে ভারতের প্রতিটি প্রাদেশিক প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত সার্থকতা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে না। তার প্রধানতম কারণ প্রাদেশিক কোন ছবিরই সারা ভারতব্যাপী চাহিদা নেই। অথচ সারা ভারতব্যাপী না প্রদর্শিত হলে কোন ছবিরই অর্থানুকূল্য হয় না। তাই এখন এ শিল্পকে বাঁচাতে হলে যে ভাষার সারা ভারতব্যাপী চাহিদা আছে সেই হিন্দী ভাষায় ছবি নির্মাণ প্রাদেশিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

বিগত যুগে কলকাতার খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্স-এর এধরনের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল এবং বাংলা চিত্রশিল্প একদা সারা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আজ নতুনভাবে এই ধরনের পুনঃ প্রচেষ্টাই প্রাদেশিক চলচ্চিত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাবে। বি পি প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'নয়ে রাস্তে' যথার্থই এই নতুন প্রচেষ্টার পথপ্রদর্শক। 'নয়ে রাস্তে'র চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত-সহকারী নিখিল চট্টোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে সুনীতি মিত্র ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে শংকর চট্টোপাধ্যায় ও শংকর গুহের উপর।

মেহেরবান চিত্রে সুনীল দত্ত ও নূতন

পালকী চিত্রে ওয়াহিদা রহমান

সংগীতে নেপথ্যকণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকালিপিতে আছেন—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দীতে এই প্রথম), সর্বেশ্বর, বিদ্যা রাও, বাণী হাজরা, সীতা মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মাঃ কেশব ও নবাগতা রীতা।

প্রায় সবটাই আউটডোরে গৃহীত এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাটি সমাপ্তপ্রায়।

'বালিকা বধূ' মুক্তি আসন্ন

তরুণ মজুমদার পরিচালিত চিত্রদীপের 'বালিকা বধূ' মুক্তি আসন্ন। ছবিটি এ মাসেই শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। কিশোর প্রেমের এই মিষ্টি কাহিনীটি রচনা করেছেন বিমল কর। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, সবিতাব্রত দত্ত ও অপর্ণা দেবী। এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মানাসাটা ফিল্ম ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় "মিস্ প্রিয়ংবদা"

ইউ টিয় হাসির ছবি "মিস্ প্রিয়ংবদা"র মুক্তি আসন্ন। দুষ্মন্ত চৌধুরী ও রবি বসু পরিচালিত এই অফুরন্ত হাসির ছবিটির কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপদান করেছেন—লিলি চক্রবর্তী, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, জহর রায়, হরিধন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, প্রেমাংশু বসু, অমর বিশ্বাস, শিখা ভট্টাচার্য, দ্বিজু ভাওয়াল,

অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী চিত্রে উত্তমকুমার ও তনুজা। ফটো : অমৃত।

তপতী ঘোষ, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। সুবীর সেন ও আজাদের সুরে গান গেয়েছেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। এই নতুন ধরনের হাসির ছবিটি সুরঞ্জনার পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করছে।

অজিত গাঙ্গুলীর পরবর্তী ছবি 'দাদু'

পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী সমাপ্তপ্রায় ছবি 'প্রতিদিন'-এর পর যে নতুন ছবিটি আরম্ভ করছেন তার নাম 'দাদু'। সম্প্রতি এ ছবির সংগীতগ্রহণ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হল। সংগীত-পরিচালনা করছেন ভারতের একমাত্র তরুণ সংগীত-পরিচালক বাপি লাহিড়ী। ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন আশা ভোঁসলে, রফি, মুকেশ ও কিশোরকুমার। এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন রঞ্জিত কাংকারিয়া।

নির্মল দে পরিচালিত 'সমান্তরাল'

শ্যাডো প্রোডাকশনের তৃতীয় ছবি 'সমান্তরাল'-র চিত্রগ্রহণ ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় শুরু করেছেন পরিচালক নির্মল দে। প্রশান্ত চৌধুরী রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, কালী সরকার, বাণী গাঙ্গুলী ও মিতা মুখোপাধ্যায়।

'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট'

বাদলরাজ সিনহা প্রযোজিত জয়দীপ পিকচার্সের রহস্যধর্মী হাসির ছবি 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতরচনা করেছেন প্রণব রায়। পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী ছবিটির পরিচালক। সুরসৃষ্টি করেছেন শ্যামল মিত্র। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে দেওজীভাই, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও সুনীল সরকার। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে আছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও লীনা ঘটক।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় ছবিটির প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন অনুপকুমার, কমল মিত্র, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, রূপক মজুমদার, মঞ্জিনা দেবী, রেণুকা রায়, কল্যাণী ঘোষ, প্রতিমা চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী।

শিবাজী গণেশন প্রযোজিত হিন্দী ছবি 'শান্তি'

মাদ্রাজের প্রখ্যাত নায়ক ও প্রযোজক শিবাজী গণেশন জনপ্রিয় তামিল ছবি 'শান্তি'র হিন্দী চিত্ররূপ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। হিন্দী ছবি নির্মাণে শ্রীগণেশনের এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। ইতিপূর্বে তিনি 'রাখী' ছবিটি নির্মাণ করেন।

শিবাজী ফিল্মসের এই রঙিন ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে মনোনীত হয়েছেন নূতন, সঞ্জীবকুমার, ওমপ্রকাশ এবং রাজেন্দ্রনাথ। এ ছবির পরিচালক হলেন এ. ভীম সিং। সংগীত-পরিচালনা করবেন রবি। আগামী সপ্তাহ থেকে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে বলে জানা গেল।

'লাভ এণ্ড গড' চিত্রের নায়ক সঞ্জীবকুমার

প্রযোজক-পরিচালক কে. আশিফের নির্মীয়মাণ ছবি 'লাভ এণ্ড গড'-এর চিত্রগ্রহণ এতদিন বন্ধ ছিল গুরু দত্তের মৃত্যুর জন্য। কারণ এ ছবির নায়ক ছিলেন প্রথমে গুরু দত্ত। বর্তমানে এ জায়গায় মনোনীত হয়েছেন নায়ক সঞ্জীবকুমার। কিন্তু চরিত্রানুযায়ী সঞ্জীবকুমারকে আরও রোগা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং সঞ্জীবকুমার তাঁর শরীরের ওজন কমাবার জন্য ব্যস্ত আছেন। ইতিমধ্যে কে. আশিফ তাঁর পরবর্তী ছবি 'চ্ছাতি কা মোতি'র কাজ শুরু করছেন। ছবির চিত্রগ্রহণ এ মাসেই শুরু হবে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীধর।

কে আর ফিল্মসের 'পতঙ্গ'

কে আর ফিল্মসের রঙিন চিত্র 'পতঙ্গ' পরিচালনা করছেন কেদার কাপুর। বিনোদকুমার রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন শশি কাপুর, ভিমি, রাজেন্দ্রনাথ, জেব রেহমান ও সজ্জন। সংগীতপরিচালনা করছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

ফ্র্যাঙ্ক ফিল্মসের 'প্রিয়া'

ফ্র্যাঙ্ক ফিল্মসের 'প্রিয়া' ছবিটির চিত্রগ্রহণ একটানা বাইশ দিন ধরে শেষ করলেন পরিচালক গোবিন্দ সারাইয়া। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জীবকুমার, তনুজা, সুলোচনা, জীবনকলা, পদ্মারাণী, দুলারী ও দর্শনকুমার। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

টি প্রকাশ রাও পরিচালিত 'বাসনা'

পরিচালক টি প্রকাশ রাও তাঁর নতুন ছবি 'বাসনা'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন কারদার স্টুডিওয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজকুমার, পদ্মিনী, বিশ্বজিৎ, কুমুদ ছুগানি, ডেভিড ও মাস্টার গোপী। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রবি।

[illegible]

ভয় নেই বিন্দু। এই তো তোমাকে দেখতে এসেছে। দেখা-দেখি তো চলছেই। বিয়ে তোমার হবেই। বাঙালী হিন্দুর বাড়ির মেয়ে তুমি। তোমার বিয়ে না হয়ে পারে। ভয় কী? কর-কোষ্ঠী-গণে-রাশিতে যদি না মেলে, নকল কোষ্ঠী করতে কতক্ষণ। তুমি তো আর যে-সে ঘরের মেয়ে নও। তোমাদের পরিবারের আলাদা একটা মর্যাদা আছে। তুমি মোটামুটি বনেদী পরিবারেরই মেয়ে।

বিয়ে তোমার হবেই বিন্দু। তবে যা একটু সময় নিচ্ছে। কি করবে বল, এতে তোমার তো কোন দোষ নেই। হঠাৎ যুদ্ধটা না বাধলে এমনটা কি হোত! রাতা-রাতি সারা শহরটা গেল পাল্টে। মানুষরা সব শহর-ছাড়া হল। তোমরাও কলকাতা ছেড়ে পালালে।

তারপর একদিন যুদ্ধ থামল। তোমরা সবাই আবার কলকাতায় ফিরে এলে। চোখে পড়ল বিরাট পরিবর্তন। সবাই কেমন যেন পাল্টে গেছে। এমন কি তোমার বাবা পর্যন্ত। আগের মত সেই মানুষটি আর নেই। কেমন যেন খিটখিটে হয়েছেন। সব সময়ই যেন আর্থিক অভাব-অনটনের কথা তাঁর চোখে-মুখে লেগে রয়েছে।

সেই থেকে তুমিও যেন অনেক পাল্টে গেছ বিন্দু। তোমার আর সেই উচ্ছলতা নেই। বয়স এবং অভিজ্ঞতার ভারে তুমিও অনেক বুড়িয়ে গেছ। হতাশ হবার বয়সটাতে তুমি যেন কত ধীর-স্থির-শান্ত হয়ে গেছ। তোমার এই থিতিয়ে যাওয়া বয়সটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বাড়ির সবাই যেন কুঁকড়ে উঠল। সবাই যেন তোমাকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তোমার এই কঙ্কালসার কাঠামোর ওপর মাটি লেপে রং চড়িয়ে ভরিয়ে তোলার জন্যই তোমার অভিভাবক-ভাই সাধন স্বাস্থ্যবান জায়গা সাঁওতাল পরগণায় নিয়ে এসেছে। মাটি আর রং লেপার কাজ শেষ হলেই তোমার জন্য আবার পাত্র দেখা শুরু হবে।

বিন্দু, তুমি নিতান্তই সাধারণ। জীবনে একটা প্রেম করতেও পারলে না। মেয়েরা যাকে বলে ভালবাসা। তাহলে এই অখণ্ড প্রহরগুলো আশা-নিরাশা, মান-অভিমান, আর চাওয়া-পাওয়ার প্রতীক্ষায় ভরিয়ে রাখতে পারতে।

কিন্তু তা তুমি পারলে না। তোমার মনের মত সেই মানুষটিকে আজও তুমি খুঁজে পেলে না। শুধুই দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোমার জীবনটা একা-একাই শেষ হতে বসেছে। তুমি যেন ক্রমশ নিজেকে হত্যা করতে চলেছ।

তাই তো শেষবারের জন্য তোমাকে আবার সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ভরিয়ে তোলা হচ্ছে। মাটি আর রং লেপার কাজ শেষ হলেই তোমার দাদার পরিচিত পাত্র অনাদি এসে তোমাকে দেখে যাবে। জানি, এভাবে মেয়ে দেখানো তোমাদের পরিবারের ঐতিহ্য নয়। কিন্তু এছাড়া আর কি উপায় আছে বল? নইলে কুল থাকে কই।

লাল মাটির দেশে এসে বিন্দু যেন প্রাণ পেল। উদার প্রকৃতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যেন নতুন করে বেঁচে উঠার প্রেরণা পেল বিন্দু। মুন লজের এই ভাড়াটে বাড়িতে একটা বিচিত্র সংসার বসেছে। বিচিত্র এই জীবনযাত্রার মাঝে এক আত্ম-ভোলা মানুষ আলোককে সব থেকে আলাদা বলে মনে হয়। প্রথম প্রথম বিন্দুর কেমন অদ্ভুত লেগেছিল আলোককে। কিন্তু ক্রমশ বিন্দু বুঝতে পারে আলোক একটি আপাত দস্যি, কিন্তু নিঃসঙ্গ করুণ চরিত্র। সেও যেন তারই মত একা। অসহায়। একলা থাকবার জন্যই হয়তো আলোক এখানে পালিয়ে এসেছে।

একমাত্র আলোক ছাড়া আর সকলেরই যেন নানান মিথ্যে নানাভাবে জড়িয়ে আছে। বিন্দুও তো তাই। একটা মিথ্যের পথ ধরে এতদূরে চলে এসেছে। তাই মিথ্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে যখন ক্লান্তি আসে, তখন আলোকের কথাই বিন্দুর সবার আগে মনে পড়ে। বিন্দুর মনে হয়, আলোকের সঙ্গে তার কি ধরনের একটা জানাজানি হয়ে গেছে। কি যেন একটা বোঝাবুঝি আপনি আপনি গড়ে উঠেছে। এর আগে ঠিক এমন করে কারও জন্যে তো ভাবেনি বিন্দু। কেন! কেন এমনটি হল? কেন সব কাজের মাঝে আলোককে বার-বার মনে পড়ে? কেন, প্রাণের মাঝে এত আবেগ উথালি-পাথালি করে?

এতো চঞ্চলতা, এতো আকুলতা এখন কি আর বিন্দুর সাজে। এই অপরাহ্নে কি আর এসব মানায়। তবু মন তো মানে না। জানি এ বয়েসে চঞ্চলতা যায়, কিন্তু ফোটার আবেগ তো যায় না। ভিখারিণী বিন্দু আজ যেন রাজরাণী হয়ে উঠেছে।

একদিন পড়ন্ত বেলায় বিন্দুর মনোনীত পাত্র অনাদি এসে এখানে পৌঁছুল। সঙ্গে তার বোন শীলা। অনাদির সঙ্গে আসলে
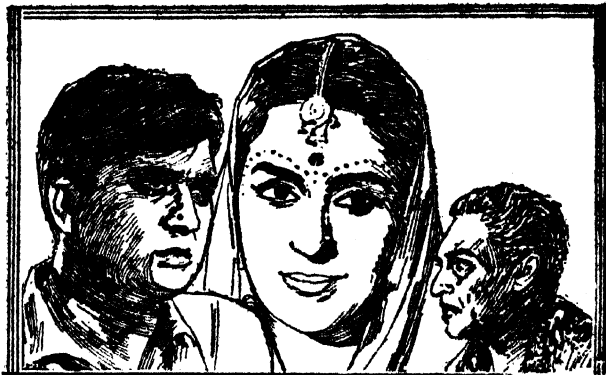
সেই দেখতে এসেছে বিনুকে। মাঝারি লম্বা দোহারা অনাদি। চোখ দুটি বড় বড়। বয়স হয়েছে। শীলাকে রূপসী বলা যায়। ওর দেহের ঔদ্ধত্য সারা শরীরে ছড়ানো। পাশে দাঁড়ালে বিনুর দারিদ্র্যই বেশী চোখে পড়ে।

এতদিন চড়াই উতরাইয়ে দিন কেটেছে। এখন আরোহণের পালা। নানান উৎসব মুখরতার মধ্যে দিয়ে আশা-নিরাশার মুহূর্তগুলো ভেসে চলল। বিনু প্রতিমুহূর্তে সজাগ থাকে। সর্বদা দৃষ্টি মেপে চলেছে। কতখানি অনাদি ঝুঁকেছে, কতখানি এগোচ্ছে। বিনু বুঝতে পেরেছে, শীলার তেমন পছন্দ হয়নি তাকে। বোধহয় বয়স এবং রূপে। তবু বিনুর মন বলছে, তেইশ বছরের বিনুর প্রতি পঁয়ত্রিশ বছরের অনাদি একটা আকর্ষণ বোধ করছে।

এ যেন শেষ চড়াই। ঠেলেঠুলে একেবারে শীর্ষে উঠতে হবে বিনুকে। তারপরে উৎরাই। আঃ! গড়িয়ে গড়িয়ে, আরামে, আলস্যে শুধু নামা। তখন আর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের কোন চিন্তা নেই। বিনু অনাদির স্ত্রী হবে। ছেলেমেয়ের মা হবে।

কিন্তু তা হল না। বিনু শেষরক্ষা করতে পারল না। শীলার কাছে তার সত্যিকারের বয়স ধরা পড়ে গেছে। শীলাই এ বিয়ে ভেঙে দিল।

কিন্তু আলোক বিনুকে ভুল বোঝেনি। বিনুকে দেখার পর থেকেই সে তার মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিল। কিন্তু বিনু যেন বলতে চায়, চেয়ে দেখ আলোক, সংসারের চোখে আমি যে কবে ফুরিয়ে গেছি, আমি যে নিঃস্ব হয়ে গেছি। আলোক নিবিড় হয়ে যেন উত্তর দেয়, অন্ধ মেয়ে! তুমি তোমার নিজেকে কতটুকু দেখলে? আমার কাছে তুমি চিরপূর্ণ।

সত্যিই তুমি জিতেছ বিনু। আলোকের মত ছেলে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা। সত্যিকারের ভালবাসাই তোমার মনের মানুষটিকে পাইয়ে দিয়েছে। তোমার জীবন পূর্ণ হোক, সার্থক হোক বিনু।

বিনু তুমি সুখী হও।

এ কাহিনীর নাম 'দুরন্ত চড়াই' সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পদ্মা দেবী, জহর রায়, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমেন চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র।

সাহেব বিবি গোলাম

সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে জেমস ওয়ারেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' মঞ্চস্থ করলেন। সামগ্রিক অভিনয়ে এঁদের পূর্বগৌরব অটুট থেকেছে এবং বহু ব্যাপারে এবার এঁরা আরো বেশী সাফল্য পেয়েছেন বলতে হবে। অভিনয়রীতির মধ্যে অপূর্ব এক ক্ষমতা ধরা পড়েছে। দৃশ্যপরিকল্পনা, আবহ-সংগীত রচনার ব্যাপারে একটা গভীর অনুভব কাজ করেছে।। অনিল মিত্রের নির্দেশনায় উন্নতধরনের কলাকৌশলের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভি
করেছেন—গীতা দে, অজন্তা দেবী, জ্যো
নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিভাসকুমার রায়, ন
চক্রবর্তী, আশুতোষ মজুমদার, বিশ্ব
ঘোষ, নির্মল ভট্টাচার্য, সুনীল দে, সু
দাস, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ দ
সুকুমার চক্রবর্তী, তারকদাস মুখোপাধ্যা
সুতপা ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না কর, প্র
চৌধুরী, চারুব্রত মুখোপাধ্যায়।

নাট্যোৎসব

সম্প্রতি দুর্গাপুর এ ভি বি কলোন
রূপকগোষ্ঠী তিনদিনব্যাপী এক নাট্যোৎস
আয়োজন করেছিলেন। উৎসবে অংশ গ্র
করেছিলেন—'পট ও দীপ', 'রূপক', 'মহ
'দরবারী', 'ইঞ্জিনীয়ার্স হোস্টেল', 'আনন্দম'
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'কলাকা'র শাখ

সংগঠনীর 'বিদেহী' নাট্যাভিনয়

গত ২রা মে কাশীপুর নিউ পল্লীমঙ্গ
সমিতির পূজা প্রাঙ্গণে সংগঠনী নাট্যসং
ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'বিদেহী' নাটকটি মঞ্চ
করেন। নাটকটি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে এ
সার্থক প্রযোজনা। প্রতিটি চরিত্রের অভি
উল্লেখযোগ্য। যদিও সংগঠনীর শিল্পী
তেমন কোন বড় পরিচয় নেই তবু এঁ
মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বি
প্রশংসনীয়। নাটকটি সুপরিচালনা ক
তপন রায়।

সুদর্শনম প্রযোজিত নতুন নাটক আব

প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে গত ২
এপ্রিল সুদর্শনম প্রযোজিত দুটি না
মঞ্চস্থ হয়। প্রথমটি জ্যোতির্ময় বসুর
একাকী। দ্বিতীয় নাটক তরুণ কথাশি
শচীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আবর্ত।
পূর্ণাঙ্গ নাটকটি এই প্রথম মঞ্চস্থ হ
আবর্ত নাটকেই তাঁরা যা-কিছু কৃতক
হয়েছেন। একাকী নাটকে প্রশান্তর ভূমিক
কুমার শোভন ভালই অভিনয় করেছেন।
মিলির চরিত্রে দীপালি চক্রবর্তীর অভি
মন্দ হয় নি।

ত্রিমুখী সংঘাতের সমন্বয়ে আ
নাটকটি রচিত। বিশেষ কোন সমস্যার
ভূমিকায় নাটকটি রচিত নয় বটে, বি
এর নাট্য সংঘাত রসিক মনে বেশ দোলা দে
আবর্ত নাটকে রজতের ভূমিকায় প্র
মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়ে
দিদি আইভির চরিত্রে দীপালি চক্রবর্ত
অভিনয় বেশ সাবলীল। অসাধু খান চরি
মিঃ বাসুর ভূমিকায় প্রভাত ভট্টাচা
অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক
সুতপার চরিত্রে শেফালী বিশ্বাসের অভি
দুর্বল। অরিন্দমের ভূমিকায় দীপক রা
অভিনয়ে আরও ব্যক্তিত্ব আরোপের প্রয়ো
ছিল। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় ক
ছেন তাঁদের অভিনয় উল্লেখ করার মত ন

সেণ্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব

সেণ্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লা
শিল্পীরা সম্প্রতি তারাশঙ্কর বন্দ্যো
পাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করেছে
নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে ক্লাবের বা
উৎসব উপলক্ষে এই অভিনয়ের আয়ো
করা হয়। শ্রীশিবদাস মুখার্জির স

নির্দেশনায় এই ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনা উন্নত ধরনের হয়েছে। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রোপযোগী অভিনয় করতে পেরেছেন। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবী রাখেন 'ইন্দ্র রায়ে'র ভূমিকায় সন্তোষ মুখার্জি। অজন্তা চৌধুরী, 'সুনীতি' চরিত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন ফণিভূষণ চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ বসু, প্রদ্যোৎকুমার বসাক, পীযূষ দত্ত, শিবদাস মুখার্জি, কল্পনা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি চ্যাটার্জি।

আনন্দলোক

গত ১০ই এপ্রিল মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে আনন্দলোক তাঁদের সংস্থার সভাপতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনকে সম্বর্ধনা জানান। এই সম্বর্ধনা সভায় গান্ধার, শৌভনিক, রূপদক্ষ সংস্থার পক্ষ থেকেও ডঃ সেনকে মাল্যদান করা হয়। এর পর সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'জ্যাঠামশাই' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

রূপমহল

'রূপমহলে'র শিল্পিবৃন্দ শ্রীরামপুর রায় ময়দানে সম্প্রতি জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যনির্দেশনায় ও আবহসংগীতে ছিলেন কাজল সেন ও ঝুনু চৌধুরী। অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন ঝুনু চৌধুরী, প্রশান্ত চক্রবর্তী, বলেন ঘোষ, সবিতা দাস, সাধনা হাজরা, সুনীল রায়চৌধুরী।

নান্দনিক

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নান্দনিক' কোন্নগর কিশোর ব্যায়াম সমিতি আয়োজিত নাট্যোৎসবে শৈলেন ভট্টাচার্যে'র 'মুখের উপর মুখোস' নাটক অভিনয় করবে। নাট্যাভিনয়ের দিন ৭ই মে। সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যে'র পরিচালনায় নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করবেন—অমর ভট্টাচার্য, পার্থ ভট্টাচার্য, ...ভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবু বোস প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী।

রূপান্তর

সম্প্রতি হুগলী গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে রূপান্তরে'র বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ১৪টি নাট্যসংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। নাট্যপ্রযোজনায় প্রথম স্থান অধিকার করে ...টির 'মান্ত্রিক' (নাটক ঃ 'রক্তে ধোয়া ধান'), দ্বিতীয় চুঁচুড়ার 'প্রতাপপুর মিলন মন্দির' (নাটক ঃ 'রাত্রি'). 'রক্তে ধোয়া ধানে'র ...জ ও দীনদয়ালের ভূমিকায় যথাক্রমে ...ল ভট্টাচার্য ও নেপাল রক্ষিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও সহ-অভিনেতা বিবেচিত হন। ...ষ্ঠ অভিনেত্রী ও সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার পান পূরবী ভট্টাচার্য 'রাত্রি' নাটকে 'স্বাতী'র ভূমিকায় ও হেনা ভট্টাচার্য '...রূপ' নাটকে 'ভদ্রমহিলা'র ভূমিকায়। ...ষ্ঠ পরিচালক হিসাবে বিবেচিত হন ...শু পালিত। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য পান ...ষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার।

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি নাগরিক কমিটির উদ্যোগে গৃহীত রেকর্ড নাটিকার অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

বিবিধ সংবাদ

বি ঝা সম্পাদিত বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী ঃ

প্রতি বছরের মত ১৯৬৭ সালের জন্যে কৃতী চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ বাগীশ্বর ঝা চলচ্চিত্র-প্রেমিক, চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী এবং সিনেমা গৃহের মালিক ও পরিচালকদের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় 'বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী অ্যাণ্ড জেনারেল ইনফরমেশন' নামে একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত করেছেন। এতে চিত্র-প্রদর্শকদের ব্যবহার্য 'ফিল্ম বুকিং চার্ট' ও 'বছরের প্রতিটি দিনের প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রয়ের খতিয়ান এবং পরিবেশকের প্রাপ্য অংশের উল্লেখের জন্যে স্তম্ভ ছাড়াও দিনপঞ্জী, দিনের তালিকা, বৈদেশিক দূতাবাস ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের ঠিকানা, প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর, ডাকঘর সংক্রান্ত খবরাখবর, বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির ঠিকানা, ১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আইন, ফিল্মের ওপর এক্সাইজ কর, কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণ আইন, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, ঠিকানা, ভারতের পূর্বাঞ্চলের চিত্রগৃহগুলির নাম এবং অবস্থিতি প্রভৃতি, ১৯৬৬ সালে সেন্সরকৃত ভারতীয় ছবির তালিকা, চলচ্চিত্রের ওপর বিভিন্ন রাজ্যের প্রমোদকর, ১৯৩১ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ছবির খতিয়ান, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কৃত ভারতীয় চিত্রের তালিকা, ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত চিত্রের তালিকা, পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তালিকা, ফিল্ম আর্কাইভ-এর বিবরণ, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র বাজারের গতিপ্রকৃতি, ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠাতাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির পরিচয় প্রভৃতি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে এই বিশিষ্ট প্রকাশনাটি পরিপূর্ণ। চমৎকার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইসমন্বিত প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠার এই তথ্যপূর্ণ ফিল্ম ডায়েরীটির মাত্র দশ টাকা মূল্য যে অত্যন্ত স্বল্প, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি নাগরিক কমিটি

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিপূজার জন্য মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি নাগরিক কমিটির উদ্যোগে হিন্দুস্থান রেকর্ডিং বাংলার বরেণ্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদবৃন্দ অভিনীত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ এক রেকর্ড নাটিকা বাংলার জনগণকে নিবেদন করতে সক্ষম হয়েছেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নিমাই নাগ-চৌধুরী, মনোজ বসু, মন্মথ রায়, উষা খান, জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

নাগরিক কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কবির খিদিরপুরস্থিত পৈত্রিক বাসভবনটি পাঠাগার স্থাপন করবার যে দাবী পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তা বিবেচনার আশ্বাস দেন।

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-পূজায় এক বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের রচনাসমৃদ্ধ স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুসূদন স্মৃতি বক্তৃতামালার ব্যবস্থার জন্য রেকর্ড বিক্রয়লব্ধ রয়ালটির টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের হস্তে অর্পণ করা হবে।

শিশুদের নববর্ষ উৎসব

সোদপুর গবর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট—বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত একটি উপনগরী। এ অঞ্চলে ছোটদের কোন সংস্থা নেই। তাই শিশু ও কিশোরদের বন্ধু শ্রীশৈলেন ঘোষের উদ্যোগে ও শ্রীপ্রশান্ত রায় চৌধুরী এবং তরুণদের সহযোগিতায় একটি শিশু-সংস্থার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছে নব-

বর্ষে এক আনন্দ-উজ্জ্বল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। নববর্ষের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রভাত-ফেরির মধ্য দিয়ে। বিকেলে এস্টেটের সেন্ট্রাল পার্ক-এ শিশুদের যেন মেলা বসে যায়। উদ্বোধন-সংগীত, পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন, শহীদ বেদীতে মাল্য-দান, দেশ-প্রেমিক ও মনীষী স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন, নববর্ষের সঙ্কল্প পাঠ, কুচকাওয়াজ, সমষ্টি-ব্যায়াম, দেশাত্ম-বোধক গান ইত্যাদিতে সমগ্র অনু-ষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরাধানন্দ ভট্টাচার্য, শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন শ্রীঅনঙ্গমোহন দাম। প্রধান অতিথি হয়েছিলেন ঃ শ্রীক্ষীরেন্দ্র-লাল নাগ এবং বড়দের মধ্যে অনেকেই শিশু ও কিশোরদের জীবনে এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীশৈলেন ঘোষ।

নতুন সংস্কৃতি সম্মেলন

গত ১৫ ও ১৬ এপ্রিল বর্ধমান টাউন হলে 'নতুন সংস্কৃতি সংগঠনী সমিতি'র উদ্যোগে 'নতুন সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে 'এ কালের জিজ্ঞাসা' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, পান্নালাল দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, বিনয় চট্টো-পাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন, অরুণ মজুমদার, তরুণ সান্যাল, প্রসূন বসু ও শেখর সেনগুপ্ত।

সম্মেলনের অন্যান্য অনুষ্ঠানসূচী ছিল, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারুকলা নিদর্শনসম্বলিত একটি 'ধ্রুপদী চিত্রকলা প্রদর্শনী', স্বদেশ ও বিদেশের 'চিরায়ত সংগীত অনুষ্ঠান' ও 'লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠান' পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় সমকালীন সমস্যানির্ভর কাটোয়ার ঐতিহ্যখ্যাত লোকগীতি নৃত্যনাট্য 'বোলান'। এছাড়া একটি কবি-সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বযুগের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আলেখ্যমালা ও উদ্ধৃতি-সংকলনসজ্জিত সম্মেলন-কক্ষটি বিশেষ ভাবগম্ভীর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সম্মেলন শেষে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে 'নতুন সংস্কৃতি' নামক একটি স্থায়ী সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

সিনে ক্লাব অব নৈহাটী

সিনে ক্লাব অব নৈহাটী আগামী ১৪ই ও ২১শে মে যথাক্রমে 'ইকুওয়ারিস' ও 'দি ম্যান ফ্রম দি ফার্স্ট সেঞ্চুরী' দেখাবেন স্থানীয় কল্যাণী সিনেমা হলে সকাল ৯টায়।

ঋত্বিক ঘটক চিত্রাবলীর প্রদর্শনী

নবগঠিত ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৮ই মে থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত ছ'দিন ধরে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস গৃহে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত চলচ্চিত্র উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে ঃ 'মেঘে ঢাকা ত (৮ই), 'কোমল গান্ধার' (৯ই), 'বাড়ী থে পালিয়ে' (১০ই), 'সুবর্ণরেখা' (১১ 'নাগরিক' (১২ই) এবং 'অযান্ত্রিক' ও 'ফিরার সর্ট' (১৩ই)। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা রাত্রি ৮-১৫তে দু'বার করে প্রদর্শনী হ

রাশিয়ার চলচ্চিত্র অধিবেশন

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা রুশ দূতা ও কনস্যুলেটের সহযোগিতায় আগামী ২ মে থেকে ২৩শে মে এক রুশ ফিল্ম সেসা আয়োজন করেছেন একাডেমী অব ফ আর্টস প্রেক্ষাগৃহে। যে ছবিগুলি প্রদা হবে তাঁর নাম চুখরাইয়ের 'ফরটি ফা 'ওথেলো', 'কার্নিভাল নাইটস' এবং 'ল ইন পোল্যান্ড' ও কয়েকটি বিশিষ্ট আ দৈর্ঘ্য চিত্র এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত।

ঝরিয়া বাঙ্গালী নববর্ষ সম্মেলন

ঝরিয়া বাঙ্গালী নববর্ষ সম্মেল ৪৫তম অধিবেশন গত ১লা ও ২রা বৈ অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ এম কে মৈত্র ও সাহি শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে সভা ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছি

উৎসবের সদস্যেরা দু'দিন দুটি ন যথাক্রমে 'এবাড়ী ওবাড়ী' ও 'দেবলা দে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অভি অংশগ্রহণ করেন বিশ্বনাথ সরকার, স চৌধুরী, নীরেন দত্ত, বীরেন চট্টোপাধ ইলাবন্ত ঘোষ, নারায়ণ সেনগুপ্ত, বি চৌধুরী, সান্ত্বনা ঘোষ, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধু

গানের জলসা

একটি সুরেলা প্রভাত

মাত্র কদিন আগে সুরেশ সংগীত সংসদের কর্তৃপক্ষ ওস্তাদ আলি আকবর খাঁন ও শ্রীঅশোক সরকারকে তাঁদের পদ্ম-ভূষণ উপাধি সম্মানে ভূষিত হওয়া উপলক্ষে উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে এক সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ ঘোষের সভাপতিত্বে অভিনন্দন জ্ঞাপন শেষে অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী এক সঙ্গীতাসরের ব্যবস্থা করে কর্মকর্তারা সঙ্গীতরসিক সমাজের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রবীণ শিল্পী খলিফা ওয়াজেদ হোসেন খাঁর তবলালহরা নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয়। খালিফা খান স্বরচিত একটি ত্রিতাল গৎ বাজালেন। গৎ টুকরো রেলায় ঘরানার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য সদাপটে এবং সগৌরবে বিঘোষিত। বাঁয়া, তবলা—উভয়ের কাজই একক এবং যুগ্মভাবে তবলাবিশারদদের মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে অসাধারণ দ্রুতলয়ের চরম মুহূর্তের বোলের অক্ষুণ্ণ স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য তার বয়সের (৬৬) পক্ষে নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়।

পরের শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী নট-ভৈরব রাগে স্বরচিত একটি বাংলা খেয়াল গেয়ে শোনালেন। বাংলা খেয়াল প্রচলন করার প্রচেষ্টা শ্রীলাহিড়ীর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম। কিন্তু মেজাজ ও উত্তেজনার চরম মুহূর্তেও দুটি বাধা কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। খেয়ালের দাবী পূর্ণ করতে হলে—কথার সৌন্দর্য কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করতে হয়ই আবার কথার কাব্যসৌন্দর্য ও রস পুরোপুরি আদায় করতে গেলে বাংলা খেয়ালকে রাগপ্রধান সঙ্গীতের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হয়।

Aristotle -এর ভাষায় "Music excites feelings because it has movement" কিন্তু খেয়ালের গতিকে বহন করবার উপযুক্ত ক্ষিপ্রতা বাংলা ভাষায় স্বধর্ম-বিরোধী। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে হয়নি। বিস্তার ও আস্থায়ী অঙ্গ শ্রীলাহিড়ীর সুরলালিত্যে, কল্পনাবৈভবে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেও 'বাট' 'বোলতানের অঙ্গে সে সরস গতিবেগ অ-ব্যাহত থাকেনি। কিন্তু শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠ, ত্রিসপ্তকের বলিষ্ঠ সঞ্চরণ ও 'সরগমে'র বৈচিত্র্য অন্যান্য ত্রুটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। চিন্ময়বাবুর আনন্দভরা মেজাজটি মুহূর্তের মধ্যেই শ্রোতাকে কাছে টেনে নেয়।

অনুষ্ঠানটি শেষ হয় ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সরোদানুষ্ঠান দিয়ে। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি আচ আলাউদ্দিনের বিশুদ্ধ রবাবী রীতি বাজিয়ে শোনালেন। 'বসন্তমুখারী' বা আলাপ দিয়ে সঙ্গতের শান্ত-মধুর পরি রচনা করে ধামার তালের ধ্রুপদী পটভূমি টোড়ির শান্তরসাশ্রিত বিষণ্ণ গাম্ভীর্য যেন জীবন্ত করে তুললেন। সেদি অনুষ্ঠান তাঁর 'তালিমী' বাজনার উজ্জ নিদর্শন। তাঁর আস্থায়ী অঙ্গের অচ বিস্তার—রবাবী বাজের মর্যাদাপ গাম্ভীর্য প্রতিটি স্বরের বাহুল্যবর্জি লক্ষ্যভেদী প্রয়োগকৌশল—আলাউদ্দিন মত গুরুর শিক্ষাধীনে বহু পরিশ্রমস ও সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য বিশেষ। সেদি অনুকূল পরিবেশ তাঁর ধ্যানমগ্ন চি বিকাশের উপযুক্ত আধার হয়ে উঠেছি 'বিরাগী'র সৌন্দর্যদীপ্ত স্বরসমন্বয় মধ পরিণতিতে পৌঁছালো দাদরা ছন্দে 'ভৈরবী'তে, যেখানে ব্যক্তিত্বে, রঙে, মাধু সঙ্গীত যেন রূপময় হয়ে উঠেছিল। কি সওয়াল জবাবসমন্বিত 'ত্রিতালে'র দ্রু ভৈরবী সেদিনের উচ্চমান বাজনার তা সাম্যতার সঙ্গে তাল রেখে চলেনি।

শঙ্কর ঘোষ ধামার, ঝাঁপতাল, আদ ছন্দ—প্রতিটি তালেই দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। ধামার তালে তি পাখোয়াজ-অঙ্গ ও তবলা-অঙ্গ উভ বোলেই প্রশংসাযোগ্য। হয়ত পাখোয়াজ অঙ্গের বোল আরো বেশী বাজানো উচি

সুরেশ স্মৃতি সংসদের অনুষ্ঠানে চিন্ময় লাহিড়ী

সুরেশ স্মৃতি সংসদের অনুষ্ঠানে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

ছিল। কিন্তু উঁচুসুরে বাঁধা তবলা তার উপযোগী নয় বলেই বোধ হয় বাজাননি। আড়ি, দেড়ী, অনাঘাত ও উপজ ছন্দের বাজনা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

আলাউদ্দিন সংগীত সমাজ

গত সপ্তাহে মহাজাতি সদনে দুদিন-ব্যাপী অধিবেশনে এক সংগীতোৎসবের আয়োজন করেছিলেন আলাউদ্দিন সংগীত সমাজ।

প্রথম রাতের আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। "মালকোষ" রাগের আলাপ ও "কৌষি-কানাড়া"য় গৎ বাজিয়ে শ্রোতাদের তিনি আনন্দলোকে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলো শ্রীভি জি যোগের বেহালা ও শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীরবি কিচলুর দ্বৈত খেয়াল।

দ্বিতীয় রাতের নায়ক ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর "দেশকার"—তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের সরস প্রকাশ। মুনোয়ার খাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কণ্ঠসংগীতে উপযুক্ত সহায়তা করেছেন।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর "টোড়ি" সুরাকিরী ও লয়াকিরী উভয় বিচারেই অতি উচ্চমানের বাজনা। শ্রীঅনিল ভট্টাচার্যর সংগত তাঁকে ছন্দের বিভিন্ন সাজে মাতিয়ে তুলে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য করে তুলেছিল।

ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁর,—সেতার আলাউদ্দিন ঘরানার প্রামাণ্য বাদনশৈলীকে প্রদর্শন করেছে। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁর বাজের দাপট লক্ষ্য করবার মত।

আনন্দকেদার, নন্দ এবং ঠুংরী গেয়ে শ্রোতাদের খুসী করতে পেরেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর শিষ্যা শ্রীমতী অর্চনা বোসের গানে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর-পূর্ণ।

সেনী সংগীত সম্মেলন

সেনী সঙ্গীত সমাজের একটি অধি-বেশন হয়ে গেল ৫৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে।

শ্রীমতী অনীতা বসুর "পূরিয়া" রাগের খেয়াল সংগীত। ওপরের পর্দার কাজে সুরসাম্যতা না থাকলেও আস্থায়ী পর্দার কাজ সুষ্ঠু।

এই আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বীন। ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে পরিবেশিত 'মারুবেহাগ' তাঁর উপযুক্ত মুন্সিয়ানায় পরিবেশিত। বীরেন্দ্রকিশোর ভারতীয় সংগীতের অভি-ভাবকস্থানীয়, স্বল্প কয়েকজন শিল্পী ও সংগীতবিদের অন্যতম যিনি বীন, রবাব, সুরশৃঙ্গার ইত্যাদি প্রাচীন ও মূল যন্ত্র-গুলির ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন।

ভাতখণ্ডে সংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গত ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উৎসব একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন দে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণের পর পুরস্কৃত শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্র-সংগীত প্রতিযোগিতা

'দেবদারু' সাংস্কৃতিক সংস্থা পরি-চালিত রবীন্দ্র-সংগীত প্রতিযোগিতা আগামী ১১ই জুন রবিবার উত্তরপাড়া মুক্ত-প্রাঙ্গণ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ দিন ১লা জুন '৬৭। পশ্চিমবঙ্গের বহিরাগত প্রতিযোগীদের যোগদানের সুবিধার্থে সংস্থা কর্তৃক থাকবার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগাযোগ কেন্দ্র :—৮৮ বিজয়কৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী।

হরিনাভিতে শাস্ত্রীয় সংগীতে ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন ও বসন্তোৎসব

গত ১৬ই এপ্রিল সংগীতবিনোদ শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ও শ্রীকমল-কৃষ্ণরায়চৌধুরীর সম্পাদনায় ২৪ পরগণার হরিনাভি প্রগতি সঙ্ঘ ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের বসন্ত উৎসব শাস্ত্রীয় সংগীতের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। এই উৎসবে কণ্ঠসংগীতে সর্বশ্রী কনক ব্যানার্জি, পান্নালাল ভট্টাচার্য, কল্যাণী চক্রবর্তী, গৌরী ভট্টাচার্য ও জয়ন্তী বসু, সেতারে বেলা বসু ও সুনীল চক্রবর্তী, বেহালায় শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং তবলায় সর্বশ্রী সঞ্জিত বসু, প্রভাত বসু, গোপাল পুরকায়েত, সুনীল চক্রবর্তী ও নারায়ণ মিত্র অংশ গ্রহণ করেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ফুটবল প্রসঙ্গ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কথা। কলকাতার সরকারী এবং বেসরকারী অফিসে ফুটবল খেলার উৎসাহী ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে স্বদেশের ছাঁচে কলকাতায় ফুটবল খেলার আসর তৈরীর উৎসাহ-উদ্দীপনা খুবই জোরদার হয়। তারই ফলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা। এর আগে তাদেরই প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৯ সালে ট্রেডস কাপ এবং ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার পত্তন হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সিমলার ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাই ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা। কিন্তু ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কারণ সূচনা থেকে বেশ কয়েক বছর একমাত্র সামরিক দলেরই এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল। এমনকি কলকাতার অভিজাত ডালহৌসী, ক্যালকাটা এফ সি, রেঞ্জার্স প্রভৃতি শক্তিশালী ইউরোপীয় ফুটবল দলগুলিকেও উপেক্ষা করা হয়েছিল। ডুরান্ড কাপকে টেক্কা দিয়ে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ইউরোপীয় বণিক সমাজ ট্রেডস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে ট্রেডস কাপই দ্বিতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। ডুরান্ড কাপের খেলায় বে-সামরিক দলের যোগদান সম্পর্কে যেমন বাধা-নিষেধ ছিল ট্রেডস কাপের খেলায় তা রাখা হয়নি। সামরিক, বে-সামরিক (ইউরোপীয় এবং ভারতীয়) এমনকি কলেজ ফুটবল দলও ট্রেডস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এককথায় ট্রেডস কাপকেই ভারতবর্ষের প্রথম সার্বজনীন ফুটবল প্রতিযোগিতা বলা চলে। ডুরান্ড কাপকে টেক্কা দিয়েও কলকাতার প্রবাসী ইংরেজরা থেমে গেলেন না। স্বদেশের ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন এবং তাদের পরিচালনায় ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ প্রতিযোগিতা (সংক্ষেপে এফ এ কাপ)—এই দুটির অনুকরণে কলকাতার ফুটবল খেলার আসরে কিছু করা যায় কিনা তা নিয়ে তৎপর হলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা তা না করে ছাড়লেন না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হল এবং এই সংস্থারই পরিচালনায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দেই আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা। এর চার বছর পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হলে ভারতীয় ফুটবল খেলার আসরে কলকাতার পদমর্যাদা আরও বেড়ে গেল। কলকাতা তখন ভারতীয় ফুটবল খেলার প্রাণকেন্দ্র বা রাজধানী।

১৮৮৯ সালে ট্রেডস কাপ এবং ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ড নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে যোগদানকারী দলগুলির মধ্যে শোভাবাজার একমাত্র ভারতীয় দল হলেও এই দুই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলকে একঘরে করা হয় নি। কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে সুদীর্ঘকাল ভারতীয় দলের যোগ্যতা উপেক্ষা করা হয়েছিল। ১৮৯৮ সালে প্রথম বিভাগ এবং ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর দ্বিতীয় বিভাগের লীগের খেলায় মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স ১৯১৪ সালে এবং প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় মোহনবাগান ১৯১৫ সালে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসাবে খেলবার অধিকার লাভ করে।

সামরিক ও ইউরোপীয়ান দলের প্রাধান্য

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন বছরে (১৮৯৮ সালে) গোরা দল (গ্লস্টার রেজিমেন্ট) লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছিল। প্রথম বেসামরিক দল হিসাবে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব দ্বিতীয় বছরেই (১৮৯৯ সালে) প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের গৌরব লাভ করে। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার এই সুদীর্ঘ ৩৬ বছরের ইতিহাসে সামরিক এবং ইউরোপীয়ান দলই অটুট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই সময়ে সামরিক দল ২৪ বার এবং ইউরোপীয়ান দল ১২ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। অপর দিকে ভারতীয় দলের পক্ষে মোহনবাগান ৫ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২ বার রানার্স-আপ হয়।

ভারতীয় প্রাধান্যের যুগ

১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ভারতীয় প্রাধান্য যুগের সূচনা হয়। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৩৩ বছরে একমাত্র ভারতীয় দলই লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—মোহনবাগান ১৩ বার, মহমেডান স্পোর্টিং ৯ বার, ইস্টবেঙ্গল ৮ বার এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে একবার। ১৯৪৭ সালে ফুটবল লীগ খেলা হয় নি এবং ১৯৫৩ সালে অসমাপ্ত অবস্থায় প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়।

অদৃষ্টের কি পরিহাস!

আজ দীর্ঘ দিন ধরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় কোন ইউরোপীয়ান দলের অস্তিত্ব নেই। তারা সকলেই একে-একে প্রথম বিভাগে খেলবার যোগ্যতা হারিয়েছে। যে ক্যালকাটা এবং ডালহৌসী ক্লাবের সক্রিয় প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের মাটিতে ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত সেই দুটি ক্লাবকেই যোগ্যতার প্রশ্নে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা থেকে হটে যেতে হয়েছে, পুনরায় ফিরে আসা সম্ভব হয় নি বরং আরও নীচের বিভাগে নেমেছে। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব চতুর্থ বিভাগের লীগের খেলা থেকে নেমে গিয়ে বর্তমানে বেঙ্গল সোকার লীগে স্থান পেয়েছে; আর ডালহৌসী খেলছে তৃতীয় বিভাগে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

মোহনবাগানের প্রাধান্য

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত—এই ১৩ বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় মোহনবাগান ক্লাবের জয় ৯বার এবং বাকি ৪ বছরে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এই তিনটি ক্লাব—মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৫৭ সালে, ইস্টার্ন রেলওয়ে ১৯৫৮ সালে এবং ইস্টবেঙ্গল ১৯৬১ ও ১৯৬৬ সালে। মোহনবাগান গত ১৩ বছরে যে ৯বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে তার মধ্যে ৭ বছরে (১৯৫৯-৬৫) ৬বার লীগ জয়ী হয়েছে। ১৯৬১ সালে যদি মোহনবাগান লীগ বিজয়ী হত তাহলে তারা উপর্যুপরি ৭বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং দলের উপর্যুপরি ৫বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলে নতুন রেকর্ড করতো। মোহনবাগান ১৯৫৯-৬০ (উপর্যুপরি ২ বার) এবং ১৯৬২-৬৫ (উপর্যুপরি ৪বার) মোট ৬বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মাঝে ১৯৬১ সালে লীগ জয়ী হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। পুনরায় ১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ বিজয়ের ফলে মোহনবাগান উপর্যুপরি ৫বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড (মহমেডান স্পোর্টিং দলের সমান) করতে পারেনি।

উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

উপর্যুপরি তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ান

৫ বার : মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৩৪—৩৮)—রেকর্ড

৪ বার : মোহনবাগান (১৯৬২—৬৫)

৩ বার : মোহনবাগান (১৯৫৪—৫৬)

৩ বার : ডারহামস (১৯৩১—৩৩)

সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান

মোহনবাগান — ১৩ বার (রেকর্ড) : ১৯৩৯, ১৯৪৩—৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪—৫৬ (উপর্যুপরি ৩বার), ১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬২—৬৫ (উপর্যুপরি ৪ বার)।

মহমেডান স্পোর্টিং—৯ বার : ১৯৩৪—৩৮ (উপর্যুপরি ৫ বার) রেকর্ড, ১৯৪০-৪১, ১৯৪৮ ও ১৯৫৭।

ক্যালকাটা এফ সি—৮ বার : ১৮৯৯, ১৯০৭, ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২২-২৩ ও ১৯২৫।

ইস্টবেঙ্গল — ৮ বার : ১৯৪২, ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৯-৫০, ১৯৫২, ১৯৬১ ও ১৯৬৬।

ডালহৌসী — ৪ বার : ১৯১০, ১৯২২, ১৯২৮-২৯।

ডারহামস এল আই — ৩ বার : ১৯৩১—৩৩ (উপর্যুপরি ৩ বার)।

অপরাজিত অবস্থায় লীগ বিজয়ী

প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৮৯৮ সালে। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৯ বছরের ইতিহাসে নীচের মাত্র দশটি দল অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই দশটি দলের মধ্যে ৬টি সামরিক দল এবং ৪টি বেসামরিক দল। দুবার করে অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে মাত্র দুটি দল—রয়েল আইরিশ রাইফেলস (১৯০০ ও ১৯০১) এবং ক্যালকাটা এফ সি (১৯১৬ ও ১৯২২)।

(১) রয়েল আইরিশ রাইফেলস (১৯০০ ও ১৯০১)।
(২) ৯৩নং হাইল্যান্ডার্স (১৯০৩)।
(৩) কিংস ওন রেজিমেন্ট (১৯০৫)।
(৪) গর্ডনস এল আই (১৯০৮)।
(৫) ব্ল্যাকওয়াচ (১৯১২)।
(৬) ক্যালকাটা এফ সি (১৯১৬ ও ১৯২২)।
(৭) নর্থ স্ট্যাফোর্ডস (১৯২৭)।
(৮) মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪৮)।
(৯) ইস্টবেঙ্গল (১৯৫০)।
(১০) মোহনবাগান (১৯৬৪)।

সমস্ত খেলায় জয়

লীগ প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এই তিনটি দল : ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস, ১৯০৮ সালে গর্ডনস এল আই এবং ১৯১২ সালে ব্ল্যাকওয়াচ।

একমাত্র নজীর

রয়েল আইরিশ রাইফেলস ১৯০১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে এবং একটা গোলও না খেয়ে লীগ পায়—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজীর।

ডেভিস কাপ

তেহরানে আয়োজিত ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতবর্ষ ৪-১ খেলায় ইরাণকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন জয়দীপ মুখার্জি এবং শিব মিশ্র। জয়দীপ তিনটি খেলায় জয়ী হন—দুটি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলসে (মিশ্রের সহযোগিতায়)। অপরদিকে মিশ্র জয়ী হন দুটি খেলায়—একটি সিঙ্গলস এবং ডাবলসে। শেষ দিনের সিঙ্গলস খেলার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

মাদ্রিদ হকি টুর্ণামেন্ট

মাদ্রিদে আয়োজিত আন্তর্জাতিক হকি টুর্ণামেন্টের ফাইনালে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে স্পেনকে পরাজিত করে ট্রফি পেয়েছে। ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে জয়সূচক গোলটি দেন বলবীর সিং।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম ভারতবর্ষ, ২য় স্পেন, ৩য় বৃটেন, ৪র্থ বেলজিয়াম, ৫ম স্পেন, ('বি' দল), ৬ষ্ঠ কানাডা, ৭ম ইতালী এবং ৮ম মেক্সিকো।

উরস্টারশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ড সফরের প্রথম খেলায় (প্রথম শ্রেণীর) চান্দু বোরদের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল ফিল্ডিং করতে নামছে।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

উরস্টারশায়ার দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের উদ্বোধনী খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। খেলা ড্র গেছে। তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে চা-পানের পর আলোর অভাবে খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এই উরস্টারশায়ার দলের বিপক্ষেই বিদেশী ক্রিকেটদল চিরাচরিত প্রথায় ইংল্যান্ড সফরের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টসে জয়ী হয়ে উরস্টারশায়ার দল প্রথম ব্যাট করার দান নেয়। বৃষ্টি এবং হাড়কাঁপুনে ঠান্ডা বাতাসের জন্যে প্রথমদিন একাধিকবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়। লাঞ্চের সময় উরস্টারশায়ার দলের রান দাঁড়ায় ৭৮ (৩ উইকেটে)। প্রথমদিনের খেলায় উরস্টারশায়ার দল ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে। তাদের দুজন বহিরাগত খেলোয়াড়—বেসিল ওলিভেরা এবং রন হেডলী ব্যাটিংয়ে ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেন। নবাগত খেলোয়াড় ওলিভেরা ২৪৮ মিনিটের খেলায় ১৭৪ রান সংগ্রহ করে নট আউট থাকেন। তাঁর প্রথমশ্রেণীর খেলার এই নট আউট ১৭৪ রানই সর্বোচ্চ রান। তিনি ২৯টা বাউন্ডারী করেন। অপরদিকে প্রখ্যাত ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট খেলোয়াড় জর্জ হেডলীর পুত্র রন হেডলী ৬০ রান করেন। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার বিষেণ বেদী ৬৮ রানে ৩টে উইকেট পান। ভারতীয় দলের নির্বাচিত অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের অসুস্থতার ফলে দলের সহ-অধিনায়ক চান্দু বোরদে দল পরিচালনা করেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই খারাপ হয়েছিল। চারটে ক্যাচ মাটিতে পড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে উরস্টারশায়ার দল ব্যাট করতে নামেনি। পূর্ব দিনে সঞ্চিত ৩৩৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় তারা প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। মাত্র দু ওভার খেলার পর বৃষ্টির জন্যে দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ৩ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ভারতীয় দলের ৮০ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। চা-পানের পর আলোর অভাবে যখন খেলা বন্ধ হয়ে যায় তখন ভারতীয় দলের রান ছিল ১০৬ (৪ উইকেটে)।

ফুটবলের হালচাল

শঙ্করবিজয় মিত্র

সে এসেছে। কালবৈশাখীর ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে তাকে নামতে দেখলাম। কি অপূর্ব সে সমারোহ। কি বিপুল তার অভ্যর্থনা। দশদিক থেকে জনতার মিছিল এল তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানাতে। এল কিশোর, এল তরুণ, এল যুবক, এল প্রৌঢ়, বৃদ্ধরাও বাদ গেই। শিশু, নারীরাও আনন্দ ধ্বনি জাগিয়ে বরণ করলো তাকে। সে যে রাজার রাজা। গণমানসের প্রেমাভিষিক্ত নায়ক। কতদিন ধরে ছিল তারা তারই প্রতীক্ষায়। শীতের দিনগুলি পেরিয়ে বসন্তের ফুল ফোটানর পালা সাঙ্গ করে রুদ্ররূপে কাল-বৈশাখী বাহনে তার আবির্ভাব। সে তো আভিজাত্যের শিখরে বসা ক্রিকেট নয়, কিংবা অনাদরে দূরে সরিয়ে রাখা হকি নয়—সে যে পরমপ্রিয় পায়ে দলা ফুটবল। পায়ে পায়ে সে হৃদয়ের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছে। তাই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের পা পোড়ানো গা জ্বালানো রোদ, আষাঢ় শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে উপেক্ষা করে তাকে দেখতে আসে কাতারে কাতারে সকল স্তরের মানুষ।

এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। ৯ই মে তারিখটা তারা মুখস্থ করে রেখেছিল—সে বিকেলটা গড়ের মাঠে থাকতেই হবে বলে স্থির করা ছিল। এসেছেও তারা দলে দলে, অভিনন্দন জানিয়ে গেছে ফুটবলের আগমনকে। বাংলা এ খেলায় এতকাল তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে এসেছে। গৌরবের মুকুট এতকাল বাংলামায়ের মাথাতেই পরানো ছিল। বাংলার খেলোয়াড়, ক্রীড়াবিদ্, কর্মকর্তারা সে গৌরবের অংশীদার ছিলেন। বাংলার ক্রীড়ানুরাগীরা অনুরাগের অঞ্জন পরে এই মহিমময় দৃশ্য দেখতেন। ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলা দল বিজয়-মাল্য জিনে এনেছে। আন্তর্জাতীয় প্রতি-যোগিতাগুলোতেও বাংলার খেলোয়াড়রাই নাম রেখেছে। এ সমস্ত প্রতিযোগিতাতেই বাংলার প্রতিনিধি খেলোয়াড়রা যে নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে আসতেন তাতে বাঙালী মাত্রই গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়েছে, তাদের অনুরাগ বর্ধিত হয়েছে।

কিন্তু এই অনুরাগের অঞ্জন কি আজও তাদের চোখে মাখানো আছে? বাংলার যে গৌরবে তারা পুলকিত হত সে গৌরব আজ কোথায়? জাতীয় ফুটবলে বাংলা আজ হৃতগৌরব। ভারতের বিভিন্ন প্রতি-যোগিতাতেও বাংলার সেরা দলগুলো ট্রফি নিয়ে আসতে পারছে না। এখন প্রতিযোগিতা চলে কোন ক্লাব কতগুলো বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে আসতে পারে এবং সেই সব ভাড়াটে-খেলোয়াড় দিয়ে লীগ বা শীল্ড জিততে পারলেই পরম কাম্য ফললাভ হল বলে ভাবে। বিত্তবান ক্লাবকর্তারা ক্লাবকে যে-কোনভাবে জয়ী দেখতে চান, দেশের (নিজ রাজ্যের) ক্রীড়ামান উন্নত হচ্ছে কিনা একবারও তা চিন্তা করেন না। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ বা গ্রামীণ ক্লাবে যে-সব ফুটবল প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে তাদের অনুসন্ধান করে শিক্ষণের ব্যবস্থা করে গড়ে তোলার দায়দায়িত্ব নিতে কেউ এগিয়ে আসে না। কত প্রতিভা যে অনাদরে বিনষ্ট হচ্ছে কেই বা তার সন্ধান রাখে! বাঙালী ছেলেদের গড়ে তোলবার কথা কেউই আজ চিন্তা করে না। অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণদের সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য স্বনামখ্যাত দুঃখীরামবাবু (উমেশচন্দ্র মজুমদার) যে পরিশ্রম করতেন আজ তা কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তখনকার সীমিত সামর্থে তাঁর পক্ষে যা সম্ভব ছিল আজকের সুযোগসমৃদ্ধ দিনে কর্মকর্তারা তা যে কেন বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন না ভাবতেও অবাক লাগে।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যখন ক্রীড়া প্রতিভা আবিষ্কারের ধুম লেগেছে, দেশে দেশে তরুণ দলের জন্য নানা ব্যবস্থাপনা, সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চলছে, তখন আমরা যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় গা ঢেলে দিয়েছি। জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটিয়ে দেশ গড়ার দুঃস্বপ্ন দেখছি। ক্লাবকর্তারা বাংলার বাইরে থেকে দুহাতে পয়সা খরচ করে খেলোয়াড় আমদানী করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করছেন। গঠনমূলক কোন পরিকল্পনার কথাই তাঁদের মাথায় বাসা বাঁধে না। এত সুলভ যেখানে পন্থা তেমনি সস্তা সেখানে বাহাদুরী অর্জন। ক্লাব সদস্যদেরও কি কোন কর্তব্যবোধ নেই, দেশপ্রীতি নেই যে তাঁরা কর্তাদের বাহাদুরী লুঠবার খোরাক জুগিয়ে যাবেন। সময় থাকতে তাঁরা সজাগ না হলে ফুটবলে বাঙালীর নাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে সময় লাগবে না।

এ কেমন ভালবাসা

যে ফুটবলে বাঙালীর ভালবাসার তুলনা নেই, মাঠে মাঠে, পথেপ্রান্তরে, ট্রামে-বাসে, অফিস-আদালতে ঘরে-বাইরে যে খেলাকে নিয়ে এত মাতামাতি সেই খেলাকে গলা টিপে মারবার বিরুদ্ধে কিনা কোন প্রতিবাদ নেই। এ যেন চোখের সামনে কোন প্রিয়জনকে হত্যা করতে দেখা। এ কেমন ভালবাসা জানি না। ভালবাসার বস্তুকে হত্যা করতে দেখেও নীরব থাকা কি বীর্যবত্তার পরিচয়! আসল কথা ফুটবলের প্রতি ভালবাসাটা একটা কথার কথা। এটা একটা সাময়িক উন্মত্ততা মাত্র। বাঙালীর জাতীয় চরিত্র থেকে সংগঠন প্রতিভা বিদায় নিয়েছে। গঠনমূলক পথে এগোবার চেষ্টা না করে উন্মাদনার গা ভাসিয়ে চলাটাই যেন তার কাছে একমাত্র পথ হয়ে উঠেছে।

তা না হলে ওঠানামা বিবর্জিত লীগ খেলা বছরের পর বছর বাংলাদেশে চলে কি করে? ফুটবলে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারের জন্যেই লীগ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। বিভিন্ন দলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষায় যে সেরা কৃতিত্ব দেখাবে সে দলকে সেরা দলের গৌরবের পুরস্কার হিসেবে উঁচু স্তরের দলে স্থান দেওয়া হবে। আর যে দল সবার পিছনে থাকবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে নিম্নপর্যায়ের দলে স্থান দিয়ে। এতে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি তত বড় কথা নয়, যত বড় খেলার মান উন্নয়নে মদৎ দেওয়া। কাজেই ওঠানামা বর্জন করলে লীগ খেলার সার্থকতা কোথায়? অথচ লীগ খেলায় প্রহসন চলেছে কলকাতার সর্বজন-প্রিয় ফুটবলে। এই লীগ এক অভিনব ব্যবস্থা। সারা দুনিয়া ঢুঁড়লেও এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। এতে করে ফুটবলের উন্নতি করার চেষ্টাকে নির্মূল করা হচ্ছে। আর বাংলার ফুটবলপ্রিয় জনসাধারণ এই অবস্থার প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টা করছে কি?

এতদিনের মধ্যে গত বছরের ওঠানামা বর্জিত লীগ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে জন-সাধারণের প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পতাকা, ফেস্টুন নিয়ে তারা বিক্ষোভ করেছিল। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষ এই বিক্ষোভকে প্রবলভাবে পরিপুষ্ট করতে পারে নি বলে আন্দোলন জোরদার হয়নি। কিন্তু তাতেও তো কর্তৃপক্ষের সুস্থ চিন্তা জাগ্রত হয়নি। এই অভিনব ব্যবস্থার ছেদ টানবার মৌলিক আশ্বাস দিয়েও তো তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে আছেন। যে জনগণের ইচ্ছার প্রবল স্রোতে একটি গভর্নমেণ্ট ভেসে গেছে তার স্রোতের মুখে অবশ্য এই খেয়াল-খুশী আর বেশীদিন চলবে না। তবু এবারের লীগ মরশুমের প্রারম্ভে সে ঘোষণা থাকলে বুঝা যেত যে তাঁরা দেওয়ালের লিখন পড়তে শিখেছেন। তাঁদের সে শুভ-বুদ্ধির উন্মেষ হোক এ কামনা জানিয়ে বাংলার ফুটবলকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের প্রশ্ন করি এ কেমন ভালবাসা?

শান্তি শৃঙ্খলা

এ ভালবাসা উদ্‌ভ্রান্ত। তা না হলে যে খেলা দেখার জন্যে অনুরাগীরা অসহনীয় দুঃখবরণ করতেও পেছপা নয়, সেই খেলার মাঠে কারণে অকারণে তারা শান্তি শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে কেন? এই তো সেদিন ইস্টবেঙ্গল ও বি এন আর দলের মধ্যে চ্যারিটি খেলাতে যে উচ্ছৃঙ্খল-তার সৃষ্টি হয়েছিল তা মোটেই কাম্য হতে পারে না।

খেলার মাঠে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাবপ্রীতি নিন্দার্হ নয় কিন্তু এই প্রীতির অশালীন বহিঃপ্রকাশে

যে অশোভন অবস্থার সৃষ্টি করে ক্লাব সদস্যদের তা মনে রাখা উচিত। আই এফ এ এবার মরশুমের গোড়া থেকেই এ বিষয়ে সজাগ হয়ে চলবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। ক'দিন আগে আই এফ এ'র নতুন সভাপতি শ্রীস্নেহাংশুকুমার আচার্য প্রথম ডিভিসন লীগ ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ক্লাব প্রতিনিধি ছাড়া রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য ও পুলিশ কমিশনার শ্রীপ্রণব সেনের সঙ্গেও আলোচনা করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি করণীয় কাজের কয়েক দফা সূচী স্থির করেছেন—(১) ঘেরা মাঠে দর্শকদের আসন বৃদ্ধি, (২) আরও দুটি ঘেরা মাঠের জন্য চেষ্টা, (৩) ছোট ক্লাবকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দান, (৪) মাঠে মাঠে আই এফ এ'র স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ, (৫) ক্লাবের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন প্রচার ও তার জন্য খেলার সময় মাঠে লাউডস্পীকারের ব্যবস্থা রাখা, (৬) সারা বছর ফুটবল অনুশীলন ও প্রস্তুতির জন্য মাঠে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা, (৭) এ্যালেনবোরা কোর্সে স্টেডিয়াম তৈরীর চেষ্টা এবং যতদিন এই স্টেডিয়াম না হয় ততদিন ইডেন উদ্যানে গুরুত্বপূর্ণ খেলার ব্যবস্থা, (৮) গড়ের মাঠে ফুটবলকে সীমাবদ্ধ না রেখে উত্তর-দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব কলকাতার জুনিয়ার খেলার বিকেন্দ্রীকরণ, (৯) রেফারীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রশ্নটা আজকাল যে বিরাট আকার ধারণ করেছে তাতে ফুটবল মরশুমের গোড়াতেই সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই প্রয়োজন। আই এফ এ'র নতুন সভাপতি কলকাতার ফুটবলে নব প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টায় ব্রতী হয়ে সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছার অধিকারী হয়েছেন। আশা করি তিনি প্রবল প্রচেষ্টায় সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করে ফুটবলে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতে পারেন দর্শকসাধারণ।

শক্তিসামর্থ্যে

কলকাতায় ফুটবলের তোড়জোড় চলে লীগ আর আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করেই। ক্লাবগুলো এদিকে নজর রেখেই দল গঠন করে। তবে দল গঠনে ক্লাবকর্তাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী নয়। বাইরের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত। 'দূরের পানে মেলে আঁখি, সদাই আমি চেয়ে থাকি'—এই ভাব। বড় বড় ক্লাবগুলোর ব্যবস্থাপনাও বড়, বড় খরচে তাদের বড় মেজাজ। কারণ তাদের আর্থিক সঙ্গতি বড়। লীগ প্রতিযোগিতায় সকলের ওপরের জায়গাটা নিয়ে কলকাতার চার পাঁচটা দলের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত পাল্লা চলে। এই দলগুলি সামর্থ্যে ও সঙ্গতিতে শীর্ষস্থানে। তাদের দৃষ্টি তাই দূরে। বাইরে কোথায় প্রতিভাধর খেলোয়াড় আছে তার খোঁজে ছুটে যায় তাদের দূত। সারা ভারত জুড়ে তারা জাল পেতে তুলে আনেন রুই-কাৎলাকে নিজেদের, তাঁদের নিজেদের দলে। এই প্রবল দলগুলিকে ঘিরেই ফুটবলে যত আবেগ ও উন্মত্ততা। এটা দেশের স্বার্থের কতটা অনুকূল তা বলা শক্ত, তবে এটাই আসল চিত্র।

গোড়াতেই বলেছি পাল্লাটা শেষ পর্যন্ত চার পাঁচটা বড় বড় দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে। এই দলগুলোর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টার্ন রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের কথাই উল্লেখ করতে হয়।

ইস্টবেঙ্গল

গত বছর লীগ ও শীল্ড দুইই পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এই সাফল্যের ধারা বজায় রাখার জন্য এবারও তাদের প্রবল প্রস্তুতি চলেছে। বরং গত বছরের তুলনায় এবারের সংগ্রহ ভালই বলতে হয়। এদের জাল এবার আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সেখান থেকে এবার এসেছে এক জাঁদরেল ফরোয়ার্ড। এই তরুণ খেলোয়াড়টির নাম ওয়েলিংটন। গত বছর দিল্লীতে সুব্রত কাপের খেলায় অনেক গোল করে অনেক প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি এবং তারই সূত্র ধরে এবার তিনি এলেন ইস্টবেঙ্গল দলে। তা ছাড়া ফরোয়ার্ডে ফিরে এসেছেন অসীম মৌলিক ও দুলাল মণ্ডল মোহনবাগান থেকে, আর এসেছেন সায়মাদ খাঁ মহমেডান স্পোর্টিং থেকে। হাফব্যাকে এসেছেন ইস্টার্ন রেলওয়ের কানন গুহ, আর এসেছেন ঐ দলেরই স্টপার সঞ্জীব বসু। এ ছাড়া আরও কয়েকজন এসে দলের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

একমাত্র ফুলব্যাক লাইনের সীমিত শক্তি ছাড়া আর সব বিভাগেই এবারে ইস্টবেঙ্গল দল বিশেষভাবে পরিপুষ্ট। এবার দল গঠনে ইস্টবেঙ্গলের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা খেলবেন তাঁদের সম্ভাব্য তালিকা দাঁড়াচ্ছে এই :—

গোল—পিটার থঙ্গরাজ, সনৎ শেঠ ও দর্জি (দার্জিলিংয়ের); **ফুলব্যাক ও স্টপার**—মহম্মদ নায়িমুদ্দিন, শান্ত মিত্র, এস ভট্টাচার্য, সঞ্জীব বসু (ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে)। **হাফব্যাক**—প্রশান্ত সিংহ, রাম বাহাদুর, পি সরকার (এরিয়ান্স) ও কানন গুহ (ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে); **ফরোয়ার্ড**—অসীম বসু, দুলাল মণ্ডল ও অসীম মৌলিক (মোহনবাগান থেকে), ওয়েলিংটন (আন্দামান-নিকোবর থেকে), সন্তোষ চ্যাটার্জি (রাজস্থান থেকে), পরিমল দে, কে শর্মা ও সায়মাদ খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং থেকে)।

মোহনবাগান

লীগে রানার্স আপ মোহনবাগানের সংগ্রহও এবার কিছু কম নয় বরং ভালই বলতে হয়। এবারকার রোভার্স কাপ বিজেতার দলে এসে জুটেছেন মহমেডান স্পোর্টিং-এর আলতাফ আমেদ ও লতিফ, ইস্টার্ন রেলওয়ের ভবানী রায়, মহীশূরের সম্পৎকুমার, ইস্টবেঙ্গলের সুকুমার সমাজপতি ও গুরুকৃপাল সিং, এরিয়ান্সের বিমান লাহিড়ী ও সুদক্ষ গোলরক্ষক কানাই সরকার। গত বছর গোলরক্ষক নিয়ে মোহনবাগান দলকে খুব ভুগতে হয়েছে, তাই কানাই সরকার এবার দলের একটি বড় রকমের সংগ্রহ। সব বিভাগেই এবার মোহনবাগানের সংগ্রহটা মোটামুটি ভালই। দল গঠনে মাঝে মাঝে 'কাকে ছেড়ে কাকে রাখি' হতে পারে এই যা। যাঁদের দিয়ে দল গঠন হবে তাঁরা হলেন :—

গোল—পি বর্মণ, কমল সরকার ও কানাই সরকার (এরিয়ান্স থেকে)। **ফুলব্যাক**—সুশীল সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, বিক্রমাদিত্য দেবনাথ (ইস্টবেঙ্গল থেকে); এম কর্মকার (উয়াড়ী থেকে) ও আলতাফ আমেদ (মহমেডান স্পোর্টিং থেকে); **স্টপার**—জার্নেল সিং, চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ ও এ টি রহমন; **হাফব্যাক**—নিত্য ঘোষ, চায়না পাল, বিমল চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত ব্যানার্জি (রাজস্থান থেকে), লতিফ (মহমেডান স্পোর্টিং থেকে), ও ভবানী রায় (ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে)। **ফরোয়ার্ড**—সুকুমার সমাজপতি (ইস্টবেঙ্গল থেকে), সম্পৎ কুমার (মহীশূর থেকে), সীতেশগোবিন্দ দাস ও গুরুকৃপাল সিং (ইস্টবেঙ্গল থেকে), দীপু দাস, অমল চক্রবর্তী, অশোক চ্যাটার্জি, পঙ্গম কানন, চুনী গোস্বামী, বিমান লাহিড়ী (এরিয়ান্স থেকে), প্রণব গাঙ্গুলী (হাওড়া ইউনিয়ন) ও অরুময়নৈগম।

মহমেডান স্পোর্টিং

মহমেডান স্পোর্টিং দলে কে কোন পর্যায়ে খেলবেন তা বলা শক্ত। কয়েকজন দলত্যাগী হয়ে ভিন্ন দলে গেছেন। কেউ বা চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন চাকুরী পাওয়াতে। দলের কর্ণধারেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন। আমার ধারণা পুরাতনদের সঙ্গে নতুন মুখ হিসাবে দেখতে পাবো এস জাহা (বিহার), এ্যামব্রোজ এ্যান্টনি, এন পাম্পানা ও সাহাদাতুল্লা (মহীশূর), রামানা ও হাফিজুর রহমনকে (পশ্চিম ভারত), মমতাজ ও আনন্দিকে (সার্ভিসেস)।

ইস্টার্ন রেলওয়ে

কলকাতার ফুটবলে ইস্টার্ন রেল একটা উল্লেখযোগ্য নাম। শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডবিক্রমে খেলে নাস্তানাবুদ করতে দলটি যেমন ওস্তাদ সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে লীগ ও শীল্ডে দলটির রেকর্ডও তেমনি আশাপ্রদ। গত বছরে লীগ তালিকায় দলটি চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এবার দল থেকে তিন তিনটে কুশলী খেলোয়াড়—সঞ্জীব বসু, কানন গুহ ও বি রায় দলত্যাগী হয়ে ভিন্ন দলে চলে গেছেন। এবার যাঁদের নিয়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে দল গঠিত হবে তাঁরা হচ্ছেন :

গোল—এন মণ্ডল, এ খাঁ (বাটা), এস এন চক্রবর্তী ও আর ঘোষ। **ফুলব্যাক ও স্টপার**—চঞ্চল গুহ, আর কে গাঙ্গুলী, এস গুহ, অজিত দাস (বাটা থেকে), আর দাস ও জয়দেব সাহা (উয়াড়ী থেকে)। **হাফব্যাক**—মিলন সেনগুপ্ত (কালীঘাট থেকে); **ফরোয়ার্ড**—বিশ্বনাথ পাল, প্রদীপ ব্যানার্জি, এন গাঙ্গুলী, প্রবীর মজুমদার, উদয়শঙ্কর চৌধুরী, জি দেব, কাজল মুখার্জি, শান্তনু ঘোষ, মীর কাশেম, এস খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং থেকে) ও ডি মিত্র।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

সতীশ দাস

'না, আজও কিছু হোল না, কাল আবার নামতে হবে কোমর কসে'। দর্শকরা মাঠ ছেড়ে ঘর মুখো হতে যাচ্ছেন, শেষের বাঁশী বাজার তখন আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র বাকী। হঠাৎ বল পড়লো লম্বা, কালো, শীর্ণকায় ছেলেটির পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের মত সট্, মুস্তাফা বিপর্যস্ত। আনন্দে উল্লাসে ভেঙ্গে পড়লো মাঠ, জয় হোল ইস্টবেঙ্গলের।

ঘটনাটি এক বছর আগের। আই এফ এ শীল্ডের সেমিফাইনাল — মহামেডান ইস্টবেঙ্গলের। আগের দুদিন নিষ্ফলা; উত্তেজনা তুঙ্গে। ফাইনালে উঠলো ইস্টবেঙ্গল। সেদিনের সেই নাটকীয় মুহূর্তে যে ছেলেটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে গিয়ে —সুখ্যাত মুস্তাফাকে হার মানিয়েছিলেন তিনি সতীশ দাস। সতীশ খেলেন ইন-সাইডে, লেফট উইংয়ের কাজও চালিয়ে যেতে পারেন প্রায় নিখুঁতভাবেই। বুদ্ধি আছে, পায়ের কাজ আছে, জায়গা পাল্টে নিয়ে আক্রমণের গতিকে ক্ষিপ্র ও কার্যকর করে তুলতে অধুনা মোহনবাগানের সতীশ দাস পারদর্শী। চালচলনে একটু ঢিলে-ঢালা হোলেও মাঝে মাঝে মাপা থ্রু পাসে

সতীশ দাস (মোহনবাগান)

প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণব্যূহ ভেঙ্গে ফেলতে সতীশের ভূমিকা লক্ষ্য করার মত। দুপায়েই সট্ আছে—কিন্তু পারৎপক্ষে মাথায় বল নেন না।

সতীশদের আদি বাড়ী পূর্ব পাকিস্থানে। দেশবিভাগের পর পাকাপাকিভাবে ঘর বেঁধেছেন মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের কাছাকাছি ইন্দায়। জন্ম ১৯৪৬ সালে। ফুটবলে পেয়ে বসেছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। বয়স তখন কতোই বা নয় কি দশ? প্রথমে মিলন সংঘে—তারপর ঐক্যবন্ধ উদ্বাস্ত সংঘে। পরিবারের অনেকেই সতীশের মত ফুটবলকে ভালবাসতেন, বিশেষতঃ সেজভাই। কৃষ্ণলাল শিক্ষায়তনে পড়ার সময় তিনি আমাকে উৎসাহ আর সাহস দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। ক্লাশ টেন-এ উঠতে স্কুল দলে পাকা আসন হোল, সেখান থেকে খড়্গপুর লীগ ফুটবলে, জেলা স্কুল দলে এবং ১৯৬২ সালে একেবারে গড়গড়িয়ে বাংলা স্কুল একাদশে। এই স্কুল দলের হয়ে খেলার সূত্রে নজর কেড়েছিলেন তিনি কোলকাতার ক্লাব কর্ণধারদের, সত্তার ও ভেঙ্কটেশের মত খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়দের। ১৯৬৩ সালে সতীশের ডাক পড়লো প্রথম ডিভিসনের হাওড়া ইউনিয়ন থেকে। সেবার লীগের দুটি খেলায়ই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে চমৎকার খেলেছিলেন সতীশ। গুণের কদর

আগামী সংখ্যায়
শান্ত মিত্র (ইস্টবেঙ্গল)
ও
নিত্য ঘোষ (মোহনবাগান)

হোল; ১৯৬৪ সালে জুনিয়র বাঙ্গলা দলে মনোনীত হলেন; প্রতিভার স্বীকৃতি পেলেন ১৯৬৫ সালে ইস্টবেঙ্গলের আমন্ত্রণে। '৬৬ সালে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলের সফল, সৈনিক, তরুণ প্রতিভা সতীশ ক্লান্তিহীন সাধনায় নজর কাড়লেন ময়দানের ফুটবলরসিকদের—ডাক এলো মোহনবাগানের তরফ থেকে। সতীশ এখন মোহনবাগানের ইনসাইড ফরওয়ার্ড। সম্প্রতি সতীশ দাস ব্যাংকক ঘুরে এসেছেন যুব ফুটবলে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে।

তপন নাগরায়

'ধ্যোৎ তোর কিছুছু হবে না, এমন লিলিপুটের মত চেহারা নিয়ে ফুটবল খেলা হয়, অন্য কিছু দেখ্‌গে।' তপনকে একথা গোড়ার দিকে অনেকেই বলেছিলেন, বলেন নি শুধু হৃষিকেশ পার্ক ইনস্টিট্যুটের কেষ্টদা (কৃষ্ণপদ সেনগুপ্ত)।

নিজের কথা সসংকোচে বলছিলেন এরিয়ান্সের 'বাচ্চা' সেন্টার ফরওয়ার্ড তপন নাগরায়। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তরুণ তপন গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ক্ষিপ্রগতি, সপ্রতিভ, পরিশ্রমী তপনের এখন কলকাতা ময়দানে বেশ নাম। দুপায়ে সট্ আছে, ড্যাস আছে, আর আছে গোল বানানোর অসামান্য নৈপুণ্য। কতকটা হাউইয়ের মতই উঠেছেন তপন তবে আশার কথা—স্থিতিকে শক্ত হাতে আঁকড়ে রাখতে পেরেছেন তিনি।

তপনের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা (ঢাকা)। জন্ম ১৯৪৯ সালে কোলকাতায় ১০ই জানুয়ারী। ফুটবলের প্রথম পাঠ শ্রীকৃষ্ণপদ সেনগুপ্তের কাছে, হৃষিকেশ পার্ক ইনস্টিট্যুটে। ময়দানে পরিচিতি আনলেন লীগ ফুটবলে—হৃষিকেশ পার্ক ইনস্টিট্যুটের মাধ্যমেই। ১৯৬৫ সাল

তপন নাগরায়
(এরিয়ান)

পর্যন্ত এইভাবেই কেটেছে। ১৯৬৬ সালে 'পাকড়াও' করলেন এরিয়ান্সের সুখেন কুন্ডু। সুরু হোল সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগে খেলা। সিনিয়র ডিভিসনে প্রথম খেলায়—প্রথম আবির্ভাবের দিনেই তপন দুটি গোল দিয়েছিলেন; বাটার বিরুদ্ধে এরিয়ান্স জিতেছিল সেদিন তিন গোলে। ১৯৬৬ সালে গোহাটিতে আয়োজিত বরদলৈ ট্রফিতে শিলংয়ের বিরুদ্ধে এরিয়ান্সের এই মাথায় খাটো, কদম ছাঁট দেওয়া ছেলেটি গোল করেছিলেন চারটি। দল জিতেছিল ৫-১ গোলের ব্যবধানে। ঐ আসরে সেবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনিই। এরিয়ান্স যে সেবার বরদলৈ ট্রফি কলকাতায় নিয়ে এসেছিল তার মূলে ছিলেন নাগরায়।

পরবর্তী পর্বে ডুরান্ড, ১৯৬৬ সালে জুনিয়র জাতীয় ফুটবল। বাঙ্গালোরে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাঙ্গলার হয়ে প্রথম খেলায় তপন কম করে গোল দিয়েছিলেন চারটি। আসামের বিরুদ্ধে দল জয়ী হয়েছিল ৬-০ গোলে। ঐ বছরই জীবনের সবচেয়ে বড় খেলায় সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরে (সগর) পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফাইনালে কোলকাতার জয়সূচক গোলটি করেছিলেন সেই 'কিছু হবে না' চিহ্নিত ছেলেটি তপন নাগরায়ই।

তিনমাস বয়সে তপন বাবাকে হারিয়েছেন কিন্তু বাবার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করতে দেন নি তাঁর মা ও বড়-ভাইয়েরা। স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে এঁরা ঘিরে রেখেছেন তপনকে। তপনের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা অনেক। হৃষিকেশ পার্ক ইনস্টিট্যুটের কেষ্টদা, এরিয়ান্সের লন্টুদা (অশোক মিত্র) ও শচীনদার মত তাঁরাও যে ভাবেন—তপন একদিন মধ্যগগণে উঠবেই। —বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
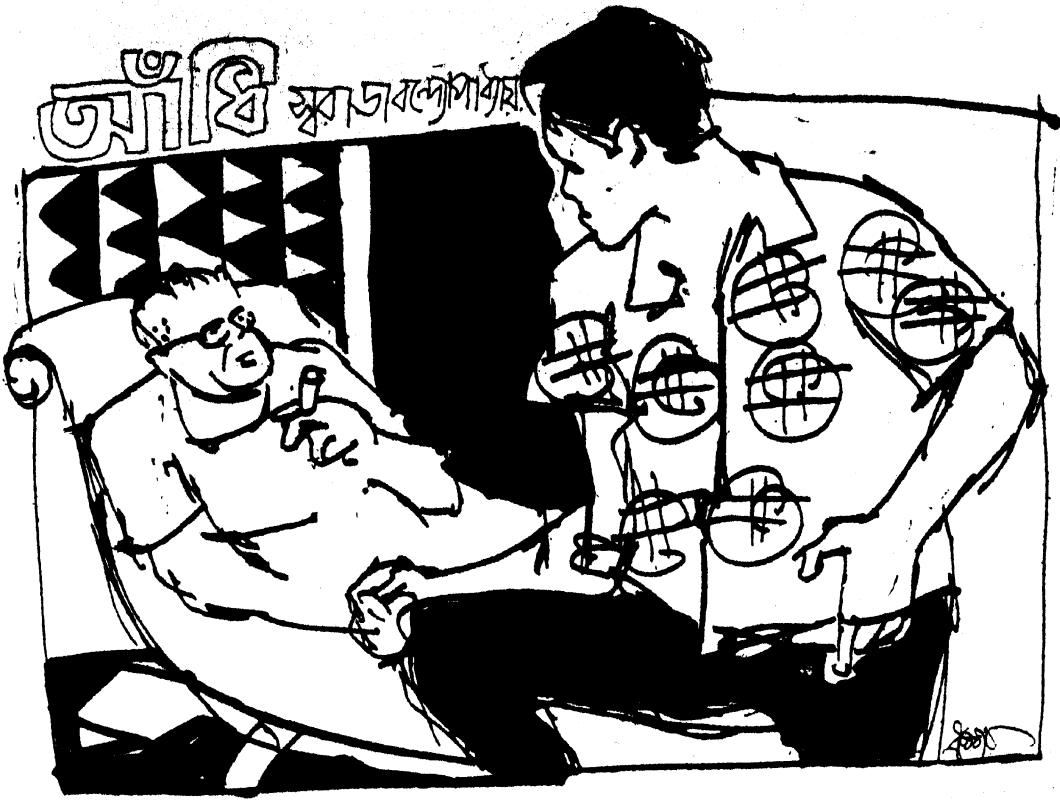
[উপন্যাস]

।। পাঁচ ।।

বার বার উঠে বসতে হচ্ছে, এমন অস্থির ভয়ংকর রাত জীবনে আর কখনো আসেনি।

বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল দীপু।

ও শুতে পারছে না। চোখ বুজতে পারছে না। চোখের পাতা ফেললে যেন কাঁটার মত বিঁধছে। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠল। এ ধরনের অস্বস্তি, এ ধরনের একটা অবস্থা যে ওর জীবনে আসবে ও কখনো কল্পনা করতে পারেনি। উঠোনের এধারে ওধারে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ছোট রোয়াকটার ওপর বসল ও।

একটা গাঢ় অবসাদ—গভীর ব্যর্থতা ওকে যেন চেপে ধরেছে আজ। কোনমতে কিছুতেই আর স্বস্তি পাচ্ছে না আর।

মায়ের কথাটা মনে হোল একবার। আরও একবার মনে হোল, মা থাকলে বোধহয় এমন হোত না। চোখ দুটো ওর আবার জলে ভরে উঠল। দীপু কাঁদছে। ও নিজেই অবাক হোল, ও কি করে কাঁদতে পারছে। চারটে ছটা পেটো বেদানা ফাটিয়ে দশটা লোককে জখম করে যে হাসতে হাসতে দোপেঁয়াজী পরোটা খেতে পারত। পেটে ছোরা চালিয়ে যার হাত এতটুকু কাঁপত না, চোখের পাতা পড়ত না। সেই দুর্দান্ত মস্তান দীপু আজ কাঁদছে।

কত আত্মীয় পরিজন তো কত গাল দিয়েছে, কত অভিশাপ দিয়েছে কত মানুষ।

কিন্তু আজ কেন এমন হোল? ইতর—ছোটলোক!

মালা এই কথা বলল?

মাত্র দেড় মাস আগে মালা তার বুকের ওপর পড়ে কেঁদেছিল, আমাকে তুমি বিয়ে করো।

বিয়ে! বিয়ে করার কথা সে কখনো চিন্তাও করেনি।

—আমাকে তুমি বিয়ে করো। নইলে সত্যি আমি মরে যাব।

মালার রাঙা পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। চোখের জলে তার জামা ভিজে উঠেছিল। সেদিনের সেই চোখের জলই বোধহয় তাকে কাদা করে দিল। মেয়েমানুষের চোখের জল, শালা পাথর গলিয়ে দেয়। ওর কড়া দিল শালা পাঁক করে দিলে।

করব বিয়ে। বিয়ে করবার মত সাহসের অভাব তার ছিল না। কিন্তু কি করে করা যায়?

বেরিয়ে এসো। রাত দেড়টায় বেরিয়ে এসো। সঙ্গে পারো কিছু পাত্তি এনো, পাপিক এনো। দু'চার ছ' মাস পরে যা হোক একটা হিল্লে করে নিতে পারবে।

—চলো। তোমাকে বিয়ে করব।

একটা নিখুঁত স্বপ্ন দেখেছিল দীপু। নিখুঁত একটা শান্তির সংসারের স্বপ্ন। সামান্য একটু স্বস্তি, একটু তৃপ্তির স্বপ্ন। একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল আরামে। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে তখন নির্বোধের মত ভেবেছিল, মালা রান্না করবে, তাকে খাওয়াবে, সে কাজ করবে, টাকা আনবে। দুজনে ছোট একটি স্বর্গ রচনা করবে।

একটি পবিত্র স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছিল।

উচিত ছিল না। এমন একটা স্বপ্ন দেখা উচিত ছিল না তার। তবু দুঃসাহসে মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যেও সে স্বপ্নের স্বাদ পেয়েছিল। সে এক আশ্চর্য স্বাদ। এ স্বাদ যদি সে কখনো না পেত, তবে বোধহয় আজ সে এমন নিঃস্ব হয়ে যেত না। এমন একটা ভয়ংকর শূন্যতার চাপ তাকে পিষে মারতে পারত না।

মালা তার জন্যে সব করতে প্রস্তুত ছিল। তা নইলে অমন অট্টালিকা আর সুখের প্রাচুর্য ছেড়ে সে কি করে বেরিয়ে এল দীপুর সঙ্গে। কথামত রাত্রে বেরিয়ে এল মালা। সঙ্গে এনেছিল চল্লিশ ভরি সোনা আর হাজার খানেক টাকা।

রাজত্ব আর রাজকন্যে করায়ত্ত করল দীপু।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এল দিদির শ্বশুরবাড়ি, বাগবাজারে।

দিদিকে আগে বলা ছিল, সে এসে দিনকতক দিদির বাসায় থাকবে। দিদি খুশী হয়েছিল। আবার ভয়ে ভয়ে বলেছিল,—

দেখিস মারামারি-টারামারি করে আসিস না যেন। তোর জামাইবাবু বড় ভীতু মানুষ।

—না, না, খেপেছ। একটা জিনিস সংগে করে আনব, দেখো।

দীপু যখন দিদির বাসায় পেঁছোল, মালাকে দেখে দিদি অবাক হোল। এটি আবার কে? এমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। চোখা নাক, টানাটানা চোখ। এমন কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং।

—একে বিয়ে করেছি দিদি। তোমার এখানে দু-চারদিন থেকে একটা বাসা করব।

দিদির চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠল। —বিয়ে করেছিস? সত্যি? কবে বিয়ে করলি? কিছু তো জানলাম না।

—জানাতে পারিনি। ওর বাবার অমত ছিল। লুকিয়ে বিয়ে করেছি।

কেমন একটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল দিদির চোখ। বলল,—সত্যি বিয়ে করেছিস তো? নাকি—'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করবার আগেই দিদি মালার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। এস, ঘরে এস।

মালা অচেনা পরিবেশে একটু সঙ্কুচিত হচ্ছিল প্রথমটায়, পরে আস্তে সহজ হয়ে এল।

মালা বললে,—আমার বাড়ির অমত। কিন্তু কি করব বলুন। ওর সংগে তো আমাকে আসতেই হবে।

দিদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মালার সব পরিচয় শুনল। মস্ত বড়ঘরের মেয়ে মালা। এমন রূপ, এমন বুদ্ধি, কথাবার্তায় কত সহজ, কত সাহস,—একটু হয়তো বা নির্লজ্জ। তা হোক, ভালবাসলে লাজলজ্জা আর থাকে না। এমন সোনার টুকরো মেয়ে—দীপুকে ভালবাসল কি করে এইটেই ভেবে পেল না ওর দিদি।

কথায় কথায় বিমর্ষ মুখে ওর দিদি বলল,—তুমি জান তো ভাই, আমার ভাইটা একটা বাঁদর! তুমি নিশ্চয় সব জেনেই ওর সংগে এসেছ!

মালা হাসল।

—তবে ওর বুদ্ধি খুব। তুমি যদি ওকে মানুষ করতে পারো, ও সত্যিই খুব ভাল হবে।

মুখ নীচু করে মালা বলল,—ও বলেছে, চাকরি করবে।

বাইরে থেকে কথাগুলো শুনছিল দীপু। ওর বেশ ভাল লাগল। ঠিক এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে ও অভ্যস্ত নয়। কথাগুলোয় যেন মিষ্টি মাখা। মালা দিদিকে বেশ জমিয়ে ফেলেছে। ভারী তুখোড় চটপটে মেয়ে মালা।

সে রাত্তিরটা মালা দিদির কাছে শুয়ে রইল। দীপু অন্য ঘরে।

জামাইবাবু মানুষটি ভারী ঠাণ্ডা, গোবেচারী। মালাকে দেখে জামাইবাবুও খুশী হোল। দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল,—ভায়া, এইবারে একটা কাজকর্ম কিছু করে ঘর সংসার করো।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টি কথা। দীপুর বেশ ভালই লাগছিল।

কোম্পানীর কাজে জামাইবাবু সেদিন বাইরে চলে গেল। ফিরবে দিন দশেক পরে। মাঝে মাঝে কাজের জন্যে জামাইবাবুকে বাইরে যেতে হয়, জানে দীপু। সেইজন্যেই দিদির বাড়িতে থাকায় সুবিধে আছে অনেক।

দীপু দিদিকে বলল,—বাবা কিন্তু জানে না।

দিদি বলল,—বাবাকে পরে বললেই হবে, থাক না এখানে দিন কতক। বাবার মত আমি করাব। কিন্তু মালার বাবার মত করাবি কি করে?

দীপু হাসল।—মত না করে যাবে কোথায়? তার মেয়ে তো আমার হাতের মুঠোয়। মাস দুয়েক পরে আমিই জানাব, মালা জানাবে, মত তাকে করতেই হবে। ওসব প্ল্যান আমাদের হয়ে গেছে, তুমি কিছু ভেবো না দিদি।

—দেখিস বাপু, হাঙ্গাম হুজ্জুত না হয়।

ভাইকে একটু ভয়ও করে ওর দিদি। যদিও সে কিছুটা বুঝতে পেরেছিল, দীপু হয়তো বা মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে এসেছে, তবু একথা নিশ্চয় করে জানল যে জোর করে বার করে নিয়ে আসেনি। মেয়েটাও ইচ্ছে করে বেরিয়ে এসেছে। সব দোষটাই দীপুর নয়। দোষই যদি হয়ে থাকে, তবে মেয়েটার দোষ কিছু কম নয়। ভেবে-চিন্তে বেশী কিছু দিদি বলল না।

দীপু কিন্তু বুঝতে পারছিল, দিদি ব্যাপারটা খুব পছন্দ করছে না।

পরদিন কালীঘাটে গেল দীপু মালাকে নিয়ে। দিব্যি করে মালা বদল করে ওরা দুজন দুজনকে স্বামী-স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিল।

একটা কালো রোগা বামুনকে ধরে দু-চারটে মন্তর পড়ে নিয়েছিল ওরা। সে মন্তরের কোন অর্থই ওরা বোঝেনি। এইটুকু শুধু মনে মনে বুঝেছিল, যে কালীমায়ের দিব্যি করে ওরা দুজনকে দুজন আপন বলে মেনে নিল।

ব্যস! আবার কি? মা কালীর দিব্যির চেয়ে বড় দিব্যি আর কি হতে পারে!

ফেরবার সময় কিছু মাংস ফল ফুল কিনে নিয়ে এল ওরা।

দীপু হেসে বলল,—ফুলশয্যা হবে না?

মালা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।—না।

—সে কি? আমাদের তো বিয়ে হয়ে গেছে।

মালা রাজী নয়। সত্যি সত্যি রাজী নয়।—না, এখন ওসব নয়। আমি দিদির কাছে শোব।

দীপু একটু চুপ করে থেকে বলল,—সেই ভাল।

দীপুর মনের এই নিস্পৃহ দিকটা মালা জানত। নিশ্চয় জানত। দীপু কখনো জন্তুর মত কামার্ত হয়ে ওঠে না। দুর্দান্ত সাহস, বলিষ্ঠ মন, বেপরোয়া হয়ে সব করতে পারে, কিন্তু মনে ওর ঘুসঘুসে জ্বরের মত কামের তাপ নেই। মেয়ে দেখলেই জিভের লাল পড়ে না। বরং অতি সহজে উপেক্ষা করতে পারে। ঘুমোলে নাক ডেকে ঘুমোয়, জেগে থাকলে মারপিটের ধান্দা করে, মেয়েমানুষের কল্পনায় কখনো তেমন পুলকিত হয়ে ওঠে না।

দীপু কখনো তেমন তাপদগ্ধ হয়ে পুরোপুরি আবিষ্ট হয়ে মালাকে জড়িয়ে ধরেনি, টান টান হয়ে পাশে বসে গল্প করেছে, হেসেছে, কিন্তু অকারণে মুহূর্তে মুহূর্তে ওর দেহটাকে নাড়াচাড়া করেনি। বরং উল্টোটাই হয়েছে। মালাই ওর দিকে ঢলে পড়েছে, কখনো বা ওর কাঁধে মাথাটা রেখে বুকের কাছে মুখ ঘসেছে, কখনো বা তেমন কোন মুহূর্তে মালাই ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। দীপু সময়ে সময়ে তাতে করে যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি, তা নয়। কিন্তু সেটা ওর স্বভাবগত নয়, বরং কিছু পরিমাণে স্বভাববিরুদ্ধ।

বরাবরই দীপু এই রকমই। সেধে কোন মেয়েমানুষের দেহ কামনা ও করেনি। কেন, ও ঠিক নিজেও জানে না। হয়তো বা তার

চেয়েও বেশী আনন্দ পেয়েছে ও মারপিট করে, শক্তির উদ্ধত পরিচয় দিয়ে।

সেদিনও দীপু মালার প্রস্তাব অক্লেশে মেনে নিল।

কে জানে, হয়তো মেনে না নিলেই মালা খুশী হোত বেশী। মালার ওপর জোর করলেই হয়তো ও আনন্দ পেত বেশী। কিন্তু কি করবে, ওটা দীপুর স্বভাববিরুদ্ধ।

—আজ একটু মাল টানতে হচ্ছে।

মালা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—না, দিদির বাড়িতে থেকে ওসব হবে না।

গুলি মারো দিদির বাড়ি! মাল একটু খাবেই দীপু। জামাইবাবু নেই। তাই অসুবিধে তেমন কিছু নেই। রাত্তিরে বেরিয়ে দু' পাত্তর টেনে এলে আর দেখছে কে?

সপ্তাহখানেক চোখের নিমেষে যেন কেটে গেল। এ দিনকটা গত আট বছরের সুদীর্ঘ অভ্যাসের ব্যতিক্রম। পড়ো ঘর নয়, তাস খেলা নয়, খিস্তিবাজী নয়, ছুরিছোরা বোমা নিয়ে তোড় করে বেড়ান নয়, চেংপা সেয়ানা ইয়ারদের নিয়ে মাল টানা নয়, এ এক অন্য জীবন।

—দিন সাতেকে কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিল দীপু। দুপুরে ঘরে বসে ঝিমোয়, রাত্তিরে ঘরে ফিরে ঘুমোন এ সব তো বহুকাল অভ্যেস নেই ওর। গুলতানী নেই, তোর মেরি নেই, প্রাণটা শালা আকুপাকু করছে মাঝে মধ্যে।

মালার সঙ্গে গল্প-হাসি, বিকেলে নিয়ে বেরোন। হেঁটে নয়, ট্যাক্সিতে, কেননা বলা যায় না, মালাদের বাড়ির কেউ যদি রাস্তায় ধরে ফেলে! অবশ্য ধরে ফেললেই হোল না। ধরতে যে আসবে, তাকে জানের মায়া ছেড়ে আসতে হবে। সেজন্যে দীপু সব সময় প্রস্তুত।

—চলো, বাইরে কোথাও চলে যাই।

দুপুরে ঘরে বসে ছুরি দিয়ে নখ কাটতে কাটতে মালার দিকে তাকিয়ে দীপু বলে। মালা এ ঘরে এসেছিল, এসে দীপুর পাশে বসেছিল। দীপু বুঝতে পেরেছিল। দিদি নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। এই ফাঁকে মালা এ ঘরে চলে এসেছে। কিছু সময় দীপুর সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে। মালা এসে পাশে বসল, দীপু পায়ের নখ কাটছিল, মুখ তুলে তাকাল।

—চলো, বাইরে কোথাও চলে যাই।

মালা ওর পিঠের ওপর থুতনিটা রেখে বলে,—কোথায়?

দীপু বুড়ো আঙুলের নখটা সাবধানে কাটতে কাটতে বলে,—যে কোন জায়গায়। দিল্লী, আগ্রা, পুরী যেখানে হোক।

—বেড়াতে?

ছুরিটা রেখে দীপু বলে,—হ্যাঁ।

—কেন?

মালার দিকে দীপু তাকায়। টুকটুকে ঠোঁট দুটি একটু ফুলে উঠেছে, বোধহয় সোহাগে। মেয়েটা একটু সোহাগী-সোহাগী। একটুতে ঠোঁট ফোলে। একটুতে টানাটানা চোখদুটো সজল হয়, নিটোল চিবুকটির তলায় ভাঁজের নীচে ফুলে ওঠে। ওর সরু কোমরটা জাপটে ধরে কাছে টানে দীপু।

—এই ছাড়ো। অসভ্য!

ন্যাকামিতে ওস্তাদ মেয়ে। হাসি পায় দীপুর—আজ রাত্তিরের ট্রেনে চলো।

—কি হবে গিয়ে?

—এখানে ভাল্লাগছে না।

চোখে একটা মিষ্টি আমেজ এনে মালা বলছে। —বলো কি, আমাকে এত কাছে পেয়েও ভাল লাগছে না?

দীপু সেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না। ওর ভাল লাগছে না বলাটা যে মালার কাছে খুব ভাল লাগবার কথা নয়, এটা ও যেন বুঝতেই পারল না। ওর মুখটা সামান্য বিমর্ষ দেখাল, বললে,—তুমি তো আছই।

—এত কাছে তো এর আগে ছিলাম না।

বলতে বলতে মালা ওর পিঠের ওপর ঢলে পড়ল। মালার নরম দেহের স্পর্শে দীপু টান টান হয়ে বসল। একটু পরে আবার ওর কোমর ধরে কাছে টেনে বললে—কি জানি, আমার মনে হয় তুমি আগেও কাছে ছিলে।

দীপু বলতে চাইছিল, আগেও মালাকে যেমন ডাকতে পারত, মাঝে মাঝে কাছে পেত, তেমনি অন্য একটা পৃথিবীও ওর ছিল। দিন আর রাত্রে কোন মুহূর্ত ফাঁকা ছিল না। এখন বরং মাঝে মাঝে ওর ফাঁকা লাগে। মালাকে সব সময় কাছে পেয়ে শুধু মালাকে ভেবে ওর দিনরাত কাটে না।

কথাটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছিল না দীপু। কি ভাবে বলবে, সেটাও বুঝতে পারছিল না।

আবার সেই আগের কথাটা ঘুরিয়ে বলল,—চলো বরং বাইরে কোথাও যাই।

মালা মাথার চুল ধরে আস্তে টানতে টানতে বললে,—বাইরে কি চিরকাল থাকা যাবে?

—না, আবার আসব।

—আবার তো এখানেই আসতে হবে।

—তা হবে।

—তার চেয়ে বরং তোমার বাবাকে জানাও আমাদের কথা। আমার বাবাকে জানাবার ব্যবস্থা করো। সবাই জেনে-শুনে একটা বিয়ে হলে তবে নিশ্চিন্ত।

অবাক হয়ে বলে দীপু,—কিন্তু বিয়ে তো আমাদের হয়ে গেছে।

—তা হয়েছে, কিন্তু সমাজ তো সে বিয়ে মেনে নেয়নি। সমাজ মেনে নিলে তবে নিশ্চিন্ত।

দীপু আবার ছুরিটা হাতে তোলে,—তোমার বাবা কি মেনে নেবেন। শালা বড় ঢেঁটিয়া—।

বলতে বলতে থেমে গেল দীপু। কি সর্বনাশ, মালার বাবার সম্পর্কে ও কি ভাষা ব্যবহার করছিল। অনেক চেষ্টা করেও ও পাড়া ঘরের কথার টান আর শব্দগুলো ছাড়তে পারছে না।

খিল খিল করে হেসে উঠল মালা।

দীপু মুখ শুকনো করে বললে,—না, বলছিলুম কি—।

মালার চোখদুটো খুশীতে মমতায় ভরে উঠেছিল, বললে,—থাক, আর বলতে হবে না। এবার বাবাকে জানাবার একটা ব্যবস্থা করো, জানতে পেরে বাবা কি করেন দেখি।

আমি যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন মেনে তাকে নিতেই হবে। আর কোথাও বিয়ে দিতে পারবে না আমায়।

দীপু ঠোঁটটা উল্টে আর এক চিলতে নখ কাটতে কাটতে বলে,—বলো তো আমি নিজে গিয়ে বলে আসতে পারি।

ভয়ে কেঁপে ওঠে মালা,—না, না, তুমি যেও না।

—কেন?

ছুরিটা হাতের মুঠোয় ধরে হাসে দীপু। এতক্ষণে ওর বেশ মজা লাগে।

মালা ভয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে,—তুমি গেলে তোমায় মেরে ফেলবে।

—আমায় মেরে ফেলবে! আমাকে চোট করবে, খতম করবে, সে মিঞা এখনো—

মালা ওকে জোরে জাপটে ধরে। ওর মুখে এই ধরনের কথা শুনলেই মালার মনে একটা অনন্য উল্লাস হয়। মালার প্যাশন বড় তীব্র।

—আমি নিজে যাব।

—না। তুমি যেতে পারবে না।

দীপু হাসতে হাসতে ছুরিটা নিয়ে আবার নীচু হয়ে নখ কাটতে আরম্ভ করে। এই যে মালা ওর পিঠ সাপটে রয়েছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই দীপুর। খুন জখম রক্তের কথা হতেই ও গরম হয়ে উঠেছে। কি করবে মালার বাবা। বড় জোর—তাকে একটা চড় মারবে, সে ওর ভুঁড়িতে একটা লাথি কসালে মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোবে ওর। মালার নরম দেহের স্পর্শের চেয়ে এই কল্পনার উত্তাপ ওকে আরও বেশী চাঙ্গা করে তোলে।

মালা বলে,—বরং আমিই একটা চিঠি লিখে বাবাকে জানাব।

—বেশ তাই জানাও।

চিঠি কিন্তু মালাকে আর দিতে হোল না। চিঠি দিচ্ছি দোব - দিচ্ছি দোব - করে আরও পাঁচ-সাতদিন কাটবার পর একদিন ভোরে দিদি এসে দীপুকে ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে তুলল। সকালে ওর ঘুম কোনদিন ভাঙে না। শুয়ে শুয়ে পর পর দু-কাপ চা খাবার পর ঘুম ভাঙে ওর কোন দিন নটা সাড়ে নটায়।

ভোরে যত ধাক্কাই খাক না কেন ঘুম ওর ভাঙতে চায় না।

—ওরে ওঠ, শিগ্গির ওঠ।

দিদির ডাকে আর ধাক্কায় একটা আড়মোড়া ভেঙে আবার কাত হয়ে শোয় দীপু

—ওঠ, পুলিশ!

পুলিশের নামটা কানে যেতেই দীপু সতর্ক হয়ে ওঠে। তড়াক করে উঠে বসে বিছানার ওপর। চোখ তুলে তাকায় দিদির দিকে।

—পুলিশ দোরে কড়া নাড়ছে। শিগ্গির ওঠ।

—কি করে জানলে পুলিশ?

—বারান্দা দিয়ে দেখলুম, তিনটে পুলিশ। একসঙ্গে এসেছে।

দীপু কি করবে ভেবে পায় না। ও নিজে এই মুহূর্তে ছাতে গিয়ে এ ছাত থেকে ও ছাতে পালাতে পারে। পুলিশ ওকে ধরতে পারবে না। কিন্তু মালা?

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালান ওদের অভ্যেস আছে। বিল্লাগাড়ি দেখলে ওরা গা ঢাকা দেয়, ঠোলী পিছু নিয়েছে টের পেলে সাবধান হয়ে যায়। কিছুতেই ছোপন হয়ে যাবে না। আজও ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনাই থাকত না। ও অতি সহজেই এ বাড়ি থেকে পালাতে পারত, কিন্তু মালাকে ছেড়ে পালিয়ে কি লাভ?

—ঠিক আছে। দোর খুলে দাও।

দিদি ভয়ে ভয়ে গিয়ে দোর খুলে দেয়।

দুজন সাব ইন্সপেক্টর অথবা এ এস আই, একজন পুলিশ, ভেতরে ঢোকে। ঢুকেই বাইরের ঘরে বিছানার ওপর বসে থাকতে দেখে দীপুকে। সোজা দীপুর সামনে আসে।

একজন আর একজনকে বলে,—ওই তো মস্তান হাজির, কি হে, ঘুম ভাঙল?

হাসল একজন অফিসার।

দীপুও হাসল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন।

—চলো মালারাণী দত্তকে নিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে।

দীপু যেন একটু বিরক্ত হোল,—কেন, আমি যেতে পারি। আমার ইস্তিরি—ওয়াইফ আপনাদের সঙ্গে যাবে না।

হো হো করে হেসে উঠল একজন অফিসার,—কি বললে ওয়াইফ! একটা বাচ্চা মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বার করে এনে এখন ওয়াইফ দেখাচ্ছ। থানায় চলো, তোমার বয়ে দেখাব।

ফোঁস করে উঠল দীপু,—মুখ সামলে কথা বলবেন স্যার, বাপ-মা তুলবেন না।

—ওরে বাবা!

একজন অফিসার এসে ওর একটা হাত চেপে ধরে গালে কসে একটা থাবড়া মারল।

—মারধোর করবেন না স্যার! আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করুন। মালাকে আমি বিয়ে করেছি।

দিদি ভাইকে মার খেতে দেখে মালাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মালার দিকে তাকিয়ে বলল দীপু,—জিজ্ঞেস করুন ওকে?

একজন অফিসার মালার দিকে তাকাল।

মালা আস্তে আস্তে বলল,—আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

অফিসারটি ঝাঁজালো গলায় বলে উঠল,—কি করে হতে পারে, আপনার বাবা কিছু জানেন না। বিয়ে হলেই হোল। আপনার বাবা তো থানায় বসে রয়েছেন। চলুন, যা বলবার সেখানে গিয়ে বলবেন।

মালার মুখটা শাদা হয়ে গেল। বাবা থানায় বসে রয়েছেন, বাবা পুলিশ পাঠিয়েছেন।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল দীপুর দিকে।

দীপু বলল,—চলুন থানায়। মালা চলো।

ওরা দুজন পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে একটা জীপে উঠল। সোজা থানায় এসে হাজির হোল।

এতদিন পর সামনাসামনি ভাল করে দেখল নিরঞ্জন দত্তকে। দীপুকেও এই প্রথম ভাল করে দেখল নিরঞ্জন দত্ত। পাতলা বেতের মত টান টান চেহারা, মুখখানি মিষ্টি ছেলেমানুষের মত। চোখদুটি মস্ত বড়—শিশুর মত সরল সহজ চাউনি।

মালা এসে মুখ নীচু করে দাঁড়াল বাবার সামনে।

—তুমি দীপু — দীপক সাহা?

—হ্যাঁ।

একজন অফিসার বললে, — ছোকরা ভারী সেয়ানা। বলে, আমি বিয়ে করেছি।

দীপুর চোখে মুখে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। বলল,—বিয়ে করেছি, জিজ্ঞাসা করুন।

নিরঞ্জন দত্ত অফিসারের দিকে তাকাল।

—দয়া করে কোন ডায়েরী লিখবেন না। কেস করবেন না। আমি আপনাদের খুশী করে দোব। আর — আর ছেলেটাকে ছেড়ে দিন। একটা ছেলেমানুষী করেছে বই তো নয়।

অফিসার বুঝতে পারল। নিরঞ্জন দত্ত ব্যাপারটা নিয়ে কোন সরব কেলেঙ্কারী করতে চায় না। একেবারে চেপে যেতে চায়। সেইটেই স্বাভাবিক। মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। হয়তো কোন বড় ঘরে বিয়ে দিতে হবে। দত্তবাড়ির মেয়ের নামে কোন কেস বা কোন প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী কেউ যদি জানতে পারে তবে হয়তো মেয়ের বিয়ে দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

—শোন।

নিরঞ্জন দত্ত দীপুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি কাল সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোর। গয়নাগুলো কি সব বিক্রি করেছ?

—না। সব আছে।

অফিসার চোখ কপালে তুলল,—বলেন কি মিস্টার দত্ত, গয়না নিয়ে পালিয়েছে।

নিরঞ্জন দত্ত বলল,—গয়নাগুলো কাল নিয়ে এসো।

—দরকার নেই স্যার। আমরা সেপাই পাঠিয়ে আপনার গয়না আনিয়ে দিচ্ছি। একে বরং ততক্ষণ আটকে রাখি। রিস্ক্ করবার দরকার নেই।

নিরঞ্জন দত্ত গম্ভীর স্বরে বললেন,—কোন রিস্ক্ নেই। গয়না ও নিজেই পৌঁছে দেবে।

—যদি পালায়? —অফিসারটি বললে।

নিরঞ্জন দত্ত হাসল,—আমি জানি, পালাবে না। কাল সন্ধ্যেবেলা তুমি এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।
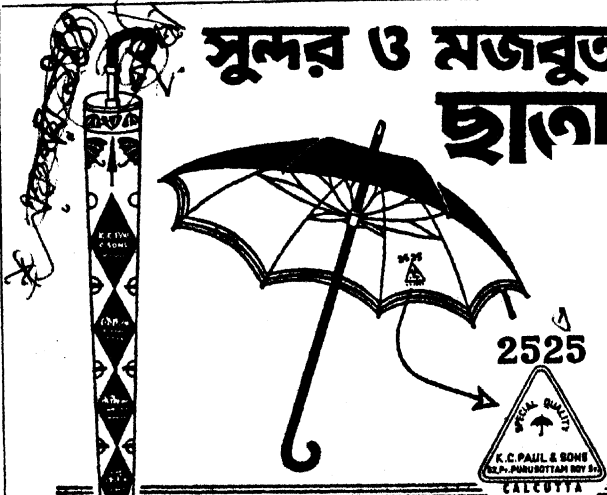
দীপু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরঞ্জন দত্ত ঘোড়েল ব্যক্তি। মালার হাত ধরে উঠলো। আস্তে আস্তে থানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল।

দীপুও পেছন পেছন এল। মালার দিকে তাকাল।

মালার মুখটা শাদা হয়ে গেছে। একবারও দীপুর দিকে চোখ তুলে তাকাল না। গাড়ি চলে গেল। (ক্রমশঃ)

এস, জি, টি, পাউডার। অর্থাৎ স্পেশ্যাল গাউট ট্রিটমেন্ট পাউডার, আবার অন্য অর্থে সিন্ধুগোবিন্দ তরফদার পাউডার।

স্বর্গীয় তরফদার মহোদয়ের এই অসামান্য আবিষ্কার যা পায়ে মেখে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশীতে জুতো পায়ে দিলে গেঁটে বাত সেরে যায় সেই পাউডারটি কিন্তু জনপ্রিয় হয়নি।

এর জন্যে পাউডারটির দোষ-গুণ, ভালোমন্দ কিছুই অবশ্য দায়ী নয়; বরং বলা যেতে পারে অন্য কয়েকটা ঘটনা পর-পর ঘটে পাউডারটিকে আমাদের শহরবাসীর কাছে অপ্রিয় করে তোলে।

সিন্ধুগোবিন্দবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন বরদা মোক্তার মশায়। ঐ বরদা মোক্তারের টাকাতেই সিন্ধুগোবিন্দবাবু একবার চামড়ার জামার ব্যবসা শুরু করেন এবং ফেল করেন। কিন্তু এতেও দুজনের বন্ধুত্বে একেবারেই কোনো চিড় ধরেনি। চিড় ধরলো একেবারে অন্য কারণে। এস, জি, টি পাউডারে শুধু গেঁটেবাতই সারে নাকি আমবাতও সারবে, এই নিয়ে দুজনে ভীষণ মতান্তর হলো।

বরদা মোক্তার মশায়ের মতে এস, জি, টি পাউডারে আমবাত সারতে পারে না, কারণ তার মধ্যে যজ্ঞডুমুরের শুকনো খোসার গুঁড়ো মেশানো নেই। কিন্তু সিন্ধু-গোবিন্দবাবুর মতে তাতে কোনোই ক্ষতি হয়নি, কারণ এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ লাল আউষ ধানের চালের গুঁড়ো রয়েছে।

বরদা মোক্তার খেপে গিয়ে সারা শহরে রটিয়ে বেড়ালেন যে সাদা চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী হলেও কথা ছিল, কিন্তু এযে একেবারে লাল চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী পাউডার। ও পায়ে মাখলে আর রক্ষে আছে! যে মাখবে তাকে গন্ধে গন্ধে সাপে-শেয়ালে কামড়াবে।

সাপে-শেয়ালে অবশ্য কামড়ালো না। কিন্তু ছোটবাজারের ফল ও মেওয়ার দোকানদার, যাকে সবাই ফলসাহেব বলতো, সেই সদাহাস্যময় সিন্ধী ভদ্রলোকটিকে একটা পাগলা বিড়ালে কামড়ে দিলো। ফলের ব্যবসা চালাবার মত যেটুকু বাংলা জানা দরকার তার চেয়ে একটুও বেশি জানতো না লোকটি। ফলে বরদা মোক্তার যখন সবাইকে বলে বেড়ালেন যে, ঐ সিন্ধুগোবিন্দের এস, জি, টি পাউডার পায়ে মেখেই ওকে বিড়ালে কামড়েছে, তখন জি নিউ তরফদার সু হাউসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ সেটা

অবিশ্বাস করলো না। যেই কেউ গিয়ে জিজ্ঞাসা করতো, 'ও ফলসাহেব, তোমাকে যেদিন বিড়ালে কামড়ালে, তুমি কি সেদিন এস, জি, টি পাউডার পায়ে মেখেছিলে?'

উত্তরে ফলসাহেব দুবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, অর্ধেক সামনে এবং তারপর তিনপোয়া পিছনে মাথাটা দুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলতো, 'হাঁ, হাঁ।'

অচেনা ফলসাহেবের এই 'হাঁ, হাঁ', এর মানে বোঝা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। কেউ যদি কখনো ফলসাহেবকে জিজ্ঞাসা করতো, 'ফলসাহেব, তুমি আগে ডাকাতি করতে না?' ফলসাহেব উত্তরে ঐ রকম মিষ্টি হেসে মাথা দুলিয়ে বলতো 'হাঁ, হাঁ।'

'কি ফলসাহেব, আঙুরগুলো বেশ টক হবে তো?' এ প্রশ্নেরও ঐ একটি জবাব ছিলো মৃদু হাসি সহযোগে 'হাঁ, হাঁ।'

কিন্তু বরদা মোক্তারের প্রচারই জয়ী হলো। এস, জি, টি পাউডার মেখেই যে ফলসাহেব বিড়ালের কামড় খেয়েছিলেন একথা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক শহরবাসী সবাই কিন্তু বিশ্বাস করে নিলো।

তবুও যা কিছুটা সংশয় কয়েকজন নির্বিরোধ এবং শান্ত মস্তিষ্কের লোকের মনে ছিলো, সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেলো যখন স্বয়ং সিন্ধুগোবিন্দ তরফদারকে তাঁর নিজের দোকানের সামনে একটা টমটম গাড়ির পাজি ঘোড়ায় কামড়িয়ে দিলে।

অতি অল্পদিনের ব্যবধানে একটা ছোট নিস্তরঙ্গ শহরের জীবনে এই দুটি চঞ্চলাকর ঘটনা ঘটে গেলো। ফলের দোকানদার বিদেশী লোকটিকে পাগলা বিড়ালে এবং স্থানীয় জুতো-ওয়ালা সিন্ধুবাবুকে পাজি ঘোড়ায় কামড়িয়ে দিলো। এর মূলে যে সিন্ধুবাবুর আবিষ্কার ঐ এস, জি, টি পাউডার এ বিষয়ে কারোর মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না।

ফলে 'নিউ তরফদার সু হাউসের' একপ্রান্তে গাদা হয়ে পড়ে রইলো কয়েক হাজার প্যাকেট এস, জি, টি পাউডার। গেঁটেবাত বা আমবাত কোনোটা সারাবার কোনো কাজেই কেউ কিনলো না কখনো।

তবে শহরের গৃহিণীরা কি [illegible] জেনেছিলেন যেন এতে আলপনা ভালো হয়। তাই ছোটরা জুতো কিনতে গেলেই তাদের মা-পিসিরা শিখিয়ে দিতো, 'এক প্যাকেট পাউডার [illegible] চেয়ে আনিস।' সেই পাউডার দিয়ে ঝকঝকে সাদা আলপনা দেওয়া হতো পৌষ সংক্রান্তিতে এবং উৎসবে। আর থিয়েটারের শৌখিন অভিনেতারা ঐ পাউডার মুখে মেখে জিঙ্ক অক্সাইডের মনে সফেদার অভাব পুষিয়ে নিতো। একটু মুখে জ্বালা করতো, একটু-আধটু চামড়াও ছড়ে যেতো, [illegible] বিনিপয়সার জিনিষ। তাছাড়া পায়ে মাখা পাউডার মুখে মাখলে এই রকমই তো হবে, অতে ছটফট করলে চলবে কেন।

— [illegible]

প্রমীলা

অপচয়

আলোক-সমুদ্রে তুফান উঠে সব আলো মুহূর্তে নিভে গিয়ে ঘন অন্ধকারও নেমে আসতে পারে, আবার অন্ধকার খান-খান করে নতুন আলোকশিখার আবির্ভাবও ঘটতে পারে। এ-দুয়ের মধ্যে যে-কোন একটাই হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি। এর মাঝামাঝি অবস্থাটা ঠিক আমাদের কাম্য নয়। কারণ সেরকমভাবে জীবনযাপন একেবারে অসহ্য হয়ে পড়ে। এখান থেকে যাত্রা শুরু করে যে-কোন একদিকে পৌঁছে যেতে হবে। অন্ধকারের হাতছানি প্রবল, তাই প্রায় সময়ই আমরা স্বচ্ছন্দে এবং হেসেখেলে এ-পথে এগিয়ে যাই। এ-সময় আমরা একান্ত নিরুপায়। কারণ, দুঃখ এবং কষ্টের তিমির রজনী পেরিয়ে আলোর রাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার গুরুভার বহন সকলের জন্য নয়। এজন্য প্রয়োজন বিশেষ যুগধর্মের। আর সে-যুগই তৈরি করে নেয় আপন মানস-পুত্রকে। আজীবন আলোক-সাধনা এবং দুশ্চর তপস্যা চালিয়ে তারা পতিত জাতিকে উদ্ধার করেন—জরাজীর্ণকে ধ্বংস করে নতুনের শ্যামসমারোহে জাতিকে নতুন ভাবতরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যান। তাই এ-দায়িত্ব পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সকলে এই দায়িত্ব বহনের যোগ্যও নয়। অথচ মাঝামাঝি এই অবস্থা থেকে উদ্ধার না হলেও সুষ্ঠুভাবে আমাদের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। নিছকই অস্তিত্বের প্রশ্ন নয়—সজ্ঞানে যাকে বিরাটের স্পর্শে উজ্জীবিত হওয়া বলে তা-ও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ সবকিছুর মূলে হলো এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতি—গড্ডালিকা প্রবাহ যার আর এক নাম। এই গড্ডালিকা-প্রবাহে আমরা গা ভাসিয়ে দিয়েছি। নতুনের কথা চিন্তা করতে পারি না। হঠাৎ আলোর ঝলকানির চকিত চমকে আত্মহারা হয়ে আসলে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলছি। পরে আফশোষ হলেও সংশোধনের জন্য খুব একটা গরজ থাকে না। বরং 'চলে যাবে' এরকম একটা মনোভাব বেশ জাঁকিয়ে মনের মধ্যে স্থান করে নেয়।

সম্প্রতি এরকম একটা ঘটনা লক্ষ্য করে মনটা বেশ খারাপ লাগল। একটি মেয়ে সেদিন বলছিল, কোন কাজটাই আমরা ভাল-ভাবে করি না। না আপিসের কাজ, না অন্যকিছু। আমরা যেন লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে চলেছি। কোথায় যাব আর কি করবো কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এরকম লক্ষ্যহীনতার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মেয়েটি বেদনায় ভেঙে পড়লো, ওকে কিভাবে সান্ত্বনা দেব তা আমি ভেবে স্থির করতে পারলাম না। এই ভাবনাটা তো শুধু ওর একার নয়—সকলের। আর সেই 'সকলে'ই এই কথাগুলো একবার ভাবছেও না। সত্যি কি মর্মান্তিক পরিস্থিতি।

এ-ঘরে আলো জ্বলবে কি করে? ভরসা এই যে, একজন ভাবছে এবং এরকম একজন একজন করে হয়তো অসংখ্যজন। পরিবর্তন যদি সম্ভব হয়, তবে তাদের দৌলতেই হবে। সেদিন পরিবর্তনের স্বাদ-বদলে কিন্তু সবাই আমন্ত্রিত হবে। কারণ, ভাবে দু'-একজন আর ফলভোগ করে সবাই।

প্রসাধনে রংয়ের প্রভাব

স্বাস্থ্যের সঙ্গে রংয়েরও একটা সম্পর্ক আছে। আবার রূপের সঙ্গে রংয়ের সম্পর্কও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রসাধনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এ পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। যেমন দেহের রংয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির রং নির্বাচন করা হয় তেমনি অঙ্গরাগের বর্ণ নির্বাচনেও আমাদের লক্ষ্য থাকে। তাছাড়া আরো নানা ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো একটি বা একাধিক রংকে নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কোনো একটি নির্দিষ্ট রং নিয়ে যদি আমরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করি তবে দেখতে পাব যে ঐ রংয়ের প্রতি দীর্ঘ-দিনের পক্ষপাতিত্বের জন্য আমাদের দেহ ও মনের উপর কতকটা উপকার বা অপকার সাধিত হয়েছে।

মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী কোন না কোন একটি বিশেষ রংয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেই জন্যই একজনের অতি প্রিয় রং অপরের কাছে অস্থির হয়ে ওঠে।

সমস্ত রংয়ের মধ্যে সবুজ রংয়ের প্রভাব স্নিগ্ধকর। এই রঙটি চোখের স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। সবুজ রংয়ের সংস্পর্শে বেশিদিন থাকলেও দেহ বা মনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। সবুজ রং দেহকে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে। রোগী বা দুর্বল মানুষের পক্ষে সবুজ রং খুবই উপকারী।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন মস্তিষ্কে একটা অবসাদ বা ক্লান্তির ভাব দেখা দেয় তখনো এই সবুজ রংয়ের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকলে ক্লান্তি দূর হয়।

হলদে রং স্বাস্থ্যজনক ও প্রফুল্লতাময়। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে সবুজ রংও অবসাদক বলে মনে হয়, সেখানে হলদে রংয়ের ব্যবহারে মন অনেকখানি খুশিতে ভরে ওঠে। বর্ষাকালে যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, চারদিকে একটা অন্ধকার এবং থমথমে ভাব এসে মনটাকে কেমন উদাস করে দেয় সেই সময় কিন্তু হলদে রং স্বভাবতঃই ভাল লাগবে। এই সময় হলদে রংয়ের সান্নিধ্যে থাকলে গুমোট ভাব ততটা মনে হবে না এবং মনও খানিকটা প্রফুল্ল হয়।

লাল রং উত্তেজনা বাড়ায়। লাল রংয়ের প্রভাবে মানুষের মনে যে উন্মত্ততা আসে তার ফলে মানুষ অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। লাল রংয়ের জিনিস মাত্রই কিন্তু উত্তেজক। গরমকালে লাল রংয়ের কাপড়-জামা পরতে নেই। তাতে আরো বেশী গরম বোধ হবে। বরং শীতকালে পরা যেতে পারে।

নীল রংও মস্তিষ্কের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। নীল রং মস্তিষ্কের উত্তেজনা না বাড়ালেও কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। তবে অনেকদিন ধরে নীল রংয়ের প্রভাবও মস্তিষ্কের পক্ষে অপকারক। যাঁরা মাথার কাজ করেন তাঁদের পক্ষে নীল রং অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা নীল রংয়ের বিশেষ পক্ষপাতী। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মানুষ যখন স্বভাবতঃই স্নিগ্ধ দ্রব্যের অনুরাগী হয় তখন নীল রং অনেকখানি শীতলতা ও শান্তি দান করে।

সাদা রং অল্পদিনের মধ্যেই দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে দেয়। সাদা রংয়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখ এমনিই পীড়িত হয়ে পড়ে যে চোখ বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কাজেই দীর্ঘদিন-ব্যাপী সাদা রংয়ের প্রভাব দৃষ্টিশক্তিকে যথেষ্ট ক্ষুন্ন করে।

আবার গাঢ় গোলাপী, গাঢ় কমলা, এগুলো বেশী ব্যবহার করলে রীতিমত গরম লাগে।

এবারে স্থান, কাল ও সময় বিশেষে কি পোষাকের পার্থক্য করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে দুচার কথা জানাই।

ভোরের দিকে এবং দিনের প্রথমভাগে ফিকে হলদে, ফিকে সবুজ, এগুলো যাদের রং বেশ ফর্সা তাদের ভালই মানায়। দুপুরে সকলকেই হাল্কা অথবা সাদা রংয়ের শাড়ী-জামা পরতে হয়। আর রাত্রে গাঢ় রংয়ের শাড়ী অলঙ্কারের সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে স্কুল-কলেজ

বা শিক্ষার জায়গায় সব সময় সাদা বা হাল্কা বেশভূষা করা উচিত।

সবাইকে সব রং যে মানায় না একথা অবশ্য কিছু কিছু সকলের জানা আছে। তবুও দু-চার কথা বললাম। দেহের রং অনুযায়ী যেমন শাড়ীর রং হওয়া দরকার তেমনি শাড়ীর রংয়ের অনুরূপ ব্লাউস, চটি বা স্যাণ্ডেল এবং ভ্যানিটি ব্যাগ হওয়া চাই। একই রংয়ের শাড়ী ও ব্লাউজ ব্যবহার না করে আরো সুন্দর দেখায় যদি এই দুই পোষাকের জন্য একই রংয়ের দু রকম শেড ব্যবহার করা যায়। ধরুন শাড়ী যদি গাঢ় সবুজ হয় এবং ব্লাউজ যদি ফিকে সবুজ হয় বা দামী কোনো কাপড়ের ব্লাউজ পরা যায় তাহলে ভালই মানায়। অনেক সময় শাড়ী ও ব্লাউজের জন্যে একই রংয়ের দু প্রকার শেডের কাপড় হয়তো পাওয়া গেল না, সেক্ষেত্রে শাড়ীর পাড়ের ভেতরের কোনো একটি রংকে বেছে নিয়ে সেই অনুরূপ ব্লাউজ পরলে মন্দ হয় না। অথবা শাড়ীর জমিতে যদি রঙীন ফুল থাকে, তবে তার সঙ্গে কোনো চেক বা ডোরাকাটা ব্লাউজ মোটেই মানাবে না। কিন্তু এখানে শাড়ীর ফুলের কোনো একটি রংকে বেছে নিয়ে ঐ রংয়ের ব্লাউজ তৈরি করা বেশ একটি রুচির পরিচয় হবে।

মোট কথা—রং সম্বন্ধে আমাদের যেন একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকে। কেননা রংই বিশেষভাবে বেশভূষার বা পোষাক-পরিচ্ছদের রূপ দেয়। কাজেই রং সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে আপনার রূপ বা সৌন্দর্যকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।

বারান্তরে অঙ্গরাগে রংয়ের প্রভাব সম্পর্কে আবার কিছু বলবার ইচ্ছে রইল।

—বেলা দে

সংবাদ

অল ইংলণ্ড উইমেনস হকি অ্যাসোসিয়েশন মিস জী ম্যাকহীথকে জাতীয় কোচ হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এই দীর্ঘাঙ্গী ক্রীড়াকুশলী মহিলা লণ্ডনের নিকটবর্তী অ্যালফোর্ড-এর ওয়েলস গার্লস স্কুলের কর্মী। তিন বছর আগে অ্যাডভান্সড কোচেস সার্টিফিকেটের জন্য যে জাতীয় প্রকল্পের সূচনা, তার জন্য যাঁরা প্রথম আবেদন করেন ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মিস ম্যাকহীথ একজন রেজিস্টার্ড আম্পায়ার ও সাউদার্ণ কাউন্টিস কোচিং সাব-কমিটির একজন অগ্রণী সদস্য। তিনি মিক্সড সেক্স দলের ক্যাপটেন এবং 'সাউথ বি' টীমের পক্ষে খেলেছেন। স্থানীয় কোচদের সহায়তায় মিস ম্যাকহীথ প্রশিক্ষণ কাজে সমন্বয় সাধন করবেন।

অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে বেলমন্ট ক্যাম্প-এ (স্কটল্যাণ্ড) ১৫—১৯ বছর বয়সীদের জন্য যে 'হকি হলিডে' অনুষ্ঠিত হবে তাতে ৭৫ জন খেলোয়াড় যোগ দেবেন।

●

পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চিম জার্মানীর গ্রামাঞ্চলে প্রসাধন ও বিচিত্র কবরীসজ্জাহীন মেয়েদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। জার্মানীর নারীসমাজে এখনও এই ধারণা বদ্ধমূল যে প্রসাধনের সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনের যোগসূত্র আছে। যেসব মেয়ে সবসময় প্রসাধন করে, তাদের সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়। লোকে চায় যে, জার্মানীর মেয়েরা হোক আত্মনির্ভর, স্বাস্থ্যবতী, প্রাণখোলা ও অকপট। একটি সমীক্ষার হিসাবে জানা গেছে যে, এক-তৃতীয়াংশ লোকের মত হচ্ছে যে, মেয়েরা পটের বিবি না সেজে সুগৃহিণী হয়ে ঘরের কাজকর্ম করুক আর দুই-তৃতীয়াংশের মতে মেয়েদের কেবল ততটুকু প্রসাধন করা ভালো যাতে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য খোলে।

●

কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি! মস্কো রেড স্কোয়ারে এবার বেরলিনের তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদের প্রদর্শনী হবে যেখানে রুশী ললনারা কিনবে রূপেলী শিয়ালের লোমের 'কাফ' দেওয়া ভেলোর কোট কিম্বা মিঙ্ক কলার আঁটা বোলে রঙের কোট টুপি। বেরলিনের ফ্যাশন শিল্পীরা এই পথে সীমানার বাধা ভেঙ্গে পূর্ব ইউরোপের বাজারে ঢোকার চেষ্টা করছে।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা

সৌন্দর্যও প্রমাণসাপেক্ষ। নিজে নিজে সুন্দর হলে চলবে না। অসংখ্য স্তাবক সুন্দরী বলে রায় দিলে তাও নাকচ হয়ে যেতে বাধ্য। যতক্ষণ না অসংখ্য সুন্দরীর সমাবেশে এই সৌন্দর্য স্বীকৃতি পাচ্ছে। সব সময়ই আমরা অবশ্য এই ব্যাকরণ মেনে চলি না। সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দিতে সবাই বাধ্য—একমাত্র অতিশয় নিন্দুক ছাড়া। সৌন্দর্যের বিচারে আমাদের ব্যক্তিগত রুচিই প্রধান বিচারক। কিন্তু এতে ব্যক্তিগত রুচির চরিতার্থতা ঘটলেও ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি। এই ফাঁকটুকু ভরাট করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর। ব্যক্তির পক্ষে যেটা মস্ত অসুবিধা এখানে সেটাই বিরাট সুবিধা। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ সৌন্দর্য তারিফের ক্ষমতা অনেকেরই নেই। কেউ বলেন, চোখ বড় সুন্দর। আবার অপরে বলেন,মুখখানা অতুলনীয়। কেউবা দেহ-সুষমায় তন্ময় হয়ে থাকে। ব্যক্তিব এই সৌন্দর্য নিরিখের বিচ্ছিন্নতাকে একত্রিত করলে তবেই তিলোত্তমা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় —সুন্দরী তার নয়নমনোহর সৌন্দর্যের স্বীকৃতি পায়। এটা তার পক্ষে যেমন আনন্দের কথা অন্যের পক্ষেও তেমনি ভরসার কথা। সে নিজের অপূর্ণতার কারণ বুঝতে পারে। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে এটা মস্ত সহায়ক। স্বীকৃতিধন্যা সৌন্দর্যবিলাসীর পক্ষেও এটা বিরাট গৌরব। সৌন্দর্য বিফলে না গিয়ে সকলের স্বীকৃতি পেয়েছে—শুধুমাত্র ব্যক্তির নয়। এর মূল্য তো কিছু কম নয়। কিন্তু সৌন্দর্যের এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে আমাদের সুন্দরীদের বেশ একটা সংকোচ দেখা যায়। এমনিতে লোকে সুন্দরী বলুক আর সৌন্দর্যের তারিফ করুক, সেটাই যথেষ্ট। লাভের উপর উপরি পাওনার আর দরকার নেই। কিন্তু সৌন্দর্যের খ্যাতি যদি ভুবনময় না হয়, তবে তার মূল্য কতখানি সেটা বোঝা ভার। সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্য বিকিরণ করে অন্ততঃ আজকের দিনে আর সন্তুষ্ট থাকা যায় না। খ্যাতির ক্ষেত্রে সবাই ঊর্ধ্বমুখী হতে চায়। এমন লোকের দেখাও সচরাচর যে পাওয়া যায় না তা নয়, যে কিনা সবকিছু সম্বন্ধে উদাসীন। এগিয়ে যাওয়া আর পিছিয়ে পড়া দু-ই তার কাছে সমান। কিন্তু এ শুধু নিয়মের ব্যতিক্রম বোঝানোর জন্যই। সুতরাং খ্যাতির শীর্ষই আমাদের লক্ষ্য—শীর্ষচ্যুতি নয়, তাই যদি হয় তবে যার সৌন্দর্য আছে, সে কেন চুপচাপ বসে থাকবে। বরং সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সে যে অগ্রগামী যুগের মতই সমান তালে এগিয়ে চলেছে, সেটা সবাইকে বুঝতে দিতে হবে। আর সেজন্য প্রয়োজন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হওয়া।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে বিভিন্ন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ উৎসাহের প্রাবল্য সুন্দরীদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। অনেকেই এ-ব্যাপারে নিস্পৃহ। তাদের অনেকেরই এ-সম্বন্ধে কোন সম্যক ধারণা নেই। তারা মনে করে সৌন্দর্যের কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক সৌন্দর্য সকলের স্বীকৃতি পাবেই। কিন্তু আসল জিনিসটা তারা কেউ ধরতে পারে না এবং বোঝার চেষ্টাও করে না। দু'-একজন মেয়ের সঙ্গে এসম্পর্কে কথাও বলেছি। কিন্তু প্রসঙ্গটাকে তারা তেমন আমল দিতে চাইল না। বরং তাচ্ছিল্যভরে কথাটাকে উড়িয়ে দিল। তাই যে-কোন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যাল্পতা আমাদের পীড়িত করে!

এই কথাটা আর একবার প্রমাণিত হলো এবারকার ফেমিনা আয়োজিত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল প্রসাধনদ্রব্য নির্মাতা জে কে

ছেলেন কার্টিস। মোট প্রতিযোগী ছিল পঞ্চাশজন। প্রাক নির্বাচনের পর উনিশে গিয়ে সংখ্যাগুলি বেশ নিরুৎসাহজনক। এজন্য দায়ী কি শুধু আমাদের অনুদার মনোভাব, না আরও কিছু?

হিন্দী হাইস্কুলের প্রেক্ষাগৃহে সেদিন যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়েছিল। অপরূপ আলোকমালায় আর ঘনঘন সুন্দরীদের আনাগোনায় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি আলোক-চকিতে শিহরিত হয়ে উঠেছিল। স্বল্প বিরতির ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরীদের চটুল-চরণ-বিক্ষেপ, অপূর্ব দেহভঙ্গিমা এবং সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সহর্ষ সম্বর্ধনা লাভ করছিল। এক সময়ে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হলো। দর্শকদের তুমুল হট্টরোলের মধ্যে বিচারকদের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। 'মিস ফেমিনা—১৯৬৭' নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী নাতালি উড। বিজয়িনীর মুকুট পরিয়ে দিলেন গত বছরের 'মিস ফেমিনা' শ্রীমতী মৈনা খান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শ্রীমতী মঞ্জু চুগানী এবং শ্রীমতী মিনি ধিংরা। এ'রা সবাই এবার যাবেন বোম্বেতে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে। সমস্ত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিজয়িনীর মধ্য থেকে সেখানে নির্বাচিত হবেন 'মিস ইন্ডিয়া—১৯৬৭'। ইতিমধ্যে

মিনি ধিংরা

নাতালি উড

ফটো : অমৃত

দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌয়ে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়েছে। বাকি রয়েছে আরও কয়েক জায়গায়। ২৪ মে চূড়ান্ত নির্বাচন হবে বোম্বাইয়ে। তারপর মিস ইন্ডিয়া যাবেন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায়। সে আসর বসবে আমেরিকার মিয়ামী বীচে।

শ্রীমতী নাতালি উডের পক্ষে স্বল্প ব্যবধানে এই গৌরব অর্জন দ্বিতীয়বার। 'টিনএজারস' প্রতিযোগিতায় কিছুদিন আগেই তিনি সেরা সুন্দরীর সম্মান অর্জন করেন এবং এই দ্বিতীয়বার। সুন্দরীদের সঙ্গে টুকরো-টাকরা বাক বিনিময়ের মাধ্যমে ফিল্মে অভিনয়ের দিকেই ওদের ঝোঁক লক্ষ্য করলাম। মিস ফেমিনা তো বলেই ফেললেন, ফিল্মে অভিনয়ের ব্যাপারে আমার বেশ আগ্রহ।

ফেরার পথে ভাবছিলাম ওদের সাগ্রহে ওরা সফল হোক। সেইসঙ্গে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিযোগীর আগমনে প্রতিযোগিতার আসর আলোক-উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। যদিও উদ্যোক্তাদের মতে এবারকার প্রতিযোগীর সংখ্যা মোটামুটি আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দিতে আরও মেয়ে এগিয়ে আসছেন। কেন এ-কথাটার উত্তর হয়তো আগামী বছরগুলিতে পাব। উদ্যোক্তাদের তাই ধারণা এবং আমারও এই বিশ্বাস।

মঞ্জু চুগানি

হঠাৎ দমকা বাতাস, বাতাসের সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। জানলা-দরজাও দুদ্দাড় করে বন্ধ। রাস্তা জুড়ে রাধাচূড়ার হলুদ ফুল ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ-আসা ধুলোর ঝড়, যার নাম পশ্চিমী আঁধি, তাও সংযত হয়েছে বৃষ্টিতে। কলকাতায় কালবৈশাখী টুরিস্টের মতন কটা দিন যেন বেড়াতে এসেছে। চতুর্দিকে বৈশাখী-মেলার পোস্টার, ফেস্টুন, রবীন্দ্র-জন্মদিন উপলক্ষে নাচগান আনন্দ উৎসবের আয়োজন। কবিকন্ঠের রেকর্ড করার কথা কানে আসছে—কোনো এক প্রতিষ্ঠিত গ্রামোফোন কোম্পানী পরীক্ষা-মূলকভাবে আধুনিক জ্যেষ্ঠ কয়েকজন কবির কণ্ঠ রেকর্ড করবেন। তদারক করছেন একজন কাব্যদরদী তরুণ কবি। আশা করা যায়, এই আশু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী আরো অ্যাডভেঞ্চারাস্ হতে পারতো। পৃথিবীর সব দেশেই কবিতার রেকর্ড প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। রাশিয়া-আমেরিকার কথা ছেড়ে দিলেও, অন্যান্য দেশে এই রেকর্ড বিক্রির পরিমাণ বড়ো কম নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশে কবিতার কোনো ব্যবসা-ভিত্তিক রেকর্ড আছে বলে আমার জানা নেই। ব্যক্তিগত-ভাবে কারো সংগ্রহে টেপ্-করা কবিকণ্ঠ আছে এমন শুনেছি। বিদেশে সুধীন্দ্রনাথের গোটা অর্কেস্ট্রার লং-প্লেয়িং চালু আছে। আকাশবাণী সময়ে-সময়ান্তরে তাঁদেরই প্রয়োজনে 'কবিকণ্ঠ' রেকর্ড করেছিলেন—মৃত কবিগণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনেক বেশি সংরক্ষণশীল মনোভাব থাকার প্রয়োজন ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এমন কি জীবনানন্দের কবিতার রেকর্ডও তাঁরা অনায়াসে নষ্ট করে ফেলেছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রতি সমাদর সাধারণ শিক্ষিতের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আকাশবাণী প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের এমন নির্মম ও মূল্যহীন আচরণ কোনোমতেই বরদাস্ত করা যায় না। এতোদিন বাদে একটি কবিতা-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকজন তরুণ কবির সংগঠিত প্রয়াস নিরন্তর এর পিছনে ছিলো বা আছে বলেই এর সামান্য প্রতিষ্ঠাও সময়ে হয়েছে। সুরু করেছেন কবিতার বইয়ের সংগ্রহ কাজের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এই সঙ্গে কবিতার পাণ্ডুলিপি, কবিদের মধ্যে পত্র-বিনিময়, আলোকচিত্র, কণ্ঠ প্রভৃতির সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এর জন্য সরকারি আনুকূল্য বিশেষভাবে দরকার। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের বদান্যতা থেকেও এই ভাবিষ্যৎময় একান্ত প্রয়োজনীয় একটি উদ্যোগ বঞ্চিত হবে না, এমন আশাই করবো। দুর্দশা এমনই এক স্তরে পৌছেছে শুনেছি, আলমারি কেনার অর্থাভাবে সংগৃহীত গ্রন্থ-সমূহ উচিতমতো উপায়ে রাখা যাচ্ছে না।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশে কবিতা ও কবিতা-পত্রিকার জগতে এক অভাবনীয় সাড়া পড়ে যায় প্রতি বছর। গত বছর সেই উত্তেজনা শিখরদেশ ছুঁয়ে এসেছে। আপনারা নিশ্চিত জানেন, গত বছর এই উপলক্ষে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে থেকে কমপক্ষে সাত-আটখানি দৈনিক কবিতার কাগজ বের হয়েছিলো। সাপ্তাহিক তুচ্ছ, ঐ দৈনিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা-বার্ষিকীর প্রকাশ পৃথিবীর কাব্য-জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবছর অন্যান্য সাময়িক-পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত থাকবে। কবিতা-বার্ষিকী সংগঠকগণ এবছর শতবার্ষিক কবিতা'র সংকলন করছেন বলে শুনেছি। এবছর কলকাতাবাসী হিন্দী কবির দল শুনছিলাম একটি দৈনিক কবিতা প্রকাশ করতে চলেছেন। বিজ্ঞাপন অফিস-গুলো উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হতে চলেছে। তরুণ কবিকুলের মধ্যে একমাত্র কথা—কতো জায়গায় লিখেছেন এবার? পঁচিশ? আমার কিন্তু সিঙ্গল! সেকি? লেখাপত্তর ছেড়ে দিলেন নাকি? জীবনযাপন করছেন? মন্দ কি? লিখাই তো সব নয়? কফি হাউস থেকে শুরু করে চা-খানা যেখা-নেই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়েকে দেখবেন মাথা ঝুঁকিয়ে তন্ময়—বুঝবেন, সূচনা হতে চলেছে—লিটল ম্যাগাজিনের জগতে আর একটি তুমুল সংযোজন হলো বলে।

বইয়ের দোকানেও ভিড় কম নয়। কবিপক্ষের বিশেষ ছাড় উপলক্ষে বেশ কিছু বই বিক্রি হয়। সারা বছরের একটানা বিক্রির প্রায় অর্ধেক শুনেছি ঐ পনেরো দিনে সম্ভব হয়। নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হলে তো কথাই নেই। বাঁধা দোকান ছাড়াও ঐ সময় কেন্দ্র করে দু-তিনটি বড়ো সাংস্কৃতিক মেলা প্রাঙ্গণে কবিরাই কবিতার স্টল খুলে বসেন। মূল লক্ষ্য আড্ডা ও জমায়েত—উপলক্ষ বই বিক্রি। বিক্রি মন্দ হয় না। বিক্রির চেয়ে বেশি থাকে—কী এক জাতের উত্তেজনা! পাঠক-পাঠিকা সরাসরি যোগা-যোগ করতে পারেন কবিকুলের সঙ্গে এই উপলক্ষে।

খবরের কাগজে দেখলুম সাদার্ণ এভিনিউর বিড়লা একাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার রবীন্দ্রনাথ অংকিত ছবির প্রদর্শনী ৪ঠা মে পর্যন্ত খোলা আছে বলে পুনর্বিজ্ঞাপিত দিয়েছেন। আমার মনে হয়, আরো কিছুদিন খোলা রাখতে পারলে কবির জন্ম-পক্ষকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গণ্য হতে পারে। সকলেই জানেন, এই ছবির জগতের রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্র-নাথের এক বিচিত্র ও নূতন পরিপূরক। এই রবীন্দ্রনাথ অনেকেরই অচেনা। বরং ছবিতে তিনি আধুনিক কবি ও জটিলতাপূর্ণ আধুনিক মানুষের অতি কাছাকাছি।

রবীন্দ্র-জন্মদিবস উপলক্ষে, কে যেন বলেছিলেন, ভারতের কবিতা দিবস ঘোষণা করা উচিত। দেশ-বিদেশের কবির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এক মহাসম্মেলন আহ্বান করা উচিত। সত্যিই উচিত—বিদেশ না হলেও দেশের বিভিন্ন ভাষার কবিদের মধ্যে অবিলম্বে এই ধরনের এক ব্যাপক যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন। পত্রিকাসমূহের সহযোগিতা পেলে বিশ্বাস করি—বাংলাদেশেই এই ধরনের সর্বভারতীয় একট উদ্যোগ সম্ভব। কবিতার আদিভূমি এই গাঙ্গেয় অঞ্চলে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের জন্ম-উপলক্ষেই এই উদ্যোগ হবার মতন আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

—রূপচাঁদ পক্ষী
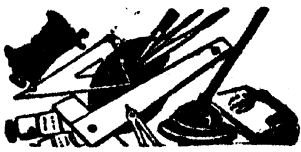
১৮৯৭ সালের বসন্তকালে আবার শরীর ভেঙেছে শার্লক হোমসের। অহো-রাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন হোমস। দীর্ঘদিন ধরে একটানা খাটুনি তাঁর মত লোহাপেটা শরীরেও সয়নি। তাই হার্লি স্ট্রীটের স্পেশালিস্ট ডক্টর মুর আগর বায়ুপরিবর্তনের কড়া হুকুম দিলেন। অগত্যা কর্নিশ পেনিনসুলার পোলধু বে'তে রওনা না হয়ে পারেননি শার্লক হোমস।

কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে। যে মানুষটি রহস্য সমাধানের বিধিলিপি নিয়ে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে গিয়েও তাঁর রেহাই নেই। তাই বিশ্রামের বদলে নতুন উৎপাত নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছে হোমসকে। যে সে উৎপাত নয়, হোমস নিজেও স্বীকার করেছেন, এরকম অদ্ভুত, লোমহর্ষক আর বিপজ্জনক মামলা নাকি তাঁর তেইশ বছরের গোয়েন্দাজীবনে দ্বিতীয়বার আসেনি। আপাতদৃষ্টিতে যে কেসকে মনে হয়েছে অলৌকিক, শার্লক হোমসের কল্পনাবিমুখ সংস্কারমুক্ত মন তার মধ্যে থেকেই উদ্ধার করেছে এমন এক ভয়াবহ চক্রান্ত যা শিহরিত করেছে বিশ্ববাসীকে, চমৎকৃত করেছে বিষ-বিজ্ঞানীদের।

অদ্রীশ বর্ধন

দশ বছর আগে কাহিল শরীর নিয়ে খুনের তদন্তে মাথা গলিয়ে যেমন প্রাণে মরতে বসেছিলেন হোমস, এক্ষেত্রে তার চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন; কিন্তু বেঁচে যান কেবলমাত্র প্রাণপ্রিয় সুহৃদ ডক্টর ওয়াটসনের প্রচেষ্টায়।

ঘটনাটা সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক। হোমসের বিশ্বাস ছিল তাঁর লৌহকঠিন শরীরে অবসাদ কোনোদিনই স্থান পাবে না। কিন্তু ডক্টর মুর আগর যখন সাফ বলে দিলেন, সম্পূর্ণ বিশ্রাম না নিলে ওয়ার্ল্ড-ফেমাস ডিটেকটিভের বিরুদ্ধেও আত্মহত্যার চার্জ আনা হবে, তখন ক্ষেপে গেলেন ডক্টর ওয়াটসন। বন্ধুবরের সব ওজোর-আপত্তি নস্যির মত উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন কর্নিশ পেনিনসুলার সেই নির্জন সমুদ্রোপকূলে। কিন্তু অরণ্যময় শৈলসমাকীর্ণ ক্ষুদ্র স্থানটিতে রহস্য তার জটিল জাল পেতে বসেছিল—রহস্যভেদী আসতে না আসতেই......!

রুক্ষ পাথর আর ঢিবি-ভরা জায়গাটায় পৌঁছোনোর পরের দিন ভোরবেলা দুই বন্ধু বেরোলেন সমুদ্রের বায়ুসেবনে। এমন সময়ে একটা ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। একগাল হেসে আলাপ করলেন গোয়েন্দা আর ডাক্তারের সঙ্গে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণও হয়ে গেল।

নিমন্ত্রণরক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ীটার দুটো অংশ। সামনের অংশে সস্ত্রীক বাস করেন সদাহাস্যমুখ ভদ্রলোক। আর পেছনের অংশে শীর্ণকায় এক ব্যক্তি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। সামান্য ঝুঁকে হাঁটেন। মনে হয়, মেরুদণ্ডে যেন কোনো বিকৃতি আছে।

বিখ্যাত ক্রিমিনলজিস্ট শার্লক হোমসকে চায়ের আসরে পেয়ে আমন্ত্রণ-কর্তার মুখে কথার ফোয়ারা ছুটল। কিন্তু শীর্ণকায় ভাড়াটে ভদ্রলোক ঘাড় গুঁজে বসে রইলেন আগাগোড়া।

দিন তিনেক পরে এক সকালে জলযোগ করছেন দুই বন্ধু, এমন সময়ে আচমকা দড়াম করে দরজা গেল খুলে, ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করল পূর্বপরিচিত দুই মূর্তি। এক পলকেই তাঁদের চেহারা দেখে বোঝা গেল, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

চকিতের মধ্যে অসুস্থ শার্লক হোমসের সর্বদেহে এল এক আমূল পরিবর্তন। নির্দয় চক্ষে কটমট করে উদ্বিগ্ন দুই মূর্তির দিকে তাকালেন ডক্টর ওয়াটসন। কিন্তু একই আতঙ্কে দুজনেই তখন সমভাবে অভিভূত।

অচিরেই শোনা গেল সেই ভৌতিক ঘটনা। জঙ্গলের দিকে যেতে যে বাড়ীটা পড়ে, সেখানে থাকেন শীর্ণকায় ভদ্রলোকের দুই ভাই আর এক বোন। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত ভাই-বোনেদের সঙ্গে তিনি তাস খেলেন। রাত দশটার পর যখন বাড়ী চলে আসেন, বাকী তিনজন তখনও বসে থাকে টেবিলের তিনদিকে। ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়ে ওখনকার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। জরুরী কল পেয়ে ভাই-বোনেদের ওদিকেই যাচ্ছেন শুনে সঙ্গ নেন উনি। গিয়ে দেখলেন এক অসাধারণ দৃশ্য।

তাঁর দুই ভাই আর বোন টেবিলের তিনদিকে রয়েছে বসে—ঠিক যেভাবে গত রাত্রে তিনি দেখে গেছিলেন। মোমবাতিগুলো শেষ অবধি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। চেয়ারে পাথরের মত শক্ত হয়ে মরে পড়ে রয়েছে তাঁর বোন, আর দু পাশে বসে দু-ভাই বিকৃত কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে, পাগলের মত হাসছে, কাঁদছে—সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো লক্ষণ তাদের মধ্যে নেই।

তিনজনেরই মুখে প্রকাশ পাচ্ছে এক অবর্ণনীয় বিভীষিকার প্রতিচ্ছবি—বিকট খিঁচুনি, প্রবল আক্ষেপে সমস্ত মুখটা যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে দারুণ আতংকে। রাঁধুনি বললে, সারারাত কোনো সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়নি, জিনিসপত্রও চুরি যায়নি। বাড়ীতে যে কেউ ঢুকেছে, তারও কোনো প্রমাণ নেই। অথচ কি এক অকল্পনীয় ভয়াবহ আতংকে একজন মহিলার জীবনপ্রদীপ চিরতরে গেছে নিভে: আর দুজন বলিষ্ঠ মানুষ গেছে উন্মাদ হয়ে।

হোমসের প্রশ্নের উত্তরে রুদ্ধ আবেগে থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে শীর্ণকায় ভদ্রলোক জানালেন, ভাই-বোনেরা তাঁর সহোদর নয়। গত রাতে আসবার সময়ে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলেন। জানলাও বন্ধ ছিল, তবে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাস খেলার সময়ে মনে হয়েছিল বাগানের ঝোপের ফাঁকে কি যেন একটা নড়ছে। আসবার সময়ে মোমবাতিও জ্বলছিল, ফায়ার প্লেসে আগুনও জ্বলছিল। কিন্তু আজ সকালে যে ভয়ংকর দৃশ্য দেখা গেছে। এরপর তার দৃঢ় বিশ্বাস এ সমস্তই অপদেবতার কাণ্ড, ভৌতিক ব্যাপার। এ ঘটনায় ইহজগতের কারো হাত নেই। ঘরের মধ্যে এমন এক অপার্থিব বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল যে নিমেষে তিনজনেরই মানসিক চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তৎক্ষণাৎ সদলবলে অকুস্থলে রওনা হলেন শার্লক হোমস। যাবার সময়ে হঠাৎ শোনা গেল সামনের দিক থেকে চাকার ঘড়ঘড় শব্দ। পাশ দিয়ে গাড়ী যাওয়ার সময়ে রুদ্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বীভৎসভাবে বিকৃত বিকট একটা মুখ কটমট করে তাকিয়ে আছে বাইরে। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত বিদ্যুৎবেগে মুখটা পথচারীদের অতিক্রম করে যেতেই ককিয়ে উঠলেন শীর্ণকায় ভদ্রলোক—'আমার ভাইরা! পুলিশ গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।'

অকুস্থলে গিয়ে শার্লক হোমস যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন। বাগানে ঢোকার সময়ে ইচ্ছে করে জলের ঝারি উল্টে ফেলে মাটি ভিজিয়ে দিলেন। তারপর শীর্ণকায় ভদ্রলোকের অজ্ঞাতসারে ভিজে মাটির ওপর তাঁর পদচিহ্ন তুলে নিয়ে গত রাত্রে বৃষ্টিস্নাত কাদা-মাটির ওপর আঁকা তাঁরই পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন কাউকে কিছু না জানিয়েই। ছাপ মিলে গেল এবং জানা গেল শীর্ণকায় ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলেছেন। বাড়ী থেকে বেরিয়ে তিনি সিধে নিজের বাড়ী গেছেন।

তবে কি জানলার কাচে মুখ রেখে অজ্ঞাত কোনো বিভীষিকা ভয় দেখিয়েছে? বাগানের আঁধারে একটা ছায়াকে নড়তে দেখা গিয়েছিল না? কিন্তু জানলার নীচে তিন ফুট চওড়া ফুলের বেদীতে এহেন ভয়ংকর আতংকের পায়ের ছাপ নেই কেন?

সেদিন সকালে সর্বপ্রথম ঘরে ঢোকে পাচিকা এবং ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শরীর এত অসুস্থ হয়ে পড়ে যে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে হয় শয্যায়। ওপরে গিয়ে লাশ দেখে এলেন হোমস। মৃত্যুর পরেও দারুণ আতংকে বিকৃত মুখ দেখে বিস্মিত হলেন।

সেদিনই বিকেলের দিকে আচম্বিতে শার্লক হোমসের কটেজে আগমন ঘটল এক বিখ্যাত সিংহশিকারী ও প্রাণীতত্ত্ববিদের। ভদ্রলোক গবেষণা নিয়েই জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়েছেন আফ্রিকার গহন জঙ্গলে। মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আসেন। অদূরবর্তী অরণ্যের মধ্যবর্তী শ্বেতশুভ্র গৃহে কয়েকটা নির্জন দিন অতিবাহিত করেন। ভদ্রলোকের মুখমণ্ডল বিরাট, ক্রূর চক্ষু, বাজপাখীর ঠোঁটের মত টিকালো নাসিকা, বিশাল গোঁফ—সব মিলিয়ে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ।

ভদ্রলোক আফ্রিকার পথে রওনা হয়েও টেলিগ্রাম পেয়ে নাকি ফিরে এসেছেন। মৃতা তরুণী তাঁর দূর সম্পর্কের বোন। তাই তিনি জানতে এসেছেন শার্লক হোমস সত্যিই রহস্যের মীমাংসা করতে পেরেছেন কিনা।

এখনও করতে পারেননি শুনে 'মিছেই খানিকটা সময় নষ্ট করলাম' বলে অরসিকের মত কুটির ত্যাগ করলেন সিংহশিকারী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছু নিলেন হোমস। ফিরলেন সেই সন্ধ্যায়। ম্লান মুখ দেখে বোঝা গেল রহস্যের জট এখনো খোলেনি।

পরের দিন সকালেই খবর এল। ভয়ংকর সংবাদ। অপদেবতার উপদ্রব শুরু হয়ে গেছে এ অঞ্চলে। গত রাতে মারা গেছেন শীর্ণকায় ভদ্রলোক। তিন ভাই বোনের অঙ্গে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তার সবই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মুখেও।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন শার্লক হোমস।

গিয়ে দেখলেন ঘরের আবহাওয়া ভয়াবহ, অবসাদজনক, শ্বাসরোধকারী। ঘরের ঠিক মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা তেলের বাতি দপ-দপ করে ধূমোদ্গীরণ করছে। পাশেই মৃত ব্যক্তি চেয়ারে
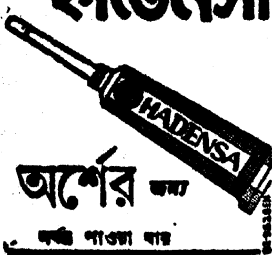
উপবিষ্ট। ছুঁচালো থুৎনি সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে এসেছে, চশমা জোড়া কপালে তোলা, শীর্ণ মুখ জানলার দিকে ফেরানো। মুখে বিকট আতংকের বীভৎস ছাপ সুস্পষ্ট। প্রবল আতংকে হাতের আঙ্গুলগুলো শক্ত হয়ে বেঁকে গেছে।

মৃত্যুমহলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল, শার্লক হোমসের বাহ্য শ্লথ-প্রকৃতির অন্তরালে কি নিদারুণ বিদ্যুৎ-গতি উদ্দীপনা থাকে সুপ্ত। কিন্তু শিকারী কুকুরের মত সব কিছু দেখে-শুনে শেষ পর্যন্ত তেলের বাতির শুভ্র আচ্ছাদনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করলেন হোমস এবং ওপরে যে ছাই জমেছিল, তারই অর্ধেকটা চেঁছে একটা খামে রেখে দিলেন। বাকী অর্ধেকটা রইল পুলিশের জন্যে। আসবার সময়ে বলে এলেন পুলিশ যেন তেলের বাতি আর জানলা নিয়ে একটু মাথা ঘামায়।

এর পরের দুদিন টো-টো করে কোথায় যেন ঘুরে বেড়ালেন হোমস। অবসর সময়ে বসে ধূমপান করলেন। একটা একসপেরিমেন্টও করলেন। তার আগে অবশ্য ওয়াটসনকে তিনি জানালেন যুক্তির সোপান বেয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যে প্রবেশ করেছে, তার ওপরেই আবহাওয়ার অদ্ভুত প্রভাব পড়েছে। ডাক্তার ঘরে ঢুকেই নাকি অজ্ঞানের মত চেয়ারে পড়ে যান, পরিচারিকাও সেই অবস্থা, শার্লক হোমস নিজেও তা টের পেয়েছেন শীর্ণকায় ব্যক্তির কক্ষে। ইঙ্গিতটা খুবই সুস্পষ্ট অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই বিষাক্ত আব-হাওয়া উপস্থিত ছিল। আরও, প্রতিক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে কিছু জ্বলছে। প্রথম ক্ষেত্রে আগুন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তেলের বাতি।

সুতরাং প্রতিক্ষেত্রেই ঘরের মধ্যে কিছু পুড়িয়ে বিষময় আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, খানিকটা ধোঁয়া চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে দুজন শুধু পাগল হয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে, আর ক্ষীণকায়া বলে একজন মারা গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তেলের বাতি সামনে থাকায় মারা গেছেন শীর্ণকায় ব্যক্তি।

তেলের বাতির শুভ্র আচ্ছাদনে খুঁজে পাওয়া গেল নরম ছাইয়ের ওপরে গোল হয়ে লেগে থাকা খানিকটা বাদামী রঙের গুঁড়ো।

সেই গুঁড়োই বাতির ওপর রেখে টেবিলের দুপাশে বসে পড়লেন দুই বন্ধু।

বেশী দেরী হল না ফলাফল জানতে। একটু পরেই পাওয়া গেল একটা গন্ধ। ঘন মৃগনাভির গন্ধ। কটু, বমনকারী। গন্ধের প্রথম ঝাপটাতেই মস্তিষ্ক আর কল্পনাশক্তি গেল কর্তৃত্বের বাইরে। একটা পুরু কালো ছায়া ঘুরপাক খেতে লাগল চোখের সামনে। মন বলল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিভীষিকা অদৃশ্য রয়েছে ঐ ঘন মেঘপুঞ্জের মধ্যে। ওৎ পেতে রয়েছে যত দানবীয় ভয়াল শয়তানী। নিকষ মেঘপুঞ্জের মধ্যে কি সব আবছা আকৃতি ভেসে বেড়াতে লাগল। যেন ভয়ংকর কিছু আসন্ন—সিঁড়ির ওপরে এখনি আবির্ভূত হবে এমন এক আগন্তুক যার ছায়াটুকুই বিদীর্ণ করে দেবে অন্তরাত্মা। আতংকে দুই বন্ধুর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে এল, চোখ কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল, মুখ হাঁ হয়ে গেল, জিভ চামড়ার মত শক্ত হয়ে ঝুলে পড়ল। চীৎকার করতে গিয়ে কাকের মত কর্কশ চীৎকার বেরুলো গলা দিয়ে। শেষ মুহূর্তে শার্লক হোমসের মুখ দেখতে পেলেন ওয়াটসন। সাদা, কঠিন এবং আতংকে বিকৃত সেই মুখের প্রতিচ্ছবি আগের দুটো মুখেও দেখা গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখেই ক্ষণেকের জন্যে শক্তি ও সুস্থতা ফিরে এল ওয়াটসনের মনে। চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে টলতে টলতে

“আমি এ পরিস্থিতিতে খুন করতাম—”

হোমসকে টেনে এনে ফেললেন বাইরের ঘাসজমিতে। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন উদার আকাশের নীচে। চারপাশের ঘনায়মান আতংকের নারকীয় মেঘ ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে আসতে লাগল উজ্জ্বল সূর্যালোক। ধীরে ধীরে কুয়াশার মত মনের ওপর থেকে উঠে গেল নিকষ মেঘরাশি।

ক্লেদাক্ত ললাট মুছতে মুছতে শার্লক হোমস জানালেন তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্ত। প্রথমক্ষেত্রে শীর্ণকায় ব্যক্তিই হত্যাকারী। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে মারাত্মক গুঁড়োটা তিনিই ফায়ার প্লেসে নিক্ষেপ করে এসেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি তিনি আত্মহত্যা করলেন?

ঠিক এই সময়ে ঘাসজমিতে আবির্ভাব ঘটল বিখ্যাত সিংহশিকারীর। হোমসের চিরকুট পেয়েই ছুটে এসেছেন তিনি।

সরাসরি তাঁকে শীর্ণকায় ব্যক্তির হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করলেন হোমস।

বেশ খানিকটা নাটকীয় দৃশ্যের পর অভিযোগ স্বীকার করলেন সিংহশিকারী। জানালেন গুঁড়োটা তিনিই এনেছেন আফ্রিকা থেকে। অসভ্যরা দেবতার সামনে বলি দেওয়ার সময়ে এই গুঁড়ো ব্যবহার করে। মৃত্যুশেকড় বা ডেথ-রুট নামে একটা শেকড় গুঁড়িয়ে পাওয়া লালচে বাদামী রংয়ের এই পাউডার। বিশ্ববিজ্ঞানে এখনো এর প্রবেশলাভ ঘটেনি। শেকড়টা দেখতে অনেকটা ছাগলের পায়ের মত। শীর্ণকায় ভদ্রলোক সেদিন তাঁরই বাড়ী থেকে খানিকটা গুঁড়ো চুরি করে আনেন। সম্পত্তির লোভে ভাইবোনেদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সিংহশিকারী ভদ্রলোক তাঁর চক্রান্ত ধরে ফেলেন। তাই ফিরে এসে ভোর রাতে যান ভাইয়ের বাড়ী। জানালার কাঁচে নুড়ি ছুঁড়ে ভাইকে ঘুম থেকে তোলেন। তারপর তেলের বাতিতে গুঁড়ো রাখেন। রিভলবারের ভয় দেখিয়ে বাতির সামনে বসে থাকতে বাধ্য করেন শীর্ণকায় ভদ্রলোককে। প্রাণাধিকা ভগ্নী-হত্যার প্রতিশোধ নেন আর একটি হত্যা করে।

শেষ হত্যা যে সিংহশিকারী ভদ্রলোকের কীর্তি, তা হোমস অনুমান করেন বাগানে বিক্ষিপ্ত নুড়িগুলো দেখে। সার্সিতে যে নুড়ি ছুঁড়ে ভাইকে জাগিয়েছিলেন তিনি, তা সিংহশিকারী ভদ্রলোকের বাড়ীর পাশেই পড়ে আছে স্তূপাকারে, আর কোথাও নেই।

হত্যাকারী সিংহশিকারীকে পুলিশের হাতে সমর্পণ না করে আফ্রিকা যাওয়ার অনুমতি দিলেন হোমস।

ওয়াটসনকে বললেন, ‘আমার কোনো সহোদরা ভাই নেই, বোনও নেই। থাকলে আমিও এ পরিস্থিতিতে খুন করতাম। তা ছাড়া আমি যখন পুলিশের হয়ে কাজ করছি না, তখন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে।’

ওয়াটসন শার্লক হোমসের লোমহর্ষক এই অ্যাডভেঞ্চারের নাম দিয়েছেন ‘দি ডেভিলস ফুট’ অর্থাৎ শয়তানের পা। এই মামলার গোড়া থেকেই অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু গোয়েন্দা-প্রবরের হিসেবী মন তাতে বিভ্রান্ত হয়নি। তদন্তের সূত্রেতে তিনি কল্পনাকে প্রশ্রয় দেননি, শীর্ণকায় ব্যক্তি আরোপিত অপ-দেবতার গালগল্পকে আমল দেননি। তাই ফুলের বেদীতে পায়ের ছাপ না পেয়ে বুঝেছেন আততায়ী ভূতপ্রেত দৈত্যদানো যাই হোক না কেন, ওপথে সে আসেনি। প্রতিবারেই রুদ্ধকক্ষে আগুন জ্বলেছে এবং বিষবাষ্পের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। অতএব সেই পথেই তদন্ত চালিয়ে পাওয়া গেছে মৃত্যুশেকড়ের গুঁড়ো। সাইগার হোমসের শিক্ষাপদ্ধতির সার্থকতা এই-ভাবেই বারে বারে পাওয়া গেছে তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র শার্লক হোমসের অবিস্মরণীয় কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে।

শুভঙ্কর

মানুষের আচরণ বিশ্লেষণে কম্প্যুটার

মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য যন্ত্র মানুষের মতো চিন্তা করতে বা নিজে ভেবে-চিন্তে কোনো কাজ করতে পারে না। মানুষ তাকে যে নির্দেশ দেয় সেটুকুই শুধু যন্ত্র তামিল করতে পারে। কিন্তু কম্প্যুটার সৃষ্টি হবার পর থেকে এই পার্থক্যের সীমারেখা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। মানুষের মস্তিষ্কের অনেক কাজের ভার আজ কম্প্যুটার গ্রহণ করেছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

কম্প্যুটারের প্রধান উপযোগিতা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি তার দ্রুত গণনার ক্ষমতা। যে সব জটিল গাণিতিক যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের কাজ করতে মানুষের দীর্ঘ সময় কেটে যায়, কম্প্যুটার তা নিমেষের মধ্যে করে দিতে পারে। কিন্তু গণনার কাজ কম্প্যুটারের একমাত্র কাজ নয়, মানুষের মস্তিষ্কের অনেক কাজের ভারই সে গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থা ও তথ্যসংরক্ষণের কাজে কম্প্যুটারকে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। মানুষের মস্তিষ্ক ও কম্প্যুটারের কার্যধারা এক নয়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন কম্প্যুটারের কার্যধারা যত সম্প্রসারিত হবে ততই এই দুটি কার্য-পদ্ধতির মধ্যে তুলনা বৃদ্ধি পাবে।

কম্প্যুটার যেভাবে মানুষের নির্দেশ অনুসরণ করে তা থেকে মস্তিষ্ক ও কম্প্যুটারের কার্যপদ্ধতির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আমাদের চোখ কোনো বস্তুর কেবল আকার-আকৃতির তারতম্য ধরতে পারে না, সেই সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং প্রায়ান্ধকার থেকে প্রখর সূর্যালোকের বিভিন্ন অবস্থায় তার বিভিন্ন রূপ আমাদের কাছে তুলে ধরে। এইসব নির্ণায়কের ভিত্তিতে কম্প্যুটারের মডেল প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে যে সেগুলি যথাযথ উত্তর দেয় কিনা। কম্প্যুটার-পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা এভাবে মানুষের আচরণের প্রতিরূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কম্প্যুটার আজ মনো-বিজ্ঞানীদের কাছে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় কম্প্যুটারকে যখন নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনটি উপাদান দিয়ে একটি সংহত বর্তনী গড়ে তোলা হয়। এই তিনটি উপাদান হচ্ছে প্রয়োজক (মানুষ), কম্প্যুটার এবং পাত্র (প্রদর্শিত বস্তু)। উদাহরণস্বরূপ একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো ছাত্রকে শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি জিনিস পর পর দেখানো হল—প্রত্যেকটিকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। ছাত্রটি এই জিনিসগুলি পর পর মনে রাখার চেষ্টা করে। ক্রমে সে সম্পূর্ণ তালিকাটি আয়ত্ত করে নেয়, তবে তার মধ্যে কয়েকটি জিনিস অন্যান্যের তুলনায় আগে শিখে ফেলে। এমন যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব যার সাহায্যে বিষয়বস্তু উত্থাপন ও সাড়া লিপিবন্ধ করা যায়। কিন্তু পূর্ববর্তী সাড়াসাপেক্ষে যখন বিষয়বস্তু বিবৃত করতে যাওয়া হয়, তখন ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

অতীত সাড়ার ভিত্তিতে তথ্যাদি গড়ে তোলার পক্ষে কম্প্যুটার বিশেষ উপযোগী। কম্প্যুটার ছাত্রের সাড়া নথিভুক্ত করে নির্ভুলতা অস্ফুটতা ইত্যাদি নির্ণায়ক অনুসারে তার শ্রেণীবিভাগ করে দেবে এবং প্রয়োজন হলে কোন বিষয়গুলি অসন্তোষ-জনক তাও জানিয়ে দেবে। যখন ছাত্র কোনো বিষয়ে দ্রুত উত্তর দেয়, তখন মানুষের (পরীক্ষক) পক্ষে এই ধরনের বিবিধ নির্ণায়ক সামলানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু কম্প্যুটার তা সহজেই সামলাতে পারে।

এখানে শিক্ষণব্যবস্থার যে উদাহরণ দেওয়া হল সে কাজে বড় কম্প্যুটারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন আরও জটিল শিক্ষণের দায়িত্ব (যেমন ছাত্রকে সংখ্যায়ন বা ভূবিদ্যা শিক্ষণের কাজে) কম্প্যুটারকে নিতে বলা হয়; তখন অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। এই ধরনের শিক্ষণ সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্যে সময় ভাগ ক বড় কম্প্যুটার দিয়ে কাজ করে দে হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছো কম্প্যুটারই হচ্ছে বেশি সুবিধাজনক

বর্তনীপন্থায় সাধারণ পারদর্শিতামূল কাজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও কম্প্যুটার প্রযু হতে পারে। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্রীড়ায় কৃতী খেলোয়াড়রা সাধারণত কৃতী প্রশিক্ষক হন না। তাঁরা নিজেরা পারদর্শিতা অর্জন করেন বটে কিন্তু নিজেদের পারদর্শিতা বিশ্লেষণ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে কম্প্যুটার অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। কারণ, শিক্ষার্থী যে মুহূর্তে নির্ধারিত কর্মক্রম থেকে বিচ্যুত হয়, কম্প্যুটার সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীর ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ভুলভাবে কম্প্যুটার দ্রুত ধরে দিতে পারে এবং এভাবে তার পারদর্শিতা অর্জনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

সমাজিক মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও কম্প্যুটার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিন-চারজন ব্যক্তির দলে প্রত্যেকে যখন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে চালিত হয়, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া প্রচলিত পন্থায় নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের কাজ কম্প্যুটার দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো একটা ব্যাপার দল কিভাবে গ্রহণ করে ও তার কি প্রতিক্রিয়া হয়, সেই দলীয় আচরণের মডেল গড়ে তোলা হয় এবং তা বিশ্লেষণ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। প্রথমত একথা অনস্বীকার্য মানুষের জ্ঞানের পরিধি দ্রুত সম্প্রসারিত
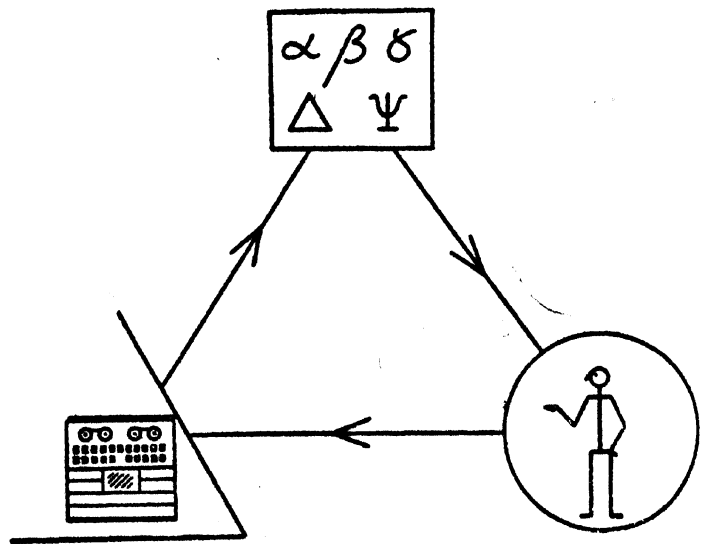
মানুষের আচরণ বিশ্লেষণে প্রযুক্ত সংহত-বর্তনীর রেখাচিত্র

...চ্ছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থী মানুষের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে কেবল মানুষ শিক্ষক নিয়োগের কথা ভাবলে চলবে না, এই আশু কর্তব্য সম্পা-দনের জন্যে যন্ত্রেরও সাহায্য আমাদের নিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে কম্প্যুটার যে এই কাজের অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দ্বিতীয়ত, মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের বিবিধ পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা কম্প্যুটার ব্যবহার করলে আচরণবিধি পূর্বাপেক্ষা আরও সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তৃতীয়ত, মানুষের আচরণবিধির সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কম্প্যু-টারের ব্যবহার ক্রমশ যেভাবে বাড়ছে এবং ...র প্রয়োগক্ষেত্র যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে, ...তে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এমন দিন ...ঘ্রই আসবে, যখন কম্প্যুটার মানুষের ...গ্য প্রতিনিধি হিসাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ...জে ভূমিকা গ্রহণ করবে। কম্প্যুটারকে ...ভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টাই বিজ্ঞানীরা বর্তমানে করছেন।

অনন্য গণিতপ্রতিভা রামানুজন

(১০)

বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে গণিতশাস্ত্রে গ্রীক অক্ষর (পাই) দিয়ে ...কাশ করা হয়। এর মান সব সময় স্থির ...কে বলে একে গণিতশাস্ত্রে ধ্রুবক বলা ...। গণিতশাস্ত্রে এরকম অনেক ধ্রুবক ...ছে। পাই-এর মান ২২/৭ বা প্রায় ...১৪১৩৬। আর্কিমিডিস, টলেমি থেকে ...রু করে আধুনিক কালের বহু গণিতজ্ঞ ...না উপায়ে পাই-এর মান নির্ণয় করেছেন। ...নাক সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সাহায্যেও পাই-... মান নির্ণয় করা হয়েছে। রামানুজনও ...জস্ব পদ্ধতিতে পাই-এর মান নির্ণয় ...রেন। পাই-এর বীজগাণিতিক আসন্ন ...স্বরূপ তিনি যে সমস্ত ক্রমনির্ণয় করেন ...গণিতজ্ঞের দৃষ্টিতে খুবই অভিনব।

...সংখ্যাতত্ত্বে রামানুজনের আর একটি ...বান সংযোজন হচ্ছে 'অতি-সংযুক্ত ...খ্যা' (হাইলি কম্পোজিট নাম্বার) সম্প-...ত গবেষণা। ৬ সংখ্যাটির ভাজক হচ্ছে ...। যেমন—১, ২, ৩, ৬ এবং ১২-র ...ক হচ্ছে ৬টি—১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২। ...নো সংখ্যার ভাজক সংখ্যা যদি তার ...বর্তী কোনো সংখ্যার ভাজক সংখ্যা ...পেক্ষা বেশি হয়, তাহলে সেই সংখ্যাটিকে ...লি কম্পোজিট নাম্বার বলা হয়। যেমন ...-এর ভাজক সংখ্যা হচ্ছে ৯টি, কিন্তু ...-এর ভাজক সংখ্যা ৪টি এবং ৩৪-এরও ...ক সংখ্যা ৪টি। এজন্যে ৩৬ সংখ্যাটি ...টি হাইলি কম্পোজিট নাম্বার। কিন্তু ... সংখ্যাটি হাইলি কম্পোজিট নাম্বার ... কারণ ৪০-এর ভাজক সংখ্যা হচ্ছে ...। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত লণ্ডনের ...ত সমিতির পত্রিকায় রামানুজন তাঁর ...লি কম্পোজিট নাম্বার" শীর্ষক নিবন্ধে ...বৃহৎ ও বিস্তৃত গবেষণার পরিচয় দেন ...গণিতশাস্ত্রে এক মহামূল্য অবদান ...বে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে ...পক হার্ডি লিখেছেন : "অসমতার বীজগণিতে রামানুজমের যে কি অসাধারণ দক্ষতা ছিল তা এই গবেষণাই প্রমাণ করে।"
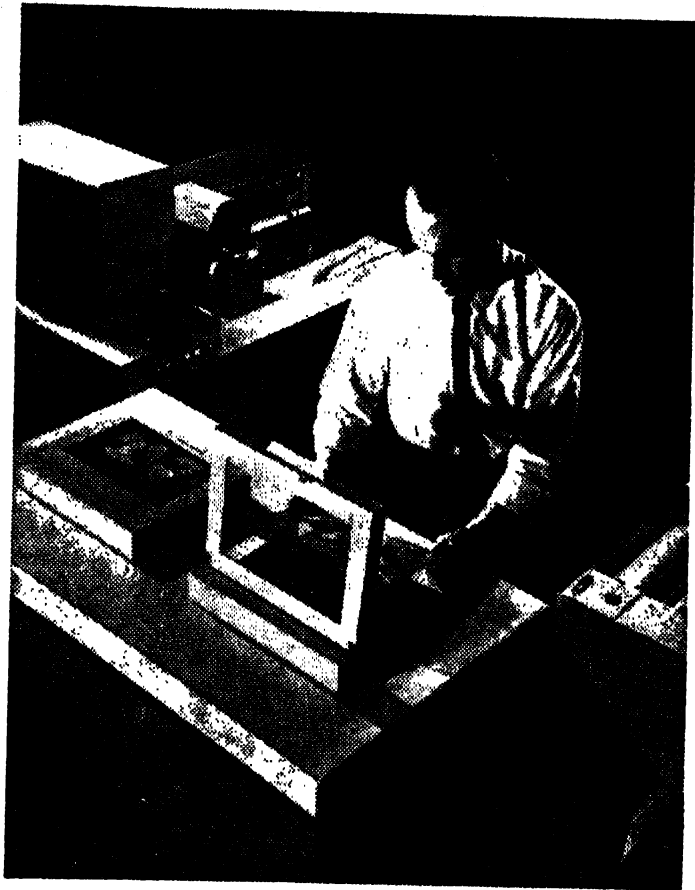
এইপ্রকার ক্ষুদ্রাকার কম্প্যুটারের সাহায্যে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গণিতজ্ঞদের মতে রামানুজনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ ঘটে-ছিল পার্টিশন তত্ত্বে, উপবৃত্তীয় অপেক্ষক এবং ক্রমিক ভগ্নাংশের গবেষণায়। বিভাজন সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম', 'সমবায়িক বিশ্লেষণে কয়েকটি অভেদের প্রমাণ' এবং 'বিভাজনের সর্বসম ধর্ম' শীর্ষক গবেষণানিবন্ধ তিনটি তাঁর অনন্য গণিতপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। অধ্যাপক হার্ডি বলেছেন : 'সমবায়িক বিশ্লেষণ কয়েকটি অভেদের প্রমাণ' শীর্ষক গবেষণাপত্রে যে 'রোজার্স-রামানুজন' অভেদটি প্রমাণিত হয়েছে তার চেয়ে সুন্দর সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেই সঙ্গে হার্ডি একথাও বলতে দ্বিধা করেন নি যে, এক্ষেত্রে রামানুজনের স্থান রোজার্স-এর পরেই।

ঐ গবেষণানিবন্ধে যে দুটি অভেদ প্রমাণিত হয়েছে তা প্রথম আবিষ্কার করেন রোজার্স এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন গণিত সমিতির পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। রামানুজনের বয়স তখন মাত্র ৭ বছর। এর কুড়ি বছর পরে রামানুজন স্বতন্ত্রভাবে ঐ দুটি অভেদ পুনরাবিষ্কার করেন। এ সময় রোজার্সের গবেষণার কথা রামানুজন একে-বারেই জানতেন না। তবে রামানুজন সে সময় সূত্র দুটির কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নি। আরোহ পদ্ধতিতে সূত্র দুটি পেয়ে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপক হার্ডিকে এ-বিষয়ে জানান। হার্ডি আবার ঐ সূত্র দুটির কথা মেজর ম্যাক-মোহন এবং অধ্যাপক পেরোঁকে জানিয়ে দেন। তাঁরা কেউই এর কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের পর তিনটি প্রমাণ প্রকাশিত হয়। একটি প্রমাণ দেন অধ্যাপক রোজার্স নিজে এবং অপর দুটি প্রমাণ দেন স্ট্রাসবার্গের অধ্যাপক স্যুর। এর পর যে প্রমাণগুলি প্রকাশিত হয় তা পূর্ব-প্রকাশিত প্রমাণ অপেক্ষা সরল ও সুন্দর। এর প্রথমটি জানা যায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ম্যাকমোহনকে লেখা রোজার্সের চিঠি থেকে এবং দ্বিতীয়টি জানা যায়, ঐ বছরের এপ্রিলে হার্ডিকে লেখা রামানুজনের চিঠি থেকে। দুটি প্রমাণ একই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রমাণ-পদ্ধতিতে অনেক-খানি পার্থক্য দেখা যায়। এই সুন্দরতম সূত্র দুটির সরল ও সাবলীল প্রমাণে হার্ডি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, অনুরাগী মহলে প্রচারের জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট দুজনের অনুমতি নিয়ে নিজেই সেগুলি প্রকাশ করেছিলেন।

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

কল্যাণকুমার বসু

(৫)

সৌম্য শান্ত ভদ্রলোকটি আজও পানিমামার বাড়িতে বসারঘরে আরাম কেদারায় কন্টকর ভঙ্গিতে বসে আবৃত্তি করছিলেন সেই একই অসংলগ্ন শব্দগুলি, যে কথার পরিপূর্ণ অর্থ ওর মনে কোন রেখাপাত করে না। অর্থ বড় হাস্যকর, অবাস্তব, অবান্তর বলে মনে জাগে। 'ওর' ইচ্ছে জেগেছিল সেই মুহূর্তে সেখান থেকে চলে আসে। পানিমামা বলেছিলেন, বসো অতুল এমন করে ওঁকে অপমান করে যেও না।

ভদ্রলোক আবার বলেছিলেন, তোমার মা তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছেন। আজ তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তোমার কোন আপত্তি আমি শুনবো না।

অতুল বলেছিল, মাকে জানিয়ে দেবেন, মায়ের প্রতি আমার কোন ভালোবাসা জমা নেই। আমাকে দেখবার কথা যেন চিন্তা না করেন। আমার বোনেদের নিয়ে তিনি সুখে থাকুন আমার কথা ভুলে যান। ক্লান্ত হয়ে ও আবার বলেছিল, পানিমামা, ভদ্রলোককে তুমি আমার সামনে থেকে যেতে বল কিম্বা অনুমতি দাও আমি এখান থেকে বিদায় নিই।

কয়েকটি শব্দহীন মুহূর্ত অতিক্রম করে ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন অতুলের পাশে, পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, তোমাকে যে আমার চাই। চল আজ আমার সঙ্গে যাবা, আর কোন কথা শুনবো না।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মাকে মনে পড়ে যায়। 'তার' হঠাৎ মনে হল কতদিন মা'কে দেখেনি। মনে মনে বড় অস্থির হয়ে পড়ল।

ও সম্মতি জানিয়ে বললে, চলুন মাকে দেখে আসি। দুর্গাবাবু ধীরে ধীরে বললেন, মাকে দেখে চলে আসলে চলবে না; তোমার মা। তুমি তাঁকে সেবা করবে, কাছে থাকবে, পাশে বসবে, তবেই না তোমার মা সুস্থ হয়ে উঠবেন। তোমাকে সকলের চেয়ে প্রয়োজন আমার। তুমি পার মায়ের মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে।

অতুল বললে, বেশ মায়ের পাশে আমি থাকবো। মাকে সেবা করে ভালো করে তুলবো। হঠাৎ যেন মার জন্য বড় মন কেমন করে উঠল, উতলা হল মন। ও বলল, চলুন আমি যাওয়ার জন্যে তৈরী।

• • •

কলকাতা শহরের একধারে পানিমামা থাকতেন। পানিমামা তখন ছিলেন চীফ ইনকাম ট্যাকস্ এসেসর। বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার তিনি থাকতেন সপরিবারে কলকাতা শহরের আর একধারে। আর ছিল দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি। যেখানে মা থাকতেন, বোনেরা থাকতো। অতুলও মাঝে মাঝে এসে থাকত। বোনেরা সে বাড়িকে আপন-বাড়ি বলে মনে করলেও ওর কিন্তু সেকথা কখনো মনে হয়নি। দুর্গামোহনবাবুর এই যে আত্মীয়তা এই যে অন্তরঙ্গতা ওর কাছে ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ দুর্গামোহনবাবু ওকে স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। নিজে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন, খেতে বসতেন। যখন যা প্রয়োজন হয় 'ওর' চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বুঝতে পারতেন এবং হাতের কাছে তা সাজিয়ে রাখতেন। তবুও ধরাছোঁয়ার বাইরে 'ও'। দুর্গামোহনবাবুকে দেখে মনে মনে বিরক্ত হোত—বিশেষত দুর্গামোহনবাবু যখন মায়ের সঙ্গে সাংসারিক অথবা যে-কোন বিষয়ে কথা বলতেন। ও ভ্রূকুটি করত, বিরক্ত বোধ করত। অনেকদিন রাগ করে ঘর ত্যাগ করে চলে যেত। দুর্গামোহনবাবু সেকথা মনে মনে বুঝতে পারতেন। মা'ও বুঝতেন। মুখে কিছু বলতেন না।

অবস্থা চরমে পৌঁছত তখন ও দুর্গাবাবুর বাড়ি ফিরত না। চলে আসত পানিমামার বাড়ি, 'পানিমামা, তোমার বাড়িতেই আমি থাকবো. তোমার এখানে থাকতে আমার ভালো লাগে!' নয়তো এসে উঠত বড়মামার বাড়ি সেখানেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসত। মামাতো ভাইবোনেরা ওকে কাছে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেত। হাসি-গল্পে-গানে-খেলায় মুহূর্তগুলি প্রাণময় হতো। ওর তখন মনে পড়তো কৈশরের দিনগুলো। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের দিনগুলো কলকাতায় এসে রং লাগত।

মামাতো বোন হেমকুসুম বড় জেদী। যখন যা চাইবে না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এই জেদের জন্যে এই মামাত বোনটি কম মার খেয়েছে মামীমার হাতে। অতুলের স্নেহদৃষ্টি তাই মামাতো বোনটিকে ঘিরে। ভালো লাগে তাকে।

হেম বলে তোমার হাত দেখি অতুলদা। হাতের ওপর হাত রাখে হেম। বলে তুমি বড় দুর্বল। একটু শক্ত হও অতুলদা। তারপর বলে জান অতুলদা, আমার মনের একটা ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় খুব ভালো বেহালা বাজাই। খুব নাম করি। তো[...] নামকরা মানুষ হতে ইচ্ছে হয় না। ত[...] ঠিক বলছি, তোমার খুব নাম হবে। ক[...] আজকাল আর লেখ না?

অতুল বলে, আমার কিছু ভালো ল[...] না, কিছুই আমার হবে না। আমি বাব[...] ভুলতে পারি না, মাকে ভালোবাসতে পারি[...] দুর্গামোহনবাবুকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারি[...] দুর্গামোহনবাবু ভালো লোক, তবু[...] বোনদের কথা ভুলতে বসেছি...তো[...] এখানে মাঝে মাঝে আসি, কিন্তু এ[...] আসতেও আজকাল আমার ভালো লাগে[...] ভাবি তোমরা আমাকে কেন এত ভালোবা[...] আমি ত আর কাউকে ভালোবাসতে পারি[...]

হেম বলে, তুমি সব পার। তোম[...] অনেক বড় হতে হবে' অতুলদা — অনেক[...]

অতুল বলে, হেম, তুমি আমার[...] জান না, বোঝ না।

আমি সব বুঝি, হেম হাসে

তারপর অতুলের হাত ধরে টেনে[...] যায় হেম। কানে কানে কি যেন ব[...] তারপর শোনা যায় অস্পষ্ট কথা, হেসে যা[...]

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশ [...] ১৮৮৯ সন। অতুল ভালোভাবে পাশ ক[...] পানিমামা-বিনোদমণি পিঠ-চাপড়ে বল[...] বাঃ। মামাতো ভাইবোনেরা চারদিক [...] ঘিরে ধরে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তু[...] মেজবোন হেমকুসুম অতুলদাকে উদ্ধার [...] বলল, অতুলদা পাশ করেছ যখন, [...] তখন আমরাই খাওয়াবো। বড়মামা কে[...] গুপ্ত একদিন সকলকে অতুলের পাশ ক[...] দৌলতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। দু[...] মোহন দাশ আন্তরিক শুভেচ্ছা জানা[...] আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, অতুল, তো[...] ভালো কলেজে এফ-এ পড়তে হবে। এ[...] পাশ করে বি-এ পড়তে হবে, এম-এ পা[...] হবে। তারপর মনে মনে কি ঠিক ক[...] বলত অতুল?

দুর্গামোহনবাবুর কথার উত্তরে বলতেন, আমি চাই ও ব্যারিস্টার হো[...]

দুর্গামোহনবাবু হেসে বলতেন, ব্যারি[...] হতে গেলে লন্ডনে যেতে হবে। বেশ[...] তোমাকে আমি লন্ডনে পাঠাবো। [...] সেকথা এখন দূরে, তোমাকে আগে এ[...] ক্লাসে ভর্তি হতে হবে, ভালোভাবে [...] করতে হবে।

একদিন অতুলকে সঙ্গে নিয়ে দু[...] মোহনবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে গে[...] দুর্গামোহনবাবু সুপরিচিত মানুষ। অ[...] ভালো ছাত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজে [...] হতে কোন অসুবিধা হল না। অতুল দু[...] মোহনবাবুর বাড়ি থেকে কলেজ যাত[...] করতে লাগলো। কখনো সেজমামা [...] মামার (গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের) বা[...] থেকে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে পড়া[...] ফাঁকে আড্ডাখানা জমজো মন্দ

প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠ থেকে আসর কখনো-সখনো গোলদিঘির চৌকো পাড়ে ঘাসের ওপর বসতো। জোর আলোচনা হোত। ...... রবিবাবু আলোচনায় অনেকখানি আলোচিত কবি ছিলেন। কবি হিসেবে অল্পস্বল্প নাম ছড়িয়েছে। এখানে ওখানে সাহিত্যসভা থেকে ডাক পড়েছে।... ও'র কড়ি ও কোমল তার আগে প্রকাশ হয়েছে। কড়ি ও কোমলকে ব্যঙ্গ করে সমালোচনা করে একখানা বই প্রকাশিত হল 'বাহুরে রচিত মিঠেকড়া'। কিছুদিন সকলের মুখে মুখে ব্যঙ্গ কবিতা-গুলি চলল — কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়, গোলদিঘির ধারে, কলেজ-ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মুখে মুখে — কলকাতা পার হয়ে ঢাকা-ময়মনসিং সব জায়গায়। চিনেবাদাম আর ঝালমুড়ি খেতে খেতে প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে অথবা গোলদিঘির ঘাসে বসে থাকতে থাকতে অতুল সুরেন ব্যানার্জিকে নকল করে হঠাৎ বক্তৃতা সুরু করত— "বন্ধুগণ ......

বন্ধুরা প্রথম প্রথম ঠাট্টাচ্ছলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতো, তারপর অবাক হয়ে বন্ধুরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা শুনত। দু'চারজন লোক জড়ো হোত, ভীড় জমবার আগেই ঝুপ করে বসে পড়ত ও আপন জায়গায়। বন্ধুরা বলত চমৎকার। অনেকে আবার বলত, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য হয়ে পড়।

অতুল মনে মনে হাসে। ওরা আর জানে কি।

ঢাকাতে থাকতে সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় যখনই ওখানে উপস্থিত হয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন অতুল সেখানে উপস্থিত হয়েছে। বক্তৃতা শুনেছে। ঢাকাতে বক্তৃতা দিয়েছেন পন্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মনমোহন ঘোষ, [illegible]টি পালিত, আনন্দমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা ছেলে-বেলায় ওর শোনারও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা! একবার সুরেন ব্যানার্জিকে দেখবার জন্যে সকলকে লুকিয়ে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে একসঙ্গে ঢাকায় ফিরেছিল। ... সুরেনবাবু ছিলেন ওর কৈশর জীবনের আর এক আদর্শ। রূপ-বাবুদের বাগানে কিম্বা আনন্দমাস্টার মহাশয়ের বাগানের নির্জন-নিভৃতে সাহিত্যা-লোচনা এবং বক্তৃতার অভ্যাস চলত ... তখন [illegible]ঙ্গী দাদা, সত্যেন্দ্র — সেকথা আর [illegible] কি জানে।

সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় যেবার কংগ্রেসে না [illegible]কাই সিদ্ধান্ত করলেন। চরমপন্থী, নরম-পন্থী কংগ্রেস লিডারদের মধ্যে দারুণ ঝগড়া [illegible]বাদ... সারা শহর, সারা দেশ জুড়ে ভীষণ উত্তেজনা। গোলদিঘির ধারে, কলেজ ইউনিভারসিটির মাঠে ছাত্রদের মাঝেও দারুণ উত্তেজনা। অতুলপ্রসাদ সেদিন দাঁড়িয়ে উঠে বললে The National Congress without Surendra Nath is mere farce.

১৮৯০ সন চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে বিলেত চললেন। সে বছর অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সীতে এফ-এ শ্রেণীর ছাত্র। যদিও জুনিয়র ছাত্র তবু হৃদ্যতা কম ছিল না ওদের মধ্যে। বি-এ পাশ করে চিত্তরঞ্জন বিলেত চলেছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে, বন্ধুরা—কয়েকজন ব্যস্ত হল বিলেত যাওয়ার বাজার সারতে। ঠান্ডার দেশ তাই তার যথোপযুক্ত গরম জামাকাপড় সাজসরঞ্জাম চৌরঙ্গীর সাহেব পাড়া থেকে কিনে আনা হল। চিত্তকে কলেজের ছাত্ররা একটা ফেয়ারওয়েল দিল। রাজেন বললে, চিত্তদা তুমি চলে গেলে আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন একেবারে কানা হয়ে যাবে।—

চিত্তরঞ্জন হেসে বললে, তোমরা ত রইলে। তুমি, অতুল চট্টোপাধ্যায়, অতুল-প্রসাদ। তাছাড়া ব্যোমকেশ চক্রবর্তী সম্পাদক, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সহ-সম্পাদক— সেখানে আমি ত সাধারণ সভ্য, বলতে পার কর্মী। তোমাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না। সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হিসেবে অভিভাবক হিসেবে তোমাদের মাথার ওপর রইলেন।

অতুলপ্রসাদ বললে, চিত্তদা, তোমার অভাবে এলবার্ট হলে এবং হিন্দুস্কুলে আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলোয় মন বসবে না আমাদের সাহিত্যসভায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে আপাততঃ আমরা বিদায় দিলুম।

চিত্তরঞ্জন চলে গেল ইংলন্ডে। জাহাজ-ঘাটে 'সি অফ' করে এল ওরা। জেব্রাল্টার পার হয়ে অনেক দেশ পার হয়ে চিত্ত পৌঁছবে ইংলন্ড উপকূলে — দেখবে কত দেশ, কত নতুন মানুষের সাথে আলাপ হবে... এক বিচিত্র অনুভূতি জাগছিল ওর। মনের কোণে প্রবল বাসনা জাগলো "বিলেত যেতে হবে'। চিত্তকে সি অফ করে বন্ধুরা ফিরে চলছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গড়ের মাঠ পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ে এসে ঘোড়ার গাড়ি ধরে সোজা উপস্থিত হল পানিমামার বাড়ি।

পানিমামা-মামিমা বললেন, অনেকদিন তোমাদের কোন খবর নেই অতুল। মা ভালো আছেন। হিরণ, কিরণ, প্রভা ভালো আছে?

ভালো মামা।

দুর্গামোহনবাবু?

ভালো।

অনেকদিন পর আমাদের কথা মনে পড়লো বুঝি?

পানিমামা জান, আজ আমাদের এক বন্ধুকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলাম। জেব্রাল্টার পার হয়ে ইংলন্ড যাবে আই-সি-এস পরীক্ষায় বসবে।

তাই বুঝি তোমার মন খারাপ। তোমারও বুঝি বাইরের দেশে যেতে ইচ্ছে করছে।

বল আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি!

বস্তুত অতুলপ্রসাদের তখন দ্বিতীয়বার মায়ের বিবাহের জন্যও এতদূর আঘাত পেয়েছে যে, নানানভাবে সে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করেও দুঃখ ভুলতে পারে না। 'ও' অনেক দূরদেশে উপস্থিত হয়ে অপরিচিত জগতে অপরিচিত মানুষের মাঝে থেকে সান্ত্বনা পেতে চায়। সে দেশে পড়তে চায়। এখানে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। চিত্তদা চলে গেল। চিত্তদা যেন ডাক দিয়ে গেল। যদিও প্রেসিডেন্সী কলেজে ও ছিল ভালো ছাত্র। দুর্গামোহনবাবুর প্রথম পক্ষের জামাই প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক দার্শনিক পি কে রায় ও-কে স্নেহ করতেন। স্নেহ করতেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বিদেশী অধ্যাপকরা। পি কে রায় ছিলেন গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ; পি কে রায়ের ক্লাসে শ্যালক চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতেন। এমনিতে চিত্তরঞ্জনের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না।

পি কে রায় বলতেন, অতুলপ্রসাদ কলেজের একজন সেরা ছাত্র। মাঝে মাঝে বলতেন, মাইডিয়ার বয়, বল ত তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?

সহপাঠী রাজেন্দ্র বলেছিল, স্যার, আমার ভারতের হাই-কমিশনার হওয়ার ইচ্ছে।

অতুল বলেছিল, স্যার, আমার ব্যারিস্টার হওয়ার ইচ্ছে। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি স্বপ্ন দেখে এসেছি। বিলেত আমার যেতেই হবে।

অতুল চট্টোপাধ্যায় বলত, স্যার, অতুল-প্রসাদ খুব ভালো কবিতা লেখে। আপনি শোনেননি?

পি কে রায় বলতেন, অতুল, তোমার লেখা আমাকে দেখিও। পি কে রায়ের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা প্রায়ই শুনতো ওরা।

বন্ধুরা অনেকেই বিদেশে পাড়ি দিল। অতুলের মন খারাপ। পি কে রায় বললেন, পাশটা করে নাও, তারপর তোমার যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু বি-এ পাশ করার আগেই বিলেত আকর্ষণ করল। বিদেশে যাওয়ার সময় হল। বিদেশে যাওয়ার আগে কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা করে এল অতুল। একজন বিদেশী অধ্যাপক বললেন, বল তোমার কি উপকারে আসতে পারি ... আমাকে যাবার আগে জানিও, আমার এক বন্ধুকে তোমার নামে একখানা চিঠি দিয়ে দেব, সেখানেই গিয়ে উঠ্‌তে পার। তোমাকে তিনি পোর্ট থেকে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারেন।

বাড়ি ফিরে এল অতুল। এসে মাকে বললে, মা, আমার পাশপোর্ট এবং প্যাসেজ জোগাড় হলেই লন্ডনের পথে পা বাড়াতে পারি। লন্ডনে থাকার একটা ব্যবস্থা আমার অধ্যাপক করে দেবেন বলেছেন। এখন প্যাসেজের টাকা জোগাড় হলেই হয়ে যায়।

দুর্গামোহনবাবু অতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, খুব সুখবর বাবা, তোমার পাসেজের জন্যে ভাবতে হবে না আমি সব ব্যবস্থা করে দেব—কিছু ভেব না। কত লাগবে আমাকে বল!

অতুল চুপ করে রইল। দুর্গামোহন-বাবুর হাত থেকে টাকা নিতে হবে, একথা মনে হতেই ওর মনে যেন কেমন বিরোধ বাধল। 'দুর্গামোহনবাবুর টাকা'—এ টাকায় আমার কোন অধিকার নেই—এ টাকায় আমার কোন অধিকার থাকতে পারে না। তাঁর টাকা আমি নিতে পারি না, তার থেকেও বড় কথা ও'র টাকা নিয়ে আমি আমার আপন ক্যারিয়ার তৈরী করতে পারবো না; নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। হতে পারে না, অসম্ভব।

না মা, ও'র টাকা নিতে আমায় বল না।

মায়ের চোখে জল দেখা দিল।

অতুল বললে, মা, তুমি কাঁদছ! আমি বিলেত যাব না মা।

'খোকন', মা ডাকেন।

কবেকার সেই ছেলেবেলার ডাক। কই মা তো আজকাল আর এ নামে ডাকেন না। বড় হতে মা ডাকেন 'অতুল'। খোকন নামটি যেন কোন বিস্মৃতির অন্তরালে ডুব দিয়েছে। মা বলেন, অতুল, তুমি ত আমার কথা শোন; কোনদিন আমার কোন কথার অবাধ্য হও না। আমি চাই তুমি বড় হও—অনেক বড় হতে হবে। কে কি বলল না বললো তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না। তোমার চলার পথে তোমার পায়ে পায়ে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি জড়িয়ে চলবে, তাদের পিছনে ফেলে চলতে হবে; তোমার অনেক মনোকষ্ট হবে, তোমাকে হয়তো অনেকে বলবে স্বার্থপর, হয়তো অনেকে অনেক দুর্নাম দেবে, কিন্তু তাতে তোমার লক্ষ্য-পথে স্থির থাকতে হবে, বিচ্যুত হলে চলবে না। অতুল, তোমাকে মানুষ হতে হবে, আমাদের মুখ চেয়ে তোমাকে মানুষ হতে হবে। বোনেদের এবং তোমার মায়ের ভার নিতে হবে। অতুল, যে সুযোগ তুমি পাবে তাকে জীবনে কোনদিন নষ্ট হতে দিও না। জীবনে সুযোগ খুউব কমই আসে।

হেমন্তশশীর চোখদুটি সজল হয় বুঝি।

মা, মা, তুমি কাঁদচ। তোমার মনে আমি কোন দুঃখ দিতে চাই না মা। তুমি যা চাইবে তাই হবে।

দুর্গামোহন স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, তুমি ঠাণ্ডার দেশে যাবে, তোমার প্রয়োজনীয় গরম জামাকাপড় সঙ্গে নিতে হবে। চল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে আসি।

অতুলের মনের বিরূপ ভাব ধীরে ধীরে যায় এতদিনে বুঝি। অতুল মাকে এবং দুর্গামোহনবাবুকে প্রণাম করে একছুটে ছুটে গেল বাড়ির বাইরে—পানিমামার বাড়ি, পানিমামাকে খবরটা দিতে হবে। পানি-মামাকে খবরটা দিয়েই বড়মামা কালীনারায়ণ গুপ্তের বালীগঞ্জের বাড়িতে উপস্থিত হল। মামা-মামিমা বললেন, আমরা খুব খুশী তোমার কথা শুনে। ব্যারিস্টার হয়ে ঘরে ফের—এই আশীর্বাদ করি। বড়মামা বললেন, তোমার কোন কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে সংকোচ করো না। মামাতো ভাই-বোনেরা ঘিরে ধরল। হেমকুসুম বললে, অতুলদা, তুমি আগে ইংল্যান্ড যাও না... আমরাও পিছু পিছু যাব।

বিলেতযাত্রার জন্যে পানিমামা অনেক চেষ্টা করলেন, অনেকরকম সাহায্য—আর্থিক এবং কায়িক। পানিমামার চেষ্টায় এবং অতুলের ঘোরাঘুরিতে পাশপোর্ট পেতে দেরী হল না। দুর্গামোহনবাবু একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন দোকানে—কেনা হল শীতের দেশের উপযোগী গরম জামা-কাপড়, বাক্স-বিছানা। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র যোগাড় করা হল. তারপর বিদেশ যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। কলকাতার চাঁদপালঘাট থেকে অতুলের জাহাজ যাত্রা করবে ইংল্যান্ড উপকূলে। চাঁদপালঘাটে সেদিন ভিড়। দুর্গামোহনবাবু, মা-বোনেরা, মামা-মামী, মামাত ভাই-বোনেরা, বন্ধুবান্ধব সকলে বিদায় জানাতে এসে দাঁড়ালেন গঙ্গার জাহাজঘাটে। মায়ের মন বিষণ্ণ, তাঁর অতুল আজ কতদূরে চলেছে এত অল্পবয়সে। এতদূরে একলা যেতে পারবে ত? যদি অসুখবিসুখ হয়—ভয়ে কেঁপে ওঠে মন। পরক্ষণেই মন আনন্দে ভরে ওঠে—তাঁর অতুল ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবে; কত বড় হবে, নাম হবে, যশ হবে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-বেদনার ওঠা-পড়া চলে মায়ের মনপ্রাণে।

অতুল মাকে প্রণাম করে, একে একে গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ মাথায় রাখে। বন্ধুদের শুভেচ্ছা-শুভকামনা গ্রহণ করে। ছোটদের দিকে হাসিমুখে চেয়ে হাত আন্দোলিত করে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে যায়। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়ায় অতুল। 'সংযোগ-সূত্র' ছিন্ন হয়ে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করল। দূরত্ব ছড়িয়ে পড়ল।

দূরে থেকে ও দেখলো মা আঁচলে চোখ মুছছেন। ছোটবোনেরা জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে। শেষবারের মত হাত আন্দোলিত করে মামা-মামীরা জেটি থেকে নেমে চলেছেন, সবশেষে হেমকুসুম-জাহাজঘাটে অগণিত মানুষে ভিড়।...হেম-কুসুম কি একবার পিছু ফিরে তাকালো... পিছু ফিরে তাকিয়ে বুঝি একবার দাঁড়ালো —আদরের মামাত বোনটি। তারপর সব ঝাপসা হয়ে গেল ভাগীরথীর ওপারের সারি সারি কলকারখানার ধোঁয়া, চিমনি...পরিচিত শহরটা।...

ভাগীরথী ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হতে হতে অকস্মাৎ এক ব্যাপ্তির মধ্যে এনে দিল যখন নিজেকে যেন মনে হল কত ক্ষুদ্র, বিন্দুমাত্র।*

(৬)

অতুল বিলেতে পাড়ি দিল ১৮৯০ সনের নভেম্বর মাসে, তারিখটা সঠিক জানা

---

*অতুলপ্রসাদের পিতা ডাঃ রামপ্রসাদ সেন ও ব্রাহ্মধর্মী সমাজকর্মী ঠাকুর দুর্গামোহন দাশের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। ব্যবসায়িক নানা প্রয়োজনে ডাঃ রামপ্রসাদ সেন দুর্গামোহন দাশের কাছ থেকে প্রায়ই পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পরে বৃদ্ধবয়সে দুর্গামোহন দাশ অতুলমাতা হেমন্ত শশীকে বিবাহ করেন। দুর্গামোহন দাশ সুপরিচিত সমাজসেবী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, নিজের সর্বস্ব তিনি দান করে গেছেন—তাঁর মত উদার মন দৃঢ়চেতা, তাঁর মত দানশীল ব্যক্তি বিরল। বৃদ্ধবয়সে তাঁর এই সিদ্ধান্তে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি-দের সাথে মনোমালিন্য হয়েছে, তবু তিনি সংকল্পে অটল।...সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডাইরির মধ্যে দুর্গামোহন দাশের উল্লেখ খুব কমই করেছেন। কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী রচনার ইচ্ছে সত্যপ্রসাদের ছিল কিন্তু তাঁর মনে ভয় ছিল "তাহা হয়তো পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে পারে।" তবে সত্যপ্রসাদ সেন স্বীকার করেছেন, "অতুল ভগ্নিদের লইয়া কিছুদিনের মধ্যেই কলি-কাতায় চলিয়া গেল। ভগ্নিরা গেল মায়ের কাছে।" ভগ্নিদের বিবাহ হল। বিবাহ দিলেন দুর্গামোহন দাশ খরচপত্র করেও এ-কথা বলেছেন শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত (অতুলপ্রসাদের মাসতুত ভাই শিশির কুমার দত্তর স্ত্রী)। শ্রীমতী বেলা সেন (অতুলপ্রসাদের পুত্রবধূ) বলেছেন, দুর্গা-মোহন দাশ আমাদের পরিবারের যে কতখানি বন্ধু ছিলেন, আমার শ্বশুর মশাইকে কতখানি সাহায্য করেছিলেন—বিলেত যাওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে তার একখানি হিসেব আমি দেখেছিলাম প্রথম আমার যখন বিবাহ হয় সেই সময়ে, তার-পর তা আর খুঁজে পাইনি। হারিয়ে গেছে। আবার সত্যপ্রসাদ বলেছেন,—বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হওয়ার প্রবল বাসনা অতুলের প্রাণে কিশোর বয়স হইতেই ছিল। খুড়োমহাশয় অকালে চলিয়া যাওয়াতে যে সংস্থান রাখিয়া গিয়া-ছিলেন, তাহাতে ইহা সম্ভব হওয়া সুকঠিন ছিল।...যৌবনেও সাংসারিক নানা ঘটনায় অতুলের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, ফলে মাতুলদের কাহারো কাহারো প্রাণে এত সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, অতুলকে দূরে দেশে পাঠাইয়া তাহার প্রাণের জ্বালা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করা সমীচীন মনে করিলেন।"

...প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ পড়া হল না অতুলপ্রসাদের। এনট্রেন্স পাশ করে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অতুল চললেন লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে।
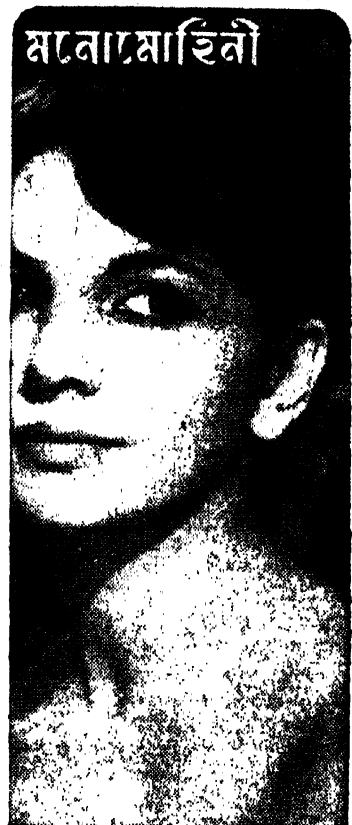
নতুন ফর্মুলায় তৈরী গয়া। আপনার
কল্পলোকের মনোমোহিনী ট্যাল্‌কম্।
কুয়াশার মত মিহি-মৃদুল,
অন্য যেকোনো ট্যাল্‌কমের চেয়ে
ঢের বেশী সুচারু, ঢের বেশী
লঘুভার।
গয়া-র শিল্পীদের সৃষ্টি
এই মধুগন্ধ পাউডার
আপনাকে সারাদিন সুরভিত
সারাদিন তাজা রাখবে।
ভিন্‌দেশী **ব্ল্যাক রোজ,**
টাটকা ফুলেল **গার্ডেনিয়া**
আর মনমাতানো **পাসপোর্ট—**
যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।
মনে রাখবেন, তিন রকম পাউডারই
পাবেন নতুন দীর্ঘাকার আধারে।
এগুলি বেশীদিন চলবে।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ
(ইংলণ্ডে সম্মিলিতবদ্ধ)

সুবাসিত ট্যাল্‌কম প্রস্তুতকারক

যায় না। তখন ওর বয়স উনিশ বছর এক মাস। কলকাতা ও ঢাকা ছাড়া বাংলার বাইরে কোথাও যায়নি। এবার তাকে যেতে হবে সুদূর সমুদ্রপারে, একেবারে খাস বিলেতে। সেখানকার আচার-ব্যবহার, মানুষজন সব-কিছুই তার কাছে অপরিচিত। এমনকি ভালো করে কাঁটা-চামচ ধরে খাওয়াতেও ও ততটা পোক্ত নয়। তার মাঝেই সান্ত্বনা—সহপাঠী দুই বন্ধু—জ্যোতিষ দাশ ও নলিনী গুপ্ত। তারা দুজনে চলছিল বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে। জাহাজে কয়েকজন অন্য প্রদেশবাসী ভারতবর্ষের তরুণ ছাত্র একসঙ্গে চলেছিল। তাদের সঙ্গে ওর আলাপ হল। ক্রমশঃ তা বন্ধুত্বে পরিণত হল। তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, গল্প-গানে, খেলায় সময়টা এগিয়ে চলছিল—কম সময় ত নয়—প্রায় পঁচিশ দিন থেকে এক মাস এই জাহাজে সমুদ্রের বুকে থাকতে হবে। হঠাৎ ডেকে কৈশোর বয়েসের সঙ্গী জ্ঞান রায়ের সঙ্গে দেখা।

জ্ঞান জড়িয়ে ধরল অতুলকে। কতদিন পরে দেখা, কোথায় ছিলে এতদিন...কোথায় পড়ছিলে, কি পড়ছিলে, কোথায় পড়তে যাচ্ছ?

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন বৃষ্টি করে জ্ঞান—জ্ঞানেন্দ্র রায়—ঢাকার সেই জ্ঞান রায় ...রায়বাবুদের বাগানে কিংবা মাস্টার-মহাশয়ের বাগানঘেরা বাড়িতে বসে যে কাব্যালোচনা করত। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখে শোনাতো। রবীন্দ্রনাথের কথা জ্ঞান প্রথম শোনায় তাকে। সেই অজ্ঞাত ইতিহাস কোন বিস্মৃতির অন্তরালে অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। মনেই পড়েনি। সেই জ্ঞান চলেছে বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে।

অতুল বললে, আমার ইচ্ছে আছে ভাই ব্যারিস্টারী পড়বো। কিন্তু আপাততঃ প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হতে হবে। তারপর ব্যারিস্টারীর কথা ভাবা যাবে।

জ্ঞান রায়কে সহযাত্রীরূপে পেয়ে খুব খুসি হল অতুল। জাহাজের অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আলাপ করিয়ে দিল জ্যোতিষ দাশ, নলিনী গুপ্তর সঙ্গে। যে জাহাজে অতুলরা চলেছিল, সে-জাহাজে জন-দশবার মিলিটারী সাহেব সপরিবারে ছুটিতে দেশে ফির-ছিলেন। তাঁরা যেদিকে থাকতেন, সেদিকে ভারতীয় যাত্রীদের যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল জাহাজের স্টুয়ার্ট।—'অপমানকর ব্যবহার'। কিন্তু কি করা আর যায় শাসকগোষ্ঠীর কাছে। মনে ক্ষোভই শুধু জমা থাকে। ভারতীয় ছাত্ররা, যাত্রীরা নিজেরাই একটা চক্র তৈরী করে নিলে কেমন হয়, বলল জ্ঞান রায়। অতুল বললে, সেখানে ওদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে।

সকলে সায় দিল।

তাই-ই হল। ভারতীয়দের চক্রে গান-বাজনার চমৎকার এক জলসা হয়ে গেল। কেউ গান গাইল, সেতার বাজাল, বেহালায় বাজালো ভারতীয় রাগ-রাগিণী। অভারতীয় ওদেশীয়রা দূরে থেকে তাকিয়ে দেখলো। ওখানে ওদের প্রবেশ নিষেধ।

লণ্ডনের কিংস ডকে জাহাজ এসে ভিড়ল। সাহেবযাত্রীরা সারি দিয়ে আগে আগে নামলেন, তাদের অবতরণ সমাপ্ত হলে ভারতীয়দের পালা। অতুল ও তার বন্ধুরা একে একে নেমে এল। নতুন দেশ, নতুন শহর, নতুন মানুষ, নতুন দৃশ্য। লণ্ডনের মাটিতে পা রেখে অবশেষে অতুল ভাবল, 'আমি এলাম আমার ছেলেবেলার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে—সেই দেশে। বিলেত দেশটা তাহলে মাটিরই।'...আজকে স্বপ্ন সফল হল, আজ এখানে আমার নতুন জীবন শুরু। যে-ক'টা বছর থাকবো, সে-ক'টা বছরকে সফল করে তুলতে হবে। ভগবান তুমি আমার সহায় হও।

ওরা চার বন্ধুতে প্রথমে এসে উঠল কোন হোটেলে। তারপর যে-যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে-যার পথে।

অতুল তার কলেজের কাছাকাছি এক পল্লীতে পূর্বনির্ধারিত একজন ভদ্র সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে উঠল। বৃদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সংসারে কেউ ছিল না। বৃদ্ধ পেন্সনপ্রাপ্ত। পুত্র-কন্যা নেই। অতুলকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। বুড়ো-বুড়ির সংসারে দুদিনেই অতুল বড় আপনার হয়ে গেল। অতুলের রূপ-গুণ মুগ্ধ করেছিল ওদের।

কিছুদিন পরে লণ্ডন জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে কলেজে প্রবেশ করে অতুল মাকে চিঠি লিখল। মা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না বেশী। আমি এখানে এক বুড়ি মাসি ও বুড়ো মেসো পেয়েছি। তাঁরা আমাকে তাঁর ছেলের মত মনে করেন। আমি ভারতবাসী, তাঁরা ইংরেজ—এই বিভেদটুকু তাঁদের মনে নেই।

তারপর আরো চিঠি লিখল অতুল মাকে ...এখানে যে এত শীত পড়ে এ-ধারণা আমার ছিল না। দারুণ শীতে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তারপর সব সময়ে বৃষ্টি। সব সময়ে বৃষ্টি—আর মেঘলা মনমরা আকাশ। একটুকু রোদ নেই। বড়ই ঠাণ্ডা। দেশ থেকে যে-সব গরমজামা-কাপড় এনেছিলাম, তা এখানকার শীতে কাজে আসবে না। জুতো-গুলো ভিজে গেলে পরা মুস্কিল। এখানে ওয়াটারপ্রুফ জুতো, গরম-ওয়াটারপ্রুফ ওভারকোট ছাড়া এক-পা চলা মুস্কিল। আমাকে ওই দুটোই করাতে হবে। উপস্থিত এখন আমি যাঁর এখানে আছি, তিনিই আমাকে একটা গরম সুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি যে-টাকা সঙ্গে নিয়ে এসে-ছিলাম, সে-টাকা আমার কলেজে ভর্তি হতেই লেগে গেছে। আমি চেষ্টা করছি আমার কলেজের অবসর সময়ে একটা কাজের চেষ্টা করতে। তোমার ভাবনার কারণ নেই। এখানে সকলে এমনিই করে। আমি এখানে থাকার খরচ চালিয়ে নিতে পারব। আমাকে যদি গরমজামা ইত্যাদির জন্যে কিছু টাকা পাঠাও ভালো হয়।

হেমন্তশশী চিঠি পেয়ে দুর্গামোহন-বাবুকে জানালেন। দুর্গামোহনবাবু টেলি-গ্রাফ মনিঅর্ডারে কিছু টাকা পাঠালেন। তখনকার দিনে বিলেতের চিঠি একবার করে মেল জাহাজে আসত। এদিকে মা, ওদিকে ছেলে চিঠির জন্যে আশা করে বসে থাকতেন। মা-র মন যতকিছু দুর্ভাবনার বন। কোন-বার যদি কোন চিঠি পৌঁছল না বা হারিয়ে গেল, অমনি খাওয়াদাওয়া ত্যাগ। এদিকে দুর্গামোহনবাবুর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে এল।

অতুল লিখল...এই শীতে রোজ ভোর-বেলা উঠে কলেজে ছুটতে হয়। তুমি ত জান মা, কেউ ভোরবেলা ডেকে তুলে না দিলে আমি কোনদিনই সকাল সকাল উঠতে পারি না...তোমার বোধহয় জানতে ইচ্ছে করছে এখানে আমাকে কে তুলে দিচ্ছে, না? আমার বুড়ি ল্যাণ্ডলেডি। তিনি ভোরবেলায় এসে দরজায় টোকা দিয়ে বলেন, 'আসতে পারি?' তারপর ঘরে এসে গরম গরম কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে, ফায়ার প্লেসের আগুনের কাঠ সরিয়ে আগুন তাজা করে বলেন, 'আমার প্রিয় খোকন, উঠে পড় তাড়াতাড়ি, তোমাকে কলেজে যেতে হবে না?'...আমি পালকের গরম-লেপটা মুখ অব্দি ঢেকে নিয়ে পাশ ফিরে শুই। শীতের জন্যে উঠতেই ইচ্ছে করে না। তবু উঠতে হয়। এক চুমুকে কফি শেষ করে, গরম জামা-কাপড় পরে, ওভার-কোট বর্ষাতি জড়িয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ল্যাণ্ডলেডিকে 'গুডমর্ণিং' জানিয়ে তাড়া-তাড়ি ছুটি। লণ্ডনের আকাশ তখন অন্ধকার থাকে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, একহাত দূরের মানুষও দেখা যায় না। তবু আমার মত অসংখ্য মানুষ ছুটে চলে তখন স্কুল-কলেজে-অফিসে। ওই ভোরে অন্ধকার থেকেই লণ্ডনের কর্মজীবন শুরু হয়ে হয়ে যায়। ...আমার বাড়ি থেকে বড় রাস্তা ধরে কলেজে যেতে একটু দূর পড়ে। কিন্তু সর্টকাট একটা রাস্তাও আছে, পার্কের মধ্যে দিয়ে, পার হয়ে যায় লোকে। বসন্তে সমস্ত পার্কটা ফুলে-ফুলে ছেয়ে থাকে। কেউ ফুলে হাত দেয় না বা তোলে না, এ-কথা ভাবতেই অবাক লাগে। আমাদের দেশ হলে পার্কের ফুলের কি অবস্থা হোত ভাব। এখানে সারা ঋতুটা মা বেশ বোঝা যায়—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। এখানে 'সামার' লোকে উপভোগ করে। উইক এণ্ড-এ দিন কাটিয়ে আসে সাগর-বেলায়...ছুটিছাটা পেলেই দলে দলে ইংরেজরা বেরিয়ে পড়ে এ-শহর থেকে ও-শহরে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে, পাহাড়ে, বনে, সমুদ্রে। উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাতে এরা ভালোবাসে। আমি এদের প্রাণোচ্ছল জীবনের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। তবুও মাঝে মাঝে বড় মন খারাপ হয়ে যায়, এদের সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব দেখে। লণ্ডনের পথেপ্রান্তে কিছু সংখ্যক ইংরেজ যুবক আমাদের ঘৃণা করে। তাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট আমরা, আমাদের সাথে প্রায়ই ওদের কথা-কাটাকাটি হয়ে যায়। ওদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করার জন্যে আমরা ভারতবাসীরা একটা সংগঠন করেছি—আমাদের ইচ্ছে যা-কিছু অন্যায়, অবিচার

তার সবল প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ আমরা জানাই এখানকার কাগজেপত্রে, সভা-সমাবেশে। তুমি ত জান চিত্তরঞ্জনকে। চিত্তদা এখন এ-কাজের ভার নিয়েছে। তুমি আমার কথা বেশী ভেবো না মা......

হয়তো সেদিন অতুল চিঠির শেষ স্তবকটি লিখে কেটে দিয়েছিল। কারণ মা দূরে ভারতবর্ষে থেকে চিন্তিত হবেন। মা-কে ভাবনায় রেখে লাভ কি।

কিন্তু মায়ের কি চিন্তা-ভাবনা যায়। মনটা যেন সকল সময়েই ওকে ঘিরে থাকে। শয়নে-স্বপনে, রাত্রে-জাগরণে অষ্টপ্রহর মায়ের চিন্তা। প্রবাসী পুত্রের জন্যে ভাবনা, মেয়েদের জন্যে ভাবনা, ভাবনা দুর্গামোহন-বাবুর জন্যে। দুর্গামোহনবাবুর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। অতুলের মাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় দুর্গামোহনবাবুর প্রথম পক্ষের পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁকে প্রায় ত্যাগ করেছেন। কোন সংবাদ তাঁরা আর রাখেন না। দুর্গামোহনবাবু অসুস্থ শরীরেও তাঁর কাজকর্ম কিছু ত্যাগ করেননি—কত কাজ তাঁর। প্রতি মাসে অতুলকেও টাকা পাঠাচ্ছিলেন। আর বুঝি শরীর সয় না। আর টাকা পাঠানো হয়ে ওঠে না। তাঁর মাথার ওপর অনেক ঋণ জমে ওঠে। মা পড়লেন সমস্যায়। পুত্র বিদেশে অর্থকষ্টে রয়েছে। এদিকে স্বামী অসুস্থ, তাঁকে কি করেই বা বলা যায় আরো অর্থ জোগাও, আরো অর্থ পাঠাও। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অতুল তখন ব্যারিস্টারী পড়ছে। ব্যারিস্টারী পড়তে হলে তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল প্রফেসরদের মাঝে মাঝে তোয়াজ করে ডিনার টেবিলে আমন্ত্রণ করা। প্রফেসর প্রসন্ন হলে ভাগ্য প্রসন্ন হবে। কিন্তু ডিনার টেবিলে প্রফেসর-দের নিমন্ত্রণ করা কি সহজ কথা। অর্থ কোথায়! টাকার কত প্রয়োজন—বাসস্থানের ভাড়া, খাওয়ার খরচ, পাঠ্যপুস্তক কেনা, যাতায়াতের খরচাদি, কলেজের মাইনে।

মা একদিন মেজভাই প্যারীমোহনের বাড়ি উপস্থিত হয়ে সবকথা খুলে বললেন। বললেন, আমার অতুলকে তুমি কিছু সাহায্য কর দাদা। 'তুমি সাহায্য না করলে নয়, আমি আর পেরে উঠছি না।

প্যারীমোহন জানালেন, তোমার ভাবনার কিছু নেই, আমি এবার থেকে অতুলকে কিছু কিছু পাঠাবো। অতুল বিলেত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারীতে এনরোল হয়ে আমার টাকাটা শোধ করে দেবে যতদিনে হয়। ...অতুল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিঠি দিল প্যারীমোহনকে।

• • •

লণ্ডনে মিডিল টেম্পিলে ব্যারিস্টারী পড়ছে অতুল। প্রায়ই পড়াশোনার জন্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে তাকে যেতে হয়। লাইব্রেরীতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রম হয়। লণ্ডনে তখন চিত্তরঞ্জন, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। চিত্তদার

নৈনিতাল ফটো : কৃষ্ণা ঘোষ

সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায় ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামে। চিত্তদা তখন খুব উত্তেজিত। আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ উঠে গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ছেন। সিনিয়র ছাত্র!

'আমি ব্যারিস্টারী কেন পড়ছি জান?'

এদের বিদ্যা, এদের বুদ্ধির ধার দেখে নিয়ে আসরে নেমে এদের সঙ্গে যুদ্ধে মাতবো।'

উত্তেজনার কারণ অন্য।

'তুমি জান আমরা ভারতবাসী। আমরা এখানে প্রবাসী। বিদেশী বিদেশীদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করা উচিত তা এদের জানা নেই। আমাদের গায়ে যদি কাদা ছোঁড়ে নোংরা জল ত্যাগ করে আমরা কি তার প্রতিবাদ করবো না! সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরী ঘরে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মাঝে কথাটি প্রচার হয়ে যেত। চিত্তরঞ্জন বলতেন, আমাদের পড়াশোনার মাঝে মাঝে অনেক কাজ করার আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামে বসেই সকল ভারতীয় ছাত্রদের জড়ো করে সেদিন বললেন,—আপনারা পড়েছেন এদেশের পার্লামেন্টের সদস্য জেমস ম্যাকলিন সাহেবের বক্তৃতা। আমাদের ভারত-বর্ষকে কিভাবে ছোট করেছেন? আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের বলেছেন 'দাস' (slaves) এবং হিন্দুদের বলেছেন চুক্তিবদ্ধ দাস (Indetured slaves) এর একটা বিহিত করতেই হবে।

যে কথা সেই কাজ। পড়াশোনা বন্ধ হল প্রায়। চিত্তরঞ্জন ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে—দেশের মানুষের অপমানের প্রতিকার-কল্পে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এক্সেটর হলে লণ্ডনের সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্ররা একত্রিত হলেন। চিত্তরঞ্জন একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। রক্ত গরম হল ভারতীয় ছাত্রদের। সভায় স্থির হল :—

(১) জেমস ম্যাকলিন সাহেব ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করেছেন তার জন্যে তাঁকে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

(২) এই সকল উক্তির জন্যে তাঁকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা হোক।

(৩) ইংল্যাণ্ডের রাণীর কাছে এক আবেদন পত্র পাঠাতে হবে।

ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ ইংরেজসমাজে ম্যাকলিনের কার্যকলাপ এবং ভারতীয় ছাত্রদের চরম প্রতিবাদ বিষয় নিয়ে দারুন আলোচনা-সমালোচনা হল। গোঁড়া ইংরেজরা ম্যাকলিনকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। উদার ইংরেজদের কাছে ম্যাকলিন ধিকৃত হলেন। তাঁরা কাগজেপত্রে চিঠি লিখলেন ম্যাকলিন সাহেবকে পার্লামেন্টের সভা থেকে বহিষ্কৃত করা হোক। উত্তেজিত হল ইংল্যাণ্ডের কাগজগুলি। তাঁরা চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার সমর্থক হয়ে বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতবাসীদের সমর্থন করে সম্পাদকীয় লিখলেন। চিত্তরঞ্জনের অবশেষে জিত হল। চিত্তরঞ্জনের পিছনে অতুলপ্রসাদ।

একদিন ভোরবেলা সংবাদপত্রে অতুল দেখল ম্যাকলিন সাহেবকে পার্লামেন্ট সভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। সংবাদ পাঠ করে খুব খুশী হয়ে অতুল ছুটল

চিত্তদার বাসায় দেখা করে আনন্দপ্রকাশ করতে।......চিত্তরঞ্জনের বোধহয় কোনদিনই কোন কাজের শেষ নেই। একখানি কাজের ইতিমুহূর্তেই আর একখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আরম্ভ। ব্যারিস্টারী পড়ার মাঝে চিত্তদা এত সময় কোথায় পায় ও ভাবে। ...আবার শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে প্রচারকার্য, লয়েড পার্কে বক্তৃতা, এক্‌সেটর হলে ভারতীয়দের গোপন পরামর্শ, বৃটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে অবসর সময়ে অনুশীলন। চিত্তরঞ্জন যেখানে যে কাজে রয়েছেন, সে-কাজ ভালোভাবে সমাধান না হয়ে যায় না। 'ফিনসবাহী' থেকে প্রবাসী ছাত্রদের জন্যে সে বছর দাদাভাই নৌরজি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হলেন।

• • •

কদিন পরে জ্ঞান এসে বলল, অতুল চল আজ বিখ্যাত গায়িকা ম্যাদাম প্যাটের গান শুনে আসি। ম্যাদাম প্যাটের নাম শুনেছ?

অতুল হাসল।

জ্ঞান বলল, ম্যাদাম প্যাট এ-দেশের একজন বিখ্যাত গায়িকা। ওর গান শোনার জন্যে এ-দেশের লোক পাগল, জান!

ম্যাদাম প্যাটের সুমিষ্ট-সুমধুর গলায় 'হোম সুইট হোম' গানখানি গাওয়া ও বোধহয় কোনদিনও ভুলতে পারবে না। সত্যি অপূর্ব, অতুলনীয়। *

জ্ঞানের আবির্ভাব এমনি মাঝে মাঝে হয়। যেমন সেদিন এসে বললে, জ্ঞান অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ এসে লন্ডনে পৌঁছেছিলেন আগস্টে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই মাত্র দুমাস এগারো দিন থেকে ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন। লন্ডনে এসে কোথাও ঘুরে বেড়ালেন না, বাড়িতে অলসভাবে বই পড়ে পড়ে পার করলেন।

মাঝে মাঝে গ্রীষ্মবকাশে ঝড়ের মত এসে বলে, চল 'সি কোস্ট' থেকে লম্বা দৌড় দিয়ে আসি, না হয় দুটো ঘোড়া ভাড়া করে টেমস নদীর পারে ঘোড়া ছোটাই। ...তাও যাবে না, তবে চল না'হয় নিছক সময় কাটানোর জন্যে একটা থিয়েটার তো দেখে আসতে পারি। সব সময়ে এত কি ভাবো, এত কি পড় বল ত! আমরা কি পড়াশোনা করি না!

অতুল বলে, বোস জ্ঞান।

জ্ঞান বলে, না তুমি উঠে পড়।...উঠবে না। পরমুহূর্তে জ্ঞান উঠে দাঁড়ায়।

অতুল বলে, একটু কফি পান করে যাও জ্ঞান, আমার ল্যান্ডলেডিকে এক্ষুনি বলছি।

জ্ঞান বলে, না থাক। তারপর যেমনি ঝড়ের মত তার আবির্ভাব, তেমনি ঝড়ের মত প্রস্থান।

ছুটির দিনগুলি অতুল এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। বইপত্তর গুছিয়ে, ল্যান্ডলেডির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্কের সর্টকাট রাস্তা ধরে ফুলবাগিচার সামনে দাঁড়িয়ে শীতের দেশের মিষ্টিরোদ উপভোগ করে। কখনো রোদে ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা-ছুটোছুটি করা দেখে। মাঝে মাঝে বুঝি নিজেকে একাকী নিঃসঙ্গ মনে হয় 'তরুণ-তরুণীর কলকাকলিপূর্ণ প্রকাশ্য চুম্বনের উৎসব-মহোৎসবে'। পার্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লন্ডনের পথ অতিক্রম করে মাটির তলার রেলপথ ধরে এসে উপস্থিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারটিতে।

সেদিন বৃটিশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত পাঠাগার ওকে অকস্মাৎ বড় আনন্দ দিল। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বইয়ের তালিকা দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর চোখে ধরা দিল 'বাংলা সাহিত্য পুস্তকে'র তালিকা। কেবল 'বাংলা সাহিত্য পুস্তকের' তালিকা নয়, বাংলা বই যে সকল ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সেদিন বোধহয় 'অনেকক্ষণ' বইয়ের তালিকা ধরা ওর হাত কেঁপেছিল। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কোন এক প্রখ্যাত 'পাঠাগার-কক্ষে' বাংলা বই, বাংলা ভাষার প্রতি এত সম্মান একথা ভাবতেই কেমন যেন বাংলা-ভাষার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জাগছিল। গর্বে ভরে উঠছিল মন। তালিকার প্রথমেই ছিল মাইকেল মধুসূদনের নাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলার ইংরিজি অনুবাদ করেছেন ফিলিপ সাহেব। ইংরিজি ভাষা থেকে অন্য অন্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং মধুসূদনের কাব্য।

অতুল আগ্রহের সঙ্গে বৃটিশ লাইব্রেরী তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালো ভারতীয় ভাষার অমূল্যরতনরাজি।

• • •

কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে চা বা কফি খেতে খেতে মনে পড়ে যায় রোজ দেশের কথা। বেশী করে মনে পড়ে যায় দাদার কথা। জাটতুত ভাই অতুল দাদাকে বলেছিল, 'দাদা, আমি তোমাকে কলকাতা থেকে মাসে মাসে ৫০ টাকা করে পাঠাবো, তোমার যদি কিছু সাহায্য হয়। মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হও। ডাক্তার তোমাকে হতেই হবে।'

অতুল কথা রেখেছিল। কলকাতা থেকে মাসে মাসে দাদাকে ঢাকার ঠিকানায় টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর তাকে লন্ডন চলে আসতে হল। ওর নিজের হাতেই বা তখন কোথায় টাকা, ওর টাকার কত প্রয়োজন। দাদাকে তাই দুঃখিত হয়ে টাকা দিতে পারার অক্ষমতার কথা জানিয়ে চিঠি দিল ও।

আগুনের ধারে পা বাড়িয়ে দিয়ে ও দাদার কথা মনে করে। দাদা বোধহয় অনেক কষ্ট করেও মেডিকেল স্কুলের পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরবো, দাদা তখন "ডাক্তার' হয়ে প্র্যাকটিসে বসবে।

দাদার অনেকদিন চিঠি পায়নি অতুল। দাদার, মায়ের, বোনেদের। বিদেশে দেশের সামান্য খবরটুকুও জানার জন্যে উৎকণ্ঠিত থাকে মন। একই দিনে তিনখানা চিঠি পায় অতুল। সত্যদাদার চিঠি, মায়ের চিঠি আর একখানা—গোটা গোটা অক্ষরে ওর নাম ও ঠিকানা লেখা—এ চিঠি বোধহয় হেমকুসুমের। দাদা লিখেছেন, ঢাকা থেকে। দাদা ঢাকায়। আর অতুল লন্ডনে—কতদূরে। দাদা লিখেছেন আমদের দুইভাইকে জীবনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের দুজনের মাথার ওপর অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে...আমাদের মাথার ওপর অনেক দায়িত্ব, সব বাধাবিপত্তি পার হয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আমরা নিশ্চয়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো; অনেক দূরে থেকেও তোমার মুখ আমার সকল সময়ে মনে হয়।

মা লিখেছেন, বাবা আমি আর কলকাতায় একা থাকতে পারছি না। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার পড়াশোনা শেষ করে বাংলাদেশে ফিরে আমাদের ভার হাতে তুলে নাও।

মায়ের চিঠি বড় করুণ সুরে লেখা। মায়ের চিঠিতে অতুল জানলো, দুর্গামোহনবাবুর শরীর খুব ভেঙে পড়েছে, বোধহয় এ-যাত্রায় আর কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। মা ওকে বন্ধুর মত চিঠি লিখেছেন। মা এবং দুর্গামোহনবাবুর কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে, সকলের কাছে হেয় হয়ে গেছেন ও'রা। আজ দুর্গামোহনবাবুর অসুখের সময়ে মরণ-বাঁচনের সময়ে কেউ তাঁকে দেখার নেই। আর্থিক সাহায্য করার মত কেউ নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অতুল।

হেমকুসুমের চিঠি তুলে নিল হাতে। হেমকুসুমের চিঠিতে কিছু খুশীর হাওয়া ছিল বোধহয়। কারণ ওর মুখে তার ছায়া দোল খেল। ও একবার দেয়ালপঞ্জীর দিকে চোখ তুলে তাকালো। কে যেন ধীরে ধীরে বললে, হেমকুসুম আসবে। ...হেমকুসুম... এই লন্ডনে...আসবে বলেছিল।

(৭)

বিদেশে থাকতে থাকতে হঠাৎ যদি দেশের মানুষের দেখা পাওয়া যায় কথা ফুরোতে চায় না। দেশের জন্যে হঠাৎ যেন কেমন করে মন। মনের খোলা বাতায়নে দেশের দিনগুলির কথা ভীড় করে আসে। আত্মীয়বন্ধু প্রতিটি মানুষের খবরাখবর জানতে ইচ্ছে করে। যাদের সঙ্গে দুদিনের আলাপ দুটি মাত্র কথা হয়েছে—যারা দেশে ছিল অলক্ষ্যে—অপাংক্তেয় হয়ে তারাও যেন ব্যক্তিত্ব নিয়ে ধরা পড়ে। তাদের কথা জানতে ইচ্ছে করে।

---

* অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত 'প্রবাসী চলরে দেশে চল' গানটির সুরে 'হোম সুইট হোম' গানটির সুরের ছায়া পড়ে।

আচ্ছা হেম তোমাদের স্টোর রোডের বাড়ির মোড়ে নামাবলী গায়ে সেই বুড়ি ভিখিরিটা এখনও বসে থাকে রোজকার মত ঘুমঘুম চোখে হাত বাড়িয়ে? বাগানের শিউলি গাছে এখনও বোধহয় ফুল ফুটছে খুউব নয়! হাস্নুহানার গন্ধ এখনও ঠিক তেমনি ছড়ায় পুবের বারান্দায়?......কলকাতা এখন বোধহয় খুউব গরম......যাই বল কলকাতায় গরম অনেক ভালো লন্ডনের এই ঠান্ডায় হাতে জমে যাওয়ার থেকে!

ওর কতই না কথা মনে হয়। জানতে ইচ্ছে করে মা কেমন, বোনেরা কেমন আছে। দুর্গামোহনবাবুর কথাও জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে পানিমামার কথা। পানিমামার কি এখনো থিয়েটার-যাত্রা করার নেশা আছে। কলকাতায় কি কোন থিয়েটার ক্লাব করেছেন। বিনোদমামী বোধহয় এই মুহূর্তে মাথার কাপড় খুলে রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। মনে পড়ে ছোটমামা বিনয়কে। বিনয়মামার মত খামখেয়ালী বোধহয় ঢাকা শহরে খুঁজে মেলে না। কে জানে দাদা কেমন আছে বর্মায়—অনেকদিন ওর কোন খবর পাওয়া যায় নি। মনে পড়ে আরো কত না মুখ!......

আচ্ছা হেম তুমি এখনও ছবি আঁকছ ত। কলকাতায় থাকতে তোমার ছবি আঁকার খুউব মনোযোগ দেখেছিলাম—সখ এখনও আছে ত!......বেহালা না তো এস্রাজ বাজনা কেমন হচ্ছে? তুমি ত এস্রাজ শিখছিলে না? এখানে তোমাকে একটা যন্ত্রসঙ্গীত শিখতে হবে? কি শিখবে বল বেহালা না এস্রাজ? কোনটা ভালো লাগে বল?

লন্ডনে থাকতে প্রায়ই ছুটি পেলে ও মামারবাড়ি এসে পৌঁছে যায়। মামা-মামিমা, মামাত ভাইবোনেরা ওকে কাছে পেয়ে খুব খুশী হয়।

তুমি আজ সারাদিন এখানেই থাকবে এখানেই খাবে। আমরা সারাদিন আজ এখানে গল্প করবো......রাতটা আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও না অতুল, তুমি ত আজকাল আর এদিকে আস না!

মামা বলেন, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে অতুল। তোমার কোন কিছু দরকার হলে আমাদের জানাতে দেরী করো না।

লণ্ডনে মামারবাড়ি এলে যেন মনেই হয় না ভারতবর্ষের বাইরে আছি। সেদ্ধ খাবার খেতে খেতে অরুচি জন্মে গেল মুখে। মামারবাড়িতে এলে তবু মামিমার হাতের রান্না খাওয়া যায়, বাংলাদেশের স্বাদ-গন্ধযুক্ত মুখরোচক খাবারের গন্ধে-গন্ধেই পেট ভরে যায়। আর বাংলা কথা বলা যায় মন খুলে। আপন ভাষায় কথা বলার যে কি সুখ তা বিদেশে উপস্থিত না হলে বোঝাই যায় না।

মামিমা মাঝে মাঝে বলেন, আমরা এখানে নতুন এসেছি পথঘাট কিছুই জানি না, অতুল তুমি তোমার ভাইবোনদের শহরটা একটু-আধটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও। ওর তো সময়ই হয় না। কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন।

ও বলে বেশ ত' মামিমা ছুটি পেলে আপনাদের সমস্ত লন্ডন ঘুরিয়ে দেখাবো।

লণ্ডন শহরটা কি কম বড়। দিন দিন চারদিকে কেবল এগিয়েই চলেছে। কূল-কিনারা নেই কোন। ওরা ঘুরে বেড়ালো লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে। কোনদিন ওরা যায় থিয়েটারে। কোনদিন—মামিমা আপনার ওয়েস্টার্ণ ক্লাসিকাল মিউজিক ভালো লাগে? মোজার্ট বিটোফেনের সুর? ম্যাদাম প্যাটের গান শুনবেন? কিম্বা চলুন মামিমা আমরা আজ শেক্‌সপিয়ারের নাটক দেখে আসি কোন।

কখনো মামা-মামিমাদের সঙ্গে ব্রাইটনের সমুদ্রবেলায় কিম্বা ব্রিস্টলের সি-কোস্টে সামারের কয়েকটা দিন আনন্দ হুল্লোড়ে পার করে আসে। সেখানে সমুদ্রবেলায় রঙিন ছাতার নিচে রৌদ্রস্নানে স্বাস্থ্যকামী ওরা। কখনও বালুকাবেলায় হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূরে বালির পাহাড় আর ঝাউবীথিকার নির্জনে দাঁড়িয়ে পিকনিক স্পট নির্বাচিত করে ওরা। সমুদ্র-ঢেউ আছড়ে পড়ে বালিয়ারীতে, গুনগুন করে সুর আসে মনে সমুদ্রের গর্জনে।

* * *

হেম তুমি বেহালা শেখ। তোমার বেহালার হাত বড় মিষ্টি।

হেম বুঝি লজ্জা পায়।

আজ তুমি বেহালা বাজাও শুনি।

হেমকুসুম বেহালা আনে, কখনও আনমনে ছড় টানে। সুর ওঠে তারের ঘর্ষণে। কখনও কোন বেসুরো সুর কানে বাজে। হেমের কানে সে-সুর ধরা পড়ে। বাজনা বন্ধ রেখে বেহালা নামিয়ে রাখে।

ও বলে, থামলে কেন, বাজাও। বেহালার হাত তোমার মিঠে। আমি বলছি, তুমি খুব নাম-করা শিল্পী হবে। চারদিকে তোমার নাম ছড়িয়ে যাবে দেখো।

বড়মামাকে বলে অতুল, একজন ভালো বেহালা-শিক্ষক রাখুন মামা হেমকুসুমের বেহালা শেখার জন্যে। বেহালায় খুব উৎসাহ হেমকুসুমের।

হেমকুসুমের বেহালা শেখায় শুধু ইচ্ছে নেই, চিত্রশিক্ষা এবং চর্চা শুরু করে দিল একজন সাহেব চিত্র-শিক্ষকের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বেহালা শিক্ষাও চলল আর একজন সংগীত-শিক্ষকের কাছে থেকে। অল্পদিনের মধ্যেই হেম পাশ্চাত্যসংগীতে, বেহালাবাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে। লণ্ডনের অনেক সংগীতসভায় সংগীত-শিক্ষকের সঙ্গে বাজিয়ে আসে। কখনও কোন আসরে একাকী বেহালা বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে। ক্রমে ক্রমে সংগীতরসিক সমাজে হেমকুসুমের নাম ছড়ায়।

বাবা অফিসের কাজে সব সময়ে ব্যস্ত, মা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত, কুসুম বলে, দাদা, তুমি আমার সঙ্গে চল ক্লাবে সভায়, নাচের আসরে। ক্লাবে আমার বেহালা বাজনা কেমন লাগল দাদা?

হেমকুসুমের কেমন যেন আকর্ষণী শক্তি আছে। ফিটফাট করে সাজলে বড় সুন্দর দেখায়। হেমের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে, হেমের কথা শুনতে ভালো লাগে। হেমের অস্তিত্ব যেন কেমন আনন্দ দেয় ওকে। প্রায় দিনই তাই পড়াশোনা সেরে ও মামার বাড়ি চলে আসে হেমের সঙ্গে গল্প করে। হেমের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা কি অন্যদের চোখে অন্যরূপ ধারণ করতে পারে—সে-কথা ও ভাবে না। হেমের সাহচর্য লাভের জন্যে ও বোধহয় সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ক্রমে ও কেমন যেন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

কিছু মাস পরে হেমকুসুমেরা লণ্ডন ছেড়ে চলে গেল। বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের লণ্ডনের কাজ আপাতত শেষ। আর এখন এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। বিষণ্ণ মন অতুলপ্রসাদের। বিষণ্ণ মনে ঘুরে বেড়ায় লণ্ডন শহরের রাস্তায় রাস্তায়। হাইডপার্কে কারণহীন, আবশ্যকহীন বক্তৃতা শুনে অনেকক্ষণ, টেমস্ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তার জলে সুউচ্চ প্রাসাদপুঞ্জের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর বরফকুচি-ছাওয়া পথে আর ঠাণ্ডায় মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ও আপন মনে আবিষ্কার করল, ও নিজে ওর শরীরের ওপর অত্যাচার করছে। কারণ, ঘুম নেই চোখে। স্নান, আহারের ইচ্ছে নেই। সময়মত হচ্ছেও না। যে-কাজের জন্যে এসেছে এখানে, সেই কাজ অর্থাৎ পড়াশোনা যথেষ্ট পরিমাণ করতে পারছে না। আর এ-কথা মনে হতেই মনে হল এবার ওকে আরো পরিশ্রম করতে হবে। আর অন্য কোনদিকে মন নয়, কোনকিছু ভাবনা নয়, শুধু পড়াশোনা, শুধুই পড়াশোনার কথা ভাবতে হবে। তবু একদিন চিত্তদার কথা মনে হল। চিত্তদার অনেকদিন খবরাখবর নেয়া হয়নি। চিত্তদার বাড়ি গেলে হয়। চল, চিত্তদার কুঠি। চিত্তরঞ্জনের লণ্ডনের বাসায় তখন দ্বিজেন্দ্রবাবু এবং আরও কয়েকজন প্রবাসী ভারতবাসীদের মাঝে মাঝে জোর সাহিত্যালোচনা চলছে।

চিত্তরঞ্জন বললেন : এসো, এসো অতুল।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, অতুলবাবু, অনেকদিন আপনার পিয়ানো শুনিনি। গান কি রচনা করলেন?

অতুল বললে, আপনি বরং একটা গান করুন দ্বিজেনবাবু, আমি আর কি গান জানি; তাছাড়া ক'দিন থেকে আমার মনটাও ভালো নেই। আপনারই গান শোনা যাক।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন, কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হেসে সকলকে চমক দিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে হঠাৎ শুরু করলেন তাঁর স্বরচিত গান।

সভাশেষে বললেন, আজ আমরা চিত্তরঞ্জনকে হাসিমুখে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন, চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখন খুব শীঘ্র দেশে ফিরে চলেছেন। আমরা খুব সুখী, সেই সঙ্গে দুখীও ওঁকে আমাদের পাশে না পেয়ে। আমরা ওঁর দেশে ফিরে যাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করছি, সেই সঙ্গে

পুরীর সমুদ্রতীর ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

শুভ কামনা জানাই দেশে উনি একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার বলে পরিচিত হবেন।

• • •

সভা ভঙ্গ হল। কয়েকদিন পরে চিত্তরঞ্জন ভারতবর্ষে ফিরলেন। চিত্তদার অভাব পূর্ণ হয় না। বিষণ্ন মন। আবার পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেল অতুল। ভুলে গেল ক্লাব, ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের আড্ডা, টেমস নদীর পাড়ে সূর্যডোবা। অহরহ বৃষ্টি, ঝিরঝির বরফ পড়া। ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুনের সামনে শরীর সেঁকতে সেঁকতে পালকের লেপে গা ঢেকে রাতভোর প্রস্তুতি চলে পরীক্ষাপর্বের। অবশেষে ফাইনাল পরীক্ষা এল। পরীক্ষা দেয়া হল। পার্টি দেয়া হলে ব্যারিস্টারীতে 'এনরোল' হল সে। এবার দেশে ফিরতে হবে। কিন্তু দেশে ফেরার আগে এ-দেশটা একবার ঘুরে দেখে যাবে না! আবার কবে সুযোগ হবে কে জানে! টাকার কিছু টানাটানি, প্যাসেজ বুঝি পুরোপুরি হয় না। মাকে চিঠি লিখতে লজ্জা করে। তবু চিঠি না লিখলে নয়!...কোনরকমে কিছু টাকা জোগাড় করে মা ওকে পাঠিয়ে দিলেন। 'ও' দেশে ফেরার জন্যে তোড়জোড় শুরু করল, সত্যি এ-দেশ আর ভালো লাগে না।

১৮৯৪ সন অতুল দেশে যাত্রা করল।

কলকাতায় দুর্গামোহনবাবুর বাড়িতে এসে উঠল ওরা। সকলের জন্যে বিদেশ থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র এনেছিল। অতুল এগিয়ে দিতে সকলেই খুব খুশী। বোনেরা সব সময়েই তাকে ঘিরে বসে গল্প শোনে। মা কাজের অবসরে মাঝে-মাঝে হাসি মুখে এসে বসেন। ওকে পেয়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন, বাড়িতে একটা খুশীর হাওয়া বইছে।

সেদিন সন্ধোবেলা বড়মামার বাড়িতে আসে। মামা-মাসীমার সঙ্গে বিলেতের অনেক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হল।

কিন্তু অতুলের চোখ যাকে খুঁজছিল সেই হেমকুসুমের দেখা নেই। অতুল মাসীমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কুসুম কোথায় মাসীমা!

মাসীমা বলেন ওর শরীরটা কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। সে বোধহয় নিজের ঘরেই শুয়ে আছে।

অতুল হেমকুসুমের ঘরে এল। কপালে ছোঁয়াল হাতখানি। তাতে হেমকুসুম চোখ মেলে তাকাল না।

অতুল বুঝল হেমকুসুমের অভিমান হয়েছে। অভিমান ভাঙাতে ওর ঘন কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললে, হেম একটা কথা শোন।

কুসুম বললে, আমি তোমার কোন কথা শুনব না। তুমি ওদেশে থাকতে আমাকে কোন চিঠি লেখ নি কেন শুনি?

অতুল হাসল। বললে, অপরাধ হয়েছে স্বীকার করছি।

অনেক সাধাসাধনায় বুঝি পাহাড়ও টলে। হেমকুসুমের রাগ পড়ল—বড় অভিমানিনী মেয়ে। হাসি, হুল্লোড়, গল্পে-গল্পে অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরল অতুল। পরের দিন সেজমামা পানিমামার সঙ্গে দেখা করল। দু-চার দিনের মধ্যেই দেখা-সাক্ষাতের পালা চুকে গেল। একদিন সকলে মিলে-মিশে স্থির করলেন অতুল একটা বাড়ি ভাড়া করবে, সেখানে সে তার অফিস-ঘর সাজিয়ে বসবে। প্র্যাকটিশের জন্যে প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কেনাকাটা তার ভার মামারা, মা এবং দুর্গামোহনবাবু নিলেন। ৮২ নম্বর সার্কুলার রোডে নতুন বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, সেখানেই অতুল থাকবে। অফিস হবে। অতুল ও ডাঃ নগেন্দ্র দাশ একসঙ্গে সেই ভাড়া বাড়িতে এসে উঠলেন। নগেন্দ্র বসু। অতুল কল হাইকোর্টে এনরোল হল। কর্মজীবনে প্র করার আগে একবার দেশ থেকে ঘুরে এ দেশের মাটির আশীর্বাদ নিয়ে।

কোর্ট-কাছারী যাতায়াত শুরু নতুন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদের রূপ গুণমুগ্ধ হলেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মান্য

তেইশ-চব্বিশ বছরের পক্ষে ওকে একটু বড়ই দেখায়, সুন্দর সুগঠিত, দেহ। সারা দিনের পরিশ্রমেও শরীরে কোন রকম ক্লান্তি নেই। কাজ-কাজ কাজ। সময় কোথায় বিয়ের কথা ভাব কোর্ট থেকে ফিরে এসেই পোষাক পরিব করে ছোটে ক্লাবে। অদ্ভুত এক ক্লাব—তার খাম-খেয়ালী সঙ্ঘ—খাম-খেয়ালী যাদের অঙ্গের ভূষণ। রবীন্দ্রনাথ যে স নেতা। জোড়াসাঁকোয় সে সঙ্ঘের জন্ম।

সরলা দেবী একদিন ওকে সঙ্গে নি উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথের দরবা আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। প্র দর্শনেই প্রেম। এর আগে হয়ত রবীন্দ্রনা ছবি ও দেখেছে। এখন তাঁর অনিন্দ্যসু স্নিগ্ধকান্তি দেখে মুগ্ধ হল। সেঁ অতুলও ছিল সেই চায়ের আসরের নিমন্ বাক্তি। রবীন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত। সুললি কণ্ঠে স্বরচিত গান কবি শোনাচ্ছিলেন। ভাল লাগছিল সেই সুমধুর সঙ্গীত। সঙ্গী সমাপ্ত হলে ওর কে এক দুষ্টু বন্ধু সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বললে, [illegible] অতু গান করে এবং নিজেও কিছু-কিছু গ রচনা করে।

কি মুস্কিল!

ছেলেবেলায় গোপনে কবিতা লি দু-একটা গান রচনা করে নিতান্ত অন্তর বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাউকে শোন নি। তারপর গানের খাতা ধরা পড়াতে লজ্জা। আর এখন লজ্জায় সঙ্কোচে পৃথি দ্বিধা হও ভাব।

অতুল প্রতিবাদ করে। কবি শোনেন না বলেন, সে তো ভাল কথা আপনি নিজে রচিত একটা গান করুন।

মনে-মনে ভাবে ও ভারতের শ্রেষ্ঠত গীতিকবি এবং একজন সুগায়কের সাম ওর নিজের রচিত গান গাইতে হবে। যা সুরে ভুল থাকে, কম্পিত হয় কণ্ঠস্বর, সু তান লয় তার ছন্দ হারিয়ে ফেলে।

রবিবাবু বুঝলেন যে ও বিব্রত হয়েছে তিনি আশ্বাস দিলেন, ওর মনে সাহস দিলেন, পিঠ চাপড়ে বললেন, গান করুন অতুলবাবু নিশ্চয়ই পারবেন।

ও সকলের সামনে সেদিন কম্পিত-কণ্ঠে গান গাইল, ওর মুখের উক্ত-রক্তিম ভাব কাটতে বেশ সময় লাগল। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ শান্ত হয়ে বসে শুনলেন গান। গান শেষ হলে বললেন, চমৎকার অতুলবাবু আপনি বেশ গান করেন।

তখন ও ছিল আপনি এবং অতুলবাবু পরে হল তুমি এবং অতুল। ও ছিল খাম-খেয়ালী সভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। সভ্য সংখ্যা কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

নন্দলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
ীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত
সাহিত্যিক, সুরসিক শিল্পী, খাম-
লীর সদস্য পদে। খামখেয়ালী সভার
ণ অবনীন্দ্রনাথের। সভায় কাজকর্ম
: খামখেয়ালী ধরনের—নিয়মের কোন
রা নেই। উদ্দেশ্য হাস্যরসের উদ্দীপন
নানান সঙ্গীতের মাধ্যমে সভ্যদের চিত্ত
ট করা এবং সভাশেষে জঠরের তুষ্টি-
। হাসির বন্যায় ভাসিয়ে হাসির গান
খামখেয়ালীর মজলিশকে মজগুল করে
ন দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল গানের
পদ গেয়ে গান থামিয়ে মুচকি হাসি
, সভ্যরা সঙ্গে-সঙ্গে কোরাস ধরেন।
নাথ কোরাসের নেতা। দ্বিজেন্দ্রলাল
রেন "হতে পারতেম আমি একজন মস্ত
ীর।" আর রবীন্দ্রনাথ মাথা আন্দোলিত
কোরাস ধরেন, 'তা বটেই তো, তা বটেই
দ্বিজেন্দ্র আবার গানে ডুব দেন,
াল একদা করিল ভীষণ পণ'। রবীন্দ্র
সমেত গান ধরেন, 'বাহারে নন্দ
র নন্দলাল'।

দ্বিজেন্দ্রলাল খামখেয়ালী সভ্যদের
। উদ্বেল তরঙ্গে যেন নৃত্য করান।
নাথ সূক্ষ্ম হাসির রসের ভয়ঙ্করী
ন মাতিয়ে তোলেন। খামখেয়ালী
: মাঝে-মাঝে রাধিকানাথ গোস্বামীর
াব হয়। মাঝে-মাঝে অবন ঠাকুর তুলি
এস্রাজ হাতে এসে উপস্থিত হন
মাঝে। সেদিন তাঁর হাতের যাদুস্পর্শে
পায় জগতের বন্দী যত রাগরাগিণী।
আপন রচনা পাঠ করেন অনেক
তাক। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
: অপূর্ব অতুলনীয়, যেমন সুপুরুষ
উদার কণ্ঠস্বর।
লেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথকে দেখে মাঝে
নে হয় ওদের মত সারা জীবনটা যদি
তার চর্চায় মেতে থাকা যায়। শুধুই
চর্চা— বাগদেবীর আরাধনা—সাহিত্য
চনা আর কোন কাজ নয় কোন
নয়, কোর্টে পৌঁছে অনর্গল 'অনেক
সত্য বলে ধরে নিয়ে' মক্কেলের
অপর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত
নয়।......জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের
র এক কোণে একটুকরো জায়গার
লালায়িত মন।

খামখেয়ালীর অধিবেশন এক একজন
বাড়িতে হয়। যাঁর বাড়িতে
শন বসে তাকে আগেই সকল
ক নিমন্ত্রণ করতে হয়। ভোজনের
খাও সঙ্গে সঙ্গে রাখা চাই। সেবার
নাথের পালা—সৌন্দর্যের পূজারী
নাথ। কবির কবিতাপাঠ, অন্যান্যের
ঠ, সঙ্গীত হাসির গান খামখেয়ালী
সম্ভোগের পর স্বল্পভাষী বিনয়ী
নাথ ভোজনের জন্যে অন্য একটি
কলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।
টি এমনভাবে ফলেপাতায় সুন্দরভাবে
সজ্জিত ছিল যে মনে হয় বুঝি নন্দনের
পুষ্পকুঞ্জে এলুম। মাঝখানে দেখি
জলাশয়। মাঝে মাঝে দু'একটি বনস্পতি,
জলে রাজহংস জলপদ্ম, সরসীর তটের
চারপাশে নবদুর্বাদল। সবই প্রকৃতির
অনুকারী...হংস তরুলতা দুর্বাদল সবই
কৃত্রিম সেই কাঁচ নির্মিত জলাধারের চার-
পাশে বসবার আসন। প্রত্যেকটি আসনের
সামনে নানাধরনের খাদ্যসম্ভার তাতে
বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। আমরা যেই খেতে
বসলাম অমনি কোন লুক্কায়িত জায়গা
থেকে মৃদুমন্দ সানাই বাজতে লাগলো।
উচ্চ হাসির এবং সভ্যদের আহার্যকালীন
মুখব্যাদান দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে হাসির
মাত্রা আরো বাড়তে লাগল। আর বাক্য-
কুশলী—হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র-
লাল, জগদীন্দ্র রায়, অর্ধেন্দু মুস্তাফী
সকলে এমন হাসতে সুরু করলেন, যে
সেই আলোড়নে সুখখাদ্য কোথায় তলিয়ে
যায় বুঝতে পারছিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এবারের খাম-
খেয়ালীর আসর অতুল তোমার বাড়িতে
বসবে স্থির হয়েছে।" জ্ঞানীগুণীর পদ-
ধূলিতে ধন্য হবে এঘর—তাই বাড়ি-ঘর-
দোর সাজানো হল। কোর্টকাছারী থেকে
তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরল
অতুল। মান রাখতে হবে বৈকি তার জন্যে
দাম দিতেও হবে।—একাকী জীবনে মাঝে
মাঝে বড় অসুবিধায় পড়তে হয়। কতদিনে
কত দৃষ্টি রাখা যায়। একাকী—নিজেকে
বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় আর একজন যদি
সঙ্গী থাকতো......

"মনে আছে যেদিন খামখেয়ালীর
অধিবেশন হয় সেদিন কবি বাড়ি গেলেন
রাত বারোটার পর। মহারাজা নাটোর
গেলেন বাড়ি একটা-দুটোর সময়ে। আর
দ্বিজেন্দ্রলাল আর আমরা কয়েকজন সারা-
রাত কীর্তন শুনে আর তাঁর হাসির গান
শুনে সময় কাটালাম। তার পরদিন প্রাতে
হাস্যরাজকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিই। মনে
আছে তাঁর স্ত্রী বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ে-
ছিলেন। তাঁর শিশুপুত্র মন্টু (দিলীপ-
কুমার রায়) বাবার কোলে উঠে ভাঙ্গা
ভাঙ্গা সুরে 'অ আ' করতে লাগল।
দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন আমার পুত্রটি
বোধহয় গাইতে পারবে না? কি মনে হয়।" *

• • •

বড়মামা একদিন এলেন অতুলের
বাড়িতে সঙ্গে বড়মামিমা এবং কন্যা
হেমকুসুম।

বড়মামা মামীমাকে দেখে অতুল তাড়া-
তাড়ি অফিসঘর থেকে বাইরে এসে অভ্যর্থনা
জানালো।

বড়মামা বললেন, আমরা আর বসবো
না অতুল। এদিকে এসেছিলাম তোমাকে
আমরা একবার দেখতে এলাম।

মামিমা বললেন তুমিও আর আমাদের
বাড়ি যাওয়া অতুল।

বড়মামা বললেন, শুনলাম তুমি নাকি
এখন সাহিত্যচর্চা করছ! সাহিত্যচর্চা
করছ কর কিন্তু আপন কাজকে ভুল না
যেন। সময় নষ্ট করো না। মনে রেখ
প্র্যাকটিস জমাতে হলে দিনরাত প্র্যাকটিসের
কথা ভাবতে হবে—মন-প্রান দিয়ে ভাবতে
হবে তবেই জীবনে দাঁড়াতে পারবে।

যাবার আগে হেমকুসুম বলে গেল
দু'একদিনের মধ্যে আমাদের বাড়ি, এসো।
আর ওর কথা শুনে মনটা যেন কেমন
হল। ওর কথা হঠাৎ যখন মনে হয় কোন
কাজের অবসরে তখন সব কাজ যেন
কেমন ভুল হয়ে যায়। মক্কেলদের দলিল-
দস্তাবেজে যথাই ঘুরে ফিরে মরে।
সওয়াল ভুল হয়। প্রতিপক্ষের ব্যারিস্টার-
এডভোকেটরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন।
সিনিয়র এস, পি, সিংহ বলেন, মাই বয়
তোমার কি হয়েছে? কাজে এত ভুল
কেন! তুমি ত এমন নও?

বার-লাইব্রেরীতে বসে আইনের মোটা-
মোটা বই খুলে নোট নিতে নিতে হঠাৎ
যেন আপন কাজকে ছোট গণ্ডিতে বাঁধা
বলে মনে হয়। এই জটিলতা-কুটিলতা
পূর্ণ জগতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
মুহূর্তে এজীবন-এজীবিকা ত্যাগ করে
ভেসে যেতে ইচ্ছে হয়।......তখনই মনে পড়ে
সাহিত্যচক্রের কথা। রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য-
সুন্দর-স্নিগ্ধ-কান্তি, বলেন্দ্রনাথের সুমিষ্ট-
সুমধুর-কাব্য-কণ্ঠ, দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বদা-
হাস্যপূর্ণ-মুখমন্ডল। ...হাইকোর্ট এই লাল
দুর্ভেদ্য দুর্গ তখন অতুলের কাছে অসহ্য...
তখন যদি...

কর্মক্লান্ত অতুল সেদিন ফিরে চলে
কোর্ট থেকে ঘরমুখো। অকস্মাৎ নববর্ষার
প্রথম বৃষ্টি ফোঁটা স্পর্শ দেয় শরীরে-
মনে। কেন জানি না ওর রবীন্দ্রনাথকে
মনে পড়ে যায়। সিক্ত শরীরে সটান পৌঁছে
গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।...বর্ষার
প্রথম সায়াহ্নে কবি তাঁর একান্ত
ঘনিষ্ঠ সহচর লোকেন • পালিতের
সঙ্গে একান্তে একখানি ছোট ঘরে
বসে নববর্ষার রূপ দেখছিলেন। এবং
মাঝে মাঝে তন্ময় কবি তার বর্ষার
কবিতা আবৃত্তি করছিলেন এবং গান
গাইছিলেন। সখা লোকেন পালিত
ইংরাজি, ফরাসী নানা ইউরোপীয় ভাষা
থেকে সেই কবিতাগুলির সমভাবাপন্ন
কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।

কবি বললেন, 'এস অতুল, বোস
এখানে—আমার পাশে। তুমি আসবে আমি
ভেবেছিলাম। তোমার কথা ভাবছিলাম
অনেকদিন।"

(ক্রমশঃ)

---

* অতুলপ্রসাদ সেনের রচনা 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি থেকে'।

নীরব ধ্বনি

সঞ্জীবকুমার ঘোষ

সারা দিনরাত্রে যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ কতরকমের আওয়াজ আপনি শুনতে পান তার হিসেব নিয়ে দেখেছেন কি? দেখেন নি। কেননা, তা' দেখা আপনার পক্ষে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। বিশেষতঃ আপনি যদি শহরবাসী হন। মৃদু, উৎকট, সুরেলা, বেসুরো কতরকমের আওয়াজ যে আপনার কানে এসে পৌঁচচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এর কোনোটা হয়ত শ্রুতিমধুর আবার কোনোটা হয়ত বিরক্তি উৎপাদন করে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে যেমন একটা চমৎকার ছন্দমাধুর্য রয়েছে তেমনি আবার বাজারের হট্টগোলে রয়েছে পৌরুষতা।

এই যে হরেকরকমের আওয়াজ আপনার কানে প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করছে তার জন্যে দায়ী কিন্তু আপনার আশপাশের বাতাস, যে-বাতাসে আপনি-আমি শ্বাসক্রিয়া চালাই। কোনো মাধ্যমের আশ্রয় ছাড়া আওয়াজ চলাফেরা করতে পারে না এ আমরা জানি। আর সচরাচর বাতাসই যে এই মাধ্যমের কাজ করে এ-ও আমাদের অজানা নয়।

এটা আমাদের জানা আছে, আওয়াজের উৎপত্তি কাঁপুনির ফলে। কাঁপুনি-সৃষ্ট আওয়াজ বাতাসে ঢেউ তুলে যখন আমাদের কানে পৌঁছয় তখনই আমরা আওয়াজ শুনি। অবিশ্যি কাঁপুনি হলেই যে আওয়াজ শোনা যাবে তা নয়। কাঁপুনি আবার দ্রুতও হতে পারে, মন্থরও হতে পারে। দ্রুতি-মন্থরতার উভয়দিকে দুটি নির্দিষ্ট সীমা আছে যার চাইতে দ্রুত বা যার চাইতে মন্থর কাঁপুনি হলে সে কাঁপুনি-জাত আওয়াজ শোনা যাবে না। কাঁপুনির ঊর্ধ্ব-সীমা অতিক্রমজনিত অশ্রুত যে শব্দ তারই নাম দেওয়া হয়েছে অতিশব্দ। আমরা এর নাম দিতে পারি নীরব ধ্বনি। কেননা, নামে ধ্বনি হলেও এটি আমাদের শ্রবণানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না।

অনেকে জানেন রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও বাদুড় পোকামাকড় ইত্যাদি শিকার ধরতে পারে, শিকার কোথায় আছে তা' চোখে না দেখেও স্থির করতে পারে। এটা সম্ভব হয় বাদুড়ের এক বিশেষ ক্ষমতার জন্যে। বাদুড় নীরব ধ্বনি উৎপন্ন করে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দেয়; কাছে-পিঠে কোথাও পোকামাকড় থাকলে তাতে তা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। নীরব ধ্বনি অন্যেরা শুনতে না পেলেও বাদুড় শুনতে পায়। আর তাই ফিরে-আসা ধ্বনি শুনে শিকারের দিক এবং দূরত্ব সে বুঝে নেয়। রেডারের কথা স্মরণ করুন। এ ব্যাপারে রেডারের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বাদুড়ের প্রকৃতিদত্ত এই কৌশলের বিরুদ্ধে সব পতঙ্গই যে অসহায় তা নয়। কয়েক জাতের মথ আছে যাদের শ্রবণশক্তি অতি প্রখর। তারা বাদুড়ের ঐ নীরব ধ্বনি শুনতে পায় এবং বাদুড়ের খপ্পরে পড়বার আগেই সরে পড়ে।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধরনের পাখি দেখতে পাওয়া যায় যারা বাদুড়ের মতোই নীরব ধ্বনির সাহায্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে ও শিকার ধরে খায়। দিনের বেলায় অবিশ্যি এদের দেখা পাওয়া যাবে না কারণ দিনে এরা গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে কাটায়।

ইঁদুরের উৎপাত অনেক বাড়ীতেই আছে, আর সে জন্যেই ইঁদুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয়টা ভালোই। সময় সময় ইঁদুরকে খেলতে দেখা যায়। এই খেলার সময় ওরা খুব জোরে চিৎকার ক'রে ওঠে, তবে সে চিৎকার আমরা শুনতে পাই না, কারণ তা নীরব ধ্বনি—যে ধ্বনি আমাদের শ্রবণক্ষমতার বাইরে।

ইঁদুর যে শুধু উৎপাতই সৃষ্টি করে তা নয়, এরা রোগবীজানুর বাহক। এই কারণেও ইঁদুর আমাদের অবাঞ্ছিত। আর ইঁদুর থেকে পরিত্রাণ পেতে নীরব ধ্বনিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। খুব জোরালো নীরব ধ্বনি ইঁদুর সহ্য করতে পারে না। দেখা গেছে, ইঁদুরের আস্তানার কাছে যন্ত্রের সাহায্যে জোরালো নীরব ধ্বনি উৎপন্ন করলে আস্তানা ছেড়ে দলে দলে ইঁদুর পালাতে থাকে।

বিখ্যাত জাহাজ টাইটানিকের কথা শুনেছেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নিবিড় অন্ধকার এক রাত্রে সেই অভিশপ্ত জাহাজটি সমুদ্রে ভাসমান অতিকায় এক হিমশৈলের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার তিন ঘণ্টার মধ্যে যাত্রীসমেত জাহাজটির সলিল সমাধি ঘটল। সমুদ্রের অতলে সেটি তলিয়ে গেল। বহুকাল অবধি হিমশৈল জাহাজের এক মারাত্মক শত্রু ছিল। আগে হিমশৈলের অস্তিত্ব বোঝার জন্যে জাহাজের ওপর থেকে খুব জোরে চিৎকার করা হত, চিৎকার প্রতিধ্বনিত হলে হিমশৈলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হল, এতে হিমশৈলের নিমজ্জিত অংশ সম্পর্কে ধারণা করা যেত না। অথচ হিমশৈলের নিমজ্জিত অংশই হল বেশী মারাত্মক। আজকাল হিমশৈলসহ জল-তলের অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্ব বোঝার জন্যে 'সোনার' নামে এক যান্ত্রিক ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং-এর সং[illegible] হল 'সোনার'। 'সোনার' জলতলে ধ্বনির ঢেউ ছড়িয়ে দেয় লক্ষ্যবস্তু[illegible] প্রত্যাগত ধ্বনিই জানিয়ে দেয় [illegible] কথা। 'সোনারে' নীরব ধ্বনি ব্যবহা[illegible] সুবিধে এই যে, এই ধ্বনির [illegible] একমুখী করানো যায়—যেমন ক[illegible] বুলেটকে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু[illegible] ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এ ছাড়া, আরো[illegible] এই যে এ ধ্বনি অন্যান্য মামুলি [illegible] ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

নীরব ধ্বনির এই বিশেষ[illegible] আজকাল জেলেদেরও একটি মস্ত[illegible] গভীর সমুদ্রে কোথাও মাছের ঝাঁ[illegible] কি-না, থাকলে তা কত গভীরে আ[illegible] ধ্বনির দৌলতে তা জানা যায়। শু[illegible] নয়, এই ধ্বনি মাছের আকৃতি [illegible] ধারণা করতেও সাহায্য করে। মা[illegible] বড়ো হয় তাহলে মাছের গায়ে ধাক্কা[illegible] প্রতিফলিত যে-ধ্বনি পাওয়া যাবে [illegible] জোরালো হবে আর ছোটো মাছের প্রতিফলিত ধ্বনি তত জোরালো হ[illegible] প্রতিফলন অবিশ্যি ঠিক মাছের গায়ে [illegible] মাছের পেটের ভেতর যে বায়ুপূর্ণ[illegible] থাকে তা-ই প্রতিফলন ঘটায়।

আগামী দিনে আমাদের দৈ[illegible] জীবনে নীরব ধ্বনি হয়ত এক গুরু[illegible] স্থান অধিকার করবে। বাসন-কোসনে [illegible] থাকা ময়লা তুলতে অনেক সময় হি[illegible] খেতে হয়। অনেক সাবানের বিনিময়ে সে-ময়লা পরিষ্কার হয়। নীরব ধ্ব[illegible] পরিশ্রম লাঘব করতে পারে। এটা [illegible] গেছে, জল বা অন্য কোনো তরলে নীরব ধ্বনি প্রয়োগ করা যায় তাহলে ছোটো ছোটো বুদ্বুদের উৎপত্তি [illegible] বুদ্বুদগুলো উৎপত্তির পরমুহূর্তেই [illegible] যায়। ফলে ঐ তরলে প্রচণ্ড চাপের [illegible] হয়। আসলে বুদ্বুদগুলোর ধ্বংস ও [illegible] ক্রমান্বয়ে চলে। এক সেকেণ্ডে লক্ষবার সৃষ্টি ও ধ্বংসক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। [illegible] ধ্বনির সাহায্যে এই যে বুদ্বুদের সৃষ্টি[illegible] ধ্বংস হওয়ার ক্রিয়া, একে বলা হয় 'ক্যা[illegible] টেশন'। আর ক্যাভিটেশনের ফলে তরল[illegible] মধ্যে অপরিষ্কার জিনিষকে নির্মল [illegible] ক্ষমতা জন্মায়।

ক্যাভিটেশন প্রক্রিয়ার গুণে অ[illegible] চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিস[illegible] তেল আর জলের কথা উল্লেখ করা [illegible] পারে। তেল আর জলে পরস্পর মিশ[illegible] না, এটাই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থে[illegible] জানি। কিন্তু নীরব ধ্বনির ক্যাভিটে[illegible] প্রক্রিয়ায় তেল আর জলকে বিমিশ্র ক[illegible] একটি স্থায়ী অবদ্রব বা ইমালসনরূপে পাও[illegible] যেতে পারে।

নীরব ধ্বনি স্বগুণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে[illegible] জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক[illegible] নিয়েছে। রিউম্যাটিজম্, আর্থ্রাইটি[illegible] ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এ[illegible] এক পরম বান্ধব বলে স্বীকৃতি পেয়েছে[illegible]

বীরু চট্টোপাধ্যায়

...র ভিতর দিয়ে মোটামুটি জোরেই ...লোকটি। অ্যান্টেয়ার্প শহরের সেই ...রাস্তা ধরে চলছিল সে। স্বল্পালো-...দোকানগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় ...বেগ হঠাৎ-ই বাড়িয়ে দিল। বেশ ...এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ...দেয়াল ঘেঁসে। কি যেন ভাবল সেই ...ী দাড়িওয়ালা লোকটি। পকেটে ...কাল তারপর। না, পিস্তলটা ঠিকই ...হলে। অযথাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল

...নজর দিয়ে এবার চারদিকে ...নিল। স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল ...ফনারের মুখে। কেউ তার পিছু ...বুঝতে পারল। আর নেবেই বা কি ...এ লাইনের বহু পুরনো মাল সে। ...জোড়া তার প্রভাব-প্রতিপত্তি। ...হীরা পাচারে তার জুড়ি গোটা ...তে সত্যিই কেউ নেই। অন্যান্য সব ...চারকারীই তাকে সেলাম জানায়। ...কার্ল হফনারকে অনুসরণ করা? ...।

...ল জানে মার্কিন কাস্টম বছরে বৈধ ...আনীত মালের উপর প্রায় ২০ কোটি ...আদায় করে থাকে। এসব মাল আসে ...জার দশেক জাহাজের আনুমানিক ...যাত্রী মারফৎ। তাছাড়া ৯ লক্ষ প্লেন-...কাছ থেকেও আদায় হয় ৯ কোটি

...তু দেড় থেকে আড়াই কোটি ডলার ...ডিউটি ফাঁকি দেয় একদল মানুষ। ...ই কৃতিত্বের কিছু অংশের অধিকারী ...র্ল সে কথা ভেবে তার আত্ম-...সীমা নেই। বলা বহুল্য, এ ব্যাপারে ...সরিক আর পঁচিশ হাজার ডলারই ...য়, আজগুবি কমিশনও রয়েছে

তবু সাবধানের মার নেই। কার্ল কয়েক মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাসে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। পূব দিক থেকে কি একটা শব্দ ভেসে আসছে না? ওহ্‌হো—ওটা চলন্ত একটা ট্রলির আওয়াজ। বাঁচা গেল।

এরপর সে সরু রাস্তার ওপারে একটা পুরনো তিনতলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এ বাড়িতেই বাস করে রিতা ও মর্টন অস্টারওয়াল্ড।

কিন্তু কার্লের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে সত্যিই তাকে একজন আগাগোড়া অনুসরণ করে আসছে।

বর্তমানে সে বাড়িটির বিপরীত দিকের একটি 'বারে' বসে সব কিছু লক্ষ্য রাখছিল।

এ লোকটির নাম অনুক্তই থাক। একে আমরা অভিহিত করবো একটি নম্বরে।

সেটি হল : ২০৯।

ইনি ইউ এস ট্রেজারি বিভাগের সুদক্ষ গোয়েন্দা এজেন্ট নং ২০৯।

ইউ এস কাস্টম কর্তৃক বেলজিয়ামে প্রেরিত মানুষটিকে তার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হবে একজন স্থানীয় দুঃস্থ নিম্নবিত্তের মানুষ। প্যান্ট, কোট, টাই সবই সস্তা আর পুরনো। টুপিটাও অদ্ভুত তোবড়ানো। মেক-আপ মাহাত্ম্যে তাকে কেমন রুগ্ন ও বোকা বোকা মনে হয়। অর্থাৎ কারুরই নজরে পড়বার মত চেহারা আদৌ নয়।

বিয়ারের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে গোয়েন্দা তার পরবর্তী কার্যক্রমটা মনে মনে ছকে নিল। দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করতে হবে এবার। পকেটের পিস্তলটা স্পর্শ করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

যদি এ বাড়ির মারফৎ সেই ৫ লক্ষ ডলার মূল্যের হীরা চালানের ব্যবস্থা হয় তবে হাতেনাতেই ধরে ফেলবে এবার। আর ঠিক একারণেই ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই মঙ্গল।

অবশ্য বেলজিয়মের নাগরিক ঐ দাড়িওয়ালা হফনারকে গ্রেপ্তার বা তল্লাসী করবার কোন এক্তিয়ার নেই তার। আর এ বাড়ির তিনতলার ঘরের দুঃস্থ ভাড়াটে দম্পতি রিতা ও মর্টনের ব্যাপার তো আরও জটিল।

মাসখানেক আগে যখন এই দম্পতিকে মার্কিন কনসুলেট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল এবং বাইরে এসে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কার্লের সঙ্গে মিলিত হতে লক্ষ্য করল, তখনই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের সন্দেহ হয়েছে যে, এই দম্পতি খুবই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়েছে এবং অচিরেই কার্লের খপ্পরে পড়ে হীরার চোরাচালানের বাহক হতে বাধ্য হবে।

পুরনো বাড়িটির তিনতলার একটি জানালায় জনৈকা মহিলার হাত দেখা গেল। একটানে জানালার পর্দাটি টেনে দিল সেই মহিলাটি।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক জানে যে কোন পরদেশে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে চোরাচালান সম্বন্ধে কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলে না। কেননা যতক্ষণ না মাল অবৈধভাবে তার নিজ দেশের চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করে ততক্ষণ সেটা আইনগ্রাহ্য কোন অপরাধ নয়, স্মাগলিং নয়।

কিছু বলতে গেলে বিদেশী সরকার চোখ রাঙিয়ে বলতে পারে, তুমি কি করে জানলে হে যে এ মাল কাস্টমস-এর কাছে 'ডিক্লেয়ার্ড' হয়ে যাবে না?

এজেন্ট নং ২০৯ উঠে বাইরে এল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঝটকরে বিপরীত দিকের সেই পুরনো বাড়িটার একপাশের গলিতে ঢুকে পড়ল।

দুবাড়ির মধ্যে ফাঁক হাত দেড়েকের, একটি বাড়ি গুদামগোছের, খালি। অন্ধকার সরু গলি। যেভাবেই হোক তিনতলা সমান দেয়াল বেয়ে উঠে উক্ত তিনতলার ঘরে কি ঘটছে দেখতেই হবে।

যে কাজের জন্যে সে এদেশে এসেছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানী ও বন্দর থেকে প্রতি বছরই অবৈধভাবে আজগুবি অর্থের হীরা চালান যায় মার্কিন দেশে। সে সবের মূলে সূত্র সন্ধানের উদ্দেশ্যেই তার বেলজিয়মের এই শহর, স্মাগলারদের তীর্থক্ষেত্র অ্যান্টওয়ার্পে আগমন।

অনেক খবর সে সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যে।

এমন কি অস্টারওয়াল্ড দম্পতির জীবনেতিহাসও তার নখদর্পণে এখন।

যাই হোক, অন্ধকারের মধ্যে গুদোম বাড়ির প্রায় ছাদ থেকে লোহার দড়ির মত কি একটা ঝুলছে দেখা গেল। সেটা ধরে একশ বিয়াল্লিশ পাউন্ড ওজনের এজেন্ট মশায় জিমন্যাস্টদের মত উপর দিকে উঠতে লাগল। বিপজ্জনক প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

দোতলা থেকে তিনতলায় উঠল। গুদোম বাড়ির ছোট্ট রেলিংঘেরা একটু ঝুলে বারান্দা পাওয়া গেল। সেখানে উঠে একটু আড়াল থেকে সামনের বাড়ির অস্টারওয়াল্ড দম্পতির রান্নাঘরটি দেখা যায়।

সেখানে ডাইনিং টেবিলের পাশে বসে আছে ২৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী রিতা, এককালে চেহারা মন্দ ছিল না মনে হয়। বছর তিরিশ বয়স্ক স্বামী মর্টন বসেছে তার পাশে। বেকার, হ্যাগার্ড গোছের দেখতে। উল্টোদিকে বসে আছে মস্তান চেহারার কার্ল হফনার।

টেবিলে দেখা গেল একটি ছোট্ট শ্যাময় লেদারের থলে থেকে বিভিন্ন আকারের অনেকগুলি হীরা ঢালা আছে।

সাবাস! চমকে উঠল এজেন্টটি। অবশেষে পাওয়া গেছে।

ওরা কথা বলছিল। কথা অবশ্য শোনা যাচ্ছিল না এতদূরে থেকে। হাতমুখ নেড়ে কার্ল উক্ত দম্পতিকে কি যেন বোঝাচ্ছিল। তবে আলোচ্য বিষয় বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না এজেন্ট নং ২০৯-এর।

এবারে রিতার কথায় আসা যাক।

১৯৪৩-এ চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওর পিতামাতাকে নাৎসীরা হত্যা করে। ওকে নিয়ে আটক রাখে একটি কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পে। বহু অত্যাচারে জর্জরিতা হয়ে এই অনাথ বালিকা একসময় বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে ১৯৪৬-তে এসে পৌঁছয় অ্যান্টোয়ার্প-এ। ১৯৪৭......১৯৪৮...... ১৯৫০-এ রিতা মার্কিন কন্স্যুলেটে গিয়ে ওদেশে প্রবেশাধিকারের জন্য আবেদনপত্রে সই করে। জাহাজ ভাড়া সংগ্রহ করতে না পারায় প্রতিবারই ভিসা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৫০-এ আরেক রেফুজি নিঃসঙ্গ অথচ ভালমানুষ মর্টনের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয় এবং পরে বিবাহসূত্রে আবন্ধ হয়। এবার স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ফের মার্কিন কন্স্যুলেটে আবেদনপত্র পেশ করে।

২০৯নং এজেন্ট ১৯৪৯ সাল থেকেই এ শহরে লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের চোরা-কারবারীদের ধরবার প্রচেষ্টায় রয়েছে। বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। অথচ ওয়াশিংটন থেকে তার উপরওয়ালার কড়া চিঠি আসছে, কি করছ ওখানে। অ্যান্টোয়ার্প থেকে অবৈধ হীরে চালান যে ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! দুচারজন বাহক যে নিউইয়র্ক বন্দরে ধরা না পড়ছে তা নয়। কিন্তু শত জেরার মুখেও তাদের কাছ থেকে রাঘববোয়াল চোরাকারবারী বা তাদের বাঘা বাঘা পরিচালকদের নাম বের করা যাচ্ছে না। বাজারের বৈধ ব্যবসায়িগণ সাংঘাতিক প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অবৈধ চালানের ঠেলায় তাদের ব্যবসাপত্র লাটে ওঠবার দাখিল হয়েছে। সরকার কি এর কোন বিহিত ব্যবস্থা করবেন না? কালোবাজারে অজস্র হীরে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ কাস্টমের এতবড় বজ্রআঁটুনিও স্মাগলারদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

২০৯নং এজেন্ট বুঝতে পারলো কার্লের কায়দাটি। বাহক নির্বাচন ঠিকই হয়েছে। এই দম্পতি ভিসার পর ভিসা অর্থাভাবে নষ্ট করছে। অথচ মার্কিন দেশে যাবার এদের সাংঘাতিক বাসনা। এরাই উপযুক্ত। এদের জাহাজ বা প্লেন ভাড়া দাও, তাহলে এরা যে কোন কাজ করতেই রাজী হবে। হয়েছেও তাই।

অবশ্য পাচারকারী বাহকদের পূর্বাহ্নে কিছু ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। তার আগে প্রয়োজন স্মাগলারদের গোয়েন্দা দিয়ে বাহকদের সব কিছু জেনে নেওয়া। এরা বিশ্বাসী কিনা সেটা সবচেয়ে আগে যাচাই করা দরকার।

প্রতি বছরই কিছুসংখ্যক বাহক পাচারকারী ধরা পড়ে। ১৯৫৯-এ ৩৫ জন ধরা পড়েছে। এদের সঙ্গে হীরা আর সোনা মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকার মাল ছিল। ধরা পড়বার তিনটি কারণ : (১) ইয়ো-রোপের আন্ডারওয়ার্ল্ড চর কর্তৃক মার্কিন কাস্টম বিভাগকে গোপন সংবাদ প্রদান। (২) কাস্টম অফিসারদের তীক্ষ্ন স্মরণশক্তি, তারা বেশ কিছু বছর বাদেও মুখ দেখে চিনে ফেলতে পারে পুরনো দাগীদের এবং অপরাধী ধরনের মানুষদের। আর (৩) 'ইন্সপেক্টোস্কোপ' নামক একটি বিস্ময়কর যাদু-মেশিন।

ধরা পড়ে সামান্য। পার হয়ে যায় অধিকাংশ। এরা সাধারণ ভদ্রলোক, এ নিরীহ গোছের দুঃস্থ মানুষ, যাদের কোন পূর্বতন রেকর্ড নাই অপরাধের। এরা নিঃসন্দেহে পার হয়ে যায়। কাস্টম অফিসারগণ এদের মালপত্র তল্লাসী করেও চোরাই মালের কোন হদিশ করতে পারে না। অথচ আসছে, হুহু করে চোরাই চালান আসছেই।

অস্টারওয়াল্ড দম্পতি মন দিয়েই কার্লের বক্তৃতা শুনছিল। তবে তাদের ভীত ভীত মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে ওরা বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। ফিরে ফিরে বিস্ফারিত নয়নে টেবিলে ঢালা জ্যোতির্ময় হীরের টুকরোগুলি দেখছিল। দাড়িওলা কার্লকে শয়তানের প্রতিমূর্তি মনে হচ্ছিল। বোধ করি সে প্রচুর আর্থিক প্রলোভন দেখাচ্ছিল। যে অর্থ ওদের মার্কিন দেশে যেতে এবং সেখানে গিয়ে কিছুকাল স্বচ্ছল-ভাবে থাকতে সাহায্য করবে। এ প্রলোভন দুর্জয় সন্দেহ কি।

এজেন্ট তীক্ষ্ন নজরে লক্ষ্য করছে সব। আশা করছে নতুন কিছু অবশ্যই দেখা যাবে। সাধারণত কার্লেরা নির্বাচিত বাহকদের বাক্স, সুটকেস বা লাগেজ পরীক্ষা করে দেখে। এক্ষেত্রেও তাই হল। মর্টন পাশের ঘর থেকে দুটো সস্তা দামের সুটকেশ নিয়ে এল। কার্ল বিশেষজ্ঞের মত ভঙ্গিতে সুটকেশ দুটোকে উলটে পাল্টে আগা পাশ তলা মায় হ্যান্ডেল তালা প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। মাথা নাড়ল সে...না পছন্দ হয়নি তার। এ চলবে না...

এজেন্ট মশায় ভাবতে লাগলেন এইসব পাচারকারীদের বিভিন্ন ও বিচিত্র কৌশল-গুলির কথা। যেমন মেয়েদের মোজার ভেতরকার লাইনিং, ভেতরে গর্ত করা বই, ফাঁপা টুথপেস্ট টিউব, সেভিং স্টিকের ফাঁকা পাত্র, ফাউন্টেন পেনের ক্লিপের কাছে গোপন স্থান, পোশাক-পরিচ্ছদের গুপ্ত পকেট ও লাইনিং ইত্যাদি ইত্যাদি। পাকা লোক কার্ল এসব পুরনো কৌশলে অবশ্যই যাবে না, একথা বুঝল এজেন্ট নং ২০৯। তাছাড়া হীরের সংখ্যাও অনেক বেশি। উপরোক্তভাবে এতগুলি হীরে পাচার করা সম্ভব নয়। এমন কি দেহের গুপ্ত স্থানে প্রবিষ্ট করা বেদনাদায়ক টিউবেও এতগুলি মাল ধরা সম্ভব নয়।

কার্ল এবার পকেট থেকে এক বান্ডিল নোট টেবিলের ওপর রাখল। রিতা সেগুলি তুলে নিয়ে তার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। কথা বলতে বলতে কার্ল হীরেগুলি ফের শ্যাময় লেদার ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যান্ডসেক করল। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

আর সময় নেই। এজেন্ট নং ২০৯ গুদাম বাড়ির ঝুল বারান্দা থেকে লোহার দাঁড় বেয়ে নিচে নেমে এল নিঃশব্দে ও অলক্ষ্যে।

কার্লকে অনুসরণ করে যেতে হবে ওকে নজরের বাইরে রাখলে চলবে না। তাহলেই সব পন্ড হবে। একমুহূর্তের জন্য ওকে চোখের আড়াল করা চলবে না।

জানুয়ারি মাসের হাড়কাঁপানো শীতের রাত।

কার্ল অ্যান্টোয়ার্পের ওই দরিদ্র পল্লীর পথ ছেড়ে শহরের অভিজাত মহল্লায় এসে পড়লো। বড় বড় ফ্যাশানেবল দোকান দুদিকে, চওড়া আলোকিত জনবহুল রাস্তা। জুয়েলারি, পোশাক ও টেলারিং-এর দোকান। নিয়ন সাইনের আলোয় সজ্জিত জাহাজ ও এয়ারওয়েজ-এর বহু অফিস রয়েছে এ অঞ্চলে।

বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে এজেন্ট নং ২০৯ অনুসরণ করে চলল কার্ল হফনারকে। এজেন্ট জানে কার্ল বোকা নয়, সে নিজে টিকিট কিনবে না। তাছাড়া রিতার হাতে তো এক বান্ডিল নোটই দিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে কার্ল একটা দোকানে ঢুকে চারটে কাঠের হ্যান্ডেলওয়ালা কোট ব্রাশ কিনলো। তাহলে কি কাঠের হ্যান্ডেল খুলে গর্ত করে মাল ঢুকিয়ে ফের লাগিয়ে হীরেগুলো পাচার করবে নাকি? হবেও বা আবার নাও হতে পারে। তবু এজেন্ট খাঁটি সব কিছু টুকে নিল। সংবাদটা নিউইয়র্ক কাস্টমসকে জানিয়ে দিতে হবে পূর্বাহ্নে।

রাত ৮-৩৪ মিঃ। কার্ল হফনার [illegible] উঠল অভিজাত পল্লীতে এক [illegible] অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। এখানেই সে বসবাস করে। দুজন মার্কিন এজেন্ট ওর [illegible] সংবাদ সংগ্রহ করেছে যে কার্ল [illegible] তরুণী, যে স্ত্রীও হতে পারে বা মিস্ট্রেস হতে পারে, তার সঙ্গে এখানে রাজার [illegible] বাস করে। অথচ এ শহরে তার কোন [illegible] বা ব্যবসা-বাণিজ্য নাই। তাহলে এত [illegible] টাকা আসে কোত্থেকে?

এজেন্ট নং ২০৯ দ্রুত এক পাবলিক টেলিফোন মারফৎ শহরের অপর [illegible] ইউ এস ট্রেজারির জনৈক প্রতিনিধিকে কিছু জানিয়ে দিল। অনুরোধ করল [illegible] পাঠিয়ে এ বাড়িটির দিকে অহোরাত্র [illegible] রাখতে। সে অবশ্য জোঁকের মত লেগে [illegible] কার্লের পেছনে একথা বলতেও ভুললো [illegible]

রাত ৯টা ৫ মিঃ। বিপরীত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা এজেন্ট চমকে উঠল। কার্ল সেক বান্ধবীসহ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ!

তারা দক্ষিণ দিকে ব্যবসায়িক অঞ্চলের দিকে চলতে লাগলো। যথানির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে এজেন্টও চলতে লাগলো পিছু পিছু। চোখের আড়াল না হয়।

৯-৩০-এর সময় সঙ্গিনীসহ কার্ল য় প্রবেশ করল অভিজাত এক ডিপার্ট-টাল স্টোরে।

কার্ল সারাক্ষণই গম্ভীর, যেন খানিকটা বিরক্ত মুখ নিয়েই সম্প্রদান করছে মেয়েটির। মেয়েটি একে একে অনেক কিছু কিনলো, যেমন: সোনার ইয়ারিং, সেন্ট, পাউডার, একটি কাশ্মীরি সোয়েটার এবং পাঁচ জোড়া জুতো।

স্টোরের ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে নজর রেখে এজেন্ট ঠিক অনুসরণ করে চললো। লক্ষ্য করল এতক্ষণ যে বিরক্ত ছিল, জুতো কেনবার সময় তার মেজাজ কেমন যেন শরিফ হয়ে উঠেছে। এরপর তারা ফের বাড়ি ফিরে গেল।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী মার্কিন অনুসন্ধানকারীরা এজেন্ট নং ২০৯-এর সঙ্গে আলোচনায় বসল। সেগুলো ব্যাপার তাদের কাছে বেশ রহস্য-জনক মনে হল। তাদের গোপন সংগৃহীত সংবাদে দেখা যায়:

রিতা অস্টারওয়াল্ড নিউইয়র্ক যাবার একটি প্লেনের টিকিট ক্রয় করেছে স্থানীয় এক ট্রাভেল এজেন্ট অফিস থেকে। একটা কেন? স্পষ্ট বোঝা গেল স্বামী মর্টন ওর

হীরকাঙ্গুরীয়
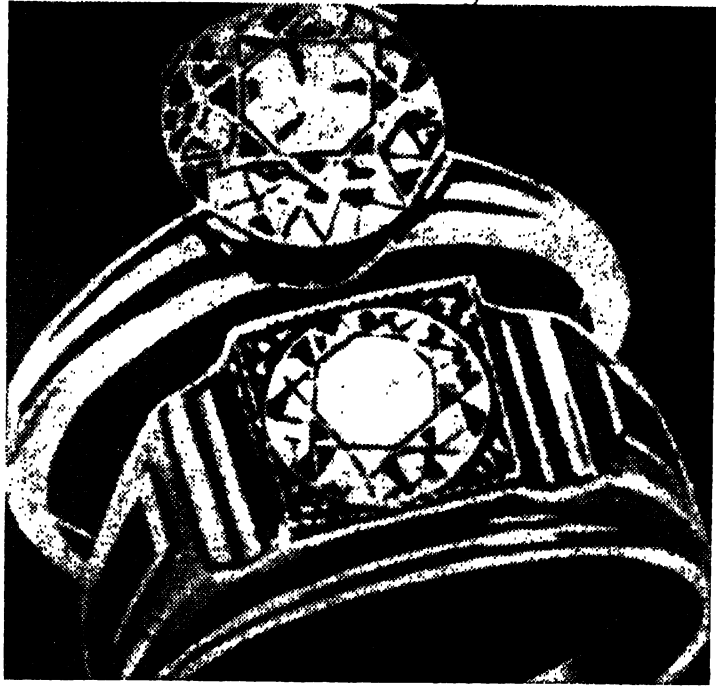
সঙ্গে কে এল এম প্লেনে যাচ্ছে না। দুদিনের মধ্যেই সে প্লেন ছাড়বে।

আর হফনার রিতাদের বাড়ি একটা লাল রঙের ইমিটেশন সুটকেস নিয়ে ঢুকেছিল ইতিমধ্যে কিন্তু বেরিয়ে আসবার সময় সেটা তার সঙ্গে দেখা যায় নি। আর মনে হয় সেই হীরকখণ্ডগুলিও বর্তমানে ওর হেপাজতে নেই। এটা অবশ্য মার্কিনী-দের অনুমান। নিঃসন্দেহে সেগুলো এখন রিতার কাছেই হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

সব কিছু সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে এখান থেকে নিউইয়র্ক কাস্টম অফিসে একটি কেবল্ পাঠানো হল: সোমবার আইডল্ ওয়াইল্ড বিমানক্ষেত্রে কে এল এম ৬৩৭ নং প্লেনে রিতা অস্টারওয়াল্ড-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

বিস্ময়কর যন্ত্র: ইন্সপেক্টোস্কোপ

যথানির্দিষ্ট সময়ে কে এল এম বিমানটি অ্যাটলান্টিক পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে বন্দরের মাটি ছেড়ে এক সময় আকাশে উঠে এল। ভেতরে বসে আছে রিতা। সঙ্গে এনেছে লাল স্যুটকেসটি আর সস্তা একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। রিতার সিটের নম্বর ৪২। ঠিক ওর পেছনের ৪৬নং সিটে একজন কেতাদুরস্ত পোশাকপরা যুবক বসে বসে বই পড়ছে দেখা গেল। ২০৯ নং এজেন্ট-এর পূর্বেকার সেই হ্যাগার্ড চেহারা আর নেই। এখন সে আদি ও অকৃত্রিম নব্য ও ভব্য যুবক। প্লেন ছাড়বার আগে স্বামী বা হফনার বিদায় জানাতে এসেছিল; কিন্তু তারা ২০৯ নং কে একজন সাধারণ যাত্রী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি।

বিশালকায় যাত্রীবাহী প্লেনটি নিস্তরঙ্গ গতিতে অ্যাটলান্টিকের নীল-কালো জলের উপর দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে উড়ে যাচ্ছিল। অন্য সময় হলে ২০৯ নং আড়মোড়া ভেঙে নিশ্চিন্তমনে পুস্তক পাঠ বা নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত করত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য। রিস্টওয়াচের দিকে তাকালো সে। মাত্র কয়েকটি মূল্যবান ঘণ্টা তার হাতে রয়েছে।

এরই মধ্যে বার করতে হবে হীরকগুলি কোথায় লুকিয়ে নিয়ে চলেছে রিতা...।

রিতা কিন্তু নির্ভাবনায় চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল। মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে জেগে উঠে এক হাঁটু থেকে আরেক হাঁটুর ওপর পা রাখছিল পর্যায়ক্রমে। হাঁটু দুটি মেয়েটির বেশ সুন্দর সন্দেহ নেই। পা দুটি সম্বন্ধে এত সাবধান কেন? ২০৯ নং ভাবলে, মোজার ফাঁকে বা অন্তর্বাসের কোথাও রেখেছে কি হীরেগুলি? না, এত সহজভাবে কি নেবে...। তবে কি ভ্যানিটি ব্যাগটার মধ্যে? উঁহু, তাও সম্ভব নয়। ছফনায় যতগুলি হীরক দেখিয়েছিল সেগুলি সবই যদি নিয়ে এসে থাকে তাহলে অতটুকু ভ্যানিটি ব্যাগে তা ধরবে না।

কিন্তু কোথায় তাহলে?

২০৯ নং এজেন্ট সিট থেকে উঠে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হল প্লেনের পেছনদিককার একটি কামরায়। সেখানে দুটি রূপসী স্টুয়ার্ডেস বসে বসে কফি খাচ্ছিল।

যাত্রীটিকে ঢুকতে দেখে দু'জনেই সোৎসুকভাবে মুখ তুলে চাইল।

একজন জিগ্যেস করলে, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন স্যার?

এজেন্ট মাথা নেড়ে অস্বীকার করে ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর নিজ পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড ও ব্যাজ প্রদর্শন করলো তরুণীদ্বয়কে।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন তরুণীই বোধকরি সতর্ক হয়ে গেল। একজন স্মরণ করিয়ে দিল, দেখুন স্যার আপনাদের মার্কিন দেশের ১২ মাইল দূরত্বের মধ্যে প্লেন প্রবেশ না করা পর্যন্ত আপনি তো কিছু করতে পারেন না।

মেয়েটি চমৎকার ইংরেজিতে বলল কথাগুলি। রাগতভাবে নয়, বেশ কোমল কণ্ঠেই।

এজেন্ট সে আইন জানে। মেয়েদের পেছনে রয়েছে ধাতব র‍্যাক, তাতে থরে থরে সাজানো রয়েছে যাত্রীদের মালপত্র। প্রায় ৬০টি স্যুটকেস ও প্লেনযাত্রার উপযোগী অন্যান্য বহু বাক্স রয়েছে তাতে।

—দেখুন, এজেন্ট বলল, আমার সন্দেহ-জনক মেয়েটি একটি লাল স্যুটকেস এনেছে। সে যাত্রীর নাম রিতা অস্টারওয়াল্ড।

স্টুয়ার্ডেস র‍্যাকের দিকে চেয়ে অনু-সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে আঙুল দিয়ে দেখালো একটি লাল স্যুটকেস, বলল, এইটিই হল রিতা অস্টারওয়াল্ডের লাগেজ। তবে দেখুন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এসব ব্যাপারে......।

মুস্কিল তো হল আইন। ২০৯ নং জানে যতক্ষণ না প্লেন দেশের বারো মাইল আওতার মধ্যে প্রবেশ করছে, ততক্ষণ কোন কিছু তল্লাসী করবার অধিকার তার নেই। অবশ্য এ তল্লাসীর দ্বারা নিউইয়র্কে অপেক্ষমান কাস্টমস অফিসারদের কাজেও সে খানিকটা বিঘ্ন ঘটাবে সন্দেহ নেই। তারা রিতার জন্যে অপেক্ষা করে আছে আইডল্ ওয়াইল্ড বিমানক্ষেত্রে। কিন্তু তবুও, তাকে জানতে হবেই মাল কোথায় আছে বা কিভাবে বহন করে নিয়ে চলেছে।

একটা বুদ্ধি এল মাথায়, স্টুয়ার্ডেসকে বলল, দয়া করে যদি আমার স্যুটকেসটা নামিয়ে দেন। বলে আঙুল দিয়ে রিতার থেকে চারটে তাক নিচেকার একটা নীল চামড়ার স্যুটকেসের প্রতি নির্দেশ করলো। স্টুয়ার্ডেস মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ওকে একটা রসিদে সই করতে বলে একটা ছোট সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে স্যুটকেসটি এনে এজেন্টের কাছে দিতে এজেন্ট তাকে বকশিস হিসেবে কয়েক ডলার দিতে গেলে তরুণী ধন্যবাদের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলো।

এজেন্ট যখন তার স্যুটকেসটাকে একটু কষ্ট করে নিজের সিটের দিকে বয়ে নিয়ে ফিরে আসছিল বিশাল প্লেনটা তখন সামান্য কাৎ হল কি কারণে। নিজের ৪৬নং সিটে ঢোকবার আগে প্যাসেজের মধ্যেই আলগা করা তালা খুলে গিয়ে ডালা গেল খুলে এবং স্যুটকেসের সমস্ত জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো। এ সমস্ত কিছুই তার পূর্বপরিকল্পিত কৌশল।

—ধুত্তুরি, দেখলে কান্ড! কি বোকার মত কাজ করলাম, সকলকে শুনিয়ে বলে উঠল এজেন্ট। শুনে প্রায় ৫।৬জন কাছাকাছি যাত্রী হেসে ফেলে উঠে এল এজেন্টকে জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলতে সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু রিতা এল না।

জিনিসগুলি ফের স্যুটকেশে ঢোকানো হল। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ সিটে সে বসতেই দেখা গেল সহসা ব্যস্তসমস্ত হয়ে রিতা উঠে চলে গেল পেছনদিককার সেই মালপত্রের কামরার দিকে।

কয়েক মিনিট বাদেই ফিরে এসে রিতা নিজ সিটে বসে পড়ল। মুখচোখ হাবভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সে যেন স্বস্তি পেয়েছে, কি এক দুশ্চিন্তার যেন নিরসন হয়েছে তার। এরপর পা থেকে কালো জুতো জোড়া খুলে একপাশে সযত্নে রেখে তন্দ্রা-দেবীর আরাধনায় মগ্ন হল।

এজেন্ট আর উক্ত কামরায় ফিরে গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই স্টুয়ার্ডেসের একজন এগিয়ে এল তার কাছে। এজেন্টের হাতে একটি ভাজ করা কাগজ দিয়ে বললে, স্যার, আপনার রসিদটা ফেলে এসেছিলেন।

সেটা খুলে দেখা গেল তাতে লেখা: রিতা অস্টারওয়াল্ড চাবি দিয়ে তার স্যুটকেস খুলে ফের বন্ধ করে দিয়েছে। কোন জিনিস বাইরে বার করে নি।

এজেন্ট বুঝলেন,, ওর স্যুটকেস খুলে যাওয়া দেখে চিন্তিত হয়ে রিতা গিয়ে নিজেরটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে এল। তালা বন্ধ আছে কিনা দেখে এল। যাক তাহলে রিতার ওপর মনস্তাত্ত্বিক কৌশলটা খেটেছে। বোঝা গেল স্যুটকেস সম্বন্ধে ও অত্যধিক সচেতন। গভীর কোন রহস্য আছে সেখানে।

সেই সোমবারের সন্ধ্যায় আইডল ওয়াইল্ড বিমানক্ষেত্রের জনৈক কাস্টম ইন্সপেক্টরের কাছে রিতা তার 'ডিক্লেরেশন' দিল। তাতে লেখা 'ব্যক্তিগত জিনিসপত্র মাত্র'। আগেই কোডেড মেসেজ ছিল। ইন্সপেক্টর আইজেনবার্গ রিতাকে নিয়ে গেল অদূরে অবস্থিত স্কোয়াড-রুমে।

আইজেনবার্গ যখন ওর স্যুটকেসের তলার সরু কাঠামোগুলি খুলে ফেলছিল, রিতা ভাবলেশশূন্য মুখ নিয়ে চেয়ারে বসে ছিল। সেখানে কিছু পাওয়া গেল না। তারপর অফিসার সন্তর্পণে কাঠের ফ্রেম থেকে স্যুটকেসের চামড়াই সরিয়ে নিল। সেখানেও কিছু নেই। স্যুটকেসের মধ্যে অন্যান্য সব জিনিসের মধ্যে পাওয়া গেল চারটি পোশাকের ব্রাশ। কাঠের হ্যান্ডেলের স্ক্রু খোলা হ'ল। এক টুকরো হীরাও নেই। সস্তা ভ্যানিটিব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল কিছু খাদ্য, রোস্ট চিকেনের টুকরো, রুটির স্লাইচ। সমস্ত কিছু কেটে ছড়িয়ে পরীক্ষা করা হল। না, এক কণা হীরেও নেই সেখানে।

উপরতলার প্রাইভেট অফিসে ট্রেজারি বিভাগ এবং কাস্টম অফিসারদের মধ্যে চরম হতাশা ও দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে বসে আছে এজেন্ট নং ২০৯। শতশত ভাবনা খেলা করে যাচ্ছে মনে। পুংখানুপুংখ স্মৃতি-চারণ করে যাচ্ছে সে। অ্যান্টোয়ার্পে দেখা সমস্ত ঘটনা। নীচে তখন নারী ইন্স-পেক্টর ম্যাথিলডা ক্লার্ক বিবস্ত্র হতে আদেশ দিলে রিতাকে। সমস্ত পোশাক আলাদা আলাদা করে প্রতিটি লাইনিংয়ে তন্নতন্ন তল্লাসী কার হল। না, কোন হীরা নেই।

বিশেষ ধরনের ডাক্তারী পরীক্ষা নেওয়া হল রিতার দেহে। না, কোনকিছু সন্দেহজনক পাওয়া গেল না।

ওকে আমরা তবুও ছেড়ে দিতে পারি না, নিষ্ফল ক্রোধে এজেন্ট নং ২০৯ বলে ওঠে, যে ভাবেই হোক, আমি নিশ্চিত যে, রিতা অসওয়াল্ড প্রায় পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের হীরা এদেশে পাচার করবার বাহক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে।

দেওয়াল ঘড়িটার টিক টিক [illegible] মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। [illegible] বুজে ফের ভাববার চেষ্টা করল এজেন্ট [illegible] ওদেশে সেই অনুসরণ, ফ্ল্যাটবাড়ি, দোকান [illegible] রান্নাঘরের কথাবার্তা, রূপসী বান্ধবী [illegible] হফনায়ের বাজার করা, রিতাকে টাকা বান্ডিল দেওয়া, লাল স্যুটকেস পেশা[illegible] দেওয়া, মেয়েটাকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকা......ম্যাথিলডা বেশ বিরা[illegible]

একটি ডলার-বাণ্ডিল পেল রিতার পকেট-বুকে। অথচ হফনারের সংগে পরিচয়ের আগে মেয়েটার সঞ্চয়ে এক কপর্দকও ছিল না।

জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল এজেন্ট-২০৯। একটি তরুণী দ্রুত হেঁটে চলেছে বহির্গামী কোন প্লেনে ওঠবার জন্যে। সুন্দর হাঁটু দুটি। হাঁটু দুটি!! সহসা প্রায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এজেন্ট। সহসা মনে পড়ল রিতাও পায়ের ওপর পা তুলে বসছিল ক্রমাগত, প্লেনের মধ্যে।

জুতো!! হ্যাঁ জুতো!! মনে পড়েছে রিতা একবার জুতো খুলে সযত্নে সিটের সংগে আগলে রেখে চোখ বুজেছিল। আরো মনে পড়ছে হফনার বান্ধবী পাঁচ জোড়া জুতো কিনেছিল। কিন্তু মাত্র চার জোড়া সে নিজে পরে কিনেছে। পঞ্চমটি কোন পায়ের মাপ ব্যতিরেকেই কেনা হয়েছিল। কেন?

দ্রুত ছুটে গেল এজেন্ট নিচে। আইজেন-বার্গ ও ক্লার্কের সংগে গোপনে কি যেন কথা বলল। এদিকে স্কোয়াড-রুমে রিতা ফের পোশাক পরিচ্ছদ পরে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত নিউইয়র্ক শহরের ভিড়ে মিশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। তাই, দাবি করছে তার রিলিজ অর্ডার।

উপায় নেই। আইজেনবার্গ ও ক্লার্ক জানায় লাল সুটকেসে রাখা জুতোজোড়া তারা আগাপাশতলা 'ট্যাপ' করে দেখেছে, কিন্তু তাতে কিছু নেই। রিতার পায়ে যে জুতো সেটা লোফার টাইপের। তাতে লুকিয়ে রাখবার মত কোন গোড়ালি নেই। ফ্ল্যাট সুখতলা। গোড়ালিশূন্য ফ্ল্যাট রবারের। উভয় অফিসার এজেন্ট-২০৯-এর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সন্দেহ নেই কিন্তু তারা নাচার। বিশেষজ্ঞের নিখুঁত পরীক্ষা ও তল্লাসীতে জুতো-বা সুটকেসে কোন সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নি।

—কিন্তু কেন? এজেন্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, কেন তাহলে ঐ স্মাগলার লাল সুটকেসটা রিতার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছিল? কেন সে পুরানো সুটকেসটা বাতিল করেছিল?

লুক্কায়িত এক ছিদ্রপথে এজেন্ট দেখলো ঘরের মধ্যে রিতা তেমনি একবার এ-পা আর একবার ও-পা উপর-নিচ করছে। এক সময় জুতো খুলে সে পায়ের পাতায় হাত বোলালো। নিশ্চয়ই এ-জুতো ওর পায়ে ফিট করেনি। ছোট হয়েছে। কেন-না হফনার এই লোফার টাইপ জুতোটি পায়ের আন্দাজ মাপে কিনেছিল।

'ট্যাপ' করে কোন ফল পাওয়া যাবে না। আইনের সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েও ঐ লোফার টাইপ জুতোটা খুলে চিরে ফেড়ে দেখতে হবে।

রিতা পুনরায় জুতো খুলে দেখাতে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল, একবার তো আপনারা পরীক্ষা করে দেখেছেনই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জুতো খুলে দিল সে।

দশ মিনিটের মধ্যে আইজেনবার্গ লোফার সু থেকে তার রবারের গোড়ালি খুলে ফেলল। হায়, কিছু সেখনে নেই। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করল যে, সমস্ত তলাটায় এক ইঞ্চি পুরু স্পঞ্জের একটা লেয়ার রয়েছে।

বাব্বা, মনে মনে ভাবল এজেন্ট-২০৯, এই দুষ্কৃতকারী দলের দেখছি নিজস্ব জুতোর কারখানাও রয়েছে।

স্পঞ্জের আবরণটাকে টেনে খুলে ফেলা হল। অমনি তা থেকে কালো কালো ছোট সাইজের কতকগুলো ক্যাপসিউল গোছের মাটিতে ঝরে পড়ল। গরম জলে সেগুলি দিতে বেরিয়ে এল এক একটি অপূর্ব না-কাটা হীরের টুকরো। দুটি জুতো থেকে প্রায় চব্বিশটি হীরে বের হল। ওজন করে দেখা গেল এ সবের আনুমানিক মূল্য হবে আড়াই লক্ষ ডলার।

—এখনো পুরোপুরি সমস্ত হীরে কিন্তু আমাদের হস্তগত হয়নি, এজেন্ট-২০৯ মাথা নাড়লো, এর চেয়ে আরো অনেক বেশি পরিমাণ হীরে রিতাকে অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। অ্যান্টোয়ার্পে ওদের ফ্ল্যাটে শ্যাময় ব্যাগে হীরে ছিল পরিমাণে এর ডবল।

অতএব আবার লাল সুটকেসটিকে আনা হল। পুনরায় শুরু হল নতুন ধরনের তল্লাসী। কাঠের কাঠামো ও চামড়া খুলে ফেলতে আগের মতই মনে হল সুটকেসটি 'নির্দোষ'। এরপর কাঠের টুকরো, ফ্রেম ও চামড়া নিপুণভাবে এক স্থানে সাজিয়ে রাখা হল। শুরু চামড়ার বেল্ট খুলে দেখা (কিছু নেই), কব্জা ও স্ক্রু খোলা (কিছু নেই), হ্যান্ডেল খুলে দু'ভাগ করা হল —তাতেও কিছু পাওয়া গেল না। পরে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে সুটকেসের প্রতিটি অংশ সূক্ষ্ম ওজনযন্ত্রে স্থাপন করা হল।

এবারে একসময় অকস্মাৎ চমকে উঠল আইজেনবার্গ। দৈর্ঘ্যের দিকের একটি কাঠের ফ্রেম সুটকেসটির অন্যান্য ফ্রেমের চেয়ে অনেকটা ভারি দেখা গেল। যদিও প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ হুবহু একই সাইজের।

কাস্টম বিভাগের কাঠের মিস্ত্রি ও বিশেষজ্ঞদের ডেকে আনা হল। তারা প্রায় শল্যচিকিৎসকের প্রবর ও নিপুণতার সেই ওজনে ভারি ফ্রেমের একটি মাত্র কাঠকে খুলে ফেললো। দেখা গেল সে কাঠটি নিশ্ছিদ্র নয়, অপরাপর কাঠের মত। সেটি লম্বালম্বি ফাঁপা। এক ইঞ্চি পুরু একটি গর্ত চলে গেছে আগা থেকে গোড়া অবধি। অদ্ভুত কাঠের কাজ। বাইরে থেকে কারুর সাধ্য নেই যে, ভাবে সেটা ফাঁপা, বা এক কাঠের নয়। চামড়াবিশেষজ্ঞদের মত কুখ্যাত দলে তাহলে অসীম পারদর্শী ছুতোর মিস্ত্রীও আছে। সেই নলের মত ফাঁপা স্থানে লম্বা একটি উড়মানোর তুলো ঢোকনো আছে। সেই তুলো বের করতে বেরিয়ে এল অনেকগুলি প্যাকেটভর্তি হীরকখণ্ড। এগুলোর দামও মোটামুটি দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ডলার।

১৫৯১ খৃঃ অব্দের ১৯শে মার্চ ক্রন্দন-রতা রিতা বিচারপতির দণ্ডাদেশ শুনলো ১৮

ক্রন্দনরতা রিতা অস্টারওয়াল্ড। পাশে জুতার সুকতলা খুলে পরীক্ষারত কাস্টমস অফিসার

মাসের জেল। গুরুদন্ড নয়। কেননা প্রত্যেকেই বিবেচনা করল মেয়েটি অবস্থা-বিপাকে একটি ঘাগী দলের শিকার হয়েছে প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বে। মেয়েটি নাৎসীবাদী শিবিরে বহুদিন নিপীড়িতা হয়েছে। তাছাড়া এর পূর্বে কোন পুলিশ রেকর্ড নেই।

সুতরাং ক্ষিতা বছর না পুরতেই মুক্তি পেল। ওকে নিয়ে যাওয়া হল এলিস আইল্যান্ডে। এখানে ডিপোর্টেসানের ব্যবস্থা হবে। দেশহীন কোন মেয়েকে কোন দেশই নিজ-নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করে না। বর্তমানে মার্কিন দেশের কোন এক স্থানে নাগরিকত্বহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে রিতা অস্টারওয়াল্ড।

এই কেস ধরা পড়বার পূর্ব পর্যন্ত বাৎসরিক প্রায় দুই কোটি ডলার মূল্যের হীরা মার্কিনদেশে অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করত। এ-ঘটনার পর অ্যান্টোয়ার্প ইউ এস এ চোরাচালান বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সাময়িকভাবেই।

সাময়িকভাবে বলা হল যেহেতু এটা রইল মোটামুটি ১৯৬০ পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক হীরক চোরাই চালানীদের অজ্ঞাত সমিতিকে বলা হয় 'দি ইনসিওরার সিপিং সিন্ডিকেট'। আসলে ধরা পড়ে বাহকেরা। কর্তৃপক্ষের এ-ধারণার মূলে প্রকৃতই সত্য নিহিত আছে যে, বহু সাধু ব্যবসায়ীও ইয়োরোপের এইসব ক্রিমিনালদের সাহায্য নিয়ে থাকে হীরা আমদানীর ব্যাপারে। কারণ হল, আমদানী শুল্ক ফাঁকি দেওয়া।

পূর্ববর্ণিত রিতার ব্যাপারে বেলজিয়াম পুলিশও কিছু সুবিধে করতে পারবে না। তারা কার্ল হফনার, তার মিস্ট্রেস, জুতো-শিল্পি বা জুতোর মিস্ত্রি কিংবা দলের আর কাউকেই খুঁজে পাবে না। এর পেছনে যেসব রাঘববোয়ালেরা আছে, তারা সব ধনী ক্রোড়পতি। টাকার খেলায় এবং সামাজিক ছদ্মবেশে চিরকালই তারা পর্দার অন্তরালে থেকে যায়। অথচ এদেরই দাবার চালে লক্ষ কোটি টাকার চোরাইচালান সংঘটিত হয়ে থাকে।

রিতার কাছে পুলিশ একটি কোড-ভাষায় লিখিত পত্র পায়। পত্রটি নিউইয়র্ক শহরের কোন একজন 'এক্স'-কে লেখা হয়েছে। যদি ধরা না পড়ত তো এই চিঠি নিয়ে বিশেষ একটি হোটেলে গিয়ে উক্ত 'এক্স'-এর হাতে তুলে দিত পাচার করে আনা হীরকখণ্ডসমূহ। বোঝা গেল, এদের চর সর্বত্র। রিতা ধরা পড়তেই সুদূর বেলজিয়াম থেকে হয়ত সাবধানবাণী এসেছে, আর উক্ত মিঃ এক্স অচিরে হাওয়া হয়ে গেছে।

কোন তথাকথিত সাধু ব্যবসায়ী ইয়োরোপ থেকে কেনা হীরা-জহরতের উপর আরোপিত মার্কিনী কাস্টম ডিউটি ফাঁকি দেবার ইচ্ছে করে তো সে কোড-ভাষায় লিখিতপত্রে উক্ত স্মাগলার সমিতিকে 'বাংকার এবং কনসাইনার' এই ছদ্মনামে জানায়।

অমনি চোরাচালানদের সমিতি তাদের নিয়ম মত টাকায় দু'আনা কমিশনে হীরা-জহরত কাস্টমস্-এর চোখে ধুলো দিয়ে পেঁছে দেবার গ্যারান্টি দেয়। এদের কাজ এত পাকা যে তীক্ষ্ম শ্যেনদৃষ্টি রেখেও সব সময় ধরা যায় না।

কিছুদিন হল ইউ এস কাস্টমস একটি নতুন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে। এ একটি আজব মেশিন। এর নামঃ ইনস-পেক্টোস্কোপ। প্রতিটি মেশিনের মূল্য সাত হাজার ডলার। ন'ফিট লম্বা, দশ ফিট উঁচু এবং তিন ফিট গভীর এই যন্ত্রটি কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মাল ও যাত্রীদের সঙ্গে থাকা মাল একটিতে রাখা হয়। একটি সুইচ টিপে উচ্চ ভোল্ট বিকীরণ করা হয়। তারপর একটা কাঠের প্যানেল তুলে দিলে বেরিয়ে পরে লিড-গ্লাস পর্দা, তার মধ্য দিয়ে সমস্ত লাগেজ ও মালপত্রের অন্ত-র্নিহিত সব কিছু দৃশ্য হয়ে ওঠে তাতে।

বিপদ হলেই আসানের চেষ্টা হয়। পুলিশী বুদ্ধিকে ছাপিয়ে দেখা দেয় চোরদের চতুরতা।

ইন্সপেক্টোস্কোপ এনেছ? আচ্ছা আমরাও দেখছি। এই ধরনের অপূর্ব কৌশল প্রয়োগের এক দৃষ্টান্ত দেখা গেল ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক যাত্রীবাহী জাহাজের এক চতুর যাত্রীর মধ্যে।

কিছুতেই তাকে ধরা যাচ্ছিল না। যাত্রীটির পোষাক-আশাক জিনিসপত্র তল্লাসী করে কিছু পাওয়া যায় নি। ইন্স-পেক্টোস্কোপের এক্স-রে পর্দায় তার প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করা হয়েছে। না, কোন হীরা নেই তাতে।

অথচ কর্তৃপক্ষ ধ্রুব নিশ্চিত যে উক্ত শাঁসালো লোকটার মারফৎ প্রচুর বে-আইনী কাজ হয়।

বিশিষ্ট লোকটির নাম ধরা যাক হারম্যান টি—(লোকটি বর্তমানে ধৃত অবস্থায় বিচারাধীন। তদন্তের সুবিধের জন্য তার প্রকৃত নাম এখনো প্রকাশ করা হয় নি)।

গোলাপী গাল, টুকটুকে অভিজাত চেহারা, বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। কাস্টম কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে প্রতিবার তার বিদেশ থেকে আগমনের মুখে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ থেকে সাড়ে নয় লক্ষ ডলার মূল্যের হীরা মার্কিন দেশে বেআইনীভাবে প্রবেশ করে এবং এ অভিযানের নায়ক অবশ্যই এ ভদ্রলোক। অথচ মালটা কিভাবে আসে কিছুতেই তা ধরা যাচ্ছিল না।

তাহলে কি হারম্যান জাহাজের কোন লোক মারফৎ মালগুলি পাচার করে? তাও তো সম্ভব নয়। কেননা জাহাজ এসে বন্দরে পোঁছলে নেমে আসা প্রতিটি নাবিককে তাদের ক্যাপ্টেন বা অফিসারসহ ভালভাবে তল্লাসী করে দেখা হয়। যে লোকটি ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করতে জাহাজে ওঠে তাদেরও একইভাবে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে দেখা হয়। প্রতিবারই ভদ্রলোকের বাদামী চুল রূপসী পত্নী আসেন অভ্যর্থনা করতে। কাস্টম অফিসারেরা ভদ্র ও বিনীতভাবে তাকেও তল্লাসী করে ছাড়েন। না, কোন কিছু কখনোই পাওয়া যায় নি।

জাহাজ এসে পোঁছবার পর বহুদিন পর্যন্ত গোয়েন্দাগণ ভদ্রলোক ও তার পত্নীকে গোপনে ছায়ার মত অনুসরণ করে নজর রাখেন। না, হীরা সম্পর্কিত কোন সন্দেহজনক কাজ দেখা যায় না। বা কোন গোপন হীরা-ক্রেতার সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। তাহলে?

ভদ্রলোক আইনজীবী। বিদেশ ভ্রমণান্তে পুনরায় তিনি নিউইয়র্কে যথারীতি কোর্ট-কাচারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী স্বভাবমত উঁচুদরের সামাজিক চক্রের বিভিন্ন আমোদানুষ্ঠানে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। রেভেনিউ অফিসারদের খোঁজখবর নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আইনব্যবসায় যা আয় তার চেয়ে শতগুণ বেশী খরচ ভদ্রলোকের। শহরটিতে নব্বুই হাজার ডলার মূল্যের বাড়ি, দুটি স্কুলে পড়া বড় মেয়ে, তিন তিনটে দুর্মূল্য মোটরকার। এত টাকা আসে কোত্থেকে?

বৃষ্টিভেজা এক সকাল। কাস্টম অফিসারেরা সামনে প্রচুর ফাইলপত্র নিয়ে গভীর আলোচনায় রত। কোনদিকেই কোন কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। আজই ফের হারম্যান টি বিদেশ যাচ্ছে। সাউদাম্পটন-গামী যাত্রীবাহী বিশাল জাহাজ অদ্যাই দ্বিপ্রহরে বন্দর ত্যাগ করবে।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল :

(১) ইয়োরোপের বিশ্বাসী গোয়েন্দারা বছর দেড়েক ধরে ক্রমাগত সংবাদ পাঠাচ্ছে যে উক্ত হারম্যান টি—লণ্ডন, প্যারিস বা বার্লিন এলেই সেখানকার সন্দেহজনক স্মাগলারদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা এবং চলাচল করে থাকেন। কমসে কম তারা বারো বার লক্ষ্য করেছেন যে তার হাতে বিভিন্ন পরিমাণ হীরে তুলে দেওয়া হয়েছে। জাহাজের মধ্যে ঘন্টায় ঘন্টায় তার প্রতি নজর রেখে দেখা হয়েছে যে ভদ্রলোক কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করেন না। নিজের মনেই একা একা থাকেন। কোন নাবিকের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে দেখা যায় নি।

(২) মার্কিন বন্দরে জাহাজ এলে, কেবলমাত্র তাঁর স্ত্রীই আসেন তাকে স্বাগতম জানাতে—আর কেউ নয়। সবচেয়ে আপশোসের কথা মিসেস টি—বা স্বয়ং টি—র কি দেহে কি মালপত্রে কোথাও কোন বেআইনী ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যায় না। সোল্লাসেই দুজন হাত ধরাধরি করে কাস্টম-শেড থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের গাড়িতে ওঠেন।

এসব আলোচনায় যখন ওরা দিশেহারা এমন সময় দলের জনৈক কাস্টম অফিসারের মনে একটি আপাত অদ্ভুত কথার উদয় হল।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে হারম্যান টি—যেদিন বিদেশ যাত্রা করে সে সময়েই হীরাগুলি বেআইনীভাবে এদেশে আমদানী করা হয়? আমরা শুধু ওর পৌঁছবার দিনেই নজর রেখে মরছি!

কথাটা শুনতে আজগুবি মনে হলেও কেউ আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না পরিকল্পনাটা।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে হারম্যান যখনই বিদেশে গেছে, আর বিদেশ থেকে ফিরেছে, প্রতিবারই সে একই জাহাজের একই কেবিন রিজার্ভ করেছে। এর অন্যথা একবারও হয় নি। অবশ্য এটা তেমন অসম্ভব কিছু নয়, বহু ভদ্র বৈধ ব্যবসায়ী যারা প্রায়শই বিদেশ যান আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তাদের অনেকেরই এ অভ্যেস আছে।

জাহাজ ছাড়বার এক ঘন্টা আগে হারম্যানের রূপসী পত্নী স্বামীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে জাহাজে গিয়ে উঠল। যথারীতি সামান্য শ্যাম্পেন পানান্তে বিদায় চুম্বন দিয়ে রূপসী পত্নী নেমে আসে। স্বভাবতই এ সময় বিনা তল্লাসেই সে জাহাজ-ঘাটা ছেড়ে চলে যায়। এ সময় তল্লাসীর কোন মানে হয় নাকি? হারম্যান তো বিদেশে যাচ্ছে, হয়ত বেআইনী হীরে জহরৎ আনতে, এ সময় তল্লাসীর প্রয়োজনই বা কি!

কিন্তু এবার তা হতে দেওয়া হবে না। কথাটা যতই যুক্তিহীন মনে হোক না কেন এবারে সেটা পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

দুপুরের কিছু আগে যাত্রীদের হুঁশিয়ারি করে দেবার জন্যে ফাইনাল ভোঁ বেজে উঠল জাহাজের। সিঁড়ি প্রভৃতি তোলবার আগে স্টুয়ার্ড ঘোষণা করল—যারা তীরে নামবার এখুনি নেমে যান তীরে।

১১-৫২ মিঃ। মিসেস টি—স্বামীকে গভীর একটি চুম্বন দান করে, স্বামীর দেওয়া এক গুচ্ছ ফুলোপহার হাতে বিষণ্ণ মনে গ্যাংওয়্যাংক দিয়ে তীরে নেমে এলেন। হারম্যান টি—জাহাজের রেলিংএ দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগলেন। বিদায় ডার্লিং, সাময়িক বিদায়।

উপরে হুইল হাউসে জাহাজের ক্যাপ্টেন ছাড়বার পূর্বমুহূর্তের করণীয় কর্তব্যে ব্যস্ত। টাগ-বোট দুটো জাহাজকে টেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। সংকীর্ণ নদীপথ দিয়ে বিপুলাকার জলযানটিকে তারা বিশাল আটলান্টিকের মোহানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কিন্তু এমন সময় একটি জরুরি বুলেটিন গেল ক্যাপ্টেনের কাছে—যতক্ষণ না ইউ এস সরকারের নির্দেশ পান জাহাজ ছাড়বেন না।

১২-৮ মিঃ। জাহাজটি তেমনি নিশ্চল-ভাবে বন্দরে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে তখন কাস্টমের পরীক্ষাগারে মিসেস টি—আর দুজন মহিলা অফিসারের মধ্যে তুলকালাম কান্ড বেঁধে গিয়েছে। তেজস্বিনী এবং দুর্জালা হারম্যান—পত্নী প্রচন্ড দুই ঘুসিতে দুজন মহিলা কর্মীকে ভূমিস্যাৎ করে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে—আমি এই মুহূর্তে একজন উকিল চাই। এটা কি ধরনের সরকারী ব্ল্যাকমইল হচ্ছে শুনি? সিল্ক কোটপরা টি-পত্নী বাঘিনীর মত লম্ফঝম্ফ করে মেয়ে কর্মীদের তল্লাসীতে বাধাদান করে চলেছে। অবশেষে একজন মহিলা অফিসার ল্যাং মেরে মিসেসকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

মিসেস টি-র বক্ষবন্ধনীর অদ্ভুত এক গোপন স্থানে কাস্টম কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করল ৬ লক্ষ ১২ হাজার ডলার দামের ঝকঝকে হীরকখণ্ডসমূহ।

উচ্চপদস্থ অফিসারদের অবিশ্বাসে মাথা খারাপ হবার দাখিল। জাহাজে এতগুলো হীরে হারম্যান তুললো কখন এবং কিভাবে? এগুলো তাহলে এদেশে আগে এসেছিল। তাই বা কিভাবে সম্ভব হল! এখন তো সে ইয়োরোপ যাচ্ছে গস্ত করতে। এগুলো এল কোত্থেকে!

জাহাজের কেবিন স্টেটরুম—৫৯এ বসে থাকা হারম্যানের গালে আর গোলাপী আভা রইল না। সে রং ফ্যাকাশে হয়ে পাঁশুটে আকৃতি ধারণ করেছে। চীৎকার করে সব কিছু সে অস্বীকার করছে। মজার কথা হচ্ছে, সে—মুহূর্তে হারম্যান তার মিসেসকে পর্যন্ত নিজের স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করল। কি করে ভদ্রমহিলা অতগুলো হীরে পেল তা সে মোটেই জানে না। অর্থাৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল হারম্যান তার সঙ্গে এ মহিলাকে জড়িয়ে ফেলার জন্যে। কাস্টম অফিসারগণ নীরবে সব কিছু শুনে গেল। তারপর হারম্যানের দেহ, মালপত্র সমস্ত কিছু তন্ন তন্ন তল্লাসী চালালো—ইন্সপেক্টোস্কোপের সামনেও হাজির করা হল সব। না, কোন হীরা জহরৎ কিছু নেই।

কিন্তু হারম্যান একটা মারাত্মক ভুল করল...ঐ যে সে বলল স্ত্রীকে সে কোনকালেই বিশ্বাস করে না—মিত ও মধুরভাষী কাস্টমের নারী অফিসাররা একথাটিকেই কাজে লাগালো। মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ হিসেবে প্রয়োগ করল মিসেস টি-র ওপর।

শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল মিসেস কি! এতবড় কথা। আমি অবিশ্বাসী, আমায় কোনকালে ইনি বিশ্বাস করেন না। এই কথা। অবিশ্বাসী আমি! আর নিজে সাধু তপস্বী। আমি জানি না বুঝি সেই সব মাগীদের কথা! চালাকি! অবিশ্বাসী আমি না সে। ও যা করেছে তা ক্ষমাহীন অপরাধ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু চিচিং ফাঁক হয়ে গেল। মিসেস টি—সেখানে বসে কাগজে একটি ম্যাপ এঁকে দিল।

কাস্টম অফিসারেরা তা দেখে একেবারে থ। বলে কি? এও নাকি সম্ভ? মানচিত্রটি হল হারম্যান যে স্টেটরুম—৫৯ সর্বদা রিজার্ভ করে যাতায়াত করে সে ঘরের মেঝের। ঘরের মেঝে মোজাইক করা। সে মোজাইকের ১১নং খণ্ডের নিচে (পূর্ব-দক্ষিণ দেয়াল থেকে ৮ ফিট দূরে) এই স্মাগলার বিশারদ একটি গোপন গর্ত করে তার মধ্যেই মাল লুকিয়ে রাখত। প্রতিবার বিদেশ থেকে আসবার সময় মাল গস্ত করে এনে সে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখত। তারপর মার্কিন দেশে ফিরে এসে খালি হাত পায়ে নেমে যেত। কারুর কোন সন্দেহের কারণ থাকত না। কয়েক মাসের মধ্যেই যখন ফের সে বিদেশ যেত, রিজার্ভ করত সেই জাহাজের সেই কেবিন। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলে স্ত্রীর হাতে তুলে দিত মাল। এভাবেই সন্দেহাতীতভাবে বেআইনী হীরে দেশে প্রবেশ লাভ করত কাস্টমসকে বোকা বানিয়ে।

এবারকার মত ঘুঘু ফাঁদে আটকে গেল।

(প্রশ্ন)

(১) পশ্চিম বাঙলায় গ্রামের সংখ্যা কত?

(২) পশ্চিম বাঙলায় সবথেকে প্রাচীন মন্দির কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? সুন্দরবন অঞ্চলে বহু প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি সম্পর্কে কোন গবেষণা হচ্ছে কি?

(৩) গঙ্গার গভীরতা এখন সবথেকে কোথায় বেশী?

(৪) বাঙলাদেশের প্রামাণ্য ইতিহাসের লেখক কে? গ্রন্থখানি কি প্রাপ্য?

(৫) পশ্চিমবঙ্গে মোট শিক্ষিতের হার কত?

পুলিনবিহারী দত্ত
ক্যানিং টাউন

●

(১) অ্যানিমোমিটার, সাইক্লোট্রোন, ডিপথেরিয়েকোল, স্পেকট্রোমিটার ও ইনসিনারেটার কি এবং এদের আবিষ্কারকের নাম কি?

(২) আলফা, বিটা, গামা ও ইনফ্রারেড রে বলতে কি বুঝায়?

(৩) একটি সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের হর্স-পাওয়ার কত?

(৪) লাইটপোস্টে ডেঞ্জার লেখা সাইন-বোর্ডে খুলি ও হাড় আঁকা থাকে কেন?

(৫) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিমানের নাম কি এবং কোন দেশের। ঐ বিমানে একসঙ্গে কতজন যাত্রী যাতায়াত করিতে পারে?

সোমনাথ ভট্টাচার্য
শিলং—৩

●

(উত্তর)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত দিলীপকুমার পাত্রের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে—(খ) সংবাদপত্র ছাপান আরম্ভ হলে যে সমস্ত সংবাদ শেষ সময়ে এসে উপস্থিত হয় তা প্রকাশের জন্য পত্রিকার খানিকটা জায়গা খালি রাখা হয়। কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকলে সেখানে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। বিলম্বে প্রাপ্ত এই সংবাদকে স্টপ প্রেস বলে। (গ) নিম্নলিখিত ইংরজ লেখকগণ ছদ্মনামে ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করেছেন। জর্জ ইলিয়ট—মেরী অ্যান ইভান্স; কিউ আর্থার—কুইলার কাউচ; মার্ক টোয়েন—স্যামুয়েল ক্লিমেন্স; লিউস ক্যারল—চার্লস ডজন; এলিয়া-চার্লস ল্যাম্ব সাকি—হেক্টর মনরো। (ঘ) লাইফ ইন্সিও-রেন্স ১৬৮৩ শতকে ইংলণ্ডে চালু হয়। ৩১শ সংখ্যাতে প্রবোধ সান্যাল ও অন্যান্যদের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে আধুনিক সামরিক সাবমেরিন আবিষ্কার করেছেন মিঃ জন হল্যান্ড নামক জনৈক আমেরিকাবাসী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরটি উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যান। এর উচ্চতা ১,৫৭৬ ফুট। (টেলিভিশন টাওয়ার বন্ধ থাকাতে।) ঐ সংখ্যাতে প্রকাশিত আরেক প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, অক্টারলনী মনুমেন্টের উচ্চতা ১,১৫০ ফুট। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে জানাই N. B. কথাটির অর্থ "নোটা বেনী" মানে পুনঃ। ৩২শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত সৈয়দ জাহির হোসেন-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে,—(ক) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ব্যক্তি হচ্ছেন লেঃ কর্নেল ইয়াকুব গোহান। তিনি সিলিগুড়ি ডিভিসনের একজন সামরিক অফিসার। (খ) ইরানের রাজকীয় ধনাগারে বর্তমানে 'ময়ূর সিংহাসন' আছে। (ঘ) প্যারাসুট আবিষ্কার করেছেন মিঃ লে মদ নামক একজন ফরাসী অবসর-প্রাপ্ত সামরিক অফিসার। তিনি ফরাসী দেশের অধিবাসী। ঐ সংখ্যাতে প্রকাশিত আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি-সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর। এর প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৪৬-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন শহরে।

●

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত নির্মলকুমার ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে—(ক) শর্টহ্যান্ডের জন্ম হয় ইংলন্ডে ১৩শ শতাব্দীতে, তবে, ১৮৩৭ খৃঃ আইজাক পিটম্যান নামক একজন ইংরেজ ভদ্রলোক শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গী ও ধ্বনির ভিত্তিতে কতকগুলি চিহ্নের প্রবর্তন করে শর্টহ্যান্ডের ব্যবহারকে কাজে লাগান। ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত তপন দাশগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে,—(ক) খৃঃ পূর্ব ৪৯০ অব্দে Pheidippides নামে এক গ্রীক যোদ্ধা ২৪ মাইল দৌড়িয়ে ম্যারাথন থেকে এথেন্সে যুদ্ধ বিজয়ের সংবাদ নিয়ে যাওয়ার পর মারা যান। ম্যারাথন রেস এই ঘটনার স্মারক প্রতিযোগিতা। এর দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। (খ) দুটি শত্রুভাবাপন্ন রাজ্যের মধ্যে যে নিরপেক্ষ রাজ্য থাকে তাকে বাফার স্টেট বলে। ওপেন ডোর পলেসি অর্থাৎ সকলকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমানাধিকার দান। একে ও জি এল অর্থাৎ ওপেন জেনারেল লাইসেন্সও বলা হয়। ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত বিমলেন্দু পট্টনায়েকের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (খ) ফাউন্টেনপেন প্রথম মিঃ ওয়াটারম্যান নামক একজন আমেরিকা-বাসী ১৮৮৪ খৃঃ আবিষ্কার করেন। (গ) গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট্, কলকাতা মিউজিয়াম (২৮, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিঃ-১৬।) বিশ্বভারতী কলা ভবন (দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ইত্যাদি...। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, মিঃ কুনিগ নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী রোটারী মেসিনের নক্সা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, পৃথিবীর প্রথম ছাপান পুস্তকের নাম হচ্ছে Ma Zarin ল্যাটিন ভাষায় লিখিত বাইবেল। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, পৃথিবীর সর্বাধিক দ্রুতগামী বিমান হচ্ছে "নীয়েল-হক" নামক বেতার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী বিমান সুপানসোনিক জেট ফাইটার থান্ডার চিফস। এই বিমান বর্তমানে U S A F এ ব্যবহৃত হচ্ছে। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, ইংল্যান্ডের নর্দাম্বারল্যান্ড ও ডারহাম কয়লাখনিতে ১৮৪৪ খৃঃ সর্বপ্রথম বেতন হ্রাসের দাবীতে ধর্মঘট হয়।

রাহুল বর্মণ।
আগরতলা, ত্রিপুরা।

●

অমৃত পত্রিকায় ৫১ম সংখ্যায় প্রকাশিত গোহাটির বিশ্বদেব দাসের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ট্রান্সজর্ডান এবং ফিনল্যান্ড স্বাধীন হয় যথাক্রমে ১৯৪৬ এবং ১৯১৭ সালে। (খ) প্রশ্নের উত্তর—বিশ্বভারতী, রাঁচি, গৌহাটি এবং উত্তর বঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রম ১৯২১, ১৯৬০, ১৯৪৮ এবং ১৯৬১ সালে। বাবল দাসের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই—ডেনমার্ক, তুরস্ক, নরওয়ে, ইথিওপিয়া ও সুইজারল্যান্ডের রাজধানী যথাক্রমে—কোপেনহেগেন, আঙ্কারা, অসলো, আদ্দিস-আবাবা এবং বার্ণ।

কলকাতার শেলী মজুমদার ও প্রকৃতি মজুমদারের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভ্যাটিকান সিটির আয়তন ১০৯ একর।

আসামের সুনির্মল দাশ পুরকায়স্থের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে।

কোচবিহারের দেবব্রত সিংহের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বঙ্গ দর্শন ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার নিতাই ঘোষের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বৃহত্তর কলকাতার নিতাই ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা ৫৮৮৭৭০৩ জন (১৯৬১ সালে)।

আল্পনা চট্টোপাধ্যায়,
বালিগঞ্জ, কলকাতা—১৯।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
KUSUM PRODUCTS LTD
নির্মল
Nirmal
BAR SOAP
নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সমস্ত ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়লা জড়শুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সব ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।
নির্মল দিয়ে কাচলে পয়সারও সাশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৩য় সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 19th May, 1967. শুক্রবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রসঙ্গে

গত ২৫শে বৈশাখ মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে ২৪ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তা উদ্যোক্তাদের চরম অবহেলার জন্য অনেক শিল্পীকে অযথা হয়রানি ও অশোভন আচরণের ভিতর পড়তে হয় যাতে তাঁরা ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এতে আমার মনে হয় রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আমাদের 'কহ্লার' শিল্পী-গোষ্ঠীকে সাড়ে পাঁচটার সময় অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল, কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে পৌনে সাতটার সময় কহ্লার গোষ্ঠীকে অনুষ্ঠানে আহ্বান করা হয়। যিনি মাইকে ঘোষণা করছিলেন এই গোষ্ঠীর শিল্পীদলের গান চলাকালীন তিনি বলতে থাকেন 'আপনারা তাড়াতাড়ি আপনাদের গান শেষ করুন।' তাতে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে থাকেন। এক সময় তিনি মাইকে বলেন, 'এবার আপনারা আসল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন 'শ্রীমতী'—মুখে। তার অর্থ এর আগে যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইলেন তাঁরা নকল সঙ্গীতই পরিবেশন করেছেন।

আমি মনে করি, এরকমভাবে প্রত্যেক শিল্পীকে চরম অপমান করা হয়েছে। আমি গভীর বেদনা ও দুঃখের সঙ্গে এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। এঁরা কি মনে করেন এভাবে বললে ভবিষ্যতে কোন শিল্পীই এঁদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সংযোগ রক্ষা করতে পারবে?

অনীতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক,
'কহ্লার' শিল্পীগোষ্ঠী।
কলিকাতা : ৯

॥ জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে ॥

৫১ সংখ্যা 'অমৃত'-এ শ্রীকিরণশংকর সেনগুপ্তের 'কবিতার শব্দজগৎ। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ' পড়লুম। বেশ প্রস্তুত হয়েই পড়তে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু দেখলুম, অতটা সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। মোটামুটি সাদাসিদে দু-চারটে কথা তিনি বলতে চেয়েছেন।

এক জায়গায় জীবনানন্দ সম্পর্কে একটা বেফাঁস কথাও ব'লে ফেলেছেন :

'......কোন সময়েই সুধীন্দ্রনাথের মতো সচেতনভাবে শব্দপ্রয়োগে তিনি উৎসাহী ছিলেন কিনা সন্দেহ'। বাক্যটি আমাকে অবাক করছে। নিজের ধারণার কথা কিছু না ব'লে জীবনানন্দের একটি পাণ্ডুলিপির ভিতরে যেতে চাই। কবিতাটির নাম 'সে'। কবিতাটির প্রথম লাইনে আমরা দেখি—'আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে',— প্রথমবারে কবি লিখেছিলেন—'আমাকে সে (একদিন) বলেছিল ডেকে', দ্বিতীয়বারে 'বলেছিল'-র জায়গায় লিখলেন 'নিয়েছিল' এবং 'বলে-ছিল' দ্বিতীয় লাইনে আনলেন; তৃতীয়বারে 'একদিন' বাদ দিলেন, আর এখানেই—জীবনানন্দ যে কতটা শব্দসচেতন ছিলেন, তা আমরা ধরে ফেলি। 'একদিন' থাকলে তা সাধারণ পাঠকের কাছে একদিনের ঘটনাই হ'য়ে থাকতো, কিন্তু জীবনানন্দ একটি মাত্র শব্দকে বিনাশ করে কবিতাটিকে চিরকালের অন্বেষণ ক'রে তুললেন। কবিতাটির শেষ লাইনের আগের লাইন আমরা পড়ি, 'ভালোবেসে ষোলো আনা নাগরিক যদি'; প্রথমে 'ভালোবাসা'-র পরে কী একটা শব্দ লিখেছিলেন, তারপরে শব্দটি কেটে 'ষোলো আনা' লিখলেন, 'নাগরিক' কেটে 'সংসারী' করলেন (তার আগে ওখানে 'সামাজিক' লিখেছিলেন), আবার 'সংসারী' কেটে 'নাগরিক' করলেন: অর্থাৎ, অত্যন্ত সচেতনভাবে যথার্থ শব্দটি প্রয়োগ করবার জন্যে কী, পরিশ্রমই না স্বীকার করেছেন।

শব্দসচেতনতার জন্যেই জীবনানন্দ আমার কাছে পরিশ্রমী শিল্পী।

সুগত চৌধুরী
কলকাতা-২০।

নজরুলের জীবনীচিত্র

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, গত ২৫ মে, '৬৬ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৭তম জন্মতিথিতে কবির জীবনীচিত্র শুরু করেছিলাম। পরি-চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অগ্রজপ্রতিম চিত্র-পরিচালক শ্রীসচ্চিদানন্দ মজুমদার। তিনি তাঁর ইউনিটসহ ছবিটি সুসম্পন্ন করা যায় সেজন্যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে এসেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় চিত্র-ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেও আজ পর্যন্ত ছবিটি তৈরী করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারিনি।

কবির ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য আমরা বিশেষভাবে চিন্তিত। তাঁর জীবিতকালে ছবিটি তৈরি করা আমাদের একান্ত কাম্য। এই হতাশার মধ্যে পরিচালক শ্রীমজুমদারের উৎসাহে কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি 'নজরুল কালচারাল ফিল্ম সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের মাধ্যমে ছবিটি নির্মাণ করার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আশাকরি জনসাধারণের সক্রিয় সহ-যোগিতায় সোসাইটির উদ্দেশ্য সার্থক হবে এবং জনগণের কবি নজরুলের জীবনীচিত্র নির্মাণ অচিরাৎ সম্পন্ন হবে।

কাজী সব্যসাচী
নজরুল কালচারাল ফিল্ম সোসাইটির পক্ষে

ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল একাল

'অমৃত' প্রতিবেশী সাহিত্য সংখ্যার (৪৯শ) 'ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল-একাল' নিবন্ধটির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য পত্র লেখক শ্রীযুক্ত সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীমতী সান্ত্বনা গুপ্তাকে অশেষ ধন্যবাদ। সাময়িক পত্রের আটপোড়ে অবয়বে ওড়িয়া সাহিত্য (তাও আবার সেকাল ও একাল) পরিবেশন করতে গিয়ে আমি কেবল মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জর বুড়ি ছোঁয়া গোছের নামোল্লেখ করেই গিয়েছিলাম। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'বৈদেহীশ বিলাস' ('বৈদেহী বিলাস' নয়) সম্বন্ধে কিছুই তখন বলা হয়নি। উপেন্দ্র ভঞ্জের সমসাময়িক কবি দীনকৃষ্ণ নানা খুঁত বার করলেও বৈদেহীশ বিলাসের স্থান অতি উচ্চে সন্দেহ নেই। এবং মহাকাব্যের সকল লক্ষণও তার রয়েছে। আলংকারিক বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এ কাব্য—শ্রীযুত ও শ্রীযুক্তা গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন—সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন—

"বয়ালিস্রশ পদরে এ চমৎকার।
বুধে হেনা ন করি মনে বিচার যে।
বোলই উপইন্দ্র ভঞ্জ এ গীত
বৈদেহীশ বিলাস নাম উদিত যে।।"

(প্রত্যেক ছন্দের পদসংখ্যা 'ব' দিয়ে আরম্ভ লক্ষ্য করবার।)

উপেন্দ্র ভঞ্জ নিজে ছিলেন সামন্তরাজ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রিক। কেননা, এ ভূমি তলে কবি-গণে কাহাকু' গণনা করতেন না তিনি। এক জয়দেব ও দীনকৃষ্ণ ছাড়া 'আউ সবু কবিঙ্কর মাথে বাম চরণ' স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। এ হেন কবিবরের কাব্যপাঠে পাণ্ডিত্যের দরকার। সাধারণের তিনি কবি ছিলেন না বলে মন্তব্য করেছেন শ্রীবিষ্ণুপদ মোহান্তি তাঁর 'উপেন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা' গ্রন্থে (দাশরথি পুস্তকালয়, কটক)। তবে এর তুলনায় 'লাবণ্যবতী'র ভাষা সরল ও মধুর। এবং লাবণ্যবতী-কাব্যে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর পরিবর্তে লৌকিক কাব্যধারার আশ্রয় নেন। এজন্যই বোধহয় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও ডঃ মায়াধর মানসিংহ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে 'লাবণ্যবতী'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

নিখিল সেন,
কলকাতা—৩।

অমৃত

নতুন রাষ্ট্রপতি

আমাদের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ জাকির হোসেন ও উপ-রাষ্ট্রপতিপদে বৃত হলেন শ্রী ভি ভি গিরি। এ'দের দুজনকেই আমরা স্বাগত জানাই। তার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে যিনি দীর্ঘকাল উপ-রাষ্ট্রপতিপদে এবং পরে রাষ্ট্রপতির পদে নিযুক্ত থেকে আমাদের দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেবা করেছেন। বিদায়-ভাষণে ডঃ রাধাকৃষ্ণন জাতির উদ্দেশে যা বলে গেছেন, আগামী দিনে নতুন রাষ্ট্রপতি এবং দেশের শাসকরা তা থেকে অনেক চিন্তার নির্দেশ পাবেন। ডঃ জাকির হোসেনও বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতিপদের দায়িত্ব অনেক। নিশ্চয়ই সুখাসনে দিনাতিপাতের সময় আর নেই। দেশের সামনে যে-সংকট দেখা দিয়েছে, সেগুলি অমীমাংসিত রেখে কোনো দেশ-নেতাই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আগেও বহুবার বলেছেন এবং এবারেও যাবার সময় বলে গেছেন যে, আমাদের দেশবাসী যাতে নির্বিবাদে বৈষয়িক ও সামাজিক প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য চীন ও পাকিস্থানের সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসায় পৌঁছানো মানববুদ্ধির অতীত কিছু ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝেছেন যে, আমাদের মূল সমস্যা হল দারিদ্র্য ও সামাজিক অসাম্য। এই দুই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দেশের অশান্তি দূর করা সম্ভব নয়।

জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন বিচার করে তিনি বলেছেন যে, যদি আঞ্চলিক বৈষম্য, বৈষয়িক অসাম্য ও সামাজিক অনৈক্য দূর করা যায় তা হলেই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হবে সুদৃঢ়। ক্ষুধার্ত ও বেকাররাই বিপ্লব ঘটিয়ে থাকে বলে প্রাজ্ঞ দার্শনিক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নতুন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মতোই একজন শিক্ষাবিদ। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ডঃ জাকীর হোসেন এমন সময়ে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হলেন যখন তাঁর কাছ থেকে জাতি নতুন সঙ্কল্প ও নেতৃত্বের দৃঢ়তা প্রত্যাশা করবে। তিনি বলেছেন, দেশবাসী আমার মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শের প্রতিফলন নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবে। আমি যেন বিনম্র চিত্তে দেশবাসীর সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি। শিক্ষাব্রতীর প্রতি ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা কত গভীর পর পর দুজন শিক্ষাব্রতীকে রাষ্ট্রের শীর্ষপদে নির্বাচিত করে দেশবাসী তার প্রমাণ দিয়েছে।

নির্বাচনে যত উত্তাপই সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কোনো বিশেষ দলের প্রতিনিধি ন'ন, তিনি জাতির প্রতিভূরূপেই পরিগণিত। দুঃখের বিষয় এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে অনেক অবান্তর কথা আলোচিত হয়েছে যা জাতির এই সর্বোচ্চপদের প্রার্থীদের পক্ষে কোনোমতেই প্রাসঙ্গিক হতে পারে না। তা ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা কেউই নিজের স্বপক্ষে প্রচারে নামেননি কিংবা কারো কাছে ভোট প্রার্থনা করেননি। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটু অভিনব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্য যাতে নির্বাচনী প্রচারে কোনো দিন ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সকল রাজনৈতিক দলেরই দৃষ্টি থাকা উচিত।

উপ-রাষ্ট্রপতিপদে শ্রী ভি ভি গিরি-র নির্বাচনেও যোগ্য ব্যক্তির পক্ষেই সম্মান লাভ হয়েছে। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোগামী সৈনিক এবং দীর্ঘকাল শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। একজন শ্রমিক-নেতার এই সম্মানিত পদে নির্বাচন ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেও গৌরবের বিষয়। আমরা রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত অভিনন্দন জানাই।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্মান

আমাদের সাহিত্যের বরণীয় লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জ্ঞানপীঠ কর্তৃপক্ষ বিগত পঁচিশ বৎসরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। লেখকের 'গণদেবতা' বইটিই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই পুরস্কার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেওয়া হয়। গত বৎসর মালয়ালম কবি শ্রীশঙ্কর কুরুপ এই সম্মান লাভ করেছিলেন। তারাশঙ্করের এই সম্মান আমাদের সাহিত্যের সম্মান। তাঁর হাত দিয়ে বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, বহু পুরস্কার এসেছে। জ্ঞানপীঠ-পুরস্কার তার সর্বশেষ সংযোজন, নিশ্চয়ই তা শেষ নয়। কারণ আমরা আশা করি তারাশঙ্করের লেখনী বাংলা সাহিত্যকে নিরলসভাবে সমৃদ্ধ করে তুলবে এবং আরও বহু সম্মান বর্ষিত হবে এই লেখকের বিনম্রনত শিরে। এই সম্মানে তাঁর সঙ্গে আমরা, তাঁর পাঠক ও অনুরাগীরাও, গৌরবান্বিত বোধ করবো। তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ জীবিত ঔপন্যাসিক। তাঁর জীবনবোধ ভারতবর্ষের আসল রূপটিকে চিনতে পেরেছে। রাঢ়বঙ্গের দর্পণে তিনি প্রতিবিম্বিত করেছেন গোটা ভারতের হৃদয়। তাঁর রচনা সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে অনূদিত হওয়া উচিত এবং সাহিত্য আকাদেমির দায়িত্ব হবে এই অনুবাদ বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষায় করে বিশ্বের দরবারে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে পরিচিত করা। কারণ, আমরা জানি তারাশঙ্করের রচনায় ভারতবর্ষের মানুষের জীবন্ত চিত্র রূপায়িত হয়েছে, তার আকাঙ্ক্ষা ও আশার সহৃদয় রূপকার তিনি। ভারতবর্ষকে জানতে হলে, তারাশঙ্করের রচনা বিদেশীদের অবশ্যপাঠ্য। এই মহৎ শিল্পীকে আন্তরিক শুভকামনা জ্ঞাপন করে আমরা তাঁর অব্যাহত শিল্পদৃষ্টি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পুরস্কৃত তারাশংকর

বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' ১৯৬৬ সালের ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। তাঁর এই সম্মাননায় আমরা গর্বিত। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য আজ যে সারা ভারতের নিকট আত্মীয় হয়ে উঠল তার জন্য তারাশংকরের অবদান গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে; বহুসংঘাত ও আনন্দ বেদনার পথরেখা অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানদের একজন হিসেবে গণ্য হয়েছেন। রবীন্দ্র শরৎ যুগের পরবর্তীকালে তারাশংকরের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির তিনি এক অগ্রগণ্য পুরুষ।

তারাশংকরের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার আশ্চর্য প্রতিচিত্র হোল তাঁর সমগ্র সৃষ্টি। সাহিত্যের ব্যাপারে চিরদিন তিনি আপোষ-বিহীন। অসত্য ও অন্যায়কে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি পরম মানব সত্যকেই বলিষ্ঠ রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পে উপন্যাসে নাটকে। তাঁর মহৎ সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যের দিগন্তকে করেছে দূরব্যাপ্ত, এবং বাঙালীর হৃদয়কে করেছে মানবতায় সমৃদ্ধ।

পরিণত বয়সে সাহিত্যসাধনা সুরু করে ধীরে ধীরে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর সম্মান লাভ করেছেন তিনি। তাঁর স্মরণীয় অবদান অনেকগুলি সার্থক ছোটগল্প ও উপন্যাস। রসোত্তীর্ণ নাটকও তিনি দিয়েছেন অনেকগুলি। তারাশংকরের মত সচেতন এবং লিপিকুশল কথাকার এযুগে দুর্লভ। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পরিচিত জগতের মানুষেরাই ভিড় করে আসে। তাঁর শিল্প স্বভাবের গভীরতর জগতে একটি কবিমন সদাজাগ্রত থেকে তাঁর কাহিনীগুলিকে অপরূপ সৃষ্টি সৌকর্যে অভিনব করে তুলেছে।

তারাশংকর যেদিন কলম ধরেছিলেন, তখন বাঙলা ও ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক চিত্র ছিল চঞ্চল এবং বিভ্রান্ত। দেশ ছিল পরাধীন। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। সেদিন যে বিশ্বাসের দীপ্তিতে তারাশংকরের জীবনপ্রদীপ জ্বলে উঠেছিল, আজও সেই সত্য অচঞ্চল। চারদিকের ঝঞ্জা, বিদ্বেষ তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'কল্লোলযুগে' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তারাশংকর প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা থেকে কিছু অংশ: 'তারাশংকরে তখনো বিপ্লব না থাকলেও ছিল পুরুষাকার। এই পুরুষাকারই চিরদিনই তারাশংকরকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। পুরুষাকারই কর্মযোগীর বিভূতি। কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় কাষ্ঠের সংঘর্ষে, তেমনি প্রতিভা প্রকাশিত হয় পুরুষাকারের প্রাবল্যে। নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে দৈবও অকৃতী। নিষ্ঠার আসনে অচল অটল সুমেরুবৎ বসে আছে তারাশংকর—সাহিত্যের সাধনার থেকে একচুল তার বিচ্যুতি হয়নি। ইহাসনে সুষ্যতু মে শরীরং—তারাশংকরের এই সঙ্কল্পসাধনা। যাকে বলে স্বস্থানে নিয়তাবস্থা—তাই সে রেখেছে চিরকাল। তীর্থের সাজ সে এক মুহূর্তের জন্যেও ফেলে দেয়নি গা থেকে। ছাত্রের তপস্যায় সে দৃঢ়নিশ্চয়। স্থিরপদে চলছে সে পর্বতারোহণে। সম্প্রতি এত বড় ইষ্ট নিষ্ঠা দেখিনি আর বাংলা সাহিত্যে।"
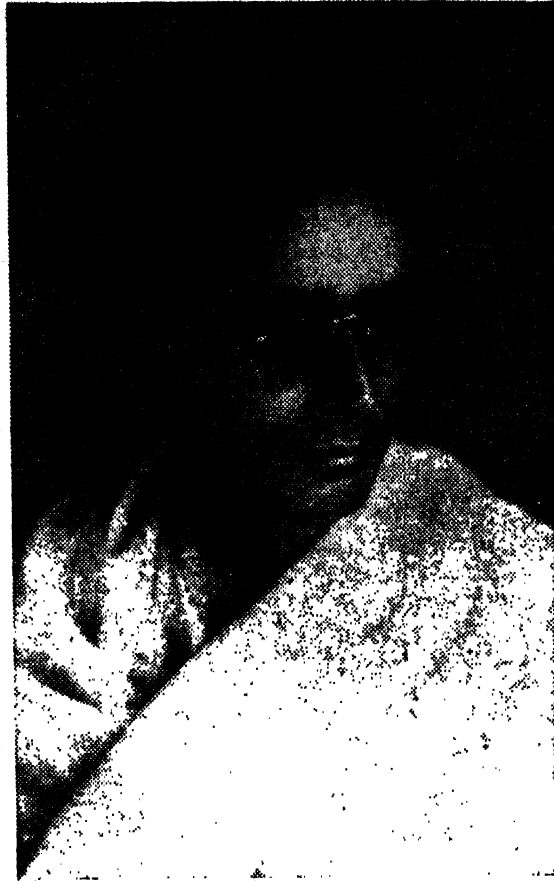
গণদেবতা প্রকাশকালে শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহীত একটি আলোকচিত্র

পুরস্কার পাওয়ার খবর শুনে দেখা করতে গিয়েছিলাম শ্রীতারাশংকরের সঙ্গে। শুভার্থীদের আগমনে বাড়ীটা সেদিন ছিল জমজমাট। নানা ফুলের মেশানো গন্ধে চারদিক ভরপুর। তাঁকে দেখলাম প্রশান্ত স্থিতধী এবং সস্নেহ। কথার ফাঁকে, ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর নিয়মিত লেখাগুলি যথারীতি লিখে চলেছেন। পুরস্কৃত গ্রন্থ 'গণদেবতা' প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। গ্রামময় চিরন্তন বাংলার অপরূপ মহাকাব্য এবং আত্মজাগ্রত নতুন বাঙালীর জীবনবেদ হোল 'গণদেবতা ও 'পঞ্চগ্রাম'। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন:

'গণদেবতা' নামটির অর্থের গভীরে আরও কিছুর আভাস মিলত একসময়। এখনও মেলেনা তা নয়, তবে 'দেবতা' শব্দটি এখন সেই মহিমা বা সেই ওজন হারিয়েছে—যাতে করে 'গণ'কে অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে পূজার অধিকারী করে তোলা যায়। গণতন্ত্রের কাল বটে—কিন্তু গণেরা দেবতা নন।

১৯৪০।৪১।৪২ সালে তখন গণেরা দেবতা হয়ে উঠবে—'গণ'কে আমরা দেবতার মত পূজা না করি একটা সমাদরে সমাদৃত করব ও সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে 'গণদেবতা' লিখতে শুরু করেছিলাম।

আমি যে 'গণ'কে চিনতাম তাদের বাস শহরে নয়—গ্রামে। তারা গ্রামের মানুষ। সমাজ তাদের নাটমন্দির। বাংলার গ্রামের গড়নের মধ্যে এমনি যেন একটি প্ল্যানিং আছে। মাঝখানে গ্রামদেবতার চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে গ্রামের বসতি। সোজা রাস্তা নয়, বাড়ীঘর সুগঠিত নয়, সুন্দরও নয়; কিন্তু মানুষেরা অসীম মমতায় এই চণ্ডীমণ্ডপের দেবতাটিকে অন্ধ বিশ্বাসে ঘিরে বেঁচে থাকে।

গণদেবতার একটি অধ্যায়ের আরম্ভ এই রকম—পল্লীগ্রামে একটি কথা বহু পুরাতনকাল থেকে প্রচলিত—চাষ ও বাস। পল্লীগ্রামে বাস করতে হলে চাষ করা ছাড়া উপায় থাকে না। যার চাষের জমি নেই তাকেও চাষের উপর নির্ভর করতে হয়। ছুতোর তৈরী করে লাঙল, জোয়াল; কামার তৈরী করে ফাল; মুচি জোগায় চামড়ার দড়ি, দেবতার স্থানে বাজনা বাজায়; নাপিত চাষীর চুল কাটে দাড়ি কামায়; ধোবা কাপড় কাচে এবং চাষ থেকে তারা ধান পায়—তাতেই চলে সংসার।

আগের কালে গ্রাম ও সমাজ পত্তনের সময় পরস্পরকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। একটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বাধীন ছিল না। পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই নির্ভরশীলতারও যোগসূত্রের গ্রন্থীগুলি ছিল কামার কুমোর নাপিত ধোবা তৈলিক ছুতোর বাদ্যকর, মায় মৃতদেহ সংস্কারের জন্য চণ্ডাল পর্যন্ত। পরে চৌকিদার, আদায়কারী পঞ্চায়েৎ, প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। যখনকার কথা লিখেছি তখন ইউনিয়ান বোর্ড এবং ইউনিয়ান কোর্ট পর্যন্ত হয়েছে। তার সঙ্গে জমিদার আছে, গমস্তা আছে, পাইক-নগদী আছে।

এই হল বস্তু জগতের কথা। এ ছাড়া আছে অন্তর জগৎ বা আত্মিক-জগৎ। সে জগতে বার মাসে তের পার্বন—বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রা থেকে দুর্গাপূজা, গাজন। মহরম, সবেরাত, রমজান। এই গ্রামাঞ্চলের বন্ধন-গ্রন্থী শিথিল হল Industrial Revolution -এর সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজের স্টীমশিপ বোঝাই হয়ে এল কলে-তৈরী করা কামারের কুমারের জোগানো জিনিষ। সমাজ দুর্বল হল। ধনীদের জমিদারদের প্রতাপ বাড়ল। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক জমিদার ও ধনী। জীবনে যে সংগ্রাম হল জীবনীশক্তির উৎস সে সংগ্রামে গ্রাম এবং গ্রামবাসী পরাজিত হতে হতে এক সময় সে একটা মিলিত শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে শক্তি হল এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি। সেই শক্তি বর্ষার বাতাসে জলীয় বাষ্পের মত দেশের আকাশ আচ্ছন্ন করলে।

মানুষের মিছিল চণ্ডীমণ্ডপ থেকে যাত্রা করে গ্রামের পথ ধরে এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, গ্রামান্তর থেকে অঞ্চলান্তর, প্রদেশান্তরে চলতে লাগল। সারা ভারতের গ্রামে প্রাণের একই কল্লোল প্রবাহিত হতে লাগল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসতে লাগল। এবং যে জীবন-মুক্তি মানুষ কামনা করছিল তার একটি কল্পনাতেই 'পঞ্চগ্রামের' পরিসমাপ্তি।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পর শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আলোকচিত্রটি শ্রীসুকুমার রায় কর্তৃক গৃহীত।

সেই কারণে দু খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির নাম রাখতে চেয়েছিলাম প্রথম খণ্ড 'চণ্ডীমণ্ডপ'—তাতে একখানি গ্রামের কথা। পরবর্তী খণ্ডের নাম—'পঞ্চগ্রাম', তাতে পাঁচখানি গ্রামের কথা। যে প্রাণাবেগের সুরু একখানি গ্রামে তার শেষ পাঁচখানি গ্রাম বা সারা দেশে, সারা ভারতবর্ষে।

যাঁরা একটু ভেবে দেখবেন তাঁরা গ্রন্থখানি পাঠশেষে ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামটিকেই এর মধ্যে দেখতে পাবেন। 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' শুধু বাঙলা দেশের গ্রামের কথার আখ্যান নয়, সারা ভারতবর্ষের গ্রামের উপন্যাস।

বীরভূম জেলার লাভপুরে ১৮৯৮ খৃঃ ২৫ জুলাই তারাশংকরের জন্ম। এ বছর তাঁর সত্তর বৎসর পূর্ণ হবে। জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও তীব্রভোগসুখের মধ্যে তিনি মানুষ হতে পারেননি। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা যান তখন তারাশংকরে বয়স মাত্র আট। মায়ের কাছেই মানুষ তিনি।

গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতার সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এর আগেই বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘটেছে যোগাযোগ। সেই সংযোগ হোল আরো গভীর। গ্রামের বাড়ীতে বন্দী জীবন যাপন করবার ফলে কলেজের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামে থাকবার সময়ে জমিদারী কাজ-

JANUARY 30 FRIDAY 1948

Bengali.—16 Magh, 1354. Samvat.—5 Magh (Badi), 2004.
Fasloe.—4 Magh, 1355. Hijri.—18 Rabbi-ul-Awwal, 1367.

মহাত্মাজী অহিংসার বেদীমূলে
হিংসার [illegible]
জীবন উৎসর্গ করেছেন।

হে মহান - হে [illegible] হে [illegible] -
তোমাকে প্রণাম।

হে বিপ্লবী - হে [illegible] হে [illegible] - [illegible]
হে [illegible] - তোমাকে প্রণাম।

হে [illegible], হে [illegible] -
তোমাকে প্রণাম।

[illegible]

JANUARY 31 SATURDAY 1948

Bengali.—17 Magh, 1354. Samvat.—6 Magh (Badi), 2004.
Fasloe.—5 Magh, 1355. Hijri.—19 Rabbi-ul-Awwal, 1367.

[illegible]

মহাত্মাজীর পরলোকগমনে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়রির পাতায় যা লিখেছিলেন

কর্ম দেখাশুনো করতেন। এর ফাঁকে চলত সাহিত্য সাধনা। কবিতা ও নাটক লিখতেন। গ্রামের নানাস্থানে সেই সব নাটকের অভিনয় হোত। জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল এগুলি। সমাজসেবার কাজে নেমে 'সোস্যাল সার্ভিস ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৮ খৃঃ ছোটগল্প লিখতে সুরু করেন। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'কল্লোলে'। সেদিনের কথা নানাভাবে তিনি ধরে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৯৩০ খৃঃ তারাশঙ্করের জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দেশের সর্বত্র জাতীয় আন্দোলন সুরু হয়েছে। তিনিও এদিকে আকৃষ্ট হলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। কারাবরণ করতে হয়েছিল কংগ্রেসের গণআন্দোলনে। জেলে যাওয়ার আগেই 'চৈতালি ঘূর্ণি' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রকাশিত হয় পরে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এই সময়ে। 'চৈতালি ঘূর্ণি' তাঁকেই উৎসর্গ করেন। তারাশঙ্করের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গতাপূর্ণ।

উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক লিখেছেন প্রায় একশখানি। তারাশঙ্করের খ্যাতি গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবেই সব থেকে বেশী, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে সাফল্য কোন অংশেই কম নয়। একথা আগেই বলা হয়েছে। কলকাতার বহু রূপমঞ্চে তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে এবং সেগুলি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে, বিশেষ করে 'দুই-পুরুষ' ও 'কালিন্দী'র কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তারাশঙ্কর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে : প্রেম ও প্রয়োজন, চিরন্তনী, নিশিপদ্ম, বিপাশা, বিস্ফোরণ, মাটি, প্রাসাদমালা, শ্রেষ্ঠগল্প, ধাত্রী দেবতা, কালিন্দী, দাবী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন, বিচারক, সপ্তপদী, রাধা, কান্না, মঞ্জুরী অপেরা, জলসাঘর, রাইকমল, তিনশূন্যে, আগুন, বেদেনী, রসকলি, দুইপুরুষ, প্রতিধ্বনি, যাদুকরী হারানো সুর। তারাশঙ্করের জমিদারী ব্যবস্থার ওপর রচিত সুদীর্ঘ উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা' অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসখানি গ্রন্থকারে প্রকাশির পূর্বে আমূল পরিবর্তন করছেন।

জীবনে অসংখ্য সম্মান এবং পুরস্কার পেয়েছেন তারাশঙ্কর। ১৯৪৭ খৃঃ 'শরচ্চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের জন্য। ১৯৫৫ খৃঃ আরোগ্য নিকেতনে'র জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এই একই উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর ১৯৫৬ খৃঃ আকাদমী পুরস্কার পান। ১৯৫৬ খৃঃ ভারত সরকার চীনে যে দুজনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তাঁদের একজন ছিলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু তারাশঙ্কর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। পরের বছরে চীন সরকারের আমন্ত্রণে তিনি একমাস চীন সফর করেন।

সাহিত্য কীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ খৃঃ তারাশঙ্করকে "জগত্তারিনী পদক" দেন। ১৯৫৮ খৃঃ এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি প্রতিনিধি হিসাবে মস্কো গমন করেন এবং এই বছরেই তিনি তাসখন্দে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫২ খৃঃ ১৯৬০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ খৃঃ থেকে ১৯৬৬ খৃঃ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৫৯ খৃঃ মাদ্রাজে তিনি নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৩ খৃঃ পান মতিলাল পুরস্কার।

এ বছর পেয়েছেন তিনি ১৯৬৬ সনের জন্যে জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার। এই পুরস্কারের মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ টাকা। মনোনয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে, ভারতীয় ভাষায় সর্বোত্তম সৃষ্টিধর্মী রচনাকেই এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালের জন্য ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কারটি পেয়েছিলেন মালয়ালম কবি জি শংকর কুরূপ। এবারে আঞ্চলিক কমিটিগুলির কাছ থেকে চারখানি বই নির্বাচনের জন্য পাঠান হয়েছিল। নির্বাচকমণ্ডলী 'গণদেবতা'র অনুকূলে তাঁদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানান। অন্য যে তিনখানি গ্রন্থের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তা হল : শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থের 'স্বর্ণকিরণ' (হিন্দী), শ্রীভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গারের 'নবরাত্রি' (কানাড়ী) এবং শ্রীকে এ মুন্সীর ভগবান পরশুরাম (গুজরাটী)।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(ছয়)

মণি-বউদি সেদিন বসে-বসে তাঁর জীবনের কথা বলেছিলেন আমাকে। সেদিন চাঁদনী রাত ছিল। ১৯৪২ সাল। শহরের রাস্তায় এবং বাড়ীঘরের বাইরের আলো-গুলো ব্ল্যাকআউটের ঠুঙিতে আটকে ফেলে কেবল মাটিতেই আবদ্ধ রেখেছিল; শূন্য-মণ্ডলে জ্যোৎস্না পেয়েছিল অবাধ খোলা-মেলা; কোন প্রাসাদের জনহীন উদ্যান সরোবরে একাকিনী স্নানার্থিনীর মত জ্যোৎস্না যেন বাঁধানো ঘাটের পৈঠেতে বসে সুঠাম শুভ্র বরতনুখানিকে সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল। হয়তো জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখছিল। আমরা দুজনে তারই মধ্যে খোলা জানালাটার ধারে বসেছিলাম। মণিদি বলে যাচ্ছিলেন আমি শুনছিলাম। কোন সংকোচ ছিল না। থাকলে ওই রূপসী জ্যোৎস্নার মায়াবিভ্রমে আমরা দুজনে অনায়াসে কপোত-কপোতী হয়ে যেতে পারতাম। এই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নারী মণি-বউদি চুপ করে যেতেন এবং তাঁর বদলে বকতে শুরু করতাম আমি। কপোত-গুঞ্জন তুলে আমি তাকে প্রদক্ষিণ করে ফিরতাম। অনায়াসেই তা হ'তে পারত। আমাদের উভয়ের অজ্ঞাতসারে, জীবনের আচরণে সকল শালীনতা বজায় রেখেই হতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। সাক্ষী তার আমি। আর যাঁকে সাক্ষী মানতে পারি তাঁকে একালের মানুষেরা জীবিত বলে স্বীকার করেন না। ঈশ্বর মৃত একথা এ যুগের দ্বারা ঘোষিত।

• • •

পৃথিবীতে জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণভঙ্গুর; জীবনের কথা কিন্তু ক্ষণস্থায়ীও নয় ক্ষণভঙ্গুরও নয়। পৃথিবীতে মানুষ মরে যায়, মরা মানুষটাকেও মানুষ ভুলে যায় কিন্তু তার কথা থাকে। তার চিহ্নও থাকে—সে কোথায় কোন দিন কপালে সিঁদুরের টিপ প'রে তার আঙুলটি মুছে গেছে তার দাগটি রয়েই যায়। বিবর্ণ হতে হতে ধুলোময়লার আবরণের তলায় লুকোয়। ধুলোময়লা ধুলেই পাওয়া যায় তাকে। খুঁজলে হয়তো, আদিম মানুষটির কোন-না-কোন চিহ্ন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও পড়ে আছে, লুকিয়ে আছে, বেরিয়ে পড়বে।

মণিদি বললেন—একটু বসুন। আমি এক্ষুনি এলাম ব'লে। যেন হঠাৎ মনেপড়া কাজের তাগিদে উঠে চলে গেলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে আমাকে বললেন—পড়ুন।

একখানা চিঠি। চিঠিখানা নিজের হাতেই রাখলেন এবং বললেন—সম্বোধনটুকু পড়ুন আর নিচে লেখক বা লেখিকার নাম পড়ুন।

দেখলাম—'প্রিয়তম অমৃত', আর পরিশেষে 'তোমার রত্না'।

মণি-বউদি বললেন—খানিকটা আমি পড়ে শোনাই। সবটা শোনাব না। শোনানো যায় না। পড়তে দিতেও যেন কেমন লাগবে আমার, দেব না। শুনুন।

"যে রমণী তোমাকে কিশোরী বয়স হইতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভালবাসিয়াছে, তোমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে, যে তোমার প্রিয়তমা ছাত্রী ছিল, যে প্রথম যৌবনে তোমার জন্য পাগলিনী হইয়াছিল, ঘর-সংসার সব ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিল, যে তোমার জন্য রাত্রির পর রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছে; অবশেষে তোমার কথায় তোমার নিকট দীক্ষা লইয়া কুমারীই থাকিয়া আজও অবধি তোমার পথ চাহিয়া মুখ চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই তুমি এত বড় সন্দেহ করিবে এতখানি ছোট চোখে নিরীক্ষণ করিবে তাহা কোনদিনই এই হতভাগিনী কল্পনা করিতে পারে নাই।

তুমি আমাকেই শেষ পর্যন্ত চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে? আমি মণির গহনা চুরি করিব, ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলো নষ্ট করিয়া দিব? 'মণি' আমার বড় দিদির মেয়ে! তোমার চেয়ে আমি তাহার অনেক আপন জন। আমি তাহার আপন মাসী। আমি এই পাপকার্য করিব?

তুমি কল্য আমার মুখের উপর বলিলে—যে, আমি তাহাকে হিংসা করি। আমি মণিকে হিংসা করিব?"

এর পরই মণি-বউদি চিঠিখানা মুড়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখলেন এবং একটু হেসে বললেন—'মানুষ যায় কথা থাকে' কথাটা আপনাদের মানে আমার স্বামীর গোষ্ঠীর কাছে শেখা কথা। কথাটা যেমন সত্যি তেমনি ভাল। আমার মাসী রত্নার কথাগুলোই শুধু আমার মনে খোদাই করা আছে তাই নয়, তার চিঠিপত্তর এবং কয়েকটা জিনিস আমি অত্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। একটা হারের লকেট দেখাই দাঁড়ান।

উঠে দাঁড়িয়েও বউদি বসলেন, বললেন—পরে দেখাব আপনাকে। লকেটটায় মীনা করে লেখা আছে 'মালা'। ওটা উনি দিয়ে-ছিলেন মাসীকে। মায়ের নাম ছিল পদ্মমালা মাসীর নাম রত্নমালা—আমার নাম মণিমালা। কিন্তু ওটা ছিল মাসীর।

আগেই তো বলেছি, আপনার দাদা এম-এ পাশ করে ইস্কুলে মাস্টারী করতে গিয়ে মাসীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। তারপর সে প্রেম এমন জমাট হল যে মাসী ঘর ছাড়ল, এ'র জন্যে মাস্টারী করতে লাগল। দুজনে সেকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশ যতদিন স্বাধীন না হবে ততদিন বিয়ে করবেন না। পরে আপনার দাদা আমাকে এর একটা বিবরণ দিয়েছিলেন। সেটা হল এই যে, ওঁরা দুজনে একদিন রাণা প্রতাপসিং থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন—সেকালে; তাতেই দেখেছিলেন—মা কালীর সম্মুখে প্রতাপসিং সর্দারদের শপথ করাচ্ছেন—মা কালীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর, যতদিন চিতোর না স্বাধীন হবে ততদিন আমরা বৃক্ষপত্র ভোজন করব, তৃণশয্যায় শয়ন করব। এইরকম একটা মস্ত ইতিহাস-বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা।

একটু হেসে বলেছিলেন—এখনও না কি চিতোরের রাণাবংশের সকলে এবং রাজপুত সর্দারদের অনেকে থালার নিচে গাছের পাতা রাখে আর খাট পালংকের গদির তলায় কয়েকগাছা খড় রেখে দেয়।

এ'রা দুজনে সেদিন থিয়েটার থেকে ফিরে, পরের দিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এবং তাই পালনও করছিলেন দুজনে। কিন্তু হঠাৎ বিধাতা-পুরুষই যেন আমাকে ওঁর ঘাড়ে দিলেন চাপিয়ে।

মাসী ব্রাহ্মঘরের মেয়ে, সরবতিয়া মাঈকে দেখে তার চটবার হয়তো কারণ ছিল। কিন্তু বারো বছরের আমাকে দেখে তো চটবার কারণ ছিল না, থাকবার কথাও নয়, তবু মাসী আমার আমাকে দেখেও চটলেন।

আমার বয়স তখন বারোর মাঝখান পেরিয়ে তেরোর কোঠার দিকে বেশী ঝুঁকেছে! আর সেকালে বারো তেরো বছরেই মেয়েরা এ বিষয়ে অনেক বেশী পেকে উঠতো। সুতরাং মাসী যাই বলুন যে ভাবে-ভঙ্গিতে বলুন, আমি তার গন্ধ থেকে ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাসী আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর দৃষ্টিতে দেখছে। আপনার দাদার বয়স তখন বত্রিশ তেত্রিশ, মাসীর বয়স ছাব্বিশ, আমার বয়স বারো। তাতে কিছু যায় আসে নি। ত্রিভুজটি দস্তুরমত শক্তপোক্ত হয়েছিল। সেই বারো বছর বয়সেই কেউ যেন খুঁচে, খোঁচা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে আমাকে মাসীর চ্যালেঞ্জ দিয়ে জীবনের আসরে নামিয়ে দিল। এবং নামিয়ে দেবামাত্র আমি দিব্যি সে চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করে কোমর বেঁধে নেমে গেলাম লড়তে।

কেমনভাবে জানেন? যাত্রীতে ঠাসাঠাসি কামরায় একটুখানি জায়গা পেয়ে কেউ যদি হঠাৎ মাঝখানে বসে পড়ে, এমন কি অক্ষম হয়েও ঠেলে পড়ে যায়, তা হলেও সঙ্গে সঙ্গে পাশের যাত্রীর কনুই দুটো যেমন সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রতিক্রিয়ার ওই ব'সে-পড়া যাত্রীটির কনুই বা সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে প্রতিরোধ করে, ঠিক তেমনিভাবে ব্যাপারটা শুরু হল।

রত্না মাসী সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে যে ঝগড়া শুরু করলে, তা দেখতে-শুনতে বেশ একটা পবিত্র গঙ্গাজল-খাওয়া হবিষ্যান্ন করা তপস্যা গোছের ব্যাপার হলেও বারো বছরের মণি-মালার মন তাতে প্রভাবিত হয়নি, সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল, মাসী ঝিকে মেরে বউকে শেখাচ্ছেন। অর্থাৎ সরবতিয়া উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য সে অর্থাৎ বারো বছরের মণি।

বারো বছরে, মণিমালার কৈশোর বাল্যকালকে দুই-এক নয়, বোধহয় চার পাঁচ পা পিছনে ফেলে যৌবনের দিকে যেন দীর্ঘ পদক্ষেপে বেশ একটু জোরেই হাঁটছিল। সরবতিয়া থাকলে হয়তো সরবতিয়ার প্রসংগ নিয়েই লড়াইটা করতো রত্নমালা, করতো অমৃত মুখুয্যের সংগে। বলতে পারত, নিজেরা পরস্পরকে ভালবেসেও যখন ব্রহ্মচর্যকে মাথায় করে তপস্যা করে যাচ্ছি, তখন সরবতিয়ার মত ভ্রষ্টার কলঙ্কিত ছোঁয়াতে কেন পড়ব? কেন?

কিন্তু সরবতিয়া মাঈ তখন চলে গেছে। সুতরাং সোজা ঝগড়া বাধল আমাকে নিয়ে।

হেসে মণি-বউদি বলেছিলেন—মেয়েদের কথা আপনি বোঝেন; লেখক মানুষ! দুই পুরুষে বিমলার চরিত্রের মধ্যে ব্যাপারটা সুন্দর করে দেখিয়েছেন। কল্যাণীকে যখন নটু ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন বিমলা এসে মহিমময়ীর মত বলছে—যেয়ো না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও। স্বামীকে তিরস্কার করে তাকে ঘরে আশ্রয় দিচ্ছে। আবার নটু যখন কল্যাণীর মুখ চেয়ে সুশোভনকে সহ্য করছে, তখন আগুন হয়ে এসে বলছে—আমার অরুণ যদি সুশোভনের মত হত, তা হলে কি তুমি তাকে সহ্য করতে?

ঠাকুরজামাই- আমার মাসী রত্নমালার চরিত্র ঠিক তাই। কল্যাণী আপনার নাটকে চরিত্র, অথবা এমনি প্যাসিভ না-হলে নাটক জমত না, অন্ততঃ ওইভাবে জমত না। আমি কল্যাণীর মত এতখানি কনসাস ছিলাম না। নিজের শুচিতা নিয়ে এতটুকু আশঙ্কাও ছিল না; কথাটা মনেও উঠত না। তা ছাড়া আমার বাবা টাকাকড়ি রেখে গিছলেন, গয়না রেখে গিছলেন, আমি ওদের উপর ভার বোঝাও ছিলাম না। বুঝেছেন ব্যাপারটা?

• • • •

শুধু ব্যাপারটাই বুঝি নি, আর বুঝে-ছিলাম, মণি-বউদি আমার আশ্চর্য মেয়ে। কারণ এমন ক'রে নিজেকে সে খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখেছে।

মণি-বউদিকে এ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন ওঁর সেই মাসী রত্নমালা এবং আংশিকভাবে অমৃতবাবু।

সরবতিয়া চলে যাওয়ার পরের দিনই। আমার মণি-বউদি—তখনকার বারো বছরের মণিমালা খুব কাতর হয়েই বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল। কাঁদছিল। অমৃতবাবু চুপ ক'রে বসেছিলেন। আপন মনে বকছিলেন মণিমালার মাসী রত্নমালা। বলছিলেন—গেছে বেশ হয়েছে। একটা প্রস্টিটিউট—একটা পাপ—বেশ হয়েছে গেছে। গঙ্গাজল দিয়ে ঘরদোর ধুয়ে ফেলা উচিত।

অমৃতবাবু কোন উত্তর করেন নি। মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন, যেন ভাবছিলেন। কি ভাবছিলেন তিনি জানেন। মণিমালা ছিল পাশের ঘরে; মাঝখানের খোলা দরজাটা দিয়ে মধ্যে মধ্যে তীর্যক দৃষ্টিতে সে দেখছিল। মাসীর কথার উত্তাপে ও তীব্রতায় তার চোখে জল পড়লেও আশ্রয়স্থল অমৃতবাবু কি বলেন শুনবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল; কথা শুনতে না পেয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে অমৃতবাবুর মুখ দেখে বুঝতে চেয়েছিল, মন তাঁর কি বলছে। অমৃতবাবুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকাটা তাকে যেন ভরসা দিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল রত্না মাসীর কথা তিনি ঠিক সমর্থন করতে পারছেন না।

মাসী সেটা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছিল, বলেছিল, কি—? কিছু বলছ না যে? কথাগুলো খুব পছন্দ হল না বুঝি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকেছিলেন, যেন প্রতীক্ষা করেছিলেন তাঁর উত্তরের; উত্তর না পেয়ে ফেটে পড়েছিলেন—শেষ! আজ থেকে তোমার সংগে আমার সম্পর্কের শেষ!

অমৃতবাবু এতক্ষণে বলেছিলেন—আঃ কি করছ রত্না? মেয়েটি পাশের ঘরে রয়েছে।

—হ্যাঁ রয়েছে। কাঁদছে। হয়তো জেগে আছে। শুনছে। তাতে কি হয়েছে? আমি ওর মাসী। মায়ের সহোদরা। তুমি কে? তোমার এত দরদ?

—দরদ মানুষের জন্যে মানুষের হয়, জন্তুর জন্যও হয়; সম্পর্ক থাকলেও হয়। না থাকলেও হয়। ওর দুঃখ একটা হয়েছে সেটা মানতেই হবে। সে মেয়েটি ওকে মায়ের মতই মানুষ করেছিল। ভালবাসত।

—মায়ের নামটা মুখে এনো না। নামটা কলঙ্কিত হবে। একটা ঝি, বাপের মিস্ট্রেস, তার মা ছিল বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের রক্ষিতা। পাপ। মূর্তিমতী পাপ। সেই পাপের হাত থেকে তাকে আমি রক্ষা করেছি।

• • •

সে এক অন্তহীন এবং অর্থহীন, অন্ততঃ নিরর্থক জোর করে বাধানো ঝগড়া। শুরুই হল কিন্তু শেষ হল না কোন দিন। দিন দিন বেড়েই চলল অকারণে।

সরবতিয়ার উপলক্ষ্য পুরানো হয়ে গেল—ঘষে পেলন হয়ে যাওয়া বাক্স এবং মিইয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের মত হাজার সংঘর্ষেও আগুন যখন জ্বালানো গেল না, তখন সরাসরি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আগুন জ্বলল।

১৯৪২ সালে সেদিন রাত্রে নিজের জীবনের গল্প বলতে বলতে যেন হঠাৎ হেসে মণি-বউদি বললেন—আগুন জ্বালানো তো খুব কঠিন নয় ঠাকুর-জামাই, কিন্তু আগুন জ্বেলে যাকে পোড়াতে চাই তাকে পোড়ানো খুব কঠিন কথা। কারণ, যাকে পোড়াতে চাই তারও তো একটা আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। আগুন প্রতিহত হলে ফিরে গিয়ে যে জ্বালিয়েছে তার কাছে চায় তার ক্ষুধার খাদ্য; অথবা পুজোর বলি, যাই বলুন। অশান্তি করতে গেলে তো আগে নিজেকে অশান্ত হতে হয়; সেই তো আগুনে জ্বলা। মাসী আমার আগুন জ্বালাতে গিয়ে গোড়াতেই আগুন জ্বাললে নিজের বুকে, তারপর তার থেকে আঙরা নিয়ে অগ্নিবাণ ছুঁড়তে লাগল ভাগাভাগি করে আমাদের দুজনের দিকে।

সরবতিয়া প্রসংগ পুরনো হ'ল, মুছে গেল; তারপর শুরু হ'ল, এ অসভ্য মন্দ তরিবৎ বিশ্রী সহবৎ মেয়েকে নিয়ে আমি করব কি? এবং ও'কে দৃঢ়স্বরে দায়ী করলেন, কেন তুমি ওকে এনে ঘাড়ে চাপালে? —কেন? কি তোমার স্বার্থ?

স্বার্থ কথাটা শুনে অমৃতবাবু প্রথম দিন বোমার মত ফাটলেন। —স্বার্থ? তুমি স্বার্থ খুঁজছ? একটি অসহায় মেয়ে বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, আমাকে বলে গেলেন—ওকে দেখো ভাই তুমি। রত্নমালাকে বলো—বলেই আমাকে ভার দিয়ে গেলেন। I promised — and I tried to keep that promise. — তোমার কাছে এনে দিয়েছি।

—আমি কেন এ দায়দায়িত্ব নিতে গেলাম? কি গরজ আমার?

—তোমার দিদির মেয়ে। তুমি মাসী।

—কিন্তু সে দিদি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে চলে গেছল একজন সমাজের বাইরের লোকের সংগে।

একটু হেসে অমৃতবাবু বলেছিলেন—থাক। এর পর আর পা বাড়িয়োনা রত্না, জায়গা নেই।

রত্নমালা কিন্তু এতেও থামে নি। শূন্য-লোকেই পা-ফেলে আকাশপথে চলতে চেষ্টা করেছিল। বলেছিল—আমি ভালবেসেছি তোমাকে কিন্তু নিজেকে কলুষিত করি নি।

একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে অমৃতবাবু বলেছিলেন—এমন হবে তা ভাবি নি আমি। ও মেয়েটি আর্থিক দিক থেকে কারুর ভার-বোঝা নয় এবং স্বভাবটভাবের কথা—; থাক সে-কথা। প্রয়োজন নেই সে বিতণ্ডায়। ওকে আমি কোন ভাল রেসিডেনসিয়েল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

মাসী চমকে উঠেছিল ঠাকুর-জামাই।

মণি-বউদিদি হেসে উঠে বলেছিলেন—সে চমক আমার মনে আছে, হাতে চায়ের কাপ ডিশ ছিল, চা খেতে-খেতে ঝগড়া হচ্ছিল; মাসী আমার চমকে বলে উঠল—কি বললে?

সংগে সংগে হাতের ডিশটার উপর থেকে কাপটা পড়ে গেল প্রথমে মাসীর কাপড়ে তারপর মেঝের উপর। এবং তপ্ত চায়ের ছ্যাঁকায়—'মাগো—মাগো' ব'লে, যাকে বলে ঝেড়েপেড়ে উঠে দাঁড়ানো, সেইভাবে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। যথাসাধ্য কাপড় ঝেড়ে চা ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন কাপড়খানা ছাড়বার জন্য। যাবার সময় বলে গেলেন—সারটেনলি নট্। ইউ কান্ট, ইউ কান্ট ডু ইট্। তোমার কোন অধিকার নেই। কো—নো—অধিকার নেই। সী ইজ মাই নিস্—আমার সহোদর

বোনের মেয়ে, আমি মাসী, আমিই তার একমাত্র গার্জেন। তার সম্বন্ধে তোমার কোন ডিসিশন নেবার কোন অধিকার নেই। আশা করি সে সম্পর্কে তুমি কনসাস্ হবে।

• • •

এবার আমার কথা বলি ঠাকুরজামাই।

এ ভারী মজার ব্যাপার। খেলা তো ঠিক নয়। কারণ খেলা মানুষ ইচ্ছে ক'রে খেলে বা খেলতে বসে। এতে মানুষের ইচ্ছের কোন দাম নেই; এতে যে যা করে—তাকে তাই একরকম যেন করতেই হবে। বর্ষার দিনে পোকাগুলো আলো দেখে উড়ে আসে, শুকনো দিনে আসে না কিন্তু মাটি ভিজলে আসবেই; যেন নেমন্তন্ন দেওয়াই আছে। এবং ওদিকে টিকটিকিকেও দেওয়া আছে। আলোর চারিধারে পোকা ওড়ে, কেন ওড়ে পোকা জানে; টিকটিকি ঘোরে পোকা খাবার জন্যে। তাকিয়ে দেখলে দেখবেন টিকটিকিটা ঠিক খেলা করছে, পোকাগুলো আলোকে ঘিরেও খেলছে, কিন্তু তাতে চলছে জীবনমৃত্যুর পালাগান।

যে-খেলায় বা যে-পালায় আমি ভিজে মাটির আশ্রয়হারা পতঙ্গ, পাখা মেলে অমৃতবাবুরূপী আলোটির কাছে উড়ে আসতে গিয়ে মাসীরূপী টিকটিকিটির গ্রাসের মুখে পড়েছিলাম, সে পালায় আমিও ক্রমাগত ওই আলোটাকেই স্বাভাবিকভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। টিকটিকিটা যখনই তাড়া করেছে তখন আমি ওই আলোর ফানুশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছি।

প্রথম শুরু হয় স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ দিয়ে। উনি এলেই আমার মুখে হাসি ফুটত। আশ্বস্ত হতাম। এবং সুযোগমত অসুবিধার কথা বলতাম।

মাসীই এগুলো ধরিয়ে দিত। বলত—তুমি ওর সম্বন্ধে কোন ইণ্টারেস্ট নিয়ো না।

ইনি বলতেন—কেন?

—কেন কি? তোমার উচিত নয়। মেয়েটা তুমি এলেই যেন হেসে ওঠে। তোমার কাছে ও আমার নামে লাগায়।

ইনি বলতেন—না। তা লাগায় না। তবে দু' চারটে অসুবিধার কথা বলে। আমাকে না-বলে কাকে বলবে? আর তো কাউকে চেনে না। এবং ওর বাপের কাছে আমি কথা দিয়ে খানিকটা মরালি রেসপনসিবল, তাও অস্বীকার করতে পারি না। তুমিই বল না পারি কি না? তা ছাড়া সংসার অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ়, এখানে মানুষ আশ্রয়স্থল স্বাভাবিকভাবেই খোঁজে। তাকে অভিযোগ করা বলে না।

মাসী তৎক্ষণাৎ কথাটার বাঁকা মানে করে নিয়ে বলত—তার মানে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ়! কেমন?

ইনি বলতেন—না—তা আমি বলি নি।

—তাই বলেছ। নইলে ও কথার মানে কি হয়? ওর কাছে সংসার বলতে তো আমার এই কোয়ার্টারটুকু এবং আমি।

ইনি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলেন—আমি আর তোমার এখানে আসব না।

মণি-বউদি বললেন—সত্যিই আসা ছাড়লেন ভদ্রলোক। ঘটনাটা প্রায় এক বছরের মাথায়। এলেন না মাসখানেক।

তারপর মাসী চিঠি লিখলে প্রেমের টানে। এবং লুকিয়ে আমিও চিঠি লিখলাম প্রাণের দায়ে। কারণ মাসী এই ভদ্রলোকের না-আসার জন্য আমাকে ষোল আনা দায়ী করে আমার উপর আক্রমণ তীব্রতর করে তুললেন। আমি বাঁচবার বা আমাকে বাঁচাতে পারে এ আক্রমণ থেকে এমন মানুষ খুঁজতে গিয়ে এ'কে ছাড়া আর দ্বিতীয়জনকে মনে মনে খুঁজে পেলাম না।

সেই শুরু হল চিঠি লেখা। ইনি এলেন চিঠি পেয়ে কিন্তু মাসীর কাছে আমার চিঠির কোন উল্লেখ করলেন না। অথচ আমি চিঠির জবাব পেয়ে গেলাম। এক ফাঁকে আমাকে একটা টুকরো কাগজে লিখে হাতে গুঁজে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—"তোমার কোন অসুবিধা হলে আমাকে এমনি করে চিঠি লিখে জানিয়ো।"

• • •

মণি-বউদি হেসে বললেন—আমাকে,—সেই ১৯৪২ সালের সেই রাত্রিটিতে, হঠাৎ কাহিনীর মাঝখানে ছেদ টেনে বললেন—"মুখোমুখি কথা বলে প্রেম জমানো বা প্রেমে দানা বাঁধানোর ভিয়েনটা কঠিন ঠাকুরজামাই; আমাদের দেশে মা-বাপে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেম একবারে রেডিমেড জামা পোশাকের মত গায়ে উঠে চেপে বসে। হাতে বড় হলে খাটিয়ে নেয়, খাটো হলে জোড়াতালি দিয়ে নেয় অথবা আজন্মই খাটো জামা প'রে কেটে যায়। তার মধ্যেও প্রেম জমাতে প্রেমপত্র ভরসা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থিয়েটারে যাত্রায় রিহার্স্যালে অভ্যেস করে তবে বলা যায়—'ওগো তোমায় ভালবাসি।' এমনিতে এটা ভারী কঠিন। চিঠির মস্ত সুবিধে মুখোমুখি চোখে চোখ রেখে বলতে হয় না; নির্জন স্থানের দরকার হয় না। দিব্যি কেমন আছ? কেমন আছ? লিখতে লিখতে দিব্যি লেখা যায়—"হৃদয়ে বড়ই যাতনা হইতেছে আজকাল—কেন তাহা বুঝিতেছি না।" সঙ্গে সঙ্গে ও তরফ থেকে উৎকণ্ঠিত উত্তর আসবামাত্র দিব্যি লেখা যায়—"হৃদয়ে কেন যাতনা হইতেছে তাহা কি বুঝিতে পারেন না?"

মণি-বউদি প্রগলভা হয়ে উঠেছিলেন। বাক্যে প্রগলভা হাস্যে প্রগলভা চিত্তেও বোধকরি প্রগলভা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটি নির্বিকারত্ব ছিল বলেই আমি অনুভব করেছিলাম।

বাল্যবয়সে প্রেম করেছিলেন, জীবন-সংকট ও সমস্যার যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে। তখন তার মধ্যে বিলাসের বৈভব ছিল না, হয়তো বা কোন মোহেরই স্থান ছিল না। আজ—অর্থাৎ ১৯৪২ সালের সেই রাত্রিটিতে, স্মৃতিস্মরণের মধ্যে বিলাস কৌতুক মোহের সরসতা ভাণ্ড পরিপূর্ণ করে এনে উজাড় করে দিয়েছিল।

মণি-বউদি অবলীলাক্রমে বলে গেলেন, কবে কখন কোন চিঠিতে যে ও'কে প্রাণ সমর্পণ করেছিলাম তা জানি না। উনিই বা যে কবে আমাকে চেয়েছিলেন তারও হিসেব ওঁর ঠিক নেই। তবে একজন বলতে পারতেন তিনি রন্না মাসী। তিনি চিঠির খবর সন্দেহ করতেন কিন্তু ধরতে পারতেন না। তবে আমার উপর নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছিল। বাড়ছিল আমার পড়াশুনো উপলক্ষ্য করে; এবং ও'র সঙ্গে ঝগড়ার পরিমাণ বাড়ছিল, যে কোন ছুতো অবলম্বন করে। সুতরাং তিনি বলতে পারতেন কার চোখের ভাষায় কবে কোন তারিখে চাওয়ার কথা ফুটে উঠতে তিনি দেখেছিলেন।

এ ভদ্রলোকের তখন সবে কপাল খুলেছে। ইনি দস্তুরমত অ্যাপিস টাপিস খুলে বসেছেন। একটা ঘোড়া একখানা পাল্কিগাড়ী যাকে কম্পাসের গাড়ী বলে, তাই কিনেছেন। মাসীর বাড়ী যাওয়া-আসা

কমে গেছে। আমি পনের পার হ'য়ে ষোলতে পড়েছি। পড়ছি সেকেণ্ড ক্লাসে মানে ক্লাস নাইনে। মাসীর পাহারায় থাকি। ইস্কুলে মাসী বাড়ীতে মাসী পথে মাসী। তবু মাসীর সন্দেহ যায় না। মাসী হঠাৎ আমার জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। আগেই বলেছি আমি তখন ষোলতে পা দিয়ে ষোড়শী হয়েছি। দাঁত দুটি উঁচু বলে এমনিতেই দেখনহাসি কিম্বা সুহাসিনী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ছবি বলে মনে হয়। ওদিকে রত্না মাসী তিরিশে পা দিয়েছেন এবং কোন কারণে জানি না, মনের দারুণ অশান্তি সত্ত্বেও দস্তুরমত মোটাতে শুরু করেছেন। সুতরাং 'তন্বি-শ্যামা শিখরিদশনা' আমাকে দেখে, যদি মাসী ঘাবড়ে গিয়ে থেকেছিলেন, তাহলে তার জন্যে কোন দোষ তাঁকে কেউই দিতে পারবে না। ঠাকুরজামাই, রত্না মাসীকে সেজন্যে অর্থাৎ আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হওয়ার আমি দোষী মনে করিনে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। কেন ঘাবড়ে গেলাম তা বুঝিনি। তবে ঘাবড়ে গিছলাম এটা ঠিক কথা। প্রস্তাবটা শুনে মনে হয়েছিল, মাসী আমাকে বিচিত্র পন্থায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কারাদণ্ডের মত একটা দণ্ড দিতে চাইছে।

আমি প্রথমে বলেছিলাম—না।

মাসী আশ্চর্য তীক্ষ্ন এবং তীর্যক দৃষ্টিতে আমার অন্তর ভেদ করে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কেন?

উত্তর তো ছিল না, সুতরাং চুপ করেই ছিলাম।

মাসী গর্জন করে উঠেছিল—বল'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—বল'। কেন বিয়ে করবে না সেটা বলতে হবে তো! বল'।

আমি এবার সাহস সঞ্চয় করে বলেছিলাম—বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবে না? কেন?

—তুমিও তো বিয়ে কর নি।

—না। করি নি। তার কারণ আছে—। তুমি বিয়ে করবে না, তার কারণটা কি? বল?

উত্তর আর চালিয়ে যেতে পারি নি, সুতরাং মাসী বিজয়িনীর মত বলেছিল—যাও, পড়াশুনো কর গে। যা করবার সে আমি করব। বাঁদরামি, প্যাকামি!

ঠিক সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা আমার না-দেওয়া জবাবটা দিলেন উনি। অর্থাৎ মাসীর প্রিয়তম বন্ধু। অমৃতবাবু তখন আসাযাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে রত্নমালার প্রতি তাঁর বিরক্তির চিহ্ন! কিন্তু ঠিক সেইদিনই এলেন তিনি। তিনি সমস্ত শুনে বললেন—না। ওর অমতে কেন বিয়ে দেবে তুমি? ওর বাপ আমাকে বলেছিলেন—দেখ ওকে পড়িয়ো। মনটাকে তৈরী ক'রে দিয়ো।

মাসী বলে উঠেছিল—না। লেখাপড়া শিখে কি হবে? এই তো আমার মত হবে। না। তা আমি হ'তে দেব না। মেয়েদের চাকরী ক'রে খাওয়ার মধ্যে গৌরব হয়তো অনেক-অনেক কিন্তু তার মধ্যে শান্তিও নেই সুখও নেই। আমি মানি না।

উনি—অর্থাৎ অমৃতবাবু বলেছিলেন;

মণি বউদি বলেছিলেন—আশ্চর্য শান্ত-ভাবে এবং তার থেকেও আশ্চর্যতর দৃঢ়তা ছিল ও'র শান্ত ভাবটির মধ্যে। উনি (অমৃতবাবু) বলেছিলেন—সে তুমি মানো বা না-মানো তাতে কিছুই আসছে যাচ্ছে না রত্না। এক্ষেত্রে যা মানতে হবে সেটা হ'ল, ওর বাপের অন্তিম ইচ্ছা এবং ওর নিজের অন্তরের বাসনা। অবশ্য তার সঙ্গে ওর যোগ্যতাও বিচার্য নিশ্চয়। এ তিনটিই তোমার মতকে সমর্থন করে না। এরপর সবথেকে যেটা বড় কথা সেটা হ'ল—মেয়েটি কারুর পোষ্য নয়। তোমার কাছে থাকলেও তোমাকে ওর জন্যে অর্থব্যয় করতে হয় না। ওর বাপ যে টাকা রেখে গেছেন—ক্যাশ সার্টিফিকেট রেখে গেছেন—ওর মায়ের যা গহনা আছে, তাতে ও কারুর দয়ার উপর নির্ভর করে না। ওর মজুত টাকা থেকে প্রতি মাসে তুমি টাকা নাও।

মাসী চীৎকার করে উঠেছিলেন—সে ওর মা থাকলে তাকেও এই টাকা থেকেই খরচ করতে হ'ত। সে রোজগার ক'রে আনত না।

অমৃতবাবু বলেছিলেন — সেক্ষেত্রে টাকাটায় তারও অধিকার থাকত। এবং মা আর মাসী ঠিক সমান কথা নয়।

মাসী আবার বলে উঠেছিল—অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠেছিল—ভাল কথা, তুমি কি ক'রে বাধা দাও আমি দেখব। বিয়ে দিয়ে ওকে আমি বিদায় করব, তবে আমি রত্নমালা।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—শোন তাহলে বলি। তা করতে চাইলে আমি কোর্টে গিয়ে দরখাস্ত করব, বলব—ওর বাপের শেষ ইচ্ছা আমি বহন করছি এই অধিকারে আদালতের আশ্রয় নিচ্ছি। ওর বাপের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ীই আমি ওকে ওর মাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি মাসী মেয়েটির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ওর বাপের শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। সুতরাং মেয়েটির স্বাধীন ইচ্ছা, পড়াশুনো করা, এবং বাপেরও সেই অন্তিম ইচ্ছা যাতে পালিত ও পূর্ণ হতে পারে, তার জন্য এই বিরুদ্ধবাদী মাসীর কাছ থেকে তাকে নিয়ে কোন নিরাপদ হোম বা বোর্ডিং হাউসে বা রেসেডেনসিয়াল ইস্কুলে তাকে রাখা হোক এবং তার পৈত্রিক টাকা গহনা ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদি কোন এ্যাটর্নির হাতে দিয়ে তাঁকেই আইন-সম্মত গার্জেন নিযুক্ত করা হোক।

এক নিশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন অমৃতবাবু। যেন মনে মনে সমস্ত কথা-গুলো ফেঁদে মক্সো করে এসেছিলেন।

শুনে রত্নমাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে-ছিলেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল—চোখদুটো নিস্পলক—চোখের তারা দুটোতে একটা ঝক্‌মকানি যেন খেলে যাচ্ছিল।

মণিবউদি বললেন—আমাকে নিয়ে মাসীর সঙ্গে ও'র ঝগড়া সেই নতুন নয়। বারো বছরে এসেছিলাম—তখন পনের পার হয়ে ষোলতে পড়েছি। চার বছর গেছে। ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে—ওর কাছে এসে পৌঁছুনোর ঠিক পর-দিন থেকে। কিন্তু কখনও রত্না মাসীকে হারতে দেখি নি। উনিও (অমৃতবাবু) কখনও বান্ধবীকে অর্থাৎ আমার মাসীকে কখনও হারিয়েও এমন ক'রে হার মানান নি। ঝগড়া শুরু করে একটা জায়গায় এসে মাসীকে কৌশলে নিরস্ত এবং নিরস্ত্র দুইই ক'রে মুখে নিজে হার মেনে নিতেন এবং নিতেন প্রেমিকের মতই সহাস্য আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গিতে— বলতেন—বেশ-বেশ তাই-তাই। তাই হ'ল গো। আমি হার স্বীকার করছি। তুমি যা করবে তাই হবে। তবে তোমার সাম্রাজ্যে এ অধীন অনুগৃহীত জন বলতে চায় যে, আমার বাক্যদানের কথাটা স্মরণ কর। আমার যুক্তিটা ভেবে দেখ।

মাসী হেসে ফেলে বলতেন—খুব যাহোক তুমি!

সে-দিন হ'ল প্রথম ব্যতিক্রম। উনি ওই কঠিন কথাগুলি বলেই উঠে চলে গেলেন। নিজের তরফ থেকে আপোষের চেষ্টা করা দূরে থাক, মাসীকেও তার নিজের হাতে রান্নাকরা চড়া নুন তর-কারিটাতে খানিকটা গুড় মিশিয়ে মুখে দেবার করে নেবারও অবকাশ দিলেন না।

আমি মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলাম ঠাকুরজামাই। মুখে আমার হাসির রেখা ফুটেছিল। হঠাৎ সশব্দ পদক্ষেপে মাসী গোটা বাড়ীটাকে চমকে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঠাস-ঠাস করে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিলেন। একটা গালে একটা মুখের সামনে—কপালে আর একটা মাথায়। বললেন—কে ওকে এসব খবর দিলে? কে? আজ সকালে কথা হয়েছে—আজই এসেছে। অথচ এ বাড়ী মাড়ানো ছেড়েছে? হঠাৎ আজই কেন এল বল? বল? বল? কে খবর দিয়েছে বল?

(ক্রমশঃ

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের সঙ্গে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি

ডঃ জাকির হোসেন ভারতের তৃতীয় ষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচন ম্পর্কে বোধহয় সবচেয়ে ভালো মন্তব্য রেছেন একটি নাগা যুবক যিনি একটি হযোগী সংবাদপত্রের সংবাদদাতার কাছে লেছেন : "কে ভাবতে পেরেছিল যে, দেশ ভাগের ২০ বছরের মধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ দে একজন মুসলমান আসীন হবেন?"

যদিও এটাই নয়াদিল্লীরও প্রধান প্রতি- য়া এবং যদিও স্বয়ং কামরাজ এই র্বাচনকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার তির জয় বলে অভিনন্দিত করেছেন, তবু মন্তব্য সবচেয়ে অবাঞ্ছিত মন্তব্যও বটে। রণ, এর মধ্যে ভারত এবং ভারতবাসী পর্কে এমন একটা কটাক্ষ প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রীতিকর নয়।

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, ডঃ হোসেনের তদ্বন্দ্বিতা গোড়া থেকেই একটা সাম্প্র- য়িক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

এই নির্বাচনের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল বটে। যেমন, এইবারই প্রথম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্যে সত্যিকার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এইবারই প্রথম বিরোধী দলগুলি মিলিতভাবে একজন প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে- ছিলেন। কিন্তু যে-বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল, তা হল এই সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন। কংগ্রেস বিরোধীরা তো বটেই, কংগ্রেসের ভেতরেও অনেকে ডঃ হোসেনের প্রার্থীপদকে সুনজরে দেখতে পারেননি। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই প্রশ্নের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে- ছিলেন। এমনকি সুপ্রীম কোর্টের কয়েকজন

উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি
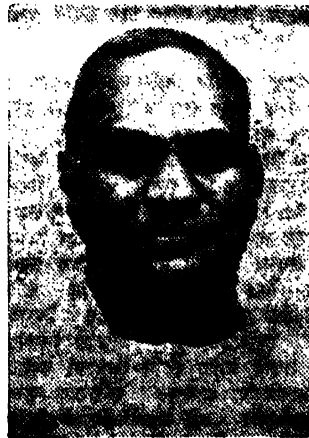
প্রাক্তন বিচারপতি এক বিবৃতিতে ডঃ হোসেনকে মনোনীত করায় কংগ্রেসের সমা- লোচনা করে বলেছিলেন যে, এর ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে আরও উস্কে দেওয়া হল। তাঁরা এ-কথাও বললেন যে, এর ফলে পাকিস্থান সম্পর্কে ভারতের পক্ষে দরকার হলে কঠিন মনোভাব গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়বে।

এই অবাঞ্ছিত বিতর্ক সৃষ্টিতে কংগ্রেসের নিজস্ব অবদানও কিছুটা ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। গোড়া থেকেই তাঁরা এমনভাবে প্রচার করে আসছিলেন যে ডঃ হোসেনের জয়-পরাজয়ের ওপরই যেন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ভারতের মর্যাদা বা অমর্যাদা নির্ভর করছে। সংবিধানে যখন সকল ধর্মের নাগরিকদের সমান অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তখন এই প্রশ্ন তোলারই কোন দরকার ছিল না। নির্বাচন যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হয় তাহলে কারো না কারো পরাজয় ঘটবেই। ডঃ হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সেইভাবে দেখা যেত। পরিপক্ক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সেটাই হত সঙ্গত।

অবশ্য এই বিতর্কের ফলে পরোক্ষ- ভাবে লাভ হয়েছে ডঃ হোসেনেরই। তিনি একজন পার্টি প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করতে পারতেন। তিনি এখন একজন অনেকটা জাতীয় প্রার্থী রূপে জয়লাভ করলেন। যে বিপুল ভোটাধিক্যে (১ লক্ষ ৭ হাজার ২৭০ ভোট) তিনি জয়লাভ করে-

ছেন তার দ্বারাই একথা প্রমাণিত হয়েছে। বিরোধী প্রার্থী শ্রীকোকা সুব্বা রাওয়ের প্রতি কোনরকম কটাক্ষ করা আমাদের দূরতম উদ্দেশ্যও নয়, কিন্তু ডঃ হোসেন তাঁর নিজস্ব বিশিষ্টতার গুণেই জয়লাভ করেছেন। তিনি কেবল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটই পান নি (তাঁর পক্ষে ২৫০২১ এম-পি ভোট দিয়েছেন, শ্রীসুব্বা রাওয়ের পক্ষে ২৭৮ জন), রাজ্য বিধানসভাগুলিরও তিনি অধিকাংশ ভোট পেয়েছেন। এবং মিলিতভাবে রাজ্য বিধানসভাগুলিতে বিরোধীপক্ষেরই প্রাধান্য। বিধানসভাগুলিতে ডঃ হোসেন পেয়েছেন ২,১৬৬ জন এম-এল-এ'র ভোট এবং শ্রীসুব্বা রাও পেয়েছেন ১,৮২৯ জন এম-এল-এ'র ভোট।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ এই তিনটি প্রধান অ-কংগ্রেসী-শাসিত রাজ্যেও ডঃ হোসেন বিরোধী প্রার্থীর চাইতে বেশী ভোট পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১০টি, পাঞ্জাবে ১২টি ও উত্তরপ্রদেশে ২৯টি অতিরিক্ত ভোট ডঃ হোসেনের পক্ষে পড়েছে। তেমনি কেরল, বিহার ও আসামেও ডঃ হোসেনের পক্ষে হিসেবের বাইরে যথাক্রমে ২১টি, ১৫টি ও ১২টি ভোট পড়েছে। দেশবাসীর চোখে তিনি যে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত এই অংকগুলি তারই তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ।

দেশে ডঃ হোসেনের নির্বাচন সম্পর্কে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেটা একটা বিশেষ শ্রেণীর এবং সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু বিদেশে সাধারণভাবে সর্বত্র এই নির্বাচন অভিনন্দিত হয়েছে। সোভিয়েট সরকারী সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়া ডঃ হোসেনকে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী এবং সোভিয়েট জনগণের অকৃত্রিম সুহৃদ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আরব দেশগুলির কাগজগুলিতে এই নির্বাচনকে ভারতের রাজনৈতিক পরিপক্কতার প্রমাণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আশা করা হয়েছে যে এর ফলে ভারতের সঙ্গে আরব দুনিয়ার সহমর্মিতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাজারত্নম এই নির্বাচনে 'গভীর আনন্দ' প্রকাশ করেছেন এবং সিঙ্গাপুরবাসীদের পক্ষ থেকে ডঃ হোসেনের স্বাস্থ্যপান করেছেন। পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়াও অসন্তোষজনক নয়।

ডঃ হোসেন নিজে তাঁর নির্বাচনকে 'একজন সামান্য শিক্ষকের' প্রতি জাতির আস্থার নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্প্রতি বলেছিলেন, যে সমাজ একজন শিক্ষকের প্রতি এই সম্মান দেখাতে পারে সেই সমাজ কখনই অসুস্থ নয়। একজন আজীবন শিক্ষাব্রতীর পক্ষে এর চাইতে সুন্দরভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের আহ্বানে যে অগণিত তরুণ জাতীয় কর্তব্যের ব্রত পালনের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন, ডঃ হোসেন ছিলেন তাঁদেরই একজন। কিন্তু ডঃ হোসেন তাঁদের চেয়ে একদিক দিয়ে বিশিষ্টও ছিলেন। কেননা জাতীয় কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিলেও রাজনীতিকে তিনি সেই কর্তব্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর আজীবনের নেশা শিক্ষাজগতের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষার এমন একটি রীতি তিনি উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন যা ভারতের প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই আদর্শ নিয়েই তিনি আলিগড়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেছিলেন। পরে এই প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে উঠে গিয়েছিল। আজ সেই প্রতিষ্ঠানটি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী যখন তাঁর বিখ্যাত বুনিয়াদী শিক্ষার মতবাদ প্রচার করেন, তখন বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদের জন্যে তিনি ডঃ হোসেনকেই বেছে নেন।

আজ ৭০ বছর বয়েসে ডঃ হোসেন শুধু এদেশের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীই নন, তিনি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতীকস্বরূপও। তিনি মূলত একজন মানবতাবাদী, একজন যুক্তিবাদী এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী। মূল্যবোধের যে দ্যুতি নিয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রপতি ভবনে এসেছিলেন সেই দ্যুতি ডঃ হোসেনের মধ্য দিয়ে সমানভাবে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবার পর মুহূর্তে এক বিবৃতিতে ডঃ হোসেন বলেছিলেন, জনগণ যে আস্থা তাঁর প্রতি দেখিয়েছেন, তার যোগ্য হয়ে উঠবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য এবং সবসময় চেষ্টা করবেন।

১৩ মে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ করবার পর রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি প্রথম যে বক্তৃতা দেন, তাতেও তিনি এই সংকল্প ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমগ্র ভারতই আমার গৃহ, সমগ্র ভারতবাসীই আমার পরিজন। এই গৃহকে সুন্দর ও শক্তিশালী করে তোলাই হবে আমার একমাত্র কাজ। ভারতীয় সংস্কৃতির সামগ্রিকত্বের বেদীমূলে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এই সামগ্রিকতা শুধু সকল ধর্মের, সকল ভাষার, সকল জাতি, বর্ণ ও মতবাদের মিলিত ফল নয়, যে মূল্যবোধ অতীতে ছিল, যে মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সনাতন ভারতবর্ষ দূর অতীত থেকে নিকট বর্তমানে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এই সামগ্রিকতা তাকেও গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে। তাই ভারতের সুখী ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতীতকেও স্মরণ করতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছিলেন :

তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও,
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও।

বর্ষার ভরসা

বিশ্ব-ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জর্জ উডস্ সম্প্রতি ভারত সফর করে গেছেন। তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিনে অনুসন্ধান করা। উডস্ নিজে তাঁর এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে এই ধারণাই হয়েছে যে, ভারতবর্ষের পরিকল্পনাকারদের মত তার উত্তমর্ণরাও এই দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভারতবর্ষের অর্থনীতি আবার চাঙা হয়ে উঠবে কিনা, ১৯৭১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে কিনা, কলকারখানাগুলি আবার চালু হবে কিনা, ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে কিনা, এইসব প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে আগামী বর্ষা কিরকম হবে তার উপর। একথা আমাদের পরিকল্পনাকাররা আগে থেকেই জানতেন। পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা ত পরিষ্কারই বলেছেন, আগামী পরিকল্পনার আয়তন নির্ভর করবে আগামী বর্ষা ও বৈদেশিক মুদ্রা কি পরিমাণ পাওয়া যাবে তার উপর। এখন জর্জ উডস্ খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে বলেছেন, "দুটি ভাল বর্ষা হলে আপনি বাহাদুর বনে যাবেন।"

এটা একটা বহু পুরাতন সত্য যে, ভারতের অর্থনীতি হচ্ছে বৃষ্টি নিয়ে জুয়া। কিন্তু কথাটা এত মর্মান্তিকভাবে সত্য আগে আর কখনও হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। ভারত সরকারের আশা এই যে, আগামী বর্ষায় সুবর্ষণ হবে, কোথাও অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হবে না, খাদ্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১০ কোটি মেট্রিক টন হবে, পাট, তুলা আখ, বাদাম প্রভৃতিরও উৎপাদন বাড়বে এবং তার ফলে চিনির কল, কাপড়ের কল, চটকল প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাবে ও বাজার দরের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হবে। আরও আশা যে, কাঁচা মালের অভাব মিটলে রপ্তানী করার মত উদ্বৃত্ত পণ্যের যোগানও বৃদ্ধি পাবে এবং তা দিয়ে ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার ঘটান যাবে।

ভারতবর্ষের পরিকল্পিত অগ্রগতির সমগ্র ব্যবস্থা তখন বলতে গেলে এই সরকারী ধারণার উপর নির্ভর করছে। বিশ্ব-ব্যাংক এই গণনা সম্পর্কে কি মনে করেন, সেই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বিশ্বব্যাংকের ধারণার উপর ভবিষ্যতের বৈদেশিক সাহায্যের ধরন ও পরিমাণ নির্ভর করছে।

সেদিক থেকে এটা ভাল কথা যে জর্জ উডস্ এই ধারণা নিয়ে ফিরে গেছেন যে, ভাল বর্ষণ হলে তার সুযোগ নিয়ে উৎপাদন বাড়াবার জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত হয়ে আছে। ভারত সরকার কিছুদিন যাবৎই বলে আসছেন যে, ভারতীয় চাষী উৎপাদন বাড়াবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে এবং সার, ভাল জাতের বীজ, কীটঘ্ন ইত্যাদির উপযোগিতা আজ বুঝতে শিখেছে। মিঃ উডস্ পাঞ্জাবে ঘুরে দেখেছেন যে, সেখানকার চাষীরা নূতন জাতের ফসল ফলাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কার্যক্রম সফল করে তুলতে উৎসুক। জর্জ উডসের মতে, ভারতবর্ষকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার পরিকল্পনায় যদি কোন কিছুর ঘাটতি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে রাসায়নিক সারের ঘাটতি।

মার্কিন সংবাদ সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকার পক্ষ থেকে জন স্কট সম্প্রতি পৃথিবীর কয়েকটি ক্ষুধাপীড়িত দেশে সফর করে বিশ্বব্যাপী বুভুক্ষা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন তাতে কিন্তু ভারতবর্ষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে—এবং সেটাও রাসায়নিক সারের যোগানের প্রশ্নে। স্কট তাঁর রিপোর্টে লিখছেন, '১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে ১২ কোটি মেট্রিক টন করার জন্য ও মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য অশোক মেহতা যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা করেছেন, তার সাফল্য নির্ভর করছে ১৯৭০ সালের মধ্যে ২৪ লক্ষ টন নাইট্রোজেন তৈরীর উপর। ১৯৬৫ সালে নাইট্রোজেন তৈরী হয়েছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন। পাঁচ বৎসরে এই উৎপাদন পাঁচগুণ করা, কম করে বললেও বলতে হয়, কঠিন হবে। প্রধানতঃ সারের কারখানা তৈরী করতে বিদেশী বেসরকারী মূলধন ব্যবহার ভারত সরকারের অনিচ্ছা বা অক্ষমতার দরুণই এখন মনে হচ্ছে যে, ১৯৭০ সালে সারের উৎপাদন পরিকল্পিত ২৫ লক্ষ টনের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। আর এই বড় ঘাটতিই ফসলের ঘাটতিকে কার্যতঃ অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।'

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য, উইলিয়াম প্যাডক ও পল প্যাডক নামে দুজন মার্কিন লেখক সম্প্রতি 'ফেমিন—১৯৭৫' নামে একটি বই লিখে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচাবার প্রয়াস করে কোন লাভ নেই। তাঁদের বক্তব্য এই যে, ১৯৭৫ সালে সারা পৃথিবীতে একটা বৃহৎ দুর্ভিক্ষ হতে চলেছে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু এইটুকু করতে পারে যে, যাদের এখনও উদ্ধার পাওয়ার আশা আছে তাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য সে সময়মত সাহায্য করতে পারে। ভারতবর্ষ এদের মধ্যে পড়ে না। ভারতবর্ষের কৃষি অত্যন্ত মন্দ-দশায় রয়েছে, তার সরকার ও প্রশাসন এত বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকর্মণ্য এবং তার কৃষকরা এত পুরাতনপন্থী যে, আগামী দশকের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা তারা করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ভারতবর্ষকে বাঁচাবার চেষ্টা করেও, তাহলেও ১৯৭৫ সালের মধ্যে এই দেশে আমদানী করা খাদ্যশস্যের চাহিদা এত বেড়ে যাবে যে, এই চাহিদা পূরণ করা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এই হচ্ছে উইলিয়াম প্যাডক ও পল প্যাডকের অভিমত।

কেবল বিদেশেই নয়, ইতিমধ্যে দেশের ভিতরেও কিছু কিছু প্রশ্ন উঠছে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে যেখানে খাদ্যশস্যের ফলন বেড়েছে মাত্র শতকরা বার্ষিক ১.২ হারে সেখানে আগামী পাঁচ বৎসরে এই ফলন বাড়বে বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে, এটা কি করে আশা করা যায়? সারা দেশে সর্বত্রই সমানভাবে সুবর্ষণ হবে, এটাই বা কি করে আশা করা হচ্ছে? অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির বৎসরও ত সারা দেশে সমান অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হয় না। গত বৎসরের অনাবৃষ্টির মধ্যেও দক্ষিণ ভারতে ভাল বৃষ্টি হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে রবি ফসল ভালই হয়েছিল।

সুতরাং, এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পরিকল্পনাকাররা কি করে আশা করছেন যে, একটা সুবর্ষণেই খাদ্যশস্যের ফলন ২ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেড়ে যাবে!

আমার যুবক বন্ধু ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমার যুবক বন্ধু, ভিন্‌দেশী পত্র ওর এইমাত্র জানাল :
ওর প্রাত্যাহিক কাজ আড্ডা কাজ ক্লান্ত দিনান্তের অবকাশ
সাধ্যসাধ পর্যটন আর তৃপ্ত তীর্থযাত্রা সাহিত্যসকাশ
আর প্রশ্ন, আমরা কেমন।...আমরা?
প্রশ্নটা কী বেখাপ্পা শোনাল!

ও কি জানে—ভাবছি আর কে জ্বালবে
গানগল্পগোলমালের আলো
বিষাদপ্রদোষে, ঝুলি ঝেড়ে বিলোবে কে বই নির্জনতা ঘাস
জোনাকি ও সিগারেট, তারার চকমকি ঠুকে ঘরকে আকাশ
কে বানাবে, বাজাবে কে ঝিঁঝিডাকা বাংলাদেশ
ফরাসি ভিঅ্যাল-ও।

আমার যুবক বন্ধু দূরে দেশে। ওকে আমি কী পারতুম দিতে?
দিলুম কী! দেশ ওকে দিল কিবা! ও কি কিছু চেয়েছিল পেতে!
জননী কি সহোদরা প্রিয় প্রিয়তরা কেউ পেল না উদ্দেশ।

ও কিন্তু নিয়েছে সঙ্গে স্মৃতির বকুলগন্ধ স্বপ্নপার যেতে
গঙ্গার গেরুয়া স্বর সেইন-এর উজানে কানে ভরে নিতে নিতে
চলে যাচ্ছে দেশবিদেশ জগতপথিক ওর পৃথিবী স্বদেশ।

জ্যোৎস্নায় স্মৃতি ॥

শঙ্কর রায়

বাতাসে ভাসে যাবার ভাষা মৃদুল ছড়ে,
তমাল বনে জ্যোৎস্নারাত মঞ্জরিত :
চেতনা কাঁপে : ভীত হরিণ তীক্ষ্ণ স্বরে
হঠাৎ ডাকে জানি না কাকে; এই নিভৃত
বৃক্ষছায়া স্মরিয়ে দেয় শীতের দিন,
দূর পাহাড়, শিলাবৃষ্টি, সেই প্রতীতি।
উড়ো চুলের গন্ধমাখা স্মৃতিবিলীন,
শ্যামলিমার মতন মুখ দীপ্তজ্যোতি,
ভুলে যাবার, দূরে যাবার মধ্যে নামে
দীঘল বেলা; অল্পায়ত স্মৃতির রেখা।
স্তব্ধতার আগল ভাঙে সঙ্ঘারামে :
অন্তরালে বিষণ্ণতা ভীষণ একা।
এখন আমি জলরঙের ছবির মতো
চিত্রশালা আগলে আছি সারাজীবন :
একটি মুখে চেয়েছিলাম সমুদ্যত
জলোচ্ছ্বাস, গড়ে উঠুক অভিভাবন
বিস্ময় বিপুলতার : এখনো তার
উচ্চারণে শান্তি পাই; চাঁদের ছায়া
নামলে পরে দরজা খুলে স্নিগ্ধতার
আস্বাদন বিছিয়ে দিতে; বিগত কায়া :
এখন মুখ ফিরিয়ে থাকি, ভিতর বুকে
অশ্রু ঝরে শব্দহীন; কিশোর কালে
নদীর বুকে হারিয়ে ফেলি হেলায় তাকে।
স্মৃতির সাধ : দুঃখ থাক জীবৎকালে।

(১)

মাধবেন্দ্রপুরী

মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্র। ধরা-বাঁধা কোনো বাসস্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ান। দুধ ছাড়া কিছু খান না, তাও যদি কেউ সেধে দেয়, তা হলেই। নিজে চেয়ে কিছু নেন না, উপোস করে থাকলেও না। সব সময়েই আনন্দে ভরপুর হয়ে আছেন। এ শুধু কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ। কৃষ্ণ যদি অশনে রাখেন, তিনিই রেখেছেন অনশনে। উপবাসও তো কৃষ্ণের কাছে গিয়েই বাস করা।

তীর্থভ্রমণ করতে-করতে গিয়েছেন মথুরায়। এক সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ তাঁকে অতিথিরূপে ঘরে ডেকে এনেছেন। সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে সন্ন্যাসীদের যে কিছু খেতে নেই। ব্রাহ্মণ ফাঁপরে পড়ল, তাহলে কি অতিথি অভুক্ত থাকবে? মাধবেন্দ্র সন্ন্যাসী হলেও কৃষ্ণপ্রেমময়তনু। তাঁর কাছে আবার জাতি-কুলের অভিমান কী। বললেন দুধ নিয়ে এস দুধ খাব। আর তোমাকে দিয়ে যাব কৃষ্ণপ্রেমের মন্ত্র।

মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীর গুরু। ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। সুতরাং লৌকিক লীলায় মাধবেন্দ্র মহাপ্রভুর গুরুর গুরু পরমগুরু।

মথুরা থেকে এসেছেন বৃন্দাবনে। গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করে গাছের নিচে বসেছেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। খাবার দুধ জোটে নি, কৃষ্ণপ্রেমে কীর্তন করে চলেছেন।

একটি রাখাল ছেলে হঠাৎ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। তার হাতে এক ঘটি দুধ।

'তুমি এই দুধ খাও।' বালক মাধবেন্দ্রের সামনে ঘটি নামিয়ে রাখল।

কে এই বালক? এমন নয়নমনোহর! আর গলার স্বরটিও কী মধুর! দেখে-শুনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়—এই বালক কে, কোথায় থাকে, কী করে জানল আমি উপবাসী।

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল মাধবেন্দ্র।

'আমি এক গয়লার ছেলে,' বালক মিঠি-মিঠি হাসে : 'ছোট্ট গয়লা।'

'কোথায় থাকো?'

'কোথায় আবার থাকব, এই গ্রামেই থাকি।'

'করো কী?'

'যারা কারু কাছে কিছু চায় না, না পেলে অনাহারে থাকে, তাদের আমি খাদ্য জোগাই।'

'তুমি কী করে জানলে আমি অনাহারে আছি?'

বালক আবার হাসল। 'কী করে জানলাম? গ্রামের গোপিনীরা গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করতে এসেছিল। তারা তোমাকে দেখে গেল, দেখেই বুঝে নিল সারা দিন কিছু খাও নি। তারাই আমাকে দুধ দিয়ে পাঠাল তোমার কাছে।'

গোপিনীরাই বা কী করে বুঝল আমার কিছু জোটে নি পানাহার! আর এ ছেলেটা কি তাদের চাকর? বলামাত্রই ফরমাস খাটতে ছুটেছে?

'তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে এসে ঘটি নিয়ে যাব। আমার সময় নেই, আমাকে এখুনি গিয়ে আরো গরু দুইতে হবে।'

বলেই বালক ছুট দিল। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাধবেন্দ্র দুধ খেয়ে ঘটি ধুয়ে রাখলেন। কিন্তু কই সেই বালক তো ফিরে এল না! পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে—পথও যা প্রতীক্ষাও তাই।

চোখে ঘুম নেই, সারা রাত বসে নাম-কীর্তন করতে লাগলেন। শেষরাতের দিকে চোখে বুঝি একটু ঘোর লাগল। স্বপ্ন দেখলেন মাধবেন্দ্র।

স্বপ্ন দেখলেন সেই রাখাল-ছেলে এসেছে।

'চলো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন মাধবেন্দ্র।

'এসো না আমার সঙ্গে।' বলে সেই বালক মাধবেন্দ্রের হাত ধরল।

পথ দেখিয়ে তাঁকে এক লতায়-পাতায় ছাওয়া ছায়াভরা সুন্দর কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে এল। বললে, 'দেখ আমি এই কুঞ্জের মধ্যে কী কষ্টে আছি। আমার মাথার উপরে কোন আচ্ছাদন নেই, চারপাশে কোন প্রাচীর নেই। শীতে-গ্রীষ্মে-বৃষ্টিতে আমার দুর্ভোগের একশেষ হচ্ছে।'

'তোমাকে এখানে আনল কে? বসাল কে?'

'আমি আগে গিরিগোবর্ধনের উপরে মন্দিরের মধ্যে ছিলাম।' বললে বালক, 'আমার সেবক ম্লেচ্ছের ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে এনে রেখে পালিয়ে গেছে। সে আর এল না। এখন তুমি আমাকে উদ্ধার করো।'

'তোমাকে গোবর্ধনে কে এনেছিল?'

'কেউ আনে নি, কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুমি আবার আমাকে গোবর্ধনে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। সেখানে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করে দাও। আমি তো তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি। কবে মাধব আসবে, কবে তার প্রেমে তার সেবা অঙ্গীকার করে নেব।'

'এ তো গোপালের মূর্তি!'

'হ্যাঁ, আমিই তো গোপাল! আমিই তো গোবর্ধন ধরেছিলাম। তাই তো গোবর্ধনে আমার অধিকার। তুমি ওঠো, আমাকে গোবর্ধনে রেখে এস।'

মাধবেন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল।

এ কী, আমি কৃষ্ণকে দেখলাম অথচ চিনতে পারলাম না! মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন মাধবেন্দ্র।

কিন্তু শুধু কাঁদলেই তো হবে না, কাজ করতে হবে। আজ্ঞা পালন করতে হবে।

প্রাতঃস্নান সেরে মাধবেন্দ্র গ্রামে গেলেন। গ্রামবাসীদের একত্র করে বললেন, 'তোমাদের এ গ্রামের ঈশ্বর কুঞ্জের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, চলো তাঁকে বার করে নিয়ে আসি।'

গ্রামবাসীরা কোদাল-কুড়ুল নিয়ে চলল। কুঞ্জ একেবারে নিবিড় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। লতাপাতা কেটে প্রবেশের পথ তৈরি করে সবাই ভিতরে ঢুকল। দেখল, সত্যিই তো, মূর্তি ঘাসে-মাটিতে ঢাকা পড়ে আছে। এবার তাকে মুক্ত করে বার করে নিয়ে এস, তোল পাহাড়ের উপর।

ভীষণ ভারি মূর্তি—জোয়ান-জোয়ান পালোয়ান নিয়ে এস। পাথরের সিংহাসন করো। তারপর তোল গোপালকে, বসাও সিংহাসনে।

যথাদিষ্ট গোপালকে গোবর্ধনে বসান হল।

এবার তবে অভিষেকের আয়োজন কর। বাদ্য-ভেরী নিয়ে এস। নাচ-গানের আসর সাজাও।

গ্রামের ব্রাহ্মণেরা একশো নতুন ঘটে গোবিন্দকুণ্ডের জল নিয়ে এল। মাধবেন্দ্র নিজের হাতে শ্রীঅঙ্গের ধুলো-মাটি ধুয়ে দিলেন। তারপর তেল দিয়ে শ্রীঅঙ্গকে চকচকে করে তুললেন। পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করালেন, গন্ধোদকে সে স্নানের সমাপ্তি হল। তারপর শ্রীঅঙ্গ মার্জন করে নববস্ত্র পরালেন। গলায় দুলিয়ে দিলেন চন্দন-তুলসীর মালা, ফুলের মালা। তারপরে ভোগ লাগালেন।

দই দুধ ঘি সন্দেশ—গোপালের জন্যে কত লোক কত কিছু যে নিয়ে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। তার উপরে দশজন ব্রাহ্মণ এসে
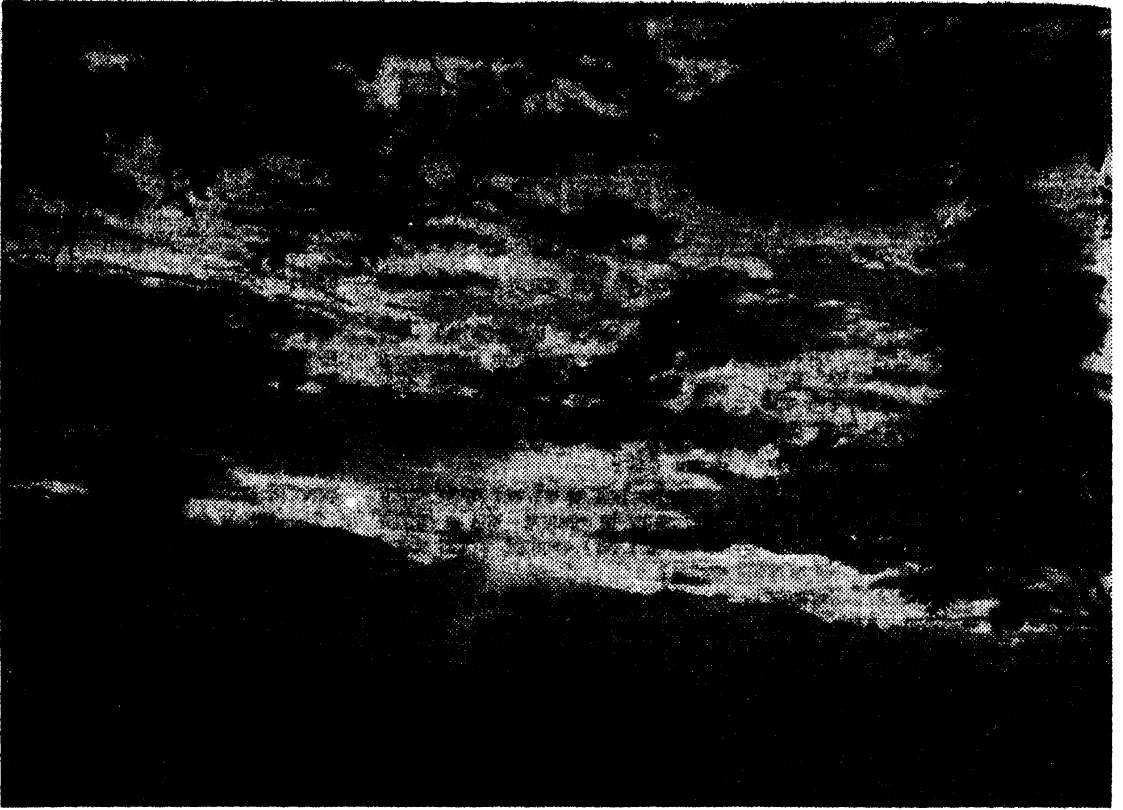
সূর্যাস্ত ফটো : মনোরঞ্জন কুন্ডুচৌধুরী

রাঁধতে লেগেছে। পাঁচ-সাতজন বসেছে রুটি বানাতে। রাশি-রাশি রুটি স্তূপে-স্তূপে ভাত। নতুন কাপড়ের উপর পলাশের পাতা পেতে তার উপরে রাখছে পাহাড় করে। বিচিত্র স্বাদের বহু তরকারিও রান্না হচ্ছে। মাঠা-মাখন-সর-পিঠে-পায়েসও কত। অনেক ঘট ভরে রাখছে ঠাণ্ডা জল।

গোপালের যে অনেক দিনের খিদে।

মাধবেন্দ্রের কাছে আর লুকনো যাবে না, সে দেখতে পেল গোপাল সব খেয়ে নিল কিন্তু আবার তারই স্পর্শে অন্ন-ব্যঞ্জন যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। স্তূপের থেকে একটি কণাও ভ্রষ্ট হল না।

তারপর মাধবেন্দ্র গোপালকে সুবাসিত জলে আচমন দিয়ে পানের খিলি খেতে দিলেন। তারপর আরতি দিয়ে শয়ন দিলেন নতুন খাটে। কাশের বেড়া দিয়ে ঢেকে দিলেন চার পাশ।

তারপর গ্রামের অধিবাসীরা সকলে প্রসাদ পেল।

ব্রজবাসী ব্রাহ্মণদের বিষ্ণুমন্ত্র দিয়ে বৈষ্ণব করলেন মাধবেন্দ্র। তোমরা এখন থেকে আমার গোপালসেবার ভার নাও।

গোপাল প্রকট হল—আশে-পাশে দেশে-দেশে সব উঠল—চলো যাই দেখে আসি, গোপালপ্রীতি তো সকলের সহজপ্রীতি।

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় গোপালের মন্দির করে দিল, কেউ করে দিল রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। কেউ বা অঙ্গনের প্রাচীর। বাংলা দেশ থেকে দুজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলে তাদের দীক্ষা দিয়ে তাদের হাতে মাধবেন্দ্র মন্দিরের মূল ভার সঁপে দিলেন।

সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

দু বছর পরে গোপাল আবার স্বপ্নে দেখা দিল।

বললে, 'মাধব, তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ কিন্তু আমার গাত্র তাপ এখনো গেল না।'

'কী করলে যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মাধবেন্দ্র।

'যদি আমার গায়ে মলয়চন্দন মেখে দিতে পারো তবেই আমার জ্বালা জুড়োয়।'

'সে চন্দন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'নীলাচলে।'

ঘুম থেকে জেগে উঠেই মাধবেন্দ্র চললেন নীলাচলে।

পথিমধ্যে এলেন বাংলা দেশে, শান্তিপুরে, অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে। প্রেমময় মাধবেন্দ্র, তাকে দেখে অদ্বৈত পরমানন্দে বললেন, আমাকে দীক্ষা দিন।

মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিলেন অদ্বৈতকে। দীক্ষা দিয়ে চললেন দক্ষিণে।

রেমুনাতে এসে পৌঁছুলেন। রেমুনাতে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। দর্শন করলেন গোপীনাথ।

সেবক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গোপীনাথের কী-কী ভোগ লাগে আমাকে একটু বলবেন? আমার গোপালকে আমি তেমনি ভোগ লাগাব।'

ব্রাহ্মণ সব বিবরণ দিল। সন্ধেয় যে ভোগ লাগে সে হচ্ছে ক্ষীর, তার আরেক নাম অমৃতকেলি। বারোটি মাটির পাত্রে সে ক্ষীর দেওয়া হয় গোপীনাথকে। সে ক্ষীরের স্বাদ অপূর্ব, তার তুলনা হয় মর্তে এমন কিছু নেই, তাই তার নাম অমৃত-কেলি।

সন্ধে হয়ে এসেছে, এখুনি ক্ষীরভোগ লাগবে, দেখে যাই না কেমনতরো!

পাত্রে-পাত্রে ক্ষীর আসছে, সেবার কী অপরূপ সৌষ্ঠব। হঠাৎ মাধবেন্দ্রের মনে হল, যদি অল্প একটু প্রসাদ পাই, তাহলে স্বাদ জেনে নিয়ে সেই স্বাদের ক্ষীর তৈরি করে আমার গোপালকে ভোগ লাগাই।

পর মুহূর্তেই নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন ছি-ছি, আমি না অযাচক? আমি ক্ষীর খাবার জন্যে লালসা করলাম? এই

আমার অযাচিতবৃত্তি? এই আমার আসক্তি-শূন্যতা?

আরতির পর গোপীনাথকে প্রণাম করে কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি সরে পড়লেন মাধবেন্দ্র। গ্রামের শূন্য হাটের একটা ঘরে বসে আপন মনে নামকীর্তন করতে লাগলেন।

এদিকে গোপীনাথের পূজারী সেবক গোপীনাথকে শয়ন দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে, স্বপ্নে গোপীনাথ তাকে বললেন, 'ওঠো' দরজা খোলো। আমি আমার ধড়ার আঁচলে এক পাত্র ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা আমার মায়ার তা জানতে পারো নি। তোমরা এগারোখানাকেই বারোখানা করে দেখেছ। যাও ঐ লুকোনো ক্ষীরপাত্র মাধব-পুরীকে দিয়ে এস।'

'মাধবপুরী। সে কোথায়?'

'দেখবে গ্রামের হাটে শুকনো মুখে বসে আছে।'

কোন হাটে কে জানে। পূজারী তাড়া-তাড়ি স্নান করে মন্দিরের দরজা খুললে, দেখতে পেল, সত্যিই তো, গোপীনাথের ধড়ার আড়ালে একটি ক্ষীরপাত্র লুকোনো রয়েছে।

সেই পাত্র হাতে নিয়ে বেরুল পূজারী। এ-হাট থেকে ও-হাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কোথায় মাধবপুরী। কোথায় মাধবেন্দ্র! তোমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছে। এসে দেখে যাও। খেয়ে যাও।

মাধবেন্দ্র আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এসে প্রেমাবেশে কাঁদতে লাগলেন।

ক্ষীরের বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁকে বললে পূজারী।

ক্ষীরভান্ড মাথায় নিয়ে মাধবেন্দ্র প্রেম-বিহ্বল হয়ে গেলেন। পূজারী ভাবল, এই না হলে কৃষ্ণের বশ্যতা! একমাত্র প্রেম-ভক্তিতেই তো কৃষ্ণ বশীভূত! এই হেন ভক্তের জন্যে কৃষ্ণ ক্ষীর চুরি করবে এ আর আশ্চর্য কী!

পূজারী মাধবেন্দ্রকে দন্ডবৎ প্রণাম করল।

ক্ষীর আস্বাদ করলেন মাধবেন্দ্র। মৃৎপাত্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বহির্বাসে বেঁধে নিলেন। ভাবলেন, এখান থেকে এখন পালাই। রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই চারদিকে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, আমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। দলে-দলে লোক আমাকে দেখতে আসবে। আমার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন মাধবেন্দ্র। চললেন নীলাচলের দিকে। পথ হাঁটেন আর প্রতিদিন একখানা করে সেই ক্ষীরপাত্রের ভাঙা টুকরো খান। আর সেই পোড়া মাটির টুকরোতেই গভীর প্রেমাবেশ।

ভক্ত প্রতিষ্ঠা না চাইলেও প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভক্তই তো কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিষ্ঠা।

আগে গোপীনাথ শুধু গোপীনাথ ছিল, মাধবেন্দ্রের দৌলতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হয়ে গেল।

নীলাচলে এসে মাধবেন্দ্র জগন্নাথের সেবক মহান্তদের বললেন, গোপাল চন্দন ভিক্ষা করেছেন। চন্দন কোথায় পাব?

মহান্তরা বললে রাজকর্মচারীদের। গোপালের ইচ্ছায় এক মণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর জোগাড় হল। জোগাড় হল পথের ছাড়পত্র। দুজন ভারবাহীও নিযুক্ত হল। তাদের পথখরচেরও অনটন হল না।

রেমুনা হয়েই ফিরতে হবে, মাধবেন্দ্র দলবল নিয়ে থামলেন রেমুনায়। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, গোপালদেব এসেছেন। বলছেন, 'মাধব, আমিও যে গোপীনাথও সেই। আমরা বহুমূর্তিতেই একমূর্তি। তুমি এই চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন করো, তাতেই আমার দাহ যাবে, আমি শীতল হব।'

গোপীনাথের সেবকদের কাছে মাধবেন্দ্র বললেন এ স্বপ্নকাহিনী।

'সত্যি?' তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল:

কতদূর পথ হেঁটে এসে কত কষ্ট করে এই চন্দন-কর্পূর সংগ্রহ করেছেন মাধবেন্দ্র। পথে কত বিপদ-বাধা কত অনিদ্রা-অনাহার, কিছু গ্রাহ্য করেননি। গ্রাম্যকথার ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গী পর্যন্ত নেয়নি। শুধু গোপালের তাপ শীতল করব এই আনন্দে পথ ভেঙেছেন। প্রেমে আবার নিজের ক্লেশ কী, শুধু প্রিয়ের সন্তোষ হবে তাতেই তার অখণ্ড উপশম।

গোপাল ভক্তশ্রম সফল করল। তোমাকে আর চলতে হবে না বইতে হবে না উদ্বেগ ভোগ করতে হবে না। গোপীনাথকে দিলেই আমাকে দেওয়া হবে।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল প্রত্যহ গোপীনাথকে সেই চন্দন দেওয়া হল। চন্দনের সঙ্গে কর্পূর মেশালে আরো তা ঠান্ডা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের আসল উপশম প্রেমে। সেই প্রেমই তো চন্দন। আর অশ্রুই তো কর্পূর। প্রেমের সঙ্গে অশ্রু এসে মিশলেই তো কৃষ্ণের বিশ্রাম।

চন্দন দেওয়া শেষ হলে, গ্রীষ্মের অবসানে, মাধবেন্দ্র ফিরলেন নীলাচলে।

আবার সেখান থেকে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনে এসে শুধু তাঁর এক আর্তি: 'কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না।'

তাঁর শিষ্য রামচন্দ্রপুরী তাঁকে উপদেশ দিতে চাইলেন: 'তুমিই তো পূর্ণব্রহ্ম তোমার আবার কাম্য কিসের?'

'দূর হ!' মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠলেন: 'তুই আমাকে মুখ দেখাবিনে, তুই আমার অশান্তি ঘটালি। কৃষ্ণ পেলাম না বলে আমি নিজের দুঃখে কাঁদছি আর তুই আমাকে ব্রহ্ম শোনাচ্ছিস? দূর হয়ে যা!'

শিষ্য ঈশ্বরপুরীর অন্য ভাব। তিনি গুরুকে নিরন্তর কৃষ্ণকথা শোনাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন কৃষ্ণশ্লোক, কৃষ্ণলীলা। শোনাতে-শোনাতে তিনিও প্রেমের সাগর হয়ে উঠেছেন।

তুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হোক।' তারপর নিজেই শ্লোক পড়লেন: 'অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরা-নাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।' হে দীন-দয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ, কবে আমি তোমার দর্শন পাব? হে দয়িত, তোমার অদর্শনে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছে, আমি কী করব বলে দাও।'

শ্লোক বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

ভক্তিকল্পতরুর অঙ্কুর এই মাধবেন্দ্র। এই অঙ্কুরের পুষ্টি ঈশ্বরপুরীতে। আর সেই বৃক্ষই শ্রীচৈতন্য।

(ক্রমশঃ)

অবরুদ্ধ নিশা

বনানী ঘোষ

'বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি পান্না?' প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়, সুশিক্ষিত সুন্দর মার্জিত পুরুষ। টেবিলের ওপর মাথাটাকে প্রায় নামিয়ে রেখেছে পান্না। ওর কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো হয়ে স্পর্শ করছে চার পাশ। অধ্যাপকের প্রশ্নে বীজগণিতের সূত্র স্মরণ করতে-করতে চোখ তুলল পান্না, বেতসপাতার মত দীর্ঘ কিশোরী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ঝকঝকে দৃষ্টি দুই চোখে।

'কি?' উত্তর নয় তার জিজ্ঞাসু প্রশ্নটাকেই সে এগিয়ে দিল অধ্যাপকের দিকে।

'শৃঙ্খলিত জ্ঞানই বিজ্ঞান'—

পান্না শুনল। এক মিনিট ভাবল। বুঝতে চেষ্টা করল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল গল্পটা উঁকি দিয়ে গেল মনে। পুনরায় প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক।

'বিজ্ঞান আমাদের কি দিয়েছে পান্না?"

'সভ্যতা।' এবার সপ্রতিভ দেখাল পান্নাকে। ওর ফ্রকের প্লিটগুলো একটা দোলন পেয়ে ঘুরে গেল।

'হ্যাঁ সভ্যতা। সেই সভ্যতা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। আরাম দিয়েছে আর দিয়েছে বিশ্লেষণ করার মত মন।'

'পান্না', একটু থেমে অধ্যাপক বলে গেলেন আবার, 'এই বিশ্লেষণী বুদ্ধি আমাদের দুঃখ চেনাচ্ছে। সুখ একটা আবরণ মাত্র। রঙিন কাগজে চিন্তাকে জুড়ে রাখ, প্রাত্যাহিক জীবনের ত্রুটি ও অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। তবেই তুমি সুখী। কিন্তু অসহায়ভাবেই আমরা প্রতিটি ব্যক্তি ক্রমশই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে চাইছি। সুতরাং আধুনিক সভ্যতার কাছে আমরা পাচ্ছি আনন্দের বিনিময়ে দুঃখ এবং সুখের দামে স্বাচ্ছন্দ্য।'

সুখ, দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দবেদনা সমস্ত কিছু একত্র যেন পান্নার মস্তিষ্ক জড়িয়ে ধরল। ছোট্ট মাথাটাকে ভার-ভার মনে হল। মনের চিন্তায় সেই শব্দগুলো দেখতে-দেখতে সে জানলার ওপাশে তাকাল—সেখানে এক ফালি খালি জমি কিছু দূর্বা, আর একটি চড়ুই পাখি। পান্নার ভাল লাগল, একটা কোমল অনুভূতিতে পান্নার অন্তর ছেয়ে গেল।

'আমি এতকথা বুঝতে পারি না মাস্টারমশাই', পান্নাকে কেমন করুণ আর অসহায় দেখাল। পান্নার দুই চোখে ওর জিজ্ঞাসু মনের ছায়া খেলা করে গেল।

'বুঝবে সব। বড় হও, লেখাপড়া কর। মনকে অশান্ত করো না।' সমস্ত টাস্ক বুঝিয়ে বিদায় নিলেন মাস্টারমশাই। তিন দিন পর পরীক্ষা। বাৎসরিক। পান্না কিছুক্ষণ নিমগ্ন হয়ে রইল নিজের চিন্তায়, অন্যমনস্ক হয়ে হিজিবিজি দাগ কাটল খাতার ওপর। তারপর প্রতিজ্ঞা করল পড়ব, পড়ব, পড়ব। মন দিয়ে পড়ব।

'পান্না, পান্নারাণী বাই-বাই!' ঘরে ঢুকলেন সঞ্জয় ঘোষ।

'বাপি, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ?' যেন ভূতগ্রস্তের মত আতঙ্কিত হয়ে উঠল পান্না।

সঞ্জয় ঘোষ খুশী হলেন। ছোট্ট মেয়ে তার চোদ্দ বৎসরের অপরিণত হাত দুটি দিয়ে বাবাকে আঁকড়ে রাখতে চায় জেনে আনন্দিত হলেন।

'হ্যাঁ বাপি। আসানসোল যাচ্ছি। একটা কাজের টেন্ডার দিতে।'

'কবে ফিরবে?' জানতে চাইল পান্না।

'পরশু'।

তার মানে সেদিন আমার পরীক্ষার শুরু, নিঃশব্দ উচ্চারণে মনে-মনে হিসেব করল পান্না। আর এই নির্ভুল হিসেবে ওর মনের অভ্যন্তরে এক মস্ত গহ্বরের সৃষ্টি হল। পান্নার মনে হল সেই ভয়ানক বিবরের চারপাশে তার ছোট্ট পা ফেলবার জন্য এতটুকু স্থানও আর অবশিষ্ট নেই। পান্নার মনটা খারাপ হতে থাকল। একটু-একটু খারাপ হতে-হতে ক্রমে ভয়ানক খারাপ, এবং গভীর এক অবসাদ এবং তীব্র অনিচ্ছা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

বাবার গাড়ী স্টার্ট নিল। মা বললেন, 'একটু সাবধানে যেও। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে।'

শুনতে-শুনতে পান্না আবার সেই জানলার ওপাশে সেই জমিটাতে তাকাল। চড়ুই পাখিটা কখন উড়ে গেছে, একটা কাল বিচিত্র কাক তার কর্কশ ধ্বনিতে উচ্চকিত করে তুলছে সমস্ত পাড়াটা।

আমার পড়া হবে না। আমি খারাপ পরীক্ষা দেব, ভাবতে-ভাবতে পান্না টেবিলে ফিরে এল। এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বইটা খুলে বসল।

হ্যালো...। পড়া বেশী দূর অগ্রসর হল না। পান্না উৎকীর্ণ হয়ে উঠল। মা ফোন করছেন। ওঘর থেকে মার কন্ঠস্বর স্পষ্ট ভেসে আসছে। পান্না উৎকর্ণ হয়ে উঠল। পান্নার মুখে শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধল।

'হ্যালো...! হুঁ আমি রাধারাণী কথা বলছি।' মার গলাটা মোলায়েম কোমল। মার ত্বকের মতই মার কণ্ঠস্বর। পান্না উৎকর্ণ হয়েই রইল।

'হ্যাঁ, বাইরে গেছেন। আপনিই ত খোঁজ নেন না।' মা বলে চলেছেন ওঘরে, 'আমি সব সময় প্রস্তুত। ইভনিং শো?...না একটু অসুবিধে আছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে আগের থেকে। কি বললেন মেলোডিয়াস গলা? না মোটেও না, গান আমি একেবারেই জানি না। ধন্যবাদ। আর সুন্দর! বয়স হতে চলল। এখন ত বুড়ি হতে বাকি। আমার মেয়েই ত এবার এগারো ছাড়াল।'

মা মিথ্যে বললেন। পান্না ভাবল, আমি এবার তেরো পেরিয়ে চোদ্দতে পা দিলাম।

'কটায় আসবেন? একটু তাড়াতাড়ি,' আবার মার গলা শোনা গেল, 'আগে গলা ভিজিয়ে নেবার ইচ্ছে আছে? না-মা আপত্তি কেন? ভালই ত। নিশ্চয়ই আমি প্রস্তুত থাকব। রাখছি।'

ফোন নামিয়ে রাখবার স্পষ্ট আওয়াজ হল। 'দিদিমণি তোমার দুধ।' সুখমতির হাতে দুধ ভর্তি গ্লাস। পান্না তাকাল। দেখল, আর ভাবল, কার সঙ্গে যাবে মা? কোথায় যাবে? নাইট-শোতে সিনেমা? না অন্য কোথাও, বড় কোনও গাড়ীতে চেপে, সুন্দর করে সেজে কোনও বড় হোটেলে হৈ-চৈ করতে? ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, 'খাব না দুধ।'

'কেন খাবে না?'

এই মুহূর্তে পান্না তার মনের চিন্তায় কোনও বাধা পছন্দ করছিল না। সে একটু একলা হয়ে ভাবতে চাইছিল। সুখমতির আবেদন তার চিন্তায় বিক্ষিপ্ত ঘটাচ্ছিল। তাই সে চিৎকার করে উঠল, 'যাও, এখানে দাঁড়িয়ে বিরক্ত কর না আমাকে।'

ফিরে গেল সুখমতি। পান্না বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের পাতায় মুখ গুঁজে রাখল।

'তুমি দুধ খাও নি কেন?'

রাধারাণী ঘরে এলেন। মায়ের শরীরের সূক্ষ্ম সুবাস ঘরময় ছড়িয়ে গেল। প্রতি দিন ভোরবেলাতে স্নান করে নেন রাধারাণী, স্নানের পর ঈষৎ আর্দ্র ত্বকে মাকে অপূর্ব দেখায়, রমণীয় এবং কমনীয়। মার দুটি চোখে সর্বদা শিশুর সরলতা খেলা করে। মায়ের হাসিতে পর্যাপ্ত শান্তির মায়া। আর সেদিকে তাকিয়ে পান্নার মনে হল, মা কোনও দিনও যেন বড় হবেন না, তেত্রিশ বৎসরের বয়সেও ষোল বৎসরের মন নিয়ে মা সকলের মনরাখা কথায় মুগ্ধ হবেন এবং কেন মা স্তাবকদের মনরাখা কথায় বিশ্বাস করবেন, কেন বড় হবেন না, এই চিন্তা পান্নার মনে এক অবাধ্য আক্রোশের সৃষ্টি করল। সেই বিদ্রোহী মন নিয়ে পান্না চিৎকার করে উঠল, 'বলেছি না একবার খাব না, যাও নিয়ে যাও দুধ।'

পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় যেন মার ভ্রূতে জমায়েত হল। পান্নার অভদ্রজনোচিত চিৎকার তাঁকে হতভম্ব করেছে। বললেন, 'তুমি দিন-দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছ পান্না। অকারণ রাগ অসভ্যতার লক্ষণ। তোমার পরশু পরীক্ষা। না খেয়ে শরীর খারাপ করতে নেই।' প্রতিটি শব্দ সুধার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে যেন ঝরে-ঝরে পড়ল। মাথা বাঁকিয়ে গোঁজ হয়ে রইল পান্না। চুলে মায়ের হাতের নরম স্পর্শ অনুভব করল।

'পান্না', মা ডাকলেন।

পান্না তাকাল না।

'পান্না কথা শোনও,' মায়ের আদর পান্নার অসহ্য মনে হল। সে হাত বাড়িয়ে এক চুমুকে শূন্য করে দিল গ্লাস। কি বলতে চাইছিলেন মা। তাঁকে থামিয়ে পান্না অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'যাও, এখন আমি পড়ব।'

রাধারাণী বিনাবাক্যে ঘর ছাড়লেন। পান্না নতুন করে মনোযোগী হল। মনে-মনে বলতে লাগল—পড়ব-পড়ব-পড়ব, অশান্ত হব না। প্রতিজ্ঞা করতে-করতে পান্নার দৃষ্টি সাহিত্যের ইতিবৃত্তের প্রথম পাতার প্রথম পংক্তিতে স্থির হয়ে রইল বহুক্ষণ ধরে। একটা খাতা চাই। ওঘরে আছে, পান্না খাতা আনতে উঠল। মনে হল, পেন্সিলটা বাইরের ঘরের ডিভানের ওপর রেখে এসেছে।

পেন্সিল নেবার জন্য ড্রইংরুমে পা দেবার আগেই পান্নার কানে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'একটু দেহের স্পর্শ, একটু মনের স্পর্শ মানুষ চায়।'

সুপরিচিত কণ্ঠস্বর। মানুষকে না দেখেও পান্নার অগোচর রইল না কে কথা বলছে। অতীনকাকা, বাবার বন্ধু। না, মায়ের বন্ধু বলাই উচিত পান্নার। পান্নার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। হাওয়ায় ঘরের পর্দা উঠল। আর সেই মুহূর্তে অতীনকাকার চোখে যে আর্তি ভাষা হয়ে কাঁপছিল, জ্বলছিল আর চিকচিক করছিল, তাকে পান্না তপ্তবাসনা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারল না। পান্নার রক্তস্রোত দ্রুত হল। পান্নার সর্বনাশকে মনে পড়ে গেল। যে বিয়াল্লিশ বৎসরের ভদ্রলোক পান্নার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তাকে অসম্মানের আদর দিয়েছিল। ভাবতে-ভাবতে পান্না বিচক্ষণ ব্যক্তির মত আবিষ্কার করল অসভ্যতার তেপান্তর পার হয়ে এসেও আজও কোন-কোন পুরুষ সেই শ্বাপদ মনকে যেন ত্যাগ করতে পারেনি। পুরুষের মুখের দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব আর কিছুই নয়। একটা মুখোশ মাত্র। কোনও নারীসত্তার সংস্পর্শে অতি সহজে তাদের সে আবরণ খসে পড়ে। কী যন্ত্রণা। যেন যন্ত্রণার সমুদ্রে আকণ্ঠ স্নান করে উঠল পান্না। ধীরে-ধীরে ঘর থেকে ফিরে আসছিল সে।

'আরে পান্নারানী, এসো-এসো। তোমার সেই জিনিসটা এসে গেছে।' অতীনকাকা ডাকলেন। পান্নাকে পর্দা সরিয়ে ঘরে পা দিতে হল। একটি ক্যামেরা। পান্নার মনে পড়ল। দিন পনেরো আগে পান্না রাধারাণীর কাছে আব্দার করেছিল, একটি ক্যামেরা চাই। নিজের প্রতি বিরক্ত হল সে। কেন সে চেয়েছিল? আর দিলেনই যদি বা তবে অতীনকাকা কেন? পান্নার বাবাও দরিদ্র নন। একটা ক্যামেরা কিনে দেবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। তবে মা কেন অতীনকাকার ক্যামেরা তাকে দেবেন? মা যেন একটা সেতু তৈরী করতে চাইছেন? অতীনকাকা যেন এইভাবে পান্নাকে ভালবেসে কাছে টেনে তার মায়ের মনের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছেন। কিম্বা অতীনকাকাই পান্নাকে তার বাবা এবং মায়ের মতই ভালবাসতে চাইছেন?

'পছন্দ হয়েছে?' জানতে চাইলেন অতীনকাকা। দেখল মায়ের দৃষ্টিতেও ফুটে উঠছে সকরুণ মিনতি। পান্না বুঝতে পারল —মার মিনতির যথাযথ মূল্য দিতে অতীনকাকার ভালবাসার মর্যাদা দিতে, এমনকি সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে হলেও

পান্নার এই মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা উচিত। কিন্তু পান্না পারল না। কেন পান্নার এমন হল? কোথা থেকে আসে এত গভীর বেদনা। মনে হয় পান্না সে বেদনাকে যেন বহন করতে পারবে না। পান্নার বুকের অস্থিতে-অস্থিতে, মজ্জায়-মজ্জায়, রক্তে-রক্তে ঘা লাগে। ঘা লাগে এমন কোনও সংস্কারে, যে সংস্কার জানে শুধু দুটি কথা—ভাল এবং মন্দ। পান্নার মনে অসহায় ক্ষোভ, কেন এমন হবে? কেন বাবার অর্থে পান্নার ফ্রক তৈয়ারী করিয়ে মায়ের মুখে সে খুশীর আলো ফুটে ওঠে, অতীনকাকার টাকায় কেনা ক্যামেরা দেখেও মায়ের মুখে সেই একই আলো ফুটিয়ে তোলে? এ যেন নেহাতই নিয়তির দুর্বোধ্য বিদ্রূপ!

কিন্তু পান্না পারে না। বিক্ষোভের প্রকাশ করে চূড়ান্ত বিদ্রোহী হয়ে বলতে পারে না—চাই না আমার ক্যামেরা। সেটা আছড়ে ভেঙে চৌচির করে ফেলতেও পারে না। শুধু তার কিশোরী শোণিতে নব-যৌবনের জ্বালা নিয়ে দাপাদাপি করতে থাকে মত্ত পাগলের মত। আর রক্তের সেই দাপাদাপিকে সহ্য করতে গিয়ে পান্নার কর্ণমূল উত্তপ্ত হয়। শক্ত হয় চোয়াল। চোখের দৃষ্টিতে কান্নার মত হাসি ফুটে ওঠে। বলে—'ভাল'। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সারাদিন বৃথাই কেটে যায়। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে পান্নার ক্লান্ত বিধ্বস্থ মন লক্ষ্য করে চলে, প্রতিদিনের মত আজও অতীনকাকা ও মা খাবার নিয়ে টেবিলে বসে, গল্প করে, হাসে। ধীরে-ধীরে বিবর্ণ বিকেলের অবসানে পান্ডু সন্ধ্যা নামে। আর কোনও কথাই পান্নার কানে আসে না। তবুও সেই একটি স্বর সন্ধানী ব্যাধের মত প্রতিটি পল-অনুপল পান্নাকে তাড়িত করে মারে।

'একটু দেহের স্পর্শ, একটু মনের স্পর্শ মানুষ চায়।' যেন ইথারের তরঙ্গে-তরঙ্গে ঝংকৃত হয়ে ফিরছে অতীনকাকার স্বীকারোক্তি।

বইমুখে বসে থাকে পান্না। অতীনকাকা বিদায় নিয়েছেন। বাথরুমের শাওয়ার থেকে জল ঝরছে ঝর-ঝর। নিজেকে সজীব সতেজ করছেন মা। নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত পান্না দেখে যায়। স্মিতমুখে আলমারি খুলে দাঁড়িয়েছেন রাধারাণী—ভাবছেন কোন্ প্রসাধনে প্রসাধিত করবেন নিজেকে। কোন্ সাজে সার্থক হবে তাঁর এই আনন্দের রাত্রি। চিরাচরিত প্রথায় বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন মা।

'পান্না, তুমিও হাত-মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও। একটু রেস্ট দাও নিজেকে। সকাল থেকে বসে আছ।'

এতক্ষণে পান্না অনুভব করল ওর মস্তিষ্ক শিলীভূত হয়ে গেছে। পান্না উঠল, প্রচুর জল ঢেলে নিজেকে শীতল করতে চাইল। গাড়ীতে হর্ণ দিচ্ছে। পান্না বাইরে এল। অতীনকাকা নয়, অভিনব বিশ্বাস।

'ভেতরে আসুন,' পান্না ভদ্রতা করল। আর এই প্রথম পান্না জানল কখনও-কখনও ইচ্ছে থাকলেও মানুষের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করা চলে না।

তারপর ল্যাভেন্ডারের সুরভি ছড়িয়ে সাজে-সজ্জায় নিজেকে অপরূপ করে বাধা-রাণী বাইরে এলেন।

'পান্না বেশী রাত জেগো না। সারাদিন বই নিয়ে ছিলে। সুখময়ীকে বলা আছে, সাড়ে আটটায় খেয়ে নেবে তুমি।

'কোথায় যাচ্ছ?' নিজের অজান্তে কখন পান্নার ভ্রূতে কুঞ্চন জেগেছে। কণ্ঠে কৈফিয়ৎ তলবের সুর। সেদিকে এক মিনিট তাকালেন রাধারাণী। পান্নার ভ্রূতে ওর বাবারই প্রতিচ্ছায়া, সেদিকে লক্ষ্য না করেই রাধারাণী জবাব দিলেন, 'লাইট হাউসে।' ওদের প্রকাণ্ড গাড়ীটা চলে গেল এক মুঠো ধোঁয়া ছড়িয়ে।

'সারাদিন পড়ছ।' মায়ের কথাটা মনে-মনে লোফালুফি করতে-করতে পান্নার হাসিতে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করল, সারাদিন ধরে কি পান্না এক বিন্দুও পড়তে পেরেছে? পান্না এক ছুটে ঘরে এল। চুল বাঁধল, জলের ঠাণ্ডা ঝাপটা দিল চোখে-মুখে। তারপর ভাবল, যাক গে যা ইচ্ছে হয় করুক মা। ঘুরুক যত ইচ্ছে বাবার বন্ধুদের সঙ্গে। আমার কি? আমি আর ভাবব না। আমার পরশু পরীক্ষা, আমাকে পড়তে হবে। আমি পড়ব। সত্যি-সত্যিই পান্না যেন অশান্ত মনকে একটু-একটু করে গুটিয়ে রাখল নিজের মধ্যে। ভাবটা যেন একদিন খুলে দেখা যাবে মনটাকে। আর যে মুহূর্তে বই-এর লেখাগুলো খুব সুন্দর করে মুখস্থ হতে শুরু করেছে পান্নার, ঠিক সেই সময় সঞ্জয় বোস বাইরে থেকে ডাক দিলেন—'পান্না।'

'বাপি!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পান্না। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রত্যাশিত এক ভয়ের সম্ভাবনায় হিম হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গ। মায়ের অনুপস্থিতি পান্না জানে, খবরটা জ্ঞাত হওয়া মাত্র সঞ্জয় বোস রূপান্তরিত হয়ে যাবেন অন্য এক মানুষে। ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা, সভ্যতা, শোভনতার বিন্দুমাত্রও তখন খুঁজে পাওয়া যাবে না সঞ্জয় বোসের মধ্যে। শুধু সেই সময়টুকুর জন্য সঞ্জয় বোস পান্নার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। সম্পূর্ণ ভিন্ন-জগতের কোনও প্রাণী, যার চোখ দুটো শিকারী বাঘের নৃশংসতায় জ্বল-জ্বল করে উঠবে। আর বাবার আচরণ দেখতে-দেখতে, বাবার সঙ্গে মায়ের অশোভন ঝগড়া শুনতে-শুনতে পান্নার মনে তার পরিবেশ, তার পরিবার, তার বাবা-মা এমনকি তার পরিচিত পৃথিবীটা সম্পর্কে তার কিশোরী মনের স্বাস্থ্যকর আলো-বাতাসের সবটুকু কেড়ে নিয়ে যে অনুভূতির জন্ম হবে তার একটি মাত্রই নামকরণ করা চলে, তা হল ঘৃণা।

'কি খুব লেখা-পড়া হচ্ছে মেয়ের?'

উজ্জ্বল চকচকে চোখে মসৃণ হাসলেন সঞ্জয় বোস। পান্না তাকিয়ে দেখল, পথের বিবর্ণ ধূলি-ধূসরিত দেহে ফিরে এসেছেন তিনি।

'আজই ফিরে এলে?'

'হ্যাঁ বাপি। ভেবেছিলাম দেরী হবে। তারপর মনে পড়ল পরশু তোমার পরীক্ষা তাই ফিরে এলাম।—মা কোথায়? একা-একা পড়ছ?' সঞ্জয় বোসের কণ্ঠস্বর কেমন ভয়ার্ত এবং করুণ মনে হল।

'সিনেমায় গেছেন', পান্নাকে বলতেই হল। পান্না দেখল তার বাবা পান্নার থেকে অনেক দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। বাবার মুখের অবয়বে একটা কুটিল আহত প্রাণীর জন্ম দেখল পান্না।

'কার সঙ্গে গেছে?' প্রশ্ন নয়, বজ্রকণ্ঠে যেন প্রায় হুংকার দিলেন সঞ্জয় বোস।

'জানি না।' এক পলক তাকিয়ে পান্না মিথ্যে উত্তর দিল।

'কেন জান না?' যেন পৃথিবী রসাতলে পাঠাবেন এমনি ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলেন সঞ্জয় বোস।

'বাপি!'—ভীত আর্তনাদে কেঁপে উঠল পান্না।

'যাও, পড়তে যাও।' নিরুপায় ক্ষোভে অসহায় আদেশ দিলেন সঞ্জয় বোস।

এই সন্ধ্যায় সঞ্জয় বোসের আর সারা-দিনের পথক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়া হল না। পান্না ঘর ছেড়ে চলে এল। এক-একটি করে নিঃশব্দ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হতে থাকল। পান্না ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সঞ্জয় বোস ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। দুটো হাত সংবদ্ধ অবস্থায় কোমর ঘিরে রাখল। শুরু করলেন পায়চারি, পান্নার খাবার রুচি বিন্দু-মাত্রও ছিল না। তবুও সে একবার বসল টেবিলে। সঞ্জয় বোস আহারে অসম্মতি জানালেন। জেগে থাকা পান্নার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। শুনতে পেল পাশের ঘরে সঞ্জয় বোসের অস্থির পদচারণার আওয়াজ। একটুও ক্লান্ত ছিল না। সেই একটানা শব্দের আওয়াজ শুনতে-শুনতে অসংখ্য ভাবনার মাঝে কখন ডুবে গিয়েছিল পান্না। একটু তন্দ্রা এসেছিল তার,

হঠাৎ চমকে গেল। গাড়ীর আওয়াজ। পান্না উৎকর্ণ হয়ে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে বালিশ আঁকড়ে রইল পান্না। অস্থির পদচারণার শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। গাড়ীটা স্টার্ট নিল। যাক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। অভিনব বিশ্বাসের চোখের ওপর এই অশান্তির খেলাটা হল না।

কিন্তু সেই আতঙ্ক, যা একটা অশুভ-ছায়া নিয়ে শুরু হয়েছিল সেই রোদছড়ানো ভোরে, এবং সূক্ষ্ম কোনও লূতাতন্তুর মত ছড়িয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের আনাচে-কানাচে, ঘটনার সম্মুখীন হয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় সেই আতঙ্ককে যেন গলাধঃকরণ করে ফেলল পান্না। ঘরের জানলা-পথে ছিটকে-আসা একটুকরো জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে সর্বাঙ্গে তুহিন ক্লান্তি অনুভব করতে করতে পান্না প্রাণপণ শক্তিতে নরম উপাধানের শীতলতায় মুখ ডুবিয়ে রাখল, কলিংবেলের সংকেতধ্বনিকে শান্ত নিস্পৃহ-তায় উপেক্ষা করল। বারান্দায় আলো জ্বলল না, দূর করল না রাত্রির অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের পথ বেয়ে চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে সঞ্জয় বোস মুখোমুখি হলেন রাধারাণীর।

'একি তুমি?' নিরুদ্বেগে চলতে চলতে মধ্যপথে ঝড়ের সূচনায় অসহায় এবং অসতর্ক মানুষের কণ্ঠে যে শঙ্কাধ্বনি বেজে ওঠে, রাধারাণীর প্রশ্নে শঙ্কার সেই স্বর মূর্ত হয়ে উঠল।

'বড্ড অসুবিধায় ফেললাম, তাই না?'—চাপা অন্ধকারের নীলাভ জ্যোৎস্নায় হিস্‌ হিস্‌ করে উঠলেন সঞ্জয় বোস।

'বারে, অসুবিধার কি আছে? কি যে বল তার ঠিক নেই! কখন ফিরেছ? পান্না ঘুমিয়ে পড়েছে?'—ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করেও, কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে সবকিছু স্বাভাবিক দেখানোর মত এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করলেন তার মা।

মায়ের প্রতি মমত্ববোধ নয়, বাবার প্রতি যথাযথ বিচার নয়, শুধু অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, যেন রাতের স্তব্ধতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না করে তোলে কোনও কঠিন তর্কাতর্কি, সেই প্রার্থনায় পান্না নিস্পন্দ রইল বহুক্ষণ।

'দাঁড়াও!'—সঞ্জয় বোসের কণ্ঠের দৃঢ়তায় পান্নার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। আগুনের মত তপ্ত মনে হল নিজেকে, দুই হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কান চেপে

পান্না উৎকর্ণ হয়ে উঠল

ধরল। প্রতিজ্ঞা করল শুনব না, শুনব না। যা-ইচ্ছে হোক, যা ঘটে ঘটুক, আজকের রাতে ঠান্ডা মাথায় না ঘুমুলে আমার পরীক্ষা খারাপ হবে। তবুও নিস্পৃহ হবার সাধনায় ক্ষুণ্ণ হতে হতে পান্নার কানে স্পষ্ট ভেসে এল সঞ্জয় বোসের প্রশ্ন।

'কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

'দেখ না হঠাৎ অভিনব বিশ্বাস এসে হাজির। সঙ্গে লাইটহাউসের টিকিট। তোমার আমার দুজনের। বললাম যাব না, তুমি নেই। অনেক করে বললেন। কিছুতেই কাটাতে পারলাম না। নয়ত যাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।'

'ভনিতা রাখো রাধারাণী, অনেক ত বোঝো আর এটুকু বোঝো না যে প্রবঞ্চনার ফাঁকিতে চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। সে-ধুলো কাদা হয়ে নিজের গায়েই ফিরে আসে।'

'বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।'

'বিশ্বাস করব তোমাকে?'

'হ্যাঁ, আর বিশ্বাস যদি নাই করতে পার, প্রশ্ন করো না।'

'বিশ্বাস কথাটার গুরুত্ব বুঝবার মত বিবেচনা তোমার আছে?'

'যা বলবার সোজা এবং স্পষ্ট বল, তোমার বাঁকা বাক্য অনুধাবনের ধৈর্য আপাততঃ আমার নেই, আমি অত্যন্ত টায়ার্ড।'

'তাহলে সোজা করেই বলি—আজ রাত্রিতে তুমি আমার অনুপস্থিতির সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে গিয়েছিলে। কিন্তু অভিনব বিশ্বাসের মত একজন লম্পটের স্ফূর্তির খোরাক হতে তোমার বাধল না? ছিঃ!'

'কি বলছ তুমি? একটা সিনেমা দেখার মধ্যে—!'

'নতুন কিছু বলছি না রাধারাণী। অবশ্য এত জানা কথাই। পনেরো বছর ধরে তোমাকে আমি চিনেছি। দিনে দিনে তিলে তিলে স্নায়ুর পীড়নে অস্থির হতে হতে আমার সুখ গেছে, শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। আমি জানতাম আজ সন্ধ্যায় তুমি বাড়ি থাকবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত অভিনব বিশ্বাসের স্ফূর্তির খোরাক হবে এ আমি ভাবতে পারিনি। রাধারাণী, একদিন আমিই বলেছিলাম আমার বন্ধুদের তোমার নিজের বন্ধু বলে ভাবতে, আর সেই সুযোগের তুমি অপব্যবহার করেছ দিনের পর দিন।'

'আজে-বাজে কি বকছ সঞ্জয়? তুমিও তো জানতে যে আমি ফ্রি-মিক্সিং এ মানুষ। জানতে না যে আমার মনে কোনো-রকম কনজারভেটিজম্‌ নেই?'

'জানতাম। আর জানতাম বলেই সেই অ্যাডভানটেজ নিয়ে তুমি সবাইকে ঠকাচ্ছ। আসলে তুমি একটি ফ্লার্ট। এন্ড এ ফুল-ফ্লেজেড্‌ ফ্লার্ট।'

'কি বলতে চাও? তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি ফ্লার্ট করেছি?'

'নয়ত কি? ইউ আর ম্যারেড টু মি বাট এ সুইট হার্ট অফ—।'

'চুপ কর সঞ্জয়, প্লিজ চুপ কর। এত-বড় অসম্মানের কথা বলতে তোমার বাধছে না? তুমি কি করে ভুলে যাচ্ছ যে আমি পান্নার মা। যদি অন্য কেউ আমার দিকে ইণ্টারেস্টেড হয়, আমি কি করতে পারি? বল।'

'ধরতে পারছ না, তোমার গলদটা কোথায়? একটিমাত্র মানুষই এখানে প্রবঞ্চক নয়। কেননা, সে-লোকটি যদি আজ মরে যায়, হাজার মানুষ তুমি সৃষ্টি করে নেবে। সেভাবেই তৈরি তোমার মন। একটা কথা জেনে রাখো রাধারাণী, শুধুমাত্র মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে কোনও সিকিউরিটি গড়ে তোলা যায় না। মা হওয়াটাও একটা আর্ট। পৃথিবীতে হাজার হাজার মেয়ে প্রতিদিন মা হচ্ছে। তার মধ্যে সার্থক মা হতে পারে অল্পই।'

'আমি সত্যিকারের মা নই?'

'না নও, মাসের টাকা হাতে তুলে দিলেই শেষ হয় না পিতার দায়িত্ব। যেমন ঘর সাজালেই গৃহিণী হওয়া যায় না, তেমনি শুধু স্নেহ এবং শুভাকাঙ্ক্ষা থাকলেই মা হওয়া যায় না। তুমি আসলে কিছুই হতে পারনি, মা হতে পারনি, স্ত্রী হতে পারনি, প্রেমিকাও হতে পারনি। তুমি একজন ঠগ। প্রবঞ্চনা করছ সকলকে, পান্নাকে আমাকে অতীনকে এবং তাদের প্রত্যেককে যাদের দিকে তুমি প্রশ্রয়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাও।'

'থাক্ আর বলতে হবে না। তোমাকে আমি চিনি না? নীচুমনা স্বার্থপর কোথাকার। আমি বুঝি একটু বেশী আনন্দ কিনে ফেললাম, এই ভয়েই ত তোমার ঘুম হয় না। আমি বুঝি না, না? কি ভেবেছ, সংসারের চারদেয়ালে আমাকে গেঁথে ফেলবে? বড় বড় অফিসের রিসেপসনিস্ট-দের মত আমিও তোমার ড্রইংরুম আলোকিত করে তোমার সংসারের রিসেপ-সনিস্টদের ভূমিকা নেব? কি হয়, কি হয় একটা সিনেমা দেখলে?'

কি অস্বাভাবিক স্বরে কথোপকথন হচ্ছিল। পর্যাপ্ত অন্ধকারের সমুদ্র পার হয়ে এসেও প্রতিটি শব্দ স্পর্শ করে যাচ্ছিল পান্নার অন্তর। কানের ওপর থেকে হাতের চাপা সরিয়ে রাখল পান্না। ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল পান্না। টের পেল ঠাকুর এবং সুখমতি ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। খোলা জানলাপথে পান্না দৃষ্টি প্রসারিত করল। মায়ের শাড়ীর আঁচলটা লম্বিত অবস্থায় কাঁধ বেয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সেই নীলাভ জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারিতে বাবার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটার অতিসান্নিকটে মায়ের ছোট-খাট সুন্দর শরীরটাকে মনে হচ্ছে দৈত্যের হাতে একরত্তি একটা পুতুল। যেন ইচ্ছে করলেই সঞ্জয় বোস তাকে ভেঙে চৌচির করে দিতে পারে। শক্ত পায়ে দাঁড়াল পান্না। সে জানে তর্কাতর্কির প্রতিটি অণু টেপ-রেকর্ডারের মত রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছে আশে-পাশের বাড়ীগুলোতে। নিস্পৃহ থাকা যে কি অসম্ভব! পান্না দরজা খুলে বাইরে এল।

সেই সময় সঞ্জয় বোস তার রক্তাভ চোখদুটো দিয়ে দৃষ্টির আগুনে পুড়িয়ে দিতে দিতে বলছেন—'একটা কথা বলি রাধারাণী, ইফ ইউ লাভ এনিবডি এলস্, ফার্স্ট কুইট মি, দেন গো এণ্ড মেক লাভ।'

সে-কথা শুনে অদ্ভুত ধরনের কান্না-গলায় আহত এবং বিক্ষত স্বরে বললেন রাধারাণী—

'এতবড় কথা বলতে তোমার মুখে একটুও বাধল না? সঞ্জয় তুমি নিজের মুখে এ-কথা উচ্চারণ করলে?'

রাধারাণীর সেই আহত বিক্ষত স্বরের কান্না-গলা শুনে ব্লটিংপেপারের মত চুপসে গেলেন সঞ্জয় বোস। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতই উচ্চারণ করে গেলেন—

'লাভ কি বল? এমনি করে থাকতে থাকতে একদিন হয়ত আমি ব্লাডপ্রেসারের রোগী হয়ে বিছানায় পড়ে থাকব, আর স্লিপিং-ট্যাবলেট খেয়ে তোমাকে জীবন-যন্ত্রণা ঘোচাতে হবে।'

ঠিক সেই সময় পান্না তার তের বছরের মনে অনেক পরিণত চিন্তা করতে করতে, ঘৃণা বিরক্তি এবং বিস্ময় নিয়ে ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল।

'শুরু করেছ কি তোমরা? কত রাত হল খেয়াল আছে?'

আগেই আলো জ্বালিয়েছে পান্না। সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘরের দরজা, দরজার পর্দা, পর্দার রং এবং বুক-শেলফের বই এবং টেবিলের রজনীগন্ধা। সেই প্রচুর আলোর বন্যায় এবং পান্নার ভর্ৎসনায় দুজন একইসঙ্গে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন, আকুল আগ্রহে আশ্রয় পেতে চেয়েছে পান্নার ছোট্ট হাতে। ঠিক যেমন ভাবে হালভাঙা জাহাজের নাবিক আশ্রয়ের প্রত্যাশায় ছুটে যায় কোনও ছোট্ট চরের সন্ধান পেলে।

'চল তো ঘুমুবে। রাত একটা বাজে, দুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছ।'

যেন কোনও কলহরত অবুঝ শিশুদের ভর্ৎসনা করছে, এমনি ভঙ্গিতে পান্না বলল। তারপর, নিঃশ্বাসের দ্রুত স্পন্দনে কম্পিত শরীর, নীলশিরা স্ফীত হাত-ধরা অবস্থায় সঞ্জয় বোসকে আকর্ষণ করল তার ঘরের দিকে। মশারী ফেলে মাথায় হাত বুলিয়ে পান্না যখন ফিরে এল, রাধারাণী তখনও সেখানে উবু হয়ে বসে।

'এই নাও তোমার শাড়ী, হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়।'

যেন কর্তব্যের খাতিরেই পান্না রাধা-রাণীকে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। বহুক্ষণ ধরে মুখ ধুলেন রাধারাণী। চুল বাঁধলেন, রাধারাণী ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। চোখের কোথাও আর ঘুম নেই। কিন্তু এই রাত্রি জাগরণ পান্নাকে পড়তে বসতে সাহায্য করবে না। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল পান্না। নীলাভ জ্যোৎস্নায় তখনও কুয়াশার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। পান্না এতক্ষণে অনুভব করল, অদ্ভুত এক স্নায়বিক দৌর্বল্যে ওর প্রতিটি প্রত্যঙ্গ কাঁপছে। সেই কুয়াশার আঘ্রাণ নিতে নিতে পান্না ভাবল, কেন এমন হয়?

মানুষের মনের পরিবর্তন হয় এ-কথা সহজবুদ্ধিতে পান্না বুঝতে পারে আজ-কাল। যেমন ওর বন্ধু জয়ন্তর মা, আজ-ওর বাবাকে পছন্দ করেন না বলেই ডিভোর্স করেছেন। ভদ্রমহিলা নতুন করে স্বামী নির্বাচন করবেন, স্বামী-স্ত্রীতে বনিবন না হলে অশান্তি হয়, ঝগড়া হয় তাও পান্না বুঝতে পারে। জয়ন্ত ইচ্ছে করলে অনেক-কিছু পারে, ছবি আঁকে, খেলে কবিতা লেখে, তবুও মাঝে মাঝে বলে জয়ন্ত—আসলে আমার কিছুই ভাল লাগে না। মস্ত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও যে-ছেলে ভয়ঙ্কর মেলাংকলিয়ার শিকার তার কথা ভাবতে ভাবতে পান্নার মনে হল, তবুও জয়ন্তর বাবা মা ভাল করেছেন প্রতিদিনের শ্বাসরোধকারী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে তাদের একমাত্র সন্তানকে মুক্তি দিতে পেরেছেন।

কিন্তু পান্নার বাবা মা? পান্না জানে এই ত্রিশংকু অবস্থা থেকে তার উত্তরণ কোনওদিনও ঘটবে না। মাস্টারমশাইর কথা-মত পান্না কোনওদিন মন দিয়ে পড়তে পাবে না, পান্না বড় হতে পারবে না। মা তার জীবনদেখার উল্লাসে বাবাকে ভালবাসতে বাসতে সিকিউরিটির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে নিজেকে ছড়িয়ে দেবেন, লোকের প্ল্যাটিটিউডে মুগ্ধ হবেন চিরকাল। আর সঞ্জয় বোস মনে ঘৃণা এবং ভালবাসার পাশাপাশি অবস্থানে নিষ্ফল প্রতিজ্ঞায় রাধারাণীকে বিসর্জন দিতে গিয়ে ব্যর্থ হবেন। ব্যর্থতার হীন-কাপুরুষতার জ্বালায় জ্বালিয়ে মারবেন সকলকে। আর প্রতিদিনের এই ভিন্ন জীবন-বোধের সংঘর্ষে প্রচুর আদর বিলাসব্যসনের মধ্যে থেকেও বাবা এবং মাকে অশ্রদ্ধা করতে করতে, এই ঘৃণার স্বীপপুঞ্জ থেকে যে-পান্নার জন্ম হবে, সে-পান্না তার পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, নিঃসঙ্গ এবং দুঃখী।

তারও পরে যখন রাত আরও নিশুত হল, পৃথিবী সুষুপ্ত, সেই নির্জন, রিক্ত, হিমেল রাতে পান্নার তের বৎসরের তুলনায় অভিজ্ঞ, তথাপি তখনও জীবনের গভীর প্রত্যয়ে বিশ্বাসী সেই অতন্দ্র মন, জীবনের জটিলতার ঊর্ধ্বে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায়, শেষ চেষ্টার মত, ঋদ্ধিশালী কোনও ঈশ্বরের নিকট বিনম্র প্রার্থনায় রত হল—

'ঈশ্বর আমার বাবা-মাকে পরিবর্তিত কর। ঈশ্বর আমাদের শান্তি দাও। ঈশ্বর আমাকে বড় হতে সাহায্য কর।'

পাঠকের বৈঠক

স্বর্গে আমার মিত্র আছে (২)

সীজার আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুক্ষণ পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। পল্লী-বাসীরা ওকে এড়িয়ে চলে, তাদের বিশ্বাস ছেলেটা অপয়া, অশুভলগ্নে জন্ম। ছেলেটা ভাবে আমি নাস্তিক তাই হয়ত ওদের এই বিরূপতা। যাই হোক তাতে আমার কি এসে যায়। ওর মিতা জুলিয়াস সীজারও নাস্তিক মানুষ, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ না করেও তিনি কত কি করে গেছেন। এখন সীজার গৃহহীন। লুইজী ওর ঝুপড়ি ভেঙে দিয়ে ওর জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়েছে। তখনও চারদিকে একেবারে আগুনের হলকা বইছে। গ্রামের লোকজন মাঠের মধ্যে জটলা করছে, গির্জার দিকে তাকিয়ে তারা আলোচনায় মত্ত। এই জনতার মধ্যে গির্জার পাদ্রী সাহেবও আছেন। সীজারের দিকে চোখ পড়তেই তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন, নিজের বুকে ক্রসচিহ্ন আঁকলেন। সীজারও সবিনয়ে নিজের অঙ্গে ক্রসচিহ্ন আঁকে। এই সময়টাতেই একটানা একটা সুর কানে ভেসে আসে। মাঠের ঠিক ওপাশ থেকে শব্দটা আসছে। গ্রামে একটা ভ্রাম্যমাণ মেলা এসেছে, ছেলেরা সেখানে ভিড় করেছে। মেলার মালিক মেজাজী মানুষ, একটা জন্তুকে খাঁচায় আটকাবার চেষ্টা করছে। জন্তুটি প্রাচীন, জীবনে বীতস্পৃহ, গাত্রচর্মের ঔজ্জ্বল্য অনেক দিন লুপ্ত। একটা চাবুক মাটিতে আছাড় মেরে মেলামালিক চেঁচাচ্ছে—'হুপ-হুপ লুক্রেজিয়া।' বৃদ্ধ ব্যাঘ্রটি হুঙ্কার দেয়, কিন্তু আসলে সে হাই তুলছে, একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। লোকটার চিৎকারে ভয় না পেয়ে সীজার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে তাকায় মেয়েটির কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে প্রশ্ন করে—'ওটা বাঘ বুঝি!' মেয়েটি হেসে বলে—'বাঘই বটে, অনেক দিন নরমাংসের স্বাদে বঞ্চিত।' সীজার বলে, বাঘটি স্ত্রীলোক! মেয়েটি বলে—স্ত্রী বাঘেরও ত দরকার। সীজার ক্ষুন্ন হয়, তার মনে ধারণা হিংস্র বাঘকে পুরুষ হলেই বেশী মানায়। পাশের খাঁচায় শিম্পাঞ্জী, তারা অবশ্য পুরুষ এবং মহিলা। তারপর দুটি নৃত্যশীল গর্দভ বেরিয়ে এল। এদের নাম 'ড্যানসিং ডনকিস'—ক্যাসটর এবং পোলক্স। তখন সীজার প্রশ্ন করে তোমার নাম কি? আমার নাম সীজার। মেয়েটি চোখ নামিয়ে বলে—মারিয়া!

এমন সময় মেলামালিক চিৎকার করে মারিয়াকে ধমক দিয়ে বলে, নিজের কাজ কর, টিকিট না কেটেই বাচ্চাগুলো ঢুকে পড়ছে।

মারিয়া সীজারকে বলে—গাধার পিঠে চড়বে নাকি?

সীজার বলে—আমার ত টাকা-কড়ি নেই।

মারিয়া বলে—উঠে পড় আমি ওদিকে তাকাব না।

সীজার সুযোগ খুঁজছিল, সে লাফিয়ে উঠে পড়ল। মালিক কিন্তু চিৎকার করে ওঠে—বেটা বেজন্মা। আমার চোখে ধুলো দিবি। আমি দেখেছি তুই পয়সা দিস নি। পয়সা বের কর বলছি।

মারিয়া কি বলতে চায়, তাকে বাধা দিয়ে মেলামালিক হুঙ্কার দেয়—পয়সা বার কর এখনই। সীজার বলে—আমার পয়সা-কড়ি নেই। মারিয়া বলে ওঠে—বাবা। মালিক বলে—এটা কি গির্জার খয়রাতি মেলা পেয়েছিস। বলে মেয়েকে বলে যায়, তুই আমাকে দেউলিয়া করে দিবি। এই বলে মালিক সীজারকে একটা ধাক্কা দিয়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। তারপর ওর পাঁজরায় লাথি মারে। গাধাদের নৃত্য থেমে গেল, তারা সহানুভূতির দৃষ্টিতে সীজারকে দেখে, শোকমগ্ন শিম্পাঞ্জীযুগল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাঘটা বুড়ো হয়েছে, সে ভাবাবেগহীন। সে গড়িয়ে পড়ে চোখটা বন্ধ করে। সীজার পাঁজরায় হাত বুলোয়, তার লেগেছে। মালিকের ভুঁড়িটা লুইজীর মত, সীজার ভাবে একটা ধাক্কা দিলেই গড়িয়ে পড়বে। তারপর মারিয়ার মুখের দিকে নজর পড়ে। সীজার বলে—ওর কোনো দোষ নেই, ও যখন অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল তখন আমি গাধার পিঠে উঠেছি। কৃতজ্ঞতা লাল হয়ে ওঠে মারিয়া। সীজার গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়ে, মাঠে মাঠে ঘোরে, গরুগুলোও কেমন চুপচাপ। সন্ধ্যার পর আবার মেলায় ফিরে এল সীজার, মারিয়াকে প্রশ্ন করে, তোমাকে মেরেছিল নাকি! মারিয়া বলে না। কিন্তু মার সে খেয়েছে, মুখটা তাই লাল হয়ে যায়। সীজার বলে—লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। মারিয়া বলে—কিন্তু উনি আমার বাবা! সীজার বলে—আমার বাপ নেই। মারিয়া শুনে দুঃখিত হয়। সীজার বলে—একজন ইংলিশ সোলজার আমার জনক, আমার চুলটা তাঁর মত। ঐ পর্যন্ত—তিনি জন্ম দিয়েই পলাতক, ফলাফলের জন্য আর অপেক্ষা করেননি। মাও বেশী দিন থাকতে পারল না তিনিও পরপারে চলে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া বলে—আহা! সে ভাবে ছেলেটা ত খাঁটি ইতালীয় নয়, তবে ছেলেটি বেশ উত্তেজনাময়। মারিয়া বলে—'একা একা থাকা ভালো নয়।' এর উত্তরে সীজার বলে ওঠে:

"Everybody is alone inside himself. I need nobody. What I have to do in this world. I will do. And I will do it by myself".

এই উক্তিতে মারিয়ার দেহে শিহর লাগে। সে শুধু বলে, আজ কি গরম সে মুখটা মুছে নেয়। এমন সময় লুইজী পরিবারবর্গ সহসা আবির্ভূত হল। সীজার ঘুরে যায়, লুইজী ওর দিকে তাকায়। ওরা সবাই নাগরদোলায় চড়েছে, মারিয়া ডেসক ছেড়ে উঠেছে, নাগরদোলা চালাবে সে নিজে। সীজার লক্ষ্য করে কিভাবে নাগরদোলাটা ঘোরায়, কিভাবে তার গতিবেগ বাড়ানো-কমানো যায়। সীজারের মাথাটা কারিগরি ব্যাপারে পরিস্কার। ওর চোখের সামনে দিয়ে যতবার লুইজী ঘুরে যায় ততবার সীজারের মনে পড়ে ওর সেই নোংরা ঝুপড়ির বাসা, তার চড়া হারের ঘরভাড়া। ওর নিষ্ঠুরতার একটা তালিকা সে মনে মনে বানায়। তবু ভদ্র হয়ে থাকাই প্রয়োজন সে ভাবে। মারিয়া তার দিকে সহানুভূতির দিকে তাকায়। সীজার ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়। মারিয়া ভাবে আর কি কোনোদিন ওর সংগে দেখা হবে! আগামীকালই এই সব পশুদের খাঁচায় ভরে অশ্বতর দুটি টেনে নিয়ে গ্রামান্তরে যাত্রা করবে। ইতিমধ্যে নাগরদোলায় বেগ বেড়েছে তা সে লক্ষ্য করেনি। বাচ্চাদের ভীতিপূর্ণ চীৎকার সে সচকিত হয়ে ওঠে— খুব দ্রুতগতিতে নাগরদোলা ঘুরছে। লুইজী, তার স্ত্রী এবং কন্যা সোফিয়ার অবস্থা কাহিল। নাগরদোলাটা যেন শূন্যে আছাড় খাবে। মারিয়া ভাবে হঠাৎ নাগরদোলা এমন বিগড়ে গেল কেন, তারপর দেখে ইঞ্জিন ঘরে সীজার, তখন সে অর্থটা বুঝতে পারে। যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল, নাগরদোলা ছিঁড়ে পড়ল। লুইজী আস্তাকুড়ে পড়ল। মারিয়া দেখল তার বাবা বজ্রনিনাদে সীজারের ঘাড়ে পড়ল।

হাকিম সাহেব ভেবেছিলেন তিনি একটু তাড়াতাড়ি শয্যা নেবেন। অবশ্য এই ভ্যাপসা গরমে নিদ্রার সম্ভাবনা কম। এমন সময় পাহারওলা দরজায় ধাক্কা দিতে উঠে দরজা খুলতে হল। বাইরের বারান্দাটা লোকজনে ভরে গেছে। লুইজী মুখে হাত চাপা দিয়ে আছে। তার মুখে সামান্য রক্ত লেগে। তার স্ত্রীর আলুথালু বেশ। সোফিয়া কাঁপছে। আর একজন মোটাসোটা মানুষ সীজারকে টানার চেষ্টা করছে। পাহারাওলা তাকে ধরে আছে।

হাকিম সব শুনে বললেন—ওকে এখানে রেখে তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো। সেই মোটা লোকটা চীৎকার করে—আমি ওকে খুন করবো! হাকিম ঠাণ্ডা গলায় বললেন—'তোমার গাধাগুলো ছাড়া আর কাউকেই মারার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি অন্য

গ্রামে গাধাদের ওপর তোমার অত্যাচার দেখেছি।'

সবাই চলে যাওয়ার পর হাকিম সাঁজারকে বললেন—বসো, কেন এসব করলে?

—মর্যাদা রক্ষা করা ত প্রয়োজন।

—মর্যাদা মানে তোমার অহংকার।

সাঁজার বলে—হাঁ, আমি একটু অহংকারীও বটে।

—তোমাকে কি কেউ বলে দেয়নি অহংকারের পতন আছে!

—আমি অনেকবার পড়েছি, তবে কোনোক্রমে উঠে আবার দাঁড়িয়েছি।

হাকিম বল্লেন—এবার আর রক্ষা নেই। তুমি অনেক ক্ষতি করেছ। আমি তোমাকে জামিন দিয়েছিলাম উত্তম আচরণের আশায়। তুমি ত বাইরে গেলে আরো ক্ষতি করবে। তুমি এই রাতটা হাজতেই থাকো!

—ভালোই হবে, আমার শোবার কোনো জায়গা নেই। কারাগারই ভালো।

হাকিমের ইচ্ছা ছিল না ওকে তালাবন্ধ করে রাখেন, তিনি বললেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা তোমার কি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

সাঁজার জানায় সে অভুক্ত। হাকিম সাহেব বললেন, আমার খাবারটা তুমি খেয়ে নাও। যা গরম আমি তাই খাইনি।'

সাঁজার গোগ্রাসে খেয়ে নেয়। কিন্তু তার চোখ রয়েছে টেবলে রাখা সেই জুলিয়ান সাঁজারের মূর্তিটায়। হাকিম সাঁজারের দৃষ্টি অনুসরণ করে মূর্তিটার দিকে তাকান, তারপর কোমল গলায় বলেনঃ

"He changes the whole world. Things were never the same after he lived".

সাঁজার বলে—আমিও তাই চাই, আধা-খেঁচড়া কাজ নয়, হয় আমরা পুরোপুরি কাজ করবো নয় কিছুই নয়।

হাকিম এই 'আমরা কথাটিতে চিন্তিত হলেন। ছেলেটার মধ্যে এতটুকু দীনতা নেই। সাঁজারের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বসে রইলেন। পাহারাওলা এসে উচ্ছিষ্ট পাত্র তুলে নিয়ে গেল।

হাকিম নিদ্রার আয়োজন করলেন, চোখ বুজিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলেটার মুখখানা বারে বারে মনে পড়ে, কি দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ! কি আত্মপ্রত্যয়! তাঁর জীবনে এই মুখচ্ছবিই শেষবারের মত ভেসে উঠেছে। এই তাঁর অন্তিম চিন্তা।

রাত একটার সময় সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল নড়ে উঠল। ভীষণ ভূমিকম্প। করেঞ্জা গ্রাম একেবারে ভূকম্পনের কেন্দ্রে অবস্থিত। এই ভূকম্পন নাকি জাপান পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে। প্রথমটা একটা হালকা গুরু-গুরু শব্দ, তারপর বজ্রপাতের মত পাহাড়ের কম্পনধ্বনি। সমস্ত ভূমি ওলোট-পালোট। মাত্র তিন সেকেন্ডে ইতালীর মধ্যাঞ্চলের গ্রামগুলিতে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল—ক্ষতির পরিমাণ প্রচন্ড। আবার আধ ঘন্টা পরে এই ভূকম্পনের পুনরাবৃত্তি। যে অংশে হাকিম ছিলেন তা ধ্বংস হল, সাঁজার যে অংশে শুয়ে ছিল সেটা দাঁড়িয়ে রইল।

কাহিনীটির এই প্রস্তাবনা অংশটুকু একটু বিস্তারিত দেওয়া গেল, বাকী অংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগামী বারে দেওয়া হবে।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

নরসিংহ দাশ পুরস্কার ॥
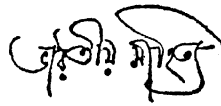
১৯৬৬ সালের নরসিংহ দাস পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী তাঁর 'মন্দিরময় ভারত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের জন্য। বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

লীলা পুরস্কার ॥

'ধর্ম ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য শ্রীমতী চিত্ররূপা সেন এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার পেয়েছেন।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কাব্যালোচনা ॥

গত ১০ মে বুধবার নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয় কবিতার উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের তুলনামূলক সাহিত্য এবং এশীয় সোসাইটির যুগ্ম উদ্যোগে এই সভা আয়োজিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল প্রেমের কবিতা পাওয়া যায় তা এই সভায় পাঠ করা হয়। এ ছাড়াও সেকালের এবং একালের ভারতীয় কবিতা পাঠ এই অনু-ষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। বলাবাহুল্য, প্রত্যেকটি কবিতাই ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা হয়। কবিতাগুলির ভাষ্য করেছিলেন কার্লো কোপলোয়া। কার্লো কোপলোয়া হলেন 'মহফিল' পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন। তবে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এঁরা এখনও অবলম্বন করতে পারেন নি।

প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন ॥

গত ৮ মে কলকাতার ইনফর্মেশন সেন্টারে একটি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন কবি বিষ্ণু দে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসাজ্জাদ জাহীর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিগত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন এবং ভারতবর্ষের পরি-বর্তিত অবস্থায় প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীগোপাল হালদার বলেন—বাংলা দেশে এখন একটি লেখক সঙ্ঘ গঠন করা খুবই প্রয়োজন। সঙ্ঘের দ্বারা লেখকরা লেখার বিষয়ে উপকৃত হবেন না সত্য, কিন্তু লেখকদের অন্যান্য যে সব সমস্যা আছে, তা এই সঙ্ঘ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অসীম রায়, দীপেন বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখও এই সভায় ভাষণ দেন।

মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা সভা ॥

গত ৭ই এপ্রিল মধুসূদন সম্পর্কে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য। ডঃ আর কে দাশগুপ্ত, মধুসূদনের উপর ফরাসী প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—'ফরাসী দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে বলেছেন যে, এই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অংশ। বর্ধমানের রাজা স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না, তারও চেয়ে ভাল ডিনার আমি এখানে পাচ্ছি। এ হচ্ছে সেই অমরাবতী। ফরাসী জনসাধারণের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। বিদ্যাসাগরের কাছেও একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, কিভাবে একজন ফরাসী মহিলা, যার সঙ্গে একটি ট্রেনে তাঁর আলাপ, সে তাঁকে ফরাসী জেল থেকে রক্ষা করেছে। সেই মহিলার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সনেটও রচনা করেন।'

বেঙ্গল লিটারেচারের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ॥

বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়ে-ছিল। তার মূলে ছিল কবির অনুবাদ-প্রয়াস। কিন্তু অনুবাদের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বঙ্গানুবাদ হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে আমরা অবাঙালীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি নি। 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকার মাধ্যমে কিছু উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক সেই দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজেদের হাতে। নানারকম প্রতি-কূলতা ও আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এদের এক বছর পূর্ণ হয়েছে অতি সম্প্রতি। সেই উপলক্ষে ২৫শে বৈশাখ মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি ছিলেন রুশ ভাইস-কনসাল শ্রী ভি আই গুর্গেনভ এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায়।

শ্রীশৈলেন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পত্রিকা সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে পত্রিকার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। প্রসঙ্গত তিনি এক বৎসরের নানা সংকট, বিজ্ঞাপনদাতাদের বিমুখতা প্রভৃতিরও উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি আশা করেন যে, বাংলা সাহিত্যের কথা ভেবেই এবার অনেকে এগিয়ে আসবেন। শ্রীগুর্গেনভ তাঁর ভাষণে বলেন যে, বাংলা সাহিত্য ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সে অনুপাতে অনুবাদ হয়নি অন্য ভাষায়। শ্রীগুর্গেনভ স্বয়ং গবেষণা করেছিলেন 'তুলনামূলক অনুবাদ' বিষয়ে। তিনি বলেন যে, অনুবাদকদের মূল সাহিত্যের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমির কথা জানতে হবে। ট্রানসলেশ্যান ইজ অ্যান আরট হুইচ বিআরস এ লট অফ রেসপনসিবিলিটিজ। অনুবাদকেরা সাহিত্যে প্রাণ আনেন, পাওয়া যায় ভিন্নতর স্বাদ আর গন্ধ। ......সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা অনুবাদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে থাকি। সেদেশে প্রথম ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছিল ১৭৮২ সালে এবং তা সংস্কৃত থেকেই। আই থিংক দ্য অরগ্যানাইজারস অফ বেঙ্গলি লিটারেচার আর ডুয়িং এ রিয়্যালি গুড থিংগ'। জাপান দূতাবাসের শ্রীতাকায়োশি ইতো তাঁর ভাষণে কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেন। ভাষাতত্ত্বের গবেষক শ্রীইতো এক বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন : 'আজকের জাপানের মানুষ আগের চেয়ে বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশী জানে ও ভালবাসে। জাপানী ভাষায় বাংলা সাহিত্য এখন কিছু কিছু অনূদিত হচ্ছে। জাপানের অধিবাসীরা প্রকৃতি-প্রেমিক, সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে।...আমি আশা করি বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।'

প্রধান বক্তা শ্রীঅন্নদাশংকর রায় বললেন, 'অনুবাদ যাদের রচনা থেকে হবে, অনুবাদকদের সেই সময়ের বোধ থাকতে হবে। অনুবাদ এক বিশেষ শক্তির প্রকাশ। অভিধান পাশে থাকলেই অনুবাদ হয়ে যায় না। এজন্য সার্থক অনুবাদ প্রায় নেই বললেই চলে।...বেঙ্গলি লিটারেচার-এর ডেফিনেশ্যান কি সেটা আমাদের জানা দরকার।' তিনি দেশবিভাগের পর বাংলা সাহিত্যের দ্বিধাবিভাজনের কথায় উল্লেখ করে বললেন যে, বাংলা সাহিত্য পূর্ববঙ্গেও অগ্রসর হচ্ছে। একথা ভুলে গেলে চলবে না; বরং পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এক ধরনের অস্বাভাবিকতা। বেঙ্গলি লিটারেচার-এর উদ্যোক্তাদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই কথাগুলি বিস্মৃত না হতে বলেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে দিয়েই বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। বিরোধ, বিদ্বেষ বাধা দেয়, কিন্তু সাহিত্যে তার প্রবেশাধিকার সীমিত। সাহিত্যে শান্তির পরিবেশে গড়ে ওঠে...অনুবাদকর্ম এ জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজদের যুগে আমরা অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারের কথা ভাববার সুযোগ পাই নি। মাইকেল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরাধীন যুগ। আজও তাঁদের রচনা অনূদিত হচ্ছে, যা তাঁদের জীবৎকালে হয় নি। য়োরোপের সোভিয়েত রাশিয়াই একটিমাত্র দেশ যারা বাংলা সাহিত্যকে বিপুলভাবে অনুবাদ করে আস্বাদ করেছে। তাদের সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক ভ্রান্তি ছিল। সেই ভ্রান্তি ভেঙে যাওয়ায় আমরা আনন্দিত। তাঁদের অনুবাদকর্মে নিষ্ঠা অনুকরণীয়।'...পরিশেষে তিনি বেঙ্গলি লিটারেচারের প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসিত করে আশা প্রকাশ করেন যে, অদূরভবিষ্যতে এরা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসভায় পৌঁছে দেবেন তার যথার্থ স্বরূপে। শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও জোসেফ ও' কনেল বক্তৃতা করেন।

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রবীণ ও নবীন কবিদের কবিতা পাঠ। কবি অজিত দত্তের সভাপতিত্বে অংশগ্রহণ করেন গোপাল ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, আলোক সরকার, বরুণ মজুমদার, কালীকৃষ্ণ গুহ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, সুনীথ মজুমদার, শংকর রায় প্রভৃতি। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমণীন্দ্র রায় পত্রিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করে পরিবেশন করেন 'ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ'।

পরলোকগত কবির কাব্যগ্রন্থ ॥

পূর্ব জার্মানীর জোহানেস ববুরোয়স্কি গত বছর পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। বন্ধু পিটার ওয়েনস্কিকে রোগশয্যায় নিজে হাতে ববুরোয়স্কি তাঁর রোগশয্যায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। প্রকাশকের দপ্তরে পেঁছুনোর সংবাদটুকুই তিনি কেবল শুনে গিয়েছেন। সম্প্রতি সেই কাব্যগ্রন্থটির একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নাম : 'শ্যাডো ল্যান্ড'। অনুবাদ করেছেন রুথ ও ম্যাথু মিড। সম্পাদকদ্বয় ববুরোয়স্কির জার্মান সচেতনতা বিষয়ে কোন আলোকপাত করেন নি। অবশ্য সঞ্চয়িত কবিতাগুলি থেকে জার্মানীর উত্তরাঞ্চলের নিসর্গ ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের আভাস অনুভব করা যায়। কখনো প্রাচীন ও ভগ্ন সৌন্দর্যের প্রতি কবির ঐতিহ্যআশ্রয়ী সুচেতনা লক্ষ্যগোচর হয়। আধুনিক জনজীবনের সঙ্গে এই অনুভূতির সংঘাতকে কবি অত্যন্ত বাস্তব ও আধুনিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে এক ধরনের সরস উপলব্ধিতে পেঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিদগ্ধ কাব্যসমালোচক কলিন ফ্যাক তাঁর সম্পর্কে বলেন,—"পূর্ব ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ কবি ববুরোয়স্কি।"

লিটারারি ওয়ার্কশপ ॥

সম্প্রতি জার্মানীতে নতুন দশকের লেখকদের একটি সাহিত্য সংস্থা লিটারারি ওয়ার্কশপ নামে গঠিত হয়েছে। এর উদ্যোক্তা হচ্ছেন পূর্ব জার্মানীর এক সাহিত্যপ্রেমিক সাংবাদিক ডাইটার সুথমডিট্। ১৯৬৪ সালে এই সংস্থাটি এক অলিখিত শর্তে চলতি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিষয়ে কয়েকটি সেমিনার আহ্বান করেছিল। তখন এই সংগঠনের কোন স্থায়ী নাম ছিল না। লিটারারি ওয়ার্কশপ নাম নিয়ে তাঁদের প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল। তরুণ কবি কার্ট সিইগেল তাঁর কবিতাপাঠের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের অধিবেশনের সূচনা করেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানটিই ছিল অত্যন্ত হাস্যকর, কৌতুককর ও সাংবাদিকের ভাষায় —ননসেন্স। কার্ট সিইগেলের কবিতা পাঠের ভাষা ও কায়দাকানুন উপস্থিত শ্রোতাদের হাসির খোরাক জুগিয়েছে। মঞ্চের উপরে উপস্থিত কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের যেমন ছিল বেশভূষার বিশৃংখলতা তেমনি তাদের স্বরচিত রচনা পাঠের সময় অদ্ভুত মুখভঙ্গী, বিকৃত কণ্ঠের উচ্চারণ তাদের বিশিষ্ট সাহিত্যভাবনা ও প্রকাশের ভঙ্গীকে পাঠক বা শ্রোতার সামনে হাজির করেছে। হেইক্ ড্রুটিন নিজেকে সাম্প্রতিক জার্মান সাহিত্যের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার বলে নিজেই ঘোষণা করেছেন মঞ্চ থেকে। উড্ওয়েনকো বলেন : আমরা লেখকদের একটি নুড কলোনি স্থাপন করতে চাই। মহিলা লেখিকা মার্গারেট জেহান সম্প্রতি 'ওভার দি রু হোরাইজন' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন যা নাকি অচিরেই বিশ্বের সব প্রধানুবর্তনকে ধ্বংস করবে। কার্লহান্স ফ্রাঙ্ক তাঁর পরীক্ষামূলক গল্প ও একটি উপন্যাসের জন্য সাহিত্যসাধনার সূচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লিটারারি ওয়ার্কশপে নাম লিখিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন আগে যা লিখেছেন সব ভুল। উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেন "সাহিত্য সংস্থা গঠনের পেছনে উন্নত সাহিত্য রচনার কোন

উদ্দেশ্যই আসলে এ'দের নেই। এটি আসলে কয়েকজন ক্ষ্যাপাটে লোকের অস্থির অস্তিত্বের ফলশ্রুতি।"

পরলোকে কবি মেস্‌ফিল্ড ॥

প্রখ্যাত কবি জন মেস্‌ফিল্ড ১২ মে ৮৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। ১৯৩০ খৃঃ থেকে তিনি বৃটেনের রাজকবি ছেলেন।

সুশান চিট্টির সাম্প্রতিক উপন্যাস ॥

সুশান চিট্টি সাম্প্রতিক ইংরেজ লেখিকাদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা মহিলা ঔপন্যাসিক। বৃটেন এবং আফ্রিকার ভূ-ভাগ সীমান্তে এর কাহিনীর পটভূমি জাল-বিস্তার করেছে। উপন্যাসটির নাম 'হোয়াইট হানট্রেস'। বৃটেনের লর্ড পরিবারের এক মহিমান্বিত কর্তাব্যক্তির ১৮টি কন্যার কাহিনী লেখিকার ঋজু অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম কৌতুকের বিশ্লেষণে সুন্দর উদ্ঘাটিত। আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের অন্তর্নিহিত ক্রন্দন ও বিপরীত শক্তির সংঘর্ষ উপন্যাসটিতে এক শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আফ্রিকার অসহায় মানুষের জন্য সহৃদয়া চরিত্র ১৮ কন্যার এক কন্যা ফ্লেবিয়ার চরিত্রটি সুশানের আন্তরিক মনস্কতায় রূপময় হয়ে উঠেছে।

পরলোকে এলমার রাইস ॥

গত ৮ই মে প্রখ্যাত মার্কিন নাট্যকার এলমার রাইস পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর। মাত্র একুশ বছর বয়সে 'অন ট্রায়াল' নাটকটি লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার পরবর্তী সুপরিচিত নাটক দুটি হল : 'দি অ্যাডিং মেসিন এবং উই দি পিপল।'

পুনর্মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ ॥

সিলভিয়া প্লথ হালের ইংরেজী কবিতার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় নাম। শুধু মহিলা কবি বলেই নয়, কবিতার নতুন দশকে সিলভিয়া প্লথ তাঁর মৌলিকত্বের জন্য ও প্রথানুবর্তনের বিরোধিতার জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

সিলভিয়া যে কাব্যগ্রন্থটির জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন তার নাম 'দি কলোসাস'। দীর্ঘকাল বইটির প্রথম মুদ্রণ ছিল নিঃশেষিত। সম্প্রতি তাঁর 'এরিয়েল' কাব্যগ্রন্থটির জনপ্রিয়তা 'দি কলোসাস'-এর পুনর্মুদ্রণের সুযোগ করে দিল। কেননা সিলভিয়ার কবিতাপাঠক ও সমালোচকদের অভিমত এই যে 'এরিয়েল' দি কলোসাসের পরিপূরক। ফেবার অ্যান্ড ফেবার সংস্থা সম্প্রতি 'দি কলোসাসের' পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেছেন। কবিতা সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, অথবা নিস্পৃহ, শুনে অবাক হবেন যে, এই মুদ্রণ সংখ্যায় ৩০,০০০ কপি। দাম আঠারো টাকা।

তরুণ গল্পকার পরিচিতি ॥

ফেবার অ্যান্ড ফেবার সংস্থা বৃটেনের তরুণ এবং তরুণতর গল্পকারদের পাঠক মহলে পরিচিত করে তোলার জন্য গত কয়েক বছর ধরে নানারকম পরিকল্পনা করে চলেছেন। ইতিপূর্বে তরুণ গল্পকারদের সমস্যা নিয়ে এই সংস্থা কয়েকটি সেমিনার আহ্বান করেছিলেন। এই সব আলোচিত সমস্যা ছোট ছোট পুস্তকাকারে প্রকাশ করে পৃথিবীর নানা প্রান্তের প্রকাশনা দপ্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও লাইব্রেরীতে পাঠান হয়েছিল। অংশতঃ সফল হবার পর এই সংস্থা আরেকটি নতুন পরিকল্পনা নেন। তা হোল এই উদ্যমী ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গল্পকারদের গল্প সংকলিত করা। ইনট্রোডাকশান ওয়ান... ইনট্রোডাকশান টু...এই রকমভাবে পর-পর এই সিরিজগুলি বেরিয়ে যাবে। প্রথম দুটি সিরিজ আগেই বেরিয়েছে। বর্তমানে বেরিয়েছে ইনট্রোডাকশান থ্রি। বর্তমান সংকলনের গল্পকাররা হচ্ছেন র‍্যাচেল বুল, ক্রিস্টোফার হ্যাম্পটন মাইকেল হয়ল্যান্ড ম্যুর ওয়টকিন্স, জন হোরেওয়ে। সানডে টাইমস এ বিষয়ে মন্তব্য করেছে—এই উদ্যোগপর্বটি এই সংস্থার পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অন্যতম ও সার্থক।

মহাতীর্থের বিবরণ

কামরূপ রাজ্যের 'কামাখ্যাতীর্থ' মহা-পুণ্যময় স্থান। বহু প্রাচীন এই স্থানটি সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কেও বিচিত্র অলৌকিক কথা শোনা যায়। পাথরের তৈরি পথ ঘাট, মন্দির, বিগ্রহ ছড়িয়ে আছে চার-দিকে। কারুকার্যবিশিষ্ট মন্দির ও বিগ্রহে শিল্পকর্মের আশ্চর্যসুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। এ সমস্ত বিষয়ের ইতিহাসভিত্তিক বিবরণ খুব কমই সংগৃহীত হয়েছে। কামাখ্যা তীর্থের আদিপূজারী পণ্ড-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বংশধর শ্রীধরণীকান্ত দেবশর্মা লিখিত 'কামাখ্যাতীর্থ' গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণ সংগ্রহ করে গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি ও তথ্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কামাখ্যাতীর্থের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে আসামের প্রাচীন ইতি-হাসের কথা। কামরূপ অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলা-লিপি ও তাম্রফলকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে কামাখ্যাতীর্থোৎপত্তির ইতিবৃত্ত, কামরূপের পৌরাণিক পরিচয়, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের বিবরণ, দেবীর মন্দির আবিষ্কার, নরনারায়ণ ও চিলারায়ের কাহিনী, অহোম-রাজগণ কর্তৃক দেবী মাহাত্ম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কামাখ্যা দেবীর মন্দির ও সৌভাগ্যকুণ্ড, মহাদেবের পণ্ডপীঠ মন্দির দর্শনক্রম, তীর্থে বাৎসরিক উৎসব ও মেলা, কামরূপের অন্যান্য মন্দির প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে কয়েকটি শিলালিপির প্রতিলিপি, ৫১ মহাপীঠ ও ২৬ উপপীঠের তালিকা গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। অনেকগুলি চিত্র আছে। শ্রীদেব-শর্মা কামাখ্যাতীর্থের বিবরণ রচনা করে পুণ্যকামী মানুষের অন্তরের শুভাশীর্বাদ লাভ করবেন।

কামাখ্যাতীর্থ : (ইতিহাস আলোচনা) —ধরণীকান্ত দেবশর্মা। কামাখ্যা গৌহাটি—১০। আসাম। দাম দেড় টাকা।

নতুন রসের উপন্যাস

গুজরাটের সমুদ্রতীরবর্তী বিখ্যাত নগরী সোমনগরের প্রতাপশালী জনপ্রিয় রাজা হিরণ্যবর্ধনের একমাত্র পুত্র আনন্দ-বর্ধন কুড়ি বৎসর বয়সে ভাস্কর্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হল কলিঙ্গের খ্যাতিমান ভাস্কর বৃদ্ধ মহীপাল ও তাঁর পুত্র ভূপালের শিল্পনৈপুণ্য দেখে। রাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজানুমতি নিয়ে আনন্দ-বর্ধন একদিন শুভক্ষণে ভাস্করদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শিল্পচর্চা শুরু করলেন। কিন্তু বিপদ এল তারপর।

রাজপুত্রের শিল্পাগারের অন্যতম কামিন চন্দ্রার প্রতি আকৃষ্ট হল সে। তাকে ঘিরে মূর্তির রূপকল্পনা শুরু হল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপুত্র কামমোহিত হল চন্দ্রার প্রতি। বিপদ ঘনিয়ে এল। সব খবরই রাজা হিরণ্যবর্ধন রাখতেন। চন্দ্রার জীবন-দীপ নিভিয়ে দিলেন তিনি। যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আনন্দবর্ধন তার কল্পিত মূর্তিকে করে তুলল বীভৎস রাজার প্রতি প্রতিশোধ নিতে।

কালস্রোতে একদিন সব শেষ হল। কেবল টিকে থাকল সেই কাহিনী এবং সেই বীভৎস মাতৃমূর্তি। বহুকাল পরে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম কর্মী তারিণী চক্রবর্তী সংসার ত্যাগ করে ঐ মূর্তির পূজার ভার নিলেন। তারিণী চক্রবর্তী সংসারত্যাগী হলেও তাঁর মনের মধ্যে ছিল আনন্দবর্ধনের অনুরূপ এক যন্ত্রণা। তিনিও মোহিত হয়েছিলেন ঐ মূর্তির কমনীয় মুখমণ্ডল দেখে, কেবল যেটুকুনি চন্দ্রার জীবিতকালে আনন্দ-বর্ধন তাঁর সুখানুভূতি দিয়ে গড়ে তুলে-ছিল।

পাশাপাশি এই দুটি কাহিনীর সমন্বয়ে রচিত হয়েছে "কামমোহিতম্।" কাহিনী—বিন্যাসে লেখক সচেতন। একই আলোকে দুটি মানুষকে তিনি দেখেছেন এবং একটি মূর্তিকে কেন্দ্র করে দুটি মানুষের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন। উপন্যাস রচনায় লেখকের মুন্সিয়ানা এখনো কিছুটা অভি-জ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। উপন্যাসের কাহিনী দুটি পাঠকদের ভালই লাগবে।

কামমোহিতম্- (উপন্যাস)—চিত্ত ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন; ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিঃ—৯। দাম পাঁচ টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ'-এ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীনীলরতন সেন এবং শ্রীদেবদাস জোয়ারদার যথাক্রমে 'রবীন্দ্র ছন্দ পরিচয়' ও 'রবীন্দ্রকাব্যে পাখির বাক প্রতিমা' সুদীর্ঘ দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'রবীন্দ্র দর্শন' অনুবাদ করেছেন প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (৫ম বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা)—সম্পাদনা : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪ এলগিন রোড, কলকাতা—২০ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

●

'আগামী' কিশোরদের উপযোগী মাসিক পত্রিকা। কয়েক বৎসর পূর্বে এই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হত এবং এর জন-প্রিয়তাও কম ছিল না। সম্পাদনায় রুচিশীল মনের পরিচয় ছিল সুস্পষ্ট। সম্প্রতি আগামীর বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'ও আন্ডার মামা' লিখছেন শ্রীবিমল কর। দুটি গল্প লিখেছেন শ্রীআশাপূর্ণা দেবী এবং শ্রীদিব্যেন্দু পালিত। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্রের 'শুভঙ্করী তন্ত্র', শ্রীমণীন্দ্র রায়ের 'তরজা গান' এবং শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর 'ছড়া' সকল শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবে। বিভাগীয় রচনা পর্যায়ে আছে পথের ঠিকানা, কিশোর বৈঠক, অবাক পৃথিবী, আমার বাংলা, বিজ্ঞানের কথা, বিদেশের চিঠি, মাঠে-ময়দানে, খবরের খবর, খোলা চোখে—এ গুলিতে লিখছেন রঞ্জনা রায়, সলিল দাশ-গুপ্ত, অমল দাশগুপ্ত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, গ্লোরিয়া মেল্টজার, চিরঞ্জীব, কৃষ্ণ ধর, মিহির সেন। সম্পাদনায় সম্পাদকদ্বয়ের রুচিশীল মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিশোর-দের রচনা সহজ করে লেখাই যথেষ্ট নয়, তাদের বোঝবার উপযোগী হওয়াই বড় কথা। সেদিক থেকে প্রকাশিত রচনাগুলির গুণধর্ম অবশ্যস্বীকার্য। পত্রিকাটির অঙ্গ-সজ্জা ও মুদ্রণপরিপাট্য লক্ষণীয়।

আগামী (বৈশাখ, ১৩৭৪) — সম্পাদনা : কৃষ্ণা দত্ত ও প্রসূন বসু। ১৯ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড থেকে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

বৃহত্তর কলকাতার একটি অঞ্চল সোদ-পুরের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ'। 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটি এই পরিষদের মুখপত্র। এই পত্রিকার ২য় খণ্ডে লিখেছেন সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অত্রি মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সরকার, গোপাল ভৌমিক, দীপক বসু প্রমুখেরা। বিজ্ঞান সম্পর্কীয় আলোচনা-গুলি এই সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ। চিন্তাশীল পাঠকরা এই সংখ্যাটি পেলে খুশী হবেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান (২য় খণ্ড : ১৯৬৭) সম্পাদক : শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত। দাম : এক টাকা।

(৭)

আজ্ঞে? ...না, আমি বেশি কিছু খাই না, যেটুকু দরকার নিয়ে নিচ্ছি, আপনি আমার জন্য ভাববেন না। চিবোতে ক্লান্ত লাগে আমার, আমি লিকুইড ডায়েটেরই বেশি পক্ষপাতী। হ্যাঁ, সকাল থেকেই। নেশা? আরে মশাই, নেশা যদি অত শস্তা জিনিশ হ'তো তাহ'লে মানুষের সুখী হবার বাধা ছিলো কী? হয় না, কিছুই হয় না, কিছুতেই কিছু হয় না। দু-এক মিনিটের ব্যাপার শুধু, বুদ্বুদ, ফুলকি জ্ব'লে উঠে নিবে যায়। হয়তো কখনো রক্ত একটু চনচন ক'রে ওঠে, মন থেকে ভয় চ'লে যায়, মনে হয় এবার ঘুমোতে পারবো। কিন্তু না, যখনই মনে-মনে ভাবি এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছি তখনই ঘুম ছুটে যায় চোখ থেকে। ঘুমের জন্য তাই অন্য দাওয়াই খুঁজে নিতে হয়, জোটাতে হয় নানা জায়গা থেকে, হাতের পাঁচ গায়ত্রী গ্রেগরি। তা এমন কী খারাপ আমার জীবনটা বলুন। বেশ তো কেটে যাচ্ছে। আছি নিজের মনে, কারো সাতে-পাঁচে নেই, কেউ বলতে পারবে না আমি তার ক্ষতি করেছি। তাছাড়া, একটু বীরত্বও আমি দাবি করতে পারি হয়তো; —আসলে আমার কিছুই ভালো লাগে না, না মদ না মেয়েমানুষ না গোলাপ ফুল, কিন্তু ভান করছি, নিজের কাছেই ভান করছি যেন ভালো লাগছে। ভান ছাড়া কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে, বলুন।

কিন্তু আপনার সব ঠিক আছে তো? কাঁকড়ার সুপটা ভালো লাগলো? কন্যা-কুমারিকার কাঁকড়া, এ-অঞ্চলে এর রসজ্ঞ ব্যক্তি বেশি নেই অবশ্য—প্রতাপান্বিত ভেজিটেরিয়ান সব। ওরা মুর্গি দিয়ে স্প্যানিশ রাইস রেঁধেছে দেখছি, বুদ্ধি ক'রে তবু ভাত করেছে যা হোক। আপনাকে মাছের-ঝোল-ভাত খাওয়াতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু ও-সব তো আর গোয়ান রাঁধুনির হাত দিয়ে বেরোয় না। যেমন স্কটল্যান্ডের জল আর ঠান্ডা ছাড়া সত্যিকার হুইস্কি হয় না, তেমনি সত্যিকার বাঙালি রান্নার জন্যেও চাই বাংলার স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া, বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার নারী। ওটা একটা ম্যাজিকের মতো ব্যাপার, মশাই, কিমিয়ার মতো, কোনো কুক্-বুকে লেখা যাবে না কখনো, কোনো এক রহস্যময় 'এক্স' আছে ওর মধ্যে যাকে আমরা বলি 'হাতের তার', সেটুকু বাদ পড়লেই সব পন্ড হ'লো। ভেজাল আমার দু-চক্ষের বিষ, আমি দিশি খানার লোভে লন্ডনের ইন্ডিয়া ক্লাবে ঢুকি না, সাহেবদের মুখে 'কারি' কথাটা শুনলে আমার ব্রহ্মতালু জ্ব'লে যায়। তামিল থেকে ঐ কথাটাকে তুলে ইংরেজরা কী জুলুম চালাচ্ছে ভেবে দেখুন—শুক্তোও 'কারি', চচ্চড়িও 'কারি', মুড়িঘণ্টও 'কারি'। বিসমিল্লা!

তা জানেন, নেলির কেমন একটা করুণ আস্থা ছিলো তার কুক্‌বুকগুলোতে। রান্না নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকারই নেই তার, বাবুর্চি বাঁধা-ধরা যা রাঁধে দিব্যি খেয়ে নেয়া যাচ্ছে, কিন্তু নেলির ভাবটা যেন সুখে-থাকতে-ভূতে-কিলোয় গোছের। বই দেখে-দেখে নিত্যি নতুন রেসিপি লিখে দেয় বাবুর্চিকে, কিন্তু জমকালো ফরাশি নাম-গুলোর তলায় স্বাদে-সোয়াদে তফাৎটা ঠিক টের পাওয়া যায় না। আমি আপত্তি করি না তবু—বেশ তো, নেলির এই যখন এক শখ চেপেছে, ক্ষতি কী? কিন্তু মুশকিল এই যে নেলি তারিফ শুনতে চায় আমার মুখে—যেমন তার ছবি আঁকায়, পিয়ানো বাজানোয়, তেমনি—যেন গুণপনার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, বিশেষ কোনো একজন মানুষের প্রশংসা পাওয়াতেই তার সার্থকতা। হাসি পায় আমার, মেজাজ বিগড়ে যায়, যখন নেলি খেতে ব'সে জিগেস করে ভালো হয়েছে কিনা, এমনভাবে তাকায় যেন সম্পাদককে কোনো লেখা পড়তে দিয়ে তরুণ লেখক দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে। শেষটায় একদিন না-ব'লে পারলুম না, 'বাংলায় বলে যেচে মান, কেঁদে সোহাগ। তেমনি হ'লো বই প'ড়ে রান্না।'

সহজ হয়নি অবশ্য ঐ বাংলা বচনটার ইংরেজি তর্জমা ক'রে ওকে বোঝানো। তা মিনিট পাঁচেক চেষ্টা ক'রে নেলির মাথায় সেঁধিয়ে দিয়েছিলুম রসিকতাটা। না, বাংলা আমি শেখাইনি ওকে. আর ওর গুজরাটি শিখিনি—কী দরকার? কী

হবে ও-সব গেঁয়ো ভাষা শিখে—কী আছে ও-সবে? ইংরেজি আছে আমাদের, জগতের ভাষা, তা-ই যথেষ্ট। ইংরেজি ভাষার জন্যেই তবু মাঝে-মাঝে ভারতবর্ষ নামে একটা ব্যাপার অনুভব করা যায়, উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে তামিল চেট্টির কথাবার্তা চলে, বিয়ে হ'তে পারে বাঙালির সঙ্গে গুজরাটির। শুধু কি ভাষা? যাকে আমার ঠাকুমা বলতেন 'সাহেব-সাহেব খেলা', সেটাই হ'লো আসল মিলনমন্ত্র। নয়তো দেখুন বামুন-শুদ্দুর, আমিষ-নিরিমিষ, ছোঁবো কি ছোঁবো না, খাবো কি খাবো না—ঝামেলা কত! এ-সবের উপরে উঠতে পারে শুধু তারাই, যারা মনে মনে আধা-সাহেব ব'নে গেছে—ঠিক না? আমি নেলিকে বরং উৎসাহ দিয়েছিলুম জর্মান শিখতে, ওর মরচে-পড়া ইটালিয়ানটা ঝালিয়ে নিতে—দেশ-ভ্রমণের সময় খুব কাজে লাগে ওগুলো, দু-চারখানা পড়ার যোগ্য বইও আছে, যদি কেউ পড়তে চায়। তাছাড়া আমি চাইওনি নেলিকে 'বাঙালি ক'রে তুলতে', আমি বাংলাদেশকে আমার মন থেকে কেটে দিয়েছিলুম; আমি ভারতীয়, আমি আন্তর্জাতিক, আমি জগতের বাসিন্দা।

নেলি আবার আর-এক ফ্যাশাদ বাধিয়েছিলো যখন তার সাজগোজের ব্যাপারেও আমাকে বিশেষজ্ঞ ব'লে ধ'রে নিলে। 'বলো তো, এটা মানাচ্ছে আমাকে? এই শাড়ি, এই চোলি, এই গয়না? এই স্কাই-ব্লুর সঙ্গে সিলভার-গ্রে? এই সানফ্লাওয়ারের সঙ্গে মিডনাইট ব্ল্যাক? এই ইণ্ডিয়ান রেডের সঙ্গে এমরাল্ড-গ্রীন?' নির্ভুলভাবে রংগুলোর পারিভাষিক নাম বলে সে—বোধহয় ছবি আঁকায় তার শিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল ওটা—যদিও আমি চোখেই দেখতে পাচ্ছি সে কী পরেছে, আর আমার চোখে কেমন লাগছে তা-ই সে জানতে চায়। 'বাঃ! চমৎকার! খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।' বা মাঝে-মাঝে—নেহাৎ তাকে খুশি করার জন্য—'চোলিটা একটু হালকা রঙের হ'লে ভালো হয় না?' 'মুক্তো বোধহয় মানাবে এর সঙ্গে।' আমি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলুম মশাই, যে কখনো, কোনো পার্টিতে বেরোবার আগে, তাকে দিয়ে খামকা তিনবার সাজগোজ বদলাই—বেচারা ঘেমে যায়, টাল-টাল শাড়ি নামাতে হয় আলমারি থেকে, আমি একটা ছোট্ট কৌতুক উপভোগ করি নিজের সঙ্গে, একটা ছোট্ট প্রতিশোধের রিহার্সেল চালাই।

তা ব'লে ভাববেন না যে মেয়েদের রূপ, বেশভূষা, এ-সবের আমি মর্ম বুঝি না। নেলিকে আমি যে মনোনীতা করেছিলুম তার একটা কারণ রূপ বইকি। ঠিক সেই ধরনের রূপ, যা বাংলাদেশে কখনো দেখা যায় না, কিন্তু এখনো উত্তরভারতে যা আর্য জাতির স্মৃতিকে চাক্ষুষ ক'রে তোলে মাঝে-মাঝে। যেন মহাভারত থেকে কুন্তী বা দ্রৌপদী উঠে এলেন, হঠাৎ দেখে এমনি মনে হয় নলিনী রোকারকে। 'কাশ্মীরি ফোটকীর মতো'—আপনার মনে আছে সুদেষ্ণার মুখে দ্রৌপদীর বর্ণনা?—তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। কিন্তু হায়, আমার তো তখন আর একুশ বছর বয়স নেই, তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে ঝানু হয়েছি, নিজেকে তৈরি ক'রে তুলেছি অন্যভাবে—ছেঁটে দিয়েছি সেই সব দুর্বলতা, বোকামি, যা আমাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলো কোনো-এক সময়ে। অতএব রূপসী নলিনীর সাধ্য কী যে আমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে? অনেক আগেই নারীকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম, লার্মিন স্ট্রিটের বকুল-ভিলায়, ভাদ্রমাসের এক সন্ধেবেলা। পেয়েছিলুম নারীত্বের সেই স্বাদ, সৌরভ, যা এই শাবলির মতোই স্নিগ্ধ, উদ্বায়ী, যা মদও নয়, মদের যে-নিশ্বাসটুকু ইয়েটসের মতে প্রেতেরা পান ক'রে থাকে, সেই নিশ্বাস। যদি সেখানেই থেমে যেতাম, সেই নিশ্বাসে ও সৌরভে, তাহ'লে আমার জীবনটা আজ অন্য রকম হ'তো—ভালো হ'তো না, বড়োজোর কোনো য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসর হ'য়ে এতদিনে কণ্টেসড়েে একটি বাড়ি তুলতাম সেই বিরাট বস্তিনগরে, যার নাম কলকাতা। ভাগ্যে আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলো ঐ মেয়েরা, যাদের সঙ্গে সেদিন আমি চায়ের টেবিলে জুটে গিয়েছিলাম!

জানেন, সেই সন্ধ্যায় আমি যেন এক নতুন চোখ পেয়েছিলুম। আমার পক্ষে অনভ্যস্ত ঐ নারীসান্নিধ্যের জন্য, আর হয়তো বাইরের ঐ আঙুর-রঙের আভার জন্যেও। মেয়েদের চেহারা ও বেশভূষার যে-সব খুঁটিনাটি আমি আগে কখনো লক্ষ্য করিনি, সেগুলি—কবিতায় কোনো আশাতীত মিল বা রবীন্দ্রনাথের চমকপ্রদ 'রডোডেনড্রন' শব্দটার মতোই—আমার চোখে পড়ছে এখন, এমনকি প্রায় সেইরকমই মূল্যবান ব'লে মনে হচ্ছে। মিতুর কালো চুলের ফাঁকে টুকটুকে লাল দুল—যা মাঝে-মাঝে ঝাপসা-ভাবে ন'ড়ে উঠছে; কাজলের গলার নিচে বুকের অনাবৃত অংশটিতে চাঁদের মতো সোনার নেকলেস; বিভাবতীর সুগোল কব্জিতে একটিমাত্র চিকরি-কাটা রুলি; বুলবুলের কালো ফ্রেমের চশমার পিছনে ছোটো তীক্ষ্ণ কাঠবিড়ালি-চোখ—তাদের মাথার গড়ন, গালের ডৌল, ঠোঁটের রেখা, অর্থাৎ, মেয়েদের সাজসজ্জা ও দেহের ভঙ্গি—তার ভাবার্থ যেন এই প্রথম ধরা পড়লো আমার মনে। 'নারী' নামক যে আক্ষরিক ধারণাটাকে নিয়ে আমি এতদিন খেলা করেছি মনে-মনে, তা যেন ছিলো পাঠ্য-বইয়ের ভূগোল; কিন্তু আজ স্কুলের ছাত্র পর্যটক হ'য়ে ভৌগোলিক বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়েছে—দেখছে নিজের চোখে হ্রদ পাহাড় গহবর যোজক অন্তরীপ, দেখছে এক অফুরন্ত বৈচিত্র্য, এক বিপুল সম্ভাবনা—ম্যাপের বইয়ে যার গুজব পর্যন্ত শোনা যায়নি।

পুজোর ছুটির মধ্যে স্বদেশী মেলা হবে এবার, তা-ই নিয়ে কথা বলছিলেন বিভাবতী। মিতু বুলবুল দু-জনেই ছাত্রী ছিলো তাঁর, আর বুলবুল মনে হ'লো রীতিমতো একজন সহকর্মিণী এখন, কিন্তু নতুন-চেনা কাজলকেও কথাবার্তার অন্তর্ভূত ক'রে নিলেন তিনি; কাজল সহজেই রাজি হ'লো কিছু শেলাইয়ের কাজ ক'রে দিতে, মেলায় বিক্রির জন্য। নতুন স্টল কী-কী খোলা যায়, কোন্-কোন কোরাসের গান শিখিয়ে দেবে মিতু, কোন-কোনটা সোলো গাইবে, এই সব নিয়ে কথা চলছে তখন, বিভাবতী এক ফাঁকে আমার দিকে তাকালেন। 'আমরা তোমার কোনো সাহায্য কি পেতে পারি, রণজিৎ?' তিনি, বিখ্যাত বিভাবতী দত্ত, আমার সঙ্গে ও-রকম অনুরোধের সুরে কথা বলছেন, এতে আমার এমন অপ্রস্তুত লাগলো যে তক্ষুনি আমার মুখে কোনো জবাব জোগালো না। বুলবুল কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো, আমি চেষ্টা ক'রে বললাম, 'বলুন, আমি কী করতে পারি?' বিভাবতী আমাকে একটা চার্ট তৈরি করে দিতে বললেন, ভারতের ইতিহাস বিষয়ে, বৈদিক যুগ থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সব প্রধান তথ্য আর তারিখ থাকবে তাতে। 'পারবে না?' 'চেষ্টা করতে পারি।' আর-একটা জিনিশ চাই তোমার কাছে—"মুক্তধারা"র জন্য একটা লেখা।' 'আমি? আমি কী লিখবো?' 'কী লিখবে তাও ব'লে দিচ্ছি—' এবার কিছুটা আদেশের সুর বিভাবতীর—'"রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' চরিত্র': গোরাকে উনি কেন আইরিশ করলেন এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। আমি জানি তুমি কবিতা লেখো, কিন্তু আমার প্রবন্ধই দরকার।' এবারে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত হলাম, কেননা আমার যে-ক'টা কবিতা (সংখ্যায় শোচনীয়রূপে অল্প তারা) কলকাতার ছোটো-ছোটো কাগজে এ-পর্যন্ত বেরিয়েছে, তাও যে বিভাবতী দত্তর মতো একজন ব্যস্ত ও নামজাদা লোকের চোখে পড়তে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিলো। আমার বিব্রত ভাবটা চাপা দেবার জন্য আমি একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, 'আচ্ছা—একটা কথা জিগেস করতে পারি কি? আপনাদের মেলায় জিনিশপত্রের দাম এত বেশি হয় কেন? চার পয়সার রুমাল চার আনা?' 'কারা তৈরি করছে সেটা দেখবে না?' ব'লে কাজল একটু হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে, আর বুলবুল ব'লে উঠলো, 'বাঃ, টাকা তোলার জন্যই তো মেলা।' কিন্তু, কেন টাকা তোলার প্রয়োজন, সেটা আমার কাছে রহস্য থেকে গেলো, বিভাবতী অন্য কথা পাড়লেন।

'আচ্ছা, দিলদার নওরোজ নাকি ঢাকায় আসছেন, মিতু কিছু জানো?' 'আমিও তাই শুনেছি।' 'তাঁর কোনো চিঠিপত্র পাওনি শিগগির?' 'দুটো নতুন গান পাঠিয়েছেন—স্বরলিপি সুদ্ধু।' বুলবুল জিগেস করলো, 'আজ গাইবি ও-দুটো?' 'আজ কী ক'রে গাইবো, আমি তো স্বরলিপি থেকে ঠিক ঠিক সুর তুলতে পারি না', সরলভাবে, আমার মনে হ'লো মধুরভাবে নিজের এই অক্ষমতাটুকু স্বীকার করলো মিতু।

'কলকাতায় গেলে দিলদার কাছেই শিখে নেবো।' 'আশ্চর্য মানুষ!' বললেন বিভাবতী, 'আমার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিলো কেষ্টনগরে—একই কনফারেন্সে গিয়েছিলুম আমরা। যেমন হাসি, তেমনি গান, তেমনি আনন্দ। একেবারে প্রাণের ফোয়ারা।' 'হ্যাঁ', মিতু সোৎসাহে মাথা নাড়লো, 'দিল-দা যেখানেই যান উনি একাই একশো। আর কী-রকম চা ভালোবাসেন! আর গান একবার শুরু হ'লো তো অন্য কিছু খেয়াল থাকে না!' 'আমি ভাবছিলাম, মিতু, আমাদের মেলার উদ্বোধনের জন্য নওরোজকে এবার আমন্ত্রণ জানাবো।' 'বেশ তো! খুব ভালো হয়!' 'শুনেছি ওঁকে ধরা খুব শক্ত?' তা তো জানি না, তবে ঢাকায় একবার আসার ওঁর ইচ্ছে আছে তা জানি।' 'তাহ'লে, মিতু, তুমি একবার লিখে দেখবে নাকি?' মিতু বিনীতভাবে জবাব দিলো, 'আপনি বলেন তো লিখতে পারি।' 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—উনি মোটামুটি রাজি থাকলে আমি স্কুলের পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করবো, ওঁর সুবিধেমতো! তারিখও বদলাতে পারি। —রণজিৎ, তোমার সঙ্গে নওরোজের আলাপ নেই?' বিভাবতী এমন সুরে কথাটা জিগেস করলেন যেন আমার দুটো-চারটে পদ্য ছাপা হয়েছে ব'লেই আমি নওরোজের বন্ধু হবারও যোগ্য। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'না, না, আমার সঙ্গে আলাপ থাকবে কী ক'রে?' মিতু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিন্তু
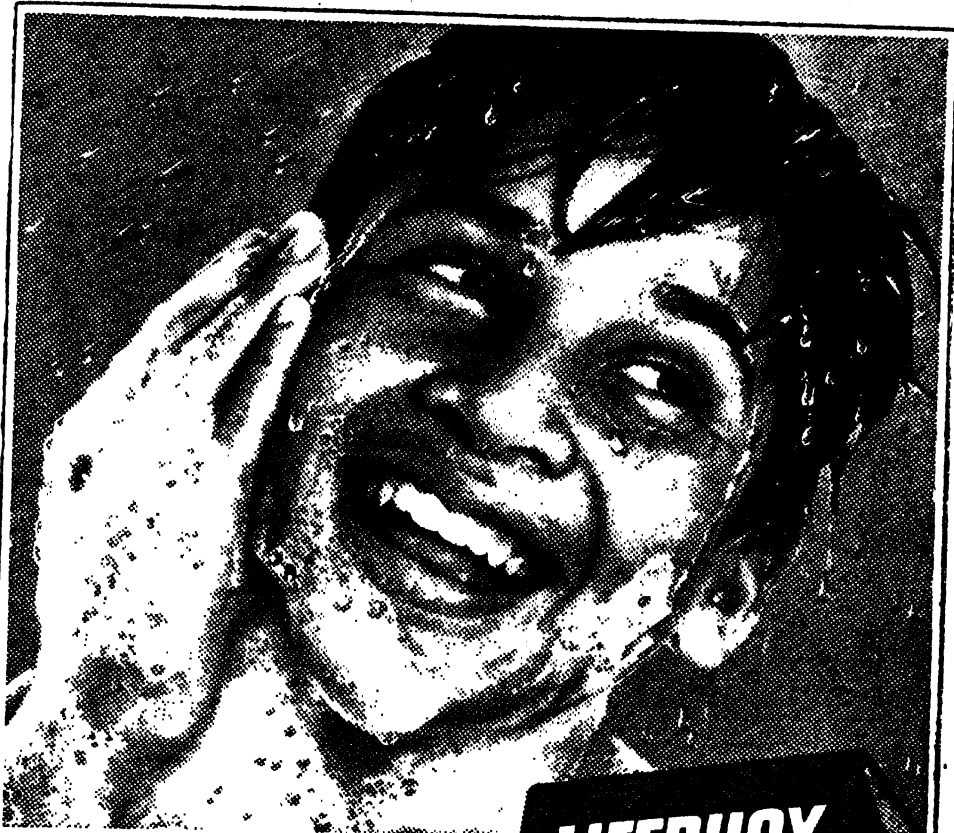
মনে হয় উনি আপনার নাম জানেন।' 'সে কী!' 'সে-সব পরে বলবো, কিন্তু উনি এলে নিশ্চয়ই আলাপ করবেন—খুব ভালো লাগবে আপনার।'

আমার মনে হ'লো আমাকে হঠাৎ কেউ এক তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় ছুঁড়ে দিয়েছে, এখানে বাতাস এত হালকা যে সহজে নিশ্বাস নিতে পারছি না। শেলির মতো ছবিতে দেখা মুখ নয়, কালিদাসের মতো কিংবদন্তী নয়, আমারই দেশের আমারই সময়ের কবি, যাঁকে চোখে দেখা, কানে শোনা যায়, যাঁর সঙ্গে—এইমাত্র জানলাম—কোনো সময়ে আমার চেনাশোনাও হ'তে পারে। সেই দিলদার নওরোজ—একদল সুস্থ সবল ফুর্তিবাজ শিশুর মতো যাঁর কবিতা আর গান এখন খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে—তাঁকে মিতু চেনে, তাঁকে তিনি নিজের গান শেখান, তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র চলে তাঁর, কত সহজে মিতু তাঁর বিষয়ে বলে—'আপনি বলেন তো লিখতে পারি; আলাপ করলে ভালো লাগবে আপনার'! কিন্তু সেই পাহাড়ের চূড়ার একটি ছোট্ট কাঁটাও বিঁধলো আমাকে—ঈর্ষা, যেহেতু মিতুর কাছে এই কবি ঘরোয়া 'দিল-দা'তে পরিণত হয়েছেন, আর যেহেতু তিনি গান দিয়ে জয় ক'রে নিয়েছেন শুধু মিতুকে নয়, বিভাবতীকেও; গান—যা কবিতার অত কাছাকাছি, অথচ কবিতার চেয়ে ঢের বেশি ঋজু, সরল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সত্যি-সত্যি যা কানের মধ্য দিয়ে তক্ষুনি মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছয়—যখন কবিতা তার চিন্তার ভারে বুদ্ধির ভারে ভাষার শাসনে অনেক পিছনে প'ড়ে থাকে—সেই সুরশিল্পকেই ঈর্ষা হ'লো আমার। আমার মনে এই কথাটা ঝিলিক দিলো যে আমি যে-রকম কবিতা লিখতে চাই তা যদি লিখেও উঠতে পারি কোনোদিন, তাহ'লেও তা মহিলাদের এ-রকম প্রিয় হবে না বা কারোরই হবে না; খুব সম্ভব—যে-রকম প্রিয় এ-মুহূর্তে আমার প্রতিবেশিনীদের কাছে নওরোজের গান। কিন্তু সেইজন্যেই আমার বুকের ভিতরটা টগবগ ক'রে উঠলো নওরোজ বিষয়ে আরো অনেক-কিছু জানার জন্য—সত্যি কি তাঁকে চা, পান, হার্মোনিয়ম আর খাতা-পেন্সিল দিয়ে বসিয়ে দিলেই একঘর লোকের মধ্যে হাসি গল্প বাহবার ফাঁকে-ফাঁকে, গান রচনা করতে পারেন তিনি? সত্যি কি খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে, দার্জিলিঙের ট্রেন ধরার আগে, মাঝের একঘণ্টা সময়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন একবার? গল্প শুনে যাঁকে মনে হয় আমার একেবারে উল্টো স্বভাবের মানুষ, মিতু দর্শনকে মাধ্যম ক'রে সেই কবির কাছাকাছি পৌঁছবার ইচ্ছায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠলাম, মনে হ'লো মিতুর মুখে আরো অনেক কথা শুনতে পেলে আমি নওরোজের কবিত্বশক্তির গোপন উৎসের সন্ধান পাবো। কিন্তু তক্ষুনি ছোট্ট একটা ঘটনা কবি ও কবিতা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিলো আমাকে। বকুল-ভিলায় ইলেকট্রিক আলো জ্ব'লে উঠলো।

আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যের পর কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলে, বড়ো-বড়ো ছায়া লাফিয়ে ওঠে দেয়ালে, কাঁপে হাওয়ায়, ঘরের মধ্যেও অনেকখানি রাত্রিকে নিয়ে আমরা বাস করি; সন্ধেবেলার আকাশের আলো যখন ম'রে আসে, তার সঙ্গে লণ্ঠন-জ্বলা মুহূর্তটির কোনো তীব্র তফাৎ থাকে না। কিন্তু আকস্মিক বৈদ্যুতিক আলোয় বারান্দার দৃশ্যটি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো। আকাশ, মেঘ আর গাছপালা দিয়ে যে-যাযাবরীয় দৃশ্যপট ঝুলছিলো এতক্ষণ তা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠলো শক্ত ইটের তৈরি চুনকাম-করা দেয়াল, চেয়ার-টেবিলের ঘন আকৃতি, টেবিল-ক্লথে চায়ের দাগ; আমার প্রতিবেশিনী মহিলারাও বদলে গেলেন। নতুন আলোয়, নতুন ছায়াতে আমি সজ্জিত দেখলাম তাঁদের; চা খাচ্ছেন তাঁরা খেতে-খেতে গল্প করছেন, তাঁদের হাত, আঙুল, গ্রীবার নড়াচড়ার ফলে কখনো আমার চোখে বিঁধছে কাজলের নেকলেসের লাল আর সবুজ পাথরগুলো, কখনো এক ঝলক গাঢ়-বাদামি আভা বেরিয়ে আসছে বুলবুলের চশমার ফ্রেম থেকে, আর হঠাৎ কোনো-একটি ভঙ্গির ফলে বিভাবতীর গলায় সেই তিনটি বিখ্যাত রেখা আমি দেখতে পেলাম—সংস্কৃতে যাকে বলে 'ত্রিবলী', আমি এতদিন যাকে কাল্পনিক ব'লে ভেবেছিলাম।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত গাইয়ে মেয়েটির অন্য এক চেহারা আমার চোখে ছিলো, আগের দিন তার গানের আসর থেকে সেই ছবিটি আমি তুলে নিয়েছিলাম। হার্মোনিয়মের সামনে যে-ভাবে সে হাঁটু মুড়ে বসে, গাইবার সময় অচেতন যে-সব ভঙ্গি হয় ঠোঁটের দাঁতের যে-অভ্যাস দেখা যায়, হার্মোনিয়মের শাদা-কালো চাবির উপর যেভাবে তার সরু-সরু আঙুলগুলি খেলা করে—সেইগুলো জানা ছিলো আমার। কিন্তু আজ এসে অন্য এক মিতুকে দেখছি। সেদিন যখন মেরুন রঙের শাড়ি প'রে গান গাইছিলো, তখন কেমন গম্ভীর ভাব ছিলো তার মুখে, কেমন সহজে মেনে নিয়েছিলো জোড়া-জোড়া চোখের দৃষ্টিভরা প্রশংসা; একটু আগে সূর্যাস্তের আলোয় তাকে দেখেছিলাম যেন সামুদ্রিক গাছপালায় জড়ানো কোনো জল-কন্যা, কিন্তু এখন তার সবুজ শাড়িটা নীল দেখাচ্ছে, একটু টেনে-টেনে নিশ্বাস নিয়ে সে কথা বলছে, ছোট্ট ক'রে সন্দেশ ভেঙে থেমে আছে বুলবুলের কথা শোনার জন্য—তার গানের গৌরব ভুলে গিয়ে এখন যেন প্রায় বালিকা হ'য়ে গেছে সে, কোনো উন্মুখ ফুল, এখনো ভীরু, সব পাপড়ি খোলেনি। আর এদিকে কাজল, যে এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে গৌরবহীন, যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করেনি, বিয়ের পরে পাঁচ বছর বাপের বাড়িতে ঘুমিয়েছে, যার বিষয়ে আমার আগ্রহের একমাত্র কারণ শুধু এটুকুই ছিলো যে ফটিক-মামা তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে আমার চমৎকার একটা থাকার জায়গা হবে সেখানে—সেই কাজল হঠাৎ বড়ো হ'য়ে উঠলো যেন, ভরপুর, শুধু মেয়ে বলেই অন্যদের সমকক্ষ ও প্রতিযোগী। এও এক বিস্ময় আমার পক্ষে।

আপনি হাসছেন?...ছেলেমানুষ ছিলুম, ভগবানের দয়ায় আমরা সকলেই একটা সময়ে ছেলেমানুষ থাকি। তা জানেন, সেদিন বাড়ি ফিরে আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি, আমার অন্ধকারকে নাড়া দিচ্ছিলো কয়েকটি মুখ, মেয়েদের মুখ, ভিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু স্থির নয়, যেন একটা নাগর-দোলা আস্তে-আস্তে ঘুরছে আমার মগজে। এক মুখ মিশে যায় অন্যটির মধ্যে, ধার ক'রে নেয় পরস্পরের অবয়ব—কারো নাকের দু-পাশে দেখতে পাচ্ছি অন্য কারো চোখ, কোনো ঠোঁটে অন্য কারো হাসি, কারো মাথার পিছনে অন্য কারো খোঁপা—যেন আমার জীবনবৃক্ষে হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি নারী মঞ্জরিত হ'লো, অনেক ব'লেই আমার নাগালের বাইরে। আমি চেষ্টা করলাম কোনো-একজনকে বেছে নিতে, ধ'রে ফেলতে, আমার চোখের মধ্যে পুরোপুরি ভ'রে ফেলতে, কিন্তু আমরা যেমন জলে গা ডুবিয়েও হাতের মুঠোয় জল ধরতে পারি না, তেমনি সেই 'এক' যেন অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে চোখে বেঁধার চেষ্টা করতে গিয়েই আমি তাকে হারিয়ে ফেলছি। তারপর আধো-ঘুমের মধ্যে আমার মনে হ'লো যে হয়তো এক বিশ্বনারীত্ব আছে কোথাও — বস্তুহীন, বর্ণনাতীত — যার আভাসমাত্র ধরা পড়ে মাঝে-মাঝে, কখনো একজনের, কখনো অন্যজনের মুখে—তাও সকলের চোখে নয়, বিশেষ কোনো মুহূর্তে বিশেষ এক দর্শকেরই চোখে—কিন্তু দাঁড়ায় না, তক্ষুনি মিলিয়ে যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন মুহূর্ত ও এমন অবস্থা সম্ভব, যখন সেই বিশ্বনারীত্বের নির্যাস বা সারাংশকে আমরা সংহত করতে পারি একটিমাত্র নারীর মধ্যে, হয়তো তাকে আমাদেরই জীবনের অংশ ক'রেও নিতে পারি? আর তখনই অন্য একটা ভাবনা ঠেলে উঠলো আমার প্রায়-ঘুমিয়ে-পড়া অন্ধকার থেকে : আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে যে-অতৃপ্ত ব্যর্থতাবোধ, সেই কণ্টকে অন্য এক সরল ভাষায় তর্জমা ক'রে নিতে পারলাম :—মনে হ'লো, আমার এই ক্ষুদ্র ভীরু মলিন পরিবেশ, এই অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ, আমাদের দাস-মনোভাব আর ইংরেজের ঔদ্ধত্য—সব সত্ত্বেও হয়তো সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়, এমনকি হয়তো সুখী হওয়াও সম্ভব, যদি পাই একটি বন্ধু—বান্ধবী—সঙ্গিনী, একটি মেয়ে যাকে আমি মনের কথা বলতে পারবো, আমার কথা যে শুনবে মন দিয়ে, বুঝবে আমি কী বলতে চাচ্ছি।

(ক্রমশ)

চিত্র-সমালোচনা

মেহেরবান (হিন্দী) : এ ভি এম-এর নিবেদন; ৪,৯২৪·০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৯ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ ভি মায়াপ্পান; পরিচালনা : এ ভীম সিং; সংলাপ ও গীতরচনা : রাজেন্দ্রকৃষন; সংগীতপরিচালনা : রবি; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : এ ভিনসেন্ট; চিত্রগ্রহণ : এ, ভেঙ্কট; শব্দানুলেখন : সি ডি বিশ্বনাথন; সংগীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক; আবহ-সংগীতানুলেখন : মঙ্গেশ দেশাই; নৃত্য-পরিচালনা : চিন্নি সম্পৎ; শিল্পনির্দেশনা : এ কে শেখর; সম্পাদনা : পল ডোরাই-সিংহম্; নেপথ্যকণ্ঠসংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও রফী; রূপায়ণ : অশোককুমার, সুনীল দত্ত, মেহমুদ, সুদেশ-কুমার, রাজ মেহেরা, রমেশ দেও, অসীম-কুমার, ভাল্লা, শ্যামলাল, মুকরী, নূতন, সুলোচনা, শশীকলা, শ্যামা, জয়ন্তী, পদ্মা, এন ভারতী, মাস্টার শঙ্কর, বেবী রোজার-মণী প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরি-বেশনায় গেল ১২ই মে, শুক্রবার থেকে নিউ এম্পায়ার, কৃষ্ণা, লোটাস, প্রিয়া, খান্না, পার্কশো হাউস, জয়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ভাগ্যলক্ষ্মী বড়োই চঞ্চল। ধনকুবের শান্তি স্বরূপ তাই একদিন আবিষ্কার কর-লেন, শেয়ার মার্কেটের বিপর্যয়ে তিনি সর্বস্ব হারিয়ে ব'সে আছেন এবং ঋণের বোঝার মাথা তুলতে পারছেন না। তাঁর দুর্দিনে তাঁর বন্ধুরা তো দূরের কথা, তাঁর তিন ছেলে পর্যন্ত তাঁর সহায়তা করল না। তাঁর পাশে রইল শুধু তাঁর স্ত্রী পার্বতী, তাঁর অবিবাহিতা ছোট মেয়ে গীতা এবং তাঁরই দ্বারা লালিত-পালিত যুবক কানহাইয়া ও তার সাধ্বী স্ত্রী লক্ষ্মী। ছেলেরা যে বাপের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, এটা কানহাইকে আহত করে। এই উপলক্ষে ছেলেদের সঙ্গে তার বিবাদ হয়। তারাও সুযোগ বুঝে তার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে সস্ত্রীক বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু তার পালককে সে ভুলতে পারে না। নিজে সে যেদিন থেকে উপার্জন-ক্ষম হয়, সেইদিন থেকেই সে মাঝে মাঝে শান্তি স্বরূপকে দেখতে আসে তাঁর প্রিয় সিগারেটের টিন হাতে ক'রে। কিন্তু একদিন সে এসে দেখে তার প্রিয় পালক তাঁর কন্যা গীতার প্রতি তাঁর ছেলেদের দুর্ব্যবহার সইতে না পেরে ব্যথিত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। যখন সে দেখল শেঠ শান্তি স্বরূপের শ্রাদ্ধ ব্যাপারে তাঁর ছেলেরা কার্পণ্য করতে চায়, তখন সে পার্বতী দেবীর কাছ থেকে যৌতুক স্বরূপ পাওয়া, তার স্ত্রী

অভিনেত্রী কল্যাণী ঘোষকে দেখা যাবে আগামী কয়েকটি ছবিতে। ফটো : অমৃত

শকুন্তীর সমস্ত অলংকার বিক্রী ক'রে উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এর পরে শান্তি স্বরূপের প্রাসাদোপম বাসভবনটিকে সেই কেমন ক'রে উপলক্ষ হয়ে নীলাম হওয়ার দায় থেকে রক্ষা করে এবং শেষ পর্যন্ত সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত ক'রে সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে পারিবারিক শান্তি ফিরিয়ে আনে, তাই নিয়েই শেষাংশ রচিত।

আশাপূর্ণা দেবী রচিত মূল-কাহিনী "যোগবিয়োগ" মাদ্রাজে নির্মিত হিন্দী ছবি "মেহেরবান"-এ যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে চরিত্রচিত্রণ থেকে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশের প্রতিই অধিকতর মনোনিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রধান চরিত্রগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় ভাগ্যের ক্রীড়নক হিসেবে: তাদের নিজেদের কিছু পুরুষাকার আছে ব'লে বোধ হয় না। শান্তি স্বরূপের প্রাসাদটি যে শেষপর্যন্ত নীলাম হওয়ার দায় থেকে রক্ষা পায়, সেখানেও দেখা যায় ভাগ্যেরই খেলা; জ্বলন্ত মোটরের তলা থেকে অর্ধদগ্ধ করমচাঁদের পুত্র রমেশকে উদ্ধার করবার সুযোগ কানহাইয়া পেয়েছিল দৈবাৎ সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল ব'লেই না?

এই ঘটনাবহুল সুদীর্ঘ ছবিটির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে শেঠ শান্তি স্বরূপ এবং এই ভূমিকাতে অভিজ্ঞ নট অশোককুমার যে সাবলীল ও জীবন্ত অভিনয় করেছেন, তা এই ভূমিকাটিকে অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আনন্দই হোক, আর দুঃখই হোক, রাগই হোক, আর অভিমানই হোক,—শান্তি স্বরূপের ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি বাচনে ও ভঙ্গীতে, রূপে ও রসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছেন। কোথাও এতটুকু অতিশয্য নেই, কোথাও কৃত্রিমতা নেই। অভিনয় যে এমন বাস্তব হয়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। কানহাইয়ার চরিত্রটিতে পুরুষোচিত শক্তিমত্তার অভাব আছে; ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, সে আগাগোড়া মার খেয়েই গেল—সার্থকভাবে রুখে দাঁড়িয়ে কোনো ক্ষেত্রেই সে জয়লাভ করল না। তাই এই চরিত্রটিতে সুনীল দত্তকে প্রায়ই কাঁদতে হয়েছে। সাদাসিধে কানহাইয়ার ফুলশয্যার রাত্রিটি শ্রীদত্তের অভিনয়গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ছবির হাল্কা অংশে "গর্দভ" রাজের সেবাইত বেশে মেহমুদ হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। অবিবাহিতা গীতার ভূমিকায় নবাগতা তরুণী ভারতীর অভিনয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। অপরাপর ভূমিকায় সুদেশকুমার (রমেশ), পদ্মা (রত্না), শশীকলা (দেবকী), সুলোচনা (পার্বতী), শ্যামা (বড়বৌ মঙ্গলা), রাজ মেহেরা (করমচাঁদ) প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবিটিতে অন্তত সাতখানি গান আছে। কিন্তু রাজেন্দ্র কৃষ্ণনের রচনা এবং সঙ্গীতপরিচালক রবির সুরযোজনা বিশেষ কোনো অভিনবত্বের সৃষ্টি না ক'রে গতানুগতিকের পর্যায়েই গেছে।

এ ভীম সিং পরিচালিত এ ভি এম চিত্র "মেহেরবান" অশোককুমারের অনন্যসাধারণ অভিনয়গুণে চিত্ররসিক মাত্রেরই দ্রষ্টব্য।

—নান্দীকর

'উসকী কাহানী'র শুভমুক্তি

বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত এইচ এম শেঠিয়ার 'উসকী কাহানী' ১৯ মে প্যারাডাইস, মিত্রা ও শহরতলির অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। এ ছবিটি বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক কুশলতার দিকে থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নতুন চিন্তাধারায় ছবিটি নির্মিত। নায়কনায়িকা চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করছেন তরুণ ও অঞ্জু মহেন্দ্র। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মানু রায়।

আগামী সপ্তাহে 'পাল্কী'

পুনম পিকচার্সের রঙিন ছবি 'পাল্কী' আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ ২৬ মে শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। মহেশ কাউল পরিচালিত এ চিত্রে রূপদান করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, ওয়াহিদা রেহমান ও জনিওয়াকর। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নৌশদ।

বিজয় বসু পরিচালিত 'আরোগ্য নিকেতন'

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'আরোগ্য নিকেতন' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সুসম্পন্ন করছেন পরিচালক বিজয় বসু। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, দিলীপ রায় ও রবি ঘোষ।

বাংলা ছবি 'আনন্দ সংবাদ'-এ রাজকাপুর

প্রিয়া ফিল্মসের দ্বিতীয় বাংলা ছবি 'আনন্দ সংবাদ'-এ নায়কের ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন রাজকাপুর। ছবিটি পরিচালনা করবেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

'গড় নাসিমপুর' চিত্রে বিশ্বজিৎ-মাধবী

বারীন্দ্রনাথ দাশ রচিত ঐতিহাসিক কাহিনী 'গড় নাসিমপুর' চিত্রের দুই প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় ছবিটি পরিচালনা করছেন পরিচালক অজিত লাহিড়ী।

"দিবারাত্রির কাব্য" আসন্ন অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ

"দিবারাত্রির কাব্য" পুরীর সমুদ্রসৈকতের বহির্দৃশ্য গ্রহণের পর আবার শীঘ্রই এর অন্তর্দৃশ গ্রহণের কাজ শুরু হবে। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন যথাক্রমে—নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন—কৃষ্ণ চক্রবর্তী। প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন—মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনুভা গুপ্তা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ'

নবগঠিত মহাজাতি কথাচিত্রম-এর প্রথম ভক্তি নিবেদন 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ সুরেশ রায়ের পরিচালনায় রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্য রচনার কাজ শ্রীরায় নিজেই সম্পন্ন করেছেন।

'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ'-এর চরিত্রে রূপদান করছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, অসিতবরণ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্বপনকুমার দীপা চট্টোপাধ্যায়, মাঃ অরিন্দম, নবাগতা সুভদ্রা মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য। কালোবরণের সুরে কণ্ঠদান করেছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি বিশ্বাস, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ রায় প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা ও নৃত্য-পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে কানাই দে, বিশ্বনাথ নায়েক, গৌর পোদ্দার ও বিনয় ঘোষ।

সমাপ্তিপথে 'লীলা'

কিনে ইউনিটের সামাজিক ছবি 'লীলা'র চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় সমাপ্তিপথে। 'নতুন জীবন'-খ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিখানির পরিচালনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন। ছবিটিতে সুর দিচ্ছেন রাজেন সরকার। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন —সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু, রবি ঘোষ, গীতা দে, মিতা চট্টোপাধ্যায়, লোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

প্রেমাংশু বসু, গঙ্গাপদ বসু ও শিশুশিল্পী মাস্টার চীনা। সরকার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আসন্ন মুক্তি-প্রতীক্ষায় মহামায়ার 'ভাঙন'

মহামায়ার প্রথম নিবেদন 'ভাঙন'-এর চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শেষ হয়ে বর্তমানে মুক্তির দিন গুনছে। আধুনিক ভঙ্গুর সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে রচিত ভাঙন-এর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন মোহন বিশ্বাস। সুর-সংযোজনা করেছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং উৎপলা সেন।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, প্রণতি ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, আশীষকুমার, পদ্মা দেবী, শিখা বাগ, অতনুকুমার, দীপিকা দাস এবং একটি জাঁকজমকপূর্ণ নৃত্যে রোম্বের লাস্যময়ী বেলা বোসকে দেখা যাবে। চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় যথাক্রমে আছেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোর পোদ্দার ও অজিত দাস।

আশা করা যাচ্ছে ছবিটি জুলাই মাসের মাঝামাঝি মুক্তিলাভ করবে।

'হাসিনা মান জায়েগী' চিত্রে শশি-ববিতা

সম্প্রতি সিমলা বহির্দৃশ্যে 'হাসিনা মান জায়েগী' চিত্রের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করলেন শশি কাপুর ও ববিতা। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন জনি ওয়াকর, বি বি ভাল্লা, মনমোহনকৃষ্ণ ও নিকিতা। সুরসৃষ্টি করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

নরেন্দ্র সুরি পরিচালিত 'বড়িদিদি'

শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওয় পরিচালক নরেন্দ্র সুরি তাঁর নতুন ছবি 'বড়িদিদি'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। একটি মারাঠি ছবির কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচিত। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন জীতেন্দ্র, নন্দা, ওমপ্রকাশ, দিলীপ রাজ, নাজির হুসেন, রাজ মেহরা ও মেহমুদ। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রবি।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'চন্দন কা পালনা'

ইসমাইল মেনন পরিচালিত আর্জু ফিল্মসের রঙিন ছবি 'চন্দন কা পালনা' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ছবিটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মীনাকুমারী, ধর্মেন্দ্র, মেহমুদ, মমতাজ, দুর্গা খোটে, নাজির হোসেন ও শবনম। সুরসৃষ্টি করেছেন রাহুলদেব বর্মন।

'মাঝলিদিদি' চিত্রের সংগীত গ্রহণ:

কে জি পিকচার্সের 'মাঝলিদিদি' ছবিটির সংগীতগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল ফিল্ম সেণ্টার স্টুডিওয়। সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কণ্ঠদান করেন লতা মঙ্গেশকর ও কমল বারট। শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' অবলম্বনে এ চিত্রটি পরিচালনা করেছেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। ছবিতে অভিনয় করছেন মীনাকুমারী, ধর্মেন্দ্র, ললিতা পাওয়ার, মাস্টার শচীন ও বেবি সারিকা।

রূপদক্ষর অভিনয়

রূপদক্ষ নাট্য সংস্থার অষ্টম বার্ষিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ ও ২৩শে মে ৬৭ সন্ধ্যা ৭টায় মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গালয়ে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন প্রখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। নাট্যোৎসবে শ্রীরতন ঘোষ বিরচিত 'সম্রাট' শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাইরের দরজা' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' মঞ্চস্থ হবে। 'সম্রাট' ও 'পুনর্জন্ম' নাটকের নির্দেশক শ্রীতড়িৎ চৌধুরী এবং 'বাইরের দরজা' নাটকের নির্দেশক শ্রীকমল ঘোষ-দস্তিদার।

রূপকার প্রযোজিত "অচলায়তন":

বাঙালী হিন্দু সমাজের চিরাচরিত শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি একদা রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন তাঁর সাংকেতিক নাট্য "অচলায়তন"-এর মাধ্যমে। আজ এই আচার-অনুষ্ঠানের অনেকখানিই ঝরা পাতার মতোই খসে পড়লেও মাত্র রচনাগুণেই এই সাঙ্কেতিক নাট্যটির আকর্ষণ যে আজও বহুল পরিমাণেই আছে, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন নিউ এম্পায়ারে রূপকার প্রযোজিত "অচলায়তন" দেখে। মূল নাটকটির অন্তর্গত দর্শকদের অংশটুকু পরিহার ক'রে এবং নাটকের প্রারম্ভভাগে অচলায়তনের বাসিন্দাদের নিয়মের প্রতি যান্ত্রিক আনুগত্যের স্বরূপটি দেখিয়ে "অচলায়তন"কে উপস্থাপিত করেছেন রূপকার সম্প্রদায়। নিয়ম যে নির্বিধায় সবচেয়ে বেশী মানে সেই মহাপঞ্চক একদিকে এবং নিয়মের অনু-

শাসনে যে আদৌ ধরা দিতে চায় না, মহা-পঞ্চকের ভ্রাতা সেই প্রাণচঞ্চল পঞ্চক আর এক দিকে—এই উভয়ের দ্বন্দ্বে যখন অচলায়তনের বহু যুগব্যাপী কর্মধারা বিপর্যস্ত, তখনই তার বাধানিষেধের প্রাচীর ধসিয়ে আবির্ভূত হন অচলায়তনের গুরু, যিনি আবার অন্ত্যজ শোনপাংশুদের দাদা-ঠাকুর, জীর্ণ শুষ্ক আচারকে উধাও ক'রে দিয়ে প্রকৃতির মাঝে মানুষে মানুষে হয় মিলন। সুপরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জা, সাজ-সজ্জা, গীত এবং অভিনয়ে সবিতাব্রত ও গীতা দত্ত প্রমুখ রূপকার শিল্পগোষ্ঠী "অচলায়তন" নাট্যাভিনয়কে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিলেন।

আনন্দলোক নিবেদিত "জেঠামশাই" :

গেল ১০ই মে, বুধবার দক্ষিণ কল-কাতার মুক্ত-অংগনে আনন্দলোক সম্প্রদায়

উস্‌কী কাহানী চিত্রের নায়িকা অঞ্জু মহেন্দ্রু

তাঁদের নতুন নাটক, সুধাংশু দাশগুপ্ত বির-চিত "জেঠামশাই"কে মঞ্চস্থ করেছিলেন। একজন বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ সহৃদয় ব্যক্তি শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কেমন করে নিজের কর্তব্যে অটল থাকে, তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে নাটকের মুখ্য চরিত্র জেঠামশাই জগমোহন। নাট্যরচনায় হৃদয়ের আবেদনের দিকে যতখানি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, নাটকের স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির দিকে ততখানি নয়। অভিনয়ে মুখ্য চরিত্রে বঙ্কিম ঘোষ নাট্যনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ছোট্ট পিসিমার ভূমিকায় কালিন্দী সেন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় অরুণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন চক্রবর্তী ও মীরা চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

প্রতিবিম্ব প্রযোজিত 'নরক থেকে ফিরে' :

গেল ১১ই মে, বৃহস্পতিবার মহাজাতি সদনে উত্তর কলকাতার অন্যতম নাট্যসংস্থা "প্রতিবিম্ব" অগ্নিদূত রচিত 'নরক থেকে ফিরে' নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত নির্ঘণ্ট-পুস্তিকার সম্পাদকের নিবেদনে **বলা হয়েছে :** মোটা-মুটিভাবে আমাদের দেশীয় সমস্যা সম্পর্কে দেশের মানুষের কাছে কিছু বলার জন্যে একটা মোটামুটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আপনাদের সামনে হাজির করেছি। এর ভালমন্দ, ভুল-ত্রুটি ধরা পড়বে শতকরা নব্বই ভাগ।...... আমরা নাটকটির প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলুম। এইটুকু অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সম্পাদক মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করেননি। শতকরা নব্বই ভাগই ভুলত্রুটিতে ভরা এই রচনাটি; এর মধ্যে দৃশ্য দেখেছি বটে, অনেকগুলি লোকের আনাগোনা ও কথাও শুনেছি বটে। কিন্তু নাটকের 'না'ও দেখতে পাইনি, আর পাগল হেডমাস্টার-বেশী অসিত সেনগুপ্ত এবং অজয়-বেশী প্রকাশকুমার ছাড়া আর কাউকে অভিনয় করতে দেখিনি। একই মঞ্চে 'জোনাল সিস্টেম'-এ অভিনয় করতে গেলে বিভিন্ন দৃশ্যকে বিভিন্ন স্তরে প্রযুক্ত করাই রীতি-সংগত।

বিশ্বরূপার নতুন নাটক "রঙ্গিণী" :

নতুন নাটক, জীবনানুগ বক্তব্য আর প্রাণধর্মী অভিনয় নিয়ে বিশ্বরূপায় অতি শীঘ্র মঞ্চস্থ হচ্ছে নতুন নাটক "রঙ্গিণী"। পরিকল্পনা ও পরিচালনায়, উপস্থাপনা ও রূপায়ণে "রঙ্গিণী" বাঙলা নাট্যাভিনয়ে এক নতুন অধ্যায়রূপে শীঘ্র দেখা দিচ্ছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী ও ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রচিত এই নাটকখানি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক তরুণ রায়। সঙ্গীতপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শশাঙ্ক ঠাকুর, মঞ্চরূপ দিচ্ছেন দেবু বন্দ্যো-পাধ্যায়, আলোকসম্পাত করছেন আশুতোষ বড়ুয়া। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, সংযুক্তা গুজ-রাল, অমৃতভূষণ গুজরাল প্রভৃতি শিল্পি-বৃন্দ। "রঙ্গিণী" নাটকের শুভমুক্তি ঘটছে আসচে শনিবার ২০এ মে।

চেনামহল

যান্ত্রিক যুগের প্রচণ্ড কল্লোল থেকে দূরে সরে এসে গ্রামের সীমারেখা যে জীবন-সংগ্রামের মুখরতায় চিহ্নিত, তাকে কেন্দ্র করে অনেক নাট্যকারের উদ্বেল অনুভূতি ভাষা পেয়েছে। এ-নজির পূর্বের বাংলা নাটকে যেমন মেলে, তেমনি আজও বাংলা নাটক সেই গ্রাম-জীবনের রক্তকরা
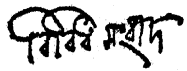
অধ্যায়ের কথা তুলে ধরে। সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'য় অভিনীত 'চেনামহল' আয়োজিত শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' নাটকের অভিনয় এই ধারণাকে আরো দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। কৃষক-সমাজের দুর্বিষহ সংগ্রাম, পথ চলতে গিয়ে তাদের সীমাহীন জীবন-যন্ত্রণা, সবই এক বলিষ্ঠ নাট্য-কাহিনীতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখানে। নাটকীয় কাহিনীতে কোন কৃত্রিম বা আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনার কোন আতিশয্য নেই, আছে পরিপূর্ণ জীবন-সত্যের প্রকৃত স্বাক্ষর। নাট্যকারের বাস্তব জীবননিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী নাটকের সংলাপকেও করেছে প্রাণাবেগসমৃদ্ধ।

শ্রীরণজিৎ দত্ত নাট্যনির্দেশনায় তাঁর গুরুদায়িত্ব সার্থকতার সংগে পালন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। প্রতিটি শিল্পীর চরিত্রোপলব্ধি ও রূপায়ণের ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। তবে গ্রাম্যচাষীদের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের উচ্চারণ-রীতিটি সব সময়ে চরিত্রোপযোগী হয়নি। এ-বিষয়ে নাট্যনির্দেশকের আরো একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। অভিনয়ের দিক দিয়ে যাঁরা নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন, তাঁরা হলেন রঞ্জিৎ বসুমল্লিক, নীহার বসু, মনীশ লাহিড়ী, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন তরফদার, অসীম সেনগুপ্ত, সুচেতা রায় ও পরিচালক স্বয়ং।

সংগীত শ্যামলা

'সংগীত শ্যামলা'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি হিন্দী হাই স্কুলে পরিবেশন করলেন 'ছায়ানট' নাটকের বলিষ্ঠ অভিনয়। এই নাটকটির অন্তর্নিহিত গূঢ় বক্তব্যটি সামগ্রিক নাট্যাভিনয়ের মধ্যে খুব বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তার কারণ হাল্কা রস সৃষ্টির দিকেই শিল্পীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। তাই নাটকটির একটি গভীরতর অধ্যায় প্রায় সব সময়েই মঞ্চে অনুপস্থিত থেকেছে, তবে এই অনুপস্থিতি শ্রোতৃবৃন্দের মনে কোন ক্ষোভ বা বিরক্তির সৃষ্টি করেনি। কারণ শিল্পিবৃন্দের হাল্কা রস পরিবেশনের জন্য যে-অভিনয়, তা এতো প্রাণচঞ্চল ও স্বাভাবিক হয়েছে, যাতে করে পূর্বোক্ত ত্রুটিটি প্রায় অনেকটা ঢেকে গিয়েছে মনে হয়। দলগত অভিনয়ের ব্যাপারে নাট্যনির্দেশককে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতে হবে। সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন 'অজিত শর্মা'র চরিত্রে 'কৃষেণকুমার'। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন সুরেন্দ্র গুপ্ত, ধরী চৌধুরী, শ্যাম পরশরাম পুরিয়া, রবি যাজ্ঞিক, বীণা মিশ্র, নিমা নারলু। আবহ-সংগীত ও মঞ্চসজ্জার কাজও প্রশংসনীয়।

বার্ণস স্পোর্টস ক্লাব

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'য় মঞ্চস্থ করলেন 'বার্ণস স্পোর্টস ক্লাবে'র শিল্পিবৃন্দ। প্রথমেই এঁদের নাটক নির্বাচন ব্যাপারে এ'রা সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, বাঁধা ছকের বাইরে এসে নতুন ধরনের নাটক নিয়ে তাঁদের যে এই প্রচেষ্টা তা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যেও প্রতিটি শিল্পীর মনের সূক্ষ্মতা ভাষা পেয়েছে এবং তাতেই 'শ্রীকান্তে'র দীপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠেছে মঞ্চে।

অভিনয়ে 'শাহজী'র চরিত্রে অসীমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'অন্নদাদিদি'র ভূমিকায় রেণু ঘোষ আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শাহজী চরিত্রের রুক্ষতা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে বলিষ্ঠভাবে স্পষ্ট। অন্নদাদিদির জীবনযন্ত্রণা শ্রীমতী ঘোষ তাঁর অপূর্ব মমতাস্নিগ্ধ অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন বসু, গোবিন্দ পাত্র। মঞ্চসজ্জায় উচ্চাংগের কলাকৌশল লক্ষ্য করা গেছে।

চরিত্রহীন

'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন' ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' মঞ্চস্থ করলেন। সংস্থার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। নাট্যরূপ রচনা, পরিচালনায় ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমণি দত্ত। শ্রীদত্তের নাট্যরূপে মূল উপন্যাসের সুর অবিকৃত আছে, উপন্যাসের নিগূঢ় বক্তব্য নাটকে সুন্দর ভাষা পেয়েছে। নির্দেশনায় শ্রীমণি দত্ত তাঁর নিবিড় উপলব্ধিটুকুকে প্রায় সবটাই কাজে লাগাতে পেরেছেন আর তারই ছোঁয়া পেয়ে সংঘবদ্ধ অভিনয় প্রাণবন্ত হয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে গীতা দে'র 'কিরণময়ী' এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শ্রীমতী দে'র অবিস্মরণীয় নাটপ্রতিভা 'কিরণময়ী'কে প্রাণ দিয়েছে। শিশির দে'র 'উপেন', সুনীল বোসের 'সতীশ', প্রণব মজুমদারের 'দিবাকর', বিজয় কুণ্ডুর 'বেহারী', শ্যামদাস রায়ের 'বিপিন' প্রশংসার দাবী রাখে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, মীরা বসু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মণিকা দত্ত, দীপিকা দাস, মনোজ নন্দী, রমেন চৌধুরী, কাজল বর্ধন, রবীন অধিকারী, ইন্দুমাধব গুপ্ত, রবি বসু।

রূপমহল সংস্থার 'দুইমহল'

গত ১২ই এপ্রিল বুধবার শ্রীরামপুর রায় ময়দানে 'রূপমহল' সংস্থা কর্তৃক জোছন দস্তিদারের 'দুইমহল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এতে যে সব শিল্পী অভিনয় করেছেন প্রায় প্রত্যেকেই সৌখিন নাট্যজগতে নবাগত। নবাগত শিল্পীদের প্রতিভা আছে। ঝনু চৌধুরী (রঞ্জন), প্রশান্ত চক্রবর্তী (ভজহরি), রণেন ঘোষ (ছেদন), অজিত বাগ (লালুয়া); সুনীল রায়চৌধুরী (মনুয়া), কবিতা দাস (ওসমানী) চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। সুঅভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন তেজময় গুহ, অর্ণব পাল, মিস পালিত, সাধনা হাজরা, সুকুমার চক্রবর্তী। পরিচালকের দায়িত্বে নাটকটি সফল হয়। নাট্যনির্দেশনা ও সঙ্গীতে ছিলেন কাজল সেন ও ঝনু চৌধুরী। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় অমরেশ রায়।

রবীন্দ্রসদনের প্রাঙ্গণে, রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান :

নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে সংযুক্ত সংস্কৃতি সংসদ ২৫এ বৈশাখ সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত পুরো তিনঘণ্টা ধরে রবীন্দ্রসদনের প্রাঙ্গণে কবির জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন। গান, আবৃত্তি, পাঠ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে। যাঁরা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন গানে পঙ্কজকুমার মল্লিক, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ প্রভৃতি, আবৃত্তিতে কাজী সব্যসাচী ও বনানী চৌধুরী, পাঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ও উৎপল দত্ত এবং অভিনয়ে রবি ঘোষ পরিচালিত 'চলাচল' সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায় ও শ্রমমন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী। অল্পাধিক তিনহাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালিত করেন সপার্ষদ সুধী প্রধান।

দশম বার্ষিক উৎসব

সম্প্রতি বিপুল উদ্যমে এবং মহাসমারোহের মধ্যে সোদপুর ক্লাবের শারীরচর্চা বিভাগের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ক্লাব-প্রাঙ্গণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য এম-এল-এর সভাপতিত্বে। শারীর-চর্চা আন্দোলনের স্বনামধন্য পুরোধা

বিজয় বোস পরিচালিত আরোগ্য নিকেতন চিত্রে শুভেন্দু চ্যাটার্জি ও সন্ধ্যা রায়। ফটোঃ অমৃত

ব্যায়ামাচার্য শ্রীবিষ্ণু ঘোষ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। প্রারম্ভে বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীরেবতী রাহা বিভাগীয় বিবরণী পেশ করেন এবং অভ্যাগতদের স্বাগত আহ্বান জানান। সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে পল্লী-অঞ্চলে শারীরচর্চা আন্দোলনে সোদপুর ক্লাবের গৌরবজনক ভূমিকার সাধুবাদ জানিয়ে ব্যক্তিগত সহায়তা ও সহযোগিতা আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের সভ্যদের মুষ্টিযুদ্ধ প্রদর্শনীতে। পরিচালনা করেন প্রখ্যাত সংগঠক ও মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীএস কে দে। যোগ-ব্যায়াম, পেশী প্রদর্শন, জিমন্যাস্টিক এবং শারীর-চর্চার বিবিধ ক্রীড়াগুলি ছিল রোমাঞ্চকর, শ্বাসরোধকারী ও আকর্ষণীয়। এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন 'ঘোষেস কলেজে'র সর্বশ্রী নিরাপদ পাখিরা, অরবিন্দ রায়, বিপিন দাশ, সাতকড়ি দাশ, মহাবীর মান্না এবং সোদপুর ক্লাবের সর্বশ্রী মাখন কর্মকার, জীবন সরকার, কানাই সাধুখাঁ এবং অলক ঘোষ। সোদপুর ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীচণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণু ঘোষ।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের মূকাভিনয়

গত ৭ মে অভিযান সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে চন্দননগরের কুণ্ডুঘাট সংঘ প্রাঙ্গণে উৎসব মুখরে পরিণত হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে কয়েকটি সুন্দর মূকাভিনয়ের ফিচার পরিবেশন করেন তরুণ মূকাভিনেতা শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। প্রতিটি ফিচার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীভট্টাচার্যের মূক অভিব্যক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ শ্রীভট্টাচার্যের মূকাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বি-এফ-জে-এর শংসাবিতরণী উৎসব

১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী প্রভৃতিকে শংসাপত্র দানে অভিনন্দিত করবেন বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আসছে ২৩-এ মে রবীন্দ্রসদনে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন এবং উদ্বোধন করবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিধুভূষণ মালিক।

বোকারোয় রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান

ডি-ভি-সি বোকারো ক্লাবের প্রয়োজনায় কবির ১০৬তম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব বোকারো ক্লাবে গত ৯ এবং ১০ মে আলোচনা, নৃত্য, গীত এবং নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

'শিশুর দল' নাটিকায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন কুমারী কৃষ্ণা মিত্র (শিক্ষক), মধুমিতা চৌধুরী (ছাত্র) স্মৃতি গুপ্তা (মিনি), রীতি গুপ্তা (পচা), চম্পা মিত্র (হাবা) এবং বহ্নি মুখার্জী (রিন্টু)। শিশুদের প্রতিটি অনুষ্ঠানই দর্শকবৃন্দ দ্বারা অভিনন্দিত হয়। বড়দের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন দীপালি ভট্টাচার্য, বাণী ব্যানার্জী এবং জ্যোতিপ্রসাদ মিত্র।

দ্বিতীয় দিনেও আবৃত্তি, নৃত্য, গীত এবং আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনও পাঁচ বৎসরের মেয়ে কেকা মজুমদার 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' সংগীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে অবাক করে দেয়। দুদিনের অনুষ্ঠানেই আলো এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন তুষার প্রামাণিক।

বার্ণপুর হোমিওপ্যাথি এসোসিয়েশনের জন্মবার্ষিকী

বার্ণপুর হোমিওপ্যাথি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৭ ও ৮ মে ভারতীভবন রঙ্গমঞ্চে ডাক্তার হ্যানিম্যানের ২১৩তম জন্ম-বার্ষিকী উদযাপিত হয়। এতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এম ভট্টাচার্য। এবং প্রধান অতিথিদ্বয় ছিলেন ডাঃ এস পাল ও ডাঃ জি এন মুখার্জি।

সভাশেষে স্থানীয় নাট্যদল 'কৌশিক' সম্প্রদায় হ্যানিম্যানের জীবনী অবলম্বনে একটি ছায়ানাট্য অভিনয় করে। এতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রবীন ভট্টাচার্য, সরিৎ ঘোষ, অলক চ্যাটার্জি, অলক চৌধুরী, দুলাল চক্রবর্তী, মান্না বিশ্বাস, শিল্পী ভট্টাচার্য, স্নিগ্ধা বিশ্বাস, কুমারী মালা, দ্যুতি ভট্টাচার্য ও বরুণ বিশ্বাস।

এছাড়া যাদুকর টি কে নাথের যাদু প্রদর্শনীও উপভোগ্য হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডাক্তার অনিল গুহ ও এ মজুমদার।

গানের জলসা

রবীন্দ্র তিথি

জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণ-পুরুষ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নৃত্য, নাট্য, সংগীত, অভিনয় একাধারে উৎসব সভা মঞ্জরিত হয়ে উঠছে নগরীর চারিপ্রান্তে।

রঙ্গিতে ত্রিবেণী পরিবেশিত "বাল্মিকী-প্রতিভা"

রঙ্গি প্রেক্ষাগৃহে ত্রিবেণী পরিবেশিত 'বাল্মিকী প্রতিভা' গত রবিবারের এক উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র উৎসব। ইংল্যান্ড প্রত্যাগত মাত্র ২১ বছরের কিশোর কবি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় অপেরার ঢং-এ 'বাল্মিকী-প্রতিভা' রচনা করেছিলেন। ইংলিস ও আইরিশ সুরের প্রভাব গানের সুরগুলিতে আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করায় রসিক মন সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল। সর্বপ্রথম জোড়াসাঁকোতে এই নাটক মঞ্চস্থ হয় যাতে কবি স্বয়ং বাল্মিকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি ঠাকুর পরিবারেরই সকলে মিলে রূপায়িত করেন। বাংগালীর সাংস্কৃতিক জগতে সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইদানীং সৌখীন এবং পেশাদার উভয় দলই মাঝে মাঝে 'বাল্মিকী-প্রতিভা' প্রদর্শন করে থাকেন কিন্তু অধিকাংশই আংশিক সার্থক।

ত্রিবেণী প্রদর্শিত 'বাল্মিকী-প্রতিভা'য় দর্শকদের চক্ষু-কর্ণ ও হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করবার মত উপাদানের অভাব ছিল না।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বালিকার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী সেনের নৃত্যাভিনয়। ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি ভাবব্যঞ্জনা মণিপুরী আংগিকাশ্রিত সুষমামণ্ডিত নৃত্য কখনও মন্থর লয়ে কখনও ত্রস্তভাবে এক নিমিষে শুধুমাত্র দর্শকচিত্তই জয় করেনি এই শিশু-শিল্পী যে তাঁর ভূমিকাটির গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেই পরিচয়ই সগৌরবে বিঘোষিত হোলো। এই প্রতি-শ্রুতিপূর্ণ শিল্পী পরিণত বয়সে তার উজ্জ্বল বিকাশকে প্রতিফলিত করবে এই আশাই আমরা রাখব।

বাল্মিকীর ভূমিকার দাবী পূর্ণ করতে পেরেছেন সুখ্যাত নৃত্যশিল্পী গোবিন্দম-কুট্টি। দস্যু রত্নাকরের প্রথম জীবনের শোণিত-তৃষ্ণ, ভয়াল নিষ্ঠুরতা, অনুচর-লুণ্ঠিত ভয়কাতরা বালিকার ক্রন্দন-বিগলিত চিত্তে করুণার উদ্ভব এবং সর্বশেষে [illegible] মৃত্যু, অন্তর্-

রঙ্গিতে অনুষ্ঠিত **বাল্মীকি-প্রতিভার** একটি নাটকীয় মুহূর্তে বালিকার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী সেন, গোবিন্দম কুটী, সাধন গুহ (বাল্মীকি—প্রথম দস্যু) এবং অন্যান্যরা

জগতের আলোড়ন এবং রত্নাকরের ঋষি বাল্মিকীতে মহৎ রূপান্তর—এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্বের ভূমিকার দুর্দমনীয় নৃশংসতা কিছু কম-জোরী হলেও শেষের পর্যায়ে নৃত্য ও অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি দর্শকমনে রেখাপাত করতে পেরেছেন। প্রথম দস্যুর ভূমিকায় সাধন গুহর নৃত্য ও অভিব্যক্তির প্রাণবন্ততা এই নৃত্যনাট্যের বিশেষ সম্পদ। শিল্পী ছাড়াও নৃত্য পরিচালক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। কথাকলি-ভিত্তিতে রচিত দস্যুদলের নৃত্যগুলি নাটকীয় সম্ভাবনাকে সুপরিস্ফুটিত করেছে। বিশেষ সাধন গুহর ভাব-ভঙ্গী ও স্বাভাবিক অভিনয় দর্শকবৃন্দের হাস্যদীপ্ত করতালি আদায় করে ছেড়েছে।

শ্রীসুমিত্রা সেনের সুযোগ্য সংগীত পরিচালনায় উপযুক্ত সংগীত সংগত নৃত্য-শিল্পীদের কাজ সহজ করেছে। নেপথ্য শিল্পীরা বিশেষ করে শ্রীতরুণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হাস্যোদ্রেককারী সংগীত পরিবেশন প্রথম দস্যুর বক্তব্যের ভাববস্তুকে সহজগ্রাহ্য করে তুলেছে। শ্রীতাপস সেনের আলোকপাত সুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সাজ-সজ্জা চরিত্রোপযোগী।

শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী

একটি নিরালা প্রণাম

শুধুমাত্র যন্ত্রসঙ্গীতে তথা বেহালার ছড়ে কবিপ্রণাম। আশ্চর্য নয় কি? কিন্তু অভাবিতকেও প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন যে দুর্লভা তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বেহালা-বাদিকা শ্রীমতী শিশিরকণা • ধুরচৌধুরী। 'জৌনপুরী'র সীমাহীন কারুণ্যে, ললিত স্বরে প্রাণকাড়া আবেগে যেন অন্তহীন সৌন্দর্যকে মুখর করে তুলেছিলেন শিল্পী। শিল্পী নিজে স্বল্পভাষী, প্রকাশকুণ্ঠ, লাজুক—তাই কি তাঁর সুরের ভাষায় এত ভাবপ্রাবল্য এমন আকুল আত্মনিবেদন? 'জৌনপুরী'র বুকফাটা মর্মবেদনা, 'গাপদ মাপ জ্ঞ'র পকড় কখনও তার সপ্তকের সুর গন্ধার রেখাবকে স্পর্শ করে যেন মধ্য-সপ্তকের সুরে আছড়ে পড়ছিল—কতরকম ছন্দ ও লয়ের আকৃতিতে। বাজনার শেষে জিজ্ঞেস করি (সসঙ্কোচেই) 'কবিগুরুর জন্মদিনের বন্দনা আনন্দমুখর না হয়ে করুণ হয়ে উঠল কেন?' —এক মুহূর্ত

নীরব থেকে শিশিরকণা [illegible] গুরুর জন্মক্ষণটিকে কেন্দ্র করে [illegible] সমারোহের মাঝে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে [illegible] যায় হারিয়ে ফেলি—আর এইটুকুও শুধু বুঝি যে তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। নিজের এই অযোগ্যতার বেদনাবোধই হয়ত —এতগুলি কথা বলা লজ্জাবিরুদ্ধ বলেই অসমাপ্ত কথার মাঝেই থেমে গেলেন শিল্পী। চোখ দুটি নত হোলো। যন্ত্রের কোলে সদাপটে ঝাঁপিয়ে পড়ল দক্ষিণ হস্তের ছড়, আর বাঁ-হাতের কয়েকটি অঙ্গুলি স্পর্শে গুঞ্জন করে উঠল মধুর মিনতির তেহাই 'সম মপদ মপদ-মপদ মজ্জ'। যেন 'জোনপুরী'র আড়ালে শিল্পীর সলাজ আত্মগোপন।

অনেক ২৫শে বৈশাখ আসবে আবার চলে যাবে। কিন্তু অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে 'জোনপুরী'র আকুতিভরা এবারের ২৫শে বৈশাখের সকালবেলার স্মৃতি।

রবীন্দ্রমেলার উদ্বোধন

প্রতিবারের মত এবারও ২৫ বৈশাখ থেকে পক্ষকালীন রবীন্দ্রউৎসবের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্রমেলার কর্তৃপক্ষ। কবির গান, নাটক, নৃত্যনাট্য ছাড়াও আলোচনা ও মেলাপ্রাঙ্গণে গ্রামীণ উৎসবের সমারোহ। এবারের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হচ্ছে গুণী-সম্বর্ধনায় সংগীতশিল্পী হিসাবে কানন দেবী এবং সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

"বৈতানিক" অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব

জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে উদযাপিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের ঐতিহ্য ও আভিজাত্যে 'বৈতানিক' শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনায় এবারও যথারীতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গাঢ় নীল পশ্চাৎপটে পুষ্পমালা ও পল্লবচিত্র সমন্বয়ে সময়োচিত ভাব ও পরিবেশ রচিত হয়েছিল। অনুষ্ঠান সুরু হয় 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' —গানটি দিয়ে। এরপর শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ শুধু উপভোগ্যই নয় মনে রেখাপাত করেছে। 'নতুন'কে ব্যাখ্যা করে বললেন, আমাদের জীবন দুটি—একটি দৈনন্দিনের সীমাবদ্ধ জীবনী, প্রয়োজনের দাবী মেটাতেই ফুরিয়ে যায়—তাই রসহীন, জীর্ণ-পুরাতন। আর একটি জীবন ভূমামুখী, অনন্তের অভিসারী। এ জীবন অফুরান—নিত্য নতুনকে প্রাপ্তির আলো ও আনন্দে উদ্ভাসিত। যে চৈতন্যের দিব্যদৃষ্টির বরলাভ করলে এ আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, সেই চৈতন্যের প্রসাদেই কবি সামগ্রিক দৃষ্টির তৃতীয় নয়নলাভ করেছিলেন বলেই চিরনতুনকে এমন প্রাণখুলে আহ্বান জানাতে পেরেছেন।

তারপর শ্রীঠাকুর কবিগুরুর গীতিনাট্য আলোচনা-প্রসঙ্গে বাংলার যাত্রা ও নাট্যগীতির বিবর্তনধারাকে আলোচনা করে, রবীন্দ্রগীতিনাট্যের স্থান, ক্রমোৎকর্ষ ও উজ্জ্বল পরিণতির পূর্ণতায় পৌঁছনোর ইতিহাস বর্ণনা করলেন। রবীন্দ্রনাথের যে সব গানে বিদেশী সুর ও দেশী রাগপ্রধান গানের ছায়া পড়েছে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের পিয়ানো-বাজানো সুরে ছন্দ মিলিয়েই সে সব গান রচিত। এসব গানে নাট্যের দিকটাই প্রধান গানের দিক গৌণ—অভিনয়-কালে ভাবপ্রকাশের সঙ্গত হিসেবে এসব গানের যতটা মূল্য স্বতন্ত্র গান হিসাবে ততটা নয়। তারপর এল দ্বিতীয় পর্যায় যখন গানের দিকটা প্রাধান্য লাভ করে নাট্যের দিক হোলো গৌণ। উদাহরণস্বরূপ 'মায়ার খেলা' থেকে সুধীর চট্টোপাধ্যায় গান পরিবেশন করলেন 'আজি কি প্রথম এল বসন্ত' ও স্মৃতি বিশ্বাস ও মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বৈতকণ্ঠে 'ওলো রেখে দে সখী' পরিবেশন করলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ এক নতুন যুগ— গদ্যে সুরারোপ এযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করলেন অসীম সেন ও মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তধারার 'নম যন্ত্র' এবং চণ্ডালিকার 'জল দাও আমায় জল দাও' গানগুলি গেয়ে। শেষ পর্যায়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল যখন গানগুলিকে সর্ববন্ধনমুক্ত করে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে প্রবাহিত করলেন। নৃত্য ও গান এখানে পরস্পরের অভিন্ন অঙ্গ। প্রথম পরীক্ষা 'চিত্রাঙ্গদায়' অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর একে একে ব্যক্ত হোলো 'শ্যামা', 'শাপমোচন'—এবং এই ধারাকে পুষ্ট করে তুলল।

পাশ্চাত্য ও রবীন্দ্র ব্যালের তুলনা-প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর বলেন, ও দেশের নৃত্যনাট্যে সুর তথা নৃত্যই প্রধান উপভোগ্য বস্তু কিন্তু কবির নৃত্যনাট্যে—বাক্যসৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যে সুর ও নৃত্য অনেক সময় গৌণ হয়ে যায়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে

কুমারী রাত্রা বসু

রবীন্দ্রনাথের বাক্যবৈভব অনেক সময় উপভোগের অন্তরায়। 'বৈতানিক' পরিবেশিত গান সহযোগে এই আলোচনার শিক্ষার দিক থেকেও মূল্য অপরিসীম।

রবিতীর্থের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রবিতীর্থ সংস্থা বালিগঞ্জ সিংহী পার্কে 'পূজা' গীতালেখ্যাদি পরিবেশন করে। এছাড়া একক ও দ্বৈত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন পান্নালাল ঘোষ, কস্তুরী বসু, মিতা চক্রবর্তী, রূপা মতিলাল, শরদিন্দু রায়, সুবীর সেন রায়, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র ও শান্তিদেব ঘোষ। মূল অনুষ্ঠান 'পূজা' গীতালেখ্যটি পরিচালনা করেন সুচিত্রা মিত্র এবং দ্বিজেন চৌধুরী।

বালক সঙ্ঘের রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গত ২৫ বৈশাখ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটস্থ সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে বালক সঙ্ঘ দ্বারা (শিশু প্রতিষ্ঠান) আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ পরিবেশিত হয়েছে। নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেছে লালি বিশ্বাস, নীহারিকা বসু, সাগরিকা বসু, জোনাকি গুহরায়, শুক্লা ব্যানার্জী, নিরোদ গুহ ও রত্না বসুমল্লিক। উপস্থিত শিশু ও অন্যান্য দর্শকদের অনবদ্য আনন্দ দিয়েছে রাজা বসু, রামু বসু ও বাবু ভট্টাচার্য 'ছাত্রের পরীক্ষা' হাস্য-কৌতুক নাটকে। কিন্তু 'অভ্যর্থনা' নাটকখানি অভিনয়ের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। এতে অংশ গ্রহণ করেছিল, অরুণ বসু, রাসবিহারী বসু, বিপ্রদাস ভট্টাচার্য ও রূপেন বসুমল্লিক।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের বর্ষবরণ উৎসব

গত ৯ বৈশাখ পাথুরিয়াঘাটাস্থ মন্মথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে কিশোর কল্যাণ পরিষদের মূলকেন্দ্রের উদ্যোগে বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'বর্ষবরণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। গীতি-আলেখ্যটি পরিচালনা করে কুমারী দেবযানী সরকার এবং সংগীতাংশে সহযোগিতা করে কুমারী বিভা ভড়, মায়া ও রিকা সাহা, একক সংগীতে চন্দ্রা দাস এবং গ্রন্থিকরূপে পাঠ করেন শ্রীরমাপ্রসাদ সরকার।

বল্লরী-র 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য

নববর্ষের প্রথম সন্ধ্যায় রবীন্দ্র স্টেডিয়ামের রঙ্গমঞ্চে 'বল্লরী' কর্তৃক নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' পরিবেশিত হয়। কি নৃত্যে, কি সংগীতে, কি নৃত্য ও সংগীতের সমন্বয়ে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয় অনুষ্ঠানটি। মঞ্চে উত্তীয়র উপস্থিতি স্বল্প কিন্তু সেই স্বল্প অবসরে দরিতার জন্য চরম আত্মত্যাগের বজ্রসেন শিল্পী শ্রীগৌরী [illegible]

দক্ষিণীর রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংস্থার শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করছেন। ফটো : অমৃত

চৌধুরীর অভিব্যক্তি দর্শকদের অভিভূত করে তোলে। বজ্রসেনের ভূমিকায় শ্রীসুপ্রিয়া রায় তাঁর ভূমিকাগত কঠিন দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে পালন করতে সমর্থ হয়েছেন। শ্যামার ভূমিকায় শ্রীজয়শ্রী সাহা শ্যামার বেদনা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। শ্যামা ও বজ্রসেনের চিরবিচ্ছেদের সমাপ্তি দৃশ্যটি শিল্পীদ্বয়ের ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠে।

আবহসংগীত ও আলোকসম্পাত উচ্চাঙ্গের। এমন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য 'বল্লরী' সংগঠনকে সাধুবাদ দিই।

'সংহতি'র রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

সোদপুরের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড) তরুণদের সংস্থা 'সংহতি' গত শুক্রবার ২৮ বৈশাখ সন্ধ্যায় সংস্থা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শুচি-সুন্দর পরিবেশে পালন করে শিক্ষাব্রতী শ্রীশিবপ্রসাদ নাগকে পুরোধা করে। অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে শ্রীসুহাস মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতে। শিক্ষাব্রতী শ্রীনাগ রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার ওপর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। একটি শিশু এবং শ্রীমান সৌমিত্র দাশগুপ্তের চমৎকার আবৃত্তির পরই শুরু হল মূল অনুষ্ঠান প্রখ্যাত শিল্পী-গোষ্ঠী 'সুররঞ্জনা'র সহযোগিতায়। রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র সুরের ভাণ্ডারী ছিলেন তারই নিদর্শন জনমানসে তুলে ধরেন শিল্পীরা একক ও সম্মেলক গানের মধ্য দিয়ে। যন্ত্রসংগীতেও এই সুরবৈচিত্র্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানের কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী ভারতী দাশগুপ্ত, সুবিমল মুখোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী, সুপ্রভাত অধিকারী, সুধীন্দ্রনাথ মৈত্র, নিত্য মণ্ডল এবং যন্ত্রসংগীতে সর্বশ্রী শঙ্কর দাশ, হারাধন মান্না, শঙ্করী চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। 'সংহতি'র তরুণ সভ্যগণের প্রযত্নে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরী পরিচালিত সিংহী পার্কে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সংগীত পরিবেশন করছেন রবিতীর্থের শিল্পীরা। ফটো: অমৃত

সি আই টি বিল্ডিং (বাগমারী)-এর রবীন্দ্রজন্মোৎসব

বাগমারী সি-আই-টি বিল্ডিংসের যুবকবৃন্দ কর্তৃক শুভ ২৫ বৈশাখ সকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০৬তম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব ঘরোয়াভাবে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, নাটক ও রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা শিল্পীদ্বয় শ্রীহরিপদ সাহা ও শ্রীমতী সাহা। কবিতা আবৃত্তি ও নাটকে অংশগ্রহণ করেন—সর্বশ্রী রাজীব ঘোষ, চিত্তপ্রসন্ন রায়, সুবল দে, ভরত ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী, অপূর্ব সমাদ্দার, কমলেন্দু দাস ও স্বপন সেনগুপ্ত। প্রাতঃকালীন এই উৎসব বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য শেষ হয়।

"নৃত্যের তালে তালে"র অনুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত "নৃত্যের তালে তালে" নামে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গত ২৩শে এপ্রিল রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতমা পৃষ্ঠপোষক ডঃ ফুলরেণু গুহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র-ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি "নৃত্যের তালে তালে"-এর ছাত্রছাত্রী কর্তৃক নৃত্য-গীত পরিবেশনে মনোজ্ঞ হয়ে উঠে। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী পিণ্টু ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি ঘোষ, প্রদীপ দাশগুপ্ত, যশোদা মুখার্জি ও বিশ্বসব মণ্ডল। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্তা। বিচিত্রানুষ্ঠানের পর ডঃ গুহ ঐ প্রতিষ্ঠানের বাটিক ও ক্র্যাফ্‌ট্‌ বিভাগের উদ্বোধন করেন।

ইস্টবেঙ্গল বনাম ভিলাই ইস্পাত কারখানা দলের বেটন কাপের ফাইনাল খেলায় (১৯৬৭) একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত।
ফটো : অমৃত

দর্শক

বেটন কাপ

১৯৬৭ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দল ১-০ গোলে ভিলাই ইস্পাত কারখানা দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল পাঁচবার ফাইনালে খেলার সূত্রে চারবার বেটন কাপ জয়ী হল। তারা ইতিপূর্বে বেটন কাপ পেয়েছে ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ সালে (মোহনবাগানের সংগে যুগ্ম বিজয়ী)। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দল যথাক্রমে মহমেডান স্পোর্টিং এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলকে পরাজিত করেছিল। ১৯৬৩ সালের ফাইনালে তারা সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হয়।

১৯৬৭ সালের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি (পেনাল্টি স্ট্রোকে) দেন ইনাম-উর-রহমন। ইস্পাত দল তাঁর এই গোলে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাদের অভিযোগ, ইনাম-উর-রহমন গোল লাইনের বাইরের বল খেলেছিলেন। অপরদিকে আম্পায়ার বলেছেন, ইস্পাত দলের গোলরক্ষক হাত দিয়ে বল ধরায় তিনি পেনাল্টি স্ট্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন। এই দিনের ফাইনালে মাত্র একটি গোলে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হলেও ইস্টবেঙ্গল দল সর্বাংশে ভাল খেলেছিল। তারা একাধিক গোলে জয়ী হলেই খেলার সংগতি বজায় থাকতো। বেটন কাপের ফাইনালে ভিলাই স্টিল দলের এই প্রথম খেলা। ১৯৬৬ সালে তারা এই প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিল।

গত তিন বছরের (১৯৬৫-৬৭) প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান (অপরাজিত অবস্থায়) বি এন আর দল কোয়ার্টার ফাইনালে ০-১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলের কাছে, গত পাঁচ বছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতার রাণার্স-আপ মোহনবাগান তৃতীয় রাউণ্ডে ১-২ গোলে ভিলাই স্টিল দলের কাছে, গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিশ দল সেমি-ফাইনালে ১-২ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে এবং গত বছরের বেটন কাপের রাণার্স-আপ কোর অব সিগন্যালস কোয়ার্টার ফাইনালে ০-১ গোলে ভিলাই স্টিল দলের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়।

প্রখ্যাত বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার সূচনা ১৮৯৫ সালে। উদ্বোধনী বছরে বেটন কাপ জয়ী হয় ন্যাভাল ভল্যান্টিয়ার্স। ক্যালকাটা কাস্টমস ১২ বার বেটন কাপ জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার জয়লাভের যে রেকর্ড করে তা আজও অক্ষুন্ন আছে। গত ১৭ বছরের প্রতিযোগিতায় কলকাতা থেকে বেটন কাপ পেয়েছেঃ মোহনবাগান ৫ বার (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী ২ বার), ইস্টবেঙ্গল ৪ বার (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী ১ বার) এবং কাস্টমস ১ বার (যুগ্ম বিজয়ী)। এই সময়ে উপর্যুপরি দুবার বেটন কাপ জয়ী হয়েছে—বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস (১৯৫৩-৫৪) এবং মোহনবাগান (১৯৬৪-৬৫—যুগ্ম বিজয়ী)।

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ

সি-এ-বি পরিচালিত ১৯৬৬-৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ২৯৭ রানে কালীঘাট দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৫ বার এবং সর্বসাকুল্যে ৮ বার ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। এই প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৩-৫৪ সালের মরশুমে। প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে (১৯৫৩-৫৪) মোহনবাগান এবং কালীঘাট যুগ্মভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ৮ বার—১৯৫৩-৫৪ (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ (উপর্যুপরি ৫ বার) সালের ক্রিকেট মরশুমে। অপরদিকে কালীঘাট লীগ পেয়েছে ৪ বার—১৯৫৩-৫৪ (যুগ্ম-বিজয়ী), ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৬১-৬২ সালের মরশুমে।

প্রথমদিনের খেলায় মোহনবাগান ৪ উইকেট খুইয়ে ২৫২ রান সংগ্রহ করে। দলের ৭৭ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়লে অধিনায়ক শ্যামসুন্দর মিত্র খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত ১০৯ রান সংগ্রহ করে

অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই ১০৯ রানে ছিল ১৬টা বাউণ্ডারী। তিনি এবং চুনী গোস্বামী ৫ম উইকেটের জুটিতে ৯৪ রান তুলে নট আউট থাকেন। লাঞ্চের সময় ছিল ১১ রান (৩ উইকেটে)। চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ১৭৬ (৪ উইকেটে)। শ্যামসুন্দর মিত্রের তখন ছিল ৫৯ রান।

দ্বিতীয়দিনে ৪২১ রানের মাথায় মোহনবাগানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। শ্যামসুন্দর মিত্র ১২৯ রান করে আউট হন। বাউণ্ডারী করেন ১৮টা। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে শ্যামসুন্দর মিত্র এবং চুনী গোস্বামী দলের ১৩৫ রান তুলেছিলেন। চুনী গোস্বামী ১৪ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। কালীঘাট দলের দীপঙ্কর সরকার ১০৪ রানে ৬টা উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়দিনের বাকি সময়ের খেলায় কালীঘাট দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয়দিনে পৌনে তিনটের সময় ১২৪ রানের মাথায় কালীঘাট দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তাদের ১০৩ রানের মাথায় ৫ম এবং ১২৪ রানের মাথায় ১০ম উইকেট পড়ে— ব্যাটিংয়ে কি শোচনীয় ব্যর্থতা! মোহনবাগান দলের ন্যাটা স্পিন বোলার জলি সরকারের মারাত্মক বোলিংয়ের দরুনই কালীঘাট দলের এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়। তিনি উপর্যুপরি ৪টে উইকেট নেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মোহনবাগান: ৪২১ রান (শ্যামসুন্দর মিত্র ১২৯, চুনী গোস্বামী ৮৬ এবং অলক দাস ৬৪ রান। দীপঙ্কর সরকার ১০৪ রানে ৬ উইকেট)।

কালীঘাট: ১২৪ রান (কল্যাণ সেন ২৯ রান। জলি সরকার ৩০ রানে ৪ এবং আর ভাটিয়া ৩৮ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ইংল্যাণ্ড সফরের তৃতীয় খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল ৭৬ রানে কেণ্ট কাউন্টি দলের কাছে পরাজিত হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় কলিন কাউড্রের নেতৃত্বে কেণ্ট দল প্রথমদিনের খেলায় ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৩১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। কেণ্টের খেলার সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি—২৭ রানের মাথায় ১ম, ২৮ রানের মাথায় ২য়, ৬৩ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ এবং ১৩৫ রানে ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দলের ১৪৪ রানের মাথায় ৭ম উইকেটের জুটি বাঁধেন জন শেফার্ড এবং এ্যালান ডিকসন। এই জুটিই শেষ পর্যন্ত খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দলের ৩১৬ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) অধিনায়ক কাউড্রে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শেফার্ড ৭০ এবং ডিক্সন ১০১ রান করে নটআউট থেকে যান। তাঁরা ৭ম উইকেটের জুটিতে ১৪৫ মিনিট সময়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করেছিলেন। প্রথম দিনের বাকি ১০ মিনিটে ভারতীয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ৫ রান তুলেছিল।

দ্বিতীয়দিনে ১৭৩ রানের মাথায় ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। কেণ্ট দলের ডেরেক আণ্ডারউড ৫৯ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলের মেরুদণ্ড ভেঙেছিলেন। ভারতীয় দলের সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। হনুমন্ত ৩৬ রান করে নটআউট ছিলেন। খেলার বাকি সময়ে কেণ্ট দল ১টা উইকেট খুইয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয়দিনে লাঞ্চের কিছু পরে ৭৫ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) কেণ্টদল দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় দল যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তখন জয়লাভের জন্যে তাদের ২১৯ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ১৪৫ মিনিট খেলার সময়। কিন্তু ১৪২ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এবার ডিক্সন ভারতীয় দলের কাল হন—তিনি ৩৯ রানে ৫টা উইকেট পান।

কেণ্ট: ৩১৬ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডিক্সন নটআউট ১০১ এবং শেফার্ড নটআউট ৭০ রান। চন্দ্রশেখর ৮৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৭৫ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ)

ভারতীয় দল: ১৭৩ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৫৩ এবং হনুমন্ত সিং নটআউট ৩৬ রান। আণ্ডারউড ৫৯ রানে ৫ উইকেট)

ও ১৪২ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৩৬ এবং হনুমন্ত সিং ৩৩ রান। ডিক্সন ৩৯ রানে ৫ এবং লিয়ারি ৩৩ রানে ৩ উইকেট)।

ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স একাদশ দলের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় খেলাটি ড্র গেছে। এই দুদিনব্যাপী খেলায় ভারতীয় দলের জয়লাভের খুবই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় দল প্রথম ব্যাট করার দান নিয়ে প্রথম ইনিংসের ২০৯ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৫৬ রানের মাথায় শেষ হয়। মোহল ৩০ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ১১ রানে ৩টে উইকেট পান। ১৫৩ রানের পিছনে পড়ে কনফারেন্স দল 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। তাদের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের ১০৮ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলাটি শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

ভারতীয় দল: ২০৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ বোরদে ৫৫ এবং আর সাক্সেনা ৪৬ রান)

ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স: ৫৬ রান (মোহল ৩০ রানে ৫, চন্দ্রশেখর ১১ রানে ৩ এবং গুহ ৯ রানে ২ উইকেট)

ও ১০৮ রান (৮ উইকেটে। গুহ ১৭ রানে ২ এবং চন্দ্রশেখর ১৫ রানে ২ উইকেট)

১৯৬৭ সালের বেটন কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক গুরুবক্স সিং লেঃ জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশ'র হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

ফটো : অমৃত

টেস্ট সমীক্ষাঃ ভারত ও ইংল্যাণ্ড

ক্ষেত্রনাথ রায়

যদিও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত মাত্র সাতটি দেশের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলা আজও সীমাবদ্ধ রয়েছে তবুও আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'রাবার' জয়ের গৌরব অলিম্পিক গেমসে স্বর্ণপদক জয়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। অলিম্পিক গেমসের আসরে ক্রিকেট খেলা বাদে ফুটবল, ভলিবল, হকি প্রভৃতি আরও পাঁচটা দলগত খেলাকে সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলা নিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসরও নিয়মিত বসে থাকে। কিন্তু খেলার রাজা ব্যাট-বল অর্থাৎ ক্রিকেট নিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতার পর্যায়ে কোন আসর আজও স্থায়ীভাবে বসলো না বলে ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং অনুরাগী মহলে কোন হাহাকার নেই। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারতবর্ষ, নিউ-জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্থান—এই সাতটি দেশ একই বছরে এবং একই আসরে মিলিত হয়ে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে না। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘ ৯১ বছরের ইতিহাসে মাত্র ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই তিনটি দেশকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ত্রিদেশীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। লীগ প্রথায় আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এই প্রথম এবং শেষ আয়োজন।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ১৮৭৭ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৮৯ সালে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯২৮ সালে, নিউজিল্যাণ্ড ১৯৩০ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালে এবং পাকিস্তান ১৯৫৪ সালে প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। ১৯২৬-২৭ সালের ক্রিকেট মরশুমে এ ই আর গিলিগানের নেতৃত্বে এম-সি-সি প্রথম ভারত সফরে এসেছিল। এই সফরটি বে-সরকারী হলেও তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই সফরের মোট ৩৪টি খেলায় এম-সি-সি ১১টা খেলায় জয়ী হয় এবং ২৩টা খেলা ড্র যায়। এম-সি-সির বিপক্ষে ভারতীয় দল কোন খেলায় জয়ী না হলেও ভারতীয় ক্রিকেট খেলাকে স্বীকৃতি দিতে এম-সি-সি কোন দ্বিধাবোধ করেনি। এই সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হয়নি। এম-সি-সি-রই প্রস্তাবে সর্ব-ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠিত হয় এবং ১৯৩২ সালে এই সংস্থারই অনুমোদিত সর্বভারতীয় ক্রিকেট দলটি প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে কর্ণেল সি কে নাইডুর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে নেমেছিল (লর্ডস মাঠ, ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন)। ভারতবর্ষ তাদের ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের হাতে ১৫৮ রানে পরাজিত হলেও ভারতবর্ষের এ পরাজয় কোনক্রমেই অগৌরবের হয়নি। ক্রিকেট ইংল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা সুতরাং যোগ্য দলের হাতেই তাদের পরাজয় ঘটেছিল।

পাতৌদির বর্তমান নবাবের (মনসুর আলি) নেতৃত্বে যে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি বর্তমানে ইংল্যাণ্ড সফর করছে তা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ৬ষ্ঠ ভারতীয় দল। ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ১৯৩২ সালে সি কে নাইডু, ১৯৩৬ সালে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার, ১৯৪৬ সালে পাতৌদির নবাব (ইফতিকার আলি), ১৯৫২ সালে বিজয় হাজারে এবং ১৯৫৯ সালে ডি কে গাইকোয়াড় এবং পংকজ রায়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল। ১৯৫৯ সালের পর ভারতবর্ষের ইংল্যাণ্ড সফর এই ১৯৬৭ সালে। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত পাঁচটি টেস্ট সিরিজেই ইংল্যাণ্ড অপরাজেয় অবস্থায় 'রাবার' জয়ী হয়। এই পাঁচটি টেস্ট সিরিজের ১৬টি খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয় ১২ এবং খেলা ড্র ৪। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হতে পারেনি। অপরদিকে ভারতবর্ষের মাটিতে অনুষ্ঠিত এই দুই দেশের চারটি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছে ইংল্যাণ্ড ১ বার (১৯৩৩-৩৪), ভারতবর্ষ ১-বার (১৯৬১-৬২) এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২-বার (১৯৫১-৫২ ও ১৯৬৪)।

ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়। সেই সময় থেকে এপর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে ৯টি টেস্ট সিরিজে যে ৩৪টি খেলা হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য রেকর্ডগুলি দেওয়া হল। আগামী ৮ই জুন লিডস মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের দশম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবে। সুতরাং নীচের পরিসংখ্যানগুলি ৮ই জুনের প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভের আগে পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৮৫ (৯ উইঃ ডিক্লে:) বোম্বাই, ১৯৫১-২

ইংল্যাণ্ডে : ৩৯০ (৫ উইঃ), ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লে:) ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬

ভারতবর্ষে : ৫৫৯ (৮ উইঃ ডিক্লে:) কানপুর, ১৯৬৪

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংস অর্থাৎ ১০ উইকেটে)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৫৮, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২

ভারতবর্ষে : ১২১, কানপুর, ১৯৫১-২

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ১৩৪, লর্ডস, ১৯৩৬

ভারতবর্ষে : ১৮৩, মাদ্রাজ, ১৯৫১-২

একটি খেলায় মোট রান

(দুই দলের রানের সমষ্টি)

সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ডে : ১৩৩৯ (৩৮ উইঃ), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯
—ইংল্যাণ্ড ৭৫৫ (১৮ উইঃ) এবং ভারতবর্ষ ৫৮৪ (২০ উইঃ)

ভারতবর্ষে : ১২৫৪ (২৮ উইঃ), বোম্বাই, ১৯৬১-২
—ইংল্যাণ্ড ৬৮৪ (১৩ উইঃ) এবং ভারতবর্ষ ৫৭০ (১৫ উইঃ)

সর্বনিম্ন রান

(পুরো ৪ ইনিংস অর্থাৎ ৪০ উইকেটে)

ইংল্যাণ্ডে : ৯১০ (৩৮ উইঃ), লর্ডস, ১৯৩২
—ইংল্যাণ্ড ৫৩৪ (১৮ উইঃ) এবং ভারতবর্ষ ৩৭৬ (২০ উইঃ)

ভারতবর্ষে : ১০৭৭ (৪০ উইঃ), কলকাতা, ১৯৬১-২
—ভারতবর্ষ ৬৩২ (২০ উইঃ) এবং ইংল্যাণ্ড ৪৪৫ (২০ উইঃ)

দ্রষ্টব্য : ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজের কোন খেলাতে এ পর্যন্ত পুরো চার ইনিংস খেলা অর্থাৎ ৪০ উইকেটের খেলা হয়নি; সর্বাধিক ৩৮ উইকেট পর্যন্ত খেলা হয়েছে।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ২০৩ নট আউট—পতৌদির নবাব, নিউদিল্লী, ১৯৬৪

ইংল্যাণ্ড : ২১৭—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, ওভাল, ১৯৩৬

সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষ : ২৬টি (১টি ডাবল সেঞ্চুরীসহ)

ইংল্যাণ্ড : ২৫টি (২টি ডাবল সেঞ্চুরীসহ)

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সাল	স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা	রাবার জয়
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	০	১	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	৫	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	০	৩	১	৪	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	০	৫	০	৫	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	২	০	৩	৫	ভারতবর্ষ
১৯৬৪	ভারতবর্ষ	০	০	৫	৫	ড্র
	মোট	৩	১৫	১৬	৩৪	

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

মরসুম	স্থান	খেলার ফলাফল
১৯৩২	লর্ডস	ইংল্যাণ্ড ১৫৮ রানে জয়ী
১৯৩৩-৪	বোম্বাই	ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী
	কলিকাতা	খেলা অমীমাংসিত
	মাদ্রাজ	ইংল্যাণ্ড ২০২ রানে জয়ী
১৯৩৬	লর্ডস	ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	খেলা অমীমাংসিত
	ওভাল	ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী
১৯৪৬	লর্ডস	ইংল্যাণ্ড ১০ উইকেটে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	খেলা অমীমাংসিত
	ওভাল	খেলা অমীমাংসিত
১৯৫১-২	নিউদিল্লী	খেলা অমীমাংসিত
	বোম্বাই	খেলা অমীমাংসিত
	কলিকাতা	খেলা অমীমাংসিত
	কানপুর	ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী
	মাদ্রাজ	ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৮ রানে জয়ী
১৯৫২	লিডস	ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে জয়ী
	লর্ডস	ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ২০৭ রানে জয়ী
	ওভাল	খেলা অমীমাংসিত
১৯৫৯	নটিংহাম	ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৫৯ রানে জয়ী
	লর্ডস	ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী
	লিডস	ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে জয়ী
	ম্যাঞ্চেস্টার	ইংল্যাণ্ড ১৭১ রানে জয়ী
	ওভাল	ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়ী
১৯৬১-২	বোম্বাই	খেলা অমীমাংসিত
	কানপুর	খেলা অমীমাংসিত
	নিউদিল্লী	খেলা অমীমাংসিত
	কলিকাতা	ভারতবর্ষ ১৮৭ রানে জয়ী
	মাদ্রাজ	ভারতবর্ষ ১২৮ রানে জয়ী
১৯৬৪	ভারতবর্ষ	পাঁচটি খেলাই অমীমাংসিত

[এক] সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান

[ভার]তবর্ষ : ৫৮৬ রান—বিজয় মঞ্জরেকার (পাঁচটি টেস্টের ৮ ইনিংসের খেলা, নট আউট ১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৮৯ নট আউট এবং গড় ৮৩·৭১, ১৯৬১-২ সাল)।

[ইংল্যা]ণ্ড : ৫৯৪ রান—কেন ব্যারিংটন (পাঁচটি টেস্টের ৯ ইনিংসের খেলা, নট আউট ৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২ এবং গড় ৯৯·০০, ১৯৬১-২ সাল)।

টেস্টে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী

[ইংল্যা]ণ্ড : বি এইচ ভ্যালেন্টাইন (১৩৬ রান), বোম্বাই ১৯৩৩-৩৪।

ভারতবর্ষ : লালা অমরনাথ (১১৮ রান), বোম্বাই, ১৯৩৩-৩৪; আব্বাস আলি বেগ (১১২ রান), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯; হনুমন্ত সিং (১০৫ রান), নিউ দিল্লী, ১৯৬৪।

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

(দলগত)

ভারতবর্ষ : ৭টি (১৯৫১-৫২ সাল), ৭টি (১৯৬৪ সাল)।

ইংল্যাণ্ড : ৫টি (১৯৬১-৬২ সাল)।

এক ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

(দলগত)

৩টি : ইংল্যান্ড (জি পুলার ১১৯, কেন ব্যারিংটন ১৭২ এবং টেড ডেক্সটার ১২৬ নট আউট), কানপুর, দ্বিতীয় টেস্ট, ১৯৬১-৬২।

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ৩৪টি (গড় ১৬·৭৯) ভিনু মানকাদ, ১৯৫১-৫২।

ইংল্যাণ্ড : ২৯টি (গড় ১৩·৩১) এফ এস ট্রুম্যান, ১৯৫২।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ৮টি (৫৫ রানে) ভিনু মানকাদ মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২।

ইংল্যাণ্ড : ৮টি (৫১ রানে) এফ এস ট্রুম্যান ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

শান্ত মিত্র (ইষ্টবেঙ্গল)

প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিন ভেবেছিলাম ছেলেটি হয়তো কবি; ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা সুদর্শন চেহারা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি বিনম্র বাঙালীভাব। পরে শুনলাম, দেখলাম এবং কাছে থেকে জানলাম শান্ত কবি নন—ফুটবল খেলোয়াড়।

ইস্টবেঙ্গলের লেফটব্যাক শান্ত মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, কাছাকাছি থেকেছি এবং তারই সূত্রে জেনেছি মাঠে শান্তর রূপের আড়ালে তাঁর আর একটি স্নিগ্ধ ভূমিকা রয়েছে, সে ভূমিকা এক স্বপ্নদর্শী কবির। জলসার আর সখের থিয়েটারের আসরে শান্তকে অনেকেই হয়তো দেখেছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক।

সম্প্রতি ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা, স্ট্যাট-ব্যাঙ্কের চাকুরে, নিটোল আত্মপ্রত্যয়ে গড়া শান্ত মিত্র বাঙলা তথা ভারতীয় ফুটবলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুতি। খেলেন লেফটব্যাকে। আদর্শ ফুটবল খেলোয়াড়ের যা কিছু প্রয়োজন, শান্তর তা সবকিছুই আছে। অফুরন্ত দম, জায়গা রাখায় নির্ভুল পরিকল্পনা, বুদ্ধিদীপ্ত ট্যাকলিং, হেডিং, ফলস্ স্টেপিংয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ফরওয়ার্ডদের নাজেহাল করার কৌশল এবং সর্বোপরি একটি পরিচ্ছন্ন মেজাজ খেলোয়াড় শান্ত মিত্রের পরম মূলধন।

শান্তর নিজের কথায় তাঁর জন্ম ফুটবল লগ্নে। বাড়ীর লোকেরা সযত্নে ফুটবলকে চৌকাঠের বাইরেই রেখেছিলেন। বাবা কড়া ফুটবল-বিরোধী; কিন্তু মায়ের অন্যমূর্তি। ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিতে মমতাময়ী মা শান্তকে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন অফুরন্ত। শান্ত জন্মেছেন ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী এই কোলকাতা মহানগরীর বুকেই; আদি বাড়ী যশোহরে। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের আসরে প্রথম আবির্ভাব আন্তঃ স্কুল ফুটবলের সূত্রে ১৯৫৮ সালে। সেবারে মধ্য কলকাতা স্কুল দলের অধিনায়ক তিনি। এখানেই নজরকাড়ার নজীর গড়লেন। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় বাঙলার অধিনায়ক হলেন শান্ত মিত্র। ফাইনালে বাঙলা হেরে গেলো অন্ধ্রের কাছে ২—১ গোলে। '৬০ সালে কলকাতা সিনিয়র ডিভিসনে খেললেন উয়াড়ীতে। '৬১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করলেন সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে। এই '৬১ সালে সুরেন্দ্রনাথ থেকে আই-এস-সি এবং পরবর্তীপর্বে স্নাতকও হয়েছেন তিনি। ১৯৬২ ও '৬৩ সালে খেলেছেন বি এন আর-এ। '৬৩ সালে আন্তঃরেল চ্যাম্পিয়ন এবং আই-এফ-এ শীল্ড জয়ী বি এন আর দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন শান্ত। '৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক। '৬৩ সালে পেনাং যুব-ফুটবলে সহঅধিনায়ক এবং '৬৪ সালে স্যাইগন যুব-ফুটবলে অধিনায়কত্ব করেছেন ভারতীয় দলের। '৬৫ সালে এলেন ইস্টবেঙ্গলে। মধ্যবর্তীকালে তাতাবানিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছেন দিল্লীতে, রুশ দলের বিরুদ্ধে কটকে এবং চেক দলের বিরুদ্ধে কলকাতায়। '৬৩ এবং '৬৪ সালে সন্তোষ-ট্রফিতে রেলের হয়ে খেলেছেন। '৬৪ সালে গোহাটিতে রেল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। '৬৬ সালে হায়দরাবাদে

আয়োজিত সন্তোষ-ট্রফির আসরে খেলেছেন বাঙলার হয়ে। এই বছরই লীগ ও আই-এফ-এ শীল্ড জয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রক্ষণভাগের অন্যতম শক্ত খুঁটি ছিলেন শান্ত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিভিন্ন আসরে স্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা সত্ত্বেও শান্ত আজ পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল পরিচালক ও মহারথীদের কাছ থেকে যোগ্য স্বীকৃতি পাননি। 'হেতু'? উত্তরে শান্ত শান্তকণ্ঠেই বলেছেন—'আমার বোধহয় চলন বাঁকা।'

নিত্য ঘোষ (মোহনবাগান)

'আমার মায়ের অন্তিম উপহার—দু' চোখ ভরা কান্না, অব্যক্ত আশীর্বাদ। মাকে আমার মনে নেই, কিন্তু বুঝতে পারছি অদৃশ্যে তিনি আছেন, আমি আছি তাঁর

স্নেহ-ছায়ায়'। নিজের কথা বোলতে গিয়ে সজলচোখে এই কথাকটিই আমাকে বলেছিলেন মোহনবাগানের হাফব্যাক নিত্যরঞ্জন ঘোষ। আবছা আলোয় অন্ধকারে নিত্যকে নিয়ে বসেছিলাম মোহনবাগান মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর। চাপা ধরা-গলা নিত্যর। বুঝিবা মায়ের কথা মনে করে।

নিত্য মাকে হারিয়েছিলেন অন্নপ্রাশনের দিনেই। বুকে করে বড়ো করে তুলেছেন বাবা। মায়ের অনুপস্থিতি ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু মায়ের যে বিকল্প নেই। মা যে মা-ই।

ছোটখাটো চেহারা, রংটি নির্ভেজাল কালো, শান্ত দুটি চোখ, শরীরটি যেন পেটা লোহায় গড়া। স্টীম-ইঞ্জিনের মত দম, ক্রীড়ারীতি সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত মাথাটি চরম উত্তেজনার মুখেও বিলকুল ঠান্ডা। মনের উত্তাপের ছোঁয়া গ্যালারীতে পৌঁছে দেন না কখনও নিত্য। খেলা তাঁর কাছে অবসর বিনোদনের নির্মল পাথেয়। বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে বিভিন্ন ফুটবলের ছোট ও বড়ো আসরে নিত্যকে দেখেছি সৃজনী ভূমিকায়। দলের পরাজয়ের মুখেও নিষ্কম্প, নিরুদ্বেগ।

নিত্য রাইট এবং লেফট হাফ—দু যায়গায়ই সমান দক্ষতায়, দৃঢ়তায় খেলতে পারেন। জায়গা রাখা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, অকুণ্ঠ পরিশ্রমী, ফরওয়ার্ডকে বল যোগাতে কলকাতা মাঠে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সীমাবদ্ধ সামর্থ্য অকৃপণভাবে উজাড় করে দিতে নিত্য সদাজাগ্রত।

১৯৪৪ সালের ২৭শে এপ্রিল ২৪-পরগণার রাজডাঙ্গায় জন্ম। লেখাপড়া জগৎবন্ধু ইনস্টিট্যুশনে (বালীগঞ্জ)। ছোটবেলা থেকেই বুট পড়ে খেলা সুরু করেছিলেন নিত্য। ফুটবলে হাতেখড়ি বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের ইন্ডিয়ান ইউথ এসোসিয়েশনে; পরবর্তীপর্বে আই-এস-এস-এ দক্ষিণ কলকাতায়। রাজ্য স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে (মেদিনীপুর) চোখে পড়ে গেলেন সবার। '৫৯ সালে কালীঘাট এবং '৬০-'৬১ সালে ইয়ংবেঙ্গলে খেলার পর '৬২ সালে যোগ দিলেন এরিয়ানে। এই বছর জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে (বার্নপুর) বাঙলা রাজ্য দলের অন্যতম প্রতিনিধিত্বের সূত্রে এক নতুন প্রতিশ্রুতি বয়ে আনলেন নিত্য। '৬৩ সালে সর্বভারতীয় ডাক। এশীয় যুব-ফুটবলে খেলতে গেলেন পেনাং। '৬৪ সালে এরিয়ানের নেতৃত্বের ভার পড়লো তাঁর ওপর। '৬৫ সালে দল পরিবর্তন করে গেলেন মোহনবাগানে। প্রত্যয়াসূত ক্রীড়ারীতির সূত্রে নিত্য ঘোষ কলকাতার ফুটবল রসিকদের মন জয় করে নিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। কুইলনে জাতীয় ফুটবলে খেললেন সদর্পে; '৬৬ সালে হায়দরাবাদে এই একই আসরে দৃঢ়তার উজ্জ্বল নজীর রাখলেন নিত্য।

১৯৬৫ সালে ডুরান্ড জয়ী এবং রোভার্স রানার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাবের রক্ষণভাগের শক্ত খুঁটি ছিলেন নিত্য।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

কমল চৌধুরী

ল্যাভরুশিনস্কি পেরেউলক-এর শান্ত পরিবেশে কাঁচের ছাদওয়ালা একটি বাড়ি। এতো সুন্দর যে মনে হয় রুশ উপকথার রাজ্য থেকে উঠে এসেছে বাড়িটা। এই বাড়িতেই ট্রেট্রিয়াকভ আর্ট গ্যালারি। সবশুদ্ধ ছবি ভাস্কর্য ইত্যাদি মিলিয়ে, চল্লিশ হাজার শিল্পকর্মের প্রদর্শনী আছে এই গ্যালারিতে। প্রায় এক হাজার বছরের শিল্পসম্পদের সঞ্চয়। এখানে এগার শতক থেকে সতের শতকের মধ্যবর্তী কালের রাশিয়ার বিখ্যাত আইকন শিল্পনিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। প্রতি বছর বারো লক্ষেরও বেশি লোক দেখতে আসেন এই গ্যালারি।

সারা সোভিয়েত রাশিয়ায় ট্রেট্রিয়াকভ আর্ট গ্যালারির মত এমন বিরাট গ্যালারি আর একটিও নেই। শিল্পসম্পদের সংখ্যা বা বৈচিত্র্যেও এটি তুলনাহীন। উনিশ শতকের শেষার্ধে যে সব মহৎ শিল্পী জীবনের গূঢ়তর সত্যকে প্রকাশ করেছেন, তাঁর সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন প্রগতিবৈরিতাকে। তাদের শিল্পকলার অনন্য নিদর্শন এই গ্যালারিতে যেমন আছে তেমন আর রাশিয়ার কোন গ্যালারিতে নেই।

প্যাভেল ট্রেট্রিয়াকভ এই আর্ট গ্যালারির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। বাস করতেন মস্কোয়। নিজে নিজে লেখাপড়া শিখেও তখনকার সব চেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হতে পেরেছিলেন। জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর তিনি কাটিয়েছেন ছবি সংগ্রহ করে—যে সব ছবির অবলম্বন রাশিয়ার মানুষের জীবন, রাশিয়ার ইতিহাস বা তার প্রাকৃতিক দৃশ্য-মালা। প্যাভেল ট্রেট্রিয়াকভের বাসনা ছিল মস্কো শহরে জাতীয় শিল্পের একটি গ্যালারি তৈরি করবেন যেখানে জনসাধারণ দলে দলে আসবেন ছবি দেখতে। তাঁর সেই বাসনার সার্থক রূপ এই গ্যালারি।

ট্রেট্রিয়াকভ আর্ট গ্যালারি যে দর্শকদের এমন অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে তার কারণ তার শিল্পসম্পদের অনন্য ঐশ্বর্য। পৃথিবীর সেরা শিল্পের সঙ্গে তুলনা হতে পারে তার। তাছাড়া রুশ এবং সোভিয়েত শিল্পের প্রতিটি স্তর থেকে স্তরান্তর প্রদর্শিত হয়েছে এখানে।

প্রাচীন রুশ ছবির সংখ্যাও এখানে অনেক। চিন্তার গভীরতা এবং শিল্পায়নের অসামান্য দক্ষতায় সেসব ছবি বিস্ময়কর। অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর আছে অনেক ছবিতে। 'আওয়ার লেডি অব ভ্লাডিমির'-এর

ইভানভের একটি অপূর্ব শিল্পকীর্তি — ট্রেট্রিয়াকভ আর্ট গ্যালারী সংগ্রহ

কুশলী শিল্পায়ন মুগ্ধ করে দর্শককে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কিয়েভ থেকে আনা হয়েছিল মূর্তিটিকে। রাশিয়ার জনসাধারণ মূর্তিটিকে ভালোবেসে ফেলল কিছুদিনের মধ্যেই। কিয়েভ থেকে পাঠান হল ভ্যাডিমির-এ। সেখানে দীর্ঘকাল ছিল মূর্তিটি, তারপর নিয়ে আসা হল মস্কোয়। ভ্যাডিমির থেকে এসেছিল বলে নাম হয়েছে 'আওয়ার লেডি অব ভ্যাডিমির'। মূর্তিটি এখন এই আর্ট গ্যালারির একটি অন্যতম আকর্ষণ। যে ঘরে এই মূর্তিটি রয়েছে তার পাশের ঘরেই রয়েছে আর একটি অমূল্য শিল্পসম্পদ—'দি ট্রিনিটি'। ছবিটির স্রষ্টা বিখ্যাতশিল্পী আন্দ্রে রুব্লিয়ভ। এ ছাড়া তাঁর আঁকা আরো অনেক ছবি রয়েছে এই গ্যালারিতে। 'দি ট্রিনিটি'র দিকে তাকালে দর্শকদের মন প্রশান্তি এবং আনন্দের অনুভবে ভরে ওঠে। রুব্লিয়ভ তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিটিতে মানুষের শান্তির স্বপ্ন, পারস্পারিক প্রীতি এবং ঐক্যবদ্ধ রাশিয়ার চিন্তাকে বিমূর্ত করেছেন।

রাশিয়ার সব বড় শিল্পীই মহান মানবিক আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। আঠার এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রতিভাধর শিল্পী ও ভাস্করদের সৃষ্টিতে তার প্রমাণ মিলবে। রোকোটভ, লেভিটস্কি, শুবিন, কিপ্রেনস্কি, ভেনেৎসিয়ানভ এবং ফেডোটোভ প্রভৃতি সব শিল্পীরই নিজস্ব মানবিক মূল্যবোধ ছিল। এই কালপর্যায়ের শিল্প হয়ত কখনো সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে অলংকৃত, কখনো তীব্র আবেগের প্রকাশক, কখনো বা ছন্দময়তায় উক্ত আবার হয়ত সোজাসুজি বিদ্রূপাত্মক। স্রষ্টার মানসিক বৈচিত্র্য, মানবমনের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁদের অনুসন্ধিৎসা, মানুষের মন ও চরিত্রের দক্ষ বিশ্লেষণ এবং ছবি বা মূর্তির মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করবার অসামান্য দক্ষতাকে প্রকাশ করছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শিল্প-সম্পদের মধ্যে ব্রিয়ুল্লোভ এবং ইভানোভ-এর ছবিগুলো নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এঁদের ছবি রয়েছে বলে এই গ্যালারি দর্শকদের কাছে প্রশংসাও পেয়েছে প্রচুর। ব্রিয়ুল্লোভ-এর ছবির প্রধান আকর্ষণ তার বলিষ্ঠতায়, মানুষের দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধে শিল্পীর মন-খোলা সানন্দ অনুরক্তিতে এবং বিষয়-

পাথরের তৈরি একটি বালক ও একটি পাখী : মস্কোর নিকটবর্তী একটি মিউজিয়মে সংগৃহীত

বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁর আনন্দিত অনুরাগে। ইভানোভ-এর বিরাট ছবি 'জনসাধারণের সামনে যীশুর আবির্ভাব'এর আবেদন তার মানবিকতা এবং নৈতিক আদর্শে, শিল্পীর চিন্তার গভীরতায় এবং তাঁর অসামান্য শক্তিতে। ছবিটি আঁকবার আগে যে অজস্র স্কেচ করেছিলেন তিনি—সেগুলো দেখলে মনে হয় তিনি বিশ শতকের শিল্পী, উনিশ শতকের নন।

এই ধরনের মিউজিয়ম আছে সোভিয়েত রাশিয়ার বুকে ছড়িয়ে। একটির সঙ্গে অপরটির কোন মিল নেই। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধরনের।

সমগ্র রাশিয়ায় মিউজিয়মের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। ইতিহাস, শিল্প, থিয়েটার, সঙ্গীত, বিজ্ঞান প্রভৃতির নীরব সাক্ষী এগুলি। আঞ্চলিক এবং শাখা মিউজিয়মও আছে অনেক। আঞ্চলিক মিউজিয়মই সংখ্যায় সব থেকে বেশী। বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস এবং সচিত্র বিবরণের শাখা এগুলি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিউজিয়মের সংখ্যাও কম নয়।

এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট মিউজিয়মের কথা উল্লেখ করছি।

সেন্ট্রাল মিউজিয়ম রেড স্কোয়ারের কাছেই। অনন্যসাধারণ সংগ্রহশালা এটি। রুশ বিপ্লবের মহান নায়কের রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম, রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত হিসাবে চিত্রিত পরিচিতি রয়েছে এখানে। ১৯৩৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ২২ মিলিয়ন দর্শক এসেছে এখানে।

'মিউজিয়ম অব রেভলুশন' রুশ বিপ্লব সম্পর্কিত তথ্যের সংগ্রহশালা। সোভিয়েত সরকার এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রদত্ত উপহার এখানে সংগৃহীত। সূক্ষ্ম কারুকর্মময় শিল্পকলা এবং কারু শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এখানে রয়েছে।

'মিউজিয়ম অব হিস্ট্রি' সোভিয়েত রাশিয়ার একটি আশ্চর্য সংগ্রহ কেন্দ্র। প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাসের নানান নিদর্শন এখানে চোখে পড়ে। মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদের অভ্যন্তরে আরম্যারি মিউজিয়মে অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্রশিল্প, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসনকোসন প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়েছে। রাশিয়ার জার এবং সামন্তবর্গ এ সমস্ত ব্যবহার করতেন। এই মিউজিয়মটিই হোল পৃথিবীর বৃহত্তম ঘোড়ায় টানা গাড়ীর নানা নমুনার বিচিত্র সংগ্রহশালা। বিপ্লবোত্তরকালে তৈরি প্রথম ট্রাক্টর 'মুনিভাসাল' এখানে সংরক্ষিত আছে। ইয়েনয়েস হাইড্রো পাওয়ার স্টেশন বাঁধের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ সংগ্রহ করা হয়েছে।

আকাদেমিসিয়ান ভস্টার আণবিক পরীক্ষা কার্য সম্পর্কিত তথ্যাদির বিবরণ এখানে দেখা যাবে। ভস্টার তৈরি একটি কালি দোয়াতের অনুরূপ জেনারেটরের মডেল বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রথম বরফ কাটা জাহাজ 'লেনিন'এর আকর্ষণীয় লগ বইটি এই মিউজিয়মে এনে রাখা হয়েছে। আর দেখা যায় যুরি গাগারিনের পাইলট লাইসেন্স, কম্প্যুটার, টেলিস্কোপ তৈরি সংক্রান্ত কাগজপত্র।

পলিটেকনিক্যাল মিউজিয়ম প্রযুক্তিবিদ্যার এক অভিনব সংগ্রহ। দেশের বৃহত্তম মিউজিয়মগুলির অন্যতম প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর প্রগতির ২৫,০০০ হাজারেরও ওপর নিদর্শন আছে। ১৭৯১ প্রতিষ্ঠিত ডারউইন মিউজিয়মে প্রা বিজ্ঞানের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়ে দেশের প্রাচীনতম মিউজিয়ম এটি।

মোট ১২৮টি শিল্প মিউজিয়ম চিত্রের গ্যালারী আছে সোভিয়েত রাশিয়া

লেনিনগ্রাদের হার্মিটেজ মিউজি প্রাচীন মিশরের শিল্পকলা এবং গ্রী
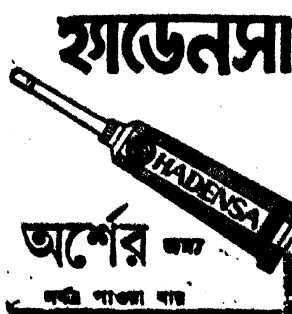
শার্ফ গায়িকা আনা বরোনোভা ঃ মস্কোর নিকটবর্তী আরখানজেলস্কয় ম্যুজিঅমে সংগৃহীত

রোমান ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখা যায়। রফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পনিদর্শন আছে এখানে। রেমব্রান্ট, রুবেন্স, ভনডিক প্রভৃতির নানান কাজ সংগৃহীত হয়েছে। রাকসী তীরে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাচীন শহরের নানান শিল্প নিদর্শন, আলতাই স্তূপ থেকে সংগৃহীত প্রাচীনযুগের নিদর্শন এই কবরগুলি থেকে পাওয়া নানা ধরনের পুরোনযুগের শিল্প কাজগুলি এখানে এনে রাখা হয়েছে। প্রায় ২,৪৪০০,০০০ চীনা-মাটির তৈজসপত্র, মুদ্রা এবং মেডেল এখান-কার অন্যতম দ্রষ্টব্য।

আঠার থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রুশ চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট সংগ্রহশালা হোল লেনিনগ্রাদের রাশিয়ান ম্যুজিঅম। রুশ ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ এখানেই আছে।

মস্কোর পুশকিন ম্যুজিঅমে প্রাচীন প্রাচ্য, পশ্চিম য়ুরোপ, ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট-দের শিল্পকর্ম এখানে আছে। মধ্য এবং রেনেসাঁ যুগের সর্বোত্তম ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি পুশকিন ম্যুজিঅমকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্প সংক্রান্ত ম্যুজিঅম, পিকচার গ্যালারি ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্র। কিয়েভ, রিগা, টিভিলিসি, বাকু, য়েরেভন, ওদেশা, গোর্কি, ইর্কুটস্ক-এর মত শহরে গড়ে উঠেছে বিচিত্র ধরনের শিল্প সংগ্রহ কেন্দ্র। ছোট ছোট শহরগুলিও এদিক থেকে পেছিয়ে পড়েনি। রুশ ফেডা-রেশনের শাহ্কভ, কিরোভ, টামবভ এবং উক্রাইনের স্থিত ডোশিয়ার সংগ্রহ নগণ্য বা উপেক্ষনীয় নয়।

দেশের মধ্যে অসংখ্য ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু জনসংযোগ স্থাপন বড় লক্ষ্য। যে পথে সোভিয়েত রাশিয়া সাফল্য-লাভ করেছে, সমগ্র দেশের জনমানসে এর প্রভাব অপরিসীম। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিস্তৃত প্রচারের। এজন্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। নতুন প্রদর্শনী, ভাষণ, সভা-সমিতি, নতুন দর্শনীয় বস্তু প্রভৃতির কথা থাকে এই পত্রিকায়। পোস্টার পুস্তিকা প্রভৃতি শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠান হয়ে থাকে। রেডিও ও টেলিভিশনে ম্যুজিঅম সংক্রান্ত খবর প্রচারিত হয়ে থাকে। ম্যুজিঅম বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পর্কে রেডিও প্রচারও হয়ে থাকে। জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের পথে ম্যুজিঅমগুলি এক অসামান্য ভূমিকা নিয়েছে।

আমাদের এই বাঙলা দেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনেকগুলি নতুন ধরনের ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানকার সংগ্রহও বিচিত্র। চৌরঙ্গীর পুরোন ম্যুজি-অমটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষের সঙ্গে বা তাদের শিক্ষার সঙ্গে গভীর সংযোগ গড়ে উঠতে পারেনি। ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগমনও ঘটে থাকে মাঝেমাঝে। এসব দেখে যখন তাঁরা ফিরে যান, তখন নতুন কোন জ্ঞান, কোন পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে যে ফিরছেন তা মনে হয় না। কখনও ম্যুজিঅমের অভ্যন্তরে কোন গবেষণারত ছাত্রছাত্রীকে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করতে দেখা যায়। কিন্তু ম্যুজিঅমকে জনপ্রিয় করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেই। আত্মিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ম্যুজিঅম প্রতিষ্ঠার মূলে এটি হোল একটি বড় সত্য। সেদিকে আমাদের যেন এখনো তেমনভাবে নজরই পড়েনি!
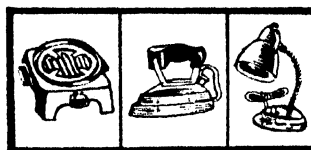
আড্ডায়

'হিল লাইফ' হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পান্ডে ত্রিকালদর্শী পুরুষ। তাঁর অনুমানে কখনো ভুল হয় না।

'হিল লাইফ' নাম শুনেই যাঁরা ভজতারণ বাবুকে এবং কোন্ শহরের কোন্ হোটেলের কথা এখানে বলা হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তাদের প্রথমেই বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, বাংলা বিহারের সীমানায় যে পাহাড়ী এলাকায় আধাশহরগুলোর খুব স্বাস্থ্যকর বলে নাম আছে, তাদের প্রত্যেকটিতে একটি করে 'হিল লাইফ' নামে হোটেল আছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ম্যানেজারের নাম ভজতারণ পান্ডে।

এই এলাকায় আধাশহরগুলোর স্বাস্থ্যকর খ্যাতি কবে, কি করে রটেছিলো কিংবা কে বা কারা কি স্বার্থবশে এই মিথ্যা রটনা করেছিলো তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। গ্রীষ্মকালে যেমন ভয়ংকর গরম পড়ে, বর্ষাকালে তেমনই বৃষ্টি, কাদা, মশা, সাপ। আর শীতে দারুণ ঠান্ডা, কেউ কখনো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু রাত্রিতে গোপনে বরফ পড়ে এ বিষয়ে যাঁরাই শীতে এই অঞ্চলে কখনো না কখনো বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।

এইরকম একটি স্বাস্থ্যকর শহরে 'হিল লাইফ' নামীয় হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পান্ডে, যাঁকে অনেকেই পাঁড়েজি বলে সম্বোধন করে। তিনি একদিন সকালে বাজার করে হোটেলে ঢোকার পথে দেখলেন যে তাঁরই হোটেলের দোতলার ঘরের জানলা থেকে এক গুচ্ছ তাস হাওয়ায় উড়ে এসে হোটেলের রান্নাঘরের সামনে ছাইগাদায় ছড়িয়ে পড়লো।

হোটেলের ঐ ঘরটিতে একজোড়া যুবক-যুবতী, দেখে মনে হয় নবদম্পতি আজ কয়দিন হলো এসে উঠেছে। কি করে যেন কি কি লক্ষণ দেখে পাঁড়েজির ধারণা হয়েছে যে, এ'রা হয়তো কোনো ম্যাজিসিয়ান দম্পতি। প্রথমেই পাঁড়েজির সন্দেহ হয়েছিলো এদের কালো সুটকেশটি দেখে। কালো চামড়ার সুটকেশের ওপর গোটা গোটা হরফে ইংরেজিতে লেখা প্রোফ (Prof.) এম এম, সরকার এবং তারপরে বাংলায় লেখা প্রঃফসার মদনমোহন সরকার।

প্রথমত প্রফেসার, তার উপরে সরকার। পাঁড়েজির বিপুল অভিজ্ঞতায় এমন কোনো যাদুকর কোথাও দেখেন নি যে প্রফেসার নয় এবং সরকার নয়। তার উপরে এইমাত্র যে দোতলার জানলা দিয়ে তাসবৃষ্টি হচ্ছিলো সে'ও নিশ্চয়ই কোনো যাদুর খেলারই অংশ।

হুড্রু জলপ্রপাত — ফটো : অমৃত

পাঁড়েজি এইসব ভাবছেন এমন সময় দোতলার ঘর থেকে যুবতীটি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলো। বাজারের থলে হাতে পাঁড়েজি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এরপরে যা ঘটলো সেটা বলার আগে সামান্য কিছুদিন আগের কথা একটু বলে নেয়া ভালো।

সামান্য কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত মদনমোহন সরকারের বিয়ে হয়েছে। একটু আগে দোতলার ঘর থেকে যে মেয়েটি বেরুলো তার নাম অপর্ণা। অপর্ণা মদনমোহনের সদ্য-পরিণীতা পত্নী। মদনমোহনের বয়স নিতান্ত আটাশ। তার পেশা অধ্যাপনা, কলকাতার শহরতলীর একটি কলেজের বিজ্ঞানবিভাগে সে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। যে কালো সুটকেশটির উপরে প্রফেসর এম এম সরকার লেখা, সেটি সে অন্যান্য দ্রব্য ও অপর্ণাসহ সদ্যবিবাহ করে অর্জন করেছে। শ্বশুরালয় থেকে জামাতার নামের পূর্বে পদমর্যাদা যোগ করে দেওয়ায় মদনমোহন কতটা খুশি হয়েছে বলা কঠিন। তবে মদনমোহন সম্পর্কে একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো। মদনমোহন পৃথিবীর সমস্ত লোককে দুই ভাগে ভাগ করে দেখে। এক, যারা তাস খেলে আর দুই, যারা তাস খেলে না। অর্থাৎ মদনমোহন অতীব তাসাসক্ত। তার বন্ধুরা তার বিয়েতে দুই প্যাকেট প্লাস্টিকের তাস উপহার দিয়েছে।

দুঃখের বিষয়, বিয়ের আগে অপর্ণা তাসের ত অক্ষরও জানতো না। শিক্ষা শুরু হলো ফুলশয্যার রাত্রিতেই। ফুলশয্যার রাতে নবদম্পতির প্রথম বাক্যালাপ এইরকম হয়েছিলো :

মদনমোহন (অপর্ণার হাত ধরে)—'বসো'।

অপর্ণা (নিচু গলায়)—'এই বসেছি'।

মদনমোহন—'তুমি তাস খেলতে জানো?'

অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'না।'

মদনমোহন (একটু হতাশ কণ্ঠে)—'তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো।'

অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'আচ্ছা।'

এরপরে একটু চুপচাপ। মদনমোহন একটু কেশে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার আমাকে ভালো লাগছে?'

অপর্ণা সলজ্জ হেসে বললো, 'হ্যাঁ'

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। আবার মদন-মোহনের প্রশ্ন, 'এক প্যাকেটে কটা তাস থাকে জানো?'

অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'না।'

মদনমোহন বললো, 'বাহান্নটা।'

অপর্ণা চুপ। মদনমোহন বললো, 'মনে থাকবে তো বাহান্নটা।'

তারপর বললো, 'বাপের বাড়ি ছেড়ে এসে তোমার মন কেমন করছে, না?' অপর্ণা ধরাগলায় কি বললো ঠিক বোঝা গেলো না।

একটু পরে আবার মদনমোহনের প্রশ্ন শোনা গেলো, 'বল তো এক প্যাকেটে কটা তাস থাকে?'

—তারাপদ

শার্লক হোমস (৩)

বন্ধুবর শার্লক হোমসের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখতে গিয়ে একস্থানে লিখেছেন ডক্টর জন এইচ ওয়াটসন, এম-ডি :

"ক্রিমিন্যাল রিসার্চের দিকে হঠাৎ তার মন গেল কেন, সে তথ্য বহুবার হোমসের মুখথেকে শোনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু স্মৃতি রোমন্থন করার মত মেজাজী মুহূর্তে তাকে ধরতে না পারায় ব্যর্থ হয়েছি প্রতিবারই।"

যাই হোক কৌতূহলোদ্দীপক সেই ঘটনাই সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে বহু গবেষণার পর। হোমস্ অনুরাগীরাই ওয়াটসনের অপ্রকাশিত এবং অসমাপ্ত কিছু কিছু 'নোট' উদ্ধার করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশের পর খাড়া করেন রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক সেই কাহিনী।

অক্সফোর্ডে ভর্তি হওয়ার আগে নিজের অত্যাশ্চর্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণী প্রতিভা সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না শার্লক হোমস। সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের মত স্রেফ যুক্তির ধাপ বেয়ে তুচ্ছ ঘটনা থেকে মোক্ষম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অসাধারণ ক্ষমতা যে তাঁর রক্তে প্রবাহিত, তাও জানতেন না।

তাই এ তথ্য যেদিন আবিষ্কৃত হল, সেদিন অবাক হয়ে গেলেন হোমস। তিনি জানতেন, মানুষ মাত্রেরই এ-ক্ষমতা আছে। দুই দাদার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তিনিও চোখের যথাসাধ্য ব্যবহার করতে শিখেছেন, এবং চোখে দেখা জিনিসের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য থেকে বহু তথ্য বার করে নিতে শিখেছেন।

অনেক বছর পরে একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন শার্লক হোমস। অনুমান-শক্তি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে যাঁরা শাণিত করতে চান তাঁদের জন্যেই অনেক খেটে প্রবন্ধটা রচনা করেছিলেন তিনি। ১৮৮১ সালে লন্ডনের একটি পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত "দি বুক অফ লাইফ" শীর্ষক এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

"তদন্তকারীর প্রশিক্ষণ শুরু হবে প্রাথমিক সমস্যাবলীকে আয়ত্তে আনা থেকে। কাউকে দেখলেই তার ইতিহাস এবং তার পেশা অথবা জীবিকাকে জানতে হবে এক পলকে। অভ্যেসটা অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, কিন্তু এই থেকেই পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ধারালো হয় এবং ঠিক কোথায় কোন তথ্যটি জানা দরকার, সে সম্বন্ধেও ধারণা পরিষ্কার হয়। আঙ্গুলের নখ, কোটের হাতা, বুট জুতো, প্যান্টের হাঁটু, তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুলের কড়া-পড়া চামড়া, মুখমন্ডলের ভাব, শার্টের আস্তিন—প্রতিটি থেকে যে কোনো মানুষের জীবিকা জানা অতি সোজা। এসব তথ্য একসঙ্গে জানা থাকলে জটিলতম কেসেও দক্ষ তদন্তকারীর ব্যর্থতার কথা ভাবাই যায় না।"

বেজায় ঢ্যাঙা আর বেজায় অসুন্দর মানুষটার জুড়ি মেলা ভার ছিল অকসফোর্ডে আন্ডার গ্রাজুয়েটদের মধ্যে। অসুন্দর কিন্তু তালঢ্যাঙা চেহারার দিকে চোখ না ফিরিয়েও উপায় ছিল না, এবং সেইটেই আঠারো বছরের তরুণ শার্লক হোমসের অসামান্য ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভালো ছাত্র ছিলেন না বটে, অ্যাথলিট হিসেবেও তেমন নাম করতে পারেন নি, কিন্তু আশৈশব মহাদেশ পর্যটনের ফলে দু'টা ভাষা বলে যেতে পারতেন অনর্গল এবং কথা একবার বলতে শুরু করলে এমন জ্ঞানের চমক দেখাতেন যা একমাত্র দেশ-ভ্রমণের মাধ্যমেই আহরণ করা সম্ভব।

সাধারণ বন্ধুতার স্বাদ শার্লক হোমস ছেলেবেলা থেকেই গ্রহণ করতে পারেননি, তাঁর বিশেষ ধরনের প্রকৃতির জন্যে। স্কুল পটভূমিকার অভাবে সঙ্গী-সাথী কি জিনিস, তা বুঝতেও পারেননি। তাই তরুণ বয়েসেও অকসফোর্ড জীবনে একেবারেই নিঃসঙ্গ রইলেন উইলিয়াম শার্লক হোমস।

কিন্তু বেশীদিন না।

অক্সফোর্ডে সেকেন্ড ইয়ারে একজন বন্ধু জুটল হোমসের।

১৮৮৭-৮৮ সালের শীতকালে বেকার স্ট্রীটের পুরোনো ঘরে আগুনের পাশে বসে এক রাত্রে ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হোমস—"ভিক্টর ট্রেভর সম্বন্ধে এর আগে আমাকে কিছু বলতে শোনোনি নিশ্চয়? ক্রাইস্ট চার্চে দু'বছর থাকার সময়ে আমার মুষ্টিমেয় বন্ধুর মধ্যে সে ছিল অনাতম।"

হোমসের প্রথম কেসের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তাতে অবশ্য ওয়াটসন কথাটা সামান্য ঘুরিয়ে লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—হোমসের কলেজ-জীবনের দু-বছরে ভিক্টর ছিল তার একমাত্র বন্ধু।

যাই হোক, সেদিন রাতে প্রিয় বন্ধুকে বলেছিলেন হোমস—"সামাজিকতা জিনিসটা আমি কোনোদিনই রপ্ত করতে পারিনি। মেলামেশাও তেমন করতে পারতাম না। সব সময়ে ঘরে বসে থাকতাম, নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। ফল, ক্লাসের অন্যান্য ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ই ঘটেনি। খেলাধুলোর মধ্যে আমার প্রিয় ছিল শুধু বক্সিং আর ফেন্সিং—মুষ্টিযুদ্ধ আর তরবারি যুদ্ধ। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও ছিল অন্যান্যের চাইতে এমনই স্বতন্ত্র যে আর কারো সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনাও ছিল না।"

এখানে বলে রাখা ভাল, একগুঁয়ে সাইগার হোমস্ এই একটি দিক দিয়ে সফল হতে পেরেছিলেন ছোট ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে। তিনি চেয়েছিলেন রীতিমত গাণিতিক প্রশিক্ষণের পর ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ারের ছাঁচে ঢালাই করে ফেলবেন। তাই অঙ্কের জটিলতা নিয়েই দিবানিশি তন্ময় থাকতেন হোমস।

যাই হোক, ভিক্টর ট্রেভর ছিলেন হোমসের মতই নিঃসঙ্গ, কিন্তু আত্মশক্তি আর উদ্দীপনায় ভরপুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনের ধার ধারতেন না বলেই একটা বুলটেরিয়ার কুকুর ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। একদিন সকালবেলা এই কুকুরটাই গ্যাঁক করে কামড় বসিয়ে দিল শার্লক হোমসের পায়ে।

ফলে, দশদিন শয্যাশায়ী রইলেন হোমস। অনুগত সারমেয়র এ-হেন বেয়াড়াপনায় বিলক্ষণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে প্রতিদিনই হোমসের কাছে খোঁজ-খবর নিতে আসতেন ট্রেভর। প্রথম প্রথম থাকতেন মিনিটখানেক। তারপরই যতই দেখা যেতে লাগল দুজনের চিন্তাধারায় আলোচনার বিষয়ে মিল রয়েছে প্রচুর, ততই বাড়তে লাগল আড্ডার সময়। দেখতে দেখতে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলেন দুই নিঃসঙ্গ তরুণ।

ট্রেভরের বাবা ছিলেন বিপত্নীক। ভিক্টর তাঁর একমাত্র পুত্র। নরফোকের ডনিথর্পেতে থাকতেন তিনি। জুন মাসের শেষের দিকে এক মাসের লম্বা ছুটি সেখানেই কাটিয়ে আসার জন্যে হোমসকে নিমন্ত্রণ করলেন ভিক্টর।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন হোমস। ১৮৭৪ সালের ১২ই জুলাই রবিবার একটা ডগ-কার্টে ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে চুনাপাথর দিয়ে বাঁধান চওড়া রাস্তা পেরিয়ে এসে পৌঁছোলেন সেকেলে বাড়ীটার সামনে। সে বাড়ীর কড়ি বরগা ওক কাঠ দিয়ে তৈরী, দেওয়ালে ইঁটের গাঁথনি, দরজা-জানালা রীতিমত চওড়া।

প্রথম থেকেই হোমসের মন টেনেছিলেন ট্রেভরের বাবা। ভদ্রলোকের দেহ যেমন মজবুত, মনও তেমনি। পড়াশুনা কম করলেও বহু দেশ তিনি ঘুরেছেন এবং যেখানে যা দেখেছেন, তা মনে রেখেছেন ছবির মত।

হোমস এসে পৌঁছোনোর দু-একদিন পরের ঘটনা। একদিন রাত্রে ডিনার খাওয়ার পর গাঢ় লাল রঙের পোর্ট মদ ভর্তি গেলাস নিয়ে গল্প করছিলেন তিনজনে। চোখে দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর ক্ষমতায় শার্লক হোমস্ যে কতবড় ওস্তাদ, তাই নিয়েই গল্প করছিলেন ভিক্টর। মন দিয়ে ছেলের সব কথাই শুনলেন বুড়ো ট্রেভর। কিন্তু বেশ বোঝা গেল বিশ্বাস করলেন না।

হাসতে হাসতে বললেন—"মিঃ হোমস, আপনার প্রতিভার চমক দেখানোর একটা সুযোগ আমি দিচ্ছি। বলুন দেখি আমাকে দেখে অপানার কি মনে হয়?"

পোর্টে চুমুক দিলেন শার্লক হোমস। গেলাস নামিয়ে বললেন—"বেশী কিছু নয়। তবে আমার বিশ্বাস, গত বছর কি ঐরকম সময়ে আপনার মনে ভয় ছিল হয়ত কেউ মারধর করতে পারে আপনাকে।"

হাসি মিলিয়ে গেল বুড়োর ঠোঁটের কোণ থেকে। ভীষণ অবাক হয়ে ছেলের দিকে ফিরে তিনি বললেন—"ভিক্টর, কথাটা সত্যি। তোর মনে থাকতে পারে, কিছুদিন আগে তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম চোরা-শিকারীদের দলটা আমি আর স্যার এডোয়ার্ড হর্বি ভেঙে দিয়েছি। হতভাগারা মাসকয়েক আগে ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে। একদিন রাতে এখানকার ভাটিখানায় বসে তারা নাকি শপথ করেছে আমাদের দুজনকেই ছুরি মেরে খতম করে দেবে। তারপরে সত্যিই রাস্কেলগুলো চড়াও হয়েছিল স্যার এডোয়ার্ডের ওপর। সেই থেকেই আমি হুঁসিয়ার রয়েছি। কিন্তু বুঝলাম না মিঃ হোমস তা জানলেন কি করে। তুই বলিসনি তো?"

"আরে না, না", মাথা নেড়ে বললেন ভিক্টর। "আমি কোনোদিনই বলিনি। শার্লক কি করে জানলে বলো তো?'

"তোমার বাবা সব সময় এই ছড়িটা সঙ্গে রাখেন," বলে ঝুঁকে পড়ে ছড়িটা তুলে নিলেন হোমস। "খোদাই করা তারিখ দেখেই বুঝেছি এ-ছড়ি তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছে গত বছরের জুন মাসে। ছড়িটা খুবই ভারী। হাতে নিলেই বুঝবে সম্প্রতি উনি ছড়ির হাতলটা ফুটো করে ভেতরে গরম সীসে ঢেলেছেন। ফলে, মারাত্মক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরীহদর্শন এই ছড়ি। প্রাণহানির শংকা না থাকলে এরকম অস্ত্র নিশ্চয় উনি কাছে রাখতেন না।"

"সাবাস!" উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন বুড়ো ট্রেভর। এমনভাবে হাততালি দিয়ে উঠলেন যেন নাটকের ক্লাইমাক্সে পৌঁছে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছেন। তাই কুশলী অভিনেতাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলেন না। "এবার বলুন দেখি আর কি জানতে পেরেছেন আমার সম্বন্ধে।"

"বয়সকালে বক্সিং লড়তেন আপনি।"

"ঠিক, ঠিক। আমার নাকের অবস্থা দেখে আঁচ করেছেন নিশ্চয়?"

"না, কান দেখে। আমি নিজে বক্সিং লড়ি। তাই লক্ষ্য করেছি, বক্সারদের কান কিভাবে লেপ্টে যায়, পুরু হয়ে যায়।"

"আর কিছু?"

"আপনার হাতের কড়াপড়া চামড়া দেখে বলতে পারি, এক সময়ে প্রচুর মাটি খোঁড়ার কাজ আপনি করেছেন।"

"সোনার খনির দৌলতেই কপাল ফিরেছে আমার।"

"আপনি নিউজিল্যান্ডে ছিলেন। জাপানেও বেড়াতে গেছিলেন।"

"গেছিলাম।"

"আপনি এমন একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যাঁর নামের আদ্যাক্ষর J·A; পরে তাঁকে আপনি মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন, জোর করে ভুলে যেতে চেয়েছেন।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই ঘটল সেই আশ্চর্য কাণ্ড। আতংকবিস্ফারিত অদ্ভুত চোখে শার্লক হোমসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন বুড়ো ট্রেভর। তার পরেই দুই বন্ধুকে চমকে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর। পড়েই জ্ঞান হারালেন।

ক্ষিপ্রহস্তে ভিক্টর আর শার্লক তাঁর কলার আলগা করে দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলেন চোখে-মুখে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সামলে নিলেন বৃদ্ধ। উঠে বসে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন—"খুবই ভয় পাইয়ে দিয়েছি, তাই না? আসলে আমার হার্ট খুবই দুর্বল, বাইরে থেকে শক্তসামর্থ দেখতে হলেও, ভেতরটা তো কাহিল। তাই ধাক্কা সামলাতে পারি না মোটেই। মিঃ হোমস্, জানি না এ অসম্ভব কি করে সম্ভব করলেন, কিন্তু আমার কি বিশ্বাস জানেন? আমার বিশ্বাস, গল্প-উপন্যাস বাস্তবের যে-কোনো ডিটেকটিভই আপনার তুলনায় নেহাতই শিশু। মিঃ হোমস্, জগতের অনেক কিছুই দেখেছি বলেই আজ বলছি, গোয়েন্দাগিরিই আপনার একমাত্র জীবিকা হওয়া উচিত।"

পরে ওয়াটসনকে বলেছিলেন হোমস্—"এই প্রশস্তিই মোড় ঘুরিয়ে দিল আমার জীবনের। সেদিন পর্যন্ত আমার কাছে যা ছিল স্রেফ হবি, উত্তরজীবনে তাকেই আমার পেশা করে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করলাম মনের মধ্যে। ওয়াটসন, বিশ্বাস করো, ওল্ড ট্রেভরের সেই উচ্ছ্বাসই সেদিন

আমার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় খুলে ধরল, আমার পথ আমি চিনতে পারলাম।"

যাই হোক, বৃদ্ধ ট্রেভরের আবেগ-উচ্ছ্বসিত সুপারিশ উপভোগ করতে করতে হোমস্ সেদিন জবাব দিয়েছিলেন—"অজান্তে নিশ্চয় আপনাকে ব্যথা দিয়ে ফেলেছি, তাই না?"

"তা দিয়েছেন। আমার বুকের সবচাইতে টনটনে যে জায়গাটা, সেখানেই খোঁচা মেরেছেন। কিন্তু কি করে এত কথা জানলেন বলুন তো? আরও কিছু জানলেও বলুন," কথাটা এমনভাবে বললেন বৃদ্ধ যেন ঠাট্টা করতে চাইছেন হোমসের সঙ্গে। কিন্তু দুই চোখের আতঙ্ক তাতে ঢাকা পড়ল না।

বুঝিয়ে দিলেন হোমস্—"আপনার মনে আছে নিশ্চয়, দিনকয়েক আগে আমরা তিনজনে নৌকো নিয়ে লেকে বেরিয়েছিলাম। একটা মাছ জল থেকে টেনে তোলার সময়ে আপনি আস্তিন গুটিয়েছিলেন। তখনি লক্ষ্য করেছিলাম কনুইয়ের ভাঁজে J.A. অক্ষরদুটো উল্কিতে আঁকা রয়েছে। গোলাপী রঙ উল্কির। অদ্ভুত এই রঙটা একমাত্র জাপানী আর্টিস্টরাই ব্যবহার করে। অক্ষরদুটো স্পষ্ট দেখা গেলেও বেশ বুঝলাম অ্যাসিড দিয়ে তা তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল।"

"সাবাস! একেই বলে বাঘের চোখ!" চীৎকার করে বলেছিলেন বৃদ্ধ ট্রেভর। "বিলকুল খাঁটি কথাই বলেছেন, মিঃ হোমস্! কিন্তু এখন এ-প্রসঙ্গ থাকুক, অন্য কিছু আলোচনা করা যাক। মরা ভালোবাসার ভূত যে মরেও মরে না!"

সমস্ত রাত ঘুমোতে পারলেন না হোমস্। বৃদ্ধ ট্রেভরের কথাগুলো চিন্তার তুফান তুলল তাঁর তরুণ মনে। মনে হল বৃথাই সময় নষ্ট করছেন তিনি। অংক নিয়ে পড়াশুনা করার ধৈর্য তাঁর নেই। ঐটনীয় সেই ঘটনার পর গতানুগতিক পড়াশুনোর সব উৎসাহই নিভে গেল তাঁর মন থেকে। ভেবে দেখলেন, সংসারে একজন সমাজ-সেবীর যা ভূমিকা, একজন ভালো গোয়েন্দার ভূমিকা তার চাইতে কোন অংশে কম নয়।

পরের দিন বাবাকে চিঠি লিখলেন ইয়র্কশায়ারে।

লিখলেন, শার্লক হোমস্ মনস্থির করে ফেলেছেন। ইঞ্জিনীয়ার তিনি হবেন না, হবেন বিশ্বের সর্বপ্রথম কনসাল্টিং ডিটেক-টিভ।

সেই ঘটনার পরের ক'টা দিন হোমসকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখতে লাগলেন বুড়ো ট্রেভর। তারপর একদিন বিকেলের দিকে হাডসন নামে এক নাবিকের আবির্ভাব ঘটল ট্রেভর নিবাসে। পাতলা কিন্তু রোদে-পোড়া তামাটে চেহারা লোকটার। চোখেমুখে অপরিসীম ধূর্ততা। দোরগোড়া থেকেই হাঁকডাক দিয়ে সে জোর করেই দেখা করতে গেল বৃদ্ধ ট্রেভরের সঙ্গে। বুড়ো নাকি তার 'পুরোনো দোস্ত।'

ঘন্টাখানেক পরে বাড়ী ফিরে ভিক্টর আর হোমস্ দেখলেন, মদ খেয়ে সোফায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছেন বুড়ো ট্রেভর।

সমস্ত ঘটনাটা একটা কুৎসিত ছাপ এঁকে দিয়ে গেল হোমসের মনে। বেশ বুঝলেন, বাড়ীর মধ্যে তাঁর উপস্থিতি প্রিয়বন্ধু ভিক্টরও আর সইতে পারছেন না। তাই পরের দিনই লন্ডনে যাওয়া মনস্থ করলেন।

পাতলা কিন্তু রোদে-পোড়া তামাটে রোগা চেহারা লোকটার

মাইক্রফট্ ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। হোমস্ আস্তানা নিলেন সেইখানেই। তারপর সাত-সাতটা সপ্তাহ উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেন অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে।

টেলিগ্রামটা এল এরপরেই। পাঠিয়েছেন ভিক্টর। শার্লক হোমস্ যেন পত্রপাঠ ট্রেভর-নিবাসে রওনা হন। সব কাজ ফেলে-ছড়িয়ে তৎক্ষণাৎ নরফোকের দিকে পা বাড়ালেন হোমস্।

যে-চিঠি পেয়ে আতংকে নীল হয়ে গিয়েছিলেন বুড়ো ট্রেভর সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক হয়েছে এবং মারা গেছেন কিছুক্ষণ পরেই, ডক্টর জন এচ ওয়াটসন তা লিখে রেখে গেছেন 'গ্লোরিয়া স্কট' কাহিনীতে।

চিঠিটা এই :

'সব রকম জানোয়ারই শেষ অবধি হেড-কীপার হাডসন জুটিয়েছে। অন্য সব শিকার বিষয়ে বলেছে মুরগীই শ্রেষ্ঠ। পালা বদলাচ্ছে। মুগয়ার ও অন্যান্য খেলার এক্ষুনি বিকল্প দরকার।'

ওয়াটসন লিখেছেন, প্রথমবার চিঠি পড়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন শার্লক হোমস্। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেলেন রহস্যের চাবীকাঠির সন্ধান। প্রথম শব্দটা ধরলেন, তারপরের দুটো শব্দ বাদ দিলেন, তারপরের শব্দটা ধরলেন, দুটো শব্দ বাদ দিলেন—এইভাবে পড়লেই হেঁয়ালির যা অর্থ দাঁড়ালো, তা এই :

'সব শেষ। হাডসন সব বলেছে। পালাও এক্ষুনি।'

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ছেলেকে এক বাণ্ডিল কাগজ দিয়ে গেছিলেন বুড়ো ট্রেভর। তাতেই পাওয়া গিয়েছিল তাঁর অপরাধের কাহিনী। কিভাবে তিনি ব্যাংকের তহবিল তছরূপ করেছিলেন, তারপর শৃঙ্খলিত হয়ে 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাওয়ার পথে অন্য কয়েকজন কয়েদী আর নাবিকের সঙ্গে দল পাকিয়ে জাহাজ দখল করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত রক্তনদী বইয়ে কাজ হাসিলও করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একশ'টা বারুদের পাত্রে আগুন লেগে উড়ে গেল 'গ্লোরিয়া স্কট'। সৌভাগ্যক্রমে সে-সময়ে নৌকোয় থাকার ফলে প্রাণে বেঁচে যান ট্রেভর। রক্তাক্ত অবস্থায় তরুণ নাবিক হাডসনকেও উদ্ধার করেন। সেখান থেকে তিনি যান খনির কাজে যোগ দিতে এবং উপনিবেশ থেকে ফিরে আসেন প্রচুর টাকা নিয়ে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। প্রায় বিশ বছর পরে ঠিকানা জোগাড় করে হাডসন এসেছিল ব্ল্যাক মেইল করতে।

অসাধারণ মামলা 'গ্লোরিয়া স্কট' এই-ভাবেই শেষ হয়েছে। এই মামলাই শার্লক হোমসের জীবনে সর্বপ্রথম মামলা।

হীরকের দ্যুতি ঠিকরোয় বহুদিকে। হীরকশ্রেষ্ঠ শার্লক হোমসের বহুমুখী প্রতিভারও সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম কেস 'গ্লোরিয়া স্কট' মামলায়—যে-মামলা হাতে না নিলে শার্লক হোমস্ হয়ত কোনদিনই ডিটেক-টিভ হতেন না, হতেন ইঞ্জিনীয়ার।

এইভাবেই সমাজের বিরাট উপকার করে গেলেন মহাপাপী ট্রেভর।

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

কল্যাণকুমার বসু

(৮)
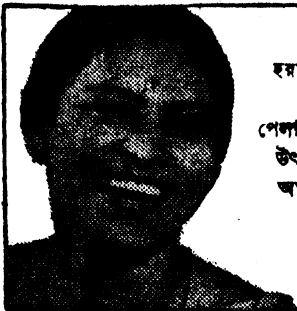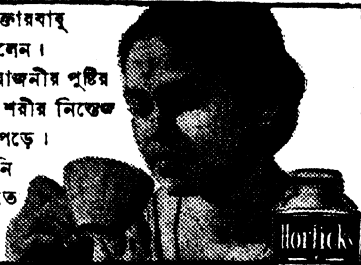
"আমি যখন তোমার বাড়ি আসবো তুমি তখন কোন কাজ করতে পারবে না বুঝলে......রেখে দাও তোমার দলিল-দস্তাবেজ ফাইল-কাগজপত্রগুলো। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও......আমার সঙ্গে গল্প কর।

সময়-অসময় নেই হেমকুসুম ওর সারকুলার রোডের বাড়িতে এসে ওর সমস্ত কাজকে গোলমাল করে দেয়। বাইরের লোকজন মানে না। ওর জন্যে ভদ্রতা রাখা বুঝি দায় হয়ে পড়ে। অফিসে এসে ওর টেবিলের অপর দিকের চেয়ারে বসে। পরক্ষণেই চেয়ার ঠেলে দাঁড়িয়ে ওঠে। চারিদিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে—তোমার অফিস-ঘর কি অপরিষ্কার......ওই জন্যেই ত কোন 'ক্লায়েন্ট' আসে না তোমার কাছে। পরিষ্কার করতে পার না ঘরদোর। পয়সা নেই? নাকি পয়সার দিকে মন নেই। তবে কোনদিকে মন! বলে হেসে ওঠে।

কোন কোনদিন অফিসঘরে এসে তাক পরিষ্কার করে বইপত্তর গুছিয়ে টেবিলের অনেক কাগজ বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে, ফুলদানিতে ফুল রেখে বলে—দেখ এবার...তারপর হেসে বল কী! ফুল ভালোবাসো না তুমি!

কোনদিন বা অফিসঘরে এসে কোন কথা না বলে চলে যায় রান্নাঘরে। স্টোভ জ্বালিয়ে, গরম জলের কেটলি চড়িয়ে হাঁক দেয় চিনি কোথায়?

তারপর গরম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওর টেবিলে ঠকাস করে নামিয়ে রেখে বলে, 'চা খাও!' পরমুহূর্তেই বলে, চা খাচ্ছ কিন্তু বেশী খেও না, শরীর খারাপ হবে বুঝলে। তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা।

যদিও প্রায়দিন হেমকুসুম এসে পৌঁছতে পারে না সারকুলার রোডের বাড়িতে তবু মুহূর্তগুলি ওর প্রত্যাশাকে পূর্ণ রাখে। নানা কাজের মাঝে হেম-কুসুমের কথা মনে হয়। ......মনে হয় এই মুহূর্তে হেম হয়তো ওর কথা ভাবছে তা না হলে হেমের কথা এত মনে পড়ে কেন। মনে মনে ভাবে একবার দেখে আসি হেমকে অসুখ-বিসুখ করেনি তো। দুশ্চিন্তা কেন যে মনের সামনে এসে দাঁড়ায় ও বুঝতে পারে না।

মা আসেন রোজ সকালে। আপন বাড়ির কাজ সেরে ছেলের বাড়ি দেখা-শোনা করতে। ছেলের নিঃসঙ্গ জীবন মাকে সকল সময়ে বড় ব্যথিত করে। মা বলেন বাবা তুই এবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হ।

ও বলে, মা মা এখন আমি বিয়েতে মত দিতে পারবো না আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।

হেসে মামীমামা বলেন, বল তোমার কি রকম মেয়ে পছন্দ .না কি তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবে?

ও কিছু বলে না, হাসে।......ও জানে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে হয়তো একদিন ওর বিচ্ছেদ নেমে আসতে পারে। ও বুঝতে পারে ওকে প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে হবে। অতুল স্থির নিশ্চিত যে, ওদের এই বিবাহ ওর কোন আত্মীয়-স্বজন সম্মতি দেবে না। কিন্তু ও সংকল্পে দৃঢ়। অতুলের মানসী প্রতিমা তো মামাতো বোন হেমকুসুম।

কলকাতায় ব্যারিস্টারীতে প্র্যাকটিশ জমে না। এখানে প্র্যাকটিশ করেন রথী-মহারথীরা। দেওয়ানীতে রাসবিহারী ঘোষ, তারক পালিত, বিনোদ মিত্র, সত্যপ্রসন্ন সিংহ ফৌজদারীতে অনেক ইংরেজ ব্যারিস্টার যেমন নর্টন সাহেব, বাঙালী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। এর মাঝে নতুন ব্যারিস্টার অতুল-প্রসাদের স্থান কোথায়! চিত্তরঞ্জন তখন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার রূপে নাম লিখিয়েছেন। ...এস পি সিংহ এবং আরও কে কে যেন পরামর্শ দিলেন রংপুরে গিয়ে প্র্যাকটিশ করুন। প্র্যাকটিশ জমবে।

মনটাও হঠাৎ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। যিনি ওদের এত দেখাশোনা করতেন অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সাহস দিয়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে। দুর্গামোহনবাবুর মৃত্যুতে ওর প্রাণে শেল বাজল।* এখন থেকে সমস্ত সংসারটাই ওর কাঁধে এসে পড়ল।

সংসার আর চলে না। রংপুরে প্র্যাকটিশের কথাটা মনে পড়ল......রংপুর বড় শহর তবে কলকাতার মত বড় নয়। এবং প্রতিযোগিতাও সেখানে কম নিশ্চয়ই। রংপুরে প্র্যাকটিশ করলে ফলাফল নিশ্চয়ই ভালো হবে। কথাটা মনঃপুত হল। সঙ্গে সঙ্গেই মন খারাপ হয়ে গেল কলকাতা ছেড়ে গেলেই কলকাতার বা বাংলার সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথর অমূল্য সঙ্গ থেকে সে বঞ্চিত হবে। খাম-খেয়ালী সংঘের সকল সভ্যদের মন থেকে সে মুছে যাবে। ......যদিও মন ক্ষণিকের জন্যে বিব্রত এবং বিচলিত হয় কিন্তু জীবিকার তাগিদে রংপুর যাওয়ার সংকল্প ছেড়ে দেয় না। শুভদিন দেখে রংপুর যাত্রা করে। এবং উৎসাহের সঙ্গে রংপুরে কিছুদিন প্র্যাকটিশ সুরু করে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা। প্র্যাকটিশ জমে না। কিছু মাস পরে অতুল রংপুরে প্র্যাকটিশ করা ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে চলে এল কলকাতায়। কলকাতায় এসে শান্তি—কলকাতায় সঙ্গীত সাহিত্য...সাহিত্যিক বন্ধু...রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ খাম-খেয়ালী সংঘ...এবং প্রস্ফুটিত প্রেমের কলি...।

এদিকে হেমকুসুম ও অতুলের প্রেমের সম্পর্ক আর আত্মীয়দের কাছে অজানা রইল না। আত্মীয়দের অনেকে উপদেশ দিলেন, অনেকে তিরস্কার করলেন। 'অতুল এবং হেমকুসুমের জন্যে ওদের পরিবারের মুখ দেখানো বুঝি দায়।'

অতুলের মা হেমন্তশশী বলেন, অতুল তোমার মামাত বোনকে বিয়ের ইচ্ছা ছেড়ে দাও। বোনের সঙ্গে বিবাহ একথা যে ভাবা যায় না, বাবা। আমাদের দেশে এ বিবাহ অসিদ্ধ সমাজরীতির বাইরে।

অতুল জানায় হেমকুসুমের সঙ্গে বিবাহ না হলে কোনদিনই বিবাহে সে মত দেবে না। আর রীতিনীতি সমাজের কথা—সমাজ ত অনেকেই মানেন না। সমাজ আমরাই হাতে গড়ি আমরাই ভাঙি।

ওদিকে হেমকুসুম তার মাকে বললে, অতুলকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহে সে রাজী নয়। বড়মামাও শুনলেন এবং বিরক্ত হলেন কন্যা এবং ভাগনের ব্যবহারে। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি জানালেন, বেশ তোমরা সাবালক হয়েছ বিয়ে করতে চাও কর। তবে এ ব্যাপারে আমাদের কোন সহায়তা পাবে না। এবং জেনে রেখ এদেশে তোমাদের বিবাহ হবে না। এদেশের আইনে তোমাদের বিবাহ হতে পারে না।

অতুল হেমকে জানালো, আমাদের বিবাহ যদি এদেশের আইনে না মানে তবে বিদেশের আইনে মানবে। ওখানে আমাদের বিবাহে কোন বাধা নেই। আমরা বিবাহের জন্যে বিদেশে পাড়ি দেব।

কিছু মাস পরে স্যর কে জি গুপ্ত অফিসের কাজে লণ্ডন চলে গেলেন।... যা কিছু জমানো টাকা আর ধার-দেনা করে বিন্দুমাত্র দেরী না করে কলকাতা থেকে একরাতে অতুল হেমকে নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের পথে বোম্বাই রওয়ানা হয়ে গেল। স্কট-ল্যাণ্ডে অনাড়ম্বরে বিবাহ কার্য শেষে সুইটজারল্যাণ্ডে হনিমুনে কাটিয়ে লণ্ডনের পথে পা বাড়ালো অতুল-হেম।

লণ্ডনে পৌঁছে অতুল হেমকুসুমকে বলল, আজ আমাদের নিজেদের সত্যি একাকী মনে হচ্ছে......আমরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিত্যক্ত, সমাজ আমাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। বিবাহের জন্যে দূর প্রবাসে আমাদের ছুটে আসতে হল হেম। দেশে বিবাহ হলে তোমার বিবাহে উৎসবের ঘটা হোতো...আলোর রোশনি, বাজীর ঝলকানিতে আকাশ হাসতো। এখানে আমরা এখন একেবারে নিঃস্ব।

কে বলে আমরা নিঃস্ব?

জান হেম, আমি স্থির করেছি আমরা আর দেশে ফিরবো না...হেম দেশ

---

* দুর্গামোহনবাবুর মৃত্যু ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৯৭।

আমাদের কোলে স্থান দেয়নি; দেশের মানুষ আমাদের অবজ্ঞা করেছে। দেশের মনো এই দূরে বিদেশে বসে মন কেঁদে উঠলেও, ভাবতে হবে, এই দেশই আমাদের আশ্রয়দাতা। আমাদের কর্মভূমি হবে এই দেশ এবং আমাদের অন্নভূমিও। আমি আমার কর্মভূমি হিসেবে ইংল্যান্ডকেই মনোনীত করলাম। আমি এখানেই ব্যারিস্টারী করবো হেমকুসুম—এই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে।

হেম বলে. সেই ভালো।

ব্রেকফাস্ট সেরে অনেক উৎসাহের সঙ্গে রোজ সকালে নতুন কর্মক্ষেত্রে ছোটে অতুল। কিন্তু বারে-বারে ব্যর্থ হয়। কলকাতা হাইকোর্টে, রংপুর আর এখন লন্ডনের ওল্ডবেলীতে সেই একই ইতিহাস। সারাদিন শেষ. কর্মহীন ক্লান্তি মেখে যখন ও বাড়ি ফেরে তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে হেমকুসুম। হেমকুসুমের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না ও। কেমন যেন লজ্জা করে। মাঝে মাঝে জগৎটার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ এসে জমা হয়। মাঝে মাঝে বুঝি নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে যায়। হেমকুসুম উৎসাহ দেয়। বলে, তুমি একদিন আপন আসন নিজেই করে নিতে পারবে দেখ। আমাদের এর মধ্যেই নিজে-দের চালিয়ে নিতে হবে......আমি চালিয়ে নেবো দেখো। সুদিন আমাদের ফিরে আসবে।

একদিন বাড়িওয়ালা এসে অতুলকে জানিয়ে দিয়ে গেল বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। শীঘ্র মিটিয়ে দাও না হলে অন্য কোথাও বাড়ি দেখে-শুনে নাও। দিন চালাই মুস্কিল হয়ে ওঠে। কোন কোনদিন সকালে মোড়ের মাথার দোকান থেকে সস্তা-সব্জি মাংস কিনে এনে হেমকুসুমের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে কয়েকদিন কষ্ট করে চালিয়ে নাও হেম।......কোন কোনদিন হাতে কিছু পাউন্ড-শিলিং এলে মন-মেজাজ শরীফ হয়ে ওঠে। অতুল বলে, আজ বাড়িতে রান্নার প্রয়োজন নেই হেম, চল রেস্তোঁরায় ডিনার খাওয়া যাক। দিল-দরিয়া মেজাজ বলে এত অভাব-অভাব ভালো লাগে না, চল হেম আজ আমরা নাটক দেখে আসি......ক্লাসিকাল গান শুনে আসি......চমৎকার লাগে আমার ওয়েস্টার্ণ মিউজিক। আমার গানের সুরে কিছু কিছু বিদেশের সুরের ছোঁয়া আছে জান।

হেমকুসুম বলে, তুমি ত অনেকদিন কোন গান রচনা করো নি গো।

মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ মনে হয় অতুলের। বলে. হেম দেশ থেকে কেউ কোন চিঠি লিখে আমাদের খবর নিলে না। আমার আত্মীয়-স্বজনেরা না হয় আমাকে ত্যাগ করেছেন কিন্তু আমার বন্ধু-বান্ধবরাও কেন চিঠি লিখল না। সকলে কি আমাদের মন থেকে মুছে ফেললো।......আমি একা থাকতে কোনদিনই ভালোবাসতাম না—আমি চিরকালই ভেবেচি আমি থাকবো আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে।

হেম বলে,—যাঁরা আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করেন না তাঁদের সঙ্গে আমিও কোন সম্পর্ক রাখবো না।* আজ্ঞা বেশ আছি। প্রয়োজন হলে আমরা চিরকাল একলা বাস করবো।

সামান্য কথার রেশ ধরে অতুল ও হেম দুজনের মনে অশান্তির বীজ দেখা দেয়। দুজনের কারো শান্তি থাকে না মনে, কারণে-অকারণে মনোমালিন্য ঘটে যায়। হেম বলে, কাকে চিঠি লিখছ শুনি।

অতুল বলে মা'কে। মায়ের জন্যে বড় চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। মা এবং বোনদের কথা মনে পড়ছে বড় আজ কতদিন......কতদিন ও'দের দেখিনি জান। বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কি ভাবে যে ও'দের দিন চলছে কে জানে!

বিরক্তি ভরা গলায় হেম বলে, তোমার মাকে বুঝি তুমি খুব ভালবাস? তোমার মা এবং বোনেরা তোমায় বিয়ের'পর কেমন ভালোবাসেন আমি দেখে নিয়েছি। তুমি চিঠি লিখছ। ও'রা তো তোমাকে কোনদিন চিঠি লিখেছেন বলে মনে পড়ে না।

অতুল চুপ করে থাকে। কখনও উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করে ঘরময়। মুখে বিরক্তির রেখা ফোটে। কখনও ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন বোধ করে। বিরক্তির রেখাগুলি সময়ের স্রোতে অন্তর্ধান করে। অতুল বলে. সত্যি হেম তোমাকে সুখে রাখতে পারলাম না। তোমাকে বিয়ে করে কেবল কষ্ট দিলাম। একটুকুর জন্যে সুখে রাখতে পারলাম না—অভাব, অর্থকষ্ট, অনটন আমাদের চিরসঙ্গী হয়ে রইল। ব্যারিস্টারীতে এখানেও ভালোভাবে বসতে পারলাম না। হেরে গেলাম হেম।

হেমকুসুম আশ্বাস দেয়।

এক সময় উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠেও। মুষ্টিবদ্ধ দুহাত পিছনে রেখে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। কখনও ফায়ার প্লেসের সামনে এসে দাঁড়ায়। হেমকুসুমের পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে. হেম তুমি শীতে কষ্ট পাও। ঘুম ভেঙে আমি দেখেছি তুমি অনেকদিন বিছানায় উঠে বসে আছ। ......তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারি......আজ কোর্ট থেকে ফিরে সোজা উপস্থিত হয়েছিলাম একটা পোষাকের দোকানে, ইচ্ছে ছিল তোমার জন্যে একখানা গরম ওভারকোর্ট এবং একটা পালকের লেপ কিনে আনবো। ......কিন্তু আমি কিনে আনতে পারলাম না ওভার-কোট কেনার মত পাউণ্ড আমার নেই।

হেম ওকে ধীরে ধীরে ডাকে,—শোন... একটা কথা আছে...কাছে এসো লক্ষীটি... আমার এখানে বোসো—এখানে...এস না... তোমাকে যে কথা বলবো ভাবছিলাম...যে কথাটা বলা হয়নি, কিন্তু বলতে লজ্জা করে। আমি কেন বিছানায় উঠে বসি, জান আমার...ফায়ার প্লেসের সামনে বসা হেমকুসুম অকস্মাৎ ওর চোখে যেন অন্য-রূপে ধরা দিল। হেমকুসুমের আঁখি দুটি যেন বড় ক্লান্ত মনে হয়। ক্লান্তি যেন সারা শরীরে ছড়িয়ে। রুক্ষতার বাস অঙ্গে; তবু যেন কেমন খুশীর আভা ওর মুখখানিতে।

হেমকুসুমের মিষ্টি-হাসি মুখখানিতে চেয়ে ও বলে তাহলে ত তোমায় শরীরের খুব যত্ন করা উচিত। তোমাকে নিয়ম করে চলতে হবে।

আবার উৎসাহ ফিরে আসে কাজে। দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দাম মনে এনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজের মাঝে। হেমকুসুমকে নিয়ে লন্ডনের হাসপাতালে যাতায়াত চলে। হাসপাতালে হেমকুসুমের যমজ সন্তান প্রসব হয়। বিদেশী বন্ধুরা এসে 'উইশ' করে গেলেন। প্রবাসী দেশী বন্ধুরা বললেন, মিষ্টি খাওয়ান একসঙ্গে দুই পুত্রের গর্বিত পিতা অতুলপ্রসাদ সেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনের চোখে তাকিয়ে হাসে। অতুল বলে, এদের নাম দেয়া দরকার। কি নাম দিই বলত! একজনের গলায় হার পরিয়ে দাও এক-জনের গলা শূন্য রাখ। দুজনকে চিনতে পারবে তো! দুজনেই যে এক দেখতে।

হেম বলে. তুমি এদের একটা নাম বল।

স্বামী বললে, একজনের নাম দাও দিলীপ পুরো নাম দিলীপকুমার সেন...... অন্যজনের কি নাম দেব বলত?

হেম মিল রেখে বললে নিলীপ—পুরো নাম নিলীপকুমার সেন।

মিল রেখে নাম দিয়ে দিলুম। কেমন নাম বল।

অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। পুত্র-দ্বয়ের সৌভাগ্যে সৌভাগ্য সূচিত করে বুঝি। কিন্তু আবার অবনতি—আর্থিক অবনতি, মানসিক বিচ্যুতি, ছোটখাটো ঘটনা থেকে অশান্তি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে।

ওল্ডবেলী থেকে সেদিন ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ বললেন, শোন হেমকুসুম মন-স্থির করেছি আমরা এবার দেশে ফিরে যাব। তবে কলকাতায় ফিরবো না। রংপুরেও নয়—বাংলাদেশে কোথাও নয়! ভারতবর্ষে ফিরে যুক্তদেশের • রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে আমরা বাসা বাঁধবো। নবাব শহর লক্ষ্ণৌ শহরে আমি ব্যারিস্টারী সুরু করবো নতুন করে। আমার বন্ধু লক্ষ্ণৌর বিশিষ্ট এক তালুকদার আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। মনে হয় ওখানে আমার পসার জমবে। আমায় ঠিকানা দিয়েছেন এক খ্যাতনামা বিশিষ্ট বাঙালী অ্যাডভোকেট মহাশয়ের যাঁর নাম বিপিনবিহারী বসু। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন সাহায্য করবেন। ......চিঠি লেখালিখি হয়েছে তাঁর সঙ্গে। আমাকে আশ্বাস দিয়ে ডাক পাঠিয়েছেন। এখন প্যাসেজ পেয়ে গেলে, টাকা জোগাড় হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যাব আবার ভারতবর্ষে।

(ক্রমশঃ)

---

*অতুলপ্রসাদ সকল সময়ে আত্মীয়-পরিজন সহ থাকতে ভালোবাসিতেন। যে সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তাঁহা-দের প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিলেন হেমকুসুম (অতুলপ্রসাদ সেনের স্ত্রী) তাঁহাদের কারো সাথে সম্পর্ক রাখিতে চাহিতেন না। পরবর্তীকালে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ এই কারণেই ঘটে।' (শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনের ডাইরি থেকে)

অঙ্গনা

পোষাক-বৈচিত্র্য

প্রমীলা

রূপকে সাজালে-গোছালে তবেই তা হবে অপরূপ। এতে যেমন নিজের তৃপ্তি তেমনি অপরের মনে-মুখেও প্রশংসার ভাব জাগানো সম্ভব। সাজগোছ না করলে নারী-জন্মই তো বৃথা। বিধাতা রূপ দিয়েছেন কিন্তু সে রূপের পরিচর্যার দায়িত্ব আমাদের। সে দায়িত্বটুকু পালন করে আমরা বিধাতার মনোরঞ্জন করি না রূপের সাধনায় অপরূপের কামনাকেই বরং রঙে-রসে সজীব করে তুলি। সুন্দরের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাই রূপ পায় এই সাধনায়। কিন্তু রূপ থাকলেই সাধনা নাও থাকতে পারে। নিজেকে সুন্দর করে তোলার প্রচণ্ড ইচ্ছা হৃদয়-মনকে আন্দোলিত নাও করতে পারে। তারা চির-কাল স্বভাব-সুন্দর হয়ে থাকতে চায়। তাদের প্রচেষ্টার অভাব—রূপের সাধনায় এ জীবন-মন সমর্পণ করার প্রচণ্ড অনাগ্রহ। আবার অনেকে হয়তো রূপের পাথরে মাথা কুটে মরছে। সুন্দরের বীণার তার অনাহত সে জীবনে। নিষ্ফল যন্ত্রণায় যে গুমরে ওঠে। কিন্তু প্রচেষ্টা রাখে অব্যাহত। নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে তোলার জন্য তার চেষ্টার আর অন্ত নেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে জেনেছে আন্তরিকতার পুরোটা বিফলে যাবে অন্তত যেতে পারে না। উৎসাহ- হৃদয়ে সে উঠে বসেছে। প্রসাধনের পরিচর্যায় রূপ তার এমনি খুলেছে। এখানেই শেষ নয়। আরো সৌন্দর্যের তুলি বুলিয়েছে অঙ্গে বরতনুর . পরতে পরতে সাজ-পোষাকে নিপুণ সংস্থাপন এবং শৈল্পিক মুহূর্তে তাকে ইন্দ্রপুরীর অনিন্দিত করে তুলেছে। কোথা থেকে হয়ে গেল। দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব তার হয়তো নিজেরই ভুল হয়ে উপক্রম—এই কি সেই রূপ!

কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ পারেন। মনে সংশয় জাগা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সন্দেহ বা সংশয় যেখানে সবের নিরসনও সেখানেই। সন্দেহের নিরসন না হবে তবে এত উদ্যোগ-আয়োজন কেন? আর কেনই বা এত বাগবিস্তার— বর্ণনার ঘটা? তাই ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে। সব জিনিষটাই তো
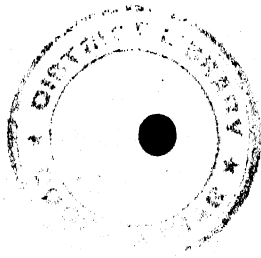
ানীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত এক ায় ঘটে যেতে পারে না। কিন্তু সবই ব। চেষ্টা থাকলে অসম্ভব কথাটি নেপোলিয়ন কেন, সকলের অভিধান ই 'পালাই পালাই' রব তুলতে বাধ্য। সেজন্য বলছিলাম হতাশ হবার কিছু পুরোদমে আয়াস চালিয়ে গেলে ল ফলতে দেরী হবে না। যাদের রূপ তাদের ক্ষেত্রে তো কোন কথাই পারে না। রূপের সাধনায় তারা হবেনই। কিন্তু এহেন সৌন্দর্য যাদের ত নয়—তারাও সাধনাবলে অনেক স্বভাবসুন্দরীদের হার মানিয়ে দেয়। এ শুধু সম্ভব আন্তরিকতার এবং র মাত্রাজ্ঞানে। এই মাত্রাজ্ঞান আছে সে বাজী জিতে যায়—অন্যেরা পড়ে থেকে তাই দেখে আর বাস ফেলে। যেখানে মাত্রাজ্ঞান নেই সাফল্য। সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন ন গৌণ হয়ে যেতে বাধ্য। সুন্দরের ণ্ডের পরশে সবাই তখন সুন্দর—শ্রীমণ্ডিত। অবস্থা তখন অনেকটা তার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে—যেন নয়ন রে।

দিন এরকমই একটা বিহ্বলতা এবং া সমগ্র চেতনা জুড়ে ছিল। কর মাহাত্ম্য দেখতে দেখতে বেশ েদর জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে-। সামান্য পোষাকের হের-ফেরে

রূপের কি বাহার খোলে! তুলনাটা অত্যন্ত সহজ। কারণ একই মেয়ে যখন বারে-বারে বিভিন্ন পোষাকে আবির্ভূত হচ্ছিল দেখে সহসা চেনার উপায় ছিল না—এ মেয়ে সেই মেয়ে। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে পরক্ষণেই জানলাম এ সেই। প্রসাধনের প্রলেপ, অলঙ্কারের নিখুঁত নির্বাচন এবং পোষাকের সমন্বয় সুন্দরীদের বরাঙ্গে সৌন্দর্যের সকল মাধুরী এনে জড়ো করেছিল। দুচোখ ভরে সে সৌন্দর্য দেখেছি—মনের সিন্দুকে সযত্নে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছি—যেন প্রয়োজনে আশ মেটাতে পারি।

সকালে কোকিল-দোয়েলের কাকলী-কুজনে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু সারাদিন এবং দিনের পর দিন পোষাকের বৈচিত্র্য 'মিস ইন্ডিয়া'র সুশোভন যৌবনচটুল দেহে কি অপরূপ রূপ বিকিরণ করবে তা প্রদর্শিত হচ্ছিল। মিস ফেমিনা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অংশ হিসাবেই অবশ্য এই ফ্যাশন প্যারেডের আয়োজন।

দেশের নামকরা বস্ত্র-উৎপাদকরা নিজে-দের দ্রব্যসম্ভার দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন সেদিন সুন্দরীদের। ঢাকোবার ঔজ্জ্বল্য দর্শক হৃদয়ে চমক জাগাচ্ছিল আবার লীলা লেশের উন্মাদ-সৌন্দর্যে মন হারিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই খাটাও ভয়েলের বিরাট আবেদন মন কেড়ে নেয়। মফৎ-লাল বা অম্বিকার শাড়ী ওদের উচ্ছল দেহ-তরঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে দর্শক হৃদয়ে কাঁপন জাগিয়েছে। পোষাকের সমারোহের অন্ত ছিল না। রকমফের শাড়ির ঝলসানো বাহার ছাড়াও ছিল চুড়িদার কামিজ, স্যুট, ইভনিং ড্রেস, ককটেল ড্রেস। সবই ভালো—সবই সুন্দর। তবু এরই মধ্যে যেন কেউ যাদুময়

পরা মেয়েটিকে ভোলা যায় না। মুখল আমলের পোষাকে মেয়েটি সেদিন অনেককে চমকে দিয়েছিল। যৌবনে আমার সময়েও যৌবনের কণ্ঠস্বর কানে বাজছিল সম্রাট শাজাহানও এই সুন্দরীর তারিফ না করে পারতেন না। মোদীর এই খাবরা সেদিন প্রশংসনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এরপরও আছে মোদী, মেটওয়ে, সেন্চুরী রেয়নের রকমারি সাজ-পোষাক। মনে দোলা দিচ্ছিল, রঙ ধরাচ্ছিল, সে সুবাসটুকু অঙ্গে-অঙ্গে ঘিরে ছিল। সাজ-পোষাকের অন্তহীন বৈচিত্র্য উপভোগ করছিলাম আর করছিলাম সুন্দরীদের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ। এইসব পোষাক-মাহাত্ম্য এবং সুন্দরী রূপসুষমা ঘিরে কল্পনার জাল হয়তো সবে গড়ে উঠছিল কিন্তু সব ঘোর কেটে গেল ঘোষকের নিষ্করুণ সমাপ্তি ঘোষণায়—রূঢ় পৃথিবী আবার স্পষ্ট হলো।

খাদ্যসমস্যা : আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সমস্যাজটিল বিশ্বের কথা ভেবে কারো মনেই স্বস্তি নেই। সবাই এই অস্বস্তিতে ভুগছে—কেউ বাদ নেই। মনের সুখ-শান্তি নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে এই সব সমস্যার বিস্তীর্ণ জটিলতায়। খাদ্য সমস্যা আবার সবার সেরা—সকলের উপরে এর স্থান। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশই এই সমস্যায় ভুগছে এবং যারা এখনো বাকি আছে আসন্ন দিনগুলির কথা চিন্তা করে তাদের চোখের ঘুমও ছুটি নিয়েছে। সবাই ভাবছে, সবাই চিন্তা করছে কিভাবে এই সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করে বিশ্বের মানুষকে খাইয়ে-পরিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা যায়।

আগামী ১ জুলাই শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মহিলা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়র সম্মেলন। এবার সম্মেলন-স্থল কেম্ব্রিজ। বিশ্বব্যাপী জরুরী খাদ্য-সমস্যা হবে সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। নয় দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ছত্রিশটি দেশের প্রায় চারশো প্রতিনিধি যোগদান করবেন। বিজ্ঞান এবং কারিগরী উভয় শাখার প্রতিনিধিরাই খাদ্য-আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তারাও প্রতিনিধিদের এবং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরে এসম্পর্কে আলোচনার এবং ভাবের আদান-প্রদানের বিরাট ব্যবস্থা করেছেন। কারিগরী শাখার অধিবেশনের বিষয় হবে খাদ্যোৎপাদনে কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ। ব্রিটেনের কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য দপ্তরের খাদ্য-বিজ্ঞান শাখার প্রধান উপদেষ্টা শ্রীমতী ডরোথি হোলিংসওয়ার্থ তাঁর লেখা 'বিশ্বের পটভূমিকায় পুষ্টি লক্ষ্য' শীর্ষক রচনা পড়ে অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন।

তারপর স্থানীয় খাদ্যসমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ব্রেজিল, জাপান, উরুগুয়ে এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিরা। 'খাদ্যের সংরক্ষণ এবং বিতরণ' বিষয়েও একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পদ্ধতি সম্পর্কে এবং যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং পরিবহনে বিমানের সাহায্য বিষয়ে রচনা পাঠ করবেন।

ভবিষ্যতের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে তার মধ্যে রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমি-উর্বরতা, যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া, বিশ্বে খাদ্য সরবরাহ, রাসায়নিক খাদ্য, ফ্রান্সের বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন আহরণ এবং পেট্রল থেকে প্রোটিন বিষয়ক আলোচনা।

এই সম্মেলনে দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী কথিকা পাঠ করবেন। এ দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী হলেন শ্রীমতী কে কে শুভচন্দনী এবং শ্রীমতী কে চন্দ্রশেখর। শ্রীমতী শুভচন্দনী ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে গবেষণারত এবং ডঃ চন্দ্রশেখর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা কলেজে প্রাণী বিজ্ঞানের রীডার। খাদ্যোৎপাদনে জীব বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে একটি রচনা পাঠ করবেন শ্রীমতী চন্দ্রশেখর। আর সমাজ বিজ্ঞান শাখায় একটি রচনা পাঠ করবেন শ্রীমতী সুভচন্দনী।

কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ বিষয়ে ইটালীর প্রতিনিধি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হাইড্রোলিকস, ঘানার প্রতিনিধি মনুষ্য-নির্মিত হ্রদ, ইউ-এ-আর-এর প্রতিনিধি সেচ এবং নাইজেরিয়া পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিজ নিজ বক্তব্য রাখবেন। সম্মেলনে আলোচনার আর একটি মনোজ্ঞ বিষয় হবে 'পেশাদারী মহিলা ইঞ্জিনীয়র'। এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। আশা করা যায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির আলোচনায় বিষয়টি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

অলংকারের দু'চার কথা

চন্ডীর রূপ বর্ণনায় পাই—তিল ফুল চিনি নাসা। তা এমন নিখুঁত নাসিকা যে সকলের অধিকারেই আছে বা থাকবে এমন তো কিছুই লেখাজোখা নেই। তাই কিছুটা কবির ভাষাতেই বলি—যার যরাতে যেমনি জুটেছে ওগো এই আমাদের ভালো ওগো এই আমাদের ভালো। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীতে ব্রজেশ্বরের মা পাখার বাতাসের সঙ্গে নথ নাড়া দিয়ে কর্তার মন ভোলাচ্ছেন প্রফুল্লর জন্য। আবার সাগরবৌ প্রফুল্লকে দেখে দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল, তার খাঁদা নাকে টানা দেওয়া নথ। যার ঐ সাগরবৌ-এর মত ডব-ডবে ভাসা-ভাসা চোখ অথচ খাঁদা-খাঁদা নাক, তেমনি নাকে পুঁথি গাঁথা ছেলা কাজের একটি আধুনিক সাইজের টানা দেওয়া নথ সত্যিই সুন্দর মানায়।

একটি ছোট্ট নাকছাবির এত গুণ যে, মুখের আদল এমন কি প্রকৃতি পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে পাল্টে দেয়। ধরুন একটি মহিলা—তিনি খুবই সুন্দরী—কাটা কাটা নাক-মুখ-চোখ তাঁর, তবু কি যেন নেই মুখের দিকে তাকালে যেন রুক্ষ স্বভাবের মনে হয় তাঁকে। হয়তো আদতেই তিনি তা নন। কিন্তু ইনিই যদি নাকের বাঁদিকে একটি ছোট্ট নাকছাবি পরেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ ধারালো মুখেও একটি কমনীয় মাধুর্য ফুটে উঠবে।

সেকালে নাকে সোনা পরার রেওয়াজ ছিল। কারণ গুরুজনরা মনে করতেন নাকের নিশ্বাস শুদ্ধ হলে সংসারে কল্যাণ হয়। তাই নাকের ভেতরেও সোনা পরার প্রচলন ছিল। নথেরও বয়স হিসেবে তারতম্য ছিল। গৃহিণী পরতেন বেশ বড় আকারের ফাঁদি নথ, বৌরা পরবে তার চেয়ে ছোট মাপের। তাতে কখন টানা থাকত কখন থাকত না। তবে বড় মাপের নথ-এ সোনার চেনের বা মুক্তোর টানা থাকতই। নথ পরা হত নাকের বাঁদিকে। নাকছাবিও তাই। এযুগে মাদ্রাজী মহিলারা ডানদিকে নাকছাবি পরে থাকেন। সেই থেকেই হয়ত ডানদিকে পরার ফ্যাসান চালু হয়ে থাকবে।

উড়িষ্যা দেশে নাকের বেসর পরার রীতি আছে। নাকের মাঝখানে এটি দোলে। নোলকের মতই, তবে আকারে বেশ বড় আর কারুকার্যময় হয় এই বেসর। ওদেশের মা দুর্গাও পুজোর সময় অমনি বেসর পরে আসর আলো করেন। পাহাড়ী মেয়েরাও নাকে অমনি বেসর পরে। মুসলমান মেয়েদের নাকের কিল মানে নাকছাবি হল তাদের সোহাগীর চিহ্ন। আমাদের যেমন মাথার সিঁদুর আর ওদের ঐ নাকছাবি সধবা আর কুমারীর তফাত বোঝায়।

তবে কথায় আছে—পর পর মা গয়না পর। সাজাতে গেলে বাজবেই। কিন্তু বেশি বয়সে নাকে ফুটো করলে পেকে যাবার ভয় থাকেই। ছোট্ট মেয়ে কান বিঁধোলেও কাঁদে না, মাকড়ী পরার লোভে, কিন্তু বড় কালে নাক বিঁধিয়ে নাক নিয়ে নাকাল না হতে হয়।

কিন্তু যাঁদের নাকে ফুটো আছে তাঁরা অনায়াসে নাকছাবি পরুন। কেমিক্যাল স্টোনের ছোট্ট ছোট্ট নাকছাবি বেশ লাগবে। সাদা, লাল, সবুজ, নীল আর মুক্তোর কটি নাকছাবি হলেই তো সব শাড়ীর সঙ্গে চলে যাবে। তবে নাকছাবি সাধারণত সাদা পাথরের, হীরের কিম্বা মুক্তোর ভাল লাগে।

এবার আসছে মানানর প্রশ্ন। ছোট মুখে বড় নাকছাবি ভালো দেখাবে। এ তিনটি পাথর দিয়ে সুন্দর একটি Trangular shape— এর নাকছাবি তৈরি করুন। আর সরু মুখে নাকছাবি ভালো দেখায়। •

ফর্সা রং হলে সাদা কেমিক্যাল স্টোন, পোখরাজ বা হীরে পরুন। আভা আভা শ্যামলা রং হলে মুক্তো পরুন সুন্দর মানাবে।

যাঁদের নাকে আদৌ ফুটো নেই তাঁরা নানা রং-এর এক বাক্স কেমিক্যাল স্টোন (ফুটো) কিনে নিন আর ওদের কাছেই আঠা পাওয়া যায়, সেই আঠা দিয়ে আটকে পরুন। এছাড়াও ক্লিপ দেওয়া নাকছাবি আর নথও পাওয়া যায়। পাথর বসান জড়োয়ার নথ আর তাঁর সঙ্গে তেমনি পাথর বসান টানাও পরে দেখতে পারেন। একটু বর্ষিয়সীদেরও চওড়া পাড় শাড়ীর সঙ্গে নাকছাবি কিন্তু বেশ সুন্দর মানিয়ে যায়। মনে হয় কোন বড় বাড়ীর গৃহিণী। বেশ একটা আভিজাত্যের ভাব আসে।

কিন্তু বোফাঁ করা চুল আর স্লিভলেস দশ ইঞ্চি ঝুলের ব্লাউজের ওপরে এখানে-ওখানে গোঁজা শাড়ী তার সঙ্গে নাকছাবি সত্যিই বড় বেমানান লাগে। এই গরমের দিনে পুরাতনী ছাঁদে এলোখোঁপা বেঁধে তাতে একটি ফুলের মালা জড়ান—কবির কথা—(অলকে কুসুম না দিও তুমি শিথিল কবরী বাঁধিও) এটি না হয় নাই শুনলেন। টিপ পরুন একটি—ছোট বা বড় যেমন মানায় তার সঙ্গে বাঁদিকের নাকে একটি নাকছাবি। দেখুন কি মিষ্টি মধুর ছন্দ আসবে সাজে। যাঁরা বিবাহিতা তাঁরা যদি নাকছাবির সঙ্গে অল্প একটু ঘোমটা দেন মাথায় তাহলে খুব Graceful দেখায়।

এবার নাক থেকে কানে আসি। আজকাল লম্বা ঝোলান দুল বা কানের ঝাড়ের খুব প্রচলন হয়েছে। প্রায় সকলেই এমনি ধরনের দুল পরে থাকেন। অনেক বর্ষিয়সীরাও পরেন। কিন্তু চুলে রুপোলী চমক আর বসা গালের কাছে দোদুল্যমান অমনি দুল মানায় কি!

তবে এমনি ঝোলান দুলের সঙ্গে টানা সত্যিই সুন্দর মানায়। জড়োয়ার ঝাড়-এর সঙ্গে ঠিক অমনি পাথর বসান চেন তৈরী করান। সোনার চেন-এর নীচে কিন্তু ঝুরির আকারে ঐ পাথরগুলি লটকান থাকবে। কানের লতির কাছে ঐ ঝাড়-এর আঁকড়ার মধ্যে দিয়ে ঐটি গলিয়ে নিন। জরির ছোট্ট রিং করাবেন যাতে ওর মধ্যে গলান যায়। এবার একটু ঝুলিয়ে চুলের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে মাথার পেছনে আটকে দিন। এখানে হুক থাকবে। মাথার দুপাশে থাকবে এই টানা। মুক্তোর ঝাড়ের সঙ্গে মুক্তোর টানা পরুন। এতেও যদি সরু মুক্তো দিয়ে চেন-এর কাজ করালেন আর মাঝে তিনটি করে মুক্তো আলগা রিং-এ গেঁথে অমনি ঝুরির আকারে ঐ মুক্তোর টানার সঙ্গে আটকে আটকে ঝুলিয়ে দিলে সেও ভারী সুন্দর দেখাবে। আবার সোনার কানবালা বা ঝুমকোর সঙ্গেও অমনি টানা পরুন। সোনার চেন-এর সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট চকচকে পালিসের লম্বা লম্বা তেঁতুল পাতার ঝুরির ঝোলান, দেখুন চমৎকার নতুনত্ব হয়।

এই কানের গয়নাও মুখের সঙ্গে মানিয়ে পরবেন। ভারী মুখে গোল বা লম্বা ঝাড় ভালো দেখায়। আর রোগা সরু মুখে চওড়া আর একটু ছোট ঝাড় সুন্দর দেখায়। লম্বা ঝোলান দুলের সঙ্গে দোলান হার ভালো দেখায় না। গলার সঙ্গে লাগান হারই এইরকম দুলের সঙ্গে মানায়।

চিকের মত গলার সঙ্গে লাগান হারেও অমনি তেঁতুল পাতার ঝুরি ঝুলিয়ে নিন। পেছনে জরির বন্ধনী লাগান, সোনাও কম লাগবে, বেশ পোক্ত হবে। বন্ধনীর নীচে মুক্তোর থোকা ঝুলিয়ে দেবেন। অমনি গলার সঙ্গে লাগান চওড়া কুন্দনের নেকলেশও পাওয়া যায়। সঙ্গে কানেও কুন্দনের ঝাড় পরুন। নয়তো আগেকার সীতাহারের ধরনের কয়েক নরী হার শুধু পালিশের চেন আর বড় রঙিন পুঁথি দিয়ে তৈরী করান। সেই সঙ্গে ম্যাচ করা কানের আর ওপর হাতের গয়নাও পরুন। হাতের রিস্টলেটও করান।

গত সপ্তাহে অঙ্গনায় প্রকাশিত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার প্রথম কলমের ফটোটি শ্রীমতী মঞ্জু চুগানীর এবং তৃতীয় কলমের ফটোটি শ্রীমতী মিনি খিংরার।

আজকাল ডান হাতের ওপরে একটি করে গয়নার প্রচলন হয়েছে। তবে সেটি তাগা বা অনন্তের আধুনিক সংস্করণ। এটিতেও নতুনত্ব আনুন। বাজু পরুন। বেশ চওড়া ধরনের কেমিক্যাল স্টোন সেটিং-এর একটি বাজু আর নীচে সরু এক গাছি মীনের চুড়ি খুব ভাল দেখাবে। নয়তো তাবিজ পরুন। সরু সোনার চেন-এর সঙ্গে পুঁথি দিয়ে গাঁথা একটি কি দুটি ঘামি থাকবে মাঝখানে। একেবারে কানের গলার সব এরকম ঐ বড় বড় পুঁথির রং মেলান গয়না খুব ভালো হয়। ওপর হাতের এই গয়না সেকালের চওড়া চুড় থাকলে তাতে কব্জা লাগিয়েও তৈরী করে নেওয়া যায়। তাবিজ গড়ালে তাতেও ঝুরি লাগাবেন গলার গয়নার অনুকরণে, দেখবেন বৈচিত্র্য আসবেই!

আগেকার কালে মাথার খোঁপায় নানা রকম গহনা পরার রেওয়াজ ছিল। মাথার বাগান, লেসপিন সিঁথি, ফুল, চিরুনি পাস চিরুনি, এমনি কত কি! এরই নতুন সংস্করণ করে যদি মাথার কাঁটা তৈরী করেন। ছাতার বাঁটের আকারে ঠেকান হবে কাঁটার ওপর দিকটা আর সেই বেঁকান জায়গায় হবে ফুল—তাতে পাথর বসান। যেন বোঁটায় ধরা হেলান ফুল! এগুলি খোঁপার ওপর লাগানর জন্য। একটিই ডাঁটি হবে এই কাঁটার। নয়তো অর্ধেক চাঁদের আকারে একটি রুপোর বা সোনার পাত, তাতে কারুকার্য করা—এর মাঝখানে একটি কাঁটা, এটি খোঁপার পেছনে পরিয়ে দিতে হয়। কোন কোন দেবীমূর্তির মাথার পেছনে এমনি কবরী-কাঁকন বা কবরী-কঙ্কণ থাকে। গোল খোঁপা বা উঁচু চুড়ো খোঁপার পেছনে আটকে দিলে চুলের প্রসাধনে এক নতুন পারিপাট্য এনে দেবে এটি।

পায়ের আংটি বা চুটকী হল বেহারী মেয়েদের অলঙ্কার। কিন্তু ঘুঙুর গাঁথা চুটকী বড় সুন্দর। প্রতি পদক্ষেপে বেশ মিষ্টি মেয়েলি রিমঝিম একটি সুর তোলে ঐ ঘুঙুর-গাঁথা চুটকী। তা ছাড়াও সুন্দর ছাঁদের চুটকী পাওয়া যায়। পরলে পায়ের শোভা বাড়ে। এছাড়াও এই বেহারী মেয়েরা পায়ে লাচ্ছা বা বিছুয়া। বেশ চওড়া ছিলে কাটা বিছে। মাত্র একটি-দুটি ঘুঙুর থাকে আবার থাকেও না। পেতে বসে পায়ের পাতার। আর আছে নূপুর। এতেও নতুনত্ব আনা যায়। রুইতনের আকারে ছোট ছোট কয়েকটি কবচ গড়িয়ে তাতে পাথর বসিয়ে ডবল রিং-এর চেন দিয়ে আটকে নূপুর তৈরী করালে সুন্দর নতুন ডিজাইনের হবে। ঐ রুইতনের মাঝখানে একটি করে নানা রং-এর বড় বড় কেমিক্যাল স্টোন সেট করিয়ে নেবেন। গোল গোল ফুলের মতও করাতে পারেন। পাপড়িগুলিতে ছেলা কাটা থাকবে—মাঝখানের কেশর হবে পাথর সেটিং-এ। বাজনা ভাল লাগলে ফুলের নীচে ঘুঙুর জুড়ে নিন। অমনি সার-সার ফুল মাঝখানে জোড়া চেন দিয়ে আটকান এই নূপুর পায়ে পেতে বসে থাকলে ভালই দেখায়।

যাঁরা হিল উঁচু জুতো পরতে অভ্যস্ত তাঁদের পায়ের জন্য চুটকীই ভালো। ছোট ছোট চুটকী হলে মাঝের দুটি আঙুলে পরুন। বড় হলে শুধু মাঝের আঙুলে পরুন। আর যাঁরা হিল ছাড়া চটি পরতে অভ্যস্ত তাঁরা অমনি নূপুর পরুন। কিম্বা পায়েল পরুন। বিয়েবাড়ী বা পার্টিতে যেতে হলে পায়ে চরণচাঁদ পরলেও সুন্দর মানায়। পায়ের দশ আঙুলে থাকলে দশটি সুন্দর ছেলা কাজের চুটকী—ঐ সব চুটকীর সঙ্গে চেন আটকান থাকবে আর পায়ের মাঝখানে বেশ কারুকার্য করা একটি থামি, সেই থামিকে ধরে থাকবে একটি নূপুর। গোড়ালির কাছ থেকে ঘুরে যাবে। চওড়া বিছে—এমনি ধরনের চরণচাঁদও হয়।

তবে সবাইকে সব কিছু মানায় না। বয়স আর দেহের গড়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরুচির সঙ্গে সাজ-সজ্জা করলে সহজে আর কারুর পরিহাসের পাত্রী হতে হবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল শালীনতা। এই শালীনতাবোধই এনে দেবে সম্ভ্রম আর সম্মানের পুরস্কার। মহিলাদের সেটিই একমাত্র কাম্য বস্তু হওয়া উচিত। বেশেবাসে আমাদের নিজেকে অমনি আভিজাত্যপূর্ণ ভাবেই তুলে ধরতে হবে। যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শুধু আর সপ্রশংস দৃষ্টিই তুলে ধরে আমাদের দিকে।

—আভা পাকড়াশী

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

উঁনিশ শতকের প্রথম পর্বে রামমোহন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তানায়ক। তাঁর চিন্তা এবং অক্লান্ত কর্মধারা অসামান্য প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। জাড্যগ্রস্ত ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম সচেতনতার সঞ্চার করেন। জাতির জীবনে নতুন চেতনা সঞ্চার রামমোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত; পৌত্তলিকতা নিরোধ, সতীদাহ নিবারণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি রামমোহনের অসামান্য কার্যাবলীর অন্যতম। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে রামমোহনের জীবনী পর্যালোচক এবং রামমোহনের আত্মীয়সভা ও ব্রহ্মসভার উত্তরসাধক, যাঁরা পরে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন এক শ্রেণী সংযোজন করেন, তাঁরা রামমোহনের সকল কর্মকীর্তির মূল প্রেরণার কথা তেমনভাবে প্রচার করতে পারেন নি। এই মূল প্রেরণা তাঁর স্বাজাত্যাভিমান। তাঁর সকল কাজের মূল উদ্দেশ্য মৃতকল্প মৃহ্যমান জাতির দেহে নবপ্রাণ সঞ্চারও তেমন প্রচারিত হয়নি। তিনি কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারক বা সমাজসংস্কারক ছিলেন না, তিনি মুখ্যতঃ ছিলেন রাজনৈতিক সংগঠক।

স্বজাতির ও দেশের পরাধীন অবস্থার গ্লানি রামমোহনকে বিশেষভাবে ব্যথিত করেছিল। রামমোহন তাঁর আত্মপরিচয়পত্রে এক জায়গায় লিখছেন, "ষোড়শ বৎসর বয়সে......বৃটিশ শাসনের প্রতি অতি ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি।" পরাধীনতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীতে যেসব জাতি কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে তারা সব একেশ্বরবাদী। সেই জাতিগুলির মধ্যে এত ধর্মবিভেদ নেই, আবার নিয়মেরও এত কঠোরতা নেই যা ভারতবর্ষে বর্তমান। এখানেই ভারতবর্ষের দুর্বলতা। এই নিয়মের বাঁধনে ভারতবর্ষের প্রতিভার বিকাশ নেই; অসংখ্য গোষ্ঠীর জন্য ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা স্তব্ধ। অথচ রামমোহন দেখলেন যে, এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম-প্রীতি খুবই গভীর। এই ধর্মপ্রীতির জন্য যে কোনও স্বার্থ এমনকি প্রাণও ত্যাগ করতে ভারতবাসী কুণ্ঠিত নয়। রামমোহনের পরে আর একজন মনীষীও ভারতের চিন্তা-মূলে যে ধর্মপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি তা স্বীকার করেছেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। রামমোহন প্রথমেই ধর্মবোধ সংস্কারে মনোযোগ দিলেন একারণেই। হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রে যে সর্বমানবগ্রাহ্য বিশ্বধর্মের প্রবর্তনা আছে তাকেই তিনি জনসমাজে প্রচার করতে চাইলেন।
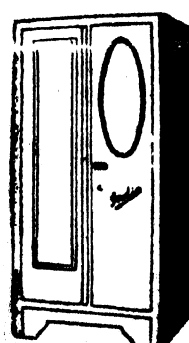
তিনি দেখলেন ভারতবর্ষের জন-সাধারণের এই ধর্মাচরণ প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়েছেন পুরোহিতেরা। তাঁরাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সৃষ্টি করে, পুরাণ রচনা করে, দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় মনোমত গল্প রচনা করে নতুন নতুন গোষ্ঠীতে ভারতবাসী-দের ভাগ করে ফেলেছেন। পুরোহিতরা তাঁদের পান্ডিত্য ও প্রতিভা দিয়ে স্ব স্ব গোষ্ঠীগুলির বিশিষ্টতা বজায় রাখবার জন্য আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়ম ও আচারের বাঁধনে জড়িয়েছেন এবং নানাপ্রকারে নিজেদের ঐহিক লাভের পথকে করেছেন সুগম। সর্ব-সাধারণের সঙ্গে এই মর্মান্তিক প্রতারণার কথা প্রকাশ করবার জন্য রামমোহন অতি সন্তর্পণে এবং সতর্কভাবে অগ্রসর হলেন। প্রথমে তিনি বেদান্তের বাংলা তর্জমা সর্ব-সাধারণের জন্য প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের হিন্দুদের যত মত আছে সবই বেদসম্মত হতে হবে—ভারতবর্ষের সকল ধর্মের এটা মূল কথা। তিনি সেই বেদান্তের বাঙলা তর্জমা করে সর্বব্যাপী সত্য নিরঞ্জন ব্রহ্মের ধারণার প্রচার করতে চাইলেন। বেদান্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখলেন, 'একাল পর্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিয়াছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন। এই হিন্দো-স্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিব-নারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তবে কিরূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আর পূর্বেও পন্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহ না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্র কিরূপে করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম-স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া-ছেন। নব্য আচার্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন।" অন্যত্র লিখছেন, "পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এসকল যত কহি ব্রহ্মের রূপ কল্পনামাত্র।" "বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে ঐ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্বসাক্ষীরূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাহাদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।"

ভারতবর্ষে তখন ইংরেজের রাজনৈতিক প্রসারকাল। ভারতবাসীও তাদের প্রতি মনে মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছে।

প্রাচীন মানবিক ঐতিহ্যমন্ডিত স্মৃতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে একটি হীনমন্যতায়। নতুন পরিবেশে অর্থ ও প্রভাবের লালসায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা ইংরাজের সংগে ঘনিষ্ঠতা করছে। কেউবা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং খৃষ্টান মিশনারীরা অবাধে হিন্দুধর্মের নিন্দা করছে। কতকাংশে হীনমন্যতায় কতক বা চরিত্রগত উদাসীনতায় কোনও পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দু সমাজ-প্রধান কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করছেন না। এইসময়ে ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অথচ ঘরে হিন্দু আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্যই রামমোহন প্রকাশ করলেন 'বেদান্তসার'। তাঁদের মনে আনতে চাইলেন স্বজাতিগরিমা, বোঝাতে চাইলেন বেদ-বেদান্তের ব্রহ্ম-ধারণার বিশ্বজনীনতা। আচারের নিরর্থক দৃঢ়তা এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বৈরীতা দূর করে নতুন দৃষ্টিশক্তির উন্মোচন করতে চাইলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত জাতিকে মেলাবার মধ্যে যে বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব নিহিত আছে—তা' তখন কেন আজও উপলব্ধি হয়নি। পুরোহিতদল বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে রামমোহনকে পাষন্ড, ধর্মসংহারকারী অপবাদে তিরস্কৃত করে নানাপ্রকার তর্ক জুড়ে দিল।

এই বাদানুবাদমূলক অনেক চিঠি পত্রিকায় প্রচারিত হোল। রামমোহনের প্রগাঢ় পান্ডিত্য, শাস্ত্রে অধিকার ও যুক্তির অকাট্যতা সেই সব পত্রোত্তরে অবিসম্বাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাদানুবাদের ফলে সাধারণের মধ্যে রামমোহন একজন হিন্দুদ্বেষী প্রতিমাপূজাবিরোধী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হলেন।

এই বাদানুবাদে মূর্তিপূজা বনাম নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা বিশেষ তর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। মহামহোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র উত্তরে রামমোহন লিখলেন, 'কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এইরূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি শ্রবণ মননেতে আশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেন। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। ....উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা। .... কিন্তু ভট্টাচার্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধিকে (প্রতিমা পূজা, অবতারপূজা, তীর্থ গমন, স্নান, দান ইত্যাদি বিধিকে) সর্বসাধারণে প্রেরণ করেন তথাপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।" রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার প্রচারের লক্ষ্য বিদগ্ধ সমাজ। পুরোহিতকুল তিরস্কৃত হলেন। বিদগ্ধ সমাজ যে পুরোহিতদের সমর্থন করে বা উদাসীন থেকে হিন্দুদের অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পরোক্ষ সাহায্য করেছেন এইখানেই রামমোহনের আপত্তি। প্রতিমা প্রতীকমাত্র। মূল লক্ষ্য পরমাত্মা ব্রহ্ম—এই সত্য যদি বিদগ্ধ সমাজ প্রচার করেন তাহলে সমাজপট পরিবর্তিত হবে। ব্রাহ্ম উপাসনাকে চরম ও শ্রেষ্ঠ মনে করে, বিদগ্ধ সমাজ যদি নির্দ্বিধায় সকল ধর্মের লোকের সংগে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দেন, সমাজে তাহলে ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। শুধু অনেক দ্বন্দ্বের নিরসন নয়, জাতীয় সংহতিও বৃদ্ধি পায়। এমনকি ভারতীয় বা বিদেশী খৃষ্টান ও মুসলমান, যাঁরা একেশ্বরবাদী তাঁরাও এসে যোগদান করতে পারেন। রামমোহনের এই প্রচেষ্টার পেছনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ডিগবীর কাছে লেখা পত্রে :

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest . .. . It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort". (Jan. 3, 1828)

রামমোহনের এই আবেদন মুষ্টিমেয় লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছাল মাত্র। অধিকাংশ লোকই গেল বিপক্ষে। বহুকাল ধরে যে প্রতিমাপূজা হিন্দুরা করে আসছে তার নিন্দাকারী এবং পরোক্ষে মুসলমানের বা খৃষ্টানের ধর্মকে বড় করে দেখাচ্ছেন বলে তাঁকে অভিযুক্ত করা হোল। রামমোহনের যুক্তির অন্তর্নিহিত জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে প্রতিমাপূজার সার্থকতা অসার্থকতার তর্ক বড় হয়ে উঠল। রামমোহন যথার্থই লিখলেন, 'যে কোন মত, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি বৈদিক, একবার ভ্রমেই বা কি যথার্থ বিচারের দ্বারাই বা কি, কথক লোকের গ্রাহ্য হয়। তাহার পর সেই মতের নাশ সম্যক প্রকারে হয় না। সেইরূপ প্রতিমাপূজা কথক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কথক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ-নির্বোধ সর্বকালে হইয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত পৃথকমত পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। বরঞ্চ পূর্বকালে বহুকাল অপেক্ষা করিয়া প্রতিমা প্রচারের অল্পতা ছিল ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোন স্থানের চতুর্দিকে ২০ ক্রোশের মন্ডলীতে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিপ্রায় করি যে ওই মন্ডলীর মধ্যে বিংশতিভাগের একভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমত পাইবেন আর উনিশভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহা দেখিবেন। রামমোহনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতীয় সকল হিন্দু ত' বটেই এমনকি মুসলমান ও খৃষ্টানকে একত্র এক ব্রহ্মউপাসনায় সমবেত করে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করা। তাঁর জীবিতকালে সে সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত।

কেরীর 'সমাচার দর্পণ' এই সুযোগে হয়ত রামমোহনের প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ সমর্থনের ভরসায় হিন্দু ধর্মের ও ধর্মাচারের নানাদিক নিয়ে নিন্দা ও উপহাস করে প্রশ্ন ও আলোচনা উপস্থাপিত করতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ-পন্ডিত ও সমাজপ্রধানরা রামমোহনের ঐতিহাসিক দিকনির্দেশকে উপেক্ষা করে তাঁকে পাষন্ড হিন্দুধর্মসংহারক বলে গালি দিয়ে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিলেন তাঁরা কেউ 'সমাচার দর্পণে'র ঐ সব প্রশ্ন প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দিলেন না। বা দিতে ভরসা পেলেন না। স্বজাতিগরিমা বা স্বধর্মপ্রীতি কাউকে উদ্বুদ্ধ করল না। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার সমর্থন, হিন্দুধর্মের সত্যতা প্রতিষ্ঠা ও খৃষ্টান ধর্মের সম্পরিমাণ না হোক, সমধারায় যে কালক্রমে আবিলতা এসেছে তা দেখবার জন্য লেখনী

ধারণ করলেন তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু রামমোহন। অবশ্য উত্তরগুলি শিবপ্রসাদ শর্মা নামে লিখিত। উত্তরগুলি এত যুক্তিপূর্ণ ও অকাট্য যে 'সমাচার দর্পণ' তা সর্বাংশে ছাপতে রাজী হয় নি। কিন্তু তাতে রামমোহনকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হোল না। প্রেসের অভাব সৃষ্টি করে বাধা দেওয়া গেল না। তখনকার দিনে যখন আর কোন প্রেস ছিল না সেই সময়ে রামমোহন অকাতরে অর্থব্যয় করে এবং অভূতপূর্ব শ্রম ও যত্ন দিয়ে ছাপাখানা বসালেন। সেখান থেকে ব্রাহ্মণ সেবধি বা Brahmianical magazine, "The Missionary and the Brahmin" নামে সাময়িক পত্রে প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। তিনি লিখলেন, গর্বভরে লিখলেন 'ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্তি না হয়েন। যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য এ অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নহে।... আপনি যে কটূক্তি করিয়াছেন যে 'মিথ্যার পিতা যাহা হইতে হিন্দুর ধর্ম উৎপত্তি হয়' আর 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন সকল,' 'হিন্দুর মিথ্যা দেবতা সকল' সাধারণ ভব্যতা এ' সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের জানা কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম-সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি পরস্পরা দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই। প্রতিমাপূজার সমর্থনে ঐ প্রবন্ধে তিনি লেখেন 'পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকাররহিত কহেন। পুরাণের অধিক এই যে মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবেক কিম্বা দুষ্কর্মে প্রবর্ত হইবে অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্বদা গ্রহ হয় তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ হয় পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞান সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধান পূর্বক কহিয়াছেন এ' সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দবুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম। বস্তুত পরমেশ্বর নামরূপহীন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়ভোগ রহিত হয়েন।......নির্বিশেষং পরম ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বর। যে মন্দাস্তেঽনুকল্পতে সবিশেষ নিরূপণৈঃ।।' তিনি বলেন যে 'মিশনারীরা তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বেদবিরুদ্ধ শিষ্টের অসংগৃহীত পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন ভাষাতে করিয়া হিন্দুর ধর্ম অতি কদর্য তাহাই সর্বদা প্রকাশ করেন।' 'মিশনরী মহোদয়দের বিনয় পূর্বক জিজ্ঞাসা করি—যে মনুষ্যরূপবিশিষ্ট যিশুখৃষ্টকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না; আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিশুখৃষ্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ ও হস্তাদি কর্মেন্দ্রিয়ের ভোগ উহারা মানেন কি না এবং ... তাঁহারা আহারাদি ছিল কি না ...... সাক্ষাৎ কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি গোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আবির্ভাবের দ্বারা যিশুখৃষ্টকে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না। যদি এ সকল স্বীকার করেন তবে পুরাণের প্রতি দোষ দিতে পারেন না।' অপর এক স্থানে মিশনারী লেখকদের যীশুখৃষ্টের উপাসনা বা তাঁর দেহাতীত চৈতন্যের উপাসনা বিষয়ে লিখেছেন, 'হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারা কি আপন আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্যরহিত দেহকে উপাসনা করেন এমৎ কদাপি নহে। যে সকল মূর্ত্তি তাঁহারা নির্মাণ করেন তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন না যাবৎ যে সকল মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসনা করেন। অতএব আপনকার লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের প্রয়োগ করা যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতন্যরহিত শরীরের উপাসনা করেন না।'

প্রতিমাপূজা বিষয়ে রামমোহনের নির্বিকল্প বিদ্বেষ ছিল না এই কথাই প্রমাণ হয়। তিনি প্রতিমাপূজার সমর্থনেও যুক্তি দেখিয়েছেন। 'কিন্তু যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহাদের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য উহারি প্রচার করাইতেছেন যেহেতু প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি মাহাত্ম্যে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষ্যে তাহাদের যে লাভ তাহা সর্বত্র বিখ্যাত আছে।' রামমোহন এদেরই ভন্ড প্রতারক হিন্দুধর্মের মর্যাদা হন্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি সর্বসাধারণকে ডেকে বলেন, 'এই সব ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র। ইহাই নিশ্চয় কর। তোমরা বুদ্ধিকে ও বিবেচনাকে দূরে রাখ। আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান। আমার তুষ্টির জন্য সর্বস্ব দিতে পার ভালই, নিদান তোমার ধনের অর্ধেক আমাকে দাও। আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।' রামমোহনের মতে এরাই আপন আপন স্বার্থপরিপূরণের জন্য সর্বসাধারণকে এইভাবে ভুলিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীপূজক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে জাতিকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই জাতিকে স্বমহিমায় ও স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার উপায় হিসাবেই রামমোহন মূর্ত্তিপূজার প্রাধান্য কমাতে চেয়েছেন—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তা না হলে মিশনারীদের নিন্দা কুৎসার দৌরাত্ম্যে তিনি বিচলিত হতেন না, বরং সমর্থনই করতেন। একদিকে রামমোহন তাঁর স্বজাতির প্রাচীন জ্ঞান সমৃদ্ধির জন্য যেমন গর্বিত ছিলেন তেমনি পরাধীনতার জন্য দুর্বহ গ্লানি বোধ করতেন। তাই তিনি লিখছেন, 'এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।'

রামমোহনের দৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি সংস্কার বা নতুন সমাজ গঠন বা হিন্দুধর্ম সংস্কারে আবদ্ধ ছিল না. উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্বোধন এবং মৃতকল্প জাতিতে নতুনপ্রাণ সঞ্চার—ঐ কথা অস্বীকার করা যায় না।
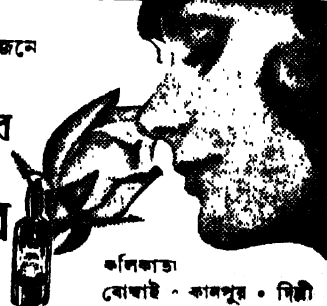
(প্রশ্ন)

১। ভারতে স্বর্ণখনি কয়টি ও কোথায় কোথায়?

২। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় যাদুঘর ও গীর্জার নাম কি?

৩। প্রাক্তন ক্রিকেটার ফ্রাঙ্ক উলী এবং নীল হার্ভের টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিং গড় কত?

৪। পৃথিবীর মধ্যে কোন সাপ সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত।

রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও
প্রভাতকুমার মুখার্জি
পোঃ, গ্রা—মালিহাটি.
জেলা—মুর্শিদাবাদ।

●

(১) ভারতের শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড কে?

(২) ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কে? তাঁর সর্বাধিক রান সংখ্যা কত?

লালমোহন ঘোষ, অরুণারাণী ঘোষ।
তালপুকুর, পার্ক রোড,
২৪ পরগণা।

●

ইনস্টিটিউট অব হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ থেকে জাতীয় নেতাদের জীবনী সংগ্রহ সংকলিত করা হচ্ছে। এই সূত্রে আমি নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছি। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেউ আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন বাধিত হবো।

অমিয় বরাট,
কেন্ডারডাইন লেন,
কলকাতা—১২।

●

১। রামতনু লাহিড়ী, কান্তবাবু, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বটকৃষ্ণ পালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে চাই?

২। বাঙলাদেশে টেলিফোন ব্যবস্থার প্রচলন হয় কোন সালে?

৩। কোন লেখক একাধিকবার রবীন্দ্র-পুরস্কার বা আকাদামি পুরস্কার পেয়েছেন কি?

৪। বাঙলাদেশে মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকার নাম কি?

সুতপা চৌধুরী
কলকাতা-৯

●

(উত্তর)

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত জগদীশ চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (৬) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রথম ভারতীয় ডাক্তার হচ্ছেন শ্রীমধুসূদন গুপ্ত।

৪৮শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্তের (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে বিমলকান্তি সেন যে উত্তর দিয়েছেন তা ভুল। ১৯৩০ নয়। ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬-২৫ মিনিটে ত্রিবান্দ্রমের নিকট থুম্বা রকেট ঘাঁটি থেকে ভারতের প্রথম সাউন্ডিং রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়।

৪৯শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত মান্তু দাশগুপ্তার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (ক) ১৮৯৯ খৃঃ ৩০ মে কলকাতা শহরে তথা বাংলাদেশে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। (খ) ভারতের বাহিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া, ইংলণ্ড, সুইডেন, আমেরিকা, জার্মাণী, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। (গ) জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন প্রাক্তন মার্কিণ প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন। ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত মিনতি মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (ঘ) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবি টি এস এলিয়ট-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা তার মৃত্যুর পূর্বে তিনি রচনা করেছিলেন, কবিতাটির নাম হচ্ছে—(সুইট টেমস সুইট......।)

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত শ্যামল সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে,—(ক) সুমাত্রা দ্বীপের বন্য র‍্যাগলেসিয়া আরগলডি নামে এক রকম ফুলই হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ফুল। ফুলগুলির ব্যাস দুই হাত। (গ) সূর্য-রশ্মি পৃথিবীতে আসবার সময় তড়িৎ অনুযুক্ত বায়ুস্তর এবং বাতাসের ধূলিকণা নীল বর্ণের আলোকে বিক্ষিপ্ত করে। এর ফলে আকাশ নীল দেখায়।

রাহুল বর্মন,
৬, রামনগর রোড,
আগরতলা, (ত্রিপুরা)।

●

১৩।৩।৬৭ তারিখের অমৃতে জানাতে পারেন বিভাগে আমার দেওয়া একটি উত্তরে একটি মারাত্মক ছাপার ভুল চোখে পড়ল। ছাপা আছে ময়সাঁ ক্লোরিন আবিষ্কার করেছেন, পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক ময়সাঁ ক্লোরিন আবিষ্কার করেন নাই। করেছিলেন ফ্লোরিন। আমার প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাস্য ছিল ফ্লোরিন প্রস্তুত কারকের নাম।

গত ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী শিখা ও মান্তু দাশগুপ্তের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে পৃথিবীর বৃহত্তম নগর বর্তমানে 'টোকিও'। ১৯৫৭ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ আমেরিকায় অবস্থিত। এর মোট দৈর্ঘ্য ২১৯০৬৭ মাইল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেল স্টেশন নিউইয়র্ক এবং গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাস। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানক্ষেত্র ইংলণ্ডের 'ক্রয়ডন' শহরে অবস্থিত। (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই দৈর্ঘ্যে ভারতীয় রেলপথকে পৃথিবীতে পঞ্চম পর্যায়ে ফেলা চলে। ভারতীয় রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৬০০০ মাইল। ৩৭ সংখ্যায় শ্রীশৈলেন্দু মজুমদার ও শ্রীচঞ্চল মজুমদার-এর (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই ফ্রান্সের গোপ সিলভেস্টার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে ঘড়ি আবিষ্কার করেন।

৪১ সংখ্যার শ্রীসন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীমতী সান্ত্বনা গুপ্তার প্রশ্নের উত্তর জানাই 'এ-এ-এ' কথাটির পুরো কথা হল 'অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস অ্যাসোসিয়েশন, ডি-ডি-ডি কথার পুরো হল ডাট, ডিকার্ট ডোডিক্যার্ট, ডি-ডি-টি কথাটির পুরো হোল ডাইক্লোরো-ডাইফেনিল-ট্রাইক্লোরোথিন। এই সংখ্যায় জগদীশ চক্রবর্তীর শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে পৃথিবীতে মোট কতগুলি ভাষা আছে তা বলা শক্ত। তবে ১৯৫৬ সালের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এস এস কালবার্ট এর হিসাবে বলেন যে, পৃথিবীতে মোটামুটি ৩৪২৪টি ভাষা প্রচলিত আছে। কম করে ১০ লক্ষ লোকে ব্যবহার করেন এমন ভাষার সংখ্যা প্রায় ১৩৫টি। এই ১৩৫টি ভাষার ভিতরে ভারতের ১৪টি জাতীয় ভাষাই ধরা আছে। পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হিসাবে ১৯৫৬ সালে প্রফেসর কালবার্ট যে হিসাব দেন তাতে দেখা যায় যে চীনা ভাষা পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত, ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ লোকে এই ভাষা ব্যবহার করেন। বর্তমানে এই সংখ্যা অবশ্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে,

সোমনাথ নিয়োগী, কলকাতা-৪।

●

গত ৫০শ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত দিলীপকুমার বৈরাগোর ১ম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ভারতে বর্তমানে একটিই মাত্র টেলিভিসন কেন্দ্র আছে এবং সেটি দিল্লীতে অবস্থিত। অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও টেলিভিসন কেন্দ্র স্থাপনের কথা আছে। ২য় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ১৯২০ সালে সারে বনাম নর্দাম্পটনশায়ারের খেলায় পি-জি এইচ ফেন্ডার মাত্র ৩৫ মিনিটে শত রান করেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে এইটিই সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরী। ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে জানাই, নয়াদিল্লীস্থিত শীলা থিয়েটারই ভারতে সর্ববৃহৎ সিনেমা হল বলে গণ্য হয়।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীরকুমার দাশের ২য় প্রশ্নের উত্তরে জানাই ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার মাত্র ১ জন বিজ্ঞানী রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি হলেন নিকোলাই সেমেনেভ। ১৯৫৬ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী সিরিল হিনশেলউডের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে এ পুরস্কার লাভ করেন।

বিমলকান্তি সেন.
ইনসডক.
দিল্লী-১২।

●

গত ৫০শ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়ের (১) প্রশ্নের উত্তরে জানাই ১৭৮৬ খৃঃ ইতালীর অন্তর্গত বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ গ্যালভানিকে ব্যাঙ নাচান অধ্যাপক বলা হত।

শিপ্রা রায়,
রাজা সুবোধ মল্লিক রোড,
কলকাতা—৪৭।

[উপন্যাস]

।। ছয় ।।
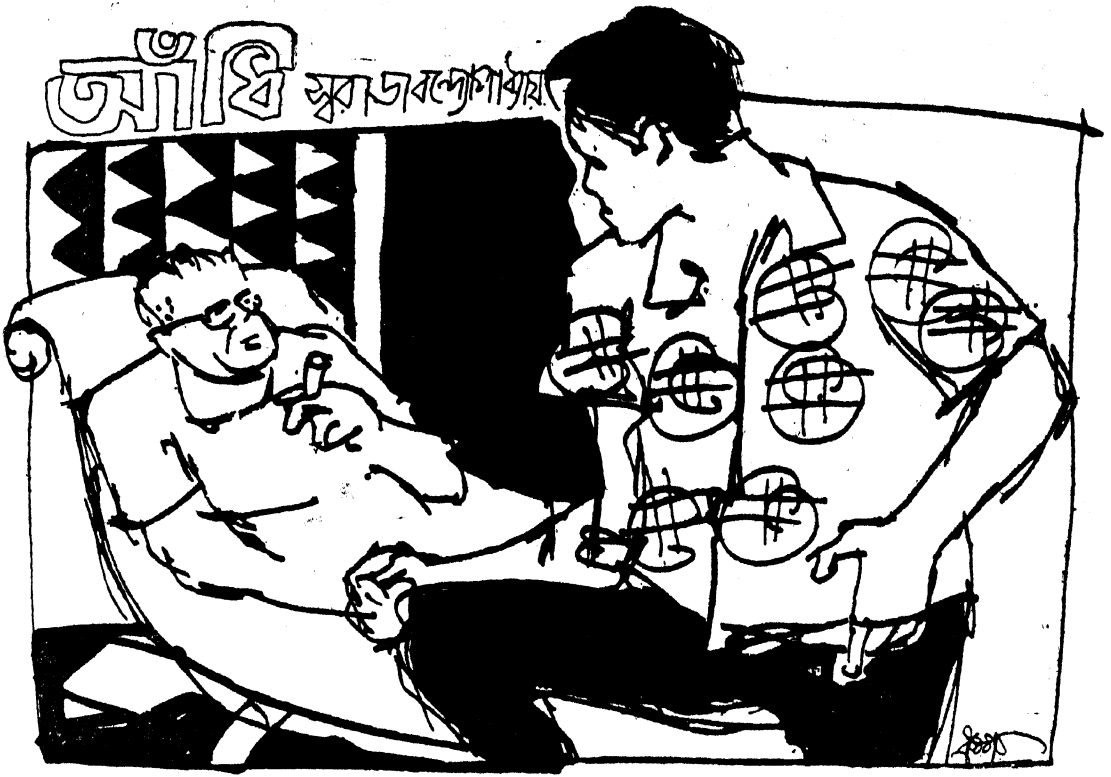
পরদিন সন্ধ্যায় গয়না টাকার সুটকেশটা নিয়ে দত্তবাড়িতে গিয়েছিল দীপু, না গিয়ে পারেনি। নিরঞ্জন দত্তর অদ্ভুত ব্যবহারে ও কিছুটা মুগ্ধ হয়েছিল। সে ভেবেছিল শানে নিরঞ্জন দত্ত তার সঙ্গে মালার বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে কিনা! হতেও পারে। কথাবার্তায় তো তেমন মেজাজ দেখা গেল না। তেমন কোন আক্রোশ বা রাগ দেখতে পেল না দীপু।

বেশ কিছুটা আশান্বিত হয়ে সুটকেশ নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকেছিল দীপু।

শাদা কাঁচের গোলক ভেদ করে ঘরে আলো তেমন উজ্জ্বল হতে পারছে না। পাণ্ডুর ফ্যাকাশে আলোর নীচে মস্ত চৌকি পাতা। তার ওপর সতরঞ্চির চাদর। মস্ত একটা কাঠের ইজি-চেয়ারে আধশোয়া হয়ে নিরঞ্জন দত্ত চুরুট টানছেন। ভুঁড়ির ওপর কাঁচা-পাকা চুল। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ভুঁড়ির ওঠানামা। নিস্তব্ধ থমথমে ঘর।

চৌকির ওপর বসে দুটো কেঁদো ছেলে দীপুর দিকে কটমট করে তাকাল।

সুটকেশটা নামিয়ে রাখতেই একটা ছেলে উঠে সুটকেশটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

দীপু চুপচাপ চৌকির ওপর বসল।

কিছু সময় পরে ছেলেটা আবার ফিরে এল।

নিরঞ্জন দত্ত গম্ভীর চোখ তুলে তাকাল। —একটা কথা দিতে হবে তোমাকে।

দীপু সোজাসুজি তাকাল নিরঞ্জন দত্তর দিকে। —বলুন।

—আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও। আমার বাড়ির কাছাকাছিও তুমি আসবে না, কথা দিতে হবে।

ঠিক এই ধরনের একটা অনুরোধের জন্যে দীপু প্রস্তুত ছিল না। ও প্রথমে অবাক হোল, পরে কিছুটা ক্ষুব্ধ হোল।

—সে কি করে হয়। আপনি কি বলছেন!

—ঠিকই বলছি। কথা দাও আমাকে।

দীপুর মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল। প্রচণ্ড রাগ আর ক্ষোভ চেপে আস্তে আস্তে বললে—এক হাতে কি তালি বাজে স্যর!

নিরঞ্জন দত্ত অবাক হয়ে তাকাল। এ ধরনের উত্তরের জন্যে সেও প্রস্তুত ছিল না।

আগে ঘর সামলান। আপনার মেয়ে আমাকে না ছাড়লে আমি কি করে ছাড়ব? এক হাতে কি তালি বাজে? কথাটা বুঝে দেখুন।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে নিরঞ্জন দত্ত বললে—বুঝে আমি দেখেছি। আমার মেয়ে ঘৃণা করে তোমাকে।

—এসব আনসান কথা কেন বলছেন! ডাকুন আপনার মেয়েকে।

এমনি করে কথায় কথায় তর্ক করে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল।

নিরঞ্জন দত্ত সেদিন অবাক হয়েছিল। ছেলেটাকে সে যত নরম যত ছেলেমানুষ ভেবেছিল, তা নয়। টান-টান পাতলা চেহারা। চোখে-মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটুও ভীত সংকুচিত হয়নি। একে খুব সহজে নোয়ান যাবে না। স্টেনলেস স্টিলের মত ঝকঝকে অনমনীয়। কথায় কথায় ছুরি চালাতে জানে। নিরঞ্জন দত্ত শুনেছিল, বোমা ছুঁড়তে নাকি ছোকরা ওস্তাদ। খুব সহজে এর সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।

অনেক ভাবতে হয়েছিল নিরঞ্জন দত্তকে। বুদ্ধি এবং বল দুটোরই আশ্রয় নিতে হবে।

বলেছিল পরের দিন সন্ধ্যায় আসতে মালার সঙ্গে দেখা হবে। মালাকে দিয়ে তাড়াতে হবে ছেলেটাকে। এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

হয়তো এই ধরনের ভাবনাই নিরঞ্জন দত্ত ভেবেছিল। দীপু যতদূর আন্দাজ করতে পারে, এর চেয়ে বেশী কিছু—ভাবতে পারেনি নিরঞ্জন দত্ত।

আজ সন্ধ্যায় আবার গিয়েছিল দীপু। দত্তবাড়ির সামনে এ মহল্লার খলিফা জাপুকে দেখে চমকে উঠেছিল। তবে কি তাকে মার দেবার বন্দোবস্ত করেছে নিরঞ্জন দত্ত?

না, তা নয়। মালা এল। মালার সঙ্গে তার দেখাও হোল।

মালা তাকে বলে বসল—ইতর, ছোটলোক!

এর চেয়ে যদি নিরঞ্জন দত্ত তার পেটে একটা পুরো গজ ভুঁসিয়ে দিত, তাও ভাল ছিল। মালার কথাকটি তার চেয়েও সাংঘাতিক, তার চেয়েও ভয়ংকর।

মালা তাকে এমন কথা বলতে পারল! অবাক হোল, স্তম্ভিত হোল, দগ্ধ হোল দীপু।

ভয় কাকে বলে ও কোনদিন জানত না, আজ সন্ধ্যায় ও প্রথম ভয় পেল।

ওর সব রোয়াব, সব কথা ভাসিয়ে দিল মালা।

এক হাতে কি তালি বাজে স্যর?

নিরঞ্জন দত্ত প্রমাণ করে দিল। এক হাতেই তালি বেজেছে। তার মেয়ে দীপুকে ঘৃণা করে।

ছোটলোক, ইতর!

কথা দুটো যেন দুটো পেটো অথবা বোমার মত বিস্ফোরিত হোল। তার ভেতরটা ভেঙে চুরে চুরমার করে দিল। দিল জখম কাকে বলে ও আজ প্রথম জানতে পারল।

এর চেয়ে যদি নিরঞ্জন দত্ত জাপুকে দিয়ে তাকে আড়ং ধোলাই দিত, তাকে পুলিশে দিত, তার কিছু বলার ছিল না। সে লড়বার চেষ্টা করত, সহ্য করবার চেষ্টা করত। কিন্তু মালা তার চেয়েও ভয়ংকর জখম করেছে তাকে। সে আজ রাত্রে ঘুমোতে পারছে না। তার এতদিনের জীবনের সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে। তার বুকটা চেপে ধরে কে যেন আখ নেংড়াবার মত নিংড়োচ্ছে।

তার এতদিনের অভ্যস্ত মস্তানী আর কোন কাজে লাগছে না। কোন লাভ নেই। নিরঞ্জন দত্তকে ছুরি মেরে কোন লাভ নেই। মালার মুখে অ্যাসিড বালব ছুঁড়ে মেরেই বা কি লাভ?

মারবে নাকি?

অন্ধকারে উঠোনে পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল দীপু।

মারবে নাকি অ্যাসিড বালব?

যে মুখে সে দীপুকে ইতর ছোটলোক বলেছে, সে চাঁদমুখখানা দোব নাকি জীবনের মত পুড়িয়ে, কদর্য করে।

হাতদুটো মুঠো করে জোরে চেপে ধরল।

ইচ্ছে করলে সে কালই টোনা অথবা ধনাকে দিয়ে অ্যাসিড বাল্ব ঝাড়তে পারে। মালা যখন স্কুলে যাবে, সেই পথে ওদের মধ্যে যে কেউ অব্যর্থ টিপে তার মুখে ঝাড়তে পারে অ্যাসিড বাল্ব। জীবনের মত দগ্ধ হয়ে যাবে তার রূপ, তার দেমাক।

অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবতে-ভাবতে বুকটা ওর ধড়াস-ধড়াস করছিল। ও ধীরে-ধীরে ঘরে চলে এল।

বড় তেষ্টা পেয়েছে। ঘরে জল নেই। জল বাইরের ঘরে থাকে না। যাক, কোথায় আবার জল খেতে যাবে। পাক তৃষ্ণা পাক। বুক জ্বলে যাক।

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল দীপু।

শালা নেমকহারাম মেয়েমানুষ!

চোখের দু কস বেয়ে জল গড়াল। অন্ধকার ঘরে নির্লজ্জের মত কাঁদতে লাগল মস্তান। দুর্দান্ত মস্তান দীপু কাঁদছে। এ কান্নার সাক্ষী কেউ নেই। তাই লজ্জা নেই। সংকোচও নেই।

মা মরবার পরেও এত কাঁদেনি দীপু। আজ সেই মরা মায়ের জন্যে কাঁদছে।

অনেকটা সময় কাঁদতে হোল তাকে।

কেন কাঁদতে হোল, কি জন্যে যে কাঁদল, কিছু বুঝতে পারল না দীপু।

মরা মায়ের চোখদুটো মনে পড়ল। শুকনো লিচুর মত দুটি চোখ। মায়ের মৃত্যু সময়ে পাশে বসেছিল সে। মরবার আগে মা দীপুর দিকে একবার তাকিয়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে দীপুর সে চোখদুটো বিষণ্ণ মনে হয়েছিল। ভোরের কুয়াশার মত বিষণ্ণ ভাবনায় ভার। ভাবনাটা যে কার জন্যে দীপু জানে। ওর জন্যেই ভাবনা। মায়ের মমতা-ভরা মস্ত মস্ত চোখদুটো ওর দিকে তাকালেই বিষণ্ণ ম্লান হয়ে উঠত। মা যেন ওর জন্যেই ভাবত বেশী। মা কি জানত যে তার আজ এমনি একটা ভয়ংকর অবস্থা হবে? কে জানে, বোধহয় মা তার ভবিষ্যৎটা টের পেত।

মোটা ছোটখাট মানুষটি বড়বড় দুটো চোখ। মায়ের কথাটা কে জানে কেন এই গভীর স্তব্ধ রাত্রে বারবার মনে হয়। মা থাকলে সে বোধহয় এমন হোত না আজ। কেউ তার মন ভেজাতে পারে নি, কিন্তু মায়ের চোখের জল বোধহয় তার সব ভিজিয়ে দিত, সে এমন হতে পারত না।

এই একটা মাত্র মানুষের কাছে সে দুর্বল ছিল, শিশুর মত কোমল ছিল। মা মরে যাবার পরে দিন-দিন তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠতে লাগল। দিন-দিন সে বদলে যেতে লাগল। মায়া-দয়া কিছু রইল না। মা মরে গেল, আবার মায়া কার জন্যে। ভেতরটা কাঠ হয়ে গেল। কেন? বোধহয় তৃষ্ণায়। একবিন্দু ভালবাসা একটুও মমতা আর তার জন্যে অবশিষ্ট ছিল না। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়েও যেন ক্ষেপে গেল সমস্ত সংসারটার ওপর। ওকে ভেজাবার কেউ ছিল না, একটু জল দিয়ে ঠান্ডা করবার কেউ ছিল না।

বাবা বরাবরই বড় বেশী নিস্পৃহ। ছেলেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব কম। শুধু টাকা এনে খালাস। হৃদয় বাবার ছিল না তা নয়, কিন্তু কোথায় কার জন্যে যে সেটা লুকোন ছিল, কে জানে।

প্রথম-প্রথম যখন বদনচাঁদের সাকরেদ হয়ে ও মারপিট করে বেড়াত, তখন ওর নামে দু-চারবার বাবার কাছে নালিশ এসেছিল। বেশ মনে আছে দীপুর। বাবা ওদের পড়ার ঘরে এসে দীপুর দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছিল—তুমি নাকি ক্লাসের একটা ছেলেকে মেরেছ? এ সব কি ভাল?

ব্যস, আর কোন কথা নয়। দীপু চুপ করে রইল। পরের দিন ইস্কুলে গিয়ে যে ওর নামে তাদের বাড়িতে বাবার কাছে নালিশ করতে এসেছিল, তাকে খুঁজে বার করে, আলু-কাবলি খাইয়ে একটা গলির ভেতর টেনে নিয়ে বেদম মার মেরেছিল। ছেলেটা মার খেতে-খেতে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছিল, বলে উঠেছিল, তোর পায়ে পড়ি, আর করব না।

না, একটু মায়া হয় নি দীপুর। মারতে-মারতে মারের ঝোঁকটা যেন আরও বেড়ে যায়। আরও প্যাঁদাতে ইচ্ছে হয়, বেশ একটা আনন্দ লাগে মার দিতে। মার দেবার স্ফূর্তিটা তাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল।

তখন যদি মা থাকত, মা যদি শুনত, সে একটা ছেলেকে ধরে বেদম মার মেরেছে। আর ছেলেটা অসহায় দুটো চোখ মেলে হাউ-মাউ করে কেঁদেছে। তবে মা কেঁদে ফেলত, ওই ছেলেটার জন্যেই কেঁদে ফেলত, —আহা রে, অমন করে মানুষটাকে মারে! তোকে যদি কেউ অমন করে মারত?

দীপু চৌকির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে অন্ধকার ঘরে একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে। চোখের দু কস বেয়ে জল গড়ায়। মায়ের চোখদুটো যতই মনে পড়ে, ততই তার চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

মা যদি তাকে বলত, তুই ইতর ছোট-লোক হয়ে গেলি দীপু?

মা বলে নি, কিন্তু মালা বলেছে। একই কথা বলেছে। অন্য কেউ বললে সে শিস দিয়ে কথাটা অক্লেশে উড়িয়ে দিতে পারত। বেশী বললে তার মাথায় একটা চাঁটা মেরে বলতে পারত, আবে চোপ!

কিন্তু মা বললে পারত না। তার বুকে গিয়ে কথাটা বিঁধে যেত, আর মালার মুখে কথাটা শুনে সে কোনমতে উড়িয়ে দিতে পারছে না। জোর করে মনে-মনে হেসে বলে উঠতে পারছে না—সে ছোটলোক হবে, ইতর হবে, আলবৎ হবে। নরক গুলজার করে ছাড়বে সে।

না বলতে পারছে না। মনে-মনে হাসতে পারছে না। যে জায়গাটা থেকে হাসি ওঠে, সে জায়গাটা যেন জখম করে দিয়েছে।

লতু একবার বলেছিল। পড়ো বস্তির লতু। শ্যামলা রঙের ছিপছিপে মেয়েটা। বয়েস ষোল না ছাব্বিশ বোঝবার উপায় নেই। এগারো বছর বয়েসে নাকি ওর বিয়েও একবার দিয়েছিল। বিয়ের বছর খানেকের ভেতর বরটা পটল হয়ে গেল। লতু নিজে কখনো এ সব বলে নি, দীপু শুনেছিল ময়নামাসীর মুখে।

রোয়াকে বসে বিড়ি টানছিল দীপু। ময়নামাসী তার পোষা টিয়া পাখী চান করাচ্ছিল কলতলায়। পেতলের দাঁড়টা ছাই দিয়ে ঘসতে-ঘসতে বলেছিল, আর বলো নি বাবা ওর কথা! এগারো বছর বয়েসে বে দিলে বারোয় পড়তে-না-পড়তে সিঁথির সিঁদুর মুছে ঘরে এল। বে'র মম্ম ও কি জানে বলো? মাছওলাকে বয়ু, মেয়ের আবার বে দাও। তা মুখপোড়া কথা শোনে না। বলে, পয়সা কোতায়! আসল কতা কি জান, যখন বে দেছল, তখন ওর মা ছেল। মাটা মরে যেতে মিনসে মেয়েকে আর বে দিতে চায় না। বে দিলে রোজ তার পিণ্ডি রাঁধবে কে?

দীপু বিড়িটা শেষটান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ময়নামাসী চোখ মটকে বলে, তোমায় ভয় নেই ধন। ও আর বে করবে না।

মোটা-মোটা ঠোঁটের ফাঁকে ময়নামাসীর মিসি-দেয়া কাল দাঁত দেখা যায়। আট আনা পয়সা দিতে পারবে ধন? কাল দিয়ে দোব?

দীপু পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে ছুঁড়ে দেয় সামনে।

এঃ। একেবারে ছাইয়ের ভেতর দিলে?

ছাইয়ের গাদা থেকে আধুলিটা তুলে কলের জলে ধুয়ে টিয়ার দাঁড় নিয়ে ঘরে যাবার আগে দীপুর দিকে তাকিয়ে হেসে আবার বলে ময়নামাসী, আমি বাড়িউলী, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, যখন খুশী সখ ফুর্তি করো। তবে হ্যাঁ মেয়েটাকে একটা নীল পাথরের নাকছাবি দিও। ওর বড় সখ।

দীপু বলে, নীল পাথর মানাবে না মাসী, লাল পাথরে মানাবে।

তবে তাই দিও। যৈবন বয়েসে একটু সোনাদানা পরতে সখ আহ্লাদ হয়, বুঝলে না?

দীপু বুঝল। ময়নামাসীকে 'নাক' পনেরো টাকা দিয়ে একটা নাকছাবি গড়িয়ে দিয়েছিল দীপু। মাসী পনেরো টাকা খরচা করে নি নিশ্চয়, টাকা দুয়েক গেঁড়িয়েছিল। যা হোক নাকছাবিটা বেশ ভালই হয়েছিল।

দীপু বলেছিল, ওর বাপের কাছে আমার নাম বল না মাসী। বলবে তুমি দিয়েছ।

মাসী খুক-খুক হেসে উঠেছিল, সে আর বলতে হবে না ধন। এ সব কম্ম আমায় শেখাতে হবে নি।

লতু জানত, দীপুই নাকছাবিটা দিয়েছে। ওর বাপ জানত, ময়নামাসী।

তখন লতুটার ওপর কি ঝোঁকই না ছিল দীপুর।

কত দিন কোনাকে দিয়ে এক সের মটর মশলা তেল আনিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে লতুর কাছে। ভাল করে ঘুগনী করে পাঠাতে হবে। আর কিছু পেঁয়াজী। সন্ধ্যের আগে চাই। সন্ধ্যে থেকে আজ ওদের মদ চলবে। দুটো বোতল দিয়ে গেছে এক ব্যাটা ভেড়ুয়া। পানসী চলবে আজ। দিল-দরিয়া হয়ে যাবে।

—পারব না রাঁধতে।

কোনা একটা হাত তুলতে গিয়ে সামলে নেয়। ঝাপড় কসালে আবার গুরু চটবে।

ফিরে এসে দীপুকে বলে দেয়।

দীপু তিন তাসে হারছিল তখন। মেজাজটা ছিল বোম হয়ে। এক ঝটকায় পাড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে বস্তির ভেতর ঢোকে। লতুদের ঘরের কাছে গিয়ে পকেটে হাত রেখে দাঁড়ায়।

লতু ঘরের সামনে ছোট্ট দাওয়াটায় বসে পচা মাছের চচ্চড়ি করছিল। বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে। মাছ সওদা করে বেছে বেছে নরম মাছ নিজের ঘরে পাঠিয়ে দেয়, ভাল মাছ মোটা দরে বেচে।

দীপু দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, কি বলিচস তুই কোনাকে।

লতু ভয় পাবার মেয়ে নয়। ময়লা রঙ হলেও মুখখানি বেশ কাটা-কাটা। টিকোল নাক, চিবুকটি সরু, দেহখানা ছিপছিপে কিন্তু বুক আর নিতম্ব ভারী। আঁটসাট দেহখানা ঝাঁকানি দিয়ে ফিরে তাকায়।

দীপুর ভুরুদুটো কুঁচকে উঠেছে।

লতু একটুও ভয় পায় না। গলায় বেশ ঝাঁজ এনে বলে, কি আবার বলব, যা বলেচি শুনেই তো এসেছ।

—মেলা ভির্টাকিলি করবিনি লতু। শালা কোনদিন খতুরা হয়ে যাবি।

লতু ফিরে তাকায়। চোখদুটো যেন শুকনো ছুরির ফলা। ঝিকঝিকিয়ে ওঠে।

—পারব না। মদের চাট জোগাতে পারব না আমি।

চাপা গলায় তর্জন করে ওঠে দীপু, তোর বাপ পারবে। ফিন তেরিমেরি করলে তোর রান্নার হাতখানা কেটে দু খানা করে দোব। চিনিস না আমাকে?

লতু খুন্তি সমেত হাতখানা বাড়িয়ে বলে ওঠে, কাটবে তো কাট না? লাও, হাত ধরো।

দীপু কটমট করে তাকায়। দাওয়ার ওপর উঠে আসে।

লতু মুখ ফিরিয়ে বলে, অত মদ খাওয়া চলবে না। নাড়িভুঁড়ি পচে যাবে যে!

—ফিন বাত? বলে দীপু ওর কাঁখে একটা লাথি ঝাড়ল।

লতু উঠে দাঁড়াল।—পারব না আমি—অত মদ খাওয়া তোমার চলবে না।

—আলবাত্ খাব। তোর বাবার পয়সায় খাই, বল, ঘুগনি করবি কিনা?

—পারব না।

ঠাস করে একটা চড় বসাল লতুর গালে। সঙ্গে-সঙ্গে গালের ওপর দুটো আঙুলের ছাপ ফুলে উঠল। লতু মুখ নিচু করে রইল। দীপু দাওয়া থেকে নামতে-নামতে বকল, রান্না করে পাঠিয়ে দিবি। সন্ধ্যের আগে চাই।

চলে গেল দীপু।

নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘরে আজ দীপুর সর্ব-শরীর জ্বালা করে। ওই শ্যামলা মেয়েটার কথা ভাবতে তার ভাল লাগে না। ভাল লাগত না কোনদিনই। তবু আজ ওই মেয়েটার কোন দোষ দেখতে পায় না। সেদিন মার খেয়েও লতু চেয়েছিল সে যেন মদ না খায়। লতু ভয় পেত, মদ খেলে দীপুর শরীর ভেঙে পড়বে। দীপু মরে যাবে। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই লতুর ছিল না।

দীপু যে তখনও একথা বুঝত না, তা নয়। একটা নীরেট বোকারও একথা বুঝতে দেরী হয় না। তবু কেন সে লতুকে মারত কেন তার কোন কথা শুনত না, কেন মেয়েটার কোন কথা তার মনের কোন জায়গায় একটুও নরম করতে পারত না, ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

একটা কথা শুধু বোঝে যে, লতুর জন্যে তার বিন্দুমাত্র মায়া ছিল না। যে কোনদিন সে লতুর গলার সরু নলিটা টিপে ধরে হাসতে পারত। তার চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলে জিভ বেরিয়ে এলে দমটা আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেলে আরও ভয়ঙ্করভাবে হাসতে পারত। এ ধরনের একটা কিছু ভাবতে পারে, কল্পনা করতে পারে। কিন্তু ও ভাবতে পারে না যে, লতুর ওপর কি তার অধিকার? কোন অধিকারে সে তাকে মারে, তাকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে। এত জোর তার কিসের?

লতু এক মাছ ব্যবসায়ীর মেয়ে। বাপ ছাড়া সংসারে ওর কেউ নেই। সেই বাপের চেয়েও বেশী অধিকার সে কি জোরে পেল?

এতখানি খুঁটিয়ে ভাববার মত বুদ্ধি তার ছিল না। একটা রদ্দা ঝাড়লে কি করে ঘাড়টা টুপ করে নীচু করে নিয়ে তলপেটের বাঁদিকে একটা ঘুসি ঝাড়তে হয়, এ বুদ্ধি তার আছে। একটা লোককে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পোলের নীচে এনে কি করে জখম করতে হয়, এ বুদ্ধিতে তার সমকক্ষ নেই বললেই চলে। কিন্তু কোন মানুষটার কথার কি কি মানে, কি জন্যে কোন কথা বলে এসব ভেবে ঘুঁটিয়ে দেখবার মত বুদ্ধি তার ছিল না।

বখতিয়ার হয়ে বসেছিল। তার কথা শুনতে হবে, এইটেই নিয়ম বলে মেনে নিয়েছিল। না শুনলে ঝাড়।

লতুর ব্যাপারেও সে এইটুকুই বুঝত। ময়নামাসী থেকে শুরু করে এ বস্তির সব মিঞা তাকে মেনে চলে, তাকে বাঘের মত ভয় করে, কাজেই লতুকেও তাই করতে হবে। লতু কোন সাহসে তার কথা অগ্রাহ্য করে! সে একটা দুর্দান্ত মস্তান, এ খবর কি লতুর জানা নেই?

তবু আজ চৌকির ওপর শুয়ে সামনের জানলা দিয়ে কাল আকাশের দিকে তাকিয়ে দীপুর মনে হয়, কোথায় তার ভুল হয়ে গেছে। জীবনটা যেভাবে কাটবে ভেবেছিল, সেভাবে কাটল না। সব গোলমাল হয়ে গেল। কেন যে এমন হয়ে গেল?

বেইমান! ওই বেইমান মেয়েটার জন্যে তার সুর ছুটে গেল। দরিয়া শুকিয়ে গেল।

ওই মালা। মালার জন্যে কেন যে সে জান্ কবুল করেছিল? দুনিয়ায় কি ওই বেইমান মেয়েটা ছাড়া আর মানুষ ছিল না। কি না করেছে সে ওই মালার জন্যে। লতুকেই কি কম তড়পেছে?

মাস ছয়েক ধরে দেখা হলেই লতু তাকে ডেকেছে। ইসারায়, ভয়ে-ভয়ে।

ও হাত-মুখ ধুয়ে সকালে পাড়ো ঘরে বসলেই লতু চা পাঠিয়ে দিত, সঙ্গে দু খানা বেগুনী বা আলুর চপ।

সেদিন তাকে দেখেই লতু ইসারায় তাকে ডাকল।

দীপু ভুরু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে তাকাল। চলে যাচ্ছিল। লতু আবার ডাকল—এাই শোন।

মালার ভাসাভাসা চোখদুটো তখন দীপুর চোখের সামনে ভাসছে। টুকটুকে পাতলা ঠোঁট আর মুক্তোর মত দাঁত। দত্ত-বাড়ির একমাত্র কন্যা মালা। ভোর থেকে উঠে ভাবছিল দীপু, আজ কখন মালার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যায়।

লতুর দিকে তাকিয়ে আরও বিরক্ত হয়ে উঠল দীপু। কি চেহারা। যেমন রঙ, তেমনি রোগা পোড়া বাঁশের মত হাত-পা। আজ সকালে উঠে আবার পান খেয়েছে। জবর

পানজোর মেয়েটা। অথচ বোঝে না যে পান খেলে ঠোঁটদুটো মনে হয় যেন টিকেয় আগুন ধরেছে।

শালা জাত শ্যাওড়ার বাচ্ছা! রাগে গর-গর করতে-করতে এগুলো দীপু। দিলে সকালটা মাটি করে। ও আজকাল তাক করে দেখেছে, এ শালার সঙ্গে দেখা হলে ভর-দিন বরবাদ হয়ে যায়।

লতুর কাছে যেতেই লতু খপ করে ওর একটা হাত চেপে ধরে।

—আরে ছাড়! চরকিটা ভেঙ্গে যাবে।

ঘড়িটার ওপরেই হাত চেপেছিল লতু। ধমক খেয়ে হাত ছেড়ে দিল।

ভয়ে ভয়ে তাকাল। বলল,—ক'দিন আসনি কেন?

আমার খুশী।

লতুর মুখটা শুকিয়ে গেল। ওর গাঢ় হলদে চোখদুটো রাঙা দেখাচ্ছে।

দীপু রুমালে মুখটা মুছে বললে,—চা পাঠিয়ে দে।

কপালের মধ্যিখানে একটা শিরা ফুলে উঠেছে লতুর। বলে,—আমি পারব না।

—কি বললি?

—পারব না! আমার খুশী।

হাতের রুমালের একটা ঝাপটা মারল লতুর গালে,—মেলা ভিট্‌কিলি করবিনি লতু। খামোকা খুন-খারাবি হয়ে যাবে।

লতুর দেহটা এবারে টান-টান হয়ে উঠল। সর্ব অঙ্গে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল,—আমি কি জানি না, তুমি কোথায় যাও, কি করো। মেয়েটা কে শুনি?

—তোর কি দরকার?

লতু ফোঁস করে উঠল, কালচে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে নিজেকে সামলাল,—আমার কি দরকার? দরকার নিশ্চয় আছে। আমার সঙ্গে তবে এ্যাদ্দিন ঠগবাজী করছিলে কেন?

দীপু লতুর মুখে কথাটা শুনে একটু থমকে গিয়েছিল। মালার কথা লতু জানল কি করে? কে বলেছে লতুকে? নাম জানতে পারলে তার জিভখানা উপড়ে ফেলবে দীপু।

—এ সব আনসান কথা তোকে কে বলেছে?

—বলব না।

লতুর একটা হাত জোরে চেপে ধরল দীপু।—বল কে বলেছে। তোকে বলতে হবে।

এত জোরে চেপে ধরেছে যে লতুর হাতে লাগছে। কপালের শিরা আবার ফুলে উঠেছে।

—বলব না।

—বলতে হবে।

লতু হঠাৎ রাগে কোন কথা বলতে পারল না। ওর রক্ত-হলুদ চোখদুটো জ্বলে উঠল। সে চোখে স্পষ্টই ঘৃণা দেখা যাচ্ছিল। ভীষণ ঘৃণা। এক মুখ থুতু ছিটিয়ে দিল হঠাৎ দীপুর চোখে-মুখে।—আমি তোমার মত বেইমান নই।

মুখে থুথু পড়তেই দীপু ওর হাত ছেড়ে দিয়ে রুমালে মুখটা মুছতে গেল। আবার কি ভেবে বাইরে উঠানে এসে কলের ধারে গিয়ে কলের জলে মুখটা ভাল করে ধুয়ে ফেলবে ভাবল, আশ্চর্য লতু কি ক্ষেপে গেছে? ও যে মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে পারে, এটা ওর ধারণার বাইরে। কেন লতু এত বেপরোয়া হয়ে উঠল? এতখানি বেপরোয়া যখন হয়ে উঠেছে, তখন ওকে আজ আর বেশী না ঘাটানোই ভাল। শেষ-কালে একটা কিছু করে বসতে পারে। চেঁচাতে পারে, লোক জড়ো করতে পারে। একটা থালা ছুঁড়ে মারতে পারে। এখন ওকে আর বিশ্বাস নেই, ও সব পারে।

মনটা খিঁচড়ে গেল। মুখ ধুয়ে ও ধীরে ধীরে চলে এল পড়ো ঘরে।

তখনো টোনাটা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কাল গাঁজা টেনেছে বেদম।

টোনার পিঠে পা দিয়ে ঠোক্কর মারলে দীপু।

—আবে ওঠ, শালা দিনরাত ভোম মেরে আছে।

টোনার সাড় নেই। বেটাচ্ছেলে বাঁশীতে দম দিতে বসলে আর উঠতে চায় না। ঘুরে-ফিরে বাঁশীতে ফুঁ মারে। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। এটাকে এবার দল থেকে বাদ দিতে হবে। তেমন চোট লিতে পারে না। গজ চালাতে জানে না। কোন কাজ সাঁটে সারতে জানে না। তবে হাঁ, পেটো ছুঁড়তে উস্তাদ। হাত কাঁপবে না। অব্যর্থ টিপ। যেখানে ঝাড়বে, ছিঁড়ে-ফুঁড়ে যাবেই।

বসে একটা সিগারেট ধরাল দীপু।

হঠাৎ দরজার পাশে ঠুনঠান শব্দ হতে তাকাল। দেখল একটা কলাই থালার ওপর দুটো কাপ আর একটা কাচের গেলাসে চা, থালার এক পাশে খানিকটা আলুভাজা। হাত বাড়িয়ে থালাটা রেখে চলে গেল লতু।

চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল খুব। উঠল দীপু। থালাটা এনে আলুভাজা চিবোতে লাগল। মনে মনে খুশী হোল। মুখে যাই বলুক, চা-টি ঠিক দিয়ে গেছে। মেয়েটা এমনিতে মন্দ নয়। তবে বড় টেঁটিয়া। একটুতেই খেঁচে যায়। কথাটা মিথ্যে নয়। এদানিং দীপু ওর কাছে যাবার সময় পায় না। সময় পেলেও কোন টান অনুভব করে না। মালার সঙ্গে লতুর তুলনা করতে গেলে তার হাসি পায়। মালার পা টেপবার ঝি হবার যুগ্যি নয় লতু। তবু ও কেন যে দীপুকে নিজের থাবায় রাখবার চেষ্টা করে!

টোনাকে ধাক্কা মেরে ওঠাল। টোনা উঠে প্রথমেই গরম চায়ের গেলাসটা ধরে এক চুমুকে চা সাবাড় করে দিলে। পেটে অত-খানি গরম চা পড়তে একটু চনচনে হয়ে উঠল টোনা। কোনো বাইরে গিয়েছিল বিড়ি কিনতে। বিড়ি মুখে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এল। আলুভাজা চা খেয়ে তাসের প্যাকেটটা জানলার পাশ থেকে নামাল।

দীপু চা খেয়ে উঠল।

কোনা বললে,—কোথা চললে গুরু?

জবাব দিলে না দীপু। ওদের কথার জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না। ও ভেতরে ঢুকল। বাড়ির ভেতরে।

চা-টা বেশ কড়া গরম করেছে লতু। খেয়ে মৌজ হোল। মনটা কেমন ভাল লাগ-ছিল না। ভাবল, লতুকে গিয়ে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে আসবে। মাঝে মাঝেই দশ-পাঁচ টাকা দেয়। তা থেকে অবিশ্যি চা-খাবারের কিছু খরচাও হয়। বাদবাকী টাকা লতু কি করে কে জানে! মাঝে-মধ্যে বোধ হয় কাচের চুড়ি কেনে, নয়তো পুঁথির মালা।

বেরোতেই চোখে পড়ল দোরের কাছে ময়নামাসী।

দীপুকে দেখে ময়নামাসী বলে উঠল,—দু আনা পয়সা দেবে ধন, গুড়ওলা মুখ-পোড়া তাগাদা করছে।

দোরের কাছে গুড়ওলা দাঁড়িয়ে আছে। দীপু পকেট থেকে বারো নয়া বার করে ময়নামাসীর হাতে দিল। ময়নামাসী কালো ছোপ-পড়া দাঁত বার করে হাসল,—বাঁচালে ধন। তোমার এক টাকা বাইশ নয়া পাওনা রইল।

হিসেবে মাসীর ভুল হয় না। পয়সা যেমন নেয়, হিসেবটা ঠিক রাখে, শুধু শোধ করাটা বড় হয়ে ওঠে না।

দীপু কোন কথা না বলে লতুর ঘরের দিকে এগোল। কোথায় লতু তো নেই। দাওয়াটা ফাঁকা। ঘরের দোর বন্ধ। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল দোরে শিকল নেই। এগিয়ে গিয়ে দোরটা ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভেতর লক্ষ্য করে দেখল, ঘরের একটা কোনে লতু উবু হয়ে বসে মাথাটা হাঁটুর ভেতর গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যাঃ বাবা! ও এমন করে কাঁদছে কেন? অমন কেঁপে কেঁপে কান্না দেখতে ভাল লাগে না দীপুর। কান্নাকাটি কেন? দীপুর তো মনে পড়ে না, তখনো পর্যন্ত দীপু একবারও কেঁদেছে। কান্না জিনিসটা ও ভারী অপছন্দ করে।

তার হাতে ধোলাই খেয়ে অনেক ছোঁড়া অনেক লোক যখন হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছে, ওর তখন হাসি পেয়েছে। উল্লুকের মত কান্না দেখে আরও কড়া ধোলাই দিয়েছে।

আজ কিন্তু হাসি পেল না। দেখতে খুব একটা ভালও লাগল না।

এগিয়ে গিয়ে ঠ্যালা দেবার জন্যে পা ওঠাল। আবার কি ভেবে পা নামিয়ে হাত দিয়ে লতুর মাথাটা নেড়ে বলল,—এ্যাই, কাঁদছিস কেন? কি হোল রে?

লতুর পিঠটা আরও কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কান্নার বেগটা বোধ হয় আরও বাড়ল।

—কি ঝামেলা শুরু করলি বাবা! কি হোল তোর?

লতু ওর হাতদুটো মুখের কাছে নিয়ে নাড়া-চাড়া করে মুখটা তুলল। এবার বেধড়ক কাঁদছে মেয়েটা। গাল ঠোঁট সব ভিজে গেছে। আঁচলে নাকটা ঝেড়ে ডানহাতটা বাড়িয়ে বলে উঠল,—এটা নিয়ে যাও।

দীপু দেখল ওর ডানহাতে সেই লাল পাথরের নাকছাবি।

—লাও, এ আমার দরকার নেই।

দীপু এ সব ভাব-ভাবনা ভাল বোঝে না। বোকা বনে গেল ও। ওকে দেখে নাক-ছাবিটা ও'ক ফিরিয়ে দিতে চায় কেন? লতু বোধহয় ওর সব ল্যাঠা চুকিয়ে দিতে চায়।

বিরক্ত হোল দীপু। এ সব নাকিকান্না, ন্যাকা-বোকা ভাবসাব ও বরদাস্ত করতে পারে না।

ও ভুরু কুঁচকে বলল,—দে। দিয়ে দে। নাকছাবিটা নিয়ে পকেটে পুরল দীপু। লতু ফোঁস ফোঁস করে উঠল,—যাকে নিয়ে মজে গ্যাছ, সে তোমার সব্বনাশ করবে। ভগমান যদি থাকে, তবে তোমাকে একদিন কাঁদতে হবে হাঁ।

আবার নাক ঝাড়ে লতু। চোখ মোছে।

দীপু বিরক্ত হয় ভীষণ। মেয়েটা জবর টেঁটিয়া। ভগবান তাকে কাঁদাবে। এত সব ছেঁড়া ঝামেলা!

লতু আবার বলতে যায়,—আমাকে যেমন ঠকিয়েছ—

ওকে থামিয়ে তড়পে ওঠে দীপু,—তোকে কী ঠগবাজী করেচি বে? তু' বরাব্বর আমার পিছু গিয়েছিস। লিজেকে তু' ফুল-টুসী ভেবেছিলি। খামাকা আমাকে ধরে টানাটানি করেছিলি। এখন আমার দোষ!

সত্যিই তাই। দীপু মেয়েমানুষের ব্যাপারে বরাবর নির্লিপ্ত, কেমন একটা আঁট নেই। মনে কোন টান অনুভব করে না ও! কোন মেয়ের দেহের ভাবভঙ্গী ওর মনের ওপর আঁকি-বুঁকি কাটতে পারে না। ও কখনো কোন মেয়ের জন্যে আটু-পাটু করে না। এটা ওর বরাবরের স্বভাব।

মালার সম্পর্কেও তাই। মালাকে ওর ভাল লাগত, দেখতে চাইত, কথা বলতে চাইত, কিন্তু মালার অমন পরম লোভনীয়

যৌবনের জন্যে কখনো ওর মনে জ্বালা ধরেনি। ওর দিকে কখনো লুকিয়ে তাকিয়ে হাত বাড়ায়নি। দেহটা ওর সহজে গরম হয় না। গোটা চারেক ডিম খেয়ে, পাক্কা এক ডিস দো-পেঁয়াজী খেয়েও ও হাই তোলবার সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়ে। মেয়েমানুষের দেহের ওপর অকারণ তৃষ্ণা ওর কম।

এই ঠান্ডা ভাবটা ও বোধহয় মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। মোটা-সোটা খাঁট মানুষটি, ভারী ঠান্ডা ছিল। মায়ের পিঠখানা ছিল কুঁজোর গায়ের মত ঠান্ডা। এই ঠান্ডা ধাতটা ওর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

কথাটা সত্যি। এ ঘরে আড্ডা জমাবার পর থেকে কখনো কোন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় নি। মারপিট করেছে, খুব কসে খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, আড্ডা মেরেছে।

লতুই প্রথম একদিন ওকে দেখে হাসল। বজ্জাতি হাসি। নানা ভাবভংগী করল।

দীপু কলঘর থেকে বেরিয়ে ফিরছিল, লতুর ভাব-সাব দেখে একটু বিরক্ত হোল—এ মেয়েটা কে? শ্যামলা রঙের আঁট-সাঁট দেহখানা দোলাচ্ছে আর তার দিকে তাকিয়ে হাসছে!

এগিয়ে এসে দীপু বললে,—এ্যাই হাসছিস যে?

খিলখিল করে হেসে লতু ঘরে ঢুকে গেল। যাঃ বাবা! হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীপু ফিরে এসেছিল।

মালাও কিন্তু দীপুকে দেখে হেসেছিল। কি আশ্চর্য মিল দুজনের এই একটা ব্যাপারে। দুজনেই মেয়েমানুষ কিনা!

দীপু হাসিটা তেমন গ্রাহ্যের ভেতর আনেনি।

পরদিন থেকে শুরু হোল লতুর পান চিবিয়ে পিক ফেলতে ফেলতে নানা ছলাকলা।

লক্ষ্য করেছিল ধনা। দীপুরে গা টিপে বলল,—গুরু লুটে লাও মাইরী।

দীপুরও তেমনি একটা সন্দেহ হচ্ছিল। মেয়েটা ভালবেসেছে। কিন্তু লোটালুট ও তখনও ভাল করে জানে না। ওর জানতেও হয়নি। লতু জাঁহাবাজ মেয়ে। যা কিছু করবার লতুই করেছে।

একদিন সন্ধ্যের পর একা একা ফিরছিল দীপু। বস্তির দরজায় ঢুকতেই একটা বস্তুর সংগে ও ধাক্কা খেল। কেরে বাবা! আর একটু এগোতে যেতেই বাধা পেল। বস্তুটি দুটো ডানা মেলে ওকে পেঁচিয়ে ধরল। ও ছাড়াবার চেষ্টা করতে যেতেই টের পেল, বস্তুটি নরম, কোন পুরুষ নয়।

অন্ধকারে ফিসফিসিয়ে উঠল,—তোমার কি চোখ নেই, কানা নাকি?

দীপু বলতে গেল,—তা অন্ধকারে আমি কি করে জানব—

চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল।

—ধুর বোকা। তা নয়। দেখতে পাও না, আমি যে মরে যাচ্ছি।

বোকার মতই বলল দীপু,—মরবে কেন?

—তোমার জন্যে।

অন্ধকারে আন্দাজে দীপুর গালের ওপর একটা চুমু খেল লতু—আমার সোনা মানিক!

আদরের ডাকটা তেমন সাড়া জাগাল না দীপুর মনে। বাঁ হাতের তালুর উলটো পিঠে গালের ওপর থেকে পানের রসের ছোপ মুছে ফেলল। বিরক্ত হয়েছিল। দিলে শালা খানিকটা পানের পিক থুতু লাগিয়ে।

এমনি করে দিনের পর দিন লতু তার পেছনে লেগে থেকে তাকে লতুর দেহ সম্পর্কে জোর করে সজাগ করে তুলেছে। অস্বীকার করুক লতু। পারে তো অস্বীকার করুক। সে লতুর সংগে ঠগবাজী করতে যায়নি।

ঠকাবার চেষ্টা সে কাউকেই করেনি, লতুকেও নয়, মালাকেও নয়। তবু লতু মনে করেছে, সে ঠকেছে। তবু কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল,—ভগবান যদি থাকে, তবে তোমাকেও আমার মত কাঁদতে হবে, হাঁ।

কথাটা সেদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি।

আজ এই অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে বারবার লতুর সেই চোখের জলে ভেজা মুখটা মনে পড়ছে। লতুর ফোঁপানি আর অন্তর থেকে বলা কথাকটি যেন কানে বাজছে—ভগবান যদি থাকে তবে তোমাকে আমার মত কাঁদতে হবে হাঁ।

লতুর কথাটা এমন নির্মমভাবে সত্যি হয়ে উঠবে ও ভাবতেও পারেনি। তার কোন দোষ ছিল না। তবু লতুর কথাটা এমন সত্যি হোল কেন কে জানে! লতুর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ওর চারদিকের বাতাস বদলে গেল। ওর হৃদয়টা বিষাক্ত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। একটার পর একটা ঘটনার চাপে সে ধীরে ধীরে এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে মালার বেইমানীটা কোন মতেই ও সহ্য করতে পারল না। লতুর সব কথা সব দীর্ঘশ্বাস সব দোষারোপ সে উড়িয়ে দিয়েছিল। মালার আজকের ব্যবহারটা ওকে যেন সামান্য সময়ের ভেতরে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। একবিন্দু শক্তিও পাচ্ছে না। চাপের পর চাপ খেতে খেতে মনের দড়াগুলো যেন এক মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে।

জানলার বাইরে কালো আকাশটার দিকে তাকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকে দীপু।

বাতাসটা কি বন্ধ হয়ে গেল? বড় গুমট লাগছে। গলা ঘেমে কাঁধে ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে। গরমে সেদ্ধ হচ্ছে দীপু।

একটু জল খেতে পেলে ভাল হোত। জল কোথায় পাবে? বাবার ঘর বন্ধ, শিবুর ঘর বন্ধ। ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে। দীপুর চোখে আজ ঘুম নেই। তৃষ্ণায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তবু ওদের ডেকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ওরা ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। ডাকলে বিরক্ত হবে।

আজ যদি মা থাকত। মা কি তাকে তৃষ্ণার্ত একা একা ফেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। যদি না ঘুমিয়েই পড়ত, মাকে ডাকতে দীপুর একটুও সঙ্কোচ হোত না। মা থাকলে তার এত পিপাসা থাকত না।

দীপুর চোখের কস বেয়ে আবার জল গড়ায়। কি ভয়ংকর অসহায় অবস্থা। বেশী অসহায়, বড় বেশী একা মনে হয় নিজেকে। দীপুর ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে। মা—মা—বলে বহুদিন পর কাঁদতে ইচ্ছে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর দীপু কাঁদে নি। আজ বুঝি সেই কান্নাটাই ওর বুক ঠেলে বেরোচ্ছে।

।। সাত ।।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন দীপুর গায়ের ওপর রোদ এসে পড়েছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল ওর মনে নেই। হয়তো শেষরাতের দিকেই ঘুমটা এসেছিল। তখন বোধহয় সামান্য ফুরফুরে বা[illegible] বইছিল। হয়তো ভাবনা-ভাবনায় মন ক্লা[illegible] হয়ে এলিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজের অজ্ঞান্তে।

বেলা আটটা সাড়ে আটটা হবে বোধহয়। চৌকির ওপর উঠে বসল দীপু। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলনা, সর্বশরীর যেন অবশ লাগে। উঠেই একটা ভ্রম হয়েছিল, ভেবেছিল ও উড়ের ঘরেই শুয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, না এ ঘর উড়ের ঘর নয়। তারপরই মনে পড়ল কালকের কথা। রাত্রির অসহ্য যন্ত্রণার কথা।

কি আশ্চর্য। কাল রাত্রে উড়ের ঘরে যাবার কথা ওর একবারও মনে হয়নি। উঠে বসে চোখ কচলে ভাবল, একবার যাবে নাকি উড়ের ঘরের দিকে? টোনা, কে[illegible] ওরা হয়তো তার অপেক্ষা করে রয়েছে।

কি হবে গিয়ে। তার দেহের কো[illegible] একটা জায়গায়ও সে একটু জোর পাচ্ছে না। এক পা হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। [illegible] ক্লান্তি, একদিনে যেন তার সমস্ত শক্তি সামর্থ হাওয়ায় মত উবে গেছে।

কি হবে এই শরীর নিয়ে ওখানে গিয়ে। মাথাটায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। মাথার ভেতর যেন তিনচার সের লোহা গাঁজিয়েছে [illegible] একদিনে। ভীষণ ভারী। মাথা তুলতে [illegible] হচ্ছে না।

মুখটা নীচু করে বসে রইল। [illegible] করবে ও কিছুই ভাবতে পারছে না।

হঠাৎ জুতোর শব্দ পেয়ে [illegible] বাবা ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির ভেতর চলে গেল। হাতে বাজার থলে। বাবা বোধহয় বাজারে গিয়েছিল। সকালে বাবা এখনো বাজারে যায়। [illegible] ওর পড়া নিয়েই ব্যস্ত। দিনরাত্তির পড়া।

কাল রাত থেকে বাবা ওর সংগে [illegible] বলেনি। ভাল করে তাকায়নি ওর দিকে।

উঃ। মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়[illegible] এমন মাথার যন্ত্রণা ওর কখনো হয়েছে [illegible] মনে পড়ে না। গোটাকতক বছর ও [illegible] একা দমকা হাওয়ায় উড়ে বেড়িয়েছে। কখনো একটু সর্দি হয়েছে বলেও [illegible] হয় না।

বাবা কেন একটা কথাও বলল না [illegible] সংগে? কিই বা বলবে? সে কতদিন [illegible] গেল, বাড়িতে প্রায় আসত না বললেই [illegible] বাড়ির কারো কোন খোঁজ করত না।

খোঁজ করবে কেন এরা। মাঝখানে শুধু
র বাসায় দিনকতক ছিল ও। মাকে
দিদির বাসায় উঠে ও ভেবেছিল,
কে বিয়ে করে বাড়ি ফিরে আসবে।
া কোন কাজকর্ম করে নিশ্চিন্ত জীবন
বে। তাও হোল না।

দিদির বাসায় পুলিশ এল। দিদি ভয়ে
হয়ে গেল। দিদির কোন দোষ নেই।
ভয় পাবারই কথা।

কি আশ্চর্য, আত্মীয়স্বজন ওকে
লে এখন ভয় পায়। ওর সঙ্গে দেখা
কথা বলে না, এড়িয়ে চলে। তাদেরই
দোষ কি? পুলিশ থানা, খুন জখম,
পটকে কে না ভয় পায়।

একটা কথা কেউ বোঝে না যে ও এসব
ই চায়নি। একটা ভীষণ বাতাসের
ওকে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে উড়িয়ে নিয়ে
ছল কয়েকটা বছর। কি করে যে কি
, ও ভাল করে বুঝতেও পারত না।

পায়ের শব্দ পেয়ে তাকাল দীপু।
রাঁধুনী ঘরে ঢুকছে। তার এক হাতে
টা ডিশ, আর এক হাতে চা।

ডিশ আর চায়ের কাপ ওর সামনে
ল। ডিশে দু' পীস পাঁউরুটি একটা
সেদ্ধ।

এ খাবার কি তার? দীপু যেন বিশ্বাস
তে পারছিল না। বলল—এ কার?

—আপনার। বাবু দিতে বললে।

রাঁধুনী চলে গেল। বাবা যাবার সময়
নীকে তার জন্যে খাবার চা দিতে
ছে। বাজার করে বাড়ি ঢোকবার সময়
দেখে রাঁধুনীকে বলেছে। খিদে তার
ছিল ঠিকই। বাবা কি তাও বুঝতে
ছে, তার খিদে পেয়েছে? বুঝলেও
তো ইচ্ছে করলেই নীরবে তার খিদেকে
করতে পারত।

বাবার চেহারাটা আরও রোগা হয়েছে
হোল। চোখের দৃষ্টি আরও বিষণ্ণ,
হতাশ। তার দিকে তাকিয়ে চোখ
নিয়ে বাবা যখন চলে গেল, ও
দেখতে পেল, বাবার মুখের রেখায়
যন্ত্রণা। একটা নিঃসীম কাতর ভাব
দুটোয়।

মানুষটি বরাবরই কথা বলে কম।
নিঃশব্দে নিজের কাজটুকু করে
কারো বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ
কারো সম্বন্ধে কোন অতিরিক্ত ভাবনা
কখনো কারো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কঠোর
লে না। এত বেশী বিশ্বাস করে, এত
নির্ভর করে সকলের ওপর, তাই
বার বার তাকে যন্ত্রণায় হতাশায়
াস চেপে যেতে হয়।

পরে মনে পড়ে না যে বাবা কখনো
য়ে হাত তুলেছে। জীবনে একটা
রেনি। শাসনও করেনি, প্রশ্রয়ও
শুধু নিঃশব্দে নিজের কাজটুকু
ছে। আর মনে মনে হয়তো কামনা
যে যার নিজের নিজের মত মানুষ

জও দীপুকে একটা কথাও না বলে
কর্তব্য যা সেইটুকুই করেছে।
জলখাবার দিতে বলে ঘরে চলে

গেছে। একটু পরেই স্নান করে খেয়ে
নীরবে অপিসে বেরিয়ে যাবে। দীপুকে
কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না।

দীপু চা খেয়ে নিল। উঠে ধীরে ধীরে
বাথরুমে গিয়ে একেবারে স্নান সেরে নিল।

বেরিয়ে এসে শিবুর একটা পাজামা পরে
আবার সেই বাইরের ঘরে এসেই বসল।
বাবার ঘরে বাবার সামনা-সামনি যাবার
সাহসটুকুও পাচ্ছে না।

কেমন একটা সঙ্কোচ লাগছে। তা ছাড়া
দেহটা যেন অবশ। একটু নড়তে চড়তে
একটু কথা বলতে ভাল লাগছে না।

ইচ্ছে হচ্ছে চুপ করে শুধু শুয়ে পড়ে
থাকে, দিনের পর দিন।

জলখাবার খেয়ে ও শুয়েই পড়ল। পাশ
ফিরে শুয়ে পড়ল। মাথার যন্ত্রণাটা স্নান
করেও কমেনি। গা-হাত-পায়েও যন্ত্রণা ক্রমে
বাড়ছে। চুপ করে শুয়ে পড়ে রইল।

বাবা কখন অপিস চলে গেছে ও জানে
না। সর্বশরীরের নিদারুণ অস্বস্তিতে ওর
কোন কিছু খেয়াল করবার মত মনের
অবস্থা ছিল না। একভাবে অসাড়ের মত
পড়েছিল।

বেলা নিশ্চয় বেড়েছে। শিবু ওর ঘরের
সামনে এসে ডাকল—দাদা।

ওর কানে অস্পষ্টভাবে ডাকটা
গিয়েছিল, কিন্তু তাকাবার মত জবাব দেবার
মত অবস্থা ছিল না। কেমন একটা ঘোর
ঘোর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

শিবু কাছে এসে ওকে ধাক্কা দিল,—
দাদা, ভাত খাবে?

—ধাক্কা খেয়ে সাড় এল। ও বললে—না।

—কেন, খেতে চলো।

—না, ভাল লাগছে না।

তাকাল এবার শিবুর দিকে। তাকাতে
গিয়ে চোখ দুটো জ্বালা করছে। ঠোঁট
শুকিয়ে আসছে, জিভে শুকনো ঠোঁট
ভিজিয়ে নিয়ে দীপু আস্তে বলল—মাথাটা
বড্ড ধরেছে।

—ওরে বাবা, চোখ দুটো তোমার
টকটকে লাল। দেখি—

শিবু কপালে হাত দিয়ে বলে উঠল—
একি জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। এখানে
শুধু চৌকিতে এমনি করে শুয়ে রয়েছ?

দীপু ভাইয়ের দিকে তাকাল। চোখ
দুটো ভীষণ জ্বালা করছে। চোখের কস-
দুটো ভিজে উঠছে।

—চলো, বাবার ঘরে চলো। ওঠ।

শিবু ওকে ধরে ওঠাল। ভাইয়ের কাঁধে
একটা হাত রেখে উঠতে গিয়ে টলে পড়তে
গেল। একটু চুপ করে থেকে শিবুর কাঁধ
ধরে বাড়ির ভেতরে বাবার ঘরে এসে ছোট
খাটটায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ে তাকাল
শিবুর দিকে।

—একটু জল দিবি?

শিবু এক গেলাস জল গড়িয়ে ওর
কাছে এল। আর এক গেলাস জল গড়িয়ে
মাথার কাছে রাখল। কাজেকর্মে শিবু বেশ
গোছাল। ছোটবেলায় মা মরে যাওয়ার জন্যেই
হোক আর দাদার এমন বাউণ্ডুলে প্রকৃতির
জন্যেই হোক। ও পরিপাটি করে কাজ করতে

পারে, গুছিয়ে ভেবেচিন্তে চলতে ফিরতে
পারে। হিসেবী বুদ্ধিটা ওর প্রখর।

—তেষ্টা পেলে জল খেও। চুপ করে
শুয়ে থাক। আমি ইস্কুল থেকে আসছি।

দীপু শিবুর দিকে তাকাল। আস্তে
বলল,—হ্যাঁরে বাবা আমার কথা কিছু
বললে?

—না, কিছু বলেনি তো।

—বাবার ঘরে শুলে বাবা রাগ করবে
না তো?

—কি যে বলো। জ্বর হয়েছে। এখন
শোবে কোথায়? আমাদের ঘরে তো খাট
নেই? তুমি ঘুমোও আমি বাসনদিকে
তোমার জন্যে বার্লি করতে বলে যাই।
একটু বার্লি খেয়ে নিও।

বাসনাদি রাঁধুনী। শিবু তাকে বার্লি
করতে বলে স্কুলে চলে যেতে চায়। কিন্তু
দীপুর এ কি হোল। দীপুর ভীষণ ভয়
করেছে। শিবুকে ও যেতে দিতে চায় না।
একবার ভাবল, স্কুলে আজ নাই বা গেলি।
কিন্তু লজ্জা হয়, নিজের ভয়টা নিজের কাছে
ভারী অদ্ভুত লাগছে। তার এত ভয় করছে
কেন?

শিবু চলে যাবার পর চিত হয়ে শুয়ে
কড়িকাঠের দিকে তাকাল দীপু। চোখদুটো
যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। ঝাপসা হয়ে
আসছে। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে কি
মরে যাবে?

এমন অসুখ তো তার কখনো হয় না।
মনে আছে ছোটবেলায় মা থাকতে একবার
খুব অসুখ হয়েছিল। মা তার মাথার কাছে
বসে থাকত। যত অস্বস্তি যত যন্ত্রণাই
হোক না কেন মায়ের ঠাণ্ডা কোলের কাছে
গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লেই একটা আরামে
চোখ বুজে আসত। মায়ের কোলের কাছে
কোন ভয় থাকত না। কোন যন্ত্রণা থাকত না।
এখন মা কোথায়? কেউই নেই।

মা মারা যাবার পর কখনো তার এরকম
মাথার যন্ত্রণা জ্বর হয়নি। শুধু কি জ্বর।
কেমন যেন লাগছে। চোখে ঝাপসা দেখছে।
একটু নড়তে গেলে মাথাটা ঝনঝন করছে।

ভীষণ ভয় করছে দীপুর। সে বোধহয়
বাঁচবে না আর, সে মরে যাবে।

মরে যেতে সে চায় না। কিছুতেই চায়
না। চোখের সামনে কড়িকাঠ দেয়াল দেখতে
পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর ভয়
পাওয়া মুখ, তার ঠিকরে বেরিয়ে আসা
দুটো চোখ। লোকটাকে মনে পড়ছে দীপুর।
সেই লোকটা। যে লোকটাকে গল্প করতে
করতে নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গল্প বন্ধ
করে ভুসিয়ে দিয়েছিল তলপেটে। লোকটা
ভীষণ ভয় পেয়েছিল। চিৎকার করতে গিয়ে
গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় নি।

লোকটা মরতে চায়নি, মরতে ভয়
পেয়েছিল।

এ ছেলেটা কে? তাগড়া চেহারা।
কোঁকড়া চুল। হাউমাউ করে কেঁদে উঠছে।
মুখটা বীভৎস হয়ে উঠেছে ভয়ে। মাটিতে
ফেলে ওর পেটে একটা লাথি মেরেছিল।
মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোল। ছেলেটা
চোখ বুজে নেতিয়ে পড়ল।

কি ভয়ঙ্কর মুখগুলো চোখের সামনে

দেখতে পাচ্ছে ও। এরা সবাই ভয়ে আতঙ্কে বীভৎস হয়ে উঠেছে।

চোখ বুজে পাশ ফিরল দীপু। এ সব কথা সে আর মনে করতে চায় না।

উঃ। কি ভীষণ ভয়। দীপু কি তবে মরে যাবে? না। মরতে সে চায় না।

যাদের সে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলত, যাদের পেটে অথবা কাঁধের নীচে গজ নেপালা চালাত, তারাও কেউ মরতে চায়নি। তাদের তো একেবারে মেরে ফেলেনি দীপু। একটাও খুন করেনি দীপু। জখম করেছে। তবু জবর জখম হবার আগে তাদের মুখে মৃত্যুভয়ের বীভৎস কান্না—শুনেছে দীপু।

আজ কেন সে এদের কথা ভাবছে। ভেবে ভয় পাচ্ছে।

কাত হয়ে উঠে মাথার কাছে রাখা জলের গেলাস থেকে জল খেল দীপু। শরীরটা জ্বলে যাচ্ছে। গায়ের চামড়ায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চিত হয়ে শুয়ে একটা মস্ত নিঃশ্বাস ফেলল দীপু।

মা—মাগো! শব্দটা আপনি আপনি দীপুর মুখ দিয়ে বেরোল। ওর চোখের সামনে মায়ের গোল ঠান্ডা শান্ত মুখখানা ভেসে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে মায়ের মুখ মিলিয়ে গিয়ে মালার মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

মালা হাসছে। দমফাটা হাসি হাসছে। হাসতে হাসতে তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। টানাটানা চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। এমনিই হোত। খুব বেশী হাসতে হাসতে মালার চোখ দুটো জলে ভরে উঠত। হাসি থামিয়ে চোখ মুছত। দীপুর দেখতে ভাল লাগত।

আজ কিন্তু চোখের সামনে ওর হাসিটা যেন দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ভাল লাগছে না। কি বিশ্রী খিলখিলে হাসি। ও মনে করতে চায় না, তবু মালার ওই দমফাটা হাসি ওর মনে ভেসে উঠছে আপনাআপনি।

কি ভয়ঙ্কর হাসি! দীপুর ভয় করছে। প্রতিটি হাসির তরঙ্গ ওর স্নায়ুগুলো তোলপাড় করছে। ভাসিয়ে দিয়েছে। তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে মালা। বেইমান মেয়েমানুষ!

অসহ্য লাগছে দীপুর। ওর সব ব্যবহার, সব কথা হাসি আজ ন্যাকামি ভন্ড বলে মনে হচ্ছে। কি সহজ সাবলীল ন্যাকামি! ধরবার জো নেই, বোঝাবার জো নেই। কথা বলতে গলে পড়ত, হাসতে গিয়ে ঢলে পড়ত। দীপুকে একেবারে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলত।

আসল রূপ লুকোতে মেয়েমানুষের জুড়ি নেই। কি ভীষণ ধৈর্য আর সাহস। দীপুর অহঙ্কার ছিল, ও খুব সাহসী, ভয় কাকে বলে ও জানে না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মালা ওর চেয়ে অনেক বেশী সাহসী!

কি ভয়ানক সাহস থাকলে একটা সতেরো বছরের মেয়ে দত্তবাড়ির কড়া শাসনের পাঁচিল ডিঙিয়ে একটা হবি মস্তানের সঙ্গে প্রেম জমাতে পারে! দীপু একটা রাস্তার ছেলে। বাউন্ডুলে রকবাজ, জুয়াড়ি মস্তান। তাকে যে কেন মালা এত বেশী আস্কারা দিয়ে বসল আজও বুঝতে পারে না দীপু। হতে পারে হয়তো বড়লোকের রূপসী মেয়ের এ এক খেয়াল; তার খামখেয়ালের জন্যে দীপু আজ কোথায় এসে নেমেছে।

ও তো কতবার বলেছিল মালাকে—কত বড়লোকের ছেলে তোমার জন্যে পাগল!

মালা হেসেছিল। এই হাসিগুলো সাংঘাতিক। কিছু মানে বোঝা যায় না।

—কত বি-এ, এম-এ, লাটের ব্যাটাকে ফেলে তুমি আমার পিছু নিলে কেন?

মালা ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলেছিল—তোমার মত চোখ কার আছে?

চোখ! অবাক হয়েছিল দীপু। এ সব কথার মানে ও বুঝত না।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তার চোখ দুটো সত্যি খুব বড় বড়, ভাসাভাসা শিশুর মত চাউনি। ঠিক ওর মায়ের মত।

ও অবাক হয়ে বলেছিল—শুধু চোখ দেখে—কেন বাজে গুল ঝাড়ছ!

—সত্যি। বিশ্বাস কর। সত্যি।

মালা আস্তে আস্তে ওর একটা হাত নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে শুধু বলত—তুমি ভীষণ দুরন্ত, ভয়ানক বেপরোয়া!

দীপু ওর কথার মাথামুণ্ডু ভাল বুঝতে পারত না। এ ধরনের গলাকাঁপা কথা, ফিসফিস মধুর ফোঁটার মত কথা শুনলে ও কেমন বোমকে যেত। তার চেয়ে বরং চেঁচামেচি হৈহল্লা অনেক ভাল। বোঝা যায়। এ সব ফিসফিসানি গুজগুজানি শুনলে ও কেমন হতভম্ব হয়ে যায়।

লতুকে চুলের গোছা ধরে বুকের কাছে টেনে আনলে লতুও পাল্টা ওর চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিত। কখনো বা দমাদম্ দুটো চাপড় কপালে পিঠে, দু' চারটে থাবড়া, চাঁটা। এ সব বোঝা যায়। মালাকে ভাল করে বুঝতেই পারেনি দীপু।

আজ এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারছে। ওর সেতারের টুংটাংয়ের মত কথা আর আধখানা চাঁদের মত স্নিগ্ধ চাউনির ভেতর আগাগোড়া একটা জবর ঢঙ ছিল। দিল ছিল না, দিল্লাগী ছিল।

ইতর—ছোটলোক! কথাদুটো সাপের বিষাক্ত দাঁতের মত তার বুকে বসে তার সর্বাঙ্গ বিষে অবশ করে দিয়েছে।

মনে মনে ভাবলে তাজ্জব বনে যায় দীপু। মালা কেমন নরম মোমের মত গাল নিয়ে বলেছিল—আমাকে বিয়ে করো, নইলে আমি মরে যাব। সত্যি মরে যাব।

সেই মুখে মালা বলল—ইতর ছোট-লোক। ওকে বাড়ি থেকে বার করে দাও!

তাজ্জব দুনিয়া! তামাম দুনিয়া তার কাছে অন্ধকার হয়ে গেল।

মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। আগুনের হল্কার মত নিঃশ্বাস পড়ছে। দীপু আবার পাশ ফিরে শুল। কিছুক্ষণের ভেতর ওর দেহ একটা আগুনের স্তূপের মত হয়ে উঠল।

জ্বরের বেগ আরও বেড়েছে। ও ত
তাকাতে পারছে না। মাথার ভেতর ক্রমে
ঝাপসা হয়ে আসছে।

ভীষণ তৃষ্ণা। কিন্তু জল খাবার
সামর্থটুকুও আর নেই।

বেঘোরে আচ্ছন্নর মত পড়ে
দীপু।

কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল
গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিছুই ভাল
আর মনে নেই ওর।

একবার তাকিয়েছিল। দেখতে পেল
আলো জ্বলছে। বাবা তাকে ধরে
করছে, আর পাশে বসে ডাক্তার তার
পিঠে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে স্তব্ধ হয়ে আ

আবার চোখ বুজল। ওদের কি
হোল দীপু আর কিছু জানে না।

সেদিন ভোররাত্রে জ্বরটা বোধহয়
ছিল। দীপু তাকাল। ওর শিয়রের
বসে বাবা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছি
ও শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটল।

বাবা বলল,—জল খাবি?

মাথা নেড়ে জানাল দীপু—হ্যাঁ।

বাবা ছোট একটা কাচের গেলাসে
সন্তর্পণে ওর মুখে অল্প অল্প করে
ঢেলে দিল। দীপু আবার চোখ বুজল।

আরও কিছু পরে বাবা ওষুধ খাওয়া
দীপু এখন সব দেখতে পাচ্ছে। সব বু
পারছে।

বাবা শিবুকে ডাকল। —তুই একটু
কাছে বোস। আমি হাতমুখ ধুয়ে আ

শিবু এসে ওর পাশে বসল
কচলাতে কচলাতে। বাবা ঘর থেকে বে
গেল।

দীপু আস্তে আস্তে চোখ মেল

শিবু চোখ বড় বড় করে
—দাদা, এখন কেমন লাগছে?

ক্ষীণ স্বরে বলল দীপু—ভাল।

একটু সময় চুপ করে থেকে
আস্তে বলল—বাবা কোথায়?

—কলঘরে। ডাকব বাবাকে?

—না। বাবা রাত্তিরে ঘুমোয় নি?

শিবু বললে—না। তিনরাত্তির
মাথার কাছে বসে আছে।

দীপু আস্তে আস্তে বলল
রাত্তির!

—হ্যাঁ। তিনদিন তিনরাত্তির
জ্ঞান ছিল না। বাড়িতে হুলুস্থুলু
দিদি এসেছে কাল।

—দিদি কোথায়?

—ও ঘরে ঘুমোচ্ছে।

দীপু আবার চোখ বুজল।
বাবা—দিদি এসেছে। বাবা তিনরা
শিয়রে জেগে বসে ছিল। দিদি—
শিবু। শিবু তার ভাই। তার
দিদি—তার ভাই!

দীপুর চোখের কসদুটো ভি
আবার।

নামটা শোনামাত্র আপনার ভক্তি চটে যাবে—কাদাপাড়া লেক! এ আবার কি নাম? একটা ভালো নাম সম্প্রতি রাখাও হয়েছে। তোদের মনে পড়ে—নেতাজী সরোবর অথবা সুভাষ সরোবর, দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের সঙ্গে মিলিয়ে।

কাদাপাড়া লেক, নামটা শুনতে যতো অসংস্কৃত—ততোই সংস্কৃত, সভ্য, খোলা-মেলা ও নতুন একে দেখতে। সরোবর বেষ্টন করে আড়াআড়ি কৃষ্ণচূড়া বীথি—পিচ ঢালা চমৎকার রাস্তা, দীর্ঘ দীঘি। শীতকালে চিড়িয়াখানার জলাশয়ের মতন এখানেও সাইবেরিয়ার হাঁস টীল প্রভৃতি পাখির অস্থায়ী আসর বসতে দেখেছি। সে সময়ে তো আর ছেলের দল ঝাঁপাই জুড়তে জলে নামে না! সুতরাং তাদেরই একার নিরবচ্ছিন্ন অবসর যাপন, জয়-জয়কার।

এই দারুণ গ্রীষ্মে জলাশয়ের জল সামান্য কমে থাকতে পারে, তবু দেখতে ইটম্বর। মাঝখানে কৃত্রিম দ্বীপ। যত্নে চষা ফুলের গুচ্ছ গাছ শুদ্ধ সাবাড়। দের দেখা যাচ্ছে ঘাস ফুলের ঝাঁক—নিয়েচোর কাশের শোভার মতনই! আর ছ, জংলী গাছ-গাছালি, যা থেকে, গায়ে লাগলেও, হাওয়ার সত্যতা প্রমাণ করা য়। ঐ সব নিদারুণ সুন্দর উঁচু ঢিবির পর সাঁতার কেটে স্থানীয় বালক-বালিকার গিয়ে জমেছে। তাদের হৈ-চৈ হাসি-য় জায়গাটা কী ভীষণভাবে প্রাণবন্ত উঠেছে গরমের দিনের এই পড়ন্ত বেলে! যতোদূর দেখে বোধ হলো, এই সরোবরকে কেন্দ্র করে কোনো সাঁতারের ক্লাব নো পর্যন্ত জন্ম নেয়নি, অথচ নেওয়ার যোগ বিস্তর। আমরা দেশবন্ধু পার্ক বা হেদুয়ায় ও গোলদীঘিতে কি ঠাসা-প্রতিষ্ঠান দেখি— তাঁদের মধ্যে কেউ কি এই লেকে অনুশীলনের কথা তা করেও দ্যাখেন নি। এখানে অথৈ শয়—সাঁতার ও জলক্রীড়ার অনুশীলনের ক নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা—কেন?

যাবার অসুবিধা তেমন নেই—দুদিক ই বাসরাস্তা। এক নারকেলডাঙা, দিকে বেলেঘাটা। হাঁটাপথে, বোধহয়, দিকেই খোলা এই লেক অঞ্চল। সুতরাং বাধা কোথায়? যদি অন্য কোনোরূপ বিপত্তি থেকেও থাকে, তা দূর করা নামেই সাধ্যাতীত নয়। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তারা এ বিষয়ে চিন্তা করুন আজই। তাতে দুরকমের সুবিধা। একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সাবলীল অনুশীলন চলবে, অন্যদিকে এই বিপুল নির্জন লেক অঞ্চল হবে হাওয়া-বিলাসীর কাছে স্বস্তিকর। আজ তার অস্বস্তি ও ভয়-বিপদের কারণই এই জনহীনতা, অন্ধকার ও প্রহরার অব্যবস্থা। সন্ধে হতে না হতেই বিশাল এলাকা জুড়ে অন্ধকার নিঃশব্দে পড়ে থাকে। পিচ-রাস্তা বরাবর সামান্য আলোর ব্যবস্থা। এছাড়া মাঠের কোথাও তেমন আলো নেই। গুণ্ডা বদমায়েসদের স্বর্গরাজ্য করে তুলতেই কি এই আলোর কার্পণ্যটুকু বজায় রাখা হয়েছে! লেক তৈরি হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত তো কম দুর্ঘটনা ঘটেনি—তবু সংশ্লিষ্ট মহলের টনক নড়ছে না কেন?

এই দুর্ধর্ষ গরমের দিনে কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মানুষ যে নিশ্চিন্তে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ঘরের বাইরে, লেকে বসে কাটাবে তার উপায় নেই। সর্বদাই সচকিত থাকতে হয়, সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। কোথা থেকে কার কর্কশ হাত এসে করতল মেলে বলবে, দাও—যা কিছু আছে, আমার হাতে দাও—না দিলে এই যে শাণিত ছোরা দেখছো!

এতো কথারও বাজে খরচ হয় না অনেক সময়। শুধু ছুরি দেখলেই অন্ধকারে অসহায় মানুষ প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্যেই সর্বস্ব দান করে বসে এবং তাতে আশ্চর্যেরও কিছু নেই।

ভেবে দেখুন কী মারাত্মক কথা! এর ওপর সঙ্গে যদি আপনার মহিলা আত্মীয়-স্বজন থাকেন তাহলে তো সূর্য ডোবামাত্রই আপনাকে স্থান ত্যাগ করতে হবে। তাহলে কাদের জন্যে এই লেক-অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে? এই প্রশ্ন, এই জিজ্ঞাসা থেকে আপনার জীবনের কোনো স্তরেই পার নেই। সাধারণ ভদ্র-গৃহস্থ মানুষের ভোগ সরাসরি চলে যাচ্ছে দুর্বৃত্ত ও সমাজ-বিরোধীদের পেটে। এর থেকে যেন কোনো উদ্ধারই নেই। মজার কথা হচ্ছে, এ সমস্ত সমাজবিরোধী কার্যকলাপে কারা লিপ্ত তা আমাদের দেশের শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষক মাত্রই হয়তো জানেন। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিলম্বিত।

ভারি সাজানো-গোছানো চমৎকার এই লেক-অঞ্চল। সারিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ার সমারোহ। ইতস্তত কর্ণিকার, অশোক, আর নানা জাতের কেসিয়া—তার মধ্যে কেসিয়া ল্যাঙ্কেস্টারিই প্রধান। জারুলে ফুল এসেছে। হাঁটাপথ ধরে গেলে পাড়ের কাছে হঠাৎ বকুল ফুল মেলাও অসম্ভব নয়। অদ্ভুত আনন্দময় ছায়াঢাকা পরিবেশ। এছাড়া কতো অজানা অচেনা গাছ, শিশু, দেবদারু।

লেকের মাঝামাঝি অঞ্চলে ছোটোদের জন্যে বেড়াজাল দেওয়া একখণ্ড ভূমি। তার মধ্যে ফোয়ারা আর নানা জাতের রঙিন ফুল। পাখি, প্রজাপতি, গিনিপিগ, খরগোসের দল। পায়রাও আছে। এছাড়া আছে বাচ্চাদের দোলনা, স্লিপ, ঢেঁকি প্রভৃতি হৈ-চৈ চিৎকারের খেলা। কিন্তু এসবই শুধু সন্ধে নামা পর্যন্ত। তারপর সব খাঁ-খাঁ করছে। গরমের দিনেও এই শিশুতীর্থের আয়ু এতো কম!

আমার এক বন্ধু রাগ করে বললেন, চুলোয় যাক তোমাদের হাওয়া খাওয়া, এতো বড়ো সরোবরটায় তো মাছের চাষও করা যায়! তাহলেও একটা স্থায়ী উপকার হয়, কলকাতার লোক খেয়ে বাঁচে।

সেকথা সত্যি, হয়তো মাছ কিছু ছাড়াও আছে—যেমন আছে হেদুয়া, দেশবন্ধু পার্ক কিংবা গোলদীঘির জলে। কিন্তু সে তো পোষাকী ব্যাপার, তাকে তো ঠিক মাছের চাষ বলা চলে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেভাবে কাজ শুরু করতে দোষ কি?

—রূপচাঁদ পক্ষী

বিবাহ অনুষ্ঠান :

সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজে বিবাহ একটি পবিত্র ভাবগম্ভীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানরূপে পালিত হয়ে আসছে। কোন সমাজে কোনদিন বিবাহ নিছক সামাজিক বা প্রমোদ অনুষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে নি। সব ধর্মের ও সব সমাজের বিবাহ সম্পর্কিত নিজস্ব আচরণবিধি আছে, অবশ্য-পালনীয় নানা নিষেধাজ্ঞা আছে, এবং হাজার-হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সব বর ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলে আসছে, তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের প্রতি যাবতীয় কর্তব্য সে যথাসাধ্য পালন করবে।

এটা সত্যই বিস্ময়কর যে, পৃথিবীর কোন দেশের কোন আদিম সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বীকৃতি দেখা যায় না। আফ্রিকার নিগ্রো, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের পলিনেশিয়া, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ার বুশম্যান—সকলের কাছে বিবাহ অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধন। পুরুষের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রথম স্বীকার করে ইহুদি ধর্ম, তারপরে ইসলাম। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি নেই এবং হিন্দু সমাজে বহু সর্ত-কন্টকিত বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধান অনুমোদিত হয়েছে অতি-সম্প্রতি। নরনারী উভয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবীর সমান অধিকার প্রথম স্বীকৃত হয় ইংলণ্ডে, ১৮৩৬ সালে।

বিবাহে পাত্র-পাত্রী বাছাইর ব্যাপারে সব সমাজেই কিছু-কিছু বিধিনিষেধ দেখা যায়। ঐ সব বিধিনিষেধ অমান্যকারীদের এক সময় মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেওয়া হত। প্রাচীন মিশর ও পারশ্যে অভিজাত পরিবার-গুলিতে ভাই-বোনে বিয়ে হত। মধ্যযুগে পেরুতে ও অতি-সম্প্রতি হাওয়াই দ্বীপ-পুঞ্জে এই বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। সং ভাই-বোনে বিয়েও এক সময় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বাইবেলে আছে, আব্রাহাম বিয়ে করেছিলেন তাঁর সং বোন সারাকে। ভারতের কোন-কোন স্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মামা-ভাগ্নীর বৈবাহিক মিলন এখনও রাজ-যোটক। পেরু, উরুগুয়ে প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে বিবাহযোগ্য কাকা থাকলে ভাইঝির আর কারও সঙ্গে বিয়ে হয় না। বৃটেনেও ফার্স্ট কাজিনদের মধ্যে অহরহ বিবাহ হয়।

প্রাচীন উপজাতীয় সমাজগুলিতে কোথাও গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল, কোথাওবা, যেমন অস্ট্রেলিয়ার বুশ-ম্যানদের মধ্যে, তা নিষিদ্ধ ছিল। এক একটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে যেসব দেশে এক একটি জাতি-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, সেখানে সেইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বর-কনে বাছাই প্রায় বাধ্যতা-মূলক। আমাদের দেশে কামার কুমোর ধোপা নাপিত সবই আলাদা 'জাত'। বামুনের ছেলে মদ বেচলেও বামুন, শৌন্ডিকের ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হলেও শৌন্ডিক, এবং তাদের স্বজাতের বাইরে গিয়ে বিয়ে করা আজও ধর্মত নিষিদ্ধ। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আফ্রিকার উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও দেখা যায়। একজন মাসাই উপজাতীয় কর্ম-কার অন্য কোন বৃত্তিজীবীর মেয়ের পাণি-পীড়নের অধিকারী নয়। এইভাবে জাত ধর্ম বংশ বর্ণ প্রভৃতির বিধিনিষেধ সকল সমাজে পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের সুযোগ সীমিত করেছে। কিন্তু কোনদিন কোন সমাজ বিবাহে নিরুৎ-সাহ প্রকাশ করেনি। সব ধর্ম সব সমাজ বরাবর একথা বলে এসেছে যে,বিবাহ মনুষ্য-জীবনের একটি অবশ্য কর্তব্য। রোমান সম্রাট অগাস্টাস চব্বিশোর্ধ্ব অবিবাহিত সকল প্রজার জরিমানার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংলন্ডে ১৬৯৫ থেকে ১৭০৬ সাল পর্যন্ত এই আইন বলবৎ ছিল যে, চব্বিশোর্ধ্ব অকৃতদার ও বিগতদারদের বিবাহ না করা পর্যন্ত—সাধারণ ব্যক্তিদের বছরে এক শিলিং, মার্কুইসদের বছরে দশ পাউন্ড ও ডিউকদের বছরে বারো পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য আমাদের দেশে অকৃতদারদের যে বিবাহিত ও সন্তানের পিতাদের তুলনায় অনেক বেশী আয়কর দিতে হয় তার কারণ স্বতন্ত্র। তাদের বেশী দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলেই তাদের কাছ থেকে বেশী নেওয়া হয়, এবং জনভারাক্রান্ত এই রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আন্তরিকভাবেই এটা চান যে, অবিবাহিতরা অবিবাহিতই থাকুন ও রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যান।

পাত্রপাত্রীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ঘটকবৃত্তি একসময় পৃথিবীর সকল দেশে প্রচলিত ছিল। আজও ভারতবর্ষে তো বটেই, জাপানেও ঘটকদের ফলাও করবার। পারস্য ও আরব দেশগুলিতে বাড়ী বাড়ী ঘটকদের আনাগোনা এখনও বন্ধ হয়নি। পৃথিবীর যেসব দেশে নরনারীর অবাধ মেলামেশা এখনও প্রচলিত হয়নি ও বিবাহসম্পর্কিত ধর্মীয় বিধিনিষেধ বলবৎ আছে সেসব দেশে ঘটকবৃত্তি অবলুপ্ত হতে আরও কিছু সময় লাগবে। ঐসব দেশে বিয়ের কথাবার্তা বেশ কিছুদিন ধ'রে চলে, এবং বিয়ের দিনক্ষণ বহুকিছু বিচারবিবেচনা করে স্থির করা হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে পুরোহিত জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ের দিন স্থির করা হ'ত, যে ব্যবস্থা ভারত ও চীনে আজও প্রচলিত।

যৌতুকদান বিবাহের একটি দীর্ঘপ্রচলিত রীতি। এই প্রথাটি গড়ে ওঠার পিছনে অবশ্য ধর্মীয় ও সামাজিক কারণের চেয়ে অর্থনীতির 'ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই' থিয়োরি বেশী কাজ করেছে। যে সমাজে ছেলে দুষ্প্রাপ্য সেখানে কন্যাপক্ষকে পণ দিয়ে ভাল বর জোগাড় করতে হয়, আবার যে সমাজে মেয়ে কম, সেখানে টাকা, জমি, গবাদি পশু প্রভৃতি নিয়ে পাত্রপক্ষকে পাত্রীর দ্বারস্থ হতে হয়। আমাদের বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ করে দুগ্ধব্যবসায়ীদের মধ্যে মে সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় পাত্রীপণ অবিশ্ব ভাবে চড়া।

বিবাহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও পৃথি সব দেশে বর বিয়ে করতে আসে রাজবে অথবা যোদ্ধরূপে। আর কনে সাজে রা মতো। ভারতবর্ষে এখনো এই রীতি প্রচা প্রাচীন গ্রীসে বর-কনে দুজনকেই ম পরানো হ'ত; রোমে পরানো হ'ত ফু সাজ। এখনও যুগোশ্লাভিয়ায়, রাশিয়ায় বর-কনের মাথায় মুকুট পরানো বিবাহকে তারা বলে পরিণয়-অভিষে মেট্রিমোনিয়াল করোনেশন। প্রাচীন বিবাহের দিন দম্পতি অঙ্গুরী-বিনি করত, পরস্পরের হাত ধরত, মাথায় ম পরত, কনের মুখ ওড়নায় ঢাকা থা ফুলের সাজে সারা অঙ্গ ঢেকে থা পুরোহিত নবদম্পতির কল্যাণ কামনা ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিবেদন স্বজনবান্ধবের সাড়ম্বর উপস্থিতিতে বি প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকত। হাজার হাজার বাদে রোম আজ খৃষ্টধর্মী, কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান প্রায় একই থেকে গে

প্রতি বিবাহেরই মোটামুটি কয়েকটি অধ্যায় থাকে। প্রথমত কয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বধূকে এক পরি থেকে আর এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমাদের বিবাহানুষ্ঠানে কনকা কোন অভিনব প্রথা নয়। স্কটল্যান্ডে যখন বাপের বাড়ী থেকে যাত্রা করে কনের গায়ে একটা ছেঁড়া জুতো ঠো বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তার উপর ঐ বা আর কোন দাবী নেই। শ্বশুরবাড় কনেকে কোলে করে প্রবেশ করানোর ইংলন্ড, প্যালেস্টাইন, জাভা, চীন প্র বহু দেশে দেখা যায়। শ্বশুরবাড়ীতে ঢো সময় চৌকাঠে কনের হোঁচট খাওয়া বি অমঙ্গলসূচক, সেইজন্যই কনেকে কোলে ঘরে ঢোকানো হয়। ভারতেও নববধূ শ্বশ্রুমাতা কোলে করেই নামান কোনো কো অঞ্চলে।

অমঙ্গল ও অশুভ শক্তির প্রভাব নবদম্পতিকে রক্ষার জন্য বিবিধ আনুষ্ঠা প্রক্রিয়া ও প্রার্থনা সব বিবাহ অনুষ্ঠা দেখা যায়। তারপর নবদম্পতি যাতে সন্তানের জনক-জননী হতে পারে জন্যও বিভিন্ন বিবাহানুষ্ঠানে কতক আচারঅনুষ্ঠান পালিত হয়। আয়ারল্যা ইলন্ডের বিবাহবাসরে কনের গায়ে জো গুঁড়ো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, কনেকে সুপারি ফল প্রভৃতি উপহার হয়। পারস্যে বিবাহানুষ্ঠানে পুরোহিত কনের গায়ে চাল ছড়িয়ে দেয়। ইহু বিবাহবাসরে বর-কনের গায়ে যব আর ছড়িয়ে দিয়ে নিমন্ত্রিতরা বলে— বাড়িয়ে চলো। আর আমাদের বিবাহের বর কনেকে উদ্দেশ করে বলে—আমি আ তুমি পৃথিবী, এসো আমরা মিলিত নবসৃষ্টির দায়িত্ব নিই।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

চিত্ররসিক

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন যে, বিতায় তিনি যা বলতে পারেন নি, ছবিতে ই বলবার চেষ্টা করেছেন। ১৯শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত বিড়লা মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথের ছবি পত্রাবলী ও ডায়েরি প্রভৃতির যে অনন্য প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে তাঁর উক্তির সত্যতা সর্ব-সাধারণের সামনে আরো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই বোধহয় প্রথম রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কাটাকুটি থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে আঁকা ছবির একটা কালানুক্রমিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। প্রদর্শিত ৭৪ খানি ছবির মধ্যে ৫৮ খানি পূর্বে কোথাও দেখান হয় নি এবং এর মধ্যে তাঁর করা একমাত্র তৈলচিত্রটিও স্থান পেয়েছে—সেটি একটি রমণীর প্রতিকৃতি। আরেকটি ইন্টারেস্টিং ছবি হল কবির আঁকা একটি নর্তকী মূর্তি। কতকটা ঢিলে হাতে তাঁর গ্রাফিকধর্মী কাজ। তবে তাঁর নিসর্গ এবং কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণীর ছবি-তেই তাঁর রঙ এবং কম্পোজিশনের স্বকীয়ত্বের স্বাক্ষর নিয়ে আছে। আমেদা-বাদে ১৯৩০-৩১ নাগাদ তিনি যখন বিশ্ব-ভারতীর জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে নৃত্য-শিল্পীদের দল নিয়ে উপস্থিত হন এবং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ১০০১, টাকা তুলে দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে নিজেকে পরিহাস করে তিনি চিঠিপত্রে হাতে একটি কুকুরের ছবি এঁকে-ছিলেন। এই করুণ পরিহাসের দলিলটিও তাঁদের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্র ও অপ্রকাশিত গানের স্বরলিপির সংগ্রহও চমৎকার হয়েছিল। ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড ছেড়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক চিঠিটি এখনো দর্শকের হৃদ-স্পন্দন দ্রুততর করবার ক্ষমতা রাখে। আর সঙ্গে এই চিঠির খসড়ার কাটাকুটির মধ্যেও একটা প্যাটার্ন তৈরীর প্রচেষ্টা পাওয়া যায়। প্রদর্শনীটি আয়োজনের পেছনে অনেক চিন্তা ও পরিশ্রমের নজীর পাওয়া যায়। এই বছর শেষে এখানে গগনেন্দ্রনাথ শত-বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বড় প্রদর্শনী ও মনোগ্রাফ তৈরী করার ব্যবস্থা হবে। এ বিষয়ে জনসাধারণের সাহায্য প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা আকাডেমির ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে ৪৬-৯৪০২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

●

দক্ষিণ কলকাতার রমণী চ্যাটার্জি রোডের আর্ট আকাডেমি হলে ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি শিল্পী সীতেশ রায় এবং মার্কিন শিল্পী রাসেল গ্রীনের একটি যৌথ প্রদর্শনী করেন। দুই দেশের দুই শিল্পীর বারোখানি ছবির মধ্যে লোক-শিল্পের প্রভাবের একটা যোগসূত্র ছিল। সীতেশ রায় প্রধানত পটের প্রভাবে কাজ করেছেন। তাঁর রেখা এবং ডিজাইনের জোর বিশেষভাবে নজরে পড়ে। তাঁর বালগোপাল, ধান্যবরণ, সুরের টানে প্রভৃতি ছবিগুলি আকর্ষণীয় হয়েছিল। রাসেল গ্রীনের গ্রাফিকগুলির মধ্যে কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য, সার্কাস, ঘোড়া এবং গরুর একটি ছবি বিশেষ ভাল লাগল। প্রদর্শনী ২২শে এপ্রিল থেকে ১লা পর্যন্ত খোলা ছিল।

●

ছ-সাত বছর আগে সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে একটি মুক্তাঙ্গনে ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়েছিল। তারপর দীর্ঘকাল পরে ২৬শে এপ্রিল থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত এখানকার ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আবার এই ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। বারোজন শিল্পীর বাইশখানি কাজ ছাড়া কলেজের অধ্যক্ষের দুখানি কাজও প্রদর্শিত হয়। আধুনিক ভাস্কর্যের প্রভাবে প্রভাবিত এই শিল্পনিদর্শনগুলির মুক্তাঙ্গনে প্রদর্শন বিশেষ একটা রূপ নিয়েছিল। আধা-রিপ্রেজেন্টেশনাল ও নন-রিপ্রেজেন্টেশনাল-কাজের এতগুলি নিদর্শনের মধ্যে দেবব্রত চক্রবর্তীর জনতা ও স্টেশনের বেঞ্চি, মধু-সূদন চ্যাটার্জির টেরাকোটা প্রাণী, বিমান

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

দাশের নন-রিপ্রেজেন্টেশনাল কাজ সার্কুলার ফর্ম ও দিলীপ সাহার 'স্টোন ফর্ম' বেশ ভাল লাগল। সঞ্জয় দাশের উপবিষ্ট মূর্তিটির ছোটর মধ্যে মনুমেন্টাল ভাব খুবই আকর্ষণ করে। চিন্তামণি করের উড্ডীয়মান অপ্সরা বোধহয় সবচেয়ে রিপ্রেজেন্টেশনাল কাজ। ছাত্রছাত্রীদের কাজের এত রকম বৈচিত্র্য ও

পরীক্ষামূলক কাজ আশাপ্রদ মনে হয়। ভরসা করি এ ধরনের প্রদর্শনী জনপ্রিয় হবে।

●

লক্ষ্মৌ-এর শিল্পী সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় শিল্পী অসিতকুমার হালদারের শিষ্য এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত ভারতীয় শিল্প-রীতির অনুসরণে কাজ করেন। কলকাতার তথ্য কেন্দ্রে আয়োজিত তাঁর জলরঙের ছবিগুলি সে যুগের ডেকরেটিভ ও রোমাণ্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। তাঁর পার্বত্য দৃশ্যাবলী ও চৈতন্যজীবনী নিয়ে ছবিগুলি বেশ তৃপ্তিকর হয়েছে। তার বৃহত্তম কাজ হল ৭৫ ফিট দীর্ঘ ৫ ফিট উ'চু মানুষের ক্রমবিকাশ নিয়ে একটি বৃহৎ স্ক্রল পেন্টিং। প্রচুর প্রতীকচিহ্নের ব্যবহার এখানে করা হয়েছে। তিনি হিমাচল প্রদেশে একটি নির্মীয়মান মন্দিরের অনেকগুলি ভাস্কর্যও করছেন। কতকগুলি খুব ছোট মাপের ভাস্কর্য ও অনেকগুলি ফটোগ্রাফের নমুনাও রাখা হয়েছিল। স্থানাভাবে তাঁর এতগুলি ছবি ভালভাবে সাজান যায় নি। বাইরে থেকে যে সব শিল্পী কলকাতায় প্রদর্শনী করতে আসেন তাঁদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁদের সহায়তা করবার কোন রকম ব্যবস্থা হলে ভাল হয়।

●

দীর্ঘকাল পরে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৬ই মে থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত শিল্পী গোপাল ঘোষের একটি বড় প্রদর্শনী হয়ে গেল। তাঁর গোড়ার দিকের আঁকা ওয়াশ টেকনিকের কতকগুলি সুন্দর ছবি থেকে শুরু করে হাল আমলের প্যাস্টেল ও জলরঙের নিসর্গ দৃশ্য নিয়ে প্রায় একশর কাছাকাছি ছবি দেখা গেল; বেশীর ভাগই মাঝারী ও ছোট মাপের ছবি। বাংলার মাঠ-ঘাট, বাংলার বাইরের পাহাড় পর্বত এবং অনেকগুলি পর্ণকুটিরের বর্ণোজ্জ্বল ছবি প্রথমটা দেখতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই কতকগুলি ছবি দেখলে মনে হয় এগুলি যেন কোন বড় মাস্টারপীস তৈরী করার প্রাথমিক নক্সা—যে মাস্টারপীস আজ পর্যন্ত আঁকা হল না। কোন ছবিতে রেখার গতি কোথাও বা রঙে ডেকরেটিভ প্রয়োগ সামগ্রিকভাবে মনকে টানে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে একটা একঘেয়েমির ভাব এসে যায়। গোপাল ঘোষ এখনো নিয়মিত ছবি এ'কে যাচ্ছেন। ছবি তাঁর প্রচুর। কিন্তু সমগ্র প্রদর্শনী দেখে কেন জানি না মনে হয় এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি বোধহয় তাঁর অল্প। কর্তৃপক্ষ একটি ক্যাটলগের ব্যবস্থা করলে ভাল হত।
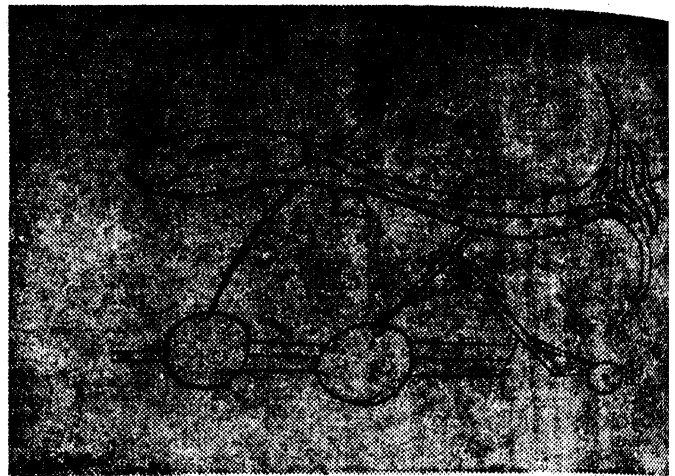
শিল্পী গোপাল ঘো[ষ]

●

টি এন মজুমদার স্ট্রীটের 'চিত্রম' গ্যালারী ১০ই থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন দাসের জলরঙের ছবির একটি প্রদর্শনী করলেন। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে জলরঙের চর্চা ইদানীং একটু কমে এসেছে। তার মধ্যে শ্রীদাসের এই কুড়িখানি হেড স্টাডি ও ল্যান্ডস্কেপ খানিকটা পরিবর্তিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। ছবিগুলি সাবেকী ধরনের, রিপ্রেজেন্টেশনই এর উদ্দেশ্য। শ্রীদাস সবচেয়ে সাফল্য লাভ [কর]ছেন তাঁর হেড স্টাডিগুলির মধ্যে এর ভেতরেও বাঙালী মেয়েদের টাই[প] আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগল। ... মা এবং পিতামহী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ টাইপ হিসাবে "বেলা" কয়েকটি অ... মেয়ের মুখ—"ছবি", "রেখা" ... চেহারাগুলি সকলের কাছেই ... মনে হয়। ১৯৬২তে শ্রেষ্ঠ জলরঙে[র] হিসেবে করা পোর্ট্রেটটিও এখানে ... হয়েছে। তাঁর গ্রুপ কম্পোজিশ[ন] আমাকে ততটা আকৃষ্ট করে নি। "মহানদী" এবং শিল্পীর দেশের ... স্কেপটি উপস্থাপনের সারল্যে মনকে ... করে।

●

গ্যালারী এভারেস্ট ৯ই থেকে ... মে পর্যন্ত শিল্পী সুনীলমাধব ... হালআমলের সাতাশখানি ছবির প্র[দর্শনী] করছেন। এবারে শ্রীসেন কতকগুলি ... ধরনের কাজ প্রদর্শন করেছেন। ... পুরোনো বিমূর্ত এবং আধা-... কয়েকটি কাজ ছাড়া বেশীর ভাগ ছবি ... কোথায় একটা লোকশিল্প এবং পপ ... মিশ্রণ দেখা গেল। অনেকগুলি ছবি ... মার্বল ডাস্টের মোজাইক দিয়ে করা ... আর্টের চাইতে ক্র্যাফট-ঘেঁষা কাজ ব[লে] হতে পারে। তবে একটা হাল্কা ... থাকায় মস্তিষ্কের ওপর অতিরিক্ত ... না করেও উপভোগ করা যায়। ... ধরনের কাজের মধ্যে দেবমূর্তি (জ[গন্নাথ], বলরাম, সুভদ্রা), মাছ (কতকটা ... মাসেনের মত কাঠি দিয়ে সাজানো), বাঘ, তাসের অভিনব ব্যবহারে মা[...] কাক, একটি টর্সোর আভাস দেওয়া ... প্রভৃতি ছবিগুলি রং ও ডিজাইনে[র] ... চোখকে টানে।

শিল্পী : সাঁতেশ রায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 26th May 1967.   শুক্রবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪   40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

ত্রিপুরার সাহিত্য সম্পর্কে

গত ৩১শে চৈত্রের বিশেষ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চিদানন্দ গোস্বামীর 'বিশশতকে ত্রিপুরার সাহিত্য' প্রবন্ধটির জন্য লেখক ও প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ বাংলা দেশের জনমানসে অনেকটা অপরিচিত এবং বলা যায় উপেক্ষিত। এই উপেক্ষা ও অপরিচিতি ঘোচানোর আংশিক প্রয়াস সত্যিই প্রশংসার্হ।

তবে বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলাম শ্রীগোস্বামী ত্রিপুরার আধুনিক কাব্য-জগতের আলোচনা করতে গিয়ে কিছু পুরনো সংবাদকে ভিত্তি করেছেন। ফলত, তাঁর আলোচনাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

'অমৃত' পত্রিকার অগণিত পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে শ্রীগোস্বামীর অলিখিত কাব্যজগতের মোটামুটি একটা চিত্র দিচ্ছি :

প্রথমত, সাময়িক পত্র-পত্রিকার যে তালিকা তিনি দিয়েছেন তার থেকে অনেকগুলি নাম সহজেই বাদ দিতে পারি। যেমন—'নবজাগরণ'; 'শিখা'; 'সুভাষ'; 'রত্নলিপি' এবং 'গান্ধার'। দীর্ঘদিন যাবৎ পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হচ্ছে না।

সাম্প্রতিককালে নিয়মিতভাবে কোন সাহিত্যপত্রই প্রকাশিত হচ্ছে না। তবে শুধুমাত্র কবিতা অবলম্বন করে বেশকিছু পত্রিকা নিয়মিত বেরোচ্ছে। আগরতলা থেকে 'নান্দীমুখ' (কবিতা ত্রৈমাসিক), 'জঠর' এবং 'ক্ষুঃ' (কবিতা-পাক্ষিক) এবং ত্রিপুরারই কৈলাশহর থেকে 'জোনাকি' (কবিতা-ত্রৈমাসিক)—এই নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পুজোর মরশুমে 'সমাচার' এবং 'ত্রিপুরা'র বিশেষ সংখ্যা সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রীগোস্বামী নিজের নামসহ এমন ক'জন কবির নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের ভূমিকা দূরান্বিত নক্ষত্রের ন্যায় খুবই ম্লান। শ্রীযুক্ত রণেন দেব, সজীলকৃষ্ণ দেববর্মা, সত্যব্রত চক্রবর্তী (কল্যাণব্রত চক্রবর্তী), মানিক ধর এবং প্রদীপ চৌধুরীর অনলস ভূমিকা সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিয়ে বাকি যাঁদের ভূমিকা ত্রিপুরার বিশশতকের বর্তমান দশকের সাহিত্যজগতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, — 'জোনাকি' সম্পাদক পীযূষ রাউত; 'নান্দীমুখ' সম্পাদক স্বপন সেনগুপ্ত; অজিতকুমার ভৌমিক এবং আপন দাস। এ ব্যতীত ত্রিপুরার উদীয়মান কবিদের মধ্যে যাঁদের রচনা সম্ভাবনাময় তাঁদের মধ্যে উল্লেখ হলেন—শঙ্খপল্লব আদিত্য, সজলকান্তি লস্কর, প্রদীপবিকাশ রায়, মানিক চক্রবর্তী।

উপরি-উল্লিখিত কবিদের মধ্যে অনেকেই কোলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। সে যাই হোক, বাংলা আধুনিক কবিতার এই সার্থক ফসলের দিনে ত্রিপুরার তরুণ কবিরা অনগ্রসর নয় বলেই মনে করি।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
আগরতলা, ত্রিপুরা।

''বিনা স্বদেশী ভাষা'' — দুটি চিঠির উত্তর

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'বিনা স্বদেশী ভাষা' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি লিখেছিলাম—

"শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কথা সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তিনি মাতৃভাষা এক প্রকার জানতেন না, বরোদায় থাকাকালে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে তিনি প্রথমে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন—ইত্যাদি।"

কথাগুলি অবশ্য স্মৃতি নির্ভর করে লিখিত। পত্রলেখক মন্তব্য করেছেন—

"এ কথা প্রচলিত আছে বটে এবং স্বয়ং দীনেন্দ্রনাথের লেখাতে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে, কিন্তু কতটা প্রমাণসহ সে বিষয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে।"

এরূপ 'জেনারেল এভিডেন্স' হিসাবে তিনি অনুমানসাপেক্ষ কিছু মন্তব্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম (পন্ডিচেরী) কর্তৃক প্রকাশিত SRI AUROBINDO ON HIMSELF AND ON THE MOTHER নামক শ্রীঅরবিন্দের জীবনী প্রসঙ্গে চিঠি-পত্র এবং মন্তব্যসম্বলিত গ্রন্থখানির প্রতি পত্র-লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় আছে—

"In my father's house only English and Hindustani was spoken. I knew no Bengali."

এই উক্তি তাঁর নিজের। পরে তিনি বাংলা শিখেছেন শিক্ষক রেখে, ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

"About the learning of Bengali, it may be said that before engaging the teacher, Sri Aurobindo already knew enough of the language to appreciate the novels of Bankim and the poetry of Madhusudan. He learned enough afterwards to write himself and conduct a Weekly Bengali, writing most of the articles himself but his mastery over the language was not at all the same as over English and he did not venture to make speeches in his mother tongue."

দীনেন্দ্রকুমার সম্পর্কে যে মন্তব্য আ… তার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। … যায় যে, দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা শিক্ষায় সাহায্য কর… দীনেন্দ্রকুমার তা নিম্নলিখিত মন্তব্য থে… বোঝা যায়, ২৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

"No there was no regul… lessons. Dinendra lived with S… Aurobindo as a companion a… his work was rather to help hi… to correct and perfect his know… ledge of the language and … accustom him to conversation i… Bengali than any regular teachin… Sri Aurobindo was not … pupil of Dinendra Kumar; … had learnt Bengali already b… himself and only called Dinendr… to help him in his study."

ঠিক তারপরে ঐ পৃষ্ঠাতেই আছে … একজন তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক বাং… শিখিয়েছিলেন :

"A teacher was engaged fo… Bengali, a young Bengali littera-teur—none for Sanskrit.'

এই তরুণ বাঙালী সাহিত্যিকটি দীনেন্দ্রকুমার বলে মনে করা হয়ত অসঙ্গত নয়। দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ত দু-রকম উক্তি হয়ে গেছে।

অমৃতের পাঠক-পাঠিকারা উপরি-উল্লিখিত মন্তব্যগুলি পাঠ করে একটা ধারণায় উপনীত হতে পারবেন এই আশা রাখি।

●

এই সূত্রে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় যে চিঠিখানি লিখেছেন, সেটিও মূল্যবান এবং সুচিন্তিত। তাঁর বক্তব্যগুলি সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো বিরোধ নেই। তিনি বলেছেন, 'কবিতা লেখাটা নেহাতই একটা ফ্যাশন মা… নয়' একথা আমিও স্বীকার করি। 'টেরিলিন' ইত্যাদি প্রবণতার উল্লেখ ছি… আধুনিককালের পরিবর্তিত রুচির পরি… দানের প্রচেষ্টায়। ইংরাজীকে বিজাতী… ভাষা আমিও বলি না। আমরা এক হিসে… ইংরাজী-প্রেমিক, কিন্তু মাতৃভাষাকে অনা… করে নয়। যে শ্রেণীর মানুষ শুধু ইংরাজী ভাষাতেই স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে… তাঁরা আত্মপ্রকাশের তাগিদে কি ভাষা… কবিতা লিখবেন? প্রশ্ন করেছেন পত্রলেখিকা। এর উত্তর আমার প্রবন্ধেই আছে, … মোরায়েস ইত্যাদি সম্পর্কে। তৃতীয়ত: কবি কি ভাষায় লিখবেন বা কি তাঁর করা কর্তব্য তা নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে বলা… বাওয়ার অর্থ অব্যাপারে নাক গলানো। শুধু সাম্প্রতিককালের সমাজ ও সাহিত্যে যে ধারা বইছে তার পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যাঁদের রচনা ভালো লেগেছে তাঁদের সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছি। চতুর্থ… মন্তব্যটি সম্পর্কে আমার অভিমতও অনু… রূপ। আমিও বিশ্বাস করি 'এলিয়ট… বিংশ শতাব্দীর সব ভাষার কবি, … শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সাধারণ অভিজ্ঞতা…

—অজয়…

অমৃত

দিনযাপনের সমস্যা

বাংলাদেশে নতুন সরকার অনেক সাহস করে পুরনো খাদ্যনীতি বদল করে নতুন খাদ্যনীতি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন যে, একটি ঘাটতি রাজ্যে চাল সংগ্রহ করা কতখানি কণ্টকর এবং ক্ষুধার্ত মানুষের দাবী মেটাতে গেলে সর্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা কতখানি অপরিহার্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে খোলা বাজারে চালের দাম কমে গিয়েছিল। অন্যান্য জিনিসের দামও ছিল নিম্নমুখী। স্বভাবতই সরকার বদলের পরে চারিদিকে একটা প্রত্যাশার ভাব জাগে এবং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে সেই প্রত্যাশা এখনও মানুষের আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশছোঁয়া জিনিসের দর। সরকার যে পরিমাণ ধান-চাল সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন তা কতখানি পূর্ণ হবে বলা যাচ্ছে না। প্রতিশ্রুতি মত চাল আসছে না সরকারের হাতে। তার ফলে খাদ্যাবস্থা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে এবং রেশনব্যবস্থা চালু রাখতে সরকার কোথা থেকে খাদ্যশস্য জোগাড় করবেন তা বলা যাচ্ছে না। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, রাজ্যের খাদ্যসঙ্কট মেটাবার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২৫ হাজার টন গম সরবরাহের ওপর নির্ভর করছেন। এই গম আসবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। কারণ, কেন্দ্রের হাতেও অতিরিক্ত গম খুব বেশি নেই।

এদিকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় খরার জন্য চরম অন্নকষ্ট দেখা দিয়েছে। অতিরিক্ত খাদ্যশস্য না পেলে এই আর্ত এলাকায় ত্রাণকার্য চালানোই দুষ্কর হয়ে উঠবে। আগামী ফসল না ওঠা পর্যন্ত রাজ্যের অবস্থা হবে দিন আনি দিন খাই-য়ের মতো। কিন্তু এই দিনে আনার ব্যবস্থাই বা হবে কী করে? খাদ্যশস্যের অপ্রাচুর্যের সঙ্গে তাল দিয়ে প্রত্যেকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ডাল, তেল, তরিতরকারী কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যাচ্ছে না। আর কলকাতায় যাঁরা বাস করেন তাঁদের বরাদ্দ রেশনও পরিমাণে অপ্রতুল। সব মিলিয়ে জনসাধারণ খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েছে। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি নিচে নামাতে না পারলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অবস্থা খুবই সঙ্গীণ হয়ে উঠবে। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, চাল যথেষ্ট আছে কিন্তু দাম বেশি। চাহিদা ও জোগানের নীতি মানলে যথেষ্ট চাল থাকলে দাম কমতে বাধ্য। আর সেই চাল কোথায় আছে, বাজারে তা কি পাওয়া যায়? নতুন সরকার যে আশা-ভরসা নিয়ে কাজ সুরু করেছিলেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চড়া দর সেই আশা অনেকখানি ক্ষুন্ন করেছে। মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিকারের দায়িত্ব সরকারের। তাঁরা কীভাবে এর সমাধান করবেন জনসাধারণ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এদিকে চাকুরীজীবী মানুষ সংসারখরচের চাপে পড়ে সরকারের কাছে মহার্ঘভাতা বাড়াবার দাবী করছেন। মহার্ঘভাতা বাড়াবার বিরুদ্ধে একটা যুক্তি দেওয়া হয় যে, মহার্ঘভাতা বাড়ালে বাজারে জিনিসের দর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গিয়ে সেই বাড়তি টাকাটা খেয়ে নেয়। সাধারণ মানুষের অবস্থা থাকে পূর্ববৎ। সুতরাং আসল সমস্যা হল ন্যায্য দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করা। অবশ্য জিনিসের দর কমাতে শুধু যে এই সরকারই পারছেন না তা নয়, গোটা দেশের অবস্থাই প্রায় এক রকম।

কিন্তু আমরা বাংলাদেশেরই সমস্যার কথাই বিশেষভাবে বলছি। কারণ, এই রাজ্য নানাবিধ সমস্যায় ক্লিষ্ট। তার মধ্যে খাদ্য-সমস্যা অন্য সকল সমস্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। মোট কথা ডাল-ভাতের সমস্যাই হল আদি সমস্যা। এর সমাধানের ওপর যে কোনো সরকারের কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন যে, উদ্বৃত্ত জেলাগুলি থেকে খাদ্যসংগ্রহ ঠিক মতই হবে। তিনি বলেছেন যে, চালের বিক্রয়-মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও মজুতদারদের অসহযোগিতার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে সেই অসহযোগিতা দেখা দিয়েছে। তার একটি প্রধান কারণ, অতি মুনাফার লোভ। সরকারী দরের চেয়ে অনেক বেশি দরে বিক্রীর জন্য রাজ্যসীমান্ত থেকে চাল পাচারের অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। সীমান্তে কর্ডন ব্যবস্থায় কোনো শিথিলতা আছে কিনা তা সরকার দেখুন। এবং বাজারে অন্যান্য জিনিসের দর কমাবার জন্যও সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। যথেচ্ছভাবে দাম বাড়বে, দরিদ্র মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে না পেরে শূন্যহাতে ঘরে ফিরবে এবং একমুঠো চালের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরবে—এই চিত্র মোটেই উজ্জ্বল আশার নয়। নতুন সরকার এই নিরাশা ও ব্যর্থতা দূর করতে কী ব্যবস্থা নেন তা দেখার জন্য আমরা আগ্রহী রইলাম। বেশি দেরী হলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

মণি-বউদি কথা বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ফেললেন। বেশ বিচিত্র হাসি-মুখেই আমাদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সে তাকানো এমন যে আমি অস্বস্তি অনুভব না করে পারলাম না। অথচ এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি এ পর্যন্ত এতটুকু সঙ্কোচের কোন হেতু পাইনি। মণি-বউদির ঠোঁটের সেই বিচিত্র হাসি যেন অল্পে-অল্পে বেড়ে চলছিল কোন সবিশেষ কারণে।

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—কি হল?

গভীর কোন ভাবনায় না-হোক ভাব-রসের আস্বাদনের মধ্যে বউদি যেন মগ্ন হয়ে ছিলেন; প্রশ্নটা একডাকে ঠিক সাড়া জাগালে না। দ্বিতীয়বারে একটু চকিত হয়ে উঠে সাড়া দিলেন—এ্যাঁ?

বললাম—থামলেন যে? কি হল? এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন?

এবার, ফিক্ করে হাসা যাকে বলে, সেই ফিক্ করে হেসে বউদি বললেন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথা ভাবছিলাম। সংসারে কার্যের পিছনে কারণ থাকে। সে কারণের মূল ধরে এগিয়ে গভীরে গেলে সেই প্রকৃতির সেই উষ্ণ প্রস্রবণে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও বোঝা কিছু যায় না, তবে আর জিজ্ঞাসা থাকে না, বোবা হয়ে যায়।

মানে বুঝি নি। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বউদি বললেন—মাসী সেদিন আমার গালে মুখে ক্রোধবশে চপেটাঘাত করেছিলেন, আঘাতগুলো আমার মুখে কিন্তু ঠিক পড়েনি; বলতে গেলে মাসীই নিজের গালে-মুখে চড় মেরেছিলেন। এবং প্রশ্ন করেছিলেন, কি করে জানলে? কে জানালে? বল্। কে জানালে বল্? এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন সে মুহূর্তে আমি জানতাম না। কল্পনাও করতে পারিনি যে এ বিশ্বসংসারে এমন দরদী আমার কেউ আছে, যে আমার দুঃখ সইতে না পেরে তা অমৃতবাবুর কাছ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করে দিয়ে আসবে।

আমি ভেবেছিলাম বা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম যে, কাকতালীয় ন্যায় অনুযায়ী তিনি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এসে পড়েছিলেন সেদিন; কিন্তু না। তা নয়, তিনি মাসীর সন্দেহমত খবর পেয়েই এসেছিলেন। খবর সত্যই একজন তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। প্রকৃতির রাজ্যে বাতাস যেমন ফুলের গন্ধ মৌমাছিকে পৌঁছে দেয়, অনেকটা সেইভাবে পৌঁছেছিল।

মাসীর বাড়ীতে ছিল এক প্রৌঢ়া ঝি, আর একটি ছোঁড়া চাকর। বয়স তখন তার তের কি চৌদ্দ তার বেশী নয়; বছর চারেক আগে যখন মণি-বউদি এ বাড়ী প্রথম আসেন তখন ছেলেটা ছিল ন'-দশ বছরের। নিতান্ত অনুগত ভালমানুষ চাকর। 'সাত চড়েও রা কাড়ে না' বলে একটা কথার কথা প্রচলিত আছে, সেটা আশ্চর্যরকমে সত্যি ছিল এই চাকরটার বেলা। ছেলেটা কানে একটু খাটো ছিল, তারই জন্যে মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকত। একটা কথা অন্ততঃ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করলে পর তবে সে তার জবাব দিত। একটু বোকা-গোছের দেখেই রত্নামাসী ছোঁড়াটাকে রেখেছিল। মাইনে কম দিত। এঁটো-কাঁটা যা থাকত তার কিছুই ফেলতে দিত না। মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় চুষেই ক্ষান্ত হত না, চিবিয়ে চুর করে ছাড়ত। সেই ছোঁড়াটা তখন চার বছরে বেড়ে চৌদ্দ কমপ্লিট করে পনেরোতে পড়েছে। আমার একটু অনুগত হয়ে পড়েছিল।

কাজে-কর্মের মধ্যে ফাঁক পেলেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি বলত, কোন কাজ করতে হবে দিদিমণি!

ছোঁড়াটার তখন বোকা ভাবটা কিছুটা কেটেছে বয়সের সঙ্গে, না হলে, বুঝতেই পারছেন, চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করত না।

জানিয়ে এসেছিল সেই ছোঁড়াটা। নাম ছিল 'পরসাদ'; কি পরসাদ তাও কেউ কোন দিন জিজ্ঞাসা করেনি, তবে শুধু প্রসাদ তো হয় না, হয় রাম, নয় শিব, কালী, দুর্গা বা দেব বা দেবী কোন একটা শব্দের প্রসাদ হতেই হয়, কিন্তু সেটা কেউ জানত না।

আমাকে সেদিন বিয়ের কথা নিয়ে মাসী যে লাঞ্ছনা করেছিল, সেটা তার চৌদ্দ-পনের বছরের নবীন মনটিকে বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। খবরটা সেদিন সেই গিয়ে দিয়ে এসেছিল অমৃত-বাবুকে। বলেছিল—; বেশ ভঙ্গি করে কণ্ঠস্বরে সম্ভবত সেই চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেটির বেদনার্ত কণ্ঠস্বরের আমেজ নকল করে মণি-বউদি বলেছিলেন, বলেছিল বহুৎ দুখ দেতি হ্যায় মাঈজী। ব-হু-ত্। দিদি-মণিকে এমুন করে বকলে—। দিদিমণির ব-হু-ত দুখ লাগল। দোনো আঁখে পানি আয়া।

একটু চুপ করে থেকে মণি-বউদি বললেন, লছমনপ্রসাদ আছে, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। আমাদের ফায়ার-ব্রিকস্ ফায়ার-ক্লের ওখানে একটা বেশ দোকান করেছে। কিছু ফায়ার-ক্লে কেটে সাপ্লাই-এর কারবারও করে। বোকা আর নয়। আমিই তার দোকান-টোকান করে দিয়েছি। আমার সঙ্গে ও'র বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত লছমন-প্রসাদ আমাদের কাছেই ছিল।

আবার একটু চুপ করে থেকে যেন ভেবেচেবে নিয়ে বললেন বউদি, আপনাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কেষ্টা, রাজারাণীর শঙ্কর, শরৎবাবুর বেহারী, অনুরূপা-দেবীর মথুরো—এরা অমর চরিত্র। চাকর হয়েও সত্যিকার মানুষ। চাকরত্বের যে নিচু-তলা, সে তলা ছাড়িয়ে তারা বড় হয়ে উঠেছে। লছমনও আমার তাই। অনেকটা তাই। আবার তফাৎও অনেকটা। হয়তো বা—।

চুপ করে গেলেন আবার। মনে হল যেন মনে-মনে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখের চাউনির মধ্যে যে অন্যমনস্কতা, সেই অন্যমনস্কতাই কথা বলে দিচ্ছিল। হঠাৎ বললেন—মানে—।

—কি বলব? আবারও একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবার যেদিন আসবে, সেদিন আপনাকে খবর দেব। নিশ্চয় আসবেন। কারণ খুশী হবেন। সত্যিকারের একটা মানুষকে দেখবেন। এই লম্বা। কালো কষ্টিপাথরে গড়া চেহারা। চল্লিশ ইঞ্চি বুকের পাটা, কোমরটা আটাশ-তিরিশের বেশী নয়। অসাধারণ সাহস সহ্যশক্তি। আর খুব ভালো গোলাপ ফোটাতে পারে। ওই কারখানার এলাকায় একটা ছোট বাংলোবাড়ী করেছে এখন; এখন তো তার অবস্থা ভাল, সেখানে বাগান করেছে। চমৎকার বাগান। চমৎকার ফুল। বিশেষ করে গোলাপ,, রজনী-গন্ধা, বেলা আর চামেইলী। যখন এখানে আসে তখন ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসে। আগে তো নিয়মিত পাঠাতো। সে রোজ। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বন্ধ করেছি।

আপনি নিশ্চয় জানেন, কানে আপনার নিশ্চয় এসেছে যে, মণিমালা মুখার্জি, মিসেস এ মুকুরজীর চালচলন সন্দেহজনক। সেটা দুপুরে এইভাবে সাধুসন্ন্যাসী গণৎকার দেবস্থান বেড়ানোর জন্যেই শুধু নয়। আরও নাকি অনেক কারণ আছে যা অত্যন্ত কদর্য। তার প্রথম কারণ আমার বয়স আর আপনার শ্যালকের বয়সের তফাৎ; আমার দেখনহাসি এই চেহারা এবং আমার হাসিখুসী; তাছাড়া উল্লসিত বিলসিত চরিত্র এবং বি-এ ডিগ্রির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সেই অসামঞ্জস্য দোষ আর তার সঙ্গে ওই লছমনের ফুলের রাশির উপঢৌকন—সোনার সঙ্গে সোহাগার মত জুটে গেছে।

আমার মুখে বোধ করি কোন ভাবা-ন্তরের চিহ্ন দেখেছিলেন মণি-বউদি। তিনি বললেন—থাক, কথাটা বেশী আড়ম্বর করে নাটুকে ভঙ্গিতে বলব না; সোজা রাস্তায়, সাদামাটাভাবে সত্য কথাটা বলি আপনাকে। আপনার মুখে [illegible]; আমার

জন্যে হয় আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, নয় অস্বস্তি, অশান্তি ভোগ করছেন।

মণি-বউদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার মাসীই আমার গায়ে কলঙ্কের কালী ছিটিয়ে দিয়েছিল প্রথম। আমার জীবনে কলঙ্ক সেই যে চন্দ্রগ্রহণের মত লাগল, ওর আর মোক্ষ হল না কোন-দিন। সেদিন মাসীর সঙ্গে অমৃতবাবুর কথাবার্তায় তপ্ত খোলায় ধান থেকে খই ফুটল এবং মাসী আমাকে চড় মেরে জিজ্ঞাসা করলে,—ওকে কে খবর দিলে বল? সেদিন সে-প্রশ্নের উত্তর আমিও দিতে পারলাম না, তিনিও বের করতে পারলেন না। কিন্তু বছর দুই পর মাসীই প্রথম বের করলেন যে, খবরটা দিয়ে এসেছিল ওই বোবার মত ইডিয়ট পরুসাদ। এবং তার অন্তর্নিহিত কারণ আমার প্রতি অন্ধ অবুঝ উন্মাদ কামনা।

হেসে আবার বললেন, এসব শব্দ-গুলো বেশ ভেবে বেছে, বাছাই করে প্রয়োগ করছি, নইলে প্রথম যেদিন মাসী এ অপবাদ দিলে, সেদিন ওই সংস্কৃতিবান ঘরের লেখাপড়া জানা পেশায় শিক্ষিকা মেয়েটি সোজাসুজি যে ভাষা প্রয়োগ করেছিল, সে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। 'পিরীত' 'ছেনাল' শব্দ দুটো সেদিন তার মুখ থেকে নিরাপদ ঘরের ভেতরে সাপ বের হওয়ার মত বের হয়ে এল। আমি প্রথম দিনটায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মাসীর মুখ আরও খুলল, তার ধারালো জিভ আরও খেলতে লাগল। এবং ওই সব শব্দের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাবুর সঙ্গে মাসীর ঝগড়াও বাড়তে লাগল।

একটা কিছু হলেই অমৃতবাবু ঠিক খবরটি পেয়ে যেতেন। এ-বেলা হলে ও-বেলায়, রাত্রে হলে কাল সকালে।

এরই মধ্যে আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল। ইস্কুল থেকে ছুটি পেলাম। ইস্কুল যেতে হত না আমাকে, কিন্তু মাসীকে যেতে হত। আমি বাড়ীতে থাকতাম। কিছুদিন যেন বেঁচে গিছলাম।

মাসীর তখন সন্দেহের বীজ থেকে অঙ্কুর কেন গাছ হয়েছে। মাসীর সন্দেহ ছিল অমৃতবাবু আমার ষোড়শী নবযৌবন এবং রূপের আগুনে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয়েছেন। ভাবতেন মাসী নিজে লণ্ঠনের ফানুষের মত আমার রূপযৌবন শিখাকে ঘিরে রেখেছেন তাই রক্ষে, নইলে এতদিন কবে অমৃতবাবু ঝপ্ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজে পুড়তেন এবং আমার শিখাকেও নিভিয়ে দিতেন। এবং পোকা পোড়ার কদর্য গন্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে কলঙ্কের গন্ধে ভরে দিত।

এবার যখন ফানুষরূপিণী মাসীকে আমাকে একলা রেখে ইস্কুলে যেতে হল, আমি একলা বাড়ীতে থাকতে লাগলাম, তখন তাঁর উৎকণ্ঠা উদ্বেগের আর সীমা রইল না। দিন আট-দশ বেশ শান্তিতে কেটেছিল। তারপরই মাসী জিনিস ফেলে যেতে লাগলেন। ইস্কুল থেকে রিক্‌স্যা করে এসে হাজির হতেন। এবং দরজায় ধাক্কা মেরে সোরগোল তুলে সেই দুপুরবেলায় গোটা পাড়াটাকেই চঞ্চল এবং চকিত করে তুলত। প্রথম কয়েক দিন লোকে কিছু বিরক্ত হয়েছিল চীৎকারের জন্য। কিন্তু দু'তিনদিন পর থেকে বিষয়বস্তুর মধ্যে কলঙ্কের স্বাদ পেয়ে তারা উল্লসিত কৌতূহলে কুতূহলী হয়ে উঠেছিল। উদগ্রীব হয়ে থাকত মাসীর উত্তপ্ত উচ্চ-কণ্ঠস্বরের জন্য। তারপর ক্রমে ক্রমে এতে মন্দা পড়ল, কারণ স্বাদটা পুরনো একঘেয়ে হয়ে আর তেমন রুচিকর রইল না।

অন্যদিকে মাসী যেন তাঁর দিক থেকে জোর হারাচ্ছিলেন। আমাকে ঠিক হাতেনাতে ধরতে পারছিলেন না। এবং এই অন্যদিকের অন্যদিকে অনুভব করছিলেন যে, অমৃতবাবু তাঁর কৈশোর যৌবনের বন্ধু, তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।

মানুষটা তখন বিষয়-ব্যাপার নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। ব্যবসায়ে আয় হচ্ছে। ভাল আয়। আয়কর বিভাগের আওতায় গিয়ে পড়েছেন। আমার ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে তিনি ঠিক করে ফেললেন, আমার পরীক্ষার ফল বের হলেই আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কোন বোর্ডিং-হাউসে। আমি সেখানেই থাকব। মাসীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর আমার থাকবে না।

আমি তখন সপ্তদশী। সতেরোতে পা দিয়েছি।

মনে মনে যেন উনোনে চড়ানো কড়ায় টগবগ করে ফুটছি।

নিশ্চয় বুঝেছেন কথাটা।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন মণি-বউদি।

তারপর বললেন, দু'দিনের দুটো কথা বলি আপনাকে। বেহায়া হয়তো ভাববেন। তা ভাবুন। বেহায়া আমাকে করে দিয়ে

ঝিলম ফটো : মানসরঞ্জন কুন্ডুচৌধুরী

গিয়েছে আমার মাসী। আমার প্রতি পদক্ষেপে প্রতি কথায়, প্রত্যেক চাউনিতে সে বেহায়াপনা দেখতে পেত এবং তার জন্যে আমার লাঞ্ছনার বাকি রাখত না। তার সংগে জীবনে কথাবার্তা, চাউনি, চলাফেরা, হাসা-কাঁদার মধ্যে আমার অজ্ঞাত বেহায়াপনা আবিষ্কার করে ওই 'পিরীত, ছেনালি' গোছের অজস্র কথা আমাকে শুনিয়ে শিখিয়ে পাকা বেহায়া করে তুলেছিল।

ঠাকুরজামাই, বেশ্যাদের সংগে পরিচয় আছে? তাদের বেহায়াপনা দেখেছেন? তাদের মুখে অশ্লীল কথা শুনেছেন? কণ্ঠস্বর তাঁর শক্ত এবং ঝাঁঝালো হয়ে উঠল।

বললেন, শোনেননি বললে বিশ্বাস করব না। আপনি বিব্রত হবেন না, আপনার কাছে কনফেসন আদায় করছি নে। বলছি তাদের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, ওই যে অশ্লীল শব্দগুলো এবং খারাপ খারাপ ইমেজগুলো মানুষের মনে জন্মদোষে বা আপনাআপনি, ফাগুনের শেষের পাতাঝরা ডাল-ভরা 'পলাশ-শিমুলের মত ফোটে না; ওগুলোকে চাষআবাদ করে ফলাতে হয়। ভদ্রঘরের বউ বা মেয়ে যখন ওপাড়ায় ওদের বাড়ী গিয়ে পড়ে, তখন ওই শব্দ আর ওই ভাব-ভাবনাগুলো হাসির মধ্যে রাগের মধ্যে চেঁচিয়ে তার কানে ঢুকিয়ে দেয়।

বলতে বলতে মণি-বউদি পাল্টালেন।

হাস্য-রহস্য কৌতুকময়ী মেয়েটি যেন শক্ত কঠিন সোজা কোন ইস্পাতের ধারালো অস্ত্রের মত ঝকমকে হয়ে উঠলেন। চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা ফুটল। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, নিজেও যেন শক্ত হয়ে উঠলেন।

এখানে আরও একটি কথা বলে নি এইখানে। মণি-বউদির কথা তো আজকের কথা নয়। পঁচিশ বছরের বেশী আগের কথা। সুতরাং মণি-বউদির সংলাপ যা বসিয়েছি তা ঠিক মণি-বউদির শ্রীমতী মুখ-নিঃসৃত অবিকল কথাগুলি নয়। তবে তার সংগে ভাবেভঙ্গিতে মিল আছে। মণি-বউদি বি-এ পাশকরা মেয়ে এবং ব্রাহ্ম মা ও মাসীর কাছে মানুষ। এ-মেয়ে যে-কালেরই হোন, এ-মেয়েরা দীপ্তিমতী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ জীবনে যেভাবে যে-দিকেই মুখ ফেরান বা ফিরে তাকান একটা ঝকমকানি থাকে। সে হাসিতেও বটে, কথাতেও বটে, রসিকতাতেও বটে, এমনকি কান্নাতেও বটে। সেই কথা মনে রেখেই মোটামুটি, সেই ১৯৪২ সালের ৯ আগস্টের শেষ বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে একদিনের শুক্লপক্ষের রাত্রে তাঁর কাছে শোনা তাঁর কথাগুলিকে আমার ভাষাতেই প্রকাশ করেছি। তবে এমনি ধরনের একটা তীর্যক ভঙ্গিতেই যেন কথাগুলো তিনি বলেছিলেন। কিন্তু এই যে শেষের কথা কয়েকটা, যেখানে কৌতুকময়ী মনোরমা মণি-বউদি অকস্মাৎ শক্ত এবং সোজা হয়ে ইস্পাতের কোন ধারালো অস্ত্রের মত হয়ে উঠে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো আমার ভালভাবে মনে আছে। কারণ, কথাটা শেষ করেছিলেন একটা গল্পের কথা বলে।

বলেছিলেন, একটা গল্প শুনেছিলাম, শুনেছিলাম বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের ঠাকুরবাড়ীতে পন্ডিতজীর কাছে। একটা ব্যাধ বন থেকে দুটি ময়নার বাচ্চা এনেছিল এবং একটা বিক্রী করেছিল এক ব্রাহ্মণকে আর একটা বিক্রী করেছিল এক ব্রাত্যকে। (এখানে তিনি একটা জাতের নাম করেছিলেন।) বামুনের বাড়ীরটা বড় হয়ে উঠে ভোর থেকেই শুরু করত—কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণরাধা। সীতারাম, সীতারাম। লোক দেখলে বলত—আসুন, আসুন। আর ব্রাত্যের বাড়ীরটা সকাল থেকেই শুরু করত অশ্লীল কথা। কুৎসিত গালাগাল।

এরপরে বলেছিলেন—আমি দুই বাড়ীর সকল বুলিই শিখেছিলাম। পাখী শুধু বুলি বলে, বুলির কোন ভাব তার অন্তরকে দোলা দেয় না, নাড়ায় না কিন্তু মানুষের মুখে যা বের হয়, বুকের ভেতর থেকেই তার জন্ম হয়। কানে যা ঢোকে, তার মানেটা বুকের ভিতরটায় ভাবের ঢেউ হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

ঠাকুরজামাই, সতের বছর বয়সে তখন সবই শিখেছি। কানে আর তখন কথাগুলো খুব কটু ঠেকে না। খুব ঝাল-তরকারী খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেলে যেমন নামেই জিভে জল আসে এবং খেয়ে পেট-মুখ জ্বললেও মনে হয় আরও খাই; না খেতে পেলেই যেমন সর্বকিছুতে অরুচি ধরে, তেমনি অবস্থা হল আমার। ঠিক এই সময়েই একদিন আবিষ্কার করলাম চারটে বা দুজোড়া লুব্ধ দৃষ্টি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

একজোড়া চোখ অমৃতবাবুর, অন্য জোড়া ওই পরসাদের লছমনপ্রসাদের।

শুধু আমি দেখলাম না। সে হলে আজ আমিই আপনাকে বলতাম—ঠাকুরজামাই ঠিক বলতে পারছি না ভাই, লোভটা তাদের, না আমার নিজের মনের? আয়নাতে ছাপ পড়ার মত ছাপ পড়েছিল।

• • •

এরই মধ্যে ঠিক আমার পরীক্ষার ফল বের হবার প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটা কান্ড ঘটে গেল।

অবশ্য অমৃতবাবু চেষ্টা করে আমার পাশের খবরটা জেনেছেন জানিয়েছেন। আমি তখন খুব খুসী। বেশ হেসেই অমৃতবাবুর সংগে কথা বলি আবদার করি। এবং আরও সূক্ষ্ম তীর্যক ভঙ্গিতে লছমনের দিকে তাকিয়ে হাসি; তখন একদিন চুরি হয়ে গেল মাসীর বাড়ীতে।

(ক্রমশঃ)

নজরুলের চিঠিপত্র

আবদুল আজীজ আল-আমান

"ছিন্নপত্র" পড়ার পর বাংলা পত্র-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কারো মনে আর কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অবশিষ্ট থাকে না। মনে হয় চরম প্রাপ্তি ঘটে গেল। তবে নিন্দুকেরা প্রশ্ন করে, 'ছিন্নপত্র কী বিশ্বকবির লেখা পত্রগুচ্ছ না তাঁর সৃষ্ট পত্র-সাহিত্য?' তারা সোচ্চারে অভিযোগ করে বেড়ায়, ছিন্নপত্রে 'পত্র' নেই, আছে 'পত্র-সাহিত্য'। চিঠির কোন আমেজ নেই, আছে গীতি-কবিতার ঝংকার। অভিযোগটি ভেবে দেখার মত। চিঠি পড়ার যে আনন্দ, তা' প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থটির মধ্যে আদৌ অবশিষ্ট নেই। মনে হয়, একজন প্রকৃতি-পাঠক ও বিশ্বপ্রেমিক আপন খেয়াল-খুশীর আলোকে প্রকৃতিকে পাঠ করে চলেছেন। পাঠ নয়—পূজো। ছিন্নপত্র কবির প্রকৃতি-পূজোর বেদ-মন্ত্র। এ কারণে তাই তিনি, চিঠি নয়—সজ্ঞানে গীতি-কবিতাই রচনা করেছেন।

নজরুলের চিঠিপত্র অন্যজাতের। তার ভেতর গীতিকবিতার আমেজ প্রবল নয়, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, নজরুলের পত্রাবলীতে চিঠির আমেজ আছে। চিঠি পড়ার যে আনন্দ তা এগুলিতে পুরো মাত্রায় বর্তমান। কৃষ্ণনগর থেকে ১০-২-২৬ তারিখে হুগলী বাবুগঞ্জের শচীন করকে এক চিঠিতে নজরুল লিখছেন...."তোর কোন চিঠিও পাইনি, এলিও না। এলে খুব খুশী হতুম। আমার সব কথা প্রাণতোষের কাছে শুনবি।"... একেবারে সহজ সরল চিঠির সুর—কোন জটিলতা নেই, তত্ত্বকথা নেই। বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবলাই দেবশর্মাকে ১৩৩২ সালের ৩১শে শ্রাবণের এক চিঠিতে লিখেছেন, "বলাইদা! আবার তুমি 'শক্তি'র হাল ধরে ভয়ের সাগরে পাড়ি দিলে দেখে উল্লাসিত হ'য়ে উঠলাম। 'ধূমকেতু'তে চড়ে আমার আর একবার বাংলার পিলে চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গোবর মস্ত সরকার সাহেব পেছনে ভীষণ লেগেছে।...বাংলার আবহাওয়া বড্ড বেশী ভেপসে উঠেছে এবং তাতে অনেক না-দেখা জীবের উদ্ভব হয়েছে। এখন একজন শক্ত বেটা ছেলের দরকার—যে কোদাল হাতে এগুলোকে সাফ করবে।......দেখ দাদা, তুমিও ভেস্তে যেও না। এ ধূমকেতু-ধ্বজাও পেছনে রইল; নুড়ো জ্বালাবার আগুনের জন্য যখনি দরকার হ'বে চেয়ে পাঠিও।"...বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠিতে কোন আবরণ থাকে না। আর নজরুলের মত দিল-খোলা মানুষ তো কোন কালে সে আবরণের ধার ধারেন নি। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম-সংবাদ দিয়ে মুরলীধর বসুকে এক চিঠিতে কবি লিখছেন, "আজ সকালে ৬টায় একটি 'পুত্ররত্ন' প্রসব করেছেন শ্রীমতী গিন্নি। ছেলেটা খুব হেলদি হয়েছে। শ্রীমতীও ভাল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। হ'য়ে যাবার পর এলাম খুলনা হ'তে। ...শৈলজা কী করছে? প্রেমেন কোথায়?...চিঠি দিও।" এ সব চিঠিতে যে চিঠির আমেজ পুরোমাত্রায় রক্ষিত হ'য়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধুত্বের গভীরতাটুকুও অনুমান করা চলে। ১০-৪-১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে কবি লিখছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে "কন্‌ফারেন্সের হিড়িকে মরবার অবসর নেই।—হেমন্তদা আর আমি সব করছি এ যজ্ঞের। কাজেই লেখাটা শেষ করতে পারিনি এতদিন। রেগো না লক্ষ্মীটি।"... সংক্ষিপ্ত চিঠি—কিন্তু অনুরাগে মোড়া। দুই বন্ধুর মাঝে কোন ব্যবধান নেই, কোন আবরণ নেই।..."এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম।... এখন সন্ধ্যা। আজ সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি—চিঠি ত নয়, বুক-চাপা কান্না। দুই বাল্য বন্ধু যৌবনের মাঝ-দরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরাডুবি দেখছি। কারুর কিছু করবার শক্তি নেই।...যত ভাঙ্গা তরীর ভীড় এক জায়গায়।"...মুরলীধর বসুকে লেখা এ চিঠিতে দুই বন্ধুর কান্নাই গুঞ্জরিত হ'য়েছে।
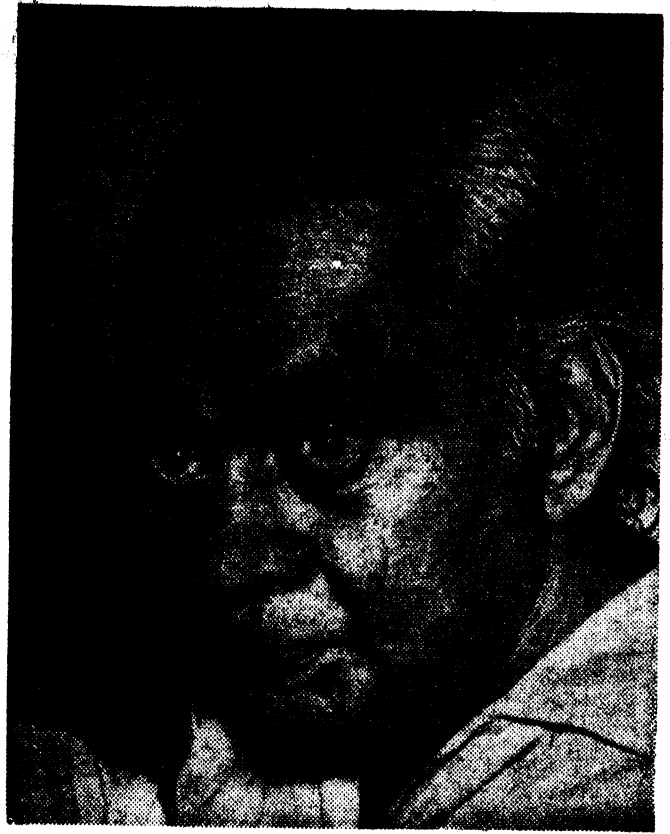
কোন কোন চিঠিতে কবি হাস্য-রসিকতার অবতারণা করেছেন। 'লাঙল' কাগজ প্রকাশের সময় এর দু'জন প্রধান উদ্যোক্তা, অর্থাৎ কবি নিজে এবং নলিনীকান্ত সরকার, জ্বরে আক্রান্ত হন। সে ঘটনাকে স্মরণ করে কবি লেখেন, "নলিনীদাও নাকি চিদানন্দকে স্মরণ করেছেন—জ্বরে। ইং। আফিসটা বোধহয় চিৎপুরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে।" অনেকগুলি চিঠিতে তিনি হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ সব চিঠিতে তাঁর হৃদয়ের উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। আবার বহুতর চিঠিতে নজরুল-জীবনীর উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে। নজরুল জীবনীকারদের নিকট এ সকল চিঠির মূল্য এবং গুরুত্ব অসীম।

নজরুলের পত্রের মধ্যে পত্র-সাহিত্যেরও অভাব নেই। বহুতর চিঠিতে একটি স্নিগ্ধ সাহিত্যিক আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে। এ সব চিঠিতে 'কবি' নজরুলকে একান্ত করে পাওয়া যায়। একটি মধুর সুরভিতে এ সকল চিঠি ভরপুর হ'য়ে উঠেছে।

২৪-২-২৮ এর সন্ধ্যায় পদ্মার বুকে পাড়ি জমাতে জমাতে কবি এক চিঠিতে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখেন,

নজরুলের একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি

"আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধহয় ব্রাউনিং-এর) একটা লাইন,— How sad and bad, mad it was/But then, how it was sweet". আর, মনে হ'চ্ছে, মোট দু'টি কথা—'সুন্দর' ও 'বেদনা'। এই দু'টি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি। ...'সুন্দর' ও 'বেদনা' এই দু'টি পাতার মাঝখানে একটি ফুল—বিকশিত বিশ্ব।" ..."মৌ-মক্ষী কিছু শোনে না, সে কেবলই গান করে—সুন্দরের স্তব সে গায়। তাকে মার, সুন্দরের স্তব করতে করতেই মরবে। কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। তাকে আবার বাঁচিয়ে ছেড়ে দাও, সে আবার সুন্দরের স্তব করবে, আবার বাগানে ঢুকে ফুলের পরাগে অন্ধ হ'য়ে ভস্মপক্ষ হ'য়ে মরবে।"..."হয়ত কোটির মাঝে একটি আসে সুন্দরের খেয়ালী—কবি। সে বিজ্ঞ নয়, বিউটিফুল নয়, সে কেবলি ভুল করে, সে কেবলি falls upon the thorns of life, he bleeds! সে সমস্ত শাসন, সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধে উঠে সুন্দরের স্তবে গান করে Skylark-এর মত। সে কেবলি বলে, সুন্দর—বিউটিফুল!' মিল্টনের স্বর্গের পাখীর মত তার পা নেই, সে ধূলোর পৃথিবী স্পর্শও করে না।"......

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধনের জন্যে নজরুল আমন্ত্রিত হন। এই আমন্ত্রণের জবাবে কবি সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক আবুল হোসেন সাহেবকে লেখেন, "আপনার সাদর আমন্ত্রণলিপি নব-ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতই খুশ-খবরী নিয়ে এসেছে।...আর আমার বাণী? তার প্রকাশ কী শোভন হ'বে আপনাদের নৌরোজের মজলিশে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী, বেদনা-শতদলে তাঁর চরণ। যুগ-যুগান্তরের অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়েছে তাঁর পায়ে। এ রূপসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ-উৎসবের নৌরাতির দীপশিখা নিবে যায় এর হুতাশ্বাসে। তবু হয়ত সে দুঃস্বপন দেখার মত সুন্দরের মেলায় আনন্দগান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্ত্যের শকুন্তলা—বিরহ-শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্ত শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি।"...

এ সব চিঠিতে কবি নজরুলের বিভিন্ন মানস-বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে নজরুলকাব্যের প্রধানতম সুরটি অল্প কথায় সুন্দররূপে ব্যক্ত হ'য়েছে। অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখতে পাব এখানে কবি যে শব্দ ও উপমাগুলি প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে সংস্কৃত ও আরবী শব্দ-সাহিত্যের সমন্বয় ঘটেছে। নজরুল তো চিরকালই এই সমন্বয়ের সাধনাই করেছিলেন।

আজ পর্যন্ত নজরুলের যে সমস্ত চিঠি পাওয়া গেছে এবং যে সমস্ত চিঠিতে কবি-প্রাণের আকুলতা প্রকাশিত হ'য়েছে সেই পত্রগুচ্ছের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লিপিটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী বেগম নার্গিস খানমকে। এ চিঠিখানি পড়'তে পড়'তে অতি অসতর্ক পাঠকেরও রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র কথা মনে পড়বেই। আমার মনে হয় ছিন্নপত্রের পর এই ধরনের চিঠি আজ পর্যন্ত আর বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়নি। চিঠিখানি দীর্ঘ। আমরা এখানে তার প্রথম অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করলাম :

"তোমার পত্র পেয়েছি সেদিন নববর্ষার নবঘনসিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে বারি-ধারায় প্লাবন নেমেছিল—তা' তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘ-পুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে।"...

নজরুল তাঁর নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে হয়তো এমনতর আরো বহু চিঠি লিখেছিলেন বহু জনের কাছে। সেগুলি সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারলে একটা বড় অভাব পূরণ হ'বে।

ছবির মত বাড়ি-ঘর। নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া সব। সামনে সাজানো-গোছানো বাগান। পরিশ্রম আর যত্নের চিহ্নগুলি নিখুঁত। দেখার প্রয়োজন আর নেই। ছায়ায়-ছায়ায় শীতল, নিঃশব্দ সবাই। কাছে-দূরে মাঠের ঘাস, গাছের পাতার রৌদ্রের ঘোরা-ফেরা মন-প্রাণ কেড়ে নেয়; থেকে-থেকে উদাস, বিষণ্ণ করে। বারবার চেয়ে দেখার, অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার মত মনোরম, লোভনীয় দৃশ্যের মিছিল। অথচ পলকে উধাও হচ্ছে গাছ, বাড়ি, ফুলের বাগান। আকাশ স্বপ্নের মত নীল। পাখিদের আনা-গোনা, আলাপন চকিতে বিস্মিত, বিভ্রান্ত করে। যেন এই পরিপূর্ণ দৃশ্যের আবহে রচিত গান, গানের মত হাওয়া নিরন্তর সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে গোপনে, চোখের আড়ালে। কেউ না টের পায়। এমন করে আর কখনো দেখেনি মুকুল। এমন করে ভাবেনি আর।

'এইসব ভালো লাগে তোমার?'

মুকুল চোখ তুলে কালিদাসের মুখের ওপরে রাখে। কেমন বোবা, অর্থহীন দৃষ্টি। দেখে অস্বস্তি বোধ করেন কালিদাস। আন-মনা হতে গিয়ে স্টিয়ারিং-এর গায়ে ঝুঁকে পড়েন। দূরে বাড়ি-ঘর আকাশের নীলে চোখ রাখেন। মৃদু গলায় অন্য কথা পাড়েন, 'চল, ফেরা যাক। প্রভা তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। দেখতে না পেলে পাগল হয়ে যাবেন।'

মুকুল তখনো চুপ। মধ্যবয়সী এই মানুষটিকে ভয়ংকর ভালো লেগেছে তার। সহসা গম্ভীর মনে হলেও কালিদাস আসলে অন্য ধাতুতে গড়া। এখনো ছেলেমানুষীর অন্ত নেই। কখন যে কী খেয়াল হবে বোঝা ভার। নইলে ভর-দুপুরে ঘরের বাইরে কে যায়? তা আবার একা নয়। সঙ্গে মুকুল! ইচ্ছে না থাকলেও আসতে হয়। অবশ্য এসে যে খারাপ লাগে তা-ও না। বরং ঘরের কোণে থেকে-থেকেই বুক ভার-ভার ঠেকে। হাঁপ ধরে যায়। এখন সেই একঘেয়ে চাপা অস্বস্তিটা কোথায়?

প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে। এমনি করেই দেখতে-দেখতে এগিয়ে গিয়েছিল। যেন দু'চোখ ভরে পান করে নিচ্ছিল সব। তারপর ঠিক একই ধাঁচের আর একটা বাড়ীর কাছে এসে থমকে গিয়েছিল। সামনে লোহার ছোট্ট ফটক। ফটকের গায়ে ঝোলানো বাড়ির মালিকের নাম আর পদবী। সঙ্গে গোপাল ছিল সেদিন। বড়দির দেওর গোপাল। রিক্সা থেকে আস্তে নেমে গিয়েছিল মুকুল।

"কে? মুকুল?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে, পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বাগানের একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল মুকুল।

'এসো!' উল্লাসে, আশঙ্কায় কালিদাসকে প্রায় বিভ্রান্ত মনে হয়েছিল। তবু হাসতে-হাসতেই কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'কত বড় হয়ে গেছো! আমি কিন্তু চিনতে পেরেছি ঠিক।'

তাঁকে চেনা যায়। এখনো সরল, সহজ, সুন্দর প্রকৃতির মানুষ। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাননি। কিন্তু প্রভা? শিউরে ওঠে মুকুল। চেনা মানুষটা কোথায়? সেই উদ্দাম উৎসাহ? প্রাণবন্ত খুশির প্রপাত। আগা-গোড়া বদলে গেছে সব। রোগে জীর্ণ, বিষাদে ভগ্ন দেহ-মন। যেন দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্যোগের দুঃসহ তান্ডব। তবু বেঁচে আছেন, অবলীলাক্রমে তিনি টিকে আছেন—এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়?

তা' বৈকি। যোগ্য ছেলে, ছেলের বউ, নাতী একসঙ্গে, একই মুহূর্তে জগৎ-সংসার মিথ্যে প্রমাণ ক'রে চলে যায়। আট বছর একনাগাড়ে বিদেশে কাটিয়ে মস্ত এঞ্জিনিয়ার হয়ে মিউনিক থেকে দেশে ফিরছিল সুশোভন। হিমাচল প্রদেশে নতুন প্রজেক্টের পুরো দায়িত্ব নিতে হবে তাকে। কালিদাস-প্রভার কাছে খবর এসে গেছে। চিঠি লিখে সুশোভনই জানিয়ে রেখেছে সব। এবার তাঁরাও থাকবেন ছেলে-বউয়ের সঙ্গে। কত আশায়, কত কল্পনার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে এক-একটি মুহূর্ত। তারপর সেই সাংঘাতিক খবর তাঁদের কাছে পেঁৗছুবার আগেই গোটা পৃথিবীর মানুষ জেনে যায়। বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহ সংবাদ ঘন্টা কয়েকের ভেতরে বেতারে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। কাগজে ছাপার অক্ষরে নির্ভুল নাম-গুলি পড়ে চিনতে আদৌ কষ্ট হয়নি মুকুলের, এরা কারা। সব খবরই কাগজে ছাপা হয়েছিল। সব কথাই শুনেছে মুকুল। কিন্তু প্রভার দিকে চেয়ে সেইসব পুরনো কথা ভাবতে ভালো লাগে না। যা যায় তা যায়। অতীত আবার ফিরে আসে কোনদিন? অতীতের মানুষ? সুশোভনও ফিরবে না। সুশোভনের বউ, ছেলে কেউ-ই না। তাহলে তাদের কথা ভেবে লাভ?

"একলাই এলে বুঝি?" গায়ে-মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে প্রভা শুধোন। নিদারুণ ক্লান্ত, নির্জীব মনে হয় তাঁকে।

'আনন্দের সঙ্গে দেখা হয়নি? আমি যে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছি ওকে।'

কালিদাস টের পান। অবরোধের ভেতরে থেকেও তিনি তাই প্রাণপণে সজীব, সুস্থ অর্থাৎ প্রকৃত স্বচ্ছল, সুখী এবং উল্লাসে অধীর পুরুষের মতই হাল্কা হতে চাইলেন। অথচ ভুলে যান আনন্দের ভরসায় মুকুল এখানে আসে নি। তেমন কথা চিঠিতে লেখা ছিল না কোথাও। স্টেশন থেকে বাড়ি অবধি পথ-ঘাটের একটা নিখুঁত মানচিত্র এঁকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। পাছে ভুল হয়। তাছাড়া চিঠিতে পথ-ঘাট-পার্কের সুন্দর, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এ দুটো হাতে পেলে আনাড়ীর পক্ষেও বাড়ি খুঁজে বার করা অসাধ্য নয়। মুকুলকেও কষ্ট পেতে হয় নি। তাছাড়া সঙ্গে তো ছিল গোপাল।

কিন্তু কে এই আনন্দ? খটকা লাগে মুকুলের। যতদূর মনে পড়ে সংসারে প্রভা ছাড়া আজ আর দ্বিতীয় আত্মীয় নেই কালিদাসের।

মাথা ঘামাতে হয় না বেশীক্ষণ। কালিদাস নিজেই সন্দেহ মোচনের পথ খুলে দেন। বলেন, 'তাই তো আনন্দকে তুমি চিনবে কেমন করে। ও আমার সুশোভনের বন্ধু। বড্ড ভাল ছেলে। একটু খেয়ালি এই যা। হৃষিকেশই চিনত ওকে।'

বাবার কথা তুলতেই মায়ের মুখ মনে পড়ে। অস্পষ্ট, সুদূর সেই স্মৃতি। মুকুল যা সারাক্ষণ ভুলে থাকতে চায়। বাবার সঙ্গে মিল ছিল না মায়ের। তার কারণও তো এই কালিদাস। বড় হয়ে আস্তে-আস্তে সব কথাই জানতে পেরেছে মুকুল। আর থেকে-থেকে মায়ের ওপরে অভিমান হয়েছে। সাধ্য থাকলে মুকুল নিশ্চয়ই মাকে নিয়ে পালিয়ে যেত কোথাও। বাবাকে সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক করে তুলত। কিন্তু হৃষিকেশ যে ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংসারিক হিসেবের বাইরে রাখা চলে তাকে। ভেতরে টেনে নিয়ে এলে অকারণ অনর্থ বেধে যায়। শেষ জীবনে তাঁকে তাই আশ্রমে ছুটে যেতে হয়েছিল। একমাত্র সন্তানের ভাবনাটুকু অবধি তুলে দিয়েছিলেন অন্যের কাঁধে। মনে-মনে মুক্তি পেতে চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলেন হৃষিকেশ। আর কেউ না বুঝুক মুকুল জানে, সে-ই ছিল বাবার পায়ে বেড়ি, পথের কাঁটা। মেয়ে বলেই বন্ধনটা ছিল আরও কঠোর, আরও কঠিন। বড় হয়ে এখনও তাই বাবার বিরুদ্ধে তার নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। বরং না জেনে, না বুঝে পৃথিবীতে চলে আসার দরুণ

নিজেকেই অপরাধী মনে হয়েছে তার। মাঝে-মাঝে এখনও হয়। অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মুকুল। ইচ্ছে হয় মরে যাবে, চলে যাবে কোথাও।

'হৃষিকেশের সঙ্গে আমার শেষ দেখা উনিশশো বাটে। বোধ করি জানুয়ারীর মাঝামাঝি। আমি তখন বক্তিয়ারপুরে। রাজগীরে এসে হৃষিকে দেখে অবাক। সে তখন গৃহীর বেশ-বাস ছেড়ে অন্য মানুষ। দেখে চেনার উপায় নেই আর।'

'আমি জানি, বাবা তখন ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন।'

'সঙ্গে তাঁর গুরুদেব পরমানন্দ গিরি।'

'শুনেছি, বাবা তখন পুরোপুরি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন।'

'তবু শুধোলাম, আমাদের কথা থাক। তোমার তো মেয়ে রয়েছে সংসারে। তাকেও কি দেখার ইচ্ছে হয় না হৃষি? শুনে ও কি বললে জানো?'

কালিদাস মুকুলের দিকে তাকালেন। পাশে দাঁড়িয়ে প্রভা। তিনি যেন নিষ্প্রাণ, নিঃসাড়। কোন কথায় কান নেই আর। কানে গেলেও বোঝার সাধ্য নেই। কেমন উদভ্রান্ত, করুণ চাহনি। মুকুল তাঁর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে কালিদাসের ওপরে রাখে। অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করে, 'কী?'

'আসল কথা, হৃষিকেশ তখন নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে। সে পথ ঘর থেকে বাইরে যাবার পথ। আজীবন সে যা খুঁজে বেড়িয়েছে।' কালিদাস চুপ করলেন। বিষণ্ন মুখে খোলা জানলার পাশে সরে গেলেন। বাইরে হাওয়ায় মেলে ধরা মানিপ্ল্যান্টের পাতা থেকে তখন ফোঁটায়-ফোঁটায় রোদ চুঁইয়ে পড়ছে নিচে। মুগ্ধ নেত্রে তিনি দেখেন আর কী ভাবেন। ভাবেন, এই তো শেষ! এমনি করেই ফোঁটায়-ফোঁটায় নিঃশেষ হচ্ছে জীবন। আহত হতেই চেয়েছিল মুকুল। কারণ তার বাবার সম্পর্কে এমন নিষ্ঠুরের মত উক্তি শুনে কেমন থমকে গিয়েছিল। হৃষিকেশ কি কোনদিন জীবন-বিমুখ ছিলেন? গোটা সংসার তাঁরই হাতে গড়া। তবু তাঁকে সংসার ছাড়তে হয়েছিল। কেন হয়েছিল, কার দুঃখে, কিসের অভাবে তিনি বাইরে ছুটে গেলেন সে খবর কে রাখে? মনে-মনে রাগ হচ্ছে তার। দারুণ অভিমান। হবারই তো কথা। গোটা সংসারের ওপরেই মুখ ফিরিয়ে থাকা উচিত। কিন্তু কতক্ষণই বা থাকা যায়। ওইটুকু মেয়ের পক্ষে অসম্ভব বলে একটা ব্যাপার আছে তো? তাই অল্পক্ষণ পরেই কালিদাসকে অমন বিষণ্ন গম্ভীর মুখে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে কেমন হয়ে যায়। তার মায়া হতে থাকে। লোকটার কথা ভেবে দুঃখ হতে থাকে কেবল। তাঁকে বাস্তবিক অসহায় মনে হয়।

'আজ আবার লতিকার কথা মনে পড়ছে।' কালিদাস প্রায় আপন মনে কথা বলেন। পাছে প্রভা না শুনতে পায়।

মায়ের নাম শুনে চমকে ওঠে মুকুল। হৃষিকেশ ছাড়া কালিদাসই এমন করে অকপটে নাম ধরে ডাকতে পারেন। সেই অধিকার তাঁর আছে। মুকুল জানে, মা-বাবা দুজনেরই অন্তরঙ্গ ছিলেন তিনি। হয়ত একদিন দূরে সরে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। তাই বলে পর হয়ে যান নি। নেলে এমন করে আজ লতিকাকেই মনে পড়ে কেন? মুকুলের সঙ্গে বাস্তবিক কোথাও মিল আছে কি তাঁর। মুকুল জানে না। মাকে সে হারিয়েছে বহুদিন। এখন আর সহসা তাঁর মুখ-চোখ, কণ্ঠস্বর মনে পড়ে না। এমন কি সাতিকা চলে গেলে অনেক দিন অবধি যে তীব্র অভাববোধ প্রায় সারাক্ষণ বিচলিত করেছে তাকে, আজ আর তা নেই। তেমন করে মায়ের কথা মনেই পড়ে না। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে কালিদাসের চোখের দিকে চেয়ে মুকুল কেমন হয়ে যায়।

'এতদিন আস নি কেন, মুকুল?'

বাগানে দাঁড়িয়ে কালিদাস যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। শিশুর মত মুগ্ধ, অপলক চোখে মুকুলের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে এগিয়ে আসেন। আবেগে, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে চেয়ে তিনি মুকুলের কাঁধে হাত রাখেন। বলেন, 'আমি তোমার পথ চেয়ে ছিলুম। ভয় ছিল, হয়ত আসবে না।'

প্রভা কি দেখছেন, দেখতে পাচ্ছেন সব? দেখে টের পাচ্ছেন, আসলে কালিদাসের মনের অবস্থাটা কী? ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে যায়। সম্মোহিতের মত তাঁর বুকের পাশে দাঁড়িয়ে কেমন আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে যায়। করণীয় কিছুই নেই যেন। থেকে-থেকে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছে মুকুলের।

"আমার নাম আনন্দ।'

গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে কখন। ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়েছিল। কথা শুনে চমক ভাঙে মুকুলের। অভিভূতের মত ঘামে ভেজা, রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে গিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। হাসতে-হাসতে সে এসে সামনে দাঁড়ায়। আবার বলে, 'আপনাকেই খুঁজতে গিয়েছিলুম।'

মানুষ অমন করে কী যে দেখে! তাছাড়া কী-ই বা আছে মুকুলের? পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, যৌবন, নাকি সৌন্দর্য?

এই তবে আনন্দ! মুকুল আশ্বস্ত হয়। বিস্ময়ের ঘোর তবু কাটে না। এ যে মূর্তিমান কন্দর্প। পরিপূর্ণ যৌবন, নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে নীরব অহমিকার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে। খুঁজলে ছবিটা স্যুটকেসের ভেতরেই পাওয়া যাবে। যত্ন করে অ্যালবামের পাতায় গুঁজে রেখেছে মুকুল। তার কাছে যা চিরদিনের প্রিয়, পবিত্র, শ্রদ্ধেয়। যৌবনে হৃষিকেশ এই আনন্দের মত ছিলেন। এমনি উজ্জ্বল আর বলিষ্ঠ।

'ও আনন্দ, আমাদের আনন্দ।' হা-হা করে বাগানের প্রান্ত থেকে প্রায় উন্মত্তের মত ছুটে এলেন। পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়ে ঘনিষ্ঠ হলেন কালিদাস। হাসি মুখে সহাস্য ভঙ্গী ফুটিয়ে বললেন, 'এই সেই মুকুল।'

যেন কত গল্প হয়ে গেছে। চোখের দেখাটুকুই ছিল বাকী। এবার সেইটুকুও পূর্ণ হল। বাকী রইল আলাপ। একদিনে কি তা হয়? দিনে-দিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে তারা পরস্পরকে জানা হয়ে গেলে বিচ্ছিন্ন হবে ফের। যে যার আবাসে ফিরে যাবে। তাই তো যায়। মুকুল যে অনেক দেখেছে। শুনেছে আরও বেশী। আর আনন্দ? দেখে মনে হয় না পাপ-পুণ্যের আঁচড় লেগেছে কোথাও দেহে-মনে এখনো নিভাঁজ। নইলে অমন করে চেয়ে থাকে? থাকতে পারে কেউ? মুকুল তো শিশু নয়। কৈশোর পেরিয়ে এসেছে কতকাল! এখন স্বপ্নের মত, দুঃখের স্মৃতির মত মনে পড়ে। ভাবলে ভেতরে-ভেতরে অস্থির, আচ্ছন্ন হতে থাকে মুকুল।

আনন্দ বলে, 'দেখেই চিনেছি।'

তাকে আহত, করুণ মনে হল মুকুলের। অজান্তে না জানি আঘাত লেগেছে কোথায়। ইচ্ছে হয়, ছুঁয়ে দেখে। প্রশ্ন করে জেনে নেয়, কোথায় বেদনা। এত সহজেই কেঁপে ওঠে আনন্দ! বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায় মুকুল যেন কানায়-কানায় ভরে ওঠে। এতদিন জানা ছিল না। অপরিচয়ের ভেতরে আনাগোনা ছিল কম। এবার শুরু হল। এখন জানা যাবে। ছুঁয়ে-ছেনে বোঝা যাবে সব। প্রথম দর্শনে আনন্দকে মন্দ লাগে না মুকুলের। সে যেন নতুন করে টের পায়, তার কোন বন্ধু নেই, ছিল না এতকাল। আনন্দের অনুচ্চ কণ্ঠ, চোখের চাউনি অনেকক্ষণ মুগ্ধ করে রাখে তাকে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বাধা বাঁচিয়ে সহজ-স্বচ্ছন্দ আলাপে মেতে ওঠার সাহস তবু হয় না।

'আপনি আসছেন শুনে আমি থেকে গেলুম।' আনন্দ হাসে। বলে, 'আপনার বাবার কাছে আমি ঋণী। জীবনে বার কয়েক তাঁকে দেখেছি। কিন্তু যতবারই দেখেছি ততবারই অভিভূত হয়েছি। ভেবেছি, আমি তুচ্ছ, তিনি আমার নাগালের বাইরে প্রায় ঈশ্বরের মত। একদিন তিনিই তো বাঁচিয়ে ছিলেন আমাকে! সেকথা কেমন করে ভুলি?'

'বাবার কথা থাক। আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে বলুন?' সহজ হবার চেষ্টা করে মুকুল।

'যাকে ভালবাসার অধিকার পাই নি কেবল দূরে থেকে ভক্তি করে গেছি, তিনি আপনার বাবা। এতদিন আপনাকে দেখার লোভ ছিল। এবার সেই দেখা হল কিন্তু দেখামাত্রই কি কিছু ভেবে নেয়া উচিত? যে পারে সে আমার নমস্য। আমি কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে ঠিক ততখানি অভিজ্ঞ নই।'

চমৎকার! দর্শনে যা ভাবা যায় আলাপে দেখা যায় তার উল্টো। আনন্দের এমন করে গুছিয়ে কথা বলার ধরন দেখে মুকুল আবার আড়ষ্ট বোধ করে। যেন শুনতে শুনতে তার শান্ত অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বকেই বার-বার প্রত্যক্ষ করে খুশি হয়।

কাঁচি হাতে আবার বেড়ার কাছে সরে গিয়েছিলেন কালিদাস। মেহেদির ডাল-পাতা ছেঁটে সমান করে দিচ্ছিলেন। এটা তার প্রাতিদিনের কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। তাছাড়া করণীয় কী-ই বা আছে আর। এখন এই তাঁর আশ্রয়। এই তাঁর অব-

লক্ষণ। বাগানে একটি ফুল ফুটিয়ে যত সুখ, তত সুখ খুঁজে কোথাও নেই, কিছুতে নেই আর। নইলে মনে-মনে তো কবেই জানা হয়ে গেছে, শেষের সেদিন কী দুঃসহ, কী ভয়ংকর। তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানে হয়? লোকে জানে তিনি নিঃস্ব নন। কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি নিজে কী জবাব দেবেন? মুখোমুখি যদি দাঁড়াতে হয় কোনদিন। সংসারে সবচেয়ে নিজেকেই তো ভয়। তাছাড়া মানুষের শত্রু কোথায়?

কাজ করতে-করতে কালিদাস শুনছিলেন। শুনে রক্তের ভেতরে এক অননুভূত শিহরন বোধ করছিলেন। বার-বার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছিল তাঁর। তৃপ্তি আর পুলকের আশ্চর্য তাড়নায় থেকে-থেকে বিমনা হচ্ছিলেন তিনি। মনে পড়ছিল হেলায় হারিয়ে যাওয়া পঁচিশ বছর বয়সের সেইসব দিনরাত্রি, সমস্ত দুপুর। একদিন পঁচিশ বছর বয়স তাঁর-ও ছিল। আনন্দ কিংবা মুকুলের মত তিনিও ছিলেন আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নে ভরপুর। কোন বাধাই বাধা মনে হয়নি তখন। তবু তো হেরে যেতে হয়। জীবনের সর্বস্ব খুইয়ে মুখ গোঁজ করে একদিন ঘরে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু কার জন্যে, কোন্ অপরাধে এহেন পরাজয়, এমন গ্লানি? আমরণ এই একমাত্র দুঃখের বাহক শুধু তিনি। নিজেকে চেনা গেল না, বোঝা গেল না, সংসার চিরদিনের মত অন্ধকার থেকে গেল।

'বসে গল্প করো তোমরা। ও অনেক-দূর থেকে এসেছে আনন্দ। ও বড় ক্লান্ত।'

কালিদাসের কথা শুনে আনন্দ লজ্জা পেল। লনের মাঝখানে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা বেতের চেয়ার-টেবিল। দূরে নিষ্পত্র রেইন ট্রির ডালে অসময়ে কোকিলের ডাক শোনা গেল। আনন্দ মুকুলের চোখে চোখ রাখে। আলতোভাবে হেসে ঘাড় ফিরিয়ে কর্মরত কালিদাসকে দেখে নেয়। সে জানে, আসলে কালিদাসের হাতে-ও কাজ বলতে কিছু নেই। কিছুই করছেন না তিনি। কাঁচি হাতে মেহেদির বেড়ার পাশে একাগ্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা ঘুরে বেড়ানো আসলেই তো চোখ আর কানকে শাসনে রেখে রাখা। নিজেকে ফাঁকি দিয়ে উদাস হয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা। তাহলে তিনি কি কিছু চান? মুকুল কিংবা আনন্দের কাছে কিসের প্রত্যাশা তাঁর? আনন্দ চলে যাবে। তার বাবার কথা শুনে তিনিই তো ডেকে এনেছেন মুকুলকে। কেন?

অবশ্য চিঠিতে আনন্দের নাম-গন্ধ ছিল না কোথাও। অন্তত মুকুলের মনে পড়ছে না এখন।

খাবার টেবিলেও না। আসল গল্প শুরু তারো পরে। কথায়-কথায় তারা অন্তরঙ্গ হচ্ছিল ক্রমশ।

কামিনী কল্যাণ কেন্দ্রের সেক্রেটারী মিসেস উপাধ্যায়। বিকেলে আনন্দকে নিয়ে ওর কাছেই যাবে মুকুল। যার জন্যে আসা আগেভাগেই সেটা সেরে ফেলা দরকার। তারপর অন্য কাজ, অন্য কথা। নিছক বেড়াতে আসা তো নয়।

কালিদাস নিজেই কথাটা পাড়েন, 'ওকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে যাও। তুমি তো আজ বাদে কালকেই চলে যাবে। তখন একলা অচেনা জায়গায় বেচারির কষ্ট হবে ভীষণ। আমি তো বুড়ো মানুষ। আমার পক্ষে কি ওকে নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করা সম্ভব?' ম্লান হাসি হেসে তিনি সামনে দেয়ালে চোখ পাতেন। নগ্ন, নির্জন বনের ভেতরে লুটিয়ে-পড়া আলু-থালু চাঁদের আলোর ছবিটাই লক্ষ্য করেন। তাঁকে বড় একা মনে হয়, বড় আতুর। কেন মনে হয় মুকুল তা জানে না। কেবল লোকপরম্পরায় তাঁর সম্পর্কে গুজবের মত শোনা একটি কি দুটি কথার ভিত্তিতে আচমকা কিছু ভেবে নিতে সে নারাজ। বরং দেখা ভালো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই সঙ্গত, সমীচীন। নইলে যাবতীয় কৌতূহলই যে মাটি। মুকুল তা চায় না।

আনন্দ বলে, 'তাহলে মিসেস উপাধ্যায় আজ থাক। আপনার চাকরি তো পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও। সেটা দুদিন পরে মিলেও চলবে। বরং চলুন, বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।'

গোপাল ফিরে গেলে নিজেকে একা মনে হচ্ছিল ভীষণ। কিন্তু আনন্দকে কাছে পেয়ে, কথা বলে সেই অসহায় ভাবটুকুই ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসে। আবার আগের মতই নিজেকে হাল্কা বোধ করে মুকুল। এই বাড়ি-ঘর বাগান মায় মানুষগুলিকে অবধি আপন মনে হয়। হয়তো এইখানে, এদের সঙ্গে আরো কতকাল কাটাতে হবে তাকে। মনে-মনে মুকুল সেই সময়ের হিসেব করতে গিয়ে কূল-কিনারা পায় না। না-জানি আরো কতকাল এইভাবে ঘাটে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে। সব আছে। অথচ কিছুই না-থাকার বেদনা নিয়ে একা, অসহায় স্রোতে ভাসা। একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকাপাকি ক'রে রেখেছেন হৃষিকেশ। মুকুল জানে সব। জগতে তাকে একা রেখে বিদায় নিয়েছেন হৃষিকেশ। কিন্তু নিঃসম্বল সে নয়। তবু স্বস্তি নেই। দুঃখ আর অতৃপ্তির ভেতরেই তার বাস। তাই একা-একা হাঁপিয়ে উঠলে শুভার কাছে ছুটে যায়। বড়মামার বড়মেয়ে শুভা। সকলের বড়দি। গোটা শরৎ ডিগবয়ে কাটিয়ে এবার এখানে আসা। এবং কি আশ্চর্য। মুকুল চাকরি নিয়ে এসেছে। কালিদাসকে আগে থেকেই চিঠি লিখে ঠিক-ঠাক করে রেখেছে সব। কালিদাসও প্রায় গলা-জলে নেমে গিয়েছিলেন। পুরোপুরি তলিয়ে যেতে বড়একটা বাকী ছিল না কিছুই। হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে গেলেন একটুকরো সবুজ, সতেজ বৃক্ষের শাখা। পরম আশ্বাসের মত, আশীর্বাদের মত আজ এই তাঁর আশ্রয়, এই তাঁর অবলম্বন। খবর পেয়ে তিনি তাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রভা বলেছিলেন, 'তুমি এলে এবার মনে হচ্ছে সেই দম আটকানো ভাবটা আর নেই।'

তিনি হাসছিলেন। হাসিটা উজ্জ্বল ছিল না আদৌ। বরং আরো স্থির বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ মনে হয়েছে তাঁকে ছেলের শোক ভুলতে পারেননি বলেই কি? অথচ ছেলের সঙ্গে খুব যে দেখা-শোনা হ'ত তা তো নয়। চিরকাল দূরে-দূরেই থেকেছে সুশোভন। মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ক্বচিৎ-কখনো। শেষের দিনগুলি তো কেটেছে বিদেশে। বিদেশী হয়েই ছিল সে। মা-বাবার কাছেও নিতান্ত পর। পদবী ছাড়া কালিদাসের কাছে আর কি পেয়েছিল? জবাব চাইলে সম্ভব হবে না দেয়া। কালিদাসের পক্ষেও না। যেমন স্ত্রীর কাছে, তেমনি মুকুলের কাছেও হয়তো মুখ বুজেই থাকবেন তিনি। লোকে জানে, তিনি গম্ভীর, ভাবুক, শোকার্ত। অথচ কোনটাই তিনি নন। মুকুল টের পেয়ে গেছে। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছে তাঁকে। সে তাই অন্য কথা ভাবে. প্রভা কি তাহলে একা কেবল কালিদাসের অযোগ্য হবার অপরাধে?

কালিদাস উঠে দাঁড়ালেন। কী ভাবতে-ভাবতে জানলার কাছে এগিয়ে যান। মৃত, অসাড়, আজন্মের মতই রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। লক্ষ্য করেনি কেউ। এখন অভিভূত হয়ে যায় মুকুল। ক্ষণেকের জন্যে মনে পড়ে, সে এখন ঘর-ছাড়া, পরিচিত পরিজনশূন্য প্রবাসে। কিন্তু নিঃসঙ্গ কখনো নয়। তাছাড়া মুকুল জানে, এই প্রবাসও একদিন নিজবাস হবে। মনকেমনকরা এই ভাবটুকুও থাকবে না তখন। বরং আরো কাছের, আরো প্রাণের প্রিয় মনে হবে এইসব বাড়ি-ঘর, রোদ্দুর, গাছপালা সব।

কী ভেবে গোটানো পর্দাটা টান-টান করে দিয়ে তিনি চেয়ারের কাছে ফিরে আসেন। একপলক মুকুল আর আনন্দকে দেখে নিয়ে শিশুর মতই মুখ গোঁজ করে বসে থাকেন খানিক। ঠিক চিন্তাশীল, ভাবুকপ্রকৃতি লোকের মতই চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন কিছুক্ষণ।

'জানো, প্ল্যানমাফিক কিছু করতে চাইলে সাকসেস্‌টাই দেখেছি চিরকাল হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাই ওইসব প্ল্যান-প্রোগ্রামের তোয়াক্কা আর করিনে। বরং মন যখন যা চায় তাই করি। এতে যেন একটা অনির্বচনীয় সুখ আছে যার জাত আলাদা, স্বাদ ভিন্ন।'

ঊর্দ্ধমুখে, উদাস নয়নে চেয়ে থাকেন। মুখ দেখে অনুমান করা চলে ভেতরে-ভেতরে এক অসহ্য যন্ত্রণাকেই রোধ করবার চেষ্টায় তিনি মরীয়া। মুকুল ভাবে, উপলক্ষ সে, তবু কথাটা আনন্দকেই অজান্তে করে বলা। যেন বুঝিয়ে দেয়া, তাঁর বয়স বেড়েছে, ঠিক তবু একেবারে ষোল আনা বুড়িয়ে যাননি। বরং বয়সের তুলনায় আরো চঞ্চল, আরো ক্ষিপ্র। সমস্ত গুরুত্ব হারিয়ে ভাব-গম্ভীর কথাগুলিই অসংলগ্ন, অচল মনে হয়। আনন্দের চোখে চোখ রাখে মুকুল। আনন্দ হাসে। কিন্তু হাসি দেখে ভাবতে-ভাবতে মুকুল যে কোন অতলে তলিয়ে যায়! কালিদাসের কথাই ভাবে। কিশোর বয়সে বার-

কয়েকের জন্যে দেখা সেই ভালোলাগা আর না-লাগার ঊর্ধ্বে স্থাপিত ব্যক্তিত্ব আজ কোথায়? নিশ্চল বসে থাকতে-থাকতে সেইসব দিনের ছোট-খাটো ঘটনাগুলিই স্মরণে তোলপাড় হতে থাকে। বাবার প্যুশে এই লুটিয়ে পড়া অস্থির মানুষটিকে দেখেই একদিন মহীরুহের মত বিরাট, মহৎ মনে হয়েছে। বিস্ময় জেগেছে রূপে, কথায়। হতে পারে তা মোহ, যা মনকে নিরন্তর আবিল করে। কিন্তু এমন করে এতখানি কাছে পাবার পরেও সুদূর ভাবার অবকাশ ছিল কি কোথাও? আজ তিনি নিজেকে নিয়ে আলাদা হ'তে চাইছেন। ভাবে-ভাষায় মুকুল, আনন্দ এমনকি প্রভাকে অবধি এড়িয়ে চলার নিপুণ বাসনা। পালিয়ে বেড়াবার এমন অভিনব কৌশল জানা থাকলে হৃষিকেশও বুঝি সংসার ছেড়ে এক পা বাইরে যেতেন না কোনদিন। অন্তত মনে-মনে মুকুল তা বিশ্বাস করে এখন। আনন্দ কোথায়? সন্ন্যাসে? কেমন করে জবাব দেবে সে? একটার স্বাদ পেতে শুরু করে যদি, অন্যটার স্বরূপ জানা নেই। হয়তো জানা যাবে না কোনদিন। ঘর থেকে বাইরের চেহারাটা আংশিক দেখা যদিও চলে, তার চরিত্র চেনার উপায় মেলে না কিছুতেই। কালিদাস সেই বাইরেটাকেই কোন চোখে দেখছেন বোঝা ভার। যে চোখেই দেখুন সে-চোখে রঙীন চশমা না থাক, রং যে লেগে আছে সন্দেহ নেই! নইলে এতখানি উত্তেজিত হবার কী আছে? এমন করে উচ্ছ্বসিত হবার?

'যাদের সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ কেবল তারাই ভাবে আমি পাগল, আমি খামখেয়ালী। নইলে আমি তো জানি তোমাদের মত এই বয়স আর বাসনা একদিন আমারও ছিল। তখন আমিও কিছু হতে চাইতুম, করতে চাইতুম তোমাদের মত।'

কথায়-সুরে আর্তি ফুটে ওঠে। আবহাওয়া দীর্ঘশ্বাসে ভরপুর। আনন্দ-নির্বাক নিষ্পলক তাঁকে দেখে। তার চেয়ে কালিদাসকে আর কে জানে বেশী? ভাসা-ভাসা জানা নয়। খানিক চোখের দেখা আর খানিক অনুমান করে নিয়ে জানাও নয়। বরং দীর্ঘদিন-মাস-বছরের হিসেবে কাছে থেকে তাঁর সুখ, তাঁর দুঃখের ঘনিষ্ঠ অংশীদার হয়ে যেমন করে ঠিক যতখানি জানা যায় ততখানি জেনেছে। কিন্তু কই এমন করে বিহ্বল, বিচলিত হতে দেখেছে কি আনন্দ? মনে পড়ে না। তবে কি মুকুল এসে বড় বেশী নাড়া দিয়েছে তাঁকে? হতে পারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্মৃতি তাঁর একমাত্র মেয়েকে দেখেই সজাগ হয়ে উঠেছে হঠাৎ। আপ্তবাক্য অনুসারে বন্ধুতার সর্বশেষ অনুশাসন দুটি ছাড়া প্রায় সবক'টিই বর্ণে বর্ণে পালন করেছেন তিনি। আর কী বাকী আছে তার? কোন পাপ, কোন অন্যায় তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে না আনন্দ। তিনি নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। উদারতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের প্রতি দয়া, প্রেম, করুণা তাঁকে আরো মহৎ, আরো উন্নত করেছে। অন্তত নিজের জীবন দিয়ে আনন্দ জানে তাঁর তুল্য পুরুষ সংসারে বিরল। তবু এই মুহূর্তে তাঁর মুখ-চোখ অবয়বের দিকে তাকিয়ে এবং প্রায় বিলাপের মত ছাড়া-ছাড়া অস্ফুট কথা শুনে ভাবে, তবে কি তাঁর জীবনেও খুঁত থেকে গেছে কোথাও? কিছু অতৃপ্তি, অপূর্ণতা? একদিন হৃষীকেশ ছাড়া তাঁকে ভাবা যেতো না। সেই হৃষী আজ নেই। কালিদাস একা, নিঃসঙ্গ, অসহায়। আর এমন দিনে প্রায় আচমকা মুকুলের আবির্ভাব। বিচলিত হবার মত ঘটনা বৈকি। মনে মনে যুক্তি খুঁজে পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দ। তার মুখে চোখে দেখা দেয় পরিতৃপ্তির রক্তোচ্ছ্বাস উদ্ভাস অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম অথচ গভীর। নজর এড়ায় না মুকুলের। আনন্দের ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে কিছুই বোঝে না।

কিন্তু আনন্দ অনুমানে সুখবোধ করে এই যে, মুকুল এসেছে! এতকালের শান্ত, শীতল, পাড়-বাঁধানো মাটির মত স্বচ্ছ পুকুরে হঠাৎ হাওয়ার দুঃসহ আলোড়ন

অনুভব করে সে। ভেতরে-ভেতরে প্রমাদ গনে। এখন ভেবে-চিন্তে হিসেব করে কথা বলতে হবে তাকে। ভাবাবেগে আকুল হবার এই তো সময়! অথচ কালিদাসের কাছে ঠিক এইভাবে অনুগতের ভাষায় যথার্থ তাল মিলিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত সে নয়।

'আর কী হবেন? মানুষের বিচারে আপনি যে সাফল্যের চূড়ায় পেঁছে গেছেন কবে!'

'আপাতচক্ষে দেখতে গেলে হয়তো তোমার কথাই ঠিক। বাড়ি-গাড়ি-টাকা-পয়সা—সাধারণভাবে মানুষ যা চায় তা প্রায় সবই হয়েছে। তবু তৃষ্ণা মেটে কই? একদিন যাকে ভেবেছি চরম সফলতা আজ সেখানে পেঁছে দেখি চরমতর বলে কিছু আছে। কিন্তু অত উঁচ্চে ওঠার সেই সাহস কোথায়, শক্তি কোথায় আজ? তাই ভয়ে-ভয়ে নেমে পড়তে হচ্ছে। এখন আরেক ভয়, একেবারে গড়িয়ে না পড়ে যাই। তাহলে যে তুলে ধরবার কেউ নেই।' তিনি থামলেন। দম নেবার জন্যে হাঁ করে বেশ জোরে-জোরে বার কয়েক শ্বাস টানেন। পুরোপুরি ছেদ টানার আগে প্রায় বুকের ওপরে থুতনি চেপে ধরে ধীর, গম্ভীর গলায় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করেন, 'লোভের পরিণাম এই হয়।'

হাতের চুরুট নিবে গিয়েছিল। ছাই ঝেড়ে ছাইদানির ওপরে রাখেন। পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার পেছনে দরজায় ঝোলানো ভারি পর্দার গায়ে চোখ রাখেন। ভাবেন, চাকর-বাকর চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কেউ। অন্তত প্রভা তো পারেন। ওত পেতে শুনতে পারেন সব কথা। এই তাঁর স্বভাব। চিরদিনের অভ্যাস বলা চলে। তাছাড়া এই প্রৌঢ় বয়সে, পড়ন্ত বেলায় এখনো তাঁরা পরস্পরের বিশ্বাসের ভূমি থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে, তিনি তা জানেন। একদিন এই নিয়ে ক্ষোভ ছিল, মনে-মনে সীমাহীন অশান্তি ছিল তাঁর। আজ আর অবশ্য নেই। খন ঘরের আঘাত নিয়ে বাইরে ছুটে গেছেন। বাইরে প্রাণের মানুষ ছিল। আত্মার আপনজন ছিল। হৃষীকেশকে পেয়েছিলেন কালিদাস। জীবনে আশীর্বাদের মত এসেছেলেন লতিকা। আজ তাঁরা একে-একে গেছেন অতীত। আর অন্ধকারে নিষ্পত্র গাছের মত তিনি সঙ্গীহীন, একা। প্রভা র ছিলেন না কোনদিন। আজও নেই। র কাছে পরম কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা, নাকর। বরং তেমন চাওয়া নিজেকে নিয়ে, রেই সঙ্গে নিষ্ঠুর, করুণ রসিকতা।

'যেভাবে শুরু করেছিলুম সেভাবেই শেষ করা যেতো!'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে আবহাওয়া গম্ভীর, হল যেন। অনেকক্ষণ কথা বলতে র না কেউ। প্রত্যেকেই মাথা নিচু করে চাপ বসে থাকে।

একসময় মুকুল কথা বলে, 'বাবাকে পাবার সুযোগ বড় ছিল না। আপনি বন্ধু। এখন আন্দাজ করতে পারছি, ন কেমন ছিলেন।' চোখ তুলে কালিদাসের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। তিনি নির্বিকার। কথা বলার উৎসাহ তাই নিবে আসে। তবু মরীয়া হয়ে মুকুল বলে, 'ভাবতে বিস্ময় লাগে, মনে-প্রাণে যাদের এত মিল জীবনে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র কয়েকবার, কয়েকটি ঘণ্টার মেয়াদে!'

'সেই দেখা তোমার জন্মের পরে হয়েছে। আগের কথা তো তোমার জানা নেই।'

কালিদাস মুকুলের চোখে চোখ রাখেন। ভাবেন, যথার্থ হল তো বলা? পাছে অন্য কিছু না ভেবে নেয়। অবিশ্বাস অথবা সন্দেহে কণ্টকিত করে তোলার চেয়ে আজ ওকে মুক্তি দেয়া ভালো। বরং সহজ, স্বচ্ছন্দ হলে আবহাওয়া শীতল, সহনীয় মনে হবে। হাঁপ ছেড়ে বুকের ভেতরে শুদ্ধ, স্বচ্ছ বাতাস টেনে নিতে পারবে সবাই। লঘু সুরে তরল রসিকতার আমেজ মিশিয়ে তিনি তাই বলেন, 'দূরের প্রেমই তো কাছে টানে। দুদণ্ডের দেখা তাই চিরন্তন হয়ে থাকে।'

'আপনাকে প্রথম দেখি কলকাতায় দাদুর বাড়িতে। মায়ের সঙ্গে আমার স্বদেশ দেখাও সেই প্রথম।'

'মনে আছে, কলকাতায় আমার ছবির একজিবিশান চলছে তখন। তোমার দাদু মানে রায়বাহাদুরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই দুর্দিনে তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে আপনজন। অভিভাবকও বলতে পারো। তাঁর অর্থ আর উৎসাহের আনুকূল্য না পেলে আমি যে কোথায় তলিয়ে যেতুম আজ!'

বলতে বলতে থমকে যান। অকপটে নিজেকে মেলে ধরা বড় কঠিন। সহজ হওয়ার চেয়ে দুরূহ সাধনা আর নেই। কালিদাসকেও তাই ভাবতে হয়। সব কথাই কি একে-একে নিপুণ কৌশলে টেনে বার করবে মুকুল? তিনি ছাইদানি থেকে চুরুট তুলে নিলেন। দেশলাইয়ের জন্যে আনন্দের কাছেই হাত বাড়ালেন। অনুনয়ের সুরে প্রায় আবদার করে বলেন, 'দাও না, সিগারেট তো খাও। দেশলাই রাখো না? লজ্জা কী? টেক মি অ্যাজ ইওর ফ্রেণ্ড।'

নিরুপায়ের মত পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল আনন্দ।

মুকুল তার আগেই দেখতে পায়। পায়ের কাছে কার্পেটের ওপরে দেশলাই পড়ে আছে।

চুরুট ধরিয়ে কালিদাস আরো হাল্কা বোধ করেন। ধোঁয়া ছেড়ে গলা সাফ করে আবার পুরনো কথার খেই ধরেন। গলা একটুও কাঁপে না আগের মত। কথার সুরে আবেগের বিন্দুমাত্র আমেজ না এনে বলেন 'তোমার মা ছিলেন আমার বন্ধু, সহপাঠী। শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের সঙ্গে আমাদের জীবনচর্যাও প্রায় একই তালে শুরু।'

তারপর?

তারপর অনেক কথাই তো মুকুলের জানা। নতুন কথা কি কিছু নেই? অন্তত যা কালিদাস জানেন কিন্তু মুকুলের অজানা? বড় সাধ হয়, মায়ের জীবনের সেই অন্ধকার, অশ্রুত কাহিনীর যিনি মূল তাঁর নিজের কথা শোনার। একমাত্র কালিদাস ছাড়া হৃষীকেশই লতিকাকে গভীরভাবে জেনেছিলেন। শুধু জানা। বোঝার চেষ্টা ছিল না কোথাও। থাকলে অমন করে বিনা নোটিশে সরে দাঁড়ায়? জীবন থেকে চিরতরে ছুটি নেবার সিদ্ধান্তটাই রাতারাতি স্থির করে ফেলে?

মুকুল তখন কয়েক শ' মাইল দূরে মিশনারীদের তাঁবেদারিতে থেকে যথার্থ মানুষ হবার সাধনায় মগ্ন। হঠাৎ ডাক পড়ে কলকাতায়। দাদু তখনো বেঁচে। কিন্তু বাঁচা না বাঁচারই সামিল। কলকাতায় তিনি তখন একা। একমাত্র মেয়ের শোকে শয্যা নিয়েছেন, বাকশক্তিরহিত। তখনকার মত সামলে নিয়েছে মুকুল। অন্তত মায়ের অভাব তাকে ততখানি ব্যাকুল করেনি যতখানি সুযোগ পেলে একটা নির্বোধ কিশোরী পাগল হয়।

আস্তে-আস্তে টের পায় শুভার কাছে এসে। সব কিছুই জানা হয়ে যায় মায়ের অভাবে, বাবার অবর্তমানে। কালিদাসের ওপরে রাগ হয়েছে তখন। ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়েছে তাঁকে। আর মা, তার মা লতিকা? মুকুল ভাবতে পারে না, পাপ তাঁকে স্পর্শ করেছে কোনদিন। সন্দেহ করার মত কিছু কি ঘটেছে কোথাও? নইলে সমস্ত সুখ, যাবতীয় ঐশ্বর্যের আরাম তুচ্ছ ভেবে হৃষীকেশ বিরাগী হন কিসের লোভে?

(ক্রমশঃ)

এসেছে লগ্ন ॥

মণীশ ঘটক

তিমির রাত্রি হয়েছে অতিক্রান্ত
এসেছে লগ্ন শঙ্খফুকটা মাত্রিক,
হয়েছে সমাধা নক্তন্দিব চক্রান্ত
পৌনঃপুনিক সংবর্তন অহোরাত্রিক।

ধ্বনি কি স্তব্ধ প্রতিধ্বনির প্রত্যাশে
তবে আলোড়ন কিসের পূর্বগগনে,
গণজাগরণ উদ্যত তবে কী আশে
নবজাতক না জন্মালে শুভলগনে?

অয়নান্তের প্রান্তে উদিত মরীচি
শর সন্ধানে হও একাগ্র লক্ষ্য,
রক্ষ অস্থি দেখ উন্মোচে দধীচি
অচিরেই হবে পলায়ন পর রক্ষ।

কোটি বীর্যের নির্যাস আনো শৌর্যে
নায়ম আত্মা বল-হীন-জন লভ্য
বৈমনস্য অমার্জনীয় ধৈর্যে—
উন্মুখ নভে বিজলী বজ্র গর্ভ!

রণাঙ্গনের প্রস্তুতি সম্পন্ন,
হ্রেষা বৃংহতি মুখরিত কুরুক্ষেত্র।
রথী মহারথী আকীর্ণ জনারণ্য
পার্থ এখনো উন্মীলিবে না নেত্র?

স্মৃতিতে জোয়ার এলো ॥

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিতে জোয়ার এলো।
ভেসে এলো বিসর্জিত প্রতিমার
মাটি খড় পাট দড়ি রাংতার মুকুট
মেখলা চরণচাঁদ
বাজুবন্ধ সাতনরী
শোলার শালুক,
মুঠো মুঠো আরতির ফুল।

পাট দড়ি মাটি খড়
খড়িমাটি রঙ
রাংতা রঙীন শোলা
নিষ্ঠার ঘন ঘামতেল,
সব কিছু দিয়ে
গড়ি যে প্রতিমা,
কল্পনার সিংহাসনে অপূর্ব রূপসী।

এবং বোধন মানে নিরঞ্জন, তাই
গভীর স্মৃতির গর্ভে দিই বিসর্জন
নিজ হাতে গড়া সেই মাটির পুতুল।।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(২)

ঈশ্বরপুরী

আজকের হালিসহর গ্রামের পুরোনো নাম কুমারহট্ট। এই গ্রামের বাসিন্দে শ্যামসুন্দর আচার্য। তাঁর ছেলেই ঈশ্বরপুরী।

কী করে কে জানে মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আর তখুনি তিনি দীক্ষা নিলেন সন্ন্যাসে।

ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অংকুর মাধবেন্দ্র আর সেই অংকুরের পুষ্টি হল ঈশ্বরে।

দীক্ষা নেবার পর থেকে ঈশ্বর মাধবেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। ঈশ্বরের আর কাজ কী—শুধু গুরুসেবা, গুরু-শুশ্রূষা। গুরুপ্রসাদের পথ দিয়েই ভগবানের করুণা।

ঈশ্বর গুরুর দেহপরিচর্যা তো করছেই কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথাও শোনাচ্ছে গুরুকে। তাঁর শরীরে যত প্রেম ছিল মাধবেন্দ্র তা পরিপূর্ণ করে দিয়ে দিলেন ঈশ্বরকে। 'যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে। সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বর-পুরীরে।' প্রেমের সাগর করে তুললেন। বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হোক।'

মাধবেন্দ্র তিরোহিত হলে ঈশ্বরপুরী বেরিয়ে পড়লেন। ইতি-উতি ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলেন নবদ্বীপ। নবদ্বীপ তখন ধন-পুত্র-রসে মত্ত, কৃষ্ণ বা কীর্তন শুনলেই পরিহাস করে ওঠে। বিদ্যার অভিমানে ভক্তিকে হেয় করে। শুধু ক্রোধ-অবতার অদ্বৈত আচার্যই হুঙ্কার করে বলছেন, দাঁড়াও, কৃষ্ণকে সকলের চোখের কাছে এনে ধরব। তখন দেখবে কী হয়, কে কী করে!

সেই নিতাই-গৌর-আনা অদ্বৈতের ঘরে ঈশ্বরপুরী একদিন অলক্ষিতে এসে উপস্থিত হলেন।

চারদিকে ভক্ত-শিষ্য নিয়ে শান্তিপুরে নিজের গৃহে বসে আছেন অদ্বৈত, কৃষ্ণকথা বলছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী এসে ভিড়ের একপাশে সংকুচিত হয়ে বসে পড়লেন।

এ কে সন্ন্যাসী? শীর্ণকায় দীনবেশ অথচ উজ্জ্বলকান্তি, কে এ আগন্তুক! হঠাৎ অযাচিত এসে পড়ে কৃষ্ণকথার মাঝখানে বসে পড়েছে, কে এ নিরভিমান!

'জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি কে?' অদ্বৈত সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করলেন।

ঈশ্বরপুরী বললেন, 'আমি কেউ নই। আমি শুধু আপনার চরণ দর্শন করতে এসেছি।'

অদ্বৈত মুকুন্দকে কৃষ্ণলীলার শ্লোক পড়তে বললেন।

মুকুন্দ পড়তে লাগল।

আর শোনামাত্রই ঈশ্বরপুরী কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। যত পড়া উচ্চতর হয় তত প্রেমাশ্রু উদ্বেলতর হয়ে ওঠে।

যে বিত্তবানের ঘরে জন্মায় তারই মধ্যে বৈভবের প্রকাশ ঘটে। এ সাধু কোন প্রেম-ধনীর উত্তরাধিকারী? পরম প্রেমের ভাণ্ডারী তো একমাত্র মাধবেন্দ্র। সুতরাং ঐ সাধু মাধবেন্দ্রেরই বংশধর।

সবাই তখন চিনতে পারল ঈশ্বর-পুরীকে।

টোল থেকে ছাত্র পড়িয়ে ফিরছে নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা।

সন্ন্যাসীকে দেখে নিমাই নমস্কার করল।

এ সুন্দর পুরুষটি কে, ঈশ্বরপুরী অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন। শুধু সুন্দর নয়, গম্ভীর, সর্ব-লক্ষণ-গুণধর।

'তুমি কে? কোথায় থাকো? কী পুঁথি পড়াও?' ঈশ্বরপুরী জিজ্ঞেস করলেন নিমাইকে।

নিমাইয়ের সঙ্গের ছেলেরা অবাক হল। এ লোকটা দেশবিশ্রুত নিমাই পণ্ডিতকে চেনে না?

'ইনি নিমাই পণ্ডিত।' কে একজন বললে সগর্বে।

'তুমিই সেই।' ঈশ্বরপুরী আনন্দ করে উঠলেন।

'আমাদের বাড়ি চলুন।' নিমাই সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করল।

'চলো।'

নিমাই ঈশ্বরপুরীকে সমাদর করে বাড়িতে নিয়ে গেল। শচীমাতা কৃষ্ণনৈবেদ্য রান্না করে দিলেন। ভিক্ষা-শেষে বিষ্ণুঘরে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন। তাঁর কৃষ্ণ-প্রেম দেখে সবাই সন্তুষ্ট হল। নিমাইয়েরও মন্দ লাগল না।

সেখান থেকে ঈশ্বরপুরী চলে গেলেন গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। সেখানে থেকে গেলেন এক মাস।

সেখানে, গোপীনাথের ঘরে, বহু লোক জমায়েত হয়। চল সন্ন্যাসীকে দেখে আসি। এদিকে সন্ন্যাসী অথচ কৃষ্ণের জন্যে কাঁদে।

টোলে পড়ানো সাঙ্গ করে নিমাইও রোজ সন্ধ্যাবেলা আসে, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে চলে যায়।

ঈশ্বরপুরী এত জানেন অথচ এটুকু জানেন না যাকে তিনি খুঁজছেন, যার জন্যে তিনি কাঁদছেন সেই এসেছে তাঁকে প্রণাম করতে।

'কৃষ্ণলীলামৃত' বলে একখানা পুঁথি লিখেছেন ঈশ্বর। ভক্ত গদাধর রোজ সন্ধ্যায় সে পুঁথি সকলকে পড়িয়ে শোনায়।

একদিন নিমাইকে ধরলেন ঈশ্বর। বললেন, 'আমি কৃষ্ণচরিত নিয়ে একখানা পুঁথি লিখেছি, তুমি দয়া করে একটু দেখে দাও, কোথায় কী দোষ-ত্রুটি হয়েছে সংশোধন করে নিই।'

নিমাই স্মিতমুখে বললে, 'ভক্তের কৃষ্ণ-বর্ণনায় কোনো দোষ হয় না। ভক্তের যেমনতরোই কবিত্ব হোক না কেন, উত্তম-মধ্যম আর অধম, কৃষ্ণ সমান সুখী।'

'মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর।।
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ।।'

কথাটা হচ্ছে বিষ্ণবে নমঃ, বিষ্ণায় নমঃ নয়। বিষ্ণায় ভুল, বিষ্ণবে শুদ্ধ। যে মূর্খ সে বিষ্ণায় বলছে আর যে পণ্ডিত সে ঠিক বিষ্ণবে বলছে। কিন্তু কৃষ্ণ ভুল-শুদ্ধ দুটোই নিচ্ছে। কৃষ্ণ ভাষা দেখে না, ভাব দেখে। পোশাক দেখে না পদবী দেখে না, হৃদয় দেখে। দেখে অনুরাগ আছে কেনা, আন্তরিকতা আছে কিনা। অনুরাগ আর আন্তরিকতা থাকলেই কৃষ্ণ মহা-আনন্দিত। ভাব পেলে তিনি আর ব্যাকরণ খোঁজেন না।

তবু যদি ব্যাকরণে দোষ থাকে তাই বা শুদ্ধ করে দেব না কেন? ভাবও আছে, ব্যাকরণও শুদ্ধ, তবেই তো সোনায় সোহাগা। ভক্ত ভালো, বিদ্বান ভক্ত আরো ভালো। যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

ঈশ্বরপুরী বললেন, 'তবু যদি কোথাও কোনো দোষ থাকে, তুমি দেখে দাও। তুমি দেখে দিলে তোমার কোনো দোষ হবে না।'

নিমাই তাই প্রত্যহ এসে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সেই পুঁথির বিচার করে।

একদিন একটা ক্রিয়া-পদের ধাতুরূপ নিয়ে কথা উঠল।

নিমাই ঈশ্বরের ভুল ধরল। বললে, 'এ আত্মনেপদী নয়, এ ধাতু পরস্মৈপদী।'

বলে নিমাই বাড়ি চলে গেল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ করে বিচার করলেন ঈশ্বরপুরী। দেখলেন আত্মনেপদীই ঠিক।

পরদিন নিমাই এলে বললেন, 'তুমি কাল যে পরস্মৈপদী বলে গেলে সেটা ভুল, আত্মনেপদীই শুদ্ধ।'

নিমাই আর কিছু বলল না, তর্কে প্রবৃত্ত হল না। ভগবান চিরকাল ভক্তেরই জয়ী করে থাকেন। ভক্তের বিজয়বর্ধনই কৃষ্ণের সন্তোষ।

কিন্তু ঐ বিচারের মধ্যে আর কোনো বক্তব্য কি প্রচ্ছন্ন ছিল না?

অর্থাৎ আত্মপদে থেকো না, পর-পদে চলে এস। অহংকার ছেড়ে চলে এস ভক্তিতে, শরণাগতিতে।

ঈশ্বরপুরী আবার নবদ্বীপ ছাড়লেন। বেরুলেন পর্যটনে।

পিতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে নিমাই গয়ায় এসেছে। গয়ার মহিমাবর্ণন শুনতে-শুনতে জেগেছে প্রেমাবেশ। আর বিষ্ণুর চরণ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে মহাভাব। একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে স্বেদ-অশ্রু-কম্প-পুলক। নর্তনে-কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। আর এ অশ্রুধারা যেন অবিচ্ছিন্ন। গঙ্গাধারা।

কী আশ্চর্য, সেই সময়ে গয়ায় ঈশ্বরপুরী এসে উপস্থিত।

যেন দৈবযোগ।

নিমাই ঈশ্বরপুরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'আমার গয়ায় আসা সফল হল। বিষ্ণুপাদপদ্মে যার নামে পিণ্ড দেওয়া হবে শুধু সেই উদ্ধার পাবে কিন্তু আপনাকে দর্শন করলে কোটি পিতৃপুরুষের মুক্তি। আপনিই মঙ্গলপ্রধান, সকল তীর্থের পরম তীর্থ, আমাকে এই সংসারসমুদ্র থেকে রক্ষা করুন। আমাকে কৃষ্ণপ্রেমরস পান করতে দিন।'

ঈশ্বরপুরী বললেন, 'তুমি যে ঈশ্বর-অংশ তাতে আর সন্দেহ নেই। এই অপরূপ রূপ অপার্থিব চরিত্র আর অলৌকিক বিদ্যা আর-কিছুতে সম্ভব নয়। কাল রাতে নিদ্রাঘোরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ গয়ায় এসে তারই সাক্ষাৎ ফললাভ করলাম। যেদিন নবদ্বীপে প্রথম তোমাকে দেখি সেদিন থেকে তুমি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। কৃষ্ণদর্শনের সুখ একমাত্র তোমাকে দেখেই।'

'আমার কী ভাগ্য!' নিমাই নির্মল নয়নে হাসল।

তীর্থশ্রাদ্ধ শেষ হবার পর বাসায় এসে নিমাই রান্না করতে বসেছে, কৃষ্ণনাম বলতে-বলতে ঈশ্বরপুরী এসে হাজির।

'ভালো সময়েই এসেছি যা হোক।' বললেন ঈশ্বরপুরী।

নিমাই বললে, 'আমার কী ভাগ্য! এই অন্নই আজ ভিক্ষা করুন।'

'তা হলে তুমি খাবে কী?'

'আমি আবার রান্না করে নেব।'

'না, আর বৃথা রান্না করতে হবে না। আমরা এই অন্নই ভাগ করে নিই এস।'

'আপনি কোনো সংকোচ করবেন না। এ অন্ন কটি আপনিই ভিক্ষা করুন। আমার রান্না এখুনিই হয়ে যাবে।'

সমস্ত অন্ন ঈশ্বরপুরীকে পরিবেশন করে দিল। ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো কিছুতে মতি নেই বলেই তার প্রতি এত করুণা।

ঈশ্বরপুরীকে খাইয়ে নিজে রান্না করে খেয়ে নিল নিমাই।

তারপর একদিন ঈশ্বরপুরীর কাছে গিয়ে নিমাই বললে, 'আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিন।'

'শুধু মন্ত্র কেন, তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত।'

নিমাইকে দশাক্ষর মন্ত্রের দীক্ষা দিলেন ঈশ্বর।

নিমাই ঈশ্বরকে প্রদক্ষিণ করে বললে, 'আজ থেকে আপনার পায়ে আমার দেহ বিকিয়ে গেল। আমার বলতে আমার আর কিছুই রইল না। আমার মন বুদ্ধি অহংকার—সমস্ত, সমস্ত আপনার। আপনি আমাকে কৃপা করে এমন শক্তি দিন যাতে আমি নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসতে পারি।'

নিমাইকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন ঈশ্বর। দুজনেই কাঁদতে লাগলেন।

গয়ায় আর কতদিন থাকবে নিমাই। তার আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে এসেছে।

ঈশ্বরপুরীর থেকে বিদায় নিয়ে নিমাই গৃহে ফিরল।

মাধবেন্দ্রের তিরোধানের পর ঈশ্বরপুরী আর বেশি দিন মর্তকায়ায় থাকলেন না। নির্বাণের সময় কাছে ছিল গোবিন্দদাস আর কাশীশ্বর গোসাই, তাদের বললেন, নীলাচলে যাও, সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করো। গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণই কলিকালে জীব নিস্তারের জন্যে নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সম্প্রতি নীলাচলে আছেন, তাঁরই চরণে গিয়ে শরণ নাও।'

গোবিন্দ আর কাশীশ্বর গুরুবাক্য শিরোধার্য করে নীলাচলে চলে এল। গোবিন্দ আগে, কাশীশ্বর কদিন পরে। সার্বভৌমের সঙ্গে বসে কৃষ্ণকথায় মেতে আছেন মহাপ্রভু, গোবিন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ, তাঁরই আদেশে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে আপনার চাকর করে নিন।'

ঈশ্বরপুরী লীলাসংবরণের সময় কী বলে গেছেন তাও বললে।

মহাপ্রভু গুরুবাক্যের মর্যাদা দিলেন, সেবকরূপে গ্রহণ করলেন গোবিন্দকে। মহাপ্রভুর চরণসেবাই গোবিন্দের প্রত্যহের নিয়মসেবা হল।

পরে কাশীশ্বর এলে তাকেও রাখলেন। তার কাজ হল প্রভুকে রোজ জগন্নাথ দর্শনে সাহায্য করা।

নীলাচল থেকে গৌড়ে আসছেন গৌরহরি। নৌকো করে পৌঁছুলেন পানিহাটি। রাঘব পণ্ডিত তাঁকে বহুমানে তার বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে একদিন থেকে মহাপ্রভু চললেন শান্তিপুরে। সহসা পথের মাঝখানে মনে পড়ে গেল কুমারহট্টের কথা, তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান যে কুমারহট্ট।

চলো তাঁর জন্মভিটা দেখে আসি।

প্রভু বোলে, কুমারহট্টেরে নমস্কার,
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার।
প্রভু বোলে, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ।।

জন্মভিটাতে পৌঁছে অবোধ বালকের মত কাঁদতে লাগলেন গৌরাঙ্গ। সহচর ভক্তেরাও কাঁদতে লাগল। চলল কীর্তন-ক্রন্দন, প্রেমবিলাসধূলিতে ধূসর হয়ে গেল সকলে।

'নাও নাও এ স্থানের মাটি নিয়ে চলো।' বললেন গৌরহরি, 'এর মত পবিত্র এর মত মূল্যবান আর কী আছে?' কয়েক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে গৌরহরি বাঁধলেন বহির্বাসে।

অনুগামী পার্ষদেরাও ঝুলি বোঝাই করে মাটি নিতে লাগল।

দেখতে দেখতে শত শত গ্রামবাসী ভক্তও দু-হাতে করে তুলতে লাগল মাটির পিণ্ড।

দেখতে-দেখতে ছোটখাটো একটি ডোবা তৈরি হয়ে গেল।

তার নামই চৈতন্যডোবা।

পার্ষদমণ্ডলী সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু কুণ্ড পরিক্রমা সুরু করলেন। প্রভুর নয়ন থেকে নেমে এল অশ্রুগঙ্গা।

প্রেমজলে সে ডোবা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

গুরুকে কী ভাবে ভালোবাসতে হয় কী করে তাঁকে সম্মান দিতে হয় আর গুরু-বিরহ সন্তাপ কী নিদারুণ তারই জ্বলন্ত নিদর্শন এই সুশীতল গৌরকুণ্ড।

(ক্রমশ)

পাঠকের বৈঠকে

স্বর্গে আমার মিত্র আছে (৩)
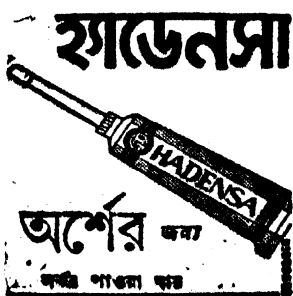
ভূমিকম্পের ফলে লয়েরো গ্রামটির কিছু আর রইল না। দশঘন্টা ধরে ত্রাণ-কর্ম চলেছে সামরিক বাহিনীর অধিকর্তা মেজর-জেনারেল ব্রাভোলোর নেতৃত্বে। উদ্ধার করার মত কিছু ছিল না। মেজর-জেনারেল অতিশয় ভাবালু প্রকৃতির, সামরিক বাহিনীর মানুষ হলেও মৃত্যুকে তেমন প্রত্যক্ষ করেননি। একটা দল কবর খননে ব্যস্ত। লুইজী পাগলের মত তার বাড়িতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, তার স্ত্রী ঈশ্বরকে অভিসম্পাত জানাচ্ছে। কন্যা সোফিয়া শুধু কাঁদছে। আর একটি কিশোরী মেয়ে শান্ত-দৃষ্টিতে উদাস-ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে। তার ভ্রাম্যমাণ মেলার দল সামনে, তার বাবা নাগর-দোলার তলায় চাপা পড়ে মরেছে, কিন্তু জন্তুগুলি ঈশ্বরের করুণায় বেঁচে গেছে।

মেজর-জেনারেল তাগিদ দিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি সব সেরে ফেলার জন্য। এই ভূমিকম্পে তাঁর চুয়াল্লিশজন লোক কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে তিনি এখানে বিশেষ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আসলে তিনি সৈনিক নন, টেবলে বসে কারিগরি কর্ম করতেন। পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। পচা আপেলের মত সমগ্র উপত্যকাটি থেঁতলে যেতে তিনি দেখলেন। তাঁর লোকজন নষ্ট হয়নি, প্রথম ধাক্কায় একটা ট্যাংক গেছে আর দ্বিতীয় কম্পনে দুটি ট্রাক নষ্ট হয়েছে। তিনি সমুদ্র ভালোবাসেন, পাহাড়-পর্বতে বিতৃষ্ণা। নেপলসেই থাকেন। গত রাতের ভূমিকম্পের পর তাঁর বিতৃষ্ণা আরো বেড়েছে। নানা চিন্তায় তিনি মগ্ন, এমন সময় সার্জেন্ট নাসো এসে সংবাদ দেয় যে একটি বালক আটক আছে, সে বেঁচে আছে। মেজর-জেনারেল তাড়াতাড়ি এখানে থেকে পালাতে চান, এই সংবাদে তিনি বললেন—পরে, এ বিষয় ভাবা যাবে না হয়, আমি তাড়াতাড়ি যেতে চাই। সার্জেন্ট জানালো যে একঘন্টা লাগবে দরজা কেটে ছেলেটাকে উদ্ধার করতে। হুকুম হল, তাকে উদ্ধার করার কাজে লেগে যাও। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। সে চেঁচায়—'তুমি কি ভেতরে আছো খোকা?' সে জবাব দেয়, 'আর কোথায় থাকবো?' সার্জেন্ট আবার বলে—তোমার নাম কি? ছেলেটি বলে—সীজার। সার্জেন্ট বলে—মস্ত নাম, তার মত হওয়ার চেষ্টা করবে।

উদ্ধার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীজার হাকিম-সাহেবের সেই বিধ্বস্ত কক্ষটিতে ছুটে গেল এবং চারিদিক তাকিয়ে আবিষ্কার করল তার সেই বাঞ্ছিত বস্তুটি। সীজারের পাথরের মূর্তিটি অক্ষত রয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সেটি সার্টের ভিতর লুকিয়ে নেয়। হাকিম লোকটি ভালো ছিলেন, আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার বেশ সহৃদয়। বাইরে অনেকগুলি বিরাট ট্যাংক এবং ট্রাক দাঁড়িয়ে। মেজর-জেনারেল এগিয়ে এসে বললেন—ট্রাকে উঠে পড়ো।

সীজার কোনো কিছু সহজে গ্রহণ করার পাত্র নয়। সে প্রশ্ন করে—কেন? আমরা কোথায় যাবো? মেজর-জেনারেল বললেন—নেপলস্। সীজার বলল—ধন্যবাদ, আমি যাবো রোমে। মেজর-জেনারেল ওর মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকালেন, তারপর বললেন—যা হুকুম করা হচ্ছে তাই করো। অবিচলভঙ্গীতে সীজার জানায়—আমি যাবো রোমে, সেখানেই আমাকে নিয়তি টানছে।

মেজর-জেনারেল বুঝলেন যে, তাঁর লোকজন কাজ থামিয়ে এসব কথা শুনছে, তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কোমল গলায় লেফটন্যান্ট আরনলফো বলেন—মিঃ মেজর-জেনারেলের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। যা বলছেন তাই শোনো।

সীজার বলল—'আমি ও'র সেনাদলের কেউ নই। আমিই আমার কর্তা, আমাকে রোমে যেতে হবে।' বিরক্তিভরে মেজর-জেনারেল বললেন : ওকে ট্রাকে ফেলে দাও। কিন্তু সীজারের অবাধ্যতায় তা সম্ভব হল না, ওর হাতে রাইফেল। মেজর-জেনারেল রেগে আগুন, লেফটেন্যান্ট বোঝালেন : দেখুন সকলের সামনে এভাবে কথা বলা খারাপ। ওকে ছেড়ে দিন। মেজর-জেনারেল শেষপর্যন্ত তাকে রেহাই দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ট্রাকে বসলেন।

সার্জেন্ট নাসো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাইফেলটা আদায়ের চেষ্টা করেন। বলেন, রোম কতদূরে তা কি তুমি জানো? সীজার বলে—প্রয়োজন হলে পায়ে হেঁটেই চলে যাবো।

সীজারের দৃষ্টি পড়ল মারিয়ার প্রতি, মেলা বিধ্বস্ত, নাগরদোলা চুরমার। মারিয়া গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সীজার বলে, তোমার বাবা কোথায়? মারিয়া আকাশের দিকে তাকায়, হাত দুটি প্রসারিত করে দেয়। সীজার তাকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর অশ্বতর দুটিতে বেশ ভালো করে দেখে, সে ওদের শক্তি জানে। সে মারিয়াকে বলে, এইভাবে বসে থাকলে চলবে? মারিয়া বলে, মোটা অফিসারটি বলছেন—ওদের সব এখানে ছেড়ে যেতে হবে। ট্রাকে ওদের খাঁচা রাখার জায়গা নেই। মারিয়ার চোখে জল।

সীজার বলল, ওর কথায় কান দিও না। আমি ওকে উপেক্ষা করেছি। আমি রোমে যাবো, যাবে তুমি আমার সঙ্গে? মারিয়া সবিস্ময়ে বলে ওঠে—আমরা সবাই?—সীজারের অবশ্য অশ্বতর দুটি ছাড়া আর কিছুর প্রতি আকর্ষণ ছিল না, এখন বাধ্য হয়ে বলে, নিশ্চয়ই। তা, খাবার-দাবার আছে?

মারিয়া বলে, গাড়ির ভেতর একটা পাউরুটি আর কিছু মাংস আছে।

সীজার বলল, সব ভার আমার, তুমি চুপ করে বসে থাকো।

তার রকম-সকম দেখে সেনাবাহিনীর লোকজন ভাবে, অল্পবয়সে জীবনটাই একটা দুঃসাহসিক অভিযাত্রার বিষয়। মেজর-জেনারেলের কনভয় শেষ পর্যন্ত সীজারের খাঁচাপত্তরের সামনে আটকে পড়ল। কিন্তু সীজার সেই অশ্বতরবাহিত শকটে সব জীবজন্তু নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অরণ্যের দিকে। মেজর-জেনারেল ভাবলেন, আপদ গেল। আর মুখ দেখতে হবে না। কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন।

পথে পড়ল শিশুযীশুর কনভেন্টের বিধ্বস্ত ভবন। কাছাকাছি পৌঁছে সীজার দেখল দুটি সাদা শিরস্ত্রাণমণ্ডিত মাথা। দু'জনেই বৃদ্ধা, তাঁরা এই অশ্বতরযানের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সীজার কাছে এসে তাঁদের নজরে পড়তেই বুঝল এইবার সমস্যার সামনে উপস্থিত হওয়া গেল, ওদের প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়। অথচ জায়গা আছে মাত্র দু'জনের। মাদার বিয়েট্রিস শুনলেন ওরা রোমে যাবে। তিনি ভাবলেন, এরা ঈশ্বর-প্রেরিত। সীজারও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে ফাঁদে পা দিয়েছে তা বোঝে। মারিয়া প্রশ্ন করে, অন্য সিসটাররা কোথায়? সিসটার বিয়েট্রিস বলেন,—এই দু'জন মাত্র বেঁচে আছি। বাকী সবাই ছাদের নীচে চাপা আছে। মারিয়া বলে, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করুন। মাদার বিয়েট্রিস বলেন, তিনি তা করেছেন। সীজার ভাবে, ভূমিকম্পটা না ঘটলে ঈশ্বরের করুণাটা আরো একটু জোরদার হত।

সীজারের ইচ্ছা ছিল না ওদের নেয়, সে আপত্তি তোলে এটা বাস নয়। কিন্তু মারিয়াও কম দৃঢ়চেতা নয়, সে বলল—এই খাঁচাগুলি সব আমার। তোমার ইচ্ছা না

থাকে নেমে যাও। সীজার বুঝল মারিয়া শক্ত মেয়ে। শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়।

এর পর কাহিনী অংশটি বিপজ্জনক অভিযাত্রার বিবরণ। মাঝে মাঝে মাদার বিয়েট্রিস সীজারকে ঈশ্বরঅভিমুখী করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। তারপর রোমের পথে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনের মত এক এক করে বিসর্জন দিতে হয়েছে সমস্ত জন্তুগুলিকে: এক অঞ্চলের বুভুক্ষিত পল্লীবাসীরা এসে ওদের গাধা দুটি নিয়েছে, আহার্যের দাবী নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছিল। আর একটি পাহাড়ি ঝরণায় ডুবে গেল সেই নৃত্যশীল গর্দভের একটি, অপরটি সহমরণে যোগ দিল। শিশুযীশু সম্পর্কে সীজারের উক্তিগুলি, আমাদের দেশে গোপাল ঠাকুরকে নিয়ে যেসব গল্প প্রচলিত আছে অনেকটা তার মত। শিশুযীশুকে সীজার বলত—তুমি নিজেই এত ছোট, তুমি আর কি করে পৃথিবীটা চালাবে।

শেষ পর্যন্ত ওরা রোমে পৌঁছেচে। মেজর-জেনারেলকেও অদৃষ্টের পরিহাসে আসতে হয়েছে সেই রোমে। সীজার তখন বলছে—'আপনার নেপলসে যাওয়া হল না, সেই রোমে আসতে হল।' এই শেষ দেখা তাঁর সংগে।

চার্চে মারিয়া মাদার বিয়েট্রিস আর সিসটার উরসুলা আশ্রয় পেলেন। সীজারের ভালো লাগে না। এ যেন কেমন কেমন। সেই পথের জীবন ছিল আরো স্বচ্ছন্দ। মারিয়া বলেছিল, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। সীজার জবাব দিয়েছিল, বিবাহ পুরুষের জীবন-বিকাশে একটা বাধা। মারিয়া তাই আশ্রয় নিল গির্জায়। যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে যায় তখন বিয়েট্রিস বলেন, ঈশ্বর তোমার সহচর।

ঈশ্বর সর্বদা তোমার সংগে আছেন,—এই কথাটি শুনে সে ভাবল, কেন থাকবেন না! It helps to have friends in Heaven.

এইখানেই এই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। সম্ভবত সীজারের জীবনের ধারা উত্তরকালে কিভাবে প্রবাহিত হবে ম্যাকস্ ক্যাটো তা পরে কোনো খন্ডে লিখবেন। কিন্তু এই উপন্যাসটিতে সীজারের কেন্দ্রীয় চরিত্র, মারিয়ার নায়িকার ভূমিকা, হাকিম-সাহেবের স্বল্পকালিক উপস্থিতি এবং কয়েকটি জীব-জন্তুর নিঃশব্দ যন্ত্রণাভোগ পাঠক-চিত্তকে অভিভূত করে। ম্যাকস্ ক্যাটোর উপন্যাসের কৃতিত্ব সেইখানে। যৌন-যন্ত্রণাকন্টকিত উপন্যাস পাঠে যাঁরা ক্লিষ্ট, এই উপন্যাস তাঁদের নতুন জীবনের সন্ধান দান করবে।*

—অভয়ঙ্কর

* I HAVE FRIENDS IN HEAVEN: By MAX CATTO: Publisned by William Heinemann Ltd

জন মেসফিল্ড

ইংলন্ডের রাজ-কবি জন মেসফিল্ড গত ১২ মে অ্যাবিংডনে পরিণত বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ইংরেজী কবিতার ঋতুবদলের সন্ধিক্ষণে এক বৈপ্লবিক চেতনার অন্যতম বিদ্রোহী প্রতীক হিসাবে তাঁর মৃত্যু যেন একটি রোমান্সের মৃত্যু। আজও সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর পরিচয় 'রাজ-কবি' নয়; তিনি 'সাধারণ মানুষের কবি' ও 'সমুদ্রের কবি'।

বিশ শতকের প্রথম দশক। ইংলন্ডের রাজা তখন পঞ্চম জর্জ। চব্বিশজন ইংরেজ কবি একটি কবিগোষ্ঠী স্থাপনা করলেন যাঁদের কবিতা সংকলন জর্জিয়ান পোয়েট্রি নামে ইংরেজী কবিতার ইতিহাসে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। ভূমিকায় সম্পাদক জানালেন কবিতাগুলি এই বিশ্বাস নিয়ে জন্ম নিল যেন ইংরেজী কবিতা আবার নতুন 'শক্তি ও সৌন্দর্যে' মহীয়ান হয়ে নবযুগের বার্তা বাহক হতে পারে। কিন্তু জর্জিয়ান কবিরা কোন চমক দেওয়া কার্যসূচী বা কোন বিশেষ জীবনদর্শন বা মতবাদ নিয়ে প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মত মাথা ঘামালেন না; তাঁরা শুধু বললেন, যে জগতে তাঁরা বাস করেন সেই জগতের শক্তি ও সৌন্দর্যকেই তাঁরা কাব্যে রূপায়িত করবেন। কাব্য রচনায় যা কিছু পুরোনো—ভাব, ভাষা, শৈলী, বহিরঙ্গ, শিল্পকলা, বাকপ্রতিমা, রূপক অলঙ্কার—সব বাতিল করে তাঁরা বস্তু-কেন্দ্রিক পার্থিব জীবন বোধে উদ্দীপ্ত প্রেরণাকে কবিতার অবলম্বন করবেন। দলে কিন্তু ভিন্নধর্মী কবিদের আনাগোনা: এবারক্রোম্বি, রুপার্ট ব্রুক, চেস্টারটন, ডেলা মেয়ার, ড্রিংক ওয়াটার, গ্রেভস, লরেন্স, স্যাসুন, গিবসন, টার্নার ও মেসফিল্ড। আরো অনেকে ছিলেন।

মুখ্যতঃ সমসাময়িক পটভূমিই বেছে নিলেন এঁরা। মেসফিল্ডের নায়ক হল নাবিক, শিকারী ও দুর্বৃত্তের দল। গিবসন পাথরভাঙা শ্রমিক, মালী, মাল্লা, ছুতোর ও চাষীদের জীবনের নাটকীয় রূপ দিলেন। লরেন্স নার্টিংহ্যামশায়ারের পরিশ্রান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও কয়লা খনির মজুরদের নিয়ে লিখলেন তাঁর প্রথম দিককার কবিতা। অবশ্য এঁদের কেউ কেউ (ডেলামেয়ার, ব্লেকার) নগরজীবনের কোলাহল ও গ্রাম-জীবনের নোংরামিতে বিরক্ত হয়ে একটি বাস্তব-সুন্দর বলিষ্ঠ জীবনের স্বর্গলোকের সন্ধান করলেন। যেখানে হবে অকলুষ আত্মার সংগে বাস্তবের মুখোমুখি সমন্বয়।

আশ্চর্য নয়, দলটি দীর্ঘস্থায়ী হল না। মতবিরোধ প্রকটভাবে দেখা দিল। প্রথম মহাযুদ্ধের বলি হলেন অনেকে। রুপার্ট ব্রুক ছিলেন সুন্দর যৌবন ও দুঃসাহসিকতার প্রতীক; সাতাশ বছরেই তিনি মৃত্যু-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্লেকার একান্তিশে গেলেন। গিবসন আধা-গ্রামীণ এক-ঘেয়েমিতে হারিয়ে গেলেন। লরেন্স অব-চেতন মনের অতলান্তিক রহস্যে অবলুপ্ত হলেন। মেসফিল্ড হলেন জীবন, মৃত্যু ও সৌন্দর্যের তত্ত্বকথার রাজ-কবি। বুদ্ধের জীবন ও দর্শন নিয়ে কবিতা লিখলেন। একথা বলা ভুল হবে না এই জর্জীয় আন্দোলন পলায়নবাদেরই ভিন্ন নাম। তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি ভালবাসা ও ক্ষমায় মমতাময়ী আর সব মানুষই ভাল। প্রকৃতির যত কাছাকাছি থাকা যায়, এই ভাল-মানুষী ততই সমৃদ্ধ হবে। তাঁরা ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সাবধান বাণীটি ভুলে গেলেন:

> Man must begin, know this,
> where Nature ends;
> Nature and man can never
> be fast friends.

কিন্তু প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ খেয়ার পাল তুলে ভিনগাঁয়ে পাড়ি দিলেন, মেসফিল্ড তখনও সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের ভাঙা ঘাটের আশে-পাশেই

জন মেসফিল্ড

ভাসতে লাগলেন। মেসফিল্ডের রচনায় তাই নন্দনকান্তি সৌন্দর্যবিলাসের সংগে হুইট-ম্যান সুলভ শুষ্ক-রুক্ষ ধুলোমাখা উন্মাদতা কোমলে কঠিনে ভাস্বর।

মেসফিল্ডের জন্ম হেরফোর্ডশায়ারের লেডবেরি গ্রামে ১ জুন, ১৮৭৮ খৃঃ। দুঃসহ সংগ্রামের বহু বেদনাময় ইতিহাস লেখা আছে তাঁর জীবনের পাতায়-পাতায় (টু লণ্ড এ জার্নি' আত্ম-কাহিনী দ্রষ্টব্য।) ওয়ারউইকের কিংস স্কুলে কিছুদিন পড়া-শোনা করেছিলেন। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন অনাথ। তের বছর বয়সে পালিয়ে গেলেন লিভারপুলের সাগর উপকূলে। 'কনওয়ে' নামক জাহাজে নাবিকের কাজ শিখলেন বেশ কিছুদিন। যে সামুদ্রিক মোহ একদিন এক ভাবুক কিশোরকে আচ্ছন্ন করেছিল, সে মোহিনী নেশা জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত

কবিকে উত্তপ্ত রেখেছিল (আই ওয়ান্ট ডাউন টু দি সিজ এগেন')। পাড়ি দিলেন আমেরিকায়—নিউয়র্কে। জীবিকার প্রয়োজনে অনেক ছোটখাট, আজেবাজে কাজ করলেন। দু বছর পরে ১৮৯৭-এ আবার ইংলন্ডে ফিরে এলেন। প্রকাশকদের কাছে বেগার লিখিয়ে হয়ে রইলেন অনেকদিন। মৌলিক লেখা গোপনে লিখতেন কিছু কিছু। ধীরে ধীরে অন্ধকার রাত্রি ভোর হয়ে এল; বন্ধুত্ব হল য়েটস ও সিন্‌জের সঙ্গে—যা শুধু ওদেশেরই সম্ভব। এরপর থেকেই সাহিত্য যশের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে এলেন উপরমহলের দুর্গম কোঠায়। প্রথমে 'স্পীকার' কাগজে সাহিত্য সম্পাদক; কিছু পরে 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে (লরেন্সকে এই কাগজের মাধ্যমে তিনিই প্রথম সাহিত্যজগতে পরিচয় করালেন)। ১৯০২ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই সল্ট ওয়াটার ব্যালাডস, যার মধ্যে আছে জনপ্রিয় সি-ফিভার, কারগোজ প্রভৃতি কবিতাগুলি। আট বছরের মধ্যে লিখলেন উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা ইত্যাদি। ১৯১১ খৃঃ অক্টোবরে ইংলিজ রিভ্যু পত্রিকায় দি এভারলাস্টিং মার্সি প্রকাশিত হওয়ার সময় সাহিত্য-রসিক মহলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কেউ বললেন, 'ইয়ুজ অফ কোয়ার্স ল্যাঙ্গুয়েজ—এ লিটারেরি সেনসেশন'। অন্যরা বললেন, 'the theme shocking and violent.' যাইহোক ঐ বছরেই তাঁকে 'এডমনড দ্য পলিন্যাক' পুরস্কারে সম্মানিত করা হল। পর পর প্রকাশিত হল উইডো ইন দি বাই স্ট্রীট (১৯১২), ডানবার (১৯১২), দি ডাফোডিলস (১৯১৩)। কিন্তু তিনি নিজে বললেন, "In 1911, I first found what Icould do" এরপর যুদ্ধের কাজে রেডক্রশে যোগদান, ফ্রান্সে। আমেরিকায় মিত্রপক্ষের তরফে বক্তৃতা দিলেন দি ওয়ার অ্যান্ড দি ফিউচার। মাতৃভূমির জয়গাথা লিখলেন—আগস্ট ১৯১৪, গুড ফ্রাইডে ('প্যাসানপে') দি ওল্ড ফ্রন্ট লাইন, গ্যালিপোলি ও দি নাইন ডেজ ওয়ান্ডার (ডানকার্কের যুদ্ধের জ্বলন্ত ছবি)। যুদ্ধান্তে ১৯৩০-এ রবার্ট ব্রিজেসের মৃত্যুর পর সাগরকন্যা ইংলন্ডের রাজকবি মনোনীত হলেন সাগর-কবি মেসফিল্ড।

মূলতঃ কবি হলেও, একথা অনস্বীকার্য, সৃজনী সাহিত্যে অন্য শাখায় মেসফিল্ড অধিক সফল। তাঁর উল্লেখ্য রচনাবলীর মধ্যে নাটক দি ট্রাজেডী অফ নান, দি ট্রাজেডি অফ পম্পি দি গ্রেট, মেরী কুইন অফ স্কটস, এন্ড অ্যান্ড বিগনিং (কাব্যনাটিকা) সুবিখ্যাত। উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে প্রথমদিকের শ্রেষ্ঠ রচনা মালটিচিয়ুড অ্যান্ড সলিচিয়ড ও জিম ডেভিস। তাছাড়া আছে ক্যাপ্টেন মার্গারেট, লর্ড হরকার, ওড হা, দি গোকস, ব্যাডন পার্চমেন্টস ও কনকরারার। জীবনী ও আলোচনা গ্রন্থ চসার ও য়েটস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম যৌবনের ইতিহাস পাওয়া যাবে টু লং টু লার্ন, ইন দি মিল, নিউ চাম নামক আত্মকাহিনীমূলক রচনাগুলিতে।

মেসফিল্ডের কবিতা সম্পর্কে একজন সমালোচক বলছেন:

> 'In his early poetry his honesty, intensity, and vigour are praiseworthy, but his mood is frequently sentimental, his language obvious, his rhythms crude to the point of doggerel."

আমাদের মনে হয় প্রথম যুগের সমালোচকরা তাঁকে প্রাপ্য স্তুতির বেশী দিয়েছেন। শেষের দিকে তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতি হয়নি। লক্ষ্য করার বিষয় কবি যখন গীতি-কাব্যের উচ্ছ্বাসময় আশাবাদ থেকে দীর্ঘ কবিতার বলিষ্ঠ গতিময়তায় ফিরে এলেন তখনই তিনি সাধারণ কাব্য-রসিক পাঠকের মনোরঞ্জনে বেশী সমর্থ হলেন। গভীর অন্তরলোকের কোন মিস্টিক চেতনা নয়, শুধু আশ্চর্য দুর্বার গতিতে জীবনের বিচিত্র পথের সংঘর্ষের উজান বেয়ে এগিয়ে যাওয়া। দি এভারলাস্টিং মার্সিতে দেখি স্বেচ্ছাচারী মদাপ নায়ক সল কেন্ বক্সিংম্যাচের রিং থেকে বার-এ যায়, সেখান থেকে প্রচণ্ড উল্লাসে পথে নেমে আসে, তারপর নিজের বিবেককে শান্ত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা। নায়কের এই সুস্থ জীবনে উত্তরণের, পুনর্জন্মের সেভিং গ্রেসই এই দীর্ঘ কবিতার বিষয়বস্তু। নায়কের কন্ঠে কবি যেন বলছেন:

> A madness took me then I felt
> I'd like to hit the world a belt.

এই কবিতার ভাষা 'অকবিজনোচিত', 'অসভ্য' নামে নিন্দিত হয়েছিল। নগ্ন বাস্তবতা আঘাত দিয়েছিল গোঁড়াপন্থীদের। কিন্তু সেই উদ্ধারকারিণী কোয়েকার মহিলার কথাগুলি কি কেনকে সান্ত্বনা দেয় নি:

> That every drop of drink accursed
> Makes Christ within you die
> of thirst....
> All that you are is that
> Christ's loss.

অবশ্য সল্ট ওয়াটার ব্যালাডস নামক কবিতাগুচ্ছে আগেই বাস্তবের নোনতা স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা না হলেও একটি প্রতীক-যাত্রার সংকল্প। প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ঢেউ ভেঙে যেন খোলা আকাশের নীচে, পথে-প্রান্তরে সাগরে মুক্তপক্ষ বিচরণ। লক্ষ্য ও পুরস্কার একটি—গা-ঢালা বোহেমিয়ান দুঃসাহসী যাযাবরী ভ্রমণের অনুভূতি:

> A wet road heaving, shining,
> And wild with sea-gulls' cries,
> A mad salt sea-wind blowing
> The salt spray in my eyes.

নারকেল-সবুজ আফ্রিকার সাগর উপকূল, গজ-দন্ত হীরা মানিক পূর্ণ সমুদ্রপথীতে প্যালেস্টাইন যাত্রা। চন্দন-দারুচিনি - লবঙ্গ-গন্ধিত - সমুদ্র - বাতাস ইত্যাদি রোমান্টিক আমেজের ইমেজগুলি কার্গোজ-এর কবিতাকে য়েটস ও কিপলিং-এর সমগোত্রে ফেলে নাকি?

গ্রাম-জীবনের জীবন্ত বাস্তব ছবির বিচিত্র মেলা বসেছে রাইট রয়েল ও রেনার্ড দি ফক্স নামক দীর্ঘ কবিতা দুটিতে। শেয়াল-শিকার ও ঘোড়দৌড়ের দিন সকালের বর্ণনাটি স্মরণীয়। এখানে দি এভারলাস্টিং মার্সি বা ট্রাজেডি অফ নান-এর বিষণ্ণতা নেই। মেসফিল্ডের অধিকাংশ কবিতার আরম্ভ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু ঐ স্থূলতা শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক মায়া আবেশে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। রেনার্ড দি ফক্স-এর শেষ দিকে বিলম্বিত শিকার-দৌড় আনন্দের পর শেয়ালটির মোক্ষপ্রাপ্তি (সলভেশন) যখন হল আকাশে তখন চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। প্রায় সব দীর্ঘ কবিতার শেষে দেখি (দি উইন্ডো ইন দি বাই স্ট্রীট, কিং কোল, দি রিভার ইত্যাদি) সূর্যাস্তের লাল রঙ জ্যোৎস্নার সবুজ পেলবতায় শান্ত হয়ে আসে।

তাঁর সর্বসবাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মালটিটিউড অ্যান্ড সলিটিউড কাহিনীতে সমাজকে অনেক আঘাত দেওয়া হয়েছে। নারীচরিত্রবর্জিত এই উপন্যাসে প্রেম বা যৌনতাঘটিত কোন ঘটনার সংঘাত নেই। নায়ক রজার নালদ্রেত একজন অসফল নাট্যকার। রঙ্গমঞ্চে তার নাটক জমে না। নৈতিকতা সম্বন্ধে তার আদর্শবাদী প্রগতিশীল ধারণা এর জন্য দায়ী। সান্ত্বনার জন্য আইরিশ প্রেমিকার কাছে সে যখন পৌঁছল, মহিলাটি তখন জলে ডুবে মারা গেছেন। মধ্যআফ্রিকায় পাড়ি দিল রজার সবন্ধু। ঘুম-অসুখের (স্লিপিং সিকনেস) অষুধের সন্ধানে মৃত্যুর ফাঁদে পা দিল তারা। কিন্তু রজারের আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার তাদের প্রাণ বাঁচাল। সে ফিরে এল ঘরে, শান্ত সমাহিত সপ্রত্যয়। জীবনকে তার মূল্যবোধকে নতুন করে বুঝে। দি স্ট্রীট অফ টুডেতে বর্ণিত হয়েছে একটি অভিশপ্ত অতৃপ্ত দম্পতির করুণ কাহিনী। লায়োনেল, রোডা ও মেরীর যৌনকামনা ও অস্বাভাবিক মানসিকতার হাহাকার। শেষের কথাগুলি শুধু কাব্য নয়, দর্শন-আত্ম-দর্শন, জীবন-দর্শন। এটি পড়বার পর টলস্টয়ের অ্যানা কারেনিনার শেষ কথাগুলি মনে পড়ে।

দি ট্রাজেডি অফ নানকে মেসফিল্ডের শ্রেষ্ঠ নাটক বলা হয়। হতাশা ও হৃদয়হীনতার এক অসহ্য জীবনবেদ। রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে বহু শহরে। হার্ডির তেস-এর সঙ্গে তুলনীয় আবেগ ও সংঘাতের প্রচণ্ডতায়। ট্র্যাজেডীর প্রায় সব গুণগুলিই পাওয়া যাবে এরিস্টটলের পোয়েটিক্সের নির্দেশানুসারে। ভেড়া চুরির অপরাধে ফাঁসি হল নানের বাবার। এই অনাথ বালিকার প্রতি অত্যাচার হল অনেক বিশেষ করে আত্মীয়-পরিজনের হাতে।

ডিকের সহানুভূতি নানকে মুগ্ধ করেছিল প্রথমে। পরে ডিকও প্রমাণিত হল শঠ, লম্পট, স্বার্থপররূপে। ডিকের কবল থেকে অন্য মেয়েদের বাঁচাবার জন্য নান তাকে হত্যা করল, তারপর তার আত্মহত্যা। প্লট সাধারণ কিন্তু আবেদন গভীর এই নাটকের। সমসাময়িক কবি চার্লস মর্লি এই নাটক দেখে বলে উঠেছিলেন, "It is finer than Oedipus!" একমাত্র মিস স্টরম জেমসন ছাড়া প্রায় সকলেই নাটকটিকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলেছেন।

জীবনের শেষপর্বটি মেসফিল্ডের সুন্দর। প্রশান্ত বার্ধক্যে গৌরবান্বিত। কয়েক বছর আগে অক্সফোর্ডের কাছে বোরস হিলে একটি ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলেছেন তিনি, যেখানে নাটক অভিনয় ছাড়াও বৎসরান্তে কাব্যপাঠের একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সমালোচকরা তাঁকে বড় কবির আসনে বসান নি। রাজকবির চার-দেয়ালের নিষিদ্ধ ঘেড়ার বাইরে তাঁর প্রেরণা কাজ করতে পারে নি বলেই বোধহয় তিনি শুধু রাজকবিই। তবু মনে হয় আবার মেসফিল্ডীয় ধারা যেন ফিরে আসবে। সাদামাটা জীবন-প্রেমিক পাঠক যেন চাইছে পৃথিবীকে সহজ চোখে দেখতে, সহজ রঙের রসে ডুবিয়ে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। জাহাজ-নৌকো-নাবিক-মাঝিমাল্লার কোলাহলমুখর, উদ্দাম অ্যাডভেঞ্চারে তরঙ্গসঙ্কুল জীবনের রুক্ষ মাধুর্যের ছবিগুলি আবার যেন সাধারণ, জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত পাঠককে মাতাল করে তুলছে। মেসফিল্ডের জয় এখানেই। —জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর রজনীতে সমাগত (পিছনে দাঁড়িয়ে বামদিক থেকে) সর্বশ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নির্মল সরকার; (মধ্যের সারিতে বসে বামদিক থেকে) সর্বশ্রীবুদ্ধদেব বসু, চারু রায়, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুধীরচন্দ্র সরকার, বিমল মিত্র (সামনে বসে) শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের দুই পৌত্রী।

তারাশঙ্কর রজনী ॥

একটি অটোগ্রাফের খাতায় সই করতে গিয়ে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল বললেন : লিখলাম তারাশঙ্কর দিবস। অচিন্ত্যকুমার বললেন—দিবস কেন, রজনী হবে। দিনক্ষণের জ্ঞান ঠিক রাখো। প্রবোধকুমার বললেন, যদি বলি তারাশঙ্কর বর্ষ? যদি বলি, "তারাশঙ্কর যুগ?"

এই বৎসরটি তারাশঙ্কর বর্ষই বটে, শুধু তিনি জ্ঞানতীর্থের লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন বলে নয়। এই বছর ৮ই শ্রাবণ তাঁর সপ্ততিতম-পূর্তির বৎসর। তারাশঙ্করকে ঘিরে তাই সেদিন শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের বাসভবনে একটি 'তারাশঙ্কর রজনী'র আয়োজন হয়েছিল। বক্তৃতা নয়, গান নয়, শুধু ছিল কয়েকজন সাহিত্যিকের একটা ঘরোয়া মজলিস। সেই চারতলার প্রশস্ত কক্ষটিতে একে একে এসে হাজির হয়েছিলেন, সর্বশ্রী তুষারকান্তি ঘোষ, সুধীরচন্দ্র সরকার, চারু রায়, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিমল মিত্র, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নির্মল সরকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মুরারিবিলাস রায়চৌধুরী ও ভবানী মুখোপাধ্যায়। অনেকক্ষণ ধরে চলল আলোচনা, তারাশঙ্করকে কেন্দ্র করেই বেশী কথা, তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবন, তাঁর নতুন রচনা শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সবরকম গ্রন্থ পড়েন, সংগ্রহ করেন এবং মনে রাখেন। তিনি নতুন ও পুরাতন কয়েকখানি গ্রন্থ যা আজ আর পাওয়া যায় না তার কথা উল্লেখ করলেন। এই উপলক্ষ্যে যে ভুরিভোজের আয়োজন হয়েছিল, শ্রীবুদ্ধদেব বসু বললেন ইদানীংকালে এই জাতীয় খাওয়া-দাওয়া লোপ পেয়েছে। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের পুত্রবধূ শ্রীমতী পার্বতী সরকার ও শ্রীমতী অনিমা সরকার প্রতিটি অতিথির দিকে সযত্ন লক্ষ্য রেখেছিলেন। সুব্রত সরকার এবং সুপ্রিয় সরকার তাঁদের স্বাভাবিক সৌজন্যে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে সেদিনের আনন্দ-বাসরে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠের পুরস্কার প্রাপ্তির পর পেয়েছেন অজস্র চিঠি, অনেক মানুষের শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা। কিন্তু তারাশঙ্কর রজনীর এই স্মৃতিটুকু অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিতর্কিত মারাঠি গল্পগ্রন্থ ॥

গত বৎসর মারাঠি সাহিত্যে অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও 'বাসনক' গ্রন্থটি নিয়ে যত হৈ-চৈ হয়েছে, তেমন আর বোধ করি কোন গ্রন্থ নিয়ে হয়নি। গ্রন্থটি হলো এগারটি ছোট গল্পের সংকলন এবং লেখক অতি তরুণ শ্রী ভাও পাধ্যায়ে। বোম্বের শহরতলীর মানুষদের দৈনন্দিন আনন্দ-বেদনাকে কেন্দ্র করেই গল্পগুলি রচিত। এমনকি, লেখক অতি সুকৌশলে তাদের যৌনজীবন এবং তাদের মুখের অশ্লীল ভাষাও গল্পে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থটির শ্লীলতা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উঠেছে। পাঠক এবং সমালোচক—সকলের মধ্যেই এই নিয়ে একটা জোর বিতর্ক। এক-দল গ্রন্থটিকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্থান দিতে চান, কিন্তু অন্যদল একদম 'যাচ্ছেতাই' বলে গ্রন্থটিকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। এমনকি লেখক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে একদল পাঠক আদালতে অভিযোগ পর্যন্ত পেশ করেছেন। এমনকি প্রখ্যাত মারাঠি লেখক ও সম্পাদক শ্রী পি কে আত্রে গ্রন্থটিকে অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। মারাঠি সাহিত্য মহা-মণ্ডলও অবিলম্বে আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। যাই হোক, গ্রন্থটি নিয়ে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সুযোগে কিন্তু গ্রন্থটির বেশ কটি সংস্করণ শেষ হয়ে গেল।

ম্যারিয়ান মুর কাব্যপুরস্কারে ভূষিত ॥

ম্যারিয়ান মুর আমেরিকার বিশিষ্ট ও সম্মানিত কবিদের অন্যতম। সম্প্রতি আমেরিকার পোয়েট্রি সোসাইটি ৭৯ বৎসর বয়স্কা এই প্রবীণ কবিকে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ও পারদর্শিতার জন্য স্বর্ণপদকে ভূষিত করেছেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস ১৯২০' এর দশকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়। তার পর থেকেই সাহিত্য সংক্রান্ত নানা পুরস্কার পেয়ে আসছেন মুর। এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অধিকাংশ সাহিত্য পুরস্কারই তিনি পেয়েছেন।

মুরের কবিতার সহজ সরস ভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ যে কোন পাঠকেরই নজরে পড়বে। তাঁর অনেক কবিতায়ই উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনের কথা আন্তরিকতার সংগে চিত্রিত। কিন্তু মানুষই তাঁর কবিতায় মূলতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়ের ও ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলিয়ট ম্যারিয়ান মুর সম্পর্কে বলেছিলেন, "তাঁর কবিতায় মৌল চেতনা, দীপ্ত বুদ্ধিমত্তার এবং গভীর আবেগের সুপ্রয়োগে ইংরেজী ভাষায় মাধুর্য লালিত হয়েছে।"

মুরের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সুশৃংখল মাত্রাগত গঠন। তাঁর ভাষায় সব-সময়েই একটা আকস্মিকতার ছোঁয়াচ বা অন্যধরনের গঠনরীতি থাকে।

১৮৫৭-র ১৫ নভেম্বর মিজৌরী রাজ্যের সেন্ট লুই শহরে মুরের জন্ম। ছাত্রজীবনে তিনি বই ভালবাসতেন কিন্তু কবিতার প্রতি কোন আগ্রহ তাঁর সেসময় ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে লেখাই ছিল তাঁর পেশা। 'ব্রাইন মর' কলেজের জীববিদ্যা গবেষণাগারে শিক্ষানবিশীকালেই উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবনের প্রতি অদ্ভুত মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা থেকে তাঁর কবিতা লেখার নেশা জাগে। ১৯২৫ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অব-জারভেশন' সে বছর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ নির্বাচিত হওয়ায় 'ডায়াল' পুরস্কার পেলো। সে বছরই 'ডায়াল' পত্রিকার সম্পাদনা কাজে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ইদানীংকালে মুরের লেখা বইগুলির অন্যতম হলো—'লা ফঁতেনের কাহিনী (অনুবাদ)', 'প্রেডি-লেকশনস', 'লাইক এ বুলওয়ার্ক'।' মুর কবিতা লেখেন খুব অল্প। বছরে পাঁচটি কি ছয়টি। 'মনে হয় সব কবিতাই বুঝি শেষ কবিতা। কিন্তু শেষের পরেও কিছু থাকে যা আমাকে আবার লিখতে উদ্বুদ্ধ করে'—বলেন ম্যারিয়ান মুর।

রেনলড্স প্রাইসের সাম্প্রতিক উপন্যাস ॥

রেনলড্স প্রাইস হালের আমেরিকান উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আমেরিকার বর্তমান দশকে উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে যাঁরা বিশেষ জনপ্রিয় রেনলড্স প্রাইস তাঁদের অন্যতম। কিশোর বয়সের যৌবন উন্মুখ প্রেমবিকাশের কাহিনী তাঁর রচনায় আশ্চর্য সংবেদনশীলতার সংগে লিখিত। হালে তাঁর যে বইটি জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান ছুঁয়েছে সেটি হলো 'এ জেনারাস ম্যান।' কিশোর ও বাল্যবয়সের বিস্মৃত অধ্যায়ে জীবনের যে অনুভূতিপ্রবণ মানসিকতার বিকাশলাভ অত্যন্ত সংগোপন হয়ে বেড়ে চলে যৌবনউন্মুখ সেই অন্তর্নিহিত সোপানগুলিতে প্রাইস তাঁর পাঠকদের এগিয়ে নিয়ে চলেন। বর্তমান উপন্যাসটিতে জীবনের এই বিচিত্র সুন্দর রোমান্স পর্বটি সকলকেই আনন্দিত করবে। পনেরো বছর বয়সের এক কিশোর, মিলো মুর্শিয়ান, এই উপন্যাসটির নায়ক। বয়সে প্রবীণ এবং বয়স্কদের নিস্পৃহতা ও উদাসীন জড়ত্ব তাঁকে দুঃখ দেয়। নর্থ ক্যারোলিনার নিসর্গপরিবেশ, সেখানকার মানুষ ছাড়াও এক আন্তর্জাতিক পৃথিবীর জন্য এই বালক-কিশোরের মমত্ববোধ উপন্যাসটির এক উজ্জ্বল সম্পদ। কাহিনী বিস্তারের গঠনকৌশল লেখকের আত্যন্তিক অনুভূতির ফলে সহজ ইন্দ্রিয়গোচর। 'এদিক থেকে তিনি উইলিয়ম ফকনারের সার্থক উত্তরশিষ্য,'—বলেন জনৈক ইংরেজ সমালোচক।

রুমানিয়ার জার্মানভাষী লেখকগোষ্ঠী ॥

ইতিপূর্বে রুমানিয়ার চলতি দশকের লেখক ও জার্মানভাষী লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা আমরা এই বিভাগে করেছি। হালের জার্মানভাষী এরকম আরো কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিশ্রুতিবান লেখকের কথা বর্তমানে আমাদের প্রতিপাদ্য।

পল স্খাস্টার এ'দের মধ্যে অন্যতম। রুমানিয়া এবং জার্মানীতে ইনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। ১৯৩০ সালে স্খাস্টারের জন্ম। 'দি ডেভিল অ্যান্ড দি নান' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। মনস্তত্ত্বমূলক একটি উপন্যাসেরও তিনি রচয়িতা। নাম 'ফাইভ্ লিটারস্ অব জুইকা।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই বাস্তবসম্মত উপন্যাসটির অন্তঃপ্রেরণা।

আরেকজন জনপ্রিয় লেখক হচ্ছেন (যদিও ইনি একটু পূর্ববর্তী দশকের প্রবীণ লেখক) অস্কার ওয়ল্টার কিসেক। ১৯৬৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর উপন্যাস 'ব্লাশ ফায়ার' একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৭৮৪ সালের ট্রানসিলভ্যানিয়ার কৃষক বিদ্রোহ এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। স্বদেশের বাইরেও পৃথিবীর প্রায় প্রতি দেশেই তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আছে।

অ্যালেক্সিউ কনার্থ, আর্নল্ড হসার, ক্রিশ্চিয়ান মরার এবং ক্লনজ্ স্টরথ্ প্রত্যেকেই ক্ষমতাবান লেখক। কিন্তু প্রথানুবর্তনকে ভাঙবার বিদ্রোহ যেন তাঁদের মধ্যে স্তিমিত।

অভিনব গোয়েন্দা কাহিনী

শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন 'অমৃত' পাঠকের একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনী রহস্য-সন্ধানী ফাদার ঘনশ্যাম' এবং 'শার্লক হোমস ফিরে এলেন' দীর্ঘকাল অমৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি বহু মৌলিক রহস্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীরও লেখক। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'মোমের হাত' গ্রন্থ। এটি সম্পূর্ণ মৌলিক গোয়েন্দা কাহিনী।

কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন গবেষণা-কেন্দ্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে একটি মোমের হাত নিয়ে। গবেষণা-কেন্দ্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর বিক্রম বক্সীর মানসিক বিভ্রান্তি ঘটাবার এক গোপন ষড়যন্ত্র এটি। সেই সঙ্গে আছে গবেষণা-কেন্দ্রের সামগ্রিক পরিকল্পনা বিনষ্ট করা। কিন্তু এর পিছনে আছে কারা? কাদের দুঃসাহসিক গোপন প্রচেষ্টা ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর ও আর্মি ইনটেলিজেন্সের অনুসন্ধানকে ব্যর্থ করে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের পথে এগিয়ে চলেছিল। অবশেষে বাঙলার শৌখিন গোয়েন্দা বিখ্যাত ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে জরুরী তলব দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন গবেষণা-কেন্দ্রের প্রধান ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশ। সুরু হল ইন্দ্রনাথের অনুসন্ধানপর্ব। শাস্ত্রোয়ানীর প্রেতচক্রে ইন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং মিথ্যা প্রেমিকা আইভি মল্লিকের সঙ্গে প্রেতচক্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎ, যাদুর দোকানে কাশ্মিরী ললনা অপূর্ব সুন্দরী নুর-নুরজাহানের সঙ্গে পরিচয় ও অভিসার যাত্রা। এর মধ্যে গুপ্তষড়যন্ত্রের জাল-বিস্তার দেখতে পেলেন ইন্দ্রনাথ। বিষ-আংটি প্রয়োগে ইন্দ্রনাথকে হত্যার যে চেষ্টা চীনা-গুপ্তচর বাসিন করেছিল নুরজাহানের প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণ হারাতে হোল নুরজাহান এবং তার পিতা সুলতানকে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে। ইন্দ্রনাথ কৌশল রক্ষা পেয়ে গেল। সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল যখন শিথিল হোয়ে এল তখন পালাল শস্তোয়ানীর দল। ইন্দ্রনাথের প্রেতচক্রে চীনা-গোয়েন্দা নিজেরই বিষ-ছুঁচে প্রাণ হারাল। সকলের সামনে মোমের হাত তৈরি করে দেখাল ইন্দ্রনাথ প্রফেসর বক্সীর পরলোকগত কন্যা ময়না বক্সীর মোমের হাত তৈরির পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

এই আশ্চর্য গোয়েন্দা কাহিনী শ্রীবর্ধন নিপুণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

যে ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত সেগুলির মধ্যে না থাকে শিক্ষণীয় কিছু, না থাকে আধুনিক চিন্তা-ধারার কোন পরিচয়। বর্তমান গ্রন্থখানি সেদিক থেকে যেমন সুরুচিপূর্ণ তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানভাবনার অনেকগুলি তথ্য তুলে ধরেছে। কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দ এবং রোমাঞ্চকর। শ্রীবর্ধনের 'মোমের হাত' বাঙলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে একটি উল্লেখ্য সংযোজন।

মোমের হাত , (গোয়েন্দা-কাহিনী)— অদ্রীশ বর্ধন। রোমাঞ্চ। ১২ হরীতকী বাগান লেন। কলকাতা-৬। দাম চার-টাকা।

বিভিন্ন তথ্যের কয়েকটি প্রবন্ধ

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু একজন তরুণ প্রবন্ধকার। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। কতকগুলি পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলনে শ্রীবসুর 'স্মৃতিময় অতীত' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আছে: এক হারানো সভ্যতার কথা, ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত, মোগল আমলে সপ্তগ্রাম, ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের গোড়ার কথা, জব চার্নকের আমলে বাংলা, ফোর্ট উইলিয়াম, ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, দুই কোম্পানীর দ্বন্দ্ব ও উইলিয়াম নরিস, একটি বিস্মৃত সমাজের কথা, শত বছর পূর্বেকার বাঙালীর জীবন ও ভারতীয় রেলপথের গোড়ার কথা—এই এগারটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনা। বাকি প্রবন্ধগুলিতে ইংরেজ আগমন থেকে কোম্পানী যুগ পর্যন্ত এদেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের একটি চিত্রকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ইতিহাসের গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন।

স্মৃতিময় অতীত (প্রবন্ধ)—সঞ্জীবকুমার বসু। সংস্কৃতি প্রকাশন। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা-১। দাম চার টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

নবজাতক পত্রিকার রবীন্দ্র-সংখ্যা নানা-কারণে আকর্ষণীয়। 'বিদ্যালয়ের সূচনা' শ্রীনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। নূতন উৎসব রীতি নিবন্ধে প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায়, নেপাল-চন্দ্র রায় প্রভৃতির সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। সুজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'ঋতু উৎসব'। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে বীরবল, অমল হোম ও ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি ছোট আলোচনা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনকড়ি ঘোষ। 'শান্তিনিকেতন একটি ভাব' রচনাটি মূল্যবান। তাছাড়া কাজী আবদুল ওদুদ নারায়ণ চৌধুরী এবং আরো কয়েকজনের আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবিতা লিখেছেন পূর্ববঙ্গের শামসুর রহমান ও আসাদ চৌধুরী এবং এখানকার গোপাল ভৌমিক। অনেকগুলি ছবি এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

নবজাতক (রবীন্দ্র-সংখ্যা)—সম্পাদক: মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১ পাম এভিনু, কলকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত। দাম দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

'দীপালিকা পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন দিলীপকুমার সাহা, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার মজুমদার, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, সোভনলাল, দীপককুমার সাহা, অর্চনা চক্রবর্তী, অনাদি ঘোষাল প্রভৃতি।

দীপালিকা পত্রিকা (প্রথম বর্ষ): প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক: অর্চনা চক্রবর্তী। ৩৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৫। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

●

'বনমর্মর' কবিতা সংকলনে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র মজুমদার, জ্যোৎস্নারাণী সাধু, কান্তিময় ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিবপ্রসাদ ঘটক, কার্তিক মোদক, হরিদাস মিত্র, মনীষা সাধু এবং আরো অনেকে।

বনমর্মর (২য় বর্ষ: ১৩৭৪)—সম্পাদক: গোপালচন্দ্র সাধু। ২৪-পরগণা। বনগ্রাম।

রণজিৎকুমার সেন

পৃথিবীর মানবজাতির ভিতরে এক সার্বভৌম ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠাই ছিল কেশবচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। সকল ধর্মের মূলে সত্য যে এক, সেই সত্য-ধর্মকেই তিনি প্রকৃত ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন; এই ছিল তাঁর 'নববিধান'। মানুষে মানুষে মিলন, ভ্রাতৃভাব, সকল প্রকার ধর্মভাবের আদান-প্রদান এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা সঞ্চার এবং সামঞ্জস্য বিধান করাই ছিল তাঁর এই 'নববিধান' ধর্মের মূলভিত্তি। তিনি বলতেনঃ 'সকল মানব জাতিই এক ধর্মে মিলিত হইবে। ঈশ্বর যদি এক হন, তবে তাঁহার পূজার মন্দিরও একটি।'

জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করে এই-ভাবেই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনৈক্য উপস্থিত হলে নিজের আদর্শের জন্য তিনি মহর্ষিদেবের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হন। দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-মন্দিরে তখন কেবল উপবীতধারী ব্রাহ্মণেরাই বসবার অধিকার পেতো, অব্রাহ্মণের সেখানে স্থান ছিল না। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' এই বর্ণ-বৈষম্যকে ভেঙে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসবার অধিকার দিল। গান্ধীজীর উদ্যোগে আধুনিক ভারতে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ এবং পূজার অধিকার লাভ সম্পর্কিত যে আন্দোলন দেখা দেয়, কেশবচন্দ্রের জীবনেই তার প্রথম সূত্রপাত। দেশবাসী হয়তো সে ইতিহাস আজ স্মরণে রাখেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষদের মধ্যে কেশবচন্দ্রের আসন ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। কি ধর্ম, কি শিক্ষা, কি সমাজ, কি অস্পৃশ্যতা-বিরোধী প্রচেষ্টা, কি ধর্ম-সমন্বয়তা, মাদকতা নিবারণ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, এমন কি সর্বসাধারণের শিক্ষা—সবদিকেই তাঁর প্রগতিশীল মনের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। যে কটি সার্থক লক্ষণের দ্বারা তিনি ভূষিত ছিলেন, তার মধ্যে বিশ্বাস ও প্রার্থনা, বিবেক বা ঈশ্বরাদেশ শ্রবণ, বৈরাগ্য, আমিত্বহীনতা, পাপবোধ, স্বাধীনতা, শিষ্যত্ব, শিশুত্বঃ শিশুর ন্যায় সরল ও পবিত্র এবং উদারতাই প্রধান।

সে যুগে এমন এক সময় এসেছিল—যখন দেশবাসী নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করতেই আরম্ভ করেছিল। কেশবচন্দ্র ভারতের সেই অতীত মাহাত্ম্যকেই দেশবাসীর মনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হলেন। অতীতকে ভিত্তি করেই সমাজ ও ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের এক অপূর্ব সম্মেলন ঘটে কেশবচন্দ্রের জীবনে। শিশুকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি কেবল নিজেই জ্ঞানানুশীলন করে আনন্দ পেতেন না। অন্যকেও তাঁর অর্জিত বিদ্যার অংশ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি-শাস্ত্র—সর্ব বিষয়েই তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি এবং অসাধারণ অনুরাগ ও জ্ঞান ছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি নিজের বাড়িতে বালক এবং মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর উদ্যোগে নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ব্রহ্ম বিদ্যালয়, সংগত সভা, আলবার্ট কলেজ, মহিলা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন, মাদক-দ্রব্য নিবারণী সভা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ধর্ম ও নীতিশিক্ষার জন্য তিনি কয়েকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। একদিকে ভাব-গাম্ভীর্য, অন্যদিকে সহজ সরলতা—পাশা-পাশি এ দুটি বিরুদ্ধ গুণের সমন্বয়ে তাঁর বাংলাভাষা তথা রচনাসমূহ অনবদ্য হয়ে উঠতো। তাঁর বক্তৃতার মধ্যেও এই ভাব-গাম্ভীর্য ও সরলতারই প্রভাব দেখা যেতো। নিজের বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'আমি যে বক্তৃতা দেই, তাহা আমি দেই না। আমার নিজের কোনও ক্ষমতা নাই। ভগবৎশক্তি আমার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমার রসনা দ্বারা উহা প্রকাশ করে। তখন এই বক্তৃতা আবেগপূর্ণ অগ্নি-ময় ভাষাতে প্রকাশিত হয়।'

ঈশ্বরের প্রতি এই অচলা বিশ্বাসেই সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দুস্তর বাধাকে তিনি হাসিমুখে জয় করতে পেরে-ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বাধীন-চেতা ও নির্ভীক চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একমাত্র পরমব্রহ্ম ভিন্ন অপর কারো অধীনতা তিনি স্বীকার করেননি। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল তাঁর নির্ভীক চিত্তের সহজাত বৃত্তি। সত্য, ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল কেশব-চন্দ্রের সকল চিন্তাসূত্রের মূল আধার। তিনি বলতেন : 'জীবনসংগ্রামে মানবমাত্রেই এক-একজন সৈনিক। তাহার রক্ষাকবচ হইল—সত্য ও ধর্ম, আর বর্ম হইল—দৃঢ় বিশ্বাস।'

১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর কলকাতায় কলুটোলার প্রসিদ্ধ সেনবংশে কেশবচন্দ্রের জন্ম। বাংলায় তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সূর্যোদয়ের সূচনা। কেশব-চন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন এবং পিতা প্যারীমোহন সেন উভয়েই ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক; মাতা সারদা দেবীর মধ্যেও সেই ধার্মিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন তিনি। কেশব-চন্দ্রের আকৃতি ছিল দীর্ঘ, গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। তাঁর শান্ত মূর্তি ও সুগঠিত দেহ দেখলে তাঁকে দিব্যকান্তি দেবশিশুর মতই মনে হতো। বিদ্যালয়ে সতীর্থগণ তাঁকে তাদের নেতা বলে মান্য করতো। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বদা জাগ্রত। এই পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিল। একদিকে তিনি যেমন লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি তেজস্বী, কৌশলী ও দৃঢ়ব্রত। কিন্তু সেই দৃঢ়তার অন্তরালে আত্মাভিমান ছিল না, বরং এটা ছিল তাঁর নৈতিক চরিত্রের আবরণস্বরূপ।

১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে বালি-গ্রামের চন্দ্রনাথ মজুমদারের ন' বছরের মেয়ে জগন্মোহিনীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহে তাঁর মত ছিল না, কিন্তু অভিভাবকদের আদেশ তাঁকে পালন করতে হয়। সংসারজীবনে স্ত্রীর সান্নিধ্যে তিনি পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলেন না। বিবাহের এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই তাঁর মনে প্রবল বৈরাগ্য ভাব উদিত হলো। আমোদ-প্রমোদ ও আমিষ আহার ত্যাগ করে তিনি কঠোর সংযম অবলম্বন করলেন। একটা অননুভূত গাম্ভীর্য ও বিষণ্ণতায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নির্জনতা বড় প্রিয় হয়ে উঠলো তাঁর। একান্ত নিভৃতে বসে একনিষ্ঠভাবে তিনি ধর্ম চিন্তা, শাস্ত্রচর্চা ও প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'প্রার্থনা করিবার জন্য আমি যখন প্রথম আদেশ পাইলাম, তখন আমি এই বাণী শুনিলাম—প্রার্থনা করো, প্রার্থনা ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইল। আমার মনোবল বৃদ্ধি পাইল।'

এ সময়ে কেশবচন্দ্র সাহিত্য, ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য কয়েকজন যুবককে নিয়ে নিজের গৃহে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন

করেন। তিনি নিজে এর রেক্টর হন। দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য ছাড়া 'ইয়ংস নাইট থট' এবং শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি হ্যামলেট অভিনয়ও করতেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় 'গুড উইল ফ্র্যাটারনিটি' সমিতি গড়ে ওঠে। সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করাই ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। দেশে তখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এ সময়ে এমন একটি সমিতির কার্যকারিতার প্রতি দেশের বিদগ্ধ সমাজ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। কেশবচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে বলেছেনঃ 'আমি কোনও একটি মুহূর্তের জন্যও মনে সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করি নাই। ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং প্রত্যেক মানুষই আমাদের ভাই—এই মতই আমি বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছে প্রচার করিয়াছি।'

এর কিছুকাল পরেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। হিমালয়ের তুহিন শীতল নির্জনতায় ব্রহ্ম-সাধনের পর যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন, তখন একদল ধর্মনিষ্ঠ যুবক তাঁর সাহচর্যে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এসময়ে মহর্ষিদেবের জীবন ও কার্য এবং কেশবচন্দ্রের জীবন ও কার্য অচ্ছেদ্য ছিল। মহর্ষিদেব তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে ১৮৬২ সালে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় কেশব-চন্দ্র যে 'ডিভিনিটি স্কুল' বা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তার ফলে খৃষ্টধর্মের প্রতি হিন্দু যুবকদের আকর্ষণ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে এবং বহু যুবক ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যথায় ইংরেজের প্রলোভন ও খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারে দেশ ক্রমে খৃষ্টানধর্মী হয়ে পড়তো। পূর্বে এই খৃষ্টধর্ম থেকে দেশকে রক্ষা করেন রাজা রামমোহন রায়; পরবর্তীকালে তাঁর অপূর্ণ কাজকে সার্থক করে তোলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ ক্রমে এক সার্বভৌমিক মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো। কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তে এদেশে এক নতুন যুবক সম্প্রদায় গড়ে উঠলো। সৃষ্টি হলো 'সংগত সভা'র। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিলঃ প্রত্যেকে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতায় উজ্জ্বল হয়ে দেশ ও জাতির সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক হবে এবং এই-ভাবে ধীরে ধীরে জগতে এক মহাজাতি গড়ে উঠবে।

এসময়ে অবকাশ মতো তিনি জনশিক্ষা-মূলক কিছু কিছু ইংরেজি পুস্তিকা রচনা করেন। 'ইয়ং বেঙ্গল, দিস ইজ ফর ইউ', 'দি প্রেয়ারফুল' প্রভৃতি পুস্তিকা এই সিরিজেরই অন্তর্গত। এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা মোট তেরোখানি। কয়েকখানি পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বও এসময়ে কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করতে হয়। ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান মিরার' ও ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা কলেজ'-এর কর্তৃত্ব-ভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি স্বতন্ত্রভাবে 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখন থেকে তাঁর ধর্মমতসমূহ এই ধর্মতত্ত্বেই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ'। এই সমাজই 'নববিধান' ধর্মসাধনের ভিত্তিভূমি। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ তখন 'আদি সমাজ' নামে অভিহিত হলো। দেবেন্দ্রনাথ আদি সমাজের নেতা হলেও 'নববিধান'-এর তিনি সভ্য হন। সমাজগতভাবে মত বিরোধ থাকলেও কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতিই এর একমাত্র কারণ।

সারা ভারতব্যাপী 'নববিধান'-এর প্রচারকার্য পরিচালনার সময় বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ শ্লোক সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করে কেশবচন্দ্র 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'ট্রু ফেইথ' বা 'প্রকৃত বিশ্বাস' তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, গৌরগোবিন্দ রায় প্রমুখ মনীষীরা বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা করে তার মূল তত্ত্বগুলিকে বাংলাভাষায় রূপ দেন। সাধু অঘোরনাথ 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', 'শাক্যমুনি' প্রভৃতি ভক্তজীবনী রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র সেন ইসলাম ধর্ম আলোচনা করে কোরান শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। সঙ্গীতা-চার্য চিরঞ্জীব শর্মা ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্তন এবং শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনা করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খৃষ্টধর্মগ্রন্থ অনু-শীলন করে ইংরেজি ও বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইভাবে কেশবচন্দ্রের ভক্ত-সাধকবৃন্দের অমূল্য দানে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

এসময়ে কেশবচন্দ্র 'মাদকতা নিবারণী সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির সভ্যরা দলবদ্ধ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে সুরা পানের কুফল প্রচার করতেন। ফলে গভর্ণমেন্ট তাঁর আব-গারী ও অন্যান্য কোনো কোনো বিভাগের আইনের সংস্কার করতে বাধ্য হন। বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় এবং 'ভারত সংস্কার সভা' নামে অপর একটি সমিতিও এই সময়ে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভারত সংস্থায়' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ 'সকলের আত্মত্যাগ অবলম্বন ব্যতীত ভারতবর্ষের পূর্ণ সংস্কার সম্ভবপর নহে। সত্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে এবং বাক্যে, কার্যে ও চিন্তায় সত্য প্রচার করিয়া আমাদিগকে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। একমাত্র সদুদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত ধ্যানবান থাকিয়া আমা-দিগকে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে। কোনও অবস্থাতেই আমাদের বিবেকের সঙ্গে আপোষ রক্ষা করিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের প্রচুর অধঃপতন হইয়াছে। ভারত মাতার দুর্গতি ও ক্লেশের আজ সীমাহীন অবস্থা। ভারতের পরিপূর্ণ সংস্কারের জন্য পরাক্রমশালী বিপ্লবের প্রয়োজন। পূর্ণ বিপ্লবের ভিতর দিয়াই উপযুক্ত সময়ে ভারত নবজীবন লাভ করিবে।'

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র ইংলন্ড যাত্রা করেন। তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ। কেশবচন্দ্র মহারাণীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে ভারতের সর্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-কেন্দ্রে ইংরেজদের সম্বোধন করে এ সম্পর্কে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। এখানে লর্ড লরেন্স, রেভারেন্ড স্পিয়ার্স, ম্যাক্সমুলার, মার্টিনো, ডীন স্ট্যানলি, গ্ল্যাডস্টোন প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে—যেমন গড়ে ওঠে অক্সফোর্ডে জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে। অতঃপর ব্রিস্টল নগরে গিয়ে তিনি মিস কার্পেন্টারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-স্মৃতির সঙ্গে

জড়িত এই ব্রিস্টল নগরী। এখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। যেখানে বসে তিনি উপাসনা করতেন, কেশবচন্দ্রও সেই স্থানটিতে উপাসনায় ব'সে রামমোহনের অমর আত্মার শান্তি কামনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর এই বিলেত ভ্রমণের ফলে লন্ডনে 'ব্রাহ্মসমাজ' এবং ব্রিস্টলে 'ন্যাশনাল সভা' স্থাপিত হয়।

দেশে ফিরে আসার পর সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা দামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দরিদ্র দেশবাসী এর দ্বারা সেদিন যে কতখানি উপকৃত হয়েছিল, তা কল্পনা করা যায় না। পত্রিকার নামের নীচে নিয়মিত একটি কবিতার পংক্তি ছাপা হতো—

'সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন,
সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।'

অনেকেই এর দ্বারা তখন এই সমাচারের প্রতি আকৃষ্ট হতো। কেশবচন্দ্র নিজেও এতে সহজ সরল ভাষায় নীতিমূলক প্রবন্ধ লিখতেন। ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে 'ইন্ডিয়ান মিরার' দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এরকম একখানি সংবাদপত্র দেশে তখন আর একখানিও ছিল না। শিক্ষাবিস্তারকল্পে শ্রমজীবীদের জন্য বাংলা বিদ্যালয়ও এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য 'বিষবেরী' নামে বিনামূল্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে দেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্য কেশবচন্দ্র গভর্ণমেন্টের সঙ্গে বহু আলোচনা ও পত্রালাপ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সৃষ্টির জন্য 'আলবার্ট হল' প্রতিষ্ঠা করেন। এতে নানা বিষয়ক গ্রন্থ সম্বলিত একটি বিপুলায়তন পাঠাগার স্থাপন এবং মাঝে মাঝেই সাধারণ বিষয়ে সভা ও বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া 'আলবার্ট কলেজ' নামে একটি উচ্চ শিক্ষায়তনও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এসময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মিলন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরমহংসদেবের মহতী ভগবদ্ভক্তি এবং সরল ও মধুর বালভাব কেশবচন্দ্রের যোগ, ভক্তি, নীতি, বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞানকে এক নতুন রূপ দান করলো। কেশবচন্দ্রও তেমনি পরমহংসদেবের হৃদয়ে নতুন এক আলোকসম্পাত করলেন। পৃথিবীতে, যত ধর্মমত প্রচলিত আছে, সকল ধর্মের সারসত্যই এক: সুতরাং ধর্ম সমন্বয়সাধনের মহামিলনে উভয়ের অন্তরে এক অপূর্ব যোগ স্থাপিত হলো।

মাঝে মাঝে নগ্নপদে গৈরিক বসন পরিধান করে কেশবচন্দ্র কলকাতার পথে পথে হরিনাম সংকীর্তন করে বেড়াতেন এবং দুঃস্থ দরিদ্র ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে একতারা সহযোগে গান করতেন। দুঃস্থদের ছিলেন তিনি দরদী বন্ধু: তাঁর ভিতরের আত্মভোলা মানুষটি ছিলেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। লোকে তাই তাঁকে অতি সহজেই গ্রহণ করেছিল। 'নববিধান' সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলতেন: 'ধর্ম সমন্বয়ের ভার লইয়া ইহার জন্ম। বিধাতা নিত্য নূতনভাবে যাহা দান করেন, তাহাই নববিধান। নববিধান ধর্মের সাধক নিত্য নূতন হইতে থাকেন। শিশু নিত্য নূতন শিক্ষালাভ করে, প্রতিদিন বর্ধিত হয়। সাধকের জীবনও সেইরূপ সাধনা দ্বারা নিত্য নূতন জীবনে উন্নত হয়।'—দেবালয়ে যেমন প্রতিদিন পঞ্চপ্রদীপে আরতি হয়, কেশবচন্দ্রও তেমনি ব্রাহ্মমন্দিরে পূজাক্ষেত্রে বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য—এই পঞ্চ উপকরণ দ্বারা পরম ব্রহ্মের আরতির ব্যবস্থা করতেন। ঈশ্বরকে আরতি করবার এই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইউরোপের নিকট এশিয়ার সংবাদ'। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও কলকাতা টাউন হলে তিনি এই বক্তৃতা দেন। তাঁর 'নব-সংহিতা' রচনাও এই সময়েই শুরু হয়। নিয়মিত 'নব-সংহিতা' লিখে তবে তিনি প্রার্থনায় বসতেন। কিন্তু স্বাস্থ্যোদ্ধার আর হলো না ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজা রামমোহন থেকে এদেশের যে রেনেসাঁ আন্দোলন সুরু হয়, বহুলাংশে তার পুষ্টি সাধিত হয় কেশবচন্দ্রের দ্বারা। তাঁর একক সাধনায় এসে ধরা দেয়নি—এমন কোনো বিষয় ছিল না, আর এমন কোনো দিক ছিল না—যেদিক কেশবচন্দ্রের দৃষ্টির বাইরে ছিল। এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, সাধন, পূজন, সাহিত্য, সংবাদ-পত্র পরিচালনা, সমাজ-কর্ম, সংস্কারবিধান ও সংগঠনশীলতা—এমন দিক নেই যেখানে নিজেকে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে দান না করে গেছেন। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিটি বিষয় জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, প্রভাবিত করেছে দেশ ও জাতিকে। তাঁর 'নববিধানে' ছিল না—এমন বিষয় নেই। সেযুগে যা কিছু প্রগতিধর্মী, তারই পরিপোষক ছিলেন কেশবচন্দ্র। তাঁর মধ্যে নবজন্ম লাভ করে বাংলাদেশ সেদিন নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে জেগে উঠেছিল, আলো দেখিয়েছিল সারা ভারতবর্ষকে।।
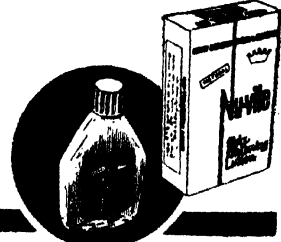
কবি কার্ল মার্কস

দিলীপ মালাকার

কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' থেকে কাব্য রস বেরুবে কিনা তা জানি না কিন্তু 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার এককালে জগৎ জুড়ে বিপ্লব এনেছিলেন। মার্কসের চিন্তাধারা এবং প্রকাশিত বইপত্র সবই ধন-বিজ্ঞান—রাজনীতির সারগর্ভ আলোচনা। পণ্ডিত, রাজনৈতিক নেতা ও ধনবিজ্ঞানীরা কার্ল মার্কসের অর্থনীতি নিয়ে চুল-চেরা তর্ক-বিতর্ক করে আনন্দ পান। কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' বইটি এবছরে শতবর্ষ পূর্ণ করল। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের পণ্ডিত কার্ল মার্কস যৌবনে ছিলেন কবি। ছাত্র জীবনে তিনি লিখতেন অসংখ্য কবিতা। এবং প্রেমের কবিতা। তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো প্রকাশের বহু আগে প্রকাশিত হয় প্রেমের কবিতা ১৮৩৬ সালে। একই বছরে তাঁর দুটো কবিতার বই প্রকাশিত হয় বার্লিনে।

কার্ল মার্কসের কাব্যালোচনা এবং কাব্য রচনার হাতেখড়ি হয় তাঁর ভাবি শ্বশুরের বাড়ীতে। ভাবি শ্বশুর লুডভিগ ফোন ভেটফালেন তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন। তাঁরই বৈঠকখানায় চলত কবিতা পাঠ। লুডভিগ ফোন ভেটফালেন ছিলেন মার্কসের পিতার বন্ধু। এদের দুই বাড়ী ছিল একই পাড়ায়। ফোন ভেটফালনের দুই মেয়ে সোফি ও জেনি। কার্ল মার্কসের পিতা ছিলেন আইনবিদ। ফোন ভেটফালেন ছিলেন রাজদরবারে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। জেনি এবং কার্ল দুজনে একই বিদ্যালয়ে পড়তেন। জেনির মাধ্যমে পরিচয় হয় ফোন ভেটফালেনের কার্ল মার্কসের। ফোন ভেটফালেনের বৈঠকখানায় বসে কার্ল মার্কস তাঁকে পড়ে শোনাতেন হোমার, শেক্সপীয়র, লেসিং, গোটে এবং তৎকালীন জার্মান কবিতা। কবিতা পড়া থেকেই কবিতা লেখার উৎসাহ জাগে কার্ল মার্কসের। এবং তা স্কুলে থাকা কালেই। তখন তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। তবে আসল কবিজীবন সুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন কালে। বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই ১৮৩৫-১৮৩৬ সালে অসংখ্য কবিতা লেখা সুরু করেন। সেগুলো পরে বই হয়ে প্রকাশিত হয় বার্লিনে।

কার্ল মার্কসকে কবিতা লেখার প্রেরণা জোগায় দুটো জিনিস। এক হল বন-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর হল প্রেয়সী জেনি। ছোট্ট শহর বন। রাইন নদী বয়ে গেছে ধার দিয়ে। ছোট ছোট টিলায় ও বনে ঘেরা বন। শহরটাই যেন বাগানবাড়ী। এখনও বন ছোট্ট শহর। রাজধানী হলেও তার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়নি। সেকালে বন-এর লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র সাতশ। রোমান্টিক শহর বন জোগায় তরুণ কার্ল মার্কসকে কাব্যরস।

কার্ল মার্কসের তখন বয়সই বা কত? মাত্র আঠার। বন-এর সৌন্দর্য আর জেনির প্রীতি আকর্ষণ এই মিলে মার্কসের মন কবিতায় আচ্ছন্ন। প্রেয়সী জেনি তখন বার্লিনে। বন থেকে অনেক দূরে। জেনির উদ্দেশ্যে তিনি মনের কথা কবিতায় রূপ দিতে সুরু করেন। ঠিক সেই সময়ে গড়ে ওঠে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিদের ক্লাব। তরুণ কবি কার্ল মার্কসও তাতে যোগ দিলেন। আলাপ হল দুই ভাবি কবির সংগে। লিরিক কবি এমানুয়েল জিবেল আর কার্ল গ্রুন তাঁরই সমবয়সী। কার্ল গ্রুন পরবর্তীকালে কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। জার্মান কবি হাইনের কবিতা নিয়ে তখন জার্মানীময় হৈ-চৈ। জার্মান সরকার হাইনের কাব্য পাঠ নিষিদ্ধ করলে মার্কসের দৃষ্টি যায় সেদিকে। মার্কসের ওপর হাইনের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

কার্ল মার্কস কবিতা লিখে কিছু কবিতা পাঠান তার পিতার কাছে। মার্কসের পিতা কয়েকটি কবিতা পড়ে ছেলেকে লিখেছিলেন ১৮ই নভেম্বর ১৮৩৫ সালে এক চিঠি। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'তোমার কবিতা কটা পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কবিতা পড়ে এক বর্ণও বুঝতে পারিনি। সবই কী তোমার স্বপ্ন না আদর্শবাদ। কবিতার অর্থ একটু পরিষ্কার করে লিখো যাতে আমি বুঝতে পারি।

মার্কসের কবিতার বিষয়বস্তু কিছু স্বপ্নে ঘেরা কিছু বা আদর্শবাদ। আদর্শবাদী মার্কসের কবিতা আদর্শবাদে উদ্দীপ্ত হবে তাতে আর বিচিত্র কী! তরুণ মার্কস তখন শেক্সপীয়র, কান্ট, ফিখটে, শিলার আর হেগেল নিয়ে মেতেছিলেন। চিন্তাশীল দার্শনিকদের আদর্শবাদ তাঁর কবিতায় প্রভাব বিস্তার করেছিল বলা চলে। আদর্শবাদী কার্ল মার্কস তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস উৎসর্গ করেছিলেন ফোন ভেটফালেনকে। উৎসর্গে তিনি লেখেন, "আদর্শবাদ শুধু কল্পনা নয়, সত্য।"

বন্ থেকে ফিরে ১৮৩৬ সালের শেষের দিকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন ভর্তি হলেন, তখন তাঁর কবিতাগুচ্ছ তুলে দিলেন জেনির হাতে। একই বছরে দুটো কবিতার বই প্রকাশিত হল বার্লিনে। প্রথমটির নাম 'বুখ্ ডার লিডার' (গানের বই), দ্বিতীয়টির নাম 'বুখ্ ডার লিবে' (প্রেমের বই)।

মার্কস রচিত কবিতার দুটো উদাহরণ না দিয়ে পারলাম না। দুটোই বাংলায় অনুবাদ করছি। প্রথমটি জেনির প্রতি প্রেম-নিবেদন। দ্বিতীয়টি আদর্শবাদ নিয়ে লেখা।

দুজনেই যখন পরস্পর নির্ভরশীল
দুজনই জানে তারা এজগতে একলা নয়।
মহাকাশ বিচরণ করলে
কানে আসে হার্পের মৃদু ঝংকার,
আরও দেখি প্রকৃতি দেবীর কটাক্ষে
জ্বলে ওঠে কামনা।
জেনি, তোমায় নির্ভয়ে বলতে পারি
আমরা দুজনে হৃদয় ও আত্মা বিনিময়
করেছি—
জ্বলছে তারা একই আগুনে
ভাসছে একই ঢেউ-এর আঘাতে।

সেন্টিমেন্টস্ঃ
শান্ত আমি হব না, পাব না শান্তি
মনকে আমার নাড়া দেয় অহরহ।
লড়াইয়ের আহ্বানে
নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা কী সম্ভব?
সবই আমি জয় করে নিতে চাই,
স্বর্গের সবই দান।
বিজ্ঞানের সাথে মিশে যেতে চাই
সব সুকুমার শিল্পকে করতে চাই আলিঙ্গন।
নির্ভয়ে এগিয়ে চল
বিশ্রামে গা না এলিয়ে।
জড়বৎ হয়ে বসে থাকব না
অকর্মার মতন হাত গুটিয়ে থাকা আর নয়।
সংঘাতের আহ্বানে
নিষ্কর্মার মতন আর বসে থাকা নয়
একই সংগে আমরা আঘাত হানবো।

(৮)
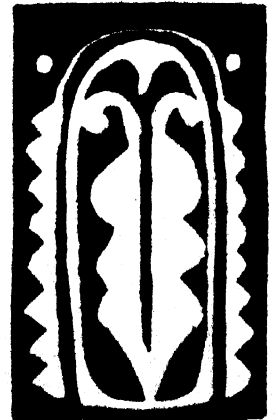
আসুন এই ঘরটায় ব'সে কফি খাওয়া যাক। এটা আমার 'স্টাডি', তা-ই হবার কথা ছিলো অন্তত, কেননা আমি এক সময়ে রটিয়েছিলুম আমি একটা অভূতপূর্ব আত্ম-জীবনী লিখছি, সেই মহৎ পরিশ্রমের জন্য ছোটো ঘরই আমার দরকার, আর তা-ই শুনে নেলি কোনো বিশালতর বালক্রাকের আন্দাজ সরঞ্জাম দিয়ে আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলো এই ঘরটা। এমনিতেও ছোটো ঘর ভালো লাগে আমার, অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয়। আমার একটা কষ্ট এই যে প্রকাণ্ড সব বাংলোতে জীবন কাটাতে হয়েছে, পুরোনো দিনের ইংরেজের তৈরি বাংলো, প্রকাণ্ড ঘর, উঁচু সীলিং, বিশাল জানলা, দূরে-দূরে দেয়াল, বিরাট কম্পাউণ্ড। রাতে হাওয়ার শব্দ, বাইরে পাহাড়ের মতো অন্ধকার। তারপর—এই বাড়ি, নেলির প্ল্যান, নেলির রচনা—মালাবার হিল-এ রতনদাসের প্রাসাদে গ'ড়ে উঠেছিলো তার মন—সে খাবার-ঘর করালে যাতে একসঙ্গে পঞ্চাশজনকে বসিয়ে খাওয়ানো যায়, ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র আনালে লণ্ডন থেকে, আমার জন্যে কাঠের প্যানেল-দেয়া লাইব্রেরি-ঘর — ইত্যাদি, ইত্যাদি, এই একটা ব্যাপারে নেলির উৎসাহ উথলে উঠেছিলো একেবারে, হাঙ্গামাও কম করেনি। 'বন্-অ্যার', আনন্দ—এমন একটা দুঃসহ তার আমার মনের উপর, কোনো কাজে লাগে না, দুঃখভোগের বিপুল উপ-করণ নিয়ে শূন্য প'ড়ে আছে। আমি ঐ পুব-খোলা বারান্দায় ব'সে সকালবেলাটা কাটিয়ে দিই, বিকেলে চ'লে আসি এই ছোটো ঘরটায়—এটার পশ্চিম খোলা, দিনের শেষতম মুহূর্ত পর্যন্ত রোদ পাই এখানে—সূর্যের অনুসরণ করি বলতে পারেন, আমি রোদ চাই, আমি আলো চাই, অন্ধকারে আমার ভয় করে। কিন্তু এই ঘরে দেয়ালগুলি ঘনিষ্ঠ, এই ঘরের ধুলোময়লা আমার সান্ত্বনা।

বুঝতেই পারছেন, নেলি যে-ভাবে ঘরটা সাজিয়ে দিয়েছিলো, তার সঙ্গে কিছুই মেলে না এখন। আমি এটাকে সাজিয়ে নিয়েছি নিজের ধরনে, বা না-সাজিয়ে নিয়েছি। দেখছেন তো মেঝেতে বই, টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো (বেদরকারি, কিন্তু ফেলে দিতে আমার আলস্য), আর ঐ সোফার কুশানটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কারো মাথার চাপে টোল খেয়ে আছে এখনো, খুঁজলে হয়তো লম্বা কালো চুলও পাওয়া যাবে দু-একটা। এই ঘরটা চাকরদের এক্তিয়ারের বাইরে, যেমন আছে তেমনি প'ড়ে থাকে, আমি দিনে-দিনে দেখি কেমন জ'মে উঠছে অজেয় ধুলো, আদিম আবর্জনা—এই জগতের ও জীবনের স্বাভাবিক অবস্থাটাকে যেন চোখে দেখতে পাই। মাঝে-মাঝে ঘরটার চেহারা ফেরে শ্রীমতী গায়ত্রীর স্বকরস্পর্শে, কিন্তু গায়ত্রীকেও আমার রোগের ছোঁয়াচ দিয়েছি আমি, তারও এই অগোছালো ভাবটা ভালো লাগছে আজকাল, আস্তে-আস্তে সেও এই আদি-সত্যটা উপলব্ধি করছে যে গা ছেড়ে দেবার মতো আরাম আর নেই।

এই আরামটুকুর জন্য বহুকালের আকাঙ্ক্ষা আমার। ছিলুম তো এক দুর্দান্ত আঁটোসাঁটো চাকরিতে, বাপের বয়সী লোকেদের মুখে 'স্যর স্যর' শুনে চুল পাকার অনেক আগেই হাড় পেকেছে, আঙুল নাড়া-মাত্র ছুটে এসেছে লাল কোমরবন্ধ-আঁটা মহিমান্বিত চাপরাশি। বিচারকের মুখোশ আমার মুখে, চোখে যেন পলক পড়ে না, গালের পেশী মূর্তির মতো অনড়, আমি ন্যায়ের প্রতিনিধি, আমি ধর্মাবতার। যখন আমার লাল-শালু-ঘেরা এজলাসের সিংহাসনে বসি, তখন আমি ষড়রিপুর ঊর্ধ্বে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তির ঊর্ধ্বে, বীতরাগ, বীতভয়, বীতমন্যু। যেন ইস্পাতের ফ্রেমে আটকে দিয়েছে আমাকে, হাতে-পায়ে পেরেক ঠুকে দিয়েছে—কতদিন নিঃশব্দ চীৎকারে ব'লে উঠেছি, 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে ছেড়ে দাও!' কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি সেই চীৎকার, কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, টের পায়নি যে আসামিদের চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করে, যেখানে আমি বেরোবার পথ খুঁজছি মনে-মনে, দরজায়-দরজায় পুলিশ পাহারা দেখে থমকে যাচ্ছি। আমিই বুঝতে দিইনি, পাথরের মতো ঠাণ্ডা রেখেছি চোখ, কথা বলেছি মৃত্যুর মতো স্থির কণ্ঠে—এটুকুই আমার কৃতিত্ব, আমার বীরত্ব। আর তার উপর—

এজলাসের বাইরে, বাড়িতে, বা যেখানেই যাই, আমার সঙ্গে আছেন রতনদাস ব্রোকারের কন্যা, আমার প্রিয়তমা পত্নী। যেন নয়কুলে দেবতা আমরা, আমাদের দিকে তাকাতে গেলে ক্ষুদ্র মানবের ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যায়—এমনি আমাদের জীবন। শুভ্র, বিবর্ণ, নিষ্কলঙ্ক, নিয়মাবন্ধ, অণুপরিমাণ ধুলো নেই কোথাও, নেই জল, হাওয়া, শ্যাওলা, মর্চে—নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত, সম্ভ্রান্ত, নির্বীজ। আমি যে সব সহ্য করেছিলুম তাতেই বুঝবেন আমি কী-রকম নিপুণ অভিনেতা। আমার বুজরুকি, আমার হাত-সাফাই, আমার জীবন। যেন আমি গরিব ছিলুম না কোনোদিন, যেন আমার বাবা পঁচাত্তর টাকা পেনশন পান না, যেন আমি নেলির মতোই আজন্ম ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেছি, যেন আমি কাঁদিনি কখনো, উড়ে যাইনি টুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো হাওয়ায়, দুলিনি ঢেউয়ের সঙ্গে তোলপাড়।—কিন্তু বলুন, ক্লান্তি কি আসে না একটা সময়ে? ইচ্ছে করে না কি নিচে নামতে—অন্য অর্থে নিচে, ইচ্ছে করে না কি সব গোলাপ মাড়িয়ে দিতে, সব আলো কালো ক'রে দিতে, নেলির অতি যত্নে গড়া ঝকঝকে জগতের মধ্যে আমদানি করতে একটি ক্ষত, একটি ব্যাধির বীজাণু, সূক্ষ্ম বিষের প্রস্রবণ? অবশেষে মন কি চায় না আশ্রয়, অবলম্বন—পাশে কোনো নির্ভেজাল স্ত্রীলোকের শরীর, আমার গুহা, দুর্গ—এই ঘরে, ঐ সোফায়, যেটা দু-জনের আন্দাজ বিছানা হ'য়ে যায় রাতে, নেলির ঐশ্বর্য থেকে দূরে, উটকামণ্ডের দ্রষ্টব্য এই বাড়িটার উজ্জ্বল আক্রমণ থেকে দূরে, গোলাপ-বাগানের প্রহসন থেকে দূরে—জন্তুর সৌন্দর্য ও সরলতায়? আমি চেয়েছিলাম নেলির ভালোবাসার প্রতিদান দিতে, প্রতিশোধ নিতে তার আর আমার নিজের উপর—আর এমনি ক'রেই—যেহেতু অন্য কোনো উপায়ে আমি নেলিকে আমার মনের কথাটা বোঝাতে পারিনি—আমার স্ত্রীলোক নিয়ে খেলা শুরু হয়েছিলো।

অনুমতি করুন, মন খুলে কথা বলি আপনার সঙ্গে। আপনাকে আমার বহু-কালের চেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার কথা আপনি সবই জানেন, বা জানতেন এককালে—কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, আমি ভুলিনি। নেলি, ছেলেমানুষ নেলি, সুখের কাঙাল, কী সরলভাবে সে বিশ্বাস করে যে সুখী হবার জন্যই পৃথিবীতে জন্ম নেয় মানুষ, কী করুণভাবে সুখী করতে চায় আমাকে। যেন সুখ একটা বম্বাই আম বা ভীমনাগের সন্দেশ যা কেউ কারো হাতে তুলে দিতে পারে। যেন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কোনো ধ্রুব বিশ্ববিধান—সৌরমণ্ডলের আবর্তনেরই মতো। কী ক'রে আমি তাকে বোঝাই যে আমি সুখী হ'তে পারি না, চাই না? ভালোবাসতে চাই না, পারি না? ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। কী ক'রে বোঝাই আমার জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা লজ্জা দেয় আমাকে—যদিও আমি চুরি করিনি, নারীধর্ষণ করিনি, খুব পরোক্ষেও ঘুষ নিইনি কখনো—বরং সাধুতা আর সুবিচারবোধের জন্য সরকারি মহলে রীতি-মতো সুনাম আছে আমার?

'সুখ' বলতে নেলি যা বোঝে তার মাল-মশলা প্রায় সবই সে জন্মসূত্রে পেয়েছিলো—অঢেল অর্থ, সামাজিক গৌরব, ইচ্ছে হ'লেই হাওয়া বদলাতে ব্ল্যাক ফরেস্টে বেড়াতে যাবার স্বাধীনতা : এগুলি তার কাছে নিশ্বাসের বাতাসের মতো, যাদের সঙ্গে তার পরিবারের মেলামেশা তারা সকলেই প্রায় এই শ্রেণীর, এ-রকম না-হ'য়ে অন্যরকম যে হ'তে পারে তা-ও যেন নেলির প্রায় ধারণার বাইরে। শুধু একটি উপাদান বাইরে থেকে জোটাতে হ'লো, তার 'সুখের' বেশ বড়ো একটা অংশ বলা যায় : 'স্বামী'—সুশ্রী, বিদ্বান, সচ্চরিত্র স্বামী। ঐ বিশেষণগুলিতে ভূষিত ছিলাম আমি—তার চোখে, তার মা-বাবার চোখেও। অভাব ছিলো না আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর, তারা কেউ-কেউ তিনশোবার কিনতে পারে আমাকে, কোনো-এক 'নেটিভ' রাজ্যের রাজার দুলালকেও জামাই পেতে পারতেন রতন-দাস কিন্তু—রমণীরতন আমারই ভাগ্যে জুটলো। কেন, কী ক'রে? একটা কারণ এই যে রতনদাস, যাঁর বিরাট ব্যাবসা প্রায় তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, আমার প্রতি ঈষৎ অনুকূল ছিলেন—আমি 'নিচু থেকে উঁচুতে' উঠেছি ব'লে। আর-একটা—আর এটাই হয়তো বেশি জরুরি—আমি প্রেমিকের ভূমিকাটিকে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিলুম নিজের সঙ্গে, যেন অচেতনভাবেই বুঝেছিলুম নেলির মনের কোন তন্ত্রীটি সবচেয়ে বেশি স্পর্শ-কাতর। 'আত্মার ভগিনী', 'হৃদয়ের বাঞ্ছিতা', 'জন্ম-জন্মান্তরের সুহৃদ'—এইসব সুবচন আমি শোনাই তাকে, যা সারাজগতে বাসি হ'য়ে গেছে, কিন্তু নলিনী ব্রোকারের কাছে চমকপ্রদ, যা অন্য কোনো যুবক তাকে আমার আগেই জপিয়ে যায়নি (কেননা কোনো বাউণ্ডুলে কবিভাবাপন্ন ছোকরা তার সান্নিধ্যেই পৌঁছতে পারবে না)—আমি যার নেকটাইগুলি সুচারু, নিখুঁত বিলেতি আদবকায়দা যার নখদর্পণে, ইণ্ডিয়ান পীনাল কোডের সঙ্গে রোমান আইনের সম্পর্ক নিয়ে যে আধঘণ্টা ধ'রে কথা বলতে পারে—সেই আমার মুখে শেলি উগো রবীন্দ্রনাথের লাইন শুনে গ'লে গেলো এই সুইৎসার্লণ্ডের স্কুলে-পড়া সেণ্টিমেণ্টল নির্বোধ বালিকা। ধ'রে নিলো আমার ভালো-বাসা অতি উচ্চ স্তরের—'নক্ষত্রের জন্য পতঙ্গের বাসনা', ইত্যাদি। রোমাণ্টিক কবিরা আমার জন্য জয় করলেন রতনদাসের বিপুল বিত্তের একটি অংশ এবং একটি জাঁক ক'রে দেখাবার মতো সুন্দরী স্ত্রী। এর পরে কেউ যেন আর না বলে যে কবিতা কোনো কাজে লাগে না।

বিয়ের পরেও আমি বছরখানেক প্রেমিকের ভূমিকা বজায় রেখে চললুম, একটি সুরক্ষিত, পুরুষের-দ্বারা-অস্পৃষ্ট কুমারীর টাটকা নধর শরীরটাকেও পয়লা দফায় মন্দ লাগলো না। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই নেলি হ'য়ে উঠলো মারাত্মকরকম স্ত্রী—তার 'সুখ' আর 'স্বামী', এই দুটো ধারণা প্রায় এক হ'য়ে গেলো। ক্রমশ আমাকে এমন সব উপায় খুঁজতে হ'লো যাতে তার ভুল ভাঙে, মোহাবেশ কেটে যায়, যাতে রোমাণ্টিক কবিতার এই মূল তত্ত্বটা সে ধরতে পারে যে স্বপ্নে ছাড়া সুখ নেই ব'লে মানুষের ভাগ্য শুধু অতৃপ্তি। বলেছি তো আপনাকে, তার ছবি আঁকার বদভ্যাস আমি না-সারিয়ে পারিনি—সেখানেই শুরু, মৃদু হাতে। সে যদি বাজে ছবি এঁকে সুখী হ'তো, আমার কী ক্ষতি ছিলো বলুন? নিজেই ক্লান্ত হ'য়ে ছেড়ে দিতো একদিন, আমার উপদেশে এমন কী সুফল হয়েছিলো যা এমনিতেই হ'তে পারতো না? অথচ আমার উপর এতই ভক্তি তার, যে আমার 'অপছন্দ' ব'লে বন্ধ হ'য়ে যায় তার তুলি বোলানো, তার পিয়ানোয় টুংটাং। আমি তাকে আঘাত দিতেই চাচ্ছি, কিন্তু আহত সে হচ্ছে না, রবারের বলের মতো মাটিতে প'ড়েই লাফিয়ে উঠছে। অতএব আমাকে আর-একটু রূঢ় হ'তে হ'লো, তার সুযোগ পেলাম নেলির মাতৃত্বে।

আমাদের প্রথম পুত্রের জন্মের পরে নেলির মুখে দেখলাম গর্ব আর স্নেহ-মেশানো মাতৃত্বের বিখ্যাত হাসি—যেন কী বৃহৎ কর্ম ক'রে উঠেছে—জগৎ জুড়ে চলছে এই মাতৃপুজো—বলবো কী মশাই, আমার গা ঘিনঘিন করে। আপনিই বলুন, একটা শিশু কি এলিফ্যাণ্টার ত্রিমূর্তি, না কি মৎসার্টের 'দন হুয়ান' যে তা সৃষ্টি করাতে কোনো বাহাদুরি আছে? যে-কাজ কেঁচো পারে, ছারপোকা পারে, তা নিয়ে অত জাঁক কিসের? নেলি অপলক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার সন্তানের দিকে—যেভাবে ধরুন, বহু-কাল ধ'রে শুধু ছাপা ছবি দেখার পর অব-শেষে আমস্টার্ডামে গিয়ে মূল রেমব্রান্টের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা, বা প্রথম-বার পুরীতে গিয়ে সমুদ্রের সামনে বিহ্বল হ'য়ে যাই। আমাকে ব'লে, 'তুমি সুখী হয়েছো? বলো, তুমি সুখী হয়েছো? দ্যাখো, কেমন তাকিয়ে আছে তোমার দিকে!' এমনি সব সনাতন বুলি যা জপিয়ে-জপিয়ে মানুষ-মায়েরা পুরুষ-জন্তুকে 'পিতা' হ'তে শিখিয়েছে, এমনকি তার স্বভাবশত্রু সন্তানের জন্য ভালোবাসারও সঞ্চার করেছে তার মনে।

পৃথিবীতে মায়েরা যা পারে খৃস্টান মিশনারিও তা পারে না। আমি দেখলুম এই একটা রাস্তা হ'লো যা দিয়ে আমি পালাতে পারি নেলির কাতর 'ভালোবাসা' থেকে, সে ছেলেকে নিয়ে মশগুল হ'লে আমার দিকে তার মনোযোগ ক'মে যাবে, আমি স্বস্তি পাবো খানিকটা—কিন্তু যেহেতু নেলি সর্বস্বভাবে সন্তানকেই চাচ্ছে এখন, ঐ নোংরা মাংসপিণ্ডকে বুকে চটকেই স্বর্গ-সুখ অনুভব করছে, তাই মাতা-পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন ব'লে আমার মনে হ'লো। আলাদা ঘরে আয়ার কাছে থাকবে, দুধ খাবে একটি মাইনে-করা স্বাস্থ্যবতী গরিবের বৌয়ের বুক থেকে, তিন মাস বয়স থেকে বিলেতি বেবি-ফুড, দিনে চারবার বাচ্চাটিকে বেশ সমারোহ ক'রে মা-র কাছে নিয়ে আসা হবে পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্য —এই সব উত্তম বিলেতি ব্যবস্থা চালু করা হ'লো। এদিকে নেলির বুক টনটন করে—শারীরিক মানসিক দুই অর্থেই, কিন্তু আমার সহায় সিভিল সার্জন আর আধুনিক বিজ্ঞান (মানে, তখন যেটা আধুনিক নামে চলতো); শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে এটাই ভালো, তার নিজের স্বাস্থ্য আর রূপ-যৌবনের পক্ষেও, এই যুক্তির কাছে হার মানলো সে, কিংবা হয়তো আমি চাচ্ছি ব'লেই আপত্তি করলো না। এইভাবেই মানুষ হয়েছে নেলির দুই ছেলে—শৈশবে আয়া, পাঁচে পড়তেই কোনো দূর স্বাস্থ্যকর শহরে মিশনারি স্কুল, সতেরোয় পড়তে-না-পড়তেই বিলেত। ছোটোটিকে কাছে রাখার জন্য বড্ড পিড়াপিড়ি করেছিলো নেলি, অনেক করুণ চাহনি ছুঁড়েছিলো আমার দিকে, রাত্রে অনেকবার তার দীর্ঘশ্বাস আমাকে শুনতে হয়েছে—বিলেতি শিক্ষার পাৎলা আবরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা তার সেকেলে, অনগ্রসর, আলোকহীন ভারতীয় মাতৃত্বের দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু আমি ছিলুম কর্তব্যের পথে অটল। আমরা কি চাই ন্যাম্বি-প্যাম্বি বাঙালি খোকন, চোদ্দ বছর বয়সে মায়ের কোলে ব'সে মায়ের হাতে ভাত-খাওয়া মেরুদণ্ডহীন মলিকডল, আমরা কি চাই এমন মা যারা জন্ম থেকে রাক্ষুসে স্নেহে ঢেকে রেখে চিরকাল শিশু ক'রে রাখে সন্তানকে? না—একশোবার, এক হাজারবার না! ছেলে সুশিক্ষা পাবে, ডিসিপ্লিন শিখবে, সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে সময়-মতো—অন্ততপক্ষে বিলাত চাকুরে—এর চেয়ে বড়ো কথা আর কী?

কিন্তু একটা মুশকিল এই হ'লো যে—ছেলেরা যেহেতু কাছে নেই—নেলির জীবন হ'য়ে উঠলো নতুন ক'রে পুরোপুরি স্বামী-কেন্দ্রিক, আমাকে ঘিরেই ঘুরছে, পৃথিবীর সংলগ্ন একটি পাংশু, ছোটো চাঁদ যেন, আঁকড়ে আছে আমাকে, আটকে আছে কাঁটা হ'য়ে গলায়, কোনো অচিকিৎস্য দাঁত-ব্যথার মতো সারাক্ষণের সঙ্গী সে আমার। আমি তার ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝতে পারি যে, ছেলেদের জন্য কষ্ট সে ভুলতে পারছে না কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলে না কখনো, আমার উপর কোনো অভিমান কোনো অভিযোগ নেই তার—রাগ তো দূরের কথা—সে শুধু এই চায় (আর সেটা একটা অসম্ভব চাওয়া!) যে তার সন্তানের বিচ্ছেদ-বেদনা, তার নিপীড়িত মাতৃত্ব, তার সব দিশি, সেকেলে, অসভ্য আকাঙ্ক্ষা যা অন্দর মহলের জোলুশ দিয়ে মেটানো যায় না—সেই সব কিছুর আমি পরিপূরণ করবো আমার 'ভালোবাসা' দিয়ে। ভেবে দেখুন, কী অন্যায় আব্দার! ভেবে দেখুন, কী জীবন আমাদের, দু-জনে মুখোমুখি কপোতকপোতী, আছি মফস্বলে, সেই একঘেয়ে একমুঠো সম্পন্ন সরকারি মহলের বাইরে মেলামেশা নেই, কোনো সাংসারিক বা পারিবারিক সমস্যা পর্যন্ত নেই যে তা নিয়ে মনটা বিক্ষিপ্ত থাকবে—আর সেইটেই ভয়াবহ সমস্যা। কিছু বৈচিত্র্য আসতো মাঝে-মাঝে এক-আধ পশলা ঝগড়াঝাঁটি হ'লে—বজ্রপাত না হোক বিজলিঝিলিক হ'তে পারতো, কিন্তু না—নেলির পক্ষে তা অসম্ভব, সে যাকে সুখের বিরোধী ব'লে জানে, সে-রকম কোনো আচরণ সে যে-কোনো অবস্থায় এড়িয়ে যাবে, আমি তাকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা ক'রে বার-বার বিফল হয়েছি। আমার বিষ-মাখানো কটু বাক্যগুলিকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে আমারই কাছে—প্রত্যাঘাত ক'রে নয়, আস্তে স'রে গিয়ে, বিরোধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার ক'রে। অথচ, লোকেরা যে কখনো-কখনো নিজেদের সুখী ব'লে ভাবতে পারে তার কারণ কি এই নয় যে অনেকগুলো বিরুদ্ধ জিনিশে পরি-বৃত হ'য়ে থাকে তারা—কখনো দারিদ্র্য, কখনো রোগ, কখনো কোনো চেষ্টায় ব্যর্থতা; স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থলাভ, যে-কোনোরকম সাফল্য—এই গতানুগতিক সুখগুলোর সত্যিকার স্বাদ শুধু তারাই জানে যারা বিছানায় বন্দী থেকেছে অসুখে, আগামী-কালের বাজার-খরচার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখেছে তাদের বহু প্রয়াসের ভস্মাবশেষ, কুকুর পুষে হৃদয়বৃত্তি তৃপ্ত করেছে। বিরুদ্ধ কিছু নেই, শুধু সুখ—এই অবস্থায় দেবতারাই টিকে থাকতে পারেন না মশাই, মানুষের কথা ছেড়েই দিন। ভেবে দেখুন ঐ গ্রীক দেবদেবীদের কাণ্ড—অমরতায় অভিশপ্ত, মৃত্যুর নিষ্কৃতিও নেই বেচারাদের, আমাদের ইন্দ্র যম বরুণের মতো প্রলয়কালেও ধ্বংস হবে না, অনন্তকাল ধ'রে কিছুই তাঁদের করার নেই আসলে, তাই তো ঐ কৃমিকীটের মতো মানুষগুলোর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন তাঁরা, কোথাকার কে হেক্টর আকীলিসকে নিয়ে মেছোনির মতো কোঁদল, স্বর্গ-মর্ত্য ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটোছুটি, গলা দিয়ে অমৃত নামিয়ে ঢেঁকুর তুলেছেন ঈর্ষাবিষ—পরস্পরকে হিংসে ক'রে, অপমান ক'রে, নাজেহাল ক'রে কোনোরকমে কাটিয়ে দিচ্ছেন স্বর্গীয় জীবন। তাহ'লে বুঝুন, নিরবচ্ছিন্ন সাধ্বী নেলিকে নিয়ে আমার কী শোচনীয় অবস্থা! আমি চাই তাকে কষ্ট দিতে, তার মনে আমার প্রতি ঘৃণা জাগাতে, তার ভালোবাসার নাগপাশ থেকে মুক্তি চাই—কিন্তু অবোধ বালিকা এ-সব কিছুই বোঝে না, বা বুঝেও বোঝে না। সে যত বেশি ধৈর্যশীলা গ্রিজেল্ডা সাজে তত আমার আক্রোশ বেড়ে যায়, ইচ্ছে করে তার পাতিব্রত্যের উচ্চ চূড়াকে ধুলোয় লুটিয়ে দিই, মনে হয় ভদ্রতার বা কূট-নীতির আবরুটুকুও আর রাখবো না, রাষ্ট্র-দূতের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা না-ব'লে সরাসরি যুদ্ধে নেমে যাবো, যদি বোমা ফেলে পিলে চমকে দিতে হয় তাতেও পেছ-পা হবো না। হ'লোও তা-ই—অবশেষে উপায় খুঁজতে হ'লো আমায় ধমনীকে, শুরু হ'লো আমার স্ত্রীলোকের শরীরে ডুবে যাওয়া—আমি নিজে তা চাই ব'লে নয়, নেলির আনন্দের উন্মীলনের জন্য। সেই ঢাকা—বকুল-ভিলার বারান্দায় সূর্যাস্তের আলোয় দেখা মহিলারা, আমার জীবনে ভালোবাসার ইচ্ছার জাগরণ, সেখান থেকে অনেক দূরে চ'লে এলাম।

(ক্রমশঃ)

সড়ক সৌধ কানাগলি

রাজভবনের সামনে কার্জন পার্কের যে-কোণে দু-দুটো বিশাল ক্যাকটাস, সেখানে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দারুণ ভিড়। গা গলানো কষ্টকর। কি ব্যাপার? ক্যাকটাসে বিস্ময়কর নিউজ-আইটেম কিছু তৈরি হলো নাকি? ভগবানগোলার সেই কলাগাছে কাঁটাল ফলার মতন অবিশ্বাস্য কিছু? বলা যায় না—প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে ঐ তুমুল ক্যাকটাসে হয়তোবা বিচিত্র ফল ফলেছে—তাই এই দুর্গম ভিড়!

কষ্ট করে গা গলিয়ে চোখ মেলে যা দেখলুম, তাও মোটেই সহজ নয়—বিস্ময়করই বলতে হবে। হাজার হাজার ছোটো-বড়ো-মাঝারি ইঁদুরবাহিনীর কুচকাওয়াজ। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত, এই ট্রেইনড, ভয়লেশহীন বিদ্যুৎবাহিনীর জন্ম কিভাবে সম্ভব হলো? রেলিং-এর ধারে বসে দুজন চিনেবাদামঅলা তারস্বরে রাষ্ট্র-ভাষার সঙ্গে বাংলা মিশিয়ে চমৎকার আলাপ-আলাপন করছে এদের সঙ্গে। ঠিক যেমন বাঁদর-নাচিয়ে শিক্ষামতন বাঁদর নাচিয়ে পয়সা রোজগার করে, চিনেবাদামঅলা দুজনও ওদেরকে ডিরেকশন মতো ঘোরাচ্ছে, ফেরাচ্ছে। ওরাও অনেকে সে-নির্দেশ মেনে কখনো কাছে এসে, হাতের তালু থেকে বাদাম ঠুকরে খাচ্ছে—কখনো 'তফাৎ যাও' বলতেই তফাতে। হুড়হুড় করে বিক্রি হচ্ছে বাদাম আর ছোলা। কখনো নির্দেশ আসছে, পাকিস্তানী লাহোর ছিন্ লেও। অমনি হুড়মুড় করে সেই ইঁদুরের দল গিয়ে পড়ছে একটা বড়োমতন মাটির ঢেলার ওপর। সেখানে তাতা-থৈ-থৈ নাচ, সে কি যুদ্ধ-বিজয়ের নাচগানহল্লা নয়? বাদামঅলা আবার নির্দেশ দিচ্ছে—ছোড় দেও ইয়ার উস্‌কা দেশ—স্বদেশ পর চলা আও, বর্ডার দেখো। অমনি সেই বিপুল বাহিনী নেমে আসছে ঢেলাঢিবি ছেড়ে।

ফলার লেও।

ছড়িয়ে দিচ্ছে বাদাম আর চানা। সেনা-বাহিনীর ভোজ শুরু হয়ে যাচ্ছে পলকে। মুখের কথায় বিশ্বাস না হলে আজই গিয়ে দেখে আসুন, বিপুল ক্যাকটাসের তলে ইঁদুরের সৈন্যশিবির, শিক্ষনবিশি, কুচ-কাওয়াজ।

বিচিত্র কলকাতার বিচিত্রতর অঞ্চল এই কার্জন পার্ক। সেখানে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আজ এই বিস্ময়কর প্রোগ্রাম। এছাড়াও সেখানের কৃষ্ণচূড়ায় রক্তবর্ণ ফুল এসে পাতা ছাপিয়ে উঠেছে। ফুটেছে ঢোলক ফুরুষ। মরসুমি ফুলের কাল নয় বলেই ফুলের শয্যাগুলো বিষন্ন, মনমরা। অল্প-সামান্য ছায়াও দখল হয়ে যাচ্ছে—কে যেন বলেছিলো, কলকাতায় একদিন ছায়া বিক্রি হবে। কার্জন পার্কে এলে সত্যিই মনে হবে, এই দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে বুঝি তাও সম্ভব। এক চিলতে টগরের ছায়াতেও দেখলাম, একটি লোক নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে আছে। অকেজো ফোয়ারার গায়েও দুজন লোক হেলান দিয়ে বসে—ফোয়ারার জলের শান্তির স্মৃতিতে নির্ভর করে আছে সম্ভবত।
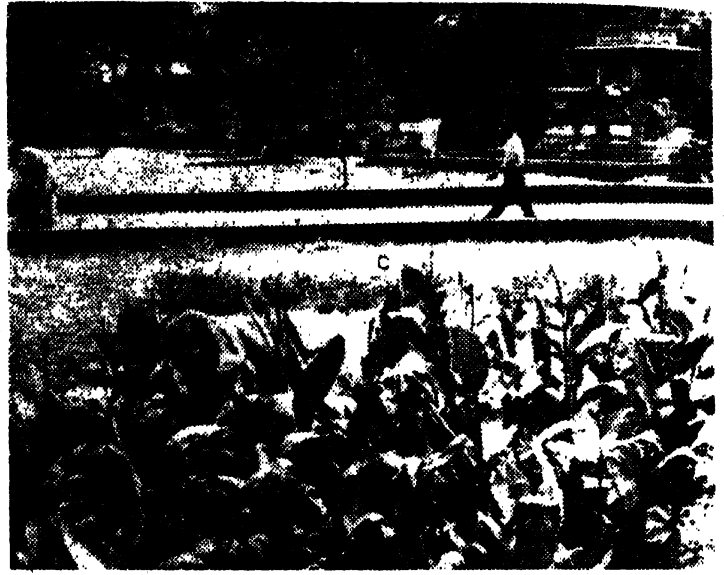
সন্ধের পর থেকেই পার্ক জমজমাট।

এরই মধ্যে নির্জনতা খুঁজে চলেছে যুবক-যুবতী, চখাচখী। মিনিমাম গাছের আড়ালে পা ছড়িয়ে বসে কূজন করবে তারা। রাজভবনের দীর্ঘ দেবদারুর শাখা থেকে এই দুরন্ত গরমেও কোকিল ডেকে ওঠে। কাছাকাছি অকাল বকুল ঝরে পড়ে। কলকাতায় গাছপালা, ফুল-ফল, পশু-পক্ষীর প্রকৃতিও কেমনধারা বদলে যেতে বসেছে। দুরন্ত বর্ষায় কোকিলের ডাক শুনে চমকে উঠেছিলুম এককালে। আজ মনে হয়, ফুল-ফলের মতন কোকিলের ডাকও বারোমাস্যা হতে বাধা নেই।

আপনি বসে থাকুন, গল্প-গাছা করুন, গরমে খোলা মাঠের ইতস্তত হাওয়ার আরাম ভোগ করুন—হাতের কাছে টুকরো খাবার-দাবার, ম্যায় চা পর্যন্ত চলে আসবে। গরমের দিনে কুলপি মালাইও পাবেন। তার জন্যে উঠে আপনাকে এদিকে-ওদিকে যেতে হবে না। মাঠে বসেই গোটা কলকাতা! আপনাকে চমকে দিয়ে 'বেলি-মল্লিকা'ও হেঁকে যাবে ফুলওয়ালা। পান-সিগারেট থেকে ঢাকার বাখরখানি পর্যন্ত—কি আপনার চাই?

একটা সময় ছিলো যখন নিরালোক দুস্তর কার্জন পার্ক, মানেই বিভীষিকা। আজ মোটেই তা নয়। যথেষ্ট আলো আর যথেষ্ট ছোটো পার্ক পুলিশ আর দুষ্কৃতি-কারীর যুগপৎ অনুপস্থিতির কারণ হয়েছে। ভালো মানুষ অনেক কাছাকাছি আছে বলেই মন্দ মানুষ দূরে সরে গেছে। আজ তারা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

তবু কোথায় যেন একটা আয়োজনের ফাঁক আমাদের পীড়া দেয়। ঐ ভ্রাম্যমাণ খাবার-দাবার ভ্রাম্যমাণ পানীয় অনায়াস-লভ্য হলেও শহরের মন আরো কিছু বিলাসিতা চায়। সেটুকু দেওয়াও বুঝি তেমন কিছু দুষ্কর নয়। পার্কের তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশের যে কোনো একটিতে, এমন কি মাঝের অংশটিতেও একটি খোলা-মাথা অর্থাৎ ওপেন-এয়ার রেস্টুরেন্ট করা যায়। চৌরঙ্গীর দমবন্ধ, মূল্যবান রেস্টুরেন্ট হোটেল ত্যাগ করে দলে দলে লোকজন যে এখানে এসে ভিড় করবে এ আমি হলপ করে বলতে পারি। কলকাতার মধ্যে এমন রেস্টুরেন্ট করার সুযোগ তো আর সর্বত্র পাওয়া যায় না। এখানে হলে একদিকে যেমন অফিস-ফেরত ক্লান্ত মানুষজনের ক্ষণস্থায়ী বিশ্রাম হবে, অন্যদিকে পার্ক ভর্তি হলে যানবাহনের হঠাৎ চাপও কিছুটা কমা সম্ভব।

সামান্য উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, ট্রামগুমটি ছাড়িয়ে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি মাঠের যে অঞ্চলে আগে ঘোড়ার গাড়ি আর ফিটনের ভিড় ছিলো সেখানে টী-বোর্ড আর কফি-বোর্ড থেকে বহুদিন থেকে যথেষ্ট সস্তায় চা-কফি বিক্রি হয়—সেখানে কি ধরণের ভিড় হয় অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন, পাশাপাশি ফুচকা-গোল-গপ্পা বিক্রির চত্বর জুড়ে কেমন কার্ণিভালের রূপ। সুতরাং, এসবের কাছাকাছি একটি ওপেন-এয়ার রেস্টুরেন্ট যে কতো দরকার তা সাধারণের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। উদ্যোগী ব্যক্তিদের এবিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করতে বলি।

—রূপচাঁদ পক্ষী

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত পালামৌ জেলার লবেহারে মা ও শিশু

বিহারের সংকট-ত্রাণ

হাজারীবাগ থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে হাজারীবাগ-ছাতরা শড়কের আশে-পাশে নরনারী শিশুদের গাছের ডালপালা চিবুতে দেখা যায়। পালামৌ জেলার কোনো কোনো জায়গায় জল এতো দুর্লভ যে স্নান দূরে থাক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মানুষ ভাল করে হাতমুখ পর্যন্ত ধোয় না। জল সেখানে এতো মহার্ঘ যে একমাত্র তৃষ্ণা নিবারণ ছাড়া জলের আর যে-কোনো ব্যবহারই বিলাসমাত্র। প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাংবাদিক দক্ষিণ বিহারের এই যে চিত্র দিয়েছেন, এ রাজ্যের খরাগ্রস্ত অঞ্চলের সর্বত্রই মানুষের সেই দুর্গতি।

বিহারের এই নিদারুণ জলাভাবের পিছনে শুধু এবারকার অনাবৃষ্টিই নয়, এর পটভূমিতে রয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রশাসন-ব্যবস্থায় লজ্জাকর ঔদাসীন্যের ইতিহাস। সমগ্র বিহারে সরকারী উদ্যোগের নলকূপের সংখ্যা এযাবত ছিল মাত্র পাঁচশো, যার তুলনায় মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে নলকূপ কয়েকগুণ বেশী। খরা ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় গঠিত নতুন গভর্ণ-মেন্ট অবশ্য এর তুলনায় অনেক তৎপর। গত কিছুদিনের মধ্যে বিদেশ থেকে পাওয়া রিগের সাহায্যে বিহারে আরো এক হাজার নলকূপ খোঁড়া হয়েছে। কাঁচা কুয়া খোঁড়া হয়েছে চার লক্ষ, যদিও লক্ষ্য ছিল আড়াই লক্ষ। কিন্তু প্রশাসনিক গলদে সবগুলো এখন পর্যন্ত কাজ দেয় না। কুয়া থেকে জল তোলার জন্য ১৪,৭০০ ডিজেল ও ১৪,০০০ ইলেকট্রিক পাম্পের মধ্যে দুয়ে-মিলে মাত্র ১৭ হাজার বসানো হয়েছে। নদী-গুলোর জন্য যে ৭ হাজার পাম্প বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যে বসানো হয়েছে মাত্র ৩৭৫টা। পালামৌ সফরের পর এই সাংবা-দিক লিখছেন যে, বহু রিগ সেখানে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, কারণ চালাবার বা মেরামত করার মতো কারিগরের অভাব; আবার ড্রিলিং কোথায়ও শেষ হলেও জল তোলার জন্য যথেষ্ট পাম্প নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিহারে ভয়াবহ জলকষ্টের খবর শুনে বিদেশী কয়েকটি দাতব্য সংস্থা এই রিগগুলো বিহারে পাঠিয়েছিল বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে। এগুলো কাজে লাগাবার সামর্থ্য দিয়েই আমাদের আন্তরিকতা ও যোগ্যতার মূল্য-বিচার হবে। সংকটত্রাণে অবশ্য বিহার সরকারের প্রচেষ্টা নিতান্ত লঘু নয়। দূরে-বর্তী অঞ্চল থেকে ওয়াগনে করে জল এনে তাঁরা হাজারীবাগ ও পালামৌতে বিতরণ করছেন। বনের ভেতরের খানা-ডোবাগুলো পর্যন্ত জলে ভরে রাখা হচ্ছে বনাপশুদের জন্য। এ-পর্যন্ত তাঁরা ৪৮ লক্ষ পারিবারিক রেশনকার্ড বিলি করেছেন, ১৮,৬০০ দোকান মারফৎ রেশন বন্টন করছেন। এপর্যন্ত খয়রাতী খাদ্যসাহায্য দেওয়া হয়েছে ৩৬,০০০ টন। এর মধ্যে অবশ্য ২৩,০০০ টনই এসেছে বিদেশ থেকে 'কেয়ার' ও 'ইউনিসেফে'র মারফৎ।

তবুও বন্টনে দুর্নীতির অভিযোগও কম নয়। বিদেশী সাহায্যের গুঁড়ো দুধ ডাল্টনগঞ্জ প্রভৃতি শিল্পএলাকায় চোরাপথে সন্দেশ-রসগোল্লার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, বিদেশী সাহায্যে পাওয়া টেরেলিন প্রভৃতি মূল্যবান কাপড়ের জামা পাটনা, রাঁচির দোকানগুলোতে সগৌরবে র‍্যাকের শোভা বর্ধন করছে।

কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্র শিশু ও প্রসূতি মায়েদের জন্য বিদেশী থেকে সাহায্য হিসেবে প্রাপ্ত গুঁড়ো দুধ মিঠাইর দোকানে ও চোরাবাজারে চলে যওয়ায় ফলে এই জরুরী সাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিহারের দুর্ভিক্ষ যেমন বিশ্ববাসীর করুণা আকর্ষণ করেছে তেমনি দুর্ভিক্ষত্রাণে আমা-দের সামর্থ্যও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর দুর্নীতি ও অযোগ্যতাই যদি সে-ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে তাহলে বিশ্বের সহানুভূতি ও সাহায্যের স্রোতেও খরা দেখা দেবে।

পাকিস্থানে দাসশিবির

পাকিস্থান থেকে সম্প্রতি যে খবর প্রকাশ পেয়েছে তা প্রথমতঃ অবিশ্বাস্য মনে হয়ে-ছিল, কারণ ১৯৬৭ সালে, এমনকি,

আফ্রিকারও এমন অনালোকিত এলাকা থাকতে পারে, কেউ ধারণা করতে পারে নি। মে মাসের গোড়ার দিকে খবরে রয়টার জানালো যে, পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলে সাতটা দাস-শিবির আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে শতশত বালক, যুবককে গুম করে অথবা ভুলিয়ে নিয়ে এসে বিনামজুরীতে সামান্য মাত্র খাদ্য দিয়ে খাটানো হতো দিনে ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা করে। শ্রমিকরা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য রাত্রে তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো এবং দিনের বেলা প্রহরীরা এদের কাজের জায়গায় পাহারা দিতো। তিন দিন বাদে মুজফফরগড়ে আরো তিনটা শিবির আবিষ্কৃত হয় সেখানে কন্ট্রাক্টররা সরকারের কাছ থেকে ঠিকা নিয়ে মরুভূমি অঞ্চলে এদের দিয়ে সেচখাল খোঁড়াচ্ছে। ১৫ই মে পাকিস্থানী পুলিশ মুলতানের কাছে আরো আটটা শিবিরে হানা দেয়। এখানে যেসব লোককে দিয়ে বেগার খাটানো হচ্ছিল তারা নাকি কেউ কেউ এগারো বছর এই কাজ করছে। সংবাদটা প্রচারিত হওয়ার পর অবশ্য প্রেসিডেন্ট আয়ুব এই ব্যাপার সম্পর্কে কড়া তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পশ্চিম পাকিস্থানের গভর্ণর মহম্মদ মুসা দোষীদের কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। তবু এই প্রশ্নটা সকলের কাছেই এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে থাকবে যে, এতো দীর্ঘদিন ধরে আয়ুবের মতো কড়া ডিকটেটরের দেশে মধ্যযুগের সেই দাস-ব্যবসায়ীদের বংশধরেরা নির্বিবাদে ব্যবসায় চালিয়ে আসছিল কি করে?

মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি

সংযুক্ত আরব ও ইস্রায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য গত '১১ বছর ধরে সিনাই ও গাজা অঞ্চলে যে রাষ্ট্রসংঘ জরুরী বাহিনী মোতায়েন ছিল, তা শেষ পর্যন্ত মিশরের দাবীতে অপসারিত হয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আবার একটা সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংঘর্ষের পর এযাবত এই সীমান্ত মাঝামাঝি অশান্তি ছাড়া মোটামুটি শান্তই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইস্রায়েল অভিযোগ তোলে যে, আরবরা জর্ডন নদীর জলধারাকে অন্যমুখী করে ইস্রায়েলকে জল থেকে বঞ্চিত করার অভিসন্ধি করছে এবং সিরিয়া ইস্রায়েলের মধ্যে ক্ষতিকর কার্যকলাপের জন্য লোক পাঠাচ্ছে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইস্রায়েলীরা আরব এলাকায় যেসব ছোটোখাটো হানা চালাতে থাকে তার মধ্যে জর্ডানের সমু জনপদের হানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে এক বিমানযুদ্ধে সিরিয়ার ছখানা বিমান ধ্বংস হয়। এরপরই হুমকি ও পাল্টা হুমকি চলতে থাকে এবং সিরিয়া ও মিশর যুদ্ধপ্রস্তুতি হিসেবে সৈন্য চলাচল শুরু করে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই অবস্থায় ভারত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এবং উদ্বেগের যথেষ্ট কারণও আছে। গত বছরের শেষভাগ থেকেই ইস্রায়েলে আবশ্যিক সামরিকবৃত্তি চালু হয়েছে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও সুয়েজের আশংকায় কিছুদিন যাবত জোর কদমে কুচকাওয়াজ চালাচ্ছে। সিরিয়ার ভঙ্গীও যুদ্ধমুখী। এই অবস্থার মধ্যেই মিশরের দাবীতে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী অপসারিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং এযাবত উভয়ের মধ্যে যে 'বাফার' ছিল তা অন্তর্হিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক চুক্তি

শুল্কের পাঁচিলের আড়াল থেকে পৃথিবীর বাণিজ্য কিছুটা পরিমাণে মুক্তি পেয়েছে। গত ১৫ মে জেনিভায় ৫৪টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে শুল্কের বাধা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা শিথিল করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিশ্ব বাণিজ্যের অন্তত চার-পঞ্চমাংশ এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হবে। বিশেষভাবে লাভবান হবে উন্নতিকামী দেশগুলি, চড়া শুল্কের জন্যে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এতদিন সম্প্রসারিত হ'তে পারছিল না।

এই চুক্তির জন্যে দীর্ঘ চার বছর ধরে চেষ্টা ও আলোচনা চলেছিল। কেনেডি রাউণ্ড বা কেনেডি বৈঠক নামে এই আলোচনা পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ

ভারতীয় বাহিনীত্রয়ের অধিকর্তাদের সঙ্গে ডঃ জাকির হোসেন। রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের পর জেনারেল কুমারমঙ্গলম, ভাইস-অ্যাডমিরাল এ কে চ্যাটার্জি এবং এয়ার চীফ মার্শাল অর্জন সিং রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কেনেডিই প্রথম এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। বিশ্ব বাণিজ্যকে বাধামুক্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের বেলাতেই আমদানী শুল্কের হার ৫০ শতাংশ কমান। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বৈঠকে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে মনে হয় হ্রাসের হার গড়পরতা ৩০ শতাংশ দাঁড়াবে। বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর এর প্রভাবও কিছু কম হবে না। জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড-এর প্রধান মিঃ এরিক উইন্ডহাম-হোয়াইট এই চুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 'অতীতের যে-কোন বাণিজ্য চুক্তির তুলনায় কেনেডি রাউন্ডের ফলাফলের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা অনেক গুণ বেশী।' ভারতের বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী এবং ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ভারতের প্রাক্তন দূত শ্রী কে বি লাল বলেছেন, শুল্ক চুক্তির ইতিহাসে এর কোন দ্বিতীয় নজির নেই।

যে ৫৪টি দেশ জেনিভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিল তারা মিলিতভাবে বিশ্ব বাণিজ্যের ৮০ শতাংশের কারবার করে থাকে। যে সব শিল্পজাত দ্রব্যের বেলায় এখন শুল্ক-হ্রাসের সুবিধা দেওয়া হবে সেই সব দ্রব্যে বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪০০০ কোটি ডলার।

আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে দুটি বিষয়ে মতানৈক্য প্রবল হয়ে উঠেছিল, এমনকি আলোচনা ভেঙে যাবারও উপক্রম হয়েছিল। এই দুটির একটি হল নতুন একটি আন্ত-র্জাতিক গম চুক্তি সংক্রান্ত এবং অপরটি রাসায়নিক শিল্পজাত দ্রব্য সংক্রান্ত। দুটি সম্পর্কেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ছিল প্রখর, কারণ দুটি বিষয়ে আমেরিকার গভীর স্বার্থ রয়েছে। শেষে আমেরিকার অনুকূলে গমের দাম বাড়িয়ে মীমাংসা করা হয়েছে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমেরিকাকে রাসায়নিক দ্রব্যের শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব মেনে নিতে হয়েছে।

যে ৩০ শতাংশ শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা প্রত্যেক জিনিসের বেলায় সমান হবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাসের পরিমাণ পাঁচ থেকে ২০ শতাংশ হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশই হ্রাস করা হবে।

তবে এই চুক্তির ফলে উন্নতিকামী দেশগুলি কতখানি লাভবান হবে তা এখনও বলা মুশকিল। উন্নতিকামী দেশগুলির বিশেষ সমস্যাবলী নিয়ে বৈঠকে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি। এর জন্যে অতিরিক্ত প্রয়াস দরকার।

শ্রীলালের মতে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ এই চুক্তির ফলে উপকৃত হবে। তিনি বলেছেন, বৃটেনে ভারতের রপ্তানী কিছুটা ব্যাহত হতে পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বর্ধিত বাণিজ্যের দ্বারা সেটা পুষিয়ে যাবে।

প্রকাশ, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভারতীয় রপ্তানীর জন্যে ব্যাপক শুল্ক সুবিধা দেবার কথা ভাবছেন। তা যদি হয় তাহলে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যে মার্কিন বাজার উন্মুক্ত হবে এবং আমেরিকা আমাদের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হবে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ভারতের বস্ত্র রপ্তানীর ওপর ২০ শতাংশেরও বেশী শুল্ক ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে, তবে পাট, নারকেলের ছোবড়ার জিনিসপত্র ও কার্পেটের বেলায় তারা এখনো কিছু জানায় নি। এই তিনটি ক্ষেত্রে তারা কি মনোভাব গ্রহণ করবে তার ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করছে।

গমের দাম বাড়ানোর ফলে আমদানী-কারক দেশ হিসেবে ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, ভারতের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় আমেরিকা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে সমস্ত শিল্পজাত ও ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে তার অনেকগুলির এই ধরনের যে সেগুলি সম্পর্কে উন্নতিশীল দেশগুলির আগ্রহ খুব বেশী না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ঐ ধরনের জিনিস এই সব দেশে তেমন উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, যে সব দ্রব্য রপ্তানী থেকে উন্নতিশীল দেশগুলির লাভ হবার সম্ভাবনা আছে সেই সব ব্যাপারে পাঁচ বছর অপেক্ষা না করে (কেনেডি রাউন্ডের সিদ্ধান্তে পাঁচ বছর অন্তর্বর্তী সময় ধার্য করা হয়েছে) শুল্ক সুবিধা অবিলম্বে দেওয়া হবে তাহলে অনেক বেশি উপকার হয়।

প্রকাশ, কেনেডি রাউন্ডে যোগদানকারী প্রধান দেশগুলি কিছুকালের মধ্যেই উন্নতি-কামী দেশগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে মিলিত হতে রাজি হয়েছে। আশা করা যায় সেই সময় এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

তপন সিংহ পরিচালিত হাটেবাজারে চিত্রের দুটে দৃশ্যে অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আজকের কথা :

চিত্র-সমালোচকদের সম্পর্কে চিত্রবোদ্ধাদের রায় :

গেল ২১-এ থেকে ২৩-এ এপ্রিল পর্যন্ত রবীন্দ্রসদনে যে 'অল ইন্ডিয়া ফিল্ম সোসাইটিজ কনফারেন্স' হয়ে গেল, তার তৃতীয় দিনের মাধ্যাহ্নকালীন অধিবেশনে (১১-৩০ মিনিট থেকে ১-৩০টা পর্যন্ত) যে আলোচনাচক্র বসে, তার বিষয়বস্তু ছিল : ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর চলচ্চিত্র-গুণাবধারণের প্রভাব ও সংবাদপত্রের ভূমিকা (The Impact of Film Appreciation on the Indian Cinema and the Role of the Press). মেরী সীটন-এর নেতৃত্বে এই আলোচনাচক্রে ভূমিকা গ্রহণ করেন পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, স্টেটসম্যান পত্রিকার দিল্লী শাখার চলচ্চিত্রবিদ অমিতা মালিক, অরুণ কাউল (ফিল্ম ফোরাম) অসীম সোম, আশিস বর্মণ, ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য (সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা), সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় (চলচ্চিত্রম) প্রভৃতি। চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের পক্ষে এই আলোচনাচক্রে প্রতিনিধিত্ব করবার কথা ছিল অমৃতবাজার পত্রিকার নির্মলকুমার ঘোষ এবং সিনে অ্যাডভান্স-এর সরোজকুমার সেনগুপ্তের। কিন্তু তাঁদের অনিবার্য অনুপস্থিতিতে এই কনফারেন্সের কর্মকর্তারা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত চিত্রসাংবাদিকদের মধ্যে কাউকে তাঁদের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে আহ্বান জানান প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ফলে এই আলোচনাচক্রে দেশের চিত্র-সাংবাদিকদের সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা যখন বহু বিদ্রূপ মন্তব্য করছিলেন, তখন প্রেক্ষাগৃহে আসীন চিত্র-সাংবাদিকদের পেশাগত শিষ্টাচার অনুযায়ী নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; কারণ উত্তেজনার বহু কারণ সত্ত্বেও তাঁরা ভুলে যেতে পারেন নি যে, তাঁরা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ঐ সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন।

বলটি অবশ্য প্রথম গড়িয়ে দিলেন পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, যখন তিনি 'এ-দেশে চলচ্চিত্রের গুণাবধারণ সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছে শূন্য'—এই কথা কয়টির মাধ্যমে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করলেন। শ্রীঘটক যে একটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্রপ্রতিভা, এ-বিষয়ে বোধ করি কেউই দ্বিমত হবেন না। এবং এও কারুর নিশ্চয় অজানা নেই যে, প্রতিভা ও চন্দ্রাহতের মধ্যে ব্যবধান-রেখা অতি সূক্ষ্ম। কাজেই প্রতিভাধরেরা কোনো কোনো মুহূর্তে পূর্বাপর বিবেচনা না করে যে-সব সঙ্গতিহীন উক্তি করে বসেন, তাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা সব সময়ে সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রেও আমরা শ্রীঘটকের উক্তিকে একটি সুচিন্তিত অভিমত বলে গ্রহণ না করে তাঁর চরিত্রোপযোগী একটি লঘু পরিহাস জ্ঞানে আলোচনার বাইরে রাখতে চাই এই কারণে যে, আলোচনার শুরুতেই এমন একটি আণবিক বোমা নিক্ষেপের কয়েক মিনিট পরেই তিনি সামান্য অজুহাতে ব্যস্তভাবে সভাগৃহ ত্যাগ করেন। তাঁর মনোভাবখানা যেন এই রকম : কেমন লাগিয়ে দিয়ে গেলুম!

কিন্তু চিত্র-সাংবাদিকদের স্বপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই জেনেও যে-সব পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন, তাঁদেরই দিতে হয় বাহবা। চিত্র-সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকদের অভিযোগের অন্ত নেই। তাঁদের সততা নেই, তাঁরা খারাপ ছবির প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ, ভালো ছবিকে খারাপ বলতে তাঁদের বাধে না, কেনই যে একখানি ছবি ভালো এবং কেনই বা আর একখানি ছবি খারাপ, তা তাঁরা বিশদ করে বুঝিয়ে বলতে পারেন না, সম্পাদনা সম্পর্কে কিছু না জেনেই তাঁরা ছবির সম্পাদনা ভালো বা খারাপ বলে বসেন, তাঁরা চলচ্চিত্রের গুণাবধারণ বিষয়ে পাঠকদের জ্ঞান-বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন নি ইত্যাদি-ইত্যাদি অন্তহীন অভিযোগের ফিরিস্তি ভদ্রলোকদের মুখে-মুখে। একটি ফিল্ম সোসাইটির প্রতিনিধি তো চলচ্চিত্রসাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেই প্রশ্ন করে বসলেন। ভদ্রলোক একবারও চিন্তা করলেন না, তাবৎ চিত্র-সাংবাদিকদের সম্বন্ধে তাঁর এই প্রশ্নটি কতখানি শালীনতার পরিপন্থী।

সারা ভারতের কথা বলতে পারি না। কিন্তু কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে যাঁরা চলচ্চিত্র-সমালোচক ও সাংবাদিকরূপে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের শিক্ষাগত এবং অপরাপর যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় না পেয়েই পত্র-পত্রিকার কর্ণধারেরা তাঁদের ওপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, এটা কি কল্পনা করাও বাতুলতার নামান্তর মাত্র নয়? প্রতিটি সংবাদপত্র পরিচালনার পিছনে থাকে একটি সুপরিকল্পিত নীতি এবং সেই সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সাংবাদিকই সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করবে, এমন একটি লিখিত (এবং অনেক সময়ে অলিখিত) শর্ত থাকে। চিত্র-সাংবাদিকদেরও এই শর্ত মেনেই চলতে হয়। কোনও ছবি ভালো হলেও খারাপ কিম্বা খারাপ হলেও ভালো বলতে হবে, এমন অনুজ্ঞা

মহেশ কাউল পরিচালিত **পালকী** চিত্রে রাজেন্দ্রকুমার ও ওয়াহিদা রহমান

বা আদেশ নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ করেন না। কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পের সামগ্রিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে ভালকে বেশী ভাল বা খারাপকে কম খারাপ বলার পরিস্থিতি দেখা দেয় বহু সময়েই।

চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ী জগতের সঙ্গে চিত্র-সাংবাদিকদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকলেও বিংশ শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠতম আর্টটিকে তাঁরা অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন

বলেই তাঁরা চিত্র-সাংবাদিকের বৃত্তি নিয়েছেন, এই তথ্য কেউ যেন বিস্মৃত না হন। তা না হলে ভারতের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে তাঁরা সাদরে বরণ করতেন না এবং তার প্রসারের জন্য অকৃপণভাবে প্রচারও করতেন না। আর এও জানা উচিত, বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি পরিবেশিত বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা পরিচালকদের সৃষ্ট আর্ট ফিল্মগুলি তাঁরাও দেখে থাকেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে ও যোগ্য গুণাবধারণে তাঁরা কোনও ফিল্ম সোসাইটির কোনও সদস্য থেকে কম তো ননই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার জোরে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। 'সাইট অ্যান্ড সাউণ্ড', 'ফিল্ম অ্যান্ড ফিল্মিং' 'ফিল্ম কমেন্ট' প্রভৃতি যে-সব বিদেশী পত্র-পত্রিকা ফিল্ম সোসাইটির সদস্যবৃন্দের জ্ঞানার্জনের পথকে প্রশস্থ করছে, সেগুলি যে চিত্র-সাংবাদিকদেরও নাগালের বাইরে নয়, এও মনে রাখা উচিত। কোনও ফিল্ম সোসাইটির সদস্য থাকা বা তার মুখপত্রে দু' কলম লিখতে পাওয়া কিম্বা একটি বা দুটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনায় অংশীদার হওয়া অথবা খান-কয়েক চলচ্চিত্রসংক্রান্ত পুস্তক- ও পত্র-পত্রিকা পাঠের ফলে দু কথা বলতে পারা মানুষকে চলচ্চিত্রসমালোক করে তোলে না। সে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি ও মানসিকতা থাকলে মানুষ রসবেত্তায় পরিণত হয়, তারই সঙ্গে চলচ্চিত্র রূপ বিশেষ আর্টটির ধর্ম ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানটি এসে যদি মিলিত হয় এবং সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা থাকে, তবেই মানুষ চলচ্চিত্র-সমালোচক ও সাংবাদিকরূপে সার্থক প্রতিষ্ঠালাভের আশা করতে পারে। কিম্বা বুঝি তাতেও হয় না। কবি যে-গুণে কবি, ঔপন্যাসিক যে-গুণে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেতা, গাইয়ে গাইয়ে, খেলোয়াড় খেলোয়াড়, ঠিক সেই অনির্বচনীয় গুণেই চলচ্চিত্র-সমালোচক হচ্ছেন সার্থক চলচ্চিত্র-সমালোচক ও সাংবাদিক। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফলজাত কোনো ব্যক্তিই—তিনি জগদ্বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকই হোন, আর নগণ্য চিত্র-নাট্যকারই হোন কিম্বা কোন ফিল্ম সোসাইটির কর্ণধারই হোন—তাঁকে নস্যাৎ করতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুর্ভাগা দেশ :

কবি অতিদুঃখেই বলেছিলেন : সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি। — এবারের ২৫-এ বৈশাখ কবির জন্মোৎসব পালন উপলক্ষ্য করে শহর কলকাতার শিল্পী-মহল যে কেচ্ছার অবতারণা করেছিলেন, তা আমরা যে আজ আগেকার থেকেও আরও বেশী অমানুষ হয়ে উঠেছি, তারই জাজ্বল্যমান নিদর্শন। কবিকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করার ব্যাপারেও নোংরা রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত অহমিকা যে এমন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। কবিকে উদ্দেশ্য করে বলব, তুমি আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে জন্মেছিলে, আমরা ধন্য, তাঁরই রচিত গান গাইব, তাঁরই কবিতা আবৃত্তি করব, রচনা পাঠ করব, নাটক অভিনয় করব, অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করব,—এই উদ্দেশ্যেও আমরা মিলিত হতে পারি না এবং মিলিত হতে না পেরে স্মৃতিপূজা বর্জন করি, আমার মনের মত করে কবিপ্রশস্তি হচ্ছে না বলে খবরের কাগজে ফতোয়া বার করি, আবার শিল্পী বলে বড়াইও করি, দেশের গণ্যমান্যরূপে দশের শ্রদ্ধালাভের অধিকারী হতে চাই। ধিক আমাদের, শত ধিক, রবীন্দ্রনাথের নাম যেন না আমরা এই পাপমুখে উচ্চারণ করি।

অগ্রদূত পরিচালিত কখনো মেঘ চিত্রে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক।

চিত্রসমালোচনা

গুনেহগার (হিন্দী) : সিমলা প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৯৮৩·৫১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : পূরণ, এস, দালওয়ানী; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : আর, ঠক্কর; সংলাপ : এস, পাল; সংগীত-পরিচালনা : ভেদপাল; গীতরচনা : নাকাশ এবং আখতার রুমানী; চিত্রগ্রহণ : আর, কে, ভকুরী; শব্দানুলেখন : গুণবন্ত, এন, রাওয়াল; সংগীতানুলেখন : বি, এন, শর্মা ও কৌশিক; শিল্পনির্দেশনা : বলদেওভাই; সম্পাদনা : লক্ষ্মণদাস ও বিজয়নাথ পাণ্ডে (হোসারেশের দুখ্যাবলী); নৃত্যপরিচালনা : পণ্ডিত বদরীপ্রসাদ, কমল ও সত্যনারায়ণ; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর, মহেন্দ্র কাপুর, কৃষ্ণ কালে ও মান্না দে; রূপায়ণে : শেখ মুক্তার, ভগবান, মদনপুরী, উমা দত্ত, সঞ্জীবকুমার, কুমকুম, সরলা লতিফ, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, টুনটুন, লক্ষ্মীছায়া, মৌজদ্ প্রভৃতি। এক্সেল পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ১৯এ মে, বুধবার থেকে নিউ সিনেমা, গ্রেস, ক্রাউন, দীপালী, প্যারামাউন্ট, ভবানী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পূর্বে হিন্দী ছবির মধ্যে যেমন কেবল গতানুগতিক ছক-বাঁধা উদ্দেশ্যহীন প্রেমের গল্পই থাকত, এখন আর ঠিক সেরকমটি থাকে না। এখন প্রায় প্রতিটি হিন্দী ছবিতেই কিছু-না-কিছু সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়, একটা-না-একটা বক্তব্য থাকে। সিমলা প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, আর, ঠক্কর রচিত 'গুনেহগার' ছবিটিরও একটি পরিষ্কার বক্তব্য আছে; ছবিটি বলতে চেয়েছে : একজন সরল ও সৎ ব্যক্তিও দারিদ্র্যের চাপে পড়ে ও সংসর্গদোষে নষ্ট হয়ে যায়, সমাজের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। দিনমজুর শঙ্করনাথ ছিল পরিশ্রমী ও সৎ। কিন্তু দুষ্ট মুরলীর প্ররোচনায় সে মদ্যপ ও জুয়াড়ী হয়ে পড়ে। তার যুবতী কন্যা মালার প্রতি মুরলীর কুনজর ছিল। মুরলী শঙ্করের কাছে তার কন্যাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করতে শঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে মুরলীকে সজোরে আঘাত করে ভূপাতিত করে। তাকে মৃত মনে করে শঙ্কর শহরে পালিয়ে গিয়ে শের খাঁ নামে এক পরাক্রান্ত ডাকাতের কবলে গিয়ে পড়ে। এদিকে মালা তার ছোটভাই মোহনকে সঙ্গে নিয়ে যখন বাপের সন্ধানে শহরে আসে, তখন মুরলীও তার পিছু নেয়। এই সময়ে পুলিশের হাবিলদার প্রীতম্ মালাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচিয়ে পুলিশ-অফিসার দীপকের আশ্রয়ে তাকে রাখে। শের খানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে শঙ্কর লুটতরাজ শুরু করে। একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়া থেকে বাঁচবার জন্যে শঙ্কর মালারই বাসস্থানে এসে হাজির হয়। মেয়ে বাপকে ধরা পড়া থেকে বাঁচাতে গিয়ে দীপকের সন্দেহভাজন হয়। শেষ পর্যন্ত কি করে সন্দেহভঞ্জন হয় এবং মালাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে শঙ্কর নিজে কতখানি আত্মত্যাগ করতে বাধ্য হয় তাই নিয়েই ছবির উত্তেজক সেনারিও রচিত হয়েছে।

অভিনয়াংশে ছবির প্রধান চরিত্র শঙ্করনাথরূপে শেখ মুক্তার অভাবের দুর্দান্ত আকর্ষণ করেন। প্রতি মুহূর্তেই শঙ্করনাথের সৎ মন অন্যায় কাজ করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে চেয়েছে, কিন্তু পরাক্রান্ত, দুর্ধর্ষ শের খানের প্রতি শেষপর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তার এই অসহায় অবস্থা শেখ মুক্তারের মারফত এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অবশ্য এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা কি শঙ্করের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল? সে যদি সৎপথে থাকতে চাইত, তাহলে সে গোড়াতেই পুলিশের শরণাপন্ন হল না কেন? কিন্তু এ হচ্ছে কাহিনীগত দুর্বলতার কথা, শেখ মুক্তারের এতে কোনো হাত নেই। শঙ্কর-কন্যা মালার ভূমিকায় কুমকুম সাবলীল অথচ দরদী অভিনয় করেছেন। ছবির রোমাণ্টিক নায়ক, পুলিশ-অফিসার দীপকবেশে সঞ্জীবকুমার কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেমের দ্বন্দ্বটিকে যথাসাধ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। পুলিশ হাবিলদার প্রীতম্-এর চরিত্রটি ভগবানের অভিনয়গুণে ছবির হাল্কা অংশটিকে চমৎকার উপভোগ্য করে তুলেছে। তার প্রেমিকার ভূমিকায় সরলা লতিফ আকর্ষণীয় অভিনয় করেছেন। আফগান ডাকাত শের খানের চরিত্রটিতে অত্যন্ত সু-অভিনয় করেছেন উমা দত্ত; বাচনে, ভঙ্গীতে তিনি চরিত্রটিকে প্রায় জীবন্ত করে তুলেছেন। দুর্বৃত্ত মুরলীরূপে মদনপুরী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, টুনটুন, মাস্টার মেহমুদ প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। ছবির দুখানি

বাসু ভট্টাচার্য
শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবির পরিচালক

সত্যজিৎ রায় : শ্রেষ্ঠ পরিচালক
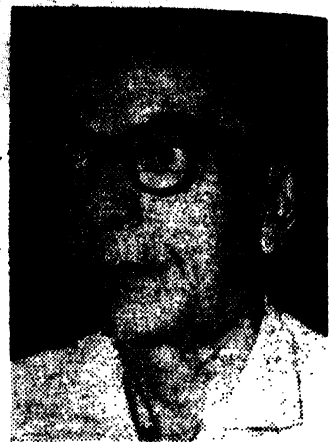
অতুল চট্টোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী

নৃপেন পাল : শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রহণ

বি-এফ-জে-এ পুরস্কৃত চলচ্চিত্র কলাকুশলীবৃন্দ

ফটো : অমৃত
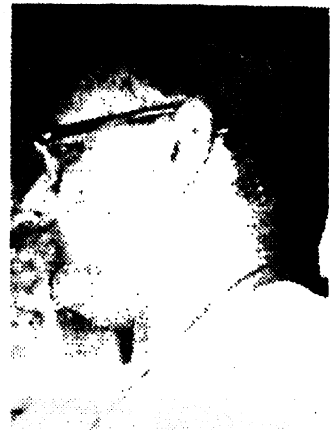
সুব্রত মিত্র
হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী

আরতি মুখোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী (মহিলা)

দুলাল দত্ত
শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা : বাংলা ছবি

সুজিৎ সরকার : শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রহণ

কার্তিক বোস : শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক

মান্না দে : শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী (বাংলা)

কৃষ্ণ চক্রবর্তী : শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রহণ (বাংলা)

গানের মধ্যে "যা রে যা, কাহে ছেড়ে রেহমান", "নারি, নায় হ্যায় মঞ্জিল, নয়ে নয়ে হায় রাস্তে" প্রভৃতি গান সুরচিত এবং সুগীত।

সিমলা প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন "গুনাহেগার" হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শকদের খুশীই করবে।

—নান্দীকর

'পাল্কী' চিত্রের শুভমুক্তি

পূণম পিকচার্স নিবেদিত রঙিন ছবি 'পাল্কী' এ সপ্তাহের ২৬ মে ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, দর্পণা, মেনকা প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে।

নৌশাদ সুরকৃত ও রচিত এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, রেহমান ও জনিওয়াকর। ছবিটির পরিবেশক শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মহেশ কাউল।

আগামী সপ্তাহে 'বালিকা বধূ'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগামী সপ্তাহের ২রা জুন তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূ' শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। কিশোর প্রেমের এ কাহিনীটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, যূই বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশক মানসাটা।

সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবি

'অশনি সংকেত'

নির্মীয়মাণ চিত্র 'চিড়িয়াখানা'-র পর সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবিটি হল 'অশনি সংকেত' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এছবির চিত্রনাট্য রচনায় বর্তমানে শ্রীরায় ব্যস্ত রয়েছেন। চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হবে। পরিবেশনার দায়িত্বগ্রহণ করেছে বলাকা পিকচার্স।

চলচ্চিত্র ভারতীর 'কালো মেঘ'

চলচ্চিত্র ভারতীয় তরফ থেকে 'কালো মেঘ' ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত-গোষ্ঠী। প্রশান্ত দেব রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত

'ঘরোন্দা' চিত্রের মহরৎ

সম্প্রতি কারদার স্টুডিওর চিত্র-নিকেতনের নতুন ছবি 'ঘরোন্দা' শুভ মহরৎ পালন করলেন পরিচালক প্রকাশ ভর্মা। ছবির মুখ্য চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন নন্দা, সঞ্জয়, দুর্গা খোটে, উমা, কে এন সিং ও জয়রাজ। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন শচীনদেব বর্মণ।

'ইজ্জৎ' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

সম্প্রতি কুলু ভ্যালি অঞ্চলে পুষ্প পিকচার্সের ইজ্জৎ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক টি, প্রকাশ রাও। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দর, জয়ললিতা, তনুজা, মেহমুদ, বলরাজ সাহনি, ললিতা মাওয়ার, লক্ষ্মীছায়া ও ডেভিড। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবিটির সুরকর।

অমৃতস্য পুত্রা : শৌভনিক-এর নিবেদন; রচনা : রতনকুমার ঘোষ; নির্দেশনা : গোবিন্দ গাঙ্গুলী; মঞ্চ-পরিকল্পনা : বিমল চক্রবর্তী; সংগীত-পরিচালনা : ভাস্কর মিত্র; শব্দ-প্রক্ষেপণ : মণ্টুপ্রসাদ; আলোকসৃষ্টি : স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতায় মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় যে-কটি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নাট্যসংস্থা নাটকের বক্তব্য, বিষয়বস্তু, রূপ এবং আঙ্গিক নিয়ে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে, তাদের মধ্যে 'শৌভনিক' বোধ করি সবথেকে অগ্রগামী। এ'দের পূর্ববর্তী নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও বর্তমান নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' দেখে আমাদের এই ধারণাই জন্মেছে। সত্যই, নিয়ত বাধা ও সীমিত সাধ্যের মধ্যে তাঁরা নাট্যানুশীলনে যে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও যুগচেতনার পরিচয় দিচ্ছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর।

রাজেন তরফদার পরিচালিত আকাশছোঁয়া চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী।
ফটো : অমৃত

লোকায়নিক-এর আধুনিকতম নিবেদন এবং রতনকুমার ঘোষ বিরচিত নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র মত বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সাম্প্রতিক কালের কোন নাটকে আমরা লক্ষ্য করিনি। নারী পুরুষকে ধরে রাখতে চায়। গৃহকোণে, কিন্তু পুরুষ অমৃতের সন্ধানে অকুতোভয়ে পাড়ি দেয় অজানা পথে। আবার দু'জন পুরুষের মধ্যে একজন নারীর আবির্ভাব ঘটলে, যৌথ কাজ ফেলে দিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত করে ঐ নারীকে উপলক্ষ্য করে। একথা দু' হাজার বছর আগেও যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনই সত্য আছে। তাই দেখি, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'তে শিবানীর ঘর বাঁধার চেষ্টাকে উপেক্ষা করে শংকর বেরিয়ে পড়েছে 'সিনিক' হয়ে এবং কুৎসিত পৃথিবীর রূপকে তুলির ডগায় ফুটিয়ে তুলতে চায়। তাই দেখি, তরুণী কবিতাকে ঘিরে বিদ্যুৎ ও তরুণের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। তাই দেখি, আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় নামে সজ্জন হয়েও কাজে লোকটা অতি বুড়ো দুর্জনকেও হার মানায়। নর-নারীর সম্পর্ক আধুনিক অর্থগৃধ্নু জগতে অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে এ জগতে মিত্তিরমশাইয়ের মত বাপেরা জেনে-শুনে বয়স্থা মেয়েদের রমণীমোহনের মত প্রতিপত্তিশালী সমাজপতিদের কাছে উৎসর্গ করে।

'অমৃতস্য পুত্রাঃ'তে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সমস্যাকে বিষয়বস্তু রূপে তুলে ধরা হয় নি; সমগ্র মানবসমাজের নৈতিক অবনতির কথা বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে চিত্রিত করবার প্রয়াস করা হয়েছে। এ নাটকে যেমন কোন নায়ক-নায়িকা নেই, তেমনই আদর্শ ও বাস্তব একাকার হয়ে গেছে। নাটকের ভাষাও তেমনই একটি ধরাবাঁধা ছাঁচে বা স্টাইলে লিখিত নয়; চরিত্র ও ঘটনার প্রয়োজনে কোথাও স্থূল, বাস্তব, আবার কোথাওবা পদ্যময় লিরিক। নাট্যকার রতনকুমার ঘোষকে বার্টোল্ট ব্রেখট-এর অনুগামী বললেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রেখট-এর মতোই তিনিই এই নাটকে এপিক রিয়ালিস্ট-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই নাটকের গঠনে যেমন বহুদিনের অনুসৃত ফর্মকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে, এর উপস্থাপনাতেও তেমনই অল্পপরিসরের মধ্যে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে আদিম, মধ্য ও বর্তমান যুগের ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রচনা ও ব্যঞ্জনায় 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' আধুনিকতার দিক দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটি অকল্পনীয় নবদিগন্তের সূচনা করল।

অভিনয়ে লোকায়নিক-গোষ্ঠীর সকলেই চরিত্রোচিত নাট্যনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ওরই মধ্যে বিশেষ করে শংকর বা সনাতনের ভূমিকায় কৃষ্ণ কুণ্ডু ও দুর্ধর্ষ সজ্জনের ভূমিকায় গোবিন্দ গাঙ্গুলীর অভিনয়কুশলতা ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। অবাঙালী সুন্দরলালরূপে অশোক মিত্র অনবদ্য; তাঁর বিভিন্ন অভিব্যক্তিসহ 'ঠিক আছে' অবিস্মরণীয়। কতো কাপ্তেন তরুণ বেশে বিমু ভৌমিক সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ধূর্ত চোরাকারবারী রমণীমোহনের কঠিন ভূমিকাটি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন সুকুমার ঘোষ। পান্নালাল মৈত্র অভিনীত চানাচুরওলা উপভোগ্য। চানাচুরওলার স্ত্রী-বেশে ইন্দু চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তব অভিনয়ও অল্প উপভোগ্য নয়। এ ছাড়া অমল মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক), অজিত দেব (বিদ্যুৎ), বিমল চক্রবর্তী (মিত্তিরমশাই), বিধু মজুমদার (অভিজিৎ), শিবানী (জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়), ছবি তালুকদার (কবিতা), অনুরাধা দাশগুপ্ত (বিধবা মহিলা), মায়া বসু (জবা) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত-রচনা, শব্দপ্রক্ষেপণ এবং আলোকসম্পাতে যথাক্রমে ভাস্কর মিত্র, মন্টু প্রসাদ ও স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

●

বাকি ইতিহাস : বহুরূপীর নিবেদন; রচনা : বাদল সরকার; নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র; মঞ্চসজ্জা : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়; আবহসংগীত রচনা : অজয় সিংহরায়; আলোকসৃষ্টি : রামপদ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ চক্রবর্তী। ২১এ মে, রবিবার সকাল ১০টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত।

বর্তমানে বাঙলা নাটকরচয়িতাদের মধ্যে বাদল সরকার একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। আফ্রিকার নাইজিরিয়া রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ার রূপে কর্মব্যস্ত থাকার মধ্যেও শ্রীসরকার কেমন করে বাঙলার নবনাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠলেন এবং বাঙলার আধুনিক দর্শকদের মনের খবর জেনে নিয়ে " এবং ইন্দ্রজিৎ" ও "বাকী ইতিহাস"-এর মতো আধুনিক জটিল নাটক আমাদের উপহার দিলেন, তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

জীবনে চলার পথে কতো না তুচ্ছ কারণেই আবর্তের সৃষ্টি হয় এবং রীতিমতো নাটকীয় সংঘর্ষ বেধে ওঠে, "বাকি ইতিহাস"-এর মূল চরিত্র দু'টি—কলেজের বাঙলা-অধ্যাপক শরদিন্দু ও তার গল্প-লেখিকা স্ত্রী বাসন্তীর মধ্যে জনৈকের আত্মহত্যার কারণ নির্ণয়ে দু'জনের কল্পনার বিভিন্নতাকে ভিত্তি করে যে সাময়িক উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এহ বাহ্য। 'বাকি ইতিহাস' ব্যক্তি-মানুষের জীবনযাত্রার রূপ রচনা করেই সন্তুষ্ট নয়, সে গোষ্ঠী-মানুষের কথাকেও তার উপজীব্য করে তুলতে চায়। তার জিজ্ঞাসা : 'ব্যক্তি-মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গোষ্ঠী-মানুষের বাঁচার ইতিহাসের যোগ কোথায়? একে কি অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন?' তাই শরদিন্দু ও বাসন্তী যখন জনৈক সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাখ্যা খাড়া করতে ব্যস্ত, তখন সীতানাথের প্রেতমূর্তি মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ওপর মানুষের বর্বরতার নিদর্শন-গুলিকে পর পর তুলে ধরে প্রশ্ন করে : এর পরেও কি সুস্থ মানুষের আত্মহত্যার কারণের জন্যে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়? এবং অগ্রগণ্য শরদিন্দুকে প্রতিপন্ন
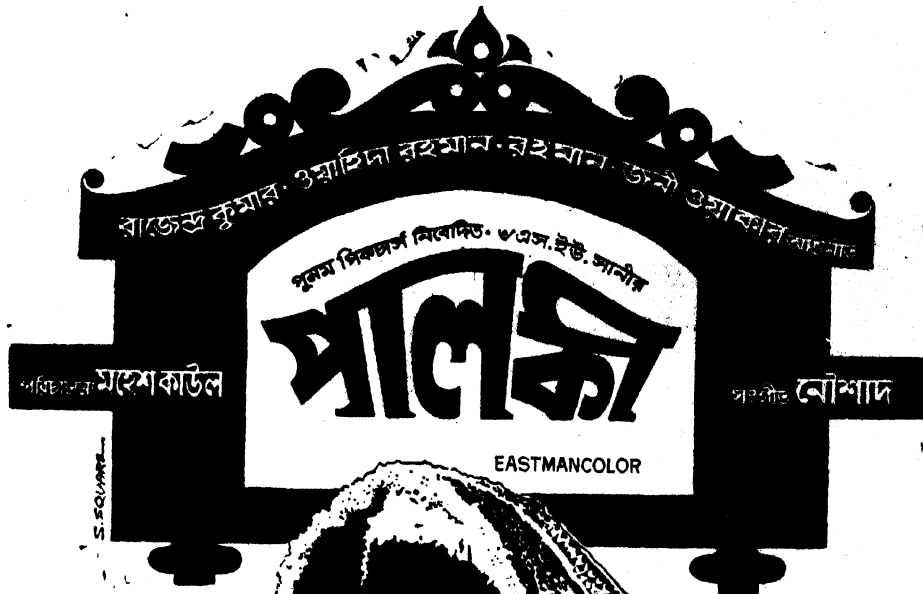
যুক্তফ্রণ্ট রিলিফ কমিটির পরিচালনায় দুর্গতদের সাহায্যের জন্য দক্ষিণ কলকাতায় যে মিছিল বাহির হয় তার সম্মুখভাগে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীচে চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

ফটো ঃ অমৃত

করে ঃ এ-হেন পৃথিবীতে তুমি আত্মহত্যা করনি কেন? অর্থাৎ সীতানাথের মতে কোনো সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই ঘৃণ্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকা উচিত নয়। ব্যক্তি-মানুষ নাকি বাঁচবার জন্যে গোষ্ঠী-মানুষের এই 'বাকি ইতিহাস'টাকে এড়িয়ে থাকে।

যীশুখ্রীস্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার দু' হাজার বছর পরেও মানুষের ওপর মানুষের বর্বরতার শেষ নেই। কিন্তু এই বর্বরতার সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে বার্টাণ্ড রাসেল-এর মতো একাগ্রচিত্তে চেষ্টা চালিয়ে না গিয়ে আত্মহত্যা করে এই দুরন্ত পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করাকে চূড়ান্ত এস্‌কেপিস্‌ম্‌ ও মানবসভ্যতার একান্ত পরাভবস্বীকার বলেই মনে করি। কাজেই 'বাকি ইতিহাস'-এর এই প্রসঙ্গটিকে যতই নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকুক না কেন, 'তুমি আত্মহত্যা করনি কেন?' জিজ্ঞাসাকে আমরা শিশুসুলভ বাতুলতা ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না: যদিও শেষে জগৎ সম্পর্কে নায়ককে সচেতন করে তোলা হয়েছে তবুও বক্তব্য পরিস্ফুট হয় নি। যবনিকা উত্তোলনের সময় থেকে শুরু করে গলরজ্জুবদ্ধ সীতা-নাথের ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত নাটকটি চমৎকার উপভোগ্য; কিন্তু তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি আমাদের কাছে নীতিশিক্ষামূলক বলে বোধ হয়েছে।

অভিনয়ে শরদিন্দু ও সীতানাথ রূপে কুমার রায় অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন: তাঁর অভিনয়ক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করেছে। বাসন্তী ও সীতানাথ-পত্নী রূপবেশে তৃপ্তি মিত্র তাঁর সহজাত নাট্য-প্রতিভার আর একটি নিদর্শন আমাদের সামনে রাখলেন। অপরাপর ভূমিকায় হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় (বাসুদেব), শান্তি দাস (নিখিল), শোভেন মজুমদার (বিধু-ভূষণ), শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (কণার বাবা), অমর গাঙ্গুলী (বিজয়) প্রভৃতি যথাযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন। ছায়ামূর্তি সীতানাথরূপে দেবতোষ ঘোষের বাচন প্রশংসনীয়।

শম্ভু মিত্রের নির্দেশনাগুণে নাটকটির অনাড়ম্বর উপস্থাপনা অত্যন্ত সুষ্ঠু। ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আলোকসম্পাতের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আবহসঙ্গীত রচনা নাট্যধারার উপযোগী।

বহুরূপী নিবেদিত নূতন নাটক "বাকি ইতিহাস" উপস্থাপনা এবং অভিনয়গুণে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করবে।

কল্পতরুর দুটি ব্যঙ্গ নাটক

আগামী ২৭শে মে দুপুর আড়াইটায় বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা কল্পতরু দুটি ব্যঙ্গ ও রঙ্গের নাটক অভিনয় করবেন বিশ্বরূপা মঞ্চে। নাটক দুটি হ'ল 'পরম পুরুষ' ও 'ভিস্‌মিস্‌'। বসন্ত ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বনাথ বসাক, সাধন দত্ত, রাজকুমার বসু, হিতব্রত সাহা, রঞ্জিৎ ঘোষ, শম্ভু দাঁ, কাজল বর্ধন, প্রদ্যুৎ রায়, পুলক সেন, শিবাজী গুপ্ত, সাধন চক্রবর্তী, বসন্ত ভট্টাচার্য, খোকন দত্ত ও নমিতা দাস।

চতুরঙ্গের নতুন নাটক

ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি ব্যঙ্গ নাট্য, নাম—"পারবে না এদের সংগে"।

চতুরঙ্গ নাট্যগোষ্ঠী এই নাটকটি সংবর্ধিতরূপে প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। এটি চতুরঙ্গের আগামী নাট্য প্রয়াস। খুব শীঘ্রই এটি মুক্ত অঙ্গনে বরুণ দাসগুপ্তের পরিচালনায় নিয়মিত অভিনীত হবে।

'বলাকা' গোষ্ঠীর "বাড়ীভাড়া" নাট্যাভিনয়

গত ২৫শে বৈশাখ বলাকা-গোষ্ঠী তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ত্যাগরাজ হলে এক মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান ও "বাড়ী ভাড়া" নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। নাটকটির রচনা ও পরিচালনা করেন অরুণকান্তি সাহা ও দিলীপ চৌধুরী। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ কল্যাণ সান্যালের ভূমিকায়—শেখর কুমার, দারোয়ান—মৃণাল ভট্টাচার্য, বিনিময়—রমেশ রায়, সুধীর—সুশান্ত ব্যানার্জি, নন্তু—তাপস রায়, পটলা—অলক মিনা, রাখহরি—মৃণাল ভট্টাচার্য, গুণনাথ—বঙ্কিম দাস, শুভাশীষ—সুপ্রিয়া সাহা, ভজুয়া—নবকুমার, পাগল—রমেশ দাস, এষা—সীমা রায় ও সোনালীর ভূমিকায়—সুচন্দ্রা রায়। সুধীর, ভজুয়া, পাগল ও এষার ভূমিকায় যথাক্রমে সুশান্ত ব্যানার্জি, বঙ্কিম দাস, নবকুমার, রমেশ দাস ও সীমা রায় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয় চরিত্রানুযায়ী। নাটকের নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী দীপালী ঘোষ।

নল দময়ন্তী চিত্রের সেটে পরিচালক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

ফটো : অমৃত

কুমারী ঘোষ দুইখানি রবীন্দ্রসংগীত ভালই গেয়েছেন। তবে রূপসজ্জায়, আলোক-সম্পাতে ও সংগীত পরিচালনায় মনোতোষ রায়, প্রদীপ দেব ও বি, জি, অরকেস্ট্রার কাজ আশানুরূপ নয়।

রঙ্গসভার—দালিয়া

আগামী ৩০শে মে মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রঙ্গসভা, মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে তাঁদের বহুপ্রশংসিত রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে 'দালিয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রপরিচালক পীযূষ বসু। নাটকের নাম-ভূমিকায় ও অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রূপ দেবেন দিলীপ রায়, স্বপনকুমার, ভোলা বসু, চন্দন রায় ও শিবশংকর।

কেন্দ্রীর নাট্য-উৎসব

উত্তর কলকাতায় জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা কেন্দ্রী তিনদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে। এই উৎসব আগামী ৫ই জুন থেকে ৭ই জুন পর্যন্ত মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সেতুবন্ধন', শক্তিপদ রাজগুরুর 'মসনদ' ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠোন' কেন্দ্রীর অভিনন্দ কর্তৃক অভিনীত হবে।

শিশির নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

মেরী ব্রাইট বয়েজ সোসাইটি আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক শিশির নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। দলগত সম্পূর্ণে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মন্ডলের অন্বেষা গোষ্ঠী (নাটক-দ্বীপ) সমভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে মৈহাটির নাবিক (নাটক-রক্তে রোয়া ধান) ও নান্দনিক (সন্ন্যাসী) এবং কল্পরূপ (শুধু ছায়া) শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রমেন লাহিড়ী (নাটক—তমসার তীরে। সংস্থা-ইস্পাত ক্লাব)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রথম বাসুদেব সেনগুপ্ত (দ্বীপ) দ্বিতীয় নিখিল ভট্টাচার্য (রক্তে রোয়া ধান) ও তৃতীয় সুধীন চৌধুরী (ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রথম শিপ্রা সাহা (সন্ন্যাসী) ও দ্বিতীয় মায়া ঘোষ (শুধু ছায়া). শ্রেষ্ঠ পরিচালক বাসুদেব সেনগুপ্ত (দ্বীপ)।

বিহার আর্ট থিয়েটারের নতুন নাটক 'আমরা বাঁচতে চাই'

বিহারের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যসংস্থা বিহার আর্ট থিয়েটার গত ১৪ই মে সন্ধ্যায় স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে তাঁদের এ'বছরের নতুন নাটক 'আমরা বাঁচতে চাই' পাটনার বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের সামনে মঞ্চস্থ করেন। বিহার আর্ট থিয়েটারের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবারের নাটকটিতেও নাট্য-রচনা থেকে প্রয়োগকৌশল সবই নতুন পরীক্ষানিরীক্ষামূলক তাই বৈচিত্র্যময়। কাহিনীটি অনাড়ম্বর তাই সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রযোজনা যেন স্বাভাবিক ও সহজ।

অভিনয়ের দিক দিয়ে পর্বতের ভূমিকায় অজিত গাঙ্গুলী ও সায়ার ভূমিকায় সুষমা সান্যাল অপূর্ব। মংপুর ভূমিকায় ব্রজগোপাল সান্যাল ও হেলা-ফেলার ভূমিকায় সুশীল চক্রবর্তী দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। সমস্ত পরিবেশটি তৈরী করতে আলোর মায়া সৃষ্টি করেছিলেন মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য। নাটকটির সুষ্ঠু পরিচালনা করেছিলেন সুশীল চক্রবর্তী। প্রযোজনা করেছিলেন শ্রীমতী পুষ্প মুখোপাধ্যায় এবং রচনা করেছিলেন শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

ফ্রেন্ডস ক্লাব

সম্প্রতি জরাসন্ধের লৌহকপাটের নাট্যরূপ পরিবেশন করলেন কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানের ডকস্ ম্যানেজার অফিসের প্রমোদ সংস্থা ফ্রেন্ডস ক্লাবের শিল্পবৃন্দ। 'লৌহকপাটে'র নাট্যরূপ দিয়েছেন জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যরূপে মূল কাহিনীর গতি, সংঘাত অব্যাহত থেকেছে সব সময়ে। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ের মধ্যেও বলিষ্ঠতার ছাপ আছে। নাট্যনির্দেশনায় সুশীল চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। ভালো অভিনয় করেছেন যাঁরা, তাঁরা হোলেন রমা দাস (কাঞ্চী) সুনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (মলয়), অশ্বিনী মণ্ডল (গিরিশ), পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (বদর মুন্সী), পবিত্র মুখোপাধ্যায় (কাশেম), সুশীল চট্টোপাধ্যায় (হারল্ড), বেলা রায় (কুন্টীবিবি)।

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্রজয়ন্তী

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তেলিপাড়া বন্ধু মিলন সংঘের উদ্যোগে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি হলে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে শ্রীপ্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমধুসূদন রায়চৌধুরীর পরিচালনায় যথাক্রমে 'ডাকঘর' এবং 'রোগীর বন্ধু' অভিনীত হয়।

'দাবী' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব

আগামী ৩রা জুন, শনিবার সন্ধ্যা ৬॥টায় স্টার থিয়েটারের 'দাবী' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতি এবং কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন।

এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় শিল্পী ও থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মিগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।

দুটি প্রখ্যাত রাশিয়ান চলচ্চিত্র

সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতার উদ্যোগে আগামী ২৭ ও ৩০ মে আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে দুটি বিখ্যাত রাশিয়ান চলচ্চিত্র 'ওথেলো' ও 'ফর্টি ফার্স্ট' প্রদর্শিত হবে।

শ্যাম স্কোয়ার সান্ধ্য মিলনীর রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল প্রাঙ্গণে কবি জন্মোৎসব শ্যাম স্কোয়ার সান্ধ্য মিলনীর সভাবৃন্দ কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য মনোগ্রাহী ভাষণে কবিপ্রতিভার বিভিন্ন ধারার কথা আলোচনা করেন। ভাষণান্তে আশাবরী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত সমবেত রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শ্রীভোলা মুখার্জি ও শ্যামল দত্ত।

সুরেন্দ্রনাথ সমবায় আবাসে অভিনয়ানুষ্ঠান

কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ সমবায় আবাসের অধিবাসীরা সম্প্রতি একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিগুরুর জন্মদিন পালন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল আবাসিকদের দ্বারা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়। অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও সাংবাদিকরা মিলে অভিনয় বেশ প্রাণবন্ত করে তোলেন। বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় অধ্যাপক মনোজ সান্যাল, কেদারের চরিত্রে অধ্যাপক হৃদয়কুমার দত্ত, তিনকড়ির ভূমিকায় অধ্যাপক তরুণকুমার সান্যাল, অবিনাশের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ ধর, ঈশানের চরিত্রে অধ্যাপক গোপাল সিংহ এবং বিপিনের চরিত্রে রূপারোপ করেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

আবাসের ছোটরা কবিগুরুর 'রসিক' ও 'গুরু বাক্য' অভিনয় করে সকলকে চমৎকৃত করে। অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেন অধ্যাপক শংকর রায় এবং পরিচালনা করেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

গত ১৭ই মে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক রাশিয়ান চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার মন্মথ রায়। আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন মৃণাল সেন ও অসীম সোম। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর 'ওথেলো' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এছাড়া 'কার্ণিভাল নাইট' এবং 'ফর্টি ফার্স্ট' ছবি দুটি দেখানো হয়।

সুহৃদ সম্মিতির রবীন্দ্র-জয়ন্তী

১৮ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুহৃদ সম্মিতি (ঢাকুরিয়া) রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। উভয়েই নাতিদীর্ঘ ভাষণে রবীন্দ্র-জীবনী আলোচনা করেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানে সংঘের শিশু বিভাগের সভ্য ও সভ্যারা একক ও সমবেতকণ্ঠে কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করে। অংশ গ্রহণ করেন সমীর ঘোষ, অশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এই অনুষ্ঠানের পর কয়েকটি একক ও সমবেত রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর "খ্যাতির বিড়ম্বনা" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অংশ গ্রহণ করে পার্থ মল্লিক, সুভাষ মজুমদার, চন্দন দত্ত, রতন ভট্টাচার্য, নরেন্দু রায়, বিমলেন্দু রায়, তরুণ ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর বসু, সুব্রত সিংহ, প্রদীপ চৌধুরী। পরবর্তী অনুষ্ঠানটি 'ঋতুরঙ্গ' গীতি আলেখ্যর জন্য চিহ্নিত ছিল। অংশ গ্রহণ করেন ঢাকুরিয়া সুনির্মল স্মৃতি পাঠাগারের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়

গ্রুপ থিয়েটার এতদিন ব্রজ্ঞাঙ্গ ব্যায়ামাগারের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে স্বল্পসংখ্যক দর্শকের কাছে নিয়মিত অভিনয়ের পর এবার মুক্ত-অঙ্গনে, ২৬শে মে '৬৭, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ভাসানো ভেলায়' ও 'শরশয্যায়' নাটক দুটি এই প্রথম যথারীতি মঞ্চস্থ করবেন।

একালের যুবজীবন ও যুবচিত্তের ভাঙাগড়ার নাট্যরূপ আছে 'ভাসানো ভেলায়' এবং তিনপুরুষের মূল্যবোধ আর আদর্শের সংঘাতে পথসন্ধানের প্রয়াস আছে 'শরশয্যায়'। দুটি নাটকেই পাওয়া যাবে নতুনের স্বাদগন্ধ।

চিত্রলিপির প্রথম নিবেদন

সঙ্গীতবহুল চিত্র 'জলতরঙ্গ', চিত্রলিপির প্রথম নিবেদন। দশখানি আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে পরিচালনা করছেন অজিত মুখোপাধ্যায়।

বিচিত্রিতার রবীন্দ্র-জয়ন্তী

বিচিত্রিতা শিল্পিগোষ্ঠী ২৮শে মে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবিগুরুর নৃত্যনাট্য 'নটরাজ' মঞ্চস্থ করবেন আকাদমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন মলয়া চক্রবর্তী ও প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায় ও নৃত্য-পরিকল্পনায় কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

গানের জলসা

গীতালিতে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন শ্রীমতী চায়না বন্দ্যোপাধ্যায়, হারমনিয়ম বাজাচ্ছেন শ্রীমতী শীলা রায়চৌধুরী এবং তবলায় আছেন শ্রীপঙ্কজ সাহা।

দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব

কবির জন্মোৎসব এবং প্রতিষ্ঠানের ঊনবিংশতি প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষ্যে জনপ্রিয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'দক্ষিণী'র সংগঠকবৃন্দ ১৪ই মে ত্যাগরাজ হলে এক সঙ্গীতোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। শান্ত-গম্ভীর পরিবেশে অতি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত এই সঙ্গীতাসর প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতা তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে কবির গানের মর্মবস্তুর যথাযথ অনুধ্যান এবং সুরের শুদ্ধতা যাতে অব্যাহত থাকে শিল্পীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান।

সত্তর মিনিটের অনুষ্ঠানে প্রতিটি মুহূর্ত সুরের পূর্ণতায়, বাণীর গভীর আবেদনে এবং আত্মার অমৃত পিপাসার আর্তিতে যেন ধ্যানের মধ্যে অতিবাহিত হলো। গানগুলি সুনির্বাচিত, সচরাচর শোনা যায় না। এই নতুনত্বের আকর্ষণও কম নয়। সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত থেকে প্রভাত, মধ্যাহ্ন এবং দিবারাত্রের প্রতি প্রহরোপযোগী সঙ্গীত বিভিন্ন ভাবের রঙিন আলোছায়াময় জাল বুনে চলেছিল। গানের মুড উপযোগী একক, দ্বৈত এবং সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনায় বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করে তুলে, উদ্যোক্তৃবৃন্দ তাঁদের শিল্পবোধ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একক সঙ্গীতে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন অমল নাগ, স্নিগ্ধা ঘোষ, হেনা সেন ও সুশীল চ্যাটার্জি।

সুরঙ্গমার সমাবর্তন

"সুরঙ্গমা"র সমাবর্তন ও কবিপক্ষ উদ্‌যাপিত হোলো রবীন্দ্র স্টেডিয়ম প্যাভিলিয়ন হলে। ২৫শে এবং ২৬শে বৈশাখের দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। সমাবর্তন ভাষণদানের পর ১৭ জন স্নাতককে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একক সঙ্গীতের আসরে শ্রীমতী নীলিমা সেন "ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি" এবং প্রসাদ সেন "মম অঙ্গনে স্বামী" গান দুটি গেয়ে শোনালেন।

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব ও সুরের ওপর এক মনোজ্ঞ আলোচনায় বললেন—সুর, বাণী ও তাল অঙ্গাঙ্গী-বিজড়িত; একটির বিচ্যুতি বা অভাবে অন্যেরা অসম্পূর্ণ। তালও ভাবপ্রকাশের অঙ্গ। তালের ছন্দ ও গতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবও পরিবর্তিত হয়—আবার ভাবকে যথাযথ রূপ দিতে হলে সুর ও তালকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

এরপর শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দাসগুপ্ত 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ থেকে "পরিচয়" কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন।

শ্রীসরোজ দাস রবীন্দ্রদর্শন ও সঙ্গীত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—কবি নিজেই বলেছিলেন, "তত্ত্ববিদ্যায় আমার অধিকার নেই।" জীবন ও মৃত্যু তাঁর মতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের পরিপূরক। মৃত্যুর তোরণদ্বার পার হয়ে তবেই জীবনের অমৃতলোকে পৌঁছানো যায়। প্রতি মুহূর্তে আমাদের নতুন করে জন্ম হচ্ছে। এই নব-জন্মের অনুভূতি, রোমাঞ্চ ও আবেগ তাঁর সাহিত্যে, গানে, কাব্যে অনুরণিত। রবীন্দ্র-দর্শনে তাই সাহিত্য, জীবন ও দর্শন এক হয়ে গেছে। এই জীবন এক প্রবহমান ধারার অংশ, অতএব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই এই জীবনকে বুঝতে হলে লোকাতীত জীবনকেও জানতে হবে।

"গতিবাদ" — পাশ্চিমের দর্শনান্তর্গত হলেও ভারতীয় দর্শনে আগন্তুক নয়। ভারতীয় দর্শনেও গতি আছে, তবে সে গতি লক্ষ্যহীন নয়। পরিপূর্ণতায় আমাদের পৌঁছে দেওয়াটাই জীবনদেবতার উদ্দেশ্য। জীবনমালাকারের এই লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস অচঞ্চল রেখে আমাদের চলতে হবে। জীবনে থেকেও জীবনবিবিক্ত বিরাগ্য, শান্তি ও ত্যাগের মন্ত্রেই তাঁর জীবনদর্শন স্পন্দিত। কোথায় পৌঁছাব নিজেই জানি না। এই অজানার সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষা, আনন্দ ও অভিসারের কাব্যরূপেই তাঁর দর্শনের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে" তাই কবি বলেছেন "জয় অজানার জয়।"

পরিশেষে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী—রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করে বললেন, সংস্কার থেকে গম্ভীমুক্ততাই রবীন্দ্র ভাবের মূল কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার জিনিষ নিয়ে তাঁর মানসযাত্রা সুরু হলেও প্রাণের মুক্ত-প্রবাহে সকল সংস্কারের জড়তা ও জীর্ণতাকে ভাসিয়ে প্রগতির আনন্দলোকে কবির আত্মার উন্মোচন ঘটেছে বারে বারে। তাঁর সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, শিল্প ও সঙ্গীতের মধ্যে প্রধান হোলো সঙ্গীত। আবার সঙ্গীতের যে বস্তুর ওপর তিনি জোর দিয়েছেন তা তার আত্মা বা ভাব। ভারতীয় রাগকে বাদ দিয়ে তিনি চলতে চাননি কোনোদিন। কারণ ভারতীয় রাগ ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ। কিন্তু রাগের আঙ্গিকের নিগড়ে, বাদীসমবাদীর কন্টকিত সমস্যায় ও ব্যাকরণের শুষ্কতায় সঙ্গীতের রসবস্তুকে হত্যা করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। "বেহাগ" রাগ শুনলে মনের মধ্যে যে ভাব জাগে সেইটেই চিরন্তন সত্য। প্রাণের এই স্বাভাবিক ধর্মকে বাদ দিলে কৃত্রিমতা এসে পড়বে। তাই গানের কথার 'মুড' অনুযায়ী কীর্তন, টপ্পা, ভাটিয়ালী বিভিন্ন ঢংএর সুর মিশিয়ে গানের ভাবকেই তিনি প্রধান করে তুলতে চেয়েছেন। এইটেই তাঁর সঙ্গীতের মূল কথা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার সময় এই কথাটিই মনে রাখতে হবে।

উপসংহারে সুরঙ্গমার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রাগভিত্তিতে রচিত উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটি সুসমাপ্ত করলেন।

গীতালির রবীন্দ্র জয়ন্তী

কলকাতাস্থিত গীতালির রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৩বি, ললিত মিত্র লেনে। "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" গানটি দ্বারা শ্রীমতী শান্তা সাহা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কন্ঠসঙ্গীতে শিশির সরকার, পূর্বা দত্ত, কল্যাণ মজুমদার, সুনীল সেনগুপ্ত, মিতা দাস-গুপ্তা, অরুণা বসু, চায়না ব্যানার্জী, উত্তরা ব্যানার্জী, শীলা রায়চৌধুরী ও শান্তা সাহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গিটারে গোপাল বসাক, শিবনাথ সাহা ও শ্যাম দাস অংশ গ্রহণ করেন। স্বপন গুহ বাঁশীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বপন গুহের ও শ্যাম দাসের পরিচালনায় গিটারে অংশ গ্রহণ করেন মীরা বিশ্বাস, অর্চনা বসু, শর্মিষ্ঠা বর্মন, স্বপন গুহ, কান্তি-রঞ্জন ঘোষ, তরুণ মিত্র, শিবনাথ দাস। গীতালির অধ্যক্ষ শ্রীপঙ্কজ সাহার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সকলের প্রশংসা লাভ করে।

খেলাধুলা

দর্শক

এফ এ কাপ ফাইনাল

১৯৬৭ সালের বিশ্ববিশ্রুত ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের (এফ এ কাপ নামে সুপরিচিত) ফাইনালে টটেনহ্যাম হটস্পার দল ২—১ গোলে চেলশি দলকে পরাজিত করে এপর্যন্ত মোট পাঁচবার ফাইনাল খেলার সূত্রে পাঁচবারই এফ এ কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে তারা ১৯০১ সালে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে ২—২ ও ৩—১ গোলে, ১৯২১ সালে উলভার-হ্যামটন ওয়াণ্ডারার্সকে ১—০ গোলে, ১৯৬১ সালে লিসেস্টার সিটিকে ২—০ গোলে এবং ১৯৬২ সালে বার্নলেকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে এফ এ কাপ জয়ী হয়েছিল। অপরদিকে চেলশি দলের এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এফ এ কাপের ফাইনাল খেলা এবং দ্বিতীয়বারের রানার্স-আপ খেতাব জয়। ১৯১৫ সালের ফাইনালে তারা ০—৩ গোলে শেফিল্ড ইউনাইটেড দলের কাছে পরাজয় বরণ করে প্রথম রানার্স-আপ হয়েছিল। এফ এ কাপ নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯৬ বছরের ইতিহাসে ইতিপূর্বে লণ্ডন শহরেরই দুই দল একই বছরে এফ এ কাপের ফাইনালে খেলেনি, এ-বছরই তার প্রথম নজির। ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে টটেনহ্যাম হটস্পার ২—১ গোলে নটিংহ্যাম ফরেস্ট দলকে এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে চেলশি ১—০ গোলে লিডস ইউনাইটেড দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। এই চারটি দলই প্রথম বিভাগের ইংলিশ ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার অন্যতম সভ্য। গত বছরের এফ এ কাপ বিজয়ী এভার্টন দল কোয়ার্টার ফাইনালে ২—৩ গোলে নটিংহ্যাম ফরেস্ট দলের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয় এবং গত বছরের রানার্স-আপ শেফিল্ড ওয়েনসডে ০—১ গোলে চেলশি দলের কাছে পরাজিত হয়। ১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ইংলিশ ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দল এ-বছরের এফ এ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠতে পারেনি। লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী নটিংহ্যাম ফরেস্ট দল সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিল। এ-বছরের এফ এ কাপ বিজয়ী টটেনহ্যাম হটস্পার দল লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান পেয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় এই 'এফ এ কাপ' নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৮৭২ সালে। ফুটবল এসোসিয়েশন চ্যালেঞ্জ কাপ এই বিরাট নামের পরিবর্তে 'এফ এ কাপ' নামটাই আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে সুপ্রচলিত। কয়েকজন ফুটবল অনুরাগী ১৮৭১ সালের গ্রীষ্মকালে লণ্ডনের এক সংবাদপত্র অফিসের ঘরোয়া বৈঠকে এই এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সি ডবলউ এ্যালকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর (১৮৭০—৯৫) ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। লণ্ডনের কেনিংটন ওভালে আয়োজিত প্রতি-যোগিতার উদ্বোধনী বছরের (১৮৭১-৭২) ফাইনালে ওয়াণ্ডারার্স দল ১—০ গোলে রয়েল ইঞ্জিনীয়ার্স দলকে পরাজিত করে এফ এ কাপ জয়ী হয়। দ্বিতীয় বছরেও তারা ২—০ গোলে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়কে পরাজিত করে কাপ জয়ী হয়। তারা মোট পাঁচবার এফ এ কাপের ফাইনালে খেলে পাঁচবারই কাপ পায় এবং তারাই সর্বপ্রথম উপর্যুপরি তিনবার (১৮৭৬—৭৮) এফ এ কাপ জয়ের রেকর্ড করে। ওয়াণ্ডারার্স দলের এই রেকর্ড এপর্যন্ত একমাত্র স্পর্শ করেছে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স (১৮৮৪—৮৬)। ওয়াণ্ডারার্স দল শেষ ফাইনালে খেলেছে ১৮৭৮ সালে।

এফ এ কাপ

যে সুদৃশ্য রৌপ্যনির্মিত কাপটি নিয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন তা আর নেই। ১৮৯৫ সালে তার অপমৃত্যু হয়েছে। ঐ বছরে অস্টন ভিলা দলের এফ এ কাপ জয়লাভের পর বার্মিংহামের এক খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জামের দোকানে কাপটি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকেই কাপটি খোয়া যায়। দশ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেও কাপটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অস্টন ভিলা দলের কাছ থেকে ২৫ পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণ আদায় করা হয়। শেষপর্যন্ত প্রতি-যোগিতার প্রথম কাপের অনুরূপ দ্বিতীয় কাপের আবির্ভাব হল। কিন্তু এই দ্বিতীয় কাপটিও এসোসিয়েশনের হাতে রইলো না। ১৯১০ সালে ইংলিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি লর্ড কেনিয়ার্ডের [illegible] উপলক্ষে তাঁকে এই দ্বিতীয় কাপটি উপহার দেওয়া হয়। ১৯১১ সাল থেকে তৃতীয় কাপ নিয়ে আজও প্রতিযোগিতা চলছে। এই তৃতীয় এফ এ কাপটি প্রথম জয় করে ব্রডফোর্ড সিটি (১৯১১ সালে)।

এপর্যন্ত এই আটটি জায়গায় এফ এ কাপের ফাইনাল খেলা হয়েছে—কেনিংটন ওভাল (২০বার), লিলিব্রিজ (১বার), ফলো-ফিল্ড (১বার), এভার্টন (১বার), ক্রিস্ট্যাল প্যালেস (২০বার), ওল্ড ট্রাফোর্ড (১বার), স্ট্যানফোর্ড ব্রিজ (১বার) এবং ওয়েম্বলে (৪৫বার)। সেই ১৯২৩ সাল থেকে লণ্ডনের প্রখ্যাত ওয়েম্বলে স্টেডিয়ামে এফ এ কাপের ফাইনাল খেলার যে ব্যবস্থা হয়েছে, এপর্যন্ত তার কোন পরিবর্তন হয়নি। ওয়েম্বলে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় (১৯২৩—৬৭) সর্বাধিক-বার (৫বার) এফ এ কাপ জয়ী হয়েছে নিউ-ক্যাসল ইউনাইটেড দল। প্রতিযোগিতায় তারা মোট ১০বার ফাইনালে খেলে সর্ব-সাকুল্যে ৬বার কাপ জয়ী হয়েছে।

এফ এ কাপ প্রতিযোগিতার সূচনার (১৮৭২ সাল) ১৬ বছর পর—১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগের ইংলিশ ফুটবল প্রতি-যোগিতার উদ্বোধন হয়। ঐ সময় থেকে (১৮৮৮ সাল) এপর্যন্ত এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মাত্র পাঁচবার (১৮৯৪, ১৯০১, ১৯০৮, ১৯১২ ও ১৯৩১) প্রথম বিভাগের ফুটবল দল এফ এ কাপ জয়ী হতে পারেনি।

বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিকবার জয়:

৭বার—অস্টন ভিলা (১৮৮৭, ১৮৯৫, ১৮৯৭, ১৯০৫, ১৯১৩, ১৯২০ ও ১৯৫৭)।

৬বার—ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স (১৮৮৪-৮৬, ১৮৯০-৯১ ও ১৯২৮)।

৬বার—নিউক্যাসল ইউনাইটেড (১৯১০, ১৯২৪, ১৯৩২, ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৫)।

উপর্যুপরি তিনবার জয়:

ওয়াণ্ডারার্স (১৮৭৬-৭৮) এবং ব্ল্যাক-বার্ন রোভার্স (১৮৮৪-৮৬)।

ফাইনালে সর্বাধিক গোল:

৭টি—ব্ল্যাকবার্ন ৬ : শেফিল্ড ওয়েনস-ডে ১ (১৮৯০)। ব্ল্যাকপুল ৪ : বোল্টন ওয়াণ্ডারার্স ৩ (১৯৫৩)।

ফাইনালে সর্বাধিক গোলে জয়:

১৯০৩ সালে বারি ৬—০ গোলে ডার্বি কাউণ্টি দলকে পরাজিত করে।

ফ্রেঞ্চ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা

বিশ্বের প্রধান চারটি টেনিস প্রতি-যোগিতার মধ্যে ফ্রেঞ্চ হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা অন্যতম। অপর তিনটি—অস্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন (ইংল্যাণ্ড) এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতা। গত

কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ-বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্য বিচার করে যে-বাছাই তালিকা তৈরী হয়েছে, তাতে পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন এবং মহিলা বিভাগের সিঙ্গলসে আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন-কিং শীর্ষ-স্থান লাভ করেছেন। ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জিকে পুরুষ-বিভাগের সিঙ্গলসে ১৬শ স্থান দেওয়া হয়েছে।

ইতালীয়ন টেনিস প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে ইতালীয়ন টেনিস প্রতিযোগিতার স্থান পঞ্চম। তার মাথার উপরে আছে অস্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন, আমেরিকান এবং ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতা। ১৯৬৭ সালের ইতালীয়ন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগান এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ারই কুমারী লেসলি টার্নার খেতাব জয় করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র কুমারী টার্নারই এ-বছরের এই প্রতিযোগিতায় তিনটি খেতাব জয়ী হয়েছেন—মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে। অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগান বর্তমানে ইতালীতে বসবাস করছেন। মুলিগান ইতিপূর্বে ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালে এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মার্টিন মুলিগান (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ০—৬, ৬—৪ ও ৬—১ গেমে ১নং বাছাই এবং গত বছরের বিজয়ী টনি রোচিকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। অপরদিকে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে কুমারী লেসলি টার্নার (অস্ট্রেলিয়া) স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন কুমারী মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল)।

১ মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড

সারে চ্যাম্পিয়ানশিপের আসরে ২৬ বছরের স্কুল-শিক্ষয়িত্রী এ্যানী স্মিথ ৪ মিনিট ৩৯.২ সেকেন্ডে ১ মাইল দৌড় শেষ করে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্বের বিশ্ব-রেকর্ড ছিল নিউজিল্যান্ডের মারিজ স্টিফেন্সের—সময় ৪ মিনিট ৩৯.৪ সেকেন্ড। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইণ্টারন্যাশনাল এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন সরকারীভাবে মহিলাদের এক মাইল দৌড় অনুষ্ঠানের কোন বিশ্বরেকর্ড স্বীকার করেন না।

আন্তর্জাতিক যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইস্তাম্বুলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাশিয়া ১—০ গোলে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করেছে। গতবারের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া এবং ইতালী যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। ইংল্যান্ডের
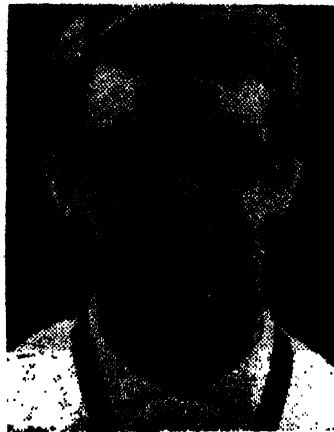
মার্টিন মুলিগান

কপাল খুবই খারাপ। কারণ, গত পাঁচ বছরে ইংল্যান্ড এই নিয়ে ৪বার ফাইনালে খেলে শুধু রানার্স-আপ খেতাবই পেল।

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম রাশিয়া, ২য় ইংল্যান্ড, ৩য় তুরস্ক এবং ৪র্থ ফ্রান্স।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের তিনদিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি: বৃষ্টির দরুণ খেলাটি পরিত্যক্ত হওয়ায় উভয় পক্ষই নিরাশ হয়। তিনদিনের বরাদ্দ খেলায় মাত্র চারঘণ্টার কিছু বেশী সময় পর্যন্ত খেলা হয়েছিল। প্রথম এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে খেলাই হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় দল ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল। বোরদে ৮৪ রান এবং হনুমন্ত সিং ৩৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। ওয়ারউইকশায়ার দল ব্যাট করার সুযোগই পায়নি।

ভারতীয় ক্রিকেট দল : ১৭৭ রান (৪ উইকেটে। বোরদে নট আউট ৮৪ এবং হনুমন্ত সিং নট আউট ৩৩ রান। ব্রাউন ২৯ রানে ২ উইকেটে)।

ভারতীয় দল বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের তিনদিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অসুস্থতার কারণে সারদেশাই এবং চন্দ্রশেখর এই খেলায় দলভুক্ত হননি।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দল ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৩৩৬ রান সংগ্রহ করে চা-পানের পর প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব ১৪৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তিনি ১৫টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। তাঁর ১০১ রান তুলতে ১৬৫ মিনিট লেগেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, পাতৌদি ছাত্রাবস্থায় উপর্যুপরি তিন বছর এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন।
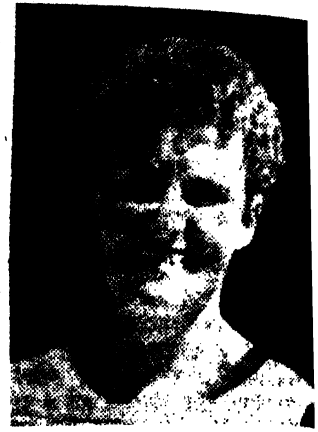
লেসলি টার্নার

প্রথমদিনের খেলার বাকি সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দল ২ উইকেট খুইয়ে ৩৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির দরুণ এক বলও খেলা হয়নি।

তৃতীয় দিনে অর্থাৎ খেলার শেষ দিন ১৩৪ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হ অক্সফোর্ড ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংস ৪ উইকেট খুইয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করেছি তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় তাদের প্রথ ইনিংসের রান ছিল ৯২ (৪ উইকেট কিন্তু লাঞ্চের পর মাত্র ৪২ রানে বাকি ৬টা উইকেট পড়ে যায়। মোহল এক ৩৯ রানে ৫টা উইকেট পান।

ভারতীয় দল : ৩৩৬ রান (৮ উইকে ডিক্লে:, পাতৌদি নট আউট ১৪৪ ইঞ্জিনীয়ার ৫২ এবং বোরদে ৪ রান)।

অক্সফোর্ড দল : ১৩৪ রান (এ খান ৩ রান। মোহল ৩৯ রানে ৫ উইকেট)। ও ৪০ রান (৪ উইকেটে)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত ৯ই মে থেকে কলকাতার ময়দা প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগি শুরু হয়ে গেছে। ২১শে মে পর্য অনুষ্ঠিত লীগের খেলার হিসাবে দেখা য গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল একটা ম্যাচ খেলে (কালীঘাটের বিপক্ষে দু' পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে। অপরদি তাদের চিরকালের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী গ বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাব দু খেলায় ৪ পয়েণ্ট পেয়েছে। বি এন রেলও উপর্যুপরি তিনটে খেলায় জয়ী হয়ে কিন্তু তাদের সহযোগী ইস্টার্ন রেলও তিনটে খেলে তিন পয়েণ্ট নষ্ট করেছে তারা উয়াড়ীর কাছে ১—২ গোলে পরাজি হয়ে এবং বাটা স্পোর্টস দলের সঙ্গে খে ড্র (০—০ গোলে) করে মূল্যবান তি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। মহমেডান স্পোর্টি দলেরও সূচনা ভাল হয়নি—প্রথম খেলায় (জর্জ টেলিগ্রাফের বিপক্ষে) তারা এক পয়েণ্ট নষ্ট করেছে।

ইংলিশ ফুটবল লীগ

১৯৬৬-৬৭ সালের ইংলিশ ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দল ৪২টা খেলায় ৬০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী নটিংহ্যাম ফরেস্ট পেয়েছে ৪২টি খেলায় ৫৬ পয়েন্ট—লীগ চ্যাম্পিয়ান দলের থেকে ৪ পয়েন্ট কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দল এই নিয়ে ৫ বার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হল এবং বর্তমানে তাদের লীগ জয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৭ বার। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দল লীগ জয়ী হয়েছে ১৯০৭-০৮, ১৯১০-১১, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের ফুটবল মরসুমে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ৭ বার লীগ জয়ের রেকর্ড করেছে এই তিনটি ক্লাব—লিভারপুল, আর্সেনাল এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। লিভারপুল শেষ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৬৫-৬৬ সালে এবং আর্সেনাল ১৯৫২-৫৩ সালে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পাওয়াতে প্রখ্যাত অস্টন ভিলা দল আগামী মরসুম থেকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে। প্রথম বিভাগে তারা মোট ৬ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

সমালোচনার ধারা বদলাতে হবে!

কমল ভট্টাচার্য

'স্টপ ইউর হুইসপারিং ক্যাম্পেন'—একথা বহুবার বলেছি, আজও বলছি। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আমার এই সাবধান বাণী তাদের কানে পৌঁছবে কিনা জানি না। ইংল্যান্ড সমালোচকদের মন্তব্যগুলি ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ছোট থেকেই জানতাম ক্রিকেট খেলার খেলা। এখানে খেলাটাই বড়। এটা ট্রু স্পোর্টস। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, আজ বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে এসে দেখছি, ক্রিকেট খেলার সে চরিত্র আর নেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা, ক্রিকেট তার এই চরিত্র হারিয়েছে তার জন্মভূমিতে। সেই ইংল্যান্ডে। আজকের ক্রিকেট সেই সূক্ষ্ম-সুরুচি বা ক্রিকেট রুচির বড় অভাব। It is not Cricket এই কথা বলে যাঁরা ক্রিকেটের নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিতেন, বেদনার কথা তাঁরাই আজ ন্যায়-অন্যায় বোধ হারিয়ে বসেছেন। ক্রিকেট মাঠে দেশের সম্মান ও ইজ্জতকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁরা ক্রিকেটের কথা ভুলে বসে আছেন। ভুলে গেছেন যে এটা অন্য কিছু নয়, ক্রিকেট খেলা— This is Cricket

এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা মনে পড়ল। ইংল্যান্ডে টেস্ট ম্যাচ খেলা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। সেয়ানে-সেয়ানে খেলা। যেখানে মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে সবাই আকুল তখন খেলার প্রথম দিনেই অঘটন ঘটল। ঝড় নেই, জল নেই তবু মাঠে ফাটল ধরল, ভাগ তচনচ হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে সবাই অবাক হলেন। আরও অবাক হলেন যখন ইংল্যান্ডের জিম লেকার অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। কেনো ডাঙ্গায় আছাড় খাবে কে জানত? জিম লেকারের মারাত্মক অফ স্পিনের মুখে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের যে কি দুর্দশা হয়েছিল সে কথা আর কে মনে রেখেছে! কিন্তু লেকারের ১৯টি উইকেট দখলের রেকর্ড চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। সে রেকর্ড কেউ স্পর্শ করতে পারবে বলে মনে হয় না। ইংল্যান্ডের ছল-চাতুরী বোঝা ভার! কিন্তু সেদিন মাঠের সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা তুলে সমালোচকরা কোন মতেই মুখ খোলেননি। কিন্তু কথায় কথায় এ'রা বলে It is not done! It is not Cricket!

মনে পড়ে গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংল্যান্ড সফরের কথা। ইংল্যান্ডের তরুণ খেলোয়াড়েরা যখন হালে পানি পেলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের কাছে, তখন তাঁরা প্রবীণ খেলোয়াড় গ্রেভনীকে দলে নেন। গ্রেভনী কাজ হাসিল করেছিলেন সেঞ্চুরী করে। দলের দুর্দশারও অবসান ঘটাল। কিন্তু যে গ্রেভনী সেঞ্চুরী করে দলের মুখ রক্ষা করলেন সেই গ্রেভনী চক্ষু লজ্জার খাতিরেও একবার মাঠে ফিল্ডিং করতে নামলেন না। কিন্তু কেউ ত' এ সম্বন্ধে কোন কথা বললেন না। এক ঘোরতর অন্যায়কে যাঁরা আড়াল করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু যাঁদের জন্যে এত আকম্বাক তাঁরা মুখে রা কাটেননি। কোন-রকমেই ক্রিকেটের আবহাওয়াকে নষ্ট করতে চাননি। কিন্তু ইংল্যান্ড নিজেদের বাঁচাবার জন্যে রাতারাতি আইন করেছেন। আবার নিজেদের স্বার্থেই সেটা বাতিলও করেছেন। যেমন বডি-লাইন বোলিং। এই বোলিং সুরু করেন লারউড। কিন্তু পাল্টা জবাবে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কনস্টানটাইন আর মার্টিন ডেলর বডি-লাইন বোলিং সুরু করলেন তখন আইন করে এই বোলিং বন্ধ করা হল। সাউথ আফ্রিকার ফাস্ট বোলার গ্রীফিনকে খেলতেই দেওয়া হল না কেননা তিনি ছুঁড়ে বল করতেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চার্লি গ্রীফিথেরও একই অবস্থা। ইংল্যান্ডের সমালোচকরা গ্রীফিথের নীতি-বিরুদ্ধ বোলিংয়ের সমালোচনা করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। এবং সেই হুইসপারিং ক্যাম্পেনের ফলে গ্রীফিথের অপমৃত্যু ঘটল। সে দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে এখানে দেখলাম। দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল এবং রয় গীলক্রিস্টের পা টেনে বল করবার জন্যে নতুন নো-বল আইন সৃষ্টি হল। এ'রা পারেন না এমন কাজ নেই—করেন না এমন কাজ নেই।

কিন্তু ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তাঁরা যে ক্যাম্পেন সুরু করেছেন তার ধারা হল অন্য রকমের। মেরিলীবোর্ণের সেক্রেটারী মিঃ বিল গ্রীফিথের বক্তব্য থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। মিঃ গ্রীফিথ রেডিওর মাধ্যমে তাঁর সাপ্তাহিক ক্রীড়া পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন—"লর্ডসের প্রথম টেস্ট ম্যাচের টিকিটের চাহিদা যথারীতি সন্তোষজনক। এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়।" ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা তুলে মিঃ গ্রীফিথ বলেন—"মে এবং জুন মাসে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকে। এবং ভারতীয় খেলোয়াড়েরা স্বভাবতঃই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীমায় খেলবেন।" তিনি আরও বলেন—"ভারতীয় খেলোয়াড়দের গড়পড়তায় বয়স ২৫। এই তরুণরা কেমন খেলবেন এটা সকলেরই লক্ষ্যবস্তু। যদিও দলের প্রয়োজনীয় ফাস্ট বোলার নেই তবে যা আছে তা উপেক্ষা করার মত নয়।"

এটা প্রচারের যুগ। এ'রা জানেন কিভাবে গুছিয়ে বললে কাজ হাসিল হয়। এ'দের বিচার-বুদ্ধি অনেক। ভারতীয় দলের সম্পর্কে ইংল্যান্ড ক্রিকেট অনুরাগীদের মনোভাব যে খুব সুবিধের নয়, বোধকরি সেই ভয়েই সেখানকার কর্তা ব্যক্তিরা সন্ত্রস্ত। তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয় দলের সম্পর্কে অনেক কথাই বলছেন। কারণ আর কিছুই নয়, ক্রিকেট উৎসাহীদের এই উপেক্ষার মনোভাব না কাটাতে পারলে টেস্ট সিরিজে ঘোরতর অর্থসংকটের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাই ভারতীয় নবাগতদের প্রতি অনুকম্পা না দেখালেই নয়। কিন্তু এর কারণ ঘটেছে কি! সত্যিই কি ভারতীয় দলের শক্তির সম্বন্ধে কোন সংশয় আছে? এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা তাঁদের এল কি করে? কিবা ব্যাটিং—কিবা বোলিং—ভারতীয় খেলোয়াড়েরা কোন অংশে ইংল্যান্ডের চেয়ে কম নয়। আর ফাস্ট বোলিংয়ের কথাটাও বলি। ইংল্যান্ডের ব্যারী-নাইট যদি ফাস্ট বোলার হন তাহলে ভারতের সুব্রত গুহ এবং মোহল কম কিসে!

কিন্তু এরপরও কথা আছে। ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে সেখানে খেলার ফলাফল নিয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সাজে না। যতবড় শক্তিশালী দল হোক না কেন ইংল্যান্ডে জিতবো একথা বড় একটা বলতে কেউ ভরসা করেন না। তার কারণ ছাড়া

সেখানকার আবহাওয়া। বিশেষ করে ভারতীয় দলটির অসুবিধে অনেক। একমাত্র অধিনায়ক পাতৌদি এবং চান্দু বোরদের ইংল্যান্ড মাঠে যা কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

বিখ্যাত খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন বলেছেন—"গ্যারী সোবার্স আমায় বলেছেন, ২২ বছরের চন্দ্রশেখর বিশেষর অন্যতম লেগ-স্পিনার। ভারতীয় দলের পাতৌদি এবং বোরদে ছাড়া ইংলিস উইকেটে আর কারুর অভিজ্ঞতা নেই। তবে এবিষয়ে কোন ভুল নেই যে ভারতীয় দল আক্রমণাত্মক ভঙ্গীমায় খেলতে ভালবাসে।"

কম্পটনের মনে যে সংশয় সেটা উপেক্ষা করার নয়। কেননা ইংল্যান্ডের মাঠে নবাগত খেলোয়াড়দের যে কি চরম অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। একে ত দারুণ ঠান্ডা। তারপর বৃষ্টি। কখনও আলো—কখনও অন্ধকার। কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে সারা মাঠটাকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। খেলতে খেলতে ছুটে আসা। প্যাভিলিয়নে হাত গুটিয়ে বিশ্রাম। বৃষ্টি থামলেই মাঠে নামতে হবে আম্পায়ারের ইসারার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু মাঠে নামলে কি হবে? বৃষ্টির জলে খেলার সমস্ত মেজাজটাকে নষ্ট করে দিয়ে যায়। মাঠের পীচ ঢাকা থাকলেও স্যাঁতসেঁতে থাকে। আলো কম। খেলার এই ছন্দপতন ঘটায় খেলোয়াড়দের মনেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃষ্টির আগে যে ব্যাটসম্যান হাত খুলে মারছিলো তাকে ভেজা মাঠে বেসামাল হতে হবে। দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার দৌড়ঝাঁপ কমিয়ে হাতে কাঠের গুঁড়ো লাগিয়ে বল করলেও সে প্রতাপ তার থাকে না। আর ফিল্ডারদের কথাত বাদ দিলাম। এই হেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় দলের অসুবিধে অনেক। এই অবস্থা মানিয়ে নিতে সময় লাগে।

ভারতীয় অধিনায়ক পাতৌদির কাজ বেড়ে গেল। তাঁকেই এই অসাধ্য সাধন করতে হবে। প্রতিটি খেলায় প্রতিটি পদক্ষেপে অধিনায়কের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। এর জন্যে অধিনায়ককে অনেক ত্যাগ করতে হবে। নবাগত খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের উচিত ছিল ইংল্যান্ডের মাঠে খেলতে অভ্যস্ত এমন একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে পাঠান। ভারতীয় দলের ম্যানেজার তারাপুরের ইংল্যান্ড মাঠে খেলার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু ভারতীয় স্কুল দলের ইংল্যান্ড সফরের ম্যানেজার মনোনীত হয়েছেন ভারতীয় প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় হেমু অধিকারী, যাঁর একাধিকবার ইংল্যান্ডের মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা আছে।

ভারতীয় অধিনায়ক চুপ করে বসে নেই। তিনি ঘন ঘন মিটিং বসিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। তাই তিনি বারবার বলছেন—"আমরা এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। তবে সব সমস্যা মিটিয়ে নিয়ে আমরা যে ভাল খেলব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

ভারতীয় দল এখনও যে সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি তার কারণই হলো বৃষ্টি। এই দারুণ সমস্যাকে কাটিয়ে তুলতে না পারলে ভারতের টেস্ট সিরিজে জয়ের সম্ভাবনা কম। এই সমস্যা মিটিয়ে নিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক যদি তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন এবং টেস্ট সিরিজে জয়লাভ করতে পারেন তাহলে তাঁকে ভারতীয় দলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের সম্মান দিতে কেউ কসুর করবে না। বলাবাহুল্য ইংল্যান্ডের মাঠে টেস্ট ম্যাচ জেতা আমাদের এখনও বাকি রয়ে গেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স ভারতীয় দলের প্রতি যে অভিমত জানিয়েছেন সে কথা বলেই আজকের লেখা শেষ করি। তিনি বলেছেন—"ভারতীয় দলকে এখন তাচ্ছিল্য করা একেবারেই সাজে না। যাঁরা এই ভুল করবেন তাঁরা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনবেন।" তিনি আরও বলেন—"ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনের প্রবলতা বড় কম।" নিজের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে সোবার্স বলেন—"সেঞ্চুরী করতে ক্যাচটি আমাকে ধরতেই হবে, অনেক বাধা সত্ত্বেও বলের নিশানা ঠিক রাখতে হবে, এই কঠিন পণ থাকা ভাল। আমি ক্লান্ত ও বেদনাকে কখনও প্রশ্রয় দিইনি।"

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

সুনীল ভট্টাচার্য

(ইস্টবেঙ্গল)

ব্যাংকক, ১৯৬৭। এশীয় যুব-ফুটবলের শেষে আসর বসলো এক প্রদর্শনী ম্যাচের। চ্যাম্পিয়ন বনাম এশীয় যুব একাদশের। স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভর্তি। যুব একাদশের নেতৃত্ব নিয়ে যিনি মাঠে নামলেন, নাম তাঁর সুনীল ভট্টাচার্য।

সুনীলের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিতভাবে আসে নি, এসেছে ফুটবলে অতন্দ্র সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে। বাংলার ছেলে সুনীল, তাঁর গৌরবে বাংলাও গরবিনী। ভারতীয় যুব দলের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যাংককে গিয়েছিলেন; তার আগে ম্যানিলায়ও একই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ১৯৬৫ সালে টোকিও যুব ফুটবলেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি।

উদীয়মান ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সুনীলের নাম এখন সারা ভারতময়। যুব-স্বচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী সুনীলের ফুটবলের চিন্তাধারা স্বচ্ছ, দূরে দূরে—তাই
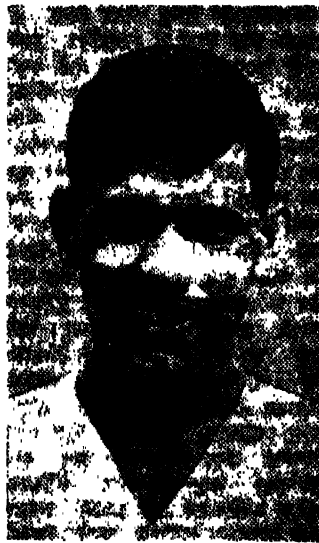
তাঁর হিসেব, জোড়াতালি বা ফাঁকির চোরাগলির পথে পা বাড়ান নি কোন দিন। নিষ্ঠাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো মূলধন, ময়দানে অতন্দ্র তিনি। রক্ষণভাগে মূলে দাঁড়িয়ে স্টপারের ভূমিকা নিয়ে সুনীল যখন মাঠে নামেন—সহযোগী খেলোয়াড়দের মনে তখন নেমে আসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয় কেননা তাঁরা জানেন, সুনীল 'জান' দেবেন কিন্তু দায়িত্বে ফাঁকি দেবেন না। দীর্ঘ বাহু মেলে, বুক চিতিয়ে তিনিই নেবেন সব দায়-দায়িত্বের বোঝা।

সুনীলকে দেখে দেখে তাঁর ওপর আমারও আস্থা বেড়েছে। এটুকু বুঝেছি, সুনীল আগামীতে কিন্তু মচকাবেন না। তেজী সট, নিখুঁত পজিসন জ্ঞান, খেলার ভঙ্গি আক্রমণাত্মক। ডিস্ট্রিবিউসন নজর কাড়ার মত, জোরালো ট্যাকলিং তাঁর। সামগ্রিক বিচারে সুনীল আজকের এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলের দরবারে একটি পরিপূর্ণ সার্থক রূপে নিয়ে দাঁড়াতে চলেছেন।

সুনীল স্বল্পবাক্। কথা আদায় করা তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু কঠিন। কিন্তু যেটুকু বলেন, বেশ গুছিয়ে, ভেবেচিন্তে, ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে।

১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর কলকাতায় সুনীলের জন্ম। আদি বাড়ী কৃষ্ণনগরে। দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতি ইন্সটিটিউশনে স্কুলের পড়াশুনো। চুনী গোস্বামীও এই

স্কুলের ছাত্র ছিলেন একদিন। তীর্থপতিতে ঢোকার আগেই সুনীলকে ফুটবল পেয়ে বসেছিল। ১৯৬২ সালে মণিপুরে আয়োজিত স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পেলেন। বিমলদা আর খোকনদার চেষ্টায় ও উৎসাহে দক্ষিণ কলকাতার লেক মাঠে মিত্র-সম্মিলনীর হয়ে। ১৯৬৪ সালে লেক থেকে সোজা ময়দানের কালীঘাট ক্লাবে। শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য তখন কালীঘাটের কোচ।

সুশীলদাই তাঁর গুরু। আজকের যা কিছু স্বীকৃতি, যেটুকু প্রতিষ্ঠা তার মূলে কোচ সুশীলদার অবদানকে হেঁট মাথায় স্বীকার করেন সুনীল। এর আগের বছরই তিনি ইলিয়ট শীল্ডে খেলার সূত্রে সুশীলদার নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। সুনীল তখন আশুতোষের ছাত্র। মণীন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে সেই ফাইনাল খেলাটি আজও মনে আছে তাঁর। সারা মাঠ জুড়ে সেদিন সুনীলের দীর্ঘ ছায়া। সুনীলকে ডিঙিয়ে যাওয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে সক্ষম হয় নি ইলিয়টের সেই ফাইনালে।

১৯৬৬ সালে কালীঘাট থেকে এলেন ইস্টবেঙ্গলে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কথায় বলতে গেলে 'পয়মন্ত' খেলোয়াড় তাঁদের সুনীল ভট্টাচার্য। 'সুনীল' ওরা বলেন না, আদর করে ডাকেন ঘরের নামে—'লাল্টু' বলে। লাল্টু স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছিলেন কিন্তু খেলাধুলোর চাপে লেখা-পড়া তেমন এগোয় নি। প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় বসবেন ভেবেছিলেন এবার কিন্তু ওদিকে ডাক এলো ব্যাংককের, যুব ফুটবলের। সুনীলের পক্ষে এ ডাকে সাড়া না দেওয়া সম্ভব হয় নি; তাই ফি জমা দিয়েও শেষ-পর্যন্ত কেতাব তুলে রেখে বল নিয়ে ব্যাংককের বিমানে উঠে পড়েন। ব্যাংককে যুব ফুটবল শেষ হোল। ঘরে ফিরে এলেন সুনীল, খেলার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। পাশ-করলেই চাকরী একেবারে পাকা।

মীরকাশিম

(ইস্টার্ণ রেলওয়ে)

'মধুদাকে কি ভুলতে পারি? আমার ফুটবল-জীবনের সঙ্গে মধুদা যে ওতো-প্রোতোভাবে জড়িয়ে আছেন। নিজের সম্পর্কে কিছু বলার আগে তাই বারবার মধুদার কথাই এসে পড়ে।'

জৈষ্ঠ্যের এক তাপক্লিষ্ট, উত্তপ্ত অপরাহ্নে ময়দানের এক প্রান্তে পা ছড়িয়ে বসে ইস্টার্ণ রেলওয়ের মীরকাশিমের মুখে তাঁর নিজের কথা শুনছিলাম একমনে। খাঁটি বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মীর-কাশিম, হাল্কিলের উঠতি ফুটবল খেলো-য়াড়দের প্রায় মুখে ইংরেজীর খৈ ফোটে না;

কথা বলেন শান্ত সংযতভাবে—পুরোপুরি মাতৃভাষায়—বাঙলায়। বাঙালী বলে মীর-কাশিমের গর্বের অন্ত নেই।

বছর পাঁচেক ধরে কলকাতা ময়দানে মীরকাশিমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে—তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ক্রীড়ারীতির সূত্রে। যেটুকু খেলেন বুদ্ধি দিয়ে, মাথা দিয়ে, গায়ের জোরে নয়। বাঁ-দিক থেকে সাপের মত দ্রুত এ'কেবেঁকে বল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যূহ ভাঙ্গার সময় মীরকাশিমের অনুরূপ : অদৃশ্য কি একটা শক্তি যেন ভর করে। দু-পায়ে সমান সট্ আছে, 'হেড' করার ব্যাপারেও কম দক্ষ নন। ডানদিকে প্রদীপ—মধ্যাহ্নের সূর্য, মাঠের সবটুকু আলো যেন তিনিই, বাঁ-দিকে মীরকাশিমকে তাই অনেক যত্নে, অনেক প্রয়াসে নিজের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে; বলা বাহুল্য মীরকাশিম সর্বপ্রযত্নে স্বীয় উপস্থিতিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরবার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন অতন্দ্র সাধনার সূত্রে।

দুটি ঘটনা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মীরকাশিমের মনের মণিকোঠায়। দু' বছর আগে ক্যালকাটা মাঠে আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা। বিক্রম দেবনাথকে কাটিয়ে ওঠাই দায়। মীরকাশিমের সামনে যেন প্রতিরোধের এক পাহাড় তুলে ধরেছেন বিক্রমজিৎ—বীর বিক্রমে। প্রদীপে-কাশিমে একবার চোখাচোখি হোল। শেষ চেষ্টা করলেন অভিমন্যুর মত ব্যূহের ঘেরা প্রদীপ মীরকাশিমের মারফৎ। জার্ণেল, বিক্রমের বেড়া ডিঙিয়ে বল দিলেন মীরকাশিমকে। এগিয়ে যাওয়ার জায়গাটুকু খুবই অল্প, সময়ও হাতে নেই। ডান-পা থেকে বাঁ-পায়ে বলটা নিয়ে একটা আউট-সাইড ডজ করলেন মীরকাশিম, মুহূর্তে বিপুল বিরাট বিক্রম দেবনাথ স্থানচ্যুত, পেছনে মর্মশও তাই, গোল ফাঁকা। তার পরের ঘটনা বোধহয় না বললেও বোঝা যাবে। সবাই সাবাস জানিয়েছিলেন সেদিন মীরকাশিমকে এই গোলটির জন্য, প্রদীপ যুকে টেনে নিয়েছিলেন যোগ্য সতীর্থকে। এই সেই মীরকাশিম। মধুদার হাতে গড়া মীরকাশিম।

১৯৪৪ সালে নভেম্বর মাসে কলকাতার মোমিনপুরে মীরকাশিমের জন্ম। বাবা মীর সাহাদাদ আলি সাহেব যতদিন বেঁচেছিলেন ছেলেকে ততদিন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। লেখা-পড়া এবং সেই সঙ্গে ফুটবল দুই-ই—সেন্ট বার্ণাবাস হাইস্কুলে পড়ার সময়। ১৯৫৯ সালে মধুদা ফর্সা, ছিপছিপে মীরকাশিমকে নিয়ে এলেন হাওড়া ইউনিয়নের কোচ রহমন সাহেবের কাছে। গড়ে-পিটে তুললেন মীর-কাশিমের গায়ে ১৯৬০ সালে দেখা গেল গেলেন এরিয়ানে। পুরো মরসুম খেললেন লীগ এবং শীল্ড। উত্তরপর্বে মীরকাশিমের সামনে এলো সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। ১৯৬০ সালের এশীয় যুব ফুটবলে গেলেন পেডং, পরের বার সায়গণ। সায়গণ ফেরা মীর-কাশিমের গায়ে ১৯৬৩ সালে দেখা মোহনবাগানের জামা এবং ১৯৬৪ সালে ইস্টার্ণ রেলওয়ের। সেই ইস্টার্ণ রেলওয়ের জামা আজও ছাড়েননি, বোধহয় আর ছাড়বেনও না।

ইস্টার্ণ রেলওয়েতে খেলার সূত্রে মীর-কাশিম ১৯৬৫-৬৬ সালে এবং পরের বছর ১৯৬৬-৬৭ সালে জাতীয় ফুটবলের আসরে রেলওয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শেষের বার অবশ্য পায়ে চোট থাকায় ফাইনালে বিজয়ী রেলদলের হয়ে খেলা সম্ভব হয়নি মীর-কাশিমের পক্ষে। জীবনে এটিই হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে বড়ো আফসোস।

দু-দুটি রুশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধেও মীরকাশিম খেলেছেন—ত্রিবান্দ্রমে এবং পাটনায়।

মীরকাশিমের ফুটবল জীবনে বাবাদার প্রভাব অনেকখানি, প্রদীপের ছায়াও বিরাট; কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছেলেবেলার গুরু মধুদার। তাই তো মধুদাকে ভোলা যায় না। ভোলা যায় না ১৯৪৭ সালের এবং ১৯৬৭ সালের ১৫ই আগস্টকেও। ১৯৪৭ সালে এলো দুশো বছরের বন্ধনমুক্তি আর ১৯৬১ সালে মীরকাশিমের জীবনে আর এক বন্ধন—পরিণয়। দুটোর অনেক ফারাক—কিন্তু দুটোই পবিত্র, দুটোই অবিস্মরণীয়।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক মদনমোহন সরকার এই পাহাড়ী শহরে সস্ত্রীক এসেছেন মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে। এসে উঠেছেন ভজতারণ পান্ডের হিল লাইফ হোটেলে।

মদনমোহন ভেবেছিলো গরমের ছুটিতে স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিকায় বেরোবে। কিন্তু যখন সে দেখলো অপর্ণা তাসখেলায় একেবারেই আনাড়ি, বাধ্য হয়েই তখন সে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ধরে এপ্রিল মাসেই বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলো। তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মধুচন্দ্রিকা যাপনের নিরিবিলি অবসরে অপর্ণাকে তাসখেলা শেখানো।

কিন্তু একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, যার নতুন বিয়ে হয়েছে, যে স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে বেরিয়েছে এবং যে এই বয়স অব্দি তাসখেলাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি, তাকে তাসখেলা শেখানো কি অসম্ভব সেটা মদনমোহন ক্রমশ বুঝতে পারছিলো।

নববিবাহের প্রথম প্রণয়রসে সিঞ্চিতা অপর্ণার এখন স্বামীর সঙ্গে ছলাকলার দিকে ঝোঁক। সে কেন তাসখেলা শিখতে যাবে?

ফলত এই পাহাড়ি শহরের ছোট হোটেলের দোতলার ঘরটি মান-অভিমানে, অনুরাগ-কলহে ভরে উঠেছে। মদনমোহন তার বিয়েয় পাওয়া দু প্যাকেট প্লাস্টিকের তাস ছড়িয়ে বসেছে। সেই ফুলশয্যায় রাত থেকে রাতদিন চেষ্টা চলছে; হরতন, ইস্কাবন, চিড়িতন আর রুহিতনের জালে অপর্ণা একেক সময় হাঁফিয়ে উঠছে।

আরেকটা অসুবিধা হয়েছে এই যে, মদনমোহন বিরক্ত বোধ করলেই বলে, 'ধুত্তোরি ছাই।' আর এই কথাটা শুনলেই অপর্ণার ভীষণ হাসি পায়। সেই ছোটবেলায় অপর্ণাদের মফস্বল শহরের বাড়ির উল্টোদিকে একটা নিমগাছের ডালে বসে একটা পাগল সারা সকাল দাঁতন করতো আর কাছাকাছি লোকজন দেখলেই 'ধুত্তোরি ছাই' করে উঠতো। সেই থেকে অপর্ণার এক রোগ এই কথাটা শুনলে হাসি কিছুতে সামলাতে পারে না।

এদিকে মদনমোহন রায় অধ্যাপকসুলভ কায়দায় তাসশিক্ষার একটা রুটিন করে নিয়েছে। যেমন সকালে তাসের সংখ্যা ও রঙ: দুপুরে বিভিন্ন তাসের বিভিন্ন ব্যবহার, বিকালে তাস খেলা কয় প্রকার ইত্যাদি।

এই মাত্র মদনমোহন সাহেব বড় না বিবি বড়—এইটা বোঝাচ্ছিলো অপর্ণাকে। কিন্তু অপর্ণার তখন নজর পড়েছে জানলার ফাঁক দিয়ে [illegible] একটা ফিকে সবুজ রঙের
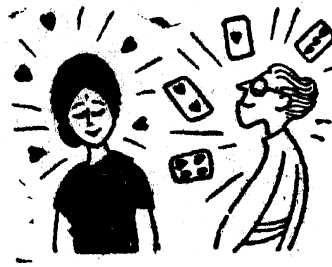
বাচ্চা পাহাড়ের দিকে। মদনমোহন যখন টেক্কা-সাহেব-বিবির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতায় ব্যস্ত, তখন আসলে অপর্ণা কিছুই শুনছে না। মদনমোহন যেই জিজ্ঞাসা করলো, 'শুনলে?' অপর্ণা পাশ কাটিয়ে অনুরোধ করলো, 'চলো না, ঐ ছোট পাহাড়টায় একটু ঘুরে আসি।'

এরকম এই প্রথম নয়, আরো এক হাজার একবার হয়েছে। হতাশ, ক্লান্ত মদনমোহন রাগে, দুঃখে প্ল্যাস্টিকের তাসগুলি যা এতক্ষণ বিছানার উপরে ছড়ানো ছিলো, তুলে নিয়ে সোজা খোলা জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিলো।

পাঁড়েজি অর্থাৎ হিল লাইফ হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পান্ডে এই সময় বাজার করে ফিরছিলেন। তাঁরই চোখের সামনে পাখির পালকের মতো তাসগুলি ছড়িয়ে ছাইগাদার উপরে এসে পড়লো।

একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অপর্ণা। ভীষণ গম্ভীর ও থমথমে মুখ তার। কিন্তু পাঁড়েজির নজরে সেটা পড়লো না। তিনি দেখলেন, মেয়েটি ধীর, স্থির পায়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঐ নোংরা ছাইগাদা থেকে সবক'টি তাস কুড়িয়ে নিলো। তিনি স্পষ্টই লক্ষ্য করলেন যে, মেয়েটির চালচলনে একটি যাদুকরী মহিমা আছে। তিনি আরো অভিভূত হয়ে পড়লেন যখন দেখলেন যে, অপর্ণা তাসগুলি টিউবওয়েলে ধুতে নিয়ে গেলো।

এর আগে পাঁড়েজি প্ল্যাস্টিকের তাস দেখেননি। তাঁর অতিবড় কল্পনাতেও এমন কিছু নেই যেখানে তাসের প্যাকেট জল দিয়ে ধোয়ামোছা করা যায়।

সুটকেশে প্রফেসার এবং সরকার দেখে মদন-দম্পতি সম্পর্কে ম্যাজিসিয়ান বলে প্রথমে তাঁর মনে যে ধারণা হয়েছিলো, জানলা দিয়ে তাস উড়ে পড়া এবং তারপরে এই জল দিয়ে তাস ধোয়া দেখে এবার সেটা বদ্ধমূল হলো।

তার উপরে এই কিছুদিন হলো একটু দূরের জংশন শহরে একজন যাদুকর খেলা দেখাচ্ছেন। পাঁড়েজির হোটেলের একজন খদ্দের বলেছিলো, তিনি নাকি এই শহরেও আসছেন। পাঁড়েজির তখন সেটা বিশ্বাস হয়নি। আজ পঁচিশ বছর তিনি এইখানে হোটেলে ম্যানেজারি করছেন। এই জংলি শহরে যাত্রা এসেছে, সার্কাস এসেছে, থিয়েটার, পুতুলনাচ পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু ম্যাজিক কখনো আসেনি। পাঁড়েজি ম্যাজিকের সত্যিমিথ্যে হাজার হাজার গল্প আশৈশব শুনে এসেছেন, কিন্তু কখনোই ভালো ম্যাজিক দেখেননি।

মদন-দম্পতির হাবভাব, চালচলন দেখে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্বপ্ন এতদিনে সফল হতে চলেছে। এঁরাই ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন।

কিন্তু এই বোকা শহরের লোকগুলোর যা ছিরিছন্দ, ম্যাজিসিয়ান শেষপর্যন্ত ম্যাজিক দেখাবে কি? এই প্রশ্নের খোঁচায় পাঁড়েজি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু উত্তর পাওয়া কি এতই সোজা!

—তারাপদ রায়
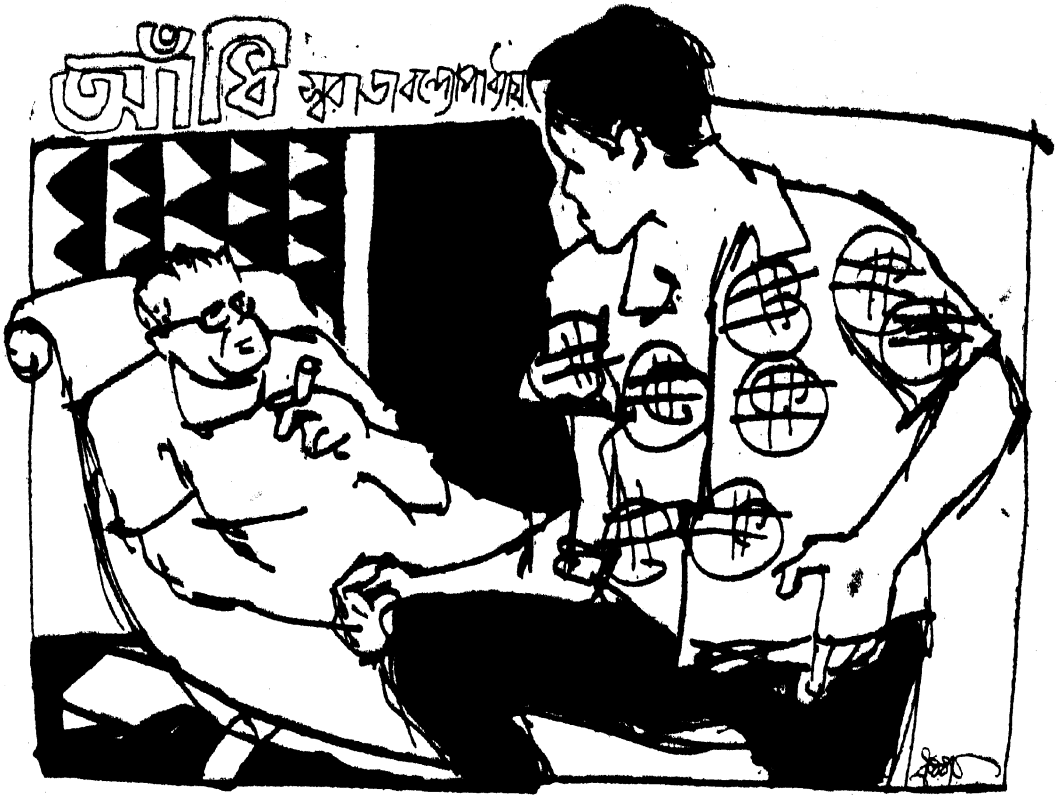
[উপন্যাস]

।। আট ।।

মাস চারেক কেটে গেছে এর পর।

টাইফয়েডে মরণাপন্ন হয়েছিল দীপু। এখন শুধু ভাল হয়ে ওঠে নি। শরীরটাও অনেক ভাল হয়ে উঠেছে। ডাক্তারের কথামত নিয়মিত খাওয়া আর বিশ্রামে শরীরটা বেশ ফিরেছে। আগের চেয়েও ভাল হয়েছে।

বাড়ি থেকে আর বেরোয় না দীপু। ভাল লাগে না। মস্তানী করবার কথা আর ভাবতেও পারে না। এই অসুখের জন্যেই হোক আর যে জন্যেই হোক, ওর দেহে-মনে আর সেই বেপরোয়া উত্তেজনা পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই। সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। ভাবনায় কথায় শান্ত ঠান্ডা একটা ভাব দেখা দিয়েছে। ঠিক ওর মায়ের মত।

অসুখ সেরে যাবার পরে ও নিজেই একদিন শিবুকে বলেছিল,—তোর বইগুলো দিস তো আমায়।

পড়াশুনো করবার যে খুব একটা ঝোঁক এসেছিল তা নয়, ঘরে কাঁহাতক আর বসে থাকতে ভাল লাগে। তাই শিবুর বইগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে চেয়েছিল। শিবু সেবারে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে। বছর খানেক বাকী। দিন-রাত পড়ছে। দাদা বেশ ক বছর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এ সব বইয়ের দাদা বিশেষ কিছু বুঝবে না। তবু বাংলা বই কিছু-কিছু দিল দাদাকে।

দুপুরে বসে-বসে দীপু পড়ত। সেহাৎই সময় কাটাবার জন্যে পড়ত।

বাবা সেদিন এসে দেখল, দীপু শুয়ে-শুয়ে এক মনে একটা বই পড়ছে। অপিস থেকে সকাল-সকাল ফিরেছিল ওর বাবা। শনিবার ছিল। হাতে এক ঠোঙা ফল ছিল দীপুর জন্যে।

ঘরে ঢুকে ফলের ঠোঙাটা তাকের ওপর রেখে জামাটা ছাড়ল, তবু দীপু তাকাল না।

কি এত পড়ছে? এ সময়ে বেশী পড়া উচিত নয়। নাটক-নভেল নয় তো? এগিয়ে এসে বইটার দিকে তাকিয়ে দেখল, উচ্চ-মাধ্যমিক ব্যাকরণ রচনার বই। এ বই এত মন দিয়ে পড়ছে?

বাবা একটু অবাক হোল।

দীপু এতক্ষণে বাবাকে দেখল, উঠে বসল। বইটা পাশে রাখল।

দেখল বাবার চোখদুটোয় যেন নোতুন একটা খুশীর ভাব। বলল,— কিরে, পড়ায় তোর এত মনোযোগ।

কথাটার ভেতরে একটু কৌতুকও ছিল। দীপু বুঝতে পারল। চোখদুটো নীচু করে বলল,—রচনাগুলো পড়তে বেশ ভাল লাগে। তোমার কি এনেছ?

—গোটা কতক আপেল। তোর জিম এনে নীচে রেখেছি।

দীপু মুখটা নীচু করে আস্তে-আস্তে বলল,—আমি আবার পড়ব বাবা।

বাবার দিকে তাকাল। বাবার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার ম্লান হয়ে গেল, —তুই পড়বি? এ বয়সে তুই কি পারবি?

দীপু ও কথার উত্তর না দিয়ে বলল,—আমি শিবুর সঙ্গে পরীক্ষা দোব।

—তুই পারবি না। একে অসুখ থেকে উঠেছিস, তার চেয়ে বরং একটা কাজে-কর্মে ঢুকতে চেষ্টা করলে—

—না, আমি পড়ব। সামনের মাসে আমি কোচিংয়ে ভর্তি হবো।

ওর গলায় বেশ দৃঢ় সুর ছিল।

বাবা অল্প হেসে বললে,—আচ্ছা, বেশ। পরে দেখা যাবে।

বাবা কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল, সে জানত, দীপুর এ একটা খেয়াল। দুদিন পরেই দেহে আর একটু জোর পেলে রাস্তার-আড্ডায় যাওয়া শুরু করলেই সব উল্টে যাবে।

দীপুর মাথায় পড়ার ভাবনাটা এমনি করে হঠাৎ এল, কিন্তু ভাবনাটা কোন মতেই ও আর ছাড়তে পারল না।

কারণ ছিল, ও পড়ো ঘরের আড্ডায় আর যাবে না, মস্তানীতে ঘেন্না ধরে গেছে, ওই হৈ-হল্লা মারপিট করবার সব সামর্থ, মেজাজ কোনটাই ওর আর নেই। চেহারাটা বাইরে দেখতে একটু গোলগাল হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ও বেশ বুঝতে পারে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। আগের সেই উল্লাসের মেজাজ আর কোনমতেই সে ফিরে পাবে না।

মেয়েদের সম্পর্কে তার আর কোন আকর্ষণ নেই। ও জাত বেইমান, জীবনে আর মেয়েমানুষের ধারে-কাছে ঘেঁসবে না।

তবে করবে কি?

একটা কিছু তো তাকে করতে হবে। পড়ার কথাটাও অবশ্য ঠিক আগে থেকে যে ভেবেছিল তা নয়, হঠাৎ বাবার ওই খুশী-খুশী চোখ দুটো দেখে ওর মনে হয়েছিল, শিবুর বইখানা পড়ছে, তাতেই বাবা চোখে খুশী। সে তার পড়াশুনো যদি শুরু করে, তবে তো বাবাকে সে আরও খুশী করতে পারে। তার অসুখের সময় বাবার বিনিদ্র বিষণ্ণ চোখদুটো দীপু ভোলে নি। বাবার উৎকণ্ঠা, রাতের পর রাত জাগা ভোলে নি। এ নিরীহ নীরব মানুষটির জন্যে সে কি কিছুই করতে পারে না?

পড়ার ভাবনাটা পেয়ে বসল দীপুকে। শিবুর বইগুলো বেশ মন দিয়ে পড়া আরম্ভ করল।

পরের মাসে কোচিংয়ে ভর্তি হোল দীপু।

সেদিন দুপুরে কোচিংয়ে বেরোচ্ছিল দীপু, একটু এগিয়েই টোনা আর ধনার সঙ্গে দেখা।

দুজনেই এগিয়ে এল,—এই যে গুরু। কি খবর।

ওরা একটা চিনেবাদামওলাকে ধরে বাদাম নিয়েছিল দু ঠোঙা।

ধনা নিজের ঠোঙাটা দীপুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—লাও ধরো।

দীপু হাসল,—ও সব খাওয়া এখন চলবে না।

—সে কি বস! বাদাম ভী খাবে না, পাত্তা ভী মিলবে না, এ সব কি কথা!

ধনার স্বরে একটু তামাসার ভান ছিল।

টোনা ওকে ধমকাল,—আরে গুরুকে টোন্ মেরে কথা বলবি না। আমরা জানি, অসুখে লেপটে গিয়েছিলে। তোমার বাড়িতে খোঁজ করেছি, কদিন ডেকেছি, এক হারামী বেরিয়ে বলে, এখন দেখা হবে না। ও শালা কে আছে?

দীপু গম্ভীর চোখ তুলে তাকায়। আমার ভাই। তখন আমার খুব অসুখ।

টোনা একটু লজ্জা পেল। চলো এবার ড্যারায় চলো। তুমি নেই, সব তছনছ হয়ে গেল। সেদিন ভুতোটা বেমহল্লায় গিয়ে মারপিট লাগালে। ওখানকার দশ-বারোটা ছেলে বেরিয়ে এল। ব্যস, ওরা তো সব ছপ্পর মেরে ন দো এগারো হয়ে গেল। আমাকে শালা গলতায় ঢুকিয়ে পুরো কাউন্টার বৈঠকী দিয়ে দিলে। তাই বলি, দীপু সাহা হলে কি কাট মারত, না আমাকে ধোলাই দিতে পারত। দীপু সাহা শেরের বাচ্চা।

ধনা চিনেবাদাম চিবোতে-চিবোতে টোনার কথায় সায় দিলে। কেনো শালা পালটি খেয়ে গেল সেদিন, দেখে তো পুরো ঝুড়া বনে গেলাম। চলো গুরু তোমাকে আর ছাড়ছি না।

দীপু হাসল।—না, এখন যেতে পারব না।

—যাবে না তুমি?

—না, এখন একটা কাজে যাচ্ছি।

—কখন আসছ তবে। রাত্তিরে আসছ? মাল রেডি রাখব?

—আমি আর যেতে পারব না। বলে দীপু তাড়াতাড়ি চলতে গেল। ধনা ওকে টেনে ধরলে,—শোন গুরু শোন, চললে কোথা?

দীপু ধমকে উঠল। হাত ছেড়ে কথা বল। চিনিস না আমায়?

ধনা একটু ভয় পেল। দু মাস আগে দীপুকে ওরা বাঘের মত ভয় করত, সে অভ্যাসটা ওদের যায় নি। ধনা হাত ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। কে জানে দীপু খাই করে একটা ঝাপড় কসাতে পারে।

টোনা ওকে ধরে টানল—চল যে চল।

ধনা আর টোনা চলে গেল।

দীপু পালায় নি। ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে কোচিংয়ের দিকে চলতে লাগল।

মনটা ওর ভাল লাগছিল না। ও বুঝতে পারছে, টোনা, ধনা, কেনো, ভুতো ওরা তার প্রত্যাশায় রয়েছে। দীপু আবার ফিরে যাবে ওদের ড্যারায়, আবার ওরা নরক গুলজার করবে, রঙবাজী ক'রে বেড়াবে। দীপুর ওপর ওদের অশেষ ভরসা। দীপু ছাড়া ওদের ভেতর দুর্দান্ত সাহসী আর একজনও নেই। থাকলে আছে ওই কেনো। কেনো বরাবরই ওকে একটু হিংসে করত। ওর চেয়েও বেশী কেতা দেখাতে গিয়ে দু-চারবার ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। দু-চার জায়গায় মার খেয়ে ফিরে এসেছিল। দীপু গিয়ে আবার তাদের ঠেঙিয়ে দিয়ে এসেছে। তাতে কেনো খুব খুশী হোত না। মুখটা কালো করে বসে থাকত। দীপুর কথা অমান্য করবার চেষ্টা করত মাঝে-মাঝে। দীপুকে বাধ্য হয়ে ওকে মধ্যে-মধ্যে দু-চারটে কোঁতকা ঝাড়তে হোত। টোনা ধনা হাসত, কেনো মার খেয়ে চুপ করে থাকত।

এখন বোধহয় কেনো ওদের 'বস' হয়েছে। কেনোর তালিমে চলাফেরা করছে ওরা। পারবে না, বেশী দিন চালাতে পারবে না। কেনোটা ভীষণ বোকা, মাথায় কিসসু নেই, চেহারাটা বেঁটে হোঁতকা, কিন্তু সাহস বড় কম। ওর সবচেয়ে বড় দোষ বড় বেশী নেশা করে। বোতল ফাঁক করে দেয়। দু-চার ছিলিম গাঁজা একা উড়িয়ে দেয়। চোখ দুটো সব সময়ই লাল। সব সময়ই নেশার ঘোর ভাবটা থাকে। সেইজন্যেই কেনো বেদম মারপিটে খুব সুবিধে করতে পারে না। মুখে তড়পায়। পরে মার খেয়ে পালায়।

পালাতে গিয়ে একবার প্রায় ধরা পড়েছিল, পরে নিজের ডাঁট বজায় রাখবার জন্যে পুলিশের বিবরণ দিয়ে বলেছিল।

—প্রথমে খোঁচড় দেখে সাটু মেরে গেলাম, তারপর ইদিক-উদিক দিয়ে খোঁচড়ের কাছে এগিয়ে হাতে একটা টালি ধরিয়ে দিলাম। ব্যস শালা খোঁচড় পোড় বনে গেল।

শুনে দীপু টোনা ওরা হেসেছিল। নিজের বুদ্ধির বাহাদুরি দেখাচ্ছে কেনো পুলিশকে একটা আধুলি দিয়ে কম করেছিল। রেলা মারবার আর জায়গা পায় নি। ধনা নিজে চোখে দেখেছে ও পোঁ-পাঁ দৌড়ে একবারে মহল্লার পার হয়ে গেল। ভাগ্যিস গলি-গলতা দিয়ে কেটে ছিল। নয়তো পুলিশের গাড়িতে ধরা পড়ত।

কেনোটা আস্ত একটা গাধা!

যাক গে, যা খুশী করুক ওরা। দীপু আর যাবে না। দৌড়-ঝাঁপ হৈ-হল্লায় ঘেন্না ধরে গেছে ওর। আর নয়। আর একটুও উৎসাহ পায় না ও। ঠিক বুঝতে পারে না, ও কি দুর্বল হয়ে পড়েছে, না কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভাল করে বুঝতে পারে না। এইটুকু বোঝা যায় যে মস্তানীর কথা ভাবলে ওর একটুও ভাল লাগে না, ভীষণ ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। চুপচাপ থাকতে যেন বেশী ভাল লাগে। শান্ত স্তব্ধতায় চুপ করে শুয়ে থাকতে সবচেয়ে ভাল লাগে অথবা কোন বই পড়তে বসলে।

কেন, কে জানে। কারণ দীপু জানে না। জানবার কোন প্রয়োজনও নেই। যতদিন ভাল লেগেছিল দীপু চূড়ান্ত মস্তানী করেছে, এখন ভাল লাগছে না। ও আর ওসব করতে পারবে না।

ইতর ছোটলোক।

মালার ওই ছোট কথা দুটো মাঝে-মাঝেই ওর মাথায় ঘুরপাক খায়। এই কথা দুটোর জবাব দিতে হবে।

তবে কি মালার এই কথার জবাব দেবার জন্যেই সে পড়াশুনোয় মন দিতে চায়। পড়াশুনো করে দেখাতে চায় যে, সে ইতর নয়, ছোটলোক নয়। তাদের বাড়ির অনেকের চেয়ে সে শিক্ষিত ভদ্রলোক।

এমনি একটা জেদ কি তার মনে-মনে দানা বেঁধেছে? হবে হয়তো। স্পষ্ট বুঝতে পারে না। অত বেশী ভাবতেও চায় না। পড়তে সে চায়। পড়তে তাকে হবেই। এ ছাড়া অন্য কোন কাজে সে এখন মন বসাতে পারবে না।

মাস চারেকে ও বেশ খানিকটা এগোতে পেরেছে। শিবুর সঙ্গেই ও পরীক্ষা দেবে। শিবু ওর চেয়ে পড়ে অনেক বেশী। বরাবরই শিবু বই খাতা নিয়ে বসে থাকতে ভালবাসে। পড়ুয়া ছেলে, ভাল ছেলে শিবু। শিবুর কাছ থেকেও কিছু সাহায্য হয়তো পাবে। ভেবেছিল শিবুর কাছ থেকে অনেক পড়া বুঝে নেবে, কিন্তু পারল না। শিবুর মুখের ভাবভঙ্গী দেখে বুঝল ও বিরক্ত হচ্ছে। বিরক্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। শিবুর নিজের পড়ার ক্ষতি করে তাকে বসে-বসে বোঝাতে যাবে কেন?

নিজেই পড়া শুরু করল দীপু। শুধুমাত্র কোচিং ছাড়া আর কারো সাহায্য নিল না।

প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধে হয়েছিল, ক্রমেই আর তেমন অসুবিধা হচ্ছে না।

মাস চারেক কেটে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কোচিং থেকে ফিরছিল দীপু। দু প্যাসেজ ট্রানস্লেশন করে মাথাটা ধরেছে একটু।

আস্তে-আস্তে পথ চলছিল। খানিকটা হেঁটে এসে একটা ছোট পার্কে বসল। খোলা হাওয়ায় পার্কে বসলে মাথা ধরাটা কমে যেতে পারে। বাড়ি গিয়ে নটার ভেতর খেয়ে নিয়ে আবার পড়তে বসবে। রাত একটা-দুটো—যতক্ষণ না ঘুম পায়, ততক্ষণ পড়তে থাকবে। পরদিন ভোরে উঠে আবার পড়া।

ধীরে-ধীরে এই অল্প সময়েই অনেক কথা সে ভুলে যেতে পেরেছিল। মাত্র মাস পাঁচেক আগের জীবনের ভয়ঙ্কর উন্দামতা ধীরে-ধীরে বিস্মৃত হয়ে আসছিল। এত তাড়াতাড়ি ভোলবার কথা নয়। কিন্তু দীপুর দেহ-মন এমনভাবে উল্টে-পাল্টে-বদলে গিয়েছিল যে ও ভেতরে ভেতরে অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। হতে পারে হয়ত অসুখের জন্যেই তার এই পরিবর্তনটা স্বাভাবিক হতে পারছিল। তা নইলে কি হত বলা যায় না। তখন যদি ওই মরণাপন্ন অসুখ তার না হত, তবে তার এই দৈহিক দুর্বলতাটা হয়ত থাকত না।

কে জানে, হয়ত আবার পড়ো ঘরে যেত। আবার পেটো ঝাড়ত নিরঞ্জন দত্তর ঘরে। তারপর থানা পুলিশ। নয়ত মাস দুয়েকের মত কলকাতা থেকে পালাতে হত!

ভাবতে গেলে ঘেমে ওঠে দীপু। কি হোত তাতে, শেষ পর্যন্ত কিছুই হত না। জীবনটা বরবাদ হয়ে যেত।

মাঝে মাঝে দীপু বড় ক্লান্তি বোধ করে। বড় দুর্বল মনে হয় নিজেকে। মাথাটা মাঝে-মাঝে ধরে। বেশ যন্ত্রণা হয়। যখনই মাথাটায় যন্ত্রণা হয়, তখনই বড় ক্লান্ত মনে হয়, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। অসুখ সেরে গেছে, শরীরও ভাল হয়েছে, কিন্তু এই রোগটা তার কোনমতে যাচ্ছে না। ডাক্তারকে বলেছিল, ডাক্তার বলেছে, এটা সারতে সময় লাগবে।

পাশের একটা বেঞ্চিতে বসে একটা নিঃশ্বাস ফেলল দীপু।

নির্জন এই ছোট পার্কটায় ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলা করে। সন্ধ্যার পর খুব কম লোক এ পার্কে আসে। একটা গাছের নীচে আধা অন্ধকারে দুটো লোক বসে রয়েছে। আর এ পাশের বেঞ্চিটায় দীপু।

দীপু লক্ষ্য করে নি, লোক দুটো উঠে আস্তে-আস্তে ওর দিকে এগিয়ে এল।

চার দিকে বড়-বড় বাড়ি। বাড়ির ছায়ায় আর গাছ-গাছালীর ছায়ায় অন্ধকার জমেছিল পার্কের ধারে-ধারে। এ সব রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলে না। লোকজনও কম। গরমে সেদিন গাছের একটা পাতা নড়ছে না। পুজোর আগে ভাদ্র মাসের ভাপসা গরম।

লোক দুটো বেঞ্চির কাছে এসে দাঁড়াল।

একজন দীপুর পিঠে একটা বেশ জোরাল চাপড় মেরে বলে উঠল,—কি ইয়ার, এখানে কেন?

দীপু চমকে তাকিয়ে দেখল কেনো। কেনোর চোখ দুটো টকটকে লাল। মুখে মদের গন্ধ। হতে পারে মাঠের এক ধারে বসে ওরা বোধহয় মদ খাচ্ছিল। নয়ত বা কোন শিকারের তালে ছিল। কেনো বরাবরই ছেনতাই পছন্দ করে। আজও ছেনতাই-মেনতাইয়ের তালে হয়ত ছিল।

কোন কথা না বলে দীপুর গর্দানটা চেপে ধরে কেনো তড়পে উঠল,—বল, শালা এখানে কেন? আমাদের পিছুতে লেগেছিস, কিনা বল?

দীপু হকচকিয়ে গেল, সে কেনোর পিছু নেবে কেন? তার কি প্রয়োজন।

—কি বে, মুখে বাত নেই কেন? শালা মস্তানী ছেড়ে ভেবেছিস সব বিলা করে দিবি? শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে গলায় তকতি ঝুলিয়ে দিবি।

দীপু কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে কেন ওদের কথা সব ফাঁস করতে যাবে, ওদের জেলে পাঠাবে? এ সব কি বলছে কেনো। নিশ্চয় কেনো তার নামে এই সব বদনাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

দীপু উঠতে গেল, কেনো ওর গর্দানটা চেপে ধরে রইল।

—তোর জন্যে শালা লতু মরেছে। গলায় দড়ি দিয়েছে।

চমকে উঠল দীপু। লতু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে! কবে? কেন? তার জন্যে মরেছে? কেন, সে তো লতুকে মরতে বলেনি। এ সব কি বলছে কেনো!

—লতুকে মেরেছিস, আমাদের ভী শ্বশুরবাড়ি পাঠাবি, কি মতলব করেছিস বে? এই ধনা—

দীপু ঘাড় কাত করবার চেষ্টা করে দেখল তার পেছনে ধনা ততক্ষণে একটা ছ' ইঞ্চি লম্বা ছুরি বার করে ফেলেছে।

দীপুর দেহের ভেতর শির-শির করে উঠল। মুহূর্তে পুরোন বিষাক্ত রক্ত শিরায়-শিরায় নতুন করে বইল। মেজাজ টং হয়ে উঠল। ভুরু দুটো কোঁচকাল।

শালা ধনা ওর সামনে গজ চমকাচ্ছে! যে ধনা তার লাথির ঝাড় খেয়ে কুত্তার মত উপুড় হয়ে পড়ত। সেই ধনা দীপু সাহার নাকের সামনে গজ চমকাচ্ছে!

গলার ভেতর ঘড়-ঘড় করে উঠল দীপুর, গর্জন করে উঠল,—অত নেশা দিয়ে বাত বলবি না কেনো!

বলে এক ঝটকায় কেনোর হাত থেকে ঘাড় ছাড়িয়ে নিয়ে ডান হাতে মুখে ঘুসি মারবার ভান করে বা হাতে তলপেটে একটা ঘুসি মারল। এ সব কৌশল এখনো দীপুর আয়ত্তে আছে।

কেনো ছিটকে সামনে পড়ে যন্ত্রণায় বেঁকে কুকড়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। ধনা গজ গুটিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চম্পট।

দীপু কেনোর দিকে একবার তাকাল। ঘর্মাক্ত মুখে খাতা-বই তুলে নিয়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ি ফিরে এসে বই-খাতা রেখে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে ওর। বিশ্রী লাগছে। এ কি বিপদ হয়েছে, সে কিছু না করলেও তার পেছনে এরা লেগে থাকবে। যেখানে যখন দেখা হবে। একটা না একটা ঝামেলা করবে? উঃ! এ কি ভীষণ জাল! যে জাল একদিন নিজে বিস্তার করেছিল, সে জাল থেকে আজ নিজে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কি দুঃসহ অবস্থা! সে চায় না, আর চায় না, কোনকিছু চায় না আর, শুধু নিজের মনে একান্তে বসে-বসে পড়াশুনো করতে চায়, আর মাঝে-মাঝে ক্লান্তি এলে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোতে চায়। উপায় নেই। বললে শুনছে কে?

সে কি একবারও কেনোকে বা ধনাকে স্পষ্ট করে বলেছিল, সে আর তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, তাদের উল্লাসে আর উল্লসিত হতে চায় না? না, সে বলে নি, কেন বলে নি? তার তো পরিষ্কার বলা উচিত ছিল। না, বলে নি সে। বলতে কেমন একটা সংকোচ বোধ করেছে, এ কথা বলার মানে এদের অনেক খাট করা। নিজের অতীতকেও খাট করে দেখা। কথাটা স্পষ্ট করে বললে ওরা সহ্য করতে পারবে না। ওদের মুখ শুকিয়ে যাবে, ওরা আহত হবে। আজ একটু আগে কেনোকে যে মারটা সে দিল, তারচেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেত, ওই কথাটা বললে, যে কথাটা তাকে মালা বলেছিল।

ইতর ছোটলোক!

ও নিশ্চয় বলতে পারে কেনো ধনা টোনা ভুতো ওরা কেউই ইতর নয়। ছোট-লোক নয়। বরং অনেক ভদ্দর লোকের চেয়ে ওরা অনেক ভদ্দর। ওরা ভালবাসতে জানে, যাকে ভালবাসে তার জন্যে জান দিতে জানে। এক কথায় দু-দশ-বিশ টাকা কাউকে দিয়ে দিতে জানে। কথা দিলে কথার মান রাখতে জানে।

ছোটলোক কাকে বলে জানে না দীপু। তবু ও বেশ বুঝতে পারে, এরা ছোটলোক নয়।

কেনো আজ কেন তার সঙ্গে মারপিট করতে এসেছিল দীপু বোঝে। দীপুকে এরা ভালবাসে, দীপু তাদের কাছে আর আসবে না, দীপু তাদের এড়িয়ে চলবে, ছেড়ে দেবে, এইটে ওরা কোনমতে সহ্য করতে পারছিল না। দীপু তাদের আপন মানুষ। দীপুকে তারা ছেড়ে দিতে পারবে না। হয় দীপু তাদের হয়ে থাকবে, নয়ত দীপুর দুনিয়ায় থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। ওকে একদম খতম করে দেবে। এখনি আজই যদি দীপু আবার পড়ো ঘরে যায়, ওরা আনন্দে হল্লা শুরু করে দেবে।

ভালবাসলে তাকে ওরা ছাড়তে চায় না। দীপু হয়ে গেছে একেবারে উল্টো। ও আর কারও ভালবাসার দরদ চায় না। ভালবাসাকে দীপু ভয় করে। এই একটি মাত্র ভয় ওকে পেয়ে বসেছে।

তবু ভালবাসা তাকে চারদিক যেন চেপে ধরছে। লতু গলায় দড়ি দিয়েছে। এই আরেক ভালবাসার চোট। সে চায় না, তবু চারদিক থেকে তাকে চোট করছে। লতু মরতে গেল কেন? লতুকে তো সে স্পষ্টই বলেছিল, সে তাকে চায় না। কোন দিন লতুকে চায় নি। তবু কেন লতু তাকে চাইল, এমন ভয়ানকভাবে চাইল।

কি ভীষণ জাল। এ জাল থেকে বেরো-বার কি কোন পথ নেই?

সবাই ষড়যন্ত্র করে তাকে জখম করে চলেছে!

দীপুর মাথার যন্ত্রণাটা কিছুতেই কমছে না আজ। গলায় দড়ি দিয়েছে লতু। দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে দম বন্ধ হয়ে মরেছে। চোখ দুটো হয়ত ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছিল, হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে শূন্যে ঝুলে কি ভয়ংকর দেখতে হয়েছিল ওকে কে জানে! কবে মরল? এক মাস আগে। না সাত দিন আগে?

লতুর জন্যে কেনোর এত দরদ কেন। লতু কি তবে কেনোকেও হাত করবার চেষ্টা করেছিল? কেনোকে লেলিয়ে দিয়ে তাকে খতম করবার চেষ্টা করেছিল? হতে পারে। লতু বড় জাহাঁবাজ মেয়ে।

ছিপছিপে শ্যামলা রঙের মেয়েটা শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিল?

দুনিয়ার হালচাল কি পাল্টে গেল?

দীপু মস্তানী ছেড়ে দিল, লতু গলায় দড়ি দিল, কেনো তাকে খুন করবার মতলবে এগিয়ে এল। কি হোল এ সব।

স্তম্ভিত হয়ে শুয়ে-শুয়ে ঘামতে থাকে দীপু।

একটি অটুট যৌবন নিঃশেষ হয়ে গেল দুনিয়া থেকে। লতু আর নেই। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে লতু।

কথাটা কেবলই বার-বার ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভগবান যদি থাকে, তোমাকেও আমার মত কাঁদতে হবে হাঁ!

কানের কাছে স্পষ্ট কান্নার ফোঁপানি শুনতে পাচ্ছে দীপু।

ভগবান যদি থাকে, তোমাকেও আমার মত গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে!

এ কথাও কি মরবার আগে বলেছিল লতু? উঃ কি ভীষণ শয়তান!

সমস্ত শরীরটা ঝিম-ঝিম করে উঠল দীপুর। হাত-পাগুলো কেমন অবশ লাগছে। ভয়ে-ভয়ে উঠে বসল দীপু। হাত-দুটো ঝাড়ল, মাথাটা ঝাঁকাল, উঠে দাঁড়াল। এক গেলাস জল খেল ঢকঢক করে।

কে জানে কেমোটা এখনো পার্কে ...ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে কিনা, কোতকা ...খেয়ে মরে যায় নি তো!

আবার শরীরটা ঝিম-ঝিম করে উঠল। ...তাড়াতাড়ি এসে একটা বই খুলে বসল দীপু।

না, মরতে পারে না। হাড় শক্ত ওদের, ...বিশ-তিরিশ রকম ঘুষি হজম করবার তাগদ আছে ওদের। মরবে না। কি বাজে ভাবনা ভাবছে সে! না হয় একটু পরে পার্কে গিয়ে একবার দেখে এলে হয়। কি হবে? কোন দরকার নেই। একটু পরে উঠে পড়ো ঘরে চলে যাবে। নয়ত টোনা ধনা এসে তুলে নিয়ে যাবে। যত বাজে ভাবনা তাকে পেয়ে বসছে।

অ্যানালাইজ দি ফলোয়িং প্যাসেজ—

অ্যানালিসিসটা ভাল করে করতে হবে ...কে। ছাকা নম্বর। একবার বুঝতে পারলে ...বে সোজা।

ভগমান যদি থাকে, তোমাকেও আমার ...ত গলায় দাঁড়—

ধুত্তোর যত বাজে ভাবনা। মরবার আগে ...প্রাণ আইঢাই। তখন কি আর কেউ কারুকে ...প-মাপ দিতে পারে। আর দোষ তার ...কিছু নেই। সে তো লতুকে মরতে বলে নি। ...কোনদিন বলে নি। নিশ্চয় কেনোর সঙ্গে ...কোন লটঘট করে মরেছে।

শোয়িং কম্পোনেন্ট ক্লজেজ—

ক্লজ দেখাতে হবে। সেনটেন্সটা কি ...কমপ্লেক্স, না কম্পাউন্ড? মানেটা ঠিক ...বোঝা যাচ্ছে না।

—তোর জন্যেই লতু গলায় দাঁড় দিয়েছে।

এই ধরনের কি একটা কথা কেনো ...বলল। বলুক। ওটা বলে কেনো নিজের ...দোষ ঢাকতে চায়। চার-পাঁচ মাস যে ওদের ...এখানে যায় না। এই চার-পাঁচ মাসে নিশ্চয় ...কেনোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছিল ...লতু। নইলে ওর লতুর জন্যে অত দরদ ...কেন? লতু মরেছে বলে ওর দীপুর ওপর ...এত রাগ কেন? দীপুকে মারতে এল কেন? ...তার মানে কেনো সকলের কাছে দেখাতে ...চায়, বোঝাতে চায় লতু তার জন্যেই মরেছে, ...অসম্ভব। তার জন্যে মরতে পারে না। সে ...লতুর মুখে এমন কথা কখনো শোনে নি। ...বরং মালা মাঝে-মাঝে বলত, তাকে বিয়ে না ...করলে সে মরে যাবে। দীপুর কথাটা শুনে ...ভয় হত। মালা মরতে পারে, বিশ্বাস করা ...যায়, কিন্তু লতু বড় জাঁদরেল মেয়ে। ভাঙে ...তো মচকায় না। উল্টো হল, মচকায় তো ...ভাঙে না। লতু ভেঙে পড়ে না। কোনদিন ...ভেঙে পড়ে নি। একদিন—শুধু একদিন ও ...লতুর কান্না দেখেছিল।

ভগমান যদি থাকে, তোমাকেও গলায় ...দাঁড়—

মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। মাথার যন্ত্রণা ...মে গিয়ে ভীষণ হাল্কা লাগছে মাথাটা।

যদি এমন একটা কথা লতু বলেই ...থাকে। সে গলায় দাঁড় দিতে যাবে কেন? ...কার জন্যে? মালার জন্যে? ওই বেইমান ...মেয়েটার জন্যে? কখনো না। সে চায় না ...কারুর। কাউকে চায় না।

গলাটায় একবার হাত বোলায় দীপু। ...গলাটা ঘেমেছে। হাতটা ঠাণ্ডা লাগছে। উঠে গিয়ে আর এক গেলাস জল খায়। আবার এসে গ্রামার বইটার সামনে বসে।

বাবা ঘরে ঢোকে। অফিস থেকে ফিরেছে বাবা। হাতে একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা দীপুর সামনে এগিয়ে বাবা বলে, এই নে, তোর তিনখানা বই এনেছি। এক বইয়ে কি দুজন পড়া হয়।

বইয়ের প্যাকেটটা বাবার হাত থেকে নিয়ে দীপু আস্তে বলে,—শিবুর অসুবিধে হয়।

—তোরও অসুবিধে হয়। দুজনের আলাদা বই না হলে পড়া হয় না। ভাল করে পড়া আরম্ভ কর। দ্যাখ যদি পাশ করতে পার।

পাশ দীপু করবে। ও মনে-মনে নিশ্চয় জানে, পাশ ও করবে। নতুন বই তিনখানা পেয়ে ও যেন বেঁচে যায়। এই বই নিয়ে চোখ-মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দীপুর।

।। নয় ।।

কলকাতার আকাশে সূর্য আরও অনেকবার উঠল, অনেকবার অস্ত গেল।

বারোটি শীত, বারোটি বসন্ত কেটে গেল। সুদীর্ঘ এক যুগে বহু জীবনে যুগান্তর ঘটে গেছে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা এত দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, সময় তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে পারছে না। মাত্র বারোটা বছরে মানুষ যেন ভয়ংকর তীব্রগতিতে এগিয়ে চলেছে। মাত্র গতকাল যা ছিল, আজ তাকে আর কোন মূল্য দিতে পারছে না। কালকের ভাবনা আজ অতীতের আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

বারো বছর আগের শহর কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার কোনদিক থেকে তুলনা করা চলছে না আর। জীবনের ভাবনা আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। রিফ্যুজি কলোনীগুলো পাকাপোক্ত হয়েছে, কলকাতার দেহখানা লম্বা-চওড়ায় ক্রমেই ফুলে-ফেঁপে উঠছে। তবু রাস্তায় মানুষের ভিড়ে পথ চলা যায় না। মানুষ কিলবিল করছে সর্বত্র। স্বার্থ, ক্ষমতা, লোভ-লালসায় শহর কলকাতার অলি-গলি আরও পিচ্ছিল আরও ভয়ংকর।

শহরের মহল্লায়-মহল্লায় আরও মস্তান গজিয়েছে। এখন অনেক বেশী প্রকাশ্যে খুন-জখম রাহাজানি চলছে। মানুষ দিন-দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। মেজাজ টং হয়ে আছে।

দীপুর আর কোন ক্ষোভ নেই। ও জানে, ওরা একদা যা শুরু করেছিল, সেইটেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, অকারণে নয়। কারণ তখনও ছিল, এখন সে কারণ আরও প্রকাশ্য আরও প্রকট।

স্বার্থ, ক্ষমতা, লোভ, লালসা। দীপু মনে-মনে ভয় পায়। ভবিষ্যৎ বড় ভয়ংকর মনে হয় ওর।

অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করেছে দীপু। ভাবনাগুলো ওর কাছে এমনি রঙীন হয়ে আসে না। অর্থনীতির চশমা পরেই ও সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভাবতে বসলে ও কোন কূলকিনারা দেখতে পায় না। এ দেশের অর্থনীতির কোন নীতিই খুঁজে পায় না দীপু।

দীপু এই ভাবনাই ভাবে। কিন্তু কিছু করবার উপায় খুঁজে পায় না।

বারো বছর আগে শিবুর সঙ্গে ও পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রথম পরীক্ষা। তারপর কলেজ। কলেজে ঢুকে শিবু বেচারী বিশেষ সুবিধে কিছু করতে পারল না। শুধুমাত্র মুখস্থ আর বেশী পড়ার ওপর উঁচু শিক্ষা চলে না। শিবু বি-এ ফেল করল একবার। দ্বিতীয়বারে পাশ করে আর পড়ল না। একটা ব্যাংকে চাকরিতে ঢুকে পড়ল। অফিসারও নয়, কেরানীও নয়, মাঝামাঝি একটা সুপারভাইজিং পদে।

দীপু বি-এতে অর্থনীতিতে অনার্স পেল।

খবর নিয়ে যেদিন সকালে বাড়ি ফিরল দীপু, বাবার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মনটা কারুণ্যে ভরে উঠেছিল। বাবার এত-দিনের স্তব্ধ-নীরব নিরাশ চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর পিঠে হাত রেখে ওকে কাছে টেনে আনল।

—তুই অনার্স পেয়েছিস!

দীপুর মনটা ভাল ছিল না। শিবুটা সেবার ফেল করেছিল।

তবু বাবার গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠেছিল, বলেছিল,—যা তোর মায়ের ফটোর সামনে প্রণাম করে আয়।

মায়ের একটি ফটো তার মনে গাঁথা রয়েছে। মৃত্যুর আগে মায়ের ঠাণ্ডা শান্ত বড় বড় চোখদুটো। দীপুর দিকে তাকিয়েছিল, কি যেন বলতে চেয়েছিল দীপুকে। বলা আর হয়নি।

মায়ের সেই ফটোকে ও বারবার প্রণাম করে, বাবা সে-খবর জানে না।

দীপু তবু বাবার কথা রাখবার জন্যে একটু এগিয়ে আবার ফিরে জিজ্ঞেস করল, —শিবু কোথায় বাবা?

—ও তো এখনো ফেরেনি। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই। পাশ ও করবেই।

দীপু মুখটা নীচু করে বলেছিল,—ও পাশ করতে পারেনি বাবা।

—শিবু পাশ করতে পারেনি?

—না। দেখি, শিবু কোথায় গেল।

ভাইয়ের জন্যে মনটা ওর অস্থির হয়ে উঠেছিল। শিবুটা বড় ভেঙে পড়বে। মনটা ওর ভাল লাগছিল না।

শিবুকে ও বরাবরই ভালবাসে আর এটাও ও জানে শিবু তার সম্পর্কে কিছুটা ঈর্ষান্বিত। আজও তাই। এখনো শিবুর ফিরতে দেরী হলে দীপু না খেয়ে বসে থাকে। শিবুর শরীর খারাপ হলে তখুনি ডাক্তার নিয়ে আসে। এই ভাই ছাড়া আজ আর তার কেই বা আছে! কেউ নেই।

পরের বছর শিবু বি-এ পাশ করল। নিজেই ব্যাংকে একটা চাকরি জোগাড় করে চাকরিতে ঢুকে পড়ল।

দীপু ওকে বারণ করেছিল—এখনি চাকরি করবি! পড়াটা চালিয়ে গেলে পারতিস।

শিবু ম্লান হেসে বলেছিল—আমার দ্বারা আর ওসব হবে না দাদা। ধর, এত

পড়ে পরীক্ষার সময় সব গুলিয়ে যায়। তাছাড়া এ-চাকরিটা ভাল। উন্নতি আছে; কি হবে আর পড়ে।

শিবু যেন খানিকটা দমে গিয়েছিল। দমে হয়তো যেত না, পড়াও ছাড়ত না, পরীক্ষায়ও এত গোলমাল করত না, এ-সবই ঘটেছে। পাশাপাশি দীপুও পড়ছে। বরাবরই খুব পড়ুয়া ভাল ছেলে বলে ওর একটা অহঙ্কার ছিল। দীপু পড়া শুরু করবার পরও মনে মনে হেসেছিল এবং দীপুর দিকে একটা চোখ রেখে পড়াশুনো করছিল, দীপুর চেয়ে অনেক ভাল ফল তাকে দেখাতেই হবে। পড়ার চিন্তার চেয়ে দীপুর চিন্তাটা ওকে বেশী পেয়ে বসেছিল আর সেইজন্যেই পরীক্ষার ফল ক্রমাগত খারাপ হতে লাগল। যত খারাপ হতে লাগল, ততই একটা অব্যক্ত মর্মদাহে জ্বলতে লাগল শিবু। দাদা ওর চেয়ে ভাল ফল দেখাচ্ছে কি করে ও ভেবে পেল না। এই ভাবনা ভাবতে গিয়ে পড়ার ভাবনাটা অনেক কমে এল। পরীক্ষা দিতে বসে দীপুর চেয়ে ভাল লিখতে হবে ভাবতে গিয়ে আরও গুলিয়ে ফেলল। শেষকালে হাল ছেড়ে দিতে হোল। না, পড়াশুনো আর করবে না শিবু। তার চেয়ে বরং চাকরিতে উন্নতি করবার চেষ্টা করা ভাল।

এমনিই হয়। সংসারে মাঝে মাঝে সব যেন ওলটপালট হয়ে যায়। সেই দীপু যার আজ মদে আর জুয়ায় পুরোপুরি ডুবে যাবার কথা ছিল, অথবা কোন খুনখারাবি করে জেলে পচে মরবার কথা ছিল, সে বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে অনার্স পেল। আর মিতভাষী গম্ভীর শান্ত একটি ভদ্রলোক হয়ে উঠল। বই আর বই। বইয়ের নেশায় পেয়ে বসল দীপুকে। এই এক নেশা। দীপু বেশ বুঝাতে পারে। এও এক নেশা। বই হাতের কাছে পেলে ওর খাওয়া-নাওয়া ভুল হয়ে যায়। এক অদ্ভুত আরামে সময় কাটে। যা-কিছু মনকে আচ্ছন্ন করে তাই নেশা। মদ নেশা, মেয়েমানুষও নেশা, টাকা নেশা, পাণ্ডিত্যও নেশা। যা-কিছু মত্ততা আনে, স্বচ্ছ মনকে আচ্ছন্ন করে, তাই নেশা।

এক নেশা ছেড়ে আর এক নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে দীপু। উপায় নেই। একটা কোন নেশা ছাড়া মানুষ বাঁচে কি নিয়ে?

এরপর এম-এ পাশ করল দীপু। পাশ করলে কি হবে, বইয়ের নেশা তাকে এখন পেয়ে বসেছে। ও আরও পড়তে চায়, আরও জানতে চায়, আরও ভাবতে চায়। ভাবনটা ওর তখনো একমুখী। অর্থনীতি আর সমাজনীতি।

কেন ও এই ভাবনা ভাবতে চায়, ও জানে। বিগত জীবনের গ্লানির কথা ও ভুলে যায়নি। ও সেই গ্লানির কারণ খুঁজে বার করতে চায়। সমাজ যাকে আবর্জনা মনে করে, সে আবর্জনার সৃষ্টির উৎস খুঁজে বার করতে চায়।

ও জানে, কেনো আজ জেলে। একটা খুনের কেসের আসামী। টোনা ভুতো বোম্বাই চলে গেছে। সেখানে নাকি তারা রাজার ব্যবসা করে। একজন রাজাবাহাদুর সেজে বসে, অন্য দু-চারজন মক্কেল ধরে আনে। তারপর মক্কেলদের জুয়ায় বসিয়ে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেয়, প্রয়োজন হলে ছোরা-ছুরি চালায়। ভুতোটা বিয়ে করেছে। পাঁচ-ছ'টা ছেলেপিলে নিয়ে একটা সাইকেল সারাবার দোকান খুলে বসে সামান্য রোজগারে হিমসিম খাচ্ছে। ভুতোর কাছ থেকেই ও সব খবর পেয়েছিল।

কেন? কেন এরা মানুষের মর্যাদা পায় না? ও জানে, ও এদের অন্তর দিয়ে জানে, এরা কেউই বোকা নয়, দুর্বল নয়, হীন নয়। তবু কেন এরা এমন একটা ঘৃণ্য অবস্থায় এসে পড়ে?

ভাবনাটার গোড়া ধরে টানতে চেষ্টা করে দীপু।

প্রাণশক্তির কি ভয়াবহ পরিণাম। প্যাশন—দুর্দমনীয় প্যাশন মানুষের আদিম বৃত্তি। জান্তব পর্যায়ে মানুষ যখন ছিল, তখন থেকেই এই প্যাশন তার একমাত্র সম্পদ। এই প্রাণশক্তির উল্লাস যখন সমাজে সোজা কোন পথ পায় না, তখনই বাঁকা-চোরা অলিগলিতে অন্ধকারে তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়।

কি ভয়ঙ্কর প্যাশন! কি অদম্য উল্লাসের অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। উল্লাসের তাড়নায় চারদিকে তাকিয়ে ও নিজেও এক-দিন পথ খুঁজে পায়নি। না, কোন পথ খুঁজে পায়নি। তার দুর্দান্ত প্যাশনকে সংহত করবার মত কোন ভরসা সে পায়নি। মা মারা যাবার পরে সংসারটা শূন্য হয়ে গেল। বাবার হতাশ চোখদুটোয় জীবনের কোন ভরসার চিহ্নমাত্র ও দেখতে পায়নি। ও সুতীব্র প্যাশনের তাড়নায় তখন বিভ্রান্ত হয়ে এক অন্ধকার গহ্বরে কোন পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছিল। ওর অটুট প্রাণশক্তি নিয়ে উন্মত্তের মত এগিয়ে চলল যে-কোন নীতি যে-কোন আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। হয়তো শেষপর্যন্ত ভীষণ উল্লাসে চলতে চলতে শেষপর্যন্ত আছড়ে গিয়ে পড়ত সেই অন্ধকার গহ্বরের এক অন্ধকারতম কোন কঠিন প্রান্তে। কিন্তু তার আগেই একটা ধাক্কা খেল। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে এসে পড়ল গহ্বরের বাইরে।

আর একটি প্রাণশক্তির ধাক্কা—সে প্রাণ-শক্তির নাম মালা।

দীপু স্তব্ধ বিস্ময় নিয়ে ভেবেছে, বহুদিন ধরে ভেবেছে, কেন সমাজের এই প্রাণশক্তির অপচয়?

কারণ ছিল, কারণ আজও রয়েছে।

সমস্ত দেশটার সামনেই যে কোন ভরসা নেই, কোন আদর্শ নেই, নীতি নেই। ভরসার কথা হয়তো ছিল, সে সেটা আজ শুধু কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের জন্যে মানুষের প্রেম নেই, অন্যের জন্যে সামান্যতম ত্যাগ নেই, কোন শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভাবনা নেই।

ভেবে কোন কূলকিনারা পায় না দীপু।

দীপু অর্থনীতির যেটুকু জেনেছে, তার বিচারে খতিয়ে দেখেছে, এখানে অর্থ-নীতি বিপর্যস্ত, প্রায় ধ্বসে পড়বার মুখে। কারণ অনেক। বহু কারণের ব্যাখ্যায় দিনের পর দিন শুধু ভেবেছে দীপু। কিন্তু করবার কিছুই নেই।

এম-এ পাশ করবার পর ও অস্থির … উঠেছিল, কিছু একটা করতে হবে। … প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে বার ক… হবে। কোন নতুন ফর্মুলা, কোন গবে… একটা কিছু ভাবতে হবে, একটা কিছু … করতেই হবে।

নানা বইয়ের স্তূপের ভেতরে প্রায় … ছিল কিছুদিন।

বাবা একদিন বললে, এম-এ পাশ … এখন কি করবি।

ও বেশী কথা বলেনি, বলেছি… একটা কিছু করতে হবে।

ওর একটা কিছুটাকে বাবা ভুল … বলেছিল—তা তো বটেই। একটা কিছু … করতেই হবে। একটা প্রফেসারী—

একটু স্পষ্ট করে বলেছিলো দীপু … ও-সব নয় বাবা, কিছু পড়াশুনো … ভাবছি।

বাবা অবাক হোল।—এরপর আ… পড়াশুনো কি? আমি দু' মাস … রিটায়ার করব। শিবু কি সব খরচ চাল… পারবে। তাছাড়া আমার আর একটি ক… রয়েছে।

দীপু চুপ করে ছিল।

বাবা আস্তে বললে—তোদের … দেয়াটা আমার কর্তব্য। এভাবে আর ক… দিন চলবে? আমারও বয়েস হয়ে আসছে…

দীপু বাবার দিকে তাকায়। বা… চোখেমুখে সেই হতাশার ছায়া।

—তোদের মা নেই, কথাটা … আমাকেই বলতে হোল।

বিয়ে! দীপু বিয়ে করবে। কোন মে… মানুষকে, আবার সেই মেয়েমানুষ!

দীপু নড়েচড়ে বসে। অসম্ভব। বি… করা তার পক্ষে অসম্ভব।

তবু বাবার আশা-ভরসাকে মর্যা… দিতেই হবে। আজ অনেকগুলো বছর … সে বাবার চোখের এই হতাশা মুছে ফেল… চেষ্টাই করেছে। এই হতাশা দেখলে সে … পায়। আজও সে এই হতাশা সহ্য কর… পারে না।

ও আস্তে আস্তে বলে—বেশ তো বাব… শিবু বিয়ে করুক।

বাবা ওর দিকে তাকায়।—তুই বি… করতে চাস না?

আবার বলে দীপু—শিবুকেই বি… দিন।

বাবা একটু সময় চুপ করে থেকে … বেশ তবে শিবুর বিয়ের চেষ্টা করতে হ… কিন্তু বিয়ে করলে সংসার চালাবার … টাকা দরকার হবে। তোকে তো একটা … করতে হবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। শিবু বিয়ে … শিবুর রোজগারে সংসার চলবে না। … রিটায়ার করলে আরও চলবে না। দীপু… একটা কিছু করতেই হবে। বাবা কোন… কারো ওপর জোর করে না। সেদি… দীপুকে বিয়ে করবার জন্যে আর এক… অনুরোধ করল না। জোর করল না। … সংসারের আর্থিক দিকটা তার যে … কর্তব্য এইটুকুই মনে করিয়ে দিল।

দীপু যা ভেবেছিল, তা হোল না…

…রেছিল, অর্থনীতি আর সমাজনীতির …বেষণায় নিজের সব শক্তি নিঃশেষে প্রয়োগ …বে। কিন্তু হোল না।

আবার ভাবে, তাতেই বা কি লাভ …তে। তার কথা কেউ শুনত না। পাগলাকে …কো ডুবাতে বারণ করলে পাগলা মুচকি …সে বলত, ভাল কথা মনে করিয়ে …য়েছিস। নৌকোটা ডোবাতেই হবে।

কত মহৎ মানুষ তো কত কথাই বলে …লো, কতবার একই কথা বলে গেল। তবু … আর সে-সব কথা শুনল। কেহবা …ঝল। তন্নতন্ন করে পড়ে ভেবে দেখেছে … মাত্র একটি দুটি কথাই বড় বড় মানুষ … গেছে, মানুষকে ভালবাস, আর …ষের ভালবাসায় নিজের সর্বকিছু ত্যাগ …। আরও ছোট করে বললে বলা যায়, … আর প্রেম। দুটো কথাই মাত্র বলা …ছে বারবার যুগের পর যুগ। হাজার … ধরে মাত্র এই দুটি কথা বারবার …জেদের জীবনে দেখিয়ে গেছে। তবু তার … পরিণাম!

সেই স্বার্থ, লোভ, ক্ষমতা, লালসার …য়ত কামড়াকামড়ি।

দীপু মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ে মাঝে …। কি হবে এ-সব ভাবনা ভেবে, পড়া- …না করে গবেষণা করে। থাক এখন। … লাভ নেই। কেউ শুনবে না। কেউ …বে না।

এরপরেই ওর এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের …রিশে একটা মস্ত কমার্শিয়াল ফার্মে …রি পেল দীপু। কমার্শিয়াল অ্যাড- …সর। ইমপোর্ট, একসপোর্ট, মার্কেট, …স, এই সবের ওপর তার স্কীম দিতে … কাজটা পড়াশুনোর এবং অর্থনীতির …গুলো সিদ্ধান্তের কাজ।

বাড়ি এসে বাবাকে জানাল,—চাকরি …ছি বাবা।

বাবার পাশে বসে শিবু হিসেবের খাতা …ছিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলে,—কি চাকরি, কত …ন?

শিবু তাকাল। দীপু বলল,— …র্সিয়াল এ্যাডভাইসর। এখন বারোশ' … দেবে। ছ মাস পরে কনফার্মেশন হবে। … হাজার টাকা দেবে তখন।

দেড় হাজার! পনেরোশ' টাকা! বাবার …টো স্পষ্টই সজল হয়ে উঠল। শিবু … নীচু করে বসে রইল।

দীপু আস্তে-আস্তে বলল,—শিবুকে … দিন। শিবুর হাতে সংসারে আমি মাসে … টাকা দোব।

শিবুর মুখটা এবার উজ্জ্বল দেখাল। … নীচু হয়ে একটা প্রণাম করল শিবু। … আবেগে ও বেশ বিহ্বল হয়ে পড়ে- … দাদার মত দাদা তার। এক কথায় …ভাইয়ের হাতে হাজার টাকা তুলে দেবে। …বিশ্বাস এই ভালবাসা কি একটুখানি। … অঙ্কে ভালবাসার বিচার করল শিবু। … তাই করছে।

…খনো শিবু আর শিবুর স্ত্রী রমলা …বলতে অজ্ঞান। দীর্ঘ চার বছর কেটে …এর পর। বাবা মারা গেছে। শিবু

বিয়ে করবার মাস ছয়েক পরেই বাবা বিছানায় পড়ল। আর মাস দুয়েকের ভেতরে মারা গেল। বাবার মৃত্যুর পর দীপু নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল নিজের ভেতর। আপিসে যাওয়া, আপিস থেকে এসে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনোয় সময় কাটিয়ে দেয়া—এ ছাড়া আর কিছু করবার কোন আকাঙ্ক্ষা আর তার রইল না।

বাবার মৃত্যুর পর ওরা বাসা বদলাল। একটা ফ্ল্যাটে উঠে এল। বাইরের দিকের বড় ঘরখানা রইল দীপুর। ঘরে শুধু বইয়ের স্তূপ আর ছোট একটা খাট পাতা। দুখানি চেয়ার একটা ছোট টেবিল ঘরের এক কোণে। আপিস আর এই ঘর। দীপুর দিন কাটছিল এই দুটি মাত্র জায়গায়। কাটছিল ঠিকই, কিন্তু ধীরে-ধীরে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ওর মুখের রেখায় ফুটে উঠছিল।

রমলা মেয়েটি বড় ভাল। দাদার সুবিধে-অসুবিধের দিকে তার সস্নেহ নজর সব সময়। দীপুর জন্যে রমলা একটা আন্তরিক মমতা অনুভব করত। ঠিক শ্রদ্ধা নয়, শিশুর মত স্নেহ-মমতাবোধ করত। দীপু মানুষটা ভারী অসহায়। দেখলে কেমন বেদনা বোধ হয়। কতদিন রমলা শিবুকে জিজ্ঞেস করেছে—তোমার দাদা বিয়ে করে নি কেন, জান?

—কি করে জানব! দাদা বরাবরই ওই রকম খামখেয়ালী।

রমলা কিন্তু শিবুর উত্তরে সন্তুষ্ট হত না।

বাবা দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছিল শিবুকে। মেয়েটি এমন কিছু রূপসী নয়। খাঁদা-বোঁচা মিষ্টি-মিষ্টি মুখখানি। ছোট-খাট মানুষটি রমলা। চোখদুটি দেখলেই বোঝা যায়, খুব চতুর। খাটবার শক্তিও ওর খুব বেশী। ভোর থেকে উঠে সংসারের সমস্ত কাজ নিজে হাতে করবে, তার ওপর সেলাই, কেনাকাটা, আত্মীয়তা ভদ্রতা সব একা সামলাবে।

বিয়ের বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই একটি মেয়ে হয়েছে। তারপর বন্ধ, আর হয় নি।

রমলা মেয়েটাকে খুব ছোট থেকে ইচ্ছে করে দীপুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। দীপু হয়ত বই পড়ছে, দোরের কাছে এসে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে রমলা সরে পড়ে। মেয়েটা হামা-গুড়ি দিতে-দিতে এগোয় মুখে শব্দ করতে-করতে, থপ করে গিয়ে একটা বইয়ের পাতা চেপে ধরে। দীপু তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে মেয়েটিকে তুলে ধরে। বই ছিঁড়ো না মা! তারপর বাধ্য হয়ে কিছুটা সময় মেয়েটাকে কোলে রাখতে হয়, সামলাতে হয়। বেশ কিছু সময় পরে রমলা ঘরে ঢুকে যেন আকাশ থেকে পড়ে,—ওমা গো! মেয়ে কখন এখানে চলে এসেছে আমি টেরও পাই নি। কি অসভ্য মেয়ে!

দীপু হাসে। একটা চুমো খেয়ে বলে, যাও এবার মায়ের কাছে যাও।

এই হাসিটুকু দেখবার জন্যেই রমলা সামান্য একটু মিথ্যের আশ্রয় নেয়। দীপুর মুখে হাসি দেখতে পেলে রমলার মনটা ভারী ভাল হয়। [illegible]

সুনিপুণ কৌশলে দীপুর ন্যাওটা করে তোলে।

বছর দুয়েক হল ছোট একটা গাড়ি কিনেছে দীপু। তাও ওই মেয়েটার জন্যেই। রমলা শিখিয়ে দিয়েছিল কিনা কে জানে। মেয়েটা মাঝে-মাঝেই দীপুকে জ্বালাত,—এট্টা মোটর গাড়ি চড়ব জেঠু।

দীপুরও একটা গাড়ি কেনবার ইচ্ছে ছিল। ছোট একটা গাড়ি কিনে ফেলে। মেয়েটাকে নিয়ে মাঝে-মাঝেই বেড়াতে যায়।

রমলা বড় মিষ্টি চতুর মেয়ে। ধীরে-ধীরে দীপু শিবু দুজনকে আয়ত্তে এনে সংসারটিকে বেশ মনোরম করে তুলেছে।

এমনি করেই হয়ত আরও বহু বছর কেটে যেতে পারত, কিন্তু তা কাটল না।

সেদিন সকালে আলু ভাজা কফি নিয়ে রমলা দীপুর ঘরে এসে দাঁড়াল। দীপু পড়ছিল। রমলাকে দাঁড়াতে দেখে মুখ তুলে আস্তে বলল,—আমাকে কিছু বলবে?

—আপনার আর কদিন ছুটি আছে দাদা?

—সামনের দশ তারিখে জয়েন করব।

একটু উসখুস করে রমলা বললে,—রুনুটাকে এ বছর ইস্কুলে দিলে হত না?

রুনুর বয়েস খুবই কম, তিন বছর ছাড়িয়েছে মাত্র। দীপু একটু সময় চুপ করে থেকে আস্তে-আস্তে বলল,—

—এখনি স্কুলে দেবে? তা কে-জি'তে দিতে পার।

—তাই বলছিলাম। আপনি যদি ওকে নিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসতেন।

—এখানে ভাল কে-জি আছে?

—আছে। ঠিকানা আছে আমার কাছে।

—বেশ যাবো। রুনুকে খাইয়ে-দাইয়ে দাও।

রমলা হাসতে-হাসতে ভেতরে চলে গেল।

দীপু আবার বইয়ে চোখ নামাল। এত অল্পবয়েসে স্কুলে দেয়াটা তার খুব ভাল লাগে না। এই বয়েসের মুক্ত অস্থিরতাকে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে শিশুমনের ওপর খুব ক্ষতিকর প্রভাব হয়। তবু আজ-কাল এই হালচাল হয়েছে। ছোট থেকে পড়েই ছেলে-মেয়েরা কেন লেখাপড়ায় দিগগজ হয়ে উঠবে না।—এই আক্ষেপ। ধৈর্য নেই, কোন-মতে তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ে মানুষ করে তুলতে পারলে বাঁচে। ফল হয় উল্টো। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েসে গোটা কুড়ি-বাইশ বইয়ের বোঝা বইতে-বইতে স্নায়ুগুলো ধ্বসে যায়। না পারে ভাল করে পাশ করতে, না পারে সবল সুস্থ হয়ে ভবিষ্যতে বাঁচতে।

আজকাল বইয়ের চাপে ছেলে-মেয়েগুলো যেন ফ্যাকাশে দুর্বল পঙ্গু হয়ে উঠছে।

বৌমা যখন বলেছে, যেতে হবে। তেমন বুঝলে রুনুকে ভর্তি করবে না দীপু। বরং নিজে কিছুক্ষণ পড়াবে।

দশটা নাগাদ রুনুকে নিয়ে বেরোল দীপু। নিজের ছোট গাড়িটা নিজেই চালায় দীপু। রুনুকে পাশে বসিয়ে গাড়িতে উঠল। ঠিকানাটা নিয়েছিল। কিছুটা দূরে স্কুল।

—জেঠু।

রুনু ডাকল দীপুকে। দীপু গাড়ি

—আমি ইট্‌কুলে যাব।

—হ্যাঁ।

—আট্টামটাই মারবে?

আবার হাসল দীপু। না-না, মারবে কেন? ভালবাসবে।

মেয়েটা ভারী চালাক। পটপট করে কথা বলে। বাড়িতে এই একটিমাত্র তিন বছরের মানুষ, যার সংগে এক-আধ সময় আড্ডা মারে দীপু। অকারণ অর্থহীন কথা বলে। তাছাড়া আর কেউ দীপুর সংগে বেশী কথা বলতে সাহস করে না। অনেককাল ধরেই দীপু খুব গম্ভীর, অকারণে কারো সংগে বাজে কথা বলে না। বই আর পত্র-পত্রিকাকেই জীবনের সংগী করে নিয়েছে।

আড্ডা! দীপুর ভাবলে হাসি পায় আজও। নিরবচ্ছিন্ন একটানা আড্ডা দিন-রাত কেটে গেছে এক সময়। তাসের জুয়ায় এক নাগাড়ে তিনদিন কাটিয়ে দিয়েছে এক ঘরে। মাঝে-মাঝে হোটেল থেকে খাবার এসেছে, আর রাত্তিরে মদ মাংস। আড্ডা! চূড়ান্ত আড্ডা। বেধড়ক নেশা, হ্যা-লা-লা-লা করে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়া। আজকের গম্ভীর পুস্তক-কীট অর্থনীতি সমাজ-নীতির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীপক এক সময়ে দক্ষিণ কলকাতার খান্দানি খলিফা ছিল। মস্তানীতে ওর জুড়ি ছিল না, আজও গাম্ভীর্যে আর বিদ্যায় ওর জুড়ি মেলা ভার।

ইস্কুলের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল দীপু। রুনুকে নামিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে ইস্কুল-বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

একটা করিডর পার হয়ে অফিসঘর। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝমঝকে-তকতকে বাড়িটা। দরজায়-জানলায় সবুজ রঙের ভারী ভারী পর্দা ঝোলান। বাড়িটা নতুন, সম্পূর্ণ বাড়িটি নতুন ধাঁচে গড়া. মেজে মোজায়েক করা, ঘরে কার্পেট। মনে-মনে খুশী হল ভেবে যে, এমন একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রুনুর মনটা তাজা থাকবে। আবার একটা বিরক্তি এল মনে, এখানে গরীবের মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ, মাইনেপত্তর এখানে বেশ চড়া। টাকাওলা ঘরের মেয়ে ছাড়া এখানে পড়বার সুযোগ পাবে না। আবার সেই অর্থনীতির আকাশ-পাতাল তফাতটাই তার মেজাজটা গরম করে দিল।

ধীরে-ধীরে অপিসঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, পরীক্ষা করে নেয়া হবে।

একটা ফর্মে মেয়ের নাম, অভিভাবকের নাম ঠিকানা সব লিখে দিতে হল। অভি-ভাবকের নামটা নিজের নামই বসাল দীপু। বাইরের দিকে একটা ঘরে বসে এবারে অপেক্ষা করতে হবে। বাইরে বেরোল দীপু। করিডর দিয়ে এগিয়ে চলল ধীরে-ধীরে।

সামনে একটি মহিলা আসছে। মহিলা-টির দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপু। মুখটা ওর রক্তিম হয়ে উঠল। চোখে মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ মহিলা এখানে কেন? একে দীপু চেনে।

মহিলাটি দীপুকে দেখে দাঁড়াল।

বিষণ্ণ ম্লান হেসে ভয়ে-ভয়ে বলল,—কি খবর?

দীপু কোন কথা না বলে রুনুর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে পাশ কাটাতে গেল।

মহিলাটির মুখখানি কালো হয়ে উঠল। আরও একটু এগিয়ে বলল,—চিনতে পারলে না?

চিনতে পেরেছে দীপু। মালাকে না চেনবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা সত্যি, মালা আগের চেয়ে কিছু রোগা হয়েছে। মুখটা গোল নেই, জমাট নেই, একটু যেন ভেঙে লম্বাটে হয়েছে। চোখদুটো আরও বড়-বড় দেখাচ্ছে। চোখে সেই চাঞ্চল্য নেই, অকারণ খুশী আর উচ্ছ্বাস নেই। নিস্তরঙ্গ দিঘির জলের মত শান্ত বিষণ্ণ।

বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল দীপুকে।

মালা শাদা শাড়ি পড়েছে, শাদা ধবধবে ব্লাউজ। চোখে চশমা।

দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেছে।

রুনুর দিকে তাকিয়ে মালা বললে আবার.—একে ভর্তি করতে এনেছ?

এতক্ষণে দীপু একটা মাত্র কথা বলতে পারল,—হ্যাঁ।

রুনুর গালটা দুই আঙুলে টিপে সহজ হবার চেষ্টা করে মালা বলল,—বাঃ! বেশ সুন্দর মেয়ে!

ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়, ভীষণ ঘৃণায় আর বিরক্তিতে।

ইতর, ছোটলোক!

কথাদুটি ওর বুকের ভেতরে তোল-পাড় করছিল। একটা বিষাক্ত জমাট রক্ত যেন আবার তরল হয়ে উঠছিল। সর্বশরীর রিমিয়ে উঠছিল। স্নায়ুগুলো ধীরে-ধীরে মোচড় দিচ্ছিল। ও কোনমতেই স্নায়ুকে সহজ করে তুলতে পারছিল না। নিরঞ্জন দত্তর মেয়ে মালার সংগে যে আবার বহুকাল পরে এমন একটা জায়গায় দেখা হবে ও কল্পনা করতে পারে নি। এতদিনে তো নিরঞ্জন দত্তর মেয়ের কোন ধনীগৃহে ঘরণী হয়ে সংসার করবার কথা। খেয়ে ঘুমিয়ে হাই তুলে দেহের চর্বি আর মেদে ফুলে ওঠবার কথা। পান-দোক্তা চিবিয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গিয়ে হিমসিম খাবার কথা। জু গার্ডেনে অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অথবা কোন সিনেমা হাউসে তাকে দেখে স্বামীর গায়ে ঢলে পড়ে খিলখিল করে হেসে ওঠবার কথা। স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে মস্ত গাড়ি চড়ে তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবার কথা।

মালাকে এভাবে দেখবার কথা সে কখনো ভাবতে পারে নি।

—এসো আমার অপিসঘরে। এ স্কুলটা আমার।

আরো অবাক হল দীপু। এ স্কুলটা মালার। নিরঞ্জন দত্তর মেয়ে হঠাৎ স্কুল করতে গেল কেন? তার তো কোন অভাব ছিল না? স্ফূর্তি আর প্রমোদ উপকরণের কিছুমাত্র ঘাটতি ছিল না?

রুনুর হাত ধরে টেনে নিল মালা। ওকে করিডরের উল্টো দিকে একটা ছোট মাঠে

দেখিয়ে বললে,—তুমি ওখানে খেলতে ... কেমন? পরে তোমাকে ডেকে আনব।

বলে দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল ... ওদের খেলবার সব ব্যবস্থা ওখানে আ... ঝি আছে। একটুকু মেয়ে কি এতক্ষণ ... ঘরে বসে থাকতে পারে? বরং খেলা কর...

দীপু কথা বলল না।

—তুমি এসো।

মালা আবার বলল। দীপু গম্ভীর ... উঠল। আস্তে বলল—এবার। আমি ... ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসি।

মালার চোখদুটো আরও গাঢ় বিষণ্ণ ... উঠল। অল্প হেসে বললে,—একা-একা ... থাকতে ভাল লাগবে না। এসো. আ... অপিসঘরে বসবে এসো।

দীপু আস্তে বলল,—কোন প্রয়ো... ছিল না।

মালা আবার একটু হাসল—প্রয়ো... আবার কিসের? এমনিই আসতে বল... অনেক দিন পরে বন্ধু-বান্ধবের সংগে ... হলে ভাল লাগে।

মালার গলায় স্বরটা বেশ নিরা... বন্ধু-বান্ধব! কথাটা জোর দিয়ে বলল মা... দীপুর কানে কথাটা খুব স্পষ্ট শোনা গে... বন্ধু-বান্ধব! দীপু তার বন্ধু-বান্ধব! ই... ছোটলোক কখনো বন্ধু হতে পারে?

তবু দীপু আস্তে-আস্তে মা... সংগে এগোল।

একেবারে শেষ প্রান্তে মস্ত একখ... ঘর। বিরাট টেবিল, চেয়ার। তিন-চা... আলমারি। বই খাতাপত্তর ভর্তি। ... জোড়া কার্পেট পাতা। ঘরের এক কো... একটি উঁচু টিপয়ের ওপর একটা পাত্রে ... গোছা ফুল।

টেবিলের ওপাশে গিয়ে বসল মালা। ... ধারে গুটি-পাঁচেক চেয়ার। সেই দিকে দে... মালা বললে।—বোস।

দীপুর বসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আস... আসতেই বার-বার মনে হচ্ছিল, সে ... না। যাবার কি দরকার? যাবে না। ... চলে যাবে। মালার সামনে কিছুক্ষণ ... থাকা মানে কিছুক্ষণ একটা তীব্র ... অস্বস্তির ভেতর কাটান। ঘরে ঢুকেও ... বার মনে হল, সে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ... মতেই বেরিয়ে যেতে পারল না। ... বাধল। ভদ্রতায় তাকে অনেক বেশী ... করে ফেলেছে। আগের সেই মস্তান ... হলে কোন মতেই এ ঘরে এসে বসত ... মালার সামনে খানিকটা থুতু ফেলে ... করে বেরিয়ে যেত।

—কেমন আছো?

ব্যক্তিগত কোন কথা দীপু ... না। ও কথার উত্তর না দিয়ে দীপু ... স্কুলটা কতদিনের?

—বছর তিনেকের। এরই ভেত... বড় হয়ে উঠেছে।

—কত ছেলে-মেয়ে?

—একশ' ছাড়িয়ে গেছে। ... পঁচিশের বেশী আর নেব না।

বলে একটু হাসল মালা। আব...

—তার নেই। তোমার মেয়েকে ...

রুনুকে দীপুর মেয়ে ভেবেছে। ভাবুক। কোন প্রতিবাদ করল না দীপু। ব্যক্তিগত কোন কথা নয়।

—মাইনেটা নিশ্চয় খুব বেশী?

—কুড়ি টাকা। তার কমে চালান যায় না।

দীপু গম্ভীর স্বরে বলল,—এদেশে কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা বাচ্চা পড়াবার ক্ষমতা ক'জনের আছে?

মালা ভাল করে তাকাল দীপুর দিকে। কথাটায় একটু ঝাঁঝ ছিল। প্রথম থেকেই দীপুর চেহারা পোষাক মুখের শ্রী দেখে মালা একটু অবাক হয়েছিল। সেই পাতলা ছিপছিপে কড়া বেতের মত দীপু মস্তান, তার সেই ভাসা মস্ত-মস্ত দুটো চোখ, চোখ মুখের বেপরোয়া ভঙ্গী, সব যেন কিছুটা পাল্টে গেছে। মুখখানা উজ্জ্বল ভরাট ভরাট হয়েছে, গায়ে মাংস লেগেছে, চলনে-বলনে কথায় সেই টান-টান বেপরোয়া ভাবটা বিন্দুমাত্র নেই। পরনে বেশ দামী ট্রাউজার সার্ট।

মালা ভাল করে চোখ মেলে তাকাল।

আস্তে-আস্তে বলল,—চা খাবে, না কি কফি?

—কিছু না।

—এখনো তো খাওয়া হয় নি, তবে বরং একটু কফি খাও।

বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ কফির কথা বলে দেয় মালা।

খুব আস্তে বলল,—কি করো এখন?

আবার সেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। দীপু না শোনবার ভান করে বলল,—এর চেয়ে যদি বিশ বিঘে জায়গার ওপর টিনের চালা করে পাঁচ-সাতশ' গরীবের ছেলে-মেয়েকে এক টাকা কি দু টাকা মাইনেতে পড়ান যেত, অনেক বেশী কাজ হত।

মালা এবারে পরিষ্কার বুঝতে পারল, দীপু নিজের সম্পর্কে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে চায়। অল্প হেসে বলল,—তা করা যায়। বিশ বিঘে জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে?

—কেন কলকাতার কাছাকাছি কোন জায়গায়।

মালা মুখটা নীচু করে একটু চুপ করে থেকে বলল,—বুঝলাম। তুমি এখন কি করো?

এবারে আর এড়ান গেল না। দীপুর মুখটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। ঠোঁটে বাঁকা হাসি দেখা গেল।

বলল,—মস্তানী করে বেড়াই।

মালা হেসে ফেলল।—দেখে মনে হয় না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে দীপু বলল,—দেখে আর কাকে কতটুকু বোঝা যায়?

পাল্টা প্রশ্ন করল দীপু,—তুমি হঠাৎ স্কুল করতে গেলে কেন?

মালা একটু ভেবে বলল,—এমনি। সখ হল।

দীপু আবার বাঁকা হাসল, — ভাবলাম বুঝি শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ গ্রহণ করেছ। যদি করতে ছোটলোক যাদের বলো, তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করলে ভাল হত।

মালার মুখটা একটু শুকোল। হাসবার চেষ্টা করে হাসতে পারল না। ও বোধহয় বুঝল। দীপু বার-বার ওর কোন একটা জায়গায় ঘা দেবার চেষ্টা করছে।

বলল,—অত বড় উদ্দেশ্য কিছু নেই। সামান্য মানুষ। সামান্য কিছু কাজ করবার চেষ্টা করছি।

দীপুর মুখে তিক্ত হাসি।—কাজ কিছুই হবে না। এই সব ছেলে-মেয়েদের পড়বার জায়গা অনেক আছে। বাড়তি আর একটা স্কুল করে কি লাভ হবে?

—তুমি এখানে মেয়েকে ভর্তি করতে এসেছ কেন, তুমি নিশ্চয় বড়লোক হয়েছ?

দীপু প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ল।

এর ভেতরে দু কাপ কফি এল। আর একটা ডিশে খানকতক বিস্কুট।

কেউ কোন কথা বলল না। আলাপটা ক্রমেই কিছুটা তেতো হয়ে উঠছিল। একটু সময় চুপ করে থাকলে হয়ত এই তিক্ত ভাব কিছুটা কাটতে পারে।

কফি এসে পড়ায় চুপ করে থাকার সুবিধে হল। দুজনেই কাপে চুমুক দিতে ব্যস্ত হল। চুপচাপ খানিকটা কফি খাওয়া হল।

মালা নরম স্বরে বলল,—তোমাকে দেখে বেশ ভাল লাগছে।

এ কথার জবাব দিল না। এ ধরনের কথা ও কোন মতেই বাড়াতে চায় না। কফির কাপে চুমুক দিতে ব্যস্ত থাকবার ভান করল।

—একদিন যাব। তোমার বৌকে দেখে আসব।

দীপু কফিটুকু শেষ করবার চেষ্টা করল।

মালা আবার বলল,—কদ্দিন বিয়ে করেছ?

কফি গলায় আটকাল দীপুর। কেশে গলা পরিষ্কার করে একটা ঢোক গিলে দীপু বলল,—বছর পাঁচেক।

মালার মুখটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তবু জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলল,—পুরোন বন্ধু বলে একটা নেমন্তন্ন করলেও তো পারতে?

কথাটা বলেই মালা লজ্জিত হল। একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। এতটা না বললেও হত। কথা পাল্টাবার জন্যে আবার বললো, একদিন এসো আমার ফ্ল্যাটে।

দীপু তাকাল। খুব শান্ত অনুত্তেজিত স্বরে বলল,—তোমার ফ্ল্যাট মানে?

—এই নাও।

ওর চামড়ার ব্যাগ থেকে বার করে একটা কার্ড দিল মালা। তাতে নাম ঠিকানা লেখা। মালা দত্ত। নামটা মালা দত্ত লেখা কেন? মালার কি বিয়ে হয় নি? সত্যিই আশ্চর্য, অমন রক্ষণশীল বাড়ির মেয়ের এতদিন বিয়ে হবে না, এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দীপু ভেবেছিল, মালার বিয়ে নিশ্চয় হয়েছে। সিঁদুর পরে নি। সিঁদুর আজকাল অনেক মেয়েই পরে না। আজকালও সেটা এমন করে সিঁথির তলায় ঢাকা থাকে যে বোঝা যায় না। এখন তো দেখছে বিয়ে হয় নি।

বয়েস সাতাশ হবে প্রায়। এত বয়েস পর্যন্ত বিয়ে করে নি মালা এ কি সম্ভব? সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হচ্ছে।

দীপু ঠিকানাটার দিকে তাকিয়ে বলল,—তোমাদের বাড়িতে না থেকে ফ্ল্যাটে—

প্রশ্নটায় মালা খুশী হল। নড়ে-চড়ে বসে বলল,—সে অনেক ব্যাপার। আমাদের আগের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আমি এই ফ্ল্যাটবাড়িটা নতুন করেছি। বছর দুয়েক হল। এসো না একদিন।

দীপু অবাক হয়ে বলে ফেলল,—তোমার বাবা!

ম্লান হয়ে উঠল মালার মুখ। বাবা মারা গেছেন। বছর চারেক হল।

নিরঞ্জন দত্ত মারা গেছে। অমন দশাসই মস্ত মানুষটা। ধবধবে ফরসা, অসামান্য বুদ্ধি। আজও চোখের সামনে ভাসছে তার মস্ত চাকার মত মুখখানা। গম্ভীর দুটো চোখ। ভুঁড়ির ওপর কাঁচাপাকা চুল। মানুষটার জন্যে কেন কে জানে একটু বেদনা অনুভব করল দীপু। জাঁদরেল ব্যক্তিত্ব ছিল তার।

মনটা ভার হয়ে উঠল। ভাল লাগল না দীপুর। পুরান বিষাক্ত জমাট রক্তটা আবার তপ্ত তরল হয়ে উঠছে।

দীপু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।—আজ উঠি।

—এক্ষুনি উঠবে? মেয়ে ভর্তি করবে না?

—না।—স্পষ্ট স্বরে জানাল দীপু।

ওর মুখে অমন পরিষ্কার 'না' শুনে আহত হোল মালা।—ভর্তি করতেই তো এনেছিলে?

দীপু তিক্ত স্বরে বলল—হ্যাঁ, এসেছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি ভর্তি করব না।

—কেন?

ও-কথার উত্তর না দিয়ে দীপু আবার বলল,—আচ্ছা, চলি।

মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মালার।—একদিন আসবে না আমার ফ্ল্যাটে?

দীপু কঠিন স্বরে বলল—বোধহয় সময় হবে না। নমস্কার।

দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল দীপু। করিডরটা পেরিয়ে এল দ্রুত পায়ে। মাঠে খেলছিল রুনুই। অন্য অনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছে।

দীপু আর দেরী করল না। রুনুর হাত ধরে স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

—আমি ভর্তি হবো না জেঠু?

দীপু রুনুর কথার জবাব দিল না। গাড়ির দরজা খুলে বসবার আগে স্কুল-বাড়িটার দিকে একবার তাকাল। চোখ পড়ল একটা খোলা জানলায়। স্পষ্ট দেখতে পেল মালার মুখ আর দুটো বিষণ্ণ ম্লান চোখ।

গাড়িতে উঠে বসল দীপু। গাড়িটা স্কুলের সামনে থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল।

অঙ্গনা

প্রমীলা

জীবিকার সন্ধানে

কতরকম কাজই তো আজকাল মেয়েরা করছে। সমস্যার সমাধান তবু দূরে অস্ত। চাকরী করে কোনদিন এই সমস্যার সমাধান হবে বলেও তো মনে হয় না। তাই নতুন কিছুর কথা ভাবতে হবে। নতুন কি করা যায় এসম্পর্কে আমাদের ঘরের মেয়েরা বোধহয় খুব ভাবতে রাজী নয়। কথাটা দীর্ঘ তিক্ততার পর বলতে বাধ্য হলাম। গতানুগতিক পথে চলার মোহ আমাদের সকলকে পেয়ে বসেছে। বাঁধানো সড়ক ধরে চলতে সবাই উৎসুক হয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

এদেশ-ওদেশের নানাকথা অহরহ কানে এসে বাজছে। কিন্তু বাস, এই পর্যন্ত। কথাগুলি আর কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পশছে না। যদি কেউ প্রশ্ন করেন এসম্পর্কে সহসা এহেন সিদ্ধান্তে আসার কারণ কি? জবাবে আমাকে সবিনয়ে এটুকুই নিবেদন করতে হবে যে, পরিবর্তন আশা করে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছি। আর সেই ব্যর্থতার উদ্‌গার হচ্ছে এই তিক্ততা। সাজ-পোষাকে, চলনে-বলনে বিদেশীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব অথচ চিন্তায়-কর্মে ওদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে দ্বিধা করবো না। এরকম মনোবৃত্তি আর যাই হোক আমাদের নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে না। এজন্য আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা প্রয়োজন। তবেই চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ঘটবে এবং নতুন পথের সন্ধান মিলবে।

ওদেশে মেয়েরা চাকরীর প্রত্যাশায় হত্যে দিয়ে বসে থাকে না। সামান্য মূলধন থেকে শুরু করে বৃহত্তর মূলধন বিনিয়োগে ওদের দক্ষতা সমান। ছোটখাট বিপণিগুলি ওরা সহজেই চালিয়ে নেয়। নিজের চাকরীর জন্য এতে যেমন ভাবতে হয় না তেমনি আরো কয়েকটি মেয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এদেশে মেয়েরা এদিকটায় বেশি এগোতে পারেনি। এজন্য আর যা অসুবিধাই থাক মনের জোরই হচ্ছে বড় সম্বল। আমাদের মেয়েদের এই জিনিষটার ভীষণ অভাব। না হলে ছোটখাট দোকান চালানো এমন কি অসুবিধের। অফিস পাড়ার টিফিনের [illegible], ছাতা কলের স্টলের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সবাই একবাক্যে রায় দিয়েছেন এতে শুধু অফিসপাড়ায় টিফিনের সমাধান হবে না, দোকানগুলি চলবেও ভাল। দোকান ভাল চলার অর্থই হলো কয়েকটি মেয়ের চাকরীর সমাধান শুধু হবে তাই নয়—অনেকেই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। উৎসাহভরে এগিয়ে এলেই একটা নতুন জীবিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীমতী ওলগা ম্যাডার

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে

বর্তমান যুগে মেয়েদের অধিকার বিস্তৃতি এবং তার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতি সমাজনীতির শাখায়-শাখায় তাদের দৃঢ় পদক্ষেপ নতুন দিনের নতুন বার্তা ঘোষণা করার মত। এখন আর ততটা চমক নেই। কিন্তু চাঞ্চল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। চাঞ্চল্যের কারণ নিয়ে গবেষণা করা অহেতুক সময় নষ্ট মাত্র। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এটাই সত্য কথা। যেমন সম্প্রতি হয়েছে ওলগা ম্যাডারকে নিয়ে। মার্কিনী এই মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন এবার আন্তর্জাতিক সংযুক্ত অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতিতে। যুক্তরাষ্ট্রে এটাই বৃহত্তম ইউনিয়ন এবং এপদে ওলগা হলেন প্রথম মহিলা সদস্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় অনেক আমেরিকানই এসে জড় হয়েছিল ডেট্রইট—মিচিগানের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। শ্রীমতী ওলগা এসময় ছিলেন শিক্ষিকা। দেশের ডাকে তিনি এই জীবিকা ছেড়ে ফোর্ড কোম্পানীতে চাকরী নিলেন। কাজের ফাঁকে কারখানায় গড়ে তুললেন রিক্রিয়েশন ডিপার্টমেন্ট। মাত্র ছমাসের মধ্যে তিনি স্বীকৃতি পেলেন। ইউনিয়ন থেকে তার ডাক এ[illegible] তাঁকে অনুরোধ করা হলো রিক্রিয়[illegible] সুপারভাইজার হিসেবে যোগদান ক[illegible] জন্য। তারপর ক্রমান্বয়ে ১৯৪৪ সালে তি[illegible] হলেন অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রিক্রি[illegible]শন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর।

ওলগার এই নির্বাচনে শতাব্দ[illegible] সূচনায় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি রা[illegible] হয়েছে। সেদিন কারখানায় কারখানায় নারী কর্মীর মোট সংখ্যা ছিল পাঁচ মিলি[illegible] আর এই সংখ্যা এখন স্ফীতকায় হ[illegible] দাঁড়িয়েছে ২৬·১ মিলিয়নে। ট্রেড ইউনিয় আন্দোলনেও প্রতি পাঁচজনে একজন নারী

ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শতকরা সতেরজনই নারী। বিভিন্ন কেন্দ্র লোকাল অফিসার হিসেবে কাজ করছেন ৮৩৪ জন। এদের মধ্যে সবাই প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী। এছাড়া বিভিন্ন কমিটিতে আরো অনেক মহিলা আছে। এবার শ্রীমতী ওলগার নির্বাচনে মহিলাদের উৎসাহ আরো বেড়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির জন্য তাঁরা নিজেদের কর্মদক্ষতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। এদের সম্মিলিত সংগ্রামে চাকরী ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে সকল বৈষম্যের সকল অবসান ঘটেছে, বেতন এবং সিনিওরিটির ব্যাপারে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। ইউনিয়নের উইমেন্স ডিপার্টমেন্ট সাধারণতঃ এব্যাপারে কর্তৃত্ব করে।

রিক্রিয়েশন ডিপার্টমেন্ট কর্মীদের অবসর বিনোদনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকে। কাজের অবসরটুকু তারা যাতে আনন্দ-গানে ভরিয়ে তুলতে পারে সেজন্য নানা ব্যবস্থার আয়োজন। শুধু কর্মী নয়, কর্মীর সঙ্গে রয়েছে তার পরিবার। আর পরিবারকে বাদ দিয়ে কর্মীর কথা ভাবা যায় না। তাই পরিবারের সন্তান-সন্ততির চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রমোদের সকল ব্যবস্থাই এ'রা করে থাকে। আর শ্রীমতী ওলগা চাকরীজীবনের শুরু থেকেই এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এমন কি ১৯৪১ সাল থেকে তিনি এই বিভাগের সর্বসময়ের কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যারা মিচিগানে আসেন তাদের বসবাসের সুবিধার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং বহুলাংশে সফল হন।

শ্রীমতী ওলগা বর্তমানে এই বিশ্বসংস্থার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের তিনি যুগ্ম-পরিচালক কিন্তু রিক্রিয়েশন ডিপার্টমেন্টে তার কর্মধারা এখনও অব্যাহত আছে। আবার উইমেন্স ডিপার্টমেন্টও তাঁর সাহায্য এবং সহযোগিতায় পুষ্ট। ইউনিয়নের সর্ব-বিভাগে তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত রয়েছে। অর্থাৎ এই নির্বাচনের ফলে তাঁর দায়িত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। অবসর-প্রাপ্ত কর্মীদের নিয়েই তিনি সাধারণতঃ বেশি মাথা ঘামান। প্রায় এধরনের কর্মীদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় বিভিন্ন ড্রপ্-ইন পারপাস সেন্টারগুলি গড়ে তোলার। এখানে শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন ট্রেনিং এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে। এগুলি সাধারণতঃ পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য করা হয়। প্রি-রিটায়মেন্ট সেন্টার খুলে প্রায়-

গত ১৫—৩০ এপ্রিল বার্লিনে আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীর স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ফ্রাউ কেং স্ট্রবেল 'হেলথ অফ দি হাউস ওয়াইফ' বিষয়ে উদ্বোধন-ভাষণের পর ওম্যান অ্যাট ওয়ার্ক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। গৃহস্থালী ও নারীর স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতা, শিশুর খেলাধুলায় মায়ের দায়িত্ব, চাকুরীজীবী-নারী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।
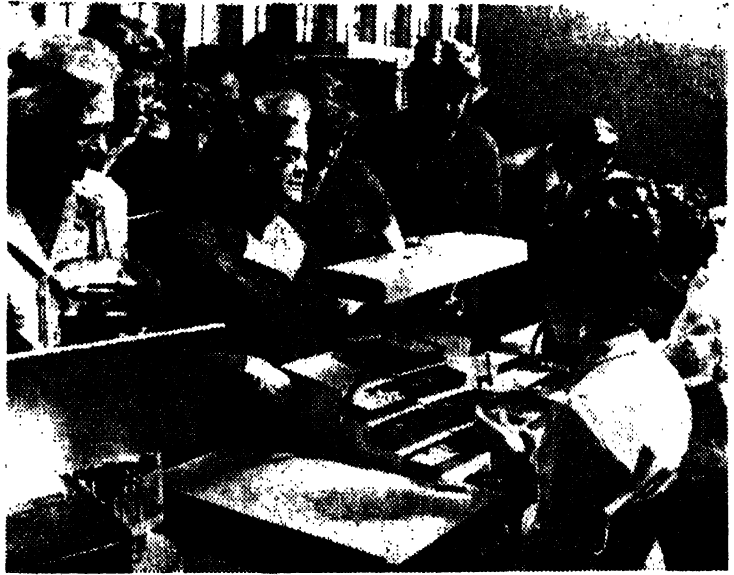
অবসরের মুখোমুখি কর্মীদের অবসর-জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে নানারকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তো আছেই।

ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সকল কর্মী একটি পরিবারের মত বাস করুক, অবসর বিনোদন করুক এবং ছুটি উপভোগ করুক এটা কর্তৃপক্ষের কাম্য। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে চারটি এধরনের কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব এদের বিবেচনাধীন রয়েছে। এদের দূরত্ব কোনক্রমেই একদিনের বেশি হবে না। এসব জায়গায় কর্মীরা শুধু ছুটির আনন্দই উপভোগ করবে না, ইউনিয়ন সম্পর্কেও নানাকথা জানতে পারবে। এজন্য খুব সামান্য অথবা সম্ভব হলে কোন মূল্য নেওয়া হবে না। এরকম কেন্দ্রের একটি হবে সম্ভবতঃ মিচিগানে। অন্য তিনটি হবে পূর্বে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে। ইউনিয়নের সদস্য এবং কর্মকর্তাদের মধ্য এজন্য বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

নতুন কারখানায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করার ব্যাপারে শ্রীমতী ওলগার যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এটা ঠিক অনেকটা বোঝার উপর শাকের আঁটির মত। তবে এব্যাপারে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না।

শ্রীমতী ওলগা ইউনিয়নে যোগদানের প্রেরণা পান ফোর্ড মোটর কোম্পানীতে চাকরী গ্রহণের পর। তিনি দেখতে পান যে কর্মীরা সবাই বিচ্ছিন্নভাবে অবসর বিনোদনের কথা ভাবে এবং অবসর জীবন-যাপনের চিন্তাও তার মাথায় ভীষণভাবে চেপে বসে। এব্যাপারে সে কারো কাছ থেকে কোন পরামর্শ বা সদুত্তর পায় না। এরপরই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করেন। ইউনাইটেড ও অটো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পঞ্চাশ নম্বর লোকাল কমিটিতে তিনি প্রথম যোগদান করেন। ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করার আগে তিনি এব্যাপারে যোগ্যতা অর্জন করেন বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করে। ১৯৩৩-৩৪ পর্যন্ত তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। রোলার বিয়ারিং প্ল্যাণ্টেও তিনি কাজ করেন দীর্ঘদিন। অবশেষে ফোর্ড মোটর কোম্পানী তাই অভিজ্ঞতার ঝুলিকা নেহাৎ শূন্য ছিল না বরং বেশ ভর্তিই ছিল।

মেয়েদের প্রসাধন

পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চিম জার্মানীর গ্রামাঞ্চলে প্রসাধন ও বিচিত্র কবরী সজ্জাহীন মেয়েদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। জার্মানীর নারীসমাজে এখনও এই ধারণা বদ্ধমূল যে প্রসাধনের সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনের যোগসূত্র আছে। যেসব মেয়ে সব সময় প্রসাধন করে, তাদের সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়। লোকে চায় যে জার্মানীর মেয়েরা হোক আত্মনির্ভর, স্বাস্থ্যবতী, প্রাণখোলা ও অকপট। একটি সমীক্ষার হিসাবে জানা গেছে যে এক-তৃতীয়াংশ লোকের মত হচ্ছে যে মেয়েরা পটের বিবি না সেজে সুগৃহিণী হয়ে ঘরের কাজকর্ম করুক আর দুই-তৃতীয়াংশের মতে মেয়েদের কেবল ততটুকু প্রসাধন করা ভালো যাতে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য খোলে।

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

আমারেও আঁধারে

কল্যাণকুমার বসু

(১)

চিঠি লেখালেখির পাট শেষ হয়েছিল। ডিসেম্বর ১৯০২ সন। অতুলপ্রসাদের লখনউ প্রবাসের দিন এগিয়ে এল। বিপিনবিহারী নিজের বড় ছেলে সনৎকুমারকে অফিস-গাড়ি নিয়ে ইস্টিশানে আনতে পাঠালেন। গাড়ি এসে ঝাউলাল পুলের বাড়িতে পৌঁছাল। বিপিনবিহারী নিজের দপ্তরখানা থেকে বেরিয়ে এসে অতুলপ্রসাদকে সাদর আহ্বান জানালেন। নিজের বড়মেয়ে প্রভাকে বললেন, বৌমাকে তুমি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাও। তোমার মায়ের কাছে।

প্রভারই বয়সী হেমকুসুম। বিপিন-বিহারীর স্ত্রী শরৎবালার প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল লাগল হেমকুসুমকে। বিপিনবিহারী অতুলপ্রসাদকে আপন গেস্ট রুমে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। শরৎবালার মনঃপুত হল না। বললেন, এরা তো আমার ছেলে বৌয়ের মত আমার বাড়িতেই থাকুক। তুমি বরং তোমার ঘর ছেড়ে দাও।

ঘরের অভাব ছিল না। বাগানের ধারেই ইউকালিপটাস বীথির সামনে সুসজ্জিত ঘরখানি। সেইখানেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদিকে কেশরবাগের বাড়িখানি ভাড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। রংচংয়ের কাজ শেষ হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের জন্যে ওয়াজিদ হোসেনকে বলে সমস্ত আসবাবপত্র তার দোকান থেকে আনিয়ে দিলেন। ড্রইং-রুম সেট, বেডরুমের জন্যে খাট-পালং, অফিসঘরের টেবিল-চেয়ার আলমারি প্রভৃতি কোন কিছুরই অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখলেন না। অতুলপ্রসাদকে কাছারীতে নিয়ে গিয়ে জুডিসিয়াল কমিশনার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় করিয়ে-দিলেন জজ-সাহেবদের সঙ্গে।

বিপিনবিহারী লখনউ বার অ্যাসো-সিয়েশনের চেয়ারম্যান। কিছুদিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদকে তিনি এখানকার সভ্য করে দিলেন। বিপিনবিহারী অতুলপ্রসাদকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। একদিন বললেন, যদিও আপনি এখানে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতে আরম্ভ করেছেন আপনাকে নীচের আদালতের দলিলপত্র বিষয়ে জানতে হবে। এখানে নীচের আদালতের বেশীর ভাগ কাজ-কর্মই উর্দু ভাষাতে হয়। আপনার উর্দু শেখা খুবই প্রয়োজন। উর্দু না জানলে এখানকার কাজ-কর্মে আপনার খুব অসুবিধা হবে। আপনাকে আমি একজন মৌলভী ঠিক করে দেব। তিনি আপনাকে উর্দু শেখাবেন। আমার মুন্সিজীকে (মুহুরী) বলবো আপনার জন্যে একজন হুঁসিয়ার মুন্সি দেখে দেবে। আপনার কোনরকম অসুবিধায় পড়তে হবে না। এরপর তিনি লক্ষ্ণৌ ও যুক্তপ্রদেশ সম্পর্কে আরো অনেক কথা বললেন, অতুলপ্রসাদকে।

আপনি এই লক্ষ্ণৌ শহরে কবে এসেছেন বিপিনবাবু?

অনেকদিন। জীবনটাই কাটিয়ে দিলাম এই সংযুক্ত প্রদেশে। আমার পৈত্রিক ভূমি বাংলাদেশের কোন্নগরে। বাবা মারা যাওয়ার পর জ্ঞাতিদের অসৎ ব্যবহারে মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বারাসতের বাদুর গ্রামে যান। বারাসত থেকে এনট্রেন্স পাশ করি। তারপর বাংলাদেশে ছেড়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসি কানপুরে মাসির বাড়ি। মাসির বাড়িতে থেকে টিউশানি করে বি-এ পাশ করলুম তারপর মীরাট কলেজে চাকরী নিলাম। মীরাট কলেজে থাকাকালীন বাংলাদেশে গিয়ে কুমারটুলির মহেন্দ্রনাথ ঘোষের মেয়েকে বিয়ে করলাম। তারপর এম-এ পরীক্ষা দেব তার জন্যে সুবিধা হবে ভেবে মীরাট কলেজ ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদের সরকারী বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। এলাহাবাদের ইউনি-ভার্সিটি তখনও স্থাপিত হয় নি। কলকাতা ইউনিভার্সিটির অধীন ছিল এলাহাবাদের মেয়র কলেজ। এম্ এ-তে সেবার আমি ভাগ্যক্রমে ফার্স্ট হয়ে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ল'টা পড়ে নিলাম। এলাহাবাদে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ডাঃ রামলাল চক্রবর্তী। হাসপাতালে কি একটা ভুলের জন্যে রামলাল চক্রবর্তীকে লখনউ শহরের সরকারী সার্জেন-রূপে বদলী করে দেয়া হল। আমি তখন এদিকে ওদিকে ইংরিজি কাগজপত্রে প্রবন্ধ লিখতাম, এমন সময়ে জানেন কলকাতা থেকে এক পাদরী এলেন এলাহাবাদে। এসে বক্তৃতায় এবং পুস্তিকা ছাপিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে প্রচার করতে লাগলেন খৃষ্টধর্ম অনেক ভালো, অনেক বড়। আমিও তাঁর বক্তৃতার ও পুস্তিকার সমুচিত জবাব কবিতায় লিখে ছাপিয়ে সকলের মাঝে ঘুরে ঘুরে বিলি করলাম। এতে সাহেব মহল খুবই বিরক্ত হলেন। আমার চালচলন কাজ-কর্ম সবই ডি পি আই-এর কানে গেল। সাহেব এক্সপ্লানেসন চাইলেন। আমি জানালাম আমি কোন অন্যায় করি নি—অন্যায় করেছ তোমরা আমার কাছে এক্সপ্লানেসন চেয়ে। কারণ আমি ত কেবল তোমাদের ব্যবহারের উত্তর দিয়েছি। আমি কোন এক্সপ্লানেসন দিতে পারবো না। ছেড়ে দিলাম চাকরী। ঠিক সেই সময়ে বন্ধু রামলাল ডাক্তারের চিঠি পেলাম। রামলাল লিখেছেন, তুমি ত 'ল' পাশ করেছ। লখনউ চলে এসো। তোমার আদর্শ জায়গা। ওকালতি কর। নবাব শহরে তোমার প্র্যাকটিশ জমবে নিশ্চয়ই। আমরা তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম।

'আমরা কে' আমি মনে মনে ভাবলাম। উত্তরে রামলাল জানালেন, আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে একজন উকিল নেই, তুমি সে অভাব পূর্ণ করবে। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব চলে এসো।

......আর দেরী করলাম না আবার নতুন জীবন......নতুন পেশার সুরু। ডেরাডাণ্ডা তুলে লখনউ এসে উপস্থিত হলাম। আর সুরু করে দিলাম ওকালতি। ওকালতিতে আমার পসার জমে উঠল। যে বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে ঢুকেছিলাম তা কিছু বছর পরে কিনে নিলাম। সংস্কার করালুম। বড় রাস্তার ওপর অফিসবাড়ি তুললাম। অতিথিদের থাকবার জন্যে গেস্ট হাউস হল। ঘোড়ার গাড়ি রাখার আস্তাবল, বাইরের মক্কেলদের জন্যে আস্তানা, সবই হল। আঠারো বছরের প্র্যাকটিশে অনেক কিছুই করলাম অতুলবাবু, নাজিরাবাদ মহল্লায় আর একখানা প্রাসাদ কিনলাম... বাঙলাদেশ ছেড়ে এসেছি এতদূরে তবু জানেন বাঙলাদেশের কথা ভুলতে পারি না, কলকাতায় গ্রে স্ট্রীটেও একখানা বাড়ি করলাম।......আর একটা সাধ ছিল আমার স্ত্রীর জমিদার-গিন্নি হবার! তাই বা কেন বাকি থাকে! কিনে ফেললুম একটা জমিদারী—এই যুক্তপ্রদেশেই—লখনউ থেকে কিছু দূরে 'ওনাওতে'। বলে হেসে ফেললেন উচ্চহাস্যে বিপিনবিহারী।

সেই সময়ে লখনউ শহরে যে কজন বিশিষ্ট বাঙালী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুলভূষণ ভাদুড়ী, লখনউর দু'জন বাঙালী জজ—কালিদাস সিংহ ও গিরিশচন্দ্র বসু, গভর্ন-মেণ্ট পাবলিক লাইব্রেরীর কিউরেটর গঙ্গাধর গাঙ্গুলী এবং ডাঃ নবীনচন্দ্র মিত্র সুপরিচিত ছিলেন। সকলে অতুলপ্রসাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বিপিনবিহারী বসুর বন্ধু-বান্ধব। লখনউ প্রবাসী এই আটজন বাঙালী আপন আপন বিষয়ে এক একটি স্তম্ভ-বিশেষ। একদিন কোন এক মুহূর্তে আটজন বাঙালী এক ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বিপিনবিহারী ছবির দিকে তাকিয়ে বলতেন 'আমরা অষ্টমূর্তি।' তারপর বললেন, আপনার সঙ্গে এ'দের সকলের আলাপ করিয়ে দেব, এঁরা আপনাকে অনেকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করবেন।

একদিন সঙ্গে করে প্রবীণদের দরবারে অতুলপ্রসাদকে উপস্থিত করলেন বিপিন-বিহারী। অতুলপ্রসাদ সাদরে গৃহীত হলেন। জজসাহেব কালীপ্রসন্ন এবং গিরিশচন্দ্র বললেন, কোন অসুবিধে হলে আমাদের জানাবেন। বিপিনবাবুও আছেন উনি আপনাকে অনেক উপদেশ দেবেন...কিভাবে লখনউএ প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় সে রহস্য ওঁর জানা।

রামলাল ডাক্তার বললেন, কৈশরবাগ থেকে গোলাগঞ্জ খুউব একটা দূরে নয়। মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে চলে আসবেন আমার বাড়ি।

• • •

অতুলপ্রসাদ যখন প্রথম লখনউতে এলেন বিপিনবিহারী বললেন, চলুন আপনাকে লখনউ শহর ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই—আমাদের বাঙালীদের সব ক'টি প্রতিষ্ঠান দেখাই।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গ পেয়ে বিপিন-বিহারীর আর নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত মেলে না...স্ত্রী শরৎকুমারী অনুযোগ করেন।

বিপিনবিহারী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অতুলপ্রসাদকে বলতেন, জানেন অতুলবাবু, চোদ্দ বছর বয়েসের সময়ে কলকাতা থেকে শরৎবালাকে বিবাহ করে এনেছিলাম ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখে। ছয় বছরের বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন, এমন যার উজ্জ্বল মুখ তাকে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছ কেন সেনগিন্নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় শরৎ-বালাকে নিয়ে গিয়ে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। লখনউ এসে শরৎবালা আমাকে বলেছিল, তুমি তো এত কাজ কর একটা মেয়েদের ইস্কুল কর না কেন? তোমার মেয়েদের শিক্ষার জন্যে তুমি যখন চিন্তা কর দেশের সকল মেয়েদের জন্যে কেন ভাব না? শরৎবালার সঙ্গে কথায় পারবার

উপায় নেই। আমি লক্ষ্য করতাম ওখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করে বাংলা পড়তে পারে না, বাংলা বলতে পারে না, বাংলাদেশ ছেড়ে এসে আমরা বাংলা ভুলেছি ...তারপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ইস্কুল তৈরীর কাজে......সেদিনে লখনউর কয়েকটি ইয়ং্যোম বাঙালীর ছেলে এসে আমায় ধরেছিল, আমরা একটা ক্লাব তৈরী করতে চাই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের পৃষ্ঠপোষক হোন। আমারও অনেক দিনের ইচ্ছে একটা বাঙালী প্রতিষ্ঠান হোক—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে না বেড়িয়ে, গুণ্ডামি না করে ছেলেগুলো যদি বাংলার সংস্কৃতি-সম্পদ-কৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে একটু চিন্তা করে তাহ'লে অনেক মঙ্গল! আমি সেদিন আমারও মতামত অনেকটা বললাম ওদের। আমি বললাম, আমাদের ক্লাবের নাম হবে ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন। ক্লাবে খেলাধুলো হবে ঘরে এবং মাঠে-ময়দানে, একটা লাইব্রেরী করতে হবে—পড়াশোনার পাঠ রাখতে হবে। আমরা বাংলাদেশ থেকে সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ সব আনাবো—আরো ইচ্ছে আছে আমরা ক্লাব প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে যাত্রা-থিয়েটার করবো।

বিপিনবিহারী বললেন, এইভাবেই ইয়ংম্যান এসোসিয়েশনের জন্ম হয়।

• • •

বিপিনবিহারী বসুর চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হল কুইন্স এ্যাংলো সংস্কৃত হাইস্কুল, হিন্দু গার্লস স্কুল। মনের সংকীর্ণতা মানবসমাজের শত্রু — শিক্ষিত মানুষদের জন্যে বাঙালাল ক্লাবের জন্ম হল। বিপিনবিহারীর চেষ্টায় অনুপ্রেরণায় এবং কর্মে অনেক কিছুই হল কিন্তু মাত্র ৫৯ বছর বয়েসে মারা গেলেন এবং প্রচারবিমুখ ছিলেন বলে এবং অন্তরালে থাকতে ভালো-বাসতেন বলে তাঁর নামটুকু লখনউর বুক থেকে ধুয়েমুছে গেল। আমিনাবাদ মহল্লার ঝাউলাল পুলের ওপরে ভাঙা পোড়ো বাড়িটিকে দেখে আজ আর কেউ ধারণা করতে পারবেন না এখানে প্রবল পরাক্রম-শালী এবং বিত্তবান অ্যাডভোকেট বিপিন-বিহারী বসু বাস করতেন। ...অতুলপ্রসাদ আসর জমিয়ে এলেন তারপরে।

(১০)

অতুলপ্রসাদ লখনউ এসেছিলেন ১৯০২ সালে। লখনউয়ে তখন তিনি নতুন ব্যারিস্টার। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কর্মে আন্ত-রিকতা ও কর্মতৎপরতা তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার বলে লখনউ শহরের মধ্যে তুলে ধরল। সুধু ব্যারিস্টার কেন একাধারে তিনি রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও সমাজ-সংস্কারক, সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার। এক সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের নির্বাসন হয়েছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পিঠস্থান লখনউ নগরী থেকে সুদূর বাঙলা দেশে। সেদিন কলকাতার মেটেবুরুজ অতুল সঙ্গীতজগতের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ......ইতিহাস প্রতিশোধ নিল। অতুলপ্রসাদকে যেতে হল সুদূর লখনউ নগরীতে বাঙলাদেশের দূত হয়ে। এদিক দিয়ে বাঙলা সঙ্গীত লাভবানই হয়েছে। অতুলপ্রসাদ বাঙলা গানে ঠুংরীর আমেজ এনেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি বাঙলার নিজস্ব সুর কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী এনেছেন।

অতুলপ্রসাদ যখন প্রথম এসেছিলেন লখনউ-এ তখন লখনউর অবস্থা ভালো ছিল না। পুরোনো শহর 'চকের' দিকটা ছিল খুবই ঘিঞ্জি। নবাব আমল যদিও তখন শেষ হয়েছে তবু নবাবী আমলের কৌলিন্য কাটিয়ে উঠতে পারেন নি লখনউ-এর মানুষরা। সিপাহী বিদ্রোহের পর লখনউ শহরের পুরোনো বাড়ি ঘর দোর মাঠ করে সাফ করে সাহেবপাড়া হজরতগঞ্জ উঠল। নতুন চওড়া রাস্তা হল মল রোডে। 'মল-রোডে' বিরাট বিরাট অট্টালিকা দোকান অফিস বাজার হল। একদিকে সাহেবপাড়া হজরতগঞ্জ অন্যদিকে পুরোনো চকের নবাবী ঐতিহ্য। মাঝে আমিনাবাদ অবহেলিত। একটিমাত্র সদর রাস্তা ইষ্টিশান থেকে কেশরবাগ পর্যন্ত এসেছিল আর ছিল কিছু উলটোপালটা আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি-পথ। যেখানে বস্তিবাড়ি, খোলা নর্দমা, দুধারে। সেই পরিবেশে দোকান-বাজারমন্ডি আর বাইজিদের মহল্লা। তারপাড়াগুলো গণেশগঞ্জ, রকাবগঞ্জ, মৌল-বীগঞ্জ, নজরাবাদ ভিক্টোরিয়া গঞ্জ, মৌলবীমন্ডি নয়াগাঁও। আর একটা রাস্তা আমিনাবাদ থেকে বেরিয়ে ঝাউলাল পুল গোলাগঞ্জ আগামীর দেওড়ি হয়ে পুরোনো চক অবধি গিয়েছিল। ......অতুলপ্রসাদ এসে যে বাড়িখানি প্রথমে ভাড়া নিলেন তা হল নবাব ওয়াজিদআলী শাহের কেশরবাগের দক্ষিণ গেটের সামনে দুটো রাস্তা আউট-ট্রাম রোড ও ক্যান্টনমেন্ট রোডের মোড়ে। ওয়াজিদআলী শাহের বেগমমহল ছিল কেশর-বাগে।—বিরাট একটা চৌকনা জমির মধ্যে চারদিকে সারিবন্ধ প্রাসাদ বেগমদের থাকবার জন্যে। বাগিচার মাঝখানে আর একখানা প্রাসাদ তার নাম বারদুয়ারী। এখানে নবাব বেগমদের নিয়ে গান-বাজনায় আনন্দে মাততেন। উত্তরদিকে বেগমদের স্নান এবং সন্তরণের জন্যে বাঁধান প্রকান্ড জলাধার কেশরবাগের ভেতরের বাগানে জলাধারে মার্বেল পাথরের আসন। ফুল পাতায় ছাওয়া কুঞ্জ। যেখানে বেগমরা একান্তে বসে পরস্পর আলাপচারী হতেন। কেশরবাগে চারটে দরওয়াজা ছিল—উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিমে। ইংরেজরা লখনউ অধিকার করার পর উত্তর-দক্ষিণ দরওয়াজা ভেঙে ফেলে। সেই শূন্য জায়গায় ক্যানিং কলেজ স্থাপন হয়। দক্ষিণ দরওয়াজা ভেঙে একটা রাস্তা চলে গেল আমিনাবাদ থেকে কেশরবাগের মধ্যে দিয়ে। মল রোডে এসে মিশে, গোমতীর তীর ধরে এগুল। গোমতী নদীর তীরে নবাবের বিখ্যাত ছত্তরমঞ্জিল প্রাসাদ রূপ নিল ইংরেজদের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস বাসনের 'ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব'। সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অল্প কিছু দূরে সিপাহী বিদ্রোহের ইংরেজদের স্মৃতিস্তম্ভ রেসিডেন্সী পার্ক বা রেসিডেন্সী। বাকি নবাব আমলের ঘর বাড়ি ভেঙে টুটে...নবাবের মন্ত্রী রোশনদ্দৌলার বাড়ি দখল করে তাতে ডেপুটি কমিশনারের কোর্ট হল—কোর্ট-কাছারী নতুন করে করা হল।—এই হল মিউ-টিনির পরে লখনউ। —তখন ছিল বাঙ্গালী তালুকদার দক্ষিণারঞ্জনের লখনউ। লখনউর উন্নতির মূলে দক্ষিণারঞ্জন।

এখনকার লখনউ শহরকে নতুন করে গড়ে তোলেন বাবু গঙ্গাপ্রসাদ ভর্মা এবং লেফটানেন্ট গভরনার স্যার হারকুট বাটলার। তারপর এলেন অতুলপ্রসাদ।

গঙ্গাপ্রসাদ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য হয়ে পরে বেসরকারী চেয়ারম্যান হয়ে লখনউর আমিনাবাদ মহল্লার উন্নতির কাজে পণ করলেন। ছোটলাট স্যার হারকুট বাট-লারকে রাজি করিয়ে বিলেত থেকে নগর-পরিকল্পক প্রফেসর গেডিসকে আনিয়ে শহরকে উন্নততর করে তুললেন। তৈরী হল আমিনাবাদ পার্ক আমানুদ্দৌলা পার্ক, লেডিজ পার্ক আরো অনেক পুষ্প-পত্র-শোভিত উদ্যান। নবাবদের আমল থেকেই লখনউকে বলা হত উদ্যাননগরী। ইংরেজরা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলো না। নতুন নতুন চওড়া রাস্তা হল—যার নাম ল্যাটুশ রোড, হিউয়েট রোড, শ্রীরাম রোড, গঙ্গাপ্রসাদ রোড। আমানুদ্দৌলা পার্কে গঙ্গাপ্রসাদ নিজের টাকায় তাঁর আপন ভাইয়ের নামে প্রকাণ্ড এক ধর্মশালা তৈরী করলেন। লখ-নউর কেশরবাগের বারদুয়ারীতে 'জন-সাধারণের সমাবেশের' একটি মাত্র জায়গা ছিল। এছাড়া আমানুদ্দৌলা পার্কে 'জন-সমাবেশের' মত একখানা হলঘর ও পাঠাগার তৈরী হল। গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর পর এই হলঘরের নাম রাখা হল গঙ্গাপ্রসাদ মেমো-রিয়াল হল।

তারপর রঙ্গমঞ্চে এলেন অতুলপ্রসাদ।

গঙ্গাপ্রসাদ দেখেছিলেন অতুলপ্রসাদকে। জহুরী জহরৎ চেনে। বিপিনবিহারীকে ধীরে ধীরে বললেন গঙ্গাপ্রসাদ—এই যে যুবক—এ যুবক একে কোথা থেকে আনলেন বিপিনবাবু, এমন নির্ভীক প্রতিভাময় অপরূপ চোখ দুটি। আমাদের যুগ শেষ হয়েছে বিপিনবাবু।

অবশেষে অতুলপ্রসাদ।

অতুলপ্রসাদের লখনউ বা লখনউর অতুল-প্রসাদ।

সেদিন অতুলপ্রসাদকে বাদ দিয়ে লখনউর অস্তিত্ব নেই—কোন মূল্য ছিল না। লখনউর মুকুটহীন রাজা অতুলপ্রসাদ।—যে কোন প্রতিষ্ঠানে যেকোন সংগঠনে উন্নয়ন-মূলক কাজে সঙ্গীতের আসরে রাজনীতিতে অতুলপ্রসাদ সকলের সামনে।

অতুলপ্রসাদ লখনউর সুপ্রসিদ্ধ প্রথম ক্লাব বেঙ্গলী ইয়ংম্যান এসোসিয়েশনের এক-জন কর্মকর্তা। প্রবাসে বাঙালীদের যেখানে বাস সেখানেই তাদের একখানা ক্লাব আর একখানা কালীবাড়ি। লখনউতে কালী-বাড়ির প্রতিষ্ঠা ১৮৬৪ সালে। কলকাতা থেকে মিলিটারী হেড কোয়ার্টার্স উঠে এল লখনউতে তখন চাকরীসূত্রে চার-পাঁচজন

বাঙালী কর্মচারী লখনউ বসবাস করছে। অনেকে ছিলেন আয়ুধে রোহিলা খন্ড রেলওয়ের চাকুরীরও বাঙালীরা। তাদের অবসর সময় কাটানোর জন্য প্রতিষ্ঠা হলো বেঙ্গলী ক্লাবের। প্রবীণরাই এ ক্লাবের একমাত্র সদস্য। রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার অতুল সিংহ হিউয়েট রোডের ওপর একখানি জমি দিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই বেঙ্গলী ক্লাবের পাকা স্টেজ হলঘর হল। অতুলপ্রসাদ যখন লখনউতে এলেন তখন দুই ক্লাবের রেষারেষি শুরু হয়েছে। প্রবাসে বাঙালীদের মধ্যে একতা থাকা দরকার। তাই অতুলপ্রসাদ বেঙ্গলী ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন এবং বেঙ্গলী ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা আনতে চেষ্টা করলেন।

বেঙ্গলী ক্লাব প্রবীণদের।

বেঙ্গলী ইয়ংম্যান এসোসিয়েশন নবীনদের।

প্রবীণ এবং নবীনদের দ্বন্দ্ব চিরকালের। নবীন চিরকাল প্রবীণদের অস্বীকার করে এসেছে। প্রবীণদের অভিমান চিরকালের চিরযুগের।

অতুলপ্রসাদ বললেন, প্রবীণের অভিজ্ঞতাটুকু এবং নবীনের প্রাণময়তার নির্যাসটুকু নিয়ে আমরা সবেগে ধাবিত হব কর্মপথে।

বেশ তাই হোক।

অনেকদিনের চেষ্টায় দুটি ক্লাবের মিলন হল। অবশ্য অনেক বছর পরে। বেঙ্গলী ক্লাবের কর্ণাধার অতুল সিংহের তখন মৃত্যু হয়েছে।—

কিন্তু তারও আগে অতুলপ্রসাদ তখন যুবক ১৯০৮ সাল ভারতবর্ষে তখন স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছে আগুন জ্বলে উঠেছে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বাঙলা দেশের বিপ্লবী তরুণেরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শাসন তন্ত্রের ভিত কেঁপে গেছে। মজঃফরপুর বোমার মামলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। প্রফুল্লচাকী কানাই আত্মত্যাগ করলেন। আলিপুর বোমার মামলায় বারীন ঘোষ উল্লাসকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। ব্যারিস্টার সি, আর, দাশের সওয়ালে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন। আগুন জ্বলল ভারতবাসীর রক্তে রক্তে। ইংরেজ ভারত ছাড়। স্বদেশের কবি অতুলপ্রসাদ। তরুণ কবি অতুলপ্রসাদ। রক্তে তাঁর বান ডাকলো। তখন শুধু গান। রক্ত পাগল করা গান তখন ওঠগো ভারত লক্ষ্মীর কবির। সারা দেশ এককণ্ঠে গাইল সেদিন ওঠ গো ভারতলক্ষ্মী.

ওঠ আদি-জগত জন পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশী কর দূরিত ভারত-লজ্জা
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে।

জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
স্বান্তন-বাস দেহ তুলে চোক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
কান্ডারী নাহিক কমলা, দুঃখলাঞ্ছিত
ভারতবর্ষে

শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-
দর্শে।
তোমার অভয় পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননীগো লহ তুলে বক্ষে,
স্বান্তন-বাস দেহো তুলে চোক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ-তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ
কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত
প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।

বিপ্লবীরা গেল জেলে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে, ফাঁসির মঞ্চে কণ্ঠে তাদের গান...

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় বসে।
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।
সোনার শিকল দে রে খুলি
দুয়ার খানি দে রে তুলি।
বুকের জ্বালা যাব ভুলি
মেঘ পরশে—শীতল মেঘের পরশে।
থাকবে নীচে ধরার ধূলি।
ভুলব পরের বচনগুলি
বলব আমরা আপন বুলি
মন হরষে — আপন মনের হরষে।

আমাদের দেশ কখনই স্বাধীন হবে না উন্নত হবে না যদি ধর্মে গোঁড়ামি থাকে—মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে। ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি হানে। আমাদের দেশে অনেক জাতি অনেক ধর্ম অনেক বর্ণ। আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করি, একে অন্যকে দাবিয়ে রাখি। একজন আর একজনের ছায়া স্পর্শ করি না। ছায়া ছুঁয়ে গেলে অপবিত্র মনে হয় গঙ্গাস্নানে পবিত্র হই। কিন্তু কল্পনা করি কি গঙ্গার স্রোতধারায় পবিত্র স্নানেই কি আমাদের মনের অপবিত্রতা দূর হয়। অতুলপ্রসাদ সেদিন লিখলেন—

পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই।
আপন কারায় বন্ধ তোরা
পরের কারায় বন্দী তাই।
হা রে মূর্খ, হাঁ রে অন্ধ,
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব!
দেশের শক্তি করিস মন্দ—
তোদের তুচ্ছ করে তাই সবাই।
সার ত্যজিয়া খোসার বড়াই।
তাই মন্দিরে মসজিদে লড়াই।
প্রবেশ করে দেখবে দুভাই—
অন্দরে যে একজনাই।

দেশমাতার বিশ্ব-মাতার
স্নেহের কাহের এক পরিবার।
নয় তুরুস্ক, নয়কো তাতার
জন্ম মৃত্যু এই যে ঠাঁই।
ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ—
এক জাতি তাই একেরই অংশ।
হিন্দু রে তুই হবি ধ্বংস
না ছাড়লে এই বালাই।

ভাইকে ছুঁলে পদতলে
শুদ্ধ হোস তুই গঙ্গাজলে
ওরে সেই অস্পৃশ্য ছেলেই তুলে কোলে
তুষ্ট হন যে গঙ্গা মাই।
খাবি নে জল ভাইয়ের দেওয়া?
খাসনে অন্ন তাদের ছোঁওয়া?
ওরে শবরীর আধ খাওয়া মেওয়া
রঘুনাথ তো খেলেন তাই।

তোরাই আবার সভাস্থলে
হাঁকিস সাম্য উচ্চরোলে;
সম-তন্ত্র চাস সকলে —
বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই।

জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে ধর্মনাশ,
নিজের পায়ে পরালি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।
ছাড় দেখিরে রেষারেষি,
কর প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।
তখন তোদের সব বিদেশী
দাস না বলে বলবে ভাই।

অতুলপ্রসাদ তখন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন একটা অঘটন হয়ে গেল।

লখনউকে বলা হয় নবাব শহর। দূর দেশ থেকে যাত্রীরা যখন নগরপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় তখন মনে হয় এ কোন নবাবী দুনিয়ায় এলাম...গম্বুজ থাম্বা সিংহদরওয়াজা আর নবাবী-মেজাজ ও শহরের বৈশিষ্ট্য। লখনউর আমিরি শেষ হওয়া সত্ত্বেও লখনউ এখনও আমির। ছত্তরমঞ্জিলের ছাদে বসে নবাবের সর্ব অঙ্গে সুগন্ধি আতর দিয়ে তেলমর্দন চলত সেই সময়টিতে গোমতীর ওপারের কবুতরখানা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়ে দেয়া হোত নবাবের মাথায় ছায়া দেওয়ার জন্যে। দিলদরিয়া নবাব অসফদ্দৌলার শাসনকালে একবার অযোধ্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। সব প্রজাদের অন্নাভাব ও অর্থকষ্ট দেখা দেয়। দিলদরিয়া নবাব প্রজাদের সাহায্যের জন্যে খোলা হাতে প্রকান্ড এক ইমারত তৈরী করার কথা চিন্তা করলেন। পরিকল্পনা হল দিন রাত কাজের। দিনে যে কাজ হয় রাতে তার কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হয়—আসল উদ্দেশ্য যে প্রজাদের আর্থিক সাহায্য। এমনি করে সে-ইমারত তৈরী হল। আগ্রা-অযোধ্যার নবাবদের শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি ভালো ছিল। মহরমের সময়ে ইমারতগুলি আলো দিয়ে সাজানো হোত এবং সে আলোর রোশনাই দেখতে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ভিড় করতো। —তেমনি দশহরার সময়ে দুই-সম্প্রদায়ের মানুষ রামলীলায় রাবণ বধের দৃশ্য উপভোগ করত। তবু মহরমের সময়ে ইসলামধর্মীদের মধ্যে সিয়া-সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরোধ লেগে থাকতো প্রত্যেক বছর। সিয়ারা তাজিয়া রাখতো দশদিন, তাজিয়ার সামনে 'মাসিয়া' গাইত। দশ দিনের দিন দল বেঁধে বুক চাপড়িয়ে শোকের মিছিল বার করত। ওদিকে সুন্নীদের মিছিল

আসত হর্ষ ভরে লাঠি ছুরি খেলা খেলতে খেলতে। দুই মিছিল সামনাসামনি হওয়া মাত্রই খুনোখুনি বেঁধে যেত লড়াই।

সিয়া সুন্নীর ঝগড়া চলে আসছিল নবাবী আমল থেকে। তারপর এল ইংরেজ। সিয়া সুন্নীর চিরকালিন বিরোধ যদিও অবসান হল তবু সূত্রপাত হল আর এক ভ্রাতৃবিরোধের বিদেশীর হস্তক্ষেপে—অতুলপ্রসাদ তখন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট।

লখনউতে আমিনাবাদ পার্কের কোনে ছোট্ট একটা মহাবীরের মন্দির আছে সে মন্দিরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকতো। সে গরমের দিনে কাছাকাছি ইঁদারা থেকে জল তুলে এনে লোকেদের জলপান করাতো ও মন্দিরের পুজাপাঠ আরতি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতো। এ কথাটি জনসাধারণের অলক্ষেই ছিল। আমিনাবাদের চারদিকে হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়ীদের নানান দোকানঘর কিছু কিছু অফিস পোষ্ট অফিস ব্যাঙ্ক। আশেপাশে কোন মসজিদ ছিল না। তাই কিছু মুসলমান পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মাদুর বিছিয়ে নমাজ পড়ত। এই নমাজ পড়া এবং মন্দিরের পুজা পাঠ আরতি বেশ মিলেমিশে শান্তভাবে চলে আসছিল কয়েক বছর। কয়েক বছর কাল তৃতীয় এক শাসক বিদেশী দলের হস্তক্ষেপে পার্কে মুসলমানদের নমাজে বসার সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মহাবীরের মন্দিরের ক্ষীণ ঘন্টাধ্বনি তাদের আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। প্রথম প্রথম সেই ব্রাহ্মণ আরতির সময়ে মন্দিরে ঘন্টা বাজানো বন্ধ করে দিত। কিন্তু হিন্দুদের সংখ্যাও আমিনাবাদে কম ছিল না তারাও সকলে আরতির সময়ে মন্দিরে এসে দাঁড়ালো। শাঁক ঘন্টাধ্বনি জোর হল। একদিন অবস্থা চরমে উঠল যখন দুই সম্প্রদায়ের দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ি থেকে লাঠালাঠি ছোরা মারামারি ঘটনা ঘটে গেল। রাস্তাঘাট অন্ধকার। মোড়ে মোড়ে জটলা। শান্তিরক্ষক বাহিনীর দেখা নেই। ভারতবর্ষের প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কয়েকদিন ধরে চলল। দাঙ্গা যখন চলছে তখন হাটবাজার দোকানপাট বন্ধ অভুক্ত মানুষ। দুধ মেলে না শিশুর।

অতুলপ্রসাদ ছুটলেন ডেপুটি কমিশনারের কাছে তাঁকে বললেন, তিন-চারদিন হয়ে গেল জনসাধারদের এমন অবস্থা আর আপনারা চুপ করে বসে আছেন। দাঙ্গা বন্ধ করুন। পুলিশ মিলিটারী ডাকুন।

কমিশনারটি পাকা সাম্রাজ্যবাদী। বললেন, মিঃ সেন, আপনারা সকলে স্বরাজ্য কামনা করছেন। আমরা এখানে না থাকলে আপনাদের স্বরাজ্য কেমন হবে একটু ভোগ করে দেখুন!

অতুলপ্রসাদ সংযত মানুষ। তিনি জানালেন, আমাদের মধ্যে কোনদিনই কোন ঝগড়া বিবাদ হয়নি। ছিল না। যতদিন কোন না কোন বিদেশী তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেচে।

এরপর দু'একদিনের মধ্যেই লখনউ শহরে মিলিটারী পুলিশ আসতে দেখা গেল। লখনউ শান্ত হল কয়েক দিনের মধ্যেই। কিন্তু লখনউ শহরের আন্দোলনের জের ধরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লখনউর *'মিউটিজক বিস্ফোর মস্ক' সূত্র ধরেই হিন্দু মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি। বোধহয় পরবর্তী কালে মুসলিম লীগের পত্তন এবং ভারতবর্ষের ভাগাভাগি।* *

রাজনৈতিক জীবনে এবং মতবাদে অতুলপ্রসাদ গোখলের মত ও পথের অনুরাগী — গোখলেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। গোখলে যখন লখনউ এসেছেন অনেক সময়ে অতুলপ্রসাদের বাড়িতেই উঠেছেন। অতুলপ্রসাদের অতিথি হয়ে তাঁর বাড়িতে থেকেছেন সরলা দেবী চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার আশুতোষ বিপিনচন্দ্র পাল। সেবার এলেন লখনউতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ রফিয়ম এসোসিয়েশন হলে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা। পন্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। বাঙালী ক্লাবের তরফ থেকে অতুলপ্রসাদ সুরেন্দ্রনাথকে মাল্যদান করে অভ্যার্থনা করার পর সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে সিংহনিনাদে বক্তৃতা করছেন এমন সময়ে একটি অবাঙালী কলেজের ছেলে 'ট্রেটর ট্রেটর টু দি কানট্রি' বলে চিৎকার করে উঠে ভয়ে পালিয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথের নিনাদ নরম হয়ে গেল এবং তিনি চ্যালেঞ্জ করলেন যে, 'ট্রেটর' বলে তাঁকে সম্বোধন করলেন তাঁকে তিনি সম্মুখে প্রশ্ন করতে চান, কিন্তু সে তখন পলাতক। মালব্যজী আসন থেকে উঠে নত হয়ে সভার সামনে 'এ্যাপলজি' চাইলেন। **...সেবারই ত বিপিনচন্দ্র পাল একমাস প্রায় লখনউতে থেকে বৈষ্ণবধর্মের ওপর বারদুয়ারী হলে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিলেন।

বাঙালী যুবক সমিতির তখন দুর্দান্ত জয়যাত্রা। কারণ অতুলপ্রসাদ তখন কর্ণধার। প্রবাসে লখনউ নগরীতে তখন প্রায়ই দিকপালদের আগমন ঘটে আর সকলের সম্মান —সম্বর্ধনা-সভার জন্যে আছে একটি মাত্র ক্লাব যার কর্ণধার অতুলপ্রসাদ।

'আমাদের মধ্যে উচ্চনীচ জ্ঞান জাত্যাভিমান বড় বেশী।' বললেন অতুলপ্রসাদ।

লখনউতে সেসময়ে বাঙালীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে দুর্গাপুজায় কালীপুজায় বিবাহে অন্নপ্রাসনে বা শ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিদের পৃথক পৃথক স্থানে খাদ্যগ্রহণের জন্যে আসনের ব্যবস্থা হোত। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যকে খাদ্যদ্রব্য ছুঁতে দেওয়া হবে না।

নিশ্চয়ই অন্যায়ই। কেন?

অতুলপ্রসাদ ডাক দিলেন ক্লাবের সভ্যদের। তিনি বললেন আমাকে যখন তোমাদের ক্লাবে প্রধান মেনে নিয়েছ আশাকরি আমার কথা তোমরা শুনবে।

কোন কোন উপলক্ষে চাঁদা তুলে সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হোত। প্রথমে ক্লাবের অনেক সভ্য হয়তো ইতস্ততঃ......দ্বিধাগ্রস্ত হতেন এক পংক্তিতে বসে খাদ্য গ্রহণে—অনেকদিনের সংস্কার।...

'একত্র ভোজনে একতা বাড়ে, মুস... মধ্যে এই যে একতা তার কারণ ... সকলেই তারা একত্র ভোজন করে। ... মানদের মধ্যে একটা প্রথা আছে ... সময়ে মনিবও তার ভৃত্যকে বলে 'আও বিসমিল্লা' করো। এই লোকাচার ... তারা এখনও বজায় রেখেচে। **

ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ।

রাজনীতিবিদ অতুলপ্রসাদ। প্র... ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য তারপর কং... ত্যাগ করে লিবারাল লীগে যোগ দিলেন। তখন যুক্তপ্রদেশের লিবারাল নেতা।

স্বদেশী কবি অতুলপ্রসাদ। স্বদে... মুক্তি কামনা যাঁর ছিল স্বপ্ন। গীতিক... গায়কও অতুলপ্রসাদ।—যেখানে সেখানে যেবে... খাতায়, ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় ডায়রী... জন্ম নিয়েছে তার কবিতাগুলি—অনে... বিখ্যাত গীতিকবিতার। কত কবি... হারিয়ে গেছে, কত গান বিস্মৃতির আড়াল... কবিতায় তাঁর বড় সংকোচ। লুকি... রাখতেন নিজেকে নিজের কবি পরি... থেকে। গান ও কবিতা ছিল তাঁর হৃদয়ে... বড় কাছের। লেখার আগে মনের মা... সুরের আনাগোনা চলতো। সুর প্রথমে মূ... চাইত। পিছু পিছু আসতো কথা।

মোকর্দমার কাজে একবার অতুলপ্রসা... কানপুর গেলেন। দেখা হল সমাজকর্মী ড... সুরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথে... সঙ্গে বাঙলাভাষা সংক্রান্ত কথা হ... অতুলপ্রসাদ তাঁকে বললেন, প্রবাসী বাঙালী... দের একটা মিলন ক্ষেত্র করা দরকার যেখানে... বছরে একবার আমরা সকলে মিলে আমাদে... সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও ভাবের আদান প্রদা... করতে পারি। প্রবাসেও আমাদের বাঙল... সাহিত্যের ধারা যাতে সমন্তরাল চলে ব্যাহ... না হয় তার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখ... কর্তব্য।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, নিশ্চয়ই। আমাদের... তা'হলে এ বিষয়ে এলাহাবাদের জজসাহেব... লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, কাশীর কেদার... বন্দ্যোপাধ্যায়, পন্ডিতপ্রবর গোপীনাথ কবি... রাজ এবং যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি আছেন... তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

কানপুরে এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা... চক্র হল নাম স্থির হল উত্তর ভারতীয় বঙ্গ... সাহিত্য সম্মেলন। প্রথম অধিবেশন বসল... ১৯২৩। অতুলপ্রসাদ এই সভাতেই প্রথম... গাইলেন:—

মোদের গরব, মোদের আশা,
আমরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।

কি যাদু বাংলা গানে —
গান গেয়ে দাঁড়-মাঝি টানে
এমন কোথা আর আছে গো।
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ইত্যাদি—

(ক্রমশ...

* বসন্তকুমার বসুর পান্ডুলিপি থেকে
** সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডাইরি থেকে

* * বসন্তকুমার বসুর পান্ডুলিপি থেকে

অদ্রীশ বর্ধন

শার্লস হোমস!

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কনসাল্টিং ডিটেকটিভ শার্লক হোমস।

কিন্তু তিনি ছাত্রজীবনেই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়েছিলেন অনেকের। সেই কাহিনীই শোনাই এবার।

অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নেওয়ার আগেই কেম্ব্রিজের দিকে ঝুঁকলেন শার্লক হোমস। ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী অবশ্য দরকারে ছিল না তাঁর এবং সেজন্যে খুব লালায়িতও ছিলেন না। বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন ডিগ্রী ছাড়াই।

যাই হোক, হোমস ভেবে দেখলেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ওয়াকিবহাল হতে গেলে কেম্ব্রিজে না গেলেই নয়। তাই ১৮৭৪ সালের শরতের শেষের দিকে সিডনিভিল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন তিনি। ভেষজ বিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পড়াশুনার দিক দিয়ে তখন যথেষ্ট নামডাক ছিল এই কলেজের।

'দি মাসগ্রেভ রিচুয়াল' অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে ওয়াটসনকে বলেছেন হোমস—"কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে আমার ছাত্রজীবনের শেষের দিকে আমার ও আমার পদ্ধতি সম্পর্কে নানান রকম কথা আলোচনা হত।"

ওয়াটসন অবশ্য 'কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি'র পরিবর্তে শুধু 'ইউনিভার্সিটি' লিখেছেন তাঁর বর্ণনায়। সে যাই হোক, এটা ঠিক যে কেম্ব্রিজে এসে সম্পূর্ণ নতুন জীবনপ্রবাহে এসে পড়লেন হোমস—অক্সফোর্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো মিলই ছিল না। জুটল অনেক ছাত্র-বন্ধু। রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ তাদের অন্যতম।

একই কলেজে পড়তেন রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আর হোমস। আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট হিসেবে সহপাঠীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন না রেজিন্যাল্ড। সহপাঠীরা বরং তাঁকে ভাবত অহংকারী, কিন্তু হোমস উপলব্ধি করতেন অহংকার নয়, নিজের সহজাত ত্রুটি আর সংকোচ ঢাকতে গিয়েই কৃত্রিম দেমাকের সৃষ্টি করে ফেলেছেন রেজিন্যাল্ড। রীতিমত অভিজাত চেহারা ছিল তাঁর। লম্বা নাক, বড় বড় চোখ, ঢলঢালা অথচ মার্জিত ব্যবহার। ইংল্যাণ্ডের এক অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর ছিলেন রেজিন্যাল্ড।

অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে উত্তর অঞ্চলের মাসগ্রেভদের আদিবংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে এঁরা নিজেদের বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পশ্চিম সাসেক্স-য়ে। সেখানে হার্লস্টোনের সেই মধ্যযুগীয় জমিদারভবনে সত্যিই দেখবার মত। ও অঞ্চলের সবচাইতে পুরোনো বাড়ী বলতে তাঁদের বাড়ীকেই বোঝাত। জন্মস্থানের মাটির ছাপ যেন ওঁর প্রকৃতিতে লেগেছিল। প্রাচীন খিলেনওয়ালা অট্টালিকা আর সেকেলে জানলার কথা আপনা থেকেই হোম্‌সের মনে উদিত হত বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেই। রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ যেন নিজেই ছিলেন একটা মূর্তিমান ভেঙে-পড়া সামন্তপ্রথা।

প্রায়ই কথার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেন দুই বন্ধু। হোম্‌সের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং তাই থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিচিত্র পদ্ধতির তারিফ করতেন রেজিন্যাল্ড।

শার্লক হোম্‌সের বহু ছাত্রবন্ধুর মধ্যে এই বন্ধুটির নামোল্লেখের প্রয়োজন আছে এই কারণে যে চার বছর পরে মাসগ্রেভ শাস্ত্রের অদ্ভুত মামলায় হোমস্‌কেই মাথা ঘামাতে হয়েছে। একটার পর একটা এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে যে সেই প্রথম রহস্য-ভেদী হিসেবে ইংল্যাণ্ডের আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনে কৌতূহল ও আগ্রহের সঞ্চার করতে পেরেছেন শার্লক হোম্‌স।

১৮৭৯ সালের দোসরা অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালবেলা হোম্‌সের মণ্টেগু স্ট্রীটের ঘরে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলেন রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ।

চেহারা সামান্যই পালটেছে রেজিন্যাল্ডের। চার বছর আগে কেম্ব্রিজের কলেজে আণ্ডারগ্রাজুয়েট সহপাঠী রেজি-ন্যাল্ডের সঙ্গে সেদিনের মানুষটির বিশেষ প্রভেদ ছিল না। বেশবাস বেশ শৌখীন। আগের মতই ছিমছাম মার্জিত শান্ত ব্যবহার। চলনে বলনে আভিজাত্য।

হৃদ্যভাবে করমর্দন করলেন দুই বন্ধু।

"মাসগ্রেভ, খবর ভালো তো?" বললেন হোম্‌স।

"বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনেছো নিশ্চয়। বছর দুয়েক হল আমাদের মায়া কাটিয়েছেন উনি। তারপর থেকে আমাকেই হার্লস্টোনের কাজকর্ম দেখতে হচ্ছে। আমি আবার জেলা-সদস্যও হয়েছি। তাই মরবার ফুরসুৎ পাই না। কিন্তু হোম্‌স, তুমি নাকি তোমার সেইসব ক্ষমতা, যা দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে, তা বাস্তব কাজে লাগাচ্ছ? কথাটা সত্যি?"

"সত্যি।" জবাব দিয়েছেন হোম্‌স। "বুদ্ধি খাটিয়েই জীবিকা রোজগারের প্ল্যান করেছি।"

"শুনে সত্যিই খুশী হলাম। তোমার পরামর্শ এখন আমার কাছে খুবই মূল্যবান। পরপর কতকগুলো ভারী অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে হার্লস্টোনে। পুলিশ তো দিশে পাচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপারটা যেমন অত্যন্ত অসাধারণ, তেমনি রীতিমত দুর্বোধ্য।"

"খুঁটিনাটি সব কিছু বলো, শুনি," সাগ্রহে বলেছেন হোম্‌স।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আশ্চর্য সেই কাহিনী শুনিয়েছেন রেজিন্যাল্ড।

হার্লস্টোন ভবনে মোট সাতজন চাকর-বাকর আছে। বাগান আর আস্তাবলের হিসেব অবশ্য এর মধ্যে নেই—সেখানকার লোকজন আলাদা। এই সাতজনের মধ্যে সবচাইতে বেশিদিনের চাকরি হল বাটলার অর্থাৎ সর্দার-চাকর ব্রানটনের। এককালে ইস্কুলমাস্টার ছিল ব্রানটন। বিশ বছর আগেই রেজিন্যাল্ডের বাবা তাকে নিয়োগ করেন হার্লস্টোনে চাকরদের সর্দার হিসেবে। লোকটা বেশ উদ্যমী। চরিত্রের দৃঢ়তাও আছে। দুদিনেই হার্লস্টোনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ব্রানটন। কিন্তু এহেন মানুষেরও একটা দোষ ছিল। ব্রানটন ছিল একটু ডনজুয়ান টাইপের। মাস কয়েক আগে দু-নম্বর ঝি র‍্যাচেল হাওয়েলসকে বাগ্‌দত্তা করার পর হঠাৎ তাকে ছেড়ে প্রধান শিকার-রক্ষকের মেয়ে জ্যানেট ট্রেজেলিসের সঙ্গে মাখামাখি শুরু করে দিয়েছে সে।

হোমসের কাছে আসার আগের বৃহস্পতিবার কিছুতেই ঘুমোতে না পেরে রাত দুটো নাগাদ বিলিয়ার্ড রুমে যাচ্ছিলেন রেজিন্যাল্ড। উদ্দেশ্য ছিল যে কোন একটা উপন্যাস নিয়ে পড়বেন। এমন সময়ে লাই-ব্রেরীর খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো দেখতে পেলেন তিনি।

চোর-ছ্যাঁচোড়ের কথাই আগে মাথায় এল রেজিন্যাল্ডের। তাই দেওয়াল থেকে একটা রণকুঠার নামিয়ে নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোলেন লাইব্রেরীর দরজার দিকে।

লাইব্রেরীতে বসেছিল সর্দার-চাকর ব্রানটন। পুরোদস্তুর পোশাক পরে একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল সে। হাঁটুর ওপর মেলে-ধরা এক টুকরো কাগজ—অনেকটা ম্যাপের মতই দেখতে। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে-ছিল কাগজখানার ওপর। তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল সেই দিকেই। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের এক পাশে রক্ষিত দেরাজের সামনে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে একটা ড্রয়ার টেনে বার করল। একটা কাগজ তুলে নিয়ে ফিরে এল চেয়ারে। মোমবাতির পাশে টেবিলের কিনারায় রেখে অনন্যমনা হয়ে পড়তে লাগল।

এক পা এগিয়ে গেলেন রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ। সঙ্গে-সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ব্রানটন। ম্যাপের মত কাগজ-খানা গুঁজে রাখলে বুকপকেটে।

ভেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন মাস-গ্রেভ—'চমৎকার! চমৎকার! তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তাই এইভাবে তার প্রতিদান দিচ্ছ! কাল সকালেই এখান থেকে বিদায় হবে তুমি!'

যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল ব্রানটন নতমস্তকে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে—একটা কথাও বলল না। দেরাজ থেকে কি কাগজ বার করেছিল ব্রানটন, তা দেখতে গিয়ে মাসগ্রেভ অবাক হয়ে গেলেন। কেননা, তা আদৌ দরকারী নয়। কাগজে লেখা আছে কতকগুলো প্রশ্ন আর তাদের উত্তর হেঁয়ালির মতই দুর্বোধ্যভাবে তা লেখা। মাসগ্রেভ পরিবারে কেউ সাবালক হলেই তাকে এই জিনিসটি জানতে হয়। বংশানু-ক্রমিক অনুষ্ঠানের মতই সবাই তা মেনে এসেছে যুগ যুগ ধরে। সংস্কারটা শুধু এই পরিবারেই আছে, আর কোথাও নেই। ঠিক যেন আচার অনুষ্ঠানের মন্ত্র। তাই মাসগ্রেভরা হেঁয়ালির নামকরণ করে-ছেন মাসগ্রেভ শাস্ত্র।

চাবিটা ব্রানটন ফেলে গিয়েছিল। তাই দিয়ে দেরাজ বন্ধ করে ঘর থেকে বেরুচ্ছে যাচ্ছেন রেজিন্যাল্ড, এমন সময়ে দেখলেন আবার ফিরে এসেছে ব্রানটন—দাঁড়িয়েছে সামনে।

বলাবাহুল্য, খুবই আশ্চর্য হলেন রেজিন্যাল্ড।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে ব্রানটন—"স্যার, এ অসম্মান আমার সহ্য হবে না। এত কাণ্ডের পরেও যদি আপনি আমাকে বরখাস্তই করতে চান, তাহলে আমাকে এক মাসের নোটিশ দিতে দিন। মাসখানেকের মধ্যেই চলে যাব আমি। লোকে জানবে আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি—এ কলঙ্ক প্রকাশ পাবে না—পেলে আপনারও অসম্মান তো।'

মাসগ্রেভ জবাব দিয়েছেন—"এক মাস অনেক বেশী সময়।" কিন্তু ব্রাইটনের কাকুতি শুনেনুয়ে শেষপর্যন্ত এক সপ্তাহ সময় দিয়েছেন, বলেছেন—"যাবার কারণ হিসেবে যা হয় কিছু বলে যেও।"

এর পর দুটো দিন কাজ-কাজ করেই পাগল হয়ে রইল ব্রানটন। কাজের মধ্যেই সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিল। তৃতীয় দিন সকালে কিন্তু ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাজির হল না ব্রানটন। অথচ প্রতিদিন সকালে রোজকার কাজকর্মের ফরমাশ নিতে প্রাতঃরাশ টেবিলে আসা তার ডিউটি।

কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না ব্রানটনকে। বিছানায় শোয় নি রাত্রে, জামা-কাপড়, ঘড়ি, টাকাকড়ি সবই যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে। নেই শুধু ব্রানটন আর কালো স্যুট। বুট জোড়া রয়েছে, কিন্তু নেই চটি জোড়া। মদ রাখবার পাতালঘর থেকে ছাদের চিলেকোঠা পর্যন্ত সব জায়গাতেই খোঁজা হল। কিন্তু রাতারাতি সব কিছু ফেলে পালিয়েছে ব্রানটন।

এই ঘটনার পর দুটো দিন গেল। এই দুদিনে র‍্যাচেল হাওয়েলস খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। চেঁচাতে লাগল হিস্টিরিয়া রোগীর মত। তৃতীয় দিন রাত্তির থেকে পাওয়া

গেল না তাকে। লেকের ধারে তার একটা ওড়না পাওয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে টানাজালের আয়োজন হল। র্যাচেলের লাশ উঠল না বটে, কিন্তু পাওয়া গেল অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস।

শন-সুতোয় বোনা একটা থলি উঠে এল জলের মধ্যে। থলির মধ্যে বেশ কিছু মরচে-পড়া বহু পুরনো ধাতুর টুকরো, বিবর্ণ নুড়ি অথবা কাঁচ খণ্ড।

সব শেষে বললেন রেজিন্যাল্ড—'এই বিচিত্র কয়েকটি জিনিস আবিষ্কার করা ছাড়া র্যাচেল হাওয়েলস বা রিচার্ড ব্রানটনের কোন সন্ধান আমরা পেলাম না। পুলিশের বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে বলেই এসেছি তোমার কাছে।'

'মাসগ্রেভ, তোমার সেই অদরকারী কাগজটা আমাকে আগে দেখতে হবে,' বলেছেন হোমস। 'চাকরি যেতে পারে জেনেও সর্দার চাকর যে কাগজ নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে পারে, আগে দরকার সেই কাগজখানা।'

মাসগ্রেভ বললেন, 'কিন্তু সেটা নেহাতই বাজে। কোন মাথামুণ্ডুই হয় না আমাদের এই মাসগ্রেভ শাস্ত্রের। তবে অনেক বছরের প্রাচীন তন্ত্র বলেই বনেদীয়ানার খাতিরে ক্ষমা করা যেতে পারে। প্রশ্নোত্তরটার একটা নকল আছে আমার কাছেই, চাও তো চোখ বুলিয়ে দেখতে পার।'

বলে, হোমসের হাতে তুলে দিয়েছেন বিদঘুটে কতকগুলো প্রশ্ন আর উত্তর।

"এটা কার ছিল?"

"যে চলে গিয়েছে।"

"এটা কে নেবে?"

"যে আসবে।"

"মাস কি ছিল?"

"প্রথম থেকে ষষ্ঠ।"

"সূর্য কোথায় ছিল?"

"ওকের মাথায়।"

"ছায়া কোথায় ছিল?"

"এলম-এর নিচে।"

"পা পড়ল কিভাবে?"

"উত্তরে দশ আর দশ, পূবে পাঁচ আর পাঁচ, দক্ষিণে দুই আর দুই, পশ্চিমে এক আর এক, ঠিক তেমনি নিচে।"

"তার জন্যে আমরা দেব কী?"

"যা কিছু আমাদের আছে।"

"কেন দেব?"

"বিশ্বাসের জোরে।"

সেই দিনই বিকেলে হার্লস্টোনে দেখা গেল হোমস আর মাসগ্রেভকে।

ওক সম্বন্ধে কোন দ্বিমত ছিল না। বাড়ীর সামনেই ওক সারির মধ্যে গোষ্ঠীপতির মত দাঁড়িয়ে ছিল সুবিশাল এক ওক গাছ। এ রকম অপরূপ গাছ জীবনে দেখেন নি হোমস। মাসগ্রেভ জানালেন, নর্ম্যানরা যখন ইংল্যান্ড জয় করে, তখন থেকেই গাছটা রয়েছে সেখানে।

কিন্তু বছর দশেক আগে ১৮৬৯ সালে বাজ পড়ে পুড়ে যায় এলম গাছটা। গুঁড়িও পরে কেটে ফেলা হয়। জায়গাটা অবশ্য দেখিয়ে দিলেন মাসগ্রেভ। উচ্চতাও বলে দিলেন, চৌষট্টি ফুট। ট্রিগোনোমেট্রির অঙ্ক কষানোর সময়ে ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই এই গাছটারও উচ্চতা বার করতে দিয়েছিলেন মাসগ্রেভকে—তাই হিসেবটা তাঁর মনে ছিল।

ফস করে প্রশ্ন করলেন হোমস, "বলো দেখি মাসগ্রেভ, ব্রানটন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোমাকে করেছিল?"

অবাক হয়ে গেলেন রেজিন্যাল্ড। বললেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে। সহিসের সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় ওর কয়েক মাস আগে। তখনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল গাছটা কত উঁচু ছিল।"

সূর্য তখনো ওকের মাথায় এসে পৌঁছয় নি, কাজেই মাসগ্রেভকে নিয়ে লাইব্রেরীতে গেলেন হোমস। কাঠ চেঁছে একটা খোঁটে তৈরী করলেন। গোঁজটার সঙ্গে বাঁধলেন একটা লম্বা সুতো—প্রতি এক গজ অন্তর একটা করে গিঁট রইল সুতোয়। তারপর দুটো ছ ফুট মাপের মাছধরা ছিপ নিয়ে গেলেন এলম যেখানে এককালে ছিল সেইখানে। সূর্য তখন হেলতে-হেলতে ওকের মাথায় এসে পৌঁছেছে। ছিপটা মাটিতে পুঁতে দিলেন হোমস। লক্ষ্য করলেন ছায়াটা কোনদিকে পড়ছে। মাপলেন তৎক্ষণাৎ। দেখা গেল তা লম্বায় ন ফুট।

এর পরের হিসেব খুবই সোজা। ছ ফুট উঁচু ছিপের ছায়া যদি ন ফুট লম্বা হয়, তাহলে চৌষট্টি ফুট উঁচু এলম-এর ছায়া হবে ছিয়ানব্বুই ফুট এবং দুটো ছায়াই একই রেখা বরাবর বিস্তৃত হবে।

ছিয়ানব্বুই ফুট মেপে এগোতেই বাড়ীর দেওয়ালের কাছে এসে পড়লেন হোমস। সে জায়গায় মাটিতে একটা খোঁটা পুঁতে দিলেন তিনি। সেখান থেকে এগোতে লাগলেন পা মেপে-মেপে।

বাঁ পায়ে দশ এবং ডান পায়ে দশ—এইভাবে এগোলেন হোমস অর্থাৎ দেওয়াল বরাবর সমান্তরাল রইল তাঁর অগ্রগতি। তারপর সতর্কভাবে প্রতি পায়ে পাঁচ পা পাঁচ পা করে এগোলেন পূর্বদিকে, সেইভাবেই দক্ষিণে দুই আর দুই। এসে পৌঁছলেন একটা পুরোনো দরজার সামনে। বাড়ীর সব চাইতে পুরোনো অংশ সেটা। সেখান থেকে পশ্চিমে দু পা যাওয়া মানেই পাথরবাঁধানো গলিপথ বেয়ে নিচে নামতে হবে হোমসকে। অর্থাৎ আগাগোড়া হেঁয়ালি দিয়ে রচিত মাসগ্রেভ শাস্ত্রে এই স্থানটিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে অতি সুকৌশলে।

উত্তেজিত হয়ে মাসগ্রেভ বললে, "এবার নিচে!"

পাথরের ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন দুই বন্ধু। দেশলাই জ্বালাতেই একটা লণ্ঠন চোখে পড়ল। বেশ বোঝা গেল, এর আগেও এই পাতালপুরীতে লোক এসেছিল।

লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে নিচে নামতেই দেখা গেল একটা গুদোমঘর। এককালে সেখানে কাঠ রাখা হত। এখন ঘরের মাঝখানটা সাফ করা হয়েছে। সেখান বসান একটা ভারী পাথরের চাঁই। তাতে লাগান লোহার আংটা। আংটায় জড়িয়ে আছে একটা উলের মাফলার।

"ব্রানটনের মাফলার!" চিৎকার করে উঠলেন মাসগ্রেভ।

ডেকে আনা হল স্থানীয় পুলিশ। অতিকষ্টে সরান হল ভারী পাথরটা। নিচে গাঢ় অন্ধকার। ঝুঁকে পড়লেন সবাই। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সেই বিচিত্র দৃশ্য।

ছোট্ট একটা কামরা। এক পাশে একটা কাঠের বাক্স। পেতল দিয়ে মোড়া। ডালাটা তোলা ওপর দিকে। বাক্সর ওপর পুরু ধুলো, ভেতরে ছাতা পড়েছে, পোকায় কাঠ খেয়ে ফেলেছে। কতকগুলো অতি প্রাচীন মুদ্রা পড়ছিল ভেতরে। তাছাড়া বাক্স শূন্য।

বাক্সের পাশে উবু হয়ে বসে একটা মানুষের দেহ। পরনে কালো স্যুট। মাথা হেঁট করে বাক্সতে ঠেকিয়ে বসেছিল সে। রক্ত-জমা নীল মুখ দেখে চেনবার উপায় না থাকলেও মাসগ্রেভের ভুল হয় নি।

কিন্তু রিচার্ড ব্রানটনের দেহে তখন প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না।

মাঝরাতের নাটকটা সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে নতুন করে রচনা করে শুনিয়ে দিলেন হোমস। হোমসের মতই পাতালকক্ষের সন্ধান পেয়েছিল ব্রানটন। র্যাচেল হাওয়েলসের সাহায্যে পাথরের চাঁইটা তুলেও ছিল। নিচে নেমে বাকস খুলেছিল সর্দার-চাকর, জিনিসগুলো সঙ্গিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। আর, তার পরেই আচম্বিতে পাথরের চাঁইটা নেমে এসেছে যথাস্থানে।

র্যাচেলের অনেক ক্ষতি করেছে বিশ্বাসঘাতক ব্রানটন। তাই সেই রাতে র্যাচেলই প্রতিশোধ নিয়েছিল কি আপনা হতেই পাথরটা নেমে এসে ব্রানটনের কবর রচনা করেছিল, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাধিমুখ বন্ধ হয়ে যেতেই মূল্যবান সম্পদভর্তি থলিটা নিয়ে ছুটে ওপরে পালিয়ে এসেছে র্যাচেল—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জলার জলে। পরের দিন থেকে সেই কারণেই হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচিয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু কাঠের বাক্সে ছিল কী?

"জলা থেকে যে থলিটা উদ্ধার করেছ, দেখা যাক তার ভেতরে কি আছে," বললেন হোমস।

সঙ্গে-সঙ্গে পড়বার ঘরে গেছেন দুই বন্ধু। টুকরো-টুকরো জঞ্জালগুলো হোমসের সামনে রেখেছেন মাসগ্রেভ।

কালো ধাতুর টুকরো আর নিষ্প্রভ পাথরগুলো হাতে ঘসতেই রোশনাই ছড়িয়েছে। হোমস তখন বলেছেন—"মরচে-ধরা এই ধাতুই হল ইংলন্ডের রাজমুকুট!"

"রাজমুকুট!" সবিস্ময়ে বলেছেন মাসগ্রেভ।

"আলবৎ তাই। দোমড়ানো-তোবড়ানো এই ধাতু আর পাথরের বস্তুটিই রাজাদের শিরে শোভা পেয়েছিল এককালে।"

শুভংকর

শান্তির জন্য জল : আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জলের আর এক নাম জীবন। মানুষের জীবনধারণের জন্যে বায়ু যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, জলও তেমনি। শুধুমাত্র প্রাণধারণের জন্যে নয়, মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেও জলের একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর তিনভাগ জল, অথচ পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক বিশুদ্ধ জল পান করতে পারে না এবং তাদের অর্ধেক বেশির ভাগ সময়ে উদরাময়, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি জলবাহিত রোগে ভোগে। এছাড়া চাষাবাদের জন্যে জলাভাব, প্রাকৃতিক বিরূপতার দরুন খরা ও দুর্ভিক্ষ, জল-প্রাবল্যে বন্যা, শিল্পের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা জলের দূষণ ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন মানুষকে হতে হয়।

পৃথিবীর অগ্রসর অনগ্রসর সকল দেশেই জল সংক্রান্ত সমস্যা আছে। তবে জলের প্রকৃতি ও জলসম্পদের পরিমাণ, শিল্পোন্নয়ন, জনবসতি অনুযায়ী সমস্যার প্রকৃতি ও চরিত্র ভিন্নতর হয়। শিল্পোন্নত দেশে সমস্যা হচ্ছে প্রধানত শিল্পের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা জল দূষণ এবং দূষিত জলের পরিশোধন সম্পর্কে। অনগ্রসর দেশে সমস্যা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল ও জলের বিশুদ্ধি রক্ষা সম্পর্কে। এছাড়া যে সব নদ-নদী একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তাদের ব্যবহার সংক্রান্ত নানা সমস্যা আছে।

শহরে ও গ্রামে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে পরিমাণ জল পাওয়া যায় তার ওপরই তাদের কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে। জল যেমন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তার স্বাস্থ্যরক্ষা, গৃহ ও সামাজিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে। জল প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে চাষাবাদের কাজে, জল প্রয়োজন শিল্পের উপকরণ হিসাবে। এই সব কটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানুষের পান ও স্বাস্থ্যবিধানের জন্যে যে জল প্রয়োজন তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ মানুষের স্বাস্থ্য যদি বজায় না থাকে, তার কর্মক্ষমতা কমে যাবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে।

গৃহস্থালি কাজের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের অভাব পৃথিবীর সকল দেশেই আছে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সমস্যা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর। যে দেড়শত কোটি লোক উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাস করে তাদের মধ্যে কমপক্ষে প্রায় শত কোটি লোক অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে পানীয় জল ব্যবহার করে থাকে। তার ফলে তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জলবাহিত বা জল-সংক্রান্ত রোগে ভুগে থাকে। প্রতি বছর আনুমানিক ৫০ কোটি লোক এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক কোটি লোক (তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশু) মারা যায়।

আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা এবং অন্যান্য উদরাময় রোগ দূষিত পানীয় জলেরই প্রত্যক্ষ ফল। টাইফাস, ট্রাকোমা ইত্যাদি রোগ পরোক্ষভাবে জলাভাবের দরুনই হয়ে থাকে। পরিধেয় বস্ত্রাদি ও গৃহাদি যদি সর্বনিম্ন মান অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখা যায়, তা হলে এই সব রোগ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সরলতম প্রয়োজন না মানার দরুনই ট্রাকোমা রোগ হয় এবং অনেক সময় তাতে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে, পৃথিবীতে ৫০ কোটি লোক ট্রাকোমা রোগে আক্রান্ত।

স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহের দ্বারা জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব যে অনেকাংশে কমানো যায় তার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জাপানে একটি গ্রামীণ সমীক্ষা থেকে জানা যায়, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহ ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর অন্ত্রের রোগ শতকরা ৭০ ভাগের বেশী এবং ট্রাকোমা শতকরা ৬৪ ভাগ হ্রাস পায়। ভারতের উত্তরপ্রদেশে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৭৪·১ ভাগ এবং টাইফয়েড রোগে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬৩·৬ ভাগ কমে যায়। আর উন্নততর স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহ ব্যবস্থার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলেরা রোগ বহু বছর আগেই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং টাইফয়েড রোগও সেখানে অতি বিরল। আর ট্রাকোমা রোগের কথা সেখানে প্রায় শোনাই যায় না এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের যে সব অঞ্চলে জল সরব ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয় সেখানেই যে এই রোগের কিছুটা প্রাদুর্ভাব দেখা য

জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় পৃথিবীর বহু অঞ্চলে আজও সহজ নয় বলে সেখানকার মেয়েদের ও বা বালিকাদের জল সংগ্রহের জন্যে দি প্রায় অর্ধেক সময় ব্যয় করতে হয়। এ আশ্চর্যজনক মনে হলেও মর্মান্তিকভ সত্য যে, মানুষের জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিক সমৃদ্ধির জন্যে পর্যা পরিমাণ জল সরবরাহের গুরুত্ব আজও সরকার যথাযথ উপলব্ধি করেন না। প বহন, শক্তি উৎপাদন ও শিল্পোন্নয় প্রকল্পের প্রতি তাঁরা এত বেশি গু আরোপ করেন যে জল সরবরাহের প্র যথোচিত দৃষ্টি দেন না। এ সমস্ত কা মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্যে বিশ জলের গুরুত্ব সম্বন্ধে সারা পৃথিবীব্যা সচেতনতা গড়ে তোলার একান্ত প্রয়ো দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীতে বর্তমান যে হারে জনসং বাড়ছে সেই অনুপাতে খাদ্যোৎপাদন বাড় না। তার ফলে অনগ্রসর দেশগুলিতে চ খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। আগামী ১ বছরে খাদ্যোৎপাদন যদি প্রয়োজনানু না বাড়ে তা হলে লক্ষ লক্ষ লো অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। ক্ষু বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে জলে সদ্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে একটি অ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষিকার্যে সেচের জ জলের একটা বৃহদংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক জল ব্যবহারে শতকরা ৮৫ ভাগ নিয়োজিত হয় সেচকার্যে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে যেম আছে জল-প্লাবন ও বন্যার সমস্যা, আবা অন্যান্য অঞ্চলে আছে জলাভাব খরা অন বৃষ্টিজনিত সমস্যা। আবার অনেক স্থানে অনুপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা, প্রাচীন প্রণালী ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের দরুন জলের সদ্ব্যবহার না হয়ে নষ্ট হয়। জলে লবণাক্ততা আর একটি সমস্যা। নদীর জলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ভারত ও পাকি স্তানে প্রতি বছর চাষাবাদের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাদ্য শুধু জমি থেকে আমরা পাই না, সমুদ্র নদী হ্রদ থেকে আহরিত মাছও আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। কিন্তু জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে মাছের উৎপাদনও হ্রাস পায়।

জল শুধু আমাদের প্রাণধারণ খাদ্যোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন হয় শিল্পের কাজেও প্রচুর পরিমাণ জলে প্রয়োজন হয়। কৃষিকার্যের পর শিল্পেই স চেয়ে বেশি পরিমাণ জল ব্যবহৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে যে

...পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয় তার শতকরা ৪৬ ভাগ শিল্পে নিয়োজিত হয়। শিল্পে ব্যবহৃত জলের বহুলাংশ নদীনালায় পরিত্যক্ত হয় এবং তা পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্পে ব্যবহৃত জল অনেক সময় নানা রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা দূষিত হয়ে থাকে।

শিল্প-বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরের পক্ষে জলপথ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা। জলপথে পণ্যদ্রব্যাদি সহজে ও সস্তায় পরিবাহিত হয়ে থাকে। সেজন্যে নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অনুন্নত দেশ সমেত পৃথিবীর সর্বত্র শক্তির চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গঠিত হয়েছে। পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎশক্তির এক-তৃতীয়াংশ এখন পাওয়া যায় জলবিদ্যুৎ থেকে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের খরচ যদিও বেশি, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অনেক কম। তাই জলবিদ্যুতের প্রতি উন্নয়নশীল সকল দেশেই আজ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জল সংক্রান্ত এই সকল বিবিধ সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধানের পথ অনুসন্ধানের জন্যে ২৩-৩১ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে 'শান্তির জন্যে জল' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে। এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইস্রায়েল প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার ১২টি দেশ সমেত ৭২টি দেশ, ১২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ৮টি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করছে। সম্মেলন প্রকাশ্য অধিবেশন ও ২টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। একটি পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের সরকারী ব্যক্তিগণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকগণ অংশ গ্রহণ করবেন। সম্মেলনে আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত, ভূগর্ভস্থ জলব্যবস্থা, শিল্পে ব্যবহৃত জলের পুনঃ ব্যবহার, নদী প্রকল্প, জলের লবণতা দূরীকরণের প্রচলিত ও পরমাণুশক্তিচালিত প্রণালী, সমুদ্রের জলকে ব্যবহারোপযোগী করা, সেচ পরিকল্পনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসংরক্ষণপদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক জল আইন সম্পর্কে আলোচনা হবে। এই সঙ্গে জল সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে যোগদান করছেন সেচ ও শক্তি মন্ত্রকের সচিব শ্রীপি আর আহুজা, পরিবহন মন্ত্রকের শ্রীকে সি মাদপ, জল ও শক্তি কমিশনের ডঃ কে এল রাও এবং কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশনের শ্রীপি এন কুম্বা।
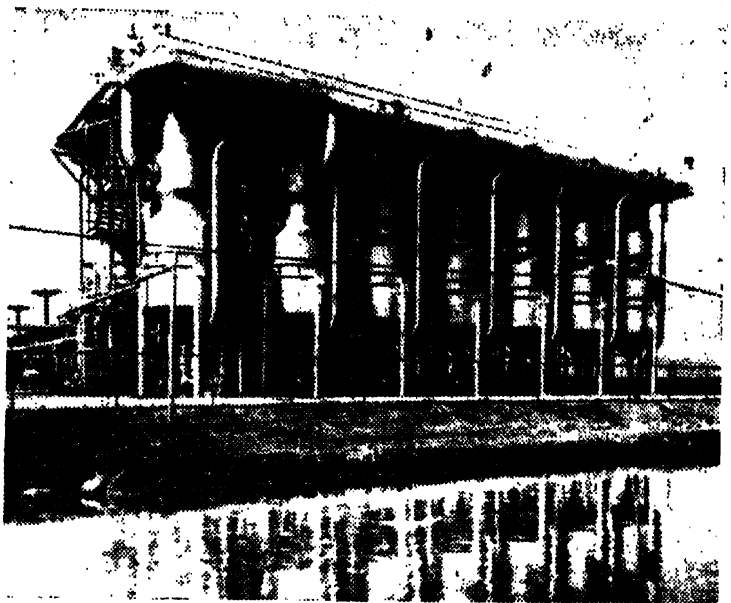
জলের লবণতা দূরীকরণের যন্ত্রকৌশল

অনন্য গণিতপ্রতিভা রামানুজন

(১১)

রামানুজনের অনন্য গণিতপ্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক হার্ডি একটি বিষয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করেছেন। সেটা হচ্ছে রামানুজনকে কিভাবে আধুনিক গণিতের সঙ্গে পরিচিত করা যায়। হার্ডির আহ্বানে রামানুজন যখন কেম্ব্রিজে উপনীত হন, তখন তাঁর সঙ্গে গবেষণা করার সময় হার্ডিকে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হার্ডি বলেছেন, রামানুজনের মতো গণিতপ্রতিভাকে নিয়মমাফিক শিক্ষা দেওয়া ও গোড়া থেকে গণিতশিক্ষা করতে বলা ধৃষ্টতা। আমি যদি এ ব্যাপারে জোর দিতুম, তা হলে রামানুজন বিরক্ত হতেন এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে এমন কয়েকটি বিষয় ছিল যার সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা দূর না করাও ছিল অনুচিত। জেটা-ফাংশনের সমস্ত শূন্য বাস্তব বলে তাঁর যে ধারণা ছিল সেটা বদ্ধমূল হতে দেওয়া অসম্ভব ছিল। তাই আমি এবিষয়ে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। তবে আমি তাঁকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই তাঁর কাছ থেকে বেশি শিখেছিলাম। কয়েক বছরের মধ্যে রামানুজন ফাংশনের তত্ত্ব এবং সংখ্যা বিশ্লেষণ তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। রামানুজন কোনোদিনই আধুনিক চিন্তাধারার গণিতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি যে সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছেন, তা ভুল বা নির্ভুল হোক, সহজাত বুদ্ধি ও আরোহ পদ্ধতিতে মীমাংসা করতেন এবং প্রত্যেকটিতে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যেত।

হার্ডির মতে বীজগণিতের সূত্র, অসীম শ্রেণীর রূপান্তর ইত্যাদিতে রামানুজনের যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন মেলে তা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। এবিষয়ে তাঁর সমকক্ষ পাওয়া যায় না এবং একমাত্র বিশ্বখ্যাত গণিতজ্ঞ ওয়লার বা জ্যাকবির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। আরোহ পদ্ধতিতে তিনি অধিকাংশ আধুনিক গণিতজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি গাণিতিক গবেষণা করেছেন।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, আধুনিক বিশ্লেষণ গণিতের গোড়া-পত্তনের সময় কোনো গণিতজ্ঞের পক্ষে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া যত সহজ ছিল আজকের দিনে তার চেয়ে অনেক কঠিন। একদিক থেকে এই কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য। রামানুজনের কাজের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের গণিতে তার প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। মহত্তম কাজের মধ্যে যে সরলতা ও অপরিহার্যতা থাকে তাঁর কাজের মধ্যে তা নেই। কিন্তু তাঁর কাজের একটি গুণ কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। সেটা হচ্ছে তাঁর গভীর ও অনন্য মৌলিকতা। রামানুজন যদি তাঁর যৌবনে গাণিতিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হতেন তা হলে তিনি হয়তো আরও বড় গণিতজ্ঞ হতে পারতেন এবং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নতুন আবিষ্কার করতে পারতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে যে রামানুজনকে আমরা পেতাম তাঁর মধ্যে 'এই রামানুজন'স খুঁজে পাওয়া যেত না এবং একজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের প্রতিচ্ছায়া বিশেষভাবে প্রকাশ পেত। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হত বেশি। আর সেই রামানুজনকে পাইনি বলেই গণিত-জগতে এই রামানুজন একক এবং অনন্য।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

(ক) মাউন্ট এভারেস্টের পরিমাপ সর্বপ্রথম কে করেছিলেন? তাঁর নামে উক্ত মাউন্টের নাম রাখা হয়নি কেন? (খ) 'ইথার'-এর আবিষ্কর্তা কে? (গ) বাংলার কাশীদাসী মহাভারতের ইংরিজি অনুবাদক কে?

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত
সান্ত্বনাকুমারী গুপ্তা
টিকর, সিংভূম।

●

বিশল্যকরণী, সাবর্ণকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী ঔষধ সমন্বিত গন্ধমাদন পর্বতের শিখরটি মহাবীর হনুমান কর্তৃক আনয়ন মূল বাল্মীকি রামায়ণে আছে কি?

সুবিমলকুমার পাল
১৮৮।১২, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
কলিকাতা—৪৫

●

বর্তমানে ভারতবর্ষের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এবং আধুনিক গানে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গায়িকা কে?

অমিত চ্যাটার্জি
আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি।

●

১। সমগ্র ভারতে চা-বাগানের সংখ্যা কয়টি? এর মধ্যে বাংলা দেশে কয়টি? ২। ভারতে প্রথম চা-বাগান কোথায় এবং এবং কে পত্তন করেন?

শেষপ্রকাশ চক্রবর্তী,
গেন্দ্রাপাড়া চা-বাগান,
পোঃ বানারহাট,
জলপাইগুড়ি।

●

উত্তর

গত ৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী শেলী মজুমদার ও প্রকৃতি মজুমদার দুটি প্রশ্নের উত্তরে জানাই ঃ

(১) ভ্যাটিকান সিটি 'টাইবারের' দক্ষিণপ্রান্তে ১০৮'৭ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে। (২) বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগারটি হল 'লেনিনগ্রাদে' অবস্থিত অ্যাকাডেমী অব সায়ান্স নামক লাইব্রেরী। এতে বই আছে ৪,০০০,০০০-এরও বেশী।

স্বরাজ মজুমদার
কসবা, কলিকাতা-৪২।

গত ৫০শ সংখ্যায় অমৃতে প্রকাশিত দিলীপকুমার বৈরাগীর (৩) প্রশ্নের উত্তরে জানাই বৃটিশ গায়েনের একসেন্ট নামের একখানি ডাকটিকিটই সবচেয়ে দামী। এর দাম সাড়ে সাত হাজার পাউন্ড।

সুব্রত ঘোষ
বাটানগর (নিউ ল্যান্ড)
জেলা ২৪ পরগণা।

●

গত ৫১শ সংখ্যায় প্রকাশিত কুচবিহারের দেবব্রত সিংহের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,—"বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাহার পর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৮৯ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নব-নবপর্যায় এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এর বেশ কিছুকাল পরে কবি মোহিতলালের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মোহিতলালের সম্পাদনায় "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়।

ঐ সংখ্যারই কলকাতার নিতাই ঘোষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,—

সাবর্ণ চৌধুরীদের সকল উত্তরপুরুষের সন্ধান না পেলেও বেহালার অন্তর্গত বড়িষা নামক স্থানে অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যাবে।

৫১শ সংখ্যায় ডুমডুমা-আসামের সুনির্মল দাশ পুরকায়স্থের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী স্থাপিত হয়।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত বর্ধমানের আশুতোষ সেনের ২নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে,—

বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়টি।—কলিকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্র-ভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণী। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় সকল বিষয়ই পড়ানর ব্যবস্থা আছে। হয়তো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয় পড়ান হয় না—কিন্তু সবগুলি বিষয়ই কোন-না-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়।

তৃপ্তিকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯, মুখার্জীপাড়া লেন,
কলিকাতা-৩১।

●

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫১শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত সুনির্মল দাশ পুরকায়স্থের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (ক) পৃথিবীতে দুইটি দীর্ঘতম রেল সেতু আছে। যথাক্রমে আফ্রিকার লোয়ার-জাম্বেসী ব্রীজ, আর্চ-ওয়ে সীডনী হার্বার ব্রীজ (অস্ট্রেলিয়া)।

(খ) পৃথিবীর সৌন্দর্যতম নগরী প্যা[রী] শহর, স্বর্ণশহর।

ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রী[মতী] শেলী মজুমদারের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি (১) ভ্যাটিক্যান সিটির আয়তন ২২ বর্গমা[ইল] (২) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী হ[ল] সোভিয়েট দেশের লেনিনগ্রাদের ন্যাশনা[ল] লাইব্রেরী। বইয়ের সংখ্যা ৭২ লক্ষ[ের] বেশী।

(১) কংগ্রেস ১৮৮৫ খৃঃ গঠিত হ[য়]। (২) শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম দশজন গা[য়ক] হচ্ছেন—প্যাট বুন, হেমন্ত মুখার্জী, [illegible] মঙ্গেশকর, কনি ফ্রান্সিস, জীম রিভ[স] মুকেশ, ববি ডরিন, লুমন্টে, [illegible] দেববর্মন। (৩) জাতীয় অধ্যাপক সত্যে[ন্দ্র] নাথ বসুর শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছেঃ—(১) "বো[স] ফের্মি সংখ্যায়নতত্ত্ব নির্ণয়" (২) "৬ ৪ সমীকরণ।"

৭ম বর্ষ, ২ সংখ্যায় প্রকাশিত প্র[শ্ন] গুলির উত্তরে জানাচ্ছি যে,—(১) পশ্চি[ম] বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গ্রাম ও জনপদগুলির সং[খ্যা] হচ্ছে ৩০টি। (২) পশ্চিমবঙ্গের [illegible] শিক্ষিতের হার হচ্ছে প্রতি হাজারে ২১ জন। (৩) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিমা[নের] নাম TU—114, বিমানটি সোভি[য়েট] রাশিয়াতে তৈরী। ঐ বিমান একস[ঙ্গে] ২২০ জন যাত্রী নিয়ে ঘন্টায় ৬২৫ মা[ইল] বেগে চলতে পারে। এর মধ্যে এক রেস্তোরাঁ আছে। (৪) খনি ও [illegible] বিপদের প্রতীক চিহ্ন বলে লাইট [illegible] ঐভাবে ডেঞ্জার লাইন দেওয়া হয়। (৫) সাইক্লোট্রন পরমাণু বিচ্ছিন্ন করবার য[ন্ত্র] স্পিন্থারিস্কোপ জাল নোট ধরবার য[ন্ত্র] স্পেকট্রোমিটার আলোকরশ্মি সনাক্ত কর[বার] যন্ত্র, আবিষ্কার করেন মিঃ জোসে[ফ] ফ্রনহফার। ইনসিনারেটর আবর্জনা পোড়া[বার] যন্ত্র। (৬) আলফারশ্মি পজেটিভ তড়ি[ৎ] ধর্মী পদার্থকণার সমষ্টি, ধর্মে হিলিয়া[ম] কণার ন্যায়। বিটা রশ্মি নেগেটিভ [illegible] তড়িৎকণা, ইলেকট্রন কণার সমষ্টি [illegible] গামারশ্মি তড়িৎকণা নয়। এই রশ্মি [illegible] তরঙ্গদৈর্ঘ্য রঞ্জনরশ্মির চেয়ে কম। [illegible] রশ্মির সাহায্যে অন্ধকারে শত্রুর সৈন্য [illegible] অবস্থান ধরা পড়ে তাকে ইনফ্রা রেড [illegible] বলে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা[চ্ছি] যে, "এটম রকেট" আবিষ্কার করেন [illegible] চার্লস কেটারিং। (৭) পশ্চিম বাংলা[র] বাঁকুড়াতে বেশী প্রাচীন মন্দির দেখ[তে] পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে কোন প্রাচীন মন্দির দেখতে পাওয়া যায় [illegible] সম্বন্ধে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব [illegible] নৃতত্ত্ব বিভাগ গবেষণা করছেন। (৮) [illegible] নদীর গভীরতা বর্তমানে বেশী [illegible] মোহানার অদূরেই।

রাহুল কর[illegible]
৬, রামনগর [illegible]
আগরতলা, ত্রি[পুরা]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

রকমারী পছন্দসই

১২৫ টাকা থেকে ঊর্দ্ধমূল্যের
রেডিও এবং ট্রানজিস্টর

আজই আপনার বন্ধু মারফি বিক্রেতার কাছে এগুলি দেখুন।

murphy মারফি গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!

Murphy sets the standard

NAS 6142

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড

অমৃত

৫ম সংখ্যা ৪০ পয়সা

Friday, 2nd June 1967. শুক্রবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

'ছুটি' প্রসঙ্গে

'ছুটি' একটি সুন্দর ছবি। এই ছবিতে পরিচালিকা দিয়েছেন নতুন মেজাজ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

একটি অসাধারণ চিত্র উপহার দেবার আকাঙ্ক্ষায় নতুন পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী একটি বিশিষ্ট গল্প বেছে নিয়ে অসামান্য চিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীবিমল করের রচনা 'খড়কুটো'র চিত্ররূপ এই ছবি। এই ছবিতে আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য অনস্বীকার্য। গঠন ও বিন্যাসেও পরিচালিকার সুষ্ঠু চিন্তা-শক্তি এবং শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালিকা তাঁর কাজে মোটের উপর প্রতিভার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন।

সঙ্গীত এই ছবিতে অলঙ্কার নয়, একটি বিশেষ অঙ্গ। সঙ্গীত পরিচালনায় অরুন্ধতী দেবী পরিচয়লিপি থেকে শুরু করে বিলম্বিত সঙ্গীত পর্যন্ত ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে আবহসঙ্গীতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি গান এখানে অর্থবহ।

ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে অমল আর ভ্রমর যেন আমাদের একান্ত আপন-জন। সেখানেই পরিচালিকার বড় কৃতিত্ব। ছবির নামকরণও সত্যিই সার্থক। তিনি ভবিষ্যতে আরও ভাল এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ছবি করবেন এই আশা আমরা পোষণ করতে পারি। নমস্কারান্তে।

দেবব্রত রায়
নবগ্রাম, হুগলি।

ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে

আপনাদের ৪৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ওড়িয়া সাহিত্যের সেকাল ও একাল' প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। প্রতিবেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এটা অবশ্য এক শুভ উদ্যম। সাহিত্য ক্ষেত্রে এরূপ উদ্যম যতই সার্থক হবে জাতীয় সংহতির ভিত্তিও তত সুদৃঢ় হবে। কিন্তু প্রবন্ধটিতে, কয়েকটি ত্রুটির জন্যে মনে বিশেষ দুঃখ হল। ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী সাহিত্য চর্চায় বিষয়গত বিরুদ্ধতার দিকে আমাদের তীব্র দৃষ্টি থাকে—এবং থাকাও উচিত। অথচ একজন বাঙালী সমালোচকের লেখা ওড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটিতে বিষয়গত বিশুদ্ধতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধকার এমন কয়েকজনকে বাদ দিয়েছেন যাঁদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কোন রকমে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কবি দীনকৃষ্ণ, কবি অভিমন্যু সামন্ত সিংহার, কবি সূর্য বলদেব রথ, (ইনি সদানন্দ কবি সূর্য ব্রহ্মানন্দ) ও গোপালকৃষ্ণ সে যুগের কাব্য ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল। অথচ প্রবন্ধে এঁদের নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। কবি রাধানাথ রায় আধুনিক যুগের প্রথম কবি। ইনি এক যুগপ্রবর্তক এবং ভূদেববাবু ও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। বস্তুত ভূদেববাবু ও নবীনচন্দ্র রাধানাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কবিতা লিখেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই রাধানাথ রায় হয়েছেন রাধানাথ রথ। আরো মজার কথা যে উৎকলমণি গোপবন্ধু হয়েছেন গোপালবন্ধু আর পন্ডিত নীলকণ্ঠ হয়েছেন উৎকলমণি নীলকণ্ঠ। বর্তমান সময়ের অনেক কবি, সাহিত্যিক ও উপন্যাসিকের নাম ঠিক এমনিভাবে বিকৃত হয়েছে। যেমন রাজকিশোর রায় হয়েছেন রাজা কিশোরীলাল রায় এবং রাজকিশোর পটনায়ক হয়েছেন রাজকিশোর পটনায়ক আবার কোথাও শ্রীকিশোরী পটনায়ক। পুস্তক-পত্রিকা ইত্যাদির নামকেও ঠিক এমনিভাবে কাহিল করা হয়েছে।

বাঘা যতীন লড়াই করে মারা গেলেন বুড়া বলঙ্গের তীরে। কার জন্যে জানি না সেই বুড়া বলঙ্গ চিরদিনের জন্যেই বাঙালীর কাছে বুড়ী বালাম হয়ে রয়ে গেল। তেমনি এই সব কবি ও সাহিত্যিকরা যদি পশ্চিমবঙ্গেই এমন পৃথক নামে চিরদিনের জন্য পরিচিত হয়ে থেকে যান তাহলে নিতান্ত দুর্ভাগ্যেরই বিষয় হবে।

প্রবন্ধকারের মতামত সম্পর্কে অনেক কথা বলার আছে। তবে চিঠির কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নিরস্ত থাকলাম।

সুধাংশুশেখর রায়
ভদ্রক, ওড়িশা

'একটি চিঠির জন্যে' গল্প প্রসঙ্গে

নিপুণ প্রয়োগের দ্বারা বীভৎসতা সাহিত্যে যে কতখানি রসোত্তীর্ণ হয় ৫০শ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'একটি চিঠির জন্য' রহস্যঘন কাহিনীটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

গল্পটি পড়ার পর অন্তত কিছুদিন অনেক পাঠকই কাজকর্মের মধ্যে অজানিত-ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে সেই নারীঘাতকের কথা ভাববেন। কেউ কেউ হয়তো বা দুঃস্বপ্নও দেখবেন।

কাহিনীটির মধ্যে লেখক অপরাধী বিজ্ঞানের একটি সত্যকে সমর্থন করেছেন যে, চার ভাগের তিন ভাগ হত্যা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় পরিবারের মধ্যে, নিকট আত্মীয়দের হাতে এবং প্রতি দশটি খুনের মধ্যে ছয়জন অর্থাৎ শতকরা ষাট ভাগই হচ্ছে নারী।

লেখকের আশ্চর্য ও অভিনব রচনা-কৌশলও অনুধাবনযোগ্য। প্রারম্ভে প্রায় বিবৃতির আকারে তিনি বলেছেন যে, তিনি ফাঁসির বিরুদ্ধে। কিন্তু তারপরেই এমন এক খল ও ক্রূর ঘাতকের কাহিনী ব... করলেন যার মত অপরাধীর সমাজে ... থাকার অধিকার নেই বলে লেখ... সাংবাদিক বন্ধু ডেভিড সিমন্ডের ... অনেকেরই মনে হবে। এর কারণ কি যে লেখক নিজেই তাঁর নিজের ম... খণ্ডন করতে চান?—না। সম্ভবত। সংক্ষিপ্ত কারণের জন্যেই নয়, প্রতিভার চমক সৃষ্টির জন্যেই সচেতনভাবে ... জিঘাংসু ও জঘন্য ঘাতককে সোজাসু... গল্পে হাজির করেছেন। কেন তার পরিণতি হল সে সম্পর্কে মনোস্তাত্ত্বিক সামাজিক বিশ্লেষণে যাননি।

মৃত্যুর আগে একটি চিঠির মধ্যে ... ঘাতক অবলীলাক্রমে স্বীকারোক্তি ... যাচ্ছে। প্রথমে মনে হতে পারে ... স্বীকারোক্তি এক সমাজশত্রুর বড় মানুষের সমাজ থেকে বিদায় নেবার আ... তাকে এক বিকট ভেংচি কাটা। কি সত্যই কি তাই? চিঠিটি প্রকৃতপক্ষে এক ঘৃণ্য অপরাধী মানুষের বিবেকের ... অন্তস্তল বিলাপ। কাহিনীটির শে... দিকের ভয়ঙ্কর দুটি কথা—'মর্মান্তি... গোঙানিটা' হচ্ছে চিরন্তন মানবআ... ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা।

তাই দণ্ডদাতার কর্তব্য বোধক হত্যাকারীর জীবন নাশ করা নয় ... আত্মা জাগিয়ে তোলা।

জ্যোৎস্না ...
শক্তিনগর, নদীয়া

কবিকন্ঠ

২৪শে চৈত্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের অ... পত্রিকার আলোচনা বিভাগে রেকর্ডে কবিক... সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে লিখছে... 'সাংগঠনিক ও ব্যবসায়িক কিছু জটিল... দেখা দেওয়ায় আমরা শিশিরকুমারে... (ভাদুড়ী) চিরস্মরণীয় আবৃত্তি সংরক্ষণ... সুযোগ হারালাম।'

আমরা বলতে দে মশাই হয়ত কো... বিশেষ রেকর্ড কোম্পানী বুঝিয়েছেন, কি... হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি শিশিরকুমা... ভাদুড়ীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'বহুদিন ম... ছিলো আশা' এবং 'কাল মধু যামিনীতে' এ... দুটি আবৃত্তি রেকর্ড (এইচ ২১৪) করিয়ে... ছিলেন এবং সে রেকর্ড এখনো কোম্পা... বাজারে চালু রেখেছেন। এছাড়া অতুলপ্রসা... সেনের স্বকণ্ঠের রেকর্ড (এইচ—২) এখন... পাওয়া যায়। সম্প্রতি অভিনেতা সৌমি... চট্টোপাধ্যায় মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নিজ কণ্ঠে আবৃত্তির রেকর্ড আবার প্রকাশ করা হ... জেনে আনন্দ হলো। নজরুলের স্বকণ্ঠে রেকর্ড বহু চেষ্টা করেও কোনো দোকানে পাওয়া গেলো না। সংশ্লিষ্ট রেকর্ড কোম্পানি যদি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং নজরুলের স্বকণ্ঠের রেকর্ডগুলো আবার প্রকাশ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমার মতো আরো অনেকের ধন্যবাদার্হ হবেন।

কুমকুম ঘোষ
নাগপুর—...

অমৃত

আইন ও শৃংখলা রক্ষা

গত সপ্তাহে কয়েকটি ঘটনায় উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। প্রথম ঘটনা ঘটে হাওড়ায় এবং দ্বিতীয় ঘটনাস্থল দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি। হাওড়ার ঘটনার সঙ্গে পুলিশ ও জনতার সম্পর্কের একটি দিক জড়িত। নকশালবাড়ির ঘটনা মূলত আইন ও শৃংখলার সমস্যাই, তবে তার সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় সমস্যাও জড়িত থাকতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি দার্জিলিং-এ এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, পুলিশ সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব পালটাতে হবে। কারণ নতুন সরকার পুলিশকে জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত করতে চাইছেন—আগেকার বিরূপতা এখন পরিবর্তন করা দরকার।

পুলিশবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য। কথায় বলে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হল পুলিশের কাজ। কিন্তু একথা বললে বোধ হয় ঠিক অত্যুক্তি হবে না যে, পুলিশের কাছ থেকে এই জিনিসটা সব সময় আশা করা যেত না। পুলিশের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আজ নতুন নয়। ইংরেজ আমলের সেই রেওয়াজ পাল্টায়নি। তা ছাড়া কোনো মানুষই নেহাৎ দায়ে না পড়লে পুলিশের ছায়া মাড়াতে চায় না। কেন চায় না, তা আশা করি ব্যাখ্যা করে না বললেও চলবে। সেই কারণেই পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের ঠিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বিদেশে যেমন পুলিশকে সর্ববিষয়ে জনসাধারণের বন্ধু ও সহায়ক বলে দেখা হয় আমাদের দেশে সেই পরিবর্তিত মনোভাব জাগ্রত হতে আরও অনেকদিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।

এটা জানা দরকার এই কারণে যে, ভারতবর্ষের নানা জায়গায় প্রায় রোজই যেমনভাবে পুলিশের সঙ্গে জনতার ছোট-বড় সংঘর্ষ বাধছে তাতে গোটা সম্পর্কটাই নতুন করে ভাবতে হবে, কেবলমাত্র আইন ও শৃংখলার সমস্যা হিসাবে এই ঘটনাগুলিকে বিচার করাই যথেষ্ট নয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি। এখানকার পুলিশবাহিনীর তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, তাদের ওপর নানারকমের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও কোথাও বাইরের লোক তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করছে। এতে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। পুলিশকে নিশ্চয়ই আইনের শাসন মেনেই চলতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ সেখানে শুধু অযৌক্তিকই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। কিন্তু পুলিশের কাছ থেকেও আনুগত্য চাইবেন সরকার, তা সে যে-কোনো দলের বা মতবাদের সরকারই হোক না কেন! হাওড়ার ঘটনায় কিন্তু তা প্রমাণ হয়নি। এক্ষেত্রে পুলিশের একাংশের কার্যকলাপ আইন ও শৃংখলা রক্ষার বিষয়ে সরকারের প্রতি সহযোগিতামূলক হয়নি। পুলিশের কাজে সহায়তা করা যেমন জনসাধারণের কর্তব্য, তেমনি জনতা যাতে অযথা নিপীড়িত না হয় এবং পুলিশ তার ক্ষমতাবলে যাতে জনতাকে বেআইনীভাবে লাঞ্ছিত না করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখাও পুলিশের কর্তব্য। মোট কথা উভয়পক্ষের সহযোগিতা ছাড়া শান্তিরক্ষা বা আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই বোধ পুলিশের ও জনতার উভয়েরই হওয়া উচিত।

নকশালবাড়িতে যা ঘটেছে তা খুবই উদ্বেগজনক এবং মর্মান্তিক। সংবাদে প্রকাশ, উগ্রপন্থী একটি রাজনৈতিক উপদলের প্ররোচনায় ভূমিহীন সাঁওতালরা ক্ষেপে গিয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর নিহত হন এবং পরে পুলিশের গুলীবর্ষণে শিশু ও নারীসহ নয়জন সাঁওতালের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু অত্যন্ত শোকাবহ। কর্তব্যরত পুলিশের মৃত্যু যেমন গভীর বেদনা ও উদ্বেগের কারণ তেমনি এতগুলি নরনারীর মৃত্যুও ঘটনার গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একটি উগ্রপন্থী রাজনৈতিক উপদলের ক্রিয়াকলাপ শুধু দায়িত্বহীনই নয় এর দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে অপদস্থ করা এবং নিজের হাতে আইন নেবার অপচেষ্টাও সুস্পষ্ট। যুক্তফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধভাবেই আইন ও শৃংখলা রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাইরের উস্কানি বা উপদলীয় উগ্রতা যুক্তফ্রন্টের শরিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো বাধা দিতে পারেনি, এটা সুলক্ষণ।

আইন ও শৃংখলার প্রশ্নে কোনো সরকারই দুর্বলতা দেখাতে পারেন না। এই দুর্বলতা পরিণামে সরকারের শক্তিকেই ক্ষুন্ন করে। হাওড়া, রাণাঘাট, নকশালবাড়ি প্রভৃতি জায়গার ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে উচ্ছৃংখলতা বা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা গোড়াতেই দমন করা না হলে তার পরিণাম হয় মর্মান্তিক। মানুষের প্রাণহানি সব সময়েই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে অবহিত হতে হবে! বিশেষ করে যে সমস্ত দল সরকার গঠন করেছেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, কেউ যেন আইন নিজের হাতে না নেয় এবং শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার ন্যায্য দায়িত্ব পালনে পুলিশবাহিনীকে যেন বাধা দেওয়া না হয়।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

মণিবউদির মাসীর বাড়ীতে হঠাৎ চুরি হয়ে গেল। তাতে যা গেল তা সবই গেল মণিবউদির। রত্নমালা-মাসীর গয়নাগাটি বিশেষ ছিল না। ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী তাঁর গয়নার উপর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না; থাকবার মধ্যে প্লেন বালা, কানের টাপ, গলার হার আর একটা হাতঘড়ি, সে সবের মধ্যে হাতঘড়িটা ছিল বালিশের তলায়, বাকী যা কিছু তা ছিল গায়ে। সে সবে তারা হাত দেয় নি। তারা ঘরের কোণে একটা লোহার সেফ ছিল, সেটা বিচিত্র কোন কৌশলে খুলে তার ভিতর থেকে নিয়ে গিয়েছিল দামী এবং মজবুদ একটা স্টীলের ক্যাশবাক্স। তার মধ্যে ছিল মণিমালার মায়ের গহনা, মণিমালারও বাড়তি বা তোলা গহনা যাকে বলে তাই কয়েকখানা আর তার বাপের কেনা ক্যাশ-সার্টিফিকেট।

মণিবউদি বলেছিলেন, বলতে ভুলে গেছি, আয়রণ সেফটা সমেত গয়নার বাক্স উনি নিয়ে এসেছিলেন পাটনা থেকে আমারই সঙ্গে। আমাকে এনে তুলে দিলেন মাসীর বাড়ী, তাই ওই আয়রণ সেফ সমেত ক্যাশ-বাক্সটাও এসে উঠেছিল মাসীর বাড়ী। চাবি কয়েকটা প্রথম ও'র কাছেই থাকত, তারপর এসেছিল মাসীর হাতে।

কলকাতার এই ধরনের চুরি আশ্চর্য চুরি হলেও বছরে অনেক কয়েকটা ঘটে, বাইরে থেকে ভিতরের ছিটকিনি হুড়কো খিল খুলে তারা ঘরে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে বা টর্চ জেবলে বাক্স-পাটরা বের করে নিয়ে চলে যায়, ঘরের মানুষেরা ঘরে অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে কোনক্রমেই লোকজনের চলা-ফেরায় বা জিনিসপত্র সরানোর শব্দে তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় না। এ সেই ধরনের চুরি।

সিন্দুক খুলে ক্যাশবাক্সটা এবং চৌকির ওপর রাখা গোটা দুই ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে গেছে। কোন প্রকারের কোন নিশানা রেখে যায় নি। নিশানার মধ্যে নিশানা পাওয়া গেল ওই ভাঙা বাক্স কয়েকটা বাড়ীর ঠিক পিছনেই জমাদার যাতায়াতের গলির মধ্যে। ভিতরের বস্তুগুলির কোন সন্ধানই কোন সূত্রে পুলিশ আবিষ্কার করতে পারলে না। আবিষ্কার করবার জন্য ধরে নিয়ে গেল পরসাদ অর্থাৎ লছমন প্রসাদকে; বোকা সরল লছমন তখন কৈশোর পার হব-হব করছে; তার চোখের দৃষ্টি বদলের কথা আপনাকে বলেছি; সম্ভবতঃ সেই নতুনরকম দৃষ্টি দেখেই তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল, বলে গেল ছেলেটার রকম-সকম খুব সাস্‌পিসাস, ওকে নেড়ে দেখতে হবে। আর বাড়ীর লোক ভিতর থেকে খবর না-দিয়ে থাকলে এ চুরি হয় না।

প্রায় মাস দুয়েক ধরে নাড়া খেয়েছিল লছমন প্রসাদ। এবং লছমন প্রসাদ ছাড়াও আরও কিছু-কিছু লোকও নাড়া খেয়েছিল; রেহাই পায় নি।

মণিবউদি বললেন—সে আমার মাসী থেকে আপনার দাদা পর্যন্ত। মাসীর বাড়ীতে থাকত একটা ঝি, সে তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম করলে। মাসীকে অমৃত-বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করত বাড়ীতে এসে; আমাকেও বাদ দেয় নি; আমাকেও জিজ্ঞাসা করত। যখন জিজ্ঞাসা করত তখন আমার ভয় হত, মনে হত হয়ত আমাকেই জেলে ধরে নিয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করত কি জানেন, জিজ্ঞাসা করত কাকে-কাকে তুমি তোমার মায়ের গয়নার কথা বলেছ? মনে কর তো? কোন মেয়েবন্ধুকে বল নি? কোন মেয়েবন্ধুর ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ নেই? ওই পরসাদ ছোঁড়াটাকে বল নি যে, তোমার মায়ের গয়না টাকাগুলো পেলে তুমি মাসীর কাছ থেকে চলে গিয়ে বাঁচতে? বলতে না?

আমার দম-বন্ধ হয়ে আসত। আমারই যখন এই অবস্থা তখন মাসীর এবং মাসীর ঝি'র অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ঝিটা থানা থেকে এসে ডাক-ছেড়ে কাঁদত। আমাকে অভিসম্পাত দিত।

মাসীও তাই। এক-একদিন বলত—আমি বিষ খাব। বিষ খেয়ে মরব। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরব।

অমৃতবাবু এ বাড়ীতে আসতেন না। তাকে সম্মুখে না-পেয়ে উদ্দেশে অভিযোগ করে বলত—আমার জীবনের অভিশাপ, আমার কুগ্রহ। ওই কুগ্রহের জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। আজ আমি পথের কুকুরের থেকেও অধম হয়ে গেছি। সারা জীবনটা পথের ধুলোয় মিথ্যেমিথ্যি ঝরিয়ে শুকিয়ে মিশিয়ে দিলাম। সাধ আকাঙ্ক্ষা আশা সব কর্পূরের মত কোন দিকে উপে গেল। এ'টো পাতার মত অবস্থা আমার। ওই একটা লোকের জন্যে। ওই লোকটা।

অর্থাৎ অমৃতবাবু।

বউদি অর্থাৎ মণিমালা-বউদি হেসে বললেন—আর আমার সম্পর্কে যা বলতেন, যে শাপ-শাপান্ত দিতেন, তার কথা ঠিক বলে প্রকাশ করতে পারব না ঠাকুরজামাই। কারণ মরার বাড়া তো গাল নেই। শাস্তিও নেই। কখনও কখনও নানান রোগ হোক বলে শাপ-শাপান্ত করে কেউ-কেউ। আপনার শ্যালকের দেশে মেয়েদের ঝগড়ায় শুনেছি—বলে—চোখের মাথা খেয়ো। একটি-একটি করে অঙ্গগুলি পচে-পচে খসে যাক। কিন্তু কথায় তো শাপ নেই, নন্দাই, শাপ আছে, কথা বলার কোপের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে। সে জেনুইন মানে আদি ও অকৃত্রিম না-হলে নকল করে আনা যায় না। তবে শেষ যে শাপই বলুন আর বাণই বলুন যেটা নিক্ষেপ করলেন, সেটা এসে সোজা আমার বুকে বিঁধল। এবং গভীর অন্তস্থলে প্রবেশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা আমি মরলাম না।

মাসী পুলিশের কাছে বলে বসল, আমার বোনঝি, আমি বলতে ঠিক পারি নি। আমার সন্দেহ হয়—। সন্দেহ হয়—ওই পরসাদ ছোঁড়াটার সঙ্গে ওর—।

কথাটা ঝাল এবং নোন্তা। দেখবা মাত্র জিভে জল আসে; জিভে দেবা মাত্র আরও একটু মুখে দিতে ইচ্ছে করে। পুলিশ কথাটা শক্ত করে ধরে বসল।

আমার গায়ে ছাপ পড়ে গেল।

কলঙ্কের ছাপ।

মণিবউদি হেসে বললেন—সেই প্রথম। সেদিন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম নন্দাই। একেবারে বোবা যাকে বলে তাই। এর কোন জবাব থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও আসে নি। আমি ওই লছমন প্রসাদের—সঙ্গে—?

লছমন প্রসাদকেও এর জন্যে কম নির্যাতন করে নি পুলিশ। লছমন পুলিশকে বলেছিল, চুরির কথা সে কিছু জানে না। সে শিউজী মহারাজের মন্দির ছু'য়ে একথা বলতে পারে। আর মণিদিদি তাকে ভালবাসে কিনা সে জানে না, তবে মণিদিদিকে বেভাবে তার মৌসী দুখ দেয় তাতে তার মনে খুব দুখ লাগে। এবং সেই এ সব খবর দিয়ে আসে অমৃতবাবুকে। এর বেশী কিছু নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। সম্বিতের সঙ্গে কথা; কথার সঙ্গে মাসীর অভিযোগের জবাব।

বলে বসলাম—আমার সন্দেহ হয় মাসীই আমার গহনা টাকা চুরি করিয়েছে। এতদিন মাসী বলে চুপ করে ছিলাম। আজ আর চুপ করে থাকব না। কেন থাকব? মাসী অমৃতবাবুকে ভালবেসে বিয়ে করে নি, বাড়ী থেকে চলে এসে চিরকুমারী হয়ে রয়েছে এ তো সবাই জানে। এখন অমৃতবাবু আমাকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায় সন্দেহ করে আমার গহনা চুরি করিয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে ওই লছমনের সঙ্গে কলঙ্ক রটিয়ে দিচ্ছে।

কথাটা মণিমালা বা মণিকন্টদি ভেবে-চিন্তে বলেন নি।

সেদিন অর্থাৎ ১৯৪২ সালে সেদিন রাত্রে আমাকে তাঁর জীবন-কথা বলতে গিয়ে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন, আমার বেশ মনে পড়ছে; বলেছিলেন, কথাটা খুব ভেবে-চিন্তে আমি বলি নি নন্দাই; ছেলেমানুষের ঝগড়ায় একজন অন্যজনকে চোর বললে সে যেমন সঙ্গে-সঙ্গে বলে বসে—কি আমি চোর? তুই চোর, তুই চোর, তুই চোর! ঠিক তেমনিভাবেই বলেছিলাম কথাটা। বলেছিলাম—আমি যদি লছমনকে ভালবেসে তাকে দিয়ে আমার গহনা টাকা চুরি করিয়ে পালাতে চেয়ে থাকি, তবে মাসীই বা অমৃতবাবুকে আমার উপর এত সদয় দেখে লছমনের সঙ্গে জড়িয়ে আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিচ্ছে না, এমনই বা হবে না কেন এবং আমার গহনা ক্যাশ-সার্টিফিকেট চুরি করিয়ে আমাকে সাজা দিতে চাচ্ছে না, এমনই বা নয় কেন? আরও একটা কথা বলে বসলাম। জানি না কেমন করে পেরেছিলাম। বলে বসলাম, লছমনকে আমি ভালটালো বাসি নে। আমি ভালবেসে ফেলেছি অমৃতবাবুকে। অমৃতবাবুও আমাকে ভালবাসে। মাসীর রাগ সেইখানে। মাসীই বলুক না বুকে হাত দিয়ে, নিজে মুখে সে কতবার এই কথাটা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলেছে! মাসীর ঝিটা, তার নাম ছিল সত্যবালা, সে শুনেছে, সেও এর সাক্ষী: বলুক না সে? অমৃতবাবু নিজেই বলুন না, তাঁকেও একথা শুনতে হয়েছে কিনা? বলুন উনি!

মাসীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

পুলিশ অফিসারকে বলেছিল, এই কথা বলেছে ও?

অফিসারটি বলেছিল, ডেকে মোকাবিলা করে দেব?

বোবা হয়ে গেল মাসী।

অফিসার তবু আমাকে ডেকেছিল, বলেছিল—আমাকে যা বলেছ তা তুমি আবার তোমার মাসীর সামনে বলতে পারবে?

মণিকন্টদি বললেন—আমি চুপ করে ছিলাম। আমার সাহস মুখোমুখি হয়ে ভেঙে আসছিল। অফিসারটি বললেন—আমাদের খাতা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

মাসী বলেছিল, খাতা আমি অমৃতবাবুকে ভালবাসি এ সবাই জানে। অমৃতবাবুই ওকে নিয়ে এসেছে খাড়ে করে এও সত্যি। আমি সন্দেহও করি এও সত্যি। অমৃতবাবু ওকে ভালবাসে এও খুব সম্ভব সত্যি। কিন্তু ও অমৃতবাবুকে ভালবাসে?

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, কিন্তু চুরির কিছু জানি না আমি।

আমি মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাসীর মুখ যেন ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গিয়েছিল। মরার মত মুখ। ঠোঁট দুটো শুকনো মনে হচ্ছিল। চোখের চাউনি যেন বোকার মত, বিহ্বলের মত।

সব থেকে কৌতূহলজনক বা বিস্ময়-জনক কি জানেন? সেটা হল অমৃতবাবুর কথা। অমৃতবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল না। অমৃতবাবুর টকটকে ফর্সা রঙ আরও যেন লাল হয়ে উঠল। বয়স তখন তাঁর চল্লিশ। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। তাছাড়া এঁদের বংশে চুল তিরিশের পরই পাকতে শুরু করে; এঁর আবার একটু বেশী। ফলে বেশ ভারিক্কি ভারিক্কি দেখায়। তার উপর দেশসেবক ব্রহ্মচারী বলে একটা নামডাক আছে। সেই মানুষটা কেমন যেন বাসরঘরের অল্পবয়সী বরের মত লজ্জিত এবং পুলকিত এবং সুরঞ্জিত হয়ে উঠল। এবং স্বীকার করলেন পুলিশ অফিসারের কাছে যে, মণিমালা যা বলেছে তাতে তাঁর প্রসঙ্গ যতটুকু আছে তা সত্য বলেই তিনি স্বীকার করছেন। হ্যাঁ, মেয়েটির ভার আমি সস্নেহে নিয়েছিলাম,

বুদ্ধগয়াতে থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দির ফটো : গোকুল বিশ্বাস

তার বাপের মৃত্যুশয্যায়। এবং আজ তিনি এতদিন পর স্বীকার করছেন যে, ক্রমে-ক্রমে স্নেহ এখন একটি উত্তপ্ত আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। তবে তাকে তিনি প্রাণপণে সংযত রেখে এসেছেন। কিন্তু রত্নমালাই তাকে খ‍ুঁচে-খ‍ুঁচে ধোঁয়াটে উনোনকে খ‍ুঁচিয়ে জ্বালিয়ে তোলার মত প্রজ্বলন্ত করে তুলেছে। এবং মণিমালা যে সন্দেহ করেছে সে সন্দেহকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়েও দিতে পারেন না তিনি। তবে অবশ্য তিনি এ সম্পর্কে নীরবই থাকছেন। কোন মন্তব্যই করছেন না।

সেই দিন রাত্রে রত্নমালা-মাসী অমৃত-বাবুকে চিঠি লিখেছিল। প্রিয়তম, অমৃত বলে।

মণিবউদি বলেছিলেন, মাসী আমার এর পর চিঠির পর চিঠি লিখেছে; এবেলা লিখেছে, ওবেলা লিখেছে। কিন্তু অমৃত-বাবু একখানারও উত্তর দেন নি। সব চিঠি-গুলো আমি সংগ্রহ করে রেখেছি।

—সে সব অনেক চিঠি। মাসী চিঠি লিখত অমৃতবাবুকে। অমৃতবাবু তাকে কোন উত্তর দিত না। প্রথম কিছুদিন চুপ-চাপ ছিল। ওদিকে পুলিশ একটু-একটু করে বেশী সক্রিয় হয়ে উঠছিল। এবং অন্য-দিকে আমার নামে অনেক রটনা রটছিল। পাড়াটা মুখর হয়ে উঠল, রটনার সুকৌশলে সপ্তদশী মণিমালা টাগ অব ওয়ারের দড়িতে পরিণত হয়ে গেল, যার একদিকে লছমন প্রসাদ, অন্যদিকে অমৃতবাবু ধরে টানছেন। এবং ক্রমে-ক্রমে আমার নিজেরও যেন তাই ধারণা হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ হেসে ফেললেন মণিবউদি।

সামনের দাঁতদুটি উঁচু মণিবউদির, চেহারাই দেখনহাসির মত; এবং সেটুকু তিনি নিজে জানেন, তাই যখন হেসে ফেলেন তখন ডান হাতে রুমাল বা কাপড়ের আঁচল তুলে মুখ মোছার ভান করেন, কখনও অকপটভাবেই মুখে কাপড় চাপা দেন।

হেসে ফেলে আঁচল টেনে চাপা দিয়ে বললেন, আমার কিন্তু বেশ লাগত ঠাকুর-জামাই। মনে-মনে গরবিনী-গরবিনী ভাব একটা আমার দেমাক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে আমার ঢঙ বেড়েছিল, ছলাকলা বেড়ে-ছিল। আমি যেন পদ্মপত্রে জলের মত টলমল করে নেচে বেড়াতাম। কথাগুলো আমার নয়; কথাগুলো আমার মাসীর ঝির। ঝিটার নাম ছিল সত্যবালা সে আবার মধ্যে-মধ্যে ছড়া কাটত। অশ্লীলতা ঘেঁষা ছড়া।

আমি মুখ টিপে হাসতাম।

এরই মধ্যে একদিন অমৃতবাবু আমাকে চিঠি লিখলে। একখানা চিঠি বের করে খুলে ধরে বললেন—আরম্ভ করেছেন স্নেহের মণিমালা সম্বোধন দিয়ে; শুরু করেছেন যেন—এরপর পড়ে গেলেন, "অনেকদিন হইতে তোমাকে লিখিব-লিখিব করিয়া লিখিতে পারি নাই। কোথা হইতে কে বা কি যেন আমার লেখনী চাপিয়া ধরিত। লিখিতে পারিতাম না। বিশেষ করিয়া তুমি পুলিশ অফিসার সুরেনবাবুকে যাহা বলিয়াছ, তাহা শুনিয়া অবধি আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, আমার সারাজীবনটাই যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে বদলাইয়া গিয়াছে। আকাশের রঙ বদলাইয়াছে, মাটির চেহারা পাল্টাইয়াছে, বাতাসের স্পর্শ পাল্টাইয়াছে, সারা জীবনের মানে পাল্টাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নিজেরই যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি, ইহা মায়া নহে তো। ইহা ভোজবিদ্যার খেলা নহে তো! আমি দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি না তো? ইহা কি সত্য হইতে পারে? তুমি আমাকে ভাল-বাসিয়াছ। আমি যৌবনের প্রায় শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তুমি সদ্য-কুসুমিত যৌবনের মাধবীকুঞ্জে মঞ্জু বিকচ কুসুমমঞ্জরী; তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ? ইহা যে আমার স্বপ্নের অতীত! ইহা যে আমি কখনও কল্পনাও করি নাই।"

আবার মুখে কাপড় চাপা দিলেন মণি-বউদি। এবং এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—এ যে কত আছে কি বলব আপনাকে? পাঁচ পৃষ্ঠা চিঠি, মূল্যবান কাগজ, সুন্দর করে লিখতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু হাতের বাংলা লেখা এত খারাপ যে, রীতিমত প্রাচীন-লিপি উদ্ধার করার মত কষ্ট করে পড়তে হয়। কথা কিন্তু ওই একটা বা দুটো, যে যেমন হিসেব করে ধরে আর কি।

ওই—'ইহা কি সত্য? তুমি আমাকে ভালবাস?"

পরিশেষে বক্তব্য আছে কিছু। চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। লিখেছেন—"রত্নমালা এখন চাহিতেছে যে, এই চুরির সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি উপরে বলিয়া-কহিয়া চাপা দিয়া দিই। তুমি নিশ্চয় জান যে, মন্ত্রি-মণ্ডলীর সঙ্গে আমার জানা-শোনা আছে। দুই-চারিজন বন্ধু-বান্ধবও আছেন। স্বয়ং হকসাহেব আমাকে স্নেহ করেন। আমি বলিলে কথাটা থাকিবে বলিয়া আশা করি। এখন সবই নির্ভর করিতেছে তোমার সম্মতির উপর। তুমি সম্মতি দিলে ব্যাপারটা আমি চাপা দিয়া দিব। রত্নমালা যে হাঙ্গামায় পড়িয়াছে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে।

অবশ্য তোমার গহনাগুলি গেল। ক্যাশ-সার্টিফিকেট উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। গহনার জন্য দুঃখ তুমি করিও না। তোমার জন্য বিধাতা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন।

তুমি ইহাতে সম্মতি দিলে আমি ব্যাপারটা চাপা দিব, বিনিময়ে রত্নমালা তোমার এবং আমার জীবন হইতে সরিয়া যাইবে।" (ক্রমশ)

মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন

শচীন্দ্রনাথ বসু

ডঃ জেমস্ বেডফোর্ড ক্যালিফর্নিয়ার মনোবিদ্যার অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন, তারপর ৭৩ বছরে কর্কট রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে আর দশজনের মত অধ্যাপক মহাশয়ের সব আশার সমাপ্তি ঘটে নি। কারণ তিনি ৪০০০ ডলার রেখে গিয়েছিলেন এক অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কৃত্রিম শ্বাসচালন ও হৃদযন্ত্র মর্দনের দ্বারা তাঁর মস্তিষ্ক সক্রিয় রাখা হয়। তারপর অবিলম্বে এক নিশ্ছিদ্র আধারে ভরে দেহটি বন্ধ করা হল, এই আধারের তাপ -২২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ যেই শীতে বরফ জমে তার ২২০ ডিগ্রি নিচে। এই শীতলীকরণ সম্ভব হল তরল নাইট্রোজেন দিয়ে: নাইট্রোজেন সাধারণত গ্যাস (বাতাসের প্রধান উপাদান), কিন্তু ঠান্ডা করলে আর দশটা গ্যাসের মত তা জলবৎ তরল হয়ে পড়ে।

এই অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টির উদ্দেশ্য? চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির ফলে যখন কর্কট রোগ সারানো সম্ভব হবে, তখন ধীরে ধীরে দেহটি আবার সাধারণ তাপে ফিরিয়ে এনে তাতে নতুন করে প্রাণ দেওয়া হবে। ডঃ বেডফোর্ড পুনর্জন্ম লাভ করবেন একই দেহে।

এই খবরটি গত জানুয়ারির শেষে আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার বেশ কিছুদিন আগেই বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে যে আমেরিকায় কয়েকজন এই ধরনের পরীক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই রকম উদ্যোগের সূচনা আমেরিকার মত দেশেই সম্ভব। এঁরা যে প্রতিষ্ঠানটি গড়েছেন তার নাম লাইফ এক্সটেনশান সোসাইটি, বাংলায় বলা যেতে পারে আয়ু বৃদ্ধি সমিতি, যদিও প্রকৃত অর্থে পুনরুজ্জীবন সমিতি বলাই ভাল।

গত গ্রীষ্মে এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এদের এক বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—অবজ্ঞাত কোণে স্থান, ক্ষুদ্র তার আকৃতি। তৎক্ষণাৎ হাওয়াই ডাকে এক চিঠি ছেড়ে দিলাম, পাঠকরা যেন মনে করবেন না যে অমরত্বের লোভ আমাকেও পেয়ে বসেছে, কারণটা নিতান্তই সাধারণ কৌতূহল। অবিলম্বে চিঠির জবাব এল, লিখেছেন সমিতির সভাপতি স্বয়ং এড্ কুপার।

দীন দরিদ্র বিজ্ঞাপনটি দেখে মনে যে ধারণা হয়েছিল চিঠিতেও তার সমর্থন পাওয়া গেল। যদিও চিঠির কাগজে সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহ সেক্রেটারির নাম সুন্দরভাবে ছাপা আছে, মনে হয় সভাপতি মহাশয় তা নিজেই টাইপ করেছেন এবং আগে কোনও খসড়া তৈরি না করে। ফলে কুড়ি লাইনের চিঠিতে বেশ কিছু কাটাকুটি, রচনাভঙ্গিও আড়ষ্ট। তথাপি তা নানা দিক থেকে চিত্তাকর্ষক, সুতরাং এখানে তার সহজ তর্জমা দেওয়া গেল।

"প্রিয় ডঃ বসু,

আপনার চিঠির জন্য এবং তাতে আপনি যে ঔৎসুক্য বা উদারমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

ভিন্ন ডাকে আমাদের সমিতি সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র ও একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদলিপি (নিউজলেটার) গেল: ওজন ও ক্ষুদ্র তহবিলের দিকে লক্ষ্য রেখে তা জাহাজ-ডাকে পাঠাচ্ছি।

আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য আর্থিক লাভ ইত্যাদি একেবারেই না, সভ্যসংখ্যা প্রায় ৫৯০, কিন্তু এর মধ্যে ভারতীয় মোটে একজন, পদার্থ বিদ্যায় ডকটর তিনি।

আমি যখন ভারত বা বিশেষ করে অনুন্নত দেশের চাষীদের কথা ভাবি তখন মনে হয় ভবিষ্যতে কিছুটা আয়ু ফিরে পেলে অন্যদের তুলনায় তারা উপকৃত হবে। তবে আমার পত্রলেখকদের মতে এই প্রচেষ্টা হাস্যকর। কিন্তু বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি হলে এবং শাসক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা থাকলে কিছুটা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা এগিয়েছি, যদিও তা সামান্য, কয়েকটি জন্তু এবং একটি মানুষের দেহ ঠান্ডায় জমিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের সংবাদলিপিতে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবেন।......

[illegible] আশা করছি আপনি [illegible] দেবেন, অন্তত [illegible] মতামত জানাবেন। [illegible] ধন্যবাদ জানিয়ে [illegible] কুপার।"

ভারতের [illegible] পুনরুজ্জীবনের সম্বন্ধে লেখকের মনে যে সম্ভাবনাটির উদয় হয়েছে [illegible] অভিনব। আমাদের মনে [illegible] স্বাভাবিক যে পুনরুজ্জীবনের প্রধান খদ্দের হবেন মার্কিন ধনকুবেররা, যাঁরা সর্বাংশে ভারতীয় চাষীদের বিপরীত। কিন্তু সব কাগজপত্র পড়ে এইসব সামান্য বিবেচনার চেয়ে আমার মনে অনেক বেশী ছাপ রেখেছে অন্য দুটি বিষয়: প্রথমত কুপার ও তাঁর সহযোগীদের গভীর আন্তরিকতা, দ্বিতীয়ত এঁদের চিন্তায় সব রকম বুজরুকি বা 'ঝুটো বিজ্ঞানের' সর্বাঙ্গীণ বর্জন। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি এবং নানা বিস্ময়কর আবিষ্কারের খবর এঁরা রাখেন এবং তারই থেকে নিজেদের উদ্দেশ্যে এঁদের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

এই বিশ্বাস যতই পরিহাসযোগ্য ঠেকুক, মনে রাখতে হবে যে, জীবন-মৃত্যুর কোনও সন্তোষজনক সংজ্ঞা বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত খুঁজে পান নি, ঠিক কখন যে প্রাণের শেষ তা বলা যায় না। ডঃ বেডফোর্ডের দেহ নিয়ে পরীক্ষার খবর যে মাসে প্রকাশিত হয়, সেই মাসেরই আর একটি সংবাদে জানা যায় যে মৃত্যুর দেড় ঘন্টা পরে আর এক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, এই ধরনের খবর প্রায়ই শোনা যায়। দ্বিতীয়ত আমরা সকলেই জানি দশ বারো বছর আগে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা যা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, আজ তার কিছু কিছু সম্ভব হয়েছে (যেমন মহাকাশ বিহার), আবার অনেক কিছু হয়নি। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে মন বিনীত ও মুক্ত রাখাই ভাল

এবং সেই সূত্রেই কুপারকে আমি জবাব দিয়েছি। ফলে তিনি আরও তথ্য পাঠিয়েছেন।

পাঠিকরা বোধ হয় বেশী উৎসুক এই পরীক্ষার রীতি-নীতি সাফল্য-অসাফল্য সম্বন্ধে আরও দুকথা জানতে। পুনরুজ্জীবন সমিতির বিশ্বাস যে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে বা পরে দেহ যদি যথাযথভাবে হিমশীতল তাপে এনে সেই অবস্থায় রক্ষা করা যায়, তা হলে সেই ব্যক্তির শারীরিক ক্ষতি সংশোধন করা এবং তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

বিজ্ঞানের কতগুলি সাম্প্রতিক সাফল্যের উপর এই আশা প্রতিষ্ঠিত। উপযুক্ত কোষ-সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ করে এবং শীতে অনির্দিষ্টকাল জমিয়ে রেখে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীদের যে আবার সক্রিয় করে তোলা যায় তা অনেক দিন থেকেই জানা আছে। কৃত্রিম শুক্রনিষেকের কাজে শুক্র অতি শীতে রক্ষা করে দরকার মত ব্যবহার করা হয়। তারপর ইঁদুর জাতীয় অপেক্ষাকৃত বড় প্রাণীকে বরফ জমার পাঁচ ডিগ্রি নিচে রেখে পরীক্ষা করা হয়, সম্পূর্ণ অসাড় প্রাণীটির দেহ তখন এত কঠিন যে কান বা লেজ একটু বেঁকালে তা ভেঙে যেত তথাপি সাধারণ তাপে ফিরিয়ে আনার পর প্রাণীটির কোনই ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু এই সব পরীক্ষায় নতুন জীবন দেওয়া হয়েছে বলা যায় না, এই জীবগুলি কখনও মরে নি। মৃত্যুর পরে ইঁদুর শ্রেণীর এবং তদপেক্ষা বড় প্রাণীর শরীরে যে সব পরিবর্তন হয় তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল মস্তিষ্কের ক্ষতি, অক্সিজেনের অভাবে সেখানকার কোষগুলি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য দরকার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোষ-সংরক্ষক রাসায়নিক প্রয়োগ করে তাপ নামিয়ে আনা।

বিড়াল ও কুকুরের মগজ বার করে নিয়ে তার উপর পরীক্ষা হয়েছে। বিড়ালের মগজটি সাড়ে ছ মাস রাখার পরেও তার মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। কুকুরের মস্তিষ্ক রাখা হয়েছিল একক অবস্থায় মাত্র এক ডিগ্রির মধ্যে, কয়েক ঘণ্টা পরে স্বাভাবিক দৈহিক তাপযুক্ত, অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত তার মধ্যে চালিয়ে দেখা যায় মগজ বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে প্রাণের সাড়া দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক পরীক্ষার খবর খুব সম্প্রতি চোখে পড়ল, কাজটা হয়েছে জাপানে, গবেষকরা তার বিবরণ দিয়েছেন বিলাতের এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়। এঁরা এক বিড়ালের মগজ সম্পূর্ণ বার করেন, তারপর ১৫ শতাংশ গ্লিসারিণে তা ভিজিয়ে ধীরে -২০ ডিগ্রীতে নিয়ে আসেন; ২০৩ দিন পরে মগজটি আবার ধীরে সাধারণ তাপে এনে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াশীলতা ফিরে পাওয়া গিয়েছে বলে।

ইংরেজ লেখক রোয়াল্ড ডল (আমেরিকান অভিনেত্রী প্যাট্রিশিয়া নীল এঁর স্ত্রী) এই বিষয়কে আশ্রয় করে একটি সুন্দর গল্প লিখেছেন, 'উইলিয়াম ও মেরি'। স্বামী উইলিয়াম প্রসিদ্ধ দার্শনিক, কিন্তু তিনি নীতিবাগিশ—কথায় কথায় স্ত্রীকে উপদেশ দিচ্ছেন মদ মদিরা ধূমপানের বিরুদ্ধে, ঠোঁটে রং মাখা তাঁর পছন্দ নয়, টেলিফোন ও টিভি তাঁর মতে বাজে খরচ। মৃত্যুর আগে এক চিকিৎসক বন্ধুর প্ররোচনায় তিনি এক পরীক্ষায় রাজী হলেন, তদনুসারে তাঁর মগজটি বাঁচিয়ে রাখা হল এক গামলাতে করে, এমন কি তার মাঝখানে একটি চোখও জুড়ে দেওয়া সম্ভব হল। মগজের চিন্তাশক্তি ও স্মৃতি অক্ষত। তখন মেরি তার সঞ্চিত রাগ প্রকাশ করলে চোখের সামনে সিগারেট ধরিয়ে এবং একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে, তা দেখে চোখটি রক্তলাল হয়ে উঠল, কিন্তু......

এই গল্পেই লেখক বলছেন রাশিয়ায় নাকি এক ডাক্তারী চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, তাতে এক কুকুরের মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে শিরায় রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করে, ঠোঁটে খাদ্য মাখিয়ে দিলে জিভটি তা চেটে নেয়, ঘরে লোক ঢুকলে চোখদুটি তার দিকে তাকায়। সুতরাং ভবিষ্যতে আদরের কুকুর বা বিড়ালটি গাড়ি চাপা পড়ে মরলে তার কিছুটা অন্তত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে!

কাল্পনিক বীভৎসতা ছেড়ে বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক। প্রথম মানব দেহটি জমিয়ে রাখা হয়েছে অ্যারিজোনা প্রদেশের ফিনিক্স শহরে, পরিবারবর্গের ইচ্ছানুসারে লোকটির নাম প্রকাশ করা হয়নি। মৃত্যু ও শীতলীকরণের মধ্যে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে, সুতরাং একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দে এঁর আবার নবজীবন লাভ করার আশা সুদূরপরাহত—ডঃ ব্রেডফোর্ডের তুলনায় অনেক কম। শীতসংরক্ষক থার্মস জাতীয় গোল আধারে শবটি -১৯৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ঠাণ্ডা করতে লাগে প্রায় ৫০০ লিটার তরল নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন অবশ্য আস্তে আস্তে উবে যায়, তার পরিপূরণ দরকার। যন্ত্রের উন্নতির ফলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতি কমিয়ে মাথাপিছু বাৎসরিক খরচ পড়বে মাত্র ৫০ ডলার, এমন আশা করছে পুনরুজ্জীবন সমিতি। সমিতির এক উৎসাহী উদ্যোক্তা অধ্যাপক এটিংজার অনুমান করেছেন আমেরিকায় স্থায়ী সংরক্ষণের খরচ পড়বে সব মিলিয়ে ৮৫০০ ডলার। আশা এই যে, বিভিন্ন দেশে স্থানীয় কর্মীরা হাসপাতালে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন, সুতরাং এক এক জায়গায় এক এক রকম খরচ পড়বে।

একদা হয়তো খরচ একেবারে কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে সব দেহ মেরু অঞ্চলে গভীর বরফে রেখে। আমরা কল্পনা করতে পারি তৃতীয় বা চতুর্থ মহাযুদ্ধে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তখন এক সময়ে ঐ সব দেহ পুনর্জন্ম লাভ করে দেখলে বিশাল পিপীলিকার দল পৃথিবীতে প্রভুত্ব করছে। ......আর একটি বৈজ্ঞানিক গল্পের খোরাক আছে এইখানে।

'মৃত্যু কি জীবনের অনিবার্য পরিণতি?' জিজ্ঞাসা করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক এ ডবলিউ গ্যালস্টন, তারপর নিজেই যোগ করছেন এ যুগের জীববিদরা এর জবাবে উচ্চস্বরে বলেছেন—'না।' এই উক্তিতে আশ্চর্য হবার হেতু নেই, কারণ মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় এই হল আমেরিকার দর্শন। যাই হক, ভাবতে ভাল লাগে যে যে সব প্রতিভার অকালে মৃত্যু ঘটে (অনেকে বলেন প্রতিভার এইটাই রীতি) তাদের আবার ফিরে পেলে বিশ্বের অনেক উপকার হয়। কে জানে রামানুজম বা কীটস-এর শক্তি পূর্ণ বিকশিত হলে আমরা আরও কত কি পেতাম। অবশ্য সাধারণ মানুষকে বাদ দিলে চলবে না, কারণ জীবনের দাম যার যার নিজের কাছে। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যারা অমরত্বপ্রয়াসী পুনরুজ্জীবন সমিতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে তাদের তৎপর হবার সময় এসেছে।......

অসময়

অশিস ঘোষ

একটু ফঁু দিতেই কাগজের ঠোঙাটা বেলুনের মতো ফুলে উঠল। তারপর ফাঁপানো ঠোঙাটাকে কয়েকটা মোচড় দিয়ে দু'হাতে একবার চাপ দিতেই শব্দ করে ফেটে গেল। ছেঁড়া কাগজের টুকরো, চিনেবাদামের খোসা, সিগারেটের প্যাকেট চারপাশে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে হয়তো। বেঞ্চিটার দিকে ভাল করে একবার চেয়ে দেখল সমীর, তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পাশের খালি বেঞ্চিটায় গিয়ে বসল।

অনিতা এখনো আসেনি। বিকেল তিনটেয় আসার কথা, চারটে বাজতে চলল, অনিতা এখনো আসছে না। সময় হয়ে আসছে। প্লাটফর্মের এদিকটায় ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। বিকেল চারটে প'য়ত্রিশের পাঁশকুড়া লোকাল এখনো 'ইন' করেনি। শনিবার এই সময়টায় বোধ হয় একটু বেশি ভিড় হয়। পেছনে হেলান দিয়ে সমীর সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। কথা ছিল অনিতা আসবে। তারপর ওরা দুজন স্টেশনের ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে কিংবা অনেকক্ষণ ধরে সারা স্টেশন ঘুরে বেড়াবে। সমীর আজ বাইরে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে খুব দূরে না হলেও, সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে। কথা ছিল অনিতা আসবে। তিনটার মধ্যেই এখানে আসবে। কিন্তু সে আসেনি। চারটে বাজতে চলল, অথচ এখনো আসছে না। এলোমেলো হাওয়ায় ধোঁয়ার রিং করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সমীর। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল বারকয়েক। ওপাশের প্লাটফর্ম থেকে একটা ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে, লাল জামা গায়ে কুলিদের ছুটোছুটি, ইঞ্জিনের শব্দ, হুইশিলের শব্দ—প্লাটফর্ম জুড়ে একটা ব্যস্ততা।

চলতে থাকা ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল সমীর। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ে। স্টেশনে এলেই কেমন যেন কষ্ট হয়। ইচ্ছে করে যে-কোন একটা গাড়িতে উঠে, যতদূরে ইচ্ছে চলে যায়। অনিতার কথা ভাবল সমীর। আশ্চর্য, এই কয়েকদিনের আলাপে যে এত ঘনিষ্ঠ হতে পারে কোন মেয়ে, এটা সে কোনদিন ভাবতেই পারেনি। কিছুদিন হ'লো তাদের অফিসে এসেছে অনিতা। কিন্তু কেন যে এসেছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি সমীর। কলকাতার কাছেই কোথায় যেন থাকে মেয়েটি। ট্রেনে করে যাতায়াত করতে হয়। অসুবিধে হয় খুব। বাড়ীর অবস্থা ভাল। এরা কেন যে এত কষ্ট করে, বুঝতে পারে না সমীর। যদি কাজ না করে চলত, তাহলে সে নিশ্চয়ই কোন কাজ করত না। বিশেষ করে অফিসে। রোজ একজায়গায় বসে কাজ করলে, আর কিছু না হোক মনের দিক থেকে খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যেতে হয়। কেমন যেন একঘেয়ে ...চেয়ারে বসে শুধু ঝিমোতে ইচ্ছে করে। এক সময় স্কুলে-কলেজে পড়ানো সম্পর্কে সে অনেক কিছুই ভাবতো। এখন ভাবতে গেলেও মন খারাপ হয়ে যায়। আশ্চর্য, লোকে এখনো মাস্টারদের শুধু মাস্টার-ই মনে করে।

আজ সকালের কথা মনে পড়ল। মা-কে কথাটা বলতেই, ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে—আ ভাল বুঝিস, আমি আর কি বলব'—এই ধরনের একটা ভাব দেখিয়ে মা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল, বাবাকে আজ যেন একটু বেশি গম্ভীর মনে হচ্ছিল। রোজকার মত আজও সকালে উঠে কাগজ পড়েছেন। থলে হাতে করে বাজারে গেছেন। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের সঙ্গে একালের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনাও করেছেন। কিন্তু যখন-ই সে তাঁর সামনে পড়েছে, তিনি কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে তাকে এড়িয়ে গেছেন। অফিসে বেরোনোর আগে দাদা একবার এসে তার পিঠে হাত রেখেছিল,—কিরে, তুই নাকি বাইরের কোন স্কুলে কাজ নিয়ে যাচ্ছিস? একটু যেন মুচকি হাসছিল দাদা।

—হ্যাঁ, আজকেই যাবার কথা। অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিল সমীর।

—কিন্তু অফিস ছেড়ে, স্কুলে কাজ করে তোর লাভটা কি? মাইনে বেশি পাবি?

—জানি না।

—দু'দিন পরে যদি ওখানকার চাকরী চলে যায়, কি করবি?

—জানি না।

—বাইরে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারবি?

—ঠিক বলতে পারি না।

আর কিছু না বলে একপাশে সরে গিয়েছিল সমীর। এ ব্যাপার নিয়ে অনেক দিন অনেক তর্ক হয়েছে। কি করে ওদের বোঝানো যায় যে, আসলে এই একঘেয়ে বস্তাপচা চাকরী আর ভাল লাগছে না। একটা পরিবর্তন চায়। কোন নতুন পরিবেশ। নতুন ভাবে দিন কাটানো। সেটা ভাল কি খারাপ হবে, তা নিয়ে আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

রুমাল দিয়ে মুখটা আর একবার মুছে নিল সমীর। এবার উঠতে হয়। অনিতা বোধহয় আসবে না। মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। কবে আবার দেখা হবে ঠিক নেই। ভেবেছিল আজ যাবার আগে একবার দেখা হবে। কিন্তু ও বোধহয় আর এলো না। তিনটের আসার কথা, চারটে বেজে গেল, ও আর এলো না।

বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সমীর। চারটে পঁয়ত্রিশের পাঁশকুড়া লোকাল এবার 'ইন্' করছে। প্লাটফর্মের ধার ঘেঁসে এখন অনেক লোকের ভিড়। লাল জামা গায়ে কুলিদের ছুটোছুটি, ইঞ্জিনের শব্দ, ধোঁয়া, হুইসিল—প্লাটফর্ম জুড়ে একটা ব্যস্ততা। একটু ইতস্তত করলো সমীর। আর একটু দেখলে হয় না? হয়তো কোন কারণে কোথাও আটকে পড়েছে, তাই আসতে দেরি হচ্ছে। কিংবা যদি একটা কিছু হয়ে থাকে? হয়তো বাড়ী থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল, কিন্তু আসতে আসতে......

আবার ঘড়ি দেখলো, ঠিক চারটে পঁচিশ। আর থাকা যায় না। আস্তে আস্তে এগুতে থাকে সমীর। এমনো তো হতে পারে যে, ও আসলে একটা কথার কথা বলেছে। এদিকে হয়তো আর আদপেই আসবে না। দু'একদিনের আলাপ, পরে কে কোথায় থাকবে ঠিক নেই। হয়তো, ওর সঙ্গে আর কোনদিন দেখাই হবে না। ভেবে দেখলো সমীর। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। সে কোথাকার কে সমীর দত্ত, কোলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরের সেউলটি স্কুলের মাস্টার হতে চলেছে, তার জন্য অনিতা সেনগুপ্তের মন খারাপ হওয়ার কথা নয়। আসলে সে-ই হয়তো বুঝতে ভুল করেছে। মেয়েটি মিশুকে। আলাপ-পরিচয় হয়েছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু এর বেশি আর কিছু কি

সত্যিই ভেবেছিল? অন্য কিছু আশা করেছিল? কে জানে হয়তো করেছিল। কিছু একটা ভাবতে ভাল লাগে, তাই অনেক কিছুই সে ভেবেছিল।

গাড়ীটা এখন ছাড়ছে বোধহয়। প্লাটফর্ম প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। চায়ের গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে পাশের কামরায় উঠে পড়ল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আর একবার দেখল সমীর, না, ও সত্যিই আর এলো না। বলেছিল আসবে। বিকেল তিনটের মধ্যেই আসবে। চারটে বেজে গেল, ট্রেন ছাড়তে চলেছে—ও কিন্তু আর এলো না। মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। আর হয়তো কোনদিন ওর সংগে দেখা হবে না, কালকে ওকে স্টেশনে আসার কথা বলতেই, ও প্রথমটায় একটু অবাক হয়ে চেয়েছিল ওর দিকে।—

—কি ব্যাপার, হঠাৎ স্টেশনে যেতে বলছেন কেন?

—আসুন না, এলেই দেখতে পাবেন।

—না হয় গেলাম, কিন্তু ব্যাপারটা বলতে পারলে ভাল হ'তো!

সমীর হেসেছিল,—ভয় নেই, পালাব না আপনাকে নিয়ে।

—ইচ্ছে থাকলেও, সে উপায় নেই।

—কেন নেই?

—এসব ব্যাপারে রেল-পুলিশ খুব ...। চোখ ছোট করে হাসতে শুরু করল ...।

আসল ব্যাপারটা ওকে বলেনি সমীর। ... ছিল এখানে এলে, ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে হঠাৎ একসময় বলবে কথাটা।—...ন, আজকে আমি বাইরে চলে যাচ্ছি? হয়তো আবাক হ'ত—'সে কি, কোথায়?'

—'এই কাছেই'—বলে একটা সিগারেট ...।

—কেন, হঠাৎ বাইরে যাচ্ছেন কেন? ... ফিরবেন? কোথায় যাচ্ছেন? ও হয়তো ... সংগে আরও অনেক প্রশ্ন করত। ...ক্ষণ চুপ করে থেকে, সিগারেটের ধোঁয়া ...তো সমীর। এদিক-ওদিক চাইতো, আর ...তে পারত ও তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখ দুটো কেমন যেন ঠান্ডা, ভেজা-...। চেয়ে থাকলে একসময় যেন ঘুম পায়।

আচ্ছা, ও কি সব শুনে খুশি হতো? ... ওজর-আপত্তি জানাতো? খুশি ...তো? কে জানে! অনেক কিছুই ... ইচ্ছে ছিল। কিছুই জানা হল না। ... আসবে। এলো না। হয়তো আর ...দিন দেখা হবে না।

...ন যেন গাড়িটা চলতে শুরু ...ল। এখন প্লাটফর্ম ছেড়ে অনেকটা ...ড়েছে। গাছের শিকড়ের মতো আঁকা-...রেললাইন চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ... একটু ... সুস্থ-অসমান-... ভাবে চলছে। কয়েক জায়গায় লাল আলো জ্বলছে। দূরে একটা খুব লম্বা ট্রেন ধীরে ধীরে স্টেশনে "ইন্" করছে দেখতে পেল।

বিকেল প্রায় পড়ে এসেছে। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ইস্পাতের লাইনের ওপর সূর্যের লাল আভা চকচক করছিল। গাড়ির জানালায় একটা হাত রেখে, মাথাটা একটু এলিয়ে দিল সমীর। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। মা বলেছিল,—'ওখানে যাস না, থাকতে পারবি না।'

ভয় নেই, পালাব না আপনাকে নিয়ে

—কেন?

—কয়েকদিন থাকলেই বুঝতে পারবি।

সে যাচ্ছে, জায়গা কেমন জানে না। থাকতে পারবে কিনা জানে না, আবার যদি ফিরে আসতে হয়, তখন কি হবে জানে না। তবুও যাচ্ছে।

সেখানে কোন বন্ধু নেই। কোন আড্ডা নেই। কেউ নেই। তবুও সে যাচ্ছে। না গিয়ে পারছে না। আসলে—

একটা কোন পরিবর্তন সে চায়।
কিছুদিন নতুন ভাবে বাঁচতে চায়।
কিছু একটা হয়তো করতে চায়।

এভাবে আর থাকতে পারছে না। একেবারে রুটিনে বাঁধা সবকিছু। রোজ সকালে উঠে কাগজ পড়া, দাঁত মাজা, চা খাওয়া, স্নান-খাওয়া সেরে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে অফিসে যাওয়া। সারাদিন একঘেয়ে সময় কাটিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আড্ডায় যাওয়া, সিগারেট-চা-কফি—চিৎকার করে করে একসময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে আসা।

ট্রেনটা ছুটছে তো ছুটছেই, ঠান্ডা হাওয়া লাগছে মাথায়। উল্টোদিকের বেঞ্চে বসে একজন ঝিমোতে ঝিমোতে কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে হাই তুলছে। কে যেন গান গাইছিল। অস্পষ্ট সুরটা ঘুরতে ঘুরতে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে জানলা দিয়ে পিছলে বাইরে চলে যাচ্ছে। গাড়ীটা ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছেই। মসৃণ লাইনের ওপর দিয়ে শব্দ করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে। সমীরের মনে হলো, কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। সে যতই চেষ্টা করুক কিছুতেই থামতে পারবে না। কোনদিন না। যতই ইচ্ছে করুক, কিছুতেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারবে না। কোনদিন না। গাড়ির চাকার কথা ভাবলো। মসৃণ সমান্তরাল লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। শব্দে শব্দে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময়ে হয়তো চাকা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে। ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু খুলে যাচ্ছে না। ভাঙছে না। কিছুতেই ভাঙবে না। থামবে না। চাকাটা কিছুতেই থামবে না।

আবছা আলোয় চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে
পাচ্ছিল সমীর।

শহরে বসন্ত ॥

উমা দেবী

এ শহরে বসন্তের আদি স্পর্শ শিমুলের ডালে—
রিক্ত শাখা মাংসল পুষ্পের স্তূপ—আয়োজন স্থূলে
তালের মঞ্জরী ওড়ে দমকা হাওয়ার তালে তালে,
কদাচিৎ নবজাত নারিকেল পত্রেরা আকুল।
ফুটপাথের তক্তপোষে রক্তিম আপেল আর কুল
চৌমাথার মোড়ে মোড়ে রজনীগন্ধা ও যূথীমালে,
হাওয়ার রাতেরা এসে অনিদ্রার উচ্চেতনা ঢালে,
প্রৌঢ়তার ছায়াতলে যৌবনের স্বপ্নেরা মশগুল।

এখন আমি কী করি! খাতা-পত্র কাগজের চাপে
যদিও বিব্রত আছি—তবু সাধ, শিমুলের শিখা
আগুন ধরিয়ে দিক কর্মস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ে,
যখন বাষ্পের মত মনস্তাপে হৃৎপত্রেরা কাঁপে.
ছুঁই-ছুঁই স্বপ্নরাজ্য!—কে এলো এ নিরন্ধ্র আলয়ে?
—আমার কপালে শুধু এ বসন্তে বসন্তের টিকা!

প্রথম বিস্ময় ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তুমি তো জানো না কবে দুরারোগ্য ভ্রমে
কি করে শরীরে চাঁদ ক্রমশ হলুদ হয়ে যায়।
বাদামের খোসা ভাঙতে এইসব আশ্চর্য বিস্ময়
গতকাল ময়দানের ঘাস ছুঁয়ে গেছে।
হঠাৎ মেঘের শব্দে মনে হলো : তুমি যেন বড়ো হয়ে গেছ।

কখন উঠোন ছেড়ে হাঁটিতে হাঁটিতে
এসেছিলে ইডেন গার্ডেনে।
এখনো ময়দানে নাকি হাওয়া বয় চোরের মতন।
আমার সঙ্কট কি তা বোঝাতে পারি না—
কেবল সেকথা জানে ভোরের বাতাস :
শুশ্রূষায় অসুখ সারে না।
মৃগনাভি ফেটে গেলে মৃগ ভাবে নিজের বিস্ময়।

চোখ তুলে তাকাতে পারি নে।
তুমি কাল এসেছিলে নীল শাড়ী পরে।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৩)

অদ্বৈত আচার্য

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।'

শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে অদ্বৈতের ...ন্ম, বাবার নাম কুবের পণ্ডিত, মার নাম ...ভা দেবী। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। লাউড়ে ...াড় বলে সবাই 'নাড়াবুড়া' বলে ডাকে। ...রাঙ্গ ডাকে শুধু নাড়া।

গৌরাঙ্গের জন্মকালে অদ্বৈতের বয়েস ...র বাহান্ন।

কুবের আচার্য রাজা দিব্যসিংহের সভা-...ণ্ডিত। আগে-আগে হিন্দু রাজাদের খাস ...রিচারকদের মাথা ন্যাড়া থাকত। সেই থেকে ...ন্ত প্রিয় পার্শ্বচরদের নাম হয়ে গিয়ে-...ল 'নাড়া'। সেই অর্থেও অদ্বৈতকে নাড়া ...কা অসম্ভব নয়।

...হাতেখড়ির পর কমলাক্ষ পাঠশালায় ...র্তি হল। সেখানে সহপাঠী পেল স্বয়ং ...জপুত্রকে। রাজপুত্র হলে কী হবে, বেচারা ...লাক্ষের দৌরাত্ম্যে একেবারে জবুথবু। ...দু কমলাক্ষ এমন মধুর যে তাকে না ...ালোবেসে তার উপায় নেই।

রাজকুমার কমলাক্ষকে তাদের বাড়িতেও ...র যায়।

রাজা দিব্যসিংহ জিজ্ঞেস করেন, ও ...?

রাজকুমার বলে, আমার সেথো। ...ঙ্গী।

রাজা আরো পরিচয় পায়। তারই সভা-...ণ্ডিতের ছেলে। বালককে দেখে কী রকম ...শ হয়ে যায় রাজা। তাই ধরে, ক্রমে-ক্রমে, ...-উপাসক দিব্যসিংহ বিষ্ণু-উপাসক হয়ে ...ঠ। সবাই বলে, অদ্বৈতের প্রভাব।

কমলাক্ষের বয়েস প্রায় বারো, কুবের-...ণ্ডিত সপরিবারে শান্তিপুরে চলে আসে। ...ন্তিপুরে এসে ফুল্লবাটি গ্রামের শান্তনু ...র্যের কাছে কমলাক্ষ শাস্ত্র পড়তে সুরু ...। কিছুকালের মধ্যেই বেদবিৎ মহাপণ্ডিত ... ওঠে। শান্তনুর ভাষায়, বেদপঞ্চানন। ... রাঢ়ের শ্যামাদাস পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী ... প্রখ্যাত। তার সঙ্গে কমলাক্ষের তর্ক-... হয়। সেই যুদ্ধে হেরে যায় শ্যামাদাস। ... গিয়ে বিনত শ্যামাদাস বিস্মিত না হয়ে ...ট কমলাক্ষের শিষ্যত্ব নেয়। আর সেই ... কমলাক্ষের নাম হয়ে যায় অদ্বৈত।

...বাবা-মা মারা গেলে অদ্বৈত গয়ায় যায় ... দিতে। সেখানেই তার মাধবেন্দ্রপুরীর ...দেখা। এ বুঝি মহাকালের নির্দেশ। ... মহৎ সাক্ষাৎই ...রকুরুর্ক ...ভক্তিধর্ম-...র ভবিষ্যৎ ভূমিকা।

পরে নীলাচলে যাবার পথে শান্তিপুরে এলেন মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রর প্রেমাবেশ দেখে অদ্বৈতের আনন্দ আর ধরে না। বললে, আমাকে দীক্ষা দিন।

মাধবেন্দ্র দীক্ষা দিল।

গয়া থেকে কাশী গেল অদ্বৈত। সেখানে সন্ন্যাসী বিজয়পুরীর সঙ্গে দেখা। বিজয়পুরীও পরে চলে এল শান্তিপুর। অদ্বৈতকে ভাগবত পড়ে শোনাল।

অদ্বৈত জিজ্ঞেস করলে, একটি বালককে দেখতে যাবে?

কোথায়?

নবদ্বীপে।

কে সে বালক?

আহা, একবারটি গিয়ে দেখে এস না।

বালক গৌরাঙ্গকে দেখতে বিজয়পুরী নবদ্বীপ গেল।

কাশী থেকে মথুরা এসে পরিক্রমা সুরু করল অদ্বৈত। পরিক্রমা করতে-করতে পেয়ে গেল একটি কৃষ্ণবিগ্রহ। মদনমোহন। একটা বটগাছের নিচে অভিষেক করে তাকে স্থাপন করল। যতদিন আছি ব্রজধামে নিত্য এর সেবা করব। কিন্তু তারপর—তারপর কী হবে?

মথুরার দামোদর চোবে ও তার স্ত্রী বল্লভা এসে ধরল অদ্বৈতকে। এ বিগ্রহ আমাদের দিয়ে দিন। একে আমরা ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা-পুজা করি।

ঘরের আচ্ছাদনে যেতে বুঝি ইচ্ছে হয়েছে বিগ্রহের। অদ্বৈত দিয়ে দিল।

কিন্তু আমি? আমি কী নিয়ে থাকি?

বিশাখা-অঙ্কিত কৃষ্ণের চিত্রপট পেয়ে গেল অদ্বৈত। তাই নিয়ে সে ফিরল শান্তিপুর।

দীক্ষা দেবার পর মাধবেন্দ্র দেখল সেই কৃষ্ণপট। বললে, আরেকজন কই?

আরেকজন!

হ্যাঁ, আরেকজন। আরেকজনকেও চাই। বলে মাধবেন্দ্র রাধিকার একটি চিত্রপট এঁকে উপহার দিলেন অদ্বৈতকে। বললেন, যুগল মূর্তির আরাধনা করো।

যুগল মূর্তি! সেই দুই কি এক হয়ে উঠবে না?

একদিন লাউড় থেকে দিব্যসিংহ এসে হাজির। মুখে অবিরল কৃষ্ণনাম, বলা যায় কৃষ্ণানুরাগের নামমূর্তি। বললে, গঙ্গাতীরে নিরালায় কুটির নির্মাণ করে অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণনাম জপ করতে এসেছি। একবার দেখে যাই তোমাকে।

এ কি দিব্যসিংহ? না কি কৃষ্ণদাস?

অদ্বৈত আনন্দিত অন্তরে বললে, তুমি কৃষ্ণদাস। তোমার নাম কৃষ্ণদাস রাখলাম। যে কৃষ্ণদাস সেই হয়তো দিব্যসিংহ।

কৃষ্ণদাস ফুল্লবাটিতে কুটির তৈরি করে কৃষ্ণনাম জপ করতে বসল।

হরিদাস এসে মিলল অদ্বৈতের সঙ্গে। বুঢ়ন গ্রাম থেকে প্রথম এল ফুলিয়ায়, পরে শান্তিপুরে।

'হেনকালে তথায় আইল হরিদাস।

শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ।।'

অদ্বৈত তার পিতৃশ্রাদ্ধে হরিদাসকে নিমন্ত্রণ করে বসল।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল, এ তুমি করেছ কী? হরিদাস যে যবন।

হরিদাস কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণদাস। দিনে তিন লক্ষ অভঙ্গ হরিনাম করে। সে বেদবিৎ ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা অদ্বৈতের ঘরে পাত পাড়ল না। অনেক-বিনয়ের পর 'সিধে' নিতে রাজি হল। তাই দাও, যে যার বাড়িতে রান্না করে নেব। তোমার গৃহে অন্ন গ্রহণ করতে পারব না।

নিমন্ত্রিতেরা চলে গেল সিধে নিয়ে। গৃহের অন্ন পড়ে রইল। সবান্ধবে উপোস করে রইল অদ্বৈত।

তারপরে নামল বৃষ্টি, মুষলবর্ষণ। তার ফলে গ্রামের সমস্ত আগুন নিবে গেল। আগুনের অভাবে ব্রাহ্মণের দল চোখে অন্ধকার দেখল। পরদিন তারা অদ্বৈতের দর-জায় গিয়ে উপস্থিত হল, কাতর মুখে বললে, আমাদের কালকের বাসি অন্নই খেতে দাও।

খাওয়াবার পর অদ্বৈত তাদেরকে হরি-দাসের গোফাতে, মাটির নিচেকার ঘরে নিয়ে গেল। সবাই দেখল সেই অঝোর বর্ষণেও হরিদাসের মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত আগুন।

শত দুঃখদৈন্য ক্লেশকষ্টের মধ্যেও হরিদাসের অন্তরে জ্বলন্ত ভক্তি।

সবাই বুঝল তখন অদ্বৈতের মহিমা।

অদ্বৈত ও হরিদাসের মিলনে বিরাট শক্তির বিস্ফোরণ ঘটল, ভেসে গেল জাতি-কুলের বেষ্টনী। ভক্তির জগতে মানুষে-মানুষে ব্যবধান রইল না।

কিন্তু সংসারাসক্ত মানুষ যে বহির্মুখী হয়ে রয়েছে। যেন পেঁচা তার কোটরের মধ্যে চোখ বুজে বসে আছে, এমন স্বচ্ছ দিনের আলো, তাই দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে শুধু অনাচার আর অভক্তি, শুধু কৃত্রিম

অনুষ্ঠানের বাহুল্য। উপায় কী? জগৎ তৃপ্ত হবে কিসে? কিসে তার দাহ যাবে, ঘোর কাটবে?

যদি কৃষ্ণ আরেকবার আসত। যদি ঢালত তার প্রেমভক্তির ধারাজল। সেই আসায়তেই তবে জগতের আসান হত।

অদ্বৈত গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়ে কৃষ্ণের পূজা করে আর প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ডাকে, তুমি এস, তুমি অবতীর্ণ হও। তুমি যদি ভক্তির বিস্তার করো তা হলেই মানুষের নিস্তার হবে।

অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারেই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

নবদ্বীপে টোল খুলেছে অদ্বৈত।

শুভদিনে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রকট হল গৌরহরি। অদ্বৈত তার স্ত্রী সীতা-দেবীকে বললে, একদিন গিয়ে শিশুটিকে দেখে এস।

সীতা গেল শচীগৃহে। ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। যাতে অপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে, তেতো লাগে, তাই তার নাম রাখল নিমাই।

ভালো নাম হল বিশ্বম্ভর। প্রেমে সমস্ত বিশ্ব ভরে দেবে বলেই ঐ নাম। সমস্ত দেখে-শুনে অদ্বৈতের বুঝতে বাকি রইল না এই সেই পরিত্রাতা, যার জন্যে তার এত প্রতীক্ষা এত গর্জন-ক্রন্দন। 'মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।' কিন্তু প্রভু নিজে না ঘোষণা করলে নিঃসংশয় হই কী করে?

বড় ভাই বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বম্ভর মাঝে-মাঝে আসে অদ্বৈতমন্দিরে। বিশ্বরূপ আসে শাস্ত্র শিখতে আর বিশ্বম্ভর আসে দেখা দিতে।
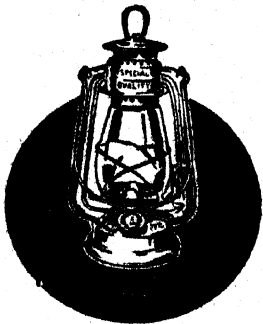
সংসারে বিরক্ত হয়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। শচীমাতার মনে হল অদ্বৈতই তাকে সংসার ছাড়তে পরামর্শ দিয়েছে। কে জানে নিমাইকেও না সেই পথের পথিক করে। অদ্বৈতের প্রতি শচী-মাতা অপ্রসন্ন হয়ে রইল।

গয়া থেকে ফিরে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হল গৌরাঙ্গ। রামাই-পণ্ডিতকে বললে, রামাই, অদ্বৈতকে গিয়ে খবর দাও। বলো যাকে সে চেয়েছিল সে এসেছে। সে যেন পূজার সজ্জা নিয়ে সস্ত্রীক চলে আসে।

অদ্বৈত রামাইকে বললে, দাঁড়াও, ঠাকুরের ঠাকুরালি দেখি। আমি নন্দন আচার্যের ঘরে লুকিয়ে থাকব, আর তুমি গিয়ে প্রভুকে বলো অদ্বৈত এল না।

রামাই তেমনি বললে প্রভুকে। তারও ভাবখানা, দেখি না কাণ্ডটা কী দাঁড়ায়।

অন্তর্যামী প্রভু নির্বিকার মুখে বললেন, যাও নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে এস।

রামাই তখুনি ছুটল নন্দন আচার্যের বাড়ি। অদ্বৈতকে বললে, চলুন, ধরা পড়ে গেছেন।

অদ্বৈত ভাবল, কে ধরা পড়ল!

শ্রীবাসের ঘরে গিয়ে দেখল বিষ্ণুখট্টায় বসে আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। নিত্যানন্দ ছাতা ধরে আছে, গদাধর তাম্বূল জোগাচ্ছে, সর্ব-প্রাণনাথ বলে ভক্তেরা স্তুতি করছে। অদ্বৈত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গৌরাঙ্গ তার মাথার উপর পা রাখলেন। নিজের গলার মালা অদ্বৈতের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, নাড়া, বর চাও, বর নাও।

অদ্বৈত বললে, তোমাকে দেখলাম, তোমাকে পেলাম এতেই তো আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হল। এর বাইরে আবার বর কী।

তোমার জন্যেই তো আমি গোচর হলাম। বললেন গৌরহরি, আর ভক্তি বিলো-বার জন্যেই আমার সব-কিছু।

তাহলে তেমন ভক্তি দাও যাতে ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করে।

অদ্বৈত বোলেন, যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।।
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে-যে জনে বাধে।।
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গায়্যা।।

গৌরাঙ্গে অদ্বৈতের প্রভুবুধি—এই তো স্বাভাবিক, কিন্তু না, অদ্বৈতে গৌরাঙ্গের গুরুবুদ্ধি। লৌকিক লীলায় মাধবেন্দ্র গৌরাঙ্গের গুরুর গুরু, আর অদ্বৈত সেই মাধবেন্দ্রর শিষ্য। সুতরাং অদ্বৈত গৌরাঙ্গের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। সেই অর্থে অদ্বৈত নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গের প্রণম্য। গৌরাঙ্গ তাই অকুণ্ঠে প্রণাম করে অদ্বৈতকে।

কিন্তু এটা অদ্বৈতের মনঃপূত নয়। তার কাছে গৌরাঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণদাস হবার আনন্দ কোটি ব্রহ্মসুখের চেয়েও বেশি। সুতরাং তার ভৃত্য হওয়াতেই তৃপ্তি, পদতলে প্রণামে ধূলিধূসর হতে।

বড় আর বড় প্রভু তাকে শাস্তি দে
শাস্তি পেলেই তো বুঝতে পারে সে দী
হীন, সে নিকৃষ্ট, সে অবজ্ঞেয়। সে ভৃত্যা
কিন্তু কী করে প্রভুর আক্রোশকে
ডেকে আনবে?

অদ্বৈত শিষ্যদের সামনে যোগবাশি
পড়াতে বসল। ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধা
স্থাপন করল। বলল, জ্ঞান বিনে ভক্তির
কোথায়? ভক্তি হচ্ছে দর্পণ, জ্ঞান হচ্ছে চো
যার চোখই নেই তার দর্পণে কাজ কী?

গৌরাঙ্গের কানে খবর গিয়ে পৌছু
এই কথা? ভক্তির চেয়ে জ্ঞানকে বড় করেছে
অসারকেই সারভূত বলে প্রচার করেছে
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্র
ছুটলেন শান্তিপুর।

অদ্বৈত টের পেল মহারুদ্র আসছে
তাকে শাসন করতে। আমি তো তাই চা
তাঁর হাতের শাসন-পীড়নই তো আম
ঘনিষ্ঠ আনন্দ।

গৌরাঙ্গকে আরো বেশি করে খেলাব
জন্যে ঘরের পিঁড়ার উপর বসে অধিক
উৎসাহে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা কর
লাগল।

গৌরাঙ্গ গর্জন করে উঠলেন : 'নাড়
বলো জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে কে বড়ো?'

এ কে না জানে? নিশ্চিন্তমুখে বল
অদ্বৈত, সর্বকালে জ্ঞানই বড়ো। যার জ্ঞা
নেই তার শুধু ভক্তি দিয়ে কী হবে?

ভক্তি দিয়ে কী হবে! 'ক্রোধে বা
পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন।' পিঁড়া হ
অদ্বৈতকে ধরে টেনে এনে উঠোনে ফেলে দ
হাতে তাকে প্রবল কিল-চড় মারতে লাগলে
গৌরাঙ্গ। যত মার খায় ততই সুখ প
অদ্বৈত। বোঝে, এই তো ঠাকুর, এই
ঠাকুরের ঠাকুরালি।

শাস্তিবিধানের পর গৌরাঙ্গ তাকে ছে
দিলে অদ্বৈত মহানন্দে নাচতে লাগ
জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি বড়ো, ভক্তি বড়ো—ভ
দিয়েই সব কিছু হবে—ভক্ত্যা সর্বং ভবিষ্যতি

মহাপ্রকাশের দিনে সকলেরে প্রে
দিলেন মহাপ্রভু, শুধু শচীমাতাকে দিলে
না।

সে কী, শচীমাতার কী অপরাধ?

শচীমাতা বৈষ্ণবাপরাধ করেছে
অদ্বৈতের প্রতি অপ্রসাদ পোষণ করেছে

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বড় ছেলে সন্ন্যা
হবার পর ছোট ছেলেও বুঝি সন্ন্যাসী হয়-
এর জন্যে অদ্বৈতের উপর দোষারোপ করেছে
সেই অপরাধ। সেই অপরাধের শাস্তি
প্রেম-না-পাওয়া।

শিক্ষাগুরু ভগবান জননীকেও শা
দিলেন?

এখন উপায়? এই অপরাধের খণ্ডন
কী করে?

একটিমাত্র প্রণামে। একটুমাত্র ক্ষমায়

শচীমাতা অদ্বৈতকে প্রণাম করতে
অদ্বৈত পদধূলি দিতে রাজি হল
কী করে আমি মা-যশোদাকে পদধূলি
শচীমাতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে-
আবেগে অদ্বৈত মূর্ছিত হয়ে পড়ল

সেই সুযোগে তাকে প্রণাম করল শচীমাতা। প্রণামই সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমাকে আবাহন করে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের খন্ডন হয়ে গেল। শচীমাতার শরীরে জাগল প্রেম-বিকার।

কাজীদমনের দিন যখন কীর্তনে বেরোলেন গৌরাঙ্গ, দলের প্রথমে রাখলেন হরিদাসকে, মধ্যে অদ্বৈতকে আর শেষে নিত্যানন্দকে। এ যেন কাজীকে সম্বোধন করে বলা—দেখ ভক্তিধর্মের মহিমা, যাতে জাতি-কুলের বিচার নেই, যাতে মুসলমানও ব্রাহ্মণের চেয়ে অধিকতর গৌরবের অধিকারী হতে পারে। আর সবার নিচে, সবার পিছে, সর্বহারাদের মাঝে আমরা দুই ভাই, গৌর-নিতাই।

কাটোয়ায় গিয়ে সন্ন্যাস নিলেন গৌরাঙ্গ। বৃন্দাবনের উদ্দেশে ছুটতে লাগলেন উন্মত্ত হয়ে. কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় যমুনা। পথ ভুলিয়ে নিত্যানন্দ তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে এল, বললে, এই যমুনা। যমুনা-ভ্রমে গঙ্গাতেই অবগাহন করলেন গৌরাঙ্গ। মনে পড়ল এক কোপীন পরেই তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, এখন স্নানান্তে দ্বিতীয় কোপীন পাবেন কোথায়?

তাকিয়ে দেখলেন গঙ্গাতীরে কোপীন ও বহির্বাস নিয়ে অদ্বৈত দাঁড়িয়ে আছেন।

এ কী, তাঁর বৃন্দাবনে আসার খবর অদ্বৈত জানল কী করে?

মুহূর্তে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল গৌরাঙ্গের। তবে এ বৃন্দাবন নয়, এ আমি যমুনায় স্নান করিনি!

অদ্বৈত বললে, তোমার পাদপদ্ম যে-স্থানেই বৃন্দাবন। আর যেখানে তুমি স্নান করবে তাই যমুনা। গঙ্গা আর যমুনা এক ধারা—একাকারা।

নৌকো করে গৌরাঙ্গকে নিয়ে এল তার বাড়িতে। যত্ন করে খাওয়াল। দু-তিন দিন ধরে রাখল, সেবা করার সুযোগ নিল। নৃত্য-কীর্তন দেখাল। তারপর নীলাচলের পথে রওনা করিয়ে দিল।

পথে কে গৌরাঙ্গের দেখাশোনা করবে? অদ্বৈতই সঙ্গী নির্বাচন করে দিল। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর আর মুকুন্দ। কেন, আমিও যাই না সঙ্গী হয়ে। নদীয়ার চাঁদের হাট ভেঙে গেলে আমি এখানে কী নিয়ে থাকব?

প্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি যদি ব্যগ্র হও তাহলে আর-সকলকে, আমার মাকে কে প্রবোধ দেবে?

অদ্বৈতকে আলিঙ্গনে নিবদ্ধ করে ফিরিয়ে দিলেন গৌরাঙ্গ।

তারপর প্রায় তিন বছর পরে যখন শুনল মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা করে নীলাচলে ফিরেছেন তখন অদ্বৈত নিজেই চলল নীলাচল।

মান্যপাত্র সর্বশিরোধার্য অদ্বৈতকে মহাপ্রভু সম্বর্ধনা করলেন। বললেন, তোমার আগমনে আমি এতদিনে পরিপূর্ণ হলাম।

সংকীর্তনে মূল-গায়ন ও প্রধান নর্তকের পদে অদ্বৈত নির্বাচিত হল। নরেন্দ্র-জলকেলি গুন্ডিচা-মার্জন, উদ্যান-ভোজন, রথাগ্র-নর্তন সর্বব্যাপারে অদ্বৈতই অগ্রগণ্য। অদ্বৈতই মহাপ্রভুর কাছে, 'আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।'

সেই অদ্বৈতই একদিন ফুল আর তুলসী দিয়ে মহাপ্রভুর পুজো করতে বসল।

আমি দাস আমি ঈশ্বর নই—প্রভুর এই কথা আর মানতে রাজি নয় অদ্বৈত। কিন্তু প্রভুও ছেড়ে দিলেন না, পুজোপাত্র থেকে ফুল-তুলসী নিয়ে তিনিও অদ্বৈতের পুজো করলেন। 'যোহসি সোহসি, নমোহস্তুতে।' তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার। নমস্কারের উত্তরে নমস্কার। 'এই মত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।' শিব রামকে নমস্কার করছে, রাম শিবকে।

আজ শুধু চৈতন্যের গান হবে, ভক্তদের বললে অদ্বৈত। 'আজ আর কোনো অবতার গাওয়া নাই। সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোঁসাই।'

সেই থেকে চৈতন্যলীলাগানের আরম্ভ।

ফিরে যাবার সময় প্রভু বললেন, আচন্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করো।

কিন্তু প্রতি বৎসর নীলাচলে আমি আসব তোমাকে দেখতে। অদ্বৈতের এই অনুরোধে সম্মতি দিলেন প্রভু।

সেবার নীলাচলে কী বৃষ্টি! প্রতিবারই নানারকম শাকের ব্যঞ্জন তৈরী করে প্রভুকে খাওয়ায় অদ্বৈত। প্রভুকে তো একা নিমন্ত্রণ করা যায় না, তাঁর স্বগণদেরও বলতে হয়। কিন্তু সেবার প্রভুর একাকী খেতে ইচ্ছে হল। অনেকের সঙ্গে এলে তাঁকে অল্প খেয়ে উঠে পড়তে হয়, তেমন করে পেট ভরে না।

সেবারও যথারীতি সদলবলে ডাকা হয়েছে প্রভুকে। সীতাদেবী জোগান দিয়েছে আর সমস্ত একা রান্না করেছে অদ্বৈত। প্রভু একা এসে সমস্ত গ্রহণ করুন এ বুঝি অদ্বৈতেরও গোপন অভিলাষ। সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী নিয়ে এলে অল্প একটু মুখে তুলেই তিনি উঠে পড়বেন।

ছুটে এল নিদারুণ প্রভঞ্জন। নামল তুমুল শিলাবৃষ্টি। সন্ন্যাসীগোষ্ঠীদের সাধ্য কী বাড়ি থেকে বেরোয়, খেতে আসে। ঝড়ে-অন্ধকারে পথঘাট সব মুছে গিয়েছে।

মুখে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ—শুধু একা প্রভু এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, কী রান্না করেছ, সব নিয়ে এস, আর যদি কেউ না আসে আমি একা খাব। কিছুই বেশি হতে দেব না।

কিছুই বেশি হবে না, কমও পড়বে না। সর্বত্র সেই একেশ্বরেরই জয় হোক।

বল্লভ ভট্ট তর্ক তুলল। কৃষ্ণই যদি পরম পতি, একমাত্র পুরুষ, তবে জীব-প্রকৃতি তাঁর স্ত্রী। পতিব্রতা স্ত্রী কি কখনো স্বামীর নাম উচ্চারণ করে? তবে তোমরা কৃষ্ণনাম বলছ কী করে? এ তোমাদের কি রকম ধর্ম?

অদ্বৈতকে লক্ষ্য করে বললে বল্লভ। অদ্বৈত বললে, 'পরমপতি প্রভুকে জিজ্ঞেস করো।'

শ্রীচৈতন্য নিজের থেকেই বললেন, 'বল্লভ, তুমি ধর্মের মর্ম জান না, তাই তোমার এই উদ্ভট প্রশ্ন। স্বামীর আজ্ঞাপালন করাই স্ত্রীর ধর্ম। স্বামীর নাম নেবার জন্যে স্বামীই স্ত্রীকে আদেশ করেছেন, স্ত্রী যদি পতিব্রতা হয় তাহলে স্বামীর সে-আদেশ সে অমান্য করে কী করে? অতএব যাও, তুমিও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। নাম করতে-করতেই প্রেমের দেখা পেয়ে যাবে। আর তোমার প্রশ্ন থাকবে না, তর্ক থাকবে না।'

নীলাচলে যাবার পথে জগদানন্দ এসেছে শান্তিপুরে। অদ্বৈতকে জিজ্ঞেস করল, প্রভুকে কিছু বলবার আছে?

অদ্বৈত বললে, তুমি সেই বাউলকে বলো, সকলে বাউল হয়ে গিয়েছে, হাটে আর চাল বিকোচ্ছে না। কী করে বিকোবে? কেউই যে আর আউল নেই, কারুরই আর ব্যস্ততা নেই, সবাই চুপচাপ বসে আছে।

যদি জিজ্ঞেস করেন একথা কে বলেছে? জিজ্ঞেস করল জগদানন্দ।

অদ্বৈত বললে, বোলো যে বলেছে সেও এক বাউল।

বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল।।

কলিহত জীবকে কৃষ্ণনাম দেবার জন্যে তোমাকে আহ্বান করেছিলাম। তুমি এসেছ, নির্বিচারে আপামর কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছ। কৃষ্ণপ্রেম পায়নি এমন লোক আর নেই সংসারে। যাদের উপর বিতরণের ভার ছিল তাদেরও কাজ ফুরিয়েছে। এবার তবে হাট গুটিয়ে ফেল।

মহাপ্রভু বুঝলেন, অদ্বৈত তাঁকে অন্তর্ধান করবার ইঙ্গিত পাঠিয়েছে।

তথাস্তু। তাই হোক। বলে তিনি চুপ করে গেলেন। (ক্রমশঃ)

অতঃপর মদনমোহন এবং অপর্ণার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমনিতেই তো তাসখেলা শিখতে গিয়ে বিপুল নাজেহাল হয়ে পড়েছে অপর্ণা। তার উপরে এই যাদুকরী সন্দেহ। মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে এসে এমন বিপদে বোধহয় আর কোনো নবদম্পতি কখনো পড়েনি।

পাঁড়েজি এবং তার হোটেলের বোর্ডারদের মধ্যে প্রথমে ফিসফাস করে আলোচনা শুরু হলো এই যাদুকর দম্পতি নিয়ে। তাঁরা মদন ও অপর্ণার সমস্ত কার্য-কলাপের মধ্যেই ম্যাজিকের ছোঁয়া দেখতে পেলেন। তাঁদের আলোচনা অতি দ্রুত হিল লাইফ হোটেলের সীমানা ছাড়িয়ে এই ছোট শহরের বাজারে, রাস্তায়, অফিসে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্রমাগত কৌতূহলী জনতার ভিড়ে হিল লাইফ হোটেল ছেয়ে রইলো। মদন-দম্পতির রাস্তায় বেরিয়েও রেহাই নেই। সর্বদাই পশ্চাতে, প্রায় পনেরো ফুটের নিরাপদ ব্যবধানে, অন্ততঃ সাত-আটজন লোক। সব সময়েই চাপা গলায় তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সবাই কি সব আলোচনা করছে।

মদনমোহন অথবা অপর্ণা কেউই প্রথমে ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারে নি ঘটনাটা কি? প্রথমে হোটেলে ভিড় দেখে তারা দুজনেই ভেবেছিলো যে হোটেলে বোধহয় কোনো রাজনৈতিক নেতা বা চিত্রতারকা বা ঐ জাতীয় অতিজনপ্রিয় কেউ আশ্রয় নিয়েছেন।

কিন্তু যখন জনতা মদনমোহনের পিছে-পিছেই ঘুরতে লাগলো, তার ভয় হলো যে এরা কি তাকে অন্য কিছু ভেবে ভুল করছে। চিত্রতারকা? কিন্তু শহর-তলীর কলেজের পদার্থবিদ্যার নিরীহ অধ্যাপক সে, তার চেহারার মধ্যে কোথাও চিত্রতারকার কোনো ব্যাপার নেই। তবে, সব নবীন স্বামীর মতই তার মনে হলো যে তার স্ত্রী অপর্ণা একেবারে যাকে বলে চিত্রতারকার মত দেখতে। সবাই হয়তো তাই ভুল করছে। কিন্তু মদনমোহন অপর্ণাকে ঘরে রেখে নিজে একা রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো তথাপি এক দঙ্গল ভিড় তাকে অনুসরণ করছে।

এইবার তার রীতিমত ভয় হলো। এরা তাকে কোনো ফৌজদারি মামলার পলাতক আসামী বলে ধরে নেয়নি তো। রাস্তায় পাশের পানের দোকানে এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য একটা দশ টাকার নোট দিতে সেই দোকানী এত বেশি উল্টেপাল্টে নোটটা দেখতে লাগলো যে মদনমোহনের রীতিমত সন্দেহ হলো যে এরা বোধহয় তাকে কোনো কুখ্যাত জালিয়াত বলে ভুল করেছে। দোকানী অনেকক্ষণ দেখেশুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নোটটা ভাঙিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আর খুচরো ফেরত দিলো। আর যেই সে দোকান ছেড়ে বেরিয়েছে অমনি সেই এক দঙ্গল লোক দোকানের উপর হুমড়িয়ে পড়ে তার দেয়া নোটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

হোটেলে ফিরেও স্বস্তি নেই। হোটেলের সমস্ত বোর্ডার, ঠাকুর-চাকর এবং সবচেয়ে বেশি করে ম্যানেজার পাঁড়েজি তাকে দেখে কিরকম অর্থময় হাসি হাসে।

তাস খেলা শেখানো মাথায় উঠেছে। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচে। রাস্তায় বেরোলে পিছনে পিছনে ভিড়, চারদিকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ। হোটেলের ভিতরেও তাই। ময়দানে মিটিং করে ফুল-শয্যা যাপন করার মতই অসম্ভব এই রকম অবস্থায় মধুচন্দ্রিকা উপভোগ করা। তার উপরে দুশ্চিন্তা; এরা কি ভাবছে, এরা কেন অনুসরণ করছে? কি এদের এত কৌতূহলের কারণ?

ঘরের দরজাও খুলে রাখার উপায় নেই। কেউ না কেউ ছাদে যাওয়ার ছলে একবার উঁকি দিয়ে দেখে যাবে তারা কি করছে। ভালো আপদ হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে অন্ধকারে উদ্বিগ্ন মুখে নবদম্পতি মুখোমুখি বসে —কি করা যায়? দুজনে মিলে ঠিক হলো আগামী কাল সন্ধ্যাতেই ফিরে যাবে। আর নয়। তবে গরমের ছুটিতে আরেকবার মধুচন্দ্রিকায় বেরোতে হবে, এবার একেবারেই জমলো না। সেই সময়েই অপর্ণা একেবারে পুরোপুরি শিখে নেবে তাস খেলাটা।

দুজনে মিলে এই রকম আলোচনা করতে করতে মনের মধ্যের উদ্বিগ্ন ভাবটা একটু কমে এসেছে। জানলা দিয়ে দূরের ফিকে সবুজ রঙের বাচ্চা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে অপর্ণা দেখলো সেটা এই সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে কেমন ফিকে নীলচে হয়ে এসেছে। অপর্ণা মদন-মোহনের হাত ধরে টান দিয়ে বললো, 'চলো ঐ পাহাড়টায় একটু যাই। এখন এই অন্ধকারে কে আর আমাদের দেখবে বা পিছু নেবে?' মদনমোহনের একটু সংশয় ছিলো যদিও, কিন্তু কোনো আপত্তি ছিলো না। ঘরের মধ্যে আরো দম আটকে আসছিলো।

দুজনে মিলে উঠে বেরোতে যাচ্ছে। এমন সময় তারা দরজা খুলবার আগেই বন্ধ দরজায় কড়াটা কে যেন একটু খুট্‌খুট্‌ ক'রে নাড়লো। মদনমোহন দরজা খুলে দিতেই দেখে পাঁড়েজি। পাঁড়েজি একই রকম অর্থময় হাসি হেসে বললেন, 'প্রফেসার সরকার, আপনাদের সঙ্গে এখানকার দারোগাবাবু একটু আলাপ করতে এসেছেন।'

দারোগাবাবুর আলাপ করতে আসা শুনে মদনমোহন বুঝতে পারলো এবার তাকে বিনাদোষে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হচ্ছে। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

—তারাপদ রায়

পাঠকের বৈঠক

একটি জীবন অনেক ঘটনা

একটি জীবন-স্মৃতি অনেক ঘটনায় ভরা। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির করুণ মধুর ইতিহাসকে সাধারণ পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা সাধারণ কর্ম নয়, শক্তিশালী রচনাকার ভিন্ন এই কৃতিত্ব কেউ দাবী করতে পারেন না। যিনি সার্থক শিল্পী তিনি জানেন কতটুকু তথ্য গ্রহণ করতে হবে, কি বর্জন করতে হবে। এখানে ওখানে কিছু রঙ, তুলির দু চারটি বলিষ্ঠ আঁচড়, তার মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে এক অন্তরঙ্গ চিত্র। আত্মজীবনী আর সেলফ্ পোর্টরেট তাই সমগোত্রীয়।

আমাদের দেশে অনেকগুলি আত্ম-স্মৃতি সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ হয়ে কালজয়ী হয়েছে। সেই সব জীবন-স্মৃতির মধ্যে ধরা আছে এক একটি বিশিষ্ট কালের ইতিহাস, সমাজচিত্র, জীবনদর্শন ও পারি-পার্শ্বিকতা। সম্প্রতি 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক মধু বসুর "আমার জীবন"। এই স্মৃতিচারণ ধারাবাহিক প্রকাশের কালে অজস্র পাঠকের অভিনন্দনে নন্দিত হয়। সম্প্রতি সেই "আমার জীবন" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সাড়ে চারশো পাতায় বিরাট গ্রন্থ, অসংখ্য চিত্রশোভিত।

নানা কারণে, মধু বসু আমাদের কাছে একটি প্রিয় নাম। আমাদের কৈশোর যৌবনে যেসব প্রখ্যাত বাঙালী আমাদের চিত্তকে অধিকার করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। যৌবনের প্রথম যুগে দালিয়া, আলিবাবা, রাজনর্তকী, বিদ্যুৎপর্ণা, রূপকথা প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় বা চিত্ররূপ দেখেন নি সেদিন বাঙালী যুবকসমাজে এমন মানুষ খুব কমই ছিলেন। আজ যাঁরা পঞ্চাশোর্ধে তাঁদের মনটিকে ভরিয়ে রেখেছিলেন মধু বসু, পরিচ্ছন্ন প্রযোজনার পরমাশ্চর্য পরিচয় দিয়ে। মধু বসুর জীবনে অনেক সাফল্য অনেক বিফলতা, অনেক অভিনন্দন, অনেক বিরূপতা। অনেক স্বাচ্ছন্দ্য, অনেক সংকট। তাই তাঁর জীবন অতি বিচিত্র, অতি চমকপ্রদ। 'আমার জীবন' এই বিচিত্র জীবনের ছবি, তাই সাহিত্যরসোত্তীর্ণ এক করুণ-মধুর কাহিনী হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে অজস্র তথ্য, অনেক ছোটখাটো ইতিহাস, অনেক ছবি।

অভিনেতার আত্মজীবনী বাংলা ভাষায় একাধিক প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিক-কালে। মধু বসুর জীবনী কিন্তু শুধু একজন বিখ্যাত অভিনেতার প্রেম কাহিনী বা শক্তিমান পরিচালকের সাফল্যের ইতিহাস নয়, এর ভেতর ছড়িয়ে আছে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব বিশিষ্ট পরিবার এই শতাব্দীর প্রথম দিকে নায়কত্ব করেছেন তাঁদের ইতিহাস। সামান্য ঘটনায়, সামান্য পরিচয়ে তাঁদের জীবন ও কর্মের রেখাচিত্র।

আমাদের কৈশোরে এক সময় নতুন দিল্লীতে স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র শংকর মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। শংকর মিত্র সেইকালে চমৎকার রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারতেন, এবং ইংরেজ আমলের একজন বিশিষ্ট আইনমন্ত্রীর পুত্র হলেও অতিশয় নিরহংকার বাঙালী তরুণ ছিলেন। শংকর মিত্র ছিলেন মধু বসুর সেজদি লেডী প্রতিমা মিত্রের পুত্র, অল্প বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। এই শংকর মিত্রের কাছেই আমরা প্রথম মধু বসুর কথা শুনতাম, তখনও তাঁর অভিনয় দেখিনি, কিন্তু মনে মনে তাঁর সম্পর্কে একটা 'হিরো ওয়ার্সিপের' ভাব জেগে উঠেছিল। মধু বসুকে দেখেছিলাম অনেক পরে, লেক রোডে 'অমিয় বসুর বাড়িতে। সেইকালে আমরা তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। এই শংকর মিত্র এবং অমিয় বসুর প্রসঙ্গ মধু বসুর "আমার জীবনে" উল্লিখিত আছে।

মধু বসু সম্পর্কে আমাদের অন্তরে অতি অল্পবয়স থেকেই একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব বর্তমান। সেই শ্রদ্ধা নিয়েই পড়েছি তাঁর জীবনী অমৃতের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে, আর তার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর। একদা স্বর্গীয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দীপালি' পত্রিকায় ও 'অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত 'বাতায়নে' মধু বসুর প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনাও করেছি। সেই সব কথা স্বভাবতই এই গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে স্মরণে আসে। মনে হয়, সেই অতীত যেন এক সুবর্ণ যুগের অতীত, যেন এই সেদিনের ঘটনা নয়, যেন অনেক অনেক কাল পার হয়ে গেছে, অনেক যুগ, অনেক দূর। মধু বসুর কৃতিত্ব সেই ফেলে আসা দিনগুলিকে তিনি কুশলী ক্যামেরাম্যানের মত ধরে রেখেছেন এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বিখ্যাত নর্তক 'নিজিনস্কি'-র একটি জীবনী লিখেছিলেন তাঁর স্ত্রী, সেই জীবনীতে আনন্দের ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়েছিল বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস। মধু বসুর 'আমার জীবন' পাঠ করলে সেই বেদনার শিহরনও মনে জাগে।

মধু বসু তাঁর জীবনী গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই তথ্য এবং ঘটনার সুসমঞ্জস পরিবেশনে পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁদের ৬৩নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বাসভবনটি সম্পর্কে তাঁর বড়দিদি শ্রীমতী সুষমা সেন মধু বসুর স্বনামধন্য পিতৃদেব প্রমথনাথ বসুর জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমাদের ধর্মতলার বাড়িটি ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ ও হৃদ্যতা ছিলো—যেমন সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের জোড়াসাঁকোর পরিবারের সমস্ত ছেলে-মেয়েরা কেশবচন্দ্র সেনের পরিবার (যাঁরা থাকতেন লিলি কটেজে), ডবলিউ, সি, ব্যানার্জি, মনোমোহন ঘোষ, বি, এল, গুপ্ত, জি, কে, গোখলে, ডাঃ জে, সি, বসু, আর, এন, রায়, কে, জি, গুপ্ত, এ, এম, বসু, ডি এল রায়, মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) প্রভৃতি। ভারতীয় সমাজের এইসব শ্রেষ্ঠ নরনারীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সুযোগ আমার হয়েছিল।"

সেই কালের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে রমেশচন্দ্র দত্তের নায়কত্বের কথা সর্বজনবিদিত। এই রমেশচন্দ্রের বাড়িতে ২৪শে জুলাই, ১৮৮২ তারিখে মধু বসুর পিতৃদেব প্রমথনাথের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের কন্যা কমলার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং এই ঐতিহাসিক দিনটিতেই রমেশচন্দ্র যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে মালাভূষিত করার উদ্যোগ করছেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র সেই মালাটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র নবীন কবি রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ-নাথ ছিলেন প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ, তেজস্বী মানুষ। তিনি সরকারী চাকরী ত্যাগ করে-ছিলেন। তিনিই ছিলেন গরুমহিষানীর লৌহ আকরের আবিষ্কর্তা। আজ সেখানে 'টাটা আয়রণ ও স্টীল ওয়ার্কস' গড়ে উঠেছে। টাটা কোম্পানী পরে কিন্তু প্রমথ-নাথের প্রতি সুবিচার করেন নি। প্রমথনাথ শুধু ভূতত্ত্ববিদ নয়, ছিলেন একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত লোক। তাঁর গ্রন্থগুলি গবেষণা কর্মীদের কাছে এক পরম মূল্যবান সম্পদ। প্রমথনাথ আচারে

জন্মদিনে আত্মীয়-বান্ধব ও গুণমুগ্ধজন পরিবৃত কবি নজরুল ইসলাম। ছবিতে কবি-সুহৃদ শ্রীপবিত্র গাঙ্গুলী, কবি-পুত্র কাজী সব্যসাচী ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যকে দেখা যাচ্ছে।

ব্যবহারে রক্ষণশীল ছিলেন, ককটেল যখন এদেশে প্রথম চালু হল, তখন তিনি সব শুনে অতিশয় আহত হয়েছিলেন। প্রমথনাথ রাঁচীতে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। মধু বসুর এই গ্রন্থে রাঁচির এই বাড়ি সম্পর্কে এবং সেকালের রাঁচির বিষয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে, তেমনই আছে শান্তিনিকেতনের কথা।

মধু বসু এতবড় পরিবারের ছেলে হলেও তাঁকেও হতাশভাবে চাকরীর সন্ধান করতে হয়েছে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে আরশোলাভরা তক্তপোষে থাকতে হয়েছে, বাজার করতে হয়েছে। চুঁচুড়ায় মেশোমশায় জে, এন, গুপ্ত মহাশয়ের গঙ্গা ধারের বাড়ি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে নৈহাটী দিয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে কয়লার ব্যবসায়ীদের সোয়ালো লেনের অফিসে চাকরী করতেও হয়েছে। শিল্পস্রষ্টা মধু বসুর দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে, হৃদয়ে জেগেছে মানবিকতার স্পর্শ। কল্পনার কল্পলোকে বাস না করে মধু বসু বিচরণ করেছেন বাস্তবের রূঢ় রঙ্গভূমিতে। এই সময় তিনি নৌকাডুবির হাত থেকেও ত্রাণ পেয়েছেন।

জীবনসংগ্রামে জর্জর মধু বসু পরে ৩নং চৌরঙ্গীতে জে, সি, মুখার্জির বাড়িতে থেকে এক আত্মীয়ের ফার্মেও কাজ করেছেন এবং এই বাড়িতেই তাঁকে জে, জে, ম্যাডান সর্বপ্রথম ফিল্ম অভিনয়ের সুযোগ দেন। সেই তাঁর হাতেখড়ি। তারপর তিনি হিমাংশু রায়ের 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে দুশো টাকা বেতনে কাজ পেলেন। [এই ছবিখানি পনের ষোলো বছর বয়সে আমরা ম্যাডান থিয়েটারে (এখন এলিট) দেখেছি] —এই ছবির নায়িকা সীতা দেবী (রীনি স্মিথ) একরকম তাঁর ও নিরঞ্জন পালের আবিষ্কার। তারপর সেই সূত্রে ১৯২৫-এ এস এস জেনোয়া জাহাজে বিদেশে পাড়ি। তারপর এমেলকার স্টুডিয়োতে শিক্ষানবিশী এবং হিলডার প্রীতিলাভ, সেই হিলডা আবার ডিরেক্টরের স্ত্রী। তাই নিয়ে কানাকানি। হিচককের সঙ্গে যোগাযোগ। হিলডার স্বামীর কুশলী স্ট্রাটেজি। হিলডার সঙ্গে আবার যোগাযোগ ইত্যাদি ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ। জীবন যে কি বিচিত্র এক রহস্য তার পরিচয় এই পর্যায়ে সুস্পষ্ট ফুটিয়েছেন মধু বসু।

মধু বসুর জীবনে দুই নারী বিচিত্ররূপে এসেছেন। একজন বিদেশিনী হিলডা, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বামীকে ছেড়ে পোলিস সঙ্গীতশিল্পীকে বিবাহ করেছিলেন। হয়ত মধু বসুর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ ঘটে যেত যদি অদৃষ্টের কারসাজিতে তাঁকে হঠাৎ সরে না আসতে হত। তারপর তাঁর জীবনে এসেছেন সাধনা বসু। মধু-সাধনা দীর্ঘকালের সংযুক্ত নাম। পনেরই ডিসেম্বর ১৯৩০ তারিখে সাধনা সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সাধনা, কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী, সরল সেন মহাশয়ের কন্যা। তাঁর যখন মাত্র পনের কি ষোল বৎসর বয়স তখন থেকে উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'দালিয়া' ছবিতে সাধনা বসুই 'তিন্নি'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার আগে মধু বসুর 'গিরিবালা' সাফল্যলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই দু'খানি গল্প নিয়েই একরকম তাঁর ছায়াচিত্রকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সেই সময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১১-১০-৩৭) লিখেছিলেন:

"১৯২৮ সাল হইতে সি, এ, পি সম্প্রদায় আলিবাবা, দালিয়া, জেরিণা, মন্দিরা, 'সাবিত্রী', 'ওমরের স্বপ্নকথা'র মধ্য দিয়া রসপিপাসু দর্শকসমাজকে তৃপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। 'বিদ্যুৎপর্ণা' তাঁহাদের অপূর্ব কল্পনাশক্তির আর একটি বিকাশ মাত্র।"

এই উদ্ধৃতিটুকু মধু বসুর সেইকালের সাফল্যের ইতিহাস। এরপর 'আলিবাবা'য় প্রযোজক এবং অভিনেতা হিসাবে তাঁর শক্তির অসামান্য পরিচয় পাওয়া গেল। মধু বসুর নাম বাংলা চিত্রশিল্পের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করল। আরও অনেকের মধ্যে একজন নয়, একটি বিশিষ্ট নাম যা জনতার মধ্য থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। অভিনয়, কুমকুম, রূপকথা মাইকেল মধুসূদন, শেষের কবিতা, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, রাখী প্রভৃতি বিখ্যাত ছায়াছবিগুলির সার্থক রচনাকার মধু বসু শিল্পী হিসাবে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন। তার পিছনে আছে কত ব্যথা ও যন্ত্রণা, কত ব্যর্থতা ও হতাশা, কত আশা ও আনন্দ,

কত বৈচিত্র্য ও বিস্ময়। আশ্চর্যের বিষয় সেইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি এই জীবনীগ্রন্থের পৃষ্ঠায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণভাবেই। অনেক তথ্য, অনেক ঘটনা জড়িয়ে তবে জীবনী। সেই তথ্যও অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তার পরিবেশন ভঙ্গীটি সুরুচিসম্পন্ন এবং পরিচ্ছন্ন। ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কিছু গোপন করেন নি মধু বসু, অপ্রিয় ও অপ্রীতিকর সত্যকে প্রকাশ করে য়ুরোপীয় ধারায় তাঁর জীবনকথা প্রকাশ করেছেন। সেইদিক থেকে বোধকরি জীবনীকার হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি জীবনের সর্বদিক খুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। এই সত্যনিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী ক্লান্তিকর নয়, মধুর ও রসোত্তীর্ণ।

যেখানে গ্রন্থটি শেষ করেছেন লেখক মধু বসু সেইখানে যে কথাগুলি বলেছেন তা পাঠকের চিত্তকে আকুল করে তোলে—

"সাধনা আমার কাছে আজ সত্যাই মাধবী। গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ) সেই অমোঘ বাণী যে কত সত্য তা প্রমাণ হতে এই পনেরটি বছর লাগল। পনেরো বছরের দীর্ঘ ব্যবধানে প্রমাণ হলো আমি যেমন সাধনাকে ভুলিনি, সাধনাও তেমনি আমাকে ভুলতে পারেনি।"

মধু ও সাধনার জীবন একসূত্রে বাঁধা, তাই তাদের বিচ্ছেদ নেই, বিরহ নেই। মধু বসু লিখেছেন ঃ

"কিন্তু শেষবারের মত প্রমাণ হয়েছে আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভোলবার সাধনায় ব্যর্থ হয়েছি। মনে রাখা যত শক্ত, ভুলে যাওয়া তেমনই আরো শক্ত। পরস্পর আমরা যত ভুলতে চেয়েছি, ততই পরস্পরকে নিবিড় করে পেয়েছি।"

মধু বসু বলেছেন, যদি কোনোদিন সাধনা হারিয়ে গিয়ে থাকে জীবন থেকে তবু সে মাধবী হয়ে ফিরে এসেছে। মধু বসু চিত্রশিল্পী, জীবনরসিক, তাই জীবনের এই বিচিত্র খেলায় তিনি পরাজয় স্বীকার করেন নি, সকল বেদনার ঊর্ধ্বে উঠে অপরাজেয় প্রেমের অমর মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে এই মহৎশিল্পীর প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে নয়, পাঠকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলতে বাধা নেই যে মধু বসুর 'আমার জীবন' এক অপূর্ব জীবনী গ্রন্থ। অনেক ঘটনার সঙ্গে অনেক ছবির সমাবেশ।

—অভয়ঙ্কর

আমার জীবন ।। (সচিত্র জীবনকথা)—মধু বসু প্রণীত। প্রকাশক ঃ বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম পনেরো টাকা।

সর্বভারতীয় সাহিত্য সেমিনার ।।

গত ২০শে মে সন্ধ্যায় 'অবন্তিকা'র উদ্যোগে 'শ্রীশিক্ষায়তন' হলে একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং জাতীয় সংহতিকে আরও ব্যাপক করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন। এতে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্যের অগ্রগতি নিয়ে এতে আলোচনা হয়। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি বিষয়ে বলেন শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, তামিল সাহিত্যের শ্রীপি এন থঙ্গরাজন, গুজরাট সাহিত্যে শ্রীশিউকুমার যোশী, হিন্দির শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এবং ইংরেজীর অগ্রগতির উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক পি পাল। এই ধরনের আলোচনার যত প্রসার হবে জাতীয় সংহতি ততই ব্যাপক হবে বলে আমরা আশা করি।

জিয়াগঞ্জে কবি সম্মেলন ।।

২১শে মে, রবিবার জিয়াগঞ্জে শ্রীপৎ সিং কলেজের স্থানীয় 'বহুমুখী' সংগঠনের উদ্যোগে একটি কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীস্বরাজব্রত সেন 'বহুমুখী' সংগঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং উপস্থিত কবিবৃন্দকে পরিচিত করিয়ে দেন। কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মুকুল গুহ, বৈশম্পায়ন ঘোষাল ও শ্যামাপদ সরকার। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে আধুনিক কবিতার ইতিহাস বিবৃত করে বলেন, "রবীন্দ্রত্তোর কবিতাও যে কবিতা হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য যে পরিমাণ পত্র-পল্লবে সজ্জিত হলে আমরা আরও খুশি হতে পারতাম, সে রকম হয় নি। তবু কবিতার ইতিহাসে এই সময়ের কবিতাও একটি উল্লেখ্য স্থান অধিকার করবে।" সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ সেনগুপ্ত আধুনিক কবিতা পঠন-পাঠন এবং প্রচারের জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'এভাবেই আধুনিক কবিতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় আরও নিবিড় হয়ে উঠবে।'

আর কে নারায়ণের সম্মান লাভ ।।

ভারতবর্ষে যাঁরা প্রধানত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক হিসেবে আর কে নারায়ণের খ্যাতি বোধ হয় সর্বাধিক। তাঁর রচিত 'গাইড' বইটি এরই মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতীয় সাহিত্যিককে ডক্টর অব লেটারস্ সম্মানে সম্মানিত করেছেন। গত ২৮ মে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

কবিতার দোকান ।।

প্রতিবারের মত এবারেও বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের মেলা-প্রাঙ্গণে কবিতা বই বিক্রয়ের এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন তরুণ কবি শংকর দে। প্রতিদিনই এই দোকানের সামনে বেশ ভিড় হচ্ছে। তাছাড়াও দোকানটিকে আকর্ষক করে তোলবার জন্য কবিতা পাঠের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মাঝে মাঝেই উপস্থিত কবিরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

বিদেশী ভাষা সম্মেলন ।।

সম্প্রতি 'রাইটার্স গিল্ড'-এর উদ্যোগে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী ভাষা-বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে 'রাইটার্স গিল্ড'-এর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশেখর সেন উপস্থিত সকলকে সম্মেলনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন। কলকাতায় ভারতীয় যাঁরা কোনো বিদেশী ভাষা জানেন অথবা যেসব বিদেশী কোনো ভারতীয় ভাষা জানেন—এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ে এই সম্মেলন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান, অনুবাদকর্মে সক্রিয় সাহায্য দান, কলকাতায় কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কোন্ কোন্ ভাষা শিখেছেন বা শিখছেন, সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা, মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও সর্বদা তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এই সম্মেলনের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট-এর ক্লাউ ফির্টজে দে, চন্দননগরস্থিত ফরাসী ইন্সটিটিউট ও কলকাতার 'এলিয়ান্স ফ্রান্সেস'-এর শ্রীকালীচরণ কর্মকার, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারের চীনা-

তাতার শিক্ষক মিঃ চেংলি, ও শ্রীনৃপেন দাশগুপ্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় এই ধরণের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে এই সম্মেলনের সংগে যুক্ত হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান করেন।

ধন্যবাদ দেন শ্রীরমেন মল্লিক।

সিন্ধি কবিতার এক বছর ॥

সিন্ধি সাহিত্যের সংগে আমাদের পরিচয় অতি ক্ষীণ। এর প্রধান কারণ, সিন্ধি-সাহিত্য এখনও তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। তার মানে এই নয় যে, সিন্ধি-সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। বরং এক বছরের সিন্ধি কবিতা তার বিপরীত সাক্ষ্য দেবে।

আজকের সিন্ধি কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলবার মূলে একটি কবিতা-মাসিকের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির নাম 'কুঞ্জ'। এই পত্রিকাটি প্রতি সংখ্যাতেই এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। এই পত্রিকাটির গত দেওয়ালী সংখ্যাটি ছিল খুবই অভিনব। এতে বাল্মীকি, কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখের কবিতার সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর কারণ হিসেবে তাঁরা জানিয়েছেন, পদ্মের মূলে যেমন গভীরে তেমনি কবিতার মূলও জাতীয় সংস্কৃতির গভীরে। এঁদের কবিতার অনুবাদ করেন শ্রীবাসদেব নির্মল, শ্রীমোহন কল্পনা ও শ্রীহরিশ বাসওয়ানি। এ-বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল, 'লালকার' নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ। এটি পাক-ভারত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কবিতার সংকলন। নারায়ণ শ্যাম রচিত 'মাক বিনা রাবেল' গ্রন্থটিও সিন্ধি কবিতার ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। লেখক এতে প্রধানত ছন্দের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। তিনি এতে প্রচলিত সিন্ধি ছন্দের সংগে সনেট ট্রিওলেট বা হাইকুর এমন একটা সমন্বয় ঘটিয়েছেন, যা এর আগে কখনও হয় নি। এক বছরের সিন্ধি কবিতার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাতে অভিনবত্ব আছে অনেক।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥

গত ২১ মে, সন্ধ্যায় ২৫, লাউডন স্ট্রীট, কলকাতাস্থ হলে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলকাতা শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীবিমলভূষণ। শ্রীহরি গংগোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রার্থনা, বিমলভূষণের কণ্ঠে সংস্কৃত গান ও একক রবীন্দ্রসংগীত এবং শ্রীমতী মমতা গংগোপাধ্যায়ের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতা আবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে সংগীতে প্রভাতভূষণ, প্রবোধভূষণ, তারকেন্দ্রনাথ, রুণা মতিলাল, অর্চনা মুখোপাধ্যায়, তপতী দত্ত, রুমা বসু, স্বপ্না ব্যানার্জি, নীলিমা রায়, বেহালায় অসিত ঘোষাল, গীটারে ডাঃ বিজয়ভূষণ ও দ্বিজেন রায়। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন সম্মেলনের কলকাতা শাখার সম্পাদক শ্রীহরি গংগোপাধ্যায়।

কলকাতার শিল্পীরা নিজেদের জীবিকা ও কর্মের সুযোগ-সুবিধার জন্য গত রবিবার ২১শে মে দেশপ্রিয় পার্কে একটি সভানুষ্ঠানের পর হাজরা পার্ক পর্যন্ত একটি মৌন মিছিল বার করেন। সভায় কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরা ভাষণ দিয়েছিলেন।

পোর্টব্লেয়ারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব ॥

গত ২৫ বৈশাখ পোর্টব্লেয়ারে অজন্তার মুক্ত-অংগনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অনেক অবাংগালী শ্রোতাও উপস্থিত ছিলেন। সংগীত,—অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীরেণু সেনগুপ্ত, শ্রীদীপক দে, শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত ও কুমারী শান্তা প্রামাণিক। আবৃত্তিতে শ্রীসুনীল গংগোপাধ্যায়, শ্রীমতী আভা গংগোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশ মুখার্জি, শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত। নৃত্য পরিবেশন করেন কুমারী দেবশ্রী দাশগুপ্ত ও শর্মিলা গাঙ্গুলী। গীটার বাজিয়ে শোনান শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী।

শ্রীকৃষ্ণদাস সাহা সমবেত দর্শকদের স্বাগত জানান। পি ডবলিউ ডি'র সেকশন অফিসারদের আন্তরিক সাহায্য এবং সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে। পোর্টব্লেয়ারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা সকলের ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

ফ্রাংকফুর্টে পুস্তক প্রদর্শনীর প্রস্তুতি ॥

ফ্রাংকফুর্টে প্রতিবছরই একটি আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের প্রতিনিধিই এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। চলতি বছরে এই 'ফ্রাংকফুর্ট বুক ফেয়ার' যাতে আরো শ্রীমণ্ডিত করা যায় তা নিয়ে সংস্থার পরিচালকরা নানারকম পরিকল্পনা করছেন। ১২ থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই বাছা বাছা পুস্তকপ্রকাশকদের দপ্তরে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

গত বছর এই প্রদর্শনীতে মোট ২,৫৩৯টি প্রকাশক সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে ৮১৯টি সংস্থা জার্মানী থেকে, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মোট ৫২টি দেশ থেকে মোট ১,৭২০টি সংস্থা এতে যোগদান করেছিলেন। সবসমেত বই সংখ্যায় ছিল ১৮০,০০০টি।

এ বছর এই প্রদর্শনীর জন্য ৪০,০০০ বর্গ গজ বিশিষ্ট একটি অতিকায় নতুন হল ঘর তৈরী করা হচ্ছে। উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সুবিধার্থে এই নতুন প্রকল্পটি করেছেন। গত বছরের তুলনায় প্রদর্শনী ঘরের এই সুব্যবস্থাটি নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক বই মেলায় নতুন প্রাণসঞ্চার করবে।

এবার অবশ্য এই নতুন ধরনের স্টলের জন্য ভাড়ার অঙ্ক একটু বাড়ল। কেননা সমস্ত প্রকল্পটিকে অন্যান্য বছরের তুলনায় একেবারে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয়েছে বলে তার খরচের দিকটাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রদর্শনীতে বই বিক্রীর ব্যাপারে উদ্যোক্তারা এবার কয়েকটি কড়া নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। সাধারণ ক্রেতার মত বইয়ের জন্য কমপ্লিমেন্টারি টিকিটধারী কোন ব্যক্তির নিকট কোন বই বিক্রী করা চলবে না। যদি কোন বিক্রেতা এই নিয়ম

...ত্যাগ করেন তবে তাকে তার স্টার্লিং ভাড়ার বিরাট অংকের টাকা জরিমানা হিসেবে দিতে হবে। যদি সেই টাকা তিনি দিতে অস্বীকৃত হন তবে ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রদর্শনীতে তাঁকে আর অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

গার্ডিয়ান পত্রিকার শিশু-সাহিত্য পুরস্কার ॥

গার্ডিয়ান পত্রিকা বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু-গ্রন্থের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতি বছরই এই পুরস্কারটি দেওয়া হবে শ্রেষ্ঠ শিশু-গ্রন্থের কাহিনী-কারকে। এ বছরই তাঁরা প্রথম এই পুরস্কার ঘোষণা করলেন। লিও গারফিল্ড তাঁর 'ডেভিল-ইন-দি-ফগ' বইটির জন্য ১০০ গিনি পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন। বইটির প্রকাশক কনস্টাবল ইয়ং বুকস্।

লিও গারফিল্ডের এই বইটি তাঁর জীবনের দ্বিতীয় প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস। তাঁর প্রথম বইটির নাম 'জ্যাক হলবর্ন'। এ বইটি সম্পর্কে একটি ঘটনা ঘটেছিল যা তার পুরস্কারপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ। জ্যাক হলবর্ন বইটি কিশোর উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও ভুল করে প্রাপ্ত-বয়স্কদের তালিকায় চলে গিয়েছিল। ভার-প্রাপ্ত মিঃ জেমস মিচেল বইটি পড়তে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যান। এতো ভালো শিশুগ্রন্থ তাঁর মতে একটিও রচনা হয়নি ইদানীং। তিনি তৎক্ষণাৎ শিশুবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিসেস হোগার্থকে বইটি পাঠিয়ে দেন। হোগার্থ বইটি পড়ে লেখকের রচনার মুন্সিয়ানায় মিঃ জেমস-এর সঙ্গে একমত হন। তখন শিশুগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসেবে গার-ফিল্ডকে একটি পুরস্কার দেওয়ার কথা তাঁরা ভাবেন। তাঁদের অনুরোধে গারফিল্ড তখন আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন।

তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থ ॥

টেড্ ওয়াকার তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফক্স অন এ বার্ণ ডোর'-এ কবি হিসেবে প্রতি-শ্রুতি রেখেছিলেন। হালে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছে। নাম 'দি সলিটারিজ'। এ বইটিতে তিনি একদিকে যেমন পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন তেমনি কবিতার রূপও বদলেছেন। অ্যালান রস বলেছেন, 'বয়সে তরুণ হলেও টেড্ ইতিমধ্যেই নিজের এক ধরনের কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন; এমনকি শব্দচয়ন, ছন্দপ্রয়োগ ও ভাবনায় মৌলিকত্বও তার কবিতার লক্ষণীয় সম্পদ।' চিত্রকল্প রচনায় টেডের অভিনবত্ব অনেককেই বিস্মিত করেছে। প্রধানত শহর-তলীর নিসর্গ, নিঃসঙ্গ মানুষ, মৃত্যুবোধ ইত্যাদি তাঁর কবিতার পরিমণ্ডল রচনা করে। টেড্ ওয়াকার বিশ্বাস করেন একজন কবি তাঁর চিন্তাধারা ও কাব্যরীতি বিষয়ে যত আধুনিকই হোন না কেন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস তিনি হারাতে পারেন না।

উল্লেখযোগ্য অনুবাদ প্রয়াস

শ্রীঅসিত সরকার সম্প্রতি দুটি কাব্য-গ্রন্থ অনুবাদের দ্বারা দুজন বিদেশী কবির কবিতা বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। তাঁদের একজন পুশকিন, অপরজন সাঁ-জন প্যার্স। পুশকিনের জন্ম ১৭৯৯ খৃীষ্টাব্দে রাশিয়ায়, আর প্যার্সের জন্ম গুয়াদলুপে ১৮৮৭ খৃীষ্টাব্দে। অর্থাৎ প্রায় একশো বৎসরের ব্যবধানে দুজন কবি ভিন্ন দেশের আবহে আছেন। কিছুটা দীর্ঘতর কাল-পরিধির উপান্তে এসেও তা কিভাবে কাব্যানুরাগী মানুষকে আলোকিত কম্পিত ও বিস্মিত করতে পারে, তার উজ্জ্বল নিদর্শন সঞ্চিত রয়েছে এ দুই কবির কবিতায়। প্যার্স অবশ্য আমাদের কালের লোক, তবু তিনি আমাদের মতো বিভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ, আলোড়িত নন। স্বকালের এই উত্তাল বস্তুমুখিতার অন্তরালে তিনি এক রহস্যময় আলোর সন্ধানী। তুলনায় পুশকিন অনেকখানি শ্রুতিগ্রাহ্য। শ্রীসরকার উভয় কবির কাব্যমানসিকতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। শ্রীসরকার এই দুজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন কবির প্রায় সবকটি কাব্য থেকেই কিছু কিছু অনুবাদ করে বাঙালী কাব্য-রসপিপাসুর নিকট ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অনুবাদের মান প্রথম শ্রেণীর না হলেও চলনসই বলা যেতে পারে।

পুস্কিনের কবিতা অনুবাদ শ্রীঅসিত সরকার। দাম তিন টাকা। সাঁ-জন প্যার্সের কবিতা। অনুবাদ : শ্রীঅসিত সরকার। প্রকাশক : আদিত্য মিত্র, ৩৭।১, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), কলকাতা—৮। দাম চার টাকা।

চিকিৎসা গ্রন্থ

আধুনিক চিকিৎসা গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক বলেছেন, এই পুস্তকে প্রকাশিত ঔষধগুলি মিহিজামের প্রখ্যাত চিকিৎসালয়ে বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কাজেই আমরা সাধারণত পুস্তকে যা পড়ি তার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে এর অমিল রয়েছে। এই পুস্তকে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করেছেন লেখক এবং একজন সাধারণ হোমিওপ্যাথের পক্ষে এ পুস্তক খুবই সাহায্যকারী হবে। যদিও হোমিওপ্যাথির নাম বলা হয়নি, তবু যেহেতু হোমিও ঔষধের সম্বন্ধেই লেখা হয়েছে তাই আমরা বলতে বাধ্য চিকিৎসা বহু ক্ষেত্রে হ্যানিম্যান পদ্ধতি অনুসারে হয়নি। যেমন একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক ঔষধের ব্যবহার।

পুস্তকের শেষে সাধারণ অসুখের ক্ষেত্রে, কুকুরে কামড়ানো, ইলেকট্রিক শক্ ইত্যাদির আলোচনা খুব মূল্যবান। এই পুস্তকের চিকিৎসাসূচী ও নির্দেশিকা চিকিৎসকদের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পুস্তকের বাঁধাই সুন্দর, ছাপা পরিষ্কার, তবে ১৫৩ পৃষ্ঠার পক্ষে ৬৲ দাম একটু বেশী।

আধুনিক চিকিৎসা প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। মিহিজাম। দাম ছয় টাকা।

আইনের বই

কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট এস্ এন্ ভট্টাচার্য 'দেশের জ্ঞাতব্য আইন' নামে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। আমাদের দেশের আইন ইংরেজি ভাষায় রচিত। যাঁরা ইংরেজি জানেন না, তাঁদের পক্ষে আইন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। বর্তমান গ্রন্থকার তাঁদের কথা স্মরণ রেখেই গ্রন্থ-খানি রচনা করেছেন। ভারতীয় সংবিধান, হিন্দু আইন, দত্তক ও ভরণপোষণ, হিন্দু উত্তরাধিকার, হিন্দু আইন-দান, হিন্দু উইল, হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, সম্পত্তি অর্পণ, মুসলমান আইন, অভিভাবক ও নাবালক বিষয়ক আইন, ভারতীয় সাবালক আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, বঙ্গীয় মহাজনী আইন, ভাড়াটিয়া স্বত্ব আইন, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন প্রভৃতি সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে।

দেশের জ্ঞাতব্য আইন (তথ্যমূলক গ্রন্থ) —এস, এন, ভট্টাচার্য। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

পঙ্কপথের নেপথ্যে

যৌবনের রূপসী সন্ধ্যাসঙ্গিনী বিনিন্দি-তার কাহিনী বর্ণনা করেছেন শ্রীগুরু বিশ্বাস। সমাজে হাজার হাজার বিনিন্দিতার ইতিহাস এইভাবেই গড়ে উঠেছে, উঠছে।

লেখক গুরু বিশ্বাস সহানুভূতি নিয়ে কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ। এর আগে এইসব মানুষের কাহিনী এভাবে কেউ তুলে ধরেন নি।

পরাজিত পদাতিক (উপন্যাস) গুরু বিশ্বাস। ছাত্রশিক্ষা নিকেতন; ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—টাঃ ২.৫০ মাত্র।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'বৈতানিক' একটি সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্য সংকলন। সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় প্রবোধকুমার সান্যাল (রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান), প্রেমেন্দ্র মিত্র (পাপশূন্য), অভয়ংকর (রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা), সুব্রত রাহা (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোট গল্প), সুবিমল বসাক (বৈয়ার গীত), গোপাল ভৌমিক (বিদ্রোহী কবি কামিংস), রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (বেঙ্গলী থিয়েটার), মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গ)—প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। দীনেশচন্দ্র সেন ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আলোচনা করেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং কমল চৌধুরী। রামজীবন ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবী' আলোচনাটি বিতর্কমূলক। গল্প লিখেছেন তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গৌতম, শৈলাজ ভদ্র, নির্মল সরকার। বিভূতিভূষণ ত্রিপাঠি ও দফন দ্য মুরিয়র-এর দুটি গল্প অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে শৈল শর্মা এবং আভা পাকড়াশী। রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি পাণ্ডুলিপি 'আমার মুক্তি গানের সুরে এই আকাশে' ও 'এসো আমার ঘরে। বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছো অন্তরে' সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

বৈতানিক (১২)—সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—একটাকা মাত্র।

●

আশিস সান্যাল সম্পাদিত 'বেঙ্গলী লিটারেচার'-এর বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যাটি পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন এবং সুসম্পাদিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবন দাস, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন, গোপাল ভৌমিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, অশোক সরকার, মণীন্দ্র রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেন গুহ, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শোভন সোম, শান্তি লাহিড়ী, কালীকৃষ্ণ গুহ এবং আশীষ সান্যালের কবিতা ; বনফুল এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি ছোট গল্প, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শিবনারায়ণ রায় ও শিশিরকুমার ঘোষ, সত্যজিৎ রায় এবং সত্য সাঁই-এর চলচ্চিত্র ও শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা, সরোজ আচার্য, আশা গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক সেন, বিনয় রায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত নিয়োগী এবং বেলা দত্তগুপ্তার গ্রন্থ সমালোচনা বর্তমান সংখ্যাটিতে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের মধ্য থেকে কাহ্নপাদ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং রামপ্রসাদ সেনের কাব্য নিদর্শন এবং এগারটি বিভিন্ন ভাষার কবিতার আন্তর্জাতিক সংকলন পত্রিকাটিকে বিশেষ মূল্যে চিহ্নিত করেছে। অনুবাদ করেছেন অশোক ফকির, সুজিত মুখোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, ক্ষিতিশ রায়, অমিয়া ভেজো, ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিকাশ বসু, মেরীয়ান দাশগুপ্ত, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মার্গারেট জোন্স, এবং আরো অনেকে।

BENGALI LITERATURE (Annual Number) : Editor : Ashis Sanyal. 53, Bidhan Palli Jadavpur, Calcutta 32. Rs. 2 only.

●

অর্ববীক্ষণের বিশেষ কবিতা সংকলন 'পঁচিশে বৈশাখের কবিতা' ২৫ বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের কবিতা এই বিশেষ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে : জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, সাগর চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধেন্দু মল্লিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, যোগব্রত চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর হাজরা, শান্তি লাহিড়ী, শক্তিব্রত চক্রবর্তী, প্রলয় সুর, শঙ্কর দাশগুপ্ত, সুনীথ মজুমদার। মঞ্জুলিকা দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

পঁচিশে বৈশাখের কবিতা (সংকলন)—সম্পাদনা : যোগব্রত চক্রবর্তী। ১।১বি মল্লিক লেন, কলকাতা—২৫। দাম পঁচিশ পয়সা।

●

কবিতা সাপ্তাহিকী যখন প্রথম বেরোয় তখন আমরা এই অভিনব প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। বৈশাখে পত্রিকাটি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত এর তিনটি সংখ্যায় লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, মৃণাল দেব, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অমলকান্তি ভট্টাচার্য, শুভাশীস গোস্বামী, সামসুল হক, শঙ্কর দে, অঞ্জন কর, পিনাকেশ সরকার, পবিত্র বল্লভ, কৌটিল্য এবং আরো অনেকে।

কবিতা সাপ্তাহিকী : সম্পাদক—নিতাই ঘোষ, ১বি, অভয় সাহা লেন, কলকাতা—৩, দাম—২৫ পয়সা।

●

'লেখা ও রেখা'র বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন গোপাল ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, ধনঞ্জয় দাশ, প্রকৃতি ভট্টাচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, কবিরুল ইসলাম, মনজুর, তুলসী মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। গল্প লিখেছেন বলাই আলহেলাল এবং বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, চিত্ত ঘোষালের নাটক 'ধীমান' এই সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ। কয়েকটি গ্রন্থ সমালোচনা আছে।

লেখা ও রেখা (মাঘ-চৈত্র)—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর, নদীয়া থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

●

'কাফেলা'র বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন আবদুল আজীজ আল-আমান সাজ্জাদ উদ্দীন আহমদ (চাঁদ সড়কে নজরুল ইসলাম), মসউদ-আর-রহমান (পশ্চিমবঙ্গের মসজিদ), সৈয়দ আবদুল বারি (প্যালেস্টাইন থেকে আরব), শকুন্তল সেন (উভয় বাংলার ভাষা ও সাহিত্য), এস এম শামসুল হক (আল কোরান), দিলীপকুমার ভট্টাচার্য (সত্যজিৎ রায়) এবং আরো অনেকে। সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয়।

কাফেলা (প্রথম বর্ষ ॥ ১১শ ও ১২শ সংখ্যা)—সম্পাদনা : আবদুল আজীজ আল-আমান ও বেগম মরিয়ম আজীজ। এ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

'রূপপণক'এ লিখেছেন বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং কয়েকজন তরুণ কবি ও প্রবন্ধকার।

রূপপণক (বৈশাখ ১৩৭৪) : সম্পাদক : দীপক সরকার ও রণেন্দ্র চক্রবর্তী। ১৩ গুরুপ্রসাদ রায় লেন, কলকাতা—৫ থেকে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

'আলোক সরণি' সর্বসাধারণের উপযোগী মাসিক পত্রিকা। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, মেয়েদের আসর, ছোটদের পাতা, খেলা, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। পত্রিকাটির এপ্রিল ও মে সংখ্যা দুটিতে লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, অশোককুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জীব সরকার, শৈবাল চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং আরো অনেকে।

আলোক সরণি (এপ্রিল ও মে)—সম্পাদক : সঞ্জীব সরকার। ৪১এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

(৯)

আপনার সময়ে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রীসংখ্যা কী-রকম ছিলো? মাপ করবেন, আমি ভুলে যাচ্ছিলাম আপনি আমারই বয়সী, একই সময়ে ছিলুম আমরা ঢাকায়। মনে আছে হস্টেলের মেয়েদের চাল-চলন, সাজগোজ? শাদা শাড়ি, আধখানা মাথা আঁচলে ঢাকা, সারবন্দী হ'য়ে হস্টেল থেকে কলেজে আসে, সৈনিকের মতো সমান তালে পা ফেলে, সামনে-পিছনে দু-তিন সারিতে বিভক্ত হ'য়ে—ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকায় না। জন পনেরো মেয়ে, তরুণী, ছাত্রী, কিন্তু দেখায় বয়স্ক ও গম্ভীর, ধরনটা প্রায় খৃস্টান নানদের মতো; এমন-ভাবে তারা আবৃত, সংবৃত, যূথচারী—যেন কোনো মঠ থেকে নির্গত হয়েছে এই শুভ্রবসনা সারস্বত ভগিনীরা, কয়েক ঘন্টা মন্দিরে ঘন্টা নেড়ে ফিরে যাবে বিকেলে, ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে না-তাকিয়ে। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত যে এই দুর্গবাসিনীরা আমাদেরই সহপাঠিনী, যে আমাদের মতো সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে কোনো মিল আছে তাদের, তারা যে কখনো হাসে বা রসিকতা করে, বা এমন কি অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কখনো কৌতূহলী হয়, তাও যেন ধারণা করা শক্ত। কলেজে একটি দুর্ভেদ্য অন্তঃপুর তৈরি আছে তাদের জন্য— যার নাম 'লেডিজ কমনরুম'—সেখানে পর্দানশিন হ'য়ে দিন কাটায় তারা, মাস্টারমশাইরা সেখান থেকে নিয়ে আসেন তাদের ক্লাশের শেষে ফেরৎ রেখে আসেন বিশ-পঁচিশ গজ বিপদসংকুল করিডর পার ক'রে দিয়ে। সে এক দৃশ্য, তামাশা, যখন ঘন্টা বাজলে হঠাৎ মিনিট দুয়েকের জন্য করিডরগুলি ললনাকীর্ণ হ'য়ে ওঠে—মেষপালকের অনু-বর্তিনী ভেড়ীর পাল—মাপ করবেন, বলতে চেয়েছিলাম গজরাজের অনুগামিনী হস্তিনীযূথ—না, এটাও ঠিক হ'লো না—বলা যাক 'ছাত্রী' নামক এই বিরল ও সুকুমার প্রাণীটিকে অতি যত্নে রক্ষা করছে আমাদের বিদ্যালয়—বেড়া তুলে, পাহারা বসিয়ে, গণ্ডি টেনে—হাজারখানেক মাংসাশী জন্তুর মধ্যে গুটি পঞ্চাশ ভীরু হরিণী যেন, যেন মুহূর্তের অসতর্কতা ঘটলে শ্বাপদেরা তক্ষুনি তাদের নধর গ্রীবায় দাঁত বসিয়ে দেবে। ক্লাশেও তাদের বসার ব্যবস্থা আলাদা—ছাত্রদের সঙ্গে এক সারিতে নয়, মাস্টারমশাইয়ের ডেস্কের ডাইনে-বাঁয়ে গৌরবান্বিত চেয়ারে। অবশ্য এমন নয় যে ক্লাশের মধ্যেই কখনো কোনো হরিণ-চক্ষু বইয়ের পাতা থেকে ছুটে আসে না আমাদের দিকে, বা কোনো রঙিন শাড়ি করিডরে এক ঝলক চঞ্চলতা ছিটিয়ে দেয় না; তাছাড়া বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানেও এই মহীয়সী সন্ন্যাসিনীদের দেখা যায়; খোকা ছেলেরা মাঝে-মাঝে আলাপও করে লেডিজ কমনরুমের বনাতে ঢাকা পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে—আলাপ মানে হেঁ-হেঁ, হুঁ-হুঁ, ঘাড় দোলানো, কোমর মোচড়ানো—কোনো-কোনো সাহসী ছেলে আরো একটু এগোবারও চেষ্টা করে, কিন্তু—লক্ষ্ণৌয়ের খোলা চিড়িয়াখানার খালের-জলে-ঘেরা ব্যর্থকাম বাঘেদের মতো, তাদেরও চেষ্টা পর্যবসিত হয় শুধু ভঙ্গিভঙ্গায়, লোলুপ দৃষ্টিতে, মানসিক ওষ্ঠলেহনের প্রহসনে। কিছুতেই ভাবা যায় না যে এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে সহজ-ভাবে মেলামেশা কখনো সম্ভব।

আমি অবশ্য একটি উচ্চ উদাসীন ভাব বজায় রেখে চলি, যেন এই যত্নলালিত আশ্রমবালিকাদের বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার, কিন্তু সেদিন করিডরে বুল-বুলকে দেখতে পেয়ে আমি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। ফিলজাফির রেবতী মুখুজ্জে ক্লাশে যাচ্ছেন, পিছনে অনিবার্য লেজুড় নিয়ে—কয়েকটি নতচক্ষু লতিয়ে-চলা ছাত্রী, তাদেরই মধ্যে বুলবুল। কিন্তু সে বোধহয় আমাকে দেখতে পেলো না, বা ইচ্ছে ক'রেই আমার চোখ এড়িয়ে গেলো; বা হয়তো অমনি ক'রেই আমাকে বুঝিয়ে দিলো যে অনাদিবাবুর বাড়িতে যার সঙ্গে সে প্রায় এগিয়ে এসে আলাপ করেছিলো, এই পবিত্র বিদ্যাপীঠে তার অস্তিত্ব সে স্বীকার করতে চায় না। আমার পক্ষে অসম্মানজনক এই ঘটনাটা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু টিফিনের

ছুটির পরে আমি যখন লাইব্রেরির স্ট্যাকে এসে বই ঘাঁটছি তখন হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনলাম আমার পিছনে। তাকিয়ে দেখি, বুলবুল। একবার প্রতিহত হবার ফলে আমি ধ'রে নিলুম যে সেও এখানে কোনো বইয়ের খোঁজে এসেছে, আমারও ভান করা উচিত যে তাকে চিনি না। কিন্তু জায়গাটা নির্জন, সে আর আমি ছাড়া কাছাকাছি কেউ নেই কোথাও, চোখাচোখি হ'তেই হলো, আর পরস্পরকে পরিচিত ব'লে মেনে না-নিয়েও উপায় রইলো না। সত্যি বলতে কী, বুলবুল এমনভাবে তাকালো যেন সে আমারই জন্য এসেছে এখানে, ছোট্ট ক'রে হেসে বললো, 'বিভা-দি এই বইটা আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।' 'বিভা-দি মানে—বিভাবতী দত্ত?' 'আমরা বিভা-দি বলি—আপনিও তা-ই বলবেন।' আমার মনে হ'লো আমাকে বিশেষ একটু খাতির করা হচ্ছে, মিনু ও বুলবুল—যারা বিভাবতীর বহুকালের চেনা প্রিয় ছাত্রী—তাদেরই সমস্তরে যেন স্থান দেয়া হ'লো আমাকে, যেন ঐ তরুণীদের জগতে, আমার সদ্য-অবিষ্কৃত নারীত্বের জগতে, আমি আরো একটু এগিয়ে গেলাম বুলবুলের মুখের ঐ একটি কথায়। কিন্তু সেটা বুলবুলকে বুঝতে দেয়াটা আমার পক্ষে গৌরবের নয়, তাই বললাম, 'আমাদের দেশে এই এক মুশকিল—মহিলারা আত্মীয় না-হ'লেও আত্মীয়তা পাতিয়ে নিতে হয় তাঁদের সঙ্গে।' আমার কথার চপল সুরে বুলবুল খুশি হ'লো না, গম্ভীরভাবে বললো, 'বিভা-দির কথা আলাদা। তিনি সত্যিকার দিদির চেয়েও অনেক বেশি। তা এই বইটা একটা ছোট্ট ভারতবর্ষের ইতিহাস—বিভা-দি পাঠিয়ে দিলেন যদি আপনার কোনো কাজে লাগে।' আমি, যাকে তিন দিনের মধ্যে সুইনবার্নের নাটক বিষয়ে ট্যুটোরিয়েল দাখিল করতে হবে, কেন উনিশ-শতকের কোনো ইংরেজ কবি এক-খানাও সত্যিকার নাটক লিখতে পারেননি, এই প্রশ্ন নিয়ে কয়েক মিনিট আগেও যে চিন্তিত ছিলো, সেই আমার কেন ভারত-বর্ষের ইতিহাস কাজে লাগবে, তা মনে আনতে একটু সময় লাগলো আমার। বোধহয় আমার মুখ থেকে সেটা আঁচ ক'রে নিয়ে বুলবুল বললো, 'সেই হিস্টরিকল চার্টের জন্য—নিশ্চয়ই ভুলে যাননি?' 'ভারতের অতীত গৌরব জাহির করতে হবে?' একটু হাসি বেরিয়ে গেলো আমার গলা দিয়ে, বুলবুল ঠোঁটে আঙুল রেখে শাসনের ভঙ্গি করলো। 'আস্তে। এটা লাইব্রেরি, এখানে কথা বলা বারণ।' নিচু গলায়, প্রায় ফিশফিশ ক'রে বললো, 'জাহির করা নয়—মনে করিয়ে দেয়া। যারা মনে রাখে তারাই মনে রাখার মতো কাজ করে।' এই শেষ কথাটা সে কি তার নিজের অনুভূতি থেকে বলছে, না কি এটা তার শোনা কথা, বইয়ে-পড়া কথা, তা বুঝে নেবার জন্য আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। চশমার পিছনে তার ছোটো-ছোটো চঞ্চল চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য স্থির হ'লো। 'আর-একটা কথা বলার আছে আপনাকে—'

ঠিক তক্ষুনি একটা ট্রেনের শব্দ শুরু হলো। লাইব্রেরির গা ঘেঁষেই রেল-লাইন, ঝকাঝক খটাংখট আওয়াজে বুঝলাম মাল-গাড়ি, সেই কর্কশ, ভারি-টেনে-চলা শব্দটা অল্পেই শেষ হ'লো না—আরো পাঁচ মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হ'লো, বুলবুলের মুখোমুখি, নিঃশব্দে, তার অসমাপ্ত কথা শোনার আশায়। থামতে তারা অজানা জন্য আমরা বাধ্য হলাম দু-একবার পরস্পরের দিকে তাকাতে, হাসতে। আমি বুকের মধ্যে ঈষৎ চঞ্চলতা অনুভব করলাম। একটি নির্জন স্থানে একটি সদ্য-চেনা তরুণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, তার কিছু বলবার আছে আমাকে—এটা যে একটা বিশেষ ঘটনা আমার বুদ্ধি তা মানতে না-চাইলেও আমার হৃদয়ে তার সাড়া জাগলো। আমার মনে হ'লো যেন বুলবুলের মুখেও আমার প্রতি একটু ঔৎসুক্যের ভাব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেটাকে আমার মনোমতো অর্থের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া যাচ্ছে না; বয়সের পক্ষে এত বেশি আত্মস্থ তার মুখের ভাবটি যেন তার ও আমার যৌবন বিষয়ে সে সচেতন নয়, কিংবা যেন সেই তথ্যটার কোনোরকম মূল্য নেই তার কাছে।

আমি বাইরের দিকে চোখ সরিয়ে নিলুম। সেখানে ঘাস সবুজ, মাঠ বিস্তীর্ণ, মেঘলা বিকেলে হাওয়ায় নড়ছে ডালপালা, কয়েকটা শালিখ লাফালাফি করছে মাটিতে। ঐ মাঠে, গাছের ছায়ায় ব'সে গল্প করা যায় না বুলবুলের সঙ্গে? সন্ধেবেলার প্রথম-তারা-ফোটা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়ানো যায় না? নিশ্চয়ই কোথাও, কোনো নেপথ্যে, একটি নারী অপেক্ষা করছে আমার জন্য—আমার কল্পিত সেই বান্ধবী ও সঙ্গিনী—শুধু একটি দৈব ঘটনার অপেক্ষা, কোনো যোগাযোগ, ভাগ্যের কোনো ইঙ্গিত, আর তখনই সে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসবে? কিন্তু ট্রেনের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর বুলবুল যা বললো তা শোনালো না ঘাসের মতো সবুজ, তার ফাঁকে-ফাঁকে শালিখ পাখি নেচে উঠলো না। 'আর-একটা কথা—স্বদেশী মেলার জন্য কাজ করতে আপনার কোনো অনিচ্ছা নেই তো?' 'বাঃ, আমি তো বলেছি ক'রে দেবো।' 'যদি নেহাৎ দায়ে প'ড়ে রাজি হয়ে থাকেন বিভা-দির কাছে, তাহ'লে বরং থাক।' আসলে, ঐ বই ঘেঁটে-ঘেঁটে তথ্য আর তারিখ সাজানোর কাজটি কল্পনা করতে একটুও সুখ হচ্ছিলো না আমার, কিন্তু আমি তো অপাঠ্য 'ফেইরি কুইন'ও প'ড়ে উঠেছিলাম পরীক্ষা পাশ করার জন্য। 'এর মধ্যে আর দায় কী আছে? আর এমন কিছু শক্ত কাজও তো নয়।' 'ও—ভুলে যাচ্ছিলাম, 'মুক্তধারা'র দুটো সংখ্যাও এনেছি আপনার জন্য। আপনার লেখাটা পনেরো দিনের মধ্যে চাই কিন্তু।' একটা ভঙ্গি হ'লো বুলবুলের কাঁধে, যেন কাজের কথা শেষ ক'রে চ'লে যাবে এবার। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনি কোন ইয়ারে পড়েন? কোথায় থাকেন?' 'সেকেণ্ড ইয়ার, ফিলজফি অনার্স। থাকি কায়েৎটুলিতে।' 'তাহ'লে আমাদের কাছেই?' 'বাড়িতে কমই থাকি আমি। পরে কথা হবে— চলি।' যাওয়ার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে আমার সঙ্গে অকারণে গল্প করার ইচ্ছে অথবা সময় তার নেই।

কিন্তু কয়েকদিন পরে বুলবুল আমাদের বাড়িতে এলো। একদিন, কাজল-মাসিকে সেলাইয়ের জন্য কাপড় দিতে। আমি তাকে আসতে দেখিনি, শুনছিলাম পাশের ঘরে কাজলের সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের গলা, 'চেনা লাগছিলো কিন্তু ঠিক যেন ধরা যাচ্ছিল না। 'রুমাল', 'টীপয়ের ঢাকনা', 'এমব্রয়ডারি', 'হেমস্টিচ'—এমনি কয়েকটা কথা কানে এলো আমার, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শুনলাম, 'রণজিৎ বাড়ি আছে নাকি?' কাজল ও-ঘর থেকেই ডাকলো 'রঞ্জু, একটু আসবে এখানে?' আমি উঠে গেলাম, বুলবুল বিশেষ লক্ষ করলো না আমাকে, কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন?'

তখন প্রায় সন্ধে, রাস্তায় বেরিয়ে বুল-বুল বললো, 'চলুন ঢাকেশ্বরী বাড়ির দিকটায় বেড়িয়ে আসি একটু।' আমি একটু অবাক হলাম তার প্রস্তাব শুনে, কেননা ঢাকায় তরুণ-তরুণীর (এমন কি রমনা পাড়ায় ছাড়া বিবাহিত দম্পতির) স্বৈরবিহার একটি অসাধারণ ঘটনা। জিগেস না-ক'রে পারলাম না, 'বাড়ি যাবেন না?' 'আমার বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।' 'আপনি কি একাই ঘুরে বেড়ান এ-রকম?' 'সাধারণত—তবে মাঝে-মাঝে কোনো সঙ্গীও জুটে যায়, এই যেমন আপনি এখন।' 'বাড়িতে কেউ কিছু বলে না?' 'নাঃ! মা-বাবা আমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন', ঠোঁটের কোণে হাসলো বুলবুল। তার কথা, তার ব্যবহার—সবই একটু ঝাপসা লাগলো আমার, একটু অদ্ভুত। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো। আমি তখন স্কুলে পড়ি—ক্লাস নাইনে—সতীনাথ নামে একটি ছেলে মাঝে-মাঝে আসতো আমার কাছে। ল পড়ছে, বয়সে বছর ছয়েকের বড়ো আমার। প্রথমদিন দু-একটা কথার পরেই আমাকে বলেছিলো তার পকেটে এখন এমন-কিছু আছে যা নিয়ে ধরা পড়লে অন্তত সাত বছর জেল হ'য়ে যাবে তার। আমি ভেবেছিলুম চালিয়াতি, বিশ্বাস করিনি। পটুয়াটুলিতে কোনো-এক ঠিকানায় আমাকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে বলেছিলো, আমি রাজি হইনি। রাজি হইনি, যেদিন সতীনাথ সন্ধের পরে আমাকে নিয়ে রেসকোর্সের কাছে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলো। আমি তাকে তাদেরই একজন ব'লে সন্দেহ করেছিলুম, যারা অন্য অর্থে 'ছেলে-ধরা'—দু-একবার যাদের পাল্লায় প'ড়েছিলুম ব'লেই যাদের কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না করে। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ওটার কী-রকম চল ছিলো ঢাকায়? উপায়ই বা কী—মেয়েরা তো ধরাছোঁয়ার বাইরে, এমনকি তাদের চোখে দেখাও সহজ নয়, ইস্কুলের দেয়াল জেল-

খানার সমান উঁচু, কয়েকটি বিশিষ্ট পাড়ায় ছাড়া রাস্তায় পা দেন না মহিলারা, গাড়িতে চলেন খড়খড়ি তুলে দিয়ে। না মশাই, আমি ও-লাইনে ছিলুম না কোনোদিন—আমি নারীপ্রেমিক, তখনও ছিলুম, এখনো আছি। তা সতীনাথকে বালক-শিকারী ভেবে হয়তো ভুল করে-ছিলুম, কিন্তু তার চোর-চোর তাকানো এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় কথা বলা, যেন একটা গা-ছমছম-করা রহস্য পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ধরনের ভাবভঙ্গি তার—এগুলো আমার এত বিশ্রী লাগলো যে তাকে দেখলেই আমি নিজের চারদিকে পাহারা বসিয়ে দিই, তার কোনো প্রস্তাবে রাজি হই না কখনো। আস্তে-আস্তে আমার কাছে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিলে সে, আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু বুলবুল মেয়ে—আমার চাইতে বেশি বয়সের সন্দেহজনক পুরুষ নয়—একটি ছিপছিপে তরুণী, মিতুর বন্ধু, বিখ্যাত বিভাবতীর দূত, তাই তার মধ্যে ঐ ঈষৎ গোপনতার ভাব লক্ষ ক'রে আমার বরং ভালোই লাগলো, আর তার স্বাধীন সাবলীল চালচলন দেখেও কিছুটা প্রশংসা-মেশানো বিস্ময় অনুভব না-ক'রে পারলুম না। সে কি জানে না এই নির্জন পথে তার আর আমার একসঙ্গে হেঁটে বেড়ানো কত বিপজ্জনক? কত রকম কথা ছড়াতে পারে, আমার মাথায় কোনো চরিত্ররক্ষকের ডান্ডা পড়তেই বা কতক্ষণ! কিন্তু আমি পুরুষ; এই ভীরু ভাবটা আমার মনে জাগলেও তা মুখে আনা অসম্ভব। কথা বলতে-বলতে বুলবুল আমাকে নিয়ে এলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পিছনকার আমবাগানে—নানারকম অখ্যাতি আছে জায়গাটার, চারদিকে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেলাম না আমি; সে বললে, 'এখানে ঘাস বেশ পরিষ্কার, একটু বসা যাক আসুন। আজ বড্ড হেঁটেছি, স্বদেশী মেলার তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেছে তো।' 'আপনিই করছেন সব?' 'কী ক'রে ভাবলেন আমি একাই সব করে উঠতে পারি?' আস্তে হাসলো বুলবুল। 'অনেকে মিলেই করা হচ্ছে—আপনিও আছেন। বিভা-দি আশ্চর্য—ঠিক বুঝে নেন কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে।' আমি জিগেস করার সুযোগ পেলাম, 'আচ্ছা, সেদিন আপনি বলছিলেন টাকা তোলার জন্যই এই মেলা। তা-ই কি?' 'খানিকটা তা-ই। তাছাড়া লোকেদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলারও একটা উপায় এটা।' 'কী হয় টাকা দিয়ে?' সে কী! এই যে বিভা-দি স্কুল চালাচ্ছেন, টাকা লাগে না? রাজবন্দীদের মামলা চালাবার খরচই কম নাকি ভেবেছেন? এ-সব আসে কোত্থেকে? এমনি ক'রে—সারা দেশ জু'ড়ে অনেক মানুষের অনেক চেষ্টায়। নবেম্বর মাসে দমদম কন্সপিরেসি কেস আসছে হাই-কোর্টে। বারোজন আসামি। বিভা-দি বলেন, ভালো উকিল-ব্যারিস্টার লাগাতে পারলে অনেকেই খালাশ পেয়ে যাবে।' আমি হঠাৎ জিগেস করলাম, 'অপরাধ করেনি ব'লে খালাশ পাবে, না কি উকিলের জারিজুরিতে?' বুলবুল সরু চোখে তাকিয়ে বললো, 'দেশের কাজকে আপনি অপরাধ বলেন?' 'আমি বলি না, কিন্তু যারা বিচার করছে, তাদের কাছে অপরাধ নিশ্চয়ই? তাদের আইনের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছে সেটা তো ঠিক?' গম্ভীর চোখে, শাসন করার ধরনে আমার দিকে তাকালো বুলবুল। 'আইন অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। কে কী করেছে সেটা নয়—আদালতে কী প্রমাণ হয় সেটাই আসল কথা। সেইজন্যেই তো ভালো উকিল চাই।' 'তার মানে—এমন উকিল, যিনি মিথ্যেটাকেই সত্য ব'লে প্রমাণ করবেন?' গভীর রং ছড়িয়ে পড়লো বুলবুলের মুখে, যেন খুব রেগে গেছে আমার উপর, যেন আমি তার বন্ধুতার সম্মান রক্ষা করছি না। একটু পরে শান্তভাবে বললো, 'সত্যি-মিথ্যে অত সোজা ব্যাপার নয় তো। ধ'রে নিতে হবে আপনার যাতে কাজ এগোবে সেটাই সত্য, আর মিথ্যে সেটাই যা আপনাকে বাধা দেয়।' 'গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ কিন্তু তা বলে না। তাতে সত্য বড়ো কথা।' 'ও, আপনি তাহ'লে গান্ধীবাদী?' 'না, না, আমি কোনোরকমই বাদী বা বিবাদী নই—সুযোগ পেলেই তর্ক করি, এই একটা বদভ্যাস আমার,' ব'লে আমি হাসলাম। 'আমি আবার তর্ক ভালোবাসি না, ওতে বড়ো কাজের ক্ষতি হয়। তাছাড়া—দু-জনে এক-মত হ'তে পারলে খুব ভালো লাগে, তা-ই না?' আমি বলতে যাচ্ছিলাম সকলেই সব ব্যাপারে সব সময় একমত হ'লে পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য থাকতো না, কিন্তু সে-মুহূর্তে বুলবুলের সরলতায় আর উৎসাহে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

বুলবুল আমাকে জিগেস করলে 'মন্ত্র-ধারা'র সংখ্যা দুটো আমার কেমন লাগলো। 'তা, ভালোই তো।' 'তার মানে—বেশি ভালো না? ঢাকার কাগজে ভালো লেখা পাওয়া সহজ নয় তো—বিভা-দি লেখেন ব'লেই চলছে।' বুলবুলের কথায় তার এই

ধারণাটি ধরা পড়লো যে বিভাবতীর লেখা নিঃসন্দেহে 'ভালো', কিন্তু তাঁর লেখা প'ড়েই সবচেয়ে নিরাশ হয়েছিলাম আমি, ছোট্ট একটি মৃদু আঘাত পেয়েছিলাম। আইরিশ বিপ্লবীদের জীবনী লিখছেন ধারাবাহিক-ভাবে, কিন্তু সবটাই যেন বই প'ড়ে লেখা, লেখকের মনের কোনো স্পর্শ নেই যেন (যদিও, ধ'রে নেয়া যায়, বিভাবতীর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে বিষয়টা খুবই উৎসাহ-জনক)। 'রক্তের তর্পণ' 'স্বাধীনতার সূর্যোদয়,' 'দধীচির অস্থি'—মাসিকপত্রে অনবরতই যা পাওয়া যায়—সেই সব শব্দ, বা 'তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন ক'রে সইবো'-র মতো অসংখ্য বার দাগা-বুলোনো কোটেশন—আমি ভাবতেই পারিনি বিভাবতী তাঁর লেখার মধ্যে স্থান দেবেন এগুলিকে। যাঁর চেহারা অত ভালো, ব্যবহার অত মা ‍ ু, যিনি কোনো নিমন্ত্রণে এলে লোকেরা কথা থামিয়ে চেয়ে দ্যাখে, যিনি তাঁর কর্মক্ষমতা ও চরিত্রের জন্য সকলেরই শ্রদ্ধেয় হয়েছেন,—আমি ধ'রেই নিয়েছিলাম তাঁর লেখা হবে উঁচু তারে বাঁধা, তাঁর পরনের খদ্দরের মতোই সাত্ত্বিক, তাঁর মুখের হাসির মতোই প্রসন্ন। ভ ভেবে কষ্ট হলো যে তাঁর অমন সুন্দর ব্যক্তিত্বের ছিটে-ফোঁটাও তিনি পৌঁছিয়ে দিতে পারেননি আরো অনেকের কাছে, যারা হয়তো কখনো তাঁকে চোখে দেখবে না তাদেরও জন্য, ঐ আইরিশ বিপ্লবীদের উপলক্ষ ক'রে। কিন্তু আমার এই মোহভঙ্গের কথা বুলবুলের কাছে অবশ্য উচ্চার্য নয়, আমি একটু ঘুরিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, আপনি জানেন, এগুলো সত্যি কি বিভা-দিরই লেখা?' 'সে কী! আপনি কি ভাবছেন অন্য কেউ তাঁর নামে লিখে দিয়েছে? এমন একটা অদ্ভুত কথা কী ক'রে মনে হ'লো আপনার?' 'শুনেছি নামজাদারা নাকি সেক্রেটারি দিয়ে লিখিয়ে নেন অনেক সময়? তাতে দোষ নেই—কত জরুরি কাজ থাকে তাঁদের, বিভা-দি কখন লেখার সময় পান তা-ই ভাবছিলাম।' আমার কথাটার কপটতা বুলবুলের কানে ধরা পড়লো না, সে খুশি হ'য়ে বললো, 'আপনি এখনো জানেন না কী অসাধারণ মানুষ আমাদের বিভা-দি।' হঠাৎ থেমে, আমাকে চোখে বিঁধে বললো, 'আপনি বুঝি খুব সিনেমায় যান?' 'কী ক'রে জানলেন?' 'বাঃ, ছাত্রমহলে কে না জানে আপনার কথা। আর আমি আপনাকে দেখেওছি কয়েকদিন সদরঘাটের সিনেমা হাউস থেকে বেরোতে।' আমি জানতাম না আমার গতিবিধি লক্ষ করার মতো সময় বা কৌতূহল কারো থাকতে পারে—বিশেষত কোনো তরুণীর; ঈষৎ গর্বিত হলাম মনে-মনে, কিন্তু সেই গর্ব ফুটো ক'রে দিয়ে বুলবুল বললো, 'সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করেন কেন?' 'সময় নষ্ট কেন হবে—ভালো লাগে, তাই যাই।' একটু ভেবে বুলবুল বললো, 'আপনার কাছে ভালো লাগাটা বড়ো কথা হ'তে পারে—আমি কিন্তু তা ভাবি না।' 'আপনি কি কখনোই যান না কোনো ফিল্ম দেখতে?' 'গিয়েছি দু-একবার, বিভা-দিই আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যে এক কমিক-অ্যাক্টর, মজার গোঁফ, পায়ে ঢলঢলে বুট-জুতো—' 'চ্যাপলিন!' আমি সোৎসাহে ব'লে উঠলাম, 'আপনি চ্যাপলিনের নাম মনে করতে পারছিলেন না? আশ্চর্য!' 'আশ্চর্য কেন?' এবার একটু ভারিক্কি চালে, একটু বিদেশ ফলাবার ধরনে আমি বললাম, 'ফিল্ম-অ্যাক্টরদের মধ্যে কেউ যদি থাকেন, সত্যি-কার প্রতিভাবান, আর্টিস্ট, তাহলে এক চার্লি চ্যাপলিনেরই নাম করতে হয়। "গোল্ড রাশ"-এ তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তাঁর ধারে-কাছে কেউ এগোতে পারে না—ফেয়ারব্যাঙ্কস, ভ্যালেনটিনো, লন চ্যানি—কেউ না। আশ্চর্য কান্না-মেশানো হাসি—যেন অলিভার টুইস্ট, না—আরো ভালো, যেন কিং লিয়রের ফুল—যদি অবশ্য এমন হ'তো যে ঐ ফুলই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলে লিয়রকে আর কর্ডেলিয়াকে, যদি সুখের সমাপ্তি হ'তে পারতো নাটকটার। —তা কি সম্ভব নয়—চ্যাপলিনের লিয়র, যাতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা হবে ফুল-এর?' হঠাৎ বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথার স্রোত থেমে গেলো, তার চোখে দেখলাম সেই সূক্ষ্ম ক্লান্তির ছায়া, যা কোনো অজানা বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপ্ত আক্রান্ত হ'লে আমাদের ভদ্রতাবোধ চাপা দিতে পারে না। আমার উৎসাহে রাশ টেনে বললাম, 'আপনি বুঝি "গোল্ড রাশ" দ্যাখেননি?' 'না,' মাথাটি একটু পিছনে হেলিয়ে জবাব দিলো বুলবুল। 'তাছাড়া—আপনার ঐ চ্যাপলিন যত বড়োই অভিনেতা হোন তাতে আমাদের কী লাভ? তাতে কি আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটবে? বন্ধ হবে ইংরেজের জুলুম? দেশ স্বাধীন হবে?' তার এই কথা শুনে আমার চোখ বিস্ফারিত হলো, এক ঝলক রক্ত উঠে এলো মাথায়, এটা তার পরিহাস কিনা তা বোঝার চেষ্টায় তার চোখের দিকে তাকালাম। না—কৌতুকের কোনো লক্ষণ নেই, স্থির, গম্ভীর তার দৃষ্টি—তাতে মিশে আছে যেন আমার জন্য কিছু আবেদন, কিছু ভর্ৎসনা। পাছে রাগের ঝোঁকে চেঁচিয়ে উঠি, তাই চেষ্টা ক'রে নিচু গলায় বললাম, 'আপনি কি সত্যি বলছেন যে ভারতবর্ষ যাতে স্বাধীন হবে না সে-রকম কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই?' 'আমি সে-রকম কিছু বলিনি, বলতে চাইনি। কিন্তু—' একটু থামলো বুলবুল, দু-আঙুলে এক ফালি ঘাস ছিঁড়লো 'আমি বিভা-দিকে দেখেছি, তাঁকে আমি দেবীর মতো ভক্তি করি, তিনি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই পথের দু-পাশে যে-সব নানা রঙের ফুল ফুটে আছে সেদিকে আমার তাকাবার সময় নেই মনও নেই।' 'দেবীর মতো,' 'জীবনের পথ'—এই দুটো কথাই খট ক'রে বাজলো আমার কানে, একটু শস্তা শোনালো, কিন্তু যখন দেখলাম বুলবুল দু-চোখ ভরা বিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, যে-বিশ্বাস সে দুঃখ দিয়ে অর্জন করেনি, হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে, তখন আমি আমার তর্কের দানোকে চাপা দিয়ে দিলাম। 'এখানে অন্ধকার হয়ে আসছে, যাবেন নাকি এবার?' 'অন্ধকারকে আমার ভয় নেই—তাছাড়া আপনি তো আছেন।' আমার একটু অবাক লাগলো যে আমিই যে তার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হ'তে পারি এটা তার কল্পনার ত্রিসীমানায় নেই। হেসে বললাম, 'আমি তেমন বলবান নই কিন্তু, কোনো দুর্বৃত্ত আক্রমণ করলে আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।' 'তখন না-হয় আমিই আপনাকে বাঁচাবো।—কিন্তু চলুন, আমাকে আবার আরেক জায়গায় যেতে হবে।' অ মবাগান থেকে বেরিয়ে, বুলবুলের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে, তার ঠোঁটে হঠাৎ একটি ছোট্ট হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আসল কথা কী জানো? আমি তো তোমার মতো কবি নই, সাহিত্যিক নই, আমি অতি সাধারণ—আমি শুধু এটুকু বুঝি যে ঘরে আগুন লেগেছে, আর তাতে যদি এক অঞ্জলি জলও ছিটোতে পারি তাতেই আমার সার্থকতা। —এই যে, 'তুমি' ব'লে ফেললাম, কিছু মনে করলেন না তো? না—মনে করার কী আছে, এই ভালো, আপনিও আমাকে "তুমি" বলবেন। কেমন—রাজি?' বুলবুল চলতে-চলতে আমার হাতটা ধরলো একবার, তক্ষুনি ছেড়ে দিলো।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

যুদ্ধের মুখোমুখি

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নাটকীয় পথে মোড় নিয়েছে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সরকার গত ২৩শে এক ঘোষণায় আকাবা উপসাগর দিয়ে ইস্রায়েলের জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা একটি বিরাট ধাপ বেড়ে গেল। ইস্রায়েল কোন পাল্টা ব্যবস্থা নেবে কিনা সেটা ইস্রায়েলই জানে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেখেছেন।

"আমরা এখন ইস্রায়েলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, এবং যদি তাঁরা বৃটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য না নিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চান তবে আমরা তাঁদের অপেক্ষা করছি।" প্রেসিডেণ্ট নাসের তাঁর ঘোষণায় বলেছেন।

আকাবা উপসাগরের অবস্থান মিশরের সিনাই উপদ্বীপ ও সৌদী আরবের মাঝখানে। এর একটি মুখ পড়েছে লোহিত সাগরে, আরেকটি মুখ ইস্রায়েলের দক্ষিণতম প্রান্ত স্পর্শ করেছে। এই উপসাগর এবং এর দক্ষিণ প্রান্তের টিরান প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হল ইস্রায়েলী বাণিজ্যকে পঙ্গু করে দেওয়া, কারণ এই জলপথে ইস্রায়েল পূর্ব আফ্রিকা ও এশিয়ার সঙ্গে সহজে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারত। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধের মীমাংসার সর্ত হিসেবে ইস্রায়েল যখন ১৯৫৭ সালে সিনাই উপদ্বীপ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়, তখন তাকে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, এই জলপথে ইস্রায়েলী জাহাজ চলাচলের অধিকার থাকবে। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত এক প্রস্তাবে এই অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়।

স্বভাবতই প্রেসিডেণ্ট নাসেরের এই ব্যবস্থায় ইস্রায়েল ক্রুদ্ধ হয়েছে। ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লেভি এশকোল একে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন।

উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন। তিনি বলেছেন: "আকাবা উপসাগর বন্ধ করে দেওয়ায় সঙ্কটের একটি নতুন ও গুরুতর দিগন্ত উন্মোচিত হল।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন বলেন, আকাবা উপসাগর দিয়ে অবাধ যাতায়াতের অধিকার রক্ষার জন্যে কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে তাঁর সরকার তাতে সমর্থন জানাবেন।

অপরপক্ষে ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি রক্ষার জন্যে যুদ্ধকালীন বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স) একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হোক।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসেন কায়রোয়। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মোহম্মদ রিয়াদকে বোঝাতে চান যে, উত্তেজনা হ্রাস করার জন্যে আকাবা উপসাগরের মুখে শার্ম এল-শেখে প্রতীকী অর্থে হলেও রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হোক কিংবা সাময়িকভাবে হলেও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হোক।

এদিকে ২৪ মে কানাডা ও ডেনমার্কের আহ্বানে নিরাপত্তা পরিষদ একটি জরুরী অধিবেশনে মিলিত হলেন।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের তাঁর সংকল্পে অবিচলিত রয়েছেন। আকাবা জলপথ বন্ধের পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে উপসাগরে প্রবেশের সমস্ত পথে মাইন পাতা হয়েছে। ইস্রায়েলের সংগে মোকাবিলা করার জন্যে সিনাই উপদ্বীপে লক্ষাধিক মিশরীয় সৈন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। উপসাগরের মুখে মিশরীয় বিমানধ্বংসী কামান সর্বদা পাহারা দিচ্ছে।

এই প্রস্তুতিকে আরো জোরদার করার জন্যে সৌদী আরব আকাবা উপসাগরের পূর্ব উপকূলে সৈন্য মোতায়েন করছে। সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে তাবুক এলাকাতেও সৌদী পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ইরাকী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, ইরাকী সৈন্যবাহিনী মিশরীয় ও সিরীয় সৈন্যবাহিনী এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার সামরিক ইউনিটগুলির সমর্থনে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে গেছে। কুয়েৎ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সৈন্যদের এই নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা যেন ইস্রায়েলী সীমান্তে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সৈন্যদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

অপর পক্ষে ইস্রায়েল এখনো তার ক্রোধ কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ করেনি। উ থাণ্টের কায়রো মিশন কোন বরফ গলাতে পারে নি। আমেরিকা আকাবা উপসাগরে যাতায়াতের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাষ্ট্রসংঘের ভিতরে ও বাইরে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকী দিলেও সেই হুমকী অনেকটা ফাঁকা আওয়াজ বলেই মনে হচ্ছে। ফ্রান্স যে বৃহৎ চতুঃশক্তির বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিল তা নিয়ে আর কেউ কোন উৎসাহ দেখায় নি। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আফ্রো-এশীয় সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার দরুণ পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতির পশ্চিমী ভাবাসম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে নি।

অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ায় এখন একটা যুদ্ধের অবস্থা তৈরী হয়ে গেছে, যদি অবশ্য ইস্রায়েল যুদ্ধ করতে চায়। এ ব্যাপারে রাশিয়া আরব পক্ষকে পূর্ণ সমর্থন
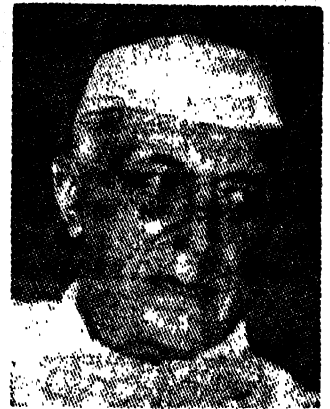
পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ২৭ মে দেশের সর্বত্র পালিত হয়।

জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা রাজ্যসভায় ঘোষণা করেছেন যে, আরব দুনিয়ায় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের চাইতে ভালো বন্ধু ভারতের আর কেউ নেই এবং আরব-ইস্রায়েলী বিরোধের গুণাগুণের বিচারেও ভারত সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রেরই পক্ষে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ সমস্যার মীমাংসার জন্যে গত মঙ্গলবার একটি প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন, মিশর ও ইস্রায়েল উভয়েই তাদের সাধারণ সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নিক। মিশর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরের এই শক্ত ভূমিকা নেবার কারণ আছে। একথা ঠিক যে সাম্প্রতিক কালে মিশরের গাজা এলাকায় ও জর্ডন ও সিরিয়ার সীমান্তে ইস্রায়েলের সামরিক হানাদারীর মাত্রা এত বেড়ে গিয়েছিল যে আরব দুনিয়ার পক্ষে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে উদ্যত না হয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু কেবল তা দিয়েই তোড়জোড়ের ব্যাপকতার ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রেসিডেণ্ট নাসের এই যাত্রায় এতখানি কঠোর হয়েছেন কারণ তিনি দেখছেন অবস্থা তাঁর অনুকূল। আমেরিকা ভিয়েৎনামে এত বেশি জড়িত যে পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে যে সহজে জড়িয়ে পড়তে পারবে না। আর বৃটেন ও ফ্রান্স ১৯৫৬ সালের অভিজ্ঞতার পর সহজে আর এই এলাকায় যুদ্ধে নামতে চাইবে না। প্রেসিডেণ্ট নাসের এই সুযোগে ১৯৫৬ সালের আক্রমণের শোধ নিতে চান।

এই ইচ্ছা তাঁর আরো প্রবল এই কারণে যে, ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট নাসের যদিও বিজয়ী পক্ষ ছিলেন, তবু সামরিক দিক দিয়ে মিশর তুলনামূলক বিচারে খুব একটা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারে নি। গাজা এলাকা থেকে মিশরীয় সৈন্যকে সরে আসতে হয়েছিল, সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, দু-তিন হাজার মিশরীয় সৈন্য ইস্রায়েলীর হাতে নিহত বা বন্দী হয়েছিল, বহু অস্ত্রশস্ত্র তাকে হারাতে হয়েছিল, শার্ম-এল-শেখের

পূর্ণাঙ্গ সামরিক ঘাঁটিটি শত্রুর কবলে চলে গিয়েছিল।

সেই ব্যর্থতাকে প্রেসিডেন্ট নাসের এখন শুধরে নিতে চান। একথা ঠিক যে ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি যদি ইস্রায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন তবে সেটা আরব বাহিনী জিততে পারবে কিনা এই সন্দেহ থেকে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তিনি যদি এখন সংঘর্ষকে বরণ করে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন তবে সেটা এই কারণে যে, তিনি জনেন এই যাত্রা তিনি জিততে পারবেন।

হতে পারে ইস্রায়েলের হাতে পশ্চিম থেকে পাওয়া উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখন ইস্রায়েলের প্রতিকূলে। এবং বর্তমানের যুদ্ধ কেবল অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয় না।

আর যদি যুদ্ধ না-ই হয়, ইস্রায়েল যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে, তাহলেও নাসেরই বিজয়ী থাকবেন। এবং সে-ক্ষেত্রে তাঁর সম্মান, গৌরব ও প্রতিপত্তি আরো বিরাট ধাপ এগিয়ে যাবে।

নাসেরের বর্তমান মনোভাবের পেছনে এই বিশ্বাসও নিশ্চয়ই অনেকখানি কাজ করেছে।

বাজেট-সমাচার

এবার বাজেট-ভাগ্য যে সাধারণ মানুষের প্রতি অপ্রসন্ন. রেলে যাত্রীভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি থেকেই তার আভাস প্যাওয়া গেছলো। তারপর সাধারণ বাজেটে মোরারজী যখন তাঁর অর্থসংগ্রহের পন্থা-গুলো শোনালেন তখন তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। বাজেটে মোট ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ৬৮ কোটি টাকা। এই ঘাটতি পূরণ করা হবে কতকগুলো ক্ষেত্রে কর ও শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা। এবারকার বাজেটের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে প্রত্যক্ষ কর দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কোনো চেষ্টা নেই, বরং সীমিতভাবে সাধারণ করদাতা ও শিল্পগুলোকে কিছু কিছু রেহাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরোক্ষ করের থাবা এতো দীর্ঘ প্রসারিত যে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা নিঃসন্দেহ আরো দুর্বহ হয়ে উঠবে।

রেলে যাত্রীভাড়া ও মালের মাশুল বাড়ানোর পরে টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য ডাক খরচাও সাধারণ বাজেটে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন থেকে পার্সেল, বুক প্যাকেট, খবরের কাগজ, এক্সপ্রেস ডেলি-ভারির চিঠি, ইনসিওর চিঠি ও এয়ার মেলের খরচ বেশী দিতে হবে। চা, কফির উৎপাদন শুল্ক বাড়বে। বাড়বে টুইস্ট সুতো, কৃত্রিম আঁশ ও রেয়নজাত দ্রব্যের ওপর। একমাত্র এই বাবদেই আয় হবে ২২ কোটি টাকা। ফলে মিহি ও অতি-মিহি কাপড়ের দাম এখন থেকে অনেক বেশী পড়বে। পেট্রলজাত দ্রব্য বিশেষভাবে পেট্রলের শুল্ক বৃদ্ধির পরিমাণ এতো বেশী যে বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধি

অতঃ কিম্ ?
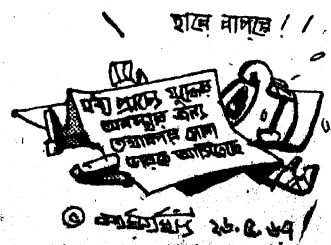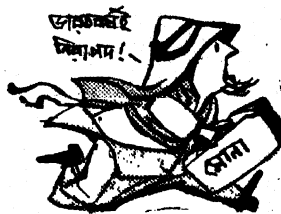
প্রায় অবশ্যম্ভাবি। তবে মোরারজী আশ্বাস দিয়েছেন যে কেরোসিনের দাম বাড়বে না। অ্যালুমিনিয়মের ওপর উৎপাদন-শুল্ক এতো বেশী বাড়ানো হয়েছে যে এখন থেকে তার দর বেশ ভালো রকমই চড়বে। জুতাকেও মোরারজী রেহাই দেন নি। এর ওপর আগে যে মূল্যানুপাতিক দশ টাকা শুল্ক ধার্য ছিলো ১৯৬৫ সালে তা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের মতে, জুতার দাম তখন সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের বেশীদিন সেই সুযোগ ভোগের অবকাশ দেন নি। ব্যবসায়ীদের এই অতিলোভের জন্য ক্রেতাদের খেসারৎ দিতে হবে। কিন্তু মোরারজীর সব চেয়ে কঠিন আঘাত হলো ধূমপায়ীদের ওপর। কর, শুল্ক বাবদ তিনি যে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করবেন তার প্রায় অর্ধেক আদায় করা হচ্ছে সিগারেট, সিগার, চুরুট প্রভৃতি খেয়ে যাঁরা নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করেন (এবং গান্ধীবাদী মোরারজীর মতে, নৈতিক অধঃগতিও বটে), তাঁদের কাছ থেকে। এই বাবদে আদায় হবে সাড়ে আঠাশ কোটি টাকা। অর্থ দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, যাঁরা গোল্ড ফ্লেক খান তাঁদের প্যাকেটে ৩৭ পয়সা, উইলসের জন্য ১০ থেকে ১৫ পয়সা এবং সর্বকনিষ্ঠ চারমিনারের জন্য প্যাকেটে তিন পয়সা বেশী দিতে হবে। ভাল কফি ও চায়ের জন্য এখন থেকে পাউণ্ডে যথাক্রমে ১৮ ও ১২ পয়সা বেশী দিতে হবে। মোরারজী বলেছেন, পয়সা আদায়ই তাঁর আসল লক্ষ্য নয়, সিগারেট খাওয়া কমান, খরচও বাঁচবে, আয়ুও বাড়বে। আর চা কফি খাওয়া কমালে বিদেশে আরো কিছু রপ্তানি বাড়বে। এই উদ্দেশ্যে উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধি নাকচ করার জন্য চা, কফির রপ্তানি শুল্কে কিছুটা রেহাই দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক বছরের আর বাকী সাড়ে ন মাসে এই বাবদে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তার পরিমাণ ৬৯ কোটি টাকা। ঘাটতির ৬৮ কোটি টাকা মিটিয়ে যে এক কোটি থাকবে তাই হবে নামমাত্র উদ্বৃত্ত। এই-ভাবেই বাজেটে আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষিত হবে।

পরোক্ষ করের এই উৎপীড়ন মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতো, প্রত্যক্ষ করের ব্যাপারে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে করদাতাদের দুর্গতির একটু সুরাহা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বছরে যাঁদের মোট আয় দশ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের জন্য আয়করে বছরে ৪০০ টাকা রেহাই পাবেন। অনর্জিত আয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার টাকা সার চার্জ মুক্ত ছিল। এখন থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ে সারচার্জ লাগবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা প্রভৃতিতে অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া হবে আয়করমুক্ত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে। শেয়ারে লগ্নীর জন্য লভ্যাংশ বাবদ যাদের আয় বছরে ৫০০ টাকার মধ্যে তাদের ঐ আয় করের আওতায় আসবে না।

সাধারণ মানুষের বোঝা বাড়লেও শিল্পগুলোকে এবার যথা সম্ভব সুবিধা দেওয়ারই চেষ্টা করা হয়েছে। যে সব কারখানা পূর্ব পাকিস্থান, ব্রহ্ম বা পূর্ব আফ্রিকা প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান করবে তারা করের ব্যাপারে কিছু সুবিধা পাবে। নতুন শিল্পগুলোর লাভ না হলে আট বছর পর্যন্ত কর থেকে রেহাই দেওয়া হবে। বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য দেশীয় হোটেল শিল্পগুলো করের ব্যাপারে সুবিধা পাবে। পাটজাত দ্রব্যকে যথেষ্ট রকম সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আকরিক লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজও রপ্তানি শুল্কে কিছুটা রেহাই পাবে।

রাজ্যগুলোর হাহাকার মেটাবার জন্য দেশাই অতিরিক্ত করের টাকা থেকে আরো ২৩ কোটি টাকা তাদের ভাগ করে দেবেন। তবে খাদ্যশস্য যদি পড়তার চেয়ে কম দরে বিক্রির জন্য কোনো রাজ্য সিদ্ধান্ত করে তাহলে সেই বাবদ লোকসানের বোঝা তারই বইতে হবে, কেন্দ্র দেবে না। তাছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকেও তাদের আর ওভারড্রাফট নেওয়া চলবে না, এই হচ্ছে মোরারজীর আর এক হুঁসিয়ারী। গত বছর বিদেশ থেকে আমদানী খাদ্যবাবদ কেন্দ্র যে ১১৮ কোটি টাকা সাবসিডি দিয়েছিল এবারও তাই দেবে।

অর্থমন্ত্রীর বাজেটে এবার আসল কথা, ঘাটতি মেটাতে তিনি আর ফালতু নোট ছাড়বেন না, মুদ্রাস্ফীতিও রোধের চেষ্টা করবেন। তবে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে মন্দা এসেছে এই বাজেটে তার কোনো সুরাহার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না। একমাত্র ভালো একটা বর্ষাই সম্ভবত দেশের এই অর্থনৈতিক অধোগতিকে রোধ করতে পারে, কারণ, তাতে একদিকে যেমন খাদ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়ে মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্র সংকুচিত করবে তেমনি কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষিজ রপ্তানীও জোরদার হবে।

বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার এই চেষ্টাকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা মোটামুটিভাবে অভিনন্দিতই করেছেন। প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাঁরা খুশি, তবে পেট্রলজাত পদার্থের উৎপাদন-শুল্ক এবং কয়লার পরিবহন মাশুল বৃদ্ধির ফলে শিল্পোৎপাদনের খরচ আরো বাড়বে। কতকগুলো ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন শুল্ক বেশী আদায়ের ফলে সাধারণ লোকের ওপর বোঝা আরো বাড়বে, এ জন্যও তাঁরা দুঃখিত। তবে বিকল্প পন্থা সম্বন্ধেও তাঁরা নীরব, কারণ, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা —এই দ্বিবিধ পারস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক দুর্যোগের কবল থেকে দেশকে রক্ষার আর কোনো পথও বোধ হয় অর্থমন্ত্রীর সামনে ছিলো না।

রেল বাজেট

সাধারণ বাজেট সম্পর্কে মানুষের সমালোচনা ভালমন্দ মিশিয়ে হলেও রেল বাজেট সম্পর্কে প্রায় সকলের মন্তব্যই বিরূপ। এবার রেলের বাজেটে মানুষ ও মাল—দুয়েরই বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক অভিযান চালানো হয়েছে বলা যেতে পারে। এই অভিযানে যাত্রী ভাড়া ও মালের (কয়লা সমেত) মাশুল বেড়েছে—সিজন টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট, রিজার্ভেশনের চার্জ সবই বাড়ানো হয়েছে। মার্চ মাসে রেলের অন্তবর্তী বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে হিসেব দেখানো হয়েছিল তার তুলনায় রেলের আয় ১৭ কোটি টাকা হ্রাস ও ব্যয় ১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আয় হ্রাসের কারণ, বৈষয়িক উন্নতিতে মন্দা আসায় অনুমানের তুলনায় মাল চলাচল হ্রাস। গত বছরে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল চলাচল হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য বছরে মাল চলাচলের পরিমাণ ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টনে পৌঁছুবে বলে আশা করা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতে রেলওয়ের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধিও করা হয়েছিল। ফলে লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও আয় বাড়ে নি। অপর পক্ষে, কর্মচারীদের মাগগি-ভাতা সম্ভাব্য বৃদ্ধির জন্যই প্রধানত ১৪ কোটি টাকা ব্যয় বাড়বে। চলতি বাজেট-বছরের অবশিষ্ট সময়ে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত আয় হবে ৩৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩১ কোটি টাকা যাবে ঘাটতি পূরণে। ৬ কোটি টাকা দেওয়া হবে ক্ষয় পূরণ তহবিলে দেয় অর্থের ঘাটতি মেটাতে। বাকী ১ কোটির কিছু বেশী টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। অবশ্য রেলওয়ের এই ঘাটতি পূরণে ভাড়া, মাশুল বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল কিনা, তাই-ই এখানে প্রশ্ন। সম্প্রতি মাল চলাচলে যে মন্দা দেখা দিয়েছে কৃষির কিছুটা উন্নতি এবং কলকারখানার কাজ কিছু ফেঁপে উঠলে তা দূর হতে পারে। অবশ্য এজন্য কিছুটা ঝুঁকি সরকারকে নিতে হতো। সেই ঝুঁকি না নিয়ে রেলমন্ত্রী সরাসরি রাজস্ব বৃদ্ধির পথই বেছে নিয়েছেন।

এই মাশুল বৃদ্ধির ফল কি হবে? বণিকসভাগুলো বলছে যে, কয়লা ও কাঁচা মালের খরচ এতে বেড়ে যাবে এবং ফলে তৈরি মালেরও দাম বাড়বে। পরিণতিতে এই ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতিরই সহায়ক হবে। তাঁদের মতে, রেল কর্তৃপক্ষ পরিচালন-ব্যয় কমিয়ে এবং রেল চলাচল-ব্যবস্থাকে আরো সুসমঞ্জস করে এই ঘাটতি মেটাতে পারতো এবং ক্রমাগত মাশুল বৃদ্ধির পরিবর্তে সেই পন্থাই বরং প্রশস্ত হতো।

জ্যা মিলন কি দস্তান চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা

"তিসরী কসম" ছবির প্রযোজক ও নায়ক ঃ

১৯৬৬ সালের ভারতে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্ররূপে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক স্বীকৃত "তিস্‌রী কসম্" ছবির প্রযোজক ছিলেন সদ্য-পরলোকগত গীতিকার শৈলেন্দ্র। বোম্বাই থেকেও ভালো শিল্পসম্মত ছবি তৈরী হতে পারে—এই ভাবনাকে বাস্তব রূপদানের সঙ্কল্প নিয়ে তিনি চিত্রপ্রযোজনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং এই ছবির প্রযোজনায় তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করেছিলেন। ছবিটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে তাঁকে বেশ কিছুটা ঋণও করতে হয়েছিল। যথাসময়ে "তিস্‌রী কসম্" মুক্তিলাভ করল; সকলে একবাক্যে ধন্য ধন্য রব তুলল, কিন্তু পয়সা এল না। ঋণভারে জর্জরিত ভগ্নোদ্যম শৈলেন্দ্র অকালে প্রাণত্যাগ করলেন। বি, এফ, জে, এ-র বার্ষিক শংসাপত্র বিতরণী উৎসবে (অ্যাওয়ার্ড গিভিং ফাংশনে) হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতার ('তিস্‌রী কসম্'-এর নায়ক) পুরস্কার নিতে এসে রাজ কাপুর পরলোকগত শৈলেন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ভালো শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রসৃষ্টির বিপদের কথা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করলেন ঃ সকলে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করে ভালো ছবি তৈরী করে লাভ কি, যদি সেই ছবি প্রযোজককে অন্তত তার ব্যয়িত অর্থটি না ফিরিয়ে দিতে পারে ?

গীতিকার শৈলেন্দ্রের অকালমৃত্যুতে কাতর রাজ কাপুর কিন্তু তাঁর বন্ধুর জন্যে নিজে কি করেছিলেন, সে-কথা জানা গেল 'তিস্‌রী কসম্'-এর পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের মুখ থেকে। ঐ বি, এফ, জে, এ-র অনুষ্ঠানেই তিনি উপস্থিত সুধীজনদের জানালেন ঃ যে ভূমিকাভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে রাজ কাপুর শংসাপত্রটি (সার্টিফিকেট অব মেরিট) নিজে গ্রহণ করতে এসেছেন, তার জন্যে পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি একটি কপর্দকও গ্রহণ করেননি; বন্ধু শৈলেন্দ্রকে সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে তিনি সময় ও শ্রম অকাতরে দান করেছেন। রাজ কাপুরের মতো অভিনেতা একটি পয়সাও না নিয়ে একখানি ছবির নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন, এ-কথা কিন্তু আয়কর বিভাগের অনুসন্ধিৎসু লোকেরা আদৌ বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁরা ছবির পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যকে গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দেবার জন্যে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, তিনিও 'ভদ্রলোকের এক কথাই' বলছেন, তখন আক্ষেপ প্রকাশ করে শ্রীভট্টাচার্যকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ আপনি আর সব ব্যাপারেই হয়ত সত্যি

কথাই বলেছেন; কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে কেন যে এমন সত্য গোপন করলেন, তা'...... ইত্যাদি। জাতশিল্পী রাজ কাপুরকে আমরা আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি!

পাকীজা (উর্দু) : পুণাম্ পিকচার্স-এর নিবেদন; ৪,৯১৪-৬৬ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : প্রবীণ ভালসামিয়া ও হীরালাল প্যাটেল; প্রযোজনা-পরিকল্পনা : পুণামভাই শাহ; পরিচালনা : পরলোকগত এস, ইউ, সানি ও মহেশ কাউল; কাহিনী ও সঙ্গীত-পরিচালনা : নৌশাদ; চিত্রনাট্য : সি. এল, কবীল; সংলাপ : ওয়াজহাদ মির্জা;; গীত-রচনা : শকীল; চিত্রগ্রহণ : ফরেদুন ইরাণী; কৌশলী চিত্রগ্রহণ : কেকি মিস্ত্রী; শব্দানুলেখন : পাণ্ডুরং বোলুর ও রঞ্জিত; সঙ্গীতানুলেখন : কৌশিক, মঙ্গেশ দেশাই ও মিনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা : ভি, মাধব রাও; সম্পাদনা : মুসা মনসুর; নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত : মোহম্মেদ রফী, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর, মান্না দে, আজিজ প্রভৃতি; রূপায়ণ : রাজেন্দ্রকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, নাজির হোসেন, মনোমোহন কৃষ্ণ, জনি ওয়াকার, রসিদ খাঁ, মিনু মমতাজ, নীলম বাই, প্রতিমা দেবী, মাস্টার বাবলু, মাস্টার শহীদ প্রভৃতি। শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৬-এ মে, লাইটহাউস ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, দর্পণা, মেনকা, প্রভাত, ছায়া, ইণ্টালী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

অবিমিশ্র, শাশ্বত প্রেমের চিত্র "পাকীজা", প্রায় স্বর্গীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছবির আরম্ভ ভাগে হয়ত' দর্শকদের একথা মনে হবে না; মনে হবে, আরও পাঁচটা হিন্দী ছবির মতোই এতেও সেই গান ও কথার মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার তথাকথিত ভালোবাসাবাসির ন্যাকামো। নায়ক সলিম ও নায়িকা সাহেবজান যখন অপর সকলের অজান্তে রাত্রিবেলা লুকিয়ে ছাদে উঠে মৃদুভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে নায়ক হঠাৎ জোর গলায় গান ধরে, "দিলে বেতাব কো সিনেসে লাগানা হোগা" এবং নায়িকাও সমান উচ্চকণ্ঠে গানেই জবাব দেয়, "আপকো প্যারকা দস্তুর নিভানা হোগা", তখন সত্যিই মনে হয়, এ-ছবিতে নতুন কি আর দেখব, আরও পাঁচটা জাঁক-জমকওলা হিন্দী ছবির মতোই হবে আর কি। কিন্তু কাহিনী যতই এগুতে থাকে, ততই মন কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং কখন যে নিজেরই অজ্ঞাতে নায়ক, উপনায়ক ও নায়িকার সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনায় সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি, তা বুঝতেই পারি না। ছবি যখন শেষ হয়, তখন মনে হয়, এমন একটি মহৎ প্রেমের হিন্দী ছবি বুঝি ইদানীংকালে আর দেখিনি।

কাহিনী সামান্যই; কিন্তু পরিস্থিতি-রচনায় কাহিনীকার নৌশাদ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ দিচ্ছি দুটো-একটা। নায়িকা নায়ককে দিব্যি দিয়ে বলেছিল, পুরস্কারের অর্থ যদি তুমি কোনো অছিলায় গ্রহণ কর, তাহ'লে তুমি আমাকে মৃত দেখবে। কিন্তু বিবাহের পরে ফুলশয্যার রাত্রে যখন আকস্মিকভাবে প্রকাশ পেল যে, যে-অর্থকে গোপন সঞ্চয় ভেবে বিবাহোৎসবে ব্যয় করা হচ্ছিল, তা' আসলে ঐ পুরস্কারের অর্থ, তখন নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে সৃষ্ট কঠিন পরিস্থিতি দর্শকদের হতবাক করে দেয়। আবার নায়ককে মৃত সাব্যস্ত করে নায়ক ও নায়িকার মা ও বৌদিদি যখন শোকে প্রায়-বিকৃতমস্তিষ্ক নায়িকার ধনকুবের নবাব মির্জার সঙ্গে আবার বিবাহ দেয় এবং ফুলশয্যার রাত্রেই নায়িকা পুনরায় সুস্থ হয়ে পড়ে ও সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, সে কোন্ অজানা মুহূর্তে নবাবের ঘরণী হয়ে পড়েছে, তখন থেকে শুরু করে আত্মহত্যা করে সকল সমস্যার সমাধান করবার জন্যে নায়িকার হাতে নবাবের বিষপাত্র তুলে দেওয়া পর্যন্ত নাটকীয় পরিস্থিতির সংখ্যা গণনা করা যায় না। কেবল একেবারে শেষে নবাব যখন নিজ মুখে জাহির করেন, তিনি নায়িকার হাতে যে-পাত্র দিয়েছিলেন, তাতে বিষের পরিবর্তে সাময়িকভাবে অজ্ঞান হবার ওষুধ ছিল এবং এরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নায়িকা বেঁচে উঠে নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন এই বোম্বাই-সুলভ মিলনান্ত সমাপ্তি দেখে দর্শকসাধারণ উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা একটুও খুশী হ'তে পারিনি।

"পাকীজা" ছবিটি নায়িকা সাহেবজানের ভূমিকায় ওয়াহিদা রেহমানের অভিনয়-কুশলতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে চিহ্নিত হবে। আন্তর্য মনোভাব-প্রকাশক একজোড়া চোখের সাহায্যে সাহেবজানের সঙ্কোচ, দুশ্চিন্তা-জ্ঞান, লাজনম্রতা, অবাধ প্রেমের অভিব্যক্তি, কর্তব্য ও প্রেমের সংঘর্ষে মন্ত্রণা, আত্মত্যাগে উন্মুখতা প্রভৃতি সকলরকম ভাবকে তিনি অবলীলাক্রমে পরিস্ফুট করেছেন। কেন জানি না, সাহেবজানের মস্তিষ্কবিকৃতির অবস্থাটি তিনি কিন্তু সার্থকভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। নায়ক সলিমের চরিত্রে রাজেন্দ্রকুমার কণ্ঠস্বরের উত্থানপতনের দ্বারা সুন্দর বাচনভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সহজ অভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করে। নবাব মির্জারূপে সোহরাব চরিত্রটিতে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় নাজির হোসেন (সলিমের বোম্বাইয়ে আশ্রয়দাতা), মনোমোহন কৃষ্ণ (নবাবের বৈদ্য), জনি ওয়াকার (নায়িকার দাদা), মিনু মমতাজ (নায়িকার বৌদিদি), প্রতিমা দেবী (নায়কের মা), মাস্টার বাবলু (নবাবের প্রথমপক্ষের সন্তান), মাস্টার শহীদ (নাজির হোসেনের বালকপুত্র) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ছবির বিরাট পটভূমি বা আউটডোর-এর কথা। শিল্পনির্দেশক ভি, মাধব রাওয়ের দৌলতে যে-ভাবে এর প্রতিটি দৃশ্যকে জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলা হয়েছে, তা যে-কোনও বিরাট হলিউডী ছবির সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। ফরেদুন ইরাণীর রঙীন চিত্রগ্রহণের কাজও সমভাবে প্রশংসনীয়। কেকি মিস্ত্রীর সহায়তায় ছবিটির ভিতর বোম্বাইয়ের ১৯৪৪ সালের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের যে-রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা' "গন উইথ দি উইণ্ডস" ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সুদীর্ঘ ছবিটিতে যে-ভাবে গতিশীলতা বা টেম্পোকে অণুমাত্রও শ্লথ হ'তে না দিয়ে সুকৌশলে দর্শক আগ্রহকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করে যাওয়া হয়েছে, তা সম্পাদক মুসা মনসুরের কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু ছবিটিতে এক দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যে যাবার জন্যে 'মিক্সিং'-এর সময়ে রংয়ের তারতম্য ঘটা চক্ষুপীড়াদায়ক হয়েছে। 'টাইটেল' মিক্সিং-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা ঘটেছে। প্রধানত লক্ষ্ণৌ শহরের কাহিনী বলেই বোধ করি ছবির সংলাপ পুরোপুরি উর্দু; এর ফলে উর্দু-না-জানা দর্শকদের সংলাপের মাধুর্য, নাটকীয়তা ও চিন্তাশীল সত্যের অভিব্যক্তি ঠিকমতো উপভোগ করা কঠিন; কিন্তু ঘটনাবলীর পারম্পর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওর মর্মার্থ গ্রহণ যে কোনও দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। সঙ্গীতানুলেখন পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে সর্বত্রই উচ্চগ্রামে করা হয়েছে এবং এর ফলে স্থানে স্থানে রসবিপর্যয় ঘটেছে। ছবির ন'খানি গানের মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে নবাবের সভাস্থলে গাওয়া কাওয়ালী গান : তেরী মহফিল মে কিস্মত আজমা কর হম ভী দেখেঙ্গে—এর ইধর আউ' ইয়া উধর যাউ"। এ ছাড়া "যামে বাজে তেরা খুদা হাফিজ", "চেহরে সে আপনে আজ

তো পরদা উঠাইয়ে", "মেরে ঘরমে প্যারকী পাল্কী চলি গায়ী" প্রভৃতি গানেরও জনপ্রিয়তা লাভের সম্ভাবনা আছে। আবহসংগীত কাহিনীর বিভিন্ন পরিস্থিতিকে সর্বত্রই সহায়তা করেছে।

পুণাম পিকচার্স-এর বিরাট রঙীন চিত্র "পাল্কী" একটি মহৎ প্রেমের কাহিনীকে উপযুক্ত নিষ্ঠা ও মর্যাদার সঙ্গে রূপায়িত করেছে এবং ওয়াহিদা রেহমানের অনবদ্য অভিনয়গুণে ও প্রযোজনাবৈশিষ্ট্যে হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় অবদানরূপে চিহ্নিত হবে।

●

অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন (ইংরাজী সাব-টাইটেলসহ রাশিয়ান) : গোর্কী ফিল্ম স্টুডিওর নিবেদন; ৩,৮৪১ মিটার দীর্ঘ এবং ১১ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট ও পরিচালনা : সার্গেই গেরাসিমভ; কাহিনী : মিখাইল শোলোকভ; সংগীত-পরিচালনা : য়ুরী লেভিটিন; চিত্রগ্রহণ : ভ্লাদিমির র‍্যাপোপোর্ট; শিল্পনির্দেশনা : বোরিস ডুলেনকভ; রূপায়ণ : পিওতর গ্লেবভ, এলিনা বাইস্ট্রিটস্কায়া, জিনাইডা কিরিয়েনকো। গীতা পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সহায়তায় অ্যাডেপ্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এর পরিবেশনায় গেল ২৬এ মে, শুক্রবার প্যারাডাইস সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক মিখাইল শোলোকভ-এর 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' হচ্ছে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জগদ্বিখ্যাত রচনা। রাশিয়ার জারের অত্যাচার যখন প্রজাদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের মধ্যে জেগেছিল দারুণ অসন্তোষ এবং সেই কারণে ১৯১৭ সাল থেকে তারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। পেট্রোগ্রাডে যে গৃহযুদ্ধের শুরু, তার হাত থেকে তারা স্বচ্ছন্দবাহিনী ডন নদীর তীরবর্তী কসাকদের গ্রামাঞ্চলও মুক্তি পায় নি। পুরাতনপন্থীদের সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসীদের এই যুদ্ধে কসাকরা মেতে উঠেছিল। গৃহযুদ্ধের এই পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে একটি আশ্চর্য প্রেমের কাহিনী, যে-প্রেম শুচি-অশুচি মানে না, পরস্ত্রী মানে না, প্রেমিকার একাগ্র নিষ্ঠাও দাবী করে না। স্টেফান অ্যাস্টাকভের স্ত্রী আকসিনিয়ার প্রতি গ্রেগরীর এমনই ভালোবাসা! স্টেফান গ্রেগরীর সঙ্গে করল মারামারি, আকসিনিয়াকে করল গুরুতরভাবে আঘাত। আকসিনিয়াকে নিয়ে গ্রেগরী গ্রাম ত্যাগ করল এবং অন্যত্র বসবাস শুরু করল। কিন্তু সেখানে গ্রেগরীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নবগঠিত সৈন্যদলের নব্যকর্তা আকসিনিয়াকে নিজের অংকশায়িনী করল। গ্রেগরী যথাসময়ে ফিরে এসে ব্যাপারটা বুঝল; সেই সুযোগসন্ধানীকে করল নৃশংস চাবুকের আঘাতে ধরাশায়ী; আর আকসিনিয়ার মিনতি সত্ত্বেও তাকে ত্যাগ করে চলে গেল এবং যুদ্ধে মেতে উঠল। আকসিনিয়া ফিরে গেছে তার স্বামী স্টেফানের কাছে। গ্রেগরীর বিবাহিতা স্ত্রী নাটালিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। কিন্তু বিদ্রোহমূলক যুদ্ধের অবসানে গ্রেগরী ফিরে এল আকসিনিয়ারই কাছে—তারই কাছে যেখানে তার মন পড়ে আছে। ডন নদী নিরুপদ্রবে বয়েই চলেছে।

১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের যে-যুদ্ধ, দর্শক হিসেবে আমরা যদি তার শরিক হতে পারতুম, তাহলে 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' ছবির যুদ্ধের দৃশ্যগুলি আমাদের রক্তে নিশ্চয়ই নাচন ধরিয়ে দিতে সক্ষম হত। ঘোড়ার পিঠে চড়ে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার দৃশ্যগুলি অর্থব্যঞ্জক সার্থকতায় ভরে উঠতে পারত। কিন্তু এই বিদ্রোহমূলক গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এত বেশী দূরে অবস্থিত যে, ছবির যেদিকটা আমাদের কাছে আসল ও মুখ্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, সেই সর্বগ্রাসী প্রেমের গল্পের মধ্যে এই যুদ্ধ দৃশ্যগুলিকে অযথা প্রক্ষিপ্ত বাধা বলে মনে হয়েছে। অথচ এও সত্যি যে, এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত না হলে আকসিনিয়ার জীবন হয়ত স্টেফানের স্ত্রীরূপেও অতিবাহিত হত; গ্রেগরীর প্রতি তার আন্তরিক ভালবাসা সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে কোনদিনই মিলিত হতে পারত না কিম্বা তার পক্ষে সৈন্যদলের নব্যকর্তার কামনার আগুনে দগ্ধ হওয়াও সম্ভব হত না। কিন্তু ছবি দেখে আমরা মনে করতে বাধ্য হয়েছি যে, প্রেমের গল্পটির সঙ্গে

বি-এফ-জে-এর পুরস্কার বিতরণী সভায় ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। সঙ্গে আছেন শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রীমতী কানন দেবী এবং শ্রীবাগীশ্বর ঝা।
ফটো : অমৃত

বি-এফ-জে-এ পুরস্কৃত তিনজন : সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, রাজ কাপুর ও শচীন দেব বর্মণ।
ফটো : অমৃত

যুদ্ধের ঘটনাটিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয় নি।

অভিনয়ে আকসিনিয়ার ভূমিকায় এলিনা বাইস্ট্রিটস্কায়া অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অসামান্য নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রেগরীর অবহেলিতা স্ত্রীরূপে জিনাইডা কিরিয়েন-কোর অভিনয় সজীব ও সাবলীল। গ্রেগরীর ভূমিকায় পিওতর গ্লেবভ পুরুষত্বের প্রতি-মূর্তি—কি যোদ্ধৃবেশে, কি প্রেমিক বেশে। প্রায় সব রুশ ছবিতেই যে আশ্চর্য স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়, বর্তমান ছবিটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ছবি দেখতে-দেখতে কোন সময়েই মনে হয় না যে, কৃত্রিম দৃশ্যপটের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে শিল্পীরা অভিনয় করছেন। মনে হয়, সবই বাস্তব। বহু ঘটনা ও যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও 'ধীরে বহে ডন' — এই কথাটিকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ডন নদীর শান্ত চিত্রকে দর্শকদের চোখের সামনে সুকৌশলে তুলে ধরে।

সোভো-কলারে রঞ্জিত 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে অকল্পনীয় শিল্পচাতুর্য ও দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। —নান্দীকর

'বালিকা বধূ' চিত্রের শুভমুক্তি

তরুণ মজুমদার পরিচালিত চিত্রদীপ সংস্থার 'বালিকা বধূ' ২ জুন থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্র-গৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। বিমল কর রচিত এ কাহিনীর মুখ্য কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা ও বঙ্কিম ঘোষ। ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'দুষ্টু প্রজাপতি' মুক্তি প্রতীক্ষিত

বোম্বাইয়ে নির্মিত বাংলা ছবি 'দুষ্টু প্রজাপতি' শীঘ্রই মিনার, বিজলী, ছবিঘর প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ললিত চিত্রমের পক্ষ থেকে ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্যাম চক্রবর্তী। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রয়েছেন কিশোরকুমার, তনুজা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, কানু রায়, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী ও অসীমকুমার। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশক বাণীশ্রী পিকচার্স।

'জলতরঙ্গ' চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণ

কাহিনীকার ও পরিচালক অজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর নব-নির্মিত চিত্র 'জল-তরঙ্গ'-এর সঙ্গীত সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও গ্রহণ করলেন। সঙ্গীতবহুল এ চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ। শ্রীঘোষের পরিচালনায় দুটি গানে কণ্ঠদান করেছেন শ্যামল মিত্র ও আরতি

মুখোপাধ্যায়। ছবির বাকি গানগুলি শীঘ্রই গৃহীত হবে। ছবির নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ আগামী মাস থেকে শুরু হবে বলে জানা গেল।

কাশ্মীর বহির্দৃশ্যে 'ঝুক গয়া আসমান'

প্রযোজক-পরিবেশক আর ডি বনশলের রঙিন ছবি 'ঝুক গয়া আসমান'এ বহির্দৃশ্য গত দু সপ্তাহ ধরে কাশ্মীর অঞ্চলে গ্রহণ করছেন পরিচালক লেখ ট্যাণ্ডন। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রাবানু, রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম চোপরা, ডেভিড, দুর্গা খোটে এবং জগীরদার। সংগীত পরিচালনা করছেন শংকর-জয়কিষণ। ছবিটি সমাপ্ত প্রায়।

ভাসু মেননের পরবর্তী ছবি 'নয়ি রস্নি'

ভাসু ফিল্মসের পতাকাতলে প্রযোজক ভাসু মেনন তাঁর আগামী ছবিটির নাম রেখেছেন 'নয়ি রস্নি।' নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এটির মুখ্য অংশে অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন অশোককুমার, মালা সিনহা, বিশ্বজিৎ, রাজকুমার, তনুজা, ভানুমতী, সুলোচনা, প্রতিমা দেবী ও আনোয়ার হোসেন ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হবে।

প্রথম ছবি 'ফির ওহি শ্যাম'

কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার শচীন ভৌমিক সর্বপ্রথম যে ছবিটি পরিচালনা করছেন তার নাম 'ফির ওহি শ্যাম'। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও কল্পনা। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রাহুল দেব বর্মন।

সমবায়ী নাট্যসংস্থার 'কালিন্দী'

প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাগুলোর বলিষ্ঠ নাট্যপ্রয়োজনার সাথে তাল রেখে আজকাল কিছু কিছু অফিস নাট্যসংস্থা উন্নত ধরনের অভিনয়রীতির মান প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছেন। সম্প্রতি কলকাতা এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার ও সেণ্ট্রাল জোনালের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারিবৃন্দের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'সমবায়ী' মিনার্ভা থিয়েটারে এই প্রচেষ্টার একটি বাস্তব রূপ দেবার জন্য মঞ্চস্থ করলেন তারাশঙ্করের জীবননিষ্ঠ নাটক 'কালিন্দী'।

সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পীদের দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামেশ্বরের ভূমিকায় অধীরচন্দ্র দে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চরিত্রটির অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাকে মঞ্চে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। অচিন্ত্য চরিত্রে জগন্নাথ রায়চৌধুরী এমন এক প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিমা প্রকাশ করেছেন যার জন্য মনে হয়েছে সমগ্র নাটকের প্রাণসৃষ্টিতে তার দান অনেক। সুনীতির ভূমিকায় মেনকা দাসের সংযত বাকভঙ্গিমা প্রায় সবাইকে মুগ্ধ করেছে। নিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর বোস নিজ নিজ চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় চিহ্নিত করেছেন। উমা চরিত্রে প্রতিমা চক্রবর্তীর অভিনয় আন্তরিকতার স্পর্শ দিতে পারেনি। সারীর ভূমিকায় মিতা চ্যাটার্জির অভিনয়ও প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি। আবহসঙ্গীত ও মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে পরিচালক শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন সংস্থা সম্পাদক প্রণব গুহঠাকুরতা।

দ্বিতীয় পাণিপথ

গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক গত ৬ই মে দর্জিপাড়া যতীন মিত্র পার্ক সংলগ্ন শীতলা পূজা প্রাঙ্গণে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক রচিত 'দ্বিতীয় পাণিপথ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অভিনয়ে শ্রীধীরেন চক্রবর্তী, সমীর ব্যানার্জি, প্রাণশঙ্কর গোস্বামী, জগবন্ধু আচার্য, শশাংক চ্যাটার্জি, প্রদ্যোৎ বসাক, গৌরচন্দ্র পাল, সুবোধ সরকার, পরেশ পাল, দেবব্রত ও দেবজ্যোতি,

কৃষ্ণ দাসগুপ্ত, মনোজ বসু, সুব্রত রায়, রমেন চ্যাটার্জি, লতিকা দাস, অঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন। নাট্যপরিচালনায় ধীরেন চক্রবর্তী দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

আমরা নাট্যগোষ্ঠী

সম্প্রতি 'আমরা নাট্যগোষ্ঠী'র শিল্পীবৃন্দ থিয়েটার সেন্টারে দুটি অ্যাবসার্ড নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটক দুটির নাম 'শেষ ফিতে' (বেকেটের 'ক্যাপস লাস্ট টেপ' এর ভাবানুবাদ) ও 'চিড়িয়াখানা' (আলবির 'জু'র স্টোরির' ভাবানুবাদ)। প্রথম নাটকটিতে অভিনয় করেন শ্রীবর্ধন ও একটি টেপ রেকর্ডার। দ্বিতীয় নাটকে অংশ নেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনা করেন শংকর ঘোষ।

এই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রথম নাট্য প্রযোজনা খুব একটা উচ্চমানের হয়নি। অ্যাবসার্ড নাটকের আবেদনকে মঞ্চে স্বাভাবিক করে তুলতে যে মঞ্চসজ্জা ও আলোক-সম্পাতের কৌশল সঞ্চারিত করতে হয়, তা এই অভিনয়ে অনুপস্থিত থেকেছে। তা ছাড়া শিল্পীদের অভিনয়ও খুব সম্ভব দর্শককে মুগ্ধ করতে পারেনি।

ঋতায়নের 'সিংহদ্বার'

গত ১৮ই মে ঋতায়ন নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় খরাপীড়িত অঞ্চলের আর্ত মানুষের সাহায্যকল্পে তাদের 'সিংহদ্বার' নাটক মুক্ত অংগনে মঞ্চস্থ হয়ে গেল।

সিংহদ্বার আপাতঃদৃষ্টিতে একটি রাজনৈতিক নাটক বলে মনে হলেও মূলতঃ এটি জীবনবোধ সম্বন্ধে নাট্যকারের মৌল চিন্তার পরিচায়ক। জীবন রক্ষিত—উপজীব্য ছিল মাস্টারী—না খেতে পেয়ে তার বউ গলায় দড়ি দেয়—সংসারে নষ্টি পোষ্য তারই মুখ চেয়ে—অথচ প্রতিকারহীন নিরুপায় জীবন। শেষ পর্যন্ত একটি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার মুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে যায় দেশের আগামীদিনের খাদ্যমন্ত্রীর কাছে।

একটি দৃশ্যের এই নাটকে ঘটনাস্থল হিসাবে স্টেশনের ওয়েটিং রুম বেছে নেওয়ায় এটি একদিকে যেমন ব্যঞ্জনাধর্মী অন্যদিকে তেমনিই নাটকীয় হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। মধ্যরাতে, স্টেশনের ওয়েটিং রুমে খাদ্যমন্ত্রীর পদের উমেদারীতে একের পর এক আসছেন—সাত্যকি, রায়বাহাদুর ও ছোটেলাল, অনিরুদ্ধ। এখানের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈশান গাংগুলী—যাঁর কথায় পার্টি ওঠে বসে—তিনি অত্যন্ত সতর্ক বিচক্ষণতায় তাঁরই প্রিয়পাত্রী হেনার খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার পথের কাঁটা দূর করছেন। ঈশান চরিত্রে মনোজ মিত্র যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আরোপ করে বাস্তবানুগ করতে পেরেছেন। অভিনয়ে চরিত্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অথবা একাত্মতা—তিনি সমান দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন। হেনার ভূমিকায় শান্তা সেনগুপ্ত খুবই সাবলীল। অন্যান্য ভূমিকায় মানব চন্দ (সাত্যকি), প্রদীপ পাল (রায়বাহাদুর), অচিন্ত্য চক্রবর্তী (ছোটেলাল) নাটকের প্রয়োজন যথাযথভাবে মিটিয়েছেন বলা চলে। অনিরুদ্ধের ভূমিকায় নিতাই ঘোষ স্বাভাবিক অভিনয় করেন।

মঞ্চপরিকল্পনায় অজয় দত্তগুপ্ত বিশেষ মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আলোক-সম্পাতে স্বরূপ মুখোপাধ্যায় নাটকীয় মুহূর্তগুলি আরো ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারতেন। বিশেষ করে নাটক শুরু হওয়ার সময় মঞ্চ একেবারে অন্ধকারে রেখে তিনি দর্শকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে বঞ্চিত করেছেন বলেই মনে হয়। এ নাটকে আবহসংগীতের প্রয়োগে অমল চক্রবর্তী প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

পারিজাত সংঘ

সিনথীর পারিজাত সংঘের শিল্পীরা সম্প্রতি স্থানীয় কল্যাণ কেন্দ্রের মুক্ত-অংগনে কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয় নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। ইলা সান্যাল, বাবলু মুখোপাধ্যায়, অজয় মল্লিক, শ্যামল রায়চৌধুরীর প্রাণবন্ত অভিনয় সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

রূপমহল

সম্প্রতি শ্রীরামপুর রায় ময়দানে জোছন দস্তিদারের 'দুইমহল' নাটক পরিবেশন করেছেন 'রূপমহলে'র শিল্পিবৃন্দ। অজিত বাগ, রনেন ঘোষ, প্রশান্ত চক্রবর্তী, ঋনু চৌধুরী অভিনয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ভালো অভিনয় করেন স্বরজিৎ ভট্টাচার্য, তেজোময় গুহ। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন কাজল সেন।
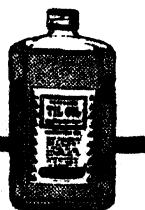
বিবিধ সংবাদ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন-এর ৩০তম বার্ষিক সংসাপত্র বিতরণী উৎসব :

২৩এ মে, মঙ্গলবার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রবীন্দ্রসদনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের (বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের) ত্রিংশ বার্ষিক শংসাপত্র (সার্টিফিকেট অব মেরিট) বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅশোককুমার সরকারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বিধুভূষণ মালিক। বি এফ জে এ মনোনীত ১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় চিত্র ও শ্রেষ্ঠ তিনটি বিদেশী চিত্রের প্রযোজক বা তাঁদের প্রতিভূ, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, পরিচালক, চিত্রনাট্যরচয়িতা, সংলাপলেখক, সুরশিল্পী, গীতিকার, আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক এবং নেপথ্য-কণ্ঠশিল্পীদের শংসাপত্র বিতরণ করেন বাঙলা চলচ্চিত্রজগতের সর্বাপেক্ষা বরণীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী। প্রতিটি শংসাপত্রপ্রাপককে বাগীশ্বর ঝা সম্পাদিত ১৯৬৭ সালের বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী উপহার দেওয়া হয়। এ ছাড়া বাঙলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রদত্ত 'বড়ুয়া মেমোরিয়াল প্লাক' (ফলক) এবং বাঙলা ও হিন্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীনবেন্দু ঘোষ (এঁর স্ত্রী উপহার নেবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন)-কে 'প্রসাদ সিংহ স্মৃতি পুরস্কার' নামে দুটি পদক উপহার দেওয়া হয়। শংসাপত্র গ্রহণের জন্যে স্থানীয় প্রাপকগণ ছাড়া বোম্বাই থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ কাপুর, কামিনী কৌশল, শচীন দেববর্মন, বাসু ভট্টাচার্য, ফণীশ্বর রেণু এবং নবেন্দু ঘোষের প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁর স্ত্রী। বাঙলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা উত্তমকুমার সম্প্রতি অসুস্থ থাকায় তাঁর পুত্র গৌতমকুমার শংসাপত্র গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে বি এফ জে এ'র চিরাচরিত প্রথামত উপস্থিত সকলের জন্যেই জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল। এ ছাড়া বি এফ জে এ'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক আনন্দ-বাজার পত্রিকার অশোককুমার সরকার শংসাপত্রপ্রাপক ও বি এফ জে এ'র সভ্যবৃন্দের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে প্রদত্ত এক সান্ধ্যভোজে মিলিত হয়েছিলেন।

বি-এফ-জে-এর শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার নিচ্ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির আগামী অনুষ্ঠান :

আসছে ৫ই ও ৬ই জুন অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস গৃহে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে যথাক্রমে ইউ-এস-এস-আর-এর 'ওথেলো' এবং ফ্রান্সের 'অরফী নিগ্রো' ছবি দুখানি দেখান হবে।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে ফরাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী :

আসছে ৫ই জুন গোখলে স্কুলস্থিত সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে ন্যুভেলভাগ সম্প্রদায়ভুক্ত পরিচালক মার্চেল কামাস পরিচালিত ও ১৯৫৯ সালে কান চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে গ্রাপীপ্রাপ্ত 'অরফী নিগ্রো' ছবিখানি ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়া ও ফরাসী কালচারাল ইনস্টিটিউট-এর সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে প্রদর্শিত হবে।

'বিচিত্রিতা' অনুষ্ঠিত নটরাজ :

রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিচিত্রিতা সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যবৃন্দ বর্ষব্যাপী ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অন্তর্লোকের পরিবর্তনকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'নটরাজ' গাথাটি আবৃত্তি,

বি-এফ-জে-এর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার নিচ্ছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

গান ও নৃত্যসহযোগে অভ্যাগতবৃন্দের সামনে উপস্থিত করেন গেল ২৮এ মে, রবিবার সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে।

উত্তর হাওড়া চলচ্চিত্র-চক্রের অনুষ্ঠান :

গেল ২৮এ মে, রবিবার সকালে হাওড়া মায়া সিনেমা গৃহে নর্থ হাওড়া ফিল্ম সার্কেল (উত্তর হাওড়া চলচ্চিত্রচক্র) পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত বিতর্কমূলক এক্সপেরিমেন্টাল চিত্র 'স্বপ্ন নিয়ে' প্রদর্শনীর আগে ঐ ছবিটি সম্বন্ধে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, কৌতুকাভিনেতা

রবি ঘোষ এবং 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবির অন্যতম অভিনেত্রী উত্তরা দাস।

ছোটদের আসরের উৎসব

ভাই-বোনেদের আসর গত ২রা বৈশাখ শিশু-সাহিত্যসম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের জন্মোদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর লেখা 'রূপকথার' শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি এবং লিখিত চিঠি-পত্রের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আসরের পরিচালক শিশু-সাহিত্যিক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

এছাড়া প্রতি বছরের মত এ বছরও 'তোমাদের দেশকে চেনো' এ পর্যায়ে সোনারপুরের অন্নপূর্ণা সিনেমার সহযোগিতায় প্রায় দুই সহস্র ছাত্র-ছাত্রীকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বিনা প্রদর্শনীতে 'কাশ্মির', 'মণিপুর', 'ভারতে আণবিক শক্তির কেন্দ্র' এবং 'ভারতের পশু-পক্ষী' সম্বন্ধে রঙ্গীন দলিল-চিত্র দেখিয়ে ছোটদের মনে প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দের সঞ্চার করেন।

আসরের পরিচালকের এই অভিনব পরিকল্পনার জন্য এবং সারাবছর বিনা প্রদর্শনীতে এই আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের জন্যে ছোটরা 'সমবেত করতালির' মাধ্যমে অভিনন্দন জানান।

বিচিত্রানুষ্ঠান

সম্প্রতি দুর্গাপুরে সর্বমঙ্গলা সমিতি দুর্গাপুরে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে সুবীর সেন, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত ব্যানার্জি, নিতাই গোস্বামীর অনুষ্ঠান শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দেয়। অনুষ্ঠানে একমাত্র কৌতুক শিল্পী মলয় রাহার অনুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

'বালিকা বধূ' চিত্রে পার্থ মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।

গানের জলসা

রবীন্দ্র-মেলা

কবিগুরুর জন্মলগ্নটিকে কেন্দ্র করে নগরের চারপ্রান্তে যখন উৎসবের পর উৎসব তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল, উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকাননে পক্ষকালব্যাপী আয়োজিত রবীন্দ্রমেলা যেন মধ্যমণির মত সকল উৎসবের মিলনসেতু হয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে, ঔজ্জ্বল্যে এবং আদর্শনিষ্ঠায় ঝলমল করছিল। এ উৎসবের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রীসুহৃদ রুদ্রের বক্তব্য এই উপলক্ষ্যে স্মরণীয়। প্রতি বৎসর রবীন্দ্র-মেলা যে আনন্দোৎসবের আয়োজন করে তার উদ্দেশ্যও কবিকে জানা, তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে, সৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া। তাই এ উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে। এই মূল্যবোধের প্রতিজ্ঞা রবীন্দ্র-মেলার উদ্যোক্তাদের প্রতিটি কাজে, প্রতি পদক্ষেপে সযত্ন-পালিত।

রবীন্দ্রকাননের প্রাঙ্গণ হয়ত দর্শক-সংখ্যানুপাতের তুলনায় সুবিস্তৃত, সুবিশাল নয়। কিন্তু তার জন্য কোথাও ছন্দপতন ঘটে নি। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী'—দর্শনের উদ্যত খড়্গ তুলে কারও উৎসাহকে রবীন্দ্রমেলা স্তিমিত করে নি। সবিনয়ে সকল অতিথিকে সাদর আহ্বান জানিয়ে উদ্যোক্তরা যেন এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'না হয় হবে ঘেঁসাঘেঁসি, এমন কিছু নয় সে বেশী'। সকলের সঙ্গে মিলিত হবার এবং সকলকে মেলানোর এই উজ্জ্বল আবেগই হল মেলার প্রাণ। এই মিলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রবীন্দ্রমেলা উদ্‌যাপন সার্থক। সকলকে আহ্বান করবার গ্রহণ করবার এবং আনন্দে-বেদনায়, স্বন্দে-ক্ষমায় মিশিয়ে পরিপূর্ণতায় পৌঁছুবার সত্যিই রবীন্দ্রমানসের গোড়ার কথা এবং শেষ কথাও। এ'দের অনুষ্ঠানসূচীও আকর্ষণীয়। কোলকাতার চারদিকে ছড়িয়ে-থাকা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় নৃত্য, সঙ্গীত এবং নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠান একত্র করে নানা রঙ্গ ফুলের সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত একটি মালা গেঁথে এ'রা যেন অতিথিদের উপহার দিয়েছেন। প্রথিত-যশাদের সঙ্গে সমান তালে স্থান পেয়েছেন উদীয়মান এবং তরুণ শিল্পিবৃন্দ। যেমন থিয়েটার সেন্টারের ষোড়শী, উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেন্টারের পরিচয়, মহিলা শিল্পী মহলের শেষরক্ষা, অভিনেত্রী সঙ্ঘের কাবুলীওয়ালা, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের মারার খেলা, এম-জি এন্টারপ্রাইজের চন্দ্রশেখর, থিয়েটার ইউনিটের কৃপণের ধন, আনন্দমেলার জ্যাঠামহাশয়—এ'দের সঙ্গে সমাগ্রহে গৃহীত হয়েছে ত্রিবেণীর মেঘের পরে মেঘ, ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ব্যালে গ্রুপের পুজারিণী, বর্তিকার নষ্টনীড়, একতারার রবিপ্রেম, মল্লারের রাজকবি, সুরঙ্গমার গ্রামীণ কবি নৃত্যনাট্য। ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষেত্র এটা নয়। কারণ কবি-পূজার শ্রদ্ধামিশ্র আবেগ নিয়েই সকল শিল্পী আপন আপন মানানুযায়ী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের আন্তরিকতা ও একাগ্রতার অভাব কোথাও ঘটে নি। এইটেই বড় কথা।

উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টারের পরিচয়-এ রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত গানের উজ্জ্বল পরিচয় অনাহত ছিল। কবিপক্ষ উপলক্ষে একটি নতুন অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছিল নমো যন্ত্র। কবির মুক্তধারা নাটকের একটি গানের নৃত্যরূপ যন্ত্রদানবের সঙ্গে মানবিক আদর্শের সংঘাতকে যেভাবে জীবন্ত করে তুলেছিল তা শঙ্কর ঘরানার শিল্পী-দেরই উপযুক্ত। একটি অনুষ্ঠানে শ্রীমতী অমলাশঙ্করের আবির্ভাব দর্শকমহলকে আনন্দমুখর করে তুলেছে। কমলেশ মিত্রের তবলাতরঙ্গ আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

ত্রিবেণী অনুষ্ঠিত মেঘের পর মেঘ উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক অপূর্ব সমন্বয়। নৃত্যগীতালেখ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত সুমিত্রা সেনের পরিচালনায় সুপরিবেশিত। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন প্রসূন ব্যানার্জি। প্রসূন ও মীরা ব্যানার্জির সময়োপযোগী রাগসঙ্গীত খুবই উপভোগ্য। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্রসূন

ব্যানার্জি গীত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রাবণ গহন রাত্রি—তাঁর পরিশীলিত কণ্ঠে ম্যানোরিজমবর্জিত ভঙ্গীতে আবেগপূর্ণ পরিবেশন একটি সরস আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাট্যের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাক-রবীন্দ্রযুগের কিছু নাট্য মঞ্চস্থ করে বাংলা নাট্যের ধারার সঙ্গে সাধারণ দর্শকের পরিচয় ঘটানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করবার মত।

একক সঙ্গীতে শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চ্যাটার্জি, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি জনপ্রিয় প্রথিতযশা শিল্পীরা ত ছিলেনই। এ ছাড়া তরুণতর গোষ্ঠীর মধ্যে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, বাণী ঠাকুর, সাগর সেন, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ সেন আনন্দ দিতে পেরেছেন। দুটি নতুন মুখ উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকান্ত শীল এবং রথীন ব্যানার্জি।

সব অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে উঠেছিল সমাপ্তি-রজনীর "গুণীজন সম্বর্ধনা"। সে সন্ধ্যা যেন জীবনের অসংখ্য মুহূর্তে থেকে বেছে নেওয়া, একটি মূল্যবান মুহূর্তের ছোট্ট সুন্দর গীতিকাব্য। পরিসরে স্বল্প কিন্তু গভীরতায় অতলস্পর্শী। এবারে এঁরা সুবিখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এবং চিত্রজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীতশিল্পীরূপে কানন দেবীকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। দুই জগতের দুই দিকপাল ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর এই অনুষ্ঠান রবীন্দ্রমেলা মণ্ডপে এক মর্যাদাগম্ভীর আবেগের পরিবেশ রচনা করেছিল। উভয়ের ললাট চন্দনচর্চিত করলেন পূজারিণী সজ্জায় বালিকা শিল্পীদ্বয়। তারপর উভয়ের হস্তে মানপত্র, রৌপ্যপাত্রে উত্তরীয়, গরদের ধুতি, বেনারসী শাড়ী, পুষ্পমাল্য ও পঞ্চফল অর্পণ করে শ্রীসুহৃৎ রুদ্র বাংলা সাহিত্যে বনফুল ও কানন দেবীর বিচিত্র অবদানের কথা উল্লেখ করে বললেন, বাঙালী রসের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের স্বপ্নে এঁদের কাছে ঋণী, সেই ঋণস্বীকারের পুণ্যলগ্নে উভয়কেই জনসাধারণ ও রবীন্দ্রমেলার পক্ষ হতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছেন। কানন দেবীর প্রসঙ্গে বললেন—রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে যাঁরা প্রথম যুগে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন—ইনি তাঁদেরই একজন। আজ কবির গানে সারা দেশ প্লাবিত। সেই গান প্রথম ছড়িয়েছিল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। সেদিনের গাওয়া কানন দেবীর "আজ সবার রঙে রং মেশাতে হবে" লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। কবির গানকে জনগণের আসরে পৌঁছে দিয়ে—জনপ্রিয় করার মহৎ দায়িত্বের ইনিও একজন বড় অংশীদার। তাই কবির গানের উৎসবে আজ তাঁর জয়মাল্য পরাবার মহালগ্ন। এ কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরে রবীন্দ্রমেলা ধন্য। দর্শকমণ্ডলী থেকে তুমুল অনুরোধ আসে কানন দেবীর গানের জন্য।

'রবীন্দ্রমেলা'য় মঞ্চস্থ মহিলা শিল্পী মহলের 'শেষরক্ষা' নাটকে কানন দেবী এবং বিভিন্ন পুরুষদের চরিত্রে অঞ্জুরবালা, সীতা মুখার্জি ও মঞ্জু দে।

বনফুল গভীর কৃতজ্ঞতায় এই সম্বর্ধনা গ্রহণান্তে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ সকল সাহিত্যিকের প্রেরণাস্বরূপ। তাই রবীন্দ্রমেলার এ সম্মান বরণীয়। জনমানসের দুঃখবেদনাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার কাজ বড় আনন্দের। এ আনন্দের কর্তব্য যদি কিছুমাত্র সম্পন্ন করতে পেরে থাকি তাতেই আমি ধন্য।"

কানন দেবী তার সুরভরা কণ্ঠে বললেন—"সঙ্গীতশিল্পীর সম্মানের আমি কতটা যোগ্য তা জানি না। তবে এদিক দিয়ে যদি আপনাদের খুশি করতে পেরে থাকি তা আমার প্রতি ঈশ্বরের অপরিসীম করুণা। মোটামুটি গাইবার মত একটা গলা পেয়েছিলাম, গুরুরা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আপনারা সাদর সাগ্রহে আমার গানকে গ্রহণ করে আমায় প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। যদি 'শিল্পী' নামের কাছাকাছিও পৌঁছতে পেরে থাকি, সে আপনাদেরই সৃষ্টি, আপনাদেরই দান। এর জন্য আপনাদের কাছে আমি ঋণী। রবীন্দ্রমেলার সুহৃৎ রুদ্র এবং অন্যান্য উদ্যোক্তারা এই ঋণস্বীকারের সুযোগ আমায় দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের কাছে এবং আপনাদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" অনভ্যাসের দরুণ গান শোনানোর অনুরোধ রাখতে পারেন নি। কানন দেবীর আবেগভেজা কথার আন্তরিকতা সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

রবীন্দ্র-মেলার মণ্ডপে যখন নাট্য-সঙ্গীত ও নৃত্যের সমারোহ চলছিল—তখন মেলাপ্রাঙ্গণে যাত্রাগান, গ্রামীণ শিল্পজাত দ্রব্য, ছায়াচিত্র প্রদর্শন ইত্যাদিতে প্রাচীনকালের এক বিস্মৃতপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরে—প্রাচীন বাংলার এক অবলুপ্তপ্রায় রূপকে নবীনযুগের কাছে জীবন্ত করে তুলেছিলেন রবীন্দ্র-মেলা কর্তৃপক্ষ।

'রবীন্দ্রমেলা'র গুণীসম্বর্ধনা আসরে চলচ্চিত্রশিল্পী ও পরিচালক শ্রীমতী কানন দেবী এবং সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে (বনফুল) সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ন রেল দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলার দিনে দাঙ্গাহাঙ্গামায় আহত একটি নিরীহ বালক। —ফটো ঃ অমৃত

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (মে ২২—২৭) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ১২টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল—৯টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি, ২টি খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র এবং একটি খেলা (মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ন রেলওয়ে) পরিত্যক্ত।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল আলোচ্য সপ্তাহে ৪-০ গোলে হাওড়া ইউনিয়ন এবং ৪-২ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে পরাজিত করে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। হাওড়া ইউনিয়ন দলের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে পরিমল দের 'হ্যাটট্রিক' এ মরশুমের প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় প্রথম 'হ্যাটট্রিক'। বর্তমানে (মে ২৭) ইস্টবেঙ্গল দল তিনটি খেলায় ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছে। লীগ তালিকায় প্রথম স্থানে আছে এরিয়ান্স—তাদের ৬টা খেলায় ৯ পয়েন্ট উঠেছে (জয় ৩ এবং ড্র ৩)। বি এন আর আছে ২য় স্থানে—৫টা খেলায় ৮ পয়েন্ট (জয় ৪ এবং হার ১)। বি এন আর উপর্যুপরি তিনটে খেলায় জয়ী হয়ে তাদের ৪র্থ খেলায় ০-১ গোলে এরিয়ান্সের কাছে পরাজিত হয়। তৃতীয় স্থান অধিকারী উয়াড়ী ৬টা খেলা ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্ট-বেঙ্গল দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে ৪র্থ স্থানে আছে গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান (৩টে খেলায় ৬ পয়েন্ট)। উপর্যুপরি তিনটে খেলায় জয়লাভের পর ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের বিপক্ষে তাদের অসমাপ্ত ৪র্থ খেলায় মোহনবাগান শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তাদের এই ব্যর্থতা উপলক্ষ্য করে মাঠের সবুজ গ্যালারী থেকে একশ্রেণীর উচ্ছৃংখল দর্শক মাঠের মধ্যে সোডার বোতল এবং ইস্টক নিক্ষেপ শুরু করেন। ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, রেফারীর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠে। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার প্রশ্নে রেফারী শেষপর্যন্ত খেলা বন্ধের সংকেত ঘোষণা করেন। এইসময়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে দল ২-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। খেলা বন্ধ করার অবস্থা শান্ত হয়নি বরং সবুজ গ্যালারী থেকে এক মারমুখী জনতা মোহন-বাগানের খেলোয়াড়দের এবং তাঁবুর উপর চড়াও হয়। মোহনবাগানের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং পুলিশ সমেত বহু দর্শক অল্পবিস্তর আহত হন। এঁদের মধ্যে মোহনবাগানের রাইট হাফ লতিফ গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হন। একদল মারমুখী দর্শক গ্যালারী এবং মোহনবাগানের তাঁবুতে আগুন লাগাতে চেষ্টা করেন; কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে তা রক্ষা পেলেও মোহনবাগানের গোলরক্ষক পি বর্মনের স্কুটারটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং মালিদের রান্নাঘরের ছাউনীটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাছাড়া বাইরের কয়েকটি গাড়িও আক্রান্ত হয়। অবস্থা শান্ত করতে পুলিশকে ১৭ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করতে হয়েছিল।

মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন বর্ষীয়ান খেলোয়াড় শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায় উন্মত্ত জনতার হাত থেকে ক্লাবের সম্পত্তি এবং খেলোয়াড়দের রক্ষা করতে গিয়ে সাংঘাতিক নিগৃহীত হন। দমকল বাহিনীর কাজেও নানারকমের বাধা দেওয়া হয়েছিল। এই দিনের দাঙ্গাহাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তাঁদের ক্লাবের পক্ষে লীগ প্রতিযোগিতার বাকি খেলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফুটবল খেলা উপলক্ষ্য করে উগ্র সমর্থকদের এই ধরনের দাঙ্গাহাঙ্গামা কলকাতার মাঠে অনেক হয়ে গেছে—আজ নতুন কিছু নয়। অত্যন্ত পরি-তাপের কথা, পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে এমনকি ফুটবল খেলায় পীঠস্থান ইংল্যান্ডের মাটিতেও ফুটবল খেলা নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। এইসব ঘটনা খেলাধুলার আদর্শের পরিপন্থী এবং সমাজজীবনে খুবই ক্ষতিকর। ক্রীড়া জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় এইসব নিশ্চয়ই নয়।

ডেভিস কাপ

১৯৬৭ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার বিভিন্ন জোনের খেলা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

২৪শে মে আয়োজিত খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, সমাজসেবী এবং আইনজীবী স্বর্গীয় দীনবন্ধু সেনের (দাঁতি সেন) প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে কলিকাতা অনাথ আশ্রমের ১০০ জন বাসিন্দার মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হয় এবং সন্ধ্যা ৬টায় নববৃন্দাবন মন্দিরে অনুষ্ঠিত সভার সূচনা হয় ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সুললিত গীতা ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এরপর উপ-পৌর প্রধান শ্রীশিবকুমার খান্নার সভাপতিত্বে স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউরোপীয়ান জোনের এ গ্রুপের সেমি-ফাইনালে খেলবে স্পেনের বিপক্ষে বৃটেন এবং রাশিয়ার বিপক্ষে চিলি। অপর দিকে বি গ্রুপের সেমি-ফাইনালের একদিকে খেলবে ব্রেজিলের বিপক্ষে ইতালী এবং অপর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফ্রান্স।

গত বছর মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে ব্রেজিল ২-৩ খেলায় ভারতবর্ষের কাছে পরাজিত হয়েছিল। গত বছর ইউরোপীয়ান জোন থেকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল ব্রেজিল এবং পশ্চিম জার্মানী।

এ বছরের এশিয়ান জোনের ফাইনালে খেলবে ভারতবর্ষ এবং জাপান। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং জাপান ইতিপূর্বে ৬ বার মিলিত হয়েছে এবং প্রতিবারই জাপানের বিপক্ষে ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে।

নর্থ আমেরিকান জোনের ফাইনালে উঠেছে আমেরিকা এবং মেক্সিকো; অপর দিকে আমেরিকান জোনের দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনালে ইকুয়াডোর এবং আর্জেন্টিনা।

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

কার্ডিফে আয়োজিত ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম গ্লামর্গান কাউন্টি দলের তিন দিনের খেলাটি বৃষ্টির দরুণ খেলার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের কিছু পরে পরিত্যক্ত হয়। প্রথম দিনে বৃষ্টির কারণেই একটা বলও খেলা হয় নি। দ্বিতীয় দিনে একই কারণে দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়েছিল, দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, গ্লামর্গান দল ৮ উইকেট খুইয়ে মাত্র ১১৭ রান সংগ্রহ করেছে। ভারতীয় দলের বোলিংয়ের মুখে গ্লামর্গান দলের খেলোয়াড়রা মোটেই সহজভাবে ব্যাট করতে পারেন নি। প্রসন্ন একাই মাত্র ২১ রানে পাঁচটি উইকেট পান। গ্লামর্গান দলের পক্ষে এলান জোন্স সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন।

তৃতীয় দিনে গ্লামর্গান দল আর ব্যাট করতে নামে নি। পূর্ব দিনে সংগৃহীত ১১৭ রানের উপর (৮ উইকেট) তারা প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৮৭ (৫ উইকেটে)। ভারতবর্ষের ৯৪ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়, তৃতীয় দিনটি ছিল শেফার্ডের সাফল্যেরই দিন। তিনি ১০ রানে ৪টে উইকেট পান। এক সময় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৫ ওভার এবং মাত্র ২ রানে ৪টে উইকেট।

গ্লামর্গান: ১১৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে: এ জোন্স ৩৬ রান। প্রসন্ন ২১ রানে ৫, চন্দ্রশেখর ৪০ রানে ২ এবং বেদী ২৭ রানে ১ উইকেট)।

ভারতীয় দল: ৯৪ রান (৬ উইকেটে। ইঞ্জিনীয়ার ৩০ এবং আর শাকসেনা নট-আউট ২৪ রান। শেফার্ড ১০ রানে ৪ উইকেট)।

বৃষ্টির দরুণ এম সি সি'র বিপক্ষে ভারতীয় ক্রিকেট দলের গুরুত্বপূর্ণ তিন দিনের খেলাটিও পরিত্যক্ত হয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক পতৌদির নবাব টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দিন এফ এ কাপের ফাইনাল খেলা থাকায় এই খেলা আরম্ভের সময় মাত্র ৫০০ লোক লর্ডস মাঠে হাজির ছিলেন। প্রথম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৪ রানের মাথায় শেষ হয় এবং খেলার বাকি সামান্য সময়ে এম সি সি কোন উইকেট না খুইয়ে এক রান সংগ্রহ করে। ভারতীয় দলের পক্ষে অধিনায়ক পতৌদি এবং হনুমন্ত সিং যা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। পতৌদি তাঁর ৭০ রানে ৮টা বাউণ্ডারী করেন; অপর দিকে হনুমন্ত সিংয়ের সংগৃহীত রানের সংখ্যা ছিল ৩৮। এঁরা দুজনে ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৭৫ রান সংগ্রহ করেন। ভারতীয় দলের খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—মাত্র ৪ রানের মাথায় ১ম ও ২য়, ৫ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। স্নো ৩৮ রানে ৫ এবং প্রাইস ৩৯ রানে ৪ উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে ২১১ রানের মাথায় এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ৭৭ রানে অগ্রগামী হয়। প্রসন্ন ৯১ রানে ৪, বেদী ৫৮ রানে ৪ এবং গুহ ৪২ রানে ২ উইকেট পান। লাঞ্চের সময় এম সি সি দলের রান ছিল ৪৫ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৩৬ (৪ উইকেটে)। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ২৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির দরুণ মাত্র ১৩৫ মিনিট খেলা হয়েছিল। লাঞ্চের পনেরো মিনিট আগে জোর বৃষ্টি নামার ফলে সেই যে খেলা বন্ধ হল তা আর আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। ভারতীয় দলের রান দাঁড়ায় ১০৮ (২ উইকেটে)।

ভারতীয় দল: ১৩৪ রান (পতৌদি ৭০ এবং হনুমন্ত সিং ৩৮ রান। জন স্নো ৩৮ রানে ৫ এবং জন প্রাইস ৩৯ রানে ৪ উইকেট)।

ও ১০৮ রান (২ উইকেটে। সুর্তি ৩৯, ইঞ্জিনীয়ার ২৭ এবং আর সাকসেনা নট-আউট ২৭ রান)।

এম সি সি: ২১১ রান (সি মিলবার্ণ ৫২ রান। প্রসন্ন ৯১ রানে ৪, বেদী ৫৮ রানে ৪ এবং সুব্রত গুহ ৪২ রানে ২ উইকেট)।

জাতীয় খেলাধুলা

শঙ্করবিজয় মিত্র

মহাভারতে একটি ছোট্ট অথচ মনোরম ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজকুমাররা একদিন নগরের বাইরে এসে বীটা নিয়ে খেলছিলেন। দৈবক্রমে তাঁদের বীটা কূপের মধ্যে পড়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা তুলতে পারলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পক্ককেশ কৃশকায় ব্রাহ্মণ নিকটে বসে হোম করছেন দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহ্মণ দ্রোণ। দ্রোণ সেই শুষ্ক কূপে একটি ঈষিকা (কাশতৃণ) ফেলে বীটা বিদ্ধ করলেন, তারপর আর একটি ঈষিকা দিয়ে প্রথম ঈষিকা বিদ্ধ করলেন। এইরূপে পরপর ঈষিকা ফেলে উপরের ঈষিকা ধরে বীটা টেনে তুললেন। মুগ্ধ রাজকুমারেরা তাঁকে ভীষ্মের কাছে নিয়ে গেলে তিনি দ্রোণকে রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু নিয়োগ করলেন। ছোট্ট একটি ঘটনা সেই অখ্যাত কৃশকায় ব্রাহ্মণকে কৌরববংশের রাজকুমারদের গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়।

ঘটনাটির অবতারণা বীটা খেলার প্রাচীনতা দেখাবার জন্যে। বীটা আর কিছু নয়, গুলি-ডাণ্ডা খেলার 'গুলি'। আমরাও ছেলেবেলায় খেলেছি। আধুনিক সভ্যতার নকলনবীশ জীবন এই ধরনের প্রাচীন খেলাগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সহজ স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের জাতীয় অনেক খেলাকেই আমরা এমনিভাবে ভুলে গেছি বা ভুলতে বসেছি। দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার অভিশাপে আমাদের শক্তি ও আনন্দের আকর অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়েছে। আঠার ও উনিশ শতকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি নির্বিচার অনুরাগের আতিশয্যে ভারতের মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় ক্রীড়াপদ্ধতির প্রতি অনুরাগের আতিশয্যে জাতীয় ক্রীড়াপদ্ধতি সম্বন্ধেও শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে তেমনি অশ্রদ্ধা ও অজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমরা আজ ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়েছি। পরানুকরণ যে জাতীয় সমৃদ্ধির পরিপন্থী সেকথা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আজ আমাদের প্রত্যেকটি আচরণে জাতীয়-ভাবাপন্ন হতে হবে। খেলাধুলো ও শরীরচর্চাতেও যত বেশী জাতীয় জিনিসের প্রচলন হয় ততই মঙ্গল। প্রত্যেক জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে সেই জাতির সংস্কৃতিমূলক ক্রীড়া প্রচলনের মূল্য অপরিসীম। সেজন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সকল খাঁটি ভারতীয় ক্রীড়াধারা এখনও টিকে আছে সেগুলির ব্যাপক অনুসন্ধান ও তরুণসমাজে সেগুলির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন রয়েছে। জাতিকে উন্নত করতে হলে তার জাতীয় ধারাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি ঐ জাতীয় ধারার সঙ্গে মিল রেখে সংস্কার আনা যায় তাহ'লে সেই সংস্কৃত ধারা স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবে। শিল্প ও বিজ্ঞানে পশ্চিমের দেশগুলো যতই উন্নতি করছে ততই তারা নানারকম খেলাধুলো ও ব্যায়ামপদ্ধতি আবিষ্কার করছে। আমরা সাগ্রহে সেই সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছি, হয়ত সেগুলো অভ্যাস করে কিছু কিছু সুফলও পেয়েছি কিন্তু পশ্চিমী খেলাধুলোর দ্বারা জাতি হিসাবে আমরা যে খুব উন্নত হয়েছি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ব্যক্তির ও জাতির গভীর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তার ক্রীড়াপদ্ধতি থেকে। বাঙালী যে জলে স্থলে একটা শক্তিশালী যোদ্ধার জাতি ছিল খৃষ্টপূর্ব বহু যুগ থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসে তার বহু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীগ্রামে প্রচলিত সাধারণ নারকেল-কাড়াকাড়ি, হা-ডু-ডু, কুস্তি, সাঁতার, বাইচ প্রভৃতি দেশীয় খেলাগুলোর মধ্যে যে সামরিক উপাদান রয়েছে তা আজকাল অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। বীরভূম, বাঁকুড়ার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত রায়বেঁশে, কাঠি, সারি প্রভৃতি নৃত্যের মধ্যেও এই সামরিক উপাদান লক্ষ্য করে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত তাঁর বিখ্যাত ব্রতচারী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন।

হা-ডু-ডু বা কাবাডি, গাদি, গুলি-ডাণ্ডা, লাঠি, তীরধনুক প্রভৃতি বহু খেলা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে। এই সমস্ত জাতীয় ক্রীড়ার প্রসারের ব্যবস্থা প্রয়োজন। আজ ফুটবল বা ক্রিকেট যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে জাতীয় ক্রীড়াপদ্ধতির প্রতি আমাদের অনীহা। বিদেশী শাসনে আমরা বিদেশীদের দ্বারা প্রচারিত পদ্ধতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে তাকেই গ্রহণ করছি এবং ঐ সকল ক্রীড়াপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক পন্থা সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু যে পরিমাণ আগ্রহ, অনুশীলন ও অর্থ আমরা তাদের পিছনে ব্যয় করেছি কোন জাতীয় ক্রীড়াধারা সম্পর্কে সেই শ্রম ও অর্থ নিয়োগ করলে জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে তাতে কম ফললাভ হত না। দেশের প্রত্যেকটি খেলাধুলার মাঝে যে সব ভাল গুণ লুকিয়ে আছে সেগুলো আলোচনা করে বের করতে ও প্রচার করতে হবে। পুরোনো আইনকানুন অদলবদল করে নতুন ছাঁচে নতুন যুগের মতন করে গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে খেলার নাম ও তার পদ্ধতির। আজ যে সমস্ত বিদেশী খেলা জগজ্জোড়া নাম কিনেছে তাদের গোড়ার দিকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জনপ্রিয়তার পথে এগোতে বহু পরিবর্তন ও যুগোপযোগী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে।

আমাদেরই দেশের খেলা বিদেশীদের হাতে নতুনরূপে, নতুন নামে প্রচারিত হয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে। সানন্দে তাকে আমরা গ্রহণ করেছি। পরের হাতে পড়ার আগে আমরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই পরিবর্তন ঘটাতে পারতাম, ব্যাডমিন্টন তাহলে ইংলণ্ডের খেলা না হয়ে হয়তো ভারতের খেলা। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃটিশ আমলে একদল গোরাসৈন্য পুনাতে থাকার সময় এই খেলাটি দেখে। খেলাটি তাদের খুবই ভাল লাগে। দেশে ফিরে গিয়ে তারা খেলাটির নিয়মকানুন অদলবদল করে একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করে ফেলে। সেখানে ব্যাডমিণ্টন ফোর্ট নামে এক কেল্লার মধ্যে থেকে এর প্রচার হয় বলে এর নামকরণ হয় ব্যাডমিণ্টন। ভারতেরই একটি ক্রীড়াধারা এমনিভাবে বিদেশী ক্রীড়ারূপে নবজন্ম নিল। আজ ব্যাডমিণ্টন সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে।

এমনিভাবেই ভারতের পুরনো খেলা পোলো নাম নিয়ে হাজির হয়েছে এবং আমরাই তাকে অভিনব কিছু ভেবে চমৎকৃত হয়েছি এবং নতুন পরিচয়ে অতীতের পরিচয়কে ভুলে গেছি।

কাবাডি খেলারও এমনি একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩৬ সালে বার্লিন ওলিম্পিকের অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের হনুমান ব্যায়ামমণ্ডলী ভারতীয় খেলা দেখাবার অনুমতি সংগ্রহ করে নানারকম খেলা দেখায়। হা-ডু-ডু (কাবাডি) খেলা দেখে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা মুগ্ধ হন এবং বিশ্বের খেলাধুলার মধ্যে এর একটা বিশিষ্ট স্থান হতে পারে অভিমত প্রকাশ করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁরা ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের খেলাধুলার মধ্যে কাবাডিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি আদায় করেন। মিঃ মামবি ছিলেন তখন ভারতীয় প্রতিনিধিদের ব্যায়ামশিক্ষক। তিনি নিজের ইচ্ছামত কাবাডির নিয়মকানুন ঠিক করে দেন। আমরাও তাঁর রচিত নিয়ম-কানুন নিয়েই তুষ্ট হই। এইভাবে আমাদের জাতীয় খেলাধুলাগুলোকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাচ্ছি।

হা-ডু-ডু খেলা বাংলাদেশের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলে খুবই চালু। সকল বালকই এই খেলাতে মাতে। ফুটবলের প্রাদুর্ভাবে এর জনপ্রিয়তা কমে গেছে সন্দেহ নেই, তবু এখনও হা-ডু-ডু আমাদের জাতীয় খেলার অন্যতম। এই খেলাটি কতকালের প্রাচীন বলা শক্ত। তবে সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে তিনশো বছর আগেও এর প্রচুর জনপ্রিয়তা ছিল। মল্লভূমের স্বাধীন রাজা বীর হাম্বিরের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী পানুয়া গ্রামে কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র

চক্রবর্তী ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন যে কবিচন্দ্র প্রণীত ভাগবতামৃত তৎকালে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই গোবিন্দমঙ্গলে হা-ডু-ডু খেলা সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে—

"শুক কহে পরীক্ষিৎ শুনহ শ্রবণে।
ব্রজশিশু সঙ্গে কৃষ্ণ করে নানা খেলা।।
কি বুঝিতে পারে রাজা শ্রীকৃষ্ণের লীলা।
ব্রজ শিশু সঙ্গে কৃষ্ণ করে নানা খেলা।।
লুকাচুরি করে সবে নিকুঞ্জের বনে।
পদ চিহ্ন অনুসারে কৃষ্ণ খুঁজে আনে।।
তারপর কৃষ্ণ সঙ্গে যতেক রাখাল।
কৌতুক করিয়া কান্ধে ধুলোর জাঙ্গাল।।
বানর লম্ফের মত লম্ফে লম্ফে যায়।
হা-ডু-ডু চিক দাড় কৌতুকে খেলায়
কৃষ্ণের গলায় গাঁথি দেই পুষ্পমালা।
গাছে গাছে দড়া বান্দি খেলায় হিন্দোলা।।
ঝালি ঝাপট খেলা খেলে চক্ষু ফুটাফুটি।
মদনমোহন সাথে খেলে ময়না গুটি।।
তারপর দুই ভাই খেলি বেঁটে নিল।
নির্মায়ে বিচিত্র গেড়ু খেলিতে লাগিল।।
লফালাফি ঝাপাঝাপি খেলায় আকুল।
শ্রীদামের অংগে ফেলে মরল মাতুল।।

এই বর্ণনা থেকে সেকালের পল্লী বালকদের নানাপ্রকার খেলার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেকালে হা-ডু-ডু খেলা যে প্রচলিত ছিল এবং এখনকার মতই চিকদাঁড় কেটে যে খেলা হত তাও বুঝতে পারি। তাছাড়া যে গেড়ু খেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের পল্লীগ্রামে এখনও তা প্রচলিত রয়েছে। গুলি-ডাণ্ডা খেলার মত একটি ডাণ্ডা ও ছেঁড়া কাপড়ের গোড় বা (ছোট ক্যাম্বিস বলের মত) ক্ষুদ্র বলের সাহায্যে এই খেলা চলে। ডাণ্ডাগুলির মতই দুদলে বিভক্ত হয়ে খেলোয়াড়েরা খেলতে থাকে। এ খেলাতেও পরাজিত দলের খাটান দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

জাতীয় খেলাধুলা বলতে যেমন একদিকে দেশে প্রাচীন প্রচলিত খেলাধুলার পুনঃপ্রচলন বুঝতে হবে, তেমনি বুঝতে হবে সমগ্র জাতির সংহত খেলাধুলো সংগঠন। এ যুগের জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প একান্তভাবে জাতীয় ঐতিহ্যানুগত নয়, জাতীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্বময় প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকে গ্রহণ করে তবেই তা সার্থক। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তেমনি। ইতিহাসের পথ বেয়ে বহু খেলাধুলো আজ সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত, সেই খেলাধুলোর মধ্যে অনেকগুলি আজ ভারতীয় জীবনের অংশ। ফুটবল, হকি, টেনিস, ক্রিকেট কিছুই আজ পরিত্যক্ত নয়। অথচ নৌকাবাইচ, কুস্তি, হা-ডু-ডু প্রভৃতি যেসব খেলা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে সর্বস্তরে প্রচলিত খেলাধুলো ছিল, সেগুলির জনপ্রিয়তা বাড়াবার প্রয়াসও আজ অপরিহার্য।

আজকাল জাতীয় খেলাধুলার মূলকথা দু-চারজন অতিকুশলীর জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান ও খ্যাতিলাভের ব্যবস্থা নয়। দেশের আপামর-সাধারণের পক্ষে আনন্দ স্বাস্থ্য ও নৈতিক সুফললাভের জন্য ব্যাপক খেলাধুলো ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের ও সম্মানলাভের সম্ভাবনা অবশ্য উৎকর্ষলাভের প্রেরণা যোগাবে, কিন্তু সেটাই জাতীয় খেলাধুলো সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হবে না।

প্রাচীন যুগের রাজকুমারদের মত এযুগেও খেলাধুলোর সুযোগ মুষ্টিমেয় শহরবাসী সম্পন্ন সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশেষ কারণ, কলকাতা তথা ভারতে বর্তমানের খেলাধুলো সংগঠনগুলি ইংরেজ রাজপুরুষ ও বণিককুলের জন্যে তাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ জাতীয় খেলাধুলো ব্যাপক প্রচলনের আদর্শ স্বীকৃত হলেও, আর প্রকৃত প্রয়োগ কোথায়? ইংরেজেরা কলকাতায় নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবল পরিচালনার জন্য যে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন গড়েছিল, তা কিন্তু আজ পর্যন্তও মূলতঃ কলকাতার শহরে গুটিকয়েক প্রতিযোগিতা পরিচালনার সংস্থাই রয়ে গিয়েছে। তাঁরা পশ্চিম বাংলায় ফুটবল প্রচলন, প্রসার ও প্রশিক্ষণ ব্রত নামে গ্রহণ করলেও, কার্যতঃ তেমন উৎসাহ দেখায় নি। অনুরূপ মন্তব্য অবশ্য সব সংগঠনের পক্ষে প্রযোজ্য।

খেলাধুলো প্রাচীন ঐতিহ্যসম্মতই হোক বা আধুনিক দুনিয়াময় প্রচলিত পদ্ধতিই হোক, আধুনিক সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র জনগণে তা পরিব্যাপ্ত করে দিতে হবে। না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে খেলার পশরা।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

গুরুকৃপাল সিং

(মোহনবাগান)

শুধু বরফ আর বরফ, দূরের ফার আর পাইন গাছের চূড়োগুলি পর্যন্ত বরফের টুপি পরে কাঁপছে। মাঝে মাঝে মাথার পর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দু-একটা হেলিকোপ্টার, চক্কর দিচ্ছে ফুড ড্রপিংয়ের জন্য। জায়গাটা লাদাক সীমান্ত, যে লাদাকের ওপর পররাজ্যলোলুপ চীনের বাহু তখন প্রসারমান। ব্যারোমিটারে তাপাঙ্ক অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল। হাত-পা জমে যাচ্ছিল শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারের ডিউটি গার্ড লেফটন্যান্ট হাবিলদার জি এস জায়গীরদারের।

কিন্তু শীত হোক, ঝড় হোক, ঝঞ্ঝা হোক, তামাম দুনিয়া উল্টে যাক ডিউটি গার্ডের পজিসন থেকে একচুল নড়বার উপায় নেই, এক মুহূর্তের জন্যও না। আর নড়বেই বা কেন? ডিউটি গার্ড জানেন—"সাঁরা জাহাজা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা হ্যায়।" মাঝে মাঝে সুদূরে প্রসারিত দৃষ্টিকে আবছা করে ভেসে জায়গীরদারের মায়ের মুখখানি—'লাল'কে যিনি কপালে চন্দন তিলক এঁকে মাতৃভূমি রক্ষায় রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। মায়ের অশ্রুভারাক্রান্ত মমতাময়ী মূর্তি বার বার মনে পড়ছিল ডিউটি গার্ডের।

লাদাক সীমান্তের সেই ডিউটি গার্ড—আজকের কলকাতা মাঠের সর্বজনপ্রিয় 'গুরু'—দুরন্ত শিখ গুরুকৃপাল সিং

জায়গীরদার। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুকৃপাল ফুটবল অনুরাগীদের মন জয় করে ফেলেছেন। গুরুর ভাষায়ঃ 'এলাম, দেখলাম, জয় কোরলাম'। সাম্প্রতিক ভারতীয় ফুটবলে মুষ্টিমেয় যে ক'জন শিখ খ্যাতির শিখরে উঠেছেন, জার্নেল, ইন্দর, গুরুদয়ালের মত গুরুকৃপালও তাঁদেরই একজন। দুর্বার, দুরন্ত গতি, প্রচন্ড সট্, ড্যাস, চমৎকার হেডিং, পলকে জায়গা পাল্টে আক্রমণের রং ও ঢং বদলাতে কলকাতার মাঠে গুরুকৃপালের আজ জুড়ি নেই বোধ হয়। পরিশ্রমে ফাঁকি দেওয়াও তাঁর চরিত্রে নেই। গুরুর কথায় বলতে গেলে—'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'। অর্থাৎ খেলা যতক্ষণ চলবে গেন্দা (বল) যতক্ষণ মাঠে থাকবে ততক্ষণই গোলের সম্ভাবনা'।

গুরুকৃপাল সিং জলন্ধর ক্যান্টনমেন্টে জন্মেছিলেন ১৯৪৩ সালে। বাবা বিক্রম সিং বেঁচে আছেন এখনও। মমতাময়ী মা-ও। লেখাপড়া সুরু করেছিলেন জলন্ধর ক্যান্টমেন্ট বোর্ড হাইস্কুলে। ফুটবলের হাতেখড়িও এখানে হরবিন্দর সিং সাহেবের কাছে। সিংজী এখন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার। ছুটি-ছাটাতে জলন্ধরে গেলেই গুরুকৃপাল সিংজীর পদস্পর্শ করে আসেন।

গুরুকৃপালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ 'তোমরা পাঞ্জাবীরা তো হকিই ভালোবাসো,

ফুটবলে এলে কেন?' গুরুবক্স বললেন : 'বড়ভাই রেডজন সিং ভাল ফুটবল খেলতেন। পিতাজীর অলক্ষ্যে তিনিই আমায় মাঠে নিয়ে যেতেন গেনা কুড়োবার জন্য। দাদার সঙ্গে মাঠে যেতে যেতে নিজের অজান্তেই ফুটবলকে ভালবেসে ফেললাম, মমতা এসে গেল। তবে হকি যে খেলিনি এমন নয়, ফৌজি থাকতে ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছি।'

সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ সাত বছর চাকরী করার সূত্রে ফৌজি ফুটবলে ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন গুরুকৃপাল। ১৯৬৩ সালে শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারের হয়ে ডি সি এম ও ডুরান্ড। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে মিশর, লেবানন, গাজা ও ইস্রাইলে খেলেছেন তিনি। ১৯৬৪ সালে বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপে টাটার বিরুদ্ধেই তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা। শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই টাটার খেলোয়াড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে চোট লাগে গুরুকৃপালের। কুপারেজের মাঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন গুরুকৃপাল আর কপাল চাপড়াচ্ছিলেন শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টার এক গোলে হেরে যাচ্ছিল বলে। 'ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের প্যাভেলিয়নের মাথার ওপরের ফ্ল্যাগ নেমে গেছে, রেফারী ঘড়ি দেখছেন ঘন ঘন। শেষের বাঁশি বাজার আর মাত্র দু' সেকেন্ড বাকী। মাঝমাঠে হঠাৎ একটা বল পেলাম আমি। ছুটলাম; আমায় রুখে টাটার গোলরক্ষক এগিয়ে এসেছিলেন। মুহূর্তে গতি পাল্টে তাঁকে কাটিয়ে ফাঁকা গোলে বল ঠেললাম, শিখ রেজিমেন্টাল নিশ্চিত হার থেকে বাঁচলো। যতদিন বাঁচবো কুপারেজের সেই উত্তেজনাকর সন্ধ্যাটি আমার মনে থাকবে।'

পরের বছর মারদেকা ফুটবলের ট্রায়ালে ডাকা হয়েছিল আমাকে—কিন্তু শেষপর্যন্ত মনোনীত হননি গুরুকৃপাল। পরের বছর এলেন কোলকাতায়—ভারতীয় ওলিম্পিক হকি খেলোয়াড় হরিপাল কৌশিকের অনুরোধে ইস্টবেঙ্গলে। '৬৬ সালে মারদেকা ফুটবলে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেন কুয়ালালামপুরে। এই বছর লীগ ও শীল্ডজয়ী ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন গুরুকৃপাল। হ্যাটট্রিকসহ গোল করেছেন গণ্ডায় গণ্ডায়।

বিয়ে করেছেন ১৯৬০ সালে। একটি ছেলে—নাম হরবিন্দরজিৎ। সেই হরবিন্দরের ছোট্ট ছবিটি দেখে দেখেই দিন কাটে কলকাতায়—গুরুকৃপালের।

কল্যাণ সাহা

(বি এন আর)

'হঠাৎ সুযোগ এসে গেল, আমিও কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলাম স্টপারের জায়গায়। নিয়মিত স্টপার এন সেনগুপ্ত অসুস্থ, উয়াড়ীর স্টপার কে খেলবে? কর্মকর্তারা বিব্রত। হঠাৎ বাদাদা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন আমার দিকে : 'কল্যাণ তুই খেলবি আজ স্টপার'। বাদাদার ফরমান—অলংঘনীয়। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে লেগে

গেলাম। এখন 'কমলি ছাড়লেও—'কমলি ছোড়তা নেই।'।

কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সাহাকে কে না চেনে? মাথায় ছ'ফুট শক্ত জোয়ান ছেলে কল্যাণ এখন বি এন আর-এর স্টপার। ঠান্ডা মেজাজ, নিখুঁত ট্যাকলিং, জায়গা রাখার সতর্কতা, মাথায়ও পায়ে সমান দাপট কল্যাণের। ঝড়ের মুখে শক্ত হাতে হাল ধরে কতবার যে কল্যাণ বি এন আরকে উত্তাল পরিস্থিতি থেকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন তা-কি আঙুলে গোনা যায়?

কলকাতা লীগ ও শীল্ডের আসরে তথা সর্বভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে দামাল ছেলে কল্যাণ বারবার নিজের প্রতিভার নজীর রেখেছেন, ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে।

কল্যাণের জন্ম ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার বিরোলিয়া গ্রামে। বাপ-ঠাকুর্দা কারবারী লোক। বেশ সচ্ছল ঘরের ছেলে তিনি। তাঁর পাঁচ বছর বয়সে দেশ-বিভাগ হোল, চার ভাই—এক বোন নিয়ে কল্যাণ মা-বাবার হাত ধরে এলেন কলকাতায়। ১৯৫৮ সালে জগৎবন্ধু থেকে স্কুল-ফাইনাল এবং ১৯৬০ সালে সুরেন্দ্রনাথ থেকে আই-কম। বি-কম ক্লাসেও গেছেন কয়েকদিন কিন্তু কলেজের লেকচার-রুম থেকে মাঠের ফুটবলই কল্যাণকে টানলো বেশী। লেখাপড়া ইতি হোল।

দক্ষিণ কলকাতায় কল্যাণদের খানদানী কাপড়ের দোকানের পেছনে একটি ছোট্ট ঘরে বসে কল্যাণ নিজের কথা বলছিলেন। জাত-ব্যবসায়ী ও'রা, যা বলেন হিসেব করেই বলেন।

'ফুটবল খেলতে সুরু করেছিলাম বেশ একটু বড়ো হয়েই। নাইনে পড়ি তখন। দক্ষিণ কলকাতা স্কুল লীগে জগৎবন্ধুর হয়ে এবং দক্ষিণ কলকাতা লীগে লেক মাঠে শক্তি সংঘের হয়ে খেলেছি প্রথম দিকে। সেখান থেকে কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ) লীগে, হেরম্ব মৈত্র শীল্ডে। ১৯৬১-৬২ সালে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে গ্রীয়ারের হয়ে খেলেছি, পরের বছর খেলেছি উয়াড়ী। এখন বি এন আর-এ। উয়াড়ীতে থাকার সময় জুনিয়র ইণ্ডিয়া দলের ট্রায়ালে ডাক পড়েছিল, কিন্তু মনোনয়ন পাইনি শেষ পর্যন্ত। ভারতীয় দলের বাছাই সফরের বেলায়ও ঐ অবস্থা। তবে রুশ দলের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় রেল-দলে জায়গা হয়েছিল খড়্গপুরের আসরে। ১৯৬৬-৬৭ সালে হায়দরাবাদে জাতীয় ফুটবলে প্রাথমিক পর্বে দুটি ম্যাচ খেলেছেন কল্যাণ রেলের হয়ে।

১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সালে নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতা দলের (চ্যাম্পিয়ন) সার্থক প্রতি-নিধি ছিলেন কল্যাণ। ১৯৬২ সালে কলেজ ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন—স্মারক চিহ্ন পেয়েছিলেন 'অসীম সোম পদক'।

'অনেক ফুটবলই তো খেলেছ, কোন্ ম্যাচটি সবচেয়ে স্মরণীয়'—প্রশ্ন করেছিলাম কল্যাণকে। একটু ভেবে কল্যাণ জবাব দিয়েছিল :

"গত বছর আন্তঃরেল ফুটবলে (মাদ্রাজ) ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে ফাইনাল। খেলা ভাঙ্গার তিন মিনিট আগে সাউথ ইস্টার্ণের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেছিলাম আমিই। দ্বিতীয় খেলারও গত বছর। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে লীগের ফিরতি ম্যাচ। ফলাফল ২-২ গোল। সে খেলাও ভোলার নয়।

বাড়ী থেকে বাবা, মা দাদা-বৌদিরা প্রথম দিকে সিরিয়াস ফুটবলকে সুনজরে দেখেননি। কিন্তু এখন দিনবদলের পালা। শুনেছি বড় খেলায় নাকি বাড়ীর সবাই রেডিওর সামনে বসে কান, মাঠে কল্যাণের খেলার বিবরণী শুনতে। যদি কখনও শোনেন—'কল্যাণ সাহা লাফিয়ে হেড করে বল ফিরিয়ে দিলেন চমৎকার ভাবে; সাবাস কল্যাণ'। বাড়ীর সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, মা-বাবার মুখেও। এই হাসিটুকুই কল্যাণের সেরা পুরস্কার। পরম শান্তি।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

[উপন্যাস]
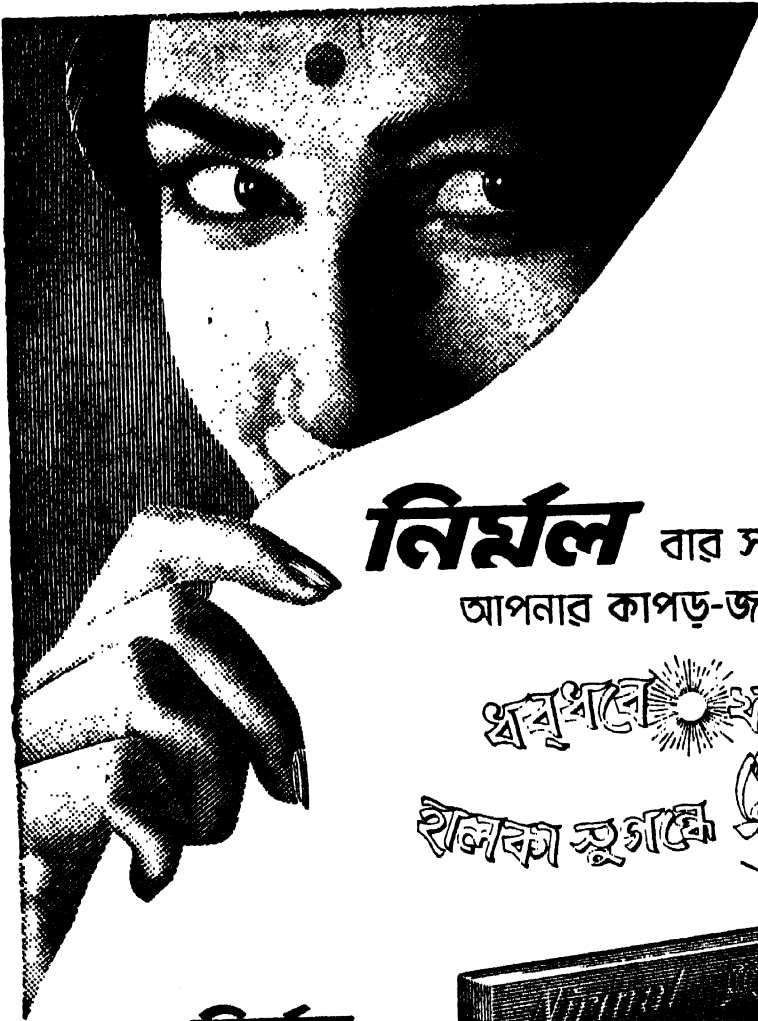
।। দশ ।।

দিন-পাঁচেক ধরে মোটা মোটা অর্থ-নীতির বইগুলো হঠাৎ অর্থহীন হয়ে উঠল শ্রীযুক্ত দীপকের কাছে। পাঁচটা রাত্রি তার কাছে বড় দীর্ঘ, বড় বিরক্তিকর মনে হোল। কেন যে সে রুনুকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গেল! না গেলেই ভাল হোত। নির-বচ্ছিন্ন সহজ সরল করে এনেছিল ও জীবনের দিনরাতগুলোকে। আগের জীবনের কথা যদি কখনো-সখনো মনে পড়ত, সেটা তেমন কিছু অস্বস্তি আনত না মনে। ভাবত, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তার জীবনের আগাপাস্তালা একটা পরিবর্তনকে প্রায় দৃঢ় করে ফেলেছিল। ভুলেই গিয়েছিল সেই বেয়াড়া ঘরের কথা। নিজের জীবনের বহু বিগত মালিন্য। একটা ভাবনাকে ও মেনে নিয়েছিল, কেন মানুষ এমন আদর্শ-হীন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, এর কি কোন কারণ নেই? এই অনুসন্ধান, এই গবেষণা নিয়েই সে তার জীবন কাটিয়ে দেবে ভেবে-ছিল।

চিন্তায় ডুবেছিল শ্রীযুক্ত দীপক।

অকস্মাৎ দিন-পাঁচেক আগে যে এমন-ভাবে মালার সঙ্গে দেখা হবে ও ভাবতেও পারেনি। দেখা হলেও এমন কিছু ক্ষতি ছিল না। মালার দিক থেকে কতকগুলো অদ্ভুত আচরণ তাকে অস্বস্তিতে ভরে তুলেছিল।

ইতর ছোটলোক।

কথাদুটি তার আজও মনে আছে। এই ইতর ছোটলোক, দারিদ্র্যদের ভাবনাই সে ভাবছে। এদের সে ঘৃণা করতে পারছে না। এদের এই অপবাদ ঘোচাবার মত কোন কিছু করা যায় কিনা এই ভাবনাই তার জীবনের ব্রত।

ইতর ছোটলোক!

কেন তারা ইতর, কেন তারা ছোটলোক, কেন তারা অশিক্ষিত, মূর্খ, বোকা—এ-প্রশ্ন তো কেউ করে না? এ-প্রশ্নের উত্তর তো কেউ ভাবে না। শুধু ঘৃণা করেই সামাজিক কর্তব্যের সমাপন করে।

আজও মালা এই ইতর ছোটলোকদের কথা তেমন করে ভাবে না। তাহলে এইসব অশিক্ষিত সন্তানদের জন্যই একটা স্কুল করত। কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে-দের জন্যে স্কুল করত না। শিক্ষিত যারা, অহঙ্কারী যারা, ভদ্র অভিমানী যারা, তাদের জন্যে স্কুল করবার সার্থকতা এমন কি একটা বেশী আছে ভেবে পায় না দীপু। কথাটা সে মালাকে শুনিয়েও দিয়ে এসেছে।

এসব মেয়ের ভাবনা ভাবতে সে আর রাজী নয়।

তবু ভাবতে হয়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে যত বাজে ভাবনা এসে তার নিটোল ঘুমটাকে নষ্ট করে। মালার কিছুটা কৃশ ম্লান মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর বিষণ্ণ দুটো চোখ। ওর মুখ-চোখেই প্রকাশ পায়। ও সুখী নয়। কিন্তু কেন অসুখী ও! কিসের অসুখ?

নিরঞ্জন দত্ত মারা গেছে। তারপর কি ওর জীবনে কিছু অঘটন ঘটেছিল? কোন একটা অঘটন, যা ওকে এমন গভীরভাবে বিষণ্ণ করে তুলেছে অথবা যা থেকে ভুলে থাকবার জন্যে ও একটা স্কুল করে বসেছে।

এ-কথা বুঝতে দেরী হয় না, স্কুলটা ওর আদর্শ কিছু নয়, একটা সখ মাত্র। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত সখ ওর হোল কেন? বিয়ে করেনি কেন? নাকি বিয়ে হয়নি? বিয়ে হয়নি কেন?

ধুত্তোর, যা খুশী হোক গে যাক, তার অত ভাবনার কি দরকার?

দীপু ঠিক করল, কাল থেকে ও অফিস যাবে, অফিসের কাজে, বাড়ির পড়াশুনোয় ব্যস্ত থাকলে এসব ভাবনা ধীরে ধীরে অনেক কমে আসবে। আপনা-আপনি কমবে। জোর করে কমান যাবে না।

রুনুকে ভর্তি করা হোল না বলে বৌমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রুনুকে রোজ সন্ধ্যায় পড়াতে বসাবে নিজের কাছে। একটা বছর পড়িয়ে সামনের বছর অন্য কোন স্কুলে ভর্তি করে দেবে।

পরদিন অফিস গেল দীপু। যদিও ছুটি তখনো ফুরোয়নি, তবু আগেই কাজে যোগ দিল।

অফিসে গিয়ে সত্যি এত বেশী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে মালার ভাবনা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িটা নিয়ে মার্কেটে গিয়ে কিছু টুকি-

টাকি জিনিস, খান-চারেক কাটলেট, একটিন কফি কিনে বাড়িতে ফিরে এল।

দরজা খুলে নিজের ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, মালা তার ছোট খাটটার ওপর বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

মালা তাকাল ওর দিকে। মনে মনে হাসল মালা। দীপুর সব মিথ্যে ওর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

মালা এসেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। দোর খুলে দিল রমলা।

বাড়িটা চিনতে ওর দেরী হয়নি। দীপু স্কুলের ফর্মে সেদিন নাম-ঠিকানা লিখে রেখে এসেছিল। সেই ঠিকানাটা নিয়েই ও চলে এসেছে। না এসেও উপায় ছিল না। আসতে ওকে হবেই। সেদিন দেখা যদি না হোত, তবে মালা কি করত বলা যায় না, কিন্তু দেখা হবার পরে দীপুর বাড়িতে না এসে ওর কোন উপায় ছিল না।

সম্পূর্ণ অসহায় তাকে সীমাহীন তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে একটা বোট কাছে পেলে যেমন একটু হাঁফ ছাড়বার ইচ্ছে হয়, তেমনি অবস্থা মালার। ও একটু ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে চায়, একটু বাতাস চায়, স্বস্তি চায়।

হোলই বা দীপু বিবাহিত, তবু দীপু তাকে কি একটু স্বস্তি দিতে পারবে না। বন্ধুর মত সুহৃদের মত দুটো কথা বলতে পারবে না, একটু মমতা দান করতে পারবে না!

তবু আসতে আসতে মালা কিছুটা ভয়-সংকোচ বোধ করেছিল। কে জানে দীপুর স্ত্রী তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে? দীপুর স্ত্রীটি কেমন কে জানে! মেয়েটি তো ভারী চমৎকার। তবু যেতে তাকে হবে। অন্তত দীপুর স্ত্রীকে একবার দেখে আসবে। পুরোন বন্ধু-স্ত্রীর জন্যে একটা ভাল দামী হাতঘড়ি নিয়েছিল মালা উপহার দিতে। এতে দীপুর স্ত্রীকে নিশ্চয় সে কিছুটা খুশী করতে পারবে।

খুব ভয়ে ভয়ে এসে দোরে ঘা মেরেছিল, দোর খুলল রমলা।

রমলার দিকে তাকিয়ে মালার বুকটা কেঁপে উঠল। ভারী মিষ্টি সুশ্রী মুখখানি দীপুর বৌয়ের। বেশ সপ্রতিভ বুদ্ধির দীপ্তি চাউনিতে। নাকটি চাপা, মুখটি গোল, গালে দুটি টোল। চোখা রূপবতী না হলেও রীতিমত সুশ্রী।

—নমস্কার।

প্রতি-নমস্কার জানাল রমলা।

হাসল মালা—আমি দীপক সাহার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—উনি তো বাড়ি নেই। অফিস থেকে ফেরেননি।

রুনু পাশ থেকে এসে মালার আঁচল ধরল।—টুমি ইটকুলে যাওনি?

রুনুর মনে আছে। মালাকে ও স্কুলে দেখেছিল। মালা হাসল। রুনুকে গাল টিপে আদর করল।

আস্তে বলল,—আমি একটু অপেক্ষা করতে পারি কি?

—আসুন, ভেতরে আসুন।

দীপকের ঘরে গিয়ে বসাল মালাকে। মালা ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিল। বইপত্তর ছড়াছড়ি। ছোট একটা খাট পাতা, খানদুয়েক বেতের চেয়ার একপাশে, ছোট একটি নীচু টেবিল।

—আপনার স্বামী কটা নাগাদ ফেরেন?

রমলা হাসল—উনি ফেরেন সাতটা সাড়ে সাতটায়। দাদা সাড়ে পাঁচটায় ফেরেন। আজ কেন দেরী হচ্ছে কে জানে!

মালা বেতের চেয়ারে বসল,—দাদা, মানে আপনার নিজের দাদা?

রমলা ফিক করে হাসল,—না, ওর জ্যাঠা।

বলে রুনুকে দেখিয়ে দিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল,—বসুন, আমি আসছি।

রমলা বেরিয়ে গেল।

মালা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে রুনুকে কাছে ডাকল,—এসো, এদিকে এসো। আমি তোমার পিসিমা।

রুনু কাছে এগোল না, খাটের পাশে দাঁড়িয়ে চাদরটা ধরে টানতে লাগল।

মালা কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, এখানে এমন হঠাৎ চলে আসাটা কি ভাল হয়েছে? দীপু তো একবারও তাকে আসতে বলেনি। সে সেধে এসেছে, দীপু যদি তেমনভাবে তার সঙ্গে কথা না বলে! তেমন ভদ্র ব্যবহার না করে! অস্বস্তি লাগল ভাবতে ভাবতে।

ও উঠে গিয়ে রুনুকে কোলে নিয়ে খাটের ওপর বসল, তার সঙ্গে আজেবাজে কথা বলতে লাগল।

একটু পরেই রমলা ঘরে ঢুকল। পেছনে বাচ্চা চাকরের হাতে দু' কাপ চা-বিস্কুট।

—আবার চা কেন?

রমলা হাসল—আমি চা খাব, কাজেই আপনাকে না দিয়ে খাই কি করে?

বেশ সহজভাবে কথা বলতে পারে দীপুর বৌ, বেশ বুদ্ধিমতী।

চায়ে চুমুক দিয়ে মালা বলল,—মেয়েকে কে-জি-তে ভর্তি করেছেন?

মালা জানতে চায় দীপু ওখান থেকে চলে এসে মেয়েকে অন্য কোথাও ভর্তি করেছে কিনা!

রমলা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল,—না, কই আর হোল!

মালা হাসল।—আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি, আপনার মেয়ে আমাকে দেখে স্কুলের কথা বলে উঠল। মেয়েটির ভারী বুদ্ধি। আমাকে ঠিক চিনে রেখেছে। সেদিন আপনার স্বামী ওকে নিয়ে গেলেন আমার স্কুলে, কিন্তু ভর্তি করলেন না। কেন যে ভর্তি করলেন না, বুঝলাম না।

রমলা চা কাপ হাতে নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।—কই উনি তো খুকুকে নিয়ে যাননি। ওর জ্যাঠা ওকে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে বললেন, এইটুকু বয়সে ভর্তি না করাই ভাল।

মালার মুখটা লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। ছি-ছি, সে কি ভুল করেছে!

সামলে নিয়ে বললে,—অ, উনি আপনার ভাসুর?

—হ্যাঁ। তাই বুঝি আবার মেয়েকে ভর্তি করাবার জন্যে বলতে এসেছেন?

—না, ঠিক তা নয়। দীপকবাবুর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল।

রমলার চোখদুটি চিকচিক একটু মেয়েলী কৌতূহলে।—তাই বুঝি!

মালা হাসল।—নিজের অপ্রতিভ ভাবটা মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললে—মেয়ে তো আমাদের স্কুলে দরকার। আপনার মেয়ে ভর্তি হলে খুব খুশীই হতাম। তা আপনার বড় জা কোথায়?

এবারে চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে ফেলল রমলা। বিষম খেল। কেশে গলা পরিষ্কার করে বললে—বড় জা বাপের বাড়িতে আইবুড়ো হয়ে আছেন নিশ্চয়। উনি তো বিয়েই করলেন না। দিনরাত্তির পড়াশুনো নিয়ে আছেন। ওই মোটা মোটা বইগুলোই এখন আমার বড় জা।

মালা আবার ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে হাসল।—বিয়ে করেননি? খুব পড়েন বুঝি?

—দিনরাত্তির। এম-এ পাশ করেও সখ মেটেনি। চাকরি করেন, আর পড়েন। মাঝে মাঝে ভাবি, ওই বইগুলোকে ঘর থেকে বিদেয় করতে পারলে বোধহয় ওঁর বিয়ের প্রয়োজন মনে করিয়ে দেয়া যেত।

হেসে ফেলল মালা। চা শেষ করে কাপটা রেখে বললে,—আপনার দেখছি বইগুলোর ওপর খুব রাগ।

রমলা চা খাওয়া শেষ করে উঠে গেল চাকরটাকে ডাকতে।

মালার বুকটা থরথর করে কাঁপছিল। নাকে আর ওপরের ঠোঁটে কিছু কিছু ঘাম জমেছিল। কানদুটো গরম লাগছিল। কি আশ্চর্য মানুষ দীপু। ও যে বিয়ে করেনি, এম-এ পাশ করেছে, এত পড়াশুনো করছে, সেদিন ঘুণাক্ষরে সে-কথা প্রকাশ করেনি। বারবার ও সব কথা এড়িয়ে গেছে।

খাটের ওপর উঠে বসল মালা। হাত-পায়ের তালু ঘামছে ওর। সর্বশরীর কেমন দুর্বল লাগছে।

রমলা ঘরে এসে আবার বসতেই নীচে মোটরের হর্ণের শব্দ শোনা গেল।

—ওই বোধহয় দাদা এলেন।

রমলা উঠে বেরিয়ে গেল আবার।

মালা তখনো ঘামছিল। অপার বিস্ময় ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একি সেই দীপু! সেই ভীষণ দুঃসাহসী মারাত্মক ছেলে দীপু, যার ভয়ে গোপাল ড্রাইভার কাঁপত, আর স্কুল ছুটির পর তাকে আর দীপুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, যার পকেটে চার-ছ' ইঞ্চি লম্বা ছোরা থাকত একখানা প্রায় সব সময়। সেই দুর্দান্ত অসমসাহসী ইস্পাতের মত কঠিন দীপু।

মালা যেন স্বপ্ন দেখছে বলে মনে হোল।

শ্রীযুক্ত দীপক ঠিক এমনি সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খাটের ওপর মালাকে বসে থাকতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

রমলা এগিয়ে এসে ভাসুরের হাত থেকে কাটলেটের প্যাকেট আর টুকিটাকি জিনিস

ধুলো নিয়ে আস্তে বলল—দাদা, কফি করে দোব?

দীপু তখনও মালার দিকে তাকিয়ে ছিল। রমলার কথায় চমকে তাকাল।

রমলা মালার দিকে দেখিয়ে বললে—ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

দু' হাত তুলে নমস্কার জানাল দীপু মালার উদ্দেশ্যে। ভাবটা এই যেন তেমন পরিচিত কেউ নয়। তারপর বলল—এখুনি আসছি।

বলে ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেল। ভেতরে গিয়ে কোট-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিল দীপু। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি লাগল ওর। মালা যে এমনভাবে সেধে তার বাড়িতে এসে হাজির হতে পারে সে ভাবতেও পারেনি। কেন এসেছে? কি প্রয়োজন? তাকে আবার খানিকটা উত্যক্ত করা ছাড়া আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে ভেবে পেল না। মনটা আজ বেশ ভাল লাগছিল, আবার দিলে মেজাজটা খারাপ করে।

বেরিয়ে এসে রমলাকে বলল—বৌমা, উনি কতক্ষণ এসেছেন?

—তা আধঘণ্টার ওপর।

—বলে দিলেই পারতে বাড়ি নেই।

রমলা সংকুচিত হোল। আস্তে বলল—বলেছিলাম. উনি বসতে চাইলেন, অপেক্ষা করতে চাইলেন।

দীপু রমলাকে আর কিছু বলল না। গম্ভীরমুখে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল মালা খাটের ওপর বসে একখানা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। ও গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসল।

গম্ভীর স্বরে বলল—কি ব্যাপার, হঠাৎ এখানে?

মালা তাকাল। হাতব্যাগ থেকে ছোট রুমালটা বার করে মুখের ঘাম মুছে অল্প একটু হাসল—খুব অবাক হয়েছ, নয়? অবাক হবারই কথা।

দীপু বলল—ঠিকানা পেলে কি করে?

মালা এ-প্রশ্নটায় একটু আহত হোল। তার আসাতে দীপু যে খুশি হয়নি, প্রশ্নটায় ঐ ভাবটাই স্পষ্ট প্রকাশ পেল। বলল—তুমি যে স্কুলে একটা ফর্ম ফিলআপ করে নাম-ঠিকানা লিখে এসেছিলে, সে-কথাটাও ভুলে গেছ? খুব যা হোক। তুমি কিন্তু খুব ভুলে যেতে শিখেছ দেখছি।

কথাটায় একটু খোঁচা ছিল। দীপুর ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল। আস্তে আস্তে আপন মনেই বলল—সব কথা মনে থাকে না।

মালা খাটের ওপরে বেশ জুত হয়ে বসে বললে—কই তুমি তো আর দেখা করলে না?

—দেখা করবার তো কথা ছিল না।

—বারে, আমি তোমাকে কতবার বললাম. আমার ফ্ল্যাটে যেতে!

—দেখছই তো সময় করে উঠতে পারি নি।

মালার চোখদুটো বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দীপু এর আগে দেখেছিল, চোখে গভীর বিষণ্ণ ভাব, কিন্তু এখন এক স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কি করে? একটা স্থির দীপ্তি ওর মুখের রঙে, আগে এতটা স্থির ছিল, মালা চঞ্চল ছিল, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল কিন্তু শান্ত ভাবটা মোটেই ছিল না। যেকোন কঠিন সমস্যার সমাধান অতি সামান্য সময়ে করে ফেলতে পারত। সহজ একটা সাহস ওর বরাবরই ছিল। এখন যেন মালা কিছু ঠাণ্ডা, কিছু ভীতু হয়ে উঠেছে।

—কি চাকরি করো?

দীপু বিরক্ত হোল। আবার সেই ব্যক্তি-গত জিজ্ঞাসা। তবু তার ঘরে বসে যখন প্রশ্ন করছে, তখন জবাব তাকে দিতে হবে। আস্তে আস্তে বলল—সামান্য একটা চাকরি।

—পরনের স্যুটটা দেখে তো সামান্য মনে হোল না।

অল্প একটু হাসল দীপু, এ-কথার উত্তর দিল না।

মালা বলল—তোমার ভাই বৌটি বড় চমৎকার। কিন্তু কই তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আলাপ হোল না?

মনে মনে হাসছিল মালা। দীপুর মুখটা একটু শুকনো দেখে ও মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপল।

দীপু কেশে নিয়ে বললে—সে তো এখানে নেই।

—কোথায়?

—বাপের বাড়ি গেছে।

হাসি চেপে মালা বললে—অঃ, তাই বুঝি? তা দেখতে কেমন হয়েছে?

একটা ঢোক গিলে দীপু বলল—এই মোটামুটি।

—পড়াশুনো কদ্দুর করেছে?

—বি-এ পাশ।

চোখ বড় বড় করে মালা বলল—বলো কি, বি-এ পাশ! তুমি কি পাশ? তুমি তো কলেজের বাড়ি কেমন জানতে না। স্কুলের বেড়াই তো ডিঙোতে পারোনি তখন।

আবার অল্প একটু হাসল দীপু।

মালা তাকের মোটা মোটা বইগুলোর দিকে দেখিয়ে বলল—আচ্ছা, এসব বইগুলো কে পড়ে?

দীপু একটা হাই তুলে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললে—কেন, তুমি পড়বে?

—রক্ষে করো। ও-সব বই কিছু বুঝব না।

দীপু বলল—কেন বুঝবে না? স্কুল করেছ, আর পড়তে ভয় পাও? কদ্দুর পড়েছ?

একটু বিরক্ত হয়েছিল দীপু। স্কুল করে অফিস করে বসেছে অথচ বই পড়ে বুঝবে না, কথাটি শুনে তার খারাপ লাগল।

মালা বলল—বি-এ পাশ করেছিলাম, তোমার বৌয়ের মত।

এবার বেশ তির্যক চালে দীপু বলল—কমবিনেশন কি ছিল?

—ইকনমিক্‌স্ ছিল না। হিস্ট্রি আর বাংলা ছিল।

—ইকনমিক্‌স্ নিলে না কেন? ভারী ইন্‌টারেস্টিং সাবজেক্ট। তাতেই বা কি, কমনসেন্স তো আছে, পড়লে বুঝতে পারবে। এই যে ওয়েলথ্ আর মানির ওপর বইখানা—এই দ্যাখ না?

দীপু বইটা নামাতে যাচ্ছিল। মালা বলে উঠল—থাক, আর দেখতে হবে না। আপনার বই পড়া শুরু হলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

হঠাৎ ওর মুখে আপনি শুনে দীপু ফিরে তাকিয়ে দেখল, রমলা ঘরে ঢুকেছে। দুটো প্লেটে দু'খানা কাটলেট আর দু' কাপ কফি। বুঝল, রমলার সামনে মালা তাকে তুমি বলতে চায় না।

দীপু আবার বেতের চেয়ারে বসল।

—আবার কফি কেন ভাই, এই তো চা খেলুম।

মালার কথার উত্তরে রমলা হেসে বললে—চায়ের পর কফি ভালই লাগবে।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালা একটু ইতস্তত করে বললে—কফি খেলে রাত্তিরে ঘুম হবে না।

—কেন?

—কি জানি, এমনিতেই রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না।

দীপু তাকাল, মালার চোখদুটো আবার ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল মালা।

দীপু বলল,—বেশ তো কাটলেটটা খাও। কফিটা ঠাণ্ডা করে খাও।

—তুমি কি খুব কফি খাও?

কাটলেটটা চামচ দিয়ে ভেঙে মুখে খানিকটা পুরে দীপু বললে—খুব নয়, দু' কাপ খাই।

মালা আর কোন কথা না বলে কাটলেট খেতে লাগল।

দীপুর মনটা খারাপ লাগল। মালার রাত্রে ঘুম হয় না শুনে ও যেন কিছুটা সম-বেদনার নরম হোল। রাত্রে ঘুম না হওয়া বড় কষ্টের। কিছুদিনের জন্যে তারও এমন একটা অবস্থা এসেছিল। সে জানে, বড় কষ্ট হয় এতে। বিশ্রী একটা যন্ত্রণা আর অস্বস্তিতে মনটা যেন সব সময় দমে থাকে।

—রাত্রে কি একেবারেই ঘুম হয় না?

মালা তাকাল. আস্তে বলল—ভোরের দিকে একটু ঘুম হয়।

—ওষুধ খাও না?

—না।

—ভাল করো। ঘুমের ওষুধ না খাওয়াই ভাল।

একটু থেমে আবার দীপু বলে—বরং রাত্তিরে শুয়ে বই পড়ে দেখতে পার। পড়তে পড়তে ঘুম পাবে। এও একটা ওষুধ। পড়াও হবে। ঘুমও হবে।

—তুমি বুঝি তাই করো?

দীপু কথার উত্তর না দিয়ে খেতে লাগল। মালাও খেতে লাগল। কিছুক্ষণ কেউই আর কথা বলল না।

দীপু একটা প্রশ্ন করবার অস্বস্তিতে কিছু অস্থির হয়ে উঠেছিল। বারবার ও ভাবছিল. মালার ব্যক্তিগত কোন কথা জিজ্ঞেস করবে কিনা। কেন মালা এতদিন অবি-বাহিত রয়েছে। কেন তার বাবা মারা যাবার পর সে আলাদা একটা ফ্ল্যাটে বাস করছে। কেন তার রাত্তিরে ঘুম হয় না। কেন তার চোখদুটো ভরা গাঢ় বিষণ্ণ অব-সাদ? মালার কথা কিছুই জানা গেল না। যদিও নিজের মধ্যে নিজে

বারবার বলছিল দীপু, জানবার তার কোন প্রয়োজন নেই। এখন মালার কথা জানা-না-জানা তার কাছে সমান। এক সময় ছিল যখন মালাকে রোজ দেখতে না পেলে মালার রোজকার সামান্য সামান্য ঘটনা পর্যন্ত শুনতে না পেলে তার মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু সেদিন আর নেই। মালা নিজে তার সেই উন্মত্ত আগ্রহকে একদিন সন্ধ্যায় ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

এখন সে দীপু নেই, আর স্বভাবতই সে মালাও আর নেই।

যে মালা একদিন তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল, সে সেধে আবার আজ তার বাড়িতে এসেছে। কিন্তু কার কাছে এসেছে? সে দীপু তো আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই, সে মন নেই, সে ভাবনা নেই। সেদিন চলে গেছে।

দীপু কফির কাপটা এক চুমুকে শেষ করে গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মালা আর তার কাছে যে আসে, সে চায় না। সে মিথ্যে করে জানাল, তার বিয়ে হয়ে গেছে, তার স্ত্রী বাপের বাড়িতে রয়েছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। তার সম্পর্কে যদি এখনো মালার তেমন কোন দুর্বলতা থেকে থাকে, তবে তা ভেঙে দেয়া। তাকে আরও হতাশ করে তোলা।

—আমাকে আজ একটু উঠতে হবে। গম্ভীর স্বরে দীপু বললে।

মালা বলল—আমিও উঠব।

মালা উঠল।—তোমার বৌয়ের সঙ্গে কিন্তু আজ আলাপ হোল না। বৌকে নিয়ে একদিন আমার ওখানে এস। হাসি চেপে বলল মালা।

দীপু বলল—আমার সময়ের বড় অভাব।

—তবু আমার ওখানে একবার এস। রোববার বিকেলে এস, কেমন?

গম্ভীর মুখে দীপু বলল—চেষ্টা করব।

মালার মুখটা আবার শুকিয়ে উঠল। এতক্ষণের উজ্জ্বলতা সব যেন নিভে গেল। চোখদুটো অবসন্ন ক্লান্ত মনে হোল দীপুর। মালা ওর দিকে তাকাল।

মালা ঘর থেকে বেরোবার আগে চোখের আন্তরিক আবেদন নিয়ে বলল—একবার এসো।

ইতর—ছোটলোক। কথাদুটো দীপুর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। যে-ইতরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে আবার এত ডাকাডাকি কেন? ইতরের কি কোন সম্মান নেই? তাড়ালে চলে যাবে, তু-তু করে ডাকলেই আবার আসবে। কি করে মালা তাকে যেতে বলতে পারছে ভেবে পায় না দীপু।

ও আস্তে বলে—গিয়ে কি বা লাভ! আচ্ছা যাব।

মালা আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

।। এগারো ।।

অন্যের মনে কষ্ট হবে ভাবতে দীপুর ভাল লাগে না।

রবিবার অফিস ছিল না। মালার বিষণ্ণ চোখদুটো মনে পড়ছিল বারবার। মনটা ক্রমেই যেন নরম হয়ে আসছিল। আজ হয়তো মালা ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে। সে যদি আজ না যায়, অপেক্ষা করবে, হয়তো কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, চোখদুটো আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠবে। তারপর আবার হয়তো একদিন এসে হাজির হবে। ভাবতে মনটা ভাল লাগে না।

নিজেই অবাক হয় দীপু। অথচ এমন একদিন ছিল যখন ও অক্লেশে একটা নিরীহ মানুষকে ধরে মারতে মারতে নাকমুখ ফাটিয়ে দিত। অনায়াসে পেটে ছুরি চালিয়ে দিতে পারত। মনে কোন দ্বিধা আসত না। চোখের পাতা একটুও কাঁপত না। একটা নীরেট তৃপ্তি আর সন্তোষ সবসময় মন ভরে থাকত। অন্যের কি কষ্ট হোল না হোল ভাববার মত মনের এতটুকু ছিদ্র থাকত না। মস্তানীর একটা উত্তেজনা আছে, সেই উত্তেজনার সন্তোষে মনটা ভরপুর হয়ে থাকত। আকণ্ঠ নেশার মত বুঁদ ভাব নিয়ে কাটত দিনরাত।

আজ মালার বিষণ্ণ চোখদুটোর ভাবনা কি করে যে তাকে একটা অস্বস্তিতে ফেলছে। ভেবে পেল না দীপু।

একবার গেলে ক্ষতি কি? মালা তাকে আর কি করতে পারে? কিছুই নয়। জীবনের অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে, এখন মালার ভাবনা তাকে আর কতটা অস্থির করে তুলতে পারবে? বরং আজ গিয়ে কথায় কথায় শান্তভাবে জানিয়ে এলেই হবে যে, সে আর কারো সঙ্গ কামনা করে না। মানুষের সঙ্গ যদি কামনা করতে হয়, তবে সে রঙীন চোখে আর মানুষকে দেখতে চায় না। সে যে অবস্থা থেকে কঠিন বেদনা আর যন্ত্রণা সয়ে আজ নিজেকে মানুষ হিসেবে পূর্ণ করে ফেলবার চেষ্টা করছে, সেই অবস্থায় আজও যারা আছে, তাদের কথা ভাবতে চায়।

মালার মত দুধেভাতে মেয়েরা শুধু রঙীন স্বপ্নই দেখতে পারে। দীপুর পক্ষে আজ তা আর সম্ভব নয়, তাই সে যাবে। চোখে রঙ লাগবার ভয় তার নেই।

বিকেলে গাড়িটা নিয়ে বেরোল দীপু। ঠিকানাটা বার করতে তেমন অসুবিধে কিছু হোল না।

দোতলার ফ্ল্যাটে থাকে মালা। দোরে কলিং-বেল টিপতে মালাই দোর খুলে দিল।

—এসো।

শাদা ধবধবে একটি তাঁতের শাড়ি পরেছে মালা। এক হাতে একগাছি বালা, একহাতে ঘড়ি। চুল ওর বরাবরই খুব বেশী নয়, তবে সামনের দিকটা খুব ঘন। মসৃণ কপালে দু-চারগাছি চুলের গুচ্ছ। খোঁপাটি ঘাড়ের পরিষ্কার গরদের রঙের চামড়ার ওপর ঝুলে আলতো ঠেকে রয়েছে। কণ্ঠের হাড়দুটি একটু জেগেছে, বোঝা যায় আগের চেয়ে রোগা হয়েছে মালা। অল্প বয়সে ও রোগা ছিল কিন্তু দেহের অস্থিসন্ধিগুলো বেশ ভরাট নরম ছিল, এমন রোগা ছিল না।

দীপু ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বাইরের ঘর। ছোট একটি চৌকি পাতা, দুটি মোড়া, একটি বইয়ের আলমারী। দীপু বসতে গেল। মালা একবার তাকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বলল, ভেতরে এসো।

ঘরটা পেরিয়ে ছোট একটি ঘেরা বারান্দা। তার পাশে আর একখানা ঘর। বেশ বড় এ-ঘরখানা। পরিষ্কার ঘর। আসবাব কিছুই নেই, শুধু একটি মস্ত খাট আর পাশে একটি ছোট নীচু টেবিল।

—বোস।

দীপু আস্তে আস্তে গিয়ে খাটটার ওপরই বসল। মস্ত খাটটার আর পাশে দাঁড়িয়ে মালা হাসল। যতই উজ্জ্বল হোক না, একটা ম্লান ছায়া সব সময়েই ওর মুখের ওপর পাতলা মেঘের মত ঢেকে রয়েছে।

একটা কিছু কথা না বললে ভাল দেখায় না। দীপু আস্তে বললে—তোমাদের অত ফার্ণিচার সব কি হোল?

মালা অল্প হাসল, বলল—বেচে দিয়েছি।

—কেন?

—কি হবে, সেইসব সেকেলে সেগুনের ফার্ণিচার। বোঝা যত কমে, ততই ভাল।

দীপু কোন কথা বলল না।

মালা আবার বলল—খুড়তুতো ভাইদের কিছু কিছু দিয়ে দিয়েছি।

দীপুর মনে পড়ল সেই প্রথম সন্ধ্যার যেদিন ও নিরঞ্জন দত্তর কাছে গিয়েছিল, নিরঞ্জন দত্তর দুটি তাগড়া ভাইপো বসেছিল চৌকির ওপর। ভ্রূকুটি করে তাকাচ্ছিল তার দিকে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে দীপু বলল—তারা সব কোথায়?

—তারা যে-যার বিয়ে-থা করে সব বাড়িঘর তৈরি করে আছে।

—এখানে আসে না?

মালা একটু চুপ করে থেকে শুধু বলল—না।

দীপু একটা কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল, বুঝল পারিবারিক কোন গুরুতর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে, যার জন্যে হয়তো ওর খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে একেনা মালার সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য বজায় আছে। কিন্তু এমন একা-একা একটা ফ্ল্যাটে মালা থাকে কি করে! এ যেন নির্জনবাস। দত্ত পরিবারের মেয়ের এমনভাবে একা থাকার কথা ভাবা যায় না।

মালা বলল—একটা ঝি থাকে। তাকে আজ সকাল সকাল বিদেয় করে দিয়েছি।

দীপু কোন কথা বলল না।

মালা একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল।—এখনই কি চা খাবে?

দীপু বলল—শুধু চা। ছুটির দিনে বিকেলে আমি আর কিছু খাই না।

—তা কি করে হয়। তুমি যে আমাকে সেদিন অত খাওয়ালে?

দীপু এবার অল্প হাসল।—তাই সেটা শোধ করে দিতে হবে? কিন্তু শোধ দেয়া, শোধ নেয়া এসব একতরফাই হোক না। দু পক্ষ থেকে ও-কথা না ওঠাই ভাল।

মালা খুব সহজভাবে হাসল।—তুমি বেশ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে শিখেছ।

তোমার কথাটা কিন্তু আমি কিছু বুঝলুম না। তোমারও কি কিছু শোধ দেবার আছে?

—না শোধ নেবার কিছু থাকতে পারে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগেই জানান দরকার।

—কি?

দীপু স্পষ্ট করেই কথাটা বলবে ঠিক করল। আস্তে অথচ কঠোর স্বরে বলল—শোধ নেবার মত মন আমার আর নেই। আমি যদি বলি আমি সম্পূর্ণ বদলে গেছি, তুমি বিশ্বাস করবে?

মালা ম্লান মুখে হাসবার চেষ্টা করল,—কেন করব না। আমিই যে আগের মত আছি, তাই বা তোমাকে কে বললে? সব মানুষই বদলায়, সবকিছুই বদলায়। কিছুই তো চিরকাল একরকম থাকে না।

দীপুর কান লাল হয়ে উঠল।—সংযত স্বরে বলল,—তাই বলছিলাম, আমার কোন নালিশ নেই। তোমার সঙ্গে আর দেখা হওয়ার কোন সার্থকতা আমার কাছে নেই।

মালার ঠোঁটে একটু চাপা হাসি ফুটে উঠল,—তুমি যতই অস্বীকার করো না কেন, নালিশ তোমার আছে। তা যদি না থাকত, তবে প্রথম থেকেই তুমি আমাকে অমন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে না। তুমি আমার কাছে মিছে কথা বলতে না।

—মিছে কথা! কি বলেছি?

—ভেবে দেখো। ছিঃ, এখনো এত ভয়, এত দুর্বল তুমি?

মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালার কথাগুলো আজ আর তেমন নরম মনে হোল না। বরং বেশ শান্ত হয়ে তার প্রত্যেকটি কথার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। এ ধরনের জবাব ও মালার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেনি বলেই হয়তো ও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কি মিথ্যে কথা বলেছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে মনে না পড়লেও মালা চলে যাবার পরেই মনে পড়ল। ও যে বিয়ে করেছে এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। মালা যতবার ওর স্ত্রীর উল্লেখ করছে, দীপু ততবারই মিথ্যে কথা বলেছে।

মিথ্যে কথাটা মালা ধরল কি করে? আর সে যে ভয়ে মিথ্যে কথা বলেছে, এমন একটা কথাই বা সে ভেবে বসল কি করে? একটু স্থিরভাবে ভাবলেই বোঝা যায়, মিছে কথাটা দীপু ভয়েই বলেছে। কিন্তু কিসের ভয়? কার ভয়? ও কি তবে মালার কাছাকাছি আসতেই ভয় পাচ্ছে, মালার সঙ্গে আবার সামান্যতম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতেও ভয় পাচ্ছে। নিজেকে অবিবাহিত বললে পাছে মালা তাদের পুরোন সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে। এই ভয় পাচ্ছে? আশ্চর্য। সত্যিই সে আবার মালার সঙ্গে মিশতেই ভয় পাচ্ছে।

মালার বুদ্ধি কত স্থির কত তীক্ষ্ন। ও দীপুর মনের চাপা ভাবটাও অক্লেশে ধরে ফেলেছে। দীপু পালাতে চাইছে, মালার কাছাকাছি পর্যন্ত আসতে চাইছে না। কেন? আরও তলায় চোখ মেলে দীপু দেখতে পায়, তার কিছু নালিশ আছে, কিছু বিক্ষোভ তার মনে জমাট হয়ে আছে। সেটা সে ভুলে থাকতে চায়। তাই মালার কোন সংস্পর্শে এলে পাছে তার সেই জমাট ক্ষোভ যন্ত্রণায় পরিণত হয়—এই তার ভয়!

আজও আবার মালার কাছে ও যেন কিছুটা পরাজিত কিছুটা সংকুচিত হোল। ওর ভেতরের ক্লেদ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মালা।

একটা কথা অকস্মাৎ ওর স্পষ্ট মনে হোল। যে দুর্দান্ত দুঃসাহস আর উত্তেজনা বিগত জীবনে ওর ছিল, সেটা বোধহয় দুর্বলতারই উল্টো একটা দিক। দুর্বল স্নায়ুই অকারণে উত্তেজিত হয় আর সেই উত্তেজিত স্নায়ু নিয়ে কখনো কখনো প্রচন্ড দুঃসাহসের কাজ করে বসতে পারে। ওটা কিন্তু স্থির শান্ত বীরত্ব নয়। সামান্য বাতাসে অল্প জলেই বড় বড় ঢেউ ওঠে, গভীর জলে ঢেউ ওঠে না।

—অনেক্ষণ একা একা বসে থাকতে হোল! বলতে বলতে মালা ঘরে ঢুকল। হাতে চায়ের পাত্র। দুটো কাপ-ডিশ এনে চা ঢালতে ঢালতে মালা বলল,—আগে এক কাপ চা খেয়ে নাও, তারপর যদি খিদে পায়, কিছু খাবে। জোর করে দেনা শোধ করব না।

খিল খিল করে হেসে উঠল মালা। ফরসা মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

মালা বেশ সহজভাবে কথা বলতে পারছে। দীপু কেন তা পারছে না।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে রইল দীপু।

মালা চায়ে চুমুক দিল।—কি হোল? চা খাও।

দীপু চায়ে চুমুক দিল এবার।

মালা মুচকি হেসে বলল,—তোমার বৌকে কিন্তু এর পরে একদিন নিয়ে এস। কেমন?

দীপু মুখটা নীচু করে চা খেতে লাগল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মালাকে।

একটু আগেই মালা বললে, তুমি আমার কাছে মিছে কথা বলেছ। ও ভেবে নিয়েছিল, তার যে বিয়ে হয়েছে এই একটামাত্র মিথ্যে কথাই সে মালাকে বলেছে—আর কোন মিথ্যে কথা বলেছে বলে মনে পড়ছে না। অথচ এক্ষুনি আবার মালা বলছে, তোমার বৌকে এর পরে একদিন নিয়ে এসো। মিথ্যে বলতে মালা কি বুঝেছে, এইটেই ভেবে পাচ্ছে না। তবে কি তার কোন সত্যি কথাই মালা মিথ্যে বলে ভেবে নিয়েছে। কিছুই ঠিক ভাল করে বুঝতে পারছে না।

টের পেয়ে লজ্জিত হোল দীপু যে নিজের মনটাই ওর কোন না কোন কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে, অসুস্থ হয়ে আছে। খুব সহজ কোন সত্যও মনে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এমন হওয়া উচিত ছিল না। বহু দিন কেটে গেছে, বয়েসও এখন উত্তর তিরিশ। এখন নিজের কাছে নিজের এভাবে ধরা পড়া লজ্জার কথা।

দীপু চা শেষ করে কাপ-ডিশটা খাটের এক পাশে রাখল।

চোখ তুলে দেখল মালা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখের ভাবটা কোনমতে বোঝা যাচ্ছে না। মালা কি খুব খুশী? চোখের মধ্যমণিটি গাঢ় নীল পাথরের মত চিক-চিক করছে। পাতলা ঠোঁটদুটি একটু চাপা, একটু যেন হাসি-হাসি ভাব, অথচ মুখখানি জুড়ে একটি বিষণ্ণ মেঘের ছায়া।

আজও মালার রূপের তুলনা নেই। কিন্তু রমণীয় সুঠাম দেহের ভেতরে রত্ন রয়েছে না আবর্জনা রয়েছে, এইটে খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না দীপু। কোনদিনই পারল না।

বিগত দিনে এক সময় তার মালাকে মনে হয়েছিল এক তাল খাঁটি সোনা, এক-মুঠো রত্নের মত। আবার একবার মনে হয়েছিল ওকে শুধুমাত্র ক্লেদ আর আবর্জনার স্তূপ। একবার মনে হয়েছিল তৃষ্ণার জল, আবার মনে হয়েছিল এক ভান্ড বিষ। কোনটে সত্যি? শেষের ধারণাটাই বজায় ছিল এতকাল। তবু দীর্ঘ সময়ে সে ভাবনার তীব্রতা অনেক কমে এসেছিল। ভেবেছিল, ওর মনে আর কোন সুতীব্র চিন্তা জাগ্রত হবে না। হয়ও নি। তেমন কিছু আবেগে ভরা রঙিন অথবা অন্ধকার দিনরাত আর তার জীবনে আসবার সম্ভাবনাও নেই। তবু মনে আজ একটা দ্বিধা জেগে উঠেছে। কে জানে তার কোন ধারণা ঠিক।

হতে পারে এ তার একটা অকারণ কৌতূহল। এ দ্বিধায় কিছু গভীরতা নেই। থাকবার কথাও নয়। তবু এই অকারণ কৌতূহল তার মনে না জাগলেই ভাল হোত। এখানে না এলেই বোধহয় ভাল হোত। আরও ভাল হোত স্কুলে সেদিন দেখা না হলে।

দেখা হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। দুজনেই কলকাতা শহরে বাস করছে, পথে-ঘাটে গাড়িতে এক সময় না এক সময় দেখা হতেই পারত। বরং এতদিন যে দেখা হয়নি এইটেই আশ্চর্য! দেখা হলে কথা বলার চেষ্টা করত না, চেষ্টা করেও নি, আর নিশ্চয় জেনেছিল যে, মালাও কথা বলবার কোন চেষ্টা করবে না। কোন এক ধনী গৃহের গৃহিণী হয়ে পরম সুখে দিন যাপন করতে একদা কোন্ এক পরিচিত ইতরের সঙ্গে দেখা হলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

তা কিন্তু হোল না, এইটেই বিস্ময়।

সে আজ সন্ধ্যা মুহূর্তে একা একা মালার নির্জন ফ্ল্যাটে তার সামনে বসে চা খাচ্ছে—এইটেই আশ্চর্য! সে যদি সত্যি আজ বিবাহিত হোত, বোধহয় ভাল হোত। মালা বিবাহিত হলে আরও ভাল হোত। কিন্তু তাও হয়নি এইটেই অবাক কান্ড।

দীপু বিমূঢ়ের মত তাকাল মালার দিকে। একটু সময় কথা বলতে পারল না।

—তোমার বৌকে দেখাবে কবে?

মালা চায়ের কাপ-ডিশটা নামিয়ে রাখল।

দীপু ও কথার জবাব দিতে সাহস করল না। কথাটা ঘুরিয়ে বলল,—এ ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত?

মালা সামান্য হেসে বলে,—এটা আমারই ফ্ল্যাট।

—এ ফ্ল্যাট বাড়িটা তোমার?

—কটা ফ্ল্যাট আছে?

—ছ'টা। পাঁচটা ভাড়া দিয়েছি। এইটেই থাকি।

দীপু সাধারণ আলাপে সহজ হবার চেষ্টা করে। বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে নাড়াতে নাড়াতে বলে,—এই টাকাতেই বোধহয় তোমার চলে? তোমার একার আর খরচই বা কত?

মালা বলে,—হ্যাঁ, চলে যায়। ইস্কুল থেকে তো বিশেষ কিছু থাকে না। যা মাইনে ওঠে, সেটা স্কুলের পেছনেই খরচ হয়. তবু তো স্কুলবাড়ির ভাড়াটা দিতে হয় না।

—ওটাও কি তোমার?

—হ্যাঁ, জায়গাটা বাবা কিনে রেখে-ছিলেন। বাবা মারা যাবার পরে ওখানে বাড়িটা তৈরী করেছি।

ম্লান হেসে একটু চুপ করে থেকে মালা বললে,—একটা কিছু করতে তো হবে।

দীপু এই কথাটার মানে বুঝতে পারছে না। একটা কিছু করতে হবে বলে মালা একটা ইস্কুল তৈরী করে চালাচ্ছে—এটা যেন বিশ্বাস করা যায় না। কেন, মালার কি কিছু করবার ছিল না। এমন রূপ, এত বড় একটা ফ্ল্যাটবাড়ির মালিক। নিরঞ্জন দত্ত টাকাও নিশ্চয় রেখে গিয়েছিলেন কিছু, এ সব থাকা সত্ত্বেও সে একটা স্কুল চালান ছাড়া আর কোন কাজ খুঁজে পেল না কেন? নিশ্চিন্তে কোন একটি পুরুষের সঙ্গে পরম

আরামে দিন কাটাতে পারত। কেন তা পারেনি?

একটা কথা ক্ষীণভাবে দীপুর মনের ওপর ভাসে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবু ভাবতে ভাল লাগে বলেই বোধহয় নিজের অনিচ্ছায় আপনা-আপনিই মনে হয়। তবে কি তার জন্যেই মালা এতকাল বিয়ে করেনি?

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। অসম্ভব। সেই সন্ধ্যায় মালার চোখে যে ঘৃণা দেখেছিল দীপু, ছোটলোক বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা মিথ্যে হতে পারে না। তার মত একটা ছেলের জন্যে মালার মত একটি মেয়ে কখনো একনিষ্ঠ-ভাবে প্রতীক্ষা করে না। এমন হাস্যকর একটা ভাবনা তার মনে এল কি করে?

মালা তাকাল বাইরের দিকে। খোলা দরজার সামনে বারান্দা। বারান্দার পরে কোন বাড়ি নেই, ফাঁকা আকাশ।। আকাশটা এসে অন্ধকার হয়ে আসছে। পুরোপুরি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পুব খোলা বারান্দার ওপারে আকাশের সীমানা থেকে ক্রমে অন্ধকার জমাট বাঁধছে। বাতাস বইছে অল্প-অল্প। সামনে তাকালে একটা তেতুল গাছের মাথা নজরে পড়ে। বাতাসে দুলছে, আর অস্পষ্ট একটা ঝুর-ঝুর আওয়াজ আসছে—বোধহয় গাছের তালপাতার আওয়াজ আরও দূরে প্রায় আকাশের সীমায় গোটা কতক তাল বা নারকেল গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে।

মালা বলল—আস্তে,—আমি তো কখনো ভাবিনি তোমাকে আবার দেখতে পাব!

—কেন?

—আমি জানতাম, তুমি জেলে আছ। যাবজ্জীবন জেলে থাকবে।

মালার মুখে জেলের কথাটা শুনে দীপু খুব খুশী হতে পারল না। মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বড় বড় চোখদুটো গম্ভীর হয়ে উঠল। মালার কাছে সে এখনো কোন্ পর্যায়ের মানুষ! মালা অনায়াসে ভাবতে পেরেছে, সে জেলে আছে। কই অন্য কোন মানুষ সম্বন্ধে তো এমন কথা ভাবতে পারে না? তার বেলা এ কথা ভাবতে একটুও বাধে না।

—দীপু গলার স্বরটা খুব শান্ত করে বলল,—কথাটা কি নিজের মনে মনেই ভেবেছ?

—না। তোমার খোঁজ করতে গিয়ে এমনি একটা কথাই শুনেছিলাম।

—কার কাছে শুনলে?

—আমার খুড়তুতো দাদার কাছে। তার হাতে পায়ে ধরে বলেছিলাম, তোমার একটা খোঁজ এনে দিতে। সে খোঁজ করে খবর নিয়ে এল, একটা বড় রকমের খুনের কেসে ধরা পড়ে তুমি জেলে গ্যাছ।

দীপু মনে মনে কৌতুক অনুভব করল। মালা হাতে-পায়ে ধরে তার খুড়তুতো দাদাকে বলেছিল তার খোঁজ এনে দিতে? কেন, এমন অবস্থা কবে হয়েছিল মালার। বিনিয়ে বিনিয়ে যে মিথ্যে কথা বলছে না, তাই বা কি করে বুঝবে দীপু।

মালা ধীরে ধীরে উঠল। ঘরের কোনে গিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাল। ঘরটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, ওরা কেউই খেয়াল করেনি। আলো জেবলে আবার ফিরে এসে একটা মোড়া টেনে নিয় বসল।

বেশ সহজভাবে চোখ তুলে দীপুর দিকে তাকিয়ে বললে,—তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার ছিল বলেই আমার এখানে তোমাকে ডেকেছিলাম। একবার আসতে বলেছিলাম।

দীপু অস্বস্তি বোধ করল। এ সব কথা সে শুনতে চায় না।

মালা আবার বলে,—তুমি বলবে, তোমার কোন নালিশ নেই। কোন কথা জানবার তোমার দায় নেই, কিন্তু আমার জানাবার দায় আছে। গুটিকতক কথা তোমাকে জানাতে চাই। তা নইলে দু'পক্ষেই কিছু কিছু দোষ থেকে যাচ্ছে।

তুমি দেখছ আমার দোষ, আমি দেখছি তোমার দোষ।

ম্লান হাসল মালা,—অবিশ্যি দোষ আমাদের কারোর নেই। এমনি যদি হয়ে থাকে, দু'পক্ষ থেকে দাবী উঠবে না। পুরোন দাবী উঠবে বলে ভয় পেয়ো না।

অক্লেশে হাসতে হাসতে মালা কি করে যে কথাগুলো বলছে ভেবে অবাক হয় দীপু। ও কোনমতেই এমন সহজভাবে এ সব কথা বলতে পারবে না। বলতে চায়ও না। শুনতেও চায় না।

আস্তে আস্তে বলে,—ও সব কথা থাক। আমি কারো দোষ দিই না।

—তুমি দোষ না দিতে পার। আমার নিজেকে দোষী মনে হতে পারে।

দীপু ও কথা চাপা দেবার জন্যে সামান্য হেসে চোখে কৌতুকের ভাব এনে বলে—তুমি জানতে আমি জেলে! কথাটা শুনে কিন্তু বেশ মজা লাগছে। তুমি নিশ্চয় শুনে খুব মজা পেয়েছিলে?

—আমি মজা পাব, কি বলছ তুমি! আমার অবস্থাটা কিছুই জান না। অথচ একটা ধারণা করে বসে আছ। তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝেছিলাম, তুমি এই বয়সেই একটা কিছু ধারণা করে বসে আছ।

—তা নয়, আমি জেলে আছি ভেবে আমার নিজেরই মজা লাগছে, তাই বললাম। কথাটা শুনলে কবে?

মালা দীপুর দিকে তাকাল। স্পষ্ট দেখতে পেল দীপুর চোখে-মুখে একটা ক্রূর হাসি কুটিল ভাব। মুখের ওপর বিষন্নতার ছায়া ঘন হয়ে এল। আস্তে বলল,—তুমি তামাসা করছ?

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বলল,—তামাসা ছাড়া আর কি করতে পারি বলো। ব্যাপারটা তো একটা তামাসাই।

মালা গম্ভীর হয়ে উঠল।—তুমি যেদিন চলে গেলে, তারপর কি একবারও আমার খোঁজ করেছিলে?

হেসে উঠল দীপু।—তোমার এ প্রশ্নটাও একটা তামাসা।

—তার মানে।

দীপু নড়ে চড়ে বলল,—থাক গে, ও সব কথা ছেড়ে দাও। পুরোন কোন কথা শোনবার কোন আগ্রহ আমার নেই। আর এ-সব কথা শুনতে আজ আমি তোমার কাছে আসি নি।

—তুমি স্বীকার করো বা না করো, তুমি কিছু শোনবার আশা নিয়েই এসেছ, আর আমি, আমিও কিছু বলবার আশা নিয়ে তোমাকে ডেকেছি। কথাটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কিন্তু স্বীকার করতে তুমি লজ্জিত হোচ্ছ, কার কাছে কে জানে। হয়তো তোমার নিজেরই কাছে।

দীপু আবার একবার থমকাল। একটা ধাক্কা খেল যেন। কথাটা খুব হালকা নয়। মাঝে মাঝে মালার মুখে এ ধরনের কথা শুনে সে থমকে যাচ্ছে। মালা তার মনের ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে। ওর নিজের কাছে নিজের অজ্ঞাত মনোভাব সহজভাবে বলে ফেলছে। সত্যি কি তাই? দীপু কি মালার কাছে শুনতে এসেছিল? কোন আশা নিয়ে এসেছিল? নাকি শুধু দয়া করে তার অনুরোধকে সম্মান জানাতে এসেছিল।

শেষের কথাটাই তার কাছে সত্যি। মালা তাকে এমন কাতরভাবে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিল যে, সে অনুরোধটা ঠেলতে পারে নি। দয়ায় তার মন নরম হয়েছিল। মালা পাছে মনে কোন কষ্ট পায়, সেই ভেবেই এসেছিল। পুরোন কোন কথা সে শুনতে চায় না, ভাবতে চায় না। সে সব দিক তার কাছে হাস্যকর শুধু নয়, সত্যিই তামাসার মত মনে হয়। তবু মালার কথাটা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারা খুব কঠিন। কে জানে হয়তো কখনো কোন

ভাল কতকগুলো মাখমের মত মেয়ে দেখলাম।

—কেন, মেয়েগুলো তো বেশ ফুটফুটে সুন্দর।

—তা বটে।

দীপু পায়েসের বাটিটা হাতে নিয়ে চামচে করে পায়েস মুখে দিল।

বলল—আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি, তুমি কখনো কালো রোগা ড্যাবডেবে হলদে চোখ ময়লা ইজের-পরা মেয়ে দেখেছ? চুলে যাদের তেল পড়ে না, ঘামে আর ময়লায় জবজবে মুখ, দেখেছ এমন মেয়ে?

মালা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দীপুর দিকে। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

দীপু আবার পায়েস মুখে দিয়ে বলল, —এই রকম কিছু মেয়েকে তোমার স্কুলে ভর্তি করে নিলে কেমন হয়?

এবারে হেসে ফেলল—ও এই কথা! আমি ভাবলুম বুঝি কি না কি বলবে। কিন্তু এ-কথা কেন?

দীপু হাসল, বলল—এমনি, পায়েসটা খেতে খুব ভাল হয়েছে।

—ভাল হয়েছে। আর একটু দোব?

—না, আর নয়। ভাল জিনিস বেশী খেতে নেই।

মালা কফির পাত্র থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল—স্কুলের কথা কি বলছিলে যেন?

—বলছিলাম, ওইসব মেয়েগুলোকে তোমার স্কুলে নাও না কেন?

সহজভাবেই বলল—ওদের নিলে কেউ স্কুলে থাকবে না।

—তা বটে।

বলে পায়েস খেয়ে বাটিটা রাখল দীপু। মালা কফির কাপ ওর সামনে রেখে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। কাচের গেলাসে এক গেলাস জল নিয়ে এল। জলের গেলাস দীপুর হাতে দিয়ে আবার মোড়াটা টেনে বসল।

দীপু জল খেয়ে পকেট থেকে রোমাল বার করে মুখ মুছল।

—পায়েসটা কিন্তু বেশ ভাল লাগল। তুমি রেঁধেছ?

—হ্যাঁ। কেন তোমার বউ রাঁধতে পারে না?

—পারে কিনা পরখ করে দেখিনি। বড়-লোকের মেয়ে, রান্নাবান্না বলতে গেলে জানেই না। আমার কাছে থাকলে পাছে কিছু কাজ-কর্ম করতে হয়, তাই বাপের বাড়ি থাকে বেশি সময়।

চোখ বড় বড় করে মালা বলে—তাই নাকি! আহা তোমার তো ভারী কষ্ট!

—কষ্ট কিসের?

—বারে বা, বিয়ে করলে অথচ বউ তোমার কাছে থাকল না।

—সে যদি না থাকতে চায়, আমি তো তাকে জোর করে রাখতে পারি না, বড়-লোকের আদুরে মেয়ে, বুঝতেই পারছ ভীষণ খামখেয়ালী, নিজের ভাবনায় নিজে চলে। ওইটুকুই বোঝে। সংসারে এত মানুষ, তাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট, কোনদিকে ফিরে তাকাতে চায় না। নিজের ভাবনা ছাড়া আর কোন ভাবনাই তার নেই।

—মানে তুমি বলছ, তোমার বউ আত্ম-কেন্দ্রিক।

—ঠিক তাই। ওসব মানুষের সঙ্গে প্রায় কারোরই বনে না। তাই আমারও বনল না।

মালার মুখে ভাবনার ছাপ পড়ল। দীপু বিয়ে করেনি ও জানে, তবু এমন করে গুছিয়ে ও কার কথা বলতে চাইছে। বড়লোকের মেয়ে, খামখেয়ালী, নিজের ভাবনা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, এসব বলছে কাকে? দীপু উলটো চাপ দিচ্ছে কি? মালা একটু বিব্রত বোধ করল। এমন গুছিয়ে তো মিছে কথা বলা যায় না, কার কথা বলছে দীপু।

অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসে মালা বলল—কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

দীপু কফির কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল।

সামনে বারান্দা দিয়ে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে। বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আকাশের দিকে তাকাল দীপু। অন্ধকার আকাশ। একটু যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে। মেঘ করেছে কি? বৃষ্টি হলেও হতে পারে। ভাপসা গরমে বৃষ্টি হলে ভালই হয়। গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে এসেছে কিনা মনে পড়ল না। গাড়ির ভেতরে জল যেতে পারে।

এখানে এতক্ষণ বসে থাকবার কোন মানে হয় না। তবু ও বসে আছে। কেন যে বসে আছে, কেন যে উঠতে চাইছে না ও নিজেও খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না। উঠব উঠব করেও উঠতে পারছে না ও।

একটা বড় নিঃশ্বাসের শব্দে ফিরে তাকাল দীপু।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোল।

গম্ভীর তিক্ত স্বরে বলল—কিন্তু দেখা হবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

—শুধু প্রয়োজনটাই জীবনে বড় নয়। কোন কারণ নেই, তবু তুমি আসতে আমি খুশি হয়েছি।

—আমি কিন্তু আসতে ভয় পাচ্ছিলাম।

—কেন?

—একবার তাড়া খেয়েছি তো, তাই ভয়।

বলেই দীপু থামল, কথাটা না বললেই ভাল হোত। কেন যে বলে ফেলল কথাটা

মালা তাকিয়ে রয়েছে দীপুর দিকে।

বারান্দার সামনে নিমগাছের ডালপাতার ঝরঝর শব্দ বাড়ছে। ঠাণ্ডা দমকা বাতাসে কপালের ওপর চুল উড়ছে।

মালা আস্তে আস্তে বলল—আজ আর বাবা নেই। কে তোমায় তাড়া দেবে?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দীপু। যাক মালা নিজের দুর্ব্যবহারের কথাটা এখনো বুঝতে পারেনি। তার কথায় মালার সম্বন্ধে কোন নালিশ প্রকাশ পায়নি।

—বাবা আজ নেই, তার নামে কিছু বলা আমার উচিত নয়, তবু তুমি যেটা জান না সেটা বলাই ভাল। বাবা সেদিন তোমাকে শুধু তাড়িয়ে দেননি, তোমাকে সেদিন মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কথাটা বলতে লজ্জা হয়, তবু বললাম। আমার ওপর স্নেহে অন্ধ হয়ে তোমাকে একেবারে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কিন্তু কি লাভ হোল বলো তো। তিনিও আজ আর নেই, আমিও আজ আর তেমন নেই।

দীপু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

—তাই তো সেদিন তোমাকে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম।

মালার মুখের ওপর গাঢ় বিষণ্ণ প্রলেপ পড়ল। দীর্ঘ সময় আগের সেই সন্ধ্যাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

—উঃ! কি ভয় করছিল আমার। সমস্ত শরীরটা তখন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবার আতঙ্কে কাঁপছিল। তোমাকে কি বলেছি, কি করেছি, আমার আজ ভাল করে মনেও নেই। ভয়ে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, কিছুই মনে ছিল না। শুধু এইটা স্থির করেছিলাম যে, তোমাকে বাঁচাতে হলে তাড়িয়ে দিতে হবে। যেমন করে হোক, বাড়ি থেকে বার করে দিতে হবে। তুমি যে ঘরে ছিলে, তার পাশের ঘরেই চারটে লোক বসেছিল। তারা নেশা করেছিল, বাবা তাদের টাকা দিয়ে আনিয়েছিল তোমাকে মারবার জন্যে। দুপুরেই আমি কথাটা শুনেছিলাম, অন্য কারো মুখে নয়, বাবারই মুখে। বাবা খেতে বসে আমাকে ডাকালেন, বললেন, সেদিন সন্ধ্যেবেলা তুমি আসবে আর আমাকে তোমাকে অপমান করতে হবে। জানাতে হবে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। বাবার মুখের ওপর কখনো কথা বলিনি, সেদিনও চুপ করে রইলাম। খেয়ে ওঠবার সময় বাবা জানালেন, যদি আমি তা না পারি, তবে তোমাকে আজ মেরে ফেলা হবে আমার সামনে। তার জন্যে যদি পাঁচ-দশ হাজার টাকা খরচ হয়, বাবা তাতে পেছপা হবেন না। শুনে কি যে ভয় হোল আমার। আবার ভাবলাম, বাবা হয়তো আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার জন্যে এসব কথা বলছেন। কিন্তু বেলা পড়তে না পড়তে সমস্ত বাড়িটা থমথমে হয়ে উঠল। খুড়তুতো দাদাদের মুখে দেখলাম আতঙ্ক আর ভয়। ওরা কিন্তু আসলে ভীষণ ভীতু, এক দাদা রীতিমত ভয় পেয়ে আমার কাছে এসে জানাল। কাকা আজ ছেলেটাকে মেরে ফেলবে। চারটে গুণ্ডা আসছে বাইরে থেকে।

দু' হাজার টাকায় রফা হয়েছে। তুই আর অবাধ্য হোসনে, কাকা যা বলছে তাই শোন। আর কোন সন্দেহ রইল না যে, তোমাকে মারবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। যেমন করে হোক তোমাকে বাঁচাতে হবে।

মালা চুপ করে তাকাল দীপুর দিকে। দীপুর মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। কানদুটো টকটকে লাল।

বাইরে থেকে দমকা বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট এসে পড়ছিল বারান্দায়। আকাশটা মেঘে মেঘে ঘন কালো দেখাচ্ছে। দূরে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দীপু গুম হয়ে বসে রইল। মালা একটা কথাও মিথ্যে বলেছে বলে মনে হচ্ছে না।

সত্যিই সেদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়ি ঢোকবার আগেও কলকাতার সেরা গুন্ডাদের একজনকে দেখেছিল। এরা পাড়ার মস্তান নয়, বখাটিয়ার নয়। এরা পেশাদার গুন্ডা। খুন-জখম-রাহাজানি করে পয়সা উপায় করে। এরা বিভ্রান্ত তরুণ নয়, যুবক নয়, পাকা-পোক্ত চল্লিশ বছরের লোক এরা। কারো বয়েস তার চেয়েও বেশী। এরা পাড়ায় কখনো মস্তানী করে না, সিনেমায় লাইন দেয় না, সরু দোনালা প্যাণ্ট পরে না, ছুঁচোল নাকের জুতো পরে না। এরা রঙ-বাজী করে না, বীরত্ব দেখাবার কোন চেষ্টা করে না, রাস্তায় কখনো মারপিট করে না, যাকে খতম করবার দরকার, তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে শেষ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এই ধরনের একজন বিখ্যাত গুন্ডা কাউকে ও দেখেছিল সেদিন নিরঞ্জন দত্তর বাড়িতে। তবু ভয় পায়নি দীপু। পকেটে পেটো বোমা ছিল ওর কাছেও। ভয় কাকে বলে দীপু তখন জানত না।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর স্বরে দীপু বললে—তুমি কি জানতে না, আমাকে মারা অত সহজ নয়?

মালার চোখদুটো ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বলল—জানতাম। কিন্তু তবু বাড়ির ভেতরে একটা ভীষণ মারামারি হবে ভেবে আমার ভয় করছিল। তুমি একা এসেছিলে, তোমাকে ওরা মেরে ফেলতেও পারত।

দীপু বললে—একা আমি ছিলাম না। বাইরে আরও তিনটি ছেলে অপেক্ষা করছিল, আমার ইশারা পেলেই তারা চলে আসত। যাক, যা হয়েছে, ভালই হয়েছে।

আবার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল দীপু।

দীপু বড় ক্লান্তি অনুভব করছিল। মনে হোল বহুকাল পরে ওর মাথা থেকে একটা বিষাক্ত রক্তের চাপ ধীরে ধীরে নেমে এল। বহু কালির জমাট একটা ভাবনার ভার অকস্মাৎ হালকা হয়ে এল। আর কোন সন্দেহ ওর নেই যে, ও ভুল করেছিল। মালার কাছ থেকে গালিগালাজ শুনে বেরিয়ে আসবার পর ও অনেক কথাই ভেবেছিল, শুধু একটা কথাই ওর মনের ধারেকাছেও আসেনি যে, তার ভুল হতে পারে। মালার সেদিনের ব্যবহারের অন্য কোন একটা মানে থাকতে পারে। তাকে বাঁচাবার জন্যে ভয়ে আতঙ্কে মালা যে তার সঙ্গে অমন ব্যবহার করতে পারে সে কল্পনা করতেও পারেনি।

ভুল তার হয়েছিল। ভালই হয়েছিল। এই ভুল না হলে তার জীবনের গতিটা সম্পূর্ণ অন্য পথেই চলত আজ পর্যন্ত। তাতে কোন লাভ হোত না। না, লাভ হোত না। মালাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন সামনে কোন পথ থাকত না। থাকত জমাট অন্ধকার।

ভালই হয়েছে। ভুল হওয়া প্রয়োজন ছিল তাই ভুল হয়েছে। আর আজ সেই ভুলের কথা জেনেও কোন লাভ নেই।

একদা মালা নাম্নী যে রোমাণ্টিক একটি মেয়ে ছিল, সেও নিশ্চয় আজ বেঁচে নেই আর তার প্রগাঢ় রোমান্সের নায়ক দুর্দান্ত মস্তান দীপুও আজ আর বেঁচে নেই। কোন লাভ নেই। আজ সেই উত্তুঙ্গ আবেগের তরঙ্গশীর্ষ থেকে দুজনেই বিচ্যুত হয়েছে। তারুণ্য আর যৌবনের প্রাণশক্তি জীবনে বার বার ফিরে আসে না।

বিষণ্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল মালা—তুমি ভুল বুঝো না। আমার বাবার কোন দোষ ছিল না। আমাকে বড় বেশী ভালবাসতেন। তাই আমার জন্যে করতে পারতেন না এমন কাজ নেই।

—জানি, দোষ কারো নেই। আমরা মাঝে মাঝে কতকগুলো ঘটনার যন্ত্র হয়ে যাই।

ম্লান হাসল দীপু, —ঘটনাগুলো অব্যর্থ নিয়মে ঘটে আর যন্ত্রের মত অবশ হয়ে ঘটনাগুলো ঘটতে দিই।

—তুমি ভাগ্য মান?

—আগে মানতাম না। এখনো মানি নে, তবে মনে হয়, এই বিরাট সংসারের পরিবেশ আমাদের চালায়। এতে আমাদের কোন হাত নেই। একে যদি ভাগ্য বলো, আমার কিছু বলবার নেই।

—আমি কিন্তু মানি।

বলে মালা তাকাল চোখ তুলে। আস্তে বলল—আমার ভাগ্য বড় খারাপ।

কথাটার উত্তর দিল না দীপু। বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই। গুমট গরমে ঘাম হচ্ছে। ফ্যানের বাতাসটাও তেমন জোরালো মনে হচ্ছে না।

হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। রাত হয়ে আসছে।

অল্প হেসে বলল—তুমি কি সন্ধ্যেবেলা এমনি একা থাক?

—মাঝে মাঝে একা থাকি। মাঝে মাঝে বেরোই।

—কোথায় বেরোও?

—সিনেমায়, মার্কেটে, কোন ঠিক নেই।

দীপু ভাবল, একবার জিজ্ঞেস করে, তোমার স্বামী কি করেন? তোমার কি বিয়ে হয়েছে? না হয়ে থাকলে এতদিন বিয়ে হয়নি কেন? এ দেশের মেয়েদের তো এমন একা থাকাটা স্বাভাবিক নয়। তবে কি এই দীর্ঘ সময়ে তোমার জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার জন্যে বিয়েটাও তোমার হয়নি? মেয়েমানুষ হয়ে এতদিন বিয়ে না করে আছ কি করে?

ভাবল, কিন্তু বলতে পারল না।

ক্লান্তস্বরে বলল—রাত হোল। চলি এবার।

মালা জিজ্ঞেস করল—তুমি সন্ধ্যেবেলা কি করো?

—পড়াশুনো করি।

বিষণ্ণ হেসে মালা বলল—এতকাল শুধু পড়াশুনো নিয়েই কাটালে?

—কি আর করা যায় বলো। আচ্ছা, উঠি।

দীপু উঠে পড়ল। মালাও উঠল। ঘরের বাইরে এসে দীপু জুতো পরতে নীচু হোল।

মালা সংকোচ নিয়ে বলল—আবার কি আসবে?

দীপু মুখটা সামান্য উঁচু করে বললে—কি হবে আর এসে?

জুতো পরে দাঁড়িয়ে আবার বলল—দেখি যদি সময় পাই। আবার আসব।

বলে বেরিয়ে গেল দীপু।

।। বারো ।।

দুদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশটা ঝাপসা হয়ে আছে জোলো মেঘে। রাস্তায় রাস্তায় জল জমেছে, চলাফেরা করা শুধু মুস্কিল নয় অত্যন্ত বিরক্তিকর। ঘরবাড়ি স্যাঁতসেতে, মনটাও যেন ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে রয়েছে। বার বার শুধু বারান্দায় এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা, জোলো হাওয়ার ভয়ে আবার ঘরে ফিরে এসে এক কাপ চা খাওয়া। কবে যে এ বৃষ্টি থামবে কে জানে!

আজ ছুটির দিন। রবিবার। সকাল থেকে কোথাও বেরোবার উপায় নেই। কেউ যে আসবে এমন আশা করবারও উপায় নেই। একা একা ফ্ল্যাটটার ভেতরে ঘুরে বেড়ান, কখনো বা শুয়ে পড়া—মালার ভাল লাগছে না।

দিন দুই হোল মালার জ্বর-জ্বর হয়েছে। প্রথম দিনের বর্ষণে সামান্য ভিজেছিল মালা। ডক্টর নাগের সঙ্গে গিয়েছিল একটা গানের সম্মেলনে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মেলন, শেষ হতে রাত হয়েছিল। তখনই বেরিয়ে দেখল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হঠাৎ সেদিন কেমন ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল মালা। ডক্টর নাগের গাড়িতে ফেরবার পথে গাড়ির জানলার কাচ খুলে দিয়েছিল। নাগ গাড়ি চালাতে চালাতে আপত্তি জানাল। ছাট আসছে।

আসুক বৃষ্টির ছাট। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির বিন্দু এসে চোখে মুখে পড়ছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে গা শিরশির করছিল। ছেলেমানুষের মত অকারণে হেসে উঠেছিল মালা।

সুর্য নাগ মালার এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল একবার। তারপর নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগল। নাগ কখনো সহজে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয় না, সেদিনও হোল না।

—বৃষ্টির জলে ভিজতে কিন্তু খুব ভাল লাগে! বেশ মজা লাগে!

প্রায় তিরিশ বছরের কোন মহিলার মুখে এ ধরনের কথা মানায় না। বিশেষ করে বিষণ্ণ গাম্ভীর্যই ছিল এই স্তব্ধযৌবনা মালা দত্তর বৈশিষ্ট্য। সুর্য তার চোখে মুখে বিষণ্ণতা দেখেছে, ক্লান্তি দেখেছে, কিন্তু আবেগময় উচ্ছ্বাস কখনো দেখেনি। ক'দিন ধরে মালা দত্ত যেন কিছুটা বদলেছে। বেশী কথা বলছে, বেশী হাসছে, অকারণে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

সুর্য নাগ আরও একবার অবাক হয়ে তাকাল।

মালা দু'হাতে বৃষ্টির গুঁড়ো মুখে ডলতে ডলতে বলল—বেশ লাগছে!

সুর্য নাগ গম্ভীর স্বরে বললে—বৃষ্টিতে ভেজা অভ্যেস থাকলে ভালই লাগে, কিন্তু অভ্যেস না থাকলে সুখটা আবার অসুখ হয়ে উঠতে পারে।

—ওই ওমনি শুরু হোল ডাক্তারী!

মালা হাসল। ভিজে হাতদুটো নাগের ঘাড়ের ওপর রেখে বলল—হাত দুটো কি ঠাণ্ডা দেখেছেন?

নাগ কোন কথা বলল না। গাড়ির গতিটা বাড়িয়ে দিল।

সেদিন মালা ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছোল রাত পৌনে একটায়। সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে ওঠবার আগেই টের পেল, মাথাটা ভারী, গায়ে হাত পায় ব্যথা-বেদনা, গলায় ব্যথা।

ডক্টর নাগের কথাই ঠিক হোল। সেদিনই স্কুলে গিয়ে জ্বর এল, এখন জ্বর নেই, কিন্তু দেহটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। সকালে আজ সুর্য নাগ এসেছিল। ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে আরও গোটা কতক বড়ি খেতে বলে গেছে।

মালা সকালেই ভাবছিল, সুর্য নাগকে সন্ধ্যেবেলা আসতে বারণ করে দেবে, কিন্তু কি বলে বারণ করা যায়? সুস্থ থাকলে না হয় বলা যেত, আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকব না, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় এই বর্ষায় সে যে বাইরে বেরোবে না একথা তো না বললেও বোঝা যায়।

ও চায় না যে ডক্টর নাগ সন্ধ্যেবেলা আজ আসুক। কে জানে দীপু হয়তো আজ ছুটির দিনে তার এখানে চলে আসতে পারে। আর এলে সে বিকেলে কিংবা সন্ধ্যেবেলাই আসবে। দীপু এলে এখন আর কেউ থাকুক এটা মালা চায় না। কেউ নয়। দীপু এলে তাকে সে একেবারে একা একা চায়। এমন অনেক কথা এখনো দীপুর সঙ্গে হতে পারে, যা সকলের সামনে বলা যায় না—সে সব কথা অন্য কেউ জানে না।

একটু ঘুরিয়ে সুর্য নাগকে মালা জিজ্ঞেস করল—সন্ধ্যেবেলা কি আজ আসছেন?

সুর্য নাগ হাসল একটু। —না, বোনের বাড়ি যেতে হবে একবার। ব্যারাকপুরে।

বাঁচল মালা। নাগ তাহলে সন্ধ্যেবেলা আজ আসছে না। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। নাগকে আসতে আর বারণ করতে হোল না। বারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। নাগ তার অনেক দিনের বন্ধু। নিঃস্বার্থ উপকারী এমন বন্ধু এখন তার আর কেউ নেই। নাগকে সে শ্রদ্ধা করে, বহুকাল ধরে আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার নাগের সঙ্গে।

আজ সন্ধ্যায় নাগ আসবে না, কিন্তু দীপুও কি আসবে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ নেই। আকাশ তখনও মেঘে মেঘে ভারী হয়ে রয়েছে। এমন দুর্যোগে কি কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়। দীপুও হয়তো আসবে না।

খাটের ওপর এসে শুয়ে পড়ল মালা।

এরচেয়ে নাগ যদি আসত, সময়টা তবু কথাবার্তা বলে কাটত। একা একা ভাল লাগছে না। সর্বক্ষণ একটা উন্মুখ প্রতীক্ষা থাকা বড় যন্ত্রণার। কিন্তু দীপুর জন্যে ও প্রতীক্ষা করবার কোন কারণ নেই। ওর না আসার সম্ভাবনাই বেশী। দীপু তো যাবার সময় স্পষ্টই বলে গেল, কি হবে আর এসে। সত্যিই তো এসে আর কি হবে? কোন লাভ নেই। দীপুর হয়তো তার ওপর আর কোন আকর্ষণও নেই। দীপু অনেক বদলে গেছে।

কটা দিনেই লক্ষ্য করেছে মালা, দীপু কথা বলে কম, চুপ করে থাকে আর ভাবে। ভাবনাটা যে কোন আবেগসঞ্জাত নয়, সেটা চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়। বয়েসের তুলনায় দীপু এখন বড় বেশী গম্ভীর মনে হয়। কপালে দুটো স্পষ্ট রেখা! চিন্তার চিহ্ন। ও যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। শুধু চোখ দুটো এখনো তেমনি বড় বড়, স্নিগ্ধ

এত সরল চাউনি। আগের চেয়ে অনেক শান্ত অনেক গভীর।

মালা নিজেও আর তেমন নেই। ওর দেহের প্রতিটি বাঁকে যৌবন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবু দীপুর সম্পর্কে ওর মনের আবেগ আজও তেমন ম্লান হয়ে যায় নি। দীপুকে প্রথম যেদিন দেখেছিল স্কুলের করিডরে, ওর গা শিরশির করে উঠেছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। ভেতরের বহুকালের এক স্তিমিত স্রোত আবার তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। অনেক কষ্টে নিজের ভাব চাপবার জন্যে বেশী কথা বলেছিল। ও একশ'টা কথা বলেছিল, দীপু বলেছিল একটা। তাতেও বুকের কাঁপুনি থামেনি। আবেগের একটা তোড় এসে তাকে অস্থির করে তুলেছিল। আবার বেহায়ার মত গিয়েছিল দীপুর বাসায়। সেখানেও তাই। রমলাকে দীপুর স্ত্রী ভেবে যেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তেমনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিল দীপুর বিয়ে হয়নি খবরটা শুনে। দীপু তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে।

বিয়ের কথাটা মিছিমিছি কেন যে দীপু বলেছিল বুঝতে একটুও সময় লাগেনি। মালার সামনে ও একটা নৈতিক পাঁচিল তুলে দিতে চায়। মালা সে পাঁচিল ভেঙে হঠাৎ এগিয়ে আসতে না পারে যাতে। কিন্তু কেন? মালার সামনে তার কাল্পনিক স্ত্রীকে খাড়া করিয়ে ও কি মালাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে চায়? মালাকে ও এত খেলো ভাবে? না, দশ বারো বছর আগের মালা আর নেই। তার মনে আবেগ আসে, কিন্তু সে আবেগে ঝড় ওঠে না। বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে পারে মালা। বিচার করে চোখ মেলে চারদিক দেখে নিতে পারে।

তবু মালা মেয়েমানুষ। দীপু তার কাছে যতখানি ভালবাসার বেদনার বস্তু ছিল, আজও তাই আছে। শুধু নিজের অস্থির চাঞ্চল্যকে সংযত করবার মত স্থির বুদ্ধিটা তার জন্মেছে। ভাব গোপন করবার একটা প্রতিরোধ শক্তি সে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করেছে।

তা যদি না হোত, তাহলে সে আবেগ লালসার হাতছানি থেকে আজও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না।

সূর্য নাগ তার জন্যে যা করেছে, শুধুমাত্র তার প্রতিদান দিতে গেলেই তাকে অনেক কিছু খোয়াতে হোত।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি করে যে সূর্য নাগ ধীরে ধীরে তার এত কাছে এগিয়ে এল ও নিজেই ঠিক বুঝতে পারে না। বছর নয়েক আগে তার বিয়েটা যদি সেদিন হয়েই যেত, তবে কোথায় বা থাকত, সূর্য নাগ আর কোথায় বা তার স্কুল।

দীপু জেলে গেছে খবরটা পেয়ে ওর অস্থিরতা আর যন্ত্রণা ধীরে ধীরে অনেক কমে এসেছিল সত্যি, কিন্তু তা একেবারে শান্ত হয়নি। বছর দুয়েক ধীরেসুস্থে সে পড়াশুনোয় মন দিয়েছিল। তখনও মনে হোত, ওর মনের সবটুকু মাধুর্য ওই দুর্দান্ত দীপু লুঠ করে নিয়ে গেছে। মনের একটা বিরাট অংশ তার হারিয়ে গেছে। তাই ভাববার তীব্রতা কমেছে। আবেগের তীব্রতা কমেছে। অবসন্ন ক্লান্তি নিয়ে শুধুমাত্র জীবনধারণ করতে পারছে।

বাবা ভুল বুঝলেন। ভাবলেন, তার মত্ততা কমে এসেছে। এখন তাকে বিয়ে দিলে সে সুখী হতে পারবে। কলকাতার বনেদী ঘরের এক রূপবান যুবকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলেন বাবা। ছেলে ডাক্তারী পড়ে। বিয়ের পর বিলেতে যাবে। তার বিলেতে যাবার খরচটা বাবাকে বহন করতে হবে।

বাবা রাজী হয়ে গেলেন। মালা সব শুনল। সে জানত, তার মতামতের কোন মূল্যই নেই। তাছাড়া প্রতিবাদ করবার মত কোন শক্তি তখন তার ছিল না। দীপুর জেলের খবর পেয়ে ও নিজের সম্পর্কে সমস্ত আশাভরসা ছেড়ে দিয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিছু একটা ভেবে ঠিক করবার মত বুদ্ধির সেই প্রখরতা ওর তখন আর ছিল না।

সব কথা চুপ করে শুনল। চুপ করেই রইল। সব ভাবভাবনা যেন কিছুকালের মত স্তম্ভিত হয়ে ছিল। বিমূঢ় বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিয়ে হবে শুনল। কেমন করে বিয়ে হবে, কার সঙ্গে বিয়ে হবে, বিয়ের পরে কি হবে, এ সব কোন ভাবনাই তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল না। স্পষ্ট করে ভাববার চেষ্টাও করল না।

আশীর্বাদ হয়ে গেল। বিয়ের তোড়জোড় সব শুরু হোল।

বিয়ের আগের দিন বাড়িতে যেন বজ্রপাত হোল।

এই সূর্য নাগ বিয়ের আগের দিন তাদের বাড়িতে এসেছিল। তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল।

শোনা গেল, সূর্য নাগ নাকি ছেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে ডাক্তারী পড়ে।

কেন সে এসেছে। শোনা গেল, সে খবর দিতে এসেছে, এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। তারা বন্ধুবান্ধবরা মিলে স্থির করেছে এ বিয়ে তারা হতে দেবে না। একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করতে তারা দেবে না। ছেলের অভিভাবকরা একটি মেয়ের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে। এটা তারা সহ্য করবে না।

কেন? ছেলের নাকি মাথা মাঝে মাঝে খারাপ হয়। আবার মাঝে মাঝে ভাল থাকে। তারা একসঙ্গে পড়ে তারা জানে মাঝে মাঝে তাদের বন্ধুর মাথাটা বিগড়ে যায়। অজ্ঞান হয়ে যায়, স্নায়ুর রোগ আছে।

ছেলে নিজেও একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে চায় না। তাই বন্ধু সূর্য নাগকে কথাটা জানাতে পাঠিয়েছে।

নিরঞ্জন দত্ত নাকি হতাশ স্বরে বলছিলেন, কিন্তু আমার মেয়ের জীবন তো এতেও নষ্টই হোল। আশীর্বাদ হয়ে যাবার পর বিয়ে বন্ধ হলে আর কি এ মেয়ের বিয়ে তিনি দিতে পারবেন।

সবাই বললে, পাগলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে বিয়ে না হওয়াও ভাল।

মালার কানেও সব কথা গেল। সে শুধু চুপ করে শুনেছিল সব কথা।

এ আঘাতটা নিরঞ্জন দত্ত সইতে পারেন নি। রক্তচাপ ভীষণ বেড়ে গেল। বিছানায় পড়লেন বাবা। মাস দুয়েকের ভেতরেই বাবা মারা গেলেন। বাবা মারা যাবার পর আবার যেন মালার বিমূঢ় ভাবটা কেটে গিয়ে বুদ্ধি সজাগ হোল। নিজের সমস্ত দায়িত্ব নিজে হাতে তুলে নিল।

সূর্য নাগের সঙ্গে তার পরিচয়টা ভাবলে বড় অদ্ভুত লাগে। আশ্চর্য মানুষ এই সূর্য নাগ।

বিয়েটা বন্ধ হবার দিন দশেক পরে একদিন সকালে টেলিফোন এল। মালা দত্তকে চাইছে।

মালা টেলিফোনটা তুলে নিল।

—আপনি মালা দত্ত?

একটি পুরুষের গলা শুনে মালা অবাক হয়েছিল। বললে—হ্যাঁ।

—আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম সূর্য নাগ।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কে?

—বললাম তো ঠিক চিনবেন না। দিনকতক আগে আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

মালা একটু সময় ভাবল।

—আপনার সঙ্গে যার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, আমি সেই অলক মিত্রের বন্ধু। সূর্য নাগ।

—কি চান বলুন।

—আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমি একটু দেখা করে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

—আমার সঙ্গে কথা! কেন, আমার সঙ্গে কি কথা। বেশ তো ফোনে বলুন।

—ফোনে বলা যাবে না। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনার কোন ভয় নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার কোন অমর্যাদা হবে না। শুধু গোটা কতক কথা বলব। কথা কটা বলতেই হবে আপনাকে।

—কিন্তু—

—বুঝেছি। বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করা চলবে না জানি। তাই রাস্তায় কোথাও—। শুনেছিলাম, আপনি তো কলেজে পড়েন। কোন্ কলেজে? আশুতোষ?

—কলেজের কি দরকার। আপনি বরং কাল কালীঘাট পার্কের কাছে আসুন।

—কাল নয়। আজই।

—বেশ বিকেল পাঁচটায় আসুন। আমি থাকব। কিন্তু—

—সেজন্যে ভাববেন না। আমি আপনার ফটো দেখেছি, চিনে নিতে পারব। নমস্কার।

—নমস্কার।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছল মালা। ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। সূর্য নাগ নামে কাউকে ও চেনে না। কেন যে তার সঙ্গে দেখা করতে চায় জানে না। সে কেন ফস্ করে রাজী হয়ে গেল দেখা করতে। বললেই পারত, আমার পক্ষে দেখা করা অসুবিধে আছে। অথবা আপনার যদি কোন কথা থাকে বাবাকে বলতে পারেন অথবা আমার সঙ্গে আপনার এমন কিছু কথা থাকতে পারে না। ইচ্ছে করলেই সে দেখা করাটা বাতিল করতে পারত আর

সেইজন্যেই কি রাজী হোল? লোকটার সাহস কম নয়। টেলিফোনটা বাবার হাতে পড়লে কি কান্ড হোত! কিন্তু তার সঙ্গে এমন কি কথা থাকতে পারে যে লোকটা এমন সাহস করে তাকে টেলিফোন করেছে?

দূর হোক ছাই। সে যাবে। যাবে বলে যখন কথা দিয়েছে, তখন যাবে। এখন তার বেরোতে কোন বাধা নেই। বাবা অসুস্থ। নীচের ঘরেই বেশীর ভাগ সময় শুয়ে থাকেন। কারো সঙ্গে প্রায় কথাই বলেন না। তার বিয়েটা ভেঙে যাওয়ায় কেমন গম্ভীর হয়ে গেছেন। মালার সঙ্গেও আর ভাল করে কথা বলেন না।

মালা কলেজে যায়। কোনদিন গাড়িতে, কোনদিন বাসে ট্রামে। বিকেলে কখনো-সখনো কোন কলেজের বন্ধুদের বাড়ি যায়। বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ি থাকে। কখনো পড়ে কখনো বাবার খাবার জলখাবার ওষুধ পাঠিয়ে দেয় ঝিকে দিয়ে। নিজে বড়একটা বাবার কাছে যায় না। সমস্ত বাড়িটা যেন থমথমে হয়ে উঠেছে। যে যার মত কাজ করে। কেউ কারো খোঁজ রাখতে আর চায় না। খুড়তুতো দাদারাও এখন নীরবে তাদের বিষয়আশয় নিয়ে মাঝে মাঝে শলাপরামর্শ করে। চুপচাপ থাকে।

বিকেল পৌনে পাঁচটায় মালা বেরোল। হালকা জামরঙের একটা শাড়ি পরে খুব সাধারণ সজ্জায় বেরোল। আজকাল প্রসাধন বড়একটা ও করে না। ভাল লাগে না। কেমন একটা আলিস্যি লাগে।

কালীঘাট পার্কের দিকে এগোবার মুখেই একটি তেইশ চব্বিশ বছরের ছেলে তার সামনে এসে দাঁড়াল। এই সূর্য নাগ। ফরসা লম্বা বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। পরনে শাদা ট্রাউজার হাফসার্ট। নাকের নীচে সরু গোঁফ।

—নমস্কার। আমার নাম সূর্য নাগ। ভাবলুম, আপনি বোধহয় আর এলেন না।

প্রতিনমস্কার জানিয়ে মালা শান্তভাবে বলল—এখনো তো পাঁচটা বাজেনি?

সূর্য নাগ হেসে বলল—চলুন, ওই চায়ের দোকানটায় যাই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে—

মালা সূর্য নাগের সঙ্গে কিছু এগিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। একটা ছোট কেবিনে ঢুকে পর্দা টেনে দিল নাগ। চেঁচিয়ে দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বসল। টেবিলের ওপর বলিষ্ঠ হাতের কনুই দুটো রেখে কোন ভূমিকা না করে বলল—আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে।

মালা আস্তে আস্তে চোখ তুলল।

—ক্ষমা! কিসের? কেন?

নাগ বরাবরই খুব স্পষ্টবাদী। চেহারায় যেমন বলিষ্ঠ কথাবার্তায়ও তেমনি। বললে—আপনার বিয়েটা আমিই ভেঙে দিয়েছি। ক'দিন ধরেই ভাবছি, কাজটা বোধহয় ভাল করিনি। আপনার বাবা বললেন, আপনার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। হয়তো তাই। এমনিভাবে বিয়ে ভাঙার পরে সহজে কি আর আপনার বিয়ে হবে?

মালা চোখ নীচু করে চুপ করে রইল।

—কাজটা বোধহয় ভাল করিনি। একটা মিথ্যে কথা বলে বিয়েটা ভেঙে দিলাম। ক'দিন ধরে বড় অস্বস্তি লাগছে। বোধহয় খুব অন্যায় করে ফেলেছি। অলক আমার বন্ধু, ওর কথামতই আমি আপনাদের বাড়ি গিয়ে মিছে কথা বলেছিলাম। আসলে মাথা ওর খারাপ নয়। ও এ বিয়েটা করতে চাইছিল না অন্য একটা কারণে।

মালা একবার তাকাল। চোখে ওর কোন উত্তেজনা নেই, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য।

অলক আর একটি মেয়েকে ভালবাসে। সে-মেয়েটিও আমাদের সঙ্গে ডাক্তারী পড়ে। ওদের বাড়ি আপনি জানেন না, বড় কনজারভেটিভ। এ-ধরনের বিয়ে অলকের বাপ-জ্যাঠারা পছন্দ করেন না। তাই অলককে অপেক্ষা করতে হবে। ওরা দুজন ডাক্তারী পাশ করে বেরোবার পর বিয়ে করবে। এ-বিয়েটা ভাঙবার জন্যে অলক তাই উঠেপড়ে লাগল। আমাকে অলকই আপনাদের বাড়ি পাঠিয়েছিল। অলকের উপকার করলাম কিনা জানি না, কিন্তু আপনার ওপর বড় অবিচার করেছি। বড় অন্যায় করেছি।

মালা চিবুকটা সামান্য তুলে আস্তে বলল—আপনি কোন অন্যায় করেননি।

—কি যে বলেন, অন্যায় আমি করেছি। পরে আমি ভেবে দেখেছি, অলকের বিয়েটা এভাবে ভেঙে দেয়াটা আমার উচিত হয়নি। বিয়ে হয়ে গেলে অলক বাধ্য হয়ে ও-মেয়েটার সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দিত। তাছাড়া জানেন তো, এ-বয়েসের এসব ভাল লাগা বেশী দিন টেঁকে না। বিয়ের পরেই সব সহজ হয়ে যায়। বিয়ের পর অলক নিশ্চয় বদলে যেত। মেয়েটি আমাদের সঙ্গে ডাক্তারী পড়ে। বিয়ের পর বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকেই আমরা অলকের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারতাম। তাতে অলকেরও সুখ হোত। সবদিকে ভাল হোত। আসলে কি জানেন, মেয়েটা তেমন ভাল নয়। অলকের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে এপর্যন্ত। ওর পেছনে অনেক টাকা খরচা করে অলক।

রেস্টুরেন্টের লোকটা এসে দু' কাপ চা দিয়ে গেল।

নাগ জিজ্ঞেস করল,—আর কিছু খাবেন নাকি?

—না।

—আমিও চা ছাড়া কিছু বলিনি। আমাদের উদ্দেশ্য তো খাওয়া নয়।

চায়ে চুমুক দিল সূর্য নাগ। একটা সিগারেট মুখে দিতে গিয়ে মালার দিকে তাকিয়ে বলল,—সিগারেট খেলে আপনার অসুবিধে হয় না তো?

—না।

সিগারেট ধরাল নাগ। মালা তাকাল ওর দিকে। সূর্য নাগের মুখখানা সত্যিই সেদিন শুকনো মনে হয়েছিল। করুণ হয়ে উঠেছিল চোখদুটো।—আপনি আমাকে বন্ধু ভেবে ক্ষমা করুন। কাজটা করবার আগে আপনার দিকটা আমি ভেবে দেখিনি। বড় অন্যায় করে ফেলেছি।

মালা এতক্ষণে একটু হাসল—না, না, অন্যায় কিসের, আপনি আমার উপকার করেছেন।

—আমার তা মনে হয় না। এখন মনে হচ্ছে বিয়েটা হলেই সবদিক থেকে ভাল হোত। আপনার ক্ষতি করলাম, অলকেরও ক্ষতি করলাম। যা হবার হয়ে গেছে। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনার যে-কোন প্রয়োজনে আমি যদি কাজে লাগি, তবে কিছুটা স্বস্তি পাবার সুযোগ পাব। আমাকে বন্ধু মনে করে সে-সুযোগ আশা করছি আমাকে দেবেন। আমার নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়ে যাচ্ছি। আমি আপনাকে আর বিরক্ত করব না, কিন্তু আপনি যে-কোন সময়ে আমাকে বিরক্ত করলে আমি খুশি হবো।

একটা কাগজে সূর্য নাগ তার নাম-ঠিকানা সব লিখে মালার দিকে এগিয়ে দিল।

মালা কোন কথা বলল না। কাগজটা নিয়ে নিজের হাতব্যাগে রাখল। আস্তে আস্তে চা শেষ করে মালা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আজ উঠি।

সূর্য নাগ তাকাল।

—আপনাকে এগিয়ে দোব কি?

—না, প্রয়োজন নেই।

মালা সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিল। সূর্য নাগের কাছে তার বিয়ে ভাঙার আসল রহস্য শোনবার পরেও ওর তেমন একটা কোন ভাবনা বা কৌতুক জাগল না। ও নিয়ে তেমন কিছু মাথা ঘামাচ্ছে না। যা হবার হয়ে গেছে। কোন কিছুই ভাবল না ও। মনের গতি ওর কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে গেছে, বুদ্ধি থমকে গেছে। কোন কিছুই একটানা ভাবতে পারল না ও। শুধু সূর্য নাগের ঠিকানাটা নিজের ছোট আলমারিতে যত্ন করে রেখে দিল।

সূর্য নাগকে ওর ভাল লেগেছিল। যেমন বলিষ্ঠ দেহ, তেমনি বলিষ্ঠ কথা-বার্তা। কোন অকারণ সঙ্কোচ-দ্বিধা নেই। সহজ বন্ধুত্ব পাবার যোগ্য পুরুষ। ওর বন্ধুত্ব কোনদিন হয়তো ওর কাজে লাগতে পারে।

এরপর বাবা মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর আঘাতেই হয়তো বা আবার ওর বুদ্ধি জাগ্রত হোল, সব সচল হোল। চারদিকে ও তাকিয়ে দেখল ওর আপন বলতে আর কেউ নেই। খুড়তুতো দুই দাদা বিষয়-আশয় নিয়ে ওর অসাক্ষাতে শলা-পরামর্শ করতে লাগল। ওর কাছ থেকে নানাভাবে নানা ধরনের কথা আদায় করবার চেষ্টা করতে লাগল। চারদিক অন্ধকার দেখল মালা।

এই সময়ে মনে পড়ল ওর সূর্য নাগের কথা। মাত্র কয়েক মাস আগে সূর্য নাগের সঙ্গে পরিচয়, তবু তাকেই এখন ডাকতে হবে। ওর নিজের বলতে এখন কেউ নেই। একজন কাউকে ওর প্রয়োজন, যে এ-সময়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াবে।

ঠিকানা বার করে টেলিফোন করল নাগের বাড়িতে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সূর্য নাগ ওর বাড়িতে এল। ওপরে নিজের ঘরে নিয়ে এল। খুড়তুতো দাদারা দেখল, দেখে বিরক্ত হোল। এ-লোকটা কে? এ-সময়ে জুটল কোত্থেকে?

সূর্য নাগকে সব বলেছিল মালা।—বলেছিলেন বিপদে পড়লে আপনাকে খবর দিতে। আজ সত্যিই আমি বড় বিপদে পড়েছি। সামনে বি-এ পরীক্ষা, বাবা মারা গেলেন, কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

সূর্য নাগ সিগারেট ধরাল,—আপনার অসুবিধেটা কি খুলে বলুন।

মালা সব বলল ওকে। খুড়তুতো দাদাদের কথা। বিষয়-সম্পত্তির কথা। সব কথা খুলে বলল।

সূর্য নাগ গম্ভীর মুখে বলল,—এখন আপনি কি চান? কি করতে হবে আমাকে বলুন।

মালা বলল,—আমি চাই দাদাদের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করতে। নিজের মত নিজে একা একা থাকতে। দরকার হলে এ-বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যেতে।

—আপনার বাবা কি উইল করে গেছেন?

—না। কোন উইল দেখলাম না।

—দলিলপত্র সব কোথায়?

—আলমারিতে। চাবি আমার কাছে। কালকেও দাদা এসে চাবি চেয়েছিল।

—চাবিটা দেবেন না। আমাদের জানা উকিল আছে। তাকে গিয়ে আমি কাল সকালে নিয়ে আসব। যা করবার সব করে দেব। কিছু ভাববেন না আপনি। উকিলই আপনার হয়ে আপনার দাদাদের সঙ্গে কথা বলবে। আপনি কোন কথা বলতে যাবেন না। সেধে কিছু করতে যাবেন না।

সূর্য নাগ চা খেল, আরও দুটো সিগারেট টানল। চলে গেল সেদিন।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ আবার এল নাগ। উকিল নিয়ে এল। উকিল সব কাগজ-পত্র দেখল। তাকে কতকগুলো পরামর্শ দিয়ে চলে গেল। আবার দুদিন পরে এল। ধীরে ধীরে সাকসেশন সার্টিফিকেট নেয়া হোল, এস্টেট ডিউটি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নেয়া হোল। আস্তে আস্তে ভাগ-বাঁটোয়ারার দিকে এগুতে লাগল উকিল।

খুড়তুতো ভাইরা বুঝল, আর টানা-পোড়েন করে কোন লাভ নেই। পার্টিশনে রাজী হোল, কিন্তু মালার নামে জঘন্য দুর্নাম রটনা করতে লাগল চতুর্দিকে। তাদের লক্ষ্য সূর্য নাগ।

মালা ভয় পেল, সূর্য নাগ হাসল।

—কোন মেয়েকে যে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে উপকার করা যায়, কথাটা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। ওদের দোষ নেই। তবে ওদের কথা কানে তুলবেন না। মন খারাপ করবেন না।

দৃঢ়স্বরে বলল সূর্য নাগ,—আমি আপনার বন্ধু। এর বেশী কিছু নয়। এর কম কিছুও নয়।

সূর্য নাগ বরাবরই এমনি সংযত বলিষ্ঠ মানুষ। আজ পর্যন্ত কোন কারণে কিছুমাত্র দুর্বলতা ওর ভেতরে দেখতে পায়নি মালা। দুর্বলতা মানুষের আছেই, হয়তো নাগেরও আছে, কিন্তু সে-দুর্বলতা গোপন করবার সংযত করবার শক্তিও তার আছে।

সূর্য নাগের মত বন্ধু পাওয়া মালার ভাগ্য। এ-কথাটা কখনো মনে মনে ও অস্বীকার করতে পারে না।

বছরের পর বছর কেটে গেল এমনি করে।

বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। কলকাতার কাছাকাছি জমিজমাও বিক্রি করে দিল মালা। তার পক্ষে দেখাশুনো করা অসুবিধে। সব টাকা নিয়ে এই মস্ত ফ্ল্যাটবাড়িটা তৈরি শুরু করল। সূর্য নাগ কন্ট্রাক্টর ঠিক করে দিল, কাজ দেখাশুনা করতে লাগল। বছর-দেড়েকের ভেতর ফ্ল্যাটে চলে এল মালা।

এই সময়ে একদিন সূর্য নাগের গলার স্বরটা সামান্য দুর্বল ঠেকেছিল মালার কাছে।

সে-সময়ে বি-এ পাশ করে কিছুদিন কি করবে ঠিক করতে পারছিল না মালা। একটা কোন চাকরি করবে? না কি ওকালতি পড়বে, এম-এ পড়বে, কি করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। এই সময়ে এক-দিন সন্ধ্যায় সূর্য নাগ ওর ফ্ল্যাটে এল। মালা তখন একাই ছিল, একটা সোয়েটার বুনছিল সম্ভবত। সূর্য নাগের জন্যে।

সূর্য নাগ সেদিন ওর মুখটা যেন আরও ম্লান, আরও বিষণ্ণ দেখল। জিজ্ঞেস করল,—সমস্ত দিন কি করলেন?

—কিছুই নয়। খেলুম আর ঘুমোলুম।

—এভাবে একা-একা দিনরাত্তির থাকলে তো শরীর-মন দুই-ই খারাপ হবে।

মালা একটু হাসল,—এটা কি ডাক্তারী মত?

—হ্যাঁ। আমি বরং আপনাকে একটা কথা ভেবে দেখতে বলি।

—কি বলুন?

—বিয়ের কথাটা তো ভেবে দেখতে পারেন।

মালা তাকাল নাগের দিকে। ওর চোখ-দুটো সলজ্জ হোল না, মুখখানিও রক্তিম হোল না।

সহজ স্বরে বলল,—ও-কথাটা কোনদিন না ভাবাই ভাল।

—কেন, তেমন পাত্র চোখে পড়ে না বলে?

মালা নীরবে তাকাল আবার। সূর্য নাগের চোখেমুখে একটা সঙ্কোচ অস্বস্তি লক্ষ্য করল। গলার স্বরটা আরও নামিয়ে নাগ বলল,—আপনার মত হলেই তো সব হয়ে যায়।

এর চেয়ে স্পষ্ট করে সূর্য নাগ আর কি বলবে। সোজাসুজি বিয়ের প্রস্তাব করে বসেছে সূর্য নাগ। মালাকে সে বিয়ে করতে চায়। এমন তো কথা ছিল না। সূর্য নাগের ভেতর তো কখনো এ-ধরনের দুর্বলতা লক্ষ্য করেনি মালা! মনে মনে কোন সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে সে কি এতকাল নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের অভিনয় করেছে?

না, এত সহজে সূর্য নাগকে তার অবিশ্বাস করা উচিত নয়। এমনও হতে পারে হয়তো মালার এই নিঃসঙ্গ অবস্থাটা সূর্য নাগকে বেদনা দিয়েছে। মালার মঙ্গলের জন্যেই বিয়ের কথা বলছে। হয়তো আজকই মালাকে দেখে কথাটা তার মনে হয়েছে। হয়তো এর পেছনে কোন গভীর তাৎপর্য নেই। এত সহজে সূর্য নাগকে অবিশ্বাস করা যায় না।

মালা খুব শান্ত স্বরে বলল,—ভাব-ছিলাম, একটা স্কুল করব।

নাগ একটু থমকে থেকে মুখে খুশিভাব এনে বললে,—এ-কথাটা মন্দ বলেননি। কি ধরনের স্কুল করতে চান?

মালা মুখ নীচু করে সোয়েটার বুনতে বুনতে বলল,—ধরুন, বাচ্চা মেয়েদের একটা স্কুল। কে জি ধরনের হবে।

—বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুই-ই তো পড়তে পারে।

—না, ছেলে নয়, শুধু মেয়ে।

কথাটার মানেটা ভাল বুঝল না নাগ। শুধু মেয়েদের জন্যে স্কুল করতে চাইছে কেন মালা দত্ত?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নাগ বললে,—একটা বাড়ি দরকার।

মালা বলল,—ভাবছি একটা ছোট বাড়ি তৈরি করে নেব। কাছাকাছি একটা জায়গা দেখে নিতে হবে।

—তবে তো অনেক সময় লাগবে।

—লাগুক। আমি ততদিনে কে জি সিস্টেমের ওপর কিছু পড়াশুনো করে নিই। দু'-একটি স্কুলে ঘুরে দেখি। আমার এক বন্ধু আছে একটা স্কুলে। তাদের স্কুলে দিন-কতক যাতায়াত করি। সময় তো একটু লাগবেই।

—বেশ, তবে তাই করা যাক।

মালা মুখ তুলে হাসল,—আপনাকে কিন্তু সেক্রেটারী হতে হবে।

—না, সেক্রেটারী রেক্টর আপনি, আমি পেছনে থাকব।

—না, পেছনে থাকা আর চলবে না। এবারে পাশে দাঁড়াতে হবে।

কথাটা বলল মালা ইচ্ছে করেই। সূর্য নাগকে একটু খুশি করবার জন্যে।

নাগ খুশি হোল সত্যি। পাশে দাঁড়াতে হবে কথাটা বেশ মনোমত হোল ওর।

—কিন্তু আমার ডাক্তারী?

—রুগী তো আপনার একটি। আমাকেই তো মাঝে মাঝে দাঁতে ব্যথা হলে, গলা ব্যথা হলে ওষুধ দেন। তা সে রুগী তো সব সময়ই আপনার পাশে থাকবে।

হেসে উঠল সূর্য নাগ। পরিবেশটা বেশ সহজ হয়ে এসেছিল সেদিন। আবেগে জর্জরিত না হয়ে শান্ত গাম্ভীর্যে অনেক কঠিন পরিবেশ সহজ করে তোলা যায়। মালা কথাটা বেশ ভাল করেই বোঝে আজ-কাল।

বছর-খানেকের ভেতরে স্কুল তৈরি হয়ে চালু হয়ে গেল। স্কুলের ভাবনায় বেশ কয়েক বছর তন্ময় হয়েছিল মালা, নিজের সম্পর্কে খুব বেশী চিন্তা করবার অবসর ছিল না। সূর্য নাগ বরাবরই রইল তার পাশে। তেমনি বলিষ্ঠ সহজ সঙ্গ সে আজও সূর্য নাগের কাছ থেকে পায়। শুধু একটা কথা ও ভেবে পায় না যে, সূর্য নাগ আজও বিয়ে করেনি কেন? কথাটা খুব স্পষ্ট করে না বললেও এক-আধবার বলেছিল মালা।

—সংসারধর্ম কি কিছুই করবেন না? বয়েস তো হোল।

ভয়ে ভয়ে কথাটা বলেছিল, কে জানে সূর্য নাগ পালটা প্রশ্ন করবে কিনা। আপনিই বা সংসার করছেন না কেন?

কিন্তু না। উত্তরে সূর্য নাগ সামান্য হেসে বলেছিল,—আজ পর্যন্ত প্র্যাকটিশ জমল না। সংসার করবার টাকা কই। ভেবে দেখছি, বিলেত-টিলেত ঘুরে না এলে প্র্যাকটিশ জমবে না। বিলেতেই যেতে হবে।

—বেশ তো ঘুরে আসুন না।

—টাকা কই?

—টাকার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। কত টাকা লাগবে?

সূর্য নাগ আবার হেসে কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিল।—দেখা যাক, সময় হলেই যাব।

মালা আর কথা বাড়ায়নি। এ-ধরনের আলাপ না বাড়ানই ভাল। কেন ও বিয়ে করেনি? কেন এখুনি বিলেত যেতে চায় না, এসব প্রশ্নের নানা জটিল অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু কি দরকার ওসব জটিল কথা ভেবে। সহজ আনন্দ নষ্ট করতে চায় না মালা। বোধহয় সূর্য নাগও চায় না। পরিচ্ছন্ন নিরুপদ্রব শান্তভাবেই দিন কাটে, তবু মাঝে মাঝে একটা গাঢ় বিষণ্ণতা পেয়ে বসে তাকে। বড় ক্লান্ত মনে হয়। নিজেকে বড় একা মনে হয়। সব আছে, তবু কোথায় কি একটা যেন নেই। বড় বেশী ফাঁকা লাগে দিনরাতগুলো। কোন কিছুতেই আর কোন আকর্ষণ থাকে না।

কেন যে অমন হয়। কারণটা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না মালা।

হতে পারে নিজের অজ্ঞাতে তার ভেতরে একটা কোন তীব্র বাসনা জেগে ওঠে। সে স্বামী চায়, সংসার চায়, সন্তান চায়। হয়তো বাসনার অতৃপ্তি তাকে অবসন্ন করে তোলে। তাকে ক্লান্ত করে তোলে। অবশ্য এ-বাসনা সে পূরণ করতে যে পারে না, তা নয়। যে-কোন পুরুষের কাছে এখনো সে লোভনীয়, এখনো সে কাম্য, যে-কোন পুরুষ তার সঙ্গ কামনা করে, তার সাহচর্যে সংসার কামনা করে, কিন্তু মালা কোনমতেই কোন পুরুষকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার কথা ভাবতে পারে না।

প্রথম যৌবনের সেই তীব্র মাধুর্য, কঠোর আঘাত সে কোনমতেই ভুলে যেতে পারে না। কিশোরী মন সবে তখন যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করছে, সে মনে যে মধু ছিল, যে রঙ ছিল, যে অর্থহীন আবেশ ছিল, তা যত হাস্যকরই মনে হোক না কেন, সে স্বাদের তুলনা নেই। মেয়েমানুষ প্রথম যৌবনের পুরুষকে বোধ করি আজীবন ভুলতে পারে না, ভোলা যায় না। সেই বোকামি, সেই কান্ডজ্ঞানহীন আচরণ, সেই অর্থহীন প্রলাপের মত প্রেমালাপ কোনদিন ভোলা যায় না। বিয়ে করলে, সংসার করলে, সন্তানের মা হলে তার ওপর হয়তো একটা আবরণ পড়ে, কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়, জীবনের সবটুকু মাধুর্য ওই বিগত দিন-গুলোতেই হারিয়ে গেছে। এখন জীবন মানে কর্তব্য আর সংসার। গম্ভীর বিচার আর বুদ্ধির সংযম। পরবর্তী জীবনে এই সম্বল করেই কাটাতে হয়।

আজ এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় বার বার আশা করছিল মালা, দীপু হয়তো আসবে।

অকস্মাৎ স্কুলে দীপুকে দেখবার পর থেকে ও নিজের সেই শান্ত গাম্ভীর্যের পরিবেশটা কোনমতেই যেন বজায় রাখতে পারছে না। পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত প্রলেপ পড়ে-ছিল মনের ওপর। দীপুর ছায়া সেখানে আবার তরঙ্গ তুলেছে। তবু সে-তরঙ্গ আজ আর তত বেশী বিচলিত করতে তাকে পারছে না। বরং মাঝে মাঝে দীপুর ভাবনাটা তার কাছে কিছুটা অসহ্য মনে হচ্ছে। প্রথম যৌবনকালের সেই প্রাণশক্তি নেই, সেই সবল পুষ্ট স্নায়ু নেই, ধীরে ধীরে ও অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দীপু আসবার পর থেকে সে এত বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিল ভেতর ভেতর যে, সে-ধাক্কাটা তার দেহের স্নায়ু সামলাতে পারেনি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে মালা, এ-অসুস্থতার কারণটাও সে পরিষ্কার বুঝতে পারে।

সেদিন বৃষ্টিতে ভেজাটা অসুখের কারণ নয়, অসুখের আসল কারণ দীপুর আকস্মিক আবির্ভাব।

দরজায় একটা শব্দ শুনতে পেয়ে মালার বুক কেঁপে উঠল।

তবে কি দীপু এল। এই দুর্যোগে এত রাত্রে দীপু এল। রাত ন'টা বেজে গেছে। একটানা বৃষ্টিতে শহরটা ঝিমিয়ে পড়েছে। আশে-পাশের সব বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। রাস্তায় কোলাহল নেই।

তবু দীপু এসেছে এই দুর্যোগে।

বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হোল মালা। তার বয়েস হয়েছে, তার এতটা বিচলিত হওয়া অসঙ্গত। হতে পারে অসুখে শরীরটা দুর্বল হয়েছে, তাই এমন হচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে দরজাটা খুলেই চমকে উঠে বলে ফেলল মালা,—অ, আপনি!

সূর্য নাগ এসেছে। আজ সন্ধ্যায় তার আসবার কথা ছিল না। বিশেষ করে রাত্রে আসবার তো কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

মালার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে খাটের ওপর বসল।

সূর্য নাগ একটু অবাক হয়েছিল। 'অ, আপনি!'—কথাটার ভেতরে একটি স্পষ্ট মনোভাব ধরা যাচ্ছিল। কথাটা পুরো করলে দাঁড়াবে—অ, আপনি! আমি ভেবেছিলাম বুঝি সে এসেছে।

তবে কি কারও প্রতীক্ষা করছিল মালা। দরজাটা খোলবার সময় চোখেমুখে যে ঔজ্জ্বল্য ছিল, সেটা যেন সূর্য নাগকে দেখে মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। চোখে পড়েছে নাগের।

খুব সহজ স্বরে বললে নাগ,—আপনি কি আর কেউ এলো ভেবেছিলেন? আর কারো আসবার কথা ছিল কি?

নিঃসংকোচে ক্ষীণ স্বরে বললে মালা,—হ্যাঁ।

নাগ গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল একটু সময়।

মালা ওর নীরবতা লক্ষ্য করে বলল,—আমার বহুকালের পরিচিত এক বন্ধুর আসবার কথা ছিল।

প্রশ্ন করা উচিত ছিল না, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাগ বললে,—আপনার তেমন কোন বন্ধুকে তো—

—দেখেননি! তার কারণ ছিল। দিন-কতক আগে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। পুরোন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলে খুব ভাল লাগে, তাই নয়?

—তা হয়।

নাগ আর কিছু বলল না। দিন-পনেরো ধরে সে মালা দত্তর ভেতরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছিল। অকারণে বেশী কথা বলছিল। অকারণে বেশী হাসছিল, একটা অদম্য উচ্ছ্বাস তার ভেতরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বৃষ্টিতে ভেজার দিন সেটা খুব বেশী করে লক্ষ্য করেছিল সূর্য নাগ। আজ তার কারণটা বুঝতে পারল।

আস্তে আস্তে বলল,—আপনি কেমন আছেন দেখতে এসেছিলাম। আর বসব না। এবার উঠি।

—ভালই আছি। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি।

—ওটা আস্তে আস্তে যাবে।

সূর্য নাগ উঠল। মুখ ফিরিয়ে বলল,—আপনার বন্ধুটির সঙ্গে একদিন আলাপ করবার ইচ্ছে রইল।

—নিশ্চয়। মালা দুর্বল স্বরে আবার বলল, একটু সময় নিয়ে,—কিন্তু তার আসবার তো কোন ঠিক নেই। দেখি কবে আসে। আপনাকে জানাব।

মালার চোখমুখে কেমন একটা তন্ময়তা লক্ষ্য করছিল সূর্য নাগ। এ বন্ধুটি যে মালার কাছে অত্যন্ত বিশিষ্ট কোন মানুষ এতে আর তার কোন সন্দেহ রইল না।

একটা অন্য কথা বলবার জন্যেই যেন বলল এবার,—স্কুলে আরও দু-চারদিন আপনার না যাওয়াই ভাল। অপর্ণা দেবী আরও ক'দিন চার্জ নিয়ে কাজ করুক, কি বলেন?

মালা বলল,—তা করুক, তবে আপনি রোজ একবার যাবেন কিন্তু।

—তা যাব, আচ্ছা, চলি।

সূর্য নাগ বেরিয়ে গেল।

মালা দরজাটা বন্ধ করে এসে এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুম খুব তাড়াতাড়ি আজ আসবে না ও জানত। তাই একখানা বই খুলে পড়তে আরম্ভ করল। পড়তে পড়তে যদি ঘুম আসে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

অঙ্গনা

প্রমীলা

বিদেশী নারীর দৃষ্টিতে নেহরু

শ্রীমতী গলব্রেথের সঙ্গে নেহরু

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন শেরম্যান কুপারের বাসভবনে। সেখানে আমরা মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেসের সম্মানার্থে প্রদত্ত এক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত ছিলাম। বাগানের এক কোণে বাদামী রঙের আচকান এবং সাদা টুপি ও চুস্ত পরিহিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ সেই বলিষ্ঠ মূর্তিটি দেখেই আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সারা মুখমন্ডলে গভীর প্রশান্তির ভাব অথচ একটি অদ্ভুত দৃঢ়তা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। সুন্দর মুখশ্রীতে সুগভীর চিন্তার ছাপ। তাঁকে দেখেই অত্যন্ত পরিচিত মনে হচ্ছিল। আমার তখন মনে হলো যে বিশ্বমানবের নিকট একান্ত পরিচিত একটি লোকের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।......

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি আবার প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎলাভ করি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিবেশে। সেদিন ছিল হোলি উৎসব। বসন্তের এই রঙীন উৎসবে প্রধানমন্ত্রীকে রঙে রঙে রাঙিয়ে দিতে সেদিন অনেক লোক জড় তাঁর বাসভবনে। তাদের সকলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাগানে। অজস্র উদ্‌গ্রীব হাত তাঁকে প্রায় ঢেকেই ফেলেছে। সারা মুখমন্ডলে রঙের প্রলেপ। আমিও তাঁর কপালে ছড়িয়ে দিলাম কিছুটা আবীর।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে আমরা যখন সরকারীভাবে ভারতবর্ষে এলাম তখন জওহরলাল নেহরু সত্তর অতিক্রম করে গেছেন। তাসত্ত্বেও তিনি জনতার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেননি। আমি ভেবে অবাক হয়ে যেতাম যে একটিমাত্র লোক সারা দেশময় এতকান্ড করার পরও কিভাবে সরকার চালান! আর ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাজ করে গিয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ চোদ্দ থেকে আঠার ঘণ্টা নিয়মিত কাজ করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেসপ্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এবং আটমিক এনার্জি কমিশনেরও চেয়ারম্যান। শেষের কাজটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ তিনি একইসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বিশ শতকের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রগতিকে লালন করেছেন এবং নিজের দেশকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে উন্নতির সিংহদ্বারে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামাজীবন, কৃষির উন্নতি ও শিল্পায়নের প্রশ্নে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে জড়িত। ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন এবং সর্বপ্রকার অপ্রতুলতা এবং বৈষম্যে তিনি ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়তেন।

বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ঐতিহ্যের দেশ ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতি সাধন ছিল তার একটি বিরাট সমস্যা, এজন্য প্রায়ই তাঁকে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হোত। তারপরও ছিল লোকসভা। তিনি প্রায় রোজই লোকসভায় যেতেন সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। বিরোধী এমনকি নিজ দলীয় সদস্যদেরও তিনি নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্কে উৎসাহ জোগাতেন। লোকসভা থেকে তিনি কোনদিন যেতেন এয়ারপোর্টে কাউকে স্বাগত জানাতে, কোন চিলড্রেন্স' পার্কে, কোন শিশু পুরস্কার বিতরণী সভায় অথবা কৃষি পরিকল্পনা ক্ষেত্রে। মিটিং, কনফারেন্স এবং নিজের কাজের মধ্যে সময় করে তিনি এসব করতেন। যখন তিনি দিল্লীতে থাকতেন তখন যে-কেউ তাঁর সঙ্গে স্বল্পসময়ের জন্য সাক্ষাৎ করতে পারতেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যেত দর্শনাভিলাষীদের সঙ্গে কথা বলতে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল গরীব গ্রামবাসী। তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখ এবং অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন। এরপর তিনি

সান্ধ্যপোষাকের আশ্চর্য সুন্দর নমুনা

কাগজের তৈরী অতি-আধুনিক পোষাকে সজ্জিতা রমণী

ছাত্র এবং বিদেশীদের সংগে সাক্ষাৎ করতেন।

একজন যুবকের পক্ষেও এত কাজ করাটা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাসত্বেও তিনি দীর্ঘদিন এই দায়িত্ব বহন করে গিয়েছেন। একবার একজন ভূতপূর্ব আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মন্তব্য করেন যে, এত কাজের মধ্যেও তিনি কি করে এত সুন্দর আছেন? নেহরু সহাস্যে উত্তর দিলেন যে, 'ব্যায়াম এবং শীর্ষাসনই' তাঁকে এতটা সুস্থ এবং সুন্দর রেখেছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর সংগে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হই তাঁর বাসভবনে একটি ভোজসভায়, এই ভোজসভায় প্রায় ডজন-খানেক অতিথি ছিলেন এবং নেহরু পরিবারেরও প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নেহরু ঘরে ঢুকেই সোজা আমার কাছে চলে এলেন এবং বললেন যে, 'আমি শুনেছি যে আপনি একটু লাজুক।' তারপর তিনি আমার সংকোচ দূর করার জন্য এগিয়ে এলেন এবং আমাকে আম কাটতে সাহায্য করলেন। যাতে আম কাটতে গিয়ে আমি লজ্জায় না পড়ি। কথা-বার্তা শুরু হলো। আমেরিকান নতুন প্রতিভা থেকে শুরু করে বাহির্মোঙ্গালিয়ার উপজাতি সংস্কৃতি নিয়ে নানা আলোচনা হলো।

তারপর প্রায় নেহরুর সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কোন না কোন অনুষ্ঠানে। কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকার পর একদিন ছোটখাটো লাঞ্চ পার্টিতে একটা কান্ড ঘটলো। আমি সে পার্টিতে প্রধনমন্ত্রীর পাশেই বসেছিলাম। আমাদের বিপরীত দিকে বসেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। হঠাৎ তিনি বাবার সংগে হিন্দীতে কথা বলতে শুরু করলেন, আমি তখন হিন্দী শিখতে শুরু করেছি এবং কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গী থেকে বুঝতে পারলাম যে নেহরুর চিবুকের একটি......নিয়ে তিনি কথা বলছেন। যখন আমি হেসে উঠলাম তখন ও'রা বুঝতে পারলেন যে আমি ও'দের কথা বুঝে ফেলেছি। নেহরু মৃদু হেসে বললেন যে, আমি নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করছি এবং এটা সকল বিদেশী অফিসগুলোকে জানাতে হবে। এরপর কথাটা কিভাবে প্রচার হয়ে পড়লো জানি না। মিসেস কেনেডীর ভারতভ্রমণের সময় সবাই বলাবলি করছিল যে, 'মিসেস গলব্রেথ হিন্দী জানেন।' এরপর আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা নিবিড় হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাতের প্রকৃষ্ট সময় ছিল হয় সকাল না হয় সন্ধ্যা। সারাদিন খাটাখাটুনির ক্লান্তি তিনি দূর করতে চাইতেন সন্ধ্যার দিকে কথাবার্তা বলে। ১৯৬৩ সালে আমেরিকান এভারেস্ট অভিযাত্রী দল কাঠমুন্ডু থেকে দিল্লী আসেন। তাঁরা দুটো এরোপ্লেনে আসছিলেন এবং সাড়ে সাতটার সময় প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাতের কথা ছিল। একটি এরোপ্লেন আসতে প্রায় একঘন্টার মত দেরী হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অধৈর্য না হয়ে সকলের সংগে একত্রে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি সকলকে তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন এবং বিশেষ করে শেরপাদের প্রতি তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান। কারণ তাঁরা অভিযাত্রী দলের সংগে প্রথমবার আমেরিকা যাচ্ছিলেন। এর কিছুদিন পর আমি আমার ছেলে দুটিকে নিয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমার ছেলে দুজনের সংগে কথাবার্তা বলে তিনি চট করে বুঝতে পারলেন যে, জেমস বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং পিটার জীব-জন্তু সম্পর্কে আগ্রহী। তিনি সেভাবেই দুজনের সংগে কথা বলতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন দিল্লীর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের বাড়ীতে একটি ব্যাঘ্র শাবক পাঠিয়ে দিলেন। এটা যে প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থা সেটা আর বুঝতে বাকী রইলো না।

ব্রিটিশদের প্রতি ভারতবাসীর ব্যবহার আমাকে সত্যি মুগ্ধ করেছে, আর এর অধিকাংশই নেহরুর জন্য সম্ভব হয়েছে। তিনি কখনো ইংরেজদের প্রতি পরাজিতের মনোভাব গ্রহণ করেননি, আজো তিনি ইংলন্ডের কুয়াশা এবং রৌদ্রভরা কৈশোরের দিনগুলি স্মরণ করে আনন্দ পান। একবার কথায় কথায় জেলে বন্দীজীবনের কথা পাড়লেন তিনি। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা

করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি উইনস্টন চার্চিলের স্মৃতিকথায় সে জায়গাটা দেখেছেন, যেখানে তিনি বন্দী জওহরলালের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন?' উত্তরে তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'এটা অবশ্য আমি দেখিনি কিন্তু চার্চিল সবসময়ই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন। জানেন তো আমরা দুজনে হ্যারোতে ছিলাম।'

[ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথের সহধর্মিণী শ্রীমতী ক্যাথারিণ গলব্রেথ লিখিত এই স্মৃতিচারণটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হল।]

কাপড়ের পুতুল —মণিপুরী মেয়ে

একটুকরো দুভাঁজ করা সাদা পরিষ্কার নতুন কাপড়ের উপর পুতুলটা কার্বন পেপার দিয়ে পরিষ্কারভাবে এ'কে নিতে হবে। তারপর কাপড়টি আঁকার পাশে কিছু কাপড় রেখে কেটে নিন। মুখ-চোখ সুন্দরভাবে এ'কে নিতে হ'বে কাপড়ের সোজা দিকটায়। ভ্রূ, চোখ কালো সুতোয় ব্যাক স্টীচ সেলাই দিয়ে তৈরী করতে হবে। ঠোঁট দুটি হ'বে লাল সুতোয়। নাক সেলাই দিয়ে করার চেয়ে একটু সাদা কাপড় ঠিক নাকের মত সেপ দিয়ে যদি সেলাই দিয়ে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মুখটা দেখতে বেশ ভালো হয়। এবারে মুখের দিকটা ভিতরে রেখে সামনে ও পিছন দিক সমানভাবে রেখে পাশগুলো সব, যেমন হাত, পা, গলা, বুক, পিঠ সব সেলাই করতে হ'বে। সেলাই হ'য়ে গেলে সামনের বুকের মাঝখানটা কেটে নিয়ে পুতুলটাকে উল্টে নিন। এবারে খুব ঠাস করে তুলো ভরে কাটা জায়গাটা সেলাই করে বন্ধ করে দেবেন। পুতুলটি মোটামুটি তৈরি হলো। এখন কাপড় জামা দিয়ে পুতুলটিকে সাজাতে হ'বে। সাজসজ্জার উপরই পুতুলটির সৌন্দর্য নির্ভর করছে। সেজন্য কাপড় জামা একটু জমকালো হওয়া দরকার এবং এগুলি যেন কনট্রাসটেড হয়।

কালো ভেলভেট অথবা কালো উল দিয়ে মাথার উপরে বেশ উ'চুতে মণিপুরী মেয়েদের মত খোঁপা বে'ধে তাতে পু'তির মালা জড়িয়ে দিতে হ'বে। এবার একটা ব্লাউজ তৈরী করে পরিয়ে দিন। কাপড়টা পরাবার জন্য কিছু নিয়ম আছে। ছয় ইঞ্চি মত একটি কাপড়ের টুকরো নিয়ে তার তলার দিকে ১½" চওড়া মোটা পিসবোর্ড বসিয়ে নিতে হ'বে। পিসবোর্ডটা যেন বাইরে থেকে দেখা না যায়। আর কাপড়ের উপর দিকটা সরু পটী করে সায়ার মত সেলাই করে দড়ি পরিয়ে নিন। এবারে পুতুলটির কোমরে ভালো করে কাপড়টি বে'ধে দিন। কাপড়ের ঝুলটা যেন পুতুলের কোমর থেকে পায়ের মাপের চেয়ে কিছু বেশী হয়। (অনেক সময় ভিতরে কোন সাপর্ট না থাকলে পুতুলটি ঠিকমত দাঁড়ায় না।) সেজন্য কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটি পিসবোর্ড গোল করে কোমরে আটকে দিতে হ'বে। এই পিসবোর্ডের মাপটা যেন কাপড়ের ঝুলের চেয়ে কিছু কম হয়। এক টুকরো লাল রঙের অথবা অন্য রঙের কাপড় বাঁ-কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডানদিকের কোমরে একটা ফাঁস বে'ধে দিতে হ'বে। মাথায় একটা সুন্দর উড়না খোঁপার উপর দিয়ে পরিয়ে দিন। কপালে একটি ছোট্ট টিপ এ'কে দিন। এবারে হাতে, গলায়, কানে পু'তির গহনা পরাতে হ'বে। গহনাগুলি পুতুলটিকে আরো সুন্দর করে তুলবে। বাচ্চাদের কাছে এই ধরনের পুতুল অতি লোভনীয়। ঘর-সাজানোর জন্যও এই পুতুল ব্যবহার করা যায়।

—স্নেহলতা ধর

ব্রিটেনে বক্তৃতা

ব্রিটেনের স্কুলগুলিতে ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য একজন কমনওয়েলথ শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত ভারতীয় শিক্ষিকাকে কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট তাঁদের বক্তামণ্ডলীর অন্যতমরূপে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন।

এই ভারতীয় শিক্ষিকা হলেন সাবিত্রী সুদ, নয়াদিল্লীর একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। ইনি বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে ব্রিটেনে শিক্ষালাভ করছেন এডিনবরার মোরে কলেজ অব এডুকেশনে। ইনি ব্রিটেনে আসেন গত সেপ্টেম্বরে।

কাপড়ের পুতুল

মেয়েদের পোষাকে ফার

কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের জনৈক মুখপাত্র লণ্ডনে বলেন 'ইনিই প্রথম কমনওয়েলথ বারসার যিনি আমাদের বক্তা হিসাবে নির্বাচিত হলেন। জুন মাসে তাঁর শিক্ষাকাল শেষ হচ্ছে। এরপর আরও ছমাস তিনি ব্রিটেনে থাকবার অনুমতি লাভ করেছেন।'

ঐ মুখপাত্রটি আরও বলেন, 'জুলাই মাসে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। তিনি প্রথমে দু সপ্তাহ ইনস্টিটিউটের গ্যালারির কাজে আমাদের সাহায্য করবেন। তাঁর কাজ হবে ব্রিটিশ স্কুলের শিশুদের গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখানো ও তাদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা।'

ইনস্টিটিউট আশা করেন আগামী বছরেও তাঁরা দুজন ভারতীয় কমনওয়েলথ বারসারকে এই একই কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন। ভারত সম্পর্কে ইনস্টিটিউটের অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীমতী এন মুনসিফ, ভারতীয় হাই কমিশনের জনৈক প্রবীণ অফিসারের স্ত্রী এবং শ্রীক্লে পি এ্যান্থিসান যাঁর জন্ম সিঙ্গাপুরে কিন্তু শিক্ষা সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে এবং যিনি ব্যাপকভাবে ভারত ভ্রমণ করেছেন।

প্রশ্ন

১। বৈজ্ঞানিকদের শান্তি পুরস্কার আজ পর্যন্ত কে কে পেয়েছেন? এবং কত সালে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়?

২। আইসল্যান্ডের লোক সংখ্যা কত? এবং রাজধানীর নাম কি?

নির্মলকুমার ঘোষ
গোমস্তাপাড়া।। জলপাইগুড়ি

●

উত্তর

গত ৫০ সংখ্যায় অমৃতে নয়াদিল্লী থেকে শ্রীবিমলকান্তি সেন অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কতকগুলি উত্তরে তথ্যঘটিত ভুল আছে, যেমন—

তিনি লিখেছেন যে জন, এ, লার্সন ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম লাই-ডিটেক্টর যন্ত্র নির্মাণ করেন। এটা আংশিক সত্য। ক্যালিফোর্নিয়ার দুইজন মনোবিজ্ঞানী লিওনার্ড কীলার এবং জন লার্সন ১৯২০ সালে এটা সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন। পরে মিঃ কীলার ক্যালিফোর্নিয়ার নর্থ-ওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে এটার অনেক ত্রুটি সংশোধন করেন।

শ্রীসেন টেস্ট ক্রিকেটে যারা হ্যাটট্রিক করেছেন এমন মাত্র ৭জন খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এ পর্যন্ত যাঁরা ক্রিকেট টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছেন তাঁরা হলেন (যে দেশের পক্ষে খেলেছেন সেই দেশের নাম প্রথমে উল্লেখ করা হল।)

১ এফ আর স্পোফোর্থ—অস্ট্রেলিয়া বঃ ইংল্যান্ড—মেলবোর্ণ ১৮৭৮-৭৯।

২ ডবলিউ বেটস—ইংল্যান্ড বঃ অস্ট্রেলিয়া—মেলবোর্ণ ১৮৮২-৮৩

৩ জে ব্রিগস—ইংল্যান্ড বঃ অস্ট্রেলিয়া—সিডনী ১৮৯১-৯২

৪ জি এ লোহম্যান—ইংল্যান্ড বঃ দঃ আফ্রিকা—পোর্ট অব্ এলিজাবেথ ১৮৯৫-৯৬

৫ জে টি হার্ণ—ইংল্যান্ড বঃ অস্ট্রেলিয়া—লীডস ১৮৯৯,

৬ এইচ ট্রাম্বল—অস্ট্রেলিয়া বঃ ইংল্যান্ড — মেলবোর্ণ ১৯০১-০২

৭ এইচ ট্রাম্বল—অস্ট্রেলিয়া বঃ ইংল্যান্ড —মেলবোর্ণ ১৯০৩-০৪

৮ টি জে ম্যাথুস—অস্ট্রেলিয়া বঃ দঃ আফ্রিকা—ম্যাঞ্চেস্টার ১৯১২

৯ টি জে ম্যাথুস—অস্ট্রেলিয়া বঃ দঃ আফ্রিকা—ম্যাঞ্চেস্টার ১৯১২

১০ এম, জে সি এ্যালোম—ইংল্যান্ড বঃ নিউজিল্যান্ড—ক্রাইস্টচার্চ ১৯২৯-৩০

১১ টি ডবলিউ গডার্ড—ইংল্যান্ড বঃ সাঃ আফ্রিকা—জোহানসবার্গ ১৯৩৮-৩৯

১২ পি জে লোডার —ইংল্যান্ড বঃ ওঃ ইন্ডিজ —লীডস ১৯৫৭

১৩ এল, এফ ক্লাইন—অস্ট্রেলিয়া বঃ সাউথ আফ্রিকা —কেপটাউন ১৯৫৭-৫৮

১৪ ডবলিউ হল —ওয়েস্ট ইন্ডিজ বঃ পাকিস্থান—লাহোর ১৯৫৮-৫৯

১৫ জি গ্রিফিন —সাউথ আফ্রিকা বঃ ইংল্যান্ড —লর্ডস ১৯৬০

১৬ ল্যান্স গিবস —ওয়েস্ট ইন্ডিজ বঃ অস্ট্রেলিয়া —এডিলেড ১৯৬০-৬১

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এ পর্যন্ত ১৪ জন খেলোয়াড় মোট ১৬ বার টেস্টে হ্যাট্রিক করেছেন। এইচ ট্রাম্বল ও টি জে ম্যাথুস প্রত্যেকে দুবার করে টেস্টে হ্যাট্রিক করেছেন। এবং শেষের জন একই টেস্টে, একই দিনে উভয় ইনিংসে হ্যাট্রিক করেছেন।

ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তাঁর ভুল আছে। অনুমান করি মুদ্রণ ঘটিত প্রমাদবশতঃ দশমিকের বিন্দু সরে গেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের রেলওয়ে বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৫৯,০৬৯ কিলোমিটার। এর মধ্যে সরকারের অধীনে আছে ৫৮,৩৯৯ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ২৮,৫৭১ কিঃ মিঃ, মিটার গেজ ২৫,৫২৩ কিঃ মিঃ এবং ন্যারো গেজ ৪,৩০৫ কিঃ মিঃ)। বাকী ৬৬২ কিঃ মিঃ বেসরকারী ন্যারো গেজ লাইন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীসেন মন্তব্য করেছেন যে আজ পর্যন্ত একমাত্র মেরী স্ক্রোরেসস্কায়া কুরীই জীবনে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ১৯০৩ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদ্বয় মেরী কুরী, তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী এবং এইচ বেকরেল পদার্থ বিদ্যায় একযোগে নোবেল পুরস্কার পান। পরে ১৯১১ সালে মেরী কুরী রসায়নে এককভাবে আবার নোবেল পুরস্কার পান। পক্ষান্তরে ১৯৫৪ সালে স্বনামধন্য অধ্যাপক লাইকাস পলিং রসায়নে এককভাবে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি আবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯৬২ সালে এবং এবারও এককভাবে।

অম্বরকৃষ্ণ হালদার
জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অব ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ পাহাড়পুর ওয়ার্কস
৫৮, তারাতলা রোড কলিকাতা—২৫

●

গত ৫১ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত আশুতোষ সেনের প্রশ্নের উত্তরে জানাই, বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭; কলিকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ এবং রবীন্দ্র-ভারতী।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সকল বিষয় পড়ানো হয় তার বিবরণ দেওয়া হল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ আর্টস **:** প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি; আরবী, পারসী; প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা; বাংলা; অর্থনীতি; শিক্ষা; ইংরাজী; ফরাসী; হিন্দি; ইতিহাস; ঐস্‌লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি; পালী; দর্শন; রাষ্ট্রবিজ্ঞান; সংস্কৃত; উর্দু; তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান; গ্রন্থাগারবিদ্যা; সাংবাদিকতা ইত্যাদি।

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ কমার্স **:** বাণিজ্যবিদ্যা

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ ল **:** আইন

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন **:** অ্যানেস্থেসিওলজী; অ্যানাটমী; ক্যান্সার রিসার্চ; কার্ডিওলজী; চেস্ট সার্জারী; চাইল্ড হেল্থ; ডার্মেটলজী; ডিজিজেস অফ চেস্ট; ডিজিজেস অফ ইয়ার, নোজ থ্যান্ড থ্রোট; জেনারেল মেডিসিন; নিউরোলজী; অবটেট্রিকস অ্যান্ড গাইনাকলজী; অফথ্যালমলজী; প্যাথলজী; ব্যাক্টেরিওলজী অ্যান্ড মেডিক্যাল জুওলজী; ফার্মাকলজী; ফিজিওলজী; বাইওফিজিক্স অ্যান্ড বাইওকেমিস্ট্রী; ফিজিওলজিক্যাল মেডিসিন; রেডিওলজী অ্যান্ড রেডিও থেরাপিউটিকস, এক্সপেরিমেন্টাল সার্জারী; জেনারেল সার্জারী অ্যান্ড কেন্সার রিসার্চ; ভেনেরিওলজী।

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স **:** কৃষিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, বাইওকেমিস্ট্রী, উদ্ভিদবিদ্যা, বিশুদ্ধ রসায়ন, ভূগোল, ভূবিদ্যা, ফলিত গণিত, বিশুদ্ধ গণিত, বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা, শরীর-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সংখ্যায়ন, প্রাণীবিদ্যা।

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ টেকনোলজী**:** ফলিত রসায়ন ফলিত পদার্থবিদ্যা, রেডিও ফিজিকস অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়— য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ আর্টস **:** বাংলা তুলনামূলক সাহিত্য, অর্থনীতি ইংরেজী, ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভাষা, গ্রন্থাগার বিদ্যা, দর্শন ও সংস্কৃত।

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজী **:** কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, হিউম্যানিটিজ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মেসী এবং টেলিকম্যুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং।

য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স— অজৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন, ভৌতিক রসায়ন, ভূবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা।

বিশ্বভারতী—কৃষি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি আরবী, পারসী এবং ইসলামিক স্টাডিজ, শিল্প ও কলা, বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষা, রবীন্দ্র সাহিত্য, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, চীনা ভাষা, অথনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা, ইংরাজী এবং আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা, হিন্দী, ইতিহাস ও ভূগোল, ইন্দো-টিবেটান স্টাডিজ, জাপানী ভাষা, গণিত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ওড়িয়া, ধর্ম এবং দর্শন পদার্থবিদ্যা, রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নৃত্য, সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, সমাজ-বিজ্ঞান প্রাণীবিদ্যা।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়—কৃষিবিদ্যা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন বাণিজ্যবিদ্যা, অথনীতি, ইংরাজী, ইতিহাস, গণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও সংস্কৃত।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যা।

রবীন্দ্র-ভারতী— কলা এবং ললিত কলা, নৃত্য, নাটক, সংগীত ও রবীন্দ্রসাহিত্য।

বিমলকান্তি সেন ইনসডক, দিল্লী-১২

অদ্রীশ বর্ধন

শার্লক হোম্স্ গ্রন্থকীট ছিলেন না। কেম্ব্রিজে তিনি শুধু পুঁথির স্তূপেই নাক ডুবিয়ে বসে থাকেন নি, বাস্তব জীবন থেকেও সংগ্রহ করেছেন বহু বিস্ময়কর তথ্য এবং তা সযত্নে সঞ্চয় করেছেন জ্ঞানের ঝুলিতে।

এইরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল বৃটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে। হোম্সের পাশেই রাশিবিজ্ঞান আর অর্থনীতি নিয়ে দিনের পর দিন তন্ময় হয়ে থাকতেন মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। গালভর্তি বাদামী রঙের দাড়ি নেড়ে একদিন ফস করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন হোম্সকে—"অ মশায়, আপনার পড়াশুনোর বিষয়টা দেখছি বড়ই বিদঘুটে! গুমখুন নিয়ে রিসার্চ করছেন নাকি?"

মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন শার্লক হোম্স। দাড়িওলা ভদ্রলোকের প্রুশিয়ান উচ্চারণ শুনে একটু কৌতূহলও হল।

"তাহলে তো আমার অ্যানার্কিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে আপনার আলাপ করতে হয়।"

এইভাবেই আলাপ হল কয়েকজন দুর্ধর্ষ গুপ্তঘাতকের সঙ্গে। অপরাধীদের মন, জীবন, পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের অসীম আগ্রহ ছিল হোমসের। আর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে বিপ্লবীরা অনেক খবর রাখতো বলে আলাপ জমতে দেরী হল না। রিডিং রুমেই নিয়মিত আসত তারা। তারা তিনজন। স্টিপ্যান, ইভান আর ভিয়াট-সোলাভ।

স্টিপ্যান লোকটা খুবই আমুদে। লাল-লাল গাল আর কুচকুচে কালো দাড়ি। শিশুসঙ্গ তার খুবই প্রিয়। কুকুর পোষায় বিষম বাতিক। অথচ নিরীহ চেহারার এই লোকই নিজের হাতে খুন করেছে দু'জন গ্র্যান্ড ডিউককে। প্রথমবার

রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর অফিসারের ছদ্মবেশে ভীড়ের মধ্যে হিজ হাইনেসের সংগে কথা কইতে কইতে কশাইয়ের ছুরি বসিয়ে দেয় বুকের মধ্যে। পরক্ষণেই দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে মৃত গ্র্যান্ড ডিউককে নিয়ে— সোরগোল কমে এলেই অদৃশ্য হয়ে যায় ভীড়ের মধ্যে।

দ্বিতীয়বারের ঘটনাও কম চমকপ্রদ নয়। তড়িৎগতিতে ডিউকের চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে—কাজ সেরেই আবার লাফিয়ে নেমে পড়ে স্টিপ্যান। সামনের গলিতে আগে থেকেই লুকোনো ছিল ভোল পালটানোর জামাকাপড়। ইয়াবড় একটা টুপী আর রামভারী একটা ওভারকোট পরে গলি থেকে আবার যখন বেরিয়ে এল স্টিপ্যান—অনুসরণকারীরা তাকে চিনতেও পারল না—হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

ইভান লোকটা কিন্তু সদাই বিষণ্ণ। বিস্ফোরক ছিল তার পড়াশুনোর একমাত্র বিষয়। আর ভিয়াটসোলাভ কাষ্ঠহাসি হাসত চোখাচোখি হলেই। নতুন নতুন কলকব্জা উদ্ভাবনের দিকেই ঝোঁক ছিল তার। অবশ্য সবই মানুষ খুন করার কল।

এদের কাছ থেকে যা জেনেছিলেন হোমস, বহু বছর পরে তা কাজে লেগেছে ওডেসা'তে গিয়ে ট্রেপফ হত্যা-রহস্য সমাধানের সময়ে। তিন গুপ্তঘাতক সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তিন মূর্তিকে তাঁর ভালও লাগত। কিন্তু যার জন্যে এদের সংগে তাঁর আলাপ সেই দাড়িওলা ভদ্রলোক সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল দুদিনেই উবে গেল। কেননা, অর্থনীতির কচকচি তাঁর মাথায় ঢুকত না।

মন্টেগু স্ট্রীটে থাকার সময়েই অনেক ভালো ভালো প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাঁর কলম থেকে। পুরোনো দলিলের তারিখ নির্ণয় সম্পর্কিত নিবন্ধটি সম্বন্ধে বিলক্ষণ গর্ববোধ করতেন হোমস। বাস্কারভিল কেসে তা বলেওছেন। পায়ের ছাপ পর্যবেক্ষণ আর প্লাস্টার অভ প্যারিস দিয়ে পদচিহ্ন সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি ফরাসী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে পরে (সাইন অভ ফোর)। হোমসের সব চাইতে প্রিয় যে গবেষণা-নিবন্ধ, যার উল্লেখ তিনি বার বার করেছেন বিভিন্ন কেসে—তামাকের ছাই সম্পর্কে সেই মূল্যবান রচনার স্থানও এই মন্টেগু স্ট্রীট। ১৪০ রকম চুরুট, সিগারেট আর পাইপ তামাকের ছাইয়ের রংগীন প্লেট, তৈরী এবং হরেকরকম ছাইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ চিরকাল অপরাধবিজ্ঞানে সমাদৃত হবে।

বিষবিজ্ঞান নিয়ে তখনি তিনি পড়াশুনা করেছেন, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখেছেন, এবং হাতেনাতে ইঁদুর বেড়ালের ওপর কিছু পরীক্ষাও করেছেন। সাধনা তাঁর বৃথা যায়নি। বহু বছর পরে 'সাসেক্স ভ্যামপায়ার' কেসে তাঁর অসামান্য সাফল্যই তার প্রমাণ।

কাহিনীর সূত্রপাত শেষ ডাকে আসা ছোট্ট একটা চিরকুট থেকে। চিঠির বিষয়-বস্তু ভ্যামপায়ার অর্থাৎ রক্তশোষক পিশাচ। মিন্সিং লেনের চায়ের দালাল রবার্ট ফার্গুসন 'মরিসন, মরিসন অ্যান্ড ডড' কোম্পানীর কাছে ভ্যামপায়ার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছিলেন। কোম্পানী থেকে শার্লক হোমসের নাম সুপারিশ করা হয়েছে এই কারণে যে মাটিল্ডাব্রিগসের কেসে স্বনামধন্য গোয়েন্দাপ্রবরের কার্যকলাপ তাঁরা এখনো বিস্মৃত হননি।

চিঠি পড়ে অবজ্ঞার হাসি হাসলেন শার্লক হোমস। জানালেন, মাটিল্ডাব্রিগস কোনো স্ত্রীলোকের নাম নয়—সুমাত্রার অতিকায় ইঁদুরভরা একটা জাহাজের নাম। বিশ্বের সামনে সে কাহিনী হাজির করার সময় এখনো আসেনি।

স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে বহু বিচিত্র তথ্যে বোঝাই পুরোনো পাঁজি নামিয়ে আনলেন হোমস। পাতা উলটোতে উলটোতে অনেক অপ্রকাশিত মামলার নাম শোনালেন। জালিয়াত ভিক্টর লিঞ্চ, বিষাক্ত টিকটিকি গিলা, হ্যামারস্মিথের বিষয় ইত্যাদি। তারপরেই পাওয়া গেল হাঙ্গারী আর ট্র্যানসিলভানিয়াতে রক্তপায়ী পিশাচের উপদ্রব কাহিনী।

চোখ বুলিয়েই পুরোনো পাঁজি দূরে নিক্ষেপ করলেন হোমস। ড্রাকুলা-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি নারাজ। ভ্যামপায়ার মানেই রক্তশোষক পিশাচ, চলন্ত লাশ। রাতের অন্ধকারে কবর ছেড়ে উঠে আসে তারা মানুষের রক্ত পান করতে। বুকের মধ্যে দিয়ে কাঠের খোঁটা চালিয়ে হৃদপিন্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে না দিলে কবরের গারদে তাদের বন্দী রাখা যায় না। অপরাধবিজ্ঞানে যখন ভূত-প্রেতের স্থান নেই, তখন আধুনিক ড্রাকুলা নিয়েও সময় নষ্ট করতে চান না শার্লক হোমস।

কথা বলতে বলতে টেবিলে পড়ে থাকা আর একটা খাম নিয়ে ছিঁড়লেন শার্লক হোমস। মুখভরা কৌতুক নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল কৌতুকচ্ছটা, সে জায়গায় ফুটে উঠল গভীর আগ্রহ।

চিঠিটা স্বয়ং রবার্ট ফার্গুসনের। লিখেছেন বছর পাঁচেক আগে তিনি বিয়ে করেছেন পেরুভিয়ান ব্যবসায়ীর এক মেয়েকে। প্রেমজ বিবাহ। কিন্তু পরদেশী প্রকৃতির দরুণই বোধ হয় পত্নীর চরিত্রের একটা দিক তিনি কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারেন নি। অথচ তাঁর স্ত্রী সত্যিই স্বামী-অনুরক্তা।

বিষয়টা জট পাকিয়েছে স্ত্রীর সাম্প্রতিক ব্যবহারে। পর পর এমন কতকগুলো অদ্ভুত কান্ড তিনি করেছেন যা তাঁর নরম স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। ফার্গুসনের প্রথম পত্নী মারা গেছেন। তাঁর বছর পনেরো বয়েসের ভারী সুন্দর ছেলেটিকে দু'দুবার মারধর করেছেন নতুন-মা। প্রথম পিটিয়েছেন লাঠি দিয়ে; দ্বিতীয়বার বেধড়ক চড়চাপড়। মারধরের কারণ কিন্তু জানা যায়নি। শৈশবে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছিল ছেলেটির। এহেন কিশোরের ওপর সৎমার মারধর সত্যিই বড় মর্মান্তিক।

এ তো গেল সপত্নীপুত্রের ওপর অত্যাচার। তার চাইতেও লোমহর্ষক কান্ড ঘটতে দেখা গেছে তাঁর নিজের ছেলের ক্ষেত্রে এক বছরের শিশুকে দুবার একলা ফেলে গেছিল ধাত্রী। দুবারই শিশুকে কামড়ে রক্তপান করেছেন তার নিজের মা। প্রথমবার কান্না শুনে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে ধাত্রী দেখেছে, খোকার মা খোকার ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘাড় কামড়ে রয়েছে। ঘাড়ে ছোট একটা ক্ষত, রক্ত গড়াচ্ছে সেখান থেকে।

এই ঘটনার পর দারুণ ঘাবড়ে যা ধাত্রী। সদাসতর্ক নজর রাখে শিশুর ওপর এবং মা-ও যেন সমান নজর রাখে, সুযোগের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে থাকে। মনিবানির টাকা খেয়ে কথাটা সে এতদিন চেপেছিল। কিন্তু আর সইতে না পেরে একদিন যখন ফার্গুসনকে সব কথা বলছে, এমন সময়ে আবার ককিয়ে কেঁদে উঠল বাচ্চা। দৌড়ে গেলেন দুজনে। গিয়ে দেখলেন সেই ভয়াবহ দৃশ্য শিশুর শয্যার পাশ থেকে নতজানু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালেন ফার্গুসন-পত্নী। বাচ্চার ঘাড়ে আর বিছানার চাদরে রক্ত মাখামাখি আতংকে বিকট চীৎকার করে উঠে স্ত্রীর মুখ আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলেন ফার্গুসন।

দেখলেন তাঁর অধরোষ্ঠের চারদিকে কাঁচা রক্ত। এতক্ষণ যে বাচ্চারই রক্তপান করছিলেন তিনি, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

এরপর থেকেই ভদ্রমহিলা তাঁর ঘরে খিল দিয়েছেন। ফার্গুসন অর্ধোন্মাদ। শার্লক হোমস্ যদি তাঁকে সাহায্য করেন, তবে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন।

রাজী হয়ে গেলেন শার্লক হোমস।

পরের দিন সকাল দশটায় ঘরে ঢুকলেন রবার্ট ফার্গুসন। হোমসের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, সমস্ত সত্তা দিয়ে তাঁর বউ তাঁকে ভালবাসেন। এই অবিশ্বাস্য ভয়ংকর কান্ড স্বচক্ষে দেখার পর বউকে তিনি ধমকাতে শুরু করলে ভদ্রমহিলা কোনো জবাব দেননি, একটা কথাও বলেন নি। দুই চোখে নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশা নিয়ে চেয়ে থেকেছেন স্বামীর দিকে। তারপর এক দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেই যে খিল দিয়েছেন, আর বেরোন নি। সংগে আছে কুমারী জীবনের ঝি ডলোরেস। বাচ্চা? তাকে চব্বিশঘণ্টা আগলে রেখেছে ধাত্রী। প্রথমপক্ষের ছেলে জ্যাকও কোনোদিনই বলেনি কেন সৎমা তাকে অত মেরেছেন। মা-মরা ছেলেটি ফার্গুসনের চোখের মণি—জ্যাকও বাবা-অন্ত প্রাণ।

সরেজমিন তদন্ত করতে অকুস্থলে হাজির হলেন শার্লক হোমস আর ডক্টর ওয়াটসন। নভেম্বরের এক আবছা কুয়াশা-ঢাকা সন্ধ্যায় সাসেক্সের এঁকাবেঁকা গলিঘুঁজির কাদার ওপর দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে এসে পৌঁছোলেন ফার্গুসনের নিরিবিলি সেকেলে খামারবাড়ীতে। বিরাট বাড়ী। টিউডর যুগের বেজায় উঁচু চিমনি আর শ্যাওলাঢাকা হর্শাম পাথরের ঢালু ছাদ। দেউড়ি ক্ষয়ে বেঁকে গেছে। টালির ওপর

কালের ভ্রূকুটি। ওক কাঠের ভারী বরগা ঢেউ খেলে বেঁকে গেছে, অলমতল থেকে বেরুচ্ছে বয়স আর জীর্ণতার গন্ধ।

দুই বন্ধুকে মাঝখানের বিরাট হলঘরে গেলেন ফার্গুসন। অনেক কিছুরই ঘটেছে সে ঘরে। চৌখোপী কাঠের কারুকরা অর্ধেক ঢাকা দেওয়ালগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর মূল ইংল্যান্ড কৃষকদের হওয়া উচিত। নীচের দিকে একেলে জল-রঙের অলংকরণ। ওপরে, যেখানে ওক নেই, সেখানে হলদে পলস্তারার ওপর ঝুলছে দক্ষিণ আমেরিকার বাসনপত্র আর অস্ত্র-শস্ত্রের সুন্দর একটা সংগ্রহ—নিঃসন্দেহে পেরুভিয়ান গৃহকর্ত্রীর। অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সর্বকিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন হোমস। ফিরে যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর দুই চোখে নিবিড় বিস্ময়।

তারপরেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন—"আরে! আরে! একী!"

কোণের দিকে বাক্সের মধ্যে শুয়ে ছিল একটা স্প্যানিয়েল কুকুর। অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল সে। ল্যাগব্যাগ করতে লাগল পেছনের পা দুটো, ল্যাজটা অবশভাবে ঝুলে রইল মেঝের ওপর।

অবাক বিস্ময়ে এই কুকুরটার দিকেই তাকিয়েছিলেন শার্লক হোমস।

"ব্যাপার কি, মিঃ হোমস?" জানতে চাইলেন ফার্গুসন।

"কুকুরটার হয়েছে কি?"

"সেইটাই তো কেউ ধরতে পারছে না। পশু ডাক্তাররা বলছে, একধরনের পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের মেনিনজাইটিস।"

"রোগের আক্রমণ কি হঠাৎ?"

"রাতারাতি।"

"কদ্দিন আগে?"

"প্রায় মাস চারেক আগে।"

"খুবই অসাধারণ! খুবই ইঙ্গিতময়!"

"এর মধ্যে অসাধারণ কি দেখলেন মিঃ হোমস?"

"দেখলাম, আগে যা ভেবেছি, তারই সমর্থন।"

বলে, মুখে চাবি দিলেন শার্লক হোমস।

একটু পরেই এল ডলোরেস। প্যাঁকাটির মত চেহারা। রাগত মুখে সে জানালে, গিন্নিরানির এখন দারুণ অসুখ। এক্ষুনি একজন ডাক্তার দরকার।

অগত্যা ডলোরেসের পিছু পিছু গেলেন ডক্টর ওয়াটসন। সেকেলে বারান্দা পেরিয়ে পৌঁছোলেন লোহার পাতমারা বিশাল একটা দরজার সামনে। দুর্গন্ধারের মত এই মজবুত দরজার জন্যেই স্ত্রী-র কাছে জোর করে যাওয়া সম্ভব নয় ফার্গুসনের। চাবি বার করল ডলোরেস। তেলহীন কব্জার ওপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল ভারি ওক কাঠের পাল্লা। ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল ডলোরেস।

বিছানার ওপর শুয়েছিলেন পরমা-সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা। জ্বরে পা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। ওয়াটসন বুঝলেন, জ্বরটা মানসিক আর স্নায়বিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া।

নাড়ি দেখতে লাগলেন ওয়াটসন। ভদ্রমহিলা তাঁর সুস্ত্রী, আরক্ত মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"আমার স্বামী কোথায়?"

"নীচে। আপনার সঙ্গে উনি দেখা করতে চান।"

আরে! আরে! একী!

"না...না, আমি দেখা করব না...করব না...করব না...নরপিশাচ! নরপিশাচ! ওঃ, কি করি আমি এই শয়তানটাকে নিয়ে?"

ওয়াটসন ভাবলেন, প্রলাপ বকছেন না তো ভদ্রমহিলা? কেননা, ফার্গুসনকে শয়তান বা নরপিশাচের চরিত্রে তো খাপ খাওয়ানো যায় না।

মুখে বললেন—"ম্যাডাম, উনি আপনাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। এ ব্যাপারে উনি দারুণ শক্ পেয়েছেন।"

জ্বলজ্বলে চোখ মেলে ভদ্রমহিলা বললেন—"তা সে জানে। কিন্তু আমিও কি বাসি না? ওর বুক ভাঙার চাইতে নিজেকে শেষ করে দিতে কি আমি চাই না? আমার ভালবাসা হল সেই জাতের। তার পরেও কিনা আমার সম্বন্ধে অমন ভাবতে পারে? ও কথা বলতে পারে?"

"উনি দুঃখ পেয়েছেন—বুঝতে পারেন নি।"

"বুঝতে না পারলেও বিশ্বাস করা উচিত।"

"আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"না...না...না। যান আপনি। তাকে বলুন, আমার খোকাকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

বলে, দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুলেন ভদ্রমহিলা।

নীচে এসে সব বললেন ওয়াটসন।

আতংকিত কণ্ঠে ফার্গুসন বললেন—"তাই কি সম্ভব? ঠোঁটের চারধারে রক্তের দাগ নিয়ে ওকে যেভাবে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখেছি, তার পরেও খোকাকে ওর কাছে পাঠানো কি নিরাপদ? না...তা হবে না।"

দরজা। প্রবেশ করল একজন কিশোর। পাণ্ডুর মুখশ্রী। সুন্দর চুল। আবেগময় হাল্কা নীল চোখ। একদৌড়ে এসে ফার্গুসনকে জড়িয়ে ধরলে সে।

"বাবা! বাবা! তুমি এসে গেছো!"

শার্লক হোম্‌সের নাম শুনে প্রশ্ন করল—"ইনিই কি সেই ডিটেকটিভ মিঃ হোম্‌স?"

"হ্যাঁ," জবাব দিলেন ফার্গুসন।

শুনে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর জ্যাকি।

কিন্তু সে দৃষ্টি যেন বিদ্বেষে ভরা!

হোম্‌সের ইচ্ছায় নিয়ে আসা হল ছোট খোকাকে।

দেবশিশুর মত ভারী সুন্দর! বাচ্ছাটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন ফার্গুসন। ঘাড়ের ছোট্ট লাল টকটকে ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন—"আহারে, এমন ছেলেকেও জখম করতে প্রাণ চায়?"

ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন ডক্টর ওয়াটসন।

আচম্বিতে শার্লক হোম্‌সের ওপর চোখ পড়তেই দেখলেন তাঁর ভাবভঙ্গিতে এক আশ্চর্য তন্ময়তা। দৃঢ় স্থির মুখ—যেন হাতীর দাঁতে খোদা। উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি জানলাপথে উধাও। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন বাইরের বিষাদমলিন কুয়াশাভেজা বাগানের দিকে। খড়খড়ির একটা ঝিলিমিলি অর্ধেক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছেন শার্লক হোম্‌স।

পরক্ষণেই হেসে উঠলেন হোম্‌স!

চোখ ফিরে এল শিশুর ওপর। কোন কথা না বলে সযত্নে পরীক্ষা করতে লাগল ঘাড়ের ক্ষতটা।

জ্যাক আর ছোট খোকাকে নিয়ে ধাত্রী বেরিয়ে যেতেই কৌতুক হাসি হেসে শার্লক হোম্‌স বললেন—"কেসটা যদিও খুব সূক্ষ্ম, কিন্তু আমি কুপোকাৎ হইনি। এ মামলা বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের উপযুক্ত বিশ্লেষণের ব্যাপার। আসলে আমি বেকার স্ট্রীটে বসেই সমাধানে পৌঁছেছিলাম—বাকি ছিল শুধু পর্যবেক্ষণ আর সমর্থন। ওয়াটসন, মিসেস ফার্গুসনের শরীর কি রকম? আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন তো?"

"পারবেন।"

"বহুৎ আচ্ছা। ব্যাপারটা আমরা তাঁর সামনেই পরিষ্কার করতে চাই। চল, যাওয়া যাক।"

"আমার মুখ দেখবে না ও," কাতর কণ্ঠে বললেন ফার্গুসন।

"দেখবে, দেখবে, আমি বলছি দেখবে।" বলে একটা কাগজে খসখস করে কয়েক ছত্র লিখলেন হোম্‌স। "ওয়াটসন, ঘরে ঢোকার অধিকার তুমি যখন পেয়েছো, তখন এই চিরকুটটা ওঁর হাতে পৌঁছে দেওয়ার ভার তোমার।"

ওপরে গিয়ে ডলোরেসের হাতে চিরকুট দিলেন ওয়াটসন। মিনিটখানেক পরেই ভেতর থেকে শোনা গেল এক চিৎকার. সে চিৎকারে বিস্ময় আর হর্ষ একই সাথে মিশোনো।

ডলোরেস দরজা ফাঁক করে জানালে, মিসেস ফার্গুসন দেখা করতে রাজী।

শার্লক হোম্‌স কি যাদুমন্ত্র জানেন?

ওয়াটসনের আহ্বানে ওপরে এলেন হোম্‌স আর ফার্গুসন।

নাটকীয়ভাবে হোম্‌স বললেন—"মিঃ ফার্গুসন, সবচাইতে চটপটে অপারেশনই সবচাইতে কম বেদনা দেয়। আপনার মন কিসে শান্ত হবে, আমাকে প্রথমেই তা বলতে দিন। আপনার স্ত্রী অত্যন্ত সাধ্বী, রীতিমত প্রেমময়ী, আর তাঁর সঙ্গে খুবই জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে।"

সহর্ষে চিৎকার করে উঠলেন ফার্গুসন।

"প্রমাণ করুন, মিঃ হোম্‌স। প্রমাণ যদি করতে পারেন, জানবেন চিরজীবন ঋণী থাকব আপনার কাছে।"

"প্রমাণ তো করবই। একদিক দিয়ে আপনি হাল্কা হবেন, কিন্তু আঘাত পাবেন আর একদিক দিয়ে।"

"আমি তা সইব।"

"তাহলে শুনুন। বেকার স্ট্রীটে বসেই রক্তপায়ী পিশাচের অলৌকিক কাহিনী একেবারেই অসম্ভব মনে হয়েছিল আমার কাছে। ইংল্যাণ্ডের অপরাধজগতে এসব ব্যাপার কখনো ঘটে না। তবুও, আপনি যা দেখেছেন, তা খুবই স্পষ্ট। বাচ্ছার দোলনার পাশ থেকে ঠোঁটের চারধারে কাঁচা রক্তের দাগ নিয়ে স্ত্রীকে আপনি উঠে দাঁড়াতে দেখেছেন।"

"দেখেছি।"

"আপনার মাথায় এ ধারণা কেন এল না যে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত পান করা ছাড়াও অন্য কারণে রক্তশোষণ করা সম্ভব? ক্ষত থেকে বিষ টেনে বার করার জন্যে ইংলিশ ইতিহাসের এক রাণী একবার রক্ত শুষে নেন নি?"

"বিষ!"

"আসবাবপত্র সব দক্ষিণ আমেরিকার। দেওয়ালের ঐ হাতিয়ারগুলো প্রথম থেকেই আমার কৌতূহল জাগ্রত করেছে। বিষ অন্য পথেও আসতে পারত, কিন্তু ঐদিকেই আমার চোখ পড়ল। পাখিমারা পুঁচকে ধনুকের পাশে ছোট্ট শূন্য তূণটা দেখেই বুঝলাম আমার হিসেবে ভুল হয় নি। কুর্‌যারি বা ঐরকম কোন মারাত্মক শেকড়ের নির্যাসে যদি ঐ তীরের একটা ফলা ডুবিয়ে বাচ্ছাটাকে খোঁচা মারা হয়, তবে বিষটা শুষে টেনে বার করে না দিলে মৃত্যু তার অবধারিত।

"তারপর ধরুন ঐ কুকুরটা। বিষপ্রয়োগ করার আগে বিষের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে কিনা, তা যাচাই করা স্বাভাবিক। তাই খোঁড়া কুকুর অতি সহজেই খাপ খেয়ে গেল আমার অনুমিতিসিদ্ধান্তে।

"দুবার আক্রমণ হল ছোটখোকার ওপর দুবারই তার মা তাকে বাঁচিয়ে দিলেন কিন্তু আসল কথাটা আপনার কাছে ভাঙলেন না, পাছে আপনার মন ভেঙে যায়।"

"জ্যাকি!"

"একটু আগেই ছোট খোকাকে যখন আদর করছিলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম জ্যাকিকে। জানলার ঝিলিমিলির কাঁচে ওর মুখচ্ছবির প্রতিফলনে যে হিংসা, যে নৃশংসতা, যে ঘৃণা আমি দেখেছি—মানুষের মুখে তা বড় একটা দেখা যায় না।"

"আমার জ্যাকি!"

"এ আঘাত আপনাকে সহ্য করতেই হবে, মিঃ ফার্গুসন। ভালবাসার এ এক বিকৃত রূপ। বিকারগ্রস্তের উদ্দাম ভালবাসা আপনাকে ঘিরে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে আর একজনের সেখানে স্থান নেই। তাই নিদারুণ ঘৃণায় জ্যাকির অন্তর জ্বলেপুড়ে খাক্‌ হয়ে গেছে।"

বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন ফার্গুসন-গৃহিণী। এখন মাথা তুলে বললেন—"একথা কি তোমাকে বলা যায়, বব? এ যে বড় মর্মান্তিক সত্য। আমি চাইছিলাম কথাটা আর কারও মুখে শোনো। এই ভদ্রলোকের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। উনি যখন সব লিখে পাঠালেন, তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।"

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে হোম্‌স বললেন—"ম্যাডাম, একটা জিনিস এখনও ধোঁয়াটে রয়ে গেল। জ্যাকির ওপর মারধরের কারণটা না হয় বুঝলাম। মায়ের সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে তো। কিন্তু গত দুদিন ধরে কোন্‌ আক্কেলে বাচ্ছাটাকে আপনি ছেড়ে আছেন?"

"নার্সকে আমি সমস্ত বলেছি। ও সব জানে।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

বাইরে এসে দাঁড়ালেন শার্লক হোম্‌স, ডক্টর ওয়াটসন আর ডলোরেস। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন হোম্‌স—"বাকিটুকু স্বামীস্ত্রীর মধ্যেই মিটমাট হয়ে যাওয়া ভাল।"

এইভাবেই শেষ হল 'সাসেক্স ভ্যামপায়ার'-এর লোমহর্ষক বৃত্তান্ত। পশুর ডাক্তারও বিষের অস্তিত্ব ধরতে পারেন নি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত কুকুর দেখে। কিন্তু বহুদূরে বসে অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করেও বিভ্রান্ত হন নি শার্লক হোম্‌স। বিষবিজ্ঞানে প্রগাঢ় জ্ঞান, হিসেবী বুদ্ধি আর ধারালো যুক্তি দিয়ে ড্রাকুলা-রহস্য ছিন্নভিন্ন করে উপনীত হয়েছেন এমন এক সামাজিক সমস্যায় যা আমাদের কারোরই অজানা নয়।

আমারে এ আঁধারে

কল্যাণকুমার বসু

(১১)

মা এসে পোঁছলেন লখনউতে। মেয়েদের বিবাহ হয়ে গেছে, দুর্গামোহন-বাবুর মৃত্যু হয়েছে—এখন সম্পূর্ণ একা। তাই প্রবাসেই এসে জীবনটা পার করবেন মনে করলেন। অতুলপ্রসাদ মাকে আপনার কাছে এনে রাখলেন। হেমকুসুমের এতে আপত্তি ছিল। আপত্তির কারণ—যে সকল আত্মীয়স্বজন ওঁদের বিবাহের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না। তাই অতুলপ্রসাদ যখন তাঁর মাকে লখনউ-এ এসে বসবাস করার জন্য বারবার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, হেমকুসুম তখন তার প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছিলেন। হেমকুসুমের ইচ্ছে হেমন্তশশী কলকাতাতেই বাস করুন। অতুলপ্রসাদ মাসে মাসে মাকে যেমন টাকা পাঠাচ্ছেন তেমনই টাকা পাঠাবেন। লখনউতে মায়ের আগমনের কোন প্রয়োজন নেই। এই পর্যন্তই থাকুক মা-এবং ছেলের সম্পর্ক। হেমন্তশশী লখনউ এলে কেবল জটিলতার সৃষ্টি হবে। অতুলপ্রসাদের ইচ্ছে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে থাকা। মা আসবেন বৈকি আমার বাড়িতে। আমার বাড়ি ত তাঁরও বাড়ি! তাঁরও অধিকার আছে এই বাড়িতে থাকবার। বোনেরাও আসবে। বোনেদের ছেলেমেয়েরা আসবে আমার এখানে। আমার যতটি আত্মীয়স্বজন আসবেন যাঁর ইচ্ছা হবে। আমি কাউকে বাধা দেব না। অতুল-প্রসাদ স্ত্রী হেমকুসুমকে বলেন, তুমি পুরোনো দিনের কথা ভোল। এখন সুখের দিন তোমার, মিলেমিশে থাকতে হবে তোমায়।

তোমার এখানে যথেষ্ট নাম হয়েছে, প্রতিপত্তি হয়েছে, হেমকুসুম বলেন, তোমার নামটুকু গ্রহণ করে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব জীবনে দাঁড়াতে চায়। দুঃখের সময়ে [illegible]বা তোমার অসময়ে তাঁরা কোন সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন? আমি কাউকে অনুগ্রহ দেখাবো না। আমার এই লখনউর বাড়িতে কাউকে আসতে কোনদিনই বলবো না। আমার এই লখনউর বাড়ির দরজা সব সময়ে তোমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে বন্ধই থাকবে।

তা' বলে তুমি চাও আমার মা আমার বাড়িতে কোনদিন আসবেন না?

সেদিন হেমকুসুমের উত্তর বড় তীক্ষ্ণ। সিধা তাঁরা যদি এ বাড়িতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, আমি তবে এ বাড়ি ছেড়ে যাবো।

অতুলপ্রসাদও বলতেন, তাই বেও। বিরক্ত হতেন অতুলপ্রসাদ। বলতেন, জেনে রেখো, মা ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। মা যখন 'অতুল' বলে ডাকেন তখন আমার সেই ছেলেবেলার দিনগুলি মনে পড়ে—মনেই থাকে না আমার এত বয়স হয়েছে—এত প্রতিষ্ঠা হয়েচে। মায়ের জন্যে আজ আমি এত বড় হয়েছি। মায়ের ইচ্ছায় মায়ের চেষ্টায় মায়ের প্রেরণায় আজ আমার এই প্রতিষ্ঠা, আর তোমার কথায় মাকে ভুলে যাব। মা'কে দূরে রেখে দেব।

মা লিখলেন, অতুল তুই যখন আমায় ডাক দিয়েছিস আমি নিশ্চয়ই তোদের কাছে গিয়ে থাকবো। মাকে কলকাতা থেকে এক সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অতুলপ্রসাদ তাঁর আউটট্রাম রোডে বাসা বাড়িতে। মা ঘুরে ঘুরে দেখলেন আউটট্রাম রোডের বাড়িটি, ঘরগুলি, বাড়ির বাইরের ফুল-বাগিচা, টেনিস লন, আউট হাউস ইত্যাদি। অল্প দূরে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা স্থলটি। 'মা বললেন, তুমি একটা ওয়েলার ঘোড়া এবং গাড়ি কিনেছ। বাড়ি ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়েছ। এবার টাকা কিছু সঞ্চয় কর। তোমার মত হেমকুসুমও একটু বাজে খরচ-খরচা করে দেখেছি। এটা বন্ধ করতে হবে! টাকার মর্ম আমি বুঝি। তোমাকে একটা বাড়ি করতে হবে মনে রেখো। গাড়ির থেকে বাড়ির প্রয়োজন সর্বপ্রথমে। মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা চাইত, ভাড়া বাড়িতে কত দিন কাটাবে!... যাক আমি এসে পড়েছি, তোমার এত ভাবনা চিন্তা না করলেও চলবে। খরচ অনেক কমিয়ে দিতে হবে। আমার কথা মত কাজ করো, দেখ তোমার ভালো হবে।

মা প্রথম দিন থেকে এসেই সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিলেন। সর্বময়ী কর্ত্রী হলেন। চিরকাল যে পদে অভ্যস্থ সে পদ কি সহজে ত্যাগ করা যায়! তাই বললেন—

হেমকুসুম তোমার ভাঁড়ারের চাবিটা আমাকে দিও। দেখি তোমার ভাঁড়ার ঘর। কেমন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ! সংসারের বিষয়ে আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তুমি নিজের শরীর এবং অতুলের শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখ।

হেমকুসুম হেমন্তশশীর সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলেন না জরুরী প্রয়োজন ছাড়া। আপন মনে চিন্তা করেন। সংসারে হেমন্তশশীর সর্বময়ী কর্তৃত্ব দেখে হেম-কুসুম বিরক্ত হন। ভেতরে ভেতরে জ্বলে যায়। ক্রমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আপন মনে আপন ঘরে অন্তরীণ হলেন। অতুল-প্রসাদ বুঝলেন না। কোনদিকে দৃষ্টি রাখলেন না। আপন কাজকর্ম নিয়ে আপন কাজে মেতে রইলেন। হেমকুসুম মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে অতুলপ্রসাদকে আপন মনের দুঃখ জানাবার প্রয়াস পান। কিন্তু সব কথা বলা হয় না। বলতেও পারেন না। অথবা অতুলপ্রসাদ হেসে হেসে বুঝি হেমকুসুমকে বলেন, বেশ তো আছো, কোন কাজকর্মের ভাবনা নেই, খাও-দাও আর...আনন্দ করো। তোমার...তোমা...র সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে আমার লোভ হয় এমন মা পেয়েছ।

মা বলেন হেম তুমি ঘরে বসে কি এত ভাব বল তো! এসো আমার সঙ্গে সংসারের কাজে হাত লাগাও।

হেমকুসুম হেমন্তশশীর ডাকে কখোনো সাড়া দেন, কখোনো মুখ ভার করে বসে থাকেন শুনেও শোনেন না। সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত হয়ে যায়। অপ্রসন্ন হেমন্তশশী অতুল-প্রসাদকে মাঝে মাঝে হেমকুসুমের অবাধ্যতার কথা বলেন। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের ওপর বিরক্ত হন। হেমকুসুমেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। রুষ্ট কণ্ঠে মাঝে মাঝে বলেন, 'আমি চললাম। আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই দেখছি। থাকো, তোমার মায়ের সঙ্গে, আমার যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব।' হেমকুসুম ভুলতে পারেন না কোন পূর্ব-স্মৃতি। পূর্বের যতকিছু অবহেলা প্রতি-শোধের রূপ ধরে বাসা বেঁধে থাকে অনুক্ষণ। অতুলপ্রসাদ সেদিক দিয়ে অনেকটা ক্ষমাপরায়ণ আপনভোলা প্রকৃতির। অতুল-প্রসাদ প্রায়ই বলেন,—তুমি সব কাজেতে এমন করে রাগ করে ওঠো কেন।

অতুলপ্রসাদের দুটি সমস্যা স্ত্রী এবং মাকে ঘিরে। ক্রমে অসহ্য হয়ে যায় দিনগুলো। প্রায় প্রতিদিনই যখনই পুত্রকে কাছে মেলে মায়ের অভিযোগের অন্ত নেই। স্ত্রীরও মায়ের প্রতি অভিযোগ নিত্য-কর্মের মধ্যে। অশান্তি। প্রতিদিন অশান্তি। ছোটখাটো কথা থেকে অশান্তি দানা বাঁধে। নিরুৎসাহ দিন-রাত্রি। বাড়ির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে হয় না। তাই বাইরের কাজ নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকেন অতুলপ্রসাদ। বাড়ি এসেও স্ত্রী এবং মাকে এড়িয়ে সকল সময়ে অফিস ঘরে। অবসর সময়ে অফিসের কোর্টের কাজ নিয়ে বসেন। মাঝে মাঝে মনে হয় হেমকুসুমের কথা মত মাকে লখনউতে না আনলেই যেন ভালো হোত। অন্তত এই রোজকার অশান্তির হাত থেকে বাঁচতেন। কিন্তু হেমকুসুমেরই বা এত জেদ কেন! হেমকুসুম কি মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না। একসঙ্গে বাস করে কি সকলে সুখী হওয়া যায় না! মায়ের কথা ভেবে দুঃখ হয়—মা কোথায় আর যাবেন? বোনেরা থাকলেও তাঁরই ত দেখাশোনার কথা। তিনিই ত তাঁর একমাত্র পুত্র।

প্রথম প্রথম অতুলপ্রসাদ স্ত্রী এবং মায়ের পরস্পরের দোষারোপ অভিযোগ প্রভৃতি শুনতেন। বোঝাতে চেষ্টা করতে দুজনকেই। এতে বিপরীত ফল হল। দুজনই তাঁকে অপরের পক্ষপাতী মনে করে অভিমানে এবং রাগে তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। এই সময়ে ক'দিন চলছিল যখন হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের সঙ্গে

কথা বলছিলেন না। বড় একটা মোকর্দমায় অতুলপ্রসাদও কয়েকদিন ভীষণ ব্যস্ত। কাছারীতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। অনেক রাত পর্যন্ত মক্কেলদের সঙ্গে পরামর্শ করা। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে। বৈঠকখানা ঘর থেকে উঠে এসে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লেই ভাবতে ইচ্ছে করে না সাংসারিক কোন কথা। সংসারটা কেমন চলছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই ঝগড়া হয়তো দু' দিনের, মিটে যাবে কাল সকালেই। কাল সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখবেন এই সংসারের নতুন রূপ।... কিন্তু ছাইচাপা আগুন অন্তস্থলে জ্বলে পুড়ে খাক্ হচ্ছিল। একদিন তা আত্মপ্রকাশ করল।

সেদিন কাছারী থেকে বেশ খুশ-মেজাজে ফিরেছেন অতুলপ্রসাদ, ভেবেছেন আজকে স্ত্রীর মান ভাঙ্গিয়ে গোমতীর তীরের খোলা হাওয়ায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। অনেক দিন হেমকুসুম কথা বন্ধ রেখেছেন। আর রাগ না ভাঙ্গালেই নয়।... কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধাতা রূপ দেন আর এক। স্নানের ঘর থেকে স্নান সেরে জলযোগে বসেছেন অতুলপ্রসাদ। মা এসে চেয়ার টেনে পাশে বসলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই হেমকুসুমের বিরুদ্ধে সাংসারিক বিষয়ে নানান অভিযোগ তুললেন।

সেদিন অতুলপ্রসাদ বললেন, মা এখন ও কথা থাক পরে বোলো।

কিন্তু হেমন্তশশী সে দিন বড় নিষ্ঠুর হলেন। দয়ামায়া মমতা কোথায় মিলিয়ে গেল। বললেন, এমন করে এখানে আর আমি থাকতে পারছি না অতুল। আমায় তুই পাঠিয়ে দে কলকাতায়। কথা শেষ হল না, অকস্মাৎ হেমকুসুম অন্য ঘর থেকে এসে রাগে অন্ধ হয়ে হাতের সামনের বাতি-দানটা ছুঁড়ে মারলেন। অতুলপ্রসাদের খাওয়া হল না। মাকে টেনে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। বাতিদান থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে দাউ দাউ করে ঘরের কার্পেট জ্বলে গেল। হেমকুসুমের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। স্বামী মায়ের হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন... স্বামীর ঘরের দিকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর যত সুট এবং সার্ট ছিল এনে আগুনে ফেললেন। আগুন দেখে অতুলপ্রসাদ লোকজনদের ডাকলেন। তারা ছুটে এল, যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে আগুন নেভালো। ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। অতুলপ্রসাদ দেখেন হেমকুসুম একটি চেয়ারের পাশে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন। তাকে ধরে নিজের ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন খাটে। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের চোখে মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিলেন।

হেমকুসুম চোখ বড় করে একবার চোখ মেলেই চোখ বুজলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে এল। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের অবস্থা দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে বাইরে এলেন। সামনের বারান্দা দিয়ে ছেলের মাষ্টারমশাই মহেশ ভট্টাচার্য ছেলেকে পড়াবার জন্যে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখেই অতুলপ্রসাদ বললেন, মহেশ ডাক্তার টাণ্ডনকে একবার ডেকে আনো এক্ষুনি। মহেশ ডাক্তার টাণ্ডনকে ডেকে আনলেন। অতুল-প্রসাদ ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ডাক্তার এলে বসার ঘরে বসিয়ে সব ঘটনার কথা বললেন। ডাক্তার সব শুনে বললেন, চলুন মিসেস সেনকে দেখে আসি। ডাক্তার টাণ্ডন ঘরে প্রবেশ করে হেমকুসুমকে পরীক্ষা করে বললেন, সব ঠিক আছে তবে ইনি মানসিক আঘাত পেয়েছেন, এর এখন ঘুমোনো দরকার, আমি তার জন্যে সব ব্যবস্থা করছি, অসুধপত্র লিখে দিচ্ছি। এঁর নার্সিং দরকার।... মহেশবাবু আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি আমার ডাক্তার-খানা থেকে অসুধপত্র দিয়ে দিচ্ছি।

অসুধপত্র নিয়ে মহেশ ফিরতেই অতুলপ্রসাদ মহেশকে বললেন, এবার একটা নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে মহেশ বললেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, দিদি এমন কিছু অসুস্থ নন, আমার ত পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন অবসর আমার, আমি দিদিকে দেখাশোনা, অসুধপত্র খাওয়ানো পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে দেখতে পারি। তা-ছাড়া আয়া ত আছে। আপনি ভাববেন না কিছু।

অতুলপ্রসাদ বললেন, ঠিক আছে। তোমার দিদিও তোমাকে খুবই স্নেহ করেন। একজন অজানা-অচেনা মানুষের চেয়ে এক-জন পরিচিত মানুষের সেবা-সাহচার্য্যে শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ থাকবে। তুমি থাকলে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকবো।

অতুলপ্রসাদের মা সেদিন সেই সন্ধ্যায় ঘটনার পর থেকে কেমন যেন হত-চকিত হয়েছেন। ছেলের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। আপন ঘরে একা একা বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলেন। কেনই বা এখানে আসতে সম্মত হলেন। ছেলের সুখের সংসারে একি বিপর্যয় আনলেন। 'আমার এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়াই উচিত' একবার মনে করলেন। আর একবার মনে এল হেমকুসুমকে দেখে আসি। ভাবলেন হেমকুসুম কি তাতে আরো উত্তেজিত হবে। হেমকুসুমকে দেখতে গিয়ে যদি ছেলের সামনে পড়েন। যদি সে কিছু মনে করে। এই ভেবে সেদিন আর যেতে পারলেন না। নিজের মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলেন। ঘর ভরা লোকজনদের সামনে একি কান্ডখানা হয়ে গেল। অতুলের এত বড় মান ইজ্জত আমার জনোই ধুলায় মিশে গেল। এই সকল কথা কি কোনদিন চাপা থাকবে। হয়তো শহরের লোকের মুখে মুখে ফিরবে, কি করে আমি মুখ দেখাব সকলের সামনে। আমি ত' অশান্তি চাই নি। অতুলের ভালোর জনোই আমি সংসারের ভার নিতে চেয়েছিলাম, যাতে সে দু পয়সা জমিয়ে একটা মাথা গোঁজবার বাড়ি-ঘর তৈরী করতে পারে। তা আমার কপাল মন্দ, আমার জনোই তাদের এই বিড়ম্বনা। আমি আর এখানে থাকবো না। অতুলকে বলবো আমাকে পাঠিয়ে দে বাবা, যেখান থেকে আমি এসেচি, যা পারিস দিস তাতেই আমার চলে যাবে। অনেক দুঃখ নিয়ে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি... অনেক দুঃখ আমার কপালে এখনো লেখা আছে।

হেমন্তশশী আপন মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপর মনে মনে ভাবলেন, হেমকুসুম সুস্থ হোক, আমি তাকে সুস্থ দেখে এখান থেকে চলে যাবো।

কিছুদিন পরে হেমকুসুম এখন কিছু সুস্থ হয়েছেন। কয়েকটি মাস গেছে এগিয়ে হেমন্তশশী একদিন অতুলপ্রসাদকে বললেন অতুল আমার আর এখানে বাস করতে ইচ্ছে করছে না বাবা, শরীরটা মোটেই ভালো থাকছে না। আমি চলে গেলে তোমরা সুখী হবে অতুল।

অতুলপ্রসাদ দুঃখিত মনে বললেন একথা কেন বলছ মা। ...মা তুমি আমার কাছে থাকবে না! কেন ফিরে যেতে চাও মা? তুমি যেও না।

হাঁ, বাবা, আমাকে যেতে দাও, আর বাধা দিও না।

অতুলপ্রসাদ অনেক দুঃখে বললেন, বেশ তবে তুমি যাও মা, তবু আর একবার বলি 'তুমি থাক মা, তোমার আর কোন কষ্ট হবে না, আর কেউ তোমাকে অপমান করবে না কোনদিন।

আউটট্রাম রোডের বাড়ির দিকে ফিরে ফিরে তাকালেন হেমন্তশশী। ভাঙ্গা দিল জোড়া লাগে না। চোখ দুটি অশ্রুসজল হল। ধীরে ধীরে বললেন, অতুল তুই বিদায় দে বাবা।

অতুলপ্রসাদ প্রণাম করলেন ব্যথিত মনে। হেমকুসুম দরজার কোণে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে অসুস্থ শরীরে। গাড়ি চলে গেল বাগের মোড় অতিক্রম করে চার বাগের দুধার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে দূরে... দূরে। (ক্রমশ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আলো নিবিয়ে একে-একে শুয়ে পড়েছে ই। কিছুক্ষণ আগে কালিদাসের গলা-ারির শোনা গেছে। এখন তিনিও চুপচাপ। -বাইরে সব কিছুই অসাড় হয়ে আছে। ল অন্ধকারে একা শুয়ে-শুয়ে আকাশ-াল ভাবছে মুকুল। তার চোখে ঘুম । অথচ সন্ধ্যার পরেই ঘরে ফিরে মনে ছিল, সে বুঝি আর একমুহূর্ত জেগে তে পারবে না। সারাদিন কালিদাস ক নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন আজ। কী টা গোপন অথচ ভয়ংকর কথা বলতে র বারবার নিজেকে সামলে নিয়েছেন ন। মুকুল জানে না, কথাটা আসলে কী। তা একদিন জানা যাবেই। আজকেই তো নিয়ে যাচ্ছে না সে। কিন্তু যতক্ষণ গোপন বে কথাটা ততক্ষণ শান্তি নেই। ভেতরে রে একটা অস্পষ্ট, অননুভূত যন্ত্রণা ব করে মুকুল।

প্রভাকে দেখেও কিছু বোঝার উপায় । তিনি যেন এ বাড়ির কেউ নন। কথা ন খুব অল্প। তা-ও আলগা, খাপছাড়া ক। বিশেষ করে কালিদাসের সঙ্গে তো নো কথাই হয় না তাঁর। বরং কাছে এলে ন পালিয়ে যাবার পথ খোঁজেন।

'তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে না তো নে?'

কালিদাস তার মুখের দিকে চেয়ে-লন। তাকে চিন্তিত, বিমর্ষ দেখেছিল ন।

মুকুল জবাব দিয়েছিল, 'না, অসুবিধে । কেন?'

তা অবশ্য হবার কথাও নয়। আরামের, আয়েসের সবরকম ব্যবস্থাই তো করে রেখেছেন কালিদাস। শুধু মুকুলের জন্যে নয়। যে আসবে সেই টের পাবে সুখ কাকে বলে। স্বাচ্ছন্দ্যের কি বিপুল আয়োজন।

কিন্তু জীবনভোর এমনি আরাম আর আয়েসের তপস্যাই কি করেছেন কালিদাস? ভেবে কুল-কিনারা পাওয়া ভার। এমনি একক, বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে লাভ? আপনার জন বলতে আজ আর কেউ নেই তাঁর। প্রভা তো থেকেও নেই। মাঝে-মাঝে আনন্দ এসে উদয় হবে হঠাৎ। একটানা অবসাদের ভেতরে অমন আচমকা আবির্ভাব ক'দিনের জন্যে ওলোট-পালোট করে দিয়ে যায় সব। ক'দিনের জন্যে প্রভাকেও মনে হবে চঞ্চল, মুখর, অস্থির। আর কালিদাসের তো বয়সের হিসেব মেলে না তখন। তিনি যেন সমস্ত দুঃখ ভুলে নতুন মানুষ হয়ে ওঠেন। সেই আনন্দ এবার আরো কিছুদিন থাকবে কথা দিয়েছে!

মুকুল জানে, ইচ্ছে হলে আরো অনেকদিন আনন্দকে ধরে রাখতে পারে সে!

কিন্তু সত্যিই কি পারে মুকুল? সংসারে উচিত-অনুচিতের প্রশ্নটা না হয় বাতিল করা গেল। তার এতদিনের অধ্যবসায়ে গড়ে তোলো রুচি, সংযম, শিক্ষাও কি আনন্দের কাছে এসে একাকার হয়ে গেল?

সে যেন পাল্টে যাচ্ছে কেমন। অবশ্য রাতারাতি গোটা একটা মানুষের আমূল পরিবর্তনে মুকুল এখনো বিশ্বাস করে না। হয়তো তলে তলে সে ক্ষয় হচ্ছিল দীর্ঘদিন, মাস মুহূর্তের ছোট-বড় অগণিত সংঘাতের ভেতর দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে প্রায় চুপিসাড়ে। তারপর ধরা যখন পড়ল তখন আর জোড়াতালি দিয়ে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখার, সামলে নেবার উপায় নেই।

'সারাটা বিকেল আনন্দ কেবল ঘর-বার করেছে। কোথায় গিয়েছিলে, মুকুল?'

প্রভার কথা শুনে মনে-মনে আরক্ত হয়ে উঠে মুকুল। জবাব দিতে গিয়ে বিষম খায়। তবু ক্লান্ত চোখে আনন্দকেই খুঁজে বেড়ায়। সঙ্গী তো কেউ নেই। আনন্দকে কাছে পেলে উজ্জ্বল ঠেকে সব। ভেতরে ভেতরে সেই উজ্জ্বলতা অনুভব করে মুকুল। কিন্তু স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। বরং কাছে গেলেই আড়ষ্ট বোধ করে কেমন। সংকোচে, শংকায় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার তাগিদটাই যেন প্রবল হয়ে ওঠে তখন।......

একদিন তারা বেড়াতে যায়।

আর আচম্বিতে ঝড় ওঠে। ছেঁড়া কাগজ, শুকনো পাতা, ধুলোর তাণ্ডব শুরু হয়। বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা পলকে লুপ্ত হয়ে যায় দশদিক। আর মহাকালের জটা থেকে স্বপ্নভঙ্গের মত নেমে আসেন মর্তের মন্দাকিনী। দেখতে দেখতে বাঁধানো সড়ক নদী হয়। প্রবল স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে সবুজ একফালি দ্বীপের কিনারে এসে ঠেকে তারা। আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষার শান্ত, নির্জনতম এ যেন আরেক আশ্রয়। নিকটে কি দূরে মানুষ ছিল না। লোকালয় আরো দূরে। তাই পোশাকী জড়তা কাটিয়ে [illegible]

'ঝড় দিয়ে শুরু হল।'

'বন্যায় শেষ হবে বলছো?'

'যদি হয়?

'কেন হবে? আমরা যদি খাঁটি থাকি হতে দেবো কেন?'

তা ঠিক। সমাজে-সংসারে বাধা-নিষেধের যত বেড়া পরোক্ষে মেয়েরাই তো গড়ে। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ হ'তে চেয়ে পুরুষের দেয়া যত বাঁধন হাসিমুখে হৃদয়ের বাঁধন বলে মেনে নেয়, নিয়েছে চিরকাল। দ্বিধা এলে আবার একদিন মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলে, ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে সব। মেয়েরাই তা ভাঙে। মুকুল তো সেই মেয়েদেরই জাত, তাদেরই একজন। রক্ত যাবে কোথায়? ইচ্ছে হলে গোটা জগৎটাকেই উপড়ে তছনছ করে দিতে পারে। গ্রহণ যে করে বর্জন তার পক্ষেই শোভন, সঙ্গত এবং সম্ভবও। তাছাড়া একটাকে বর্জন করেই তো অন্যটাকে গ্রহণ। নইলে কী নিয়ে থাকে মানুষ, কী নিয়ে থাকে? সাহস আছে, ও পারে। ক্ষেপিয়ে তুললে এখুনি পারে হয়তো। ততখানি তেজ কি আনন্দর আছে? ঠিক ততখানি সাহস যা দিয়ে দীর্ঘদিনের শ্রম আর স্বার্থ, মস্তিষ্ক আর হৃদয় দিয়ে গড়া একটা আকাশচুম্বী মিথ্যের ভিত ভেঙে, গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা যায়?

আপাতত তৃপ্তিবোধ করে আনন্দ। এতদিনে একটা ষোল আনা খাঁটি আর তেজী মেয়ের দেখা পায় তাহলে! সেই বিলিতী রূপকথার নায়িকা প্রকৃত রাজকুমারীর মত! এ-যেন তার জন্ম-জন্মান্তের তিল-তিল সাধনার ফল।

আনন্দ বেপরোয়া। গোটা বাড়ির মালিক যেন সে একা। আর সবাই একান্ত বশম্বদ তার কাছে। এই কথাটাই কি ফলাও করে না হলেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চায় না? পা ভারি হয়ে ওঠে মুকুলের। হঠাৎ বাধো-বাধো ঠেকে কেমন। তা হলে কেন আসা? কার জন্যে অন্ধকার এত উচে উঠে আসা তার? সেই যদি দূরে থাকে, এমন করে পর হয়ে থাকে চিরকাল? প্রভাকে নিয়ে চরম অনিচ্ছা নিয়েই আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন কালিদাস। ঝড়বাদল শুরু না হলে কখন ফিরে আসতেন। এই সুযোগটুকুই তো মনে মনে কামনা করেছে আনন্দ। মুকুলের সায় ছিল। এখন এত দূরে এগিয়ে এসে কিসের দ্বিধা তবে? কার ভয়?

অবাক হবে, বিরক্ত হবে, ক্ষুণ্ন হবে কোথায় তা না। বরং স্বচ্ছন্দে দিগ্বিজয়ীর মত ঘুরে বেড়ায়। এমন সময়ে এ ঘরে মুকুলের উপস্থিতির কথাটা অবধি বেমালুম চেপে গিয়ে সে যেন নির্ভার খুশির আমেজে ভরপুর হয়ে ওঠে।

'আমার এক বন্ধু কী বলে জানো?' দেয়ালে সুইচের গায়ে হাত রাখে আনন্দ।

'কী?' আলো জ্বলে উঠলে মুখ-চোখ আতঙ্কে অন্ধকার হয়ে ওঠে মুকুলের। গভীর বনে বাঘের ছবি দেখতে পায় সে। অন্য দেয়ালে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলা একা। বড় কৃশ, বড় করুণ মনে হয় তাকে। দেখে দুঃখে-মমতায় গলে যেতে চায় মুকুল। একে-একে মা-বাবা, বাড়ি-ঘর, এমনকি পশ্চিমের ছোট্ট শহর-ঘেঁষা সেই শান্ত শীর্ণ নদীটিকে মনে পড়ে। কেন মনে পড়ে তার অর্থ খুঁজে সে পায় না।

'মেয়েরা মাথার ওপরে আকাশ রাখতে নারাজ।'

'তার মানে?'

চমকে ওঠে মুকুল। তন্ময়তা মুহূর্তে খান-খান হয়ে যায়। আনন্দর ঠোঁটের ফাঁকে চোখের কোনায় অদ্ভুত হাসি দেখে বোকার মত চেয়ে থাকে। এখন তার কী যে করণীয় ভেবে না পেয়ে অসহায় বোধ করে মুকুল। দরজা খুলে ছুটে যে নীচে নেমে যাবে তেমন সাহসও আর নেই। অথচ আনন্দকে এখনো অসহ্য ঠেকে না, খারাপ লাগে না তার। কেবল ভাবে, ধরা-ছোঁয়া-নাগালের ভেতরে হয়তো পাওয়া যাবে না কোনোদিন।

'মেয়েরা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে বেড়ায়। আশ্রয়, সুখ, নিরাপত্তা এই সবই চায় আর কি। কল্পনা জিনিসটা বরদাস্ত হয় না। অম্বলের রোগীর কাছে ঝাল-টকের সামিল। আসলে জীবনে নগদ মূল্যটাই তাদের বিচারে চরম। ছোট সুখ, তুচ্ছ স্বার্থ যে প্রেমকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয় সেই সত্য মেনে নেবার মত ধৈর্য কিম্বা মেধা মেয়েদের নেই।'

অত কথা, অমন বাছা-বাছা বুলি কি মুকুলের মত মেয়ের মগজে ঠাঁই পায়? ততখানি তলিয়ে ভাবার, বিচার করে কথা বলার সময় কোথায়? মাথার ভেতরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। বুকের ভেতরে তার আঁচ অনুভব করে। টের পায়, আনন্দ আসলে মেয়েদের ভালোবাসে না, বাসতে চায় না। কেবল কৌতূহল মেটাবার তাগিদে বাজিয়ে দেখে। পরখ করে নিতে চায়, অন্তত মেয়ে হিসেবেই মুকুল কতখানি খাঁটি। হাজার হোক মেয়ে তো। বাংলাদেশ, ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় কেবলমাত্র শ্বাসটুকু সম্বল করে টিকে থাকতে চাওয়া মেয়ে মুকুল। স্বামীকে স্বামী হিসেবে মান্য করে না, দেবতা বানিয়ে মাথায় তুলে রাখতে চায়! পুরোপুরি পাবার আগে আনন্দ কি পরখ করে দেখতে চায় তবে? খাবার আগে চেখে দেখার মত? সাবধানের তো মার নেই। তবু যদি ঠকতেই হয় সান্ত্বনা থাকবে। আফশোস করে কপাল কুটতে হবে না। বিনাবাক্যে মেনে নেবে এই তার ভাগ্য, এই তার নিয়তি। স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও সাধ্য নেই খণ্ডায়। তাছাড়া মেয়ে তো! রঙ বদলাতে ওস্তাদ। সময়ে গিরগিটি অবধি হার মানে। মনে মনে তাই হুঁশিয়ার না হয়ে উপায় আছে আনন্দর?

'তোমার বন্ধু কি কবি, না পাগল?' খোঁচা দিতে মুকুলও জানে। পেট থেকে আসল কথা টেনে বার করতে চেয়ে বলে, 'প্রেমে ব্যর্থ না হলে কি ছেলেরা কবি হয়, পাগল হয় কখনো?'

কথাটা বুঝি মনের মত ঠেকে না। জোর গলায় প্রায় ধমকের সুরে প্রতিবাদ করে আনন্দ!

'কবি হতে যাবে কেন? কোন্ দুঃখে হবে শুনি? কবিতার নাম শুনলেই ব[illegible] অ্যালার্জি হয় বেচারির।'

হাসির দমকে বিষম খাবার উপক্র[illegible] কি নিদারুণ রসের কথাই না শুনিয়ে[illegible] আনন্দ! কোনমতে নিজেকে সামলে নি[illegible] আত্মস্থ হতে চেষ্টা করে মুকুল। আব[illegible] খানিক বাদেই গম্ভীর হতে হয়। কথা বল[illegible] তাগিদে ভাবতে হয়। বোকার মত বেম[illegible] যা খুশি বলা কি যায়? বিশেষ করে এ[illegible] ক্ষেত্রে শাদা-মাটা মুখের কথাও গীত অথ[illegible] কবিতার তুল্য সুন্দর, সুখশ্রাব্য করে তো[illegible] দরকার—যে-কথা মনে ধরে, চোখে [illegible] লাগায়, প্রাণকে পাগল করে ছাড়ে। নিজে[illegible] জীবনে প্রেমের আবির্ভাব আচমকা ন[illegible] হলেও প্রেমে-পড়া আছাড় খাওয়া, ঘুনে ধ[illegible] প্রায় ডজনখানেক বান্ধবীর অভিজ্ঞতা দিয়ে[illegible] মুকুল জানে, বোঝে, টের পায়, প্রেম প[illegible] কি চাট্টিখানি কথা! কেবল যে পড়ে সে[illegible] জানে, কত শত-সহস্র সাধ্য-সাধনা, রা[illegible] অনুরাগের সার্থক, সফল ও সংঘাত[illegible] পরিণতি এই প্রেম! কত ত্যাগ, কত অশ্র[illegible] বিনিময়ে লোকে পায়। অথচ তার ভা[illegible] ঘরে এ হেন বাঞ্ছিতের আবির্ভাব [illegible] নোটিশে হঠাৎ। আজ আনন্দ তার সাম[illegible] দাঁড়িয়ে! সে তার ভালোবাসা, মূর্তিম[illegible] প্রেম! যে-প্রেম দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মত অনশ্বর, সর্বশক্তিমান! যুদ্ধ তো পণ্ডশ্র[illegible] ছাড়া কিছু না। সময় আর শক্তির অপচ[illegible] মাত্র। শুনলে তাকেই দুয়ো দেবে লোকে[illegible] বলবে, কী বোকা! কী বোকা! সবু[illegible] মেওয়া ফলাবার বাসনা তাই নেই। চারে ম[illegible] নিয়ে অহেতুক খেলা খেলবার কদর্য রু[illegible] বরদাস্ত করে না মুকুল। তার বয়স বৈশা[illegible] পঁচিশ হলেও যুবতী না বলার সাহস হ[illegible] না কারো। তবু ভয় হয়। দুঃখের চে[illegible] ভয়টাই বরং বেশী। ভদ্রলোকের পা[illegible] পড়ার মত অবস্থা যদি নাই থাকে [illegible] আফশোস করবে না মুকুল। কিন্তু অপ্রেমে[illegible] ভেতরে বেঁচে থাকার, বুড়িয়ে যাবা[illegible] আতঙ্ক থেকে রেহাই পাবে কেমন করে[illegible] সে তাই ভাবে, মান করা কি সাজে আর[illegible] দূরে দাঁড়িয়ে থাকাটাই কি শোভন? ব[illegible] সন্ধিপত্র হাতে নিয়ে এগিয়ে আসাই সহজ[illegible] সুন্দর, অভিনব পদ্ধতি। সাক্ষী-সাবুদে[illegible] চোখের সামনেই দু'পক্ষ সই করুক, টিপ ছাপ দিক, একজন অন্যজনকে পাকাপাক[illegible] ভাবে স্বীকার করে নিক। যে-কালে যেম[illegible] রীতি, যে-দেশে যেমন আচার। মনে পা[illegible] থাকে না, কালি জমে না কোথাও। আর ক[illegible] চাই?

সকলের আগে তাই বোঝাপড়া[illegible] কাজটুকুই সেরে নিতে হয়। ওইটে দরকার[illegible]

কারণ, নিজে কবি না হয়েও আনন্দ[illegible] হাড়ে-মজ্জায় বিশ্বাস করে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং কবি। ব্রহ্মাণ্ড রচনার আগে তাঁকেও ভাবতে হয়েছে নিশ্চয়ই। কত কল্পসাধনার ফলে তাঁর মানসলোকে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে সৃষ্টির আকার, প্রকার, প্রকৃতি[illegible] কল্পনা কি একা কবির মূলধন? স্থপতির[illegible] নয়? সুতরাং সৃষ্টিকর্তা একাধারে কবি [illegible] স্থপতি। অন্তত মনে-প্রাণে আনন্দ স্বীকার করে কথাটা এবং স্বীকার করে বলেই হয়তো[illegible]

মুকুলের নিখাদ প্রেম, নিভাঁজ টান অথবা অকৃত্রিম অনুরাগের প্রতি তার শ্রদ্ধা সীমাহীন।

'খুব ভড়কে গিয়েছো তো?'

'কেন?'

তার মুখে-চোখে নিদারুণ ভাবালুতার ঘোর। চেয়ে থাকতে থাকতে আনন্দর কলেজে পড়ানো পাকা আর সরেস মাথাটাই বিগড়ে যেতে চায়। খাট থেকে তাই নিচে নেমে আসে। এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে মুকুল যদি অমন করে ভীরুর মত কাঁপে তাহলে পুরুষ হয়ে নিজেকে কোন ভাষায়, কেমন করে সান্ত্বনা জানাবে আনন্দ?

গুলি খাওয়া বাঘের মতই জানলা-দরজাগুলি হাঁ হয়ে ছিল।

একে-একে পাল্লাগুলি ভেজিয়ে দেয়। তারপর পরম নিশ্চিন্তে হাতে হাত রাখে মুকুলের। এখনো প্রাণের কথা বলা বাকি। সময় যে যায়! সময়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা জীবন-যৌবন!

'আর যদি যেতে না দিই?'

'যাবো না।'

'এতো সাহস!'

চোখ কপালে তোলে আনন্দ। মনে-মনে তারিফ করে। যাবতীয় অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে-পুষিয়ে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে মুকুল তাহলে প্রস্তুত? নিছক মিষ্টি কথা শুনে আর শুনিয়ে যাবার তাগিদে এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে এতদূরে এগিয়ে আসে কেউ? এরই মধ্যে ষোল আনা বিশ্বাস করে নিয়েছে তাকে, তার প্রেমকে। মুকুল ধরেই নিয়েছে, আনন্দ তার! একান্তভাবে তারই!

'আমি তো পালিয়ে আসিনি।'

'যদি কেউ দেখতে পায় তবু?'

'দেখুক।' সরাসরি উত্তর দিয়ে নিরস্ত হবার বদলে আরো ঘনিষ্ঠ হল মুকুল। দুহাতে আনন্দকে জড়িয়ে ধরে, বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে বেশ বেপরোয়া ভঙ্গীতে কথা বলে, 'দেখে যাক আমাদের। আমরা আবার কেয়ার করি কাউকে?'

একা নিজের কথা না। আনন্দকে জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আজ বুঝি দুজনের কথাই বলতে চায়। চালাক মেয়ে মুকুল। এখন থেকে আর একা নয় তারা, অভিন্ন।

কিন্তু চালাকিটা হাতে-নাতে ধরে ফেলার আগেই অলক্ষ্যে বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। তীব্র নীল আগুনের হল্কা চোখ ধাঁধিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে কয়েক সেকেণ্ডও লাগে না। অথচ এরই মধ্যে বিপুল বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হয়। গোটা বাড়ি অন্ধকার হয়ে আছে। বাতিগুলি একসঙ্গে বুঝি সড় করে নিবে গেছে হঠাৎ। মুকুল আর দেখে না কিছুই। সে এখন অন্ধ হয়ে গেছে। অস্ফুট চাপা গলায় আর্তনাদ করে ওঠার আগে কীভাবে আরো গভীরতর অন্ধকারের দিকেই ছিটকে সরে যায়। অবশ্য চিরতরে পালিয়ে যাবার কথা ভাবে না।

তারপর ঝড় থেমে গেলে বৃষ্টি শুরু হয়।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ তাই আনমনা যথার্থ কবি কিংবা প্রেমিকের মতই আকাশ দেখে। আকাশে মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুতের অপরূপ লীলা। খাটের ওপরে চুপ-চাপ উঠে আসে মুকুল। এতক্ষণে বুকের ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়। ওপরে-নীচে হুলোস্থুলো ব্যাপার। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে কারা। চতুর্দিকে গেল-গেল রব। আলোর জন্যে মরীয়া সবাই। শুধু কি তারা নয়?

'কাছে এসো।'

মুকুল ডাকে। মৃত্যুর মত গম্ভীর, অকপট সেই আহ্বানে নিঃসাড়, নিঃশব্দ থাকা দায়। অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে আনন্দ এগিয়ে যায়। টেবিলে টানার ভেতরে আধখানা মোমবাতি পড়ে আছে কবে থেকে! মনে পড়ল এখন। প্রয়োজন হলেই তো খোঁজ পড়ে সব কিছুর। যেমন মুকুলকে টেনে এনেছে সে।

বৃষ্টি থেমে গেলে একসময় ধীরে ধীরে মেঘও সরে যায়। বনের আড়ালে অলক্ষ্যে লুকিয়ে থাকা চাঁদ কখন যে গুটি গুটি পায়ে মধ্যগগনে উঠে আসে কেউ জানে না। এখন শিরশির, শিরশির করে হাওয়া বয়। কাছে-দূরে গাছের পাতা, ঘাসের ডগা থরথরিয়ে কাঁপে। আলুথালু চাঁদের আলোর নাচন আর থামে না। জমে থাকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলিই মুক্তোর ফলের মত, চোখের জলের মত মনে হয়। অনেক পাহাড়, অনেক নদীর পথ ভেঙে, ভেজা ঘাসের শয্যাপাতা মাঠের বুকে একবার, দু'বার তারপর অনেকবার গড়িয়ে নিয়ে অলস, মন্থর হাওয়া বুঝি পৃথিবীর ধুলো-মাটি, জল আর যাবতীয় উদ্ভিদের খবর নিয়ে এই ঘরের ভেতরে এসেই হারিয়ে যায়। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলি উড়ছে। মনে পড়ে, তার পঁচিশ বছর বয়স। ফুলদানির ফুলগুলি বড় ম্লান। প্রায় ঝড়ের মতই জীবনে আনন্দের আবির্ভাব। একদিন সে যদি ফিরে যায়। মুকুল শুকিয়ে যাবে। অমন অবহেলা সইতে পারবে না কোনোদিন। কিন্তু প্রভা যে তাই বললেন? বললেন, জীবন বড় কৃপণ, মুকুল! হাত পাতলেই সে কিছু দেবে না।

আচমকা সর-সর শব্দে কেঁপে উঠল, শিউরে উঠল গাছপালা, স্বপ্নময় বনভূমি। একসঙ্গে এক লক্ষ করতালি বাজিয়ে যেন গা ঝাড়া দিয়ে চাঙা হয়ে উঠতে চাইল কারা। রাত-পাখির আর্ত, বিপন্ন কলরব দিগন্ত-বিস্তৃত স্তব্ধতার বুক চিরে উধাও হচ্ছে কোথায়!
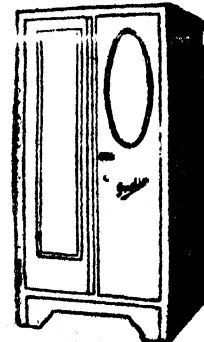
অনেকক্ষণ জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ঠাণ্ডা লোহার গরাদে গাল চেপে একমনে ভাবছিল, অনতিদূর ভবিষ্যৎ আর অতিদূর অতীতের মাঝখানে বড় একা। আনন্দকে নিবিড় করে পাবার আগেই সে বুঝি দিগন্তের মত দূরে, সুদূরে হয়ে যাবে।

বাতি নিবিয়ে অনেকক্ষণ বিছানার ওপরে চুপ-চাপ বসে থাকে। বাইরে বিপুল জ্যোৎস্নার ভেতরে বনের সশব্দ শিহরন অনুভব করে কষ্ট হয়। সে যেন দীর্ঘকাল জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আচ্ছন্ন দৃষ্টির ভেতরে এই ঘর, দেয়াল, আসবাব এবং প্রায়ান্ধকার প্রতিটি ভাবনাই অপরিচয় অথবা অর্ধপরিচয়ের ব্যবধানে দুস্তর, করুণ, শব্দহীন অথচ চঞ্চল মনে হয়। যেন এই আছে এই নেই, এমনি সবাই। বিদ্যুচ্চমকের মতই অতীত, অবর্তমানতা, আনন্দিত মুখচ্ছবি অথবা বিধুর কোনো মুখরতা, সূর্যাস্তে কিংবা সকালে দেখা উড়ন্ত বকের পাতিতকে আপাতবিষন্ন আবার তোলপাড় করে।

'মুকুল, মুকুল! আমি এসেছি!'

বিছানা ছেড়ে মুকুল আবার জানলার কাছে এগিয়ে যায়। তার বুকের ভেতরে মৃদু, চঞ্চল অথচ নিঃশব্দ পদপাত। রক্তের ভেতরে কার আগমনী, দুরন্ত আহ্বান তাকে মোহিত, বিভ্রান্ত করে। চোখে-মুখে-চুলে আদর করে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে বাতাস যেন তাকে অশান্ত হতে বারণ করে দিলে। এই তো সময়। এখন কি অমন করে ব্যাকুল হওয়া সাজে? মুকুল তাই স্থির, ধীর, মৌন হতে চেয়ে মনে-মনে নিজেকে চোখ রাঙায়, শাসন করে। বুকের ভেতরে দুরু-দুরু কাঁপুনি তবু থামে না। বনের লতাপাতা আঁকা হাল্কা সবুজ রঙের পর্দাটা দুহাতে সরিয়ে মুকুল বাইরে চোখ রাখে। জানলার নিচে বাগান। বৃষ্টিভেজা যুঁইফুলের গন্ধে বাতাস ঈষৎ ভারি তবু রমণীয় মনে হয়। জায়গাটা মুকুলের কাছে হঠাৎ বড় চেনা ঠেকে। এই সেই পশ্চিমের শহরঘেঁষা ছোট্ট কাঠের বাড়ি। তার শৈশবের শখের বাগিচা।

কলা ফুলের ঝাড়গুলি আলো করে রেখেছে অসংখ্য লাল আর হলুদ রঙের পাপড়ি। রোজকার সেই পাপিয়াটাই পেয়ারার ডালে বসে গলা ফাটিয়ে ডাকছে।

'মুকুল, ফিরে আয়।'

'ফিরে এসো মুকুল। ওই পাখি কোনোদিন ধরা দেবে না মনে রেখো।'

'গাছে চড়ার বয়স তোমার নেই আর। নিন্দে করবে লোকে।'

দোলনার ছায়াটা বড় স্থির। দিন-মাস-বছরের হাতে-হাতে রোদ্দুরে পুড়ে-পুড়ে আবার বর্ষায় ভিজে-ভিজে দাঁড়গুলি কোনোমতে টিকে আছে মাত্র। এখন বসতে গেলেই ছিঁড়ে যাবে। দুলতে চাইলেই হাত-পা ভেঙে স্বর্গে চলে যেতে হবে। তবু মুকুলের ভারি সাধ হয়, বড় আহ্লাদ হয় এইসব অতিপরিচিত প্রায় আত্মীয়ের মত ফুল, পাখি, বৃক্ষ এবং দোলনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সর্বকিছুই ছায়াবিহীন আর একা মনে হল মুকুলের। একা এবং নিরুত্তাপ। অথচ চরম বিষণ্ণ, চরম সুখী কেউ নয়। বরং এইটেই স্বাভাবিক। এই পরিণামহীন, নিরালম্ব অবস্থান। এই ছবিবিহীন, নিঃশব্দ শীতলতা।

মুকুল আরো এগিয়ে গেল। সায়েবদের গলফ্ খেলার মাঠ পেরিয়ে সেই দীর্ঘ, শীর্ণ, খরস্রোতা নদীটির দেখা পেল—বৈশাখ মাসেও যার হাঁটুজল থাকে! বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি! পথে-ঘাটে তাই এত পাঁক। বাড়িগুলির গা-বেয়ে শাদা ধোঁয়া ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যাচ্ছে সব। মুকুল তবু পথ চিনে-চিনে নদীর কাছে গেল। নদীর বুকে ঘোলাটে জলের ঢল দেখে আজ আর ভয় করে না তার। কারণ জলের ওপরে স্থির, ভাসমান হাসপাতালের তিনখানা খাট আর শুভ্র শয্যা দেখে লোভ সামলাতে পারে না। মাকে নিঃসাড় পড়ে থাকতে দেখে মুকুল আদ্যোপান্ত ভাবতে চেষ্টা করে সব। কেমন করে এত দীর্ঘ, বাঁকা, জটিল পথ ঘুরে-ঘুরে অবশেষে প্রায় আচমকা এখানে পৌঁছে গেছে সেই কথাই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভাবতে গিয়ে অন্য খাটে আপাদমস্তক শাদা চাদরে মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা বাবার দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল মুকুল। ধীরে ধীরে জল-কাদা ভেঙে লক্ষ্মী মেয়েটির মত বাবা আর মায়ের মাঝখানে বহু যত্নে পাতা শূন্য বিছানায় উঠে বসে। যেন বাবা কিংবা মা কেউ না টের পায় কোথায়, কতদূরে, কেমন করে চলে গিয়েছিল সে। আবার কেমন করে চুপি-চুপি ফিরে এল।

সাড়া পেয়ে মুখের চাদর সরিয়ে নিষ্পলক চেয়ে থাকে বাবা।

মা বুঝি টের পায়। তার গলায় মালার মত ফাঁসির দাগ। পাশ ফিরে সে তাদের দুজনকেই দেখে। তার মুখ করুণ এবং বীভৎস। মায়ের চোখে জল।

মুকুলের ইচ্ছে হল, সে মায়ের খাটে চলে যাবে। কোলে মুখ গুঁজে চুপ-চাপ পড়ে থাকবে।

কিন্তু তার আগেই নৌকোর মত বাবার খাট আর বিছানা ভাসতে ভাসতে নদীর ওপাড়ে চলে যায়। পাহাড়ের নীচে একটা বিন্দুর মত মিলিয়ে যেতে থাকে। আর তখন পাহাড়ের চূড়োয় মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। আর খাট-পালঙ্ক বিছানা-সমেত মা যেন জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট অভিমান।

ইচ্ছে হল ডুকরে কেঁদে ওঠে মুকুল। তার আগেই আনন্দ তাকে ডাকে। হাত ধরে বলে, 'এসো।'

আবার তারা বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

দোলনায় বসিয়ে, তাকে দুলিয়ে দিয়ে হাততালির শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে আনন্দ। জ্যোৎস্নার ভেতরে তার মুখে-চোখে স্বর্গীয় আভা ফুটে ওঠে। দেখে বিস্মিত, বিহ্বল মুকুল ভাবে, আমি তো ঘরের ভেতরে বিছানায় শুয়ে পড়েছি কখন! কতদিন ঘুমিয়ে আছি মনে নেই। তাহলে আনন্দ কোথা দিয়ে, কেমন করে এল? দরজা বন্ধ ছিল জানি। জানলাটা খোলা ছিল ঠিক। কিন্তু গরাদের বাইরে আমি কী করে এলাম! এইসব কথাই ভাবতে ভাবতে তার ভয় হল। সে নিজের ছায়া খুঁজে পেতে চেয়ে ডাইনে-বাঁয়ে চতুর্দিকে তাকাল। তারপর চীৎকার করে উঠল, 'আনন্দ। আনন্দ!'......

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল মুকুল। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। এখনো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। ভয়ার্ত চোখে সে একবার ঘর-দোর, জানালা-দেয়াল এবং প্রতিটি আসবাব দেখে নেয়। যে-যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থির, নিশ্চল। ফুলদানির ফুল, ক্যালেন্ডারের পাতা, টেবিলে বুদ্ধের মূর্তি সব আছে, সব। একটুও নড়চড় হয়নি। ছিঁড়ে-খুঁড়ে উধাও হয়নি কিছুই। এমন কি সে নিজে যথাস্থানে শয়ান।

অল্প শীত করছিল। গা থেকে চাদর সরে গিয়েছিল। কোমর থেকে সর্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে নিতে গিয়ে জানলায় চোখ রাখল মুকুল। চাঁদ ডুবে গেছে কখন। বাইরে গাছ-গাছালির মাথা থেকে একটু একটু করে অন্ধকার সরে গিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ হচ্ছে সব। ভোর হচ্ছে। জানলার পর্দাটা তির-তির করে কাঁপছে। স্বপ্নে দেখা সেই বনের লতা-পাতা আঁকা ঘন সবুজ পর্দাটা কোথায়! আকাশী রঙের নেটের গায়ে চোখ বুলিয়ে দৃষ্টি ক্রমশ স্নিগ্ধ, শীতল হয়ে আসে। মনের ভার ধীরে ধীরে লাঘব হয়ে আসে মুকুলের।

আরো অনেকক্ষণ নিশ্চেতন বিছানায় পড়ে থাকে। বোজা চোখের পাতার ওপরে কখন যেন রেশমের মত নরম, কোমল এবং উষ্ণ হাত রাখে রোদ্দুর। মুকুল চোখ মেলে চেয়ে দেখে আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর-দোর সারাটা সংসার। অবাধ্য জনস্রোতে মুখর পথ-ঘাট। রিক্সার ঘণ্টি, টমটমের হাঁক, মোটরের ভেঁপু, ফেরিঅলার চীৎকার সব মিলিয়ে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

দরজা খুলে বাইরে গেল মুকুল। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে বাগান দেখল। দেয়ালের গায়ে দীর্ঘ ছায়া সব। আনত, অকম্প্র প্রতিটি গাছ। ইউক্যালিপটাসের সজল, সৌরভে আবহাওয়া বিষণ্ণ, আতুর। আকাশে মেঘ নেই। রাস্তায়, মাঠের ওপারে, গাছ-বাড়ি, গির্জার ত্রিশূলে রোদ যেন প্রসন্ন, উদার। অপরাজিতার পাপড়ির মত আকাশ গভীর নীল। দূরে পাখি ডাকে। আর মুকুলের মনে হল, যে যেন দীর্ঘদিন ঘরছাড়া। আকাশের দিকে চেয়ে মন কেমন করে। মস্ত বড় নীলের বাটি থেকে রোদ যেন উতলে, উপচে পড়ছে নীচে—পৃথিবীর মাঠে-ঘাটে, গাছ-গাছালির মাথায়, বাড়ি-ঘরের ছাদে, আলিসায় সর্বত্র। অথচ অনেক রাত অবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এখন মাঠের ঘাস ঘন সবুজ। যেন আকাশের পটে আঁকা বন-পাহাড়, দূরবর্তী সৌধ সকল। বাতাসে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। যেন সব তৃষ্ণা জুড়িয়ে যায়। বুকের ভেতরে হিম হয়ে আসে।

মুকুল তবু খুঁজে বেড়ায়। আঁতি-পাতি করে দেখে সব। পাঁচিল ঘেঁষা কলা ফুলের ঝাড়টা আছে ঠিক। পেয়ারা গাছ কিম্বা দোলনার চিহ্ন নেই কোথাও। যেন ছিল, এখানেই ছিল তারা। মিথ্যে ভেবে উড়িয়ে দিতে তাই পারে না। যা দেখেছে, যাদের দেখেছে সারারাত তারাই এখন অন্য-নামে, অন্যবেশে লুকিয়ে আছে কোথাও। খুঁজলে মুকুল কি আর কাউকে পাবে না কোনদিন?

আনন্দকে মনে পড়ে। বড় বেশী মনে পড়ে তার। এখানে দল বেঁধে বেড়াতে আসার আগে একদিন পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় চোখে চোখ রেখে প্রায় স্বপ্নের মত অনুচ্চার কণ্ঠে বলেছিল, 'এই চাঁদ আমার অসহ্য মুকুল। জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আমি বেশীক্ষণ মুগ্ধ হতে পারি নে। এক সময় আত্মহত্যার বাসনা আমাকে পাগল করে তোলে।'

কথা শুনে মুকুলের মুখ ভেজা পাতার মত বিষণ্ণ হয়ে গেল। কথা বলার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেলে সে তখন বোবার মত চেয়ে থাকে। সংসারে একে-একে সবাই ছেড়ে যাবে তাকে। গোপন অথবা প্রকাশ্য পথে পলায়ন করবে সবাই। তার মা আত্মহননের মুক্তি পেতে চেয়েছিল। তার বাবা আত্ম-নিপীড়নে। হয়ত আনন্দও পালিয়ে যাবে কোথাও। কবে, তা কেউ জানবে না।

'আনন্দ, আমি যে বাঁচতে চাই!'

'তা কি আর জানি নে, মুকুল।'

'তবে যে হারিয়ে যেতে চাও?'

'মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয় অনেক উঁচুতে শূন্যের শিখরে দাঁড়িয়ে আমি এই আকাশ-মেখলা সংসারের শোভা দেখি। ঘন সবুজ দ্রাক্ষাকুঞ্জে রোদ্দের ঘোরা-ফেরা, দিগন্ত-বিস্তৃত ফসলের ক্ষেতে হাওয়ার হুল্লোড়, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া সূর্যাস্তের তির্যক ভঙ্গিমা, ঘর-মুখো দিনের রাখাল আর ঝর্ণার জলে এক লক্ষ ডুবুরি চাঁদ—অনেক-অনেক উঁচু থেকে আমার এই সব দেখার সাধ হয়।' দীর্ঘশ্বাসে বাতাস কাঁপিয়ে সে যেন ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে মিলিয়ে যেতে থাকে।

'আনন্দ, আমি জেগে থেকে সব কিছু

দেখতে চাই। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নয়।' মুকুল আর্তনাদ করে ওঠে।

'আমিও তাই চাই।' সান্ত্বনার মত আনন্দের গলাও অদ্ভুত সুরেলা শোনায়।

'তবে এসব কথা কী শুনি, আনন্দ।'

'প্রাণের কথা থাকবে না আমার? একান্ত গোপন কিছু কথা? যে-কথা আর কারো নয়, কারো জন্যে নয়, শুধু আমার?'

'থাক।' মুকুলকে আহত, ক্লান্ত মনে হল তখন।

'তুমিও থাকবে মুকুল। যেখানেই যাই গোপন কথার মতই তুমি আমার প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে চিরদিন।'

তারপরেই হাওয়ার লোভে তারা এই পাহাড়ে চলে এল সবাই। কালিদাস, প্রভা, মুকুল এবং আনন্দ। কালিদাসের বন্ধুর এই বাড়ি। আজ আর তিনি নেই। মালীই দেখে সব। পুকুর, বাড়ি, বাগান মায় আস্তাবলের বুড়ো কালো ঘোড়াটা অবধি! দুদিন ঘোড়ায় চেপে শহর ঘুরে এসেছে আনন্দ। মুকুলের জন্যে গাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে। প্রভা আর কালিদাসও একদিন দেখে-শুনে এসেছেন সব। কেবল মুকুলের দেখা শেষ হয় না। আনন্দের তৃষ্ণা মেটে না কিছুতেই।

গেটের দরজাটা খোলা। ভেজা লাল সুরকির ওপরে ক্ষত চিহ্নের মত গাড়ির চাকার দাগ কি গভীর। দীর্ঘ, সমান্তরাল রেখা যেন দূরে শূন্যে মিলিয়ে গেছে কবে! হয়তো সারারাত দরজাটা এমনি খোলাই ছিল। যে গেছে সে আর ফেরে নি। হয়তো ফিরবে না কোনদিন! গোলাপের গাছ-গুলি মাড়িয়ে, রজনীগন্ধার সতেজ, সবুজ ডাঁটাগুলি গরু নয়তো ছাগলে মুড়িয়ে রেখে গেছে কখন। দেখে বিশ্রী লাগে। অথচ এই বাড়ি-ঘর-বাগানের ওপরে মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ, এ বাড়ির মালিক সে নয়। কালিদাসও না। একদিন তারা চলে যাবে। আজ কিম্বা কাল। হয়তো ভুলেও যাবে সব। আনন্দ, বিষাদ এবং আবেগের চিহ্নগুলিই স্মৃতি থেকে ধীরে-ধীরে লুপ্ত হবে, সুদূরে হয়ে যাবে একদিন। তবু মায়া হয়, অপাতত দুঃখ হয় মুকুলের। এত সাধের বাগান ফেলে একজন যুদ্ধে চলে যায়। ফিরে আর আসে না। কার দুঃখে, কিসের অভাবে? হয়তো আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল। তাই যত্নের অভাব ছিল না, আদরের ত্রুটি ছিল না কোথাও। কিন্তু কিছুই যে ভোগে আসে না, কাজে লাগে না মানুষের! নইলে কোথায় গেল মায়া আর তার আলোকে লালিত অজস্র জীবন? পিপীলিকার আহার হল সব।

'এই হয়, বুঝলে মুকুল, এই হয়! অল্প বুদ্ধি আমাদের, তাই বড়াই করি। ভাবি, চিরদিন এই সব আগলে বসে থাকব। কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দেব না। কিন্তু ভুল করেও মানুষ যদি একবার ভাবতো, গোটা দুনিয়ার মালিকানা পেলেও আসল মালিকের ডাকে একদিন মাটির ঢেলার মত এই সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে হবে তাকে! তাহলে মানুষে-মানুষে হানাহানি আর হত না। বাদ-বিসম্বাদের আশঙ্কা থাকত না কোথাও। কেউ কাউকে আপন ভেবে আঁকড়ে ধরতে চাইতো না, আবার পর ভেবে দূরে ঠেলেও দিত না।'

ওপরে-নীচে ঘর-দোর-বারান্দা খুঁজে-খুঁজে মুকুল আবার ফিরে আসে। তাকে ক্লান্ত মনে হয়। মুখে-চোখে আতঙ্কের ছাপ।

'সুদাস।'

সুদাস মালির নাম। এই বিপুল নির্জনতার একমাত্র রক্ষক। হয়তো এখনো আশা তার, একদিন যুদ্ধ জয় করে তার মনিব এখানে ফিরে আসবে। কালান্তরের খবর তো সে রাখে না। হয়তো রাখতে চায় না ভয়ে। যদি তার মালিক সত্যি-সত্যি না ফেরে।

হাতের কাজ ফেলে সুদাস এসে সামনে দাঁড়ায়। চোখে সে দেখে অল্প। বয়সের ভারে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে মনে হয়।

'কে গেল, সুদাস?'

মাটির ওপরে চাকার দাগ দেখায় মুকুল। দিগন্তে বিলীন দীর্ঘ, ঋজু, সমান্তরাল রেখা। পিঠ বাঁকিয়ে নীচু হয়ে চোখের পাতা কুঁচকে আরো ছোট করে সুদাস যেন হারানো পয়সা খুঁজে বেড়ায়। সে আর বেশী দিন নেই! মুকুলের মনে হল। অনেকেরই মনে হয়। সুদাস বলে, 'অনেকেই তো আসে আবার চলে যায়! আমি কার, কতটুকু খবর আর রাখতে পারি?'

'আমি যে আনন্দকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে কোথায়?'

সুদাস তার চোখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবে। শেষে কাঁপাগলায় ধীরে-ধীরে বলে, 'বলা বারণ।'

'কার?' চমকে ওঠে মুকুল।

'কর্তার।' সুদাস মুখ কালো করে গম্ভীর হয়ে যায়।

কালিদাসকে পিঠে নিয়ে সুদাসের ঘোড়া তখন ফিরে আসে। সরাসরি বাড়ির পেছনে চলে যায়। যেন মুকুলকে দেখেও দেখেন না কালিদাস। তাঁকে অন্যদিনের চেয়ে হাল্কা, প্রফুল্ল মনে হয়। কিন্তু নতুন তো নয়। রোজই যান। সকালবেলা ঘোড়ার পিঠে চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়ে যান কালিদাস। অন্যদিন তাঁকে ক্লান্ত মনে হয়। বিষণ্ণ, চিন্তিত মুখে তিনি ফেরেন। আজকের মত মুকুল যেন এমন করে কোনদিন দেখেনি তাঁকে। এত উজ্জ্বল, আরক্ত এবং অচঞ্চল। খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন কি? গাড়ি চালাবার সময় যেমন দিশে হারিয়ে যায় ঠিক তেমনি? আজ তাঁকে একটুও বয়স্ক মনে হয় না। বরং উচ্ছল তারুণ্যে তিনি ভরপুর। যে-কোন তরুণের ঈর্ষার ইন্ধন হতে পারেন। মনে-মনে প্রমাদ গণে মুকুল। বিভ্রান্ত, বিচলিত বোধ করে।

কালিদাস চলে গেলে মুকুল আবার প্রভার কথা ভাবে। সকালবেলা তিনি যেন গল্প করতেই এসেছিলেন। তাঁর সব কথাই মনে পড়ে। তিনিও যে মুকুলের মতই ভেঙে পড়বেন, হতাশার সুরে কথা বলবেন সে তা ভাবে নি। তাকে রুষ্ট, বিরক্ত হয়েছিল। এবং বিষণ্ণ, আতুর। সাড়া দেয় নি মুকুল। আনন্দের জন্যে সে বড় ব্যাকুল। অথচ কাল আনন্দ কিছুই বলে নি তাকে। যাবার সময় একবার দেখা দেবার কথাটাও কি মনে পড়ে না? ভেতরে-ভেতরে জ্বলতে থাকে মুকুল। রাগে লাল হতে থাকে। কিন্তু রাগ কাকে? কিসের ওপরে অভিমান? অনেকক্ষণ চুপচাপ ঘুরে বেড়াবার পর হঠাৎ ইচ্ছে হয় বেরিয়ে যাবে কোথাও। কিন্তু কোথায় যাবে? আনন্দকে খুঁজে বার করে তাঁর স্বপ্নের কথা বলবে না? সে হয়তো এখনো ঘুমিয়ে। মুকুল আর একবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

'তুমি আনন্দকে খুঁজতে বেরিয়েছো, আমি তা জানি।'

চমকে ওঠে মুকুল। প্রভার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে। তিনি গম্ভীর। আশঙ্কায় আর অভিমানে থম-থমে। না জানি কী গভীর দুঃখকেই মনে-মনে বয়ে বেড়াতে হয় তাঁকে। কিসের অভাব তাঁর? কোথায় বেদনা? তিনি তো জানেন, সুশোভন কোনদিন ফিরবে না? তাছাড়া শোকের পরমায়ু কতটুকু? হোক না আপন, একান্ত নিকট। অদর্শনে সবই তো সুদূর। তবে কি আনন্দকে নিয়েই যত আশা আজ? মুকুল জানে না। ভাবতে পারে না আর। অবুঝের মত এমন মানুষকে এড়িয়ে চলে আনন্দ? না বলে পালিয়ে যায়?

হঠাৎ আত্মবিহ্বলের মতই চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে মুকুল। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে প্রভাকে।'

'মা গো, মা! তাকে যে আমার চাই। তাকে ছাড়া আমি যে বাঁচি নে।'

'আমি তা জানি।'

সস্নেহে মুকুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন প্রভা। সান্ত্বনার সুরে বলেন, 'অমন আশা করতে নেই মুকুল। তাহলে যে ঠকতে হয়। আশার নামই যে দুঃখ। তুমি কি ভুলে গেলে সব?'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তিনি মুকুলকে অবধি কাঁপিয়ে তোলেন। খাপছাড়া, রহস্যময় ঠেকে সব। তবু অন্তরঙ্গ মনে হয় তাঁকেই। তিনি যেন সব কথাই জানেন। সবকিছুই দেখতে পান। কেবল মুখ ফুটে বলতে চান না কিছুই। কী লাভ? অযথা আঘাত করা বই তো নয়। মুকুল তাঁকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল।

'আঘাত সইতে পারবে তো মুকুল?'

মুকুলের মাথায় হাত রাখলেন প্রভা। বললেন, 'আনন্দ তোমার ভাই!'

'শুনেছো সব?'

কালিদাসের কণ্ঠ ম্লানি। তাঁকে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মনে হয়।

'শুনেছি।'

মুকুল ধীরে-ধীরে তাঁর কাছে সরে এল। মুখোমুখি চেয়ারে বসার সাধ্য যেন নেই।

'আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, সময় এলে সব কথাই তোমাকে জানাব। নিজে তা পারি নি। তাই প্রভার শরণ নিতে হল। তার কাছেও তো অপরাধের সীমা ছিল না আমার। সারাটা জীবন শুধু বঞ্চনাই করেছি। ঘৃণা ছাড়া উপহার কিছু দিই নি তাকে। অথচ তার বিনিময়ে আমি চেয়েছি

প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। তাই কি হয়। দেহ ছাড়া প্রভা তাই কিছুই দেয় নি আমাকে। সব কিছু জেনে-শুনে সে যে আমাকে সহ্য করেছে চিরদিন তাতেই আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল।'

কালিদাস চুপ করলেন। বাইরে শরতের উজ্জ্বল আকাশ। পাখির ডাকে নিবিড় মনে হয়। একান্ত নির্জন, নিঃসঙ্গ দুপুর। অন্য-দিন তিনি ঘুমিয়ে কাটান। আর মুকুল, একলা বই পড়ে। কাছে থাকলে আনন্দের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেয়। টের পায় না, কখন দুপুর ফুরিয়ে বিকেল; আবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে।

'আমরা কেউ-ই সুখী হতে পারি নি মুকুল। হাতের মুঠোয় পয়সা রেখে যেন ঘরে-বাইরে সর্বত্র সেই পয়সার খোঁজ করেছি। ভুলেও ভাবি নি যা খুঁজেছি আমাদের মুঠোর ভেতরেই তা রয়ে গেছে। ভুলটা যখন ধরা পড়ল তখন আর করার কিছু নেই। সুখের পসরা নিয়ে জীবন তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। আর যে কোন দিন নাগাল পাবো তেমন ভরসা নেই।'

'আপনার মনে কি খেদ আছে? কোন অনুশোচনা?'

শুনে প্রথমে তিনি হাসলেন। তারপর বিষণ্ণ, গম্ভীর হতে চাইলেন। উদাস চোখে জানলার ওপারে গাছ আর আকাশ দেখতে দেখতে বলেন, 'রক্তের তেজ আর নেই। এখন অনুশোচনা হবে বৈকি মা। না হলে যে মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে যাবো। আর যার কাছে যেমন করেই নিজেকে লুকিয়ে রাখি না কেন, নিজের কাছে তো ফাঁকি চলবে না। ভেতরের মানুষটির কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। সে যে বিবেক। তার বিচারে আমি যে ক্ষমার অযোগ্য।'

'তাহলে?'

এবার মুকুল মুখোমুখি চেয়ারে বসে। সরাসরি মুখের দিকে তাকায়। তার চোখে ভয় নেই, লজ্জা নেই। ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান কিছু না। সে এখন অবিচল। যেন সমস্ত কথা শুনবে বলেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

'তাহলে সব কথাই তোমাকে শুনতে হয়।'

দ্বিধা কি তবু ঘোচে? কেশে গলা সাফ করে নিতে হয়। তারপর ধীর, মন্থর গলায় আবৃত্তির মত বলে যান, 'লতিকার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আর হৃষিকেশের বিবাগী হওয়ার মূলেও ছিলাম আমিই।'

'আমি শুনেছি।'

একটুকু করুণ কোমল মনে হল না তাকে। বরং রুক্ষ, কঠিন, কর্কশ শোনাল গলা।

থমকে গেলেন কালিদাস। মুকুলের অবিচল ভাব, ভঙ্গী লক্ষ্য করে তিনি যেন অস্বস্তিবোধ করেন। ভাবেন, সব কথা কি বলা যায়? মুকুল কি সহ্য করতে পারবে সব? শোনা হয়ে গেলে তাঁকে নীচ, অপদার্থ ভেবে চিরদিনের মত এড়িয়ে যেতে চাইবে না? ঘৃণায় তাঁর মুখের ওপরেই হয়ত থুথু ছিটিয়ে দেবে তখন। জেনে-শুনে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইবে না আর। তিনি নিজে যদি মুকুল হতেন? একবার মুকুলের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনা-গুলিই আগাগোড়া তলিয়ে ভেবে নিতে চাইলেন। বাস্তবিক, ক্ষমার অযোগ্য তিনি। ভাবাবেগে তিনি যেন সহসা কানায়-কানায় ভরে ওঠেন। নিজেকে নয়, মুকুলকেই মনে হল যথার্থ সৎ, স্বাভাবিক এবং সহজ। যার বিচারে অস্পষ্টতা নেই, পক্ষপাত নেই। হৃদয়ের, আবেগের আকর্ষণে সে কেবল নিছক নুয়ে পড়ে না। স্বচ্ছ সতা দৃষ্টি নিয়ে পিঠটান করে উঠেও দাঁড়ায়। ভাল-মন্দের সবটুকুই বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখতে চায়।

'তুমি কি আনন্দকে এখনো দেখতে চাও মুকুল?'

'না।'

বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। মুকুল তবু প্রাণপণে আত্মস্থ হতেই চেষ্টা করে। শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। সংযমে, শাসনে নিজেকে শান্ত, শীতল করে রাখার সমস্ত কৌশলই যে তার জানা! দেখে-শুনে কালিদাস অভিভূত হয়ে যান। গাম্ভীর্যের বেশ-বাস যেন একে-একে অজান্তে খুলে পড়ে। সহসা শিশুর মতই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক হতে চেয়ে তিনি কেমন ব্যাকুল, অস্থির দাপাদাপি শুরু করেন। বাইরে থেকে দেখেও মুকুল যেন আভাসে টের পায়। কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে বিরত করার কথা আর ভাবে না। কারণ আজ তার জানা দরকার, সে কে! কোথা থেকে কেমন করে এই পৃথিবীতে আসা তার! একমাত্র কালিদাসই যে জানেন সব। জীবনের যা কিছু গোপনতা, যত কিছু পাপ,—যেন তাঁর কাছেই গচ্ছিত রেখে একে-একে বিদায় নিয়েছেন লতিকা আর হৃষিকেশ। প্রভা আপন দুঃখকে বুকে নিয়ে সংসারের এক কোণে নির্জীবের মত দিনাতিপাত করে চলেছেন। তাঁর পক্ষে কি আর জানা সম্ভব, জীবনে কত ঢেউ, কত আবর্ত? কী দুঃসহ জটিল জালে অন্ধকার জড়িয়ে রেখেছে সমস্ত দেহ-মন?

'হাওয়া বদলের প্রয়োজন হয়েছিল আমার। তাই সদ্য-পাওয়া চাকরি থেকেও ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম তোমায়। শান্তি পাচ্ছিলাম না ওখানে। অপরাধের বোঝা দিন-দিন দুর্বহ হচ্ছিল কেবল। তাই একান্তে অপরিচয়ের মাঝখানে এসে বুক-ভরে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসেও দেখি স্বস্তি নেই। আনন্দ আর তোমার অমন অবাধ মেলা-মেশাই যেন দ্বিগুণ করে ক্ষেপিয়ে তুলল আমাকে। স্থির হয়ে থাকা তাই অসম্ভব মনে হল। রাতারাতি সমস্ত গোপন কথা শুনিয়ে আনন্দকে চিরদিনের মত নির্বাসনেই পাঠিয়েছি। এ-জীবনে সে হয়তো আর কোন দিন আমার মুখ দেখতে চাইবে না। অথচ হৃষিকেশকে কথা দিয়েছিলাম, আনন্দের সব ভার আমার। বেঁচে থাকলে আজ আঘাত পেত সে। কিন্তু মুখ বুজে সহাস্যে সহ্য করে নিত সব। তার স্বভাব যে আমার জানা। হয়তো আনন্দের হাত ধরে অন্য কোথাও চলে যেত। তাই বলে তোমাকেও ঠেলে ফেলতে না কোনদিন। এইখানেই তার কাছে আমি এখনো ছোট হয়ে আছি। অন্যায় আমার করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি সব। পেলে গোটা পৃথিবীটাকেই আত্মসাৎ করতে চেয়েছি। কিন্তু তাকে গ্রহণ করার সেই ধৈর্য, সেই শক্তি, সেই উদারতা আমার কোথায়?'

অপলক চেয়ে থাকে মুকুল। জবাব দেবার বিন্দুমাত্র প্রেরণা যেন নেই। অসহনীয় ধৈর্যের অবিচল মূর্তির মতই চুপচাপ বসে থাকে। তাঁর কথাকে, কথার প্রতিটি শব্দকেই যেন জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। শুনতে-শুনতে আজ আবার অনেক কথা মনে পড়ে তার। বাবা-মায়ের অজস্র বাদ-বিসম্বাদের টুকরো ঘটনাই চোখের সামনে উজ্জ্বল, প্রখর হয়ে ওঠে। কিন্তু কাউকেই হীন, কদর্য ভাবা যাচ্ছে না। ছোট কিম্বা বড় ভেবে দুজনকে দুদিকে সরিয়ে পৃথক করা যাচ্ছে না। মুকুল তাই অস্বস্তিবোধ করে। অতৃপ্তির ভেতরে অকারণ ছটফট করে শুধু হৃদয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

রকমারী পছন্দসই

১২৫ টাকা থেকে শুরু মূল্যের রেডিও এবং ট্রানজিস্টর
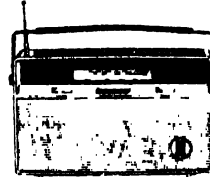
মডেল টি বি ০৮১৬
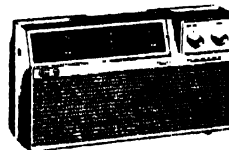
মডেল টি বি ০৫৮১

মডেল টি বি ০৫৭৯
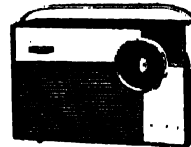
মডেল টি বি ০৫০৯

মডেল টিএ/টি ইউ ০৭৭৭
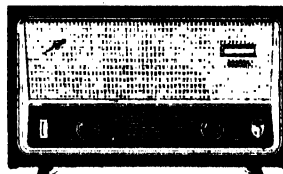
মডেল টিএ ০৯২৬
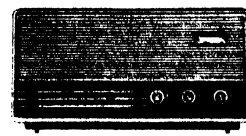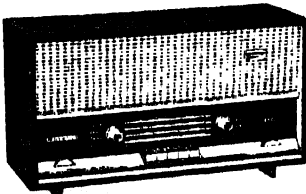
মডেল টিএ/টিইউ ০২০২

মডেল টিএ/টিইউ ০৭৭৬
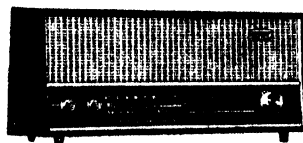
মডেল টিএ/টিইউ ০৮২৪
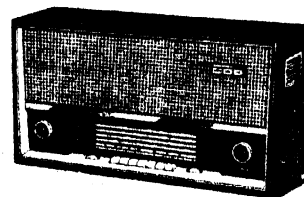
মডেল টিএ ০৩৬৬

আজই আপনার বন্ধু মারফি বিক্রেতার কাছে রেঞ্জটি দেখুন।

murphy মারফি গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!

Murphy sets the standard

NAS 61424

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	[মফস্বল]
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ ... ষষ্ঠ সংখ্যা
১ম খণ্ড

Friday, 9th June 1967. শুক্রবার ... Paise

সূচীপত্র

॥ ছুটি ছবি প্রসঙ্গে ॥

বস্তাপচা কাহিনীর ন্যাক্কারজনক চিত্ররূপ দেখতে দেখতে যখন ভাবনাচিন্তা আর আবেগ অনুভূতির তন্ত্রীগুলো ঝিমিয়ে পড়ে, যখন বাঙলা ছবির (হিন্দির কোন প্রশ্নই নেই) প্রযোজক পরিচালকদের ওপর রাগে দুঃখে অভিমানে "সত্যজিৎ রায় আর তপন সিংহের ছবি ছাড়া আর বাঙলা ছবি দেখব না" বলে পণ করে বসি তখন 'ছুটি'র মত ছবি সব অভিমান সব অভিযোগ ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, ক্ষতি কি 'ছুটি'র মত ছবি সারা বছরে অন্তত একটি তো হয়।

'ছুটি'র প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত ও পরিচালক শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাই। বক্স অফিস ছাড়া এমন ছবির উদাহরণ শুধুমাত্র একটি—পথের পাঁচালী।

ছবিটির অনেকগুলি গুণাগুণের মধ্যে যা বিশেষভাবে ভালো লেগেছে আর যা ভালো লাগে নি, সেই অংশগুলির প্রতি পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। **যা ভালো লেগেছে :** (ক) চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। 'ছুটি'তে তা সোচ্চার। সম্প্রতি মেট্রোতে প্রদর্শিত 'এ প্যাচ্ অব ব্লু' ছবিতে যা দেখেছিলাম। 'ছুটি'র কয়েকটি বোবা মুহূর্ত অবিস্মরণীয়। (খ) অমলের প্রতি ভ্রমরের সাময়িক উত্তেজনার অংশটুকু। যেখানে অমল বলছে—"দেখত, আমার মুখে সিগারেটের গন্ধ আছে নাকি? তারপর ভ্রমরের ক্লোজ আপ্-এ ভেজা ঠোঁটের নীরব অভিব্যক্তিটুকু। ভ্রমর—'না'। অমল—'তাহলে চল'। এরপরে ভ্রমরের বেড়ালবাচ্চাটাকে মুখে খোঁচা দিয়ে আদর করার দৃশ্য। পরের অংশে অফ্ ভয়েসে অমলের কণ্ঠস্বর—"দেখত——দেখত—দেখত—।" ভ্রমরের কণ্ঠস্বর—"দেখত—দেখত—।" বাবার কণ্ঠস্বর—"দেখত মেয়েটার প্রায়ই জ্বর......" ইত্যাদি। তারপরে ভ্রমরের রক্ত নেবার সময় হঠাৎ ভ্রমরের চোখ লক্ষ্য করে ডাক্তারের উক্তি—"তোমার কি কোন মানসিক উত্তেজনা হয়েছিল?"

উল্লিখিত কম্পোজিশানটুকুর এমন শৈল্পিক উপস্থাপনা আজ পর্যন্ত কোন বাঙলা ছবিতে দেখিনি। রবার্ট ওয়াইজ্ পরিচালিত 'দি সাউন্ড অফ মিউজিক'-এ লিজ্‌ল্ ও রলফ্-এর সাময়িক উত্তেজনার এমন একটি শিল্পমাধুর্যমন্ডিত দৃশ্য ছিল বটে, কিন্তু শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি'র এই অংশটুকু অনেক বেশী পরিণত মনে হয়েছে। (গ) ভ্রমর হাসপাতালে ভর্তি হ'তে যাবার আগে একসময় অমলকে বলছে—"আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি থাকবে তো? বলো না, থাকবে তো?" তখন দুজনার মাঝে একটি গাছের অবস্থান—। এই সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টশনটিও চমৎকার।

যা ভালো লাগে নি—(ক) শুরুতে ভ্রমরের নেপথ্য ভাষ্যের সময় ছবির সম্পাদনার কাজটুকু যথেষ্ট সুক্ষ্ম নয়। নেপথ্যে—"তারপর একদিন আমার মা মারা গেলেন"—। সেই সময় বাবার হাসিটা স্থির (still) করা হয়েছে। প্রয়োগটি সুন্দর হলেও পুরোনো। (খ) স্টেশনে ভ্রমরের বাবার সঙ্গে কথা বলার দৃশ্যে অমলের মুখে পর পর কয়েকবার 'মেসোমশাই' কথাটার পুনরুক্তি। তারপর মাঝে মাঝে অমলের 'বিউটিফুল' কথাটির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। (গ) ডাক্তারের কাছ থেকে ভ্রমরের লিউকেমিয়া হওয়ার দুঃসংবাদ পাবার পর বাবার মুখে—"তাহলে কি মেয়েটা বাঁচবে না?" এই পর্যন্ত অপূর্ব। কিন্তু পরক্ষণেই দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নার দৃশ্যটি আগের সেই ক্লাসিক সিচুয়েশানের সঙ্গে একটু লঘু মনে হয়েছে। (ঘ) ছবির পরিণতি। সারা ছবি জুড়ে যে চিন্তার ছাপ ছিল, শেষ দৃশ্যে তা বড় এলোমেলো মনে হয়েছে। যে রোগীকে তার রোগ জানানো হয়নি সেই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে যাবার সময় তার সামনে সকলকে ওভাবে ভেঙে পড়ার দৃশ্য ছবির মুড্ কিছুটা নষ্ট করেছে। দৃশ্যটি যতটা বেদনাতুর করার চেষ্টা হয়েছে ততটা হয়নি। পরিণতিটা অন্যভাবে হলে ভাল হত।

বাবলু দাশগুপ্ত
রঞ্জপুর, ২৪-পরগণা

॥ আমার এ আঁধারে প্রসঙ্গে ॥

অমৃত পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫১শ সংখ্যায়) "অতুলপ্রসাদ জীবনী" পড়লাম। প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেদিনের ভাঙন ধরার যে তথ্য লেখক পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের অমিল লক্ষ্য করলাম। ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সর্বকনিষ্ঠ। আদি ব্রাহ্মসমাজই সেদিনে রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মচর্চার প্রথম প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি এই সমাজেই প্রথমাবস্থায় যোগদান করেন। কিছুদিন পর মহর্ষির সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ায় ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি একদল আদি সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর এই দলের মধ্যেও মতদ্বৈধ উপস্থিত হল। তার অন্যতম কারণ, কোচবিহার মহারাজার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ-কন্যা সুনীতিদেবীর বিবাহ। ব্রাহ্মসমাজ কন্যাদের বিবাহযোগ্য বয়স ১৪ বৎসর বলে স্থির করার সময় ব্রহ্মানন্দই ছিলেন প্রধান। অথচ নিজেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে উদ্যত হলেন। তাই প্রগতিশীল বিশিষ্ট একদল সভ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন। এর ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। এ সমস্ত ইতিহাসের কথা। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, যোগ্যতাও আমার নাই। লেখক যদি ব্রাহ্মসমাজ ইতিহাস একবার পড়েন তবেই তথ্যাদি জানতে পারবেন।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে আজ যে আমূল সংস্কার সাধিত হয়েছে তার মূলে ব্রাহ্মসমাজের দান অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজ ছিলেন অগ্রণী।

শোভনা নন্দী
কলিঃ—৭

(২)

কবি অতুলপ্রসাদের চরিত্রকে কেউ সম্পূর্ণ চেহারায় উপস্থিত করেছেন কিনা সন্দেহ। বাংলা সাহিত্যের সে অভাব পূরণ করতে চলেছেন শ্রীকল্যাণকুমার বসু তাঁর 'আমার এ আঁধারে' রচনায়। হেমন্তশশীর দ্বিতীয় বিবাহে অতুলপ্রসাদের কিশোর-মনের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃই ডিকেন্সের ডেভিড্ কপারফিল্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখকের লিপিচাতুর্য সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়,
নেতাজীনগর, নয়াদিল্লী

॥ মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র জয়ন্তী ॥

"অমৃতে"র ৩য় সংখ্যায় কহ্লার সম্পাদিকা শ্রীমতী অনীতা চট্টোপাধ্যায় গত ২৫শে বৈশাখ মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অব্যবহারের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়েছেন, তা সর্ববাদিসম্মত। কোন শিল্পীই সেদিন এই অনুষ্ঠানকে আপন বলে মেনে নিতে পারেন নি, এবং মনে হয় উদ্যোক্তাদের ঔদাসীন্যই এর জন্য দায়ী।

সেদিন ঘোষকের কণ্ঠে একাধিকবার শোনা গেল "এবার আবৃত্তি" করছেন......" সবচেয়ে আশ্চর্য এবং দুঃখের কথা, উদ্যোক্তা এবং শিল্পীদের কয়েকজন ফুলপ্যান্ট পরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। অপরাহ্নে একজন প্যান্টপরিহিত ব্যক্তি আবৃত্তির নামে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি হাস্যজনকভাবে শোনালেন। দর্শকদের প্রায় সবকটি আসনই যখন ধুতি-শাড়ী শ্বেত কবরীকে শোভা পাচ্ছিল, তখন মঞ্চে, বিশেষ করে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে, প্যান্টওয়ালাদের উপস্থিতি বেমানান ও দৃষ্টিকটু লাগছিল।

অনুষ্ঠান দেখে বোঝা গেল, শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারে উদ্যোক্তারা মোটেই মাথা ঘামান নি। কিন্তু অবস্থা চরমে ওঠে যখন নাটক "পণরক্ষা" হঠাৎ মাঝপথে শেষ করবার কথা ঘোষণা করা হল। অনুগত ও উৎসাহী শ্রোতৃবৃন্দ অবশ্য উদ্যোক্তাদের এই স্বেচ্ছাচার ক্ষমা করেন নি। তাই চাপে পড়ে কিছুক্ষণ পরেই সিনেমার কাটা ফিল্মের মত পুনরায় অভিনয় শুরু হলে অবস্থা আয়ত্তাধীন হয়।

উদ্যোক্তাদের অবহেলার জন্য শুধু শিল্পীই নয়, শ্রোতামাত্রই বিব্রত ও অপমানিত বোধ করেছেন।

অধীপ রায়,
করুণা বসু,
সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

অমৃত
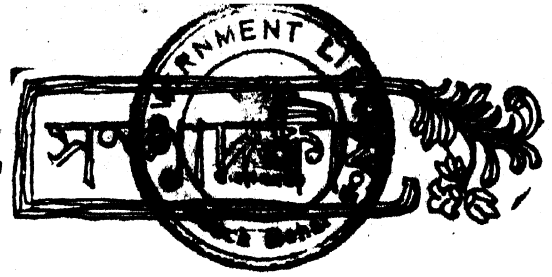
নতুন রাজ্যপাল

শ্রীযুক্ত ধর্মবীর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে দায়িত্ব নেবার আগেই আরেকটি সমস্যাসংকুল রাজ্য পাঞ্জাবের রাজ্যপাল পদে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হয়ে হরিয়ানা ও পাঞ্জাব দুই রাজ্যের সৃষ্টি হবার পরে তিনি এই দুই রাজ্যেরই রাজ্যপালের দায়িত্ব নিরপেক্ষতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর পক্ষে কাজ করতে কোনরূপ অসুবিধা হবে, এমন আশংকা অমূলক।

নূতন রাজ্যপালকে এই রাজ্যের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা স্বাগত জানাই। বিদায়ী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এক দশকেরও বেশি সময় নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত পশ্চিম বাংলার এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে গেছেন।

তিনি তাঁর বিদায় ভাষণে উল্লেখ করে গেছেন কীভাবে বহু দুঃখকষ্টের মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষ তাদের হৃদয়ের স্থৈর্য, উদারতা ও সাহস না হারিয়ে প্রত্যেকটি সমস্যার মোকাবিলা করেছে। শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে বাংলাদেশের একটি আত্মিক যোগ ছিল। যদিও তিনি বাংলাভাষা জানতেন না, তবু বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি জন্মসূত্রে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মহিয়সী মাতা ছিলেন বাঙালী পিতা-মাতার সন্তান।

নূতন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরকে অবশ্য সম্পূর্ণ এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হল। তিনি রাজনীতিক নন, কোনো দলেরও ন'ন। তিনি একজন পাকা প্রশাসক। কিন্তু বুরোক্র্যাট বলতে আমরা যা বুঝি শ্রীধর্মবীর ঠিক সেই জাতের লোক ন'ন। তিনি নতুন যুগে প্রাশসকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন। এর পরিচয় তিনি তাঁর বিচিত্র কর্তব্য পালনে সুষ্ঠুভাবেই দিয়েছেন।

এটা মনে করলে ভুল করা হবে যে, যেহেতু এই রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়েছে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে সব বিষয়েই তার মতৈক্য অবধারিত নয়, সেহেতু রাজ্যপালের কাজ হবে কেন্দ্রের হয়ে রাজ্য সরকারের ওপর খবরদারী করা। এই মনোভাব কোনো কোনো মহলে থাকতে পারে। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁর কর্তব্যভার গ্রহণের প্রথম দিনেই পরিষ্কার ভাষায় এটা বলে দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হবে এই রাজ্যের এবং রাজ্য সরকারের বক্তব্য সঠিকভাবে কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ফেডারেল রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণের সময় আজ উপস্থিত হয়েছে। এই পুনর্বিচারে রাজ্যপালের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও বিভিন্ন অকংগ্রেসী সরকারের বিরোধ বলে যে বিষয়টা কল্পনা করা হচ্ছে তার অনেকাংশই মনস্তাত্ত্বিক। আসল বিরোধের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। তবে দীর্ঘকাল কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের শাসন চালু থাকায় রাজ্যসমূহের প্রকৃত ক্ষমতা কতখানি তা যাচাই হয়নি। সুতরাং মতানৈক্য যদি কখনও ঘটে (তা ঘটবে না বলেই আমরা আশা করি) তা সংবিধানের আওতার বাইরে কখনো যাবে না। সেক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের সঠিক সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণই হবে বাঞ্ছিত কাজ। সে-কাজে রাজ্যপালের ভূমিকা, আইনের জ্ঞান এবং নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা সমস্যা সমাধানে প্রভূত সহায়তা করবে।

কংগ্রেসের আমলেও এই রাজ্য সরকার বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা জটিল হয়েছে, তার সীমাবদ্ধ জমির ওপর এবং সীমাবদ্ধ সম্পদের ওপর এই রাজ্যের এবং অন্য রাজ্য থেকে আগত কর্মপ্রার্থীদের চাপ পড়ছে ক্রমাগত। শিল্পনগরী হিসেবে কলকাতার সমস্যাও শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের সমস্যা বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে, যেমন ভুল হবে ৪০ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভরণপোষণ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের সমস্যাকে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের একার দায়িত্ব মনে করলে। নতুন রাজ্যপাল প্রথমদিনেই উদ্বাস্তু সমস্যার জাতীয় দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। তার সঙ্গে আরও দুটি বড় সমস্যা আছে পশ্চিমবঙ্গের—বেকারত্ব এবং খাদ্য সংস্থান। মোটামুটি এই তিনটি দায়িত্ব পালনে রাজ্যসরকার সঙ্গতভাবেই দিল্লীর কাছে সাহায্য, সহযোগিতা এবং সহানুভূতি প্রত্যাশী। নূতন রাজ্যপালকে এই সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য দিল্লীর কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর হয়ে দৌত্য করতে হবে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, শ্রীযুক্ত ধর্মবীরের দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা এবং কর্তব্যবুদ্ধি সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের এই প্রত্যাশা পূরণে সাহায্য করবে। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে, আমরা আশা করি, নূতন রাজ্যপালকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সকলপ্রকার সহযোগিতা দেওয়া হবে এবং তার ফলে দিল্লী ও কলকাতার এই নূতন যোগসূত্র রাজ্যের কল্যাণে সুদৃঢ় হয়ে উঠবে।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

মণি-বউদি, এই পর্যন্ত ব'লে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন ভেবে নিচ্ছিলেন। সেদিন তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আমি এবার একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। গোড়ার দিকটা বেশ ভাল লেগেছিল কিন্তু এতক্ষণ ধরে বলার পর যেন তেমন কোন জমাট কিছু পাই নি বলে আর ততটা ভাল লাগছিল না।

একটি ত্রিংশোধর্বা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একটি কিশোরী বা সপ্তদশী সদ্যযুবতীর এই দ্বন্দ্ব যতটা কৌতুকজনক হোক না কেন তার থেকেও যেন বেশী বিয়োগান্ত, বেদনা-দায়ক। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি মণি-বউদির মাসীর জয় হলেই খুশী হতাম। মণি-বউদির জয় হয়েও তো জয় ঠিক হয় নি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মণি-বউদি নিজে সুখী হন নি। সুখী হবার কথাই যে নয়। একটি সপ্তদশ বসন্তের মালার পক্ষে উপযুক্ত কণ্ঠদেশটির বয়স ত্রিংশের নিচেই হওয়া উচিত।

আমি উঠে আসতে চাচ্ছিলাম।

মণি-বউদি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন--বললেন—পাড়াগাঁ অঞ্চলে একটা কথা আছে, লোকে বলে—সতীনের হাড়ে মেয়ের জন্ম তার মানে মায়ের ভাগ্যে মেয়ে হিংসে করে। মায়ের গয়না হলে মায়ের ননদ বা জায়েরা হিংসায় কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না কিন্তু মেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যায়—আমার কই? আমার কই? আমি নেব। বাপ মাকে আদর করলেও মেয়ের হিংসে হয়। মেয়ের বিয়ে হলে দিনকতক মা মেতে ওঠে মেয়েকে নিয়ে। ক্ষেত্রবিশেষে মায়েও মেয়ের হিংসে করে বলেই আমার বিশ্বাস ঠাকুর-জামাই। মাসীর কথা তো শুনেছেনই! এবং মেয়ের সব থেকে বড় শত্রু পুরুষ নয়, খাদ্যখাদক সম্বন্ধ হলেও নয়; মেয়ের সব থেকে মারাত্মক শত্রু হল মেয়ে।

আমি—; মণি-বউদি বললেন—আমি ওঁর চিঠি পেয়ে মাসীর এই লাঞ্ছনায় এবং তার পরাজয়ে আশ্চর্য রকমের খুশী হয়ে উঠেছিলাম। আজকাল লোকে বলে 'ভীষণ আনন্দ' হয়েছে, তা আমার ক্ষেত্রে সেদিনের সে আনন্দ সত্যি সত্যিই ভীষণ আনন্দই ছিল। সেই ভীষণ আনন্দটুকু আশ্চর্য রকমের রোমান্টিক করে তুলেছিল, আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়—আমার মেসোর বয়সী অমৃতবাবুর ওই বিহ্বল প্রেম-নিবেদন কি বলব আপনাকে। দুটো আনন্দ মিলিয়ে সে যেন আনন্দের তাল-বেতাল-সন্ধির আনন্দ অনুভব করেছিলাম। সর্বাঙ্গে যেন খুশী কানায় কানায় ভরা সরোবর দীঘির মত টলমল করছিল, একটু নড়াচড়া করতে গেলেই উছলে পড়ে চারি পাড় বা চারিপাশকে ভিজিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

এখানেই একবার একটু থেমে আমার মুখের দিকে সঙ্কোচহীন বড় প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বললেন—আপনাকে আজ পরম বন্ধুর মত মনে হচ্ছে নন্দাই—কোন কথা গোপন করব না আপনার কাছে; সেদিন আমি চার পাঁচবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে কটাক্ষ হেনেছি এবং উল্লাসে হেসে প্রায় ভেঙে পড়েছি। বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে একবারও লছমন প্রসাদের কথা ভাবি নি বা একবারও মনে হয় নি যে, অমৃতবাবু আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়, মাথার চুলে তার পাক ধরেছে এবং সামনের দিকটার চুল বেশ পাতলা হয়ে এসে টাক ফেলছে! অসাধারণ মজা লাগছিল এতবড় একটা মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে, বোকা হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমানুষির আর শেষ রাখছে না।

থাক। সে সব অনেক কথা। আপনি যদি এই নিয়ে একটা নাটক লেখেন তবে আমার কাছে বসবেন খাতা কলম নিয়ে; আমি বলব আপনি লিখে নেবেন। তারপর মেজেঘষে নিলেই সে যেমন রিয়েল হবে তেমনি সাহিত্যও হবে। এবং নাটকও হবে। একটু থামলেন আবার। একটা চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে এলেই যে ভাবান্তর হয় তাতে এই হঠাৎ একটা ছেদের প্রয়োজন আছে। ইলেকট্রিক পাখার সুইচ অনই করুন বা অফই করুন একটা শব্দ হবেই। ওইটেই ছেদ। একটু থেমে বললেন—কিন্তু মাসীর উপর শোধ নিতে যে কি নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলাম তা আজ যখন ভাবি তখন নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। যেমন করে ঈশপের গল্পের ছেলেরা ব্যাঙ নিয়ে খুঁচে খুঁচে আমোদ করেছিল ঠিক তেমনি ভাবে। খুঁচে খুঁচে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। এতটুকু মায়া হয় নি। উল্টে আনন্দ হয়েছিল।

না, ঠাকুর-জামাই, ভুল বললাম। মাসী আমার ব্যাঙ ছিল না, আমিও ছেলেমানুষের ছেলেমী করি নি। মাসী ছিল আমার সাপ আমি ছিলাম বেঁজী। না, ঠাকুর-জামাই, ঠিক বলা হল না। বেজীতে সাপে লড়াইয়ে যে হারে সে বেঁচে থাকে না তাকে মরতে হয়। মাসী শেষ পর্যন্ত মরে নি। আজও তার জন্যে পাগলা গারদের খরচ জোগাচ্ছি। উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। বিশাল একটা মাংসস্তূপ। এ-ই মোটা হয়েছে। এবং—। বলতে বাধছে মুখে।

জীবনের তার সব চলে গেছে, আছে শুধু জীবনের অশ্লীলতা যা তাই।

থাক। এ হল অনেক পরের কথা। সে সময় অমৃতবাবুর পত্র পেয়ে—। পত্রখানা নিয়ে এসেছিল অমৃতবাবুর আরদালী। পত্রখানা দিয়ে বললে—উত্তর নিয়ে যেতে বলেছেন। বাড়ীর বাইরে তখন ইনস্‌পেক্টর বসে আছে, মাসীর সঙ্গে চুরি সম্পর্কে তদন্ত করছে।

অমৃতবাবুর নিজের লেখা চিঠিখানার সঙ্গে আমার মাসী তাঁকে যে চিঠিখানা লিখেছিল সেখানা একাধারে বিগলিত প্রেমপত্র এবং সকাতর মার্জনা ভিক্ষার স্বীকারোক্তি বহন করছিল, যেখানা পড়ে শোনালাম আপনাকে, সেখানারও একখানা নকল ছিল। সম্ভবতঃ আমাকে যে অমৃত-বাবু প্রেম নিবেদন করেছিলেন তার অকপটতা প্রমাণের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আমার অমতে তিনি প্রথম যৌবনের অন্তরঙ্গ বান্ধবীকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমার প্রতি তাঁর অনুরাগের গভীরতার প্রমাণ দেবার জন্য জীবনের গোপনতার তলদেশ থেকে প্রেমপত্রখানা তুলে পাঠাতে চেয়েছিলেন বোধ হয়।

একটু বেশী হেসে ফেলে বললেন—প্রেমে পড়লে মানুষে বোকা হয়ে যায়। প্রেমিকার কাছে সিনসিয়ারিটি প্রমাণ করা তো সোজা কথা নয়!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে—আমার উল্লাস। এবং চাইতাম কি জানেন—চাইতাম কোন-না-কোন ছুতোতে একটু আলুথালু চুলে ও পোশাকে ওর সামনে গিয়ে পড়ে জিভ কেটে সলজ্জিতা হয়ে থমকে দাঁড়াতে।

এমনি অবস্থার পটভূমিতে চিঠিখানা পেলাম। মাসীর লেখা চিঠিখানা (অমৃত-বাবুকে লেখা) পড়ে মন বলে উঠল—হেরে গেছে, হেরে গেছে, মাসী রাক্ষসী হেরে গেছে।

শুধু হেরে যাওয়া নয়; মাসী হাতজোড় করলে। হাতজোড় করিয়ে আমি ছাড়লাম। মাসী কথা বলছিল থানা অফিসারের সঙ্গে। আমি ঝিটাকে বললাম—একবার মাসীকে ডাকো। বল খুব জরুরী দরকার। খুব জরুরী।

মাসী আসতেই তাঁর লেখা চিঠির সেই নকলখানা তাকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—অমৃতবাবু এই চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়ে-

ছেন, আর আমাকে লিখেছেন—আমি রাজী থাকলে উনি এ ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেবেন। আমি কি বলব? কি লিখব? তুমি যদি বল মণি তুই চাপা দিতে বল, আমি তোকে বলছি—তা হ'লে তাই বলব আমি। কিন্তু নিজে থেকে আমি বলব না।

মাসী হতবাক হয়ে নিষ্পলক চোখে আমার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিল কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে কোন ভাষা ছিল না। সে যেন বোবা তাকানি। শুধু বার কয়েক তার নিচের ঠোঁট দুটি খুব সূক্ষ্ম কম্পনে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আমি চোখ নামিয়ে একটু অপেক্ষা করে বলেছিলাম—মাসী!

মাসী বলেছিল—বেশ তাই বলছি।

আমিও তাই লিখলাম। এবং হলও তাই। কেসটা ধামাচাপা পড়ল।

বউদি বললেন—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ঠাকুর-জামাই যে, দেশের কর্তা-মহলে ওঁর জানাশোনা আছে। হক সাহেব ওঁকে স্নেহ করতেন। উনি বলেক'য়ে চাপা দিলেন ব্যাপারটা। কিছু যেন নগদও খরচ করেছিলেন। আমার গয়না গেল, কাজ সার্টিফিকেটেরও হদিশ হল না; কিন্তু উনি লিখলেন—আমার সর্বস্বই তোমার। গয়নার জন্য ক্ষেদ করিও না।

আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মণি-বউদি; মুখে কাপড় দিয়ে হাসি ঢাকা দিয়ে বললেন—নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—চল্লিশ বছরের আধটাকপড়া অমৃতবাবুর যথাসর্বস্ব বিষয়সম্পত্তি সম্পদ সঞ্চয় থেকে হৃদয় পর্যন্ত সব কিছু ঝপঝপ করে এসে পড়ল এই অষ্টাদশী দেখন-হাসি মণিমালার চরণতলে।

মাসখানেকের মধ্যে পত্র মারফতে আমাদের; কি বলব;—মন দেওয়ানেওয়াই বলি, মন দেওয়া নেওয়ার পালাটি সুশেষ হয়ে গেল। অপেক্ষা রইল আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার। আঠারো বছর পূর্ণ হলেই আমি সাবালিকা হব। তার আগে হাতে-হাতে বন্ধন হতে গেলে মাসী হয়তো সে বাঁধনে কোপ মারতে পারে এই আশঙ্কায় অপেক্ষা করাই স্থির হয়েছিল। অমৃতবাবু আপনার শ্যালকটি—আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়—এবং তখন তাঁর বয়স এসেছে যৌবনের ওপারের সিংহদরজার কাছাকাছি; আমার মত পূর্ণ সপ্তদশীর রূপযৌবনের প্রতি লালসা এবং লোভ যথেষ্টই ছিল, প্রেম-পত্রে প্রেমের কথা লেখবার সময় দিশাও হারাতেন তবুও বলব লোকটি সুস্থির মানুষ, যাকে বলা হয় ধীর এবং বিচক্ষণ তাই তাঁকে বলতে হবে। তিনি নিজেই অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

মাসীর কাছ থেকে মাসখানেকের পরই আমার স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা করলেন। স্থির হল আমি এর পর থাকব Y, W, C, A, ইয়ং উয়োমেনস কৃশ্চান এ্যাসোসিয়েশন বোর্ডিং-এ।

মাসী আমার তখনই দু' চারটে কথা[illegible] কাজে পাগলামির পরিচয় দিতে শুরু করেছে। কিন্তু তখন আমরা কেউই সেট[illegible] বুঝতে পারি নি।

হঠাৎ মাসী আমার পদাবলী কীর্তন গাইতে শুরু করলে। একদিনের কথা বলি—ক'দিন থেকেই আমার ঘর থেকেই শুনতাম মাসী কীর্তন গাইছে। সেকালে তখনও পান্না কীর্তন-ওয়ালীর "ও কুব্জার বন্ধু। কেমন করে পাসরিলে রাই-মুখ-ইন্দু?" গানের রেকর্ডখানার যথেষ্ট সমাদর ছিল দেশে। যাদেরই গ্রামোফোন ছিল তারাই ওখানা রাখত। এবং কীর্তনের কথা উঠলেই লোকের ওখানার কথা মনে পড়ত। প্রথম দিন [illegible] এসেছিল কিন্তু মনে [illegible] হয় নি। তখন আমি [illegible] কেমন [illegible] হয়ে গেছি, বেশ অনুভব [illegible] ছ যে, [illegible] দাড়ি ছিঁড়ে ফেললে [illegible] নি। মনে হচ্ছে যেন [illegible] বাঁধা পড়ছি। অমৃতবাবু তখন প্রত্যেকদিন একবার করে [illegible]ছেন। [illegible] ব'সে আমার সঙ্গে [illegible] কথা [illegible]লে যাচ্ছেন। নিতান্ত সাধারণ কথা, তারই মধ্যে লাল হয়ে যাচ্ছেন। তোৎলার মত কথা আটকাচ্ছে।

—কেমন আছ?

—কিছু দরকার টরকার থাকে তো বল?

—চল না একদিন মার্কেটে গিয়ে পছন্দ করে কাপড়-চোপড় কিনে আনবে।

—ভাদুড়ীমশায়ের সীতা দেখে আসি চল। যাবে?

এখানে মাসীর কথা উঠত। আমিই বলতাম—অভ্যাসবশে, আপনি যেন বলে ফেলতাম—মাসীকে বলুন!

হেসে অমৃতবাবু বলতেন—কেন? কি প্রয়োজন? তবে তুমি চাও তো বলতে পারি। সঙ্গে নিতে চাও? সে কিন্তু ঠিক হবে না!

বিচিত্রভাবে অমৃতবাবুর ভিতর থেকে সনাতন পুরুষ তার অকৃত্রিম চেহারা নিয়ে সবল মুঠিতে প্রথমে আঁচল তারপর হাত তারপর দু'হাতে ঝাপটে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি খানিকটা অসহায়ভাবে খানিকটা পুলকিত তনু হয়ে আত্মসমর্পণ করলাম।

ভালই লেগেছিল নন্দাই। অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। একটি সদ্যউদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের কাছে বোধকরি এর থেকে মিষ্ট এবং কাম্য আর কিছু নেই। এই সনাতন এই শাশ্বত।

মাসীরত্নমালা যেদিন বাপের বাড়ীর সম্বন্ধ কাটিয়ে প্রেমে তপস্বিনী হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল, আমার থেকে আর কিছু বেশী বয়সে সেদিনও এই সনাতন এই শাশ্বত আকর্ষণেই এসেছিল। কিন্তু মাসীর এই পরিণামের কথাটা আমাকে ভয় দেখায় নি, আমি তাতে ভয় পাই নি।

কবিরা অবশ্য মেয়েদের রূপকেই বলে আগুনের শিখা।

বেটাছেলেদের বলে পতঙ্গ।

বলে, পুরুষেরাই পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখা পুড়িয়ে মরে। কিন্তু না, বেটাছেলেরাই আগুন—মেয়েরাই পতঙ্গ। মেয়েরাই পুড়ে মরে।

হঠাৎ হেসে বললেন—আপনার শ্যালক থিয়েটারে সীতা দেখতে গিয়ে এই কথা বলে অভিযোগ করেছিলেন। মেয়ে জাতটাই হল আগুন; পুরুষ জাতকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে বিধাতা এই আগুন জেলেছেন সৃষ্টির আদিতে। আজও তাই করে যাচ্ছে! আমি বলেছিলাম—না। আগুন তোমরাই। তবে নেহাতই যদি জোর কর তাহলে বলব—মেয়েরা আগুন যেকালে ছিল—ছিল একালে তারা পুরুষদের হাতের কৌশলে দেশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়েছে। সেও নেহাৎ সিগারেট ধরাবার জন্যে।

উনি হেসে বলেছিলেন—তুমি এমন কথা বল যে অবাক হয়ে যাই।

আমি হেসে বলেছিলাম—তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী। আমি অবাক হয়ে শুনি—কেবল শুনি।

আমার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে উনি বলেছিলেন—চল এখান থেকেই যাই কালীঘাট। মায়ের প্রসাদী সিন্দুর—আমি ভয় পেয়েছিলাম ততক্ষণে। বুঝতে পেরেছিলাম শার্দুলের ঘুম ভেঙেছে। পিছিয়ে এসে বলেছিলাম—না। আমি পড়ব। অন্ততঃ আই-এটা পাশ করতে দাও আমাকে—তার আগে না।

উনি চুপ করে বসেছিলেন। বুঝতে পারছিলাম নিজেকে সংযত করছেন। আমি ভয়ে ঘামছিলাম।

কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—বড্ড ঘামছ তুমি।

আসল সত্য ঢাকবার জন্য হ্যাঁ বলে এড়াতে চেয়েছিলাম। হাতখানা একটু টেনেও ছিলাম। তিনিও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

এত-কথা এমন করে বলছি কেন জানেন। বলছি এই জন্যে যে এখনও ঠিক আমি যাচাই করে বুঝতে পারিনে কেন এমনভাবে ওঁর সঙ্গে লুকোচুরির মত খেলা খেলেছিলাম।

সবটাই কি মাসীর বন্ধুকে কেড়ে নেবার জন্যে?

কখনও মনে হয় তাই। হ্যাঁ রত্নমালা-মাসীর পরিণত যৌবনের শতকামনার যে-বন্ধুটিকে সে পুজোর আসনে বসিয়ে পুজো করেও পায় নি তাকেই আমি আমার সপ্তদশ বসন্তের একখানি বকুল মালার লোভ দেখিয়ে হাতছানি দিয়ে দিব্য হাঁটি হাঁটি পা-পা করে হাঁটিয়ে আসন থেকে উঠিয়ে আনাই ছিল এ খেলার মূল কথা।

কখনও মনে হয়—না, তাই সব নয়। পুরুষের সঙ্গে এই খেলা খেলার মত সাধের খেলা, সুখের খেলা মেয়েদের আর নেই—আর হয় না। এতে একবার নামলে আর রক্ষা থাকে না। বাঁধবাঁধা জল যেমন একবার বাঁধ ভেঙে সরু একটি ধারায় বেরিয়ে যেতে শুরু করলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে ধারায় গতিতে সবলা প্রবলা হয়ে ওঠে দু' কূলভাসিনী হয়ে তরঙ্গিনী হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি ভাবেই আমিও সেদিন ক্রমশঃ প্রগলভা হয়ে উঠেছিলাম—আর আমার তখন পিছনের ডাকে ফেরার উপায় ছিল না।

আবার চুপ করে গেলেন বউদি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—সেইদিন যখন থিয়েটার থেকে বাড়ী ফিরলাম তখন ফিরেই শুনলাম, মাসীর ঝিটি বললে—মাসী নাকি পাগল হয়ে গেছে। ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরে বসে আছে, বলছে—আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি। আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি।

চোখে দেখলাম।

কানে শুনলাম। অনেক অশ্রাব্য কথার সঙ্গে অনেক গান। কীর্তন—পদাবলী।

পরের দিনই আমি চলে গেলাম হোস্টেলে।

মাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন অমৃতবাবু। কিন্তু কিছুই হয়নি চিকিৎসায়। দু বছর পরে মাসীকে রাঁচীতে পাঠিয়ে তবে আমাদের বিয়ে হল। তবে এই দু বছরের মধ্যে মধ্যে-মধ্যে মাসী বেশ ভালই থেকেছে; একেবারে ভাল থাকার মত ভালো; সে-সময়ে আমার নামে নানান কলঙ্ক রটিয়ে আমাকে নামজাদা কলঙ্কিনী করে তুলে তবে ছেড়েছিল।

অমৃতবাবুর আত্মীয়দের তো সে জানতো। তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

লছমন পরসাদের সঙ্গে।

কমলকুমারের সঙ্গে। কমলকুমারও তখন এসেছে, ও'র বাড়ীতে থাকে। আরও অনেকজনের সঙ্গে অনেক কলঙ্ক।

১৯৪২ সালের সেদিন রাত্রে মণিবউদির কাহিনীতে এইখানেই ছেদ পড়েছিল।

রাত্রি তখন অনেকটা হয়েছিল।

প্রায় এগারটা। তিনি বলেছিলেন—তবে বুঝতেই পারলাম না ঠাকুরজামাই, আমি সুখী না দুঃখী? অভাবটাই বা কিসের? কেন এমন ক'রে ফিরি? আপনি বলতে পারেন? আপনি তো লেখক! আমার মনটা পড়ে দিতে পারেন?

আমার মনে সেদিন নানান কথা ঘুরপাক খেয়েছিল, কিন্তু বলতে সাহস করিনি। অথবা মণিবউদিকে এমন কোন আঘাত দিতে চাই নি যা শকথেরাপীর কাজ করে। এই এক ধরনের পাগলামির মধ্যে বেশ আছেন। কাজ নেই তার ভাল হয়ে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম।

মুহূর্তে মণিবউদি পাল্টে গিয়েছিলেন, মুচকি হেসে বলেছিলেন— নষ্ট-চাঁদ দেখলেন—আপনার নামে মিথ্যে কলঙ্ক হবে।

বুঝলাম ইঙ্গিতটা। মণিবউদির তারিফ করলাম ওঁর বাকশক্তির জন্য এবং ওঁর এই অতিসহজ ললিত-রাগ বিস্তার চিত্তের জন্য। ইচ্ছে হ'ল বসে কথাগুলো বলে যাই। কিন্তু ভাগ্যে বলি নি। ওঃ, কিছুদিনের মধ্যেই মণিদিকে আবার যে নূতনরূপে দেখলাম—! মনে হ'ল মণিবউদি বহুরূপা। বহুরূপী অর্থে নয়। সত্য অর্থে।

(ক্রমশঃ)

বাদামী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

হাওড়া স্টেশনে আনতে গিয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে। দিল্লীমেল প্ল্যাটফর্মে এসে থামলে তাঁকে খুঁজে নিতে দেরী হোল না। কামরা থেকে নামলেন, দেখি বুকের কাছে আঁচলে ঢেকে নিয়ে আছেন এক কুকুরছানা, শুধু মুখটি তার বেরিয়ে আছে। রং বাদামী-কমলা, কান দুটি আধ-মোড়া, ঘন লোম। আমার স্ত্রীর কুকুরের শখ ছেলেবেলা থেকে; কুকুরকে নাওয়ানো, মোছানো, পাউডার মাখানো, খাওয়ানো প্রভৃতিতে শিশুকাল থেকেই তিনি অভ্যস্ত। বিয়ে হয়ে এ বাড়ীতে এসে মনঃপুত হচ্ছিল না তাঁর কুকুর না থাকায়। একদিন দোতলার জানালা থেকে দেখলেন একজন দুটি কুকুরবাচ্ছা নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কী কথা হোল,—আমায় ডেকে বললেন, 'ঐ কুকুরছানাটা কিনে দাও না।' একটা ছিল সাদা ধবধবে, অন্যটি মেটে রং।। কেনা হোল সাদাটি। সে হল এর আট বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে কয়েক মাস আগে কুকুরটি হয়েছে বিগত। বুঝলাম তার শূন্যস্থান পূরণ হবে এবার। তবু কেমন বললাম,—'এ যে দেখছি লেডি কুত্তো; কোত্থেকে নিয়ে এলে একে?'

আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি করে বললেন,—'হোক লেডি কুত্তো, তোমাকে ত' কোন ঝক্কি পোয়াতে হবে না। ও লুটিয়ে পড়েছিলো আমার পায়ে এসে,—থাকবে আমার কাছে।'

সুটকেস বেডিং গাড়ীতে তুলে আমরা ফিরলাম বাড়ী। আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন এলাহাবাদে, এক আত্মীয়ের ছোট ছেলের পৈতে উপলক্ষে। বললেন, একদিন তাঁদের বাড়ী থেকে যাচ্ছিলেন ক্যানিং রোড দিয়ে এমন সময় অনুভব করলেন পায়ের কাছে এক নরম স্পর্শ। মাথা নীচু করে দেখলেন কুকুরছানাটি। পায়ের ওপর লুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাস্তা জনশূন্য। সঙ্গে আত্মীয়দের যে ছেলেটি ছিল সে বলল কুকুরছানা তাদের নয়। নিকটে কোন বাড়ীও ছিল না। কুকুরবাচ্ছাটিকে কোলে তুলে নিতে সে আমার স্ত্রীর মুখ চাটতে লাগল, ও পরম আরামে বসলো স্থির হয়ে, নির্ভয়ে। কাদের কুকুর, কে মালিক খানিকটা খোঁজাখুঁজি করে কিছু স্থির করতে না পেরে তাকে নিয়ে এলেন বাসায় ও কলকাতা ফেরার সময় সঙ্গে এনেছেন।

কুকুরটির বড় লোম, কান দুটি লম্বা ভাঁজ করে ভেঙে পড়া ও আকার দেখে মনে হোল স্প্যানিয়াল জাতের দো-আঁশলা। নর নয়, মাদী। রং দেখে আমার ছোটমেয়ে নাম রাখলো, বাদামী। বাদামী বড় হতে লাগল। প্রথম প্রথম ঘরের টেবিল চেয়ার চৌকির পায়া চিবিয়ে দাগী করে দিত; নতুন কাঁচ দাঁত করত সর-সর। তাকে এনে দিলাম শক্ত রবারের বল—তাতে পায়া চিবানো কমলো। বলটা ছুঁড়ে দিয়ে শেখালাম তাকে ধরে নিয়ে এসে আমার হাতে দিতে। আরও সব কসরৎ শেখালাম,—দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। হাত পেতে সামনের এক পায়ের থাবা হাতে দিয়ে দাঁড়াতে ইত্যাদি। এর জন্য কিছু সময় ও অধ্যবসায় আমাকে ব্যয় করতে হয়েছিল।

বছরখানেক হয়ে গেল, এমন সময় আমার হাতে এলো লণ্ডনের নাম করা বন্দুকনির্মাতা 'হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ডে'র তৈরী 'ব্যাডমিণ্টন' নামাঙ্কের এক বন্দুক। আমার স্ত্রীর যেমন কুকুরের সখ, আমার তেমনি শখ ছিল শিকারের। ফটোগ্রাফী-বিলাসীদের উৎকৃষ্ট ক্যামেরা, আমার স্বপ্ন ছিল একটি উৎকৃষ্ট বন্দুক লাভ। বসওয়েল, পার্ডি, হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড, বিসলী, রিগাবি প্রভৃতি নাম করা বন্দুক-নির্মাতাদের ক্যাটালগ ও আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বই সংগ্রহ করে প্রত্যেকের কল-কব্জা ও গঠন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত

করেছিলাম। কী করে ওগুলোর মধ্যে যে-কোন একটি সংগ্রহ করা যায় মনে মনে তাই ধ্যান করতাম। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ। বিদেশ থেকে বন্দুক আমদানি হয়েছে বন্ধ। দোকানে দু-একটি উৎকৃষ্ট জিনিস যা পাওয়া যায় তা অতি দুর্মূল্য। এমন সময় বন্দুকটি আমার হাতে এলো। পেনশনপ্রাপ্ত এক মিলিটারী ইংরেজ দেশে ফিরে যাবার মুখে বন্দুকটি আমায় বিক্রী করেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তাঁর এ-দেশে কত দিনের স্নাইপ-হাঁস শিকারের স্মৃতি বন্দুকটির সঙ্গে জড়িত। স্নাইপ শিকারে বিশেষ করে ওটি খুব হাতসই ছিল। তবে আমাকে বিক্রী করে যাচ্ছেন, কারণ দেশে তাঁর আছে এক পার্ডি'।' প্রকৃত দুর্লভ জিনিস আমি পেলাম, এখন মারতে পারা চাই সিধে—
"You must Shoot straight"

বন্দুকটি হাতে পেয়ে শিকারের নেশা গেল বেড়ে; দ্বিগুণ উৎসাহে আমি শিকারে যেতে লাগলাম।

শিকার অর্থে পাখী-শিকার,—হাঁস ও স্নাইপ বা কাদাখোঁচা। এ-অঞ্চলে শুধু এ দুটি শিকারই মেলে, আর কিছু বা হরিয়াল। তিতির, স্যাণ্ডগ্রাউজ, বনমোরগ, চকোর, কলিজ, বটের—বাংলার পশ্চিমে ও অন্যত্র। হাঁসের কদরই বেশী আর কলকাতার সন্নিকটে পাওয়া যায় প্রচুর। পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের সংখ্যাতীত জলা ও মাছের ভেড়ি শীতের আগমনে দলে দলে বুনোহাঁস ও গীজ এসে ছেয়ে ফেলে। আবার গ্রীষ্মের ঝড়-ঝপটা ও দীর্ঘ দিনের সূত্রপাতে হিমালয় পার হয়ে ফিরে যায় তারা মানস সরোবর, বৈকাল প্রভৃতি হ্রদে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে যাযাবর হাঁসদের অচিহ্নিত আকাশ-মার্গে এই সুদীর্ঘ হাজার হাজার মাইল গমনাগমন প্রাণী বৃত্তান্তের এক দুর্ভেদ্য রহস্য।

অপর পক্ষে ছোট হলেও শিকারবিলাসীর কাছে স্নাইপের সংরক্ষিত স্থান আছে। এ-শিকার যেমন শ্রমসাধ্য, তেমনি কঠিন। কাদাজলে পাঁকে স্নাইপ খাবার খুঁজে চরে বেড়ায় সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে। শিকারীর আগমনে তার পায়ের আওয়াজে উড়ে ওঠে দূর থেকে আতঙ্কের ডাক দিয়ে। উড়ে উঠে কুটিল তড়িৎগতিতে একটা ধোঁয়ার ফুৎকারের মত আকাশে যায় মিলিয়ে।

হাঁসের শিকার যেমন শীতে, স্নাইপের তেমনি বর্ষায়। বর্ষায় যখন ধান পাট ঘাস আগাছায় ক্ষেত ঘনিয়ে ওঠে পাঁকে, কাদাখোঁচা তখন এসে জমায়েত হয় এইসব জমিতে। দু-তিন জনে দল বেঁধে মাঝে ব্যবধান রেখে শিকারী অস্ত্রধারীদের নামতে হয় এইসব জমিতে আধ হাঁটু-ভর কাদায়। খেতে নেমে কাঁধ বুকসই ধানের ও দীর্ঘতর পাটগাছের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হও এক-পা এক-পা করে, বন্দুকের নল নামিয়ে ধরে। পাখী উড়ে উঠলে চলা থামিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুক কাঁধে তুলে মার সামনে পাখী সে মার অব্যর্থ নিশানে উড়ন্ত পাখীকে। পড়লে শিকার-কুড়ানী লক্ষ্য রাখবে; কিন্তু চলবে না লাইন ভেঙ্গে কুড়োতে যাওয়া। বন্দুকে টোটা ভরে আবার একসঙ্গে সকলে অগ্রসর হও। অপ্রত্যাশিত অলক্ষিত স্থান থেকে পাখীর উড়ে ওঠা, মুহূর্তের জন্য চকিতে দেখা ও কুটিলগতিতে আকাশে মিলিয়ে যাওয়াতে সংরক্ষিত এ শিকারের চমৎকারিত্ব।

মনের পটে রূপ দান করে এ শিকারের পরিবেশ। ভোরের আলো ফোটার আগে প্রত্যূষে দলের শিকারীদের একত্রিত করে বেরিয়ে পড়তে হয়। যেতে হবে শহর ছেড়ে যশোর রোড ধরে—বা অন্য রাস্তা ধরে—গ্রামাঞ্চলে, যেখানে ধান পাটের ক্ষেত। গ্রামের শিকারী আগের দিনে ক্ষেতে কত স্নাইপ সমাগম দেখে খবর দিয়ে যায়। ম্লান আলোতে কলকাতার রাস্তা বাড়ীগুলি রূপকথার পরিত্যক্ত দৈত্যপুরীর রূপ গ্রহণ করে। যশোর রোডের দু'ধারের বৃক্ষশ্রেণী রাস্তার মাথার ওপর নিরবিচ্ছিন্ন চাঁদোয়া ঝুলিয়ে রেখে দেয়। ভোরের আলোয় নির্জন প্রকৃতি তার ব্যস্তদিনের অবগুণ্ঠন খুলে ধরে।

ক্লান্ত দিনের শিকারের শেষে শিকারীর দল আসন্ন সন্ধ্যালোকে একত্রিত হয়ে আপন আপন সফলতা বিফলতার খতিয়ান চর্চা করে। উন্মাদনা, বৈচিত্র্য, ক্লান্তি, আলাপ। এই মদিরা পান করতাম আকণ্ঠ।

পাখী শিকারের সঙ্গে থাকে একজন করে গ্রাম্য-শিকারী, পাখী পড়লে লক্ষ্য রাখা ও যথাসময়ে পাখী তুলে আনা হল তার কাজ। কখনো কখনো তাতে দু-একটি হারায়। এ-কাজ কিন্তু নির্ভুলভাবে সুসম্পন্ন করতে পারে শিক্ষিত শিকারী-কুকুর।

একদিন বিকালে হাঁস শিকারে গিয়েছি ধাপার এক মাছের ভেড়িতে। ভেড়ির বাঁধে একটা ছোট গাছ ও হোগলার মাঝে আড়াল (Butts) তৈরী করে বসবার উদ্যোগে বন্দুক, কার্তুজব্যাগ, জলের বোতল ইত্যাদি সাজিয়ে রাখছি—এমন সময় দেখি এক সাহেব শিকার করে ফিরছেন। সঙ্গী শিকারী'র হাতে দু-ছড় ভর্তি স্নাইপ, ও সঙ্গে এক বড় স্প্যানিয়াল কুকুর; তলপেট, পা ও গায়ের লোম অল্প ভেজা। চক্-চক্ করছে। জিজ্ঞেস করলাম—What Luck—; বললেন, "thirty Braces" ষাটটি স্নাইপ। শুনে পুলকিত হলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করায় বললেন, সকাল সাতটার আগে নেমেছিলেন ভেড়ির আশে পাশে জলকাদা-ভরা আগাছার পতিত জমিগুলিতে। বিস্তর স্নাইপ ছিল তাতে। চার বাক্স কার্তুজ খরচ করেছেন। কুকুরটির কথা বললেন,—আসল জাতশিকারী Retriever সব পাখী ওই তুলেছে, একটিও খোয়া যায় নি।

সেদিন শিকারের এক নতুন সূত্রের সন্ধান পেলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম বাদামীকে শিকার শেখাব। সেও ত জাতে আধা-স্প্যানিয়াল।

অবিলম্বে আরম্ভ হ'ল তার পাখী-কুড়ানো শিক্ষা। বল ছুঁড়ে দিলে তুলে এনে আমার হাতে দিতে শিখিয়েছিলাম আগেই। এবার শেখালাম আলপিন গাঁথা বড় সাইজের পিনকুশন ছুঁড়ে দিলে তুলে এনে আমার হাতে দেওয়া। পিনগাঁথা কুশন মুখে ধরবে আলতো করে। লাল কাপড় কিনে স্নাইপের মাপের টোঁড বানিয়ে তাতে পিন গেঁথে ছুঁড়ে দিতে লাগলাম; কিছু ভ্রূকুটি ধমক ও সরু গাছের ডাল ব্যবহার করেছিলাম। দু-চার দিনের মধ্যেই বাদামী টোঁড তুলে এনে দিতে পোক্ত হয়ে উঠল। সাঁতারের উদ্দেশ্যে এবার তাকে নিয়ে গেলাম ঢাকুরে লেকে, খুব ভোরে ভোরে। নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে রবারের বল জলে ছুঁড়ে দিতে বাদামী বিনা দ্বিধায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে তুলে এনে দিল বলটি। তোয়ালেতে গা মুছিয়ে তাকে বাড়ী আনলাম। কয়েক দিন বাদামীকে নিয়ে লেকে এইভাবে বল খেলা চলল।

এবার পরীক্ষা করতে হবে বন্দুকের আওয়াজে ভয় পায় কি-না, আসল পাখী কুড়িয়ে আনতে পারে কিনা।

একদিন তাকে নিয়ে গেলাম গাড়ীতে গড়ে পার হয়ে বারুইপুরের দিকে। ধানকাটা শেষ হয়েছে, ক্ষেতে নেমেছে গোললা-পায়রা ধান খুঁটে খেতে। দূরে গাছের পাড়ের অন্তরাল। একটা নির্জন খোলা মাঠ বেছে নিয়ে গাড়ী রাস্তায় রেখে নেমে গেলাম। বাদামীর গলায় বাঁধা চেনটা পায়ে টিপে ধরে মাঠে চরা পায়রার ওপর আওয়াজ করতে পড়ল একটি; দ্বিতীয় আওয়াজে ওড়া পায়রাও একটি ফেললাম। উপরি উপরি দুটি আওয়াজে বাদামী বেশ একটু চমকে উঠল। গলায় চেন খুলে দিয়ে 'শ—শ' শব্দ করাতে সে ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় পায়রাটি মুখে তুলে নিয়ে এল। হাত পাততে মুখ আলগা করে দিল, পায়রাটি মুখ থেকে বার করে নিলাম। এবার প্রথম মারা পায়রাটি যেখানে পড়েছে সেদিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ দিতে সেটিও খুঁজে বার করে কুড়িয়ে এনে দিল। বাদামী দীক্ষিত হল শিকারে।

এরপর বাদামীকে হাঁস ও স্নাইপ শিকারে নিয়ে যেতে সুরু করলাম। প্রথম দু-একদিন স্নাইপের ক্ষেতে গোলমাল করে ফেলত; পাখী পড়তেই ছুটে যেতে চাইত। তাতে মাঠ থেকে অসময়ে উড়ে যেত সামনের পাখী, মারার সুযোগ না দিয়েই। কয়েক দিনেই সে শিখে নিল পাখী পড়লে দেখে রাখতে ও শিকার করতে করতে এগিয়ে সে বরাবর পৌঁছলে তাকে খুঁজে তাকে মুখে তুলে দিতে। শিকারীর ভুল হতো পাখী খুঁজে পেতে কিন্তু বাদামীর

কখনো ভুল হোত না। দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণশক্তিই তাকে সাহায্য করতো এতে। ভেড়ির জলে হাঁস পড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে তুলে আনতে লাগল বাদামী। হোগলা, নলবন প্রভৃতির ভেতর পড়লেও সে ঠিক তুলে এনে দিত। নেড়ি কুত্তো বলে স্ত্রীর কাছে একদিন যার নিন্দে করেছিলাম, সে হয়ে উঠল আমার পরম বিশ্বস্ত নিত্য শিকার-সঙ্গী। শিকারের পোষাক পরলে বা আলমারি থেকে বন্দুক হাতে নিলে সারা শরীর টান করে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক-পা তুলে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত,—কখন গাড়ীতে ওঠবার ডাক আসবে এই অধৈর্য প্রতীক্ষায়।

বাদামীর আর এক প্রতীক্ষারত হৃদয় অল্পে অল্পে আত্মপ্রকাশ করল। আপিস থেকে বাড়ী ফেরবার সময় সন্ধ্যায় সে গেটের কোলে এসে পায়ের থাবা দুটির ভেতর মাথা রেখে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকত বসে। সিকি মাইল দূরে থেকে আমার গাড়ীর খবর পেত। এক রকম আনন্দ-উচ্ছাসের শব্দ করে ডেকে গৃহস্থকে জানিয়ে দিত প্রভুর আগমন-বার্তা। বাড়ী পেঁছে গাড়ী থেকে নামলে লেজ নেড়ে কাছে এসে পরম আনন্দে আমার একটি হাত চাটত অনেকক্ষণ ধরে। আরামে চোখ দুটি বুজে আসত। দেখে আমার স্ত্রী বলতে সুরু করলেন, —'আহা, সোহাগী!' অতদূর থেকে সে কী করে টের পেত আমার আসার খবর? সে কী বাতাসে ভেসে আসা গন্ধে, না মাটির কাঁপনে?—কে জানে?

গন্ধই হবে। পরম উপাদেয় ছিল তার কাছে আমার মুখের চিবানো উচ্ছিষ্ট—কমলালেবু, পেয়ারার ছিবড়ে, মাছের কাঁটা-কুটো। তার খাবার ভাত রুটি আমার স্ত্রী বা আমার হাত দিয়ে মেখে না দিলে সে তা না খেয়ে শুঁকে চলে যেতো।

বাদামীর এক বদ অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল, পাড়ার দোকান বাজারে বা প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী গেলে চুরি করে সে আমার স্ত্রীর ও আমার পিছু নিত। গেট খুলে বাইরে যাবার সময় তাকে ভেতরে রেখে সাবধানে গেট বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু সে কতক্ষণ,—একটু পরেই কেউ না কেউ গেট খুলে ভেতরে যেত বা বাইরে আসত। সেই সুযোগে বাদামী চলে আসত বাইরে, অলক্ষিতে। আমরা যেখানে যেতাম হাওয়ায় সে পর্যন্ত গন্ধের এক সূক্ষ্ম রেখাপাত হয়ে যেত, সেই গন্ধের রেখা অনুসরণ করে বাদামী নির্ভুলভাবে উপস্থিত হোত সেখানে নিঃসন্দেহে। বন্ধুদের ঘরে হলে হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে একটা আমোদ ও হাসির ঢেউ খেলে যেত; দোকানে হলে খরিদ্দার ও দোকানী শঙ্কিত হয়ে উঠত। এমন হোত কখনও কখনও যে, আমার স্ত্রী বা আমি এক পথ দিয়ে গিয়ে ফিরেছি অন্য পথে। বাদামী আমাদের গন্তব্যস্থান পর্যন্ত উপস্থিত ও কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছে বাড়ীতে। বাড়ীর দোকানী

দু-এক দিন বাদামীকে তার গলার কলারে দড়ি বেঁধে ফিরিয়ে এনে দিয়ে গেছে। বাদামী ছিল পাড়ায় সর্বত্র সুপরিচিত।

গন্ধের অমোঘ আকর্ষণ বাদামীকে টেনে নিয়ে গেল এক চূড়ান্ত লাঞ্ছনায় একদিন।

আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন সিনেমার বৈকালিক অধিবেশনে। সিনেমাটি ছিল বাড়ীর নিকটে রেললাইনের ওপারে। আরম্ভের কিছুক্ষণ পরেই সিনেমাহলে আরম্ভ হোল একটা চাপা উত্তেজনা; হৈ-হৈ শব্দ। তিন-চার সারি দর্শকবৃন্দ উঠলেন দাঁড়িয়ে। কর্তৃপক্ষ পর্দায় ছবি দেখানো বন্ধ করে হলে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। আমার স্ত্রী দেখলেন বাদামী এসে হাজির হয়েছে তাঁর কাছে। তার গায়ে কাদামাখা, দুর্গন্ধ। দু-একজন টিকিট-চেকার বাদামীকে তাড়া দিয়ে বার করে দেবার প্রচেষ্টায় এসেছিলেন তার পিছু পিছু। তাঁদের জামার হাতায় ও কাপড়ে সেই কাদার ছাপ; তাকে ধরার চেষ্টার ফল। একটা হট্টগোল ও ভর্ৎসনা-বাক্য শুনতে শুনতে সিনেমা দেখা অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হোল আমার স্ত্রীকে। গন্ধ অনুসরণ করে রেলের ওভারব্রীজ পার হয়ে বাদামী এসেছে—তারপর পথিকদের তাড়নায় রাস্তার ধারের খোলা নর্দমায় পড়ে সেখানকার ময়লা-মাখা হয়ে উপস্থিত হয়েছিল সিনেমায়।

সেবার শারদীয়া পুজোর শেষে আমার কলকাতা ত্যাগ করে বাইরে যেতে হোল দিন পনেরর জন্য। ফিরে এসে বাড়ীতে পেঁছালে বাদামীর উল্লসিত অভ্যর্থনার অনুপস্থিতিতে বিস্মিত হলাম। ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রীর মুখ বিমর্ষ। 'বাদামীকে দেখছি না কেন'—অনুসন্ধান করায় জানলাম, আমার যাবার পরদিন থেকে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাদামী নিরুদ্দিষ্ট।

আমি চলে যাবার পরদিন আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়েছিলেন এক নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে, সকালেই। বিকেলে ফিরে আর বাদামীকে দেখতে পেলেন না বাড়ীতে। বাড়ীর চাকর বলল, কখন সে চলে গেছে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি। প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী তাকে খুঁজে এলেন, কোথাও পাওয়া গেল না। পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলে; তারা সঙ্গী হয়ে সুরু করল রাস্তায় রাস্তায় খুঁজতে। কে একজন বলল, এক জায়গায় লাল রঙের কুকুরকে দেখেছে দড়ি দিয়ে রেখেছে বেঁধে। তাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখলেন, সে অন্য কুকুর। আর একজন বলল, একটা কুকুর পড়েছে ট্রাম-চাপা; দেখা গেল সেও নয়। রাত্রি হয়ে এলো—সমস্ত পাড়া, বাড়ী-বাড়ী, রাস্তা, অলি-গলি খোঁজা হয়ে গেল। কুকুর পাওয়া গেল না। সে রাত্রি কেটে গেল আমার স্ত্রীর না খেয়ে। পরদিন থানায় ডায়েরি করে এলেন। তারপর ফোন করে সহকারী পুলিশ কমিশনারকে জানালেন; ইনি ছিলেন আমার এক সহপাঠীর কনিষ্ঠ। বাড়ীর চাকর সে সময়ে ছিল একজন নেপালী। সহকারী কমিশনার সন্দেহ করে তাকে হাজতে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। তিনি সন্দেহ করেন যে, নেপালীটি আমার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বাদামীকে কোথাও বিক্রী করে দিয়েছে।

সবিশেষ শুনে আমি দেখা করলাম থানা অফিসারের সঙ্গে। তিনি বললেন, সন্দেহ করে তাঁরা দিন-দশেক আসামী ধরে রাখতে পারেন; কিন্তু নেপালীটির কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি বা কুকুর চুরির অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আসামীকে তিনি ছেড়ে দেবেন বললেন। আমি সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম।

এরপর আমার স্ত্রী কেমন বিমর্ষ হয়ে গেলেন। দেখতাম সময়ে অসময়ে হঠাৎ তাঁর চোখ জলে ভরে যেত; গলার স্বর হোত গাঢ়। অনেক সময় তাঁর খাওয়া অসমাপ্ত পড়ে থাকত,—উঠে যেতেন শেষ না করে।

তাঁর হাতে মাখা ভাত-রুটি খাবার জীবটি অপহৃত।

ক্রিস্টমাস-ইভ সমাগত। সকাল সকাল আপিসের ছুটি হয়েছে। বাড়ী ফেরার পথে চৌরঙ্গীর মোড়ে দেখি একজন প্যান্ট-কোট পরা লোক—সম্ভবত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। দু'হাতে সাদায়-কালো ছোপ দুটি সুন্দর কুকুরছানা নিয়ে দাঁড়িয়ে পথিকদের স্রোত লক্ষ্য করছে। তার দৃষ্টি বলছে—নেবেন কুকুর? পাশের রাস্তায় গাড়ী রেখে এসে দর করে কিনলাম কুকুরছানা দুটি। বলল, জাতে টেরিয়ার, বয়স মাসখানেকের কিছু কম। বাড়ীতে এসে কুকুরছানা দুটি আমার স্ত্রীকে দিলে প্রথমে অবাক হলেন। একটা প্লেটে দুধ এনে ধরলে তারা ভাল করে খেল না দেখে বললেন একটা ফিডিং-বোতল এনে দিতে। এনে দিলাম, তাতে বেশ দুধ খেলো। ছানা দুটি আমার স্ত্রীর পরম যত্ন ও আদরে বড় হতে লাগল। বাদামীর শোক তিনি বিস্মৃত হলেন। বাড়ীতে আর বাদামীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় না।

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ অতিবাহিত হয়ে উপস্থিত হোল এপ্রিলের শেষ। ভোর হয় নি, —আবছা অন্ধকার রয়েছে তখনও। নতুন কুকুর দুটির অবিশ্রাম ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে সদর দরজা খুলে গেটের কাছে এসে একেবারে তড়িৎস্পৃষ্ট স্থানু হয়ে গেলাম। গেটের ওপারে বসে আছে বাদামী; কুকুর দুটি তারস্বরে চীৎকার করছে তাকে দেখেই আর বাদামী বসে আছে অকুণ্ঠিতভাবে। আমাকে দেখেই সে মুখ নীচু করে নিল, যেন কত অপরাধী। তালা খুলে গেট উন্মুক্ত করতে বাদামী এসে ঠিক আগের মত চোখ মুদে হাত চাটতে লাগল আমার। আমার স্ত্রী এসে পড়লেন ইতিমধ্যে, বাদামীকে নিলেন কোলে তুলে। সে তাঁর মুখ ও হাত চাটতে লাগল। কোল থেকে নামিয়ে দিলে দেখলাম বাদামীর শরীর হয়েছে নধর, গায়টি মসৃণ। গলায় দামী চমৎকার কলার। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম—কে তাকে রেখেছিল ধরে, কত যত্ন করেছে। বাদামী সাত মাসের অধিক তার যত্ন-আদর ভোগ করেও ভুলতে পারে নি তার শিকারসঙ্গী পুরানো মনিবকে। অবশেষে রাত্রের অন্ধকারের সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে—বা অলক্ষিতে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে ফিরে। কে জানে কতটা পথ, কত দূর থেকে চিনে সে উপস্থিত হয়েছে। তাকে কি পথ চিনিয়েছে গন্ধের স্মৃতি-সূত্র?...নিশ্চয়ই।

শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিলেন আমার স্ত্রী। পাড়ার ছেলেরা এসে বাদামীকে দেখে গেল; প্রতিবেশীরা খোঁজ নিয়ে গেলেন। দিনটি এক ছোটখাটো উৎসবের দিনে হোল পরিণত।

বাদামী হারানোর পর শিকারে এলো আমার এক গভীর নিরুৎসাহ। আলমারিতে তোলা থাকে 'ব্যাডমিন্টন' বন্দুক। বন্ধুর দলের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে কখনো যাই সঙ্গে। সে ফিরে এলে আবার নতুন উৎসাহে শিকারে যাওয়া সুরু হোল। কিন্তু কাদাজল মেখে বা যে-কারণেই হোক কয়েকবার যাবার পর বাদামীর একটা অবসন্নতা লক্ষ্য করলাম। আমার স্ত্রী একদিন বললেন, ও আর ভাল করে খেতে পারছে না, গিলতে কষ্ট হচ্ছে,—খক্-খক্ করে একটা শব্দ করছে। আমি ওর মুখ হাঁ করিয়ে গলায় টর্চ ফেলে ও পরে আঙ্গুলে দিয়ে কিছু ঠাহর করতে পারলাম না। পরদিন নিয়ে গেলাম 'ভেট'-এর কাছে। তিনি পেনিসিলিন ইঞ্জেকসন দিলেন ও বললেন, 'হিট-রে' দিতে। তাতে একটু উপকার হোল, —কিন্তু চুপ করে সে বসে থাকে; সে চঞ্চলতা হোল বিলুপ্ত।

বছর ঘুরে এলো। বাদামী সব সময়েই প্রায় পায়ের থাবার ওপর মুখ রেখে বসে থাকে। ভাল করে খায় না। কাসির জন্য করে। তাকে শিকারে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করেছিলাম আগেই। বেশ রোগা হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ আমার ডাক এলো বিদেশ যাবার জন্য; পশ্চিম জার্মানীতে, মাস তিনেক মেয়াদে। সেখানে, ফেরবার হপ্তাদুই আগে আমার ছেলের চিঠি পেলাম,—বাদামী আর কিছুই খেতে পারছে না বলে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে বেলগাছিয়া হাসপাতালে। মা, মুখ বেঁধে পাশের ঠোঁট ফাঁক করে চামচ দিয়ে দুধ ঢেলে দিতেন। কোন মতে দু-এক ফোঁটা উদরে যায়,—বাকি গড়িয়ে পড়ে যায়। বাড়ীতে ওকে রেখে শুশ্রূষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বেলগাছিয়ায় দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন, 'ক্যান্সার'।

নির্দিষ্ট দিনে দমদম এরোড্রোমে পৌঁছে প্লেন থেকে নামলাম বেলা প্রায় এগারোটায়। আমার ছেলে অপেক্ষা করছিল গাড়ী নিয়ে। মালপত্তর খালাস করে গাড়ীতে উঠে প্রথমেই হাজির হলাম বেলগাছিয়া হাসপাতালে,—যেখানে বাদামীকে রাখা হয়েছিল। শিক দেওয়া গবাক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাদামী শুয়ে আছে কুঠরির অপর প্রান্তে। চেনা যায় না, কঙ্কালসার দেহ, গায়ের সেই উজ্জ্বল রং একেবারে বিবর্ণ; লোম রুক্ষ। নাম ধরে ডাকতে মাথা তুলে কিছুক্ষণ দেখল। চোখ দুটি পিচুটিতে ভরা। উঠে কাছে এল টলতে টলতে,—একবার পড়ে গেল। শিকের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাত বুলিয়ে দিলাম তার গায়ে মাথায়। আগের মত আবার তেমনি করে সে হাত চাটতে লাগল চোখ মুদে। তার পর আর দাঁড়াতে না পেরে পড়ল শুয়ে। কতক্ষণ হয়ে গেল,—ধীরে ধীরে চলে এলাম। পরিচারক ডোমকে কিছু টাকা দিয়ে এলাম যেন যত্নের ত্রুটি না হয়। বাড়ী চলে এলাম।

একদিন পরে ডাকে চিঠি পেলাম, বেলগাছিয়া হাসপাতাল থেকে; জানানো হয়েছে, আমি চলে আসার পর বিকেলে মারা গেছে বাদামী।

শুনে—'তোমাকে শেষ দেখা দেখবার জন্য কোন রকমে সে বেঁচে ছিল'—বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আমার স্ত্রী।

হিন্দুমেলা ও অমৃতবাজার পত্রিকা

পুলকেশ দে সরকার

অমৃতবাজার পত্রিকা চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন। পত্রিকা মতে সূচনায় কয়েকজন ব্রাহ্ম ছ বছর ধরে এমন একটি মেলা করার জন্য বাংলার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬)

বছর তিনেক এর নাম ছিল চৈত্র মেলা—কেন না, তখন মেলা হত চৈত্র সংক্রান্তিতে। পরে মাঘ বা ফাল্গুনে হত। তখন নামের পরিবর্তন হল। বলা হত হিন্দু বা জাতীয় মেলা।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারীর সংখ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকা বলছেন :

'আমরা চৈত্র মেলার সাম্বৎসরিক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি পাইবামাত্র আমাদের দ্বিবিধ সুখ বোধ হইতে লাগিল, গত বৎসরের কথা মনে করিয়া, আর চৈত্র মেলা সন্নিকট বলিয়া।

'চৈত্র মেলার এক্ষণে শৈশবস্থা কিন্তু এটি আমাদের বড় প্রিয় জিনিস। চৈত্র মেলায় এই দুইটা সন্দেহ দূর করিয়াছে। প্রথম আমাদের স্বদেশের উপর অদ্যাপি কিছু টান আছে, দ্বিতীয় আমরা যদি এক প্রকার মরিয়া আছি তবু এতটুকু জীবনী শক্তি আমাদের আছে যে, আমরা আপনার কিছু একটা করিয়া তুলিতে পারি। বাঙ্গালীদের নিজের এই কয়েকটি সামগ্রী—ব্রাহ্ম সমাজ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান আর এই চৈত্র মেলা। ইহার মধ্যে প্রথমটি একেবারে, দ্বিতীয়টি কিয়ৎ পরিমাণে জাতীয় বন্ধন ছেদন করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য অনুরূপ। ইহাতে জাতীয় বন্ধন যেখানে যেখানে শিথিল হইয়াছে, তাহাই দৃঢ় করিবে, ও নির্বোধ, গোঁড়া ও স্বার্থপর ব্যক্তিগণ সমাজে যে সমুদয় আঘাত করিয়াছে তাহাতে স্নিগ্ধকারী ঔষধ দিবে।"

১১ই মার্চ "চৈত্র মেলার বিজ্ঞাপন" বেরোয়। তাতে ১৬টি বিষয়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যাঁরা লেখা দেবেন তাঁদের তা ১০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ন্যাশনাল প্রেসে ২০শে চৈত্রের মধ্যে পাঠাতে হবে, আর যাঁরা প্রদর্শনীর জন্য জিনিস দেবেন তাঁরা যেন শোভাবাজার রাজবাটিতে কুমার সুরেন্দ্রকুমার দেবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন. তিনি অথবা ব্রজনাথ দেব তার রসিদ দেবেন। সম্পাদক—শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সহকারী সম্পাদক—শ্রীনবগোপাল মিত্র।

২২শে এপ্রিল মেলার বিবরণ দেওয়া হয় :

'গত বৎসর অপেক্ষা এবার অধিকতর সমারোহের সহিত কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ......কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থান সংকীর্ণ ও উত্তম বন্দোবস্ত না হওয়ায় ভারি গোল হইয়াছিল। এমন কি আমরা শুনিলাম অনেকগুলি ভদ্রলোককে ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। এদেশজাত অনেক জিনিসপত্রের আমদানী হইয়াছিল। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পজ দ্রব্যও বিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছিল। ... বিশেষ আহ্লাদের বিষয়, সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র বেণী সংহার নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যশালাটি অতিশয় অপ্রশস্ত হইয়াছিল এবং এই অভিনয় দেখিতে লোকের এত সমাগম হয় যে, তাঁহারা অভিনয় ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন।... অনেকগুলি ভদ্র সন্তান ব্যায়াম চর্চার পরীক্ষা দেন। তাঁহাদের নৈপুণ্যতা দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।......স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা চৈত্র মেলার বিশেষ বর্ণন এবার করিতে পারিলাম না।'

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী "জাতীয় মেলা"—এই শিরোনামায় অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন :

'আর কয়েক দিবস পরে আমাদের জাতীয় মেলা উপস্থিত হইবে। এ মেলাটির উদ্দেশ্য আমোদ নয়, ইহার উদ্দেশ্য টক্কর দেওয়া নয়, ইহার উদ্দেশ অতি মহৎ। এরূপ একটি উৎসব করিবার নিমিত্ত যশোহরের একটি পরিবারের উন্মাদ হন, কিছু অর্থ ব্যয় করেন এবং অনেক স্থলে ভ্রমণ করেন, সংবাদপত্রেও ঐ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক হয়, কয়েকখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবিষয় বিজ্ঞাপিত করা হয়। কিন্তু বস্তুত ব্যাপারটি যত বৃহৎ, ইহার উদ্যোগকারীরা তত যোগ্য ছিলেন না, অথবা তাঁহারা অসময়ে উদ্যোগ করেন বলিয়া ইহাতে কয়েকজন বড় বড় লোককে ব্রতী করা ব্যতীত আর কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হন না।......মেলার এই তৃতীয় বৎসর, কিন্তু এক্ষণ পর্যন্ত কলিকাতার কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইহাতে তাদৃক উৎসাহ কি যত্ন দেখায় নাই। আমরা মেলায় গিয়া কোথায় এত লোকের সমাগম দেখিব যে গমনাগমনের পথ পাইব না, আর এক্ষণ কলিকাতায় একটি সামান্য ভাসানে চিৎপুরের রাস্তায় যত লোকের ভিড় হয়, ইহাতে অহাও হয় না।

দেশে নূতন গবর্ণর জেনারেল আইলে জমিদারগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ধাবিত হন, ডিউকের উপস্থিতকালে ধনী নির্ধন মূর্খ পণ্ডিত সকলে নগর পরিপূর্ণ করিলেন, কিন্তু জাতীয় মেলা— যে মেলার উদ্দেশ্য আমাদের মুমূর্ষু দেশে পুনর্জীবন সঞ্চার করা, তাহা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে কাহার স্পৃহা হয় না। দেশীয়গণ কি এটিও মনে করেন না যে, মেলাটি আমাদের নিজের?

'যিনি কখনও ভারতবর্ষের হীনাবস্থার কথা মনে করিয়া বেদনা পাইয়াছেন, যিনি কখন আপনারদিগের পূর্বপুরুষগণের বীর্য ও শৌর্যের বিষয় মনে করিয়া আপনাদিগকে তদ্বংশোদ্ভূত বলিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন, যিনি কখন স্বাধীন অবস্থার মধুরতা চিন্তা করিয়াছেন, যিনি কখন বীররস পান করিয়াছেন, যিনি কখন দেশীয়গণের হীনবল বুদ্ধি ক্ষমতা দেখিয়া চক্ষুর জল

ফেলিয়াছেন, অথবা যিনি আপনার সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে উচ্চপদারূঢ় হয় বাসনা করেন, যিনি আপনার যে কোন অহংকার, আশা ও স্বার্থ চান তাঁহার কর্তব্য ইহাতে যোগ দেওয়া।'

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আর একটি প্রবন্ধে লেখেন :

'এ বৎসর চৈত্র মাসে না হইয়া ফাল্গুন মাসে হওয়ায় মেলায় উপস্থিত সকলে গ্রীষ্ম কর্তৃক তত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পূর্ব বৎসর অপেক্ষাও এবার আয়োজনের কতক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।......মেলাতে......কথকতা, রাসায়নিক প্রদর্শন, লিখিত বক্তৃতা পাঠ, গান, কৃত্রিম ফলফুল, কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষি উপযোগী যন্ত্রের প্রদর্শন, বাঙলা পুস্তক, তদ্ভিন্ন ফলফুল কারুকার্য্য এবং শেষ দিন কুস্তি লাঠি খেলা নৌকার বাজী প্রভৃতি হয়।......

'আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এসঙ্গে শারীরিক বল-বীর্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা।...অমারা বোধহয় কুক্কামিনীর চারুকার্যের পারিপাট্যতার কথা অপেক্ষা অনেকে মেলায় ঘোড়দৌড়ে দুজন বিকলাঙ্গ হইয়াছে, লাঠি খেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুঁড়াতে একজন মরিয়াছে' শুনিলে অসংখ্য গুণে সন্তুষ্ট হইতাম।"
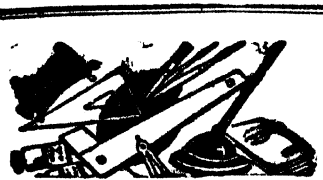
১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার হিন্দুমেলা সম্পর্কে লেখেন :

'হিন্দুমেলায় এবার ভারি উৎসব হয়। এবার বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল। শনিবার আরম্ভ হইয়া সোমবার উহার অবসান হয়। এবৎসর প্রদর্শন নিমিত্ত অনেক নূতন নূতন দ্রব্যও নীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সীতানাথ ঘোষের নূতন প্রণালীর এক তাঁত উপস্থিত হওয়ায় এবার মেলার বিশেষ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। বাবু সীতানাথ ঘোষের নিবাস যশোহরে।'

২রা মার্চের আরও এক মন্তব্যে বলা হয় : 'ব্যায়াম চর্চার প্রথম সোপান নবগোপালবাবু দেখাইয়াছেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ব্যায়াম চর্চা করিবার মাঘ মেলাও তাঁহারই যত্নে হইয়াছে। কিন্তু সকলে না মিশিলে এক নবগোপালবাবুর দ্বারা কিছু হইবে না। বাঙলার প্রতি স্কুলে কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হউক। যিনি দেশহিতৈষী তাহার ক্ষণকাল তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।'

পরের বছর "জাতীয় মেলা" দেখে অমৃতবাজার সুখী হতে পারেননি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী লেখেন : 'জাতীয় মেলা আমাদের সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নত করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সুতরাং ইহাতে যত কৃতকার্য হইব আমাদের উপকারও তত হইবে। গত রবিবার এই মেলা অনেক আশা-ভরসা লইয়া দেখিতে গেলাম কিন্তু নিরাশ হইলাম।

'মেলাতে যে কয়েকটি বিষয়ের প্রদর্শন হয় তাহা দেখিলে সহসা বোধ হয় এটি ইংরেজ মেমদিগের ফ্যান্সি ফেয়ারের ন্যায় একটি আমোদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

'মেলার হিতাকাঙ্ক্ষীগণ এটি দেখিয়া বেদনা না পাইয়া থাকিতে পারেন না। যদি প্রতিষ্ঠাতাগণের মেলাটি শেষে ইহাই করিয়া তোলা উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা বলি, উহাতে কাজ নাই।'

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মেলা বসবার কিছুদিন আগে এই সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা একটি পৃথক প্রবন্ধ লেখেন ; তাতে মেলা সম্পর্কে পত্রিকার ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হয়।

'ফাল্গুন মাসের ৫ তারিখে জাতীয় মেলার সমাবেশন হইবে। স্রোতের গতির দিক পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায় সেই দিকে অনেকের টনক নড়িয়াছে। বাবু রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব পাঠে শ্রোতাদের অফুরন্ত উৎসাহ দেখা যায়।......আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মেলাটি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয় এবং অনেক লোকেরও সমাবেশ হয়।......হিন্দু সমাজ ভিন্ন দেশীয় রাজার অধীনে অবস্থিত, এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রাদুর্ভাব। এক্ষেত্রে বলঃক্ষয়ী সমাজকে পুনঃ সবল করা কঠিন কাজ।...জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য যদি হিন্দু সমাজকে এক সূত্রে আবদ্ধ করা লক্ষ্য হয় তাহা হইতে অনেক বিলম্ব আছে এবং বিলম্বে হওয়ারও সন্দেহ আছে। মেলার কর্তৃপক্ষরা ইহাকে আপাততঃ এক সূত্রে গ্রথিত করিতে না পারিলেও উহার পুনর্জীবনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।......

'বাবু নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় ব্যায়াম চর্চা নিমিত্ত অনেনকগুলি স্কুল খুলিয়াছেন কিন্তু সাফল্যের মুখে বিঘ্ন অনেক।'

মেলা সম্পর্কে ২০শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লেখেন :

'এবারের হিন্দু মেলা যথারীতি তিন-দিনব্যাপী (শনি—সোম) কলিকাতা হইতে তিন ক্রোশ দূরে নৈনানে বাবু হীরালাল শীলের বাগানে বহু লোকের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যখন দেশীয়গণের মধ্যে এরূপ কোন নিঃস্বার্থ উৎসব দেখি, তখনই আমরা পুনর্বার যে জীবিত হইব এই আশায় আশান্বিত হই।

'মেলা আজ কয়েক বৎসর অপ্রতিহত-ভাবে হইল। এখন আমাদের কতক কতক ভরসা হয় যে, এটি বুঝি স্থায়ী হইয়াছে ; কিন্তু যখন আমরা উহার প্রথম বৎসরের উদ্যোগ ও উৎসাহ সমারোহের সহিত বর্তমান কি গত বৎসরের কথা মনে করি, তখন আবার হতাশ হই। প্রথম বৎসর মেলায় ঘোড়দৌড় প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরুষিক কাজ হয়......কিন্তু এখন সে বীরত্ব নাই।... তত্রাচ, ৬ বৎসর যখন উহা জীবিত আছে, উহার প্রণেতার যখন উৎসাহ সমানভাবে আছে, যখন শত শত লোক রৌদ্র ধূলা দুঃখ কিছুই মনে না করিয়া মেলায় উপস্থিত হয়, তখন ইহা দ্বারা যে কিছু উপকার হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।......

মেলার কর্তৃপক্ষীয়গণের উদ্দেশ্য মহৎ। ...আমাদেরও এই মত যে উহা এইরূপ আমোদ ও উৎসাহের কাজ করা উচিত যাহাতে আমাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়।......নবগোপালবাবু একা, তিনি আপনার ধন-প্রাণ সমুদায় মেলার নিমিত্ত বিসর্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।...দেশের মধ্যে আপাতত রাজনৈতিক সম্বন্ধে লোকের স্বার্থ ক্রমেই উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং তিনি যদি কোথায় কোন অত্যাচার হইতেছে মেলাদ্বারা নবগোপালবাবু তাহা সংগ্রহ করেন তবে বিস্তর উপকার হইতে পারে। তিনি যদি বারওয়ারির সং কি দেবদেবীর উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে না চান, তবে এক কাজ করিতে পারেন। তিনি পুতুল দ্বারা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক দুর্দশা প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।'

এমনি প্রতি বছর হিন্দু জাতীয় মেলা অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিত স্থান পেয়েছে।

পাঠকের বৈঠক

নেহরু জীবন সায়াহ্নে

পণ্ডিত জওহরলাল সম্পর্কিত নানা ধরনের পুস্তিকা ও আলোচনা গ্রন্থ প্রায় প্রতি মাসেই প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত। নেহরুর জীবনের সংগে জড়িয়ে আছে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের অংশ বিশেষ, তাই নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া এক হিসাবে ভালো। অনেক তুচ্ছ ঘটনাও প্রকাশ হয়ে পড়ে এই সূত্রে। নেহরুর মৃত্যুর পর লন্ডনে একটি ট্রাস্ট গঠিত হয় তাঁর স্মৃতির প্রতি মর্যাদাদানের উদ্দেশ্যে। এই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। প্রতি বছর নেহরু স্মারক বক্তৃতাদান এই ট্রাস্টের একটি মুখ্য কর্ম। গত বছর নেহরু বক্তৃতা দান করেন লর্ড বাটলার। লর্ড বাটলার চার্চিলের দক্ষিণ হস্ত এবং কনসারভেটিভ পার্টির একজন প্রধান নেতা। সেই মানুষটির বক্তৃতার বিষয় নেহরুর জীবন এবং মানসিকতা। নেহরু সম্পর্কে এই টোরী এম-পি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে আলোচনা করেছেন। নেহরুর প্রতি তাঁর এই সপ্রশংস ভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লর্ড বাটলারের খুল্লতাত স্যার হারকোর্ট বাটলার ছিলেন যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর। তিনি মতিলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বাটলার মতিলাল নেহরুর সংগে তাঁর পিতৃব্যের বন্ধুত্বের প্রসংগে বলেছেন:

> "Jawaharlal indignantly denies—that my uncle sent his father Champagne in gaol, but—my researches in family archives go to show that the Champagne was sent by a Jemadar".

এই উক্তির ফলে এদেশে প্রচলিত একটি পরিচিত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া গেল।

লর্ড বাটলার প্রতিটি ছত্র লিখেছেন প্রীতি ভরে। তিনি ১৯৩৫ গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই বিষয়ে নেহরুর সংগে পরে তাঁর কথা হয়েছে এবং তাঁর বিশ্বাস যে এই আইনের দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের সংগে ভারতবাসীর সম্পর্কে যে চিড় খেয়েছিল তা সম্পূর্ণ মেরামত হয়ে যায়। এই বোঝাপড়ার মনোভাব নেহরুর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। নেহরু ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ তাই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। লর্ড বাটলার মনে করেন আধুনিক কালের উদারনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ফেবিয়ান পন্থাতিয় সমাজতন্ত্রবাদ নেহরুর মনের গভীর গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে টলাতে পারেনি। নেহরু এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত যে 'কমনওয়েলথ পার্টিছাড়া'র বন্ধন ছিন্ন করেননি এতে লর্ড বাটলার ভারী খুশি।

লর্ড বাটলার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন:

> "Before his death Nehru had become what he himself had earlier declared Gandhi to be the Father of India—"

লর্ড বাটলার জানেন না বোধহয় যে সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম গান্ধীজীকে 'ফাদার অব ইণ্ডিয়া' বলে সম্বোধন করেন। অনেক মজার উক্তি সত্ত্বেও লর্ড বাটলারের এই ২৬ পৃষ্ঠার ভাষণটি আধুনিক ভারতের ইতিহাস গবেষকের কাজে লাগবে।

নেহরু সম্পর্কে আর একখানি জীবনী লিখেছেন মেরী সেটন। গ্রন্থটির নাম—'পণ্ডিতজী:—এ পোর্ট্রেট অব জওহরলাল নেহরু।' জওহরলালের জীবনী লিখতে গিয়ে মেরী সেটন নেহরুর রেখাচিত্র এঁকেছেন কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখায়। সেই সংগে জড়িয়ে আছে ভারতের সামাজিক ইতিহাস। মেরী সেটনের বিষয়বস্তু নেহরু। নেহরুকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে গত কুড়ি বছরের ভারতবর্ষ, তাই এই গ্রন্থটিও ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ।

মেরী সেটন অনেক ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট, তাই এই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো আছে অসংখ্য কাহিনী, অনেক ব্যক্তিগত তথ্যের খুঁটিনাটি খবর।

এই গ্রন্থটিকে তাই ব্যক্তিগত স্মৃতি কাহিনী বলা যায়। মেরী সেটন গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের স্পর্শলাভ করেছেন। কাহিনী শুনেছেন স্বয়ং স্বকর্ণে, নয়ত এর ওর তার কাছে। ইন্দিরা গান্ধীর সংগে তাঁর সখীত্ব হয়েছে, আর তিন মূর্তি মার্গের নেহরু ভবনের কর্মী উষা ভগত, বিমলা সোনধি ও মদনমোহনের কাছ থেকেও অনেক সংবাদ কুড়িয়ে নিয়েছেন।

মেরী সেটনের পরিবেশন ভঙ্গীটুকু নাটকীয়, তাতে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে। যেটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন তা যেমন স্পষ্ট আকৃতি লাভ করেছে তেমনি যা তাঁর গোচরের বাইরে তাকেও তিনি রঙে-রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন।

মেরী সেটন জওহরলালের এই জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম যুগের ঘটনা বিধৃত করেছেন, অনেক টুকরো সংবাদকে ভিত্তি করে নতুন করে গড়ে নিয়েছেন নানা ঘটনা।

কমলা নেহরুর রোগ যন্ত্রণা, তাঁকে নিয়ে নেহরুর উদ্বেগ প্রভৃতি অতিশয় সুন্দর ভঙ্গীতে লিপিবন্ধ করেছেন মেরী সেটন। ইন্দিরা তখন ছোট, মার এই দুঃখ, পিতৃদেব অধিকাংশ দিন কারাগারে, বেচারী ইন্দিরা একাকী কিভাবে অসহায়ের মত দিন কাটায় নিরালা নির্জনে, তার সুন্দর ছবি এঁকেছেন। সেই সংগে লেখিকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পর্কিত কথাও আছে, নেহরুদের সংগে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই অনেক মানুষের সংগে তাঁর দেখা হয়েছে।

লেখিকা কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। কৃষ্ণ মেননকে দেখে তাঁর ভালো লাগে। মেনন সাহেবের কঠোর পরিশ্রম করার শক্তি ও সাধারণ ভঙ্গীটুকু লেখিকার অন্তরকে স্পর্শ করে। মেনন সাহেবের আচরণ অতি রূঢ় এবং রুক্ষ এই কথা সবাই বলেন। কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে ভালো কথা কেউ বলেননি। এদেশে ও বিদেশের লোক এবং সাংবাদিকবৃন্দ কৃষ্ণ মেননের মেজাজের বিষয় ফলাও করে লিখেছেন। মেরী সেটন কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক পরিচয়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর তিনি অনেক সহজ এবং সরল। কৃষ্ণ মেনন তাঁর ব্যক্তিগত মত ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসেন, তার পিছনে বাতিক-গ্রস্তের মত পরিশ্রম করেন। কৃষ্ণ মেননের তাই গুরুগিরিতেও লোভ নেই, চেলা হওয়ারও আকাঙ্ক্ষা নেই। মেরী সেটনের মতে মেনন সম্পর্কে অনেক ধারণা ভ্রান্ত এবং ভুলের ভিত্তিতে গড়া। তিনি নিজস্ব মতবাদ আঁকড়ে থাকতে চান, রুশ বিপ্লবের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তাই তিনি রাশিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর এই কারণেই সাধারণের বিশ্বাস তিনি কম্যুনিস্ট। মেননকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার একটা চেষ্টা এই গ্রন্থে আছে। নেহরুর সহকর্মী মেননের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই। নেহরু প্রবল প্রতিবাদের মুখেও মেননকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তারপর এল চৈনিক আক্রমণের কাল। মেরী সেটন সেই কালের কাহিনী লিখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে। নেহরুর বাসভবনে তখন তাঁর নিত্য যাতায়াত। তিনি একরকম পারিবারিক বন্ধুদের সমগোত্রীয়। সেই কালে তিনি দেখেছেন নেহরু দিন-দিন কত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন. নিঃসঙ্গতার দুঃখ তাঁকে গ্রাস করছে। যে নেহরুর মধ্যে

ছিল প্রচন্ড প্রাণশক্তি, সেই নেহরু যেন সহসা বীতবহ্নি। তাঁর সামগ্রিক শক্তির উৎস যেন সহসা রুদ্ধ হয়ে গেছে। মেননকে ত্যাগ করতে হয়েছে এবং শেষ জীবনটা এক রকম একাকী কাটাতে হয়েছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেননকে পরিত্যাগ করতে তাঁর নিরতিশয় দুঃখ হয়েছে। মেরী সেটন বলেছেন যে মেননের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কুণ্ঠিত।

মেরী সেটন মানুষ নেহরু ও রাজনৈতিক নেতা নেহরুর এক আশ্চর্য নিখুঁত চিত্র এ'কেছেন। চৈনিক আক্রমণের সময় নেহরু নাকি বলেছেন, আমি নাকি আমারই স্বদেশস্থ ভূমি আক্রমণে অগ্রাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেছি। এর চেয়ে কঠোর পরিহাস আর কি হতে পারে।

মেরী সেটনের এই জীবনী গ্রন্থে নেহরুর সঙ্গে মেননের প্রতিকৃতিও অনেক সহৃদয় ভঙ্গীতে তুলে ধরা হয়েছে। মেননের সম্পর্কে এত তথ্য এবং সংবেদনশীল উক্তি বোধ করি ইদানীংকালে আর কেউ করেননি। মেননের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি ইতস্তত ছড়ানো মাল-মশলার মধ্যে গড়ে উঠেছে। উত্তরকালে যাঁরা মেননের জীবনচরিত নিয়ে গবেষণা করবেন মেরী সেটনের গ্রন্থটি তাঁদের কাজে লাগবে। তাছাড়া নেহরুর শেষ জীবনের কয়েকটি করুণ মুহূর্ত তিনি তুলে ধরেছেন অসামান্য নিপুণতায়।

আর একখানি গ্রন্থ মিঃ আর কে করনজিয়া লিখেছেন নেহরুর জীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। আগামীবারে সেই গ্রন্থটি আলোচিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

---

(1) Jawharlal Nehru: The struggle for Independence! By Lord Butler: Cambridge University Press. Price 5 Shillings.

(2) Panditji: A Portrait of Jawharlal Nehru! By Marie Setrn: Dobson Books Ltd., London. Price 63 Shillings.

নবকান্ত বরুয়া: নতুনকালের সর্বাধিক উল্লেখ্য অসমীয়া লেখক॥

অসমীয়া সাহিত্যে নতুন কালে যে-সব কবিদের আবির্ভাব হচ্ছে, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম হলো নবকান্ত বরুয়া। পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকেই অসমীয়া সাহিত্যে একটি নতুন বোধ এবং কবিতার নতুন রীতির প্রবর্তন করেন এবং মাত্র এক দশকে মধ্যেই অসমীয়া কবিতায় একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন। অসমীয়া কাব্য-সাহিত্যে এমন বৈচিত্র্য নিয়ে সাম্প্রতিক কালে আর কোনও কবির আবির্ভাব হয়েছে কিনা, সন্দেহ।

নবকান্তের পিতা ছিলেন একজন স্কুল ইন্সপেক্টর। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেন নবকান্ত বরুয়া। জন্ম ১৯২৬ সালে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবকান্ত বরুয়া আসামের জাতীয় কবি এবং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শৈশব থেকেই নবকান্তের মনে কবিতার প্রতি একটা অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। স্কুল-জীবন নওগাঁতে কাটালেও তাঁর কলেজ-জীবন অতিবাহিত হয় শান্তিনিকেতনে। ঐচ্ছিক বাংলাসহ ইংরেজি অনার্স নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে বি-এ পাশ করেন। এম-এ পাশ করেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'হে অরণ্য হে মহানগর' (১৯৫১)। এই গ্রন্থটি রচনার পটভূমি রচনা করেছে কিন্তু এই শিল্পনগরী কলকাতা। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কবি-বন্ধু অমূল্য বরুয়া প্রাণ হারালেন। বন্ধু বিয়োগের তীব্র বেদনাই তাঁর উক্ত গ্রন্থের পটভূমি রচনা করেছে। 'হে অরণ্য' বলতে তিনি মূলত আসাম এবং 'হে মহানগর' বলতে বুঝিয়েছেন কলকাতাকে। তিনি এই গ্রন্থে দুটি ভাবনার সংঘর্ষে যেন দোলায়িত। মহানগরীর রুক্ষতায় অরণ্য-জীবনের নির্জনতাকে উপলব্ধি করলেন, আবার অরণ্যজীবনে অনুভব করলেন চলমান ও গতিশীল নগরজীবনকে। এরপর তাঁর 'এটি দুটি এঘারোটি তারা' (১৯৫৮), 'যদি আরু কেইটমান স্কেচ' (১৯৫৮) গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থদুটিতেও নগর-সভ্যতার রুক্ষতা বর্ণিত হয়েছে। 'সম্রাট' (১৯৬২) এবং 'রাবণ' (১৯৬৪) সালে প্রকাশিত হয়। 'সম্রাট' আসলে একটি দীর্ঘ কবিতা। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রকে এখানে কবি প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"মানুহর রাষ্ট্র-সত্তার প্রতীকর সন্ধান করোঁতে মোর আগত থিয়-দিলেহি অন্ধ স্থবির সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রর ছায়ামূর্তি। শত্রুনীতির ক্ষেত্রও কৌটিল্য মেকিয়াভেলি আনকি অনুগীতার ভীষ্মও কেবলমাত্র আংশিক। রাবণর রাজনীতিও চাণক্যসূত্রীয়া। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র একক, সম্পূর্ণ। কল্যাণকামী আরু শক্তিসন্ধ—রাষ্ট্রর এই দুয়োটা রূপতেই এটা কথা স্পষ্টকৈ প্রতীয়মান হয় যে, মানুহর রাষ্ট্র-বিধি কেবলমাত্র অতীতর অভিজ্ঞতাতেই গঢ়ি উঠে—ভবিষ্যতর কথা ভাবিলেই কার্লমার্ক্সর দরে রাষ্ট্রকে হেরুয়াই পেলাবলগীয়া হয়।" রাষ্ট্রের গভীর ঊর্ণাজালে ঢাকা রয়েছে মানুষের হৃদয়ের ক্রন্দন। 'সম্রাট' গ্রন্থটি থেকে একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে কবির মনোভাবকে এখানে আরো স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা যাচ্ছে—

"প্রেম চির বিকল্প বিহীন,
প্রেমতো নহয় কোনো পার-পত্র গভীর নিষ্ঠার,
প্রেম সিহে সুপরিপূর্ণ খর্বতার,
প্রেম নোহে অন্ধ মনসিজ,
মনর সি সন্দীন শিখা।
প্রেম নোহে মহীয়ান, মহত্তর জনক কেবল।
প্রেমর করিলা মাপ তুলাযন্ত্র আনি বৈরাগ্যর।
প্রেম নোহে সমব্যথা, প্রেম সঞ্জীবন, আরু
জীবনর পরিমাপ নাই" (পৃঃ ৯)

শিশু-সাহিত্যিক, অনুবাদক, গীতিকার এবং প্রাবন্ধিক হিসেবেও নবকান্ত বরুয়া অসমীয়া সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর যে সমস্ত শিশু-সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে 'শিয়ালি পালে গৈ রতনপুর' (১৯৫২), 'আখবর জখলা' (১৯৫৬) উল্লেখ্য। দ্বিতীয় গ্রন্থটির জন্য আসাম সরকারের পুরস্কার লাভ করেছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনুল্লেখ্য নয়। 'কপিলি পরীয়া সাধু' ('৫৩) উপন্যাসটি অসমীয়া সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। গানের সংকলন 'মনের খবর', রম্যরচনা 'রমনীয়া' (১৯৬৪), শিল্প ও সংস্কৃতির লেখা প্রবন্ধ সংকলন 'মোর এ-ভারতের' এবং 'অসমীয়া ছন্দ শিল্পের ভূমিকা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও তাঁর খ্যাতির অন্যতম উপাদান।

অনুবাদক হিসেবেও তাঁর স্থান প্রথম শ্রেণীতে। সাহিত্য আকাদমী সংকলিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি আসামী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের Towards Universal Man, নাটক 'মুক্ত ধারা' এবং নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'ও অসমীয়াতে অনুবাদ করেছেন। হুইটম্যানের কবিতার একটি অনূদিত সংকলনও প্রকাশে

নবকান্ত বরুয়া

অপেক্ষায় আছে। আধুনিক বাংলা কবিতারও কিছু কিছু অনুবাদ তিনি করেছেন। নবগ্রন্থ বরুয়া সম্বন্ধে এত সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সামান্য পরিচিতি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো। উদ্দেশ্য প্রতিবেশী সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা।

পাঞ্জাবী কবিতার অনুবাদ ॥

শ্রীমতী প্রাভজট কাউর একজন সুপরিচিত পাঞ্জাবী লেখিকা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তিনি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি তাঁর কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'অধিতাকা'। এর আগেও তাঁর কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে এর আগে এর চেয়ে বৃহৎ গ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে যাঁরা পাঞ্জাবী জানেন না, তাঁরাও তাঁর কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

কিন্তু কয়েকটি অনুবাদ ছাড়া বাকি অনুবাদগুলি খুবই দুর্বল হয়েছে। দুর্বল অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অবশ্য মন উদার রাখলে এ-থেকেও কবিতা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া অসম্ভব নয়। শ্রীমতী কাউরের কবিতার প্রধান গুণ সরলতা এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা।

ভারতীয় সাহিত্যে অনুবাদ ॥

১৯৬৫ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় অনুবাদ ভারতীয় ভাষায় খুব একটা অগ্রাধিকার না পেলেও মোটামুটিভাবে একটি উল্লেখ্য স্থান অধিকার করেছে। ৮৪২টি গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে সাহিত্যের গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে ২৯৪টি। সাহিত্য গ্রন্থ সর্বাধিক অনূদিত হয়েছে বাংলায়—মোট ৫৪টি। এর পরেই হিন্দিতে হয়েছে ৪৯টি। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখা গেছে, অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা হিন্দিতে ১৮৫, মারাঠিতে ১৩৫, গুজরাটিতে ১১৪ এবং বাংলায় ১০৪। মোট ৮৪২ অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে আবার ৩৩০টি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে একটি ভারতীয় ভাষা থেকে অন্য ভারতীয় ভাষায়। এই ভারতীয় ভাষাগুলির ১১৯টি অনূদিত হয়েছে সংস্কৃত থেকে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বাংলার অনুবাদ হয়েছে সর্বাধিক—মোট ৫৯টি। হিন্দির হয়েছে ৪৭টি। ভারতীয় ভাষায় যে সব গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে তার মধ্যে ইংরেজি থেকেই হয়েছে সর্বাধিক—৪০২টি। এর পরেই রুশ ভাষা থেকে মোট ৩০টির অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যের এই হল এক বছরের ইতিহাস। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ। অন্তত দুটি পত্রিকা এদিক থেকে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে—তার মধ্যে একটি বোম্বে ও অপরটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ বিষয়ে আরও আগ্রহী হবার এখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

মাদ্রাজে রবীন্দ্র জন্ম-দিবস ॥

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রচারের দিক দিয়ে মাদ্রাজের "টাগোর আকাদমী"র অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থাপিত হয়। সেই থেকে এঁরা রবীন্দ্র সাহিত্য প্রচার এবং প্রসারের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। সম্প্রতি ৮ দিন-ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এঁরা রবীন্দ্র জন্মদিবস পালন করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে মাদ্রাজের "সেন্টিনারী এক্সজিবিশন হল"-এ একটি রবীন্দ্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীচন্দন দেবনেসেনের উপস্থিতিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি, তাঁর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সময়ে তোলা ছবি ছাড়াও তাঁর আঁকা বিভিন্ন ছবিও প্রদর্শনীতে স্থান পায়। কিন্তু সর্বাধিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে ১৯১৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কবির স্বহস্তে অনূদিত জন-গন-মন-এর ইংরেজি অনুবাদ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এতে যোগদান করেন। সোভিয়েট কন্সাল জেনারেল শ্রীকাভেরিন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং জানান যে, রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা অনূদিত হয়েছে। আমেরিকার ডঃ বার্টন গেটইন বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিশ্বমানব। বিশ শতকের তিনি অন্যতম মানবতন্ত্রী মানুষ। তাঁর সাহিত্যে এই বিশ্বমানবতাই প্রসারিত।"

শ্রীমতী বালামুরলী কৃষ্ণ, শ্রীমতী মণিকৃষ্ণস্বামী, শ্রীযশুদাসন, শ্রীপবিত্র দে এবং শ্রীঅরুণ ব্যানার্জি প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মাদ্রাজের "চিলড্রেন্স থিয়েটারের" উদ্যোগেও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীমতী প্রীতি ঘোষের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি রবীন্দ্র-নৃত্য প্রদর্শিত হয়। কুমারী প্রেমা চতুর্বেদী ও কুমারী রথা কর্তৃক পরিবেশিত "আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে" নৃত্যনাট্যটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন কুমারী বঙ্গালোর লতা, শ্রীমতী পি লীলা, কুমারী শৈলশ্রী, শ্রীমতী কেকা ভরত, শ্রীমতী জয়কৃষ্ণান, শ্রীমতী মালিনী কস্তুরীরঙ্গম, শ্রী এম রায়চৌধুরী, শ্রীপার্থ ঘোষ, শ্রী পি বি শ্রীনিবাস, শ্রীযশেদাশন, শ্রীপবিত্র দে ও শ্রীশর্মা।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এই উদ্যোগ যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স সংস্থা ॥

আমেরিকায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে সবচেয়ে সম্মানের ব্যাপার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস' এর সভ্য নির্বাচিত হওয়া। সম্প্রতি আমেরিকার নয়জন সাহিত্যসেবী, চিত্রকর ও সঙ্গীত-রচয়িতা এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ঔপন্যাসিক নর্মান মেইলার; কবি ও জীবনীকার মরিয়েল রুকেসিয়ার, চিত্রশিল্পী রিচার্ড ডিবেনকর্ন, যোসেফ হিরসখ এবং উইলিয়াম থন, সঙ্গীত-রচয়িতা উইলিয়াম বের্গসমা, গুন্থার স্কুলার এবং রবার্ট ওয়ার্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছেন চিত্রশিল্পী ডেভিড বুরলুইক। এই সম্মানের খবর জানার আগেই বুরলুইক পরলোকগত হন। ১৯১১ সালে জার্মানীতে আয়োজিত 'দার ব্লু রিটার' চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিমূর্ত শিল্পের রচয়িতার আখ্যা দেওয়া হয়।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এই সংস্থাটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য সাহিত্যের মান উন্নত করা ও বছরে কয়েকটি সাহিত্যের ও শিল্পের পুরস্কার দান করা।

এই সংস্থার ১৯৬৭ সালের পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে ঔপন্যাসিক ক্যাথারিন আনি পোর্টার এবং ঐতিহাসিক-জীবনীকার আর্থার এম শ্লেসিংগার (ছোট)। ক্যাথারিন ১৯৪১ সালে এই সংস্থার সভ্য নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। অধ্যাপক শ্লেসিংগার নির্বাচিত সভ্য হন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে।

ইনস্টিটিউটের এই পুরস্কার দশটি বিষয়ের উপর দেওয়া হয়। প্রতি বছর দুজন করে তা পেয়ে থাকেন। ১৯৬৬ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন প্রখ্যাত ভাস্কর জ্যাকস লিপচিৎস ও প্রখ্যাত গীতিকার ভার্জিল থমসন। ১৯৬২ সালে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য উইলিয়াম ফকনারকে পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ইতিহাসের জন্য পেয়েছিলেন স্যামুয়েল এলিয়ট মরিসন।

একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক ॥

জুলিয়ে গ্রাক ফরাসী সাহিত্যের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক। প্রচার বিমুখ এই লেখকের নিজেকে 'ম্যান অব লেটার্স' আখ্যা দিতেও আপত্তি। বলা যায় সাহিত্যজগতে তিনি একজন অচেনা

লোক। অথচ যখন ফরাসী দেশে কাফে রেস্তোরাঁয় সাহিত্য নিয়ে চুলচেরা মাতামাতি সে সময় নিজেকে এই স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে গ্র্যাক কিন্তু অমর ও জনপ্রিয় কাহিনী রচনা করে গেছেন। অবশ্য সস্তা কাউন্টার সেল হবার মতো কাহিনী তিনি রচনা করেন না। গ্র্যাক লেখেন অত্যন্ত কম। তাঁর নির্বাচিত পাঠকশ্রেণী বৎসরাধিককাল অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর পরবর্তী কোন বইয়ের জন্য যা পূর্ববর্তী রচনার একেবারে বিপরীতধর্মী। গত তিরিশ বছরের মধ্যে গ্র্যাক উপন্যাস লিখেছেন মোট চারটি, একটি কাব্যগ্রন্থ, চারটি সমালোচনা গ্রন্থ, এবং একটি নাটক। ১৯৫১ সালে বেরোয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি সী-শোর অব দি সিরটেস'। এ বইটি ফরাসী দেশের অন্যতম 'গোঁকুর' পুরস্কার লাভ করেছিল। কিন্তু জুলিয়েঁ গ্র্যাক এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

গ্র্যাক ছিলেন মনে-প্রাণে একজন সুর-রিয়ালিস্ট। সুররিয়ালিজমের হোতা আঁদ্রে ব্রেতোঁর প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। অবশ্য তিনি নিজে কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনে যোগদান করেননি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্য বা যে কোন সুকুমার শিল্পকলার অবাধ মুক্তি হচ্ছে স্যুররিয়ালিজমের পথে।

ইলিয়া কাজনের বই বেস্ট সেলার ॥

ইলিয়া কাজন আমেরিকার থিয়েটারের মঞ্চে মঞ্চেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। আমেরিকার মঞ্চসফল প্রখ্যাত নাট্যপ্রযোজনার জন্য ইলিয়া কাজন বিশ্বের সর্বত্র নন্দিত। 'এ স্ট্রিট্ কার নেমড্ ডিজায়ার', এবং 'ডেথ্ অব এ সেলসম্যান' তাঁর প্রযোজনা ও পরিচালনায় এক সময়ে আমেরিকার নবনাট্য আন্দোলনে একটা যুগের সৃষ্টি করেছিল। চলচ্চিত্রের পরি-চালনার কাজেও তিনি হয়েছিলেন বিশ্ব-বন্দিত। 'অন্ দি ওয়াটার ফ্রন্ট' এবং 'ঈস্ট অব ইডেন' দেখেননি এমন লোক খুব কমই আছেন।

বর্তমানে ইলিয়া কাজনের বয়স ৫৭ বছর। এখন তিনি সাহিত্যকর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চান। নিউইয়র্কের সাংবাদিক-দের কাছে তিনি বলেছেন, 'আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জীবনযাত্রার বোঝাকে কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।' 'দি অ্যারেঞ্জমেন্ট' নামক উপন্যাসটি তারই তিক্ত ও সুন্দর ফসল। হাল আমেরিকার পুস্তক-ব্যবসায়ে এ গ্রন্থটি এখন 'বেস্ট সেলার'। এ পর্যন্ত বইটি বিক্রয় হয়েছে ১০০,০০০টি কপি। লাইফ্ পত্রিকা ইলিয়া কাজন সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আজকের দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুর্লভ গল্পকার।'

এতোদিন ইলিয়া কাজন সম্পর্কে ইউ-রোপ ও আমেরিকায় নানারকম গুজব রটেছিল। অনেকেরই মতে, 'আমি ফুরিয়ে গেছি, আমার স্নায়ুতন্ত্র নিস্তেজ, আমি ব্যর্থ এবং পলাতক।' শেষের দিকে এক মার্ভাস চরিত্রের অভিনয় করতে করতে ইলিয়া মঞ্চের ও জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমানে তাই সেসব ছেড়ে দিয়ে অনাবিল সাহিত্যচর্চা ও তাঁর এই নির্জন ঘরের একাকীত্বই তাঁর কাছে অনেক ভাল।

শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্মের জন্য পুরস্কার ॥

সোসায়েটি অব অথরস অ্যান্ড ট্রান-স্লেটারস অ্যাসোসিয়েশন শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-কর্মের জন্য সম্প্রতি ১৯৬৮ সালের "স্খলেগেল-টিক" পুরস্কার প্রদান করে-ছেন যথাক্রমে জেমস স্ট্র্যাখে এবং মাইকেল হামবুর্গারকে। স্ট্র্যাখে অনুবাদ করেছেন 'কমপ্লিট সাইকোলজিকাল ওয়ার্কস অব ফ্রয়েড'-এর প্রথম খণ্ডটি। প্রথম পুরস্কার তিনিই পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পুরস্কারের বিজেতা হাম-বুর্গার অনুবাদ করেছেন 'ফ্রেডরিক হোল্ডারলিন, পোয়েমস অ্যান্ড ফ্র্যাগমেণ্টস' গ্রন্থটি। এই পুরস্কারের নির্বাচকমণ্ডলী ছিলেন এরিক মসবেখার, ক্রিস্টোফার হোম এবং নর্ম্যান ডেনি।

তুর্গেনেভ স্টেট মিউজিয়াম ॥

ইভান তুর্গেনেভ রুশ সাহিত্যের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক একথা সকলেই জানেন। সম্প্রতি রাশিয়ায় তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের তোড়জোড় চলেছে। রুশ বিপ্লবেরও অনেক আগে থেকে তুর্গেনেভের স্মৃতিরক্ষার নানাবিধ প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রুশ সাহিত্যের তৎকালীন প্রখ্যাত গদ্যশিল্পী নিকোলাই লেসকভ তুর্গেনেভের অমর স্মৃতিরক্ষার জন্য সংসদ গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু নানারকম বাধাবিপত্তি আসার জন্য শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।

ইভান তুর্গেনেভ

অতঃপর দীর্ঘকাল পরে আবার একটি 'আই এস তুর্গেনেভ স্টেট মিউজিয়াম' গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয় স্পাসক-লুতোভিনভ অঞ্চলে। এখানেই তুর্গেনেভের শৈশব ও যৌবনকাল কেটেছিল। এবং এই অঞ্চলে বসবাস করার সময়ই তুর্গেনেভ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীগুলো রচনা করেন।

'ওরিয়েল রিজিওনাল ড্রামা থিয়েটার' এখন তুর্গেনেভের নামেই পরিচিত। এখানেই তুর্গেনেভের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা সংগ্রহ সংরক্ষিত করা আছে।

তুর্গেনেভ মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা এখন তাঁর ১৫০তম পূর্তি উপলক্ষে একটি পুস্তকপ্রদর্শনীর পরিকল্পনা করছেন। তুর্গেনেভের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, মূল রচনার পাণ্ডুলিপি, পলিন ভারডট-এর চিঠিপত্র এবং বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ এই প্রদর্শনীর শোভা বর্ধন করছে।

অনুবাদ সাহিত্য

ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও পরস্পর সহযোগিতার কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন সাহিত্য আকাদেমী। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত ক্লাসিকগুলিকে অপরা-পর ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে এই জাতীয় সাহিত্যসংস্থা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থমালায় জ্ঞানদেবের 'অমৃতানুভব ও চাঙ্গদেব-পাসষ্টী' মূল মারাঠী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন। জ্ঞানদেবের শ্রীমদ্‌ভাগবদ্-গীতার 'জ্ঞানেশ্বরী' টীকা গীতার টীকা হিসেবেই শুধু নয়, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ইতিহাসেও একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। দশ প্রকরণে বিভক্ত এই অমৃতানু-ভব' তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর গুরু নিবৃত্তিনাথের আজ্ঞায়। 'চাঙ্গদেব-পাসষ্টী' গ্রন্থটি ৬৫টি শ্লোকের সমষ্টি—শ্রীচাঙ্গদেব নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যোগীকে জ্ঞানদেব এই শ্লোকগুলির মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছেন। জ্ঞানদেবরচিত এই দুটি গ্রন্থকে একটি গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ করার ফলে জ্ঞানদেবের দার্শনিক প্রজ্ঞার একটি সামগ্রিক রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানেশ্বরী', 'অমৃতানু-ভব' ও 'চাঙ্গদেব-পাসষ্টী'—এই তিনটিকে জ্ঞানদেবের দার্শনিক চিন্তার তিনটি ধাপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে অদ্বৈততত্ত্বকে জ্ঞানদেবের জীবনসাধনার ও দার্শনিক প্রজ্ঞার

মূলভিত্তি বলা যায়, তাকেই এই তিনটি রচনার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। 'জ্ঞানেশ্বরী' টীকাতে এই তত্ত্বের আভাস সূচিত হয়েছে। 'চাঙ্গদেব-পাসষ্টী'র ৬০নং শ্লোকে যে ব্রহ্মৈক্যরূপ জ্ঞানসম্পত্তি'-র কথা বলা হয়েছে, তাই এই কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। 'অমৃতানুভব' গ্রন্থের দশটি প্রকরণের মধ্য দিয়ে এই অদ্বৈততত্ত্বকেই নানা উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজের এই দুটি গ্রন্থ শুধু দর্শন হিসাবেই নয়, মারাঠী ভাষার উচ্চাঙ্গের কাব্য হিসাবেও স্বীকৃত হয়েছে। অনুবাদক মারাঠী ভাষার এই গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকাদি অলঙ্কারের দ্বারা শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ তাঁর বর্ণিত রহস্যময় তত্ত্বকে রূপ-মণ্ডিত করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থে বঙ্গানুবাদের সঙ্গে কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা থাকলে পূর্ণাঙ্গ হতো।

সাহিত্য আকাদমী থেকে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলীর সংস্কৃত অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটির নাম-করণ করা হয়েছে 'সংস্কৃত রবীন্দ্রম্'। সংস্কৃতসাহিত্য ও প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ডঃ রাঘবন্ এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। আঠারটি কবিতা, পাঁচটি গদ্যরচনা (এর মধ্যে প্রথম চারটিই হলো গল্প), তিনটি নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। সংকলনটির শেষাংশে 'সমীক্ষালেখঃ' অংশের প্রথমে সম্পাদক ডঃ রাঘবন্ 'রবীন্দ্রঃ সংস্কৃতং চ' নামক প্রবন্ধে সংস্কৃতসাহিত্যের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি সামান্য পরি-চায়িকা মাত্র, কোনো বিস্তৃত বিশ্লেষণ নয়। তাছাড়া পুস্তকরূপে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংস্কৃতানুবাদের সংক্ষিপ্ত সমা-লোচনা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের সংস্কৃতানু-বাদের একটি সূচী দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ করা এক দুরূহ ব্যাপার, বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যের। কারণ কবিতার মধ্যে কবি তাঁর আন্তরিক অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রকাব্য থেকে যে আঠারোটি কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে, তা যে সুনির্বা-চিত একথা সম্ভবত কোনো রবীন্দ্ররসিকই স্বীকার করবেন না। রবীন্দ্রমানসকে ফুটিয়ে তুলতে হলে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্যমূলক কবিতাগুলিরই অনুবাদ করা উচিত ছিল। বলাকা এবং বলাকা পরবর্তী যুগের কোনো কবিতাই এখানে স্থান পায় নি। নির্বাচন দেখে মনে হয় যেন গীতাঞ্জলি পর্বেই রবীন্দ্রপ্রতিভা থেমে গিয়েছে। উত্তরকাব্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক মানসিকতার সংযোগ নিবিড়তর। এই অংশ বাদ পড়লে মহত্তর রবীন্দ্রনাথই বাদ পড়ে যান। কালীপদ তর্কাচার্যের দুটি কাব্যানুবাদ ও ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তীর 'ডাকঘর' নাটকের অনুবাদ (বার্তাগৃহম্) সংকলনটির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি প্রবন্ধ এখানে স্থান পেয়েছে। আরো দু' একটি প্রবন্ধ থাকলে (বিশেষত সংস্কৃতসাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক) ভালো হতো। অন্ততঃ প্রাচীন সাহিত্যের দু' একটি প্রবন্ধ থাকলে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্যের সংযোগ স্পষ্টতর হতো। কিছু কিছু অপূর্ণতা সত্ত্বেও সাহিত্য অকাদেমীর এই দুটি প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

—রবীন্দ্রনাথ দাস

জ্ঞানদেব-বিরচিত অমৃতানুভব ও চাঙ্গদেব পাসষ্টী— অনুবাদক : শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন। সাহিত্য অকাদেমী, নিউদিল্লী। মূল্য আট টাকা।

সংস্কৃত রবীন্দ্রম্ : সম্পাদক : ভি রাঘবন্। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। মূল্য : চার টাকা।

॥ নগাধিরাজ হিমালয় ॥

বর্তমান যুগে হিমালয় নিয়ে পর্যটকের এবং সাধারণ মানুষের কৌতূহলের আর সীমা নেই। পর্বত-আরোহণ সমিতি গড়ে উঠেছে একাধিক। প্রতি বছরই অনেকগুলি দল পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়া অধিকারে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। এবং তাঁদের সেই সব বিবরণ সাধারাণ পাঠক অতিশয় আগ্রহভরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঠ করে পরিতৃপ্ত হয়। হিমালয় সম্পর্কে কিন্তু সামগ্রিকভাবে তথ্যনির্ভর গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নি বলা যায়। শান্তিনিকেতনের সুকুমার বসু এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি হিমালয় নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা সাহিত্যে বিশেষ মূল্যবান সংযোজন। হিমালয়ের ভূগোল, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, তীর্থস্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গে এই জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বলে স্মরণ করা কঠিন।

এই গ্রন্থে আছে ভৌগোলিক বিবরণ। তার মধ্যে হিমালয়ের নদ-নদী, ভূপ্রকৃতি, হিমালয়ের অবস্থান প্রভৃতি, উত্তরাখণ্ডের পরিচয় প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের জলবায়ু, উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল, হিমালয়ের খনিজ, পাহাড়ী ভাষা, পাহাড়ী চিত্রকলা প্রভৃতি, ভারতের প্রতিরক্ষা ও হিমালয় পর্বত, হিমা-লয়ের ভূতাত্ত্বিক বিবরণ যথা হিমালয়ের গঠন, বয়স প্রভৃতি এবং হিমালয় অভিযান, হিমালয় [illegible] আলোচনা আছে। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্র দাস ও রাধানাথ শিকদার বিষয়েও আলোচনা আছে। পরিশেষে এভারেস্ট শৃঙ্গাভিযানের বিশদ বিবরণ আছে। গ্রন্থ শেষে নির্বাচিত গ্রন্থ-পঞ্জী, নির্ঘণ্ট, ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

হিমালয় মাউন্টেনীয়ারীং ইনস্টিটিউট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রেখে এই গ্রন্থের লেখক সুকুমার বসু গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করেছেন। হিমালয় গ্রন্থটি তথ্যনির্ভর ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে হিমালয় প্রেমিকদের কাছে শুধু নয়, সাধারণ পাঠকের কাছেও সমাদর লাভ করবে। লেখক সমবায় সমিতি ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। নতুবা চটুল কাহিনী-প্লাবিত এই দেশে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের কোন সম্ভাবনা ছিল না। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং মানচিত্রটি মূল্যবান। প্রচ্ছদ-চিত্র শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় কর্তৃক অঙ্কিত।

হিমালয় : (আলোচনা) : সুকুমার বসু প্রণীত। প্রকাশক : লেখক সমবায় সমিতি। কলিকাতা—২৬। দাম : পাঁচ [illegible]

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'মানব মন' মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয়-জ্ঞাপক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। 'বিচ্ছিন্নতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন মণীন্দ্র রায়। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রয়োগবাদ', সাম্রাজ্যবাদের 'জীবন দর্শন' এবং জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিবেশ ও মন' মূল্যবান আলোচনা। তাছাড়া 'মনোবিদের ডায়েরী' প্রথাতঙ্ক, 'জীবকোষের জন্মকথা,' 'বুদ্ধি বাড়ানো যায়,' 'বায়োনিকস : একটি নতুন বিজ্ঞান' আলোচনাগুলি সহজবোধ্য এবং প্রয়োজনীয়। আরো কয়েকটি আলোচনা আছে।

মানব মন :(এপ্রিল ১৯৬৭)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৪ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

●

ক্রান্তির বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় (ঋক .সংহিতার ব্রহ্ম), জর্জ নোভাক (মার্ক্সবাদ এবং অস্তিবাদ), দিলীপকুমার রায়চৌধুরী (ডায়ালেকটিকস প্রসঙ্গে), অবিনাশ দাশগুপ্ত (ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন), চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায় (যোগীন্দ্রনাথ সরকার), জ্যোৎস্না সিংহরায় (আচার্য দীনেশচন্দ্র) এবং গ্রন্থা-লোচনা করেছেন মানস রায়চৌধুরী, সত্য-প্রিয় ঘোষ, পবিত্র পাল, অরবিন্দ চক্রবর্তী।

ক্রান্তি :(মে ১৯৬৭)—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা—

আহত নায়ক ॥ গোপাল ভৌমিক

প্রচণ্ড লড়াই করে ভিতরে-বাহিরে
প্রতিদিন পথ করে চলি,
দেহে যদি আঘাতের চিহ্ন দেখা যেত
হতাম নিশ্চয় মহাবলী।

যেখানে আঘাত লাগে নিগূঢ় সে সত্তা থাকে
জনতার চোখের আড়ালে,
যা-কিছু আঘাত সব নিঃশব্দেই নেয়
কে জানে কি ঘটেছে পাতালে।

মুখের দর্পণে তাই প্রতিদিন দেখে
কে আমাকে কতটুকু চেনে?
এমন তো হতে পারে সম্মুখের আমি
পড়ে থাকে পশ্চাতের ড্রেনে।

সকলের কথা শুনি, স্তুতি নিন্দাবাদে
কান বড় দেই না সহসা,
বিদূষক বিদূষণে খুশি হয়ে তবু
মনে খুব পায় না ভরসা।

তবে তাই হোক ॥ যুগল সেন

জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের কতটুকু দেখা যায়
কতটুকু বা রাতের আয়নাতে।
তোমাদের আনন্দের হাট
আমায় ব্যাপারী করেছে,
আকাঙ্ক্ষিত আকুল প্রত্যাশায় মেলাতে চেয়েছি
মূকের ভাষা, মেলাতে চেয়েছি,
রাতের বেলাতেও।

রাজপথের তির্যক গ্যাসের আলোয়
হন্যে হয়ে তোমাদের খুঁজেছি
মনে নেই তো, কথা-চেনা-মুখ,
লাস্ট ট্রেনের গলা চেরা করুণ আকৃতি।
তাই আর নির্জীব বাড়িটার মতন
অসহায় অভিমান
আর তোমাদের চঞ্চল করবে না—
আর জ্বালাতন করবে না,
আমার শৈশবের বেড়ার কোণে
হাড় বের হওয়া বৃদ্ধ শেফালী গাছটা।

(১০)

আমি চমকে উঠেছিলাম বুলবুলের মুখে হঠাৎ 'তুমি' শুনে, তার হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠিনি তাও নয়, আমার বয়সে ও অবস্থায় তা অনিবার্য ছিলো। আপনার তো মনে আছে তখনকার বাংলা উপন্যাসে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে বদলটা কী-বিরাট একটা ঘটনা ছিলো, কত কাঠখড় পোড়াতে হ'তো তরুণ-তরুণীকে ঐ স্তরে নিয়ে আসার জন্য, আর হাত থেকে জলের গ্লাশ নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুলে ঠেকে যাবার ফলে বা রোগশয্যায় কোনো নারীহস্তের স্পর্শে (নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন নায়ক-নায়িকার কেমন ঘন-ঘন অসুখ বাধাতেন লেখকেরা, তাদের কাছা-কাছি আনার আর কোনো উপায় না-পেয়ে!) যত বিদ্যুৎ ছাপার অক্ষরে ব'য়ে গেছে তা দিয়ে ভারতবর্ষের আঠারো লক্ষ গ্রামে ইলেকট্রিক আলো জেলে দেয়া যায়। আমাকে মানতেই হবে, আমারও শিরায় একটি ফুলকি জ্বলেছিলো বুলবুলের ঐ আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত আচরণে, কিন্তু তার দিক থেকে একেবারেই কোনো বিকার দেখলাম না, তার আর আমার মধ্যে যে অগ্নি ও দাহ্যবস্তুর একটি সম্বন্ধ বন্ধমূল, তা যেন তার খেয়ালই নেই। মাঠ পেরিয়ে আলো-জ্বলা রাস্তায় পড়লাম আমরা, হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলতে লাগলো সে, যেন সে আর আমি বাচ্চা বয়স থেকে এক বাড়িতে বড়ো হয়েছি, যেন আমরা ভাই-বোনের মতো পরস্পরের অত্যন্ত বেশি পরিচিত। তার এই মেকি অন্তরঙ্গতা আমাকে অবশ্য পীড়া দিচ্ছিলো; এক-একটি ল্যাম্পপোস্ট পার হবার সময় আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখছি তার মুখের দিকে—যেন বুঝে নেবার চেষ্টা করছি এর কতটা অংশ ছলনা বা আত্ম-প্রতারণা। মিতু বর্ধনের কথা তুললো সে, আমার সঙ্গে সেদিনের পরে আর দেখা হয়নি শুনে বললো, 'আমি পর্শু বিকেলে যাচ্ছি মিতুর কাছে—মানে শনিবার—ইচ্ছে হ'লে তুমিও আসতে পারো। অবশ্য আমার মধ্যস্থতার কোনো দরকার নেই, তুমি যা ভাবছো তার চেয়ে বেশি সে চেনে তোমাকে। অনেকদিন ধরেই চেনে।...অবাক হচ্ছো? মিতুকে আবার বোলো না যে আমি বলেছি—তোমার যেখানে যা লেখা বেরোয় সব সে খুঁজে-খুঁজে জোগাড় করে—বোধহয় দিলদার নওরোজকেও তোমার কবিতা পাঠিয়েছিলো।' আমি ব'লে উঠলাম, 'যাঃ!' 'কেন, এতে অবাক হবার কী আছে? মিতু আমার মতো কাঠখোট্টা নয়—কবিতা ভালোবাসে, নিজেও গল্প লেখে লুকিয়ে-লুকিয়ে। কিন্তু ভীষণ লাজুক, কাউকে দেখাতে চায় না, তা তুমি পিড়া-পিড়ি করলে রাজি হ'তে পারে—তার সঙ্গে

ভঙ্গি দেখে আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'চলুন আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পেণছিয়ে দিয়ে আসি।' 'কোনো দরকার নেই—তাছাড়া আমি বাড়িও যাচ্ছি না এক্ষুনি। কিন্তু ঐ 'আপনি'টা কি তুমি ছাড়বে না কিছুতেই? আচ্ছা, আর-একটু আসতে পারো আমার সঙ্গে—ঐ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত। তা শোনো,' আমার মুখের উপর তার দৃষ্টি অনুভব ক'রে অমিও ফিরে তাকালাম, 'মিতু'কে আমি ভালবাসি খুব, কিন্তু সব কথা বলি না তাকে—হয়তো তার সহ্য হবে না, তাই।' আমি হাঁটা থামিয়ে বললাম, 'মানে? কী সহ্য হবে না?' 'তা তোমাকে পরে একদিন বলবো, কেমন? এখন তো দেখা হবে মাঝে-মাঝে স্বদেশী মেলার ব্যাপারে।' বুলবুলের এই কথাটায় দুটো অনুমান ছিলো যা আমাকে ভাবিত করলো একটু: এক, তাদের স্বদেশী মেলার সঙ্গে আমিও যেন রীতি-মতো যুক্ত হয়ে গিয়েছি; দুই, যেন এই মেলা হয়ে গেলেই তার সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার। কিন্তু আমি কোনো প্রশ্ন তোলার আগেই সে আবার বললো, 'তাহ'লে তুমি আসছো বকুল-ভিলায় শনিবারে?' 'শনিবার আমার অন্য একটা—' এখানেই থেমে গেলাম আমি, কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার মনে হ'লো যে শনিবার আমার অন্য কোথায় যাবার কথা তা বুল-

জোন্সের সঙ্গে আমার আবার দু-মিনিট কথা হয়েছিলো, খানিকটা সংস্কৃত পড়েছিলো ব'লে বঙ্কিমের বাংলা সে বুঝতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে নিয়ে অসুবিধে হচ্ছে তার, আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে মাঝে-মাঝে তাকে সাহায্য করা? যদি সময় হয়? অসুবিধে না হয়? আমি রাজি হয়েছিলুম, জোন্স বলেছিলো তাহ'লে শনিবার যদি পাঁচটা নাগাদ চা খাই গিয়ে তার সঙ্গে। —হঠাৎ এই ব্যাপারটা আমার মনে প'ড়ে গেলো। আমি সঠিকভাবে রাজি হয়েছিলুম কিনা ঠিক মনে পড়লো না (কেননা আমার চোখ সে-মুহূর্তে স'রে গিয়েছিলো কাজলের দিকে, মিতুর কাছে বিদায় নিচ্ছিলো সে—'চলি, মিতু, খুব, খু-ব ভালো লাগলো, একদিন এসো আমাদের ওখানে।' 'আপনারা আবার আসবেন,' বলে মিতু চোখ ফিরিয়েছিলো—ঠিক আমার দিকে নয়, আমি যেখানে জোন্সের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেদিকে)—কিন্তু 'না' বলিনি এটা নিশ্চিত, জোন্স হয়তো ধ'রে নিয়েছে আমি যাবো, তাই আমাকে যেতেই হবে, নয়তো আমিও তার চোখে তেমনি একজন ভারতীয় ব'নে যাবো যারা নিমন্ত্রণ নিয়ে যা, ক'রে ভুলে যায় আর সময় বিষয়ে যাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। 'আপনি ক-টার সময় যাবেন?' 'কেন আপনি!'—বুলবুলের চোখে কৌতুক ভেসে উঠলো—'আমি কি কখনো ঘড়ি দেখে চলি ভেবেছো? যাবো বিকেলে কোনো সময়ে।' 'আমার একটু দেরি হ'তে পারে।' 'তোমার ইচ্ছে না-হ'লে আমি তোমাকে জোর করছি না—একটু স'রে দাঁড়াও।' আমাদের পিছনে একটা ঝংকৃত আত্মঘোষণা বেজে উঠলো, একদল বাচ্চার উচ্চহাসির মতো সাইকেলের ঘুণ্টি, ফিরে তাকিয়ে আবছা আলোয় আমার মনে হ'লো অন্ধকারে চাঁদের মতো অমূল্যর গোলগাল সদাপ্রফুল্ল মুখখানার উদয় হয়েছে। 'ঠিক চিনতে পেরেছি পিছন থেকে,' ব'লে সদাপ্রফুল্ল অমূল্য কোমর থেকে পা পর্যন্ত একটি লীলায়িত ভঙ্গি ক'রে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। আমি ধরে নিয়েছিলুম তার কথাটা আমারই উদ্দেশে বলা, ভেবেছিলুম আমার সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখেই সে সাইকেলের ঘুণ্টিকে তূর্যনাদে পরিণত না-ক'রে পারেনি, তাই যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলুম যখন বুলবুল কথা বললো উত্তরে। 'আরে, অমূল্য! অমন অসভ্যের মতো ঘণ্টা বাজাও কেন?' 'আমি সাইকেলের বেল্-এ গিটকিরি প্র্যাকটিস করছিলাম। জানো, আমি আজ জগন্নাথ-হল-নিবাসী যুববৃন্দের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছি তাদের কর্ণকুহরে গীতবর্ষণের জন্য। অবশ্য দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারও আছে। —তুমি যাচ্ছো নাকি, রণজিৎ, সুধাংশুর ম্যানেজারিতে সাধিত এই তুচ্ছ ভোজসভায়? থুড়ি, মাফ কিজীয়ে, আই বেগ ইওর পার্ডন, ভুলেই যাচ্ছিলাম ও-সব জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তুমি নেই—হস্টেলের কোনো ফীস্টে কেউ কখনো দ্যাখেনি তোমাকে। তুমি ফুলের মধু চাঁদের সুধা পান করো—' আমি ঝাঁকালো গলায় ব'লে উঠলাম, 'তোমার এই বান্দ রসিকতাগুলো এবার ছাড়ো তো, অমূল্য—গর্দভের রাগিণী যদি বা শোনা যায় তার রসিকতা অসহ্য!' কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র একটু খারাপ লাগলো আমার (কেননা সাধারণত আমি কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলি না), কিন্তু অমূল্যর মুখে হাসি আরো বিস্তীর্ণ হ'লো এই কথা শুনে (তার চামড়ায় বেঁধাবার মতো তীর বোধহয় তৈরি হয়নি), আর বুলবুল খানিকটা হাসি খানিকটা শাসনের সুরে ব'লে উঠলো, 'তুমিও যেমন? অমূল্যর কথায় কেউ আবার রাগ করে নাকি। ওর শাদা মনে কাদা নেই।—চলো অমূল্য, আমিও রমনার দিকে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে একটু হাঁটিয়ে চলো।' একবার ফিরে তাকিয়ে, ছোট্ট হেসে, বন্ধুভাবে হাত নেড়ে, আমার কাছে বিদায় নিলো বুলবুল।

আমি আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে এলাম, এক ঝাঁক প্রশ্ন আমাকে ঘিরে ধরলো। কয়েকদিন আগে, য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরির স্ট্যাকে দাঁড়িয়ে, যখন চলন্ত ট্রেনে বুলবুলের আরম্ভ করা কথা থামিয়ে দিয়েছিলো, তখন , যাতে বার-বার তার দিকে তাকাতে না হয়, তাই বাইরে মাঠের উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে যে-সুখস্বপ্নটিকে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, তা-ই যেন বাস্তব হলো আজ ঃ সন্ধেবেলা, প্রথম-তারা-ফোটা ঠাণ্ডা নীল আকাশের তলায়, একটি সঙ্গিনীকে আমি পেয়েছিলাম। এর আগে কখনো এমন হয়নি যে এতটা সময় একান্তে কোনো তরুণীর সঙ্গে আমি কাটিয়েছি। আরো কথা ঃ আমি তাকে খুঁজে বের করিনি, পিছনে ছুটিনি, সেই আমার কাছে এসেছে। নির্জনতা, তার চোখে-মুখে ঔৎসুক্য যা লুকোবার কোনো চেষ্টা সে করেনি, তার কোনো-কোনো কথায় ও ভঙ্গিতে গোপনতার ভাব, এমনকি 'তুমি' বলা, হাতে হাত ধরা—একটা প্রেমের কাহিনী গ'ড়ে ওঠার মতো উপাদানের অভাব ছিলো না। রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত ছিলো আমার, প্রায় হয়েওছিলুম একটা সময়ে, কিন্তু আখেরে এই অবসাদ কেন, এই অস্বস্তি? বুলবুলের সঙ্গে যে সময়টুকু আমি কাটালাম, তার মধ্যে আমার ভূমিকা কত তুচ্ছ তা চিন্তা ক'রে আমার অহমিকায় আঘাত লাগলো। মনে ক'রে দেখলাম, তার ইচ্ছেমতোই সব-কিছু [illegible] তামিল করলুম এতক্ষণ। 'আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসুন—চলুন ঐ আমবাগানে—আসুন বসা যাক—এবার উঠুন—ঐ লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত—তোমার ইচ্ছে না হ'লে আমি জোর করছি না।' যেন জোর করার কোনো প্রশ্ন ওঠে, যেন এই একঘণ্টার মধ্যেই তার কোনো দাবি জ'ন্মে গেছে আমার উপর। আর তারপর—অমূল্যকে দেখামাত্র আমাকে ফেলে তার সঙ্গে চ'লে যাওয়া। তাহ'লে অমূল্যর সঙ্গেও তার বন্ধুতা, তাকেও সে 'তুমি' বলে, 'শাদা মনে কাদা নেই' ব'লে প্রশংসাও করে। সে কি চাচ্ছে এইভাবে ঈর্ষা জাগাতে আমার মনে? জানে না, অমূল্যর মতো একটা বাজে ছেলেকে ঈর্ষা করা আমার পক্ষে কত অসম্ভব? আর তারপর অন্য একটা কথা আমার মনে হ'লো, যেন এক ঝলকে বুলবুলের ভিতরটা দেখতে পেলাম। না—ঈর্ষা জাগানো নয়, নারীর চিরাচরিত মনোমুগ্ধকর ছলাকলা নয়, ও-সবের বিমুখেই নিজেকে ঘিরে একটি চতুর ব্যূহ সে রচনা করেছে। তার 'তুমি' বলা, হাত ছোঁয়া, প্রায় বালকের মতো সহজ ভঙ্গি—এই সবই হ'লো প্রতিষেধক, বসন্তের টিকার মতো—অন্তত তার দিক থেকে তা-ই অন্তত সে ভাবছে যে অমনি ক'রেই প্রেমের বীজাণুগুলিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে, পারবে 'নির্দোষ'ভাবে মেলামেশা করতে যুবকদের সঙ্গে। কথাটা ভেবে একটু মন-খারাপ হ'লো আমার, একটু অপমানিত বোধ করলুম, যেহেতু—আমি যদি তাকে ভুল না-বুঝে থাকি—তাহ'লে আমার পৌরুষের কোনো মূল্য নেই তার কাছে, তার নিজের নারীত্বেরও কোনো মর্যাদা নেই ঃ প্রেম, যার জন্য সেই বকুল-ভিলার সন্ধ্যা থেকে শুরু ক'রে আমার আকাঙ্ক্ষা দিনে-দিনে আরো তীব্র হ'য়ে উঠছে, তার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে সে রাজি নয়। আমার মনে হ'লো, দুটো মিষ্টি কথা ব'লে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেলো মেয়েটা, অনুতাপ হ'লো, তাকে অতটা কাছে ঘেঁষতে দিয়েছিলুম ব'লে, স্থির করলুম পরে কখনো তাকে বুঝিয়ে দেবো যে তার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করার মতো গোবরগণেশ ছেলে আমি নই।

শনিবার সন্ধের পরে আমি যখন খান কয়েক বই হাতে নিয়ে বকুল-ভিলায় পৌঁছলুম, বুলবুল তখন যাবার মুখে। আমাকে দেখে সে ব'লে উঠলো, 'বেশ ছেলে! আমিও যাচ্ছি আর উনিও এলেন। কত বই হাতে। বিদ্যের জাহাজ। মিতুর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো একটু আগে—বিভা-দি ভাবছেন মেয়েদের দিয়ে একটি নৃত্যনাট্য করাবেন মেলায়, বারো-চোদ্দটি স্বদেশী গান গেঁথে-গেঁথে একটি নাটিকার মতো হবে আর কি। বঙ্কিম থেকে দিলদার নওরোজ পর্যন্ত বাছা-বাছা গান থাকবে। কোন-কোন গান, পর-পর কী-ভাবে সাজালে ভালো হয়, তা-ই নিয়ে কথা হচ্ছিলো। তোমার কী মনে হয়, রণজিৎ?' আমি কোনো জবাব দিলাম না, বুলবুল দরজার দিকে এগোলো। [illegible] নেই আমার,

আমার ছাত্রী আমার অদর্শনে-কাতর হ'য়ে পড়েছে এতক্ষণে। রণজিৎ, একটু ভেবে দেখো যা বললাম—ঐ স্বদেশী গানের ব্যাপারটা; মিতু তুই জেনে নিস ওর কাছে, তুই আর রণজিৎ মিলে করলে সবচেয়ে ভালো হয়। —আরে, আর্থার জোন্সের নাম লেখা দেখছি!' আমি, আমার হাতের বই-গুলোকে একটা টেবিলে নামিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে একটু থেমে বুলবুল একটার মলাট উল্টেছিলো, তার শেষ বিস্ময়বোধক বাক্যের সেটাই কারণ। আমাকে বলতে হ'লো, 'উনি পড়তে দিলেন আমাকে।' 'কে? আর্থার জোন্স? তুমি তার বাড়ি গিয়েছিলে নাকি?' আমি, জানি না কেন, খানিকটা আত্ম-সমর্থনের সুরে বললাম, 'কেন, গেলে কোনো দোষ আছে?' 'না, না, দোষ কেন থাকবে, আমরা সকলেই জানি জোন্স খুব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায়। তা সাহেবের সঙ্গে কী কথা হ'লো তোমরা?' ও-রকম প্রশ্ন করাটা যে সৌজন্যসম্মত নয়, বুল-বুলকে তা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, সংক্ষেপে জবাব দিলাম, 'নানা কথা হ'লো।'

আসলে নানা কথা হয়নি, জোন্সের সঙ্গে আমার আলাপের বিষয় ছিলো শুধু ভাষা ও সাহিত্য। রমনার প্রায় শেষ প্রান্তে তার বাংলোতে ঢুকে প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত আমার অস্বস্তিতে কেটেছিলো। ঘরের মেঝে এত ঝকঝকে আর পালিশ-করা যে আমার ঢুকতে গিয়ে পা হড়কে যাচ্ছিলো, আসবাবপত্র এতই সুশোভন যে বসতে প্রায় সংকোচ বোধ হয়, চায়ের পেয়ালা এত বেশি সুন্দর যে মনে হয় না সত্যি ওগুলো ঠোঁট ঠেকিয়ে চা খাবার জন্য তৈরি—অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিলো আমার, কেননা তখনও আমি জানি না যে এর চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ বিলাসিতায় উন্নীত হবো আমি—আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। কিন্তু জোন্সের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার অনভ্যাসজনিত দ্বিধার ভাবটা কেটে গেলো। বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মেজাজ যদিও এত আলাদা, তবু কোনো-কোনো শব্দে কেমন অতি দূর ঐতিহাসিক আত্মীয়তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়, এই ব্যাপারটা দেখলাম তাকে বেশ উত্তেজিত ক'রে রেখেছে: 'জন্ম' শুনে তার মনে পড়ে যায় 'genesis', generation'; 'জ্ঞান শুনে ignorant' 'cunning'; 'স্থান' শুনে 'stand' 'তৃষ্ণা'র সঙ্গে 'thirst' এর আর 'স্মৃতি'র সঙ্গে 'martyr' -এর সম্পর্ক না টেনে সে পারে না, আর 'বিদ্যার মধ্যে সেই মূল সে খুঁজে পায় যা থেকে তৈরি হয়েছে 'wise' 'witch', 'ideal' idea' আমি তখন, আমার প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী সত্ত্বে, ভাষাতত্ত্ব অল্পই জানি, 'স্মৃতি' আর 'বিদ্যা' শব্দ কেমন ক'রে 'মার্টার' আর 'আইডিয়া'র আত্মীয় হ'লো, আমার তা ধারণাতীত, কিন্তু আমি আমার বিস্ময় বেশি প্রকাশ করলুম না পাছে জোন্স আমাকে নেহাৎ অজ্ঞ বলে ভাবে। কিন্তু সে যখন কথায়-কথায় বললে যে ইংরেজি

'কৃমি' থেকে এসেছে তখন আমি ব'লে না-উঠে পারলুম না, 'সত্যি? আশ্চর্য!' 'আশ্চর্য না! 'শর্করা' থেকে "sugar" বা 'খণ্ড' থেকে "candy" এগুলো বোঝা যায়—এখানে উচ্চারণ খুব কাছাকাছি আর অর্থের কোনো বদলই হয়নি—কিন্তু কোথায় 'কৃমি'—একটা যেন্নার ব্যাপার—আর কোথায় গোলাপের "crimson" রং! একরকম পোকার মৃতদেহ থেকে লাল রং তৈরি হ'তো আগে, আরবরা তার নাম দিয়েছিলো 'কিরমিজ'—যা 'কৃমি'র আরবি উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়; তা-ই থেকে, মাঝে আরো কয়েকটা ভাষা ঘুরে ইংরেজি 'crimson' -এ পৌঁছলো গেলো। আর-একটা খুব মজার কথা হলো "banyan" —ওটার মূলে আছে সংস্কৃত 'বণিক', তাই থেকে পর্তুগীজ 'বানিয়ান'—আপনাদের 'বানিয়া', 'বেনে'—গাছটার ঐ নাম হ'লো যেহেতু ভারতবর্ষে বটতলায় কেনাবেচা চলে। সত্যি—ভাষার মতো এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কিছু নেই। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস লুকোনো আছে ভাষার মধ্যে, সব জাতি একত্র হয়েছে সেখানে, ঋণ নিয়েছে পরস্পরের কাছে। যারা বিশেষ কোনো জাতি বা ধর্মের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করে—যেমন আমরা ইংরেজরা করতুম উনিশ শতকে, আর এখন হিটলার শুরু করেছে জর্মানিতে, তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি পাওয়া যাবে ভাষাতত্ত্বে।'

আমি তাকে জিগেস করলাম এখনকার ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাকে তার ভালো লাগে। সে এমন একটা নাম করলে যা তখন আমার শুধু ঝাপসাভাবে শোনা ছিলো: টি এস এলিয়ট, একজন আমেরি-কান, আমি তাঁর কিছু পড়িনি শুনে তখনই 'প্রুফ্রক' ব'লে একটা কবিতা পড়ে শোনালো। আমি যখন জিগেস করলুম বইটা আমি কয়েকদিনের জন্য ধার পেতে পারি কিনা তখন সে সোৎসাহে ব'লে উঠলো, 'নিশ্চয়ই। ......ইয়েটসের শেষ বইটা পড়েছেন? —একেবারে নতুন এক কবির জন্ম হয়েছে এটাতে! জেমস জয়সের এটা......?' আমি বিদায় নিলাম সাইকেলের কেরিয়ারে কয়েকটি নতুন বই আর মগজে অনেক নতুন ধরনের ভাবনা নিয়ে।

বুলবুল চ'লে যাবার পর আমি মিতুকে বললাম, 'আপনার বন্ধুটি আমাকে হঠাৎ 'তুমি' বলতে শুরু করেছেন কেন জানি না। আর ঐ এক স্বদেশী মেলা ছাড়া আর কী কোনো কথা নেই?' মিতু সস্নেহে বললো, 'হ্যাঁ, বুলবুলকে একটু পাগলাটে মনে হয় প্রথমে, তবে ও খুব ভালো—আপনি কিছু মনে করেননি তো?' আমি বললাম, 'বুলবুলও খুব প্রশংসা করে আপনার, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কলেজে (পুরো সত্যটা বললাম না); আপনারা দেখছি পারস্পরিক-অনুরাগ-সমিতি গঠন করেছেন।' 'সমিতি কেন হবে—বন্ধুতা।' বুলবুলের সঙ্গে মিতুর বন্ধুতার ভিত্তিটা কী, তা জানার জন্য

'বুলবুলকে আপনি কি অনেকদিন ধ'রে চেনেন?' 'প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ট্যুশনি ক'রে পড়া-খরচ চালায়, কত রকম স্বদেশী কাজ করে—অসাধারণ মেয়ে।' 'কত মেয়ে তো জেলেও যাচ্ছেন আজকাল, এতে আর অসাধারণ কী আছে?' মিতু একটু হেসে বললো, 'আমি নিজে তো পারি না ও-সব, তাই অন্য কাউকে করতে দেখলে খুব ভালো লাগে। আমার এখনো একা পথ চলতে বাধো-বাধো লাগে, মাথা ধরে রোদে বেরোলে—আসলে আমি একটু সেকালে ধরনের আছি বোধহয়।' বুলবুলের সঙ্গে মিতুর স্বভাবের বা মতিগতির মিল নেই জেনে আমি মনে-মনে গভীর স্বস্তি পেলাম, একটু বেশি উৎসাহের সুরে ব'লে উঠলাম, 'সকলকেই সব পারতে হবে কেন—আপনি এত ভালো গান করেন যে আর-কিছুরই দরকার নেই আপনার।' আমার একটু অবাক লাগলো মিতু যখন লাল হ'লো আমার কথা শুনে—তার গানের প্রশংসা তো সারাক্ষণ শুনছে সে, এখনো এতে লজ্জা পায়? একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'মা-র সঙ্গে একবার দেখা করবেন, আসুন, তাঁর শরীরটা বেশি ভালো নেই আজ—ওপরে গিয়ে বসবেন নাকি? বাবাও এসে পড়বেন এক্ষুনি।' সে রাতে আমি ন-টা অবধি কাটিয়ে এলাম বকুল-ভিলায়? ফেরার পথে যেমন জলের উপর ঝিরিঝিরি হাওয়া, বা শুকনো পাতা চৈত্রমাসে উড়ে চলে, বা দূরে থেকে শোনা ঝাউবনের মর্মর, তেমনি, মাঝে-মাঝে, মৃদু ও ফিরে-ফিরে আসা, অশান্ত ও মধুর, আমার মনের উপর দিয়ে একটি ভাবনা ব'য়ে গেলো—'আমি কি প্রেমে পড়ছি?' 'আমি কি প্রেমে পড়ছি?'

(ক্রমশঃ)

পরীক্ষায় প্রায় ফেল হতে বসেছিল!
পড়াশুনোয় দিব্বি ভাল মেয়ে। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হতে যখন আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি, পড়াশুনোয় যেন ওর কোনো উৎসাহই আর রইল না।
আমরা অবশ্য তখনই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন —না, শুধু অতিরিক্ত খাটুনির জন্যে নয়, আসলে উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে ওর ক্ষয়িত শক্তির পূরণ হচ্ছে না।
Horlicks
তাঁর কথামত ওকে হরলিকস খাওয়াতে লাগলাম। ও আবার দেখতে দেখতে নতুন উৎসাহে পড়া শুরু করল। আর হরলিকস-এর গুণেই সগৌরবে পাশ ক'রে বেরুল!
ছোটদের শরীরের শক্তি বেজায় তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যায়। সেই ক্ষয় পূরণ না হলে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পড়াশুনোয় মন বসাতে পারে না। ডাক্তাররা জানেন, ননীপূর্ণ দুধ, পেষাই-করা গম আর মল্টেড বার্লির সারাংশ থেকে হরলিকস অতিরিক্ত পুষ্টি যোগায়। দেহমনের ওপর যখন বেজায় চাপ পড়ে, হরলিকস খেলে আশ্চর্য ফল হয়।
হরলিকস
অতিরিক্ত শক্তি যোগায়
Horlicks

চাল চাই—চাল নাই

আমাদের **হাঁড়ির খবর** কারো আর অজানা নেই। তার কারণ, কেরালা হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছে, চাল নাই। রেশন ভেঙে পড়ার উপক্রম, নাম্বুদিরিপাদ ছুটে গেছলেন দিল্লীতে। চাল নাই, হাতে মাত্র ১,১৮৬ টন চাল মজুতে। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম নাচার। অন্ধ্র কেরালাকে চাল দিতে পারছে না, কারণ চাল সংগ্রহে তার দেরী হয়ে গেছে। বিদেশ থেকে যে আট লক্ষ টন চাল আমদানীর কথা, তার মধ্যে ব্রহ্মদেশ থেকে পাওয়া যাবে দেড় লক্ষ টন। কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন। যে চাল এতদিনে পৌঁছানোর কথা ছিলো, তা পেতে নাকি জুলাই এসে যাবে। নাম্বুদিরিপাদ বলেছিলেন, তবে অন্ধ্রের চাল পেয়ে শোধ করা হবে এই শর্তে মাদ্রাজকে কিছু চাল দিতে বলা হোক।

কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর অবশ্য মাদ্রাজসহ অন্যান্য চাল-উৎপাদক রাজ্যে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন কেরলের আশু সংকট মোচনের জন্য। কিন্তু পরপর দু-বছর খরার অভিজ্ঞতা সামনে নিয়ে চালের ব্যাপারে সকলেরই পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্ক; এমনকি, কংগ্রেসী রাজ্যগুলোর মধ্যেও চালের ব্যাপারে 'ভাই ভাই' নেই। আন্নাদুরাই নিজের রাজ্যে লোকদের সস্তায় 'আম্মা চাল' খাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, চাল তিনি এখন দিতে পারবেন না বলে দিয়েছেন, যদি হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। ফলে দিল্লীর 'রাজদরবারে' নাম্বুদিরিপাদের এবং পার্লামেন্টের 'গণ দরবারে' গোপালন প্রমুখ ২৪ জন কেরলী এম-পি'র 'ধর্ণা' প্রায় নিষ্ফল হয়েছে এবং নাম্বুদিরিপাদ রাজ্যে ফিরে এসেছেন জুন মাসে ৬০ হাজার টন চালের আশ্বাস নিয়ে (যদিও রেশন বজায় রাখতে কেরালার মাসে দরকার ৭০ হাজার টন)। এ-ছাড়া কেরালাকে দেওয়া হবে মাসে ২০ হাজার টন গম এবং যদি ট্যাপিওকা লোককে খাওয়ানো যায় তাহলে কিলো প্রতি ১৬ পয়সা সাবসিডি দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু কেরালার খাদ্য চাল, গম সে নিচ্ছে বটে, তবে নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন যে খাদ্যাভ্যাস অতো সহজে বদলানো যায় না। আর ট্যাপিয়কা দিয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করলে তার রাজনৈতিক ফল খারাপ হতে পারে। মাঝখানে এই রকম দাবী উঠেছিল যে, কেরালা যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে, তা দিয়ে তাকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে দেওয়া হোক। নাম্বুদিরিপাদ খোলাখুলি এই দাবী না তুললেও তাঁর খাদ্যমন্ত্রী গৌরী প্রস্তাব পেয়েছেন। চালের কিছু নমুনাও তাঁর কাছে পৌঁচেছে। এই প্রস্তাবের কথা কেন্দ্রকে জানানো হয়েছে। দাম কত করে জানা গেছে কি? কিন্তু শ্রীমতী গৌরী দামের পরোয়া করেন না। বলেছেন, কেরালার লোকের চাল চাই। আমরা যে কোনো দরে নিতে প্রস্তুত।

কেরালা রোজগেরে ছেলের দাপট দেখালেও, শিল্প ও কৃষি দুটোতেই হীন সামর্থ্য, বৈদেশিক মুদ্রাও রোজগারে অক্ষম, বিহারের কথায় কোনো জবরদস্তি নেই। ভারতের মধ্যে যে এক অনাসৃষ্টি করেছে ইংরেজ রাজত্বের দুশ বছরের এবং স্বদেশী রাজত্বের ২০ বছরের ট্র্যাডিশন ভেঙে, কারণ তার রাজ্যে অনাহারে মানুষ মরেছে (মহামায়াপ্রসাদ বলেছেন, কৃষ্ণবল্লভের আমলে ১৫৭ জন আর তাঁর আমলে দু-তিনজন)। কেরালায় তবু রেশনের প্রত্যাশায় উনুনে হাঁড়ি চড়ে, বিহারের ক্ষুৎপীড়িত জেলাগুলোতে পারিবারিক হাঁড়ি সিকেয় উঠেছে—সকলের এক হাঁড়ি লঙ্গরখানায়। সেখানে গম আর মাইলোই মানুষগুলোকে কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছে। গম বিহার পাচ্ছে, শুধু মে মাসেই দু'লক্ষ কুড়ি হাজার টন এসেছে। তবু মহামায়াপ্রসাদ এখন আর চাল ছাড়া চালাতে পারছেন না। চাল তাঁর কিছু চাইই, খাওয়ার জন্য ৫০ হাজার আর বীজ-ধান ৬০ হাজার টন। কে দেবে, কেন্দ্রের ত' ভাঁড়ে ভবানী। মহামায়াপ্রসাদ তাতেও পিছপাও নন, তিনি উড়িষ্যা, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের সঙ্গে কথা বলছেন। যদি চাল পাওয়া যায় তাহলে কেন্দ্রের ভাঁড়ারে বিহারের জন্য যে গম বরাদ্দ আছে তা দিয়ে কাটাকাটি করবেন। উড়িষ্যা যখন কেন্দ্রকেই চাল দিতে পারছে না, তখন বিহারকে কি করে দেবে? মহামায়াপ্রসাদ বলছেন, তার জন্য চিন্তা নেই, কেন্দ্র আমাদের অনুমতিই দিক না।

অনুমতি অবশ্য কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে উড়িষ্যা থেকে রাজ্যসূত্রে চাল আনার। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এখন তাই নিয়ে কথা বলছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী সিংদেওর সঙ্গে। গত বৎসর উড়িষ্যার কিছুটা অঞ্চলে খরা নেমেছিল, তা ছাড়া, নতুন সরকার গদী নিয়েছে, কাজেই চালের ব্যাপারে উড়িষ্যাও খুব সতর্ক। তবে হয়তো দাম কিছু বাড়ালে ডঃ ঘোষ তাঁর প্রার্থিত চাল পেতে পারেন। পঃ বঙ্গেও খাদ্যাবস্থা খুব সংকটজনক। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি কেন্দ্রের দোষ দিলেও খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ কিন্তু কেন্দ্রকে রেহাই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মে মাসে কেন্দ্র ২২ হাজার টন গম কম দিয়েছিল, জুন মাসে তা পুরিয়ে দেবে বলেছে। কেন্দ্রের মাসে ৭৫ হাজার টন গম দেওয়ার কথা। ডঃ ঘোষ বলেছেন তিনি আগামী তিন মাসের জন্য আরো ৫০ হাজার টন করে গম চাইবেন, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমের দুর্গত এলাকায় বন্টনের জন্য। পুরুলিয়ায়ও ১৯ জন লোক মরেছে। কিন্তু অবস্থা যতোই সংকটময় হোক, চালের চিহ্ন ত্রিসীমায়ও নেই। মজুতদারীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রায় নিষ্ফল হয়েছে, ১০০০ টনের বেশী পাওয়া যায়নি। আগের সরকার যা রেখে গেছেলো তাই মিলিয়ে সংগ্রহের লক্ষ্য দু-লাখ টনের এক-তৃতীয়াংশও ওঠেনি। কেন্দ্র রিক্ত। এখন উড়িষ্যাই সম্বল।

তবু আশাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিইনি আমরা। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ এবার তিন লক্ষ একর জমিতে তাইচুং ধানের চাষ করছেন যাতে একর প্রতি ফলন হবে প্রায় ৬০ মণ (সাধারণ বীজের ফলন ২৫-৩০ মণ) এবং মোট পাওয়া যাবে তিন লক্ষ টন। এই ধান উঠবে ১১০ দিনে, তারপর আবার নাকি দ্বিতীয় ফসল দেওয়া যাবে। ধান যেখানে প্রায় অদৃশ্য সেখানে ধান্যলক্ষ্মীর দুবার আবির্ভাব, কল্পনায়ও আমেজ লাগে।

এবং আরো আশার কথা, মৌসুমী মেঘ কেরলার দক্ষিণে এসে পৌঁছে গেছে, সেখানে বৃষ্টি নেমেছে, প্রত্যাশিত সময়ের আগেই। সেই জলদ মেঘের উত্তরাভিসার দ্রুত হোক, বজ্র আসুক, বিদ্যুৎ আসুক, এবং বারিধারা নামুক অজস্রধারে, অন্ততঃ খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রামকে সর্বজনীন অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্য।

নাইজিরিয়া ফেডারেশনে ভাঙন

২৪শে মার্চের এক অন্তর্বিপ্লবে সিয়েরা লিওনের শাসনকর্তৃত্ব কর্ণেলদের এক জোটের হাতে চলে যাওয়ার পর, গত সপ্তাহে উপজাতীয় বিরোধের ফলে নাইজিরিয়া ফেডারেশন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে এবং বিচ্ছিন্ন পূর্বাঞ্চল বায়াফ্রা নাম নিয়ে ফেডারেশন থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে।

১৯৬০ সালে আবুবকর তাফেওয়া বালেওয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে নাইজেরিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়। ছ-বছরের মধ্যেই এক সামরিক অভ্যুত্থানে আবুবকর নিহত হন এবং জেনারেল ইরনসি কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইরনসির শাসনও স্থায়ী হয়নি এবং কর্ণেলদের এক জোট লেঃ কঃ গাওনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। গত জানুয়ারী মাসে নাইজিরিয়ার চারটি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ঘানায় আবুরিতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ফেডারেশনকে রক্ষার জন্য কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সময় গাওন ঘোষণা করেন যে, নাইজিরিয়া অখণ্ড এবং কেউ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী করলে তা রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল হবে। কিন্তু মে মাসের গোড়ার দিকে পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর কর্ণেল ওদুমেগু ওজুকিউ কতকগুলো নির্দেশ জারী করে পূর্বাঞ্চলে ফেডারেশন কর্তৃত্বের প্রায় অবসান ঘটান। তারপর পূর্বাঞ্চলের পরামর্শদাতা পরিষদ যখন নাইজিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বায়াফ্রা নামে স্বতন্ত্র ও রাষ্ট্র

চালের জন্য সমগ্র নাইজিরিয়াকে ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত করে এক ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণায় পূর্বাঞ্চলকে তিনটি রাজ্যে বিভক্ত করা হয় এবং পূর্বাঞ্চলের বর্তমান গভর্ণরকে মধ্য-পূর্ব রাজ্যের গভর্ণর পদে নিয়োগ করা হয়। এই ঘটনার দুদিনের মধ্যেই পূর্বাঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গাওন এর উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদের সমাবেশের নির্দেশ জারী করেছেন।

এই ঘটনাগুলো হয়তো নাইজিরিয়ায় উপজাতীয় গৃহযুদ্ধের সূচনা করছে যা থেকে আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন প্রায় কোনো দেশই মুক্ত নয়। গত দু বছরে আফ্রিকার নটি দেশে অসামরিক শাসনের উৎখাত হয়েছে সামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা। ১৯৬৫ সালে বুরুণ্ডিতে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর পর থেকে দু বছরের মধ্যে কঙ্গো, দাহোমি, মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিক, আপার ভোল্টা, নাইজিরিয়া, ঘানা, টোগো ও সিয়েরা লিওনে অসামরিক শাসনের অবসান ঘটে। উপজাতীয় বিরোধ ছাড়া, শাসকদের দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও স্বেচ্ছাচারও দেশবাসীর কাছে তাদের অতিমাত্রায় অপ্রিয় করে তুলেছিল। নাইজিরিয়ার বর্তমান বিচ্ছিন্ন পূর্বাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার পিছনেও রয়েছে উত্তরী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। কর্ণেল ওদুমেগু বলছেন যে, উত্তর ও অন্যান্য অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতির প্রায় ৬০ হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং এক লক্ষ আশি হাজার লোক কর্মহীন হয়ে পূর্বাঞ্চলে ফিরে এসেছে। অভিযোগের মধ্যে সত্য-মিথ্যা যতটুকুই থাক না কেন, একথা আজ অবশ্য স্বীকার্য যে, আবুবকরই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি এই বিভিন্ন ধর্ম ও বহু উপজাতি অধ্যুষিত ফেডারেশনকে দীর্ঘকাল একত্র করে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অপসারণের পর নাইজিরিয়ায় যে সেই সামর্থ্যের অবসান ঘটেছে বারংবার অন্তর্বিদ্রোহই তার প্রমাণ।

উন্নয়নের দশক এবং ভারত

এই জুন মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'উন্নয়নের দশকের' তিন-চতুর্থাংশ কাল অতিবাহিত হয়ে যাবে। অনগ্রসর, উন্নতিকামী দেশগুলির অগ্রগতির প্রয়াসের সঙ্গে উন্নত দেশগুলির সহযোগিতার মিলন সাধনের আদর্শ রূপে রাষ্ট্রসংঘ এই দশকের কল্পনা করেছিল। সেই কল্পনার কতটুকু বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে আর কতটুকু এখনো কল্পনাই রয়ে গেছে?

সাধারণভাবে পৃথিবীর এবং বিশেষভাবে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার একটি সুন্দর ও চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করেছেন মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর ভারতীয় ডিরেক্টর মিঃ জন পি লিউইস। গত ২৯ মে বোম্বাইয়ে ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটিতে কেনেডি-স্মারক বক্তৃতামালার উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি এই প্রসঙ্গে রেখে-ঢেকে কোন কথা বলেননি।

মিঃ লিউইস বলেছেন, ১৯৬০-৬১ সালে যখন 'উন্নয়নের দশকের' সূত্রপাত হয়, তখন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রসংঘের পরিবারে এবং বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে একটা বিরাট উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট কেনেডি তখন তাঁর 'নয়া উন্নয়ন অর্থনীতি' ঘোষণা করেছেন যার মূল বক্তব্যগুলি ছিল ঃ এক, গণতান্ত্রিক, মুক্ত, দ্রুত উন্নতিকামী অর্থনীতিগুলিকে রক্ষা করতে হলে বাইরে থেকে ব্যাপক মূলধন যোগানো দরকার; দুই, এই যোগান অবাধে ও নির্ভরযোগ্য হওয়া দরকার; তিন, এই যোগানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেসরকারী বিনিয়োগ থেকে এলেও অধিকাংশই সরকারী সূত্রে পরিচালিত করা দরকার, হয় দ্বি-পাক্ষিকভাবে না হয় বিশ্ব ব্যাঙ্কের মত সংস্থার মাধ্যমে। রাষ্ট্রসংঘ আহ্বান জানালো সকল শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির কাছে তাদের

জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ উন্নতিশীল দেশগুলির সাহায্যে নিয়োগ করার জন্যে। তাতে দরিদ্র ও সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে আয়ের পার্থক্য ক্রমশ কমে আসবে।

এই আহ্বান ও ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৬১ সালে গঠিত হল ভারত সাহায্য সংস্থা এবং ঘোষিত হল ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি বছরে ১০০ কোটি ডলার করে সাহায্যের কথা।

উন্নয়নের দশকের তিন-চতুর্থাংশ কাল পার হয়ে আসার পর সেই আশা ও উৎসাহ রইল কোথায়? মিঃ লিউইস বলেছেন, বর্তমান এর স্থান নিয়েছে হতাশা আর নিরুৎসাহ।

রাষ্ট্রসংঘ যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, সমৃদ্ধ দেশগুলির সাহায্য তার চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে। অতএব সেইসব দেশের জাতীয় আয় কিন্তু বেড়েই চলেছে।

উৎপাদনের নিরিখে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, পাকিস্থান প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ভালো করলেও সাধারণভাবে উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থনীতির সম্প্রসারণ ১৯৬০-৬১ সালের হিসাবের তুলনায় অনেক কম। এবং সমৃদ্ধ ও দরিদ্র দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের ফারাক বেড়েই গেছে, কমেনি।

এমন কি, মিঃ লিউইস বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—যে দেশ উন্নয়নমূলক সাহায্যের প্রধান সূত্র—১৯৬০ সালের সে উৎসাহ আর নেই। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর পেছনে ১৯৬১ সালে যে ক্ষীণ গৌরবের ছটাটুকু ছিল তা-ও অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। মিঃ লিউইস এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন উন্নতিশীল দেশগুলিতে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা, বন্ধুত্বমূলক মনোভাবের অভাব, ও বৈদেশিক সাহায্যের অসন্তোষজনক ব্যবহার।

১৯৬০-৬১ সালের আশা ও ১৯৬৭ সালের নিরাশার মধ্যে যে ব্যবধান, ভারতের ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে বিরাট। মিঃ লিউইসের এই সিদ্ধান্ত বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যই পূর্ণ হয়নি। গত দু-বছরের মন্দা অবস্থার আগেও বিকাশের হার ৩ই শতাংশ ছাড়াতে পারেনি; অথচ লক্ষ্য ছিল ৫ই থেকে ৬ শতাংশ। বড় বড় শিল্প প্রকল্পগুলির 'দাঁত ওঠার কাল' অত্যধিক দীর্ঘ হয়ে দাঁড়ায়। বেকারী ও আধা-বেকারী আশংকার চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। বিদেশী সাহায্য অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। কৃষির লক্ষ্য নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মিঃ লিউইসের ভাষায় "খরার কথা ছেড়ে দিলেও যদি কেউ উৎপাদনের পরিসংখ্যানের দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখেন তাহলে তাঁকে বলতেই হবে যে, ১৯৬০-৬১ সালে ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ং-

রাণীভবানীর মন্দির—জিয়াগঞ্জ ফটো: সুনীলচন্দ্র পোদ্দার
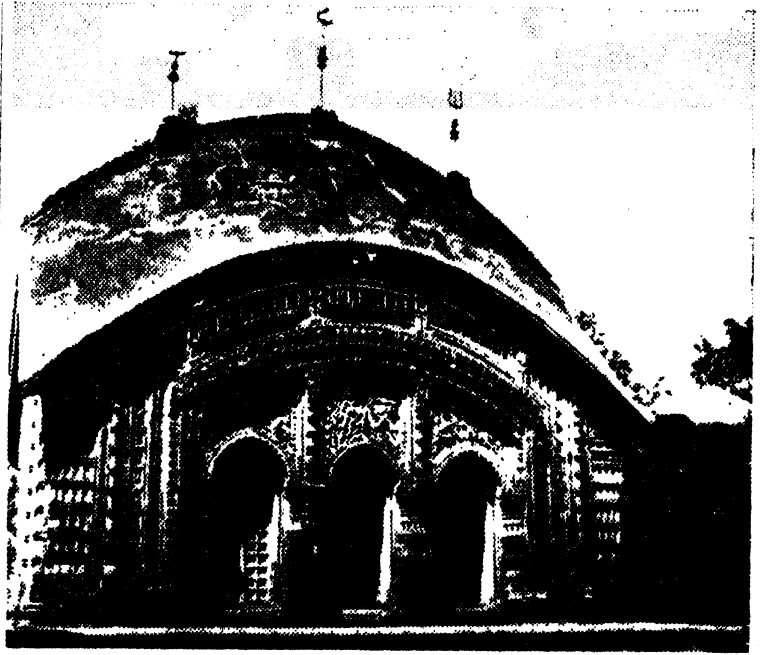
মিঃ লিউইস এই অবস্থার কারণ খুঁজেছেন ভারতে ও আমেরিকার কয়েকটি ঘটনাচক্রের মধ্যে। ভারতে পর পর দু-বছর খরা চলেছে। তাছাড়া এই দশক আরম্ভ হবার পর ভারতকে দুটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এর ওপর আছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতার আকস্মিক আবির্ভাব। আমেরিকার বেলায় রয়েছে ভিয়েৎনামের সমস্যা, আভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতি অধিক দৃষ্টিদান এবং কংগ্রেস থেকে উপযুক্ত সমর্থনের অভাব (যার জন্যে মিঃ লিউইস অবশ্য সাহায্য কর্মসূচীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনাকেই দায়ী করেছেন)।

কিন্তু দশকের বাকী এক চতুর্থাংশ সম্পর্কে মিঃ লিউইস মোটেই নিরাশবাদী নন। কারণ, তিনি বলেছেন, ভারত ও আমেরিকা উভয়েই বিগত তিন-চতুর্থাংশের ব্যর্থতা থেকে কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং এই অনুসারে ভারত (১) কৃষির ওপর অনেক বেশি জোর দিচ্ছে, (২) সার উৎপাদন ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবার জন্যে সরকারী বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী বিনিয়োগকেও উৎসাহ দিচ্ছে, (৩) রপ্তানী বাড়াবার জন্যে নানাবিধ ব্যবস্থা নিচ্ছে, (৪) পরিবার পরিকল্পনার ওপর বাঞ্ছিত জোর দিতে আরম্ভ করেছে, ও (৫) আমদানী উদারতর করে, ইস্পাত, সিমেন্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে শিল্প লাইসেন্সিং প্রথা আংশিকভাবে

আর আমেরিকা (১) মূলধনী প্রকল্প পরিকল্পনায় আরো সতর্কতা অবলম্বনের ও প্রকল্প প্রশাসনকে দৃঢ়নিবদ্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছে, (২) মূলধনী সাহায্যের সঙ্গে কারিগরী সহায়তাও দিচ্ছে, (৩) ঋণাত্মক সাহায্যের আগেকার রীতি পাল্টে প্রকল্পবহির্ভূত খতে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে, (৩) খাদ্য সাহায্যকে ভারতের নিজস্ব খাদ্য উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির শর্তের সঙ্গে যুক্ত করেছে ও (৪) এবং এই শর্ত আরোপ করার ব্যাপারে আগে যে কুণ্ঠা ছিল তা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে।

এর ওপর ভিত্তি করে মিঃ লিউইস এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, উন্নয়নের দশকের প্রথম তিন-চতুর্থাংশের কাজের রেকর্ডের তুলনায় শেষ এক-চতুর্থাংশ কাজের রেকর্ড অনেক ভালো হবে। একদিকে ভারত অনেক বেশি বাস্তবমুখী হয়ে বাস্তব নীতি গ্রহণ করতে চলেছে; অন্যদিকে সাহায্যদাতা দেশগুলিও কিভাবে আরো ভালোভাবে বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া যায় তা শিখছেন, বুঝছেন। এর মিলিত ফল ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ।

বোধ হয় মিঃ লিউইস ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এর পরেও একটা কথা আছে: সবকিছু নির্ভর করছে ভারত কতখানি এবং কি শর্তে বৈদেশিক সাহায্য পাচ্ছে, গৃহীত নীতি রূপায়ণে কতখানি আন্তরিকতা, তৎপরতা ও দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে কর্মীদের

দারোগার নাম শুনে মদনমোহনের প্রাণে যতটা ভয় হয়েছিল। দারোগাকে দেখে কিন্তু ভয় একটু কাটলো। এই গরমেও গলায় সিল্কের মাফলার জড়ানো, প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত লম্বা জুলপি, চিকন প্রজাপতি সিরিজের গোঁফ. তার কয়েকটা লোম সদ্য পেকেছে. চোখে-মুখে আমুদে চেহারা এই লোকটিকে দারোগার পোষাকে যেন বড় বেমানান মনে হচ্ছে।

মদনমোহনের ভরসা হলো যে সে চেষ্টা করলেই এই দারোগাবাবুকে বোঝাতে পারবে যে সে আসলে নিরীহ অধ্যাপক; কোনো ফৌজদারী মামলার পলাতক আসামী বা জালিয়াত অথবা ঐ জাতীয় কিছু নয়।
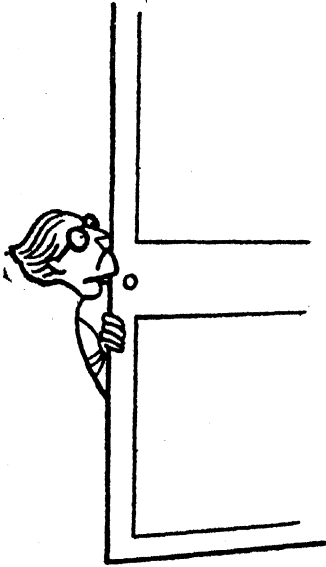
কিন্তু দারোগার কথা শুনে তার মন আবার সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। দারোগা মদনমোহনকে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্য অভি-নন্দন জানিয়ে বললো, 'আসুন, আসুন। আপনার কথা এতই শুনছি যে আপনাকে না দেখে থাকতে পারলাম না। একেবারে থানার কাজ ফেলে রেখে চলে এলাম।'

এরই সঙ্গে পাঁড়েজি যোগ দিলেন, 'আপনার সব কথাই আমি ওকে বলেছি।'

কি বলেছে পাঁড়েজি, কে জানে? মদন-মোহন ভয়ঙ্কর ঘামতে লাগলো।

দারোগাবাবু আবার বলতে লাগলেন, [illegible]

অজ শহরে যে পদধূলি দেবেন এ আমরা আশাই করতে পারি না।'

কথাগুলো কেমন ব্যঙ্গের মত শোনাতে লাগলো মদনমোহনের কানে। এরকম স্তুতি-বাক্য শোনা তার বিশেষ অভ্যাস নেই। সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো; হাতজোড় করে বললো, 'পাঁড়েজি বা দারোগাবাবু, আপনারা কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সকাল-সন্ধ্যা আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ঘিরে এত ভিড় কিসের?'

দারোগাবাবু কিছু বলার আগেই হাত কচলাতে কচলাতে পাঁড়েজি উত্তর দিলেন, 'আপনার মত এতবড় ম্যাজিসিয়ান আমাদের এখানে এসেছেন। তা লোকজনের একটু উৎসাহ হবে না? তারা আপনাকে দেখতে চাইলে আপনি কি না করতে পারেন?'

মদনমোহন বিস্মিত, বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, 'ম্যাজিসিয়ান, তার মানে?'

দারোগাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে আপনি। দারোগাগিরি করছি আমি বারো বছর। আমার কাছে আর গোপন করবেন না প্রফেসর সরকার।'

বহু চেষ্টা করলো মদনমোহন, সেই চেষ্টায় সতী-সাধ্বী অপর্ণাও যোগ দিলো, কিন্তু এদের মন থেকে কিছুতেই, সে বা তারা যে মোটেই ম্যাজিসিয়ান নয়, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারলো না।

এই রকম বিপদে মানুষে পড়ে! এর চেয়ে জালিয়াত হয়ে জেলে গেলে কখনো না কখনো খালাস পাওয়া যেতো। কিন্তু এদের হাত থেকে খালাস নেই। শহরের সমস্ত লোক দাবি জানিয়েছে যে প্রফেসর সরকারকে এই শহরে অন্ততঃ -একবারের জন্যও ম্যাজিক দেখাতে হবে।

কোনো উপায় নেই। ঠিক হলো যা কিছু যোগাড়যন্ত্র শহরের লোকেরাই করবে। পরের দিন বিকালে স্টেশনের সামনে মাঠে ম্যাজিক দেখাতেই হবে।

সেই রাতে মদনমোহন ও অপর্ণা কারো চোখের পাতাতেই একবিন্দু ঘুম নেই। ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা সামান্য জিনিস নয়। তারা এসবের কখগ পর্যন্ত জানে না। কি ম্যাজিক দেখাবে?

সবচেয়ে ভালো ম্যাজিক হতে পারে পালিয়ে যাওয়া। একেবারে এখান থেকে নিরুদ্দেশ, গায়েব হয়ে যাওয়া। কিন্তু পাঁড়েজির চোখ ফাঁকি দিয়ে হোটেল থেকে বেরুনো অসম্ভব। তাছাড়া এই আধাচেনা দেহাতি শহরে রাতের বেলা বৌ নিয়ে বেরুনোও বোধহয় খুব নিরাপদ নয়। আর দিনের বেলা সারাক্ষণ পিছনে ফেউয়ের দল লেগে। কি করে পালানো যাবে তাদের চোখের সম্মুখ থেকে।

সুতরাং সমস্যার শেষ নেই। ম্যাজিক যদি না দেখাতে পারে তাহলে কি হবে, দু'জন মিলে তাই ভাবতে লাগলো।

এদিকে ভোর হয়ে এলো। ভোরের বেলা মদনমোহনের মাথা একটু একটু করে সাফ হয়ে এলো। ছাত্রজীবনেও সে দেখেছে পরীক্ষার আগে যে যত রাত জেগেছে তত তার মাথা সাফ হয়েছে। সে অপর্ণার সঙ্গে এবার ম্যাজিক নিয়ে আলোচনা করতে

লাগলো, দুজনে কে কত রকম ম্যাজিক দেখেছে তাই দিয়ে একটা ফিরিস্তি বানালো :—

(১) খড়ি গুঁড়ো করে আবার ডাল করা।

(২) একশো টাকার নোট পুড়িয়ে ফেলে আবার ঠিক করা।

(৩) হাতে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে চাবি কুয়োর জলে ফেলে দিয়ে হ্যাণ্ডকাফ অনায়াসে খুলে ফেলা।

(৪) বাক্সের ভিতর আটকিয়ে রেখে বের করে আনা।

(৫) পাখি উড়িয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনা।

(৬) চলন্ত ট্রেন স্টেজের উপর নিয়ে আসা।

[illegible] রায়

(৪)

নিত্যানন্দ

(ক)

বীরভূমের একচক্রা গ্রামে হাড়াই ওঝার বাড়ি। থানা মৌড়েশ্বর, মল্লারপুর স্টেশন থেকে মাইল সাতেক হবে। হাড়াই ওঝাকে কেউ-কেউ হাড়াই পণ্ডিতও বলে। ভালো নাম মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল।

একচক্রা থেকে কিছু দূরে মৌড়েশ্বর শিবের মন্দির। হাড়াই আর পদ্মাবতী দুজনেই মৌড়েশ্বর শিবের পুজো করে। দুজনেই শিবভক্ত।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে হাড়াইয়ের ঘরে পদ্মাবতীর কোল আলো করে নিত্যানন্দের আবির্ভাব হল।

নাম রাখা হল কুবের। হাড়াই পণ্ডিতের ছেলে কুবের পণ্ডিত।

ছেলেবেলা হতেই নিত্যানন্দের অদ্ভুত খেলা। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ খেলা। পুতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, কালীয়দমন, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ—এই সব খেলাতেই সে ভালোবাসে। একদিন দিব্যি অক্রূর সেজে এল কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যেতে। এই দেখ কংসের ধনুর্যজ্ঞে কেমন ধনুক ভাঙছে, কেমন দুই মল্লপ্রধান চানুর আর মুষ্টিককে ঘায়েল করছে—আবার এই দেখ কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা দেখে গোপীভাবে কাঁদছে আকুল হয়ে।

বাবা-মা ভীষণ ভয় পায়। এইটুকু শিশু, এত সব কৃষ্ণলীলা কী করে জানল?

পাড়ার আর সব ছেলেদেরও দেখ। তারাও নিত্যানন্দ ছাড়া আর কারু সঙ্গে খেলবে না। আমাদের নিতাইয়ের যখন কৃষ্ণ-লীলার খেলা ছাড়া আর কিছুতে মন নেই, আমাদেরও ঐ খেলাতেই আনন্দ।

নিতাইয়ের বয়স যখন বারো তখন নবদ্বীপে সন্ধ্যায় গৌরচন্দ্রের উদয় হল। একচক্রা থেকে গর্জন করে উঠল নিতাই।

এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এ কিসের শব্দ? কোথাও বাজ পড়ল বোধ-হয়। না কি মৌড়েশ্বর শিব প্রলয়-বিষাণে হুংকার ছাড়লেন?

নিত্যানন্দকে কেউ চিনতে পারল না।

সেই থেকে নিত্যানন্দের মন কেমন উড়ু-উড়ু। ঘরের বন্ধন কেটে কোথাও চলে যাবার জন্যে ছটফট করছে। বাবা-মা বোঝেন নিতাই আর ঘরে থাকতে চাইছে না, কিন্তু দেখায় ততই হাড়াই তাকে আঁকড়ে ধরে। 'ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে। ননীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে।।'

হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাড়াই পণ্ডিতের আতিথ্য নিলে।

আমার কী ভাগ্য! আমার গৃহে আপনি ভিক্ষে করুন। হাড়াই আনন্দিত চিত্তে সংবর্ধনা করল।

সারা রাত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করল দুজনে।

ভোর হলে সন্ন্যাসী যখন বিদায় নিয়ে যাবে তখন হাড়াইকে বললে, আমার একটি ভিক্ষে আছে।

বলুন। আপনাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

আমি তীর্থপর্যটনে যাচ্ছি। বললে সন্ন্যাসী, আমার সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণ নেই। আপনার বড় ছেলেটিকে দিন, আমার সে সঙ্গী হবে।

নিত্যানন্দ—নিতাইকে দেব? হাড়াইয়ের বুকে যেন শেল বিঁধল।

অল্প কদিনের জন্যে দিন। দিন কয়েক ঘুরে আবার সে ফিরে আসবে।

হাড়াই বলতে গেল পদ্মাবতীকে। অঞ্চলের গ্রন্থি খুলে নিতাই-নিধিকে ছেড়ে দিতে পারবে?

পদ্মাবতী বললে, তুমি পারলে আমিও পারব।

স্বামীকে মনে করিয়ে দিল বিয়ের পর নারায়ণ সাক্ষী করে তারা কী প্রতিজ্ঞা করেছিল? প্রতিজ্ঞা করেছিল অতিথিকে কখনো বিমুখ করব না। আজ বুঝি সেই প্রতিজ্ঞারই পরীক্ষা নিচ্ছেন নারায়ণ।

নিত্যানন্দের হাত ধরে সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে পড়ল।

কে এ সন্ন্যাসী?

এ সেই বিশ্বরূপ, নিমাইয়ের দাদা। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নাম শ্রীশংকরারণ্য পুরী। মাধবেন্দ্র পুরীর যে গুরু লক্ষ্মীপতি পুরী তার কাছ থেকেই বিশ্বরূপের দীক্ষা।

আসলে বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের অভিন্ন-স্বরূপ বলরাম।

গৃহত্যাগ করে প্রথমেই নিতাই বক্রেশ্বর গেল। সেখান থেকে বৈদ্যনাথ। তারপর গয়া হয়ে কাশী, শিব-রাজধানী, 'যেথা ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী।' সেখান থেকে প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে হস্তিনাপুর। তারপর প্রভাস দ্বারকা গোমতী গণ্ডকী হয়ে, মহেন্দ্র পর্বত অতিক্রম করে হরিদ্বার। একেবারে কন্যাকানগর বা কন্যাকুমারী পর্যন্ত। বেশবাস অবধূতের মত কিন্তু কৃষ্ণ-বেশে বশীভূত। সন্ন্যাসী তো রুক্ষ-কণ্ঠ নয় কেন, এ যে তরলায়িত, এ যে ভাববিহ্বল! 'নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস।।'

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডুরপুরে এসে থামল শঙ্করারণ্য। নিত্যানন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে তার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

নিত্যানন্দ সহস্রতেজা সূর্যের মত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

একা-একা ফিরতে লাগল নিত্যানন্দ। নাম নিল অবধূত।

হঠাৎ মাধবেন্দ্রের সঙ্গে দেখা। ভক্তি-রসের আদি সূত্রধার মাধবেন্দ্র, অহর্নিশ যে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, মেঘ দেখলেই যে কৃষ্ণ-বিরহে কেঁদে ওঠে।

মাধবেন্দ্র বললে, কী বলছেন? আপনিই তো প্রকট প্রেমমূর্তি। আপনাকে পেয়েই তো অনুভব করছি আমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা আছে।

কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দ। যেখানে যাই সেখানেই দেখি কৃষ্ণের আসন আচ্ছাদিত। তিনি কোথায় গেলেন?

তিনি নদীয়ায় গিয়েছেন। নাম নিয়েছেন নিমাই। তাঁর সংকীর্তন-লীলা আরম্ভ হতে আর দেরি নেই।

তা কি আর নিত্যানন্দ জানে না? যখন মহাপ্রকাশ হবে তখন ঠিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমিই তো তার কীর্তন-লীলার প্রধান সহচর।

মাধবেন্দ্র গেল সরযূদর্শনে, নিত্যানন্দ সেতুবন্ধে। সেখান থেকে ঘুরতে-ঘুরতে নীলাচল। নীলাচল থেকে গঙ্গাসাগর। তারপর আবার ফিরল মথুরায়। 'নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।' কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি।।'

গয়া থেকে ফিরে নবদ্বীপে গৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করেছে। সুরু করেছে নাম-লীলা। বিলিয়ে দিচ্ছে প্রেমধন। এবার তবে যেতে হয়, জুটতে হয় ভাইয়ের সঙ্গে।

জানো কাল রাতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি। বললে নিমাই, দেখলাম এক তালধ্বজ রথ আমার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই রথ থেকে রজত পর্বতের মত এক বিশালবাহু মহাপুরুষ নেমে এল। তার পরনে নীল রঙের কাপড়, মাথায়ও ঐ রঙের পাগড়ি, ডান কাঁধে স্তম্ভ, বাম হাতে

যেন সাক্ষাৎ হলধর। আমার দিকে তাকিয়ে বারে-বারে বললে, এ বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের? আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? উত্তর হল, আজ নয়, কাল পরিচয় পাবে। আমার মনে হচ্ছে নবদ্বীপে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, শ্রীবাস আর হরিদাস, তোমরা যাও, খোঁজ নিয়ে এস, কে এল, কোথায় এল?

অনেক ঘোরাঘুরি করে ফিরল দুজনে। বললে, ঘরে-ঘরে খোঁজ নিয়ে এলাম, কোথাও কেউ আসেনি।

নিমাই বললে, চলো, আমি দেখি গে।

সটান নন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে হাজির হল।

দেখল নিত্যানন্দ অবধূতে বেশে বসে আছে। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনটি। 'ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।'

ধ্যানের বস্তু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এক পলকে চিনল নিত্যানন্দ। এ যে তার সেই 'আপন ঈশ্বর', আপন-বান্ধব।

নিমাই শ্রীবাসকে বললে, ভাগবতের শ্লোক পড়ো।

কৃষ্ণরূপ বর্ণনার শ্লোক পড়ল শ্রীবাস। শ্লোক শুনতেই নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ হল, নিমাইয়ের বাহুবন্ধনে ধরা দিল নিমেষে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে, 'তুই সেই কানাই না রে? কিন্তু তোর চুড়ো আর বাঁশি কই?

নিমাইও অস্ফুট উত্তর দিল: ব্রজের খেলা দৌড়োদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি। ব্রজের খেলা বাঁশির কান, নদের খেলা হরি-গান। ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া, নদের বেশ কৌপীন পরা।

পরে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা, আপনি কোথায় ব্যাসপুজা করবেন?

নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই বামনার ঘরেই পুজো করব।

শ্রীবাসের মহা আনন্দ, স্বচক্ষে নিত্যানন্দের ব্যাসপুজো দেখবে।

শ্রীবাসের ঘরে রাত কাটাল নিত্যানন্দ। অর্ধরাতে হঠাৎ সে হুংকার করে উঠল। কী ব্যাপার? নিত্যানন্দ তার দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেছে।

এ কী, দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙলেন কেন? শ্রীবাস আর্তনাদ করে উঠল।

আর কী হবে, দণ্ড-কমণ্ডলু দিয়ে? যাকে পাবার জন্যে ওদের সম্বল করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি তাকে পাবার পর ওদের আর আমার কী দরকার? কেন আর অনর্থক এই বোঝা বওয়া?

শ্রীবাস নিমাইকে খবর দিতে ছুটল।

নিমাই এসে নিত্যানন্দকে বললে, চলো গঙ্গাস্নান করে আসি।

সকলকে নিয়ে গঙ্গায় চলল নিমাই। নিত্যানন্দের দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল।

নিত্যানন্দের যেন জীবনের প্রতিও আর মমতা নেই। সে জলে নেমে কুমির দেখে তাকে ধরবার জন্যে সাঁতার দিল। সকলে হায়-হায় করে উঠল। নিমাই শাসনের সুরে বললে, উঠে এস। তোমাকে আজ ব্যাস-পুজো করতে হবে না?

আদেশ শুনে নিত্যানন্দ উঠে পড়ল।

নিত্যানন্দের ব্যাসপুজো, আচার্য শ্রীবাস। পুজো-অন্তে শ্রীবাস নিত্যানন্দের হাতে এক গাছি ফুলের মালা দিয়ে বললে, স্বহস্তে এই মালা ব্যাসদেবের আসনে দিন, এই পুজোর বিধি।

নিত্যানন্দ মালা হাতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, মালা দেবার গলা কই?

এ কী, মালা দিন আসনে। মন্ত্র বলুন।

নিতাই নিস্পন্দ, নীরব।

শ্রীবাস-অঙ্গনের অন্যপ্রান্তে বসে কীর্তন করছিল নিমাই। তার কাছে খবর গেল, নিত্যানন্দ পুজো সাঙ্গ করছে না, মালা হাতে কেবল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আপনি আসুন।

নিমাই এসে হাঁক দিল, ব্যাসকে মালা দাও।

আনন্দে মত্ত হল নিত্যানন্দ। হাতের মালা গৌরসুন্দরের গলায় দুলিয়ে দিল। গৌরসুন্দর ষড়ভুজ মূর্তি ধরলেন।

শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম শ্রীহল মুষল।

দেখিয়া মূর্ছিত হৈল নিতাই বিহ্বল।।

নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরেই থেকে গেল। সদানন্দ বাল্যভাব। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীর সে শিশুপুত্র। মালিনী তাকে কাছে বসিয়ে না খাওয়ালে তার খাওয়া হয় না—'আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।' তার যত বালক-চাপল্য—সমস্ত স্নেহচক্ষে ক্ষমা করে মালিনী।

শ্রীবাসকে পরীক্ষা করতে চাইল নিমাই। বললে, তুমি যে অবধূতকে এক নাগাড়ে তোমার ঘরে রাখছ এটা কি ঠিক হচ্ছে?

শ্রীবাস নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। নিমাই কী বলতে চাইছে বুঝে উঠতে পারল না।

এই অবধূতের কোন জাত কোন কুল কিছুই জান না। একে নিরন্তর ঘরে রাখা উচিত হচ্ছে না। তোমার নিজের জাত-কুলের জন্যে যদি কিছু মায়া থাকে তবে অবধূতকে বিদায় করো।

শ্রীবাস হেসে ফেলল। বললে, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ। এ তোমার উচিত নয়। নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনীতেও আসক্ত হয় আর তার জন্যে যদি আমার ধন-প্রাণ কুল-মান যায় তবু তার প্রতি আমার বিশ্বাস অটল থাকবে।

সত্যি? আমার নিতাইয়ের উপর তোমার এত বিশ্বাস? নিমাই শ্রীবাসকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তোমাকে বর দিচ্ছি লক্ষ্মী যদি নগরে নগরে ভিক্ষে করেও বেড়ায় তবু তোমার ঘরে দারিদ্র্য হবে না। আমার নিতাইচাঁদকে তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম।

নদীয়ার পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় নিত্যানন্দ। বালকদের সঙ্গে খেলা করে। কখনো এর-ওর বাড়ি ঢুকে পড়ে, কখনো বা শচীমাতার অঙ্গনে। শচীমাতাকে দেখলেই প্রণাম করতে হাত বাড়ায়। শচীমাতা হেসে পালিয়ে যান কিন্তু মনের মধ্যে পুরোনো স্নেহ উথলে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি তবে আমার বিশ্বরূপ?

একদিন পালিয়ে না গিয়ে নিতাইয়ের হাত দুটো ধরে ফেললেন শচীমাতা। জিজ্ঞেস করলেন, বল তুই কে? তুই কি আমার বিশ্বরূপ?

হ্যাঁ, মা, আমি বিশ্বরূপ। নিতাই বললে, একথা যেন কাউকে প্রকাশ কোরো না।

আমার বাড়িতে আজ তোমার ভিক্ষা। মা ডেকে পাঠিয়েছেন। নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করল নিমাই। বললে, কিন্তু অনুরোধ করছি, চঞ্চলতা করবেন না।

আমি বুঝি চঞ্চল? তুমি নিজে যেমন তেমনি সবাইকে দেখ। নিত্যানন্দ হাসল।

নিমাই নিতাই দু ভাই পাশাপাশি খেতে বসল। সেই ভাব, সেই স্বভাব, সেই সমস্ত।

সন্দেহ নেই, এরাই ওরা, ওরাই এরা। যেন কৌশল্যার ঘরে রাম-লক্ষ্মণ। যশোদার ঘরে কৃষ্ণ-বলরাম।

পরিবেশন করতে-করতে শচীমাতা দেখলেন দুটি পাঁচ বছরের উলঙ্গ শিশু পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। নিমাই কালো নিতাই ফর্সা। কিন্তু দুজনেই চতুর্ভুজ। নিমাইয়ের হাতে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম আর নিতাইয়ের হাতে শঙ্খ-চক্র হল মুষল। হাতের থালা খসে পড়ল, শচীমাতা ভূমি-তলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

কী হল, কী হল, উঠে পড়ল দু ভাই। মায়ের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল।

শচীমাতা উঠে বসে কাঁদতে লাগলেন। নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি তোমার ছোট ভাই নিমাইকে দেখো।

মা, কাঁদছ কেন? মালিনীকে জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দ।

মালিনী দেখল তার শিশু নিতাই। যার স্পর্শে তার শুষ্ক স্তনে দুধ আসে। বললে, বাবা, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভোগের ঘৃতপাত্র কাকে নিয়ে গেছে।

কোন কাক চিনতে পারবে?

ঐ তো বাটি মুখে করে উড়ে গিয়ে বাটি ফেলে দিয়ে ফের ঐ গাছের ডালে এসে বসেছে। মালিনী কাকটাকে চিনিয়ে দিল।

নিত্যানন্দ কাককে সম্বোধন করে বললে, বাটি ফেরৎ দিয়ে যাও।

কাক উড়ে গেল। বাটি মুখে করে উড়ে এসে রাখল নিতাইয়ের কাছে।

মালিনী স্তব করতে বসল। নিতাই বললে, ওসব ছাড়ো, আমাকে খেতে দাও।

শচীমাতাও পাঁচটি ক্ষীর সন্দেশ খেতে দিলেন নিতাইকে।

মহাভাবাবেশ হয়েছিল, বাল্যভাবে নিত্যানন্দ দিগম্বর হয়ে গিয়েছিল। নিমাই বললে, বসন পরো। 'চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ মাত্র মানে।' নিমাই-ই বসন পরিয়ে দিল। শাসনে শান্ত হয়ে বসল নিত্যানন্দ। খেতে চাইলে শচীমাতা সন্দেশ দিলেন।

একটি খেয়ে বাকি চারটি নিতাই ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। একটাই যথেষ্ট। এত-গুলি একসঙ্গে দিলে কেন?

সন্দেশটা খেয়েই নিতাই আবার হাত পাতল।

শচীমাতা বললেন, আর পাব কোথায়? নিজেই তো তখন ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

দেখ গে পাবে।

শচীমাতা ঘরে ঢুকে দেখলেন, কী আশ্চর্য, নিটোল চারটি সন্দেশ থালায় শোভা পাচ্ছে, গায়ে ধুলো মাখা। যেগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেগুলো ঘরের মধ্যে এল কী করে?

বাবা, এগুলো ঘরের মধ্যে এল কী করে? সন্দেশ নিয়ে দাওয়ায় চলে এলেন শচীমাতা। দেখলেন, নিতাইয়ের হাতে চারটি সন্দেশ, সে খাচ্ছে তাই তৃপ্তের মত।

এ আবার কোত্থেকে পেলে? শচীমাতার চোখে বিস্ময়ের ঘোর লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, যা ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলাম তাই আবার কুড়িয়ে এনেছি।

তারপর সেদিন গৌরসুন্দর নিজের হাতে চন্দনে-মাল্যে সাজালেন নিত্যানন্দকে। স্তব করতে লাগলেন। 'নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ। এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্তিমন্ত।।'

স্তবশেষে বললেন, তোমার একখানা কৌপীন আমাকে দাও।

কৌপীন পেয়ে তাকে টুকরো টুকরো করলেন, ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বললেন, এই পবিত্র বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধো, কৃষ্ণদাস হয়ে যাও।

তারপর আদেশ করলেন, নিত্যানন্দ, হরিদাস, ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করো। 'প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।'

হরিদাস আগে আগে চলেছে, পিছে নিত্যানন্দ। হরিদাস নাম করছে কিন্তু নিত্যানন্দ মূক।

এ কী, আপনি চুপ করে আছেন? জিজ্ঞেস করল হরিদাস।

আমি ও সবের কী জানি!

সে কী, মহাপ্রভু যে বললেন নাম করতে।

তুমি করতে হয় করো, আমি তার আদেশের ধার ধারি না।

তবে আপনি এসেছেন কেন?

নাম প্রচারের জন্যে।

তাই তো, তাই তবে করুন।

শোনো, তাই করছি। বলে নিত্যানন্দ দু বাহু তুলে বলে উঠল: 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে। সে জন আমার হয় আমি হই তার রে।।'

গৌরাঙ্গ নিজেকে লুকোতে চাইছে নিত্যানন্দ তাকে লুকোতে দেবে না। কৃষ্ণই যে বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপে এসেছে একথা সে ফাঁস করে দেবে। তাই হরিদাস মহাপ্রভুর আদেশে ভজ কৃষ্ণ বলুক, নিত্যানন্দ বিদ্রোহাচরণ করেই বলবে, ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে এরা কারা? এরা দু ভাই জগদানন্দ আর মাধব, ডাক-নাম জগাই-মাধাই। নদীয়ার নগর-কোটাল। বিস্তর পয়সা। হেন দুষ্কর্ম নেই যা করে না। গো-মাংস ভক্ষণ, ডাকা-চুরি, পরগৃহদাহ, মদ্যপান, নারীনির্যাতন—মাতাল লম্পট দুটোর অকার্য কিছু নেই। কাজী কী করবে? কাজী তো ওদের টাকায় বশীভূত।

চলো ওদের নাম শুনিয়ে আসি। বললে নিত্যানন্দ।

চলো।

হরিদাস বললে, ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ। আর নিত্যানন্দ বললে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ।

ধর ধর বলে তাড়া করল জগাই-মাধাই। হরিদাস আর নিত্যানন্দ দুজনেই ছুটে দিল। হরিদাস পালাল অদ্বৈতের ঘরে, নিত্যানন্দ চলে এল গৌরাঙ্গের কাছে। সব বিবরণ শুনে গৌরাঙ্গ বললেন, দুই পাপাশয়কে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে দেব। 'খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা।'

নিত্যানন্দ চুপ করে রইল। মনে-মনে বললে, মেরেই যদি ফেললে তাহলে আর উদ্ধার করলে কী! তা হলে নামের মাহাত্ম্য আর রইল কোথায়?

তারপর রাত্রে একদিন বাড়ি ফিরছে নিত্যানন্দ, জগাই-মাধাই তার উপর চড়াও হল। ঐ সেই অবধূত যাচ্ছে না? নাম বিলোচ্ছে! মার ব্যাটাকে।

মদের ভাঙা কলসীর টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে মাধাই নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। নিত্যানন্দের কপালে লেগে কেটে গেল, রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে।

নিত্যানন্দ ভ্রূক্ষেপও করল না। বললে, মেরেছিস তো মেরেছিস, আমার ব্যথা লাগেনি। শুধু তোরা একবার সুমধুর হরিনাম বল, বল গৌরহরি। তোদেরও সমস্ত ব্যথা চলে যাবে।

দেখি কেমন তোর ব্যথা না লাগে—মাধাই আবার তাকে মারতে এগোল।

জগাই তাকে নিরস্ত করলে। দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মেরে তোর কী এমন পৌরুষ বাড়বে?

গৌরাঙ্গের কাছে খবর পৌঁছুল। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলেন। রুদ্রমূর্তি ধরে সুদর্শনকে আহ্বান করলেন।

নিত্যানন্দ আবার বিদ্রোহ করল। বললে, প্রভু তুমি এ কী করছ? তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ এই অবতারে তুমি অস্ত্র ধরবে না, কাউকে নিধন করবে না। শুধু নামমন্ত্রে চিত্তশুদ্ধি করে সবাইকে উদ্ধার করবে। তবে অন্যথা করছ কেন? এরা তো দুঃখী, মোহান্ধ, এদেরকে প্রাণে না মেরে আমাকে ভিক্ষে দাও। আমি এদের মধ্যে তোমার পতিতপাবন লীলার মহিমা দেখাই।

গৌরাঙ্গ তবুও নিবৃত্ত হতে চান না।

নিত্যানন্দ বললে, দণ্ড দিতে হলে দুজনকেই দিতে পারো না। মাধাই আমাকে দ্বিতীয়বার মারতে চাইলে জগাই তাকে বাধা দিয়েছিল, জগাইয়ের জন্যেই আমি বেঁচে গিয়েছি।

তুই আমার নিতাইকে বাঁচিয়েছিস? আয় আমার বুকে আয়। গৌরাঙ্গ হাত বাড়ালেন।

জগাই গৌরহরির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। প্রভু তাকে তুলে নিয়ে বুকে ধরলেন। প্রেমধনে ধনী হয়ে জগাই কাঁদতে লাগল।

সংগ্রাম ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারও তা হলে গতি করো। মিনতি করল মাধাই। আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল কোরো না।

আমার নিজের শরীরের চেয়ে আমার ভক্তের শরীর আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। আমার নিতাইয়ের শরীরে তুই আঘাত করেছিস তোর নিস্তার নেই।

তোমার রাজত্বে কারু নিস্তার নেই এ কি কখনো হতে পারে? বলো আমার পথ বলে দাও।

তাহলে তুমি নিত্যানন্দের পায়ে পড়ো, নিত্যানন্দই তোমার উপায় করবে।

নিত্যানন্দ বললে, প্রভু, এ শুধু আমার মান বাড়াবার জন্যে তোমার প্রচ্ছন্ন লীলা। বেশ, কোনো জন্মে আমার যদি কোনো সুকৃতি থাকে, আমি তা মাধাইকে দিলাম। বলে ভূপতিত মাধাইকে বুকে তুলে নিল। বললে, এ আমার মাধাই। এ যদি আমার হয় তবে ও তোমারও।

জগৎ যারে ত্যাগ করে
নিতাই তারে বুকে ধরে।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে
জগৎ যারে ঠেলে ফেলে,
ভয় নেই তোর আছি বলে
নিতাই তারে করে কোলে।।

গৌরাঙ্গও বুকে নিলেন মাধাইকে। গৌরাঙ্গের রুদ্রমূর্তি নিত্যানন্দের করুণা-মূর্তিতে লীলায়িত হল।

গৌরাঙ্গকে নিয়ে নিত্যানন্দ শান্তিপুরে চলেছে। পথে ললিতপুর গ্রাম, এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর বাড়িতে এসে উঠেছে। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতেই সন্ন্যাসী তাকে কামিনী-কাঞ্চন-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করল। ধন হোক বিদ্যা হোক বধূ হোক বংশ হোক।

গৌরাঙ্গ বললে, এসব আশীর্বাদ নয়। বলুন কৃষ্ণের প্রসাদ হোক।

সন্ন্যাসী খেপে গেল। বললে, ধন না হলে খাবে কী?

যদি কর্মফলে থাকে খাওয়া আপনি মিলবে। ধন-পুত্রও তো থাকে না। শুধু কৃষ্ণপ্রসাদই থাকে। আপনি শুধু বলুন আমার কৃষ্ণে মতি হোক।

কোথাকার কে এক দুগ্ধপোষ্য বালক আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। আমাকে শেখাচ্ছে আশীর্বাদ! সন্ন্যাসী রাগে আগুন হয়ে উঠল।

ছি-ছি, বালকের অন্যায় স্পর্ধা, আপনার সঙ্গে তর্ক করে! নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীকে শান্ত করতে চাইল। ও অবোধ, ও কী জানে! আপনার সঙ্গে ওর তুলনা! ওকে আপনি মার্জনা করুন।

প্রশংসা শুনে সন্ন্যাসী খুশি হল। বললে, আনন্দ আনব, খাবে?

আনন্দ কী? গৌরাঙ্গ চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করল নিত্যানন্দকে।

নিত্যানন্দ বললে, মদ।

বিষ্ণু, বিষ্ণু! গৌরাঙ্গ ছুটে দিল, ঝাঁপ দিল গঙ্গায়।

নিত্যানন্দকে বললে, আমার নবদ্বীপ বাস ফুরিয়ে এল। আমি এবার সন্ন্যাস নেব। শিখাসূত্র ত্যাগ করব। আমি কাঙাল সেজে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না করলে লোকে হরিনাম নেবে না, নামবে না তাদের অভিমানের মঞ্চ থেকে।

কিন্তু তোমার মায়ের কী দশা হবে? নিত্যানন্দ বললে কাতর হয়ে।

নিতাই, তুমি সবই জানো। আমি একা কেঁদে সকলের হৃদয় গলাতে পারব না। মা কাঁদবে, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদবে, ভক্তদল কাঁদবে তবেই না কঠিন মাটি কোমল হবে। তবেই না তাতে তুমি ভক্তির বীজ ছড়িয়ে দেবে. তবেই না প্রেমের ফসল ফলাবে।

কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিলেন।

প্রেমোন্মাদে চললেন বৃন্দাবন।

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আর চন্দ্রশেখর।

নিত্যানন্দ মাঠের রাখালদের শিখিয়ে দিল, প্রভুকে দেখলেই হরিবোল বলবি আর যদি বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞেস করেন গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিবি।

গরু চরাচ্ছিল ছেলেগুলো, গৌর-সুন্দরকে দেখে হরিবোল বলে উঠল।

ব্রজের ধ্যানে বিভোর হয়ে আছেন, প্রভু বললেন, তোমরাই বুঝি ব্রজের বালক। বলতে পারো আমার বৃন্দাবন আর কতদূর? কোন পথে গেলে পাব আমার বৃন্দাবনকে?

এই যে এই পথে। গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল।

গৌরহরি শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে গিয়ে উঠলেন।

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে শচীমাতার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল : মা, মা—

কে রে? আমার নিমাই এলি?

না, আমি তোমার নিতাই। তোমার নিমাইকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে এনে রেখেছি। তুমি চলো একবার দেখবে চলো।

এখুনি যাব। বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্দেশ করে ডাকলেন শচীমাতা। বউমা, শিগগির চলো। নিমাই শান্তিপুরে এসেছে।

নিত্যানন্দ গম্ভীর মুখে বললে, আপনি একাই চলুন।

আর বউমা?

সন্ন্যাসীর যে স্ত্রীদর্শন নিষেধ।

নিষেধ? আমার নিমাই তবে সন্ন্যাসী হয়েছে?

নিত্যানন্দ চুপ করে রইল।

সে যদি আমাকে ছাড়তে পারে আমি তাঁকে ছাড়তে পারব না কেন? শচীমাতা শক্ত হতে চাইলেন। বউমা যদি না যায় তো আমিও যাব না।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদতে লাগল। বললে, না, মা, আপনি যান। হয়তো তাঁর ইচ্ছে আপনার সঙ্গে দেখা হোক। তাই আপনি একবার তাঁকে দেখে আসুন।

শাশুড়ীকে উত্তরীয় ও নামাবলী দিয়ে সাজিয়ে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপরে রওনা করিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ শিবিকায় চড়িয়ে শচীমাতাকে শান্তিপুরে নিয়ে এল। মাতা-পুত্রের মিলন করিয়ে দিল।

মায়ের থেকে অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভু চললেন নীলাচল।

(ক্রমশঃ)

শার্লক হোমস (৬)

অদ্রীশ বর্ধন

আলক্রেড-শাসিত শার্লক হোমসের তৃতীয় কেস। দুজন বিখ্যাত শার্লকিয়ান গবেষকের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি প্রথম আর দ্বিতীয় কেসের বিবরণীও উদঘাটিত হয়েছে।

১৮৭৭ আর ১৮৭৮ সালে বৃটিশ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনে লক্কাভেদ নিয়ে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী ঘটে। তখন করণোয়াল হোমস নামে এক ব্যক্তি দুবার প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে দুটো পুরস্কার পকেটস্থ করেন। প্রতারণার তদন্ত করার উদ্দেশ্যে শার্লক হোমসই যে ছদ্মবেশে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

দ্বিতীয় মামলাটি আরো চাঞ্চল্যকর।

১৮৮৮ সালের বিশে মার্চ এক রহস্যময় মক্কেলের আবির্ভাব ঘটে হোমসের ২২১-বি, বেকার স্ট্রীটস্থ বাসভবনে। উচ্চতায় তিনি সাড়ে ছ ফুটের কম নন। হাত-পা বুক হার্কিউলিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোশাক অত্যন্ত মহার্ঘ আর বড় বেশি চটকদার। কাঁধের ঝোঁকে ঝকমক

করছে দামী ফিরোজা পাথর। মুখে মুখোশ, কিন্তু চিবুকে দৃঢ়তা আর একগুঁয়েমির ছাপ সুস্পষ্ট। কথা বলার ভঙ্গিমা কর্কশ, উচ্চারণে জার্মাণ টান।

রহস্যময় আগন্তুক কিন্তু আত্ম-পরিচয় গোপন করতে পারেননি শার্লক হোমসের কাছে। মুখ খোলার আগেই হোমস জেনে-ছিলেন তাঁর দীনহীন ঘরে সেদিন আগমন ঘটেছে বোহেমিয়ার এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। নাম তাঁর ভিলএলম গটরাইখ সিজিসমণ্ড ফন অর্মস্টাইন, ক্যাসল-ফেল-স্টাইনের গ্র্যাণ্ড ডিউক, বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজা।

এইভাবেই শুরু হয়েছিল বোহেমিয়ার কেলেঙ্কারীর কৌতূহলোদ্দীপক মামলা। কিন্তু মুখোশাবৃত মহারাজকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন শার্লক হোমস। তবে কি রাজার সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর আলাপ ছিল?

ছিল। এবং সেই হল শার্লক হোমসের গোয়েন্দাজীবনের দ্বিতীয় মামলা। সুইসাইড ক্লাবের কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রিন্স ফ্লোরিজেল। ডানপিটেদের শিরোমণি ছিলেন প্রিন্স। কিন্তু সুইসাইড ক্লাবে তিনি পড়লেন ব্ল্যাকমেলারদের খপ্পরে। কর্ণেল জেরাল্ডিন তখন সংগোপনে এক ডিটেকটিভকে মোতায়েন করেন এবং খুনে-খারাপীর আড্ডা থেকে প্রিন্স ফ্লোরিজেলকে উদ্ধার করে নিয়ে যান নামহীন সেই তরুণ ডিটেকটিভ।

কাজ সেরে মন্টেগু স্ট্রীটের ঘরে ফিরে গেছিলেন তরুণ গোয়েন্দা শার্লক হোমস। কিন্তু ছদ্মনাম্নী প্রিন্স ফ্লোরিজেলের প্রকৃত পরিচয় গোপন থাকেনি তাঁর সন্ধানী মনের কাছে। গট্রাইখ আর ফ্লোরিজেল যে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি—তা জেনেও উচ্চবাক্য করেননি গোপনীয়তার খাতিরে।

প্রিয় বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনও মধ্যে মধ্যে কাছ ছাড়া হয়েছেন শার্লক হোমসের—কিন্তু তাঁর সঙ্গ ছাড়া হয়নি যে বস্তুটি, সেটি তাঁর বেহালা। বহু আবিল মুহূর্তে এই বেহালার সুর তাঁর মনের জট ছাড়িয়েছে।

মন্টেগু স্ট্রীটে থাকার সময়েই বেহালাটির আবির্ভাব ঘটে তাঁর ঘরে।

বিকেলের দিকে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড দিয়ে হাঁটছিলেন হোমস। সোহোতে সদ্য লাঞ্চ খেয়েছেন। হাতে কাজ নেই। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যাচ্ছেন। এমন সময়ে চোখ পড়ল ধূলি-ধূসরিত একটা কাঁচের শোকেসে।

অভিজ্ঞ চোখ। কাজেই বেহালাটি দেখেই চিনেছেন হোমস। STRADIVARIUS বেহালা এমন অবহেলায় পড়ে থাকতে বিস্মিতও হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিয়েছেন হোমস। দোকানদার বন্ধকী কার-বারী। কিন্তু এরকম একটা মূল্যবান বস্তুর প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে সে বেচারী কিছুই জানে না দেখে যেমন অবাক হলেন, তেমনি উল্লসিত হলেন শার্লক হোমস। অতএব মাত্র পঞ্চান্ন শিলিংয়ের বিনিময়ে বেহালাটার মালিক হয়ে বসলেন হোমস ('দি কার্ডবোর্ড বকস' গল্প দ্রষ্টব্য)। তারপর থেকেই সযত্নে কেস ভর্তি বেহালাটাকে তিনি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ঘরের এককোণে ('খালি বাড়ী' গল্প দ্রষ্টব্য)। একবারই শুধু মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়ায় এমন প্রাণপ্রিয় বস্তুটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ('নরউডের স্থপিত' গল্প দেখুন)।

১৮৭১ সালের গ্রীষ্মে মায়ের কাছে বেহালা বাজানো শিখেছিলেন হোমস। STRADIVARIUS -এর মালিক হওয়ার পর শুরু হল তাঁর সাধনা এবং ১৮৮১ সালের মধ্যেই রীতিমত দক্ষতা অর্জন করলেন বেহালা বাদনে।

'এ স্টাডি ইন স্কারলেট'—অ্যাডভেঞ্চারে ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হোমস—'আপনার অপছন্দের মধ্যে বেহালা বাজনা নেই তো?'

বেশ উদ্বেগের সংগেই প্রশ্ন করেছিলেন হোমস। কেন না, ওয়াটসনের সংগে সেই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ।

ওয়াটসন জবাব দিয়েছিলেন—'সেটা নির্ভর করছে বাদকের ওপর। পাকা হাতের বেহালার সুর দিয়ে ভগবানকে খুশী করা চলে। আর খারাপ হাতের—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' খুশী চাপতে না পেরে হেসে ফেলেছিলেন শার্লক হোমস।

এই বেহালার সুর শুনিয়েই ১৮৮৮ সালে বন্ধুবরকে একদিন ঘুম পাড়িয়ে-ছিলেন শার্লক হোমস (দি সাইন অভ দি ফোর)।

'ওহে ওয়াটসন, তোমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বেজায় দমে গেছো,' বলেছেন হোমস। 'সোফাটায় শুয়ে পড়ো দেখি। দেখা যাক তোমায় ঘুম পাড়াতে পারি কিনা।'

ধরে, কোণ থেকে বেহালা বার করেছেন শার্লক হোমস। ছড়ির টানে স্বপ্নিল মূর্ছনা সৃষ্টি করেছেন। বলা বহুল্য ছন্দময় সে সুরলহরী শার্লক হোমসের স্বরচিত। শুধু সংগীতেই উৎসাহ ছিল না হোমসের, তিনি ছিলেন উঁচুদরের সুরকার।

'দি রেড হেডেড লীগ' মামলায় শার্লক হোমস ওয়াটসন কে বলেছেন—...'একটা স্যাণ্ড-উইচ আর এককাপ কফি। তারপরেই আমরা পৌঁছোবো বেহালার এথতিয়ারে—সেখানে সব কিছুই মিষ্টি মধুর, নরম কোমল, ছন্দোময়। কোনো রক্তকেশ মক্কেল এসে আর আমাদের সেখানে বিরক্ত করবে না।'

অনন্য সাধারণ শার্লক হোমসের চরিত্রের দুটি বিভিন্ন সত্তা প্রকট হয়ে উঠেছে লাল-চুলো সমিতির মামলায়। তন্দ্রালস হোমস যে শিকারী হোমস হতে পারেন, স্মিত মুখ হোমস যে নিষ্ঠুর হোমস হতে পারেন—তা প্রকাশ পেয়েছে এই কেসে। চূড়ান্ত আলস্য থেকে কর্মচাঞ্চল্যে আকস্মিক পরিবর্তন যে তাঁর স্বভাব, তা জানা গেছে এই মামলাতেই। যখন তিনি সুরকার তখন তাঁর চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি, দার্শনিকের কুহেলী। আবার এই চোখেই দেখা গেছে সূচাগ্র তীক্ষ্ণতা আর সূক্ষ্মবুদ্ধির ঝিলিক—যেন এই বুদ্ধির রোশনাইটুকুও তাঁর কাব্যময় রোমন্থনের প্রতিক্রিয়া।

ওয়াটসন তখন কেন্সিংটনে আলাদা বাড়ীতে থাকতেন। শরৎকাল একদিন বন্ধু-বর হোমসের সঙ্গে তিনি দেখা করতে এসে ঘরের মধ্যে মোটাসোটা মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলেন। ভদ্রলোকের চুলের রং লালচে এবং আগুনের মতই উজ্জ্বল। পরনে চেক ট্রাউজার্স, তামাটে রঙের ওয়েস্টকোটে ঝুলছে তামার অ্যালবার্ট চেন এবং একটুকরো ধাতু অলংকার হিসেবে শোভা পাচ্ছে সেই চেনে।

আলাপ হওয়ার পর জানা গেল ভদ্রলোকের নাম মিঃ জাবেজ উইলসন। বন্ধুর কায়দায় ভদ্রলোকের পোশাক আর চেহারা থেকে কিছু আঁচ করার চেষ্টা কর-ছিলেন ওয়াটসন। তাই দেখে শার্লক হোমসের চঞ্চল বিশ্লেষণী দৃষ্টিও তৎপর হয়ে উঠল।

বললেন, 'ভদ্রলোক কিছুদিন মজুর-গিরি করেছেন, নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে, রাজমিস্ত্রির কাজ করেছেন, চীনদেশে ছিলেন এবং বর্তমানে এন্তার লেখার কাজ করছেন।'
করছেন।'

শুনেই আঁৎকে উঠলেন মিঃ উইলসন।

'আরে মশায়, জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি হিসেবেই তো আমার কর্মজীবন শুরু হয়। কিন্তু আপনি তা জানলেন কি করে?'

আপনার হাত দেখে। মজুর হিসেবে মেহনৎ করার সময় আপনি ডানহাতের কাজ বেশি করেছেন। তাই ডানহাত বাঁহাতের চেয়ে আকারে বড়, পুষ্ট। আপনি যে ব্রেস্টপিন আর কম্পাস ব্যবহার করেন তা
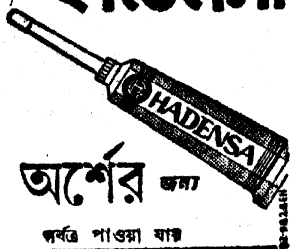
থেকে বুঝেছি একজন রাজমিস্ত্রিও ছিলেন। আপনার ডানহাতের নীচের দিকের ইঞ্চি পাঁচেক জায়গা বেশ চকচকে। অথচ বাঁহাতের কনুইয়ের কাছটা টেবিলে ভর দেওয়ার জন্যে কালচে। সুতরাং আপনি খুব লেখার কাজ করছেন। আপনার ডান কব্জির ওপরে মাছের উল্কি আঁকা। মাছের আঁশে ঐ যে হাল্কা গোলাপী রঙ লাগানো হয়েছে, তা একমাত্র চীনদেশেরই বৈশিষ্ট্য। ঘড়ির চেনে ঝোলানো চীনে মুদ্রা দেখেও বুঝেছি আপনি চীনদেশে ছিলেন।'

হো-হো করে হেসে মিঃ উইলসন দলা পাকানো একটা খবরের কাগজ মেলে ধরলেন। দেখালেন এক অদ্ভুত কর্ম-খালির বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের মোদ্দা কথা হল এই যে লালচুলো সমিতিতে আর একটা চাকরী খালি হয়েছে। বয়স একুশের ওপর হলে আর চুলের রঙ আগুনের মত ঘোর লাল হলে চাকরীটা যে কেউ পেতে পারে। মাইনে, হপ্তায় চার পাউন্ড। কাজ, নামমাত্র।

বিচিত্র বিজ্ঞাপনটা পড়ে শোনানোর পর মিঃ উইলসন তাঁর কাহিনী বললেন। তাঁর বন্ধকী তেজারতির ব্যবসা। ইদানীং কারবার বড়ই মন্দা যাচ্ছে বলে আধা মাইনায় একটা চালাক-চতুর ছোকরাকে কোনমতে দোকানে বহাল করেছেন। ছোকরার যা বুদ্ধি, তাতে ডবল মাইনার চাকরী যেখানে হয় পেতে পারে। তা সত্ত্বেও উইলসনের কাজে সে লেগে গেছে। বদ নেশার মধ্যে তার ফটো তোলার বাতিক। এন্তার ছবি তোলে, আর তা ডেভালাপ করার জন্যে মাটির নীচে ডার্করুমে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা।

ছোকরার নাম ভিনসেন্ট স্পলডিং। দু-মাস আগে স্পলডিং বিজ্ঞাপন সমেত এই কাগজটা নিয়ে এল দোকানে। লালচুলো সমিতির বৃত্তান্ত তার মুখেই শুনলেন মিঃ উইলসন। এজেকিয়া হপকিন্স নামে এক খেয়ালী আমেরিকান কোটিপতি এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নিজের মাথার চুলের রঙ ছিল লাল। তাই মৃত্যুকালে এমন উইল করে গেছেন যাতে মাথার চুল যাদের লাল, তারা যেন তাঁর বিপুল সম্পত্তির সুদ থেকে সাহায্য পায়। চুলের রঙ আগুনের মত উজ্জ্বল হওয়া চাই, দরখাস্তকারীকে লন্ডনবাসী হওয়া চাই এবং মাঝবয়েসী হওয়া চাই।

উইলসনকে সমিতির কার্যালয়ে নিয়ে গেল স্পলডিং। টাকার তখন খুবই দরকার। কাজেই চুলের রঙ লাল হওয়ার জন্যে যদি কাকতালে বছরে দুশ পাউন্ড রোজগার করা যায় তো মন্দ কি।

গিয়ে দেখা গেল ফ্লীট স্ট্রীট—গিজগিজ করছে লালচুলো লোকের ভিড়ে, সারা জায়গাটা যেন একটা কমলালেবুর দোকান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভিড় দেখে হতাশ হয়েছিলেন মিঃ উইলসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরীটা তাঁর কপালেই জুটল। ম্যানেজারের নাম ডানকান রস। আমেরিকান কোটিপতির পেনশনভুক্ত-দের অন্যতম তিনি—কেন না তাঁরও মাথায় চুল টকটকে লাল। ডানকান রস দুহাতে মিঃ উইলসনের চুল টেনে দেখলেন পরচুলা কিনা। খোঁজ নিলেন বিবাহিত কিনা। অবিবাহিত শুনে একটু খুঁত-খুঁত করলেও সঙ্গে সঙ্গে চাকরীতে বহাল করে দিলেন তাঁকে স্রেফ চুলের খাসা রঙের জন্যে। কাজ অতি সামান্য। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত অফিসের টেবিল-চেয়ারে বসে এনসাইক্লোপিডিয়া বিট্রানিকা নকল করা। শুরু করতে হবে A অক্ষর থেকে। কাগজ-কলম-কালি মিঃ উইলসনকেই আনতে হবে। কাজের অন্যতম শর্ত হল অফিস থেকে দশটা থেকে দুটোর মধ্যে একেবারেই বেরোতে পারবেন না। কোনো অছিলাতেই এই চারঘন্টার মধ্যে ঘর থেকে বেরোলেই চাকরী খতম হয়ে যাবে।

চাকরী যেমন অদ্ভুত, শর্তও তেমনি বিদঘুটে। কিন্তু জাবেজ উইলসনের তখন টাকার দরকার। রাজী হয়ে গেলেন তিনি। বন্ধকী কারবার? সকালের দিকে স্পলডিং দেখবে বিকেলের দিকে মিঃ উইলসন।

দুমাস একনাগাড়ে চাকরী করলেন মিঃ উইলসন। প্রথম প্রথম ডানকান রস ঘন-ঘন আসতেন। তারপর একেবারেই আসা বন্ধ করে দিলেন। শুধু সপ্তাহ শেষে চার পাউন্ড গুণে দেওয়ার সময়ে দেখা যেত তাঁকে।

কিন্তু সেদিন সকালে অফিসে গিয়ে ভড়কে গেলেন জাবেজ উইলসন।

কেন না, অফিসে তালা ঝুলতে দেখলেন তিনি। আর দেখলেন একটা শাদা চৌকো পিচবোর্ড। তাতে লেখাঃ

লালচুলো সমিতি
তুলে দেওয়া হল
৯ই অক্টোবর, ১৮৯০

ভ্যাবাচাকা খেয়ে জাবেজ উইলসন ছুটলেন বাড়িওলার কাছে। তিনি তো লাল-চুলো সমিতির নাম শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। ডানকান রস-এর নাম শুনে হাঁ করে রইলেন। লালচুলো লোকটা? তাঁর নাম তো উইলিয়াম মরিস, সলিসিটর। নিজের ঘর যদ্দিন না গুছোনো হয়, তদ্দিনের জন্য

...বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখ

এ ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন। কাল তিনি চলে গেছেন। কোথায় গেছেন? ১৭ নং কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীটে।

তৎক্ষণাৎ সেখানে দৌড়োলেন জাবেজ উইলসন এবং আর একবার বোকা বনলেন। কেন না, সে ঠিকানায় রয়েছে একটা নী-ক্যাপের কারখানা। ডানকান রস বা উইলিয়াম মরিস নামে কাউকে সেখানে কেউ চেনে না।

অমন খাসা চাকরীটা হারিয়ে খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন জাবেজ উইলসন। হোমস এটা-সেটা প্রশ্ন করে জানলেন, স্পলডিং ছোকরাকে কাজে বহাল করার একমাস পরেই বিজ্ঞাপনটা এনে সে দেখায় মিঃ উইলসনকে।

ছোকরা বেঁটে হলেও চেহারা খুব মজবুত। বেজায় চটপটে। বছর তিরিশ বয়স। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। কপালে অ্যাসিডে পোড়ার শাদা দাগ।

শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন শার্লক হোমস।

জিজ্ঞেস করলেন—'দুল পরার জন্যে ি ছোকরার কান বেঁধানো আছে?'

'আছে। ছেলেবেলায় একজন থে নাকি কান বিঁধিয়ে দিয়েছিল।'

'হুম! ঠিক ধরেছি! ঠিক আছে মি উইলসন, আজ হল শনিবার। সোমবারে মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পার বলে আশা করছি!'

জাবেজ উইলসন বিদায় হতেই শার্ল হোমস বললেন—'ভায়া ওয়াটসন, কেস খুবই রহস্যময় এবং এ কেসে আমা পুরো তিন পাইপ ধূমপান করা দরকার অতএব পঞ্চাশ মিনিটের আগে আমা সঙ্গে কথা বলো না।'

বলেই হাঁটু মুড়ে শিবনেত্র হ বসলেন হোমস। কিছুক্ষণ পরে ওয়াটস যখন ঝিমুতে শুরু করেছেন, এমন সম তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলে হোমস।

বললেন, 'সেন্ট জেমস হলে আ বিকেলে সারা সেট-এর বাজনা আছে প্রোগ্রামে জার্মান বাজনা একটু বেশি রয়েছে যদিও, তাহলেও ইটালিয়ান ফরাসীর চাইতে ভাল। চল, বেরিয়ে প যাক। রাস্তায় লাঞ্চ খেয়ে নেওয়া যাবে তারপর বাজনা শুনতে শুনতে মনের গহ ডুব মারা যাবে।'

মাটির তলায় ট্রেন ধরে প্রথমে দ বন্ধু গেলেন এই অদ্ভুত ঘটনার কে স্যাক্সকোবার্গ স্কোয়ারে। জাবেজ উইলসনে দোকানের সামনে গিয়ে দু-তিনবার জো জোরে রাস্তায় লাঠি ঠুকলেন। তার টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। দে গোড়ায় আবির্ভূত হল দাড়ি-গোঁফ কামা এক ছোকরা। বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্ব মুখ।

হোমস শুধু জানতে চাইলেন স্ট্রা কোন পথে যাওয়া যায়। পথের হ জেনে কিছু দূর এসে মন্তব্য করলেন।

'ছোকরা ভারি স্মার্ট হে, লন্ডনে চেয়ে স্মার্ট মানুষ আছে আর মাত্র তিনজ আর দুঃসাহসের দিক দিয়ে দেখতে গে তিন নম্বর।'

"রাস্তা জানতে চাওয়ার অছিলায় নি ওকেই দেখতে চেয়েছিলে তুমি?'

'উঁহু, ওকে নয়, ওর প্যান্টের হ দেখতে চেয়েছিলাম।"

"কী দেখলে?"

"যা দেখতে চেয়েছিলাম।"

"আর রাস্তায় লাঠি ঠোকার উদ্দেশ্য

"বন্ধু, এখন শুধু পর্যবেক্ষণ ক যাও, প্রশ্ন করো না।"

বলে, সমস্ত অঞ্চলটায় টহল দিয়ে বা ঘরদোর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন শা হোমস। পর্যবেক্ষণ শেষ হলে স্যান্ডউ আর কফি খেয়ে গেলেন সেন্ট জেমস হ সঙ্গীতের আসরে। সারাটা বিকেল খুশি ডগমগচিত্তে বাজনা শুনলেন। সুরের ত তালে আঙুল দোলালেন। সঙ্গীতবিে

...রেই মানুষটিকে দেখে তখন আর বোঝবার উপায় রইল না যে ইনিই ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী বহু রহস্যকাহিনীর নায়ক সদাপ্রস্তুত ডিটেক্‌টিভ শার্লক হোমস। পরম আলস্যের সময়ে তিনি এক মানুষ; আবার শত্রুশিকারের সময়ে তিনি আর এক মানুষ। তখন আশ্চর্যরকম প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর বিশ্লেষণীশক্তি, বাঘের চোখের মত শানিত হয়ে ওঠে উৎসাহ-চঞ্চল চোখ।

সঙ্গীত শ্রবণ শেষ করে বেরিয়ে এসে হোমস্ বললেন—'ওহে ডাক্তার, কোবার্গ স্কোয়ারের ব্যাপারটা তাচ্ছিল্য করার মত নয়। একটা জবর অপরাধের দারুণ ষড়যন্ত্র চলছে। আজ রাতে তোমার সাহায্য দরকার। রাত দশটার সময়ে বেকার স্ট্রীটে চলে এস। আর হ্যাঁ, একটু বিপদের সম্ভাবনা আছে। তোমার সঙ্গে তোমার মিলিটারী রিভলবারটা এনো।'

ডক্টর ওয়াটসন নেহাত বোকা ছিলেন না। কিন্তু শার্লক হোমসের সান্নিধ্যে হাঁদা হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। লালচুলো সমিতির মামলায় এ পর্যন্ত ওয়াটসন যা দেখেছেন এবং শুনেছেন, হোম্‌সও তা দেখেছেন এবং শুনেছেন—অথচ শার্লক হোমস্ ষড়যন্ত্র আঁচ করে ফেলেছেন। ওয়াটসন অন্ধকারেই রয়ে গেলেন।

যাই হোক, রাত দশটায় বেকার স্ট্রীটের বাড়ী গিয়ে ওয়াটসন দুজন ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন। তাঁদের একজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ অফিসার মিঃ জোন্স। অপরজন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ মেরি-ওয়েদার।

মেরিওয়েদারের মুখ দেখে মনে হল ইনি উৎসাহিত নন। সাতাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবার তাঁর তাসখেলা বন্ধ হওয়ায় একটু ব্যাজারও। মুখে বললেন—"এত কাঠখড় পোড়ানোর পর শেষপর্যন্ত এ অভিযান অশ্বডিম্ব প্রসব না করে।"

জোন্স বললেন—"মাভৈঃ। শার্লক হোমসকে আপনি চেনেন না। যদিও ওর নিজস্ব পদ্ধতিগুলো খুবই কেতাবি, তাহলেও শোল্‌টোর খুনের বা আগ্রার ধনসম্পদের ক্ষেত্রে ও'র সিদ্ধান্ত সরকারী পুলিশের চেয়ে নির্ভুল হয়েছিল।"

শার্লক হোমস্ বললেন—"মিঃ মেরি-ওয়েদার, জন ক্লে দুর্দান্ত খুনে; চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতিতেও তার জুড়ি নেই। বয়স অল্প হলেও সে এখন বদ্‌মাসদের শিরোমণি। ওর বাবা ছিলেন ডিউক, সুতরাং জন ক্লে রাজার নাতি। লেখাপড়া শিখেছে ইটন আর অক্সফোর্ডে। বুদ্ধিতে সে তুখোড়, হাতসাফাইতে ওস্তাদ। মিঃ জোন্স তাকে অনেকদিন খুঁজছেন। আমার সঙ্গেও তার মোকাবিলার টক্কর লেগেছে। কিন্তু আজ রাতে তাকে আমি গারদে পুরবই। চলুন, যাওয়া যাক।"

ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পাতাল-কক্ষে পৌঁছলেন অভিযাত্রীরা। ভারী ভারী মজবুত দরজা খুলে মিঃ মেরিওয়েদার সবাইকে নিয়ে গেলেন তাঁর মাটির নীচের প্রকাণ্ড ভল্টে। ঘরভর্তি কেবল বিরাট বিরাট বাক্স আর প্যাকিং কেস।

মেঝেতে লাঠি ঠুকেই চমকে উঠলেন মেরিওয়েদার—"একী! মেঝে ফাঁপা মনে হচ্ছে যে!"

খেঁকিয়ে উঠলেন হোমস্—"প্ল্যানটা কাঁচিয়ে না দিয়ে দেখছি ছাড়বেন না। বসুন একটা বাক্সের ওপর।"

ক্ষুন্ন হলেন মেরিওয়েদার। লণ্ঠন আর আতস কাচ দিয়ে মেঝে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন হোমস্।

বললেন—"ঠিক আছে। এখনও ঘণ্টা-খানেক দেরী আছে। কেননা, মিঃ জ্যাবেজ উইলসনের নাক না ডাকা পর্যন্ত ওরা কাজ শুরু করতে পারবে না। জোন্স, ওদের পালাবার পথ একটাই—স্যাক্সকোবার্গ স্কোয়ারের সেই বাড়ীটা। সে পথ বন্ধ তো?"

"একজন ইন্সপেক্টর দুজন কনেস্টবলকে নিয়ে সামনের দরজায় ওৎ পেতে আছে।'

"বহুৎ আচ্ছা। মিঃ মেরিওয়েদার, লন্ডনের ব্যাঙ্ক-লুঠেরারা আপনার এই ভল্ট নিয়ে কেন এত উৎসাহিত, তা ডাক্তার-ভায়াকে একবার শুনিয়ে দিন।"

ফিকফিস করে মেরিওয়েদার বললেন—"আমি যে বাক্সটার ওপর বসে রয়েছি, এর মধ্যে আছে ত্রিশ হাজার পাউন্ডের মত ফরাসী সোনা। ব্যাঙ্কে যত সোনা মজুদ রাখা রেওয়াজ, তার চাইতে অনেক বেশী রয়েছে এখানে। তাই তো এত দুর্ভাবনা।"

হোমস বললেন—"সব দুর্ভাবনার শেষ ঘটবে এখুনি। এই আমি লণ্ঠনে চাপা দিলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘর একদম অন্ধকার হয়ে গেল। চার মূর্তি ঘাপটি মেরে রইল বাক্সের আড়ালে।

অনেক...অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা আলোর ছটা দেখা গেল। পাথুরে মেঝের ওপর চোখে পড়ল একটা ম্যাড়মেড়ে আভা। ক্রমে-ক্রমে লম্বা হতে লাগল আভাটা—তারপরেই নিঃশব্দে একটা গর্ত ফুটে উঠল মেঝেতে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল একটা মেয়েলী হাত। মিনিট খানেকের মধ্যেই অদৃশ্য হয় হাতটা এবং তারপরেই সশব্দে মেঝের একটা গোটা পাথর উল্টে গেল।

চৌকো গহ্বর পথে প্রথমে দেখা গেল লণ্ঠনের আলো, তারপর উঁকি দিল একটা কচি মুখ। পরক্ষণেই পাতাল সুড়ঙ্গ থেকে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হল পর-পর দুজন পুরুষ। তার মধ্যে একজনের মাথার চুল টকটকে লাল। আর একজন সুদর্শন তরুণ।

আচম্বিতে তরুণের জামার কলার খামচে ধরলেন হোমস। লালচুলো লোকটা ঝাঁপ দিল গর্তের মধ্যে, জোন্সের হাতের মুঠোয় থেকে গেল তার জামার ছিন্নাংশ। ঝলসে উঠল রিভলবারের নল। কিন্তু সপাং শব্দে হোমসের চাবুক আছড়ে পড়ল ছোকরার কব্জিতে—রিভলবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

"জন ক্লে, তোমার খেল খতম।" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন হোমস।

"কিন্তু আমার সাগরেদ এতক্ষণে পগারপার।"

"তার জন্যে বাইরে তিনজন আছে।"

"সাবাস। কাজটা বেশ নিখুঁত হয়েছে দেখছি।

"ওহে ক্লে, হাতটা একটু বাড়াও দেখি বাপু, লোহার বালাটা লাগিয়ে দি," বললেন জোন্স।

"দয়া করে তোমার ঐ নোংরা হাতে আমাকে ছুঁয়ো না। আর কথাবর্তায় একটু শিষ্টাচার দেখিও। ভুলে যেও না আমার শিরায় রাজরক্ত বইছে!"

সকালবেলা হুইস্কি পান করতে ওয়াটসনকে বললেন—"ভায়া, প্রথম থেকেই তো বোঝা যাচ্ছিল লালচুলো সমিতির ভাঁওতা মেরে হপ্তায় চার পাউণ্ড দিয়ে অফিস ঘরে মাথামোটা বন্ধকী কারবারীকে আটক রাখার মূল উদ্দেশ্যই ছিল দোকান ঘর থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা। কেন? মাসখানেক আগে যে ছোকরা কর্মচারীকে নিয়োগ করেছেন মিঃ উইলসন, তার নাকি ফটো তোলা বাতিক আছে। হামেশাই মাটির নীচের ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা ফিল্ম ডেভোলাপ করতে যায়। আবার সেই ছোকরাই লালচুলো সমিতির বিজ্ঞাপন এনেছে—মিঃ উইলসনকে নিয়ে গিয়ে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। রহস্য-জনক ব্যাপার। তবে কি অন্য কোন বাড়ীর সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথ খোঁড়া হচ্ছে? প্রথমেই এই সন্দেহটা এল মাথায়।

"তাই দোকান ঘরের সামনে গিয়ে মেঝেতে লাঠি ঠুকলাম। তুমি অবাক হলে। কিন্তু আমি বুঝলাম, সুড়ঙ্গ বাড়ীর সামনের দিকে নেই। রাস্তা জানবার আছিলায় দরজায় ধাক্কা দিতে যে বেরিয়ে এল, তার মুখ না দেখে হাঁটু দেখলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা মাটি খোঁড়ার সব চিহ্নই দেখলাম প্যান্টের ময়লা হাঁটুতে। এদিক-ওদিক ঘুরতেই দেখলাম, দোকান ঘরের লাগোয়া সিটি অ্যান্ড সাবর্বন ব্যাঙ্ক। সঙ্গে-সঙ্গে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।"

"কিন্তু ওরা যে শনিবারেই আসবে, তা জানলে কি করে?"

"খুবই সহজে। ওরা যখন সমিতির অফিস তুলে দিল, তখন নিশ্চয় সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে গেছে। মিঃ উইলসনকেও আর আটক রাখার দরকার নেই। শুভস্য শীঘ্রম। শনিবার সোনাগুলো সরাতে পারলে চম্পট দেওয়ার জন্যে দুটো দিন পাওয়া যাবে। তাই আমি আশা করছিলাম, ওরা আসবেই।"

বলে, হাই তুললেন শার্লক হোমস।

ইন্দিরা সিনেমায় **বালিকা বধূ** চিত্রের প্রেস শোতে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়, খুকুই বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

বালিকা বধূ (বাঙলা) : চিত্রদীপ-এর নিবেদন; ৩,৭৫৬·৭৬ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : সুনীলা দেবী; চিত্রনাট্য, অতিরিক্ত সংলাপ ও পরিচালনা : তরুণ মজুমদার; কাহিনী : বিমল কর; সঙ্গীতপরিচালনা : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল এবং অনিল তালুকদার; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত; সম্পাদনা : দুলাল দত্ত; নেপথ্য কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী দাশগুপ্ত, বেলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি; রূপায়ণ : পার্থ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার দাস, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারধন মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, সবিতাব্রত দত্ত, বঙ্কিম ঘোষ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, মাস্টার শৈবাল গাঙ্গুলী, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, খুকুই বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, রুমা গুহঠাকুরতা, সুরুচি সেনগুপ্ত, অপর্ণা দেবী, সুলেখা ভট্টাচার্য, মিনতি দেবনাথ প্রভৃতি। মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রি-বিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২রা জুন, শুক্রবার শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

না, 'বালিকা বধূ' চিত্রের কাহিনী বর্তমান যুগের কোনো ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত নয়; এ-কাহিনী যে-যুগের সে-যুগে বাপ-মায়েরা তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতেন, পুণ্যার্থী বাপ-মা আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে গৌরীদান করতেন। ছোট ছোট মেয়েরা লাল চেলী প'রে বিয়ের কনে সেজে শ্বশুরবাড়ী যেত এবং সেখানে বিয়ের খুঁটিনাটি হাঙ্গামা চুকে গেলেই আরও পাঁচটা সমবয়সী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নানারকম খেলায় মেতে উঠত। তার কাছে তার বরও ছিল একজন খেলার সাথী মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। তবে গুরুজনদের মুখে শুনে তার মনে ধারণা জন্মাত, তার বরটি তার একান্ত আপন; তার ওপর তার জোরও যেমন আছে, তেমনই তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই তার একটু পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত। বর হয়ত ধীরে ধীরে বাল্য পেরিয়ে কৈশোর, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে, কিন্তু তার বধূটি হয়ত তখনও বালিকা, প্রেম-ট্রেমের কোনও ধারই সে ধারে না। বেচারা যুবা বর, মনের ভাষাকে প্রকাশ করতে না পেরে মরমে মরে থাকে, বালিকা-বধূর ছেলেমানুষি তার আর ভালো লাগে না, অপেক্ষা করতে থাকে সেই শুভ দিনটির জন্যে, যেদিন সে দেহেমনে যুবতী হয়ে তার কাছে প্রিয়া রূপে ধরা দেবে, মদন বাণে জর্জরিত হওয়া কাকে বলে, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে। —হ্যাঁ, আজ থেকে অন্তত বছর পঞ্চাশ আগেকার যুগের কাহিনী 'বালিকা-বধূ'তে বিধৃত।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, একটি বিবাহিতা বালিকার তার পরম গুরু কিশোর পতির সঙ্গে 'বর, বর' খেলাকে কি আশ্চর্য রসের বস্তুতেই না পরিণত করেছেন পরিচালক তরুণকুমার মজুমদার। বালিকা-বধূ রজনীর যে-বয়স পর্দায় ধরা পড়েছে, আজকের যুগের সেই বয়সের মেয়েরা লুকিয়ে প্রেম করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে বিবাহ-দলিলে সই পর্যন্ত করে; অথচ ১৯০৭-৯ সালের কিশোরী রজনী যে মনের দিক থেকে নিতান্ত বালিকাই থেকে গেছে, তা' তার কণ্ঠস্বর, ভাবভঙ্গী এবং সর্বোপরি তার অপাপবিদ্ধ মুখচ্ছবি থেকে অতি সহজেই প্রকাশিত হয়েছে; রজনী যে নিতান্তই বালিকা, সে যে যৌবনধর্মের রীতিনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এ-কথা অতি সহজেই মেনে নিতে বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব হয় না। ফুলশয্যার রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করা থেকে শুরু করে নিঃশব্দে বরের সাহায্যে খিল খুলে নন্দাই শরৎ প্রমুখ সকলকে অপ্রস্তুত করা, বিয়ের রাতে ধাঁধার উত্তর দিতে পারেনি ব'লে বরকে হাবা-বোবা বলে মজা পাওয়া, বরের মুখের দিকে পা করে শুয়েছিল বলে ঘুম ভেঙে 'এই যাঃ, পাপ হয়েছে' বলা এবং এ-ব্যাপার কাউকে না জানানোর জন্যে বরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া ইত্যাদি তার শতেক আচরণের কোনোটিকেই অস্বাভাবিক ন্যাকামি বলে তো বোধই হয় না, বরং রজনীর প্রতিটি কথা, কাজ, ভঙ্গী তাকে একটি সম্পূর্ণ রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট প্রাণচঞ্চল 'বালিকাবধূ' রূপে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করে। একদিন রাত্রে অমল তার প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক দিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে, তখন ঐ

তাদের শিশুচিত্ত বালিকাটির প্রতি সহৃদয় সহানুভূতি না জানিয়ে পারা যায় না।

একটি মেয়ের বালিকা থেকে যৌবনে পদার্পণ করার মধ্যে দেহগত যে পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন আজও ভারতীয় চিত্রের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু দেহের পরিবর্তনের চেয়ে মনের পরিবর্তন হচ্ছে বড়ো কথা। এবং সেই পরিবর্তন প্রায়ই আসে অজান্তে। তাই তার মধ্যে হয়ত নাটকীয়তা কম কিংবা একেবারেই নেই। কিন্তু এমন যদি হয়, একটি যৌবনলক্ষণাক্রান্ত কিশোরী মেয়ের দেহের সঙ্গে মন বাড়তে না পেয়ে মনের দিক দিয়ে সে একেবারেই শিশু ছিল, সহসা একদিন অতর্কিতে কোনো একটি ঘটনা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সে নিজের যৌবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, নিজের নারীত্বকে মুহূর্তে করল আবিষ্কার, তাহ'লে তার নাটকীয়ত্ব অসীম ও গভীর। এই নাটকীয়ত্বই আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হয়েছে 'বালিকা-বধূ'র রজনী চরিত্রে। পিতামাতার সঙ্গে তীর্থপর্যটন করতে করতে কোনারকে গিয়ে সূর্য মন্দির গাত্রে প্রেমময় যুগল মূর্তিগুলি নিরীক্ষণ করতে করতে সে সহসা তার দেহতটে আছড়ে পড়ল। যে-রজনী অমলকে ছেড়ে তীর্থপর্যটনে গিয়েছিল, আর যে-রজনী কোনারক থেকে সদ্যপ্রত্যাগত হয়ে অমলের কাছে ফিরে এল, তারা এক নয়: সেই 'বালিকা-বধূ' অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়ে তার পরিবর্তে এল নবযৌবনা ষোড়শী নায়িকা। কোথায় গেল সেই শিশুসুলভ চাহনি ও বাচনভঙ্গী, কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল এই কম্পিত বক্ষ, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ব্রীড়াবনত সচকিত সপ্রেম চক্ষু! অমলের বুকটিতে মাথা রেখে যে বলে—আমি এইখানেই থাকব, তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাব না।

অমল-রজনীর বিবাহের কথাবার্তা থেকে আরম্ভ করে বালিকাস্বভাবা রজনীর নারীত্বের পূর্ণ মহিমা নিয়ে অমলের কাছে ধরা দেওয়া পর্যন্ত কাহিনীটি অপরূপ সুষমা ও মাধুর্যমণ্ডিত করে বলা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত হবার পরে সদ্যমৃত রজনীর ফোটো আলবামের সামনে উপবিষ্ট প্রৌঢ় অমলের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। অমল-রজনী যে আজকের যুগের মানুষ নয়, তারা যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙালী পল্লীসমাজের লোক, তা' দর্শককে বোঝাবার জন্যে উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে, অমলের বাপকে বিদ্যাসাগরের আদর্শ শিষ্যরূপে চিত্রিত করে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়োপযোগী যুবক মুকুন্দ দাসকে "সাবধান, সাবধান" ও "ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি" গান গাইয়ে এবং বাড়ীর বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে বোমা তৈরীর আসামীরূপে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার করিয়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেছে রজনী চরিত্রে, যখন সে তীর্থে যাবার আগে অমলের হাতে তার সযত্নরক্ষিত রেশমী চুড়িগুলিকে বাক্সসুদ্ধ তুলে দিয়ে বলেছে: জলে ফেলে দিও।

"বালিকা-বধূ"র মতো অপূর্ব মাধুর্যপূর্ণ ছবি যে কোনও দেশের পক্ষে যথেষ্ট গর্বের বিষয়। নিঃসন্দেহে ছবিখানি বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে নবমহিমায় মণ্ডিত করল। পরিচালক তরুণ মজুমদারকে অশেষ ধন্যবাদ "বালিকা-বধূ"র মতো এমন একখানি রসের আকর আমাদের উপহার দেবার জন্যে।

অভিনয়ে বালিকা-বধূ রজনীর ভূমিকায় নবাবিষ্কৃত মৌসুমী (ইন্দিরা) চট্টোপাধ্যায় রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। বালিকা থেকে মুহূর্তে যৌবনরসসিক্তা নারীতে পরিণত হওয়াকে তিনি যে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন, তা তাঁর সহজাত নাট্যপ্রতিভারই পরিচায়ক। নায়ক অমলের চরিত্র স্বভাবতই কঠিন। সে-যুগের স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশে (বর্তমানের ক্লাশ নাইন) পড়া-ছেলে অমল সংসারানভিজ্ঞ, লাজুক প্রকৃতির, অন্তর্মনা। রজনীর ভাষায় সে 'হাবা-গবা'। তার অন্তরে প্রেমের অস্পষ্ট ছায়া পড়ে; কিন্তু বালিকা-স্ত্রী রজনীর মাধ্যমে সেই ছায়া মূর্তি পরিগ্রহ করে না। শেষ পর্যন্ত যখন রজনী নারীরূপে তার কাছে ধরা দেয়, তখনই সে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের মধ্যে রজনীকে পাশে রেখে গেয়ে ওঠে: "সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" এই প্রধানত অন্তর্মুখী চরিত্রচিত্রণে পার্থ মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা অনস্বীকার্য। ননদিনী চন্দ্রার স্নিগ্ধ-মধুর ভূমিকাভিনয়ে আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছেন নবাগতা যূথী বন্দ্যোপাধ্যায়। রজনীর নন্দাই, চন্দ্রার স্বামী শরৎরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন যশস্বী অভিনেতা অনুপকুমার। শরতের ওপরই অমলকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার দিয়েছেন কাহিনীকার। এ-ভার তিনি বহনও করেছেন; তবে আরও কিছু সংযতভাবে হলে ভালো হত। অমলের বাবা শশধর সিংহ'বেশে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণকে নিখুঁত বলা যায়। অপরাপর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা (নলিনী দিদি), সব্যসাচী দত্ত (চারণ কবি মুকুন্দ দাস), অরুণ মুখোপাধ্যায় (অমলের কৌতুকপ্রিয় সহপাঠী), হরিধন মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ (অঙ্কের মাস্টার), অপর্ণা দেবী (অমলের মা), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (রজনীর বাবা), মাস্টার শৈবাল গাঙ্গুলী (অমলের ছোটভাই কমল), রুমা গুহঠাকুরতা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (নাপিত), রবি ঘোষ ও সন্ধ্যা রায় (নর্তক-নর্তকী), অজিত চট্টোপাধ্যায় ও

চন্দন কা পালনা চিত্রে ধর্মেন্দ্র ও মীনাকুমারী

বিজয় বোস পরিচালিত বাঘিনী চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

জহর রায় (যাত্রায় রাজপুত্র ও রাজকন্যা প্রভৃতি উল্লেখ্য সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান বজায় রাখবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে আলোকচিত্রণের কাজ ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। ছবির গতিকে একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় রেখে কোথাও অনুমাত্র শ্লথ হতে না দেওয়ার মধ্যে সম্পাদকের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। পঞ্চাশ বছর আগেকার পরিবেশ রচনায় শিল্পনির্দেশক সার্থকভাবে প্রচেষ্টা করেছেন। ছবির দশখানি গানে প্রধানত অতীত যুগোপযোগী সুর ও ভাষা আছে। ওরই মধ্যে রবীন্দ্র সুরের ব্যবহার ছবিকে মাধুর্যদান করেছে।

ছবির কয়েকটি দৃশ্য সম্পর্কে হয়ত কারুর কারুর মনে কিছু প্রশ্ন জাগতে পারে। যেমন, পঞ্চাশ বছর আগে পল্লীগ্রামের বর কি বরযাত্রীসহ মোটরযানারূঢ় হ'ত? রাজপুত্র-রাজকন্যার দৃশ্যটির সার্থকতা কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীতে নিখুঁত সৃষ্টি ক'টি? চাঁদও কলঙ্কমুক্ত নয়। উপভোগ্যভাবে কাহিনীর প্রাচীন পরিবেশ রচনার জন্যে যাত্রা, অভিনয়, নৃত্যগীতাদি সংযোগ করতে গিয়ে এমন একখানি মাধুর্যমণ্ডিত ছবির সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সহজেই উপেক্ষা করা যেতে পারে।

—নান্দীকর

'চন্দন কা পালনা' চিত্রের শুভমুক্তি

আরজু ফিল্মসের রঙিন ছবি 'চন্দন কা পালনা'-র শুভমুক্তি ৯ই জুন। ছবিটি রূপসী, প্রিয়া, গণেশ, মিত্রা প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে। ইসমাইল মেনন পরিচালিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন মীনাকুমারী, ধর্মেন্দ্র, মমতাজ, দুর্গা খোটে, বিপিন গুপ্ত, নাজির হুসেন ও মেহমুদ। রাহুলদেব বর্মণ ছবিটির সুরকার।

'আকাশ ছোঁয়া' মুক্তি আসন্ন

রাজেন তরফদার পরিচালিত মহাশ্বেতা দেবীর 'আকাশ ছোঁয়া' এ মাসেই রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে। এক সার্কাস পার্টির পরিবেশে এ গল্পের প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিখা ভট্টাচার্য। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'প্রস্তর স্বাক্ষর'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত ছায়া-ছবি প্রতিষ্ঠানের 'প্রস্তর স্বাক্ষর' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সলিল দত্ত পরিচালিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, গীতাঞ্জলি রায়, জহর রায়, অনুপকুমার,

ছোট্ট জিজ্ঞাসা চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ

বনানী চৌধুরী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এস. বি. ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

নির্মীয়মাণ চিত্র 'খেয়া'

রূপছায়া চিত্রের 'খেয়া' ছবিটি পরিচালনা করছেন রূপকগোষ্ঠী। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও গীতা দে। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন শ্যামল মিত্র।

'কিসমৎ' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু

সম্প্রতি কমল মেহেরা প্রযোজিত ও মনমোহন দেশাই পরিচালিত 'কিসমৎ' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও ববিতা।

পরিচালক কালিদাসের নতুন ছবি 'সাজিশ'

'ভিগী রাত' ছবির পর প্রযোজক-পরিচালক কালিদাস যে রঙিন ছবিটির কাজ শুরু করেছেন তার নাম 'সাজিশ'। এ ছবির বহির্দৃশ্য রোম, লণ্ডন, ভেনিস ও দক্ষিণ আমেরিকার উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলিতে গৃহীত হবে। ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে থাকছেন ধর্মেন্দ্র ও সায়রা বানু। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

'পরিবার' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ

প্রযোজক-পরিচালক কেওয়ল পি কাশ্যপ তাঁর ছবি 'পরিবার'এর চিত্রগ্রহণ বর্তমানে পালন করছেন রাজকমল স্টুডিওয়। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন জীতেন্দ্র, নন্দা, রাজেন্দ্রনাথ, পদ্মরাণী, মাধবী ও ওম প্রকাশ। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

'কহি' দিন কহি' রাত'-এর সঙ্গীতগ্রহণ

সঙ্গীত পরিচালক ও পি নায়ার সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মসের 'কহি' দিন কহি' রাত' ছবির সঙ্গীত গ্রহণ করেন। কণ্ঠদান করেন মহেন্দ্রকুমার ও আশা ভোঁসলে। দর্শন পরিচালিত এই রঙিন ছবিতে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, স্বপ্না, নাদিরা, ভীনা, মোহন ছোটি, অসিত সেন ও প্রাণ।

'পাগলা কহি' কা' সমাপ্ত প্রায়

পরিচালক-প্রযোজক শক্তি সামন্ত তাঁর সমাপ্তপ্রায় ছবি 'পাগলা কহি' কা'-র দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি শেষ করলেন রূপতারা স্টুডিওয়। ছবিটির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন আশা পারেখ, শাম্মি কাপুর, মনমোহন কৃষ্ণ, হেলেন, মাধবী এবং প্রেম চোপরা। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

অবর্ণনীয় অবস্থায় পড়ল মন্দিরা। চার-চারটে ভাই-বোন রেখে মা মারা গেলেন। বাবাও দেখতে দেখতে দেহ রাখলেন। এতো বড় সংসার মন্দিরার মাথায় এসে পড়ল।

এক ভাই চার বোন। মন্দিরা সবচেয়ে বড়। তার আট বছরের ছোট ভাই সুনন্দ। তারপর তিন বোন ইন্দিরা, নন্দিতা এবং ছন্দিতা। একমাত্র বাড়িটা ছাড়া বাবা আর কিছু রেখে যেতে পারেননি। মন্দিরা শক্ত মেয়ে বলেই কারও কোন সাহায্য না নিয়ে নিজেই সংসারের ভার বহন করে চলল।

পৈত্রিক বাড়ির এক তলায় স্কুল খুলেছে মন্দিরা। এই বুদ্ধিটা সে নিজেই আবিষ্কার করেছে। নিজে কোথায় গিয়ে চাকরী করবে, কে দেখবে এই অপোগণ্ডগুলোকে? কে দুবেলা তাদের মুখের গোড়ায় ভাতের থালা ধরে দেবে? অতএব শেষ পর্যন্ত এই 'কমল কলি পাঠশালা'র উদ্বোধন।

ঝগড়া আর খেলা। হাসি আর গান। এই নিয়ে ভারী একটা সুখী মানুষ হয়ে আছে মন্দিরা। দিদির কাছে ভাই-বোনেদের অবাধ প্রশ্রয়। অসীম ভালবাসা। দিদি ছাড়া কেউ এক পা চলতে পারে না। সুনন্দ থেকে সবাই উঠতে, বসতে, খেতে 'দিদি' ছাড়া কোন কথা নেই।

জীবনের এই সার্থকতা কি কম? বেশ তো কেটে যাচ্ছে। নাই বা হল নিজের সুখ কিছু। বিয়ে না করে তার জীবন তো ব্যর্থ যায় নি। বরং স্নেহের ভাই-বোনেদের নিয়ে দিব্যি মন্দিরার কেটে যাচ্ছে।

মন্দিরার চারিধারে নতুন প্রাণের জোয়ার। মন্দিরা যখন ক্লাসে এসে দাঁড়ায় তখন 'কমল কলি দিদিমণি' বলে একরাশ কচি হাত ধরতে আসে মন্দিরাকে। এক-মুঠো ফুলের গাল ফুলো বাচ্চাগুলো ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে নালিশ জানায় মন্দিরাকে। তারপর স্কুলের কাজ সেরে মন্দিরা যখন ওপরে ওঠে, নন্দিতা তখন তার পালকের মত হাল্কা দেহটা এনে ছেড়ে দেয় মন্দিরার গায়ে। বলে, 'দিদি, তুমি খালি তোমার স্কুল নিয়ে থাকবে, আমার স্কুলের গল্প শুনবে না? কাল কি হয়েছিল জানো—'

ওর কথার মাঝখানে ছন্দা এসে জাপটে ধরে মন্দিরার কোল ঘেঁষে বসে বলে, 'দিদি, দিদি আমার সেজদি আমার মুটকী বলছে—' সব সময় এই তাজা প্রাণের মধ্যে বিরাজ করছে মন্দিরা।

আর অভিজিৎ? সে কি এখনো মন্দিরার জন্য অপেক্ষা করে আছে। হ্যাঁ, অভিজিৎ মনে মনে মন্দিরাকে ভালবেসেছে। মন্দিরার বাবা-মা বেঁচে থাকলে কবে এদের দুজনার বিয়ে হয়ে যেত। মন্দিরা ভাই-বোনেদের মানুষ না করে কিছুতেই নিজের বিয়ের ব্যাপারটা ভাবতে পারে না। বেশ আছে মন্দিরা আর অভিজিৎ। একজন স্কুল নিয়ে আর একজন ডাক্তারী নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে অভিজিৎ বেড়াতে এলে মন্দিরা বলে, 'তোমার চেহারাটা ক্রমশ কি রকম হয়ে উঠছে জানো? মার্কামারা বুড়ো ব্যাচিলার!' অভিজিৎ উত্তর দেয়, 'আমার আবার 'ওল্ড মেড' দেখলে করুণায় প্রাণ বিগলিত হয়ে ওঠে!'

—আমার চেহারায় তোমার মতন অমন ঝুলে পড়াভাব হয়েছে?

—নিজে কি বোঝা যায়?

—ইস, স্কুলের বাচ্চারা আমায় কি বলে জানো? 'কমল কলি দিদিমণি!'

—বাচ্চারা ঠাকমা দিদিমাদের অমন আদর করে থাকে।

—হিংসুটেদের কথা আমি গায়ে মাখি না।

—তবু যদি পাকা চুলের খবরটা না পেতাম।

মন্দিরা হঠাৎ একথায় গম্ভীর হয়ে যায়। ভুরু কুঁচকে বলে, 'আর তবে ঝুলে থাকা কেন? এবার আশা ত্যাগ কর না! চেষ্টা করলে এখনো জুটতে পারে কনে। পয়সাওলা বুড়োকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে এমন মেয়ের অভাব নেই।'

অভিজিৎ বলে, 'যাচ্ছেতাই!'

দেখতে দেখতে সব যেন কেমন পাল্টে গেল। সময়ের দূত এসে এ সংসারের সবাইকে কেমন বদলে দিল। এর মধ্যে বোনেদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে মন্দিরা। সুনন্দ নিজেই তার পাত্রী খুঁজে নিয়ে কর্মস্থলে বউকে নিয়ে চলে গেছে।

শুধু একা পড়ে আছে মন্দিরা। মায়ের মৃত্যুর পর অভিজিৎ বিদেশে চলে গিয়েছে। হঠাৎ এই শূন্যতার মাঝে সুনন্দর কাছে থেকে উকিলের চিঠি আসে। মন্দিরাকে সে জানিয়েছে, অবিলম্বে তার স্কুল তুলে দিয়ে এ বাড়ি যেন ছেড়ে দেয়। কারণ নিজের পৈত্রিক বাড়িতে এসে থাকার অধিকার তার অবশ্যই আছে।

মন্দিরা ভেবে পায় না কিছুই। এমনি দিনে অভিজিৎ ফিরে আসে। মন্দিরা অভিজিৎকে উকিলের চিঠিটা দেখিয়ে বলে, 'ভেবেছিলাম গৌরবের সঙ্গে তোমার ঘরে আসবো, এখন তুমি সমারোহ করে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হবে। সে অহঙ্কার আমার আর রইল না।'

অভিজিৎ মন্দিরাকে গ্রহণ করে।

এ কাহিনীর নাম 'বালুচরী।' আশাপূর্ণা দেবীর এ কাহিনীকে বর্তমানে চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন মন্দিরা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ—অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দ—অনুপকুমার, ইন্দিরা—লিলি চক্রবর্তী ও ছন্দা—জ্যোৎস্না বিশ্বাস। কার্তিক বর্মন প্রযোজিত এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন রাজেন সরকার।
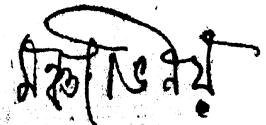
সত্য মারা গেছে

সম্প্রতি স্টেট ব্যাংক অব অফ ইন্ডিয়া স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য শিল্পীরা বিশ্বরূপায় গঙ্গাপদ বসুর সত্য মারা গেছে নাটকটি পরিবেশন করেছেন। নাটকটির মঞ্চরূপায়ন শিল্পীদের অভিনয়সমৃদ্ধ হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সত্যচরণ বসু, বিপাশা গোস্বামী, ভূতনাথ চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূপাল বসু, চন্দ্রমোহন ঘোষ, অটল মন্ডল, শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ মিত্র, সাধন বড়াল, কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়।

তিনটি একাংকিকা

সাম্প্রতিক জীবন জিজ্ঞাসার বিচিত্রমুখী জটিলতা আজকের মঞ্চকে মুখর করে তুলছে সন্দেহ নেই। পূর্ণাঙ্গ নাটকের ব্যাপ্তিতে, বহু ঘটনার আবর্তে দোহা পাওয়া গুমরে কেঁদে মরা অনেক প্রশ্ন আন্দোলন তোলে সবার মনে। কিন্তু ছোট্ট একটি একাঙ্ক নাটকের একটি বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়েও এই কল্লোলকে মুখর করে তোলা যেতে পারে আর চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম রুচিবোধে বিকাশের দিক থেকে এই প্রচেষ্টা বোধহয় সর্বপ্রথম অভিনন্দনযোগ্য। সম্প্রতি মিনার্ভায় নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত তিনটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয় দেখে মনে হয়েছে আধুনিক জীবনচেতনার মোটামুটি একটা সুষ্ঠুরূপ এতে পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনটি ভিন্ন স্বাদের একাঙ্কিকার অভিনয় পরিবেশন করে এই গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং এদের প্রচেষ্টা যে ভবিষ্যৎ নাট্যঐতিহ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এ আশা চিহ্নিত করতে পেরেছেন নাট্যানুরাগীদের মনে। কিন্তু যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও পরিমিত রসবোধ নাট্য প্রযোজনার নেপথ্যে

স্টারে দাবী নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসবানুষ্ঠানে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সংঘবদ্ধ অভিনয়ে তা বোধহয় খুব সম্ভাবনার ঔৎসুক্য দিতে পারেনি।

'নাট্য সম্প্রদায়' প্রযোজিত তিনটি একাঙ্ক নাটকের নাম হোল 'একলব্য', 'বাঘ', 'প্রজাপতির প্রাণ'। মহাভারতের আখ্যান থেকে নেওয়া আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একটি কাব্যনাট্য একলব্য। শিল্পীদের অভিনয়ে এই আধুনিক চেতনা স্পষ্টতা পায়নি। সংলাপ উচ্চারণে তাঁরা সবসময়েই প্রায় সচেতন ছিলেন কিন্তু এই ধরনের নাটকে সংলাপ উচ্চারণে কণ্ঠের যে কারুকার্যের প্রয়োজন হয় তা এ'দের মধ্যে ... না। অভিনেতাদ্বয়ের মধ্যে রণজিৎ ...পাধ্যায়, সুনীল সরকার মোটামুটি নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন, কিন্তু চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁদের আরো গভীরতর উপলব্ধি ও নিবিড় অনুশীলন প্রয়োজন।

দ্বিতীয় নাটক 'বাঘ' একটি প্রতীকধর্মী শিল্পসৃষ্টি। শ্রেণী সংঘর্ষের উত্তেজনা ও যন্ত্রণা রয়েছে এই নাটকের প্রেক্ষাপটে। বাঘ এখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই নাটকের বিষয়বস্তু যতো গভীর, কাহিনীর গঠন ও রচনাশৈলীর মধ্যে সেই পরিমাণ গভীরতা না থাকায় দর্শকের মনে এই নাটক প্রকৃতপক্ষে কোন আন্দোলন তুলতে পারেনি। কৌশিক সান্যালের নির্দেশনায় এই নাটকে অভিনয় করেছেন মুকুন্দ দাস, সবিতা সমাদ্দার, রাজেন মুখোপাধ্যায়। দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাতে পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধের চিহ্ন স্বাক্ষরিত হয়েছে।

'প্রজাপতির প্রাণ' একটি লঘুরসের নাটক। এই নাটক নির্বাচনে খুব একটা উন্নত ধরণের চিন্তা কাজ করছে বলে মনে হয় না। তবে অভিনয়ের দিক থেকে এই নাটকের কয়েকটি পরিহাসমুখর মুহূর্ত নাট্যানুরাগীকে খুশী করেছে। এতে অভিনয় করেছেন প্রণব বসু, ইন্দ্র লাহিড়ী, সমর চৌধুরী, কৌশিক সান্যাল, দীপালী ঘোষ, সুভাষ চৌধুরী, সুনীল সরকার।

নাট্যোৎসব

ঠাকুরপুকুর নাট্যোৎসব সমিতির পরিচালনায় দুদিনের নাট্যোৎসব সম্প্রতি শেষ হয়েছে। তিনটি একাঙ্ক নাটক, একটি গীতিনাট্য ও একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। প্রথম দিন পরিবেশিত হয় তিনটি একাংক নাটক —চিত্তরঞ্জন দাস রচিত 'মৃত্যুহীন', এটি প্রযোজনা করেন ঠাকুরপুকুরের সম্মিলিত নাট্যসংস্থা। পরিচালনা করেন সমীর বসু। দ্বিতীয় নাটক 'এগিয়ে চলার শপথ', প্রযোজনা ইউনিক থিয়েটারের। রচনা ও নির্দেশনা শুভ মিত্র। ঠাকুরপুকুর ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজনায় তৃতীয় নাটক রবিদাস রাহা রায়ের 'শিল্পী চাই' অভিনীত হয়। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রতাপ ব্যানার্জী।

দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয় সংঘমিত্রা'র প্রযোজনায় 'অভিসার' গীতিনাট্য। নির্দেশনায় ছিলেন জয়া সেন। সব শেষে অভিনীত হয় 'দুই মহল'। নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন প্রতাপ ব্যানার্জী।

'হারানো ছন্দ'

সম্প্রতি ব্রিটানিয়া বিস্কুট এমপ্লয়িজ ক্লাবের নির্বাচিত শিল্পীরা মীরাটলালের

ে রঙের পাড়হীন একটা ...তলা শাড়ি। চলটা কুঁচিয়ে সদ্য করে বুকের ওপর দা। সামান্য আনত বুকদুটি প্রায় স্পষ্ট া যাচ্ছে। পেটে কোন আবরণ নেই। সা মসৃণ পরিষ্কার কোমরে দুটি ভাঁজ ীর নাভির নীচে শাড়ির বাঁধান। নিতম্ব ই আরও ভারী সামান্য মাংসল হয়ে ছে। এমন ধরনের শাড়ি আর জামা পরে ছে যে ওর দেহের গড়নটি খুব স্পষ্ট উঠেছে।

দীপু তাকাল। চোখ ফেরাবার ইচ্ছে বার হোল, তবু চোখ ফেরাল না। মালার া বসে তাকে যেমন করে হোক সহজ হবে। সামান্য হেসে বললী,—তুমি ও সুন্দর হয়েছ।

এমন একটা কথা বোধহয় দীপুর মুখ ি আশা করে নি মালা। মুখটা একটু দেখাল। পরমুহূর্তে হেসে উঠল,— র ছিলাম আগে। তখন কত স্মার্ট াম।

—তা ছিলে। কিন্তু তখন তোমার ধ্যে একটা ছটফটানি ছিল, চঞ্চল ছিলে। অন্যরকম।

ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল। খুব কটা হেসে বললে,—তুমি কি কাব্যচর্চা নাকি। ছোরা বোমা ছেড়ে কলম ?

দীপুর মুখটা একটু ম্লান হোল।

মালা কথাটা পালটে নিয়ে বললে, র। —তুমিও তখন অনেক বেশী স্মার্ট । যাকগে, ওকথা, কি খাবে বলো। —এলেই শুধু খাওয়াতে ব্যস্ত হও ।

মালা আবার হাসল।

দীপু লক্ষ্য করল, এই মাসখানেকের র মালা চোখমুখ থেকে সেই বিষণ্ণ ী অনেক কমে এসেছে। দেহটাও যেন ; ভারী হয়েছে। সত্যিই বেশ সুন্দর হ মালাকে। মোড়ার ওপর থেকে উঠে ল দীপু।

মালা আস্তে বলল,—খাবার কথা বলছি জান? ঝিটাকে দিয়ে খাবার আনিয়ে ক এখুনি বিদেয় করে দোব।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দীপু ,—দোকানের খাবার আমি খাব না। চা এইমাত্র আমি খেয়ে এসেছি।

—কে খাবার করে দিলে, বৌ এসেছে ?

ঠোঁট টিপে হাসল মালা।

দীপু ওর দিকে চোখ মেলে তাকাল। ড় চোখদুটি ওর স্বচ্ছ। সবটা মন দিয়ে র দিকে আজও তাকাতে পারছে।

এর ভেতরে ঝি ঘরে এল। চা বিস্কুট ।

মালা একটু বিরক্ত হয়ে ঝিকে বললে,— ক বিস্কুট চা দিতে বললে কে?

দীপু হাসল। বলল,—ওর দোষ নেই। লে, অতিথি এলেই চা বিস্কুট দিতে

মালা এ কথার জবাব না দিয়ে ঝিটাকে বলল,—বিছানা ঝেড়ে পেতে রেখেছিস?

ঝি মাথা নাড়ল।

—তবে এখন তুই যা। কাল খুব ভোরে আসবি। সকাল সকাল বেরোব আমি।

ঝি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরে গেল। ভেতর থেকে একটা গামছায় বাঁধা পাত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দীপু বুঝল, ঝি রাত্রের খাবার নিয়ে চলে গেল।

মালা দরজাটা বন্ধ করে খাটের ওপর বসল। দীপু বসল আবার মোড়াটায়।

—নাও চা বিস্কুট খেয়ে নাও। তারপরে যা হয় কিছু করে দোব।

দীপু চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে হেসে বলল,—আর কিছু দরকার নেই। এতেই হবে। খিদে নেই তেমন।

মালা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এক-টুকরো বিস্কুট ভেঙে চিবোতে চিবোতে বললে,—বৌ এমন কি খাওয়ালে তোমার যে খিদে নেই। কি খাবার করেছিল?

দীপু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—বৌ নয়, ভাইয়ের স্ত্রী। খুব যত্ন করে আমায়।

—সেদিন দেখেছি, মেয়েটি বড় ভাল মনে হোল। কিন্তু বৌ কোথায়?

আর এক ঢোক চা গিলে দীপু আস্তে বলল,—বৌ নেই।

—তার মানে? বৌ মরে গেল নাকি?

কৌতুকে চিকচিক করে উঠল মালার চোখ দুটো।

—মরে যায়নি। বৌ কোনদিনই ছিল না।

মুখটা নীচু করে চায়ে চুমুক দিল দীপু। —তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম।

মালা তাকিয়ে রইল দীপুর দিকে। দীপু যে এমন সহজ করে এত অসংকোচে তার কাছে সত্যি কথা বলবে ও ভাবতে পারেনি। দীপুর মুখে মিথ্যে কথাটা শুনে ওর মনে সামান্য একটু ক্ষোভ ছিল, কিছুটা বেদনা পেয়েছিল। আজ দীপু নিজে তার মিথ্যেটা স্বীকার করে নেওয়ায় ওর সব হালকা হয়ে গেল মুহূর্তে। দীপুর সম্পর্কে সামান্যতম গ্লানিও ওর মনে রইল না। এই মুহূর্তে ওর মন দীপুর জন্যে এক গভীর কারুণ্যে মমতায় ভরে উঠল। চোখদুটো চিকচিক করে উঠল। শান্ত কোমল লাবণ্যে ভরে উঠল মুখখানা।

চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে নরম ভেজা গলায় ও বললে, —আমি জানতুম। তুমি বলবার আগেই আমি জানতুম।

—তুমি জানতে?

—হ্যাঁ, তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর মুখে সেদিনই শুনেছিলাম। কিন্তু কেন এমন একটা মিছে কথা বলতে গেলে বলো তো? তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি বিয়ে করেছ শুনলে আমি হা-হুতাশ করে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দোব। আর কখনো তোমার কাছে যাব না? তোমার সঙ্গ আমার কাছে

বিষ হয়ে উঠবে? তুমি আমাকে এত ছোট ভাবলে।

দীপু চুপ করে রইল।

—তুমি কি করে বুঝবে, তুমি বিয়ে করলে আমি খুশী হতাম। তুমি সুখে আছ, আনন্দে আছ জানলে আমার সত্যি ভাল লাগত। এ সব তুমি বুঝবে না। তুমি যদি মেয়েমানুষ হতে তবে বুঝতে।

দীপুর মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছিল। বললে,—সত্যি তুমি সুখী হতে।

—সত্যি সুখী হতাম। এর ভেতরে একটুও মিছে নেই। বললাম তো তুমি বুঝবে না, বুঝলে তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথাটা বলতে না।

দীপু গম্ভীর স্বরে বললে,—তোমাকে লুকোব না আর কিছু। তোমাকে দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভয়ে মিছে কথা বলেছিলাম।

—কিসের ভয়?

—পাছে তুমি পুরোন দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করো এই ভেবে।

মালার মুখের ওপর আবার বিষন্ন ছায়া পড়ল। বারান্দার দিকে তাকাল। যেন খানিকটা আপন মনেই বলল,—কিন্তু পুরোন দিনগুলো কি এত সহজে শেষ হয়ে যায়?

বারান্দার ওপারে নিমগাছের ডালপাতার ঝিরঝির শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে। ফুরফুর করে বাতাস বইছে। গরম আজ কম। কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে গরম বেশ কমে গেছে।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে দীপু বললে,—শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। কি লাভ আর জোর করে পুরোন ভাবনাকে বার বার টেনে এনে। যে দিন যায়, তা আর ফিরে আসে না। তার জন্যে আক্ষেপ করার চেয়ে বোকামি আর নেই। নোতুন মানুষ নোতুন ভাবনা নিয়ে দিন কাটানই ভাল।

একটু থেমে আবার বলল দীপু,— একটা কথা তোমাকে বলি মালা, শুধু তুমি আর আমি এই পৃথিবীটা নয়। সংসারটা অনেক বড়। অনেক মানুষ। কারোর সুখ-দুঃখ কিছু কম নয়। নিজের সুখদুঃখকে খুব বেশী বড় করে দেখো না। চারদিকে একটু তাকাও, দেখবে কত মানুষ—অগুন্তি মানুষ—এদের দেখতে ভাল লাগে, এদের কথা ভাবতেও ভাল লাগে।

চায়ের কাপ ডিশটা নামিয়ে রেখে দীপু আবার বলে,—এ সব আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শোনা কথা নয়, পড়া কথা নয়। আমি ভালমন্দ অনেক মানুষ দেখেছি। এখন মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান, তাদের জন্যে মমতায় আমার বুক ভরে ওঠে, তাদের কষ্টে অসহায় মনে হয় নিজেকে। আমার নিজের ভাবনা এত মানুষের ভাবনার কাছে বড় বেশী ছোট বলে মনে হয়। আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান, নিজের ভাবনা ভাবার চেয়ে বড় পাপ বোধ-হয় সংসারে আর কিছু নেই।

ওইটেই সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা, মানুষের সবচেয়ে বড় শাস্তি।

সামান্য হেসে দীপু আবার বলল,—তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, একটা হতাশা রয়েছে তোমার ভেতরে। কিসের এত হতাশা?

মালা এতক্ষণ নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিল দীপুর দিকে।

ওর হঠাৎ মনে হোল, ও হাত বাড়িয়ে দীপুকে ধরবার চেষ্টা করছে, কিন্তু দীপুর নাগাল পাচ্ছে না। দীপু ছড়িয়ে পড়ছে। বিস্তৃত হয়ে পড়ছে, ওর আলিঙ্গনের ছোট পরিধির চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে।

ওর মুখে গাঢ় যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল।

আস্তে আস্তে বলল,—আমি তো নিজের কথা কখনো ভাবিনি।

—তুমি কি নিজের সুখের কথা ভাবোনি। ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি তাই ভেবেছ। প্রতি মুহূর্তে নিজের বাসনা নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছ। আর সেইজন্যেই তোমার এত কষ্ট।

—না। তুমি জানো না। তোমার চারপাশে অসংখ্য মানুষ। চোখ বন্ধ করে থেকো না। তাকিয়ে দেখ।

ম্লান মুখে হাসল মালা। —আমি সামান্য মেয়েমানুষ। আমি তো অনেক মানুষকে জানি না। একজন মানুষকে জানাই আমার ধর্ম।

দীপু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল,—না। তা হতে পারে না। বহু মানুষের ভাবনাই তোমার ভাবনা। তুমি এই মস্ত সংসারের সমস্ত মানুষের জন্যে জন্মেছ।

অবসন্ন স্বরে মালা বলল,—আমার কথা তুমি বুঝবে না।

—বুঝেছি বলেই আজ বলতে এসেছি। শুধু নিজেকে নিয়ে খেলা করতে করতে ব্যর্থ হয়ে যেও না।

মালা উঠে দাঁড়াল। দীপুর কথাগুলো ওকে আরও বিষন্ন করে তুলল। আবার ওর মনে হোল, হাত বাড়িয়ে আর দীপুর নাগাল পাচ্ছে না ও। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। আস্তে আস্তে উঠে ভেতরে গিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে ভেতরে এল।

দীপু উঠে বারান্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আকাশটা অনেক বড়। অসংখ্য নক্ষত্র আকাশে। দূরে গাছগাছালির ছায়া বাড়ির পর বাড়ি সামনে। অনেক অনেক প্রাণ ভরে রয়েছে সর্বত্র। দীপু একা নয়। নিঃসঙ্গ নয়। প্রতিটি প্রাণের স্পন্দন নিজের প্রাণে অনুভব করতে পারছে সে।

নিঃসঙ্গতা তাকে আর স্পর্শ করতে পারছে না। নিঃসঙ্গতা একটা বিকার। স্বার্থচিন্তা একটা ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগ থেকে মালাকে মুক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের বিন্দুটুকুর ভেতরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার নাম নিঃসঙ্গতার আত্মবিলাস, এ এক বদ্ধ যন্ত্রণার বিকার।

দীপুর কাঁধে একটা নরম হাতের স্পর্শে ফিরে তাকাল ও। মালা এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ একটু হেসে দীপু বললে,—আচ্ছা, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

এমন আকস্মিক প্রশ্নে মালা অবাক হয়ে তাকালে।

—তোমার বাবা কি বিয়ের কোন চেষ্টা করেন নি।

—করেছিলেন। কিন্তু হয়নি।

—পরে তো করতে পারতে।

—পরে ভেবে দেখলাম, বিয়ে মেয়েমানুষের একবারই হয়। আমার বিয়ে হয়ে গেছে অনেক আগে।

সামান্য হাসল দীপু। তক্ষুনি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। মালার কথাটার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, বড় বেশী স্পষ্ট। তবু দীপু আজ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হোল না। খুব সহজ স্বরে বলল,—কিন্তু আমি তো জেলে তুমি জানতে।

—তাতে কি?

—আমার সঙ্গে তো তোমার দেখা না হতেও পারত।

—তা পারত।

—তবে?

—তবে কি?

—তুমি তো আমাকে খোঁজবার চেষ্টাও করোনি।

মালা স্পষ্ট উত্তর দিল। —খোঁজবার কথা তোমার। আমার নয়।

দীপু ওর সামনা-সামনি দাঁড়াল।

দৃঢ় জোরালো কণ্ঠে বলল,—তুমি এখন কি চাও বলো তো?

দীপুর মুখের ওপর চোখ দুটো রেখে মালা খুব আস্তে বলল,—কিছুই না। আমি কি জানি।

দীপু কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে দরজায় শব্দ হোল। কেউ বোধহয় ডাকছে।

রাত বেশী হয়নি। সাড়ে আটটা বেজেছে সবে।

দরজায় শব্দ শুনে মালার মুখের চেহারাটা পালটে গেল। একটু যেন বিব্রত হোল। কি করবে ভেবে পেল না।

আবার দরজায় শব্দ হোল।

দীপু দেখল মালা নড়ছে না। কি ভাবছে।

মালা কিছু করবার আগেই [illegible] এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। [illegible] সামনে দাঁড়িয়ে একটি সুপুরুষ ভদ্র[illegible] বেশ ফরসা জোয়ান লোকটি। বলিষ্ঠ [illegible] তেমনি বলিষ্ঠ দৃষ্টি।

—কাকে চাইছেন আপনি?

দীপু প্রশ্ন করল। লোকটি অবাক [illegible] তার দিকে তাকাল। দীপুর কথার [illegible] উত্তর দেয়া প্রয়োজন মনে করল না। স[illegible] মুখে ঘরে ঢুকল। দীপু বুঝল, [illegible] কথাটা তার ঠিক হয়নি। লোকটি [illegible] মালার খুব পরিচিত, তা নইলে [illegible] প্রশ্নটা শুনে তার মুখে বিরক্তি বিস্ময় [illegible] যাবে কেন? দীপুর কথাটা এমন অ[illegible] অগ্রাহ্য করবে কেন?

তবু ভদ্রলোকের ব্যবহারে একটু [illegible] হোল দীপু। এমনভাবে তাকালো যে[illegible] যেন বলতে চাইল, আপনি কে? অ[illegible] এখানে কেন? দীপু দোরটা ভেজিয়ে [illegible] তাকিয়ে দেখল মালা আকাশের দিকে [illegible] করে পেছন ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে র[illegible]

লোকটি এগোল। দীপু [illegible] এগোল না।

—কি হোল, আজ মিটিংয়ে এলেন [illegible]

মালা ফিরে তাকাল। দীপু লক্ষ্য [illegible] মালার মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হা[illegible] চেষ্টা করে বলল,—কিসের মিটিং?

—বারে, স্কুল লাইব্রেরীর মি[illegible] আপনার জন্যে অপেক্ষা করে নিতে [illegible] আপনাকে।

মালা চোখদুটোয় অনেক বিস্ময় [illegible] তোলবার চেষ্টা করে বলে উঠল,—ও [illegible] আমার একেবারে মনে ছিল না। [illegible] অনেক দিনের বন্ধু দীপক সাহা [illegible] ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কথাটা [illegible] বারে ভুলে গিয়েছিলাম।

একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর হাওয়া [illegible] উঠেছিল। দু-চারটে কথার পর একটু [illegible] মনে হল ঘরের বাতাস।

মালা দীপুর দিকে তাকিয়ে বল[illegible] এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? প[illegible] করিয়ে দিই। ইনি ডক্টর সুর্য নাগ। আ[illegible] স্কুলের মেম্বর।

—নমস্কার। দীপু দু হাত [illegible] নমস্কার জানাল। প্রতিনমস্কার করল [illegible] নাগ। কোন কথা বলল না।

মালার দিকে ফিরে তাকিয়ে [illegible] বলল,—তাহলে মিটিংয়ে যাবেন তো?

মালার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল,—আর কি করে যাওয়া হয়?

দীপু ওইখানে দাঁড়িয়ে আস্তে ব[illegible] আমি বরং আজ চলি।

দীপুর কথাটা শুনে মালা [illegible] একটা ভয় পেল মনে হল, দুর্বল স্বরে [illegible] দিয়ে বলবার চেষ্টা করল,—না, না,

এখন যাবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সূর্য নাগের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু হাসল। কথা পরেও হতে পারবে, কি বলেন? আজ আমি চলি।

—শোন।

এগিয়ে গেল মালা।

দীপু ওর ডাক অগ্রাহ্য করে সূর্য নাগের দিকে বলল,—চলি, নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেল সূর্য নাগ। দীপু দোরটা খুলে বেরিয়ে গেল।

সূর্য নাগ দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। একটু সময় ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল।

মালার মুখের দিকে তাকাল সূর্য নাগ। বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে মুখখানা থমথমে। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে সামান্য বেঁকে বসে রয়েছে মালা। কথা বলছে না।

একটা কোন কথা না বললে ভাল দেখায় না। নাগ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—আপনি যদি আগে বলতেন, মিটিং আজ বন্ধ করে দেয়া যেত। মিসেস বোস, মিস রায়, সবাই অপেক্ষা করছে।

মালা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলুন, যাই। একটু বসুন।

মালা ভেতরে গিয়ে শাড়ি বদলাল আবার। বড় বেশী ভয় পেয়েছে মালা। কেবলই মনে হচ্ছে দীপু কি ভাবল। নাগই বা কি ভাবছে? কাউকে কিছু ভাল করে বলবার অবসর পাওয়া গেল না। ধীরে-ধীরে আলাপের মধ্য দিয়ে কেউ কারো কাছে সহজ হতে পারল না। নাগ যদি মিটিংয়ের তাড়া না দিত, তবে বোধহয় দীপু চলে যেত না। বসে নাগের সঙ্গেও দুটো কথা বলত, আলাপ করত। নাগের এসব বাড়াবাড়ি। মিটিং কি একটা দিন তাকে ছাড়া চলত না। সে যখন যেতে পারে নি, তখন নিশ্চয়ই বোঝা উচিত ছিল সে একটা কোন কাজে আটকে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে যাবার জন্যে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

এর পর একদিন ওদের দুজনকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

শাড়ি বদলে ঘরে এসে অবাক হয়ে গেল মালা।

এ কি নাগ কোথায় গেল? নাগ ঘরে নেই। দরজাটা সামান্য খোলা। নাগ নিশ্চয় চলে গেছে। বারান্দায় এসে নীচের দিকে একবার তাকাল। অন্ধকার নিমগাছটার ডাল-পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ভেতরে ফিরতেই খাটের ওপর এক টুকরো কাগজ দেখতে গেল। তাড়াতাড়ি এসে কাগজটুকু তুলে নিয়ে দেখল সূর্য নাগের লেখা—বিরক্ত করলাম বলে লজ্জাবোধ করছি। কাল দেখা হবে।

।। চোদ্দ ।।

শহর কলকাতায় তখনো শীত পড়ে নি। ধোঁয়া আর কুয়াশায় শীতের বাতাস তেমন জোর বয় না। মাঝে মাঝে ভাপসা দমআটকান গুমোট মনে হয়। রাত্রি প্রথম প্রহরে গুমোট ভাবটা কেটে যায় শেষ প্রহরে। তখন গায়ে একটা কিছু চাপা না দিলে ঘুমোন যায় না। মাঝরাত্রে বই পড়তে পড়তে পায়ে বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছিল। ইজিচেয়ার থেকে উঠে একটা চাদর এনে কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে বসল দীপু। বইটা খুলে কোলের ওপর রাখল।

আজ ঘুম আসতে বড় দেরী হচ্ছে ওর। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তীব্র একটা দ্বিধা তার কিছুতেই কাটছে না। বন্ধ সে কোনমতে বিচার করে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কি তার করা উচিত, কি করা কর্তব্য। কিছুতেই বুদ্ধি দিয়ে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না। অথচ একটা সমাধানে তাকে আসতেই হবে। একটা কিছু নিশ্চিতভাবে স্থির করতে হবে।

কি করবে সে? মালাকে কি গ্রহণ করবে। জীবনের এই রেখায় সে কি আর একটি বিন্দুকে টেনে নিয়ে আসবে। দুটি রেখা কি মিলবে। না কি পাশাপাশি চিরকাল সমান্তরাল চলবে?

মালা কি চায়, মালা জানে। ওর মনে কোন দ্বিধা নেই। একটুও দ্বন্দ্ব নেই।

কিন্তু দ্বিধা নেই, এ কথাই বলা যায় কি? সূর্য নাগ কি কখনো-কখনো ওর জীবনের রেখায় কোন আঁকা-বাঁকা কোণের সৃষ্টি করে না? সূর্য নাগকে ও কি ভাবে দেখে, সেটা কি ও নিজেও জানে!

সূর্য নাগ মালার জীবনে খুব সামান্য একটি ঘটনা নয়, কোন হাল্কা একটি পরিচয় মাত্র নয়। এ কথাটা মালা না বুঝুক, দীপু খুব পরিষ্কার বুঝেছে।

প্রথম দিনের আলাপে সে মানুষটাকে অদ্ভুত ধরনের এক রূপ স্তাবক ভেবেছিল। ভেবেছিল, মালার কোন মুগ্ধ ভক্ত। কিন্তু তা নয়। পরে আর একদিনের পরিচয়ে তার এ ভুল ভেঙেছিল।

সূর্য নাগ একটি বিশিষ্ট চরিত্রের মানুষ। সহজ স্বচ্ছ তার দৃষ্টি। মনে স্পষ্ট ধারণা আনতে সমর্থ। ধোঁয়াটে বা রঙিন কোন মিথ্যে স্বপ্ন দেখবার অভ্যাস সূর্য নাগের নেই। ধীর-স্থির একটি ব্যক্তিত্ব। হাল্কা বলে উড়িয়ে দেবার মত মানুষ সূর্য নাগ নয়।

এসব দীপু হয়ত জানতে পারত না, যদি না মালা আবার তার বাড়ি আসত।

প্রথম দিন সূর্য নাগকে দেখে চলে এসে দীপু স্থির করেছিল আর মালার কাছে তার যাবার প্রয়োজন নেই। মালা একা নয়। মালার রূপবান স্তাবক আছে, ভক্ত আছে, ক্লাব আছে, মিটিং আছে, হয়ত বা আরও অনেক কিছু আছে। যা দীপু জানে না। মালাও জানাবার প্রয়োজন মনে করে নি।

সূর্য নাগদের মত আরও দু-পাঁচজন যদি থাকে, তাদের ভেতর থেকে যে কোন একজনকে বেছে নিয়ে জীবন কাটাতে পারবে। তা না পারলেও স্তাবকদের নিয়ে অন্তত অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকতে পারবে। এইভাবে বছরের পর বছর দীপু, মালা এতগুলো বছর কি ভাবে কাটিয়েছে। একা যে কাটায় নি এতে আর কোন সন্দেহ। পুরুষের সঙ্গ লাভ যে করেছে তাতে আর কোন ভুল নেই। শুধু পুরুষ নয়, বহু পুরুষের সঙ্গ লাভ করাটা তার মত অর্থবতী, রূপবতীর পক্ষে স্বাভাবিক।

ভালই হয়েছে। মনে-মনে দীপু খুশী হয়েছিল। তার আর কোন দায় নেই, ভাবনা নেই।

মনটা বেশ খুশী রইল দিন কতক। ও যেন অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বাঁচল। আবার দীপু নিয়মমত পড়ায় মন দিল। ছুতোর জন্যে একটা বেয়ারার চাকরি ঠিক করল এক বন্ধুর কোম্পানীতে, তার নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভার যথারীতি রমজার ওপর ছেড়ে দিয়ে বেশ আরাম বোধ করল।

আরাম অত সুলভ নয়। মনকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না।

দিন কতকের ভেতরেই ধারণা বদলাল, মনের গতি উল্টোমুখো হল। সেদিনের মালার মুখের দু-চারটে কথা যতই ওর মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, ততই নিশ্চিন্ত ভাবটা নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করল। 'বিয়ে মেয়েমানুষের একবারই হয়,—কথাটায় আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। 'আমার কথা তুমি বুঝবে না। এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কার কথাই বা কে বোঝে। সংসারে সবাই যে যার নিজেরটুকু নিয়ে ব্যস্ত। 'তুমি মেয়েমানুষ হলে বুঝতে'—

নাঃ! নাগের উপস্থিতির চেয়েও কথাগুলো তার কাছে ক্রমে বড় হয়ে উঠছে কেন?

তা উঠুক। কথাগুলো যত বড়ই মনে হোক, সত্যি-সত্যি তার নিজের দিক থেকে সেধে বিশেষ কিছু করবার নেই। মালা কিছু ছেলেমানুষ নয়। তার ওপর একান্ত নির্ভর করে ও জীবন কাটাচ্ছে না। শুধু অর্থই নয়, মানুষও তার চারপাশে অনেক আছে নিশ্চয়। তার বিপদে দেখবার মত লোকেরও অভাব নেই। তবু মালাকে তার চাই। কেন চাই? তার প্রেমকে সে সার্থক করে তুলতে চায়। প্রেমের নামে রোমান্টিক আত্মবিলাসকে সফল করতে চায়। আসলে অন্য কাউকেই ভালবাসে না। নিজেকেই নিজে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

ভালই হয়েছে। আর মালার ওখানে যাবার প্রয়োজন নেই।

নিজেকে আশ্বস্ত করে তোলবার চেষ্টা করতেই বেশ দিনকতক কেটে গেল। নিজেকেও নিজে ভাল করে দেখবার বোঝবার চেষ্টা করল। না, তার কোন বেদনা নেই। মালাকে বহুদিন পর দেখে সে যেমন মস্ত একটা লাভ হয়েছে বলে মনে করে নি, আজও তেমনি খুব বড় একটা লোকসান কিছু হচ্ছে বলে তার মনে হল না। মালা তার জীবনের একটা সমস্যা কিছু ছিল না। এত বড় পৃথিবীতে শুধু একটি মেয়েকে জীবনের একমাত্র সমস্যা বলে ভাবতে সে কিছুতেই পারে না।

এমনি একটা দিনে সকালে মালা এসে হাজির।

দীপু তখন খবরের কাগজ পড়ছিল। মালা এসে ঘরে ঢুকল। চোখে-মুখে আগের মতই বিষণ্ণ চোখ। আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকল। দীপুকে দেখে হাসল। হাসিটা দুর্বল বলে মনে হল।

—এসো। বোস।

দীপু এখন বেশ সহজ হতে পারছিল। —হঠাৎ সকালবেলা এসে পড়লে?

মালা চেয়ারে বসল সঙ্কুচিত হয়ে।—এমনি। এলাম।

বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলল,—তুমি অনেক দিন যাও নি।

—না, সময় করে উঠতে পারি নি।

মিছে কথা বলল দীপু। মালা বোধহয় মিথ্যেটা ধরতেও পারল। তবু তেমন জোরাল স্বরে কিছু বলতে পারল না। মুখটা তুলে একবার দীপুর দিকে তাকাল। আবার মুখ নীচু করে খুব আস্তে বলল,—সেদিন কি ডক্টর নাগকে দেখে তুমি কিছু মনে করেছ?

দীপু হাসল। পরিষ্কার হাসি। কি আবার মনে করব? কিছু না।

মালা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বলল,—যাক বাঁচালে।

মালা কিসে যে বাঁচল দীপু কিছুই বুঝতে পারল না। ও হঠাৎ লক্ষ্য করল মালা উঠে পড়ল। ওর কাছে এসে বল,—চলো, আমার সঙ্গে চলো।

—কোথায়?

—আমার ফ্ল্যাটে। ওখানেই তোমার নেমন্তন্ন আজ দুপুরে। চলো নাও জামা পরে নাও।

দীপু অবাক হয়ে বলল,—আরে দাঁড়াও। আমার অফিস আছে। তাছাড়া—

—কোন কথা নয়। এক্ষুনি চলো।

কানের কাছে মুখটা এনে খুব আস্তে বললে,—নাগকে তোমার কথা সব বলেছি। শুনে ও খুব খুশী হয়েছে। ও বরাবরই আমার ভাল চায়। মানুষটা বড় ভাল। ও আজ আসবে। একসঙ্গে খাব আমরা।

বিব্রত বোধ করল দীপু।—মুখটা সরাও। কি কোচ্ছ, বাড়িতে বৌমা আছেন। তাছাড়া তোমার সঙ্গে এভাবে বেরোনটা বৌমা কি ভাববে।

—ভাবুক না। একটু ভাবতেই না হয় দাও। অত ভয় কেন?

কথাটা মিথ্যে নয়। রমলাকে এত ভয় করবার কি প্রয়োজন। যা ভাবার রমলা ভাবুক। তার কিই বা আসে-যায় তাতে। সে অন্যায় কিছু করেছে না তো। একটি ভদ্রমহিলার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে। দীপু উঠে পড়ল। ডক্টর সূর্য নাগ মানুষটিকেও আর একবার তার দেখবার ইচ্ছে ছিল।

সেদিন মালার সঙ্গে তাকে আসতেই হল। রমলাকে বলে এল, সে দুপুরে খাবে না। রমলা কি ভাবল রমলাই জানে। দীপু সোজা চলে এল মালার বাড়ি।

এখন বুঝতে পারে দীপু বেশ ভেবে-চিন্তেই মালা এই ব্যবস্থাটা করেছিল। নাগ মালার ফ্ল্যাটেই ছিল। রান্নার তদারক করছিল। খাবার বেশ জোরাল ব্যবস্থাই হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা কি পরে বুঝতে পেরেছিল দীপু। নাগ দীপুর সঙ্গে ভালভাবে আলাপ করতে চেয়েছিল। এইটেই মূল উদ্দেশ্য। আলাপ হলে দুজনের সম্পর্কে দুজনের ধারণা যদি কিছু ভুল থাকে, শুধরে যাবে এও একটা উদ্দেশ্য। সেদিন পুরোপুরি সফল হয়েছিল মালা। মালার সফলতাকে ও রোধ করতে পারে নি আজও।

চাদরটা কোমর থেকে বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে ইজিচেয়ারে নড়ে বসল দীপু। রাত একটা বেজে দশ মিনিট। ঘুম আজ আসছে না। ঘুমোবার চেষ্টাও করছে না। সে নিজেরই অজ্ঞাতে আজ একটা কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে দুটো পথ। একটা তাকে বেছে নিতে হবে। আসছে কাল সন্ধ্যায় কথাটা স্পষ্ট করে জানাতে হবে মালাকে।

আজ ভাবতেই বসেছে দীপু। বিশেষ করে সূর্য নাগের কথাটা তাকে আজ বেশী ভাবতে হবে।

সেদিন সূর্য নাগ হেসে অভ্যর্থনা করেছিল।— আসুন, আপনার জন্যেই আজ এই আয়োজন?

দীপু একটু লজ্জিত হোল। হেসে বলল,—আমার একার জন্যে নয়। আমাদের সকলের জন্যে।

সিগারেট বার করে নাগ খুব হেসে বলেছিল,—আমরা তো ইতরজন। আপনিই মুখ্য।

খুব হেসেছিল সূর্য নাগ। একটু বেশী হাসবার চেষ্টা করেছিল বলে মনে হয়। দীপু ঠিক মনে করতে পারছে না। হাসবার সময় সূর্য নাগের মুখে ম্লান ছায়া ছিল কিনা।

তার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরেছিল নাগ।

দীপু হেসে বলেছিল,—ধন্যবাদ। আমি খাই না।

নাগ নিজে সিগারেটে খুব জোরালো দু-চারটে টান দিয়ে বলেছিল,—যাই, ফ্রায়েড রাইসটার রান্না দেখিয়ে দিয়ে আসি। রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।

মালা অল্প হেসে দীপুকে বলেছিল,—নাগ খুব ভাল রান্না জানে। তুমি বোস। চা খাবে, না কফি।

এক কাপ কফির কথাই বলেছিল দীপু। শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করছিল। এক কাপ কফি খেলে হয়তো একটু চাঙা হওয়া যাবে। বসেছিল দীপু। সেদিন বহুক্ষণ ছিল মালার ঘরে।

রান্না হোল। তিনজন একসঙ্গে বসে খাওয়া হোল। হাসি গল্পও হোল।

একটা কথা কেবলি দীপুর মনে হচ্ছিল, নাগকে কি মালা তার সম্পর্কে সব কিছুই বলেছে। তার বিগত জীবনের উন্মাদ কার্যকলাপের কাহিনী কি বলেছে? বলেই যদি থাকে, তাতেই বা কি আসে-যায়! নিজের কোন এক সময়ের বিভ্রান্ত অবস্থার জন্যে সে কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। যেমন আজ তার বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে সে কিছুমাত্র অহঙ্কৃত নয়। সমাজের চারপাশের পরিবেশের চাপে, ঘটনার চাপে তার জীবনের গড়ন নানাভাবে বদল হতে পারে, এতে তার নিজের কোন দোষও যেমন নেই। তেমনি নিজের কোন কৃতিত্বও নেই। চারপাশের বহু মানুষের ভাব-ভাবনা আকাঙ্ক্ষা-বেদনা তার জীবনের ওপর প্রভাব আনবেই। সে যদি আজ মাড়োয়ার তনয় হোত, বা গুজরাটি নন্দন হোত, তবে তাকে কোন একটা ব্যবসায় নামতে হোত, যদি ইংরেজ-বাচ্চা হোত, কলকারখানার ফন্দীফিকির তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করত। যদি রুশ-সন্তান হোত, রাষ্ট্রের মঙ্গলচিন্তা তার ওপর প্রভাব আনত। যেহেতু সে সাধারণ বিত্ত বাঙালী সন্তান। সে এম-এ পাশ করে একটা চাকরি করছে। আর তাতেই সর্বসিদ্ধির পথ খুঁজেছে। এতে তার কোন কৃতিত্বই নেই। তার কোন অপরাধও নেই। মানুষ একা নয়। একক ভাবভাবনায় সে গড়ে ওঠে না।

যদি মালা তার সম্বন্ধে সব কথা নাগকে বলেই থাকে, তাতে তার কিছু আসে-যায় না।

খাওয়ার পর রাঁধুনী ঝিকে নিয়ে মালা যখন ব্যস্ত ছিল, সে সময় নাগ এসে বসল খাটটার ওপর। মস্ত একটা ঢেঁকুর তুলে একটা সিগারেট ধরাল।—বসুন।

দীপু দুটিখানি মৌরি এলাচ চিবোতে-চিবোতে খাটের এক পাশে বসল।

—এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন মশাই। মিস দত্তর এত বিপদ-আপদ গেল, টানাপোড়েন গেল। উঃ সে কি ঝামেলা!

সূর্য নাগ সেই ঝামেলার দিনে মালা দত্তর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এইটেই বোধ-হয় বেশ রঙ চড়িয়ে শোনাতে চায়।

দীপু অল্প একটু হাসল।

—মিস দত্তর বিয়ে তো ঠিক হয়ে গিয়েছিল, বিয়েটা ভেঙে দিলুম আমি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সে সব মহাভারতের বৃত্তান্ত আর কি! মানে আমারই এক বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বন্ধুটির এ বিয়েতে মত ছিল না। অন্য একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কাজেই বন্ধুর উপকার করবার প্রেরণায় একেবারে হুড়মুড় করে এসে বিয়েটা ভেঙে দিলাম। তার পরে কিন্তু মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এটা করলাম কি! মিস দত্তর জীবনটা নষ্ট করলাম না তো? ওর কাছে এসে ক্ষমা চাইলাম।

হেসে উঠল সূর্য নাগ। —এখন দেখছি ভালই করছিলাম। আপনার আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কি বলুন?

সূর্য নাগ হাসল। দীপুর বেশ মনে পড়ে এ হাসির পেছনে একটা বিষণ্ণ ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটা বড় নিঃশ্বাসও ফেলেছিল নাগ।

দীপু এবারেও সামান্য হাসল।

—আপনি কি করেন?

দীপু অফিসের নাম বলল, কি কাজ করে বলল।

—ও বাব্বা! আপনি তো মস্ত অফিসার। আপনাদের অফিসে একটা কাজকর্ম দিন না? প্রাকটিশ তেমন জমছে না। ভাবছি, বিলেত চলে যাব। ঘুরে না এলে কিছু হবে না। আপনি কি বাইরে গিয়েছিলেন।

—না।

—কলকাতায়ই ছিলেন? বলেন কি মশাই। কলকাতায় থেকে এখানে এতদিন একবারও আসেননি। অঃ বুঝেছি, ব্যক্তিগত কোন কারণ থাকতে পারে। মান অভিমান কত রকমেরই তো হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক না-কেন, একটা কথা আপনাকে বলি. মিস দত্ত আজ পর্যন্ত বিয়ে করেন নি। অন্য কোন মানুষের তার কোন ইনটারেস্ট দেখিনি। তাই আপনাকে নিশ্চিন্ত বলতে পারি। উনি শুধু আপনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সত্যি ইট্‌জ্‌ জেনুইন লভ। এ রকম আমি বড় একটা দেখিনি। শুধু আমাকে যদি উনি একবার বলতেন, আমি আপনার খোঁজ করে আপনাকে ধরে নিয়ে আসতাম। কোনদিন বলেন নি। আশ্চর্য!

বড় বেশী কথা বলছিল সূর্য নাগ। আধখানার ওপর সিগারেট হাতেই পুড়ে গেল। আবার একটা সিগারেট ধরাল। এত সিগারেট খাওয়া এত বেশী কথা বলা, এ থেকে কি কিছু একটা বোঝা যায় না?

সূর্য নাগের মনোভাবটা ধরা কি এতই কঠিন! মা মনে হয় না। মাঝে মাঝে সূর্য নাগ বেশ পরিষ্কার ধরা পড়ে গেছে।

শুধু সেদিনই নয়। তার পরেও এ ক' মাসে আরও। অনেকবার সূর্য নাগের সঙ্গে দেখা হয়েছে দীপুর। শেষের দিকে লক্ষ্য করেছে, অত বেশী কথা আর বলত না। মাঝে মাঝে মুখটা তার বেশ ম্লান মনে হোত।

একদিন তো তার সামনে মালা বলেই ফেলল,—আপনার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে?

—হাসবার চেষ্টা করে নাগ বললে,—না তো।

—তবে মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন? শরীরটাও কিন্তু শুকিয়েছে আপনার।

—ও কিছু নয়। একটু খাটুনি পড়েছে। আজকাল রুগী বেড়েছে। তাছাড়া একটা হাসপাতালে কাজ নিয়েছি।

—অত খাটলে তেমনি খেতেও তো হয়।

সূর্য নাগ ও কথার উত্তর না দিয়ে দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল,—নিউ এম্পায়ারে একটা ডান্স দেখতে যাবেন?

বলে পকেট থেকে দুখানা টিকিট বার করে দীপুর হাতে দেয়। —সাতটায় আরম্ভ। দুজনে চলে যান।

দীপু হেসে বলল,—টিকিট তিনখানা আনা উচিত ছিল।

নাগ হেসে ওঠে। —আমার আজ যাবার উপায় নেই। জরুরী রুগী আছে দুটো। আপনারাই যান। আমি আজ চলি।

সূর্য নাগ চলে গিয়েছিল।

মালার দিকে তাকাল দীপু। রমলার মুখটা বেশ গম্ভীর দেখাল। মালা যেন একটা নিঃশ্বাস চাপল বলে মনে হোল।

একটু চুপ করে থেকে বলল,—ক'টা বাজে?

—সওয়া ছ'টা।

—আর একটু পরে বেরোলেও চলবে।

—তা চলবে। কিন্তু রাত কত হবে?

—রাত এগারোটা হতে পারে।

—মুস্কিল। রাত হলে রমলার মুখটা ভার হয়ে যায়।

—কেন?

একটু হাসে দীপু। —সংসারটা বড় আশ্চর্য! আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, রমলা চায় না যে আমি অন্য কোথাও যাই। মানে, সে চায় না যে আমি তার ওপর নির্ভর না করে অন্য কোন নির্ভর স্থান খুঁজে বেড়াই।

মালা অবাক হয়ে তাকায়। —কেন, বলো তো।

আবার হাসে দীপু। শুধু বলে,—রমলা মেয়েমানুষ।

এর বেশী আর কিছু মালাকে বলা প্রয়োজন ছিল না। এর বেশী কিছু বলবারও ছিল না। দীপু রমলাকে বুঝতে পারে। রমলার মনোভাবটা তার কাছে একটুও অস্পষ্ট নয়। শিবু তার প্রিয়, আর দীপু তার শ্রদ্ধেয়। প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় দুটি পুরুষকে দু'ভাবে তার নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্তে রেখে সংসারটাকে নিজের মত করে গড়ে তুলতে চায়। দীপুর এতটুকু অযত্ন সে হতে দেয় না। সব সময় তার প্রয়োজনের নীরব নজর রাখে, যাতে করে দীপু কখনো না মনে করতে পারে যে তার সেবাযত্নের জন্য অন্য আর একজনের প্রয়োজন। রমলা দীপুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা সেবা যত্ন দিয়ে সুখী করে রাখতে চায়। সত্যিই রমলার তুলনা নেই। তবু একথা দীপু নিশ্চিত জানে, তার জীবনে অন্য কোন মেয়ে এসে সেবাযত্নের ভারটা রমলার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিক—এটা রমলা চায় না।

—ইদানীং মাঝে মাঝে সে মালার বাড়ি যেত, ফিরতে কখনো কখনো রাত হোত। কখনো কখনো রাতে খেয়ে ফিরত, রমলা কিছুই বলত না। একটা কথাও জিজ্ঞেস করত না। শুধু মুখখানা দেখে বোঝা যেত সে মোটেই খুশী নয়।

উপায় নেই। মালাকে সে কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারছে না। জোর করে অগ্রাহ্য করবার কোন প্রয়োজনও মনে করছে না। মালার সঙ্গে সহজভাবে মেশবার সংকল্প সে করেছিল। সেইভাবেই মিশছে, তার বেশী কিছু কোনদিন ভাবেনি।

ক্রমে মাসের পর মাস গড়িয়ে শীত এসে পড়ল। মালা বোধহয় এতদিন অপেক্ষা করছিল দীপু নিজে মুখে কিছু বলুক। এখন দু'জন একসঙ্গে থাকতে আর কোন বাধাই নেই। তবু এভাবে মাঝে মাঝে যাতায়াত করে দীপু কেন তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হবার কোন ইচ্ছে প্রকাশ করছে না? দীপু কিছু বলুক।

দীপু একেবারে নীরব। তার দিক থেকে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হবার কোন আগ্রহই দেখা গেল না। মালা ধীরে ধীরে বেশ অস্থির হয়ে উঠল।

ইদানীং সূর্য নাগ আর বেশী আসে না। ধীরে ধীরে সূর্য নাগ যেন তার কাছ থেকে তফাতে সরে যেতে চাইছে। অথচ দীপুও এগিয়ে আসছে না। বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিল মালা।

মালা নিশ্চয় অধীর হয়ে উঠেছিল। দীপু বুঝতে পারত। সবই বুঝতে পারত। কিন্তু এগোতে চাইত না। এগিয়ে যাবার মত কোন সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করত না। খুব সহজ গা ছাড়া ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছিল।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল,—ডাক্তার আর আসে না কেন?

মালা হালকাভাবে জবাব দিয়েছিল,—কে জানে। বোধহয় সময় পায় না।

—আমার মনে হয়, আমি আসবার পর থেকেই বোধহয় তার আসা কমেছে।

আবার সেই ছাড়া ছাড়া জবাব পেয়েছিল—কি জানি, খেয়াল করিনি।

জবাবগুলো মালা যেন ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেল। কিন্তু কেন? ডাক্তার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন কথা বলতে মালা এত ভয় পায় কেন। সঙ্কুচিত হয় কেন? ডাক্তারের প্রসঙ্গ ইচ্ছে করে এড়াবার চেষ্টা করে কেন? এর পেছনে কি কোন কারণ নেই? মালা কি কিছু একটা গোপন করতে চাইছে না? কিছু একটা লুকোতে চাইছে না?

এ সব কথা ভাববার কোন প্রয়োজনই দীপুর ছিল না। কিন্তু আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তার কাছ থেকে স্বীকৃতি চেয়েছে। কথাটা মালাকেই বলতে হয়েছে। হয়তো, বা দীপু কোনমতেই কোন স্বীকৃতির ভেতর

থেকে চাইছে না দেখে অস্থির হয়ে মালা কথাটা পেড়ে বসল।

—তুমি তো আমার এখানে এসে থাকলেই পারো।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল দীপু। অকস্মাৎ এমন একটি প্রস্তাব সে প্রত্যাশা করেনি।

ও কোন উত্তর দেবার আগেই মালা আবার বলেছিল,—অবিশ্যি তোমার যদি কোন অসুবিধে না হয়।

মালা যতটা সম্ভব সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করছিল, শুধু গলাটা ওর সামান্য কাঁপছিল।

দীপু একটু সময় ভেবে আস্তে আস্তে বলেছিল,—না, অসুবিধে আর কি! তবে লোকে কি বলবে? ডাক্তার কি ভাববে?

ডাক্তারের কথাটা ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেছিল দীপু। ভেবেছিল, মালার ওই দুর্বল জায়গাটায় ঘা দিয়ে কথা বললে হয়তো আপাতত কথাটা চাপা পড়তে পারে।

তা হোল না। মালা যেন আর একটু জোর পেয়ে গেল মনে হোল। —তুমি ঠিকই বলেছ, আমিও এ কথাটা ভাবছিলাম। নাগের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে!

—কথা হয়েছে! কি কথা হয়েছে!

ধীরে ধীরে বলল মালা,—নাগ বলছিল, সামনের সোমবার তুমি যদি এখানে এগারোটা নাগাদ আস, তবে রেজিস্ট্রির একটা কথাবার্তা বলে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে আর কারো কিছু বলবার থাকবে না।

—সামনের সোমবার?

—হ্যাঁ, ঠিক এসো কিন্তু এগারোটায়।

দীপুকে আর হ্যাঁ না কিছু বলবার অবসরই দেয়নি মালা। মালা যাই বলুক না, যাই স্থির করুক না কেন, দীপুকে একবার ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। নিজের কাছে নিজেকে জেনে নিতে হবে সে মালাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত কিনা।

পরশু সোমবার। আজ রাত্রে ভেবে ভেবে কোনমতেই এ ব্যাপারে সে মন থেকে কোন সায় পাচ্ছে না।

আজ বলে নয়, বরাবরই নারীদেহের প্রতি ওর অহেতুক কোন আকর্ষণ নেই, ভীষণ লালসার জ্বালা সে কখনো অনুভব করেনি। কামোত্তেজনার উত্তাপ কখনো ওর স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারেনি। একটা স্বাভাবিক স্মৃতি তাকে সব সময় কিছুটা নির্লিপ্ত করে রেখেছে। আজকের দিনেও মালার মত একটি রূপসী মেয়েকে হাতের কাছে পেয়েও তার দেহভোগের জন্যে কখনো দীপু অধীর হয়ে ওঠেনি। কারো জন্যেই নয়। লতুর জন্যেও সে কখনো কোন তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত না।

তাই আজও মালার দেহের স্তব্ধ গম্ভীর যৌবনের কোন আকর্ষণ ও মনে অনুভব করতে পারল না। শুধু একটা নিবিড় মমতা অনুভব করল। এই বিনম্র মমতা ওর মনকে বহু সময় দুর্বল করে ফেলেছে। একে যদি দুর্বলতা বলা যায়, তবে এ দুর্বলতা ওর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মমতায় ভরা মায়ের বড় বড় চোখদুটি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে দীপুর। ওর স্বভাবের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য একেবারে মায়ের মত।

না। মালার কথায় রাজি হওয়া কোন মতেই ঠিক হবে না। মালা নিজেও ঠকবে। তাকে নিজের রূপযৌবনের আকর্ষণের জালে আবদ্ধ করে রাখতে তো পারবেই না, তার ওপর দীপুর আজকের ভাব-ভাবনার সঙ্গে মালা একেবারে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। মালা শেষপর্যন্ত ঠকবে। দীপুকে পাওয়া মানে বেশী কিছু পাওয়া নয়। এটা যখন বুঝতে পারবে, তখন হয়তো আক্ষেপে আরও বিকৃত হয়ে উঠবে।

মালার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পুরুষ সূর্য নাগ।

অনেক ভাবনার পর এ কথা ও নিশ্চয় বুঝতে পারছে, সূর্য নাগ মালাকে ভালবাসে। মালা সেটা জেনেও জানতে চায় না। মালা আরও জানতে চায় না যে তারও সূর্য নাগের জন্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। ওরা বিয়ে করলে নিশ্চয় সুখী হবে।

দীপু কি করবে এখন? কলকাতা থেকে বাইরে চলে গেলে কেমন হয়? এই পরিবেশ এই কোলাহল, মত্ততা আর ভাল লাগছে না। কালই যদি বাইরে কোথাও চলে যেতে পারে ও। পরশু সোমবার মালার কাছে যাবার কোন দায় থাকবে না। আর মালা যখন শুনবে যে সে বাইরে চলে গেছে, তখন নিশ্চয় তার মনোভাবটা বুঝতে পেরে সূর্য নাগের দিকেই এগোবে।

তার পক্ষে এখন এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল।

বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। ইজিচেয়ার থেকে উঠে জানলার কাচ বন্ধ করে এবারে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

একটু সময়ের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

।। পনেরো ।।

গোধুলিয়ার কাছে হোটেল থেকে হয় সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসত, নয়তো একটা রিক্‌শা নিয়ে দক্ষিণে অসি ঘাটের দিকে গিয়ে গঙ্গার ওপরে পাথরের সিঁড়িতে বসে থাকত।

তখনও বারাণসীতে চেপে শীত পড়েনি। একটা গরম চাদর মুড়ি দিয়ে গঙ্গার ধারে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতে বেশ ভাল লাগত। মাত্র কয়েকদিনে দীপু ওর নিজের ভেতরে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। প্রায় নির্জন গঙ্গাতীরে বসে মনের একটা বাসনা ধীরে ধীরে ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সিঁড়িতে বসে চোখে পড়ে গঙ্গা অনেক নীচে। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে অনেক নীচে নেমে গেছে। একটানা স্রোত চলেছে উত্তরদিকে। কিছু কিছু নৌকো কখনো উজানে কখনো স্রোতের অনুকূলে বয়ে চলেছে। নৌকোর ওপর নানা ধরনের মানুষ। সন্ধ্যায় গঙ্গার ওপরে নৌকোও বেড়াতে বেরোয়। ক্রমে সন্ধ্যা উতরে যায়। নৌকো-গুলো ঘাটে ঘাটে বাঁধা পড়ে। অন্ধকার গঙ্গার বুক নির্জন হয়ে আসে। ঝুরঝুরে ঠাণ্ডা বাতাসে চুপচাপ একা একা বসে থাকে দীপু।

ক'দিন হোল বারাণসীতে এসে ওর মনের চাপা কতকগুলো বাসনাকে ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আর বেশ বুঝতে পারছে, এ বাসনা তার কাছে কিছুকাল অস্পষ্ট ছিল। সেইজন্যেই বোধহয় চাপা কুন্ঠা এনে অবসাদ বিষাদ তাকে চেপে ধরেছিল। যেমন চলছে তেমনি চলুক—এমনি একটা গাছাড়া ভাব নিয়ে সে দিন কাটাচ্ছিল।

মালাকে ও কেন তেমন একান্ত করে চাইতে পারল না। কেন ঘর-সংসারের আকর্ষণ তাকে তেমন করে টানল না। তার কারণটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। চাকরি করা ওর আর চলবে না। না, চাকরি নয়, সংসারের কোন বন্ধ কামরাতে নয়। ও কিছু কাজ করতে চায়, যে কাজ ওকে বন্ধ পশুর মত আয়াসে বন্দীশালায় সঙ্কুচিত করে তুলবে না।

ও ভেবেছিল। অনেক ভেবেছিল মানুষের কথা, কিন্তু কিছু করবার মত সুযোগ পায়নি বলে একটা আক্ষেপে কোন মতে দিন কাটাচ্ছিল। এখন বুঝতে পারছে, সুযোগ আসার অপেক্ষায় থাকার চেয়ে বোকামি আর নেই। সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে হয়। নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যটা জানতে পারলে সুযোগের জন্যে হাহুতাশ করতে হয় না।

অনেকের জন্যে বাঁচার নাম জীবন। শুধু নিজের জন্যে বাঁচার নাম মৃত্যু। ওর নিজের বহুদিনের ভাবনাটা যেন আলোর অক্ষরে দেখতে পেল দীপু।

গঙ্গার ওপারে ধু ধু বালির চড়া। গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয়, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ নেই, ঠাণ্ডা শীতল শান্ত, অথচ অব্যর্থ গতিতে উত্তরে বয়ে চলেছে। অবিরাম একটানা বয়ে চলেছে। গঙ্গা অবসন্ন হয় না, বাতাস অবসন্ন হয়। সূর্য অবসন্ন হয় না, প্রাণও কখনো বিষণ্ণ নয়, অবসন্ন নয়।

বারাণসীর নির্জন গঙ্গাতীরে বসে দীপু নিজের অক্লান্ত শান্ত প্রাণশক্তির সাক্ষাৎ পেল। এ প্রাণশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে যে একক বলে ভাবতে চায়, অনেক প্রাণের স্পর্শ থেকে সত্তার বাঁচিয়ে নিয়ে চলতে চায়, তারই যন্ত্রণা, তারই নিঃসঙ্গ বিকার। নিঃসঙ্গ কিছুই নেই। এক সুবিপুল প্রাণ-শক্তির একটি সামান্যতম বিন্দুর মত একটি মানুষ কি করে নিজেকে একা ভাবতে পারে। এ বিশাল প্রাণের সঙ্গে তার কিন্তুটিও অচ্ছেদ্যভাবে এক হয়ে আছে। তাই প্রাণের স্বভাব বহু প্রাণের স্পর্শে আনন্দের ভাগ গ্রহণ করা। বর্জন নয়, গুটিয়ে নেয়া নয়, ছড়িয়ে দেয়া।

দীপু নিজেকে বিস্তৃত করে ধরবে, তার হৃদয়কে পেতে ধরবে বহু জনের ভালবাসা পাবার জন্যে।

না, চাকরি আর নয়, ঘর আর নয়। বাইরে বহু মানুষের ভেতরে তার দিনরাতের মুহূর্তগুলো ছড়িয়ে দেবে। বন্ধ বিশ্বাস আর বন্দীশালা থেকে মুক্তি যদি কোথাও থাকে,

তবে সেইখানে। মাঠে ঘাটে অসহায় আর্ত কোটি কোটি মানুষের ভেতরেই মুক্তির মন্ত্র লুকিয়ে আছে।

মালার ফরসা নরম দেহটি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরিষ্কার নিটোল গ্রীবা, দুটি সুডোল নরম স্তন, সুকোঠিত জঙ্ঘা, গুরু নিতম্ব, মাংসপেশী চর্বি রক্তের একটি প্রতিমা। এই দেহটি জীবনের একমাত্র কাম্য হতে পারে না। না, না, কখনোই নয়। জীবন এত ছোট নয়, এত সঙ্কীর্ণ নয়।

মন? মালার মনের অশেষ বাসনা, দগদগে লালসা, আগ্রাসী কামনা, নিজের সুখের জন্যে সুতীব্র জ্বালা—যাকে ও ভালবাসা নাম দিয়েছে—না, না, না, কখনোই তা জীবনের শেষ হতে পারে না। ওই এক বিন্দু মনের অন্ধকার ভাপসা গহ্বরে জীবনের স্বাদ নেই। থাকতে পারে না।

বারাণসীর গঙ্গার বাতাসের তরঙ্গে ওর মনের এক একটি করে ভাবনা স্তরে আপনা-আপনি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। জীবনরহস্য তার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

টান-টান হয়ে বসে আছে পাথরের সিঁড়ির ওপর।

আজকের এই রাত্রি তার কাছে জীবনের আশ্চর্য বার্তা বয়ে এনেছে। বড় ভয়ঙ্কর আনন্দের রাত। দীপুর মনে আর কোন গ্লানি নেই। না, ক্ষোভ আর নেই। প্রাণের অফুরন্ত শক্তির সন্ধান আজ পেয়েছে ও। এই সন্ধানে এতকাল সে শুধু বসে বসে ভেবেছে—শুধু ভেবেছে।

আর ভাবনা নয়। এবার কাজের সময় এসে গেছে। আর যে ক'টা বছর বাঁচবে, এই শক্তিকে সে আর আচ্ছন্ন হতে দেবে না। অবসন্ন হতে দেবে না।

বিষণ্ণ হতাশা প্রাণের ধর্ম নয়। এক বিপরীত বিকার মাত্র। এই রহস্য আজ তার কাছে ধরা পড়েছে।

আজ আর সামান্যতম দুর্বলতাও তার নেই। এক বিন্দু অবসাদ নেই। বিষণ্ণ যন্ত্রণা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল দীপু। সোজা হয়ে দাঁড়াল পাথরের সিঁড়ির ধাপের ওপর। ওপরে বিস্তীর্ণ আকাশ আর নীচে গঙ্গার স্রোত। চোখ মেলে তাকাল দীপু। মনে হোল, এসব আমার। এ আকাশ আমার। এ গঙ্গা আমার। এই সুবিপুল সংসার একান্ত আমার। আমি ভালবাসি। এই সমগ্র সংসারে প্রতিটি কণায় আমার ভালবাসা।

দীপুর দেহ রোমাঞ্চিত হোল। একি অভূতপূর্ব অনুভূতি! অসহ্য ভয়ঙ্কর অনুভূতি। প্রগাঢ় মধুর নিবিড় মমতার অনুভূতি।

দীপু ধীরে ধীরে ফিরে চলল হোটেলের দিকে। মনে মনে স্থির করে নিল, এখানেই ও আরও কিছুকাল কাটাবে, তারপর নিজের ভবিষ্যতের কাজের নির্দিষ্ট একটা ছক তৈরী করে কাজ শুরু করবে। বহুদিনের স্থির পরে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে মনটা তাজা হয়ে ওঠে, তেমনি তাজা মন নিয়ে হোটেলে ফিরে এল দীপু।

হোটেলের দোতলায় উঠে ও যেন একটা ধাক্কা খেল। সামান্য বিস্ময় নয়, তবু মনের সতেজ ভাবের কাছে এ বিস্ময়কে খুব বড় বলে মনে হোল না। এমনি একটা কিছু ও যে ঠিক আশা করেছিল, তা নয়। তবু সূর্য নাগের এমন আকস্মিক উপস্থিতিটা ওকে খুব বেশী বিচলিত করতে পারল না।

ওর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে অপরিসর বারান্দায় সূর্য নাগকেই ও দেখল। চোখের ভুল নয়। সূর্য নাগ সশরীরে পায়চারী করছে, তাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

সূর্য নাগের কিছু বলবার আগেই দীপু হেসে বলল,—কি খবর ডাক্তার, এখানে?

নাগের মুখটা গম্ভীর, কিছুটা উত্তেজিত, মুখখানা আরক্তিম।

আস্তে আস্তে বলল,—আপনার খোঁজে।

দীপু শান্তভাবে দরজার তালা খুলে বলল,—আসুন। ভেতরে আসুন।

দীপু চৌকির ওপর বসে চেয়ারটা দেখিয়ে নাগকে বলল,—বসুন।

নাগ চেয়ারে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। ভুরু কুঁচকে বলল,—আচ্ছা মানুষ আপনি!

হাসল দীপু। —কেন, কি হোল?

—আপনি আবার হাসছেন! কি রকম লোক মশাই আপনি। একটা কথার ঠিক নেই?

দীপু তবুও হাসল। নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—কখন এলেন?

সূর্য নাগ রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠল,—আর কখন এলেন! আপনার জন্যে সোমবার থেকে অপেক্ষা করে করে হয়রান। তারপর আপনার অফিসে দৌড়োই। তারা কিছু জানে না। বাড়িতে ছুটি, সেখানে আপনার একটা পাত্তা যদিবা পাওয়া গেল, তারা আপনার ঠিকানা জানে না। গতকাল আবার আপনার বাড়িতে খোঁজ করে শুনলাম, একটা পৌঁছ সংবাদ দিয়েছেন। তাতে ঠিকানা আছে। সেই ঠিকানা নিয়ে তখুনি স্টেশন। রেলে চড়ে সোজা এই আপনার কাছে। কি ব্যাপার বলুন তো। একটা দায়িত্ব বলে কথা আছে!

দীপু অল্প অল্প হাসে। বলে,—কিসের দায়িত্ব? কার দায়িত্ব!

—আপনি হাসালেন মশাই। আমার অবস্থাটা যদি বুঝতেন। মিস দত্ত তো খাওয়া ঘুম ত্যাগ করলেন। আবার আমাকে সন্দেহ করে বসলেন। আমিই আপনাকে গায়েব করেছি। কি বিপদ বুঝুন। আমার কাছে কেঁদেই ফেললেন। বলেন, তাঁর বাবা, তাঁর দাদারা থেকে আরম্ভ করে সবাই নাকি চিরকাল ষড়যন্ত্র করে আপনাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। তার মানে আমিও সেই দলের। কি ভীষণ বিপদেই আমায় ফেলেছিলেন মশাই! মিস দত্তও যেমন অবুঝ, আপনারও মাথায় ছিট আছে। দুজনে মিলবে ভাল। নিন, বুঝেপড়ে নিন মশাই, আমাকে রেহাই দিন।

সূর্য নাগ বিরক্তি রাগ আর চাপতে পারল না। কি করেই বা পারবে। দীপু বুঝল মালা নিশ্চয় তাকে এ ক'দিন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। অন্য একটি মানুষের জন্যে মালা তাকে এত বেশী ব্যস্ত বিরক্ত করে তুলবে এটা সে একেবারে পছন্দ করেনি, বরং কিছুটা অসহ্য মনে হয়েছে তার কাছে। সূর্য নাগ বিরক্ত হয়েছে, রেগেছে, কিন্তু তার ওপর নয়, মালার ওপর।

দীপু বলল,—বসুন, একটু জিরোন। চা দিতে বলি।

—তার আগে আপনি একটা কথা খুলে বলুন তো, হঠাৎ এখানে চলে এলেন কেন?

দীপুর চোখের দৃষ্টি গভীর হোল। বলল,—সত্যি বললে বলতে হয়, আপনাদের রেহাই দেবার জন্যে।

সূর্য নাগ অবাক হয়ে তাকাল। সিগারেটে দুটো টান দিয়ে একটু সময় নিল। তারপর আস্তে বলল,—আমাদের মানে?

দীপু অল্প একটু হাসল, —অবাক হবেন না ডাক্তার। রাগ করবেন না। লজ্জাও এতে কিছু নেই, আমি জানি, আপনি মালাকে ভালবাসেন আর মালাও সেটা জানে।

সূর্য নাগের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে দীপুর দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

আস্তে বলল দীপু,—তাই আমি চাই। আপনি মালাকে বিয়ে করুন। আপনারা সুখী হবেন।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সূর্য নাগ বলল,—আপনি কি তামাসা করছেন?

—এ কথা আপনার মনে হোল কেন?

—আপনি কি মিস দত্তকে জানেন না। আপনি নিজেই তো জানেন, আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব।

দীপু চুপ করে রইল একটু সময়। সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারল না।

আর একটা সিগারেট ধরাল সূর্য নাগ। —তাছাড়া আমি সামনের মাসে বিলেত চলে যাচ্ছি। সব ঠিক করে ফেলেছি।

সূর্য নাগের মুখের কালিমা এবারে স্পষ্ট দেখতে পেল দীপু।

সিগারেটে আরও দুটো টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাগ। আস্তে আস্তে বলল,—আমরা এই হোটেলেই ঘর নিয়েছি। যান ওই কোণের ঘরটায় মিস দত্ত শুয়ে আছেন। ট্রেনে এসে তার মাথা ঘুরছে। আপনি যান ও ঘরে।

—আপনিও চলুন।

গম্ভীর স্বরে বলল সূর্য নাগ।—আমি আজ রাত্তিরের কোন ট্রেনে ফিরে যাব কলকাতায়।

দীপু স্পষ্ট বলল এবার,—মালাকে যদি আমি রাজী করাতে পারি তবে আপনার তো কোন অমত থাকবে না।

—মিথ্যে কেন এসব কথা বলছেন। যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই।

—আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। আমি আসছি।
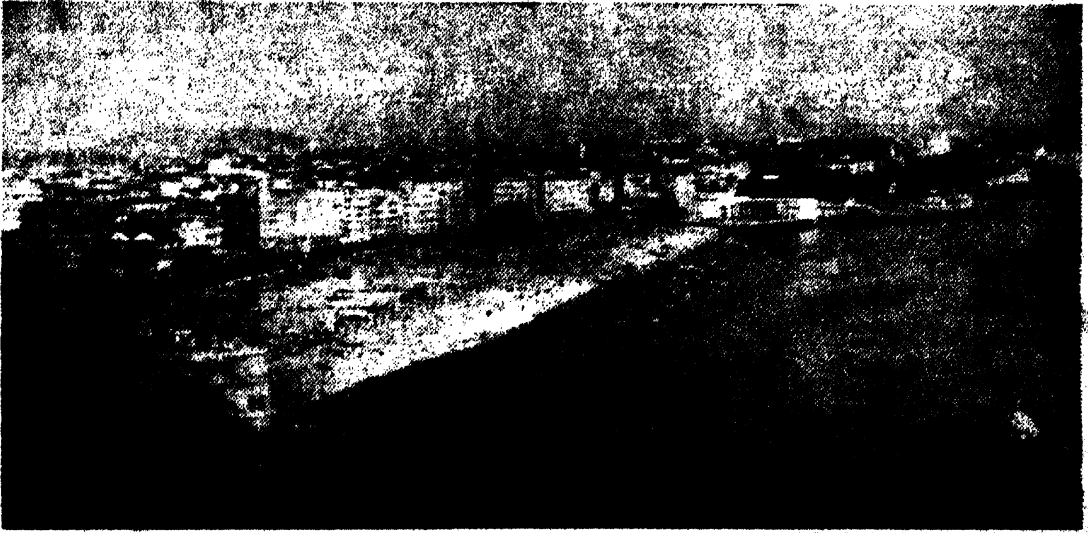
মালাবার হিল থেকে মেরিন ড্রাইভ   ফটো : কৃষ্ণ ঘোষ

দীপু ঘরে থেকে বেরিয়ে বারান্দাটার শেষপ্রান্তের ঘরের দরজাটা খুলল।

মালা শুয়ে ছিল না। চেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

দীপু ঘরে ঢুকতে মালা তাকাল। কিন্তু কোন কথা বলল না। বসে একটা কম্পন অনুভব করছিল। ঠোঁটদুটো কাঁপছিল, হাতের আঙুল কাঁপছিল। আবার বাইরের দিকে তাকাল মালা।

দীপু শান্তভাবে চৌকির ওপর বসল। দেখল হোল্ডঅলটা শুধু খোলা হয়েছে চৌকির ওপর। স্যুটকেশ, জলের বোতল, ফ্লাকস্ সব পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। কিছুই এখনো খোলা হয়নি। মালার মুখে গাঢ় বিষন্ন ক্লান্তি।

একটু সময় চুপ করে রইল দীপু। বুঝতে পারল মালা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। ওর পরিষ্কার মসৃণ কপালে দু-চার গাছি রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে। মুখের রেখায় দেহের ভঙ্গীতে ভাবসাযুল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওকে একটু সময় দেয়া দরকার।

আরও একটু সময় চৌকির ওপর তাকিয়ে রইল দীপু। তারপর আস্তে বলল,—ডাক্তারকে নিয়ে চলে এসেছ?

মালা কোন কথা বলল না। মুখটা আরও একটু ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

দীপু আবার বলল,—ভালই করেছ।

এবারেও মালা নীরব।

আবার বলল,—আমি ভেবেছিলাম, আমার চলে আসাতেই তুমি বুঝবে, তুমি যা বোলছ তা মেনে নেয়া আমার পক্ষে কঠিন।

মালা মুখ ফিরিয়েই রইল। তাকাল না, কথা বলল না।

দীপুর কাছে মালার এই সুতীব্র অভিমান অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হোল। একটুও বিরক্ত হোল না। অস্থির হোল না। মালাকে কথাটা জানাতেই হবে, তাই শুধু জানানটাই তার কাজ।

—আমি ভেবে দেখলাম—

একটু থেমে আবার বলল,—আমি অনেক ভেবে দেখলাম, ডাক্তার তোমাকে সুখী করতে পারবে।

মালা ফিরে তাকাল।

দীপু জানত, মালা এবারে ফিরে না তাকিয়ে পারবে না।

চোখদুটো ওর সামান্য রক্তিম জোলো থমথমে।

কথা বলতে গিয়ে গলাটা কাঁপল মালার।—তার মানে, কি বলতে চাও তুমি?

—বলছিলাম, সূর্য নাগ তোমাকে ভালবাসে।

চাপা গর্জনের মত শোনাল মালার গলা,—তাতে আমার কি? তুমি এত নীচ, তুমি এত ছোট!

দীপু শান্ত চোখ দুটো তুলে তাকাল। ইতর ছোটলোক শুনে একদা যে ভুল দীপু করেছিল। আজ নীচ ছোট শুনে আরও একবার সে ভুল করল না। ভুল করবার কোন কারণ ছিল না। মন আজ তার পরিষ্কার স্বচ্ছ, দৃঢ়।

শান্ত স্বরে বলল,—তোমার ওই নরম দুখানা হাতে আমাকে তো তুমি বাঁধতে পারবে না।

মালার চোখ দুটো ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছিল।

—তোমার ওই ছোট ঘরে আমাকে কতটুকু সুখ দিতে পার মালা? আমার পথ যে বাইরে।

মালার মুখের রেখাগুলো নরম হয়ে এল। চোখ দুটো থেকে টপ-টপ করে কয়েক ফোটা জল পড়ল মসৃণ গালের ওপর। ধরা গলায় বলল,—জানি। কিন্তু তুমি কি জান না, তোমার পথই আমার পথ।

দীপু শুধু বলল, — এসব শুধু আবেগের কথা নয় মালা। তুমি কি পারবে তোমার সব কিছু ছেড়ে আমার সঙ্গে কোন গাঁয়ে চলে যেতে। তুমি কি পারবে প্রত্যেকটি মানুষকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে?

মালা শান্ত হয়ে এল। বলল,—কেন পারব না। তুমি পারলে আমিও পারব। তুমি আমাকে শিখিয়ে নেবে। তোমার কি মনে নেই, একদিন বাবার সব সম্পত্তি ছেড়ে তোমার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম?

দীপু একটু ভাবল। অল্প হেসে বলল, — সেটা হয়তো অল্প বয়সের রোমান্টিক ঝোঁকে একটা কিছু করে বসেছিলে। কিন্তু তুমি জান না, সত্যি-সত্যি সব ছেড়ে আসা বড় কঠিন। তুমি আজ আমাকে চাইছ কিন্তু আমি যদি আমার নিজের বলতে কিছুই না রাখি। আমাকে তো তুমি পাবে না?

মালা বলল,—পাব। তুমি যদি নিজেকে এত বড় করে সংসারে বিলিয়ে দাও। সংসারের সকলের সুখ নিজের বলে ভাব, সকলের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে ভাব, আমিও নিজেকে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে আরও বড় করে পাব। সকলের ভেতরে তোমাকে পাব।

দীপু এবার অবাক হয়ে তাকাল মালার দিকে। এ ধরনের কথা মালার মুখে শুনবে বলে ও কল্পনা করতে পারে নি। মালাকে বুঝতে আবার তার ভুল হয়েছিল। মনে-মনে স্বীকার না করে আর উপায় রইল না।

শুধু বুঝতে পারল না। কিসের জোরে মালা নিজেকে এমন অক্লেশে তার ভাবনায় নিজের ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারে? মালার সত্যিকারের অস্তিত্বটা কোথায়, প্রাণশক্তির মূল কোথায়? এ রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে দীপুর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ এক আনন্দের স্বাদ।

শেষ

গ্রামীণা

বিশ্ব গ্রামমহিলা সম্মেলনের নেত্রী ভারতীয়

বিশ্বের [illegible] গ্রামমহিলা তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে গত মে মাসে [illegible] মিলিত হন। সম্মেলনের চেয়ারম্যান ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড কান্ট্রি উইমেন অব দি ওয়ার্লড-এর প্রেসিডেন্ট কলকাতার শ্রীমতী আরতি দত্ত।

এই বিশ্ব মহিলা সংস্থার অধীনস্থ [illegible] ৬০ লক্ষ মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধিরা নেপাল, ক্যামেরুন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইটালীতে কাজের বিবরণ পেশ করেন।

গ্রামমহিলাদের জন্য এই একমাত্র বিশ্ব সংস্থার পাঁচটি মহাদেশের ও ৪৯ দেশের সদস্য রয়েছেন। উন্নত গ্রামীণ পরিবেশ ও উন্নততর গৃহের জন্য এই সংস্থা কাজ করে এবং সবসময়ে খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিশুযত্ন প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে মহিলাদের মতামত রাষ্ট্রসংঘের সামনে তুলে ধরে। সর্বোপরি এই সংস্থা সকল স্তরে সমঝোতা ও মৈত্রী গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। শ্রীমতী দত্ত ও এ-সি-ডবলু-ডবলু-এর অন্যান্য অফিসাররা সব সময় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বহু দেশের সদস্যাদের সঙ্গে দেখা করছেন।

সম্মেলনে শ্রীমতী দত্ত তাঁর সাম্প্রতিক নেপাল সফরের কথা বলেন। তিনি বলেন সেখানে তাঁদের সংস্থা বয়স্ক মহিলাদের সাক্ষর করে তুলছেন। বর্তমানে সেখানে শতকরা ৯৭ জনই নিরক্ষর। কিন্তু একবার যদি মায়েদের লিখতে পড়তে শিখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানরা আপনা-আপনি সাক্ষর হয়ে উঠবে। অন্যান্য সামাজিক সংস্কারও অনিবার্যভাবে আসবে।

শ্রীমতী দত্ত বলেন, আফ্রিকান, বৃটিশ ও ফরাসী সংস্কৃতির সমন্বয় ও প্রায় ৪০০ উপজাতি ভাষার অন্তরায় সত্ত্বেও ক্যামেরুনে প্রবল অগ্রগতি হয়েছে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা স্থানীয় মহিলা সংস্থায় যোগ দিতে সমুৎসুক। আধুনিক শিশু-যত্ন ও রন্ধন পদ্ধতি শিখতে তারা খুবই আগ্রহী।

কুয়ালালামপুরের সে কামিশরা সিংহলে ভ্রাম্যমাণ ইউনিটের কাজ বর্ণনা করেন। প্রায় প্রতিদিন ঐ ইউনিট একটি করে গ্রাম সফর করে স্বাস্থ্য, শিশুযত্ন, পুষ্টি ইত্যাদির তদারকির উদ্দেশে। এক বছরে ২০০টিরও বেশি সমিতি পরিদর্শন করা হয় এবং ১০,০০০ এরও বেশি গ্রামবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

মিস অ্যালিস স্টুয়ার্ট (মেলবোর্ন) জানান আইল্যান্ড নিউইতে একটি বাজার স্থাপন করতে নিউজিল্যান্ডের কান্ট্রি গার্লস ক্লাবগুলি ২,০০০ পাউন্ড তোলেন। এই দ্বীপে মাসে একবার করে নৌকো ভেড়ে। এখন এই বাজারটি স্থাপিত হওয়ায় সেখানকার মেয়েরা তাঁদের তৈরী জিনিস বেচতে পারেন।

সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় এ-সি-ডবলু-ডবলু-এর ১৫তম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ট ল্যানসিং-এ।

স্ত্রীর মূল্য?

স্ত্রীর মূল্য কতো? যাঁরা তাকে মূল্যহীন বলেন অথবা যাঁরা তাকে অমূল্য মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমেরিকানরা একমত হবেন না, কারণ তাঁদের দেশে সম্প্রতি তাঁরা গড়পড়তা স্ত্রীর ডলারে একটা মূল্যায়ন করেছেন। আমেরিকায় একজন সাধারণ স্ত্রীর দাম বছরে ৮৩০০ ডলার। স্ত্রী সংসারে যে বারো রকমের কাজ করে থাকেন তার মজুরী হিসেব করেই এই মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। অবশ্য যাঁর স্বামী রাষ্ট্রদূত তাঁর দাম আরো বেশী, যদিও সপ্তাহে তিনি কাজ করেন মাত্র ১২-২ ঘণ্টা। সমীক্ষার হিসেবে তাঁর মূল্য ৮৭০০ ডলার, বাড়তি সম্মান অতিথিসেবিকা হিসেবে তাঁর বিশেষ ভূমিকার জন্য। আমেরিকার সবচেয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিতা কূটনৈতিক পরামর্শদাতার স্ত্রী। অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর মজুরী ঘণ্টায় ২-১৫ ডলার, কাজ করেন সপ্তাহে ১৪-৫ ঘণ্টা, মজুরী বছরে ৮০০০ ডলার। ডিশ ধোয়া, কাপড়কাচা, সেলাই প্রভৃতি তিনি করেন না, কাজেই সে বাবদ তাঁর কোনো প্রাপ্য নেই, প্রাপ্যবৃদ্ধিরও পথ নেই।

সুগন্ধীর সঠিক ব্যবহার-রীতি

নারী প্রকৃতির প্রতিরূপ। আর বসন্ত চিরন্তন। চিরযৌবনা প্রকৃতি যুগে যুগে কত শত এমন বসন্তে নব নব রূপে বিকশিতা। কবে কোন আদি মধুমাসে তরুণী ধরার প্রকৃতি কোন খেয়ালে তার পুষ্পরাজির সাজি সাজিয়েছিল কাকে উপহার দিতে কে জানে।

'সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল
চকিত চামেলী,
স্মিত শুভ্রমুখী
তরুণ রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক
উন্মীলিতা
একান্ত কৌতুকী—'

এই সব সুবাসিত পুষ্পের গন্ধে আমোদিত সুমন্দ পবনের আমন্ত্রণে মধুপ আসে, আসে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি—এরা ফুলের রেণু আর পুষ্পপরাগের সলজ্জ মালাবদলে ফুলবালার রূপযৌবন সার্থক করে তোলে।

ফুল আপন গন্ধে আপনি বিকশিত। কস্তুরী-মৃগও আপন গন্ধে আপনি পাগল হয়ে বনে বনে ফেরে। সুগন্ধের [illegible] এতই তীব্র যে অতীতে ব্যবহৃত সুগন্ধির শূন্য আধারও বহু পূর্বস্মৃতি বহন করে আনে। আনে নাকি! সুতরাং মধুগন্ধে ভরা সুবাসিত একটি [illegible] আপন বৈশিষ্ট্যে অনুরূপ স্থায়ী সুরভিত স্মৃতিতে পর্যবসিত হতে পারে। এর জন্য চাই সুগন্ধসারের সঠিক ব্যবহার।

সেকালের সুন্দরীরা যেমন [illegible] কালের [illegible] ধূপের ধোঁয়া দিয়ে কেশ সুরভিত করতেন, এ যুগের আমরাও ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে অনায়াসে আমাদের বেশবাস সুরভিত করতে পারি।

গরমের সময় ঘামের চোটে তো অতিষ্ঠ হতে হয়। তার জন্য কাপড়চোপড়ে দুর্গন্ধ হয়। আর বর্ষায় এমনিই সোঁদা গন্ধ হয়। এই সময়ে হাল্কা রং-এর ছাপা শাড়ী, টাঙ্গাইল প্রশস্ত। সারাদিন ধরে একটি শাড়ী পরেই তো বাইরের কাজ সামাল দিতে হবে! ট্যালকম পাউডারের গন্ধ তা যত দামীই হোক স্থায়ী হয় না। অথচ একটি স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ যদি শরীর ঘিরে জড়িয়ে থাকে তো নিজেকেও বেশ উৎফুল্ল মনে হয় আর কাছাকাছি যাঁরা আসেন তাঁদেরও উল্লসিত করে। এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করে দেখুন। অমনি স্বাচ্ছন্দ্যই পাবেন।

ভালো ধুনোর সঙ্গে খানিকটা চন্দনের গুঁড়ো মেশান, একটু গুগ্গুল আর খসখসও এ সঙ্গে দিন। বড় মাটির ধুনুচিতে কাঠকয়লায় আঁচ করুন, তার মধ্যে ঐ মিশ্রিত পদার্থটি একটু একটু করে ছড়িয়ে দিন। যে কাপড়টি আপনি একটু পরেই পরে সান্ধ্যভ্রমণে বা দিনের কাজে যাবেন, সেটিকে আলগাভাবে কুঁচিয়ে বেশ ফুলিয়ে ঘাগরার মত করুন। ঐ ধুনুচির ওপরে একটি দড়ির চারপাই বা বড় বড় ফুটোর বেতের মোড়া রাখুন। মোড়ার ভেতরে থাকবে ধুনুচি কিম্বা চারপাইয়ের নীচে। এবার ঐ মোড়া বা চারপাইয়ের ওপরে ঐ কাপড়টি অমনি ঘাগরার ধরণে গোল করে ফুলিয়ে সাজিয়ে দিন। অন্তর্বাস, ব্লাউজ, পেটিকোটও মোড়া ঘিরে সাজিয়ে দিন বা চারপাইএর ওপরে রাখুন। বেশী নয়, মিনিট দশেক হলেই যথেষ্ট। তারপর তুলে নিয়ে ব্যবহার করুন। [illegible] করবেন যাতে পুরো ধোঁয়াটি কাপড়ে লাগে। এর ফলে বস্ত্রও সুরভিত হবে। মশার হাত থেকেও রেহাই মিলবে। আর সারাদিন ধরে আপনি প্রফুল্ল চিত্তে এই সুগন্ধের রেশ বয়ে বেড়াবেন।

অতীতে—লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখ বালা—লোধ্র ফুল কেমন দেখতে বা কোথায় ফোটে তাও জানি না। আমরা তার বদলে পাউডার মাখি। ঘামের চোটে সেই পাউডার গলে গিয়ে মন্দাকিনীর দুধস্নাদা ধারা হয়। তখন আরও কুশ্রী হয়ে ওঠে মুখখানি। তার চেয়ে এই গরমে ফেস পাউডার সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে একটু ট্যালকম পাউডারের সঙ্গে চন্দনের গুঁড়ো মিশিয়ে হালকা করে মাখলে মুখখানি পেলব থাকবে। ব্রোটা ব্রণ বা ঘামাচির হাত থেকেও এই চন্দনের গুঁড়ো মুখখানিকে রক্ষা করবে। চন্দন ঘষে সারা মুখে মেখে শুকিয়ে নিয়ে টান ধরলে ঘষে তুলে দিতে পারলে খুব ভালো ফেসপ্যাকের কাজও করে। আর চন্দনের গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। শুধু মুখে ট্যালকম পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে ঐ চন্দনের গুঁড়ো গায়েও মাখতে পারেন।

মাথায় ফুল পরা বড় সুন্দর অভ্যাস। এতে কবরীর শোভা তো বাড়েই তাছাড়া পুষ্পের সুরভিতে নিজের সঙ্গে অন্যকেও আনন্দিত করা যায়। ঘামে ভিজে চুলে বিশ্রী গন্ধ হয়। এমনিও নারকেল তেলের মিঠে গন্ধ মোটেই সুখদায়ক নয়। আবার চাকুরীজীবী মেয়েদের সব সময় সব জায়গায় মাথায় ফুল সাজিয়ে যাওয়াটাও শোভন নয়। এক্ষেত্রে তীব্র গন্ধের ফুল বেছে নিন। যেমন চাঁপা, গন্ধরাজ বা গোলাপ কিম্বা যুঁই। ঠিক কাজে বেরুবার আগে চুল বাঁধা পর্ব সারা হলে মাদ্রাজীরা যেভাবে ফুল পরে অমনি প্রথায় একটু চুল তুলে নিয়ে তার ভেতরে একটি দুটি চাঁপা, গন্ধরাজ বা গোলাপ কিম্বা একগোছা যুঁই ঢুকিয়ে দিন। ফুল দেখা যাবে না। অথচ গন্ধ ছড়াবে। আবার আপনার চুলগুলিকেও সুরভিত করে রাখবে।

সেন্ট বা ল্যাভেন্ডার সাধারণত আমরা ব্যবহার করি কাপড়ের ওপরে বা রুমালে। কিন্তু গন্ধসার ব্যবহারের রীতি তা নয়। লক্ষ্য করে থাকবেন হয়তো কেউ কেউ ড্রয়িংরুম সাজান এক ধরনের পরোক্ষ আলো দিয়ে। আলোর ছটা আছে অথচ আলোর দেখা নেই। কিন্তু বেশ মৃদু মনোরম একটি স্নিগ্ধ আলোয় ঘরখানি ভরে আছে। ঠিক এমনি করেই সুগন্ধ আপনাকে ঘিরে থাকবে। হাতের তালু, কব্জি হাতের ভাঁজ, ঘাড়ের পেছনে হাঁটুর তলা গন্ধসার লাগানর নিয়ম। হাঁটতে চলতে দেহ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধির সুবাস ছড়াবে। বেশ একটি মৃদু মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলবে। এ ড্রয়িংরুম-এর নরম আলোর মত।

ঋতুভেদে গন্ধসার বেছে নেবার চেষ্টা করুন। শীতে ঘন গন্ধের সেন্ট মন্দ লাগে না। কিন্তু গরমে ফুল, ফলের সুবাস, মৃদু বনজঙ্গলের গন্ধ এগুলিই মন টানে না কি! তবে সত্যি কথা বলতে কি তেমন ভাল সেন্ট কোথায় আমাদের দেশে! যার এক ফোঁটা ব্যবহার করলে বহুক্ষণ সেই গন্ধের রেশ থাকবে তেমন সেন্ট বা ল্যাভেন্ডার নেই। বিদেশের বিলাস এইই বিদেশী জিনিষগুলি ভালো ছিল। কিন্তু তা যখন নেই তখন ঈর্ষান্বিতভাবে আর সতৃষ্ণনয়নে সে দেশের দিকে তাকিয়ে থেকেও তো লাভ নেই কিছু। তার চেয়ে খাঁটি দেশী জিনিষে আসক্ত হওয়াই ভালো! ভালো আতর ব্যবহার করুন, দেখবেন অনেক আনন্দ পাবেন।

যুঁই, খসখস, বেল, চামেলী আর গোলাপ—এইসব ফুলের নির্যাসের আতর পাওয়া যায় আবার মিশ্রিত সুগন্ধও আছে। গরমের দিনে খসখস-এর আতর সবচেয়ে প্রশস্ত; বেশ একটা হিমেল বাতাসের ঠাণ্ডা আমেজ এনে দেয় এই খসখস-এর আতর। ছোট্ট এক শিশি আতর আপনার অনেক দিনের চাহিদা মেটাতেও সক্ষম।

যুঁই, বেল, চামেলী বা হাস্নুহানা (রাত-কী-রাণী) এগুলির গন্ধও অপূর্ব। আতর বা ইত্তর হল আমাদের শাহী আমলের সৌখীন গন্ধসার। বেগম নূরজাহানের গোসলখানায় শ্বেতপাথরের হামামে বড় বড় গোলাপের গুলদস্তা বা ফুলের তোড়া ফেলে রাখা হত। পরের দিন সেই গোলাপগন্ধি জলে তিনি স্নান করতেন। একদিন স্নানের আগে হামাম-এর দিকে নজর পড়তে দেখেন জলের ওপর তেলের মত ভাসছে গোলাপের নির্যাস। হুকুম দিলেন এই সমস্ত জল বড় হাণ্ডায় তুলে জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে ফেলা হোক। খোদ মালেকার হুকুম! হোলও তাই। সেই দিন থেকে গোলাপের আতরের জন্ম হল। তবে গোলাপের গন্ধ শীতের সময় ভাল লাগে। ওদেশের গন্ধসারেরও এমনি কত ইতিহাস বর্তমান। ক্লিওপেট্রা থেকে এলিজাবেথ—রোম থেকে রোমাঁও, পারস্য থেকে প্যারীস খুঁজে বার করলে তামাম হদিস মিলে যাবে। আভিজাত্যের মূল্যে যে সেন্ট বা ল্যাভেণ্ডার যত পুরনো ওদেশে তার তত কদর বেশী। আমাদের আতরও শাহীতক্ত-এ বসেছে। চূড়ান্ত বিলাসের চূড়ায় অধিষ্ঠিত সম্রাট সাজাহাঁ বা বেগম নূরজাহাঁ বা তাজের শাহেনশা জাহাঙ্গীর বাদশা এঁদের অঙ্গে এককালে যার অবস্থিতি ছিল তখন তারই বা কৌলীন্য কম কোথায়!

আতর মাখতে হয় তুলো করে তুলে নিয়ে। অমনি করে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আতর মাখা তুলো ঘষে দিন, তারপর সেই তুলোটি চুলের ভেতর চালিয়ে দিন, দেখুন কেমন সুরভিত থাকবেন সারাদিন। অথচ খরচের দিক থেকে মনে হয় সেন্টের তুলনায় অনেক কমই ব্যয় হবে। এদিকে আতরের গন্ধটিও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। শুধু একটু বেছে আর দেখে কিনতে হবে। তাহলে আপনিও অমনি বাদশাজাদীর মুদু গন্ধে সেকালের বাদশার মত সুরভিতা আর মনোলোভা হয়ে উঠবেন।

যদি সব সময় একটিই গন্ধসার আপনার নিজের রুচি অনুযায়ী বেছে নেন তাহলে আপনার পরিচিত জনের সূক্ষ্ম চেতনায় ঐ গন্ধটি একটি চিরস্থায়ী আসন করে নেবে। সুগন্ধই সবচেয়ে প্রথমে মনচেতনার দ্বারে গিয়ে আঘাত হানে। ঐ বিশেষ গন্ধটি নাকে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাই আপনার বৈশিষ্ট্যে, ঐ সুগন্ধের পথ বেয়ে আপনি আপনার প্রিয়জনের মানসপটে ভেসে উঠবেন। আপনাকে তাঁর মনে পড়বেই। —আভা পাকড়াশী

সাম্প্রতিক পোষাক

পোষাকে বৈচিত্র্য

পোষাক পরিবর্তন হয় ঋতুতে ঋতুতে। দেশে দেশে চলেছে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতা। নানা প্রতিষ্ঠান নিত্য নতুন অভিনবত্বের সৃষ্টিতে ব্যস্ত। বিশেষ করে আমেরিকা ও প্যারিসে পোষাক-পরিচ্ছদ

নিয়ে যে অস্থিরতা চলেছে বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সে সম্পর্কে নানান সংবাদ পড়েছি। কিছু কিছু সচিত্র আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছে কোথাও কোথাও। অবশ্য আমাদের দেশ ঠিক তত-খানি এগিয়ে যায়নি। কিন্তু অন্যভাবে এগিয়েছে। যাক সে প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি না।

সম্প্রতি রুশ দেশেও মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নানাপ্রকার পরিবর্তন চলেছে। বাইরের দেশগুলির প্রভাবও এক্ষেত্রে কম নয়। অমৃতের কয়েক সংখ্যা আগে রুশ ললনাদের বার্লিনের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রীতির একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরিতে তন কার্মের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা প্রায় দুশ শত রকমের নানাধরনের পোষাক তৈরি করেছেন। এরা প্রাচীন রুশ সূচীশিল্পকে তুলে ধরেছেন। বার্লিনের ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে এদের তৈরি পোষাক বেশ সমাদৃত হয়েছে। শন এবং অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে তৈরি সাম্প্রতিক পোষাকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। রুশীয় লোকশিল্পের অনুকরণে পোষাকের ঊর্ধাংশে সুন্দর লেসের কাজ আকর্ষণীয়।

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

(১) কাকে হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচন বলে এবং কিভাবে হয়?

(২) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভা-পতি নির্বাচনে ভোটার কারা এবং তাঁরা কিভাবে নির্বাচিত হন?

(৩) রাষ্ট্রসঙ্ঘ-এর বর্তমান সদস্য কোন কোন রাষ্ট্র, তাদের নির্বাচনের তারিখ এবং রাজধানীর নাম কি?

●

১। অমৃতবাজার পত্রিকায় শতবর্ষ কবে পূর্ণ হবে? বাংলাদেশে এত পুরোন আর কোন দৈনিক পত্রিকা আছে কি?

২। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে পারলে উপকৃত হবো

মৃণাল বসু
২, হরলাল দাস রো,
কলকাতা।

●

১। জুল ভার্নের কোন কোন গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে?

২। বাংলা ভাষায় কোন শ্রেণীর গ্রন্থ সব থেকে বেশী প্রকাশিত হয়ে থাকে?

৩। কোন কোন বাঙ্গালী লেখক বিদেশে জনপ্রিয়?

গণেশ দত্ত
ধানবাদ।

●

(ক) পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম কে নোবেল পুরস্কার পান! তিনি কোন দেশের লোক? কোন বিষয়ে, কত সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন?

(খ) পরমাণু, প্রোটন, নিউট্রনের আবিষ্কর্তা কে কে?

(গ) ভূপাল ও আমেদাবাদ কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত?

(ঘ) বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত এবং শয্যা সংখ্যা কত?

অশোককুমার মিত্র
২৩, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু রোড,
বনগাঁ, ২৪ পরগণা।

(উত্তর)

গত ৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত বর্ধমানের শুভতোষ শীলের (১নং) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, নাইলন ও টেরিলিন উভয়েই পেট্রোলিয়ম অথবা পেট্রোলিয়ম জাতীয় অয়েল থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত হয়।

নাইলন, এডিপিক এসিড ও হেক্সা-মিথিলিন ডাইঅ্যামিন নামক দুটি রাসায়নিক বস্তুর সংযোগে এবং টেরিলিন, টেরেপথ্যা-লিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকল নামক অপর দুটি রাসায়নিক বস্তুর সংযোগে তৈরি হয়। সব বস্তুগুলিরই মূল উপাদান পেট্রোলিঅম বা পেট্রোলিঅম জাতীয় অয়েল।

রবীন্দ্রনাথ ধর,
আমেদাবাদ-২।

●

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত পুলিনবিহারী দত্তের ২নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বারাসতের কাছে বেড়াচাঁপায় যে মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ মাটি খুড়ে বার করা হয়েছে সেইটিই পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দিরটি ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত। পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে বরাকরের বেগুনিয়াতে পাথরের তৈরি একটি মন্দির, বাঁকুড়ার বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির ও সুন্দরবনের জটার দেউল ৯ম থেকে ১০ম শতকে নির্মিত হয়েছিল।

সুন্দরবনের মন্দিরগুলির মধ্যে জটার দেউল সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি একটি ইটের তৈরি 'রেখ মন্দির'। মন্দিরের ভিত্তি আশে-পাশের ভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। দেউলের উপর যে 'আমলকটি' আছে তা চতুষ্কোণ। এরকম অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। এটি হিন্দু মন্দির না বৌদ্ধ মন্দির এবং কোন রাজার আমলে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। বর্তমানে মন্দিরটির অবস্থা খুবই জীর্ণ। সরকারী সংরক্ষণের গুণে মন্দিরের উপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে।

এ বিষয়ে আরও সংবাদ 'অমৃত' ৭ম বর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যায় পাওয়া যাবে।

ক্ষিতিলাল রায়,
৩২বি, অবিনাশ ব্যানার্জী লেন,
কলি-১০।

●

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় অমৃতে 'জানাতে পারেন' বিভাগে কেন কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

স্বরাজ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন লেনিনগ্রাদের অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স লাইব্রেরী বিশ্বে বৃহত্তম। একথা সত্য নয়। মস্কোস্থিত লেনিন স্টেট লাইব্রেরী বিশ্বে বৃহত্তম।

রাহুল বর্মনের উত্তরেও বিস্তর ভুল রয়েছে। (ক) তিনি জানিয়েছেন ভ্যাটিক্যান সিটির আয়তন ২২ বর্গ মাইল। প্রকৃত-পক্ষে ভ্যাটিক্যান সিটির আয়তন মাত্র ১০৮ ৭ একর। (খ) লেনিনগ্রাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে তিনি বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরী বলেছেন। তা নয়, মস্কোস্থিত স্টেট লাইব্রেরী বিশ্বে বৃহত্তম। যার বইয়ের সংখ্যা (সাময়িক পত্রের খণ্ডাবলী সমেত) দুই কোটি কুড়ি লক্ষেরও বেশী। (গ) শ্রীবর্মন বোস-ফের্মি সংখ্যায়নতত্ত্বকে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসুর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে অভিহিত করেছেন। সবিনয়ে জানাই বোস-ফের্মি সংখ্যায়নতত্ত্ব বলে কোন তত্ত্বই নেই। যে কাজের জন্য জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেটি হল বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নতত্ত্ব। (ঘ) শ্রীবর্মন সাইক্লোট্রোনকে পরমাণু বিচ্ছিন্ন করার যন্ত্র এবং স্পেকট্রোমিটারকে আলোক-রশ্মি সনাক্ত করার যন্ত্র বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে সাইক্লোট্রোন হল পরমাণু ভাঙ্গার যন্ত্র এবং স্পেকট্রোমিটার হল প্রতি-সরণাঙ্ক নির্ণায়ক যন্ত্র।

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় অমৃতে রাহুল বর্মন ম্যাগনোলিয়া আরণলডি ফুলকে বিশ্বের বৃহত্তম ফুল বলে জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বৃহত্তম ফুলের নাম হল র‍্যাফলেসিয়া আর্নলডি।

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় অমৃতে রাহুল বর্মন জানিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্বার-ল্যাণ্ড ও ডারহাম কয়লা খনিতে সর্বপ্রথম ধর্মঘট হয়। সবিনয়ে বলেন কবি, এনসাই-ক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানায় মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম ধর্মঘটের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেটি হয়েছিল ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে। এর থেকেই বোঝা যায় শ্রীবর্মন যে ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি প্রথম ধর্মঘট নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এনসাইক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানা পৃথিবীর প্রথম ধর্মঘটটি সম্বন্ধে নীরব। কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক হয়ত এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন।

বিমলকান্তি সেন,
ইসলামপুর, বস্তী-১২।

আমারে এ আঁধারে

কল্যাণকুমার বসু

(১২)

মা অপমানিত মনে লখনউ ত্যাগ করে চলে গেলেন কোন রকমেই আর বেঁধে রাখা গেল না। মা লখনউ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে অতুলপ্রসাদের সারা মন নৈরাশ্যে ভরে গেল। যন্ত্রচালিত মানুষের মত প্রতিদিনের কাজকর্ম করে চললেন। হেমকুসুমের মানসিক সুস্থতা তখনও সম্পূর্ণ ফিরে আসে নি। উপযুক্ত চিকিৎসার এবং মহেশের সেবা-যত্নের জন্যে হেমকুসুম অনেকটা সুস্থ হলেন। চিকিৎসক বলেছিলেন, হেমকুসুম যেন সকালে বিকেলে একটু আধটু ভ্রমণ করেন তাতে হেমকুসুমের মন প্রফুল্ল থাকবে। মন প্রফুল্ল থাকলে শরীর ভালো থাকবে।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে সঙ্গে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হতেন। সঙ্গী হিসেবে মহেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গ দুজনের কাছেই আনন্দজনক। মহেশের সঙ্গে কথা কয়ে হেমকুসুমের মন অনেকটা ভালো থাকে তাই অতুলপ্রসাদ মহেশকে বলেন, তুমি এসে গল্প কয়ে তোমার দিদির মনকে চাঙ্গা করে রেখ কেমন।

চিকিৎসক বলেছিলেন এমন কোন কাজ করবেন না যেন যাতে মিসেস সেন উত্তেজিত হন। উত্তেজনা ওঁর শরীরে আনবে অনিষ্ট-মুহূর্ত।

অতুলপ্রসাদ সে কথা জানেন বোঝেন তবু উত্তেজনাপূর্ণ শব্দগুলি দু-চার কথার মাঝে কোন অজ্ঞাতসারে এসে পড়ে। নিজেকে সংবরণে সামর্থ নেই, ভুলতে পারেন না হেমকুসুমের জন্যেই মা তাঁদের ত্যাগ করে চলে গেছেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক-সম্বন্ধ নেই। বড় রুক্ষ হন অতুলপ্রসাদ। রুক্ষতা-কর্কশতা মেশানো কন্ঠস্বর তাঁর। মুখ দেখাদেখি কম হয় ইদানীং। হেমকুসুম এবং অতুলপ্রসাদের মাঝখানে অদৃশ্য এক দেয়াল বিধাতা ধীরে ধীরে ইঁট সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে তুলতে থাকেন। তাই বোধ হয় অতুলপ্রসাদের কাজের বিরতি নেই, সময় নেই এক মুহূর্ত, অবসর নেই হেমকুসুমের সঙ্গে আলাপ করার। কোর্টের কাজকর্ম সেরে মামলা-মোকর্দমার কাজকর্মের পর সন্ধেটুকু তখন তার সাহিত্য সাধনায়—গান রচনায়, সুর সংযোজনায়। প্রায় দিনই সুরপিয়াসীর দল হেমকুসুমের সময়টুকু নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে উপস্থিত থাকে। রবাহূত অভ্যাগতদের ভীড়ে নিজেকে খুব অসহায় মনে হয় হেমকুসুমের। অতুলপ্রসাদকে অনেক দূরের মানুষ মনে হয়। সেই জন্যেই তাঁকে অসহনীয় মনে হয়। মন 'ক্ষমাহীন' দাবী জানায় না প্রতিশোধের স্পৃহা জাগায়।

মহেশকে সঙ্গে নিয়ে শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত অতুলপ্রসাদের সামনে দিয়ে হেমকুসুম ভ্রমণে বাহির হন নিত্যদিন।... গোমতী নদীর তীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতেন, কৈশরবাগের বাগিচায় এসে লতানকুঞ্জ ঘেরা পাথরের আসনে বসে হেমকুসুম-মহেশ আলাপচারী হতেন। কখনও আপন মনে ভাবতেন—ভাবনার কূল-কিনারা ছিল না কোন। বাগিচার সবুজ মাঠে অন্য সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিলীপ খেলাধুলোয় মাতত। তারপর রোদ উঠলে বেড়ানো সাঙ্গ হতো। বিকেলে রোদ পড়লে ছেলে ইস্কুল থেকে ফিরলে তাকে জল-খাবার খাইয়ে খেলতে পাঠাতেন। বলতেন খেলাধুলো করে এসে তুমি পড়তে বসবে তারপর আমরা বেড়িয়ে ফিরে এলে মহেশ-কাকা তোমাকে পড়াতে বসবেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেমকুসুম মহেশের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন, বেড়াতে বেড়াতে গোমতী নদীর তীর ধরে মতিমহল অবধি এসে তার চত্বরে বসেছেন, কথায় কথায় অনেক রাত হয়। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয় না হেমকুসুমের।... কি হবে বাড়ি ফিরে—সেই নির্জন নির্বান্ধব পুরীতে—যেখানে এক মুহূর্ত আর বাস করতে ইচ্ছে হয় না—যেখানে কথা বলার—ভালোবাসার মানুষ নেই! হঠাৎ হেমকুসুমের যেন মনে হয় তিনি অনেক দিন অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলেন নি, তাঁর পরিচর্যা করেন নি—ব্যবধানের প্রাচীর কেন যে হঠাৎ মাঝে রূপ নিল কে বলতে পারে!

অকস্মাৎ হেমকুসুমের মন অতুল-প্রসাদের জন্যে কেমন যেন চঞ্চল হল। বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যগ্র হলেন। তখনই বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির গেট পার হয়ে ভেতরে এসে দেখেন বসার ঘরের সব কটা আলো জ্বলছে 'দিন' হয়ে। সুরলহরী ভেসে আসে নারী পুরুষ কন্ঠের। ধীরে ধীরে বসার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন হেমকুসুম দেখলেন আপন মনে বিভোর হয়ে অর্গান বাজিয়ে গান গাইছেন অতুলপ্রসাদ। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর গলায় সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইছেন দুটি তরুণ তরুণী। তারা বোধ হয় অতুলপ্রসাদের নতুন কোন গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে। নতুন নয় তবু হেমকুসুম সেদিন অকস্মাৎ দুরন্ত রাগে প্রচন্ড আক্রোশে ফেটে পড়লেন।

সে রাতে অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম দুজনেই অভুক্ত রইলেন। নিদ্রাহীন রাত যাপন করলেন ভিন্ন ঘরে। ঘরময় পায়চারী করেছেন অতুলপ্রসাদ এবং অনবরত ধূমপান করছিলেন। ঘরময় পোড়া সিগারেটের টুকরো।

অবশেষে অতুলপ্রসাদ সমাধানের পথ খুঁজে পেলেন। হাতে যে কটা মামলা আছে শেষ করবেন। মুনশীকে টাকাপয়সা দিয়ে যাব হেমকুসুমকে খরচপত্র দেবে। দিলীপ যেমন লেখাপড়া করছে করুক। মহেশকে বলে যাব যেন ওকে দেখাশোনা করে। সত্যকুমার* আমাকে খুউব ভালোবাসে। সে যেন রোজ এসে খোঁজখবর নিয়ে যায় আর আমাকে যেন চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর জানায়। হেমকুসুম এখানে থাকুক। ওর জন্যে চাকরবাকর খান-সামা বেয়ারা ফিটন আইজিতভার কুক সব রইল, ও সুখে থাকুক এখানে।......লখনউ ছেড়ে যেতে একটু দুঃখ হবে—অনেকদিনের কর্মভূমি অনেকখানি প্রতিষ্ঠা নাম-যশ, তবু আমাকে নতুন করে কলকাতায় ফিরে গিয়ে কর্মজীবন শুরু করতে হবে। মনেমনেই একটা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন অতুল-প্রসাদ।

• • •

পরদিন সকালবেলায় গোমতী নদীর তীরে বেড়াতে গিয়েছেন সত্যকুমার, ফেরার পথে ভাবলেন একবার অতুলদাদার বাড়ি ঘুরে গেলে কেমন হয়। যে কথা ভাবা সেই কাজ। সত্যকুমার অতুলদাদার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। বাংলোর সামনেই দালানে মুনসি কনাইয়ালাল বসেছিলেন। তিনি জানালেন সাহেব ঘুমুচ্ছেন এখনও।

সত্যকুমার শুনে আশ্চর্য হলেন। মনে মনে ভাবলেন 'সাহেব' ত এত বেলা অবধি ঘুমোন না শরীর ভালো আছে ত? ইতিমধ্যে পুরোনো ভৃত্য বেরিয়ে এসে বললে বাবু আপনি যাবেন না বসুন আমি বৈঠকখানা খুলে দিচ্ছি। সত্যকুমার বৈঠকখানায় বসলে পর ভৃত্যটি বলল কাল সাহেব মেমসাহেব রাত্রে দুজনেই কেউ খাওয়াদাওয়া করেন নি। আপনি এসেছেন আপনাকে দেখলে সাহেব খুশী হবেন। আপনাকে চা দিয়ে যাচ্ছি, কাগজ দেখুন।—

ভৃত্য প্রভুর ঘরে ধীরে ধীরে আওয়াজ দিয়ে প্রভুকে জাগিয়ে জানালো; সত্যকুমার-বাবু এসেছেন, বৈঠকখানায় আপনার জন্যে অপেক্ষায় আছেন।

অতুলপ্রসাদ হাতমুখ ধুয়ে সত্যকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, তোমার কথাই কাল রাতে ভাবছিলাম।

---

* সত্যকুমারের পরিচয়—সত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, পিতা অমরনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি নববিধান সমাজের একজন প্রচারক ছিলেন। সত্যকুমার অতুলপ্রসাদের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর।

বামদিক থেকে মালা দেবী, বেলা দেবী ও বেলা দেবীর একমাত্র নাতি

সত্যকুমার বললেন, আপনি ও বৌদি কাল রাত্রে কিছু খাননি কি ব্যাপার বলুন ত!

অতুলপ্রসাদ তখন গতকালের ঘটনার কথা সত্যকুমারকে বললেন। এবং তিনি মনে যে কথা স্থির করেছেন অর্থাৎ তিনি এসময়ে কিছু দূরে থাকলে হেমকুসুমের মনের পরিবর্তন হতে পারে সেকথা সত্যকুমারকে জানালেন।

সত্যকুমার বললেন যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে সেকাজই করে দেখুন।

অতুলপ্রসাদ বললেন তোমাকে যে ভার দিচ্ছি সেটা তোমাকে পালন করতে হবে।

সত্যকুমার বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি সেকাজ যথাসাধ্য করে যাবো।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি একবার বৌদির কাছে যাও।

সত্যকুমার হেসে হেমকুসুমের ঘরে এলেন। হেমকুসুম তখন আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন। আয়া চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সত্যকুমারকে দেখে আন্তরিকভাবে ডাকলেন হেমকুসুম। নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে বললেন 'তুমি অনেকদিন আসনি যে সত্যকুমার? তাঁর চেহারার মধ্যে গতকালের ঝড়ের কোন চিহ্ন নেই। সত্যকুমার বললেন, আজ সকালে আপনি বেড়াতে গেলেন না যে!

আজ শরীরটা তেমন ভালো বোধ হচ্ছিল না, হেমকুসুম বললেন তাই মহেশকে বললাম তুমি দিলীপকে নিয়ে বেড়াতে যাও। আমি আজ যাবো না।

সত্যকুমার বললেন, আপনার চা-জল-খাবার খাওয়া হয়েছে? শুনলাম কাল থেকে আপনি অন্নগ্রহণ করেননি। বড় অন্যায়। আয়াকে বলি আপনার খাবার দিয়ে যেতে। আমার জন্যেও এককাপ চা বানাতে বলবেন। যদিও অতুলদার ঘরে আমার এক কাপ চা হয়েছে তবু আমি ত চায়ের পোকা জানেন ......কদিন সাহেবের সঙ্গে অফিসের কাজে দেরাদুন মোসৌরী ঘুরে এলাম। মোসৌরী বড় চমৎকার জায়গা, চারদিকে পাহাড় ঝরনা, দূরে একটা লেক আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন— বড় ভালো লাগলো। এক কাজ করতে তো পারেন দাদা এবং আপনি দিলীপকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন। শরীরও সারবে, মনও ভালো থাকবে। আমি বলছি দেখবেন, সেখানে কয়েকটি দিন কাটিয়ে এলে একেবারে নতুন জীবন মনে হবে। আর দেরী করবেন না, আপনারা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন।

হেমকুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমারও আর ভালো লাগে না। এখানে বড় একঘেয়ে মনে হয়। তবে উনি এখানকার কাজকর্ম বন্ধ রেখে মুসৌরী যেতে পারবেন কি? বলবেন তোমরা যাও। ওঁকে আমি এই সাতশো রাক্ষসীর দেশে রেখে যেতে পারবো না।

যখন সত্যকুমার বললেন, দেরাদুন মুসৌরী বেড়াতে যাওয়ার আপনার মত আছে তখন দেখি দাদাকে একবার বলে। আশা করি দাদা মত দেবেন। আচ্ছা আজ চলি আর একদিন আসবো। অফিস আছে তো। এই বলে সত্যকুমার উঠে পড়লেন। যাবার আগে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কাছারীতে দেখা করে বলে এলেন যে বৌদির মেজাজ ভালোই দেখলুম। চা-টা খাচ্ছেন। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী কার্যক্রম আপনাকে জানাবো। ইতিমধ্যে আপনি বৌদির ওপর মেজাজ-টেজাজ দেখাবেন না যেন!

দিনদুই কাটলে একদিন সত্যকুমার অফিসফেরতা এলেন অতুলপ্রসাদের বাড়ি। তখন তিনি কোর্ট থেকে ফেরেন নি। ভৃত্যদের কাছে শুনলেন মেমসাহেব বাড়িতে আছেন কোথাও বেড়াতে যান নি। সত্যকুমার মনে ভাবলেন ভালোই হল তিনি হেমকুসুমের বৌদির সঙ্গে দেখা করার কথাই ভাবছিলেন প্রথমে। তাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাড়ির অন্দরমহলে এলেন।

হেমকুসুম তাঁর গলার স্বর শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সত্যকুমার তুমি সেদিন বলে গেলে আসবে, ক'দিন আর দেখাই নেই।

আসিনি তার কারণ আমাদের অফিসে অডিট হচ্ছিল তাই রোজই ফিরতে রাত হোত। আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল তাই চলে এলাম।

হেমকুসুম বললেন, তুমি সেদিন দেরা-দুনের কথা বলছিলে। আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে সেখানেই যাই। অনেকদিন লখনউর বাইরে পা বাড়াই নি। কিন্তু তোমার দাদার ইচ্ছে না হলে কেমন করে যাই বল তো!

সত্যকুমার বললেন, এখনো বুঝি আপনাদের মধ্যে অভিমান চলেছে। কথা বন্ধ। আপনার মনের কথা দূত হয়ে আমার অতুলদাদার কানে পৌঁছে দিতে হবে ত।

মনস্তে ক্লাবের সভ্যগণ

সত্যকুমার জল খেতে খেতে বললেন, বৌদি আর নয় এবার দাদার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন। আপনিও কিছু ত্যাগ করুন, দাদাও কিছু ত্যাগ করবে। যা হবার তাত হয়েই গেছে।

হেমকুসুম বললেন, না তাই আমি কেন মিটমাট করতে যাব প্রথমে। উনিত আমার সঙ্গে কথা বলেন না, কাছে ডাকেন না, কোন সংস্রব রাখতে চান না তখন আমারইবা নীচু হয়ে লাভ কি। আমিবা সর্বকিছু ত্যাগ করে প্রথমে ও'র কাছে এগিয়ে যাব কেন?

সত্যকুমার হাসতে হাসতে বললেন, আপনিও নীচু হবেন না দাদাও নীচু হবেন না। দুজনেরই এক কথা সমান জিদ। হবে না কেন যখন দুজনেরই মাঝে একই রক্ত বইছে। সত্যকুমার বললেন দাদা কোর্ট থেকে আসুন আজই আমি দাদাকে মুসৌরী যাওয়ার কথা বলছি এবং রাজী করাচ্ছি। আপনি নিশ্চিত হয়ে মুসৌরী যাওয়ার জন্যে তোড়জোড় করুন।

তা তোমার যা ইচ্ছে কর, হেমকুসুম বললেন, দাদা তোমার কথা শোনেন শুনবেন, কিন্তু আমি তোমার দাদার কাছে প্রথমে যাব না।

এমন সময় ভৃত্য এসে জানিয়ে গেল সাহেব অনেকক্ষণ এসেছেন এবং সত্যকুমারবাবুকে সেলাম দিয়েছেন। সত্যকুমার বললেন চল যাচ্ছি।

সত্যকুমার অতুলপ্রসাদের ঘরে আসতেই তাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি দুদিন আসনি এদিকে? সত্যকুমার অতুলপ্রসাদকে অফিসের কথা পুনর্বার জানালেন। তারপর বললেন অতুলদাদা আপনি যে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বনবাসে যাচ্ছিলেন তা এখন কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখুন?

কেন?

যদি অভয় দেন তো বলি।

বল।

আমি বলি কি আপনি এবং বৌদি এখন কিছুদিনের জন্যে দেরাদুন মুসৌরী কিম্বা সিমলা-নৈনিতাল থেকে বেড়িয়ে আসুন তাহলে সব মেঘ কেটে যাবে।

তারপর সত্যকুমার হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার আদ্যোপান্ত সবকথা বললেন। বললেন বৌদি আমার প্রস্তাবনা শুনে পাহাড়ে যেতে উৎসুক।

অতুলপ্রসাদ বললেন বেশ হেমকুসুম যদি রাজী থাকে আনন্দের সঙ্গেই যাওয়া যাবে। ......হাতের কাজগুলির তাড়াতাড়ি একটা নিষ্পত্তি করে নি। যাক তোমার কথা শুনে ভালো লাগল। তুমি যে আমাদের হিতকামনা কর এতে আমি সুখী হয়েছি।

সত্যকুমার বললেন, বৌদির যখন পাহাড়ে যাবার এত ইচ্ছে আপনি তখন আর দেরী করবেন না। বড় তাড়াতাড়ি হয় বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আগামী সপ্তাহে শুক্রবার যাত্রা করা যায় দিনটা ভালো।

অতুলপ্রসাদ বললেন, দেখি যদি পারিত সেই চেষ্টা করবো। কাল তুমি কাল একবার এস।

পরেরদিন সত্যকুমার আসতে অতুলপ্রসাদ বললেন, দেখ আমার হাতে দুটো মোকর্দমা আছে, আর, মিনি একটার কাল নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, অন্যটার দিন পড়েছে শুক্রবার। সেইদিনই গাড়ি রিজার্ভের ব্যবস্থা করে দিলে শনিবার রাত্রের গাড়িতে দেরাদুন রওয়ানা হয়ে যাবো।

সত্যকুমার বললেন, ঠিক আছে। বৌদিকে বলেছেন কি?

অতুলপ্রসাদ বললেন, না তুমি বল গিয়ে।

হেমকুসুম শুনে বললেন, দেখ না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যতক্ষণ না গাড়িতে চড়ছি বিশ্বাস হচ্ছে না।

শুক্রবারদিন সকালে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে সত্যকুমার দেখা করলেন। তিনি বললেন, তুমি এসেছ ভালোই হল। তোমাকে টাকা দিচ্ছি। তুমি কালকের জন্যে রিজারভেশানটা করিয়ে দাও। সত্যকুমার টাকা নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন আজ বিকেলে টিকিট নিয়ে আসছি এখন অফিসের তাড়া।... সত্যকুমার বিকেলবেলা অফিসফেরতা অতুলপ্রসাদের বাড়ি এলেন। শুনলেন সাহেব এখনও বাড়িতে ফেরেন নি। তাই বৌদির কাছেই সোজা চলে গেলেন। কুসুম বৌদিকে দেখেই বললেন, বৌদি গোছগাছ করে ফেলুন। টিকিট কাটা বার্থ রিজার্ভ হয়ে গেছে।

বৌদি হেসে বললেন, সমুদ্রের ওপর পোলতে বেঁধে ফেলছ এখন দেখছি সীতা উদ্ধারের দেরী নেই!

বেশ বৌদি আমাকে তুমি হনুমান বললে? যদি তাই হতে পারতাম তাহলে বুক চিরে তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখালে তোমরা খুশী হতে বৌদি।

রসিকতায় দুজনেই হাসলেন। টমটমের শব্দে হেমকুসুম বললেন ওই তোমার দাদার প্রিয় ওয়েলার ঘোড়া দাদাকে নিয়ে বোধহয় কোর্টইয়ার্ডে প্রবেশ করল। অনেক দেরী হল। তোমার দাদা জামাকাপড় ছাড়ুন মুখ হাত-পা ধুয়ে নিন। তোমার খবর আমার ভৃত্যই দেবে। তুমি ততক্ষণ এখানে কাছেই বোসো।

সত্যকুমার বললেন, বৌদি আপনি আজকে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন। আজ চলুন একবার ওঘরে আমার সঙ্গে। আপনাকে যেতেই হবে। ওজর আপত্তি শুনবো না।

হেমকুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন আচ্ছা যাবো তুমি যখন বলছ।

একটু পরে সত্যকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন চলুন বৌদি।...হেমকুসুম শঙ্কিত ভঙ্গিতে বললেন তুমি এগোও আমি আসছি।

সত্যকুমার অতুলপ্রসাদের ঘরে প্রবেশ করে বললেন দাদা টিকিট কাটা হয়ে গেছে। কালকের ট্রেনে বার্থরিজার্ভ করাও হয়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদ ক্লান্তভাবে আরামকেদারায় বসেছিলেন। সত্যকুমারের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, আজ ভেবেছিলাম মোকর্দমাটা শেষ হয়ে যাবে। তা হল না। সোমবারও চলবে। কি করি বলত?

অতুলপ্রসাদ যখন এই কথা বলছিলেন হেমকুসুম তখন ঘরে প্রবেশ করছেন কথাটা তাঁর কানেও গেল। তাঁর নত মস্তক দেখে অতুলপ্রসাদ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। একই বাড়িতে আছেন অথচ কতদিন তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি কথাও বন্ধ।

সত্যকুমার বললেন, বৌদি এসেছেন? দাদার পাশের চেয়ারটায় বসুন। তারপর অতুলপ্রসাদের দিকে ফিরে বললেন কি বলছিলেন দাদা, বৌদিরও পরামর্শ দরকার।

হেমকুসুম এগিয়ে এসে অতুলপ্রসাদের পাশের সোফায় বসতে বসতে বললেন, দেখলে ত সত্যকুমার বলেছিলাম না যতক্ষণ গাড়িতে না উঠি বিশ্বাস নেই।

অতুলপ্রসাদ খানিক চিন্তা করে বললেন, সত্যকুমার তুমি ভাই একটা কাজ কর তুমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে বেশ আনন্দেই সেখানে আমাদের দিনগুলি কাটবে। আমি মনে করছিলাম তোমার সঙ্গে কালকেই তোমার বৌদিকে পাঠিয়ে দিই তারপর এখানকার কাজটা শেষ করেই আমি সেখানে রওয়ানা হয়ে যাবো।

সত্যকুমার বললেন আমার ত আপনাদের সঙ্গে যেতে খুবই ইচ্ছে করে। বুড়ো বাবা-মাকে ছেড়ে যাই কেমন করে তার ওপর বাবার শরীরটাও ভালো নেই কখন কি হয় বলা যায় না আমি চলে গেলে ডাক্তার ডাকার দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই।

হেমকুসুম আর চুপ করে থাকতে পারলেন না অতুলপ্রসাদকে বলে ফেললেন তোমার এই কাজ-কাজের জন্যে আমি পাগল হয়ে যাবো।

সে কি বলছ, অতুলপ্রসাদ বললেন কাজইত আমাদের লক্ষ্মী কাজইত আমাদের অন্নবস্ত্র সুখ ঐশ্বর্য যোগাচ্ছে। যাক এসব নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ নেই কালকের যাওয়ার কি করা যায় তার একটা ঠিক করতে হবে।

হেমকুসুম মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে, মুখভার করে বললেন তাহলে আমি আর যাব না বলে রাগ করে ওঠে চলে আসছিলেন সত্যকুমার বললেন বৌদি, আপনাদের আমি নিরাশ করতাম না, কিন্তু বাবা-মায়ের কথা ভেবে বড় অসুবিধায় পড়েছি তবে আমি একটা

কথা ভেবেছি মহেশের পরীক্ষা ত' হয়ে গেছে সেই না হয় কাল আপনাকে এবং দিলীপকে নিয়ে যাক্। তারপর দাদাত দু'চারদিনের মধ্যে যাচ্ছেন। তারপর মহেশ না'হয় ফিরে আসবে।

এই কথা শুনে অতুলপ্রসাদ হেম-কুসুমকে বললেন তুমি আর অমত করো না। সত্যকুমার খুব ভালো সাজেসন দিয়েছে। তারপর চাকরকে ডেকে বললেন দেখত মাস্টারবাবু দিলীপের ঘরে পড়াচ্ছেন কিনা। তাহলে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দাও। মহেশ দিলীপকে পড়াচ্ছিলেন খবর পেয়ে ঘরে এলে অতুলপ্রসাদ বললেন মহেশ তোমাকে ডেকেছিলাম একটা কাজের জন্যে তোমার তো এম-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন ছুটি। তোমকে ভাই একটা কাজ করতে হবে। আমাদের মুসৌরী যাবার সব ব্যবস্থা কালকের রাতের গাড়িতে হয়েছিল, কিন্তু আমার একটা দরকারী কাজের জন্যে কাল যাওয়া হয়ে উঠবে না দু'একদিন পরে যাব। কাল তোমাকে দিলীপ এবং দিলীপের মাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

সে একটু ভাবলে তারপর বললে, আচ্ছা আমি রাজী আপনি যখন বলেছেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন আমি সেখানে তোমাদের জন্যে সেখানকার সিভিল মিলিটারী হোটেলে থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তাদের গাড়িও তোমাদের নিতে আসবে। কোন ভাবনা নেই হোটেলের মালিকও আমার মক্কেল। সেই এখান থেকে টেলিগ্রাম করে সব বন্দোবস্ত করে দেবে। তারপর বললেন তুমি তবে কাল সন্ধ্যার আগেই সব ব্যবস্থা করে নাও। জিনিষপত্র নিয়ে চলে আসবে আমার বাড়িতে।

মহেশ উঠে গেল দিলীপের ঘরে। সত্যকুমার বললেন, বৌদি আপনার তা'হলে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল এখন গোছগাছ করে নিন আমি আপনাদের কাল ইস্টিসানে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো। হেমকুসুম বললেন যাচ্ছি কিন্তু তোমার ওপর ভার রইল তোমার দাদাকে যত তাড়াতাড়ি হয় পাঠিয়ে দিও।

হেমকুসুম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলছিলেন অতুলপ্রসাদ হাত ধরে বললেন বোসো।

হেমকুসুম বললেন, কি বলছ বল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, এতদিন তুমি আমার সঙ্গে কথা না কয়ে কি রকম করে ছিলে বলত ?

হেমকুসুম বললেন, কেন তুমিও ত আমার সঙ্গে কথা না বলে আছ। তারপর হেসে বললেন সত্যকুমার সেদিন যা বললে ঠিক বলেছিল।

অতুলপ্রসাদ বললেন কি কথা বলেছিল ?

হেমকুসুম বললেন, সে বললে আপনাদের দু'জনের যা গোঁ কেউ কম যান না, হবে না কেন দু'জনের গায়েই একই রক্ত বইছে।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, ও মুখ-ফোঁড় লোক। মুখে এক পেটে এক কথা রাখে না সবই বলে ফেলে। তারপর বললেন কুসুম তোমার জন্যে কাল বড় মন কেমন করছিল যখন ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছিল। আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না একটা গান লিখে ফেললুম, শুনবে ?

হেমকুসুম বললেন, আন।

অতুলপ্রসাদ উঠে গিয়ে নিজের শোবার ঘর থেকে প্যাড নিয়ে এলেন। বললেন পড়ছি শোন। শুধু পড়া নয় গুণ গুণ সুরে সুরেলাকণ্ঠে তিনি গাইলেন।

বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি-পাতে
আমিও একাকী তুমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন তিয়াসে,
ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে
পল্লীর বধু বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলনে সম্ভাষে।
আমারও যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে—
নিদ নাহি আঁখিপাতে।
গগনে বাদল নয়নে বাদল,
জীবনে বাদল ছাইয়া,
এসো হে আমার বাদলের বঁধু
চাতকিনী আছে চাহিয়া।
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া,
সজনী তোমার জাগিয়া।
কোন অভিমানে হে নিঠুর নাথ,
এখনো আমারে ত্যাগিয়া ?
এ জীবন ভার হয়েছে অবহ
সঁপিয়া তোমার হাতে।
নিদ নাহি আঁখিপাতে।

গান শুনে হেমকুসুম হেসে বললেন তুমি এতও পারো। যাক রাত হয়েছে দিলীপের মাস্টার চলে গেল, তোমাদের খাবার দিতে বলি। তুমি খাবার ঘরে এসো।

অনেকদিন পরে আবার আনন্দে এক-সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ফর্সা হয়ে চাঁদ উঠল দুজনের মনের মেঘও কেটে গেল।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

শুভংকর

হীরানির্মিত তাপমান যন্ত্র

পৃথিবীতে মানুষের মহামূল্যবান রত্ন-সামগ্রীর মধ্যে হীরা হচ্ছে অন্যতম। কিন্তু শুধু অলংকারের উপকরণ হিসাবে হীরার এই মহামূল্য নয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উপাদান হিসাবেও হীরার মূল্য অপরিসীম।

সম্প্রতি তাপমাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রে হীরার উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়েছে। অতিনিম্ন ও অতিউচ্চ তাপমান পরিমাপের উপযোগী থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের অভাব বিজ্ঞানীরা বহুদিন অনুভব করেছেন। এমন এক তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা তাঁরা করেছেন, যার দ্বারা অতিনিম্ন ও অতিউচ্চ উভয় তাপমাত্রাই পরিমাপ করা যাবে। সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম হীরানির্মিত এমনই এক অভিনব তাপমান যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে শূন্যের নিচে ৩২৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট (শূন্য ডিগ্রীর নিচে ১৯৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) পরিমাপ করা যায়। এই তাপমাত্রায় বহু গ্যাস তরলে পরিণত হয়। অপরদিকে এর সাহায্যে ১২০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট (৬৪৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) পরিমাপ করা যায়। এই তাপমাত্রায় বিভিন্ন ধাতু গনগনে লাল হয়ে ওঠে।

এই তাপমান যন্ত্রের তাপমাত্রা পরিমাপের বস্তুটি হচ্ছে বিশেষ ধরনের এক-প্রকার কৃত্রিম হীরা। বিজ্ঞানীদের কথিত 'অর্ধপরিবাহী' মাত্রায় এই হীরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে থাকে। 'অর্ধপরিবাহিতা' বলতে বোঝায় অন্তরক পদার্থের চেয়ে ভালোভাবে তবে ধাতবদ্রব্যের চেয়ে নিকৃষ্টভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করা। তাপমাত্রা কমলে বা বাড়লে এই হীরার বিদ্যুৎ-রোধ ক্ষমতা বাড়ে বা কমে যায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা যত কম হবে হীরার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা তত বাড়বে।

তাপমাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী এই পরিবাহিতা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ কারণে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে হীরার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নির্ণয় করে তাপমাত্রার যথাযথ পরিমাপ করা যায়। হীরার সঙ্গে কয়েকটি তার যুক্ত থাকে এবং এই তারগুলি মিলিত হয় যেখানে তাপমান পড়ার ব্যবস্থা আছে। অতি ক্ষুদ্র প্রস্তরখন্ডের আকারের একটি কাচের টুকরো সম্পূর্ণ বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় ক্ষুদ্রকায় যন্ত্রসমাবেশকে ঘিরে রাখে। ক্ষুদ্রাকারের দরুণ এই যন্ত্রকৌশল তাপমান পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দেয়।

এই যন্ত্রকৌশল মরিচারোধক এবং তরল ও বায়ব পদার্থের তাপমান পরিমাপের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। এই

হীরা নির্মিত তাপমান যন্ত্র : স্বচ্ছ কাচের অংশের মধ্যে কালো রঙের বস্তুটি হচ্ছে কৃত্রিম হীরা

ক্ষুদ্রাকার তাপমান পরিমাপ-ব্যবস্থা 'থার্মিস্টার' নামে অভিহিত। জার্মেনিয়াম, সিলিকন কারবাইড পলিক্রিস্টোলাইন অক্সাইড ইত্যাদি অন্যান্য অর্ধ-পরিবাহী উপাদানের দ্বারাও থার্মিস্টার নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এদের কোনটিই হীরার থার্মিস্টারের মতো নির্ভুল ও অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত তাপমান পরিমাপ করতে পারে না।

আমরা জানি, পৃথিবীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে হীরা হচ্ছে কঠিনতম পদার্থ। এই কঠিনতা ধর্মের জন্যে শিল্পক্ষেত্রে কাটা, গুঁড়ো করা ও পালিশ করার যন্ত্রপাতির উপাদান হিসাবেই হীরা প্রধানত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাপমান পরিমাপের ক্ষেত্রে হীরার এই ব্যবহার নতুন। আমরা আরও জানি, কয়লা গ্রাফাইট ও হীরা একই উপাদান অঙ্গারের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতিতে অতিউচ্চ তাপ ও চাপে গ্রাফাইট রূপান্তরিত হয় হীরায়। তত্ত্বীয় দিক থেকে বলা যায়, প্রতি বর্গ সেন্টি-মিটারে ২ লক্ষ কিলোগ্রাম চাপে এবং ৯ হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় গ্রাফাইট রূপান্তরিত হয় হীরায়। কিন্তু ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭০ হাজার কিলোগ্রাম চাপে এবং ২ হাজার ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রায় কৃত্রিম হীরা প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। চাপ ও তাপের সঙ্গে একটি বিগলিত ধাতব অনুঘটক ব্যবহার করে তাঁরা এই অসাধ্য সাধন করেন। কৃত্রিম হীরার সঙ্গে ইচ্ছাপূর্বক বোরন, বেরিলিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে অর্ধ-পরিবাহী হীরা উৎপাদন করা যায়। এই উপায়েই জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী হীরার থার্মিস্টার উদ্ভাবন করেছেন।

মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় ভারত

গ্রহান্তর যাত্রায় মহাকাশ-অভিযানে ভারত উদ্যোগী না হলেও মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় ভারতের ভূমিকা নিতান্ত অনুল্লেখ্য নয়। সম্প্রতি ত্রিবেন্দ্রামের সন্নিহিত থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

থেকে একটি দ্বিস্তর 'সেনট্যর' রকেট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার কর্মকাণ্ডে এই ঘটনাটি নতুন এক অধ্যায় সূচনা করেছে।

থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে এই নিয়ে মোট ৪৮টি রকেট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হল। সেনট্যর রকেটটি ফ্রান্সে নির্মিত। এটি উৎক্ষেপণের সঙ্গে নতুন একটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই পর্যায়ে যে সমস্ত রকেট উৎক্ষিপ্ত হবে সেগুলি নানাবিধ যন্ত্রপাতি নিয়ে ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে উপনীত হবে ও সেখানে আয়ন বাষ্পের পরিমাণ, ঘনত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য সংগৃহীত হবে। এই জুন মাসে থুম্বা থেকে তিনটি নাইক অ্যাপাশে রকেট উৎক্ষেপণের কথা আছে।

থুম্বাই হচ্ছে ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণকেন্দ্র। ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর এখান থেকে প্রথম রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়। সেটি ছিল একটি নাইক অ্যাপাশে রকেট। তারপর এখান থেকে অনেকগুলি নাইক-অ্যাপাশে, জুডি ডার্ট এবং সেনট্যর রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রথম দু শ্রেণীর রকেটগুলি দান করেছিলেন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা (নাসা)। আয়নমণ্ডলের বিষুবীয় বিদ্যুৎপ্রবাহ সংক্রান্ত গবেষণায় নাইক-অ্যাপাশে এবং বায়ুপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত গবেষণায় জুডি ডার্ট রকেটগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে থুম্বা একটি আন্তর্জাতিক তথ্যসন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে। এদিক থেকে থুম্বার গুরুত্ব অনেকখানি। ১৯৬২ সালে ঊর্ধ্ব মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে গঠিত রাষ্ট্রসংঘের এক কমিটি একটি আন্তর্জাতিক তথ্যসন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণকেন্দ্র স্থাপনের আহ্বান জানান। এই কর্মসূচীর ক্ষেত্রে থুম্বার ভৌগোলিক অবস্থান (চৌম্বকীয় নিরক্ষবৃত্তের কাছা-কাছি) বিশেষ অনুকূল হওয়ায় স্বভাবতই এই স্থানটি এই কর্মসূচীর জন্যে নির্বাচিত হয়।

থুম্বাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতার ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের রকেট-উৎক্ষেপণ ও মহাকাশে গবেষণার জন্যে বহুবিধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা নিজেরাও যন্ত্রপাতি তৈরী করার প্রেরণা লাভ করেছেন। সম্প্রতি যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে সেনট্যর রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তার সবই ভারতে তৈরী। থুম্বার ভারতীয় বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদেরা আশা করেন, অল্পদিনের মধ্যেই এখান থেকে ভারতে তৈরী রকেট মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। এ বছর শেষ হবার আগেই এরকম তিনটি রকেট তৈরী করতে পারবেন বলে তাঁদের আশা।

থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব

বিজ্ঞানীরা নীরবে নিভৃতে সাধনা করলেও তাঁরা সমাজেই বাস করেন। সে কারণে তাঁরা যে দেশে ও যে সমাজে বাস করেন, তার প্রতি তাঁদের কিছু দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন না। 'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব' সম্পর্কে গত ৫ মে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঊনবিংশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ দেবেন্দ্র-মোহন বসু এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয়কুমার বসু, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী এবং ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী।

ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেনঃ কৃষি-বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব অনেকখানি। কারণ আমরা প্রায় সকলে কৃষির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে আমাদের দেশে যে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের জন্যে উন্নত-তর কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজন। আগামী ১৫ বছরে আমাদের দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এর জন্যে শস্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি, সেচের ব্যবস্থা ও সুষম সার বন্টনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের দরকারী সার, বীজ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নেই। সুতরাং আমাদের নিজেদের জিনিসপত্রের সীমা চিন্তা করে তার ব্যবহার করা উচিত।

ডাঃ অমিয় বসু চিকিৎসকের সামাজিক দায়িত্ব পর্যালোচনা করে বলেনঃ চিকিৎসাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ না করে সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শুধু রোগ প্রতিকার নয়, জনসমাজকে সুস্থ সবল করে গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্যে প্রয়োজন ভূমি-সংস্কার ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন।

ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় বনৌষধির গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেনঃ প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বনৌষধির যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বর্তমানে আমরা বিদেশ থেকে ভেষজ আমদানিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে থাকি। অথচ আমাদের দেশে যে সকল মূল্যবান বনৌষধি রয়েছে সেগুলিকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তা হলে অল্পমূল্যে ভেষজ পাওয়া যাবে, বহু লোকের কর্ম-সংস্থান হবে এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করতে পারব। এছাড়া সাম্প্রতিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সংশ্লেষিত ভেষজের তুলনায় প্রকৃতিজ ভেষজের বিষক্রিয়া অনেক কম।

শ্রীঅধিকারী বলেনঃ দেশীয় ভেষজ বিদেশে রপ্তানির পক্ষে আমাদের দেশে প্রতিবন্ধক হচ্ছে সরকারী নীতি। এই নীতির পরিবর্তন দরকার। এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্য একটি কথা মনে রাখা দরকার, এদেশে কম মূল্যে কম যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কম সময়ের মধ্যে ভেষজ প্রস্তুত করতে হবে।

ডঃ ভাদুড়ী বলেন : বিজ্ঞানীরা সমাজ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন না দেশের সামগ্রিক প্রগতির জন্যে দেশবাসীর মনে বিজ্ঞানচেতনা গড়ে তোলার জন্যে তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। এবিষয়ে মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

সভাপতি ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেন বিজ্ঞানসাধনায় দেশ-ধর্মের গণ্ডী থাকা উচিত নয় সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানীকে 'স্বদেশ জাতিক মোহ' ত্যাগ করে প্রথমে যে দেশে জন্মেছি তার সেবার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন?'

'তোমার মায়েরও।'

'মাকে ভালোবাসতেন আপনি?'

'যেমন আনন্দ তোমাকে ভালোবাসে।'

'কিন্তু দাদু......'

'হ্যাঁ, রায়বাহাদুরের কাছে আমাদের অবাধ মেলা-মেশা অশোভন ঠেকেনি কোথাও। কেবল বিয়ের প্রস্তাব শুনেই তাঁর মর্যাদাবোধ সজাগ হয়ে উঠেছিল বোধ করি। উত্তর দেবার বদলে তিনি তাই নিজের খরচে আমাকে বিদেশে চালান করে দিলেন। আমিও মনের আনন্দে গোটা কন্টিনেন্টের আর্টগ্যালারি ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন। এই ফাঁকে রায়বাহাদুর সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি করে ফেললেন। আমার অজান্তেই লতিকা অন্যের ঘরে চলে গেল।'

কড়া মদের মতই ঝাঁঝালো ঠেকে সব। চোখে-মুখে দারুণ উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে মুকুলের। নিঃশ্বাস উষ্ণ মনে হয়। মাথার ভেতর যেন এক লক্ষ ট্রেণের চাকার ধাতব-শব্দ শুরু হয়। শান্ত দুপুর যেন প্রবল ঝড়ের তাড়নায় সহসা উন্মেল হয়ে ওঠে। তার মা, বাবা, দাদু—একেএকে চেনা-অচেনা আরো অজস্র মানুষ যেন তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তার চেতনায় মেঘের মত জমতে থাকে অজস্র কথা, অসংখ্য দিন-মাস মুহূর্তের ভিড়। বিবর্ণ, পান্ডুর সময় যেন আরোগ্যের প্রার্থনা নিয়ে চেয়ে থাকে। কেমন করে ফিরিয়ে দেবে সে? বিমুখ করবে কাকে? সবাই যে চেনা, পরিচিত, অত্যন্ত নিকট মুকুলের। কালিদাসকেই কি চেঁচিয়ে, ধমকে স্তব্ধ করে দিতে পারে সে? বলতে পারে, আপনি থামুন। দয়া করে এবার রেহাই দিন আমাকে, আমি আপনাকে চিনেছি। সব কথাই বুঝতে পেরেছি আপনাদের?

পারে না। আর পারে না বলেই তো অসহায়, আক্রান্ত বোধ করে। থেকে-থেকে শোকে, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ার বাসনাই যে তাকে তোলপাড় করে এখন।

আর কেউ না বুঝুক। কালিদাস অন্তত টের পান। এই ক'দিন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে তিনি যেন বুঝে নিয়েছেন সব। তার মন, তার ইচ্ছা, তার রুচি সব সমস্ত কিছুই। মুকুল যে তারই ভয়-ভীতি-বাসনায় গঠিত প্রাণ। অনিচ্ছায় হলেও তাকে তো পৃথিবীর আলো-বাতাস-আকাশ দেখবার মূল তিনি। আর কেউ না জানুক, কালিদাস নিজে কি ভুলতে পারেন? বেঁচে থাকলে আজ লতিকাই কি তেমনি সহজ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ হতে পারতেন? যা তিনি নন। হতে চেয়ে হতে না পারার জ্বালায় দগ্ধ হতে হয়। অথচ এই বোধ, এই বিবেক সেদিন যদি সজাগ হত একবার। তাঁকে জাগিয়ে দিত, সাবধান করে দিত! তা দেয় নি। নাকি দিতে চাইলে কালিদাসই তাদের ধমকে, শাসিয়ে, চোখ রাঙিয়ে বিদেয় করেছে সেদিন? বিবেক তো থাকেই। বোধ-ও থাকে। মানুষের রক্তের ভেতরেই বাসা বেঁধে থাকে তারা। অন্তরঙ্গ সঙ্গীর মত, একান্ত আপনজনের মতই বেঁচে থাকে তারা। নইলে মানুষ মানুষ হয়ে সংসারে টিকে থাকার ভরসা পায়? আর পাঁচটা আপদ জুটে তাকে লুটে-পুটে নিঃশেষ করে দেবে না?

বিদেশে বসেই লতিকার চিঠি পেলেন। তাতে আক্ষেপ ছিল, হতাশা ছিল; আবার সান্ত্বনার সুরে চরম ভরসার কথাও লেখা ছিল মনে পড়ে। সেসব কথা কি খোলাখুলি কাউকে বলা যায়? চোখ বুজে মনে-মনে আউড়ে যেতে হয় কেবল। গোপনতাই যে তাদের পবিত্র আভরণ। সশব্দে উচ্চারিত হলেই যেন অন্তরের সকল মহিমা, সমস্ত সুবাস লুপ্ত হবে! রূপহীন, গন্ধহীন সেই প্রেম, প্রণয়ের সেই স্মৃতি যে দুঃসহ জঞ্জাল হয়ে ওঠে তখন। বরং আপনমনে আপনাকে শুনিয়ে সুখ আছে, রমণীয় দুঃখ আছে, যা সকল সুখের বাড়া।

..উপায় নেই। তাই বাবার দেয়া এমন শাস্তিই আজ মাথা পেতে নিচ্ছি। তুমি যে অনেক দূরে কালিদাস। কিন্তু পুড়েছেন

ফুলের মত এই যে দেহ, গন্ধদীপের মত এই হৃদয় যা জ্বালিয়ে একবার তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছি তা দিয়েই জীবনে আরেকজনকে আবাহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই দেহের ভেতরে এখনো তোমার দান আমি পরম নিষ্ঠা সহকারে লালন করে চলেছি। স্থির করেছি, এই লোকটিকেও প্রতারণা করবো না। অকপটে স্বীকার করবো সব। তারপর তাঁর যা বিচার ভাগ্যের বিচার বলে মেনে নেবো। তবু নিজেকে কলুষিত করবো না। অসহায় যে-জীবন আজ আলোর আশায় উন্মুখ, মাথার ওপরে যত কঠোর দণ্ডই নেমে আসুক, আমি তাকে চির-অন্ধকারেই নির্বাসন দিতে পারবো না, পারবো না, পারবো না।

হৃষিকেশ উদার, প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করেছিলেন সব। হয়তো ক্ষমাও করেছিলেন লতিকাকে। মেয়ে হলে আদর করে নাম রেখেছিলেন মুকুল। আশা মুকুল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান—কিছুই কি ছিল না তাঁর? প্রতিশোধের ক্ষীণতম স্পৃহা?

ছিল। সে-খবর লতিকারই গোচরে নিয়ে এলেন তিনিই। বোমার আতঙ্কে যা কেউ তখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ছেলেটা যে শূন্য ঘরেই দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। গান গায়, হাততালি দিয়ে নাচে। হৃষিকেশকে দেখে সেই উল্লাস দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ওর নাম আনন্দ। যা তাঁর কাছে সেই মুহূর্তে যথার্থ মনে হল। কিন্তু কোথায় মা যেত? অফিস-আদালতে ছুটি হয়ে যায়। আলো থাকতে থাকতে সবাই ফেরে। কেবল তার দেখা নেই। অথচ রাতারাতি এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাচ্ছেও সবাই। দলে-দলে কাতারে-কাতারে লোক অন্ধকার নিরুদ্দেশের বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রাণের চেয়ে কাকে মায়া? অবস্থা বুঝে লতিকাকে অবশ্য কয়েক মাস আগেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে সে চিরজীবন এখানে, এই শহরেই থেকে যাবে এমনি আশাই বুঝি ছিল। তাই লতিকা চলে গেলে চিঠি লিখে একবার তাঁর খোঁজটুকু নেবার গরজও যেন থাকে না। মনে-মনে লতিকাও বুঝি মেনে গেল, সমস্ত সম্পর্কের এইখানেই ইতি।

কিন্তু না। তারপরেও আসে খবর। আনন্দকে নিয়ে আসামের পথে পাড়ি জমিয়েছেন হৃষিকেশ। ভণিতা ছাড়াই প্রকাশ করেছেন সব। কপটতা তাঁর স্বভাবে ছিল না কোথাও। নিজেকে মিথ্যার আড়ালে গোপন করে রাখার মত হীন দুর্বলতা। কিন্তু লতিকা যে ভুলে যান সব। তাঁর অতীত! কালিদাস, গোপন প্রণয়, প্রণয়ের তিক্ত ফসল! মুকুল তখন কাছেই। কতটুকু আর? ঠিক মনে নেই। কিন্তু সে মেয়ে যেন দুচোখের বিষ। ঝি-চাকর কেউ কাছে নিয়ে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। রায়বাহাদুরের দিনও বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। নিজের ভুলের কথা ভেবে তখন আর আফসোসের অন্ত নেই তাঁর। কালিদাসকে তিনিই ডেকে বলেন, 'বড় ভুল হয়ে গেছে কালিদাস। এমন করে যে সব মাটি হবে, সমস্ত আশায় ছাই পড়বে ভাবি নি। তুমি ওর বন্ধু ছিলে। কথাটাকে একটুও গুরুত্ব দিইনি তখন। এখন এ আমার পাপ। আমাকেই আজীবন বহন করতে হবে। তাছাড়া কে আছে? তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখও তো আমার নেই। আমি যে তোমাদের সকলের ক্ষমার অযোগ্য।'

কৃতঘ্ন তিনি নন। তাই প্রতিদিন অন্তত একবার রায়বাহাদুরকে দেখে যেতেন। তাছাড়া লতিকার আকর্ষণই কি কম? দীর্ঘ দিনের অদর্শনে সেই আকর্ষণই যেন তীব্র হয়েছে, টান হয়েছে আরো গভীর।

লতিকাই একদিন ডেকে পাঠালেন। হাতে চিঠি গুঁজে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো।'

'কার চিঠি?'

'হৃষিকেশের।'

'কী লিখেছেন?'

'আমি তো তোমাকে পড়তেই দিয়েছি কালিদাস। না পড়লে কেমন করে বুঝবে?'

লতিকার চোখে জল। কণ্ঠ শুনে হতচকিত কালিদাস ভেবে পান না, কী করবেন। হাত ধরে আস্তে কাছে টানেন। অস্ফুটগলায় বলেন, 'লতিকা, এখনো ভুলতে পারো নি কিছুই?'

'আমাকে তুমি নিয়ে যাও কালিদাস। লোক-দেখানো এই সম্পর্কের জের আমি যে টানতে পারছি নে আর। বড় ক্লান্ত লাগে। তোমার মেয়েটাকেও প্রাণখুলে ভালোবাসতে পারিনে। আমি যে ওর মা! কথাটা কেমন করে ভুলি? হৃষিকেশ ওকে কৃপা করে জানি। তাই ঘৃণা হয় নিজের ওপরে, মেয়েটার ওপরে, জগৎসংসার সকলের ওপরেই।'

'আমাকে করো না?'

'করি। কাপুরুষ জেনে তোমাকে সব-চেয়ে বেশী ঘৃণা করি হয়তো।'

'কিন্তু আমার মেয়ে যদি আমি নিয়ে যাই? সকলকে জানিয়ে নিয়ে যাই যদি আজ?'

'চাইলেই দেবো নাকি? আমার কোন অধিকার নেই? এত বড় অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে কে ওকে পৃথিবীতে নিয়ে এল? আজ কর্তব্যের তাগিদে তুমি মেয়েকে নিয়ে যাবে। আর সমস্ত স্নেহ-মমতা ভুলে আমি বুঝি এই অবহেলার ভেতরেই একলা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবো চিরকাল?'

'তা হয় না লতিকা। এখন আর তো একা নই। সংসারে আমার স্ত্রী আছেন, আছে সুশোভন। তাঁদের কাছে আজ আমি স্বামী, আমি বাবা। সেই সুখের, শান্তির, সম্মানের আসন থেকে তুমি কি আবার আমাকে পাঁকের ভেতরে টেনে নামাতে চাও? সেই অন্ধকারে?'

'কী, কী বললে কালিদাস? অন্ধকার পাঁকের ভেতরে আমি তোমাকে টেনে নামিয়েছিলাম? এতবড়—এতবড় নিষ্ঠুর তুমি কালিদাস? আমি ভাবিনি, কোন দিন এত ছোট করে ভাবতে পারিনি তোমাকে।'

অন্ধকার ছাদের ওপরে বসে নক্ষত্র দেখছিলেন কালিদাস। চাপাগলায় লতিকার কান্না শুনতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু অনুভবের শক্তি যেন হারিয়ে ফেলছিলেন অকস্মাৎ। লতিকা বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেও যেন এতটুকু ব্যস্ত, বিচলিত হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোথাও। সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাটাই চোখের ওপরে মিলিয়ে যাচ্ছিল, লুপ্ত হচ্ছিল ক্রমশ। এমন কি দ্রুত নীচে নেমে যাবার কথাটা অবধি মনে পড়ছিল না তাঁর। খেয়াল হল অনেক, অনেকক্ষণ পরে লতিকার গলা শুনেই।

'যাও, আর কখনো এই মুখ নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িও না কালিদাস। জীবনে আমি যেন আর কোন দিন দেখতে না পাই। তাহলে মরে যাবো, নির্ঘাৎ মরে যাবো আমি।'

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ক্লান্ত, শিথিল পায়ে টলতে-টলতে যেন দীর্ঘকাল পরে বাইরে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালেন কালিদাস। আজ আর রায়বাহাদুরের সঙ্গে একবার দেখা করার কথাটা মনে পড়ল না তাঁর? তিনি তখন বসবার ঘরে একা। খল থেকে মকরধ্বজ চেটে নিচ্ছেন। হয়তো আশা, যাবার আগে অন্তত একবার দেখা দেবেন কালিদাস। কিন্তু তিনি যে একাগ্র-ভাবে লতিকার কান্নার তালে-তালে অসহায়ের মত বেজে চলেছেন। অনেক দূরে লতিকা তখন জমাট শিলার মত কান্নায় নিথর। হৃষিকেশের চিঠিটা কিন্তু কালিদাসের হাতেই রয়ে গেছে। পড়া আর হয় নি। কথাটা মনে পড়তেই দ্রুত বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

……তোমার যেমন মুকুল, আমার তেমনি আনন্দ। একদিন মুকুলকে গ্রহণ করেছি নির্দ্বিধায়। আজ তুমি আমার আনন্দকে নেবে না? ওদের কোন অপরাধ নেই। আমাদেরই কামনা-বাসনার ……

'কালিদাসবাবু!'

'কে?' চিঠি রেখে ছুটে বেরিয়ে এলেন কালিদাস। ফটকের দরজা খুলে দিলেন।

'লতিকা বিষ খেয়েছেন। একবার যেতে হবে যে।'

কিছুই লিখে রেখে যান নি। কত লোকে কত কাব্য করে। আর লতিকা কিনা বুকের খাঁজে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেছে: 'ওগো! এই বুকে বড় ব্যথা!'

বুড়ো বাপকেও দায়ী করে নি। মরা মাকেই উদ্দেশ্য করে লিখে রেখে গেছে। বড় কদর্য, বড় নিষ্ঠুর এই সংসার। এখানে থাকার চেয়ে মুক্তি না থাকাতেই দুঃখ। লতিকা তাই সকলের আগে স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেন।

কেমন করে কী হয়ে যায়! সব কথা শুনে মুকুল যেন স্থির হয়ে ওঠে। তার মু

'তুমি ছিলে। কিন্তু তোমার সেই থাকাটা যে কী দুঃসহ মনে হত তখন। আমি পাষন্ড তাই বাপ হয়ে দিন-রাত মেয়ের মৃত্যুই প্রার্থনা করেছি। পাছে দেখা হয়ে যায়। সব কথাই জেনে ফেলে সবাই। আমি যে কেবল অর্থের, খ্যাতির মোহে মশগুল হয়ে আছি তখন। পাপ-পুণ্যের বেড়া ভেঙে সকলের ওপরে উঠতে চাইছি।'

আবেগে থর-থর করছিল গলা। দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করেই নিরুচ্চার বসে থাকে মুকুল। আরো শান্ত, আরো শীতল, আরো সহনীয় করে তোলে নিজেকে। এখনো যে অন্ধকারেই থেকে গেছে সব। নিজেকে প্রায় অর্ধেক চেনা বাকী। কে তার মা, কে তার বাবা, কী তার পরিচয়—কিছুই যে জানে না মুকুল। নিজেকে তাই অচ্ছ্যুৎ, অপাঙক্তেয় ঠেকে সে যেন এই সংসারের কেউ নয়। তার যেন কিছুই নেই।

কারই বা আছে! চেঁচিয়ে কে বলতে পারে, এই ঘর আমার। এই বাড়ির মালিক স্বয়ং আমি! এই যে সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবী, সমুদ্রমেখলা বিপুল বসুধা এইসব, সমস্তকিছুর নিয়তিনির্ধারিত একমাত্র ঈশ্বর আমিই!

পারে না। তবু এমন করেই বুঝি বলতে চায় সবাই। ভাবতে চায়, সে ছাড়া সংসার অচল।

'তবু দেখা হয়। থাকতে না পেরে নিজে চেঁচিয়ে সব কথা জানিয়ে দিতে চাই। নিজেকে গোপন করে রাখার মত শক্তি যে আর নেই। অহরহ মনে হচ্ছে এ যে পাপ! এ যে অন্যায়! এ যে মূর্খতা! আমি অন্যকে ফাঁকি দিতে চেয়ে শেষ অবধি কি নিজের চরম হারকেই মেনে নিচ্ছিনে?

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে দু' পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন।

বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। দ্রুত সরে যাবার শব্দ শোনা গেল। সাড়া পেয়ে প্রায় ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন কালিদাস।

'কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে।'

'কেউ না। ও যে হাওয়া।'

মুকুল যেন নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত হতেই বলে। উত্তেজনার নাম-গন্ধ নেই কথায়। সেই বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের মুখোশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে সে যেন অনায়াস সহজ, স্বাভাবিক হতে চাইছে। আরো সুস্থ, সবল মন-প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে। সে তাই উদ্‌গ্রীব, উৎসুক চোখ মেলে চেয়ে থাকে। মন-প্রাণ দিয়ে দেখতে চায়, বুঝে নিতে চায় সব।

চুরুট ধরিয়ে তিনি আবার ভাবেন। আগা-গোড়া সমস্ত ঘটনাই যেন আরেকবার তলিয়ে দেখে নিতে চান।

'মুকুল!'

'বলুন।'

'আমি ভয় পাচ্ছি।'

'কাকে?'

'নিজেকেই।'

'কেন?'

'জবাব দিতে হবে যে। যাবার সময় ঘনিয়ে এল। এখন যে-কোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে। অথচ সম্বল বলতে একটা কানাকড়িও আমার হাতে নেই যা নিয়ে খেয়ায় উঠে বসতে পারি। ভাবছি, তাঁর কাছেও কি চালাকি টেকে? ভিড়ের মাঝখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলেও কি তিনি ধরে ফেলবেন না? ফাঁকি দিয়ে চলেছি জেনে যদি মাঝদরিয়ায় ফেলে দেন?'

'তাই কি হয়? চোরের মালিক যিনি, সাধুর মালিকও যে তিনিই। ভালো-মন্দ তাঁরই বিধান।'

'তা ঠিক। তাঁর নাম যে পাতকীতাড়ন। তা ছাড়া এপারের বিচার বোধকরি এপারেই হয়ে যায়।'

বলতে বলতে নিজেকে সামলে নিলেন কালিদাস। মুকুলের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। আজ তাঁর কষ্ট হচ্ছে। অপরিসীম দুঃখের ভারে তিনি যেন প্রকাশ্যে ভেঙে পড়ার মতলবই করেছেন। অথচ তাঁর মত চাপা আর গম্ভীর মানুষ নাকি মেলে না। অন্তত মুকুলের ধারণা ছিল তাই। এখন কিন্তু করুণ, হাস্যকর ঠেকে। দেখে মনে হয় না, এই মানুষ অত বড় আত্মাভিমানী। অতখানি আত্মসচেতন। বরং মায়া করতে ইচ্ছে হয়। সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে নিরস্ত করতে। এতকাল পরে বন্ধ দুয়ার খুলে কী লাভ? পুরোনো দিন কি আর ফেরে? সেদিনের সেইসব মানুষ? বরং এই হাহাকার শুনে হেসে উঠবে সবাই। দেখিয়ে না হোক, লুকিয়ে লুকিয়ে তারা যে মজা পাবে, ঔৎসুক্যে উদ্দীপনায় প্রায় শিশুর মত চঞ্চল, অস্থির হবে মুকুল তা জানে।

'শেষ অবধি আমারই হার হল, মুকুল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি যেন সচেতন হতে চাইলেন। শেষের কথাটাই শুরু করতে চাইলেন এবার।

বাইরে কাকের কলহ শোনা গেল। দরজার শেকল খোলার শব্দ হল কোথায়। বুকের ভার ক্রমশ লঘু হয়ে আসে। মুখে-চোখে উজ্জ্বল প্রসন্নতা ফুটিয়ে তোলে মুকুল। আনন্দের জন্যে সেই তীব্র ব্যাকুলতা, অভাবের সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ধীরে ধীরে সহ্যের সীমার ভেতরে এসে দাঁড়ায়। জানলার ফাঁকে আনমনা চেয়ে থাকে। আলতো হাওয়ার হাতে বাগানের লতা-পাতা দোল খায়। রোদের গভীর থেকে দোয়েলের মিষ্টি ডাক ভেসে আসে। ঘাস-মাটি-ফুলের সুগন্ধে ঘর ভরে যায়।

'খবর পেলুম একদিন তোমাকেও নিয়ে গেছে হৃষীকেশ।'

'হ্যাঁ, আমাকে তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি অনেক বড় হবো, এই ছিল তাঁর আশা। আমার জন্যে ব্যবস্থার কোনো ত্রুটিই তাই করেননি।'

কালিদাস থতমত খেলেন। বারকয়েক ঢোক গিলে শেষে প্রায় কৈফিয়তের সুরে বলেন, 'আমি কিন্তু তোকে ভুলতে পারিনি মুকুল। তারপর থেকে তোকে খুঁজে বেড়িয়েছি কেবল। শেষে রাজগীরে দেখা হয়ে গেল হৃষীকেশের সঙ্গে। সমস্ত অপরাধের কথা তার কাছে স্বীকার করেছি। ক্ষমা চেয়ে বলেছি, তুমি ফিরে চল হৃষীকেশ। মুকুল তোমারই মেয়ে। তোমার পরিচয়ই তার পরিচয়। আমার কিংবা লতিকার ভুলের জন্যে তাকে এমন করে শাস্তি দিও না।'

তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ বুজে এল। মাথা নীচু করে তাই বসে থাকেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, আজ আর কোনো দ্বিধাই রাখবেন না। বুকের ভেতরে পাপ পুষে রেখে বাইরে পবিত্র হতে চাওয়া হাস্যকর। নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী ঠেকে, বোকা মনে হয়। এখন যদি সব কথা শুনে তাঁকে ঘৃণা করে মুকুল? আপত্তি নেই। তাঁর ভয় নেই একটুও। প্রভার চোখে তো তিনি চিরদিনের অপরাধী। আজ না হয় নতুন করে মুকুলের কাছে হবেন। সুশোভন কিছু না জেনেই চলে গেছে। অর্ধেক শুনে আনন্দ বিদায় নিয়েছে কাল। এবার মুকুল সবটুকু শুনে তাঁকে ঘৃণায়, অপমানে দগ্ধ করতে পারবে? ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে যেদিকে দু' চোখ যায়? তাহলেই তিনি নিশ্চিন্ত, নির্ভার হতে পারেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেও যেদিকে খুশি বেরিয়ে যেতে পারেন। প্রভা নিশ্চয়ই পথ আগলে দাঁড়াবেন না তখন? দাঁড়ালে বুঝিয়ে বলা যাবে, তোমার তো আছে সব। আমি ছাড়া যা-কিছু সবই তোমার। বল তো কোনোদিন কি আমাকে আপন মনে হয়েছে তোমার? অবশ্য এই না হওয়ার মূলে তুমি নও। আমিই। আমিই তোমাকে আপন করে নিতে পারিনি। নিজেও আপন হতে পারিনি তোমার। সারাক্ষণই লতিকার স্মৃতিই যে দগ্ধ করেছে আমাকে। থেকে থেকে মুকুলকেই মনে পড়েছে কেবল। তুমি ভুল বুঝেছিলে, আর কাউকে ভালোবেসে আমি তোমাকেই অবহেলা করেছি চিরদিন।

'মরার আগে তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে আপনার কথা ছিল।'

'আমাকে আর কোনোদিন কিছুই লেখেনি।'

আফশোসের সুরে কথা বলেন। আবার মলিন মনে হল তাঁকে।

'তবু বিশ্বাস ছিল, একদিন দেখা পাবো। সুশোভন চলে গেলে আমি তোর পথের দিকেই চেয়েছিলাম, মুকুল।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মুকুল উঠে দাঁড়ায়। তাঁর মাথা নেই ডেকে বসাবার। তবু শেষবারের মতই আকুল আহ্বান শোনা গেল। শুনে ক্লান্ত, বিপন্ন মনে হল তাঁকে।

'আরো যে কথা ছিল মুকুল।'
'ওইটুকু না হয় গোপন থাক।'

যেতে যেতে চৌকাঠের ওপারে থমকে দাঁড়ায় মুকুল। নিষ্ঠুর, নির্বিকার কণ্ঠ তার।

কালিদাস আহত হলেন কিনা কে জানে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন একবার। তারপরেই বসে পড়লেন। ঝি এসে টেবিলের ওপরে আলো জ্বালিয়ে রেখে গেল। তিনি টেরও পেলেন না, কখন দিন ফুরিয়ে রাত শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার গুটি-গুটি পায়ে বাইরে থেকে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলোর ওপারে অন্ধকারের দিকে চেয়ে তাঁর বুক থেকে কান্না উঠে এল। এক সময় আরো গভীর অন্ধকারের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে চরাচর লুপ্তপ্রায়। বহুদূরে আকাশের মাঝ বরাবর কালপুরুষের উজ্জ্বল উপস্থিতিই যেন সহসা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ মনে হল তার। সমস্ত ভয় থেকে, ভাবনা থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেতে চেয়ে গরাদের গায়ে হাত রাখলেন তিনি। নিশ্চিন্ত হতে চেয়ে বাইরে নিশ্ছিদ্র, নিকষ অন্ধকারে চোখ মেলে দিলেন।

গাড়ি তৈরীই ছিল। সুদাসের সেই বুড়ো কালো ঘোড়া আর আস্তাবলের এক কোণে এতকাল অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকা ভাঙা ফিটনগাড়িটা। বিকেল থেকে প্রভাই বুঝি সুদামকে দিয়ে ঠিকঠাক করিয়ে রেখেছেন সব। সুদামও তৈরী। তার পরনে আজ উজ্জ্বল পোশাক-আশাক। মনটাও আগের তুলনায় অনেকখানি চাঙ্গা।

না খেয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল মুকুল। ঘুমের ঘোরে কখন অসাড়, অচেতন হয়ে গিয়েছে জানে না। আচমকা গায়ে ঠেলা দিতে উঠে বসে। এমন চোখে তাকায় যেন প্রভাকে সে চেনে না। খোলা জানলার ওপারে দুধে ধোয়া আকাশ চোখে পড়ে। অন্ধকারের ওপার থেকে অজান্তে চাঁদ উঠে এসেছে কখন। বিছানার ওপরে রুপোর পাতের মত কয়েক ফালি জ্যোৎস্না অচল, অনড় হয়ে পড়ে আছে। ঘরে-বাইরে জগৎ সংসার মূর্ছিত, অসাড় মনে হয়। হাওয়া নেই। তবু ঘাস-মাটি-ফুলের গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে সব। মুকুল তার শৈশব-কৈশোরের প্রায় সমস্ত কথাই ভাবতে পারে এখন। চাঁদের আলোর স্পর্শ বাঁচিয়ে বেশ খানিকটা দূরে বসে থাকা প্রভার দিকে চেয়ে লতিকার কথা ভাবতে পারে। কাতিকের মানুষ কখনো চোখে দেখেনি মুকুল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বুঝি তার পূর্বজন্মের কথাও স্মরণ করতে পারে। নদী থেকে পশ্চিমের সেই ছোট্ট শহর, তারপর কলকাতা—কিছুই তার স্মৃতি থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। একে-একে মনে পড়ে সব—সমস্ত কথাই। হৃষীকেশ, লতিকা, রায়বাহাদুর—একে-একে ভিড় করে দাঁড়ায় সবাই। অথচ কতদিন হয়ে গেল তাঁরা নেই।

ধীরে ধীরে সব কথাই মনে পড়ল মুকুলের। কালিদাসের কথাগুলিই নতুন করে আরেকবার স্মরণ হল তার। মুহূর্তে সে যেন মিইয়ে গেল। ভাবল, এ জীবনে আনন্দের সঙ্গে যদি দেখা হয় ফের তাহলে কেমন করে মুখ দেখাবে সে! যেন সমস্ত অপরাধ তার। হৃষীকেশ, কালিদাস কিংবা লতিকার জীবনে শান্তি ছিল না কোথাও। ঘৃণা আর অবিশ্বাস নিয়ে তাঁরা বেঁচে থাকতে চেয়েছেন সবাই। অথচ অমন বাঁচা অসম্ভব। তাই দুজনকে মরা আর মরার বাড়া বেঁচে থাকার পথ বেছে নিতে হয়। অনাত্মজন স্বনির্বাচিত স্বর্গেই নির্বাসনকে ভাবেন শ্রেয়। মুকুল এসব কিছুই চায়নি। অথচ তাকেই কী নির্মম আঘাত সইতে হয়।

'উঠে এসো মুকুল।'

প্রভা তার গায়ে হাত রাখেন। একই সঙ্গে কণ্ঠে আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা ফুটিয়ে কাছে ডাকেন।

'মুকুল, মুকুল!'

'মা, মা গো! তুমি আমাকে ধরো। আমি যে দেখতে পাচ্ছিনে কিছুই। এখন অন্ধকার ঠেকে সব, মিথ্যে মনে হয়।'

ঘুমের ভেতরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মুকুল।

আর দেখতে পায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে প্রভা তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরেন। সস্নেহে, আবেগজড়ানো গলায় বলেন, 'এবার আমরা পালিয়ে যাবো মুকুল।'

'কোথায়? আমার তো কেউ নেই।'

বড় হতাশ, বড় বিবর্ণ শোনাল মুকুলের গলা। নিজের কাছেই নিজেকে অচেনা ঠেকে তার। যে কারণ বিস্ময়ে চমকে উঠে আরেকবার খতিয়ে দেখে নিতে চায়, বুঝে নিতে চায় মুকুল, এই ঘর-বাড়ি, এমনকি সে নিজে অর্থাৎ তার উপস্থিতি কতখানি খাঁটি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না মুকুল। বরং স্বপ্নের চেয়ে আরো সুন্দর, ভয়াবহ, রোমাঞ্চকর এবং আরো অবাস্তব ঠেকে সব। যা তার মনের ভেতরে নিরুপায় দুঃখ এবং নিষ্ফল প্রতিহিংসার বাসনাকেই শতগুণ তীব্র, অশান্ত করে তোলে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রভা। তাঁর মুঠোর ভেতরে আহত, আর্ত পাখির মত মুকুলের শীতল, নিষ্পন্দ হাত।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নার ভেতরে প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সব। সিঁড়ির নিচে অশ্বহীন গাড়িটা এসে দাঁড়ালে তাঁরা দুজনেই চোরের মত চুপি-চুপি উঠে বসেন। এতক্ষণে মুকুল যেন টের পায়, সত্যিই পালিয়ে যাচ্ছে সে! একবার কালিদাসের কথাই কি মনে হল তার? কিন্তু প্রভার দিকে চেয়ে সে যেন মুহূর্তে নীল হয়ে গেল। সুদাস অবধি সব ছেড়ে-ছুড়ে সঙ্গ নিয়েছে তার! এটা কেমন করে সম্ভব হল, বুঝতে পারে না মুকুল। তাহলে যক্ষের মত একা এই বিশাল পুরী আগলে থাকবে কে? কালিদাস? বুকের ভেতরে প্রায় অজান্তে মোচড় দিয়ে ওঠে। নেমে যাবে কি যাবে না ভাবার আগেই চোখের ওপরে রংচটা, ভাঙা কাঠের দরজাটা টেনে দিলেন প্রভা। তিনি যেন মুকুলের মনের কথা শুনতে পেয়েছেন সব। তার মুখের দিকে অপলক শিকারী চোখ দুটি স্থির নিবদ্ধ রেখে নিষ্ঠুর শীতল কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চল, সুদাস!'

বাইরে চাঁদের আলোয় অসাড়, অচেতন বৃক্ষ সব। রূপকথার মৃত্যুপুরীর মত বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট, গাছ-পালা নিষ্প্রাণ, নিঃঝুম মনে হয়। মুকুল চেয়ে থাকে। সামনে অন্তহীন পথরেখা অপরিচয়ের অন্ধকারে উধাও। ঘোড়ার খুরের একটানা শব্দে যেন সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, জ্যোৎস্নারাশি এতক্ষণে গুঁড়িয়ে একাকার। অল্প শীত করছিল শিশিরভেজা ধুলো আর ঘাস আর বনের গন্ধে তার মন, তার চেতনা ক্রমশ আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে আসে। জড়িয়ে জড়িয়ে সে যেন শেষবারের মতই উচ্চারণ করে, 'এমন করে কোথায় চলেছি আমরা?'

প্রতিধ্বনি কথা বলে, 'আনন্দের কাছে।'

'সে কি আছে! সে কি আছে আর!'

এ যেন অন্তহীন পথের শেষহীন সংলাপ। কে জানে কোথায়, কখন সমাপ্তি কার!

দেখতে দেখতে সেই বুড়ো ঘোড়াটাই এখন উল্কার মত উদ্দাম হয়ে ছোটে। শহর ছাড়িয়ে তারা গ্রামের পথে পড়ে। দূরে, বহুদূরে সূর্যোদয়ের দিগন্ত ক্রমশ উজ্জ্বল জলরেখার মত কাঁপে।

আর এখানে নিশ্চল দুটি প্রাণ। তাদের ভেতরে অবাধ, অনর্গল ইচ্ছা, বাসনা, স্বপ্ন যেন ক্লান্তিহীন। তাদের দেহে-মনে আর কোনো শ্রান্তি নেই, শোক নেই, তাপ নেই। ভেতরে-বাইরে চিরকালের মত পূর্ণ হয়ে আছে তারা। কেবল একবার, এবং এই শেষ-বার অত্যন্ত গোপনে চোখ দুটি ছলছলিয়ে ওঠে মুকুলের। মনে পড়ে, কালিদাস থেকে গেলেন একা। তাঁর কেউ রইল না, কিছুই রইল না। আর সুদাস? ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে তার বাজখাই গলায় আজ আর একটিবারও হেঁকে ওঠে না, 'খবরদার!' জমাট কান্নার মত সে এখন স্থির, মৌন, মূর্তিমান। যেন এখনো তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে অনড়, অচল অন্ধকারের দুর্ভেদ্য অহমিকা। প্রায় অলঙ্ঘ্য সেই বাধার প্রাচীর। যার গায়ে মরচেধরা সেই ছোট্ট লোহার ফটক।

পেছনে অপসৃয়মান মাঠ-বন-পাহাড়ের সারি আরো দুরন্ত, আরো দুর্নিবার মনে হয়।

—শেষ—

একটি স্মৃতি ঃ

এ পি পেনেল

হেমন্তকুমার সেনগুপ্ত

এ. পি. পেনেল জাতিতে আইরিশ। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ভারতে আসেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ছাপরার সেসন জজের পদে কাজ করেছিলেন। এই সময় করবেট নামে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁধ ভরাটের জন্য নরসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন, সে এই কাজ করতে অসম্মত হয়। এই অপরাধে সাহেব তাকে গুরুতরভাবে প্রহার করেন। নরসিংহ ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য স্থানীয় সিভিল সার্জন ক্যাপ্টেন মিঃ ম্যাডক্সের নিকটে উপস্থিত হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হুইভেল ও পুলিশ সুপার মিঃ ব্র্যাডলির নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করেন এবং চারি-জনে পরামর্শ করে নরসিংহ ছত্রীকে সরকারী কাজে বাধা দেবার মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত করে এক মোকদ্দমার বিচারার্থ জাকির হোসেন নামে জনৈক ডেপুটির নিকট প্রেরণ করেন। আসামীকে কারাগারে পাঠান হয়। আসামীর উকিল 'এফিডেবিট'-যোগে জজ পেনেল সাহেবকে ঘটনার কথা জ্ঞাপন করলে তিনি অনুসন্ধান করে আসামীকে মুক্তিদান করে বিচারক জাকির হোসেন, ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং সহ-পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি চারিজন উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। ফলে দেশে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। বাঙলার গভর্নর স্যর জন উড্‌বার্ন তারযোগে পেনেল সাহেবকে নোয়াখালির মত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী করেন। পেনেল সাহেব নোয়াখালি আসার অল্প পরেই ছোটলাট স্যর জন উড্‌বার্ন চীফ সেক্রেটারী মিঃ বোল্টনকে নিয়ে জেলখানা পরিদর্শনের অছিলায় সেখানে এসেছিলেন এবং জজ মিঃ পেনেলকে খাসকামরায় ডেকে এনে ছাপরার মামলার কথা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে পেনেল সাহেবকে নিন্দা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নোয়াখালিতেও আর একটি মামলার জন্য দেশে আবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক খুনের মামলার বিচারকালে আসামীর স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার অপরাধে জজ পেনেল সাহেব নোয়াখালির পুলিশ সাহেব মিঃ রেলীকে হাজতবাসের আদেশ প্রদান করেন।

শ্বেতাঙ্গ সমাজে হুলুস্থুলু পড়ে যায়। হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস্ স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকলিন তারযোগে রেলী সাহেবের মুক্তির আদেশ দেন এবং তারই অনুরোধক্রমে পেনেল সাহেবকে অস্থায়ী-ভাবে কর্মচ্যুত করা হয়। পেনেল সাহেবের রায় তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী হয়েছিল। তিনি এতে ইংরাজের শাসনপ্রণালীর ত্রুটি-বিচ্যুতির, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পক্ষ-পাতিত্ব সমস্তই বিশদভাবে বর্ণনা করে পরিশিষ্টে অনেক গোপনীয় চিঠি, সার্কুলার ইত্যাদি যোগ করে দিয়েছিলেন। বাঙলার ছোটলাট, চীফ সেক্রেটারী, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এমনকি বড়লাটের কার্য-প্রণালীরও সমালোচনা করা হয়েছিল। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী লর্ড কার্জন তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি পেনেল সাহেবকে বরখাস্ত করবার জন্য ভারত-সচিবের নিকট লিখেছিলেন। এদেশীয়দের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির জন্য পেনেলের খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। নোয়াখালির ঘটনায় তাঁর এই লাঞ্ছনার পর তা অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে দাঁড়াল। নানা 'বার অ্যাসো-সিয়েশন' থেকে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আহ্বান আসতে থাকে। কারণ, উকিল-সম্প্রদায়ই ছিলেন সে-সময় মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদূত। বরিশালের সাদর আহ্বানে তিনি সর্বাগ্রে সাড়া দিলেন। অশ্বিনীবাবু (অশ্বিনীকুমার দত্ত) সকলকে বললেন, 'পেনেল সাহেব আসছেন—সম্বর্ধনার আয়ো-জন কর।' বরিশালে অবর্ণনীয় উদ্দীপনার সঞ্চার হল। উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যার যা সাধ্য, সে সেইভাবে সাহায্য করতে থাকে। আমাদের কলেজ-হলে অভ্যর্থনা করা হবে। বিশাল হলটি অতি পরিপাটি করে সাজান হল। রূপাতাল থেকে গাড়ী-বোঝাই দেব-দারু পাতা, লাখুটিয়া থেকে গাড়ী-বোঝাই জলপদ্ম, নানারকম ফুলপাতা কলেজ-প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত হল। বরিশালে তখন বিখ্যাত বোম্বাই সার্কাস পার্টি এসেছিল। তাঁরা সার্কাস বন্ধ রেখে তাঁদের আলোক-সম্ভার দিলেন। কলেজ-হলের দক্ষিণাংশে একটি মঞ্চ নির্মিত হল। ব্রাউন সাহেবের বাড়ী থেকে বসবার চেয়ার ও হাওয়া করবার বড় পাখা আনান হল। কীর্তি-পাশার জমিদার-বাড়ী থেকে আসল মখমল কিংখাব ইত্যাদি। একটি বৃহৎ সাবুগাছের ছড়া আলোকমালায় সজ্জিত করে চন্দ্রাতপ-রূপে টাঙান হল। পত্র, পুষ্প, আলোক-মালা-শোভিত অভ্যর্থনার স্থানটিকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। নোয়াখালি থেকে পেনেল সাহেব স্টীমারে আসবেন এই 'প্রোগ্রাম' ছিল। স্টীমার পৌঁছবার সময় অনির্দিষ্ট। সন্ধ্যার পূর্ব থেকেই শুধু সুবৃহৎ হলঘরটি নয়, সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ, এমনকি রাস্তা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। এইরূপ বিপুল জনসমাবেশ বরিশালে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়েস্টন সাহেব স্টীমারঘাট থেকে শোভাযাত্রা করে সভাস্থলে আসবার অনুমতি দেননি। নেতৃ-বৃন্দ স্টেশনেই অপেক্ষা করছিলেন। মিনিট-পনের অন্তর স্টীমারঘাট থেকে সাইকেল-যোগে পেনেল [illegible] পৌঁছেছেন কিনা এই সংবাদ আসছিল। [illegible] শিক্ষক তারিণী সেন মহাশয় দাঁড়িয়ে 'পেনেল সাহেব' এই কথা বলবামাত্র সেই বিরাট জনতা গর্জিয়ে উঠে 'থ্রি চিয়ার্স ফর মিঃ পেনেল'—এই বলে চীৎকার করে ওঠে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তখনও প্রচলিত হয়নি। পেনেল সাহেব আসেননি, অগত্যাই এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করে হতাশভাবে সেন মহাশয় বসে পড়লেন। বারবার এর পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। রাত্রি দশটায় খবর আসল যে, সেদিন সাহেব আসবেন না। জনতা ক্রমে ক্রমে কমতে লাগল। ঐ রাত্রেই তিনি পৌঁছেছিলেন—রাত্রি তিনটায়। পরের দিন সকালে সভা করবার প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু রাত্রের আলোকসজ্জা ব্যতীত সভার 'বাহার' খুলবে না বলে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। সাহেব জেলা বোর্ডের ডাকবাংলায় ছিলেন। পরের দিন সন্ধ্যার পরে ঐ সভার অধি-বেশন হয়। ঘোড়ার গাড়ীতে সাহেব কলেজের রাস্তায় পৌঁছলে ঘোড়া খুলে ঐ গাড়ীখানি নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র-সম্প্রদায় নিজেরাই বহন করেন। 'হিপ্ হিপ্ হুররে', 'পেনেল সাহেব কি জয়' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত হচ্ছিল। প্রায় কাঁধে করে পেনেল সাহেবকে এনে নির্দিষ্ট আসনে বসান হল। কালীবাড়ী থেকে পুরোহিত ঠাকুর 'প্রসাদী ফুল, বিল্বপত্র ইত্যাদি এনে সাহেবকে আশীর্বাদ করলেন। সাহেব সসম্ভ্রমে উঠে নিজের মাথায় দিলেন। মসজিদ থেকে জনৈক মৌলবী এসে 'দোয়া' করলেন। পাদ্রী স্পার্জন সাহেব এসেও অভিবাদন জানালেন। তারপর মালাদানের পালা আরম্ভ হল। নেতৃবর্গ বিশেষ কেউ কিছু বলতে পারলেন না—অশ্বিনীবাবুও নয়। সকলেরই ক্রমাগত চীৎকার করতে করতে স্বর ভেঙে গিয়েছিল। একমাত্র প্রবীণ শিক্ষাব্রতী পরেশবাবু তাঁর জলদগম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা বলতে পেরেছিলেন। তার ২। ১ লাইন মনে আছে।

> 'We had Lord Ripon as our vice-roy — we had Sir Barness Pea-cock as our chief-justice, we have our Pennell now'.

প্রত্যুত্তর দিতে উঠে পেনেল সাহেবও কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। ভাবাবেগে ক্রন্দন করে ফেললেন। বহুদিন পূর্বে কবিবর হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> 'ব্রিটিশ সিংহের বিকট বদনে
> না পারি নির্ভয় করিতে দরশন
> কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী
> জাহাজী গোরাঙ্গ কিংবা ভেকধারী
> সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।'

এই দিনে পেনেল সাহেবের সহৃদয়তার আন্তরিক পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ এই দেশ-বাসী অকপট-হৃদয় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে [illegible] সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৭ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 16th June 1967. শুক্রবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

'আমারে এ আঁধারে' প্রসঙ্গে

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ অমৃত পত্রিকায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শোভনা নন্দী মহাশয়ার পত্রখানির জন্য ধন্যবাদ। আমি তাঁর সাথে একমত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শগত বিরোধের ফলেই কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা চলতি কথায় নববিধান সমাজ। পরবর্তী জীবনে অতুলপ্রসাদ সেনের পিতা ডাঃ রামপ্রসাদ সেন এতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন যা আমার রচনায় উল্লেখ আছে। হিন্দু রাজ-পরিবারে কেশব সেনের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হল তারই পরবর্তী অধ্যায়ে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মদের নেতৃত্বে ১৫ই মে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে টাউন হলে ব্রাহ্মদের সভায় আহ্বান করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করা হল। ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই সর্বকনিষ্ঠ।

পত্রলেখিকাকে আমার ত্রুটিটুকু সংশোধন করানোর জন্য ধন্যবাদ।

কল্যাণকুমার বসু,
কলিকাতা : ২৯

॥ বাংলা সাহিত্যের একাডেমী ॥

২৮শে এপ্রিলের 'অমৃত'-এ বাংলা সাহিত্যের একাডেমী শীর্ষক মূল্যবান রচনাটি ভাল লেগেছে। বস্তুত বাংলা দেশে আজও একটা একাডেমী স্থাপিত হয় নি (স্টেডিয়ামের মতই) জেনে দুঃখ হয়। দিল্লীর তখ্‌ত-এ-তাউসে বসে যাঁরা একাডেমী পরিচালনা করেন—তাঁদের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকা চলে না, সেখানে হিন্দীর দাপটই বেশী। অথচ বাংলভাষার স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা। কিন্তু এই ভাষায় শুধুমাত্র সাহিত্যের বই-ই প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলা ভাষার চর্চা বা গবেষণা হয়ে উঠছে না। আজকাল কয়েকটি পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে অবশ্য কৃতী সাহিত্যিকদের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। কিন্তু সেটাই সব নয়। সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগে গুণী ব্যক্তিদের সম্মানিত করার ভার একাডেমীকে নিতে হবে। চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি প্রদেশে যেন এই প্রচেষ্টা সফল হয়। বাংলার বাইরে বহু প্রবাসী বাঙালী আছেন, যাঁদের মধ্যে শিক্ষিত ও বিদ্বান লোকের অভাব নেই, তাঁরাও এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হবেন! পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা বাংলা এবং সেখানেও একাডেমী যখন স্থাপন হতে পারে তখন ঐতিহ্যপূর্ণ মহানগরী কোলকাতায় একাডেমী স্থাপন করা কি খুব কষ্টকর? বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে এবিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন—তা জেনে আমরা খুশী হলাম। জাতীয় সংহতির রক্ষাকল্পে এই একাডেমী একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস। আমার মতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্যকর হলে একাডেমী জনপ্রিয় হবে :

(১) প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় বেশী অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ।

(২) প্রতিটি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে একাডেমীর আঞ্চলিক শাখাগঠন ও সাহিত্য-সেমিনার, পুস্তক প্রদর্শনী পরিচালনা করা।

(৩) শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার, কবি অথবা গবেষণাকারীকে পুরস্কার প্রদান।

(৪) বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা ও অভিধান প্রণয়ন করা।

(৫) একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিকে একাডেমীর কার্যকর্তা মনোনীত করা।

(৬) বাংলা ভাষায় পুস্তক, পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

(৭) স্বল্পমূল্যে উদীয়মান লেখকদের পুস্তক প্রকাশের সুযোগ দেওয়া।

(৮) প্রবীণ ও অক্ষম সাহিত্যিককে ভাতা বা সাহায্য প্রদান করা।

৯) সরকারী মুখাপেক্ষী না হয়ে, নিজস্ব ফান্ড বা তহবিল গঠন করা ও সভ্য-তালিকা রচনা করা।

(১০) মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করা।

সাহিত্যপ্রেমীরা আশা করি এ বিষয়ে একমত হবেন।

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক : "কাঁচাহাতের কাগজ"
রাঁচি—৪

॥ বিদেশী পথিক প্রসঙ্গে ॥

"অমৃত" পত্রিকার ২৪শে চৈত্রের সংখ্যার 'বিদেশী পথিক' রচনাটি পড়ে মনে হোলো যে আমাদের পর্যটন বিভাগের কতগুলো প্রাথমিক গলদ লেখক খুব সুন্দরভাবে এবং সময়োপযোগীভাবে তুলে ধরেছেন।

সত্যি, বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করতে গিয়ে আমরা বিলাসবহুল হোটেল-গুলোর সংখ্যা এবং মান উন্নত করতে হয়তো কিছুটা সচেষ্ট হয়েছি, কিন্তু সেই মেয়ে-দুটি এবং ছেলেটি, যারা নাচ-গান দেখিয়ে পয়সা যোগাড় করে ও দেশ দেখে বেড়াচ্ছে কিংবা 'মার্লে'র মতো মেয়ে, যে 'ব্রেড, বাটার ও ফ্রাইড এগ' দিয়ে লাঞ্চ করে ও ইন্ডিয়া দেশটা একটু ঘুরে দেখতে চায়, তাদের কথা কতটুকু ভেবেছি? 'হিচ্ হাইকে'র দেশ ইউরোপ আমেরিকার ছেলেমেয়েরা হয়তো এমনি কষ্ট সহ্য করেও দেশ দেখার উন্মাদনাটা ছেড়ে দিতে পারে না, কিন্তু 'মার্লে' মেয়েটি ভারত সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে ফিরে গেলো তা' আমাদের পক্ষে মোটেই সম্মান নয়। আমরা সেই Very important foreign personদের নিয়ে যতটা মাতামাতি করি, সে তুলনায় মার্লের মতো ভারতপথিকও আমাদের অনেকটা মনোযোগ আশা করতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে বিশ্ব পর্যটক সপ্তাহ উপলক্ষে পর্যটন মন্ত্রী ডঃ করণ সিংহের ভাষণ। পর্যটন আমাদের মনকে উদার করে। অনেক নতুন কিছু জানায়, দূরের মানুষকে কাছে এনে দেয়—এমনি অনেককিছু হয়তো আমরা অনেকবার শুনেছি, জানিও। অনেকসময় এটা কাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়, ঠিক বোঝা যায় না।

সাদা চোখে আমরা যা দেখছি তাতে বলতে পারি পর্যটনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন, সরকারী তরফে পর্যটন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলা, অল্প পয়সায় হোটেল গড়ে তোলা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাহাখরচ বাবদ সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা, ভ্রমণেচ্ছু সরকারী বেসরকারী কর্মচারীর জন্যে ছুটি পাওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি অনেককিছুই করণীয় রয়েছে।

তা' হলেই ভারতের মতো বিরাট দেশে এক প্রান্তের লোক আরেক প্রান্তের লোককে কাছ থেকে চিনতে পারবে। ঐতিহ্য তাদের সজাগ করবে, দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে। আর মার্লের মতো বিদেশী মেয়েও ভারত সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারণা নিয়ে ফিরে যাবে।

মানস মুখোপাধ্যায়,
অমৃতনগর,
আগরতলা, ত্রিপুরা

॥ ভোজপুরী ভাষা ॥

গত ২৮শে বৈশাখের অমৃতে শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোজপুরী ভাষা সম্পর্কে পত্রটি পড়েছি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিশুদ্ধ ভোজপুরীভাষী অঞ্চল হিসেবে আরা-ছাপরা প্রভৃতি এলাকার দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, ভোজপুরী ভাষা এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে। কিন্তু এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, উত্তর প্রদেশের সর্বত্র ভোজপুরীর প্রচলন নেই। বারাণসী, বলিয়া, গাজীপুর, আজমগড়, দেওরিয়া ইত্যাদি জেলার অধিবাসীরাই ভোজপুরীতে কথাবর্তা বলে থাকেন। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গোরক্ষপুরেও ভোজপুরী শোনা যায়।

বিহারের মধ্যে শাহাবাদ (আরা) এবং সারণ (ছাপরা) এই দুই জেলাই মুখ্য ভোজপুরীভাষী অঞ্চল। মোতিহারি এবং হাজীপুরেও ভোজপুরী প্রচলিত রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভোজপুর সম্ভবত শাহাবাদ (আরা) জেলায় পড়ে। এ সম্পর্কে পত্রলেখকের আর একটি মন্তব্যেরও বিনীত প্রতিবাদ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, রাঁচিরও অনেক লোক ভোজপুরীভাষী। আসল কথা এই, এমন অনেকে এই অঞ্চলে কর্ম উপলক্ষে রয়েছেন, ভোজপুরী যাঁদের কথ্যভাষা। তাঁরাই ভোজপুরীতে কথাবার্তা বলে থাকেন। রাঁচি জেলা ভোজপুরীভাষী নয়। (যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাঁচির কথ্যভাষার সঙ্গে ভোজপুরীর ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।)

শ্যামল সেন,
হীনু, রাঁচি।

অমৃত

যুদ্ধ ও শান্তি

গত সপ্তাহে সবচেয়ে উদ্বেগজনক সংবাদ এসেছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে। এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। তাই ইস্রায়েল কর্তৃক সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য আরব রাজ্য আক্রান্ত হওয়াতে ভারত স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এই এলাকার শান্তি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে। ভারত গোড়া থেকেই স্পষ্টভাষায় একথা বলেছিল যে, আরবজাতির ওপর ইস্রায়েলই প্রথম আক্রমণকারী। সুতরাং আমাদের সহানুভূতি আরবজাতিসমূহের প্রতিই। তবে একথা বলার অর্থ এই নয় যে, ইস্রায়েলের অস্তিত্বের আমরা বিরোধী। ইস্রায়েল রাষ্ট্রসংঘের সদস্য, এ-সত্য ভারত স্বীকার করে। ভারত ইস্রায়েলকে বোম্বাইয়ে একটি কনসাল আফিস খুলতেও অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এর বেশি কোনো যোগাযোগ ইস্রায়েলের সঙ্গে ভারতের নেই। আরবজাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ভারত সব সময়েই সমর্থন করে। কিন্তু কোনোরূপ ধর্মান্ধতার সমর্থক ভারত নয়। আরবজগতে মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে, ভারত সেই প্রগতিশীল শক্তিরই সমর্থক। সেই কারণেই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেই ভারতের ঘনিষ্ঠতা। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রও নানা সময়ে ভারতকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে।

ইস্রায়েলী আক্রমণে আরবজাতিসমূহের সামরিক পরাজয় ঘটেছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ন্যায্য দাবী সত্ত্বেও আরবজাতিসমূহ রণাঙ্গনে উন্নততর ইস্রায়েলী সেনাবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে। বিরাট আরব অঞ্চল আজ ইস্রায়েলের দখলে। চারদিন যুদ্ধের পর স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমরে পর্যুদস্ত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল নাসের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরব দেশসমূহের জনসাধারণ তাঁকে নিরস্ত করেছে। কারণ, নতুন আরব জাতীয়তাবাদ নাসেরকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। তিনি পরাজিত হলেও অন্যায় যুদ্ধেই তাঁকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। আক্রমণকারীর জয়ের দ্বারা একটা জাতির বা দেশের ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য কালিমালিপ্ত করে রাখা যায় না। আরব দেশগুলোর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

ইস্রায়েলীরা এতটা মারমুখী ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে, তারা গাজা অঞ্চলে শান্তিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘবাহিনীভুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের ওপর কাপুরোষিত আক্রমণ চালিয়ে সতেরজনকে হত্যা করে। রাষ্ট্রসংঘের পতাকা থাকা সত্ত্বেও তাদের আক্রমণ থেকে শান্তির প্রহরী ভারতীয় বাহিনীকে রেহাই দেয়নি। তাদের জঙ্গীবাহিনী ভূমধ্যসাগরে একটি মার্কিন জাহাজের ওপর আক্রমণ চালিয়েও চারজন নাবিককে হত্যা করে। তারা যেন সত্য সত্যই রণোন্মাদ হয়ে উঠেছিল। সামরিক শিক্ষায় অপটু আরবরা তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। এখন ইস্রায়েল চাইবে তার নিজের শর্তে আরবজাতিসমূহের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি। ইস্রায়েলী মুখপাত্ররা স্পষ্টতই বলাবলি করছেন যে, তাঁরা জেরুজালেম হাতছাড়া করবেন না, কারণ এই নগরী ইহুদীদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আকাবা উপসাগরের মুখে শার্ম এল্ শেখ দুর্গটিও তাঁদের চাই। তা না হলে ইস্রায়েলের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। সামরিক দখলদারী স্বীকার করে কোনো জাতির পক্ষেই শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়। আরবজাতিসমূহের বেলায় স্বস্তি পরিষদ নিশ্চয়ই তা হতে দিতে পারে না। যদি তা হয়, তবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে আক্রমণকারীদেরই উৎসাহ দেওয়া হবে।

এসম্পর্কে স্বস্তি পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। প্রাণহানি বন্ধ করার জনাই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভারত সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ৪ জুন তারিখের আগে আরব ও ইস্রায়েলী বাহিনী যে যেখানে ছিল, সেখানে অবশ্যই তাদের ফিরে যেতে হবে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে এটা খুবই স্বস্তির কথা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দখলদারী ইস্রায়েলী বাহিনী আরবভূমি থেকে সরে না যাচ্ছে, ততদিন এই স্পর্শকাতর ভূখণ্ডে স্থায়ী শান্তির আশা করা যায় না। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে এখন রাষ্ট্রসংঘকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষে বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি একটুমাত্র ভুল পদক্ষেপ করতো, তাহলে বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারতো। মানবজাতির সৌভাগ্য যে, রাশিয়া এবং আমেরিকা নিজেদের সংযত করে রেখেছে এবং এই সংঘর্ষকে বিশ্বব্যাপী দাবানলে পরিণত হতে দেয়নি। এখন তাদেরও দায়িত্ব হবে পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী ও ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে সাহায্য করা এবং ইস্রায়েলের ওপর নৈতিক চাপ দেওয়া।

যুদ্ধ ও শান্তি বর্তমান দুনিয়ায় অতি সূক্ষ্ম সূত্রে আজ ঝুলছে। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভিয়েৎনামে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। পশ্চিম এশিয়ায় তারই ক্ষণস্থায়ী মহড়া হয়ে গেল। ভিয়েৎনামের যুদ্ধাবসানে রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টা আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। পশ্চিম এশিয়ায় তা হয়েছে। সুতরাং এই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে যেন আর কোনো ষড়যন্ত্র না হয় সেদিকে রাষ্ট্রসংঘের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

মণিবউদিকে যে-কারণে বহুরূপা বলছি তা হল এই।—

যে মণিবউদিকে, ভর্তি দুপুরে কলকাতার জনবিরল পথে, হাতীপাঞ্জাপেড়ে তাঁতের শাড়ী গিন্নীবান্নীর মত ঢলকো ক'রে প'রে, শান্তিনিকেতনী ঝোলা কাঁধে, ঠাকুরমন্দির, গঙ্গারঘাট, ভাগবতপাঠের আসর, জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরতে দেখেছি, আবার যাকে নিজের বাড়ীতে স্বামী অমৃতবাবুর নিমন্ত্রিত সংস্কৃতিবান ধনবান রাজনীতিক্ষেত্রের শক্তিমানদের মধ্যে ফেরতা দিয়ে আধুনিক ঢঙে সাজসজ্জা করে বাঁকা ছাঁদে বেশ সুর করে প্যাঁচালো কথাবার্তা শুনেছি, তাকেই একদা দেখলাম গ্র্যান্ড হোটেলে একজন খাজা বিলিতী বা আমেরিকান সাহেবের প্রায় অঙ্গলগ্না হয়ে উপর থেকে নীচে নেমে আসছেন। পোষাক যা দেখেছিলাম, তা এর আগে আর কখনও মণিবউদিকে পরতে দেখিনি। বগলকাটা, কাঁধকাটা অর্ধেক বুক বের-করা জামা, রেশমী খসখসে কাপড়, যার আঁচল ক্ষণে ক্ষণে কাঁধ ও হাত থেকে খসে খসে পড়ছে, পায়ে শৌখিন নাগরা, এবং চোখে গাঢ় কালো গগলস—এই ছিল সেদিনের পোষাক; চুলের প্রসাধনও ছিল অদ্ভুত যার নাম আমি ঠিক জানি না। এবং তাঁর সারাঅঙ্গ থেকে নির্গত প্রসাধনের সুরভির সঙ্গে একটা তীব্র অন্য গন্ধও মিশ্রিত ছিল—যেটা আমার মনে হয় তাঁর নিশ্বাস এবং দেহের রোমকূপ থেকে বের হচ্ছিল।

কালটা ১৯৪৪-এর প্রথম। ১৯৪২-এর সেই সেপ্টেম্বরের চন্দ্রালোকিত রাত্রিটির পৌনে দু'বছর পর। এবং এই পৌনে দু' বছরে জীবন-নদীতে যত জল প্রবাহিত হয়েছিল, এবং তার তীব্র তরঙ্গাবেগে দুই কূলে যত ভাঙাগড়া ঘটেছিল, তা জোয়ার-ভাটা খেলা ভাগীরথীর বুকেও প্রবাহিত হয়নি কিংবা তার দুই কূলে অত ভাঙাগড়া ঘটেনি।

সে-ভাঙাগড়া আমার জীবনের ভাঙাগড়াও বটে এবং অমৃতবাবু মণিবউদির জীবনের ভাঙাগড়াও বটে। ওই দুই পুরুষ নাটকের পর থেকে যে খ্যাতি প্রতিষ্ঠার দ্বীপ গড়ে উঠল, তার উপর ছোটখাটো দালানকোঠারও পত্তন হয়ে গেল। ওই সেপ্টেম্বরের রাত্রিটার মাস-চারেকের মধ্যেই দুই পুরুষের শততম রাত্রির উৎসবের দিন একদিকে বোমা পড়ল, অন্যদিকে আমার ভাগ্যে দুই পুরুষের সিনেমা কণ্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল। দুই পুরুষের শততম রাত্রিতে মণিবউদি এবং অমৃতবাবুকে প্রত্যাশা করেছিলাম কিন্তু ও'রা আসেননি; একটা ফুলের তোড়া এবং একখানা পত্রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভাষাটা ছিল ইংরেজী-মিশানো, ইংরাজী অংশটুকুর গড়ন-বৈচিত্র্যের জন্য আবছা আবছা মনে আছে। আমার সাহিত্যকর্মকে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিলেন—

Congratulation for first Century—go on completing another hundred not out

এ-পত্রখানা অমৃতবাবুর। মণিবউদির পত্রও একখানা ছিল, সেখানা খুবই বিচিত্র। কমলকুমার এবং আর একজন লম্বা শক্তসবল হিন্দুস্থানী এসেছিল ওদের চিঠি এবং তোড়া নিয়ে; এবং ফার্স্ট রো-এর পরই সেকেন্ড বা থার্ড রোয়ের টিকিট কেটে দুই পুরুষ দেখে গিয়েছিল। বলেছিল, ও'রা দিল্লী চলে গেলেন।

কমলকুমার বলেছিল, বড় কাজ ধরেছেন। একেবারে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবেন।

হিন্দুস্থানীটিই লছমনপ্রসাদ। সে এসেছিল তিন ঝুড়ি ফুল নিয়ে, গোলাপ, ক্রিসেনথামাম; যার সবই ও'রা নিয়ে গেছেন দিল্লী; বড়দিনের বাজার তখন সামনে। দিল্লীতে ভেট দেবেন। তারই মধ্য থেকে কিছু ফুল এবং পাতা দিয়ে একটা তোড়া বেঁধে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ও'রা। এসব আমার ভাল লাগেনি, তবে বউদি একখানা চিঠি দিয়েছিলেন লছমনপ্রসাদের হাতে। সে এক সময় আমাকে কমলকুমারের অগোচরে চিঠিখানা হাতে দিয়ে বলেছিল,—ইয়ে চিঠ্‌ঠি তো দিদি আপকে দিলেন।

খামখানা সুদৃশ্য এবং সুরভিত।

খুলে দেখলাম, দুটি ছত্রে লেখা একখানি পত্র। প্রথমেই পদাবলীর কোটেশন—"তোমারই গরবে গরবিনী হাম্।" তারপরই লেখা—কিন্তু ভাগ্যে নেই। কি করব? দিল্লী যাচ্ছি। ইতি—বউদি। ভাল লাগল, বিশেষ করে পদাবলীর উদ্ধৃতিটুকু। কিন্তু এর মেকীত্ব বস্তুটা তা আমার অজানা ছিল না।

• • •

দুই পুরুষের সেঞ্চিনারির পর আর দেখা একরকম হয়নি ও'দের সঙ্গে। তবে তার আগে দেখা হয়েছিল। যার ফলে আর আমার আকর্ষণ বিশেষ ছিল না। কিন্তু সে থাক।

অমৃতবাবু দিল্লীতে আপিস খুলেছিলেন, বাসাও করেছিলেন ওখানে। কলকাতায় আসতেন-যেতেন; সে যাওয়া-আসা ভি-আই-পি পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত মার্গ ধরে যাওয়া-আসা। কখনও-সখনও খবর পেতাম, কখনও পেতাম না; তবে দু'-চারবার তত্ত্ব-তল্লাসের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছি। এর মধ্যে আমার মেয়ের বিয়ে গেছে, বড় ছেলের বিয়ে গেছে; নেমন্তন্নপত্র আমার দিক থেকে করা হয়নি; আপত্তি ছিল অন্দর মহলের। গৃহিণী বলেছিলেন—দেখ, কুলীনের জ্ঞাতিত্বের দাবী, মরলে অশৌচ হয়। তিনদিন কোনরকম মাছটা না খেয়ে থাকে; আগে দাড়ী-গোঁফ কামাতো না; এখন এইসব আপিসী সভ্যতার যুগে একদিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দিনে নিজে কামিয়ে নিয়ে চান করলেই অশৌচ চলে যায়। জাতাশৌচে তো খবরই দেয় না। অন্নপ্রাশন, বিয়ে এসবে কোন দায়ই নেই। কুটুম্বিতে রাখলে থাকে, না-রাখলে থাকে না। আত্মীয় হিসেবে আত্মীয় মেনে তোমার সঙ্গে আলাপ করেনি। যেচে আলাপ করেছে লেখক হিসেবে। নেমন্তন্ন করেছে, গিয়েছ—বেশ হয়েছে। আর থাক। তুমি আর নেমন্তন্ন ছেঁড়াচুলে বিনুনী পাকিয়ে খোঁপা বাঁধার মত সম্পর্ক পাকিয়ো না বাপু। আমার সম্পর্কে ওর সঙ্গে সম্পর্ক—আমারই তা সইবে না। আমার যারা সত্যিকারের আত্মীয়, তারা ওদের ভাল চোখে দেখে না। ভাল লোকও ঠিক নয়। তাছাড়া আমাদের ছেলে-মেয়ে আছে, ওদের ও-পাট নেই। ছেলে বলতে অমৃতদা, মেয়ে বলতে দেখনহাসি মণিবউদি। ওরা আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নৌকুতো দেবে, বিশেষ করে আমার সত্যিকারের আপনজনদের ছোট করবার জন্যে বেশ দেখানো করে দামী জিনিসপত্তর দেবে। আমরা নিয়ে খেয়ে থাকব তো! শোধ দেব কখন! কাজ তো হবে দুটো।

কথাটা চরম কথা। দুটো কাজ অর্থে ও'দের দু'জনের দুটো পারলৌকিকক্রিয়া। শ্রাদ্ধ। এবং তাও অত্যন্ত অনিশ্চিত কারণ আমার ঐ ক্রিয়াটা আগে হয়ে যেতে পারে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

গৃহিণীর কথাগুলি যেমন নিষ্করুণ, তেমনি সত্যও বটে। আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালে ও'রা যে ঐশ্বর্যের ঘটা ও ছটা বিকীর্ণ করে দেখনসাহী উপঢৌকন পাঠাতেন তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেও পাঠাতেন হৃদয়ের কোন প্রেরণায় নয়, পাঠাতেন আমাকে এবং আমার অন্য আত্মীয়স্বজনকে চমৎকৃত করবার জন্য, তাঁদের প্রচ্ছন্ন বাসনা তার মধ্যে ছিল না এমন কথাই বা কে হলপ্ করে বলবে?

"এইটেই ওদের ধারা।" আমাদের আপ্‌না-আপ্‌নির মধ্যে অর্থাৎ জ্ঞাতি-কুটম্বের মধ্যে বলা-কওয়া হয়—"এটাই অমৃতদের ঢঙ। ওই বউটার যেমন ঠমক।"

কথাটা মিথ্যা নয়। এর মূলে ছিলেন মণিবউদি। অমৃতবাবু নয়। অমৃতবাবুর উচ্চ নাসাপনা ঠিক ঐশ্বর্যের ঘটার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোড়ার জীবনে তাঁর তো ঐশ্বর্য ছিল না। ঐশ্বর্যবানদের প্রতি এই বিদ্বান ও সেবাব্রতী ব্যক্তিটির অবজ্ঞা এবং উদ্ধত বিদ্রোহী আচরণের ভিতের উপরেই ছিল তার প্রতিষ্ঠা। তার উপর ছিলেন কুমার ব্রহ্মচারী। আমাদের ছেলে

কুমারদের খাতির তো শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব থেকেও বেশী।

মণিবউদি আসতেই কুমারত্ব খিড়কীর দরজা দিয়ে নির্গত হল। বাকি রইল বিদ্যা-বত্তা এবং দেশপ্রেম, ও দুটোকেও মণিবউদি বিদেয় করলেন বাড়ীর পুরনো রাঁধুনী এবং চাকরটার মত।

এ-উপমা উপমার জন্য বানিয়ে বলছি না। সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। মণি-বউদি ঠিক তাই করেছিলেন। আই-এ পরীক্ষার পরই ওদের বিয়ে হয়ে গেল। পরীক্ষার ফল বের হবার প্রতীক্ষাও করেননি অমৃতবাবু। অমৃতবাবুর মনোপিঞ্জরে বন্দী ক্ষুধিত শার্দুল খাঁচাটা ভেঙে ফেলেছিল। বিয়ের পর মণিবউদি স্বামীগৃহে এসে প্রথম কিছুদিন অমৃতবাবুর প্রমত্ততার ছোঁয়াচে প্রমত্তা হয়ে উঠেছিলেন, কোনদিকে তাকাবার অবকাশ পাননি। মাসআষ্টেক পর যখন খানিকটা ক্লান্তি এসেছে উভয়ের জীবনে এবং কাজের তাড়ায় টেনেছে অমৃতবাবুকে, তখন বাড়ীর দিকে তাকিয়ে মণিবউয়ের মসৃণ ললাটে সারি সারি রেখা জেগে উঠল। বাড়ীটা যেন পরের দখলে। তিনি সিংহাসনে বসে আছেন—লক্ষ্মীর ঘরের আটনে নতুন পাতা লক্ষ্মীঠাকরুণের মত, আর বাড়ীটার দখল নিয়ে বসে আছে অমৃতবাবুর পুরনো-কালের রাঁধুনী কালীঠাকুর আর পশ্চিমা খানসামা রামধনিয়া। রান্নাশাল ভাঁড়ার ঘর এসবের মালিক ঠাকুর এবং বাইরের দরজার মোটা তালাটা থেকে বাক্স প্যাটরা স্যুটকেস আলমারী এ্যাটাচি এ-সমস্তকিছুর চাবি-গুলো সব জিম্মাদারী রামধনী চাকরের।

হুকুম খাটাতে গিয়ে তিনি বাধা পাননি কিন্তু বিচিত্রজ্ঞানে অনুভব করলেন যে, এই লোকদুটো আশ্চর্যতৎপরতার সঙ্গে তাঁকে দিয়েই তাঁর হুকুম এমনভাবে সংশোধন করিয়ে নেয় যে, তাঁর সংশোধিত ইচ্ছার সঙ্গে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন তফাৎ থাকে না। শুধু তাই নয়— আরও তাঁর নজরে পড়ল যে, এরাই দুজনে অমৃত-বাবুর আত্মীয়স্বজনদের খবরাখবর রাখে, এ-বাড়ীর খবর ও-বাড়ীতে দিয়ে আসে এবং অমৃতবাবুর যেটুকু স্বাধীন ইচ্ছা, সেটুকু ওই ওদের ইচ্ছার মধ্যেই যেন প্রকাশ পায়।

মণিবউদি বলেছিলেন, (১৯৪২ সালের ওই রাত্রে নয়, পরে অনেক পরে একদিন) —একদিনে ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে-ছিলাম ঠাকুরজামাই। দেখলাম কি জানেন— দেখলাম ঘি দিয়ে রান্না হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—উনি ঠাকুরকে বলেছেন, তেলের রান্না ও'র সহ্য হচ্ছে না। উনি বললেন— হ্যাঁ, তেলের রান্নায় একটু অম্বল হচ্ছে কিন্তু ঘিয়ে রান্না করতে তো বলিনি। তবে আগে ওরা এইরকম করত। রান্না পাল্টাতো।

মণিবউদি এ নিয়ে কোন বিতর্ক না করে ঠাকুরটিকে বিহারে কারখানায় পিওনের চাকরী দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে জবাব দিয়ে বিদায় করেছিলেন। ওরা দূরে হতেই অমৃতবাবুর স্বাধীন আত্মসমর্পণ পূর্ণভাবে হল সম্পূর্ণ। মণিবউদি নিজে নিলেন বাক্স, স্যুটকেস, আলমারি, এ্যাটাচির চাবীর গোছা। আরও করলেন, ছোট একটা ঘরে ইলেকট্রিক উনোন কিনে অমৃতবাবুর জন্যে ঘিয়ে রান্না করতে লাগলেন নিজের হাতে।

এইভাবে রত্নমালা মাসী থেকে পুরনো ঠাকুর-চাকর ছোট-বড় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করে মণিবউদি যত সান্ত্বনাই পান সুখ পেলেন না। শান্তিও না। সুখ কিসে তারও হদিস পেলেন না, শান্তি কোথায় তারও নিশানা না।

এদিকে বছর-কয়েকের মধ্যে অমৃত-বাবুর জীবনে যত বৈষয়িক উন্নতি হল, তত তিনি মডার্ন হলেন, তত তিনি ফ্যাশনেবল হলেন; তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বাড়ল সংস্কৃতির কমলহীরের ঝলমলানি। সে-ঝলমলানি আর আদরিনী মণিবউদি—দুইয়ে মিশে এক হয়ে গেল। অমৃতবাবুর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যারা এতকাল ধরে অমৃতবাবুর উচ্চনাসাত্বের জন্য বিরূপ ছিল, তারা এবার অমৃতবাবুকে ছেড়ে মণিবউদিকে নিয়ে পড়ল, কারণ অমৃতবাবুর নাকের উপর এখন মণিবউ পিন্সনেজের মত শোভা পাচ্ছিল। রত্নমালা পত্রযোগে তাদের কাছে যে-সব অপবাদের বাণ পাঠিয়েছিল, সে-সব বাণ তারা নিক্ষেপ করতে লাগল তার দিকে।

মণিবউ এগুলি অলঙ্কার বর্মে ঠেকিয়ে ভূতলশায়ী করে চলতেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ সংঘর্ষও বাধত। কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ করে এক স্থানে একত্র হবার সুযোগ পেলেই মণিবউদি যুদ্ধের তুরঙ্গিণীর মত ঘাড় উঁচু করে পা ঠুকে হ্রেষারব ছেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতেন। এবং ঐশ্বর্যের ঘটা ও উচ্চ সংস্কৃতির ছটাময় উপঢৌকনরূপ বাণ প্রয়োগে সকলকে আঘাত দিতে ও ঝলসে দিতে চাইতেন। এবং নিজেও আসতেন সেজেগুজে। যে সাজ-গোজে সোনা-রুপো, মণি-মুক্তোর কোন ছোঁয়াচ থাকত না। হাতে থাকত একহাত গালার চুড়ি নয়তো কাচের চুড়ি। মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনী ঢঙের রুপোর গয়না পরতেন মণিবউদি। এবং সেগুলো সবই সাঁওতালী গয়না। তার সঙ্গে দু-চারটে পাথর বসানো থাকত। লাল এবং সবুজ পাথর। রুবি আর পান্না। মস্ত খোঁপায় এই এত বড় একটা রুপার ফুল, তা থেকে কানে ঝোলান ঝুমকো। অবাক হয়ে দেখতে হত। কাজেই এটা সকলেই অপছন্দ করত। এবং এই ধরনের আক্রমণাত্মক ঐশ্বর্য দেখানটা কারুর কাছেই ঠিক পছন্দের নয়। আমার গৃহিনীর যুক্তি সংক্ষিপ্ত হলেও তার অর্থ ছিল অনেক।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির পর হয়ত আমার এই কথাটা ঠিক বিশ্বাস্য হবে না বলেই আর একটা দেখা হওয়ার কথা বলি। বোধ করি, অক্টোবরে; পুজোর আগে; বিয়াল্লিশের সেই ইতিহাস বিখ্যাত সাইক্লোন তখনও সামনে। ওদিকে আগস্ট আন্দোলন ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানের জীবনকে চঞ্চল করে তুললেও কলকাতায় ইংরেজের সামরিক বাহিনীর চাপে মূর্চ্ছাহত। আমার পুজোর কাজ শেষ হয়ে গেছে; তখন আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই 'গণদেবতা' লিখছি। একদিকে লিখে কপি যোগাচ্ছি, অন্যদিকে ছাপা হচ্ছে। বিন্দুমাত্র অবসর নেই। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় কেমন করে ও'দের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ঠিক বলতে পারি নে। তবে একটা সঙ্গত কারণ ছিল। সেটা হল— দিল্লীর বিখ্যাত মিষ্টান্ন ঘন্টেওয়ালার দোকানের 'সোহন হালুয়া ; এবং খস-খস আতরের একটা ভক্ত বা তল্লাস সকালে এসে পৌঁচেছিল ও'র কাছ থেকে। বাহক আর কেউ নয় কমলকুমার। সে বলেছিল—"উনি মানে খুড়ী ফিরেছে কাল দিল্লী থেকে। এই সব জিনিষ এনেছে। এখন আমার উপর অর্ডার হয়েছে দিয়ে এস ঘরে-ঘরে পৌঁছে।"

ও'দের বাড়ীর দরজায় গিয়ে যখন খেয়াল হল যে, আমার চরণযুগল আমার অজ্ঞাত মানসের আদেশে বা নির্দেশে চালিত হয়ে ও'দের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিয়েছে,

তখন সোহন হালুয়া এবং খসখস আতরের জন্য ধন্যবাদ রচনা করে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

বাড়ীর চাকর-বাকরেরা মোটামুটি চিনে রেখেছিল। বাড়ীর দরজায় একজন গুর্খা দারোয়ানও ছিল। সেও চিনত। এবার গিয়ে দেখলাম তারা কেউ নেই; এক দারোয়ান ছাড়া সেটকে-সেটই নতুন। অসুবিধে হল। সবাই জিজ্ঞেস করে কাকে চাই। এবং সকলেই যেন অবজ্ঞা ভরে তাকায়। কারণটা বুঝতে আমার দেরী হয় নি। আমার জীবনে এটা প্রায় অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল। আমার চেহারা দৈর্ঘে-প্রস্থে দু-দিকেই খাট এবং ক্ষীণ। গায়ের রঙও কালো। একবার একজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাকে বাড়ীর গমস্তা ভেবে পান খাবার জন্য কিঞ্চিৎ দিয়ে আমাদের সেরেস্তায় কার্যোদ্ধার করে নিতে চেয়েছিলেন। এবং আজও অনেকে এসে আমাকেই বলেন—ও'কে ডেকে দিন, দরকার আছে। সুতরাং রাগ করি নি, বা চলে আসি নি; একটু গলা উঁচু করে বলেছিলাম—বউদি এরা আমাকে আপনার নন্দাই বলে মানতে চাচ্ছে না। একটু নেমে আসুন।

নেমে তিনি আসেন নি, ও'র ঝি (সে পুরনো লোক) আমাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে সে বললে—ওমা আপনি!

সরাসরি পর্বটায় ছেদ টেনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বউদি কোথায়? কণ্ঠস্বর একটু শুকনো-শুকনো হয়ে উঠেছিল ঝিকে দেখে। সেদিনের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে একান্ত নিরালায় বউদির আত্মকাহিনী শোনার পর আমাকে অভ্যর্থনার জন্য তাঁকেই প্রত্যাশা করেছিলাম, তাঁর বদলে ওই ঝিটিকে দেখে কণ্ঠস্বর শুষ্ক হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিকভাবে।

বলেছিল, উপরে। একটু কাজে ব্যস্ত আছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। একটা অবজ্ঞা বা অবহেলার ধাক্কা যেন আচমকা বুকে এসে লেগেছিল।

বলেছিলাম—তা হলে আমি যাই।

ঝি বলেছিল—না-না। আমি খবর দিই দাঁড়ান।

—কি দরকার?

—না, শেষে আমার উপর রাগ করবেন। এ বাড়ীর সবারই চাকরী গিয়েছে, শুধু দারোয়ান আর আমি আছি, শেষে আমারও যাবে। একটু বসুন।

আমি বসলাম, ঝি দ্রুত চলনেই উপরে উঠে গেল। সে ওদের প্রমুখ্যাৎ শুনে এবং আমার সঙ্গে ও'দের ব্যবহারের ধারা দেখে আমার সম্পর্কে একটা ভাল ওজন আন্দাজ করে রেখেছিল। এবং ঝি-এর এই ব্যস্ত-সমস্ততা আমার ভালই লেগেছিল। মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, বউদি এবার নিশ্চয় নামবেন এবং হয়ত ধরে বলবেন—দেখুন তো এমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম, ছি-ছি-ছি, আপনার গলা শুনেও বুঝতে পারি নি, কথার ছন্দ থেকেও খেয়াল হয় নি যে, এ ছন্দ আপনি ছাড়া আর কারুর হতে পারে না। এরা আমাকে আপনার নন্দাই বলে স্বীকার করছে না। এবং কথা শেষ করে কাপড়ের আঁচল চাপা দিয়ে সম্মুখের দেখন-হাসি দাঁত দুটিকে আবৃত করবেন। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, এর উত্তরে বলব—"সেদিন আকাশের স্বপ্নপারাবারে একাদশীর চাঁদ খেয়া দিতে-দিতে সাক্ষী হয়েছিল, আজ আকাশে চাঁদ নেই কিনা, তাই ভ্রম হয়েছে, আপনার দোষ নেই।"

ঠিক এই সময়েই নেমে এলেন মনি-বউদি। কিন্তু ঠোঁটে এতটুকু হাসির রেখা ফুটল না, চোখের দৃষ্টিতে এতটুকু দীপ্তির ঝিকিমিকি জাগল না, সারা শরীরের ছন্দে এতটুকু হিল্লোল বইল না, তিনি সোজা শক্ত ভঙ্গিতে চটির শব্দ তুলে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালেন একটি নমস্কার করে, বললেন—নমস্কার! অত্যন্ত দুঃখিত, কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম! তারপর? কেমন আছেন? বাড়ীর সব ভাল আছে তো? সোহন হালুয়া খেয়েছেন? খসখস আতর?

যত কিছু প্রশ্ন ছিল, সব পর-পর ক'রে গেলেন, যেন একটার উত্তর নিয়ে আর একটা প্রশ্ন করতে সময় কিছু বেশী ব্যয় হবে! যার অর্থ হল, তাঁর সময়ের অভাব এবং আসলে প্রশ্নগুলোর কোন উত্তরই তিনি চান নি।

সেটা বুঝতে আমার বিলম্ব হয় নি। এবং অত্যন্ত চতুরভাবেই এর পর দু-তিনটে কথায় ওখানকার পালা সেরে আমি উঠে পড়েছিলাম এবং বলেছিলাম—আজ তাহলে উঠলাম।

ভদ্রতার খাতিরেই বোধহয় বলেছিলেন, একটু কফি খাবেন না? একথাও বলতে দিই নি। বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না বউদি দোহাই আপনার, বিষ খেতেও রাজী আছি, কিন্তু চা কফি, কি মিষ্টি জল, এ না। আপনার ঘৃতসিক্ত সোহন হালুয়া যা বস্তু; বাপস! মাথার চুলগুলো থাকলে হয়। গলায়-গলায় অম্বল হয়ে আছে।

বলে চলে এসেছিলাম। আসতে-আসতে ভেবে পাই নি মহিলাটির এমন আচরণের অর্থ কি? দুটো-তিনটে দিন যতদূর মনে পড়ছে ও'র এই বিচিত্র আচরণের কথা চিন্তা করে মনে-মনে কিছু পীড়া অনুভব করে-ছিলাম। এর পর আর ও-মুখো হই নি। কি প্রয়োজন? প্রয়োজন ছিল না, প্রলোভন ছিল ওই মনিবউদির মত চপলা খেয়ালী মেজাজের মডার্ন বউদিটির মধ্যে। তবে ও প্রলোভনটা আমার কাছে খুব বড় প্রলোভন ছিল না। কারণ তখন আমি আরও একটা বড় প্রলোভনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে চলেছি। খ্যাতির প্রলোভন প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ। এবং আজ সত্যকে গোপন করব না, অকপটেই বলব যে, তখন পত্রযোগে অনেক মুগ্ধের প্রশস্তি আমি পাচ্ছি। থাক। এখন সহজ সোজা ভাষায় যা ঘটেছিল ও'র ও আমার মধ্যে তাই বলে যাই। আমি আর ওপথ মাড়াই নি। ও'রাও আর ঠিক খোঁজ করেন নি। একেবারে ওই দুই পুরুষের শততম রজনীর অভিনয় উৎসবে কমলকুমার এবং লছমন প্রসাদের মারফৎ একটা খুব ভাল ফুলের তোড়া পেলাম, সেটা দিয়েছেন বিচিত্র রূপিনী মনিবউদি এবং একখানা চিঠি, সেটা দিয়েছেন অমৃতদা— go on completing another hundred not out.—"

সেদিন শুনলাম আমার জীবনে দুই পুরুষের শততম অভিনয় যত গৌরবের; অমৃতবাবু এবং মনিবউদির জীবনে দিল্লীতে অভিনব ব্যবসায়ের কৃষ্ণগৌরব এবং তার সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছল্য, তার থেকে কোন-ক্রমেই কম নয়, অনেক বেশী। ব্যাপারটা লোহার পারমিট নিয়ে রহস্যজনক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

এর পর আমার জীবন যেমন দ্রুতবেগে চলেছে, ততোধিক দ্রুতবেগে চলেছে ওদের জীবন। হিমালয় থেকে বেরিয়ে সিন্ধু যেমন পশ্চিম মুখে এবং ব্রহ্মপুত্র যেমন পূর্ব মুখে বেরিয়ে বিপরীত মুখে চলে গেছে, তেমনি-ভাবেই ওরা দুজনে দিল্লী কলকাতা বোম্বাই-এর ব্যবসায়ের বাজারে অনেক দূরে চলে গেলেন।

আমিও ভুলে গেলাম তাদের কথা।

ও'রাও নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন আমার কথা; হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল গ্র্যান্ড হোটেলে। মনিবউদির নূতন প্রকাশ দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

হায়, মনিবউদি,

বিচিত্র মনিবউদি। এও তাঁর প্রকাশের শেষ নয়। এর পরও আছে।

(ক্রমশঃ)

আমি যাব ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমি যাব। কোথা থেকে ভয়ঙ্কর ঝড়
উড়িয়ে নিয়ে গেল নিমেষেই
বহুদিনের স্তূপাকৃত ঝরা পচা পাতা,
পুঞ্জীভূত ধুলো বালি,
ঘরের চৌকাটের মাকড়সার জাল।

আমি যাব। কে যেন বললে কানে কানেঃ
এবার যাত্রার পথ সুগম, এসো;
এসো তোমার জগদ্দল পাথরের
সমস্ত সংস্কার অতিক্রম ক'রে,
এসো নতুন নতুন ঢেউয়ের সহযোগিতায়,
এসো আশ্চর্য সহজ প্রত্যয়ী প্রেরণায়,
এসো।

চারদিকের গাছের রঙ বদলে যাচ্ছে
ধীরে-ধীরে, পাণ্ডুর বিবর্ণ পাতায়
নতুন সবুজের ছোপ, ডালে ডালে
শুকনো পুষ্পস্তবকে লাল রঙের বিন্যাস,
পুকুরের জল আয়নার মতো স্বচ্ছ।

আজ আবার নতুন ক'রে শুরু করতে হবে,
চতুর্দিকে কিসের নতুন সমারোহ
মনে হয় চারদিক থেকে এইবার
বহুদিনের হতাশার কুয়াশাকে হটিয়ে,
অবিশ্বাসী অন্ধকারকে দীর্ণ ক'রে
লক্ষ লক্ষ উদ্যমের পাশাপাশি
একবার নতুন দিগন্তের দিকে যাব।।

উক্তি ॥ মৃণাল দত্ত

ক্ষমা করব না।
তুমি ঘোর নিশাকালে বাগানের নিদ্রিত কুসুম
ছিন্ন করেছিলে। শব্দ শোনা গিয়েছিল
যেন যোগ্য প্রতিশোধ নিতে এসে তুমি প্রেম চূর্ণ করেছিলে।
নিঃশব্দ চোরের মতো তুমি পায়ে পায়ে
রাত্রি এনেছিলে।
হাওয়ার নিস্বন লেগে মন্দিরের ঘণ্টাগুলি
বেজে উঠেছিল

শব্দময় ঘোষণায়
লক্ষ ঝাড়-লণ্ঠনের সুপ্ত বাতিগুলি
দুলে উঠেছিল।

।। ২ ।।

যেন কে দুঃখের স্মৃতি রেখে গিয়েছিল
টবের অর্কিডে।
নিস্তব্ধ বিজন কক্ষে যেন তারই ক্ষীণ উপস্থিতি
ও'ডিকলোনের গন্ধে হাওয়ার হাওয়ায়—।
তারই শোকে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি
ইন্দ্রিয়ের কোষে
দক্ষিণ শিয়রে বুঝি তারই দীর্ণ অলৌকিক ছায়া—
নির্জন হৃদয় যেন দুলে ওঠে বিবশ মর্মর।

জন্মান্তরে

বনফুল

॥ ১ ॥

দোষ যে কার তা বলা শক্ত। আসলে দোষ কারো নয়। দোষ পরিবেশের। ওই পরিবেশের মধ্যে শান্তি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। না পারার জন্যেও তাকে দোষ দিই না, কারণ সে মানবী, দেবী নয়। দ্বিতীয় পক্ষের বর তাকে বিয়ে করে এনে প্রথম দিনই শোবার ঘরে একটি অয়েল-পেন্টিং ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন — "ওকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমার দুরদৃষ্ট তাই ও রইল না। ভেবেছিলাম আর বিয়ে করব না, কিন্তু মায়ের অনুরোধে করতে হল। ওই ছবির নীচে রোজ দুটো করে মহিশূরী ধূপ কাঠি জেলে দি। তুমিও দিও। আর একটা অনুরোধ করব, যদিও তুমি খোকনের মায়ের স্থান অধিকার

করতে পারবে না, কিন্তু তবু ওকে কাছে টেনে নিও—।"

এই কথা শোনামাত্র খোকনকে কাছে টানার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শান্তির আর ইচ্ছে হয়েছিল ওই ছবিটাকে টেনে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিতে। তার স্বামী নরেশবাবু শিক্ষিত লোক। তিনি ঠিক প্রথম দিনই যদি ওই কথাগুলো অমন আবেগ-গদ-গদ কণ্ঠে না বলতেন তাহলে হয়তো শান্তির মনের অবস্থা অন্যরকম হত।

অন্য কারণও ছিল।

নরেশবাবুর মা বিষধরী সর্পিণী একটি। যখন কথা বলেন মনে হয় ছোবল মারছেন। বিয়ের পরই তিনি শান্তির রূপের এবং শান্তির বাবা-মায়ের ছোট নজরের যে কড়া লম্বাচওড়া করেছিলেন তাতে শান্তি যদি পাথরের মূর্তি হত তাহলে ফেটে যেত, সে পাথরের মূর্তি নয় বলেই বিদীর্ণ হল না, কিন্তু তার মন বিষাক্ত হয়ে গেল। বাইরে লোক দেখানো-ভাবে খোকনকে সে আদর করতে গিয়েছিল কিন্তু নরেশবাবুর মা 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন। এমন ভাব করলেন খোকন যেন শত্রুর কবলে পড়েছে।

খোকনকে নরেশবাবুর মা-ই খাওয়াতেন, নাওয়াতেন, কাছে-কাছে রাখতেন। খোকন রাত্রে তাঁর কাছেই শুত। নরেশবাবুর মা এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন সংসারের সব কিছুই খোকনের, তার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি সহ্য করবেন না তিনি, তার সেবা-যত্ন তিনি করবেন নিজের হাতে আর শান্তি কেবল দাসীর মত সে সেবার উপকরণ জুগিয়ে যাবে — খোকনের জামা-কাপড়ে সাবান দেবে, তার জন্যে ভালমন্দ খাবার করবে—বাস্ আর কিছু না।

খোকনের বয়স মাত্র তিন বছর। কিন্তু কি আদুরে, কি বায়নাদার ছেলে। বাড়ির আবহাওয়ায় তার কান্না চিৎকার চেঁচামেচির ঝড় বইত দিন-রাত্রি।

অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল শান্তি। সে যদি লেখাপড়া জানত—যদি অন্য কোথাও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবার তার সুযোগ থাকত হয়তো পালিয়ে যেত সে। কিন্তু সে সুযোগ ছিল না তার। একটা অনড় খুঁটিতে বেঁধে সংসার তাকে চাবকাচ্ছিল। চাবুকটা ওই খোকন, আর চাবুক চালাচ্ছিলেন তার ঠাকুমা। কিন্তু একটা কথা শুনলে আপনারা হয়তো বিস্মিত হবেন—ওই চাবুকটাকে—ওই খোকনকেই—আদর করবার ইচ্ছা ক্রমশ অঙ্কুরিত হতে লাগল তার মনে। অমন সুন্দর অনিন্দ্য-কান্তি ফুটফুটে ছেলে, দেখলেই কোলে করতে ইচ্ছে করে যে, চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার এ গোপন ভালবাসা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। তবু খোকনকে প্রায়ই সে আড়ালে ধরবার চেষ্টা করত। একদিন ধরেও ছিল, কিন্তু খোকন তার হাতে কামড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

আর চিৎকার করে বলতে লাগল—"ঠাক্‌মা-ঠাক্‌মা, লাক্কুসি আমাকে জাপটে ধরেছিল—!" সর্পিণী সঙ্গে-সঙ্গে ফণা তুলে তেড়ে এলেন। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু একভাবে চিরদিন চলে না। সর্পিণীরাও অমর নয়। খোকনের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার ঠাকুমা মারা গেলেন। শান্তির মনে হল এইবার বুঝি খোকন তার কাছে ধরা দেবে। কিন্তু দিল না। ঠাকুমা তাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—শান্তি ডাইনি, শান্তি রাক্ষসী, ওর কাছে খবরদার যাস নি। কিছুতেই সে যেতে চাইত না শান্তির কাছে। বাড়ির পুরোনো ঝি সৌদামিনীই তাকে তেল মাখাত, স্নান করাত, ভাত খাওয়াত। সৌদামিনীর কাছেই রাত্রিবেলা শুত সে। শান্তিকে সে নানাভাবে জ্বালাতন করত কেবল। কখনও তার কাপড় ছিঁড়ে দিত, কখনও তেলের শিশি উল্টে দিত, কখনও সাবানটা ফেলে দিত কুয়োর ভিতর। নরেশবাবু কিছু বলতেন না। শান্তি একদিন তাঁকে বলেছিল—'ওকে তুমি একটু শাসন কর। কি দুষ্টুমি যে করে, আর, আমাকে কি খারাপ-খারাপ গাল যে দেয়?' নরেশবাবু একটু মুচকি হেসে বলেছিলেন—'আমার শাসন ও শুনবে না, কারণ আমি তোমাকে বিয়ে করেছি।'

সেদিন যে ঘটনাটা ঘটল তা সামান্য। কিন্তু তা অসামান্য হয়ে উঠল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। ভাঁড়ার ঘরে শব্দ শুনে শান্তি চিৎকার করে উঠল—কে রে। কোন উত্তর নেই। ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে খোকন নাগরির ভিতর হাত ঢুকিয়ে খেজুরে গুড় খাচ্ছে। মুখে-বুকে-হাতে খেজুর গুড় মাখামাখি।

তবে রে—।

একটা চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে গেল শান্তি। খোকন ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। রাস্তায় বেরিয়ে সে হাসি মুখে চেয়ে রইল খিড়কির দরজাটার দিকে। ঠিক সেই সময় একটি ফটোগ্রাফার আবির্ভূত হলেন রাস্তার আর এক প্রান্তে। ইনি সেই জাতের ফটোগ্রাফার যাঁরা ঘুরে-ঘুরে নানা রকম ফটো তুলে বেড়ান এবং দাঁও-মাফিক সেগুলো বিক্রি করেন। অনিন্দ্যকান্তি খোকনের ফটোটা তিনি তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

খিড়কির দরজায় মুখ বাড়িয়ে শান্তি ডাকাডাকি করতে লাগল—আয়, আয়, শিগগির আয় বলছি—

খোকন এল না। হাসতে লাগল।

তবে রে—

তাড়া করে বেরিয়ে এল শান্তি। খোকন ছুটতে লাগল। বেশীক্ষণ ছুটতে হল না তাকে, একটা প্রকাণ্ড লরী আসছিল, তার তলায় চাপা পড়ে গেল সে।

সন্ধ্যাবেলা নরেশবাবু এসে দেখলেন শান্তির দেহটা ঘরের আড়কাটা থেকে ঝুলছে। আত্মহত্যা করেছে সে।

॥২॥

তিরিশ বছর পরে।

কুমোরখালি চেরিটেবল ডিসপেন্সারি। ডাক্তারবাবুর চারিদিকে নানারকম রোগীর ভীড়। সামনের দেওয়ালে একটি ক্যালেন্ডার টাঙানো। ক্যালেন্ডারে খোকনের ছবি। খোকনের সেই ফোটোগ্রাফ একটি ঔষধ ব্যবসায়ী কাজে লাগিয়েছেন—মলট-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, খোকনের হাতে কায়দা করে মল্টের শিশিটাও ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। খোকন যেন মহানন্দে মল্ট খাচ্ছে—বুকে মুখে চারিদিকে মল্ট মাখামাখি। খোকন হাসছে। চমৎকার দেখাচ্ছে।

রোগীর ভীড়ের মধ্যে একটি যুবতী বারবার চেয়ে চেয়ে দেখছে খোকনকে। মাঝে মাঝে নির্নিমেষ হয়ে যাচ্ছে সে।

"তোমার কি চাই—"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তাকে।

"আমার শাশুড়ির কোমরে ব্যথা হয়েছে ডাক্তারবাবু—"

"কতদিন থেকে—"

"দিনসাতেক হয়েছে—"

"আচ্ছা, একটা মালিশ লিখে দিচ্ছি। রোজ দু'-তিনবার মালিশ কোরো। আর গুলি দিচ্ছি কয়েকটা, চারঘণ্টা অন্তর খাইও—তিনদিনের ওষুধ দিলাম।" প্রেসক্রিপশন নিয়ে তবু বসে রইল মেয়েটি। চেয়ে রইল ক্যালেন্ডারের ছবিটার দিকে।

"যাও, ওষুধ নিয়ে যাও"—ডাক্তারবাবু বললেন।

"হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি—। ওটা কার ছবি ডাক্তারবাবু—"

"ওটা ক্যালেন্ডার—"

"ও।"

মেয়েটি আরও কিছুক্ষণ ছবিটার আশে-পাশে ঘুরঘুর করল। আরও বারকয়েক দেখল, তারপর ওষুধ নিয়ে চলে গেল।

তারপর দিন আবার এল সে।

চেয়ে রইল ছবিটার দিকে।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন আছেন তোমার শাশুড়ি?"

"ভাল আছেন—"

"তিনদিনের ওষুধ দিয়েছি তো, আজ তবে এলো কেন—"

"না, এমনি—মানে এই ছবিটাকে দেখতে এলাম—"

"ছবিটা খুব ভাল লেগেছে?"

চুপ করে রইল। হঠাৎ ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল তার। চোখে জল ভরে এল।

"কি হল—!"

"না, কিছু নয়—"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে চোখের জল মুছে ফেলল সে। তারপর বলল, "জানি না কেমন করে ওর ছবি এখানে এল—"

"কার ছবি?"

"আমার খোকনের। পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়। এ-ছবি আপনি কোথায় পেলেন? ক্যালেন্ডার কি?"

নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে ক্যালেন্ডার কি তা বোঝানো শক্ত।

"তোমার ছেলে এইরকম ছিল?"

"অবিকল। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি—"

"আচ্ছা, ছবিটা তুমি নিয়ে যাও—"

"দেবেন আমাকে? দেবেন? সত্যি?"

ডাক্তারবাবু ক্যালেন্ডারটা পেড়ে তার হাতে দিলেন। ছবিটাকে সে ক্রমাগত চুমু খেতে লাগল।

"আমাকে ছেড়ে কোথা পালিয়েছিলি, কোথা পালিয়েছিলি, চল বাড়ি চল—"

ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। ছবি-জন্মে খোকন যে মাকে পেল সে তার নিজের মা, শান্তি, না আর কেউ? কে জানে!
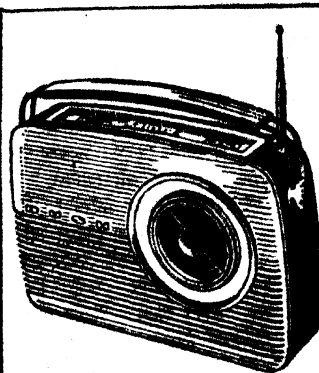
অজয় হোম

সমাজের সকল স্তরে এক ধরনের লোককে দেখা যায়, যারা কোনোরকম দায়-দায়িত্ব না নিয়ে বেশ দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়। যাকে বলে স্রেফ পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিন কাটানো। শুধু নিজেরাই নয়, অনেক সময় দেখা যায় নিজেরা তো কাটাচ্ছেই আবার নিজের ছেলেমেয়েরাও মানুষ হচ্ছে অপরের অন্নে ও অর্থে। এদের আমরা বলে থাকি পরভৃত, অর্থাৎ অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত। ইংরেজিতে বলি parasite।

পক্ষিকুলেও এমন স্বভাবের পাখির অভাব নেই। এরা অনুক্রিকাশি বর্গ বা গোত্রের (Order Coccyges) অন্তর্ভুক্ত পরভৃত-বংশীয় বা Cuculidae পরিবারভুক্ত পাখি। বেদে বা বোহিমিয়ান প্রকৃতি এদের মধ্যে প্রকট। কোনও বিশেষ একজনের সঙ্গে জোড় বাঁধে না। বাছ-বিচারহীন জীবন কাটায়। কোনো একস্থানে স্থিতিশীল নয়। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে কোকিলই একমাত্র স্থিতিশীল। যদিও তারা শীতকালে এমন আত্মগোপন করে যে, মনে হয় এ তল্লাটেই বুঝি নেই। এই বংশের সব পাখিই কিন্তু পরভৃত নয়। কয়েকটি এমন জাত আছে যারা বাসা বাঁধে, নিজেরা ডিম ফোটায় এবং দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়। অথচ শারীরস্থানের বিচারে তারা পরভৃত। কবে কোন যুগে এরা বংশগত স্বভাব পরিত্যাগ করেছে তা জানা যায় না। তাদের মধ্যে একটি আমাদের ঘরের পাখি অর্থাৎ বাংলার পরিচিত পাখি—কুকো (Crow-Pheasant)

বৌ-কথাকও

বৌ-কথাকও পাখির এক-এক জায়গায় এক-এক নাম। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বলতে শুনেছি—চৈতার বৌ। তারা ডাকটা শোনে—চইতার বউগো। নেপালীতে—কুট্টা কাটো। চা-বাগানের সাহেবদের কাছে—Orange-pekoe বা Crossword Puzzle দেরাদুন-মুসৌরী অঞ্চলে— কইফুল-পাক্কা।

পুরুষ পাখির পিঠ গাঢ় ছাই, মাথা ছাই, গলা ও বুক ধূসর। পেট সাদা, তার উপর অনুভূমিকভাবে গাঢ় পাটকিলে সোজা সোজা দাগ। ডানায় পালক পাটকিলে। ডানার তলাতেও অনুভূমিক ভাঙা ভাঙা চাঁদা দাগ, তার উপর সাদা ছিটে। লেজ পাটকিলে-ছাই, লেজের শেষপ্রান্তে চওড়া কালো পট্টি, তার তলায় খুব সরু সাদা কটা লাইন বা ছোপ। ঠোঁট কালো, গোড়াটা হলদে। চোখের মণি হলদেটে পাটকিলে। পা হলদে। লম্বায় ১২ ইঞ্চি। স্ত্রী পাখির গায়ের রঙে পাটকিলে ভাবটা একটু প্রকট। বুকের দাগ হলদেটে পাটকিলে।

খাদ্য—প্রধানত শুঁয়োপোকা, তাছাড়া নানা রকমের পোকা-মাকড় ও ছোটো ফল-পাকুড়।

বৌ-কথাকও স্থানীয় পাখি নয়। শীতের শেষে বসন্তের মাঝামাঝি এরা পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতলে নেমে আসে। গাছের উপরেই থাকে মাটিতে কখনও নামে না।

আমাদের দেশে বৌ-কথাকও সম্বন্ধে খবর জানবার কারুর কোনো উৎসাহ না থাকাতে কেউই বিশেষ কিছুই জানে না। যেসব ধনীর পাখি পোষার ঝোঁক তাঁরা হাট-বাজার থেকে কিনে এনে পোষেন। ডাক শোনেন। পুষতে গেলে যা-যা করণীয় তা তাঁরা জানেন। এও জানেন এ পাখিকে বন্দী-জীবন যাপন করানো কী কঠিন, বাঁচানো কত শক্ত এবং ডাকানো প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে দেখেছি আমার এক বন্ধুকে। ডজন ডজন পুষেছেন বাঁচিয়েছেন ডাকিয়েছেন। অদ্ভুত হাতযশ—মরতে দেখেছি ক্বচিৎ।

বিলিতি কাব্যে ও সাহিত্যে এদের সম্বন্ধে বহু উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু আমাদের সাহিত্যে পরভৃতের এই গোষ্ঠীর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ কোথাও পাই নে ইওরোপীয় বৌ-কথাকও (C. Canorus) শীতের শেষে বসন্তকালে ভারতে আসে, এমনকি কলকাতার আশেপাশেও। দু' একটি আমাদের খাঁচাতেও ছিল।

পরভৃত-বংশীয় পাখিদের ডাক শুনতে গিয়ে বিলিতি বৌ-কথাকও হাতিবাগান ও শেয়ালদর হাটে পেয়েছি। ভারতীয়ের সঙ্গে তফাৎ লম্বায় ইঞ্চিখনেক বেশি—১৩ ইঞ্চি। লেজের কালো পট্টিটা একটু ফিকে। ডানার তলায় সাদা দাগ একটু বেশি। চোখের মণি হলদে। ঠোঁট কালচে পাটকিলে, তলার ঠোঁটের গোড়াটা সবুজে। ডাক ভারতীয়দের অপেক্ষা একটু মিঠে। এরা ইওরোপ থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত উড়ে যায়। হিমালয় প্রদেশে যে জাতটা (C. C. Canorus) ডিম পাড়ে, তারা শীতকালে মধ্যভারত ও রাঁচি-হাজারিবাগে আসে এবং কেউ কেউ থেকে যায়। এদের লেজের কালো পট্টিটা একটু বেশি চওড়া। ইওরোপীয় ও হিমালয়ের বৌ-কথাকওকে সিংহল পর্যন্ত দক্ষিণে নামতে দেখা গেছে।

আগেই বলেছি এদের স্বভাব পরের বাসায় ডিম পাড়া আর বাছ-বিচারহীন জীবন-যাত্রা। ইওরোপীয় ডিম পাড়ে খঞ্জনের জাতি খঞ্জরিট—বা Motacillidae বংশীয় নানা জাতের 'ঘাসারিচ' বা 'খোরাসনি চুড়ি' (Pipits; Anthus) ও দোয়েলের জাতি তর্দাশ বা Turdidae বংশীয় নানা জাতের অশ্বক্ষ-গণ বা Chats-এর (Luscinia, Saxicola Rhodophila) বাসায়। এরা সবাই ছোট জাতের পাখি। ভারতীয়রা ডিম পাড়ে ছাতারের বাসায়।

বাসা ছোটো হওয়াতে ইওরোপীয় ও হিমালয়ের জাতের পক্ষে অসুবিধে হয় অতবড়ো দেহ নিয়ে ওই ছোট্ট বাসায় বসতে। জায়গাই হয় না। তাই তারা হয় একটু উপরের ডালে বসে, না হয় ছোট্ট বাসায় কোণা আঁকড়ে ধরে তাক করে বাসার গর্তের মধ্যে ডিম ফেলে। সময়ে সময়ে টিপ ঠিক হয় না বাইরে চলে যায় এবং মাটিতে পড়ে ডিমটা ভাঙে। এমনও কথা শোনা যায় যে ডিম পাড়ার বাসা না পেয়ে উড়তে উড়তে শূন্যে ডিম ছেড়ে দিয়ে বৌ-কথাকও চলে গেছে। মাঠের মাঝে বা অসম্ভব স্থানে ডিম ভাঙা অবস্থায় দেখে এ ধারণা করতে হয়েছে।

পালক-বাপ-মা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর পর সেই বাচ্চা তার সৎ-ভাইদের অর্থাৎ ন্যায্য অধিকারীদের পিঠ দিয়ে ঠেলে তুলে বাসা থেকে নিচে মাটিতে ফেলে দেয়। পালক বাপ-মার অজ্ঞাতে সেই বাচ্চা মারা পড়ে। এই তুলে ফেলার জন্যে সমস্ত পরভৃত বংশীয় পাখির পিঠের হাড় খোঁদল করা। এটি করে অন্য পাখি থাকলে তার খাবারের ভাগে কম হয় বলে।

ক্রমে বড়ো হতে থাকে। বৌ-কথাকও-এর আকারের তুলনায় পালক-বাপমা অনেক ছোটো। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না নিজের সন্তান নয় বলে। খাদ্যের চাহিদাও এদের বেশি। সুতরাং পালক-বাপমাকে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে পরিশ্রম করতে হয় যথেষ্ট। বাসার বাইরে আসার পরও আকারে বড়ো হওয়ার জন্যে পালক-পাখিদের বাচ্চার পিঠে চড়ে মুখের মধ্যে খাবার গুঁজে দিতে হয়।

ডিম পাড়ার সময় মে-জুন মাসে। এই সময় এরা দিনে-রাতে ডাকে। চাঁদনি রাত হলে কথাই নেই। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি লাগে এবং বাচ্চা বড়ো হতেও সময় নেয়। সাধারণতঃ পালক-পাখির একটি বাসায় লুকিয়ে একটি করে ডিম পাড়ে। পরবর্তী ডিম পাড়ার সময় দু-চারদিন পরে এবং ইতিমধ্যে স্ত্রী-বৌ-কথাকও অন্য বাসায় সন্ধান করে সেখানে একটি ডিম পেড়ে আসে। অনেক সময় একই বাসায় দুটো-তিনটে ডিম পাওয়া যায়। একই পাখির ডিম বলে মনে হয় না, অন্যান্য বৌ-কথাকও এসে সম্ভবত পেড়ে যায়।

একটু গোলাকার ডিম। খোলা মোটা ও ভারী এবং অল্প পালিশ। ডিমের গায়ের রং নানারকম হয়—সাদা, ফিকে লাল বা পাথুরে এবং ছোপ দাগ ও ছিট থাকে হয় পাটকিলে, না হয় হলদেটে লাল বা ফিকে বেগুনীর। কালো ছোটো ছোটো ছিট প্রত্যেক ডিমেই থাকে। কখনও বা নীল রঙের ডিম দেখা যায়।
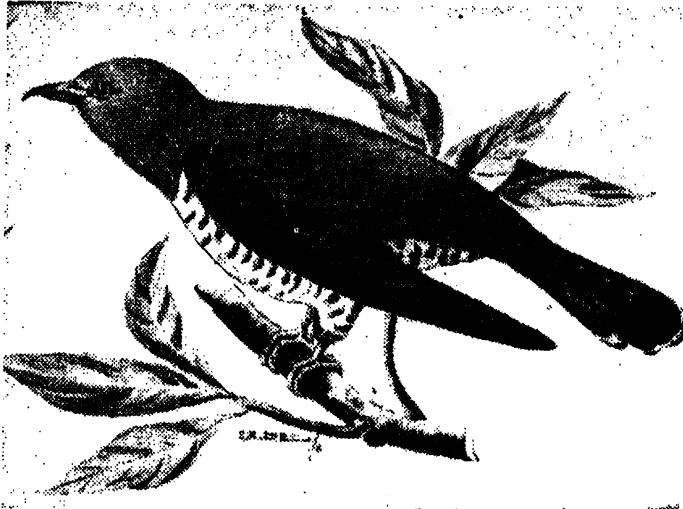
বৌ-কথা কও

ডিমের মাপ—লম্বায় ০·৯৭, চওড়ায় ০·৭২ ইঞ্চি।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে আরও একটা জাতকে(C. C. bakeri) প্রায়ই নজরে পড়ে। এই অঞ্চলটায় এই জাতটা ডিম পাড়ে বেশি। হিমালয় অঞ্চলে অপর একটি জাতের (C optatus) ডাক হুপোর মতো হুদ-হুদ হুদ-হুদ। হিমালয়ের পাদদেশে একটি ছোটো আকারের বৌ-কথাকও (Little Cuckoo; C. Poliocephalus দেখা যায় তারা দক্ষিণে পূর্বকূলে নেলোর পর্যন্ত শীতকালে নামে। ডাক মিষ্টি নয়, ডাকে চ্যা চ্যা করে। ভুটিয়ারা ডাকটাকে নকল করে বলে 'পিচু-গিয়াপু'। দার্জিলিং-এর চা-বাগানের সাহেবরা নাম দিয়েছে— That's your smoky paper.

পাপিয়া

বড়ো বটগাছটার পাতার আড়ালে বসে ডেকে চলেছে একটা পাখি। প্রথমে পিক্ পিক্ যেন গলা সেধে নিল। তারপরেই পী...কাঁহা, পী-ই...কাঁহা, পী-ই-ই...কাঁহা। গুণেছি এক দুই তিন। ব্যস থেমে গেল। একটু দম নিয়েই আবার পিক্ পিক্ এবার এক দুই তিন চার পাঁচ। স্বরগ্রাম উচ্চ হতে উচ্চতর পর্দায় ক্রমেই বেড়ে চলে। সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচবার ডাকে। তারপর দম নেয়। খুব বয়স্ক পাখি সাতবারও ডেকে থাকে। কাছাকাছি অন্য একটি পাখি থাকলে দুজনে মিলে এমন ডাক শুরু করে যে মনে হয় পাগলা হয়ে গেছে।

বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এমনকি কলকাতার আশে-পাশে এই পাখির আকুল করা তান শোনা যায়—পিউ-কাঁহা, অর্থাৎ প্রিয়া কোথায়—Where is my love?

পাখিটির নাম—পাপিয়া বা চোখ-গেল (Hierococcyx varius) । হিন্দিতে—পিউ-কাঁহা, পাপিহা। ইংরেজি— Common Hawk-Cuckoo.

পাপিয়া স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। পূর্ণ বয়স্কের উপরের পালক ধূসর-ছাই, ওড়ার পালক (flight feathers) পাটকিলে, চওড়া টানা সাদা দাগ তলার দিকে। লেজ লালচে আভাযুক্ত ছাই রঙ্গা; লেজে চার কি পাঁচটি লালচে ডোরা দাগ, একদম শেষেরটা লেজের ডগায় বেশি চওড়া। কাঁধ ও বুক ফিকে ছাই-এর সঙ্গে লালচে ভাব। বুকের তলাটায় সরু সরু টানা দাগ। পেট সাদার সঙ্গে লালচে ভাব মেশানো, কিছুটা ছাই রঙের টানা দাগ। চোখের মণি হলদে, চোখের গোলাকার পর্দা সেটাও হলদে। ঠোঁট সবজে, উপরটা কালো। পা হলদে। লম্বায় ১৩ ইঞ্চি। ছবিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার আগের চেহারা। বৌ-কথাকও অপেক্ষা শিকরের সঙ্গে পাপিয়ার সাদৃশ্য অদ্ভুত। শুধু তাই নয় বাচ্চা পাপিয়াও ঠিক বাচ্চা শিকরের মতো দেখতে। ওড়ার ভঙ্গিও তাই। কয়েকবার ডানা ঝাপটানো একটু ভেসে যাওয়া আবার ডানা ঝাপটানো আবার ভাসা।

খাদ্য—শুঁয়োপোকা খুবই প্রিয়, তাছাড়া বট জাতীয় ছোটো ফল এবং অন্যান্য পোকা-মাকড়।

বাংলা বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাব্যে বা গানে বৌ-কথাকওর যেমন অনাদর তেমনি পাপিয়ার আদর খুব। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাপিয়ারই আকুল তানে আকাশ-ভুবন গেল ভেসে, থামাও এখন বাঁশীর ধ্বনি চুপ করে শোন বাইরে এসে' কিংবা নজরুলের 'কাঁদে পিউ-কাঁহা পাপিয়া, পরাণ প্রিয়া' ইত্যাদি বাংলা গানে উল্লেখ পাই।

চোখ-গেল পাখির জন্মকথা নিয়ে বাংলায় একটি উপকথা আছে। খুব ছেলে-বেলায় শুনেছিলাম মনে যা আছে তা বলছি।...কোনো গেরস্তর একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বেশ দূর গাঁয়ে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার পর থেকে তার মা-বাবা আর কোনো সংবাদ পায় না। শেষে আর থাকতে না পেরে মেয়েটির মা বাড়ির পুরোনো দাসী যে মেয়েটিকে বলতে গেলে মানুষই করেছিল, তাকে পাঠালো মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্বতল্লাশ করতে। সেই দাসী ক'দিনের হাঁটাপথে গিয়ে অনেক কষ্টে পৌঁছল মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে। মেয়ে তো ধাই-মাকে দেখে চোখে আঁচল দেয় আর অঝোরে কাঁদে। কোনো কথা বলে না শুধু কাঁদে। চোখ ঘষে ঘষে মেয়ের চোখ রাঙা। মেয়েটির দুঃখ দাসীটি আর দেখতে পারল না। সারাটা পথ সে প্রায় দৌড়েই ফিরল 'চোখ-গেল চোখ-গেল' বলতে বলতে। মেয়েটির মার সামনে এসে 'মেয়েটার চোখ-গেল চোখ-গেল' বলতে বলতে দড়াম করে মাটিতে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাসীটি একটি পাখি হয়ে 'চোখ-গেল চোখ-গেল' বলতে বলতে উড়ে চলে গেল।

ঘন গাছপালা, মানুষের বসতি এবং চাষ-আবাদের খেত-খামার যেখানে সেখানেই পাপিয়ারা বাস করতে ভালবাসে। নেহাৎ পোকার খাতিরে মুহূর্তের জন্যে ছাড়া মাটিতে বলতে গেলে একদম নামেই না। গাছে-গাছেই উড়ে বেড়ায়। এদের ডাক আরম্ভ হলে সহজে থামতে চায় না। দিনে-রাতে দু সময়েই ডেকে থাকে। বসন্তের আগমন থেকে বা তার

পাপিয়া

কিছু আগে শুরু হয়ে ডাক আর বর্ষার শেষে থামে। শীতকালে একদম চুপ।

ডিম পাড়ার সময় এপ্রিল থেকে জুন। পরভৃত-বংশীয় বলে বিভিন্ন জাতের ছাতারের বাসায় ডিম পাড়ে। যে পাখির বাসায় ডিম পাড়ে তার ডিমের সঙ্গে পাপিয়ার ডিমের রঙের মিল এত বেশী যে, তফাং করা শক্ত। একটি করেই ডিম একটি বাসায় পাড়ে। ডিমের রঙ গাঢ় নীল, একটু বড়, চকচকে ভাব একটু কম, মোটা খোলা। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·০০, চওড়ায় ০·৮ ইঞ্চি।

বাচ্চা পাপিয়াও ন্যায্যত বাসার মালিক ছাতারের ছানাদের ঠেলে বাইরে ফেলে দেয়। একবার একটি ছাতারের বাচ্চাসহ পাপিয়ার ছানা একই বাসায় আমার নজরে পড়েছে। তাতে মনে হয় সব সময় অপর ছানা থাকলেই যে ফেলে দেয় তা বোধহয় নয়।

পাপিয়াকে দেখা যায় প্রায় ভারতের সর্বত্র। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে সিংহল; পশ্চিমে আম্বালা, যোধপুর, কচ্ছ আর পূবে পূর্ব পাকিস্তান।

আর একটি পাখি পাপিয়ারই জ্ঞাতি ভাই, আচারে-ব্যবহারে একই, তার নাম—কোলা বুলবুল, ঝুঁটিদার পাপিয়া বা গোলা কোকিল (Clamator jacobinus) ইংরেজিতে — Pied Crested Cuckoo.

ঝুঁটি সমেত সমস্ত উপরিভাগ সবুজাভ কালো। ওড়ার পালক গাঢ় পাটকিলে মাঝ-খানে সাদা পটি। লেজ লম্বা, লেজের পালকের আগা সাদা। তলার দিক সমস্তটা সাদা। চোখের মণি লালচে-পাটকিলে। ঠোঁট কালো। পা সীসে-নীল। লম্বায় ১৩ ইঞ্চি।

একটু স্যাঁতসেঁতে জংলা জায়গা পছন্দ করে। বর্ষাকালে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশের কিছু অংশে ও আফ্রিকায় ৮ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে এদের দেখা যায়। ছাতারের বাসা ছাড়াও হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ী পোরদুইয়া (Streaked Laughing-Thrush) ও নীল-গিরির বাজার-এর (Nilgiri Laughing Thrush) বাসায় ডিম ছেড়ে পালায়। এদের ডাকটা একটু ধাতব—পিউ...পিউ... পি-পি-পিউ...পি-পি-পিউ। কখনও বা শুধু পিউ ডাকই ডাকে।

পরভৃতবংশীয় একটি পাখিকে দেখে-ছিলাম অপ্রত্যাশিতভাবে বহু বছর আগে। শীতের শেষ। পাখি-ধরা বেদে কানা-সতীশের সঙ্গে বেরিয়েছি। উদ্দেশ্য— পাখি দেখতে প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের জানতে ও ফাঁদ পেতে ধরতে।

বত্রিশ-তেত্রিশ বছর আগে শান্তিপুকুর অঞ্চল ছিল নির্জন ও জঙ্গল বিশেষ। এত কারখানা বাড়ি জাপগর কলোনি ইত্যাদি কিছুই হয় নি। আর ছিল কিছু অবহেলে পড়ে থাকা ধনীর বাগানবাড়ি ও মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেল। বেলঘরিয়া, শান্তি-পুকুর পার হয়ে যশোর রোড বাঁদিকে রেখে গেল। মার্টিনের রেললাইন ধরে চলেছি নন্দীগ্রাম পার হয়ে দূরে বাগুইহাটির দিকে।

হঠাৎ একটা স্থলপদ্মের গাছের উপর অদ্ভুত একটা ফিঙে দেখলাম। পরিষ্কার ফিঙে, কেবল লেজটা সাদা-কালোর ডোরা দাগ পাপিয়া বা শিকরের মত। সতীশও দেখেছে। সেও পাখিটা চেনে না। ফিঙের এমন ডোরাকাটা লেজ আমরা তো দেখিই নি, সতীশও কখনও দেখে নি। রেললাইন থেকে নেমে চুপ করে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সতীশ পাখিটাকে ধরার জন্যে অনেক ঘুরে পাখিটার পিছনে গেল। গাছের আড়াল থেকে ঘুরঘুরে পোকা দিয়ে চৌঘুড়ি ফাঁদটাকে সাতনালায় একটা সরু বাঁশের আগায় ঝোলাল। তারপর অতি ধীরে-ধীরে আড়াল থেকে বাঁশের মাথায় রাখা ফাঁদটাকে সন্তর্পণে এগিয়ে নিয়ে স্থলপদ্ম গাছটার তলায় রাখল।

পাখিটা আপন মনে ডাকছে। ফিঙের ডাক নয়, ডাকছে—টু...টু-উ...টু-উ-উ...। মিঠে ডাক। তিনটি স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে।

সতীশের কেরামতিতে আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘুরঘুরে পোকা খাবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে ধরা পড়ল। এবার পাখিটাকে ভাল করে সবাই দেখলাম।

উপর দিকটা চকচকে কালোর উপর নীলচে সবুজের আভা। মাথায় অল্প ঝুঁটি। ঘাড়ের ঠিক মাঝে দুটো পালক সাদা। উরুর পালকে কিছুটা সাদার ভাব, ডানার পালকের উপরেও কয়েকটা সাদা ছিট। লেজের মাঝা-মাঝি থেকে সাদা-কালোর ডোরা। এই কালোটা একটু ফিকে। ঠোঁট কালো, পা ধুসর-লালচে. চোখের মণি লালচে-পাটকিলে। লম্বায় ১০ ইঞ্চিটাক।

কি পাখিরে বাবা? জল্পনা-কল্পনা করেও পাখিটা কি তা ঠিক করতে পারলাম না। ফিঙে-শিকরে? না ফিঙে-পাপিয়া? দুটোই সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রীয় পাখি সুতরাং এদের সংমিশ্রণ অসম্ভব। তবে কি?

জার্ডনের বই 'বার্ড'স অফ ইণ্ডিয়া' খুলে পাখিটার নাম পেলাম- Drongo-Cuckoo বা Fork-tailed Cuckoo। ফিঙে-পাপিয়া (Surniculus dicruroides) এবং এদের আর একটা জাত আছে সেটা আকারে ছোট (S. legubris)। মাছ-লেজটাও অত পরিস্কার নয়। বাসস্থান—বহিহিমালয়। সেখান থেকে শীতকালে নামে উপদ্বীপাত্মক ভারত অর্থাৎ মধ্য-ভারত থেকে দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে। বাংলার সমতলভূমিতে দেশান্তরী হয়ে আসে কিনা তার পরিচয় নেই। তবে দার্জিলিং ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখা যায়।

কোকিল

বসন্তের অগ্রদূতকে কবি আহ্বান জানিয়েছেন—'এস এস বসন্ত ধরাতলে, আনো কুহুতান। বাংলা গানে ও কবিতায় বসন্তের দূত কোকিল (Eudynamis Scolopaceus) সম্বন্ধে যত বলা হয়েছে এত আর কোন পাখি সম্বন্ধে বলা হয় নি। বিলেতের কবিদের কাছে কৌ-কাকু-এর (Cuckoo) যেমন প্রাধান্য বাংলায় তেমনি কোকিলের।

গাঁয়ের কথা ছেড়েই দিলুম। শহর কলকাতায় বুকে খাঁচায় পোষা পাখি ছাড়াও রাস্তার ঘাটে বা কোন বাড়িতে বড় গাছ থাকলেই কোকিলের আগমন ঘটে, এমন কি দিন-দুপুরে চৌরঙ্গী পাড়ায় ও ফুটপাতে গড়ের মাঠের গাছ ছাড়াও এ-কুটের দেবদারু, শিরীষ রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছের উপর থেকেও ডাক পথচারীর কানে ভেসে আসে। জানিনে বাংলাদেশে এমন কেউ আছেন কিনা যিনি কোকিলের ডাক শোনেন নি।

কোকিলকে হিন্দি ও ইংরেজিতে বলে — Koel।

পুরুষের দেহ নীলচে সবুজ আভাযুক্ত কুচকুচে কালো। চোখের মণি টকটকে লাল। ঠোঁট নিষ্প্রভ সবুজ। পা সীসে রঙা। লেজ লম্বাটে। লম্বায় ১৭ ইঞ্চি। স্ত্রী-কোকিল জলপাই আভাযুক্ত পাটকিলে। তার উপর সাদা ছিট। ডানা, লেজ, বুক ও পেটে সাদা টানা দাগ। স্ত্রী-কোকিল বা কোকিলাকে সাধারণত লোকে বলে—ছিট-কোকিল। ছিট-কোকিল কিক কিক ডাক ছাড়া আর কিছুই ডাকতে পারে না।

খাদ্য—বট পিপুল তেলাকুচা পেঁপে ইত্যাদি ফল-পাকুড় খুবই প্রিয়। পোকা-মাকড়ও খায়।

বাগান বা কুঞ্জ যেখানে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ, পাতার আড়ালে লুকোন চলে সেখানেই এদের আনাগোনা। গাছের উপরেই থাকে, মাটিতে কখনো নামে না। মুখরোচক খাদ্যের লোভে যদিবা দৈবাৎ মাটিতে নামতে হয়, পায়ের এমন গড়ন যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পা দুমড়ে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে বসতে হয়।

এদের ডাক প্রথমটা বার-কতক খুব তাড়াতাড়ি কু-ও কু-ও কু-ও তারপরেই কুউ-উ কুউ-উ কুউ-উ করে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে চলে সমানে। এগাছ থেকে একটা পাখি ডাকছে, অল্প দূরে অন্য গাছে অপর একটি পাখি যখন ডাক শুরু করে তখন সেই জায়গাটা এক অপূর্ব মাধুর্যে ভরে যায়। কী রকম যেন একটা উদাস-করা সুরে চতু-র্দিক ভরিয়ে তোলে।

কোকিল

শীত পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এরা যে কোথায় আত্মগোপন করে তা সহজে টের পাবার উপায় নেই, যদিও জানি এরা স্থানীয় পাখি, দেশ ছেড়ে কোথাও যায় না।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'খল ও নিন্দুক' বলে একটা কবিতা পড়েছিলাম। তাতে একটা লাইন ছিল 'কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে। কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে।' কাকের সঙ্গে কোকিলের স্বরের মিল না থাকতে পারে কিন্তু একটা সম্বন্ধ আছে। কেননা এই কাকের বাসাতেই কোকিল ডিম পেড়ে আসে। কাক এত চালাক হয়েও কোকিলের এই বুদ্ধির কাছে হেরে যায়। বোকার মত পরের ডিম ফোটায় ও পরের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে।

আমারই চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটতে দেখেছি। বাগানে অশ্বত্থ গাছটায় বাসা বেঁধেছে কাক দম্পতী। বসন্তের আগমনে কোকিলও এসে হাজির। কদিন ধরেই দেখছি একটা ছিট-কোকিল কোকিল-টার কাছে-কাছে ঘুরছে। পাঁচ থেকে কুড়ি গজের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। এমনি-ভাবে কদিন যায়।

লক্ষ্য করি স্ত্রী-কাকটা ডিম পেড়েছে। বাসা ছেড়ে বেশী দূরে যায় না। পুরুষ কাকটা এক-একবার আসে তদারক করে চলে যায়। তার আসার সময়ের কোন স্থিরতা নেই। হঠাৎ কোকিলটা কাকের বাসার কাছে এসে খুব ডাকাডাকি শুরু করে দিলে। মাঝে-মাঝে খুব কাছে আসতে লাগল। স্ত্রী-কাকটা প্রথমে দ্রূক্ষেপ করে নি। শেষে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। বাসা থেকে বেরিয়ে তেড়ে গেল হাড়জ্বালানে কোকিলটাকে। কোকিলটা লেজে খেলাতে-খেলাতে একটু দূরের আম গাছটায় নিয়ে গেল কাকটাকে। সেই ফাঁকে দেখি ওই অশ্বত্থ গাছে কাকের বাসাটার অনেক উপরে পাতার আড়ালে ছিট-কোকিলটা ঘাপটি মেরে বসেছিল, ঝপ করে নেমে এসে বসে পড়ল ওই বাসায় ডিম পাড়তে।

হন্যে হয়ে স্ত্রী-কাকটা যখন ফিরে এল তখন ছিট-কোকিলের ডিম পাড়া হয়ে গেছে। ধীরে-সুস্থে সরেও পড়েছে। লক্ষ্য করলাম ছিট-কোকিলটা ডিম পাড়তে মিনিট দুয়ের বেশী সময় নেয় নি।

কোকিল-ছানাকে কিন্তু পিঠ দিয়ে ঠেলে কাকের বাচ্চাকে মাটিতে ফেলে দিতে চাক্ষুষ দেখি নি। দেয় জানি, কারণ সমস্ত পরভৃতের কোমরের কাছে হাড়ের গড়ন ফেলে দেবার জন্যেই। কিন্তু গাছের তলায় কাকের ডিম ভাঙা অবস্থায় দেখে বুঝেছি ডিম ফেলে দিয়েছে।

বাংলাদেশে কোকিল অনেক বেশী বলে একই কাকের বাসায় দু-তিনটে ডিম দেখা যায়। শোনা যায় তেরোটি পর্যন্ত ডিম একটি বাসায় দেখা গেছে। ওই ছিট-কোকিলটাকে বা অন্য কোনও কোকিলকে আমার দেখা বাসায় আর ডিম পাড়তে দেখি নি।

ডিম ফোটা, বাচ্চা প্রতিপালন ও বড় হয়ে উড়ে যাওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করেছিলাম। ছিট-কোকিলের মাতৃস্নেহের পরিচয়ও পেয়েছি। ওই বাচ্চাটাকে মাঝে-মাঝে এসে খাইয়ে যেত কাকের অবর্তমানে। কাক যখন বুঝল ওটা ওর বাচ্চা নয় তখন আর তার করার কিছু নেই।

ছিট-কোকিলের মাতৃস্নেহের প্রকাশ খুবই আশ্চর্যজনক। খাঁটি পরভৃত-বংশীয় কোন পাখির এই আচরণ তাদের রীতি-বিরুদ্ধ। পরিবেশের কোন তারতম্যে এবং কোন কারণে এরা তাদের স্বধর্ম ত্যাগ করেছে সেটা বিজ্ঞানের চিন্তনীয় বিষয়।

স্ত্রী-কোকিল দেখতে ভিন্ন হলেও বাচ্চা অবস্থায় একদম কালো, তফাৎ করার কোন উপায় নেই বরং পুরুষের চেয়ে কালোর ভাবটা একটু বেশী মাত্রায়।

কোকিলের ডিম পাড়ার সময় সাধারণতঃ এপ্রিল থেকে আগস্ট। কিন্তু এর তারতম্য ঘটে। যেখানে স্থানীয় কাক যে সময় ডিম পাড়ে কোকিল ঠিক সেই সময় ডিম দেয়। কেবল যে পাতিকাকের বাসায় ডিম পাড়ে তা নয়, দাঁড়কাকের বাসাও বাদ যায় না।

ডিমের চেহারা কাকেরই মত, কেবল আকারে একটু ছোট। রঙ হাল্কা ধূসরাভ সবুজ কিম্বা পাথুরে। তার উপর লালচে পাটকিলে এবং হাল্কা বেগুনীর ছিট ছোপ ও দাগ। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·২০, চওড়ায় ০·৯ ইঞ্চি।

কোকিল ভারতের সর্বত্র; দুই পাকিস্তান, ব্রহ্ম ও সিংহল। আসাম-ব্রহ্ম যে জাতটা (E. Malayana) তারা ভারতীয় অপেক্ষা আকারে একটু বড়।

কুকো

পুকুরটার দক্ষিণ পাড়ের দু কোণে দুটো ছোট শিবমন্দির। বড় রাস্তার দিকে যে শিবমন্দির তার আশ-পাশটায় বেশ ঝোপঝাড়। হাতার পাঁচিল পার হয়ে তবে বড় রাস্তা। শিবমন্দির ও ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে পায়ে-চলা রাস্তা পুকুরটার পুব পাড় ধরে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছি, শিবমন্দিরটা পার হয়েছি কি হই নি হঠাৎ কানে এল ভারী গম্ভীর গলায় কে যেন বলছে—কু-ক কু-ক। আমার অসাটা পাখিটা বুঝতে পারে নি। ঝোপ থেকে ঝুপ করে নেমে পুকুর পাড়ের ঘাসের উপর কয়েক পা মাথা নিচু করে সরু থেকে ক্রমশঃ চওড়া লেজ নিয়ে হাঁটল বেশ হেলেদুলে, যেন বড়লোকের গিন্নি। বেশ বোঝা যায় উড়তে ভাল পারে না, ঝোপঝাড়ের পাখি।

কুকো

হাঁটার ভঙ্গিটা বেশ। লেজটা একবার ছড়াচ্ছে আর একবার বন্ধ করছে।

নাম--কুকো (Centropus bengalensis) হিন্দি — মাহোকা। ইংরেজিতে— Crow-Pheasant বা Coucal

আকারে দাঁড় কাক। লম্বায় প্রায় ১৮ ইঞ্চি, স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। কুচকুচে কালো'র উপর সবুজ ইস্পাত-নীল ও বেগুনীর আভা মেশান। কেবল ডানা গাঢ় বাদামী এবং দেহের অনুপাতে ছোট ও গোল। চোখের মণি টকটকে লাল। ঠোঁট ও পা কালো। ঠোঁট মোটা ও ঈষৎ বাঁকানো। পিছনের পায়ের একটা নখ বড় এবং সোজা।

খাদ্য—ঘেসো ফড়িং, গঙ্গা ফড়িং, শুঁয়ো পোকা, মেঠো নেংটি, বিছে, টিকটিকি গিরগিটি, ছোটখাট সাপ, নানাবিধ পোকা ও ছোটখাট ফল। অন্য পাখির ডিম ও ছানা চুরি করে খেতে এরা ভারী ওস্তাদ।

বাংলাদেশের প্রতিটি পল্লীগ্রামে বা যে কোন ঝোপঝাড়ের বাগানে মানুষের বসতির পাশে বা মাঝে কুকোর বাস। ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। কারণ কোনও জঙ্গলে কুকো দেখি নি। জোড়ায় বা একা থাকতেই ভালবাসে। টোটকা চিকিৎসায় এদের মাংস বুকে সর্দি অর্থাৎ ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

শারীরস্থানের বিচারে কুকো পরভৃত-বংশীয় পাখি হলেও এরা স্বভাবে মোটেই পরভৃত নয়। কেবল কুকো নয় এরকম আরও কতকগুলি পাখি আছে। এরা স্ত্রী-পুরুষ দুজনে মিলে বাসা বানায়, ডিমে তা দেয়, বাচ্চা প্রতিপালন করে, দেশান্তরে যায় না; স্থানীয় পাখি। এই বিপরীত-ধর্মী স্বভাবের জন্যে অনেক বিজ্ঞানীর মত এদের আলাদা এক গোত্র বা বর্গে ধরা উচিত।

কাটি-কুটো ঘাস ও গাছের পাতা দিয়ে ফুটবলের মত গোল বাসা বানায়। তার মাঝে থাকে প্রবেশদ্বার। তার ভিতর ঢুকে লেজটা বাইরে বের করে দেয়। কখনও বা পিরিচের আকারে এবড়ো-খেবড়ো বাসাও বানায়। বাসা বানাতে সাধারণতঃ কাঁটাঝোপ পছন্দ করে বেশী। গাছের দুই ডালের ফাঁকে বা ঘাসবনেও বানাতে দেখা গেছে। মাটি থেকে উচ্চতার কোন ঠিক নেই, তবে নিচের দিক ঘেঁষেই।

ডিম পাড়ার সময় ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর। ৩ থেকে ৪টে সাদা পালিশহীন ডিম। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·৪, চওড়ায় ১·২ ইঞ্চি।

বাসস্থান—তরাই অঞ্চল, দুই বাংলাদেশ, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত। এদের বড় ভাই অর্থাৎ আকারে একটু বড় যে জাত (C. Sinensis) তাকে দেখা যায় হিমালয়ের পাদদেশে ৬ হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত, কাশ্মীরে, উত্তর ভারতের সমতলভূমি থেকে সিন্ধুপ্রদেশ এবং উত্তর আসাম থেকে চীন। লম্বায় কেবল ১৯ ইঞ্চি, আর কোন তফাৎ নেই। দক্ষিণ বোম্বাই থেকে সিংহল পর্যন্ত বাংলার চেয়ে আকারে ছোট এক জাতকে (C. S. parroti) দেখা যায়।

আরও দুটো পাখি যারা এই শ্রেণীর হয়েও কৌলীন্য বজায় রাখে না তাদের খবর দেব। একটিকে দেখেছি মেদিনীপুরে ও উড়িষ্যার জঙ্গলে। তাকে দেখা যায় নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলে, আসাম, হিমালয়ের পাদদেশ এবং মধ্যভারত থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে।

নাম--বনকোকিল (Rhopodytes tristis) হিন্দি — কাপরা-পপৈহা। ইংরেজি — Green-Billed Malkhoa।

বেশ বড় পাখি, প্রায় ২০ ইঞ্চি কি তার কিছু বেশী হবে। উপরের পালক সবুজাভ গাঢ় ধূসর। সরু থেকে চওড়া লম্বা লেজের ধারের পালকগুলির প্রান্তদেশ সাদা। গলা ও বুক গাঢ় ধূসরের উপর সাদাটে ছাইয়ের দাগ। পেটের অংশ জরদ-হলুদ। লালচে চোখের মণির চারিদিকে সাদার বেড়, তারপর লোমহীন খানিকটা গোল চামড়া, তার রং লাল। ঠোঁট সবুজ এবং পা জলপাই রঙ্গা।

খুব সুন্দর দেখতে। বনকোকিলকে বন্য পরিবেশে হঠাৎ যখন প্রথম দেখি, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে এর সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম। আচার-ব্যবহার প্রায় সবই কুকোর মত, তবে মাটিতে এরা বিশেষ নামে না।

ভারতবর্ষে অপর একটা জাতকে (R. viridirostris) দেখা যায়। এদের চোখের চারি পাশের লোমহীন চামড়া আকাশীনীল। আকারে ছোট—১৫ ইঞ্চি।

দ্বিতীয়টিকে বাংলা-হিন্দিতে বলে—জংলি তোতা (Taccocua Sirkee) ইংরেজি—Sirkeer। নামে তোতা হলেও কিন্তু এরা তোতাপাখি নয়।

লম্বায় ১৭ ইঞ্চি। উপরিভাগ গাঢ় জলপাই-পাটকিলে। ডানা ও লেজ একটু রেশমী ভাবের জলপাই-সবুজ। লেজের শেষ প্রান্তের পালকগুলি কালো, অগ্রভাগ সাদা। চিবুক গলা বুক ও লেজের তলা জলপাই-সবুজ। পেট গাঢ় লালচে বা বাদামী। চোখের মণি লালচে-পাটকিলে। ঠোঁট টুকটুকে লাল। ডগাটি একটু বাঁকা ও হলুদ। পা সীসে রং।

নিরিবিলি জঙ্গল ভালবাসে। আচার-ব্যবহার কুকোর মত। মুখ দিয়ে আওয়াজ সহজে বার করে না। খুব চুপচাপ। এই কারণে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। বাংলা, আসাম ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এদের বাসস্থান।

আরও দুটো জাত আছে। প্রথমটিকে (T. leschenaulth) দেখা যায় হায়দ্রাবাদ থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি (T. l. infuscata) পূর্ব হিমালয়ে ৬ হাজার ফিট পর্যন্ত।

কেন যে এদের জংলি তোতা বলা হয় তা বুঝি না। না শারীরস্থান না আচার-ব্যবহার কোন কিছুতেই তোতা বা টিয়া জাতীয় পাখির সঙ্গে মিল নেই একমাত্র লাল ঠোঁট ও অগ্রভাগ একটু বাঁকা এই ছাড়া। হয়ত তার জন্যেই তোতা নাম এসেছে।

পাঠকের বৈঠক

নেহরু : জীবন সায়াহ্নে

সাপ্তাহিক ব্লিৎস পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আর কে করণজিয়া মাঝে মাঝে পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে নানাবিধ সমকালীন সমস্যা বিষয়ে তাঁর অভিমত সংগ্রহ করতেন। এই জাতীয় কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ তাঁর 'দি মাইনড্ অব মিঃ নেহরু' নামক গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থে নেহরুর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের অনেক ঐতিহাসিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং নেহরুর জীবনে যে যুক্তিগ্রাহ্য সমন্বয়ের ধারার পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল কোথায় তা জানা যায়। এই সমন্বয়-নীতি নেহরুজীর নিরপেক্ষ-নীতির মৌল ভিত্তি। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে ঢালার প্রেরণা এই সমন্বয় সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন।

'দি ফিলসফি অব মিঃ নেহরু' গ্রন্থে মিঃ করণজিয়া সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটিতে নেহরুর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যাবে না, বরং কিভাবে নেহরু তাঁর জীবনদর্শন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রয়োগ করেছেন, তার পরিচয় মিলবে। এক হিসাবে প্রথম গ্রন্থটি ছিল সদ্য স্বাধীনতালব্ধ নেহরুর উৎসাহ-প্রদীপ্ত জীবনের উত্তেজনাময় মুহূর্তের কয়েকটি খণ্ডচিত্র। মিঃ করণজিয়া এই কালটিকে 'সুবর্ণযুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৫০-৬০ খৃষ্টাব্দে নেহরু-নীতির সুফল আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেখা গেছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়ন-প্রকল্পে নেহরুর নেতৃত্ব স্বীকৃতিলাভ করেছে। স্বদেশে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র একই সঙ্গে একটা শিল্পসমৃদ্ধ ঘাঁটি রচনায় সহায়তা করেছেন। এইসব দৃষ্টিকোণে বিচার করলে মনে হয় যে, স্বয়ং নেহরুর মনে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব জেগেছিল।

নিরপেক্ষ নীতির অর্থ হল ঘরে-বাইরে নিজস্ব নীতি মেনে চলা, স্বাধীনভাবে নিজস্ব ভঙ্গীতে কাজ করা। স্বাধীনতার মূল কথাই এই। স্বাধীনতা মানেই অবাধ স্বাধীনতা। নেহরুর এই নীতি নতুন কিছু হয়নি, ভারতবর্ষ যে-নীতিকে বিশ্বের সামনে ধরেছিল, তার পিছনে ছিল সুগভীর আত্মপ্রত্যয়। শুধু স্বদেশের নয়, অন্যান্য অনগ্রসর দেশের শিল্পগত উন্নয়ন যে বিশ্বশান্তির মূল সূত্র এ-কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বিজ্ঞান ও কারিগরীশিল্পের উন্নয়ন বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

এইসব বিষয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধী-নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী নীতি আরো পিছিয়ে চলে গিয়েছিল এবং সর্বদাই তা একটা যোগাযোগ পড়ার ব্যবস্থা করেছে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। পরস্পর-বিরোধী নীতির মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে, সংঘাতের দ্বারা কোনো সমস্যার নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করেনি।

ভারতবর্ষ তার স্বক্ষেত্রে যে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচ আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, সেই নীতিও এই একই ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। প্রথমে এই নীতির একটা কাঠামো ভারতীয় কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে গৃহীত হয়, তারপর নাগপুর অধিবেশনে পূর্ণাঙ্গ খসড়া রচিত হয়। গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং সমবায় খামার কৃষি-বিপ্লবকে যমজ হাতিয়ার হিসাবে ধরা হল। এই নীতি অবশ্য ঠিকমত আকৃতিলাভ করেনি, তবে নেহরুজী যে-সময় এই কথা বলেছিলেন, তখন অবশ্য কৃষি অর্থনীতির কায়াকল্প সাধনে এই অস্ত্রকেই যোগ্যতম বিবেচনা করা হয়েছিল।

অচিরেই অবশ্য এইসব আশাবাদী প্রকল্পের মধ্য থেকে খড় বেরিয়ে পড়ল, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নীতির দুর্বলতা দেখা দিল। প্রকৃতপক্ষে গোড়ার দিকের এক সাক্ষাৎকারে নেহরুজী বলেছিলেন, "যদিও পাকিস্তান ও চীন-সম্পর্কিত ভারতীয় নীতিকেই অকাট্য বলে মনে করি, আমরা কিন্তু বর্তমানে এক কানাগলিতে এসে আটকে পড়েছি।" নেহরুজীর অবশ্য আশা ছিল যে, পরিণামে এই নীতির শুভ প্রতিক্রিয়া অপরপক্ষে ঘটবে।

এই নীতি সফল হয়নি এ-কথা সকলেই জানেন। অনেকের ধারণা তাঁরাও বুঝেছিলেন এই নীতি বিফল হতে বাধ্য। কিন্তু অনেকেই এই কথা চিন্তা করেন না যে, ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে যে নেহরুর সুগভীর জ্ঞান, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ে যিনি সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন, আন্তর্জাতিক জোটের অভিসন্ধি সম্পর্কেও তিনি ধারণাহীন ছিলেন না, তথাপি এই ধারণা কেন তাঁর হয়েছিল যে পাকিস্তান ও চীন হয়ত একটা বোঝাপড়ার পথে এসে দাঁড়াবেন। শুধু তাই নয়, পরে দেখা গেল, পাকিস্তান চীনের সঙ্গে একটা সামরিক মিত্রতার গাঁটছড়া বেঁধেছেন শুধু ভারতবর্ষকে জব্দ করার জন্য। এই সম্ভাবনাও নেহরুর চিন্তার বাইরে ছিল। এই মিত্রতার পিছনে ছিল শত্রুতার অভিসন্ধি। মজার কথা এই যে, যাঁরা চীনের বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ সেই সব রাষ্ট্র কিন্তু পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন, পাকিস্তানের সমর্থনে তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই, পাকিস্তানের প্রতি সমবেদনায় তাঁদের চোখে জল।

মিঃ করণজিয়ার এই গ্রন্থে কোন কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। সেই সব অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য না হতেও পারে তবু, তার মধ্যে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেছে তার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

চীনের ভারত আক্রমণ নেহরুজীর কাছে এক প্রচণ্ড আঘাতের মত বেজেছে। তিনি সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে বলেছেন :

> "The cynicism and duplicity of the whole things baffles human imagination. We are supposed to be aggressors upon our own land and they come as defenders of our territory!"

কিন্তু এই সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতবর্ষ আগে ভাগে কি কোন সংবাদই পায় নি? এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত কোন সূত্র কি গোপনে জানা যায় নি? এর জবাবে নেহরুজী বলেছেন :

> "I know something of history, and it teaches me that whenever China had a strong Central Government she tended to be imperialist; but I expected that their much vaunted Communist discipline might induce the new Chinese Government to act otherwise."

এই সূত্রে নেহরুজী আবার অন্যত্র বলেছেন :

> "China and India constitute two of the biggest countries of Asia with many great similarities and many great differences. Now if the similarities could have been mobilised and the differences were made to co-exist, what a mighty power for peaceful development and co-operative achievement could be generated!"

নেহরুজীর এই চিন্তা সকল ভারতবাসীরই চিন্তা ছিল। নেহরুজী চীনের তরফ থেকে একটা সংঘর্ষ ঘটতে পারে এটা কল্পনা করতে পারেন নি। তাই গোড়ার দিককার একটি সাক্ষাৎকারে করণজিয়া প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'আপনার কি মনে হয়, চীনের সঙ্গে একটা গুরুতর সংঘর্ষ ঘটবে?'

এর উত্তরে নেহরুজী সেদিন বলেছিলেন : 'না আমার তা মনে হয় না। আমি

অন্তত ভারত-চীন সংঘর্ষ যে হতে পারে তা চিন্তা করতে পারি না।'

এই উক্তি থেকে নেহরুর চিন্তার একটা সূত্র সন্ধান করা যায়। নেহরুজী বুঝেছিলেন যে পৃথিবীর প্রকৃত সংঘাত ধনতন্ত্রবাদ আর সমাজবাদ নিয়ে নয়, আসল সংঘর্ষ হল উন্নত আর অনুন্নত দেশের সংঘাত। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, চীনের সঙ্গে একটা সমঝোতা ও সহযোগিতার চুক্তি বজায় থাকলে সংঘাত এড়ান যাবে।

সংঘাতের চরিত্র নিয়ে চীনারা নেহরুজীর সঙ্গে একমত হলেও তাঁদের মত-পার্থক্য ছিল বিরোধের মীমাংসার পদ্ধতি বিষয়ে। মার্শাল লিন পিয়াও রচিত মীমাংসার সূত্রে পৃথিবীর কৃষি অঞ্চলের সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উন্নততর দেশের নগরগুলিকে অবরোধ করা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পঞ্চশীল নীতি অনুসারে তিব্বত সম্পর্কে যে চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদিত হয় তা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তবে চোর পালালে গৃহস্থের বুদ্ধিটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

এই আলোচনায় বোঝা যায় যে, নেহরুজী একটা ভাবধারা সম্পর্কে যতখানি আগ্রহশীল হতেন তার সমাধান বিষয়ে সেই আগ্রহের অভাব ছিল। আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে নাগপুর প্রস্তাব হয়ত একটা জবাব নয়। আমরা কোন দিনই এ বিষয়ে কিছু জানব না, কারণ সেই প্রস্তাব নিরালম্ব বায়ুভূক অবস্থায় আছে। মিঃ করণজিয়ার এই গ্রন্থটিতে নেহরু দর্শনের বা মনোভঙ্গীর পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। বিশেষত জীবনসন্ধ্যায় হতাশাজর্জর বিভ্রান্ত, বেদনাহত নেহরুর এক নিখুঁত আলেখ্য বলা যায় এই বইকে।

—অভয়ংকর

THE PHILOSOPHY OF MR. NEHRU: By Mr. R. K. KARANJIA Published by George Allen and Unwin: Price 18 Shillings.

প্রয়াগে হিন্দি ও উর্দু লেখক সম্মেলন ॥

সম-সাময়িক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক সাহিত্যের সমস্যা আলোচনার জন্য সম্প্রতি প্রয়াগে 'প্রগতি'র উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক হিন্দী-উর্দু লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রবীণ ও নবীন বহু সাহিত্যিক উপস্থিত হন। আলোচনার সুবিধার্থে এই সম্মেলনকে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা। এক এক গোষ্ঠীর উপর এক-একটি বিষয় আলোচনার ভার পড়ে।

প্রথম গোষ্ঠীর আলোচ্য বিষয় ছিল, 'সাহিত্য ও সমসাময়িক জীবন।' এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা। শ্রীপ্রকাশ-চন্দ্র গুপ্ত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে আলোচ্য বিষয়টি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। মূল বিষয়টি উত্থাপন করায় কথা ছিল শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থের। কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন শ্রীঅমৃত রায়। তিনি তরুণ লেখকদের রচনায় নগ্ন-যৌনতার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আশা করেন যে সাহিত্য এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবেই। শ্রীরামকুমার বর্মা, শ্রীপন্থের কথা মোটামুটি সমর্থন করেন। শ্রীওমপ্রকাশ ভাটনগরের মতে প্রেমচাঁদের পরে আর কোনও যথার্থ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেনি। ডাঃ জিল্লে হুসেন, ডাঃ প্রসাদ সিংহ, শ্রীগোপীকৃষ্ণ গোমেশ, শ্রীবসন্ত নবাস প্রভৃতিও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

সভনেত্রীর ভাষণে শ্রীমতী বর্মা বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি একটি শুভ সংকেত লক্ষ্য করছেন। এর দ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না সত্য, কিন্তু অনেক বিপরীত কথা-বার্তা শোনা গেল যা সৃজনশীল সাহিত্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বিষয় ছিল, 'সাহিত্য বিধায়েঃ স্বরূপ ও সংগঠন।' এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ জগদীশ গুপ্ত। এই বিষয়ের উপর প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীদুলাচন্দ্র ঘোষ। এছাড়া শ্রীরামলাল 'কাহিনী ও পাঠক', শ্রীশামসুর রহমান ফিরোকী 'কবিতার আন্তরিক স্বরূপ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয় গোষ্ঠীর আলোচ্য বিষয় ছিল—'সাহিত্য আলোচনাঃ নয়ে প্রতিমান'। এতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীফিরাক গোরখপুরী। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅজিতকুমার, শ্রীবিমল বর্মা, শ্রীঅজিত পুষ্কল, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বর্মা প্রমুখ আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্নমুখী আলোচনার ফলে অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে। এই ধরনের আলোচনা সভা এর আগে অল্পই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হিন্দী পত্রিকার বাংলা বিশেষ সংখ্যা ॥

যুযুৎসা নামক হিন্দী সাহিত্যপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানান হয়েছে যে, তাঁরা বাংলা ভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও কবিতার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীজয়ন্তকুমার। যাঁদের লেখা হিন্দীতে অনূদিত হবে বলে

জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, বনফুল, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলি, জরাসন্ধ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও সি গাঙ্গুলি, সত্যজিৎ রায়, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, কমল চৌধুরী শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, বিমল কর, কমল মজুমদার, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু ও আরো অনেকে।

উর্দু কবির পরলোকগমন ॥

প্রখ্যাত উর্দু কবি নবাব মীর্জা জাফর আলী খান কামার গত ৬ জুন লখনউ শহরে পরলোকগমন করেন। তিনি কাশ্মীরের মহারাজা হরিসিং-এর সময়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকলেও তাঁর কবিপ্রতিভা ব্যাহত হয়নি। আধুনিক উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুতে উর্দু সাহিত্যের যে খুবই ক্ষতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

একটি সাহিত্য পত্রিকা ॥

মালয়ালম ভাষায় 'সমীক্ষা' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপিত হয়েছে কেরলে। যদিও মালয়ালম ভাষাতেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তবু ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও পত্রিকাটির যথেষ্ট অবদান আছে। পত্রিকাটির সম্পাদক হলেন শ্রী এম গোবিন্দন।

সম্প্রতি 'সমীক্ষা' পত্রিকাটির একটি বিশেষ ইংরেজি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভারতের বিভিন্ন ভাষার আধুনিকতার উপর কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও কাজী নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, অজ্ঞেয়, পু শি রেগে, কা না সুব্রহ্মনিয়ম, শিবরুদ্রাপ্পা প্রভৃতি প্রবীণ কবিদের কবিতার পাশাপাশি দিলীপ চিত্রে, নারায়ণ সুর্বে প্রভৃতি তরুণ কবিদের কবিতাও স্থান পেয়েছে।

লিটারেরি কুইজ ॥

লিটকুইজ বোম্বের সম্প্রতিকালের একটি সাড়া জাগানো সাহিত্য প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন ভারতীয় লেখকের রচনা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতাটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। অবসর সময় নিশ্চিন্তে কাটান যায় এ নিয়ে। সম্প্রতি লিটকুইজ প্রাইভেট লিমিটেড ২৫,০০০ হাজার টাকার পুরস্কার বিতরণ করেছেন। প্রায় চব্বিশটি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে মোট ২,৬৩,৫০০ টাকা।

১৯৬৫-এর অসমীয়া কবিতা ॥

'বছরের কবিতা ১৯৬৫'—এই নামে সম্প্রতি অসমীয়া কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অসমীয়া কাব্য-সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগী পাঠকদের কাছে এই সংকলন গ্রন্থটি অপরিহার্য।

বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা যে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা হয়ত অনেক সময়েই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। একসঙ্গে সুনির্বাচিত কবিতাগুলি পেলে পাঠক অতি-সহজেই কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমান সংকলক অবশ্য ভূমিকায় বলেছেন তাঁর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য খুবই সীমাবদ্ধ। এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন—

> "এতিয়ার অসমীয়া কবিতা ঘাইকৈ আলোচনীর পাতত ক্ষীণজীবী অথবা অনাতাঁরর তরংগত ক্ষণজীবী। অতি কম সংখ্যক কবিরহে ব্যক্তিগত কাব্য সংকলন প্রকাশ হৈছে। হঠাৎ কোনো এজন পাঠকর যদি কোনো এজন কবির কবিতা এটা আকৌ এবার পঢ়ি চাবর মন যায়, তেও' পুরণি আলোচনী বিচারী হাবাথুরি খাবলগীয়াত পরে।"

এই অসুবিধা দূর করার জন্যই এবং সাধারণ পাঠকের সঙ্গে কবিতাকে পরিচিত করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এই সংকলন। এই সংকলনটি থেকে আসামের কাব্যধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

আসামের নবীন কবিরা প্রায় সকলেই একথা উপলব্ধি করেছেন যে, জটিলতা সৃষ্টি কবিতার ধর্ম নয়—চিন্তাধারার কলাসংগীত প্রকাশরীতিই কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য। তবে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে কবিতা যেভাবে নতুন মূল্যবোধ দ্বারা আক্রান্ত, অসমীয়া কবিতাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। সমাজ চেতনাও ১৯৬৫ অসমীয়া কবিতার অন্যতম উপাদান। একটা স্থায়ী মূল্যবোধের দিকেই যেন এখন কবিদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি। অবশ্য একথা ঠিক, এই সমাজচেতনা মূলত আত্মকেন্দ্রিক। শ্রীপরেশমল্ল বড়ুয়া কবিতার এই আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন—

> "এই বছরর কবিতাবলীর বেচিভাগেই সমাজসচেতনাত্মক হলেও আত্ম-কেন্দ্রিক ঃ নিরিবিলি পরিবেশর মাজত উপলব্ধ আত্মিক অনুভূতির বিস্তীর্ণ বেদনা। কবিসকলে প্রায় সময়তেই আত্মোপলব্ধির এক গভীরতম স্তরত বিচরণ করিছে।" এই আত্মকেন্দ্রিক সমাজ সচেতনতার পরিচয় বোধ হয় শ্রীনীলমণি ফুকনের কবিতাতেই সর্বাধিক পরিস্ফুট।

উদ্ধৃতি দিতে গেলে হয়ত কলেবর বৃদ্ধি পাবে। শুধু উপসংহারে এটুকুই বলা যায়, এই সংকলনটি আধুনিক অসমীয়া কবিতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রবীণ কবি থেকে আরম্ভ করে তরুণতর কবিদের কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। ফলে একই সঙ্গে সকলের কবিতা পাঠের আনন্দ যেমন একদিকে পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে কবিতার অগ্রগতি সম্বন্ধেও একটি ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

কিশোর বয়সের কাহিনী

আজকাল 'জুভেনাইল ফিকশান' রচনার একটি ঝোঁক দেখা দিয়েছে। কিশোরদের মানসিক প্রবণতা, অদ্ভুত চরিত্র, প্রেমানুভূতি, অল্প বয়সের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। রেপে বেগিয়ানির 'দি সান ট্রেন' সম্ভবতঃ সবগুলিকেই টেক্কা দিতে চলেছে। বইটি কিশোর বয়সের কাহিনী হিসেবে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একাধিক পুরস্কার ও বইটিকে ঘিরে ঘোষণা হয়েছে। যে কোনো বয়সের লোকের কাছেই বইটি উপাদেয় বলে বিবেচিত হবে। অত্যন্ত বিচিত্র ও সুন্দরভাবে এক কিশোরের মাধ্যমে যৌবন উদ্দীপনার ক্রমসঞ্চরমান পর্বটি বিধৃত হয়েছে। বইটির গদ্যভঙ্গি ও সরস কৌতুক কটাক্ষগুলি পাঠকের দীর্ঘকাল মনে থাকবে।

পরলোকে কবি ল্যাংস্টন হিউজ ॥

নিগ্রো কবি ল্যাংস্টন হিউজ সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু স্বদেশে এবং বিদেশে অনুরাগী পাঠকদের অভিভূত করেছে। আজীবন মানবতার পূজারী হিউজ নিগ্রো মুক্তি আন্দোলনের জন্য অমর হয়ে থাকবেন।

অল্প বয়স থেকেই হিউজ ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। ছাত্র জীবনেই 'লিবারেটার' পত্রিকায় জাঁদরেল আমেরিকান কবিদের সঙ্গে পাশাপাশি তাঁর কবিতা বেরিয়েছে। হুইটম্যানের কবিতার তিনি ছিলেন বিশেষ ভক্ত।

হিউজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি ওয়েরি ব্লুজ।' এই কাব্যগ্রন্থটি তাঁকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম চালিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর স্নাতক হয়ে পেশাদার লেখক হিসেবেই জীবিকা শুরু করেন। গল্প, কবিতা, নাটক উপন্যাস ছাড়াও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনায়ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। শিশুদের জন্যও তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মুলাতো' দীর্ঘকাল ব্রডওয়ে থিয়েটারে অভিনীত হয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। তাঁর

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ফাইন ক্লথস টু দি জু', 'ডিয়ার লাভলি ডেথ' 'শেক্সপীয়র ইন হার্লেম' উল্লেখযোগ্য। 'নট উইদাউট লাফটার' উপন্যাসখানির জন্য তিনি হার্মোন পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এছাড়া একটি ভ্রমণকাহিনীও তিনি রচনা করেছেন—নাম 'দি বিগ সী।'

নিগ্রো মুক্তি আন্দোলন, জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই হিউজের কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। কবিতার আঙ্গিক বা প্রকরণশিল্পের জন্য তিনি তেমন নজর দেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর অনেক তরুণ মার্কিন কবি হিউজের কবিতার বক্তব্যগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। এ'দের মধ্যে ওয়েন ডডসন, রবার্ট হেডেন, ও হিগিনস, মেলভিল তলসন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একাদশ বার্ষিক লেনিন পুরস্কার ॥

সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে লেনিন পুরস্কার। সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে।

এ বছর থেকে প্রতি দু বছর অন্তর একবার লেনিন পুরস্কার দেওয়া হবে। সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির জন্য মোট পাঁচটি পুরস্কার থাকবে। এছাড়া থাকবে অন্তঃ দশটি প্রাদেশিক পুরস্কার।

১৯৬৭ সালে সাহিত্যের জন্য লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন কবি মিখাইল স্বেৎলভ। অবশ্য এই পুরস্কার প্রাপ্তির অনেক আগেই তিনি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'গ্রেনাডা' ও 'কাকোভকা'। এই দুটি কবিতা গ্রন্থের জনাই তিনি প্রত্যেক রুশবাসীর কাছে ও কবিতানুরাগীর কাছে অমর হয়ে থাকবেন।

তরুণ লেখকের প্রথম উপন্যাস ॥

জীবনের প্রথম উপন্যাসেই অনেক লেখক প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—এরকম নজিরের অভাব নেই। তরুণ ঔপন্যাসিক পল বেইলির প্রথম উপন্যাস 'এ্যাট দি জেরুজালেম' প্রথম আবির্ভাবেই লেখক সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার অবকাশ রাখে।

বার্ধক্যের অপরিসীম দুর্ভোগ ও নিঃসংগতা আলোচ্য উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য। লেখক বয়সে তরুণ হয়েও জীবনের এই পর্বের এতো সার্থক চিত্র এ'কেছেন যে তা প্রতিটি মানুষের সহানুভূতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ৭০ বৎসর বয়স্ক ফেথ গ্যার্ডানি—একজন বিধবা। মৃত্যুচিন্তায় তিনি জর্জরিত, সন্দেহপ্রবণ। পুত্র-কন্যা কারো পরিবারেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। ফলতঃ দিনের পর দিন এই সব অসন্তোষ পরিণামে তাঁকে আরো দুঃখিত, বিষণ্ণ ও ম্যালিনায়গ্রস্ত করে তোলে।

ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য সভ্যতা সম্পর্কে সোভিয়েত সাহিত্য ॥

অন্যান্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা ও ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন নতুন পুস্তক সোভিয়েত সাহিত্যে সংযোজিত হচ্ছে অনবরত। জ্যোতিপদার্থ-বিজ্ঞানী ইওসিফ শ্‌ক্লোভ্‌স্কি'র "ব্রহ্মাণ্ড, জীবন ও যুক্তি" বইটি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং এতে অন্যান্য গ্রহে ও নক্ষত্র-মণ্ডলীতে বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন মানে সভ্যতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই বইটির পরেই বিয়েলোরুশিয়ার রাজধানী মিনস্ক-এ প্রকাশিত হয়েছে ফেলিকস জিগেল'এর বই "মহাজগতে জীবন"। এই বইটিতে জ্যোতিঃ রসায়নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন গতি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯০৮ সনের যে তুঙ্গুস উল্কা-পাত এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সজীব আলোচনার খোরাক হয়ে রয়েছে জিগেল পুনরায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একটি অনুমান অনুসারে ১৯০৮ সনে অন্য একটি গ্রহ থেকে একটি মহাকাশ-যান পৃথিবীতে এসেছিল। অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির নাউকা প্রকাশভবন "জনাকীর্ণ মহাজগত" নামে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করবে। আকা-দেমিসিয়ান বোরিস কনস্তান্তিনোভ'এর সম্পাদনায় এই বইটিতে পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্বের প্রশ্নটির বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিগত মাসগুলিতে এইভাবে নিয়ে লিখিত একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে মস্কোর বৃহৎ মীর প্রকাশ-ভবন থেকে। এই বইগুলি হল স্ত ফিসোফ'এর "পৃথিবীর বাইরে জীবন" ও এম ওয়েন্দেন'এর "ব্রহ্মাণ্ডে জীবন" (ইংরেজী ভাষায় অনূদিত)।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অতিশয় জটিল এবং তার ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসংগে' এই দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। তিনি বলেছেন "একমাত্র রাধা-ভাবে উপনীত হইতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরম স্বরূপটির স্ফুরণ সম্ভব হয়, তৎপূর্বে ঠিক ঠিক স্ফূর্তি হয় না।" শ্রীকৃষ্ণলীলাই ভগবদ্‌লীলার অনন্ত মাধুর্যময় প্রকাশ।

শ্রীজীব গোস্বামীর মতে :

"কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ
নিবৃতি বাচকঃ
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ
ইত্যভিধীয়তে।।"

কৃষি বা কৃষ ধাতু ভূ বাচক, 'ণ' প্রত্যয় আনন্দ বাচক—এই উভয়ের ঐক্যই পরম ব্রহ্ম, এই হেতু তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নামের মধ্যেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষক রূপ নত্যই সুগভীর অর্থসূচক। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ।

পণ্ডিতপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ লিখেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান এই বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ভাব। কিন্তু মানুষদেহ ধারণ করিয়া তিনি এই ধরাধামে প্রকট হইয়া-ছিলেন—এই দিকটা ঐতিহাসিক আলো-চনার বিষয়।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এই দৃষ্টিকোণে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম আনন্দময় রসস্বরূপ সত্তার ব্যাখ্যা করেছেন সুপণ্ডিত লেখক এবং সেই ব্যাখ্যা প্রত্যয়নিষ্ঠ নিজস্ব বক্তব্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অসংখ্য উধৃতি বা সমর্থনসূচক মহাজন বাক্যে এই মহাগ্রন্থ কণ্টকিত নয়। গোপী-নাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠ নির্বিকল্প ব্রহ্মস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বাঙালীর প্রাণের আক-র্ষণ আছে। তত্ত্ব যতই দুরূহ হোক বাঙালী ভক্তসমাজ সেই তত্ত্বকে সরল করে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার অবৈষ্ণব, তত্ত্ব-জ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়; এই জনাই তাহা ছড়ায়, গানে, যাত্রায়, কথ-কতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।"

এই গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় লেখক এক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মহাপুরুষের অনুরোধক্রমে রচনা করেন। স্বর্গীয় স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ মহারাজ প্রতিদিন লেখকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করতেন, এই আলোচনা সূত্রে তাঁর মনে যে গভীর ও ব্যাপক জিজ্ঞাসার উদয় হয় তার নিবৃত্তি ক্ষণিক আলোচনায় সম্ভবপর নয়। এই কারণে নিত্য মননের জন্য স্বামীজী পণ্ডিত-প্রবর গোপীনাথ কবিরাজকে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ রচনায় উৎসাহিত করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে রচিত সেই প্রসঙ্গগুলি সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। সদ্য পরলোক-গত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই রচনাগুলি স্বামীজীর ভক্তমণ্ডলীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে পণ্ডিত গোপীনাথ কবি-রাজ মহাশয়কে প্রত্যার্পণ করেন এবং এই আলোচনা প্রকাশনের জন্য লিখিত না হলেও তিনি স্বামীজীর ভক্তমণ্ডলীকে প্রকাশনের অনুমতি দান করেছেন।

এই গ্রন্থটি হয়ত লোকচক্ষের অন্তরালে থেকে যেত, এবং বাংলা ধর্মীয় সাহিত্য এক মহামূল্য সম্পদ থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকত। এই কারণে গ্রন্থটির প্রকাশ ব্যবস্থা করে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্মিবৃন্দ একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্বয়-তত্ত্ব - ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান - জীব - জগৎশক্তির বিশদ ব্যাখ্যা আছে। এই প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু অপ্রাকৃত জগতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই উল্লেখের হেতু লেখক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন. "যদিও প্রচলিত দার্শনিক শাস্ত্রে এবং ভজনানুকূল সাধনায় নিরত সাধকশ্রেণীর মধ্যে অপ্রাকৃত জগতের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না তথাপি ইহা সত্য যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে কোন কোন বিশিষ্ট সাধক ও সাধকসম্প্রদায় অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোন না কোন প্রকারে তাহার আভাসও দিয়াছেন।"

শক্তি ধাম ও লীলাভাব প্রসঙ্গে চারটি বৃহৎ অধ্যায় রচিত হয়েছে। এই সব অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নানা পরিচয় ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া হয়েছে। যেমন অনন্তনাগ, বাসুদেব, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, বৈকুণ্ঠ, গোলকধাম, মহাগোলক, মহা বৃন্দাবন, শ্রী অথবা মহালক্ষ্মী, রাধা-তত্ত্ব ইত্যাদির সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লেখক বলেছেন—'লক্ষ্মী ও নারায়ণ পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মরূপে, অদ্বৈত চিদানন্দময় মহাসত্তারূপে, প্রতিষ্ঠিত নন: এই মহাসত্তাতে যে মহাশক্তি খেলা করে—ভিন্নরূপে নহে, ভিন্না ভিন্ন রূপেও নহে—অভিন্নরূপে খেলা করে এবং অদ্বৈতরূপে যাহা নিত্য মিলিত হয় তাহাই সপ্তদশী কলা। বস্তুতঃ অমাকলা ইহারই স্বরূপ। ইহকেই ভক্তগণ রাধাতত্ত্ব রূপে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের মহাভাবরূপা নিজ শক্তি রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।"

রাধা কথার অর্থ আধা, আধা কৃষ্ণ আধা রাধা। উভয়ের সম্মেলনে একটি অখণ্ড রসময় তত্ত্ব বিগ্রহরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

এ-ছাড়া রাগাত্মিক ভক্তি ও রাগানুগা-ভক্তির বিবরণটিও বেশ সরল। শেষ তিনটি অধ্যায়ে ভাবরাজ্য ও লীলা-রহস্য সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের স্বাভাবিক পর্যবসান রাসলীলার গূঢ় মাধুর্যের আস্বাদনে। মহারাসের ক্ষীণ আভাস মাত্র তিনি দিয়েছেন। পণ্ডিতপ্রবর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করি মহারাসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা তিনি লিপিবদ্ধ করুন। এই জাতীয় জটিল তত্ত্বালোচনায় অধিকারী ব্যক্তিগণ ক্রমশই বিরলপ্রায়, লেখক নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তত্ত্বের মনোহর বিশ্লেষণে বিশেষ পারদর্শী, তাই অনুরোধ যে তিনি তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ অনুভূতির রস সাধারণকে আস্বাদনের সুযোগ দিন। এমন একখানি অমূল্য গ্রন্থ যথোচিত যত্ন সহকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকাশকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ : (তত্ত্বালোচনা) - মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘ— পি৪৮/১, কেয়াতলা, কলিকাতা-২৯। দাম আট টাকা।

• • প্রকৃতিচেতন উপন্যাস • •

শ্রীসুমথনাথ ঘোষের 'বনরাজিনীলা' উপন্যাসটি নামেও যেমন কবিত্বময়, অন্তঃপ্রকৃতিতেও তেমনি সৌন্দর্যরসাপ্লুত। এর মধ্যে সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন জাতীয় আদিবাসী-অধ্যুষিত বনভূমির প্রতি চমৎকার রূপ ও ভাবসঞ্চারশক্তির বর্ণনা কাব্যানুভূতিময় ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কলিকাতার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের এক প্রেমিক-প্রবঞ্চিতা তরুণী তার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার ও দগ্ধ হৃদয়ের ক্ষত প্রশমনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যধন্য এই সমস্ত অঞ্চলে তার বাবা-মার সঙ্গে ভ্রমণে এসেছে। সুতরাং একটি ভ্রমণকাহিনীর পটভূমিকায় এই অন্তর্বেদনাক্লিষ্ট জীবনবিমুখ তরুণ প্রাণের শূন্যতাবোধপূরণের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস বিন্যস্ত হয়েছে। এরই মাধ্যমে তার মনে ঔৎসুক্যরস সঞ্চারের উপায়স্বরূপ তার নিকট নানা নতুন নতুন দৃশ্যবৈচিত্র্যের ছবি ও নানা অপরিচিত জীবনরীতির কৌতূহলময় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভ্রমণের কৌতূহল ও আদিবাসীদের জীবন-প্রথাবৈচিত্র্য। ছিন্নমূল জীবনতরুর শিকড়-জালে রসসিঞ্চন করেছে। উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে সময় সময় সন্দেহ জাগে যে লেখক সুকৌশলে উপন্যাসের বেনামিতে পাঠকের নিকট নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্ভার পরিবেশন করছেন না ত? এই বৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্য ও জীবনকথা কৌতূহলের প্রবল স্রোতে তরুণীর হৃদয়-বেদনা যেন দৃষ্টিপথের অন্তরালে ভেসে গেছে। বিষয়সন্নিবেশের রীতিবৈশিষ্ট্যে মুখ্য ও গৌণ স্থানবিনিময় করেছে মনে হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে মানুষ প্রকৃতির অভিভব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ স্বাধীন সত্তার পুনরুদ্ধার করেছে। সমস্ত উপন্যাস মানবপরিচয় প্রকৃতি-পরিচয়ের তুলনায় গৌণরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

যা হোক উপন্যাসটিতে প্রকৃতিরূপ-মুগ্ধতা ও তার অন্তরসৌরভ অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে অনুভূত হয়ে তার সমস্ত আকাশ-বাতাসকে ঘন পরিব্যাপ্ত করেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিসর্গ-প্রেম, বহিঃপ্রকৃতির আত্মার গভীরে নিমজ্জন এই উপন্যাসে সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছে। ফুলডিহী, কুসুমতলা ও ধনোয়ার রোড এই তিনটি স্থানের প্রকৃতি-পরিবেশের বিভিন্নতা ও তার রূপসজ্জার আবেদন-বৈচিত্র্য লেখকের অন্তর্মুখী অনুভব ও প্রকাশশক্তির সাহায্যে অপূর্বভাবে ও প্রত্যেকের সত্তা-বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে। এই প্রকৃতিচেতনার সৌকুমার্যই উপন্যাসটির প্রধান কৃতিত্ব। ধানোয়ার রোডে অতি আকস্মিকভাবে শুভেন্দু ও সরমার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ও সরমার মনের উপর ডঃ বাগচীর অনার্য-জীবনযাত্রা ও সুস্থ ভাবাবেগহীন. পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি উৎসারিত দাম্পত্য সম্পর্কের দৃষ্টান্ত-প্রভাব পরিস্ফুট করে লেখক মানবজীবনের অভাবনীয় প্রতি-ক্রিয়াটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সরমার দীর্ঘ-অবদমিত জীবনক্ষুধা অকস্মাৎ একটা অনিবার্য শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে স্তিমিত মানবমন তারই মাদকতাময় প্রেরণায় ও আরণ্যক সমাজের প্রাকৃতউল্লাসের সংক্রামক স্পর্শে হঠাৎ মত্ত হয়ে উঠে সমস্ত সংযম-সংস্কারকে বিদীর্ণ করেছে। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণোচ্ছ্বাস তরুণী-চিত্তকে নিজ নিবিড় রক্তিমায় রঙীন করে তুলেছে। এই প্রকৃতি-প্রাধান্যের মানবমুখ্যতায় উত্তরণই রচনাটির গোত্র পরিচয়টি সংস্কার মুক্ত করেছে।

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বনরাজিনীলা (উপন্যাস) সুমথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অধ্যাপক কল্যাণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক স্মারক সংখ্যা। সর্বশ্রী অরুণকুমার সেন, স্নিগ্ধা মিত্র, কল্যাণনাথ দত্ত, এস এল মুখার্জি, জে এন চৌধুরী, তরুণকুমার ব্যানার্জি, ললিতকুমার মিত্র, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, লীনা দত্তগুপ্ত প্রভৃতির লেখাগুলি পড়বার মত।

Sibnath Sastri College Annual, 1966-67 : Editor Kalyannath Datta.

•

'নির্মোকে' দীপ্তি মুখোপাধ্যায় এবং আশাপূর্ণা দেবীর প্রবন্ধ দুটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আরো কয়েকটি প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও সিনেমার খবর আছে।

নির্মোক (প্রথম বর্ষ ॥ দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : কৃষ্ণপদ মজুমদার। ২৭ বিশ্বাস নার্সারী লেন, কলকাতা ১০ থেকে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

।। এক ।।

একটি মাত্র ছেলে, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। এ'দের রাশি-চক্রের ফলশ্রুতি এদিকে রাজ-যোটকই, নৈলে স্ত্রীভাগ্যে এতবড় বিষয়-সম্পত্তিটা গড়ে উঠতে পারত না, অপর পক্ষে কিন্তু কোন কিছু নিয়ে আলোচনা হলেই মৃদু কথা কাটাকাটি—কলহ-মান-অভিমান এবং তারপর অনেক ক্ষেত্রেই......

—অনেক ক্ষেত্রে কী সেটা এখনই টের পাওয়া যাবে।

আদিনাথ বলছিলেন—'সন্দুর সম্বন্ধে এবার একটা কিছু ঠিক করে ফেলা নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছে।'

'সেকথা তো কতবার বলেছি তোমায়।' —উত্তর করলেন সুরবালা।

আদিনাথ একটু বিস্মিত অপাঙ্গে চাইলেন, স্ত্রী কখনও যে ওপরপড়া হয়ে কোন প্রস্তাব করেছেন এ বিষয়ে স্মরণে আনতে পারছেন না। কিন্তু সেটা বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা নিরাপদ হবে কিনা ঠিক করতে না পেরে দৃষ্টি তখনই আবার সহজ করে নিয়ে বললেন—'বলেছ বলছ... তাহলে নিশ্চয় বলে থাকবে, কিন্তু কখনও উকিল, কখনও ডাক্তার, কখনও বা......'

'তুমি যে কোনটাতেই রাজি হচ্ছ না'—সুর যেন একটু বদলাল সুরবালার কণ্ঠে।

'রাজি হওয়ার মতন? তুমিই একটু ভেবে দ্যাখো না।'—একটু নরম হয়ে, কতকটা বিরক্তির স্বরেই বললেন আদিনাথ।

স্বামী-স্ত্রীর কলহ-সূচনায় স্বামীই থাকে তটস্থ, অন্তত যে স্বামীর কিঞ্চিৎ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। আদিনাথের আছেই সেটা। কিন্তু ফল কিছু হোল বলে মনে হোল না। সুরবালা মুখটা একটু নীচু করে নিয়ে উত্তর করলেন—'আমার ভাবার যদি কোন দাম থকত এ-সংসারে......'

একটু চুপ করে গেলেন আদিনাথ। তারপর বক্তব্যটাকে সাধ্যমতো গুছিয়ে নিয়ে বললেন—'ভেবে দেখতে এই জন্যে বলছি—আমি কারবারি মানুষ, সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি বাড়াবার—লোহালক্কড় ছিল, এখন কাগজটাও ধরেছি, সব ওরই ভরসায় তো, ওই দেখবে, ওতেই বর্তাবে, কিন্তু ওই যদি ডাক্তার, কি উকিল, কি ইঞ্জিনীয়ার হয়ে......'

'হয়ে বসে আছে অমনি! ......সেই সব পুরনো কথা শোনাবার জন্যে ডেকেছ? তাহলে আমার কিন্তর কাজ আছে ওদিকে।'

'এটাও তো কম দরকারি কাজ নয়।'—কেমন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা। সুরবালা স্থিরভাবে মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইলেন, তারপর গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন—'তা যদি বললে তো যার কাজ তিনি তো বুঝছেনই। দোসর ডাকার দরকার কি? বেশ তো, তুমি যেমন কারবারেই ঢোকাতে চাইছ, বসুক গিয়ে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে......'

ও'রও বেফাঁস হয়ে গেছে বুঝে হঠাৎ থেমে গেলেন। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, এই দুর্বলতা থেকেই জোর পেলেন আদিনাথ। আঘাতটা লেগেছেও খুব, অভিমানের সঙ্গে খানিকটা দর্পের সুর মিলিয়ে বললেন—'ওর বাপকেও এক হিসেবে দাঁড়িপাল্লা থেকেই আরম্ভ করতে হয়েছিল সুরো। আজ না হয় ছাপানো চিঠিপত্র, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে চলছে কারবার; কিন্তু......'

'আমি তাই ভেবে বললাম?'—একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন সুরবালা। কিন্তু হয়তো সেইজন্যই সুর আর একটু চড়া পর্দায় না তুললে সামলান যাবে না ভেবে বললেন—'যদি এমনি করেই কথার ছল ধরে আমায় অপমান করবে তো কেন ডাকা বাপু? তোমার ছেলে তুমি যেমন ভালো বোঝ......'

'অমনি অপমান করলাম তোমায়! নেহাৎ দাঁড়িপাল্লার কথাটা তুললে তুমি...'

—এর পরই কিন্তু তর্কের ভাবটা ছেড়ে দিয়ে আবার সামলাবার চেষ্টা করেই বললেন—'থাক ওসব। স্থির হয়ে একটা কিছু ঠিক করে ফেলা দরকার। না হয় ডাক্তার-উকিলই। পাশ করে এতদিন বেকার হয়ে বসে আছে ছেলেটা। আর কোন দোষ না হোক, কেমন যেন লাজুক, মুখচোরা হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন—বুঝছ তো সেও তো একটা দোষই ব্যাটাছেলের পক্ষে।'...

বেশ নরম মনভেজানো আপোষ-রফার টোন; কিন্তু এবারেও ফল হোল না। মেয়েদের যে দুর্বলতা সবচেয়ে সবল তার প্রথম পদক্ষেপ শুরুই হয়ে গিয়েছিল—অশ্রুটা গলা পর্যন্ত ঠেলে এসেছিল, নরম কথায় চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল। ধরা

গলায় বললেন—'বুঝব না কেন? বুঝছি সবই। তবে কি বলতে গিয়ে কী বলে ফেলে অপদস্থ হব, তার চেয়ে এসব কথায় না থাকাই ভালো আমার। কাজের কথা এমনিই বলছিলাম, এ বাড়ির কাজ আমি না থাকলে কখনও আটকায় নি, আটকাবেও না, তার চেয়ে বরং.....'

—বলতে বলতেই উঠে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

ওপারের বারান্দায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। আদিনাথ অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে চুপ করে বসে রইলেন, তারপর উঠে নেমে যাওয়ার মুখে একবার তির্যকভাবে ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন ট্রাঙ্ক-সুটকেশ নামিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

ওটা রোখা যায় না, বরঞ্চ চেষ্টা করলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেটা সামলানো আরও দুষ্কর হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন আদিনাথ।

।। দুই ।।

একটি মাত্র ছেলে হওয়ার বিপদ ঐ। যাদের পাঁচটি আছে তারা পাঁচ রকমে সাধ মেটাতে পারে—কেউ হল ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ বা আরও কিছু; একটি হলে কোনদিকে যাবে তাই নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। ফলে, সময় যায় এগিয়ে এবং তার সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যা এসে অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারটাকেই জটিল করে তোলে।

বয়স হয়ে যাচ্ছে সন্দীপের। আদিনাথ ছেলেকে ব্যবসার দিকেই টানবেন মনে মনে এঁচে বি-কম'এর কোর্স পড়াচ্ছিলেন, যখন পাশ করল, টেনে নেবেন, আপত্তিটা উঠল সুরবালার দিক থেকে। ও'র ইচ্ছা, একটি মাত্র ছেলে, সে ডাক্তার হয়। আদিনাথ জানালেন ডাক্তারি পড়তে হোলে সন্দীপকে আবার দু বছর পড়ে বি-এস-সি হতে হয়। সুরবালা মুখভার করলেন, ভাবটা দেখালেন—এ রহস্যটা আগে না জানিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন স্বামী; বস্তুত তাঁর একটা দুরভিসন্ধিই। সেবারেও যে মনোমালিন্যটা হোল তাতেও সুরবালা বাপের বাড়ি গিয়ে কাটালেন মাসখানেক। ফলে, সন্দীপের সম্বন্ধে না ডাক্তারি, না ব্যবসা কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হোল না। এরপর সন্দীপের কথা উঠল কয়েক মাস পরে যখন সুরবালা উত্তর-প্রদেশের তাঁর বাপের বাড়ির দিকের এক উকিল আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরলেন। স্বামীকে জানালেন তাঁর ইচ্ছা সন্দীপও উকিল হোক। ছেলে বসে আছে, রাজি হয়ে যেতেন আদিনাথ, কিছু একটা নিয়ে থাক; কিন্তু ব্যবসায়-সম্পর্কীয় একটা মকর্দমায় তার আগের দিনই উকিলের কড়া জেরায় পড়ে মনটা বিষিয়ে ছিল ও জাতিটারই ওপর, আপত্তি করলেন। অবশ্য তীব্রভাবে নয়, ও'র আপত্তি সুরবালার আপত্তির মতো জোরালো হয় না, তবে বিদেশে উকিল, আত্মীয়ের বোলবোলাও

দেখে এসে খুব নাকি উৎসাহের সঙ্গে কথাটা পেড়েছিলেন উনি, ঐটুকুই সেবার প্রায় ধুলোপায়েই পিত্রালয় যাওয়ার নিমিত্ত হয়ে উঠল।

বড়লোকের বেকার ছেলে, তার সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়ায় স্বভাব-চরিত্র নিয়ে। ভাগ্যক্রমে সন্দীপের এদিকটা রইল নিদাগ একরকম। তার কারণটা এমন কিছু নতুন না হলেও কিছুটা নতুনই বলতে হয়।

ছেলেবেলা থেকে ওর একটু-আধটু কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল। স্কুল-কলেজের যুগে পাঠ্য-পুস্তকের তলায় পড়ে গিয়ে জিনিসটা ভালোভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি, এবারে পেয়ে সন্দীপকেও বেশ ভালোভাবে পেয়ে বসল। জায়গাটা আধা শহর, আধা পাড়াগাঁ, একটা ইস্পাত-নগরীর মাইল কয়েক দূরে লোহা এবং অন্যান্য কয়েকটা পণ্য আশ্রয় করে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে। বড়লোকের ছেলে, নিজেদের ক্লাবে, সভা-সমিতিতে খানিকটা বিশিষ্ট ছিলই সন্দীপ, তার কবি-প্রতিভাকে ঘিরে বেশ একটি ভক্তের দল গড়ে উঠল।

সুরবালার ভালোই লেগে এসেছে। সেটা যে শুধু স্বামী আদিনাথ জিনিসটাকে ভালো চক্ষে দেখেন না, সেজন্যই নয়। খানিকটা সেকেলে হলেও কলকাতার মেয়ে, কলেজ না হোক, স্কুলের উঁচু ধাপ পর্যন্ত মাড়ানো আছে, ও'র ভালোই লাগে।

আদিনাথ কিন্তু গোড়া থেকেই একটু চিন্তিত। উঠতি কারবার, অন্য কোনদিকেই যেমন বেশি নজর দিতে পারেন না, তেমনি ছেলের দিকেও নয়। ভালো ব্যবস্থা করা আছে পড়াশুনার, ছেলে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, ভাববার কিছু নেই সেদিকে। তবে ছেলে যে গোড়া থেকেই বাপের মতো স্মার্ট না হয়ে একটু কেমন যেন লাজুক হয়ে যাচ্ছে, এটা, যখন এদিকে একটু মনোযোগ দেওয়ার অবসর হোত তখন তাঁকে খানিকটা অস্বস্তির মধ্যেই ফেলত। যার মাথায় টন-হন্দরে, লোহা-লক্কর জাঁকিয়ে বসেছে, কবিতা বা এই জাতীয় কোন বস্তুর সন্দেহ উদয় না হওয়ারই কথা তার মনে। তারপর যখন টের পেলেন, একটু সন্দিগ্ধই হয়ে পড়লেন। আশা রইল, বুদ্ধি হলে কেটে যাবে ঝোঁকটা। এরপর পাশ করে বেরিয়ে কেটে যাওয়ার পরিবর্তে বর্ধিত আকারে আত্ম-প্রকাশ করতে দেখে তাঁর মাঝে-মাঝে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। ছেলের পোষাক-পরিচ্ছদ হয়ে পড়েছে আরও ঢিলেঢালা; ঢিলা পাঞ্জাবী, একটা কিছু হলেই তার ওপর ফাঁপা উড়ানি। এমন কি কোথাও সামাজিক নিমন্ত্রণ থাকলেও। এদিকে মাথার চুল কবে আস্তে আস্তে বড় হয়ে গিয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। দৃষ্টিও স্বপ্নময়; চোখের নীচেই যে এরকম একটা রুক্ষ জগৎ রয়েছে, এত বাস্তব, সে সম্বন্ধে যেন হুঁস নেই। পোষাকে-মেজাজে আনুষ্ঠানিকভাবে কবি হয়ে উঠছে সন্দীপ। আর লুকানোর কিছু নেই। চিন্তিত হয়ে উঠলেন আদিনাথ।

সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে আরও যেন গুটিয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে। আরও মুখচোরা। অপরিচিতের সামনে মুখ তুলে চেয়ে কথা বলতে পারে না।

আদিনাথ বলেন পুরুষের পক্ষে এটা দোষ; অমার্জনীয়ই। সুরবালা বলেন—গুণই; তাঁর ছেলের বাচাল হয়েও কাজ নেই, চোখ ড্যাবড্যাবে করে চেয়ে থাকারও দরকার নেই। যেমন আছে, বেশ আছে।

এখানে সন্দীপের কবি হয়ে ওঠার প্রসঙ্গটা উঠেছিল তার স্বভাব-চরিত্রের কথা থেকে। আদিনাথ যদি ওটাকে একটা দোষই মনে করেন তো এটাও না মেনে নিয়ে উপায় নেই যে ঐ দোষই ও'র অনুকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় লোকের ছেলে, উঠতি বয়স, শেষে ও'দের মতের অমিলের জন্য তার সঙ্গে প্রচুর অবসরও গেল জুটে, এ দোষটা ওকে নেশার মতো না বসলে কোথায় থেকে কোথায় ভেসে যেত কে জানে?

।। তিন ।।

সুরবালা বাপের বাড়ি এলেন সন্দীপকে সঙ্গে করে। উনি ডাকেন 'খোকা' বলে।

ছেলের ওপর নির্ভর করে বাড়ি থেকে বেরুনো এই প্রথম সুরবালার। বাপের-বাড়িতে প্রায়ই আসতে হয় ও'কে। তার একটা কারণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে কোন কিছু নিয়ে মতান্তর, অবশ্য একটু গুরুতর হলেই। দ্বিতীয় কারণ, উনি বাড়ির একমাত্র মেয়ে, সবার আদরে লালিত, এবং লালনের সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও সবার মনে এখনও সেই আগেকার স্থানটুকুই অধিকার করে রয়েছেন। ফলে, বাড়িতে একটা কিছু হলেই—ছোটখাট পাল-পার্বনেও, ও'র থাকাটা চাই-ই। উৎসবাদিতে আদিনাথ প্রায় নিজেই থাকেন, ছোটখাট ব্যাপারে অন্য কাউকে সঙ্গে নেন সুরবালা। একশ মাইলের ভেতরই, রেলেই যাওয়া-আসা। তবে, মোটরেরও সাহায্য নেন কখনও কখনও; বিশেষ করে আদিনাথের সঙ্গে মতান্তরটা যখন একটু উগ্র আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থায়, সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন না পেলে রাগটা জুড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং সুরবালা টাটকাটাটকি মোটরই বের করতে বলেন ড্রাইভারকে।

এবারেও তাই করলেন। এবং সঙ্গে নিলেন সন্দীপকে।

সন্দীপ মামারবাড়ি আসে কম। চায় না আসতে, মামারবাড়িতে অনেকগুলি লোক; কুনো মানুষ, একটা অস্বস্তি বোধ করে। স্কুল-কলেজের যুগে টানাটানি করা চলতই না, এখনও ডাক পড়লে কোন একটা ছুতো করে এড়িয়ে যায়।

এবার পারল না। না পারার কারণ, এবার যখন সুরবালা তাকে ডেকে পাঠালেন তখন তাঁর রাগটা এতটুকুও তরল না হয়ে পুরোমাত্রাতেই রয়েছে, সেই সঙ্গে নিজের অধিকার-বোধও। সন্দীপ আপত্তি করলে,

ওঁর মুখটা থমথমে হয়ে উঠল, বললেন—'তোমায় যেতে হবে। না যাও, তোমাদের সংসার নিয়ে থাক তোমরা দুজনে, তবে, মা আর ফিরে আসবে না। তুমি বড্ড কুনো-মুখচোরা হয়ে যাচ্ছ খোকা......সবার তাই মত।'

ওটুকু অবশ্য বাংগোক্তি। 'সবার' অর্থ আদিনাথের। বাড়ির হাওয়াটা হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তার তাপটাও অনুভব করা যায়, সন্দীপ আর আপত্তি তো করলই না, কি ভেবে ধুতি-পালটে প্যান্টের ওপর একটা আধুনিক স্টাইলের বুশ-শার্ট পরে উপস্থিত হোল। হাতে একটা সুটকেশও।

নজর পড়তেই জ্বলে উঠলেন সুরবালা। তখনই কিন্তু রাগটাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে নরম করে নিয়ে একটু চেঁচিয়েই বললেন—'ঝি! কোথায় গেলি? একবার ডেকে দে, ছেলেকে দেখে যান, তাহলে আর দুঃখু থাকবে না।'

হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল সন্দীপ, তার দিকে চেয়ে মিষ্টি করেই বললেন—অবশ্য তীব্র ব্যংগেই—'কেন বাবা, ধুতি চাদরেও কি স্মার্ট হওয়া যায় না? বাঙ্গালীর ছেলেই তো?'

ছেলে তাঁদের স্মার্ট নয়, স্বামীর এই অপবাদটা খণ্ডন করবার জন্যই বিশেষ করে সন্দীপকে সংগে নেওয়া, সাজগোছেও স্বামীর মতের এতটুকু মর্যাদা থাকে সেটা চান না সুরবালা।

একটু পরে ধুতি-চাদরে উপস্থিত হলে সঙ্গে নিয়ে নেমে এসে মোটরে উঠলেন।

আদিনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, এই সময় টেলিফোনে একটা ট্রাংক-কলের ঝনঝনি বেজে ওঠায় নিরুপায়ভাবে দুটো হাত একটু চিতিয়ে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে, যখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, হর্ণ বাজিয়ে মোটরটা গেট পেরিয়ে বাগবাজারের একটা বড় বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। চেনা হর্ণ, ছোট-বড় কয়েকজন সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সুরবালা দোর খুলে নামতেই বড় ভাইয়ের প্রথম সম্ভাষণ—'নিশ্চয় কলহান্তরিতা রূপে......'

পেছনে সন্দীপকে নামতে দেখে কথাটা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে নিয়ে বললেন—'এই যে সন্দীপও এসেছ। ......খবর সব ভালো তো রে সুরো?'

সুরবালা নেমে প্রণাম করে উঠে বললেন—'ভালো না থাকলে যেন আসবার উপায় আছে। এখানকার খবর কি বড়দা?... কতদিন যে চিঠি নেই বাড়ির! ছুটে আসতে হোল।......তোমার বড়মামা খোকা, প্রণাম করো।'

সে জ্ঞানটা অবশ্য আছে সন্দীপের, একটু জড়িত পদে এগুচ্ছিলই, হাতটা উড়ুনিতে একটু লেপটে গেছে, ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ের ধুলো নিল। আরও সবাই নেমে এসেছে, দুই দিকে প্রণামের পর্ব চুকে গেলে, গল্প করতে করতে দলটা ওপরে উঠে গেল। হলঘরে গিয়েও নিতান্ত প্রাথমিক আরও গোটা কতক কথা হোল, তারপর মুখ-হাত ধুয়ে সাজগোজ পাল্টাবার জন্য সুরবালা ভেতরে চলে গেলেন। সন্দীপকে আলাদা সংগে করেই নিয়ে যেতে হোল; ওর বেশ সহজ হয়ে উঠতে একটু সময় লাগে। জানে সবাই।

॥ চার ॥

ঘন্টাখানেক পরে ওঁদের চা-জলখাবার সারা হয়ে গেলে আবার হলঘরে একত্রিত হয়েই গল্পসল্প শুরু হোল। এবার শুধু বড়রাই। বড় দুই ভাই, ছোট ভাই, বড় ভাজ, সুরবালার সমবয়সী পিসতুত বোন রেবা, আজই ডায়মন্ডহারবার থেকে এসেছেন তাঁর বড়মেয়ে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে। এঁরা কজন আগে থাকতেই বসেছিলেন, রেবার স্বামী মুনসেফ, মাসখানেক হোল বদলি হয়ে গেছেন সেখানে, জায়গাটারও গল্প হচ্ছিল, সুরবালা আসতে বড় ভাজ হেমাঙ্গিনী বললেন—'তখন যে বললে বাড়ির চিঠি পাও না সুরোঠাকুরঝি কিন্তু চিঠি তো কেউ না কেউ দিচ্ছেই, তুমিই বরং......'

'ঠাকুরঝির মিথ্যে বলা স্বভাব।'—ভাজের অনুযোগটা সত্যি বলে চাপা দিলেন সুরবালা, বেশ একটু মুখ ভার করেই।

বড়ভাই সনাতন বললেন—'ওকে আজ খুঁচিও না, একে ঝগড়া করে এসেছে......'

'অমনি ঝগড়া করে এলুম; তুমি দেখতে গিয়েছিলে!'

আদুরে বোন, সম্বন্ধটা এই রকমই দাদাদের সঙ্গে। সনাতন আবার একটু রহস্য-প্রিয়, সুবিধা পেলে এই ধরনের ঠাট্টা করে বোনের ভেতরের মিষ্ট ঝাঁঝটুকু টেনে এনে উপভোগ করেন। বললেন—'যেতে হবে কেন, ঝগড়া যে তুই করে এসেছিস সেটা তোর মুখেই লেখা রয়েছে।'

'মুখে লেখা—সে বরং তোমাদের দুজনের থাকে।' একটা শোফায় বসতে বসতে বললেন সুরবালা। 'কদিন ধরেই মুখ নয়তো, যেন তোলো হাঁড়ি নামিয়ে বসে থাক দুজনে......।

......রেবা তো দেখেছিস, বল, মিথ্যে বলছি?'

'নিজেই তো বললে, মিথ্যে বলা অভ্যেস।'

—হেমাঙ্গিনীর টিপ্পনিতে ঘুরে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন সুরবালা—'আপনি চুপ করুন গো ঠাকরুণ, কর্তার হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না। তার চেয়ে বরং তাকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়, বোন ঝগড়াটে তো কেন গিয়েছিলেন তার বিয়ে দিতে।'

দাদার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টিও নিক্ষেপ করলেন।

সবাই মুখ টিপে হাসছে, কেউ মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে, সনাতন বললেন—'সেটা তো আদিনাথেরই জিজ্ঞেস করার কথা তার বাবা-মাকে—নিশ্চয়ই করেও ছিল......'

'দ্যাখো দিকিন! আমি তাহলে উঠলাম। কাজ নেই, ধুলো পায়েই ফিরে যাই। একটা মানুষ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল একশ মাইল থেকে, কোথায় জিজ্ঞেস করবেন কেন এভাবে আসা, না, ঝগড়া করেছিস—ঝগড়া করেছিস! কী সমিস্যেয় পড়ে যে ছুটে আসা, রেবা, কি বলব তোকে!'

হঠাৎ ঘরের তরলতাটুকু কেটে গিয়ে সবার মুখেই উদ্বেগ ফুটে উঠল। সনাতনই ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—'ব্যাপারখানা কি বলবি তো আগে। আমি না হয় মোটরে আস্তে দেখে—তোদের যা রোগ...'

'তা যদি বললে তো হয়েছে বৈকি খিটিমিটি একটু, অস্বীকার করি কি করে? আর কেনই বা করব? —আমিই যদি ভুল বলে থাকি তো বিচার করে দ্যাখো তোমরা...'

'গৌরচন্দ্রিকা ছাড় দিকিন।' —মেজো-ভাই প্রশান্ত অধৈর্য হয়েই বললেন। ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর আকার নিয়ে উঠছে ওঁদের কল্পনায়।

'কথাটা হচ্ছে...'

—আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন সুরবালা, এই সময় সন্দীপ একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে ভেতরের দিক থেকে এসে প্রবেশ করল। মনের মধ্যে যাই হোক, সুরবালা

মুখ-চোখে একটু রুক্ষতা ফুটিয়েই বললেন—'তুমি তোমার দাদা-দিদি-বৌদিদিদের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করোগে না খোকা, আস তো কমই। আমাদের বড়দের এখানে একটা পরামর্শ হচ্ছে।'

বাধ্য ছেলের মতোই সন্দীপ একটু অপ্রতিভ হয়ে মেয়েটির হাত ধরে ঘুরে বেরিয়ে যাওয়ার পরও সুরবালা দরজার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি কিছুক্ষণ ঐদিকে ফেলে রাখলেন, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে একটু গলা নামিয়ে বললেন—'সমিস্যে ঐ দাদা—যা দেখলে সামনে।'

'সে কি!!' —সবার মুখ থেকেই আতঙ্কিত প্রশ্নটা এল বেরিয়ে। মেজভাই বললেন—'সন্দীপের মতন ভালো ছেলে যে দেখা যায় না রে!'

'সমিস্যে তো ঐখানেই দাদা'——মুখে উদ্বেগের ভাব টেনে আনলেন সুরবালা, বললেন—'আজকালকার দিনে ওরকম মিনমিনে ভালো ছেলে হলে চলবে? তোমাদের ভগ্নীপতিও নিশ্চিন্দি, ছেলে আমার ভালো. মুখ তুলে কথা কইতে জানে না। বছরে বছরে দিব্যি তো একটার পর একটা পাস দিয়ে যাচ্ছে। বলি, হ্যাঁগা, পাস দেওয়াই যত পুরুষার্থ হোল? এরপরে যার তোমার ব্যবসাটা সামলাতে হবে তার অমন মুখচোরা মিনমিনে হলে চলবে?...... তোমরাই বল না দাদা, চলবে?'

'তা কি চলে?'— বড়ই মন্তব্য করলেন। পকেট থেকে সিগারেটের কেস বের করে একটা ধরালেন। হাল্কা ভাবটা একেবারে কেটে গেছে। সমস্যার মধ্যে এসে পড়েছেন কতকটা।

সুরবালা বললেন—'শোনই না তাহলেই বুঝতে পারবে। এর উত্তর হচ্ছে—আমি আমার ছেলেকে আনবই না ব্যবসাতে—এত ঝুঁজুতে। তাহলে কি করবে বাপু?—না, উকিল করব......'

'উকিল!' বিস্মিত হলেন সনাতন, বললেন—'কৈ। কখনও বলোনি তো। বি-কম পড়াচ্ছে, জানি ব্যবসার দিকেই সুবিধে হবে।'

'আমাকেই কি বলেন? দেখে দেখে অসহ্য হলে যখন খুঁচিয়ে বের করি, এই তখনই টের পাই। তারপর শোন না, যদি জিজ্ঞেস করলাম—ছেলে তোমার উকিল হয়ে করবেন কি? —এই তো চারিদিকে উকিলের ছড়াছড়ি দেখছি। না, এই যে ব্যবসা নিয়ে পার্টিদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মামলা-মোকদ্দমা, ছুটোছুটি—সন্দীপই সামলাবে তখন। আমি বলি, টাকা থাকলে কলকাতা থেকে ভালো ভালো উকিল ব্যারিস্টার আপনি ছুটে এসে সামলাবে তোমার মামলা। ভুল বলি দাদা, তোমরাই বলো?'

সনাতনকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সমর্থনই করতে হল, বললেন—'উচিত কথাই তো।'

'উচিত কথা বলতে গেলেই হয়ে পড়ে একটু খিটিমিটি। ঝগড়াই বল আর যাই বল......'

আদরের বোন, তার ভাবনায় চিন্তিত হয়ে বেশ ভুলে যান সনাতন। কিন্তু সবাই হয়তো নয়। রেবার হাসি চাপতে গিয়ে ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কথা থামিয়ে একটু অপাঙ্গে চেয়ে নিয়ে সুরবালা জিজ্ঞেস করলেন—'তুই যে বড় হাসছিস রেবা? বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'বাঃ, বিশ্বাস না হবার কি আছে?'—একটু যেন থতমতই খেয়ে গেলেন রেবা. তখনই সামলে নিয়ে বললেন—'আমি ভাবছিলাম—ঝগড়াটা তাহলে মাঝে মাঝে—হচ্ছেই?'

'একে ঝগড়া বলতে হয় বলো। তা' বলে, দেখছি ছেলেটা যেন গুটিয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে, মা হয়ে মুখ বুঝে থাকতে পারা যায়?...... তুমিই বল বড়বৌদি...।'

'তা বৈকি'—সমর্থন পান হেমাঙ্গিনীর কাছেও, যদিও মেয়েদের মধ্যে এধরনের ব্যাপারে একটা মিল থাকেই বলে। হেমাঙ্গিনী একবার আড়চোখে দেখেও নেন স্বামীকে। অনুযোগের দৃষ্টিতেই।

'এর ওপর আবার শুনছি নাকি পদ্য লেখার বাতিক হয়েছে।'

—কথাটা সবাই কিভাবে নেন, তাঁকে সমর্থন করে কি আদিনাথকেই, সেটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর এগুনোই ঠিক হবে ভেবে একবার সবার মুখের দিকে চাইলেন। আর সবাই সঙ্গে সঙ্গে মতামত না দিয়ে চুপ করেই রইলেন, হয়তো ওঁর মনের একরকম অবস্থায় কি বলা চলে ঠিক করতে না পেরেই, শুধু ছোটভাই রঞ্জন বললে—'একটু কবিতা লেখে, এ আর এমন দোষের কি?'

পাশে বসে ছিল, ঘুরে চাইলেন সুরবালা। নিজের মতের সমর্থন পেয়ে উৎসাহিতই হয়ে উঠেছেন, তবে সে ভাবটা চেপে দুদিকেই কিছু হাতে রেখে বললেন—'তুই তো বলবিই—'নরানাং মাতুলক্রম' তো, তোর নিজের যে ঐ বাই আছে। কিন্তু ভাই ভেবে দেখ, একে তো ঐ মুখচোরা, তার ওপর যদি কবিতার মিল খুঁজতে খুঁজতেই দিন কেটে যায় ঘরের কোণে বসে......'

'পৃথিবীর যত কবি ঘরের কোণে বসে শুধু মিল খুঁজল!'

এত জোরালো যুক্তি পেয়ে মনের খুশিতেই হেসে ওঠেন সুরবালা। তবে, বলেন তর্কের ভঙ্গিতেই, হেসেই—

'না হয় আকাশ পানেই চেয়ে...'

বড় ভাজ বলেন—'এক কবির বাবাকে চটাচ্ছ, আর এক খোদ কবিকেই, দরকারটা কি তোমার?'

'চটবার কি আছে?' —রঞ্জন মুখ ভার করে বলল—'আমি কবিও নয়, কিন্তু হাতুড়ি পিটতে পিটতে দিন যায়। তবে অন্যায় মানব কেন? —কবি হলেই অমনি তার বসে বসে শুধু মিল খুঁজতে হবে! ভেতরে ক্ষমতা থাকলে রুগীর নাড়ি টিপতে টিপতেও ইন্‌স্‌পিরেশন এসে যায় কত লোকের...'

'থাক, তোকে আর চটতে হবে না, ঘাট হয়েছে, মেনে নিচ্ছি'—স্মিত হাস্যের সঙ্গে ওর কথা মাথা নীচু করে শুনতে শুনতে হঠাৎ বাধা দিয়ে উঠলেন সুরবালা। তারপর শিউরে উঠেই সনাতনের দিকে চেয়ে বললেন—'হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম বড়দা, রঞ্জনের কথায় মনে পড়ে গেল—তাও বলেন তিনি, ছেলেকে ডাক্তার করব আমি! নাও, বোঝ!'

আহারের জন্য ডাক না পড়া পর্যন্ত গল্পের স্রোত চলে, সন্দীপকে কেন্দ্র করেই। একটানা স্রোত, তাতে কখনও একটু আবর্ত সৃষ্টিও হয়তো হয়ে গেল, একটা কথার প্রসঙ্গে আর একটা এসে পড়ে; যেমন এ ধরনের আলাপ-আলোচনা হয়ই।

মনে গলদ ছিল বলেই আহারাদির পর সুরবালা রেবাকে খোলা ছাতে টেনে নিয়ে আবার গল্প জুড়লেন, অনেকদিন পরে দুই বোনে দেখা, অনেক কথা, এখন ডায়মণ্ড-হারবারের কথাটাও চাপা পড়ে গিয়েছিল।

তার মধ্যেই একবার, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এই রকম ভাবটা দেখিয়ে বলে উঠলেন—'হাঁরে, তুই অমন মিটিমিটি করে যে বড় হাসছিলি? বিশ্বাস হচ্ছিল না যা বললাম?'

হেসেই ফেললেন রেবা, উত্তর করলেন—'বিশ্বাস হবে না কেন? তবে তুই আবার কখনও ওলট-পালটও তো করে ফেলিস, এরটা ওর, ওরটা এর। চিনি তো!...... বেচারি জামাইবাবু!'

কথাটা একেবারে কেটে দিতে কেমন যেন মুখে বেধে গেল সুরবালার।

বললেন—'মরণ! জামাইবাবুকে চেন না তো, দিনকতক না হয় গিয়ে......'

—খুব অন্তরঙ্গ সখীদের মধ্যে যে ধরনের রহস্যটা চলে।

(ক্রমশঃ)
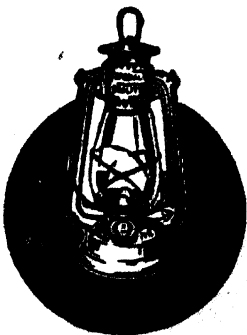
দেশে বিদেশে

চারদিনের যুদ্ধ

ইস্রায়েল - আরব সীমান্তগুলিতে যদিও এখন "পূর্ণ নীরবতা", তবু রণক্ষেত্রের বাইরে আরব দুনিয়ায় সবকিছুই নীরব নয়।

শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েল প্রেসিডেন্ট নাসেরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল, আর তার ফলে পশ্চিম এশিয়ায় দিন চারেকের জন্যে যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল তা সমগ্রভাবে আরব দুনিয়ার এবং বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট নাসেরের পক্ষে মোটেই সুখকর হয়নি।

বরং এই যুদ্ধ যে "আমাদের পক্ষে গুরুতর রকমে বিপর্যয়কর হয়েছে" একথা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নাসের স্বীকার করেছেন। জাতীয় নেতার উপযুক্ত আচরণের প্রমাণ দিয়ে এই বিপর্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিজে মাথায় নিয়ে তিনি পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁকে পদত্যাগ করতে দেয়নি।
ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিদায় চারদিনের এই যুদ্ধের প্রথম সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া।

অথচ আরব দুনিয়া আল্লার নাম নিয়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিল, প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট নাসের ঘোষণা করেছিলেন ইস্রায়েল যদি যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহলে সে যুদ্ধ কেবল আরব দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, কারণ "তখন আমাদের লক্ষ্য হবে ইস্রায়েলের ধ্বংস।" ৫ জুন ভোরে ইস্রায়েলী বিমান যখন কায়রো এবং সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য বিমানঘাঁটির ওপর একযোগে আক্রমণ চালালো তখন গোটা আরব দুনিয়া—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, সিরিয়া, জর্ডন, লেবানন, ইরাক, সৌদী আরব ও কুয়েৎ যারা ইস্রায়েলকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে—একযোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট নাসের নিজে যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ৫ জুন সন্ধ্যা নাগাদ সংযুক্ত আরব সৈন্যদল সিনাই উপদ্বীপের এল কুন্টিলা শহরের কাছাকাছি সীমান্ত অতিক্রম করে ইস্রায়েলী এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সিরিয়া ও জর্ডন কয়েকটি ইস্রায়েলী ঘাঁটির ওপর বিমান আক্রমণ চালায় এবং কয়েকটি স্থানে ইস্রায়েলী এলাকায় ঢুকে পড়ে। ইরাকী বিমান ইস্রায়েলের রাজধানী তেল আবিবের ওপর বোমাবর্ষণ করে আসে। আরব ভাইদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করবার জন্যে সৌদী আরবের সৈন্যবাহিনী জর্ডনে এসে জড়ো

প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর পদত্যাগের সংকল্প বেতার ও টি ভি মারফত তাঁর দেশবাসীকে জানিয়ে দেন—এবং পরে আবার তা প্রত্যাহার করে নেন

হয়। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী রসিদ কারামি ঘোষণা করেন যে, লেবানন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। কুয়েৎ রেডিও জানায় কুয়েৎ ইস্রায়েলের সংগে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তুরস্ক বিমান দিয়ে এবং আলজিরিয়া সৈন্য ও বিমান দিয়ে সাহায্য করে। সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ইরাক, কুয়েৎ ও আলজিরিয়া, বৃটেন ও আমেরিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু তবু ১৯৫৬ সালের সিনাই উপদ্বীপের লড়াইয়ের মত এবারেও ইস্রায়েলীরা উড়ন্ত পতাকা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই যুদ্ধের সাফল্য ও কৃতিত্ব ইস্রায়েলেরই প্রাপ্য। ইস্রায়েলকে ধ্বংস করা দূরে থাকুক, আরব দুনিয়া সমস্ত ফ্রন্টে ইস্রায়েলী বাহিনীর হাতে প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরব বাহিনী অপেক্ষাকৃত জোরদার প্রতিরোধ দিয়েছিল বটে, কিন্তু ইস্রায়েলী সাফল্যকে বানচাল করে দিতে পারেনি।

অথচ ইস্রায়েল এবারেও সিনাই উপদ্বীপ এলাকায় অবিকল ১৯৫৬ সালের স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করেছিল। সিনাইয়ের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একটি ইস্রায়েলী বাহিনী অভিযান চালিয়ে গাজা এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং অপ্রতিহত গতিতে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হয়ে এল আরিশ শহর দখল করে একেবারে সুয়েজ খালের পূর্ব তীর পর্যন্ত পৌঁছয়। সেই সঙ্গে এল কুন্টিলার দক্ষিণ দিক দিয়ে একটি বাহিনী ঢুকে পড়ে সোজা এগিয়ে যায় সিনাইর দক্ষিণ প্রান্তে টিরান প্রণালীর মুখে শার্ম এল শেখের দিকে। এই দ্বিবিধ অভিযানের ফলে সিনাই উপদ্বীপ সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের দখলে চলে যায়। আর শার্ম এল শেখ দখলের ফলে কেবল টিরান প্রণালীতেই নয় আকাবা উপসাগরেও ইস্রায়েলের যাতায়াতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রণালী ও উপসাগর বন্ধ করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট নাসের ইস্রায়েলকে যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তারই ফলে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল।

অন্যান্য ফ্রন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত হয়েছিল জর্ডন। জর্ডনের বিরুদ্ধে ইস্রায়েল চারমুখী অভিযান চালিয়েছিল। জেরুজালেম শহর এবং আরো কয়েকটি শহর সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলী দখলে চলে গিয়েছে। রাজধানী আম্মানের
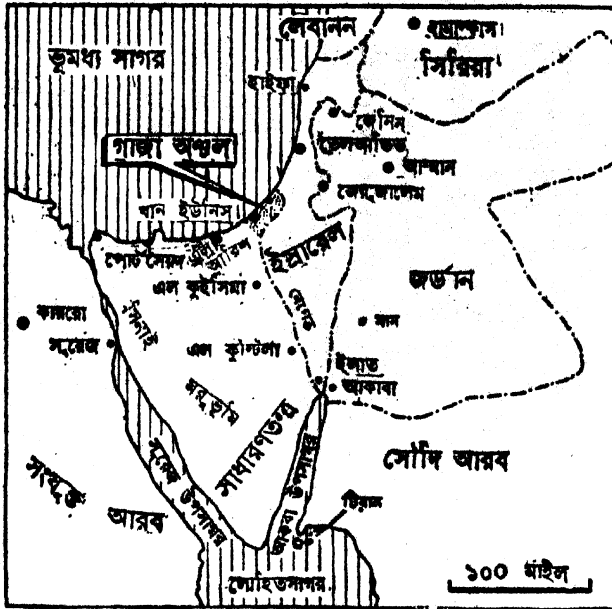
ওপর বোমা বর্ষিত হয়েছিল। অন্তত ১৫ হাজার লোক সেখানে নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। জর্ডনের অবস্থা এতখানি শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রেসিডেন্ট নাসের পর্যন্ত পরে বলেছিলেন : জর্ডনের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল।' বোধ হয় বেগতিক বুঝেই জর্ডন নিরাপত্তা পরিষদের ৬ জুনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সবচেয়ে প্রথমে মেনে নেয়।

এই শোচনীয় আরব বিপর্যয়ের জন্যে ইস্রাইলী স্ট্র্যাটিজি নিশ্চয়ই দায়ী ছিল। সিনাই উপদ্বীপে ১৯৫৬ সালের কৌশল অনুসরণ করলেও এবার ইস্রায়েলী অভিযানের বৈশিষ্ট্য ছিল সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ওপর "বিদ্যুৎসক্রিগ" ধরণের আক্রমণ। এর ফলে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সমস্ত বিমানঘাটি একযোগে অকেজো হয়ে গিয়ে তার বিমানশক্তি প্রথমেই অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে সংযুক্ত আরবের বিমানশক্তি আরব সৈন্যবাহিনীর বিশেষ কোন কাজে লাগতে পারেনি।

কিন্তু কেবল ইস্রায়েলী কৌশলের দোহাই দিয়ে বিপর্যয়ের সবটুকু ব্যাখ্যা করা যাবে না। ইস্রায়েল যে বিমানঘাটিগুলি ধ্বংস করে দিতে চাইবে এইটুকু যদি সংযুক্ত আরবের কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে না থাকেন তাহলে সেটা মোটেই গৌরবের কথা নয়। যুদ্ধে ভাগ্যের হাতে কিছুই ছেড়ে দেওয়া যায় না। প্রচার যতই আড়ম্বরপূর্ণ হোক না কেন, সংযুক্ত আরব যে অন্তত এই দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিল না ইস্রায়েলী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থতা তার প্রমাণ। তার হাতে মাটি থেকে আকাশে নিক্ষেপের উপযোগী যেসব ক্ষেপণাস্ত্র আছে সেগুলি যে আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি তার থেকেও আরব দক্ষতার খুব উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় না।

সিনাই উপদ্বীপে যে ইস্রায়েল ১৯৫৬ সালের স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করবে সেটাও অনুমান করতে না পারার কোন কারণ নেই (কারণ সেইটাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত স্ট্র্যাটিজি)। আর যদি সেটা অনুমানের মধ্যে থেকে থাকত তাহলে আরব পক্ষ থেকে যত দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি চলেছিল এবং যত সোচ্চার প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল তাতে সিনাই সীমান্ত প্রথম রক্ষাব্যূহ এত সহজে ধ্বসে পড়ার কোন কারণ ছিল না। তবু যে পড়েছিল তাতেই বোঝা যাচ্ছে আরব প্রস্তুতি প্রচারে যতটা ছিল কাজে ততটা ছিল না।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের অপ্রস্তুতি ও অসতর্কতা যদি আরব পক্ষের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়তাও এর জন্যে কিছু কম দায়ী নয়। প্রেসিডেন্ট নাসেরের দুর্ভাগ্য আরব দুনিয়ার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে ইরাক ও আলজিরিয়া ছাড়া আর সকলে যুদ্ধে কতখানি সক্রিয় ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। জর্ডন যতখানি কাহিল হয়েছিল ততখানি যুদ্ধ করেছিল কিনা সেটা একটা
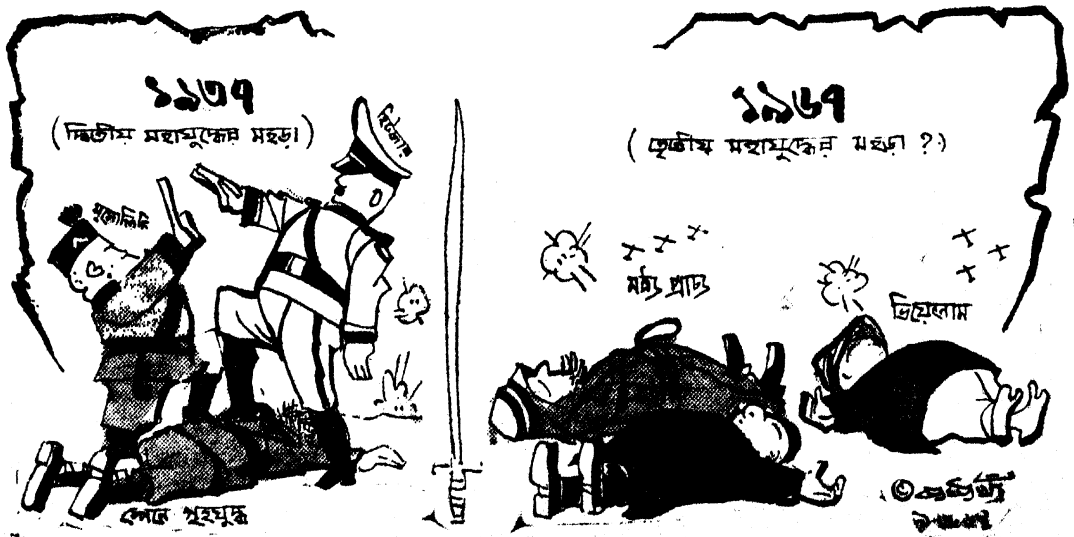
ঐতিহাসিক প্রশ্ন হয়ে থাকবে। সৌদী আরবের বাহিনী লড়াইয়ের জন্যে জর্ডনে ঢুকেছিল; তারপর তারা কি করেছে সে খবর অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। এমন কি যে সিরিয়ার সীমান্তে ইস্রায়েলের সঙ্গে গোলমাল সবচেয়ে বেশি এবং যার চাপে পড়েই নাসেরকে চরমপন্থী মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল, সেই সিরিয়াও প্রচার যুদ্ধের বাইরে কতখানি যুদ্ধ করেছে সেটা গবেষণার বিষয়। এদের এই নিষ্ক্রিয়তা ইতিহাসের বিচারে প্রচ্ছন্ন অসহযোগিতা বলে বিবেচিত হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। এর জন্যে নাসের-বিরোধী রাজনীতি কতটা কাজ করেছে সেটাও একটা আগ্রহপূর্ণ বিষয়।

১৯৪৮ সালে একবার, ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৬৭ সালে তৃতীয়বার ইস্রায়েল আরব দুনিয়ার সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এই জয় তাকে নতুন গৌরব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে সন্দেহ নেই। এখন আরব দুনিয়ায় এই যুদ্ধের কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেটাই বিচার্য বিষয়। যেহেতু গামাল আবদেল নাসের মিশরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সেইজন্যে আমরা চারটি সম্ভাবনার কথা অনুমান করতে পারি : এক, ইস্রায়েলের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আরও কঠোর হবে এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরব দুনিয়ার ঐক্যকে আরো জোরদার ও কার্যকর করার দিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন; দুই, কিন্তু অন্যান্য আরব রাষ্ট্র এই সুযোগে নাসের-বিরোধী একটা জোট পাকিয়ে তুলতে পারে, অন্তত সিরিয়া এই কথাটা সহজে ভুলবে না যে ৮ জুন চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি হয়ে যাবার পরেও ইস্রাইল যখন সিরিয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে তখন প্রেসিডেন্ট নাসের তাকে রক্ষা করতে আসেননি; তিন, যদি আরব-দুনিয়ায় নাসের-বিরোধীরা দানা বাঁধতে পারে তাহলে সেই অনুপাতে সেখানে প্রগতিশীল আন্দোলন পিছিয়ে যাবে; চার, সেই অবস্থা নিশ্চয়ই মিশরের কাম্য নয়, এবং সেরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে তার পক্ষে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে সমভাবাপন্ন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক হবে না। সেক্ষেত্রেও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশরের মনোমালিন্য বেড়ে যেতে পারে।

পরলোকে শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত

বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত ৮ জুন পরলোকগমন করেছেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় হাতেখড়ি। তারপর ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ, শ্যামসুন্দর পত্রিকা, সারভেণ্ট পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। সারভেণ্ট পত্রিকায় দীর্ঘদিন যুক্ত থাকবার পর ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া'র কলকাতা বিভাগের দায়িত্ব নেন। 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠান বিধুভূষণের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু অর্থাভাবে

এটি বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৮ খৃঃ। সংবাদ জগৎ থেকে তিনি কোনদিন সরে থাকতে পারেননি। জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি পত্রিকা-যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

মহার্ঘতা ও মহার্ঘ-ভাতা

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গজেন্দ্রগড়কার কমিশন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির হার সম্পর্কে তাঁদের সুপারিশ পেশ করেছেন। ইতিপূর্বে কেরল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যও তাঁদের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরাও এই ভাতাবৃদ্ধির আওতায় আসবেন। বিহারে পঞ্চায়েৎ কর্মী, স্বশাসক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অশিক্ষক কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি হবে এবং বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের সমতুল্য হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদেরও বেতন বাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিসেব করে দেখেছেন যে এই ভাতাবৃদ্ধি বাবদ তাঁদের সাড়ে এগার কোটি টাকা ব্যয় বাড়বে। শিগগিরই তাঁরা যে পাকা বাজেট পেশ করবেন তাতে এই ব্যয়বৃদ্ধি হয়তো অন্য খাতের ঘাটতির সঙ্গে মিলে স্ফীত আকার ধারণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করলে তাঁদের ব্যয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা অবশ্য এখনো প্রকাশ পায়নি তবে এই ব্যয় কোনো দিক থেকেই সামান্য নয়। বিহার সরকার ভাতাবৃদ্ধিতে যে প্রণালী অনুসরণ করেছেন তাতে তাঁরা কোন ক্ষেত্রেই নগদে অর্ধেকের বেশী অর্থ কর্মচারীদের দেবেন না। এই ব্যবস্থায় ১১০ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মচারীরা বর্ধিত ভাতার ৫০ শতাংশ হাতে পাবেন এবং বাকী অর্ধটা পরিবার কল্যাণ তহবিলে জমা থাকবে। ১১০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মচারীরা মাত্র ২৫ শতাংশ নগদ পাবেন বাকী টাকাটা পারিবারিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা পড়বে। ৬০০ টাকার ঊর্ধ্ব বেতনের কর্মচারীরা হাতে কিছুই পাবেন না, সব টাকাই জমা থাকবে। কর্মচারীদের ভাতার হার সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সমতুল্য হবে। সরকারকে নগদ যে টাকা দিতে হবে তাতে এখনই তার সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হবে এবং প্রতি বৎসর মোট খরচ হবে সাড়ে পনের কোটি টাকা।

এই ভাতাবৃদ্ধিতে কারা কতোখানি সন্তুষ্ট বা উপকৃত হবেন তা বলা কষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের জন্য যে বৃদ্ধির সুপারিশ হয়েছে তাতে কর্মচারীদের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া সন্তোষের নয়। এবং একথা অনস্বীকার্য যে এই ব্যয়বৃদ্ধি সরকারেরও সন্তোষের কারণ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের ভাতাবৃদ্ধিতে অধস্তন কর্মচারীরা আপাততঃ সন্তুষ্ট হলেও এই সন্তোষ স্থায়ী হবে কিনা, তা বলা সম্ভব নয়। বিহার সর্বনিম্ন বেতনের কর্মচারীরাও বর্ধিত ভাতার অর্ধেকের বেশী হাতে পাচ্ছেন না। যেখানে বাজার নিরন্তর ঊর্ধ্বমুখী সেখানে ভাতার অংশ কর্মচারীদের নামে জমা রাখার ব্যবস্থা তাঁদের পক্ষে কতখানি সান্ত্বনার বিষয় হবে তা বলা কষ্ট।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা ত স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট। তাঁদের সংস্থাগুলোর নেতারা বলছেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের মূল্যবৃদ্ধিজনিত আর্থিক ক্ষতির শতকরা ৯৫ থেকে ১০০ ভাগ পূরণ করা উচিত ছিলো। সেক্ষেত্রে মাত্র ৬০ শতাংশ পূরণ দ্বারা তাদের প্রতি অন্যায়ই করা হয়েছে।

অবশ্য কর্মচারীদের দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও কমিশনকে যে দুরূহ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাতে তাঁদের পক্ষে কাউকেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট করা সম্ভব হতো না। অধিকাংশ রাজ্য সরকারই তাঁদের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় কর্মীদের সমতুল্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছেন। কাজেই সুপারিশের সময় কমিশনকে শুধু কেন্দ্রের সামর্থ্য নয় রাজ্যগুলির সামর্থ্যের প্রতিও নজর রাখতে হয়েছে। অথচ বাড়তি মহার্ঘভাতা আংশিক নগদে দিয়ে বাকিটা কোনো তহবিলে জমা রাখার পরিকল্পনাও কমিশন অনুমোদন করতে পারেন নি (বিহারে যা করা হয়েছে) কারণ মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে স্বল্পআয়ের লোকদের দুর্গতি লাঘব তার দ্বারা সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের এই ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে। এর ফলে বাজেটের ওপর কতখানি চাপ পড়বে তা বর্তমানে বলা সম্ভব নয়, তবে অর্থমন্ত্রী এই বাবদ বাজেটে ১৪ কোটি টাকা ধরে রেখেছেন। এর ওপর রাজ্য সরকারগুলোর দাবী আসছে, কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় তা কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করতে হবে। কারণ, তাঁরা ন্যায্যতই বলতে পারেন এবং বলছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যয়-নীতিই বর্তমান মূল্যাস্ফীতির জন্য দায়ী।

একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান মূল্যস্ফীতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়নীতিই সর্বাধিক দায়ী তবুও চীন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে দেশরক্ষা ব্যয়-বৃদ্ধি ও পর পর দু-বছরের খরায় খাদ্য মূল্যের ওপর প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপার-গুলো অনিবার্য। অপর পক্ষে, পরিকল্পনার সূচনা থেকে আশু খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বাঁধ পরি-কল্পনায় অর্থ লগ্নী করা, সরকারী শিল্পগুলো পরিচালনে অদক্ষতার জন্য অত্যধিক ব্যয়বৃদ্ধি ও লগ্নীর তুলনায় লাভের স্বল্পতা, ভোগ্যপণ্যের বাজারের সংকোচ প্রভৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই সম্পূর্ণ দায়ী। এরি পরিণতিতে বছরের পর বছর পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতি থেকে যাচ্ছে যা নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতা সরকারের নেই। চলতি বছরে সর্বভারতীয় পাইকারী মূল্যসূচী ১৬'৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগের দুবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ শতাংশ হিসেবে কমিশন অবশ্য তাঁদের রিপোর্টে মূল্যবৃদ্ধি-জনিত এই ভয়াবহ অবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাকে যদি অবিলম্বে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তাহলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাঁদের মতে, মহার্ঘভাতা নির্ধারণের একটা সুষ্ঠু পন্থা আবিষ্কারই আমাদের কাছে বড় সমস্যা নয়, আমাদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে এমন একটা সুপরিকল্পিত সার্থক অর্থ-নীতি প্রবর্তন যা অদূর ভবিষ্যতে মূল্য-মানকে স্থিতিশীল করতে সমর্থ হবে।

কিন্তু ভোগ্যপণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং মূল্যমানের স্থিতিশীলতা আজকের দিনে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তৎকালীন সরকার নিজেদের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার অংশবিশেষ টাকায় না দিয়ে জিনিসপত্রে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এর ফলে সরকারী কর্মচারীরা সরকারী রেশন দোকান থেকে খাদ্যসমেত অনেকগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে পেতেন। বর্তমান গজেন্দ্র-গড়কর কমিশনের সামনেও এই বিকল্প প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা এই প্রস্তাব কার্যকরী বলে মনে করেননি, কারণ, তাঁদের সামনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সব পদস্থ কর্মচারীরা ও কর্মচারী সংস্থার প্রতিনিধিরা সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই খোলাখুলিভাবে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কর্মচারীদের যে নির্ধারিত মূল্যে নিয়মিতভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে এরকম ধারণা তাঁদের কারুরই নেই। তাঁদের ভেতর অনেকে বলেছেন যে, সরবরাহের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হবে না, তাছাড়া, পরিচালনব্যবস্থায়ও যোগ্যতার অভাব থাকবে। কর্মচারীরা ত এইভাবে ভাতা নেওয়ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। কাজেই, কমিশন এই প্রস্তাবকেও আমল দেন নি।

কেন্দ্রীয় সরকার মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির পর রাজ্য সরকারগুলো কি করবে সে এক বিরাট সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ সমেত কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই তাঁদের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সমতুল্য হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। কমিশন অবশ্য এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ না করে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। তাঁদের মত এই যে, মহার্ঘভাতা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণও সেই হারে হওয়া দরকার, তবে এর অর্থ এই নয় যে, রাজ্য কর্মচারীদের বর্ধিত ভাতা কেন্দ্রের ভাতার সমতুল্য হতে হবে। এর কারণ, রাজ্যগুলো ভাতাবৃদ্ধির জন্য বর্ধিত ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বর্তমানে চাপ দিচ্ছে। স্বভাবতঃই কেন্দ্র এই চাপে অত্যন্ত বিব্রত, কারণ, করবৃদ্ধির দ্বারা বাজেটে আয়-ব্যয় সমান করার পর যদি এখন রাজ্যগুলির তরফ থেকে আরো অর্থবরাদ্দের জন্য দাবী আসতে থাকে, তাহলে কেন্দ্রকে যে কর বৃদ্ধি করে নতুন ঘাটতি মেটাতে হবে না হয় ফালতু নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি আরো ভয়াবহ হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিতে হবে।

মহার্ঘতা ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির এই দুষ্টচক্রের আবর্তন প্রতিরোধে কোনো কোনো অর্থনীতিক ভবিষ্যতে ভাতাবৃদ্ধি সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, এমনকি মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও। তাঁদের মতে মহার্ঘভাতা যতো বাড়ানো হবে, মূল্যও ততো বৃদ্ধি পাবে। কিছুদিন আগে বৃটেনে মুদ্রাস্ফীতির এই সমস্যা নিরসনে উইলসন সরকার মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধি সাময়িক বন্ধের যে নির্দেশ বলবৎ করেছিলেন, তাতে বৃটিশ অর্থনীতিতে অচিন্তনীয় সুলক্ষণ দেখা গেছে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশের ভেতর বেকারী সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক লেনদেনের উন্নতি, শিল্পোৎপাদন ও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতায় উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্যের ওপর বৃটিশ সরকারের যে কর্তৃত্ব আছে, আমাদের দেশে সরকারের কাছে তা প্রায় স্বপ্নের মতো। দিন কয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেন তাতে খোলাখুলিভাবেই তাঁদের এই ব্যর্থতা স্বীকার করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আমাদের দেশের আপাতঃ সমস্যা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা এবং খাদ্যের সমবন্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা ও তাকে জোরদার করে তোলা। কিন্তু পণ্যের সরবরাহ এমন গুরুতর রকমে সীমাবদ্ধ যে, একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও মূল্যমান স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে না। সমীক্ষায় এর পর বলা হয়েছে, এরকম অবস্থায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টনব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস বিশেষ কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই, সরকারী ও বেসরকারী খাতে লগ্নীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। যেসব ব্যয় উন্নয়নমূলক নয় তা হ্রাস করা এবং যেগুলো উন্নয়নমূলক তাতে যথাসম্ভব মিতব্যয়িতার পথ অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

সমীক্ষার এই সদিচ্ছা কেন্দ্রের পক্ষে অনুসরণ করা কতখানি সম্ভব হবে বলা সম্ভব নয়। কোন কোন অর্থনীতিক এই-রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, সরকার যদি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থাবলম্বন না করেন, তাহলে আগামী ছয় কি আট মাসের মধ্যে পণ্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগতি আরো দ্রুত হবে। গজেন্দ্র-গড়কার কমিশনও অর্থনীতিকদের এই আশঙ্কার সঙ্গে একমত। তাঁরা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো মূল্য স্থিতিশীল করার জন্য যদি কার্যকরী কোনো ব্যবস্থাবলম্বন করেন তাহলে আগামী দুবছরের মধ্যে তাঁরা মূল্যকে অনেকখানি আয়ত্তে আনতে পারবেন। যদি ভাগ্যগুণে পর পর দুটো বছর ভালো বর্ষণ হয় তাহলে খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের পথ অনেক সহজ হয়ে আসবে। অপরপক্ষে, বর্ষা যদি আশানুরূপ না হয়, অথবা সরকারের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ঘটে তাহলে মূল্য ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকবে। এই অবস্থায় তাঁদের বর্তমান সুপারিশ-গুলোর আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না, কারণ মহার্ঘভাতা যে পরিমাণ বাড়ানো হবে, পণ্যের স্ফীতমূল্য তাকে গ্রাস করে আবার নতুন অশান্তির প্রেরণা যোগাবে।

কমিশনের বর্তমান সুপারিশের আয়ুষ্কাল দু'বছর অথবা সর্বভারতীয় পাইকারী মূল্য-সূচী ২৪৫-এর কোঠায় পৌঁছানো পর্যন্ত (যেটা আগে আসে)। গত জানুয়ারী মাসে এই মূল্যসূচী ১৮৫তে পৌঁছেছে। এবং তারপর থেকেও নিশ্চয়ই এর ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত আছে। সরকারের হাতে এখন দু-বছর সময় আছে। এর মধ্যে যদি তাঁরা অন্ততঃ সঠিক পথে পদার্পণের সূচনা না করতে পারেন তাহলে ক্রমাগত এই মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধির আবর্তেই দেশের অর্থনীতি ঘুরপাক খেতে থাকবে। —
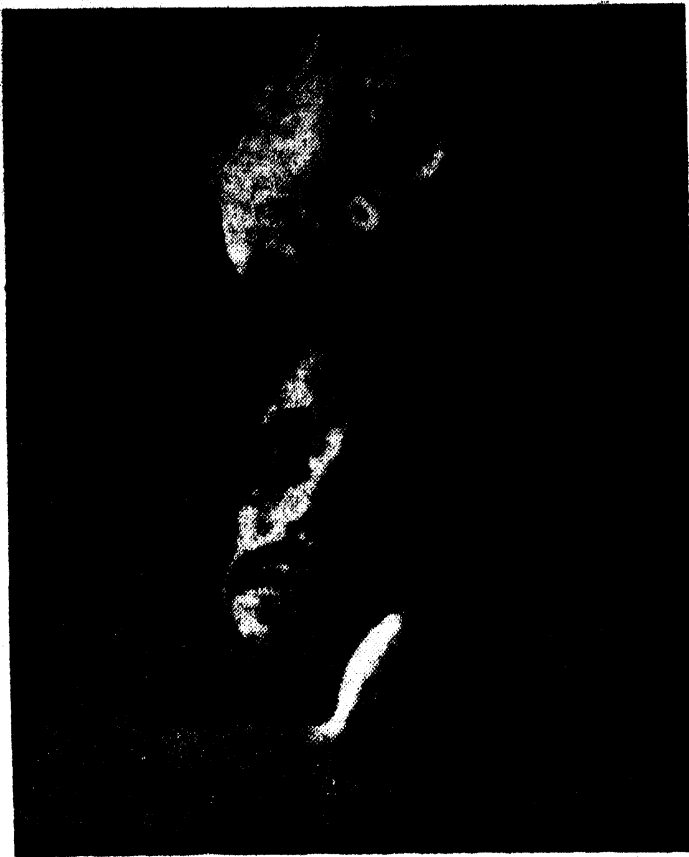
অ্যালপাইন ব্যালাডে'র একটি দৃশ্য

সোভিয়েত চলচ্চিত্র

বর্তমান শতকের মাঝামাঝি, অর্থাৎ সেরগেই আইজেনস্টাইনের 'পটেমকিন' ও 'অকটোবর' এবং পুডভকিনের 'মাদার', 'দ্য এনড অফ সেন্ট পিটার্সবুর্গ" ও 'দ্য ডিসেনডেনট অফ চেংগিজ খান" মুক্তি পাবার পর সোভিয়েট চলচ্চিত্র বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আদর্শ ভিত্তিক আবেগ অনুভূতি, চিন্তার সজীবতা এবং উন্নতমানের শিল্পকাজ এই ছবিগুলোর মধ্যে ছিল। সুবিখ্যাত মার্কিন চিত্র সমালোচক বলেছেন যে, এতাবৎকাল সোভিয়েত চিত্রের 'প্রচার' ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত চলচ্চিত্রে যে এক নব যুগের সূচনা হয়েছে তা জানা গেল বিপ্লব থেমে যাবার পর।

বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক অ্যাবেল হ্যান্স মনে করে যে সোভিয়েত ছায়াচিত্রের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তাঁর মতে আইজেন-স্টাইন, পুডভকিন ও তাঁদের সহকারীরা সকলের ভালবাসা ও সহানুভূতি পাবার যোগ্য।

আমবার্তো বারবারে বলেছেন যে, ইতালীতে সোভিয়েত চিত্রের প্রভাব শুধু সেখানকার শিল্পেই নয়, তা গভীরভাবে প্রবেশ করেছে ইতালীর সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শের জগতে।

প্রাক-বিপ্লব যুগে সোভিয়েত সিনেমায় খানজানকভ, ইয়রমালিয়ভ, ড্রাংকভ, তালদি-কিনের মতন সংস্থার আবির্ভাব হলেও তেমন কোন ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। সে যুগে প্রতাজানভ, গারডিন, বোয়ার, চার-ডিনিনের মতন পরিচালকরা বিখ্যাত লেখকদের বহু পঠিত উপন্যাসগুলির বাইরে দৃষ্টি বড় একটা দিতেন না। সে যুগের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম করতে হলে প্রথমেই ইভান মজজুকিন ' ওভেরা খোলদ নায়াগ নাম করতে হয়। কিন্তু বিপ্লবের পর বিশিষ্ট প্রযোজকরা দেশত্যাগী হয়।

নতুন যুগের সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মধ্যমণি হলেন সারগেই আইজেনস্টাইন। ১৯২৫ খৃঃ প্রথম ছবি "স্ট্রাইক"-এ আইজেন-স্টাইন বিপ্লবী জনসাধারণকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এ ছবিতেই 'অ্যাকশন' সর্বপ্রথম স্থান-লাভ করল। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পোটেমকিন' ঐ বছরই মুক্তিলাভ করে। সংলাপের ভাষাকে তিনি সংকেত ও ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত করেন। তাঁর সহকারী ছিলেন আলোকচিত্রী এডোয়ার্ড টিসে, গ্রেগরি য়্যালেনড্রেভ, ম্যাকসিম স্ট্রউখ। এ'দের সাহায্যেই তিনি সৃষ্টি করেন 'অকটোবর', 'দি ওল্ড অ্যান্ড দি নিউ'। দেশ-ব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সংস্কার হল এ ছবির পটভূমিকা।

এযুগের আর একজন মহান স্রষ্টা হলেন পুডভকিন। তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'মাদার'। আইজেনস্টাইনের মতন তিনিও অভিনয়ের উপর বিশেষ জোর দিতেন। তাঁর দুটি মহান কীর্তি হল 'দি এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবুর্গ' ও 'দি ডিসেনডেন্ট অফ চেংগিস খান।'

এই সময়ই মস্কোয় আইজেনস্টাইন ও পুডভকিনের সংগে সংগেই অ্যাব্রাম রুম ইয়কভ প্রতাজানভ, বোরিস বার্নেট, ভিকতর তুরিন, এসফির শাব ও লেনিনগ্রাদে ফ্রেদরিক এমলার, ইওজেনি চেরিকভের মতন চিত্র-নির্মাতারা কাজ করতেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন আইগর ইলিনস্কি, নিকোলাই বাতালভ, ফিওদর নিকিতিন, সার্জাই জোরাসিমভ, ভেরা মারেতস্কায়া, ওলগার জিজনেভা ও ইলিনা কুজমিনা প্রমুখ। এ'দের জনপ্রিয়তা রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে গিয়েছিল।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল, তার বহু-জাতীয় চরিত্র। সোভিয়েতের প্রতিটি প্রজাতন্ত্রে সিনেমা শিল্প গড়ে উঠে নিজের স্বকীয়তার উপর ভিত্তি করে। তৃতীয় দশকের শেষদিকে আলেকজান্দার দোভজেনকোর মতন বিরাট প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর কীর্তি হল 'জেনিগোরা' 'আর্সেন্যাল' জেমলিয়া'। জর্জিয়ায় দেখা দেয় আর একটি প্রতিভা—নিকোলাই সেংগেলায়া ও মিখায়েল চিওরেলি। তারপর আসেন ইভান পেরেসতিয়ানী। আর্মেনিয়া, বিলোরুশিয়া-তেউ বেক নাজারভ ও য়ুরী গরিচ মহান পরিচালকদের আবির্ভাব হয়। ত্রিশ দশকে সোভিয়েত দেশের বহু-জাতীয় ছবি-গুলি—পোটেমকিন, মাদার, আর্থ প্রভৃতি—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ছবিগুলি আজ প্রগতিশীল মানব সভ্যতার অংগ হয়ে পড়েছে।

ত্রিশ দশকে সিনেমা শিল্প নতুন এক দিগন্তের সন্ধান পায়—আবিষ্কার হয় 'সাউন্ড' ব্যবস্থা। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারেরা সিনেমাকে আরও বাস্তবধর্মী করে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের কাছে এ এক নতুন জগতের দ্বার খুলে দিল। পশ্চিমের অনেক মহান চলচ্চিত্র স্রষ্টাই প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে তা নস্যাৎ করেছিলেন পর্যন্ত। সোভিয়েতের প্রথম শব্দচিত্র হল 'দি ওয়ে অফ লাইফ', তৈরী করেছিলেন নিকোলাই এক। ভেরটভ করলেন 'সিমফনি অফ বনবাস।' 'পুডভকিন করলেন 'দি ডেজারটার', দোভজেনকোর 'উভান' দর্শকদের মোহিত করল।

১৯৩৪ সালে তৈরী হল সর্বকালীন এপিক চিত্র—'চাপায়েভ'। ভাসিলিয়েভ ভ্রাতারা এ ছবিটি তৈরী করেন। এ ছবিতে বোরিস বাবোচকিনের অভিনয় অনবদ্য। এ

শর্ট্ চিত্রের দৃশ্য

সময় এবং পরবর্তীকালেও সোভিয়েত সিনেমায় ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক আদর্শ ও কাহিনীই অধিকাংশ স্থান অধিকার করে থাকে। ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল বালটিক ডেপুটি, ট্রিলজী অফ ম্যাক্সিম, স্কারস, লেনিন ইন অক্টোবর, লেনিন ইন ১৯১৮, দি ম্যান উইথ দি রাইফেল প্রভৃতি। ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও অনেক উৎকৃষ্ট ছবি হয়, যথা, পিটর দি গ্রেট, আলেকজান্দার নেভস্কিন, সুভোরভ প্রভৃতি। ছবিগুলি আবার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে অদ্বিতীয়। সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও রুশ ছবিতে স্থান পেয়েছেন, যথা, দি গ্রেট সিটিজেন, বোম্বার অফ গভর্ণমেন্ট, দি টিচার, এ বিগ লাইফ প্রভৃতি।

পরবর্তীকালে সৃষ্টি হোল প্রফেসর ম্যামলক, দি ওপেনহেইম ফ্যামিলি, য়্যারো-গ্রাড, অন দি বর্ডার। ফ্যাশীস্টরা স্বদেশ আক্রমণ করলে দেশের সিনেমা নির্মাতারা কোমর বেঁধে নামেন। আবার ক্রনিকল ও তথ্যচিত্র প্রাধান্য লাভ করে। জার্মানদের বিতাড়ন থেকে বার্লিনের পতন পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের ঘটনাবলী বীর ক্যামেরা-ম্যানরা একটি মহান তথ্যচিত্রে ধরে রেখেছেন। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র নির্মাতাদের মধ্যে ইলিয়া কোপালিন, রোমান কারমেন, ভ্যাসিলি ব্যালিয়েচ, যুলী রেইজম্যান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

যুদ্ধ কাহিনী চিত্রকারদের অনেক চিন্তার খোরাক যোগায়। সোভিয়েত সৈনিক-দের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে তাদের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের আদর্শ তুলে ধরা হয় ঐ সব ছবিতে। ১৯৪২ থেকে এ ধরনের ছবি তৈরী হয়। এ ধরনের ছবিগুলির অন্যতম হল—সেক্রেটারী অফ দি রিজিওন্যাল পার্টি কমিটি, দি রেনবো, শি ডিফেণ্ডস হার কানট্রি, দি ইনভেনশন, ইন দি নেম অফ দি ফাদারল্যাণ্ড, ইভান নিকুলিন। এ সবের সংগেই চলে ঐতিহাসিক ছবি। আইজেন-স্টাইন (তিসের সহযোগিতায়) তৈরী করেন আইভান দি টেরিবল।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রকাররা এ ব্যাপারে খুব গর্ব বোধ করেন যে দেশের দুর্দিনে ঐতিহ্য ব্যাহত হতে তারা দেননি। তারা সবাই জয়ের জন্যে সচেষ্ট হন। কিন্তু কখনই তারা যুদ্ধের নিছক যুদ্ধের জয়গান করেননি।

যুদ্ধোত্তরকালে হাল্কা ছবিই বেশি হয়। কিন্তু তার মধ্যেও দু-চারটি অতি ভাল ছবি হয় যেমন, দি রিটার্ণ অফ ভাসিলি বরতিলিকভ, ভিলেজ টিচার, ভিলেজ ডক্টর প্রভৃতি। মিচুরিন ও প্যাভলভ সম্পর্কে জীবনী চিত্র হয়েছে। শেষদিকে সোভিয়েত সিনেমায় বড় রকমের ভাটা দেখা দেয়।

পূর্ণ থিয়েটারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন। চিত্রে সোভিয়েট চিত্রশিল্পীদের সংগে প্রচারমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীকে দেখা যাচ্ছে।
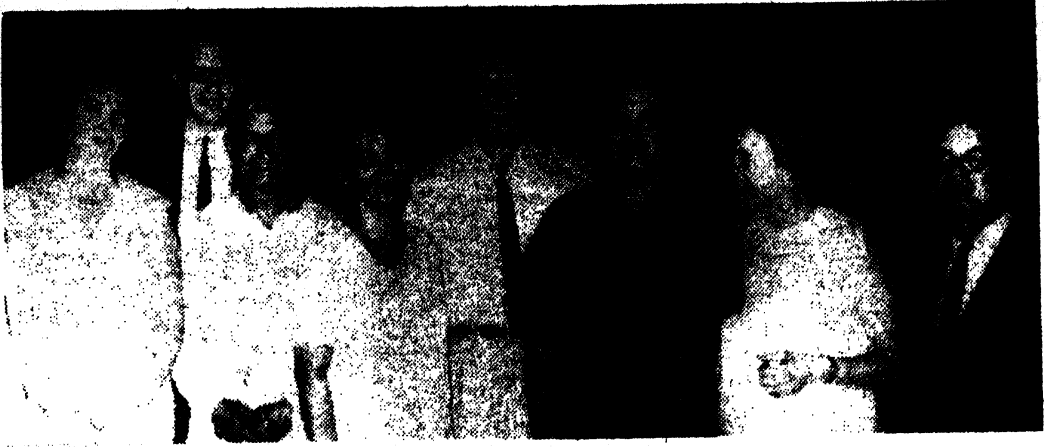
কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে সোভিয়েট চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্থানীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিরা।

তারপর ১৯৫৩ সালে যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান ঘটে। শুরু হয় নতুন যুগ। আবার নতুন নতুন প্রতিভার সমাগম হয়। খুব উঁচু দরের ছবি তৈরী হয় দি বিগ ফ্যামিলি দি রুমায়েনৎমভ্ কেস, দি হাইট, আন-রিলেটেড ফ্যামিলি প্রভৃতি। এদের বিষয়বস্তু হল সমসাময়িক সমাজ। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা প্রভৃতি। নতুন নতুন ধরনের ছবি দেখা দেয়। আজ সে আবার তার পুরান গৌরব ফিরে পেয়েছে। কালাতেরজাতের মতন পরিচালক দেখা দিয়েছে। তার ছবি হল "ক্রেন্স আর ফ্লাইং" সার্জেই উরুসেভ্‌স-কির মতন আলোকচিত্রী, তাতিয়ানার মতন অভিনেত্রী, বাতানভের মতন অভিনেতা দেখা দিয়েছে। তৈরী হয়েছে 'দি হাউস ইন হুইচ আই লিভ, দি এনটি, সোলজার্স ফাদার, ইভান্স চাইলডহুড, ক্লেমিং ইরস্য, ডেস্টিনি অফ ম্যান, কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন, ওয়ানডারিং থ্রু টরমেন্টস, ফরটি ফাস্ট'। এযুগের চুকরাই আর একটি দিগচিহ্ন। তার মত পরিচালক পাওয়া মুস্কিল। ইদানীং আবার পশ্চিমী কাহিনী অবলম্বনে ছবি তৈরী হচ্ছে—যথা ওথেলো, ডন কুইকজোট, হ্যামলেট, লেডি উইথ দি লিটল ডগ প্রভৃতি।

কাহিনী চিত্রের সংগে সংগে সোভিয়েত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য চিত্র ও বিজ্ঞান চিত্র বেশ উন্নতি করেছে। ১৯৬৪ সালে ম্যান-হেইনের আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য চিত্র প্রতি-যোগিতায় 'তারকাসব' 'দ্য ম্যান উইথ দ্য ফিল্ম ক্যামেরা' এবং 'দি ওল্ড ব্যাণ্ড নিউ'—এই তিনখানা সোভিয়েত চিত্র শ্রেষ্ঠ চিত্র-গুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছিল।

রসপিপাসু দর্শক ও সমালোচকরা নিম্নলিখিত সোভিয়েত সাউণ্ড ফিল্ম-গুলোর প্রশংসা করে থাকেন :—

দ্য ওয়ে ইনটু লাইফ, চাপায়েভ বালটিক ডেপুটি, লেনিন ইন অক্টোবর, লেনিন ইন ১৯১৮, ম্যান উইথ দ্য রাইফেল, ট্রিলজি ম্যাবাউট ম্যাকিসম, আউটস্কারটস, দ্য স্টর্ম, চাইল্ডহুড, য়্যাংমোং পিপল, দ্য সারকাস, দ্য টিচার, পিটার ১ ম্যাশেনকা, রেনকো, ডেয়ারিং পিপল ইত্যাদি।

তবে সম্প্রতিকালে বিদেশে নিম্নলিখিত ছবিগুলোর খুব সমাদর হয়েছে, দ্য ফেট অব এ ম্যান, ব্যালাড অব-এ সোলজার, দ্য ফরটি ফার্স্ট, টেল অব দ্য ফ্লেমিং ইয়ারস, দ্য ইমমরটাল গ্যারিসন, কোয়ায়েট ফ্লোস দ্য ডন, ওথেলো, হ্যামলেট, দ্য কম্যুনিস্ট, দ্য বিগ ফ্যামিলি ডিংগো—দ্য ওয়াইল্ড ডগ, আইভান্স চাইল্ড হুড—ইত্যাদি।

১৯৬৫-৬৬ সালে বিভিন্ন সোভিয়েত চিত্র মোট একশটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও মানপত্র পেয়েছিল। মস্কোতে চতুর্থ বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত চিত্র ওয়ার অ্যান্ড পীস' গ্রান্ড প্রিকস পেয়েছিল। ঐ উৎসবে 'দ্য ফাদার অব এ সোলজার' এবং 'দ্য টু'—চিত্র দুখানার ভাগ্যেও দুটো পুরস্কার জুটেছিল।

ভেনিসে তিনবার গোল্ড লায়ন পেয়ে-ছিল তিনখানা সোভিয়েত চিত্র—পুরস্কার-প্রাপ্ত অন্যান্য ছবিদের মধ্যে 'আই অ্যাম টুয়েনটি' লয়্যালটি, দ্য গর্ল অ্যাণ্ড দি একো, নোবাডি ওয়ান্টেড টু ডাই' দ্য চার্মড ডেসনা, 'দ্য লাস্ট ডে অব দ্য ভ্যাকেশনস ইত্যাদির নাম করা যায়। দিল্লীতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় 'দ্য ডন স্টোরি' চিত্রের অভিনেতা ই লিওনোভ সিলভার পীকক পেয়েছিল।

দ্য শ্যাডোজ অব ফরগটন ম্যানসেসটরস দুটো চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় দুটো করে পুরস্কার পায়। গ্রিগরি কোজিনস্তেভের 'হ্যামলেট' ৬৫-৬৬ সালে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছিল। পরিচালনা, অভিনয় ইত্যাদি সবদিক দিয়ে চিত্রখানি ছিনিয়ে এনেছে বিশ্বের অনেকগুলো সেরা পুরস্কার।

১৯৬৬ সালে সেরগেই ইয়ুতকেভিচের 'লেনিন ইন পোল্যাণ্ড' দুটো পুরস্কার পেয়েছে। "অরডিনারি ফ্যাসিজম" ছায়াছবি খানা সপ্তম বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক সেরগেই জেরাসিমোভ স্বীকার করেছেন যে, আইজেন-স্টাইন, পুডভকিন, ডভঝেনকো, ভাসি-লিয়েভ ভ্রাতৃগণ, সান্ডচেনকো, ট্রিসে, মস্কভিন প্রমুখ বিখ্যাত চিত্র পরিচালকেরাই সোভিয়েট ছায়াছবির নবযুগের সূচনা করেছেন।

সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সোভিয়েত ছায়াচিত্রে মানবতাবোধ, নাটকীয়তা এবং উন্নতমানের শিল্প কাজ প্রভূতভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিককালে বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পে সোভিয়েত চিত্রের এক বিশেষ আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত কয়েকটি চিত্র

লেনিন ইন পোল্যাণ্ড। পরিচালক : সেরগেই ইয়ুৎকেভিচ।

অ্যালপাইন ব্যালাড। পরিচালক : বোরিস স্তেপানভ।

সেরিওঝা। পরিচালক : গিয়র্গি দানে-লিয়া ও ইগর তালানকিন।

হাও শুড আই কল ইউ নাও? পরি-চালনা : ভ্লাদিমির চেবোতারিয়ভ।

স্কাইলার্ক। পরিচালনা : নিকিতা কুরিখিন ও লিওনিদ মেনাকার।

আরশিন মল আলান। পরিচালনা : তোফিক তাঘি-জাদে।

শট। পরিচালনা : নাউথ গ্রাথটেনবার্গ।

সুবর্ণরেখার সাধ চিত্রের মহরতে বিকাশ রায়, প্রযোজক দুলালী চৌধুরী, কাহিনীকার আশাপূর্ণা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সান্যাল ও পশ্চিম বাংলার শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া। ফটো : অমৃত

আজকের কথা :

চলচ্চিত্রাভিনয়ের রীতি সম্পর্কে নতুন কথা :

"লেনিন ইন অকটোবর", "লেনিন ইন ১৯১৮", "নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার" প্রভৃতি ছবির বিখ্যাত রুশ পরিচালক মিহাইল রম চলচ্চিত্রে অনুসৃত অভিনয়শৈলী সম্পর্কে সম্প্রতি যে-কথা বলেছেন, তা যেমনই অভিনব, তেমনই বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সম্পূর্ণ দু'বছরকাল প্রত্যহ আট ঘণ্টা ধরে নিয়মিতভাবে তথ্য বা দলিল-চিত্র দেখবার ফলে তাঁর কাছে স্টুডিওর ভিতরে তোলা কাহিনী চিত্রের ছোট ছোট অংশগুলিকে বিরক্তিকরভাবে অবাস্তব বলে বোধ হত, বাস্তব এবং অনুকরণের মধ্যে প্রভেদটি বড়ো হয়ে দেখা দিত। চিত্র-সম্পাদকের কক্ষ থেকে নির্গত কাহিনীচিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বরকে তাঁর বড্ড বেশী কৃত্রিম বলে মনে হত।

"অর্ডিনারী ফ্যাসিজম" নামে ছবিটির অনেকখানি অংশ মিহাইল রম তুলেছিলেন অলক্ষিত ক্যামেরার সাহায্যে। একেবারে বুঝতে না পারে, এমনভাবে ছবি নিয়েছিলেন তিনি মস্কোর সাধারণ মানুষের—কেউ পথ হাঁটছে, কেউ বা দোকানে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছে, কেউ হয়ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, আবার কেউ বা আর কারুর সঙ্গে আলোচনা করছে। এই ছবিগুলি যখন পর্দায় প্রতিফলিত করে দেখছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন; একজন সাধারণ মানুষ ভাবতে গিয়ে—অতি তুচ্ছতম বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে বাইরে তার চোখমুখের ভাব-ভঙ্গীতে তা কতখানি প্রকাশ করে ফেলে! এক-একজনের মুখের একাগ্র চিন্তা বা যথার্থ গাম্ভীর্যের বাহ্যঃ-প্রকাশ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন এবং ভেবেছেন, কোনও অভিনেতার পক্ষে অতখানি প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কারণ, শট নেবার সময়ে অভিনেতা তো আসলে ভাবনার গভীরে ডুবে যেতে পারেন না, তিনি কেবল গভীর চিন্তার অনুকরণ-মাত্র পরিবেশন করতে পারেন। একটি মেয়ের উদাহরণ দিয়েছেন মিহাইল রম। মেয়েটি একটি কলেজে ভর্তি হবার জন্যে আবেদন করেছিল। কলেজ-কর্তৃপক্ষ যখন ভর্তিযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা প্রকাশ করেন, তখন মেয়েটি অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তার নামটি ঐ তালিকার মধ্যে খোঁজবার চেষ্টা করছিল। তখন মেয়েটি যৌবনের স্বাভাবিক উচ্ছলতায় প্রত্যাশার উত্তেজনায়—সে তার নাম দেখতে পাবেই পাবে, এ-রকম একটা সম্ভাবনাময় প্রত্যাশার উত্তেজনায় হাসছিল; কিন্তু পরে যখন মেয়েটি আবিষ্কার করল, সমগ্র তালিকার মধ্যে কোথাও তার নাম নেই, তখন তার মুখে নিমিষে ফুটে উঠল হতাশা—দুঃসহ বেদনা-ময় হতাশা। মনের এক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য এক অবস্থায় এমন যথার্থ উত্তরণ মিহাইল রম কাহিনী-চিত্রের মাধ্যমে কচিৎ দেখেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

খণ্ড খণ্ড তথ্যচিত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অভিনয়ের আদর্শ এবং অভিনেতার ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলছেন, "আমি চাই, পর্দায় মানুষ স্বাভাবিকভাবে সহজে চলাফেরা করবে, ক্যামেরা লুকিয়ে আছে না জেনে মানুষ যেভাবে চলাফেরা করে, ঠিক সেই-ভাবে; চলচ্চিত্রে প্রকৃতি, বাতাস, জল, বন যে-জীবন যাপন করে, সেই জীবন যাপন করবে।" এইখানেই তিনি অভিনেতাদের অভিনয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা তুলেছেন। অভিনয়কালে তাঁরা নির্ভর করেন অনুভব-সংশ্লিষ্ট, পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত অঙ্গ-ভঙ্গিমা ও মুখভাবের উপর। তাতে তাঁদের অভিনয় হয়ত প্রকাশময় হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে যথাযথ হয় না। কারণ, অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে যে-চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন, জীবন্ত চরিত্র তার থেকে অনেক বেশী জটিল।

মিহাইল রম বলছেন, "মুখ খোলবার আগেই আমি যে-কোনও পুরানো অভিনেতাকে চিনে নিতে পারি—মুখের রেখাগুলো থেকেই তাকে ধরে ফেলা যায়। আমরা জীবনে যা-কিছু অনুভব করে থাকি, সেই প্রেম, বিচ্ছেদ, আনন্দ প্রভৃতি সে সারাজীবন ধরে রূপায়িত করছে। কিন্তু প্রতিদিন অন্তরের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করতে করতে তার মুখের চামড়ায় রেখা পড়ে গেছে—সে-রেখা অভিনেতার মুখের রেখা। বৃদ্ধ চাষীর ঘাড়ে, কপালে রেখা পড়ে, বিজ্ঞানী, চাষী, শ্রমিকের মুখের রেখা তার মুখে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। এবং এই সার্বজনীনতার ফলে তার মুখটাই হয়ে ওঠে অবাস্তব।"

পরিচালক মিহাইল রম-এর ভাবনা, তথ্যচিত্রে তিনি যে-সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই সত্যে তিনি কেমন করে পৌঁছুবেন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাধ্যমে কাহিনী-চিত্রের পরিচালনা করবার সময়ে। অভিনয়ের সমস্যা নিয়ে তাঁকে এখন থেকে অনেক বেশী ভাবতে হবে।

পরিচালক মিহাইল রম-এর এই ভাবনার কথা শোনবার পরে আমাদের কাহিনী-চিত্রের পরিচালকদের ভাবনাও যদি বেড়ে যায়, তাতে বিস্মিত হব না।

চিত্রসমালোচনা

চন্দন কা পালনা (হিন্দী) : আজুদ্‌ ফিল্মস্‌-এর নিবেদন; ৩,৯৯১·৪১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শ্রীমতী খায়রুন্নিসা ইসমাইল ও জেরুন্নিসা উসমান আলি; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ইসমাইল মেনন; সংলাপ : শোর নিয়াজি; সংগীত-পরিচালনা : রাহুল দেববর্মণ; গীতরচনা : আনন্দ বক্‌সী; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : ডি সি মেহতা; সংগীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক, ডি ও বালসারি, মঙ্গেশ দেশাই ও কৌশিক; শিল্পনির্দেশনা : আবদুল রহিম; সম্পাদনা : বিঠল ব্যাঙ্কার; নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা : গোপীকৃষ্ণ; নৃত্য : সুরেশ ভাট; নেপথ্যকণ্ঠ-সংগীত : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, ঊষা মঙ্গেশকর, মান্না দে ও মোহম্মদ রফী; রূপায়ণ : মীনাকুমারী, ধর্মেন্দ্র, মেহমুদ, মমতাজ, দুর্গা খোটে, শবনাম, নাজির হোসেন, বিপিন গুপ্ত, অভি ভট্টাচার্য, ধুমল, মুকরী, অসিত সেন প্রভৃতি। জগৎ এন্টারপ্রাইজ-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৯ই জুন রক্সী প্রিয়া, লোটাস, গণেশ, মিত্রা, নাজ, কালিকা, ছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

সন্তানবতী বা বিশেষ করে পুত্রবতী হতে না পাওয়া আজকের দিনের মেয়েরা গুরুতর দুর্ভাগ্য অথবা অভিশাপ বলে মনে করে কিনা এবং পুত্রসন্তান না জন্মালে তাদের শ্বশুরকুলে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, এই চিন্তায় তাদের সুখনিদ্রা বিঘ্নিত হয় কিনা, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু "চন্দন কা পালনা"র নায়িকা শোভা তার প্রেমাস্পদ অজিতের সঙ্গে বছর পাঁচ-ছয় বিবাহিত জীবনযাপনের পরে যে-দিন শুনল সে বন্ধ্যা এবং আরও শুনল নির্বংশ হয়ে যাবে জেনেও তার স্বামী অজিত তার মায়ের (শোভার শাশুড়ীর) শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও শোভার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের জন্যে দ্বিতীয়বার বিবাহে অস্বীকার করেছে, সেদিন স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের পথ সহজ ও নিষ্কণ্টক করবার অভিপ্রায়ে সে গোপনে গঙ্গামাইয়ার কোলে আত্মবিসর্জন করতে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তার শ্বশুরবংশের পুরোহিত ও গুরু প্রতিবন্ধকস্বরূপ তার সামনে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, সে আত্মহত্যা করলে তার প্রতি প্রেমাসক্ত তার স্বামীও যদি তার অনুগমন করে কিংবা তার শোকে উন্মাদ হয়ে যায়, তাহলে কি তার সংকল্প সিদ্ধ হবে, তখন সে আত্মহত্যা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে গুরুকেই তার কর্তব্য-পথ বাৎলে দিতে বলে। গুরু-প্রদর্শিত কঠিন পথে চলে সে নিজেকে অতিশীঘ্রই এমনভাবে তার স্বামী, শাশুড়ী ও সমাজের চোখে হেয় ও শালীনতাবর্জিত বলে প্রতিপন্ন করে যে, অজিত তার মায়ের সনির্বন্ধ

রাজেন তরফদার পরিচালিত **আকাশ ছোঁয়া**চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

আমনা চিত্রে বিশ্বজিৎ ও মালা সিন্‌হা।

অনুরোধে আবার বিবাহ করতে সম্মত হওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় দেখতে পায় না। যথাসময়ে যখন নববধূর কোলে পুত্রসন্তান এল, তখন শোভা গোপনে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করল—গঙ্গামাইয়া তার প্রার্থনা পূরণ করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত নবজাত পুত্রসন্তানকে চন্দননির্মিত দোলনায় শোয়াবার জন্যে তাকেই সসম্মানে ডাক দেওয়া হল কেন, তাই নিয়েই ছবির শেষের দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে।

হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে মীনাকুমারী একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। সংবেদনশীল, ভাবাবেশপূর্ণ ভূমিকায় তাঁর সমকক্ষ অভিনেত্রী আর নেই বললেও চলে। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর বয়সে এখন আর রোমাণ্টিক নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। অথচ বর্তমান "চন্দন কা পালনা" চিত্রের প্রথমাংশে তাঁর গৃহীত শোভা চরিত্রটি রোমাণ্টিক নায়িকা ছাড়া আর কিছু নয়। এই অংশে তাঁর অভিনয়ের মধ্যে যৌবনের

স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতার অভাবই লক্ষ্য করেছি। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে, যেখানে শোভা নিজেকে বন্ধ্যা জেনে স্বামীর মনকে তার প্রতি বিরূপ করবার চেষ্টায় নিজেকে আচারে-আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিপন্ন করছে, অথচ গোপনে স্বামীর মঙ্গলের জন্যে শুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করছে, সেখানে মীনা-কুমারীর অভিনয় অনবদ্য। "ম্যয় শরাবী" গানের সঙ্গে তাঁর মত্ততার অভিনয় অবি-স্মরণীয়। নায়ক অজিতরূপে ধর্মেন্দ্র তাঁর সহজ সাবলীল অভিনয় করেছেন। একটি বাঙালী যুবকের (মহেশ মুখুজ্যে) ভূমিকায় বাংলা-হিন্দী সংলাপের সাহায্যে এবং বাংলা-হিন্দী-ইংরেজী গান গেয়ে ও নেচে মেহমুদ ছবির হাল্কা অংশটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন অজিতের ভগ্নীর ভূমিকায় সুদক্ষা তরুণী অভিনেত্রী মমতাজ। শোভার বাবা রায়সাহেব বদ্রীনারায়ণ এবং অজিতের মা রাধার ভূমিকায় যথাক্রমে নাজির হোসেন ও দুর্গা খোটে চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত (পুরোহিত-গুরু), অভি ভট্টাচার্য (ডাঃ এ এন দাস), অসিত সেন (সেবারাম) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ইস্টম্যান কলারে তোলা "চন্দন কা পালনা"র কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে রঙীন বহির্দৃশ্যগুলি নয়নানন্দকর। জন্ম-দিনের উৎসবে ক্ষণে আলো ক্ষণে অন্ধকারের মাঝে নৃত্যগীতাদি অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ছবির গীতরচনা ও সুরযোজনাতেও আকর্ষ-ণীয় বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়।

আরজু ফিল্মস্-এর "চন্দন কা পালনা" হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ।

—নান্দীকর

'আকাশছোঁয়া' চিত্রের শুভমুক্তি

রাজেন তরফদার পরিচালিত চলচ্চিত্রা-য়ণের 'আকাশছোঁয়া' ছবিটি ১৬ই জুন রাধা, পূর্ণ, পূরবী প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। মহাশ্বেতা দেবী রচিত এক সার্কাস পার্টির পরিবেশে এ কাহিনী বিধৃত। প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন দিলীপ মুখার্জি, সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চ্যাটার্জি, চারুপ্রকাশ ঘোষ, হারাধন ব্যানার্জি, ছায়া দেবী, বিনতা রায় ও শিখা ভট্টাচার্য। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'আসরা' চিত্রের শুভারম্ভ

সেভেন আর্টসের 'আসরা' ছবিটি এ সপ্তাহের ১৬ই জুন সোসাইটি, প্রিয়া, বীণা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে শুভ মুক্তিলাভ করছে। প্রতিভা বসুর 'মধ্যরাতের তারা' উপন্যাসের অবলম্বনে এ কাহিনীটি পরিচালনা করেছেন পরিচালক সত্যেন বসু। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, বলরাজ সাহানী ও নিরূপা রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

'সুয়োরাণীর সাধ'-এর শুভমহরৎ

আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'সুয়োরাণীর সাধ' কাহিনীর চিত্ররূপায়ণের জন্য পরি-চালক হীরেন নাগ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে ছবিটির শুভমহরৎ গত ৫ জুন সুসম্পন্ন করেন। এ ছবির প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সুমিতা সান্যাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী ও জহর রায়। ছবিটি প্রযোজনা করছেন বরুণ মিত্র এবং দুলালী চৌধুরী।

'শীলা' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নরেন্দ্র মিত্রের 'শীলা' ছবিটি বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। রাজেন সরকার সুরকৃত এ ছবির মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু ও রবি ঘোষ।

মেঘ ভাঙা রোদ

স্বরচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে পরিচালক অমল দত্ত তাঁর দ্বিতীয় ছবি "মেঘ ভাঙা রোদ"-এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু করছেন। চিত্রায়ণ নিবেদিত এই ছবির কাহিনীকার ও প্রযোজক মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। মুখ্য চরিত্র-গুলিতে রূপদান করছেন অনিল চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, সুমিতা সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, গীতা দে, শিখা ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুখেন দাস, মন্মথ মুখার্জি প্রভৃতি।

'বালুচরী'র চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ

দু'মাস একটানা চিত্রগ্রহণ করে কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের তৃতীয় ছবি আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে 'বালুচরী'র চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ করলেন নবীন খ্যাতিমান পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন রাজেন সরকার। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশক। প্রধান চরিত্রে আছেন ঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অমিল চ্যাটার্জি, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্র-বর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, দীপিকা দাস, অজয় গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী, জহর রায়, রেণুকা রায়, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল'

জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে নতুন নাটকের শুভমুক্তির পূর্বে মাত্র কয়েকটি রজনীর জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী নাটক 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' রঙমহলে রঙমহল-শিল্পিগোষ্ঠী কর্তৃক মঞ্চস্থ হবে। এই পর্যায়ে প্রথম রজনী হয়েছে গেল বৃহস্পতিবার, ১৫ জুন। এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতি ও শনি-বার ৬॥টায় ও রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও সন্ধ্যা ৬॥টায় অভিনয় হবে। নাটকের প্রধান চরিত্রে আছেন ঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রঙমহলের বিভিন্ন শিল্পী। হাজারী ঠাকুর চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী নতুন নাটকের মহড়া চলছে।

'গৌরী মা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণে যাত্রা

গেল ৯ই জুন নিউ ফেজ ইউনিট তাঁদের নির্মীয়মান ছবি অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের 'গৌরী মা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, দেব-প্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, কাশীধাম, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতির পথে কলকাতা ত্যাগ করেছেন। পরিচালক রবি বসু, মুখ্যভূমিকাভিনেত্রী দীপ্তি রায় এবং কুশলী ও কর্মিবৃন্দ এই দলে আছেন। প্রায় দেড়মাসকাল ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ করে ইউনিট কলকাতায় ফিরবেন বলে জানা গেছে।

সুইজারল্যাণ্ডে 'ইভনিং ইন প্যারিস'

সম্প্রতি পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর রঙিন ছবি 'ইভনিং ইন প্যারিস' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করেছেন। এ ছবির নায়ক-নায়িকা শাম্মি কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর এবং কৌতুকশিল্পী রাজেন্দ্রনাথ এই বহির্দৃশ্যে উপস্থিত আছেন। ছবির সুরসৃষ্টিকার হলেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

গুরুদত্ত ফিল্মসের 'শিকার'

গুরুদত্ত ফিল্মসের রঙিন ছবি 'শিকার' পরিচালনা করছেন পরিচালক আত্মারাম। বর্তমানে ছবিটির চিত্রগ্রহণ সুসম্পন্ন হচ্ছে গুরুদত্ত স্টুডিওয়। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, সঞ্জীবকুমার, লতা সিনহা ও মুবুলা। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

'সুহাগ রাত' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

আর, ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও পরিচালিত রঙিন ছবি 'সুহাগ রাত' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সম্প্রতি একটানা শেষ অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ গুরুদত্ত স্টুডিওয় পালিত হল। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন জিতেন্দ্র, রাজশ্রী, প্রকাশ, সুলোচনা, কাবেরী, হেলেন, মধুমতী, শবনম ও মেহমুদ। সুরসৃষ্টি করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

বৈজয়ন্তী-ধর্মেন্দ্র অভিনীত 'প্যার হি প্যার'

আর, এস, প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'প্যার হি প্যার'-র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শুরু হয়েছে মেহেবুব স্টুডিওয়। বাম্পি সোনী পরিচালিত এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বৈজয়ন্তীমালা, ধর্মেন্দ্র, প্রাণ, রাজ মেহরা, হেলেন, সুলচনা এবং মেহমুদ। শঙ্কর-জয়কিষণ এ ছবির সুরকার।

'নরক থেকে ফিরে'

'প্রতিবিম্বে'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ করলেন তাঁদের নতুন নাটক অগ্নিদূত রচিত 'নরক থেকে ফিরে'। শহর সভ্যতার কৃত্রিমতার নেপথ্যে বহু পাপের জন্ম হোচ্ছে প্রতিদিন এবং জীবনের সীমারেখা তার গ্লানিতে ছেয়ে গেছে, এমনি একটা পরিচিত বক্তব্য রয়েছে নাটকটির পটভূমিতে। বক্তব্যের গভীরতা যেমন নাটকটিতে ঠিকভাবে চিহ্নিত হয়নি, প্রকাশভঙ্গীর কোন নতুনত্ব চোখে তেমন পড়েনি। তবে সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পী-বৃন্দের আন্তরিক নিষ্ঠায় কোন অভাব থাকেনি। নির্দেশক প্রকাশকুমার বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। কয়েকটি ভূমিকায় প্রকাশ কুণ্ডু, রবীন পণ্ডিত, অসিত সেনগুপ্ত, কেয়া রায়ের অভিনয় মর্মস্পর্শী। আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত নাটকের রসসৃষ্টিতে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি।

'সাজঘর'

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গভীর বক্তব্যসমৃদ্ধ নাটক 'মরুঝঞ্ঝা' অভিনীত হয়েছে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন সাজঘর নাট্যদলের শিল্পীরা। সমবেত অভিনয়ে প্রাণের স্পর্শ ছিল। বাচ্চা বসু নাটকটির নির্দেশনার ব্যাপারে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। ডাঃ স্বপন, হিগিন, মেজর, ইব্রাম, ইরফান, স্যাচেল ও মীনা চরিত্রে সার্থকভাবে রূপ দেন বাচ্চা বসু, হরিপদ সেনগুপ্ত, দীপক ঘোষ, সন্তোষ চক্রবর্তী, সুদর্শন দাস, বরুণ সরকার, শিখা ভট্টাচার্য।

"কালের বিচার"

বাংলা সাহিত্য আলোচনার আসরে যে সমস্যা, যে প্রশ্ন সমালোচক ও পাঠকের মানসিকতায় আন্দোলন তোলে, তা আজ নাটকের ছোট্ট পরিসরে, মঞ্চের কৃত্রিম আলোয় আরো স্পষ্ট হয়ে রূপলাভ করছে। দর্শক যেন তাতে আরো গভীরে ডুব দিয়ে সেই সমস্যার সুষ্ঠু একটা সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে। সম্প্রতি 'নবদর্শন' নাট্য-গোষ্ঠীর 'কালের বিচার' নাট্যপ্রযোজনা এমনি একটি ইঙ্গিত বহন করে এনেছে নাট্যানুরাগীদের কাছে। নাটকটি রচনা করেছেন বঙ্কিম দাস।

নারী চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে মৌল পার্থক্য এবং আপাতঃদৃষ্টিতে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই 'কালের বিচার' নাটকটি গড়ে উঠেছে। বঙ্কিম ও শরৎ যুগ এই নাটকের প্রেক্ষাপটে রয়েছে, তাই কিছুটা সাহিত্যের ইতিহাসের আস্বাদ নিহিত আছে এই শিল্পসৃষ্টিতে। কিন্তু নাট্যকারের দক্ষতা এখানেই যে কোথাও ইতিহাস এসে নাটকের স্বকীয় গতি এবং সাহিত্যধর্মকে আচ্ছন্ন করেনি। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে এই দুই দিকপালের বক্তব্য যেমন নাটকে স্থান পেয়েছে, তেমনি সাম্প্রতিক

চিড়িয়াখানার সেটে সত্যজিৎ রায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখার প্রয়াসও চিহ্নিত হয়েছে বলে মনে হয়।

নাটকটির প্রযোজনা, উপস্থাপনায় শিল্পীবৃন্দ উন্নতধরনের নাট্যবোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন। দলগত অভিনয়ে কোন শৈথিল্য প্রকাশ পায়নি। দুই সাহিত্যিকের ভূমিকায় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ রায়ের অভিনয় সত্যি অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন তুষার দাস, মণিলাল, মায়া ঘোষ, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপালি ঘোষ, অনিল পাল, প্রহ্লাদ বাউল।

বলাকা

'বলাকা গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি অরুণকান্তি সাহার 'বাড়ি-ভাড়া' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাগরিক জীবনের একটা পরিচিত সমস্যা রয়েছে এই নাটকের পটভূমিতে। নাটকের মধ্যে যে কাহিনী রয়েছে তার গতি স্বচ্ছ, সাবলীল। দিলীপ চৌধুরী নাট্যনির্দেশনার ব্যাপারে সর্বত্র কৃতিত্বের পরিচয় রাখতে পারেন নি, কিন্তু সমগ্র নাটকটির উপস্থাপনার ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠার কোন অভাব থাকেনি। দলগত অভিনয় নাট্যানুরাগীদের সন্তুষ্ট করেছে। অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী নৈপুণ্য দেখান রমেশ রায়, সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস রায়, অলক সিনহা, মৃণাল ভট্টাচার্য, সুপ্রিয় সাহা। সীমা রায়, সুচন্দ্রা রায়ের অভিনয়ও ভালো হয়েছে। আলোকসম্পাত ও আবহ-সংগীত নাটকের গতিকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করেছে।

সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব

'সিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্পীরা গত ২রা জুন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে সলিল সেনের "স্বীকৃতি" নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাট্যপ্রযোজনার কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই চিহ্নিত হয়নি। প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যনির্দেশনা নাটকের গতিকে ঠিক পরিণতির পথে এগিয়ে দিতে পারেনি। কয়েকটি শিল্পীর বাচনভঙ্গী সম্পর্কে তাঁকে আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল। অভিনয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী নৈপুণ্যের নজীর রাখেন মিতা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'মলি' চরিত্রচিত্রণ অপূর্ব। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে মোটামুটি অভিনয় করেন গৌর ঘোষ, অমল বসু, ডি মজুমদার, অজন্তা চৌধুরী, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস চট্টোপাধ্যায়।

মিনিস্টার

'সব্যসাচী' শিল্পীগোষ্ঠী এবার নিয়মিত অভিনয় করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বুলগেরিয়ান নাটক 'গোলেমানভ' অনুসরণে রচিত বাংলা নাটক 'মিনিস্টর' নিয়ে তাঁরা যাত্রা শুরু করবেন। নাটকটি রচনা করেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব দিলীপ মজুমদারের। সব্যসাচীর শিল্পীরা প্রথম অভিনয় করবেন 'থিয়েটার সেণ্টার' মঞ্চে আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

'মুছেও যা মোছেনা'

সম্প্রতি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শিয়ালদহ শাখার কর্মীরা প্রখ্যাত নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চসফল নাটক 'মুছেও যা মোছেনা' পরিবেশন করেছেন। এই নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়ে প্রতি মুহূর্তে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে নির্দেশক নির্মলকুমার ঘোষের ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা স্মরণযোগ্য, নাটকের উপস্থাপনা রীতিতে তাঁর সুষম শিল্পবোধের ছাপ রয়েছে প্রায় সর্বত্রই। বিভিন্ন ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করে নাটককে এক সুষ্ঠু পরিণতির দিকে উত্তীর্ণ করে দিতে যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন তাঁরা হোলেন মলয় রায়, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, মিহির সেন, প্রভাত ভট্টাচার্য, শর্বরীভূষণ মুখোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, দীনেশ দত্ত,

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত **জীবন সংগীত** চিত্রে রীণা ঘোষ ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, পতাকী চট্টোপাধ্যায়, প্রণব সরকার, জ্যোতির্ময় বসু, শাশ্বতী রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই তিমিরে'

কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি হাল্কা নাটক 'সেই তিমিরে' মঞ্চস্থ করে প্রাণবন্ত অভিনয়ের একটা বৈশিষ্ট্য রেখেছেন নাট্যানুরাগীদের সামনে। নির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকতার সঙ্গে পালন করেন অনিল মিত্র। নির্দেশনায় তাঁর যে সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন শচীন বসাক, গোপাল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক সেন, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, অজন্তা চৌধুরী, মালতী চৌধুরী, স্বরাজ বসু, দিলীপ রায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন মিত্র, অশোক দাস, অমল মিত্র, নারান সাহা, ইরা মিত্র, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বসু, শাশ্বতী রায়।

বেঙ্গলী ক্লাব

সম্প্রতি নয়াদিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাব অতনু সর্বাধিকারীর নাটক 'শ্বেতচ্ছায়া' আইফ্যাক্স হলে মঞ্চস্থ করেছেন। একটা জমাট রহস্য নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। রহস্যঘেরা এই নাটকের মঞ্চরূপায়ণ দিল্লীর নাট্যানুরাগীর অজস্র অভিনন্দন পেয়েছে। সংঘবদ্ধ অভিনয় ছিল সুন্দর এবং প্রয়োগ পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্ন শিল্পচেতনার আভাস ফুটে উঠেছে। সুরজিৎ রায়, নির্মল বৈঠ, দিলীপ মজুমদার, সমীর রায়চৌধুরী, অসীম চট্টোপাধ্যায়, দীপক ঘোষ, সুধাংশু চক্রবর্তী, হিমাংশু চক্রবর্তী, নিতাই চট্টোপাধ্যায় সার্থক অভিনয় করেছেন। অজিত দত্তের মঞ্চসজ্জা ও সীতাংশু মুখোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাত নতুনত্বের ইঙ্গিত এনেছে এবং সমগ্র নাট্যাভিনয়কে একটা অপূর্ব ব্যঞ্জনায় সুন্দর করে তুলেছে।

শালবনী সংঘ

উত্তর বাংলার চালসা শালবনী সংঘের শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি স্থানীয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বিকাশ স্মৃতি মন্দিরে 'দুই মহল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভবেশ চৌধুরী। বিভিন্ন চরিত্রে প্রতিভার ছাপ রাখেন ধ্রুব চৌধুরী, নীহার চক্রবর্তী, ভবেশ চৌধুরী, হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধীর রাহা রায়, প্রমথ দেব, শঙ্কর চক্রবর্তী, প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর চক্রবর্তী, পিযূষ মজুমদার, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বারো ঘণ্টা

পোস্টাল অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ইলেকট্রিফিকেশন সারকেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার মহারাষ্ট্র নিবাস মঞ্চে অভিনীত হোল কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' নাটক। মধ্যবিত্ত জীবনের যে করুণ ছবিটি নাটকটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, শিল্পীবৃন্দের অভিনয়ে তা আরো প্রাণবন্তরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে মঞ্চে। অভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য যাঁরা দেখাতে পেরেছেন তাঁরা হোলেন সুকুমার মুখোপাধ্যায়, শচীন মিত্র, সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ ঘোষ দস্তিদার, নির্মলেন্দু মিত্র, মাধব গুহ, সুধাকর সিংহ, মুরারীহারী ঘোষ, মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

সোভিয়েত চলচ্চিত্র সপ্তাহ:

সোভিয়েত সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গেল শুক্রবার, ৯ই জুন থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত সাতদিন ধরে পূর্ণ ও রাধাতে সোভিয়েত চলচ্চিত্র সপ্তাহ উপলক্ষে হাল্কা, গুরুগম্ভীর ও নৃত্যগীতপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের সাতটি কাহিনী-চিত্র ও কতকগুলি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হল। ৯ই জুন সন্ধ্যায় পূর্ণ থিয়েটারে এই বিশেষ চলচ্চিত্র সপ্তাহের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, সোভিয়েত চলচ্চিত্র 'একটি নতুন অর্থ, নতুন মূল্যমান ও নতুন প্রভাব' নিয়ে এসেছে আমাদের মধ্যে। সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা মিঃ এস পি ইভানভ সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী দৃঢ়তর করবে, এই আশা প্রকাশ করে তাঁদের দেশের চলচ্চিত্রের সমাজধর্মী বাস্তবতামূলক গতি-প্রকৃতিকে উপস্থিত সুধিবর্গের সামনে যথাসম্ভব অল্পকথায় উদ্ঘাটিত করেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সোভিয়েত কনসাল-জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীকে মাল্যদান করেন মঞ্জু গুহঠাকুরতা, নন্দিনী মালিয়া, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার বিশিষ্ট চলচ্চিত্রশিল্পীরা।

পূরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান:

পূরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব সাংস্কৃতিক সংস্থাটি কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের নাটক, নৃত্যনাট্য, সংগীত এবং সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন। এই সংস্থার মেয়েরা ও অন্যান্য শিল্পীরা 'তাসের দেশ' ও 'শ্যামা' অভিনয় করে ইতিপূর্বে প্রভূত প্রশংসা অর্জন

করেছেন। সংস্থার কলিকাতাস্থ অনুরাগি-দের আগ্রহে ও আমন্ত্রণে ২৪-এ ও ২৫-এ জুন শনি ও রবিবার ফাইন আর্টস্‌ মঞ্চে যথাক্রমে 'তাসের দেশ' ও 'শ্যামা' অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। সংগীত-পরিচালনায় মাখনলাল হালদার, নৃত্যপরিকল্পনায় বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী এবং ব্যবস্থাপনায় রানী হালদার। সহযোগিতায় আছেন পুরী ও কলকাতার বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পিবৃন্দ। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকরূপে থাকবেন যথাক্রমে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়।

সিনে সেণ্ট্রাল-এর জুন মাসের প্রদর্শনসূচী

সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতা জুন মাসে নিম্নলিখিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন: (১) ১০ই জুন—সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল: অরফী নিগ্রো; (২) ২১এ জুন—অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্‌: ইফ এ থাউজ্যান্ড ক্ল্যারিনেটস্‌; (৩) ২৪এ জুন—সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল: নো লাফিং ম্যাটার এবং (৪) ৩০এ জুন—অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্‌: ফিল্মস্‌ ও পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট নির্মিত কয়েকটি খণ্ডচিত্র।

গ্লোবে 'সাউণ্ড অব মিউজিক'-এর রজত-জয়ন্তী উৎসব:

টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-এর অবিস্মরণীয় চিত্র ৭০ মিলিমিটার, টড এও-তে নির্মিত 'সাউণ্ড অব মিউজিক' গেল ৯ই জুন, শুক্রবার থেকে গ্লোবে একটানা চলে পঁচিশ সপ্তাহে পদার্পণ করেছে। প্রধানত বালক-বালিকা অভিনীত এই সুমধুর ছবিখানি দেখবার জন্যে এখনও যে আশ্চর্যরকম জনসমাগম হচ্ছে, তাতে আশা করা অন্যায় হবে না যে, ছবিখানি গ্লোবে সুবর্ণ-জয়ন্তী সপ্তাহ উৎসব পালনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবে। রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ পালন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট চিত্র-সাংবাদিকদের একটি মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন।

'নৃত্যের তালে তালে' কর্তৃক রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গেল শনিবার ২৭-এ মে রবীন্দ্রসরোবর প্যাভিলিয়ন মঞ্চে দক্ষিণ কলিকাতার সুপরিচিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'নৃত্যের-তালে-তালে' কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহের মধ্যে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অনিমেষ বসু। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সুহৃদ রুদ্র। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুপ্রীতি ঘোষ, কল্যাণ রায়, এস বালচন্দর (বাঁশী), মৃদুলা ঘোষাল, উৎপল দাশগুপ্ত, বটুক নন্দী (গীটার), হরিমোহন মিত্র, (সেতার), সমরজিৎ সিংহ (গীটার), বিপ্লব মণ্ডল (তবলা) এবং অরবিন্দ লাহা (তবলা)। শ্রীমীরা দাশগুপ্তার পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় রাখাল রায়চৌধুরী রচিত 'মহাজীবনের প্রাঙ্গনে' (রবীন্দ্রসংগীতসহযোগে সংগীতালেখ্য) নৃত্যনাট্য 'নৃত্যের-তালে-তালে'-র ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

আই-টি-এর নতুন নাট্যপ্রয়াস:

গোর্কীর মা, ইবসনের গোস্টস্‌, রবীন্দ্রনাথের গোরা, রাজা, বাঁশরী, আধুনিক নাটক যা-নয়-তাই, ললনা প্রভৃতি ১৬টি সফল নাট্যপ্রয়োগের পর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিচালক-অভিনেতা বীরেশ মুখোপাধ্যায় নাট্যকার ভবানীপ্রসাদ ঘোষ রচিত সমাজ-চেতনায় বলিষ্ঠ নতুন নাটক 'কালোচিতা' থিয়েটার সেণ্টারে ৮ই জুন থেকে শুরু করে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নিয়মিতভাবে পরিবেশন করছেন। শ্রেষ্ঠাংশে নির্বেদিতা দাশ এবং আই-টি-এ'র শিল্পিবৃন্দ।

নওরোজ কিশোর কল্যাণ সংসদের নজরুল জয়ন্তী

গত ৪ঠা জুন ২৪ পরগনা জেলার আমতলা-বিষ্ণুপুর ব্লকের অন্তর্গত বোরহানপুর গ্রামে নওরোজ কিশোর কল্যাণ সংসদের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৬৮তম জন্মজয়ন্তী মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সুসাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি শ্রীকৃষ্ণ ধর এবং নজরুল সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুক্তকেন্দ্রের শ্রীরবীন বন্দোপাধ্যায় এবং স্থানীয় শিক্ষক শ্রীকরুণাময় ঘোষ ও স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়। সভায় নজরুল-গীতি পরিবেশন করেন সর্বশ্রী প্রকাশ হাজরা, শীলা ঘোষ, ওয়ালিউর রহমান, অরবিন্দ ঘোষ ও ইলা ঘোষ এবং আবৃত্তি করেন কবি আবদুল মজিদ। এই উপলক্ষে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় এবং একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

উদীচীর বাসবদত্তা

গত ৩রা জুন শনিবার সন্ধ্যায় বেলগাছিয়া জাগ্রত সঙ্ঘের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতা অবলম্বনে বাসবদত্তা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। বাসবদত্তার ভূমিকায় দেববানী মুখোপাধ্যায়ের নৃত্য ও উপগুপ্তের ভূমিকায় ধ্রুব মিত্রের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। সঙ্গীতাংশে তপন সিংহ (উপগুপ্ত), ঋতা ভড় ও জলি ঘোষ (বাসবদত্তা) উল্লেখ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন শৈলেশ ভড়।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মাননায় চা-পান ও সভা:

সোভিয়েত চলচ্চিত্র সপ্তাহ উপলক্ষে কলিকাতায় আগত চারজন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মাননায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়া ক্যালকাটা ইনফর্মেশন সেণ্টারে চা-পান ও সংবর্ধনাসভার আয়োজন করেছেন।
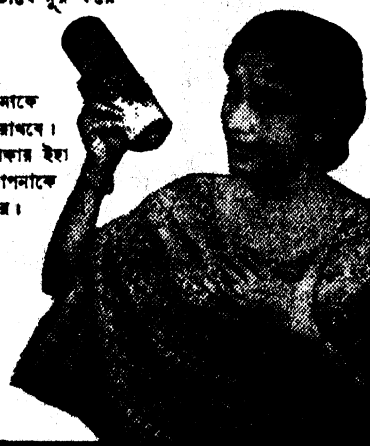
গানের জলসা

ওস্তাদ আলি আকবর ও সুচিত্রা মিত্র সম্বর্ধিত

সপ্তমবার আমেরিকা সফরের প্রাক্কালে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁন গত সপ্তাহে পর পর চার জায়গায় সম্বর্ধিত হন। ৪ঠা জুন আমেরিকান কনসাল মিঃ হিচককের গৃহে, ৫ই জুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্পাইস ৬ই জুন হিজ মাস্টারস ভয়েস কোং (নিউ আলিপুর), ৭ই জুন কানাল স্ট্রীটে শ্রীঅদ্রিজা মুখার্জির গৃহে কলিকাতা সংগীত-সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এখানে কলিকাতা সংগীত-সমাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কে উল্লেখ করা হোচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে নতুনত্ব হোলো এই যে পরের পর দুদিনের অনুষ্ঠানে (৭ই এবং ৮ই জুন) পদ্মভূষণ আলি আকবর খাঁন এবং রবীন্দ্রসংগীতের আসরে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রকে এক অত্যন্ত কাব্যময় পরিবেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। "কলিকাতা সংগীত-সমাজ" ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এঁদের লক্ষ্য মহৎ নামটিও সার্থক। রেডিও এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ছাড়াও বহু শিল্পী ও সংগীতানুরাগী শ্রোতার সমাবেশে এই আসরদ্বয়ের সংগীতিক পরিবেশ শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র বইকি।

ওস্তাদ আলি আকবর বাজালেন দেশ-মল্লার, এবং পরিশেষে পিলুর ওপর নানান রাগের আলোছায়ার সমাবেশে এক চিত্তহরা রচনা। আশ্চর্য এই, যে মানুষটা পরদিনই উড়ে যাবে সুদূর মার্কিনে—এমন শান্ত-সমাহিত চিত্তে কেমন করে আলাপ বিস্তার ও বিভিন্ন লয়ের ছন্দবৈচিত্র্যে একাধারে ধ্যানপ্রশান্তি ও কখনও অরধার চকিত ইশারায় কখনও নানান পর্দাসমন্বয়ের ঝিকিমিকি আলোয়-স্বপ্নের ভাষায় শিল্পী-সত্তার দুর্লভ ঐশ্বর্যকে এমন লক্ষ্যভেদী করে শ্রোতাদের মর্মমূলে পৌঁছে দিতে পারলেন? দেশমল্লারে সকল পর্দা পরিক্রমণ কালে অকস্মাৎ কোমল গান্ধারের আলুগা ছোঁয়া যেন ছায়াঘন স্নিগ্ধতার অপরূপ আবেশে মনকে কোমল করে তুলেছিল।

দেড়ী, সন্ধা ও আড়ির চিত্রবিচিত্র কৌতুকে শংকর ঘোষের সরস সংগত ওস্তাদের মেজাজকে উদ্দীপ্ত করে তুলে-ছিলো। শেষের পিলুতে কখনও, শিব-রঞ্জনী, শ্যামকল্যাণ ভৈরবী, মাঝখাম্বাজ যেন চিরন্তন আনন্দ-বেদনা বিরহ-মিলনের রোমাঞ্চ ও আকুলতাকে শিল্পসুন্দর রূপদান করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শ্রোতার আসনে মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছিলেন স্বয়ং বড়ে গোলাম আলি খান—তাঁর পাশেই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ওস্তাদের এক-একটি [illegible] [illegible] কারিগরী ও কল্পনার

কলিকাতা সংগীত-সমাজ আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও সুচিত্রা মিত্র।
ফটো : অমৃত

রসোচ্ছল সমারোহে গোলাম আলির চোখে যে তারিফের আলো জ্বলে ওঠে বিদ্যুচ্চমকের মত তা জ্ঞানবাবুর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তারপর যুগল গুণীর উচ্ছ্বসিত "বাহবা" সংগতে মেলে অন্যান্য শ্রোতাদের অকুণ্ঠ আবেগ—সমস্ত পরিবেশে নেমে আসে এমন একটা হার্দ্যভাব এমন অনুভবঘন ভাকালুতা যা একান্তভাবে উপলব্ধির বস্তু। এবং এ বস্তু সহজ-লভ্য নয়।

দ্বিতীয় দিন রবীন্দ্রসংগীতের আসরে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের গানের আগেই শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষের সরস সূচনা-[illegible] কম উপভোগ্য হয়নি। তাঁর বক্তব্যের মর্মবাণী হোলো—এই আগ্রহী শ্রোতা-সমাবেশপূর্ণ আসরের পটভূমিকা সামান্য নয়। ডাঃ ত্রিগুণা সেন বলেছিলেন, তাঁর যা কিছু শ্রেষ্ঠকীর্তি বা রচনার অভিজ্ঞতার উৎস হোলো আড্ডা। কোলকাতার এই সমস্ত আড্ডা অনেক বিদগ্ধ রসিকের ঐশ্বর্যভান্ডার, শ্রেষ্ঠগুণীর প্রেরণার উৎস। এই রকম আড্ডার মাধ্যমে কোলকাতার সংস্কৃতি ধারাকে অনাহত রাখবার মহৎ প্রচেষ্টার জন্য শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র প্রসঙ্গে বললেন, শ্রীমতী মিত্র খুব কমদিনের মানুষ নয়। তাঁর পর দুটি জেনারেশন চলে গেছে। কিন্তু আজও সুচিত্রাকে কেউ
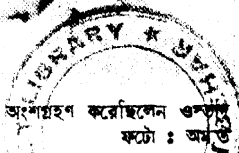
ছাপিয়ে উঠতে পারেননি। কারণ রবীন্দ্র-সংগীতের নিজস্ব ঢং ত আছেই তাছাড়াও শ্রীমতী মিত্রের এক ব্যক্তিগত ঢং বা গায়ন-শৈলী যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। এ বস্তু অনুকরণে হয় না, শিক্ষায় না, জ্ঞানেও নয়—এ হলো শিল্পীর অন্তরের উপলব্ধির সাধনা এবং এইখানেই তিনি অনন্যা। এইরকম আসরে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে পাওয়াটা ভাগ্যের কথা। এ ত কোনো পার্কের মেলায়—চানাচুর খেতে খেতে রবীন্দ্র-সংগীত শোনা নয়—এ শিল্পী ও শ্রোতার হৃদয়বিনিময়ের সভা। এর মূল্য স্বতন্ত্র। অগণিত "সুচিত্রাভক্ত"র (সুকমলকান্তি ঘোষের ভাষায়) সমাবেশে উজ্জ্বল সভা। শ্রীমতী মিত্র গান শুরু করলেন "আসা-যাওয়ার মাঝখানে"—প্রতিটি মীড়ের বাঁকে বাঁকে পুরবীর উদাস বৈরাগ্যের গৈরিক ছায়া মূর্ত হয়ে উঠল শ্রীমতী মিত্রের বলিষ্ঠ কণ্ঠের ভাবঘন পরিবেশনে। অনেক চেনা গানের অতি পরিচিত সুরে তিনি যেমন অচেনা রসসঞ্চার করেছেন আবার বহু অচেনা গানের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাঁর সতৃষ্ণ অনুরাগীবৃন্দের অঞ্জলি ভরে দিয়েছেন। যেমন 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী' 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা' "মোরে বারে বারে কে ডাকে", বিশেষ অনুরোধে গাইলেন "বড় বিস্ময় লাগে" "কৃষ্ণকলি তারেই আমি বলি", শেষ হলো "তবু মনে রেখো"। কবি-গুরু একদা বলেছিলেন কথাকে বাদ দিয়ে বাংলা গান কোনোদিন চিরকুমারব্রত গ্রহণ করবে না। একথার অর্থ নতুন আলোয় জ্বলে উঠল সেদিন সুচিত্রা মিত্রর গান শুনে। কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় ঘটাতে পারেন শিল্পী এবং এইখানেই তিনি স্রষ্টা। কারণ এ ত পড়ে পাওয়া বস্তু নয় এ গড়ে নেওয়া সম্পদ। সেদিন মনে হয়েছিল শিল্পী যেন আত্মহারা হয়ে গেয়ে চলেছেন—এ নিছক সংগীত পরিবেশন নয় আত্ম-উন্মোচনের তীব্র তাগিদ। গানে কখনও মল্লারের সজল স্পর্শ, কখনও দেশীর কোমল করুণতা, কখনও কাফির রঙিন উদ্বেলতা—তাঁর আবেগব্যাকুল গানে কখনও স্বকীয় মাধুর্যে কখনও বহুরসের সংগমে মিলিত এক অপরূপ আবেগের ছবি হয়ে উঠেছিল। এই "সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য" রসোত্তীর্ণ আসর—যেন কবিকেও নতুন করে বোঝাবার অবকাশ দিয়েছে।

পন্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র

পন্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বয়সে নবীন, পরলোকগত প্রখ্যাত তবলাবাদক আনোখেলালের সুযোগ্য ছাত্র তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের দ্বারা পাশ্চাত্যের সকল স্তরের মানুষের মন জয় করে এসেছেন।

ভারতীয় সংগীতের ধারা ও প্রকৃতি পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের সংগীতের চেয়ে স্বতন্ত্র একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কারণ ভারতীয় সংগীত শুধুমাত্র সংগীত নয়—ভারতীয় দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতার

মহাপুরুষ মিশ্র

পরিপূরক ও বাহক। বিভিন্ন রাগরাগিণী ও মূর্ছনার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের সেই সনাতন ধর্মটুকুই প্রকাশিত। তবলা শুধুমাত্র সংগীতের সহায়ক নয়, সুরমূর্ছনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরও যে বিরাট অবদান রয়েছে পন্ডিত মিশ্র পাশ্চাত্য দেশের কাছে তা সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

পন্ডিতজী বলেন, বর্তমানে আমরা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত যেখানে সংগীতের সঠিক মূল্যায়ন অনেকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু একমাত্র এই ভারতীয় সংগীতই মানুষকে নিয়ে যেতে পারে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে—তাকে দিতে পারে অমৃতের সন্ধান, যে অমৃতের সন্ধানে একদিন আর্য মুনিঋষিরা সাধনা করে গেছেন একান্তে নীরবে তপোবনের নিভৃতে। ভারতীয় সংগীতের এই পশ্চাতপটই তাকে যুগে যুগে দিয়েছে বিশ্বের দরবারে সম্মান ও মর্যাদা। তারা অবাকবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে নির্জীব দুটি কাঠের ড্রামের সজীব অনুভূতি ও স্বতস্ফূর্ত আবেদন।

এক প্রশ্নের উত্তরে পন্ডিতজী বলেন—বস্তুবাদী পাশ্চাত্য জগতের বেশীর ভাগই হাল্কা ধরনের গান ও সুরে অভ্যস্ত। 'বস্তু' গানের মাধ্যমে ভগবৎসাধনা ও জীবনদর্শন বোধহয় তাঁদের নিকট অজ্ঞাত। গানকে ও বাজনাকে তাঁরা এককথায় রিক্রিয়েশান-এর একটা প্রধান অঙ্গ বলেই মনে করে। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের মধ্যে যে মানবদর্শন লুক্কায়িত রয়েছে—মানুষের মন ও বিভিন্ন ঋতুর উপর সংগীতের যে বিরাট প্রভাব লুক্কায়িত রয়েছে তার আস্বাদ পেয়ে তাঁরা বিস্মিত, অভিভূত। যদিও এ ধরনের শ্রোতা কম তবুও বিরল নয়।

নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের দশদিনব্যাপী অষ্টম বার্ষিক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা, বালিগঞ্জস্থিত তীর্থপতি ইন্সটিটিউশানে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুরসংখ্যক প্রতিযোগী এ বছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। যে সকল সংগীতবিদ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন চৌধুরী, নিখিল সেন, বিভূতি দত্ত, দ্বিজেন চৌধুরী, সুনীল রায়, হিমময় রায়চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, মায়া সেন, আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎনারায়ণ, নীহারবিন্দু চৌধুরী, প্রহ্লাদ দাস, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলরঞ্জন বসু, কালীপদ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

যে সকল প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের নাম দেওয়া হল ঃ

খেয়াল ঃ শিখা পারুই, ব্রততী সিংহ, দীপ্তি পাল, জয়তী চৌধুরী, সঞ্জয় দাশগুপ্ত। **রাগপ্রধান ঃ** গীতা ঘোষ, ব্রততী সিংহ, ইরা মুখোপাধ্যায়, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, সুমন চট্টোপাধ্যায়। **রবীন্দ্রসংগীত ঃ** সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা গাঙ্গুলী, সাধনা মুখোপাধ্যায়, সুমিতা শীল, দেবব্রত সিংহ, শিপ্রা ঘোষ। **ভজন ঃ** গীতা ঘোষ, রত্না রায়-চৌধুরী, সাধনা মুখোপাধ্যায়, নমিতা চক্রবর্তী, সুমন চট্টোপাধ্যায়। **আধুনিক ঃ** সুনন্দা পাল, সোনালী মিশ্র, ইরা মুখো-পাধ্যায়, আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ দাস। **পল্লীগীতি ঃ** রীতা দাস, শিবানী আচার্য, দেবদ্যুতি দত্ত, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ সাহা। **শ্যামাসংগীত ঃ** গীতা ঘোষ, শীলা সেন, সাধনা মুখোপাধ্যায়, সুমিতা শীল, নারায়ণ শর্মা। **হিমাংশুগীতি ঃ** রত্না রায়-চৌধুরী, ইরা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা চট্টো-পাধ্যায়, সুমন চট্টোপাধ্যায়। **গীটার ঃ** লিপিকা ঘোষ, পাপলু দত্ত, মলয় দাস। **সেতার ঃ** কৃষ্ণা বিশ্বাস, রাধিকা দাস। **কত্থক নৃত্য ঃ** রূপা দাশগুপ্ত, পম্পা মুখোপাধ্যায়, চম্পা মুখোপাধ্যায়। **ভরতনাট্যম ঃ** মিতা চৌধুরী, পম্পা মুখোপাধ্যায়, চম্পা মুখো-পাধ্যায়। **মণিপুরী ঃ** স্বপ্না দাশগুপ্ত, পম্পা মুখোপাধ্যায়। **রবীন্দ্রনৃত্য ঃ** শ্রাবণী হালদার, মঞ্জু নন্দী, স্মৃতিকণা সরকার।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"

গত ৪ঠা জুন ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব ঝাউতলা রোডস্থিত 'সুরেন্দ্র ভবনে' উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তের পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে কয়েকটি নৃত্য ও চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যটি সুন্দর-রূপে পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন নৃত্যে, গীতে ও আবৃত্তিতে—মিতা হোপ, শৈলী দাস, শুভ্রা গাঙ্গুলী, শিপ্রা সেন, মহুয়া ভৌমিক, বনানী চৌধুরী, মীনা ও লীনা মজুমদার, অভিজিৎ, সুবীর, বাপী ও পাপ্পু, দর্শক-বৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে।
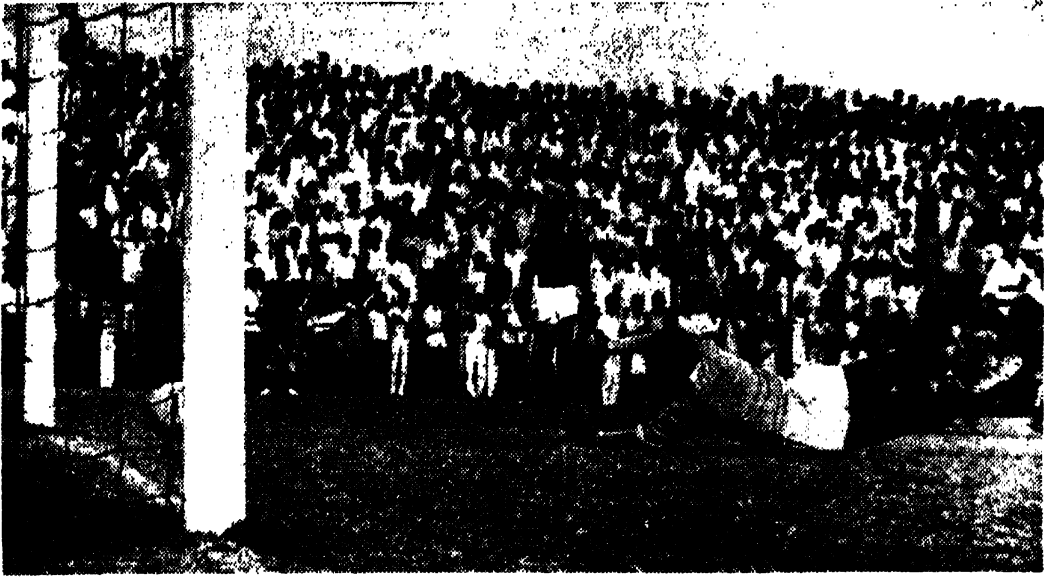
প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের প্রথম গোল। ফটো : অমৃত

দর্শক

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জাকার্তায় আয়োজিত সপ্তম বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার (১৯৬৭) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলা (মালয়েশিয়া বনাম ইন্দোনেশিয়া) বার হাজার দর্শকের বিক্ষোভে শেষ হতে পারেনি। স্টেডিয়ামটি কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। কর্মকর্তারা সেনাদলের সহযোগিতায় দর্শকদের শান্ত করতে না পারায় খেলার আয়োজন পণ্ড হয়। এই অসমাপ্ত খেলা কবে শুরু হবে জানা যায়নি। খেলা বন্ধের সময় মালয়েশিয়া ৪—৩ খেলায় অগ্রগামী ছিল। মালয়েশিয়া দ্বিতীয় দিনের বাকি দুটি খেলার একটিতে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করলে টমাস কাপ জয়ী হত। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার গত ৬ বারের খেলায় মাত্র এই দুটি দেশ টমাস কাপ জয়ী হয়েছে—মালয়েশিয়া উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৪৯, ১৯৫২ ও ১৯৫৫) এবং ইন্দোনেশিয়া উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৫৮, ১৯৬১ ও ১৯৬৪)। দু' বছর অন্তর অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় বছরে এই প্রতিযোগিতার আসর বসে।

১৯৬৭ সালের সপ্তম বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রথম দিনে মালয়েশিয়া ৩—১ খেলায় অগ্রগামী ছিল। উদ্বোধনী (সিঙ্গলস) খেলায় হো ১৫—৯ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে ইন্দোনেশিয়ার অধিনায়ক ফেরী সোনেভিলেকে পরাজিত করলে মালয়েশিয়া ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সিঙ্গলসে ইন্দোনেশিয়ার ১৮ বছরের খেলোয়াড় (এ বছরের প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়) মুডি হার্তোনো ১৫—৬ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে মালয়েশিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান এবং প্রাক্তন অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ান তান আইক হুয়াংকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করলে খেলার ফলাফল সমান (১—১) দাঁড়ায়। পরবর্তী দুটি ডাবলসের খেলায় মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়দের জয়লাভের ফলে মালয়েশিয়া প্রথম দিনে ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনে পাঁচটি খেলা হওয়ার কথা ছিল—তিনটি সিঙ্গলস এবং দুটি ডাবলস। দ্বিতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় ইন্দোনেশিয়া পরাজিত হলে মালয়েশিয়া ৪—১ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া পরবর্তী দুটি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হলে মালয়েশিয়ার পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ৪—৩। এবং দ্বিতীয় দিনের প্রথম ডাবলসের খেলার প্রথম সেটে মালয়েশিয়া ১৫-২ পয়েণ্টে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় সেটে ১০-২ পয়েণ্টে অগ্রগামী হয়। খেলার এই অবস্থায় সারা স্টেডিয়াম জুড়ে ইন্দোনেশিয়ার উগ্রপন্থী সমর্থকদের বিদ্রুপ ধ্বনিতে মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেটের খেলায় ১৫-১৮ পয়েণ্টে পরাজয় বরণ করে। শোচনীয় অবস্থা দেখে রেফারী খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হন।

ইণ্টার-জোন সেমিফাইনাল

আলোচ্য বছরের একদিকের ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে মালয়েশিয়া ৭-২ খেলায় ডেনমার্ককে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন ফাইনালে ওঠে। প্রথম দিনে মালয়েশিয়া এবং ডেনমার্ক উভয় দেশই একটি করে সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেলায় জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনে বাকি তিনটি সিঙ্গলস এবং দুটি ডাবলসের খেলায় মালয়েশিয়া জয়ী হয়। প্রথম দিনের উদ্বোধনী সিঙ্গলস খেলায় ডেনমার্কের এক নম্বর খেলোয়াড় এবং সাতবারের অল্-ইংল্যাণ্ড সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান বিশ্ববিশ্রুত আরল্যাণ্ড কপস মালয়েশিয়ার চেং হোকে পরাজিত করলে ডেনমার্ক ১-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু ডেনমার্কের সেভেন এণ্ডারসন দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় পরাজিত হলে খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। এরপর মালয়েশিয়া এই দিনের প্রথম ডাবলসে জয়ী হয়ে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হলেও ডেনমার্ক দ্বিতীয় ডাবলসে জয়ী হয়ে খেলার ফলাফল সমান (২-২) করে।

অপর দিকের ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে জাপান ৭-২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন ফাইনালে মালয়েশিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

ইণ্টার-জোন ফাইনাল

ইণ্টার-জোন ফাইনালে মালয়েশিয়া ৬—৩ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে গত তিনবারের (১৯৫৮, ১৯৬১ ও ১৯৬৪) বিজয়ী ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজেতা

১৯৪৮-৪৯ : ফাইনালে মালয়েশিয়া ৮—১ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে।

১৯৫১-৫২ : চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মালয়েশিয়া ৭—২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে।

১৯৫৪-৫৫ : চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মালয়েশিয়া ৮—১ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৩ বার টমাস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল বনাম উয়াড়ীর খেলায় উয়াড়ীর গোলের সামনের একটি দৃশ্য।

১৯৫৭-৫৮ : চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়া ৬—৩ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে।

১৯৬০-৬১ : চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়া ৬—৩ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

১৯৬৩-৬৪ : চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়া ৫—৪ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে।

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা

৬১তম আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার (১৯৬৭) তৃতীয় দিনের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ দল (জলন্ধর) ৩-০ গোলে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী দলকে (পেরাম্বুর) পরাজিত করে উপর্যুপরি চারবার (১৯৬৪—৬৭) আগা খাঁ কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৬৪ সালে পাঞ্জাব পুলিশ এবং মোহনবাগান যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিনে ১-১ এবং দ্বিতীয় দিনে ০-০ গোলে ড্র ছিল। সেমিফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ ১-১, ১-১ ও ২-০ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স দলকে (দিল্লী) এবং ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী ২-০ গোলে বি এন আর দলকে (কলকাতা) পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ল্যাঙ্কাশায়ার : ১৯৭ রান (ডি আর উর্সলে ৪০ এবং জি পুলার ৪৮ রান। সুব্রত গুহ ৪৩ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

ও **১৮৬ রান** (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বি উড ৫৩ এবং উর্সলে ৩২ রান। চন্দ্রশেখর ৫১ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ৫৭ রানে ৩ উইকেট)

ভারতীয় দল : ১৮৪ রান (আর এফ সুর্তি ৫৪ রান। স্যাভেজ ৩৭ রানে ৫ এবং স্টাথাম ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ও **১১৯ রান** (৭ উইকেটে। সুর্তি ৩১ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৩৮ রান। স্যাভেজ ৩৮ রানে ৪ উইকেট)

সাউথ পোর্টে আয়োজিত ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম ল্যাঙ্কাশায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের তিন দিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার দল প্রথম ব্যাট করে প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৯৭ রান সংগ্রহ করে। ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৩ রান কম সংগ্রহ করেছিল। ল্যাঙ্কাশায়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে যখন দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন আর ২০০ মিনিটের মত খেলার সময় ছিল এবং খেলায় ভারতীয় দলের জয়লাভের পক্ষে ২০০ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতীয় দল এই সময়ের মধ্যে ৭ উইকেট খুইয়ে ১১৯ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় খেলোয়াড়রা ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

লিডসের হেডিংলে মাঠে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট ম্যাচ আরম্ভের ঠিক আগে এই তিনদিনব্যাপী খেলাটি (ভারতীয় বনাম ল্যাঙ্কাশায়ার) ছিল এবারের সফরের ১০ম খেলা।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ৫—১০) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ১১টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ৯টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ২টি খেলা ড্র।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল আলোচ্য সপ্তাহে তিনটি খেলায় জয়লাভের সূত্রে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে উঠে গেছে—বর্তমানে ৭টি খেলায় তাদের ১৪ পয়েন্ট উঠেছে। আলোচ্য সপ্তাহে তারা বালী প্রতিভাকে ২—০ গোলে, ইস্টার্ন রেলওয়েকে ১—০ গোলে এবং উয়াড়ীকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এরিয়ান্স প্রথম স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমেছে—৯টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট—ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে দুটো ম্যাচ বেশী খেলে ১ পয়েন্ট কম। বি এন আর দল অপ্রত্যাশিতভাবে লীগ তালিকার সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী হাওড়া ইউনিয়নের কাছে ১—২ গোলে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমেছে—তাদের ৮টা খেলায় ১১ পয়েন্ট।

খেলার মাঠে দর্শকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সপ্তাহেও মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগের খেলায় যোগদান থেকে বিরত ছিল। তবে এই দুই দল খেলায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে দুটো হ্যাটট্রিক হয়েছে—বাটা স্পোর্টসের বিপক্ষে খিদিরপুরের সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিপক্ষে এরিয়ান্সের দেবী দত্ত হ্যাটট্রিক করেন। এ মরসুমে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় এই নিয়ে তিনটে হ্যাটট্রিক হল। প্রথম হ্যাটট্রিক করেন ইস্টবেঙ্গল দলের পরিমল দে (হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে)।

গত ৩১শে মে (১৯৬৭) ইণ্ডিয়া হাউসে আয়োজিত ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সম্বর্ধনা সভায় (ছবির বাঁদিক থেকে) ভারতবর্ষের অস্থায়ী হাই-কমিশনার শ্রীডি এন চ্যাটার্জি, শ্রীমতী চ্যাটার্জি, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব।

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই...

কমল ভট্টাচার্য

বছর দশেক আগের কথা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার লিয়ারী কনস্টানটাইন এসেছিলেন ভারতে "পলিটিক্যাল" ট্যুর করতে। নানা অনুষ্ঠানে তিনি ক্রিকেট কর্তৃপক্ষদের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেননি। চা-পানের এক বৈঠকে তিনি ক্রিকেটের দুর্দশার কথা উত্থাপন করেন।

কনস্টানটাইন আলোচনা সুরু করেন নিজেদের কথা দিয়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে। খেলায় আনন্দ পরিবেশনে তারা বদ্ধপরিকর। আক্রমণাত্মক ও চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলতে গিয়ে তাদের অনেক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ খেলাতেও পরাজয় বরণ করতে হয়। কিন্তু এই পরাজয়ে তারা কখনও গ্লানি অনুভব করেননি। পরিশেষে কনস্টানটাইন আরও বলেন যে, দুনিয়ার ক্রিকেট আজ ডুবতে বসেছে। তিনি জোর গলায় বলেন, ইংল্যাণ্ডের হাটন এবং বেইলীর মত খেলোয়াড়দের খেলা বন্ধ না হলে বিশ্বে ক্রিকেট খেলা উঠে যাবে। তিনি হাটন এবং বেইলীর পুঁথিগত ব্যাটিং ও মন্থর গতির খেলার জন্যেই এই আশঙ্কার বাণী উচ্চরণ করেছিলেন। আর তিনি সেই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই পতনোন্মুখী ক্রিকেটকেই পুনর্জীবিত করতে চায়।

অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল সেই আশা ও উদ্দীপনার আশ্বাস। মাত্র কয়েকটা বছর বাদে সেই 'টাই' হওয়া টেস্ট ম্যাচ (১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) ক্রিকেটের ইতিহাসে শুধু স্মরণীয় হয়েই রইল না, সত্যি বলতে কি, এই ব্রিসবেন ম্যাচেই ক্রিকেট আবার পুনর্জীবিত হলো। সবাই উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকলেন ব্রিসবেন টেস্ট আবার ফিরে আসুক। আর সবচেয়ে বেশী মর্যাদা পেলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম অশ্বেতকায় অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল।

কিন্তু সেদিনের সেই বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় কনস্টানটাইনের কথায় আমাদের ভারতীয় ক্রিকেটকে কি সজীব করতে পেরেছিল? বোধহয় না। এমনকি তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন তাদেরও যে কোন চেতনা জেগেছে বলে মনে হয় না। তার প্রমাণ ভারতের বিরুদ্ধে বয়কটের হতাশাব্যঞ্জক খেলা। সেই হাটন-বেইলীর মতই মন্থর ও প্রাণহীন খেলা। ক্রিকেটরসিকরা এই খেলা দেখে যে খুশী হতে পারেননি তার প্রমাণ তাঁদের বিরূপ মন্তব্য এবং অবজ্ঞার মনোভাব।

কিন্তু কোন যাদুতে সেদিনের ফ্রাঙ্ক ওরেল সেই অসাধ্য সাধন করলেন? কি তার রহস্য।

কিছুকাল আগেও জানতাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিম বলতে কিছুই ছিল না। একা একা তাঁরা দুনিয়াজয়ী খেলোয়াড়। অনবদ্য তাঁদের ক্ষমতা। তাঁদের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। কিন্তু দলগত নৈপুণ্যে তারা ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একক প্রতিভায় এঁরা সবাই দিকপাল। কিন্তু কি যে হয়—ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে মরে।

এটা বুঝতে পেরেছিলেন হেডলী, কনস্টানটাইনের মত ধুরন্ধর খেলোয়াড়েরা। আর পেরেছিলেন বলেই তাঁরা দল গড়ার উপযুক্ত কারিগর খুঁজছিলেন। আর এই অন্বেষণে এলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল। পরবর্তীকালে স্যার ওরেল। তিনি যেন খেলোয়াড়দের এক মন্ত্রপূত সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করলেন।

কিন্তু এই সাফল্যের চাবিকাঠি কি? সেটা বলতে একটা কাহিনীর অবতারণা করতে হয়।

"অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স একটি অপূর্ব ক্যাচ ধরলেন। ব্যাটসম্যান ছিলেন গ্রাউট। শেষ জুটিকে বিচ্ছিন্ন করায় আনন্দে সোবার্স নেচে উঠলেন। খেলা শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু আম্পায়ার আউট দিলেন না। ক্যাচটি ধরার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু ছিল। অর্থাৎ বলটি মাটি স্পর্শ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা কানাকানি করেন। ওঁদের আফসোস ম্যাচটি জিততে পারলেন না বলে। ম্যাচ ড্র হল। খেলার শেষে অধিনায়ক ওরেল দলের খেলোয়াড়দের একত্রে ডাকলেন। সমবেত খেলোয়াড়দের সামনে তিনি কথা সুরু করতে পারলেন না। খেলোয়াড়রা বেশ হকচকিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ বাদে তিনি মুখ খুললেন। দূরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফ্ল্যাগটির দিকে দৃষ্টি রেখে শান্ত কণ্ঠে বলেন, "আশাকরি এর মর্যাদা তোমরা নষ্ট করতে চাও না। আমার একটা অনুরোধ আছে। সোবার্সের ক্যাচ ধরা সম্বন্ধে যদি কোন মতবাদ থাকে তাহলেও সে কথা তোমরা মুখ ফুটে উচ্চারণ করো না। তাতে স্বদেশেরই মর্যাদাহানি হবে। আমি ত এর মধ্যে বিশেষ কোন বাহাদুরী দেখি না।" ওরেলের এই মন্তব্যে সোবার্স ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমি যে ভুল করেছি এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" আর ওরেল প্রেস রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আম্পায়ারের বিচারে আমার কোন বলার কিছু নেই।"

ওরেলের দেশপ্রেম, মহত্ব এবং ব্যক্তিত্বের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খেলায় তিনি যে কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না সে সম্বন্ধেও একটা গল্প আছে।

"ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল তখন অস্ট্রেলিয়া সফরে। হঠাৎ কে একজন ওরেলকে বলেন, ওহে শুনেছ, তোমার দল যে গেল। সেখানে একদল লোক বলে রোহন কানহাই বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। অপর দল বলে গারফিল্ড সোবার্স। এখনই সামলাও। নয়তো তোমার দলের সর্বনাশ হবে।

ফ্রাঙ্ক শুনলেন সব। বুঝলেনও সব। কিন্তু চাঞ্চল্য দেখালেন না। তাঁর ধ্যানমৌন চোখ জোড়ায় কোন ভাবাবেগের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। শুধু বললেন, খবরটার জন্যে ধন্যবাদ। দেখি কি করা যায়। সেদিন সন্ধ্যায় দলের লোকদের বিয়ার সেবনে নেমন্তন্ন করলেন 'ফ্রাঙ্ক ওরেল'। সবাই যখন খুশীতে ভরপুর—ওরেল তাঁর দলের খেলোয়াড়দের ডেকে বললেন, ওহে শুনছি, তোমরা নাকি কানহাই এবং সোবার্স এদের মধ্যে কে বড় খেলোয়াড় তাই নিয়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছ? তা বাছা, তোমাদের একটা কথা বলি শোন। ওরা দুজনেই বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান। কিন্তু দেখ, তোমরা যদি এ নিয়ে আর ছেলেমানুষি কর আমি দুজনকেই বাদ দিয়ে আমার টিম করব এবং মনে রেখ তাতে আমার দলের কিছু এসে যাবে না। হাঁ, আমি আবার বলছি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কিছুই এসে যাবে না।

দলের খেলোয়াড়রা ওরেলকে চিনত। তারা জানত ওরেল এই অসম্ভব কাজ করতে পারে। তাই তারা বুদ্ধিমানের মত এই ঝগড়া আর বাড়ায়নি।"

এই একের ওপর দলের স্বীকৃতি লাভ—এটাই ওরেলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে বড় অবদান। এর ফলেই তাঁরা আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল হয়েছে।

তবে এসব সত্ত্বেও ওরেল কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের আসল চরিত্র বিকাশের পথে বাধা দেননি। সেই কনস্টানটাইনের কথা—কপিবুক ক্রিকেট নয়—প্রাণবন্ত উজ্জ্বল ক্রিকেট তারা খেলে গেছে। এমনকি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুদলের মধ্যে ফাস্ট বোলিংয়ের যখন মারাত্মক আক্রমণ চলেছে তখন ওরেলই গিয়ে বিপক্ষের অধিনায়ক রীচি বেনোকে বলেন, এই হিংস্র আচরণ বন্ধ কর। এস আমরা প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলি, যা দেখে দর্শকরা খুশী হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই দুদলের খেলা দেখে দর্শকরা খুবই খুশী হয়েছিলেন। সবচেয়ে খুশী হলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের কর্তৃপক্ষরা। খুশী হয়ে তাঁরা ওরেলের নামে ট্রফি উৎসর্গ করলেন। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজের খেলায় যে জিতবে সেই পাবে এই ওরেল ট্রফি। এ সম্মান শুধু ওরেলের নয়। সাদা দেশের লোকেরা অশ্বেতকায়দের স্বীকার করে নিলেন—এরচেয়ে বড় সম্মান আর কি হ'তে পারে।

ওরেলের টেস্ট খেলা থেকে বিদায় নেওয়ার পর প্রশ্ন হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেতৃত্বের ভার কার ওপর দেওয়া যায়। কর্তৃপক্ষ মহল একরকম স্থির সিদ্ধান্তে এলেন তাঁরা হান্টকে ক্যাপ্টেন করবেন। এখবর শুনেই দূর দেশ থেকে ছুটে এলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল এবং কোন দ্বিধা না করেই অধিনায়ক হিসাবে সোবার্সের নাম প্রস্তাব করলেন। ওরেলের সেদিনের সেই প্রস্তাবকে কর্তৃপক্ষরা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সেদিনে তাঁর এই প্রস্তাবে অনেকেই ব্যাঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু বেশীদিন গেল না, সোবার্সের নেতৃত্বে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

এ তো গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কথা। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের কি হল? এই বিশাল ভারতে যেখানে বাহাত্তর কোটি লোকের বসবাস সেখানে যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? ক্রিকেটে ভারতের এই অবনতির কথা ভেবে আমরা কি করেছি? কর্তৃপক্ষরা এমন কোন ঘটনামূলক পরিকল্পনা দেখাতে পারলেন না যাতে দেশের উন্নতি হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ বলি, বর্তমান ইংল্যাণ্ড সফরে আমাদের দলের বেশীরভাগ খেলোয়াড়ই ইংল্যাণ্ডে নবাগত। সেখানকার আবহাওয়ার কথা ভেবে আমরা অনায়াসে দ্বিতীয় সফরের তালিকাটি নিতে পারতাম। তাতে কিছুটা কাজ হোত। সেদিক দিয়ে পাকিস্থান অনেক হুঁসিয়ার। আমার মনে হয় না কর্তৃপক্ষরা এবিষয়ে কোন চিন্তা করেছিলেন। যদি করেও কাজ না হয়ে থাকে তাহলে এ সফর বাতিল করলে কি ক্ষতি হত? আমার বক্তব্য, ভারত যদি ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধে তালিকাভুক্ত হত তাহলে ইংল্যাণ্ডের বর্তমান দারুণ আবহাওয়াকে কিছুটা এড়াতে পারত।

ক্রিকেটের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি:—

১। উপযুক্ত ক্ষমতা না অর্জন করা পর্যন্ত টেস্ট সিরিজে অংশ গ্রহণ না করা।

২। খেলার উন্নতির জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৩। যোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্বের ভার দেওয়া।

৪। ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। মার্চেন্ট, মুস্তাক, মোদী, অমরনাথ, হাজারে, মানকাদ, সুটে ব্যানার্জি এবং গোলাম আমেদের মত খেলোয়াড়রা যদি একজোট হয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করেন তাহলে ভারতীয় ক্রিকেটের যে উন্নতি হবে না একথা আমি বিশ্বাস করি না।

দুদিন বাদে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে যাবে। তার প্রস্তুতির ভার পড়েছে প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটের হেমু অধিকারীর হাতে। তিনি ক্যাম্প করে, রীতিমত মিলিটারী পদ্ধতিতে ছেলেদের ক্রিকেট খেলার তালিম দিচ্ছেন। এর ফল যে ভাল হবে একথা অবশ্যই বলব। বড়দের ক্ষেত্রে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই তবু আমরা ক্রিকেটের সর্দার।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

প্রণব গাঙ্গুলী
(মোহনবাগান)

'ছোটবেলায় বাড়ী থেকে বার-বার বলা হয়েছে : লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই— কিন্তু খেলাধুলো করে যেই, সে কি করে? এর কোন উত্তর পাই নি।

খেলোয়াড় হব একথা ছোটবেলায় আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। ফুটবল খেলোয়াড় তো নয়ই। কিন্তু ভাগ্যদেবী আমায় মাঠের দিকেই ঠেলে দিলেন। বই হোল গৌণ, বল মুখ্য'— কথাগুলি মোহনবাগানের তরুণ লেফট আউট প্রণব গাঙ্গুলীর। একুশ বছরের টকটকে ফর্সা, লম্বা, জোয়ান ছেলে প্রণব এ মরসুমে কলকাতা ময়দানে ফুটবলঅনুরাগীদের নতুন করে নজর কেড়েছেন। হাফ্ফিল করেকটি খেলার সূত্রে প্রণবের মধ্যে নাকি কেউ-কেউ মাসুদ ফকরীর ছায়া দেখেছেন। আমি অতটা বলব না, তবে এটুকু বলব যে, প্রণব নিজেকে সযত্নে তৈরী করেছেন; বড় হওয়ার ইঙ্গিত তাঁর ভেতরে প্রচুর। এক পায়ের খেলোয়াড় তিনি (ডান পা চলে না): কিন্তু সে পায়ের সট বড় জোরাল, যে কোন গোলরক্ষকের পক্ষে শঙ্কার কারণ। একটু ধীরগতি কিন্তু মাথা সাফ। ভিড়-ভাট্টায় নেই, গোলমালে নেই। যেটুকু খেলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তিকে নির্ভর করে। খেলা প্রণবের কাছে নির্মল অবকাশরঞ্জনের অবলম্বন, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। খেলা নিয়ে কি করে যে মাঠে রক্তগঙ্গা বয়ে যায় প্রণবের তা বুদ্ধির অগম্য।

১৯৪৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী হাওড়ার শিবপুরে প্রণবের জন্ম। কৈশোর কেটেছে শান্তিনিকেতনে। এই শান্তিনিকেতনে পাঠ-ভবনের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়ই বীরভূম জেলা আন্তঃস্কুল ফুটবলের সূত্রেই সর্ব-প্রথম স্বীকৃত ফুটবলের আসরে প্রণবের আবির্ভাব। তারপর ১৯৫৯ সালে শিবপুরে দীনবন্ধু স্কুলের ছাত্র হিসেবে আন্তঃ-স্কুল ফুটবলে হাওড়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। ১৯৬২ সালে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় (মণিপুরে) চ্যাম্পিয়ান বাংলা রাজ্য দলের অন্যতম খেলোয়াড় প্রণব ফাইনালসহ তিনটি খেলায় কম করে ৬টি গোল করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে আজমীঢ়ে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাংলা রাজ্য দলের পক্ষে এবং ১৯৬৬ সালে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত যুব ফুটবলে ভারতীয় দলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং এই বছরই আই এফ এ দলের বর্মা সফরে স্ট্যাণ্ড-বাই ছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় ১৯৬০—৬৩ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র দলে এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত হাওড়া ইউনিয়নে খেলেছেন। ১৯৬৬ সালে সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগে ১৭ খেলায় কম করে গোল করেছেন ১১টি। ১৯৬৬ সালের জাতীয় ফুটবলের আসরে (হায়দরাবাদ) প্রণব ছিলেন বাংলার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।

শুধু ফুটবলেই নয়, ক্রিকেটেও তিনি কৃতী খেলোয়াড়—একজন স্বীকৃত বোলার ও ব্যাটসম্যান। ১৯৬০ সাল থেকে সি এ বি লীগ ও নক-আউট প্রতিযোগিতায় হাওড়া ইউনিয়নের পক্ষে খেলছেন। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান হাওড়া ইউনিয়নের পক্ষে ফাইনালে অর্ধশত রান করেছিলেন। গত বছর সব জড়িয়ে একশো উইকেট পেয়েছেন তিনি। এ বছর নক-আউট
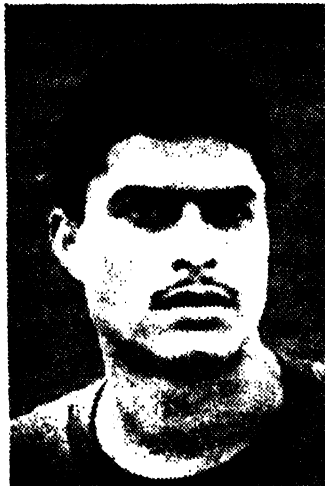
ক্রিকেটে কুমারটুলির বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী এবং হোয়াইট বর্ডারের বিরুদ্ধে তাঁর বোলিং হয়েছিল সবচেয়ে কার্যকরী (৩৯ রানে ৮ উইঃ)। নক-আউটের পরবর্তী পর্বে ভূকৈলাসের বিরুদ্ধে পেয়েছেন ২১ রানে ৬টি উইকেট।

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীর চাকুরে প্রণবের ওপর অনেকেরই অনেক আশা। প্রখ্যাত কোচ বাঘাদা এবং ল্যাংচাদা অনেক আশা রাখেন প্রণবকে ঘিরে। প্রণবও তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণে কৃতসঙ্কল্প।

অসীম বসু
(ইস্টবেঙ্গল)

'প্রত্যেকবারই ওপরের দিকে নাম থাকত ক্লাশ প্রমোসনে। বাবা ('অমরেন্দ্রনাথ বসু) ভেবেছিলেন আমার পড়াশুনো হবে।' একটা

দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে-চাপতে অসীম বসু নিজের ছেলেবেলার কথা বলছিলেন। অসীমের ডাক নাম নরু। নরুকে ঘিরে তাঁর বাবা অমরবাবুর প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু অমরবাবুর হিসেবে ভুল হল; তর্জন-গর্জন ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নরু ফুটবলকেই আঁকড়ে ধরলেন, বইয়ের বাঁধন আলগা হয়ে গেল।

১৯৬০ সালে নরু কলকাতা ময়দানে এসে পৌছলেন লীগ ফুটবলে খেলার জন্য। গায়ে তখন তাঁর ইয়ংবেঙ্গলের জামা। ১৯৬১ সালে শ্রীরমণী সরকার নিয়ে এলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে। পরের বছর বিনা আহ্বানেই গিয়ে উঠলেন পাশের জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবুতে। টেলিগ্রাফ তখন বেশ ভাল টিম। লীগে স্থান ছিল পঞ্চম। সেবার মরসুমের দুটি খেলাতেই মোহনবাগান টেলিগ্রাফের কাছে হেরে গেল, একবার ইস্টবেঙ্গলও। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

১৯৬২ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র হিসেবে বেনারসে আয়োজিত আন্তঃবিশ্ব-বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৬৩ সালে এশীয় যুব ফুটবলে (পেনাং) ভারতের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন নরু। দলের কোচ ইংরেজ রাইট সাহেব। ১৯৬৪-৬৫ সাল কেটেছে এরিয়ানে। এই অব-কাশে তিনি রোভার্স এবং বরদৌলৈ ট্রফিতে (গোহাটি) খেলেছেন। ১৯৬৪ সালে সন্তোষ ট্রফির আসরে বাংলার হয়েও খেলেছেন তিনি। পরের বছর ইস্টবেঙ্গলে। ইস্ট-বেঙ্গলের তখন স্থানীয় ফুটবলে জয়-জয়াকার—লীগ ও শীল্ড বিজয়ী।

ছোটখাট চেহারা অসীমের (নরুর)। কিন্তু খেলার মাঠে নড়াচড়ায় আশ্চর্যজনক সপ্রতিভ। গতি ক্ষিপ্র, ফুটবলের চিন্তাধারা স্বচ্ছ। রাইট উইং-এর খেলোয়াড় নিজে; দরকার হলে ইনসাইডে খেলতে পারেন;

রিসিভিং এবং ড্রিব্লিং চমৎকার, পায়ে জোরাল সটও আছে। দ্রুত আক্রমণ রচনার কালে পরস্পর জায়গা পাল্টে প্রতিদ্বন্দ্বীর রক্ষণ-ভাগকে হিমসিম খাইয়ে দেন নরু।

একাধিক খেলা নরুর জীবনে উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও। ১৯৬২ সালে লীগে দু-দুবারই জর্জ টেলিগ্রাফ মোহনবাগানকে হারাল। ফিরতি পর্বের খেলাটিই সবচেয়ে স্মরণীয়। এক পয়েন্ট পেলেই মোহনবাগান সেবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে ঠিক সেই মুহূর্তে জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে হেরে গেল ২—১ গোলে! সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কর্মী—নরুর জন্ম ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন এই কলকাতারই বৌবাজার অঞ্চলে। পাড়ার ওপর বড্ড মায়া, তাই শত অনুরোধ সত্ত্বেও নরু নিজের পাড়া ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় ক্লাবের ক্যাম্পে যান নি।

চঞ্চল গুহ

(ইস্টার্ণ রেল)

বিনা মেঘে বজ্রপাত। কোচবিহার থেকে খবর এল কলকাতায় ছানাবাবু ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ময়দানে এরিয়ান ক্লাবের পতাকা পতপত করে উড়ছিল এতক্ষণ, সে পতাকা ধীরে-ধীরে অর্ধনমিত হল, শোকের ছায়া পড়ল এরিয়ানের প্রশস্ত অঙ্গনে। এই সেদিন চলে গেলেন সর্বজনপ্রিয় সরোজ বসু, পরের আঘাত এল কোচবিহার থেকে, ছানা-বাবুও চলে গেলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী পর্বে ছানাবাবু উত্তরবঙ্গে তো বটেই, ময়দানেও নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। কোচবিহারের মহারাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন—তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধিত এরিয়ান ক্লাবে খেলেছেন ছানাবাবু। আজকের ময়দানের চঞ্চল গুহ ছানাবাবুরই সুযোগ্য পুত্র। চঞ্চল ইস্টার্ণ রেলওয়ের রক্ষণভাগের শক্ত খুঁটি। মাঝারি চেহারা, পেশীর বাঁধনগুলো শক্ত। প্রচুর দম, জায়গা আগলাতে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভুল হয় কদাচিৎ। দুটি পাই সমান চলে, ওপরের বল সামলাতে মাথা চলে নিখুঁত।

চঞ্চলের জন্ম ১৯৪৪ সালে কোচবিহারে। পড়াশুনা করেছেন কোচবিহার জেঙ্কিংস স্কুলে। প্রতিনিধিত্বমূলক ফুটবলে প্রথম খেলেছেন ১৯৬৫ সালে আন্তঃজেলা স্কুল প্রতিযোগিতায়। পরবর্তী পর্বে চঞ্চল কোচবিহার থেকে চাকরী নিয়ে গেলেন গৌহাটিতে। মহারাণা ক্লাবের ডাক এল সঙ্গে সঙ্গে। খেললেন সেখানে কিছুদিন।

আসামে থাকার সময় ১৯৬২-৬৩ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সুনামের সঙ্গেই খেলেছেন। এই প্রতি-যোগিতার সূত্র ধরেই প্রতিভার স্বীকৃতি পেলেন। আহ্বান এল কলকাতার ইস্টার্ণ রেলওয়ের তরফ থেকে, বাঘাদার আমন্ত্রণ।

চঞ্চলের স্মরণীয় দিন সেটি। প্রদীপ ব্যানার্জির দলে খেলতে পাবেন—এই আনন্দে ও উত্তেজনায় সারারাত ঘুমই এল না। ইস্টার্ণ রেলওয়েতে যোগ দিলেন চঞ্চল। অনতিবিলম্বে এল সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। ১৯৬৫ সালে রুশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় রেলওয়ে একাদশের পক্ষে নির্বাচিত হলেন চঞ্চল; কয়েক দিন পর ঐ রুশ দলের বিরুদ্ধে পাটনায় খেললেন বিহার একাদশের হয়ে। জাতীয় ফুটবলে রেল দলের পক্ষেও মনোনয়ন পেয়েছিলেন সাম্প্রতিক প্রতি-যোগিতার আসরে।

সুধাংশু ঘোষচৌধুরী

(এরিয়ান)

অনেকেই এলেন না ব্লু বিতরণ অনুষ্ঠানে, এলেন যাঁরা তাঁরা নেহাৎই মুষ্টি-মেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু বিতরণ উৎসবে এসে এবার থমকে গিয়ে-ছিলেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি সাঁতার, টেনিস, অ্যাথলেটিকস মিলিয়ে প্রতিনিধির সংখ্যা বিপুল হওয়ার কথা, কিন্তু গুনে-গুনে সর্বসাকুল্যে ডজনখানিকও ডিঙ্গাল না।

সলজ্জ ভঙ্গিতে এক কোণে বসেছিলেন সুধাংশু আর তপন। সুধাংশু ঘোষচৌধুরী আর তপন নাগরায়। জিজ্ঞাসা করলুম : তোমরা এলে যে বড়?' 'আসব না!' উত্তর দিলেন বেঁটেখাট গোলগাল চেহারার সুধাংশু। জীবনে এমন সুযোগ, এমন সৌভাগ্য কদিন

আসে? আজকের দিনটি আমাদের পরম স্মরণীয় দিন।

সুধাংশু এরিয়ানের হাফ-ব্যাক। চোখ-ঝলসান খেলোয়াড় নন সুধাংশু কিন্তু দলের পক্ষে খুবই কাজের। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরোয়ার্ডের পেছনে জোঁকের মত লেগে থেকে তাঁকে পিছু হটাতে সুধাংশু যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বল এবং মানুষ—দুটি জিনিস তাঁর আওতা থেকে কদাচিৎ যেতে দেখেছি। হয় বল থাকবে নয়ত মানুষ।

সুধাংশুর জন্ম ১৯৪২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী চব্বিশ পরগণার লক্ষ্মীকান্ত-পুরে। লেখাপড়া চেতলা বিদ্যামন্দিরে, বিদ্যাসাগর থেকে বি-কম পাশ করে ল' কলেজে। চাকরী করেন ডি এ জি পি টিতে। ফুটবলের হাতেখড়ি শ্রীসমীর বিশ্বাসের কাছে। তৃতীয় ডিভিসন ফুটবল লীগ প্রতিযোগী ভ্রাতৃসঙ্ঘের মাধ্যমে গড়ের মাঠের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, পরিচয় থেকে মাঠের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ল। ১৯৬৬ সালে খেললেন স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে সিনিয়র ডিভিসন লীগে। ১৯৬৭ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে চলে এসেছেন এরিয়ানে।

সুধাংশু কলকাতার মাঠে বাঙালী খেলোয়াড় মহলে এক নতুন প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন তিনি ১৯৬৬ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা কেন্দ্র সগরের আসরে। কলকাতা সেবারের সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ন। পরিবারে সেজ ছেলে সুধাংশু। ফুটবল বাদে হকি, ব্যাডমিন্টন এবং সাঁতারেও বিশেষ উৎসাহী কিন্তু সবচেয়ে বেশী ফুটবলেই।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

সেই তখনকার আমি, আর কয়েক বছর পর যার ছবি বেরিয়েছিলো বম্বাইয়ের সব ক-টা কাগজে, নলিনী ব্রোকারের সঙ্গে বাহুবন্ধ অবস্থায়, নব দম্পতি, সুখী, সহাস্য, সমপদস্থের ঈর্ষাভাজন আর সাধারণের ইচ্ছাপূরণের উপায়—এ-দুজন কি এক মানুষ? জানেন, নলিনীকে নিয়ে আমার প্রথম কর্মস্থলে যখন পৌঁছলুম, অচেনা মধ্যপ্রদেশের ছোটো শহরে, বাংলাদেশ থেকে দূরে, অন্য ভাষার মানুষের মধ্যে, আর তারপর আমার এমন এক জীবন শুরু হ'লো যেখানে আমাকে অন্যেরা প্রায় কখনোই ভুলতে দেয় না যে আমি একজন ঊর্ধ্বতন রাজপুরুষ, ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক—তখন আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে এবারে নিজের সম্পূর্ণ রূপান্তর আমি ঘটাতে পেরেছি। চাকুরে হিশেবে, প্রকাশ্য জীবনে, যা-কিছু ভঙ্গি আমার কাছে প্রত্যাশিত, সেগুলি এমন নিখুঁতভাবে আয়ত্ত ক'রে নিলুম যে কয়েক বছরের মধ্যেই 'ব্রিলিয়েন্ট অফিসার' ব'লে আমার খ্যাতি ছড়ালো প্রাদেশিক গবর্নর থেকে নয়াদিল্লির দপ্তর পর্যন্ত। আমি মনে-মনে হাসলাম নিজের এই সাফল্যে, আমার কৌতূহল হ'লো অন্য দিক থেকে নিজেকে যাচাই করতে, আমি আমার অতীত থেকে কত দূরে স'রে আসতে পারি, তা নিয়ে একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হ'লো। পরীক্ষা—মানে এক্সপেরিমেন্ট। তার ল্যাবরেটরি আমার মন, যন্ত্রপাতি আমার বুদ্ধি, আর গিনি-পিগ আমার স্ত্রী।

সম্ভব কি ছিলো না আমার পক্ষে নেলিকে ভালোবাসা? নিশ্চয়ই ছিলো। মন করলে কী না পাওয়া যায়—আর এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়, শুধু নেলির রূপ-যৌবনকে সেটুকু সুযোগ দেয়া যাতে শরীরের মন্থন থেকেই উঠে আসতে পারে সেই সুঘ্রাণ নবনী, চলতি কথায় যাকে 'স্নেহ' ব'লে থাকে। স্নেহ—মমত্ববোধ—যার বেশি অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীর ভাগ্যে আখেরে জোটে না কখনো—সেটুকু জন্মাবার বাধা ছিলো কী? আমাদের হৃদয় তো ম'রে যায় না সত্যি, শুধু ঘুমিয়ে পড়ে মাঝে-মাঝে, কখনো কোনো আঘাতে জেগে ওঠে আবার—কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাকে জাগাতে পারে না, যদি না আমরা নিজেরা ইচ্ছুক হই, সহযোগী হই, এগিয়ে আসি। নেলিকে ভালোবাসতে আমি ইচ্ছুক ছিলুম না, প্রতিরোধী ছিলুম—এই আসল কি মোদ্দা কথাটা। এমন একটা উপায় আছে যাতে কামনার বিহ্বল মুহূর্তেও হিম হাওয়া বইয়ে দেয়া যায়—তা হ'লো নিজেকে দু-অংশে ভাগ ক'রে নেয়া, সেই দুই উপনিষদের পাখির মতো। তা-ই করেছিলুম আমি; যখন আমি নেলির আলিঙ্গনে গ'লে যাচ্ছি ঠিক তখনই, আর-একজন আমি পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে দু-জনকে, বাঁকা ঠোঁটে মিটিমিটি হেসে, হয়তো দেড়-ইঞ্চি ছাই-সমেত একটা মোটা চুরুট মুখে নিয়ে—দেখছে এক মজার ডনকুস্তি, সার্কাসের খেলা, হাঁপানি, গোঙানি, মুমূর্ষুর মতো নাভিশ্বাস—কিন্তু বড্ড পুরোনো, গতানুগতিক, ক্লান্তিকর। পরে আমি যখন স্ত্রীলোক নিয়ে খেলা শুরু করলুম তখনও ঠিক এই ব্যাপার। ছেনে, ছিঁড়ে, খুঁড়ে, মেঝেতে গড়িয়ে, দু-পাশে দুই মেদ-মাংস ঢাকা কঙ্কালকে নিয়ে রাত কাটিয়ে—আমার উদ্ভাবিত নানারকম উৎকট ব্যায়াম থেকে যেটুকু সুখ আমি নিংড়ে নিতে পেরেছি তা হ'লো নিজেকে লক্ষ করার, ধাপে-ধাপে নিজের উন্নতির দৃশ্য দেখার বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তৃপ্তি। উন্নতি বইকি—আমি ঘৃণা লজ্জা ভয় কাটিয়ে উঠছি, মজে আমি ঠিক তা-ই নিয়ে আমার রুচির পক্ষে য বীভৎস, আমার মধ্যে মহাপুরুষের সম্ভাবন আছে—অন্তত আরো অনেক কিছু সম্ভব হ'তে পারে আমাকে দিয়ে। কিন্তু না—তুমি একটু বেশি জাঁক করছো, রণজিৎ—এই খেলার রসদ জোগাতে এখনো বিস্তর বেগ পেতে হয় তোমাকে, তুমি এখনো সাংসারিক সুবুদ্ধি হারাওনি, কটাক্ষপাত করো ন কোনো কমিশনারের পত্নী কিংবা কর্নেলের বান্ধবীর দিকে, কোনো রাজাবাহাদুরের হীরেয়-মোড়া রক্ষিতাকেও এমনতর আনত শির অভিবাদন জানাও যেন তিনি কোনো মহীয়সী মহিলা—এক কথায়, যাদের সঙ্গে তোমার সামাজিক মেলামেশা নির্ধারিত—ক্লাব, রেসকোর্স, বল্-নাচের আসর, গবর্নরের

পার্টি, এই সব নির্দিষ্ট জায়গায় যাঁরা কিছুক্ষণের জন্য হৃদ্যতার চর্চা ক'রে থাকেন—তাঁদের সঙ্গে একেবারে নিয়মমাফিক মাজা-ঘষা ব্যবহার ক'রে তুমি নেলির সাজানো বাড়ির মতোই নিষ্কলঙ্ক রেখেছো বাইরের জগতে তোমার সুনাম। —এমনি, নিজেকে আমি গঞ্জনা দিই মাঝে-মাঝে, শাসন করি, উস্কে দিই, যখন কোনো ছুতো ক'রে আমি নেলিকে পাঠিয়ে দিই তার মা-র কাছে, আর আমার অনুগত অর্থগৃধ্নু ভৃত্যেরা সন্ধের পরে এনে হাজির করে কোনো গাঁয়ের বধূ, বন্য যুবতী, কোনো হাভাতের কুমারী মেয়ে, বা হয়তো কোনো ধিকিধিকি-জ্বলা মধ্যবয়সী বিধবা। ভাববেন না কোনো ক্ষতি করেছি কারো, আপনাকে তো বলেছি এটা বিশুদ্ধ লেনদেনের ব্যাপার, কোনো কুমারী কান্নাকাটি করলে আমি ছেড়েও দিয়েছি (তাও খালি হাতে নয়)—যদি কোনো অন্যায় ক'রে থাকি তা করেছি শুধু নিজেরই উপর। তবু—আমার কৌতূহল, আমার আত্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা আমাকে থামতে দেয়নি; আস্তে-আস্তে আমি নিজেই পথঘাট চিনে নিলুম, বুঝে নিলুম আমার গবেষণায় উপাদানগুলো এমন-কিছু বিরল পদার্থ নয়; যে-কোনো শহরে ছুটি কাটাতে যাই—দেশের মধ্যে, বা য়োরোপে—সেখানেই দেখি লীলাসঙ্গিনীরা অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য—কেউ দশ টাকা পেলেই খুশি, কারো খাঁকতি পঞ্চাশ পাউন্ড, এই যা তফাৎ। বিনামূল্যে, শুধু খানিকটা ফুর্তির জন্য যারা রাজি, তাদের আমি সভয়ে এড়িয়ে চলেছি, পাছে পরে অন্য ধরনের ঋণশোধের দাবি তুলে আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়। আমি হ'য়ে উঠেছিলুম ততটাই চতুর যতটা নেলি ছিলো সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ; তাই এটা সম্ভব হ'লো যে সে কিছুই টের পায়নি, যদিও দেশভ্রমণের সময় আমার সঙ্গেই থাকতো সে।

একেবারে টের পায়নি? সন্দেহ করেনি কিছু? তা কি সম্ভব? কিন্তু আমার উপর আস্থা হারালে সে বাঁচবে কী নিয়ে? তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিলো তার বিয়ে; ভেবেছিলো সেটাই বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে গিয়ে পল্লবিত হ'য়ে, তাকে আশ্রয় দেবে বাকি জীবনের মতো, তা-ই সে দেখেছে তার মায়ের জীবনে, তার বয়সী অনেক মেয়ের জীবনেও—হঠাৎ তার বেলায় যে একটা ব্যতিক্রম ঘটতে পারে তা যেন তার ধারণার বাইরে। তাই সে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখে সন্দেহ, অনবরত নিজেকে বোঝায় যে সব ঠিক আছে, আঁকড়ে থাকে তার বালিকাবয়সের 'সুখে'র ধারণাকে, একই অমূলে তরুতে জল ঢালে প্রতিদিন। আমি এদিকে নিজের কাছে দোষী হ'য়ে আছি এখন পর্যন্ত গোপনতার দুর্বলতাটুকু কাটাতে পারিনি ব'লে—যদি নেলির কাছেই লুকিয়ে রইলুম তাহ'লে আমার এক্সপেরি-মেন্টের চরম ফলাফল তো জানা যাবে না, যে-আত্মজ্ঞান আমি এতদিন ধ'রে অর্জন করেছি তার অংশ আমার সহধর্মিণীকে দিতেই হবে, আমার কৃতিত্বের নির্ভুল প্রমাণ শুধু তারই কাছে আমি পেতে পারি। তাই, সে যখন তার সুখের স্বপ্নকে একটা মূর্ত রূপ দেবার জন্য তৈরি করলে উটকামণ্ডে এই বাড়ি, এই বিখ্যাত বাগান, তার সাধের 'আনন্দ', 'বনু-আর'—আমি তখনই স্থির করলাম যে এই আমার সুযোগ, আর বেশি দেরি করা চলবে না।

আমার প্রথম কাজ হ'লো হতচ্ছাড়া চাকরি থেকে কেটে পড়া। অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো; ইংরেজের গৌরব-রবি অস্ত যাবার পর খদ্দরধারী মন্ত্রীদের তাঁবেদারি বেশিদিন আমার ধাতে সইলো না। টিকে গেলে হয়তো স্বাধীন ভারতে ক্ষুদ্র একটি জ্যোতিষ্ক হ'তে পারতুম—কিন্তু না মশাই, পলিটিক্স আমার ঘেন্না, ওর কেউটের ছোবল একবার প্রায় খেয়ে-ছিলুম তো। নেলিরও ও-সব বাজে ভড়ং নেই; কংগ্রেসি মহলে তার বাবার অগাধ প্রতি-পত্তি তার যে কোনো কাজে লাগতে পারে, সে যে চাইলে হ'তে পারে লোকসভার সদস্য বা উপমন্ত্রী এ-সব তার মগজেই খেলে না; স্ত্রী, মা, গৃহিণীর ছাঁচেই ঈশ্বর তাকে গড়েছেন। আমি অকালে রিটায়ার করাতে খুশি হ'লো সে; ভাবলে এবার দ্বিতীয় যৌবনে দ্বিতীয় হানিমুন শুরু হবে। সেজন্যে যা-কিছু দরকার সবই আছে আমাদের: স্বাস্থ্য, অর্থ, অবসর, আর এই নতুন রমণীয় পরিবেশ। ছেলেরা একবার উড়ে এসে মাসখানেক কাটিয়ে গেলো আমাদের সঙ্গে, খুব তারিফ করলে বাড়ি দেখে; তারা বিলেতে ফিরে যাবার পর তাদের প্রতিটি মন্তব্য (যার অধিকাংশ আমি স্বকর্ণে শুনেছিলাম) আমাকে আরো অনেক-বার নেলির মুখে শুনতে হ'লো। যৌবন-প্রাপ্ত ছেলেদের দেখে সে মুগ্ধ; কবে তারা দেশে ফিরবে, বিয়ে করবে, নাতি-নাৎনি উপহার দেবে আমাদের, এই নতুন স্বপ্নে রঙিন হ'য়ে উঠলো তার দিনগুলি। যে-পুত্রবধূরা এখনো অনিশ্চিত, যে-পৌত্র-পৌত্রীরা এখনো শুধু দুর্নিরীক্ষ্য জীবাণু ছাড়া কিছু নয়, তাদের কল্পনাতেই নেলি দেখলাম উচ্ছল—এমনি অসাধা-রণ তার স্নেহবৃত্তি। তা হোক, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার এই স্বপ্নের অংশ আমাকেও দিতে চায় সে, যেন ওটা এমন কোনো অভিনব সুখাদ্য যা থেকে আমি বঞ্চিত হ'লে তার নিজের ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। সব মিলিয়ে এমনি তার ভাবভঙ্গি যেন হঠাৎ কোনো মলয়সমীরণ ব'য়ে যাচ্ছে, আমার পুরোনো চোখেও মাঝে-মাঝে নেলিকে সুন্দর মনে হয়, বাগানের গোলাপগুলো যেন মোহ ছড়িয়ে দেয়. এমনকি বহুকাল পরে নেলির সঙ্গে কয়েকটা প্রণয়রজনীও যাপন করলুম। কিন্তু তারপরেই ভয় হ'লো পাছে শেষ মুহূর্তে সত্যি হেরে যাই, পাছে, এই অফুরন্ত অবসরের সুযোগে নেলি আমার অনেক দিনের অনেক কষ্টের সাধনাকে বানচাল ক'রে দেয়। পেরেকের মাথায় হাতুড়ি ঠুকে দিলাম এবার, বাড়িতে মেয়েমানুষ আনা শুরু হ'লো। নেলির চোখের উপর, নাকের তলা দিয়ে।

আমি অবশ্য এমন ব্যবস্থা করেছিলুম যাতে হঠাৎ একটা ভাঙচুর না হয়, ব্যাপারটাকে রসিয়ে-রসিয়ে অনেকদিন ধ'রে উপভোগ করতে পারি। প্রথমে জ্বলন্ত কয়লা, তারপর স্নিগ্ধ মলম। পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাওয়া, 'তুমি দেবী, আমি নরকের কীট,' দু-চার ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত। নেলি জানে—এতদিনে জেনেছে—আমার সত্যিকার চেহারাটা কী, তবু আমার মুখের কথা চোখের জল একেবারে উড়িয়ে দেবে এমনও তার মনে জোর নেই। মাঝে-মাঝে বিরাম দিই—যাতে নেলি একেবারে আশা ছেড়ে না দেয় আমার বিষয়ে, যাতে আবার একদিন আধো-ঘুমে-শোনা মেয়েলি গলায় বেলেল্লা হাসি ছোরা হ'য়ে বিঁধতে পারে তাকে। তারপর আবার ক্ষমা চাওয়া, মূর্ছিতের মুখে বারিসিঞ্চন। এমনি চালাতে লাগলুম আমার চমৎকার টেকনীক—পর-পর ব্যভিচার আর ন্যাকামি। অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন শ্রীমতী নলিনী কী ক'রে সহ্য করেছিলো, বিদ্রোহ করেনি, চ'লে যায়নি, আইনের শরণ নিয়ে কঠিন কোনো শাস্তি দেয়নি আমাকে? সে, রতনদাসের কন্যা, কিসের অভাব তার, কার তোয়াক্কা রাখে সে, আমাকে পথের ভিখিরি ক'রে ছেড়ে দেয়াও তার সাধ্যে কুলোতো না তা নয়। কিন্তু কেন কিছু করেনি, এ-বাড়ি ছেড়ে চ'লে যায়নি পর্যন্ত, তার কারণটা তো সোজা। না—সে পারবে না, কিছুতেই জানাতে পারবে না জগৎকে, তার নিকটতম মা-বাবাকেও না, যে তার সুখের প্রাসাদ চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেছে, কোনদিন গ'ড়েই ওঠেনি, যে তার সমস্ত জীবন এক-মুঠো ধুলোর বেশি কিছু নয়, আর সে নিতান্ত অবোধ ব'লেই এতদিন তা বোঝেনি। এই পরাজয়—যা আমি তাকে অবশেষে মেনে নিতে বাধ্য করলুম—তা অন্যের কাছে উদ্-ঘাটন করতে পারলে না সে; সেই অপমান এড়াবার জন্য মৃত্যু বেছে নিলে। না—আত্মহত্যা নয়, বরং আত্মরক্ষা, জীবের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা, যা শরীরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোলে কোনো রোগ, মনের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। নিঃশব্দ হ'য়ে গেলো, নিঃসাড় হ'য়ে গেলো, যেন আস্তে-আস্তে ফুরিয়ে এলো মোমবাতির মতো—ডাক্তারি ভাষায় তার নাম হ'লো মারাত্মক অ্যানেমিয়া। আমি তার চিকিৎসা নিয়ে হুলুস্থুল করেছিলুম, আনিয়েছিলুম বম্বাই আর কলকাতা থেকে বিশারদ—কিন্তু তার শরীর কোনো সহ-যোগিতা করলে না চিকিৎসার সঙ্গে, নেলি তার বিদ্রোহ ঘোষণা করলো কোনো কথায় নয়, কাজে নয়—তার রক্তে অফুরন্তভাবে বেড়ে-চলা শ্বেতকণিকায়, বিকল হৃৎ-পিণ্ডে, যকৃতের অক্ষমতায়। জানেন, এক রাত্রে—আমি যখন অসহ্য সময় কাটাবার জন্য কালো গোলাপের গবেষণা করছি, অনেক রাত্রে হল্যান্ড থেকে আনানো বই পড়ছি এই ঘরে ব'সে—সে এসেছিলো আমার কাছে। বই থেকে চোখ তুলে হঠাৎ দেখলাম তাকে। গায়ের রং একেবারে বদলে গেছে—কালো, ছাইয়ের মতো, গালে ঠোঁটে কোথাও এক ফোঁটা লাল নেই। 'আমাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?' পরিষ্কার বাংলায় বললে কথাটা, খুব নরম

গলার, একটু টেনে-টেনে। তিনবার, চারবার তাকে দেখলাম; সে আসে, দাঁড়ায় আমার কাছে এসে, আমার চোখে চোখ রেখে ঐ একটি কথা বলে মিলিয়ে যায়। অগত্যা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম একজন হাউস-কীপারের জন্য; গায়ত্রীকে খুঁজে পাওয়া গেলো।

আজ্ঞে? আমি হত্যাকারী? আগে-ভাগেই রায় দেবেন না মশাই, পুরো মামলাটা শোনেননি এখনো। আসুন কিছু-ক্ষণের জন্য ঢাকায় ফিরে যাই। আপনার আমার যৌবনের দিনে। আপনি কি যুবক আছেন এখনো?...আজ্ঞে? ঐ তো ভুল করছেন, বয়স দিয়ে বার্ধক্যের হিশেব হয় না। আমার বার্ধক্য শুরু হয়েছিলো পঁচিশ বছরে—বহুদিন ধ'রে একই রকম বুড়ো আছি, দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আমি জানি আমার পঁচিশে আর পঁচানব্বুইতে কোনো তফাৎ নেই। তবু—আমিও একবার যৌবন পেয়েছিলাম—কয়েক বছর, কয়েক মাস, অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য। সেই বকুল-ভিলার দুপুরবেলাগুলো! মাস আশ্বিন, আকাশ মিনিটে-মিনিটে বদলে যাচ্ছে। কালো মেঘ, রূপোলি মেঘ, ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি একই সঙ্গে বৃষ্টি আর রোদ, কখনো এমন আশ্চর্য নীল যেন ওপিঠে সত্যি স্বর্গ আছে, কখনো আবার বিকেলের দিকে ঝোড়ো। আর, যেন ঐ দূর, প্রকাণ্ড আকাশেরই একটি ঘনিষ্ঠতর রূপের মতো, মিতু। তার আস্তে-আস্তে, টেনে-টেনে কথা বলার ধরন। তার কোমল সলজ্জ ভাব, নিজের কিছুটা অংশ গুটিয়ে রাখার, লুকিয়ে রাখার ভঙ্গি; তার ঈষৎ দূরত্ব, তার চোখ, কালো, ধূসর, বাদামি, নীল, কিন্তু ঝোড়ো নয় কখনো—শান্ত, ভরপুর। কী-কথা বলতাম? মনে নেই কী-কথা, কেমন ক'রে কেটে যেতো ঘন্টাগুলো তাও মনে নেই। সন্ধেবেলা আছে তার গানের রেওয়াজ, লোকজনের আনাগোনা—আমি তাই দুপুরবেলাটা বেছে নিয়েছি; সোজা কলেজ থেকে দেড়টা নাগাদ পাড়ি দিই ওয়াড়িতে, যখন বেরিয়ে আসি পশ্চিমের সূর্য বকুল-ভিলার লম্বা ছায়া ফেলেছে সামনের কম্পাউন্ডে। যে-প্রশ্নটা আমাকে দোলা দিয়েছিলো কয়েকদিন আগে, তার উত্তর আমার হৃদয়ের শব্দে বেজে উঠলো, কোনো প্রথম অন্তঃসত্ত্বার মতোই আমি অনুভব করলাম আমারই মধ্যে নতুন এক জন্মের সূচনা—শুধু ইচ্ছা নয়, কল্পনা নয়—বাস্তব, নির্ভুল, বাড়ন্ত—তারই নাম প্রেম।
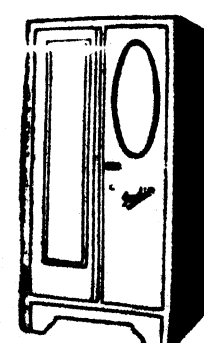
কিন্তু আমাদের জীবনে বিশুদ্ধ কিছু নেই—সবই মিশোল, যাকে আমরা মহৎ ব্যক্তি বলি তারও মধ্যে কিছু-না-কিছু ভেজাল থাকেই। এক অদম্য আবেগ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় মিতুর কাছে—কলেজের ক্লাশ শেষ হওয়ামাত্র; কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে যখন বেরিয়ে আসি তখন আর আমি ভাবে বিভোর প্রেমিক থাকি না, আমি টের পাই নিজের মধ্যে কোথায় একটু ক্ষীণ বিরক্তিবোধ—অস্বস্তি, অতৃপ্তি। প্রকৃতি, আমার অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রে, আমার মধ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে; একটি তরুণী, যে বুলবুলের মতো অত্যন্ত বেশি খোলা-মেলা হ'য়ে তার নারীত্বকে বরবাদ ক'রে দেয়নি, বরং সেটাকে কিছুটা আড়ালে রেখে আরো প্রস্ফুট ক'রে তুলেছে—তেমনি একটি তরুণীর সঙ্গলাভের ফলে আমার রক্তে ফণা তুলছে কামনা—মাঝে-মাঝে এমনকি একটু অসহিষ্ণুভাবে। এটা নিজের কাছে স্বীকার করতে আমি লজ্জা পাই, চেষ্টা করি ভুলে থাকতে—ভুলে থাকা কঠিনও হয় না, কেননা সেই একই সময়ে একই কারণে, অন্য একটা ঘটনাও ঘটছিলো, যাকে হয়তো বলা যায় আমার সত্তার সম্প্রসারণ। আমি যেন খুলে যাচ্ছি, ছড়িয়ে যাচ্ছি চারদিকে, হ'য়ে উঠছি নিজের চাইতে অনেক বড়ো, অনেক ভালো, ক্ষমতাশালী, যেন পৃথিবীতে সকলেই আমার বন্ধু। আমি বুলবুলকে আর অপছন্দ করি না, কেননা, আমার কাছে নারী হিশেবে তার অস্তিত্ব আর নেই, নারীত্বের সব লক্ষণ সব সুঘ্রাণ আমার জন্য গুচ্ছ ক'রে ধ'রে রেখেছে অন্য একজন। বুলবুল আমাকে যা-কিছু বলেছিলো সব আমি ক'রে দিয়েছি—তাদের মেলার জন্য ঐতিহাসিক চার্ট, 'মুক্তধারা'র জন্য গোরা-চরিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ, নৃত্যনাট্যের জন্য স্বদেশী গানও বেছে দিয়েছি—আর এগুলো ক'রে উঠতে কোনো কষ্টও হয়নি আমার, বিরক্ত লাগেনি—এখন সবই যেন সহজ হ'য়ে গেছে আমার কাছে। অমূল্যকেও আর অসহ্য লাগে না আমার—বকুল-ভিলায় সব সময় যাওয়া-আসা করে সে, যাকে বলে 'বাড়ির ছেলের মতো'; মিতুর মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশায় ডাকে, দরকারমতো ফরমাশ খাটে তাঁদের, মিতুর ওস্তাদজীকে কোনো খবর পাঠাবার দরকার হ'লে সাইকেল নিয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যায়, মিতুকে কিনে এনে দেয় সদরঘাট থেকে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'নবশক্তি'। আমি, আমার প্রেমে-পড়া নতুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে, অমূল্যর বোকামি আর বদ রসিকতাগুলোকে ক্ষমা করতে পারি এখন, একটু করুণাও করি তাকে—যেহেতু মিতুর শুধু একটুখানি আশে-পাশে থাকার জন্য তাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে, এত বিভিন্নভাবে কাজে লাগতে হচ্ছে এই পরিবারের। আমি এমনকি ইতিমধ্যে আর্থার জোন্সের কানেও অমূল্যর কথাটা তুলেছি—আমার এক বন্ধুকে কোনোরকম একটা সুপারিশ দিতে সে পারে কিনা—সে-কথা বলতে পারার মতো বন্ধুত্ব জোন্সের সঙ্গে আমার হয়েছে ততদিনে। সপ্তাহে একদিন বা দু-দিন বিকেলবেলাটা আমি জোন্সের সঙ্গে কাটাই; আমার জিভ থেকে কিছুতেই কেন 'th'-এর ঠিক উচ্চারণ বেরোয় না, আর কেনই বা 'ট' আর 'ঠ'-এর তফাৎ বোঝা তার পক্ষে সীমা-হীনভাবে অসম্ভব—এই ধরনের কয়েকটা মৃদু ঠাট্টা চলে তার সঙ্গে আমার; কিন্তু তার বাংলা পড়ায় আমি যেটুকু সাহায্য করছি সে-তুলনায় অনেক বেশি ফেরৎ পাই তার কথাবার্তা থেকে, কেননা এমন কোনো কথাই সে বলে না যা ব্র্যাডলি অথবা ম্যাথু আর্নল্ড থেকে তুলে নেয়া; আর তার কাছে ধার-পাওয়া বইগুলো প'ড়ে-প'ড়ে সাহিত্য বিষয়ে আমারও ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি একেবারে অন্য ধরনে কবিতা লিখতে, ভাবছি যে অমিত রায় হয়তো ঠাট্টার ছলে ঠিক কথাই বলে-ছিলো, সত্যি এখন 'কড়া লাইনের খাড়া লাইনের' রচনা চাই—অমিত রায়ের কথাটাকে মনে-মনে সংশোধন ক'রে নিয়ে এও ভাবি (কেননা নারীর মুখ আমার কাছে এখন জগতের এক অপরিহার্য উপাদান) যে গোলাপফুল বা নারীর মুখ যদি 'ন্যুরেল-জিয়ার ব্যথা' হয়ে পাঠকের মনে পৌঁছয় তাহ'লে তো কিছু দোষ হয় না, এই যে আমার মিতুর কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে টনটন করে, এটাকে বলার জন্য বোধহয় এক তীব্র ভাষাই বানিয়ে নিতে হবে। আমার মনের মধ্যে, আমার ভালোবাসারই সহোদর যেন, আস্তে-আস্তে একটা আশা গ'ড়ে উঠছে যে আমি শেষ পর্যন্ত লেখকই হবো—হ'তে পারবো; হঠাৎ আমার সঙ্গে এই যে একজন সাহিত্যরসিক ইংরেজের আলাপ হ'য়ে গেলো, এতেও যেন তারই ইঙ্গিত পাচ্ছি।

আরো একজনের সঙ্গে আমি কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলাম এই সময়ে—সে কাজল। কিন্তু এর পিছনে একটু বেদনার ইতিহাস আছে।

(ক্রমশঃ)

পরের দিন বিকাল বেলা। স্টেশনের সামনের মাঠ লোকে লোকারণ্য। সকালেই মদনমোহন ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছে তার কি কি জিনিস প্রয়োজন। সব ঠিকমতো এসে গেছে।

সাড়ে পাঁচটায় ম্যাজিক আরম্ভ হবার কথা। মদনমোহন তার প্রফেসর এম এম সরকার লেখা স্যুটকেস এবং অপর্ণাসহ পাঁচটা নাগাদ মাঠে এসে পৌঁছালো। আগেই খোঁজ নিয়েছে মাঠের পাশে যে রেল লাইন সেখান দিয়ে কলকাতার একটা ট্রেন যায় সাড়ে ছয়টায়, তবে এ স্টেশনে দাঁড়ায় না দাঁড়ায় গিয়ে পরের জংশন স্টেশনে।

ম্যাজিকের মাঠে গিয়ে প্রথমেই মদনমোহন খোঁজ করলো স্থানীয় স্টেশন মাস্টার এসেছেন কি-না। তাঁকে খুঁজে বের করে একেবারে মঞ্চে এনে বসালো। তারপর মিলিয়ে নিলো ফিরিস্তি অনুযায়ী জিনিস এসেছে কিনা। সবই ঠিক এসেছে। এক-জোড়া হামানদিস্তা, দারোগাবাবুর থানা থেকে দুটো হ্যান্ডকাপ, বাজারে জুতোর দোকান থেকে বড় কালো স্টিলের বাক্স। একটা খাঁচাশুদ্ধ পাখি আনার কথা ছিলো, সেটাও আনা হয়েছে। একটা সুন্দর তোতা পাখি। বেশ কথা বলে। কিন্তু অতি বজ্জাত, মদনমোহনকে দেখেই, 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে লাগলো।

পাখিটার উপর বিষম রাগ হলো মদনমোহনের। প্রথমেই বিদায় করতে হবে এটাকে।

সাড়ে পাঁচটায়, একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে মদনমোহন আর অপর্ণা উঠে গেলো মঞ্চের উপরে।

প্রথমেই পাখির খেলা। খাঁচাশুদ্ধ পাখিটাকে হাতে নিয়ে মদনমোহন জিজ্ঞাসা করলো, 'এই তোতা পাখিটা কার?' এখানকার বি ডি ও সাহেবের স্ত্রী গর্বিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন, 'এ পাখিটা আমার।'

'এ পাখিটা আপনার ভালো লাগে?' জাত যাদুকরের মত মদনমোহন প্রশ্ন করলো।

বি ডি ও সাহেবের স্ত্রী ডগমগ হয়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। এই রকম আরো একটা পাখি আপনাকে আনিয়ে দিচ্ছি আমি।' বলে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলো মদনমোহন। এতক্ষণ পাখিটা তারস্বরে 'চোর-চোর' বলে চেঁচাচ্ছিলো, এইবার 'সাধু, সাধু' বলে উড়ে গেলো। উড্ডীয়মান তোতাপাখিটার দিকে মদন ও অপর্ণা একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইলো যতক্ষণ না সেটা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলো।

এইবার দ্বিতীয় খেলা। মঞ্চের সামনে অপর্ণা এগিয়ে গেলো। তারপর মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'আপনাদের কারোর হাতে সোনার ঘড়ি আছে?'

সুন্দরী কন্ঠের এই প্রশ্নে একসঙ্গে দশ-বারোটা মণিবন্ধ এগিয়ে এলো। একবার মদনমোহনের দিকে তাকিয়ে সব কটাই খুলে নিলো অপর্ণা। তারপর হামানদিস্তার মধ্যে ফেলে স্টেশন মাস্টার মশাইকে বললো, 'আপনি এগুলো গুঁড়ো করে ফেলুন একেবারে।'

এরপরে আবার একবার অপর্ণার মধুর অনুরোধ শোনা গেলো, 'আপনাদের কারো কাছে একশো টাকার নোট থাকলে দিয়ে দিন।'

বেশি নয়, মাত্র তেইশটা একশো টাকার নোট পাওয়া গেল। নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্যে দর্শকদের মধ্য থেকে কাকে যেন অপর্ণা ডাকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু মদনমোহনের মনের মধ্যে তখন অমানুষিক উত্তেজনা। সে নিজেই সবকটা নোট গোছা করে ধরে দেশলাই কাঠি জেলে পুড়িয়ে ফেললো।

হতবাক, বিস্মিত জনসমুদ্র ম্যাজিসিয়ান দম্পতির খেলা দেখতে লাগলো।

এইবার হ্যান্ডকাপ দুটো হাতে তুলে নিলো মদনমোহন। তারপর দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই একটা মাত্র চাবি; এ ছাড়া আর কোনো চাবি দিয়ে খোলা যাবে না তো?'

দারোগাবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, না।'

'আপনি ছাড়া আপনার থানার আর কে আছে এখানে?' মদনমোহন জিজ্ঞাসা করতে দেখা গেলো অনেকেই, বোধহয় থানার সবাই এখানে। মদনমোহন হাবিলদারকে আর সেই দারোগাবাবুকে মঞ্চে ডেকে এনে দুজনের হাতে আচ্ছা করে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

এবার পাঁড়েজির পালা। পাঁড়েজিকে ডাকতে তিনি মঞ্চে উঠে এলেন। বিরাট স্টিলের বাক্সের ডালা তুলে তার মধ্যে পাঁড়েজিকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারপর মদন নিজের হাতে একটা শক্ত ছয় লিভারের তালা সেই বাক্সের গায়ে লাগিয়ে দিলো।

এবার একজন দর্শককে ডেকে বললো, 'সামনের ঐ ইঁদারার মধ্যে এই হাতকড়ার আর বাক্সের চাবি ফেলে দিন।'

আর একটা মাত্র কাজ বাকি। স্টেশন-মাস্টারকে বললো, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর ঘড়ি গুঁড়ো করতে হবে না। এখন এই সাড়ে ছটায় যে ট্রেনটা আসছে, সেটা এখানে এই সভার পাশে সিগন্যাল দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিন। আমরা উঠে গিয়ে সেটাকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসি।'

স্টেশন মাস্টার আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সমবেত জনতার দাবীতে তাঁকে সিগন্যাল ঠেকাতেই হলো। গাড়ি ঘ্যাচাং করে থেমে যাওয়া মাত্র প্রফেসর মদনমোহন সরকার একহাতে স্যুটকেস অন্য হাতে স্ত্রীকে ধরে সোজা গাড়ির ড্রাইভারের কামরায় উঠে বললেন, 'গাড়িটা ছেড়ে দিন। না হলে এই গাড়িটা ঐ মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। লাইন ছাড়া গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন? না হলে সবাই মারা পড়বো। তাড়াতাড়ি ছাড়ুন।'

গাড়ি ছেড়ে দিলো। কিন্তু মঞ্চের উপর উঠে এলো না; যখন বুঝতে পারলো যাদু-পিপাসু জনতা তখন মদন-অপর্ণা জংশন স্টেশনের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে।

কাঁথা

নারীদের বেশবাস প্রদর্শনী

ভারতীয় নারীদের বেশবাসের একটি মনোরম প্রদর্শনী আয়োজিত হয় একাডেমি অব ফাইন-আর্টস্ ভবনে।

পূর্ব ভারত, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নারীরা আধুনিককালে যেমন শতাব্দী পূর্বেও তেমনি তাঁদের অঙ্গাবরণে রুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

নানান সূক্ষ্ম কাজসহ রেশম ও সুতীর শাড়ী, চেলী, চাদর প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

কুর্তা, ঘাঘড়া, মছলন্দ, ওড়না ও বারানসী চোগা

প্রমীলা

শ্রীমা ও নিবেদিতা

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর। লণ্ডনের পিকাডেলির একটি হলঘর, লোকে-লোকারণ্য! উপলক্ষ একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর ভাষণ! শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছেন একটি তরুণী—বিদুষী, লাবণ্যময়ী দীর্ঘাঙ্গী—প্রখর ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। জ্যোতির্ময় সেই সন্ন্যাসী তন্ময় হয়ে বলে গেলেন ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের সাধনার কথা—তার ধর্ম ও দর্শনের কথা। মুগ্ধ হল সবাই মুগ্ধ হলো সেই তরুণী! সৌম্যমূর্তি এই সন্ন্যাসী তার জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিনকার সেই সন্ন্যাসী ভারতের যুগ-মানব যোগীপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। আর সেই তরুণী মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—পরবর্তীকালে আমাদের ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতা এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন, ধর্মসভা এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা যাঁকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছিল। আইরিশ জাতীয়তাবাদেরও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ধর্মপ্রাণা নিবেদিতা হয়েছিলেন মুক্তিপ্রাণা! যে মুক্তিচেতনা সীমিত ছিল আয়ারল্যাণ্ডের মাটিতে, স্বামী বিবেকানন্দের যাদুস্পর্শে তা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্ব-জগতে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন। স্বামীজীর একখানি পত্র এলো। দিনরাত্রি বসে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেই পত্রখানি পাঠ করতেন। তার মধ্যে খুঁজে পেলেন বিধি-নির্দিষ্ট পথের সন্ধান। স্বামীজি লিখছেন—"আমার এই ধারণা নিশ্চিত হইয়াছে যে, তোমার মন সর্ব-সংস্কারমুক্ত, তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে, যাহা এই পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে।" নিবেদিতা শুনতে পেলেন জীবনের আহ্বান—'ত্যাগ করো, ত্যাগ করো, সর্বস্ব ত্যাগ করো।'

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের, ২৮ জানুয়ারী। জন্মভূমি ছেড়ে মার্গারেট এলেন ভারতবর্ষে; ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবনকে পিছনে ফেলে রেখে নতুন জীবন সুরু করলেন কলকাতার এক দীন পল্লীতে। নিবেদিতা হলেন সমর্পিতা। স্বামীজি বললেন—'তোমাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় হতে হবে। নিষ্ঠাবতী, ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতে হবে—দ্যাখো, পারবে কি না! সংস্বরে নিবেদিতা উত্তর দিলেন—"পারব।"

স্বামীজি বললেন—'তোমার জপের মন্ত্র আর কিছু নয় শুধু 'ভারত', 'ভারত'।

স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে ঘরে আনার মন্ত্র পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অতি সাধারণ ঘটনার মাঝখানে। নিবেদিতাও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা অন্তর্মুখী

সারদাদেবীকে সংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে দেখেও তাঁকে চিনতে ভুল করলেন না। বললেন—'তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ পেয়ালা।' তাই সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে তাঁরই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নিবেদিতা কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিরক্ষরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই দেশে নিবেদিতা প্রথমে আত্মনিয়োগ করলেন নারীশিক্ষা বিস্তারে। সেকালে নারীশিক্ষা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। যতটুকু ছিল তার চাইতে বেশী ছিল বিরোধিতা। তারই মধ্যে যে উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়ে তিনি তাঁর ব্রত পালন করেছিলেন, শিক্ষাজগতের ইতিহাসে তা এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর শ্যামা-পূজার দিন কলকাতা বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে গুরুর নির্দেশমত একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাঙালী মেয়েদের জন্য নিবেদিতা একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করে নিজের আশীর্বাদ বাণী দান করেছিলেন—"আমি প্রার্থনা করিতেছি এই বিদ্যালয়ের উপর যেন জগজ্জননীর আশীর্বাদ থাকে এবং যে সকল বালিকা এখানে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা যেন দেশের আদর্শ কন্যা হয়।"

নিবেদিতা এক অভিনব দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমাকে একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে দেখতেন। এই তেজস্বিনী, মনস্বিনী মহীয়সী নারী শ্রীমায়ের কাছে এলে একেবারে একটি ক্ষুদ্র বালিকার মত সহজ, সরল ও শান্ত হয়ে যেতেন। শ্রীমায়ের চরণ-প্রান্তে এলে নিবেদিতা তাঁর পবিত্রভাবে ও সুনিবিড় স্নেহে আপনাকে একেবারে ভুলে যেতেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে নিজ জীবনের অনেক ঘটনা ভগিনী নিবেদিতা অননুকরণীয় ভংগীতে "The Master as I saw Him" নামক তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করেছেন। তা-ছাড়া সে সময়ে রামকৃষ্ণ সংঘের কোনো কোনো সন্ন্যাসী ও ভক্তনারী শ্রীমা ও নিবেদিতার জীবন সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা কোন কোন গ্রন্থে লিখেছেন—

শ্রীমায়ের কাছে নিবেদিতা একান্ত স্নেহ ও প্রীতির পাত্রী ছিলেন। নিবেদিতার মধুর স্বভাব সারল্য পবিত্রতা ও আন্তরিক ভক্তিতে শ্রীমা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর চিরবরণ্যে গুরুর অন্তর্ধানে নিবেদিতার প্রাণ-মন ও জীবনের একান্ত অবলম্বন ও আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন শ্রীমা। শ্রীমায়ের কল্যাণপ্রদ শান্তিপ্রদ সান্নিধ্য ও অভয় বাণীই গুরুসঙ্গহারা নিবেদিতার জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও সান্ত্বনাস্থল ছিল। দুঃখের বিষয় শ্রীমায়ের জীবনকালেই ভগিনী নিবেদিতা অকালে দেহত্যাগ করেন। কন্যাপ্রতিম নিবেদিতার মহাপ্রয়াণজনিত অভাব শ্রীমা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করতেন। কারণ ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে একান্ত আপনার থেকেও আপনার। তাঁর 'আত্মার আত্মীয়'।

নারীদের বেশবাস প্রদর্শনীতে চোলী সুর্চি রুমাল
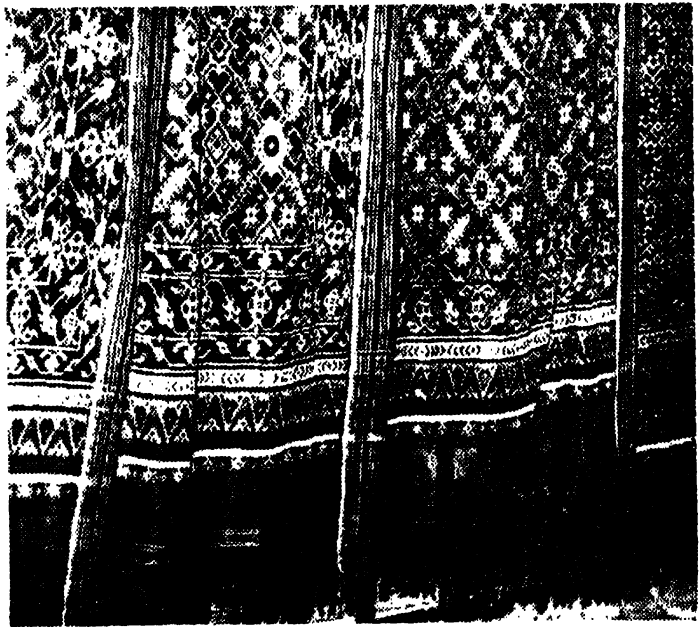
নারীদের বেশবাস প্রদর্শনীতে নাটোলা শাড়ী

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীমা প্রায়ই একান্ত স্নেহ-মমতা ও বেদনার সঙ্গে নিজের শিষ্যাদের কাছে অনেক কথা বলতেন। সে সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে স্নেহ-মমতা ও কাতরতা ফুটে উঠত।

নিবেদিতাও যে শ্রীমাকে কতখানি ভক্তি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন আমেরিকা থেকে তাঁর লেখা একখানি পত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। "পরম প্রিয় মাতাঠাকুরাণী, আজ খুব বেলায় আমি সারার (মিসেস সারা সি বুল) জন্য গির্জায় প্রার্থনা করতে গেছলাম। সেখানে উপস্থিত সমস্ত লোক যীশুর জননী মেরীর কথা ভাবছিলেন—তখন হঠাৎ আপনার সেই প্রিয় মুখখানি,

আপনার স্নেহমাখা মূর্তি, আর আপনার দেহখানিকে আবৃত করে রাখা সেই সাদা শাড়ীখানি আর গলার হারটিও মনে পড়লো। সত্যাই সবই যেন সেখানে দেখতে পেলুম এবং আমার মনে হলো সেখানে যেন আপনি রোগশয্যায় শায়িতা ভগিনী সারার রোগযন্ত্রণা সারিয়ে দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আর সত্যিই আপনি কি জানেন, যখন সন্ধ্যায় বাগবাজারের মঠে ঠাকুরের আরতি হচ্ছিল, তখন আপনার ঘরে সাক্ষাৎ আপনারই সামনে বসে ধ্যান করবার জন্য আমি কিরূপ অন্ধের মত চেষ্টা করে-ছিলুম? কেন আমি তখন বুঝতে পারিনি আপনার চরণপ্রান্তে বসে থাকাই আমার মত আপনার একটি ক্ষুদ্র শিশুসন্তানের পক্ষে সেই সময়ের পক্ষে যথেষ্ট পবিত্র ব্যাপার ছিল? প্রিয় মা, সত্যাই আপনি প্রেম-স্বরূপিণী। আর আপনার ভালবাসা আমাদের মতো সংসারে বাস করা লোকেদের মত অসংযত ও হুজুকে ভালবাসার হঠাৎ আলোর ক্ষণিক ঝলকানিমাত্র নয়। কিন্তু আপনার ভালবাসা অবিচল শান্তিতে ভরা, সেই ভালবাসা সকলের কাছে কল্যাণকে নিয়ে আসে, তা কখনো কারুর অনিষ্ট চিন্তা করে না। এই ভালবাসা সোনালী জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও লীলাময়ী। সেই রবিবারটি জানি না কতই পবিত্র ছিল! যখন কয়েক মাস আগে আমি গঙ্গাতীরে বাস করতে যাবার আগে আপনার কাছে বিদায় নেবার জন্য ছুটে গিয়েছিলুম, আবার যখন সেখান থেকে ফিরে এসে আপনাকে দর্শন করতে এসে-ছিলুম। সেদিন আপনার স্নেহময় সদনে আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আমি বিস্ময়কর এক মুক্তির আস্বাদ পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়ে-ছিলুম।

সত্যাই আপনি বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি! জগতের সকলের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার প্রেমধারার একমাত্র পাত্রাধারই আপনি —ঠাকুর তাঁর লীলাসহচরদের ছাড়াও সমগ্র জগতকে আরো একটি পবিত্র প্রতীকরূপে আপনাকে দান করে গেছেন। বর্তমান যুগে যখন আমরা সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে থাকি, তখন আপনার পদপ্রান্তে এসে ধীর শান্ত সমাহিত চিত্তে বসে থাকাই আমাদের উচিত, অবশ্য কোন কোন সময়ে হয়তো একটু-আধটু হাসি ও কৌতুক আমাদের মধ্যে তখন দেখা দিতে পারে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত জিনিস সবচেয়ে আশ্চর্য, নিশ্চয়ই তারা সর্বদাই প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে থাকে। জানি না কখন অজ্ঞাত-সারে এসে তারা আমাদের জীবনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। সূর্যের আলো, বাতাস, ফুলফোটা বাগানের মধুর সৌন্দর্য আর গঙ্গার শোভারাশি। এরা সকলেই নীরব ও শান্ত। ঠিক আপনারই মতন। রোগে কাতরা ভগিনী সারার জন্যে আপনার আশীর্বাদ-পূর্ণ একটি নিদর্শন আপনি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন। ইতি, হে চিরপ্রিয় জননী, আপনার অবোধ শিশুকন্যা নিবেদিতা।"

শ্রীমা বলতেন—"আহা, নিবেদিতার কি ভক্তিই না ছিল! আমার জন্যে কি করবে

নারীদের বেশবাস প্রদর্শনীতে পাখা, চম্বা, রুমাল বাক্সকোট, তোরণ ইত্যাদি

ভেবে পেতো না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসতো, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতে ও সঙ্কুচিত হচ্ছে।" ভগিনী নিবেদিতার অকালে মহাপ্রয়াণের জন্য ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সকল সমাজের সকল শ্রেণীর অসংখ্য লোকের দুঃখিত ও বিষণ্ণ হওয়ার কথা শুনে শ্রীমা ঐ সময়ে বলেছিলেন—"যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্যে কাঁদে মহাপ্রাণী।"

মাত্র ৪৪ বছরের জীবনে নিবেদিতা হলেন লোকমাতা, জনগণবন্দিতা মূর্তিমতী সেবা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিস আমরা যাহা পাই, বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তার জন্য দর-দস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়, তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে-জীবন দিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি মহাজীবন। তাঁহার দিক হইতে তিনি বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেন নাই; প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন।"

নিবেদিতা ও শ্রীশ্রীমার জীবন-কথা সকলের কাছে শাশ্বত শান্তি আর আনন্দের বাণী বহন করে এনেছে। বেদান্তসূর্যের কিরণছটায় যে-নিবেদিতা-কলিকা চোখ মেলেছিল, প্রতিটি পাপড়ি তার বেদান্ত আভাতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"একদিন নিবে-দিতার নামে সারা ভারত মুখর হইয়া উঠিবে।" স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হোক।।

—বেলা দে
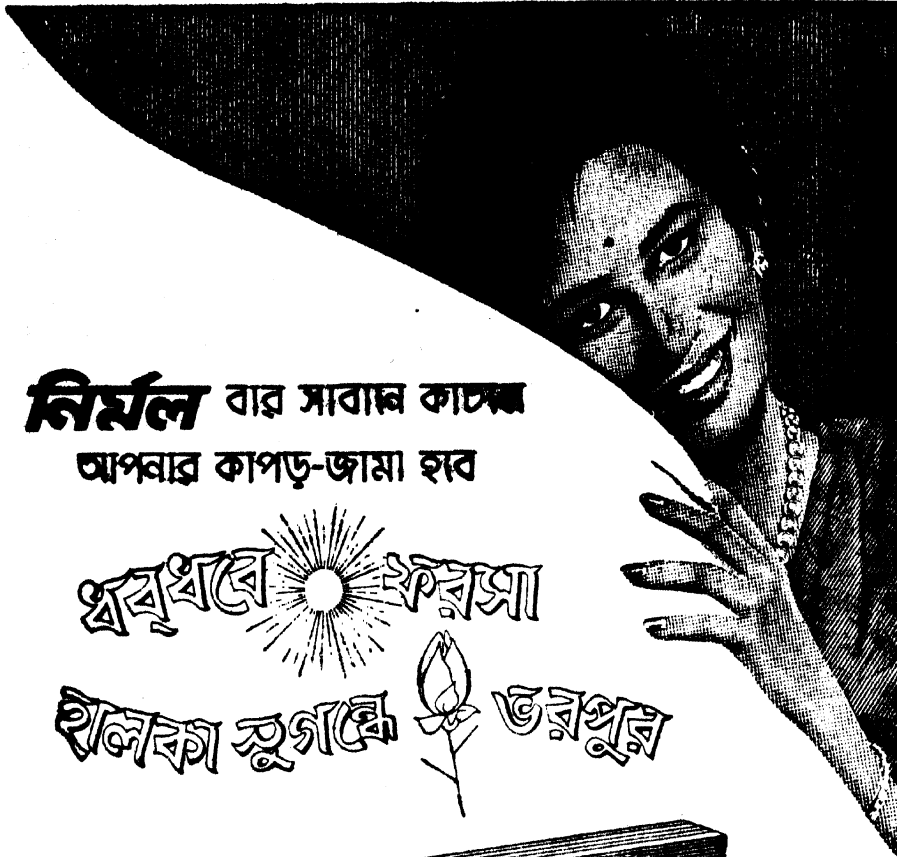
নির্মল বার সাবানে কাচলে
আপনার কাপড়-জামা হবে
ধব্‌ধবে ফরসা
হাল্কা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
KUSUM PRODUCTS LTD
নির্মল
কুসুম প্রোডাক্টস লিঃ
নির্মল
Nirmal
BAR SOAP
নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর সদ্য ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।
নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর সেই ফেনায় তেলকালি ও ধূলোময়লা জড়সুদ্ধ বেরিয়ে যায়। আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সদ্য ধোপ দেওয়ার সুগন্ধে ভরে থাকে।
নির্মল দিয়ে কাচলে পয়স... াশ্রয় হয়। ঢের বেশী দিন চলে—সাবানটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় না।
নির্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কালকাতা-১
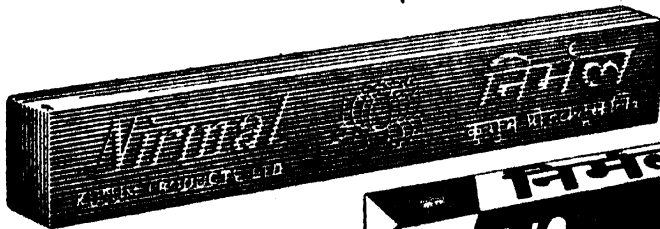
(৪)

নিত্যানন্দ

(খ)

কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে এসে দাঁড়াল সকলে।

গৌরাঙ্গ বললেন, কপোতেশ্বর মহাদেব দেখে আসি।

দামোদর আর মুকুন্দ সঙ্গে গেল। নদী-তীরে নিত্যানন্দ আর জগদানন্দ অপেক্ষা করতে লাগল।

জগদানন্দের হাতে গৌরাঙ্গের দন্ড। সে-ই গৌরাঙ্গের দন্ডবাহক। কিন্তু প্রভু এতক্ষণেও ফিরছেন না কেন? জগদানন্দ অধীর হয়ে উঠল।

'তুমি দন্ড ধরো তো. আমি একবার দেখে আসি কেন এত দেরি হচ্ছে।'

গৌরসুন্দরের দণ্ডের প্রয়োজন কী? সন্ন্যাসীরা দন্ড নেয় আসক্তিকে শাসন করবার জন্যে। স্বয়ং ভগবানের আবার আসক্তি কী!

নিত্যানন্দের মনে হল এ-দন্ড শুধু তাকেই দন্ড দেবার জন্যে। আমি যাঁকে হৃদয়ে বহন করছি, তিনি আবার দণ্ডকে বহন করে চলবেন এ অসহ্য।

সুতরাং আজ দণ্ডের দন্ড হোক।

দণ্ডকে তিন খন্ড করে নদীতে ভাসিয়ে দিল নিত্যানন্দ।

জগদানন্দ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলে, দণ্ড কই?

তিন টুকরো করে ভেঙে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

কী সর্বনাশ! জগদানন্দের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। এখন তবে উপায় কী!

যার দন্ড তিনিই ভেঙেছেন, তোমার এত ভয় পাবার কী হয়েছে!

ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গ দণ্ডের খোঁজ করলেন না।

আঠার নালায় এসে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিত্যানন্দকে বললেন. আমার দন্ড দাও।

তুমি প্রেমাবেশে আমার উপর পড়লে. আমি তোমাকে নিয়ে আমার হাতে-ধরা দণ্ডের উপর পড়লাম। দুজনের ভারে দন্ড ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল। তারপর টুকরোগুলো কোথায় গিয়ে পড়ল কিছুই জানি না। সপ্রতিভ সহাস্যমুখে বললে নিত্যানন্দ।

না, প্রভু, জগদানন্দ বলে উঠল, অবধূত গোসাই নিজ হাতে দন্ড ভেঙে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

দিয়েছি তো বেশ করেছি। নিত্যানন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, একখানা শুকনো বাঁশ বই তো নয়।

গৌরাঙ্গ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, শুকনো বাঁশ! যে সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমগ্র দেবলোক বিরাজ করছে। যা ত্যাগ-ধর্মের প্রতীক, তাকে তুমি সামান্য শুকনো বাঁশ বলছ?

হ্যাঁ, বলছিই তো, একশোবার বলছি। সে বাঁশ তুমি বুকে করে বয়ে বেড়াবে এ আমার পক্ষে অসহ্য। নিত্যানন্দ মাথা পাতল। দন্ড ভাঙার জন্যে যে দন্ড দিতে হয় দাও, আমি মাথা পেতে নেব।

অন্তরে গভীর প্রসন্নতা, বাইরে প্রভু ক্রোধভাব জাগিয়ে রাখলেন। বললেন. আমার সবেধন ছিল এই দন্ড আমার সঙ্গের সাথি. তোমরা তাও রাখলে না। বেশ. যাও, আমার আর তবে কারু সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রইল না, আমি একাই জগন্নাথ দর্শনে যাব।

সে কী কথা! সবাই আপত্তি করল।

হ্যাঁ, একা যাব। তোমাদের সঙ্গে একত্রে যাব না। হয় তোমরা আগে যাও, নয়তো আমি আগে যাই।

মুকুন্দ বললে, তুমি আগে যাও। আমরা পরে যাব।

গৌরাঙ্গ একা চললেন। একাকী ছিলেন বলেই তো সার্বভৌম তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারল।

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—বলতে বলতে বিদ্যুৎগতিতে ছুটলেন গৌরাঙ্গ। মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সার্বভৌম তাঁকে সুস্থ করবার জন্যে গৃহে নিয়ে গেল।

সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ। সঙ্গে সহচরগণ।

জগন্নাথের সেবক বললে, আপনারা স্থির হয়ে জগন্নাথদর্শন করবেন. ঐ সোনার-বরণ ঠাকুরের মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেন না।

নিত্যানন্দ মৃদু-মৃদু হাসল। ঢুকল মন্দিরে।

ঢুকেই এক লাফ দিয়ে রত্ন-সিংহাসনে উঠে ধরতে গেল বলরামকে। এক বিরাট দেহ পালোয়ান সেবক নিত্যানন্দের হাত ধরে বাধা দিতে গেল, নিত্যানন্দ হাত ছাড়িয়ে নিতে পড়ল গিয়ে দশ হাত দূরে। হাড়গোড় ভেঙে গেল বোধহয়।

বলরামের গলার মালা তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরল নিত্যানন্দ।

সেবক বললে, আমি মত্ত হাতি ধরে রাখতে পারি কিন্তু এই অবধূতকে ছুঁতে না ছুঁতেই আমি মেঝের উপর ছিটকে পড়লাম। এ কি মানুষ না আর কেউ?

আমি এবার দক্ষিণে যাব। বললেন গৌরহরি।

সেখানে কী?

আমার বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে দক্ষিণ দেশে গিয়েছে বলে শুনেছি. নিত্যা-নন্দের দু'হাত চেপে ধরলেন প্রভু. আমি তার সন্ধানে যাব, পারি তো নিয়ে আসব ফিরিয়ে।

নিত্যানন্দই যে বিশ্বরূপ এ তো প্রভুর জানা। তবে আবার এই লীলা কেন?

নিত্যানন্দ বুঝল এই লীলাচ্ছলেই গৌরাঙ্গ দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করতে চলেছেন।

বললে. আমি তোমার সঙ্গে যাব। পথ-ঘাট সমস্ত আমার জানা।

প্রভু বললেন. না আমি একা যাব। আমার দন্ড নেই ঝুলি নেই কিছু নেই, আমি এক নিঃস্ব একাকী।

এ হতেই পারে না। তোমার দু'হাত তো নামের সংখ্যা গণনায় বদ্ধ থাকবে, বহির্বাস বা জলপাত্র বইবে কী করে? প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে পড়লে তোমাকে দেখবে কে? বেশ তো, আমাদের না নাও ব্রাহ্মণকুমার কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী করো। সেই তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারবে।

'গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে'—সেই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী করে চললেন গৌর-হরি।

আলালনাথ পর্যন্ত এগিয়ে দিল নিত্যা-নন্দ. পরে নীলাচলে ফিরে প্রভুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দু' বছর পর ফিরলেন গৌরহরি।

শচীমাতার কাছে খবর গেল নিমাই আবার নীলাচলে স্থির হয়েছে। মা গো, আজ্ঞা করো, আমরাও একবার তবে দেখে আসি প্রাণগৌরকে। অদ্বৈতসহ অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্ত শচীমাতার অনুমতি চাইল। অনুমতি পেয়ে চলে এল শ্রীক্ষেত্র।

কীর্তনে-নর্তনে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠল চারদিকে।

গৌরাঙ্গ গৌড়ীয় ভক্তদের বললেন, তোমরা এবার দেশে ফিরে যাও। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় এস।

তারপর একদিন নিত্যানন্দকে নিয়ে বসলেন গোপনে।

বললেন. তুমি সুরধুনী তীরে গিয়ে হরিনাম বিলাও। জীবজগৎ অন্ধ হয়ে আছে, তুমি হরিনাম দিয়ে এদের চোখ ফোটাও।

পিপাসায় শুষ্ক বিরস হয়ে আছে, তুমি হরি-নাম দিয়ে এদের শীতল কর। নিন্দুক পাষণ্ড পাপী দুরাচার কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। মুখে-বুকে হরিনাম নিয়ে কারু যেন আর যমভয় না থাকে। যারা কুমতি, যারা তার্কিক, যারা শুধু-পড়ুয়া তাদের প্রেমধন দান করে দুঃখের খণ্ডন কর। 'মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যে জন, ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন।' নিত্যানন্দ, সংকীর্তন-প্রেমরসে সর্বদেশ প্লাবিত কর। নামপ্রেমে বিশ্ব ভরে দেব বলেই আমার নাম বিশ্বম্ভর। তুমিই আমার লীলার সহায়, আমার বিশ্বম্ভর নাম সার্থক কর। অবিচারে অবিচ্ছেদে নাম দাও প্রেম দাও সকলকে।

প্রাণগৌরের আদেশ পেয়ে নিত্যানন্দ চলল গৌড়দেশে।

আর ভয় কী, অবিচারে নাম দিতে হবে, নামপ্রেমে ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করাতে হবে—পার্ষদদের নিয়ে নিত্যানন্দ চলল গঙ্গাতীরে।

নিত্যানন্দের লীলা আরম্ভ হল।

পথেই সহচরদের সকলকে উদ্দাম ভাব দিলেন। রামদাসের দেহে গোপালের প্রকাশ হল, গদাধর রাধিকা-ভাবে বিভাসিত হল, আর রঘুনাথ বৈদ্যে দেখা দিল রেবতীর আবেশ। কৃষ্ণদাস আর পরমেশ্বরদাসও গোপাল-ভাবে হৈ-হৈ করতে লাগল। পুরন্দর তো একেবারে গাছে উঠে বসল, বললে, আমি অঙ্গদ।

গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম। সেই গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ। সর্বদাই গর্গর-মাতোয়ারা। একে-একে গায়কের দল এসে জুটতে লাগল। মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ তিন ভাই—তিন ভাই-ই কীর্তন-বিশারদ, তিন ভাই-ই গান ধরল। নিত্যানন্দ নৃত্য সুরু করলেন। পদভরে কাঁপতে লাগল পৃথিবী। নৃত্য করতে-করতে যার দিকে দৃষ্টি ফেলেন সে-ই প্রেমবিহ্বল হয়ে যায়।

চার স্থানে গৌরাঙ্গের নিত্য আবির্ভাব। শচীর মন্দিরে, রাঘবের ভবনে, শ্রীবাসের কীর্তনে আর নিত্যানন্দের নর্তনে।

তাই রাঘবগৃহে নিত্যানন্দের নৃত্যলীলা।

হঠাৎ খাটের উপর বসে পড়ে নিত্যানন্দ বললেন, আমার অভিষেক করো।

সুবাসিত গঙ্গাজলে স্নান করানো হল, নববস্ত্র পরিয়ে চন্দন মাখানো হল শ্রীঅঙ্গে, গলায় দোলানো হল তুলসীর বনমালা। অভিষেক-মন্ত্র পড়া হল। রাঘব পণ্ডিত নিজে মাথায় ছাতা ধরল। আনন্দ-ক্রন্দনের রোল উঠল চারদিকে।

রাঘব, আমার জন্যে কদম ফুল নিয়ে এস। নিত্যানন্দ আদেশ করলেন।

কদম ফুল!

হ্যাঁ, কদমকাননে আমার নিত্য বাস। কদম আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

কিন্তু এ তো কদমের সময় নয়।

সময় নয়? নিত্যানন্দ হাসলেন। তোমার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখ, কোথাও-না-কোথাও ফুটেছেও পারে।

রাঘব পণ্ডিত বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখল জম্বীরের গাছে অসংখ্য কদম ফুল ফুটে আছে।

যে দেখল সেই অবাক হল। এ কী অতিমানুষী বিভূতি!

কদমের মালা গলায় পরে খাটে সমাসীন নিত্যানন্দ। বললেন, সবাই একটা নতুন গন্ধ পাচ্ছ না?

হ্যাঁ, চারদিকে দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি।

এ-গন্ধ কোত্থেকে আসছে বলতে পার?

কোত্থেকে?

শোনো বলি। তোমাদের নাচ দেখতে, তোমাদের কীর্তন শুনতে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে চলে এসেছেন। এ তাঁরই সৌরভ। তোমাদের সকলের দেহ-মন কৃষ্ণনাম-সৌরভে পরিপূর্ণ হোক।

রাঘবের ঘরে তিনমাস ধরে চলল এই ভক্তিবিলাস।

সপ্তগ্রাম থেকে রঘুনাথদাস এসে হাজির।

গৌরাঙ্গ পাবার জন্যে বার-বার বাড়ি থেকে পালায় রঘুনাথ, তার বাপ তাকে বার-বারই ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শান্তিপুরে দুবার গৌরহরির সাক্ষাৎদর্শন পেয়েছিল, দুবারই মহাপ্রভু তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করো।

কেন যে ফিরিয়ে দিচ্ছেন বুঝতে পারছে না রঘুনাথ।

তাই নিত্যানন্দের কাছে জানতে এসেছে।

গঙ্গাতীরে একটা বটগাছের নীচে বসে আছে রঘুনাথ, দেখল ভক্তদলের সঙ্গে নিত্যানন্দ আসছেন। দেখেই রঘুনাথ দণ্ডবৎ প্রণত হল।

নিত্যানন্দ বললেন, ঐ সেই চোরটা বুঝি এতদিনে দর্শন দিল।

চোর! রঘুনাথ ম্লান হয়ে গেল। আমি কী চুরি করলাম, কবে চুরি করলাম! নিত্যা-নন্দের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। এখুনি-এখুনি চুরি করলাম কী!

চুরি করোনি তো চুরি করবার চেষ্টা করেছিলে। যে চুরি করতে চেষ্টা করে অথচ পারে না সে-ও চোর।

কী আবার চেষ্টা করলাম!

না বলে নেওয়ার নামই তো চুরি। তুমি আমাকে না বলে আমার গৌরধন নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, সেটা চুরি করার চেষ্টা হল না?

গৌরধন শুধু তোমার?

শুধু আমার। বললেন নিত্যানন্দ, আমি না বলে দিলে কেউ পাবে না গৌরচরণ। আমি দরজা খুলে না দিলে কেউ গৌর-অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারবে না।

রঘুনাথ এতক্ষণে বুঝল মহাপ্রভু কেন তাকে দু'-দুবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

বুঝল নিত্যানন্দের হাতেই ঘরের চাবি। প্রেমের ছাড়পত্র।

মহাপ্রভুও তাই বলেছেন। 'নিতাই যারে দিবে ইচ্ছা করে, আমি তারই হব অবিচারে।'

করজোড়ে রঘুনাথ বললে, আমাকে তবে দণ্ড দিন।

নিত্যানন্দ বললেন, তুমি ভক্তের দই-চিঁড়ের মহোৎসব লাগাও।

দই দুধ চিঁড়ে কলা চিনি কর্পূর—বিরাট আয়োজন করল রঘুনাথ। আহূত-অনাহূত বিস্তর লোকসমাগম হল। জায়গা ছাপিয়ে বসল গিয়ে নদীতীরে, কেউ-কেউ তীরে স্থান না পেয়ে জলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেককে দুখানি করে মালসা দেওয়া হল, একটিতে ক্ষীর-চিঁড়ে, আরেকটিতে দই-চিঁড়ে।

সকলকে বিতরণ করা হয়ে গেলে নিত্যানন্দ ধ্যানযোগে আকর্ষণ করে মহা-প্রভুকে নিয়ে এলেন নীলাচল থেকে। জনে-জনে সকলের কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে, প্রত্যেক মালসা থেকে একমুঠো চিঁড়ে তুলে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন, মহাপ্রভুও দিতে লাগলেন নিত্যানন্দের মুখে। সকলে ভাবল, নিত্যানন্দই বুঝি নিচ্ছেন, নিত্যা-নন্দই বুঝি খাচ্ছেন। কোনো-কোনো ভাগ্যবান শুধু দেখতে পেল গৌররায়কে।

তারপর বিরলে দুই ভাই বসলেন চিঁড়ে খেতে, পাশাপাশি আসনে। রাঘব পণ্ডিত এসে পড়লে তাকেও ভাগ দিলেন।

বলো প্রভু নিতাই, আমি কি গৌর পাব? রঘুনাথ কেঁদে পড়ল।

নিত্যানন্দ বললেন, তুমি আমার ভক্ত-দের দই-চিঁড়ে খাওয়ালে, মহাপ্রভু নিজে এসে খেয়ে গেলেন। আর দেরি নেই, তুমি পাবে গৌরধন। দেখো প্রভু তোমাকে স্বরূপের হাতে সঁপে দেবেন, তোমাকে ডাকবেন স্বরূপের রঘুনাথ বলে।

গৌরসেবার বিগ্রহই নিত্যানন্দ। তাঁর কাজ শুধু গৌরাঙ্গের সেবা করা। গৌরাঙ্গের আদেশ পালন করে গৌড়ে এসে হরিনাম বিলোচ্ছেন এও গৌরসেবা। কিন্তু আরো—আরো সেবা করবার জন্যে মন উচাটন। পারছেন না বলেই তাঁর মনে

কতকিছুই পারছেন না, পারছেন গৌরের শ্রীঅঙ্গ সাজিয়ে দিতে।

কিন্তু, ভাবলেন, নিজে সাজলেই তো গৌরাঙ্গকে সাজানো হবে। যিনিই মহাপ্রভু তিনিই তো নিত্যানন্দ।

ইচ্ছা প্রকাশ করামাত্রই নানা লোক নানা অলঙ্কার তৈরি করে আনল।

দুই হাতে সোনার অঙ্গদ-বলয় পরলেন, দশ আঙুলে সোনার অঙ্গুরি, কণ্ঠে মণি-মুক্তোর মালা, শ্রুতিমূলে সোনার কুণ্ডল, পাদপদ্মে রজত-নূপুর, তার উপরে মলবঙ্ক, হাতে লৌহদণ্ড—যেন হলধর মুষল ধারণ করে আছেন।

তারপর সুরু করলেন ঘরে ঘরে পর্যটন-কেলি। 'কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য-টনে, ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্তন বিনে।'

একদিন গদাধর দাসের বাড়িতে এসে উঠলেন।

হাঁক দিলেন, গোপী, দান দে, দান দে।

গদাধর গোপীভাবে বিভোর। সে মাথায় গঙ্গাজলের কলসী নিয়ে কে দুধ কিনবে গো বলে দ্বারে দ্বারে ফিরি করে। কড়ি নেই বললে বিনাদামে দিয়ে যায়।

নিত্যানন্দের সঙ্গে গদাধর প্রেমানন্দে নাচতে লাগল। মাধব ঘোষ এসে গাইতে লাগল দানলীলা।

পানিহাটি থেকে নিত্যানন্দ গেলেন খড়দহে।

একবার এখানকার জমিদারের কাছে কিছুটা জমি চেয়েছিলেন নিত্যানন্দ, বসবাস করবেন বলে।

জমি? জমিদার ব্যঙ্গ করে বললে, ঐ গঙ্গায় ওখানে দহ আছে ওখানে গিয়ে থাকো।

নিত্যানন্দ মৃদু হেসে একগাছি খড় ঐ দহে ছুঁড়ে দিল আর তার ফলে দহ থেকে উঠে এল শক্ত ভূমি। আর সেই থেকে নাম হল খড়দহ।

খড়দহ থেকে এলেন সপ্তগ্রাম। উঠলেন ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের বাড়িতে।

সে-যুগে সুবর্ণ-বণিকেরা সামাজিক নানা নির্যাতনে বিড়ম্বিত ছিল, তাদের কৃতার্থ করবার জন্যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে 'বণিককুলের নাথ' করে পাঠালেন। নিত্যানন্দ সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল করে তুললেন। 'বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিল প্রেমভক্তি অধিকার। সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে।।'

উদ্ধারণকে বললেন, তোমার পবিত্রতা সকলের কাছে প্রচার করব। তুমি আজ থেকে আমার রান্না করে দেবে।

ব্রাহ্মণেরা চটে গেল। এ কখনো হতে পারে? বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধতা কিছুতেই সহ্য করব না আমরা। তোমরা সবাই এস, একটা সিদ্ধান্ত করো।

আগে চলো স্বচক্ষে দেখে আসি সত্যিই উদ্ধারণ রাঁধছে কিনা। শোনা কথায় কিছু করে ফেলা ঠিক হবে না।

নিত্যানন্দ বললেন, উদ্ধারণ, ও'রা এসেছেন। তুমি অড়হরের যে কাঠি দিয়ে ভাত ঘাঁটছ ওটা অঙ্গনে পুঁতে দাও।

যথা আজ্ঞা, উদ্ধারণ তাই করল। দেখতে দেখতে সেই কাঠি থেকে ঘনবদ্ধ মাধবীলতা বেরিয়ে এল, সমস্ত অঙ্গন ফেলল আচ্ছন্ন করে।

বিরোধী ব্রাহ্মণেরা আর রা কাড়তে পেল না। নিত্যানন্দের চরণে শরণ নিলে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই মাধবীলতা এখনো বিরাজ করছে।

সেখান থেকে গেলেন শান্তিপুর, মিলনের অদ্বৈতের সঙ্গে। 'দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণ।'

তারপর গেলেন নবদ্বীপ। যাই এবার একবার মাকে দেখে আসি।

শচীমাতা আনন্দে অধীর হলেন। বাপ, তুমি অন্তর্যামী, আমার দুঃখী মনের অভিলাষ টের পেয়ে আমাকে দেখা দিতে এসেছ।

তোমার চরণদর্শন করতে এসেছি।

নবদ্বীপে কিছুদিন থাকো।

তাই থাকব মা। প্রতি গৃহে সংকীর্তনের আসর বসাব।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণতনয় ডাকাতের দলের সর্দার। নিত্যানন্দের গায়ে এত গয়না, ইচ্ছে হল লুণ্ঠন করে নেয়। উপায় কী? উপায়, ভক্তের ভান করে কাছে-কাছে থাকা আর সুযোগ পেলেই গলা টিপে ধরা।

নিত্যানন্দ নিজেই সুযোগ করে দিলেন। গেলেন হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি। সেখানে লোকজন বিশেষ নেই, ডাকাতি করতে সুবিধে হবে।

গভীর রাত্রে ডাকাতের দল বাড়ি ঘেরাও করল।

দেখল নিত্যানন্দ খাচ্ছেন, ভক্তদল বসে আছে।

এবার সবাই ঘুমুবে। ঘুমিয়ে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ব সকলে। আর একটু অপেক্ষা করি।

অপেক্ষা করতে করতে ডাকাতের দলই ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল দেখল ভোর হয়ে গেছে।

আরেক রাত্তে এল অনেক তোড়জোড় করে। আজ আর অপেক্ষা করব না।

গিয়ে দেখল অনেক প্রহরী বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ডাকাতদের চেয়েও তারা সংখ্যায় বেশি, আর স্বাস্থ্যে-তেজে বলীয়ান।

আর কী বকছে রে প্রহরীগুলো?

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলছে।

আজ কাজ নেই। আরেক রাতে আসা যাবে। ভরা অমাবস্যার অন্ধকারে।

ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতের দল বাড়ি ঢুকল। কিন্তু এ কী, চোখে যে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এ রাতের অন্ধকার নয়, এ তাদের চোখের অন্ধতা। সবাই নিমেষে অন্ধ হয়ে গেল। চোখে দেখতে না পেয়ে সবাই গর্তে গিয়ে পড়ল। শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। সেইসঙ্গে বৃশ্চিকদংশন।

তখন ডাকাতেরাই আর্তনাদ করতে লাগল। প্রভু নিত্যানন্দ, আমাদের কৃপা কর।

নিত্যানন্দকে স্মরণ করামাত্রই তাদের চোখ খুলে গেল, থেমে গেল ঝড়বৃষ্টি, শান্ত হল বিষদাহ। তারা নিত্যানন্দের পা ধরে কাঁদতে লাগল।

বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ। প্রেমভক্তি দিয়ে নিত্যানন্দ উদ্ধার করলেন ডাকাতদের।

নিমাইয়ের এক সহপাঠী ব্রাহ্মণ নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বললেন, কী কতগুলো অলঙ্কার পরে বেড়ায়, আচার-অনুষ্ঠান কিছু মানে না।

মহাপ্রভু বললেন, নিত্যানন্দের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। তাঁর গায়ে যে অলঙ্কার দেখছ তা প্রাকৃত অলঙ্কার নয়, তা নববিধ ভক্তি। আর আচার? জেনো—'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে, তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।।'

ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে অকপটে সব বললে নিতাইকে। বললে, আমার অপরাধ মার্জনা করো।

নিত্যানন্দ বললেন, অপরাধ? আমার প্রভু কারো অপরাধ দেখেন না। যে গৌরাঙ্গকে ভালোবাসে তার আবার অপরাধ কী? বলো গৌরহরি।

গৌরাঙ্গ যদিও নিত্যানন্দকে বলে দিয়েছিলেন, প্রতি বৎসর নীলাচলে এস না, তবুও প্রতি বৎসরই রথযাত্রায় নিত্যানন্দ যেতেন নীলাচল। গৌড়ে প্রেম বিতরণ তো করছি, তবু বৎসরান্তে একবার শ্রীমুখখানি দেখতে না পেলে বাঁচি কী করে?

তাছাড়া আমি গেলে যিনি বারণ করেছেন, তিনিই তো বেশি সুখী হবেন। আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন তো শুষ্ক বিদ্রোহ নয়, আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন প্রেমেরই কারুকলা। 'আজ্ঞার পালনে কৃষ্ণের হয় যে সন্তোষ। প্রেমে আজ্ঞা ভাঙিলে হয় কোটি সুখপোষ।'

নিত্যানন্দ সরাসরি মহাপ্রভুর কাছে না গিয়ে এক উদ্যানে এসে বসলেন। গৌরাঙ্গ-ধ্যানে আবিষ্ট হলেন। দেখলেন একা-একা চলে এসেছেন গৌরহরি। এসে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে স্তব করছেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেতেই নিত্যানন্দ উঠলেন, দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন গৌরাঙ্গকে।

গৌরাঙ্গ আবার তাঁর কানে কানে কী কথা বললেন।

হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও নিত্যানন্দকে গৃহাশ্রমী হতে হবে। এই মহাপ্রভুর নির্দেশ। তাছাড়া 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ। বিধিনিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ।'

অম্বিকা-কালনার সূর্যদাস সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করলেন নিত্যানন্দ। বিয়ের পর খড়দহে বসতি করলেন। 'মন হৈল খড়দহ করিব শ্রীপাট। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট।' খড়দহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করলেন আর প্রচার করলেন প্রেমভক্তি।

নিত্যানন্দের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম বীরচন্দ্র আর মেয়ের নাম গঙ্গা।

বীরচন্দ্র একচাকা গ্রামের পাশে বীরচন্দ্র-পুর বলে এক নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন আর সেইখানেই শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বা শ্রীবাঁকা রায় বিগ্রহ-সেবা প্রকটিত করেন।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের দু' বছর পরে নিত্যানন্দ তিরোধান করেন। যুগপৎ মিলিয়ে যান খড়দহের শ্যামসুন্দরে আর বীরচন্দ্র-পুরের বঙ্কিমচন্দ্রে।

(ক্রমশঃ)

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গানের পথ হচ্ছে সাধনার পথ। এ সত্য বহুকাল থেকে আমাদের দেশের গুণীজ্ঞানীরা জানেন। একটি মহাবাক্য আছে—

জপ কোটি গুণং ধ্যানং
ধ্যান কোটি গুণং লয়ং।
লয় কোটি গুণং গানং
গানাৎ পরতরং ন হি ।।

সত্যিই গানের থেকে প্রশস্ত পথ আর নেই। যত সিদ্ধ-সাধক জন্মেছেন এ-দেশে সবাই এ পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন।

বৈদিক যুগ থেকেই এই সত্য ঋষিরা প্রচার করেন। তাঁরাই সূচনা করেন সাম-গানের। সাম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে স+অম=সাম, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে অম বা অমৃতের সহিত বর্তমান। সুর যে অমৃত এ কথা আমাদের শাস্ত্রে নানা-ভাবেই বলা হয়েছে। অনেকে আবার বলেন—সাম ও ঋক এই দুটি শব্দ থেকে এসেছে—স + ঋক + অম = সঋগম।

আচার্য পিংগলের "ছন্দঃসূত্র" থেকে পাই—সাতটি বৈদিক ছন্দ থেকেই সপ্তস্বর এসেছে এই ভাবে—গায়ত্রী থেকে ষড়জ, উষ্ণিক থেকে ঋষভ, অনুষ্টুপ থেকে গান্ধার বৃহতী থেকে মধ্যম, পঙক্তি থেকে পঞ্চম, ত্রিষ্টুপ থেকে ধৈবৎ আর জগতী থেকে নিষাদ। ঐ সপ্তছন্দই হচ্ছে সাতটি তাল।

আবার মুনি ভরতের "নাট্যশাস্ত্রে" ধ্রুবপদ বা মার্গসংগীত এবং দেশী সংগীতেরও একটি বিস্তৃত অধ্যায় আছে। তাতে ত্রিস্র বা তিন মাত্রা এবং চতুরস্র বা চার মাত্রার তালেরও উল্লেখ আছে।

কিন্তু সামগানের সাধনার কথা সবি পাই ছান্দোগ্যউপনিষদে। ছন্দোগ অর্থাৎ ছন্দই যার গতি—সেই ছিল সুরের অন্য নাম। তাই ওই ছান্দোগ্য উপনিষদেই রয়েছে স্বরসাধন, শ্রুতিসাধন, শব্দউচ্চারণ, পঞ্চা-বয়ব ও সপ্তাবয়ব বা পাঁচ পর্দা ও সাত পর্দার ক্রমসাধনের পদ্ধতি।

তখনকার দিনে স্বরসাধনা করতে হতো 'ওম্' এই শব্দের সাহায্যে উৎগীথ প্রক্রিয়ায়। 'উৎ' হচ্ছে তারা, 'গী' হচ্ছে মুদারা আর 'থ' হচ্ছে উদারা। অর্থাৎ সুর ধরতে হতো চড়ায় ক্রমে নামিয়ে আনতে হতো খাদে। চড়ায় সুর ধরলে একটি মস্ত সুবিধা এই হয় যে—সভায় যতই কেন কলরব হোক—সুর ধরার সংগে সংগে শ্রোতারা সচকিত হয়ে শান্ত হন। অবশ্য আজকাল তো সভায় মাইক ব্যবহার হয়, তাই সুর মুদারা বা উদারার মাঝখান থেকে ধরলেও চলে। কিন্তু সেই পুরাকালে গলার জোরেই সভা ঠান্ডা করতে হতো। তারো বড় কথা ছিল—সুর দিয়ে শুধু জনসভা নয় আরো দূরে ব্রহ্ম পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করতে হতো সাধককে।

সংগীত শাস্ত্রে আজো তিনটি মত প্রচলিত—একটি হচ্ছে ব্রহ্মার, একটি তাঁর পুত্র নারদের আর একটি হনুমানের। হনুমান তো পবন বা বায়ুর পুত্র বলেই বিখ্যাত। নারদ অর্থে বোঝায় প্রবাহিত বায়, যা রস বা জল দান করে—আর ব্রহ্মা থাকেন হংসা-সনে। হংস শব্দের গূঢ় অর্থ হচ্ছে শ্বাস বা বায়ুর ক্রিয়া। অর্থাৎ সুরের সাধনা হচ্ছে মূলত প্রাণায়াম বা বায়ুর ক্রিয়া। সেই পথেই তো এগোতে হয় পরমব্রহ্মের দিকে।

সামগানের পরের যুগে বাল্মীকি মুনি তন্ত্রীলয় সমন্বিত রামায়ণ গান প্রচার করেন। রামায়ণে আছে চব্বিশ হাজার শ্লোক। গায়ত্রী ছন্দের চব্বিশটি অক্ষরের প্রত্যেক অক্ষরকে এক হাজার শ্লোকে রূপ দিয়েছেন বাল্মীকি। ওই রামায়ণে আছে সাতটি কান্ড—তার মধ্যে দিয়েও সপ্তস্বরের বিস্তার ঘটেছে।

তারপর বেদব্যাস রচনা করলেন লক্ষ-শ্লোকী মহাভারত। তাতে আছে আঠারোটি পর্ব। আঠারোটি পর্বে আঠারোটি পর্দার কথাই লুকোনো আছে। সাধারণত মানুষের গলায় আঠারোটি পর্দার বেশী প্রকাশ পায় না—একথা সে যুগেও জানা ছিল। দৈবাৎ কোন সাধক পূর্ণ ত্রিসপ্তক বা একুশটি পর্দা গলায় বের করতে পারেন।

ক্রমে পুরাণ, ভাগবত, গীতা, চন্ডী প্রভৃতি যত কিছুই তৈরি হলো তা সবি ছিল গেয়। গীতায় তো বলাই হচ্ছে—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা।।

আরো পরের যুগে যে সব সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি রচিত হলো—তাও তো সব গান। বেশী কথা কি বলব—দুর্গাপূজার প্রত্যেকটি মন্ত্রে নির্দেশ দেয়া আছে সেটি কোন রাগে ও কোন তালে গাইতে হবে। কিন্তু সেই চর্চা দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ঠিক সেইভাবেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—বৌদ্ধসাধনার অংগ "চর্যাপদ"—যা ছিল বাংলা ভাষার একেবারে আদিরূপ। সে-গুলিও ছিল গান, বৌদ্ধসাধনাপদ্ধতির নানা মর্মকথা নিহিত ছিল সেই গানে।

জয়দেবের পদাবলীও গান—তাই যদিও তা সংস্কৃতে লেখা—তবু আজও পালাকীর্তন গানের অংগীভূত। সেইভাবে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনের পদাবলী আজও প্রচলিত। আসলে সেগুলি কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনার পদ্ধতির কথাই বলে—বিশেষ করে ভাবসাধনার কথা।

আরো পরের যুগে আউল, বাউল ও সাঁই সম্প্রদায় তাঁদের সাধনার তত্ত্ব প্রচার করলেন গানের মাধ্যমেই। আর শাক্ত-সাধকরাও ঐ পথেই অগ্রসর হলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর গীতাঞ্জলির জন্যেই জগৎবিখ্যাত। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রজনী সেন, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সবাই গিয়েছেন ঐ গানের পথ ধরেই।

কেবল মুসলমান আমলে কিছুকালের জন্যে পথ জগদীশ্বরের দিক থেকে বেঁকে দিল্লীশ্বরের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু তারও প্রথম দিকে সব গানের বাণীগুলি ছিল—সাধনার দ্যোতক—যদিও সুরের মধ্যে এসে গিয়েছিল দরবারী ঠাট। শেষ পর্যন্ত খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরীর রং লাগায় বাণীর চালও গেল বদলে। তবে ঐ যুগেই আবার দেখা দিলেন মরমিয়া সাধকরা—কবীর, দাদু, নানক, মীরাবাঈ প্রভৃতি যাঁদের অগ্রণী—তাঁরা আবার গানের ধারাকে সাধনার দিকে ঈশ্বরের দিক বইয়ে দিলেন। দাক্ষিণাত্যে কিন্তু গানের পথ আদিকাল থেকে আজও পর্যন্ত সাধনার দিকেই আছে।

এখানে একটি কথা না বললে নয় যে, রুচির পরিবর্তনে বাণীর যতই কেন পরি-বর্তন হোক আদি রাগ-রাগিণীর অলৌকিক প্রভাব দেখা যায় প্রকৃতির ওপরে। তার প্রমাণ আমাদের কালেই দিয়েছেন বিখ্যাত গুণী পন্ডিত ওংকারনাথ মেঘমল্লার রাগিণীর আসর বসিয়ে বিষম খরার দিনে বর্ষা নামিয়ে। আরো এক কথা, মার্গসংগীতে বাণী তো মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে সুর বা স্বর—যা প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করে আ, ই, উ, এ, ও এই পাঁচটি স্বরবর্ণে। এই স্বর যত দীর্ঘ হয় ততই তা যায় ঈশ্বরের দিকে—লীন হয়ে যায় পরম তত্ত্বে। যার অতি অপূর্ব উদাহরণ দেখিয়ে গেলেন এই তো সেদিন ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেব—ওয়ক্‌ৎ হো গিয়া—বলে গান করতে বসেই দেহরক্ষা ক'রে।

এখন যন্ত্রসংগীতের কথাও না বললে নয়। যন্ত্রে তো কোন বাণী প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় শুধু সুর ও ছন্দ। কিন্তু কি আশ্চর্য সেই যন্ত্রের সংগীতও আকুল ক'রে তোলে সবাইকে। বলাই বাহুল্য যে ঠিক সুরটি ও ছন্দটি লাগলেই তা সম্ভব।

গানের পথ আমাদের সামনে সেই পরম শক্তির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিক এই প্রার্থনা করি। সেই আদিযুগের ঋষিদের নির্দেশে আমরাও যেন বলতে পাই—

"লোকদ্বারং অপাবৃণু
পশ্যেম ত্বা বয়ং রাজ্যায়।।"

শার্লক হোম্‌স (৭)

অদ্রীশ বর্ধন

১৮৭০ সাল। লণ্ডন শহর।

জিনিসপত্র তখন খুব শস্তা। মধ্যবিত্ত গেরস্তের পক্ষে লণ্ডন শহরে থাকা খুব মুস্কিলের ব্যাপার নয়।

তা সত্ত্বেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন বেচারী শার্লক হোম্‌স। টেনেটুনে একদিকের অভাব মেটান তো আর একদিকে নেই-নেই থেকেই যায়। সামান্য মাসোহারা পাঠান বাবা—তা দিয়ে কোনমতে পকেট খরচ চলে। লণ্ডন শহরে দুবেলা খেয়েপরে মাথাগুঁজে থাকা যায় না।

কাঁহাতক আর লড়াই করা যায়। মনস্থির করে ফেললেন হোম্‌স। হয় শহর ছেড়ে লম্বা দেবেন, আর না হয় জীবনধারণের মান এমন নামিয়ে আনবেন যাতে ঐ টাকার মধ্যে কুলিয়ে যায়।

যেদিন মন বেঁধে ফেললেন হোম্‌স, সেইদিনই পিকাডিলি সার্কাসে এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর যিনি শার্লক হোম্‌সের জীবনের একটি বৈচিত্র্যময় অধ্যায়ের পাতা খুলে দিয়ে গেলেন।

পিকাডিলি সার্কাস দিয়ে আনমনে হাঁটছিলেন হোম্‌স। এমন সময়ে কাঁধে টোকা পড়ল।

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন হোম্‌স এবং পরমুহূর্তে ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত চোখে সোল্লাসে বললেন—"আরে! লর্ড পিটার যে!"
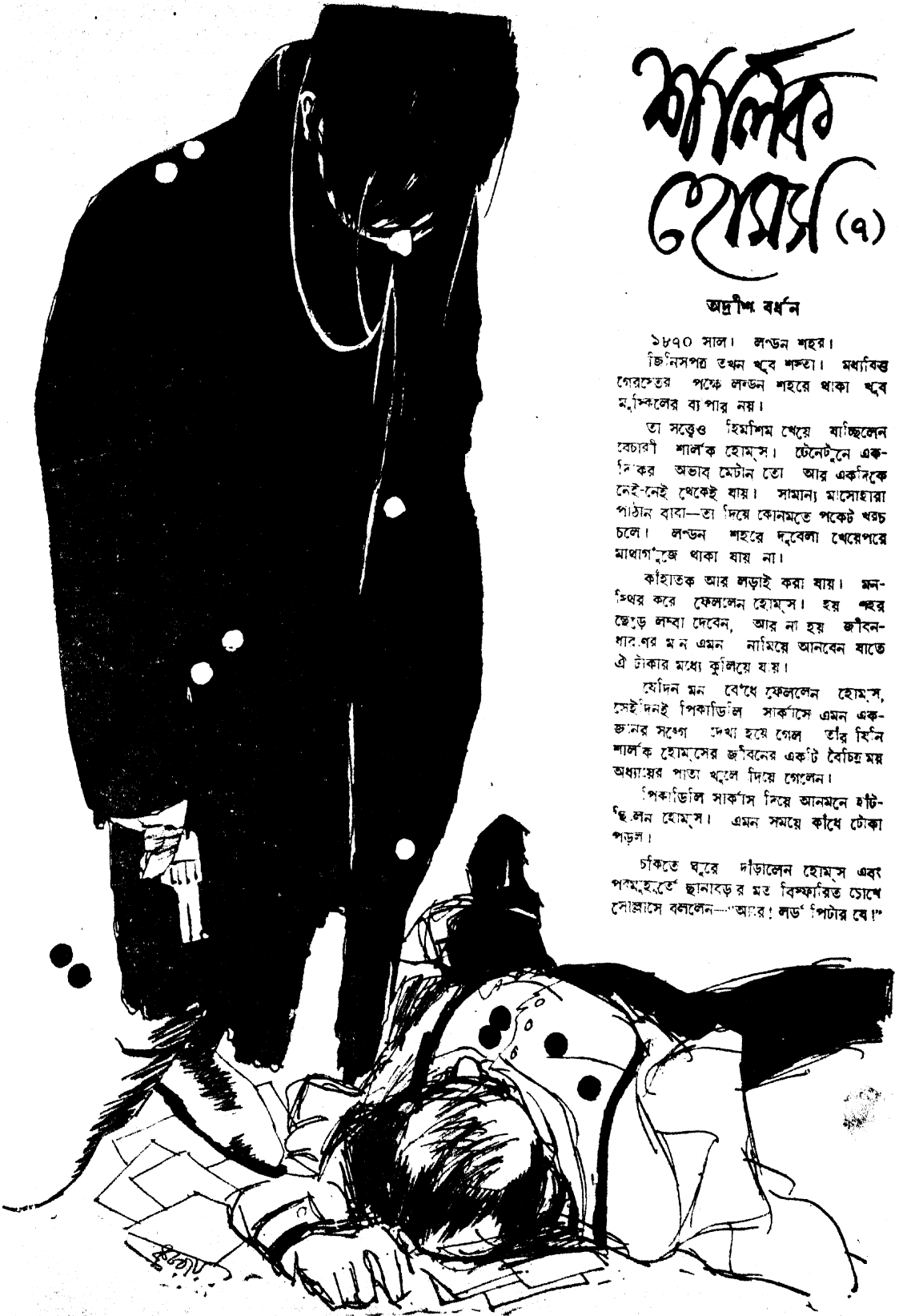
লর্ড পিটার! শার্লক হোম্‌স যখন কেম্ব্রিজের ছাত্র, তখন তিনিও একই কলেজে আন্ডারগ্রাজুয়েট।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন লর্ড পিটার নামধারী সুদর্শন যুবক—"প্লীজ, আর খেতাব নয়। যে নামে আমার পেশায় আমি পরিচিত, সেই নামেই সবাই আমাকে চিনুক —এই আমি চাই।"

"তোমার আবার পেশা কি? নতুন নামই বা কি?" ভুরু তুলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন হোম্‌স।

"ল্যাংডেল পাইক, অভিনেতা," বাতাসে মাথা ঠুকে থিয়েটারী ঢংয়ে জবাব দিলেন লর্ড পিটার।

অট্টহাস্য করে উঠলেন শার্লক হোম্‌স। কেননা, রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভের মত লর্ড পিটারও ইংল্যান্ডের এক প্রাচীন রাজ-বংশের বংশধর।

"বন্ধু দাঁত বার করে হেসো না। জানো, আমার বাবা এজন্যে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন?" গম্ভীরমুখে বললেন ল্যাংডেল পাইক।

"তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে তুমিও শুনে রাখো বন্ধু, আমার বাবাও আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন," চোখ নাচিয়ে বললেন হোম্‌স।

"ক্যাপিটাল। তাহলে চলে এস আমার ক্লাবে। লাঞ্চ খেতে খেতে সব শোনা যাবেখন।"

সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন হোমস। সেন্ট জেম্‌স স্ট্রীটে ল্যাংডেল পাইকের ক্লাবের খানার নাম শুনলেই তখন পেটুক মানুষদের জিভে জল এসে যেত।

ঘন্টা কয়েক পরে ভাগাভাগি করে এক বোতল পোর্ট মদ গিলতে গিলতে ল্যাংডেল পাইক বললেন—"একটা খাসা মতলব মাথায় এসেছে। চেহারাটা তোমার খুবসুরৎ না হলেও কদাকার নয়। সবচাইতে বড় কথা, মাথায় তুমি তালগাছের মত। গলার যা জোর —তা ফুটলাইটের ওদিকে পৌঁছোবে। 'হ্যামলেট'-এ একটা ছোট্ট 'পার্ট', তোমাকে মানাবে ভাল। আমাদের বেশির ভাগ নাটকই অবশ্য শেক্‌সপিয়ারের। আরে দোস্ত, চল এখুনি ঢুঁ মারা যাক থিয়েটারে—মহড়াও হয়ে যাক। যাত্রার অধিকারী হলেও বুড়ো সাসানফ লোক খারাপ নয়। ভাল কথা, অভিনয়-টভিনয় আসে তো?"

"তা তো জানি না, কখনো চেষ্টাও করিনি," বলেছেন শার্লক হোম্‌স।

মঞ্চাভিনয় শুরু করে নতুন নাম নিলেন হোম্‌স। 'উইলিয়াম শার্লক স্কট হোম্‌স' নামটাকে কেটেকুটে এনে দাঁড় করালেন 'উইলিয়াম এস্‌কট'-এ।

সমালোচকরাই লিখে গেছেন, হাউইয়ের মত খ্যাতির গগনে উঠে গেছেন 'উইলিয়াম এস্‌কট'। বিস্ময়কর এই সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর চেহারা আর মুখ—যা দর্শক-সাধারণের মনে স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়ে যেত। চওড়া উঁচু কপাল, অনুভূতি-ব্যঞ্জক ভুরু, শাণিত নাক, পাতলা ঠোঁট, শক্ত চোয়াল, তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী ধূসর চোখ আর ঢেউ-খেলানো গাঢ় বাদামী রং-এর চুল দিয়ে চকিতে দর্শকমন জয় করে ফেলতেন উই-লিয়ম এস্‌কট।

ফাঁকি দিয়ে বড় হওয়া শার্লক হোম্‌সের কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। তাই অভিনয়-জীবনে এসেও পড়াশুনা ছাড়লেন না। মঞ্চ-ইতিহাস আর অভিনয়ের কায়দাকানুন সম্পর্কে বিস্তর কেতাব সংগ্রহ করে পড়ে ফেললেন। রূপসজ্জা আর পোশাক নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। মঞ্চ-সজ্জা আর আলোকসম্পাতের ব্যাপারেও যথেষ্ট মাথা খাটালেন।

'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ক্যাসিয়াসের ভূমিকায় হোমস এত নাম করে ফেললেন যে বুড়ো সাসানফ ঠিক করলেন তাঁকে নিয়ে আমেরিকা পর্যটনে বেরুবেন।

১৮৭৯ সালের ২৩শে নভেম্বর শুরু হল সমুদ্রযাত্রা। দশ দিন পরে দলবল নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছোলেন সাসানফ। মঞ্চস্থ করলেন শেক্‌সপীয়ারের 'দ্বাদশ রজনী' নাটক এবং এই একটা নাটকই আমেরিকার বিভিন্ন শহরে একশো আটাশ রজনী অভিনীত হল।

নিউইয়র্ক শহরেই উইলসন হার্গ্রেভ-এর সঙ্গে আলাপ হয় হোম্‌সের। পরে পুলিশের 'বড় অফিসার হলেও (নাচিয়ে মূর্তিগুলো গল্প দ্রষ্টব্য) সে সময়ে হার্গ্রেভ ছিলেন হোম্‌সের মতই বেসরকারী গোয়েন্দা। 'ভ্যান্ডারবিল্ট আর এগম্যান' এর মামলায় (সাসেক্‌স ভ্যাম্পায়ার গল্প দ্রষ্টব্য) হোম্‌সই তাঁকে সমাধান সূত্র ধরিয়ে দেন। সবুজ-ঘরের দরজা যে 'বাইরে' থেকে ভাঙা হয়নি, 'ভেতর' থেকে ভাঙা হয়েছে, এ তথ্য হোম্‌সের মুখে শুনেই সিন্দুক-চোরকে পাকড়াও করতে পেরেছিলেন হার্গ্রেভ এবং 'এগম্যান'-এর স্বরূপও আবিষ্কার করে-ছিলেন।

ফিলাডেলফিয়াতে থিয়েটারের জন্যে কেনা একটা শটগানে পেনসিলভানিয়া স্মল আর্মস কোম্পানীর মার্কা দেখেছিলেন হোম্‌স এবং 'দি ভ্যালী অভ ফিয়ার' মামলায় তাই তিনি অন্ধকারে আলো দেখে-ছিলেন।

বাল্টিমোরে গিয়ে ঝিনুকের আস্বাদ লাভ করেন হোম্‌স (দি সাইন অভ ফোর গল্প দ্রষ্টব্য।) এবং গ্রীষ্মের এক তপ্ত মধ্যাহ্নে স্থানীয় পুলিশের আমন্ত্রণে গিয়ে অ্যাবারনেট্টি ফ্যামিলির রোমাঞ্চকর কেসের জট ছাড়িয়ে দেন নাটকীয়ভাবে। দারুণ গরমে মাখনের মধ্যে পার্সলি কতটা ডুবে গেছে—শুধু এই দিকেই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন হোম্‌স।

শিকাগোতে সর্বপ্রথম লুঠেরা ডাকাত-দের সঙ্গে মোলাকাৎ ঘটে গোয়েন্দা-অভিনেতা হোম্‌সের (পাঁচটি কমলার বীচি গল্প দ্রষ্টব্য।)

আমেরিকা আর আমেরিকানদের ভাল-বেসেছিলেন শার্লক হোমস। তাই 'সম্ভ্রান্ত ব্যাচেলরের অ্যাডভেঞ্চার' মামলায় বলে-ছিলেন—"যে কোনো আমেরিকানের সঙ্গে মেলামেশায় আমি আনন্দ পাই। আমি বিশ্বাস করি, অতীতের কোনো রাজা বা মন্ত্রীর ভুল নীতি একই বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার থেকে আমাদের সন্তানদের বঞ্চিত করতে পারবে না। সে রাষ্ট্রের পতাকায় ইউনিয়ন জ্যাক আর তারা ও রেখা একসঙ্গে শোভা পাবে।"

১৮৮০ সালে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন হোম্‌স। হাতে কিছু টাকা জমেছিল। তাই নিয়ে আবার শুরু করলেন অপরাধ চর্চা। আইন, শারীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যার সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র নিয়ে মেতে রইলেন দিনের পর দিন।

ডিটেক্‌টিভ শার্লক হোম্‌সের নামডাক তখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। কেসের পর কেস আসতে লাগল মন্টেগু স্ট্রীটের বাসভবনে।

ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল আধখানা পৃথিবীর ওপারে—ভূগোলকের ঠিক উল্টো দিকে—যে ঘটনা না ঘটলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কনসাল্টিং ডিটেক্‌টিভের বহু কীর্তিকাহিনী জনসাধারণের অগোচরে থেকে যেত।

Malwand-এর মরণপণ যুদ্ধে কাঁধে জেজেল বুলেট বিদ্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন বার্কশায়ারের আর্মি সার্জন ডক্টর জন এইচ ওয়াটসন। সেদিন খুনে গাজীদের হাতে তিনি নির্ঘাৎ ধরা পড়তেন যদি না তাঁর একান্ত অনুরক্ত অসমসাহসিক আর্দালী মুরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিত তাঁর জখম দেহ। মুরে-ই ওয়াটসনকে ফিরিয়ে আনে বৃটিশ এলাকায়।

শার্লক হোম্‌স তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলেন না। তিনি তখন মেতেছেন অভিনয় সাধনায়—যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার ফলে উত্তরকালে বহু মামলায় অসামান্য জয়লাভ ঘটেছে তাঁর ভাগ্যে।

এমনি একটি মামলা 'চার্লস অগাস্টাস মিল্ভার্টন'।

দীর্ঘদিন এই ঘটনা জনগণের সামনে হাজির করতে পারেননি ডক্টর ওয়াটসন। কিন্তু উপাখ্যানের মূল চরিত্র যখন আইনের নাগালের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেলেন, তখন লেখনী তুলে নিলেন ওয়াটসন। তবুও, যাতে কারও কোনরকম ক্ষতি না হয়, তাই মূল ঘটনার একটু-আধটু অংশ বেমালুম চেপে গেলেন। শার্লক হোম্‌স আর ডক্টর ওয়াটসনের যুগ্ম কর্মজীবনের এক অতি-বিচিত্র অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ বিবরণ নিয়েই এ গল্পের সৃষ্টি। ঠিক কোন সময়টিতে ঘটনার শুরু এবং শেষ, তা কারও পক্ষে যাতে হিসেব করে বার করা সম্ভব না হয়, তাই তারিখ এবং কিছু কিছু খুঁটিনাটিরও কোনরকম উল্লেখ করেন নি ওয়াটসন। পাঠকের কাছে সেজন্যে অবশ্য তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

অভ্যাসমত উদ্দেশ্যবিহীন সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন হোম্‌স আর ওয়াটসন। কুয়াশা-ঘন, হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যা। ছটা নাগাদ ঘরে ফিরে হোম্‌স বাতিটা জ্বালাতেই আলো গিয়ে পড়ল টেবিলের

ওপর রাখা একটা ভিজিটিং কার্ডের ওপর।

কার্ডটা তুলে নিলেন হোমস্। একবার মাত্র চোখ বুলোলেন। তারপরেই পরম ঘৃণাভরে ধুত্তোর বলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে মেঝের ওপর।

কার্ডটা তুলে নিয়ে ওয়াটসন দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে :

চার্লস অগাস্টাস্ মিলভারটন
অ্যাপলডোর টাওয়ারস্
হ্যাম্প্স্টেড

এজেন্ট।

"লোকটা কে হে?" জিজ্ঞেস করলেন ওয়াটসন।

"লণ্ডনের জঘন্যতম লোক", আগুনের সামনে বসে পড়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিলেন হোমস্। "কার্ডের পেছনে কিছু লেখা আছে নাকি?"

কার্ডটা উল্টে নিয়ে পড়লেন ওয়াটসন—"সন্ধ্যা ছটায় আসছি—সি এ এম।"

"হুম! আমার সময়ও হয়ে এল দেখছি। ওয়াটসন, চিড়িয়াখানায় সাপের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিলবিলে, হড়হড়ে, পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত প্রাণীগুলোর কালো মৃত্যুর মত চকচকে চোখ আর কুটিল, চ্যাপ্টা মুখের দিকে তাকালে তোমার গা শিরশির করে না। আপাদমস্তক রি-রি করে ওঠে না অপরিসীম ঘৃণায়? সারা জীবনে পঞ্চাশজন খুনীর সঙ্গে বুদ্ধির পাঞ্জা লড়েছি আমি, কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বদ লোকটার নাম শুনলেও আমার এতটা ঘৃণা আর বিদ্বেষ জাগে না, যতটা হয় ঐ লোকটার নাম শুনলে। ওর ছায়া মাড়ানোর প্রবৃত্তিও আমার নেই। তবুও ব্যবসার খাতিরে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আমার উপায় নেই। কেননা, সত্যি কথা বলতে কি, আমার আমন্ত্রণ রাখতেই আজকে মিলভারটন আসছে এখানে।"

"কিন্তু লোকটা কে, তা তো বললে না?"

"বলছি, ওয়াটসন, বলছি। দুনিয়ায় যত ব্ল্যাকমেলারের নাম শুনেছ, তাদের সম্রাট বলা যায় চার্লস্ অগাস্টাস মিলভারটনকে। যে পুরুষ আর যে নারীর গূঢ় খবর আর সামাজিক মানসম্মান মিলভারটনের হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, ভগবান তাঁদের রক্ষে করুন। ঠোঁটের কোণে অম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে অথচ মার্বেল পাথরের মত কঠিন হৃদয় নিয়ে শোষণ শুরু হবে তার, যতক্ষণ না শুধু ছিবড়েটুকু অবশিষ্ট থাকে। লোকটার প্রতিভা আছে এবং শোষণবিদ্যায় তার এতটা পাণ্ডিত্য থাকার ফলে এ জাতীয় অন্য যে কোন ব্যবসায় সে প্রথিতযশা হতে পারত। ওর পদ্ধতি এই রকম : সুকৌশলে মিলভারটন সবাইকে জানিয়ে দেয়, বিত্ত বা খ্যাতির জীবনে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁদের জীবনের গূঢ় তথ্য লেখা কোন চিঠি অতি উচ্চমূল্যে কিনতে সে প্রস্তুত। অন্দর-মহলের বিশ্বাসঘাতক চাকর বা ঝি-রাই শুধু এ ধরনের চিঠি তার কাছে পাঠায় না, স্নেহ-ভালবাসা-আস্থা অর্জন করে যারা মেয়েদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এমন ভদ্র-বংশসম্ভূতাও অর্থের লোভে ভরিয়ে তোলে মিলভারটনের চিঠির ঝাঁপি। এদিক দিয়ে মোটেই বায়কুণ্ঠ নয় সে। আমি জানি, দু লাইনে লেখা একটা চিরকুটের জন্যে একজন পেয়াদাকে সে সাতশ পাউণ্ড দাম দিয়েছিল, আর তার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছিল একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার। বাজারে হেন খবর নেই, যা মিলভারটনের কাছে যায় না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবরও জমা পড়ে তার দপ্তরের খাতায়। তাই এ শহরের শত শত লোক তার নাম শুনলেই ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কবে কোথায় কিভাবে যে তার মরণ-টিপুনি শুরু হবে, তা কেউ জানে না। কেননা, দিন এনে দিন খাওয়ার মত অবস্থা তার নয়; অর্থের যেমন তার অভাব নেই, তেমনি অভাব নেই কূট বুদ্ধির। ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে হাতের তাস হাতেই রেখে বছরের পর বছর শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে সে। তারপর যখন বোঝে চড়া বাজী জেতার সময় এসেছে, তখন ছাড়ে তার হাতের তাস। তোমাকে তো বললামই, লণ্ডনের জঘন্যতম লোক হল এই মিলভারটন। সাধারণ দুর্বৃত্তের সঙ্গে এর তুলনা হয় না, কেন জান? রক্ত গরম হয়ে গেলে মারপিট, খুন-জখম করা এক জিনিস, আর ধীরে-সুস্থে হিসেবমত অবসর সময়ে মানুষের দিবানিশার শান্তি কেড়ে নিয়ে তার স্নায়ু-মণ্ডলে বিপর্যয় ডেকে এনে পরিপুষ্ট টাকার থলিকে আরও পুষ্ট করার প্রচেষ্টা আর এক জিনিস।"

বন্ধুবরকে এ রকম তীব্র আবেগ-থর-থর ভাষায় কথা বলতে খুব কমই দেখেছিলেন ওয়াটসন।

এখন বললেন—"কিন্তু আইনের আওতায় কি সে পড়ে না?"

"পড়ে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোন মূল্যই নেই। ধর, এক মহিলার সর্বনাশ আসন্ন। সে সময়ে মিলভারটনকে কয়েক মাসের জন্যে শ্রী-ঘরে পাঠিয়ে তাঁর কোন লাভ তো হচ্ছেই না, বরং মিলভারটন জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বনাশও হচ্ছে সম্পূর্ণ। এইজন্যেই তার শিকাররা পাল্টা ঘা দিতে সাহস পায় না। নির্দোষ লোককে শোষন করার চেষ্টা করলে অবশ্য ফলাফল হত অন্যরকম। কিন্তু এদিক দিয়ে পাকা শয়তানের মত ক্ষুরধার বুদ্ধি তার। না হে, না, ওর সঙ্গে লড়তে গেলে অন্য পন্থা ভাবতে হবে আমাদের।"

"এমন লোককে এখানে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?"

"কারণ, এক স্বনামধন্যা মহিলা তাঁর কেস দিয়েছেন আমার হাতে। কেসটা শুনলে সত্যিই করুণা হয়, ওয়াটসন। গত মরশুমে প্রথম আবির্ভাবেই সেরা সুন্দরী হিসেবে যিনি নাম করেছেন, ইনিই সেই লেডী ইভা ব্ল্যাকওয়েল। দিন পনেরোর মধ্যেই আর্ল অভ ডোভার কোর্টের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। এই সময়ে ভদ্রমহিলার অবিবেচকের মত লেখা কয়েকটি চিঠি এসে পড়েছে এই মানুষ-পিশাচটার খপ্পরে। অবিবেচনা ছাড়া কি আর বলব, ওয়াটসন। চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের এক বিত্তহীন সম্ভ্রান্ত যুবককে। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পক্ষে চিঠিগুলো যথেষ্ট। মোটা টাকা না পেলে মিলভারটন ওগুলো পাঠিয়ে দেবে আর্লের কাছে। আমার ওপর ভার পড়েছে তার সঙ্গে দেখা করে যতদূর সম্ভব ভাল শর্তের ভিত্তিতে বিষয়টার ফয়সালা করার।"

ঠিক সেই মুহূর্তে খটাখট খট খট শব্দের সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল নিচে রাস্তার ওপর। জমকালো একটা জুড়িগাড়ী দাঁড়িয়ে নিচে। জোরালো বাতি দুটোর আলো ঠিকরে পড়ছিল ঘোড়া-দুটোর অপূর্ব-সুন্দর গাঢ় লালচে-বাদামী রং-এর পালিশ-করা কাঁধের ওপর থেকে। একজন পেয়াদা দরজা খুলে ধরলে এবং খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট এক পুরুষ নেমে এল নিচে। লোকটার গায়ে রাশিয়ার অ্যাসট্রা-খান অঞ্চলের ভেড়ার লোমশ-চামড়ার ওভার-কোট। এক মিনিট পরেই ঘরে ঢুকল সে।

চার্লস অগাস্টাস মিলভারটনের বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। ধীমান পুরুষের মত মস্ত বড় সুগঠিত মাথা। গোলগাল, মাংসল শ্মশ্রুবিহীন মুখ। ঠোঁটের কোণে যেন ফ্রেমে-বাঁধানো অষ্টপ্রহরের হিমশীতল হাসি। আর, চওড়া সোনার চশমার পেছনে একজোড়া তীক্ষ্ণ ধূসর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি। লোকটার হাব-ভাবে মিঃ পিকউইক-সুলভ হিতৈষণার ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন ছদ্মবেশেও সামান্য ত্রুটি থেকে গেছে—ফ্রেমে-আঁটা নকল হাসি আর অশান্ত, অন্তর্ভেদী চোখের সুকঠিন ঝিকিমিকির জন্যে। কণ্ঠস্বর মুখের মতই মসৃণ, পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঢুকেই হৃষ্টপুষ্ট হাত বাড়িয়ে বিড়বিড় করে দুঃখপ্রকাশ করে এগিয়ে এল সে।

হাতটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গ্র্যানাইট-কঠিন মুখে হোমস তাকালো তার দিকে। আরও ছড়িয়ে পড়ল মিলভারটনের হাসি। যেন নেহাতই নাচার হয়ে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে

খুলে ফেলল ওভারকোট। তারপর পরিপাটি করে ভাঁজ করে চেয়ারের পেছনে রেখে আসন গ্রহণ করল।

ওয়াটসনকে দেখিয়ে বলল—"এঁর সামনে কথা বলা যাবে তো?"

"ডক্টর ওয়াটসন আমার বন্ধু এবং পার্টনার।"

"বেশ, বেশ, মিস্টার হোমস্। আপনার মক্কেলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই বললাম কথাটা। এ রকম একটা দুরূহ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা—"

"ডক্টর ওয়াটসন এ সম্বন্ধে আগেই সব শুনেছেন।"

"তাহলে সরাসরি কাজের কথাই হোক। লেডী ইভার তরফে আলোচনা করতে চান আপনি। আমার শর্ত মেনে নেওয়ার অধিকারও নিশ্চয় তিনি আপনাকে দিয়েছেন?"

"শর্তটা কি, আগে তাই বলুন।"

"সাত হাজার পাউন্ড।"

"আর যদি তা না দেওয়া যায়?"

"মাই ডিয়ার স্যার, আমার পক্ষে সে-আলোচনা বড়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু ১৪ তারিখে টাকা না দিলে ১৮ তারিখে যে বিয়ে হবে না, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

লোকটার অসহ্য হাসি আগের চাইতেও খুশি-খুশি হয়ে ওঠে। ক্ষণকাল চিন্তা করেন হোমস্।

তারপর বলেন—"আপনি এমনই অসম্ভব শর্ত আরোপ করছেন যে, তা মেনে নেওয়া যায় না। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবশ্য আমিও ওয়াকিবহাল। আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেও দ্বিধা করবেন না লেডী ইভা। কাজেই আমি তাঁকে বলব, ভবিষ্যৎ স্বামীর কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলে তাঁর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে।"

নিঃশব্দে হেসে উঠলেন মিলভারটন।

"দেখছি, আর্লকে আপনি একেবারেই চেনেন না।"

হোমসের মুখে পরাজয়ের চিহ্ন দেখে ওয়াটসন বুঝলেন আর্লকে চিনতে তাঁরও বাকি নেই।

তবুও জিজ্ঞেস করেন—"এমন কি ক্ষতিকর কথা আছে চিঠিগুলোয়?"

মিলভারটন জবাব দেন—"প্রত্যেকটি চিঠিই বেজায় চনমনে—প্রাণরসে ভরপুর। চমৎকার চিঠি লেখেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু আর্ল অভ ডোভারকোর্ট যে এই চমৎকারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করবেন না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সে-কথা থাক, আপনি যখন অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছেন, তখন না-হয় যবনিকা পড়ুক এ-প্রসঙ্গে। নিছক ব্যবসার কথাই বলতে এসেছি আমি। আপনি যদি মনে করেন, এ-পত্রগুচ্ছ আর্লের হাতে সমর্পণ করলেই আপনার মক্কেলের স্বার্থ-রক্ষা পাবে, তখন না-হয় তাই করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে এই সামান্য লিপিকটা ফিরিয়ে আনার জন্যে এতগুলো টাকা জলে ফেলাও আপনার পক্ষে বোকামো।"

বলে, দাঁড়িয়ে উঠে ভেড়ার চামড়ার লোমশ কোটে হাত রাখল মিলভারটন।

রাগে, অপমানে ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে ওঠে হোমসের মুখ।

"সবুর। ধীরে-সুস্থে কাজ করা দেখছি আপনার ধাতে নেই। এ-ব্যাপারে কোনরকম কেলেঙ্কারী যাতে না ছড়ায়, সে-বন্দোবস্ত যেভাবেই হোক আজ আমাদের করতেই হবে।"

আবার আসন গ্রহণ করে মিলভারটন।

বলে, "আমি জানতাম, এ-দিকটাও আপনি ভাববেন।"

হোমস্ বলেন, "লেডী ইভা খুব ধনবতী নন। দু' হাজার পাউন্ড দেওয়া মানেই তাঁর স্বল্প বিত্তের প্রায় সবটুকুই দিয়ে দেওয়া—আপনার দাবীমত সাত হাজার পাউন্ড দেওয়ার ক্ষমতা তো তাঁর একেবারেই নেই। কাজেই আমার অনুরোধ, আপনি অত চড়া দাম না হেঁকে ওই দু' হাজারেই চিঠিগুলো ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বিশ্বাস করুন, দু' হাজারের বেশি একটা কপর্দক দেওয়ার ক্ষমতাও লেডী ইভার নেই।"

আর একটু ছড়িয়ে পড়ে মিলভারটনের হাসি—দুই চোখে ঝিকমিক করে ওঠে কৌতুকের আলো।

"লেডী ইভার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যা বললেন, তা আমারও অজানা নয়। তবে কি জানেন, একটা বিষয় আপনাকে মানতেই হবে। যে-কোন মহিলার জীবনে তাঁর বিয়ের লগ্নটাই হল স্মরণীয়তম মুহূর্ত। এই সময়ে তাঁর প্রতিটি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তাঁর জন্যে কিছু-না-কিছু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মামুলী উপহার দেওয়াটা অনেকের মনঃপূত হয় না। তাই বলছিলাম, লণ্ডনের সেরা শামাদান আর মাখনভরা ডিস উপহার দিয়ে যতটা আনন্দ পাওয়া যাবে, তার চাইতেও বহুগুণ বেশি তৃপ্তি পাওয়া যাবে সামান্য এই পত্রগুচ্ছটি দিলে।"

"তা অসম্ভব", বললেন হোমস্।

"কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! তাহলে তো লেডী ইভার কপাল পুড়ল!" পকেট থেকে ইয়ামোটা একটা পকেটবই বার করতে করতে খামোকা গলা চড়িয়ে বললে মিলভারটন। "কুপরামর্শ শুনে যেসব মেয়েরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকে, তাদের দুর্গতির কথা না ভেবে পারলাম না। এই দেখুন!"

লেফাপার ওপর বংশ-প্রতীকের ছাপ-মারা একটা ছোট্ট চিরকুট দুই বুড়ো আঙুলের নাকের ওপর নাড়তে নাড়তে মিলভারটন বললে—"এ-চিঠিটা হল—নাঃ, কাল সকাল না হওয়া পর্যন্ত নামটা বলা সংগত হবে না। কিন্তু সে সময়ে এ-চিঠি গিয়ে হাজির হবে ভদ্রমহিলার স্বামীর হাতে। সামান্য কটা টাকা বই তো নয়, নিজের হীরেগুলোর মায়া ত্যাগ করলেই উঠে আসে সে টাকা। কিন্তু ভদ্রমহিলা বেজায় একগুঁয়ে। তা না হলে, ব্যাপার এতদূর গড়াতই না। আচ্ছা, অনারেবল মিস মাইলস আর কর্নেল ডোকিং-এর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার খবরটা

মনে আছে আপনার? বিয়ের মাত্র দু' দিন আগে কয়েকটি লাইন বেরোয় মর্নিং-পোস্টে; তা থেকেই আপনারা জানলেন সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। কিন্তু কেন? শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাত্র বারোশো পাউন্ড দিলেই সব ঝামেলা চুকে যেত। কি দুঃখের কথা বলুন তো? সেইজন্যেই তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনার দূরদর্শিতা দেখে। মক্কেলের মান-সম্মান, ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেওয়াটা আপনার মত কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে উচিত হচ্ছে কি? মিস্টার হোমস্, সত্যিই আমাকে আপনি অবাক করলেন।"

হোমস্ উত্তর দিলেন—"যা বললাম তা সত্য। আপনার দাবীমত অত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম, ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে আপনার যখন কোন লাভই হবে না, তখন যা পাচ্ছেন তাই নেওয়াই আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"ভুল করলেন, মিঃ হোমস, ভুল করলেন। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে আমার লাভ বই লোকসান হবে না। এক্ষেত্রে লাভটা অবশ্য হবে পরোক্ষভাবে এবং তা নিতান্ত সামান্য নয়। বর্তমানে এ ধরনের আট-দশটা কেস হাতে রেখে পাকাচ্ছি—শুধু ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে। একগুঁয়েমির কি কঠোর শাস্তি লেডী ইভাকে আমি দিয়েছি, এ খবর তাদের মধ্যে একবার ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এ নজীর কানে গেলে অবাধ্য হওয়ার কল্পনাতেও শিউরে উঠবে আমার মক্কেলরা। পয়েন্টটা বুঝেছেন নিশ্চয়ই?"

বিদ্যুতের মত চেয়ার থেকে ছিটকে গেলেন হোমস।

"ওয়াটসন, পথ আগলে দাঁড়াও। বেরোতে দিও না ঘর থেকে! ঠিক আছে। এবার স্যার, আপনার ঐ নোটবইতে আর কি-কি আছে দেখান দেখি আমাকে।"

ইঁদুরের মত ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের ধারে পিছলে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মিলভারটন।

পরমুহূর্তেই কোটের সামনের দিকটা ফেরাতেই চোখে পড়ল ভেতর পকেট থেকে ঠেলে বেরিয়ে-আসা বড় রিভলবারের কুঁদাটা।

শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললে মিলভারটন—"মিঃ হোমস, এর জন্যে আমি তৈরী হয়ে এসেছি। এরকম কাণ্ড প্রায়ই হয় কিনা, কিন্তু করে কোন লাভ আছে কি? আরে মশাই, আপনার বোঝা উচিত, অস্ত্র না নিয়ে আমি কোথাও যাই না। দরকার হলে গুলী চালাতেও দ্বিধা করি না এবং এক্ষেত্রেও করব না। আইনের সমর্থন যে পাব, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তাছাড়া, চিঠিসমেত নোটবই নিয়ে এখানে আসব, উজবুকের মত একথা ভাবতে পারলেন কি করে ভেবে পাচ্ছি না। অতটা বোকা আমাকে ভাববেন না। যাই হোক, এবার তো আমাকে যেতে হয়, জেন্টেলম্যান। আজ রাতেই আরো দু-একটা ছোটখাট অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। হ্যামপস্টেডে ফিরে

যেতেও অনেকটা সময় লাগবে। এক-পা এগিয়ে এসে কোটটা তুলে নিলে মিলভারটন। তারপর রিভলবারের ওপর হাত রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওয়াটসন অবশ্য একটা চেয়ার তুলেছিলেন, কিন্তু হোমস মাথা নাড়তে রেখে দিলেন যথাস্থানে।

বাতাসে মাথা ঠুকে সার্কাসী ঢং-এ গা-জ্বলানো হাসি হেসেই উধাও হয়ে গেল মিলভারটন। কয়েক মুহূর্ত পরেই দড়াম করে গাড়ীর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে এল এবং পরক্ষণেই রাস্তা কাঁপিয়ে দূরে হতে দূরে উধাও হয়ে গেল তার জুড়ি।

ট্রাউজার্সের পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে, বুকের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে, অপলক চোখে জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে অনড় দেহে বসে রইলেন হোমস। পুরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নীরব, নিশ্চল হয়ে ডুব দিয়ে রইলেন চিন্তার অতলে।

তার পরেই, যেন মতলব স্থির হয়ে গেছে, এমনিভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেলেন শোওয়ার ঘরে। একটু পরেই ছোকরা বয়েসের এক লম্পট মজুর হেলে-দুলে ফতোবাবুর মত ঘরে ঢুকল। ছাগল দাড়ি নেড়ে বাতির শিখায় মাটির পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে নেমে গেল রাস্তায়।

যাবার আগে বলে গেল—"ওয়াটসন, আমার ফিরতে দেরী হবে।"

রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লম্পট মজুর ছোকরার কৃশ মূর্তি।

ওয়াটসন বুঝলেন, চার্লস অগাস্টাস

মিলভারটনের বিরুদ্ধে শুরু হল ছদ্মবেশী শার্লক হোমসের অভিযান। কিন্তু তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, অভিযানের অন্তে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে তাঁদের।

বেশ কয়েক দিন ধরে এই বেশেই আনাগোনা করলেন হোমস। প্রতিদিনই নাকি তিনি হ্যাম্পসটেডে যাচ্ছেন এবং সময়টা সেখানে ভালই কাটছে, এ ছাড়া তাঁর মুখ্য আর কিছুই শুনতে পেলেন না ওয়াটসন।

তারপরেই একদিন দুরন্ত ঝড়ের রাতে ফিরে এলেন হোমস। হাহাকার শব্দে দরজা-জানলায় মাথাখুঁড়ে ফিরে যাচ্ছিল পাগলা হাওয়া।

"আরে ভাই, আমার কিছু খবরের দরকার ছিল।"

"কিন্তু সেজন্যে তো দেখছি গড়িয়েছো অনেকদূর।"

"এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমার নাম এস্কট। জলের পাইপ, সিসটার্ণ ইত্যাদি বসানো এবং মেরামত করাই আমার ব্যবসা। কারবার দিন-দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েটার সঙ্গে হাওয়া খেয়েছি আর এন্তার বক-বক করেছি। আরে গেল যা, সেসব কথা তো বলাও যায় না। দূর হোক ছাই, আমার যা-যা দরকার, সবই পেয়ে গেছি। মিলভারটনের বাড়ির খুঁটিনাটি এখন আমার নখদর্পণে।"

"কিন্তু হোমস্, মেয়েটা?"

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস্ বললেন, "মাই ডিয়ার ওয়াটসন, অত ভাবতে গেলে কি চলে? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ভালো কথা, আর একটা আনন্দের খবর আছে। অভিসার-অভিনয় করতে গিয়ে আমার এক প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়ে ফেলেছি। বাগে পেলে লোকটা নির্ঘাৎ আমার টুঁটি কেটে ছাড়বে। অহো, কি চমৎকার রাত!"

"আজকের আবহাওয়া তোমার ভাল লাগছে?"

"আবহাওয়াটা আমার কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী। ওয়াটসন, আজ রাতেই মিলভারটনের বাড়িতে সিঁদ দিতে চাই আমি।"

'এর জন্যে আমি তৈরী হয়ে এসেছি'

এ-মামলায় ছদ্মবেশে শার্লক হোমসের সেই হল শেষ অভিযান। ধড়াচূড়া খসিয়ে আগুনের ধারে পা ছড়িয়ে বসলেন হোমস্। তারপর নিজের মনেই নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। আপন মনে প্রাণখুলে হাসাটা অবশ্য শার্লক হোমসের বরাবরের অভ্যেস।

হাসতে হাসতেই বললেন, "ওহে ওয়াটসন, যদি বলি আমি বিয়ে করতে চলেছি, তাহলে নিশ্চয় তা বিশ্বাস করবে না?"

"নিশ্চয় না!"

"ভায়া, তাহলে তোমার পিলে চমকে দেওয়া যাক! আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।"

"মাই ডিয়ার হোমস্! আমার অভিনন্দন রইল—"

"মিলভারটনের বাড়ির ঝি-এর সঙ্গে।"

"সর্বনাশ! কি বলছো হোমস্?"

শুনেই তো ওয়াটসনের বুক ধড়াস করে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। অথচ হোমস্ কথাটা বললেন খুব ধীরে-সুস্থে দৃঢ়তার সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে ওয়াটসনের চোখের সামনে সারি সারি ছবির মত ভেসে উঠল এই দুঃসাহসের সাংঘাতিক পরিণতিগুলো—তদন্ত, গ্রেপ্তার, ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা আর সম্মানজনক কর্মজীবনের অসম্মানজনক পরিসমাপ্তি। শার্লক হোমস্ নিজেই তখন ওই জঘন্য মিলভারটনের হাতের পুতুল হয়ে পড়বেন। থাকতে গিয়ে বাধা দিয়েছেন ওয়াটসন—"হোমস্, কি করতে চলেছো, তা কি ভেবে দেখেছো?"

"মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, তলিয়ে না ভেবে কি এতদূর এগিয়েছি আমি? তুমি তো জানোই, ঝোঁকের মাথায় অবিবেচকের মত আমি কিছু করি না। বিকল্প পথ থাকলে কি এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি আমি নিতে যাই? এ-কাজ করতে গেলে কতখানি মানসিক বল থাকা দরকার, তা তো তুমি বোঝোই। এবার এস, যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা। আইনত একাজ অপরাধ সন্দেহ নেই, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে তা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত, তা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। জবরদস্তি করে পকেট-বইটা হাতানোর চাইতে সিঁদ দেওয়াটা এমন কিছু বেশি অপরাধ নয়—আর গায়ের জোরে নোটবই হাতানোর কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে গেছিলে।"

হোমসের যুক্তি মনে মনে তোলাপাড়া করে ওয়াটসন বললেন, "ঠিকই বলেছো। বে-আইনী উদ্দেশ্যে মিলভারটন যেসব জিনিস জমিয়ে রেখেছে তার বাড়িতে, সেগুলো ছাড়া অন্য কোন জিনিস অপহরণ না করলেই তোমার নৈশ অভিযানকে নৈতিক সমর্থন দেওয়া যায়।"

"এগ্‌জ্যাক্টলি। নৈতিক সমর্থন যখন রইলই, তখন ভাবতে হবে আমার ব্যক্তিগত ঝুঁকি নেওয়াটা উচিত হবে কিনা। আরে ভাই, সাহায্যের জন্যে মরিয়া হয়ে কোনো ভদ্রমহিলা যদি কোনো ভদ্রলোকের দ্বারস্থ হন, তখন কি এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো উচিত?"

"কিন্তু পাঁচজনের সামনে মাথা কাটা যাবে যে!"

"সেটাও তো ঝুঁকিরই একটা অংশ। কিন্তু এছাড়া চিঠিগুলো ফিরে পাওয়ার আর কোনো সম্ভাব্য পথ নেই। ভদ্রমহিলার টাকা তো নেই-ই, উপরন্তু এমন কোনো বন্ধুবান্ধব নেই যাকে এ-কথা বিশ্বাস করে বলা চলে। টাকা দেওয়ার মেয়াদ ফুরোচ্ছে আগামীকাল। কাজেই, আজ রাতে যদি চিঠিগুলো উদ্ধার করতে না পারি, তাহলে বুঝতেই পারছো, শয়তান মিলভারটন তার কথামত কাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ফলে, সর্বনাশ হয়ে যাবে বেচারী লেডী ইভার। এক্ষেত্রে হয় তাকে অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমাকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়, আর না হয় হাতের শেষ তাস ফেলে দেখতে হয় ফলাফলটা কি দাঁড়ায়। ওয়াটসন, এ-ব্যাপারটা এখন মিলভারটন

আর আমার চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধির আর শক্তির লড়াইয়ের প্রথমদিকটায় তোমার সামনেই সে আমাকে টেক্কা মেরে গেছে। এবার আমার সম্মান আর সুনামের প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। এ-যুদ্ধে তাকে নিপাত না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

ওয়াটসন বললেন—"কাজটা যদিও আমার ভাল মনে হচ্ছে না, তাহলেও দেখছি না করলেই নয়। যাক, কখন বেরুচ্ছি আমরা?"

"আমরা নয়, আমি। তুমি যাচ্ছো না।"

"তাহলে তোমারও যাওয়া হচ্ছে না। এ-অ্যাডভেঞ্চারে যদি ভাগীদার না হই, তাহলে শেষ কথাটা বলে রাখি—একটা গাড়ী নিয়ে সিধে পুলিশফাঁড়িতে গিয়ে ফাঁসিয়ে দেব তোমায়।"

"তোমাকে দিয়ে আমার কোন সাহায্যই হবে না।"

"তা জানছো কি করে? আগে থেকেই তো খড়ি পেতে তা বলা সম্ভব নয়। সে যাই হোক, আমার সংকল্প তো শুনলেই। জীবনে আমার কথার কখনও নড়চড় হয়নি। তুমি ছাড়াও দুনিয়ার অনেকের আত্মসম্মান আর সুনাম আছে।"

বিরক্ত চোখে তাকালেন হোমস্। কিন্তু দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তার ললাটের কুঞ্চন। ওয়াটসনের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন—"বেশ, বেশ, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড তথাস্তু। বহু বছর ভাগাভাগি করে এই ঘরে থেকেছি আমরা। এবার না হয়, শ্রী-ঘরের একটা খুপরি ভাগাভাগি করে নেবো দুজনে। মজা মন্দ হবে না, কি বল? ওয়াটসন, তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নিজের সম্বন্ধে বিচিত্র একটা ধারণা অনেকদিন ধরেই লুকিয়ে আছে আমার মনের কোণে। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে হয়ত আমি প্রথম শ্রেণীর নিপুণ অপরাধী হতে পারতাম। আমার সেই বিশ্বাস যাচাই করে নেওয়ার সে-সুযোগ আজ রাতে আমি পাব, তা হয়তো আর সারাজীবনে নাও পেতে পারি। এই দ্যাখো!"

বলে, ড্রয়ারে ভেতর থেকে চামড়ার তৈরী ছোট্ট সুন্দর একটা কেস বার করলেন হোমস্। খুলে ফেলতেই চোখে পড়ল সারি সারি অনেকগুলো চকচকে যন্ত্র।

"রাতের অন্ধকারে গেরস্তকে পথে বসিয়ে দেওয়ার যাবতীয় আধুনিক সরঞ্জাম তুমি এর মধ্যে পাবে। সবই প্রথম শ্রেণীর। সভ্যতা এগিয়েছে, সেইসঙ্গে সিঁদেল-চোরদের কলকব্জারও উন্নতি ঘটেছে, যেমন, নিকেল-করা সিঁদকাঠি, ডগায় হীরে-বসানো কাঁচকাটা, সব খোলচাবির তোড়া—এছাড়াও আরও অনেক আধুনিক আবিষ্কার। এই দ্যাখো, চোরালণ্ঠনও এনেছি। শব্দহীন জুতো তো তোমার আছেই!"

"টেনিস খেলার রাবারসোল জুতো আছে।"

"চমৎকার! মুখোশ?"

"কালো সিল্ক কেটে গোটাদুয়েক বানিয়ে ফেলব'খন।"

"এসব কাজের দিকে দেখছি তোমারও সহজাত ঝোঁক আছে। সাবাস! মুখোশগুলো তৈরী করে ফেলো। ডিনার খেয়েই বেরুবো। এখন সাড়ে ন'টা। এগারোটায় চার্চ রো পর্যন্ত যাবো একটা গাড়ী নিয়ে। মিনিট-পনেরো হাঁটলেই অ্যাপলেডোর টাওয়ার্স। বারোটার আগেই কাজে লেগে পড়ব আমরা। মিলভারটনের ঘুম খুব গাঢ় আর কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় ঘুমোনো তার অভ্যেস। কপাল ভাল থাকলে দুটোর আগেই ফিরে আসব এখানে। পকেটে আসবে লেডী ইভার পত্রগুচ্ছ!"

সান্ধ্য-পোশাক পরে নিলেন হোমস্ আর ওয়াটসন। দেখলে মনে হবে যেন থিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরছেন দুই ভদ্রলোক। একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে হ্যামপ্-স্টেডে পৌঁছোলেন দুই বন্ধু। দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছিল। কনকনে হাওয়ার ঝাপটায় মনে হচ্ছিল যেন বরফের ছুরি কেটে কেটে বসে যাচ্ছে মাংসের মধ্যে। ওভারকোটের বোতাম এঁটে নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন দুজনে।

হোমস্ বললেন—"আজকের কাজটা বিশেষ রকমের দুরূহ। হিসেবী আর হুঁশিয়ার না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। মিলভারটনের পড়ার ঘরে একটা সিন্দুকের মধ্যে থাকে দলিল-দস্তাবেজগুলো। পড়ার ঘরটা আবার তার শোবার ঘরের লাগোয়া একটা ঘর। কিন্তু আমাদের একটা সুবিধে আছে। মানুষ যখন টাকার কুমীর হয় আর নাদুস-নুদুস বেঁটে বক্কেশ্বর হয়, তখন তাদের যে অসুস্থ অভ্যাস থাকে, মিলভার-টনেরও তা আছে। অর্থাৎ লোকটা বেজায় ঘুমকাতুরে। আমার প্রেমিকা আগাথার কাছে শুনলাম চাকরমহলে সবাই নাকি এ নিয়ে হাসাহাসি করে। একবার ঘুমোলে হল, সে-কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর ক্ষমতা আর কারও নেই। মিলভারটনের সেক্রেটারীও সারাদিন পড়ার ঘর ছেড়ে এক পা-ও নড়ে না। সেই কারণেই এই নৈশ অভিযান। এর ওপর লোকটার একটা বাঘা কুকুর আছে। সারারাত বাগানে টহল দেওয়া তার কাজ। গত দু'রাতে আগাথার সঙ্গে দেখা করার সময়ে সে চাবি দিয়ে রেখেছিল কুকুরটাকে, কাজেই নির্বিঘ্নে যেতে আসতে পেরেছি আমি। এই যে, এই বাড়ীটা, বাগানগুলো এই বড় বাড়ীটা। ফটক দিয়ে ঢুকে পড়। এবার ডাইনে মোড় নিয়ে দাঁড়ানো যাক লরেল-ঝোপের মধ্যে। মুখোশগুলো এখানেই পরে নেওয়া যাক, কি বল? লক্ষ্য করেছ, কোনো জানলা দিয়েই আলোর এতটুকু রশ্মি দেখা যাচ্ছে না। চমৎকার প্ল্যান, যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনটিই হয়েছে দেখছি।"

কালো সিল্ক দিয়ে মুখ ঢাকার পর দুই বন্ধুকে দেখতে হল লণ্ডনের দু'-দুটো অতি-ভয়ংকর নিশাচর প্রাণীর মত। মার্জারের মত নিঃশব্দচরণে ঝিমিয়ে-পড়া বাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেলেন দুই কৃষ্ণ-মূর্তি। চারিদিক নিস্তব্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন। একদিকে দেখা গেল, টালির ছাউনি দেওয়া একটা বারান্দায় সারি সারি অনেকগুলো জানলা আর দুটো দরজা।

ফিস-ফিস করে হোমস বললেন—"ওইটাই ওর শোবার ঘর। দরজা খুললেই পড়ার ঘর। সবচেয়ে ভাল হত এই দরজাটা খুলতে পারলে। কিন্তু দরজার ওদিকে শুধু ছিটকিনি নয়, তালাও লাগান আছে। কাজেই এদিক দিয়ে ঢুকতে গেলে শব্দটব্দ একটু বেশিই হবে। এস, ঘুরে যাওয়া যাক। ওদিকে একটা কাঁচের তৈরী গাছপালা রাখার গ্রীন-হাউস আছে। তার ভেতর দিয়েও বসার ঘরে যাওয়া যায়।"

সেখানেও তালা লাগানো। কিন্তু কাঁচের একটা গোল চাকতি কেটে ফেলে হাত গলিয়ে ভেতর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দিলেন হোমস। চাকতে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আইনের চোখে গুরু অপরাধ শুরু হয়ে গেল দুই বন্ধুর। সবুজ ঘরের ভারী উষ্ণ বাতাসে আর বিদেশ থেকে আনা রকমারি চারাগাছের দম-আটকানো সৌরভে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অন্ধকারের মধ্যে ওয়াটসনের হাত চেপে ধরে দ্রুত এগিয়ে চললেন হোমস, গুল্মের কিনারা দিয়ে যাওয়ার সময়ে পাতাগুলো ঘষড়ে যেতে লাগল মুখের ওপর। বহু দিনের সযত্নে অভ্যাসে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে-ছিলেন হোমস। এক হাতে ওয়াটসনের হাত আঁকড়ে, অপর হাতে একটা দরজা খুললেন তিনি। মনে হল, সে ঘরে একটু আগেই কেউ যেন চুরুট খেয়ে গেছে। আসবাবপত্রের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেলেন হোমস, আর একটা দরজা খুলে ওয়াটসনকে টেনে নিয়ে গেলেন ওদিকে। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর ওয়াটসন হাত বাড়াতেই দেওয়াল থেকে ঝোলান কতকগুলো কোটে হাত ঠেকল। অর্থাৎ প্যাসেজে এসে পড়েছেন দুজনে। প্যাসেজ পেরিয়ে

হোমস অতি সন্তর্পণে 'ডান দিকের একটা দরজা খুলে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে একটা প্রাণী ধেয়ে এল, আর ওয়াটসনের হৃৎপিণ্ডটাও ডিগবাজী খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে!

কিন্তু পরক্ষণেই বোঝা গেল, প্রাণীটা চতুষ্পদ এবং একটা নিরীহ বেড়াল। এ ঘরে আগুন জ্বলছিল চুল্লীতে। মন্থর বাতাসে ভাসছিল তামাকের ঘন ধোঁয়া। পা টিপে-টিপে ভেতরে ঢুকলেন দু বন্ধু। তালাতো-ভাবে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

ঘরটা মিলভারটনের পড়ার ঘর। অপর প্রান্তে ঝুলছে একটা পর্দা। অর্থাৎ সেই হল শোওয়ার ঘরের পথ।

জোয়াল আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল সমস্ত ঘরটা। দরজার কাছে চকচক করছিল একটা বৈদ্যুতিক সুইচ। আগুনের আলো থাকায় আর সুইচ টেপার দরকার হল না। আগুনের চুল্লীর এক পাশে একটা দরজা—বারান্দায় যাওয়ার পথ। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ডেস্ক আর চকচকে লাল চামড়া-মোড়া ঘূর্ণন্ত চেয়ার। উল্টো দিকে একটা মস্তবড় বুককেস। ওপরে রয়েছে জ্ঞানের দেবী এথেনের মার্বেল পাথরের আবক্ষ প্রতিমূর্তি। কোণের দিকে বইয়ের আলমারী আর দেওয়ালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে একটা লম্বা সবুজ রঙের সিন্দুক।

আগুনের আলো ঠিকরে পড়ছিল সিন্দুকটার পালিশ-করা তামার হাতলের ওপর থেকে। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে একবার দেখে নিলেন হোমস। তারপর পা টিপে শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে কান খাড়া করে রইলেন কিছুক্ষণ। কোনরকম সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে।

ইতিমধ্যে ওয়াটসন ভাবলেন, বাইরের দিকের দরজা দিয়ে চম্পট দেওয়ার ব্যবস্থাটা আগে থেকেই সম্পূর্ণ করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই তিনি দরজাটা পরীক্ষা করতে গেলেন। গিয়ে তো অবাক! কেননা, দরজায় তালাও নেই, ছিটকিনিও নেই—বাইরে থেকে একটু ঠেলা মারলেই খুলে যায়! হোমসের বাহু স্পর্শ করতেই—তিনিও মুখোসপরা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন দরজার দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠলেন।

ওয়াটসনের কানের গোড়ায় মুখ এনে ফিসফিস করে হোমস বললেন — "গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। ধুত্তোর! আর সময় নষ্ট করা যায় না।"

"আমার কিছু করার আছে?"

"আছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তুমি। কাউকে আসতে শুনলেই ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিও। তারপর যে পথে এসেছি, সটকান দেব সেই পথেই। যদি উল্টো দিক থেকে কেউ এসে পড়ে, তাহলে কাজ শেষ হয়ে এলে বারান্দার দরজা দিয়ে সরে পড়ব। আর, না হলে, এই পর্দাটার আড়ালে লুকোব। বুঝেছ তো?"

ঘাড় কাত করে ওয়াটসন জানালেন, বোঝা গেছে প্ল্যানটা। তারপর দাঁড়ালেন দরজার সামনে। প্রথম-প্রথম একটু ভয়-ভয় করলেও এখন সে-ভাব অনেকটা কেটে গেছে। বরং সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল এক অননুভূত তীব্র উল্লাসে। আইনের রক্ষক হিসেবে এতদিন এ জাতীয় আনন্দশিহরণ উপলব্ধি করতে পারেন নি ওয়াটসন। কিন্তু সেদিন আইনের ভক্ষক হিসেবে সেই প্রথম আস্বাদ পেলেন বিচিত্র আনন্দের। রমণীর স্বার্থে এই মহান অভিযানের জন্য বীররসের সঙ্গে মিশেছিল অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ, স্পোর্টসম্যানের আগ্রহ। কাজটা যে নিঃস্বার্থ, সে জ্ঞান ছিল টনটনে, প্রতিপক্ষের চরিত্র যে কতখানি ক্রুর, তাও জানা ছিল দুজনের। কাজেই অপরাধ-সচেতন হওয়া দূরে থাকুক, বিপদের সম্ভাবনা যতই বাড়ছিল, ততই অসহ্য আনন্দে শিউরে উঠছিলেন ওয়াটসন।

যন্ত্রপাতির চামড়ার কেসটা গড়িয়ে গড়িয়ে খুলে ফেললেন হোমস। কঠিন অপারেশন করার আগে সার্জন যেমন ধীর-শান্তভাবে, বিজ্ঞানীসুলভ নিপুণ হাতে একটার পর একটা যন্ত্র বেছে-বেছে তুলে নেয়, ঠিক তেমনি অভ্যস্ত হুঁশিয়ারীতে তৎপর হয়ে উঠল তাঁর দশ আঙুল।

সিন্দুক খোলা যে হোমসের বিশেষ শখ, তা জানতেন ওয়াটসন। তাই এরকম একটা দানব-সিন্দুকের সামনা-সামনি হয়ে তিনি যে আনন্দে অধীর হয়ে উঠবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

সিন্দুক তো নয়, যেন সোনালী আর সবুজ রঙের একটা ড্রাগন। জঠরে সঞ্চিত রয়েছে কত সুন্দরী মহিলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার উপাদান।

কোটের হাতা গুটিয়ে নিলেন হোমস। ওভারকোট রাখলেন চেয়ারের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে পুরো উদ্যমে শুরু হয়ে গেল কাজ। দুটো ছেঁদা করার ড্রিল' একটা সিঁদকাটি আর কয়েকটা খাঁজহীন চাবি বার করলেন লেদার-কেসের মধ্যে থেকে।

মাঝখানের দরজায় হুঁশিয়ার হয়ে পাহারায় রইলেন ওয়াটসন। অতর্কিত বিপদের জন্যে তৈরী হয়ে থাকলেও হঠাৎ কেউ এসে পড়লে কি যে করতে হবে, সে সম্বন্ধে ওয়াটসনের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না।

প্রায় আধ ঘন্টা তন্ময় হয়ে রইলেন হোমস। পরম উৎসাহে একটার পর একটা যন্ত্র তুলে ট্রেনিং পাওয়া কারিগরের মত পাকা হাতে কাজ করে চললেন। অবশেষে ক্লিক শব্দে কব্জার ওপর ঘুরে গেল চওড়া সবুজ দরজাটা।

ভেতরে দেখা গেল, অনেকগুলো কাগজের প্যাকেট। প্রত্যেকটা প্যাকেট সুতো দিয়ে বাঁধা, সীলমোহর করা এবং ওপরে নাম-ধাম-সংখ্যা লেখা।

হোমস একটা প্যাকেট তুলে নিলেন। কিন্তু আগুনের কাঁপা আলোর ওপরের লেখা পড়া সম্ভব হল না। ইলেকট্রিক আলো জ্বালাও বিপজ্জনক। কেননা, পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে স্বয়ং মিলভারটন। তাই, চোরা-লণ্ঠনটা টেনে আনলেন হোমস।

তারপরেই, আচম্বিতে থমকে গেলেন। উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনলেন এবং পর মুহূর্তেই সিন্দুকের পাল্লা ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়ে ওভারকোটটা তুলে নিলেন। দ্রুত হাতে যন্ত্রপাতিগুলো কোটের পকেটে ঠেসে নিয়ে তীরবেগে লুকিয়ে পড়লেন জানলার পর্দার পেছনে।

শার্লক হোমসের পাশে গিয়ে ওয়াটসন দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুনতে পেলেন শব্দটা। তীব্র অনুভূতি দিয়ে অনেক আগেই এ শব্দ শুনে হুঁশিয়ার হয়ে ছিলেন হোমস।

বাড়ীর মধ্যে কোথায় যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল। অনেক দূরে যেন দড়াম করে বন্ধ হল একটা দরজা। তারপরেই শোনা গেল অস্পষ্ট চাপা গজগজানির পরেই থপ-থপ শব্দ—কে যেন অতিদ্রুত কিন্তু মেপে-মেপে পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

ঘরের বাইরে প্যাসেজে এসে গেল থপ-থপ শব্দটা।...

তারপরেই থমকে গেল দরজার সামনে।

খুলে গেল দরজা। শোনা গেল সুইচ টেপার খটাস শব্দ—দপ করে জ্বলে উঠল ইলেকট্রিক আলো। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কড়া চুরুটের কটু গন্ধ ভেসে এল নাসারন্ধ্রে। তারপর দুই বন্ধুর কয়েক গজের মধ্যেই পায়ের শব্দ ক্রমাগত আসা-যাওয়া করতে লাগল ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। থেমে গেল পদশব্দ, শোনা গেল চেয়ারের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ। তারপরে চাবি লাগানোর ক্লিক শব্দ এবং কাগজপত্র নাড়াচাড়া করার খসখস আওয়াজ।

এতক্ষণে উঁকি মারার সাহস হয় নি কারোরই। এবার বুক ঠুকে পর্দাজোড়া সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকালেন ওয়াটসন। কাঁধের ওপর হোমসের কাঁধের চাপ পড়ায় বুঝলেন, হোমসও উঁকি মারার লোভ সামলাতে পারেন নি।

ঠিক সামনেই, নাগালের মধ্যেই, চোখে পড়ল একটা চওড়া গোলাকার পিঠ—দুই বন্ধুর দিকে পেছন ফিরে বসে আছে স্বয়ং মিলভারটন!

অর্থাৎ তার গতিবিধির হিসেব কষতে আগাগোড়াই ভুল করেছেন হোমস আর ওয়াটসন। শোবার ঘরে সে মোটেই আসে নি। এতক্ষণ বসেছিল ধূমপান করার বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে। ঘরটা বাড়ীর অন্য প্রান্তে থাকায় আলোকিত জানলাগুলো চোখ এড়িয়ে গেছে দুজনেরই।

মিলভারটনের চ্যাটালো ধূসর মাথা আর চকচকে টাকটা ছিল ও'দের ঠিক চোখের সামনেই। দু পা টান-টান করে ছড়িয়ে দিয়ে লাল চামড়া-মোড়া চেয়ারের পেছনে এলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। মুখ থেকে কোনাকুনি বেরিয়ে ছিল লম্বা কালো চুরুট। পরনে কারুকাজ-করা আধা-সামরিক স্মোকিং-জ্যাকেট। জ্যাকেটের রঙ ফরাসী দেশের ক্লারেট মদের মত লাল, কিন্তু কলারটা কুচকুচে কালো মখমলের। এক হাতে একটা লম্বা দলিল নিয়ে চোখ বুলোচ্ছিল অলস-ভাবে। আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটার পর একটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ছিল শূন্যে। আয়েস

করে বসার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল না খুব তাড়াতাড়ি বিদেয় হওয়ার ইচ্ছে তার।

ওয়াটসনের হাতে মৃদু ঝাঁকানি দিলেন হোমস। হাত ঝাঁকিয়ে যেন অভয় দিতে চাইলেন ওয়াটসনকে। বলতে চাইলেন, পরিস্থিতি এখনো আয়ত্তের বাইরে যায় নি। সুতরাং ভয়ের চোটে ভিরমি খাওয়ার সময় এখনো আসে নি। কিন্তু ওয়াটসন যা দেখতে পাচ্ছিলেন, তা শার্লক হোমস দেখতে পান নি। পেছনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়াও সম্ভব ছিল না।

ওয়াটসন সভয়ে দেখছিলেন, তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করায় সিন্দুকের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয় নি। যে কোন মুহূর্তে মিলভারটনের চোখ পড়তে পারে সেদিকে। সুতরাং ওয়াটসন তৈরী হয়ে রইলেন। যে মুহূর্তে বুঝবেন আধ-বন্ধ পাল্লাটা মিলভারটনের চোখে পড়েছে, সেই মুহূর্তে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ওভারকোটটা মুণ্ডুর ওপর ছুঁড়ে দিয়ে কাবু করে ফেলবেন তাকে। তারপর যা করার শার্লক হোমস করবেন।

মিলভারটন কিন্তু একবারও চোখ তুলল না। পাতার পর পাতা উল্টে চলল অলস-মন্থর ভঙ্গিমায়। ওয়াটসন ভাবলেন দলিল পড়া শেষ হলে চুরুট পুড়ে ছাই হলে নিশ্চয় শোওয়ার আয়োজন করবে মিলভারটন। কিন্তু তার আগেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

বেশ কয়েকবার মিলভারটনকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেছিলেন ওয়াটসন। একবার তো অধীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। রাতদুপুরে যে তার সঙ্গে কারো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকতে পারে, এ ধারণাটা দুই বন্ধুর কারো মাথাতেই আসে নি। অনেকক্ষণ পরে আচম্বিতে বাইরের বারান্দা থেকে ভেসে এল একটা মৃদু শব্দ। কাগজপত্র ডেস্কের ওপর ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসল মিলভারটন।

আবার শোনা গেল শব্দটা। তারপরেই শোনা গেল আলতো করে দরজায় টোকা মারার আওয়াজ। দাঁড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিলে মিলভারটন।

বললে ত্বরিত স্বরে—"প্রায় আধ ঘণ্টার মত দেরী হয়েছে তোমার।"

অর্গলমুক্ত দরজা আর মিলভারটনের রাত জাগার অর্থও সুস্পষ্ট হয়ে গেল নিমেষে মধ্যে। শোনা গেল স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষার মৃদু খস-খস শব্দ। মিলভারটন ঘুরে দাঁড়াতেই পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওয়াটসন। এবার সাহস করে আবার ফাঁক করে উঁকি দিলেন বাইরে।

আবার আসন গ্রহণ করেছিল মিলভারটন। আগের মতই চুরুটটাকে আলগোছে ধরে রেখেছিল ঠোঁটের কোণে।

ঠিক সামনে, বিদ্যুৎবাতির প্রখর আলোয় দাঁড়িয়েছিল ছিপছিপে লম্বা চেহারার কালোবরণ এক স্ত্রীলোক। অবগুণ্ঠনে ঢাকা তার মুখ। চিবুক থেকে ঝুলছিল বৈধব্যসূচক আলখাল্লা। সঘন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে বরতনুর প্রতিটি ইঞ্চি কেঁপে-কেঁপে উঠছিল প্রবল আবেগে।

মিলভারটন বললে—"মাইডিয়ার, রাতের বিশ্রাম তো আমার নষ্ট করে দিলে। যাই হোক, ঘুম না হওয়ার উপযুক্ত মূল্য আশা করি তুমি দিতে পারবে। অন্য কোন সময়ে তোমার আসা সম্ভব হয় না বুঝি?"

ঘাড় নাড়ল স্ত্রীলোকটি।

বেশ, বেশ, না আসতে পারলে এস না। কাউন্টেসের শাসন যদি এতই কড়া বলে মনে কর তো তাকে শায়েস্তা করার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। কি মুস্কিল! এত কাঁপছ কেন? ঠিক আছে, এই তো চাই! সামলে নাও নিজেকে! এবার এস, কিছু কাজের কথা হোক।"

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা চিরকুট বার করল মিলভারটন।

বলল—"তুমি লিখেছ, এমন পাঁচখানা চিঠি তোমার হাতে এসেছে যা কাউন্টেস দ্য অ্যালবার্টকে বিপদে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। চিঠিগুলো তুমি চাও বিক্রী করতে। আর আমি চাই কিনতে। সুতরাং এবার দামের কথাই হোক। তার আগে আমি চিঠিগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাই। নমুনা যদি সত্যি-সত্যিই ভাল হয়—কী সর্বনাশ! আপনি!"

একটি কথাও না বলে অবগুণ্ঠন তুলে ফেলেছিল স্ত্রীলোকটি। চিবুকের ওপর থেকে আলখাল্লা খসে পড়েছিল বুকের ওপর।

মিলভারটনের চোখে-চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন এক অদ্ভুত সুন্দরী মহিলা। বর্ণ মলিন হলেও তিনি সুশ্রী; সুগঠিত মুখে হুকের মত বেঁকানো নাক, ঘন কালো ধারালো ভুরু-যুগল; ঝকমকে কিন্তু ইস্পাত-কঠিন এক জোড়া চোখ; আর, অবঙ্কিম পাতলা অধরোষ্ঠে সর্বনাশা হাসি।

চিবিয়ে-চিবিয়ে উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা—"হ্যাঁ, আমি। যার জীবনে আপনি সর্বনাশের আগুন জেলেছেন—আমিই সেই।"

হেসে উঠল মিলভারটন। কিন্তু শঙ্কা রণরণিয়ে উঠল কণ্ঠে।

বলল—"বড় একগুঁয়ে ছিলেন আপনি, তাই এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। মিছিমিছি একটা মাছিকেও মারতে চাই না আমি, কিন্তু আপনি আমায় বাধ্য করলেন নিষ্ঠুর হতে। আপনার সাধ্যমত দাম আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কানাকড়িও খরচ করতে রাজী হলেন না।"

"আর তাই চিঠিগুলো আপনি পাঠিয়ে দিলেন আমার স্বামীর কাছে। ও রকম মহান পুরুষ আমি আর দেখিনি—তাঁর জুতোর ফিতে বাঁধার যোগ্যতাও ছিল না আমার। চিঠিগুলো পেয়ে এমন প্রচণ্ড আঘাত পেলেন যে, সহ্য করতে পারলেন না, চির-বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। সেই শেষ রাতের কথা মনে আছে? ওই দরজা দিয়ে এসে কাকুতি-মিনতি করে দয়া ভিক্ষা করেছিলাম আপনার? সেদিন শুধু হেসে উঠেছিলেন আমার মুখের ওপর। আজকেও ঠিক সেই রকমভাবে হাসতে চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু পারছেন না। ঠোঁট কাঁপুনি বন্ধ করার শক্তিও আপনার ভীরু মনে নেই। কিন্তু সে রাতের শিক্ষা আমি ভুলি নি। দিনের পর দিন ভেবেছি, দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলার জন্যে আবার কিভাবে দেখা করা যায় আপনার সঙ্গে—কিভাবে পাওয়া যাবে আপনাকে সম্পূর্ণ একলা অবস্থায়। চার্লস মিলভারটন, কি বলার আছে আপনার?"

মিলভারটন দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"যদি ভেবে থাকেন জোর-জবরদস্তি করে কাজ হাসিল করতে পারবেন, তাহলে ভুল করেছেন। হাঁক পাড়লেই এখুনি আমার চাকর-বাকরদের হাতে ধরা পড়বেন আপনি। কিন্তু আপনি রেগে গেছেন—তাই আপনার স্পর্ধাকে ক্ষমা করলাম, কথাগুলোও গায়ে মাখলাম না। এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান আপনি।"

বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন নিশীথিনী মহিলা, পাতলা অধরোষ্ঠে খেলা করতে লাগল সেই ভয়ানক বিষাক্ত হাসি।

"আমার জীবন যেভাবে ধ্বংস করেছেন, সেভাবে আর কোন জীবনে আপনি সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে পারবেন না। আমার বুক যেভাবে ভেঙেছেন, সেভাবে তার কারও বুকে আপনি আপনার শেল হানতে পারবেন না। পৃথিবীর বুক থেকে আমি মুছে দেব একটা অতি বিষাক্ত বস্তুর অস্তিত্ব। এই নে, কুকুর, এই নে...আর একটা!...আর একটা!... আর একটা!"

বুকের মধ্যে থেকে একটা চকচকে ক্ষুদে রিভলবার বার করে মিলভারটনের দেহের ওপর একটার পর একটা ঘর খালি করে চললেন ভদ্রমহিলা—নলচেটা রইল মিলভারটনের শার্ট থেকে দু ফুটের মধ্যেই।

উপর্যুপরি গুলিবর্ষণের মধ্যেই কুঁচকে সরে এল মিলভারটন। উপুড় হয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। কাগজগুলো খামচে ধরে কাশতে লাগল ভীষণভাবে। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল টলতে-টলতে। কিন্তু আর একটা গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

চেঁচিয়ে উঠল বিকট আর্তকণ্ঠে—মেরে ফেললে...মেরে ফেললে আমায়!"

সঙ্গে-সঙ্গে নিস্পন্দ হয়ে গেল তার গুলিবিদ্ধ দেহ। নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা। জুতোর হিল রগড়ালেন মুখের ওপর। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

শোনা গেল জোরাল খস-খস শব্দ। হু-হু করে রাতের হাওয়া ঢুকে পড়ল উত্তপ্ত ঘরের মধ্যে।

বাইরের অন্ধকারে নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন রহস্যময়ী প্রতিহন্ত্রী।

মিলভারটনের কুঁচকানো দেহের মধ্যে যখন পর-পর গুলি গেঁথে চলেছেন ভদ্রমহিলা, তখন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে গেছিলেন ওয়াটসন, কিন্তু হিমশীতল কঠিন হাতে তাঁর কব্জি চেপে ধরে রেখেছেন শার্লক হোমস। কারণটাও সঙ্গে-সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন ডক্টর ওয়াটসন। মিলভারটনের যে অবস্থাই হোক না কেন, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি? নিয়তির দণ্ড নেমে এসেছে এক কুচক্রী শয়তানের শিরে।

সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এসেছেন তা ভুললে তো চলবে না।

ভদ্রমহিলা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই তিন লাফে অন্য দরজায় পৌঁছোলেন শার্লক হোমস্। কড়াৎ করে চাবি ঘুরিয়ে এ'টে দিলেন তালা।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল বাড়ীর মধ্যে চে'চামেচি আর ধাবমান পায়ের শব্দ। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে জেগে উঠেছে বাড়ীর প্রত্যেকে।

শার্লক হোমসও কিন্তু তখনও ধীর, শান্ত। অবিচল হাতে সিন্দুকটা খুলে ফেললেন তিনি, দু' হাতে এক বোঝা চিঠির তাড়া নিয়ে ফেলে দিলেন আগুনে। ফিরে এসে নিয়ে গেলেন আর এক বোঝা। কয়েকবারেই শেষ হয়ে গেল সিন্দুকের অভিশপ্ত উদর।

বাইরে থেকে দরজার কে হাতল ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল। চকিত চোখে চারদিক দেখে নিলেন হোমস্। মিলভারটনের মৃত্যু-দূত চিঠিটা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়েছিল টেবিলের ওপর। সেটাও দাউ-দাউ আগুনে ফেলে দিয়ে এলেন হোমস্। তারপরেই বাইরের দরজা থেকে চাবিটা খুলে নিলেন, ওয়াটসনকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে তালা এ'টে দিলেন।

বললেন—"ওয়াটসন, এদিকে। এদিকে গেলেই বাগানের পাঁচিল টপকাতে পারব।"

এত তাড়াতাড়ি যে সমস্ত বাড়ী জেগে উঠবে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না ওয়াটসন। আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল অতবড় বাড়ীটা। সামনের দরজা খোলা—কয়েকজন লোক ছুটেছিল বাগানের পথে। বহু লোকের হাঁক-ডাকে সাড়া পড়ে গেছিল বাগানে। বারান্দা থেকে দুই বন্ধু বেরোতেই 'পাকড়াও, পাকড়াও' করে চে'চাতে চে'চাতে একজন ছুটে এল পেছনে।

কিন্তু সমস্ত বাগানটা যেন হোমসের নখদর্পণে। তীরবেগে দৌড়োলেন তিনি চারাগাছের মধ্যে দিয়ে—আঠার মত পেছনে লেগে রইলেন ডক্টর ওয়াটসন। তাঁরও পেছনে নাছোড়বান্দা লোকটা। সামনেই পড়ল ছ' ফুট উঁচু পাঁচিল। অবলীলাক্রমে এক লাফে ওপরে উঠে পড়লেন হোমস্ এবং পরক্ষণেই নেমে পড়লেন ওদিকে। ওয়াটসনও লাফিয়ে ওঠার সংগে সংগে পেছনের লোকটা ছিনে জোঁকের মত আঁকড়ে ধরল গোড়ালি। লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁক-পাঁক করে কোনমতে তিনি উঠে পড়লেন ওপরের ঘাসেঢাকা অংশে, পরক্ষণেই মুখ থুবড়ে পড়লেন ওদিকের ঝোপের মধ্যে।

পলকের মধ্যে এক হ্যাঁচকা টানে তাঁকে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিলেন হোমস্। টেনে দৌড়োলেন 'হ্যামপ্‌স্‌টেড হীথ'-এর বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। প্রায় মাইলদুয়েক একটানা ছোটার পর দাঁড়িয়ে পড়লেন হোমস্, কান খাড়া করে রইলেন কিছুক্ষণ। নিথর নিস্তব্ধতায় ঝিমিয়ে ছিল পেছনকার পথ।

নাছোড়বান্দা লোকটার চোখে শেষ-পর্যন্ত ধুলো দেওয়া গেছে এবং নিরাপদ ব্যবধানে পৌঁছে গেছেন শার্লক হোমস্ আর ডক্টর ওয়াটসন।

এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভের পরের দিন সকালবেলা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেসট্রেড চিন্তামগ্ন মুখে ঢুকলেন হোমসের বসবার ঘরে।

"সুপ্রভাত, মিস্টার হোমস্, সুপ্রভাত। খুব ব্যস্ত আছেন নাকি?"

"তোমার কথা শোনার মত সময় আছে।"

"হাতে যদি কাজ না থাকে, তাহলে একটা ভারী অদ্ভুত কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে পারতেন। ঘটনাটা কাল রাতে হ্যামপ্‌স্‌টেডে ঘটেছে।"

"সর্বনাশ! কি ব্যাপার শুনি?" বললেন হোমস্।

"খুন—অত্যন্ত নাটকীয় এবং আশ্চর্য রকমের খুন। মোটেই সাধারণ খুন নয়। এই মিলভারটন লোকটার ওপর বেশ কিছুক্ষণ নজর রেখেছিলাম আমরা। আপনাকেই শুধু বলছি, লোকটা একটা আস্ত শয়তান। ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে অনেক কাগজপত্র নাকি ও নিজের কাছে রেখে দিত। খুনীরা সব কাগজই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। মূল্যবান কোনো জিনিস খোয়া যায়নি। সুতরাং আমাদের অনুমান, আততায়ীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এ-ধরনের সামাজিক কেলেঙ্কারী বন্ধ করা।"

"আততায়ীরা! বহুবচন কেন?" বললেন হোমস্।

"দুজন এসেছিল। ধরা পড়ে যেত আর একটু হলেই। পায়ের ছাপ পেয়েছি, চেহারার বর্ণনা পেয়েছি। কাজেই পিছু নিয়ে পাকড়াও করাও খুব অসম্ভব হবে না। প্রথম লোকটা একটু বেশি রকমের স্মার্ট। দ্বিতীয় লোকটার পায়ের গোড়ালি চেপে ধরেছিল বাগানের মালী—কিন্তু আটকে রাখতে পারেনি। মাঝারি আকারের, বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা লোকটার, চৌকো চোয়াল, পুরু ঘাড়, গোঁফ আছে। চোখ-দুটোয় অবশ্য কালো মুখোশ ঢাকা ছিল।"

শার্লক হোমস্ বললেন—"খুবই অস্পষ্ট বর্ণনা। আরে, ওয়াটসনের চেহারাও তো ঐরকম!"

শুনে বেশ কৌতুক অনুভব করে ইন্সপেক্টর।

বলে, "তা যা বলেছেন। বর্ণনার সংগে বেশ খাপ খেয়ে যায় ও'র চেহারা।"

হোমস্ বলেন, "লেসট্রেড, এ-যাত্রা তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারব না। কেননা, মিলভারটন লোকটাকে আমিও জানতাম। সে ছিল লন্ডনের সবচাইতে বিপজ্জনক লোকেদের একজন। আমি মনে করি, সংসারে এমন কতকগুলো অপরাধ আছে, আইন যাদের স্পর্শ করতে পারে না; কাজেই, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অনুমোদন করা চলে। না, না, তর্ক করে লাভ নেই। যে মরেছে তার ওপর আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই। যারা মেরেছে, তাদের ওপর রইল আমার সহানুভূতি। সুতরাং, এ-কেসে আমি নাক গলাব না।"

যে-শোচনীয় দৃশ্য চোখের সামনে দেখেছিলেন ওয়াটসন, সে সম্বন্ধে হোমস্ তাঁকে একটা কথাও বলেননি। কিন্তু সারাটা সকাল খুবই চিন্তামগ্ন মুখে বসে রইলেন শার্লক হোমস্। শূন্যোগর্ভ দৃষ্টি আর নিবিড় তন্ময়তা দেখে মনে হল যেন কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছেন। লাঞ্চ খেতে বসে আধ-খাওয়া খাবার ফেলে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

"সর্বনাশ! ওয়াটসন! পেয়েছি! টুপি নাও! এসো আমার সংগে।"

হন-হন করে হে'টে দুজনে গিয়ে পৌঁছোলেন রিজেন্ট সার্কাসে। এখানে বাঁদিকের একটা দোকানের জানলায় সাজানো ছিল ওই সময়কার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি আর সুন্দরীদের ফোটোগ্রাফ। শার্লক হোমসের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল একটা ছবির ওপর। দৃষ্টি অনুসরণ করে ওয়াটসন দেখলেন, রানীর মত গরবিনী এক মহিলার ফোটোগ্রাফ। পরণে রাজসভার পরিচ্ছদ। সুগঠিত মাথায় মস্তবড় হীরের টায়রা। আভিজাত্য যেন ঠিকরে পড়েছিল তাঁর সর্ব অংগে, হুকের মত সুচারু বঙ্কিম নাকে, ধারালো ভুরু যুগলে, পাতলা অধরোষ্ঠে, আর ছোট্ট কিন্তু দৃঢ় থুতনিতে।

পরক্ষণেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল ডক্টর ওয়াটসনের। চোখ পড়ল উপাধির দিকে। যুগ যুগ ধরে সম্মানিত সুপ্রাচীন সেই উপাধি দেখেই বুঝলেন, কার স্ত্রী ছিলেন ইনি। অভিজাতমহলে কুল-মানে শ্রেষ্ঠ এই সম্ভ্রান্ত রাজনীতিবিদের নাম কে না জানে।

চোখাচোখি হতেই ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ডক্টর ওয়াটসনকে নিয়ে জানলার সামনে থেকে সরে এলেন শার্লক হোমস্।

সড়ক সৌধ কানাগলি

সন্ধ্যে থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ক্যাথিড্রাল রোড প্রায়ান্ধকার। চকিতে সশব্দ মোটর পাশ দিয়ে দৌড়ে যায়। সেন্ট পল্‌স চার্চের লোহার রেলিং টপকে ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে শাদা করুণ হলারীহেনা ফুল। বৃষ্টিতে, মন্দ হাওয়ায়, এককথায়—হঠাৎ কলকাতা বদলে গেছে আজ, দারুণ দাবদাহে দুর্দান্ত কলকাতা হয়ে উঠেছে অপরূপা, শ্রীময়ী। একেই তো গলি-উপগলির কলকাতার সঙ্গে এতদঞ্চলের কলকাতার সীমাহীন তফাৎ। তার উপর আজকের এই হঠাৎ রাঙা-সাজার দিনে তো কথাই নেই। অদূরে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালের কালো জলে নিওন আলো ঝিকমিক করে উঠছে। বেজেছে বন্ধের বাঁশি। সবার মনেই গুঞ্জন : এতো তাড়া কেন?

সত্যিই, অমন সুন্দর এক বেড়াবার, বসে থাকার মনোগ্রাহী খোলা জায়গা শাত-তাড়াতাড়ি বন্ধ, অবরুদ্ধ হবার কোনো অর্থই হয় না। বহুদিন ভেবেছি, এ নিয়ে একটা কিছু করা উচিত। যদি ভিক্‌-টোরিয়াই বন্ধ করতে হয়—তাহলে সর্ব-সুদ্ধ কলকাতাও বন্ধ করে দেওয়া হোক্‌। এ যেন কার্ফু বলবৎ করার মতন জরুরী অবস্থায়, সন্ধ্যে হতে না হতেই বাবার বাঁশি বেজে ওঠা। অথচ অপরদিকে দুঃসাহসী ময়দান খোলা আছে গোটা রাত।

ক্যাথিড্রাল রোডে একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে সারাবছরই কিছু না কিছু প্রদর্শনী লেগে আছে। বছরের মধ্যে বহুবারই তাই ওখানে যাওয়া পড়ে। কিছুদিন আগেও ওখানের ক্যান্টিন আর ছোট্ট মাঠটি জুড়ে একদল চিত্র-শিল্পীকে অবসর বিনোদন করতে দেখ-তাম। গোল হয়ে বসে গল্প-গাছা করছেন কিংবা কখনো গভীর হয়ে উঠছেন শিল্পের গভীরতম তত্ত্ব-সমীক্ষায়। আজ আর তাঁরা নেই। কিংবা আছেন ইতস্তত, অনিয়-মিত। অথচ, বাংলাদেশে, কলকাতা শহরে, এই একাডেমিকে কেন্দ্র করে শিল্পীদের অন্যান্য শ্রীবৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও পর-স্পরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমঝাওতার সুযোগ ছিলো। আমাদের দেশে চিত্রশিল্পীদের এককাট্টা হবার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। তবু হয়তো তরুণ কিছু কবিকে খুঁজতে লোকে কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে ধাওয়া করতে পারে। আমদের দেশ ফরাসী দেশ নয়, আমাদের মানসিকতার শতাংশেই বাঙালিয়ানার রসে ভরপুর, এসব বিলাস আমাদের নয়—আমাদের ছিলো বৈঠকখানায় আড্ডা, তক্ত-পোশ, তাকিয়া আর তামাক। ন্যূন অংশে গ্রাহ্য হলেও আজ তার কিছু কিছু নবীন বাঙালীর ভেতরেও রয়ে গেছে। আমরা জানি না, আমাদের তরুণ শিল্পী বন্ধুবগণ কি কারণে একাডেমির প্রাঙ্গণে মিলিত হতে পারছেন না নিয়মিত। কার্যসূচীর ব্যাপারে আমি ব্যস্ত নই। সবাই স্তবকে বন্ধ হলেই কার্যসূচী আপসে বের হয়ে আসবে। তাঁদের এই মিলনের পথে যদি কোনো বিশেষ বাধা থেকে থাকে, তারও খোলাখুলি আলোচনা হয়ে গেলে ক্ষতি কি?

কলকাতায় শীতের সময় যতো বেশি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, বছরের অন্যান্য সময়ে তেমন নয়। তবু, যেন, এ-বছরই লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে নানা রকম একজি-বিশনের একটা জোয়ার এসেছে কলকাতায়। তারই মধ্যে বিশেষ করে ক্যাথিড্রাল রোডের একাডেমি-ভবন জমজমাট। একটা না একটা কিছু সর্বদাই লেগে আছে।

প্রধানত আর্থিক কারণেই একাডেমি-ভবনে শিল্প-প্রদর্শনী আজকাল অনেক অল্প হয়ে গেছে। সর্বত্রই অল্প। নিরু-পায় শিল্পীদের তবু পেট-খরচায় ভাগ বসিয়ে প্রদর্শনী করতে আমরা দেখেছি। অনেকে যাঁরা কক্ষ ত্যাগ করে পথের প্রদ-র্শনীতে নেমে এসেছেন তাঁদেরও স্বাগত জানিয়েছি। কিন্তু, এতো সব কিছু ত্যাগ করায় তো সন্ন্যাসেরই সামিল। স্বাভাবিক, সুস্থ, সহজ প্রদর্শনীর জন্যে পথের চেষ্টা কোথায়?

বৃষ্টির মধ্যেই একাডেমি-ভবনের ভিতরে ঢুকে দেখা গেলো, বাম দিকে প্রচণ্ড ভিড়। ওদিকে নিশ্চিত সেই সিনেমা অথবা নাচ-গানের আসর। এসেছিলাম আমাদের গৌরবময় প্রাচীন তাঁতশিল্পের কিছু নিদ-র্শন দেখতে। শুনলাম দোতলায় সেই প্রদর্শনী এক সপ্তাহের জন্যে খুলে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই প্রদর্শনী-কক্ষে পৌঁছুলাম। যথেষ্ট আলো, যথেষ্ট বর্ণবাহার! কাপড়ের গায়ে-গায়ে নম্বর আঁটা। ভাবলাম, বুঝিবা ঐ নম্বর মিলিয়ে কোনো হ্যান্ড-আউটে এদের সংগ্রহ-জীবনীর কিঞ্চিদংশ জানা যাবে, জানা যাবে এদের আয়ুষ্কাল, বৈশিষ্ট্য, তাঁতি-সম্প্রদায়ের জীবনরহস্য। নাঃ, সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। এক বিহারী দারোয়ানকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে শূন্য ঘরে আর মাঝেমাঝে অজ্ঞাত-কারণে রক্ষিত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফ চুমরাচ্ছে। তার কাছে কিছু শুধোলেই সে উত্তর করছে, যো নিশানা হ্যায়, ওহী ঠিক হ্যায়—হামি কুছু জানে না।

হতাশ বোধ করেছিলাম, তা অস্বীকার করব না। তবু প্রদর্শনীটি দেখে ভালো লাগল।

প্রদর্শিত পুরাতন শাড়ির কিছু নাম দিলাম, নমুনা সম্পর্কে প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ কিছুই জানাতে চান নি। বিষ্ণুপুরে বালু-চর, পাঞ্জাব, ফুলকারী, পাটোলা, ঢাকাই শাড়ির সঙ্গে মন্দির শাড়ি আর পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় রংদার শাড়ির সমারোহ; সামান্য দু-একখানি যশোহরের কাঁথা, একটি পুঁতির কাজ-করা হাতপাখা, সুরাটের ফুল-তোলা রুমাল, চম্বা রুমাল—চম্বার রুমালের ওপর শলমা-চুমকি-জরির কাজ—ভিতরে রাসলীলার চিত্র, মুসলমানী ড্রেসিং গাউন, চোলী, মছলন্দ, বারানসী চোগা, ওড়না, কুর্তা, খুসীদ, রাজকোট আর তোরণ। দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের মধ্যে যতোদূর জানি মিরপুরের দুবরাজ দাসের হাতে বোনা খান-তিনেক শাড়িই এই প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য।

—রূপচাঁদ পক্ষী

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

(ক) বর্তমানে পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কে?

(খ) ভারতে কত সালে প্রথম ক্রিকেট খেলা চালু হয় এবং কোথায়?

উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত,
ঝরিয়া (ধানবাদ)

●

মানুষ কতদিন পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে পারে?

বিদ্যুৎজ্যোতি দেব
শিলচর, কাছাড়

●

১। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল গোলরক্ষক কে?

২। গত ২০ বৎসরে কোন্ দেশ কতবার এবং কত সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?

প্রদীপ দাশগুপ্ত,
চার্চ রোড,
সেখপুরা, মেদিনীপুর

●

১। স্ট্রেপটোমাইসিন কত খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়?

২। ঐ ঔষধ আবিষ্কারক সেলম্যান ওয়াকসম্যান কোথায় বাস করতেন?

মৃণালকান্তি বসু, পাইওনিয়ার
পল্লী, শংকর কুটীর, বারাসত।

●

(ক) পৃথিবীতে এখনো কতগুলি পরাধীন রাষ্ট্র আছে?

(খ) যোটক-বিচারের যন্ত্র ও মিথ্যা কথা ধরার যন্ত্র—দুটির নাম কি কি? —ওগুলো কে কোন্ সময়ে আবিষ্কার করেন?

(গ) হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার সর্বপ্রথম কে, কোথায়, কোন সময়ে করেন?

(ঘ) শ্বেত-রক্ত-কণা (হোয়াইট্ কার্পাস্‌লস্) কি করে সতেজ হয়?

(ঙ) হিমোগ্লোবিন্ কি করে শুদ্ধ হয়? —তার কতগুলি উপায় আছে?

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত, সান্ত্বনা গুপ্তা,
ডি টি ১৩৩০, ধুরুআ, রাঁচী-৪।

(উত্তর)

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত শ্রীসৌমিত্র মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (১) সৈন্য নেই, পুলিশ নেই এবং করগোই ফরাসী ও স্পেনের মধ্যবর্তী এন্ডোরা বা (Andora) দেশে। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার এবং আয়তন ১৯১ বর্গ মাইল। সমগ্র রাজস্ব জুয়োখেলা থেকে সংগ্রহ হয়। (২) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাচীনতম শহর হচ্ছে সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কাস। কথিত আছে UZ (উজ) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীরমা দাশগুপ্তার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (গ) ১৯৩৩ সালে "যুগান্তর" (বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক।) আত্মপ্রকাশ করে। ঐ একই সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীদিলীপকুমার বৈরাগ্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (৪) ভারতের বৃহৎ সিনেমা হল হচ্ছে নয়াদিল্লীর 'শীলা' সিনেমা হল। (৩) ব্রিটিশ গিয়ানার ডাকটিকিটের দাম সবচেয়ে বেশী ছিল একসময়।

প্রতিবাদ :—

গত ৫০শ সংখ্যাতে শ্রীবিমলকান্তি সেন আমার কোন একটি (ছ) প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন চীফ এয়ার মার্শাল স্যার চার্লস এল ওয়াদী (এলস ওয়াদি নয়।) ইংলণ্ডের বিমান বহরের সর্বাধিনায়ক।

তিনি জানিয়েছেন এলস্ ওয়াদি নয় সেটা হবে এল্ ওয়াদী। তা ভুল। তার সঠিক নামই হচ্ছে স্যার চার্লস এলস ওয়াদি" আমারটিই ঠিক। কোরাল সাগরের নৌযুদ্ধে যখন তিনি "Air craft Carrier-Essex" A Sky-Hawk Jet Fighters squadron এর কমোডোর ছিলেন তখনই তাঁকে "স্যার" উপাধি দেওয়া হয় তার অপূর্ব বীরত্বের দারুন।

রাহুল বর্মন,
৬, রামনগর রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

●

গত ৩৬ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধনঞ্জয় ঘোষের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, মেঘনাদ সাহার আদি নিবাস ঢাকা জেলার শতরাতলী গ্রাম। এই গ্রামেই মেঘনাদ সাহা ১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। Theory of thermal ionisation and its application to the interpretation of stellar spectra হল তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে Principle of relativity এবং Treatise on Heat এর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়।

গত ৩৭ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত শুভেন্দু ও চঞ্চল মজুমদারের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই সময় নিরূপণের জন্য মানুষ জলঘড়ি, বালিঘড়ি ইত্যাদির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই করে এসেছে। অনুমিত হয় যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন শুরু হয়েছে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। কিন্তু যান্ত্রিক ঘড়ি সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন, সে সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। প্রাচীনতম যে ঘড়িটির খবর মানুষের জানা আছে, সে হল হেনরি ডি ভিক নির্মিত একটি ঘড়ি। এই ঘড়িটি দেখতে অনেকটা আজকালকার ঘড়ির মতই ছিল এবং এটি নির্মিত হয়েছিল ১৩৬২-৭০ খৃষ্টাব্দে।

গত ৪১ সংখ্যার অমৃতে প্রকাশিত মোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবিনোদের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই, হেলিকপ্টার আবিষ্কারের কৃতিত্ব কোন একজন বিশেষ বিজ্ঞানী বা যন্ত্রবিদের নয়। এর আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদের অবদান। সংক্ষেপে হেলিকপ্টার আবিষ্কারের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হল।- হেলিকপ্টারের কল্পনা মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই করে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীর খ্যাতনামা চিত্রকর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সর্বপ্রথম হেলিকপ্টারের অনুরূপ একটি বায়ুযানের ছবি আঁকেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দু-জন ফরাসী বিজ্ঞানী Launoy এবং Bienvenu সর্বপ্রথম মডেল হেলিকপ্টার নির্মাণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জর্জ কেলী, মডেল হেলিকপ্টারের খানিকটা উন্নতিসাধন করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ডবলিউ, এইচ, ফিলিপস বাষ্পচালিত একটি মডেল হেলিকপ্টার তৈরী করেন। উনিশ শতকের সপ্তম দশকে Alphonse Penaud রাবার-ব্যান্ড সমন্বিত যে মডেল হেলিকপ্টার তৈরী করেন সেগুলো ৫০ ফুট পর্যন্ত উঠে। ১৮৭৮ সালে এনরিকো ফোরলানিনি যে বাষ্পচালিত মডেল হেলিকপ্টার তৈরী করেন সেটি ৪০ ফুট উপরে উঠে এবং ২০ সেকেন্ড শূন্যে অবস্থান করে। হেলিকপ্টারের সাহায্যে মানুষের আকাশে উড়ার স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সাফল্যলাভ করেনি। বিংশশতাব্দীতে যে সব বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে হেলিকপ্টারের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এবং সত্যি সত্যিই মানুষ একদিন এই বায়ুযানের সাহায্যে আকাশে উড়েছে, তারা হলেন পল কর্ণু, লুই এবং জ্যাকুইস ব্রিগেট, টি, ফন, কারমান, জর্জ, ডি, বোয়েথেৎসাট, এমিল বার্লিনার, কোরাদিনো দাস্কানিও, হাইনরিখ ফোক এবং ইগর আই সিকোরস্কী। আধুনিক হলিকপ্টার নির্মাণের কৃতিত্ব শেষোক্ত দু-জনকেই দেওয়া হয়।

গত ৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীরকুমার দাশের ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে জানাই, বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭,৫৫৫,০০০ মেট্রিক টোন এবং ভারতবর্ষ ৪৫৮,০০০ মেট্রিক টোন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করেছে।

বিনীত
বিমলকান্তি সেন,
ইনস্ডক, দিল্লী—১২

●

আমি গত ৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বদেব দাসের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা দিবস ৬ই ডিসেম্বর।

বিনীত—
তরুণকুমার বসু,
আড়া, [illegible]

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

আমারে এ আঁধারে

কল্যাণকুমার বসু

(১৩)

পরেরদিন ভোর হতেই পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ত্যাগ করে নিঃশব্দে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরোজাটা ভেজিয়ে দিলেন হেমকুসুম। তারপর বাগানের সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পাখির কাকলি ফুরফুরে বাতাস আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে করতে ভাবলেন, ভগবান কেন আমার এই সুখে বাধা পড়ে। কেন আমায় রাগেতে পাগল করে তোলো ...যার জন্যে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। আমার তো কোন কিছুরইত অভাব রাখ নি। তবে কেন এমন হল। সকলের অমতে বিনা আশীর্বাদে আমাদের এই মিলন তাই কি এত বাধা পড়ে।

চা-পর্ব আজ একসঙ্গে বসে সমাপ্ত হল। অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি এবার তৈরী হয়ে নাও। কেনাকাটা যদি কিছু সারতে হয় একসঙ্গে গাড়িতে বেরোবো। আমি এখন কাচারীতে গিয়ে বসছি। তোমার সময় হলে আমায় ডাক পাঠিও। ...দিলীপের ঘর থেকে দিলীপকে পড়িয়ে মহেশ বাড়ি ফিরছিল, হেমকুসুম বললেন, তাকে, তুমি তোমার জিনিষপত্র সঙ্গে করে নিয়ে আমার এখানেই রেখে একসঙ্গে খেয়েদেয়ে ইস্টিশানে যাবে।

বিকেল থেকে অতুলপ্রসাদ মক্কেলদের নিয়ে বসেছিলেন। এদের সঙ্গে কথাবার্তায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মক্কেলদের বিদায় করে ধীর-পায়ে উঠে অধৈর্য হেমকুসুমের ঘরে এসে হেসে বললেন, তোমার কথা ভুলিনি। ট্রেনের এখনও দেরী আছে। কোচওয়ানকে গাড়ি আনতেও বলেছি।

হেমকুসুম বললেন মুখ হাত পা ধুয়ে এস তুমিও আমার সঙ্গে বসে খেয়ে নাও।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বেশ ভালো।

হেমকুসুম কিছুপরে খাওয়ার অবসরে বললেন, দেখ তুমি এখানে যেন বেশী দেরী করো না, যত তাড়াতাড়ি পার দেরাদুন চলে এসো। তুমি না এলে আমার ভালো লাগবে না।

...জিনিষপত্র তোলা হলে সকলে ফিটনে উঠে বসলেন—স্বামী-স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র দিলীপ। পথ থেকে সত্যকুমারকে তুলে নেয়া হল সকলে ইস্টিশানে পৌছালেন। মহেশও অনেক আগেই এসেছিলেন।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুম ও দিলীপকে বললেন যাও তোমরা কামরায় উঠে বোসো। তারপর মহেশকে বললেন তুমি আছ তাই আমার কোন ভাবনা নেই।

যথাসময়ে ট্রেন দুলে উঠল। প্ল্যাটফরমের ধার ধরে এগিয়ে চলল। সত্যকুমার বললেন, বৌদি এবার বিশ্বাস হচ্ছেত আপনি সত্যিসত্যি দেরাদুন মুসৌরী চলেছেন। হেমকুসুম জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন তোমার দাদাকে যে-দিন পাঠাতে পারবে সেদিনই বুঝবো আজ নয়।

ট্রেন প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল অতুলপ্রসাদ কিছুক্ষণ অনিমেষে চেয়ে থাকলেন সত্যকুমারের কন্ঠস্বরে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চল যাওয়া যাক।

পাশাপাশি ফিটনে বসে সত্যকুমারকে বললেন তোমার বাহাদুরী আছে যাক তুমি আমাদের একটা বড় কাজ করলে—যা মনান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার ভয় হচ্ছিল এর পরিণতি কোথায় গিয়ে না দাঁড়ায়। তোমার তো কাল ছুটী আছে দশটার পর এসো না আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। সারা দুপুর তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে।

সত্যকুমার বললেন, বেশ আপনি যখন বলছেন যাবো। ফিটন বাড়ির কাছাকাছি এসে সত্যকুমার নেমে পড়লেন। কিছুদূর চলার পর কোচওয়ানকে অতুলপ্রসাদ বললেন, গাড়ি ঘোরাও, চল গোমতী নদীর ধারে ধারে।......

'জো হুকুম'। কোচওয়ান সেলাম দিল। রিভার ব্যাঙ্ক রোড ধরে অতুলপ্রসাদের ভিক্‌টোরিয়া ফিটন এগিয়ে চলল। শীর্ণকায়া গোমতীর জলধারা বহে চলে—এমনিতে গোমতী বড় শান্ত যখন বন্যা নামে দুকূল ভাসিয়ে চলে তবে তা কদাচিৎ। পদ্মা-মেঘনার মত অহরহ নয়। 'পদ্মা' এই কথাটির মধ্যে দিয়ে পূর্ববাঙলার স্মৃতি মনে ভাসে, অদূরে অস্তমিত সূর্য লোহাপুলের ধার ঘেঁসে 'লক্ষ্মণটিলার' ওপর নবনির্মিত মেডিকেল কলেজ, এপাশে 'ভুলভুলাইয়া' 'ছত্তর মঞ্জিল'—নবাবের প্রাসাদ—এখন ইংরেজদের ক্লাব কোলাহল অট্টহাস্য আনন্দ-হুল্লোড় মত্ত। গোমতীর ওপারে নতুন লখনউ ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে—বাটলারগঞ্জ ...হেমকুসুম এখন অনেকদূরে— এগিয়েছে।......গোমতীর ধারে-ধারে চলে অতুলপ্রসাদের ভিক্‌টোরিয়া ফিটন। বনেদী সদারঙের ওয়েলার ঘোড়া ক্ষুরে শব্দ তোলে ঠক ঠকাস ঠক্ ঠক্। খাঁটি লখনউর পোষাক অতুলপ্রসাদের অঙ্গে—সাদা মসলিনের শেরওয়ানী, চুড়িদার পায়জামা, চিকনকাজের বাঁকাটুপি। মনে সুর আসে গুনগুন। ভিক্‌টোরিয়া ফিটন থেকে নেমে শেরওয়ানীর পিছনে হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ করে পায়েচারী করেন আপনমনে। মনে সুরের খেলা যখন চলে তখন নতুন গানের আনাগোনা হয়। মুক্তি চায় কথা সুরে সুরে।

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটিরে?
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি
কুঞ্জকুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা-তীরে।

ও দুটি নয়নমণি চিনি গো আমি চিনি,
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল-শিশিরে।
জানি ও উজল হাসি, বিষাদ-তমস-নাশী,
দেখেছি বঙ্কিম ধনু নীল নীরদ-নীরে।

কাল রবিবার। ছুটির দিন। ছুটির দিনে বন্ধু-বান্ধব ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা সকলের অবারিত দ্বার। আর তারা এলে তাদের জন্যে সামান্য কিছুর বন্দোবস্ত করতে হয় বৈকি।

সকালে মক্কেলদের জন্যে কিছু সময় ব্যয় করলেন। এগারোটার সময়ে সত্যকুমার এলেন। বললেন এসো এসো সত্যকুমার। চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে দুজনে ডিভানে শুয়ে নানান গল্পগুজব করলেন। চারটে বাজতেই সত্যকুমার লাফিয়ে উঠলেন হকি ম্যাচ আছে। একটা ভালো টিমের সঙ্গে আমাদের ক্লাবের। যাবো মনে করছি।

অতুলপ্রসাদ বললেন চা-টা খেয়ে যাও।

চা-পান করে সত্যকুমার ছুট দিলেন। বিকেলবেলা ছুটীর দিনে বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে হল না। স্নান সেরে জামা কাপড় বদলিয়ে ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। গোমতী নদীর ধারে নির্জন রিভারব্যাঙ্ক রোডে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে যখন ফিরলেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বসার ঘরে দু'চারজন লোক বসে আছেন। অফিস ঘরে আলো জ্বলছে।। সহকর্মী ব্যারিস্টার মোমতাজ হোসেন বসে আছেন তাঁর জন্যে তাকে অভিনন্দন জানাতে হাত মিলিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, কি ব্যাপার?

মমতাজ হোসেন বললেন, দেখ বার-কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচন করা হবে কদিন পরে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, সে তো আমি জানি।

মমতাজ হোসেন বললেন, শুধু জানলেই হবে না। এবার তোমাকে সভাপতি করতে চাই—আমাদের পার্টি এবং লালা পার্টির সকলে তোমাকে ভোট দেব। তুমি রাজী কিনা বল?

অতুলপ্রসাদ বললেন, সে কি করে হয়। পন্ডিত কেদারনাথ মিত্র পুরানো এবং বিজ্ঞ লোক আমিত তাঁর কাছে নগণ্য।—

মমতাজ জানালেন, আমরা তোমার নাম নির্বাচন করেছি। তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। আমি তোমার কথা বিশ্বেশ্বর নাথের কাছে বলেছি, তিনি বলেছেন, তুমি সভাপতি পদে দাঁড়ালে তাঁদের পার্টির সকলেই তোমাকে ভোট দেবেন।

অতুলপ্রসাদ ভাবলেন ঈশ্বরের অসীম করুণা। বললেন আপনারা যা স্থির করেছেন আমি রাজি আছি। তারপর বললেন, হোসেন সাহেব কি খাবেন বলুন চা না কফি?

আজ কিছু না, কিছু না। মমতাজ হোসেন বললেন, আগে তুমি বার-কাউন্সিলের

সভাপতি হও তারপর আমরা একটা ভোজ খাবো তোমার কাছে। আজ উঠি। এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

একজন লোক লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীজ্ঞান চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, অতুলপ্রসাদ চিঠিখানি হাতে নিয়ে পড়লেন। জ্ঞান চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আপনাকে আমার খুব প্রয়োজন। আপনাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারী সভার সভারূপে মনোনীত করতে মনস্থ করেছি। একদিন সাক্ষাৎ হলে বাধিত হবো। আগামী সোমবার আপনি কি কাছারীর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন?

অতুলপ্রসাদ দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সকলে চলে যেতে অতুলপ্রসাদ ঘরে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে সিগার ধরালেন তারপর মনে মনে ভাবলেন কোথায় কাছারীর কাজ সেরে দেরাদুন মোসৌরী যাবো তা নয় দুটো কাজের বাধা এসে গেল। এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি। ভগবানের দেয়া সম্মান একদিকে অথবা স্ত্রীর মনোরঞ্জন। কুসুম নিশ্চয়ই খুউবই রাগ করবে আমার যেতে দেরী হলে। যাক্ কালকেই তাকে এই সকল কথা জানিয়ে চিঠি দিয়ে দেবো।

হঠাৎ খবর পেলেন সরলা দেবী আসছেন লখনউ-এ! ...সেদিন যে কি আনন্দের দিন ছিল সরলা দেবী এলেন অতুলদাদার গৃহ-প্রাঙ্গনে বন্দেমাতরম গান গাইলেন। সহস্রাধিক শ্রোতা মুগ্ধ স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে যেন গানের লহরে আনন্দে সাঁতার কাটতে লাগলো সমস্ত পাড়াটা যেন সঙ্গীত ঝঙ্কারে আমোদিত হল। তারপর অতুলদাদা মিষ্ট কণ্ঠে সুললিত কবিসুলভ ভাষায় দেবীকে প্রশংসাসূচক যে ভাষার মালা পরিয়ে দিলেন তাতে দেবী পরিতোষ লাভ করে স্বীকার করলেন যে মালার অতিভরে তাঁর মস্তক নত হয়েছে এবং সে ভার বহন করা তাঁর সাধ্যের ওপারে। সরলা দেবী লখনউ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।—

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেলেন অতুলপ্রসাদ। চিঠিত শুধু নয় আমন্ত্রণ।... রবীন্দ্রনাথ গরমের সময়টা রামগড়ে পাহাড়ি জায়গায় কয়েকটা দিন কাটাবেন স্থির করেছেন। রামগড় কাঠগুদোম থেকে অল্প দূরে। যাত্রাপথে লখনউ ছুঁয়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। 'অতুল তুমিও আমার সঙ্গে চল কয়েকটা দিন রামগড়ে একসঙ্গে আনন্দে দিন কাটানো যাবে।'

রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছেন! তাঁর অমূল্য-সঙ্গ ত্যাগ করা যায়? নিশ্চয়ই নয়। ...হেমকুসুম রাগ করবে। বড় অভিমানিনী...... কিন্তু ....

১৯১৪ মে-জুন মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ কন্যা এবং পুত্রবধূ সমেত হিমগিরির পায়ের তলায় রামগড় যাত্রা করলেন। রবীন্দ্রনাথ বদরিনাথ থেকে ফেরার পথে রামগড়ে পৌঁছে গেলেন। অতুলপ্রসাদ সব-কাজ থেকে ছুটী নিয়ে কয়েকটি দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটিয়ে এলেন।

অতুলপ্রসাদের নিজের কথাতেই সে সব দিনের কথা শোনা যাক। ......'একদিন বৈকালে প্রবল বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্ষার আসর বসিল বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত। কবি একাধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন এবং গান গাহিলেন। সেদিনটি আমি কখোনোও ভুলিব না। রাত্রি আটটার সময়ে খাবার প্রস্তুত। কবিকন্যা এবং পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতিক্ষা করিতেছেন। কবির কিম্বা আমাদের কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই। বর্ষাগীতির মাদকতায় আমাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত করিয়াছে। ক্ষুৎপিপাসা তিরোহিত হইয়াছে। ...এই প্রসঙ্গে একটি হাসির কথা মনে পড়িতেছে। সে আসরে রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে আদেশ করিলেন 'অতুল তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাওতো হে।' আমি গাহিলাম, 'মহারাজ কেওরিয়া খোল, রসকি বুঁদ পড়ে।' সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে গানটি ভালো লাগিল। কবি সে গানটি আমার সহিত গাহিতে লাগিলেন।—আমাদের সকলকেই বর্ষার মোহ আচ্ছন্ন করিয়াছে এমনকি সঙ্গীত-অজ্ঞ Rev. Andrews সাহেবকেও এই গানের ছোঁয়া ধরিল। তিনি আমার সঙ্গে অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া এবং ততোধিক বেসুরো কণ্ঠস্বরে আমাদের সহিত গাহিতে লাগিলেন 'মহারাজা ......খেলো।' তাঁর সঙ্গীতের আকস্মিক উচ্ছাস রোধ করা দুস্কর দেখিয়া আমরা তাঁকে বাধা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করিলাম না। *... সেবার রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন, আমার শয্যা সেই ঘরেই ছিল। আমি দেখিতাম তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি বাটির বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতুহল হইল। আমিও তাঁহার অলক্ষিতে তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। আমি একটি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তার দুইদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈলকুসুম। তাঁর সম্মুখে অনন্ত আকাশ এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষারমালা বালরবি-কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ এবং হিমগিরি পানে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন। তাঁর প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল উষার আলোয় শান্তোজ্জ্বল। তিনি গুনগুন করিয়া তন্ময় চিত্তে গান রচনা করিতেছেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁর সেই অনুপম গানটির সদ্য রচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম এবং তিনি নামিয়া আসিবার পূর্বেই পলাইয়া আসিলাম। আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন—'ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে পূজার ছায়ে।' এইরকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তাঁর গান রচনা শুনিতাম। আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেবময় মূর্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। পলাইয়া আসিবার সময়ে দেখিয়া ফেলিলেন। সুচতুর কবি বুঝিলেন যে গোপনে আমি তাঁর গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অতুল এখানে এত ভোরে যে, কোথায় ছুটে যাচ্ছ?' আমি দেখিলাম ধরা পড়িয়াছি আর উপায় নাই। বলিলাম লুকাইয়া আপনার গান শুনিতেছিলাম।

তার দুইদিন পরে তিনি যখন আমাদের শুনাইলেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' আমি বলিলাম—'ওই গানটি আমি পূর্বেই শুনিয়াছি।' তিনি বলিলেন—'পূর্বে কি করে শুনলে? আমি তো মাত্র দুদিন হল এই গানটি রচনা করেছি।' আমি বলিলাম—'রচনা করবার সময়ই শুনেছিলাম।

কবি বললেন, 'তুমি তো বড় দুষ্টু, এই রকম করে রোজ শুনতে বুঝি। আমরা সকলে খুউব হাসলাম।

......একদিন বৈকালে বাহিরে বসিয়া আমরা চা ও গৃহজাত নানাপ্রকার সুখাদ্যের সম্ভোগে ব্যস্ত ছিলাম, কবি হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া 'অতুল এস' বলে হাত ধরে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহার কন্যা ও পুত্রবধূ বলিয়া উঠিলেন—'বাবা ওকি', অতুলবাবুর যে খাওয়া এখনো শেষ হয়নি।' 'তা হবে এখন' বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর লাগিল। আমি আগ্রহের সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়া গিয়া পরম রমণীয় পত্রপুষ্প শোভিত একটি সুন্দর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন। সত্যই মুগ্ধ হইবার মত সেই স্থান। তিনি বলিলেন 'আমি রোজ এখানে আসি। এখানে বসি, গান গাই এবং গান রচনা করি।' আমি অনুরোধ করিবামাত্রই কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শোনাইলেন। কি যে ভালো লাগিয়াছিল বলিতে পারিতেছি না। ফিরিয়া আসিলে কবিকন্যা বলিলেন 'বাবা, তোমার যে কাণ্ড, অতুলবাবুকে না

---

* 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি' প্রবন্ধে ('উত্তরা' ষষ্ঠ বর্ষ মাঘ ১৩৩৮ সালে পৃষ্ঠা ৪৫৫-৪৬০) অতুলপ্রসাদ লিখেছেন, Rev. Andrews সাহেব রামগড়ে তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অতুলপ্রসাদ এন্ড্রুজ প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার ...... লিখেছেন 'দিল্লী হইতে এন্ড্রুজ আসিতে পারিলেন না। তিনি গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনের কার্যে যোগদান করিবেন তাই বোধহয় সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের সহিত দীর্ঘবন্ধনের গ্রন্থিসমূহ সম্পূর্ণ মোচন করিতেছেন।' কবি প্রায় প্রতিদিনই এন্ড্রুজকে একখানি করিয়া পত্র লেখেন, মনের নানা কথা নানা চিন্তা প্রকাশ করেন।"

খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে?' 'তিনি বলিলেন, অতুলকে জিজ্ঞেস কর।' আমি বললাম, 'আমি সেখানে খুউব ভালো জিনিষ খেয়ে এসেছি।'

......রামগড়ের সে দশদিনের সে অবিরাম আনন্দ ও গীতোৎসব কখনো ভুলিব না। *

রামগড় থেকে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। আবার শুরু হল তাঁর কর্মময় জীবনধারা। ইতিমধ্যে হেমকুসুমও ফিরে এসেছেন।— সম্পর্ক হল তিক্ত। হেমকুসুম শারীরিক সুস্থ, মানসিক অসুস্থ। নানারকম সন্দেহ তাঁকে ঘিরে ধরল। কুরে কুরে তাঁকে খেল। নানারকম যুক্তি তাঁর 'যেহেতু তিনি সুস্থ, তাই অতুলপ্রসাদ তাঁকে আর দেখছেন না— তাঁর তরে একটুকু সময় ব্যয় করেন না।' আবার মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হয় বুঝি। ঝড়ের সূচনা দেখা দিল ক্রমে ঝড় এসে পড়ল। অতুলপ্রসাদের একজন বন্ধুপত্নী এলেন তাঁর জন্মদিনে তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাতে। নিমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

হেমকুসুম আরাম কেদারায় শুয়ে-ছিলেন। মহিলাটিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কোনরূপ স্বাগত জানালেন না। ঈষৎ বিরক্তির রেখা তাঁর মুখে অঙ্কিত হল। বললেন শুধু, আমার শরীর ভালো নেই আমি কোথাও যেতে পারবো না।

অপমানিত মহিলাটি।

অতুলপ্রসাদ তাঁর অফিসঘরে পরিবৃত মক্কেলদের মাঝ থেকেও অভ্যর্থনা করে তাদের হাসিমুখে ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। বললেন নিশ্চয়ই যাব নিমন্ত্রণে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনারা কি খাওয়াচ্ছেন বলুন কি কি মেনু।

মার্কেট থেকে হাল্কা রংয়ের সুন্দর একখানি শাড়ি পছন্দমত কিনে বাড়ি ফিরলেন। জামা-কাপড় বদলে খাবার ঘরে চা-জলখাবার খেতে বসেছেন। হেম-কুসুমকে ঘরে দেখতে না পেয়ে ভৃত্যকে বললেন, মেমসাহেব কোথায়?

ভৃত্য জানালো, তিনি তাঁর ঘরেই আছেন।

অতুলপ্রসাদ কি মনে করে চায়ের পেয়ালা হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে তাঁকে ডাকতে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, এতদিন একটা কেস নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলাম হাঁফ ছাড়বার ফুরসত পাইনি। আজ মিটে গেছে। খুউব খাটুনি গেছে জানো। যাক চল আজ বন্ধু-পত্নীর জন্মদিনে গিয়ে একটু আমোদ করে আসি চল। জন্মদিনের উপহার স্বরূপ একটা কাপড় কোর্ট থেকে ফেরার পথে কিনে এনেছি। এই বলে ঘরে উঠে গিয়ে কাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে এসে হেমকুসুমের সামনে মেলে ধরলেন খুব খুশী মনে।

কাপড়টা দেখেই অকস্মাৎ হেমকুসুমের পুরোনো বীভৎস ভয়ঙ্কর রাগ জেগে উঠল। রক্তবর্ণ চক্ষুগোলক কাঁপতে কাঁপতে স্থির হলো। ঝড়ের পূর্বাভাস। বললেন তাতো আনবেই। আনবে না কেন। হঠাৎ হেমকুসুম উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের বাণ্ডিল হাতে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের কোণে। বললেন, যাও তুমি একা যেখানে খুশী আমি যাবো না।

অতুলপ্রসাদ কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে টমটম হাঁকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলেন।

রাত্রি অতুলপ্রসাদের বিনিদ্র গেল। ভোর হলে তিনি অন্য কোনখানে চলে যাবার জন্যে মন স্থির করলেন। ভৃত্যকে বললেন, তাঁর জামা-কাপড় পোষাক-আসাক যেন তাঁর সুটকেসে গুছিয়ে দেয়। তিনি একটু একা বাইরে যাবেন। বিছানাপত্র সে যেন বেঁধেছেঁদে রাখে। তারপর বললেন কোচওয়ানকে বল গাড়ি বার করতে আমি একটু ঘুরে আসি। এই বলে তিনি উপহারের কাপড়টি হাতে নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধুবরের বাড়িতে গিয়ে বললেন বন্ধুবরকে, যে আমি কিছুদিনের জন্যে কলকাতা যাব মনস্থ করেছি। আমার হাতের মামলা-মোকর্দমাগুলো তুমিই দেখ। মুনসিজী তোমাকে সব কাগজপত্রগুলো দিয়ে যাবে। তারপর বললেন, তোমার স্ত্রীকে ডাক তাঁর জন্য এই উপহার কিনে-ছিলাম। কাল শরীর ভালো ছিল না আসতে পারিনি। আজ দিয়ে যাই।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না কাপড়-খানি বন্ধু-স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে অতুল-প্রসাদ বিদায় নিলেন। বাড়িতে এসে মুনসিজীকে বললেন, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। মেমসাহেব ও দিলীপ থাকবে। তুমি এসে রোজ দেখাশোনা করবে। আমি চলে গেলে আমার গাড়ির কোচ-ওয়ানকে ছুটি দিয়ে দিও। আমার খিতমতগার ভৃত্যও বলছিল দেশে যাবে। তাকেও দেশে পাঠিয়ে দিও। আয়া, মালি, খানাসামা ও মেমসাহেবের গাড়ি থাকবে দেখবে এদের যেন কোন কষ্ট না হয়। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে চিঠি লিখবো। এখানকার খরচপত্রেরও ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে তুমি তোমার মোকর্দমার কাগজপত্র নিয়ে

* অতুল প্রসাদ রচিত আমার কয়েকটি রবীন্দ্র স্মৃতি থেকে (প্রথম উত্তরা-প্রকাশিত ষষ্ঠ বর্ষ মাঘ ১৩৩৮ সাল পৃষ্ঠা ৪৫৫-৪৬০)

যাবে। তিনিই সব কাজ করবেন। তিনি যা বলবেন তাই কোরো তাঁর কথা মতো।

ভাবলেন একবার হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন হেমকুসুমের ঘরের দিকে তারপর কি মনে করে ফিরে এলেন এসে আরাম কেদারায় শুয়ে ভাবলেন আপন মনে হেসে, এর আগেরবার মিটমাট হয়েছিল সত্যকুমারের জন্যে। কিন্তু বোধহয় মিটমাট রফা তাঁদের মধ্যে কোনদিনই হবে না কোনদিনই তাঁদের মনের মিল হবে না। আশ্চর্য কেমন করে মনে মিল হয়েছিল সেকথা ভেবে এখন আশ্চর্য মনে হয়। ঘুমিয়ে ছিলেন।

ঘুম ভেঙ্গে দেখলেন অফিসঘরে মক্কেলেরা বসে আছেন। এঁরা এখনো জানেন না অতুলপ্রসাদ—সেনসাহেব লখনউ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। মুনসিজীর কথা ওরা অনেকেই বুঝতে পারছে না বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে আছেন। অনেকে নানা প্রশ্নে মুনসিজীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। অতুলপ্রসাদ তাঁদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করে ভৃত্যকে বললেন কোচোয়ানকে বল, গাড়ি বার করতে স্টেশন যাবো। আর তুমি আমার জিনিষপত্রগুলি গাড়িতে তুলে দাও। দেরী করো না। আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। আর আমি কোথায় যাচ্ছি মেমসাহেব যদি প্রশ্ন করেন তবে বলো আমি জানি না। আমাদের কোন কথা বলে যাননি।

একথা বলে অতুলপ্রসাদ তাঁর প্রিয় ভিক্টোরিয়া ফিটন গাড়িতে চড়ে কোচোয়ানকে বললেন 'স্টেশন চলো।'

(১৪)

এরপর যবনিকা উঠল হল ১৯১৬ সালে। অতুলপ্রসাদ পারিবারিক কারণে লখউন্ ত্যাগ করে কলকাতাবাসী হয়েছেন। ইচ্ছা কলকাতায় বাস করে এখানেই ব্যারিস্টারী করবেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এবং কলকাতার আরো কয়েকজন তাঁকে অনুপ্রেরণা দিলেন। কলকাতায় বাস করেই এখানেই প্র্যাকটিশ করুন, কেন অত দূরে আমাদের ছেড়ে থাকবেন।

অতুলপ্রসাদ ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন ওয়েলেসলী স্ট্রীটের মোড়ে ওয়েলসলী মানসনে। লখনউ ত্যাগ করে এসে রোজকার অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। শান্তি পেলেন।

সাহিত্যপ্রেমিক অমল হোম একদিন এসে বললেন, চলুন একদিন আমাদের মণ্ডে ক্লাবে—সাহিত্যিক শিল্পীদের আড্ডায়। কলকাতা সাহিত্যের রঙ্গভূমি। কয়েক বছর আগে অমল হোমই অতুলপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে ভারতী অফিসের বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরিচয় হয়েছিল সেদিন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কবি অতুলপ্রসাদের। সেদিনের কথা কি ভোলা যায়!*

বন্ধু মহলে অতুলপ্রসাদের গানের ও অতুলপ্রসাদ মানুষটির কথা অনেক গল্প করলাম। তাঁর কোন গান তখনও বের হয়নি। ভারতী অফিসে আমাদের প্রতিদিন বৈঠক বসতো। মণিলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বন্ধুমহলের মধ্যমণি। আর ছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এখানে বেসুরো হারমোনিয়ামের সঙ্গে আমরা ততধিক গলা মিলিয়ে গাইতেম:

বঁধুয়া নিদ......যতে

সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দিতেন তার সাথে। বর্ষার সন্ধ্যাগুলি মূর্ত হয়ে উঠত গানের কলিতে

> গগনে বাদল, নয়নে বাদল
> জীবনে বাদল ছাইয়া—
> এসেছো আমার বাদলের বঁধু
> চাতকিনী আছে চাহিয়া।

অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত হয়ে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর তাগিদেই আমি অতুল-প্রসাদকে লিখলাম আপনার নতুন গান যা হচ্ছে আমায় পাঠিয়ে দিন। চিঠি লেখামাত্রই জবাব পেলাম—স্নেহপূর্ণ পত্র তার গান সত্যেন্দ্রনাথের (দত্ত) ভালো লাগাতে পরম আনন্দ এবং গৌরববোধ করেছেন। কিন্তু কোন গান পাঠাননি। লিখেছেন সুর ছাড়া আমার লেখাগুলি বড় ছন্দহীন। ছন্দের রাজার কাছে তা কি করিয়া পাঠাবো? এবার যখন কলিকাতায় আসবো তখন এক-দিন সত্যেন্দ্রবাবুকে আপনাকে এবং আপনার বন্ধুদের গান শুনাইবো। কিন্তু অতুল-প্রসাদের নতুন গান শোনবার ও শেখবার সুযোগ ঘটে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। আমার পরম আত্মীয় ও বন্ধু সুকুমার রায়ের পত্নী অতুলপ্রসাদের মাসতুত বোন শ্রীমতী সুপ্রভা রায়ের কাছে। একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম একখানি সুরম্য চামড়ায় বাঁধানো খাতা—আগাগোড়া অতুলপ্রসাদের স্বহস্তে লেখা স্বরচিত সঙ্গীতে ঠাসা। সেগুলি সত্যেন্দ্রনাথ সমীপে পৌঁছে দিলাম। তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন ...কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদের চিঠি পেলাম কলকাতায় আসচেন তাঁর মেসোমশাই শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। সকালবেলা প্রাণকৃষ্ণ মহাশয়ের কন্যাকে গান শোনাচ্ছেন। শেখাচ্ছেন। সে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠস্বর, হ্যারিসন রোডের ট্রামের ও মোটরের ঘর্ঘর ধ্বনি ছাপিয়ে তাঁর সুরলহরী মুগ্ধ করেছিল। বাড়ি ফিরে এলাম। কথা হল পরদিন সন্ধ্যায় তিনি ভারতী অফিসের বৈঠকে আসবেন—সত্যেন্দ্রনাথের থাকা চাই তাঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্যে অতুলপ্রসাদ উৎসুক। দুই কবির পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত হল। দুজনেই স্বল্পভাষি মধুর স্বভাব অক্লান্ত কণ্ঠ অতুলপ্রসাদ গানের পর গান গেয়ে শোনালেন।"

অতুলপ্রসাদের কলকাতায় আসার কিছুদিন আগেই অমল হোম ও কয়েকজন মিলে সোমবার বা মণ্ডে ক্লাব নাম দিয়ে ছোট্ট বন্ধুগোষ্ঠী রচনা করেছিলেন। বয়স এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের সে ক্লাবের প্রথম সভ্য ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুকুমার রায়।

মনডে ক্লাবের সাহিত্য-প্রেমিক বন্ধুরা অতুলপ্রসাদকে বললেন আপনি যখন কলকাতায় এসেছেন আমাদের বৈঠকে যোগ দিন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বাংলাদেশে সেই কারণেই ত এলাম। গল্পে গানে হাস্য-পরি-হাসে সমবয়সী অল্পবয়সী সকলকে একান্ত-ভাবে আপনার করে নিলেন। মনডে ক্লাবের বৈঠকের জন্যে অতুলপ্রসাদের ফ্ল্যাটের বসার-ঘরে একজোড়া তক্তাপোষ পড়ল। তার ওপর পাতা হল পুরু গালিচা। তারপর চর্ব্যচষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যেরকম বিরাট আকার ধারণ করল তাতে ক্লাবের বৈঠক অন্য কোথাও বসা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেক বৈঠকেই সুনিবিড় সঙ্গীত চর্চা চলত, কাব্যালোচনা ছিল। অতুলপ্রসাদ প্রায় প্রত্যেক বৈঠকেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন এবং সঙ্গীত শোনাতেন।

শুধু যে নিজের ফ্ল্যাটের অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত থাকতেন তা নয় অন্য সব সভ্যদের বাড়িতে অধিবেশনগুলিতেও পৌঁছে যেতেন। বৈঠক অনেকের বাড়িতেই বসত। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের গঙ্গার ওপরে মেয়ো হাস-পাতালের ছাদে, নরেন্দ্রনাথ সেন স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রীটের অমল হোমের বৈঠকখানায়, গড়পাড়ে সুকুমার রায়ের ড্রইংরুমে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুকিয়া রোর পৈতৃক বাসভবনে। বিজয়চন্দ্র বসুর আলিপুরের চিড়িয়াখানার ভিতরে কোয়ার্টারে। বিজয়চন্দ্র বসু ছিলেন চিড়িয়া-খানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কালিদাস নাগের মামা। চিড়িয়াখানার সেই প্রথম মনডে ক্লাবের সকল সভ্য মিলিত হয়েছিলেন একখানি ছবি তোলা হল সেই প্রথম এবং শেষ ছবি মনডে ক্লাবের সকল সভ্যদের—অতুলপ্রসাদ সেখানে মধ্যমণি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছিল। জ্যোৎস্নায় চিড়িয়াখানার ঝিলে সেদিন চমৎকার রোয়িং করা গেল। আর

সাহিত্যপ্রেমিক এবং সুসাহিত্যিক অমল হোম তাঁর স্মৃতিকথা প্রবন্ধে (উত্তরা আশ্বিন সংখ্যা ১৩৪১) লিখেছেন কলকাতায় ফিরে এসে।

একবার মনডে ক্লাবের সকল সভ্যরা ষ্টীমার ভাড়া করে চললেন কোলাঘাট। ভোরবেলা ষ্টীমার কলকাতার ঘাট থেকে নোঙর তুলল। যাত্রা হল। গংগাবক্ষে কোলাঘাট। কলকল জলস্রোত দিগন্ত প্রসারী বেলাভূমি আর একটানা ষ্টীমার যান্ত্রিক ধ্বনির সংগে সংগে চলল আনন্দ উৎসব সাহিত্যালোচনা আর জঠর তৃপ্তি শান্তি আর সকল কিছু ছাপিয়ে সকলের কণ্ঠে সেদিন রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গান। অপরাহ্নে কোলা-ঘাটে নেমে ডাক-বাংলোর ছাদে পূর্ণিমার নিশি যাপনের মধুর স্মৃতি মনে এ'কে ফিরে এলেন সকলে কলকাতা। একবার কোন এক অধিবেশনে অমল হোম অসকার ওয়াইল্ডর মানুষ এবং তাহার কর্ম (man and his work) এই নামে খুব বড় একখানা প্রবন্ধ পাঠ করে উপস্থিত সভ্যদের বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ মনোযোগ দিয়ে প্রবন্ধখানি শুনে বললেন, পরের অধিবেশনে অসকার সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তার কিছুদিন পরে কালিদাস নাগের মামার আলিপুর চিড়িয়া-খানার কোয়ার্টারে যখন মনডে ক্লাবের অধিবেশন বসল অতুলপ্রসাদ অসকার ওয়াইল্ডর ট্রায়াল বৃত্তান্ত শোনালেন। অসকার ওয়াইল্ডর যখন ট্রায়াল হয় তখন চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অতুলপ্রসাদ দুজনেই ব্যারিস্টারী পড়ছেন। ওল্ডবেলীতে তাঁরা দুজনেই বিচার দেখতে গিয়েছিলেন। Sir Edward Carson র জেরার জবাবে ওয়াইল্ডের মুখে কি রকম 'তুবড়ি ফুটেছিল' সে গল্প করলেন।*

কলকাতায় এসে পুরোনো বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং সাহিত্যচক্রের মধ্যে থেকে মন যদিও কিছু ভালো ছিল তবু কোথায় যেন একটা অভাব বোধ অনুক্ষণ জেগে থাকে। সে অভাব পূর্ণ হয় না বুঝি! ভুলতে পারেন না লখনউ—তাঁর অনেকদিনের অনেক বছরের পরিচিত জগৎটাকে—স্বদেশের আত্মীয়ের মত মানুষদের মক্কেলদের। ......গোমতী নদীর জলধারা তেমনি বহে চলে সময়ের স্রোতে, কেশর-বাগের মোড় টাংগা-এক্কাওয়ালাদের সোয়ারীর জন্যে প্রতীক্ষা, আমিনাবাদ ধীরে ধীরে জমজমাট হয়ে আসছে, কেশরবাগের রাস্তা ধরে এক্কা ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে ধুলোর ঝড় তুলে গোমতীর লোহপুলের দিকে দৌড় দিল এক্কা-টাঙ্গার দল। সাদা ফিটন আর তাঁর প্রিয় ওয়েলার ঘোড়ার জন্যে বুঝি ক্ষণিক মন কেমন করে। ......হেম-কুসুমের এতক্ষণে বোধহয় ঘুম ভাঙল। একটু পরে দিলীপের মাস্টার মহেশ আসবে। ওরা প্রাতঃভ্রমণে বেরোবে। ......আজ যেন বড় বেশী হেমকুসুমের কথা মনে পড়ে। দিলীপকে একবারটি দেখবার জন্যে মন কেমন করে ওঠে। ভালো লাগে না কলকাতা।

* শ্রীঅমল হোমের 'স্মৃতিকথা' থেকে

তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। কলকাতা শহর থেকে হঠাৎ শান্তিনিকেতন চলে এলেন অতুলপ্রসাদ কয়েকটা দিন রবীন্দ্র-সংগমে অতিবাহিত করে ফিরে এলেন কল-কাতায় ওয়েলেসলী ম্যানসনে, বৃদ্ধ খিদম-গোর নবাব আলির তত্ত্বাবধানে কলকাতায় প্রভুভৃত্যের সংসারে। প্রভু কর্মস্থল থেকে না ফেরা পর্যন্ত অভুক্ত থাকে ভৃত্য। বড় বিশ্বাসী খিদমৎগার নবাব আলি।

একদিন লিডার সম্পাদক সি ওয়াই চিন্তামনি এলেন। পুরোনো দুই রাজ-নীতিবিদ বন্ধুর সাক্ষাৎ হলো। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হল। সি ওয়াই-এর গান্ধীজির অসহযোগ আন্দো-লনের ওপর বিশেষ আস্থা নেই। অতুল-প্রসাদ বললেন, চেয়ে থাক ও'র মাঝেই মহাশক্তি লুকিয়ে আছে। আমারও বিশেষ আস্থা না থাকলেও অনাস্থা নেই। ...জ্ঞানী-গুণীদের সমাগম হয় ওয়েলেসলি ম্যানসনে। সরোজিনী নাইডুর ভাই হারীন্দ্রনাথ সেদিন বললেন দেখে রেখ একদিন তুমি তোমার দিদিকে ছাড়িয়ে যাবে ঠিক। হারীন্দ্রনাথ এসে নেমেছিলেন অতুলপ্রসাদের বাড়ি তাঁর অতিথি হয়ে। অনেকদিন ছিলেন। মনডে ক্লাবের অনেক সভাবৃন্দ জমায়েত হতেন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে অতুলপ্রসাদের কাছে। যোধপুরী পাজামার ওপর কালো অথবা খয়রী রং ইউনিফরম কোট, মাথায় রাজপুতানী পাগড়ি এই ছিল তাঁর পোষাক। আর ছিল তাঁর অপরূপ রসিকতা। বড় রসিক মানুষ অতুলপ্রসাদ।

সেদিন এক পরিচিত ফরেস্ট অফিসার বন্ধু বললেন সুন্দরবন চলেছি অফিসের কাজে যাবেন আমার সংগে, কয়েকটা দিন বেড়িয়ে আসবেন। আপনার ভালো লাগবে। আমরা লঞ্চে যাবো আর আসবো আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

অতুলপ্রসাদ রাজী হলেন।

স্টিমলঞ্চটি বেশ বড়। অতুলপ্রসাদের ভালো লাগল। দুখানি ঘর—একটি খাবার ঘর ও একটি শোবার ঘর বাথরুম স্নানের ব্যবস্থা। একখানি ঘরে লেখাপড়া করার জন্যে ছোট্ট একখানি টেবিল চেয়ার পাতা। টেবিলে বই কাগজপত্র কালি—সেখানে যেমনটি ঠিক তেমনিই।

বন্ধু বললেন আপনার প্রয়োজনে আসতে পারে তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে।

লঞ্চের নীচের তলায় লঞ্চের ইনজিন লোকজনদের থাকার ব্যবস্থা একদিকে। রেলিং দেওয়া ছোট্ট একটা বারান্দা দুখানি বেতের চেয়ার পাতা। চেয়ারে আরামে বসে অতুলপ্রসাদ বললেন বেশ ব্যবস্থা হয়েছে। খানাটানার কি ব্যবস্থা হয়েছে—কি ব্যবস্থা করেছ হে?

ফরেস্ট অফিসর হেসে বললেন সুন্দর-বনে হরিণ শিকার যদিও বে-আইনী কিন্তু আপনি যখন আমাদের অতিথি তখন সব ব্যবস্থাই হয়েছে......হরিণের মাংসের রান্নারও ব্যবস্থা হয়েছে।

ভেরী গুড, অতুলপ্রসাদ হাসলেন বললেন—বে-আইনী কাজটাও তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি—তাহলে কি বল।

সন্ধ্যা নাগাদ লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চ এগিয়ে চলল মাঝ দরিয়া ধরে কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে কলকারখানার অলো-ধোঁয়ার রাজ্য পার হয়ে। সীমান্তের অন্ধকারে গাছের সারি। মিলন পিয়াসী জোনাকীরা জ্বলে-জ্বলে সারা।

অতুলপ্রসাদ বললেন একটু পরে চাঁদ উঠবে। আকাশ দেখে তাই মনে হয়।

বন্ধু বললেন প্রোগ্রাম এমন করেছি যাতে পূর্ণিমার সময়টা আমরা বনে কাটাতে পারবো। চাঁদের আলোয় সুন্দরবনের দৃশ্য অপরূপ—কিন্তু সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর। নির্জন ভীতিপ্রদ।

অতুলপ্রসাদ বললেন আমি সে দৃশ্য দেখবার জন্য খুবই উদগ্রীব।

একটু পরে চাঁদ উঠল। স্নিগ্ধ আলোয় পৃথিবী রূপ ফেরালো। চন্দ্রালোকে তরংগতে শত-শত চন্দ্রমা মালিকার সৃষ্টি হল। নভমন্ডলে আলোকের ছটা। মুগ্ধ অতুলপ্রসাদ। লঞ্চ এগিয়ে চলল। তন্ময়তা ভাঙলো বন্ধু বললেন আসুন আমরা খাবার ঘরে যাই ভোজন করে নিই। আপনার ক্ষুধা পায়নি এখানে বসেই খানা খাবেন? খান-সামাকে আনতে বলি?

অতুলপ্রসাদ বললেন, না চল খাবার ঘরেই যাই।

খাওয়া শেষ হতে তাঁরা দুজনে বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসলেন।

বন্ধু বললেন, এমন পরিবেশে আপনি একটা কবিতা আবৃত্তি করুন। ......বন্ধুর অনুরোধে অতুলপ্রসাদ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন পরে কয়েকটি আপন গান গাইলেন। রাত হয়েছিল অনেক অতুল-প্রসাদ গান থামিয়ে বললেন, আর নয় চল, এবার ঘুমুনো যাক।

লঞ্চের অন্দরে এসে দুই বন্ধু আপন-আপন শয্যায় শয়ন করলেন। পাশের জানলা দিয়ে গংগার ফুরফুরে বাতাস আসছিল। স্টিমলঞ্চ চলছিল তার আপন গতিতে ইনজিনের একটানা শব্দ তরংগ তুলে। ইনজিনের শব্দ জলের শব্দ এবং বাইরের নিস্তব্ধ নিথর মৌন পৃথিবী চন্দ্র-কিরণ মেখে গীত হয়ে স্বপ্নের জাল বুনে-ছিল। অতুলপ্রসাদ ঘুমিয়েছিলেন রাত অনেক তখন মুখে চন্দ্রকিরণ পড়ল এসে। —মোহনায় এল লঞ্চ। হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ মেলে চাইলেন অতুলপ্রসাদ। আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসলেন। জানালার মধ্যে দিয়ে দেখলেন চাঁদনী রাতের তরংগায়িত মনোমুগ্ধকর ভাগীরথীর দৃশ্য। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজপত্র কলম এনে জানালার পাশে বসলেন। মনের মধ্যের সুর মুক্তি চাইল। গুনগুন গাইলেন। তারপর কলম তুলে

কাগজে লিখলেন . চন্দ্রকিরণে লিখতে অসুবিধা হল না কোন। লিখলেন—

আজি এ-নিশি সখী, সহিতে নারি।
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা বারি।
এমনি সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি—
নাহিক শ্যামের তরী, নাহি বাঁশরী।
ছিল গো সেদিন, সখী হেন যামিনী।
আছে ফুল নাহি মধু,
আছে আশা নাহি বঁধু,
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী।
মিলনমধুর নিশি আসিবে না আর,
আজি এ চাঁদনী ধরা বিরহ-বেদন-ভরা,
আকাশের গ্রহ-তারা শ্যাম-ভিখারী।

গান লেখা হলে বেহাগের সুরে গুন-গুনিয়ে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে গাইলেন। ভয়। পাছে বন্ধুর ঘুম টুটে যায়! গান থামতেই বন্ধু মুগ্ধভাবে বললেন, আমার জীবন সার্থক হল...এমন পরিবেশে আপনার গান শুনলাম। আর একটা গান আপনি গান।

গান থামিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি বুঝি ঘুমোওনি? শুয়ে শুয়েই আমার গান শুনছিলে প্রথম থেকেই।

আপনিও ঘুমোন নি। কেন?

অতুলপ্রসাদ হাসলেন, বললেন, ঘুমিয়ে ত ছিলাম। চাঁদ বাদ সেধে ঘুম টুটিয়ে দিল।

বন্ধু বললেন, রাত জাগলে আপনার শরীর খারাপ হবে। হেসে বললেন, ঝিলি-মিলি নামিয়ে দিন। চন্দ্রকিরণ আসবে না। তাহলে নিদ্রাদেবীর আগমন ঘটবে।

পরের দিন ভোরবেলা ইঞ্জিনের একটানা ঘরঘর শব্দে এবং একঝাঁক উড়েচলা পাখির

কলকাকলিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চাইলেন অতুলপ্রসাদ। বন্ধু এসে সুপ্রভাত জানিয়ে আপন অফিসের কাজে ফাইলপত্তরের মাঝে ব্যস্ত হলেন। অতুলপ্রসাদ আরাম-কেদারায় বসে তাকিয়ে রইলেন দূরে। মোহনা অতিক্রম করে লঞ্চ এল সুন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য খাঁড়ির একটিতে। সুন্দরবন এলাকা শুরু হল সুন্দরী বৃক্ষের জঙ্গল। আরো কতরকমের বৃক্ষ, বৃক্ষে ফলফুল নানান পক্ষীর কলকাকলিমুখর বনভূমি। বন ক্রমে ঘন থেকে ঘনতর হল সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভয়াবহ। বড় উদাসী...তবু সুন্দর। মুগ্ধ অতুলপ্রসাদ। লিখলেন—

ওরে বন, তোর বিজনে সংগোপনে
কোন উদাসী থাকে?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে
সে আজ ডাকে:
নিজে সে নীরব হয়ে রয়।
শোনে সে ফুল যে কথা কয়:
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়;
শোনে সে লতার অনুনয়।
পাখিদের প্রগল্‌ভতা দেয় কি ব্যথা তাকে।
কেউ তারে পায় নাকো ডাকি;
থাকে সে সদাই একাকী,
কোন একাকী করল তারে এমন একাকী?
তারে বৃথা খোঁজে চন্দ্র-তপন
পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
আজি মন বিবাগী চঞ্চল,
বিরহে চক্ষু ছলছল্;
সদাই ভনে—ওই বিজনে আমায় নিয়ে চল্।
ওরে মোর পাগলা পরাণ,
পাবি কি তুই তাকে!*

বন্ধুর সঙ্গে সুন্দরবনে আরো কয়েকটি দিন কাটিয়ে নতুন জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ কলকাতায়।

একদিন সন্ধ্যায় অকস্মাৎ ওয়েলসলী স্ট্রীটের ওয়েলেসলী ম্যানসনের ফ্ল্যাটের দরোজার 'ডাকার ঘণ্টা' অধৈর্য হয়ে বাজলো। বৃদ্ধ খিদমৎগার নবাব আলি দরজা খুলে ধরামাত্রই ঈষৎ কৃশ এবং দীর্ঘ একটি মানুষ খিদমৎগারকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে এল। নবাব আলি আগন্তুকের পিছু পিছু এসে দেখে সাহেব এবং আগন্তুক সাহেব ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাপাশে বদ্ধ। ভৃত্য অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা...তোমাকে কতদিন পরে দেখলাম বলত?

সত্যপ্রসাদ বললেন, হাঁ ভাই কতদিন পর। শুনেছিলাম তুমি কলকাতায় এসেছ, তোমার ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। তুমি ভাই আমাদের আর কোন খবর রাখ না।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি তো বর্মা থেকে ফিরে এসে এখন লাকসামে আছো, দেখো আমি খবর রাখি তোমার। যদিও চিঠিপত্র লিখতে পারি না। তাছাড়া আমার চিঠিপত্র লেখাও ঠিক আসে না। তবু আমার মনটা তোমাদের ঘিরেই সব সময়ে থাকে।

সত্যপ্রসাদ হেসে বললেন, জানি জানি। তা তুমি কবে আসছ লাকসামে—আমার ওখানে। চল আমরা একসঙ্গে বেড়িয়ে আসবো ঢাকা, আমাদের গ্রামখানি থেকে। কতদিন গ্রামখানিতে যাইনি বলত। মনে পড়ে না তোমার ঢাকার মিরাতারের বাসা, লক্ষ্মীর-বাজারের দিনগুলো ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধবদের।

মনে পড়ে বৈকি।

তারপর দুই ভাই দুই বন্ধুতে কত সুখ-দুঃখের কথা হয়। অতুলপ্রসাদ বললে, দাদা তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আমি শীঘ্রই যাবো তোমার কাছে, একটু সময় হাতে পেলেই।

সত্যপ্রসাদ ফিরে চলে গেলেন লাকসামে তাঁর কর্মস্থলে। মন ভালো লাগছিল না, তাই কিছুদিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ দাদার কাছে লাকসামে চলে এলেন। সত্যপ্রসাদ অতুল-প্রসাদকে কাছে পেয়ে খু-উ-ব খুশি। স্ত্রী সুরবালাকে বলেন, অতুল এসেছে। অতুলকে ভালো খাওয়াও-দাওয়াও, দেখ অতুলের যেন কোন কষ্ট না হয়। অতুল সাহেব মানুষ বলে স্ত্রীকে বিব্রত করে তুললে।

অতুল বললেন, দাদা তুমি থাম। দাদা তুমি কি চাও আমি চলে যাই। সুরবালাকে বললেন অতুলপ্রসাদ, বৌঠান, আমি সাহেব-টাহেব নই, খাঁটি বাঙালী, মনে-প্রাণে বাঙালী। খাওয়া-দাওয়ার পর কত রাত ধরে দুই ভাইয়ের কত গল্প চলে। দুজনে দুজনের দীর্ঘ বিচ্ছেদ সময়কার ঘটনাবলীর কথা বলে। সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ পায়। অতুলপ্রসাদের হেমকুসুমের বর্তমান সম্পর্কের কথা জানতে পেরে সত্যপ্রসাদ দুঃখিত হলেন।

ক'দিন সত্যপ্রসাদের কাছে লাকসামে থাকবার পর অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা আমার বড় ইচ্ছে, এত কাছে যখন এসেছি একবার আমাদের দেশটা আমাদের গ্রামটা ঘুরে আসি। আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম কতদিন আমাদের মাতৃভূমিকে দেখিনি। তুমি ত বলেছিলে তুমি আমার সঙ্গে চল না।

সত্যপ্রসাদ জানালেন ছুটি পাওয়ার বড় অসুবিধে এখন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক, দেশ থেকে ফিরে আসি আমি তারপর কিছুদিন দার্জিলিং বেড়াতে যাবো ইচ্ছে আছে...তুমি এর মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেল ছুটির। দুজনেই দার্জিলিং যাবো।

সত্যপ্রসাদ বললেন, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি ছুটির জন্য।

অতুলপ্রসাদ দিনকয়েক পরে লাকসাম থেকে জন্মভূমি ঢাকা এবং পদ্মা পার হয়ে দেশ অর্থাৎ মগর-গ্রামে পৌঁছোলেন। মগর-গ্রামে পৌঁছে দেখলেন গ্রাম ঠিক তেমনি আছে। সেই হোগলাবন, ক্ষেতভরা ধান, বকুলতলার মাঠ, গ্রামের চাষী-ভাইরা, কাজল-দীঘি...আর আর...না সবকিছুই বদল হয়েছে

* ওপরের কবিতাটি সুন্দরবন যাত্রাপথে রচিত। কোন একজন ফরেস্ট অফিসর বন্ধুর সাথে অতুলপ্রসাদ ১৯১৬ সালের কোন এক মাসে সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এই তথ্যটুকু নানা সূত্রে জানতে পারা যায়। বন্ধুর নামটি অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি। নামটি কারু জানা থাকলে লিখলে বাধিত হবো।

পুরোনো মানুষেরা বিদায় নিয়েছে। দৃষ্টি-ভঙ্গিও বদল হয়েছে।

এদিকে হেমকুসুম বাংলাদেশ থেকে দূরে যুক্তপ্রদেশের রাজধানী লখনউ-এ পুত্র দিলীপকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। একাকী জীবন, মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। জীবনে যত নিঃসঙ্গতা বোধ জাগে, তা ছাপিয়ে অভিমান, শেষে ক্রোধ এসে জমে। প্রতি-শোধের প্রচণ্ড স্পৃহা মনের কোণে বাসা বাঁধে।

দিলীপ পড়ছিল কনভেন্ট স্কুলে। সে-বছর দিলীপের পড়াশোনা এবং পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হল না। ছেলেবেলাতেই নানান অসুখ-বিসুখ করে সে কিছু মনে রাখতে পারে না। সকল কিছু যেন কেমন ভুল হয়ে যায়। ওর পড়াশোনা আর হবে না। দিলীপের মাস্টারমহাশয় মহেশ এসে হেম-কুসুমের কাছে বিদায় চাইলেন। মহেশ এম-এ পাশ করেছে ভালোভাবে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিশেষ কেউ নেই। লখনউতে একমাত্র বাবা ছিলেন। বাবা হঠাৎ মারা গেছেন। মহেশ এসে জানালেন হেমকুসুমকে তার আর লখনউতে মন ঠিক থাকছে না। বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। কলকাতায় পেঁাছে কোন একটা চাকরী-টাকরী খুঁজে নেবেন।

হেমকুসুম বললেন, তুমি এখানে ছিলে, আমার তবু একজন সঙ্গী ছিল, কথা বলার দেখাশোনার, সাংসারিক নানান কাজে সাহায্য করার।...একটু থেমে বললেন, কি প্রয়োজন তোমার কলকাতায় যাওয়ার। তার থেকে তুমি যেরকম দিলীপের গার্জেন টিউটর হয়ে আছ, সেইরকমই থাক। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার হাত-খরচা বাড়িয়ে দেবো।

মহেশের অসুবিধা কিছুই হবার নয়। কারণ, তার যখন যে-জিনিসের প্রয়োজন, হেমকুসুমের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ পেঁাছে যায়। এদিকে অতুলপ্রসাদ কলকাতা হাইকোর্টে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন: প্রতি মাসে হেমকুসুমের নামে টাকা পাঠিয়ে থাকেন।...টাকা পাঠিয়েই যেন তাঁর সকল কর্তব্য শেষ। হেমকুসুম ভাবেন—টাকাটাই কি সব! মনে মনে স্থির করেন টাকা আমি আর নেব না।

একদিন সত্যকুমার এলেন। বললেন, বৌদি কেমন আছেন? দাদার চিঠিপত্র পেয়েছেন?

হেমকুসুম বললেন, কলকাতায় গিয়ে অবধি তিনি আমাকে বা দিলীপকে একটিও চিঠি লেখেননি কিন্তু শুনেছি অন্য সকলকে—বন্ধু-বন্ধুপত্নী সকলকেই প্রায়ই লিখে থাকেন। আমাদের মুনশিকেও চিঠিপত্র লেখেন অথচ আমাদের কোন চিঠিপত্র লেখার ফুরসত পান না, টাকা পাঠিয়েই বোঝেন কাজ সারা হল।

সত্যকুমার সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, বৌদি আপনি উতলা হবেন না। দাদা আমার শিবতুল্য লোক। রাগ নিশ্চয়ই পড়বে এক-দিন, সেদিন আপনার কাছে নিশ্চয়ই ছুটে চলে আসবেন।

মহেশ একটা চাকরী জোগাড়ের চেষ্টা করেন। দেশ-বিদেশের কাগজেপত্রে দরখাস্ত ছাড়তে শুরু করেন। যদি মনের মত একটা অধ্যাপনা জুটে যায়! অবশেষে বাংলাদেশের কলকাতা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের একটা কলেজ* থেকে ডাক এল। মাইনা তারা ভালো দেবে। চাকরীটা ভালো। চিঠি পেয়ে মহেশের মন উৎফুল্ল হল। চিঠি হাতে নিয়ে হেমকুসুমের বাংলোয় এলেন মহেশ। নতুন চাকরীর কথা জানালেন আর বললেন, ক'-দিনের মধ্যে তাঁকে কলকাতায় পেঁাছে চাকরিতে যোগদান করতে হবে। শুনে হেম-কুসুম মনে বড় আঘাত পেলেন, তাঁর মন চঞ্চল হল।

অনেক দিনের সম্পর্ক এমন একদিনে শেষ করা যায় মহেশেরও কষ্ট হচ্ছিল।

হেমকুসুম বললেন, তুমি চলে গেলে মহেশ আমার ছেলেটার কি যে পড়াশোনা হবে ভেবে আকুল হচ্ছি। ওর জন্যে আমার যত ভাবনা।

মহেশ একটা প্রস্তাব দিলেন। হেম-কুসুমকে বললেন, আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন, আমি আপনাদের কাছে খুউ-ব ঋণী। দিলীপের পড়াশোনার ক্ষতি হোক আমি চাই না। তাই আপনার কাছে প্রস্তাব করছি মিঃ সেন ত কলকাতায় আছেন, আমি কলকাতায় চলেছি, আপনি দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন কলকাতায়। আপনাকে মিঃ সেনের বাড়িতে পেঁাছে দেব। দিলীপ এবং আপনি ওখানেই থাকুন। দিলীপ পড়াশোনা করুক কলকাতায় কোন ইস্কুলে থেকে। আমিও ওর পড়া-শোনার বিষয়ে সবরকম সাহায্য করবো। বাংলাদেশে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এনট্রেনস্ পরীক্ষার অনেক সুবিধে এবং সহজ করে দিয়েছেন, ওখানে দিলীপের পাশ করার সুবিধে হবে।

হেমকুসুমের কথাটি মনঃপুত হলেও অতুলপ্রসাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সেখানেই বাস করার কথাটি মনে ধরল না। কেনই বা তিনি প্রথমে স্বামীর কাছে যাবেন যখন স্বামী তাকে লখনউতে একলা রেখে চলে গেছেন। হেমকুসুম বললেন, কলকাতায় মাকে চিঠি লিখছি, মায়ের ওখানে প্রথমে নামবো। তুমি কলকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত কর।

সত্যকুমার এর মাঝে একদিন অফিস ফেরতা এলেন। সত্যকুমারকে হেমকুসুম তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বললেন। সত্যকুমার সকল কিছু শুনে চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আপনি যা ভেবেছেন ঠিকই। ছেলের ভবিষ্যৎ আপনাকে আগে ভাবতে হবে বৈ'কি।

* * *

ওদিকে অতুলপ্রসাদ লাকসাম থেকে ঢাকা হয়ে দেশে মগর গ্রামে পেঁাছে গেলেন। অনেকদিন পর দেশে এসে দেশের দুরবস্থা দেখে খুউব দুঃখ হল। আত্মীয়স্বজনেরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। অপরিচিত নতুন মুখ নতুন জীবন সব। কেউ কাউকে চেনেন না। ঢাকা শহরও বদলিয়ে গেছে। বিনয়-মামার সঙ্গে দেখা হল। বিনয়মামা ঢাকাতেই পৈত্রিক জমিজমা দেখাশোনা বসবাস করেন। পুরোনো স্কুল কলেজের বন্ধুরা কে কোথায় চলে গেছে যেন। বিরাট একটা পরিবর্তন সারা জগৎটা জুড়ে নেমেছে যেন। কোথাও গিয়ে শান্তি নেই—কোথাও শান্তি নেই। লাকসামে ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। সত্যপ্রসাদকে বললেন, তৈরী হয়ে আছ ত দাদা? চল বেরিয়ে পড়ি দারজিলিঙ।

সত্যপ্রসাদ বললেন, চল আমি তৈরী।

দিন কয়েকের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ সত্যপ্রসাদ দুই ভাই—দুই বন্ধুতে দারজিলিঙের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি রওয়ানা হলেন। সকালে শিলিগুড়ি স্টেশানে নেমে জলযোগ সেরে দারজিলিঙগামী ছোট্ট ট্রেনে উঠে বসলেন। ট্রেন পাইন বনের মধ্যে দিয়ে চড়াই-উৎরাই পথে এগিয়ে চলল। খুউব ভালো লাগলো সকালের ঠাণ্ডা বাতাস। সকালের আলো পাইনের বন ছুঁয়ে আলো-আঁধারিতে স্বপ্নরাজ্য করে তুলল। কবির মন আন্দোলিত হল। কাগজ কলম মন এক সঙ্গে অধীর হল।

সত্যপ্রসাদ বললেন, তুমি কবিতা লেখ। স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াও আমি ততক্ষণে বাস্তবের জগতের খবরাখবর আজকের খবরের কাগজ থেকে সংগ্রহ করি কি বল?

অতুলপ্রসাদ হাসলেন মৃদু। লিখলেন—

এই বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল?
কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকুল?
সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও নাকি মুকুল
গহনে বিহগ হেন আমারে ভুলায় কেন?
এত গন্ধ এত গান সকলি কি মহা ভুল
বড় সাধ ছিল মনে ভরিব আঁচল বনে,
ভুলিব চরণে ব্যথা, নয়ন বেদন-দুল।

লেখা শেষ হলে গুনে গুনে ভৈরবী সুরে গাইতে লাগলেন গান। ট্রেন এগিয়ে চলে। খেলাঘরের ট্রেন। ছোট ছোট তিনটি বগি। ছোট্ট ইনজিনখানি। ট্রেন চলে ঝিকঝিক। এল কার্শিয়ং, গেল বাতাসিয়া লুপ, ঘুমে আচ্ছন্ন ঘুম পিছনে সরে গেল, ট্রেন তবু চলেছে। সবুজ এই পাহাড় বন উপত্যকা! মেঘমালার দেশে নানান রঙের মেলা। সুন্দর।

অতুলপ্রসাদ লিখলেন—

কে হে তুমি সুন্দর
অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!
কভু নবীন ভানু ভালে,
কভু ভূষিত নীরদ মালে,
কভু বিহগ কুজিত কুহক কণ্ঠে
গাহিছে অতি সুন্দর!
কভু নির্মল নীল প্রান্তে
কনক কিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর
কভু পুষ্পিত নভকুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম—
মুরতি অতি সুন্দর।

* সাউথ সুবার্বন কলেজ—বর্তমানে আশু-তোষ কলেজ।

দারজিলিঙ এসে দুই ভাই নিরিবিলিতে হোটেলের পাশাপাশি দুখানি ঘর নিলেন। শয়নকক্ষ ছিল পাশাপাশি। কিন্তু অতুল-প্রসাদ আপন শয্যায় শয়নের অল্পক্ষণ পরেই দাদার শয্যায় এসে দাদার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। নীরবতার মাঝেই অতুল-প্রসাদের প্রাণের বেদনা সত্যপ্রসাদ অনুভব করতেন। অতুলপ্রসাদও সত্যপ্রসাদের সহানু-ভূতির স্নিগ্ধ ছোঁয়াটুকু প্রাণভরে গ্রহণ করতেন। কত বিনিদ্র রজনী গেছে দুই ভাইয়ের আন্তরিক দুঃখসুখের গল্পে গল্পে। সকাল হবার আগেই দুইভাই বেড়াতে যেতেন। কখোনো চড়াই ভেঙে, কখনও উৎরাই বেয়ে নেমেছেন নিচে। পাইনের বনের ধারে ধারে—আলো-আঁধারিতে—সূর্যের সাতটি রঙের স্বপ্নের পুরীতে। ...রাত থাকতে যাত্রা করে টাইগার হিলের ভোরের সূর্যোদয় দেখে কবির মনে ভাবের বন্যা নেমেছে কখনও। পর্বতের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে কখনও বলেছেন—প্রকৃতির এই সৌন্দর্য দুঃখশোক সব ভুলিয়ে দেয়। কখনো বলেছেন, পর্বতশীর্ষে এসে দাঁড়ালে মন বড় উদার হয়। পথের ধারে পাথরে বসে বিহঙ্গের কাকলির ন্যায় তাঁর নতুন নতুন গান শুনিয়েছেন মুগ্ধ করেছেন দাদাকে অতুলপ্রসাদ।

যাব না, যাব না, যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।
বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক ভরে।
আকাশের দু' তীরে দু' বেলা
আলো কালো করে হোলি খেলা;
আমারো পরাণে লেগেছে রং
কালোর 'পরে
নীল সরে হেমতরী —'পরে
হাসে নব বিধু লাজে-ভরে।
'এসো বঁধু ব'লে ডাকে মোরে
মোহন সুরে *

অকস্মাৎ মাসতুতভাই শিশিরকুমার দত্তর সঙ্গে অতুলপ্রসাদের দারজিলিঙয়ে দেখা।

* সত্যপ্রসাদ সেনের ডাইরী থেকে। কবিতাটি দারজিলিঙয়ে রচিত।
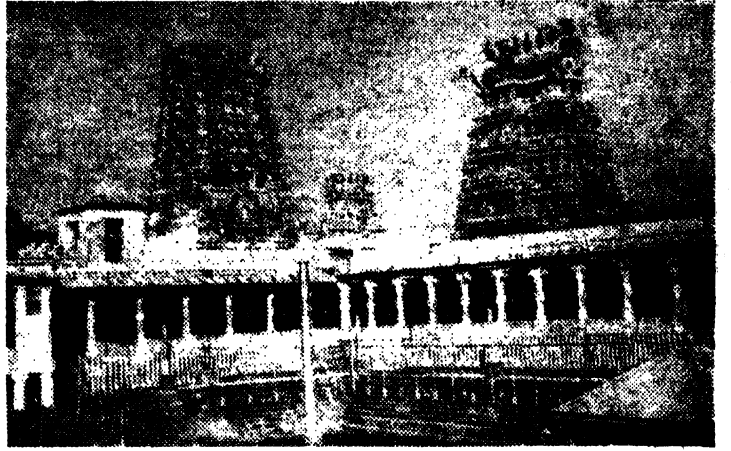
মীনাক্ষীমন্দির : মাদুরা ফটো : বাবু সামন্ত

দেখা হতে শিশিরকুমারের মুখে শুনলেন, হেমকুসুম দিলীপকে নিয়ে দারজিলিঙ এসেছেন। শিশিরকুমার দত্ত তাদের দারজিলিঙ নিয়ে এসেছেন। শিশিরকুমার বললেন, হেমকুসুমের সাথে দেখা করার ইচ্ছে হয়তো বল আমি হেমকুসুমকে তোমার কথা বলি।

বিশ্বাস হয় না হেমকুসুম ও দিলীপ এসেছে দারজিলিঙএ তবে কি তাঁর জন্যই লখনউ থেকে ছুটে এলেন এই দারজিলিঙএ হেমকুসুম? বিশ্বাস হয় না! অবিশ্বাসই কি হয়? বরং অবিশ্বাসের হাতে আপনাকে সমর্পণ করে সুখী হতে ইচ্ছে জাগে। দিলীপের জন্যে বড় মন কেমন করে একটিমাত্র ছেলে—কতদিন তাকে দেখেন নি অতুলপ্রসাদ।

শিশিরকুমার বললেন, তুমি রাজি হলেই হল তাহলে হেমকুসুমকে বলি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এই ভরসা মনে এলেই দারজিলিঙএ এনেছিলাম ওদের। যাক তুমি যে রাজী হয়েছ ভাইদাদা তাতে আমি খুব খুশী। এবার তোমাদের মিলন হোক। তাকে আমি নিয়ে আসবো তোমার কাছে।

শিশিরকুমার দত্ত হেমকুসুমকে বললেন, অতুলপ্রসাদ তোমার দেখা পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। তুমি রাজী হলেই তোমাকে আর দীলিপকে ও'র কাছে নিয়ে যাব।

হেমকুসুম রাজী হলেন না অতুল-প্রসাদের সঙ্গে দেখা করায়। কেন যে কেউ বলতে পারল না। জানালেন দারজিলিঙএ তিনি বেড়াতে এসেছেন, কারো সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নয়। কোন সর্ত মেনে নিয়ে তিনি পাহাড়ী এই শহরে আসেন নি। শিশিরকুমার দত্ত স্তব্ধ হয়ে শুনলেন সেকথা। অতুলপ্রসাদ পুত্র দীলিপকে একবারটি চোখে দেখার কামনা জানালেন সে আবেদনও মঞ্জুর হল না। হেমকুসুম নিষ্ঠুর-ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। শিশিরকুমার দত্ত সে কথা অতুলপ্রসাদকে জানিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ আর একবার মিনতি জানালেন শিশিরকুমারকে তুমি একবারটি আমার ছেলেকে লুকিয়ে আমার কাছে এনে দাও। তাকে অনেকদিন দেখিনি, ওর জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে, একবারটি দেখতে চাই। তুমি দীলিপকে একবার আমার কাছে এনে দিতে পার না।

শিশিরকুমার দত্ত বললেন, আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো। আমি দীলিপকে তোমার কাছে এনে দেবো, ভাইদাদা তুমি কিছু ভেবো না।

দু' একদিনের মধ্যেই বেড়াতে যাওয়ার নাম করে দীলিপের হাত ধরে শিশিরকুমার দত্ত অতুলপ্রসাদের হোটেলে পৌঁছে গেলেন। পর পর আরো কয়েকদিন এলেন। পিতা-পুত্রের মিলন হল। সে দৃশ্য বুঝি দেখা যায় না। *

কয়েকদিন পরে অতুলপ্রসাদ সত্য-প্রসাদকে বললেন, চল দাদা এবার ফেরা যাক। তুমিত তোমার কর্মস্থলে ফিরছ না?

হঠাৎ অতুলপ্রসাদ স্থির করলেন আবার লখনউ ফিরে যাবেন।

২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ মনডে ক্লাবের পক্ষ থেকে কবি অতুলপ্রসাদ সেনকে 'বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন ক্লাবের সভ্যরা দুঃখিত মনে। তার দু'চারদিনের মধ্যে অতুলপ্রসাদ শহর কলকাতা ছেড়ে ফিরে চলে এলেন পুরোনো কর্মক্ষেত্রে নবাব শহর লখনউ।

(ক্রমশ)

* শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত এবং শ্রীদীলিপ-কুমার সেনের বক্তব্য অনুসারে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বর্ষার পথে সাবধান!
আসন্ন বর্ষার কথা ভেবে আজই একজোড়া বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো কিনে রাখুন। এর ঘন রবারের হিল আর সোলে এমন খোদাই নকশা যা পারতপক্ষে হড়কাবে না।
প্রসঙ্গত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও লক্ষণীয় : উপরিভাগে ষোলোআনা জলরোধক উপাদান, আরামের জন্য নরম সুতীর আস্তরণ, ক্ষয়শীল সন্ধিস্থলে অতিরিক্ত সংযোজন, আর জলকাদারোধী দৃঢ় রবারের বন্ধনী। সব মিলিয়ে বর্ষার ভেজাপথে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।
বিভিন্ন রঙ ও বিবিধ নকশায় বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো, আপনার নিকটেই যে বাটার দোকান সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। আসুন, আজই বেছে নিন আপনার মনের মতো জুতো।
ওয়াটারপ্রুফ ক্যাজুয়াল ৭.৯৫
ওয়াটারপ্রুফ অক্সফোর্ড ৭.৯৫
Bata
বর্ষার ভেজাপথে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা
উল্লিখিত মূল্য উৎপাদন শুল্ক ব্যতীত
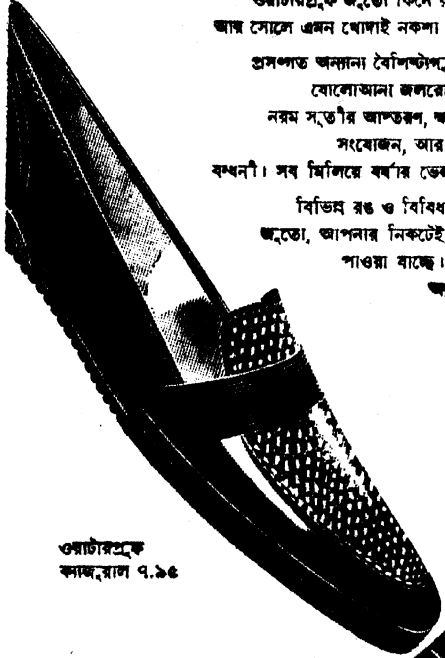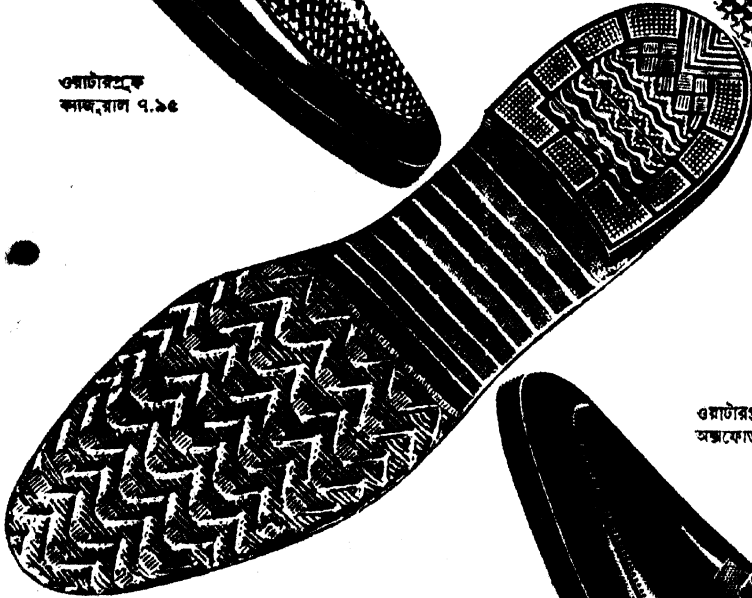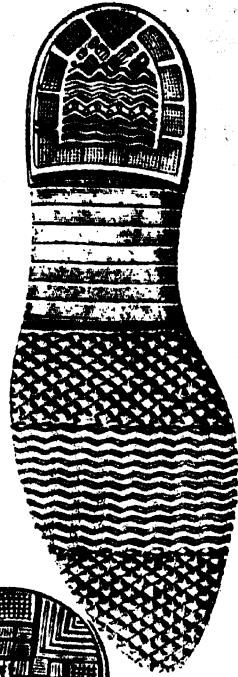
লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড

অমৃত

৮ম সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 23rd June 1967. শুক্রবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

॥ ছোটোসী মুলাকাৎ প্রসঙ্গে ॥

অমৃতের বার্ষিক সংখ্যার জন্য আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

উক্ত সংখ্যার 'প্রেক্ষাগৃহ' বিভাগে 'ছোটোসী মুলাকাৎ'-এর সমালোচনাটি পড়ে তৃপ্তি পেয়েছি। এর জন্য আমি নান্দীকর মহাশয়কে একজন চিত্রামোদী হিসাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নান্দীকর এক জায়গায় লিখেছেন ঃ— "মনে হয়, হিন্দী ছবির চিত্রনাট্যকাররা নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভদ্র, শোভন ও সুস্থভাবে প্রেমের সঞ্চার এবং উভয়ের ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হওয়ার মধুর চিত্রকল্পনা করতেই ভুলে গেছেন।" আমি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত।

নান্দীকর আর এক জায়গায় লিখেছেন ঃ—'ছোটোসী মুলাকাৎ'-এর চিত্রনাট্য থেকে 'অগ্নি পরীক্ষা'র চিত্রনাট্য অনেক বেশী সুসংবদ্ধ ছিল। বাঙলাতে নায়িকার জীবনের অতীত ঘটনাকে কাহিনীর যথাস্থানে ফ্ল্যাসব্যাকের সাহায্যে বিবৃত করায় কাহিনীর নাট্য-কৌতূহল, সাসপেন্স ও চমৎকারিত্ব ঢের বেশী পরিস্ফুট এবং উপভোগ্য হয়েছিল।

হিন্দী সংস্করণে বাল্যের ঘটনাকে ছবির আরম্ভ ভাগেই সোজাসুজি দেখিয়ে দেওয়ায় ছবির সাসপেন্স অনেকখানি ব্যহত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার যতদূর মনে পড়ছে যে, বাঙলা ছবি 'অগ্নি পরীক্ষা'তেও বাল্যের ঘটনা আগেভাগে দেখানো হয়েছে।

অমরেন্দ্র আঢ্য,
আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।

॥ বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত ॥

বার্ষিক সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় (৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত' প্রবন্ধটিতে স্বল্প পরিসরে তথ্যের সংগে তাঁর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। পরিপূরক হিসেবে আরও কয়েকটি কথা মনে আসে বলে আলোচ্য পত্রের অবতারণা।

প্রবন্ধে উল্লিখিত গান ছাড়াও চলচ্চিত্রে পঙ্কজকুমার মল্লিকের অন্যান্য বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত 'ওরে সাবধানী পথিক' (অভিযান), 'আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল' (আলোছায়া)। মুক্তি ছবিতেই তিনি প্রথম অভিনয় করেছেন।

কে, এল, সাইগলের 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' এবং কানন দেবীর 'আমারে না হয় না জানো', 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তখনকার দিনে ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী' (পরাজয়), 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি' (মন্ত্রমুগ্ধ), 'সর্ব খর্ব তারে দহে' (অঞ্জনগড়) 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' 'ফুলে ফুলে ধন্য আমি' (প্রতিবাদ) ইত্যাদি। পরবর্তী কালে 'দীপ নিভে গেছে মম' (দস্যু) ও 'অনন্যা' বাণী চিত্রের রবীন্দ্রসংগীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সবাক ছবির সুরু থেকে আজ পর্যন্ত অজস্র রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হলেও সার্থক হয়েছে স্বল্প সংখ্যক। অতীতের রবীন্দ্রসংগীত দর্শকদের মোহাবিষ্ট করেনি। প্রসংগক্রমে মনে পড়ে 'দস্তুর মতো টকী' ছবিতে লোকান্তরিতা কঙ্কাবতীর কন্ঠে 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' হতাশাব্যঞ্জক। এই গানই শ্রীমতী কানন দেবীর কন্ঠে দর্শকদের অভিভূত করেছে। অথচ শ্রীমতী কঙ্কাবতী 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটি গেয়ে একদা দেশে আলোড়ন তুলেছিলেন। প্লে-ব্যাক প্রথার বহুল প্রচার না থাকার জন্যেই বোধ হয় শিল্পীর নিজের গলায় গাইবার ফলেই এই অবস্থা। রবীন্দ্রসংগীত সকলের কন্ঠের উপযুক্ত নয় এটা উপলব্ধি করা যায় তখনকার ছবি দেখার সুযোগ পেলে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত না হলেও শ্রুতিমধুর বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয় শিল্পীদের কন্ঠেই এ সব গান গাওয়া হয় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলছি যে রবীন্দ্রসংগীতে খানিকটা নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে বাংলা 'লালপাথর' ছবিতে। কবির বিখ্যাত 'আলো আমার আলো' গানটি জার্মান ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে এই ছবিতে। মূল সুর অবিকৃত রেখে গানটি গেয়েছেন শ্যামল মিত্র।

একটা জিনিষ দুর্বোধ্য মনে হয় যে, অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকটি গানই (যা বহু শিল্পীর কন্ঠে বিভিন্ন সময়ে রেকর্ড হয়েছে) ছায়াছবিতে শোনা যায়। সময়বিশেষে এমনও হয়েছে প্রায় একই সময়ে প্রদর্শিত দুটো ছবিতে একই গান শোনা গেছে। যেমন ক্ষুধিত পাষাণ ও মেঘে ঢাকা তারা-তে 'যে রাতে মোর' গানটি।

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, কারণে অকারণে রবীন্দ্রসংগীত সংযোজিত করে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার জন্যে চিত্রনির্মাতারা অনেকেই সচেষ্ট। এর ফলে বহু ক্ষেত্রেই ছবিকে মর্যাদার আসনে নিয়ে যেতে পারে না এবং রবীন্দ্রসংগীতেরও অপমৃত্যু ঘটায়।

অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত
কলিকাতা—২৬

॥ অনেক বই, কম সময় প্রসঙ্গে ॥

৫০শ সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'অনেক বই, কম সময়,' যুগোপযোগী হয়েছে। এজন্য লেখককে এবং অমৃত কর্তৃপক্ষকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত লেখা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। লেখক বিশেষ করে দ্রুতপঠনের দিকটাই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বই পড়ার আর একটা দিক আছে। অবশ্য লেখক সেটা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান যুগে বাজারে বহুপ্রচারিত ও প্রকাশিত নতুন নতুন বই পাঠ করে শেষ করতে হলে পাঠককে হাঁসের মতোই জল পরিত্যাগ করে দুধটুকু আহরণ করতে হবে।

এছাড়াও আর এক ধরনের পাঠক আছেন। তাঁরা সেই বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের মতটা অনুসরণ করে চলেন—

"Do not read good books, read the best, for time is short and Art is long".

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত,
সান্ত্বনাকুমারী গুপ্তা,
টিকর, সিংহভূম।

'আঁধি' প্রসঙ্গে

সুলেখক ও সুসাহিত্যিক শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই তাঁর 'আঁধি' গল্পটির জন্য। সাহিত্যের দিগন্তে তিনি দিয়েছেন নবরূপ। কিছুদিন পূর্বে 'গোপীসংবাদ' রচনা করে স্বরাজবাবু আমাদের মনের গভীরে এনে দিয়েছিলেন এক নতুন স্বাদ ও নতুন অনুভূতি। তাঁর সম্প্রতি লেখা 'আঁধি' গল্পটিও আমাদের মনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে তিনি সৃষ্টি করেছেন দীপু ও মালার চরিত্রদুটিকে। এর তুলনা খুব কমই মেলে। যে অপূর্ব, সুন্দর ও গভীর মনস্তত্ত্বের সমাবেশ সৃষ্টি হয়েছে উপরোক্ত চরিত্রদুটির মাধ্যমে তা যেমন তুলনাহীন, তেমনই সুন্দর হয়েছে। আজকাল সাহিত্যে ও গল্পে যে আবর্জনার স্তূপ দেখতে পাই—তার বহু ঊর্ধ্বে উঠেছেন শ্রীযুত স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই জন্য তাঁকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই। আমরা ভরসা করি ও আশা রাখি স্বরাজবাবু মধ্যে মধ্যে এইরকম সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করে আমাদের আনন্দ দান করবেন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা—৩৯

(২)

অমৃত-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আঁধি' পড়লাম। কি পরিবেশ সৃষ্টিতে, কি চরিত্র চিত্রনে, কি ভাষার সাবলীলতায়, ঘটনাপ্রবাহের স্বচ্ছন্দগতিতে লেখকের অপূর্ব কৃতিত্ব পাঠকমনকে আবিষ্ট করে, মুগ্ধ করে. উপন্যাসপাঠে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেলাম যা বহু উপন্যাস পাঠ করে পাই নি।

'আঁধি' পড়ার আগে বহুদিন উপন্যাস পড়ার এত তৃপ্তি পাইনি। অবশ্য রঙবাজী, ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই, রেলা, ফ্যাকড়া-হুজ্জুৎ, নেপালা পিলিয়ে দেওয়া, টেঁটিয়া প্রভৃতি প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ শব্দ সকলের কাছে হয়ত খুব পরিচিত নয় তবু আজকাল অনেকের কাছেই পরিচিত। এগুলির এক-একটি বিশেষ অর্থ আছে। লেখক অতি নিপুণভাবে এই শব্দগুলি সংযোজন করে তরুণ দীপুর চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরেছেন।

দিলীপকুমার পাল
কাল্লা, আসানসোল

অমৃত

কূটনীতিকের লাঞ্ছনা

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটেছে। এর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে চীনের। পিকিং-য়ে ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেক্রেটারী যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণন রঘুনাথ ও শ্রী পি, বিজয়কে গুপ্তচরবৃত্তির ভুয়া অভিযোগ দিয়ে চীনা সরকার চরম লাঞ্ছনার মধ্যে তাঁদের বহিষ্কৃত করেছেন। যেভাবে সমস্ত বিষয়টি তৈরী করা হয়েছে এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে ভারতের দুই কূটনীতিককে বিতাড়িত করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দার্হ। এই অপমান গোটা ভারতেরই অপমান। কারণ, কূটনীতিকরা জাতির প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও তাঁদের কাজকর্মের অবাধ সুযোগ দেবার দায়িত্ব ছিল চীনা গভর্নমেন্টের। চীন তা করেনি। বরং লালরক্ষীদের লেলিয়ে দিয়ে কূটনীতিকদের মারধোর করেছে এবং নানাভাবে লাঞ্ছিত করে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে পিকিং-এর দৌরাত্ম্য না দেখলে তা বিশ্বাস করাই শক্ত হত।

ভারত সরকার এই অপমানকে নীরবে সহ্য করেননি। তাঁরাও পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে দিল্লীতে চীনা দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারীর কূটনৈতিক মর্যাদা কেড়ে নিয়েছেন এবং তৃতীয় সেক্রেটারীকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, বিদেশী রেজিস্ট্রেশন অফিসে নাম রেজেস্ট্রি করতে। তিনি তা না করে আত্মগোপন করে আছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সরকারের নির্দেশ অমান্য করে চীনা কূটনৈতিক প্রতিনিধি বেআইনীভাবে ভারত ত্যাগের চেষ্টা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

এই লাঞ্ছনা ও অপমানে লোকসভা নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। অনেক সদস্য চীনের সঙ্গে অবিলম্বে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের দাবী জানিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা সে-দাবী অবশ্য মানেননি। তবে একথা ঠিক যে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যেভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে তাতে এই সম্পর্ক রাখা আর না রাখা সমান। কারণ, পিকিং-এ ভারতীয় দূতাবাসকে কার্যত বন্দীদশায় কাটাতে হয়। তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায়ই তাঁদের উন্মত্ত জনতার লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রাশিয়াকে দিনে চৌদ্দবার বাপান্ত করলেও পিকিং-য়ে সোভিয়েট দূতাবাসের কর্মীদের কিন্তু এই ধরনের অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় না। ভারতের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং শত্রুতাই আমাদের কূটনীতিকদের এই বিড়ম্বনার কারণ। অথচ যে আমেরিকার শ্রাদ্ধ না করে চীন জলগ্রহণ করে না এবং যার সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কও নেই সেই আমেরিকার কূটনীতিক প্রতিনিধির সঙ্গে ওয়ারশতে চীনা কূটনীতিক প্রতিনিধির ১৯৫৫ সাল থেকে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা চলছে। রাষ্ট্র হিসাবে আমেরিকার গুরুত্ব স্বীকার করে চীন তার সঙ্গে সমঝওতায় আসার জন্যই এই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাকে ছিন্ন করার জন্য চীনের আগ্রহের অন্ত নেই। এই শত্রুতার কারণ কী তা আজ ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

এর প্রধান কারণ, এশিয়ায় চীনের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ানোর উৎকট আগ্রহ। একে চীনের উগ্র জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কোনো সংজ্ঞাতেই ফেলা যায় না। নতুবা ভারতের দিক থেকে চীনের সামরিক ভীতির কোনো কারণ নেই, চীনের কোনো অঞ্চলেও ভারতের দাবী নেই, তবু এই বৈরিতা কেন? আরও দেখা গেছে যে, চীন নিজের সময় ও সুবিধামত ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে বদ্ধপরিকর। ১৯৬২ সালে তার আক্রমণ, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে তার চরমপত্র দান চীনের চরম শত্রুতাই প্রমাণ করে।

ভারতবর্ষের দিক থেকে অনেকদিন অপেক্ষা করা হয়েছে যে শান্তিপূর্ণভাবে চীনের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা করা যায় কিনা। চীন মনে করে যে ভারত দুর্বল, তার আভ্যন্তর সমস্যা নিয়ে সে বিব্রত। সুতরাং চাপ দিলেই ভারতের কাছ থেকে দাবী আদায় করা যাবে। তাছাড়া রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায়, ভারতকে অপমান করে সে রাশিয়াকেও পরোক্ষে শাসাচ্ছে। তা না হলে বিনা প্ররোচনায় ভারতীয় কূটনীতিকদের ওপর এই হামলা ও তাদের বিতাড়নের অন্য কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। ভারতীয় কূটনীতিকরা বলেছেন যে, বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তাঁরা পা দেননি এবং কোনোরূপ গুপ্তস্থানের ছবিও তাঁরা তোলেননি। সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। আসলে ভারতের সঙ্গে বিরোধ চাঙ্গা করে তোলার জন্যই এই কারসাজি। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এর পেছনে চীনের গূঢ়তর কোনো মতলব আছে। সে দিকেই ভারতকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে ভারত সরকার এবার যে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছেন তা থেকে চীন সরকার এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, হামলাবাজি করে ও অশিষ্টতা দেখিয়ে চীন পার পাবে না। ভারতও পাল্টা ব্যবস্থার জন্য তৈরী। এ ছাড়া ভারতের মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষা করার কোনো পথ নেই।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১)

বলা চলে এর এক যুগ পর।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ-যুগের যুগ নয়, সচরাচর যে-যুগ আমরা বারো বছরে গণনা করে থাকি, সেই যুগ। অর্থাৎ বারো বছর পর।

১৯৪৪ সাল আর ১৯৫৬ সাল। বারো বছর পর আবার মণিবউদিকে দেখলাম। ১৯৪৪ সালে গ্র্যান্ড হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে একজন বেশ ভারিক্কি জবরদস্ত শ্বেতাঙ্গের প্রায় বাহুলগ্না হয়ে বিচিত্রবেশিনী মণিবউদিকে সেই যে দেখেছিলাম, তারপর এই বারো বছরের মধ্যে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। যে-তিনি বা যে-তাঁরা অর্থাৎ মণিবউদি এবং অমৃতবাবু আমার সঙ্গে উপযাচক হয়ে ডেকে দেখা করে তিনপুরুষ আগের মরচে-ধরা বা ময়লাপড়া সম্পর্ক শৃঙ্খলের জোড় আবিষ্কার করে, তাকে মেজেঘষে নতুন করে পান ধরিয়ে আমাকে এতখানি সমাদর করেছিলেন, সে-তিনি বা সে-তাঁরা এরপর যেন মর্ত্যলোকের মঞ্চ থেকে অকস্মাৎ দেবলোকে চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেলেন। বলা চলে—শিকলের সম্পর্ক কেটে চলে গেল, আর এল না। যে মণিবউদি ১৯৪২ সালের ব্ল্যাক আউটের কল্যাণে প্রাপ্ত একটি দুর্লভ জ্যোৎস্নালোকিত ভাদ্র-রজনীতে খোলা বাতায়নের পাশে বসে জানালার শিকে মাথা রেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অকপট অন্তরঙ্গতায় তাঁর বিগত-জীবনের কথা বলেছিলেন, তিনি এরপর আর ভুলেও একছত্র পত্রযোগেও আমাকে আমার জীবনসাফল্যে উৎসাহিত করলেন না। কাব্য করে 'তোমার গরবে গরবিনী হাম' লেখা দূরে থাক একেবারে মেঠো গদ্যেতেও লিখলেন না—'আপনার সম্মানে সুখিনী হইলাম।' অথবা 'সাবাস' জানাচ্ছি।

দুইপুরুষের সাফল্যের পর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কালটা তো কম নয়। বারো বছরেরও বেশী; চৌদ্দ বছর। এর মধ্যে দুইপুরুষ থেকে আরও ' অনেক উজ্জ্বলতর সাফল্য আমার জীবনে এসেছে। এবং এই যুগ-পরিবর্তন যাকে সত্য অর্থে বলা যায় যুগান্তর, সেই যুগান্তরের মধ্যে যে-যুগ গেল, তারও প্রসাদ যেমন পেয়েছিলাম আমি, আগন্তুক যুগের অকৃপণ প্রসাদও ঠিক তেমনি পেয়েছিলাম আমি। এবং আগন্তুক যুগের প্রসাদগুলি উজ্জ্বলতর ছিল তাও আগে বলেছি। তাছাড়াও সে-প্রসাদের বার্তা শুধু মর্ত্যলোক অর্থাৎ বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল না—যাকে দেবলোক বলছি, সেই দিল্লী পর্যন্তও গিয়ে পৌঁচেছিল। সুতরাং দেবলোকবাসিনী মণিবউদি এবং দেবলোকবাসী অমৃতবাবু অনায়াসে কিছুটা বাহবা তাকে তিন পয়সার পোস্টকার্ডযোগেও দিতে পারতেন। এবং এ-দেওয়া তাঁদের মত মানুষ যাঁরা তাঁদের কাছে তো হীরের বালা-পরা হাতখানি ঘুরিয়ে বালার হীরে থেকে ঠিকরে-পরা ছটায় চোখ-ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত কৌতুকের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। সুন্দরী মণিবউদি অনায়াসে লিখতে পারতেন—"তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।" তাতে এই রূপহীন কালো মানুষটিকে দারুণ ঠাট্টা করা হতো। এবং অমৃতবাবু এবার ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলের হ্যাট্রিক-ট্যাট্রিক গোছের নতুন কিছু বলে উৎসাহিত করতে পারতেন। সেটা রেকর্ড হয়েও থাকতে পারত।

থাক।

লেখার সুর বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং বঁড়শির মত নিষ্ঠুর রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, যাতে বুঝতে পারছি, ও'দের উপর আমার মনের বিদ্বেষ আজও যায়নি। অথচ মণিবউদির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রখানা সামনে পড়ে রয়েছে।

যা বলার তা সোজা কথাতেই বলা ভাল। অনেক কাল আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনেছিলাম—"এ তোমার ভালো তোমাতে থাক, আমায় তো তার ভাগ দেবে না।" শুধু ভালোই বা কেন মন্দর বেলায়ও তো তাই বলা উচিত। মন্দের ভাগও তো কেউ নেয় না। মণিবউদি অমৃতদার ভালো, সে-ভালোর পরিমাণ বৃহৎ এবং বিপুল, তার ভাগ কাউকে ও'রা দিন বা না-দিন, ও'দের ভালো থেকে খসে-পড়া ঝরে-পড়া ভালো অংশ বহুজনে কুড়িয়ে নিয়েছে, পিছন থেকে পাশ থেকে টেনেটুনে বাগিয়েও নিয়েছে, আমি তাদের দলের নই, এ আমার অহংকার।

ও'দের সংস্পর্শ, ও'দের সংবাদ ওই ১৯৪২ সালেই আরম্ভ; ১৯৪২ সালেই শেষ। শেষ উপঢৌকন খসখসের আতর আর সোহন হালুয়া। এবং শেষ সাক্ষাৎ ও'দের বাড়ীতে, সেই শীতল সাক্ষাৎ। ১৯৪২-এর সাইক্লোনের সপ্তাহ-দেড়েক আগে। তারপরই সব যেন চুকেবুকে গেল। এরপর বাংলাদেশে যুগান্তরের ঘূর্ণপাক যেন গাজনের চড়ক-পাটার মত ঘুরতে লাগল। বর্ণনার দরকার নেই। এ-ইতিহাসের কথা। সাইক্লোন-মন্বন্তর থেকে নাগাসিকি হিরোসিমা পর্যন্ত যা ঘটেছিল, তাতে পৃথিবীর মানচিত্রের রঙ পাল্টালো চেহারা পাল্টালো, ভূগোল নতুন করে লেখা হল, ঝড়ে বন্যায় দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মহাযুদ্ধে মহাপ্রলয়ের একটা ঝাপটা এসে কাকে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেললে, তার খবর রাখবার অবকাশ কারুর ছিল না। এর মধ্যে আমিও কালের প্রসাদধন্য এবং মণিবউদিরাও তাই শুনেছিলাম—তবুও তাঁদের সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না। ১৯৪৪ সালে গ্র্যান্ড হোটেলের সিঁড়িতে ওই নতুন রূপে মণিবউদিকে দেখে যে-বিস্ময় এবং যে-প্রশ্ন জেগেছিল, তার উত্তর পাবার জন্য কৌতূহল আমার জাগ্রত হয়নি এমন নয়, কিন্তু তার উত্তর পাবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে পারিনি। তার আগেই অন্যকিছুর টানে অনেক দূরে গিয়ে পড়তে হয়েছে; মনে মনে অনেক দূরে, নইলে বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে গ্রে স্ট্রীটের একটু ওধার—সে আর কতটুকু পথ!

ও'রা অবশ্য তখন মর্ত্যলোকে থাকতেন না। ১৯৪২ সালেই মর্ত্যভূমি-রূপ এই ঘিঞ্জি কলকাতা নগরী ছেড়ে দিল্লী গেছেন। সে-কথা আগেই বলেছি। এবং উড়ো ভাসা যে দু'-চারটে খবর বা কথা—সে গুজবই হোক আর সত্যই হোক, তাই মনের এই দুর্বল কৌতূহলকে আপনাআপনি স্তিমিত-তর করে প্রায় নিভিয়ে এনেছিল।

১৯৪৪ সাল। যে-সময়ে রাশি রাশি নোটের বাণ্ডিল এনে এই গরীব দেশের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল দুটি দেশ—ইংলণ্ড ও আমেরিকা। সে-সময় একাদশে বৃহস্পতি থাকার জন্যই হোক আর শনি তুঙ্গী থাকার জন্যই হোক অথবা উভচরী যোগের কল্যাণেই হোক অমৃত মণি-দম্পতি বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা বড় কারখানার মালিকানি অর্জন করেছিলেন বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে।

জল প্রচণ্ড হিমে জমে বরফ হয়, তখন জলকে সে ঢেকে রাখে, তার স্রোতকে সে রুদ্ধ করে কিন্তু বরফ যখন গলে, তখন জল হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। অমৃতবাবু জলই হোন আর বরফই হোন, এক সময় বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে ব্যবসায়-ধর্মে একাত্ম হয়ে মিশে গিছলেন।

এসব শোনা কথা মাত্র, তার অধিক কিছু নয়। এবং এ নিয়ে আমার দিক থেকে শিরঃপীড়ার বা গাত্রদাহেরও কারণ ছিল না এবং আমার নিজের হাতের মাপে আমার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত থেকে এতটুকু খাটিয়ে যাইনি। বরং তার বিপরীতই হয়েছিল আমার হাতের মাপে আমার দৈর্ঘ্য কিছু বেশীই হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালে দিল্লী গেলাম। আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছি, সেই পুরস্কার আনতে গেছি। তখনও দিল্লীর বিখ্যাত বিজ্ঞানভবন সম্পূর্ণ এবং ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। পুরস্কার বিতরণের জন্য বর্ণাঢ্য সামিয়ানা খাটিয়ে মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল। তখন আকাদেমির সভাপতি স্বর্গত তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষেই ছিলেন না, বিদেশে গিয়েছিলেন, সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন।

মণ্ডপের মধ্যে সভাপতির বেদী ও আসনের ঠিক ডানদিকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল—সম্মানিত লেখকবর্গের আসন: বাঁদিকে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি করে বসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। এবং সামনে ছিল সারিবন্দী নিমন্ত্রিত অতিথিদের আসন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা ছিলেন, পার্লামেন্টের সভ্যরা ছিলেন, বড় বড় রাজকর্মচারীরা ছিলেন, তাছাড়া যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বড় কম পদস্থ নন—তাঁরা ওখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিজীবনের দাবীতে; সে-ব্যক্তিত্ব সম্পদের মুকুটেও উজ্জ্বল হতে পারে আবার বিদ্যা বা গুণপনার মুকুটেও উজ্জ্বল হতে পারে। শিল্পপতি এবং বড় বৈজ্ঞানিক পাশাপাশি বসেছিলেন সেখানে। তাঁদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। এবং তাঁদের গুণের কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে যথাযোগ্য সম্ভ্রম জানিয়ে তাঁদের রূপের এবং বেশভূষার ও দীপ্তিছটার কথা এই বয়সেও বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলব যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পূজা প্রাপ্য নারীর এবং তারপরের যে-পূজাটি, সে-পূজাটি প্রাপ্য রূপের, অর্থাৎ রূপসী নারীর থেকে রমণীয়াও কেউ নেই এবং পূজার দাবীও কারুর নেই। পূজা নিয়ে যদি বা জ্ঞানের ও গুণের আদালতে ইনজাংশান পড়ে, তাহলেও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, চোখের আরতি ওঁরাই পাবেন, চোখ ওঁদের উপরেই আগে পড়বে। পুরুষরাই যে মেয়েদের দিকে তাকান তা নয়, মেয়েরাও আগে তাকান মেয়েদের দিকে। তবে তাঁরা তাকিয়ে দেখেন ঈর্ষার দৃষ্টিতে: অর্থাৎ যে-রূপ তাঁর রূপ থেকে উজ্জ্বল, সে-রূপের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি দেশলাইয়ের কাঠির মত ফস্ করে জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দিতে চায়। রূপবান গুণবান ঐশ্বর্যবান প্রিয়তমের বামভাগে বসেও তাঁরা কোন সামান্য ব্যক্তির রূপসী প্রিয়তমার দিকে ওই একই দৃষ্টিতে তাকান। এত কথা বলার কারণ এই যে, সেদিন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—একটি নিরবরণা শুভ্রবসনা সুন্দরীর দিকে। শাদা পোষাক খালি হাত খাটো করে কাটা চুল অনেকটা বব করার মত হলেও যেন কিছুটা গরমিল আছে; নিখুঁত শাদা বেশবাসের উপর একখানা কাশ্মীরী শাল, তারও রঙ শাদা। অতি চমৎকার তাঁকে মানিয়েছিল। পরিপূর্ণ যুবতী বলেই মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, সামনের সারিতে তাঁর আসন ছিল বলে দেখতে পেয়েছিলাম যে, তাঁর পায়ের স্লিপারের রঙটাও শাদা। চোখে রিমলেস চশমা। নাকের উপরে সোনাটুকু ঝিকমিক করছে। আর বয়স সত্ত্বেও আশ্চর্য স্লিম লাগছিল। বেশ একটু রোগা হয়ে গেছেন যেন।

যেকোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝবার কথা যে, মহিলাটি বিধবা। কিন্তু যদি এ-প্রশ্ন ওঠে যে, ওই শাদা পোষাকের মধ্যে বৈরাগ্য বড়, না রুচি বড়, তাহলে প্রশ্নটা মুহূর্তে জটিল হয়ে উঠবে। এবং যিনি প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনি থমকে যাবেন, এ-কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

পাঠকেরা বুঝতে নিশ্চয় পারছেন যে, তিনি মণিবউদি। সেই তাঁর সামনের দাঁত-দুটি ঈষৎ উঁচু। বয়স হিসেব মত পঞ্চাশের ধারে পৌঁচেছিল নিশ্চয়, কিন্তু তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি মুগ্ধবিস্ময়ে একটু বেদনার সঙ্গেই তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। মুগ্ধতার কারণ বিস্ময়ের কারণ আমার একার ছিল না, সেটা ছিল প্রায় সবার; দেখছিলাম তো সকলেই এই শুভ্রবসনা পরিপূর্ণ স্থিরযৌবনা মেয়েটির দিকে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। তাঁরা বেদনাবোধ করেননি, করবার হেতুও ছিল না। কিন্তু আমি বেদনাবোধ না করে পারিনি। সেইটুকুই ছিল আমার নিজের। আত্মীয় হিসেবে সেইটুকু ছিল আমার মণিবউদিকে দেয়।

মণিবউদি বিধবা? অমৃতবাবু নেই?

মণিবউদি আমার দিকে কয়েকবারই তাকালেন। চোখাচোখি যাকে বলে, চোখের তারায় তারায় দৃষ্টি বিনিময়—তাও কয়েকবার হল। কিন্তু একটুও হাসলেন না তিনি। চিনলেন কিনা তাও যেন বুঝতে পারলাম না।

সেবার, চোদ্দটি ভাষার মধ্যে Bengali অর্থাৎ বঙ্গভাষার লেখকের পুরস্কৃত হবার পালা সর্বপ্রথম। A·B হিসেবে বাংলার স্থান দ্বিতীয় কিন্তু অসমীয়া ভাষার কোন গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়নি বলে প্রথম A অক্ষরের আসন ফাঁক থেকে গিছল। আমার নাম ঘোষিত হল, আমি পুরস্কার নিয়ে ফিরে এসে বসলাম। এবার দেখলাম, মণিবউদি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

(ক্রমশঃ)

তোমার খেয়ায় ভাসি ॥ কৃষ্ণ ধর

এইখানে গোধূলি বিষণ্ণ আলো, ওইখানে রক্তিম উষার
উপস্থিতি দেখি দূর হতে
যাই না সেখানে আমরা, দেখি স্বপ্ন দিয়ে
(স্বপ্নেরই শুধু ডানা আছে)
গুনি হাতের আঙুলে
দিন, সাল, ভবিষ্যৎ, অনিদ্র প্রহর
শুনি সেই শীর্ষদেশে অলৌকিক কোনো কণ্ঠস্বর
জলে ভাসে, মেঘে ডাকে, রঙে রঙে রামধনু দিগন্ত ছাপায়
আমরা তখন যাই নিরুদ্দেশ কালের খেয়ায়।

অন্য কিছু আর মনে নেই,
দুঃখ সুখ অপমান, হৃদয়ের নির্মম প্রস্থান
এ বুকের মাঝখানে আছে গাঢ় চাবুকের দাগ
আজ সব মুছে যাক
তোমার গভীর আলিঙ্গনে,
আমরা সব এক হয়ে ভেসে যাই, ভেসে যেতে চাই
তোমার খেয়ায়।
এই গূঢ় নীলিমায়
আমাদের নক্ষত্রেরা দিনরাত শুধু পাক খায়
যেখানে বিচ্ছেদ নেই, তুচ্ছ কোনো নেই বিসম্বাদ
সেইখানে আছে শুধু আনন্দিত গভীর বিষাদ।

আমরা এই বিষাদের বেড়া ভেঙে চলে যেতে চাই
তোমাদের কাছে
যেখানে দোলনায় শিশু, আমাদের সবার জননী
মহিমায়, মাটির দাওয়ায় বসে আছেন, তাঁকেই
আলগোছে একবার ছুঁয়ে আসি সাধ হয়,
আমাদের আর সব কথা না-হয় পরেই হবে
তোমার উঠোনে এক কোণে
তখন সবাই মিলে গান গাইব লোকায়ত স্বরে।।

কারুকার্য বিস্মরণে ॥

মনোরমা সিংহরায়

দূরান্তরে চলে যাবো? স্নেহ যদি শূন্যময় তবে
সে অনন্ত বহুদূর। আর কতো, দূরান্তরে যাবো!
বার বার দিয়েছ আঘাত। ফিরিয়েছ—
উন্মুখ হৃদয়। কখনো পড়ে কি মনে
স্নেহাতুর কণ্ঠ সেই? খর গ্রীষ্মের প্রতাপে
একাকী দাঁড়িয়ে আছি বাহির দুয়ারে।
কিছুই শোনোনি। শুধু আত্মঅহংকারে
ধনগর্ব স্ফীত মনে উপেক্ষা করেছ—।

নিশ্চল দুঃখের রঙ হৃদয়ের পটে
কতো কী যে এঁকে যায়। সব রঙ কালো
শুধু অন্ধকার শূন্য এক ব্যাপ্ত আছে যেন।
যবনিকা পড়ে গেছে। নাটকের শেষ অঙ্ক
এতো তাড়াতাড়ি এসে যাবে ভাবিনি সে কথা।।

আন্তরিক সেই স্নেহে অনাদর কোথাও থাকে না
এ বিশ্বাস মনে ছিলো। শিল্পময় কারুকার্য
কেন তবে মনেও পড়ে না। আনন্দ প্রতিম
হারিয়েছে অনিন্দ্য সে মুখ। আশ্চর্য শিল্পের মূর্তি
ভগ্ন রুক্ষ ধূলি ধূসরিত। কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে
অমোঘ যন্ত্রণা সেই দূরে নিয়ে এসেছে আমাকে।
আর কতো দূরান্তরে যাবো?

অস্বস্তিকর একটা যন্ত্রণা শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ল। এ যন্ত্রণার উৎস ও অস্বস্তির কারণ বিশ্লেষণ করা ইভার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মনে হ'ল একেবারে আচমকা ভয়ের ভ্যাম্পায়ার তার বিরাট অশুভ ডানাদুটো মেলে দিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। কুক্ষিগত করতে পারলে ইস্পাত-কঠিন চঞ্চু দিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

সোফা থেকে উঠে ইভা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। চোখ মেলে বাইরের দিকে দেখল। কিন্তু, না, এখানেও কোন সান্ত্বনা নেই। ধূসর মেঘহীন আকাশ। মুঠো মুঠো আগুন ছড়াচ্ছে। তাপদগ্ধ ঊষর মাটি। দু-এক জায়গায় সবুজের সামান্য চিহ্ন। তার ফাঁকে ফাঁকে কালো রংয়ের ইশারা।

কয়লা, কয়লা আর কয়লা। এ জায়গাটার প্রাণবস্তু। এই কালোহীরার সন্ধানে মানুষ মাটির বুক বিদীর্ণ করে তার অন্তঃপুরে অভিযান চালিয়েছে। হাজার হাজার প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, কত পরিবার দুঃস্থ, নিঃসম্বল, কিন্তু এ নেশার শেষ নেই। আধুনিক সভ্যতার দুটি প্রধান রসদ কয়লা আর পেট্রোল। দুটোই ধরিত্রী নিজের বক্ষপুটে লুকিয়ে রেখেছে, কিন্তু তবু লোভী মানুষের চোখ এড়াতে পারে নি।

অবনীশকে ভোরবেলা ডেকে নিয়ে গেছে। তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। আধো আলো আধো অন্ধকারে মানুষটাকে ভাল করে ইভা দেখতেই পায় নি। তার পোশাক এগিয়ে দিয়েছে। গলায় টাই বেঁধে দিয়েছে। হাতঘড়ি আটকে দিয়েছে মণিবন্ধে।

তারপর একরূপ কালো ধুলো উড়িয়ে মোটর উধাও হয়ে গিয়েছে।

তারপর থেকেই এই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ইভা ছটফট করছে। কোন রকমে স্নান আর খাওয়া সেরে নিয়েছে। ঘুমকে নিয়ে ভোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। ঘুমের

দু'টি চোখে এবং ঠোঁটের গড়নে আর একটা মানুষের প্রত্যঙ্গের অস্পষ্ট আভাস। একজনকে কাছে টানলে আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়।

বার বার ইভা নিজের মনকে ধমক দিয়েছে। ভয় পাবার কি আছে এতে? এভাবে মুষড়ে পড়ার মতন কি ঘটেছে তার জীবনে?

রামবিলাসের একটা কথাতেই ইভা অত্যন্ত শঙ্কিত, অত্ত বিচলিত হয়ে পড়ল?

পাঁচ নম্বর পিটের মধ্যে মাঝে মাঝে আগুন দেখা যাচ্ছে ম্যানেজার সাব। কুলিরা নামতে ভয় পাচ্ছে।

অবনীশ ভ্রূ কুঁচকে একটু যেন কি ভাবল, দু-এক মুহূর্ত, তারপর স্বল্প হেসে দুশ্চিন্তার মেঘটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, ভয় পাবার কি আছে? পিটে অনেক কারণেই আগুন দেখা যায়। চল।

তারপর লোকটা চলে গিয়েছিল।

দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে আরো অনেকবার এমন হয়েছে। অবনীশ গেছে আবার ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যে চলেও এসেছে। কিন্তু আজ! মনে মনে ইভা হিসাব করল দেয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে। আট ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল, মানুষটার কোন খবর নেই।

আবার ইভা নিজের মনকে বোঝাল। খারাপ খবর থাকলে নিশ্চয় ইভাকে কেউ খবর দিত। লোক ছুটে আসত তার কাছে। নিশ্চয় সে রকম কিছু হয় নি। হয়তো আগুনের একটা ব্যবস্থা করে, কাজ চালু করে দিয়ে তবে অবনীশ ফিরবে। কুলিকামিনদের ভয় ভাঙিয়ে তবে আসবে বাড়ির লোকটার ভয় ভাঙাতে।

ভয়ের কিছু নেই, এমন একটা মন্ত্র অনবরত ইভা জপ করতে লাগল। বিধাতা এত নিষ্ঠুর হতে পারে না।

সোফায় বসে গোলটেবিলে রাখা পত্রিকাগুলো ইভা কোলের ওপর তুলে নিল। একটু সময় কাটাবে। অন্যমনস্ক হবে।

একটা পত্রিকার দু-এক পাতা উল্টেই ইভা তাড়াতাড়ি পত্রিকাটা সরিয়ে দিল। শুধু সেই পত্রিকাটাই নয়, সব পত্রিকাগুলো। পাতায় পাতায় কোলিয়ারীর বিস্ফোরণের ছবি। কয়লার খাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ। যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি।

ইভা উঠে বিছানায় মুমুর পাশে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে। যেন চোখ বুজলেই বাইরের জীবন তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে মুছে যাবে।

লোক এল বিকাল পাঁচটায়।

ইভা চাকরটাকে কোলিয়ারীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছে। সেই সময়।

লোক মানে কৃষ্ণদয়াল গুপ্ত। এই কোলিয়ারীর হাজিরাবাবু। কুলিকামিনদের জীয়ন-মরণের কাঠি এর হাতে।

মেমসাহেব আপনাকে একটু যেতে হবে আমার সঙ্গে।

কৃষ্ণদয়ালের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মাটির দিকে ফিরে তার কথা বলা, চাপা কুণ্ঠিত কণ্ঠ, সব মিলিয়ে একটা যেন অমঙ্গলের আভাস। ইভা বুঝতে পারল ভয়ের যে ভ্যাম্পায়ারটা এ বাড়িটাকে লক্ষ্য করে এতক্ষণ চক্রাকারে পাক দিচ্ছিল, সেটা এবার নেমে এসেছে। ডানার দাপটে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে তাকে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে, এক হাতে দরজার পর্দাটা মুঠো করে ধরে, ইভা প্রথম টালটা সামলাল। আস্তে আস্তে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এইভাবে বলল, কোথায়? কোথায় যেতে হবে আমাকে?

সদর হাসপাতালে।

আর নিজেকে ইভা সংযত করতে পারল না। অশ্রুরুদ্ধ গলায় চীৎকার করে উঠল, অবনীশ কেমন আছে? অবনীশ বেঁচে আছে তো?

বিকৃত কণ্ঠের চীৎকারে লন থেকে মালী এসে সামনে দাঁড়াল। বাড়ির মধ্যে থেকে মুমুকে কোলে নিয়ে ফুলমতিয়া।

অন্য সময় হলে নিজের স্বামীর কথা উল্লেখ করার সময়ে সাহেব বলত, কিংবা ম্যানেজার সাহেব, কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে এটিকেটের নকল বাঁধ ধ্বসে গেল।

কৃষ্ণদয়াল হাত তুলে অভয় দিল। মুখে প্রশান্ত হাসি আনবার প্রয়াস।

আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন। ভয়ের কিছু নেই। একটা জ্বলন্ত কয়লার চাঙড় ছিটকে এসে গায়ে পড়েছে। সামান্য পুড়ে গেছে। নিন, তৈরি হয়ে নিন।

তৈরি? নতুন করে ইভা আর কি তৈরি হবে? মনটা তো সারাটা দিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল। অজানা এক বিরাট পুরুষের নির্দেশে একটা সর্বনাশের মুখোমুখি হবার জন্য কে যেন বার বার তাকে প্রস্তুত হবার কথা বলেছে কানে কানে।

যে পোশাকে ছিল ইভা সেই পোশাকেই বেরিয়ে পড়ল। হাত দিয়ে শুধু চুলগুলো বেঁধে নিল।

কোলিয়ারীর জীপ অপেক্ষা করছিল। দুজনে উঠে পড়ল তাতে।

সদর হাসপাতাল মাইল তিনেক। পিচঢালা মসৃণ পথ। ময়াল সাপের মতন আঁকাবাঁকা রেখায় পড়ে আছে। জীপের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'ল।

কিন্তু সে গতি ইভার চিন্তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। অবনীশের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে, পূর্বরাগের পালা, আনুষ্ঠানিক বিয়ে, শান্তিময় দাম্পত্যজীবন সব একে একে ভেসে উঠল মনের মধ্যে।

একবার ইভার মনে হ'ল, ড্রাইভারের পাশে প্রস্তরমূর্তির মতন বসে থাকা মানুষটার সঙ্গে কথা বলবে। জীপের একটানা যান্ত্রিক শব্দ ছাপিয়ে কৃষ্ণদয়ালের আশ্বাসবাণী তবু যদি একটু ভিন্ন সুরের সৃষ্টি করে। গতির মধ্যেও বিরতি।

কিন্তু ইভা পারল না। নিজের স্বর বুঝি নিজের আয়ত্তে নয়।

হাসপাতালে পা দিয়েই ইভা বুঝতে পারল।

কোলিয়ারীর মালিক গোকুলচাঁদ বাগেরিয়া এসে হাজির। কলকাতা থেকে তাকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। নার্সরা সন্ত্রস্ত, সিভিল সার্জনের মুখে আসন্ন বিপদের ছায়া।

অবনীশের সঙ্গে দেখা হ'ল না। তাকে দেখার উপায় নেই।

বারান্দায় একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে পরিশ্রান্ত ইভা অপেক্ষা করল। কিসের জন্য অপেক্ষা ভাবতেও তার ভয় হ'ল। কেউ একজন এসে বলবে, অবনীশ আর নেই। অবনীশ নামে রক্ত-মাংসের যে সত্তার সঙ্গে তার পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সবন্ধ ছিল, সে মুছে গেছে। খনির এক দুর্ঘটনায় তার পরমায়ুর পরিসমাপ্তি।

কিংবা, মুখ তুলে ইভা জানলা দিয়ে একবার কিছুটা অন্ধকার হয়ে আসা বাইরের গাছপালার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। কিংবা, কেউ একজন এসে বলছে, ভয়ের কিছু নেই। অবনীশ ভাল আছে। অবনীশ সেরে উঠবে। আশ্চর্যজনকভাবে সে বেঁচে গেছে। এমন অবস্থায় মানুষ সচরাচর বাঁচে না।

আধো অন্ধকারে দীপ্তিহীন বাতির নিচ দিয়ে কে একজন যেন এগিয়ে আসছে। সোজাসুজি না দেখেও ইভা বুঝতে পারল। কিছুটা যেন অনুভব করতে পারল।

মিসেস্ মজুমদার।

গোকুলচাঁদ বাগেরিয়ার গলা। খোদ মালিক এসেছে সান্ত্বনা দিতে। তা'ছাড়া আর কেই বা আসবে। এখানে কে চেনে ইভাকে।

হাজিরাবাবু তাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে। তিন মাইল দূরের এক কোলিয়ারীর ম্যানেজারের স্ত্রীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার মতন লোক আর কে এখানে আছে।

বলুন।

বাগেরিয়া খুব কাছে এসে দাঁড়াতে ইভা বলল। ফিস-ফিস করে।

সবই ভগবানের খেলা।

ইভা কিছু বলল না। বুঝতে পারল বাগেরিয়ার কথাটা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। তার বক্তব্যের সূচনা।

ঠিকই তাই। এবার বাগেরিয়া সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে-মুখে বিনীত ভাব।

আমার তো মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

এইবার ইভা চমকে মুখ তুলল। সকাল থেকে এই প্রথম একটা লোক ভিন্ন সুরে কথা বলছে। আশার বাণী, আশ্বাসের বারিসিঞ্চন করছে নির্জীব একটা দেহে।

একটা পা বোধ হয় কেটে বাদ দিতে হবে।

একটা পা?

হ্যাঁ, ডান পাটা। এ ছাড়া আর উপায় নেই। কি জানেন, মানুষের জানের চেয়ে পায়ের দাম বেশি নয়।

বাগেরিয়ার এ মূল্যনির্ণয় অবিসংবাদীভাবে সত্য। কিন্তু বাগেরিয়া জানে না, অবনীশের ঐ একটা পায়ের অনেক দাম। কলেজ স্পোর্টস্-এ বিখ্যাত অ্যাথলীট অবনীশ মজুমদার। সবুজ মাঠে অবনীশ যখন ক্ষিপ্রগতিতে একটার পর একটা হার্ডলস্-এর বেড়া পার হয়ে যেত, তখন দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসে যারা হাততালির ঝড় তুলত, ইভা ছিল তাদের একজন।

ইভার মনে হয়, অবনীশের মনের সঙ্গে মিতালী হবার অনেক আগেই বোধ হয় সে তার পায়ের প্রেমে পড়েছিল। অবিরাম সাইকেল চালনা, দীর্ঘ পাঁচ মাইল দৌড়—সব কিছুতে অবনীশ অগ্রণী দুটি পেশী-চিক্কন সুগঠিত পায়ের মালিক।

তার একটি অখ্যাত এক হাসপাতালে অবনীশকে রেখে যেতে হবে।

তবে এ কথা ঠিক, যদি অবনীশের পরমায়ু আর তার একটা প্রত্যঙ্গের মধ্যে বাছতে হয় ইভাকে, তা'হলে তার মনের নিক্তি কোন-দিকে ঝুঁকবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাগেরিয়ার সেই আশার বিন্দু কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। পরের দিন থেকে বাগেরিয়াকে আর দেখা গেল না। কাজের মানুষ, তার এক জায়গায় আটকে থাকলে হবে না।

সিভিল সার্জন কোন ভরসা দিতে পারল না।

ইভার প্রশ্নের উত্তরে তুহিন-শীতল কণ্ঠে বলল, পরমায়ুর আশ্বাস দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যথাসাধ্য করব এইটুকুই আপনাকে বলতে পারি।

ফলে, প্রত্যেকদিন সকালে কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে ইভা হাসপাতালে চলে আসত, মুমুকে ফুলমতিয়ার কোলে তুলে দিয়ে। ফিরত সন্ধ্যার পর।

কোলিয়ারীতে নতুন অস্থায়ী ম্যানেজার এসেছে। মিস্টার প্যাটেল। ভদ্র, বিনয়ী। কোলিয়ারীর জীপটা সকাল-সন্ধ্যা সে ইভার জন্য ছেড়ে দিত।

খবর দেবার মতন কোথাও কেউ ছিল না। অবনীশের তিনকুলে যে কেউ নেই, এটা সে বিয়ের সময়ই জানতে পেরেছিল। ইভার এক দাদা আছে সুদূর মীরাটে। কিন্তু তাকে খবর দেওয়া অর্থহীন। এ বিয়েতে তার মত ছিল না। ঈশ্বর জানেন, কি কারণ, অবনীশকে তার ভাল লাগে নি। কলকাতায় এক ঘণ্টার আলাপেই নাকচ করে দিয়েছিল।

তার পর থেকে যোগাযোগ নেই। ইভা বিয়ের পরে চিঠি লিখে সংযোগ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু দাদা সে চিঠির কোন উত্তর দেয় নি।

তাই ইভার এই দুঃখ, এই বেদনার অংশ নেবার কেউ নেই। সমস্ত যন্ত্রণাটুকু তার নিজের। তার প্রেমের মতন, তার যন্ত্রণাটুকুরও অংশীদার সে নিজে।

দেড় মাস পর দেখা মিলল।

নার্স তাকে ডেকে কেবিনের মধ্যে নিয়ে গেল।

ইভার মনে হয়েছিল রক্তবাহী শিরাগুলো বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এতদিন ধরে কষ্টে সংযত করা সব আবেগ, উচ্ছ্বাস কূলপ্লাবী হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাকে। অবনীশের সামনে সে মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

কিন্তু সে রকম কিছুই হ'ল না।

হ'ল না, কারণ অবনীশের কতটুকু আর সে দেখতে পেয়েছিল।

কোমর পর্যন্ত সাদা চাদর চাপা। মাথার একদিকে পুরো ব্যাণ্ডেজ। একটা হাত বুকের ওপর আটকানো। মুখের যেটুকু অনাবৃত, সেটুকুতেও কড়া লাল রংয়ের প্রলেপ।

নার্স অবনীশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে কি বলল। সম্ভবত ইভার আগমনবার্তা জানাল।

অবনীশের সমস্ত শরীরটা অল্প কেঁপে উঠল। যে চোখটা খোলা ছিল, সেটা মুহূর্তের জন্য চিক চিক করে উঠল। বাঁচার আনন্দদ্যুতি না সবহারানোর চিতা-বহ্নি ইভা বুঝতে পারল না।

অবনীশ আস্তে আস্তে একটা হাত তুলে ইভাকে অভ্যর্থনা করল।

মাথার কাছে একটা টুল ছিল, ধীর মন্থর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ইভা সেই টুলের ওপর বসল।

ব্যস্, এই পর্যন্ত।

অবনীশের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তার সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ।

ইভার সব কথা বুঝি হারিয়ে গেছে। অব্যক্ত কান্নার বেগ ছাড়া তার কণ্ঠ দিয়ে আর কিছু বের হ'ল না।

অবনীশ বাড়ি ফিরল মাস তিনেক পর। তখনও মুখে ব্যাণ্ডেজ। বগলে ক্র্যাচ। একটা পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা।

গোকুল বাগেরিয়া নিঃসন্দেহে মহানুভব। অবনীশ কর্মক্ষম নয়, কোনদিন যে হবে, এমন আশা দুরাশা। তবু এ কোয়ার্টার ছাড়ার জন্য হুমকি দেয় নি। মাসের প্রথম দিনে মাইনের টাকাটা ঠিক পাঠিয়ে যাচ্ছে, একেবারে ইভার হাতে।

তারপর সপ্তাহে সপ্তাহে এসে দেখা করছে। মানুষের সবকিছুই যে ভাগ্য-নির্ভর এমন কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে ইভাকে বোঝাচ্ছে। নয়তো, আরো বিশদ ব্যাখ্যাও করছে, কি প্রয়োজন ছিল ম্যানেজার সায়েবের কোলিয়ারীর আইন-কানুন অমান্য করে ওই অবস্থায় ছুটে খাদের মধ্যে নামবার? কুলিকামিনরা সবাই ঠিক সময়ে সরে এসেছিল। তাদের গায়ে আঁচড়টি লাগে নি। সব ধাক্কাটা গেল ম্যানেজার সায়েবের ওপর দিয়ে। নসিব ছাড়া আর কি?

কোলের ওপর দুটো হাত জড়ো করে রেখে ভাগবত শোনার ভঙ্গিতে বসে বসে ইভা সব শুনেছিল। একটি কথাও বলে নি। ঠিকই বলেছে গোকুল বাগেরিয়া। নসিব ছাড়া আর কিছুই নয়। ইভার নসিব।

যেদিন ব্যাণ্ডেজ খোলা হল, সেদিন ইভা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। নার্স অনেকবার তাকে অন্য ঘরে যেতে বলেছিল, ইভা শোনে নি।

দুটি চোখ ভরে একবার অবনীশকে ইভা দেখবে, এতটা বিপর্যয়ের পর, এতদিনের অদর্শনের পরে, এই মুহূর্তে কি করে ইভা সরে থাকবে!

তাছাড়া অবনীশও তো দু চোখের দৃষ্টি মেলে প্রথমেই তাকেই খুঁজবে।

ব্যাণ্ডেজ সম্পূর্ণ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ইভা চীৎকার করে টলে পড়ল।

এই আকস্মিক বিপদের জন্য নার্স বোধ হয় তৈরিই ছিল। ইভাকে ধরে সাবধানে সোফার ওপর শুইয়ে দিল।

কিন্তু সারা জীবন অচেতন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এক সময় ইভাকে চোখ খুলতে হয়, মানুষটার দিকে ফিরে চাইতে হয়। সব অনুভূতি রোধ করে তার কাছেও আসতে হয়।

যেখানে ডান চোখটা ছিল, সেখানে বর্তমানে ছোট একটা রক্তাক্ত গর্ত। একটা গালের মাংস নেই। দাঁতের সার বাইরে থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঠোঁটের একটা পাশে দ্রাক্ষাগুচ্ছের মতন মাংসের স্তূপ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইভা দেখল, নির্নিমেষ-নেত্রে। অবনীশ মজুমদারের প্রেতাত্মা। এই বীভৎসতার সঙ্গে ইভাকে সারাটা জীবন কাটাতে হবে। ক্লান্তিকর, মর্মদাহী অনেক দিন।

একটা অস্পষ্ট গোঙানি শুনে ইভা আবার চমকে উঠল।

অবনীশ কথা বলবার চেষ্টা করছে। কে

জানে হয়তো গাঢ় কণ্ঠে ইভার নাম উচ্চারণের চেষ্টা।

কিন্তু মাংসপুঞ্জের জন্য পরিষ্কার শব্দ আসছে না। একটা আর্তস্বর বাতাসকে চিরে দিচ্ছে। শুধু বাতাসকেই নয়, ইভার মর্মমূলকেও।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে।

চিন্তিত হবেন না মিসেস্ মজুমদার। পাথরের চোখ একটা বসিয়ে দেব। উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে গালে বসিয়ে দিলে আর খুব খারাপ দেখাবে না। যাই বলুন, পুনর্জন্ম তো।

সার্জনের অপরিসীম কৃতিত্বে ডাক্তার গৌরব অনুভব করে। যমের সঙ্গে মানুষের প্রাণান্তকর যুদ্ধে মানুষ জয়ী হয়েছে, কিন্তু রোগীকে শমনের কবল থেকে সম্পূর্ণ টেনে আনতে পারে নি। তার কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎকোচ দিয়ে পরমায়ুটুকু মিলেছে।

একবার ইভার মনে হ'ল বলে, উরু থেকে কেন, তার চেয়ে ইভার বুক থেকে ক্ষুরে ক্ষুরে মাংস চেঁছে নিয়ে ওই মানুষটার অপুষ্টি পূরণ করা যায় না? তা হলে ইভা শান্তি পাবে। নিশ্চিন্ত হবে।

কিন্তু ইভা কিছু বলল না। জীবন নিয়ে কথা কাটাকাটি খেলা খেলতে তার ভাল লাগল না। এ খেলায় যে হারে, সে নিঃস্ব হয়।

শুধু অবনীশকে বলল।

তোমার কথা বলতে অসুবিধা হয়, তুমি যা বলতে চাও, একটা কাগজে লিখে দিও। আমি তোমার হাতের কাছে কাগজ পেন্সিল রেখে দেব।

অবনীশের হাতের কাছে কাগজ পেন্সিল থাকলেও সে কথা বলা বন্ধ করল না। ডাক্তারের নির্দেশ তাই ছিল। চেষ্টা করতে করতে জড়তা কেটে যাবে। একেবারে পারিষ্কার হয়তো হবে না, তবু কিছুটা ভাল। শুধু আর্তনাদের সগোত্র নয়।

এটাও ইভার ক্রমে ক্রমে সহ্য হয়ে এল।

কিন্তু আর একটা ব্যাপারে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

সারা বাড়ি জুড়ে খট-খট শব্দ। ক্রাচ-নির্ভর একটা মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে। এক ঘর থেকে আর এক ঘর।

ক্রাচের সঙ্গে মেঝের সংযোগে যে শব্দ উত্থিত হচ্ছে, সে যেন ইভার শঙ্কিত হৃদস্পন্দনেরই প্রতিধ্বনি।

কেন এমন করে ঘুরে বেড়ায় মানুষটা? চুপচাপ এক জায়গায় কেন বসে থাকে না? তা'হলে অন্তত ইভা ভাবতে পারত মাঝখানের সাংঘাতিক দিনগুলো আসে নি তার জীবনে। কল্পনা করতে পারত অবনীশ অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে নিরাপদেই আছে।

গোকুল বাগেরিয়া দেবদূতের কাজ করেছে। অবনীশের চাকরি নেই, তবু এ কোয়ার্টার ছাড়ার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করে নি। নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছে ইভার হাতে।

চোখ-মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলেছে, আপনার সারা জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল অবনীশবাবুর হঠকারিতার জন্য। ওভাবে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া একেবারে অর্থহীন।

ইভা লক্ষ্য করেছে, গোকুল বাগেরিয়া অবনীশকে আর ম্যানেজার সাহেব বলে না, নাম ধরে শুধু বাবু বলে। ম্যানেজারীর গদিতে আর একজন আসীন হয়েছে।

তবু গোকুলচাঁদের মহানুভবতার অন্ত নেই।

যখন আপনার দরকার হবে বলবেন, কোলিয়ারীর জীপ আপনার দরজায় চলে আসবে। একটু এদিক-ওদিক না বেড়ালে দমবন্ধ হয়ে যাবে যে।

কি করে ইভা গোকুলচাঁদকে বোঝাবে, বাইরে বের হলেই বরং তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য লোকের মুখে হাসির লহর দেখলে নিজের দুঃখের সমুদ্র আরো উত্তাল, আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

তার চেয়ে ঘরের অন্ধকার কোণ অনেক ভাল। এখানে মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁদা যায়। নিজের কপালে করাঘাত করে দোষারোপ করা যায় অদৃষ্টকে।

কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে অবনীশ বুঝি মেধাও হারিয়েছে।

নয়তো দরজায় জীপ এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে গাড়িতে বসতে যাবে কেন?

চল ইভা, বহুদিন বাইরের আলো-বাতাস মাখি নি।

এই ধরনের কিছু একটা বুঝি অবনীশ বলতে চেটা করল, ভাল বোঝা গেল না। মাংসের বীভৎস কুঞ্চনের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলো অর্থহীন শব্দ নিঃসারিত হ'ল।

নিরুপায় ইভাকেও জীপে উঠতে হল। ড্রাইভারের পাশে বসা যায় না, তাই বসতেও হ'ল অবনীশের পাশে।

ড্রাইভারকে ইভা নির্দেশ দিল কাঁচা মাটির সড়ক ধরে গাঁয়ের দিকে যেতে, কিন্তু অবনীশ বাধা দিল।

একটা হাত রাখল ড্রাইভারের কাঁধে, ইঙ্গিতে শহরের দিকে চলতে বলল।

আশ্চর্য, কেন বোঝে না লোকটা! এমন জায়গায় যেতে চাইছিল ইভা, যেখানে একাধিক পথচারীর লক্ষ্য তারা হবে না। শহরের পরিচিত অর্ধপরিচিত লোকেরা দৃষ্টিতে বিস্ময় আর আতঙ্ক ফুটিয়ে যেভাবে চেয়ে থাকবে, সে নির্মম চাউনি সহ্য করা ইভার পক্ষে অসম্ভব। অতিপরিচিত যারা, তারা এগিয়ে এসে সান্ত্বনার বাণী শোনাবে, সহানুভূতির ছিটে, তালুতে জিভ ঠেকিয়ে ইভার ভাগ্যের উদ্দেশ্যে সমবেদনার প্রকাশ।

যে বিপর্যয়, বিধাতার যে নির্মম অবিচার ভোলবার চেষ্টা ইভা অবিরত করছে, সেটাই সবাই মিলে মনে করিয়ে দেবে। অন্তহীন বেদনার বাষ্পটুকু আলোড়িত করে আকাশ করে দেবে ইভার দিগন্ত।

অবনীশ নির্বিকার। ক্রাচটা এমনভাবে এক হাতে আঁকড়ে ধরেছে, যেন সেটা ক্রাচ নয়, সৌখিন নক্সাকাটা মালাক্কা বেতের ছড়ি। পঙ্গুত্ব যেন তার জীবনের একটা অলঙ্কার।

বাজারের কাছ বরাবর আসতেই অবনীশ জীপটা থামাল।

ইভার দিকে ফিরে বলল, কতকগুলো জিনিস কিনতে হবে আমার।

ইদানীং অবনীশের কথা কিছু কিছু ইভা বুঝতে পারে।

কি, কিনবে কি?

উত্তরে অবনীশ নিজের জামা-কাপড় দেখাল। পকেট থেকে রুমাল বের করে তুলে ধরল ইভার সামনে।

একটু বেহিসেবী, একটু বেপরোয়া হয়েছে অবনীশ। এর জন্য গোকুল বাগেরিয়া কিছুটা দায়ী।

নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইভার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। অবনীশের সামনেই। একথাও বলেছে, আইনত তার ক্ষতিপূরণ দেবার দায় নয়। ওভাবে মরণকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবনীশ নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছে। কিন্তু আইনই তো শেষ কথা নয়। মানুষের কোমল অনুভূতিরও অনেক দাম। নৈতিক দায়িত্বের বোঝাও কিছু কম নয়।

অন্য লোক কিন্তু অন্য কথা বলেছে। প্রতিবেশীরা ইভাকে পরামর্শ দিয়েছে।

অতবড় একটা মানুষের দাম মাত্র পঞ্চাশ হাজার? আদালতে ইভা আবেদন করুক। লাখ দুয়েক টাকা চেয়ে, অন্তত লাখ টাকা নির্ঘাত এসে যাবে হাতের মুঠোয়।

ইভা চুপচাপ বসে বসে শুনেছে। তার মুখ দেখে মনে হয় নি কথাগুলো তার কানে গেছে। কানে গেলেও মন সায় দেয় নি।

একটা মানুষের দান এভাবে টাকার অঙ্কে যাচাই করতে তার ভাল লাগে নি। বেশি টাকা দিলেই বুঝি ইভার কষ্টের লাঘব হবে! তার হারানো জীবন রংয়ে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে! যা গেছে ইভার, তার আর কোনদিনই পূরণ হবে না। এটা তার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না, জানবার কথা নয়।

কিন্তু টাকার গোছা দেখে অবনীশ ভারসাম্য হারিয়েছে।

সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে শুধু জলপানির জোরে। বাপ বেসরকারী অফিসের কলমনিষ্ঠ কেরানী। চোখে ঠুলি-পরা ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতন চাকরির বাঁধা সড়ক ধরে চিরদিন ছুটেছে। মাপা আয়ের মধ্যে সংসারের সকল দাবি মেটাতে বার বার হাঁপিয়ে উঠেছে।

অবনীশ যখন কোলিয়ারীর ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সনদ পেল, তার আগেই তার বাপ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। মা মারা গেছেন আগেই। গোকুল বাগেরিয়ার মিমতিগাড়া কোলিয়ারী এমন কিছু বড় নয়। বি গ্রেড কয়লার আকর। ম্যানেজারের মাইনে খুব লোভনীয় নয়।

কিন্তু অবনীশ এই চাকরিই আঁকড়ে ধরল। এদিক ওদিক না চেয়ে।

আঁকড়ে ধরার অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

ইভার দাদা বোনের বিয়ের জন্য প্রায় পৃথিবী চষে ফেলেছে। সাগর সেঁচে মুক্তা তোলার মতন ভাল ভাল ছেলে আহরণ করেছে দিকবিদিক থেকে।

ইভার মন অবনীশের খুঁটিতে বাঁধা। দু-একদিন অন্তর ইভা অবনীশকে শাসিয়ে বলেছে। যে কোন চাকরি একটা জোটাতে না পারলে, ইভা চিরদিনের মতন হারিয়ে যাবে। বেকার অবনীশের গলায় মালা দিতে সে ভরসা পাচ্ছে না।

এই চাকরি সেই ভরসা। অবনীশের মতন মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলের পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয় মনে হ'লেও ইভার মনে একটু ইতস্তত ভাব ছিল।

কিন্তু তখন দুজনেরই অপেক্ষা করার মতন পর্যাপ্ত সময় হাতে ছিল না। তাই এভাবে থোক টাকাটা হাতে আসাতে অবনীশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কিন্তু কিসের বিনিময়ে সে কথা একবার ভাবল না।

অবশ্য না ভাবার একটা মস্ত সুবিধাও ছিল।

দর্পণের সামনে না দাঁড়ালে নিজের চেহারাটা দেখার কোন সুযোগ অবনীশের হয় না। কিন্তু চোখ তুললেই ইভা মানুষটাকে দেখতে পায়।

দেয়ালে টাঙ্গানো একাধিক ফটোর পটভূমিতে আজকের এই রূপান্তর আরো বীভৎস, আরো ভয়াবহ মনে হয়।

তুমি গাড়িতে বস, আমি নেমে কিনে আনছি।

ইভা একবার শেষ চেষ্টা করল।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই তার কানে এল কঠিন অ্যাসফাল্টের সংগে ক্রাচের সংঘর্ষের শব্দ। ক্রাচটা অবনীশ যেন রাস্তার ওপর নয়, ইভার হৃদপিন্ডের ওপর আঘাত করে করে এগিয়ে আসছে।

ইভা স্পষ্ট দেখতে পেল, দোকানে আরো দু-একজন যে ক্রেতা ছিল, তারা ভয়চকিত চোখ তুলে অবনীশকে দেখছে। একটি মহিলা তো দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

অবনীশের কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

নিচু হয়ে পাঞ্জাবির কাপড় দেখতে লাগল। ক্রাচটা শোকেসে হেলান দিয়ে রেখে।

দরকষাকষি না করে কোন রকমে জিনিসগুলো তুলে ইভা যেন পালিয়ে বাঁচল।

মাঝে মাঝে অন্য কোয়ার্টার থেকে প্রতিবেশীরা আসত। সাধারণ সময়ে এটা স্বাভাবিক। বিদেশে বিভূঁয়ে পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনা করা, খবর নেওয়াটাই রীতি। কিন্তু ইভা বুঝতে পারত এখন তাদের আসার উদ্দেশ্য অন্য।

লোকে চিড়িয়াখানায় নতুন আমদানী কোন আশ্চর্য জন্তু দেখতে যেমন যায়, কিংবা মিউজিয়মে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল, ঠিক সেই উৎসাহ, সেই আগ্রহ নিয়ে আশেপাশের লোকেরা ইভার কোয়ার্টারে আসত। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আসা আত্মীয়কুটুম্বদের সঙ্গে নিয়ে।

কোন ভরসা দিতে পারল না......

ইভার কাছে বেশিক্ষণ বসত না। ভিড় করত অবনীশের ঘরের দরজায়।

এসব দাঁতে দাঁত চেপে ইভা সহ্য করেছে। একটু উত্তেজিত হয় নি, উত্তেজনার ভানও করে নি।

মাঝে মাঝে শুধু অবনীশকে বলেছে, কই স্কিন-গ্রাফটিংয়ের কি হল? ডাক্তারকে খবর দেও?

না, না, অবনীশ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছে, অপারেশনের ধকল আর আমি সইতে পারব না। আমি মরে যাব।

ডাক্তারও ঠিক সেই কথাই বলেছে। চুপি চুপি ইভা দেখা করেছিল। জিজ্ঞাসা করেছে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্লাস্টিক সার্জারির যে কথা ছিল, তার কি হ'ল?

ডাক্তার মাথা নেড়েছে।

ঝুঁকি নিতে সাহস হচ্ছে না। মিস্টার মজুমদারের হার্টের অবস্থা ভাল নয়। অবশ্য অপারেশনটা মোটেই মেজর নয়, কিন্তু রোগী নার্ভাস হয়ে পড়লে অসুবিধা হবে।

ইভা আর একটি কথাও বলে নি। মাথা নিচু করে ধীরপায়ে চলে এসেছে। মাথা তুললেই ডাক্তার তার জলভরা চোখ দুটো দেখতে পেত।

অবনীশ জড়িয়ে জড়িয়ে অন্য কথাও বলেছে।

এখানকার মাংস ওখানে দিলে আমার চেহারার কিছু হেরফের হবে না ইভা। যে কদিন বাঁচব, এইভাবেই বাঁচতে হবে। চেহারার উন্নতি করতে গিয়ে প্রাণটাই হয়তো বেরিয়ে যাবে।

এরপর ইভা আর কিছু বলে নি। বলা সম্ভব হয় নি। সকলের অগোচরে চোখের জল মুছেছে।

মনে মনে শুধু এই কথা ভেবেছে। এমন কি সম্ভব নয়, অবনীশ আর মুমুকে নিয়ে ইভা দূরে কোথাও চলে যাবে। যেখানে পরিচিত মানুষ একটিও থাকবে না, অপরিচিত মানুষের সংখ্যাও অঙ্গুলিমেয়। এ বীভৎসতা ধীরে ধীরে যেখানে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। একদিন অবনীশ কান্তিমান ছিল, ইভা সৌভাগ্যবতী, এমন কথা কেউ ভাববে না।

কিন্তু সেদিন ইভার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

ইভা রান্নার তদারকী করছিল। ফুলমতিয়াই সব করে। একাধারে পাচিকা আবার দাসী। হঠাৎ মুমুর তীব্র চীৎকারে ইভা ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ছেলেটা নিশ্চয় পড়ে গেছে সাংঘাতিকভাবে।

শোবার ঘরের চৌকাঠে পা রেখেই ইভা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

মুমু শক্ত, কঠিন হয়ে গেছে। আরক্ত মুখ। একবার চীৎকার করেই থেমে গেছে। কাঁদবার শক্তিও যেন আর তার নেই।

সামনে প্রসারিতহস্ত অবনীশ। ছেলেকে সস্নেহে কোলে তোলার জন্য এগিয়ে আসছে। মুখে আদরের আহ্বান, কিন্তু সে আহ্বান রূপান্তরিত হচ্ছে বিকট অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে।

ছুটে গিয়ে ইভা মুমুকে কোলে তুলে নিল। আঁচল দিয়ে তাকে আবৃত করল।

অবনীশকে বলল, ওরকম কর না. দেখছ না মুমু ভয় পাচ্ছে। তুমি অত কাছে এস না।

অবনীশ আর এগোল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়েই বলল, কিন্তু ওর ভয় ভাঙানো দরকার। আমি ওর বাবা। ছেলেবেলা থেকে আমাকে ভয় করতে থাকলে, বড় হলেও এ ভয় কাটাতে পারবে না।

হয়তো অবনীশের কথাই ঠিক। দুজনের মাঝখানে ভয়ের নিরেট এক প্রাচীর গড়ে উঠলে, ভবিষ্যতে সে অবরোধ আর ভাঙা কোনদিন সম্ভব হবে না। কিন্তু কি করে ইভা মুমুর ভয় ভাঙাবে? অবনীশের সান্নিধ্যে মুমু নীরক্ত, পাথরপ্রতিম হয়ে যায়। ইভার মনে হয়, অবনীশ যদি হাত বাড়িয়ে মুমুকে ছোঁয়, তাকে কোলে নেবার চেষ্টা করে, তাহলে হয়তো মুমুর হৃদ-স্পন্দনই বন্ধ হয়ে যাবে।

এতদিন ইভা মুমুকে সরিয়ে সরিয়ে রেখেছে। পারতপক্ষে অবনীশকে তার কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। ফুলমতিয়াকে এই রকমই নির্দেশ দেওয়া ছিল। এতদিন অবনীশও বোধ হয় নিজের চিন্তা, নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে, দূরে থেকে মুমুকে দেখেছে, এভাবে কাছে আসার প্রয়াস করে নি।

আজকে হঠাৎ তার অপত্যস্নেহ জেগে উঠল। ছেলেকে কাছে টানার দুর্নিবার আকর্ষণ।

ইভা মুমুকে নিয়ে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াল। ফুলমতিয়াকে ডেকে বলল, মুমুকে নিয়ে একটু বাইরে বেড়িয়ে আয় ফুলমতিয়া, রান্নাটা আমি দেখছি।

প্রচুর শব্দ করে ইভা রান্না শুরু করল। প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। যাতে আর একটা মানুষের আবেদন নিবেদন সব চাপা পড়ে যায়। একটুও কানে না আসে।

অবনীশের যেন একটা জেদ চেপে গেল।

মাঝরাতে অব্যক্ত একটা গোঙানি কানে যেতে ইভা ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর দৃশ্য দেখে তার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল।

ইদানীং একই ঘরে অবনীশ আলাদা খাটে শোয়। সেই বিপর্যয়ের পর থেকে।

অনেক বার ইভা ভেবেছে মুমুকে নিয়ে পাশের ঘরে শোবে, কিন্তু পারে নি। পারে নি অসহায় অবনীশের মুখ চেয়ে। কি জানি মানুষটার কখন কি দরকার হয়।

কখন অবনীশ এ খাটে এসে বসেছে। সন্তর্পণে হাত বোলাচ্ছে মুমুর গায়ে। ঘরে আবছা নীল আলোর দ্যুতি। সেই স্বল্প বাতিতেই ইভা দেখতে পেল মুমু জেগে উঠে স্থির নেত্রে অবনীশের দিকে চেয়ে রয়েছে। এত ভয় পেয়েছে যে কাঁদতেও পারছে না। মুখ আবেগে দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে।

অল্প আলো, অল্প অন্ধকারে অবনীশকে আরো বীভৎস, আরো জান্তব বলে মনে হচ্ছে।

তুমি কি মেরে ফেলবে ছেলেটাকে?

এক ঝটকায় মুমুকে কোলে তুলে নিয়ে ইভা দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নিস্তার নেই। ক্রাচে ভর দিয়ে মূর্তিমান ভয়টা এগিয়ে আসছে। খট্, খট্, খট।

তুমি ভুল করছ ইভা। মুমুকে আমার কাছে দাও। আমার এ চেহারায় মুমুকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে দাও। নয়তো বাপ আর ছেলের মাঝখানে চির-দিনের জন্য একটা শংকার প্রাচীর গড়ে উঠবে। ও কোনদিনই আমাকে ভালভাবে চিনতে পারবে না।

অবনীশ মুমুর গায়ে হাতটা রাখতেই মুমু শিউরে উঠল। প্রাণপণ শক্তিতে ইভাকে জড়িয়ে ধরে আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না।

ইভা মুমুকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিল।

সে রাত্রে মুমুর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে বেশ সময় নিল। গায়ে, মাথায়, হাত বোলাতে বোলাতে অনেক কষ্টে ইভা তাকে ঘুম পাড়াল।

অবনীশও যেন মরীয়া।

বাইরের সব কাজ বন্ধ। গতি পরিমিত, তাই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এক সর্বনেশে খেলায় মাতল।

সময় সুযোগ পেলে, মুমু অরক্ষিত অবস্থায় থাকলেই তার কাছে এসে দাঁড়াত। আদর সোহাগের ব্যর্থ চেষ্টায় তাকে আতঙ্কিত করে তুলত। ফুলমতিয়াকে গ্রাহ্য করত না। ইভার সঙ্গে তর্ক করত।

তুমি ভুলে যাচ্ছ ইভা, মুমু আমারও সন্তান। তার ওপর আমারও ন্যায্য অধিকার আছে। আজ আমি কুৎসিতদর্শন হয়েছি বলে আমার ছেলেকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পার না। বোঝালে বোঝে না। অবনীশ যেন একটা অবিবেচক দানব হয়ে উঠেছে।

আগে শান্তভাবে কথা বলত। অনুনয়, বিনয়। আজকাল চেঁচামেচি শুরু করে। ক্রাচ ছুঁড়ে বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙে। ইভাকে গালিগালাজ।

একদিন রাগ করেই ইভা মুমুকে ছেড়ে দিয়েছিল অবনীশের কাছে, কিন্তু বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারে নি। মুমুর আর্তস্বর কানে যেতেই ছুটে গিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল।

পরের দিন থেকেই মুমুর জ্বর। একশো তিন। এক নাগাড়ে দশদিন চলল যমে মানুষে টানাটানি।

ডাক্তার রোগের কারণ শুনে ইভাকে আলাদা ডেকে বলল, ছোট বাচ্চা এভাবে ভয় পেলে তার প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এরকম একটা আতংকের পাশাপাশি বাস করা তার পক্ষে ক্ষতিকর। আপনি ছেলেকে কোন আত্মীয়-স্বজনের কাছে বরং সরিয়ে দিন মিসেস মজুমদার। আমি মিস্টার মজুমদারকে বলেছি, কিন্তু তিনি আমার কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। তাঁর ধারণা বাচ্চার জ্বরটা সেরে গেলেই ভয়টা ভেঙে যাবে। ভয়টা ভেঙে যাচ্ছে, এই জ্বরই নাকি তার লক্ষণ।

সারা রাত ইভা ঘুমাল না। পারল না ঘুমাতে। মুমুকে জড়িয়ে অঝোরধারায় কাঁদল।

কোন উপায় নেই। একটা পথ তাকে বাছতে হবে। একজনকে।

অবনীশ অতীত, তার সাংসারিক মূল্য শূন্য, কিন্তু বাঁচতে হ'লে ইভাকে মুমুকে জড়িয়েই বাঁচতে হবে। ইভার ভবিষ্যত। হয়তো সম্বল, সহায়।

ভোরের দিকে নিদ্রাহীন শয্যা ছেড়ে ইভা যখন উঠল, তখন তার চোখের গভীরে, মুখের রেখায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ।

খুব সকালে দুধ খায় অবনীশ। গরম এক কাপ দুধ। ইভা রোজকার মতন নিজের হাতে দুধ নিয়ে গেল। তার আগে আলমারি খুলল। ঘুমের বড়ি বের করল একমুঠো। প্রথম প্রথম অবনীশের দরকার হ'ত। সব বড়িগুলো দুধে ফেলে একবার ঘুমন্ত মুমুর দিকে চেয়ে দেখল। পরম নির্ভয়ে পাশ বালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে। উত্তাপহীন দেহে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার লক্ষণ।

কই, দুধ কি হ'ল? অবনীশের রুক্ষ কণ্ঠ শোনা গেল।

যাই। দুধের কাপ হাতে চৌকাটের কাছে গিয়েই ইভা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা হাত প্রসারিত করে অবনীশ অপেক্ষা করছে।

কিন্তু তারপর! মানুষটা মরে যাওয়া মানে গোকুল বাগেরিয়ার দয়া, অনুকম্পা সব অন্তর্হিত হবে। এ কোয়ার্টার ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হবে ইভাকে।

প্রায় অনড়, পঙ্গু এই অসহায়তাকে সামনে রেখে দাক্ষিণ্যের যে মুষ্টি ভিক্ষা এতদিন গোটা সংসারটা বাঁচিয়ে রেখেছিল, সে সংসারের কি পরিণতি হবে?

মুমুকে বাঁচাতে অবনীশের বাঁচারও বুঝি প্রয়োজন। যে ভাবেই হোক।

দুধের কাপটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ইভা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। এগোবার পথ নেই। ফেরার পথও তো বিপদরহিত নয়।
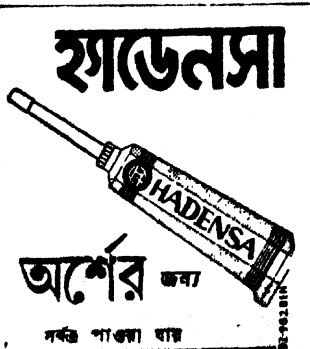
হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের পুরোন চিত্র

কলকাতার একটি শিক্ষায়তন

কমল চৌধুরী

কলকাতায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য হিন্দু স্কুল এবং প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। এই দুটি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে উনিশ শতকের বাঙালী জীবন নতুন প্রাণের স্পন্দন পেয়েছিল। দুই সংস্কৃতির মিলনভূমিতে দাঁড়িয়ে সেকালের বাঙালী সন্তান সংস্কারমুক্তচিত্তে প্রবল প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জাতির চিন্তাদৈন্যের মুক্তি ঘটিয়েছিল। যে কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মত সে কাহিনীও যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি আকর্ষণীয়। উনিশ শতকের বাংলাদেশে নবজাগরণে পথিকৃৎ হিসেবে প্রাচীন শিক্ষাক্ষেত্র হিন্দু স্কুলের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এদেশের মানুষকে নাড়া দেওয়ার পক্ষে এর অবদান ছিল অতুলনীয়। সেকালের বুদ্ধিজীবী বাঙালী মাত্রেই ছিলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র। প্রাচীন সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে এদের যে লড়াই চলেছিল সে কাহিনী বহু গবেষকের রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। হিন্দু স্কুল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সেকালে শিক্ষার অবস্থা প্রসঙ্গে এখানে সামান্য কথা উল্লেখ করছি।

ইউরোপীয় আদর্শে এদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হোল কলকাতা মাদ্রাসা: গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৮০ খৃঃ। হেস্টিংস নিজের খরচায় এই বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী এবং বাৎসরিক ব্যয় বহনের জন্য ২৯০০০ হাজার টাকায় একটি জমিদারী ব্যবস্থা করে দেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান যুবকদের আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। ১৮১১ খৃঃ নদীয়া ও ত্রিহুতে দুটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সরকার। চুঁচুড়ায় পাদরী মিঃ মেঃ ১৮১৪ খৃঃ ১৪ জুলাই একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লেখাপড়া এবং গণিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রথমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ষোল। পরে ছাত্রসংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যায়। জেলা কমিশনার মিঃ ফোর্বেস পুরোন পর্তুগীজ দুর্গে একটি সুবৃহৎ ঘর দিয়েছিলেন স্কুলের ব্যবহারের জন্য। ১৮১৫ খৃঃ তিনি আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ মে একজন উচ্চমনা আদর্শবান পুরুষ ছিলেন। এক বছরের মধ্যে চুঁচুড়ায় বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন ঐ অঞ্চলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি ছিল। মিঃ মে তাঁর বিদ্যালয়ের খরচ চালাবার জন্য সরকার থেকে প্রথমে ছ' শত এবং পরে আটশত টাকা সাহায্য হিসাবে পেতেন।

তখন কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবার জন্য সেকালের কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালী এবং তৎকালীন সরকারের আত্যন্তিক প্রয়াস নানাপ্রকার বাধা পেয়েও রুদ্ধ হয়নি। মিঃ শেরবার্ন কলকাতায় একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলের দুজন বিখ্যাত ছাত্র হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রমানাথ ঠাকুর। তাছাড়া আরো যে দু' একটি ছোটখাট স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাতে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারকামীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রবর্তনে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সেকালের বিশিষ্ট বাঙালীদের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তিনি কলকাতায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দেশীয় সমাজপ্রধানদের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইস্টের বাড়ীতে ১৮১৬ খৃঃ ১৪ মে সেই উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের বাড়ীতে ১৮১৬ খৃঃ ২১ মে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় সেকালের বিশিষ্ট বাঙালী রামমোহন রায় অনুপস্থিত ছিলেন। যদিও শোনা যায় যে, রামমোহন নাকি হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডেভিড হেয়ারের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন : "নীতি ও ধর্মের সংস্কারক রামমোহন একেবারে গোড়ার থেকেই নিশ্চিতভাবে বুঝেতে পেরেছিলেন যে তাঁর লক্ষ্যসাধনের উপযোগী সর্বোত্তম পথ হিসাবে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে উন্নততর ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোল অপরিহার্য। নিজের খরচে তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ডেভিড হেয়ারের পরিকল্পনাগুলি তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেইগুলি কার্যরূপায়ণের জন্য সোৎসাহ সাহায্যও করেছিলেন তিনি। কিন্তু হিন্দু পৌত্তলিকতার আপোষহীন শত্রু ছিলেন বলে, তাঁর গোঁড়া স্বদেশবাসীরা তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখত; তিনি অনুমান করেছিলেন, তাঁর সেই সভায় উপস্থিত হয়তো সভার কাজ ব্যাহত করবে, এবং সভা আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাঁর এ অনুমান ছিল অভ্রান্ত। হিন্দুমতের প্রতিনিধি কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোক তো সার হাইড ইস্টকে সত্যি সত্যি বলেছিলেন যে পরিকল্পিত কলেজটিকে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জানাবেন, যদি রামমোহন রায় এর সঙ্গে জড়িত না থাকেন, ঐ স্বধর্মত্যাগীর সঙ্গে কোনরূপ সংস্রব তাদের থাকবে না। পাছে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা পরিকল্পনাটিকে বাধা করে দেয় সেই ভয়ে রামমোহন স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে আনলেন। তিনি বললেন, "যদি পরিকল্পিত কলেজটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকায় কলেজের স্বার্থহানির আশঙ্কা ঘটে, তাহলে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করছি।" রক্ষণশীল হিন্দুদের জন্য রামমোহন একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেও তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন নি। /

গোপীমোহন ঠাকুর

রাজা বৈদ্যনাথ রায়

মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর

আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে ১৮১৬ খৃঃ হিন্দু কলেজের ক্লাশ আরম্ভ হয়। এখান থেকে উঠে যায় জোড়াসাঁকোয় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীতে। পরে গোরাচাঁদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। কমল বসুর বাড়ী ত্যাগ করে হিন্দু স্কুল টিরেটী বাজারে যায়।

হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিয়মাবলীতে উল্লেখ আছে : "এই শিক্ষায়তনের মূল উদ্দেশ্য হল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইওরোপ-এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।" ইংরেজি ফার্সী সংস্কৃত বাংলা ভাষা শেখবার উল্লেখ থাকলেও ইংরেজিই প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রথম দিকে সংস্কৃত শেখান বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪১ খৃঃ ফার্সীও বন্ধ করে দেওয়া হয়। একমাত্র ইংরেজি ও বাংলা শেখান হোত।

কলেজ পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন দশজন ইউরোপীয় এবং কুড়িজন দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু ইউরোপীয়রা বেশীদিন এই কমিটিতে ছিলেন না। দেশীয় সদস্যদের মধ্য থেকে কলেজ পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়। এ'দের মধ্যে ছিলেন :

রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর—গভর্নর
বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর— „
বাবু গোপীমোহন দেব—ডিরেক্টর
বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ— „
বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস— „

প্রথম দেশীয় সেক্রেটারী ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং য়ুরোপীয় সেক্রেটারী ছিলেন মেজর আর্ভিন। তিনি ইংরেজি বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পরিচালক সমিতির চারজন সদস্য ডিরেক্টররা নির্বাচিত করতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন : "প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা তাই দেখাই ছিল তাঁদের কর্তব্য। তাঁরা নিয়ম পরিবর্তন করতে পারতেন আবার নতুন নিয়ম তৈরিও করতে পারতেন; কলেজের দরকারী বিষয় বা প্রয়োজনীয়

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

ব্যাপার নিয়ে তাঁরা আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। শিক্ষক নিয়োগ বা বরখাস্ত করার এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁদের ছিল। যখন কোন বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বীদের সংখ্যা সমান হোত তখন প্রশ্নটি যে কোন একজন গভর্নর-এর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হতো; তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।"

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে ১,১৩,১৭৯ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল: বর্ধমানের মহারাজা ১০০০০ টাকা, গোপীমোহন ঠাকুর ১০০০০ টাকা দিয়েছিলেন। এ সময় কলেজটি সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। হিন্দুপ্রধানরা সাত বৎসর খরচ চালিয়েছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে এইচ হ্যারিংটন হিন্দু কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিব জন্য উৎসুক ছিলেন। ১৮২১ খৃঃ তিনি বিলাত যান, তাঁর অনুরোধে বৃটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি হিন্দু কলেজকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দানস্বরূপ বিনাখরচে পাঠাতে চান। কিন্তু ভাড়া বাড়ীতে এইসব যন্ত্রপাতি বসাবার উপায় ছিল না। তারপর চলছিল চরম অর্থসংকট। ফলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে অর্থসাহায্য এবং উপযুক্ত বাড়ীর জন্য আবেদন জানান। কর্তৃপক্ষ সরকারকে এও জানালেন যে, যদি হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ পাশাপাশি থাকে তাহলে উভয় কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞানশিক্ষার সুবিধা হবে। তাঁরা জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস্-এর কাছেও এই অনুরোধ জানান। সরকার রাজী হলেন। তখন বৌবাজারে সাময়িকভাবে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু কলেজ সংস্কৃত কলেজের কাছেই একটি ভাড়া বাড়ীতে উঠে যায়। ১৮২৪ খৃঃ জানুয়ারী মাস থেকে সরকার ঐ ভাড়া বাড়ীর খরচ দিতে থাকেন। এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষকের বেতন দিতেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির ফলে ততদিনে কলেজের একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং ছাত্রদের বৃত্তিদান ব্যবস্থারও প্রবর্তন হয়েছে।

সরকারী সাহায্যের বিনিময়ে সরকার কলেজ পরিচালন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে কলেজ পরিচালকরা তাতে সম্মত হন। সুতরাং কলেজ পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতি হয়ে এলেন ডঃ উইলসন। ডঃ

উইলসন ছিলেন জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস-এর সেক্রেটারী।

১৮২৩ খৃঃ সরকার সংস্কৃত কলেজের জন্য দুই বিঘা জমি কিনেছিলেন গোল দীঘির উত্তরদিকে। জমি কেনা ও বাড়ী তৈরীর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের জন্য কেনা জমির পাশে দুদিকে ছিল ডেভিড হেয়ারের তিন বিঘা সাত কাঠা জমি। ঐ জমিও কিনে নেওয়া হোল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। দাম পড়ল তেত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা। সংস্কৃত কলেজের দুই ধারে হিন্দু কলেজের জন্য দুটি গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা হোল। নক্‌সা করলেন ক্যাপ্টেন বক্সটন। বাড়ী তৈরির দায়িত্ব নিলেন বার্ন কোম্পানী। মোট খরচ ধরা হয় ১১৯,৪৬১ টাকা। এর মধ্যে ১৫,৯৮৮ টাকা হিন্দু কলেজের নির্মাণের জন্য।

১৮২৪ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট। ঐ প্রস্তরেই প্রথম হিন্দু কলেজ নাম ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এর আগে হিন্দু কলেজকে 'মহাবিদ্যালয়' বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ'ও বলা হোত। ঐ ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা ছিল ঃ

In the Regin of
His Most Gracious Majesty George the Fourth
Under the Auspices of
The Right Hon'ble William Pitt Amherst
Governor General of the British Possessions in India
This Foundation Stone of this Edifice
The Hindu College of Calcutta
Was laid by
John Pescal Larkins Esquire
Provincial Grand Master of the Fraternity of Free
Masons in Bengal
Amidst the acclamations
of all ranks of the Native Population of this city
In the presence of
A Numerous Assembly of the Fraternity
And of the
President and Members of the Committee of
General Instruction
On the 25th day of February 1824 and the
Area of Masonry 5824
Which may God prosper
Planned by B. Buxton Lieutenant
Bengal Engineers
Constructed by
William Burn and James Mackintosh.

দুই বৎসর ধরে গৃহনির্মাণ চলে। ১৮২৬ খৃঃ ১ মে স্বতন্ত্র নিজস্ব ভবনে উঠে গেল কলেজ দুটি। মূল গৃহের দুপাশে পূর্ব ও পশ্চিমের একতলা গৃহে হিন্দু কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগের ক্লাস বসত। বিজ্ঞানের ক্লাস হোত মূল গৃহের দ্বিতলে। দুই কলেজের ছাত্ররাই এখানে এক সঙ্গে ক্লাসে বসত। ১৮৩৯ খৃঃ দু' পাশের একতলা গৃহের সঙ্গে আরও একটি করে ঘর এবং দরোয়ানদের ঘর তৈরি হয়। বর্তমানে আর এই ঘরগুলিকে দেখা যাবে না। এই বাড়ীগুলি ভেঙে নতুন সুবৃহৎ বাড়ী উঠেছে।

হিন্দু কলেজের সমস্ত টাকা পয়সা গচ্ছিত থাকত জোসেফ বেরেটো নামে পর্তুগীজ সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হওয়ার কলেজ একটি নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হয়। মাত্র তেইশ হাজার টাকা অবশিষ্ট ছিল। ১৮২৪ খৃঃ কলেজের মাসে প্রায় ৮৪০ টাকা উপার্জন হোত। আয়ের সূত্র ছিল

কলেজের মূলধন থেকে প্রাপ্ত সুদ	৩০০ টাকা
বেতন বাবদ প্রাপ্ত	৩৫০ "
স্কুল সোসাইটির বৃত্তি বাবদ প্রাপ্ত	১৫০ "
গুদামের ভাড়া বাবদ	৪০ "

সরকার প্রথমে কলেজকে মাসে ৩০০ টাকা সাহায্য দিতেন। ১৮২৭ খৃঃ এবং ১৮৩০ খৃঃ এই সাহায্যের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে নশ টাকা এবং বারশ পঞ্চাশ টাকা। এছাড়া ১৮২৯ খৃঃ ইংরেজি পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকার কলেজকে মোটা টাকা দেন। এই বৎসরে গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

এই সময় থেকে কলেজের আয় বাড়তে থাকে। ১৮২৭ খৃঃ জানুয়ারি মাসে এই আয় ছিল দু হাজার দশ চল্লিশ টাকা। এক হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল ছাত্রদের প্রাপ্ত বেতন বাবদ। ১৮৩০ খৃঃ এই আয় দাঁড়ায় তিন হাজার দুশ বাহাত্তর টাকায়। ছাত্রদের বেতন বাবদ পাওয়া গিয়েছিল পনেরশ টাকা। ১৮২৫ খৃঃ শেষে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৯০ জন। ১৮২৬ খৃঃ থেকে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২২০ জনে। ১৮২৩ খৃঃ পঁচিশ জন ছাত্র বেতন দিত। মোট বেতনের পরিমাণ ছিল ১২৫ টাকা। ১৮২৫ খৃঃ এই সংখ্যা দাঁড়ায় সত্তরজনে। বেতন পরিমাণ হোল ৩৫০ টাকা। ১৮২৭ খৃঃ ও ১৮২৮ খৃঃ এদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০০ জন এবং ৩৩৬ জন। ছাত্রদের মাহিনা বাবদ প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ত্রিশ হাজার টাকায়।

প্রথম দিকে সকল শ্রেণীর ছাত্রের বেতন সমান ছিল। পরে এই বেতনে তারতম্য হোল। কলেজ পর্যায়ে আট টাকা। উচ্চতর বিদ্যালয় পর্যায়ে ছয় টাকা এবং নীচু ক্লাসে পাঁচ টাকা। তবে কলেজ পর্যায়ের ছাত্রদের বেশীরভাগই বৃত্তি পেতেন।

কলেজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সাহায্য বেড়ে যেতে থাকে। ১৮৪০ খৃঃ সাহায্য পরিমাণ দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার টাকায়। কলেজের পরীক্ষা পরিচালনা, সাংগঠনিক পরিবর্তন, কলেজ পরিদর্শন প্রভৃতি কাজ সরকার চালাতেন কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাশনস-এর মাধ্যমে।

জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্স-এর সেক্রেটারী ডঃ উইলসন হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিপদের আশঙ্কায় দুটি কলেজকেই রেলিং দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। উইলসনের পর সদর্ল্যাণ্ড, ওয়াইজ প্রভৃতি য়োরোপীয় ব্যক্তি এই ডিরেক্টরের পদ লাভ করেছিলেন। এই জেনারেল কমিটি কাউন্সিল অফ এডুকেশনে পরিণত হয় ১৮৪১ খৃঃ। তখন শিক্ষা সচিব স্যর এডওয়ার্ড রায়েন কলেজের সরকারী সাহায্য তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়ম করলেন যে কলেজ কমিটির সকল সদস্যই শিক্ষা সমাজের সদস্য হবেন এবং শিক্ষা সমাজের সদস্যরা কলেজ কমিটির সদস্য হবেন। কলেজ কমিটির নাম হোল সেকশন অফ দি কাউন্সিল অব এডুকেশন ফর দি ম্যানেজমেন্ট অফ হিন্দু স্কুল। কলেজ কমিটির অধিবেশনে শিক্ষা সমাজের দুজন সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক উপস্থিত থাকতেন।

হিন্দু কলেজকে বিচিত্র নানা সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কলেজ পরিচালনায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং ছাত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘোরতর বিবাদ দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৩ খৃঃ কৈলাশচন্দ্র বসু ছিলেন কলেজের শিক্ষক। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কমিটি সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব, রসময় দত্ত—তাঁর কলেজ ত্যাগ করার

ব্যাপার নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রচারের নিন্দা করেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক কলেজ প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করেন। তার ফলেই ১৮৫৪ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের সৃষ্টি। ১৮৫৪ খৃঃ ১১ জানুয়ারি কলেজের শেষ বৈঠক বসে। সরকার ১৮৫৪ খৃঃ ১১ সেপ্টেম্বর কলেজের নীতি ও নাম পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন। হিন্দু কলেজ বন্ধ হয়ে যায় ১৮৫৫ খৃঃ ১৫ এপ্রিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের কাজ আরম্ভ হয়েছিল এই বৎসরেরই ১৫ জুন থেকে। হিন্দু স্কুলের দেশীয় সদস্যরা কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। সরকারী পরিচালকদের সঙ্গে বেসরকারী পরিচালকদের মনোমালিন্যও এই বিরোধের আর একটি কারণ।

১৮১৭ খৃঃ ১৮৩০ খৃঃ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের হেডমাস্টার ছিলেন ডেনসেলেম। এই সময়ে সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত টাইটলার। টাইটলার চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। সে সময়ের সরকারী চিকিৎসা বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। আরবী, পার্সী সংস্কৃতও জানতেন তিনি। কেমিস্ট্রি অধ্যাপক ভি রস সোডা পদার্থের সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞান রাখতেন। ঐ বিষয়েই ক্লাসে সব সময়ে পড়াবার জন্যে ছাত্রেরা তার চোখ দিয়েছিল সোডা। আইন বিষয়ের দুজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন ব্যারিস্টার থিওডোর ডিকেন্স এবং জন পিটার গ্রান্ট। গ্রান্ট পরে সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজের আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিক্ষক ছিলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। অসাধারণ জ্ঞানী এই শিক্ষক ছিলেন ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: 'ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তিনি কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহদ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন।' ডিরোজিও বিদেশী হয়েও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে মনে করতেন। এদেশকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন:

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার, হায় সেইদিন যবে
দেবতা সমান পুজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি:
তব শুভধ্যায় লোকে অভাগা জননি
(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত)

ডিরোজিও ছাত্রদের নানাপ্রকার ধর্ম সংক্রান্ত ও সমাজ বিষয়ক উপদেশ দিতেন। ফলে যুব সমাজে নতুন চিন্তার জোয়ার আসে। হিন্দু সমাজের সংস্কার মুক্ত হয়ে তারা বেরিয়ে আসতে চাইল। কলেজের কমিটিতে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়নের প্রস্তাব আসে। এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ডিরোজিও কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবং কিছুকাল বাদেই মারা যান।

ডেনসেলেমের পর হিন্দু কলেজের হেড মাস্টার হন স্পীড সাহেব। তিনি অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের লোক ছিলেন। ১৮৩৫ খৃঃ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসেন। ১৮৪১ খৃঃ তিনি অধ্যক্ষ হন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'রিচার্ডসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের মনে তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত কাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মিয়া ছিল, এমন কি পরিহাস পর্যন্ত চলিত।' গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এই সময়ে হ্যালফোর্ড। গণিত ও সাহিত্য শাস্ত্রের বিখ্যাত আর একজন অধ্যাপক ক্লিন্ট। ১৮৪৩ খৃঃ ১৮৪৮ খৃঃ পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন কার কিশোরীচাঁদ মিত্র ডিরোজিও প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: 'অত্যুজ্জ্বল সাফল্যে দীপ্ত ডিরোজিওর শিক্ষক-জীবন। অন্যান্য অসংখ্য অধ্যাপক বা স্কুল শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ছিল অনেক বেশি মহৎ, অনেক বেশি খাঁটি। তাই তিনি মনে করতেন তাঁর কর্তব্য হল শুধু কথা নয়, কাজ শিক্ষা দেওয়া, শুধু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়কেও স্পর্শ করা।'

রিচার্ডসন ১৮৪৮ খৃঃ পুনরায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৪৯ খৃঃ তার কর্মত্যাগের পর লজ অধ্যক্ষ হন এবং ১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত অধ্যক্ষের কাজ চালান। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হলে অধ্যক্ষ হন সটক্লিফ।

হিন্দু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের যে সমস্ত ছাত্র পরবর্তীকালে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, দ্বারকানাথ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং আরো কয়েকজন।

পাঠকের বৈঠকে

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ

অখণ্ড ভারতের দুটি প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্য ছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু সংখ্যক মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন, অনেকে আবার শাসক সম্প্রদায়ের তাঁবেদারি করেছেন। ব্রিটিশ শাসক আবার হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চিরন্তন বিরোধের বীজ বপন করেছিলেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগ এবং পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেছে। অনেক মুসলমান ভারতবর্ষে রয়ে গেছেন, তবে তাঁরা সবাই ভারতপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী মুসলমান নন, এদেশে এখনও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলমানের অভাব নেই, হিন্দুও অনেকে আছেন গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতার মন নিয়ে। ব্রিটিশ গেছে বটে কিন্তু যাওয়ার আগে শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনার সাগর সর্দারের মত জানিয়ে দিয়ে গেছে—কারা গেল। আজ আমাদের অঙ্গ থেকে সাম্প্রদায়িক ক্ষতের রক্তপাত বন্ধ হয়নি।

ইংরেজ আমলে অনেক মানুষ ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা স্বদেশপ্রেমিক, এবং দেশের জন্য তাঁরা অনেক ক্লেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, দুঃখবরণ করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে তাঁদের মনে দ্বিধা জাগেনি, এঁদের পরিচয় ছিল ন্যাশনালিস্ট মুসলিম বা জাতীয়তাবাদী। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মুসলমান গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে যায়, এক হিসাবে দেশবিভাগের তাঁরা অন্যতম বলি।

এইসব ঘটনা সাম্প্রতিককালের, অনেক তথ্য আজো পাওয়া সম্ভব, অনেক মানুষ আজো জীবিত যাঁরা প্রকৃত সত্য অবগত আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাই এইসব ইতিহাস কালক্রমে বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে যে সময় অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল জোয়ার সেই কালে জনাব আবুল হায়াত ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী। বাঙালী মুসলমান সমাজের এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান হায়াত সাহেব গান্ধীজীর আহ্বানে সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনে তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে এবং জাতীয় সংহতি সংরক্ষণে তিনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এখন তাঁর বয়স আশী বছরের ওপর। জীবনের প্রায় শেষসীমানায় পৌঁছে তিনি 'মুসলমানস অব বেঙ্গল' এই নামে একটি ইতিহাসাশ্রিত আলোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা কারণে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু নতুন আলোকসম্পাত করবে এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি।

জনাব আবুল হায়াৎ অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যেসব মুসলমান নেতা দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন আজ স্বাধীনতাউত্তরকালে তাঁদের স্থান কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য যদিও ভাবাবেগ এবং উচ্ছাসের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি তথাপি তার মধ্যে বলিষ্ঠ যুক্তি এবং অনেক অপ্রিয় সত্য কথা আছে।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের কিছু অংশ স্বাধীনতাসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং একটা বৃহৎ অংশ বাধা সৃষ্টি করেছিলেন সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই কাজের ভার যোগ্যতর লেখকের নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি বলেই তিনি স্বয়ং সেই ভার গ্রহণ করেছেন। যে-পরিস্থিতিতে দেশ-বিভাগজনিত বিপর্যয় ঘটেছে তার মূখ্য কারণ জনাব আবুল হায়াৎ বিশ্লেষণ করেছেন নিরপেক্ষ নিস্পৃহতায়, আর এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর গ্রন্থটিকে মর্যাদামণ্ডিত করে তুলেছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় স্যার আলি ইমাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন :

> "With the conditions obtaining in India the cry of Allah-O-Akbar has as little right to national acceptance as Bande-mataram". It is difficult for the student of history and literature to dissociate the one from the prowess of the Muslims and the other from the moral of Bankim Chandra's plot of Anandamath. To succeed in inspiring our countrymen with truly national aspirations it is necessary that the method applied should be acceptable to all."

কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সততা ও সদিচ্ছাকে প্রায় নিষ্ফল করে দিলেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মানুষরা। জাতীয়তাবাদী জিন্নাকে কংগ্রেস তার পক্ষপুটে ধরে রাখতে পারেনি, তিনি কংগ্রেস থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে এলেন ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামির সংমিশ্রণ অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ নীতি। মার্কস এই কথাটাই বেশী জোর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ধর্মকে আফিম সদৃশ বলেছেন মুখ্যতঃ এই কারণে। গান্ধীজী কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের একটা ককটেল করেছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়েছিল কিন্তু সেই উৎসাহে যখন ভাটা পড়ল তখন কংগ্রেসী কর্মসূচী মুসলমান সমাজকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। গান্ধীজীর স্বরাজ মানে রামরাজ এই উক্তিটাও অনেকের ভালো লাগেনি, অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

এর পর হরিজন আন্দোলন শুরু হল। তখন জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা একবার নতুন করে আত্মবিশ্লেষণে মন দিলেন। জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল সমাজের মানুষের সঙ্গে সমান ব্যবহার বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও তাঁদের সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে অনুন্নত সমাজের উন্নয়নে আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। এমন কি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে শুদ্ধি ও সংগঠনের আন্দোলন গড়ে উঠল। মুসলমানরাও তানজিম বা সংগঠনের কাজে মাতলেন। আবার গান্ধীজীর রামরাজের আদর্শবাদ অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে অভ্যুত্থানের মনোভঙ্গীতে মাতিয়ে তুলতে সাহায্য করল। তাঁরা ইসলামিয়া রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

মহম্মদ আলি জিন্না যখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন তখন তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে টেনে আনার বিরোধিতা করেছিলেন, খিলাফৎ আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন এই কারণে। তিনি বলেছিলেন যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণ হলে এমন অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আর কারো হাতে থাকবে না। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত সাফল্যলাভ করল। দেশ বিভাগ হল। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান জন্মলাভ করেই হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। পাকিস্তানের হিন্দুরা তাড়া খেয়ে হিন্দুস্থানে চলে এল, হিন্দুস্থানের কিছু মুসলমান অবশ্য পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তবে যাঁরা আছেন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য নন। আজ হিন্দুস্থানের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জাকির হোসেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাগলা, ফকরুদ্দীন আলি আমেদও একজন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রী। এমনই আরো অনেকে আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তানে আজ প্রায় হিন্দুশূন্য। প্রকৃতপক্ষে তাদের মেরে তাড়ানো হয়েছে।

দেশ যখন বিভক্ত হল, জাতীয়তাবাদী হলেও এই গ্রন্থের লেখক আবুল হায়াৎ

সাহেবের মনেও বাসনা জেগেছিল পাকিস্তানে চলে যাওয়ার—

> "that I should shift to Pakistan—not out of any attraction to Pakistan,—nor due to any emotion against Bharat—simply out of disgust I thought that by ignomiously conceding the Muslim League claim for partition of the country the Congress leadership had unabashedly accepted Jinnah's "two-nation theory" and created a situation in which Muslims in India would be treated as aliens."

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ঘোর কাটতে তিনি কিন্তু বুঝলেন এর নাম নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করা। পাকিস্তানে তিনি শেষ পর্যন্ত আর যেতে পারেন নি, তবে জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করে একরকম বানপ্রস্থ গ্রহণ করলেন। দেশবিভাগের কাল পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসে তাঁর এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত কিষাণ আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের যে বিভ্রান্তি মনে আসে তার ফলে তিনি রাজনীতি বর্জন করাই শ্রেয় মনে করলেন। মুসলমান বলে শুধু জনাব আবুল হায়াৎ নন অনেক হিন্দু রাজনৈতিক কর্মীও দূরে সরে গেছেন প্রায় একই কারণে।

আবুল হায়াৎ সাহেব লিখেছেন যে জিন্না সাহেব রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেদন আনার প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন, ধর্মীয় রাজনীতিই হয়ে উঠল তাঁর প্রধানতম হাতিয়ার। রাজনীতিতে ছলে বলে কৌশলে কাজ সারতে হয়। জিন্না সাহেব কয়েকজন মৌলভীকে ধরে এক ফতোয়া জারি করলেন যে কংগ্রেসী রাজনীতিতে মুসলমানরা যোগ দিলে গুণাহ হবে। কংগ্রেস যে জনসংযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে তা সার্থক হয়নি। লেখক বলেছেন কোনো অর্থনৈতিক কার্যসূচী না থাকায়, সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণে কোনোরকম প্রচেষ্টা না থাকায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সহজেই সাম্প্রদায়িকতার শিকারে পরিণত হয়েছেন। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ছিলেন মধ্যযুগীয় সামন্তরাজদের মত সম্ভ্রম ও সম্পদের মহিমায় ভূষিত। তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির দ্বারা তাঁরা সহজেই সাধারণ মানুষকে হাত করে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামক মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে একঘরে করে দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে 'মায়ে ভাত দেয়নি, বাপেও খেদে দিয়েছে' অর্থাৎ কংগ্রেসও তাঁদের দিকে তাকিয়ে এঁদের স্বার্থসংরক্ষণ করেন নি।

আবুল হায়াৎ সাহেব অতিশয় মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে অনুযোগ করেছেন যে, দেশবিভাগ মেনে নিয়ে কংগ্রেস তাঁকে এবং তাঁর মত আরো অনেক মুসলমান যাঁরা জাতীয়তাবাদী হিসাবে পরিচিত, তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মুজিবর রহমন, মৌলভী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী প্রভৃতি বাঙালী মুসলমানের অবদান ইতিহাস কোনোদিন বিস্মৃত হবে না। তাঁদের আগে আব্দুল্লা রসুল, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আজ ঘটনা থেকে অনেক দূরে সরে এসে নিস্পৃহভঙ্গীতে বিচার করে বলা যায় ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব হয়ত ভারতবর্ষের অবস্থাকে এত নীচে নামিয়ে আনতো না, কংগ্রেসী হাইকমাণ্ডের শক্তি অধিকারের লোভ ও গান্ধীজীর মৌন সম্মতির ফলেই দেশবিভাগ হয়েছে। দেশবিভাগের কালে গান্ধীজীর নীতি ছিল 'অশ্বত্থমা হত—ইতি গজ' জাতীয় এবং তিনি যদি হঠাৎ 'আমি কিছু জানি না' এই নীতিতে অবিচল হয়ে না পড়তেন, তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যপথে চলত।

যা হয় নি, তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে লাভ নেই, তবে ইতিহাস ক্ষমাহীন। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে যা সত্য তা প্রকাশিত হবে, তবে ক্ষতি যেটুকু হওয়ার, সর্বনাশ যা ঘটার তা ঘটে যায়। সেই সংকট থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। জনাব আবুল হায়াৎ সাহেবের গ্রন্থটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত।

—অভয়ংকর

MUSSALMANS OF BENGAL: By Abul Hayat. Published by Zahid Ali—Burdwan Bhavan: 4/A, Orient Row, Calcutta-17. Price: Rupees Five only.

তারাশংকরের সম্বর্ধনা॥

"জ্ঞানপীঠ" পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে "বঙ্গীয় জৈন পরিষদের" পক্ষ থেকে গত ১৮ জুন শনিবার কুমার সিং হলে সম্বর্ধনা জানান হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "তাঁর রচনায় বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্ত দিকগুলি বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছে।" শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে "গণদেবতা" গ্রন্থটির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বক্তারাও তারাশংকরের বিভিন্নমুখী প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করেন। "ভারতীয় জ্ঞানপীঠের" সম্পাদক শ্রী এস সি জৈন এবং "বঙ্গীয় জৈন পরিষদের" সম্পাদক শ্রীইন্দ্র দুগারও সভায় ভাষণ দেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ সম্মান তাঁর ব্যক্তিগত নয়—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই এই সম্মান। বাংলা সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারের জন্যও তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান।

হিন্দি সাহিত্যের আলোচনা সভা॥

গত ২৩ মার্চ প্রয়াগে হিন্দি ও উর্দু লেখক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। এই দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল : "সাহিত্য আলোচনা : নএপ্রতিমান।" অন্য দুইদিনের আলোচনার বিষয় এর আগে অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় দিনের আলোচনাতেও হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকরা অংশগ্রহণ করেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক শ্রীফিরাফ গোরখপুরী।

বিষয় প্রবর্তন করেন শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত। তিনি বর্তমান পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান নির্ভর সময়ে লিখিত সাহিত্যকে সংবেদনশীল ও নিষ্কাম ব্যক্তি থেকে বিচার করবার জন্য আবেদন জানান।

শ্রীঅজিতকুমার সমালোচনা পদ্ধতির উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন।

শ্রীফিরাফ গোরখপুরী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, রচনার আসল বিচারক হচ্ছে পাঠক। প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন যে, সাহিত্যে পুরানো বলতে কিছু নেই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণ হচ্ছে তা চিরকালীন।

ডঃ রামস্বরূপ চতুর্বেদী মনে করেন, সমালোচকের দায়িত্ব সাহিত্যকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ রাব হিন্দি সমালোচনা সাহিত্যের রচনাশৈলীর উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হিন্দি সমালোচনার ভাষা প্রধানত তৎসম-বহুল এবং মৃত। এই ভাষা উপলব্ধি করা কঠিন। গভীরতার নামে আসলে এ এক-প্রকার ছদ্মবেশ। লোকপ্রিয়তা দ্বারা সাহিত্যের বিচার করা যায় না। সমাজের উপরও সাহিত্যিকের কোন প্রভাব নেই বা লেখকের কোন সামাজিক দায়িত্ব নেই। শ্রীঅজিত পুষ্কলের মতে সৃজনশীল লেখকই একমাত্র ভাল সমালোচক হতে পারে।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বর্মা, শ্রীঅমৃত রায় এবং শ্রীপহুতশ্যাম হুসেনও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন মতামত থেকে হিন্দি সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান সমস্যা এবং গতি-প্রকৃতির একটি পরিচয় ফুটে উঠেছে। অনুষ্ঠানটি খুবই ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

একজন তরুণ উর্দু কবি ॥

উর্দু সাহিত্যে যে সব তরুণ এবং প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হচ্ছে, তার মধ্যে বয়স এবং খ্যাতির দিক দিয়ে বোধকরি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীকৈসরাজ কোমাল। মশায়ারা-নির্ভর উর্দু সাহিত্যে তিনি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

তাঁর প্রথম আবির্ভাব কিন্তু সমালোচকদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারিনি। ১৯৫৪ সালে "মেরি নাজমে" নামে মাত্র ৪৯টি কবিতা নিয়ে যখন তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন এই গ্রন্থটি দুই-একজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কারও দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু মাত্র এক-দশকের মধ্যে শ্রীকোমাল উর্দু সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব স্থানটি অধিকার করে নিয়েছেন।

তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "রিস্ত-এ-দিল" ১৯৬৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ ওয়াজির আগা তাঁকে বর্তমানের কবি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অনুভূতির সততাও উল্লেখ্য। তাঁর কবিতার নায়ক হলো একজন নির্জন, হতাশ প্রেমিক। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"সেই উন্মত্ত ঋতুতে

এক নতুন শহরে আমি তাকে দেখলাম।
আগের মতোই সেই লাভ-ক্ষতির ব্যবসায়
সম্পূর্ণ সমাহিত।
সেই একইভাবে একই ব্যস্ততার মধ্যে
খালি পা, খালি মাথায়
সেই একই একটা বাক্সে
গল্পের নায়কের মতো
আমি তাকে দেখলাম॥"

চিত্রকল্প রচনাতেও শ্রীকোমালের পারদর্শিতা অভিনব। কিন্তু তাঁর কবিতা কোথাও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এখনও তিনি লিখে যাচ্ছেন। উর্দু সাহিত্যে নতুন কালের কবিদের প্রথম সারিতেই তাঁর স্থান।
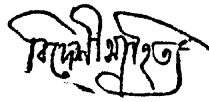
উরি ড্যানিয়েলের ছোটগল্প ॥

উরি ড্যানিয়েল নিকোলাই আরজাখ নামেও হালের রুশ-সাহিত্যমহলে পরিচিত। আধুনিক রুশ গল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ইনি বিশিষ্ট। সম্প্রতি তাঁর চারটি পরীক্ষা-মূলক বিশেষ ধরণের গল্প নিয়ে একটি গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে। বইটির নাম 'ফোর স্টোরিজ'। কেবলমাত্র একজোড়া হাতের অসাড় ও কাল্পনিক নিষ্ক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে এক যুবকের জীবনে কী সাংঘাতিক নৈরাশ্য কাজ করতে পারে এ গ্রন্থের অন্তর্গত 'দি হ্যান্ডস' গল্পটি তারই তীক্ষ্ন বিশ্লেষণ। 'মস্কো কলিং' এবং 'দি ম্যান ফ্রম মিনাপ্স' আরো দুটি উজ্জ্বল নিরীক্ষা। সর্বশেষ গল্পটি 'দি এক্সপিরেশন' এর সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শিশু সাহিত্যের কর্তব্য ॥

বিখ্যাত সোভিয়েত কবি ও নাট্যকার সার্গেই মিখাইলকোফ চতুর্থ সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে শিশু সাহিত্যের কর্তব্যের রূপরেখা দান করে বলেন: সাহিত্যকে তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের এমন-ভাবে লালন-পালন করতে হবে যাতে তারা প্রকৃত নাগরিক হতে পারে, যাতে তারা শুধু রণাঙ্গনে ও প্রকৃতির শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নয় নৈতিক সংগ্রামে এবং ন্যায়-বিচার ও জনগণের সুখের জন্য সংগ্রামেও প্রকৃত বীর হতে পারে।

মিখাইলকোফ বলেন, নির্দিষ্ট শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও শিশুদের জন্য রচিত পুস্তকসমূহের মধ্যে সোভিয়েত দেশের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহকে, তার ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অতীতকে প্রতিফলিত করতে হবে। শিশু-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও রীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে "এমন কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলিকে শিশু সাহিত্যের লেখকদের রচনায় বাদ দিতে হবে—বাদ দিতে হবে এমন সব ঘটনা ও ঝোঁককে যা শিশুদের আত্মাকে দূষিত করে দিতে পারে।"

তিনি বলেন: আমাদের তরুণ-তরুণীদের আমরা সংগ্রামী আন্তর্জাতিকতাবাদী করে গড়ে তুলছি। গর্বের সঙ্গে আমি ঘোষণা করতে পারি যে, আমাদের দেশে এমন একটিও বই নেই, এমন একটিও নাটক নেই, এমন একটিও চলচ্চিত্র নেই, এমন একটিও বেতার বা টেলিভিশন সূচী নেই যার মধ্যে তরুণ মনে মানুষের প্রতি হিংসার, মানব-বিদ্বেষের ভাব বা বর্ণবৈষম্যের কুৎসিত ধ্যানধারণা ঢুকিয়ে দিতে পারে এমন একটি কথাও খুঁজে পাওয়া যাবে।

কবিতা প্রসঙ্গে ॥

হুগো উইলিয়ামস ষাটের দশকের একজন প্রতিভাবান তরুণ কবি। ইংরেজী কবিতার আসরে ইতিমধ্যেই তিনি নিজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তৈরী করে নিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। হালে বেরিয়েছে তাঁর 'সিম্পটমস্ অব লস্' কাব্য-গ্রন্থটি। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সম্প্রতি 'পোয়েট্রি বুক সোসাইটি'র পুরস্কারের জন্য এই গ্রন্থটি অনুমোদন পেয়েছে। সোসাইটি ১৯৬৬ সালের 'এরিক গ্রেগরি ট্রাস্ট ফান্ড' পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনজন তরুণ কবির মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচনা করেছেন হুগো উইলিয়ামসকে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য হচ্ছে ১,০০০ পাউন্ড। যে দুজন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন তাঁরা হলেন সীমাস হিনে এবং রবিন ফালটন। উইলিয়ামসের 'সিমটমস্ অব লস্' ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ-কাব্যগ্রন্থটি সমালোচনা করতে গিয়ে আয়ান হ্যামিলটন বলেছেন 'লেখকের কাব্য-প্রতিভা ও নির্মাণ-শৈলী বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাঁর কবিতায় চৈতন্যের যে অবিস্মরণীয় বিকাশ তা তাঁকে স্পষ্টতই অন্যান্য কবির থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে।'

শিশু সাহিত্যের পুরস্কার ॥

ইংরেজীতে শিশু-সাহিত্যের জন্য 'কার্নেগি মেডাল' একটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। আলোচ্য বছরে এই পুরস্কার পেয়েছেন জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিক ফিলিপ টার্নার—তাঁর "দি গ্রাঞ্জ অ্যাট হাই ফোর্স" বইটির জন্য।

শিশুগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসেবে 'কেট গ্রীনওয়ে মেডাল' পুরস্কারটি এবছর পেয়েছেন বিখ্যাত শিশু-কাহিনীর চিত্রকর ভিকটর জি অ্যাম্ব্রাস্—"দি থ্রী পওর টেলার্স" নামের বইটির চিত্রকর্মের জন্য। এ-বইটির কাহিনীকারও তিনি নিজে। এদুটি বই-ই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত।

অগাস্ট স্ট্রীন্ডবার্গের আত্মকাহিনী ॥

জন অগাস্ট স্ট্রীন্ডবার্গ ১৮৪৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। জীব-

দশায় ও উত্তরকালের সাহিত্যের ইতিহাসে স্ট্রীণ্ডবার্গ সম্ভবত সুইডেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখক। একথা সকলেই জানেন যে, তাঁর পরবর্তীকালের সমসাময়িক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নাট্যকার ইবসেনও স্ট্রীণ্ডবার্গের নিকট তাঁর পূর্বসূরীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। স্ট্রীণ্ডবার্গের বিখ্যাত নাটকদ্বয় 'দি ফাদার' এবং 'দি স্পুক সোনাটা' সে সময়কার সমাজজীবন ও তৎকালীন চিন্তার নৈরাশ্যে এক আশ্চর্য প্রথানুবর্তন-বিরোধী ও প্রতিভাদীপ্ত নাটক। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং প্রকরণ-পদ্ধতির অভিনবত্বে এরকম নাটক এযুগে আর একটিও রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্ট্রীণ্ডবার্গ নিজে মনে করতেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হল আত্মজীবনী গ্রন্থ 'দি সান অব এ সারভেন্ট'।

দীর্ঘকাল অনুবাদের অভাবে স্ট্রীণ্ডবার্গের এই স্মৃতি-বিষয়ক গ্রন্থটি পাঠকের আগ্রহের কারণ হওয়া সত্ত্বেও হাতে পৌঁছতে পারছিল না। সম্প্রতি এঙ্কার্ট স্প্রিগ্যথেগ এ বইটির একটি সুঅনূদিত সংস্করণ প্রকাশ করে পাঠকের দীর্ঘকালের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন।

স্ট্রীবার্গ ছিলেন জন্ম-ভীতু প্রকৃতির লোক। নিজের জীবন ও মানুষ সম্পর্কে সব সময় এক ধরণের ভয় তাঁকে মুক্ত-জীবনের আলো থেকে আড়াল করে রাখতো। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ তাঁকে প্রায় পাগল করে ফেলেছিল। আত্মযন্ত্রণা ও আত্মহত্যা-প্রবণতা, নিষ্ঠুর ও নির্দয় জীবনযাত্রা উনিশ শতকের বোদলেয়র, র‍্যাঁবো এবং ভলটেয়ে-ভাস্কির মতো তাঁকেও পরিত্রাণ দেয়নি। এছাড়াও, জন্মসূত্রে তাঁর পিতার উচ্চবংশ মর্যাদা ও নিম্নবংশীয় মাতায় পারিবারিক জীবনের অমিল, অগ্রজ ভ্রাতার জন্ম-কলঙ্ক পরবর্তীকালে তাঁকে আরো উদভ্রান্ত করে তুলেছিল। আলোচ্য বইটিতে এসমস্ত কাহিনীও টুকরো টুকরো ঘটনা একত্র সম্মিলিত হয়ে তাঁর জীবনের করুণ ইতিহাসকে ঘনীভূত করেছে। আত্মজীবনী লিখতে বসে নিজের জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায়কে তিনি আবরণের আড়ালে রাখেন নি। আর এজন্যেই এ বই এতো জনপ্রিয় ও অবশ্যপাঠ্য।
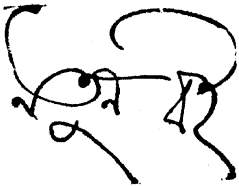
উঁচু মহলের কাহিনী

অমলেশ গরীব ঘরের ছেলে, ভালোভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এক বড়লোকের লেখাপড়া-জানা অধ্যাপিকা কন্যাকে বিবাহ করেছিল। তাদের বিয়ের মেয়াদ মাত্র পাঁচ বছর। কন্যা চম্পা জন্মেছে চার বছর আগে। অমলেশের সঙ্গে তার স্ত্রী মমতার 'মনের মিল হয়নি বটে, কিন্তু দেহের মিল হয়েছিল খুব'—একথা বলেছেন লেখক। মমতা মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। সে তাই তার স্বামীর মাতৃভক্তির মধ্যে ইডিপাস কমপ্লেকস্ খুঁজে পেয়েছে, সেই বলে আঘাত দিত। যাই হোক, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, চম্পা এখন মার কাছেই থাকবে, অমলেশ যাবে ইংলন্ডে কোম্পানীর কাজে আর মমতার প্রেমলীলা চলবে ডিকি ডিয়ারের সঙ্গে। ডিকি চ্যাটার্জি মমতার ছেলেবেলার বন্ধু, ধনী ঘরের অপদার্থ লম্পট ও মদ্যপ কুষ্মাণ্ড বিশেষ। তাকেই অমলেশের সামনে ফোন করে মমতা—'ডিকি ডিয়ার—আজ আমি মুক্ত। স্বাধীন—' আর সে বলছে—"আমি যে মাতাল হয়ে গিয়েছি ডারলিং। পা টলছে। দুষ্কর্ম করবার ক্ষমতা থাকলেও যেতুম।" এই অবস্থায় অমলেশ আশ্রয় করেছিল একটি উন্নতমনা কোটীপতির কন্যা—রমলাকে। রমলা কিন্তু শেষপর্যন্ত আশ্রয় পেল না, বন্দরহীন নৌকার মত • যে ভেঙে গেল। ডিকি চ্যাটার্জির দু ছেলের মা বিলাতী স্ত্রীর কাহিনী জানা গেল। মমতা শেষপর্যন্ত ভুল হয়ত বোঝে। আর মধ্যলীলায় বিলাতী রঙ্গিনী মিস উইলসন হাজার পাউন্ড রোজগার করে নেয়। এই হল সংক্ষেপে দীপক চৌধুরীর নতুনতম উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ওপরতলার সমাজের পয়সা অঢেল, চরিত্রের বালাই নেই যার যথা ইচ্ছা সে তাই করছে। মাড়োয়ারী অমরচাঁদ আর অমলেশের সেকেলে বাবাটি বেশ সংস্কারমুক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিত্তবান সমাজের ভেতরকার সংবাদ পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে। কাহিনীর মধ্যে কোনো চড়াই-উৎরাই নেই, সহজ মসৃণ কাহিনী। চম্পা শ্লেটের ওপর আঁকা খড়িমাটির 'আঁকিবুঁকি'র মত মানুষের জীবনগুলো অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ যেখানে অর্থ সেখানেই অনর্থ। খড়িমাটির স্বর্গে তাই শান্তি আছে, সুখ নেই।

দীপক চৌধুরী উঁচুতলার সমাজের একটি অংশ সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন যার ফলে চৌরঙ্গী পাড়ার আশেপাশে যেসব ধনীরা থাকেন তাঁদের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

খড়িমাটির স্বর্গ : (উপন্যাস) দীপক চৌধুরী। প্রকাশক : গ্রন্থম। ২২।১ বিধান সরণী। কলিকাতা—৬। দাম : সাত টাকা।

আদিম রিপুর যন্ত্রণা

'হাঙ্গার' লিখেছিলেন হামসুন, তারপর যোহান বয়ার লিখলেন 'গ্রেট হাঙ্গার'। ঠিক সেই রকম তুলনীয় ঘটনা না হলেও এ যুগের অন্যতম শক্তিমান লেখক সমরেশ বসুর 'বিবর' নিয়ে একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সমরেশ বসুর 'বিবর' আজ বহু আলোচিত বহু পঠিত। রমাপতি বসু লিখেছেন—'দ্বিতীয় বিবর'। আদিম রিপুর তাড়নায় অবক্ষয়ী সমাজের যে আজ কি হাল হয়েছে তাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন রমাপতি বসু। আদিম ক্ষুধার হাত থেকে নিবৃত্তি নেই। দেহের বুভুক্ষা নিবারণ করা সহজ নয়। বিশেষত বেসমাজে আজ লাম্পট্য, ব্যভিচার, দুষ্কৃতি, যৌনবিকার একটা অবাধ ছাড়পত্র পেয়েছে স্বাধীনতাউত্তর নয়া সমাজের পটভূমিকায়। কিছু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত মানুষের হাতে সৎভাবেই হোক আর অসৎভাবেই হোক প্রচুর টাকা এসে পড়েছে। মদের লাইসেন্সও সরকার মুক্তহস্তে দিয়েছেন। রাতের কলকাতার আকৃতি অন্য। সেখানে আস্তাভাব নেই। বস্ত্রাভাবও নেই, তথাপি মানুষ তখন নগ্ন। আদিম অরণ্যে বিচরণশীল মানুষনামধারী মানব পশুর পদধ্বনি শোনা যায় শহরের বুকে। সুর, হয় লাম্পট্যলীলার যথেচ্ছ অভিব্যক্তি। এই উপন্যাসটিতে আছে এই জাতীয় স্বচ্ছন্দ বিহারের অস্বচ্ছন্দ বিবরণ। বর্তমানকালে আমরা একটি কথা অতিশয় ব্যবহারে প্রায় তিক্ত করে এনেছি তার নাম 'যুগযন্ত্রণা'। যুগযন্ত্রণার নামটা পরিবর্তন করে যৌনযন্ত্রণাই বলা উচিত। বর্তমানকাল হল স্পষ্টতার কাল। কোনো 'কিন্তু', অস্পষ্ট থাকা উচিত নয়, পরিবর্তিত মূল্যবোধের শাদা চশমায় জগৎটাকে বিচার করতে হবে। এই উপন্যাসের নায়ক 'সুব্রত' সেই যুগযন্ত্রণায় প্রতীক। মূল্যবিধ্বংসী নয়া সভ্যতার শিকার। দীপার ক্ষীণ আর্তধ্বনি ভাষাহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার জীবনে আলো নেই। নৈতিক অন্যায়, অসত্য এবং অবিচারের রাজ্যে আলোক বর্তিকা। বর্তমান শতাব্দীর বেপরোয়া জীবনবোধের চিত্র 'দ্বিতীয় বিবর'। কিন্তু কিছু, শিক্ষা এদের আছে, কিংবা জুতোর মুখে রাম নামের মত দেলাইয়ে কবিতা, রবি ঠাকুরের গান, বাৎস্য বাৎস্যায়নের বুকনি, বাঁদুরে

বাণী এদা আওড়ায়। হোটেলে গিয়ে ভডকা, রাম ইত্যাদি ওড়ায়। সুব্রতের জীবনে তাই অকালে নেমে আসে যবনিকা। তার স্ত্রী নন্দিনী তাকে ছেড়ে দিয়ে একটা পাঞ্জাবী ছোকরার সঙ্গে চলে যায়। যৌনজীবনে সুব্রতর হাতেখড়ি সুকমলের বোন লতিকার কাছে। সুব্রতর কাছে নারীদের কোনো মৌরসীপাট্টা আবিষ্কার নেই, সে যখন যার তখন তার। লতিকার মেয়ে দীপাও কনভেন্ট থেকে পালিয়ে এসে সুব্রতর অঙ্কশায়িনী হয়। সুব্রত অবশ্য তার বাবার বয়সী। সে অবশ্য অনেক পরে জানতে পারে তার জননী লতিকার সঙ্গেও সুব্রতর যৌনসম্পর্ক ঘটেছিল।

তখন সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হল, মনে জাগল প্রতিহিংসা। সুব্রতর সুরাপাত্রে সে মিশিয়ে দিল পটাসিয়াম সায়নাইড। এছাড়া আরো অনেক পার্শ্বচরিত্র আছে যারা সবাই এর ওর তার সঙ্গে যৌনসূত্রে জড়িত। মোটকথা এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগণ বিকৃত সুধার ফাঁদে বন্দী হয়ে যেন একটা অন্ধকার গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যৌন বাণিজ্যের নানাবিধ পথঘাট এই উপন্যাসে বিধৃত। যেমন ব্ল্যাকমেলীকারিণী বাণী, স্বল্প সময়ের ঘর ভাড়া দেবার মালিক যুগল আর মেয়ে শিকার করে আনার দালাল মাধবী দত্ত। রমাপতি বসু সমাজের একটা পঙ্কিল আবর্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অতিশয় ক্লেদাক্ত পরিবেশ হলেও নর্দমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিশ্চয়ই সুস্থতার পরিচয় নয়। সেই নর্দমার দিকেই লেখক সতর্ক অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

দ্বিতীয় বিবর : (উপন্যাস)—রমাপতি বসু। প্রকাশক : জ্ঞানতীর্থ। ১, বিধান সরণী — কলিকাতা-১২। মূল্য—৬-০০ টাকা।

শহীদ স্মৃতি

বালেশ্বর রক্ততীর্থের সংগ্রামী পাঁচজন শহীদের জীবনী-রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বালেশ্বর সংগ্রামের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গঠিত সমিতি। সেই উদ্দেশ্যে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী 'রক্ততীর্থ' প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী। বীর সংগ্রামীদের এই ধরনের জীবন-কাহিনী প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। দেশের যুব-সমাজে যখন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা চলেছে, তখন তরুণ সমাজের জীবন-গঠনের পক্ষে এই গভীর দেশাত্মবোধক জীবন-কাহিনীগুলির মূল্য অপরিসীম। বর্তমান সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি রচনার জন্য শ্রীচক্রবর্তী সকলেরই অভিনন্দন লাভ করবেন।

রক্ততীর্থ (জীবনী)—পঞ্চানন চক্রবর্তী। চক্রতীর্থ, ১৭ ডি ১ এ রাণীব্রাঞ্চ রোড। কলকাতা-২। দাম দুইটাকা।

ফেরদৌসী চরিত

কবি মোজাম্মেল হক ছিলেন রবীন্দ্র-সমসাময়িক। তাঁর রচিত বিশ্ববিশ্রুত পারস্য মহাকাব্য 'শাহনামা' রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী তুসীর জীবন-বৃত্তান্ত "ফেরদৌসী চরিত" বাংলা সাহিত্যের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বহুকাল গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি এই চরিত-গ্রন্থখানি প্রকাশ করে প্রকাশক শ্রীমনিরুল আজীজ বহুজনের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

এই অমর-সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। ফেরদৌসীর জন্ম, বিদ্যা, শিক্ষা, শাহনাম গ্রন্থোৎপত্তির সূত্র, কবির গজনী-যাত্রা, গজনীর রাজকবিদের সঙ্গে কাব্যালাপ, শাহনামা প্রণয়ন থেকে সুলতানের ক্রোধ-বহ্নিতে পড়ে পলায়ন, দেশ পর্যটন এবং পরলোকপ্রাপ্তি পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। মোজাম্মেল হক 'শাহনামা', 'টীপু সুলতান' 'মহর্ষি মনসুর' 'হাতেম তাই' 'তাপস-কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও তাঁর অধিকাংশ জীবনী-গ্রন্থ, তবুও অনেকগুলি গ্রন্থও ছিল। 'জোহরা' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। হকসাহেবের ভাষাভঙ্গী বেশ মনোরম এবং সহজবোধ্য। 'ফেরদৌসী চরিতে'র শেষ থেকে তাঁর গদ্যরচনার নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করছি : 'আজ প্রায় নয়শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, কালের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে পৃথিবীতে কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কত স্থানে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—কত শোভা-সমৃদ্ধিশালী নগর মহারণ্য এবং মহারণ্য নগরে পরিণত হইয়াছে, কত শত সম্রাট সাম্রাজ্যসহ অনন্তকালসমুদ্রে ক্ষণস্থায়ী জল-বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু মহাপ্রাণ ফেরদৌসীর মহাপুণ্যবলে সেই বাঁধ ও পবিত্রকায়মাটি অবিনশ্বর পুণ্য-স্তম্ভস্বরূপ কালের বক্ষে আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কবির প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র নামের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।' সম্প্রতি এই চরিত-গ্রন্থখানি প্রকাশ করে প্রকাশক শ্রীমনিরুল আজীজ বহুজনের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

ফেরদৌসী চরিত (জীবনী)—মোজাম্মেল হক। হরফ প্রকাশনী এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। দাম দু টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'পুনশ্চ' বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবি ও কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রৈমাসিক মুখপত্র। বর্তমানে তাঁদের পঞ্চম বর্ষ বৈশাখ-আষাঢ় সংকলনটি প্রকাশিত হলো। ইতিমধ্যেই পুনশ্চ যে কবিতা-পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য সংখ্যাটি ষাট-দশকের কবিদের বেশ কিছু ভালো ভালো কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, শংকর রায়, মৃণাল দত্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, পুষ্কর দাশগুপ্ত, বেলাল চৌধুরী, শংকর দে, কালীকৃষ্ণ গুহ, সুচেতা ভট্টাচার্য, রীণা ঘোষ, পার্থ রাহা প্রভৃতির কবিতা এ সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। স্বপন দাশের প্রচ্ছদলিপি অভিনবত্বের দাবী রাখে।

পুনশ্চ ।। সম্পাদনা : মৃণাল দত্ত, আশিস সান্যাল।। ২৪এ, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড। কলিঃ-৩২।। দাম : এক টাকা।

●

'বজ্রারে' লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দেব, শিবশম্ভু পাল মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস গোস্বামী, শঙ্কর দে, ফিরোজ চৌধুরী, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, নিতাই সরকার, অমলকান্তি ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

বজ্রার (১ম সঙ্কলন)—সম্পাদন : অঞ্জন কর ও দীনেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ এফ বীরপাড়া লেন, কলকাতা—৩০। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

●

কবিতার নতুন কাগজ 'সুন্দরে'র প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন কর, দ্রোণাচার্য ঘোষ, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর ঘোষ, দীপঙ্কর ঘোষ এবং আরো অনেকে।

সুন্দর (১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা—সম্পাদক : দ্রোণাচার্য ঘোষ। জয়পুর, মগরা, হুগলী। দাম : ২৫ পয়সা।

●

'অভিযানের' রবীন্দ্র-সংখ্যায় গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন শ্রীপিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী। তাছাড়া আরো কয়েকটি রচনা আছে।

অভিযান (রবীন্দ্র-সংখ্যা)—সম্পাদক : পিনাকী চক্রবর্তী। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড। কলকাতা-২০।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। পাঁচ ।।

কয়েকদিন ধরে সন্দীপই সবার আলোচনার বিষয় হয়ে রইল, যাদের চিন্তিত হওয়ার কথা ঠিক হোল—ও এখন কিছুদিন থাক কলকাতায়, দেখুক-শুনুক, পাঁচজনের সঙ্গে মিশুক। একটা ছোট জায়গার গণ্ডীর মধ্যে থেকে, সেখানেও আবার গণ্ডীর ভেতর নিজের আলাদা গণ্ডী করে নিয়ে কূপমণ্ডূকতা এসে গেছে; যাবেই তো এসে। এটা কাটাতে হবে। তার ওষুধ কলকাতা।

কলকাতায় যে নতুন এল সন্দীপ এমন নয়। আগেও এসেছে, দেখেছে পাঁচ রকম, কিন্তু ওর এই রোগের দিকে কারুর দৃষ্টি না পড়ায়, সুরবালা দৃষ্টি আকর্ষণ না করায় বলাই হয়তো ঠিক, দেখে-শুনে ফল কি হোল, আদৌও কিছু হোল কিনা সেদিকে কারুরই খেয়াল যায়নি। এবার ব্যবস্থাটা অন্যরকম, সবার একরকম গোপন পরামর্শেই রীতিমতো একটা প্ল্যান, পরিকল্পনা, যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ওকে স্মার্ট, চৌখশ করে তোলবার। এবং সেটা পঞ্চবার্ষিকীও নয়। যত শীঘ্র হয়, যুগটা যে গতির যুগ। দুদিক থেকেই সবার বড়, সে-হিসাবে সনাতনের উদ্বেগটাই সবচেয়ে বেশি। বললেন—'বলছিস, বি-কম পাশ করেছে তখন বয়েস একুশ। তারপরেও তোদের দুজনের দুদিকের টানাটানিতে প্রায় দুটো বছর গেল কেটে, কিন্তু এমন অবস্থা করে তুলেছিস, চোদ্দ-পনের বছরের একটা ছেলের চেয়েও যেন মুখচোরা।... ছেলেই বা কোথা? —যেন একটা ঐ-বয়সের মেয়ে। ...তা যদি বলিস তো আজকালকার মেয়েও যে ওর চেয়ে ঢের চৌকস, ঢের স্মার্ট।... আর, ও এখনও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখ তুলে কথা কইতে পারে না! কী কাণ্ড রে? শুধু নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছিস দুজনে, আর এক একবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ঝগড়া করেছিস! দেখুক, শুনুক—সিনেমা, বায়স্কোপ, ক্রিকেট, ফুটবল, কিছু বাদ দেওয়ার দরকার নেই—মিটিংগুলোতে যাক, কম্যুনিস্টরা কী মুখ ধরেছে, কংগ্রেসীরা কী তার জবাব দিচ্ছে; ওদিকে সাহিত্যের আসরে সভাপতি প্রধান-অতিথিরা কী ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে শুনুক। রাতারাতি মানুষ হয়ে যাবে। বলবার মতন কিছু পেটে না থাকলে মুখ খুলবে কিসে?'

তাই করা হচ্ছে। কলকাতা বেশ বড় আকারের একটা কবিরাজী বড়ি, তাতে অম্ল-কষায়-কটু-তিক্ত-লবণ কিছুই বাদ নেই। বড়িটাকে গিলিয়ে দেওয়ার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগে গেছেন।

সুবিধা আছে। বড় সংসার, বাড়িতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, কজন প্রায় সমবয়সীই সন্দীপের, কোন দিক দিয়ে কোন একটা হুজুগ লেগেই থাকে, টেনে নিয়ে যায়। যার খেলা যেখান হুজুগ সে টেনে নিয়ে যায় মাঠে। যার বায়স্কোপ-থিয়েটার নিয়ে, সে সেইদিকে। তাদের নিজের নিজের দল আছে; এটাদের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা হয়। শোনে, শেখে সন্দীপ। কানে গেলেই যে-শেখা, শুধু সেই শেখাই নয়। এদিকের বিশেষজ্ঞ বড় মামার মেজ ছেলে হাবুল। বছর খানেকের বড় সন্দীপের চেয়ে। দলের আর সব চলে গেলে যখন শুধু দুজনে রয়েছে, ঘুরে একটু নাক-মুখ কুঁচকে বলল—'পাটৌডির ব্যাটিঙের কথা উঠতে ভোঁদা যখন তোমার ওপিনিয়ন জিজ্ঞেস করল, তুমি অমন করে শুধু একটু হেসে চুপ করে রইলে যে সন্দীপ?'

'কোনটে পাটৌডি ওর মধ্যে? তাছাড়া......'

'ইস!'—ওর অজ্ঞতাটা আরও প্রকাশ হওয়ার আগেই দারুণ বিরক্তিতে ডান হাতটা শূন্যে ঝেড়ে সিঁটকে উঠল হাবুল, বলল—'আমার ভাই, কে পাটৌডি তা জানে না। ফর শেম! চলো, আজ তোমায় হু-ইজ-হু-ইন ক্যালকাটা টেস্টটা ভালো করে দেখিয়ে দিই। কোথায় পড়ে আছ হে!

সেজমামার বড় ছেলে পটল মাস কয়েকের ছোট। সিনেমা-থিয়েটার তার নখ-দর্পণে। সেও কোন উদীয়মান তারকার সম্বন্ধে ঐ-ধরনের অজ্ঞতা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে শরীরটা সিনেমা-স্টাইলেই এলিয়ে দিল, একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া গোছের করে। বলল—'সুমিতা রায়ের নাম শোননি একথা আমার সামনে বললে তো বললে, আর কারুর সামনে যেন বলে ফেলো না সন্দীপদা'। একটা শো'র পরেই ওর যা নাম বেরিয়ে গেছে, স্টার হয়ে উঠতে আর দেরি নেই!'

ওদিকে যখন ধিক্কারে-ধিক্কারে স্মার্ট করে তোলবার চেষ্টা চলছে, ছোটমামা রঞ্জন ধরেছে অন্যপথ। বয়সেও সন্দীপের চেয়ে বছর পাঁচেক বড়। ওদের ক্লাব আছে; একটা পাঠাগার তার সঙ্গে, কিছু আভ্যন্তরীণ খেলাধূলো, তাস, টেবিল-টেনিস, ক্যারম ইত্যাদি। নাম 'সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ'। সাহিত্যের দিকটার পাণ্ডা রঞ্জনই। ওদের মাসিক বৈঠক হয়, তাতে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ এবং সে সবের সমালোচনা হয়। রঞ্জনের প্রায় কবিতাই থাকে।

একদিন নিয়ে গিয়ে পরিচিত করিয়ে দিল সন্দীপকে।

কবি হলেও মেজাজ বা প্রকৃতির দিক দিয়ে রঞ্জন সন্দীপের একেবারে বিপরীত। খুব স্পষ্ট, নিঃসংকোচ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কলকাতার বাইরে একটা বড় কারখানায় কাজ করে। অবসর কম বলে বেশি রকম যোগাযোগ রাখতে পারে না সন্দীপের সঙ্গে, তবে যেটুকু পারে তার মধ্যে ঐ একমাত্র ওকে উৎসাহ দিয়ে যায়, প্রয়োজনবোধে ধিক্কারের আকারেও।

একটা ছুটির দিন পেয়ে সন্দীপকে বলল—'চলো, আজ তোমায় আমাদের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ক'দিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু হয়ে উঠছে না।'

সন্দীপ ঘরে গিয়ে কাপড়টা পালটে গেঞ্জির ওপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে আসতে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল—'একি, তোমার উড়ুনিটা জড়িয়ে নিলে না যে।'

'উড়ুনি!'—একটু বিস্মিত হয়েই চাইল সন্দীপ। ও জিনিসটা একরকম কায়েমীভাবে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; এখানে তো বটেই, বাড়ি গিয়েও আর বের করবার মতো মনটা উড়ুনি-ভাবাপন্ন থাকবে কিনা নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল; কলকাতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছেই তো মনে।

'বড় দুর্বলচিত্ত তো তুমি সন্দীপ!'—ওর বিস্ময়ে বিস্মিতভাবেই উত্তর করল রঞ্জন। বলল—'তুমি তো গুন্ডামির জায়গায় যাচ্ছ না সন্দীপ—প্রথমত টিকিট কিনতে যা অবস্থা—তারপর ভেতরে গিয়ে সেই নারকীয় উল্লাস, তদুপযুক্ত ভাষায়,—তুমি যাচ্ছ একটা ভদ্রসমাবেশে—সেখানে তাদের চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার সব অন্যরকম। তোমায় সেখানে সেখানকার মতন হয়েই যেতে হবে,যে......'

'ওখানে সবাই উড়ুনি-চাদর ব্যবহার করেন?'

'একজনও নয়।'

একটু আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল সন্দীপ, খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েই বলল—'তাহলে?'

'তাহলেও তোমায় তোমার নিজের সাজেই যেতে হবে। কথাটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি, আগে নিয়ে এসো উড়ুনিটা; দেরি হয়ে যাবে।'

ও এলে ওকে সঙ্গে করে একবার বাড়ির মধ্যে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এল, এর-তার সঙ্গে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় দু-একটা কথা বলে। এক ধরনের চ্যালেঞ্জ; সবাই দেখুক, কিছু বলবার থাকে তো বলুক। সন্দীপ কিছুটা সঙ্কুচিতই রইল, তবে, কিছু বলল না। বাইরে এসে রঞ্জনই বলল—'হয়তো বুঝেছ কেন এটা করলাম?'

সন্দীপ চুপ করেই থাকায়, বুঝেছেই ধরে নিয়ে বলল—'এবার তোমার প্রশ্নটার উত্তর দিই—আমাদের কেউই উড়ুনি-চাদর না ব্যবহার করা সত্ত্বেও তোমায় কেন এই বেশেই যেতে বললাম আমি। তুমি আজ আমাদের ক্লাবে,—বিশেষ করে লাইব্রেরী নিয়ে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকটায় একটা দূতালির কাজ করছ সন্দীপ।'

পথে নেমেই যেতে যেতে ওদের গল্প হচ্ছে, সন্দীপ একটু বিমূঢ়ভাবেই ঘুরে চাইতে বলল—'বুঝলে না?—তাহলে বলি বুঝিয়ে। তারাও কবি কিন্তু তারা কলকাতা-মার্কা কবি—ইট পাথর পিচের রাস্তা, ট্রাম, বাস, বড়বাজার, খিদিরপুর, তার সঙ্গে হয়তো এক-আধটা পার্ক; রেডিও-স্টেডিয়াম-পিষ্ট গোটাকতক গাছপালা, ওরা বলে ইডেন-গার্ডেন অর্থাৎ নন্দন-কানন; এক চিলতে সবুজ ঘাস, তাও রেসকোর্সে, মিলিটারি ক্যাম্প আর স্পোর্টস টেন্টে জর্জরিত—ওরা বলে ময়দান—আমায় নাম দিতে দিলে বলব—ময়দানবের আস্তানা। ওরা এইখানকার কবি, তাই ওদের কাব্যের কী থেকে প্রেরণা, কী জটিল তার ভাষা, কী খঞ্জ তার ছন্দ—একটা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা খুললেই পারবে বুঝতে। নিজেকে ধরেই বলছি সন্দীপ। দুঃখের কথা কী বলব—আমি সেদিন টিংচার আয়োডিন, আর এসিটিলিন, গ্যাস নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেললাম; ক্লাবের সবার তারিফও পেল। কি করব বল না? আমি থাকি অবশ্য কলকাতার বাইরেই সমস্ত দিন, কিন্তু একটা ফ্যাক্টরির গর্ভে; সেখানে যাতায়াত করি যেপথ দিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে, সেটাও আগাগোড়া দুদিকেই কারখানা দিয়ে মোড়া। তার মধ্যে আধুনিকতম কার-খানা হোল একটা এই সব আয়োডিন—গ্যাস ইত্যাদির সূতিকাগৃহ—আর সবের অত্যাচার চক্ষু আর কর্ণের ওপর, এ আবার শ্রবণেন্দ্রিয়টাকেও টেনেছে তার সঙ্গে। দেখেছ নিশ্চয়?'

ঘুরে চাইতে সন্দীপ সঙ্কুচিতভাবে বলল—'দরকারও তো' এসবের।'

'দরকার নয়তো ইনসপিরেশনটা আমার এল কোথা থেকে?' —বলে চলল রঞ্জন।—'এবার তোমার কথায় আসা যাক। তুমি হচ্ছ অন্য জগতের কবি; সেই জগৎ যা চিরকাল সৃষ্টি করে এসেছে কবি। তুমি যেখানে রয়েছ সেখানে নীল আকাশের নীচে দিবা আর রাত্রি নিজের নিজের স্বরূপে সপ্রকাশ; সেখানে ছটা ঋতুর নিরন্তর প্রবাহ পৃথিবীকে করে রেখেছে নিত্য নতুন। কলকাতাতেও দিন আর রাত বলে দুটো বস্তু আছে সন্দীপ, কিন্তু কলকাতার আকাশ উদয় বা অস্তরাগ দিয়ে তাদের আসা-যাওয়া চিহ্নিত করে না বলে তারা কখন এল কখন গেল কেউ যেন জানতেই পারে না। এখানে আকাশচুম্বী বাড়িগুলোয় কৃত্রিম আলোয় দিনেরবেলায় কৃত্রিম রাত, রাতের-বেলায় কৃত্রিম দিন! এই কৃত্রিমতাই কলকাতার প্রাণ-ধর্ম, যেদিকে যাও তার স্বাক্ষর দেখতে পাবে, সুতরাং এখানকার কবিও হবে কৃত্রিম এ আর নতুন কি? তুমি এখানে আনছ অন্য জগতের বার্তা, যে-জগৎটা নিজেই একটি কাব্য—সহজ, সুন্দর, স্বতঃস্ফূর্ত। তোমার চেহারা, তোমার পরিচ্ছদ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না হলে, শুধু যে তোমায় চিনে নেওয়া শক্ত হবে তাই নয়, সে-জগতের ওপর তোমার অবিচার করাই হবে সন্দীপ, দাগা-বাজি না হয় না-ই বললাম।

'সেদিন তোমার উড়ুনি-পাঞ্জাবি নিয়ে দাদার সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গেল; কবিতা লেখা নিয়ে তো বটেই। বললাম ও যেভাবে সৃষ্ট হয়ে উঠছে, যে পরিবেশের মধ্যে, সেইভাবেই হতে দিন, যেমন অন্তরের দিক দিয়ে তেমনি বাইরের দিক দিয়ে। সন্দীপ সরু পেন্টালুনের ওপর কোমর পর্যন্ত একটা খর্ব, হাত-কাটা বুশ-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতেও যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!'

।। ছয় ।।

কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু মিলে। মামাতো ভাইয়েদের তত্ত্বা-বধানে ঘুরে ফিরে, দেখে-শুনে, তাদের সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এদিকে প্রগতির পথে কেমন খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে, রঞ্জন তেমনি আবার প্রাণপণে টেনেই রাখবার চেষ্টা করছে ওকে ওর নিজের জায়গাটিতে। রঞ্জনের প্রভাবটাই বেশি ফলে পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে বেশ খানিকটা আধুনিক হয়ে উঠলেও, মনের দিক দিয়ে সন্দীপ যেন যেখানকার সেখানেই থেকে যাচ্ছে। ওর যেন এখন দুটো সত্তা দাঁড়িয়ে গেছে; হাবুল-পটলের দলে থাকলে খানিকটা স্মার্ট, জ্ঞান-আহরণের সঙ্গে দলসম্মত বোলচালও ঝাড়ছে কিছু কিছু দলের বাইরে কিন্তু সেই আবার স্বপ্নালু, আত্মসমাহিত কবি মানুষটি; স্বল্পবাক, লাজুক। একটা কথা তো ঠিকই; এইটিই ওর স্বাভাবিক সত্তা, তাছাড়া রঞ্জন ওকে কাব্যলোকের দূত হিসাবে যেভাবে ঘটা করে পরিচিত করেছে নিজের ক্লাবে, তাতে সত্তার এই দিকটা শ্রদ্ধা-সমাদরও পেয়েছে তাদের মধ্যে। এদিকে এই, আর ওদিকে হাবুল-পটলের দলে যেন চেষ্টা করে তাদের সমকক্ষ হতে যাওয়া, সুতরাং দলের বাইরে এসে আর সে ভাবটা টেঁকে না বড় একটা, বরং দুটো মিশে গিয়ে আরও কি রকমটা করে তোলে মাঝে মাঝে।

বাড়ির মধ্যে এই দিকটাই সবার নজরে পড়ে। হয়তো পোষাক-পরিচ্ছদে কখন কখন প্রগতির লক্ষণ দেখে একটু আশা জাগে মনে, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখেও মনের

দিকে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।

চিন্তিত করে তোলে, আলোচনা হয়। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। হেমাঙ্গিনী আছেন, মেজবৌ অপর্ণা আছেন, রেবাও এসে দুশ্চিন্তার অংশীদার হয়ে পড়েন। সুরবালার তো কথাই নেই। আগে মতামত যাই থাক, স্বামীর সঙ্গে যাই তর্ক করুন, এখন মতের যে অনেকটা পরিবর্তন এসেই গিয়েছিল, বড় ভাইয়ের কাছে যেভাবে উল্ট ব্যাখ্যানা দেওয়া তাই থেকেই প্রকাশ পায়। এখন আবার ছেলেকে আর পাঁচজনের মধ্যে ফেলে যাচাই করে তিনি বেশ শঙ্কিতই হয়ে উঠেছেন বলা চলে। অন্যান্যবার রাগ বা অভিমান করে চলে এলে আবার কয়েক-দিনের মধ্যেই ফিরে যান, এবার প্রায় দু' মাস হয়ে গেল। বাড়িতে আরও পাঁচটা কাজ থাকত, এখানে একরকম বলতে গেলে শুধু ছেলে নিয়েই চিন্তা, সুতরাং ছোটখাট ব্যাপারগুলোও বড় হয়ে দেখা দেয়, আরও যেন চিন্তিত হয়ে ওঠেন। মানুষটির মধ্যে একাল আর সেকাল দুটো যুগই গেছে মিশে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এসে গেছে। ভাইয়েদের আদরে খানিকটা ছেলে-মানুষ করে রেখেছে—খানিকটা আধুনিকাই, তবু সেকালের গৃহিণীপনাও মনটা দখল করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে, তার তুক-তাক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে। একদিন নিজের আশঙ্কাটা প্রকাশ করেও ফেললেন হেমাঙ্গিনীর কাছে—

'লক্ষ্য করেছ বড়বৌদি? ......খোকার কথা বলছি।'

লক্ষ্য আছেই হেমাঙ্গিনীর, আলোচনাও হয় মাঝে মাঝে, তবে ননদের শঙ্কাকুল দৃষ্টি তুলে বলার ভঙ্গিতে ও'র মুখেও উদ্বেগের ছায়াটা গাঢ় হয়ে ওঠে, প্রশ্ন করেন—'কী লক্ষ্য করব বলছ?'

একটু অভিমানই এসে যায় সুরবালার, মুখভার করে বলেন—'কিছু লক্ষ্য করছ না তোমরা, দিব্যি আছ। অথচ তোমাদের ভরসাতেই এখানে এনে ফেলে রাখা।'

'একটু ভেঙ্গে বলো, নতুন কিছু হয়েছে নাকি?'—

—ছেলের বয়স হয়েছে, কলকাতায় এসে হঠাৎই ভালো-মন্দ সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছে, অভ্যস্থ নয়, তাল রাখা শক্তই; হেমাঙ্গিনী রীতিমতো শঙ্কিত হয়েই চেয়ে রইলেন ও'র মুখের দিকে।

'এর ওপর নতুন কিছু হলেই তো চিত্তির।' —উত্তর করলেন সুরবালা—'তবে হয়ে গেলেই বা কে কি করছে? আমি সে কথা বলছিলাম না; আমি বলছিলাম, এই এতদিন রইল এখানে, সবাই চেষ্টা করতেও কসুর করছে না, তবু একটুও উনিশ-বিশ দেখছ ছেলের মধ্যে? বরং আরও যেন জবু-থবু হয়ে পড়ছে না?'

'চুপ করো ঠাকুরঝি!' —যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু ধমকের সুরেই বলে উঠলেন হেমাঙ্গিনী—'ছেলে রাতারাতি অমনি বদলে যাবে! তা যদি বললে তো বদলাবার এখন আছেই বা কি জিজ্ঞেস করি? বাপ-মায়ের একটি মাত্র ছেলে, আদর-আব্দারার অভাব নেই, তবু এতটুকু পা ফসকায়নি, সিগারেট-বিড়িটা পর্যন্ত ওঠেনি ঠোঁটে। হীরের টুকরো ছেলে, বদলাবার আছেটাই কি? থাক যেমন আছে।... অমন করে চেয়ে আছ মুখের দিকে, খেলাপ বলছি কিছু?'

'সাত চড়ে কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে, দুটো অপরিচিত মানুষ দেখলে ঘরের কোণ নেয়, শুধু সিগারেট ধরেনি বলে হীরের টুকরো হয়ে গেল? চলবে অমন হীরের টুকরো এযুগে? তুমি যে অবাক করলে বৌদি!'

ও'র হতাশ ভাব দেখে হেসে ফেলেন হেমাঙ্গিনী। বলেন—'জ্বালা মা হয়েছে বাছা! না চলে তো তার চেষ্টাও তো হচ্ছে। বদলায় নি? আর, ভালোই কি একেবারে হুড়মুড় করে বদলানো? কলকাতা শহর—রয়ে-সয়ে হয় সেই ভালো নয় কি? আগে যেমন লোক দেখলেই......'

'তুমি একটা উপকার করো বৌদি। অনেকটা তো এনেছ সামলে'—কথার পিঠে হঠাৎ ব্যাকুলভাবেই বলে ওঠেন সুরবালা। খোসামোদের টোনে, দু হাতে ও'র একটা হাত ধরে নিয়ে।

'উপকার কি আবার?' —বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করেন হেমাঙ্গিনী ও'র হঠাৎ ভাবান্তরে।

সুরবালা বলেন—'রঞ্জনকে বলো ওকে ছেড়ে দিতে। সেখানেও তো লিখত বৌদি, এখানে এ আরও যেন কি রকম হয়ে গেছে। না বিশ্বাস হয়, জিজ্ঞেস কোর মেজবৌদিকে...'

ও'র ভাষা আর ভাবগতিকে এবার একেবারে খিলখিল করে হেসে ওঠেন হেমাঙ্গিনী, বলেন—'মানুষটা পাগল হয়ে গেল নাকি! হ্যাঁগা, রঞ্জন ঠাকুরপো ভূত, না, বেহ্মদত্যি যে রোজা ডাকিয়ে ছাড়াতে হবে?'

আবার মুখভার হয় সুরবালার, বলেন—'থাক তবে বৌদি, আমার কথা বুঝতে চাইবে না, উলটে ঠাট্টা...'

শান্তভাবে কাঁধে একটা হাত চেপে ধরেন হেমাঙ্গিনী, বলেন—'বুঝছি তোমার মনের ভাবটা ঠাকুরঝি। হয়তো ঠিকও তোমার কথা, ঠাকুরপো এদিকে খানিকটা টেনে না রাখলে সন্দীপ আরও খানিকটা চটপটে হয়ে উঠত এতদিনে। কিন্তু একে-বারে অধৈর্য না হয়ে অন্য দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে? ওর নিজের ভাগনে, বলতে পারা যায় এমন কোন কথা যাতে ওর মনে চোট লাগে? —ভাবতে পারে তো, আমরা মনে করছি ও তার শত্রুতা করছে।'

'পারি মনে করতে সেকথা কখনও'—একটু রুক্ষ কণ্ঠে বললেন সুরবালা, যেন রঞ্জনেরই মনের কথাটা ধরে নিয়ে।

'ও তাই ভাববেই। অথচ কথাটা সত্যি সত্যি কখনই হতে পারে না, মাঝখান থেকে শুধু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে পড়বে খানিকটা।'

'তবে না হয় থাক বড়বৌদি, আমার কপালে যা আছে তাই হবে।'

আলোচনা অনেক সময় এইভাবেই শেষ হয় সুরবালার দিক থেকে, খানিকটা যুক্তি মেনে নেওয়া, খানিকটা নৈরাশ্য, খানিকটা অদৃষ্টের ওপর অভিমান।

এই করে চলে।

(ক্রমশঃ)

সড়ক সৌধ কানাগলি

গত সপ্তাহে রাজ্য সরকার রয়াল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহযোগে ১৯৬৭ সালের জন্যে আম, অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফলমূল, শাক-সবজির এক প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন সোসাইটির আলিপুরের বাগানে। এবছর নিয়ে পর পর চার বছর এজাতীয় প্রতিযোগিতা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো। কর্তৃপক্ষের কাছে শুনে আশ্বস্ত হলাম যে, প্রতিবছরই ক্রমাগত সহযোগ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত এ-বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে আক্রান্ত হয়েও যেভাবে এই প্রদর্শনীতে ব্যাপক অংশগ্রহণ করেছেন তা উদাহরণ-স্বরূপ। সোসাইটির সম্পাদক ডক্টর তরুণ বসু মশায় আমাদের স্বাগত জানালেন। রাজ্যের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের কণ্ঠ আমরা বাগানে প্রবেশ করেই শুনতে পেয়েছিলাম। তিনি এ-ধরণের প্রদর্শনীর তাৎপর্য হিসেবে সবিশেষ জোর দিলেন ব্যাপক ফলনের উপর। প্রদর্শনীর এক বিরাট অংশ জুড়ে গ্রীষ্মকালীন ফল-মূলের বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে যে সব পণ্যসম্ভার ছিলো ডঃ ঘোষ তাদের সমালোচনা করেন। তাজা ফলের গুণাগুণ এইসব শুকনো এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাক্সবন্দী পণ্যের মধ্যে আছে কিনা তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষার উপর জোর দিলেন। যদি তা না থাকে তাহলে, এসবের প্রয়োজন নেই। এমনকি, এর ফলে যদি বৈদেশিক মুদ্রার সংসার হয়—তাও, সাধারণ মানুষকে অনাহারে রেখে, এমন ব্যবস্থা বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। আমরা বক্তৃতামঞ্চ থেকে প্রদর্শনী-কক্ষে এসে দাঁড়ালাম। অন্যান্য বছরেও যেমন দেখেছিলাম, আম ছাড়া প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এখনো ফুটে ওঠেনি তেমন, একথা বলতে লজ্জা নেই। অন্যান্য ফলমূলাদির মধ্যে সবই আছে, কাঁঠাল থেকে সুরু করে করমচা পর্যন্ত—কিন্তু সবই সাধারণ, বাজার-সুলভ, সংক্ষিপ্ত আকৃতির। জামরুলের রাশি দেখেও সন্তুষ্ট হতে পারলাম কই? গোলাপ জাম, কালো জাম, আনারস, পেয়ারা, ফুটি, খরমুজ, বেল, ডাব-নারকেল, খেজুর, লিচু সব কিছুর আয়োজন ভারি সাধারণ। অর্থাৎ বলার কথা, প্রদর্শনীর জন্যে বিশেষভাবে বাছাই করা হয় না কেন? বাজারে প্রদর্শিত জিনিসের থেকে শ্রেষ্ঠ জিনিস যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে অনায়াসে খানিকটা নজর দিতে পারেন।

তারপর শাক-সবজি মহলেও ঘুরে ঘুরে তেমন আহামরি ফসল একটাও চোখে পড়লো না। সব পেয়ে পাইপাতাই যা
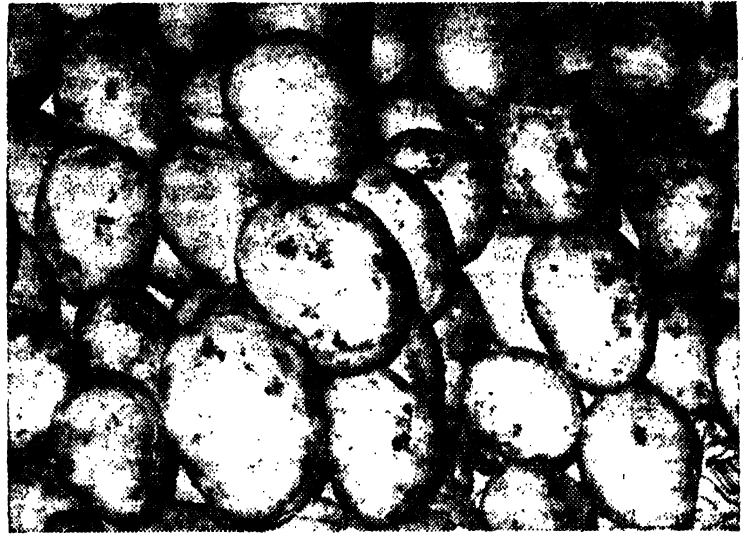
কিছু কালো আর তাজা হয়েছে। আগে থেকেই খবর রেখেছিলাম, ডক্টর বসুও আমাদের দেখালেন—দুটি বিশেষ হাইব্রিড্—একটি গোলাপ জাম আর জামরুলে, অন্যটি জাম ও করমচায়। হাসতে-হাসতে বললাম, ওদের দুটোকে যথাক্রমে গামরুল ও চামরুল নামে ডাকুন। আপনার ল্যাটিন-ফ্যাটিন চলবে না।

আগেই বলেছি, গত বছরের তুলনায় যোগদানের সংখ্যা বেশি হলেও, নানা-জাতের আম এবার এসেছে অনেক অল্প; তাদের মধ্যে অদ্ভুত নামের তালিকা একটি আপনাদের জ্ঞাতার্থে এখানে পরিবেশন করি: কেলো, গুড়ভাটুলী, অলচোঁচ, পাঁচকেফুলি, ছুঁচোফুলি, প্রতাপপুর, পশ্চিমে মেঘলন্ঠন, কামারে বিশ্বনাথ, মাথাভাঙ্গা, মাখন সা—আরো অনেক।

মাথার ঠিক রুজু রুজু নিয়ম আলো আর তৎপর পাখা। বক্তৃতা করে চলেছে বিশেষজ্ঞ ও গাইডের দল। আধুনিকারা আমচুর, স্কোয়াশ, আসতেল, আমসত্ত্ব আর আচারের শিশি বোতলের ওপর পড়েছেন ঝুঁকে।

আমের সাধারণ গল্প সুরু করার আগে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। এই যে নানান নাম, তার প্রত্যেকের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক একটি সরস গল্প-কাহিনী। আর তার অধিকাংশই ভুলেছে লোকে। শুধু আছে নাম-জড়ানো আম।

স্থানের নামে আমের নাম: কলকাতা আমিন, বম্বে গ্রীন, মালদা বা চুনাখালি, বেঙ্গালী গোল, সিঙ্গাপুরী প্রভৃতি।

রাজা বা ব্যক্তির নামে নাম: হুমায়ুন্দিন, জাহাঙ্গীর, নিসারপসন্দ, আমিন মিঃ ফোর্ড, রহমৎখাস, ডেভীর, ফেভারিট প্রভৃতি।

পদবী ও কৌলীন্যনির্ভর নাম: ভাইসরয়, কালেক্টর, সেসনপসন্দ, মহারাজা-পসন্দ, ডাক্তার পসন্দ ইত্যাদি।

রোমান্টিক আইডিয়া নিয়ে নাম: দিলপসন্দ, হুসনারা, পরী, কিষণভোগ প্রভৃতি।

আস্বাদ অনুসারে নাম: সরবতী, মালাই, মিছরি, দুধিয়ামংলা, কাঁচামিঠা।

আকার অনুসারে নাম: হাতীঝুলে, পাঁচসেরী, ওমলেট, লাড্ডু, চ্যাপ্টা, সোলা, বোতল, কিড্নি, গিলাস প্রভৃতি।

গন্ধ অনুযায়ী নাম: আনারস, গোলাব-খাস, গুলাবজাম, লেমন, লা রোজ ইত্যাদি।

দুর্মূল্য রত্নপাথর অনুসারে নাম: সোনাতাল, ডায়মন্ড, নীলম প্রভৃতি।

ফলন হিসাবে নাম: বারোমাসী, সদাবাহার, দোফসলা।

মাস-ফলন কেন্দ্র করে নাম: বৈশাখিয়া, শ্রাবণী, ভাদুরিয়া, কার্তিকী প্রভৃতি।

উপরোক্ত তালিকা তবু সিন্ধুতে বিন্দুর সামিল। কতো রকমের ল্যাংড়া আছে জানেন আপনারা? দেখুন—ল্যাংড়া দীঘা, ল্যাংড়া বেনারসী, ল্যাংড়া হাজিপুর, ল্যাংড়া পাটনা, ল্যাংড়া মীরাট, ল্যাংড়া ফকিরওয়ালা এবং ল্যাংড়া ডেভিড ফোর্ডই সর্বাধিক বিখ্যাত।

ভারতবর্ষের মতো এতো সুস্বাদু আর ভালো জাতের আম পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় না। তবুও অল্পবিস্তর আম সেন্ট্রাল আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল, ইন্দোচীন, মেক্সিকো, সিংহল, বর্মা, মিশর, ম্যাডাগাস্কার, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়।

সর্বপ্রথম ১৮৯৬ সালে বম্বে থেকে জাহাজে আমাদের দেশের আম ইংলন্ডে জনৈক বার্ডউড কোম্পানীর মাধ্যমে রপ্তানী করা হয়। এ-ব্যাপারে 'আলফাঁসো' আমই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

পুরাণ প্রভৃতি ছাড়া ইতিহাসে সম্ভবত আলেকজান্ডারই প্রথম যিনি সিন্ধু উপত্যকার আমের বাগান লক্ষ্য করেছিলেন, সেটা খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে। পরে হিউয়েন শাং ও ইবন হাক্কল এই আমকে যথাক্রমে আন-মো-লো এবং আম-বাগ নামে বর্ণনা করেছেন। ইবন বতুতা বলেছেন, এই আম কমলার মতন দেখতে!

—রূপচাঁদ পক্ষী

প্রেসিডেন্ট মিঃ জনসন

দেশে বিদেশে

চীনের নব্য সংস্কৃতির একটি নমুনা

আন্তর্জাতিক আচরণের ক্ষেত্রে চীনা-রীতির আবার একটা চমৎকার নমুনা পাওয়া গেলো। ব্যাপারটা ঘটেছে পিকিংস্থ ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সচিব কে রঘুনাথ ও পি বিজয়কে কেন্দ্র করে। সপ্তাহ তিনেক আগে এঁরা দুজন পিকিংএর পশ্চিম শহরতলীর পাহাড় অঞ্চলে বেড়াতে যান। এই সময় ভারতীয় কূটনীতিকদ্বয় সেখানকার কয়েকটা প্রাচীন চীনাভবন এবং দর্শনীয় স্থানের ছবি তোলেন। কিছু-সংখ্যক চীনা তাঁদের এই ফটো তোলায় আপত্তি করে এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ আটক রেখে পুলিশ এঁদের ছেড়ে দেয়।

ভারত সরকারের কাছে এই খবর পৌঁছুলে তাঁরা কূটনীতিকদের প্রতি এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ জানান। চীনারা এর উত্তরে এঁদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্যান্য আপত্তিকর কার্যকলাপের অভিযোগ করে। ভারত সরকার এই অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাঁরা রঘুনাথকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে রাজি হন।

কোনো কূটনীতিকের আচরণ সম্পর্কে আপত্তি উঠলে সভ্য দেশগুলোতে এইখানেই তার যবনিকাপাত হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রচলিত সভ্যরীতির সঙ্গে পার্থক্য দেখানোর জন্যই চীন হঠাৎ ঘোষণা করলো যে রঘুনাথকে কূটনৈতিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং গণ-আদালতে বিচারের আগে তাকে চীন ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না। তৃতীয় সচিব বিজয়কে "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি"রূপে ঘোষণা করে তিন-দিনের মধ্যে চীন ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরদিন নাকি পিকিং-এর স্পোর্টস স্টেডিয়ামে পনের হাজার লোকের উপস্থিতিতে তথাকথিত গণ-আদালতে রঘুনাথের বিচার করা হয় এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে অবিলম্বে চীন ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত সরকারের আশঙ্কা ছিলো যে রঘুনাথকে হয়তো জবরদস্তি করে আদালতে হাজির করবার চেষ্টা করা হবে, যদিও শেষপর্যন্ত তা করা হয়নি।

বুধবার রঘুনাথ ও বিজয় যখন পিকিং ত্যাগের জন্য বিমানঘাঁটিতে আসেন তখন চীনের সাম্প্রতিক বিপ্লবলব্ধ নব্য সংস্কৃতির নমুনা দেখাবার জন্য রেডগার্ড নামধারী উঠতি গুন্ডারা কয়েক হাজারে সেখানে উপস্থিত ছিলো। বিমানের দিকে এগোবার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

কালে তারা রঘুনাথ ও বিজয়কে ভারতীয় কূটনীতিকদের পাশ থেকে টেনে নিয়ে যায় এবং কিল চড় ঘুসি দ্বারা জর্জরিত করে। অনেকে মাও সে তুং-এর মহাবাণীসম্বলিত লাল পুস্তিকা তাঁদের সামনে আন্দোলিত করতে থাকে। ভারতীয় দূতাবাসের অপর যেসব কূটনীতিক এঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন তাঁদেরও ভাগ্যে লাঞ্ছনা জোটে। ভারতীয় দূতাবাসের যে গাড়ীগুলো বিমান-ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাতে পোস্টার ও রং-এর প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। সকাল ছ'টার সময় ভারতীয় কূট-নীতিকরা বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হন এবং সাতটায় বিমান ছাড়ার পূর্বপর্যন্ত তাঁদের ওপর চীনের নব্যসংস্কৃতির ঝান্ডাবাহীদের এই তান্ডব চলতে থাকে।

কূটনীতিকদ্বয়কে নিয়ে বিমানখানা যখন হংকং-এর পথে ক্যান্টনে পৌঁছোয় তখন সেখানেও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। রেডগার্ডরা রঘুনাথকে একখানা ভ্যানে চড়িয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে এবং

প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন

শারীরিক নানারকম নির্যাতন চালায়। বিজয়কে অবশ্য এখানে রেহাই দেওয়া হয়।

স্বভাবতঃই এই ঘটনায় ভারত সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হন। দিল্লীস্থ চীনা দূতকে তলব করে এই ধরনের বর্বর আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এই সঙ্গে সামরিক গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে দিল্লীস্থ চীনা দূতাবাসের মুখ্যসচিব চেন লু চিনকে কূটনৈতিক মর্যাদাচ্যুত করা হয় এবং অবিলম্বে ভারত ত্যাগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া চীনা দূতাবাসের তৃতীয় সচিব সিয়ে চেং হাওকে "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি"রূপে ঘোষণা করে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ভারত ত্যাগের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শনিবার এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউই ভারত ত্যাগ করেন নি।

পিকিং ও ক্যান্টনের এইসব ঘটনা ভারতীয় জন-মনে যে গভীর বিরক্তি ও

পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএম সি চাগলা

ক্রোধের সঞ্চার করেছে পার্লামেন্টের উত্তেজিত বিতর্ক থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। কোনো কোনো সদস্য চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের দাবী করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাগলা অবশ্য এই বলে তাঁদের নিবৃত্ত করেন যে, চীনস্থ দূতাবাস এমন একটা গবাক্ষের কাজ করছে যার মধ্য দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভারতের গোচরে এসে থাকে।

সম্পর্কচ্ছেদের দাবী বর্তমানে সময়োচিত না হলেও বিদেশীদের প্রতি চীনাদের দুর্ব্যবহার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যখন তাকে নির্বিবাদে সহ্য করাও সম্ভব বা উচিত নয়। গণআদালতে কোনো বৈদেশিক দূতের বিচার, রেডগার্ড নামধারী গুন্ডাদলের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনে মৌনসম্মতি, যে-কোনো সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক গর্হিত আচরণ। অথচ চীনে এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়, বরং দূতাবাসগুলোর সামনে গুন্ডামি, বিদেশী কূটনীতিকদের প্রতি অভদ্র আচরণ প্রভৃতি ব্যাপারে জন্য পিকিং কিছুদিন যাবত পৃথিবীর সমস্ত রাজধানীগুলোর মধ্যে অত্যন্ত কুখ্যাতি অর্জন করেছে। ইতিপূর্বে বৃটিশ, ফরাসী, সোভিয়েট, যুগোশ্লাভ প্রভৃতি দেশগুলোর দূতাবাসের সামনে দিনের পর দিন সাংস্কৃতিক বিপ্লবীদের যে ভয়াবহ তান্ডব অনুষ্ঠিত হয়, তা আধুনিক চীনের রাষ্ট্র-জীবনের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

কোনো দূতাবাস বা কূটনীতিকের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভদ্র আচরণকে অন্য দেশগুলো অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করার ফলেই চীন ক্রমশঃ তার মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। অথচ বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আজ ঐক্যবোধের এমনই অভাব যে নিজেদের সমষ্টিগত মর্যাদা বা স্বার্থরক্ষার জন্যও তাদের পক্ষে সমবেতভাবে ব্যবস্থাবলম্বনের কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশ্বরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যখন সুবিধা-সন্ধান এতো প্রবল তখন চীনের ন্যায় অপরিণতবুদ্ধি উদ্ধত রাষ্ট্রের কাছে তাদের এই ধরনের মর্যাদাহানি অপ্রতিরোধ্য।

যুদ্ধ শেষ, কিন্তু শান্তি কই?

আরব ও ইস্রায়েলের দীর্ঘ প্রস্তুতির যুদ্ধ শেষপর্যন্ত মাত্র চারদিনেই শেষ হয়েছে এবং এই স্বল্পসময়ের মধ্যে আরবদের বিশেষভাবে মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার যে পরিমাণ ভূমি, সৈন্য ও সমরোপকরণ হারাতে হয়েছে, সামরিক ইতিহাসে তা প্রায় একটা বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে থাকবে। ইস্রায়েলের ঝটিকা-আক্রমণের ফলে সূচনায়ই মিশরী বিমানগুলো এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, এরপর চারদিন যুদ্ধ চললেও আরবদের পরাজয় প্রায় অবধারিত ছিলো। আকাশপথে অরক্ষিত মিশরী বাহিনী নামমাত্র যুদ্ধে সমগ্র সিনাই এলাকা ত্যাগ করে সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে চলে আসে। এই অঞ্চলের যুদ্ধে তাদের পনের হাজার সৈন্য ও কয়েকজন সেনাপতি ইস্রায়েলীদের হাতে বন্দী হয়। অন্য সীমান্তে ইস্রায়েলীরা জেরুজালেমের জর্ডান-অধিকৃত অংশ দখল করে এবং জর্ডানের মধ্যে অগ্রসর হয়। সিরিয়া সীমান্তের যুদ্ধ আরো দিন দুয়েক বেশী চলে। ইস্রায়েলীরা সীমান্ত থেকে সিরিয়ার অভ্যন্তরে বার মাইল এগোনোর পর রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে তাদের অস্ত্র-সংবরণ করতে হয়।

পিকিংস্থ ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব শ্রীকে রঘুনাথ (উপরে) এবং তৃতীয় সচিব শ্রীপি বিজয়।

এই বিজয়ে ইহুদীরা স্বভাবতঃই বিশেষ গর্বিত ও উৎফুল্ল। ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকোল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোসে দায়ান যুদ্ধান্তে ঘোষণা করেছেন যে, বিজিত এমন কোনো এলাকা থেকে তাঁরা সরে যাবেন না যাতে ভবিষ্যতে তাঁদের নিরাপত্তার পক্ষে আবার বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর নীরবতা থেকে মনে হয় যে তাঁরাও সম্ভবত ইস্রায়েলের এই দাবী সমর্থন করবে।

সীমান্তগত নিরাপত্তার প্রশ্ন যে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বাগ্রে বিবেচ্য হলেও, যে শান্তি মধ্যপ্রাচ্যের পক্ষে এবং বিশেষভাবে ইস্রায়েলের পক্ষে আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এই বিজয় তার পক্ষে কতখানি সহায়ক হবে তাও আজ ভেবে দেখা দরকার। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থায়ী করতে হলে ইস্রায়েলের পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আরব রাষ্ট্রগুলোর শুভেচ্ছা অর্জন। অপরপক্ষে, ইস্রায়েলের অস্তিত্ব যে একটা অনস্বীকার্য ঘটনা আরব রাষ্ট্রগুলোকেও তা স্বীকার করে নিতে হবে। আরবদের পক্ষে যেমন ইস্রায়েলের পঁচিশ লক্ষ ইহুদীকে দেশান্তরিত করা সম্ভব নয়, তেমনি ইস্রায়েলকেও এই সত্য স্বীকার করতে হবে যে, সীমান্তে বার লক্ষ আরব বাস্তুত্যাগী থাকা পর্যন্ত তার পক্ষে শান্তিতে কালযাপন সম্ভব হয়। অবশ্য একথা কেউ বলবে না যে ইস্রায়েলের মতো একটা ক্ষুদ্র দেশের একক চেষ্টায় এই বিরাট উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান সম্ভব। কিন্তু এই ব্যাপারে অন্ততঃ কিছুটা সদিচ্ছার পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। অথচ, উদ্বাস্তুদের কথা দূরে থাক, ইস্রায়েলের মধ্যে যে আরবরা আছে তাদের সম্পর্কেও তার আচরণ অতিমাত্রায় পক্ষপাতদুষ্ট। গাজা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে প্যালেস্টাইনত্যাগী যে আরবরা রয়েছে তারা সেখানে অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে শিবির-জীবন যাপন করছে। এই বার লক্ষ মানুষের পুনর্বাসন একটা বিরাট সমস্যা, একথা স্বীকার করেও বলা দরকার যে ইস্রায়েল যদি প্রথম অগ্রণী হয়ে এদের দুর্গতি লাঘবের কোনো প্রচেষ্টার সূচনা করতো তাহলে আরব রাষ্ট্রগুলোও হয়তো তার এই সদিচ্ছায় কিছুটা সাড়া দিতো। আরব উদ্বাস্তু সমস্যা যতো বিরাটই হোক না কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে, উভয় জার্মানীতে এবং ভারত-প্যাকিস্থানে যে উদ্বাস্তু চলাচল হয়েছে তার তুলনায় তা নিতান্ত সামান্য। ইহুদী এবং আরব—উভয়পক্ষের সম্মিলিত ইচ্ছা থাকলে রাষ্ট্রসংঘের জনকল্যাণ সংস্থাগুলো এই প্রচেষ্টায় সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারতো এবং এই বার লক্ষ মানুষের বাসস্থান, আহার্য ও জীবিকার সমস্যা হয়তো আজকের মতো দুরূহ বলে মনে হতো না। বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বিজয়োদ্ধত ইস্রায়েলীদের প্রতি এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করেছেন। ইহুদীদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জার্মানরা তাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিল, তারা যেন ভুল করে বাস্তুত্যাগী আরবদের প্রতি সেই ব্যবহার না করে বসে। জার্মানদের এই মারাত্মক ভুলই যে ইস্রায়েল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পক্ষে সর্বাপেক্ষা জোরালো যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে কথাও তিনি ইহুদীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শান্তির জন্যে জল

"Oh the glamour and the clamour
That attend affairs of State
Seem to fascinate the people
And impress some people as great.

But the truth of the matter,
In the scale of loss and gain:
Not one inauguration is worth
A good, slow two-inch rain".

(রাষ্ট্রীয় ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে গৌরব আছে, কলরব আছে; লোকে এতে অভিভূত হয়, কেউ কেউ ভাবে এসব বুঝি একটা বিরাট কিছু। কিন্তু লাভ-ক্ষতির মানদন্ডের বিচারে আসল কথাটা হল, কোন রাজকার্যই ভালো ইঞ্চি দুয়েক বৃষ্টির তুল্যমূল্য হ'তে পারে না।)

এই কবিতাংশ উদ্ধৃত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন মে মাসের শেষ সপ্তাহে ওয়াশিংটনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল : জল। যে জল আছে বর্ষার মেঘে, অতল অপার সমুদ্রের বুকে, তুষারাবৃত পর্বত-শীর্ষে, প্লাবনের স্রোতে, মাটির নীচে। এত জল, তবু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তীব্র জলকষ্টের সম্মুখীন : তার সেচের অভাব, তার তৃষ্ণার জল নেই। এই অভাব দূর করার জন্যে পৃথিবীর অব্যবহৃত অফুরন্ত জলসম্পদকে কিভাবে কাজে নিয়োগ করা যায়, সম্মেলনের সামনে সেটাই ছিল সমস্যা।

ফলাফল কি হয়েছে সেটা এখনো জানার সময় আসেনি, কারণ সম্মেলনের চিন্তাধারাকে কার্যকর পরিকল্পনায় রূপ দেওয়া সময়সাধ্য ব্যাপার। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন : এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। আমেরিকা এই কাজে পূর্ণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে : এই প্রয়াসের সে নাম দিয়েছে 'শান্তির জন্যে জল।'

যদিও বাঁধ নির্মাণ, জলাধার তৈরী, গভীর নলকূপ স্থাপন, উন্নত পরিস্রবণ ইত্যাদি প্রচলিত ব্যবস্থার ওপরেই আপাতত জোর দেওয়া হবে, তবু ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি দিকে এই প্রয়াসকে পরিচালিত করার কথা ভাবা হচ্ছে : এক, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত; দুই, সমুদ্রের জলের লবণমুক্তি।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত নিয়ে পরীক্ষার জন্যে আমেরিকার সহায়তায় শীঘ্রিই একটা পরিকল্পনা ভারতে চালু হতে চলেছে। এই পরীক্ষা যদি সফল হয় তবে কৃষি-কার্যের একটা মস্তবড় দুশ্চিন্তার যে অবসান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সত্যিকারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে যদি সমুদ্রের জলের লবণমুক্তির পরিকল্পনা সফল হয়। জলের এই বৃহত্তম সম্পদকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে পৃথিবীর সেচ ও তৃষ্ণার সমস্ত প্রয়োজন এর দ্বারাই মেটানো সম্ভব।

আমেরিকার লবণমুক্তি পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত জনৈক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনকে জানান, ১৯৮০ সাল নাগাদ লবণমুক্তির এমন এক একটি কারখানা তৈরী করা যাবে যার দ্বারা দৈনিক ১০০ কোটি গ্যালন পরিষ্কার জল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

লবণমুক্তির কিছু কারখানা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। কিন্তু সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। সবচেয়ে বড় যে কারখানা, সেখানে দৈনিক মাত্র ৫০ লক্ষ গ্যালন পরিষ্কার জল উৎপন্ন হতে পারে। এই কারখানাগুলির মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ১৫ কোটি গ্যালন।

উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে লবণমুক্তির খরচাও ক্রমশ কমে আসছে এবং সেই অনুপাতে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল দেশগুলির সাধ্যায়ত্ত হয়ে উঠছে। দশ বছর আগে যেখানে প্রতি ১০০০ গ্যালন লবণমুক্ত জল তৈরী করতে খরচ পড়ত পাঁচ ডলার, এখন সেখানে পড়ছে এক ডলার।

উক্ত বিশেষজ্ঞ বলেন, অদূর ভবিষ্যতেই দৈনিক ১ কোটি গ্যালন উৎপাদনক্ষম কারখানা তৈরী করা যাবে, তাতে খরচ পড়বে প্রতি হাজার গ্যালনে ৫০ সেন্ট।

চা-শিল্পের সংকট

ভারতীয় চায়ের রপ্তানী বাজারে এখন রীতিমত মন্দা চলছে। যেহেতু চা আমাদের একটি ঐতিহ্যাশ্রয়ী রপ্তানী সামগ্রী এবং বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম বৃহৎ উপার্জক, সেই জন্যে এই মন্দা গভীর দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে।

রপ্তানীর দুরবস্থার চিত্রটা একটা দৃষ্টান্ত থেকে ভালো বোঝা যাবে। ১৯৫৬ সালে ভারত থেকে ৩ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড চা আমেরিকায় যেত। ১৯৬৫ সালে সেই পরিমাণ ৩৩ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ডে।

গত বছর চায়ের বিশ্ব রপ্তানীর ৪৫ শতাংশই ছিল ভারতের অবদান। এ বছর তা কমে এসেছে ৩৫ শতাংশে।

এই রপ্তানী সংকটের একটা প্রধান কারণ অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে সিংহল ও আফ্রিকার দেশগুলির প্রতিযোগিতা। গত দশ বছরে আমেরিকায় সিংহলের রপ্তানী ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড থেকে বেড়ে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ডে দাঁড়ায়। আফ্রিকার দেশগুলি আমাদের চাইতে অনেক সস্তা দরে সাধারণ চা বিক্রি করতে পারে। এই চায়েরই কাটতি বেশি।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে পেরে উঠছেন না। চড়া দামের অসুবিধা তো আছেই, তার ওপর ভারতীয় চায়ের গুণ এবং রপ্তানীর ধরনও মস্তবড় অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় চা এখন প্রধানত প্যাকেজ ও টি-ব্যাগের আকারে রপ্তানী হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্যাকেজ করা চায়ের চাহিদা দ্রুত কমে আসছে এবং টি-ব্যাগও বিদেশী ক্রেতারা তেমন পছন্দ করছেন না। এর বদলে চালু হয়েছে ইনস্ট্যান্ট টি। ভারতীয় চা ইনস্ট্যান্ট টি তৈরী করার পক্ষে অনুপযুক্ত।

এ-ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে চায়ের ব্যবহার বেড়ে যাবার দরুণ ক্রমশ কম পরিমাণ চা রপ্তানীর জন্যে পাওয়া যাচ্ছে। রপ্তানী সংকটের এটাও একটা বড় কারণ।

রপ্তানীর এই সব সমস্যা এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে চা-শিল্পের সমস্যা আলোচনার জন্যে কলকাতায় ১২ ও ১৩ জুন টি বোর্ড ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটুট অব ফরেন এড-এর উদ্যোগে একটি বৈঠক বসেছিল।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং এই বৈঠকের উদ্বোধন করে চা-শিল্পের সামগ্রিক সংকটের জন্যে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করেন।

প্রথমত, গত ৪০ বছর ধরে চায়ের জমির পরিমাণ একই রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পুরনো গাছগুলির বদলে নতুন গাছ লাগানোর কাজ অত্যন্ত ঢিলে তালে চলছে। শিল্পপতিরা তাঁদের লাভের খুব কম অংশই বাগিচার উন্নতির জন্যে পুনর্নিয়োগ করেন। চায়ের আওতায় বর্তমানে ৩,৪০,০০০ হেক্টার জমি রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৫০০ হেক্টার জমিতে নতুন চারা লাগানো হয়েছে। অথচ চা বাগিচাগুলি ৪০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে চলেছেন।

তৃতীয়ত, চাষের পদ্ধতি সন্তোষজনক নয়।

চতুর্থত, ভারতীয় চায়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে জোরদার প্রচারাভিযান প্রায় অনুপস্থিত।

শিল্পপতিদের তরফ থেকে এই কথাটা জোর দিয়ে বলা হয় যে, চা-শিল্পের সামনে বর্তমানে বৃহত্তম সমস্যা হল অর্থের। এর ওপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য করের বোঝা অবস্থাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। উৎপাদন ব্যয়ের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের জন্যেই দায়ী এই করের বোঝা।

এই উদ্দেশ্যে শিল্পপতিদের তরফ থেকে চার-দফা একটি আর্থিক উৎসাহদান পরিকল্পনা পেশ করা হয় :

এক, রপ্তানীর সময় আবগারী শুল্ক পুরোটা সম্ভব না হলে কিলো-প্রতি ৩০ পয়সা হারে ফিরিয়ে দিতে হবে।

দুই, যে চায়ের দাম সাড়ে চার টাকা থেকে সাড়ে সাত টাকার মধ্যে—এই চা'ই রপ্তানীর অধিকাংশ এবং এরই ক্ষেত্রে তীব্রতম প্রতিযোগিতা দেখা দিচ্ছে—তার রপ্তানী কর ব্যাপকভাবে কমাতে হবে।

তিন, যে সব উৎপাদক নিজেরাই রপ্তানীকারক, তাঁদের ক্ষেত্রে ট্যাক্স ক্রেডিট সার্টিফিকেট আবার চালু করতে হবে।

চার, পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশ কর নামে যে কর আছে তা বাতিল করতে হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা :

আকাশ ছোঁয়া (বাঙলা) : চলচ্চিত্রায়ণ-এর নিবেদন; ৪,২৬৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : রেণুকা ঘোষ ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রাজেন তরফদার; কাহিনী : মহাশ্বেতা দেবী; সঙ্গীতপরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত; গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ; চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : দুলাল দত্ত এবং অরবিন্দ ভট্টাচার্য; নেপথ্য-কণ্ঠসঙ্গীত : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল চক্রবর্তী; রূপায়ণ : দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, পারিজাত বসু, প্রশান্তকুমার, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ রায়, অবনী চট্টোপাধ্যায়, রাম চৌধুরী, সুপ্রিয়া দেবী, ছায়া দেবী, বিনতা রায়, শিখা ভট্টাচার্য, সীতা মুখোপাধ্যায়, মাস্টার স্বপন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১৬ই জুন, শুক্রবার রাধা, পূর্ণ, পূরবী, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

না, কোনও বৈমানিকের কাহিনী নয়, চলচ্চিত্রায়ণ-এর প্রথম প্রয়াস "আকাশ ছোঁয়া" গড়ে উঠেছে একজন চৌকস ক্রীড়াবিদের সুখী জীবনযাত্রার জন্যে দুরন্ত প্রচেষ্টাকে ঘিরে। অজিত বসু ছিল একজন অলরাউণ্ড অ্যাথেলেট—দৌড়, সাঁতার, সাইকেল চালনা, মোটর-সাইকেল চালনা প্রভৃতিতে সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কত যে মেডেল, কাপ, শীল্ড সে জিতেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই গুণকে সম্বল করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তা সে শীঘ্রই বুঝতে পারল। ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড় হলে আজকাল অনেক অফিসে চাকরী মেলে, কিন্তু দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, সাইকেল বা মোটার-সাইকেল চালনায় দক্ষতা অন্ন-সংস্থানে তেমন সহায়ক নয়। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অজিতকে চাকরী নিতে হল সার্কাসে—মোটর-সাইকেলে চেপে জীবন-বিপন্ন-করা 'ডেথ জাম্প' (মৃত্যুলম্ফ) খেলা দেখাবার জন্যে। একদিন এই খেলা দেখাবার পূর্বমুহূর্তে সে খবর পেল তার আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। বিচলিত মন নিয়ে খেলা দেখাতে গিয়ে খেলার শেষে সে গুরুতরভাবে আহত হল এবং এই আঘাতের ফলে সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। তার সার্কাসের বন্ধু শিশির তারই সনির্বন্ধ অনুরোধে ইতিমধ্যে তারই পরিবারভুক্ত একজন হয়ে তারই সঙ্গে বাস করছিল। তখন অজিতের দুর্দিনে সেই তাদের সংসারের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নিজের এই অকর্মণ্যতা ও

তিন অধ্যায় চিত্রের সেটে সুপ্রিয়া দেবী, অজয় গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। ফটো : অমৃত
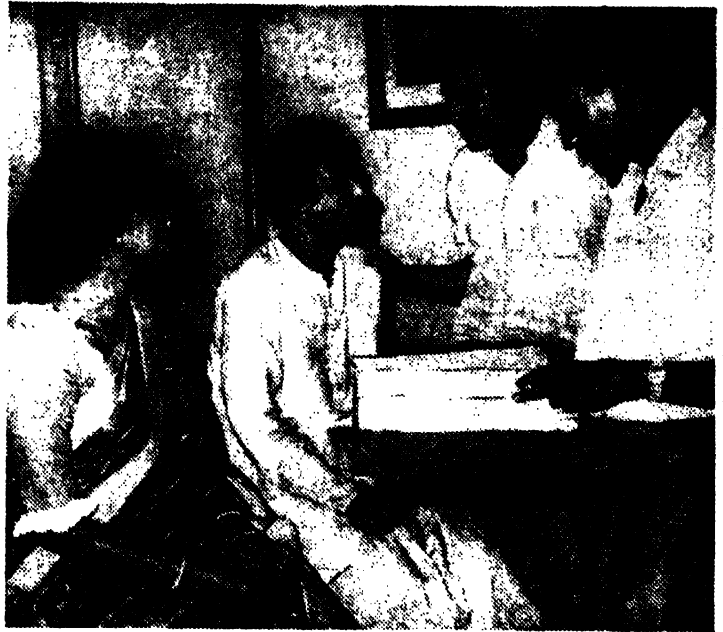
মহাশ্বেতা চিত্রের সেটে অঞ্জনা ভৌমিক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী অমল সরকার। ফটো : অমৃত

পরমুখাপেক্ষিতা অজিতকে ক্রমেই হীনমনা করে তুলল; সে তার উদারচেতা বন্ধু শিশির ও তদ্গতপ্রাণা স্ত্রী মিনতির মধ্যে একটি অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠছে কল্পনা করে অন্তরে দগ্ধ হতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত রূঢ়ভাবে দু'জনকেই অপমান করে বসল। শিশির তার বন্ধুর মানসিক পরিবর্তন দেখে ক্ষুব্ধ হল এবং দুঃখিতচিত্তে ওদের সংসার থেকে বিদায় গ্রহণ করল। এর পর মিনতি এককভাবেই সংসারতরণীটিকে কোনো ক্রমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সে দেখল, অতীতের গৌরবকে আঁকড়ে ধরে অজিত তার মদ খাওয়ার মাত্রাকে বাড়িয়ে চলেছে এবং তাদের শিশুপুত্রের কাছে নিজেকে একজন বীররূপে প্রতিপন্ন করছে, তখন সে অজিতকে অপমান করে বাড়ীর বার করে দিল। জীবনযুদ্ধে পরাজিত অজিত যখন আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন কি বিচিত্র উপায়ে সে আবার নিজের ওপর বিশ্বাসকে ফিরিয়ে

গেল, তাই বিধৃত হয়েছে ছবির শেষের দিকের উত্তেজক দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে।

গতানুগতিকতাকে পরিহার করে সার্কাসের অভিনব পটভূমির ওপর কাহিনীটি রচিত হয়েছে বলে "আকাশ ছোঁয়া"র মধ্যে দর্শকরা একটি ভিন্নজাতের রস আস্বাদন করতে পারবেন। এমন কি, সার্কাসের রোমহর্ষক ট্রাপিজের খেলাটি একটি উপকাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ বলে দর্শক-মনে একটি আশ্চর্য সাসপেন্সের সঞ্চার করে। এ ছাড়া মূল কাহিনীটির একটি আবেগপ্রধান আবেদন তো আছেই। সার্কাসের পটভূমিকাটি, বলা বাহুল্য, বাঙলা ছবিতে এই প্রথম ব্যবহৃত হল এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা, কোথাও সার্কাসের দৃশ্যগুলিকে অবান্তর বলে বোধ হয়নি, বরং সবটাই পরম উপভোগ্য মনে হয়েছে।

মিনতির ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবী একটি আন্তরিক অভিনয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন তুলে ধরেছেন। চরিত্রটির আনন্দ-বেদনাকে তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন। নায়ক অজিত চরিত্রে দৃশ্য-প্রযোজক দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে বাস্তবানুগ। জীবনে ব্যর্থতা, স্ত্রী ও বন্ধু সম্পর্কে সন্দেহ, নিজের হৃতশক্তিকে ফিরে পাওয়ার

আনন্দ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদারচেতা, বন্ধুবৎসল, 'জমিক জায়ান্ট' সিশির দাসের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়গুণে। সার্কাস-মালিক কর্মবিহারী সিংহের (সাহার?) ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। ট্রাপিজের খেলোয়াড় রঞ্জনাথের চরিত্রটিকে মর্যাদা দিয়েছেন পারিজাত বসু। ধনী ব্যবসায়ী ত্রিদিবের চরিত্রটি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন প্রশান্তকুমার। গৃহস্বামীর স্ত্রীর দরদী চরিত্রটি মূর্ত হয়ে উঠেছে ছায়া দেবীর অভিনয়গুণে। এ-ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে চারুপ্রকাশ ঘোষ (মিনতির বাবা অবনী রায়), শিখা ভট্টাচার্য (ট্রাপিজকুইন সিন্থিয়া), মন্মথ মুখোপাধ্যায় (সার্কাস-ম্যানেজার দাশরথি), অরুণ রায় (রায় বাহাদুর), মাস্টার স্বপন ভট্টাচার্য (বাবু) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন দীনেন গুপ্ত। সার্কাসের দৃশ্যগুলির থ্রিলটিকে যেমন সুকৌশলে তিনি ক্যামেরায় বন্দী করেছেন, তেমনই শিশুর জন্মমুহূর্তে প্রসূতির যন্ত্রণাকেও তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। কাহিনীর ভাবপরিবেশকে এমন-ভাবে ক্যামেরার সাহায্যে পরিস্ফুট করা কচিৎ দেখা যায়। ছবির দৃশ্যাদির সংস্থাপনে শিল্পনির্দেশক রবি চট্টোপাধ্যায়ের সচেতন মানসিকতা লক্ষণীয়। সম্পাদনা ছবির লয়কে নিপুণভাবে ধরে রেখে একটিও মুহূর্তকে ঢিমে হতে দেয়নি। ছবিতে দু'খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে "পথের শেষ কোথায়" গানটি সুপ্রযুক্ত। আবহ-সঙ্গীত রচনায় অভিনবত্ব শ্রুতিকে আকর্ষণ করে।

চলচ্চিত্রায়ণ নিবেদিত ও চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত "আকাশ ছোঁয়া" সার্কাসের পটভূমিকায় রচিত বলে দর্শকদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে।

●

আসরা (হিন্দী) : সেভেন আর্টস পিকচার্স-এর নিবেদন; ৪,৫৭২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : মদন মোহলা; পরিচালনা : সত্যেন বসু; কাহিনী : শ্রীমতী প্রতিভা বসু; চিত্রনাট্য : নবেন্দু ঘোষ; সংলাপ : গোবিন্দ মুনীস; সঙ্গীতপরিচালনা : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল; গীতরচনা : আনন্দ বক্সী; চিত্রগ্রহণ : মদন সিংহ; শব্দানুলেখন : কে, এস, রাণে; সঙ্গীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা : জি, এল, যাদব; সম্পাদনা : লছমনদাস; নৃত্যপরিচালনা : লচ্ছু মহারাজ ও বদ্রীপ্রসাদ; নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত : লতা মঙ্গেশকার, মোহম্মদ রফী, আশা ভোঁসলে এবং উষা মঙ্গেশকার; রূপায়ণ : মালা সিংহ, বিশ্বজিৎ, বলরাজ সাহনী, নিরূপা রায়, অমিতা, জগদীপ, ডেভিড, পরভীন পাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, বেলা বসু, লক্ষ্মীছায়া, বেবী ফরিদা, সবিনা, সুনীতা প্রভৃতি। দোসানী ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় গত ১৬ই জুন, শুক্রবার থেকে সোসাইটি প্রিয়া, বীণা, পূর্ণশ্রী, রূপালী, ইণ্টালী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে এম, এম, প্রোডাকসন্স-এর হয়ে প্রতিভা বসু রচিত "মধ্যরাতের তারা" কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়েছিলেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়; সেভেন আর্টস পিকচার্স নিবেদিত ও সত্যেন বসু পরিচালিত "আসরা" তারই হিন্দী সংস্করণ। একটি নিরাশ্রয়া সর্বগুণ-সম্পন্না মেয়ে তার এক দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রায় দাসীর মতোই থাকত। সেই বাড়ীর উগ্র আধুনিকা বড়ো মেয়ের যে-ডাক্তার যুবকের সঙ্গে বিবাহের আশায় বাড়ীর কর্তাগিন্নী কোমর বাঁধছিলেন, সেই যুবকটির মন কিন্তু ঐ নিরাশ্রয় মেয়েটির দিকে ধাবিত হয়। ভালোবাসাবাসির কথা গোপন রেখেই ছেলেটি উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলাত যাত্রা করে। এ-দিকে ঐ বাড়ীর এক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের মামা মেয়েটির সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়। মেয়েটি তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে প্রকাশ পায় সে অন্তঃসত্ত্বা। কে যে তার এই অবস্থার জন্যে দায়ী, এ-কথা সে কিছুতেই প্রকাশ করল না, তখন তার প্রতি-প্রথম-থেকেই-বিরূপ আশ্রয়দাত্রী তাকে রীতিমত প্রহার করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মেয়েটি এসে উঠল সেই ডাক্তার-যুবকের পিত্রালয়ে। যুবকটির মা তার প্রতি আগে থাকতেই সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন; কিন্তু যখন তিনি জানলেন, মেয়েটি মা হতে চলেছে, তখন তিনি তাকে কোনো অনাথ আশ্রমে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু যুবকটির বাপও ছিলেন একজন বিজ্ঞ ডাক্তার। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির যখন সবচেয়ে বেশী পরিচর্যার প্রয়োজন, তখনই তাকে নির্মমভাবে দূরে সরিয়ে দেবার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারলেন না। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল এবং সস্ত্রীক ডাক্তারের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হতে লাগল। কিন্তু ডাক্তারবাবু তাঁর সংকীর্ণমনা বিবাহিতা কন্যার অনুযোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ছেলের মাকে গোপনে অন্য এক আশ্রয়ে রেখে ঘোষণা করে দিলেন যে, সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। অবশেষে ডাক্তার ভদ্রলোকের যুবক-সন্তান যখন বিলাতের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে শুনল, তার দরিদ্র সন্তানের জন্ম দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তখন সে সেই সন্তানকে বুকে পাবার জন্যে কেন অমন করে আকুল হয়ে উঠল, সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করে ছবির সমাপ্তিপর্ব রচিত হয়েছে।

চিত্রনাট্য সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। কোনো একটি সাধারণ গার্হস্থ্য চিত্রে সাসপেন্স—উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবার জন্যে রহস্যচিত্রের (mystry thriller) রীতি অবলম্বন করা কি যুক্তিযুক্ত? একটি রহস্যচিত্রে হত্যাকারী কে, এই জিজ্ঞাসাকে দর্শকমনে একেবারে শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ, তা না করলে ছবির আকর্ষণটাই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু এই যে 'আসরা'-তে মেয়েটি

নাবিক গোষ্ঠী পরিচালিত **দিবরাত্রির কাব্য** চিত্রের একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী ও অঞ্জনা ভৌমিক। ফটো : অমৃত

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জন্যে দায়ী কে, এ প্রশ্ন কি দর্শকমনে জাগিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন ছিল সাসপেন্স সৃষ্টির জন্যে? আমাদের মনে হয়, দর্শক যদি আগে থাকতেই ব্যাপারটা জানত, তাহলে সে মেয়েটির এই নীরবতাকে ঢের বেশী তাৎপর্যপূর্ণ মনে করত এবং আগ্রহান্বিত-চিত্তে অপেক্ষা করত, কবে, কখন এবং কিভাবে রহস্যটি উদ্ঘাটিত হবে অন্যান্য চরিত্রদের সামনে এবং দর্শকের এই আগ্রহান্বিত অপেক্ষাই হচ্ছে যথার্থ সাসপেন্স সৃষ্টি। অনর্থক জগৎমামারূপে দুর্বৃত্ত চরিত্রেও সৃষ্টি হত না এই ঘটনাকে রহস্যাবৃত রাখবার জন্যে।

অভিনয়ে নায়িকা শোভার চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছেন মালা সিংহ। তার স্বাভাবিক মিষ্টতা, অনুরাগ, অভিমান, সন্দেহ, সহনশীলতা প্রভৃতি প্রতিটি ভাব তিনি স্বচ্ছন্দভঙ্গীতে পরিস্ফুট করেছেন। নায়ক অমরের বেশে বিশ্বজিৎ বেশ সাবলীল অভিনয় করেছেন। অমরের সদাশয় পিতা সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাটিকে স্মরণীয় করে রাখলেন বলরাজ সাহানী তাঁর অনবদ্য অভিনয়গুণে। অমরের মামার চরিত্রে নিরুপা রায় অত্যন্ত দরদী প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। বিশ্বম্ভরের ভূমিকায় ডেভিড অনাড়ম্বর স্বাভাবিক অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বিশ্বম্ভরের আধুনিকা কন্যা-রূপে অমিতাকে বেশ উগ্রস্বভাবা গায়ে-পড়া মেয়ে বলে বোধ হয়েছে। জগৎমামাবেশে দীপক মুখোপাধ্যায় যেন ক্রুরতার প্রতিমূর্তি। হাস্যময় হরিশরূপে জগদীপ অত্যন্ত উপভোগ্য অভিনয় করেছেন। বিশ্বম্ভরের অপরা কন্যা সোনার ভূমিকায় বেবী ফরিদা প্রাণবন্ত। বিশ্বম্ভরের স্ত্রী রূপে পারভীন পাল অত্যন্ত সু-অভিনয় করেছেন। বেলা বসু ও লক্ষ্মীছায়ার নৃত্য কিন্তু বড্ডবেশী মঞ্চঘেঁষা।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর পরিচ্ছন্ন। ছবির ছ'খানি গানের মধ্যে "দইয়ারে দইয়া", "তুম্ কোন্ হো বাতাও", "মেরে শুনে জীবনকা আসরা হায় তু" গান তিনখানি সুলিখিত, সুগীত, সুরসমৃদ্ধ ও সুপ্রযুক্ত।

সেভেন আর্টস পিকচার্স-এর "আসুর" কাহিনী এবং অভিনয়গুণে জনসমাদৃত হবে।

—নান্দীকর

'পঞ্চশর' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত ফিল্ম ক্র্যাফটের 'পঞ্চশর' ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে বিধৃত এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সুমিতা সান্যাল, অনুভা গুপ্তা, কণিকা মজুমদার ও জহর রায়। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছায়ালোক ছবিটির পরিবেশক।

'দুষ্টু প্রজাপতি' মুক্তি আসন্ন

সবিতা চট্টোপাধ্যায় নিবেদিত ও কৌশল ব্যানার্জি প্রযোজিত ললিত চিত্রমের মিষ্টি ছবি 'দুষ্টু প্রজাপতি' মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও শহরতলীর অন্যান্য বহু চিত্র-গৃহের পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে মুক্তি প্রতীক্ষিত। শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান

শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দুলারী দুলাকাং চিত্রের সেটে লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, সহকারী ক্যামেরাম্যান কে, এ, রেজা এবং শবনম। ফটো : অমৃত

করেছেন কিশোরকুমার, তনুজা, সবিতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, কানু রায়, অসীমকুমার, কেষ্ট মুখার্জি, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, ভারতী দেবী, মাঃ শান্তনু, সুরেখা পণ্ডিত, কবিতা বসু, রুমা গোস্বামী প্রভৃতি।

সংগীতাংশ ছবিটির অন্যান্য অনেক আকর্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। হেমন্তকুমার মুখার্জী সুরারোপিত ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন—কিশোরকুমার, রাণু মুখার্জি, নীলিমা চ্যাটার্জী ও হেমন্তকুমার মুখার্জী।

বোম্বাই-এ নির্মিত ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—বাণীশ্রী পিকচার্স।

কল্পনা প্রোডাকশন্সের 'নারী ও পৃথিবী'

কল্পনা প্রোডাকশন্সের 'লতার স্বপ্ন' চিত্রের নতুন নাম 'নারী ও পৃথিবী'। এ ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা এবং প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন শ্রীমতী কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমিতা সান্যাল, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, উপমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত ও বেবী গুপ্তা, নিভাননী ও ভারতী দেবী।

রামকৃষ্ণ পিকচার্সের 'হাসতে মানা'

সম্প্রতি ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে রামকৃষ্ণ পিকচার্সের নতুন ছবি 'হাসতে মানা'র সঙ্গীতগ্রহণ সুসম্পন্ন করেন সঙ্গীত-পরিচালক হৃদয় কুশারী। কণ্ঠদান করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও শিপ্রা বসু। এ ছবির প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির পরিচালক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী।

সেভেন স্টার প্রোডাকশন্সের 'টুকরো টুকরো হীরে'

সেভেন স্টার প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি 'টুকরো টুকরো হীরে'র কাজ বর্তমানে শুরু করেছেন পরিচালক পরিতোষ দাশগুপ্ত। কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অনুপকুমার ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ-কে বির "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" :

এ-কে-বি ফিল্মস-এর নির্মীয়মান চিত্র 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ'র স্যুটিং পরিচালক দীপক গুপ্তের নির্দেশনায় এগিয়ে চলেছে। নাম-ভূমিকায় দিলীপ রায় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে এই মহান চরিত্রের রূপদান করছেন। অপরাপর ভূমিকায় রাজা মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, পদ্মা দেবী প্রভৃতি শিল্পী ইতিমধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। "সুভাষচন্দ্র"-এর প্রযোজক এ, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইটি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

"ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত

পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচিতি, না পুত্রের খ্যাতিতে পিতার পরিচয়? বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ট্রায়ো ফিল্মস্-এর "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" ছবির শ্যুটিং যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের মনেই এই একই জিজ্ঞাসা। সকলেই প্রশ্ন করছেন ছোট্ট প্রসেনজিৎ এ ছবিতে যে অসাধারণ অভিনয় করেছে, তা বিশ্বজিৎ-এর দীর্ঘদিন সাধনালব্ধ অভিনয় নৈপুণ্যকে ম্লান করে দেবেনা ত'?

বোম্বাই-এর বিখ্যাত সম্পাদক-পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। বোম্বাই-এ ছবিটির সম্পাদনার কাজ চলছে, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ছবিটির কাহিনী ও গীতরচনা করেছেন। সুরসৃষ্টি করেছেন নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও নীতা সেন।

ছবিটির বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন—প্রসেনজিৎ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গীতা, দে, সুরুচিবালা সেনগুপ্তা, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, সংগীতা কর, প্রতিমা চক্রবর্তী, সীমা জানা, শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি।

স্কাপস্ ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

হিন্দী ছবির নায়িকা অপর্ণা দাশগুপ্তা

বাংলাদেশের তরুণ নায়িকা অপর্ণা দাশগুপ্তা সম্প্রতি দেবী মুভিজের পরবর্তী ছবির নায়িকা হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন। নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন জীতেন্দ্র। ছবিটি পরিচালনা করছেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। হেমন্তকুমার ছবিটির সুরকার।

এছাড়া শ্রীমতী দাশগুপ্তা পুষ্প পিকচার্সের আগামী ছবির নায়িকা হিসেবে আর একটি ছবিতে মনোনীত হয়েছেন। এ ছবির নায়ক চরিত্রে থাকছেন জীতেন্দ্র।

'ইসক পর জোর নেহি' চিত্রে ধর্মেন্দ্র-সাধনা-বিশ্বজিৎ

পরিচালক রমেশ সাইগল তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'ইসক পর জোর নেহি'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, সাধনা, বিশ্বজিৎ ও মেহমুদ। এস ডি বর্মণ ছবিটির সুরকার।

সমাপ্তপ্রায় চিত্র 'তমান্না'

কে পি আত্মা পরিচালিত রঙিন ছবি 'তমান্না' সমাপ্তপ্রায়। সুরজ প্রকাশ প্রযোজিত এ ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রাবলীর নাম হল মালা সিনহা, বিশ্বজিৎ, নাসির হুসেন, দেবেন বর্মা, নাজিমা, সজ্জন, আগা, সুলচনা এবং অচলা সচদেব। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

'পাথর কে সামনে' চিত্রের নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান

রাজা নাওয়াথে পরিচালিত 'পাথর কে সামনে' চিত্রের চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন হচ্ছে। প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন ওয়াহিদা রেহমান, মনোজকুমার, মুমতাজ, মেহমুদ, প্রাণ, রাজ মেহেরা, ললিতা পাওয়ার ও অরুণা ইরাণী। [illegible]-

প্যারেলাল সুরসৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছেন।

'লাট সাহেব' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

ইণ্টারন্যাশন্যাল এণ্টারপ্রাইজের রঙীন ছবি 'লাট সাহেব' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। হরি ভালিয়া পরিচালিত ছবিতে অভিনয় করেছেন, শাম্মিকাপুর, নূতন, ললিতা পাওয়ার, প্রেম চোপরা, ওমপ্রকাশ ও রাজেন্দ্রনাথ। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন।

'কাঁহি' দিন কাঁহি রাত' চিত্রে বিশ্বজিৎ-স্বপ্না

প্রযোজক-পরিচালক দর্শন তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'কাঁহি' দিন কাঁহি' রাত-এর অন্তর্দৃশ্য শুরু করেছেন ফিল্মালয় স্টুডিওয়। ও, পি নায়ার সুরকৃত এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ, স্বপ্না, মমতাজ, জনিওয়াকর, ধূমল এবং প্রাণ।

ডিভিসনাল স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড, কলিকাতা টেলিফোনস্

এই সংস্থাটির প্রযোজনায় আন্তঃ-কলিকাতা টেলিফোনস ২য় বার্ষিক একাংক নাট্যোৎসব সুসম্পন্ন হল গত ১৭ই থেকে ২০শে মে টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে। নাট্যোৎসবে যোগদান করেছিল কলকাতা টেলিফোনসের সাতটি ক্লাব সংস্থা। অনুষ্ঠানটি টেলিফোনের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে এক বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে এবং জনসমাগমও প্রচুর হয়। অনুষ্ঠানের প্রধানতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিভাগীয় কর্মীদের রচিত চারটি নাটক পরিবেশনা। শ্রেণীসংগ্রাম ও জীবনসংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত বিভিন্ন নাটক পরিবেশনার মধ্যে টেলিফোনের সাংস্কৃতিক কর্মীরা আজকের গণনাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্তাই সংগ্রামী অভিনন্দনযোগ্য। উৎসবান্তে প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ও প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা শ্রীজোছন দস্তিদার বর্তমান গণনাট্য আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। আমরা ডিভিসনাল স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকবৃন্দকে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

উৎসবের ফলাফল—শ্রেষ্ঠ দল—টেলিফোন ভবন ইউনিট—'মিছিল'; ২য় শ্রেষ্ঠ দল—বড়বাজার ইউনিট—"অনিবার্য কারণবশতঃ"; শ্রেষ্ঠ পরিচালক—শ্রীদীপক রায়চৌধুরী অনিবার্যকারণবশতঃ; শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—শ্রীদীপক রায়চৌধুরী, অনিবার্যকারণবশতঃ; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীশচীন চক্রবর্তী—"মিছিল"; অভিনেত্রী—শ্রীমতী অনিমা মুখার্জি—"প্রতীত"; সহ-অভিনেতা—শ্রীঅরুণ দত্ত—"আর দেরী নয়" ও সহ-অভিনেত্রী—শ্রীমতী মালবিকা মজুমদার—"আর দেরী নয়"।

রূপরঙ্গ (সৌখিন নাট্য সংস্থা)

সম্প্রতি বাঁকুড়ার আরেঙ্গার মুক্তাঙ্গনে রূপরঙ্গ শিল্পীরা মঞ্চস্থ করলেন গঙ্গাপদ বসুর 'মহাশ্বেতা নিপাত' ও সলিল চ্যাটার্জির 'মনোবীক্ষণ'। এই তিনমঞ্চের নাটক দুটির পরিচালক ছিলেন সলিল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সুন্দর উপস্থাপনা ও দলগত অভিনয়ের গুণে দর্শকের যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। শিল্পীদের মধ্যে সলিল চ্যাটার্জি, সুপ্রতিম মুখার্জি ও ফুলচাঁদ সরাফ নিখুঁত চরিত্র-সৃষ্টির জন্যে দর্শকের সাধুবাদ আদায় করে নেন। অন্যান্য ভূমিকায় প্রতিমা চক্রবর্তী, সত্য ব্যানার্জি, ফণী সেন, পূর্ণ ভট্টাচার্য, বিমল গুহ, নারায়ণ রায়, রাধাশংকর দাস, মাঃ অলোক ও বেবী মুনমুন সুন্দর অভিনয় করেন।

এলেম নতুন দেশে

আকস্মিকভাবে কয়েকজন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ হঠাৎ এসে পেঁছায় এক অজানা দেশের দ্বারপ্রান্তে। সেই মানুষগুলির অজানা দেশে অবস্থানকালের কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিচিত্র বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত নাটক **এলেম নতুন দেশে** রঙ্গশ্রী গোষ্ঠীর নবতম প্রযোজনা। মননশীল নাট্যরসিক মহলে ইতিমধ্যেই এ নাটকটি সাড়া জাগিয়েছে। রচনাকৃতিত্ব রমেন লাহিড়ীর। রঙ্গশ্রী গোষ্ঠী এ নাটকের পুনরাভিনয় করলেন গত ২২শে জুন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। পরিচালনায় দায়িত্বও নাট্যকারের।

দুটি ভিন্নসুরের নাটক

নাট্যকার বসন্ত ভট্টাচার্য রচিত "পরম পুরুষ" ও "ডিস্‌মিস্" সম্প্রতি বিশ্বরূপার অভিনয় করলেন কল্পতরুর সদস্যবৃন্দ। শিক্ষা সমস্যার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পণপ্রথা বিলোপের আশু কার্যকরী ব্যবস্থা যথাক্রমে দুটি নাটকের মধ্যে ব্যঙ্গ ও রঙ্গ মাধ্যমে উপস্থাপনা এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ সংস্থাকে নাট্যরসিক মহলে আরো সুপরিচিত করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। চরিত্রানুযায়ী সু-অভিনয়ে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন তাঁরা হলেন, সাধন দত্ত, বসন্ত ভট্টাচার্য, শম্ভু দাঁ, রাজকুমার বসু ও নমিতা দাস। এ ছাড়া কাজল বর্ধন, বিশ্বনাথ বসাক, হিতব্রত সাহা, প্রদ্যুৎ রায় ও বিমল অধিকারীকেও দর্শকের ভালো লাগে। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটি পরিচালনা করেন।

লোক-তীর্থের একাংক মেলা

২৩শে জুন সন্ধ্যা ৭টায় মুক্ত অঙ্গনে দক্ষিণ কলকাতার লোকতীর্থ নাট্যগোষ্ঠীর একটি একাংক মেলা অনুষ্ঠিত হবে। একাংক মেলায় সুনীত মুখোপাধ্যায় রচিত "জংশন স্টেশন", বিমল দে রচিত "চিঠি" এবং অশোক সরকারের "চুমকী" অভিনীত হবে। এই তিনটি ভিন্নস্বাদের নাটক পরিচালনা করবেন বিমল দে।

মধ্যপ্রদেশে বাঙলা নাট্যানুষ্ঠান

মধ্যপ্রদেশ, জব্বলপুর খামারিয়ার খ্যাতনামা "শিল্পশ্রী" ক্লাব তাদের পঞ্চদশ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৫ই জুন গোবিন্দ দের পরিচালনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "অন্বেষণ" গল্পটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি দর্শকবৃন্দ দ্বারা অভিনন্দিত হয়। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বশ্রী শিশির রায়, গোবিন্দ দে, রঞ্জিত বিশ্বাস, গোবিন্দ সরকার, দীপু সরকার, অনিল ভট্টাচার্য, এ, পি, দাশগুপ্ত, নারাণ রায়, অশেষ চৌধুরী, সজীব বিশ্বাস, নিশিথ ব্যানার্জি, বিজয় মালাকার ও কুমারী মায়া মুখার্জি।

এছাড়া এই উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য দিন নাচ, গান ও নাটকের দ্বারা প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলার সাহিত্য ও শিল্প-কলাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

নাট্য সম্মেলন ও আলোচনাচক্র

বিগত ১০ই মে তারিখে উত্তর কলিকাতাস্থিত বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে স্বামী অভেদানন্দ জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের উদ্যোগে এক চিন্তা-কর্ষক নাট্যবিষয়ক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান

অগ্রদূত গোষ্ঠীর (বাঁকুড়া) **ঝিন্দের বন্দী** নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্তে স্বরূপ দত্ত, অসিত জরিপা ওঅরুণ মিত্র।

হয়। এই আলোচনাচক্রে যোগদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডক্টর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়।

আলোচনার উদ্বোধন করে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার জনমানসের উপর যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানগুলির এককালীন সুগভীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং কীভাবে গত একশত বৎসর কালের মধ্যে জাতীয় জীবনের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে বাংলা নাট্যশালা ও বাংলা নাটক গড়ে উঠেছে তার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। ডক্টর সাধন ভট্টাচার্য তাঁর বক্তৃতায় বর্তমান নাট্যশালাগুলির অতিরিক্ত ব্যবসায়িক প্রবণতায় প্রভাব যাতে অচিরে বন্ধ হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত হতে বলেন।

সভাপতি মহাশয় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগম্ভীর ভাষণে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অশেষ দুঃখদুর্দশার চিত্রটি তুলে ধরেন এবং এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণলাভের চেষ্টায় বাংলার নাট্যশালাগুলিরও বিশেষ করণীয় আছে। তিনি নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তর মূল্যবোধগুলির উজ্জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আলোচনা-অন্তে স্বামী অভেদানন্দ শতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সমাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর শ্রীমন্মথ রায় রচিত 'রামকৃষ্ণ-অভেদানন্দ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

নাটকের পরিচালনা করেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সহযোগিতা করেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। নাট্যানুষ্ঠান অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছিল।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন জহর গাঙ্গুলী, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, রূপক মজুমদার, শ্রীমতী অপর্ণা দেবী, শ্রীমতী বাসন্তী চ্যাটার্জি ও শ্রীমতী প্রিয়া চ্যাটার্জি। অভিনয়-শেষে শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপহার প্রদান করা হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র উপহার বিতরণ করেন।

অগ্রদূত গোষ্ঠীর নাট্যাভিনয়

বাঁকুড়ার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা "অগ্রদূত"-গোষ্ঠী সম্প্রতি উৎপল দত্তের "ফেরারী ফৌজ" এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঝিন্দের বন্দী" নাটক দুটি স্থানীয় হাজরা মন্ত্রাঙ্গনে আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে বর্তমান যুগের নাট্যপরীক্ষা-নিরীক্ষায় এক উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি রেখেছে।

সুপরিচিত চিত্রশিল্পী জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই দুই নাটকের প্রয়োগ-রীতি ও বলিষ্ঠ দলগত অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। নাটক দুটির মূল রসকে দর্শকমনে সঞ্চারিত করতে অসিত দরিপা, শমিতা বিশ্বাস, অরুণ মিত্র, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, রাজেন দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়, চন্দনা সেন ও ফুলচাঁদ সরাফের চরিত্রচিত্রণ অবিস্মরণীয়।

এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন সাধন সেনগুপ্ত, বাসুদেব সেন, দীপক চ্যাটার্জি, ভবতোষ ঘটক, রামমোহন মুখোপাধ্যায়, দুঃখভঞ্জন দত্ত, চিত্ত সরকার, অশ্বিনী কর্মকার, গঙ্গা গোস্বামী, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ কুণ্ডু, অর্ধেন্দু রক্ষিত, ফণিভূষণ সেন, গীতা প্রধান, অসিত সামন্ত, করুণাশংকর দরিপা ও বাসুদেব রায়।

সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের 'শুরুতেই শেষ'

গত ২১শে মে শিলিগুড়ি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যবৃন্দ মিত্র সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে 'শুরুতেই শেষ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সৌমেন চক্রবর্তী, গীতা বর্ধন, শ্যামল এবং দেবাশীষ।

গিরিশ নাট্যসংসদের নাট্যোৎসব

বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উত্তর কলিকাতার গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক আগামী জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ সংসদসভ্যবৃন্দ কর্তৃক মহাকবির 'জনা' নাটক অভিনয়। নাটকখানিকে নবভাবে রূপায়ণের জন্য সভ্যগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অভিনয় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন

নাট্যভারতীর **হে অতীত কথা কও** নাটকে বিশ্বমর্দন ও মৃগাঙ্কের ভূমিকায় ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও প্রবীরকুমার

শ্রীসতীশ দত্ত, শ্রীধীরেন চক্রবর্তী এবং প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতপরিচালনা করবেন শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামী। অপর দুইখানি নাটকের নাম পরে বিজ্ঞাপিত হবে।

অগ্রণী গোষ্ঠীর নাট্যোৎসব

প্রতাপ মেমোরিয়্যাল হল-এ উত্তর কলকাতার অগ্রণী নাট্যগোষ্ঠী শ্রীশচীন ভট্টাচার্য রচিত 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। দীর্ঘকাল নীরবতা পরে এঁরা আবার নাট্যপ্রযোজনা শুরু করেছেন।

নাটকটির আখ্যানভাগ দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা ও অর্থগত সমস্যার কেন্দ্রে নির্মিত। কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ক্রমক্ষীয়মান একটি পরিবার। দলগত অভিনয় মোটামুটিভাবে উচ্চমানে সম্পন্ন। একক অভিনয়ে শ্রীকানু ভট্টাচার্যের সত্যব্রত-চরিত্র রূপায়ণ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। বিকৃতমস্তিষ্ক চরিত্রটিতে তিনি যদি অতিনাটকীয়তা বর্জন করতে পারতেন, তাহলে তাঁর অভিনয় অধিকতর সফল হত। সোমেনের ভূমিকায় শ্রীযজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর অভিনয় পরিমিতবোধে উজ্জ্বল। অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী নির্মালা রায়, শঙ্কর চক্রবর্তী, সুকুমার হালদার ও রেণু ঘোষের অভিনয় প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

শূদ্রকের শেষরক্ষা অভিনয়

আগামী ২৪শে জুন '৬৭ 'শূদ্রক' কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষরক্ষা' রবীন্দ্র-ভারতী মঞ্চে অভিনীত হবে। অভিনয়ে থাকবেন বাদল সমাদ্দার, মল্লিকা সোম, রূপেন ভট্টাচার্য, শিখা সেন, শ্যামল রায়চৌধুরী, সুভদ্রা চক্রবর্তী, সন্দীপ সোম, মানিক বসু, লালা সোম ও আরও অনেকে।

বিবিধ সংবাদ

'অ্যাণ্টনী কবিয়াল'-এর শততম রজনীর স্মারক-উৎসব :

গেল বুধবার, ১৪ই জুন নান্দিকর নাট্য-সম্প্রদায় মানিকতলা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তাঁদের বিজয়বৈজয়ন্তী "অ্যাণ্টনী কবিয়াল"-এর শততম রজনীর স্মারকোৎসব পালন করলেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং প্রসিদ্ধ কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী। যথারীতি সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণের সঙ্গে এই জনপ্রিয় নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চমায়াকর, নেপথ্য-কর্মী প্রভৃতি সকলকেই নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়।

শিশুস্বর্গ

শিশু প্রতিভার বিকাশ, কিম্বা বলা যায়, নাচবে এরা, গাইবে এরা, অভিনয় করবে নাটিকা। আর ওই সঙ্গে তারা জানবে, শিখবে, তাদের মনোমত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একে স্বাবলম্বনময় করে তোলা। এরকম একটি আনন্দ জগতের স্থায়ী ব্যবস্থার দাবী আজও ওঠেনি, তবে নাট্য সম্মেলন এরকমই একটি জগৎ তৈরী করে ফেলেছেন প্রতি সপ্তাহে মহাজাতি সদনে।

ডঃ গোল্ডফুট অ্যাণ্ড দি বিকিনি মেশিন চিত্রের দৃশ্য।

নতুন এ জগতের নাম 'শিশুস্বর্গ'। এখন থেকে প্রতি রবিবার সকালে ওই আনন্দের মেলা বসবে মহাজাতি সদনে।

সম্প্রতি এই আনন্দ আসরের উদ্বোধন হল নাট্য সম্মেলন ও মহাজাতি সদন অছি পরিষদের যুগ্ম প্রচেষ্টায়।

দশজন শিশু শিল্পী নাচ, গান, আবৃত্তি করে শোনায় (প্রতি সপ্তাহে এমন দশজন শিশু শিল্পীকে নিয়মিত সুযোগ দেওয়া হবে)। তাছাড়া দর্জিপাড়া শিশু সংঘের শিল্পীরা ব্রতচারী নৃত্য ও নাটিকা 'বিনি পয়সার ভোজ' অভিনয় করে। সবশেষে কার্টুন চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। শুরু থেকে শেষ অবধি প্রেক্ষাগৃহে শিশু ও তাদের অভিভাবকেরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করেন।

পরবর্তী অনুষ্ঠান আগামী ২৫ জুন, সকাল ৯টায়। অনুষ্ঠান সূচীতে থাকবেন শ্রীযোগেশ দত্ত, সনৎ সিংহ আর নাটক 'নটীর পূজা' করবে বরানগর কিশোরী শিল্পী সংসদ, শেষে চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব কর্তৃক গত ১৮ জুন 'ওথেলো' প্রদর্শিত হয়। এবং ২৫ জুন 'ফরটি ফার্স্ট' ও 'লিও টলস্টয়' এই সোভিয়েট চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। সকাল ৯টায় এন্টালী টকীজে।

শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলন

'কৃষ্টি' আয়োজিত শিশু ও কিশোর শিল্পী সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, কবিতা ও গল্প রচনা, চিত্রাংকন প্রভৃতি বিষয়ের এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে (ক) শিশু বিভাগ ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত, (খ) কিশোর বিভাগ ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে জুন মাসের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে—

'কৃষ্টি কার্যালয়' ২৮নং অনন্তরাম মুখার্জি লেন, হাওড়া-১।

ঢাকুরিয়া যুব-সমাজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১৭ই জুন, শনিবার, ঢাকুরিয়া যুব সমাজ সাফল্যের সঙ্গে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীঅরুণ ঘোষ এক মনোজ্ঞ ভাষণে স্থানীয় যুবকদের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কাজ ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তী অনুষ্ঠানে সংগীত, যন্ত্রসংগীত ও হাস্যকৌতুকে অংশ গ্রহণ করেন মিনতি ঘোষ, বিজন মল্লিক, সোমনাথ বসু, অর্চনা সরকার, দীপক গাঙ্গুলী, চন্দন সেনগুপ্ত, কানু ভট্টাচার্য, বনানী অধিকারী, অসিত সরকার, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেনগুপ্ত, নিমাই ভট্টাচার্য, মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্ত রায়, শান্তা চট্টোপাধ্যায়, রবীন দে, প্রশান্ত মিত্র, অজিত বড়ুয়া।

ছবি বিশ্বাস স্মৃতি তর্পণ

প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হোল গত ১১ই জুন তাঁর টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে। ভজন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুকুলবীথির ছাত্রীরা। উপস্থিত কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনের পর প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঊষা চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বাস পরিবারের অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু

হিসাবে তিনি ছবি বিশ্বাসের বিভিন্ন গুণাবলীর পর্যালোচনা করেন। এই সভায় স্থির হয় যে আগামী ১৬ই জুলাই ছবি বিশ্বাসের জন্মতিথি উপলক্ষে ছোট জাগুলিয়া গ্রামে তাঁর পৈত্রিক বাসভবনে তাঁরই স্মৃতিরক্ষার্থে শিশু ও কিশোরদের জন্য একটি সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক ও খেলা-ধুলোর আসরের উদ্বোধন করা হবে। সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকের আসরটি পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন কলকাতার সুপরিচিত শিশু সংস্থা মুকুলবীথি এবং খেলাধুলোর আসরটি পরিচালনা করবেন যুগান্তর সব পেয়েছির আসরের পরিচালক শ্রীস্বপন বুড়ো।

সান্ধ্যচক্রের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব

গত ২৯ বৈশাখ (১৩ই মে) সোদপুরে গভঃ হাউসিং এস্টেটে 'সান্ধ্যচক্রে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রারম্ভে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে সর্বশ্রী সুহাস মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ শর্মা সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দেন। নৃত্য পরিবেশন করেন কুমারী প্রণতি ভট্টাচার্য।

তারপর শ্রীমতী বাণী গুহের পরিচালনায় হাউসিং এস্টেটের কিশোর-কিশোরীবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর "রথের রশি" অভিনীত হয়। অভিনয়ে সর্বশ্রী নীলাক্ষী শিকদার, পূর্ণিমা দত্ত, সুস্মিতা চক্রবর্তী, সুজিত চক্রবর্তী, সুঘোষ রায়, দীপক দত্ত, তন্ময় পাঠক ও অমিতাভ ধর বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। "সান্ধ্যচক্রে"র শিল্পী গোষ্ঠী পরিচালিত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এমন দিন আসতে পারে" নাটকটি সকলকে মুগ্ধ করে। অভিনয়ে সর্বশ্রী মঞ্জু ভট্টাচার্য, তরুণ সেনগুপ্ত, রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও শুভ্রাংশু লাহিড়ী বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। শ্রীঅজিত দত্ত ও শ্রীমতী প্রতিমা দত্তের পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

বিচিত্র ইন্দ্রজাল

সম্প্রতি মেদিনীপুরে নাড়াজোল রাজ কলেজের উন্নয়নকল্পে দুদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করলেন যাদুকর দি গ্রেট সুশীল, যাদুকর সুশেন এবং যাদুকর গৌতম গুহ। যাদুকর দি গ্রেট সুশীল, কয়েকটি সুন্দর খেলা দেখিয়ে দর্শকমনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছেন। যাদুকর সুশেন তাঁর চমকপ্রদ বলের খেলাগুলি দেখালেন। সর্বশেষ দেখালেন গৌতম গুহ। তাঁর 'আমরা শান্তি চাই', রহস্যের মোহ, মিশরের চালাকি, যাদুলাঠির আজব কাণ্ড, ভারতের মন্দির, শূন্যে ভাসমান তরুণী খেলাগুলি সাফল্যের সাথে প্রদর্শন করলেন। দুদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শক সমাবেশ ঘটেছিল।

একটি ঘরোয়া রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ 'অভিযান' কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন শ্রদ্ধেয়া শৈলজা রায়চৌধুরী। গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। উদ্বোধনী সংগীতের পর ছোটদের মধ্য থেকে 'প্রশ্ন' ও 'দেবতা বিদায়' আবৃত্তি করে সকলকে আনন্দ দেয় যথাক্রমে কুমারী মহালয়া চট্টোপাধ্যায় ও বিজন চক্রবর্তী। এর পর পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী 'শিশুতীর্থ' ও শ্রীসুদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঁচিশে বৈশাখ' আবৃত্তি করে শোনান। একক সংগীতের আসরে শ্রীমতী লিলি চট্টোপাধ্যায় দরদ দিয়ে কয়েকখানি রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করার পর এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে।

জগৎচন্দ্র স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রজয়ন্তী

কবিপক্ষ গত ৩১শে বৈশাখ, বেথুয়াডহরি জগৎচন্দ্র স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১০৬তম রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তী পালন করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা ভৌমিক সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কবিগুরুর একটি প্রহসন 'গুরুবাক্য' ও একটি নাটক 'মুকুট' অভিনয় করে।

গানের জলসা

জলসাঘরের 'জলসা'

নবজাত সংগীত প্রতিষ্ঠান 'জলসাঘর'-এর উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ জলসার আয়োজন করা হয়েছিলো ১০ জুন, ২৪।১ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীটে। এই আসরের বৈশিষ্ট্য ছিল একক শিল্পীর অনুষ্ঠান পরিবেশন। মাদ্রাজে এই ধরনের আসরেরই সমধিক প্রচলন। এই রকম আসরের একটা বিশেষ মজা হোলো এই যে কোনো শিল্পীকে (তরুণই হোন বা প্রবীণই হোন) তাঁর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যে ভাল-মন্দ মিশিয়ে শোনা যায়। তাঁর নিজস্ব ভাবনা-কল্পনা, রেওয়াজ, শিক্ষা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয় এবং নানাপ্রকার অনুষ্ঠান বাহুল্যে শ্রোতার মনও—দোলায়িত হয়ে কেন্দ্রচ্যুত হয় না।

সেদিনের আসরের শিল্পী ছিলেন তরুণ সেতারবাদক শ্রীমণিলাল নাগ। ইমন-কল্যাণ রাগে ইনি আলাপ, জোড় ও ঝালা বাজালেন। পরে ঐ রাগেরই ত্রিতালে বিলম্বিত এবং ধামারে দ্রুত গৎ বাজিয়ে শোনালেন। শ্রীনাগ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিমধ্যেই নিজস্ব আসন তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষা আছে রেওয়াজী হাত। বিস্তার তানে মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। অনেক তান ও মীড়ের ঢং রবিশঙ্করকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঁহাতের কারুকার্য প্রশ্নাতীত তবে দক্ষিণ হস্তের 'বাজ'এর গাম্ভীর্য (ওয়েট) যদি আর একটু জোরালো হয়—তাহলে বাজনার বাহার আরো খোলে। বিভিন্ন তালের ছন্দ ও লয়কারীর ওপর এঁর প্রশংসাযোগ্য দখল। বিশেষ ধামার তালের ওপর তেহাই-এর নিপুণ্য দেড়ী ছন্দের তালফেরতা উপভোগ করবার মত। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে ইনি পিলু ধুন ও মিশ্রগারা বাজিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটান। পণ্ডিত কিষণ মহারাজের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীঅনিল পালিত যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গত করেছেন।

'সুরবাহার'-এর বিচিত্রানুষ্ঠান

মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত 'সুরবাহার'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিপ্রা বসুর সঙ্গীত নিয়ে সুরু হয়। একক সঙ্গীতের আসরে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, বাণী ঠাকুর এবং লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সকলেই শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পেরেছেন। প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি কবি নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক নক্সা ও শ্রোতারা ভালভাবেই গ্রহণ করেছেন। আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বটুক নন্দী ও সম্প্রদায়ের অর্কেস্ট্রা। গীটার ছাড়াও পিয়ানো, একর্ডিয়ান, বঙ্গোও এই ঐকতানের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ গতানুগতিক হলেও যোগ্যতার স্বাক্ষরবাহী উল্লেখযোগ্য সংগীত রচনার শ্রীনন্দীর কৃতিত্ব সুপরিলক্ষিত।

ক্যালেণ্ডারে সঙ্গীতালেখ্য

সম্প্রতি প্রকাশিত জি রেডিয়েন্ট প্রসেসের একটি ক্যালেণ্ডার শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায় অংকিত ছয়টি চিত্রে ভারতীয় সঙ্গীতের পরিচয় ও এক-ঝলকে দেখা-যায় এমন একটি পরিপূর্ণ রূপ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

সঙ্গীত মানুষের আত্মবিকাশ ও পূর্ণতাকে অনুসন্ধানের পথ। এর আকৃতি বিশ্বজনীন হলেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শিল্পীর প্রকাশবৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। ভারতীয় সঙ্গীতেরও নিজস্ব এক বিস্তারবিভব আছে। সেই ধারাকেই শ্রীমুখোপাধ্যায় এখানে অনুসরণ করেছেন।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণানুযায়ী প্রণব মন্ত্র ওংকার থেকেই আধ্যাত্মিক সম্পদদীপ্ত স্বরগুলির জন্ম। সাতটি স্বর অনুদাত্ত, উদাত্ত, সাবিত্রীজাত এবং প্রাণীজগতের সাতটি প্রাণীর প্রতিনিধি-স্বরূপ। প্রথম চিত্রে সাতটি প্রাণীর নানারঙা রূপকচিত্রে এই ভাবটিই পরিস্ফুট।

ছয়টি মূল রাগ হোলো ভৈঁরো, মালব-কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী এবং মেঘ। হনুমত মতানুসারে প্রতিটি রাগের সঙ্গিনী রাগিণীও আছে এবং এই রাগ ও রাগিণীর সমষ্টি হোলো মোট ছত্রিশ। [illegible] [illegible]

গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ ভাস্কর মেনন প্রদত্ত রূপার সরোদ-হস্তে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

জলসাঘরের জলসায় মণিলাল নাগ ও অনিল পালিত

সঙ্গীতশাস্ত্র মতে প্রতিটি রাগ ও রাগিণীর নিজস্ব আবেগ, ভাব ও রূপ আছে। পরবর্তীকালের শিল্পীরা এই ছত্রিশটি রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আরো কিছু যোগও করেছেন। তবে এই মূল ছত্রিশের সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। এই ছটি জাত রাগের চিত্রে রাগরূপের আকর্ষণীয় কল্পনা ব্যক্ত।

ভারতীয় সঙ্গীতের জন্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে। এই ওঙ্কারেরই পরে ধ্রুপদ ও ধামারে পরিণতি। তাই ধ্রুপদ-ধামারে ভক্তির ভাব এমন সুগম্ভীর। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরনৃত্যের সঙ্গত সঙ্গীত ছিল এই ধ্রুপদ। এই নৃত্য ও সঙ্গীতে ভাবঘন সঙ্গত যন্ত্র বীণা, তম্বুরা ও মৃদঙ্গ। ক্রমশ সঙ্গীত এল দরবারে। সঙ্গীতানুরাগী উদার আকবরের সময়ে যুগান্তকারী প্রতিভা তানসেনের আবির্ভাবে ক্রমশ বীণা থেকে সেতার মৃদঙ্গ থেকে এল তবলা। ধ্রুপদ থেকে খেয়ালের জন্ম এই সময়ই। এই দরবারের রসিক সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে একে একে ঠুমরী, গজল ইত্যাদি চিত্তহরা সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত লঘু সঙ্গীতের আবির্ভাব। শৃঙ্গার রসই এই সব গানের আশ্রিত রস।

তারপর এল রবীন্দ্রযুগ। এই আলোক-সামান্য স্রষ্টা পশ্চিমের সুরের সঙ্গে প্রাচ্য-ভাবের মিলন ঘটিয়ে বিস্তারবৈচিত্র্যে ও ভাবগভীরতায় সাধারণের বোধগম্য সঙ্গীত রচনা করে সারা দেশ প্লাবিত করেন। বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন লোকসঙ্গীতও নতুন রূপ নেয়।

ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি, বিস্তার ও বহুধাবৈচিত্র্যের ধারার ইতিহাস রং ও রসের অপরূপতায় চিত্তগ্রাহী করে তুলে ধরেছেন শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুও একনজরে ভারতীয় সঙ্গীতসম্পদের এক সুন্দর ধারণা গড়ে নিতে পারেন। এইখানেই এর মূল্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীমুখোপাধ্যায় ভারত সরকার প্রদত্ত এওয়ার্ড পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫৭ খৃঃ এবং ১৯৫৯ খৃঃ আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছেন।

পশুপতি স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

পশুপতি স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আগামী ২ জুলাই হুগলীর জনাইবাজার অঞ্চলে গাঙ্গুলী বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় বিষয়সূচীর মধ্যে থাকছে ভজন, রাগপ্রধান, শ্যামাসঙ্গীত এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত। বারো বৎসরের ঊর্ধ্বে এবং অনুর্ধ্বের প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কোন প্রবেশ মূল্য নেই। যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে জুন। যোগাযোগের ঠিকানাঃ পনবীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকা, সিটি অফিস, ৩নং চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ, কলকাতা-১৩।

ছায়া-হিন্দোল-এর রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ৪ জুন গাঙ্গুলীবাগানে 'ছায়া-হিন্দোল' সংগীত শিক্ষায়তনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ শ্রীরঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত গীটারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান। এরপর শ্রীসুপ্রকাশ চাকীর সংগীত পরিচালনায় একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। নৃত্যপরিচালনা করেন শ্রীশিশির শোভন। এছাড়া আবৃত্তি, একক সংগীত এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্প অবলম্বনে একটি নাটক পরিবেশিত হয়। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলেই অনুষ্ঠানটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক পদ্ম-ভূষণ আলি আকবর সম্বর্ধিত

গত ৬ জুন গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীভাস্কর মেননের আলিপুর রোডস্থ বাসভবনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদ শিল্পী পদ্মভূষণ আলি আকবর খাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে শহরের বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সঙ্গীতরসিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমেনন তাঁর সংক্ষিপ্ত এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষণে বলেন যে, বিশ্বের সর্বত্র আলি আকবরের শিল্প-ঐশ্বর্য রেকর্ড মাধ্যমে পরিবেশন করে ভারতের 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' গৌরবান্বিত হয়েছে। খাঁ সাহেবের প্রতি কোম্পানীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ শ্রীমেনন তাঁকে সরোদের একটি রৌপ্য নির্মিত প্রতিকৃতি উপহার দেন। উত্তরে আলি আকবর গ্রামোফোন কোম্পানীকে ধন্যবাদ জানান।

গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং অধি-কর্তা শ্রীএ সি সেন অতিথিবর্গকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষ

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

ইংল্যান্ড : ৫৫০ রাণ (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ। জিওফ বয়কট নট আউট ২৪৬, বেসিল ডি' ওলিভেরা ১০৯, কেন ব্যারিংটন ৯৩ এবং টম গ্রেভনী ৫৯ রাণ। চন্দ্রশেখর ১২১ রাণে ২ এবং সুর্তি ২৫ রাণে ১ উইকেট)।

ও ১২৬ রাণ (৪ উইকেটে। কেন ব্যারিংটন ৪৬ রাণ। চন্দ্রশেখর ৫০ রাণে ৩ এবং প্রসন্ন ৫৪ রাণে ১ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ১৬৪ রাণ (পাতৌদি ৬৪, ইঞ্জিনিয়ার ৪২ এবং সুর্তি ২২ রাণ। রে ইলিংওয়ার্থ ৩১ রাণে ৩, রবিন হবস ৪৫ রাণে ৩ এবং জন স্নো ৩৪ রাণে ২ উইকেট) ও ৫১০ রাণ (পাতৌদি ১৪৮, অজিত ওয়াদেকার ৯১, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৮৭ এবং হনুমন্ত সিং ৭৩ রাণ। রে ইলিংওয়ার্থ ১০০ রাণে ৪, ব্রায়ান ক্লোজ ৪৮ রাণে ২ এবং জন স্নো ১০৮ রাণে ২ উইকেট)।

প্রথম দিন (জুন ৮) :

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ২৮১ রাণ সংগ্রহ করে। প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন জিওফ বয়কট (১০৬ রাণ) এবং বেসিল ডি' ওলিভেরা (১৯ রাণ)।

দ্বিতীয় দিন (জুন ৯) :

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রাণের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেট খুইয়ে ৮৬ রাণ সংগ্রহ করে। এইদিন ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় অপরাজিত থাকেন পাতৌদি (১৪ রাণ) এবং সুব্রত গুহ (৪ রাণ)।

তৃতীয় দিন (জুন ১০) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ১৬৪ রাণের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৩৮৬ রাণের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৮ রাণ সংগ্রহ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অপরাজিত থাকেন অজিত ওয়াদেকার (৮৪ রাণ) এবং চান্দু বোরদে (১৬ রাণ)।

চতুর্থ দিন (জুন ১২) :

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪৭৫ রাণ (৮ উইকেটে) দাঁড়ায়। এই দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন পাতৌদি (১২৯ রাণ) এবং বিষেণ সিং বেদী (শূন্য)।

পঞ্চম দিন (জুন ১৩) :

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ৫১০ রাণের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২৫ রাণ সংগ্রহ করতে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১২৬ রাণ তুলে ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

নবাব পাতৌদি

লিডসের হেডিংলে মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের ৯ম টেস্ট সিরিজের (১৯৬৭) প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী হলেও তাদের সে জয় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার পাশে ম্লান হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের খেলার তুলনায় ভারতবর্ষের খেলায় ক্রিকেটের মাধুর্য, আনন্দ, শিহরণ এবং বৈশিষ্ট্য খুব বেশী ছিল। ইংল্যান্ডের থেকে ৩৮৬ রানের পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১০ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট হাতে নিতে বাধ্য করবে ক্রিকেটের বড় বড় পন্ডিতদেরও তা ধারণাতীত ছিল। ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫০০ রান সংগ্রহ করার নজির টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বিরল। ভারতবর্ষের এই দুরূহ কাজের নায়ক ছিলেন অধিনায়ক 'টাইগার' পাতৌদি। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্রিকেট সমালোচকরা মুক্তকণ্ঠে ভারতবর্ষের খেলার প্রশংসা করেছেন। 'ডেইলী মিরার' পত্রিকায় ব্রায়ান চ্যাপম্যান লিখেছেন 'ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ, পাতৌদি জিন্দাবাদ : ভারতীয় ক্রিকেট দীর্ঘজীবী হউক।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্ববিশ্রুত প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইন তাঁর নিবন্ধে পাতৌদি সম্বন্ধে বলেছেন, 'পাতৌদির এই খেলা সর্বকালের অন্যতম বীরত্বব্যঞ্জক নিদর্শন'। 'ডেইলী

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

এক্সপ্রেসের' প্রস্তাব ছিল 'ইংল্যান্ডের সকলেরই 'টাইগার' এবং তাঁর সাহসী ভারতীয় দলকে স্যালুট করা উচিত'।

লিডসের প্রথম টেস্টের দল গঠন ব্যাপারে ইংল্যান্ড তার চিরাচরিত রক্ষণশীল নীতি অবলম্বন করেছিল। ১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওভাল মাঠের শেষ পঞ্চম টেস্টে ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বে যে ইংল্যান্ড দলটি জয়ী হয়েছিল (১৯৬৬ সালের সিরিজে ইংল্যান্ডের একমাত্র জয়) সেই দলের ৯ জন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কেন ব্যারিংটন এবং রবিন হবসকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত টেস্টের ইংল্যান্ড দল গঠন করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্ট খেলার আগে ব্রায়ান ক্লোজ ছিলেন দীর্ঘ দিনের বাতিল টেস্ট খেলোয়াড়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের নির্বাচকমন্ডলী একরকম মরিয়া হয়েই দীর্ঘ দিনের বাতিল টেস্ট খেলোয়াড় ইয়র্কশায়ার দলের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজকে অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। তাঁর এই নির্বাচন প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রগুলির ক্রীড়া-সাংবাদিকেরা কঠোর মন্তব্যে আবহাওয়া সরগরম করেন। তারপর ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বেই ওভাল মাঠের শেষ টেস্টে ইংল্যান্ড যখন এক ইনিংস ও ৩৪ রাণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে পরাজিত করে তখন ইংল্যান্ডের পোড়া-মুখে হাসি আর ধরে না। সমালোচকদের কলমে ব্রায়ান ক্লোজের সে কি প্রশংসার তুবড়িই না ছুটেছিল! সুতরাং তুক-তাক যখন একবার লেগে গেছে তখন ইংল্যান্ডের জাতীয় রক্ষণশীল চরিত্রের হাত থেকে ব্রায়ান ক্লোজের সহজে নিস্তার নেই। তিনি কৃতী খেলোয়াড় না হলেও ইংল্যান্ডের যে পয়মন্ত অধিনায়ক সে বিষয়ে দ্বিমত কমই।

লিডসের সদ্য সমাপ্ত প্রথম টেস্টে এই তিনজন খেলোয়াড় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলার গৌরব লাভ করেছেন—ভারতবর্ষের সুব্রত গুহ ও রমেশ সাক্সেনা এবং ইংল্যান্ডের রবিন হবস।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান গ্রহণ করেন। জন এডরিচকে বল দিয়ে সুব্রত গুহ প্রথম টেস্ট খেলার সূচনা করেন। খেলা সবে দশ মিনিট হয়েছে। এবং ইংল্যান্ডের রাণের ঘরে মাত্র ৭ রাণ জমা পড়েছে। খেলার এই অবস্থায় সুর্তির দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বল খেলে ন্যাটা খেলোয়াড় জন এডরিচ উইকেট-কীপার ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে খেলা থেকে বিদায় নিলেন। এই লিডস মাঠেই দু-বছর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জন এডরিচ ৩১০ রাণ করে নট আউট ছিলেন। সুতরাং এডরিচের উইকেট পাওয়া লাভের ব্যাপার। খেলার সূচনাতেই বিপর্যয় দেখা দিলেও ইংল্যান্ডের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কারণ ভাগ্যদেবী ভারতবর্ষের প্রতি বিমুখ ছিলেন। লাঞ্চের পরের খেলায় ব্যারিংটনের প্রচন্ড সট সুর্তির বাঁ পায়ের হাঁটুতে লাগে। সুর্তিকে হাসপাতালে ছুটতে হয়। আর চা-পানের ঠিক আগে মাংসপেশীর টানে বিষেণ সিং

হনুমন্ত সিং

বেদীকেও মাঠ ত্যাগ করতে হয়। ফলে ভারতবর্ষের বোলিংয়ে ভাটা পড়ে। তার উপর ভারতবর্ষ দুটো সোজা ক্যাচ মাটিতে ফেলে দেয়। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রাণ দাঁড়ায় ৭৩ (১ উইকেটে); উইকেটে অপরাজিত ছিলেন বয়কট (২৫ রাণ) এবং ব্যারিংটন (৪৬ রাণ)। ব্যারিংটন ব্যক্তিগত ৯৩ রাণ সংগ্রহ করে রাণ আউট হন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রাণ ছিল ১৭০ (২ উইকেটে)।

চা-পানের পর তৃতীয় উইকেট-জুটি বয়কট এবং গ্রেভনী ইংল্যান্ডের খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ব্যারিংটন এবং বয়কট ১৩৯ রাণ এবং তৃতীয় উইকেটের জুটিতে গ্রেভনী এবং বয়কট ১০৪ রাণ সংগ্রহ করেন। প্রথম দিনের খেলা ভাঙ্গার ১৫ মিনিট আগে জিওফ বয়কট তাঁর ব্যক্তিগত শত রাণ (১১টি বাউণ্ডারী সহ) পূর্ণ করেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরী। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের ৩ উইকেট পড়ে মাত্র ২৮১ রাণ উঠে ছিল। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন বয়কট (১০৬ রাণ) এবং ডি' ওলিভেরা (১৯ রাণ)। বয়কট দীর্ঘ ৬ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ১০৬ রাণ (১২টি বাউণ্ডারীসহ) সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর একঘেয়ে খেলা দেখে দর্শকেরা খুবই ক্লান্ত এবং বিরক্ত হন।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের আধ ঘণ্টা আগে ৫৫০ রাণের মাথায় (৪ উইকেটে) ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বয়কট (২৪৬ রাণ) এবং ক্লোজ (২২ রাণ) অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড আরও একটা উইকেট খুইয়ে ২১০ মিনিটে ২৬৯ রাণ সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলা প্রথম দিনের মত একঘেয়ে হয়নি। দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রাণ দাঁড়ায় ৪৩০ রাণ (৩ উইকেটে)। অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে পর্যন্ত পূর্ব দিনের অপরাজিত খেলোয়াড় বয়কট এবং ডি' ওলিভেরা ১৫২ রাণ সংগ্রহ করেছিলেন। অপরদিকে প্রথম দিনের লাঞ্চের সময় ছিল মাত্র ৭৩ রাণ। ইংল্যান্ড ৩৮২ মিনিটে ৩০০ রাণ, ৪৩৪ মিনিটে ৩৫০ রাণ, ৪৬৬ মিনিটে ৪০০ রাণ এবং ৫০৭ মিনিটে ৫০০ রাণ সংগ্রহ করেছিল। লাঞ্চের সময় বয়কট ১১০ এবং ডি' ওলিভেরা ৭৪ রাণ সংগ্রহ করে অপরাজিত ছিলেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডি' ওলিভেরা এবং বয়কট ২৫২ রাণ সংগ্রহ করেন—১৯৩৬ সালে ওভালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে হ্যামণ্ড এবং ওয়ার্দিংটন প্রতিষ্ঠিত ৪র্থ উইকেটের রেকর্ড রাণের (২৬৭) থেকে ১৫ রাণ কম। ডি' ওলিভেরা ১৯৬ মিনিট খেলে ১০৯ রাণ (১৩টা বাউণ্ডারীসহ) করেন—তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে প্রথম সেঞ্চুরী। জিওফ বয়কট দ্বিতীয় দিনে অনেক উন্নত পর্যায়ে খেলেছিলেন। এইদিন তিনি ২০০ মিনিটের খেলায় ১৪০ রাণ সংগ্রহ করেন। অথচ প্রথম দিনে তাঁর ১০৬ রাণ তুলতে ৩৬০ মিনিট সময় লেগেছিল। তিনি তাঁর নট আউট ২৪৬ রাণ সংগ্রহ করেছিলেন ৫৭৩ মিনিটে। তাঁর এই ২৪৬ রাণে ছিল ২৯টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। ভারতবর্ষের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলার বয়কটের এই নট আউট ২৪৬ রাণই ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণের রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ছিল ওয়ালী হ্যামণ্ডের ২১৭ রাণ (ওভাল, ১৯৩৬)। লিডস মাঠে সংগৃহীত ইংল্যান্ডের এই ৫৫০ রাণই (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড। তবে লিডস মাঠে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার ৫৮৪ রাণ (১৯৩৪ সাল)। অস্ট্রেলিয়ার এই ৫৮৪ রাণের মধ্যে ডন ব্র্যাডম্যান একাই ৩০৪ রাণ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় সুর্তি এবং বেদী খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি।

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৬ রাণ—অর্থাৎ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রাণের (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) থেকে ৪৬৪ রাণ কম। খেলার এই অবস্থায় 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতবর্ষের ২৬৫ রাণের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে অপরাজিত ছিলেন পাতৌদি (১৪ রাণ) এবং সুব্রত গুহ (৪ রাণ)।

অজিত ওয়াদেকার

কেন ব্যারিংটন

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর ভারতবর্ষ ১০ মিনিট খেলেছিল। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা এইদিনেও যে ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট স্থায়ী হবে তা দ্বিতীয় দিনের খেলার অবস্থা দেখে কেউ ভাবতেই পারেন নি। এইদিন লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রাণ ছিল ১৫১ (৮ উইকেটে)—৫৫ রাণ করে পাতৌদি অপরাজিত ছিলেন। লাঞ্চের ঠিক আগের ওভারে রবিন হবস তাঁর শেষ বলে সুর্তির 'ক্যাচ' নেন—টেস্ট ক্রিকেটে হবসের এই প্রথম উইকেট লাভ। ৮ম উইকেটে আহত সুর্তি (২২ রাণ) এবং পতৌদি দলের ৫৯ রাণ তুলেছিলেন। পতৌদি ১৮৪ মিনিট খেলে ব্যক্তিগত ৬৪ রাণ করেন। তাঁর এই ৬৪ রাণে ছিল ৭টা বাউণ্ডারী এবং ইলিংওয়ার্থের বলে দর্শনীয় একটা 'ছক্কা'। তাঁর ব্যাটিংয়ের জৌলুষ এবং দলের চরম সংকট সময়ে দৃঢ়তাপূর্ণ প্রাণবন্ত খেলা রাণের এই সংখ্যায় প্রকাশ পায় না। তাঁর প্রতিটি স্ট্রোক মাঠের দর্শকেরা করতালি এবং আনন্দধ্বনি দিয়ে উপভোগ করেন। তিনি সহজভঙ্গীতে খেলে প্রমাণ করেন, ইংল্যান্ডের বোলিংয়ে ভয়ের কারণ নেই। তাঁর খেলাই ভগ্নোদ্যম ভারতীয় দলে সাহস এবং আশা সঞ্চারিত করে।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রাণের (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ) থেকে ৩৮৬ রাণের পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ যে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তার সূচনা শুভ হয়নি। দলের মাত্র ৫ রাণের মাথায় আহত সুর্তি আউট হন। এই পাঁচ রাণই সুর্তির। চা-

মহিলাদের দলগত বিশ্ব লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরস্কার
ফেডারেশন কাপ
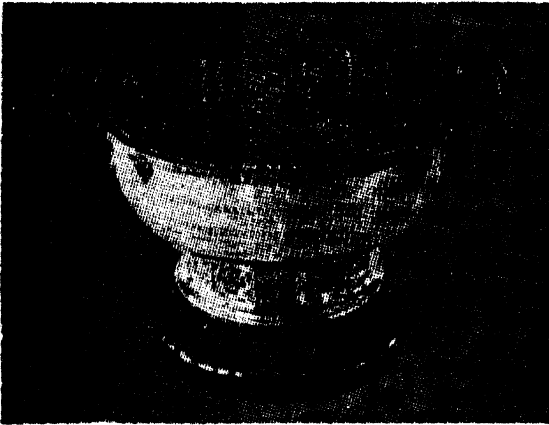
পানের সময় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ১০০ (১ উইকেটে)। খেলায় তখন অপরাজিত ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার (৫২ রাণ) এবং ওয়াদেকার (৪১ রাণ)। ইঞ্জিনিয়ার ৮৭ রাণ করে আউট হন। তাঁর দুর্ভাগ্য—মাত্র ১৩ রানের জন্যে শতরান পূর্ণ করতে পারেন নি। ইঞ্জিনিয়ার এবং ওয়াদেকারের ২য় উইকেট জুটিই ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন। তাঁদের এই দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৬৮ রান উঠেছিল—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। পূর্বে রেকর্ড ছিল—কুন্দরন এবং সারদেশাইয়ের ১৪৩ রান (মাদ্রাজ, ১৯৬৩-৬৪)। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৯৮ (২ উইকেটে)—খেলায় অপরাজিত ওয়াদেকার (৮৪ রান) এবং বোরদে (১৬ রান)।

চতুর্থদিনের খেলায় ভারতবর্ষ আরও ৬টা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৯৮ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে ২৭৭ রান যোগ করে। এই দিনের খেলার শেষে রান দাঁড়ায় ৪৭৫ (৮ উইকেটে)। ফলে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রান ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ ৮৯ রানে অগ্রগামী হয় এবং হাতে জমা থাকে দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট। চতুর্থ দিনে ২১৭ রানের মাথায় যখন ভারতবর্ষের ৩য় উইকেট (ওয়াদেকার) পড়ে তখনও ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতবর্ষের ১৬৯ রানের প্রয়োজন ছিল। মাত্র ৯ রানের জন্যে ওয়াদেকারের সেঞ্চুরী রান পূর্ণ হয়নি। ওয়াদেকার ২২৫ মিনিট খেলে তাঁর ৯১ রানে ১৬টা বাউন্ডারী করেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৭৮ (৪ উইকেটে)। তখন খেলায় অপরাজিত ছিলেন হনুমন্ত সিং (৩০ রান) এবং পতৌদি (২২ রান)। চা-পানের ২০ মিনিট আগে দলের ৩৬২ রানের মাথায় হনুমন্ত সিং ব্যক্তিগত ৭৩ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি ১৭৮ মিনিটের খেলায় ৬টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী করেছিলেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে হনুমন্ত এবং পতৌদি দলের ১৩৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৩৮৪ (৫ উইকেটে)। তখন খেলায় অপরাজিত পতৌদির রান ৬৪ এবং নবাগত সাক্সেনার ১২ রান। প্রসন্ন (১৯ রান) এবং পতৌদির ৭ম উইকেটের জুটিতে সংগৃহীত ৬০ রান খুবই কাজ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৭৫ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়। পতৌদি ১২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন এবং তাঁর ৯ম উইকেটের জুটি বেদীর রানের ঘর তখনও শূন্য ছিল। পতৌদির ১২৯ রানে ছিল ১৩টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে তাঁর ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ (এর মধ্যে একটা ডাবল সেঞ্চুরী), নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১ সেঞ্চুরী।

ভারতবর্ষের ২০০ রাণ ২১৯ মিনিটে (৬৯-২ ওভারের খেলায়) এবং ৩০০ রান ৩৭৫ মিনিটে (১১২ ওভারের খেলায়) সংগৃহীত হয়েছিল। পতৌদি এবং হনুমন্ত সিং প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁরা সূর্যের আলোতে প্রচুর রান করতে পারেন এবং ইংল্যান্ডের আক্রমণের দৌড় সীমাবদ্ধ।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস আরও ৫০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ইনিংস ৫১০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে ১২৫ রানের প্রয়োজন হয়। অধিনায়ক পতৌদি ৩৫১ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ১৪৮ রানে ১৫টা বাউন্ডারী এবং একটা ছক্কা মারেন। লিডসের এই প্রথম টেস্টে তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ২১২ (৬৪ ও ১৪৮ রান)। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫০০ রান উঠেছিল ৬১৫ মিনিটে এবং মোট ৫১০ রান ৬২৫ মিনিটে। ইংল্যান্ড কিন্তু খুব সহজে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২৫ রান তুলতে সক্ষম হয়নি। এই রান তুলতে তাদের ৪টে উইকেট খোয়াতে হয়েছিল। পঞ্চম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে দু' ঘণ্টার বেশী আগে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান উঠেছিল ৮১ (২ উইকেটে)—জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানের থেকে ৪৪ রান কম।

হরলিকস পুরস্কার

লিডসের প্রথম টেস্ট খেলায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে চারজন খেলোয়াড়কে নগদ হরলিকস পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। কৃতী ব্যাটসম্যান হিসাবে নগদ একশ পাউন্ড করে পুরস্কার লাভ করেছেন ভারতবর্ষের অধিনায়ক নবাব পাতৌদি (৬৪ ও ১৪৮ রান) এবং ইংল্যান্ডের কেন ব্যারিংটন (৯৩ ও ৪৬ রান)। শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার হিসাবে ৫০ পাউন্ডের পুরস্কার পান উইকেট-কীপার ফারুক ইঞ্জিনীয়ার। ইংল্যান্ডের রে ইলিংওয়ার্থ শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে ১০০ পাউন্ড পেয়েছেন (৩১ রানে ৩ এবং ১০০ রানে ৪ উইকেট)।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ)—লিডস মাঠে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড। পূর্বে রেকর্ড ছিল—৪৮৩ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ), ১৯৫৯ সাল। লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার ৫৮৪ রান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), ১৯৩৪ সাল।

জিওফ বয়কটের নটআউট ২৪৬ রান—তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের তৃতীয় সেঞ্চুরী এবং ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড। পূর্বে রেকর্ড—ওয়ল্টার হ্যামন্ডের ২১৭ রান (ওভাল, ১৯৩৬)।

দক্ষিণ আফ্রিকাজাত অশ্বেতকায় বেসিল ডি'ওলিভেরার ১০৯ রান তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী।

লিডসের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষের রানের সমষ্টি ১৩৫০ (২৮ উইকেটে)—এই দুই দেশের একটি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক মোট রানের নতুন রেকর্ড।

পূর্বে রেকর্ড—১৩০৯ (৩৮ উইকেটে), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯।

লিডসে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫১০ রান—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ৫০০ রান এবং সর্বাধিক রান সংগ্রহের নতুন রেকর্ড। পূর্বে রেকর্ড—৪৮৫ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৫১-৫২।

লিডসে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ)—ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ডের পঞ্চমবার ৫০০ বা তার বেশী রান সংগ্রহের নজীর।

ফেডারেশন কাপ

মহিলাদের দলগত পঞ্চম বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে (১৯৬৭) [illegible]

বছরের বিজয়ী আমেরিকা ৩-০ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার এবং প্রতিযোগিতার পাঁচ বছরের ইতিহাসে মোট তিনবার ফেডারেশন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। মহিলাদের এই দলগত বিশ্ব লন টেনিস প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৬৩ সালে। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত মাত্র এই দুটি দেশ ফেডারেশন কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ৩বার (১৯৬৩, ১৯৬৬-৬৭) এবং অস্ট্রেলিয়া ২বার (১৯৬৪-৬৫)। প্রতিযোগিতার ফাইনালে রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছে আমেরিকা ২বার (১৯৬৪-৬৫) এবং ১বার করে অস্ট্রেলিয়া (১৯৬৩), পশ্চিম জার্মানী (১৯৬৬) এবং ইংল্যান্ড (১৯৬৭)। পুরুষদের দলগত অনুষ্ঠানে ডেভিস কাপ এবং মহিলাদের দলগত অনুষ্ঠানে এই ফেডারেশন কাপ জয়ের সম্মান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত অনুষ্ঠানে বিশ্ব খেতাব জয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ১২—১৮) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ১৫টি খেলায় সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ৮টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৭টি খেলা ড্র।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল আলোচ্য সপ্তাহে এরিয়ান্স এবং বি এন আর দলের বিপক্ষে খেলা ড্র করেছে (গোল-শূন্য অবস্থায়)। বর্তমানে তারা ৯টি খেলায় ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে এরিয়ান্স—১১টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট এবং তৃতীয় স্থানে বি এন আর—১০টা খেলায় ১৪ পয়েন্ট। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাব দীর্ঘ ১৭ দিন পর পুনরায় প্রথম বিভাগের খেলায় যোগদান করে তাদের চতুর্থ খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে পরবর্তী খেলাটি ড্র করেছে। ফলে তাদের ৫টা খেলায় ৯ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের সঙ্গে তাদের পরিত্যক্ত খেলার ফলাফল সরকারীভাবে এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

আঁধার থেকে আলো

শঙ্করবিজয় মিত্র

রবীন্দ্র সরোবরের সুবিন্যস্ত স্টেডিয়ামে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল প্রদর্শনী ফুটবল। যে দুটি দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সে দুটি দল হল ইস্টবেঙ্গল ও বি এন আর। গত বছরের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী দল বলেই নয়, ইস্টবেঙ্গল সারা বাংলা মুলুকের জনসাধারণের একটা বিপুল অংশের সমর্থনের অংশভাগ। খেলার মাঠে গত কয়েক বছরে উন্নতমানের ক্রীড়াশৈলীর সমাবেশে বি এন আর দলও জনসমর্থনে পরিপুষ্ট। আশা ছিল জনসেবার নৈবেদ্যের ডালিতে দর্শকরা অনেক আনুকূল্য সাজিয়ে দেবেন। ভাল খেলা দেখার আশা নিয়ে অনেকে জমায়েৎ হয়েছিলেন সেদিন স্টেডিয়ামে। খেলা জমেছিলও বেশ। অকস্মাৎ আকাশ ঢাকা আঁধার এল নেমে—সমর্থকদের মনের কালো মেঘে মহৎ উদ্দেশ্যের শুভ প্রতীকটি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মালিন্যের গ্লানি অঙ্গে মেখে সমর্থকরা সেদিন ফিরে গেলেন—পন্ড হল একটি মহৎ অনুষ্ঠানের শেষাংশের কার্যাবলী। ঈশান কোণে অল্পক্ষণের এক খন্ড মেঘ জমা হয়ে রইল।

মে মাসের বহ্নি-জ্বালা আকাশের তলায় লীগের খেলা সুরু হয়। চলতে থাকে খেলা, জমে ওঠে আসর। তীব্র রোদের দহন উপেক্ষা করেও ফুটবলপ্রেমিক দর্শকদল খেলা দেখে। মনে হয় সেই অল্পক্ষণে মেঘটা বুঝি কেটে গেছে। অন্ধকার সরে গেছে।

কিন্তু আবার সেই অনর্থ। এবার এই অনর্থের সূত্রপাত মোহনবাগান আর ইস্টার্ণ রেলওয়ের খেলাকে ঘিরে। ইস্টার্ণ রেল দল গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় দর্শকদলের হানা-হানিতে খেলা পন্ড হয়, খেলোয়াড়ও আহত হন। সবচেয়ে বেশি আহত হয় বাংলা দেশের খেলোয়াড়ীসুলভ মনোবৃত্তি। সারা ভারতের ক্রীড়াজগতের জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয় মোহনবাগানের সম্মান, মর্যাদা ও ঐতিহ্য কয়েক হাজার উগ্র সমর্থকের অপরিণামদর্শিতার শিকার হতে হয়। তাই বেদনাহত ক্লাব কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই ঘোষণা করেন, সমর্থকদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে তাঁদের দল আর খেলবে না।

বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন না হলেও এর প্রতিকারের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত অভিনব। প্রায় আশি বছর ধরে যে ক্লাব ফুটবল খেলে আসছে। ভারতের জাতীয় জীবনে যে দলের খেলা একদা উজ্জীবন এনে দিয়েছে, মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে সেই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ কি প্রচন্ড আঘাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

এমন দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে আলোক-শিখার মত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিলে ইস্টবেঙ্গল দলের কর্তৃপক্ষ। তাঁরা খেলার মাঠে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটালেন। কোন রকম পুলিশ সাহায্য না নিয়েই তাঁরা লীগ তালিকায় নির্ধারিত খেলায় অবতীর্ণ হলেন। সুশৃঙ্খল আচরণে দলের সমর্থকরা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ঈশান কোণের সেই খন্ড মেঘটা আকাশের কোন এক কোণে মিলিয়ে গেল। দর্শকসাধারণের শুভবুদ্ধির প্রদীপ্ত শিখায় আলোকিত হল কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন আনন্দের কলরবে হল মুখরিত।

এই আশ্বাসবার্তা আই এফ এ সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্যকে নতুনভাবে উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করল। মোহনবাগান আবার খেলার মাঠে নবীন উৎসাহ নিয়ে অবতীর্ণ হল। বাংলার ক্রীড়ারসিকজনের সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেল। দর্শক, সমর্থক, খেলোয়াড় বা ক্রীড়ারসিক যদি সোজা কথাটা মেনে চলেন যে খেলা, খেলার জন্যেই, তাতে জিতও আছে হারও আছে। খুসী মনে খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখিয়ে তাকে মেনে নিতে হবে। মাঠে মেজাজ গরম করা পাগলামিরই নামান্তর। জীবনযুদ্ধে নানা সমস্যায় বিব্রত মানুষ যে খেলার মাঠে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

এবার আশা করব দুর্যোগের ঘনঘটা কেটে গিয়ে সুস্থ শান্ত পরিবেশ গড়ে উঠবে। খেলার মাঠে মোহনবাগানের পুনরাবির্ভাব সেই বারতাই বহন করে এনেছে। পুনরাবির্ভাবের খেলায় মোহনবাগানকে বেশ সজীব মনে হল। জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে তারা তিন গোলে হারিয়ে দিয়ে সমর্থকদের তুষ্ট করলে। ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গে খেলার আগে মোহনবাগান পর পর তিনটে খেলায় জয়ী হলেও তাতে কোন দীপ্তি বা সজীবতা ছিল না। এখন দলের মধ্যে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। হারজিৎ ছাড়াও যে খেলার নৈপুণ্য থাকে দর্শকরা তারই তারিফ করে। তবুও বলব এবছর প্রথম শ্রেণীর খেলাগুলোতে কোন দলই প্রথম শ্রেণীর নৈপুণ্যের স্তরে এখনও পৌঁছতে পারেনি। তবে অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার পথে দলীয় সংহতি উন্নত পর্যায়ে উঠতেও পারে বলে আশা হয়।

ইস্টবেঙ্গলের খেলাতেও এ পর্যন্ত দলগত সংহতির দিক থেকে বড়একটা উন্নত ধরনের খেলা দেখা যায়নি। পর পর সাতটা খেলায় জয়ী হবার পর অষ্টম ও নবম খেলায় ইস্টবেঙ্গল প্রতিপক্ষ এরিয়ান্স ও বি এন আরের সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত রেখে দুটো পয়েন্ট হারিয়েছে। মাঝে মাঝে আক্রমণাত্মক শৈলীর চমক থাকলেও শেষরক্ষা হচ্ছে না।

ইস্টার্ণ রেল দল এদিক থেকে অনেকটা চোখে পড়ার মত। এ পর্যন্ত তারা কটা পয়েন্ট পেয়েছে সেকথা ছেড়ে দিয়ে খেলার দিকটা বিচার করলে দেখা যায় অধিকাংশ খেলাতেই তাদের দলগত সংহতির সঙ্গে তাল রেখে আক্রমণাত্মক ধারা আত্মপ্রকাশ করে দর্শকদের প্রীত করছে, দুঃখের কথা বেশীক্ষণ এই ধারা তারা বজায় রাখতে পারে না।

বি এন আর, মহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি অগ্রণী দলগুলির খেলা দেখে মনে

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ দলের বিপক্ষে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল।

হয় এখনও যেন তারা প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে ওঠেনি কিংবা ক্রীড়ারীতির বিভিন্ন বিন্যাসের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এখনও তারা মনস্থির করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে চার-দুই-চার বিন্যাস খেলার কথা ওঠে। মোহনবাগান দল প্রধানতঃ এই বিন্যাস খেলার চেষ্টা করে চলেছে। এখনও এ বিন্যাস সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও তারা এগিয়ে চলেছে। ইস্টবেঙ্গল দল পুরাতন ছক তিন-দুই-পাঁচ পদ্ধতির খেলা পাল্টায়নি। নতুন বিন্যাসে তাদের যেন অনীহা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আজকের বিশ্বে সমস্ত প্রগতি-শীল দেশই এই ধারাকে গ্রহণ করেছে। এই বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক দিক আছে। এতে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় দিকটাই সমান গুরুত্ব পায় এবং সামর্থ্য, দম ও নৈপুণ্যের অভাব না ঘটলে এতে সত্যিই ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। ব্রেজিল, স্পেন, জার্মানী প্রভৃতি অগ্রগামী দেশগুলি এই বিন্যাসে খেলে সাফল্যের শিখরে উঠেছে।

আসল কথা এর জন্যে যে প্রস্তুতি ও কোচিং দরকার তা আমাদের নেই। নেই আমাদের ফুটবলকর্তাদের আন্তরিক আগ্রহ আর আমাদের খেলোয়াড়দের আন্তরিক ও শারীরিক সামর্থ্য। আর এগুলোর একত্র সমাবেশ না ঘটলে নৈপুণ্য বা সাফল্যের কথাই আসে না।

খেলার মাঠে এই যে দুর্যোগ, এই যে বিক্ষোভ তার একটা বড় কথা হল স্টেডিয়ামের অভাব। দর্শকসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ খেলা দেখার সৌভাগ্য থেকে বহুকাল বঞ্চিত হয়ে আসছে। ফলে তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে। এই অসন্তোষ বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে খেলার মাঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কলকাতায় ১৯২৮ সাল থেকে স্টেডিয়ামের জন্য দাবী উঠেছে। অনেক আলোচনা, অনেক অনুসন্ধান, অনেক জল ঘোলা করেও তার কোন সুরাহা হয়নি।

আজ গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যাটিকে দেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। জনসাধারণ যাতে বড় বড় খেলা দেখে তৃপ্ত হতে পারে এবং চ্যারিটি ম্যাচের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দ্বার ফুটবলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। শত বর্ষেরও বেশি ঐতিহ্যমণ্ডিত ইডেনের ক্রিকেট মাঠ ফুটবলকে স্বাগত জানাল ১৮ই জুন তারিখের শুভলগ্নে। ক্রিকেট অনুরাগীর বড় একটি অংশ এটাকে ভাল চোখে না দেখলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ১৮ই জুনের শুভক্ষণে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে এই মাঠে যে প্রথম চ্যারিটি খেলা হল তাতে অর্ধ লক্ষ দর্শকের সমাবেশে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। টিকেটের জন্য হাহাকার সেদিন আর কলকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেনি।

স্বীকার করি বিশেষ ঐতিহ্যসম্পন্ন ইডেন ক্রিকেটের কীর্তিগাথার নন্দনকানন। ফুটবলের পদচিহ্নে ইডেনের কৌলিন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে যাঁরা আজ সোচ্চার তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য লন টেনিস খেলা সম্পর্কে আমারও কোন আপত্তি নেই। হকি, এ্যাথলেটিকস, ভলিবল, জলসা, নৃত্যানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক আসর যদি বসতে পারে ফুটবলের পদধ্বনিতে কি আপত্তি থাকতে পারে? বিশেষ করে মাঠে ফুটবলের অনুপ্রবেশের আগেই মাঠের যে চরম দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা লক্ষ্য করার মত। টেস্ট ক্রিকেটে বহু যুদ্ধের নায়ক পঙ্কজ রায় ত সেদিন সেন কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এর চরম অবস্থার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

ইডেনের শক্ত মাঠে ক্রিকেট বল শ্লথ গতিতে ফিরলেও ফুটবলের গতি ছিল দ্রুত। বল দ্রুতলয়ে চলেছে বলে খেলোয়াড়দের নাকাল হতে হয়েছে। খেলা ক্ষিপ্র হলেও মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর মত ঐতিহ্যসম্পন্ন দু দলের খেলা আদৌ জমেনি। ভারতীয় ক্রিকেটের তীর্থ-ভূমি ইডেনে ফুটবল আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাতে দুটো দল—মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর নাম জড়িয়ে রইল। প্রথম খেলায় কোন দল ভালমন্দ খেলল কেউ তার বিচার করবে না, বলবে ইডেনে প্রথম ফুটবল খেলা বন্ধ্যাভাবেই শেষ হয়েছে। খেলোয়াড়দের মত সাংবাদিক এবং বেতার-ভাষ্যকারদেরও সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে। প্রায় দেড়শো গজ দূরে থেকে খেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার বিষয়ও বড় কম কথা নয়।

শতাব্দীর ক্রিকেটের ঐতিহ্যকে পেছনে ফেলে ইডেনের সবুজ শ্যামল মাঠে ফুটবলের পদধ্বনিতে যেমন এক নতুন নজীরের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আই এফ এ'র সভাপতি অচিরে ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবেন। আমরা এখন ইডেন উদ্যানের স্টেডিয়াম নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে থাকবো না, আমাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত থাকবে এ্যালেনবারা কোর্সের স্টেডিয়ামের পানে।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

কান্নন
(মোহনবাগান)

'এ পাখি শুধু খাঁচার বাইরে বেরুতে চায়, চায় দেওয়ালে বন্দী করে একে কে রাখবে'? হায়দরাবাদ নামপল্লী স্টেশনের লাগোয়া এক খানদানী হোটেলের ঘরে বসে বাঙ্গালোর ম্যানেজার নন্তুদা (এ মিত্র) রহস্য করে বলেছিলেন দলের একজন খেলোয়াড় সম্পর্কে।

জিজ্ঞাসা করলাম : 'নন্তুদা তোমার এ পাখিটি কে'? 'দেখবে এসো'—বলে তিনি আমার হাত ধরে হোটেলের ঘর ছেড়ে সদর রাস্তায় একটা দোকানের সামনে নিয়ে এলেন, বললেন : 'ঐ দেখ'। দেখলাম দোকানের সামনে একটা সোফায় বসে কোলাহলমুখর রাস্তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কান্নন।

মোহনবাগানের পুস্পান কান্নন সাম্প্রতিক ভারতীয় ফুটবলে একটি বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নাম। লম্বা চওড়া নিকষ কালো জোয়ান চেহারা কান্ননের। স্বপ্নালু জিজ্ঞাসু দুটি চোখ। প্রথম নজরে দাক্ষিণী বলে মনেই হয় না। যেন আমাদেরই ঘরের ছেলে।

দুঃখের ছায়াতেই কান্ননের জন্ম বাঙ্গালোরে। ১৯৪৮ সালের ১০ই জুলাই পৃথিবীর আলো দেখলেন আর তার কমাস পরেই তাঁর বাবার চোখের আলো নিভলো। কান্নন তখন তিন মাসের বাচ্চা। বাবা পুস্পান ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক: মা এখনও বেঁচে আছেন: তিন ভাই, চার বোনকে নিয়ে মস্তবড় সংসার।

সেন্টার ফরওয়ার্ড বাদে পুরোভাগের সমস্ত জায়গায় খেলতে পারেন কান্নন, তবে সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটি হল ইনসাইড লেফট। দ্রুত, শাণিত আক্রমণ হানতে কান্নন সিদ্ধহস্ত। পায়ের সট অত্যন্ত জোরালো, লাট্টুর মত ঘুরে গিয়ে সে বল যে কখন গোলরক্ষককে নাস্তানাবুদ করবে তা বলা কঠিন। খাটতে পারেন প্রচুর, খেলার পেছনে সর্বদাই একটি পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির ছাপ জড়ানো রয়েছে কান্ননের।

১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালোর অস্টিন টাউনে কর্পোরেশন হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন কান্নন; তবে ফুটবলের নেশায় ক্লাসের পুঁথিপত্তর খুব আমল পায়নি। ১৯৬৩ সালে লীগে তৃতীয় ডিভিসনে বাঙ্গালোর হিরোজ, ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে এইচ এ এল এবং ১৯৬৫ সালে প্রথম ডিভিসন সি আই এল দলের হয়ে খেলেছেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৩ সালে এলাহাবাদে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে মহীশুরের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন কান্নন। মহীশুর সে বছর দিল্লীর সঙ্গে যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন। পরের বছর বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের সূত্রে কান্ননের প্রথম সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ। ১৯৬৫ সালে বাঙ্গালোরের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগে সি আই এল-এর হয়ে খেলেছেন; সি আই এল সেবার চ্যাম্পিয়ন, শুধু তাই নয়—চাকোলা গোল্ড কাপ, মাদ্রাজ ফুটবল এসোসিয়েশন শীল্ড এবং মহীশুরে আয়েঙ্গার ট্রফিও লাভ করেছিল এই সি আই এল। প্রত্যেকটি ফাইনালে রীতিমত খ্যাতনামা দলকে হারিয়েছিল কান্ননের সি আই এল। চাকোলা গোল্ড কাপে হায়দরাবাদ পুলিশ, এম এফ এ শীল্ডে এ এস সি বাঙ্গালোর এবং আয়েঙ্গার ট্রফিতে বোম্বাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সবকটি ক্ষেত্রেই কান্ননের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: একাধিক গোল করেছেন এই ফাইনাল খেলাগুলিতে। ১৯৬৫ সালে কটকে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে কান্নন এলেন মহীশুরের অধি-নায়ক হয়ে, কিন্তু কপাল মন্দ, কোয়ার্টার

ফাইনালেই মহীশুর হেরে গেল মহারাষ্ট্রের কাছে। এই বছর কুইলনে আয়োজিত সন্তোষ ট্রফির আসরে কান্নন মহীশুরের অন্যতম খেলোয়াড়রূপে সকলের নজর কাড়লেন। দ্বি-পাদ সেমিফাইনালের প্রথম দফায় মহীশুরের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা ২-০ গোলে জিতেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে হারলো ১-০ গোলে; এই গোল করেছিলেন কান্ননই। ১৯৬৬ সালে এলেন মোহন-বাগানে। বলতে গেলে অরুময়ই হাত ধরে নিয়ে এলেন কলকাতায়। এই বছরই ম্যানিলায় এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় দলে এবং এশীয় ক্রীড়ায় (ব্যাঙ্কক) ভারতীয় দলে স্থান হোল তাঁর। ১৯৬৬ সালে হায়দরাবাদে সন্তোষ ট্রফির আসরে কান্ননের গায়ে উঠলো বাঙ্গলার ব্লেজার।

আস্তে আস্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাও রপ্ত করেছেন কান্নন কোলকাতায় এসে। শুনে আশ্চর্য হবেন—দু একটি বাঙ্গলা কীর্তন গানও!

নিরঞ্জন গাঙ্গুলী
(ইস্টার্ন রেলওয়ে)

এই সে দিনের ঘটনা, দুর্ঘটনাও বলতে পারা যায়। সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগে মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলার সূত্রে মোহনবাগান মাঠে কি দক্ষ-যজ্ঞটাই না হয়ে গেল। খেলা অসমাপ্ত রইলো। দর্শকদের হামলায়, মাঠে রক্তগঙ্গা বইলো, পরাজিত মোহনবাগানের কোন কোন খেলোয়াড় নির্মমভাবে মার খেলেন অতি-প্রেমিক সমর্থকদের হাতে। হিরোরা তাঁদের এক মুহূর্তে জিরো বনে গেলেন!

সে খেলায় ইস্টার্ণ রেলওয়ের দু' দুটি গোল করেছেন এন গাঙ্গুলী—নিরঞ্জনের আদ্যাক্ষর এন। সবার মুখে নিরঞ্জনের নাম। গাঙ্গুলী খেলেন রাইট আউটে, কখনও ইন-সাইডেও। মুহূর্তে জায়গা পাল্টাতে, বুলেটের মত সট নিতে, ইনসাইড আউট-সাইড ডজিংয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাকাল করতে নিরঞ্জন অসাধারণ। সেই নৈপুণ্যের সূত্রে নিরঞ্জন আজ কলকাতার ফুটবলে এক নতুন প্রতিভা, এক নতুন স্বীকৃতি।

নিরঞ্জনের জন্ম ১৯৪৩ সালের ২০শে মার্চ, ঢাকার তাঁতারে। হালফিল বর্ধমান অন্ডালের বাসিন্দা। কাজ করেন লোকো বিভাগে। ছ' ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সে। বোন তিনটি। ১৯৪৮ সালে নিরঞ্জনেরা পাকিস্থান ছেড়ে এলেন ভারতে; সাময়িক-ভাবে ডেরা বাঁধলেন ধানবাদে। ১৯৬১ সালে ধানবাদ প্রাণজীবন একাডেমী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। এই স্কুলে থাকার সময়ই আন্তঃস্কুল ফুটবলের সূত্রে নিরঞ্জন প্রথম নামলেন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে। পায়ে ছেলেবেলা থেকেই বুট। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সর্বশ্রী এ কে ব্যানার্জি ও পিকে বসুর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে অন্ডাল লোকো রিক্রিয়েশন ক্লাবে ফুটবলে গড়াপেটা হোল তাঁর। ১৯৬৫ সালে আন্তঃবিভাগীয় খেলার মাধ্যমে নিরঞ্জন নজরে পড়ে গেলেন ইস্টার্ন রেলের নিখিল নন্দীর। পরের বছর ১৯৬৬ সালে এলেন কোলকাতার মাঠে—গায়ে ইস্টার্ন রেলের জামা। আসরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা, দলে আসন পাকা। এই বছরই পান্ডুতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-

রেলওয়ে ফুটবলে নিরঞ্জন গাঙ্গুলী ইস্টার্নের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। পরের বার মাদ্রাজেও।

শুধু তাই নয়, ১৯৬৬ সালে তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতার হয়েও খেলেছেন—নরসিংহ দত্ত কলেজের ছাত্র হিসেবে। কলাবিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এখন নিরঞ্জন।

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেদিনের খেলা নিরঞ্জনের স্মরণীয় খেলা বৈকি! কিন্তু সবচেয়ে স্মরণীয় নয়। যে খেলাটি তাঁর মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে সেটি হোল—বছর দুই আগে উখ্‌রা রেলস্টেশন সংলগ্ন কুমারডিতে স্থানীয় একটি শীল্ডের সেমি-ফাইনাল। খেলা হচ্ছিল অন্ডাল লোকো ও আসানসোল টি ইউ সি'র মধ্যে। টি ইউ সি'র বিরুদ্ধে নিরঞ্জনের লোকো দল সমাপ্তির দশ মিনিট আগে পর্যন্ত হারছিলো ০-৩ গোলে। শেষ সাত মিনিটে অন্ডাল তিন তিনটে গোল শোধ করলো—অতিরিক্ত সময়ে বাড়তি আরও একটি গোল! বাড়তি জয়-সূচক গোলটি দিয়েছিলেন আর কেউ নয়—নিরঞ্জনই।

হিমাংশু দে

(এরিয়ান)

প্রকৃত লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই সৈনিকের যোগ্য পরিচয়। এরিয়ানের ব্যাক বারবার সেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সেদিনের কথা—ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এরি-য়ানের লীগের প্রথম পর্বের খেলা। ইস্ট-বেঙ্গলের বাঘা বাঘা ফরওয়ার্ডদের একটি বারের জন্যও সাধ্য হোল না হিমাংশুকে অতিক্রম করা। বারবার ফুঁসে উঠছে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু বারবারই হার মানছে ওই হিমাংশুর সামনে এসে; হিমাংশু সেদিন অনতিক্রম্য।

কিন্তু শৈশবে হিমাংশু স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তিনি ভলিবল ছেড়ে ফুটবলের আসরে ঢুকে পড়বেন। ফুটবলের সূত্রেই প্রতিষ্ঠা পাবেন কলকাতার ময়দানে। লম্বা সট্, ভাল পজিসন জ্ঞান, জোরালো ট্যাকলিং, শারীরিক দক্ষতা—সব মিলিয়ে হিমাংশু এখন একজন নিটোল প্রত্যয়ে গড়া ফুল-ব্যাক। কলকাতা মাঠে পূর্ণ পরিচিতির পূর্বে একটি ছোটখাটো ফুটবল প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে নজরে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রখ্যাত কোচ ল্যাংচাবাবুর (এস মিত্র) এবং শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলীর। ল্যাংচাবাবু পাকা জহুরী। নিয়ে এলেন বালী প্রতিভায়। কালক্রমে সেখান থেকে এরিয়ানে। জন্ম ১৯৪৫ সালে। লেখাপড়া করেছেন ব্যারাক-পুর মন্মথ হাইস্কুলে এবং উত্তরপর্বে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। চাকরী এ জি বেঙ্গলে।

ফুটবলে হাতেখড়ি অন্নপূর্ণা অ্যাথ-লেটিক ক্লাব এবং মোহনপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবে। ১৯৬২ সালে খিদিরপুর এবং তার-পর বালী প্রতিভায়। ১৯৫৮ সালে বাংলা রাজ্য স্কুল দলের অন্যতম ব্যাক ছিলেন হিমাংশু দে। ১৯৬৫ সালে আন্তঃবিশ্ব-

বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিমাংশু, কুরু-ক্ষেত্রের সেই ফাইনাল খেলা আজও ভুলতে পারেন নি। আগের দু' বছরে উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ন কলকাতা, সুতরাং তৃতীয়বারেও সেই গৌরব অম্লান রাখতে হবে সেই প্রতিজ্ঞা নিল বাংলার ছেলেরা। কুরুক্ষেত্রের ময়দানে নতুন এক কুরুক্ষেত্র' হয়ে গেল সেদিন। ফুটবল নয়তো যেন দাঙ্গা। প্রতি-দ্বন্দ্বীরা বল ছেড়ে মানুষ নিয়েই ব্যস্ত। মার খেতে খেতে বাঙ্গলার ছেলেদেরও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা; খেলা ভাঙ্গার আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র বাকী। কলকাতার অধিনায়ক—মহাভারতের অভিমন্যুর মতই "ব্যূহ" ভেদ করে গোল দিলেন। কলকাতা আবার চ্যাম্পিয়ন হোল। সেটিই হিমাংশুর ফুটবল-জীবনের সবচেয়ে বড় খেলা।

দুলাল মণ্ডল

(ইস্টবেঙ্গল)

ঘরের সবচেয়ে আদর কুড়ানো ছেলে, একাই সারা বাড়ী মাথায় করে রেখেছে, বাবা-মা, দাদাদিদির নয়নের মণি, সবার মমতা জড়ানো—ফুটফুটে ছেলে—দুলাল আজকের ময়দানের দুলাল মণ্ডল, ইস্টবেঙ্গলের রাইট আউট দুলাল মন্ডলের কথাই বলছি।

কলকাতা ময়দানে দুলাল নামের পেছনে একটা যাদু আছে, বিশেষতঃ ইস্টবেঙ্গলের। স্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী কালে কলকাতা ময়দানে যেকটি বাঙালী খেলোয়াড় খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যেও একজন ছিলেন দুলাল। অবশ্য মন্ডল নয়, দুলাল গুহঠাকুরতা; তিনিও খেলতেন ইস্টবেঙ্গলের রাইট আউটে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক।

দুলাল মন্ডল কলকাতায় ছোটবড় অনেকগুলি ক্লাব ঘুরে এসেছেন ইস্ট-বেঙ্গলে। গতি ক্ষিপ্র, স্যুটিং এবং সেন্টার চোখ জুড়ানো। খেলার পেছনে বুদ্ধির ছাপও বিপুল। কুড়ি বছর আগে—অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে খুলনার কামিনীবাসী গ্রামে দুলালের জন্ম। দেশবিভাগের পর চলে এলেন পশ্চিম বাংলায়, দমদমের বাগুই-আটিতে। শৈশবের লেখাপড়া দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দিরে, পরে দমদম শহীদ রামেশ্বর স্কুলে। এই শহীদ রামেশ্বর বিদ্যামন্দির থেকেই স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছেন দুলাল।

স্কুলে পড়ার সময় ১৯৫৯ সালে আন্তঃ-জেলা ফুটবলে ২৪-পরগনা দলে স্থান পেলেন দুলাল, ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত খেলেছেন কুমারটুলি ক্লাবে। ১৯৬১ সালে বেনেটোলায়। পরপর তিন বছর কুমারটুলির অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। পরের বছর খেললেন হাওড়া ইউ-নিয়নে। অধিগত নৈপুণ্যের সূত্রে দুলাল মাঠের সকলের নজরে পড়লেন। এই হাওড়া ইউনিয়নে খেলার সময়ই, ১৯৬৪ সালে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরে কলকাতার অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন দুলাল মন্ডল। সেবারের এই প্রতিযোগিতায় সব-চেয়ে বেশী গোল করেছিলেন তিনি।

পরের বছর আমন্ত্রণ এলো মোহন-বাগান থেকে। মোহনবাগানে এসেই আপন প্রতিভায়, আপন বৈশিষ্ট্যে দুলাল স্বীকৃতি পেলেন, পেলেন যশ। ১৯৬৫ সালের টোকিও যুব ফুটবলে ভারতীয় দলে ঠাঁই করে নিতে দুলালের দেরী হোল না। ১৯৬৬ সাল কাটলো মোহনবাগানে। মহামেডান স্পোর্টিং-মোহনবাগানের লীগের সে খেলাটি তাঁর মনে এখনও ভাসছে। দিনের একমাত্র গোলটি করলেন দুলাল: অনুরাগীরা সোচ্চার হোলেন দুলালের যশগানে। মোহনবাগান ঘুরে দুলাল এ বছর এসেছেন ইস্টবেঙ্গলে। দুলালের মনে এখন একমাত্র চিন্তা, একমাত্র উৎকণ্ঠা—শ্রদ্ধেয় দুলালদার (দুলাল গুহঠাকুরতা) "নখের যোগ্য" হতে পারবো তো?

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

লণ্ডন চিড়িয়াখানার শাদা গণ্ডার যুগল পূর্বরাগ হিসাবে লড়াই-এ প্রবৃত্ত হচ্ছে।

শুভংকর

চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি

সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বুকে যেসব জীব-জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে তাদের সব কটির অস্তিত্ব আজ বজায় নেই। প্রাকৃতিক কারণে ও মানুষের লোভের শিকারে বহু জীবজন্তু ইতিমধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে বা ক্রমশ লোপ পেতে চলেছে। আজও কিছুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় দেখা যায়। কিন্তু এগুলির বংশবৃদ্ধির চেষ্টা যদি করা না হয়, তাহলে এই প্রাণীগুলিও কালক্রমে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে।

দুটি প্রধান কারণে চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমত বিলীয়মান প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা করা, যাতে বংশবৃদ্ধি করে পরবর্তীকালে স্বাভাবিক বাসস্থানে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত বন্য প্রাণীদের প্রজনধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা (আশ্চর্যের বিষয় বন্য প্রাণীর প্রজনধর্ম সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা নেই)। এই লব্ধ জ্ঞান চিড়িয়াখানায় বন্য প্রাণীর বংশবৃদ্ধির জন্যে এবং সংরক্ষিত অঞ্চলেও তাদের প্রজননের কাজে লাগানো যেতে পারে।

কিন্তু পৃথিবীর অনেক চিড়িয়াখানার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণী সংগ্রহের মতো অর্থসামর্থ্য তাদের নেই। বন্য পরিবেশেও প্রাণীর বহু প্রজাতি আজ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেসব বড়ো চিড়িয়াখানায় এই ধরনের দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু আছে, তাদের গুরুত্ব আজ অনেকখানি বেড়ে গেছে। বিলীয়মান প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার একটা দায়িত্বও তাদের আছে।

চীন দেশের ডেভিড হরিণ, ইউরোপীয় বাইসন এবং মঙ্গোলীয় বন্য অশ্ব আজ আর প্রকৃতিতে দেখা যায় না। কয়েকটি চিড়িয়াখানায় তাদের অস্তিত্ব কোনোক্রমে বজায় আছে। তাই সেসব চিড়িয়াখানায় এই প্রজাতিগুলির প্রত্যেকটির বংশবৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তার ফলে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ইউরোপীয় বাইসনের সংখ্যা এভাবে এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে পোলাণ্ডের ওয়ারশর কাছে অরণ্যে স্বাভাবিক পরিবেশে কিছু-সংখ্যক বাইসনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এক সময় রাশিয়ার অরণ্যে মঙ্গোলীয় বন্য অশ্ব প্রচুর সংখ্যায় ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার সংখ্যা কমে এসে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই রাশিয়ার বন্য অশ্বের পুনর্বসতির জন্যে একটা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং সেখানে একটি সংরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাবও হয়েছে।

কয়েক বছর আগে লণ্ডন চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ চীনদেশে তিনটি ডেভিড হরিণ পাঠান এবং এখন পিকিং চিড়িয়াখানায় তাদের সংখ্যা বেশ ভালোভাবেই বেড়ে চলেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর চীনদেশে এই প্রজাতিকে এই প্রথম দেখা গেল। মোরগ সদৃশ রঙিন "ফেজণ্ট" পাখীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে দূরপ্রাচ্যে আর একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। একসময় ফরমোজায় এই রঙিন পাখী বসবাস করত, কিন্তু এখন সেখানে এই পাখী প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক চিড়িয়াখানায় এই ফেজণ্টের এত বংশবৃদ্ধি হয়েছে যে আদি বাসস্থানে তাদের পুনর্বসতি করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চিড়িয়াখানায় বন্য জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির করাল গ্রাস থেকে বিরল প্রজাতিকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় কারণ হল তাদের প্রজননতত্ত্ব ও প্রজননগত আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা।

কিন্তু চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি বা যৌন-আচরণ পর্যবেক্ষণে নানা সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। চিড়িয়াখানায় কখনও কখন দেখা যায়, ভুলক্রমে দুটি পুরুষ বা দুটি স্ত্রী জন্তুকে একসঙ্গে রাখা হয়েছে। চিড়িয়াখানার পরিবেশে জীবজন্তুর যৌনবোধ বিকাশের পক্ষে একটি বাধার প্রায়ই সম্মুখীন হতে হয়। সেটি হচ্ছে, যদি কোনো জন্তু শিশুকাল থেকে মানুষের হাতে লালিত-পালিত হয়, তাহলে তারা নিজেদের 'মানুষেরই একজন' বলে মনে করে। তার ফলে বড় হবার পর তারা নিজস্ব প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ প্রকাশ করে না। চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুর এই ধরনের আচরণ তাদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে একটি বিশেষ বাধা। চিড়িয়াখানায় বানর জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বাধা প্রায়ই দেখা যায়। এই মানবগত আচরণের কারণেই বোধহয় লণ্ডন চিড়িয়াখানার মূল্যবান সংগ্রহ বৃহদাকার স্ত্রী-পাণ্ডা 'চি-চি' সম্প্রতি মস্কো চিড়িয়াখানার পুরুষ-পাণ্ডা 'আম-আম'-এর সঙ্গে মিলনে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

সার্থক প্রজননের জন্যে বহু প্রাণীর পক্ষে শিশুকাল থেকে নিজস্ব প্রজাতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্যে জীবজন্তুর ইতিবৃত্ত জানা দরকার হয়ে পড়ে। যে প্রাণী ছোটবেলা থেকে মানুষের হাতে লালিত-পালিত হয়েছে তার সাথী হিসাবে নিজস্ব প্রজাতির এমন একটি বন্য প্রাণীকে নির্বাচন করা উচিত যে প্রজন-আচরণে অভিজ্ঞ।

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার বর্তমানে চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুর সন্তান উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পুরুষ প্রাণীদেহ-নিঃসৃত শুক্রাণু স্ত্রী-প্রাণীর গর্ভাশয়ে ইঞ্জেকশনের দ্বারা রোপণ করা হয়। আর একটি কৃত্রিম পদ্ধতি হচ্ছে হর্মোন প্রয়োগ করে প্রজন-আচরণ উদ্রেক

করা। কৃত্রিম উপায়ে বন্য প্রাণীর গর্ভ-সঞ্চারের সমস্যা অনেক। কারণ বিভিন্ন প্রজাতির প্রজন-ক্রম বিভিন্ন। তাছাড়া, একবার প্রাণীদেহ থেকে শুক্রাণু নিষ্কাশনের পর হিমায়িত করে তা সংরক্ষণ করতে হয়। এটা একটা বিরাট সমস্যা। কারণ বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণু বিভিন্ন তাপমাত্রায় হিমায়িত হয় এবং অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম তাপমাত্রা যে কত তা জানা নেই।

চিড়িয়াখানার জীবজন্তুর কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারে লণ্ডন চিড়িয়াখানার ওয়েলকাম ইনস্টিট্যুট বিশেষ অগ্রণী। বর্তমানে সেখানে সাদা গণ্ডারের কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চলছে। গণ্ডারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী বলে দেখা গেছে। কারণ গণ্ডার সব সময় নিয়মিতভাবে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয় না এবং যদি মিলিত হয় তাও মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্যে এবং কখনও কখন এই মিলনের সময় তারা মিথুনে প্রবৃত্ত হয় না। কাজেই কৃত্রিম উপায়ে শুক্রাণু রোপণের উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলে কয়েক টন ওজনের একটি গণ্ডারকে গলদঘর্ম হয়ে জাহাজে তুলে অন্য দেশে পাঠাবার প্রয়োজন হবে না, শুধু এক শিশি হিমায়িত শুক্রাণু পাঠিয়ে দিলেই কাজ হবে। এছাড়া, চিড়িয়াখানায় স্বাভাবিকভাবে দুটি গণ্ডারের মিলন ঘটিয়ে গর্ভসঞ্চারের একটা বিপজ্জনক সমস্যা আছে। কারণ গণ্ডাররা প্রণয় নিবেদনের অঙ্গ হিসাবে সাধারণত দুজনে লড়াই করে। এই লড়াই-এর জন্যে প্রশস্ত জায়গা থাকা দরকার, নইলে দুজনের একজন মারাত্মকভাবে ঘায়েল হয়ে মারা যেতে পারে। আর একটি গণ্ডার মারা যাওয়ার মানে চিড়িয়াখানার প্রভূত অর্থ-নাশ। কারণ একটি গণ্ডারের দাম বর্তমানে কমপক্ষে সাড়ে ৩১ হাজার টাকা।
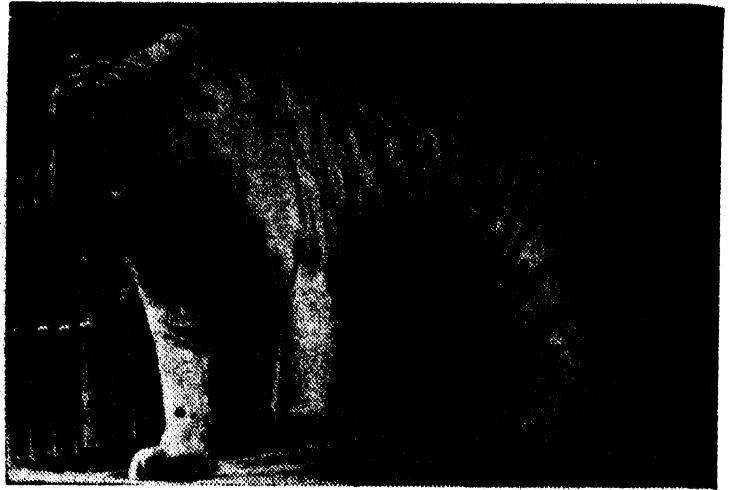
আলিপুর চিড়িয়াখানার ভূমিষ্ঠ শাদা বাঘের একটি।

চিড়িয়াখানায় কৃত্রিম উপায়ে জীবজন্তুর সার্থক প্রজননের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে তাদের প্রজন-আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। কোনো কোনো প্রাণী, বিশেষত মাংসাশী স্তনপায়ী প্রাণীরা, তিনদিন ধরে দিনে প্রায় ৪০ বার মিথুনে লিপ্ত হয়, কিন্তু খুর-বিশিষ্ট প্রাণীরা দিনে একবার কিংবা দুবার মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মিথুনক্রিয়া করে। সুতরাং চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের কাজ হবে পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারণ করা কোন কোন প্রাণীর প্রজন-আচরণ স্বাভাবিক। যে প্রাণী দিনান্তে বহুবার মিথুনে লিপ্ত হয়, তার দেহে কৃত্রিম উপায়ে একবার মাত্র শুক্রাণু রোপণ করে স্বভাবতই কোনো ফল হবে না।

এখন প্রশ্ন হল—কোন প্রাণীগুলি চিড়িয়াখানায় সন্তান উৎপাদন করতে পারে? দেখা গেছে, হরিণ, উট, ভল্লুক, বড় বিড়াল এবং বাঘ-সিংহ বন্দী অবস্থায় সহজে সন্তান উৎপাদন করতে পারে। চিড়িয়াখানায় প্রজননের ফলে সিংহ ও ভাল্লুকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাদের ভরণ-পোষণ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে যেসব প্রাণীকে চিড়িয়াখানায় সন্তান উৎপাদন করানো সবচেয়ে কঠিন তার মধ্যে আছে কয়েক শ্রেণীর বানর, আর্মাডিলো ইত্যাদি প্রাণী এবং পতঙ্গভুক প্রাণী। যে সকল প্রাণী বিচরণ করে খাদ্য সংগ্রহ করে বা অন্যান্য প্রাণীকে তাড়া করে ও মেরে খায়, সাধারণত তাদের বন্দী অবস্থায় রাখা ও সন্তান উৎপাদন করানো সবচেয়ে সহজ। এই শ্রেণীর প্রাণী জটিল ও বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সত্য। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রাণীরা যখন চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করে, তখন বোঝা যায় তারা চিড়িয়াখানার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের বেশ ভালোভাবেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

পৃথিবীতে বিরল প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাদা বাঘ। সারা পৃথিবীতে শাদা বাঘ অতি অল্পসংখ্যকই আছে। আমাদের দেশে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চলে এই বাঘ পাওয়া যায়, তবে সংখ্যায় খুবই কম। চিড়িয়াখানায় এই শাদা বাঘের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা আমাদের দেশে বিশেষভাবে করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেওয়ার মহারাজার কাছ থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য শাদা বাঘ কিনে আলিপুর চিড়িয়াখানায় উপযুক্ত পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করেন। তারপর একটি হলদে ডোরা-কাটা বাংলার বাঘের সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে হিমাদ্রি ও নীলাদ্রি নামে দুটি শাদা সন্তান উৎপাদন করা হয়েছে। পরবর্তী-কালে এই শাদা বাঘের পরিবারে আরও নতুন অতিথি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি করেছে।

মোরগ সদৃশ ফেজণ্ট পাখী; সারা পৃথিবী তে এই প্রজাতির পাখী মোট ৩৩৭টি আছে।

(১২)

বেদনা?...তা নারীর বেদনা তো বাংলাদেশের সনাতন সম্পত্তি, ওর চেয়ে মামুলি আর কী আছে? আমি নেলিকে যা ক'রেছিলুম তার পিছনে ছিলো আস্ত একটা জীবনদর্শন—আমার কোনো স্বার্থ নয়, অন্য কারো প্রতি আসক্তি নয়, বিশুদ্ধ কৌতূহল শুধু—প্রেম, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি বিখ্যাত ভূতগুলোকে মেরে ফেলার চেষ্টা। কিন্তু সব সময় সে-রকম কিছু থাকে না—নেহাৎ ঘটনাচক্রে কষ্ট পায় লোকেরা, সমাজ অনড় ব'লে, পাহারাওয়ালারা দুর্ধর্ষ ব'লে। যারা শুধু প'ড়ে প'ড়ে মার খায়, প্রতিবাদ করে না, প্রতিবাদ করতে শেখেনি কখনো—বলুন তো, তাদের জন্য কি ব্যথিত হওয়া যায়, তারা কি সহানুভূতিরও যোগ্য? ...আজ্ঞে? আমার স্ত্রী? তা তার সপক্ষে অন্তত এটুকু বলার আছে যে সে আমাকে ভালোবাসতো, আর মানুষের হৃদয়ের উপর তার নিজেরও হাত নেই। তার সঙ্গে কাজলের তুলনা করলে খুব ভুল করবেন।

আপনি নিশ্চয়ই অনেক আগেই বুঝেছেন যে ফটিক-কাজলের দাম্পত্য জীবন ভালো চলছিলো না? যে জলপাইগুড়ির সেই বাস্-লাইনের মালিক, যাঁর টাকায় তিনি বিলেত যাবার সাধ মিটিয়েছিলেন, তাঁর কন্যাটির প্রতি একেবারেই মন ছিলো না ফটিক-মামার? যে খুব সম্ভব তিনি বিদেশে পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেননি, হয়তো বা কোনো 'ধিঙ্গি মেম' তাঁকে পুরোপুরি গিলেও নিয়েছিলো? এটা তো কিছু শক্ত কথা নয়, বাড়ির বয়স্করা চোখের পলকে বুঝে নিয়েছিলেন, মামা প্রথম ফেরার পর দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেও টের পেয়েছিলেন আমার দিদি—শুধু আমারই, অনেকদিন পর্যন্ত, কিছু খেয়াল হয়নি। যৌবন বড়ো স্বার্থপর সময় মশাই, অন্যের কথা ভাবার তখন সময় থাকে না, অন্যেরা আমাদের যতটুকু সুখ জোগাতে পারে শুধু ততটুকুই তখন সম্পর্ক আমাদের তাদের সঙ্গে। কিন্তু এমন একটা সময় এলো যখন স্বার্থপর যুবক আমিও কাজলের দুঃখের দরদী না-হ'য়ে পারলুম না।

ফটিক-মামা হঠাৎ ঘোষণা করলেন তাঁকে শিগগিরই কলকাতায় ফিরতে হবে। মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—'সে কী? সামনে পুজো, এটা কি একটা যাবার সময়?' কিন্তু মা-র অনুরোধ, অনুনয়, চোখের জল কোনো কাজে লাগলো না; ফটিক-মামাকে যেতেই হবে, তাঁর ব্যবসার পার্টনারের চিঠি পেয়েছেন কলকাতা থেকে—জরুরি কাজ। তাছাড়া কী-বা হবে ঢাকায় ব'সে থেকে, এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা ক'রে মাত্র তিনজনকে রাজি করাতে পেরেছেন তাঁদের কোম্পানির শেয়ার কিনতে—একজন অনাদিবাবু, আর অনাদিবাবুরই সূত্রে আরো দু-জন—কাউকে বোঝানো যায় না যে ইলেকট্রিক বাল্‌ব এমন একটি দরকারি জিনিশ যে এই ব্যাবসায় ফেল হবার কোনো কথাই ওঠে না, দিশি বাল্‌ব বিলিতির চাইতে শস্তা হবে, লোকেরা স্বদেশী ব'লেও কিনবে তাঁদের 'জ্যোতি' বাল্‌ব—এর পরে পাখাও তৈরি হবে, পাখার নাম হবে 'মলয়'—দু-বছরের মধ্যেই ডিভিডেন্ড দিতে পারবেন তাঁরা। কিন্তু না—ঢাকার লোকেরা ইণ্ডাস্ট্রি-মাইণ্ডেড নয়, চাকুরে-পুষ্টি সেই মামুলি 'গাভ্‌মেন্ট পেপার' ছাড়া কিছু বোঝে না, জমিদার-শ্রেণী বংশানুক্রমে তুলোর বাক্সে জীবন কাটাবার ফলে পাই-পয়সা রিস্ক নিতে নারাজ, আর সাহা-বসাকদের মধ্যে যারা লাখ টাকার কারবারি তারা এখনো ঘরে-ঘরে সিঁদুর-লেপা গণেশ-বসানো সিন্দুকে পাঁজা-পাঁজা নোট রেখে দেয়, আর ব্যবসা বলতেও তাদের মৌরসি-পাট্টা শাঁখা শাড়ি কাপড়ের দোকান মনোহারি দোকানই বোঝে শুধু। কী দুঃখ এই দেশের—যেখানে মেডিয়াভল অন্ধকার বিরাজমান, যেখানে এখনো কারো-কারো ধারণা যে ইলেকট্রিক আলোয় চোখ খারাপ হয়, যেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা গণেশের ভুঁড়ির মধ্যে প'চে যায়, আর মেয়েদের গায়ের সোনা হ'য়ে আটকে থাকে? 'ভারত-ললনাদের স্বর্ণালঙ্কার কেড়ে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে খাটানো উচিত, তাহ'লে দেশে আর অভাব থাকবে না।'

শেষ কথাটা ব'লে ফটিক-মামা সমর্থনের জন্য আমার দিকে তাকালেন। কিছুদিন

আগে হ'লে আমি তৎক্ষণাৎ সর্বান্তঃকরণে একমত হতুম, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠলো কাজল-মামির চাঁদের মতো নেকলেসটা, যার চুনি-পান্নার ঝিলিকের সঙ্গে কাজলের চোখ একবার অন্তত পাল্লা দিয়েছিলো। সেদিন, মিতুর জন্মদিনের সন্ধ্যায়, আমি যখন মহিলাদের সঙ্গে ব'সে চা খাচ্ছিলুম, আমার চোখ কয়েকবার স'রে এসেছিলো কাজলের মুখ থেকে ঐ নেকলেসটাতে, আমি ভাবছিলাম তার গলা আর বুক আরো কত সুন্দর দেখাচ্ছে ওটার জন্য, আর ঐ ঠাণ্ডা সোনা আর পাথরগুলোতে কি সঞ্চারিত হচ্ছে না তার শরীরের কিছুটা উত্তাপ? আমি তাই একটু সাবধানে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো ফটিক-মামা, তবে মেয়েদের সুন্দর দেখালে ভালো লাগে তা মানবে নিশ্চয়ই?' 'Ah young man!' ব'লে ফটিক-মামা আমার পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন, কিন্তু তারপরেই যেন মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে একটা হালকা ছায়া পড়লো, নিচু গলায় বললেন, 'গয়না ছাড়াই সুন্দর দেখায় এমনও আছে।'

আমি বরাবরই রাত-জাগা পাখি; সে-রাতেও জেগে-জেগে একটা চিঠি লিখছিলাম। টুকটাক আওয়াজ আসছে পাশের ঘর থেকে—সেটা ফটিক-কাজলকে ছেড়ে দিয়েছেন আমার মা—মামা কাল চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর জিনিশপত্র গোছানো হচ্ছে। গোছগাছ হ'য়ে যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গেলো, চারদিক নিশুতি নীরব, আমার ঠোঁট নিঃশব্দে নড়ছে, কলম চলছে, এমন সময় আবার কথাবার্তা শুরু হ'লো পাশের ঘরে, মামার বিরক্তিভরা মৃদু গলা শুনলাম, 'আঃ! থামো তো! ঘুমোতে দাও।' যাকে বলা হ'লো সে কিন্তু থামলো না, গুনগুন ক'রে কী-যেন-কী বলতে লাগলো—মনে হ'লো কিছু একটা তর্কাতর্কি হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় কথা শোনা উচিত নয়, এই চিঠিটা অনেক বেশি জরুরি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দুজনেরই গলা চ'ড়ে যাচ্ছে ব'লে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে সেই শান্ত নীরব আবহাওয়া, যা এই চিঠি লেখার জন্য দরকার আমার : ফটিক-মামার গলায় 'গয়নার টিপি, তোমার বাবা' এই কথা দুটো বেশ রাগি আওয়াজে ছুটে এলো আমার কানে—তবে কি উনি সত্যি কাজলের গয়নাগুলো নিয়ে যেতে যাচ্ছেন ব্যাবসায় তা খাটাবার জন্য না কি চাচ্ছেন কাজল তার বাবার কাছ থেকে স্বামীর জন্য মূলধন এনে দিক? 'তোমার লজ্জা করে না—' ব'লে কাজল একটা কথা আরম্ভ করলো, তার ঐ নরম গলা অত তীক্ষ্ণ হ'তে পারে আমার ধারণা ছিলো না (যেমন মিতুর কথা শুনে ভাবা যায় না গাইবার সময় তার গলা কেমন অতি সহজে উঁচু থেকে আরো উঁচু পর্দায় ঢেউ তুলে-তুলে খেলা করতে পারে)—কিন্তু এর পরে কাজল কী বললো বোঝা গেলো না। আরো কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথা চললো দুজনের মধ্যে—নিচু, চাপা, কিন্তু তলায়-তলায় তীব্র (আমি পাশের ঘর থেকেও তা টের পাচ্ছিলাম)—তারপর হঠাৎ একটা কথা যেন কাজলের গলা চিরে বেরিয়ে এলো—'বলো, ঐ ছবিটা কার! বলতেই হবে!' ফটিক-মামা বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন, 'চুপ!' তারপর নিথর স্তব্ধতা নামলো।

আমি বিরক্ত হলাম চিঠি লেখায় এই ব্যাঘাত ঘটলো ব'লে, কিন্তু ওটাতে তক্ষুনি আবার মন দিতে পারলুম না, আমার মনে প'ড়ে গেলো কয়েকদিন আগেকার একটা ছোট্ট ঘটনা। সাইকেলটা সারাতে দিয়েছিলাম সেদিন, হেঁটে-হেঁটে ফিরছিলাম রাত দশটা নাগাদ, বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখি আমার বিশ-পঁচিশ গজ আগে-আগে ফটিক-মামাও চলেছেন। আস্তে হাঁটছিলেন, একটু ক্লান্তভাবে, মাথা নিচু ক'রে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম তাঁকে ধ'রে ফেলার জন্য, কিন্তু ফটিক-মামা একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় থামলেন, পকেট থেকে কিছু-একটা বের ক'রে দেখতে লাগলেন মন দিয়ে—ছোটো এক টুকরো কাগজ, কোনো চিঠি বা ফোটো বোধহয়—এত মন দিয়ে দেখছিলেন বা পড়ছিলেন যে পিছনে আমার পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না, আমার 'ফটিক-মামা' ডাক শুনে এত বেশি চমকে উঠলেন যে কাগজটা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেলো। বিদ্যুৎবেগে সেটা তুলে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'রঞ্জু, আড্ডা দিয়ে ফিরছিস। চল শিগগির, বাড়ি চল, জবর খিদে পেয়ে গেছে, আর দিদি বোধহয় মাংসের রেজেলা করেছেন আজ।' কথা বলার এই ধরনটাই ফটিক-মামার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সে-মুহূর্তে সেটা ঠিক যেন মানালো না তাঁকে, যেন চেষ্টা ক'রে হাসছেন, তাঁর কপালে আমি যেন চিন্তার রেখা দেখলাম, অন্তত এটুকু স্পষ্ট বোঝা গেলো যে আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তিনি বাড়ি ফিরে খাওয়ার কথা ভাবছিলেন না। ব্যাপারটা আমি পরের দিনই ভুলে গিয়েছিলাম অবশ্য, কিন্তু সে-রাতে শুয়ে-শুয়ে মনে পড়লো—হঠাৎ মনে হ'লো আমি যেন চকিতে দেখতে পেয়েছিলাম মামার হাত থেকে প'ড়ে-যাওয়া কাগজটাকে—কোনো ফোটোগ্রাফ, কোনো মুখ, কোনো মেয়ের মুখ?

কখনো বা মা-কে দেখতাম ফিসফিশ ক'রে কিছু বলছেন ফটিক-মামাকে—কোনো সাংসারিক সদুপদেশ দিচ্ছেন বোধহয়—আর আমার ফূর্তিবাজ বিশালবক্ষ ভোজন-বিলাসী ফটিক-মামা কপালে হাত দিয়ে কী যে ভাবছেন বোঝার উপায় নেই। মাঝে-মাঝে বিদেশী টিকিটওলা চিঠি আসে মামার নামে—সেটা খুবই স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই নানা দেশে বন্ধুবান্ধব আছে তাঁর, কিন্তু মিনু যখন জমাবার জন্য স্ট্যাম্পগুলি চেয়ে নেয় আমি দেখি সেগুলো সবই জর্মানির। মামাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে-দেশটা তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো তা হ'লো জর্মানি; গ্যেটের বিষয়ে বেশি কিছু না-জানলেও জর্মানদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ; আর, যদিও পলিটিক্স নিয়ে এমনিতে কখনো কথা বলেন না, তবু এক-একদিনের কাগজ প'ড়ে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন—'দেখছিস রঞ্জু, কীরকম গুণ্ডামি চালিয়ে যাচ্ছে হিটলার। কী অত্যাচার ইহুদিদের ওপর! এই দৈত্যকে আরো বাড়তে দিলে কিন্তু সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। নাঃ, আর-একটা যুদ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই, দেখছি।' সে-সময়ে, অন্য অনেকেরই মতো, হিটলারকে নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলুম না, তাই আমি ধরতে পারিনি মামার এ-সব কথায় এই সত্যিকার দুশ্চিন্তার সুর কেন, যদি ধরা যাক জর্মানির কোনো ক্ষতিও করে হিটলার, তাতে তাঁর কি এসে যায়? আমি জানতাম আমাদের ইংরেজ-বিদ্বেষের একটা উল্টো পিঠ হলো জর্মান-প্রীতি, এঞ্জিনিয়র-দের পক্ষে জর্মানি একটি আদর্শ দেশ তাও শুনেছিলাম; কিন্তু এটা আমার মাথায় কখনো খেলেনি যে জর্মানির সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে ফটিক-মামার, বা হিটলার বিষয়ে ভীত হবার কোনো ব্যক্তিগত কারণ। এও লক্ষ করিনি যে বিদেশী চিঠি যেদিনই আসে সেদিনই একটু বিমর্ষ হ'য়ে থাকেন ফটিক-মামা।

এবারেও কাজলকে নিয়ে যাবার কথা তুলেছিলেন আমার মা, খুব মৃদুভাবে অবশ্য; ফটিক-মামা সহাস্যে বলেছিলেন, 'আর ভাবনা নেই দিদি, এবারে গুছিয়ে আনা গেছে, ফ্যাক্টরির কাজ শুরু হ'লেই বাড়িটা বদলাবো, তারপর—' মা বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি তো তোকে কতবার বলেছি বাড়ি বদলাবার জন্যে ভাবিস না—দুটি প্রাণীর সংসার তো, ওতেই চমৎকার চ'লে যাবে। কাজল এখন পাকা গিন্নি হয়েছে, ছবির মতো গুছিয়ে নেবে, দেখিস।' মামা একটা পচা রসিকতা করলেন এর উত্তরে, 'ওঃ দিদি, তোমার কাজলের প্রশংসা শুনে-শুনে

জেরবার হ'য়ে গেলাম, এর পরে আমার হিংসে হবে কিন্তু ব'লে দিচ্ছি!'—একটু থেমে, একই রকম হালকা সুরে—'শোনো দিদি, আমি ভাবছি কাজলের গয়নাগুলো আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো এবার—ওসব জবড়জং ভারি গয়নার দিন তো আর নেই, কলকাতায় নিয়ে চমৎকার হালকা হালফ্যাশনের ডিজাইনে গড়িয়ে দিলে হয় না?' মা একটু ভেবে বললেন, 'তা বেশ, কিন্তু তুই পুরুষমানুষ ও-সবের তো ঘুঁটিনাটি কিছু জানিস না, স্যাকরা যদি ঠকিয়ে দেয় তোকে? বরং এখানে আমাদের গদাধর স্যাকরা পুরোনো লোক, ও'র হাতের কাজও খুব পরিষ্কার, আর তাছাড়া কাজলের নিজের পছন্দমতো ডিজাইন হওয়া চাই তো।' মামা একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'বেশ, যা ভালো বোঝো।'

ঐ যে কয়েকটা কথা দৈবাৎ আমার কানে এসেছিলো সে-রাত্রে, তার সঙ্গে এমনি কয়েকটা তুচ্ছ ব্যাপার মিলিয়ে নিতে-নিতে যেন একটা সন্দেহের ছায়া পড়লো আমার মনে, কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবলাম না আমি, ভবতে ইচ্ছেও করলো না, যেহেতু মনে-মনে আমি বিরক্ত হয়েছিলুম মিতুকে লেখা চিঠিটা আজ রাত্রে শেষ হ'লো না ব'লে।

পরের দিন আমি স্টেশনে এলাম মামাকে তুলে দিতে; মীটার-গেজের ছোট্ট ট্রেনটা যখন টিকশ-টিকশ করে টিকাটুলির বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, তখন একটা গভীর নিশ্বাস পড়লো আমার। রোজ এগারোটা পঞ্চাশে ঢাকা স্টেশন থেকে ছাড়ছে এই ট্রেন, তৈরি থাকছে নারানগঞ্জের ঘাটে স্টিমার—কেন আমি একটা টিকিট কেটে চেপে বসি না, পরের দিন ভোরবেলা নামি না কেন গমগমে আধো-অন্ধকার মস্ত-বড়ো-ঘড়ি-বসানো শেয়ালদা স্টেশনে, সেই শহরে, সময় যেখানে বত্রিশ মিনিট এগিয়ে আছে, ভোরের রোদে চিকচিক করে জলে-ধোয়া অ্যাসফল্টের রাস্তা, যেখানে সব বই, সব পত্রিকা কিনতে পাওয়া যায়, লোকেরা পরিষ্কার উচ্চারণে বাংলা বলে, আর—সবচেয়ে বড়ো কথা—যেখানে মিতু আছে এখন? এর চেয়ে সহজ আর কী হ'তে পারে, কেন যাই না, কেন আমি বঞ্চিত রাখছি নিজেকে? ভাগ্য যেন খেলা করছে আমাকে নিয়ে; ঠিক এই সময়—যখন বকুল-তিলার দুপুরগুলো হ'য়ে উঠছে আমার অস্তিত্বের কেন্দ্র, দিন-রাত্রির অন্য সব সময়ের তলায় তারই অনুরণন আমি শুনতে পাচ্ছি—ঠিক তখনই মিতুর ডাক পড়লো কলকাতায়, দিলদার নওরোজের নতুন গান রেকর্ড করার জন্য। নওরোজ, যার কবিতার আমি ভক্ত, আর এডিসনের উদ্ভাবিত ঐ গোল, ভঙ্গুর চাকতিগুলো, যা গেঁথে দিয়েছে আমার স্মৃতিতে কনক দাশের গলায় 'যাবার বেলায় পিছু ডাকে' লাইনটা—তারা আমার এমন শত্রুতা করবে কে জানতো? যদি চলে যাই কোনো ছুতো ক'রে কলকাতায়, তারপর মিতুর সঙ্গে একই তারিখে ফিরে আসি? ভোরবেলা গোয়ালন্দের স্টিমার, নদীর বুকে শরতের কুয়াশা, চলতেচলতে রেলিঙে ভর দিয়ে পদ্মার ঘুলোলি জল, একতলায় এঞ্জিন-ঘরের গরম ধোঁয়া, সারেঙের ঘণ্টার নির্দেশ, সিংহের থাবার মতো পিস্টনগুলোর অবিরাম ওঠাপড়া, জলের গন্ধ, স্টিমারের চাকার ফেনিয়ে-ওঠা ঘূর্ণি, খালাসিদের রান্নার গন্ধ, কোনো স্টেশনে তক্তা পাতার সময় খালাসিদের সুরেলা চীৎকার—এই সব দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ যদি তার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারি, তারই পাশে দাঁড়িয়ে, তার চেয়ে বড়ো সুখ আর কী হ'তে পারে আমার জীবনে? পদ্মার বুকে দোতলা স্টিমার—'এমু' কিংবা 'অস্ট্রিচ' যার নাম, যেখানে আমরা সাত ঘণ্টার জন্য ছুটি পেয়েছি অন্য সব দায়িত্ব থেকে, যেখানে সময় কাটানো ছাড়া আর-কিছুই করার নেই আর চারদিকে অনেক-কিছু আছে যা অভ্যেস এখনো পচিয়ে দেয়নি—সেখানে নিশ্চয়ই মিতুর আরো একটু কাছে আমি আসতে পারবো, যেন আমার মুঠোর মধ্যে প্রায় এসে যাবে সেই রহস্য, যার জন্য আমি তাকে ভালোবাসছি, অথচ যার সঠিক কোনো উপলব্ধি এখনো আমার ঘটেনি। কিন্তু না—মিতু লিখেছে তার রেকর্ডিঙের তারিখ আগামী সপ্তাহে স্থির হয়েছে, তার বাবাও তাঁর রোগীদের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাদের ফিরতে আর বেশি দেরি হবে না।

'মিতু লিখেছে—' এই কথাটা কতই না সহজে বলা হ'য়ে গেলো, কিন্তু—তারা চলে যাবার পর তৃতীয় দিনেই যখন মিতুর প্রথম চিঠি এসে পৌঁছলো আমার হাতে, তখন পত্রপ্রাপকের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি

একাত্ম ক'রে তুলতে আমার কেটে গিয়েছিলো সারাটা সন্ধ্যা আর অর্ধেক রাত্রি। আমি আশা করিনি সে চিঠি লিখবে, একেবারেই আশা করিনি তাও নয়—হয়তো আমরা চোখে-চোখে কিছু বলেছিলাম, কিন্তু সেই নিঃশব্দ বিনিময়কে স্পষ্ট ভাষায় রচিত, নির্ভুল নাম-ঠিকানা-লেখা চিঠিতে তর্জমা ক'রে নেবার মতো সাহস আমার ছিলো না। শুধু বার্তা বা সারাংশ নয়, চিঠিটার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার পক্ষে গবেষণার বিষয় হ'য়ে উঠলো—যে-ভাবে একজন সমালোচক কোনো কবিতার ছন্দ, উপমা, শব্দব্যবহার, কমা-সেমিকোলন, আর সম্ভব হ'লে তার পরিত্যক্ত পূর্বলেখনগুলো সব খুঁটে-খুঁটে পরীক্ষা করেন, আর অমনি ক'রেই টেনে বের করেন তার নিহিত অর্থ, যা শব্দগুলো অর্ধেক লুকিয়ে রেখেছে পাঠককে আরো উত্তেজিত করার জন্য, ঠিক সেইভাবে আমি লক্ষ করলাম নীলচে রঙের কাগজের উপর ভায়োলেট কালিতে আঁকা অক্ষরগুলিকে, একটু বড়ো-বড়ো, ডানদিকে হেলানো হাতের লেখা, তার ই-কার উ-কারের লম্বা টানগুলো, যা উপরের ও নিচের কথাটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন এক নতুন লিপি রচনা করছে, কমার বদলে ড্যাশ-এর অত্যধিক ব্যবহার (বোধহয় কোনো সদ্য-নামজাদা তরুণ লেখকের প্রভাব), দুটো-একটা মজার বানান ভুল (যেমন চিহ্নে মূর্ধণ্য ণ দিয়ে অকারণে 'সুন্থে' একটা য-ফলা বসিয়ে দেয়া)—এই সব-কিছু জোগান দিলো আমার সুখে, আমার রসবোধকে উস্কে দিলো, আর তাছাড়া, যে-কথাগুলোকে সে লেখার পরে দুটো আড়াআড়ি লাইন টেনে কেটে দিয়েছে, তা থেকেও আমি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম সে তার মনের ভাব কতটা লুকিয়েছে, আর সেই লুকোনো ভাবটা কী। আমি খুব আস্তে ছুঁলাম চিঠিটাকে, নিচু হ'য়ে গন্ধ নিলাম, হালকা ক'রে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম একবার—যেন ঐ এক টুকরো কাগজ খুব কোমল ও মূল্যবান কোনো সামগ্রী, যেন আমি হাত দিয়ে জোরে চাপ দিলে হঠাৎ লেখাগুলি শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

আমি যে ভাবছিলাম মিতুর সঙ্গে এক স্টিমারে ভ্রমণ করতে পারলে আশ্চর্য কোনো ফলাফল ঘটবে, সেটাই হয়তো ভুল আসলে—স্টিমারেও অন্য লোক থাকবে, অন্য কাজ, খিদে পাবে, বেলা বেড়ে উঠলে ঘুমও পেতে পারে ক্লান্তিতে, ডেক্-এর উপর বাক্স-তোরঙ্গ শিশু নিয়ে শুয়ে-ব'সে-থাকা সারি সারি যাত্রীর ভিড়ে চলা-ফেরাও সহজ হবে না—মিতুর বা তার মা-বাবার চেনা অন্য যাত্রীও বেরিয়েপড়া অসম্ভব কী? তাছাড়া এমন যদি হয় যে অনাদিবাবুরা সেকেণ্ড ক্লাশের যাত্রী, তাহলে আমি তো সেখানে পৌঁছতেই পারবো না। কিন্তু চিঠি—চিঠিটা একেবারেই ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ, চিঠি আর আমার মধ্যে জগতের কোনো সাধ্য নেই কোনো দেয়াল তোলে—সকলের চোখের আড়ালে, দূরে-দূরে থেকেও, মিলিত হয়েছে দু-জন মানুষ, মুখোমুখি, যেন প্রায় ছুঁতে পারছে পরস্পরকে। অন্য একজন মানুষের সঙ্গে সত্যিকার সহৃদয় সংস্পর্শ—কত কম ঘটে সেটা আমাদের জীবনে; কত বিরল সেই মুহূর্ত, যখন সে আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই, আর দু-জনেরই মন এক সুরে বাঁধা, এক পথে যাত্রী। কত বিপদ—কত খানা খন্দ গর্ত খাদ ঘিরে রেখেছে আমাদের, দুই বন্ধুর মধ্যে একজন যখন 'ওঅর অ্যান্ড পীস' প্রায় শেষ ক'রে এনে টলস্টয় ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারছে না, ঠিক তখনই অন্য জন কোনো অভিনেত্রীর চতুর্থ বিবাহ নিয়ে উত্তেজিত; রেস্তোরায় ব'সে প্রেমিকটি যখন নিভৃত আলাপের সুযোগ খোঁজে, তখন প্রেমিকাটির কান ও মন কেড়ে নেয় মঞ্চনিঃসৃত গীতবাদ্য; তরুণী স্ত্রী যখন বিকেলে চুল বেঁধে স্বামীর অপেক্ষায় ব'সে আছে, স্বামী তখন বাড়ি ফিরে শোনায় তার এইমাত্র দেখা টেনিস-খেলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, যার বিন্দু-বিসর্গ তার স্ত্রীর মাথায় ঢোকে না;—এমনি ক'রে, তুচ্ছতম কারণে, অনবরত ব্যর্থ হ'য়ে যায় মনের সঙ্গে মন মেলাবার চেষ্টা। কিন্তু চিঠির এ-সব বিপদ নেই; —আমরা যাকে ভালোবাসি তার নির্যাস যেন ধরা পড়ে তাতে, শুধু আমাদেরই জন্য; মাথা ধরা, খিদে পাওয়া, অন্য লোকের সংসর্গ, অন্য কোনো উপসর্গ—এই সব আকস্মিকতার উৎপাত থেকে তা মুক্ত; এমনকি বলা যায় সেটা দৈবের অধীন পর্যন্ত নয়, যদি না অবশ্য ডাকবিভাগ বিলি করতে ভুল করে।

আর-একটা কথা আমার মনে হয়েছিলো মিতুর প্রথম চিঠি প'ড়ে, পরে যার অনেক প্রমাণ পেয়েছি আমার জীবনে। মানুষের উপস্থিতি আর চিঠি প্রায়ই একরকম হয় না; অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা ক'রে বোঝা যায় না তার চিঠি কেমন হবে; কখনো এমন হয় যে, সাক্ষাৎমতো যাকে বেশ ভালো লেগেছিলো, তার একটি চিঠি পাওয়ামাত্র তার বিষয়ে আগের [illegible]

রচিত শব্দগুলো ফাঁস ক'রে দিয়েছে তার এমন কোনো বোকামি বা ন্যাকামি বা অশিক্ষা বা স্থূলতা, তার মধ্যে যার অস্তিত্ব আমরা সম্ভব ব'লে ভাবিনি। আবার এমনও হয় যে কথা শুনে যাকে খুব সাধারণ ভেবেছিলুম, চিঠিতে সে নিজেকে প্রমাণ করে বুদ্ধিমান ও সুরসিক ব'লে। আর যাদের উপস্থিতি ও চিঠি সমান ভালো, তাদেরও একটি নতুন ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে চিঠিতে—তারই উদাহরণ আমার কাছে এখন মিতু। আমি দেখলাম, মিতুর ব্যবহার যতটা লাজুক তার হাতের লেখা ততটাই নিঃসংকোচ, মুখের কথায় সে অত্যন্ত বিনীত হ'লেও তার লিখিত ভাষায় দুর্বলতা নেই—'আপনার চিঠির আশায় থাকবো'—এ-রকম একটা কথা মুখ ফুটে সে কিছুতেই বলতো না আমাকে। চিঠিও সাহিত্য জাতীয় জিনিশ—অন্তত সম্ভাব্য সাহিত্য (মাদাম দ্য সেভিন্যে শুধু তাঁর কন্যাকে চিঠি লিখেই সাহিত্যিক ব'লে গণ্য হয়েছেন); —চোখের তাকানো, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, হাতের বা ভুরুর ভঙ্গি—ভাব-প্রকাশের এ-সব গৌণ উপায় সাহায্য করছে না ব'লে শুধুমাত্র ভাষা দিয়েই সব বলতে হয় চিঠিতে; তাছাড়া পরস্পরকে দেখা যাচ্ছে না ব'লে কোনো কথা শুনে লাল বা ফ্যাকাশে হবার মতো কোনো শ্রোতা ঠিক সামনে ব'সে নেই ব'লে বলা একটু সহজও হয়। মিতুর চিঠি পেয়ে সেই রাত্রেই জবাব লিখলাম আমি, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে, রাত দুটো অবধি জেগে; পরের দিন কলেজে যাবার পথে নিজের হাতে ডাকে দিলাম রমনার পোস্টাপিশে। অন্য এক স্বাদ এলো আমার জীবনে, যেন আমাকে ফুঁড়ে নতুন এক হাওয়া বইছে, আমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে এক নতুন রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা। মিতুর জন্যে আমার যে-অভাববোধ, তারই তলা দিয়ে সুখের ফল্গু বইতে লাগলো। আমি বিকেলে ডাকপিওনের আশায় বাড়ির সামনে পাইচারি করি (এমনও হ'লো পর-পর দু-দিনে দুটো চিঠি এলো মিতুর); খাম খোলার আগেই ভেবে ফেলি আমার উত্তরের প্রথম লাইনটা (যদিও লিখতে ব'সে তা অনিবার্যভাবে বদলে যায়); আর যেদিন সে নীলচের বদলে শাদা কাগজে আর ভায়োলেটের বদলে কালো কালিতে চিঠি লিখলে, সেদিন আমার তেমনি বিস্ময়ের অনুভূতি হ'লো, যেমন হয়েছিলো সবুজ শাড়ি হলদে ব্লাউজে সূর্যাস্তের আলোয় তার নতুন এক চেহারা দেখতে পেয়ে।

একদিন কলেজ থেকে দেরি ক'রে ফিরেছি; কাজল-মামি আমার হাতে একটা পুরু খাম দিয়ে বললেন, 'মিতুর চিঠি—না?' সাধ্যমতো উদসীনভাবে বললাম, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' 'এইমাত্র দিয়ে গেলো ডাকপিওন, খানিকটা জবাবদিহি দেবার ধরনে কাজল আবার বললো, 'তোমাকে বুঝি রোজই চিঠি লেখে মিতু?' 'না, না, রোজ লিখবে কেন—এই—মাঝে মাঝে।' আমার কেমন একটু অপ্রস্তুত লাগলো কাজলের সামনে, হঠাৎ মনে পড়লো ফটিক-মামা কলকাতা থেকে কাজলকে কখনোই চিঠি লেখেন না—মাঝে-মাঝে আমার মা-কেই লেখেন দু-চার লাইন, আর এটা এ-বাড়ির সবাই এমনভাবে মেনে নিয়েছে যে এ-নিয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করে না পর্যন্ত, আমারও এ-মুহূর্তের আগে মনে হয়নি এটা কত অস্বাভাবিক, সাধারণ সাংসারিক দিক থেকেও কত বড়ো অন্যায়। 'আর তুমি বুঝি পাওয়ামাত্র জবাব দাও?' ব'লে কাজল ঠোঁটের কোণে হাসলো। আমি একটু লাল হ'য়ে বললাম, 'আমার এই এক বদভ্যাস জানো তো, কিছু লেখার জন্য হাত নিশপিশ করে, আর কিছু না পারি তো চিঠিই সই।' কাজলের মুখ গম্ভীর হলো, আমার চোখে চোখ ফেললো মুহূর্তের জন্য; তারপর হঠাৎ কিন্তু অতর্কিতে নয়, সুচিন্তিতভাবে, তার ঠোঁট থেকে আস্তে একটি প্রশ্ন খ'সে পড়লো, 'তুমি মিতুকে বিয়ে করবে?' মুহূর্তের জন্য যেন আলপিন ফুটলো আমার সারা মুখে, নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'কী যে বলো, আমার মনের ত্রিসীমানায় বিয়ের চিন্তা নেই! তুমি বুঝি ভাবো কাউকে চিঠি লিখলেই তাকে বিয়ে করতে হবে?' 'থাক থাক, আর বলতে হবে না, যে-রকম লাল হ'য়ে উঠেছো তাতেই সব বোঝা গেছে। চা খাবে এসো।

এর পর থেকে কাজল মাঝে-মাঝেই আমাকে শোনাতে লাগলো মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে কী ভালোই না হয়।

চমৎকার মানাবে তোমাদের দু-জনকে—আহা, এক্ষুনি কেন, কিন্তু এম-এ পাশ ক'রে বেরোতে তো বেশি দেরি নেই তোমার, চাকরিও পাবে, এখন থেকেই ঠিক হ'য়ে থাক না। আমি নিশ্চয়ই জানি মিতুর মা-বাবার আপত্তি হবে না, তাঁরা তা-ই চাচ্ছেন মনে-মনে, আর আমরাই বা এর চেয়ে ভালো পাত্রী কোথায় পাবো তোমার জন্য? কী বলো—ও'রা ফিরে এলে ওঁদের কানে তুলে দেবো নাকি কথাটা? মিতুকে তোমার বৌ ব'লে ভাবতে আমার এত আনন্দ হয় যে কী বলবো!' অন্য কেউ এ-ধরনের কথা বললে আমি ভীষণ রেগে যেতাম, হয়তো আর কথাই বলতাম না তার সঙ্গে, কিন্তু—যেহেতু মিতুর হৃদয়ের ভাষা আমি তার চিঠির মধ্যে শুনতে পেয়েছি, তাই যেন আমার কাজলের কাছে অপরাধী লাগছে নিজেকে, যেন তার প্রাপ্য ভালোবাসাই তার বদলে আমার কাছে চ'লে এলো—এমনি একটা অস্বস্তি আমি অনুভব করি, সে যখন আমার কাছে মিতুর সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের রঙিন ছবি আঁকে; বা বলা যায় প্রেমে পড়ার ফলে আমার চরিত্রের এটুকু উন্নতি হয়েছে যে কাজলকে আমি করুণা করতে শিখেছি এখন, তাকে প্রশ্রয় দিতে আমার অপত্তি নেই; মিতুকে আর আমাকে নিয়ে তার জল্পনা-কল্পনা শুনতে আমার খুব খারাপও লাগে না সত্যি বলতে—হয়তো এই ভাবটাকেই চলতি ভাষায় বলে 'সহানুভূতি'। আমার ভালো লাগে ভাবতে যে, অন্য একজন মানুষ আমার ভালোবাসাকে সমর্থন করে, ভালো লাগে যে সেই অন্য মানুষটিকে আমি কিছুটা সুখীও করতে পারি দু-দণ্ড তার কাছে ব'সে গল্প ক'রে। এমনি ক'রে অন্য একটা সম্পর্ক আমার গ'ড়ে উঠলো কাজলের সঙ্গে, আমি কলেজ থেকে এলে সে-ই আমাকে চা দেয় খাবার দেয়, আমি (তাকে সুখী করার জনাই) তাকে বলি আমার রুমালে তার ও-ডি-কলোন থেকে কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে দিতে. একদিন বলার পরে রোজই আমার রুমালে সুগন্ধ পাই। মিতু যেদিন লিখলে তারা সামনের শুক্রবার ফিরছে সেদিনও আনন্দের আতিশয্যে, খবরটা কাজলকে না-জানিয়ে পারলুম না। কিন্তু তার পরের দিনই—পুজো প্রায় এসে গেছে তখন—ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলো।

(ক্রমশঃ)

(৫)

হরিদাস

বনগাঁয়ের কাছে বূঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে হরিদাসের জন্ম।

কী করে যে মুসলমানের ছেলে হরিদাস হল, সংসারবন্ধন ছিন্ন করে বৈরাগী হল, কেউ বলতে পারে না। কে তার গুরু ছিল, কিংবা কেউ তার গুরু ছিল কিনা, কোথা থেকে সে কুড়িয়ে পেল ভক্তির স্পর্শমণি, হরিদাসের পূর্বজীবন কারু জানা নেই। হরিদাসও কাউকে বলেন নি স্পষ্ট করে। শুধু এইটুকু বলেছে, এইটুকু বুঝিয়েছে যে জাতি-কুল নিরর্থক, আসল হচ্ছে ভক্তি।

আসল হচ্ছে দৈন্য, অভিমানশূন্যতা। আসল হচ্ছে নামসংকীর্তন।

বেনাপোলের জঙ্গলে একটি কুটির করে একা-একা থাকে হরিদাস। যুবক, অকৃতদার। কুটিরের কাছে নিজের হাতে একটি তুলসী-গাছ পুঁতেছে, সকাল-সন্ধেয় তাকে জল দেয়। প্রাতঃস্নান সেরে নামকীর্তনে বসে। সূর্যাস্তের আগে বন থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে ভিক্ষা নেয়। তারপরে আবার সুরু করে নামকীর্তন।

একমাসে এক কোটি নাম করবে এই ছিল হরিদাসের নিয়ম। তাহলে দিনে তিন লক্ষেরও বেশি নাম করা দরকার। শুধু দিনের বারো ঘণ্টায় সেই সংখ্যাপূরণ অসম্ভব। তাই রাত্রেও হরিদাসকে বসতে হয় নাম নিয়ে।

উচ্চরবে নাম করে হরিদাস। শুধু ধ্বনি নয়, এক মধুরের উৎসব। যে শোনে সেই তন্ময় হয়ে যায়।

মনে-মনে নাম জপে শুধু সাধকের নিজের মুক্তি, কিন্তু উচ্চরব নামকীর্তনে পরসেবা, পরোপকার।

বনগাঁয়ের জমিদার রামচন্দ্র খান। তারই তাঁবের লোকেরা হরিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ তার অসহ্য হল। হরিদাসের চরিত্রে কোনো ছিদ্র পাওয়া যায় কিনা তারই খোঁজ করতে লাগল।

অদোষসুন্দর হরিদাস। কোথাও এতটুকু মসীবিন্দু পাওয়া গেল না।

ঠিক করল, প্রভাবকে হরিদাসকে অপদস্থ করতে হবে। সুন্দরী গণিকা লক্ষহীরাকে বললে, যাও, হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নাশ করো।

লক্ষহীরা বললে, এ আর বেশি কথা কী। তিন দিনের মধ্যেই তাকে ধর্মচ্যুত করব।

তিনদিন নয়, আজই, এই মুহূর্তে তাকে আবদ্ধ করো। আমার পাইককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সে তোমাদের দুজনকে একত্র ধরে নিয়ে আসবে।

লক্ষহীরা বললে, আগে সঙ্গ হোক, পরে পাইক পাঠাবেন।

অনেক সাজল-গুজল লক্ষহীরা, তারপরে রাত করে চলে এল হরিদাসের সাধন-কুটিরে। দেখল হরিদাস কুটিরে বসে অনন্য-লক্ষ্যে হরিনাম করছে।

লক্ষহীরা আশ্রমের মর্যাদা রাখল। তুলসীকে প্রণাম করল। প্রণাম করল তেজঃপুঞ্জকলেবর হরিদাসকে।

দ্বারপ্রান্তে বসল গণিকা। বেশবাসের শাসনকে শিথিল করে দিল। বললে, 'ঠাকুর, তোমাকে দেখে তোমার সঙ্গলাভের জন্যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমাকে তুমি দয়া করে একটিবার অঙ্গীকার করবে না?'

হরিদাস তাকে তাড়িয়ে দিল না। কোনো রূঢ় বাক্যও প্রয়োগ করল না। বসিয়ে রাখল। শুধু মধুর কণ্ঠের নাম শোনাল।

বললে, নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীকার করব, তার আগে, একটু অপেক্ষা করো, আমার নামসংখ্যা সমাপ্ত হোক।

রাত প্রভাত হয়ে গেল তবু হরিদাসের সংখ্যাপূরণ হল না।

লক্ষহীরা বললে, আমি আবার রাত্রে আসব।

রামচন্দ্র খবর নিতে এল।

কাল বচনে অঙ্গীকার করেছে আজ নিশ্চয়ই সঙ্গম সফল হবে। রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করল গণিকা।

আবার রাত্রে গিয়ে বসল দুয়ারে।

তোমার কাল খুব কষ্ট হয়েছে। সারা রাত শুতে পারোনি। ঘুমুতে পারোনি, ঠায় বসেছিলে সারাক্ষণ। তার জন্যে আমার কষ্টও কম হয়নি। হরিদাস বললে মধুরস্বরে, কিন্তু কী করব, আমার নামসংখ্যা যে আজও পূর্ণ হয়নি। তুমি বোসো, আমার নামকীর্তন শোনো। আজই পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি। পূর্ণ হয়ে গেলেই তোমার অভিলাষও পূর্ণ হবে।

কিন্তু সে রাত্রেও হরিদাসের নাম-সংখ্যার পূরণ হল না। বললে, কাল আবার এস। মাসে কোটি নাম, কাল যজ্ঞ শেষ হবে আশা করি। ব্রতপূর্তির পরেই স্বচ্ছন্দে তোমার বাসনা মিটিয়ে দেব।

প্রভাতে রামচন্দ্র আবার এল খোঁজ নিতে। কী হল?

আজ আবার যাব।

হ্যাঁ, শিকার ছেড়ো না।

তৃতীয় রাত্রে হরিদাসের সংখ্যাপূরণ হল। লক্ষহীরাকে জিজ্ঞেস করলে, বলো তোমার কী বাসনা?

চোখে জল ও কণ্ঠে মধু নিয়ে লক্ষহীরা বললে, কৃষ্ণসেবার বাসনা।

বলে হরিদাসের পায়ে পড়ল। অপার পাপ করেছি, আমাকে উদ্ধার করুন।

হরিদাস বললে, তোমাকে উদ্ধার করব বলেই তো তিনদিন এই কাননে থাকলাম, নইলে প্রথম দিনেই রামচন্দ্রের কারসাজির কথা টের পেয়ে পালিয়ে যেতাম। বন্ধ্যা ভূমিতে ফসল ফলাব, গণিকাকে বৈষ্ণবী করব তারই জন্যেই আমার এই তিন রাত্রির তপস্যা। এখন থেকে তোমার নাম কৃষ্ণদাসী।

আমি তবে এখন কী করব?

ঘরের সমস্ত দ্রব্য দান করো, আর তোমার ঘরেরও দরকার নেই, তুমি আমার ঘরে এসে থাকো। নিরন্তর নাম করো। আর তুলসীর সেবা করো।

কৃষ্ণদাসী তাই করল। সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিলিয়ে দিল। কেটে ফেলল কেশদাম। ভিখারিনী সাজল। জঙ্গলের মধ্যে হরিদাসের পর্ণকুটিরে এসে উঠল। রুখা-শুখা ছোলা চিবিয়ে খায়, আর দিনে-রাত্রে তিনলক্ষ নাম নেয়। কোনোদিন

আহার জোটে না তবু উপবাসে অনিদ্রায়ও নামের সংখ্যায় স্খলন নেই।

আর হরিদাস?

হরিদাস তাকে ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে চাঁদপুরে চলে গিয়েছে।

চাঁদপুরে বলরাম আচার্যের অতিথি হয়েছে। বলরাম হিরণ্য ও গোবর্ধন দাসের কুলপুরোহিত। হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভাই সপ্তগ্রামের জমিদার, বিরাট ধনী অথচ ধার্মিক, নামগুণগানে উৎসুক।

একদিন তারা বলরামকে বললে, হরিদাসকে নিয়ে আসুন, তার মুখে নাম-মাহাত্ম্য শুনি।

বলরামের মিনতিতে রাজি হয়ে হরিদাস জমিদার-সভায় উপস্থিত হল।

নাম করলে কী হয়?

কেউ বললে, নাম করলে পাপক্ষয় হয়। কেউ বললে, মুক্তি মেলে।

হরিদাস বললে, মুক্তি নামে কেন, নামাভাসেই পাওয়া যায়। মুক্তি বা পাপনাশ নামের আনুষঙ্গিক ফল। নামের মুখ্য ফল প্রেম। নাম করলে কৃষ্ণে ভালোবাসা আসে।

এই পণ্ডিত বলে কী? জমিদারদের তশিলদার গোপাল চক্রবর্তী তেড়ে এল। যে মুক্তি কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে পাওয়া যায় না তা মাত্র নামাভাসে মিলে যাবে? হরিদাস ঠাকুর, বাজি ধরো। যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় তাহলে তোমার নাক কেটে দেব।

হরিদাস রাজি হল। বললে, এ তো ভাই আমার মনগড়া কথা নয়, এ শাস্ত্রের কথা।

বৃথা শাস্ত্র। চক্রবর্তী আবার তর্ক জুড়ল।

সবাই চক্রবর্তীর উপর চটে গেল। কিন্তু হরিদাসের রোষ নেই। বললে, ও'র রূঢ়তায় আপনারা কেউ ব্যথিত হবেন না। উনি তর্কনিষ্ঠ, তর্ক তো ও'কে করতেই হবে।

কিন্তু বাজির কথা ভুলে যেও না ঠাকুর। নাক কাটা যাবে।

ভক্ত তার নিন্দুককে ক্ষমা করে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তনিন্দা সইতে পারেন না। তিনদিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর কুষ্ঠ হল। তার হাতের আঙুল কুঁকড়ে গেল, নাক খসে পড়ল।

হিরণ্য দাসের ছেলে নেই। গোবর্ধনের একমাত্র ছেলে রঘুনাথ। সেই বিরাট জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু, পনেরো বছর বয়েসে রঘুনাথ হরিদাসকে প্রথম দেখেই তন্ময় হয়ে গেল। হরিদাসের স্নেহদৃষ্টিই তার মনে ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্পর্শমণি ছুঁইয়ে দিল। সেই কৃপাতেই সে সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে গেল গৌরহরিকে।

চাঁদপুর থেকে হরিদাস শান্তিপুরে এল। মিলল অদ্বৈতের সঙ্গে।

শান্তিপুরেও হরিদাসের আশ্রম-কুটিরে এক রূপসী যুবতীর আবির্ভাব হল। সেও লক্ষহীরার মত এসেছে তাকে প্রলুব্ধ করতে, কিন্তু হরিদাস আগের মতই নির্বিকার। তাকে দ্বারে বসিয়ে রেখে নাম শুনিয়েছে। নামসংখ্যা সমাপ্ত হচ্ছে না বলে তাকেও তিনদিন ঘুরিয়েছে, বলেছে, কী করব বলো, যা নিয়ম করেছি তা ছাড়ি কী করে?

তখন রমণী আত্মপ্রকাশ করল। আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছি। আমি মায়া। আমার মোহিনীশক্তিতে ব্রহ্মা পর্যন্ত মুগ্ধ কিন্তু তোমাকে বিচলিত করতে পারলাম না। বরং আমিই তোমার কৃষ্ণনামে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঠাকুর, কৃষ্ণনাম যে দেখি কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়ে তোলে। তুমি আমাকে সেই কৃষ্ণনাম দাও, গৌর-অবতারে প্রেমবন্যায় ভেসে যাই।

ঠাকুর হরিদাস মায়ারও গুরু। মায়াকেও সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

শান্তিপুর থেকে চলে এল ফুলিয়ায়। কৃত্তিবাসের জন্মভূমিতে।

ফুলিয়া আর শান্তিপুর তখন গোড়াই কাজীর অধীনে আর নবদ্বীপের শাসক চাঁদ কাজী।

হরিদাসের তখন প্রেমোন্মাদ অবস্থা। কুটিরে বা গোফায় বসে নির্জনেই শুধু আর নাম করে না, গঙ্গাতীর ধরে চলতে-চলতে নাম করে। সঙ্গে-সঙ্গে চলে শত শত ভক্তস্রোত—সে আরেক গঙ্গা।

গোড়াই কাজী চঞ্চল হয়ে উঠল। যবন হয়ে হিন্দুর আচার করে কেন?

কিন্তু নিজে শাসন করে এমন সাহস হল না। হরিদাসের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিতে ভয় পেল। তাই মুলুকপতির কাছে গিয়ে নালিশ করল, এর একটা বিহিত করুন।

হরিদাসকে ধরে নিয়ে এস। মুলুকপতি পাইক পাঠিয়ে দিল।

হরিদাস নির্বিবাদে ধরা দিল। কৃষ্ণের প্রসাদে তার কালান্তককেও ভয় নেই। বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ। চলো মুলুকপতিকে গিয়ে দর্শন করি।

কিন্তু তক্ষুনি-তক্ষুনি মুলুকপতির দর্শন পাওয়া গেল না। তাই হরিদাসকে জেল-হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

কারাগারে তখন অনেক হিন্দু বন্দী। ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারার দরুন কয়েদ খাটছে। তারা হরিদাসের নাম শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি আসছেন এই কারাগারে? তবে তো কারাগার তীর্থ হয়ে উঠবে।

কারাগারের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে হরিদাস, দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়াল বন্দীরা। কেউ কেউ বা রক্ষকদের অনুমতি নিয়ে দাঁড়াল উঁচু জায়গায়, এখানে-ওখানে। আমাদের চোখ ভরে দেখতে দাও হরিদাসকে। কৃষ্ণময় জীবিতকে।

দর্শন মাত্রই সকলের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়েছে। সবাই ভক্তিনম্র হয়ে নমস্কার করছে হরিদাসকে।

হরিদাস হাসিমুখে সবাইকে আশীর্বাদ করল : যেভাবে আছ চিরকাল সেইভাবেই থেকো।

এ আশীর্বাদ পেয়ে অনেকেই বিষণ্ণ হল। তার মানে কি এখন যেমন বন্দী আছি। চিরকাল তেমনি বন্দীই থাকব? এ কেমনতরো আশীর্বাদ?

তোমরা আমার আশীর্বাদের মর্ম বোঝনি। হরিদাস বুঝিয়ে দিল। আমি বলতে চেয়েছি তোমাদের মনে এখন যেমন কৃষ্ণপ্রীতি কৃষ্ণাভিমুখিতা এসেছে, সেই প্রীতি সেই প্রবণতা যেন চিরন্তন থাকে। 'বন্দী থাকো—হেন আশীর্বাদ নাহি করি। বিষয় পাসরো, অহর্নিশ বোল হরি।।'

মুলুকপতির দরবারে হরিদাসকে হাজির করানো হল। ধর্মীয় প্রশ্নের বিচার হবে তাই অনেক গণ্যমান্যের সমাবেশ হয়েছে। আট-আটজন কাজী আসন নিয়েছে মঞ্চে। উজির নাজির তো আছেই।

মুলুকপতি হরিদাসকে সসম্মান আসন দিল। সাদর সম্ভাষণ করে বললে, তোমার ভাই এমন দুর্মতি হল কেন? মুসলমান হয়ে কেন তুমি হিন্দু-আচারে মন দিলে? শোনো, তোমাকে কলমা পড়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

হরিদাস বললে, প্রভু, ঈশ্বর এক, শুদ্ধ ও শাশ্বত। তিনিই সকলের হৃদয়ে একাসনে বিরাজ করছেন। তিনিই হিন্দুর কৃষ্ণ মুসলমানের আল্লা। তিনিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভক্তের ভগবান। হিন্দুর পুরাণে যে সার-কথা মুসলমানের কোরানেও সেই সার-কথা। যার যেমন রুচি সে তেমনিভাবে তেমনি নামে ঈশ্বরকে ডাকে। নামে আলাদা ডাকে এক। ঈশ্বর আমাকে যে নাম নিতে প্রেরণা দিচ্ছেন আমি সেই নামে তাঁকে ডাকছি। কত হিন্দুও তো স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে ঈশ্বরকে আল্লা বলছে। তেমনি আমিও হিন্দু হয়ে ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলছি, রাম বলছি হরি বলছি। আপনি যদি মনে করেন এতে আমার অপরাধ হচ্ছে আমাকে যথোচিত শাস্তি দিন।

মুলুকপতি নরম হতে চাইলেও গোড়াই কাজী টলল না। বললে, একে যদি শাস্তি না দেন তাহলে মুসলমান সমাজে অনাচার প্রশ্রয় পাবে।

মলুকপতি কঠিন হল। বললে, সত্যিই তো, নিজের শাস্ত্রমতেই তোমার চলা উচিত। তুমি নিজের শাস্ত্র বলো, তোমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না।

হরিদাস বললে, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে যা বলান তাই বলব, যা করান তাই করব। এর অন্যথা হতে পারবে না।

তোমাকে হরিনাম ছাড়তে হবে।

যদি আমার শরীরকে টুকরো টুকরো কেটেও ফেলা হয় আমি হরিনাম ছাড়তে পারব না। 'খন্ড খন্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।'

গোড়াই কাজীর দিকে তাকাল মলুকপতি। এখন একে কী শাস্তি দেব বলো?

একে বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে হবে। গর্জে উঠল গোড়াই। মেরে-মেরে শেষ করে দিতে হবে। যবন হয়ে হিন্দুয়ানি করলে প্রাণান্তই তার উদ্ধারের একমাত্র পথ।

পাইকেরা দড়ি দিয়ে বাঁধল হরিদাসকে। বাজারে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে লাগল। শোকে দুঃখে ক্রোধে অভিভূত জনতা পাইকদের পায়ে পড়ে মিনতি করতে লাগল, তোমাদের টাকা দিচ্ছি, ঠাকুরকে তোমরা আস্তে-আস্তে মারো, অল্প করে মারো। তাঁর রক্তাক্ত গাত্র দেখতে পারি না।

পাইকদের প্রাণে দয়ার ছায়ামাত্র নেই। এ বাজারে জনতাক্লিষ্ট হয় তো ও বাজারে নিয়ে যায়।

কিন্তু হরিদাস—হরিদাসের কী অবস্থা?

হরিদাসের দেহস্মৃতি নেই, সে কৃষ্ণ-নামামৃত সমুদ্রে ডুবে আছে। শত প্রহারেও তার মুখে মালিন্য নেই, নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও সে কৃষ্ণবিশ্রামে প্রসন্ন-পরিপূর্ণ।

এত মারেও মরে না কে এ লোকোত্তর পুরুষ। পাইকদের কি রকম ধাঁধা লাগল। এ কোনো পীর নাকি? নইলে মরে না কেন? না মরলে যে আমরা মরব। মলুকপতির আদেশ পালন করতে পারিনি বলে আমাদের প্রাণদন্ড হবে।

অত্যাচারীদের দুঃখেই দুঃখিত হরি-দাস। আমি বেঁচে থাকলে যদি তোমাদের অমঙ্গল হয় তবে আমি মরি।

কৃষ্ণধ্যানে যোগমগ্ন হল হরিদাস। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

মৃতজ্ঞানে নিশ্চিন্ত পাইকেরা হরি-দাসকে মলুকপতির দরজায় এনে ফেলে দিল।

মলুকপতিও দেখল, মরে গেছে। বললে, একে তবে মাটি দাও।

গোড়াই আপত্তি করে উঠল। ওকে কবর দিলে তো ও তরে যাবে। ওর মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দাও। যাতে চিরকাল ও দুঃখ পায়। চিরকাল দুর্গতিতে থাকে।

পাইকেরা ধরাধরি করে হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল।

ভাসতে ভাসতে অবশেষে তীরে এসে উঠল হরিদাস। ছুটল ফুলিয়ার দিকে। মুখে শুদ্ধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

দেশময় সাড়া পড়ে গেল। মরা হরিদাস বেঁচে উঠেছে। যে নামের সে আশ্রয় করেছিল সেই নামই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

স্বয়ং মলুকপতি এসে পায়ে পড়ল। আমাদের সকল অপরাধ মার্জনা করুন। আপনাকে কেউ চিনতে পারিনি। আপনি যেখানে খুশি সেখানে যান, যা খুশি নাম করুন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

হরিদাস গোফায় বসে কৃষ্ণকীর্তন সুরু করল।

সেই গোফার কোন দূর বিবরে এক বিষধর সাপ ছিল। হরিদাসের কাছে যারা আসে তারা বিষের জ্বালায় ছটফট করে। কী ব্যাপার? হরিদাসের আশ্রমে এই জ্বালা কেন?

হরিদাস বলে, কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ফুলিয়ার বেদেরা এসে বললে, গোফার নিচে এক মহানাগ বাস করছে। তার বিষেই এই দাহ।

আপনি এ গোফা ছেড়ে অন্যত্র চলুন। ভক্তদল হরিদাসকে অনুনয় করল। আমাদের এখানে আসতে আতঙ্ক হচ্ছে। তারপর বিষের জ্বালায় আমরা বসতে পারছি না।

অলক্ষিত সাপকে সম্বোধন করে হরিদাস বললে, যদি কোনো মহাশয় এখানে সর্পরূপে থেকে থাকেন তিনি দয়া করে কালকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করুন, নয়তো অত্যন্ত পরিহার করতে আমি নিজেই এ গোফা ছেড়ে যাব।

সন্ধ্যাকালে সকলে দেখল এক প্রকান্ড সাপ বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। পীতশ্বেত-নীলে-শ্বেতে মহা-অদ্ভুত পুচ্ছ সুন্দর সাপ, মাথায় মহামণি ধীরে ধীরে চলে গেল অন্যত্র।

হরিদাসের দৃষ্টিতে অবিদ্যা-বন্ধন দূর হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল তাপ-দাহ।

অদ্বৈতের মতো নবদ্বীপে গৌরজন্ম জানতে পারল হরিদাস। এতদিন নির্জনে সাধন করছিল এখন গৌরাঙ্গের আনন্দের হাটে এসে বেসাতি নিয়ে বসল।

গৌরাঙ্গ সাতপ্রহর ধরে ভাবে আবিষ্ট থেকে সর্বাবতার মূর্তি দেখালেন।

হরিদাসকে ডেকে বললেন, বাইশ বাজারে ওরা যখন তোমাকে বেত মারছিল তখন তুমি আমাকে স্মরণ করছিলে। তাই একটা ঘা-ও তোমার পিঠে পড়তে দিইনি, সমস্তই আমি পিঠ পেতে নিয়েছি। এই দেখ চিহ্ন দেখ। প্রভু শ্রী-অঙ্গ মুক্ত করে আঘাতের চিহ্ন দেখালেন। বললেন, হরিদাস, আমার দেহের চেয়ে তোমার দেহ অনেক বড়। আমার প্রকাশে যদিও বা কিছু দেরি হত, তোমার কষ্ট সইতে না পেরেই আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিংকর হয় আপন ইচ্ছায়।।
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।।

কারুণ্যপূর্ণ কথা শুনে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগল হরিদাস।

নবদ্বীপের চাঁদ কাজী নগরকীর্তন বন্ধ করার হুকুম জারি করল। বৈষ্ণবদের মৃদঙ্গ মন্দিরা ভেঙে ফেলল। ফের যদি চেঁচাও জাত মারব।

এই কথা শুনে প্রভু রুদ্রাবতার হয়ে উঠলেন। বজ্রনাদে গর্জন করলেন হরিদাস, নিত্যানন্দ চলো, আজ সময় নবদ্বীপে কীর্তন করে বেড়াবে, দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়। হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালো, সহস্র কন্ঠে তোলো হরিধ্বনি।

নগরকীর্তনের বিরাট দল নিয়ে বেরুলেন গৌরহরি। সর্বাগ্রে অদ্বৈত, তারপরে হরিদাস, তারপরে শ্রীবাস পন্ডিত। পশ্চাতে মহাপ্রভু, সঙ্গে নিত্যানন্দ আর গদাধর।

কাজী ভয় পেয়ে পালাল অন্তঃপুরে।

কাজীকে দমন করতে এসেছিলেন প্রভু, উদ্ধার করে গেলেন। কীর্তন বন্ধের হুকুম বাতিল হয়ে গেল।

নবদ্বীপে গৌরহরির প্রতিটি লীলায় সহায়-সহচর হরিদাস।

যখন গৌরহরি নীলাচলে যাচ্ছেন, হরিদাস জিজ্ঞেস করল, আমার কি গতি হবে?

তোমার জন্যে আমি নীলাচলচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করব। বললেন গৌরহরি, তোমাকে নিয়ে যাব নীলাচল।

যখন দাক্ষিণাত্য জয় করে প্রভু শ্রীক্ষেত্রে ফিরলেন, গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল।

হরিদাস অদ্বৈতকে জিজ্ঞেস করলে, আমি কি যেতে পারি?

তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তোমাকে না দেখলে প্রভু দুঃখিত হবেন।

আমি শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে যাব না। দূর থেকে প্রভুর চরণ দর্শন করব।

দূর থেকে কেন?

আমি যে নীচ জাতি। আমার স্পর্শে ক্ষেত্রবাসী মহাত্মাদের শরীর অপবিত্র হবে।

সে সকল কথা প্রভু জানেন। তুমি চলো।

হরিদাস এসেছে তবু দলের মধ্যে নেই, মহাপ্রভু উদাসীন হয়ে রইলেন। যখন শুনলেন তার দৈন্যের কথা, দুঃখের কথা, ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন তার সন্ধানে। কাশী মিশ্রকে ডেকে গম্ভীরার কাছে এক নির্জন উদ্যানে একটি কুটিরে হরিদাসের থাকবার জায়গা ঠিক করলেন। এখন কোথায় হরিদাস? তাকে পাই কোথায়? খুঁজি কোথায়?

পথের একধারে বসে উচ্চে নাম-কীর্তন করছে—ঐ তো হরিদাস।

প্রভু তার কাছে যেতেই হরিদাস তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। প্রভু তাকে বুকে তুলে নিলেন।

হরিদাস বললে, আমাকে ছাড়ো, আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি নীচ, অস্পৃশ্য, নরাধম।

তুমি ভাগবতোত্তম। তোমাকে স্পর্শ করি নিজে পবিত্র হতে। প্রভু প্রেমভরে হরিদাসকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

আত্মস্তুতি শুনে হরিদাস কানে আঙুল দিল।

চলো তোমার জন্যে বাসা ঠিক করেছি। রোজ আমি ওখানে গিয়ে, তোমার সঙ্গে মিলব। গোবিন্দ তোমার জন্যে প্রসাদান্ন নিয়ে আসবে। তুমি মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম করবে আর নামসংকীর্তন করবে।

হরিদাসের সেই আবাসস্থলই সিদ্ধ-বকুল।

আমার একটি শুধু বাসনা। হরিদাস বললে, আমার মনে হচ্ছে তুমি শিগগিরই লীলা সম্বরণ করবে। আমাকে শুধু এই কৃপা কর, যেন তোমার অপ্রকট হবার আগেই আমার দেহপাত হয়। হৃদয়ে তোমার চরণ-কমল ধরতে-ধরতে, চোখে তোমার মুখখানি দেখতে-দেখতে আর মুখে তোমার নাম বলতে-বলতে আমার যেন প্রাণ যায়।

প্রভু বললেন, হরিদাস, তোমার কোনো প্রার্থনাই কৃষ্ণ অপূর্ণ রাখবেন না। কিন্তু আমার যা সুখ সব তো তোমাকে নিয়ে। তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে কী করে?

একটা পিপীলিকা চলে গেলে পৃথিবীর কোনো হানি হয় না। আমার মত ক্ষুদ্র জীবাধমের অভাবেও তোমার লীলায় কোনো ত্রুটি হবে না।

সিদ্ধ-বকুলের অঙ্গনতলে প্রভু কীর্তন আরম্ভ করলেন।

অনাবৃত স্থানে রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে হরিদাস দিবানিশি নাম করে, তার কষ্ট সইতে পারেন না গৌরহরি। হরিদাস তো গৃহবাসী হবে না, তাই তাকে কী করে আচ্ছাদন দেওয়া যায়, কী করে রোদ-বৃষ্টি হাত থেকে বাঁচানো যায়, উপায় খুঁজতে লাগলেন। একদিন জগন্নাথের দন্তকাষ্ঠ এনে নিজের হাতে পুঁতে দিলেন। সেই বকুল গাছের প্রসাদী দাঁতনই শাখা-পত্র-পল্লবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ছায়া আর আচ্ছাদন দুই-ই পেয়ে গেল হরিদাস।

হরিদাস প্রভুকে কাছে বসতে বললে। প্রভু বসলেন সন্নিহিত হয়ে।

প্রভুর দুখানি চরণ বুকের মধ্যে টেনে নিল হরিদাস, নিষ্পলক চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, বললে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ ছেড়ে দিল।

সারা জীবন হরে-কৃষ্ণ বলে প্রাণ ছাড়বার সময় গৌরাঙ্গের নাম করলে। হরে-কৃষ্ণই সাধন, আর চৈতন্য-চরণই সাধ্য।

নাম-সাধনের ফলে অন্তিমে পাওয়া যাবে গৌরাঙ্গকে। (ক্রমশঃ)

চোখে হরিণাক্ষীর ব্যঞ্জনা

প্রমীলা

ভ্যানিটি বক্স

প্রসাধনের ব্যবহারে ভারতবর্ষ বিশেষ অগ্রণীর ভূমিকা দাবী করতে পারে। মন্দির-গাত্রে এবং অসংখ্য ভাস্কর্যে এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। দিনের শেষে সেদিনের ভারত-ললনা চন্দন-অগুরু এবং কুসুম-বিলাসে তন্ময় হয়ে যেত। মনোরম কবরী বন্ধনে এই বিলাসটুকু হয়ে উঠত সম্পূর্ণ; দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে নিজেই হয়ত আত্মতৃপ্তিতে বিভোর হয়ে যেত। রূপসৌন্দর্যসচেতন সে যুগের নারী আজ ইতিহাসের সামগ্রী। কিন্তু সৌন্দর্যচেতনা তা বলে লুপ্ত হয়ে যায় নি। তা বারে-বারে ফিরে এসেছে। এবং প্রতিবারই নব-নব রঙে-রসে উজ্জ্বল করেছে এবং সৌন্দর্যসচেতন নারীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে রূপভাস্বর করেছে। হরাপ্পার ধ্বংসস্তূপের অনেক কিছুর সঙ্গে একটি প্রসাধন সামগ্রীর বাক্স আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বাক্সে সেকালের মেয়েদের প্রসাধনের অনেক নিদর্শন আছে। মুখমন্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক এরকম কয়েকটি জিনিসের নমুনা এতে পাওয়া গেছে। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এই সভ্যতা নারীর প্রসাধনের ক্ষেত্রেও আজকের তুলনায় মোটেই অনগ্রসর ছিল না।

প্রসাধনে ভারতবর্ষের এই বিপুল সম্ভার আজ আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে এই মনোভাব পশ্চিমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নানা রকম প্রসাধনের আবিষ্কারে ইউরোপীয় দেশগুলি সারা দুনিয়ার চোখ ঝলসে দেয়। নারীর সৌন্দর্যচেতনায় তারা নতুন প্রাণ-সঞ্চার করেছেন বলা যেতে পারে। আজও ক্রমান্বয়ে দেশে বিদেশে নিত্যনতুন প্রসাধন আবিষ্কারের অন্ত নেই। সবাই চাইছে সৌন্দর্যপ্রয়াসীদের মনের মত প্রসাধন আবিষ্কার করতে। প্রসাধনের ক্ষেত্রে ইউ-ডি-কলোনের স্থান যুগভাস্বর। এর আবিষ্কারক হচ্ছেন একজন ইটালীয়ান। পরে তিনি জার্মানীর কলোনে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এবার জার্মানীতে একটি বিউটি মিউজিয়মের উদ্বোধন করা হয়েছে। মেয়েদের প্রসাধনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এতে প্রতি-ফলিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ভ্যানিটি ফেয়ার-এর অপূর্ব সমাবেশ এর মর্যাদা ও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সেকালের কার্টুনিস্টরা মেয়েদের প্রসাধন নিয়ে নানা রকম রঙ্গরসিকতা করে-ছেন। চুলের বাহার এবং অন্যান্য প্রসাধন নিয়ে সেদিন তাঁদের চিন্তার বিস্তৃত প্রসারের কথা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রসাধন সম্পর্কিত কার্টুনিস্টদের কয়েকটি অলংকরণ এই মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। এগুলি সংগ্রহ করতে যে বেশ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। আর একটা খবর শুনে অনেকেই তাজ্জব বনে যাবেন। প্রসাধন সম্পর্কে সেই সুদূর অতীতে একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্যন্ত হয়েছে। ভ্যালি-রিয়াস এরফার্ট নামক একজন ব্যক্তি ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য এ সম্পর্কে একটি থিসিস রচনা করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লিপজিগ বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক এ থিসিসটি প্রকাশিত হয়। প্রসাধন সম্পর্কে এরকম গবেষণার অপ্রকাশিত কাহিনী সৌন্দর্যপিয়াসীদের নিশ্চয়ই উল্লসিত করবে। বিশেষভাবে ঘটনাটি যখন অতীতে সংঘটিত হয়েছিল। প্রাচীন দ্রব্য সম্ভারের আরও বহু নিদর্শন এখানে স্থান করে নিয়েছে। রেস্টোরেশন যুগের 'পলিটি-ক্যাল রেজর' এবং কপোর হেড-রেস্ট এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রোমের ব্রোঞ্জ নির্মিত ইয়ার পিকস এবং গ্রীক রেজর প্রাচীন প্রসাধনের আরও নিদর্শন বহন করে চলেছে। আধুনিক প্রসাধন-সামগ্রীর কথা বলাই বাহুল্য।

চক্ষু পরিচর্যা

ক্রীমের প্রলেপে মুখশ্রী হয় অপরূপ

চিন্তায় সামগ্রিকতা

সার্বিক চিন্তাধারা ছাড়া কোনদিন বৃহত্তর সাফল্য সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চিন্তার উজান ঠেলে সমন্বয় করা গেলেও পূর্ণতর উপলব্ধিতে পৌঁছন যায় না। দৃষ্টিভঙ্গীর এহেন সঙ্কীর্ণতাকে সীমাবদ্ধতা বলাই অধিকতর সঙ্গত। চিরকাল কিন্তু এরকম ছিল না। একদিন ছিল যখন সার্বিক চিন্তা-ধারার বিকাশে আমাদের আত্মিক সম্পূর্ণতা ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। যুগ বদলেছে। দিন বদলের এই স্বাক্ষরটুকু ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সর্বাঙ্গে। আজ আমরা যাও দেখছি, কালের অমোঘ বিধানে ততটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ পরিবর্তনের ধাক্কাটা তো নেহাত কম নয়। আজ চিন্তার ক্ষেত্রে এই সঙ্কীর্ণতা ও দৈন্যের জন্য দায়ী কোন ক্ষেত্রেই আমরা নই। যুগ বদলের পালায় আমরা পাল্টে গিয়েছি মাত্র। তাই দায়িত্ব এতে কারও খুব বেশী একটা নেই। চিন্তার এই দীনতার ক্ষেত্রে অন্যান্য সব-কিছুর মত পথিকৃৎ খুঁজে বার করাও সম্ভব নয়। এজন্য কেউ কৃতিত্বের চিহ্ন রেখে যায় না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পূর্ব-বর্তী যুগও আজ আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই অখণ্ড মহিমায় বিরাজ করছে না। আবার যে যুগে আমরা বাস করছি, আগামী বংশধররা যে তা পূর্ণ মর্যাদায় অটুট রেখেছে তাই বা বলি কি করে। যে মর্যাদা আমরা দিই নি সেই মর্যাদা অপরের কাছে প্রত্যাশা করাও বাতুলতা। কিন্তু সব কথা ছাপিয়ে যে কথাটা বিশেষভাবে মনে রেখাপাত করছে তা হল চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্রমবিচ্যুতি। সব কিছু মেনে নেওয়া যায় সহজেই কিন্তু মানুষের স্বধর্মবিরোধী এই চিন্তার দীনতাকে মেনে নেওয়া মোটেই সহজ নয়। কি ছিলাম আর কি হলাম একথা ভেবে তাই আফশোষের শেষ নেই। এই পরিতাপ নিশ্চয়ই সময়ের অপচয়। অনেকেই একথা সায় দিয়ে বলবেন যে, যা ছিল সেজন্য দুঃখ না করে নতুনভাবে ভাববার চেষ্টা করাটাই

হবে দুঃশ্রমাদের কাজ। অতীতের কথা ভেবে দুঃখ-দীপ্ত চাপড়ে যেটুকু সময় নষ্ট করব সেটুকু সময় সাশ্রয় করে বরং চিন্তার শরীরের বাড়াম খেতে পারে।

চিন্তাধারায় সামগ্রিকতায় প্রতিফলন আজও একান্ত অসম্ভব যে নয় এরকম বহু নজীর আমাদের জানা আছে। বহু স্বনামধন্যা মহিলার জীবনে চিন্তার ক্ষেত্রে এই সামগ্রিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের অনুসরণ করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। চিন্তার পরিসর বাড়াতে হলে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার করতে হবে। আর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটলে চিন্তারও প্রসার ঘটবে। এবং তখনই চিন্তার অঙ্গসংবদ্ধ সামগ্রিকতা আসবে। এজন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রস্তুতি ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়। আজকের যুগে মেয়েদের পক্ষে এই প্রয়াস চালিয়ে চিন্তার সামগ্রিকতা লাভ করাটা অনেকাংশে সহজ। অধিকাংশ মেয়েই সংসার-গৃহস্থালির সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার (বিশেষভাবে কর্মস্থলের) সামঞ্জস্যবিধান করে চলছেন। এর ফলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা লুপ্ত হতে যাচ্ছে। মনের প্রসারতা এর বিপরীত। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। সাফল্যও তখনই করায়ত্ব হবে।

সাক্ষাৎকার

আমাদের লণ্ডন-প্রবাসী লেখিকা শ্রীরাখী ঘোষের সঙ্গে অমৃত-এর পাঠকমহল সুপরিচিত। সম্প্রতি স্বল্পকালীন ছুটির অবকাশে তিনি কলকাতা এসেছিলেন। সেই সময়ে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়া কয়েকজন লেখিকার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এ সংখ্যায় আছে শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

আশাপূর্ণা দেবী

বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী এক বিস্ময়। তাঁর সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সত্যিই আশ্চর্যকর। আশাপূর্ণা দেবী যে যুগের ও যে সমাজের মানুষ সেখানে মেয়েরা দূরের কথা পুরুষদের মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গী দুর্লভ। মেয়েরা প্রথমে মানুষ তারপর মা মেয়ে বা অন্য কিছু ঐ কথা এত জোরের সঙ্গে আমাদের দেশে ক'জন লেখক বলতে পেরেছেন জানি না। আমাদের ঘরের কোণে আমাদেরই বহু পরিচিত মা ঠাকুমা বৌদিদের জীবনে যে এত ব্যর্থতা এত বঞ্চনা এত অভিযোগ জমে রয়েছে কে

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

জানত! আশাপূর্ণা দেবীই তাদের আশা নিরাশা সাধ আহ্লাদের কথা আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেন। আশাপূর্ণা দেবী কথা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বললেন "দুঃখ কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করাকেই আমি মহত্ত্ব মনে করি না।"

১৯০৯ সালে কলকাতায় আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম। বাড়ীতেই তাঁর পড়াশুনা। তাঁর তের বছর বয়সে শিশুসাথীতে প্রথম গল্প ছাপা হয়। দশ ভাই বোনের মধ্যে তিনিই সাহিত্যিক। পনেরো বছর বয়সে বিবাহ হয়। ভারতবর্ষ ও প্রবাসীর জন্য লিখতেন। প্রথম বড়দের জন্য লেখা গল্প ছাপা হয় আনন্দবজারের পূজো সংখ্যায়। তখন তাঁর বয়স আটাশ। আজ পর্যন্ত তাঁর কোন লেখা ফেরৎ আসেনি। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ভাল লাগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল ও তারাশঙ্কর। তবে তিনি ছোট-গল্পই পড়তে ভালবাসেন। নতুন লেখকদের অনেক লেখাই জোরালো মনে হয় কিন্তু ভাষার নিরাবরণতা সহ্য করতে পারেন না।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন "হতাশ হবার কোন কারণ ঘটেনি। অক্ষর পরিচয় আছে এমন লোকের সংখ্যা বাড়ছে। পত্র-পত্রিকা বেড়েছে। লেখকেরাও সংখ্যায় বেড়েছেন। এই প্রাচুর্যের বন্যা সরে গেলেও অনেক থেকে যাবে। সাহিত্যের আসরে সবটাই বেনোজল বলে গণ্য হবে না। তবে মহিলা লেখকের সংখ্যা আশানুরূপ বেড়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর যুগের অবরোধ থেকে এ যুগের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে একটা সময় গেছে যেটা হল অবরোধ মোচনের লগ্ন। এই লগ্নের ইতিহাস কোন মেয়ের কলমে ধরা পড়েনি।

আশাপূর্ণা দেবী তাবলে আদর্শবাদে বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন সত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয় না। আত্মবঞ্চনা হতে পারে। কিন্তু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে তিনি রাজী নন। আধুনিক সাহিত্যে এই বিশ্বাসের অভাব তাঁকে পীড়া দেয়। কারণ তিনি মনে করেন শিল্পী ও সাহিত্যিকের কর্তব্য হল মানুষকে বিশ্বাসের বাণী শোনানো।

নিজের লেখা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন, "লিখে কোনদিন সন্তুষ্ট হইনি। তবে নিজের লেখা ছোটগল্প মাঝে মাঝে ভাল লাগে। আমি গভীর রাত্রে লিখি এবং দ্রুত লিখি। সময়-সময় লিখতে মোটেই ভাল লাগে না। তবু লিখতে হয়। লেখা শুরু করলে শেষ করতেই হয়। প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠে না।" আশাপূর্ণা দেবী বললেন, "চাল্লিশ বছর বয়সে প্রথম বাইরে বেরুই অর্থাৎ সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করি। আমার মস্ত বড় গর্ব আমি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি সবারই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছি। এঁদের অনেকের ধারণা ছিল আমি পুরুষ, ছদ্মনামে লিখি। এরকম ধারণার একটাই কারণ আমার গল্পগুলিতে গল্প যে বলছে অনেক সময়ই সে পুরুষ।"

কথক পুরুষ হলেও আশাপূর্ণা দেবীর দৃষ্টিভঙ্গী মেয়ের। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। সামান্যকে তিনি করে তোলেন অসামান্য। তাঁর নিজের বেলায়ও সে কথা খাটে। সাধারণ সংসারের একজন হয়েও সাহিত্যের আসরে তিনি অসাধারণত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। সাধারণ কথাবার্তায় চলে গেলেন আশাপূর্ণা দেবী। বিদেশে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, লেখায় উৎসাহ দিলেন, দেশে ফিরে কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করলেন। কিছু কিছু জিনিস যেমন চারিদিকে প্রকট দারিদ্র্যের পাশে তথাকথিত ধনীদের উৎকট ও হাস্যকর আত্মঅহমিকা, গাঢ় কুসংস্কারের সঙ্গে তথাকথিত পশ্চিমী আধুনিকতা সহ্য হচ্ছে না জানাতে ক্ষুন্ন হলেন না বরং আগ্রহে আলোচনা করলেন। নিজের দেশের বরং প্রদেশের সব কিছুই মাথায় তুলে রাখার মত তিনি মনে করেন না। রাত হয়ে আসছিলো। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

৭-৭-৬৭ তারিখের সংখ্যায় থাকবে

লীলা মজুমদার

আজকের পোষাক পরিচ্ছদ

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে নারী-জাতির রূপচর্চার যে ধারা দেখছি তাতে দেশের ভবিষ্যৎ কি ভাববার বিষয়। দেশের চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ-বক্তা প্রগতিশীল অনেক মনীষার সংস্পর্শে এসেছি। হাটে-বাজারে রাস্তা-ঘাটে হোটেল-রেস্টুরেন্টে আজকের

পোষাক-পরিচ্ছদ বদলায় রুচি বদলাবার সঙ্গে তাল রেখে। নানা ধরনের পোষাকের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে মানুষের রুচিবোধ।

নারীদের যে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে দেখেছি তা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের প্রশ্ন করেছিলাম, এর ভবিষ্যৎ কি? শুভ না অশুভ? এটা সভ্যতার না নগ্নতার শুভপদক্ষেপ? কেউই এর কোন ঠিক-ঠিক উত্তর করতে পারেন নি, তাই আজ সবাইয়ের কাছে প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেছে। এর পরিণাম কি হবে, আর কি হতে পারে? এতে দেশের কি কোনও উন্নতি হবে? ঠিক উন্নতির কোন লক্ষণ ত দেখা যাচ্ছে না, আবৃত অংশকে অনাবৃত করবার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে নারীসমাজের মধ্যে তার পরিণাম বড় ভয়াবহ বলেই মনে হয়।

ভারতীয় তথা বাঙালী নারীর আজকের রূপচর্চার প্রথম অঙ্গ হল পোষাক-পরিচ্ছদ। সেই পোষাক সম্পর্কে আমার সামান্য একটু বক্তব্য দেশের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চাই। আধুনিক যুগের স্কুল-কলেজে-পড়া শিক্ষিতা উগ্র আধুনিকারা তাঁদের রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য যে ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করছেন তা কি তাঁদের রুচিসম্মত, না অনুকরণপ্রিয়তা? দেশের নারীরা যে ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করছেন তা সত্যই লজ্জাদায়ক।

ভারতীয় তথা বাঙালী নারীদের বরাবরই একটা দুর্নাম রয়ে গেছে যে, তারা নাকি অনুকরণপ্রিয়। কথাটিকে শুধুমাত্র অপবাদ, কিছুমাত্র সত্য নয় এমন কথা আমি নিজে নারী হয়েও বলতে পারি না। আধুনিকারা অনুকরণপ্রিয়তার যে নিদর্শন দেখাচ্ছেন তা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার! আজকের শিক্ষিতা মেয়েরা কোন চলচ্চিত্র দেখে এসে সেই চিত্রের নায়িকার বসনভূষণ হাঁটাচলা এমন কি কথা বলার ভঙ্গীও হুবহু অনুকরণ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের শরীর যদি অত্যধিক নগ্ন হয়ে পড়ে তাহলেও আজকের উগ্র আধুনিকারা অনুকরণপ্রবৃত্তি থেকে বিরত হন না। আর তার ফলেই নারী জাতির পোষাক-পরিচ্ছদের মান এমন নিম্নগামী। এই ধরনের অনুকরণপ্রিয়তার ফলস্বরূপ দেশের যে কত বড় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তা বোধহয় আমার এই আলোচনাপত্রে না লিখলেও চলবে। অনেক সময় দেখা গেছে উগ্র আধুনিকারা শুধুমাত্র অনুকরণপ্রিয়তার জন্য নিজের বিবেক রুচিবোধকেও বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন না। এ সম্বন্ধে একটা উপমা দেওয়াই বোধহয় যুক্তিযুক্ত। কোন নারী হয়ত রাস্তায় দেখে এলেন এক উগ্র আধুনিকার নগ্ন পোষাক। এখন দর্শক নারীও চেষ্টা করেন সেই পোষাক অনুকরণ করার। সেই ধরনের পোষাক তৈরী করিয়ে তা পরে রাস্তায় বেরুতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বোধহয় নিজের বিবেক একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নি তাই এ ধরনের পোষাক পরে রাস্তা চলবার সময় মনে সঙ্কোচ জাগে, আর তার ফলেই দেখা যায় অনুকরণপ্রিয় নারী কাপড়ের আঁচলটাকে পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বুকটাকে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করেন। আর রাস্তায় চলবার সময় দেখা যায় তিনি তাঁর অঙ্গের কাপড়টাকে একবার এদিকে টানছেন, একবার সেদিকে টানছেন কাপড়টাকে একটু বাড়াবার চেষ্টায় কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাপড়টা আর কিছুতেই বাড়তে চায় না! কি করে আর বাড়বে বলুন, কাপড়টা ত আর রবার নয় যে, টানলেই বেড়ে যাবে! রাস্তায় এ ধরনের মেয়েকে দেখলেই আমার মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় ইনি কি মহাভারতের দ্রৌপদী নাকি? দুঃশাসনের ভয়ে কাপড়টাকে অমন সজোরে আঁকড়ে ধরেছেন! আবার মনে হয় এ যুগে দ্রৌপদীরও অভাব নেই, আর দুঃশাসনের মত মেয়েদের বস্ত্র হরণের দস্যুরও অভাব নেই, তাই তিনি কাপড়টাকে অমন সজোরে আঁকড়ে ধরেছেন যাতে কোন দুঃশাসন এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারেন। যাই হোক আমি এমন নারীরও সন্ধান লাভ করেছি। একটু চোখ মেলে চাইলেই হয়ত এরকম অনেককেই দেখে থাকবেন। এ ধরনের মহিলাদের চেনার একমাত্র পথ হল এই, এঁরা রাস্তা চলার সময় ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এটা একমাত্র হয়ে থাকে অনুকরণপ্রিয়তার জন্য। এইভাবেই একজনের দেখে আর একজন আর একজনের দেখে আর একজন, এইভাবে ধীরে-ধীরে বোধহয় সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়বে নগ্ন পোষাক। এর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ হল অনুকরণ বর্জন, নিজের বিবেক রুচিবোধকে বলিষ্ঠ করা।

শুধুমাত্র অনুকরণপ্রিয়তার জন্য রুচিবোধের বিরোধিতা করে নগ্ন পোষাক-পরিহিত নারীকেও আমি তার পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যখনই প্রশ্ন করেছি, আচ্ছা আপনি একটু ভেবে বলুন ত এ ধরনের পোষাক ব্যবহার করার আগে আপনার কি সম্পূর্ণ মত ছিল? অনুকরণপ্রিয় নারীরা সরাসরি উত্তর করতে পারেন না। তখনই বেশ বোঝা যায় এটা শুধুমাত্র অনুকরণপ্রিয়তার ফল। এই অনুকরণ করার ফল কি শুভ?

এ ধরনের রূপচর্চার ফলে দেশের উন্নতি না অবনতি হবে তা বলা খুবই শক্ত। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেশের অবনতির আশঙ্কাই বেশী। এই ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার ফলে দেশের অবনতির আশঙ্কাই বেশী। এই ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার ফলে দেশের নারী জাতির মনোভাব ধীরে-ধীরে পাশ্চাত্য দেশের নারী জাতির মনোভাবের সঙ্গে এক হতে চলেছে। ফলে দেশে ছড়িয়ে

পড়ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ আর আমাদের দেশীয় সভ্যতার অপমৃত্যু। ধীরে-ধীরে আমরাও হয়ে পড়ছি অনুকরণপ্রিয় সভ্য জাতি। আমাদের যে ভারতীয় সভ্যতা তা আর বেঁচে থাকছে না। নামেমাত্র আমরা ভারতীয় সভ্য জাতি। এ থেকে কি দেশকে বাঁচান যায় না?

দেশের নারী জাতির এই ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার ফলে দেশের সমগ্র জনসাধারণের মনোভাব কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে তাও দেখা একান্তই প্রয়োজন। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, রাস্তা চলার সময় পুরুষেরা রাস্তার নারীদের প্রতি একবার তাঁর সুতীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে যান। বেশী ভাগ সময়েই দেখা গেছে এদের বয়স ছোট ভাইয়ের থেকেও অনেক কম। অথচ সে দৃষ্টি থাকে ঘৃণ্য লালসা আর লোলুপতায় ভরা। এই যে সমগ্র পুরুষ জাতির মধ্যে একটা লোলুপতা, একটা লালসার পরিষ্কার মনোভাব ফুটে উঠছে এর কারণ কি? এর জন্য আধুনিক উগ্র নারীসমাজ কি পুরোপুরিভাবে দায়ী নন? এর থেকেই দেখা যাচ্ছে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা উশৃংখলতার মনোভাব। এই উশৃংখলতাকে কি কোন মতেই রোধ করা যেতে পারে না? আধুনিক নারী-সমাজ তাঁদের আধুনিকতা, তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের অনুকরণপ্রিয়তা সবই বাঁচিয়ে রাখুন তাতে কোন কিছু বলার নেই কিন্তু নগ্নতাকে বাঁচিয়ে। অনুকরণ নিশ্চয়ই করবেন কিন্তু খারাপ দৃষ্টিকটু দিকটা কেন? ভাল দিকটা কি অনুকরণ করা যায় না? আজকাল রাস্তাঘাটে অনেক সময় দেখা যায় মেয়েরা আঁচলটা পিঠের দিক থেকে ঘুরিয়ে বুকের ব্লাউজের ভেতরে গুঁজে দেন। দেখতে নেহাৎ খারাপ লাগে না কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে ব্লাউজের কাটিংটা এমনই নগ্ন যে, বুকের আবৃত সমস্ত অংশটাই দেখা যাচ্ছে। এটা কি ভাল? এই যে বুকে কাপড় গোঁজা এর পিছনেও অনেক সুযুক্তি রয়েছে, যেমন ধরুন এর ফলে স্কুল-কলেজের মেয়েদের অনেকখানি সুবিধা হয়। কাপড় সামলাবার জন্য একটা হাতকে ব্যস্ত রাখতে হয় না বলে বই ব্যাগ ছাতা নিয়ে বাসে-ট্রামে উঠতেও সুবিধা হয়। অথচ এতে মেয়েটাকে নগ্ন দেখতেও লাগে না আর তার মধ্যে থেকে অভদ্রতাও ফুটে ওঠে না। কিন্তু যাঁরা নগ্ন অনুকরণপ্রিয় তাঁরা কিন্তু এই সুযোগে তাঁর একান্তই গোপন প্রশস্ত বুকটাকে খুলে রাখতে দ্বিধা করেন না। এটা কি ভাল দেখায়? যাঁরা খুবই ফর্সা তাঁদের বুকের নীল রঙের শিরা-উপশিরা-গুলি বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। যার ফলে ছোট-ছোট ভাইদের থেকে আরম্ভ করে সবাই তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন। এই যে ছোট-ছোট ভাইদের আহ্বান করার চেষ্টা, কিসের জন্য?

আজকের ইউরোপে এই ধরনের পোষাক ভরে গেছে। রুচিভেদে মেয়েরা ব্যবহার করে। শালীনতা এবং ভব্যতার মাপকাঠি বজায় রেখে যতদূর সম্ভব পোষাক নির্মাতারা নানান ধরনের কাটিং-এর নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চলেছেন।

কিছু দিন আগে এক মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানেও নারী জাতির পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেক আলাপ-আলোচনা শুনলাম। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে নগ্নতার মনোভাব ফুটে উঠছে এর কারণ কি? একজন বর্ষীয়সী শিক্ষিতা রুচিবান মহিলা হেসে বললেন, এই যে নগ্নতা, তার কারণ বোধহয় নারী জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সচেতনতার ফল। উগ্র শিক্ষিতা নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কেমন উন্নতিলাভ করেছেন তাই দেখাবার জন্যই বোধহয় এমন নগ্নতার পরিচয় দিচ্ছেন। ব্লাউজগুলি যে হাতকাটা থেকে ক্রমে-ক্রমে পুরুষদের স্যান্ডো গেঞ্জীর মত মেয়েদের ব্যাসিয়ারের আকার ধারণ করছে এর মূলে বোধহয় অর্থনৈতিক কোন কারণ রয়েছে। হাতওয়ালা ব্লাউজ করলে অনেকখানি কাপড় বেশী লাগে সেক্ষেত্রে হাতটা যদি শুধুমাত্র কাঁধের পাশ থেকে একটা চওড়া ফিতের মত করা যায় তাহলে অনেক কাপড়ও বাঁচে, তাতে পয়সা কম লাগে। শুনে হাসি পেল কিন্তু দুঃখে হাসতেও পারলুম না। আবার সেই ভদ্র-মহিলাই বললেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জান ভাই, ওই সব মেয়েদের পরনের কাপড়-খানা আর গায়ে সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনী দেখলে ত বিশ্বাস হয় না এরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সচেতন। ব্লাউজের দিক থেকে যেমন অর্থনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে, কাপড় আর প্রসাধনীর দিক থেকে ঠিক তেমনই অচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরোপুরি যদি অর্থনৈতিক সচেতনতা দেখাতেন তাহলেও আজকের সুসভ্য নারী জাতিদের ধন্যবাদ দেওয়া যেত, কারণ তাঁরা দেশের এই অর্থনৈতিক সংকটময় মুহূর্তেও সজাগ আছেন। অপব্যয় মোটেই করেন না। কিন্তু তা ত নয়, তাই বড় দুঃখ লাগে এদের দেখে। বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা আজকের শিক্ষিতা মেয়েদের নগ্নতা দেখে দুঃখে একটু রসিকতা না করে পারলেন না।

আর এক ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন, বড়দি, তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক-ঠিক বলা হল না। আসলে কি জান, আজ-কালের মেয়েরা ওই ব্যাসিয়ার ধরনের ব্লাউজ পরে শুধুমাত্র গরমের জন্য। রাস্তায় বড্ড গরম কিনা তাই একটু ঠাণ্ডা লাগাবার জন্যই ওই নগ্নতাকে ওরা স্বীকার করে নেয়। আসলে কিন্তু ওরা নগ্নতাকে প্রশ্রয় দেয় না। কথাটা শুনে আমার আরও হাসি পেল। বললাম, এটা যে শুধু গরমেই ব্যবহার করে তা নয়, শীতেও এর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাহলে কি ভাবব শীতেও এদের গরম সমান?

—[illegible] দেবী

বাঘা তেঁতুল

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ফ্লীট স্ট্রীটের উ[illegible]খ্যাতি, চটকদার স্তম্ভনবিশ আমার বন্ধু এরিক সিনক্লেয়ার সেই মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার আগে বলে ছিল যে তিনি বৃটেনের সবচেয়ে বাস্তববাদী সমাজসেবিকা।—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে এক মার্জিত-রুচি প্রৌঢ়া রবিন হুড। সেই সঙ্গে সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে ছিল যে আলাপের সময় আমি যেন বেফাঁস প্রকাশ করে না বসি যে আমি তাঁর পরহিতৈষণা সম্পর্কে বিশেষ কিছু, এমন কি সামান্য কিছুও, জানি। তাঁর যা কিছু সৎকর্ম তা তিনি জনান্তিকে নীরবে করতে চান। অন্তত, আমাদের মত পরের ব্যাপারে ঢাক পেটানো যাদের পেশা, সেই কাগজের লোকদের জানিয়ে তো নয়ই।

মহিলার সেই আশ্চর্য পরিপাটি, নয়নানন্দময় ড্রইংরুমে বসে আমাদের যে ঘন্টা-খানের পরিচয় হয়েছিল তার বেশিরভাগই ছিল ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান নিয়ে। দু বিষয়েই মহিলার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অন্তর স্পর্শ করবার মত। পরিচয় শেষে বাইরে বেরিয়ে এরিক জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন দেখলে মহিলাকে?"

আমি বললাম, "বাইরে থেকে টোরী পার্টির সম্মেলনে আগত মহিলাদের সঙ্গে খুব তফাৎ নেই। তেমনি মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত। কিন্তু মনের দিকটা অন্য রকম।" তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে বললাম, "অবশ্য তোমার নারী রবিন হুডের কথাটা বোধহয় গল্প। "গসিপ কলম" লিখিয়ের খোশ কল্পনা।

আমার কথা শুনে এরিক রীতিমত চটে গেল। বলল, "অফিসে বসে-বসে আর পাঁচ-জনের লেখা পড়ে দু'কলম লিখে পাঠালেই তো আমাদের চলে না। আমাদের ঘুরে-ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, পাঁচটা বিচিত্র চরিত্রের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। আমাদের লেখার বিষয়বস্তু অন্য লোকে জোগাড় করে দেয় না।"

তার এই হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে যাওয়ায় আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। বললাম, "সেটা ঠিকই। তোমরা আমাদের চেয়ে বেশি ঘুরে এবং দেখে বেড়াও। কিন্তু তোমাদের লেখার মধ্যে তোমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে খুব বাস্তব প্রতিফলন হয় তা বোধহয় সব সময় সত্যি নয়। যেমন ধরো ঐ মহিলার মধ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবার মত কঠোরতা ও নম্রতার কি দেখলে?"

সেই মুহূর্তে সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিলো। এরিক হাত দেখিয়ে সেটাকে থামিয়ে আমায় প্রায় টেনে তাতে তুলে নিয়ে এজওয়েয় রোডের একটা বাল-গেরীন রেস্টুরেন্টের ঠিকানা বলে দিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "তোমাকে প্রমাণ দেখাবো।"

রেস্টুরেন্টে পৌঁছে সে আমাকে একটি নিরালা কোণে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে পানীয়ের অর্ডার দিলে। আগেই লক্ষ্য করে ছিলাম যে সে ঢোকবার মুখে তার হাত ব্যাগটা জমা দিয়ে আসে নি। এইবার সেটা খুলে সে তিনটি কাগজের কাটিং বের করে আমাকে দিয়ে বলল, "পড়ে দেখো।"

প্রথমটি মেরী ব্যানবারী নামে এক পঁয়ষট্টি বছরের মহিলার আত্মহত্যার কাহিনী। তিনি পেন ইন ক্রিসেন্টে তিন-তলার একটি ফ্ল্যাটে একা থাকতেন। ঘটনাটি প্রকাশিত হবার চারদিন আগে রান্নাঘরে কম্বল ভাঁজ করে মেঝের বিছিয়ে তিনি উনুনের গ্যাসটা খুলে দেন।

দরজায় কদিন দুধের বোতল জমে রয়েছে দেখে দুধওয়ালা খোঁজ খবর করতে নীচের তলার লোকেদের হুঁস হয়। তারপর মহিলাটির ফ্ল্যাটে বেল টিপে টিপে উত্তর না পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে লাস নিয়ে গিয়ে বহু তদন্ত করে শেষ পর্যন্ত 'আত্মহত্যা' বলে রায় দেয়।

দ্বিতীয়টিও আত্মহত্যার বিবরণ। মিঃ জন ম্যানচেস্টার নামে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ডিসেম্বরের কালো কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রে পুরো এক শিশি ঘুমের বড়ি খেয়ে চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়েন। পরে তদন্ত করে দেখা গেছে সেই অত্যন্ত হিসেবী ও মিতব্যয়ী লোকটি কিছুকাল আগে তার চিরদিনের বাঁচানো সব টাকা তুলে আরো অনেক টাকা ওভারড্রাফট নিয়েছিলেন। কিন্তু কেন এবং কোথায় কিভাবে তা ব্যয় করেছিলেন তার হদিস পাওয়া যায় নি।

কাগজের তৃতীয় ছাঁটটি আত্মহত্যা না হলেও আত্মহত্যার এক অদ্ভুত চেষ্টা এবং তা থেকে পরিত্রাণের বিবরণ। এ ক্ষেত্রে মহিলাটির বয়স প্রায় ষাট। একটি উঁচু বারান্দা থেকে তিনি ঝাঁপ দিয়ে একটি ধাব-মান বিশাল মালবাহী ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ট্রাকের সামনে না পড়ে তার পেছনে বোঝাই সব্জির গাদায় পড়ে বেঁচে যান। মহিলাটির নাম শ্রীমতী পটারসন। তিনি চির অনূঢ়া।

তাঁরও মামলা কোর্টে উঠলে দেখা গেল যে সারাজীবন ধরে ভবিষ্যতের বার্ধক্যের জন্যে অল্প-সল্প করে তিনি যা সঞ্চয় করে-ছিলেন ঘটনার কিছু আগেই তিনি তা হটাৎ খরচ করে ফেলেছেন। কিন্তু কিসে, ও কেন, তা অনেক জেরা ও অনুনয় করেও তাঁর কাছ থেকে বের করা যায় নি।

কাগজের ছাঁট-কাট পড়া শেষ হবার আগে বেয়ারা এসে হুইস্কী ও সোডা দিয়ে গিয়েছিল। তার কয়েকটি চুমুকেই এরিকের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে। তাই নির্ভাবনায় জিজ্ঞাসা করলাম, "ঘটনাগুলো অবশ্য লণ্ডনের মত একটা বৃহৎ ও জটিল নাগরিক জীবনে অসম্ভব ও অভাবনীয় কিছু নয়। কিন্তু ঐ মহিলার সঙ্গে এগুলির যোগসূত্র যে কি তা তো বুঝতে পারছি না?"

—এরিক সে কথার উত্তর দেবার আগে হাঙেগরীয়ান গুলাস ও পোলাউয়ের অর্ডার দিয়ে গুছিয়ে বসে বলল, সেটাই তো বলবে বলে সে আমাকে আজ নেমতন্ন করেছে এবং সবটা শোনার পর আমি বুঝতে পারবো যে ঐ মহিলার সঠিক স্বরূপটি কি। অবশ্য কাহিনীটি আরম্ভ করার আগেই সে আরেকবার বলে নিলো যে তার সবটাই তাকে পরোক্ষভাবে এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। তবে মোদ্দা অংশটা পেয়েছে সেই মহিলা অর্থাৎ মিস্ সিমসনের দাসী মিস প্যাট স্টোন নামে এক কিঞ্চিৎ প্রগলভা কিন্তু সপ্রতিভা প্রৌঢ়ার কাছ থেকে।

ব্যাপারটা অনুরূপ : সেটা এপ্রিলের এক উজ্জ্বল সকাল। মিসেস স্টোন এসে খবর দিল যে এক ভদ্রলোক মিস সিমসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। যেন কাউকে প্রত্যাশা করছেন,—মিসেস সিমসন এমন-ভাবেই বসেছিলেন। বললেন, "তাঁকে নিয়ে এসো।"

যে লোকটি এসে ঘরে ঢুকলো তার চাঁদিতে টাক। চেহারাটা গোলগাল। গোঁফটি নিপুণভাবে ছাঁটা। পোষাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও রীতিমত হাল ফ্যাশানের। ঘরে ঢুকে মিস সিমসনকে সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বেশ জাঁকিয়ে বসে মিস সিমসনের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, আমি বেশিক্ষণ সময় নেবো না।... আপনি কি মিসেস রিচার্ডসনকে চেনেন?"

হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন ঘরের মধ্যে সময়ের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এলো। তারপর সেই স্তব্ধতার ওপার থেকে মিস্ সিমসন্ থমথমে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু ও প্রশ্ন কেন? বড় অদ্ভুত তো। আপনি কে?"

লোকটি কঠোর কণ্ঠে-ছাঁটা উত্তর দিল, "আমি যেই হই না কেন!"

মিস সিমসন এবার একটু রূঢ়-কণ্ঠে উত্তর দিলেন "আমি যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর না দি?" লোকটি পকেট থেকে একটি ছোট নোটবই বের করে ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললে, "তা যদি না দেন, তা হলে হয়তো এ কথাটা দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন যে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ঠিক সোয়া এগারোটার সময় কার্ট রাইট গার্ডেন পোস্ট অফিসে মিসেস রিচার্ডসনের নাম করে কেন পঁচিশটি পাউন্ড তুলেছেন?"

তারপর একটু নড়ে চড়ে বসে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়াটা ওপরের দিকে ফুৎকার করে দিয়ে যেন মিস সিমসনকে অনেক নীচে ফেলে দিয়ে লোকটি আবার বলতে আরম্ভ করলো, "অবশ্য ওটা একটা প্রায় সাধারণ জোচ্চুরি! আদালত কিন্তু ইদানীং ওসব বিষয়ে বড্ড কড়া রায় দিচ্ছে! ......বিশেষ করে জোচ্চুরিটা যখন আপনার মত নিপুণভাবে. একটা পুরোনো সেভিং অ্যাকাউনটের বই জোগাড় করে হয়। খুবই নিপুণ। খুবই বুদ্ধি খাটিয়ে করা। কিন্তু একেবারে বে-আইনী।"

মিস সিমসন থমথমে কণ্ঠে জিজ্ঞাস করলেন, "আপনি কি পুলিশের লোক?"

"নিশ্চয় নই। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। জুয়াচোর ও সমাজ বিরোধীদের নজর রাখা আমার নেশা। পেশাও বলতে পারেন।"

"কিন্তু কি করে আপনি—?"

"জানতে পারলাম?" লোকটির দৃষ্টি সপ্রশ্ন হয়ে উঠলো। তারপর সিগারেটে

উড়ুক্কু টান দিয়ে বললে, "মহাশয়া, আমি ঐ ধরণের কাজে নামলে আমার লক্ষ্য-ব্যক্তিটিকে ছায়ার মত অনুসরণ করে থাকি। কিন্তু সে ছায়া অদৃশ্য ছায়া। আপনি যখন পোস্টাপিসে কারচুপি করছিলেন তখন ঠিক আমার চোখের নীচেই করছিলেন অথচ আপনার তা ছিল ধারণারও অতীত। পোস্টাপিসের কাউন্টারের মেয়েটা যদি ছোকরা কেরাণীটার সঙ্গে মসকরার অত মজে না থাকতো তবে তো আপনার চলা-বলা, চাহনি দেখে এক মাইল দূরে থেকেও আপনার মতলববাজি ধরে ফেলতে পারতো।"

অনেকটা যেন সামলে নেবার ভঙ্গী করে জিজ্ঞাসা করলেন মিস সিমসন, "কিন্তু আপনি কি করতে চান?"

"করার কথা যদি তোলেন তা হলে তো বলতে হয় যে আমি যদি আমার নিম্নতম দায়িত্বটুকু এতক্ষণে পালন করতাম তা হলে আপনার হাতে হাতকড়ি পড়তো!"

মিস সিমসন শিউরে উঠলেন, "না, না, না। তা হতে পারে না। এ শুধু আমার কথা নয়। আমাদের সারা পরিবারের সম্মানের কথা। আমার বাবা কতবড় উদ্ভাবক ছিলেন! ওঃ। ভাগ্যে আজ তিনি বেঁচে নেই.

লোকটি মুরুব্বী চালে বললো, "ঠিকই তো! তবে ব্যাপার কি জানেন, আমার কিছু মূলধনের দরকার পড়েছে। আজকালকার দিনে জানেনই তো মাইনের টাকাটা কিছুই নয়। প্রায় সবটাই ট্যাক্সওয়ালাদের দিয়ে দিতে হয়। তারওপর সব খরচই বেড়ে যাচ্ছে। আমার আবার মদের খরচটা একটু বেশি। তাছাড়া জুয়োটা আমার নেশা। যদি হাজারটা পাউন্ড আমাকে দিয়ে দেন তো একটা রফা হয়ে যেতে পারে।"

"হাজার পাউন্ড!" মিস সিমসন অসহায়ভাবে বললেন, "কোথায় পাবো হাজার পাউন্ড!"

লোকটা এবার কঠিনভাবে উত্তর দিলো, "যে অপরাধ করেছেন তাতে হাজার পাউন্ডটা কিছুই নয়! আর আপনার পেছনে আমার যে সময় অপচয় হয়েছে তাতে হাজার পাউন্ডটা এমন কি বেশি? তাছাড়া আমি সঠিকভাবেই জানি আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স কতো। পৈত্রিক শেয়ারগুলি থেকে আপনার অনুপার্জিত আয় কতখানি। ঘানার কোকো বাগানের শেয়ারের ডিভিডেন্ট মাস ছয়েকের আয়ই তো হাজার পাউন্ডের ওপরে।

"আমার তো তা—।"

'হাজার পাউন্ডের প্রস্তাবটা মোটে মিনিট দুই বলবৎ থাকবে। তারপরই সেটা দেড় হাজার হয়ে যাবে।"

মিস সিমসন খানিকটা দম নিয়ে বললেন, "আপনাকে আমায় কিছুটা সময় দিতে হবে।"

বেশ! তিন দিন সময় দিলাম।"

তৃতীয় দিনের সকালে মিস সিমসন গিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে হাজার পাউন্ড তুলে আনলেন। বিকালে নির্দিষ্ট সময়ে সেই কঠিন, কঠোর মৃদুভাষ লোকটি পুনরায় আবির্ভূত হলো। ঠিক আগের মতই অনুমতি নিয়েই একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লো এবং তোয়াজ করে সিগারেট ধরালো।

মিস সিমসন তাঁর সংযত, মিতাচরণের এতটুকু ব্যতিক্রম না করে স্মিত হাস্যে তাকে সম্ভাষণ করে হাজার পাউন্ড ভরা একটি খাম তার হতে তুলে দিলেন। বললেন, "পাঁচ পাউন্ডের নোটে ওর মধ্যে ঠিক হাজার পাউন্ড আছে।"

"ধন্যবাদ! আমার মনে হয় তবু একবার গুনে নেওয়াই ভালো।"

"তা নিন।" মিস সিমসন নম্রভাবে উত্তর দিলেন। "কিন্তু একটা কথা। কি করে নিশ্চিন্ত হবো যে আপনি ফের টাকা চাইবেন না?"

লোকটা তাঁর দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে আমায় বিশ্বাস করতে হবে।"

"যেমন করে মিস পটারসন আপনাকে বিশ্বাস করেছিল?" প্রশ্ন বাজল মিস সিমসনের কণ্ঠে। নোটের তাড়া গুনতে গুনতে লোকটার আঙুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। থতমত খাওয়া গলায় জিজ্ঞাসা করলো, "কেন মিস পটারসন সম্পর্কে আপনি কি জানেন?"

"বারে! মিস পটারসন আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু!" বলে মিস সিমসন আবার জুড়ে দিলেন। "আমি তো মেরী ব্যানবারীকেও চিনতাম আর জন ম্যানচেস্টার সম্পর্কেও অল্প-স্বল্প জানি।"

"তাতে কি এসে যায়?" লোকটা সংক্ষেপে উত্তর দিল। "আপনার বক্তব্যটা কি শুনি!"

—"মাস চারেক আগে মিস পটারসন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন সে আমাকে সবই খুলে বলে। তারপর আমরা দুজনে মিলে একটা ষড়যন্ত্র করি। আমাদের সুবিধে ছিল যে, আমরা তিনটি ঘটনারই সবকিছু জানতাম। মেরী ব্যানবেরীর সেই তথাকথিত স্বামীটি, যার কাছ থেকে সে প্রতি সপ্তাহে চিঠি পেতো। তার সব খবর আমরা এখন জানি।"

মিস সিমসন বলতে থাকলেন—"জন ম্যানচেস্টার তার পোস্টাফিসের এ্যাকাউন্ট নিয়ে বুড়ো বয়সে লোভে পড়ে যে কেলেংকারী করে তাও আমরা জানি। আর সত্যি কথা বলতে কি বর্তমান ষড়যন্ত্র ছকটা তার ঘটনা অনুকরণ করেই তৈরী।

"আর প্যাটারসনের ঘটনাটা শুনে তো আমি অবাক! ঐ রকম একটা তুচ্ছ ঘটনা ঢাকবার জন্যে অত অপব্যয়? তবে মানুষের আত্ম-সম্মান সম্পর্কে ধারণা বিচিত্র!

"অবশ্য সব ঘটনাগুলির মধ্যেই সাধারণ বিষয়টা হচ্ছে পোস্ট অফিস। সুতরাং আমরা অনুমান করলাম যে, লোকটি এদের গোপন কথা জেনে নিয়ে এদের কাছ থেকে ফন্দি-ফিকির ও জুলুম করে টাকা আদায় করছে সে নিশ্চয়ই পোস্ট অফিসের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে করে খবর সংগ্রহ করে।

"পুলিশে ধরিয়ে দেওয়াতে তার কোন আস্থা নেই।"

"তারপরে আমরা মিস স্টোন অর্থাৎ আমার দাসী প্যাট স্টোনের নামে উত্তর লণ্ডনের অনেকগুলি ছোট-খাটো এ্যাকাউণ্ট খুলে দিলাম। ওর আসল নাম কিন্তু মিসেস রিচার্ডসন। আমি ওর কুমারী নাম ধরেই ডাকি আর সেটা হাল ফ্যাসানের বলে ওর খুব পছন্দ।

টাকা জমা দেবার পর খুব আনাড়ীর মত ভাব দেখিয়ে সেইসব পোস্ট অফিস থেকে প্রতি সপ্তাহে পাউণ্ড দশেক করে তুলে আনতাম। ওঃ! তার জন্যে হাঁটা-হাঁটি আর ঝকমারী কি কিছু কম হয়েছে!"

হঠাৎ লোকটা চাপা হুংকার করে উঠলো, "এ-সবের প্রমাণ কি? প্রমাণ করতে পারবেন আদালতে দাঁড়িয়ে?"

শান্তশিষ্ট কণ্ঠে মিস সিমসন বললেন, "ও হ্যাঁ, তা পারবো বৈকি। কারুর নাম না করেই প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যান্‌ ব্যারিস্টারের মত নিয়েছি।

তিনি অবশ্য বলে দিয়েছিলেন যে, আপনি যখন টাকা চাইবেন এবং টাকা নেবেন তখনো যেন একজন সাক্ষী রাখি। তাও রেখেছি। প্রথম দিন তবু তো পর্দার ওদিকটায় তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলেন, আজ তো আবার তা করতেও ভুলে গেছেন।...মিস স্টোন! একটু বেরিয়ে এসো তো!"

"মাদাম আপনাকে ধন্যবাদ।" মিস স্টোন পর্দার আড়াল থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, "আমি সব কথাই শুনেছি।"

"আপনার টাকা আপনি ফেরৎ নিন।" লোকটা একটু রাগের ভাব দেখিয়ে মিস সিমসনের দিকে টাকার খামটা এগিয়ে দিল।

টাকাটা ফেরৎ নেবার এতটুকু তাগিদ না দেখিয়ে মিস সিমসন বললেন, "তা আপনি যদি একান্ত পীড়াপীড়ি করেন, তবে ওটা ফেরৎই দেবো। তাতে কিন্তু আইনের দিক থেকে বিশেষ কিছু তফাৎ হবে না। কারণ, টাকাটা প্রথমে আপনি তো নিয়েছেন।"

"আপনি তা কখনোই প্রমাণ করতে পারবেন না।"

"তা কেন পারবো না? আপনি প্রথম যেদিন এলেন সেদিনই যদি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনতেন তা হলেই বুঝতে পারতেন যে, ওসব আমার পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার নয়।"

"কি রকম?" লোকটা ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলো।

"কেন?—বলিনি যে আমার বাবা উদ্ভাবক ছিলেন।? মাইক্রোফন ও রেকর্ডিং-এর তিনি কত উন্নতি করে গেছেন? টেলি-ফোনের উন্নতিতেও তাঁর দান কম নয়। তাঁর কাছে ওসব জিনিস সম্পর্কে আমিও কিছু শিখেছিলাম। অবশ্য ইদানীং তো টেপ-রেকর্ডের দৌলতে সবই রেকর্ড করা কত সোজা হয়ে গেছে।

একটু অপেক্ষা করুন আমি আপনাকে আমাদের প্রথম দিনে আলাপ পরিচয়ের সব কথাই শুনিয়ে দিচ্ছি।

"প্যাট সুইচটি টিপে দাও তো।"

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে বেজে উঠলো, ভারী পায়ে ঘরে ঢোকার শব্দ, চেয়ারটানা। তারপর "আপনি কি মিসেস রিচার্ডসনকে চেনেন?"

আচম্বিতে লোকটা খ্যাপা ষাঁড়ের মত লাফিয়ে উঠে একটা সুন্দর রূপোর ফুল-দানি তুলে নিয়ে মাইক্রোফোনটির ওপর ছুঁড়ে মারলো। প্যাট স্টোন আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো।

মিস সিমসন কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। শুধু তাঁর ভুরুর কুঞ্চনে একটু বিরক্তি ফুটে উঠলো। বল্লেন, 'আর নির্বু-দ্ধিতার পরিচয় দেবেন না। ওটা তো শুধু মাইক্রোফোন। রেকর্ড ভেতরের ঘরে। সে ঘরে চাবি দেওয়া।'

লোকটা অসহায় ভাবে চীৎকার করে উঠলো, "আপনি কি চান।'

"আপাতত পনেরো শ পাউণ্ড!...... বলবেন না যে আপনার কাছে অত টাকা নেই। মেরী ব্যানবেরী, জন ম্যানচেস্টার আর প্যাটারসনের কাছে তো অন্তত চার গুণ নিশ্চয় বের করেছেন।"...তারপর শ্লেষাত্মক কৌতুকের সঙ্গে বললে, "ওটা তো আপনার অনুপার্জিত আয়! আমার কিছু মূলধন চাই!"

—এরিক তার গল্প শেষ করে শেষ চুমুকে হুইস্কির তলানিটুকুতে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, সেই পনেরশ পাউণ্ডের শেষ পেনিটি পর্যন্ত লোকটির কাছ থেকে মিস সিমসন আদায় করেছেন এবং নানা সৎ কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু লোকটাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়াতে তাঁর কোন আস্থা নেই।

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

কল্যাণকুমার বসু

(১৫)

দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে পর দিলীপকে নিয়ে হেমকুসুম প্রথমে উঠলেন ১০।১, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। তারপর ৩৩।১।ডি অথবা ১১।১।বি, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। হেমকুসুমের বাবা তখন অল্পদূরে স্টোর রোডের তাঁর আপন বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন। মহেশ উত্তরপাড়া থেকে সাউথ সুবার্বন কলেজে যাতায়াত করতেন। কলেজ-ফেরতা প্রায় প্রত্যেকদিন দিলীপদের বাড়ি পৌঁছে গিয়ে দিলীপের পড়াশোনার বিষয়ে সাহায্য করতেন। হেমকুসুমের সাংসারিক নানা কাজে নানা বিষয়ে সাহায্যে আসতেন।

মহেশকে হেমকুসুম বললেন, এবার দিলীপকে একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। দিলীপ ভর্তি হলো মিত্র ইনস্টিটিউসনের নীচু ক্লাসে। মহেশ কলকাতায় এসেও তাঁর ছাত্রকে নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন কিভাবে তার বুদ্ধির বিকাশ হয়, পড়াশোনায় মন দিতে পারে। উত্তরপাড়া থেকে কলেজে যাতায়াতে অনেক অসুবিধে হচ্ছিল, মহেশ ভাবলেন, কলেজের কাছাকাছি থাকলেই ভালো হয়। রোজ অত দূরে যাতায়াত করতে হয় না, হেমদিদিকেও দেখাশোনা করা যায়।

কয়েক মাস পরে মহেশ চক্রবেড়িয়া রোডে উঠে এলেন। চক্রবেড়িয়া রোড থেকে হেমকুসুমের ল্যান্সডাউন রোডের বাসস্থান কাছাকাছি। মহেশ কলেজ যাওয়ার আগে বা পরে এসে খবরা-খবর নিতেন, দিলীপের পড়াশোনা দেখতেন।

মহেশ প্রায়ই হেমকুসুমকে বলতেন, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি একজন রান্নার লোক রাখুন। আপনি নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করবেন না। আপনার এসব অভ্যাস নেই।

মহেশ মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন, আপনার এভাবে এখানে থাকার কোন মানেই হয় না। সেনসাহেবের কাছে আপনি ফিরে চলুন, আমি আপনাকে লখনউ পৌঁছে দিয়ে আসবো।

হেমকুসুম মহেশের কথায় মত দিতে পারেন না। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর লখনউর জন্যে মন ব্যাকুল হয়। মন ব্যাকুল হয়. অতুলপ্রসাদের জন্যে একবারটি চোখের দেখা পেতে ইচ্ছে হয়...কিন্তু মনের সে-ইচ্ছেকে বোধহয় জোর করে দমন করতে হয়।......

কলকাতায় অনেক আত্মীয়স্বজন চারিদিকে ছড়িয়ে বাস করে। হেমকুসুমের তাঁদের কারো সঙ্গে কোন প্রয়োজন নেই। তবু মায়ের জন্যে, বাবার জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে, তাই কখনও কখনও স্টোর রোডে বাপের বাড়ি মা-বাবাকে দেখে আসেন। ...এমনিভাবে বিচ্ছেদের মাঝে কয়েক বছর এগিয়ে গেল। গ্রীষ্মের ছুটিতে অতুলপ্রসাদ মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছেন, থেকেছেন হোটেলে, কখনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে কখনও কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। কলকাতায় এসেও অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের সাথে দেখা করেন না। হেমকুসুমও অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নন। বিচ্ছেদ হওয়াই স্থির হল, তাঁরা দুজনে দুজনের জীবন থেকে সরে দাঁড়াবেন। অভিমান করে দুজনে বিচ্ছিন্ন আগেই হয়েছিলেন, এখন বিচ্ছেদ চিরজীবনের মত—কোর্টকাছারী কিছু হল না...দুজনেই আপনাআপনিই স্থির করলেন। অতুলপ্রসাদ মাসে মাসে হেমকুসুমকে পাঁচশো টাকা পাঠাবেন, হেমকুসুম প্রাপ্তিস্বীকার করবেন। দিলীপ বছরের কিছু সময় মায়ের কাছে থাকবে, কিছু সময় বাবার কাছে থাকবে। আর কোন যোগসূত্র থাকবে না।

তবু যোগসূত্র থাকল মহেশ। মহেশ তখন সাউথ সুবার্বন কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছেন। একার সংসার। ভোরবেলা নিজের হাতে রান্না সেরে ছোটেন কলেজে। কলেজে পড়ানো এবং অবসর সময়ে পাঠাগারে পড়াশোনার পর ছুটতে হত টিউশানিতে। বাড়ি ফেরার পথে রোজকার একটা কাজ হেমকুসুমের বাড়ি আসা, দিলীপের স্কুলের পড়া তৈরী করে দেয়া, তাকে নতুন পড়া দেয়া-নেওয়া। পড়ানো শেষ হতে না হতেই হেমকুসুম মহেশের চা-জলখাবার নিয়ে এসে সামনে রেখে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে তাকে খাওয়ান।... এ যেন রোজকার নিয়ম।

হেমকুসুম বলেন, একা মানুষ তুমি, এত খাটার দরকার কী। খেটে খেটেই জীবনটা শেষ করবে নাকি?

মহেশ কিছু বলেন না, হাসেন। হেমকুসুম জানেন মহেশের তিনকুলে কেউ নেই। মহেশ বড় পরোপকারী মানুষ। অন্যের অনেক বিপদ-আপদ মাথায় তুলে নিয়েছে, খাটতে পারে প্রচণ্ড, ও সকলের উপকার করে বেড়ায়। ও যদি শোনে ওর কোনো আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনাত্মীয় অপরিচিত পুরুষ একাকী রোগগ্রস্ত অসহায় অবস্থায়, ও সব কাজ ফেলে তার কাছে ছুটে চলে গিয়ে আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় সারিয়ে তুলতে পারে।* টাকাকড়ি শ্রমসেবা দিয়ে কোনকিছুরই অভাব রাখে না। তাই বোধহয় তার টাকার এত দরকার। এত পরিশ্রম করে সে। উপকার করা যার নেশা, সে বোধহয় সারাটা জীবন পরের উপকার করে যায়।

প্রতি সন্ধ্যায় সেই একই ঘটনা। ক্লান্ত-শ্রান্ত মহেশ আসেন দিলীপের পড়াশোনা দেখেন। নীরবে হেমকুসুমের মুখোমুখি বসে থাকেন। হেমকুসুমের বেদনায় ব্যথিত হন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—হেমকুসুম যাতে সুখী হয়। বিচ্ছেদের কাল হোক অবসান।...মহেশ হেমকুসুমকে না জানিয়ে কলকাতার সকল খবর জানিয়ে লখনউতে অতুলপ্রসাদকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন। দিলীপ মাঝে মাঝে লখনউ চলে যায়। দিলীপের পড়াশোনা বিশেষ কিছু এগোয় না, কোনকিছু মনে রাখতে পারে না। ও মাঝে মাঝে তার মায়ের মত রেগে যায়, তখন কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না...এমনিতে শান্ত-স্বভাবের ছেলে। দিলীপ যখন থাকে না, লখনউতে যায় তার বাবার কাছে মহেশের তখন কাজ বেড়ে যায় ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটিতে আসার সময়ই পায় না। খবরাখবর কিন্তু রাখে।

সেদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল—ঘটনা না বলে দুর্ঘটনা বলা উচিত। ভাড়াটে-বাড়ির সিঁড়ির ধাপগুলো উঁচু। জল পড়ে সেগুলি পিচ্ছিল হয়েছিল। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে সিঁড়িতে পা ঠিক রাখা গেল না, পিছলিয়ে শেষ ধাপে গড়িয়ে এসে আঘাত পেলেন হেমকুসুম। অজ্ঞানের মত অবস্থা। জ্ঞান যখন সম্পূর্ণরূপে এল, তখন দেখলে মহেশ তাঁর দিকে ব্যাকুলনয়নে চেয়ে আছে। দিলীপ অঝোরে কান্না জুড়েছে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। যথাসময়ে ডাক্তার এলেন, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থতা এল না হেমকুসুমের। শরীরটা ক্রমে যেন দুর্বল বোধ হল। কয়েক মাসের মধ্যে হেমকুসুম শয্যা নিলেন।

মহেশ বললেন, আমি অতুলদাদাকে একটা খবর দিই। তাকে সকল কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখি।

অসুস্থ শরীর। তবু হেমকুসুম বললেন, না তাকে কোন খবর দেবার দরকার নেই। কোন চিঠি লিখবে না মহেশ। আমার শরীরের কোন কথা জানাবে না।

কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার শরীরের যে অবস্থা ওকে খবর দেওয়া উচিত।

আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। কারও ভাবনার প্রয়োজন নেই।

তুমি যদি কোন চিঠি লেখ, তোমার আমার সম্পর্ক শেষ হবে।

মহেশ ভাবনায় পড়লেন। তাকে এই ভাবনা থেকে উদ্ধার করল দিলীপ। সে এসে মার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, মা আমি লখনউ যাচ্ছি বাবাকে খবর দেবো। তোমার এত অসুখ, বাবা জানবেন না, একথা ঠিক

---

* যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সেবা করার সময় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মহেশের মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথদেবের মন্দির ফটো : নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

নয়। বাবা তোমাকে ভালোভাবে চিকিৎসা করাবেন। তুমি ভালো হয়ে যাবে মা।

হেমকুসুম কিছু বলেন না। তাঁর মন বুঝি যৌবনের নানা রংয়ের নানান স্মৃতি-ঘেরা লখনউ টানে। বিয়ের পর লন্ডন থেকে ফিরে কলকাতা, রংপুর, বাংলা, বিহার কোথাও তাদের আস্তানা জুটলো না, শেষে সুদূর সেই নবাব শহরে যেতে হল। সেদিনের দিনগুলো কি আনন্দে ভরাই না ছিল! তবে কেন এমন হল! হেমকুসুমের এই যে শরীর খারাপ—একি কেবল শরীরের জন্যেই, মন কি এর আর এক কারণ নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ হয় হেম-কুসুমের; রাগের কথা মনে হলে মনে পড়ে অন্যায়েই এবং অসম্ভব একগুঁয়েমির জন্যে মায়ের কাছে কতদিন বকুনি এবং শেষে মার কিল-চড়-চাপড়টা খেয়েছেন। তখন কতদিন অতুলপ্রসাদ দু'হাত বাড়িয়ে মায়ের মারের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তারপর আরো কতদিন এগিয়েছে এই একগুঁয়ে মেয়েটা—মামাত বোন হেমকুসুম বিয়ে হয়ে কার হাতে গিয়ে পড়বে, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কত দুঃখ লেখা আছে এই ভয়ে 'র্তিনি' সারা। ভাবতে ভাবতে কোন একসময়ে অতুলপ্রসাদ নিজের মনকে সমর্পণ করেছিলেন এবং শেষে বিবাহ করলেন হেমকুসুমকে। সেদিন দুজনে কারো কথায় কান পাতেন নি। ...তবে কেন এমন হল, এ কোন গ্রহে!

দিলীপের মুখ থেকে হেমকুসুমের অসুস্থতার খবর শুনে অতুলপ্রসাদের কিছু ভালো লাগে না। সকল সময়ে বিষণ্ন মনে থাকেন বন্ধু-বান্ধব এলে যা একটু কথায় কথায় মনটা প্রফুল্ল হয়। কাজে তেমন উৎসাহ জাগে না। ভাবেন এই তো মানুষের জীবন। তার জন্যে মানুষ গর্ব করে রাগ-অভিমান করে। কখন কার ভাগ্যে কি লেখা আছে কে কি বলতে পারে। হেমকুসুমের এত রাগারাগি মান অভিমান এখন অসুস্থ শরীরে সে কতই না অসহায়। দিলীপের মুখে সব কথা শুনে হেমকুসুমের জন্যে হঠাৎ যেন মন কেমন করে ওঠে।

অতুলপ্রসাদ খুউব চিন্তিতভাবে দিলীপকে বললেন, কলকাতায় তোমার মায়ের ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে ত। ডাক্তার কি বললেন, এখন কেমন আছেন। আমার কাছে তোমার মাকে যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে এসো। আমি এখান থেকেই তাঁর চিকিৎসা করাবো। তোমরা আমাকে চিঠি-পত্র লেখ না কেন?

মা লিখতে বারণ করেছিলেন। মা'র ইচ্ছে নয়, মা'র অসুখের কথা তোমার কাছে লিখে জানাই। মহেশকাকা কলকাতাতে ডাক্তার ডেকেছিলেন, তাঁরা দেখে গেছেন। অসুধপত্র আনা হয়েছে। মহেশকাকা মায়ের অনেক সেবাশুশ্রূষা করছেন। তুমি একবার কলকাতায় চল মাকে নিয়ে আসবে। তুমি নিজে না আনলে মা কখনই লখনউ আসবেন না।

বেশ ত, আমি নিজে নিয়ে আসবো তোমার মাকে কলকাতা থেকে। জানতে চাইলেন, তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

হচ্ছে না, দিলীপ বললে, আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম কারণ মায়ের সেবাশুশ্রূষা করতে করতে পড়াশোনা করতে পারিনি, দ্বিতীয়, আমার পড়া মনে থাকে না। আমি ভাবছি অন্য কিছু শিখবো কোন কিছু ট্রেনিং নেবো।

কি শিখতে চাও তুমি?

ফার্মিং শিখবো আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।

বেশ তো তোমাকে না হয় দেরাদুন পাঠানো যেতে পারে ওই জন্যে। তুমি বাবা একটা কাজ কর, তোমার মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে এসো। আমার এখন এদিকে একটা কাজ আছে, একদম সময় পাচ্ছি না, কোর্টের ছুটি নেই। তুমিও তো এখন বড় হয়েছো। মায়ের শরীর ত এখন একটু ভালো আগের থেকে না? পারবে না!

দিলীপ বললে, পারবো।

দিলীপ ফিরে চলে গেল কলকাতায়। কলকাতা থেকে ফেরার তোড়জোড় করতে লাগল। কলকাতায় এসে শুনল, মহেশকাকা বিবাহ করেছেন একটা দুঃস্থ ঘরের মেয়েকে। মহেশকাকার মত মানুষ হয় না। মেয়েটার বাবার অসহায় অবস্থা দেখে মহেশকাকা অল্পসময়ের মধ্যে তার বাবাকে কথা দিয়ে তাকে বিবাহ করেছেন। বিবাহ করে দূরে অন্য জায়গায় বাসা নিয়েও মাকে দেখাশোনা করছেন। সেবাশুশ্রূষা করছেন স্বামীস্ত্রী মিলেই। মহেশকাকা খুব কর্তব্যপরায়ণ নির্ভীক পুরুষ।

দিলীপ বললে, মা তুমি চল, তোমার আর কোন আপত্তি শুনবো না।

এটুকু যেন শোনার অপেক্ষায় ছিলেন হেমকুসুম। অভাব দুজনেই অনুভব করছিলেন। অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুম। হেমকুসুমের অসুস্থতা বুঝি সাময়িকভাবে মিলনের পথ হয়ে দেখা দিল।

অতুলপ্রসাদ দিলীপকে লিখলেন, তুমি কবে তোমার মাকে নিয়ে লখনউ আসছ নিশ্চিতভাবে চিঠি লিখে জানাও। তোমার মায়ের জন্যে বড় চিন্তিত আছি। হেম-কুসুমকে জানালেন, তুমি এখানে এলে তোমার চিকিৎসার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা আমি করবো। আর তোমার যদি আমার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে না হয়, এই লখনউ শহরেই তোমার জন্যে একখানা ভালো বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাখবো। সেখানেই থাকবে! তোমার কোন কষ্ট হবে না আশা করি।

হেমকুসুমের চোখ দুটি জলভরা হল। মহেশ বললেন, আমি আপনার লখনউ যাওয়ার ব্যবস্থা করি। অতুলদাদা যখন এত করে আপনাকে ডাক পাঠিয়েছেন, আপনি যেতে আর আপত্তি করবেন না। ওখানে আপনার চিকিৎসা ভালো হবে।

(ক্রমশঃ)

ফ্রান্সিস এম কুরিয়ার, পি এম স্টোন
মুখ বহু শার্লক-ভক্ত স্বীকার করেছেন,
র্লক হোমসের সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধুত্ব
ছল আর অস্টিন ফ্রীম্যানের ডক্টর থর্ন-
াইকের। ডক্টর থর্নডাইক ছিলেন বিজ্ঞান-
ানা ডিটেকটিভ। তাঁর সব অ্যাডভেঞ্চারেই
কছু না কিছু বিজ্ঞানের কথা থাকত।

ছোট্ট একটা ঘটনা থেকেই জানা যায়,
বজ্ঞানিক তথ্যাদির লেনদেন ছিল দুই
ন্ধুর মধ্যে।

গুয়াইকাম বা লিগনাম ভাইটা গাছ
ন্মায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আমে-
রকার উত্তরাঞ্চলে। ভেষজবিজ্ঞানে এ-গাছের
াল আর রজন খুববেশি দরকার লাগে।
ক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে এক-
াগ রজনের সঙ্গে ছ'ভাগ সুরাসার মিশোনো
টিংচার-এর প্রয়োজন হয়। যে তরল পদার্থের
ধ্যে রক্ত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে,
াইতে এই টিংচার মিশিয়ে ইথারমিশ্রত
ইড্রোজেন পারক্সাইডের কয়েক ফোঁটা দিয়ে
াকাতে হয়। তাহলেই ইথারে রজন গলে
য়; আর যদি হিমোগ্লোবিন থাকে তো,
শ্রণটার রঙ পালটে দাঁড়ায় উজ্জ্বল
ীলে। এ-তথ্য জানা যায় এনসাইক্লোপিডিয়া
টানিকা (১৮৮০ সংস্করণ) আর ক্রিস্টো-
ার মোর্লের গ্রন্থ "শার্লক হোমস অ্যান্ড
ক্টর ওয়াটসন" থেকে।

আর অস্টিন ফ্রীম্যান 'ইন দি শ্যাডো
ভ দি উলফ' কাহিনীতে যে এক্স-
ারিমেন্টের বর্ণনা দিয়েছেন, তা এই
য়াইকাম টেস্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।
াটার রঙ পালটে যখন উজ্জ্বল নীল হয়ে
ল, তখন ডক্টর থর্নডাইক বলছেন—
ানে বুঝলে তো? দাগটা রক্তের।"

শার্লক হোমস গুয়াইকাম টেস্টের
বরণ জেনেছিলেন ডক্টর থর্নডাইকের কাছ
কেই। কিন্তু তাঁর গবেষকমন তাতে খুশি
নি। ঘরে বসে টেস্ট-টিউব নিয়ে নাড়া-
ড়া করতে করতে হঠাৎ একদিন একটা বিরাট
বিষ্কার করে বসলেন।

বার্টস-এর ল্যাবরেটরীতে শার্লক হোমস
খন একাই কাজ করতেন। কাজ করতেন
র আকাশপাতাল ভাবতেন।

সেদিনও তিনি ভাবছিলেন। ভাবছিলেন
গের দিন দেখে-আসা খুনগুলোর কথা।
তাঁর মনে ধরেছে, কিন্তু ডাক্তার কথা
বতেই বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যাচ্ছে।

মনোমত কাউকে যদি পাওয়া যেত, তাহলে না-হয় দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে থাকা যেত। বাড়ির মালিকানী মিসেস্ হাডসনকেও মাসে মাসে ভাড়া গুনতে আর বেগ পেতে হত না। রুমমেট নেওয়ার প্রসঙ্গটা অবশ্য স্ট্যামফোর্ডকে তিনি বলেছেন। কাজ হলে ওতেই হবে।

আচম্বিতে সামনের চওড়া-নীচু টেবিলে রাখা টেস্ট-টিউবটার দিকে চোখ পড়ল শার্লক হোমসের। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল ভাবনাচিন্তা, পুরো মনটাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেস্ট-টিউবের ভেতরকার বস্তুটির দিকে।

আর, ঠিক সেই সময়ে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল দোরগোড়ায়।

ঘুরে তাকালেন শার্লক হোমস্। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তরুণ স্ট্যামফোর্ড। সঙ্গে মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক, বেশ মজবুত কাঠামো, চৌকোনা চোয়াল, পুরু ঘাড় আর মোটা গোঁফ।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন শার্লক হোমস্। খপ করে টেস্ট-টিউবটা তুলে নিলেন। স্ট্যামফোর্ডের দিকে বেগে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠলেন সহর্ষে—"পেয়েছি! পেয়েছি! হিমোগ্লোবিন না থাকলে যে রিএজেন্টের তলানি পড়বে না, তা আমি পেয়েছি!"

পরস্পরের আলাপ করিয়ে দিল স্ট্যামফোর্ড।

বলল—"ডক্টর ওয়াটসন—মিঃ শার্লক হোমস্।"

"কিরকম আছেন, বলুন;" বলেই ওয়াটসনের হাত ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলেন হোমস্ যে, আলাপের প্রারম্ভেই হাড়ে হাড়ে টের পেলেন ওয়াটসন রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা হলেও আঙুলে সাঁড়াশির মত শক্ত ধরেন শার্লক হোমস্।

হোমসের চিন্তা কিন্তু তখন তুরঙ্গগতিতে ছুটে চলেছে। উনি ভাবছেন: "লোকটার চেহারা দেখে মনে হয় ডাক্তার, কিন্তু ধরনধারণ দেখে মনে হয় মিলিটারীর লোক। সুতরাং নিঃসন্দেহে আর্মি-ডক্টর। ভদ্রলোক সবে বিষুব অঞ্চল থেকে এসেছেন, কেননা রোদে মুখ পুড়ে গেছে; মুখের যা রঙ দেখছি, তার সঙ্গে গায়ের রঙের মিল নেই—কেননা, কব্জি রীতিমত ফর্সা। শ্রান্ত ক্লান্ত মুখ দেখে মনে হয় শরীর আর মনের ওপর দিয়ে বেশ ধকল গেছে; হাড়ভাঙা খাটুনি তো গেছেই, সেইসঙ্গে রোগেও ভুগতে হয়েছে। বাঁ হাতটা নিশ্চয় জখম হয়েছে—সেইজন্যেই এত আড়ষ্ট আর অসহজ। কোন্ বিষুব অঞ্চলে গেলে ইংলিশ আর্মি-ডক্টরের ওপর দিয়ে এতটা ধকল যেতে পারে এবং একটা হাতও জখম হওয়া সম্ভব?"

ফস্ করে বলে উঠলেন তরুণ শার্লক হোমস্, "দেখছি, আফগানিস্তানে ছিলেন আপনি।"

"কী সর্বনাশ! আপনি তা জানলেন কি করে?" সবিস্ময়ে বললেন ডক্টর ওয়াটসন।

খুক খুক করে খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন শার্লক হোমস্—"থাকগে সে-কথা, ও নিয়ে আর মাথা খারাপ করবেন না। আপাতত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল হিমোগ্লোবিন। আবিষ্কারটার গুরুত্ব নিশ্চয় বুঝেছেন আপনি।"

"কেমিক্যালি বিষয়টা চিত্তাকর্ষক" হুঁশিয়ার কন্ঠে জবাব দিয়েছেন ওয়াটসন, "কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল—"

"আরে মশায়, আইন আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এত বড় প্র্যাকটিক্যাল আবিষ্কার বেশ কিছু বছরের মধ্যে হয়েছে বলে শুনেছেন? শোনেননি। রক্তের দাগ অকাট্যভাবে প্রমাণ করার এই হল মোক্ষম পদ্ধতি। আসুন দিকি এদিকে।"

বলেই ওয়াটসনের কোটের হাতা খামচে ধরে হিড় হিড় করে টেবিলের সামনে টেনে নিয়ে গেলেন শার্লক হোমস্।

"দরকার খানিকটা টাটকা রক্তের", বলে প্যাঁট করে নিজের আঙুলের ডগায় একটা ইয়া লম্বা ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলেন হোমস্, কেমিক্যাল পিপেটে ধরে নিলেন খানিকটা রক্ত।

বললেন—"এবার এক লিটার জলে মিশিয়ে দিলাম এই রক্ত। রক্তের পরিমাণ খুবই কম, দশ লক্ষভাগ জলে একভাগও রক্ত আছে কিনা সন্দেহ—সেই কারণ জলের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বিশুদ্ধ জল—রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু আমার মোক্ষম টেস্টে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কেমিক্যাল রিঅ্যাকসনটা ঠিকই দেখা যাবে।"

কথা বলতে বলতে পাত্রটার মধ্যে খানিকটা শাদা ক্রিস্ট্যাল ফেলে দিলেন হোমস্। তারপর ফোঁটা ফোঁটা করে ফেললেন খানিকটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ।

মুহূর্তের মধ্যে পাত্রভর্তি জলের রঙ পালটে গেল। ফ্যাকাশে মেহগনি রঙের আবির্ভাব ঘটল ম্যাজিকের মত এবং বাদামী রঙের খানিকটা ধুলোর তলানি পড়ল পাত্রের তলায়।

"বিউটিফুল!" পটাপট করে হাততালি দিয়ে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন শার্লক হোমস্। বাচ্চা ছেলের হাতে নতুন খেলনা পড়লেই বুঝি এমনি উল্লাস দেখা যায়। "বলুন, এবার কি বলবেন।"

"দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই সূক্ষ্ম টেস্ট", বললেন ডাক্তার।

"এই আবিষ্কারের পর মান্ধাতা আমলের গুয়াইকাম টেস্টকে সুড়সুড় করে বিদায় নিতে হবে। ওটা কি আবার একটা টেস্ট হলো? যেমন গোলমেলে, তেমনি অনিশ্চিত। রক্তের দাগটা কয়েক ঘন্টার বাসি হলেই তো দফা রফা হয়ে গেল। তখন আর মাইক্রোসকোপ পরীক্ষায় রক্তকণিকাকে দেখে চেনাও যায় না। কিন্তু আমার এই পদ্ধতি দিয়ে বাসি-টাটকা সব রক্তই টেস্ট করা যাবে। এ-আবিষ্কার যদি আগে হত, তাহলে কতশত লোককে আর নিশ্চিন্ত মনে ধরাধামে হেঁটে বেড়াতে হত না—পাপের মূল্য দিতে হত জীবন দিয়ে।"

ঝিকমিক ঝিকমিক করতে লাগল শার্লক হোমসের দুই চোখ। বুকের ওপর হাত রেখে এমনভাবে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন করলেন যেন তিনি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন বিস্ময়বিমুগ্ধ জনতা। ঘনঘন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাঁর আবিষ্কারকে।

"অভিনন্দন আপনার প্রাপ্য", বললেন ওয়াটসন।

"ফ্র্যাঙ্কফোর্টের ভন বিসচফের কেসটা মনে পড়ছে। গত বছরের ঘটনা। শার্লক হোমস্ টেস্ট তখন জানা থাকলে নির্ঘাৎ ফাঁসি হয়ে যেত ভন বিসচফের। আরও আছে। ব্র্যাডফোর্ডের ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার, মণ্টপেলিয়ারের লেফভার, নিউ অর্লিয়েন্সে স্যামসন......"

হেসে ফেলে বলল স্ট্যামফোর্ড, "ক্রাইমের একটা চলমান ক্যালেণ্ডার নাকি তুমি? এ-লাইনে একটা জার্নাল বার করলেই পার। নাম দিও 'অতীতের পুলিশ খবর'।"

"দারুণ ইণ্টারেস্টিং হবে।" আঙুলের ডগায় একটুকরো স্টিকিং প্লাস্টার লাগাতে লাগাতে বললেন হোমস্—"একটু সাবধান থাকা ভাল," ওয়াটসনের দিকে ফিরে "আমাকে আবার বেশ কিছু বিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় কিনা।"

"আমরা এসেছি কিন্তু কাজের কথা বলতে," একটা তিনপায়া টুল টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল স্ট্যামফোর্ড, পা দিয়ে আর একটা ঠেলে দিল ওয়াটসনের দিকে। "আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন রুমমেট খুঁজছেন। তুমিও সেদিন বলছিলে ভাগাভাগি করে থাকতে চাও। তাই ভাবলাম তোমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে পারলেই এক ঢিলে দু' পাখি মারা যায়।"

শুনে আনন্দে আটখানা হয়ে হোমস্ বললেন—"বেকার স্ট্রীটে একটা সুইট আমি দেখে এসেছি। ভাল কথা, কড়া তামাকের গন্ধ আপনার সহ্য হয় তো?"

"আমি নিজেই সব সময়ে 'শিপস্' স্মোক করি," জবাব দিলেন ওয়াটসন।

"বেশ, বেশ। আমার কিন্তু কেমিক্যাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার অভ্যেস, মাঝে মাঝে এক্সপেরিমেণ্টও করি। বিরক্ত-টিরক্ত হবেন না তো?"

"মোটেই না।"

"বেশ, বেশ। আর কি কি বদভ্যেস আছে আমার? মাঝে মাঝে উৎকটভাবে গোমড়ামুখো হয়ে যাই আমি, দিনের পর দিন একদম মুখ খুলি না। তখন যেন ভাববেন না আমি মুখভারী করে বসে আছি। [illegible] দেখে যাবেন, চুপচাপ থাকবেন, দেখবেন দু'দিনেই আবার ঠিক হয়ে গেছি। এবার বলে ফেলুন দিকি আপনার কি কি বদভ্যেস আছে?"

জেরার বহর দেখে ফিক করে হেসে ফেললেন ওয়াটসন।

বললেন, "বেশ, তাহলে বলাই যাক। ঝগড়াঝাঁটি আমার পছন্দ হয় না, [illegible]

মনিতেই আমার স্নায়ুর ওপর দিয়ে নেক ধকল গেছে। আমার যখন তখন এমন ক রাতদুপুরেও, ঘুম ভাঙে। আমি দারুণ ড়ে। শরীর ভাল থাকলে আরও কিছু কছু কুকর্ম আমি করি বটে, তবে যা লেলাম এইগুলোই বর্তমানে মাথাচাড়া দয়েছে।"

"তাহলে তো বোঝাপড়া হয়েই গেল—বশ্য ঘর যদি আপনার পছন্দ হয়।" লেলেন হোমস।

"ঘরগুলো দেখা যাবে কখন?"

"কাল দুপুরে চলে আসুন এখানে। একসঙ্গে যাওয়া যাবেখন।"

"অলরাইট—ঠিক দুপুরবেলা।" বললেন ওয়াটসন। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে।

শার্লক হোমস্ আবার নাক ডুবিয়ে বসলেন কেমিক্যালের মধ্যে।

পরের দিন দুপুরে দেখা হল হোমসের সঙ্গে ওয়াটসনের। দু'জনে মিলে দেখে এলেন ২২১বি বেকার স্ট্রীটের বাড়ী। খান দুয়েক আরামে থাকার মত শোবার ঘর, একটা বেশ বড় আলোবাতাসযুক্ত বসবার ঘর, ঘরে দুটো মস্ত জানলা। সে জানলায় দাঁড়ালে নিচে দেখা যায় বেকার স্ট্রীটের পশ্চিম দিকটা।

সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। সেই দিনই সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে চলে এলেন

ওয়াটসন। স্ট্র্যান্ডের হোটেলে বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল বেচারীর। পরের দিন সকালে অনেকগুলো বড় বড় বাক্স আর পোর্টম্যান্টো নিয়ে উঠে এলেন শার্লক হোমস্।

দিন দুয়েক পোঁটলা-পুঁটলি খুলে গোছগাছ করতেই গেল। সে কাজ শেষ হলে আস্তে আস্তে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিলেন দুজনে।

প্রথম দিকে হপ্তাখানেক কেউ ডাকতে এল না দুজনের কাউকেই। ওয়াটসন ধরে নিলেন, তাঁরই মত শার্লক হোমস্ও নির্বান্ধব।

কিন্তু ঘুম ভাঙল ক'দিন পরেই। দেখলেন, হোমসের চেনাজানা লোকের পুঁজি আর শেষ নেই। সমাজের বিভিন্ন মহলের অনেকেই তাঁকে চেনেন। লেসট্রেড নামে একটা কালো-চোখ ফ্যাকাশে-মুখ বাঁটকুল চেহারার লোক তো এক সপ্তাহের মধ্যে চার চারবার দেখা করে গেল হোমসের সঙ্গে। একদিন সকালে এল এক অল্পবয়েসী মেয়ে। পরনে হালফ্যাশানি পোশাক। রইল আধ-ঘণ্টার মত। সেইদিনই বিকেলের দিকে এল একজন পাকা চুল হাঘরে চেহারার লোক। দেখলেই মনে হয় পেশায় ফেরিওয়ালা। বিলক্ষণ উত্তেজিত অবস্থায় এল লোকটা। তারপরেই এল চটিপরা এক প্রৌঢ়া। আর একবার এল শাদা চুল এক বুড়ো। অনেকক্ষণ বকবক করে গেল হোমসের সঙ্গে। এল ভেলভেটের ইউনিফর্ম পরা এক রেলওয়ে কুলি। এরা এলেই হোমস্ বসবার ঘরটা একাই দখল করতেন এবং ওয়াটসন গিয়ে বসতেন শোবার ঘরে। অসুবিধে সৃষ্টির জন্যে অবশ্য প্রতিবারেই বৈষ্ণব বিনয় দেখাতেন হোমস্। সবিনয়ে বলতেন—"কি করি বলুন, এঁরা সবাই আমার মক্কেল। বসবার ঘরটাকে তাই ব্যবসার ঘর হিসেবে ব্যবহার না করে পারি না।"

চৌঠা মার্চ শুক্রবার সকালবেলা সেই প্রথম ওয়াটসনকে শার্লক হোমস্ জানালেন, পেশায় তিনি কনসাল্টিং ডিটেকটিভ।

বললেন, "আমার বিশ্বাস, কনসাল্টিং ডিটেকটিভ বলতে সারা দুনিয়ায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। লণ্ডনে অবশ্য সরকারী গোয়েন্দার শেষ নেই, বেসরকারী গোয়েন্দাও রয়েছে একপাল। এরা প্রত্যেকেই যখান কিছু না কিছু ভুল করে, হালে পানি পায় না, তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে আমার কাছে। আমি এদের ভুল শুধরে ঠিক পথে চালিয়ে দিই। আমার সামনে সমস্ত প্রমাণ হাজির করে এরা, আমি শুধু মাথা খাটাই। অপরাধের ইতিহাস যা জানি তাই দিয়ে রহস্যের জট ছাড়াই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হই। যেমন, এই লেসট্রেড। ডিটেকটিভ হিসেবে খুবই নামকরা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি একটা জালিয়াতি মামলায় ল্যাজেগোবরে এক হয়ে গেছিল লেসট্রেডের। তাই অত ঘন ঘন পায়ের ধুলো দিয়েছিল এ ঘরে।"

"আর সবাই যারা আসে?" জিজ্ঞেস করেছেন ওয়াটসন।

"ওদের পাঠায় প্রাইভেট এজেন্সি থেকে। কিছু না কিছু ফ্যাসাদে না পড়লে এখানে কেউ আসে না। আমি ওদের কাহিনী শুনি, অন্ধকারে আলো দেখাই, আমার মতামত শোনাই, আর ফী পকেটস্থ করি।"

জানলার সামনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে-ছিলেন ওয়াটসন।

আচম্বিতে রাস্তার দিকে আঙুল নামিয়ে বললেন, "লোকটা কি খুঁজছে তাই ভাবছি।"

যার দিকে আঙুল নামিয়ে দেখালেন ওয়াটসন, পরনে তার সাদাসিদে পোশাক। এক হাতে একটা মস্ত নীল লেফাপা। উদ্বিগ্ন মুখে বাড়ীর নম্বর দেখতে দেখতে ধীরপদে হাঁটছিল বেকার স্ট্রীটের পূর্বদিক দিয়ে।

জানলার সামনে গিয়ে বললেন হোমস্— "লোকটা নেভীর রিটায়ার্ড সার্জেণ্ট।"

"মহা চালিয়াৎ তো!" মনে মনেই বলেছেন ওয়াটসন। "ভালভাবেই জানেন এ অনুমান আমার পক্ষে যাচাই করে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এত লম্বা লম্বা বচন!"

কিন্তু কপাল মন্দ ওয়াটসনের, তা না হলে রাস্তার লোকটা হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকবে কেন? শার্লক হোমসের অনুমান যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাই বা যাচাই হয়ে যাবে কেন?

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে। বাড়ীর নম্বর দেখতে দেখতে আচম্বিতে এ বাড়ীর নম্বর চোখে পড়ল লোকটার। সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে পেরিয়ে এল রাস্তা—পরমুহূর্তেই শোনা গেল দরজায় করাঘাত এবং একটু পরেই আবির্ভাব ঘটল বসবার ঘরে।

সুযোগ ছাড়লেন না ওয়াটসন। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলেন তাকে, কী করা হয়।

লোকটি জানালে, বর্তমানে চিঠি খবর ইত্যাদি বহন করা হয় বটে, কিন্তু এককালে সে নেভীতে সার্জেণ্ট ছিল। এখন রিটায়ার্ড।

শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল ডক্টর ওয়াটসনের। প্যাকাটিপানা লোকটা ম্যাজিক-ফ্যাজিক জানে নাকি? নিমেষ মধ্যে হোমসের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তাঁর।

শার্লক হোমসের হাতে লেফাপাটি তুলে দিয়ে স্যালুট করে বিদায় হন রিটায়ার্ড সার্জেণ্ট।

ওয়াটসনও নাছোড়বান্দার মত ধরলেন— রিটায়ার্ড সার্জেণ্টকে কিভাবে চেনা গেল, তা বলতেই হবে।

"খুব সহজে," বুঝিয়ে দিলেন হোমস্। "জানলা থেকেই দেখতে পেলাম লোকটার হাতের পেছন দিকে একটা মস্তবড় নীল রঙের নোঙরের উল্কি রয়েছে। এই থেকেই এল সমুদ্রের অনুমান। লোকটার চলাফেরা মিলিটারী মেজাজে, গালেও বেশ বড় জুলপি। সব মিলিয়ে পাওয়া গেল নেভী। দেখে মনে হল, নিজে যে হেঁজিপেঁজি নয়, সে সম্বন্ধে বেশ সচেতন লোকটা; হুকুম করারও যে অভ্যেস আছে তাও বোঝা গেল হাবভাব দেখে। ঘাড় কাৎ করে মাথার কায়দা আর বেতের ছড়ি দোলানোর স্টাইলটা নিশ্চয় আপনারও চোখ এড়োয়নি। আত্ম-সম্মানবোধসম্পন্ন মাঝবয়েসী, ধীরস্থির মুখ দেখেই সব বোঝা গেল। সব কিছুর যোগফল দাঁড়াল লোকটা নৌবহরের রিটায়ার্ড সার্জেণ্ট।"

"ওয়ান্ডারফুল!"

চিঠিখানা ওয়াটসনের হাতে তুলে দিলেন হোমস্।

ওয়াটসন দেখলেন, তলায় সই রয়েছে 'টোবিয়াস গ্রেগসন।'

হোমস্ বললেন, "স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের মধ্যে সবচাইতে স্মার্ট হল এই গ্রেগসন।"

"আপনার সাহায্য চাইছেন উনি।"

"সেইজন্যেই ভাবছি আমাদের যাওয়া দরকার। কি যেন ঠিকানাটা?"

"তিন নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্স বেরিয়েছে ব্রিক্সটন রোড থেকে।"

"বেশ, বেশ। টুপি নিন আপনার।"

"আমাকে আসতে বলছেন?"

"যদি আপনার হাতে কোন কাজ না থাকে।"

মিনিটখানেক পরেই একটা ভাড়াটে গাড়ী নিয়ে দুজনে রওনা হলেন ব্রিক্সটন রোড অভিমুখে।

ভোরের কুয়াশা তখনও কাটেনি। বাড়ী ঘরদোরের উপর ঝুলন্ত পাণ্ডুর বর্ণ কুহেলি পর্দা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তা রাস্তাঘাটের কাদারই প্রতিফলন।

হোমসের স্ফূর্তি দেখে কে! সঙ্গীত নিয়ে সারা রাস্তা বকবক করতে লাগলেন।

ওয়াটসন একবার বললেন, "কেসটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে চান না মনে হচ্ছে।"

"হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ-পঞ্জি না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নয়," জবাব দিলেন হোমস্। "সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতে আসার আগে থিওরী খাড়া করা হল মারাত্মক ভুল। বিচারবুদ্ধি আর নিরপেক্ষ থাকে না।"

গাড়ী এসে থামল তিন নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্সের সামনে।

বাড়ীটার চেহারা অতিশয় কদাকার। ভাঙাচোরা, নোংরা। এ বাড়ীতে যে মানুষ থাকে না, তা এক পলকেই বোঝা যায়।

গাড়ী থেকে নেমেই কিন্তু বাড়ীর মধ্যে দৌড়োলেন না শার্লক হোমস্। পথের ওপর দিয়ে আপন মনে আনাগোনা করতে লাগলেন বারবার। ওয়াটসনের মনে হয়, পায়চারি করতে করতে যেন শূন্যদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন কখনো জমির দিকে, কখনও আকাশের দিকে, কখনও বিপরীত দিকের বাড়ীর দিকে, আবার কখনো রেলিংয়ের দিকে।

অবশেষে রাস্তার ধার বরাবর ঘাসের পটির ওপর দিয়ে ঘাড় হেঁট করে হাঁটতে লাগলেন হোমস্। দুবার থমকে দাঁড়ালেন। দুবারই আপন মনে হেসে উঠলেন এবং সবিস্ময়ে অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠলেন।

সদর দরজার সামনে আসতেই দেখা হল লম্বা চেহারার এক পুরুষের সঙ্গে। ভদ্রলোকের মাথায় সোনালী চুল, হাতে খোলা নোটবই। হোমস্‌কে দেখেই দৌড়ে এসে করমর্দন করলেন তিনি।

সহর্ষে বললেন—"এসেছেন! আঃ, বাঁচলাম! কিচ্ছুতে এখনো হাত দিই নি। ভারী অদ্ভুত কেস। এসব ব্যাপারে আপনার ইন্টারেস্ট জানি তো, তাই—"

"ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে এসেছেন নাকি?" প্রশ্ন করলেন হোমস্।

"না তো।"

"লেসস্ট্রেড আসেনি তো?"

"আজ্ঞে না।"

"তাহলে চলো, ঘরটা দেখা যাক।" বলে বকের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন শার্লক হোমস্। পেছন পেছন গেলেন ওয়াটসন আর গ্রেগসন।

ডাইনিং রুমে ঢুকতেই ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখে পড়ল ওয়াটসনের।

মেঝের ওপর লম্বমান এক বীভৎস মূর্তি। নিস্পন্দ, নিথর, নিষ্প্রাণ। দৃষ্টিহীন শূন্য চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে রঙচটা কড়িকাঠের দিকে।

লোকটার বয়স কমসেকম তেতাল্লিশ বছর। উচ্চতা মাঝামাঝি। চওড়া কাঁধ। ছোট ছোট কোঁকড়ানো কালো চুল। খাটো, কিন্তু মোটা দাড়ি। পরনে ফ্রককোট আর ওয়েস্ট-কোট। হাল্কা রঙের ট্রাউজার্স। কড়া ইস্ত্রি করা পরিষ্কার কলার আর শার্টের হাতা। বেশ করে বুরুশ করা টপহ্যাটটা বসানো রয়েছে পাশেই মেঝের ওপর। দুই হাত মুঠো করা এবং দুপাশে ছড়ানো। অথচ দু' পা এমনভাবে জট বেঁধে রয়েছে যেন মরণকালে যমের সঙ্গে লড়াইটা খুব সহজ হয়নি। আড়ষ্ট মুখে সে কী নিঃসীম আতংক আর ঘৃণার প্রতিচ্ছবি। ওয়াটসনের তো মনে হল কোনো মানুষের মুখে আতংক আর ঘৃণাকে এমন প্রকট হয়ে উঠতে এর আগে তিনি আর দেখেননি।

বাটকুল চেহারা আর বেঁজির মত চনমনে ভাব নিয়ে দোরগোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল লেসস্ট্রেড।

লাশের কাছে এগিয়ে গেলেন শার্লক হোমস্। হাঁটু গেড়ে বসলেন পাশে। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে চারপাশের রক্তের ছিটের দিকে আঙুল তুলে বললেন—"দেহে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই তো?"

"না।" একই সঙ্গে বললে দুই ডিটেকটিভ।

"তাহলে এ রক্ত এসেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির দেহ থেকে—খুব সম্ভব সে-ই খুনী। অবশ্য খুন যদি আদৌ হয়ে থাকে। দেখেশুনে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ১৮৩৪ সালে ভ্যান জ্যানসেনের খুনের ঘটনা। সেবারেও ঠিক এইরকম পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল।"

স্ট্রেচারসমেত চারজন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল গ্রেগসন। তৎক্ষণাৎ মড়া সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দিলে সে। ধরাধরি করে লাশ তোলা হচ্ছে, এমন সময়ে টং করে একটা আংটি পড়ল মেঝের ওপর। পড়েই গড়িয়ে গেল।

ছোঁ মেরে আংটিটা তুলে নিলে লেসস্ট্রেড।

বললে—"বটে! তাহলে মেয়েছেলেও আছে এ ব্যাপারে। এ আংটি বিয়ের আংটি।"

"পকেটে কি-কি পাওয়া গেছে?" জানতে চাইলেন হোমস্।

"এই তো রয়েছে এখানে", জবাব দিলে গ্রেগসন। "সোনার ঘড়ি, সোনার অ্যালবার্ট চেন, কারুকাজকরা সোনার চেন, রাশিয়ান চামড়ার কার্ড-কেস, কার্ডে নাম লেখা রয়েছে

ছোঁ মেরে আংটিটা তুলে নিলে লেসস্ট্রেড

কথা বলছিলেন হোমস্, কিন্তু আঙুল চলছিল সমানে। একই আঙুল বিভিন্ন কাজ করে চলেছে। কখন টিপে দেখছে, কখনও বোতাম খুলছে, কখনও বুলিয়ে অনুভব করছে, আরও কতরকমভাবে পরীক্ষা করছে।

সবশেষে মড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠোঁট শুঁকলেন হোমস্। তারপরেই চোখ বুলিয়ে নিলেন পেটেন্ট-লেদার বুটের শুকতলায়।

বললেন—"এবার একে মর্গে নিয়ে যেতে পার। আর কিছু জানার নেই।"

'এনক্ জে ড্রেবার, ক্লিভল্যান্ড'। জামা-কাপড়ে এই নামেরই আদ্যাক্ষর লেখা রয়েছে 'ই জে ডি'। মানিব্যাগ নেই, কিন্তু সাত পাউন্ড তেরো শিলিংয়ের মত খুচরো আছে। আর আছে বোকাসিও-র 'ডেক্যামেরন'-এর পকেট সংস্করণ। প্রথম পাতায় রয়েছে 'জোসেফ স্টেনজারসন'-এর নাম। রয়েছে দুটো চিঠি। লেখা হয়েছে ই জে ড্রেবার আর জোসেফ স্টেনজারসনকে।"

"ঠিকানা?"

"অ্যামেরিকান একস্‌চেঞ্জ, দি স্ট্র্যান্ড—এসে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চিঠি ঐ ঠিকানাতেই পড়ে থাকবে। দুটো চিঠিই এসেছে ইউনিয়ন স্টীমশিপ কোম্পানী থেকে—লিভারপুল থেকে জাহাজ ছাড়া সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, বেচারা নিউইয়র্কে ফিরে যাবার আয়োজন করছিলেন।"

"স্টেনজারসন সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছ?"

"নিয়েছি। সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছি। অ্যামেরিকান একস্‌চেঞ্জে আমার লোকও গেছে। কিন্তু ভদ্রলোক এখনো এসে পৌঁছোননি", বললে গ্রেগসন।

"ক্লিভল্যান্ডে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ?"

"আজ সকালেই পাঠিয়েছি।"

আচমকা গলা শোনা গেল লেসট্রেডের—"মিঃ গ্রেগসন, বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার করেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ফস্‌ করে বুটে ঘসে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ফেললে লেসট্রেড। জ্বলন্ত কাঠিটা দেওয়ালের কাছে ধরতেই দেখা গেল কোণের দিকে বেশ খানিকটা কাগজ টান মেরে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ফলে, বেরিয়ে পড়েছে চৌকোণা হলদে পলস্তারা। চৌকোণা পলস্তারার ওপর রক্তরাঙা অক্ষরে লেখা শুধু একটি শব্দ :

RACHE

আবিষ্কারের আনন্দে প্রায় লাফাতে লাগল লেসট্রেড। সোৎসাহে বললে—"বলুন দিকি এর মানে কী? খুনী নিজের রক্ত দিয়ে লিখেছে শব্দটা। খুনী অবশ্য মেয়েছেলে হতে পারে, ব্যাটাছেলেও হতে পারে। দেখছেন তো দেওয়ালের গা বেয়ে কি রকমভাবে গড়িয়ে এসেছে বাড়তি রক্তের ধারা! বলুন দিকি লেখার জন্যে কেন এই কোণটাকেই বেছে নেওয়া হল? আমিই বলছি। ম্যান্টলপিসের ওপর মোমবাতিটা দেখছেন তো? খুনের সময়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল। এখন কোণটা সবচাইতে অন্ধকার বটে। কিন্তু মোমবাতি জ্বললে এই কোণেই সবচাইতে বেশি আলো পড়ে।"

গ্রেগসন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তার মানেটা কী?"

"মানে? আরে মশায়, খুনী নিজের হাতে মেয়েলী নাম **RACHEL** লিখতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ করার আগেই বাধা পড়ে। তাই লেখা হয়েছে **RACHE** পর্যন্ত।"

একটা মাপবার ফিতে আর একটা বড় গোলাকার ম্যাগনিফাইং গ্লাস পকেট থেকে বার করলেন শার্লক হোমস। তারপর চরকি-পাক দিতে লাগলেন ঘরময়। কখনও থমকে দাঁড়ালেন, কখনও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন, আবার কখনও সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। এক জায়গায় খানিকটা ধূসর ধুলো সযত্নে খামে ভরে রাখলেন। দেখেশুনে ওয়াটসনের মনে হল যেন কড়া ট্রেনিং পাওয়া একটা শিকারী ফক্স-হাউন্ড হারিয়ে-যাওয়া গন্ধের খোঁজে হন্যে হয়ে লাফালাফি করছে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত।

সবশেষে দেওয়ালে লেখা রক্তরাঙা শব্দটা অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন হোমস্‌ হাতেধরা আতস-কাঁচের মধ্যে দিয়ে।

"কি দেখলেন, স্যার", জিজ্ঞেস করল গ্রেগসন।

মুচকি হেসে হোমস্‌ বললেন, "সাহায্য করতে গেলে তোমাদের প্রাপ্য বাহবাটুকু স্রেফ লোপাট করা ছাড়া পথ দেখছি না। কাজ তোমরা ভালই করেছ, এত ভাল যে, তার মধ্যে নাক গলানোর উপায় নেই। তা সত্ত্বেও একটা জিনিস তোমাদের বলে যাই, তাতে তোমাদের আখেরে লাভ হবে। লোকটা এমনি অক্কা পায়নি—খুন করা হয়েছে। খুন যে করেছে, সে পুরুষ। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, তরুণ যুবার মত চটপটে, উচ্চতার অনুপাতে পায়ের মাপ ছোট; থ্যাবড়ামুখো মোটা ভারী বুট পরে এবং ত্রিচিনোপল্লী চুরুট খায়। চার চাকা-ওয়ালা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে এনক্‌ জে ড্রেবারকে নিয়ে এখানে এসেছে। যে-ঘোড়া গাড়ীটা টেনে এনেছে, তার তিন পায়ে পুরোনো নাল লাগানো আছে বটে, কিন্তু সামনের একটা পায়ের নাল সবে পালটানো হয়েছে। যতদূর সম্ভব, খুনীর মুখ টকটকে রাঙা; ডান হাতের নখগুলো আশ্চর্যরকমের লম্বা। তদন্তের সূচনা হিসেবে খবরগুলো খুবই সামান্য—হয়ত তোমাদের কাজে লাগতে পারে।"

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল গ্রেগসন আর লেসট্রেড এবং এমন অবিশ্বাসের হাসি হাসল যে, দেখে মনে হল শার্লক হোমস্‌ যেন একটা ভাঁওতাবাজির ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

লেসট্রেড বললে, "এঁকে যদি খুনই করা হয়ে থাকে, তাহলে তা কি করে করা হল?"

"বিষ দিয়ে", ছোট্ট করে বললেন হোমস্‌। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "ওহো, আর একটা কথা, লেসট্রেড", বলতে বলতে চৌকাঠের ওপর ঘুরে দাঁড়ালেন, "মিস্‌ র‍্যাচেলকে খুঁজে বার করার জন্য খামোকা সময় নষ্ট করো না। **RACHE** একটা জার্মান শব্দ। মানে হল, 'প্রতিশোধ'।"

যেন ভিমরুলে প্রয়োগ করে গেলেন হোমস্‌, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডিটেকটিভ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল পেছনে।

ফেরার পথে হোমস্‌ বললেন, "আরে, ভুল হবার জোটি নেই। এসেই দেখলাম ফুটপাতের ধার ঘেঁসে একজোড়া চাকার দাগ। যেহেতু কাল রাতের আগে বৃষ্টি হয়নি, সুতরাং চাকার গভীর দাগটা পড়েছে কাল রাতেই। ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপও পড়েছে কাদার ওপর। তার মধ্যে একটার ছাপ খুবই স্পষ্ট, অর্থাৎ নতুন নাল লাগানো হয়েছে। আর, মাথায় কে কত লম্বা, তা তো পদ-ক্ষেপের মাপ থেকেই বলা যায়। লোকটার পায়ের ছাপ বাইরে কাদায় আছে, ভেতরে ঘরের ধুলোয় আছে। হিসেবটা পরখ করে নিলাম আর একভাবে। কেউ যখন দেওয়ালে লেখে, তখন তা চোখের সমান সমান জায়গায় লেখা হয়। দেখলাম, লেখাটা মেঝে থেকে ছ' ফুট উঁচুতে। অতএব লোকটা ছ' ফুটের ওপর লম্বা। আর বয়স? আরে মশাই, যে-লোক সাড়ে চার ফুট অনায়াসে ডিঙিয়ে যায়, সে কি বুড়ো-হাবড়া হতে পারে? বাগানের খানিকটা কাদা জমির পাশ দিয়ে ঘুরে পেটেন্ট লেদার বুট এগিয়েছে। কিন্তু থ্যাবড়ামুখো বুট সোজা ডিঙিয়ে গেছে। হাতের নখ আর ত্রিচিনো-পল্লী? ওটা নেহাতই ছেলেখেলা। রক্তে তর্জনী ডুবিয়ে দেওয়ালের লেখাটা লেখা হয়েছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলাম, পলস্তারায় স্পষ্ট আঁচড়ের দাগ। তর্জনীর নখ লম্বা না হলে দাগ পড়বে কেন? মাঝে থেকে খানিকটা ছাই তুলে নিয়ে দেখলাম রঙটা কালচে এবং চেহারাটা পাতলা পাতলা অংশের মত। যে-কোন তামাক বা চুরুটের ছাই দেখেই আমি তফাৎ বলে দিতে পারি। এসম্পর্কে আমার কিছু প্রবন্ধও আছে।"

"কিন্তু টকটকে রাঙা মুখ?" জানতে চেয়েছেন ওয়াটসন।

শার্লক হোমস্‌ এ-প্রশ্নের জবাব তখন দেননি। আসামী ধরা পড়লে হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছিলেন হত্যাকারী Aortic Aneurism রোগে ভুগছিল বলে রক্তের চাপহেতু তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ত। এই রক্ত দিয়ে **RACHE** শব্দটা লেখা হয়েছে এবং এইজন্যেই নিহত ব্যক্তির দেহে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়নি। আর রক্তোচ্ছ্বাসহেতু যার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তার মুখ যে টক-টকে রাঙা হবে, এতো স্বাভাবিক।

হোমস্‌ আরও বলেছিলেন, **RACHE** শব্দ লিখে খুনী পুলিশকে বিপথে চালানোর চেষ্টা করছে। এটা মোটেই রাজ-নৈতিক হত্যা নয়। জার্মান শব্দ লিখলেও খুনী জার্মান নয়। কেননা, খাঁটি জার্মান হলে **A** অক্ষরটা নিখুঁত ল্যাটিন কায়দায় লিখত। খুনী তা নকল করতে গিয়েও পারেনি।

শুনে তো চোখ কপালে উঠে গেছে ওয়াটসনের। গদগদকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—"গোয়েন্দাগিরিকে খাঁটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে এনে ফেললেন আপনি।"

তোষামোদ শুনে গলে যেতেন হোমস্‌। জগদ্বিখ্যাত গোয়েন্দা হলে কি হবে, এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের মত।

রূপের সুখ্যাতি শুনলে মেয়েরা যেমন আনন্দে আটখানা হয়, শার্লক হোমস্‌ও তেমনি খোশামোদ শুনলে আহ্লাদে আটখানা হতেন।

সরেজমিন তদন্ত শেষ করে দুজনে গেছেন সেই কনস্টেবলের কাছে যে লাশটা প্রথম দেখেছে। তার কাছে যখন শোনা গেল, ফটকের কাছে একজন মাতালকে সে বসে থাকতে দেখেছিল, তখন চটে গিয়ে হোমস্‌ তাকে বলেছেন, সাতজন্মেও পুলিশের কাজে তোমার নাম হবে না। কাল রাতে মাতাল ভেবে যাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, সেই হল খুনী।"

ফেরবার পথে গাড়ীর মধ্যে হেলান দিয়ে বেহালার সুর ভাঁজতে লাগলেন হোমস—"ট্রা-লা-লা-লিরা-লিরা-লে!"

সংগীত সম্বন্ধে হোমস্‌ বলতেন—"ডারউইন দাবী করেন, মানুষের বাকশক্তি জাগ্রত হওয়ার বহু আগে থেকেই গান-বাজনা সৃষ্টি এবং তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে এসেছিল। সেই কারণেই বোধ-হয় সংগীত আমাদের এরকম সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে।"

কিন্তু খুন করার পরে ফটকের কাছে খুনী বসে রইল কেন? শার্লক হোমস্‌ বললেন—"সে এসেছিল ভুল করে ফেলে-যাওয়া আংটিটা ফেরৎ নিয়ে যেতে। কিন্তু পুলিশের জন্যে পারল না। তাই আজকে সকালেই "হারানো-প্রাপ্তি" কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। বিকেলের দিকে লোকটা ঠিকই আসবে আমার ডেরায় আংটি নিয়ে যেতে।"

কিন্তু লালমুখো ছ'ফুট লম্বা খুনে এল না। এল বুড়ির ছদ্মবেশে এক তরুণ এবং শার্লক হোমস্‌কে বোকা বানিয়ে সরে পড়ল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বিষণ্ণসুরে বেহালা বাজালেন শার্লক হোমস্‌।

পরের দিন সকালে সবক'টা কাগজে 'ব্রিকস্‌টন রহস্য' বৃত্তান্ত ফলাও করে ছাপা হল।

যে ভদ্রলোক মারা গেছেন, তিনি অ্যামেরিকান। দেশ-বিদেশে বেড়ানোর সময়ে সঙ্গে থাকেন প্রাইভেট সেক্রেটারী জোসেফ স্টেনজারসন। কয়েক হপ্তা লণ্ডনে থাকার পর দুজনেই স্টেশনের দিকে রওনা হন লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারপরেই মিঃ ড্রেবারের লাশ পাওয়া গেল একটা খালি বাড়ীতে। মিঃ স্টেনজারসন এখনও নিপাত্তা।

ঠিক এই সময়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এক দঙ্গল রাস্তার ছেলে। কি তাদের চেহারার ছিরি!! যেমন নোংরা গা, তেমনি ছেঁড়া জামাকাপড়। এরকম বকাটে ছেলের দল জীবনে দেখেন নি ওয়াটসন। তাই তিনি আঁৎকে উঠেছিলেন। শার্লক হোমস্‌ কিন্তু গম্ভীর মুখে জানালেন এরাই হল 'ডিটেকটিভ পুলিশ ফোর্সের' বেকার স্ট্রীট ডিভিসন'।

বলেই, কড়াগলায় হুকুম দিলেন হোমস্‌—"টেন্‌সন!"

তৎক্ষণাৎ, ছটা নোংরা স্ট্যাচুর মত সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল ছজন খুদে বদমাস।

হোমস্‌ বললেন—"এবার থেকে রিপোর্ট পাঠাবার দরকার হলে শুধু উইগিনস্‌কে পাঠিয়ে দিয়ে তোরা বাইরে অপেক্ষা করবি। উইগিনস্‌, পাওয়া গেল?"

"আজ্ঞে, না," জবাব দিল সবচেয়ে ঢ্যাঙা ছোঁড়াটা।

"না পাওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়িস নি। এই নে তোদের মাইনে," বলে প্রত্যেকের হাতে দিলেন একটা শিলিং। যা এখন, এবার যখন আসবি ভাল খবর নিয়ে আসিস্‌।"

একপাল ধেড়ে ইঁদুরের মত ঠেলাঠেলি করে চকিতে উধাও হয়ে গেল ছজন চ্যাংড়া।

ওয়াটসনকে হোমস্‌ জানালেন, ব্রিক্সটন রহস্য সম্বন্ধেই একটা খবর জানার জন্যে এই বালখিল্য দলকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

ঠিক এইসময়ে আবির্ভাব ঘটল গ্রেগসনের। তার মুখেই জানা গেল উজবুক লেসট্রেডটা নাকি সেক্রেটারী স্টেনজারসনকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছে।

আর তারপরেই ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করল লেসট্রেড স্বয়ং।

বললে গম্ভীরভাবে, "আজ ভোর ছটায় হ্যালিডেস্‌ প্রাইভেট হোটেলে খুন হয়েছেন সেক্রেটারী মিঃ জোসেফ স্টেনজারসন!"

এইভাবেই কাদাঘাঁটাই সার হল লেস-ট্রেডের। গ্রেগসন নিজেও যে ভুল লোকের পেছনে ছুটেছিল, তা-ও প্রমাণিত হয়ে গেল সেক্রেটারীর মৃত্যুতে।

তখন দুই সরকারী ডিটেকটিভ, এমনকি ওয়াটসন নিজেও চেপে ধরলেন শার্লক হোমস্‌কে—আর একটা খুন যদি রদ করতে চান তিনি, তাহলে হত্যাকারীর নাম তাঁকে বলতেই হবে—অবশ্য যদি সে নাম তাঁর জানা থাকে।

পীড়াপীড়িতে খানিকটা নরম হলেন হোমস্‌। নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি ঘোষণা করলেন: "আর কোন খুন হবে না। সুতরাং সে সম্ভাবনা বাদ গেল। আপনারা জানতে চাইছেন, হত্যাকারীর নাম আমি জানি কিনা। হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু তাকে আমি নিজেই গ্রেপ্তার করতে চাই, কেননা, সে ভয়ানক ধড়িবাজ এবং ভীষণ বিপজ্জনক লোক।"

ঠিক এই সময়ে আবির্ভাব ঘটল উই-গিনস্‌ নামে রাস্তার ছোঁড়াটার।

স্যালুট করে বললে, "গাড়ী এনেছি, স্যার।"

"গুড বয়", বললেন হোমস্‌। বলতে বলতে একজোড়া হাতকড়া ড্রয়ার থেকে বার করলেন। লেসট্রেডকে বললেন, "এ-জিনিসটা তোমরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চালু করছ না কেন? স্প্রিংয়ের কাজটা দেখেছো? খিটাট-খুলে! চক্ষের নিমেষে আটকে যায়।"

সবিনয়ে লেসট্রেড জবাব দিয়েছে, "আমাদের সেকেলে হাতকড়াতেই কাজ হবে—অবশ্য হাতে পরনোর মত লোকটাকে যদি পাওয়া যায়।"

"ভেরী গুড, ভেরী গুড", হাসতে হাসতে বলেছেন হোমস্‌। "গাড়োয়ানটা এলে বাক্সটার বাঁধাছাঁদায় হাত লাগাতে পারত। উইগিনস্‌, ওকে ওপরে পাঠিয়ে দে তো।"

লণ্ডনের বাইরে যাওয়ার প্ল্যান আছে হোমসের, তা জানা ছিল না ওয়াটসনের। তাই বিলক্ষণ অবাক হলেন তিনি। ঘরে একটা পোর্টম্যাণ্টো ছিল। তারই বেল্ট কষতে লাগলেন হোমস্‌। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল গাড়োয়ান।

হাঁটু গেড়ে বসে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে মাথা না ঘুরিয়েই বললেন হোমস্‌—"বাক্‌সটা নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়লাম তো, একটু হাত লাগাবে?"

উদ্ধত ভঙ্গিমায় এগিয়ে এল গাড়োয়ান। হাত নামাল বেল্টের ওপর।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল, ঝনাৎ করে ধাতুতে-ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দ হল, আর তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন শার্লক হোমস্‌।

ঘোষণা করলেন প্রদীপ্ত চোখে—"জেন্টেলমেন, আসুন মিঃ জেফারসন হোপ-এর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই—ইনিই এনক্‌ ড্রেবার আর জোসেফ স্টেন-জারসনের একমাত্র খুনী।"

সমস্ত জিনিসটা এমনই চকিতে ঘটে গেল যে ভালভাবে কিছু বোঝবারও সময় পেলেন না ওয়াটসন। কিন্তু সেই মুহূর্তের দৃশ্যটা চিরকাল জ্বলজ্বল করবে তাঁর মনের চোখে। হোমসের বিজয়ী মুখচ্ছবি আর তাঁর গমগমে কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের হতভম্ব বর্বর মুখ আর ঝকমকে হাতকড়ার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকানো—যেন নাটকের উত্তেজনাঘন ক্লাইম্যাক্‌স্‌। ম্যাজিকের মতই লোকটার বলিষ্ঠ হাতে আবির্ভাব ঘটেছিল হাতকড়াজোড়ার। বাকি সবাইও সেকেণ্ড-দুয়েক পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন।

আর, তারপরই ভয়াল হুংকার ছেড়ে হোমসের বাহুবন্ধন থেকে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানলার দিকে ছুটে গেল কয়েদী।

ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল শার্সির কাচ আর কাঠ। কিন্তু জানলা-পথে দেহটা পুরোপুরি গলে যাবার আগেই তিন-তিনটে স্ট্যাগ-হাউণ্ডের মত একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিন ডিটেকটিভ, হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে এলেন ঘরের মাঝখানে এবং বিস্তর ধস্তাধস্তির পর, বেঁধে ফেললেন হাত আর পা।
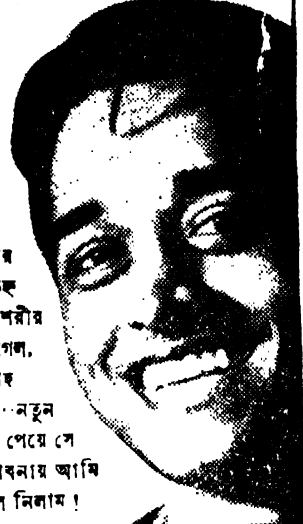
স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কয়েদীকে নিয়ে যাওয়ার পর শোনা গেল সেই চাঞ্চল্যকর কাহিনী। কয়েদী বললে, "আমি তো আজ নয়। কাল এমনিই মরব—ফাঁসিকাঠে উঠতে হবে না। আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। যে-দুজনকে আমি নিজের হাতে খুন করেছি, তারাই অনেকদিন আগে আমার প্রেয়সী আর তার বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর তার আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে আমি যে শপথ করেছিলাম, তা রেখেছি। একজনকে বিষ খাইয়েছি—সে-বিষ দক্ষিণ আমেরিকার তীরের ফলায় লাগানো হয়। আর একজন বিষ খেতে চায়নি বলে ছুরি মেরেছি। এদেরই পিছু নিয়ে আমি লন্ডনে এসেছি। অভাবের তাড়নায় গাড়োয়ানি করেছি। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দিনদুয়েক থেকে আমি লন্ডন ছেড়ে চলে যেতাম। কিন্তু আজ সকালে আমাকে একজন ছোকরা গিয়ে ডেকে নিয়ে এল। বললে, আমার নাম জেফারসন হোপ কিনা, হলে ২২১।বি, বেকার স্ট্রীটে গাড়ীটা নিয়ে যেতে হবে। অতশত সন্দেহ না করেই আমি এসেছিলাম, তারপরেই এই হাতকড়া। আমার মনে হয়, পুলিশ-চীফের পদ যদি খালি থাকে, তাহলে তা এই শার্লক হোমস্ ভদ্রলোককেই দেওয়া উচিত।"

পরের দিন সকালে হাজতঘরের মেঝেতে হাসিমুখে শুয়ে থাকতে দেখা গেল জেফারসন হোপকে। কিন্তু সে-দেহে আর প্রাণ ছিল না। আগের দিনের অত উত্তেজনা অসুস্থ শরীরে সহ্য হয়নি। রাতেই Aneurism ফেটে গেছে—হাসতে হাসতে রওনা হয়েছে পরপারের আদালতে।

শার্লক হোমস্ তখন বুঝিয়ে দিয়েছেন ওয়াটসনকে কিভাবে তাঁর বিশ্লেষণী মন এগিয়েছে এবং আবিষ্কার করেছে জেফারসন হোপকে। এ-কেসে তিনি পিছুহাটা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ ফলাফলটা জানার পর কোন্ কোন্ ধাপ পেরিয়ে সে-ফলে পৌঁছোতে হয়েছে, তা হিসেব করে বার করেছেন। দুঃখপ্রকাশ করেছেন, পায়ের ছাপ অনুসরণের আর্ট ডিটেকটিভ সায়ান্সে এতদিন অবহেলিত থেকে এসেছে বলে।

মৃতদেহের ঠোঁট শুঁকেই একটা তেতো গন্ধ পেয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন খুনটা করা হয়েছে জোর করে বিষ খাইয়ে।

খুনটা যে রাজনৈতিক নয়, তা বুঝেছেন চারদিকে পায়ের ছাপ দেখে। গুপ্তঘাতক এত বোকা হয় না, তারা নিঃশব্দে এসে কোন চিহ্ন না ফেলে খুন করে সরে পড়ে। আর আসে না। কিন্তু এখানে হত্যাকারী আবার ফিরে এসেছিল। নিশ্চয় আংটি নিতে। সুতরাং খুনের মোটিভটা স্রেফ প্রতিশোধ নেওয়া এবং এর পেছনে একজন মেয়েছেলে আছে।

তাই তিনি ক্লিভল্যান্ডে টেলিগ্রাম করে খবর আনিয়েছেন। জানা গেছে, ড্রেবার সেখানে আইনের শরণ নিয়েছেন ঃ ভালবাসার ক্ষেত্রে পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জেফারসন হোপ নাকি তাকে প্রাণে মারতে পারে—তাই আইন-মাফিক আগে থেকেই খবরটা জানিয়ে রেখেছেন। আর এই হোপ লোকটা নাকি এখন ইউরোপেই রয়েছে।

অতএব, হত্যাকারীর নাম জানা গেল। এবার বাকি রইল শুধু তাকে খুঁজে বার করা। রাস্তার কাদায় গাড়ীর চাকার দাগ দেখে হোমস্ বুঝেছিলেন, গাড়ীতে তখন গাড়োয়ান ছিল না বলেই ঘোড়াটা গাড়ী নিয়ে এদিক-ওদিক টানাটানি করেছে। গাড়োয়ান তাহলে নিশ্চয় ড্রেবারের সংগে বাড়ীর মধ্যে গেছিল। আর, লন্ডন শহরের রাস্তাঘাটে কারোর পিছু নিতে হলে গাড়োয়ানের ছদ্মবেশই তো সবচাইতে নিরাপদ।

কাজেই নিশ্চিন্ত হলেন হোমস্—হত্যাকারী একজন গাড়োয়ান এবং তাকে ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাতেই খুঁজতে হবে। নাম সে নিশ্চয় পালটাবে না। বিদেশে তাকে চেনে কে?

তাই গাড়োয়ান জেফারসন হোপকে ডেকে আনার জন্যে ডেঁপো ছোঁড়াগুলোকে লন্ডনের বিভিন্ন গাড়ীর আস্তায় পাঠিয়ে দিলেন হোমস্ এবং ফলাফলও পেলেন হাতেনাতে।

সেইদিনের কাগজেই ফলাও করে ছাপা হল লেসট্রেড আর গ্রেগসনের কীর্তি-কাহিনী। সব কৃতিত্বই নাকি এই দুই দুঁদে ডিটেক্‌টিভের প্রাপ্য। খুনী অবশ্য ধরা পড়েছে শার্লক হোমস্ নামে একজন শখের গোয়েন্দার বাড়ীতে। কাজেই আশা করা যাচ্ছে, লেসট্রেড আর গ্রেগসনের উপদেশ-টুপদেশ মেনে চললে এ-লাইনে শার্লক হোমস্ হয়ত নাম করতে পারবেন।

খবর পড়ে হাসতে লাগলেন শার্লক হোমস্।

ওয়াটসন বললেন—"নেভার মাইন্ড। শীগগিরই এ-কাহিনী আমি লিখছি। সব ঘটনা পাবলিক তখনি জানতে পারবে।"

কাহিনীটি "এ স্টাডি ইন স্কারলেট" নামে যথাসময়ে প্রকাশ করেছিলেন ডক্টর জন এচ ওয়াটসন। অনেক দিক দিয়ে এ উপন্যাসের গুরুত্ব আছে। শার্লক হোমসের এই হল সর্বপ্রথম কাহিনী যা জনসাধারণের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্চর্য মানুষ শার্লক হোমসের বিস্ময়কর চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্যই ওয়াটসন ফুটিয়ে তুলেছেন এই কাহিনীতে; জানা গেছে মানুষটি সম্বন্ধে এমন অনেক অদ্ভুত তথ্য, যা শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

ডক্টর ওয়াটসন নিজেই লিখেছেন ঃ

ভদ্রলোকের বিপুল অজ্ঞতা ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের মত বিস্ময়কর। সমসাময়িক সাহিত্য, দর্শন আর রাজনীতি সম্বন্ধে উনি কোনো খবরই রাখেন না এবং কিছুই জানেন না। টমাস কারলাইলের নাম বলতে অকপটে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে এবং তার কীর্তিকলাপই বা কী। আমার বিস্ময় চরমে উঠল সেইদিনই যেদিন জানলাম শার্লক হোমস্ কোপারনিকান থিওরী আর সৌরজগতের গ্রহাদি সম্বন্ধে বিলকুল অজ্ঞ। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে, এ তথ্য উনবিংশ শতাব্দীর কোন সভ্য মানুষের জানা নেই—এ যে কত বড় অসাধারণ ঘটনা তা বলে বোঝানো যায় না। আমি তো সেদিন দারুণ তাজ্জব হয়ে গেলাম ওঁর বিদ্যের দৌড় দেখে।

আমার বিস্ময় দেখে মুচকি হেসে হোমস্ বললেন—"খুব অবাক হয়ে গেছেন দেখছি। কিন্তু এই যে বিষয়টা আমি জানলাম, এবার তাও ভুলে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে আমাকে।"

"ভুলে যাবেন কি মশায়!"

"কেন যাবো না? আমার মতে, প্রথম অবস্থায় মানুষের মগজ হল একটা শূন্য খুপরিঘর। পছন্দমত আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে হয় এই ঘর। একমাত্র আহাম্মকই যা পায়, তাই এনে জড়ো করে মগজের মধ্যে। ফলে, এত তথ্য গজগজ করতে থাকে যে দরকারের সময়ে সেই গাদাগাদির মধ্যে থেকে আসল খবরটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ওস্তাদ কারিগরের কথা আলাদা। খুব হুঁশিয়ার হয়ে প্রতিটি জিনিস এনে জড়ো করে সে ব্রেনের খুপরিতে। কাজের যন্ত্রপাতি ছাড়া সেখানে আর কিছুই রাখা হয় না; সংখ্যায় অনেক বেশি এবং হরেকরকমের হলেও থরে থরে সাজানো থাকে প্রতিটি জিনিস। ব্রেনের ছোট্ট এই ঘরের দেওয়াল বেলুনের মত ফুলিয়ে বড় করা যায়—এ ধারণা ভুল। ইচ্ছেমত এ ঘরের দেওয়াল সীমাহীনভাবে বাড়ানো যায় না। সেইজন্যেই, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই, যখনি বাড়তি তথ্যের ভিড় বাড়তে থাকে, ততই আগেকার জানা তথ্য ভুলে না গিয়ে উপায় থাকে না। সেইজন্যে, অদরকারী জ্ঞান দিয়ে দরকারী জ্ঞানকে গুঁড়িয়ে হটিয়ে দেওয়ার কোন মানেই হয় না।"

"তাই বলে সৌরজগত কি, তা ভুলে যেতে হবে!"

"মনে রেখে আমার লাভটা কী?" অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেছেন শার্লক হোমস্। "আমরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছি—আপনি বললেন, আমিও শুনলাম। কিন্তু আমরা যদি চাঁদের চারদিকেও ঘুরি, তাতেই বা আমার কি এসে যায়? আমার বা আমার কাজের কাছে এই তফাতের যা মূল্য, তা একটা পেনিরও সমান নয়!"

(প্রশ্ন)

১। বাংলাদেশ থেকে হিন্দী দৈনিক মাসিক ও ত্রৈমাসিকের সংখ্যা কত? কোথা থেকে কার সম্পাদনায় এগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে?

২। স্যর রবার্ট চেম্বার্স, জেমস প্রিন্সেপ, মাদাম গ্রান্ড, রেভারেন্ড লং, স্যর জন পিটার গ্রান্ট—এদের পরিচয় কি?

৩। কলকাতায় সব থেকে বড় হাসপাতাল কোনটি? এর বেড সংখ্যা, ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীর সংখ্যাই বা কত?

৪। আফ্রিকার এখনও পরাধীন দেশগুলির নাম কি? ১৯৬৬ সালে কোন কোন আফ্রিকান রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে

সুতপা চৌধুরী
৪।এ, রাজা লেন, কলিকাতা-৯।

●

(উত্তর)

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ভারতবর্ষের প্রধান স্বর্ণ খনি মহীশূরের কোলার নামক স্থানে আছে। একই সংখ্যায় অরুণারাণী ও লালমোহন ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে জানাই বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান চাঁদু বোরদে। তাঁর ১৭৭ নট্ আউট পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রাণ।

সুশান্ত, দুরাতীন সুজিত বসু
ভাগলপুর

●

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত লালমোহন ঘোষ ও অরুণারাণীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড ভূপিন্দর সিং রাওয়াত ও অসীম মৌলিক।

উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত।
ঝরিয়া ।। ধানবাদ

●

ষষ্ঠ বর্ষ ৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ক্রিকেট জগতে ইডেন গার্ডেনের স্থান তৃতীয়। —শেখর গঙ্গোপাধ্যায়,
নন্দ মিত্র লেন, কলকাতা—৪০।

●

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত কতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—

(৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে প্রথম টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করা হয়। (৫) বাংলা দেশে মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকার নাম হচ্ছে "ভারতী"। বর্তমানে সাপ্তাহিক বসুমতী সম্পাদনা করছেন জয়শ্রী সেন। (৬) সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার ও ১৯৫৬ সালে আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন। "আরোগ্য নিকেতন" নামক রচনার জন্য ঐ পুরস্কারগুলি তিনি পেয়েছিলেন। (৮) ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হচ্ছেন :— চাঁদু বোরদে, মনসুর আলী খাঁ, হনুমন্ত সিং, জয়সীমা, দিলীপ সরদেশাই প্রভৃতি

●

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অমৃতে 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তরে জানাচ্ছি যে,—(১) মাউন্ট এভারেস্ট পরিমাপ সর্বপ্রথম করেছিলেন সার্ভেয়র রাধানাথ সিকদার। তার নামে উক্ত পর্বতের চূড়ার নামকরণ হয়নি তার কারণ বৃটিশ শাসকবর্গ বাঙ্গালীদের প্রতিভার মূল্য দিতে তখন ইচ্ছুক ছিলেন না। (২) ভারতে প্রথম চীনের চা ব্যবহৃত হয় ১৮৩৪ খৃঃ। পরে ১৮৫২ খৃঃ ভারতের আসাম অঞ্চলে চায়ের চাষ সুরু হয়। (৩) ভারতের আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা হচ্ছেন মুকেশ, হেমন্ত মুখার্জি লতা মঙ্গেশকর, সুমন কল্যাণপুর, বাণী ঘোষাল, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, মহম্মদ রফী। শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক হচ্ছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, মালবিকা কানন, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান, এম এস শুভলক্ষ্মী প্রভৃতি। (৪) ইথার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে সমর্থ হোন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। (৫) কাশীদাসী মহাভারতের অনুবাদ ইংরাজীতে করেন মিঃ জোসেফ বার্নহার্ড জোসেফ (সর্বপ্রথম কিনা তা জানা যায়নি)। অন্য কতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি সাবসোনিক জিরো ফাইটার আবিষ্কার করতে সক্ষম হোন নিপ্পন এয়ার ফোর্স। ইউ-এস-এ-এফ-এ ব্যবহৃত থান্ডার চীফ (আকাশের বাজ)। ১০ ইঞ্জিন যুক্ত স্ট্রেটোজিক বম্বার-এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪৭৪ মাইল, যা ৭-৩০ মিনিটে উত্তর ভিয়েৎনাম এপার-ওপার অতিক্রম করতে পারে।

রাহুল বর্মন,
৬, রামনগর রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

●

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যার অমৃতে "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীবিমলকান্তি সেন লিখেছেন যে, লেনিনগ্রাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরী নয়, মস্কোস্থিত লেনিন্ স্টেট লাইব্রেরীই বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরী। এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস, ক্যাপিটল হিল ওয়াশিংটন ডি, সি (স্থাপিত ২৪শে এপ্রিল ১৮০০), এই গ্রন্থাগারে ৩০শে জুন ১৯৬[illegible] সালে সর্বমোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪৩,৫২৬,৬০০-এরও বেশী। অবশ্য এই সংখ্যা সব ধরনের প্রকাশনের সমষ্টি পক্ষান্তরে শ্রীসেন উল্লিখিত মস্কোস্থিত লেনিন্ স্টেট্ লাইব্রেরীতে বইএর সংখ্যা ২২,০০০,০০০-এর কিছু বেশী।

ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীআশীষকুমার মিত্রের প্রশ্নের জবাবে জানাই যে

(১) পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

(ক) ডবলিউ রনট্জেন, জার্মানী—পদার্থবিদ্যা। (খ) জে, ভ্যান্ট্ হফ্, নেদারল্যান্ডস—রসায়ন। (গ) ই, এ, ভন্ বেহ্রিং জার্মানী—শরীর ও চিকিৎসা বিজ্ঞান। (ঘ) প্রুদোম্ স্যালি, ফ্রান্স—সাহিত্য। (ঙ) জিন হেনরী ডুন্যান্ট, সুইজারল্যান্ড—শান্তি (চ) ফ্রেডারিক্ প্যাসি, ফ্রান্স—শান্তি।

(২) পরমাণু আবিষ্কার করেন জন ডলটন, প্রোটন লর্ড আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং নিউট্রন স্যার জেমস্ চ্যাড্উইক্।

(৩) ভূপাল বৈদ্যুতিক যন্ত্রশিল্প এবং আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(৪) চিকাগো সহরে অবস্থিত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টারই বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল এতে ৫,৬০০ শয্যা আছে এবং এর আয়তন ৪৭৮ একর।

অম্বরকৃষ্ণ হালদার
জি, ই, সি, অফ্ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ
পাহাড়পুর ওয়ার্কস
৫৮, তারাতলা রোড
কলিকাতা—২৯

●

৫১ সংখ্যায় বর্ধমান নিবাসী ভবতোষ শীলের (৩)নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কাজ হল তিনি পরিসংখ্যান বিদ্যায় বসু আয়েনস্টাইন থিওরি আবিষ্কার করে বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

দিগম্বর মুখোপাধ্যায়,
পোদড়া,
হাওড়া।

●

৫১ সংখ্যার সংখ্যায় প্রকাশিত কলকাতার সোমনাথ নিয়োগী, (২) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, কংগ্রেস কথাটির আভিধানিক অর্থ মহাসভা। এবং উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম অধিবেশন বসে।

—সাধনরঞ্জন ধর,
অম্বরনাথ
বোম্বাই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নাসির মৈনুদ্দিন ডাগরের সাংগীতিক অবদান প্রসংগে

৬ষ্ঠ সংখ্যার অমৃতে 'গানের জলসা' পর্যায়ে নাসির মৈনুদ্দিন ডাগরের সাংগীতিক অবদান সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে দু-একটি বিষয়ে কিছু ভুল থাকায় সংশোধিত একটি বক্তব্য প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি :

"ডাগরবাণীর ধ্রুপদের বিশিষ্ট বিকাশের জন্য ডাগর ঘরানা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সম্রাট আকবরের সময় তাঁর সংগীত সভায় মস্নদ আলী খাঁ ও সুরঞ্জন খাঁ ডাগরবাণীর ধ্রুপদ গাইতেন। এ'দের বংশ ব্রাহ্মণকুল-সমুদ্ভূত। জাহাঙ্গীরের সময়ে এই বংশেরই জ্ঞাতি হরিদাস ডাগর হরিদ্বার তীর্থে থাকতেন ও ডাগরবাণীর গান গাইতেন। হরিদাস সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাই কালিদাস গৃহী ছিলেন। তাঁর বংশধররা জয়পুর রাজ্যের পুরোহিত পদ লাভ করেন। এ'রা সংস্কৃত শ্লোক ও হিন্দী পদ অবলম্বনে ডাগরবাণীর ধ্রুপদ গাইতেন। সত্যদেব ছিলেন এই বংশের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কলাকার। সামাজিক কারণে ইনি ইমাম বক্স নাম গ্রহণ করেন। বৈরাম খাঁ এ'রই স্বনামধন্য পুত্র,—সংগীতবিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী ছিলেন সেইরূপ বহু সংস্কৃত ও হিন্দী ধ্রুপদ রচনা করেছেন। তাঁর দুই পৌত্র জাকরুদ্দিন খাঁ ও আলাবান্দে খাঁকে সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। পরিণত বয়সে এই ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের শীর্ষস্থান লাভ করেন; জয়পুরের সেনী ঘরানার বহু ধ্রুপদও এ'রা গাইতেন। উত্তরকালে অধিকাংশ সেনীরা ধ্রুপদের ঐতিহ্য রক্ষা করলেও দরবারে অধিকাংশের যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করতেন। এইজন্যও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের ধারা বজায় রাখবার কৃতিত্ব ডাগরভ্রাতৃদ্বয়ের যথেষ্ট। আলাবন্দের পুত্র নাসিরুদ্দিন খাঁ নিখিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলনে ধ্রুপদের মাধুর্য প্রকাশে শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়কীও ম্লান করে দিয়েছেন। পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর দুই পুত্র নাসির মৈনুদ্দিন ও নাসির আমিনুদ্দিন বর্তমানে আলাপ ও ধ্রুপদ গানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মৈনুদ্দিনের অকাল বিয়োগে সংগীতজগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে। তা সত্ত্বেও তাঁর ভ্রাতা নাসির আমিনুদ্দিন তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে স্থিরচিত্ত রয়েছেন এবং 'বড়লা আকাদেমির মাধ্যমে ধ্রুপদ প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারাও তাঁরই আদর্শ অনুসরণে দিল্লী ও বোম্বাই কেন্দ্রে নিয়ত নিরত আছেন। সম্প্রতি তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা মহিনুদ্দিন বোম্বাই থেকে বাজিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। এখনকার লঘু সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ সংগীতের পক্ষ থেকে আমরা স্বর্গীয় মৈনুদ্দিন ও তাঁর ভ্রাতাদের নিকট চিরঋণী।"

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী,
কলকাতা—১৯।

অনুবাদে ভ্রান্তি

শুক্রবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅদ্রীশ বর্ধনের "শার্লক হোমস্ (৬)" রচনায় কয়েকটি ভুল দেখলাম। লেখকের মতে হোমস্ জাবেজ উইলিয়মের পোশাকে একটি বিশেষ চিহ্নযুক্ত অলংকার দেখে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে জাবেজ উইলিয়ম এক সময়ে রাজমিস্ত্রি ছিলেন। বস্তুতঃ হোমস্ বুঝেছিলেন যে লোকটি একজন free mason, রাজমিস্ত্রি বা mason নন। Free mason রা মোটেই রাজমিস্ত্রি নয়—তারা একটি মেটামুটি অভিজাত শ্রেণীর ক্লাবের সভ্য। এই ক্লাব বা lodge -এর বৈশিষ্ট্য এই যে এদের কার্যবিধি একটি গুপ্ত সমিতির মত। কোলকাতাতেও এই ক্লাবের অনেক শাখা আছে এবং সভ্যরা সকলেই ধনী ব্যক্তি। লেখক হোমস্‌কে দিয়ে বলিয়েছেন, জন ক্লের বাবা ছিলেন একজন ডিউক, অতএব জন ক্লে রাজার 'নাতি'। নাতি পদবী সম্ভবতঃ "জ্ঞাতি"র পরিবর্তে ভুল ছাপা হয়েছে। যাইহোক, এই থেকে এই ভুল ধারণা হতে পারে যে ডিউক মাত্রেই রাজার জ্ঞাতি। ইংলণ্ডে রাজার জ্যেষ্ঠতর পুত্ররা সবাই ডিউক উপাধি পেয়ে থাকেন। তাদের royal duke বলা হয়। রাজার সঙ্গে রক্তসম্পর্কহীন ব্যক্তিরাও বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ডিউক উপাধি পান। যেমন ডিউক অব ওয়েলিংটন। মূল গ্রন্থে আছে যে জন ক্লের পিতামহ একজন রয়াল ডিউক ছিলেন সুতরাং তাঁর শরীরে রাজরক্ত ছিল।

সামান্য অনবধানতার জন্য আজকাল অনেক রচনাতেই বিশেষতঃ অনুবাদ কার্যে ছোটখাটো ভুল এসে পড়ে। অল্প কিছুদিন আগে অমৃতে পত্রিকায় "সেন্ট হেলেনার নাম্বারিক" নামে এক প্রবন্ধে উক্ত দ্বীপের শাসনকর্তার নাম স্যার ডেসন লো বলে বহুবার উল্লিখিত হয়েছিল। শাসনকর্তার নাম ছিল হাডসন লো। ওই প্রবন্ধেই লেখক (বা অনুবাদকারী) বলেছিলেন যে নেপোলিয়নকে তাঁর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে দেয়া হোত না। নেপোলিয়নের কোনও কন্যাসন্তান ছিল না। সম্ভবতঃ অসতর্কভাবে family কথাটির বাংলা অনুবাদ "ছেলেমেয়ে" করাতে এই ভুলের সৃষ্টি হয়েছিল।

সুদীপ গুপ্ত,
কালনা রোড, বর্ধমান।

বেশি বই, কম সময়

অমৃত পত্রিকার পঞ্চাশ সংখ্যায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'অনেক বই, কম সময়' স্বল্প পরিসরে আমাদের মনের সঠিক [illegible] ... আজকাল সকলের ভাবনা যে এইটুকু জীবনে এত বই পড়ব কি করে। জীবনটা যদিও খুব সংকীর্ণ নয়—পরিধি বেশ অনেকের পক্ষে বিস্তৃত কিন্তু বইয়ের সংখ্যা কোন সময়েই স্থির সংখ্যায় নির্দিষ্ট হয়ে থাকছে না। সব সময়ই এই সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং আয়ুর পরিধি যতই বাড়ুক না কেন সমস্ত পড়ে ওঠা এক জন্মে সম্ভব নয়। পড়া অবশ্য এক্ষেত্রে শুধু চোখ বুলানো নয়—হৃদয়ঙ্গম করাও। এক্ষেত্রে তাই আমাদের বেশ সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে হবে। নীর-বিহীন দুধ গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বইগুলি সম্পর্কেই আমাদের কৌতূহল সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাইরে গেলেই সমস্ত জিনিসটা আমাদের সাধ্যাতীত হয়ে পড়বে এবং আমরা গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরব। বইয়ের বহর দেখে তাই চমকে না উঠে ধীর-স্থিরভাবে এগুলেই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

অমিয় মিত্র
কলকাতা-২৬

"নেহরু : জীবন সায়াহ্নে"

আপনাদের "অমৃত"তে প্রকাশিত (৭ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ও ৭ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা—"সাহিত্য ও সংস্কৃতি", শ্রীঅভয়ংকরের "নেহরু : জীবন সায়াহ্নে" প্রবন্ধটিতে শ্রীঅভয়ংকর সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের পরলোকগত মহান নেতা নেহরুর শেষ জীবনের কয়েকটি অধ্যায়কে। সম্প্রতি কিছু কিছু পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে শ্রীনেহরুকে তাঁর শেষ জীবনে যে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিলো, তাকে কেন্দ্র করে। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় শ্রীনেহরু ছিলেন "Policy of Non-alignment and peaceful co-existence" এর জনক। নেহরু তাঁর জীবন সায়াহ্নে চীনের কাছ থেকে তাঁর কল্পনার বাইরে যে অমানুষিক আঘাত পেয়েছিলেন তা আমাদের ধারণাতীত। নেহরু সত্যসত্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে চীনের সঙ্গে কোনদিন গুরুতর সংঘর্ষ ঘটতে পারে না। তিনি চীন ও পাকিস্থানের সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেই নীতির অবসান ও পরিসমাপ্তি তাঁর শেষ জীবনেই ঘটেছিলো। এই আঘাত নেহরু সহ্য করতে পারেন নি। শ্রীঅভয়ংকর সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন কয়েকখানা সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকের উপর নির্ভর করে—নেহরুর জীবনের এই দিকটা। নেহরুর জীবন সায়াহ্নেই ঘটেছিলো "Policy of Non-alignment and "Peaceful Co-existence" এর নীতির অপমৃত্যু।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলকাতা—৩১।

অমৃত

সব চেয়ে বড় চিন্তা খাদ্যের

পশ্চিম বাংলায় এখন ঘরে ঘরেই হাহাকার দেখা দিয়েছে। এ শুধু আলংকারিক অর্থে নয় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। এই সঙ্কট শুধু খাদ্যের জন্য নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই দুর্মূল্য ও দুর্লভ হওয়ার দরুণ সংকটের তীব্রতা এত বেড়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার নিজেরাই স্বীকার করছেন যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্য তাঁরা পূরণ করতে পারেননি তাঁদের সংগ্রহনীতির দুর্বলতার জন্য। তাঁরা লেভী তুলে দিয়েছেন, আন্তঃজেলা কর্ডনিং রদ করেছেন এবং ধান-চালের বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য যাঁদের ছিল তাঁরা স্বেচ্ছায়, যতটা আশা করা গিয়েছিল, তা সরকারের হাতে তুলে দেননি। কর্ডনিং না থাকায় উদ্বৃত্ত জেলার চাল ঘাটতি এলাকায় বেশি দামে বিকোবার জন্য চলে গেছে। ফলে ঘাটতি ও বাড়তি এলাকার খাদ্যদশা প্রায় একই রকম। এর সঙ্গে সঙ্গে ডাল, তেল, তরিতরকারীর দামও তালে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে। মোট কথা, বাজার আগুন। সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই কোনো কিছুতে হাত দেয়। এক অস্বাভাবিক সংকটের মধ্যে পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের বাস করতে হচ্ছে।

শহরে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় সাপ্তাহিক চালের বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। খোলাবাজারে চাল গ্রামাঞ্চলেই কিলো প্রতি তিন টাকার ওপরে, কোথাও কম, কোথায় বেশি। রেশন এলাকার মানুষ গম খেয়ে কোনোমতে চালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গম নেই, চাল নাগালের বাইরে। ডাল, চিনি, তেলের তো কথাই নেই। এই অবস্থায় চারিদিকে জনসাধারণের মনে তীব্র ক্ষোভ ও নৈরাশ্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তার পরিণতিতে শহরের বাইরে নানা জায়গায় ধান-চাল লুঠপাট ও খাদ্যের সন্ধানে হামলা হচ্ছে। সরকার বলছেন, কেন্দ্র থেকে আশানুরূপ খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এটা ঠিক কথা যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে বরাদ্দ চাল বা গম একসঙ্গে না পাওয়ার দরুন সঙ্কট বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে, খাদ্য পাঠাতে দেরী হচ্ছে বটে, কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের কথা ছিল তার সামান্য অংশ মাত্র সংগৃহীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এখনও আশাবাদী। তিনি বলেছেন যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহ লক্ষ্যের অর্ধেক সংগৃহীত হয়েছে, আমরা সংগ্রহ করে যাচ্ছি।

আশা করতে দোষ নেই। কিন্তু এ বৎসরে খাদ্যশস্য যতটা দুর্মূল্য হয়েছে এর আগে তা হয়নি। গত বৎসর এর চেয়ে অনেক কম খাদ্যসংকট হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। (বিগত সরকারের পতনের অন্যতম কারণও তাই)। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাগ্যবান যে, জনসাধারণ এখনও ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে আছেন যে সরকার এই সঙ্কটের একটা সুরাহা করবেন। কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আউস ধান ওঠা পর্যন্ত ক্ষুধার্ত মানুষ অপেক্ষা করে থাকতে পারবে না। এর মধ্যেই সরকারকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীজ্যোতি বসু সম্প্রতি বলেছেন যে, সরকার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর অত্যধিক নির্ভরতার যে-নীতি এতদিন অনুসরণ করা হয়েছে তা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন যে, খাদ্যের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের হাতেই নিতে হবে এবং মরসুমের গোড়াতেই সমস্ত বিক্রয়যোগ্য শস্য সরকারী ভাণ্ডারে তুলে নিতে হবে। সরকারের এই মনোভাবের সঙ্গে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু এই মন্দার সময়টা তাঁরা কি করে পার হবেন সেটাই এখন বিচার্য। মজুত গোপন চাল বের করে আনার জন্য সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু চাল কি সহজে ধরা যাবে? বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত চাল আর কী পরিমাণ আছে তাও যাচাই করে দেখা দরকার। কর্ডনিং না থাকায় এবং আন্তঃরাজ্য কর্ডন প্রথার শিথিলতার জন্য বহু চাল রাজ্যের বাইরে চলে গেছে বলে আশঙ্কা হয়। এখন নিবর্তনমূলক আটক আইন দিয়েও প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বের করা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মোট কথা, সরকারের খাদ্যনীতির দুর্বলতার জন্যই মুনাফাশিকারীরা চাল নিয়ে এই মারাত্মক ব্যবসা করতে পেরেছে। সরকারের এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। তা না করার ফলেই চারিদিকে এমন হাহাকার। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এসম্পর্কে পরস্পরকে দোষারোপ করছেন। কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। রাজ্যের অভ্যন্তরে মজুত চাল যা অবশিষ্ট আছে তা বের করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হোক এবং উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে অর্থমূল্য দিয়ে সরাসরি খাদ্যশস্য কিনে আনার সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হোক। এছাড়া এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২)

আকাদেমী অ্যাওয়ার্ড বিতরণী সভায় মণি-বউদির সঙ্গে চোখে চোখ মিলিয়ে দেখা হল, তিনি আমার দিকে বার দুয়েক চোখ মিলিয়ে তাকালেন; কিন্তু কোন সাড়া যেন পেলাম না। আমি বারবার তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম, অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে থেকেছিলাম; মুগ্ধ হয়েও দেখেছিলাম—তাকে ভাল করে বিশ্লেষণ করেও দেখেছিলাম।

মণি-বউদির শুভ্র বেশবাসের মধ্যে বর্ণাঢ্যতার অভাব ছিল কিন্তু দীপ্তির অভাব ছিল না; বৈধব্যের সকরুণ ইঙ্গিত ছিল কিন্তু তা তাঁর রূপকে ম্লান করেনি অথবা তাঁর ভিতরের জনটিকে খুব অপ্রসন্ন করেছে বলে মনে হয়নি। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি খানিকটা বিষণ্ণতার সন্ধান করেছিলাম; চোখের দৃষ্টি ঠোঁটের কোণ এমনকি সমস্ত কিছু নিয়ে এই শুভ্রবসনা সুন্দরীটির অবয়ব ও কান্তিতে কোন কিছুর একটি অস্পষ্ট ছায়াও আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে হ্যাঁ, এ কথাটা স্বীকার করব যে তাঁর সেই ঈষৎ উঁচু দাঁত দুটির শুভ্রচ্ছটা দিয়ে সেই সুহাসিনী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন আর চলত না; সেই 'দেখন-হাসি' রূপটি তাঁর গাম্ভীর্যের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এমন কি আমার সঙ্গে দু-দুবার তাঁর চোখোচোখি হওয়ার সময়েও সে দেখনহাসি সুপ্রসন্না মণি-বউদি চকিতের জন্যও উঁকি মারেন নি।

এর ফলটা আমার কাছে কিছু রূঢ় হয়ে উঠেছিল। তিক্তও বলা যায়। মানুষের মন তো। মনের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের কাছে শোনা যত কনফিডান্সিয়াল মার্কা কালো মলাটের ফাইল বন্দী—চুপিসাড়ের কাহিনীর কাগজ দমকা হাওয়া ফরফর করে উড়ে গিয়েছিল আমার চোখের সামনে।

লছমন প্রসাদ কমলকুমার অজ্ঞাত নাম ক্যাপ্টেন বা মেজর বা কর্নেল বা মিস্টার কোন জনের নামও মনে পড়েছিল।

তা পড়ুক। তাতেও মণি-বউদির প্রতি ঘৃণা হয় নি বা তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ এক বিন্দু কমে নি। আমি প্রশ্নকুঞ্চিত ললাট নিয়েও অবাক হয়ে দেখেছিলাম তাঁর রূপ। মণি-বউদিকে যত দেখলাম তত মনে হল মণি-বউদির রূপ যেন এই পরিণত পূর্ণ যৌবনে রূপ রসে আশ্বিনের কানায় কানায় ভরা দীঘির মত আশ্চর্য মনোহারিণী এবং শীতলাভাসে টলোমলো হয়ে উঠছেন। না, এও যেন হ'ল না। একেবারে পরিপূর্ণ খুলে যাওয়া লাল পদ্ম দেখেছেন? এমন ফুটেছে যে পাঁপড়িগুলোর একটু একটু খ'সে পড়ি-পড়ি ভাব, গন্ধ বেশ কিছু গাঢ় যেন একটু বাসী মনে হয়। ভিতরের মর্মকোষ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত; সব নিয়ে মনে হয় যৌবন যেন ক্লান্ত, রূপ যেন তন্দ্রালু হয়ে পড়েছে মণি-বউদির সর্বাঙ্গে।

সব থেকে বেশী মনোহারিণী করেছিল তাঁকে তাঁর চুলের রুক্ষ শোভা এবং খাটো বিন্যাস। বলতে ভুলেছি চুলের খাটো বিন্যাস ও'র তখন থেকেই। গ্র্যান্ড হোটেলের সিঁড়িতে যখন ও'কে দেখেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম তাঁর খাটো করে ছাঁটা খাটো চুলের বিন্যাস। কাঁধ পর্যন্ত বেশ থাক বেঁধে দুলছে। কিন্তু তখন যে-কোন কারণেই হোক এমন ভালো লাগে নি। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর জীবনাকাশে তাঁর রূপচ্ছটা একেবারে মধ্যগগনবিহারিণী। বয়স তখন তাঁর বোধ করি পঁয়তাল্লিশ। ওই সভায় মহিলার সংখ্যা কম ছিল না। পাঞ্জাবের রূপের নাম-ডাক আছে এবং রঙের জৌলুষে ও দীর্ঘাঙ্গীত্বের ছন্দে তরুণী বয়সে ওদের আকর্ষণ দুর্দমনীয়। তবুও তাদের মধ্যেও মণি-বউদি অপরাজিতা বিশেষণসমন্বিতা গরবিনীদের অন্যতমা হয়ে বসেছিলেন এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল, উনি কোন একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেও প্রকাশ করুন যে, 'উনি আমাকে চিনেছেন।' তিনি আমাকে চিনে একটু না-হাসায় আমার আকাদেমি পুরস্কার লাভের গৌরবের স্বাদটুকু একটু লবণহীন বলে মনে হচ্ছিল। অন্য সভা বা অনুষ্ঠান হলে হয়তো নিজেই আমি ও'র কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে বসতাম—'কি? চিনতে পারছেন না কি?'

পুরস্কার পাবার আগে যেতাম না। পরে যেতাম এবং পুরস্কারের ফলকটা হাতে করেই গিয়ে সামনে দাঁড়াতাম। যাতে তিনি আমার এই গৌরব ও সম্মান সম্পর্কে ভুল করবার কোন সুযোগ না পান। কিন্তু এ সভা সাধারণ সভা নয়। মণ্ডপের বেদীর উপর বসে আছেন, ভারতবর্ষের বাণীরূপের প্রতীকের মত উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন। পুরস্কারস্বরূপ ওই ফলকটি আমার হাতে দেবার সময় তিনি এমন দু' তিনটি কথা আমাকে বলেছিলেন যা আমার চিত্ত এবং অন্তরকে একটি মহৎ আবেগে পূর্ণ এবং শান্ত করে দিয়েছিল। এই দুটো কারণেই সেদিন বাইরের সকল আকর্ষণের—সে মণি-বউদির আকর্ষণের মোহ এবং চাপল্যকেও ঠোঁটে তর্জনী রেখে ভ্রূভঙ্গির শাসনে শাসিত করে রেখেছিল। নড়াচড়ার উপায়ও ছিল না। এবং ওই শাসন আমাকে অচপল করেই রেখেছিল।

নারীর মোহে—সে মোহের মধ্যে কোন কামনা থাক বা না থাক, পুরুষেরা বিধাতার নির্দেশে দুচার পা বা কদম আদিম নৃত্যচ্ছন্দে ফেলে থাকেন; এবং সারা অঙ্গে দুটো একটা হিল্লোলও বয়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের জীবনে বিধাতার এই নির্দেশের চেয়েও কঠিনতর নির্দেশ আছে, সে নির্দেশ তার সমাজের; সে নির্দেশ দৈববাণীর চেয়েও অমোঘ।

সুতরাং বসেই ছিলাম। বারবার তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে নানান কল্পনা করেছিলাম। সেও ওই কল্পনাতেই শেষ। শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। কারণ অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মণি-বউদি বিশিষ্ট মানুষের জনতার মধ্যে যেন মিশিয়ে গেলেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বেরিয়ে যাবার পরই এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সাজানো সভাটার মানুষেরা উঠে মিলেমিশে যেন একটা বিশৃঙ্খল জনারণ্যের সৃষ্টি করে ফেললেন, তার মধ্যে মণি-বউদি-রূপা স্বর্ণলতাটি যে কোন সহকারের স্কন্ধ-লগ্না হয়ে কোন পথে কোন দিকে বেরিয়ে গেলেন তার আর কোন হদিশই পেলাম না আমি। মনে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই এমনভাবে নিজেকে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমার চোখের আড়াল হলেন মণি-বউদি। কিন্তু মণি-বউদির একটা ভুল হয়েছিল: দৃষ্টির বাইরে গেলেই নিজেকে নিখোঁজ করা অধিকাংশের পক্ষে সম্ভবপর হলেও কিছু মানুষ আছে তাদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। কারণ তাঁরা শুধু রূপ দিয়েই তো চিহ্নিত নন, ষষ্ঠেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের ধ্বনি স্পর্শ এবং গন্ধ তিন দিয়েও তাঁরা মানুষের মহলে সুপরিচিত। এসব মানুষের ঠিকানা সকলে জানে। ওই সভার ভাঙা আসরেই তখন মাত্র বিশ-পঁচিশজন মানুষ অবশিষ্ট; তাদের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি খানিকটা বিভ্রান্তের মত; ভাবছি ওই মণি-বউদিরই কথা। এরই মধ্যে কেউ আমাকে বললেন—ও! ওই উনি—! Lady in the white উনি তো মিসেস মুকুরজী! ভারতবর্ষের বৈজয়ন্তীধাম এই দেহলী নগরীতে উনি সুপরিচিতা। ভেরী ভেরী ওয়েলনোন পারসোনালিটি! এই ক' বছর বা ঘুরলেন—বোধ হয় বার পাঁচেক হল—ওয়ার্ল্ড টুর হয়ে গেছে। কোথায় না? ইউ-এস-এ থেকে চায়না পর্যন্ত। মিস্টার মুকুরজীর প্লেনেই ছিলেন উনি। এখন তো ও'র হাতেই সব। যদিও আর বেশী কিছু নেই; যা আছে তা খোসা মাত্র; শাঁস যা ছিল তা' নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ইট ইজ ভেরী ইজি টু ফাইন্ড আউট হার অফিস। কিন্তু এনগেজমেণ্ট না করে যাবেন না। দেখা হবে না।

সেই সঙ্গে শুনলাম স্বাধীন ভারত-বর্ষের যাঁরা নারীশিরোমণি, সর্বজন-শ্রদ্ধাস্পদা—তাঁদের সঙ্গেও মণি-বউদির যোগ-সূত্র নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। শুধু ব্যবসায়-সূত্রেই তিনি বিশ্বভ্রমণ করেন নি।

কালচারাল রিলেশনের তাগিদে এবং প্রয়োজনেও তিনি ঘুরেছেন। সেও ইংল্যান্ড-আমেরিকা থেকে রাশিয়া চায়না পর্যন্ত।

নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি সংকল্প ছাড়ি নি; আমি মুকুরজী এণ্টারপ্রাইজের আপিসের দরজায় বিনা এনগেজমেণ্টেই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কলকাত্তার আপিসের কায়দা তবু দেখাশোনা আছে দিল্লীর ঘোরানো জাঁকজমক বলতে গেলে সেই প্রথম দেখলাম।

রিসেপসনিস্ট মেয়েটি—বাঙালী মেয়ে। খুব চটপটে, কথাবার্তাও খুব ভাল; ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে মনে হয় এ নিশ্চয় সেই মেয়েটি কথা বলছে যে রেডিয়োতে খবর বলতে বলতে বলে—'দিস ইজ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো—গিভিং ইউ দি নিউজ—'। তার উচ্চারণভঙ্গি এবং কন্ঠস্বর শুনতে ভারী ভাল লাগে।

আমার আগে থেকে এনগেজমেণ্ট নেই অথচ আমি দেখা করতে চাই শুনে সে বিচিত্র ধরনে শিউরে উঠে বলে উঠল—ও মাই গডনেস! এনগেজমেণ্ট নেই অথচ মিসেস মুকুরজীর সঙ্গে দেখা করবে।

তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন তাকে আমি আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেবার কথা বলেছি।

ইচ্ছে হল বলি—দেখ মেয়ে বেশী ন্যাকামি ক'র না। খবরটা দিয়ে দেখই না। ১৯৪২ সালে একদিন রাত্রে তোমার বস চাঁদ পেড়ে আমার কপালে টিপ পরিয়ে দিতে চেয়েছিল। মুখেও আমি বলেছিলাম—অনুগ্রহ করে খবরটা বা একটা স্লিপ তুমি পাঠিয়েই দাও না।

তা অবশ্য বলতে হল না। তার আগেই ভেতর থেকে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সেই পুরাতন কমলকুমার।

বেশ একটু দীর্ঘ এবং রূঢ় পদক্ষেপে সে বেরিয়ে এসে চলে যাচ্ছিল যেন কোন উত্তপ্ত বাতাবরণ থেকে উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতেই সে আসছিল; শুধু পদক্ষেপের শব্দ এবং ভঙ্গিই নয়, তার মুখ চোখের থমথমে ভাবও সে কথা বলে দিচ্ছিল। সে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। —আপনি?

আমি বললাম—হ্যাঁ। ও'র সঙ্গে একটু দেখা করব।

—কার সঙ্গে? ওই নটোরিয়াস উয়োম্যানটির সঙ্গে?

কথাটা শুনে ধাক্কা খুব খেলাম না কিন্তু কমলকুমারের মুখে কথাটা ভাল লাগল না। মানালো না।

ঝট করে মুখে আপনি এসে গেল—এখানে চাকরী কর না, মনে হচ্ছে। কি করছ?

—করছি অনেক কিছু। কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে কেন?

—বললাম তো বউদির সঙ্গে দেখা করব। অনেকদিন দেখা হয় নি—।

—বউদি? আশ্চর্য এক তিক্ত হাসি ফুটল কমলের মুখে। বারবুকের বেশ সরস বাংলার ভঙ্গিতে বললে—বউদি? বউদি? হায় হায় হায়! এই মহিলাটি?

সবিস্ময়ে বললাম—কি বলছ?

—কি বলব? ঠিক বলছি। বলছি—উনি কারুর বউদি নন। বেকালে ছিলেন—ছিলেন। এখন নন। এখন আবার—। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—কাকার মৃত্যুসংবাদ জানেন তো?

—না। শুনি নি। তবে সেদিন সভায় ও'কে দেখে মনে হয়েছিল কথাটা।

কমল বললে—সেও এক কেলেঙ্কারীর মৃত্যু। সুইসাইড।

—সুইসাইড?

—হ্যাঁ। তিনি সুইসাইড করেছিলেন—ইনি পঞ্চাশ বছরের ধিঙ্গী বিধবা মাগী—সী ইজ গোয়িং টু ম্যারি এগেন। অমৃত মুখুজ্জের চৌদ্দপুরুষ উদ্বাহু হয়ে নেত্য করছেন। বিধবা বউমা তাদের করবেন বিয়ে, হবে ছেলে, স্বর্গে যাবেন পিন্ডি পেলে।

—কমল!

কমলের পিছনের দরজাটা খুলে গেল এবং সে খোলা দরজায় বেরিয়ে এসে

দাঁড়ালেন মণি-বউদি—না মিসেস মুকুরজী। মুকুরজী এণ্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কমল ঘুরে তাকালে। এবং চুপ করে গেল তার মণি-খুড়ীকে দেখে।

মণি-বউদি আমাকে দেখেও আমার সঙ্গে কথা না বলে কমলকেই বললে—আমার আপিসের মধ্যে তুমি অন্তত শালিতা রক্ষা করে চলবে বলে আশা করি। এবং সেটা খুব নিরাপদও নয় তোমার পক্ষে।

কমল একমুহূর্তে যেন দেখতে অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন হয়ে গেল। সে একটা প্রায় অশ্রাব্য কথা বলে হন হন করে নেমে চলে গেল। মণি-বউদি একটু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আমার মনে হয়েছিল আপনি আসবেন।

• • •

ও'র আপিস ঘরের পাশেই একটি ছোটখাটো বিশ্রাম কক্ষ। একেবারে আধুনিক ছাঁদে সাজানো। যে ধরনের সাজানো ঘর সচরাচর বিলিতী অথবা ইংরিজী সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের পাতায় ফটো ব্লকে দেওয়া বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখতে পাই সেই ধরনের। কলকাতায় এমন সাজানো ঘর নেই এমন কথা বলব না তবে সে সব অঞ্চলে তখনও (অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে) আমার যাতায়াতের 'ভিসা' ঠিক ছিল না। কাঠের কারবারটা সেখানে বেশী। যাক বর্ণনা করতে যাব না তাতে আমাকে বিপন্ন হতে হবে।

মণি-বউদি সেই ঘরে আমাকে বসিয়ে বললেন—বসুন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। আজও তাঁর প্রায় সেই সেদিনের মতই সাজ-সজ্জা বেশভূষা। একটি সাদাসিধে নিরা-ভরণতার আবরণ ঘষা কাচের চোখের মত আশ্চর্য একটি উজ্জ্বলতা এবং দীপ্তিকে যেন অত্যন্ত অনায়াস সহজ ছন্দে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে রেখেছে; অর্থাৎ মনেই হয় না যে, ইচ্ছে করে সযত্নে সুকৌশলে কেয়ারফুল কেয়ারলেসনেসের মত এটাকে কেউ গড়ে তুলেছে। যত্নের চিহ্নটা আদৌ ধরা পড়ে না; বর্ষাকালে জঙ্গলে সাদা কাঞ্চনের অজস্র সাদা ফুলে ভরা লম্বা এবং রোগা গাছটির মত দেখাছিল তাকে।

• • •

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দামী সিগারেট ডি মুরিয়ারের লাল রঙের টিন বের করে সামনে ধরে বললেন—খান।

কর্কটিপড সিগারেট; ভারী ভাল সিগারেট। উনি নিজেই লাইটার জেলে সিগারেটটার সামনে ধরে বললেন—ভারী ভাল সিগারেট। যাদের এ্যাজমা আছে তারা খেলেও টান ধরে না।

একটু পর বললেন—অনেকগুলো টিন কিনে স্টক করে রেখেছিলাম। নিয়ে যাবেন?

আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম এই জন্যে যে, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর এই তাঁর সঙ্গে ব্যাকরণমতে তৃতীয়বার দেখা, নইলে বলতে গেলে এই প্রথম দেখা। গ্র্যান্ড হোটেলের সিঁড়িতে এবং সেদিন আকাদেমি এ্যাওয়ার্ড প্যান্ডেলে দুবার চোখোচোখি হওয়াটাকে ঠিক দেখা হওয়ার সামিল না ধরলেও কিছু যায়-আসে না। এই সত্য বা তথ্যটি মানুষের জীবনে অনেক কিছুর কারণ হতে পারে। অনেক প্রশ্ন অন্ততঃ আমার মনে জমা হয়েও ছিল এবং ভিড় করে বের হবার জন্য ঠেলা-ঠেলিও করছিল। কিন্তু মণি-বউদি আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে এমন সহজ ছন্দে একটি লোহার ফটক টেনে বন্ধ করে দিলেন, যে প্রশ্নোত্তরের পালায় মুহূর্তে ছেদ পড়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তাঁর সেই সহজ ছন্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বময়ী বিলাসিনী রূপটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনের প্রশ্নগুলো বোবা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

মণি-বউদি, পুরনো কথা এবং পুরনো কালের সব অভিযোগ অনায়াসে এড়িয়ে গিয়ে ডি-মুশরিয়ার সিগারেট প্রসঙ্গ তুলে কথা বলে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্য থেকে হঠাৎ এক সময় বলে বসলেন—উনি শেষটায় এত বেশী ড্রিংক আর স্মোক করতে ধরেছিলেন যে, হাঁপানীর টান হ'ত। ডাক্তারেরা ওগুলো ছাড়তে বলেছিলেন, তা হেসে আপনার দুই পুরুষের সুশোভনের কথা কোট করে জবাব দিয়েছিলেন, ওরে বাবাঃ, তাহলে বাঁচব কি খেয়ে নুটুদা? শেষে ডাক্তারেরা প্রেসক্রাইব করলে মারটেন ব্র্যাণ্ডি আর ডি মুরিয়ার সিগারেট। সে-সময় আমিও খেয়েছি।

চমকে খুব উঠলাম না। কারণ শুভ্রবসনা স্থিরযৌবনা মণি-বউদির হালের রূপের মধ্যে যে দীপ্তি ঝিলিক মারছে, তাতে সিগারেট না খেলেই বেমানান হবে। ভারত-বর্ষে যাঁরা বর্তমানে গরীয়সী মহিলা, তাঁদের এক হাতে পানীয়ের গ্লাস এবং অন্য হাতে লম্বা পাইপে সিগারেট নইলে রূপে সম্পূর্ণই হন না।

হঠাৎ কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন মণি-বউদি।

—ও'র মৃত্যুর খবর জানতেন না, না?

বিষণ্ণ হেসে বললেন—কেলেঙ্কারির দায়ে খবরটা চেপে যেতে হয়েছিল। সুইসাইড করলেন; একটা ইংরেজ মেয়েকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারী করলেন, যে শেষ পর্যন্ত সুই-সাইড করলেন। সেও বিদেশে। সেটাও একটা সুবিধে হয়েছিল, এখানে ব্যাপারটা পাব্লিসিটি পায় নি।

একটু আগেই কমল বলে গিয়েছিল, সেও এক কেলেঙ্কারীর মৃত্যু সুইসাইড। সুতরাং বিস্ময়ের ধাক্কা আসে নি তাতে। কিন্তু ইংরেজ মেয়েকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারী কথাটুকু বিস্ময় নিয়ে এল অনিবার্যরূপে।

মনের মধ্যে মাছি আছে। সে মাছি ফুলের মধুও পান করে, আবার সেই মাছিই নর্দমায় বসে পরমানন্দে পঙ্করসে ডুবে থাকে। মনের সেই মাছিটা পাখা মেলে উড়তে শুরু করলে—ওই ইংরেজ মেয়েকে নিয়ে অমৃত-বাবুর কেলেঙ্কারীর পঙ্ক রসকুণ্ডের সন্ধানে।

—আমি বারণ করেছিলাম ও'কে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মণি-বউদি। একটা সত্যকারের বিষণ্ণতা যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘরের বায়ুমণ্ডলে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে অনুভব করলাম তার স্বাদ।

—খুব সুখের জীবন ছিল আমার। একটু থেমে আবার বললেন—জীবনে ছেলে-বেলা থেকে কখনও হারি নি আমি। কক্ষনো না। সে বিহারশরীফ থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত কোথাও না।

—হেরে গেলাম, দিল্লীতে এসে।

আবার একটু চুপ করে যেন ভেবেচিন্তে নিয়ে বললেন—প্রথমটা বুঝতেই পারি নি যে হারছি। মনে হয়েছিল জিতছি। সে-জেতা এমন-তেমন নয়। যেন দিন-দুনিয়া জিতে নেওয়া। কিন্তু আসলে যে পায়ের তলায় মাটি সরে-সরে ডুবে যেতে বসেছি, তা বুঝতে পারি নি।

—হঠাৎ একজন কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মানে অ্যাকসিডেন্টাল নয়; যে রকমটা উপন্যাস গল্পে দেখা যায়। যা থেকে রোমান্স হয়। তা নয়। সহজ পথে আলাপ হল। ব্যবসার পথে। কর্ণেল সায়েবটির হাতে ছিল সরকারী দিকটার কর্তৃত্ব। টেণ্ডার স্যাংশন করবার একটা কমিটি আছে, কিন্তু সেই সব। তারপর মাল দেখে নেওয়া-সেও তাঁর হাত। বিল পাশ করে অন্য লোক কিন্তু সেখানেও এর হাত।

একটু হেসে বললেন — এতগুলো ব্যাপার যার হাতে এবং মাথায় সে মানুষটার দশটা মাথা কুড়িটা হাত বাইরে থেকে দেখা না-গেলেও-ভেতরে-ভেতরে থাকেই। যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে দেখতে পায়ই।

সে অন্তর্দৃষ্টি উনি ব্যবসা করতে শুরু করে অর্জন করেছিলেন। এককালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন; দেশ-প্রেমিক কুমার ব্রতধারী মানুষটির কপালে এক-সঙ্গে জমে উঠল ব্যবসা, আর প্রেম। যে-ডাঙ্গাটা নিয়েছিলেন তুলোর চাষের জন্য-সেখানে কপাল-গুণে বেরিয়ে গেল ফায়ার ক্লে; আর এক ডাক্তার ভদ্রলোকের মৃত্যুশয্যায় দায়ে পড়ে নিজের কন্যার বয়সী তার যে কিশোরী মেয়েটিকে একান্তভাবে স্নেহবশে নিয়ে এলেন, সে যুবতী হয়ে তাঁর গলায় মালা দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলে, এও তার কপাল গুণ ছাড়া আর কি বলুন। বোধ করি সেই কপালচক্রেই উনি পাকা ব্যবসাদার হয়ে উঠে এ অন্তর্দৃষ্টিটুকু অর্জন করেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন—মণি, এ লোকটা একটা জাত হাঙ্গর, ব্যাটার দাঁত যত ধারাল, পেট তেমনি অভর। গাঁথতে পারলে অনায়াসে ওর তেল নিঙড়ে বের করে নেওয়া যায়।

সেই তেল নিঙড়ে নিতে গেলেন। এক-জন সুন্দরী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে স্টেনোর চাকরী দিয়ে এনে তার সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি করে বললেন — সায়েবকে পাকড়াতে হবে।

টোপের আগে চারের ব্যবস্থা।

সে ব্যবস্থা খানা-পিনা-ডিনারে ড্রিংক।

বলতে পারব না, কি করে এসব তিনি পারলেন, কি করে তাঁর মন এতে সায় দিলে? একদিন তো উনি সত্যিকারের নীতিবাদী খাঁটি মানুষ ছিলেন।

হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ, প্রায় মিনিট খানেক, চুপ করে বোধ হয় ভেবে নিলেন এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—এক-এক সময় আমার নিজেকেই দায়ী বলে মনে হয়। আমার রূপ-যৌবনের লোভেই তিনি পা পিছলালেন। স্বামীর প্রেম তার পড়ন্ত যৌবনের সঙ্গে-সঙ্গেই বাসী হয়ে গেল। সে আমার জন্যেই। এবং আমি তাকে টেনেছিলাম।

আবার হেসে বললেন—অবশ্য বাস্তব দুনিয়ার শক্ত মাটিতে হুঁচোট খেয়ে-খেয়ে সেন্টিমেন্ট আর প্রায় অবশিষ্ট নেই বললেই হয়, তবুও মধ্যে-মধ্যে এই ধরনের ইমোশন বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চায় এবং ওঠেও সময়-সময়। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ইমোশনের মধ্যে সত্যি কিছু নেই। ওতে পেট ভরে না। ওর ফুড ভ্যালু নেই। তৃষ্ণার জলও নয়। কিন্তু ওতে একটা নেশা আছে। মদের নেশার চেয়েও গাঢ় একটা নেশা হয়। উনি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মধ্যে-মধ্যে কাঁদতেন. মণি, আমি-আমি-আমি সব কিছুর জন্যে রেসপনসিবল। আই অ্যাম রেসপন-সিবল! মণি, তুমি আমার পবিত্র মণি;

সে শুনে না-হেসে পারতাম না।

হাসলে আবার রাগ করতেন। কিন্তু যে-দিন মদ না-খেয়ে নিছক ইমোশন বশে কাঁদতেন সেদিন আমাকেও কাঁদতে হত। দুজনে দুটো ঘরে শুয়ে-শুয়ে কাঁদতাম। এ কি হল? কেন এমন হল? কিন্তু কি করব? এই যে চলতে-থাকা দুনিয়া, এ বড় কঠিন, এক দণ্ড, কি এক মুহূর্ত থামে না। ইট নেভার স্টপস। আমার আপনারও থামবার অবকাশ নেই। সেই চলার টানে আমরা চলি। পুরোপুরি ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাপার ইমো-শনাল নয়: কিন্তু তবু ইমোশন আছে জীবনে। অন্ততঃ একাল পর্যন্ত তো আছে।

• • •

একটু থেমে হয়তো ভেবে নিয়ে কিম্বা দম নিয়ে বললেন—কি আর বলব বলুন। কালের এমন একটা প্রবল স্রোত, যা হাজার-হাজার নায়গ্রা ফলসের চেয়েও প্রবল! কথাটা উনি বলতেন। বলতেন, এই যে কালটা, এই যে ওয়ার, এর যা স্পীড এর যা মোমেন্টাম, এতে গোটা পৃথিবীর ম্যান, মেটিরিয়েল, একেবারে জল আর কয়লার মত বয়লারের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হিটলারের মত শান্তি উড়ে গেল, জীর্ণ খসে পড়া পাতার মত। তো আমি!

বলতেন—না দুঃখ আমার নেই। আই হ্যাভ টেস্টেড এভরিথিং।

দুঃখ করতেন আমার জন্যে।

বলতেন—কিন্তু আপশোষ তোমাকে কেন এর মধ্যে টানলাম মণি?

আমি সান্ত্বনা দেবার মত কথাও খুঁজে পাই নি। কমল টমলের কাছে ডিটেলস শুনতে পাবেন। আরও অনেকের কাছে পাবেন। ওরা সব দেখেছে। চোখ দিয়ে দেখে যা বোঝা যায় যতটুকু বলা যায় তার রেকর্ড আছে তাদের কাছে। কিন্তু তার মানে ওরা ঠিক জানে না। আমিও ঠিক বলতে পারব না। এখনও আমার কাছেও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে আসে নি। উনি সুইসাইড করেছেন। আমি তা করি নি। যত কলঙ্ক, যত অপবাদ মাথায় করে নিয়েছি। মাথায় করে কেন? সাপের মত আমার দেহটা জড়িয়ে রেখেছে। আগেকার আমলের আমি হলে আমিও বোধ হয় সুইসাইড করতাম। কিন্তু এই দশ-বারো বছরে জীবনে অনেক চল নেমে বেয়ে গেল ঠাকুরজামাই। যে মণি-বউদি হাতীপাজা-পেড়ে শাড়ী, পুরনো আমলের ঢঙে চলকো করে পরে কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে গণক দৈবজ্ঞদের কাছে যেতাম, সে মণিমালা একে-বারে পাল্টে গেছে। এ বারো বছরে চার-চার বার ফরেন টুর করে এসেছি। দুবার কণ্টিনেন্ট ঘুরেছি; একবার সারা পৃথিবী। রাশিয়া চায়না তাও গেছি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে? বাইরের চেহারার সঙ্গে তার অনেক গরমিল।

কমল এখুনি খুব শাসিয়ে তর্জনী উদ্যত করে শাসিয়ে গেল। নালিশ করবে। অমৃতবাবুর ধর্মভ্রষ্টা নীতিভ্রষ্টা পত্নী হিসেবে আমার জাত গেছে, কুল গেছে, সব গেছে সুতরাং অমৃতবাবুর যে উত্তরাধিকারে আমি অধিষ্ঠিতা রয়েছি, তা থেকে আমাকে হঠে যেতে হবে। আই মাস্ট কুইট।

অবশ্য তার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করলে আলাদা কথা।

সর্ত মাত্র তিনটি।

আমি তাকে ভজবো—নাম্বার ওয়ান।

নাম্বার টু হল একখানা কাগজে সই করে দিতে হবে। যে কাগজের লেখাগুলি অর্ধ সত্য অথবা বাইরে সত্য, ভিতরের প্রশ্নই নেই—সে কাগজখানা তার হাতে থাকবে আমার মৃত্যুবাণ হিসেবে।

তিন নম্বর হল—যমুনাপ্রসাদকে যেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম এই বারো-চৌদ্দ বছরে আমূল পরিবর্তিত হয়ে-যাওয়া মণি-বউদিকে।

এতটুকু মিল নেই। মধ্যে-মধ্যে জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাচ্ছি-লেন, তার মধ্যে ১৯৪২ সালের সেই রাত্রের জীবন-কাহিনী বলা মণি-বউদিকে মনে পড়ছিল, তিনিও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে এমনিভাবে তাকিয়েছিলেন মধ্যে-মধ্যে। ঠিক এমনি বা তেমনি উদাসীনতার সঙ্গে।

আমি সিগারেট টেনে যাচ্ছিলাম একটার পর একটা।

সেদিনের পালা প্রায় এইখানেই শেষ হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ছিলাম ও'র কাছে, বার দুয়েক কফি খাইয়েছিলেন, তার সঙ্গে বাদাম বিস্কুট ছিল, তার বেশী কিছু না। ফিরে আসবার সময় সিগারেটের টিনটা নিতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি নিই নি।

এক বছর পর মণি-বউদি টেলিগ্রাম করলেন, একবার আসতেই হবে। শেষ অনুরোধ। কলকাতা অফিসকে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রাণের ভূগোলে ॥

গোবিন্দ চক্রবর্তী

মাটির কুটীর চেয়েছিলাম।
চারিদিকে দীর্ঘ গাছ, অন্যমনা নদীর প্রবাহ
এবং নির্জন এক টিয়ারঙ গ্রাম।

আমার খামার
দুর্গ হ'ত অপরূপ সবুজ সোনার,
আবারও শস্যের জন্য প্রান্তরে যেতাম।

হয়ত' গফুর হ'ত নাম।
শুধু সাদা একজোড়া বলিষ্ঠ বলদ—
ভারতবর্ষের কোনো কৃষক হ'তাম।

ঈশ্বরের মুখ
এখানে উৎকীর্ণ আছে, কেউ না চিনুক—
প্রাণের ভূগোলে এই দেশ চিনতাম।

আত্মবিশ্লেষণজনিত ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বাহ্যত সম্পূর্ণ, তবু নিঃস্ব পরাজিত দুর্যোধন
দ্বৈপায়ন তীরে আত্মগোপনে অস্তিত্ব টেনে চলে।
ক্লান্ত প্রাণ, ভগ্ন উরু, বহে যায় বুকের অতলে
স্বপ্নের শীতল স্রোত, কবরে শায়িত প্রেতগণ
বিভ্রান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে, হু-হু করে প্রাচীন গহ্বর।
হে দাম্ভিক কুরুশ্রেষ্ঠ! রথ অশ্ব সারথী সুরথী
সকলেই অপেক্ষমাণ, সম্মুখে জ্বলন্ত পরিণতি—
দাঁড়াও, কাঁপাও, পৃথ্বীপদভরে, ধরো মৃত্যুশর।

বৃথা চেষ্টা করো, উরু ভেঙে গেছে, বন্ধু সহচর
কেহ নাই চারিপাশে, আছে নিঃস্ব শীতল শূন্যতা,
বুকে বা চোখের কোলে অসহায় অস্তিত্ব স্বাক্ষর,
রেখে গেছে, চেয়ে দ্যাখো, দ্বৈপায়ন হ্রদে সম্পূর্ণতা
ভুলে গেছে। মানবের ইতিহাস খণ্ডিত আত্মার
সংঘর্ষে রক্তাক্ত ঘৃণ্য ইতিকথা আমার তোমার।

রক্তের প্রত্যাশা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ট্রেনটা চলে গেল বাঁকের দিকে। তারপর ঘন জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হল। কেবল গাছপালার শীর্ষে ধোঁয়ার একটা ধূসর রেখা অপটু তুলির টানের মত কিছুক্ষণ দেখা গেল। চাকার শব্দও ক্ষীণতম হয়ে এল। তখন সুমিত্রা দেখল, মালপত্রের সামনে সে নিতান্ত একা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট একটা হল্ট স্টেশন। চারপাশে অজস্র গাছ-পালা। কোথাও কোন লোক নেই। সুমিত্রার চোখে জায়গাটা হাস্যকর রকমের ফাঁকা আর ব্যর্থ দেখাচ্ছিল।

একটু পরেই আশুবাবু ফিরে এলেন। এসে বললেন—মনে হচ্ছে, দাদা চিঠি পাননি। লোকজন কাকেও তো দেখলুম না।

সুমিত্রা শুকনো হেসে বলল—এ হবে, আমি জানতুম। তোমাদের রাজত্বের সব খবরই তো আমার জানা। সাত মাইল দূরে পোস্টাপিস, সেও নাকি নদীর ওপারে। আর এই বন-জঙ্গল। পিওন বেচারার প্রাণের ভয় তো আছে!

আশুবাবুকেও হাসতে হল। সুমিত্রার কথা সত্য। স্টেশনটাও এমন অদ্ভুত জায়গায়, কাছাকাছি কোন গ্রামের চিহ্ন নেই। আছে শুধু প্রসারিত কাশকুশশরের দুর্গম প্রান্তর, অজস্র গাছ, খালবিল আর নদী। তবু ঠিক এখানেই স্টেশন হবার কারণ আশুবাবুর বাবা অবনী চৌধুরীর তদ্বির। পিছনে অল্প দূরে নদী। মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে পদ্মার সঙ্গে সে মিশেছে। তাই অথৈ বিশালতা নিয়ে সে বেঁচে আছে। এবং তার ওপারে দেখা যায়, মন্দিরের ধূসর চূড়ায় বিবর্ণ সোনালি ত্রিশূল রোদে ঝকমক করছে। চেনা যাচ্ছে সবুজে ধূসরে মেশা মহুলা গ্রামটিকে। চৌধুরীদের প্রাচীন প্রাসাদ সেখানে ইতিহাসকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনের নাম মহুলা। নদীর নাম মৌলী। ছেলেবেলায় সুমিত্রা অনেকবার

বাবার সঙ্গে এখানে এসেছে। কিন্তু দুদিনেই হাঁফিয়ে পড়েছে। আলো দেখা চোখে এখানের অন্ধকার খুব বেশী বোধ করাই স্বাভাবিক। দশ বছর আগে আশুবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ সুমিত্রার মা মারা যান। এই দশটি বছর আশুবাবু বাংলাদেশের বাইরে-বাইরে বেশী কাটিয়েছেন। সে কারণে সুমিত্রারও আর আসবার সুযোগ হয়নি।

এখন অবশ্য তার তৃতীয় একটা চোখের উদ্ভব হবার কথা। এ বয়সে নিসর্গকে নতুন করে আবিষ্কার করা সম্ভব। সে দূরে মহানগরীতে বসে নদীকে ভাবতে পারে জীবনের বহতা রূপে। ফুল পাখি প্রজাপতি সুন্দর সুন্দর ইচ্ছার প্রতীক। গাছকে সে জানে প্রাণের নৈশব্দ্য। এবং এ ধরনের মানবিক গুণাবলীই সে আরো পাঁচটা শিক্ষিতা মেয়ের মত নিসর্গে আরোপ করতে পটু।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর যে বন্দুকটা সব সময়ের সংগী করে নিয়েছিলেন আশুবাবু। সেটা মহুলা আসবার সময় পিঠে ঝুলেছে স্বভাবত। মহুলায় বাঘ আছে শুয়োর আছে সাপ আছে। তায় এখন চৈত্র মাস। জলায় বুনোহাঁসেরর চলাফেরা আছে। মাথার উপর এখন থেকেই তাদের উড্ডীন ডানায় চঞ্চল ধ্বনিপুঞ্জ ফোটে।

আশুবাবু মুখ তুলে আকাশ দেখে বললেন—স্টেশনের একটি মাত্র খালাসী। দুদিন থেকে নাকি অসুস্থ। মোট নিয়ে বেশ মুস্কিলে পড়া গেল।

সুমিত্রা হেঁট হল। —নাও, আমি আমার সুটকেশ নিচ্ছি। তোমারটা তুমি নাও। আর ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাও।

অগত্যা তাই। মহুলার কোন যাত্রীও নেই আজ। টিনের শেডটা শূন্য পড়ে আছে। পাশ কাটিয়ে দুজনে পথে নামল। চৈত্রের আকাশে কোথাও-কোথাও দুধের সরের মত পাতলা, মেঘ, কোথাও হাল্কা নীল শূন্যতা। হাওয়া দিচ্ছিল। নদীতীরে কাশঝোপ আর ঝাউবন দুলে-দুলে নৃত্য করছিল। হঠাৎ কোথা থেকে নিমফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। ঘাসের ফুলের উপর প্রজাপতি উড়ছিল। একটা খরগোস ছুটে যাচ্ছিল খড়ের জঙ্গলে। সুমিত্রার ক্রমশ নেশা ধরে গেল।

সামনে উত্তরঙ্গ নদী। আশুবাবু বললেন—জায়গাটা এত ফাঁকা লাগছে কেন? গাছগুলো কোথায় গেল?

সুমিত্রা সুটকেশটা হাত বদল করে বলল—কেন? জ্যাঠামশাই গাছ বিক্রির কথা লিখেছিলেন না।

—তোর সব মনে থাকে দেখছি। কিন্তু সে কি এখানের? বলে আশুবাবু চারপাশটা দেখতে থাকলেন নিবিষ্টমনে।

তবে এখানেই থামতে হবে। সামনে ঘাট। পায়ের কাছে ঝকঝকে তকতকে কিছু মাটি—তার প্রান্তে নৌকোর ছইয়ের মত একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। বাঁশের মাচার উপর সেটা। ঠিক বিশ্রামরত কোন জন্তুর মত মুখ তুলে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমিত্রা জল দেখছিল। বিস্তৃত নীলাভ জলে কী দুরন্ত ইচ্ছার আলোড়ন যেন। শঙ্খচিল উড়ছে। গাঙ শালিক উড়ছে। পায়ের কাছে হলুদ রঙের ফেনা, অজস্র খড়কুটো। জলের দিকে তাকাতেই সুমিত্রা কেমন উন্মনা হয়ে গেল। কী যেন মনে পড়ে না, দুরান্ত কালের কোন আবছা স্মৃতি, যা দূর-দিগন্তের মত ধূসর এবং যা কেবল বিষাদকে বহন করে আনে।

আশুবাবু মেয়ের তন্ময়তা ভেঙে দিলেন। —ও সুমি, নৌকোও যে এপারে নেই।

তন্ময়তা ভেঙে গেল সুমিত্রার। তবু সুন্দর একটা প্রজাপতি হাত ফসকে গেলেও আঙুলে যেমন চটচটে কিছু রং লেগে থাকে, তেমনি একটা ভাঙচুর বর্ণলতা তার মনে জড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে কাগজে ছেলেধরার উৎপাত শোনা যায়। সে এখানে এক ছেলেধরার কথা ভাবছিল। ডাইনীবুড়ি পিঠেগাছ থেকে রাখালছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গল্পের মধ্যে একটা মারাত্মক সত্য আছে যেন। পিঠেগাছ বলতেই তো সেই স্বর্গযুগের কথা মনে পড়ে, যখন পৃথিবীতে ছিল মানুষের জন্য অজস্র খাদ্য, প্রকৃতির ভাণ্ডার ছিল ভরা। তারপর শিল্প-সভ্যতার ডাইনীবুড়ি ছলনার ঝুলিতে জীবনের ছেলেবেলাকে এ কোথায় আনল! এখানে নর-মাংস ভোজনই পরম সত্য। নর-মাংসে উৎসব। স্বজনকুটুম্বরা তৃপ্ত হয়।... তবু গল্পের শেষে একটা আশ্বাস আছে। রাখাল ফিরে আসতে পেরেছিল তার পিঠে-গাছে। এবং হয়ত এ আশ্বাসই ইতিহাসের সত্য। সুমিত্রা আশ্চর্য আনন্দের মধ্যে এই সব কথা ভাবছিল। তখন আশুবাবু তাকে ডাকলেন।

সে কিন্তু নৌকো না থাকা জানতে পেরে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হল না। চারপাশে প্রসারিত ঘাসের বনে জলায় গাছপালায় বিকেলের ঘষা রোদ পড়ে আছে। মেঘলা কেটে যাচ্ছে একটু করে। সে বলল—নৌকো এসে যাবে এখনই। না এলেই বা ক্ষতি কী। তোমার রাজত্বে যখন পা দিয়েছি, পারাপারের কথা ভাবিনি। কেন—তুমিই তো বলতে, মহুলায় যাবি সুমি, তাহলে কিন্তু স্রেফ জংলী সাজতে হবে। সাঁতার শিখতে হবে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে হবে!

আশুবাবু বললেন—তোর সব মনে থাকে দেখছি। তবে হারু পাটনী এখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা। ওর আবার অদ্ভুত অভ্যাস আছে, জানিস? ওপারে যাত্রী না পেলে এপারে আসবার নাম করে না। বলে—নিজেকে পার করবার জন্যে তো নৌকো বাইনে, ওতে অধম্ম হবে হুজুর!

দুজনেই জোর হাসল। তারপর সুমিত্রা বলল—ক্ষতি কী? ওই ছোট্ট কুঁড়েঘরেই জীবন কাটাতে আমার আপত্তি নেই, বাবা। চারপাশে যা দেখছি, খাদ্যের অভাব হবে না।

—তার মানে, শামুক-গুগলি খাবি নাকি!

—ঠিক তাই।

—আমার পক্ষে ওটা কঠিন নয়, সুমি। আমি এদেশেই জন্মেছি একদিন। তুই পারবি তো!

সুমিত্রা কথার জবাব না দিয়ে কুঁড়েঘরের পাশে চলে গেল। খড়ের চালে চিকন নীল কয়েকটা ডানা গোঁজা ছিল। সে ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজল। তারপর চঞ্চল লঘু পায়ে শুকনো ঘাসের উপর সোজা হাঁটতে লাগল। আশুবাবু ডাকলেন—এই, এই সুমি, ওদিকে নয়।

বেপরোয়া বল্গাছাড়া তুরঙ্গীর মত ঘাড় বাঁকিয়ে সুমিত্রা বলল—কেন?

সাপটাপ থাকতে পারে। ফিরে আয়।

সুমিত্রা একটুখানি থমকাল। তর্জনী কামড়ে হয়ত বা ঘাসের নীচে সাপ দেখবার চেষ্টা করছিল সে। পরক্ষণে পাশের উঁচু বাঁধটার দিকে দৃষ্টি গেল তার। সামনে কয়েক গজ মাত্র শুকনো খড়ের জমি। তার মধ্যে পায়েচলা এক ফালি পথ। বহুদূর দেখা যাচ্ছে, বাঁধটা এঁকেবেঁকে নদীর সমান্তরালে চলেছে।

আশুবাবু উচ্চকণ্ঠে ডাকছিলেন—সুমি, ফিরে আয়।
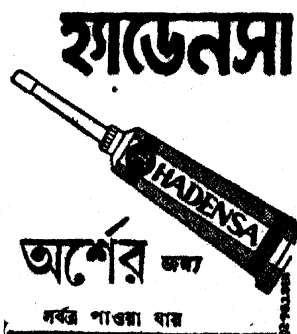
সুমিত্রা ফিরল না। কচি মেয়ের মত নির্জন মাঠে ছুটোছুটি করে প্রজাপতি ধরার সাধ তাকে পেয়ে বসেছিল। কয়েকটি দ্রুত পদক্ষেপে খড়ের জঙ্গল পেরিয়ে সে বাঁধে উঠল। অশান্ত বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছিল। পাখি এখনই ডানা মেলবে, এমন মনোরম ভঙ্গি তার শরীরে। আশুবাবু বিরক্ত হলেন। কিন্তু দুরন্ত মেয়েটি তাঁর ভাল লাগল। মা-হারা মেয়ে, অসাধারণ জেদী আর খাম-খেয়ালী। এই মুক্ত পরিবেশে কিছু স্বাস্থ্য সঞ্চয় করলে ক্ষতি কী?

সুতরাং তিনি বাক্স দুটো উঠিয়ে কুড়েঘরের মাচানে রাখলেন। বন্দুকটা পিঠ থেকে খুললেন। তারপর মাচানে অর্ধশায়িত অবস্থায় জলের দিকে তাকালেন। যতদূর দেখা যায়, হারুর নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই। আশেপাশে একটি লোকও পাচ্ছেন না, যার কাছে দশ বছর পরে এই এলাকার সব হাল-হদিশ জেনে নেন।

কিন্তু সূর্য যে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে! একটা সিগ্রেট জেবলে আলস্যভরে মাচানে কাত হয়ে শুলেন আশুবাবু। যতদূরেই যাক, সুমিত্রা তো ছেলেমানুষ নয়।

ওদিকে কিন্তু বাঁধে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে সুমিত্রা। সে এক দিকসীমানাহীন ধূসর তৃণভূমিকে দেখতে পেয়েছিল। কী নির্জন, কী অশান্ত! দীঘায় বাঁধে উঠে প্রথম সমুদ্রকে সে ঠিক এই বিস্ময়েই দেখেছিল। অজস্র ঘাস-ফড়িঙের অস্ফুট চিৎকার, পাখিদের ঝাঁক মেলে ওড়া আর ঘাসে ছড়িয়ে পড়া, খরগোসের ছুটো-ছুটি—কিছুতে ভাঙে না এ দুর্গম নির্জনতা। মনে হয়, অনাদিকাল থেকে কী প্রতীক্ষায় একটা আয়োজন চলেছে চোখের আড়ালে। কী পরিণতির অপেক্ষায় একটা অবোধ চাঞ্চল্য বিস্তৃত হচ্ছে। সুমিত্রার অস্পষ্টভাবে মনে হল, এই নেপথ্য আয়োজনে তারও কি ভূমিকা আছে? হঠাৎ-হঠাৎ সে চমকে উঠছিল। ত্রাস বিহবলতা সংশয়! তবু থামতে ইচ্ছে করে না। চৈত্রের বিকেল আর অশান্ত হাওয়া দূরের শহর থেকে ডেকে এনে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায় তাকে।

সুমিত্রা বাঁধ থেকে নেমে ঘাসের জমিতে চলে এসেছিল। ঝোপে অজস্র কাঁটাফুল। তার তুলতে ইচ্ছে করছিল। সেই সময় দারুণ চমক খেল সে। জানু অবশ হয়ে এল। মাথার ভিতরটা খালি বোধ হল। পরক্ষণে সে নিজেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল। মাত্র কয়েক গজ তফাতে ঘাসের ভিতর মুখ তুলেছে—কী ওটা?

নবা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তার কুতকুতে চোখ দুটো ছোট্ট কপালের নীচে ডুবে যাচ্ছিল। বড় বড় হলদে দাঁত ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়েছিল। থুতনি ঝুলেছিল। দুহাঁটুর হাড়ি কাঠে মুণ্ডু আটকে গিয়েছিল। তার শরীর মরা গাছের কাঁধ-কাটা গুঁড়ির মত ধূসর ও স্থানু দেখাচ্ছিল।

তার মানে, শামুক-গুগলি খাব নাকি?

হাতের কাস্তে থামেনি হলুদ শিকড়ে থেমেছে। কনুইতে শুকনো ঘাসের কুটো। চৈত্রে ঘাস হলুদ হয়ে এসেছে। সেই হলুদ মিলানো ঘাসে তার সাধের বকনাটির বড় রুচি হয়। এবং অন্য অন্য ঘাসকাটাদের চোখে পড়বার আগেই সে সবটা সংগ্রহ করতে চায়। এমন কি বাপ হারু পাটনীকেও ডাক লাগানোর ইচ্ছে তার ছিল। হারু কতক্ষণে ফিরবে, সে বিষয়ে একটা ধারণা তার আছে। ফলে খুবই দ্রুত মুখ নীচু করে সে ঘাস কাটছিল। হঠাৎ মুখ তুলে স্থির হয়ে গেছে।
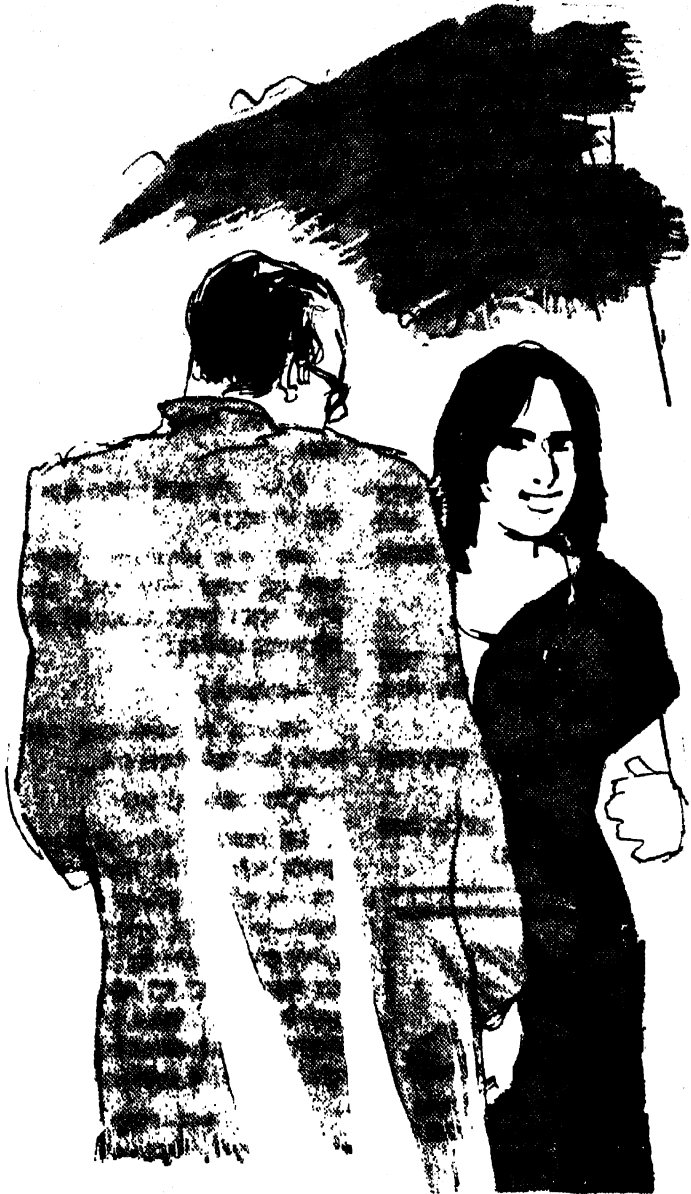
এ কি সম্ভব? হেঁটে পাশে এ অলৌকিক কাণ্ড? পট থেকে উঠে আসা এ অবাক রূপসী হিজলের মাঠে ঘাসের বনে, নাকি প্রেতিনী, নাকি দেবদেবী, ডাইনীর মন ভুলানো মায়া—তবে কি না, লালগোলা শহরে কিংবা বিনোদিঘির মেলায়

টকীবাজারীর পটে এমন দেখা যায়! কানাই বাউড়ীর মেয়ে অলকাও এমনি রূপবতী বটে—গতরের ধারে পুরুষ কাটতে কাটতে পথ হাঁটে। আর মহল্লার ঘাটে মাঝে মাঝে শহর ফেরা বাবুবাড়ির মেয়েদের সে দেখেছে। বাবার জিরানে বৈঠা বায় নবচন্দ্র। চেহারা দেখতে নৌকো ঘোরে অন্যদিকে। ভয়ানক সাধ যায়, একেবারে ভেসে চলে পদ্মার ওদিকে, ওপার পাকিস্তানেই যা থাকে কপালে—তবু সাধ্য থাকে না। বাহুর দিকে তাকাচ্ছে নবা। বাহুর উপর ডিমালো মাংস দেখছে। মস্ত পেট দেখছে। বুকের উপর দিকে মাংসের রঙ দেখছে। টলটলে সোনালি মাংসের উপর রোদ নাচছে টাল-মাটাল। এবং নবার বলতে সাধ যায়—একি সাহস বাপু, হিজলে বাঘ আছে, শুয়োর আছে, সাপ আছে! তুমি কী মানুষ বটে, তুমি কি মানুষ?

ততক্ষণে সুমিত্রা সামলে নিয়ে হেসেছে। প্রকট নির্জনতা হঠাৎ ভাঙবার ফলেই সে চমক খেয়েছিল সম্ভবত। শান্ত জলে ঢিল পড়লে যেমন হয়।

নবা উঠে দাঁড়িয়েছে। মোটাসোটা হলুদ দাঁত, বড় বড় শৌখিন চুল, জানু অব্দি গোটানো অশ্লীল গামছা, এবং সে কাস্তের ডগা দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে।

সুমিত্রা বলল—তুমি কে?

—আজ্ঞে! নবা কাস্তে শুদ্ধ প্রণাম করল জোরহাতে। —আজ্ঞে আমি নবচন্দ্র হই, বাবুদিদি।

—তাই নাকি! সুমিত্রা দারুণ হেসে ফেলল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি পাটনীর ছেলে নবচন্দ্র। ইখেনে ঘাস কাটছি।

সুমিত্রা আরও সাহস পেয়ে ভাবল, ঘাটে একে দেখলে গাইড হিসেবে সঙ্গে নিত। সে বলল—এদিকে দেখবার মত কি সব আছে!

—দেখবার মত? নবা উল্লসিতভাবে বলতে থাকল—অ্যানেক, অ্যানেক কিছু বাবুদিদি। বোঝলেন? অবিশ্যি আপনারা শহুরে লোক, তবে কি না......হেঁ-হেঁ করে হাসছিল সে। ভিতরে একটা প্রবল আকুতি জাগছিল।

সে সুন্দর-সুন্দর অনেক কিছু খুঁজছিল—যা দিয়ে একে তৃপ্ত করা যায়।—আজ্ঞে, মানিকদির বাঁওড় আছে, সাপের রাজ্যি সেটা। বড় বড় শামুক চরে। তাপরে আছে, জটাবাবার থান। সিথানে দিন-দুপুরে ডোরাকাটা শ্যাল বেরয়। উদিকে এক সাধুবাবা আছেন—তিনি এই আছেন এই নাই বোঝলেন?......সম্ভব-অসম্ভব সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল তার বলায়—প্রবল কাকুতি ধুরে পাক খাচ্ছিল মনে।

সুমিত্রা হাসি চেপে বলল—বুঝেছি। আর কী আছে?

নবা দুপা এগিয়ে এসে সোৎসাহে বলল—হুই নালার পারে দেউড় বাঁশের জঙ্গল আছে। সিথানে মউলের বড় তরফ এট্টা অজগর মেরেছিল।

—জ্যাঠামশাই?

নবা চমকে উঠে বলল—আজ্ঞে, তাইলে আপনি কিনা ছোট তরফের সেই......

সুমিত্রা বলল—হ্যাঁ মেয়ে।

নবা বিস্তকণ্ঠে বলল—অই, চেনাচেনা ঠেকছিল বটে! বাবুদিদি, সিবারে নৌকোয় বসে পা ঝুলিয়ে যাচ্ছিলেন, ছোটবাবু বললেন—কুমীরে ধরবে, হুঁ-হুঁ...নবা মাথা দুলিয়ে হাসতে থাকল। ধরে ফেলার উল্লাস তার আচরণে। —হুঁ হুঁ, আমি ভুলি নাই বাবুদিদি, মোনে আছে। তা ছোটবাবু অ্যানেকদিন বাদে এলেন। ঘাটে আছেন বুঝি? নবা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছিল।

সুমিত্রা বলল—শোনো, ওঁকে অভ্যর্থনাটা পরেই করবে। এখন, আমাকে একটু ঘুরে-ফিরে সব দেখাও তো, যা সব বলছিলে।

নবা ফিরল। কিন্তু কেমন অন্যমনস্ক তার দৃষ্টিটা। তারপর হাতের কাস্তেটা তুলে পথ দেখিয়ে বলল—তাইলে বাঁওড় পানেই চলুন। বড় বড় শামুক দেখবেন......

সুমিত্রা একটু ইতস্তত করছিল পরক্ষণে। শামুক দেখবে? কিন্তু নবা হাঁটতে শুরু করেছে। সে তাকে অনুসরণ করল। হাঁটতে হাঁটতে নবা কথা বলছিল অনর্গল। মা বসুমতী এখানে হাত ভরে দেবার জন্যে তৈরি আছেন। দুর গ্রামের দুঃখী পুরুষ আর দুঃখিনী মেয়েদের বেঁচে থাকবার মত অজস্র সম্পদ এখানে আছে। জলে মাছ আছে। শামুক-গুগলি ঝিনুক আর কচ্ছপও কম নেই। মাংস খেতে ইচ্ছে হলে ফাঁদ পেতে পাখি ধরো। খরগোস ধরো। তবে পাখির মাংস খাওয়া ঠিক নয়। ওরা আকাশের প্রাণী। শাপ দিলে মাথার চুল উড়ে যায়। ......বোঝলেন দিদি, এই যে এমন সোন্দর চুল আপনার মাথায়, যদি উড়ে যায়, কত কুচ্ছিত দেখাবে, বোঝলেন না?

সুমিত্রার গা ছমছম করে উঠল মুহূর্তের জন্য। নবা চুলের প্রসঙ্গে তার প্রশংসা করছে। অযাচিত প্রশংসা। সুমিত্রার মনে হল, নবার শরীরটা বড় অশ্লীল, জানু অব্দি গোটানো একটুকরো ছেঁড়া গামছা—সে সংকোচবশে তার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল।

নবা বলছিল, এখানে খাদ্যের ভাণ্ডার ফুরোয় না। হেমন্তে কুল পাকতে থাকবে। এখনও খুঁজলে কিছু মিলবে। খরায় বৈঁচি পাকবে। বর্ষায় জাম। এবং এখন থেকেই মেয়েরা শামুক সংগ্রহ করে রাখছে। খালের জল এখন শুকিয়েছে। শামুক-গুলো কাদায় লুকিয়ে পড়ছে সে কারণে। এই শামুক দিয়ে দূরের মাঠে ধানের শীষ কুড়নো যায়—মেয়েরা তো সেই শীতের দিকেই তাকিয়ে থাকে সারা বছর। তবে বাবুদিদি, হেজলে সুখের দিন শেষ হয়ে এল। বোঝলেন? হেজলে আর কিছু বাঁচবে না।

সুমিত্রা ফের চমকে উঠে বলল—কেন?

—হুই বাঁধ বেঁধেছে। দেখছেন? নবা আঙুল তুলে বলল। —ইখেনে সব ধানের জমি হবে। সামনে খরায় নাকি আগুনে লাগিয়ে দেবে হেজলে। আমার খুব ভয় লাগে, বাবুদিদি। চিন্তায় ঘুম হয় না। হেজলে কত কী আছে, সাপ, পোকামাকড়, জন্তু-জানোয়ার—সব পুড়ে মরবে। পাখি-গুলান কী করবে তখন? সেই কথা ভাবি।

—তাই নাকি?

—হুঁ। আর বাবুদিদি, আমার স্বপন হয়। ত্যাখন ঘাসের জঙ্গল ধু-ধু জ্বলছে দেখতে পাই......হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বসে পড়ল নবা। পরক্ষণেই থ্যাবড়া পায়ের তলা থেকে বিদ্ধ একটা ভাঙা শামুক উপড়ে ফেলে দিল সে। রক্ত উপচে এল। সুমিত্রা আঁতকে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

নবা মুখ নীচু করে থুথু দিয়ে পায়ের তলাটা বার-বার মুছে ফেলছে। দৃশ্যটা

খারাপ লাগছে সুমিত্রার। কিন্তু রক্ত। সুমিত্রা দু-হাঁটুতে দুটি হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল। সেই সময় নবা মুখ তুলেছে।

নবা মুখ তুলে তাকিয়েছে। তার অতি কাছে ঝকঝকে তকতকে অপার্থিব কী বস্তু, ব্লাউজের নিচে সুমিত্রার নগ্ন পেটের কিয়দংশ, স্খলিত শাড়ির ফাঁকে স্ফীত বুক, কাঁধ বাহু গ্রীবা ও গালে বিকেলের ফিকে রোদ......নবা ভারবাহী পশুর মত শ্বাস ফেলছিল। তার চোখের দৃষ্টিতে নিজের রক্তের ছোপ এবং যেন বা এই নির্জন প্রাচীন মাঠে এক সাতমহলা রূপকথার পুরীর দরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে ভিখারীর মত। রঙিন কাঁচের ঘরের ভিতর কী উৎসব চলে, সে যেতে পারে না। তার কেবলই মনে পড়ে পুলিশ মশাইদের কথা। ক্রমশ সে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল।

খুবই কষ্ট হচ্ছিল নবার। হিজলের মাঠে অনেক শামুকের খোল আর বড় বড় কাঁটা তার পায়ে বিঁধেছে। অনেক রক্ত ঝরেছে। অথচ নবার মনে কাতরানি পোকার মত ঘুরে ঘুরে কটকট শব্দ করে। সে মনে মনে বলে—হেই বাপ, এ কি যন্তনা, যেন কালসাপ ছুঁইয়ে দিলে, গরল মেখে রক্ত চোয়ায়, মুখের থুতু যোগায় না। শুকনো খড়ের মত জিভ নড়াচড়া করে। একটা ওতপ্রোত বিলাপ তার রক্তে ছড়ায়—মা, ক্যানে ওদরে ধরেছিলিস ই অঙ্গের গোটা-খানা। আদর পেতে ইচ্ছে করে নবার। দেহের ভিতর দীর্ঘকালের বিশাল নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সোনালি শামুকের টুকরোটা একটা চিড় সৃষ্টি করে এসেছে। নবার বড় কষ্ট হয়।

সুমিত্রার মনে অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেক-শনের চিন্তা। সে শুকনো গলায় বলল—তোমার কী শরীর খারাপ করছে?

নবা ফোঁৎ-ফোঁৎ করে হাসবার চেষ্টা করল। গলা ধরাল। গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ, শব্দের সঙ্গে কথা জড়িয়ে এল। —অই বাবুদিদি, অঙ্গ দেখলে কী রকম হয় গো, বোঝলেন? আর দ্যাখেন, শরীলে বড় উপদ্দু......যেন বোলতাচাকি ঘা, এই রকম লাগে।

সুমিত্রা উদ্বিগ্ন মুখে বলল—সে আবার কী?

—হুঁ-হুঁ। বোলতার চাকের মতন ঘা থাকে-থাকে দানা বাঁধে।

ক্যান্সারের কথা বলছে নাকি? সুমিত্রা শিউরে উঠল। —কিন্তু তুমি ওকথা ভাবছ কেন?

নবার কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে হঠাৎ। —ক্যানে? কে জানে ক্যানে। শুধু এই রকম লাগে। হুঁ, ঠিক এই রকম......সে উঠে দাঁড়াল।

সুমিত্রা সোজা হল পরক্ষণে। উন্মত্ত পেশল বুক, জঙ্ঘা, বাহু—এক আদিম নিরাবরণ মানুষের স্তূপ থেকে যেন অজস্র দৃষ্টিপাত—সহস্র চক্ষু দিয়ে প্রাচীন পৃথিবী তাকে দেখছে।

সুমিত্রার মনে হল—একটা আগ্নেয়-গিরির চূড়ায় সে তখন অগোচরে পৌঁছে গেছে। দারুণ উত্তেজনায় বাবার কথা সে ভাবছিল।

হঠাৎ নবা পা বাড়াল। তার পেশী-গুলো চঞ্চল দেখাল। এবং সেই পা ফেলবার ভঙ্গি, পেশীর চাঞ্চল্য, সর্বাঙ্গের অজস্র দৃষ্টিপাত, সর্বোপরি নবার হাতটা রক্তাক্ত—এই সব থেকে কী প্রচণ্ড শঙ্কা অনুভব করে সুমিত্রা দারুণ চিৎকার করে ছুটতে থাকল বাঁধের দিকে।

দেরি দেখে আশুবাবু বাঁধের উপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ দূরে সুমিত্রাকে ছুটে আসতে দেখে ও চিৎকার শুনে ক্ষিপ্র-হাতে বন্দুকে কার্তুজ ভরে নিয়েছিলেন। তারপর ছুটে গিয়েছিলেন সেদিকে।

সুমিত্রা প্রাণপণে ছুটে এসে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে হাঁপাচ্ছিল। শাড়ির নীচের দিকে প্রচুর চোরকাঁটা। একটা আস্ত কাঁটাঝোপের টুকরোও পিছনে নিয়ে এসেছে সে। আশুবাবু বললেন—কী-কী হয়েছে সুমি?

সুমিত্রা আঙুল তুলে দেখাল। তারপর হেঁট হয়ে কাঁটাঝোপের টুকরোটা কাপড় থেকে ছাড়াতে ব্যস্ত হল।

আশুবাবু দেখলেন, দূরে ঘাসের বনে হাঁটু ডুবিয়ে ধূসর গাছের গুঁড়ির মত অর্ধোলঙ্গ কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। পলকে ব্যাপারটা অনুমান করে তিনি হিংস্র হয়ে উঠলেন। তারপর বন্দুক তুললেন। শরীরে প্রাচীন জমিদার রক্ত চঞ্চল হয়েছিল।

পরমুহূর্তেই সুমিত্রা বাবার হাত ধরে টানল। —ছিঃ, ও কী করছ! ওকে আচমকা দেখে ভয় পেয়েছিলুম!

—তাই বল! আশুবাবু হেসে ফেললেন।

হাঁটতে হাঁটতে বার-বার নিজের মুখো-মুখি হচ্ছিল সুমিত্রা। এবং বিষণ্ণ বোধ করছিল। কেন এমন উদ্ভট আচরণ করে ফেলল সে? একটা আজেবাজে গ্রাম্য যুবকের কাছে কেমন ছোট হয়ে গেল না কি? অজান্তিতে মুখটা একবার ঘুরে গেল চলতে চলতে। যেন দৃষ্টির ভাষায় বলল—আমায় ক্ষমা করো।

তারপর সন্ধ্যা নেমেছে। বুড়ো হারু পাটনী সওয়ারী ওপারে পৌঁছে দিয়ে ঘাটে ফিরেছে। নৌকো বেঁধে ডেকেছে—নবা, হেই নবারে!

সাড়া নেই দেখে সে ফের গলা তুলে ডাক দিল—হেই নবচন্দর!

মাচানে কে শুয়ে আছে। মাথায় শুকনো ঘাসের বোঝা। হারু কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিল। —অই অই নব, শুয়ে আছিস ক্যানে? কী হয়েছে তুর?

নবা অন্ধকারে মাথা দোলাল। —না, কিছু হয় নাই।

—তবে শুয়ে আছিস ক্যানে, অবেলায়? হারু পাটনী সস্নেহে জোয়ান ছেলের গায়ে হাত বোলায়। আর ছেলে বাপের বুকে ঘন হতে থাকে। অন্ধকারে গাল ছপছপ করে জলে। বন্দুক তুলেছিল ছোটবাবু। অবিকল সেই ছবি দেখে অন্ধকারে। দেখে ভয়ে মুখ লুকায়। —অই, অই নব, তু কাঁদছিস। ক্যানে কাঁদছিস, ক্যানে? হারু পাটনী ফুঁসে ওঠে।

—না, কাঁদি নাই। নবা এবার আকাশ দেখে। আকাশে নক্ষত্র। নিসর্গের অন্ধকারে পোকামাকড় ডাকে। আর সে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। রক্তমাখা পায়ে ঘাটের কিনারায় চিরকালের জল এসে ছলছল করে। সব ধুয়ে দিয়ে যায়।
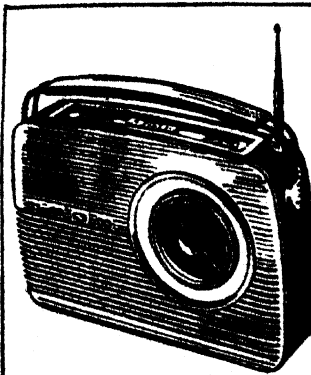
বাসনাই হচ্ছে স্বপ্নদর্শনের মূলে। যেমন জাগ্রদবস্থায়, তেমনি স্বপ্নাবস্থায়ও আমরা প্রকৃতির অনুসরণ করি। স্বপ্নের ভেতর দিয়েই আমাদের 'আসল মানুষ প্রকট হয়'. এ সংসারে কেউ সত্ত্বগুণী, কেউ বা রজোগুণী, কেউ তমোগুণী। ভারতীয় ঋষিদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমাদের গুণভেদে রুচি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য ঘটে থাকে, আর এই গুণভেদেই আমাদের স্বপ্নও ভিন্ন প্রকারের হয়। মনস্বী ফ্রয়েড বলেছেন—— Dreams are the via regia to the Unconscious. স্বপ্ন-বিশ্লেষণের যে অভিনব পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তার সাহায্যে তিনি রোগীর মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অচেতন স্তরে আলোকপাত করতেন। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশকে (manifest content) অবলম্বন করেই তিনি স্বপ্নের গূঢ় তাৎপর্য (latent content) উদ্‌ঘাটন করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমাদের অসামাজিক বা নীতিবিরুদ্ধ বাসনা স্বপ্নের ভেতরেও সোজাসুজি চরিতার্থ হতে পারে না। কারণ, নিদ্রিত অবস্থায়ও আমাদের মানসকক্ষের দ্বারে প্রহরী (censor) জেগে থাকে। কোনো অবৈধ কামনা যখন আমাদের সুষুপ্ত অবস্থায় মনের কুঠরীতে প্রবেশ করতে চায়, তখন প্রহরী বাধা দেয়। তাই আমাদের সমাজবিরুদ্ধ কামনাগুলি ছদ্মবেশ ধারণ করে। তখন প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টিকে অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। কিভাবে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে মানুষের মনের অচেতন স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়, মনস্বী ডাক্তার ফ্রয়েড তা আমাদের শিখিয়েছেন। তাঁর Interpretation of Dreams একখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ। কিন্তু স্বপ্ন-সম্পর্কে সকল রহস্য যে তিনি উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া মানস ব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি রুগ্ন ব্যক্তিদের স্বপ্নের যে তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন, তা হয়তো সর্বত্র সকল মানবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের মনের যে একটি অচেতন স্তর রয়েছে, ভারতের ঋষিরাও সে কথা জানতেন। তাঁরা বলেছেন, আমাদের ভাবনাসমূহ সংস্কাররূপে পরিণত হয়ে মনের অচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। স্বপ্নাবস্থায় এই সংস্কারগুলোই মনের ওপর ভেসে ওঠে। স্বপ্নের ভেতরেও আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় অর্থাৎ কর্মফল ভোগ হয়। এই অবস্থায় অনুভূতিকে যদি রস বলা হয়, তবে বলতে হয়, স্বপ্নদ্রষ্টার মনরসেরই আস্বাদন হতে পারে। স্বপ্নে কখনো কখনো অনাগত ঘটনার প্রত্যক্ষ হয় কেন, মনস্বী ফ্রয়েড কিন্তু তার কোনো কারণ নির্দেশ করতে পারেন নি। অথচ, স্বপ্নে যে কখনো কখনো ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হয়, পাশ্চাত্যের কোনো কোনো মনীষীও সে কথা স্বীকার করেছেন। 'My Experiments With Time' গ্রন্থের লেখক স্বপ্নে যে যুদ্ধ-ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা' সত্য সত্যই এক বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল। অনেক সময়ে দেখা যায়, আমাদের কোনো দূরস্থিত প্রিয়জন মৃত্যুকালে আমাদিগকে স্বপ্নে দর্শন দান করে বলেন—'আমি চল্লেম,' অথচ তাঁর সামান্য অসুখের সংবাদও আমাদের জানা ছিল না। আমাদের দেশের যোগীরা বলেন, এরূপ স্বপ্ন হচ্ছে সাত্ত্বিক স্বপ্ন, আর সত্ত্বগুণের ধর্মই হচ্ছে প্রকাশ করা। সুপ্তাবস্থায়ও যদি আমাদের মনে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন আমাদের মনকে স্বচ্ছ দর্পণের সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর এই অবস্থায় আমরা দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করি।

মহাভারতে স্বপ্ন

আমাদের দেশে কথায় বলে—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। আর্ষ মহাভারতেও বলা হয়েছে—'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎকচিৎ'। মহাভারতের শান্তিপর্বে দু' শ তেরো অধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। (এটা হচ্ছে গুরুশিষ্য-সংবাদ।) ভীষ্মদেব বলছেন—

স্বপ্নে হি রজসা দেহী তমসা চাভিভূয়তে।
দেহান্তরমিবাপন্নশ্চরত্যপগতস্পৃহঃ।।
২১৩।২

স্বপ্নের সময় মানুষ রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে। এই সময়ে স্বপ্নদ্রষ্টা যেন অন্য দেহ ধারণ করে এবং স্পৃহাশূন্য হয়ে বিচরণ করে।

তত্রাহ কো স্বয়ং ভবঃ স্বপ্নে বিষয়বানিব।
প্রলীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্দেহী বর্ত্ততে দেহবানিব॥
২১৩।৪

পূর্বপক্ষকারী প্রশ্ন করেন—স্বপ্নের সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, অথচ মানুষ যেন শরীর ধারণ করে রূপ, রস ইত্যাদি বিষয় গ্রহণ করে, —এ ব্যাপারটা কি?

ইন্দ্রিয়াণাং শ্রমাৎ স্বপ্নমাহুঃ
সর্ব্বগতং বুধাঃ।
মনসস্ত্বপ্রলীনত্বাত্তত্তদাহুর্নিদর্শনম্॥
২১৩।৬

উত্তরে মহর্ষিরা বলেন—জাগ্রৎ অবস্থায় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সর্বদা বিষয় গ্রহণ করে, তারপর পরিশ্রমের ফলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়দের চেয়ে মন অধিকতর শক্তিমান, তাই মন কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না। এরূপ অবস্থায় মনের যে বিষয়ের অনুভূতি, তার নাম স্বপ্ন। এ বিষয়ের নিদর্শন (প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত) বলা হচ্ছে।

কার্য্যে ব্যাসক্তমনসঃ সঙ্কল্পো
জাগ্রতো হ্যপি।
যদ্বন্মনোরথৈশ্বর্য্যং স্বপ্নে
তদ্বন্মনোগতম্।। ২১৩।৭

জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মন কোনো ব্যাপারে আসক্ত থাকলেও তার যেমন অপরাপর বিষয়ে সঙ্কল্প হয় এবং তার মনোরথ বা ইচ্ছা সেইসব দিকে চলতে থাকে, স্বপ্নেও তেমনি ঘটে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়ও মানুষের সঙ্কল্প ও ইচ্ছা চলতে থাকে।

সংসারাণামসংখ্যানাং কামাত্মা তদবাপ্নুয়াৎ।
মনস্যন্তর্হিতং সর্ব্বং স
বেদোত্তম পূরুষ।। ২১৩।৮

পূর্বে আমাদের অসংখ্যবার জন্ম হয়েছে, তখন নানা বিষয় লাভের জন্যে ইচ্ছা জেগেছে, তারি ফলে আমাদের আত্মাকে আশ্রয় করে রয়েছে বহুবিধ সংস্কার। তাই স্বপ্নেও মনে জাগে নানা বিষয়ের অনুভব, আর জীবাত্মাও আমাদের মনে যা রয়েছে, তা' সবই জানতে পারেন।

গুণানামপি যদ্যৎ কর্ম্মণা
জানাত্যুপস্থিতম্।
তত্তচ্ছংসন্তি ভূতানি মনো
যদ্ভাবিতং যথা।। ২১৩।৯

মানুষের স্বপ্নের যে অসংখ্য বৈচিত্র্য, তার কারণ এখানে বলা হচ্ছে। নিদ্রিত অবস্থায়ও আমাদের মনে কখনো সত্ত্বগুণের, কখনো রজোগুণের, কখনো বা তমোগুণের উদ্রেক হয়, মন যখন যে বস্তুর দ্বারা ভাবিত বা স্পৃষ্ট হয়, সূক্ষ্ম মহাভূত বা তন্মাত্রসমূহও সেই ভাবে সেই বস্তু আমাদের জানিয়ে দেয়।

ততস্তমুপবর্ত্তন্তে গুণা রাজসতামসা।
সাত্ত্বিকা বা যথাযোগমানন্তর্য্য
ফলোদয়ম্।। ২১৩।১০

তারপর মানুষের মন সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, ফলে স্বপ্নকালে তার মনে সুখ, দুঃখ বা মোহ উৎপন্ন হয়।

ততঃ পশ্যন্ত্যসংবুদ্ধ্যা
বাতপিত্তকফোত্তরান্।
রাজস্তমোগতৈর্ভাবৈস্তদপ্যাহুর্দুরত্যয়ম্॥
২১৩।১১

তারপর, মানুষ স্বাভাবিক অজ্ঞানের বশে স্বপ্নে নানারকমের দেহ দেখতে পায়, সেই দেহগুলি ত্রিধাতুবিশিষ্ট ও কামমোহাদিযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হলে স্বপ্নদর্শনকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

[ত্রিধাতু—বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই ত্রিধাতুর সমতা বা সাম্যাবস্থার নাম স্বাস্থ্য, আর ধাতুবৈষম্যই হচ্ছে রোগ। কামমোহাদিযুক্ত—রজোগুণ থেকে কাম ও তমোগুণ থেকে মোহের উৎপত্তি হয়ে থাকে।]

প্রসন্নৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্‌যৎ সঙ্কল্পয়তি
মানসম্।
তত্তৎ স্বপ্নেঽপ্যুপগতে
মনোদৃষ্টির্নিরীক্ষতে।। ২১৩।১২

নির্মল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মন যা যা সঙ্কল্প করে, স্বপ্নকালে তাই দর্শন করে, স্বপ্নকালে মানুষের মন দর্শনশক্তি লাভ করে।

যোগদর্শনে স্বপ্ন

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের সমাধিপাদে চিত্তকে একাগ্র করার জন্যে নানা উপায়ের নির্দেশ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় 'যোগ' কথাটির বহু অর্থ প্রচলিত আছে কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলির মতে 'যোগ' কথাটার অর্থ হচ্ছে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, অর্থাৎ একটি লক্ষ্যের দিকে সমুদয় চিত্তবৃত্তিকে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করা। এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একটি উপায় হচ্ছে—

'স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা'।

কখনও কখনও আমরা স্বপ্নাবস্থায় দিব্য বা অলৌকিক জ্ঞান লাভ করি। সেই জ্ঞানের বিষয় ধ্যান বা চিন্তন করলে আমাদের চিত্ত স্থির হয়। আবার নিদ্রা বা সুষুপ্তির অবস্থায় আমরা যে সাত্ত্বিক আনন্দ লাভ করি, তার ধ্যান করলেও আমাদের চিত্ত একটা অচঞ্চল, প্রশান্ত অবস্থা লাভ করে।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তের যে পাঁচটি বৃত্তির কথা বলেছেন, তার ভেতর একটি হচ্ছে নিদ্রা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে 'নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা', শ্লেষ্মা ও তমোগুণ যখন প্রবল হয়, তখনই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, আমাদের নিদ্রাও তিন রকমের হয়ে থাকে,—সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান। সত্ত্বপ্রধান নিদ্রা থেকে সুখের অনুভব হয়, রজঃপ্রধান নিদ্রা থেকে দুঃখ জন্মে, আর তমঃপ্রধান নিদ্রা আমাদের দেহে ও মনে এনে দেয় জড়তা ও মোহ।

এই সূত্রটির ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

'কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা আসিয়া কথা-বার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবা-বেশে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ব সংগীতধ্বনি ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে, সে তাহা শুনিতেছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে। জাগরণের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ স্বপ্নটিকে সত্য বলিয়া চিন্তা কর, উহার ধ্যান কর।' (রাজযোগ।)

নিদ্রিত অবস্থায়ও যে মানুষ কখনো কখনো দিব্যানুভূতি লাভ করে থাকে, সে কথা মনস্বী ট্রাইন (Ralph Waldo Trine) করেছেন। তিনি বলেছেন—

'During the process of sleep it is merely the physical body that is at rest and in quiet; the soul-life with all its activities goes right on.

নিদ্রাকালে শুধু আমাদের জড় দেহই বিশ্রাম পায় ও শান্তভাবে অবস্থান করে কিন্তু আমাদের আত্মিক জীবনের অর্থাৎ মনের সকল ক্রিয়াকলাপ যথাযথভাবে চলতে থাকে।

ট্রাইন বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কোনো সংস্পর্শ ঘটে না, তাই আমাদের মনেও কোনো আলোড়ন বা বিক্ষোভ জাগে না। এই কারণেই নিদ্রিত মানুষের মনে কখনো কখনো দিব্য অনুভূতি বা দিব্য চেতনার সঞ্চার হতে পারে। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে অনেক সময়ে আমাদের অনেক দুরূহ সমস্যারও সমাধান হতে পারে। ট্রাইন আরও বলেছেন—

'When we are asleep to the exterior we can be wide awake to the interior world'

বহির্জগতে যখন আমরা নিদ্রিত, তখন আমরা অন্তর্জগতে সম্পূর্ণরূপে জাগরূক থাকতে পারি। কোলরিজের কুবলাই খান নামে বিখ্যাত কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আয়ুর্বেদে স্বপ্ন

আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে, বিশেষ বিশেষ স্বপ্নের দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগ সূচিত হয়ে থাকে। কখনো কখনো স্বপ্নের ভেতর দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টার ভাবী রোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আচার্য মাধব কর তাঁর 'নিদান' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে যক্ষ্মারোগীর স্বপ্ন সম্পর্কে বলেছেন—

স্বপ্নেষু কাকশুক শল্লকি নীলকণ্ঠা
গৃধ্রাস্তথৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ।
তং বাহয়ন্তি স নদীর্বিজলাশ্চ পশ্যেৎ
শুষ্কাংস্তরূন্ পবনধূমদবার্দিতাংশ্চ'।।

যক্ষ্মারোগী স্বপ্ন দেখে যেন কাক, শুক, সজারু, ময়ূর, শকুনি, বানর ও কাকলাস তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, নদীসমূহ যেন জলশূন্য, বৃক্ষসকল যেন শুষ্ক এবং ঝটিকা, ধূম ও দাবানলের দ্বারা আকুলিত।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, চিকিৎসককে স্বপ্নতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে। কোন্ স্বপ্নে কোন্ ভাবী ব্যাধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সে সম্পর্কেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এ কালের কৌতূহলী মনস্তত্ত্ববিদরা এ সম্পর্কে গবেষণা করতে পারেন।

প্রতীচ্যের স্বপ্ন-বিজ্ঞান

আমরা বলেছি, আদিমকাল থেকে স্বপ্নের কারণ জানার জন্যে মানুষের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। স্বপ্নে যে অনেক সময়ে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হয় (Dreams are often prophetic), মানুষের সে বিশ্বাসও অতি প্রাচীন কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে স্বপ্ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে ঊনিশ শতকের শেষভাগে। প্রখ্যাত চিকিৎসক ও মানসিক চিকিৎসায় 'মনঃ-সমীক্ষণ' প্রণালীর উদ্ভাবক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডই সর্বপ্রথম স্বপ্ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মনোব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে মনস্বী ফ্রয়েড বহু রোগীর ওপর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন, অনেক রোগীর স্বপ্নও বিশ্লেষণ করেছিলেন। পরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, আমাদের মনের অসংবিদে অর্থাৎ অচেতন স্তরে বহু সমাজবিরোধী কামনা সঞ্চিত থাকে, স্বপ্নের ভেতর সেই সব কামনাই সোজাসুজি অথবা ছদ্মবেশ ধারণ করে মনের চেতন স্তরে ভেসে ওঠে। এই যে আমাদের অবৈধ কামনাগুলোর অচেতন স্তর থেকে চেতন স্তরে ভেসে ওঠা—এরই নাম স্বপ্ন। অবশ্য, ফ্রয়েডের মতে আমাদের অধিকাংশ অবৈধ আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে যৌন আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মনে যখন কোনো সমাজবিরুদ্ধ ইচ্ছা জাগে, তখন আমরা নিজেরাই চমকে উঠি, মনে হয়, আমি একজন শিক্ষিত সভ্য ভব্য মানুষ, আমার রুচি-মার্জিত ও বিদগ্ধজনোচিত, আমার মনে এমন কুভাব কেমন করে স্থান পেল। তখন আমাদের অভিমান আহত হয়, তাই আমরা আমাদের সমাজবিরুদ্ধ বাসনাগুলিকে দমন করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাদের দমন করতে পারি না, তারা মনের অচেতন স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু আমাদের অচেতন মনের কামনা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করে।

মনস্বী ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু বাংলা ভাষায় 'স্বপ্ন' নামক গ্রন্থ রচনা করে বাঙালী পাঠকদের ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত করেছেন। অবশ্য স্বপ্ন-সম্পর্কে ফ্রয়েডের সকল সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ-যোগ্য নয়। কয়েকজন রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে কোনো সামান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাহসের কার্য। এই জন্যে কোন্ প্রকার স্বপ্ন কোন্ কামনার প্রতীক, তা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। কোন মানুষ হয়তো স্বপ্নের ভেতর শূন্যে উড়ে যাচ্ছে, আমরা হয়তো বলবো, তার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে চরিতার্থ হচ্ছে, আবার হয়তো কোনো মানুষ স্বপ্ন দেখছে, সে আকাশ হতে ক্রমশঃ নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছে, আমরা হয়তো বলবো যে এই স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে—স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু এই জাতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে 'অতিমাত্রায় সরলীকরণ' বা over-simplification-এর দৃষ্টান্ত।

নিদ্রা ও স্বপ্ন সম্পর্কে আরো দুটি রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে — সুপ্তিভ্রমণ (somnambulism) ও স্বপ্নে ঔষধপ্রাপ্তি। ফ্রয়েডের অনুগামীরা মনে করেন, স্বপ্নে ভেষজপ্রাপ্তি আমাদের অচেতন মনের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়, কখনো কখনো এর মূলে কোনো প্রতারকের কৌশলও থাকতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কিনা, তা' বিচার করে দেখা আবশ্যক। আমাদের দেশের যোগসিদ্ধ পুরুষেরা অবশ্য স্বপ্নে ভেষজ-প্রাপ্তির ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সুপ্তিভ্রমণ আর একটি আশ্চর্য ঘটনা। আমাদের দেশে কথায় বলে, নিশির ডাক শুনে ঘুমন্ত মানুষ উন্মত্তের মতো ছুটে চলে, এদের অনেকে নদী বা খালবিলে ডুবে মরে, আবার অনেকে পথের মধ্যেই ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তাদের হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এই জন্যে গ্রাম্য লোকের সংস্কার আছে, রাত্রে যদি কেউ তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ডাকে, তবে ঘুম ভেঙে গেলেও সাড়া দেবে না, যদি তিনবার সেই ডাক শুনতে পাও, তবে সাড়া দেবে। মনস্বী লেখক লালবিহারী দে তাঁর Bengal Peasant Life উপন্যাসে এরূপ সংস্কারের কারণ নির্দেশ করেছেন—

'The superstition has doubtless its origin in the peril incurred by those who are afflicted with somnambulism'

কিন্তু, মনস্তাত্ত্বিক মাত্রেই হয়তো স্বীকার করবেন, মানুষের দেহের ওপর তার অচেতন মনের প্রভাব কতখানি, এই 'সুপ্তি-ভ্রমণের' ঘটনাই তার প্রমাণ।

মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বলেন, ব্যক্তির মতো জাতিও স্বপ্ন দেখে। নানা দেশের রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি হচ্ছে জাতির স্বপ্ন। (race-dreams). এ সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদ ইউং (Jung) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

যাঁরা জড়বাদী (materialist) অথবা আচরণবাদী (behaviourist), তাঁরা স্বপ্নের কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। ডাঃ লুই বার্মান (Louis Berman) মনে করেন, আমাদের স্বপ্নের মূলে রয়েছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরসের (endocrine glands) ক্রিয়া। তিনি বলেছেন, কোনো বিশেষ
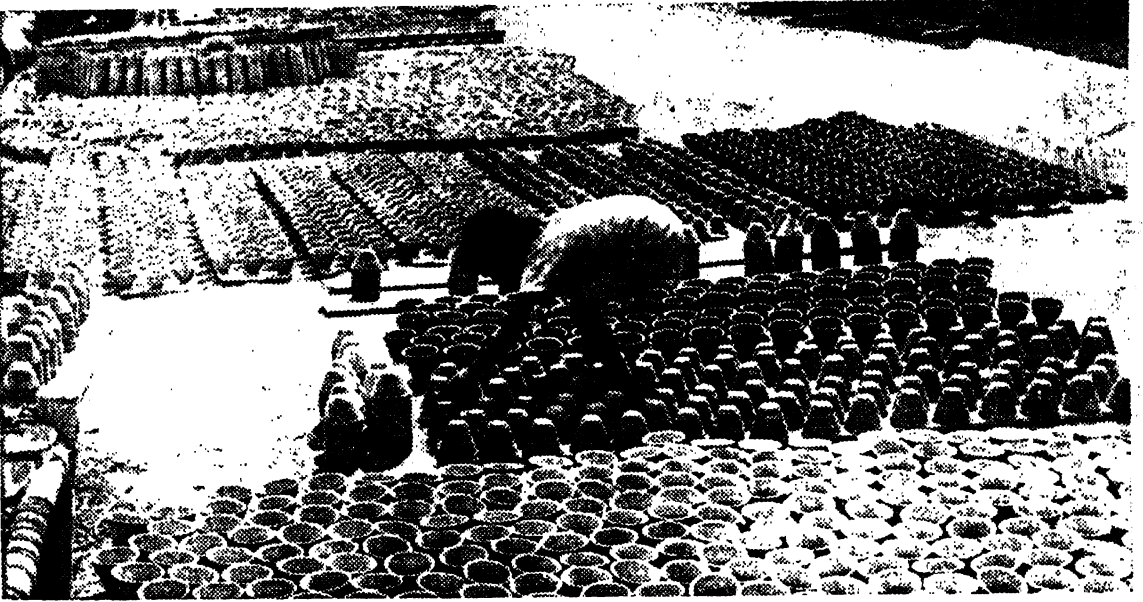
জীবিকা ফটো : সুনীলকুমার দত্ত

গ্রন্থিরস সূচিকার সাহায্যে রোগীর দেহে প্রবেশ করালে সে ভীতিজনক স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু এই ভীতিজনক স্বপ্ন তো রোগীর উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র, এর স্বারা কিছু প্রমাণিত হয় না।

আমরা বলেছি, ভারতীয় ঋষিদের মতে স্বপ্ন হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া। আমাদের বাসনাসমূহই সংস্কাররূপে পরিণত হয় আর স্বপ্নকালে এই সংস্কারগুলি মনের উপরিভাগে ভেসে ওঠে। অবশ্য, ভারতের ঋষিগণ এ কথাও বলেছেন যে, আমরা জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। এই সংস্কারের বীজকে দগ্ধ করাই যোগীদের জীবনের লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, যাঁদের সংস্কার শুভ, তাঁরা স্বপ্নে মঙ্গলজনক পদার্থ দর্শন করেন, যেমন তীর্থস্থান, মন্দির, দেবদেবী প্রভৃতি। যাঁদের ভেতর সত্ত্বগুণ প্রবল, সাধারণত তাঁরাই এরূপ স্বপ্ন দেখে থাকেন, আর যাঁদের ভেতর অশুভ সংস্কার প্রবল, তাঁরা স্বপ্নে ঘৃণ্য বা অমঙ্গলজনক অথবা ভীতি-জনক বস্তু দর্শন করেন, যথা—ভূত প্রেত, সাপ-ব্যাঙ প্রভৃতি। এ'দের অবৈধ কামনা স্বপ্নের ভেতর দিয়েই চরিতার্থ হয়। এ'রা হচ্ছেন রজোগুণী বা তমোগুণী মানুষ। এ'রা যদি রজোগুণ বা তমোগুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তবেই এ'রা সাত্ত্বিক স্বপ্নই দেখবেন। তাই আমরা যদি তীব্র সংকল্প ও তীব্র প্রয়াসের স্বারা দুর্বার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারি, তবে নিদ্রিত অবস্থায়ও মনের ওপর প্রভুত্ব করতে পারবো। মহামতি চরক বলেছেন—রজোগুণ আর তমোগুণই হচ্ছে মানসিক ব্যাধির কারণ। (তাই রজোগুণী ও তামসিক প্রকৃতির মানুষের স্বপ্ন হচ্ছে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের স্বপ্ন।) এই দুটি গুণকে জয় করার উপায় হচ্ছে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধি। সেই সঙ্গে আমাদের ভগবদ্‌গীতার বাণীও স্মরণ করতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—হে অর্জুন, যারা বেশী খায় অথবা যারা একান্ত অনাহারে থাকে, যারা বেশী ঘুমায় অথবা যারা বেশী জেগে থাকে, তাদের কারুরই চিত্ত স্থির হয় না। মনে রাখতে হবে, মধ্যপন্থাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে একমাত্র কল্যাণের পন্থা। ভগবান তথাগত ও দার্শনিক পণ্ডিত এরিস্টটল আমাদের এই মধ্যপন্থা অনু-সরণেরই উপদেশ দিয়েছেন। সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনকে দুশ্চিন্তা থেকেও মুক্ত রাখতে হবে। আমাদের মন যে পরিমাণে শান্ত হবে, সেই পরিমাণে আমরা সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার আনন্দ সম্ভোগ করতে পারবো।

আমরা বলেছি, মানুষ শুধু ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখে না, জেগেও স্বপ্ন দেখে, আর এটাই হচ্ছে মানুষের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কল্পনা করে, তারা বড়ো হয়ে কতো কী করবে। আমাদের জাগ্রত-স্বপ্ন ও নিদ্রাকালীন স্বপ্নের ভেতর অনেক সময়ে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে, কেননা, স্বপ্নের মধ্য দিয়েই তো 'আসল মানুষ প্রকট হয়'। তাই শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, যাতে তারা বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখতে শেখে। এ সংসারে যাঁদের আমরা মহামানব বা লোকোত্তর পুরুষ বলি, তাঁরা সবাই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। ভগবান তথাগত স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি সর্ব মানবকে তথা সর্ব ভূতকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করবেন, মহামানব যীশুও স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। যে মানুষ কোনোদিন জেগে স্বপ্ন দেখে না, যে মানুষ নিজের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে না, সে শুধু 'রাশিবর্ধনমাত্রং হি', মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র। তাই, আমাদের যেমন শুধুই স্বপ্ন-বিলাসী হলে চলবে না, তেমনি স্বপ্ন-বিদ্বেষী হলেও চলবে না, কেননা, স্বপ্নই হচ্ছে আমাদের সকল কর্মের উৎস। হয়তো, জ্ঞানীর চোখে আমাদের এই জীবনটা ও পরিদৃশ্যমান জগৎটা একটা দীর্ঘ-স্থায়ী স্বপ্নমাত্র, আর সে অর্থে পৃথিবীতে সকলেই স্বপ্নদ্রষ্টা, হয়তো সেক্সপীয়রের কথাই সত্য, 'We are such stuff as dreams are made of, হয়তো কোকিলকে সম্বোধন করে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ যা' বলেছিলেন তাই সত্য,—

'O blessed bird! the earth we pace,
Again appears to be,
An unsubstantial,' fairy, thing;
It is fit home for thee.'

তবু ধন্য তাঁরাই যাঁরা এই স্বপ্ন-পুরীতে বাস করেও বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখেন আর সেই সব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াস পান। মহৎ স্বপ্নই আমাদের মহৎ কর্ম করার প্রেরণা দেয়, সর্ব-প্রকার বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করার শক্তি প্রদান করে এবং প্রয়োজন হলে আমাদের ভেতর মৃত্যুকেও বরণ করার সাহস সঞ্চার করে। আমরা যে শ্রেণীর স্বপ্নদ্রষ্টার কথা বললাম, তাঁরাই সব চেয়ে বেশী কর্ম-কুশলী হন, স্বর্গ ও মর্ত্যের ভেতর তাঁরাই সেতু রচনা করে থাকেন।

আত্মবিস্মৃত জাতির ইতিহাস

বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি একথা পূর্বসূরীরা সখেদে বলেছেন। বর্তমান কালের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, সত্যই আমরা একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের যেন কোনো আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আমরা কিছু না বুঝেই ঝাঁপিয়ে পড়ি, কলরবে মাতি, মাঠে ঢিল ছুঁড়ি, ট্রাম বাস পোড়াই, আবার পরমুহূর্তেই অতীব শান্তশিষ্ট "মাথায় ছোট বাহারে বড় বাঙালী সন্তান"।

এই বাঙালী জাতি কে বা কোথা থেকে উদ্ভূত তার সঠিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ করে রচনা করেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। সাহিত্যিক, কলাবিদ এবং ঐতিহাসিক হিসাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বর্তমান কালে ডঃ নীহাররঞ্জন একজন খ্যাতিমান পুরুষ। বিদগ্ধ বাঙালী সমাজের তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি, তাই তাঁর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ডঃ নীহাররঞ্জন রচিত "বাঙালীর ইতিহাস" বাংলা ভাষার এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

আচার্য যদুনাথ সরকার ১৩৫৬ সালে মূল গ্রন্থের প্রকাশকালে পরিচয়পত্র প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> "বাঙালী জাতি কিরূপে তাহার এখনকার বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, চরিত্র ও জীবন প্রণালী লাভ করিয়াছে, কত শতাব্দীর বিচিত্র অভিব্যক্তির ফলে, এবং কোন্ কোন্ বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে আর ভিতরকার উৎস প্রবাহে বাঙালী ও বাংলা দেশ আজিকার এই আকার ধারণ করিয়াছে, এই সব কথা জানিবার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ইতিহাসের চরম গৌরব ও সার্থকতা। অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের মহাগ্রন্থে এই চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সে-চেষ্টা অসামান্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।"

আচার্য যদুনাথ ছিলেন ইতিহাস সম্পর্কে অতিশয় কঠোর বিচারক, কোনো রকম জনশ্রুতি বা জনপ্রবাদ বা অন্ধ-বিশ্বাসে নির্ভরশীল ইতিহাস রচনা প্রয়াস তাঁর কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। তাই নীহার-রঞ্জনের গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর এই অকুণ্ঠিত প্রশংসা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ডঃ নীহাররঞ্জন কোথাও পাণ্ডিত্য গোঁ প্রকাশ করে নিজের বিশ্বাস, অনুমান বা মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন নি। তিনি পূর্বসূরীদের মতামত বিশ্লেষণ করে নতুন যুক্তি এবং তথ্য [illegible] যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন পাঠকের কাছে তাই প্রকাশ করেছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জনের ভঙ্গী যেমন অভিনব তেমনই বিচিত্রভাবে তিনি বিষয়-বস্তু নির্বাচন করেছেন। আচার্য যদুনাথ সরকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "গ্রন্থের সমস্তটাই বিষয়বস্তু হইতেছে বাংলার লোকদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ প্রভৃতি। অর্থাৎ, বাঙালী জাতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা। বাংলার লোকেরা একেবারে আদিতে কেমন ছিল, কখন কোথা হইতে কে আসিল, এই ভূখণ্ডের নদ-নদী পাহাড়-প্রান্তর-বন-খাল বিল কালক্রমে কিরূপে পরিবর্তিত হইল, ভৌগোলিক প্রভাব এই প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কোথায় কি কি কাজ করিয়াছে, বাঙালীর দেহে কোন্ কোন্ জাতির রক্ত কিভাবে মিশিয়াছে; অতীত যুগের ভূমিসংস্থা, কৃষি-পদ্ধতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অশন-বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্প-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এক কথায় প্রাচীন বাঙালীর জীবনের সকল দিক, হাজার বৎসর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইল—এই সব তলাইয়া বুঝিবার এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা এই গ্রন্থে হইয়াছে।"

আচার্য যদুনাথের মত সহজে এবং এমন সরল ভঙ্গীতে এই পরিচয় দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই উধৃতি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক উপরি উধৃত মন্তব্য থেকে স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারবেন যে, ডঃ নীহাররঞ্জন কি অসাধ্য সাধন করেছেন। একত্রে এতগুলি গুণসম্পন্ন 'বাঙালীর ইতিহাস' ডঃ নীহার-রঞ্জনের পূর্বে আর কেউ রচনা করেন নি, সেই দিক থেকেও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন ১৩৪৬ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত অধরচন্দ্র বক্তৃতা দানে আমন্ত্রিত হয়ে পর পর তিনটি বক্তৃতা দান করেন। সেই বক্তৃতা সভার সভাপতি ছিলেন আচার্য যদুনাথ। ডঃ নীহাররঞ্জন 'বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো' প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ভাষণ দান করেন। আচার্য যদুনাথ লেখককে উৎসাহিত করেন এবং বাঙালীর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য লেখককে অনুপ্রাণিত করেন। বাঙালীর মনীষার গৌরব ও বাংলার গৌরবের আদি পর্ব রচনার কাজে পরে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

সেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন অধুনালুপ্ত 'বুক এম্পোরিয়াম'। বুক এম্পোরিয়াম অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু "বাঙালীর ইতিহাস" তাঁদের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। সেই কালে গ্রন্থের দাম ছিল কুড়ি টাকা। গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন আচার্য যদুনাথ এই মহাগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সুলভ সংস্করণ প্রকাশের জন্য লেখককে অনুরোধ করেন। এতদিনে সেই মূল-গ্রন্থটিকে সংক্ষেপিত করেছেন জ্যোৎস্না সিংহরায়। তাঁর এই সংক্ষেপীকরণের বৈশিষ্ট্য এই যে, "মূলের ভাষা এবং বাক-ভঙ্গিকে অবিকৃত রাখিয়া এই সংক্ষেপ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে" একথা বলেছেন স্বয়ং ডঃ নীহাররঞ্জন। সংক্ষেপকার জ্যোৎস্না সিংহরায় এই প্রশংসার অধিকারী, তিনি মূল লেখকের মৌল সাহিত্যরসটির সূক্ষ্ম স্পর্শ ঠিকমত উপলব্ধি করেছেন এবং সংক্ষেপীকরণের কাজে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ভিন্ন এমন সাফল্য লাভ সহজে সম্ভব নয়। জ্যোৎস্না সিংহরায় স্বয়ং সুপণ্ডিত, তাই মূল গ্রন্থের সাহিত্যরস এবং ঐতিহাসিক বক্তব্য তিনি যথাযথ অক্ষুন্ন রাখতে সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন : "নীহার-রঞ্জনের আবেগদীপ্ত সামাজিক অনু-ভূতিকে পাঠক হৃদয়ে যথাসাধ্য সঞ্চারিত করার আকাঙ্ক্ষা আমাকে সংক্ষেপ কার্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।" জ্যোৎস্না সিংহরায় এই সুকঠিন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

বাংলার ইতিহাস এবং বাঙালীর ইতিহাস দুইটি এক বস্তু নয়, দুয়ের মধ্যে কোথায় প্রভেদ তা সকলেই জানেন। বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা অনেকের থাকা সম্ভব, কিন্তু সেই ধারণা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অজ্ঞতায় পরি-পূর্ণ। একথা অনেকেই জানেন যে, বঙ্কিম-চন্দ্র একদা সখেদে বলেছিলেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না......সে ইতিহাস বলিবে, রাজ্যশাসন প্রণালী কিরূপে ছিল, শান্তি-রক্ষা কিরূপে হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? কত প্রকার রাজকর্মচারী ছিল? — ইত্যাদি" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। প্রাচীন বাঙালীর সমাজজীবনের কথার সংগে জড়িত বাঙালীর ইতিহাস। সমাজবিন্যাসের ইতিহাস প্রকৃত জনগণের ইতিহাস। লেখক বলেছেন জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে নি, বাংলা দেশের মানুষের একটি বিশিষ্ট রূপ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, সেই ভালোবাসা এবং ভালোলাগার প্রেরণাতেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জনের সাহিত্যরসসমৃদ্ধ এই পরিচ্ছন্ন, তথ্যনির্ভর এবং তত্ত্বানুগ ইতিহাস বাঙালী মাত্রেরই পঠিতব্য। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছিলেন—'বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা'। এই বাঙালী জনসাধারণের অর্থ রাজা থেকে রাজপেয়াদা, জমিদার থেকে ভূমিদাস, জোতদার থেকে মজদুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষ। এতাবৎ তাদের কথা ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েছে, আলোচনার অংশ হিসাবে গৃহীত হয় নি। নানা বিচিত্র উপাদান বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী এবং তিব্বতে ও নেপালে প্রাপ্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভিন্ন বিষয়ক পুঁথি-পত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস প্রসংগে নরতত্ত্ব ও জনতত্ত্বের সংগে ভাষাতত্ত্বের কথা এই আলোচনায় অংগীভূত করেছেন। "বাঙালীর জন, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট ঊষাকালের কথা" ঠিক এইভাবে আর কেউ তাঁর পূর্বে পরিবেশন প্রয়াসী হন নি, ডঃ নীহাররঞ্জন এই কারণেই স্মরণীয় একথা পূর্বেও বলেছি।

সুবৃহৎ মূল গ্রন্থের সামগ্রিক বক্তব্য এই সংক্ষেপিত সংস্করণে আছে এবং মূল লেখকের ভাষাও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন সংক্ষেপক জ্যোৎস্না সিংহরায়। তাই সংক্ষেপিত সংস্করণের আয়তন প্রত্যাশিত মাত্রা অতিক্রম করেছে। সংক্ষেপিত গ্রন্থটি লাইনো টাইপে প্রায় পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের প্রকাশকগণ লাভের লোভে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নি। এতাবৎ তাঁরা কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁদের প্রতিষ্ঠানগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করেছেন এই কারণে তাঁরা অভিনন্দন-যোগ্য।

—অভয়ঙ্কর

বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব (ইতিহাস)—নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত। জ্যোৎস্না সিংহরায় কর্তৃক সংক্ষেপিত। প্রকাশক — লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা — ২৬। পরিবেশক — বাক সাহিত্য ও মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা—৯। দাম—আঠারো টাকা মাত্র।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস ॥

গত ১লা আষাঢ় সাহিত্য তীর্থের উদ্যোগে বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী। এবারের অনুষ্ঠানটি শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষের আমন্ত্রণে বংগভাষা প্রসার সমিতির ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘদূত' অনুবাদ পাঠ করেন। ডঃ রমা রায় 'সংস্কৃত কাব্যে বর্ষাবর্ণনা', ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোকসাহিত্যে বর্ষাবর্ণনা' এবং ডঃ অজিত-কুমার ঘোষ 'রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষাবর্ণনা' বিষয়ে তিনটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

একজন তরুণ হিন্দী কবি ॥

আধুনিক তরুণ হিন্দি কবিদের মধ্যে রাজকমল চৌধুরীর নাম বিভিন্ন কারণেই উল্লেখযোগ্য। হিন্দি কাব্য আন্দোলনে তিনিই 'বীট' প্রভাবিত 'ভুখা পিঢ়ি' আন্দোলনের প্রবর্তক। তাঁর কবিতা কতদূর সার্থক হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে যে যথেষ্ট মতভেদ আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে বিশেষ হৈ-চৈ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সে বিষয় সকলেই একমত হবেন।

ইদানীং, তাঁর কবিতায় তান্ত্রিক শব্দশ্রয়ী এক বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহারের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তাঁর কবিতায় প্রতীকী কথন প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরাজকমল চৌধুরী তাঁর কবিতা সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন : "আমার কবিতা এবং আমার বাসনা আমার কাছে প্রথম ও অন্তিম বর্তমান। এর মধ্যে অর্থাৎ এর কোনও একটার সংগে একাত্ম হয়ে আমরা সামিল হতে পারি। এছাড়া ভবিষ্যতের সংগে সামিল হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।" এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত যে, তাৎক্ষণিক বর্তমানই তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষণ।

কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর কবিতা কতখানি কালের বিচারে টিকে থাকবে, তা বিশ্লেষণ এখানে অবান্তর। কিন্তু হিন্দি সাহিত্যে এখন তাঁর খুব নামডাক।

সাম্প্রতিক মারাঠি উপন্যাস ॥

একটি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এ বছর মারাঠি ভাষায় ৭০০ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একশত হচ্ছে উপন্যাস। এর আগে মারাঠি সাহিত্যে এত বেশি উপন্যাস এক বছরে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা এই যে, উপন্যাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ছোটগল্পের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। মাত্র ৭০টি ছোটগল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবার। সাহিত্যের ইতিহাসে সাম্প্রতিককালে এরকম ইতিহাস খুব কম লক্ষ্য করা যায়।

সম্প্রতি একটি উপন্যাস নিয়ে যতো বাদানুবাদ, হৈ-চৈ হয়েছে, এর আগে এরকম কখনও দেখা যায় নি। যে উপন্যাসটি নিয়ে এত আলোড়ন, তার নাম "স্বামী"। আসলে এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম পেশোয়ার মাধব রাও এর নায়ক। তাঁর পতনের পরেই ইংরেজরা সেই দেশ জয় করে। এই গ্রন্থটির এ পর্যন্ত ৮০০০ কপি বিক্রী হয়েছে। এই জনপ্রিয়তা দেখে গ্রন্থটির একটি সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করা হয় এবং এক মাসের মধ্যে তারও ১০,০০০ কপি বিক্রী হয়ে যায়। অন্ততঃ বিক্রীর দিক থেকে মারাঠি সাহিত্যে এটি একটি রেকর্ড।

সম্প্রতি মারাঠি সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কিন্তু, সামাজিক উপন্যাস রচনায় ভাটা পড়েনি। বিশেষ করে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় আগ্রহ অত্যধিক লক্ষ্য করা যায়। মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। এদিকে সর্বাধিক সার্থকতা দেখিয়েছেন শ্রীভেঙ্কটেশ মুদগালকার। তাঁর রচনায় গ্রামীন চরিত্রগুলি খুবই বাস্তব হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁকে যারা অনুসরণ করেছে, তাদের মধ্যে একটা কৃত্রিমতা লক্ষ্যণীয়।

তবে এই সার্থকতা সত্ত্বেও তথাকথিত উপন্যাসেরও অভাব বেশি নেই। যাই হোক, উপরের পরিসংখ্যান থেকেই জানা যায়, গত বছর সবসমেত ৩,০০,০০০ কপি মারাঠি উপন্যাস বিক্রীত হয়েছে এবং প্রায় ৩০,০০,০০০ জন পাঠক এইসব উপন্যাস পাঠ করেছে।

দুটি তেলেগু নাটক ॥

তেলেগু সাহিত্যে নাট্যসাহিত্য খুব সমৃদ্ধ নয়। তবে এবার দুটি নাটক মৌলিকতার দিক দিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রথম নাটকটির নাম 'পুতুল আপিনা বন্দী'। এই নাটকটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীরবি কন্ডালারাও। দ্বিতীয় নাটকটির নাম 'কলিকালাম' এবং রচয়িতা শ্রীরবি রাধাকৃষ্ণ। দুটি নাটকই পরীক্ষামূলক। তাছাড়া চরিত্রসৃষ্টিতেও তাঁদের অভিনবত্ব আছে। দ্বিতীয় নাটকটি বর্তমান সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত এবং বর্তমানের বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি নাট্যকার তীব্র কটাক্ষ করেছেন। সমাজের তথাকথিত নেতাদের চরিত্র তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

পাঞ্জাবিতে অনুবাদ ॥

পাঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদের সংখ্যা খুব বেশি নেই। তবে অতি সাম্প্রতিককালে অনুবাদের দিকে বেশ একটা ঝোঁক পড়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষা থেকে এইসব অনুবাদ হয়েছে। ভারতীয় ভাষা

থেকে যেসব অনুবাদ হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটকের অনুবাদের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই দুটি নাটকের একটি সংকলন অনুবাদ করেছেন শ্রীকর্তার সিং ডুগাল, মোহন সিং এবং বলবন্ত গার্গী। এছাড়া কাশ্মীরী কবিতার অনুবাদ করেছেন শ্রীহরবাল সিং আজাদ। ভারতীয় ভাষা থেকে পাঞ্জাবিতে এই দুটিই উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী ভাষা থেকে যেসব অনুবাদ হয়েছে, তার মধ্যে আছে, ইংরেজি থেকে হেনরি ডেভিড থিওডোর-এর 'ওয়ালডেন'। এটি অনুবাদ করেছেন শ্রীগোপাল সিং। ফরাসী 'মাদাম ভোভারি'র অনুবাদ করেছেন শ্রীগোবিন্দর সিং রামদেব। ইবসেনের 'পিলারস অব সোসাইটি' অনুবাদ করেছেন শ্রীঅমর সিং মালিক। মিখাইল সোলোকভের কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন শ্রীসুখাবীর। এছাড়াও আরো কিছু অনুবাদ হয়েছে। তবে উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলিই অনুবাদের দিক দিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

নেহেরুর সম্মানে পশ্চিম জার্মান ॥

ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সম্মানে পশ্চিম জার্মান সরকার একটি বার্ষিক ৫,৪০০ টাকা মূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এই পুরস্কার আগামী বৎসর থেকে দেওয়া হবে। এর জন্য এর মধ্যেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। পুরস্কারের জন্য সারা ভারতের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভারত-জার্মান সংস্কৃতির উপর লিখিত রচনাই এই প্রতিযোগিতার জন্য স্বীকৃত হবে। পুরস্কার প্রদান করবেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ভারতে জার্মানির রাষ্ট্রদূত।

কবিতা পাঠের আসর ॥

বাংলা কবিতা পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১৬ জুন সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনে একটি কবিতাপাঠের আসর আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুশীল রায়। কবিতাপাঠে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমানস রায়চৌধুরী, শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত। কবিতা আন্দোলন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীসাজসুল হক।

বিদেশী সাহিত্য
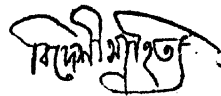
কবি ও কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের সমস্যা ॥

আমরা অনেকেই মনে করে থাকি বিদেশে, বিশেষতঃ ইংরেজীভাষী দেশগুলিতে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের কবিতার বইয়ের খুব ভালো বিক্রী আছে। সম্প্রতি চার্লস মন্টিয়েথের একটি আলোচনা থেকে বোঝা যায় এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। চার্লস মন্টিয়েথকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা কবিতার বই কেন প্রকাশ করেন? তার বিক্রী থেকে কি লভ্যাংশ কিছু থাকে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন কবিতার বই আমরা আজকাল অনেকটাই প্রকাশ করে আনন্দ পাওয়ার জন্য ছাপিয়ে থাকি। কবিতার বই ছাপিয়ে লাভ করার কথা যদি কেউ ভেবে থাকেন তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হবে। অনেকক্ষেত্রেই আজকল সম্ভাবনাময় কোন কোন তরুণ প্রতিভার প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই প্রকাশকরা তার একটি বই প্রকাশের চেষ্টা করে থাকেন। তার পেছনে কোন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থাকে না। কেননা এখন কোন নতুন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণই ছাপা হয় মোটে ৩০০০ কপি। কবিতার বই সেক্ষেত্রে বড়জোর ১০০০ অথবা তারো কম ছাপা হয়। এই কম ছাপানোর জন্যই ইদানীং কবিতার বইয়ের দামও একটু বেশী করতে হচ্ছে। কেননা ছাপার যা খরচা এক হাজার কপির বিক্রীতে তা উঠে আসে না। এর কারণ ৩০০০ কপি এবং ১০০০ কপি ছাপতে খরচের মুদ্রা সমান অঙ্ক। সে কারণেই এক হাজার যার প্রথম মুদ্রণ সে গ্রন্থের মূল্য ধরা হয় ৪ শিলিং। সেক্ষেত্রে তিন হাজার কপির একেকটির দাম দাঁড়ায় মোটে ১শিঃ ৬ পেঃ। অল্পসংখ্যক ছাপার জন্যে একারণেই কবিতার বইয়ের দাম বেশী করতে হয়। এর মধ্যে আবার বাঁধাই, কাগজ, জ্যাকেট, লেখকের রয়্যালটি এবং বিক্রেতার কমিশন আছে। [illegible] কিছুই থাকার কথা নয়। তার উপর বিক্রীর মন্দা। এ প্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন যে, হার্ডবোর্ডে কবিতার বই না বের করে পেপারব্যাকে বের করলে মোট খরচের মূল্য অনেক কমবে। কিন্তু প্রকাশকরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে পেপারব্যাক কাব্যগ্রন্থ কোন লাইব্রেরী নিতে চায় না। কবিতার সংগ্রহকারীদের মধ্যেও তাঁরা এ অসন্তোষ লক্ষ্য করেছেন। পেপারব্যাক করা চলে একমাত্র এমন কাব্যগ্রন্থের যে বইয়ের বিক্রী লেখকের নামানুসারে হু হু করে চলবার সম্ভাবনা এবং যে কবির কবিতা বহুপঠিত ও যিনি জনপ্রিয়। যেমন অডেন, রুপার্ট ব্রুক, এলিয়ট, টম গান, টেড হিউজ, লোরেল, ম্যাকনিস, স্পেন্ডার, এডওয়ার্ড টমাস প্রভৃতি কবিতার পেপার-ব্যাক এখনও খুব কাটতি। আজকাল পেপারব্যাক হয় সেইসব কবিতার বইয়ের যেগুলি বহুদিন নিঃশেষিত অথচ জনপ্রিয়তা ও চাহিদার হেতু যেগুলির পুনর্মুদ্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাজে কাজেই কবিতার বই প্রকাশ করার ব্যাপারে কবি-নির্বাচনের প্রশ্নটি সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে। মন্টিয়েথ বলেছেন, বছরে ৫০০-৬০০টি কবিতা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাদের দপ্তরে আসে। কবি-নির্বাচন তাই দুরূহ সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। প্রতি তিন বছরে একজনের বেশী নতুন কবির বই প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। অনুবাদ-গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য কবির দ্বারা অনূদিত না হলে দোকানীর ঘরে পড়ে থাকে। 'কবি ও কবিতা নির্বাচনের কাজ তাই আমরা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। যদি কোন কবির একটু আধটু নামডাক হয় তাহলেই তার কবিতার বই আমরা প্রকাশ করে থাকি'—বলেন মন্টিয়েথ। তবে মজার কথা হচ্ছে যে যার বই একবার বিক্রী হতে শুরু করে একটি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই বিক্রী বেশ চলতে থাকে। সে সময় লাভের অঙ্কও বাড়ে—এমনকি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে 'বেস্ট সেলার'-ও হয়ে যায়। যেমনটি হয়েছিল এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর ক্ষেত্রে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ॥

ক্যারিবিয়ান সাহিত্য এখন সমৃদ্ধির পথে। এ পর্যন্ত ক্যারিবিয়ানদের যে কজন দিকপাল সাহিত্যকার পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যরসিক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে রয় ফুলার, ন্যাদিন গর্ডিমার এবং ফ্রাঙ্ক তুয়োহির নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। অপেক্ষাকৃত তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে হালে জনপ্রিয় হতে চলেছেন মাইকেল অ্যান্থনি। বিদেশী সমালোচকরা অ্যান্থনি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ও তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আস্থাবান।

মাইকেল অ্যান্থনি এ পর্যন্ত মোট তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনটিই তাঁকে অশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে ত্রিনিদাদ অঞ্চলের মানুষ। তাদের বাস্তব দুঃখ ও জীবনধারণের সংগ্রাম। এবং প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্গতির অতি বাস্তব চিত্র।

বর্তমানে অ্যান্থনি বৃটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ১৯৬৩ সালে বেরিয়েছে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি গেমস ওয়্যার কামিং'। বিশ্লেষণ পদ্ধতির অভিনবত্ব ও সুচারু বর্ণনপদ্ধতি তাঁকে সেই সূত্রে ইংরেজী সাহিত্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দি ইয়ার ইন সানফার্নান্ডো' তাঁকে খ্যাতির উচ্চশীর্ষে নিয়ে যায়। চরিত্র-চিত্রণ আলোচ্য উপন্যাসটির অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ। বারো বছর বয়সের এক দরিদ্র বালক ও তার বিধবা নিঃসহায় মায়ের অপরিসীম সংগ্রামের কাহিনী এর প্রতিপাদ্য। তাঁর সর্বশেষ ও তৃতীয় উপন্যাসটি হচ্ছে 'গ্রীন ডেজ বাই দি রিভার'। এতে পনেরো বছর বয়সের এক কিশোরের যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া ও

যৌনতার সংস্পর্শে এসে জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতাবরণের কাহিনী ট্র্যাজিক রসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাইকেল অ্যান্থনি এসমস্ত ব্যর্থতার ও ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য ত্রিনিদাদ অঞ্চলের চির-দারিদ্র্যকে দায়ী করেছেন। 'দারিদ্র্যের আত্যন্তিক নিপীড়নই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তথা ত্রিনিদাদের মানুষকে স্বপ্নকল্প ও আকাশছোঁয়া বিলাস থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে ছুঁড়ে মারছে'—এক সাক্ষাৎকারে অ্যান্থনি তাঁর এই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

১৯৬৬-র অস্ট্রেলিয় কবিতা সংকলন ॥

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয় কবিতার একটি বার্ষিক সংকলন গ্রন্থ বেরিয়েছে 'অস্ট্রেলিয়ান পোয়েট্রি' নামে। এতে ১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলিয় কবিদের গুচ্ছ-কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।......"সংকলনটি কবিতা-পাঠকদের হতাশ করবে। কেননা কোন সংকলনে যে পরিমাণ কবিতা ভালো হওয়া উচিত তুলনায় নিকৃষ্ট কবিতারই সংখ্যাধিক্য দুঃখজনক"—অধিকাংশ সমালোচকই আলোচ্য বইটি সম্পর্কে এরকমের মত ব্যক্ত করেছেন। সংকলনটির অধিকাংশ কবিতাতেই না আছে যুগধর্মের নিয়ত পরিবর্তনশীলতা, মূল্যবোধের সংঘর্ষ, মৌলিকত্ব, নির্মাণশৈলী। কেবল গাছপালার বর্ণনা, সুন্দর সুন্দর জায়গার নাম, আঞ্চলিক প্রবাদ প্রবচন—যেন গত শতাব্দীর ইংরেজী কবিতারই এগুলো সরলীকরণ। অস্ট্রেলিয় কবিদের কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যেন চোখেই পড়ে না। সবই যেন ইংরেজী থেকে ধার করা। যেমন ডগলাস স্টুয়ার্টের 'বি ফ্ল্যাট' অনন্য হয়েও যেন কবি অডেনের প্রতিধ্বনি, অন্যদিকে এ ডি হোপের কাবিতা কবি গ্রেভস্-এর সরলীকরণ।

আলোচ্য বছরটিতে অস্ট্রেলিয় কবিতার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। সংকলনটি সে উদ্দেশ্যেই অস্ট্রেলিয়ার কাবিতাচর্চাকে আরো দৃঢ় করতে চেয়েছে। অবশ্য একথাও বলা চলে যে, আলোচ্য সংকলনটির উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠতর কবিদেরও নির্দিষ্ট করা। একথা মেনে নিলে কেবলমাত্র জেফ্রি লেহ্‌ম্যান এবং ভিন্সেন্ট বাকলের কবিতাই সবচেয়ে আশাপ্রদ বলা চলে। অবশ্য কেনেথ ম্যাকেঞ্জির 'দি ডোর' অথবা গ্রেস পেরীর 'আইডেন্টিফিকেশন'ও ভিন্নতর স্বাদের জন্য বিশিষ্ট।

একটি উল্লেখযোগ্য বই : 'কস্‌মস্' ॥

কস্‌মস্ বইটির লেখক হচ্ছেন উইটোল্ড গোমব্রোউয়িকজ। জাতে ইনি ফরাসী। সম্প্রতি বইটি প্রিক্স ইন্টারন্যাশনাল দ্য লিটারেচার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এর একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদক এরিক মসবেখার। বইটি প্রকাশ করছেন 'ম্যাকগিবন অ্যান্ড কী' সংস্থা।
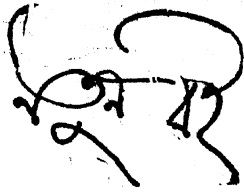
ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। এ বিতর্ক শুধু আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, পশ্চিমের মনীষী সমালোচক মহলেও এ সম্পর্কে মতৈক্য ঘটে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ঘটনাবস্তু ও চরিত্র আছে, তবু 'রাজসিংহ' ছাড়া আর কোনো উপন্যাসকে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে সম্মত হন নি। আবার আচার্য যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞানির্ণয়ে আসল মতভেদ হল ঐতিহাসিক যথার্থ্যের তারতম্য নিয়ে। একদল মনে করেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে হলে চাই ইতিহাসের আনুগত্য। আর একদল ইতিহাসের দু'একটি ক্ষীণসূত্র ধরে নিজের খেয়াল-খুশি মতো কাহিনী তৈরী করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দু শ্রেণীর ঐতিহাসিক আখ্যায়িকারই সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো মনীষী ব্যক্তি উপন্যাস লিখতে বসে নির্জলা ইতিহাস পরিবেশন করতে গিয়ে উপন্যাসকে দুর্বল করেছেন। আবার এর বিপরীত উদাহরণও আছে। সেখানে সামান্যতম ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে সস্তা রোমান্সের কল্পিত আখ্যায়িকা দাঁড় করানো হয়েছে। বঙ্কিমানুসারী অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতাই এই সস্তা রোমান্সের মোহে মুগ্ধ হয়েছেন। সে যুগে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁর দিব্য প্রতিভাবলে উপরোক্ত দুটি দুর্লক্ষণ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

অবশ্য একালে ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। ইতিহাস-গবেষকদের প্রচেষ্টায় আলোকিত হচ্ছে অনাবিষ্কৃত তথ্য-সম্ভার। ইতিহাস যে কতকগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনাপুঞ্জ নয়, যুদ্ধবিগ্রহের উন্মাদ কোলাহল নয়, বাদশা-বেগম-বাঁদীর কিস্‌সা-কাহিনীমাত্র নয়—এ সত্য বর্তমান যুগে সুবিদিত। তাই আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের বহিরাশ্রয়ী রঙ্গভূমির নেপথ্যে অনুসন্ধান করেন এর সুদূরপ্রসারী অর্থবহ তাৎপর্য। তাই আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকের কাছে রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লোকজীবনের ইতিহাস। যাঁরা এই নবজাগ্রত ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন, তাঁদের দায়িত্ব গুরুতর। কারণ ইতিহাসের রাজপথ ও রাজাবাদশার কীর্তিকলাপ সম্পর্কিত কাহিনী ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা সহজ, কিন্তু ইতিহাসের যে সব অন্ধকার গলিপথ আছে যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ ও আনন্দবেদনার বহু ইতি-

ইতিহাস ও লোকজীবন

হাস ছড়িয়ে আছে তাকে আবিষ্কার করা সহজ নয়। শিল্পীর জীবনদৃষ্টিই একমাত্র ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে যদি সুলভ রোমাঞ্চ ও খোশগল্প তৈরি করার দিকেই ঔপন্যাসিকের প্রবণতা হয় তা হলে শিল্প হিসাবে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রসন্নিবেশের মধ্যে কল্পনাশক্তি বা উদ্ভাবনের স্থান আছে কিন্তু তা যথেচ্ছাচারী নয়, ইতিহাসের সম্ভাব্যতা তাকে মানতে হয়, মানতে হয় স্থান-কাল ও যুগজীবনের অমোঘ নির্দেশ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'আঁধারমানিক' উপন্যাস বাংলা দেশের বর্গীহাঙ্গামার পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৪২—৫১) বাংলা দেশে বর্গী আক্রমণের ইতিহাস একটি সাধারণ ঘটনামাত্র নয়। যুগসন্ধি ও পটপরিবর্তনের এক অভ্রান্ত সংকেত বর্গীদস্যুদের অশ্বখুরধ্বনিতে ও উন্মুক্ত তলোয়ারের নির্মম আঘাতে সচকিত হয়ে উঠেছিল। বর্গী আক্রমণ থেকে মুক্ত হওয়ার মাত্র ছ' বছর পরের ঘটনা পলাশীর যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজদ্দৌলার পতন প্রকৃতপক্ষে একটি অনিবার্য ফলশ্রুতিমাত্র। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ও দেশপ্রেমিক বাঙালী কবিরা পলাশীর যুদ্ধের ওপর প্রাপ্যের অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ একটি পরিণামমাত্র, নবাব সিরাজদ্দৌলা তার একটি প্যাথেটিক উপলক্ষ। আওরংজেবের মৃত্যুর পর পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যের সুযোগে গড়ে উঠলো মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদ। নাদিরশাহের আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য পতনকে আরো সুনিশ্চিত করে তুললো। ভারতভাগ্যাকাশে যখন এই যুগান্তকারী পটপরিবর্তনের লীলা চলেছিল, তখন ভারতের পূর্বপ্রান্তে ঘনিয়ে এসেছিল যুগান্তের ঘনঘটা। নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকাল (১৭৪০—৫৬) বাংলা দেশের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে এইকালের মধ্যেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তকে এক সুদূরপ্রসারী কালান্তরের ইংগিত সূচিত করেছিল। বর্গীর আক্রমণ ও ভয়াবহ অত্যাচার দেশের পুরনো কাঠামোর ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল। এই কালের ঐতিহাসিক বলেছেন :

> "The Maratha incursions were perhaps the most calamitous events in the history of Bengal during the first half of the eighteenth century. Their influence was felt more or less, in every sphere of life, economic, social and political".

'আঁধারমানিক' উপন্যাসে ইতিহাসের মূল কাঠামোটিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নবাব আলিবর্দী, মির হাবিব, ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, জানকীরাম, ভাস্কর পণ্ডিত প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও তাঁদের চরিত্ররূপ জীবনরসে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইতিহাসগবেষকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ যুগের ইতিহাস অনেকখানি আলোকিত হয়েছে। 'সিয়ার-উল-মুতক্ষরিণ,' 'মুজফফরনামা, 'তা রখ-ই-বাঙগলা,' রিয়াজ-আস্-সলাতিন,' প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও যদুনাথ সরকার কালী-কিঙ্কর দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকের একাধিক গ্রন্থে এই যুগের মর্মবাণী ও ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যেও রাষ্ট্রীয় সমাজজীবনের কিছু কিছু প্রতি-ফলন ঘটেছে। সবচেয়ে জীবন্ত বর্ণনা আছে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' গ্রন্থে। লেখিকা এই সব আকরগ্রন্থ থেকে যুগ-সংকটের যে ছবি এঁকেছেন, তা যেমন জীবন্ত তেমনি অন্তরঙ্গ। বর্গীর আক্রমণের জন্য আলি-বর্দীর মতো বিচক্ষণ শাসনকর্তারও বিচলিত হতে হয়েছিল, অন্যদিকে তেমন নজর দেওয়ার অবকাশ হয়নি; সেই সুযোগে বিদেশী বণিকদের সুযোগ-সন্ধানী কর্মতৎপরতা তীব্রতর হয়েছিল। এই আক্রমণের ফলে ভেঙে পড়লো বাংলা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে এই দুর্যোগ না ঘটলে বাংলা তথা ভারতের ইতি-হাস কেমন হতো সে কথা কে বলতে পারে! বর্গীর আক্রমণকে কেন্দ্র করে লেখিকা বাংলা দেশের যুগসন্ধি ও নবযুগের যে ইঙ্গিত ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা যেমন বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি সমগ্র।

কিন্তু ইতিহাসবিধাতার অমোঘ নির্দেশ পালন করেও লেখিকা ঔপন্যাসিক মর্যাদা পূর্ণরূপেই রক্ষা করেছেন। বর্গীর অত্যা-চারের ফলে সেদিন পশ্চিম বাংলার লোক-জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, বাস্তুহারা নরনারীর বিপুল জনস্রোত যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে ও কলকাতায় তার বিস্ময়কর ব্যাপক ও জীবন্তরূপ ঔপ-ন্যাসিকের বলিষ্ঠ চিত্রাংকনী ক্ষমতার পরি-চয় দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধ সংস্কারা-চ্ছন্ন সমাজজীবনের নির্মম যূপকাষ্ঠে অস-হায় নরনারীর আর্ত হাহাকার যেমন 'আঁধারমানিক'কে কেন্দ্র করে গোটা বাংলা দেশের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি এই শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় শাসন-পাশের বিরুদ্ধে জেগেছিল প্রবল প্রতিবাদ। অষ্টা-দশ শতাব্দীর বাংলা দেশের মিশ্রমানস ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র কাহিনী আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে লেখিকা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সে যুগের ঘূর্ণিবাত্যায় নর-নারীর হাসি-কান্না যে সুরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, তা লেখিকার পর্যবেক্ষণদক্ষ অন্তরঙ্গ চিত্রণে উদ্ভাসিত হয়েছে। সন্ন্যাসী সুরকণ্ঠের ভবিষ্যদৃষ্টি আনন্দরাম-ফুলেশ্বরীর দাম্পত্য সঙ্কট, প্রতিহিংসোপরায়ণ নরপতি, অন্ধসংস্কারের যূপকাষ্ঠে নির্মলা ও পারীর নির্মম বলিদান, কামিনীকাঞ্চন-মোহ-মুগ্ধ জগৎপতি, নতুন যুগের মানুষ কাশীশ্বরের সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, বিশা-লাক্ষীর সর্বসংস্কারের ঊর্ধ্বে মাতৃ-মমতার অপরূপ প্রকাশ, শিবকালী গাঙ্গুলীর ঔদার্য ও হৃদয়বত্তা—প্রভৃতি চিত্র ও চরিত্র জীবনমহিমায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। আঁধার-মানিক উপন্যাসে ইতিহাসের রাজপথের শোভাযাত্রাকে অতিক্রম করে অবজ্ঞাত গলি-পথের বিচিত্র কাহিনীই বড়ো হয়ে উঠেছে। বর্গীর আক্রমণের ভয়াবহ আঘাতে বাংলা দেশের সামগ্রিক ইতিহাস কীভাবে রূপান্ত-রিত হয়েছিল 'আঁধারমানিক' তারই মহাকাব্য। মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর বর্ধমান, হুগলী-চন্দননগর প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক জীবনের মধ্যযুগীয় বিলাসবিভ্রমের রোমাঞ্চ-কর ছবি আঁকার কোনো কৌতূহল নেই লেখিকার, 'আঁধারমানিক' গ্রামকে ঘিরে সাধা-রণ মানুষের আনন্দ-বেদনারই ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। যুগসংকটের উত্তাল তরঙ্গের তালে তালে লোকজীবনের বিচিত্র বিবর্তন মহাশ্বেতা দেবীর বলিষ্ঠ লেখনীর রেখায় রূপ পেয়েছে। ইতিহাসের তাৎপর্য আবি-ষ্কারে, অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায়, কাহিনী-কথনের সাবলীলতায়, চরিত্রঅংকনের তীক্ষ্ণ-তায় 'আঁধারমানিক' বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট সংযোজন। ইতিহাস ও মানবজীবনের এমন বাঞ্ছিত সমন্বয় বাংলা উপন্যাসে খুব বেশি ঘটে নি। শিল্পের এই দুরূহ ভার-সাম্য রক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় লেখিকা উত্তীর্ণ হয়েছেন।

—রথীন্দ্রনাথ রায়

আঁধার মানিক— মহাশ্বেতা দেবী। মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। সাড়ে বারো টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবনাদর্শ সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' কাগজটি রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। বর্তমানে পত্রিকাটি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই সংখ্যায় চারটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ভূদেব চৌধুরী, দেবদাস জোয়ারদার, সোমেন্দ্রনাথ বসু ও কিরণশশী দে।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (৬ষ্ঠ বর্ষ: ১ম সংখ্যা) সম্পাদক: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, এলগিন রোড, দাম: এক টাকা।

●

কবিতার কাগজ হিসেবে "শতভিষা" মোটামুটি পরিচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানস রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, মৃণাল দত্ত, শংকর রায়, কালীকৃষ্ণ গুহ এবং আরো অনেকে। প্রবন্ধ লিখেছেন অরুণকুমার সরকার, দীপংকর দাশগুপ্ত ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

শতভিষা (ছাত্র সংকলন) সম্পাদক: তরুণ মিত্র ও আলোক সরকার। ১এ, বিজয় মুখার্জি লেন, কলকাতা—২৫। দাম: এক টাকা।

●

"গাঙ্গেয়ী" বাংলাদেশের কবি ও কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রিমাসিক পত্রিকা। সম্প্রতি তাঁদের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ, সজনী-কান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, দিনেশ দাস, ভবানী মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, গণেশ বসু, শান্তনু দাস, সামসুল হক, গৌতম গুহ, বিশ্বনাথ কয়াল, স্বদেশরঞ্জন দত্ত এবং আরো অনেকে।

গঙ্গোত্রী (৪র্থ বর্ষ: ১ম সংখ্যা) সম্পাদক: শান্তনু দাস ও গৌতম গুহ ৪এ, আক্তাব মস্ক লেন, কলি:-২৭ দাম: ষাট পয়সা।

●

দিশারীর বর্তমান সংখ্যায় সুধানন্দ চট্টো-পাধ্যায়, শিশির নিয়োগী, অমলকুমার ঘোষ, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সলিল দত্ত, প্রিয়-রঞ্জন সেন, সবিতা চৌধুরী, অসীমকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

দিশারী (২য় সংখ্যা) সম্পাদক: শরৎ দে ও শংকর ঘটক। কলিকাতা মহানগরী পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত।

●

প্রবন্ধের কাগজ হিসেবে "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" সুপ্রতিষ্ঠিত। এর বর্তমান সংখ্যাটি নানা দিক থেকেই উল্লেখের দাবী রাখে। এ সংখ্যায় লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ ঘোষ, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন মণ্ডল, রমা বসু ও হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

একটি রঙীন কালীঘাটের পটচিত্র এবং কয়েকটি আলোকচিত্র সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (৩য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা) সম্পাদক: সঞ্জীবকুমার বসু, ১০, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলি: ১। দাম: দেড় টাকা।

সেদিন অভিধানে 'ইয়ে' কথাটার মানে খ্‌ুঁজলাম, কিন্তু মানে মিলল না। অথচ বাংলায় 'ইয়ের' ব্যবহার বিস্ময়করভাবে ব্যাপক। ভেবে দেখুন, দেখবেন 'ইয়ে' আপনি হরদম বলছেন। অথচ এত বেশি প্রচলিত একটি শব্দের অভিধানে কোন স্থান মিলল না। বলা বাহুল্য, এটা আশ্চর্যজনক মনে হলেও খুবই স্বাভাবিক। 'ইয়ে'কে আমরা 'ইয়ে' বলে মনে করি, অনেকটা এলেবেলের মত। হ্যাঁ, তাই দেখবেন "এলেবেলে" শব্দটিরও অভিধানে স্থান নেই, অথচ ছেলেবেলায় 'এলেবেলে' কতবার বলেছেন। আর 'ইয়ে' সারা জীবনে অসংখ্যবার বলেও অভিধান লিখতে বসে মনে থাকে না।

"ইয়ে, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

"ইয়ের খবর কি?"

"ইয়েটা এনেছ?"

"এই যাঃ, ইয়ে হয়েছে!"

"আমি বলছি, ইয়ে, তুমি এক কাজ কর।"

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, আপনারা নিজেরাই অনেক জানেন, বলেন। তবে উপরে উদাহরণগুলি লক্ষ্য করুন, একটি বিশেষত্ব নজরে পড়বে। সেটা হল, ইয়ের ব্যবহার সর্ব-নাম অথবা অব্যয় হিসাবে। স্ত্রী-পুরুষ, প্রাণী-অপ্রাণী নির্বিশেষে 'ইয়ে' সকলের বদলে ব্যবহৃত হয়। ইয়ের মত সর্বব্যাপক সর্বনাম বোধহয় আর নেই। এমন একটি শব্দকে অভিধানে স্থান না দিয়ে অভিধান-কারক মহা ভুল করেছেন। 'এলেবেলে'-না-হয় 'এলেবেলে', কিন্তু ইয়েকে 'ইয়ে' জ্ঞান করা? কক্ষনো নয়।

অন্য একটি শব্দ—হ-য-ব-র-ল। সুকুমার রায়কে ধন্যবাদ। কিন্তু অভিধানকারক, আপনি কেন এ শব্দটিকে বাদ দিয়ে হজ্‌পজ্‌ করে অভিধান তৈরী করছেন?

আচ্ছা, এবার অন্য একটি শব্দের ব্যব-হারের কথায় আসা যাক। শব্দটি হচ্ছে—'আচ্ছা'।

কোন একজন অচেনা লোককে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই, অথবা যার সঙ্গে কথা বলতে চাই তার নাম জানা নেই, ভাবনা কি, কথা শুরু হোক 'আচ্ছা' দিয়ে?

"আচ্ছা, গোলদিঘীটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?",

"আচ্ছা, এইটাই কি বিনয়বাবুর বাড়ি?"

"আচ্ছা, দেখুন...শুনছেন ?"

ইত্যাদি অনেক উদাহরণ তোলা যায়।

অতএব, অভিধানকারক, আপনি আবার সাবধান হোন। আপনি যে আচ্ছা মানে শুধুই 'হ্যাঁ' 'ঠিক' বা ঐ জাতীয় কিছু লিখে খালাস হবেন, সেটি চলবে না, আপনাকে 'আচ্ছা'র এই বিশেষ ব্যবহারও বেশ 'আচ্ছা' করে লিখতে হবে। এইমাত্র যে সর্বশেষ নতুন 'আচ্ছা'টা ব্যবহার হল, তার মানে লিখতে ভুললেও চলবে না।

অভিধানকারক মহাশয়, অত সহজে নিস্তার পাবার উপায় নেই। আপনার সঙ্গে আরও একটু লদ্‌কা-লদকি বাকি আছে।

আমরা বিদায় নেবার সময় বলি, "আচ্ছা নগেনবাবু, তবে আসছি।"

নগেনবাবুর সঙ্গে হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না, হয়তো নিশ্চয় করে জানেন

ইয়েটা এনেছ?

যে, তার বাড়ি আর আপনি ফিরে আসবেন না, তবু বললেন, "আসছি"।

এর মানে কি?

"পিসিমা, আমি আসছি তাহলে" বলে পিসিমার বাড়ি থেকে নিজের বাড়ির দিকে রওনা।

পিসিমার সঙ্গে তো রসিকতা করছেন না!

তবে এ 'আসছি'র মানে কি? মানে হচ্ছে, 'যাচ্ছি।'

সব কেমন হ-য-ব-র-ল হয়ে যাচ্ছে। অভিধানিক আমার বাড়িতে থাকলে এক্ষুনি "আসছি" বলে হয়তো পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবেন; এবং আমি তাঁর বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে প্রহারেণ ধনঞ্জয় হাসপাতালে যাচ্ছি।

অতএব আপাতত এখানেই থামা যাক।

আচ্ছা, তাহলে ইয়ে, অনেক ইয়ে হল, এবার তাহলে আসা যাক, আসছি তাহলে।

আসছি তাহলে

(উপন্যাস)

গোলাপ কেন কালো

বুদ্ধদেব বসু

(১৩)

এই যে, চা দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন—আসুন। আমার প্রথম প্রেম, আর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে টেকসই। শুরু করেছিলুম আট বছর বয়সে, তারপর এখনো, বিকেল পাঁচটা নাগাদ, আমার অ্যাল্‌কহলে ডোবানো স্নায়ুগুলো কাৎরে ওঠে কয়েক ফোঁটা ট্যানিন রসের জন্য। ধন্য বলি এই অভ্যেসকে যা পঞ্চাশ বছরেও আমাকে ছেড়ে যায়নি, অনেক দুঃখের দিনে বন্ধুর মতো যে পাশে ছিলো। ধরুন না সেই দাঙ্গার সময়—আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? য়ুনিভার্সিটি ছুটি হ'য়ে গেছে, শহর অচল, রোজ রাত্রে যুদ্ধের হুংকার, আর্তের চীৎকার, আগুনের ঝাল, ঘুম নেই। আমি ঢাকার ছেলে, 'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নতুন নয় আমার কাছে, কিন্তু আগে যাকে মনে হ'তো শুধু উপদ্রব, বিশ্রী একটা অসুবিধের ব্যাপার, এবারে তা রীতিমতো যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে—যেহেতু ওরই জন্য দিনের পর দিন মিতু আটকে আছে কলকাতায়। কাগজের হেডলাইন, ইতিহাস—আর আমাদের জীবন : এ-দুয়ের মধ্যে গরমিলটা কখনো ভেবে দেখেছেন কি? পার্ল হার্বরে যেদিন বোমা পড়লো, সেদিনও কি জাপানে ছিলো না অনেক তরুণ-তরুণী, যারা হানিমুনে বেরিয়েছে, বা বাগ্‌দত্ত হয়েছে, বা সেই তারিখেই বিয়ে হ'লো যাদের—তারা কি পলকের জন্যও ভেবেছিলো ঐ ঘটনার কী-রকম সব ফলাফল হ'তে পারে তাদের জীবনে, আর তাদের সন্ততিরও জীবনে? তেমনি, আমাকেও যদি কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তখন বলতেন, 'এই দাঙ্গার শেষ পরিণাম কী, জানো? ভারতবর্ষ টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে!'—তাহ'লে আমিও ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে জবাব দিতাম, 'তা যা-ই হোক, কিন্তু মিতু কবে ফিরবে তা বলতে পারেন?' যাদের ঘর পুড়ছে, স্বামী-পুত্র খুন হচ্ছে, যারা রাস্তায় ছোরা খেয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না, যে-চাষির বৌ শহরে সব্জি বেচতে এসে আর ফেরেনি, যে-সব দিনমজুরের রোজগার বন্ধ—আমার যন্ত্রণা তাদের জন্য নয়, নিজের অসহায়, আশাহীন হাত-পা-বাঁধা অবস্থার জন্য—যেহেতু আমার এমন কোনো সাধ্য নেই যে বাঞ্ছিতার ফিরে আসার তারিখটিকে একটি দিনও এগিয়ে আনতে পারি। সেই ক্লান্ত বিরস বিরক্তিকর কুৎসিত দিনগুলোর মধ্যে শুধু কয়েকটা মুহূর্ত সহনীয় হ'য়ে উঠতো, যখন কাজল আমাকে এনে দিতো, অসময়ে, জেগে-ব'সে-থাকা বা ঘুম-ভেঙে-যাওয়া কোনো রাত্তির দুটোতে হয়তো—সোনালি সুগন্ধি এক পেয়ালা চা। শুধু চায়ের জন্য নয়, কাজলের সঙ্গও আমার ক্রমশ একটু বেশি ভালো লাগছিলো—অন্য কোনো সঙ্গী নেই ব'লে, আর-কিছু করার নেই ব'লে। দিন-রাত আটকে আছি বাড়ির ক-খানা দেয়ালের মধ্যে—বড়োজোর পাড়ার মধ্যে একটু পাইচারি করি কখনো বা, কিন্তু কাছাকাছি কথা বলার মতো কেউ নেই, কোনো লেখাতে মন বসে না, বই পড়াতেও অরুচি ধ'রে যাচ্ছে—এ-রকম অবস্থায় কাজলকেই আমার মনে হচ্ছে মরুভূমিতে ছোট্ট ওয়েসিসের মতো, অন্তত একটু ছায়া, একটু জল, একটু বৈচিত্র্য। আগের মতো নিঃশব্দ আর শিথিল আর নেই কাজল, এখন সে কথা বলে, তার চলাফেরাও বেশ স্বচ্ছন্দ, সন্ধেবেলা মাঝে-মাঝে আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যায় সে, আমি তাকে তারা চেনাবার চেষ্টা করি, গ্রহ আর নক্ষত্রের তফাৎ বোঝাই, কখনো বা দুপুরে খাওয়ার পর নিজের ঘরে বিছানায় গা ঢেলে না-দিয়ে আমার ঘরে ডেকচেয়ারটায় ব'সে গল্প করে সে। কথাবার্তার বিষয় তার বেশি নেই, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা—যারা রাত্রে লাঠিসোটা নিয়ে পাহারায় থাকে আর দিনের বেলা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাল আলু লঙ্কা পেঁয়াজের জোগান দেয়, সেই কর্মিষ্ঠ ও সাহসী ছেলেদের মুখে মুসলমান-নিধনের নিত্য-নতুন প্ল্যান শুনে-শুনে আমি এমন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি যে সে-তুলনায় আমার বরং ভালো লাগে কাজলের জলপাইগুড়ির বাল্যস্মৃতি, আর আমাকে আর মিতুকে ঘিরে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যাতে নিজের একটি অংশ সে তৈরি ক'রে নিতে চাচ্ছে দূতী হ'য়ে, ঘটকালি ক'রে। আমি সাবধান থাকি যাতে ফটিক-মামার কোনো প্রসঙ্গ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে, দাঙ্গার খবরে উদ্বিগ্ন

হ'য়েও কাজলকে আলাদা কোনো চিঠি লেখেন নি ফটিক-মামা, আমারও আর ভালো লাগে না তাঁর কথা ভাবতে), যাতে আচমকা কখনো আঘাত না-দিয়ে ফেলি কাজলকে। আমার এই সুশ্রী ও বঞ্চিতা আত্মীয়াটিকে দয়া করা আমার কর্তব্য, এমনি একটা দাম্ভিক মনোভাব আমি এড়াতে পারি না; আবার অন্য দিক থেকে মনে হয় আমি রীতিমতো কৃতজ্ঞ তার কাছে, যেহেতু অনুপস্থিত মিতু আর আমার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সেতুর মতো যেন হ'য়ে আছে সে, মিতুর অভাবের কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণের মতো। কাজের অভাবে শূন্যতার চাপে যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন আমি মাঝে-মাঝে একটু খেলাও করি তাকে নিয়ে, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝতে দিই যে অন্য দু-একটি তরুণীকেও আমার মন্দ লাগে না—এই যেমন আমাদের য়ুনিভার্সিটির বিজয়া সেন। এই খবর শুনে কাজল রীতিমতো অস্থির হ'য়ে পড়ে—প্রাগুক্ত কাল্পনিক বিজয়া সেন দেখতে কেমন, কোন ইয়ারে পড়ে, বয়স কত, চশমা আছে কিনা—তার এই ধরনের কৌতূহল আমাকে মেটাতে হয়: এম-এ পড়ে শুনে আঁৎকে ওঠে কাজল—'ওরে বাবা, তাহ'লে তো বুড়ি!' 'তা কেন—আমারই বয়সী—ছোটোও হ'তে পারে।' 'বোকা ছেলে—একুশ বছরের ছেলেরা হ'লো কচি ডাব, আর মেয়েরা একদম ঝুনো নারকোল, তাও জানো না!' আমার মজা লাগলো কাজলের উপমা শুনে—'কই তোমার তো একুশেরও বেশি, কিন্তু তোমাকে কি বুড়ি মনে হয়?' 'কী পাকা ছেলে রে বাবা! ফাজিল!' একটু লাল হ'লো কাজল, তারপর বললো, 'আমি জানি তুমি বানিয়ে বলছো, বিজয়া সেন ব'লে কেউ নেই।' 'বা রে, থাকবে না কেন—রোজ দেখি কলেজে, আর তুমি বলবে মানুষটাই নেই! ভালো ছাত্রী—ম্যাট্রিক ফার্স্ট হয়েছিলো ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে।' কাজল গম্ভীর হ'য়ে বললো, আচ্ছা, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো—আমাকে ছুঁয়ে বলো, তাহ'লে বুঝবো!' আমার দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিলো কাজল, আমি হেসে উঠলাম, সেও হাসলো তার সুন্দর আঁটো দাঁতে ঝিলিক তুলে—মিতুর প্রতি আমার নিষ্ঠায় যে সত্যি কোনো চিড় ধরেনি তা জানতে পেরে তার মন হাল্কা হ'য়ে গেলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন আশঙ্কার ছায়া পড়লো তার মুখে হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে বলে উঠলো, বলো—কথা দাও আমাকে, মিতু ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে ভাববে না কখনো!' যে-রকম তীব্র ভাবে সে বললে কথাটা তাতে আমি অবাক হলাম; তার মাংসল নরম মুঠো থেকে নিজের হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিতে-নিতে আমার মনে হ'লো যে কাজলের জন্যই মিতু হ'য়ে উঠছে আমার জীবনে আরো বেশি বড়ো, আরো বেশি সত্য। আমার লজ্জা করলো সহপাঠিনী-সংক্রান্ত রসিকতাটা উদ্ভাবন করেছিলুম ব'লে, কাজলের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বিশ্বাস হলো হৃদয়ের সব আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবে একজনকে সমর্পণ করাকেই বলে সার্থকতা। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে কাজল বললো, 'কী ভাবছো? আজ চিঠি আসার তারিখ বুঝি? কিন্তু পিয়ন আসার এখনো সময় হয়নি।'

মিতুর চিঠি! ঐ এক নতুন ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে। দাঙ্গার শুরুতে শহরের এমন অবস্থা হয়েছিলো যে দু-দিন ডাক পর্যন্ত বিলি হয়নি; তারপর একই সঙ্গে তিনটে চিঠি এলো মিতুর। ঢাকা থেকে এক আত্মীয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে তার বাবা ফেরার তারিখ পেছিয়ে দিয়েছেন—'কাগজ প'ড়ে মনে হচ্ছে সাংঘাতিক ব্যাপার, আপনারা ভালো আছেন তো? খুব সাবধানে থাকবেন, বেশি আর কী বলবো। এদিকে মা-বাবা অস্থির হ'য়ে আছেন বাড়িটা খালি আছে ব'লে, লুঠতরাজ না হ'য়ে যায়, কেন যে এ-সব গোলমাল বাধে কে জানে। শহরের অবস্থা একটু ভালো হ'লেই আমরা আর এক মুহূর্ত দেরি করবো না।' তিনটে ছোটো-ছোটো চিঠি প্রায় একই কথা প্রত্যেকটাতে; শেষেরটায় লিখেছে, 'পারেন তো রোজই চিঠি লিখবেন, দুশ্চিন্তায় আমি ঘুমোতে পারি না।' অনেকগুলো ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে চিঠির মধ্যে, যাতে ঐ বস্তুটি সংগ্রহের জন্য আমাকে বিপদের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে না হয়।

আমি প্রায় রোজই চিঠি লিখতে লাগলুম, কিন্তু কয়েক দিন পরেই আমার মনে হ'লো আমার লেখার কথা ফুরিয়ে গেছে. মিতুর চিঠিও আর যেন আমাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে না। চিঠিঃ যা নিয়ে আমি মনে-মনে এত বাড়াবাড়ি করেছিলুম, এমনকি ভেবেছিলুম উপস্থিতির চেয়েও ভালো, এখন দেখি সেটা ধোঁয়াটে ছায়ামাত্র, এক ম্লান অশরীরী বিকল্প—ক্ষণিক, আংশিক, খণ্ডিত, বা যেন এক মন্থর গোযান, যাকে ছাড়িয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার উপলব্ধি হ'লো যে পুরো মানুষটার একটিমাত্র মুহূর্তের প্রতিনিধি হ'লো চিঠি; সেটা লিখতে তার যে-দশ মিনিট বা এক ঘন্টা সময় লেগেছিলো, শুধু সেটুকুই আমি পেলাম ব'লে ধরা যায়—দিন-রাত্রির অবশিষ্ট সময় সে কী-ভাবে কাটায় আমি তা জানি না, সে আমাকে কী-খবর দেবে কিংবা দেবে না, তা সম্পূর্ণ তারই মর্জির উপর নির্ভর করছে। ঈর্ষা হানা দিলো আমার মনে—কলকাতায় মিতুদের যারা চেনাশোনা, তার গানের যারা ভক্ত, আর যাদের সঙ্গে এবারে নতুন আলাপ হ'ল তার, তাদের সকলের প্রতি ঈর্ষা; কত হাসি, আনন্দ, বন্ধুতার বিনিময় হচ্ছে নিরাপদ, সুসভ্য, হাজার আকর্ষণে ভরা কলকাতায়, যার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সংস্রব নেই, যার বদলে আমি পাচ্ছি—শুধু এক টুকরো কাগজ, কয়েকটি শব্দ, কয়েকটি কঙ্কালের মতো অক্ষর। আমার চিঠি থেকে স্বাচ্ছন্দ্য চ'লে গেলো, আকারে ছোটো হ'তে লাগলো ক্রমশ, তারপর একদিন (যেহেতু প্রেমে-পড়া অবস্থাতেও মাঝে-মাঝে ভঙ্গিধারণ করার লোভ হয় আমাদের) পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে একটা কৃত্রিম চিঠি লিখলুম, প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুরে, যেন, দাঙ্গা মিটে যাবার পরেও, ইচ্ছে ক'রে, আমার কাছে অপ্রকাশ্য কোনো কারণে বা আমার প্রতি উদাসীনতাবশত, সে ফিরতে দেরি করছে। এর উত্তর এলো—'আমরা সামনের বেস্পতিবার পৌঁচাচ্ছি, তখন সব কথা হবে। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না!'

ততদিনে, প্রায় তিন সপ্তাহ তাণ্ডবের পর, পুজোর সব ক-টা তারিখ পার ক'রে দিয়ে, এক বিমর্ষ বিস্বাদ থমথমে শান্তি নেমেছে ঢাকায়। এ-রকম সময়ে প্রথম যে বাড়ি ব'য়ে আমার খবর নিতে এলো, সে বুলবুল। আমি খুশি হলুম তাকে দেখে, কিন্তু তার মুখে এমন কিছুই শুনলুম না, যা আমার পক্ষে উৎসাহজনক; আমি যখন এই দাঙ্গা ব্যাপারটাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছি, ভাবছি এটা একটা অপলাপমাত্র, দুঃস্বপ্নের মতো অলীক, যে আসলে সভ্যতাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা, তখন বুলবুল ওটাকে আরো বেশি বাস্তব ক'রে তুললো কতগুলো বীভৎস ঘটনা শুনিয়ে, যার কিছু-কিছু কায়েৎটুলিতে তার স্বচক্ষে দেখা। 'ভাগ্যিশ ও-রকম কিছু চোখে দেখতে হয়নি আমাকে!' আমার এই কথা শুনে বুলবুল হাসলো। "তুমি না-দেখলেই হলো বুঝি? তাহ'লেই সব ঠিক আছে?' 'তা বেঠিকটাকে ঠিক করার ক্ষমতা তো নেই আমার, তাই এড়িয়ে চলা ছাড়া উপায় কী?' 'ক্ষমতা নেই কে বললো?' হেসে বললাম, 'তোমার থাকতে পারে, আমার নেই।' 'সকলে ও-ই ভাবে ব'লেই তো এই দশা আমাদের।' এর উত্তরে আমি বললাম, 'চলো একটু বাইরে ঘুরে আসি।'

রেল-লাইন পেরিয়ে রমনায় এসে একটা নর্দমার বাঁধের উপর বসলাম তাকে নিয়ে। কার্তিকের বিকেল, য়ুনিভার্সিটি ছুটি থাকার জন্য পথে লোক নেই, বাতাসে এক নতুন ঠাণ্ডার আমেজ, ঋতু-বদলের ইশারা। এতদিন পরে নির্ভয়ে বেড়ানো যাচ্ছে, দুশ্চিন্তা হচ্ছে না এ-কথা ভেবে যে আমাদের শরীরের একটা পৃষ্ঠদেশ আছে, যা আমাদের নিজেদের পক্ষে অদৃশ্য, যেখানে হঠাৎ কেউ ছোরা বিঁধিয়ে দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াবারও সময় পাবো না। কিন্তু এই নবলব্ধ নিরাপত্তাবোধ, মাঠের উপরে নুয়ে-পড়া প্রকাণ্ড গোল আকাশ, ঘাসের উপরে হলুদ রোদ্দুরের প্লাবন—যার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে পড়ছিলো প্রি-র্যাফেলাইটদের কবিতা, রসেটির কোনো ছবিতে দেখা গালভাঙা, গর্তে-বসা-চোখ, পিঠে-লম্বা-হলুদ-চুল-ছড়ানো মেয়েকে—সে-সবের দিকে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফেরালো না বুলবুল, কথা বলতে লাগলো। তার কথা যেন খবরকাগজের সম্পাদকীয়, যেন জনসভার উদ্দীপক বক্তৃতা—ফুটন্ত কেটলির মতো আবেগে ভরা, কিন্তু বিষয়বস্তু ঠিক তা-ই, যা ছাড়া এ-কদিন ধ'রে পাড়ায়-পাড়ায় কেউ কিছু বলেনি। আমি কি ভেবে দেখেছি কী অন্যায়, কী অত্যাচার ঘ'টে গেলো এই শহরে? দাঙ্গা তো কতবারই হয়েছে, কিন্তু এ-রকম হিংস্রতা আর কখনো দেখা যায়নি—যেন পশুর স্তরে নেমে এসেছিলো মানুষগুলো। পুজোটা পর্যন্ত হ'তে পারলো না—যার জন্য কত লোক সারা বছর ধ'রে পথ চেয়ে থাকে, সেই কয়েকটা আনন্দের দিনও বরবাদ হ'য়ে গেলো। দু-মাস পরে ঈদ—এখন থেকেই লোকেরা ভয়

পাচ্ছে, পাছে আবার একটা গোলমাল বাধে সেই সময়, পাছে একটা পাল্টা জবাবের চেষ্টা হয়। কিন্তু কার দোষে এ-রকম হচ্ছে বার-বার? দায়ী কে? হিন্দু? মুসলমান? কেউ না। দায়ী তৃতীয় পক্ষ—ইংরেজ—সেই ধূর্ত শয়তান, যে একের বিরুদ্ধে অন্যকে খেলাচ্ছে, ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাদের আসল শত্রু কে। এমনি ক'রে এ-দেশের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকবে এরা, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেবে। আমি কি জানি পুলিশ কী করেছে এবার? ঘরে আগুন দেবার পেট্রোল জুগিয়েছে তারা, দাঙ্গা জীইয়ে রেখেছে বল্লম ছোরা তলোয়ার জুগিয়ে, আবার অনেক গৃহস্থের ঘরে ঢুকে কেড়ে নিয়ে গেছে রান্নাঘরের বঁটি থেকে মশারি খাটাবার লাঠি পর্যন্ত যা-কিছু আত্মরক্ষার জন্য কাজে লাগানো যায়। আমানিটোলার বিপিন মজুমদারের দুই ছেলে বাধা দিতে গিয়েছিল, তাদের চাবুক মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে গোরা সার্জেন্ট। গেন্ডারিয়ার শিবেশ্বর নাগের পুত্রবধূ ছিলো অন্তঃস্বত্ত্বা, তার পেটে লাথি মেরেছে জানোয়ারগুলো। এও কি মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? আমরা কি প্রতিশোধ নেবো না? আমরা কি ওদের বুঝতে দেবো না যে আমরাও মানুষ?

বুলবুলের মুখ লাল হ'লো, নিশ্বাস ঘন, তার বুকের দ্রুত ওঠা-পড়া আমি লক্ষ করলাম। একটু পরে নিচু গলায় বললো, 'তোমার কিছু বলার নেই, রণজিৎ? তোমার রক্ত গরম হয় না?' আমার মনে পড়লো সেই যেদিন জোন্সের সঙ্গে কিপলিং নিয়ে তর্ক করেছিলাম। তখনও একটা জ্বালা ছিলো আমার মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে; তখনও গান্ধী যাকে বলেছেন দাস-মনোভাব, আমাদের জীবনের সর্বত্র আমি তার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তখনও আমার বন্দী মনে হচ্ছে নিজেকে, এক ক্ষুদ্র মলিন অচল সমাজের গণ্ডির মধ্যে বন্দী। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত—দেশের অবস্থা যদিও একই আছে, বা আরো খারাপ হয়েছে বলা যায়—কোনো-কোনো বিষয়ে পরিবর্তন হয়েছে আমার। জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে আমার ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রশামিত হয়েছে, ইতিহাসকে একটু অন্যভাবে দেখতে শিখেছি; আমার সন্দেহ হচ্ছে যে ইংরেজ যদি আজ সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হ'য়ে থাকে তার পিছনে তাদের কিছু যোগ্যতা নেই তা নয়, আর আমাদের এই হতচ্ছাড়া অবস্থা হয়েছে হয়তো আমাদেরও অনেক দোষের জন্য। তাছাড়া আমি জীবনে এখন অন্য এক প্রেরণা পেয়েছি—প্রেম: আমার চোখের সামনে দিগন্ত খুলে গেছে, আমার পক্ষে পানাপুকুর ছেড়ে প্রখর নদীতে নৌকো ভাসানো আর অসম্ভব নয়। কেন আমি ঘৃণা ক'রে সময় নষ্ট করবো, যখন আমার মন রঙিন হ'য়ে আছে ভালোবাসায়, সূর্যোদয়ের আকাশের মতো? আমি বুলবুলকে জিগেস করলাম তাদের স্বদেশী মেলার কী হ'লো।

'আর স্বদেশী মেলা!' নিশ্বাস ছাড়লো বুলবুল, 'এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম—সব পণ্ড হ'লো। কিন্তু এটাও এখন ছোটো কথা হ'য়ে গেছে। বিভা-দি বলছেন মেলাটা বাদ দেবেন এ-বছর, আরো কঠিন কাজ হাতে নেবার সময় হ'লো। বিষাক্ত ঘায়ে মলম লাগিয়ে আর লাভ নেই—অস্ত্রোপচার চাই। ওরা কি এখনো ভাবছে জেলে পুরে, ফাঁসিতে লটকে ঠেকাতে পারবে আমাদের? মেদিনীপুরে তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট নিপাত হবার পরেও? ঢাকাতেও একটি ছোট্ট নাটক তৈরি হচ্ছে।' জোরে নিশ্বাস ফেললো বুলবুল, মুহূর্তের জন্য তার চোখ স্থির হ'লো আমার চোখের উপর। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'বুলবুল, তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু—' 'কিন্তু তুমি এর মধ্যে নেই—এই তো?' নরম ক'রে হাসলো বুলবুল। 'ভয় নেই, তোমাকে কোনো ফ্যাশাদের মধ্যে জড়াবো না। চারদিকে কী-রকম ধর-পাকড় হচ্ছে দেখছো তো? দাঙ্গার মধ্যেই পঞ্চাশটি ছেলেকে ডোটিনায় ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে, কবে কার ঘরে নেকড়ে হানা দেবে কেউ জানে না। আমি বরং আর তোমার কাছে না এলাম।' তার শেষ কথাটায় আমার পৌরুষে আঘাত লাগলো, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম, 'সে কী! আসবে না কেন? অত ভয় পাবার কী আছে?' এর উত্তরে বুলবুল বললো, 'আমার জন্য কোনো ভয় নেই, কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি হয়তো আশ্চর্য কোনো বই লিখবে কোনোদিন—মিতুকেই তোমার দরকার, আমাকে নয়।' আমি—মূঢ় যুবক—মনে-মনে একটু খুশি না-হ'য়ে পারলুম না এ-কথা ভেবে যে বুলবুলের কাছেও আমার কিছু মূল্য আছে, আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে সেও শ্রদ্ধা করে, যদিও আমি তাকে আসলে তেমন পছন্দ করি না।

বুলবুলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'লো বকুল-তলায়, মিতুরা সেখানে পৌঁছবার তিনঘণ্টা পরে। আমার আগেই এসে ব'সে ছিলো সে, আমি যখন গেলুম তখন সেই একতলার বারান্দায় ব'সে সপরিবারে চা খাচ্ছিলেন অনাদিবাবু। বুলবুল একই কথা বলছিলো—দাঙ্গা, পুলিশ, 'তৃতীয় পক্ষ'; আমার মনে হ'লো স্বাধীনতা আনার শ্রেষ্ঠ উপায় কোনটা তা নিয়ে একটা তর্ক চলছে তার সঙ্গে অনাদিবাবুর: তিনি গান্ধীর পথে চলতে বলছেন, আর বুলবুল বোধহয় আরো দ্রুত এবং কিছুটা ভয়াবহ কোনো উপায়ের পরামর্শ দিচ্ছে। সে-মুহূর্তে যে-স্বাধীনতায় আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো—মিতুকে একটু নিরিবিলি পাবার স্বাধীনতা—তাকে যেন সুদূরপরাহত ক'রে তুললো বুলবুল। আমি বুঝলাম আমার মুখের ভাব ক্রমশ কঠিন হ'য়ে উঠছে, আমার রাগ হ'লো—শুধু বুলবুলের নয় মিতুরও উপর, যেহেতু ও-সব তর্কাতর্কি মন দিয়ে শুনছে সে—অন্তত শোনার ভান করছে—আমার চোখ এড়িয়ে তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। অথচ এই তর্কে সে যোগও দিচ্ছে না—তার মুখের ভাব ক্লান্ত, অন্যমনস্ক। বুলবুলের একটা কথা আমার কানে এলো—'গান্ধীজী আসলে ইংরেজ-ভক্ত, নয়তো যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিলেন কেন তাদের? শত্রুকে যে-কোনো উপায়ে উপড়ে ফেলতে হয়, পলিটিক্সে ভালো-মানুষির কোনো জায়গা নেই।' এবারে আমি কথা না-ব'লে পারলাম না—'কিন্তু কে জানে ইংরেজের জন্যই আমরা কি আজ পতিত না কি আগে থেকেই পতিত ছিলুম ব'লে ইংরেজ অত সহজে কেড়ে নিতে পারলো দেশটা? আমাদের দারিদ্র্য, কুসংস্কার ধর্মে-ধর্মে লড়াই—এ-সবের জন্যে আমাদেরও কি দায়িত্ব নেই?' 'নিশ্চয়ই আছে। খুব ভালো কথা বলেছ রণজিৎ—হয়তো আমরা নিজেদের পাপেই ডুবে যাচ্ছি, আমাদের অস্পৃশ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, অদৃষ্টবাদ—কী না? রামমোহন থেকে গান্ধী পর্যন্ত এ-সবের বিরুদ্ধে কম চেষ্টা তো হ'লো না, কিন্তু দেশটা কতটুকু বদলেছে?' অনাদিবাবুর কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি জোর গলায় বলতে লাগলাম, 'আমরা কী করেছি—গত পাঁচশো বছর, এক হাজার বছরের মধ্যে কী করেছি আমরা, যার জন্যে আজ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার দাবি করতে পারি? আমরা কি আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকার মাটি ছুঁয়েছিলাম, আবিষ্কার করেছিলাম কোনো ক্ষুদ্রতম দ্বীপ কোনো নতুন ফসল? বাষ্প আর বিদ্যুৎ যে মানুষের এত বড়ো কাজে লাগতে পারে তা কি আমাদের কল্পনাতেও ছিলো কখনো? আমরা কি শিখেছিলাম মাটি খুঁড়ে পেট্রোল বের করতে? বেশি আর কথা কী—আমাদেরই পাহাড়ে জঙ্গলে আগাছার মতো রাশি-রাশি চা গজিয়েছে খুব সম্ভব ঋগ্বেদের সময় থেকেই—তাও আমরা চিনতে পারিনি, এতই আমরা অন্ধ ও নির্বোধ! এই সবই করেছে শাদা চামড়ার মানুষ, তারাই এ-যুগের বীর, অতএব তারা যে পৃথিবীর অধীশ্বর হবে সেটা আর আশ্চর্য কী?' বুলবুল হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে তুমি বলছো আমাদেরও বীর হ'তে হবে, ক্ষমতাশালী হ'তে হবে?' তার দিকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ থমকে গেলাম, অন্য রকম সুরে বললাম, 'আমি কিছুই বলছি না। আমি নগণ্য জীব, দেশোদ্ধারের কোনো প্রেস্ক্রিপশন আমার জানা নেই।' অনাদিবাবু বললেন, 'কিন্তু কী-ধরনের বীরত্ব, কী-ধরনের ক্ষমতা, সেটা ভেবে দেখা দরকার।' বুলবুল মাথা ঝোঁকে বললো, 'অত ভাবলে কোনো কাজ হয় না, মেসোমশাই!' অনাদিবাবু হেসে বললেন, 'ঐ তো আবার আর-এক তর্ক তুললে, বুলবুল—আমরা যাকে সভ্যতা বলি তা কি ভাবুকের সৃষ্টি, না কর্মীর? দুয়েরই নিশ্চয়ই, কিন্তু—' অনাদিবাবুর চেয়ারের শব্দ হলো, 'আজ সময় নেই, আর-একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেবো যে সব কাজ চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে। আমি বেরোচ্ছি।' স্ত্রী আর কন্যার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার দুই রোগী জরুরি খবর পাঠিয়েছে—গাড়িটা তৈরি হ'লো কিনা দেখি। মিতু, তুই এত চুপচাপ কেন—শরীর খারাপ হয়নি তো?' 'মিতু অন্য কথা ভাবছে—' আমার দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে বুলবুলও উঠলো। 'আমিও যাই এখন — মেসোমশাই আমাকে রাস্তার দেউড়িতে নামিয়ে দেবেন?'

মিতু আমাকে নিয়ে দোতলায় এলো—সেই বারান্দাটিতে, যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগে অনেক ভরপুর দুপুর আমরা কাটিয়েছি। কিন্তু এই বহু-প্রতীক্ষিত পুনর্মিলনের মুহূর্ত টিক কল্পনায় যে-উচ্চশিখরে বসিয়েছিলুম, বাস্তব তার অনেক নিচে প'ড়ে রইলো। বেসুরো হ'য়ে আছে আমার মন,
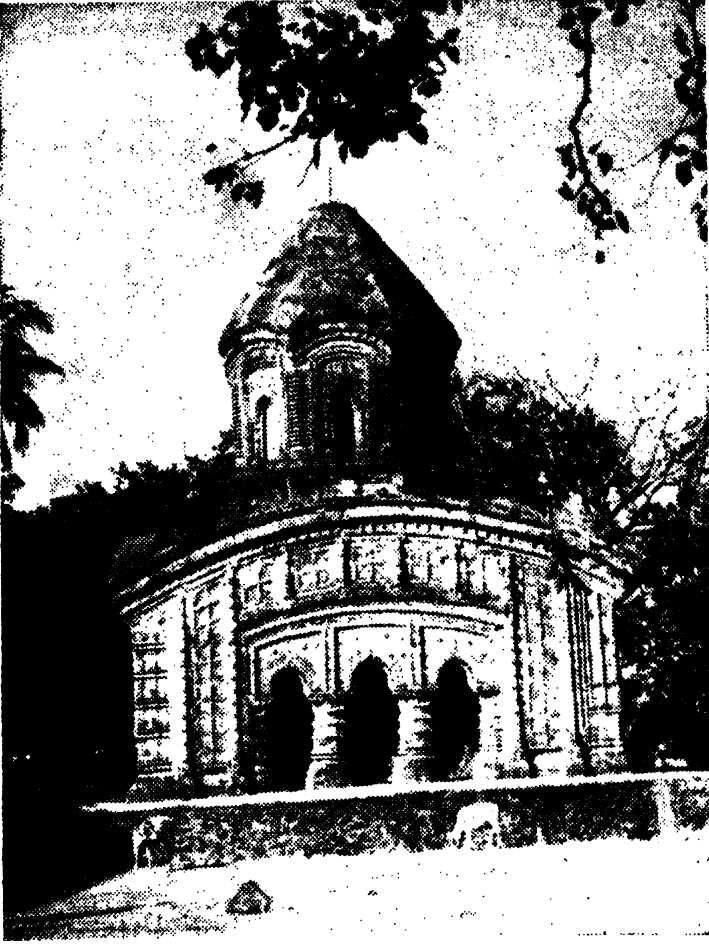
বংশবাটীর সুবিখ্যাত বাসুদেবের মন্দির। ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

আমার আবেগ যেন শুকিয়ে গেছে, নিজেকে তেমনি বিস্বাদ লাগছে যেমন লাগে গ্রীষ্মের দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলে ; আজ এক্ষুনি—আর কয়েক দিন আগে রমনায় বেড়াতে বেরিয়ে—বুলবুলের মুখে যে-সব কথা শুনেছিলুম, যা আমার পরমুহূর্তেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিলো, আমার রুচিকে যা আহত করে, আমার স্বভাবের যা বিরোধী, আমার সুখের পক্ষে যা হানিকর, সেই কথাগুলোই যেন আটকে আছে আমার মনের তলায়, চিরতার জলের সারাদিন-ধ'রে জিভে-লেগে-থাকা তেতো স্বাদের মতো, যেন কালো-কালো ছায়া হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারদিকে, বা কোনো সূক্ষ্ম বিষ, যা ভুল ক'রে গিলে ফেলে এখন আর উগরে তুলতে পারছি না আমি থামাতে পারছি না আমার রক্তে তার ছড়িয়ে পড়া। সবচেয়ে যা খারাপ তা এই যে, আমার মনের এক গোপন অংশ যেন মেনে নিয়েছে যে বুলবুলের কথাগুলো অপ্রীতিকর হ'লেও সত্য, আর সেখানে মাঝে-মাঝে এমনও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে যেন প্রীত হবার, সুখী হবার এই ইচ্ছের জন্য আমি অপরাধী। এদিকে মিতুও, হয়তো আমাকে অন্যমনস্ক দেখেই, কথা বলছে বাধো-বাধোভাবে, কিংবা যেন এক নতুন লজ্জা হেমন্তের সন্ধেবেলার এই কুয়াশার মতো জড়িয়ে আছে তাকে ; আমরা কেউই অন্যজনের কাছে পুরোপুরি উপস্থিত হ'তে পারছি না।

খুচরো বিষয়ে কথা চললো খানিকক্ষণ ; কলকাতায় কেমন কাটলো তাদের, তার নতুন রেকর্ড কবে বেরোবে, দিলদার নওরোজ নতুন আর কী বই লিখছেন, ছাদ-খোলা দোতলা বাস্ কি তুলে দিলো সত্যি? কিন্তু কলকাতার প্রসঙ্গ শিগগিরই ফুরিয়ে গেলো, কেননা প্রায় সব খবরই চিঠিতে সে লিখেছিলো আমাকে, তাছাড়া মিতু ঢাকায় ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পক্ষে কলকাতার আকর্ষণ তেমন প্রবল নেই আর, সেখানে কী-ভাবে তার সময় কেটেছে সে বিষয়েও আমি কৌতূহল হারিয়েছি। আর ঢাকার খবর মানেই দাঙ্গা ; সে-প্রসঙ্গ বুলবুল একেবারে চটকে রেখে গেছে। মিতু আমাকে জিগেস করলো আমাদের য়ুনিভার্সিটি কবে খুলবে। 'সামনের সোমবারই খুলে যাচ্ছে।' 'আপনার এম,এ, পরীক্ষা কবে?' 'দেরি আছে এখনো—সামনের বছর, জুলাই মাসে।' একটু চুপ ক'রে থেকে মিতু বললো, 'এবার কলকাতায়—' 'কী? থামলেন কেন?' 'বলছি।' হঠাৎ আমার ভিতরকার প্রেমিক-সত্তা জেগে উঠলো, যেন একটা বোবায়-ধরা তন্দ্রার অবস্থাকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে আমি তীক্ষ্ন চোখে তার দিকে তাকালাম। 'এবার কলকাতায় এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান।' আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো তাঁর কথা শুনে, শুকনো গলায় বললাম, 'তারপর?' 'মা-বাবার অমত ছিলো না—ভদ্রলোকটি সবদিক থেকেই চমৎকার।' তার ক্রিয়াপদের অতীত বচন লক্ষ্য না-ক'রে আমি ব'লে উঠলাম, 'তাহ'লে ঠিক হয়ে গেছে?' 'ঠিক কেন হবে? কেউ চমৎকার হ'লেই তাকে বিয়ে করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।' 'তুমি রাজি হওনি?' 'রাজি হবার কথা ওঠে না কি?' মিতু একবার তাকালো আমার দিকে. তার চোখে তার মনের ভাষা আমি প'ড়ে নিলাম। 'তোমার মা-বাবা যদি জোর করেন?' 'তুমি তো জানো, তাঁরা ও-রকম নন। আমি যা বলবো তা-ই হবে।' তারপর নিশ্বাসের স্বরে বললো, 'তুমি একবার বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি?' আমি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, যেন নিশ্বাস পড়ে না, আমার বুকের শব্দে অন্য সব আওয়াজ চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। আস্তে আমার হাতের উপর হাত রাখলো মিতু, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি অপেক্ষা করবো—তুমি যতদিন বলবে, ততদিন।'

মাথার মধ্যে ঘূর্ণি নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। প্রেমে পড়া নয়, চিঠি-লেখালেখি নয়, গল্প ক'রে দুপুর কাটানো নয়—বিয়ে! অন্য একজনের সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ সব আমার হাতে! আমার সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া! এত বড়ো দায়িত্ব আমি কি নিতে পারি—আমি, যে এখন পর্যন্ত বলবার মতো কিছুই করিনি জীবনে, এক দরিদ্র, অনিশ্চিত, পরিচয়হীন, একুশ বছরের যুবক! মিতু—বিখ্যাত অমিতা বর্ধন, কত গুণীমানীর স্নেহের পাত্রী, দিলদার নওরোজ যাকে গানের বই উৎসর্গ করেছেন—সে কিনা এই আমারই জন্য ফিরে তাকাবে না অন্য সব কৃতী পুরুষের দিকে, যারা 'সব দিক থেকেই চমৎকার'! আমার মনে হ'লো আমি যেন আনন্দ আর উৎকণ্ঠার চাপে পিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি, যেন হঠাৎ আমার উপর এমন একটা প্রকাণ্ড দাবি এসেছে যা আমি ফেরাতেও পারি না সহ্য করতেও পারি না; শুয়ে বালিশে মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে নিঃশব্দ চীৎকারে বলতে লাগলাম, 'মিতু, আমাকে তোমার যোগ্য ক'রে নাও, আমাকে তোমার যোগ্য ক'রে নাও।'

(ক্রমশঃ)

অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত

১৯৬২ সালের ২৬ অক্টোবর, চীনের ভারত আক্রমণের চারদিন পরে, দেশে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছিল। চীনের সংগে প্রত্যক্ষ লড়াই কিছুদিন পরেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থা সেই থেকে সমানে চলে আসছে।

একটানা এত দীর্ঘদিন জরুরী অবস্থার নজীর কোন গণতান্ত্রিক দেশে আর দ্বিতীয় নেই। যুদ্ধের কিম্বা আভ্যন্তরীণ বিপদের প্রত্যক্ষ সঙ্কট কেটে যাবার পর জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া হয়, এটাই নিয়ম। গত পাঁচ বছরে বহুবার বহু মহল থেকে তীব্রতম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার হরণকারী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, প্রশ্ন তোলা হয়েছে এত দীর্ঘকাল ধরে জরুরী অবস্থা জীইয়ে রাখার নৈতিক যৌক্তিকতা নিয়ে। কিন্তু সমস্ত সমালোচনা, সমস্ত নীতির প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবকে এক বিন্দুও টলাতে পারে নি।

হয়ত ভুল বলা হল। ১৯৬৬ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটু টলেছিলেন, কিংবা মনে হয়েছিল একটু টলেছেন। সেদিন ভারতরক্ষা বিধির সংশোধন করে বলা হয়েছিল এই বিধি কেবল আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরেই পুরোপুরি বলবৎ থাকবে; অন্যান্য রাজ্যে এই বিধি প্রয়োগের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি নিতে হবে। তারপর গত ১৮ মার্চ মনে হয়েছিল ভারত সরকার বুঝি সত্যিই অনেকখানি টলেছেন। সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চাবন সংসদে জানান, আগামী ১ জুলাই থেকে ভারত সরকার জরুরী অবস্থা তুলে নিতে চান। কেবল আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে এই অবস্থা বজায় থাকবে। এটা যাতে সম্ভব হয় (বর্তমানে সংবিধানে সীমাবদ্ধ জরুরী অবস্থা প্রচলনের কোন ব্যবস্থা নেই) সেজন্যে সংসদে সংবিধান সংশোধনের জন্যে তাঁরা একটি বিল আনবেন।

তখন কে জানত এটা শুধুই একটা কথার কথা? কে জানত এ ব্যাপারে ভারত সরকার নিজের ইচ্ছেকেই একমেবাদ্বিতীয়ম বলে মনে করেন? কে জানত সংসদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ নেই? জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংসদের আলোচনার মাধ্যমে সারা দেশের প্রতিবাদ বারবার উচ্চারিত হয়েছে। '১৮ মার্চ' মনে হয়েছিল এই প্রতিবাদের মর্যাদা দিয়েই বুঝি ভারত সরকার ১ জুলাই থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে চলেছেন। এই মর্যাদা যদি তাঁরা সত্যিই দিতে পারতেন তাহলে ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবটি নিয়ে তাঁরা সংসদের সামনে হাজির হতেন, সেটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। গণতান্ত্রিক ঔচিত্য সেই কথাই বলে। কিন্তু ভারত সরকার সেদিক দিয়েই গেলেন না। বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনা করে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝতে পারলেন যে, সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করানো সম্ভব হবে না, তখন তিনি ১ অক্টোবর পর্যন্ত জরুরী অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। সে প্রস্তাবও যখন অগ্রাহ্য হল তখন গণতান্ত্রিক ঔচিত্যের প্রশ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীচাবন ২২ জুন সংসদে ঘোষণা করলেন যে, জরুরী অবস্থা আপাতত অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বজায় থাকবে।

সংসদ সদস্যরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি ভংগের অভিযোগ এনেছেন। এই অভিযোগ তাঁরা কোনভাবেই এড়াতে পারেন না।

শ্রীচাবন জরুরী অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে যে কারণগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি সংক্ষেপে হল এই: (১) আসাম, বিশেষত মিজো ও সন্নিহিত পার্বত্য এলাকার অবস্থা উদ্বেগজনক; (২) নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও সন্নিহিত এলাকার অবস্থা আত্মসন্তুষ্টির কোন সুযোগ রাখছে না; (৩) চীনারা নাগা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে; (৪) পাকিস্থান, জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার তাল করছে।

সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ নেই একথা আমরা কখনই বলি না। কিন্তু জরুরী অবস্থার মত একটি সর্বব্যাপী ব্যবস্থা জীইয়ে রাখার দোহাই হিসেবে এই যুক্তিগুলি এতই বে-মানান যে অবাক না হয়ে উপায় নেই। (১) ১৮ মার্চ যখন শ্রীচাবন জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন কি মিজো ও সন্নিহিত পার্বত্য এলাকার অবস্থা উদ্বেগজনক ছিল না? আর হঠাৎ বেশি উদ্বেগজনক হয়ে উঠল কোনদিক দিয়ে? (২) জরুরী অবস্থা যখন ঘোষিত হয়নি, নাগাল্যাণ্ডে যখন বৈরী নাগাদের সংগে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর রীতিমত লড়াই চলছিল, তখন কি আত্মসন্তুষ্টির সুযোগ ছিল? তাহলে সেদিন জরুরী অবস্থা ছাড়াই ভারত সরকার কিভাবে সেখানকার পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন? আজ তো নাগাল্যাণ্ডে সশস্ত্র লড়াই অনুপস্থিত। তাহলে আজ জরুরী অবস্থা ছাড়া পরিস্থিতির মোকাবিলার কথা সরকার কেন ভাবতে পারছেন না? (৩) ১৮ মার্চের পরে চীনারা নতুন করে কোন বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে বলে কিংবা নতুন কোন বিদ্রোহী নাগাদল চীনে গিয়েছে বা চীন থেকে ফিরে এসেছে বলে তো আমরা শুনিনি। তাহলে ১৮ মার্চ যদি সরকার জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন তো আজকে নেই কেন? (৪) ১৯৬৫ সালে যখন জরুরী অবস্থা পুরোদমে বজায় ছিল তখন জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্থানীদের ব্যাপক এবং প্রকাশ্য অনুপ্রবেশ ভারত সরকার ঠেকাতে পারেননি। আজ যদি নতুন করে অনুপ্রবেশের আশংকা ঘটে থাকে তাহলে কেবল জরুরী অবস্থা বজায় রাখলেই তা ঠেকানো যাবে?

এই সমস্ত এলাকার যে সমস্যা তা প্রচলিত আইনী ব্যবস্থায় প্রতিকার করা যায় না একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ ছাড়া আর কোনদিক দিয়ে ভারতরক্ষা আইন প্রচলিত জননিরাপত্তা প্রভৃতি আইনের থেকে বিশেষ উন্নত নয়। নিরাপত্তা আইনগুলিকে সংশোধন করে নিয়ে ভারতরক্ষা আইনের মতই কঠোর করে তোলা যায়, এবং তারদ্বারা যে কোন অপরাধের মোকাবিলা করা সম্ভব। অথচ ভারত সরকার সেই রাস্তা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তবে কি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণই ভারত সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য? যাতে নাগরিকের বিরুদ্ধে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নাগরিকের প্রতিবাদ করবার এবং প্রতিবিধান খোঁজবার উপায় না থাকে? এতে তাঁরা হয়ত অনেক ঝামেলা এবং কৈফিয়তের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন, কিন্তু মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে এই উদ্যত হুমকি নাগরিকরা অনির্দিষ্টকাল ধরে কেন সহ্য করবে? যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে ভারত সরকার জরুরী ক্ষমতা হাতে রাখতে চাইছেন তা অদূর ভবিষ্যতে সহজ হবে বলে মনে হয় না। কতদিন তাহলে এই দুঃসহ বোঝা নাগরিকদের সইতে হবে?

সংসদকে আশ্বস্ত করে শ্রীচাবন অবশ্য এই কথা বলেছেন যে, জরুরী অবস্থার প্রয়োগ কেবল সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, দেশের বাকী অংশে তা প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু এটা কোন আশ্বাসই নয় এবং এর মধ্যে যুক্তির পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে। যদি এটাই সরকারের তখনকার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যে, সীমান্ত এলাকা ছাড়া আর কোথাও জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে না, তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, দেশের বাকী অংশে যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর কোন কার্যকলাপ দেখা দেয় তাহলে সরকার প্রচলিত আইনের ক্ষমতা বলেই তার মোকাবিলা করবেন। যদি দেশের অধিকাংশ এলাকায় প্রচলিত আইনই এখন যথেষ্ট মনে করা হয় তবে সীমান্ত এলাকায়—যেখানে সমস্যার চরিত্র কিছু আলাদা নয়—তা যথেষ্ট হবে না কেন? তাহলে কোন হিসাবে ভারত সরকার জরুরী অবস্থা জীইয়ে রাখতে চাইছেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত যুক্তিটার মধ্যেই একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। তবু সংসদ যদি সীমাবদ্ধ জরুরী ক্ষমতার প্রস্তাব মেনে নিত তাহলে কারো কিছু বলবার থাকত না। কেন্দ্রীয় সরকার যদি খোলা মন নিয়ে সংসদের দ্বারস্থ হতেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আজকে এই প্রবন্ধ লেখবার দরকার হত না। সেটাই হত শোভন,

গণতান্ত্রিক সরকারের উপযুক্ত কাজ। তা না করে একটা অত্যন্ত ছেঁদো যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা সংসদকে এড়িয়ে গেছেন। গণতন্ত্রের প্রতি যাঁদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে তাঁরা কেউ সরকারের এই আচরণের নিন্দা না করে পারবেন না।

হতে পারে সংবিধানে বলা আছে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির বিবেচনাই যথেষ্ট। এটাও ঠিক যে, জরুরী অবস্থার কোন মেয়াদ সংবিধানে বেঁধে দেওয়া নেই। একথাও আমরা অস্বীকার করছি না যে, সংবিধান অনুযায়ী যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ সংকটের আশঙ্কাতেও রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু তবু গণতন্ত্রের দেশে মৌলিক অধিকারকে একটানা এত দীর্ঘকাল ধরে খর্ব করে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক একথাও সকলেই স্বীকার করবেন। প্রত্যক্ষ বিপদ দেখা দিলে সরকার যে কোন মুহূর্তে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিপদ যখন নেই তখনও এই অবস্থা বজায় রাখার সার্থকতা কোথায়? জরুরী ক্ষমতা ছাড়া যে দেশের শাসন চলে না সে দেশ সম্পর্কে আমরা তাহলে কি ধারণা করে নেব? সে দেশের শাসনদক্ষতা, বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা তাহলে কোন পর্যায়ে নেমে এসেছে? পাঁচ বছর ধরে সমানে যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা অনুপস্থিত থাকে সে দেশের রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রনেতাদের সম্পর্কেই বা আমরা কি ভাবব?

এই পাঁচ বছরে জরুরী ক্ষমতা ঢালাও ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নির্বিচারে, কারণ এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিধান নেই। সবটাই যে ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যেই নেওয়া হয়েছে এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে কেরলে জি, সদানন্দন নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী যে মামলা করা হয়েছিল তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের কোন যোগ ছিল না। সদানন্দনের অপরাধ ছিল তিনি ত্রিবান্দ্রমে কেরোসিনের ডিলারশিপ পেয়েছিলেন। এতে অপর এক ব্যবসায়ী চটে যান। ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যবসায়ীর সঙ্গে পুলিশের একজন অফিসারের যোগাযোগ ছিল। সুতরাং ঐ অফিসারের সাহায্যে সদানন্দের বিরুদ্ধে ডি-আই-আর প্রযুক্ত হয়ে গেল।

সদানন্দনের ঘটনাটি আদালতে উঠেছিল কারণ যে পুলিশ অফিসার ডি-আই-আরের বলে সদানন্দনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাঁর ডি-আই-আর প্রয়োগের কোন অধিকার ছিল না। এটা ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ডি-আই-আর প্রয়োগের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

সদানন্দনের মামলাটি সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল। সুপ্রীমকোর্ট তাঁকে মুক্তির আদেশ দিয়ে ১৯৬৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী যে মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রতি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোর্ট বলেছিলেন, সদানন্দনের মত ঘটনা যখন ঘটে তখন এই আশংকাই হয় যে, এই ধরনের ব্যাপক ক্ষমতা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে শাসনকর্তৃপক্ষ সংবিধানের পবিত্রতা ও নির্দেশ সম্পর্কে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলবেন।
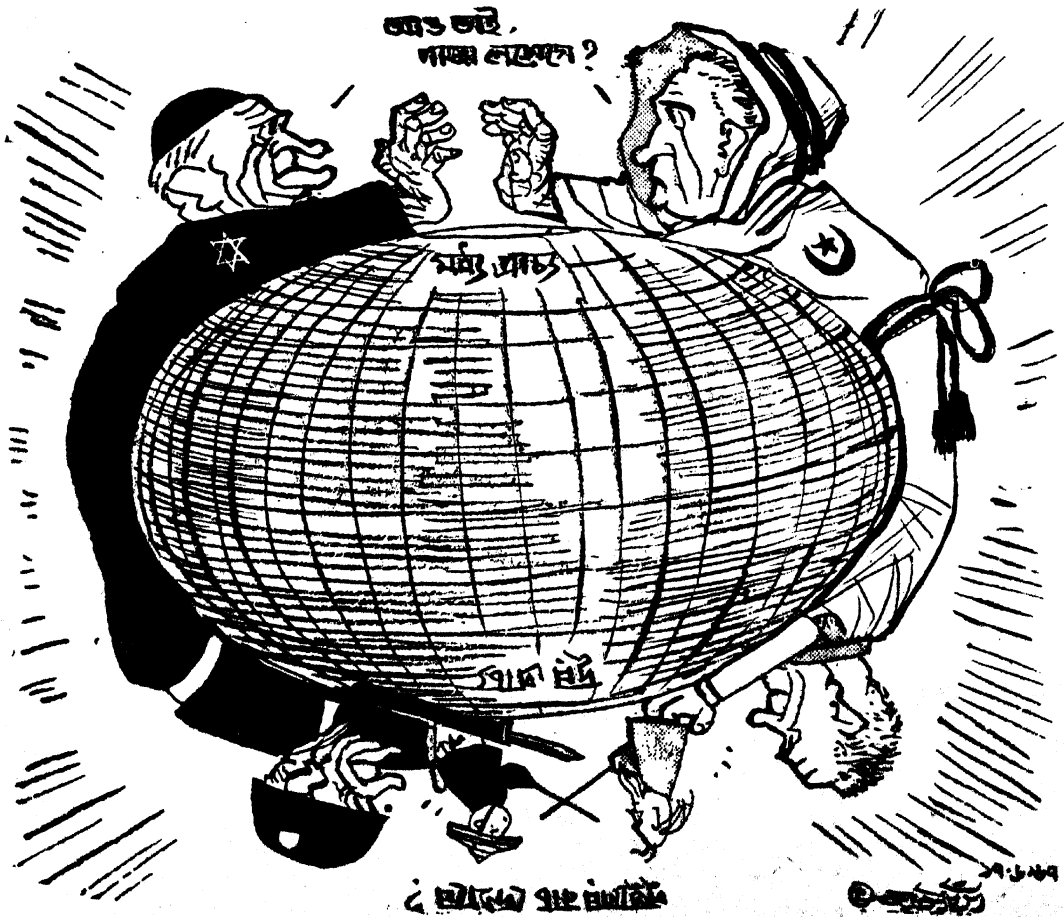
জাতীয় কল্যাণে ব্যাংক ব্যবসায়

ভারতে ব্যাংক ব্যবসায় জাতীয় প্রয়োজনে কি পরিমাণে নিয়োজিত হয় তা নিয়ে মনে একটা দীর্ঘকালের সন্দেহ এবং রাজনীতিক-দের মধ্যে একটা বহু পুরাতন বিতর্ক আছে, যার পরিণতিতে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সভায় ও সম্মেলনে এবং পার্লামেন্টে আলোচনায় ব্যাংক জাতীয়করণের দাবী বারংবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অবশ্য জাতীয়করণের দাবীর যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা নিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে বিতর্ক থাকলেও এ বিষয়ে আজ প্রায় সকলেই একমত যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে ব্যাংকগুলো জাতীয় উন্নয়নে যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে, আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। এবং এইজন্যই জাতীয়করণের প্রশ্ন দূরে রেখেও, ব্যাংক ব্যবসায় যাতে দেশের প্রাগসর অর্থনীতিতে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তজ্জন্য তার ওপর সামাজিক কর্তৃত্বের অধিকতর বিস্তার অবলম্বেই একান্ত প্রয়োজন।

দিন কয়েক আগে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যাংকারদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। ভারতীয় ব্যাংক সমিতির সভাপতি ছাড়া, স্টেট ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ব্যাংক অব বরোদা প্রভৃতির প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী জানান যে, ব্যাংক ব্যবসায়কে যাতে আরো সুষ্ঠুভাবে জাতীয় কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত করা যায় তজ্জন্য তিনি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা সমীক্ষা চালাতে এবং প্রয়োজনমত সুপারিশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের এই রিপোর্ট ছ' সপ্তাহের মধ্যে হস্তগত হওয়ার আশা আছে। তবে ব্যাংকাররাও যেন এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকেন এবং তাঁদের পক্ষে কি করণীয় আছে তা চিন্তা করেন। জাতীয় কল্যাণসাধনে ব্যাংক ব্যবসায় কতখানি অগ্রসর হতে পারে তৎসম্পর্কে তাঁরাও যেন তাঁদের প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট সরকারের হস্তগত হওয়ার আগেই তা দাখিল করেন।

অবশ্য, ব্যাংকগুলোর ওপর সামাজিক, অপর কথায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে কম নয়। গত প্রায় দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যাংকগুলোর ওপর রিজার্ভ ব্যাংক মারফৎ সরকারী কর্তৃত্বের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। ইতিপূর্বে আর্থিকভাবে দুর্বল যেসব ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তক্ষেপের ফলে সেগুলো প্রায় লোপ পেয়েছে। ফলে পূর্বে চালু ৪০২টি বেসরকারী ব্যাংক সংযুক্তি-করণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যায় কমে বর্তমানে ১০৯টিতে দাঁড়িয়েছে, যেগুলোর আর্থিক বনিয়াদ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী মজবুত। কোনো ব্যাংকের পরিচালনায় অব্যবস্থা থাকলে রিজার্ভ ব্যাংক তার পরিচালন-কর্তৃত্ব থেকে কোনো ব্যক্তিকে অপসারণ করতে পারে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত ডিরেক্টর নিয়োগের পরামর্শ দিতে পারে। কাউকে এক কোটি টাকার বেশী দাদন দেওয়া হলে রিজার্ভ ব্যাংকের তার ওপর খবরদারীর ব্যবস্থা আছে। আমানত বাবদ সংগৃহীত অর্থের কি পরিমাণ ঋণ ও দাদনে নিয়োজিত করা যাবে তা রিজার্ভ ব্যাংকই নির্দিষ্ট করে দেয় এবং দেশের অর্থনীতির প্রয়োজনে ব্যাংকের সুদের হার মাঝেমাঝেই হ্রাস বা বৃদ্ধি করে লগ্নীর পরিমাণকে আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করে।

তবুও এই কর্তৃত্ব ব্যাংকগুলোকে জাতীয় লক্ষ্যসাধনের পথে কতোখানি নিয়োজিত করতে পেরেছে তা নিয়ে দেশ-বাসীর মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ ও বিতর্ক রয়েছে। দেশে শিল্প ও কৃষির বিস্তারে ব্যাংকের ভূমিকা সকলের ওপরে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের ওপর মহাজন ও সম্পন্ন কৃষকদের শোষণের অবসান ঘটাতে হলে চাষের মরসুমে চাষীদের ঋণপ্রাপ্তির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংকগুলোর মুখ্য ঋণদাতার ভূমিকা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাংকগুলোর অর্থ-লগ্নী আজও খুব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতীয় বেসরকারী ব্যাংকগুলো যে পরিমাণ অর্থ দাদন দিয়ে থাকে তার দু'-তৃতীয়াংশই বণ্টিত হয় মাত্র ৬৫০ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে। ফলে ব্যাংকগুলোর মোট দাদনের প্রায় আশি ভাগই যাঁরা পান তাঁরা ব্যাংকের পুরোনো খাতক। এইভাবে লগ্নীর সিংহভাগই যায় কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের আয়ত্তে, যা অনেকক্ষেত্রেই মামুলী। নতুন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোনো উদ্যোগ হয় এবং বিশেষভাবে উদ্যোক্তারা যদি শিল্পক্ষেত্রে নবাগত হন তাহলে তাঁদের পক্ষে ঋণ সংগ্রহ অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। তেমনি অসুবিধা হয় ছোটখাট কৃষিজীবীদের ঋণ পাওয়ার। ফলে শিল্পক্ষেত্রে নতুন উদ্যম বা কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষিজীবী-দের প্রচেষ্টায় অর্থের অভাবে ভাঁটা পড়ে।

অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উদ্যম প্রধানত ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলো এবং কৃষিতে অর্থলগ্নীর প্রশ্ন নিয়েই। তিনি বলেছেন যে, ব্যাংকগুলো যদি ছোটোখাটো ঋণের পরিমাণ আরো বাড়ায় তাহলে শিল্পক্ষেত্রে অনেক বেশীসংখ্যক লোক তাদের কল্যাণের আওতায় আসবে। এই ব্যবস্থায় ব্যাংক-গুলোরও কল্যাণ হবে, কারণ মক্কেলবৃদ্ধির ফলে আমানতের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। দেশে বহু তরুণ শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তি প্রতিভা ও উদ্যম সত্ত্বেও নিছক অর্থের অভাবে শিল্পপ্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হতে পারে না। এরা যদি ঋণের ব্যাপারে উৎসাহ পায় তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণ হবে। এইদিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে তরুণ শিল্পোদ্যোগীরা ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে অর্থমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করেন। কৃষির ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর সরাসরি ঋণ দেওয়ার পথে যে অসুবিধা রয়েছে সেকথা অবশ্য অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন, তবে তিনি বলেন যে, কো-অপারেটিভ ও জমি বন্ধকী ব্যাংক-গুলোর মারফৎ কৃষিজীবীদের মধ্যে ঋণ-ব্যবস্থার প্রসারের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

সম্প্রতি স্টেট ব্যাংক এবং কতকগুলো কমার্শিয়াল ব্যাংক ছোট ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে ঋণের বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছে। ছোটখাট শিল্পগুলোকে ঋণ দিয়ে সাহায্যের ব্যাপারে স্টেট ব্যাংকে প্রায় একশত কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। অন্যান্য কয়েকটা কমার্শিয়াল ব্যাংকও ছোটশিল্পে অর্থ দাদনের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্য আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমানে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো আমানত বাবদ সংগৃহীত অর্থের ৭২ শতাংশ ঋণ হিসেবে বণ্টন করতে পারে। কিন্তু এই ঋণ বণ্টনের বর্তমান প্রকৃতি এমন যাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায় ও শিল্পগুলোই প্রয়োজনমতো অর্থ পায়। এদের অনেকে ঋণ বাবদ সংগৃহীত অর্থ ফাটকাবাজিতেও খাটায়। এই সুযোগ যতদিন তাদের থাকবে ততদিন দেশের অর্থনীতিতে মাঝেমাঝেই বিশৃংখলা দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। দাদনের অর্থ যাতে নিছক উৎপাদনমূলক কাজেই নিয়োজিত হয় এবং ফাটকাবাজিতে না খাটে তা দেখার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের আছে এবং রিজার্ভ ব্যাংক মাঝে-মাঝেই এই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে। তবুও ব্যাংক ব্যবসায় যে এই দুষ্টব্যধিমুক্ত নয়, দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে বর্তমানের গুরুতর বিশৃংখলাই তার প্রমাণ।

অবশ্য বেসরকারী ব্যাংকগুলোর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অথবা সরকার-নিয়ন্ত্রিত যেসব সংস্থা এই কাজে নিয়োজিত আছে তারাও সমালোচনা থেকে রেহাই পায় না। বর্তমানে সমবায় ব্যাংক ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন এবং স্টেট ব্যাংক ছোটখাট ও মাঝারি শিল্পগুলোকে অর্থ যোগানের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তারা যদি এই দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারতো তাহলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো এতো অসুবিধার সম্মুখীন হতো না। বিভিন্ন রাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলোর পাওনা টাকা আদায়ের ব্যবস্থা এমন শিথিল যে প্রচুর টাকা বাজারে পড়ে থাকে এবং নতুন দাদনের পথে অসুবিধার সৃষ্টি করে। বেসরকারী ব্যাংকগুলোর কাজকর্মের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ঋণদান সংস্থাগুলোর শিথিলতা ও দৌর্বল্য কোথায় তারও সন্ধান করা দরকার।

সড়ক সৌধ কানাগলি

চৌরঙ্গী-ধর্মতলা অঞ্চলে কি বেকুবের সংখ্যা বেশি? প্রশ্ন করেছিলেন এক বিদেশী পর্যটক। নতুবা, শহরের আর কোনো অঞ্চলেই এতো দাঁও মারার সুযোগের ছড়াছড়ি নেই কেন? এতদঞ্চলের প্রতিটি থামের পাশেই আপনি দাঁড়ান, কানের কাছে ফিসফাস, হাতের কোষে জব্দ বিক্রয়যোগ্য পসরা, চাপা মহামূল্য পেন অথবা ঘড়ি, জেড পাথর, ডায়মন্ড—কতো কি? 'হলুদ-কাগজ' বা নিষিদ্ধ ছবি-ছাব্‌লার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। সে-সব তো থরে থরে নির্দিষ্ট জায়গায় সাজানো থাকে। আমি-আপনি সবাই জানি। জানে পুলিশেও। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কেউ কিছু করে না। কেন করে না তাও বোধহয় আমরা জানি। কিছুতেই প্রতিরোধ-প্রতিবাদের আঙুল উঁচু করি না। নিঃশব্দে সবকিছু অনাচার ও দুর্নীতি হজম করার ক্ষমতা আমাদের সীমাহীন।

এর হিসেব-নিকেশ, আদায়-তশিল, আসা-যাওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য করেন এমন এক অনুসন্ধিৎসুর কাছেই শুনেছি—সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এ-ধরনের গোপন পথের ব্যবসা থেকে কয়েক সহস্র টাকা সচল হয়ে ওঠে। চোরাই মালের কারবার-বন্দী রিং-এর যোগাযোগ-ব্যবস্থাও অসাধারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেতা লোভের বশীভূত হয়ে ঠকে যেতে বাধ্য হন। এভাবে ঠকে গেলে তার আর কোনো পুনর্বিবেচনা নেই, থানা-পুলিশ নেই—সেখানে আপনি রাম-রাবণ দুজনের হাতেই মার খাবেন। যতোদূর মনে হয়, বিদেশী ও শহরের বাইরে থেকে আসা ভারতীয়গণই এই হঠাৎ লোভের সর্বাধিক শিকার। শহরের স্থানীয় লোকজন ততো নয়, যতোটা আবার গ্রামাঞ্চল থেকে নতুন বেড়াতে আসা চাষ-বাসের ঘরের ছেলে।

এই কলাও ঠকানোর কারবার আপনার-আমার চোখের সামনে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আমরা ভ্রূক্ষেপ করছি না। বিদেশেও এ-সম্পর্কে রটনা খুব, যাঁরা এ-দেশ ঘুরে যান, তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে কলকাতার চারিপাশে ছড়ানো ছোটো-বড়ো গভীর ও সর্বব্যাপক এইসব মৃত্যুফাঁদের খবরের সঙ্গে আরো আজগুবি রসের আমদানি করে ডায়রি ও ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। আমরা সে-সমস্ত পড়ে ক্ষেপে উঠি—এসব ছবি টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে কেন? এ-বিষয়ে প্রতিবাদ পাঠাই, অথচ নিজেদের দাঁড়াবার জায়গাটা কিছুতেই পরিষ্কার আর অমলিন রাখার চেষ্টা করি না। আমাদের দোষ-গুণের সবটুকুই তো ভ্রূক্ষেপহীনতা।

কানাঘুষোয় শুনেছিলুম যে, শিয়ালদার কাছেই বিশাল চত্বর জুড়ে নানারকম চোরাই-মাল ঢেলে বিক্রি হয়। চৌরঙ্গীর ব্যাপারে এতো বিচলিত বোধ করা সেক্ষেত্রে স্রোতের মুখে কুটোর মতন ভেসে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কি? শুনেছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস করতে বেধেছিলো। চোরাইমালের স্থায়ী দোকান কিভাবে সম্ভব? পরে ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটার সঙ্গে 'চোরাই' কথাটা না দিলেই তো সমস্যা চুকে যায়—বলে দিলেই হলো : পুরোনো মালের কেনাবেচার বাজার। কাব্যি করে অনেকেই এর নামকরণ করেছেন 'সন্ধ্যাবাজার'। বেশ নাম, সন্ধেবেলাতেই আঁধারে-আলোয় এ-বাজার জমজমাট হয়ে ওঠে। ভিড়ে গা গলানো যায় না। ডাকসাইটে সন্ধ্যাবাজারের আসল চরিত্র তো সেইটেই। এই ভিড়ে মনে হয় যেন, দুহাতের বদলে দশখানা হাতেও আপনি আপনার সঙ্গের, গায়ের, পকেটের জিনিসপত্র ঠিকঠাক রাখতে পারবেন না।

প্রথম গিয়েছিলুম দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকটায়। কারণ ছিলো। শুনে-ছিলুম সন্ধেবেলার ঐ তাতা-থৈ-থৈ আসরের কথা আগে থেকে। তাই সন্ধে এড়িয়ে স-বান্ধব বৌবাজারের দরজা দিয়েই ঢুকে পড়লুম। ঢুকেই তো চক্ষু চড়কগাছ। তাও নাকি সব দোকান বন্ধ, মাত্র দু-চারটি অন্য-মনস্কভাবে খোলা রয়েছে। বাঁহাতি রাশি রাশি পার্টি মিলিয়ে জুতোর পসরা—জিজ্ঞেস করলুম, এর সবই কি পুরোনো?

জী হাঁ।

সবই চুরি?

জী নেহি। স্বল্প উত্তর।

তব্? শুধোই

তব্ কেয়া? দোকানির ভ্রূকুটিতে পেছিয়ে পড়ি দুহাত। এরা বোধহয় এমন-সব প্রশ্ন জীবনে প্রথম শুনছে। একেবারেই অনভ্যস্ত।

আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করি—কীভাবে আসে? এতো জুতো নানান সাইজের পাওয়া যায়ই বা কি করে?

এবারেও দোকানি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সাফ জবাব দেয়—চলা আতা এইসেই। অর্থাৎ, হয়তো বাজারের থলে হাতে কোনো কোনো বাড়ির চাকর চলে আসে—জুতো ঢেলে দিয়ে দাম নিয়ে সিনেমা দ্যাখে, বিড়ি-পত্তর খায়। যেভাবে পুরোনো বনেদী বাড়ি ভেঙে দামী রেকর্ড, ঝাড়লণ্ঠন, বাড়ির বাসনকোসন, পেতল আর ব্রোঞ্জের মূর্তি এখানে এসে পৌঁছেছে।

অবলোকিতেশ্বরের একটি প্রাচীন ছোট্ট মূর্তির দর জিজ্ঞেস করলুম।

আটশ' টাকা।

কপি?

না, নেপাল থেকে আনা। আপনি এক্সপার্ট দেখিয়ে কিনবেন। এখনি কিনতে বলছি না। তাঁর দোকান ভর্তি কিউরিও। কতো পুরোনো ঐতিহাসিক মালমশলার দোকানদার তিনি। বললেন, আমাদের এ-দোকান আমার ঠাকুরদার আমল থেকে। আমার আগে আমার বাবা-জেঠা বসতেন। এখন আমি।

এরপর আপনার ছেলে—হাসতে-হাসতেই বলি, সেই ট্রাডিশন—

ভদ্রলোকও হেসে জবাব দেন, সমানে চলেছে? না! এসব জিনিসের শখ থাকলে আমার কাছে চলে আসবেন। ঠকাবো না। জায়গাটার বদনাম আছে, কিন্তু অভিজ্ঞ-মাত্রকেই জিজ্ঞেস করবেন, আমাদের সুনামের কথা— সবাই একবাক্যে বলবে, আজ দেখে যান—পরে কোনোদিন আসতে হতে পারে। একটা ম্যান্ডোলিনের দর করলাম।

বললেন, ষাট টাকা—তবে আপনি নিলে পঞ্চাশ পর্যন্ত নামতে পারি। কিন্তু নেবেন না।

কেন? বলছি নেবেন না—এটা আমারই দোকানে বারবার তিনবার বেচাকেনা হয়েছে। রাও নামে এক কোৎথানিজ সেলার মাস-তিনেক আগে এটা আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। সে-ও ফেরৎ দিয়ে গেছে। আজ সে বেঁচে নেই। নানান লোকে নানান কথা বলে—সবই গাঁজাখুরি। বলে নাকি, এই যন্ত্রটা অভিশপ্ত!

সন্ধ্যে হয়নি, আষাঢ় মাসও নয়—আপনি কি—বলতে চাইলাম আমি, গাঁজা-খুরি গপ্প চালাচ্ছেন?

সত্যিই তাই, দোকানি মুখ গম্ভীর করেন—আমিও বিশ্বাস করি না। তবে বহুলোকে বহু কথাই বলে—বিশেষ করে, এ-বাজারে যে-সব সেলাররা আসে, তারা যে আমাকে কতোরকম গল্প বলে যায়। সবক'টা আমার মনেও থাকে না ছাই—

বাজারের বিরাট অংশ জুড়ে পুরোনো ফার্ণিচারের সমাবেশ। নানান স্টাইলের মেহগিনি ফার্ণিচার সব। একদিকে পোষাক-আসাক, পুরোনো স্যুট টাই—গরম কাপড়, মিলিটারি ডিসপোজালের মাল। ছোটখাটো দোকানে হরেকরকম পসরা—বিলিতি ব্লেড থেকে শুরু করে ভিনটেজ অষ্টাদশ শতাব্দীর কিম্ভূতকিমাকার স্টোভ পর্যন্ত। বহু দেশের বহু পুরোনো মুদ্রা, মোহর, স্ট্যাম্প—নানা রঙে রঙিন কাট্‌গ্লাস, মোটর পার্টস, ঘড়ি-আংটি, মাউথ অরগ্যান, ছুঁচ। পৃথিবীতে যাকিছু হারিয়ে গেছে, তার সমস্তই নজর করে ফিরলে এখানেই পাওয়া সম্ভব। কেনার জন্যেই নয়, বিস্ময়কর ভ্রমণের জায়গা হিসেবে এই অদ্ভুত বাজার সুযোগ পেলেই দেখে আসা যেতে পারে।

—রূপচাঁদ পক্ষী

প্রেক্ষাগৃহে

আজকের কথা :

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা :

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার ৫ম বর্ষের ১৯ সংখ্যায় প্রেক্ষাগৃহ-স্তম্ভের আজকের কথায় পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছিল। ডাঃ রায়ের পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে আবার এইখানে দেওয়া হল :

পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় নাট্যশালা হবে বাঙলা দেশের নাট্যাভিনয়, নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্ম-প্রচেষ্টার মূল উৎস; এই নাট্যশালা যোগাবে এদের উন্নয়নের প্রেরণা। এরই জন্যে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মঞ্চশিল্পী, সংগীতবিদ ও মঞ্চকলাকুশলীদের জাতীয় ও রাষ্ট্রশিল্পীরূপে সম্মানিত করা হবে। এবং এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমে তিনজন অভিনেতা, তিনজন অভিনেত্রী, চারজন যন্ত্রসংগীতশিল্পী ও দুজন গায়ককে জাতীয় শিল্পীরূপে এবং দুজন অভিনেতা, তিনজন অভিনেত্রী, পাঁচজন যন্ত্রসংগীত-শিল্পী, দুজন গায়ক ও পোষাক-পরিচ্ছদ-পরিকল্পনাকারী, দৃশ্য-নির্মাতা বা শিল্প-নির্দেশক, আলোকসম্পাত পরিকল্পনাকারী ও বিশেষ চমকসৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছ'জনকে রাষ্ট্রশিল্পীরূপে সম্মাননা দেওয়া হবে। জাতীয় ও রাষ্ট্রশিল্পীদের প্রথমে দু বছরের জন্যে নির্বাচিত করে তাঁদের প্রত্যেককে যথাক্রমে মাসিক দুইশত এবং একশত টাকা হিসাবে সম্মানদক্ষিণাপ্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বারোজন জাতীয় শিল্পী এবং বাইশজন রাষ্ট্রশিল্পী—সর্বসমেত চৌত্রিশজন সম্মানিত শিল্পী জাতীয় নাট্যশালা থেকে বছরে অন্তত চারখানি করে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবেন এবং প্রতিটি নাটকের অন্তত কুড়িটি করে অভিনয় হবে। এ'দের মধ্যে যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশিল্লষ্ট, তাঁদের নিয়মিত অভিনয়ে যাতে কোনরকম বাধার সৃষ্টি না হয়, সেইজন্যে জাতীয় রঙ্গালয়ের অভিনয়কে সোম, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রতি অভিনয়-রাত্রে জাতীয় ও রাষ্ট্রশিল্পীরা প্রত্যেকে দক্ষিণা পাবেন যথাক্রমে একশত ও পঞ্চাশ টাকা। জাতীয় নাট্যশালা হবে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা; এর উপদেষ্টা পরিষদে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা অন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি, (২) শিল্পী, নাট্যকার, নাট্য-সমালোচক ও নাট্য-বিশেষজ্ঞগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, (৩) মহিলাসংস্থার প্রতিনিধি, (৪) পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, (৫) কোনও আইন-উপদেষ্টা ও (৬-৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও অর্থ বিভাগের সচিবদ্বয়। এই উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে সম্মানিত শিল্পীরা প্রতি বছরে অভিনয়ের জন্যে চারখানি নতুন নাটক নির্বাচিত করবেন এবং তাঁদের ভিতর থেকেই এক-একজনকে এক-একখানি নাটক পরিচালনার ভার দেবেন। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৮০টি দিন জাতীয় নাট্যশালার অভিনয়ের জন্যে সংরক্ষিত রেখে বাকী ২৮৫ দিন দেশীয় গুণী শিল্পীদের দ্বারা নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান, বিদেশাগত সুপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনয়, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, উচ্চমানবিশিষ্ট কৃতী নাট্য-সংস্থাগুলির নাটকাভিনয়, আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলির প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-স্মরণীতে (বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে) এই জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ
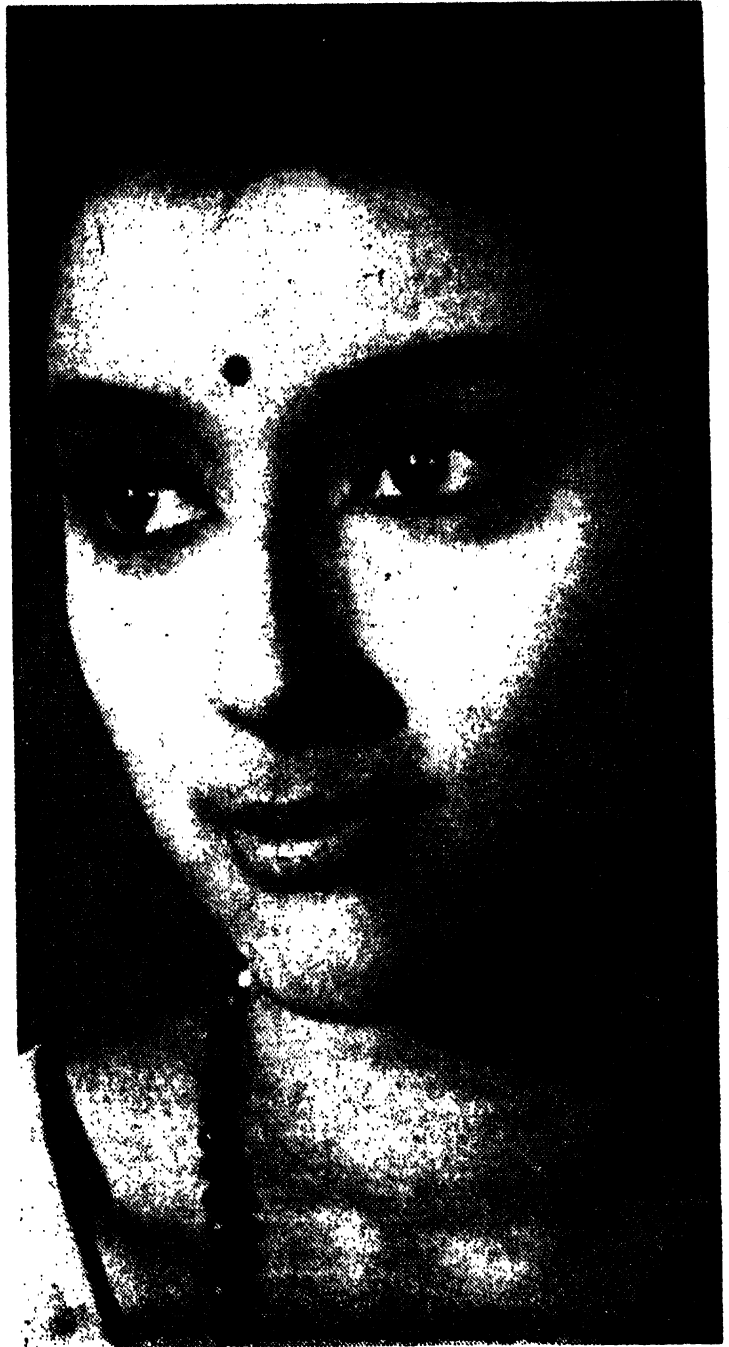
পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত হৃদয় মিথুন চিত্রে অপর্ণা দাশগুপ্ত। ফটো : অমৃত

এই নাট্যসৌধ হবে সর্ববিষয়ে আধুনিক। এখানে থাকবে নাটক, নৃত্য ও সংগীত-পরিবেশনের আধুনিকতম ব্যবস্থা। এরই সংগে এখানে থাকবে নাট্যাভিনয় এবং নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান সম্পর্কে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থাসমন্বিত কেন্দ্র এবং বিদেশাগত শিল্পীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা।

কিছুদিন আগে (২৯-এ মে) রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নাটক আকাদমীর যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রভারতী প্রেক্ষাগৃহে 'জাতীয় রঙ্গালয়' সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্র বসেছিল। এই চক্রে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বরূপার অন্যতম পরিচালক রাসবিহারী সরকার, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ রমেশ ভাট, অধ্যাপক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ এবং সর্বশেষে সভাপতি মন্মথ রায় জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাকে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করেন। এ সম্পর্কে আমরা বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করবার আশা রাখি।

—নান্দীকর

'অভিনেত্রী চাই'

'অভিনেত্রী চাই' হল একটি ছবির নাম। সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় এ ছবির শুভ মহরৎ উদযাপিত হল। গৌরাঙ্গ-প্রসাদ ঘোষ রচিত এ কাহিনীটির চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন প্রযোজকদ্বয় সুনীলকুমার দাস ও জগন্নাথ দাস।

'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট'

জয়দীপ পিকচার্সের 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। প্রণব রায় রচিত এ কাহিনীর উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, রুমক মজুমদার, কল্যাণী ঘোষ, অসিতবরণ, রেণুকা রায় ও পাহাড়ী সান্যাল। পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত এ ছবির সুরশিল্পীর হলেন শ্যামল মিত্র।

'মেঘ ভাঙা রোদ'

'মেঘ ভাঙা রোদ' ছবিটি পরিচালনা করছেন অমল দত্ত। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় এ ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। মধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ও রচিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সমিতা সান্যাল, জহর রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য অজয় গাঙ্গুলী, গীতা দে ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

'গরীয়সী গৌরী'

গৌরী-মা'র জীবনী অবলম্বনে 'গরীয়সী গৌরী' ছবিটি পরিচালনা করছেন রবি বসু। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত চিত্রনাট্যে রূপ দিচ্ছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, গীতা দে ও এন বিশ্বনাথন। অপরেশ লাহিড়ী ছবিটির সুরকার।

'অজানা শপথ'

সরকার প্রোডাকসন্সের 'অজানা শপথ' ছবিটির সম্পূর্ণ কাজ সম্প্রতি শেষ করেছেন পরিচালক সলিল সেন। কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সোমেন চক্রবর্তী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নবাগতা শিবানী বসু। শ্রীরঞ্জিত পিকচার্সের ছবিটির পরিবেশক।

'ঝুক গয়া আসমান'

প্রযোজক-পরিবেশক আর ডি বনশলের প্রথম হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আসমান'র সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ করলেন পরিচালক লেখ ট্যান্ডন। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বানু, প্রেম চোপরা, রাজেন্দ্রনাথ, ডেভিড, দুর্গা খোটে ও জাগীরদার। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

'হয়ে কাঁচ কি চুড়িয়াঁ' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

কিশোর সাহু প্রযোজিত ও পরিচালিত 'হয়ে কাঁচ কি চুড়িয়াঁ' ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি-লাভ করবে। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরকৃত এ ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও নয়না সাহু।

'আমনে সামনে'

সাইট এণ্ড সাউণ্ড প্রতিষ্ঠানে 'আমনে সামনে' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। ছবিটি পরিচালনায় করছেন সুরজ প্রকাশ। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন শশী কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, প্রেম চোপরা, মদনপুরী এবং কমল কাপুর। সংগীত-পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

'বিশ্বাস' চিত্রের শুভমহরৎ

বিজয়া মুভিজের রঙিন ছবি 'বিশ্বাস'-র শুভমহরৎ সম্প্রতি ফেমাস স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হল। এ ছবির নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বাংলার তরুণ নায়িকা অপর্ণা সেন (সেনগুপ্ত)। নায়ক চরিত্রে থাকছেন জীতেন্দ্র। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করবেন কামনী কৌশল, রাজেন্দ্রনাথ ও গুলসন। ছবিটি পরিচালনা করছেন সেওল পি কাশ্যপ। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন।

রঙ্গিণী : বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ের সম্প্রতি সসম্প্রদায় তরুণ রায় যে 'রঙ্গিণী' নাটকটি নিয়মিতভাবে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সামনে সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করছেন, সেটি যে তাঁর নিজস্ব মঞ্চ থিয়েটার সেন্টারে অভিনীত 'লেবেডেফ' থেকে অভিন্ন, এই কথাটি প্রথমেই জানিয়ে রাখা কর্তব্য। গেরাসিম লেবেডেফ নামে যে রুশ সংগীতজ্ঞ এই শহর-কলকাতায় প্রথম বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭-এ নভেম্বর তারিখে, তাঁরই নাট্য-প্রচেষ্টাকে উপজীব্য করে একটি কল্পনায়ভরা সরস কাহিনী রচনা করেছেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। এই রচনাকে আশ্রয় করে ২৬টি দৃশ্য ও দুটি অঙ্কে সম্পূর্ণ 'লেবেডেফ' নাটক গ্রথিত করেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। এই ইতিহাসাশ্রিত কল্পনামূলক নাটকটিতে এক দিকে দেখান হয়েছে লেবেডেফের বাঙলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠাপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্যালকাটা থিয়েটারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং অপর দিকে লেবেডেফের থিয়েটারের নায়িকা চম্পার সংগে ইংরেজ মরিসনের প্রেমকাহিনী ও মরিসন-দম্পতির বিরোধকাহিনী। চম্পার প্রতি উন্নতমনা লেবেডেফের একটি নিরুচ্চার প্রেমের ইঙ্গিত দর্শকমনকে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু মরিসনের প্রতি চম্পার একনিষ্ঠ প্রেমের উজ্জ্বলতার কাছে তাকে নিষ্প্রভ বলেই বোধ হয়। নাটকবর্ণিত কাহিনী দুটি পরস্পরকে খুব বেশী সাহায্য করে না বলেই নাটকটি একটি অখণ্ড গতি-বেগ বিশিষ্ট চূড়ান্ত ট্র্যাজিডিতে পরিণত হতে পায় নি।

বিশ্বরূপার বিস্তৃত মঞ্চের উপযোগী একটি প্রধান দৃশ্য এবং কয়েকটি অল্প-পরিসর খণ্ডদৃশ্যের সাহায্যে পূর্বের 'লেবেডেফ' বর্তমানে রঙ্গিণী নামে মঞ্চস্থ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের শহর-কলকাতাকে প্রধানত খেলোয়ার সাহায্যেই উপস্থাপিত করবার প্রয়াসটি

শিল্পশ্রী প্রযোজিত জরাসন্ধের লোহ-কপাট নাটকের একটি নাটকীয় মুহূর্তে রমজান ও কুট্টির ভূমিকায় তপন চট্টোপাধ্যায় ও গীতা দে।

প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। অভিনয়ে যথারীতি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তরুণ রায় (লেবেডেফ), দীপান্বিতা রায় (চম্পা—রঙ্গিণী), অমৃতভূষণ গুজরাল (বব মরিসন), অনুকূল দত্ত, (গোলক দাস), পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় (ভোজবাজীওয়ালা কণ্ঠিরাম), সংযুক্তা গুজরাল (লুসি মরিসন), অজিত মিত্র (জগন্নাথ গাঙ্গুলী), নন্দিতা ভট্টাচার্য (নর্তকী কুসুম) প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

●

এলেম নতুন দেশে : রঙ্গশ্রী নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি যে নাটকটি অন্তত দুবার মঞ্চস্থ করলেন, সেটি হচ্ছে নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর আধুনিকতম রচনা 'এলেম নতুন দেশে'। বলা হয়েছে, 'এলেম নতুন দেশে' একটি স্বপ্নসম্ভব নাটক। কিন্তু নাটকটি দেখবার পরে অসম্ভাব্যতাই বা কোনখানে? আজও দুর্ভাগ্যক্রমে যে-সব দেশে সমাজ-ব্যবস্থায় অসমতা চালু রয়েছে, সে-সব দেশের জনগণের পক্ষে সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থা অনধিগম্য হয়ে আছে বটে, কিন্তু নিজের নিজের পথে শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার পথে সকল দেশই যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, এ সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় আছে কি? ভারতেও আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদই লক্ষ্য হিসাবে মেনে নিয়েছি। [illegible] '[illegible] মুখার্জি' [illegible] বা বসন্ত সেনশর্মার মত বৈদেশিক বাণিজ্যদপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারী কিম্বা সিকদারের মত কন্ট্রাক্টারের যতই অপছন্দ হোক না কেন, শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রসার যে আজ হোক, বা দুদিন পরেই হোক, সকল সামাজিক অব্যবস্থার অবসান ঘটাবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়, এর মধ্যে স্বপ্ন বলে কিছু নেই।

নতুন শহরের দ্বারপ্রান্তে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রকে উপস্থিত করে এবং নূতন উষার স্বর্ণস্বার উন্মুক্ত হবার পরে তাদের সেই শহর সম্পর্কে ঘন্টাকয়েক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়ে ফেরত আনবার মধ্যে বিশেষ কোনও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আমরা দেখতে পাই নি। নারীর সহজাত ঈর্ষা বা পরস্পরের ভুল-বোঝাবুঝির ফলে মাঝে মাঝে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে এই শহর-দেখা-না-দেখার কোন সম্পর্কই নেই। তাই সমগ্র নাটকটিকে আমরা নিছক সাম্যবাদের জয়গান ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারছি না।

চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়ে জবরদস্ত নারী দেবশ্রীর ভূমিকায় রেণু ঘোষের অভিনয়কে আমাদের জীবন্ত বোধ হয়েছে; আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে তিনি ঐ ভূমিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মিঃ মুখার্জির সন্তানহারা পুত্র বিজয়ের বেশে নির্মল সরকারের অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁর খালি গলার গানও বিশেষ উপভোগ্য। কাজরীবেশে রেণু দেবী কতকটা যেন মেলো-ড্রামাটিক; ভাবাবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, তিনি যেন অভিনয় করছেন। নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর কুশল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ স্বাভাবিক; কেবল শেষের দিকে 'বাইরে কেন'র উত্তরে তাঁর একই কথা 'বিশেষ কারণ আছে'—দর্শকের মনে আশানুরূপ সাসপেন্স জাগানোর পরিবর্তে কিছুটা বিরক্তিরই উৎপাদন করেছে। অপরাপর ভূমিকায় নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ মুখার্জি), সত্য চট্টোপাধ্যায় (বসন্ত), কালিদাস ভট্টাচার্য (ঐতিহাসিক সুনীত মুখো), কেষ্টাদাস (সিকদার) ও সূর্যদাস (ফটিক) স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

●

জুলিয়াস ফুচিক : ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সীমান্তিক শাখা গেল ১২ই জুন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চিত্তরঞ্জন দাস লিখিত ও পরিচালিত 'জুলিয়াস ফুচিক' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। চেক কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য, সমাজতন্ত্রের প্রতি অবিচল প্রত্যয়ী, নিপীড়িত মানবাত্মার দরদী বন্ধু জুলিয়াস ফুচিক-এর গেস্টাপোদের হাতে বন্দীদশার শেষ কয়েকটি দিনের অতি-বাস্তব আলেখ্য এই নাটক-খানিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন নাট্যকার চিত্তরঞ্জন দাস। কুখ্যাত বর্বর নাৎসীদের বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক অত্যাচারকে যেভাবে নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা অতি-বড়ো কঠিন-হৃদয় দর্শকেরও সহ্য করা কঠিন। আমরাও এ-সব দৃশ্য চোখের সামনে বেশীক্ষণ ধরে ঘটতে দিতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছি নাটক অর্ধপথে পৌঁছুবার আগেই। কাজেই একমাত্র খালেদ

চৌধুরী পরিকল্পিত জেল-দৃশ্যটির প্রশংসা করা ছাড়া অপর কোন বিষয়ে মতামত দিতে অপারগ।

●

তাসের দেশ : পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব ২৪-এ জুন সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে কবির 'তাসের দেশ নৃত্যানাট্যটি মঞ্চস্থ করলেন। পুরী হোটেলের স্বত্বাধিকারী মাখনলাল হালদার ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী রাণী হালদারের অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অদম্য উৎসাহ একটি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। নানা পর্ব এবং উৎসব উপলক্ষে তাঁরা তাঁদের পুরী হোটেলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ও নবনির্মিত মঞ্চে বহুপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে উপস্থিত সুধিবর্গের আনন্দবর্ধন করে থাকেন। এবারে এঁরা সদলবলে কলকাতায় এঁদের সার্থক নৃত্যনাট্যাভিনয় দুটি 'তাসের দেশ' ও 'শ্যামা' কলিকাতাবাসীদের সমক্ষে পরিবেশন করতে এসেছেন। আমরা 'তাসের দেশ'টিই দেখবার সুযোগ পেয়েছি। সীমিত মঞ্চসজ্জা ও মাইক্রোফোনের অব্যবস্থাপূর্ণ অসহযোগ সত্ত্বেও হালদার-দম্পতির কিশোরী সম্প্রদায় নৃত্যে, অভিনয়ে, বাচনে, ভঙ্গীতে এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতায় আমাদের সামনে 'তাসের দেশ'-এর যে রূপ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন, তাকে আমরা সাদরে অভিনন্দন জানাই। নৃত্যের জন্যে সৃষ্ট সঙ্গীতাংশ প্রচুর নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মণিকা লাহার 'হরতনী' বেশে নৃত্য যেন আনন্দের ঝর্ণা। রাজপুত্র, সদাগরপুত্র, রাজা, রানী ও পঞ্জা-বেশে যথাক্রমে বীণা হালদার, দীপালি নস্কর, ঝর্ণা ঘোষ, সীমা চট্টোপাধ্যায় ও মমতা হালদার অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে স্ব স্ব ভূমিকায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্য ও পরিচ্ছদপরিকল্পনায় নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। মাত্র পরিচ্ছদে ইংরাজীতে 'কে' 'কিউ' '২' '৩' '৫' প্রভৃতি লেখা দৃষ্টিকটু বোধ হয়েছে।

রূপ ও ছন্দ

সম্প্রতি 'রূপ ও ছন্দে'র শিল্পীবৃন্দ স্টার রঙ্গমঞ্চে সংস্থার পঞ্চদশ বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে মঞ্চস্থ করলেন মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটক। মঞ্চসফল এই নাটকের অভিনয় সেদিন বোধহয় খুব উন্নত ধরনের নজীর সৃষ্টি করতে পারেনি। নাট্যনির্দেশনায় রাস-বিহারী দাস বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখতেও সক্ষম হননি। সামগ্রিক অভিনয়ের ব্যাপারে শিল্পীদের নিষ্ঠা চোখে পড়েছে। মিঃ মুখার্জির চরিত্রে দেবী চক্রবর্তী বৈশিষ্ট্য দেখাতে পেরেছেন, কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে। স্ত্রীচরিত্রচিত্রণে গীতা দে, বাসন্ত চ্যাটার্জি, প্রতিমা চক্রবর্তী ভালো অভিনয় করেছেন। নাটকের নায়কের ভূমিকায় দিলীপ সিনহার অভিনয় নাট্যানুরাগীকে নিরাশ করেছে। এ বিষয়ে নাট্যনির্দেশকের আরো একটু সচেতন হওয়া দরকার ছিল। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেন অসিত মিত্র, সুনীল কুণ্ডু, প্রশান্ত বসু, অজিত দত্ত।

বলাই সেন পরিচালিত **কেদাররাজা** চিত্রে লিলি চক্রবর্তী ও রত্না ঘোষাল।
ফটো : অমৃত

ভোলামাস্টার

অয়স্কান্ত বক্সী রচিত 'ভোলামাস্টার' একদিন বাংলার নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। পুরোনো দিনের এই মঞ্চসফল নাটকের একটি সুক্ষ্ম অভিনয় কিছুদিন আগে পরিবেশিত হোল 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'বহুমুখী' নাট্যগোষ্ঠী। সেদিন-কার মঞ্চরূপায়ণ অনেক দিক থেকে গতানুগতিকতা মুক্ত হোতে পেরেছিল। এই জন্য নাট্যনির্দেশক সাধন সরকার ও বহু-মুখীর শিল্পিবৃন্দ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখেন।

নাটকের বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের সংঘাত শিল্পীদের বলিষ্ঠ অভিনয়ে মঞ্চে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'ভোলামাস্টার' চরিত্রে অম্বিকা ভট্টাচার্যের চরিত্রানুগ অভিনয় দর্শককে তৃপ্ত করেছে। চরিত্রটির মর্মবেদনা শিল্পীর অভিনয়ে প্রতিটি মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্য দুটি চরিত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সুভাষ আচার্য, অসিত রায়। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সন্তোষ রায়, শ্যামলী মজুমদার, গীতা নাগ, শংকরনারায়ণ, সুতপা ভট্টাচার্য, কল্পনা ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ দত্ত, নীলকন্ঠ বন্দ্যো-পাধ্যায়, রবি রায়, হীরালাল দত্ত। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতে সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের ছাপ চিহ্নিত হয়েছে।

অগ্রণী

অগ্রণী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটক পরিবেশন করেছেন। অভিনয় আর আঙ্গিকের প্রাণবন্ত সমন্বয়ে সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনা সার্থক হয়ে

উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন—সুশীল মন্ডল, কানু ভট্টাচার্য, অলোক সান্যাল, নির্মাল্য রায়, যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী, শঙ্কর চক্রবর্তী, প্রকাশ গুপ্ত, সুকুমার হালদার, রেণু ঘোষ, গার্গী গুহ।

'শতরূপা'

রণজিৎ দত্তের 'অলৌকিক' ও রমেন লাহিড়ীর 'রাজযোটক' সম্প্রতি অভিনীত হোল প্রদীপ মেমোরিয়াল হলে। অভিনয়ের আয়োজন করেন 'শতরূপা' নাট্যগোষ্ঠী। 'অলৌকিক' নাটকের পরিবেশনে 'শতরূপা'র শিল্পীবৃন্দ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। বিশেষ করে ভূদেব ঘোষের চরিত্রে শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রাখার মতো। সুষমার চরিত্রে রুবী হালদারের অভিনয়ও সুন্দর। এছাড়া হরনাথের ভূমিকায় শচীন সেন, কমলের ভূমিকায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ও ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের চরিত্রে বারীন লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

*

'রাজযোটক' নাটকটির অভিনয়ে প্রত্যাশিত গতি অব্যাহত ছিল। সদানন্দ চরিত্রে বারীন লাহিড়ীর অভিনয় স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান দিয়েছে। চাটুজ্জে ও বিন্দুবাসিনীর ভূমিকায় শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায় ও দীপা হালদারের অভিনয় প্রশংসা করার মতো। নাটক দুটি আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন বারীন লাহিড়ী।

'আজ অভিনয় বন্ধ'

সম্প্রতি 'এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্পিবৃন্দ স্টার থিয়েটারে বীরেন্দ্র পাল চৌধুরীর 'আজ অভিনয় বন্ধ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সামগ্রিক নাট্যাভিনয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছে। এই ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক অজিত চট্টোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। ভালো অভিনয় যাঁরা করেন তাঁরা হোলেন গোরাচাঁদ শীল, ভূপতি ভাটিয়া, কমলেশ দত্ত, শঙ্কর মিত্র, দ্বারিক মতিলাল এবং ব্রজমোহন খান, লতিকা দাশগুপ্ত, গীতা দে, প্রতিমা পাল।

দুই পুরুষ

সম্প্রতি নর্দার্ন এ্যান্ড এমপ্লয়াস' রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ 'রঙমহলে' তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রমেশ চ্যাটার্জী। নটুবিহারীর ভূমিকায় গোপী মিত্রের অভিনয় মর্মস্পর্শী। সুশোভন ও শিবনারায়ণ চরিত্রে বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, এস মুখার্জী দর্শককে 'কছুটা নিরাশ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় শিল্পী-দের অভিনয় চরিত্রোপযোগী।

রূপরঙ্গ

বাঁকুড়ার নাট্য-সংস্থা 'রূপরঙ্গ' স্থানীয় আয়েঙ্গার মুক্তাঙ্গনে গঙ্গাপদ বসুর 'মহা-গুরু নিপাত' ও সলিল চট্টোপাধ্যায়ের 'মনোবীক্ষণ' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। নাটক দুটির বলিষ্ঠ অভিনয় দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত আদ্যাশক্তি মহামায়া চিত্রে সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও অসিতবরণ

চক্রবর্তী, ফণী সেন, ফুলচাঁদ সরাফ, সলিল চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ ভট্টাচার্য, নারায়ণ রায়, অরূপ সরকার, হরি-প্রসন্ন চক্রবর্তী, বিমল গুহ, সিদ্ধেশ্বর মালাকার, মাঃ অলোক, বেবী মুনমুন। আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীত নাটকের গতিকে অক্ষুন্ন রেখেছে।

জিগীষা-র 'বিন্দুর ছেলে' নাট্যাভিনয়

গত ১৮ জুন নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে জিগীষা সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কিশোর শিল্পীদের অভিনয়ে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন। অন্নপূর্ণার ভূমিকায় কল্পনা সেন বরাট, অমূল্যের ভূমিকায় কবরী সেন বরাট, যাদব-এর ভূমিকায় তপন মল্লিক ও নরেনের ভূমিকায় কল্যাণ সেন বরাট তাদের সাবলীল অভিনয়ে দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে।

বিন্দুর ও এলোকেশীর ভূমিকায় যথাক্রমে মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামলী গোস্বামী সুন্দর অভিনয় করে। নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অসীম সেন।

শিল্পশ্রী-র 'লৌহকপাট'

নবনাট্য আন্দোলনের ঢেউ আজ ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে দূরে শহরাঞ্চলেও। নানান রকমারী নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে যাঁরা নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সংগঠন কৃষ্ণনগরের অভিজাত গোষ্ঠী 'শিল্পশ্রী' গত ১৩ জুন স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে অভিনয় করলেন জরাসন্ধ রচিত ও জোতু বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য রূপায়িত 'লৌহকপাট'।

নাটকটির দলগত অভিনয়নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন অতিথি শিল্পী শ্রীজ্ঞানেশ মুখার্জি (ধন-রাজ), গীতা দে (কুট্টি), হিমানী গাঙ্গুলী (কাঙ্গী), স্থানীয় শিল্পী তপন চট্টোপাধ্যায় (রমজান), সিধু ব্যানার্জী (ভূতনাথ), নির্মাল্য ব্যানার্জী (বদর মুন্সী), বামনদাস গাঙ্গুলী (গিরীন), দুলাল রায় (রহিম), বসন্ত নন্দী (সালেম), শিব গুহ (সতীনাথ) ও অতিথি শিল্পী হৃদয় নস্কর (অজিত) এবং নাটকটির পরিচালক ও সংগঠনের প্রাণস্বরূপ শ্রীঅম্বুজ মৌলিক (কাশেম ফকীর)।

এঁরা ছাড়াও পার্শ্বচরিত্রে মনে রাখবার মত অভিনয় করেন বলাই মিত্র, রত্না ঘোষাল,

হীরেন নাগ পরিচালিত **সুয়োরাণীর সাধ** চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা সান্যাল। ফটো : অমৃত

সরোজ পাল, গৌর সাহা, শঙ্কর মুখার্জী প্রভৃতিরা।

এ ধরনের নাটক কৃষ্ণনগরের দর্শকেরা বহুদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবেন বলে মনে হয়।

শূদ্রক-এর নাট্যানুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার একটি বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা 'শূদ্রক' গত ২৪ জুন তাঁদের মঞ্চ-সফল নাটক 'শেষরক্ষা' রবীন্দ্রভারতীভবন মঞ্চে অভিনয় করেন। কবিগুরুর এই নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীপরিতোষ সোম। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে বাদল সমাদ্দার, রণেন ভট্টাচার্য, সন্তু চক্রবর্তী, সন্দীপ সোম, সুপ্রতিম সোম, বিদ্যুৎ বসুঠাকুর, সজল চক্রবর্তী, শ্যামল রায়চৌধুরী, মানিক বসু (সুনীল), সুভদ্রা চক্রবর্তী, মল্লিকা সোম, শিখা সেন ও পরিচালক পরিতোষ সোম। রূপসজ্জায় এবং সঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত রায়চৌধুরী ও প্রণতি বসু। শব্দপ্রক্ষেপণে ছিলেন নটবাবু।

বিবিধ সংবাদ

বিশ্ববিজয়ী হেমন্তকুমার :

"ভারতীয় সংগীতের প্রতি পশ্চিমী সমাজ আশ্চর্যরকম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন" এই অভিমত ব্যক্ত করলেন মধুকণ্ঠ গায়ক ও সংগীত-পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক বিশ্ব-পরিক্রমা শেষ করবার পরে সাংবাদিকদের প্রদত্ত এক নৈশ-ভোজের আসরে। স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়, পুত্র জয়ন্ত, কন্যা রাণু, প্রখ্যাত যন্ত্রী ভি, বালসারা এবং তবলা ও খোলবাদক পণ্ডিত সুদর্শনী অধিকারী—এই পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে হেমন্তকুমার বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন গেল ২৮-এ এপ্রিল। লণ্ডন, আমস্টার্ডাম, হেগ, সুরিনাম (দক্ষিণ আমেরিকা), গায়েনা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ত্রিনিদাদ, সান্-ফার্নাণ্ডো, পোর্ট অব স্পেন, চাগুয়ানা, নিউইয়র্ক, বোস্টন, ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যান্ড, টোরোন্টো (কানাডা), লস্ এঞ্জেলস্, টোকিও এবং সবশেষে হংকং হয়ে তাঁরা দমদমে ফিরে আসেন ১৭ই জুন রাত্রে। প্রতিটি জায়গায় ভারতীয় সংগীতের, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সংগীতের জনপ্রিয়তা তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। তিনি ও তাঁর দলের প্রত্যেকজন পেয়েছেন উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা প্রতিটি স্থানে। আমরা সপরিবার হেমন্তকুমারের নিরাপদ দীর্ঘজীবন কামনা করি ও তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত।

সায়ান্স ফিকশান সিনে ক্লাব :

আসছে ২রা জুলাই, ১৯৬৭, রবিবার বিকেলে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর প্রেক্ষাগৃহে চেকোশ্লোভাকিয়ার পূর্ণদৈর্ঘ্যের রঙীন কার্টুন ফিল্ম 'দি ক্রিয়েশন অব দি ওয়ার্ল্ড' এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের ফিল্ম 'ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড অব ক্যারেল জেমান' প্রদর্শিত হবে। এডওয়ার্ড হফম্যান পরিচালিত প্রথম ছবিটি ১৯৫৮ সালে ভিয়েনায় সপ্তম বিশ্বযুব ও ছাত্র উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক এবং একই বছরে ভেনিসে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় গ্র্যান্ড প্রিক্স্ ও স্পেশাল প্রাইজ অব জুরী লাভ করে।

ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানী আবার চালু

ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানীর আগরপাড়া কারখানায় দীর্ঘদিন যাবৎ যে লক-আউট চলছিল এক চুক্তির ফলে সম্প্রতি তার নিষ্পত্তি হয়। গত ২৮ জুন, বুধবার থেকে কারখানাটি আবার চালু হয়েছে।

খরাপীড়িত অঞ্চলের সাহায্যার্থে যাদু নাটক 'মায়ামহল'

সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় লর্ড সিনহা রোডে শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে গত ১৮ জুন সন্ধ্যায় ভারতবিখ্যাত যোগী যাদুকর মৃণাল রায়ের যাদু-নাটক 'মায়ামহল' প্রদর্শিত হয়। নৃত্যগীতসমৃদ্ধ বিশ্বের সর্বপ্রথম ও একমাত্র যাদু কৌশলের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ 'মায়ামহল' সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। মঞ্চে প্রায় ত্রিশজন কুশলী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর এক অভিনব অভিনয়ের মাধ্যমে 'মায়ামহল' প্রদর্শিত হয়। ম্যাজিকের প্রত্যেকটি খেলা বিভিন্ন আঙ্গিক ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কৌশলে অনবদ্য হয়। দর্শকমনকে বিমোহিত করতে এই ধরনের শিল্পসমৃদ্ধ যাদুক্রীড়া প্রদর্শনে শ্রীমৃণাল রায়ের কৃতিত্ব তাঁর শিল্পীসুলভ প্রতিভারই স্বাক্ষরস্বরূপ। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী মায়া রায়ের স্মরণ-শক্তির খেলাটিও দর্শকমনে গভীর রেখাপাত

করে। তিনি বহু অনুষ্ঠানে এই খেলাটি দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

খরাত্রাণে অনুষ্ঠিত এই যাদুপ্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীহেমন্তকুমার বসু উপস্থিত হয়ে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

মুরারীপুকুর ও-সি'র বাৎসরিক সভা

গত ১৭ জুন রামমোহন লাইব্রেরী হলে মুরারীপুকুর ও-সি'র বাৎসরিক সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে ডাঃ অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উক্ত অনুষ্ঠানে সংঘের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত 'বাঘনখ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় স্বপন গড়াই, স্বপন পাল, কমল অধিকারী, বাসুদেব সাহা, ধ্রুব কুন্ডু, বৈদ্যনাথ দাস, স্বপন সিংহ, লক্ষ্মীপদ দেব, সমগ্র ব্রন্দের অভিনয় এক কথায় সুন্দর। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীরমেশ দাস, নির্দেশনার দিক থেকে রমেশ দাসের কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। আবাহসঙ্গীত পরিবেশন করেন মিহির ঘোষ। আলোক-নিয়ন্ত্রণে প্রাণকৃষ্ণ কুন্ডু দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা পান।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনদাতা সম্মেলন

গত ২৬ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনদাতা সম্মেলন। এতে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন ন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীহরিশচন্দ্র জৈন।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ১৬ জুন বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর ৮৫তম প্রতিষ্ঠাদিবস নানা তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য ছবির মাধ্যমে বাংলা যাত্রাগানের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে বাংলার নিজস্ব সম্পদ যাত্রাগানের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভাষণ দেন এবং এ ধরনের প্রদর্শনীর প্রয়োজনীতা উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রদর্শনটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের সদস্য শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।
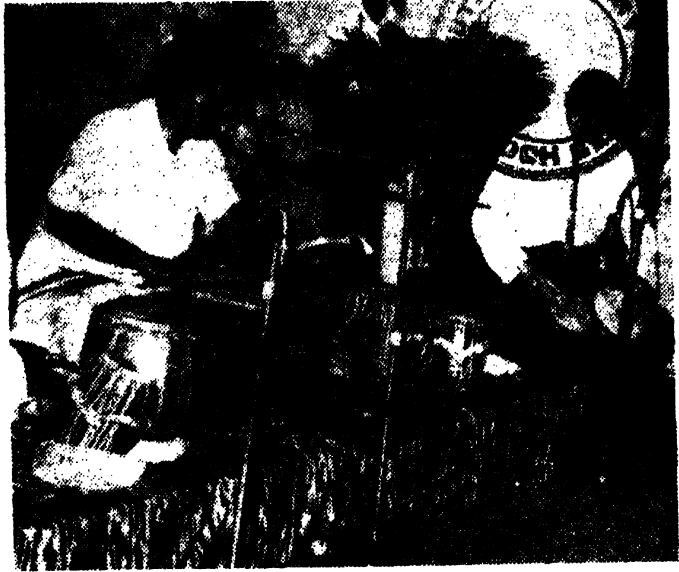
গায়েনার কুইন্স্ হল-এর অনুষ্ঠানে হেমন্তকুমার, বেলা মুখোপাধ্যায় এবং জয়ন্তকুমার।

সংস্কৃতি সংসদের নজরুল জয়ন্তী

গত ১৮ জুন বর্ধমান টাউনহলে সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে এক রুচিস্নিগ্ধ পরিবেশে নজরুল জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সনৎকুমার রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন নজরুলের সুখ-দুঃখের চিরসহচর প্রবীণ সাহিত্যসেবী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। নজরুল জয়ন্তীর বিচিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী ফজলুল করিম, ফাজলা করিম, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মৈনাক মুখোপাধ্যায়, কাজী সুফিকা, কাজী ফৌজিয়া, শ্রীমতী কলি ভট্টাচার্য, শ্রীমতী দুর্গা পাল প্রভৃতি।

জীবন বসু ও সুশান্ত চৌধুরী পরিচালিত মিস্ প্রিয়ংবদা চিত্রে লিলি চক্রবর্তী।

কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৯ জুন রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপি কে সেন। অনুষ্ঠানে সমিতির সভ্যগণ শ্রীরমেশ গোস্বামী রচিত 'কেদার রায়' নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যপরিচালনা করেন ও নামভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন ডঃ মনোরঞ্জন বসু। চাঁদরায়ের চরিত্রে ডঃ অরবিন্দ ঘোষের অভিনয় মনে রাখার মত। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে সর্বশ্রী নীলকন্ঠ ব্যানার্জি, জ্যোতিশ বসু, নিরঞ্জন ব্যানার্জি, কৃষ্ণ ব্যানার্জি'র অভিনয় ভাল লেগেছে। সমগ্র নাটকের টীম ওয়ার্ক খুবই উল্লেখযোগ্য। নারীচরিত্রে শ্রীমতী শিপ্রা সাহা ও কুমারী চায়না ব্যানার্জী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এক অভিনব পরিবেশে মরমী'র কবি প্রণাম

গত ২৮শে মে, সুরিষা (ডায়মণ্ডহারবার) দত্তপাড়া চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গণে মরমী সাংস্কৃতিক সংস্থা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব উদযাপন করে।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শাসক দিলীপ ব্যানার্জি, প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন স্থানীয় ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যাপক শিবপ্রসাদ হালদার ও উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ বিষ্ণুপ্রসাদ বসু।

গানের জলসা

‘সাতরং’ সংগীত সম্মেলনের জলসা

সাতরং সংগীত স্কুলের উদ্যোগে সম্প্রতি ‘একাডেমী অফ ফাইন আর্টস’ হলে দুদিনব্যাপী এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের স্মরণীয় অনুষ্ঠান হোলো দাগার শিল্পীদের ধ্রুপদী সঙ্গীত। ধ্রুপদ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উৎস—এবং ধ্রুপদী ভিত্তি খেয়ালের গাম্ভীর্য ও মর্যাদাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কেন করে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় এ'দের ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করলে।

প্রথম দিনের শিল্পী ছিলেন নাসির জহিরুদ্দিন দাগার ও নাসির ফৈয়াজুদ্দিন দাগার। তরুণ শিল্পীদ্বয়ের আলাপের বিলম্বিত অঙ্গ, মধ্যজোড় ও ধামারে, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা ও রেওয়াজ প্রশংসার দাবী রাখে। গমকবাহুল্যের চাঞ্চল্য যদি কিছু থেকে থাকে—হয়ত তা নবীন মনের গতিপ্রবণতা। পরিণত বয়সে এ ত্রুটি শুধরে যাবে। মিঞা মল্লারের ভাবটিও এ'রা সুপরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছিলেন।

জিয়া মহীউদ্দিন দাগারের বীন-ধ্রুপদী শুদ্ধ গায়কী অঙ্গে পরিবেশিত। বৃহদায়তন লাউ ও দাণ্ডীর এই বীন দক্ষিণ ভারতে ‘রুদ্রবীন’ নামে পরিচিত—উত্তর ভারতে সারস্বত বীন। ভারী তারের গম্ভীর আওয়াজ অল্প সময়েই ভাব-গভীর পরিবেশ রচনা করে। ইনি বাজালেন পুরিয়া কল্যাণ। প্রতিটি স্বরের শুদ্ধ শান্ত ভার-সাম্য, মীড়ের সূক্ষ্মকাজ এবং শ্রুতি-সৌন্দর্যের মধ্যে গান্ধারের রেশ ভোলার নয়। বিলম্বিত, মধ্যজোড় উভয় অঙ্গই সবিস্তারে পল্লবিত। তবে মেজরা ব্যবহার করেননি বলেই হয়ত বোলের বৈচিত্র্য ও ঝালার অংগ কম।

শেষের দিন সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোলো ওস্তাদ আমিনুদ্দিন দাগারের ধ্রুপদ দিয়ে। ললিতের শান্তকরুণ রস তাঁর উদার বিস্তারে মর্মস্পর্শভাবে অভিব্যক্ত। পূর্বে বহুবার তাঁকে স্বর্গত ভ্রাতা মহীউদ্দিনের সঙ্গে গাইতে শোনা গেছে, তাঁর একক অনুষ্ঠানে সেই সাথী-শিল্পীর অভাব গভীর ভাব-ব্যঞ্জনার মুহূর্তেও স্মরণে আসে। শুদ্ধবাণীর সঙ্গে প্রয়োজনমত খাণ্ডারবাণী প্রয়োগে—ভাবকে প্রগাঢ় করে তুলেছেন। সবগুলি ধ্রুপদা-নুষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীবিঠলভাই দাস গুজরাটির মেজাজী পাখোয়াজসঙ্গত গানের বাহার খুলে দিয়েছে।

খেয়ালের অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ‘পুরিয়া’ সংগীত। ওস্তাদ আমীর খাঁর কিছু প্রভাব তাঁর গায়কীতে যদি এসেই থাকে ক্ষতি কি? এই সব গুণীদের আন্দাজও উত্তরসূরীদের মারফৎ ভাবীকালের দরবারে পৌঁছোনো দরকার?

শ্রীমতী মালবিকা কাননের কেদার ও দেশ তাঁর স্বভাবানুগ অনাড়ম্বর দক্ষতায় সীমিত পরিসরের মধ্যেও সুপরিবেশিত।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ গাইলেন মালকোশ। পুত্র ও শিষ্য মুনোয়ার খাঁ ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠসহযোগিতার অভাবেই হয়ত তাঁর অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তবু সুরেলা তানবৈচিত্র্যে তাঁর রঙিন মনের কল্পনাবৈভব শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। মাঝে মাঝে মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠদান করেছেন। প্রায় সবকটি খেয়ালের সঙ্গে (অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া) আফাক হোসেনের তবলাসঙ্গত অনুষ্ঠান-গুলির উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর জয়-জয়ন্তী অনিল ভট্টাচার্যর তবলাসহযোগে ছন্দবৈচিত্র্যে চিত্তরঞ্জনী।

মণিলাল নাগের বসন্তমুখারী রসিক শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

ভি জি যোগ ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বেহালা ও হার্মোনিয়মের যুগলবন্দী এখনকার সঙ্গীতাসরগুলির অন্যতম আকর্ষণ। আপনাপন বৈশিষ্ট্যে তাঁরা আসর জমিয়ে রেখেছেন। ছন্দচাতুর্যের খেলায় যদি কখনও চাঞ্চল্য এসে থাকে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বৈদগ্ধ্য তাকে নিঃসন্দেহে পরি-মার্জিত করেছে। গৌড়মল্লার গতের বন্দেজটি বড় মেজাজী।

কথক নৃত্য পরিবেশন করেছেন বাংলার মায়া চ্যাটার্জি এবং দিল্লীর উমা শর্মা। বাংলা সুনাম বজায় রেখেছে। তবে আসরকে মুগ্ধ করে রেখেছেন দিল্লীর নৃত্য-শিল্পী। গতানুগতিক প্রথায় দীনতা পরিহার করে নতুন অঙ্গিক এবং কল্পনার পটভূমিকায় কিছু নৃত্যরচনা প্রদর্শন করলেন শুদ্ধ কত্থকের ঢঙেই। সুন্দর মহা-রাজজীর শিষ্যা হলেও বিরজু মহারাজের কিছু উপাদান তিনি পেশ করলেন। যেমন ছন্দবিন্যাস তেমনই সুষমার ঐশ্বর্য। প্রতি পদক্ষেপের—শোভন লালিত্যে সৌন্দর্যের আবেদন হৃদয়-সঞ্চারী। তাঁর সংগীত-সংগতিয়াও প্রশংসাযোগ্য উল্লেখের দাবী রাখে। সংগতীয়াদের মধ্যে সরোদে স্বনাম-খ্যাত ওস্তাদ হাফেজ আলির পুত্র রহমতের উপস্থিতি (নৃত্য-সঙ্গতীরূপে) কাউকে কাউকে হয়তো বেদনা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের তা মনে হয়নি। কারণ আমজেদ আলি খাঁ হবার ক্ষমতা না থাকলেই যে এক শিল্পীর সঙ্গীতজীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে হবে এই বা কেমন কথা? বরং অহমিকা ত্যাগ করে আপন যোগ্যতার পথ খুঁজে নেওয়ার মধ্যেও একটা গৌরব আছে। কোন প্রতিভা কোন পথে সার্থক হয়ে ওঠে তা কি কেউ বলতে পারে? তাছাড়া নৃত্যসংগতে বাজালেই শিল্পী ছোট হয়ে যায় না। উদয়শঙ্করের সঙ্গীত-দলের শিল্পীরা আজও সারা ভারতের বিস্ময় ও গৌরবের বস্তু। অবশ্য উদয়শঙ্করের মত শিল্পী ‘কোটিতে গোটিক’ মেলে।

উদয়াচলম-এর মাসিক সঙ্গীত অধিবেশন

‘উদয়াচলম’এর মাসিক সাংগীতিক অধি-বেশন বাঁশরী মিত্র ও জয়শ্রী মিত্রের দ্বৈত সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সুরু হয়। একটি নতুন বাদ্যযন্ত্র (মেলো ডয়ান) বাজিয়ে বাঁশরী মিত্র শ্রোতাদের বিস্মিত করেন। বেহালায় রবীন্দ্রসংগীত ও লঘু সংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান রঞ্জিৎ দে। রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে শোনান জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। অলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত কন্ঠে বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সবশেষে সঞ্জিৎ দে ও রঞ্জিৎ ঘোষের গীটার ও তবলার সুরমূর্ছনায় অনুষ্ঠানটিকে আরও সুমধুর করে তোলে।

শ্রীঅমীতা চট্টোপাধ্যায়। নত বিশিষ্ট সংগীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে প্রভূত প্রশংসা পেয়েছেন।

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলার একটি দৃশ্য। —ফটো : অমৃত

দর্শক

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দল

ভারতবর্ষ : ৩৬২ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সারদেশাই ১০৪, কুন্দরন ১৩৪, ওয়াদেকার ৫৬ এবং বোরদে নটআউট ৫৮ রান)।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় : ১৮১ রান (এন জে কোস ৬৪ রান। প্রসন্ন ৫৩ রানে ৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৩২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪১ রান (জি এ কোটরেল ৫০ এবং সি এল প্রুনিহা ৪৪ রান। প্রসন্ন ১১ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৪৫ রানে ৫ উইকেট)

কেম্ব্রিজে আয়োজিত তিনদিনের খেলায় চান্দু বোরদের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৪০ রানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে—১৯৬৭ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম জয়।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দল তিন উইকেটের বিনিময়ে ৩৬২ রান সংগ্রহ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম উইকেটের জুটিতে সরদেশাই (১০৪) এবং কুন্দরন ১৭৫ মিনিটের খেলায় দলের ২১০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। সরদেশাই এবং কুন্দরনের মধ্যে সেঞ্চুরী করা নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। সরদেশাই প্রথম সেঞ্চুরী রান (১২টি বাউন্ডারীসহ) পূর্ণ করেন। কুন্দরনের সেঞ্চুরী রানে ছিল ১৬টা বাউণ্ডারী। চা-পানের বিরতির সময় ভারতীয় দলের রান দাঁড়ায় ২৮০ (২ উইকেটে)। কুন্দরন ২১৭ মিনিট খেলে তাঁর ১৩৪ রানের (২১টা বাউন্ডারী) মাথায় আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংস ১৮১ এবং দ্বিতীয় ইনিংস ১৪১ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। লাঞ্চের সময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংসের রান ছিল ১৩৭ (৫ উইকেটে)—অর্থাৎ 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ৭৫ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লাঞ্চের পরের খেলায় তাদের ব্যাটিংয়ে দারুন ভাঙ্গন ধরে। ১৮১ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ১৮১ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়েছিল। চা-পানের সময় কেম্ব্রিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট পড়ে ৩৪ রান উঠেছিল—ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ১৪৭ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ইনিংস পরাজয় থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। এই খেলায় প্রসন্ন ৬৪ রানে ৭ উইকেট (৫৩ রানে ৪ ও ১১ রানে ৩) এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৭৭ রানে ৮ উইকেট (৩২ রানে ৩ ও ৪৫ রানে ৫ উইকেট) পান।

ভারতীয় দল : ৩১৬ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বোরদে নটআউট ১১৫, ওয়াদেকার ৫১ এবং সরদেশাই ৪৯ রান)।

ও ১৮৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াদেকার ৮১ রান। ক্যাপল ৪৭ রানে ২ উইকেট)

হ্যাম্পসায়ার : ২০৭ রান (রয় মার্শেল ৭৭ এবং পি জে সলিসবারি ৫২ রান। চন্দ্রশেখর ৭২ রানে ৫টা এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৫৫ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৮৬ রান (৯ উইকেটে। রয় মার্শেল ১১২ রান। গুহ ৭৫ রানে ২, ভেঙ্কটরাঘবন ১৫ রানে ২ এবং চন্দ্রশেখর ৫৭ রানে ৫ উইকেট)।

ভারতীয় বনাম হ্যাম্পসায়ার দলের তিন দিনের খেলাটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ড্র যায়।

প্রথমদিনের খেলায় ভারতীয় দল ৫ উইকেট খুইয়ে দলের ৩১৬ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কাউন্টি দল বাকি সময়ের খেলায় ১৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের কিছু পরেই ২০৭ রানের মাথায় কাউন্টি দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনের লাঞ্চের পর ১৫ মিনিট ব্যাট করে ভারতীয় দল ১৮৩ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি [illegible]

ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন রেলওয়ে দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় রেলওয়ে দলের গোলের সম্মুখের একটি দৃশ্য।
—ফটো : অমৃত

করে। খেলার এই অবস্থায় কাউন্টি দলের জয়লাভের জন্যে ২৯৩ রানের প্রয়োজন ছিল। চা-পানের সময় কাউন্টি দল ১১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের ২৮৬ রানের মাথায় সুব্রত গুহ এই খেলার শেষ ওভারের বল করার ভার পান। তখন জয়লাভের জন্যে কাউন্টি দলের মাত্র ৭ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে জমা ছিল দুটো উইকেট। গুহ এইদিনের খেলার শেষ ওভারের প্রথম বলেই টিমসকে বোল্ড আউট করেন। কাউন্টি দল শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। ভারতীয় দল পরাজয়ের হাত থেকে খুব জোর রক্ষা পায়। কাউন্টি দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দলের অধিনায়ক রয় মার্শেলের সেঞ্চুরী (১১২ রান) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ১৯-২৫) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ১৪টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল: ১১টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৩টি খেলা ড্র।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ তালিকায় তাদের শীর্ষস্থান এ সপ্তাহেও বজায় রেখেছে। আলোচ্য সপ্তাহে ৪—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং লীগের দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় ২—১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করায় ইস্টবেঙ্গল দল লীগ তালিকায় শীর্ষস্থানেই থেকে গেছে—১১টা খেলায় ২০ পয়েন্ট (জয় ৯ এবং ড্র ২)। গত বছর- রানার্স-আপ মোহনবাগানের বিপক্ষে তাদের ২-১ গোলে জয়লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এরিয়ান্স ১-৩ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হয়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে— ১২টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট। অপরদিকে বি-এন আর ১-১ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং ১-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে খেলা ড্র করে তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে—১২টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট। ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১-০ গোলে রাজস্থান এবং ৩-১ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত করে ক্লাবের অবস্থা অনেকটা ফিরিয়েছে—১১টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগানের ৭টা খেলায় ১১ পয়েন্ট উঠেছে (জয় ৫, ড্র ১, হার ১)।

জিওফ বয়কট (ইংল্যান্ড) : লিডসের হেডিংলে মাঠে ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের প্রথম টেস্টে যে নটআউট ২৪৬ রান করেন তা তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের তৃতীয় সেঞ্চুরী এবং ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড।

বিশ্ব বাস্কেটবল খেতাব

বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রেজিল ৭৪-৬৬ পয়েন্টে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার বিশ্ব খেতাব জয়ী হয়েছে।

বিশ্ব রেকর্ড

পোল ভল্ট: ৫-৩৬ মিটার—বব সিগ্রেন

৪×১০০ গজ রিলে: ৩৯ সেকেন্ড—দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় হকি দলের ইউরোপ সফর

পৃথিপাল সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দল ইউরোপ সফর শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসেছে। মোট ৩০টি খেলার ফলাফল: ভারতীয় দলের জয় ২২, পরাজয় ৩ এবং ড্র ৫। ভারতীয় দলের তিনটি পরাজয়—হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং ইংল্যান্ডের হনেটস ক্লাবের বিপক্ষে।

লর্ডস মাঠের সংগ্রহশালায় মৃৎপাত্রে সংরক্ষিত ১৮৮২-৮৩ সালে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ব্যবহৃত উইকেটের চিতাভস্ম।

ক্রিকেটের পুণ্যতীর্থ-লর্ডস

ক্ষেত্রনাথ রায়

ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট মাঠ—লণ্ডন সহরের সেণ্ট জন্স উড রোডের ঠিকানায় অবস্থিত। মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাব এবং মিডলসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট ক্লাবের হেড-কোয়ার্টারস এই লর্ডস মাঠ সারা বিশ্বের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পুণ্য তীর্থস্থান। লর্ডস মাঠের প্রতিটি তৃণ এবং ধূলিকণা অতীতের বহু গৌরবময় ক্রিকেট অধ্যায়ের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। ক্রিকেট খেলার সূত্রে লর্ডস মাঠ ইংল্যাণ্ডের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট সজীব জাতীয় সংগ্রহশালা। বর্তমান তৃতীয় লর্ডস মাঠের দুই শরিক মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাব এবং মিডলসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট ক্লাবের কর্ম-জীবনে বিরাট পার্থক্য আছে। প্রথম বিভাগের কাউণ্টি ক্রিকেট লীগে যোগদানকারী ১৭টি ক্লাবের অন্যতম ক্লাব এই মিডলসেক্স ক্রিকেট ক্লাব, প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩ সালে। অপর-দিকে মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষেপে এম সি সি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৭৮৭-৮৮ সালের ক্রিকেট মরসুমে। সুতরাং এম সি সি বয়োজ্যেষ্ঠ। কাউণ্টি ক্রিকেট ক্লাব, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংল্যাণ্ড সফরকারী বৈদেশিক ক্রিকেট দলের সঙ্গে এম সি সি নিয়মিতভাবে ক্রিকেট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করলেও ইংল্যাণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ, গিলেট কাপ নকআউট প্রতিযোগিতা বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করে না। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ কর্তা হল এই এম সি সি। বৈদেশিক ক্রিকেট সফরে কাউণ্টি ক্রিকেট দলগুলির খেলোয়াড় নিয়ে এম সি সি দল তৈরী করে এবং সফরের টেস্ট খেলায় এই এম সি সি দলই ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। ক্রিকেট খেলার আইন প্রণয়ন এবং আইনের সংশোধন ব্যাপারে এম সি সি'র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ক্রিকেট খেলার আইনের প্রশ্নে এম সি সি সুপ্রীম-কোর্ট। বিশ্বের ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশ-গুলির সঙ্গে এম সি সির খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। এম সি সির প্রধান কর্মস্থানের জন্যেই লর্ডস মাঠের এত নাম-ডাক।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে পরম বিক্রমশালী এই এম সি সি এবং ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠ—এদের সঙ্গে টমাস লর্ডের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইয়র্ক-সায়ারের অধিবাসী টমাস লর্ডের নামেই লর্ডস মাঠের নামকরণ। টমাস লর্ড ছিলেন হোয়াইট কনডুইট ক্লাবের একজন কর্মচারী এবং সেই সূত্রে ক্রিকেট খেলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক এবং অনুরাগী। অষ্টম আর্ল অব উইনচেলসা এবং চার্লস লেনোক্সের (পরবর্তীকালে চতুর্থ ডিউক অব রিচমণ্ড) আনুকুল্যে পোর্টম্যান এস্টেট থেকে ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে টমাস লর্ড ১৭৮৭ সালে খেলার জমি (বর্তমানে ডরসেট স্কোয়ার) ইজারা নিয়েছিলেন। এই প্রথম লর্ডস মাঠে প্রথম ক্রিকেট খেলার আসর বসে ১৭৮৭ সালের ৩১শে মে—মিডলসেক্স বনাম এসেক্স। হোয়াইট কনডুইট ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য অষ্টম আর্ল অব উইনচেলসা এবং চার্লস লেনোক্সের পৃষ্ঠপোষকতায় ডরসেট স্কোয়ারের এই লর্ডস মাঠে মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাঠে এম সি সি তাদের প্রথম ক্রিকেট খেলায় (১৭৮৮ সালের ২৭শে জুন) ৮৩ রানে হোয়াইট কনডুইট ক্লাবকে পরাজিত করে। অল্প দিনের মধ্যে হোয়াইট কনডুইট ক্লাবের অস্তিত্ব লোপ পায়, তারা শেষ পর্যন্ত মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে ভিড়ে যায়। এদিকে প্রথম লর্ডস ক্রিকেট মাঠের চারপাশে বাড়ী তৈরীর হিড়িক দেখে দূরদর্শী টমাস লর্ড ১৮০৮ সালে নর্থ ব্যাঙ্কের কাছে এক-খণ্ড জমি ইজারা নিলেন। ১৮১১ সালের মে মাসে প্রথম লর্ডস মাঠ থেকে এম সি সি দ্বিতীয় লর্ডস মাঠে উঠে আসে। অফিসের আসবাবপত্রের সঙ্গে প্রথম লর্ডস মাঠের পীচও তুলে আনা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় লর্ডস মাঠের মাঝখান দিয়ে রিজেণ্ট ক্যানেল খননের চূড়ান্ত প্রস্তাবে এম সি সিকে দ্বিতীয়বার বাস্তুত্যাগী হতে হয়। সেণ্ট-জন্স উডে টমাস লর্ড ১৮১৪ সালে যে তৃতীয় জমি ইজারা নিয়েছিলেন, সেই তৃতীয় লর্ডস মাঠেই ১৮১৪ সাল থেকে এম সি সির বর্তমান হেডকোয়ার্টার্স। ১৮২৫ সালে টমাস লর্ডের আর্থিক সংকটকালে উইলিয়ম ওয়ার্ডের কাছ থেকে ৫০০০ পাউণ্ডের সাহায্য না পাওয়া গেলে লর্ডস মাঠ এবং সেই সঙ্গে এম সি সির জীবনে মহাবিপর্যয় দেখা দিত। পরবর্তীকালে লর্ডস মাঠের মালিকানা দুই হাত বদলে (উইলিয়ম ওয়ার্ড এবং জেমস হেনরী ডার্ক) শেষ পর্যন্ত আইজ্যাক মসের হাতে আসে। ১৮৬৬ সালে এম সি সি কর্তৃপক্ষ ১৮০০০ পাউণ্ড মূল্যে লর্ডস মাঠের মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করেন এবং ১৮৭৭ সালে বর্তমান তৃতীয় লর্ডস মাঠ মিডলসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট দলেরও হেড-কোয়াটার্সে পরিণত হয়। প্রধানতঃ উইলিয়ম ওয়ার্ডের আর্থিক আনুকুল্যে লর্ডস মাঠের যে প্রথম প্যাভিলিয়ানটি নির্মিত হয়েছিল, তা ১৮২৫ সালের অগ্নিকাণ্ডে বহু ক্রিকেট রেকর্ডের সঙ্গে ভস্মীভূত হয়। লর্ডসের দ্বিতীয় প্যাভিলিয়ানটি তৈরী হয় ১৮২৬ সালে এবং ১৮৩৮ সালে আর্চারি গ্রাউণ্ড, বোলিং গ্রীণ, টেনিস কোর্ট প্রভৃতি নির্মিত হয়। ১৮৬৬ সালে দ্বিতীয় প্যাভিলিয়ানটি আরও বড় করা হয় এবং এই বছরেই গ্র্যাণ্ড

স্ট্যান্ড এবং আগের ট্যাভার্ণের পরিবর্তে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত নতুন অট্টালিকা তৈরী হয়। বর্তমানের ৩নং প্যাভিলিয়নটির নির্মাণকার্য ১৮৮৯ সালে আরম্ভ হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহে প্রবেশ হয় ১৮৯০ সালে।

ইংলিশ ক্রিকেটের জনক ডাঃ উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেসের স্মরণে গ্রেস গেট এবং গার্ডেন্স, মিডলসেক্স এবং ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্ণারের স্মৃতিতে ওয়ার্ণার স্ট্যান্ড, গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ফাদার টাইম), লর্ডসের সংগ্রহশালা প্রভৃতি নিয়ে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড আপন ঐতিহ্যে হিমালয় পর্বতের সমান উঁচু মাথা করে দণ্ডায়মান রয়েছে।

লর্ডস মাঠের সংগ্রহশালায় আছে ক্রিকেট খেলার অসংখ্য রঙীন চিত্র, খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট মাঠের আলোকচিত্র, ছাপা ছবি, ব্যাট, বল, উইকেট প্রভৃতি স্মারক দ্রব্য, কৌতূহলোদ্দীপক সামগ্রী, খেলার স্মৃতিচিহ্ন, বীরত্ব ব্যঞ্জক গাথা এবং ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক।

সংগ্রহশালার প্রধান আকর্ষণঃ ১৯৩৬ সালের ৩রা জুলাই তারিখে লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত এম-সি-সি বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলায় যে হতভাগ্য চড়ুই পাখিটি ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় জাহাঙ্গীর খাঁর (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) বোলিংয়ের মুখে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল তার মরদেহ (অভিশপ্ত বলের উপর শায়িত অবস্থায়), ১৮৮২-৮৩ সালে মেলবোর্ণে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ব্যবহৃত উইকেটের চিতাভস্ম (যা মেলবোর্ণের একদল মহিলা মৃৎপাত্রে সংগৃহীত করে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আইভো ব্লিগকে উপহার দিয়েছিলেন), অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক উইলিয়ম মার্ডোকের ব্যবহৃত ব্যাট (এই ব্যাটেই তিনি ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওভাল মাঠে ১৫৩* রান করেছিলেন), স্যার লিওনার্ড হাটনের ব্যবহৃত ব্যাট (যা দিয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভাল মাঠে ৩৬৪ রান করে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন)।

১৯৩৬ সালের ৩রা জুলাই তারিখে লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত এম সি সি বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলায় যে হতভাগ্য চড়ুই পাখিটি ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় জাহাঙ্গীর খাঁর (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) বোলিংয়ের মুখে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয় তার মরদেহ (অভিশপ্ত বলের উপর শায়িত অবস্থায়)।

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড ॥

স্থান : লর্ডস মাঠ (১৯৩২—৬৭)

১৯৩২ (জুন ২৫-২৮): ইংল্যান্ড ১৫৮ রানে জয়ী।

ইংল্যান্ড: ২৫৯ রান (ডগলাস জার্ডিন ৭৯ এবং লেসলি এমস ৬৫ রান। মহম্মদ নিসার ৯৩ রানে ৫, অমর সিং ৭৫ রানে ২ এবং সি কে নাইডু ৪০ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৭৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ। জার্ডিন নটআউট ৮৫ এবং এডওয়ার্ড পেন্টার ৫৪ রান। জাহাঙ্গীর খাঁ ৬০ রানে ৪, অমর সিং ৮৪ রানে ২ উইকেট)।

ভারতবর্ষ: ১৮৯ রান (সি কে নাইডু ৪০, নওমল জিওমল ৩৩ এবং এস ওয়াজির আলী ৩১ রান। বাউজ ৪৯ রানে ৪, ভোস ২৩ রানে ৩ এবং রবিন্স ৩৯ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৮৭ রান (অমর সিং ৫১ এবং এস ওয়াজির আলী ৩৯ রান। হ্যামন্ড ৯ রানে ৩ উইকেট)

১৯৩৬ (জুন ২৭-৩০): ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়ী।

ভারতবর্ষ: ১৪৭ রান (বিজয় মার্চেন্ট ৩৫ এবং ডি ডি হিন্দেলকার ২৬ রান। জি ও এ্যালেন ৩৫ রানে ৫ এবং রবিন্স ৫০ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৯৩ রান (ডি ডি হিন্দেলকার ১৭ রান। এ্যালেন ৪৩ রানে ৫ এবং ভেরিটি ১৭ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যান্ড: ১৩৪ রান (মরিস লেল্যান্ড ৬০ রান। অমর সিং ৩৫ রানে ৬ এবং নিসার ৩৬ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১০৮ রান (১ উইকেটে। এইচ গিম্বলেট নটআউট ৬৭ রান। নিসার ২৬ রানে ১ উইকেট)।

১৯৪৬ (জুন ২২-২৫): ইংল্যান্ড ১০ উইকেটে জয়ী।

ভারতবর্ষ: ২০০ রান (রুসী মোদী নটআউট ৫৭, হাফিজ ৪৩ এবং হাজারে ৩১ রান। এ ভি বেডসার ৪৯ রানে ৭ এবং রাইট ৫৩ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৭৫ রান (ভিনু মানকাদ ৬৩, লালা অমরনাথ ৫০ এবং হাজারে ৩৪ রান। এ ভি বেডসার ৯৬ রানে ৪ এবং স্মেলস ৪৪ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড: ৪২৮ রান (জোসেফ হার্ডস্টাফ নটআউট ২০৫, পি এ গিব ৬০ রান।

অমরনাথ ১১৮ রানে ৫ উইকেট)।

ও ৪৮ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

১৯৫২ (জন ১৯-২৪): ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী।

ভারতবর্ষ: ২৩৫ রান (ভিন্ন মানকাদ ৭২ এবং ভি এস হাজারে নটআউট ৬৯ রান। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৭২ রানে ৪ এবং এ জে ওয়ার্টকিন্স ৩৭ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৩৭৮ রান (মানকাদ ১৮৪, হাজারে ৪৯ এবং জি এস রামচাঁদ ৪২ রান। ট্রুম্যান ১১০ রানে ৪ এবং জে সি লেকার ১০২ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যান্ড: ৫৩৭ রান (লেন হাটন ১৫০, আর টি সিম্পসন ৫৩, পিটার মে ৭৪, টম গ্রেভনী ৭৩ এবং গডফ্রে ইভান্স ১০৪ রান। মানকাদ ১৯৬ রানে ৫ এবং গোলাম আমেদ ১০৬ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৭৯ রান (২ উইকেটে)।

১৯৫৯ (জন ১৮-২০): ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী।

ভারতবর্ষ: ১৬৮ রান (নরী কন্ট্রাক্টর ৮১ এবং ঘোরপাদে ৪১ রান। গ্রীনহাউ ৩৫ রানে ৫, হর্টন ২৪ রানে ২ এবং স্ট্যাথাম ২৭ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৬৫ রান (ভি এল মঞ্জরেকার ৬১ এবং কৃপাল সিং ৪১ রান। স্ট্যাথাম ৪৫ রানে ৩, ট্রুম্যান ৫৫ রানে ২, মস ৩০ রানে ২ এবং গ্রীনহাউ ৩১ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যান্ড: ২২৬ রান (কেন ব্যারিংটন ৮০ এবং স্ট্যাথাম ৩৮ রান। রমাকান্ত দেশাই ৮৯ রানে ৫, সুরেন্দ্রনাথ ৪৬ রানে ৩ এবং সুভাষ গুপ্তে ৬২ রানে ২ উইকেট)।

ও ১০৮ রান (২ উইকেটে)

১৯৬৭ (জন ২২—২৪ ও ২৬): ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১২৪ রানে জয়ী।

ভারতবর্ষ: ১৫২ রান (ওয়াদেকার ৫৭ রান। স্নো ৪৯ রানে ৩ এবং ব্রাউন ৬১ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১১০ রান (কুন্দরণ ৪৭ রান। ইলিংওয়ার্থ ২৯ রানে ৬ এবং ক্লোজ ২৮ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যান্ড: ৩৮৬ রান (ব্যারিংটন ৯৩ এবং গ্রেভনী ১৫১ রান। চন্দ্রশেখর ১২৭ রানে ৫ এবং বেদী ৬৮ রানে ৩ উইকেট)।

লর্ডস মাঠের টেস্ট রেকর্ড

১৮৮৪ (জুলাই ২১)—১৯৬৭ (জুন ২৬)

লর্ডস মাঠে টেস্ট খেলার ফলাফল

বিপক্ষে	খেলা	ইংল্যান্ডের জয়	হার	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	২১	৫	৮	৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৭	৪	১	২
দঃ আফ্রিকা	১০	৬	১	৩
ভারতবর্ষ	৬	৬	০	০
নিউজিল্যান্ড	৫	২	০	৩
পাকিস্তান	২	১	০	১
মোট	৫১	২৪	১০	১৭

১৯১২ সালে লর্ডস মাঠে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়ী হয়।

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান

৭২৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লে:। ডি জি ব্র্যাডম্যান ২৫৪, উডফুল ১৫৫, কিপ্যাক্স ৮৩ এবং পন্সফোর্ড ৮১ রান)—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩০

৬৫৪ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:)— ইংল্যান্ড (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা), ১৯৪৭

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

৪৭—নিউজিল্যান্ড, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫৮

৫৩—ইংল্যান্ড (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ১৮৮৮

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রান
(দুই দলের রানের সমষ্টি)

১৬০১ রান (২৯ উইকেটে)—ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩০

ইংল্যান্ড: ৪২৫ রান ও ৩৭৫ রান।

অস্ট্রেলিয়া: ৭২৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লে:) ও ৭২ রান (৩ উইকেটে)

একটি খেলায় সর্বনিম্ন রান
(পুরো দুই ইনিংসের খেলায়)

২৯১ রান (৪০ উইকেট): ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৮৮৮

অস্ট্রেলিয়া: ১১৬ ও ৬০

ইংল্যান্ড: ৫৩ ও ৬২

দ্রুততম সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পি ডবলউ সেরওয়েল তাঁর ব্যক্তিগত ১১৫ রানের মধ্যে ৯৫ মিনিটে শত রান পূর্ণ করেন।

ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড: ৪৩টি

বিপক্ষ দল: ৩৫টি

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

২৪০ রান—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যান্ড) বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৮

২৫৪ রান—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩০

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

৮টি (৪৩ রানে)—হেডলে ভেরিটি (ইংল্যান্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৩৪

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৫টি (১০৪ রানে)—হেডলে ভেরিটি (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ১৯৩৪

অপরাজিত ওপনিং ব্যাটসম্যান
(পুরো এক ইনিংসের খেলায়)

১৯৩ নটআউট: ওয়ারেন বার্ডসলে (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯২৬। এই প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৩৮৩।

২০৬ নটআউট: উইলিয়াম ব্রাউন (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩৮। এই প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৪২২।

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

জ্যাক হবস (২১১ রান) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের পূর্বে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী করেন।

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১০৬ ও ১০৭ রান: জর্জ হেডলে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩৯।

একদিনে সর্বাধিক উইকেট

১৪টি উইকেট (৮০ রানে): হেডলে ভেরিটি (ইংল্যান্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ২৫শে জুন (১৯৩৪)। হেডলের এই বিশ্ব রেকর্ড (একদিনে সর্বাধিক উইকেট লাভ) আজও অক্ষুন্ন।

হ্যাট-ট্রিক
(উপর্যুপরি বলে তিনজনকে আউট করা)

জর্জ গ্রিফিন (দঃ আফ্রিকা), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৬০

দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরী

১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্যার জ্যাক হবস (ইংল্যান্ড) তাঁর ব্যক্তিগত ২১১ রানের মধ্যে ২৭০ মিনিটে ডাবল সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন।

জুটিতে দ্রুততম সেঞ্চুরী

৫৫ মিনিটে নটআউট ১২১ রান (৩য় উইকেটের জুটিতে): ফ্র্যাঙ্ক উলী এবং হেন্ড্রেন (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯২৪

১৪০ মিনিটে ২৪৮ রান (৪র্থ উইকেটের জুটিতে): লেন হাটন এবং ডেনিস কম্পটন (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৩৯

৪০ মিনিটে ৭৪ রান (৮ম উইকেটের জুটিতে): অমর সিং এবং লাল সিং (ভারতবর্ষ), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩২

একদিনে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

২১০ রান: ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৮। হ্যামণ্ড এই খেলায় ২৪০ রান করেন।

এক ওভারে সর্বাধিক রান

২১ রান (১, ২, ২, ৪, ৬, ৬): ইংল্যান্ডের জে সি লেকারের এক ওভারের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান প্রথম রানটি এবং এস জি বার্নেস বাকি ২০ রান (২২৪৬৬) সংগ্রহ করেন।

জুটির খেলায় বিশ্ব রেকর্ড

৩৭০ রান (৩য় উইকেটে): ডবলউ জে এডরিচ এবং ডেনিস কম্পটন (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৪৭

২৪৬ রান (৮ম উইকেটে): লেসলি এমস এবং জি ও এ্যালেন (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৩১

একদিনে দলগত সর্বোচ্চ রান

৫০৩ রান (২ উইকেটে): ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে এই ৫০৩ রান (বিশ্ব রেকর্ড) সংগ্রহ করে। ইংল্যান্ড ৫৩১ রানের (২ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে এই খেলায় শেষ পর্যন্ত এক ইনিংস ও ১৮ রানে জয়ী হয়।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

পরিমল দে
(ইস্টবেংগল)

মাঝরাতে কড়া নড়ে উঠলো। হুড়মুড় করে উঠে বসলাম। তবে কি কলকাতা থেকে খারাপ খবর এলো কিছু? অফিস কি আমার ডেসপ্যাচ সময় মত পাচ্ছে না—তারই তাগাদা এলো? ধড়মড় করে উঠে হোটেল-ঘরের দরজা খুলে দিয়ে দেখি জংলা দাঁড়িয়ে।

ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটা পেরিয়ে গেছে। এতো রাত্তিরে জংলার কি দরকার আমার কাছে ভেবেই উঠতে পারলাম না। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে জংলাই উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আপনার হোটেলে লেবু আছে, অশোকটার বড্ড জ্বর, কিছু খেতে চাইছে না, ভাবছি লেবু-বার্লি দেবো একটু; সারা গোহাটি বাজারে এই রাত্তিরে একটাও লেবু পাওয়া গেল না।' হোটেলের বেয়ারা লেবু এনে দিলো, বাস্তপদে জংলা চলে গেলেন—অন্ধকারের মধ্যে। ও'র যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবছিলাম, জংলা আর অশোক দু রংয়ের জামা গায়ে মাঠে নামলে কলকাতায় ও'দের দলের সমর্থকরা পরস্পরকে মুখ ভেংচিয়ে কি কাণ্ডটাই না করেন! মাঠের বাইরেও সে কি গরম মেজাজ। হায় রে, তাঁদের যদি আজকের এই ছোট্ট ঘটনাটি দেখাতে পারতুম।

পরিমল দে'র ডাক নাম জংলা। পরিমলের চেয়ে জংলা নামটাই বেশি পছন্দ ইস্টবেংগল ক্লাবের সমর্থকদের। জংলাকে ঘিরে বিপুল প্রত্যাশা।

হালফিল জংলাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বহু প্রশংসা হয়েছে। আমি জংলাকে প্রথম কাছে থেকে দেখেছিলাম মাদ্রাজে আয়োজিত জাতীয় ফুটবলের আসরে। রোজ আমার হোটেলে যুগান্তর পড়তে আসতো। শান্ত, লাজুক এবং বিনয়ী।

কিন্তু মাঠে জংলার অন্য রূপ, সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা। আক্রমণাত্মক মেজাজ সব সময়েই তুংগে, সব সময়ই শানানো। ছোট্ট, বেঁটে চেহারা কিন্তু কি সাফ মাথা, পায়ে কি কাজ, অল্প জায়গার ভেতর থেকে বল টেনে নেওয়ার কি মুন্সিয়ানা, সটে কি জোর! প্রয়োজনীয় সময়ে পায়ে মিনিটের পর মিনিট বল ধরে রেখে দলের স্বার্থ জিইয়ে রাখতেও জংলার সমগোত্রীয় হাল ফিল কলকাতার মাঠে আর কেউ আছেন বলে মনে হয় না শরীরটি বাড়ন্ত এবং হৃষ্টপুষ্ট হোলে ভারতীয় ফুটবলে আমেদ, সত্তার, বলরাম কিম্বা চুনীর সার্থক উত্তর-সূরী হয়ে দাঁড়াতে পারতেন।

পরিমলের (জংলা) জন্ম ১৯৪২ সালের ৪ঠা মে, পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে। পাঁচ বছর বয়সে মা-বাবার সংগে পশ্চিমবংগে চলে আসেন। থাকেন খড়দায়। স্কুলের লেখাপড়া খড়দা শিবনাথ হাইস্কুলে এবং কলেজের বংগবাসীতে। কলেজ বেশিদিন টেনে রাখতে পারেনি তাঁকে, ফুটবল লেখা-পড়াকে পেছনে ফেলে দিয়ে—এগিয়ে এলো পরিমলের জীবনে।

খড়দায় প্রতিবেশী সূত্রে আলাপ হোল বি-এন আর-এর সুশান্ত ঘোষের সংগে। পরিমলের জীবনে সুশান্ত ঘোষের প্রভাব ব্যাপক। আজও পরিমল সুশান্ত ঘোষকে পহেলা নম্বর গুরু বলেই মানেন, এক সময় কলকাতা ময়দানে সুশান্ত ঘোষেরও সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে যথেষ্ট নাম-ডাক ছিল। ভারতীয় ফুটবল দলের সোভিয়েট রাশিয়া সফরে সুশান্ত ঘোষ ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি।

কিন্তু সে প্রসংগ যাক। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পরিমল দে নিয়মিতভাবে

আন্তঃ স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এই সময় জেলা ফুটবলেও খেলেছেন ২৪ পরগণার পক্ষে। ১৯৬০ সালে পরিমল প্রথম এলেন কলকাতা ময়দানে সিনিয়র ডিভিসন ফুটবলে বালী প্রতিভার হয়ে খেলতে। পরিমলের প্রতিভা আর এক প্রতিভাধরের নজরে পড়লো। বাঘাদা চিনলেন তাঁকে। তাঁকে নিয়ে গেলেন উয়াড়ীতে। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই উয়াড়ীতেই কাটলো পরিমলের। খেলার প্রকরণগত উন্নতি হোল, সুনাম বাড়লো, প্রতিষ্ঠা এলো। ১৯৬৪ সালে এলেন ইস্টবেংগলে। এই পরিমল যেদিন নড়াচড়া করেন, ইস্টবেংগলের পুরোভাগও সেদিন নড়ে-চড়ে, পরিমল না খেলতে পারলে, প্রায় অন্ধকার।

১৯৬৩ সাল থেকে নিয়মিত সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছেন (শুধু বিগত হায়দরাবাদের অনুষ্ঠান বাদে)। ১৯৬৫ সালে দিল্লীতে রুশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে, ১৯৬৬ সালে মারডেকা ফুটবলে ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন পরিমল দে। ব্যাংকক এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় দল থেকেও তিনি বাদ পড়েননি। কয়েক বছর আগে আই এফ এ দলের হয়ে ব্রহ্মদেশও সফর করেছেন।

কাজ করেন স্টেট ট্রান্সপোর্টে। উয়াড়ী ক্লাবে পরিমলের আর একটি ভাই ধীরে ধীরে কলকাতার ময়দানে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। পরিমলের বড় সাধ, দু ভাই এক-দলে পাশাপাশি দুই ইন সাইড খেলবেন।

সমীর ব্যানার্জি
(এরিয়ান)

'বলতে গেলে একেবারে ডবল প্রমোসন, মাঝপথের একটা সিঁড়ি টপকে শচীনদা আর নন্তুদার হাত ধরে হাজির হলাম এরিয়ান ক্লাবে।'

ইস্টার্ণ রেলের সংগে সিনিয়র ডিভিসন লীগ খেলার শেষে গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ক্লান্ত সমীর ব্যানার্জি নিজের কথা বোলতে বসেছিলেন ক্লাব-লনের নিরালা একটি কোণে। শক্ত জোয়ান চেহারা, চোখে-মুখে দৃঢ় প্রতিভার ছাপ, মিতভাষী সমীর।

সমীর এরিয়ানের রাইট হাফ ব্যাক। জায়গা আগলাবার ব্যাপারে বা ট্যাকলিংয়ে সমীরের আচরণ, সমীরের দৃঢ়তা নজর কাড়ার মত। সর্বোপরি কঠোর পরিশ্রমের মূলধনে দলের সমগ্র রক্ষণভাগকে মাঠে এক সজীব ভূমিকা গ্রহণে উজ্জীবিত করেন সমীর। শুধু ট্যাকলিং বা পজিসন জ্ঞানই নয়, হেডিং এবং সরাসরি পাশিংয়েও তিনি দক্ষ।

১৯৪৭ সালে কলকাতায় সমীর ব্যানার্জি'র জন্ম। বাবা স্বর্গীয় শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি থ্যাকার স্পিংকে কাজ করতেন। মা প্রভা দেবী এখনও বেঁচে আছেন। সমীররা চার ভাই, তিন বোন। ভাইদের মধ্যে তিনি মেজ। ছেলেবেলায় সমীরের মাথায় যখন ফুটবল চাড়া দিয়ে উঠলো, পরিবারের সবাই স্বাগত জানালেন তাঁকে। সবাই এসে পাশে দাঁড়ালেন।

পাশে এসে দাঁড়ালেন সমীরের ফুটবল গুরু সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মশাই। ভ্রাতৃসংঘে দীর্ঘদিন সুরেন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় কাটিয়ে-ছেন তিনি।

সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুলের অধিনায়ক সমীর ব্যানার্জি। ১৯৫৭ সালে যখন কলকাতা ময়দানে তৃতীয় ডিভিসন লীগে খেলতে এলেন সুরেনদার হাত ধরে তখন তাঁর বয়স কতই বা? দশ-এগারো। অপর পক্ষের খেলোয়াড়রা ভেবেছিলেন বাচ্চা ছেলেটি হয়তো অনাদের কাপড়-জামা আগলাতে এসেছে কিন্তু ওমা একি, এ যে ভ্রাতৃসংঘের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলতে নামলো? কি খেলবে ও, দুধের ছেলে?

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভ্রাতৃসংঘে খেলেছেন সমীর ব্যানার্জি, ১৯৬৭ সালে এলেন এরিয়ানে। উন্নতির পথে

সুরেনদা বাধা হয়ে দাঁড়াননি। হাসিমুখে সম্মতি দিয়েছিলেন, প্রাণভরা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি সমীরকে।

এরিয়ানে আসার আগে, ১৯৬৫ সালে সমীর আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক (পাটনা) এবং মূল অনুষ্ঠানে (কুরুক্ষেত্র) কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন হেরম্বচন্দ্রের ছাত্র হিসেবে। কলকাতা সেবারের ফাইনালে ওসমানিয়াকে হারিয়েছিল এক গোলে। ১৯৬৬ সালে তিনি জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে (বাঙ্গালোর) বাংলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই মরশুমে হরেন্দ্র স্মৃতি শীল্ডে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছেন আই এফ এ একাদশের হয়ে। ডুরান্ড এবং বরদলৈ ট্রফিও খেলেছেন এই ১৯৬৬ সালেই। ১৯৬৭ সালে এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় দল নির্বাচনের ট্রায়ালে ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত দলে জায়গা মেলেনি। কিন্তু সেজন্য সমীরের কোন খেদ নেই; নির্বাচকমণ্ডলীর চোখে যোগ্যতর বলে পরিচিতদের জায়গা হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

অনুশীলনের ব্যাপারে সমীর রীতিমত সিরিয়াস। অনুশীলনে ফাঁকি দিলে, নিজেকেই ফাঁকিতে পড়তে হয় বলে তাঁর ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণার বিশ্বাসী হয়েও বাঁধাধরা প্র্যাকটিসে অংশ নেন সমীর প্রত্যেক দিন—সকাল-সন্ধ্যায় পুরোদস্তুর ছাত্রদের মত।

রঞ্জিৎ গাঙ্গুলী
(ইস্টার্ণ রেল)

'ফুটবল মাঠে প্রথম পদক্ষেপের সময় যে বিরাট প্রতিভার সংস্পর্শে এসেছিলাম, উত্তর পর্বে সেই প্রতিভার কানাকড়িরও যদি আমি অধিকারী হতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। খেলার মাঠে তিনি আমায় অনেক উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন। সেই উপদেশের কতটুকুই বা আমি সার্থকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি?'

আক্ষেপ করে বলছিলেন ম্যানসন ইনস্টিটিউটে বসে ইস্টার্ণ রেলের ব্যাক রঞ্জিৎকুমার গাঙ্গুলী। লম্বা দোহারা চেহারা রঞ্জিতের। প্রাণশক্তিতে টইটুম্বুর। মাঠে যতক্ষণ থাকেন, আশপাশের সবাই উপলব্ধি করতে পারেন রঞ্জিতের প্রত্যয়ভরা ভূমিকা। দু পায়ে লম্বা সট, সবাইকে ডিঙ্গিয়ে হেড, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গা রাখার চেষ্টা, ছক মিলিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁর এই খেলা বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। বাঘাদা, নিখিল নন্দী, সুশীল ভট্টাচার্য, মোহিনী ব্যানার্জি এবং প্রদীপের তাই রঞ্জিতের ওপর ভরসা অনেক। রঞ্জিতের সবচেয়ে বড় গুণ—যা কিছু করেন, ভেবে-চিন্তে এবং ঠাণ্ডা মাথায়। গ্যালারীর হাততালির দিকে মোহ কম।

১৯৪৮ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর রঞ্জিতের জন্ম ফরিদপুরে। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী মশাই—ছেলের ফুটবল খেলাকে বিষ চোখে তো দেখেনই নি, পক্ষান্তরে উৎসাহ দিয়েছেন। ক্ষিতীশবাবু ১৯৪৮ সালেই পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের কোন্নগর কালীতোলা কলোনীতে। রঞ্জিতেরা দু ভাই।

কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি স্কুলে পড়ার সময়ই রঞ্জিত ফুটবল খেলা সুরু করেন

সাইড ব্যাক হিসাবে। একটু বড় হয়ে বাংলার কীর্তিমান খেলোয়াড় শ্রীসুর্য চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এলেন কোন্নগর ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্বে ইস্টবেঙ্গল এবং অধুনা রেলওয়ে। ইস্টবেঙ্গলের নেতৃত্ব করলেন এক বছর পাওয়ার লীগে। ১৯৬৪ সালে সিনিয়র ডিভিসনে বালী প্রতিভার হয়ে খেললেন রঞ্জিৎ স্টপার হিসেবে নীলেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে। সে বছর বালী প্রতিভা খেতাব কাপে সেন্ট্রাল রেলের কাছে এক গোলে হেরে গেলেও বালীর রক্ষণভাগকে, বিশেষতঃ রঞ্জিৎকে মাঠভরা লোক কুণ্ঠাহীন প্রশংসা জানিয়েছিলেন। তারপর ১৯৬৫ সালে ইস্টার্ণ রেলওয়েতে তাঁর আবির্ভাব। এই রেলে আসার একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। এই সময় রঞ্জিৎ সিগন্যালসের চাকুরে। সিগন্যালসের একটি খেলার সূত্রে চোখে পড়লেন ইস্টার্ণ রেলওয়ের শ্রীনিখিল নন্দীর 'ব্যস তারপর থেকে নিখিলদার কব্জায়।'

১৯৬৬ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ট্রফি) বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাংলা সেবার হেরে যায় সেমি-ফাইনালে। এ বছর এশীয় যুব ফুটবলে যোগদানকারী ভারতীয় দলের স্ট্যান্ড বাই ছিলেন রঞ্জিৎ গাঙ্গুলী। আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবলের আসরে খেলছেন সেই ১৯৬৫ সাল থেকে। ১৯৬৪-৬৫ সালে আন্তঃ জেলা ফুটবলে (ও মজুমদার ট্রফি) হুগলীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

রঞ্জিতের চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভরা। কিন্তু অতীতকে সে ভুলতে নারাজ। রঞ্জিতের নিজের কথায়—'আরও ভাল খেলার আশা রাখি ভবিষ্যতে, অবশ্য সেজন্য অনুশীলন চাই, চাই সঠিক নির্দেশ। দুটোর কোনটারই হয়তো অভাব হবে না। খেলে নিজেও আনন্দ পাবো, অন্যকেও আনন্দ দিতে পারবো—এই প্রত্যাশা নিয়েই মাঠে নামি; যে কোন উপায়ে জিততেই হবে—এমন চিন্তা অন্ততঃ আমি করি না। খেলাধুলা নির্মল আনন্দেরই বাহক মাত্র, এরচেয়ে বেশী কিছু নয়।'

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

।। সাত ।।
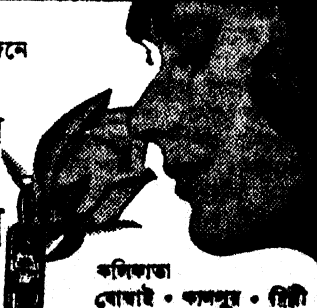
তবে, অদৃষ্ট নিতান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না। তার অনেক সময় যা রীতি, সামনের মঞ্চে বিভ্রম সৃষ্টি করে নেপথ্য-মঞ্চে যা আসল কাজ সেটা করেই যায়।

এখানে আসবার প্রায় মাসখানেক পরের কথা। কোন ছুটিছাটা না থাকলে হাবুল-পটলের থাকে কলেজ, রঞ্জনের আফিস, দুপুর আর বিকালের খানিকটা সন্দীপের নিঃসঙ্গই কাটছিল; খানিকটা ঘুমিয়ে খানিকটা এটা-সেটা কিছু পড়ে, খানিকটা, যদি মাথায় কিছু এল তো লিখে। একটা কথা, লেখার দিকটা এখানে আসার পর তেমন জমছে না ভালো। এ-অবস্থাটা হয়েছে কতকটা যেন বনের পাখি খাঁচায় এসে পড়ার মতো। স্বতঃ-স্ফূর্ত ভাবটা তেমন নেই। রঞ্জন রয়েছে তার উৎসাহ নিয়ে, তার ক্লাবের সবাই রয়েছে তাদের অনুরোধ-প্রত্যাশা নিয়ে, লিখতে হয়, লেখেও, কিন্তু ভাবকে কলমের ডগায় এনে ফেলবার জন্য যেন তপস্যায় বসতে হয় অনেক সময়; মুখে-চোখে কষ্ট-কল্পনার একটা অন্যমনস্কতা, অনেক সময় বিরক্তির ভাবই থাকে লেগে যেটাকে নাকি ভুল বুঝে রঞ্জনের ওপর দোষটা চালাচ্ছিলেন সুরবালা।

একদিন ওর এই তপস্যা থেকে ওকে টেনে নিয়ে গেল তমাল।

সেদিন সকাল থেকে তোড়জোড় করে দুপুরের পর বর্ষা নামলো। সন্দীপদের কলকাতায় আসার পর এই প্রথম। ভিজে এলোমেলো বাতাসে একটা হারানো সুরের কলি মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠে মাঝে মাঝে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল, ওপরতলায় ওর ঘরের জানলার সামনে খাতা-কলম নিয়ে বসেছিল সন্দীপ। কয়েকটা আঁচড় পড়েছে খাতায়, এমন সময় তমাল এসে বলল—ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে, সন্দীপকে উদ্ধার করতে হবে, সন্দীপ ভিন্ন গতি নেই।

তমালের এই ধারা। যেটা বলবে বা করবে সেটাকে একেবারে শেষ পর্যায়ে ঠেলে তুলবে; কথার মাত্রা 'ভীষণ', 'ভয়ঙ্কর'—এই ধরনের। ছেলেবেলা থেকেই এইরকম এবং এটা ওর নামের সঙ্গে আছে জড়িয়ে। ভালো কিছু হোল তো 'ভীষণ' ভালো, মন্দ তো তাও 'ভীষণ', ওর কাছে মাঝামাঝি কিছু থাকবার জো ছিল না। রঞ্জন ব্যাকরণের ভাষায় ওকে 'তম' বলে ডাকত। 'তর'-র পরে 'তম' অর্থাৎ চূড়ান্ত; সেইটেই একদিন নাম নির্বাচনে 'তমাল'-এ কায়েমী হয়ে যায়। তমাল নামটা কিন্তু বড় নরম, ওকে ঠিক ফোটাতে পারে না, তাই রঞ্জনই আবার একটা আলাদা নাম দিয়েছে, ইংরাজী ব্যাকরণের 'সুপারলেটিভ' অর্থাৎ চূড়ান্ত। ওকে কিছু বলতে আসতে দেখলেই আগে-ভাগেই প্রশ্ন করে বসে—"সুপারলেটিভের 'ভীষণ', কি খবর বলো।"

সন্দীপের মামাতো বোন তমাল, সনাতনের মেয়ে।

একটু আলুথালুভাবেই এসে জানাল ভয়ানক বিপদে পড়েছে, সন্দীপ একমাত্র ভরসা।

বিপদটা অবশ্য কিছুই নয়। এই বাড়িতে এই সময় মেয়েদের একটা তাসের আড্ডা বসে, বাড়ির আর পাশের ক'বাড়ির মেয়েদের নিয়ে। প্রধানত যারা পড়াশুনো শেষ করে বসে আছে, তাদেরই আড্ডা, তাছাড়া নববিবাহিতারাও আছে, যাদের বাপের বাড়ি এখানে; পাশের ফ্ল্যাট থেকে দুটি বধূও কখনও কখনও এসে উপস্থিত হয় তাদের স্বামী আফিসে চলে গেলে, ফ্ল্যাটে তালা ঝুলিয়ে। আরও আসে কেউ কেউ। তার মধ্যে একজন হোল আর্দ্রা। জন-সাত-আট এই বয়সের মেয়ে সব। তবে বয়স নিয়ে বিশেষ কোন বিধিনিষেধ নেই। অবসর রইল বা ইচ্ছা হোল তো গিন্নিরাও এসে বসেন কখনও কখনও, কোন খেলুড়ির পাশে বা নিজেই তাস হাতে করে। হেমাঙ্গিনী, মেজবৌ অপর্ণা, সুরবালা বা রেবা রইলেন তো তাঁরাও। পাশের বাড়ির গিন্নিদের ডাকিয়ে বড়দের আলাদাই তাস বসে। তবে কম, মাসে দু'চার দিন।

পুরুষও বারণ নয়। অবশ্য বড়রা আসেন না, তবে ছুটি থাকলে হাবুল, পটল যায়ই বসে, কখনও বা রঞ্জন। তাছাড়া পাড়ার দু'-একজন ঐ বয়সের নতুন জামাইও আছে যারা এলে ডাক পড়ে। তমালের বিপদ, আজ বর্ষার জন্য মাত্র দু'জন এসেছে, একটা জায়গা খালি। সন্দীপ গিয়ে ভর্তি না করলে কোন-মতেই চলবে না—কোনমতেই না। হাতদুটো মুঠো করে থাকল—"উঃ, বৌদিটাও বাপের বাড়ি গিয়ে বসে রইল এসময়। একটু যদি আক্কেল থাকে!" বৌদি, হাবুলের বৌ বাণী। সন্তানসম্ভবা হয়ে বাপের বাড়ি

গেছে সম্প্রতি। খুব বিস্মিত হয়েই চেয়ে রইল সন্দীপ, বলল—"আমি!...তোমাদের সঙ্গে বসে তাস!"

"কেন, দোষটা কি?"

"দোষ...মানে..."

দোষটা বা বাধাটা যে কোথায় তার পক্ষে, সেটা প্রকাশ করে বলবার ভাষা খুঁজে না পাওয়ায় ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল সন্দীপ। "বুঝেছি"—বুঝে নিয়ে বলল তমাল—"কেন, পটলদারা বসেন না? রঞ্জন-কাকাও তো!...আমার আবার মতিভ্রম, বর্ষা দেখে আট প্যাকেট ঝালচানা কিনে বসে আছি, আজ দিন বুঝে ও হতভাগাকেও হেঁকে যেতে হবে রাস্তা দিয়ে।"

—অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

"তা বিলি করে দাওগে না, বাড়িতে তো খাবার লোক আছে।"—কাটান দেওয়ার চেষ্টা করল সন্দীপ। ওর বিপর্যস্ত ভাব দেখে একটু কৌতুকও অনুভব করছে, বলল—"না হয় আমাকেও গোটাদুই প্যাকেট দিয়ে দাও।"

"পদ্য লেখার সঙ্গে ঝালচানা!—আমায় আর জ্বালাবেন না সন্দুদা। তারপর কি ভয়ঙ্কর মুশকিল দেখুন আমার—কাকেই বা বলি—কাল আদুদিদির কাছে হেরেছি—বেইমানি করে হারিয়েছেন—আজ কোট করে বসে আছি হারাবই। তা সেথোরই অভাব। না, চলুন।"

"কিন্তু আমায় সঙ্গে নিলে তো আরও হারবেই।"

"আঃ, ভবু বাজে কথা! হারিজিত সে আমার ভাবনা, আপনি চলুন তো। তা নয়, আসলে আপনার মাথায় ভূত চেপেছে। তাহলে দিন, আমিও ভূত ঝাড়তে জানি।"

খপ করে খাতাটা তুলে নেয়। বলে—"চলুন এবার।"

একটা হাত ধরে টেনেই নিয়ে যায় খানিকটা।

ঘরে ঢুকলে, একটি মেয়ে দরজার দিকে চেয়ে মুখিয়েই বসেছিল, দু'হাত জোড় করে একটু ভঙ্গির সঙ্গেই ঘাড়টা হেলিয়ে অভ্যর্থনা করল—"নমস্কার, আসুন। আমারই নাম আর্দ্রা, আদু; পরিচয় দিয়েছে নিশ্চয়?"

তমাল বসতে বসতে ওর নামটার অর্থ বিকৃত করে বলল—"ভিজে বেড়াল, সন্দুদা, খুব সাবধানে থাকবেন। নাও, বোস।"

জড়সড় হয়ে বসল সন্দীপ, আর্দ্রার পাশে, তমালের উল্টোদিকে।

আর্দ্রাই তাসের গোছা তুলে নিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হেসে ভাঁজতে লাগল তাসগুলো। বার দুই চোখের কোণে চেয়েও নিল সন্দীপকে, যেন কী দরের প্রতিপক্ষ এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছে।

।। আট ।।

একবার দরজা টপকাবার পর আর বিশেষ বাধল না। অবশ্য তমালই এসে ডেকে নিয়ে যায়। বার কয়েক অনিচ্ছার ভাবই দেখাল সন্দীপ, তারপর ক্রমে সহজই হয়ে এল ব্যাপারটা। সেই থেকে, রোজ না হোক, প্রায়ই দুপুরটা এখানেই কাটে। বাদ যায় যেদিন পটল বা হাবুল তাদের দিকে টানে; লেকচার, মেলা, সিনেমা বা অন্য হুজুগ; রঞ্জনও ক্লাবে নিয়ে যায়। তেমনি, ওদের কেউও এসে বসে কখনও, বেশ জমেই ওঠে। এই করে চলে।

তমাল এসে ডেকে নিয়ে যায়, ডাকলেও নিমরাজির মতো ভাবটা দেখিয়ে যাওয়া, এসবই ঠাট বজায় রাখা, নয়তো বেশ আকর্ষণ অনুভব করে সন্দীপ। ও খেলে ভালো। প্রথম দিনটা জড়োসড়োই হয়ে রইল, একেবারে মেয়েদের দল, তারপর আর্দ্রার এইরকম অভ্যর্থনা; হেরেও গেল। কিন্তু তাইতেই শুধু হয়ে গেল আকর্ষণটা। তাস একটা দুরন্ত নেশা, তার হারজিৎ—বিশেষ করে হারাটা, আরও বিশেষ করে যার জেতবারই শক্তি আছে তার হেরে যাওয়াটা মনের পেটিকায় জমা হয়ে যায়, অনিদ্রা ঘটায়, নেশাটাকে বাড়িয়েই দেয়। পরদিন তমাল এসে একটু বলতেই সামান্য আপত্তি করে শেষে গেল সন্দীপ। সেদিন নূতন আমদানির কথাটা (তাও বেটাছেলে) চারিয়ে পড়ে দলটা বেশ পুষ্ট হওয়ায় আড়ষ্ট ভাবটা বেড়েই গেছে। তা ভিন্ন আর্দ্রা মেয়েটা তাসের ভাষায় এক নম্বর 'চোর', ঠিক থইও পেল না সন্দীপ; সেদিনও হারল। এরপর, দুটো বিরুদ্ধ, বিসম্বাদী মনোভাব বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারে না বলেই তাসখেলার নেশাটা বেড়ে ওঠার অনুপাতে জড়তাটা কেটে যেতে লাগল। আর্দ্রাকে চিনলও ভালো করে। প্রথম-প্রথম ওর কূটচাল আর ফাঁকিবাজি টের পেলেও বলতে যে জিভে বেধে যেত, সে ভাবটাও রইল না। চার্জ, উল্টচার্জ, তর্ক, আত্মপক্ষসমর্থন—বেশ জমে উঠতে লাগল।

একা আর্দ্রাই বা কেন?

যে মেয়েটি খেলার 'সেথো' হয়ে উল্টো-দিকে বসল, তার ভুলভ্রান্তি নিয়েও তো বচসা হয়। হারার গ্লানির মধ্যে মুখ ফসকে হয়তো বেরিয়েও গেল—"নাঃ, এত বে-হিসেব হলে তাস খেলা চলে না"—কিম্বা, আরও এক পর্দা উঁচু—"আপনি বরং বাঘবন্দী খেলুন গিয়ে ছোটদের সঙ্গে।"

ভুল হয় নিজেরও, ধারাল জিভের বুকনি সইতে হয়। ভালো খেলিয়ে, তায় পুরুষ, একলা, বলবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে অনেকেই—"এমন ভুল যে আনাড়িতেও করে না।" কে উত্তর দেয়—"কিন্তু কবিতে করে। তাসের হিসেব রাখবেন, না, ঘরের সঙ্গে ঝড়ের মিল বসাবেন তাই বলু।"

পুরুষ বলেই বিঁধবার ঝোঁকটা সংক্রামক হয়ে ওঠে। কেউ স্পষ্ট করেই বলে, কেউবা অর্ধস্পষ্ট একটা টিপ্পনী করে পাশের মেয়ের ঘাড়ে মুখটা নেয় লুকিয়ে।

ভালো লাগে না তমালের। চটে ওঠে। হয়তো হাতটা ধরে টানই দিল একটা। বলল—"ওঠো সন্দুদা। আর কখনও যদি তোমায় এখানে আসতে দিই......নিজেরা কাঁড়ি কাঁড়ি ভুল করে যাচ্ছেন, তাতে কিছু নয়। ওঠো তুমি বলছি।"

"বলতে দে না, গায়ে ফোস্কা তো পড়ছে না।" হয়তো হালকা হাসির সঙ্গে মন্তব্য করল সন্দীপ। তাসের বুকনিতে অভ্যস্তই তো। তমাল হাত ছেড়ে দিয়ে বলে—"তবে শোন বসে বসে। কী ভয়ঙ্কর যে মোহ তোমার, আশ্চর্য!......তবু যদি......"

দুপক্ষকে জড়িয়ে খুব সূক্ষ্ম একটা ইংগিতই রেখে দিল। অর্থাৎ তাহলে, মেয়ে বলেই মোহ সন্দীপের। অপরদিকে, তবুও মোহ ঘটাবার মতো যদি রূপ থাকত কারুর।

হয়তো এটাও থাকে তার সঙ্গে—কবি, তার এত অল্পতেই মোহ!

ভালো লাগে কিন্তু সুরবালার। এ ধরনের মুক্ত বাক্যরণ কানে গেলেই তিনি সামনের বারান্দা হয়ে একবার ঘুরে যাবেনই, দরজা-জানলার ফাঁকে একবার মুখটা ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে। ওপর তৃপ্তি, ছেলে তবু এক জায়গায় সপ্রতিভ, মুখর না হোক, অনন্ত সবাক। মেয়েদের মধ্যে বলেই তাঁর আরও লাগে ভালো, কেননা অতিবড় বাচাল পুরুষও যে অনাত্মীয় মেয়ের সামনে মূক এটা অজানা নয় তাঁর, মেয়ে হিসাবে একটা জয়-গৌরবই। মনে হয় এটা যেন একটা পাঠশালাই, যেখানে ছেলে তাঁর মানুষ হয়ে যাওয়ার পাঠ নিয়ে যাচ্ছে। এরপর একদিন এই আশার পাশে একটা নূতন ধরনের প্রত্যাশা এসে পড়ে, যেটা ছিল শুধু ভালোলাগা, সেটা হয়ে উঠল মধুর; তাস-তান্ডবের মধ্যে একটি নূতন ধরনের সুর উঠে।

একদিন হেমাঙ্গিনী বললেন—"আমায় 'লক্ষ্য করছ—লক্ষ্য করছ' বড় যে সুধোও ঠাকুরঝি, তুমি নিজে কিছু করেছ লক্ষ্য? সন্দীপের কথাই বলছি।"

"কি লক্ষ্য করব বড়বৌদি?"—বলার ঢঙে একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করলেন সুরবালা।

"আদুর ভাবটা, ছেলেরও আদুর দিকে?"

একটু ভ্রূ চেপে মিলিয়ে নিলেন সুরবালা। সংকেতেই বললেন—"তুমি তাই ভাবছ? কিন্তু ওরা দুজনে তো মনে হয় যেন আদায়-কাঁচকলায়—খাওটুকু দেখতে পাই।"

মুখটিপে হাসলেন হেমাঙ্গিনী। বললেন—"ঠাকুরঝি এক এক সময় বেশ ন্যাকা সাজতে জানেন। নিজেদের ওপরই এসে পড়ে কিনা। ঐটেই তো লক্ষণ। তা না'হলে কর্তাকে তো তালাক দিতে হয় তোমায়!......আমি কোথায় ভাবছি, ঠাকুরঝিই বুঝি একদিন এইবার জিজ্ঞেস করে বসেন। মেয়েটি আমাদের স্বঘরও।......ওরকম ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলে যে?"

"হবে বনিবনাও? এমনি তো দেখতেও পরিষ্কার মেয়েটি, কিন্তু......"

"জ্বালিও না ঠকুরঝি আর! বেশ তো, না বনে, না হয় বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ির মতনই হোল। আটকাচ্ছে তোমাদের ঝগড়ায়? এসে পর্যন্ত এদিক থেকে ক'খানা চিঠি গেছে খোঁজ রাখি, ওদিক থেকেও কখানা এসেছে। নম্বর দেখেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। এরপর যেদিন না হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়েন কর্তা।"

নূতন সুরটা উঠে তাসের বৈঠকটা নিয়ে আরও কুতূহলী হয়ে ওঠেন সুরবালা।

কিন্তু মায়ের মন, আশা-আশঙ্কার মধ্যে দোল খাওয়াই তার ধর্ম। আর্থাকে বন্ধ করে নেওয়া, দুজনের বিরোধের মধ্যে থেকে আকর্ষণের কোথায় কি থাকতে পারে, হেমাঙ্গিনীর কথামতো—সেটা লক্ষ্য করে যাওয়া, এর মধ্যে একটা মাধুর্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু এটা তো মূল সমস্যা নয়। ছেলের বিবাহের কথাটা এখনও উদয়ও হয়নি সেভাবে স্বামী-স্ত্রীর মনে। মূল সমস্যা যা, সেদিকে তাদের আস্তা কতটা সমাধানের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে সেইটেই হয়েছে আসল প্রশ্ন। সেদিকে যেমন আশার আলো খানিকটা দেখতে পান তেমনি আশঙ্কার ছায়াও আসে মাঝে মাঝে ঘনিয়ে। মেয়েদের স্বভাবই এই-রকম যে, অন্য সর্ববিষয়ে সে যতই সবল হোক যেখানে সে মা সেখানে সে একেবারেই দুর্বল, ফলে কানপাৎলা, পরমুখাপেক্ষী, যে যা বলে সেইদিকেই মনটা পড়ে ঢলে। তার মধ্যে নিজের মতের যেমন সমর্থন থাকতে পারে তেমনি উল্টোটাও বিরল নয়। সমর্থন থাকলে যেমন তা থেকে শক্তিসঞ্চয় হয়, উল্টোটা হলে তেমনি সংশয়ে মনটা পড়ে নুয়ে।

সমর্থন পান খানিকটা রঙ্গ-ঠানদিদির কাছে।

।। নয় ।।

রঙ্গ-ঠানদিদি পাড়ার সবচেয়ে বর্ষীয়সী মহিলা। বেশ একটি সম্পন্ন বড় পরিবারের গৃহিণী। তবে বহুদিন থেকেই বৌয়েদের হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে এখন টহলদারি করে বেড়ানই কাজের মধ্যে কাজ; কর্তাও অবসর-প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, তাঁকে সঙ্গে করে তীর্থ বা বাইরে-বাইরে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। এখানে রইলেন তো প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি, মজলিস জমিয়ে, খোঁজখবর নিয়ে কার কোথায় ঘাটতি, কি সমস্যা। সেকালের মানুষ, টোটকা-টুটকি, মন্ত্র-তন্ত্র অনেক কিছু নখদর্পণে, প্রয়োজন হলে একাল-সম্মত বিধান দিতেও দক্ষ; বা যা একাল-সেকাল সর্বকালের। এদিকে পাড়ার গেজেট রঙ্গ-ঠানদিদি, এখানে থাকলে তো কথাই নেই, বাইরে থাকলেও 'বিশেষ সংবাদদাতা'র মাধ্যমে, পাড়ার সংবাদের মতো কিছু ঘটলেই সেটা পোঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওঁর আসল নাম বিন্ধ্যবাসিনী, ডাক নাম ছিল রঙ্গ। ক্রমে স্বভাবের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় আসলটা তলিয়ে গিয়ে এইটেই কায়েমী হয়ে গেছে; রঙ্গ।

বেশ কিছুদিন ছিলেন না, একদিন বাড়ি ফিরে বিকালের দিকে এসে উপস্থিত হলেন সনাতনের বাড়ি। উনি এলে, বিশেষ করে যদি দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এলেন তো সবাই আর সব কাজ মুলতুবি রেখে জটলা করে ঘিরে বসে ওঁকে, অবশ্য মেয়ের দল। গল্পের রাশি নিয়ে বসেন রঙ্গ-ঠানদিদি, বিশেষ করে রোমান্স-অঙ্গের গল্প সংগ্রহে অদ্ভুত দক্ষতা, পরিবেশনে অদ্ভুত বাক-শৈলী, জমে ওঠে মজলিস। সেদিন তাসের মজলিশ খুব গুলজার, বড়দেরও একটা দল একটু আলাদা হয়ে বসেছে ঘরের একদিকে, রঙ্গ-ঠানদিদি আসতে সবাই তাস গুটিয়ে ঘিরে বসল তাঁকে। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প-গুজব চলল। প্রায় মাস তিনেকের সফর ছিল এবার রঙ্গ-ঠানদিদির, অনেক পুঁজি জমেছে। শেষের দিকে আসর পাৎলা হয়ে গিয়ে যখন উঠবেন, সুরবালাকে ঠাট্টা করে বললেন—"আর সুরো, একটু এগিয়ে দে আমায়। না হয় চলই না আমার সঙ্গে একটু, তোর আর কাজ কি এমন? বাপের বাড়িতে এসেছিস।"

হেমাঙ্গিনী আর সেজবৌও ছিলেন, তাঁদের বললেন—"নিয়ে যাই গো একটু সুরোকে।"

গলি দিয়ে যেতে যেতেই প্রশ্ন করলেন—"কি ব্যাপার রে নাতনী? মুখটা অমন শুকনো করে বসে ছিলি বরাবর। চোখো-চোখিও হয়ে গেল কবার, মনে হোল কিছু যেন বলবি, তাই ডেকেও নিয়ে এলুম। ব্যাপারখানা কি?"

"চলো, বলছি ঠানদি, যাচ্ছিই যখন। তোমার জন্যে সে কী হাপিত্যেশ করে বসে-ছিলাম, আর এবারেই তোমার যত দেরি করতে হয়......"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, স্বল্প-আলোকিত গলি, রঙ্গ-ঠানদিদির মনে হোল গলাটা যেন ধরে এসেছে শেষের দিকে একটু।

"তা না হয়, বাড়ি গিয়েই শুনব।...... নাতজামাইয়ের সঙ্গে আবার কিছু হয়নি তো? শুনছি, দুমাস এসে বসে আছিস। সেই যে তোর বাঁহাতের কবচ্ ধোওয়া জলটা খাইয়ে দিতে বলেছিলাম কোনও ছুতোনাতা করে......"

নির্জন গলি, দুজন লোক গল্প করতে করতে পেছন থেকে এসে পড়ায় থেমে যেতে হোল। এসেও গেছেন বাড়ি। "চল, একেবারে ছাতে চলে যাই।"—বলে দুজনে চলে গেলেন ওপরে। একটি ছোট নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে একটা মাদুর নিয়ে আসতে বলে দিলেন।

ওপরে গিয়ে বললেন—"যা জিজ্ঞেস করছিলাম—দিয়েছিলি জলপড়াটা খাইয়ে?"

"জ্বালিও না ঠানদিদি আর জ্বালার ওপর!"

অসহিষ্ণুভাবেই বলে উঠলেন সুরবালা নির্জন ছাতে একা পেয়ে। বললেন—"জলপড়ায় সায়েস্তা হবার মানুষ হলে... তাভিন্ন আমি এক অন্য ভাবনা নিয়ে পড়েছি। সেখানে যদি তোমার কিছু বিদ্যে কাজ দেয়—কতদিন থেকে যে তোমার পথ চেয়ে..."

অন্ধকার ছাতের রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজনে, হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল ঝরে পড়তে আঁচলটা তুলে চেপে ধরলেন।

মেয়েটি মাদুর এনে বিছিয়ে দিয়ে গেল। রঙ্গময়ী বললেন—"আয় বোন। এমন তো লিখে দিলেই পারতিস বাড়ি থেকে ঠিকানা নিয়ে। চলে আসতাম। তা ব্যাপার-খানা কি খুলে বলদিকিন। কাঁদিসনি, কান্নাটা অমঙ্গল। এসে যখন পড়েছিই একটা বিহিত হবেই।"

"অমঙ্গলের আর বাকি কি আছে ঠান-দিদি?—একটি মাত্র ছেলে..."

"তা হয়েছে কি!"—একটা অদ্ভুত কল্পনায় হঠাৎ একটু শিউরেই উঠলেন রঙ্গ-ঠানদিদি। তখনি কিন্তু সামলে নিয়ে বললেন—"ঐ তো ফর্সা লম্বাপানা ছেলেটি, আমি আসতে উঠে গেল—তোরই ছেলে তো, অনেকদিন দেখিনি বলে ধোঁকা লাগতে কাকে যেন জিজ্ঞেস করতে..."

"দেখবে কোথা থেকে ঠানদিদি?—ঐ তো ব্যাধি। তাকে ঘর থেকে টেনে আনা যাবে তবে তো দেখবে লোকে। কী যেন দিন দিন হয়ে যাচ্ছে বাছা আমার। শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে, আর লোক যদি দেখলে অচেনা কেউ, মেয়েই হোক বা পুরুষই হোক..."

"কেন, দিব্যি তো বসে তাস খেলছিল ওদের সঙ্গে।"—মন্তব্য করলেন রঙ্গ-ঠাকরুণ।

"একদিনে হয়েছে? এক মাসেরও ওপর হয়ে গেল তো। একটু একটু করে সইতে সইতে তবে এখন এসে খানিকটা সড়গড় হয়ে এসেছে।"

"বটে?"

কি যেন একটা ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী।

সুরবালা বললেন—"তবে আর বলছি কি? ঐ তো দেখলে—বেশ খেলছিল, যেই তুমি এসেছ আর ঠাট্টা করতে করতে ঢুকলে অমনি যেন বাঘ কি ভাল্লুক..."

"থাম দিকিন, হয়েছে, বুঝেছি"—বামুন সংশয়টা কেটে গিয়ে একটা কৌতুক-হাসি ফুটে উঠেছে রঙ্গ-ঠানদিদির ঠোঁটে। ডিবে-থেকে একটা পান বের করে নিয়ে আঙুলে টিপে শুনছিলেন, মুখে চালান করে দিয়ে ঘাড় উল্টে এক টিপ দোক্তা ফেলে দিয়ে বললেন—"হ্যাঁরে, সেই কথা নাকি? পোড়া কপাল, মনেও ছিল না আমার। তখন আমি পাটনায় শান্তর বাড়িতে চলে এসেছি। রাঙাবৌয়ের এক চিঠি—ভীষণ মকুলে তো ওটা আবার; আর সব খবরের মধ্যে এক খবর, চাটুজ্যেদের বাড়ির সুরোদিদি তাঁর ছেলেকে নিয়ে কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছেন—কলকাতার বেপরোয়ায় ছেড়ে দিয়ে—কি যে একটা বেশ লিখেছে তাই করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে..."

"সবাই বলছে, যেমন পড়াশুনো, যেমন বয়স, তার মতন বেশ নাকি স্মার্ট হয়ে উঠছে না ছেলে, ঠানদিদি।"

—জুগিয়ে দিলেন সুরবালা।

"হ্যাঁ, তাই যেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেকেলে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমার আবার মনেও থাকে না—তোদের একালের সব কথা বাছা। তা, এরই জন্য যত ভাবনা?"

"হবে না ঠানদিদি? বেটা ছেলে, সে হবে মিনমিনে, মুখচোরা, কুনো। নতুন মানুষ দেখলে পাশ কাটাবে, একটা কথা জিজ্ঞেস করলে মুখ তুলে জবাব দিতে পারবে না—চলবে ঠানদিদি, তুমিই বল না? একজন যে মুখে রক্ত উঠে এতবড় কাণ্ডটা করছে, ওরই ভরসায় তো ঠানদি, তা ওই যদি...আর একটা দোষ হয়েছে, বসে বসে পদ্য লেখা।...তোর বসে বসে পদ্য লিখলে চলবে?"

পেলিকান ফটো : প্রলিনবিহারী চক্রবর্তী

"তা এত হেদিয়ে পড়ছিস কেন?—এ-সবের তো দাবাই রয়েছে।"

"সেইজন্যেই তো নিয়ে আসা এখানে, ভাবলাম ঠানদিদি রয়েছেন, ভাবনা কি আমার। তোমার নাৎজামাইয়ের সঙ্গে এক-চোট হয়েও গেল।

"তা হোল কিছু এখানে [illegible]—একটু যেন ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রশ্ন [illegible] রঙ্গময়ী। বললেন—"রাঙাবৌ যেন নি[illegible], হাবুল-পটলের দলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা উঠেপড়ে তালিম দিতে আরম্ভ করেছে..."

"আজ দু'মাসের ওপর এসেছি, কৈ, হওয়ার মতন তো কিছু চোখে পড়ল না..."

"হবে!"—ব্যঙ্গে নীচের ঠোঁটটা উলটে গেল রঙ্গময়ীর। বললেন—"তাদের কে তালিম দেয় তার ঠিক নেই। বিয়ের বয়স হোল, দাগা ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।... বলি, ঘটক লাগায়েছিস ছেলের জন্যে?"

কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে একটু থমকে চুপ করে গেলেন সুরবালা। ও'র আর্দ্রার কথা মনে পড়ে গেল। একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তুমি কি বল, বিয়ে দিলেই আপনি-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে ঠানদি?"

"ওমা, তার ওপর আর কথা আছে? যে-বয়সের যা। তবে আপনি-আপনি হয়? তেমনি বাছাই চাই নাতনী, তারপর টেনিং। ঘটক না লাগিয়ে থাকিস, কাজ নেই, ঘটকের ঘটক এসে গেছি। এ নাকি আবার একটা সমিস্যে! গেছি আর কি!...ছড়া নেকে বলছিলি যেন?"

"বললাম না?—খাতা-কলম নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। এখানে এসে যেন আরও বেড়েছে। গা ছমছম করে ঠানদিদি—সে যদি দেখ..."

"দেখেছিস খাতাপত্তর উটকে? থাক, না দেখে থাকিস কাজ নেই। এ-বয়সের ছড়াকাটা, একটা পেঁচ-খোঁচ আছেই তার মধ্যে..."

"বল তো না হয় খোঁজ নেওয়াই ঠানদি।"

একটু চোখ তুলে ভেবে নিলেন রঙ্গ-ঠানদিদি, বললেন—"থাক, কাজ নেই। বল-ছিলাম—ওদের ছড়া তো টিকলো নাক আর পটল-চেরা চোখ নিয়ে—নিকে যাক যত পারে, তারপর আমি আছি।"

"সামলাবে তো ঠানদিদি?"—উৎসুক প্রশ্ন করলেন সুরবালা। মুখে আর একটিপ দোক্তা ছেড়ে দিয়ে উঠে গিয়ে পিক ফেলে এলেন রঙ্গ-ঠানদিদি। বসতে বসতে ঠোঁট গুটিয়ে বললেন—"থাম দিকিন, সামলাবে না! এমন দেখেশুনে এনে দোব, এমন টেনিং তার সঙ্গে—সম্রাট-সম্রাট করছিস কি, মাস-খানেকের মধ্যে ছেলেকে তোর দিগ্বিজয়ী সম্রাট করে তুলবে না? ঐ তোদের ঠাকুরদা, জিজ্ঞেস করিস না, কি ছিল। তারপর বছর না ঘুরতে এমন সম্রাট যে, যার কাছে তালিম সেই আমিই মুখের সামনে দাঁড়াতে পারি না। চোদ্দ বছরের মেয়েটি। আর আজকাল তো এমনিই তোয়ের হয়ে আসছে সব, তার সঙ্গে ঠানদিদির বাছাই আর—কি যে বলে..."

"তাহলে আর একটা কথা বলি ঠানদি। ছোট ভাই, কিছু বলতেও পারি না..."

"চুপ কর, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। রঞ্জন তো? মুখ শোকাসুকি করছে, রাঙাবৌ সে-কথাও লিখেছিল—এক গোয়ালেরই গরু তো। আমার নজর আছে, অনেকদিন থেকেই। তোর ছেলেটার একটা বিলি-ব্যবস্থা করি আগে, বড় নাকি হেদিয়ে পড়েছিস, তারপর ওরও ব্যবস্থা হবে।... চল, নীচে গিয়ে একটু বসবি। যাওয়ার সময়, হেমা-নাৎবৌয়ের জন্যে খানিকটা পাটনেয়ে জর্দা নিয়ে যাবি মনে করে, ভুলে গিয়েছিলুম।"

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

চিন্তার প্রকাশ

আকাশে মেঘ জমে। বৃষ্টি হলেই নীল আকাশ আবার ঝকঝকে হয়ে উঁকি মারে। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত চলে মেঘের খেলা। তাও কম নয়নাভিরাম নয়। কিন্তু সবটুকু যদি খেলায় শেষ হতো তাহলে এই আমেজ লাগা নেশাটুকু বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করতো না। নীলাঞ্জনের মোহজড়ানো ঘুম ঘুম ভাবটুকু কবে ছুটে যেত। তখন সেই জায়গাটুকুর দখলদার হতেন রুদ্রভৈরব—যে কিনা রুক্ষতার হিসেব-নিকেশ রুক্ষভাবেই বোঝাপড়া করে থাকে। কল্পনা, স্বপ্ন দেখা আর রঙ চড়ানো তার কাছে মানুষের বিলাস ছাড়া আর কি হতে পারে। এই দুয়ের মাঝে নিরাট 'কিন্তু'টা অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে এর চেয়ে সত্যি আর কেউ নেই। এই সত্যটুকু আছে বলেই পৃথিবী এখনও মনোরম বাসের যোগ্য। সব রুক্ষতার মধ্যে এখনও মনের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

কিন্তু মেঘ আজকাল জমছে মনের কোণে। কোনরকম পারস্পরিক মান-অভি-মানের কথা আমি বলছি না। সে মেঘ এক সময়ে কেটে যায় এবং রৌদ্রের ঝিলিকে আবার সবকিছু ঝলমলিয়ে ওঠে। এ মনের মেঘ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ মেঘ জমছে। কিন্তু বর্ষণ হচ্ছে না। তাই বর্ষণক্লান্ত মনের ছবিও প্রকাশ পাচ্ছে না। এ মেঘ হচ্ছে নানা মনের নানা চিন্তা। অনেকের মাথায় নানা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে কিন্তু সুযোগ এবং সুযোগ্য পাত্রের অভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণায় বেচারা গুমরে মরছে। এরকম একজন মেয়ের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। চাকরীবাকরীর হালফিলের অবস্থা সম্বন্ধে অন্য সকলের মত সেও বেশ সচেতন। সে কিন্তু সেখানেই থেমে নেই। আর একটু এগিয়ে সে ভেবেছে মেয়েদের বিভিন্নভাবে অর্থ রোজগারের কথা। কথায় কথায় মেয়ে-দের হাতের কাজের কথা এসে পড়লো। নানা হাতের কাজে মেয়েরা অভ্যস্ত। একটু ট্রেনিং পেলে এগুলির আরো সুচারু প্রকাশ সম্ভব। এভাবে সমবায়ের মাধ্যমে ওদের নিয়ে শুরু করা যায় বিভাগীয় বিপণি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরি-চালিত। আর সরকারী সাহায্যের কথা তো

সুদক্ষিণার প্রবেশ পথ

বলাই বাহুল্য। এভাবে বহু মেয়ের সুষ্ঠু সংস্থান সম্ভব। মেয়েটি অনেকদিন থেকে কথাটি ভাবছে। কিন্তু সাধ্য থাকলেও সাধ্যের অভাবে মনের কথা মনেই থেকে যাচ্ছে। কয়েকজনকে বলেও মেয়েটি খুব একটা সাড়া পায়নি। তাই এখন একেবারে হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে আছে। বর্তমান অবস্থাটা নির্বিবাদে হজম করে যাচ্ছে।

অথচ ওর আইডিয়াটা যদি নেওয়া যেতো তবে অনেকের সুবিধের কথা ছেড়ে দিয়েও ওর কাছে আরো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মনের চিন্তা মনেই রয়ে গেল। মেঘ দেখা দিল কিন্তু বর্ষণ হলো না। ভারাক্রান্ত মন আরেকটু ভারাক্রান্ত হলো।

সফল উদ্যম

১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিতা উদ্যোগী মহিলা সুদক্ষিণা উইমেন্স কো-অপারেটিভ স্টোর্সের গোড়াপত্তন করেন। সেই সময়ে এঁদের এই প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমবায় প্রথায় যদি দোকান ইত্যাদি করা যায় তাহলে মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলাদের এতে খুব সুবিধা হবে। অর্থাৎ চলতি বাজারের চেয়ে হয়তো কিছুটা সস্তায় জিনিষপত্র এখানে পাওয়া যাবে, সমস্ত জিনিষ যদি একত্রে পাওয়া যায় তাহলে নানা জায়গায় ঘুরে বাজার করার যে অসুবিধা তা দূর হবে। এক কথায় তাদের তখনকার ইচ্ছা

ক্রেতার ভীড়

মাছ মাংস প্রভৃতি ডিপ ফ্রিজে রাখা হয়

ছিল সুদক্ষিণাকে তাঁরা বিদেশী ভাষায় থাকে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স বলে তার রূপ দেবেন।

সেই ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা উঠেপড়ে লাগলেন। খুব সহজে কোন কাজ আমাদের দেশে তো হয়ই না অন্য দেশের কথা খুব একটা জানা নেই। আমরা বড় হিসেবী, কোন কাজ করার আগে আমি এতে কি সুবিধা পাব তা আমরা আগে ভেবে নিই। যে গুটিকতক মহিলা এই কাজে নামলেন শেয়ার বিক্রীর ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হলেও তাঁরা মোটামুটি কিছু টাকা তুলতে পারলেন যা দিয়ে একটা ছোটখাট দোকান কোন রকমে দাঁড়াতে পারে। গড়িয়াহাটার হিন্দুস্থান মার্টের দোতলায় একটি ঘরে এই ক্ষুদ্র সমবায় বিপণির শুভ উদ্বোধন হোলো। তদানীন্তন সমবায়মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে সমবায় প্রথা কি এবং তা কিভাবে দেশের ও দশের উপকারে আসতে পারে তার বর্ণনা দিলেন।

দোকান তো আরম্ভ হোলো কিন্তু খরিদ্দার কোথায়? বিক্রী নেই বললেই চলে—প্রথমতঃ সমবায় জিনিষটা কি তা না জানায় এই দোকানের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি কম এবং যখন খোলা বাজারে সব জিনিষই পাওয়া যায় তখন আবার দোতলায় উঠে এই ছোট্ট দোকানে যাওয়া কেন—দ্বিতীয়তঃ প্রচারের অভাবে এ বিপণির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবাই জ্ঞাত নয় এবং অর্থের অনটনে সেখানে সে রকম জিনিষ-পত্রও নেই যা খরিদ্দারের মন ভরাতে পারে—তাই দোকান শুধু টিঁকে রইল সেই মহিলাদের আদর্শের বলে অর্থাৎ খরিদ্দার তখন শুধু তাঁরা নিজেরাই। আত্মীয়-বন্ধুদের টেলিফোনের মাধ্যমে দোকান থেকে জিনিষ খরিদ করার অনুরোধ জানান হয়, কিন্তু তাতে যে বিশেষ ফল হয় তা নয়।

যাই হোক এইভাবে কিছুদিন কাটনর পর দোকানের যখন প্রায় নিবু-নিবু অবস্থা এমন সময় দেশে সমবায় আন্দোলনের সাড়া জাগলো। কেন্দ্রীয় সরকার সমবায় আন্দোলনকে কার্যকরী করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কালোবাজারীদের অত্যাচার থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাঁচানো। সেই ঢেউ বাংলাদেশের শিক্ষিত 'জনচিত্তে' সাড়া জাগালো ও প্রায় বাংলার প্রতি শহরে সমবায় প্রথায় বিপণি খোলা হোলো। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হোলো কলকাতা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এবং তাঁদের কাজ হলো ছোট সমবায় সংস্থাগুলোকে সর্বরকম সাহায্য দিয়ে রক্ষা করা। অবশ্য সংস্থাকে এর সদস্য হতে হবে ১০০০ ন্যূনতম শেয়ার কিনে। সুদক্ষিণাও সোসাইটির একজন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। এর ফলে সুদক্ষিণা হিন্দুস্থান মার্ট থেকে বর্তমানে যে ঘরে আছে সে ঘরে আসার সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় দপ্তর এই ঘরটি সুদক্ষিণার জন্য ব্যবস্থা করে দেন। এরপর থেকেই সুদক্ষিণা ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। আজ এর সভ্যসংখ্যা আট শতেরও অধিক। সদস্যাদের মধ্যে যেমন আছেন কর্মজীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, সমাজসেবিকা, দেশনেত্রী আবারও আছেন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মহিলা। তাঁদের জন্য আছে সুদক্ষিণায় ন্যায্য মূল্যে সাংসারিক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, অর্থাৎ মশলা, তেল, আচার, মাছ, মাংস, ডিম, বেবী ফুড ইত্যাদি। সুদক্ষিণার নিজস্ব রেফ্রিজারেটর ও ডীপ ফ্রিজ আছে যাতে মাছ, মাংস রাখা হয়। মাছের বাজার যখন অগ্নিমূল্য, মুরগীর মাংস মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বপ্ন, সুদক্ষিণা তখনও সভ্যাদের মাছ-মাংস মুরগী দিয়ে তাঁদের সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়েছে। এর জন্য সুদক্ষিণার কর্তৃপক্ষ সেন্ট্রাল ফিসারীজ কর্পোরেশন এর কাছে কৃতজ্ঞ—তাঁদের কাছ থেকে মাছ কিনে সুদক্ষিণা অগ্নিমূল্যের দিনেও ন্যায্যমূল্যে মাছ বিক্রী করতে সমর্থ হয়েছে। আজ সুদক্ষিণা কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সভ্যাদের সহানুভূতির ফলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজসেবিকাদের জন্য সুদক্ষিণা সমবায় তো আছেই, আরও আছে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, যার কাজ হোলো বস্তির ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখান, মধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য আছে নানান রন্ধন প্রণালী আচার ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা যা অল্প খরচে করা যায়। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নানা দেশের খবর জানা, মাঝে মাঝে সংগীতবাদ্যের অনুষ্ঠান করে সভ্যা-দের জীবনের একঘেয়েমিতে কিছুটা বৈচিত্র আনা। এর অধিবেশন বসে প্রতি মাসের প্রথম সোমবার। এই সোসাইটির আরও একটি উদ্দেশ্য প্রায় বাস্তবের রূপ নিতে চলেছে তা হোলো একটি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল খোলা—যেখানে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মহিলাদের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের তৈয়ারী এই ধরনের বাড়ী কলকাতায় আরও আছে এবং বিভিন্ন মহিলা সংস্থার দ্বারা সেই সব মহিলা আবাস পরিচালিত হয়ে থাকে। যে সব মহিলা চিকিৎসক সুদক্ষিণার সভ্যা তাঁদের ইচ্ছা একটি ক্রেশ খোলা। ছয় মাস থেকে তিন বছরের শিশুদের এখানে রাখা হবে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে। মধ্যবিত্ত বাবা-মা যায় চাকুরী করতে—উদ্দেশ্য তাদের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনা, কিন্তু তাদের উপায়ান্তর থাকে না শিশুকে ঝি-চাকরের কাছে ফেলে যাওয়া ছাড়া—তাই মা চায় এমন এক জায়গায় তার শিশু সারাদিন থাকে যেখানে সে মায়েরই স্নেহ ও রক্ষণা-বেক্ষণ পাবে। তাই সুদক্ষিণার কর্তৃপক্ষের এই ক্রেশ খোলার চেষ্টা। তাঁরা তাঁদের এই উদ্দেশ্য এখনও ঠিক কার্যকরী করে উঠতে পারেন স্থানাভাবের জন্য—কিন্তু তাঁদের উৎসাহই ঠিকই আছে। এঁদের আরও একটি

॥ সুদক্ষিণায় আলোকচিত্র অমৃত ফটোগ্রাফার গৃহীত ॥

কাজ হলো অল্পশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মহিলাদের পরিবারপরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলা। এতে তাঁরা বিশেষ সাড়া পেয়েছেন বলে মনে হয়।

সুদক্ষিণার প্রারম্ভকালে উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী প্রথায় একটা সুপার মার্কেট করার কিন্তু অর্থ ও স্থানাভাবে সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সুদক্ষিণার উদ্যোক্তারা এখনও তার আশা ছাড়েননি। সুদক্ষিণা আজ সরকারী সমবায় দপ্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতায় সমাজসেবা করে চলেছে। মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুদক্ষিণা অন্যতম। সমবায় ব্যাপারে দক্ষ যে সব বিদেশী কলকাতায় আসেন সকলেরই পদধূলি সুদক্ষিণায় পড়ে। তাঁদের কাছ থেকে সুদক্ষিণা ভূয়সী প্রশংসা পেয়ে থাকে। বর্তমানে সুদক্ষিণার একটি নবতম প্রচেষ্টা হলো বিহার ও বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে ওষুধ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সুদক্ষিণার সভ্যাদের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পেয়েছেন।

—সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

জিনিসপত্রের স্টক পরীক্ষা করছেন দুজন সদস্য

দন্তরুচি কৌমুদী

কালিদাসস্য উপমায় বলে আননের আলো হল—দন্তরুচি কৌমুদী। দাঁতের সারিতে অমনি দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাভাস ফুটিয়ে তুলতে গেলে একটি নির্দিষ্ট অয়নের অভ্যাস করতে হবে। তবেই না হাসলে মুক্তো আর কর্নেল পান্না ঝরবে। না হাসির কথা নয়, ভেবে দেখুন সুন্দর সুগঠিত ঝকঝকে পরিষ্কার দাঁত মুখের কি পরিমাণ শোভা বাড়ায়। কোন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন নয়! সত্যিকারের স্বতঃস্ফূর্ত একমুখ মিষ্টি হাসির মূল্য কিছু কম নয়! এমনি একটি হাসিতে মানুষের বহুদিনের সঞ্চিত রাগ, অভিমান বা দুঃখ সব ভুলিয়ে দেয়। যে মানুষ হাসতে পারে, বা হাসাতে পারে সে সহজেই অন্যের মনে আসন করে নেয়।

তবে ফসল ফলাতে গেলে যেমন মাটির বুকে চাষ করতে হয়, মুখে হাসি ফোটাতে গেলে তেমনি অন্তরে আনন্দের চাষ করতে হয়, আর যত্ন নিতে হয় দাঁতের তবেই অমনি অনাবিল হাসিটি ফুটে ওঠে।

সবাই কিন্তু সুসম সমান ছাঁদের দাঁতের অধিকারী নন! যাঁদের সামনের একটি বা দুটি দাঁত সামান্য উঁচু তাঁদের মুখখানিতে মনে হয় দেখন হাসি। আবার যাঁদের দাঁতের ওপরের পাটি সামান্য একটু পিছনে হেলান তাঁদের মনে হয় আহ্লাদী গোছের। তবে

জার্মানীর এই মহিলা তার ক্লাবে রীতিমত জুডো শিক্ষা দেন পুরুষ ও মহিলা সভ্যদের

দাঁতের গড়ন যেমনই হোক যদি তা ঝকঝকে পরিষ্কার হয় তবে তা সুন্দর লাগবেই।

সকালে উঠে সকলেই দাঁত মেজে থাকেন। কিন্তু কেউ হয়তো দায়সারা ভাবে কোন রকমে তাড়াতাড়ি ক'রে একটু ব্রাস ক'রে নিলেন আবার কেউ বা অনেকক্ষণ ধ'রে চেপে চেপে ঘষে ঘষে ব্রাস করেন দাঁতে। এই দু'রকম প্রক্রিয়াই দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর।

সে-কালে ঘরে তৈরী মাজন দিয়ে দাঁত মাজা হত। নয়তো দাঁতন। দাঁতের পক্ষে নিমের দাঁতনের চেয়ে উপকারী আর কিছুই নেই! ঐভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতনকে নরম করে এক দিকটার আঁস বার ক'রে সেটি দিয়ে ঘষে ঘষে দাঁত মাজতে পারলে দাঁতের গোড়া নিমের রসে যেমন শক্ত থাকে তেমনি দাঁতও থাকে পোক্ত। সাঁওতালী বা দেহাতী মেয়েদের দুধসাদা দাঁতের দিকে তাকালে আমাদের ব্রাস দ্বারা মর্দিত দাঁতে দে'তো হাসিই ফোটে নাকি! আগেকার ঘরে তৈরী মাজনে থাকত—সুপুরীপোড়া ছাই, খড়িমাটি, কর্পূর আর সামান্য কাঠকয়লার গুঁড়ো। হাতে মাজন নিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে দাঁত মাজার দরুণ ছোট বয়স থেকেই দাঁতগুলি সমান ছাঁদে বেড়ে উঠতো। দুধে দাঁত সহজে না পড়লে তাকে সুতো দিয়ে টেনে তুলে ফেলা হত, না হলে আসল দাঁতটি বেঁকে বেরোবে! এইভাবে ছোট থেকে দাঁতের যত্ন নিলে দাঁত কখনই অসমান হতে পারে না। তাছাড়াও মাজনের গুণাগুণে দাঁতের গোড়াও হত শক্ত। আমার ঠাকুমার তো দেখেছি পঁচানব্বুই বছর বয়সেও সব দাঁত পড়ে নি। আর এখন তো ঘরে ঘরে বাঁধান দাঁতের প্রচলন হয়েছে। নানা রঙের মনোহরণ গন্ধের কোন টুথপেস্টই তো চালভাজা বা ছোলাভাজা খাবার মত শক্ত বা সুস্থ দাঁত উপহার দিতে পারে না। তা তারা যত বিজ্ঞাপনই দিক। এখন অবশ্য বিজ্ঞানের আর বিজ্ঞাপনেরই যুগ। তায় আধুনিকাকে আর দাঁতন করতে বলি কোন-মুখে। তাছাড়া সময়াভাব। কিন্তু ব্রাস করারও নিয়ম আছে। আগে ব্রাসটি একটু ভিজিয়ে নিয়ে তারপর টুথপেস্ট নিন। একটু বেশী করেই নেবেন। টুথপেস্ট কিনতে হলে স্বাদ বা গন্ধের দিকে না গিয়ে উপকারিতার বিচারে বেছে নিন। এবার উপর থেকে নীচে আগে সামনের দাঁত ব্রাস করুন। তারপর দাঁতের দুপাশে আর সবশেষে হাঁ করে দাঁতের ভেতরের দিকে ওপর নীচের পাটিতে ব্রাস চালান। বেশী জোরে চাপ দিয়ে বা অনেকক্ষণ ধরে ব্রাস করবেন না তাহলে দাঁতের এনামেল উঠে যাবে। এবার আঙুলের চাপ দিয়ে মাড়িতে পেস্ট বুলিয়ে নিন তারপর পরিষ্কার জলে বেশী করে কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

তবে ছোটদের দুধে দাঁত না-পড়া পর্যন্ত ব্রাস ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়! ঘরে তৈরী মাজনের অভাবে তারা টুথ পাউডার বা খড়িমাটি দিয়েই দাঁত মাজুক। কচি আঙুলের চাপে দেখবেন তাদের দাঁত আপনিই সরলরেখায় সমানভাবে বেড়ে উঠেছে।

যাঁদের দাঁতের রং সাদা নয় তাঁরা পেট পরিষ্কার রাখবেন। হপ্তায় অন্ততঃ একদিন লিস্টারীণ দিয়ে মুখ ধোবেন। আবার তক্ষুণি হয়তো কোন পার্টিতে যেতে হবে তাহলে একটু সোডা বাইকার্ব দিয়ে দাঁত মেজে নিন দেখুন কেমন ঝকঝকে সাদা হয়ে যাবে দাঁতের সারি। তবে বেশী ব্যবহারে দাঁতের ক্ষতি করবে।

পান খাওয়া দাঁতের পক্ষে একদিকে ভাল আবার অন্যদিকে ছোপ ধরে। তবে মিঠাপানে ছোপ ধরে না। নয়তো পান খেয়ে তারপর দাঁত মেজে ফেলবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাতে শুতে যাবার আগে যদি দু'বার করে দাঁত মাজতে পারেন তাহলে আর সহজে দাঁত নষ্ট হবার ভয় থাকবে না।

আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে, দাঁতেরও ব্যায়াম প্রয়োজন। তবেই দাঁত শক্ত হয়! শুধু তো দৃশ্যসুন্দর নয়! দাঁতের প্রয়োজনীয়তা যে আমাদের জীবনে কি পরিমাণ তা তো দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না এই কথাতেই প্রমাণ।

তাই যা অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে খাওয়া যায় এমন জিনিষ খেতে হবে। যেমন—চালভাজা, মুড়ি, নারকেল, ছোলাভাজা এইসব ধরণের জিনিষ। এতে করে হজম শক্তিও বাড়ে দাঁতেরও জোর হয়। দেহাতী মেয়েরা দাঁতে করে আখ ছিলে খায় এত জোর ওদের দাঁতে। ধীরে ধীরে টোস্ট চাঁবিয়ে খেলে আর চামচে করে তুলে আইসক্রীম খেলে শেষপর্যন্ত পাওরিয়ায় ভুগতেই হবে। অতিরিক্ত মিষ্টি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর। ছোট বাচ্চাদের কৃমিও দাঁতের ক্ষতি করে। দাঁতে একবার পোকা ধরলে সারা জীবনে আর সে যন্ত্রণা থেকে রেহাই নেই। আমেরিকানরা এতকাল পরে ইজিপ্টের ফারাও রামাসেস-এর মামীর দাঁতের এক্স-রে তুলে দেখেছে এবং প্রমাণ করেছে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দন্তরোগে। তবেই দেখুন এটিও রাজরোগের পর্যায়ে পড়ে। পেটের গণ্ডগোলে দাঁত নষ্ট হয়। আবার খারাপ দাঁতের দরুণ চোখ খারাপ হয়, হজমের গোলমাল হয়। দাঁতের যন্ত্রণা যদি একবার কারুর হয়েছে তবে তিনি দাঁতের মর্ম বেশ বুঝেছেন! সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হয়ে যান। হোটেল রেস্টুরেন্টে খেয়ে মুখ প্রক্ষালনের রীতি নেই—আরিস্টোক্রেসিতে আটকায়। রীতি নেই লাঞ্চ বা ডিনারের পর মুখ ধোয়ার। শুধুমাত্র ফিঙ্গার বোল ভরসা, সুতরাং দন্তকটি অচিরেই ফরসা। বাধ্য হয়ে নকল দাঁতে দে'তো হাসি হাসতে হয়। এইসব ঝুঠা হ্যারের যুগে তাও হয়তো মানিয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের কনের বাঁধান দাঁত ফুলশয্যার রাতে বোধহয় কোন আধুনিক বরও বরদাস্ত করতে পারবেন না। নির্ঘাত আঁৎকে উঠবেন। নয় কি!

মুখের ধাঁচ পাল্টাতে প্লাস্টিক সার্জারী করা হচ্ছে! মার্জার চক্ষুর বদলে কাজলকালো কাকচক্ষু তৈরী হচ্ছে রং-এর প্রলেপে, তবে আর উঁচু দাঁত সমান করা আর বাঁকা দাঁত সিধে করায় ব্যাঘাত কোথায়! কিন্তু তা কি সত্যিই আসল দাঁতের মত কার্যকরী হয়। অমনি অসমান বাঁকাচোরা দাঁতেরও একটা আলগা সৌন্দর্য থাকে! সে কথা তো আগেই বলেছি! সামনের দাঁত যদি কারুর একটু ভাঙাও থাকে তাহলেও হাসিটি ভারী মিষ্টি লাগে। তাই বলছি যার যেমন দাঁত আছে তেমনি থাক শুধু তাতে পরিষ্কারের পালিশ চড়ান দেখুন কেমন নতুন আলো ফুটবে আপনার হাসিতে।

একটি সোনাহাসিনী সিনেমাসুন্দরী হয়তো অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে সক্ষম। আবার অধরা প্রিয়ার বিশেষ ক্ষণের প্রিয় অধরের একটি বাঁকাচোরা হাসি অনেকটা সময় চুরি করতে পটু। শুভ্র দাঁতের ঝিলিক দেওয়া এক ঝলক মধুর হাসি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনেই চিরন্তনীর পর্যায়ে পড়ে। অলস মুহূর্তে মানসপটে বারবার ভেসে ওঠে সেই আকাঙ্ক্ষিত পাগলকরা হাসিটি।

—[illegible]

(৬)

শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীবাসের জন্ম শ্রীহট্টে, ব্রাহ্মণ বংশে। বাপের নাম জলধর পণ্ডিত। নবদ্বীপে এসে বাড়ি করে। বাড়ি করে কুমারহট্টেও। কিন্তু নিয়ত বাসস্থান নবদ্বীপ।

শ্রীবাসেরা চার ভাই। শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি।

ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিল শ্রীবাস, প্রায় উদ্ধতের শিরোমণি। কিন্তু যখন তার ষোলো-সতেরো বছর বয়েস, গঙ্গার ধারে বেড়াতে-বেড়াতে দেখল কে একটা লোক কী পড়ছে, আর কতগুলি মানুষ গোল হয়ে বসে তাই শুনছে।

কী হচ্ছে রে ওখানে?

গল্প পড়ছে। পুরাণের গল্প।

কে পড়ছে?

দেবানন্দ পণ্ডিত।

যাই শুনি গে। গল্প যখন, ভালো াগতে পারে।

জনতার এক পাশে শান্ত হয়ে বসল ্রীবাস। একটু শুনেই বুঝে নিল দেবানন্দ াকুর ভাগবত পড়ছে। বলছে প্রহ্লাদের াহিনী। নিতান্ত গল্পই বলছে দেবানন্দ। ্হ্লাদের ভক্তির কথা বলছে না, বলছে না ারণাগতির কথা। কী বলিষ্ঠ বিশ্বাসে ৃষ্ণের কাছে সর্বসমর্পণ করে দিয়েছে সে ্থার ব্যাখ্যা কই।

এ কী রকম পাঠ। শুধু অন্বয় আর নুবাদ, লেশমাত্র ভক্তির সৌরভ নেই। তবু হ্বদচারিত্রে ভক্তি কল্পনা করে নিতে ্ধল না শ্রীবাসের, নিজের থেকেই প্রেমাকুল ্য়ে কাঁদতে বসল।

এ জঞ্জাল জুটল কোত্থেকে? পাঠ ্নতে বসে কাঁদে! আর-আর পড়ুয়ারা ্বাসকে হাত ধরে টেনে সভার বার ্রে দিল।

দেবানন্দ এতটুকু প্রতিবাদ করল না।

অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে বাস করতে ্সেছে কিন্তু তার সময়ের বেশির ভাগই ্টে শ্রীবাসের বাড়িতে। অদ্বৈত যখন ্ল খুলল তখন শ্রীবাসই তার মনোযোগী ্।

সমাজের দুরবস্থা দেখে অদ্বৈত আর ্বাস দুজনেই খুব বিমর্ষ—শোধন-সাধন ্তে যদি কোনো অবতারপুরুষ ্সেন।

গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথিতে চন্দ্র-গ্রহণের মুহূর্তে শ্রীবাস হঠাৎ উল্লাস করে উঠল। কী হল, কী হল? কী হল কে জানে। মনে হচ্ছে কে যেন এসেছে।

জগন্নাথ আর শ্রীবাস প্রতিবেশী, দুই পরিবারে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তাই নিমাইয়ের জন্মকালে মঙ্গলকর্মে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীর ডাক পড়ল। শ্রীবাসও সাহায্য করল জগন্নাথকে। মালিনীর মধ্যে জাগল বাৎসল্য-ভাব আর শ্রীবাসের মধ্যে শুধু দাস্যভাবে সেবাবাসনা।

কিন্তু নিমাই যত বড় হয়ে উঠছে ততই উদ্ধতের চূড়ামণি হচ্ছে। রূপে-গুণে ভুবন-মোহন হয়ে এ তার কী কঠিন আচরণ! সর্বক্ষণ কেবল পুঁথি হাতে করেই রয়েছে মুখে একটুও কৃষ্ণকথা নেই। নেই ভক্তির আর্দ্রতা।

অথচ শ্রীবাসেরা চার ভাই কতদিন ধরে রুদ্ধগৃহে উচ্চনাদে কীর্তন করছে—ভগবানের আবির্ভাবের আশ্বাসে। এ নিয়ে পাষণ্ডীদের কাছে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাদের, কত বা বক্র পরিহাস। আস্তে-আস্তে কীর্তন করা যায় না? এত চেঁচাবার কী দরকার? আর পাগলের মত নাচতে হবে এই বা কোন শাস্ত্রে লিখেছে? কেউ বলছে, বেটাদের ঘর ভেঙে গঙ্গায় ফেলে দাও, কেউ বলছে তাড়িয়ে দাও নবদ্বীপ থেকে। তবু সব তারা সহ্য করেছে কৃষ্ণ-আবির্ভাবের মুহূর্ত গুনে-গুনে। জগন্নাথের ঘরে এক অদ্বিতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেও তার এ কী বিমুখ ব্যবহার! সেও কিনা বিদ্যারসেই মত্ত হয়েছে।

আহা নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হত কত সুখের হত! শুকনো ডালে ফুল ফুটত। মরা নদী উজান বইত। মূক মুখে জেগে উঠত হরিনাম।

একদিন পথের উপর নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। হাতে তেমনি পুঁথি। বিদ্যার ঝুড়ি।

উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছে কোথায়? শ্রীবাস গর্জন করে উঠল।

নিমাই বিনয়ে নমস্কার করে পদ্মনেত্রে তাকিয়ে রইল।

রাত্রি-দিন কী অত পড়ছ-পড়াচ্ছ? পুঁথির মধ্যে আছে কী?

নিমাই যেন নিজেও জানে না কী আছে।

লোকে পড়ে কেন? বললে, আবার শ্রীবাস, শুধু একটি কথা জানবার জন্যে, তার নাম কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি। শোনো, গম্ভীর মুখে উপদেশ করল শ্রীবাস, অনেক তো পড়লে, এখন একটু কৃষ্ণভজন করো।

আপনাদের কৃপায় তাও একদিন হতে পারে।

গয়া থেকে ফিরে আসার পরেই নিমাইয়ের মধ্যে প্রেমবিকার জাগল। শচীমাতা ভাবলেন, নিমাইয়ের বায়ুব্যাধি হয়েছে, বললেন, চিকিৎসক ডাকো, আমার নিমাইয়ের উন্মাদ-বায়ু ভালো করে দিক।

শ্রীবাস দেখতে এল।

আশ্চর্য, শ্রীবাসকে স্বাভাবিক অনুরাগে নমস্কার করল নিমাই। ভক্ত দেখে তার ভক্তি-ভাব আরো বেড়ে গেল। মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

একে বায়ুরোগ কে বলে? শ্রীবাস বললে, এ মহাভক্তিযোগ।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিমাই জিজ্ঞেস করলে, তোমার কী মনে হয়? বায়ুরোগ? এ আমার একটা বাই?

শ্রীবাস বললে, তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হয়েছে, তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগ দেখতে পাচ্ছি। এরকম বাই যদি আমার হত। 'তোমার যেমন বাই তাই আমি চাই।'

নিমাই গম্ভীর হয়ে বললে, তুমিও যদি বায়ুরোগ বলতে তাহলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরতাম।

কিন্তু শচীমাতার বায়ুজ্ঞান দূর হলেও ভাবনা দূর হয় না। নিমাইকে তিনি বেঁধেই রাখতে চান, আগে ভয় ছিল মাটিতে কেবল আছাড় খায়, এখন ভয় হল, উদাসীন হয়ে না বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

সেই থেকে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিমাইয়ের কৃষ্ণকীর্তন সুরু হল।

চলল পুরো এক বছর।

বহির্মুখদের বাইরে রাখবার জন্যে দ্বারে কপাট দিয়ে কীর্তন হয়। তাতে পাষণ্ডীরা জ্বলে-পুড়ে মরে, ভাবে শ্রীবাসকে কী করে জব্দ করবে।

গোপাল চাপাল সেই পাষণ্ডীদের প্রধান। যেমন বাচাল তেমনি দুর্মুখ। বিদ্যার ঔদ্ধত্যে বেশি বকবক করত বলেই সবাই চাপাল বলত।

সে একদিন শ্রীবাসের রুদ্ধ দ্বারের পাশে মদের ভাণ্ড রেখে গেল।

শ্রীবাস দরজা খুলে দেখল অজ্ঞানিদ্বেষের বিষ কতদূর ছড়িয়েছে। মদের ভাণ্ড রেখে বোঝাতে চাইছে শ্রীবাস মদ খায়।

শ্রীবাস শিষ্টজনদের ডেকে এনে দেখালি।

বিষের ক্রিয়া দেখতে-দেখতে চাপাল গোপালের দেহে প্রকট হল কুষ্ঠরূপে।

নীলাচল থেকে মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপের পথপারে কুলিয়া গ্রামে এলেন তখন চাপাল গোপাল তাঁর পায়ে পড়ল।

গৌরহরি বললেন, শ্রীবাসের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও, তিনিই তোমার ভক্তবিদ্বেষের পাপ মোচন করবেন।

শ্রীবাসের শরণ নিল গোপাল। শ্রীবাসের কৃপায় নিরাময় হয়ে গেল।

কিন্তু এখন যে শুনছি নবাবের লোক শ্রীবাসকে বেঁধে নিতে আসছে। পাষণ্ডীর দল নালিশ করেছে শ্রীবাসের বিরুদ্ধে। তার কীর্তনের জ্বালায় আমরা টিকতে পারছি না।

নবাবের নৌকো এসে পড়ল বলে।

শ্রীবাস ভয় পেল। কিন্তু গোবিন্দ স্মরণ সমস্ত ভয়ের উপর। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে উপস্থিত থাকতে তার ভয় কিসের?

বিশ্বম্ভর প্রভু নগরে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। নিরস্ত্র ও নিঃসঙ্গ। কই নবাবের নৌকো, নবাবের রাজশক্তি!

শ্রীবাসের বাড়ি গিয়ে দেখল শ্রীবাস ঘরে দরজা দিয়ে নৃসিংহদেবের পুজো করছে।

কার পুজো করছিস? কার ধ্যান? বন্ধ দরজায় লাথি মারতে লাগল নিমাইঃ যার পুজো করছিস চেয়ে দ্যাখ সেই তোর সামনে বসে আছে।

শ্রীবাস চেয়ে দেখল ঘরে দরজা নেই, বীরাসনে বিশ্বম্ভর চার হাতে শংখ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে বসে আছে। বলছে, তোর ভয় নেই, যদি নবাবের নৌকো আসে, আমি তাতে আগে গিয়ে চড়ব, সকলের আগে নবাবকে দিয়ে কৃষ্ণ বলাব। যদি মত্ত হস্তীও নিয়ে আসে দেখবি সেও কৃষ্ণ বলবে। আমাকে দ্যাখ, আমাকে দেখে নির্ভয় হ।

শ্রীবাসের গৃহেই গৌরাঙ্গের অভিষেক হল।

ঘরের সকলেই প্রাণ ঢেলে সেবা-পুজোর কাজ করতে লাগল।

ঐ পরিচারিকার নাম কী?

দুঃখী। ওকে সবাই দুঃখী বলে ডাকে।

আজ থেকে ওর নাম সুখী হয়ে গেল। বললেন গৌরহরি, ওকে সবাই সুখী বলে ডেকো। শ্রমনিষ্ঠাতেই ওর অনন্ত ভক্তি। ও ভক্তিতেই আনন্দিতা।

কিন্তু সেদিন কীর্তনে উল্লাস আসছে না কেন? মহাপ্রভু উন্মনা হয়ে উঠলেন। বললেন, নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে এখানে।

অন্তরে ভক্তি নেই, শুধু কৌতূহলে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে। পাছে ধরা পড়ে তাই এককোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে লুকিয়ে।

খুঁজে বার করে নিতে দেরি হল না।

সে আর কেউ নয়, শ্রীবাসের শাশুড়ি। শাশুড়ি বলে তার মার্জনা নেই। তাকে সভা-স্থল থেকে বার করে দেওয়া হল।

নিমেষে জমে উঠল কীর্তন।

কিন্তু সেদিন প্রভুর কীর্তনের মধ্যেই শ্রীবাসের ছেলেটি মারা গেল।

শ্রীবাস পরিজনদের বললে, কান্নাকাটি কোরো না। কোলাহল শুনলে প্রভুর নৃত্য-সুখে ভঙ্গ হবে। আর স্বয়ং প্রভু যেখানে নৃত্য করছেন সেখানে মৃত্যু কোথায়?

হঠাৎ প্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কোনো দুঃখ উপস্থিত হয়েছে?

দুঃখ? যার ঘরে তুমি, তোমার প্রসন্ন মুখ, সে ঘরে আবার দুঃখ কোথায়?

প্রভু, শ্রীবাসের শিশুপুত্রটি মারা গেছে। তোমার আনন্দভঙ্গের ভয়ে শ্রীবাস তোমাকে এতক্ষণ বলেনি।

প্রভু কেঁদে উঠলেন। দেখ দেখ শ্রীবাসের ভক্তি দেখ। আমার প্রতি প্রেমে সে পুত্রশোক পর্যন্ত ভুলে আছে।

তখন প্রভু মৃত শিশুকে প্রশ্ন করলেন, শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন?

মৃত শিশু কথা কয়ে উঠল। বলল, কে কার পিতা কে কার পুত্র। যতদিন নির্বন্ধ ছিল পণ্ডিতের ঘরে খেলা করে গেলাম। এখন আবার অন্য ঘরে ডাক পড়েছে, চলেছি সেখানে। তুমিই সমস্ত খেলার মালিক। আবার তুমিই পিতা তুমিই পুত্র, তুমিই সমস্ত পরিবার-পরিজন।

শ্রীবাসকে সান্ত্বনা দিলেন প্রভু। বললেন, তুমি পুত্রহারা হওনি। আজ থেকে আমি আর নিত্যানন্দই তোমার দুই পুত্র। এক পুত্র হারিয়ে তুমি দুই পুত্র পেলে।

একদিন কীর্তনের সময় নিবিড় মেঘ করে এল। সবাই ভাবল অঙ্গন বুঝি বৃষ্টিতে ভেসে যাবে, কীর্তন আর হতে পাবে না।

প্রভু একবার গগন-অঙ্গন নিরীক্ষণ করলেন। মেঘ কেটে গেল। বৃষ্টি ঝরল না।

সেদিন শ্রীবাসকে বললেন, শ্রীবাস বৃহৎ সহস্রনাম পড়ো।

শুনতে শুনতে প্রভুর নৃসিংহ-আবেশ হল। গদা হাতে নিয়ে পাষণ্ডীদলন করতে নগরে ধাবিত হলেন। লোকজন ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল।

লোকভয় দেখে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন প্রভু। শ্রীবাসের ঘরে ফিরে এসে গদা ফেলে দিলেন। বললেন, পথের মানুষকে অকারণে ভয় পাইয়ে উদ্বিগ্ন করেছি। শ্রীবাস, আমার অপরাধ হয়েছে।

শ্রীবাস বললে, তোমার আবার অপরাধ কী। নৃসিংহের ভাবে তোমাকে যে দেখেছে সেই উদ্ধার পেয়েছে। তোমার রুদ্রমূর্তি তাই মঙ্গলের হেতু। তুমি মারতে আসছ এই বলে তোমার যে নাম করেছে তাতেই তার পাপক্ষয় হয়ে গেছে। সুতরাং তোমার কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

দেবানন্দ পণ্ডিতকে একদিন তিরস্কার করলেন গৌরহরি।

তুমি না আমার শ্রীবাসকে একদিন সভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? ভাগবত শুনতে শুনতে সে কৃষ্ণপ্রেমে কেঁদেছিল এই অপরাধে?

দেবানন্দ চুপ করে রইল।

ভাগবত পড়ানো তাহলে ছেড়ে দাও। প্রেমভক্তিই তো ভাগবত। তাহলে কী সুখে তুমি শ্রম করছ? যদি ভাগবতে প্রেমেরই দেখা না পেলে তবে কিসে, কোথায় তোমার সন্তোষ?

দেবানন্দ ভাগ্যবান, প্রতিবাদ করল না। নম্রশিরে দণ্ড স্বীকার করে নিল। যে প্রভুর দণ্ড নিতে জানে সে অনায়াসে ভক্ত হয়ে ওঠে।

এ যবন কে?

এ আমার দরজি! বললে শ্রীবাস।

আমার ভক্তের দরজি? গৌরহরি সে যবন-দরজিকেও কৃপা করলেন।

কিন্তু তাই বলে তুমি ঐ মাতালটার ঘরে যেতে পারবে না। শ্রীবাস ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গকে বাধা দিল।

প্রভু বললেন, আমার বেলায়ও কি বিধি-নিষেধ খাটবে? আমি যাব।

কিন্তু আমিও বলছি, তুমি যদি ঐ মাতালের বাড়িতে যাও আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।

মাতাল তো ভক্তিহীন আর শ্রীবাস তো ভক্ত। ভক্তের সংকল্প প্রভু লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

যা বলেছ, তোমার বাক্য মিথ্যে করতে পারি না। প্রভু হার স্বীকার করে অন্য পথে পা বাড়ালেন।
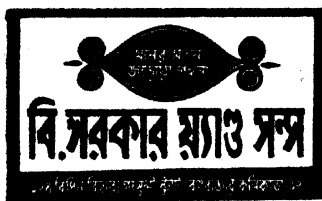
সন্ন্যাসের আগে শ্রীবাসকে বললেন, কুমারহট্টে গিয়ে বাস করো।

দাক্ষিণাত্য থেকে নীলাচলে ফিরলে প্রভুদর্শনে গেল শ্রীবাস, সঙ্গে তার তিন ভাই। প্রভু বললেন, আমি তোমাদের চার ভাইয়ের মূল্যক্রীত।

তুমি বিপরীত বললে। তোমার কৃপা-মূল্যে আমরাই তোমার কাছে বিক্রীত হয়েছি।

নীলাচলে প্রভুর নাচ দেখছেন প্রতাপ রুদ্র, পাশে তাঁর মহাপাত্র হরিচন্দন। কিন্তু সামনে শ্রীবাস দাঁড়িয়ে আছে বলে দর্শনে ব্যাঘাত হচ্ছে। হরিচন্দন বারে বারে শ্রীবাসকে ঠেলছে, এক পাশে সরে দাঁড়াবার জন্যে। তন্ময়তার জন্যে শ্রীবাস প্রথমটা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু শেষবার ধাক্কাটা একটু জোরালো হল দেখে শ্রীবাস হরিচন্দকে চড় মেরে বসল।

হরিচন্দন রুখে দাঁড়াল।

প্রতাপ রুদ্র তাকে নিরস্ত করলেন। বললেন, তোমার মহাভাগ্য, তুমি ভক্ত শ্রীবাসের হস্তস্পর্শ পেলে। তোমার নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। আমার ভাগ্যে নেই আমি পেলাম না।

প্রতি বৎসরই নীলাচলে গিয়ে প্রভুকে দেখে আসে শ্রীবাস। কোনো কোনো বার মালিনীকে সঙ্গে নেয়। মালিনীও বাৎসল্য-ভাবে নানা ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়ায় প্রভুকে।

প্রভুর নিজের মাকে মনে পড়ে যায়।

বললেন, শ্রীবাস, জগন্নাথের এই প্রসাদী বসনখানা তুমি আমার মাকে দিও। তাঁর সেবা ছেড়ে আমি যে সন্ন্যাস করেছি আমার সেই অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিও। তাঁকে বলো আমি নিত্য তাঁর গৃহে যাই, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসি। একবার সব ফুরিয়ে গেল আবার সব ভরে দিই। তুমি বললেই তাঁর বিশ্বাস হবে।

অদ্বৈতের সঙ্গে শ্রীবাসও জুটল মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলে স্তব করতে।

যে একান্তে থাকতে চায় তাকে সকলের সামনে টেনে আনো কেন? মহাপ্রভু আপত্তি করলেন।

শ্রীবাস বললে, সূর্য একবার উঠে পড়লে তাকে কি আর গোপন করা চলে? ঐ দেখ জয়ধ্বনি করে জনতা আসছে তোমার চরণ-দর্শনে। বলো আমি হাত দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখি!

শান্তিপুরে এসেছিলেন গৌরহরি, সেখান থেকে গিয়েছেন কুমারহট্টে, শ্রীবাসের বাড়িতে। শ্রীবাসের তখন দারুণ দুর্দিন, তেল প্রদীপের তলায় এসে ঠেকেছে।

ঘর থেকে তো কোথাও বেরোও না দেখছি, শ্রীগৌরাঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে চালাও কী করে?

প্রভু, কোথাও গিয়ে ভিক্ষে করতে ইচ্ছে হয় না।

আদ্যাপীঠ ফটো : মানসরঞ্জন কুন্ডু চৌধুরী

তোমার এত বড় পরিবার, উপযুক্ত উপার্জন না করলে নির্বাহ করবে কী করে?

অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

তবে তুমি সন্ন্যাস করো।

পারব না।

ভিক্ষেও করবে না সন্ন্যাসও করবে না তবে এই পরিবার পোষণ হবে কী করে? তোমার ঘরে এসে কাউকে তো কিছু দিয়ে যেতেও দেখলাম না। তবে তুমি কী করে চালাবে আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

শ্রীবাস দু হাতে তালি দিয়ে উঠল—এক, দুই, তিন তালি। বললে, এই এক, দুই, তিন তালি দিয়ে চুপ করে যাব।

তার অর্থ কী?

তার অর্থ তিন দিন উপবাস করব আর তিন দিন উপবাসের পরও যদি আহার না জোটে গলার কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবব।

কী? আমার ভক্ত শ্রীবাস অন্নের দুঃখে উপবাস করে থাকবে? গৌরহরি হুঙ্কার ছাড়লেন: যদি লক্ষ্মীও ভিক্ষে করে, আমার ভক্তের গৃহে দারিদ্র্য থাকবে না। গীতায় কী বলেছি তোমার মনে নেই? যে অনন্যমনা হয়ে শুধু আমাকেই উপাসনা করে, সর্ব-ভাবে আমাতেই আসক্ত থাকে তার যোগক্ষেম আমি বহন করি।

যে যে জনে চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেই মুই মাথায় বহিয়া।।
যেই মোরে চিন্তে নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনি আসিয়া সর্বসিদ্ধি মেলে তরে।।

বেশ তুমি তোমার ঘরেই বসে থাকো, শ্রীবাসকে আশ্বাস দিলেন, সমস্ত আপনা-আপনিই চলে আসবে।

শ্রীরামকে ডেকে বললেন, ঈশ্বরবুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসের সেবা করবে।

শ্রীরাম প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করল।

গৌরাঙ্গের তিরোভাবের পরেও শ্রীবাস বেঁচে ছিল, কিন্তু কোথায়, কতদিন, কেউ জানে না।

(প্রশ্ন)

১। সিংহ কেন দুর্গার বাহন? পেচক কেন লক্ষ্মীর বাহন?

২। কোন্ কোন্ পুরাণে গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়?

৩। জগদ্ধাত্রী কে?

দেবপ্রসাদ মিত্র
উদয়রাজপুর
২৪-পরগণা

●

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম কি? সকলেই কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন?

অনুপকুমার বসু
বেহালা
কলকাতা

●

১। অনেকের কাগজের নীচে এ-পি, ইউ, পি ও পি. টি, আই লেখা থাকে কেন?
২। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হোটেল কোনটি?

শৈলেন্দ্রকুমার ব্যানার্জি,
ওয়েস্ট গোটানগর, মালিগাঁও, পাণ্ডু,
আসাম।

●

১। ভারতে কতগুলি ব্যাঙ্ক আছে? তাদের নাম কি?

২। ১৯৬৬ সালে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি পরিমাণ কত?

৩। বর্তমানে ভারত রাশিয়ার সংগে কত টাকার কি কি দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি করে থাকে?

৪। ১৯৬৬ সালে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের কত অংশ ভারত উৎপাদন করে?

কালীপদ রায়বর্ধন,
মহানন্দপাড়া, শিলিগুড়ি,
দার্জিলিং।

●

(উত্তর)

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা অমৃতে জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত কতগুলো প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, রাষ্ট্রসংঘে বহু সদস্য রাষ্ট্র আছে, যথাক্রমে ভারত, জাপান, পাকিস্তান, জাতীয়-চীন, আমেরিকা, বৃটেন, স্পেন, ফ্রান্স. মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়া, ইরাক, ইরাণ, ঘানা, ইথিওপিয়া, মালি, বৎসোয়ানা, নেপাল, আর্জেন্টিনা, পেরু, ব্রাজিল, সোভিয়েট রাশিয়া, ফিলিপাইন, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, সৌদি আরব, ইরাণ, মালয়েশিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি আরো অনেক দেশ। তাদের রাজধানী হচ্ছে দিল্লী, টোকিও, ইসলামাবাদ, তাইপে, দামাস্কাস, লিমা, বুয়েনস এয়ার্স, কাটমাণ্ডু, আদ্দিস আবাবা, তেহরাণ, রিও ডি জানিরিও, ম্যানিলা, মস্কো, ওয়াশিংটন, বাগদাদ, কায়রো, আক্রা, আলজিয়ার্স, লণ্ডন, প্যারী, মাদ্রিদ, রিয়াধ, কুয়ালালামপুর, বেলগ্রেড ইত্যাদি। (২) হ্যাঁ, হয়েছে। চাঁদে প্রথম মানুষ, আশিদিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ ইত্যাদি। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ঘটনা সম্বলিত কৌতূহলী কাহিনীই অনূদিত হয়েছে বেশী। (৩) অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ ১৯৬৮ সালে পূর্ণ হবে। আছে, আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী এই দুটি পত্রিকাও প্রাচীন। (৪) অমৃতবাজার প্রথমে বাংলাতে প্রকাশিত হতো, বর্তমানে ইংরেজিতে হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ। (৫) বাংলা ভাষায় বড় গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ বেশী পরিমাণে প্রকাশিত হয়ে থাকে। (৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (ইনি আমেরিকাতে শিশুপাঠ্য রচনা করে New boy prize ১৯২৮ সালে পান)। পাশ্চাত্য জগৎ জনপ্রিয়।

রাহুল দর্পণ।
৬, রাজনগর রোড।
আগরতলা, (ত্রিপুরা)।

●

গত ১৮।৫।৬৭ তারিখের অমৃতে জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত শ্রীস্বরূপা চৌধুরীর ১ম প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীর পরিচয় জানতে চেয়েছেন, নিচে তা দেবার চেষ্টা করছি।

বটকৃষ্ণ পাল

(জন্ম ১৮৩৫ খৃঃ, মৃত্যু ১৯১৪ খৃঃ)।

বটকৃষ্ণ পাল ঔষধ ব্যবসায়ী হিসাবে বঙ্গের সর্বত্র সুবিদিত। শৈশবে জনক-জননীর মৃত্যু হওয়াতে ইনি কলকাতায় মাতুলালয়ে (বেনেটোলা স্ট্রীট) প্রতিপালিত হন। বার বৎসর বয়সে ইনি মাতুলের মশলার দোকানে কাজ করতে আরম্ভ করেন। পরে একুশ বৎসর বয়সে নিজে সামান্য পুঁজিতে খেঙ্গরাপট্টীতে একটি মশলার দোকান খোলেন। পরে জোড়াসাঁকোর মাধবচন্দ্র দাঁকে অংশীদার করে তাঁর দোকান থেকে জিনিষপত্র আনতেন। ঐ দোকানেই তিনি কিছু কিছু করে বিলাতী ঔষধ রাখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ-বিক্রেতা হয়ে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। ইনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন। নিজের জন্মস্থানে ইনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেনেটোলাতেও ইনি বালকদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে-ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি ভূতনাথ, হরিশঙ্কর ও হরিমোহন নামে তিনটি পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী

ইনি লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। কলকাতায় তাঁর জন্ম। ইনি মুন্সেফ ছিলেন, পরে বর্ধমানের রাজার অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরজীতে মনুসংহিতার অনুবাদ করেন এবং একখানি ইংরাজী-বাংলা অভিধান প্রকাশ করেন। Quill নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করে ইনি সরকারের অপ্রীতিভাজন হন। রামমোহন রায়ের বন্ধু ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন।

রামতনু লাহিড়ী

(জন্ম ১৮১৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৯৮ খৃঃ)

ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষার আদর্শে ইনি এদেশের সমাজসংস্কারে উদ্যোগী হন। পরে কিছুদিন কেশবচন্দ্র সেনের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু প্রচলিত কোন ধর্মমতে আস্থা ছিল না।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ইনি অন্নসত্র খুলে কলকাতায় সমাগত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে অন্নদান করে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। গভর্ণমেন্ট এঁর এই দানের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে রায়-বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। মৃত্যুর পূর্বে ইনি যে ব্যবস্থা করে গেছেন তাতে এখনও বহু নিরন্ন ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে অন্ন-গ্রহণ করে জীবনধারণ করে থাকে। তাঁর চোরবাগানস্থ মর্মর প্রাসাদে এখনও কলকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে রয়েছে।

শাশ্বত পাত্র,
যাদবপুর

●

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'অমৃতে' পত্রিকায় প্রকাশিত আশীষকুমার মিত্রের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, রাদারফোর্ড ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রোটন্, চ্যাড্উইক্ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিউট্রোন্, এবং ফের্মি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পরমাণু আবিষ্কার করেন।

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত মৃণাল-কান্তি বসুর ১। প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েক্স্ম্যান্-স্ট্রেপ্টো-মাইসিন্ আবিষ্কার করেন।

—সন্তোষকুমার গুপ্ত, সান্ত্বনা গুপ্তা,
ডি-টি ১০৩৩, রাঁচী—৪

"ওরে বাচ্চু! তোকে আমি এখন কোথায় রেখে যাই বল? তুই যা দুষ্টু হয়েছিস!"

চটপট আপিসের পোষাক পরতে-পরতে নিজেকে যেন সুধা [illegible] করলে। তারপর আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতে যেন কথাটা খেয়াল হল, বাচ্চু তো সামনে নেই, পাছে বায়না করে আগে থেকে তাকে পার্কে পাঠিয়ে দিয়েছে! আপিস যাবার সময় রোজ বায়না ধরে, আমি যাব! আমি যাব!

এতদিন চলছিল, আর চলে না। পরিচারিকাও বলে দিয়েছে, বাচ্চুকে সামলান তার সাধ্য নয়! কখন কি হবে, গেলে সে দায়ী হবে না!

আয়নায় প্রতিফলিত মুখটা যেন তার নয় এমনি অবাক বিস্ময়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিজেকে সুধা দেখে। সত্যি সে-ই কিনা পরখ করবার জন্যে যেন অস্ফুটে ডাকলে, সুধা! সুধা!

আপন ডাকে সুধা চমকে ওঠে। স্বরটা যেন তার নয়, আর একজনের। মুহূর্তের জন্যে, তারপর নিজেকে সামলে নেয়। সুধা ভ্রুকুঞ্চিত করলে, যত বাজে চিন্তা!

সদর রাস্তায় আপিসের গাড়িটা থেকে-থেকে হর্ন দিচ্ছে। বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, দেরি হয়ে গেছে।

সুধা তাড়াতাড়ি হ্যান্ড-ব্যাগটা নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দোতলা থেকে নেমে এসে সিঁড়ির নিচে থমকে দাঁড়াল—সার-সার লেটার বক্সের ওপর দৃষ্টি পড়তে একটি নাম যেন তার চোখে বাণ ছুঁড়ে দিল। সুধা চোখ ফিরিয়ে নিল, মনে-মনে বললে, আজই এসে বাক্সটা সরিয়ে ফেলবে, নয় নামটা মুছে ফেলবে। বাড়ির মালিক এখন সে-ই, মাসে-মাসে ভাড়া সে-ই পাবে, চিঠির বাক্স তার নামেই থাকবে!

ইচ্ছে করছে লেটার বাক্সটা টেনে-হিঁচড়ে উপড়ে ফেলে দেয় এখনি। পরের বোঝা সে আর বইবে না! চিরদিনের কোন চিহ্ন আর রাখবে না সম্বন্ধের।

আবার আপিসের গাড়ির হর্ন বাজল। সুধা দ্রুত পদে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। বেশ অপ্রস্তুত মনে হল নিজেকে, তার জন্যে এতগুলো লোক অধৈর্য হয়ে

উঠেছে! জিজ্ঞেস করলে আপিসের গাড়ি ডিটেণ্ড করার কোন কারণই দেখাতে পারবে না সে।

মাথা নিচু করে পিছনের সিটে জানলার দিকে মুখ করে সুধা বসল। যেন তার মুখটা গাড়ির ভেতরের কেউ দেখতে না পায়—সুধার কেমন যেন মনে হল, আজ তার মুখে এমন কিছু লেখা আছে যা দেখে সহজেই সহকর্মীরা তার মানসিক অবস্থার অস্থিরতা ধরে ফেলবে। কিছুই যেন আর রাখা-ঢাকা যাবে না। অনেক নিঃশব্দ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কি ভাববে কি জানে।

নিজেকে স্বাভাবিক করতে সুধা মনটাকে যেন শূন্য চেতনাহীন করতে চায়, মুখে হাসি ফুটিয়ে পাশের সহকর্মিণীর সঙ্গে সহজ সুরে আলাপ করে ঃ এবার বোধ হয় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল! কদিন কি বৃষ্টিটা গেল!

সহকর্মিণী ছোট্ট রুমাল দিয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে বললে, হরিবল! বিশ্রী!

অদূরে পাশের একজন নাতিপ্রৌঢ় সহকর্মী বললে, সামটাইম ওয়েলকাম! বৃষ্টি দিয়ে উজ্জ্বল দিনের আন্দাজ করা যায়।

কথাটা দার্শনিকতার মত শোনাল, গাড়ির মধ্যে সবার মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফুটল।

জানলার বাইরে চোখ রেখে সুধার মনে হল, বৃষ্টি-ধোয়া রোদটা যেন সদ্যস্নাতা যুবতীর মত উজ্জ্বল!

সহকর্মিণী বললে, এবার গরম পড়বে। অসময়ে বৃষ্টি হল, দরকারের সময় এক ফোঁটা আর পড়বে না!

দার্শনিক সহকর্মী বললে, আজকাল নেচারও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে! বাংলা দেশ নয়, যেন পশ্চিম!

সহকর্মিণী রুমাল নেড়ে বললে, প্যাচ-পেচের চেয়ে শুকনোই ভাল! সুধার আর এদিকে খেয়াল ছিল না। সে এখন নিশ্চিন্ত তার বিষয় নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে না।

আবার বাচ্চুর কথাটা মনে পড়ল। সুধা মনে-মনে বললে, ওরে বাচ্চু, তোকে নিয়ে কি করি বল! কোথায় তোকে রাখি?

মতিরমাকে আরো কটা টাকা বেশি দিলে ছেলেটাকে সারাক্ষণ রাখে না? রাত-দিন না হয় তার বাড়ীতেই রইল পরি-চারিকা!

কিন্তু বাচ্চু বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে, রাত-দিনের ঝি সামলাতে পারছে না। স্পষ্টই বলেছে কিছু হলে সে দায়ী হবে না।

যেন ঝিয়ের কথার ওপর রাগ করেই সুধা মনে-মনে বললে, যত দায়িত্ব কি আমার? কেন?

হঠাৎ 'কেন' কথাটা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাশের সহকর্মিণী সবিস্ময়ে সুধার কঠিন মুখটার দিকে চেয়ে দেখল। সুধা বুঝতে পেরে মুখ ফেরালে। আপন ভাব-ভাবনা উদ্বেগ-উত্তেজনা মনের মধ্যে তার প্রক্রিয়া যাই হোক এভাবে প্রকাশ পাওয়া সত্যিই লজ্জার! বিশেষ করে এই সব সুসজ্জিত ভদ্র জীবিকান্বেষীর সামনে তো বটেই। কি ভাবল অপর্ণা? পাগল না, মাথা খারাপ?

না, সুধা আজকাল ভাবের মধ্যে নিজেকে যেন ছেড়ে দিয়েছে, একটুতে যেন দিশাহারা, আর অসহায় বোধ করছে! কদিন বাচ্চু কান্নাকাটি করেছে তাতেই একেবারে সে অস্থির হয়ে গেছে! আর যদি পারবে না, তা হলে ছেলের ভার নিয়েছিল কেন! নীরেন তো বলেছিল—

হঠাৎ নিজেকে যেন শাসন করে সুধা বললে, ফের সেই নাম! নামটা ঠিক মনে আছে তো এখনো?

সুধা ভাবলে এর চেয়ে নির্লজ্জতা বুঝি স্বামী সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন কোন মেয়েই নিজের কাছেও প্রকাশ করে না।...

দুপুরের দিকে বোস সাহেব ডিকটেশন দিতে ডেকে পাঠালেন। সুধা যে সাহেবের স্টেনো তিনি বোস নন, তিনি অবাঙালী একজন মারাঠী। হঠাৎ আজ আপিসের মেজ সাহেব কেন তাকে ডাকলেন? তাঁর তো স্টেনো আছে, একটি অ্যাংলো মেয়ে রিটা! আপিসের মধ্যে সেই নাকি সবচেয়ে সেরা। শুধু স্টেনো নয়, পি-এও বটে।

ওরা কয়েকজন কাঠের পার্টিশান দেওয়া ঘরে বসে। আপিসের সাহেব ভাগ করা আছে এক-একজনের নামে। বেয়ারা এসে দাঁড়ালেই ওরা বুঝতে পারে কোন সাহেব কাকে ডাকছেন। কেবল রিটার বেলায় আলাদা ব্যবস্থা, তার নিজস্ব ঘর আছে, কলিং বেল আছে, প্রায় আধা অফিসারের মত। অনেক সময় স্টেনোদের ওপর কর্তৃত্ব করার ভারও তার ওপর পড়ে। কেউ-ই সন্তুষ্ট নয় রিটার ওপর, কাজের চেয়ে কাজের আড়ম্বরটা খুব শিখেছে বোস সাহেবের পি-এ।

সুধার মনে হল, রিটা আসে নি তাই তার ডাক পড়েছে। বোস সাহেব নিজের স্টেনো ছাড়া কাউকে বড়-একটা ডাকেন না; ওরা শুনেছে আর কারো কাজ নাকি তাঁর পছন্দ হয় না। আপিস শুদ্ধ সবাই তাই বলে, অবশ্য আড়ালে, রিটা খুব ম্যানেজ করেছে সাহেবকে। বোধহয় মোহিনী সেই জন্যে! মুখরোচক আরো অনেক আলোচনা হয় উভয়কে জড়িয়ে।

সুধা ভয়ে-ভয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বোস সাহেবের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হল অনেক দিন যেন সে বোস সাহেবকে দেখে নি। ম্যানেজিং ডিরেকটরের পর কর্তৃত্বে এবং পদমর্যাদায় উনিই উল্লেখ্য আপিসে। বেয়ারা থেকে বাবুরা প্রায় প্রতিদিনই বোস সাহেবের মেজাজ এবং ধরণ-ধারণের গল্প করে—কখনো তা উত্তেজক, কখনো সরস, কখনো বা কৌতুকাবহ। অর্থাৎ এমন দিন নেই, যেদিন আপিসে বোস সাহেবকে নিয়ে অধঃ-স্তনদের মধ্যে আলোচনা না হয়! আপিস বলতে বোস সাহেব!

ইতস্তত করে সুধা অস্ফুটে বললে, মে আই কাম ইন!

ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় আহ্বান এল, কাম ইন!

রিটার অনুপস্থিতিতে দু-একবার বোস সাহেবের ঘরে সুধার ডাক পড়েছে, মাথা নিচু করে কাজ করে উঠে গেছে, অত খেয়াল করে নি।

আজ ঘরে ঢুকেই মনে হল, ঘরটা খুব প্রশস্ত, ছিম-ছাম কেমন যেন নবীন যুবকের মত, টেবিলটা বেশ বড়, আঃ কি ঠাণ্ডা ঘরটা!

বোস সাহেব চোখ তুলে বললেন, বসুন!

সুধা সামনের চেয়ারে বসল। সাহেবের টেবিলের কাচে আপন ছায়াটা কেমন পেন্সিল স্কেচের মত যেন।

বোস সাহেব বললেন, আপনাকে কিন্তু ডিকটেশন দেবার জন্যে ডাকি নি।

তাহলে? প্রশ্নটা মনে-মনে সুধা করলে। শ্রুতিলিপিকারিণীদের সঙ্গে আপিস-কর্তাদের আর কি কাজ থাকতে পারে?

বোস সাহেব বললেন, আমরা ভেবেছি আপনাকে প্রমোশন দেব। মানে রিটার জায়গায় আপনি কাজ করবেন আমার সঙ্গে!

কেন, রিটার কি হলো? সে এখন কি করবে? তার জায়গায় সে যখন বসছে তার গতি কি হবে? ইত্যাদি সুধা মনে-মনে অনেকগুলো প্রশ্ন করলে।

বোস সাহেব বললেন, আপনি আজ থেকে আমার পি-এ হিসেবে কাজ করবেন; রিটার ঘরেই বসবেন।

কি বলবে সুধা ভাবতে পারলে না। কৃতজ্ঞতা জানান তো উচিত। কিন্তু কেমন যেন জবুথবু মেরে গেল। অপ্রস্তুতের মত বসে রইল।

বোস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আর ইউ হ্যাপি?

সুধা মাথা নাড়লে, স্পষ্ট করে খুশিটা প্রকাশ করতে পারলে না। উঠে দোরগোড়ায় এসে যেন মনে হল, অন্তত একটু তার হাসা উচিত ছিল।

দরজাটা বন্ধ করে পিছন ফিরে সুধা একবার চেয়ে দেখলে, বোস সাহেবই হাসছেন, যেন তার চেয়ে তিনিই খুশি হয়েছেন সুধাকে রিটার জায়গায় বসিয়ে।

আশ্চর্য, সুধা যা না জানে তার সহ-কর্মিণীরা যেন তার চেয়ে অনেক বেশি জানে এ ব্যাপারে। সুধা বোস সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ওরা ছেঁকে ধরলো। সাহেব কি বললে না বললে (সুধা জবাব দেবার আগেই) নিজেরাই উত্তর-প্রত্যুত্তরে বলাবলি করে মীমাংসা করলে। এমনও বললে, তারা জানতো, কিন্তু সুধাকে বলে নি, অবাক করবার জন্যে।

তারপর ওদের যেন খেয়াল হল, রিটা আজ দু-তিন দিন আপিসে আসছে না। কেন? বোধ হয় এই কারণ! বোস সাহেবের পি-এ বলে বড্ড যেন অহঙ্কার ছিল। তার ওপর আলাদা ঘর হয়ে আরো যেন—

সহকর্মিণী অপর্ণা বললে, আমি কিন্তু ভাই যখন-তখন তোমার ঘরে যাব। যারই পি-এ হও আমি মানবো না।

সুধা এদের অভিনন্দনে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, বললে, মানতে কে বলেছে! ভিন্ন ঘরে গেলে কি ভিন্ন মানুষ হতে হয়?

বলা যায় না! কত লোককে তাই দেখলুম তো! দু-পাঁচ টাকার মাইনের তফাতে তাই কত—

সুধা অস্ফুটে না-না করলে। সে কিছুতে বদলে যাবে না। চাকরিতে উন্নতি হলে তার স্বভাব বা চরিত্র কেন বদলাবে? সহকর্মিণীদের ধারণা সে মিথ্যে করে দেবে। নেহাৎ প্রয়োজন বলেই না সে চাকরি করছে, না হলে কারো মন-যুগিয়ে চাকরি করার তার কি দরকার ছিল? লোকে বলে বটে তারা স্বাধীন, কিন্তু তারা তো জানে না এই স্বাধীনতার মানে কি, তার অন্তর্নিহিত ভাবটাই বা কি। থাকা-খাওয়ার সুখের জন্যে কি অশান্তি যে ভোগ করতে হয় বাইরে থেকে লোকে কি বুঝবে!

নতুন ঘরে একলা-একলা বসে সুধার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। আপিসে প্রমোশন হয়ে সে যেন একঘরে হয়ে গেছে! অপর্ণা, লীলা, ছন্দা, কেউ-ই তার কাছে আসে না, যাবার-আসবার পথে কখনো দেখা হলে ঐ চোখে-মুখে ইশারা করে যা আলাপ করে। তার বেশি নয়। ওদের সেই সশব্দ বা সরস আলাপ আর নেই। সুধার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। অথচ মুখ ফুটে ওদের জিজ্ঞেস করতে পারে না, কারণটা কি, কেন ওরা তার সঙ্গে আগের মত মেশে না? তার চারপাশে সব যেন কেমন চুপ-চাপ হয়ে গেছে। অবাক হয়ে গেছে বোধ হয় তার অবস্থার পরিবর্তনে।

প্রথম দিন ঘরের মধ্যে এসে বসতে সুধারই কেমন যেন অবাক লাগছিল। এত দিন তারা তিন-চারজন এক ঘরে পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করছিল, আজ তাদের মধ্যে থেকে সে-ই বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত হয়ে গেল। আর্থিক উন্নতি সুনিশ্চিত হলেও নিজের সম্বন্ধে সুধার কেমন যেন সংশয় রয়ে গেল। ওরা কি ভাবছে? ভাবছে বোধ হয়—

সে-ভাবনাটা সুধা মন থেকে একেবারে তাড়াতে পারে না। রিটার বেলায় সে-ও ভেবেছিল, সুতরাং তার বেলায় ওরাও ভাববে জানা কথা। রিটার পরে তাকেই বা বোস সাহেব পছন্দ করলেন কেন? কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে, এবং তা গূঢ় অর্থপূর্ণ! (সহকর্মিণীরা এই মত ভাবছে নিশ্চয়ই!)

সুধা বিপরীত ভেবেছে, আর সবার চেয়ে তার যোগ্যতা নিশ্চয়ই বেশি, তাই তাকে রিটার জায়গায় বেছে নেওয়া হয়েছে। অপরে কি ভাবলে না ভাবলে তার কিছু যায় আসে না। সে ফলভোগ করবে আপন সামর্থ্যের যোগ্যতায়। তাতে যদি কারো ঈর্ষা হয়, হোক। সে যোগ্য, সে দক্ষ—

আত্মশ্লাঘা করতে-করতে সুধা যেন অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেল, ভাবনাটা সামনে না গিয়ে অনেকটা পিছন দিকে ফিরল। একদিন এই চাকরি সে নিজেই যোগাড় করেছিল, একটা চাকরির তার সেদিন খুব দরকার ছিল। চাকরি না হলে বুঝি সে সেদিন কোথায় তলিয়ে যেত। বাড়ীতে বড় আপত্তি চলছিল তাদের মেলা-মেশা নিয়ে।

উঃ, চাকরিটা পেয়ে সেদিন খুব বেঁচে গিয়েছিল! একটা অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় হয়েছিল। তার অনেক ভাগ্য যে, সে সহজে চাকরি পেয়েছিল। নতুন চাকরির নিয়োগপত্র নিয়ে নীরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুধা বলেছিল, এইবার?

নীরেন নিয়োগপত্রটা নাড়াচাড়া করে জিজ্ঞেস করেছিল, কি এইবার?

সুধা তেমনি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলেছিল, উনি যেন বুঝতে পারছেন না! চালাকি হচ্ছে!

নীরেন হয়তো সত্যিই বুঝতে পারে নি। সুধাও স্পষ্ট করে বলে নি। কিন্তু তারপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল তা কাউকে না বুঝিয়ে বললেও সকলে বুঝেছিল।

সুধার অভিভাবকের আপত্তি কিছু টেঁকে নি। নিজের মনোনীত পাত্রকে সুধা বিয়ে করেছিল।

রমাপদবাবু তো প্রথম থেকেই বেঁকে বসে ছিলেন। খবরটা বাড়ীতে চাপা থাকে নি। ভয়ে-ভয়ে সুধার মা একদিন মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁরে সুধা এসব কি শুনছি?

সুধা মার কাছে স্বীকার করতে চায় নি, বেশ উষ্মার সঙ্গে বলেছিল, কি আবার শুনলে?

মেয়েকে মা স্পষ্ট বলতে পারেন নি, বেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বলেছিলেন, সত্যিই তুই জানিস না! বুঝতে পারছিস না?

বুঝতে পারলেও তার স্বীকার-অস্বীকার গুরুজনদের সামনে করাটা বেহায়াপনা। তাছাড়া কাজটা যেন অপরাধের সংসারের ধারণায়।

সুধা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলেছিল, ওসব তুমি শোন কেন!

মা হঠাৎ মেয়ের হাতটা ধরে আপন দেহে স্পর্শ করিয়ে বলেছিলেন, বেশ আমার গা ছুঁয়ে বল।

সুধা হাত ছাড়িয়ে রাগ করে মার সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। তারপর নেপথ্যে রমাপদবাবুর কটু-কাটব্য প্রায়ই শোনা যেতে লাগল। মা বেচারার প্রাণান্ত। মেয়েকে রমাপদ সামনা-সামনি কিছু বলেন না, যত রাগ তিনি স্ত্রীর ওপর খাটান। সুধা বুঝতে পারে তার জন্যে মায়ের নির্যাতন পুরো মাত্রায় হচ্ছে।

একদিন সুধা রান্নাঘরে খেতে বসে বললে, মা, আমার জন্যে কেন তুমি বাবার কথা শোন! আমি বরং চলে যাই। বাবা আর রাগ করবার কারণ পাবেন না।

মা কোন উত্তর দেন নি। সে-ই দিনই আপিস থেকে ফিরে এসে রমাপদবাবু মেয়েকে নিয়ে স্ত্রীকে যাচ্ছেতাই করে শুনিয়েছিলেন এমনও বলেছেন—মেয়ে যেন তাঁর বাড়ী ছেড়ে যেখানে খুশি গিয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারিণী মেয়েকে তিনি ঘরে রাখবেন না। একথাও বলেছেন, তিনি পাপ করতে চান না।

মা না বললেও বাবার সব কথা সুধার কানে এসেছিল। মনে-মনে সে আরো কঠিন হয়ে উঠেছিল। সংকল্পে দৃঢ় হয়েছিল। পাপই সে করবে।

অবশেষে মা বলেছিলেন, তুই যা ভাল বুঝিস তাই করিস। বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছিস!

নিজের ভাল-মন্দ সে নিশ্চয়ই বুঝতে শিখেছে। সুতরাং বাবা বললেই সে মানতে পারে না যে, সে অন্যায় করেছে, বা কোন পাপের ভাগী হচ্ছে। বরং বাবার রাগের কারণটা তার কিছুতে বোধগম্য নয়। বেশ তো তিনি এসে সামনা-সামনি তার সঙ্গে তর্ক করুন, কি, সমালোচনা করুন। মনে-মনে নীরেন আর তার মেলামেশার বৈধতা বা স্বাভাবিকতা নিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক সুধা তৈরী করে রেখেছিল। বাবা যদি বুঝতে চান সে বুঝিয়ে দেবে। বাবার রাগের কোন মানে হয় না। নীরেন শুনে বলেছিল, এ ব্যাপারে সব বাবারাই সমান অবুঝ! তোমার বাবা আছে, তাই শুনছো; আমার বাবা নেই, থাকলে ঐ রকমই বিরূপতার সম্মুখীন হতে হ'তো।

সেদিন নিজেদের ভালবাসার সরলতা, পবিত্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে সুধা বলে ফেলেছিল, আমাদের ছেলে-মেয়েদের কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলতে যাব না, দেখে নিও! অত অবুঝ হব না।

নীরেন কিছু বলে নি। কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সুধার কেমন খটকা লেগেছিল, সে যে অভিভাবকদের সঙ্গে এত বিরূপতা করছে, কই তার জন্যে নীরেন তো তাকে মুখেও সমর্থন বা উৎসাহ দিচ্ছে না? সে যেমন সবার মুখের ওপর বলতে চায় বেশ করেছি, খুব করেছি নীরেনও তেমনি বলুক অন্তত তার সামনে। সে বুঝবে নীরেনের জোরেই তার জোর! আর কারো কথা সে আমলই দেয় না।

নিজের মনে অনেক কথা বকে শেষটা যেন সুধার খেয়াল হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, কই, তুমি তো কিছু বলছো না?

নীরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল, বললে, আমি আবার কি বলবো? তোমার বাবা, তাঁকে—

হঠাৎ সেদিন বড় রুষ্ট আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সুধা, সঙ্গে-সঙ্গেই তীক্ষ্ণ স্বরে বলেছিল, আমার বাবাকে তোমাকে কিছু বলতে কে বলেছে! আর তুমি কি বলবে সে-কথা আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে?

নীরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল সুধার এই আকস্মিক আক্রমণে। কি কথায় কি কথায় সৃষ্টি হল শুধু-শুধু? সে বুঝতে পারেনি সুধা তাকে দিয়ে কি বলিয়ে নিতে চাইছে!

সুধা আরো রেগে বলেছিল, এখন দেখছি, আমারই ভুল, আমারই অন্যায়! গুরুজনরা মিথ্যে বলেন না! উঃ!

নীরেন তেমনি হতচেতন, নিশ্চুপ। কি বলবে ভেবে পেল না।

সুধা বলতে লাগল, চুপ করে যদি থাকবে তখন বললে কেন, তা হলে তো আর এভাবে সবার সঙ্গে ঝগড়া করতে হতো না। সব দায়িত্ব যে আমাকে নিতে হবে আগে জানাওনি কেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নীরেন বললে, আমি তোমার কোন কথা বুঝতে পারছি না। এতে আমার বলবার কি আছে, তাও ভাবতে পারছি না। তুমি তোমার অভিভাবকদের অবাধ্যতা করেছ সে তোমার আপন ব্যক্তিত্বই করিয়েছে, তাতে কারো

বলবার কি আছে; আর কারো বলার ওপর তার মর্যাদাও নির্ভর করে না। আমি হলে বোধহয় ওর চেয়ে বেশি কিছু করতুম না।

সুধা কি ভাবলে সে-ই জানে। নীরেনের কথায় শান্ত হল বলে মনে হল না। চুপচাপ খানিক বসে থেকে উঠে গেল।

কিন্তু সেই তাকেই আবার ফিরে যেতে হয়েছিল। সুধা স্থির থাকতে পারেনি। রমাপদবাবু দুদিন পরে মেয়েকে নোটিশ দিয়েছিলেন, মেয়ে যেন নিজের ব্যবস্থা করে নেয়, মানে পথ দেখে নিক। মা অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। রমাপদবাবু অটল।

এখন উপায়? শেষে যেন নীরেনই একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কসবায় নীরেনের এক সম্পর্কে মাসীমা ছিলেন, সুধাকে নীরেন তার কাছে জিম্মা করে দিয়েছিল।

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়ী থেকে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে কিছু স্পষ্ট করে সুধা ভাবতে পারেনি। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে মাঠের এক ধারে এসে চুপ করে বসেছিল। এখানে তারা দুজনে প্রায়ই আসতো আগে পিছে। জায়গাটা একরকম তাদেরই যেন হয়ে গিয়েছিল। সুধা সারাদিন বসে বসে ভেবে ভেবে নতুন আশ্রয়ের কূলকিনারা পায়নি। আজই যে বাবা তাকে পথ দেখে নিতে বলেছিলেন না নয়। মাও তাই বলেছিলেন, বেশ তো যাস্, একটা ঘরটর ঠিক করে যা।

না, এখনই সুধা চলে যাবে। আর এক-মুহূর্ত সে এ বাড়ীতে থাকবে না। উঃ, কি জেদ চেপেছিল সুধা!

সেদিন মাঠ থেকে একরকম তুলে নীরেনই তাকে কসবায় মাসীর বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল। সুধার মানসিক অবস্থা তখন অবর্ণনীয়! হাঁ-না কিছুই সে বলতে পারেনি। তবে হ্যাঁ মনে আছে, নীরেনের মাসীর সামনে উপস্থিত হতে সে যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিল তার সব অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য আর অভিমান ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যবহার করেছিলেন নীরেনের মাসীমা, যেন নিজের অভিমানিনী মেয়েকে তিনি হাত ধরে ঘরে তুলে আনলেন। তারপর তিনিই উদ্যোগ আয়োজন করে তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন, আইনসম্মত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে।

সুধার লজ্জা যায়নি। অবস্থাটা তার অজ্ঞাতবাসের মত মনে হয়েছিল, তাছাড়া মাসীই বা কতদিন তাঁর বাড়ীতে রাখবেন। তাঁর ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে, তার ঝামেলা কম নয়! বিশেষ করে স্থানসংকুলানের কথাও আছে। নিজেরা একখানা ঘরে থেকে কতদিন আর তাদের স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত অবস্থানের ব্যবস্থা করবেন? অবস্থাটা ভালও দেখায় না। সুধার মনে হ'তো জোর-জবরদস্তি!

সুধা জানতো তাকে নিয়ে যত ঝামেলা। তার নিজের বাড়ীতে জায়গা হলো না, আবার নীরেনের বাড়ীতেও জায়গা হলো না। পরাশ্রয়ে পরানুগ্রহে দিন কাটাতে হচ্ছে। নববধূ বলে নয়, আপন ঘরের এ ধারণা তার ছিল না। নীরেন অবশ্য চেষ্টার ত্রুটী করেনি, কিন্তু সুযোগ মত বাসার সন্ধান মেলেনি। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। কেবল মনে হয়েছে বুঝি হেরে গেল সে।

না সে হারেনি, বিজয়িনীর মত নিজের সংসার পেতেছিল। কিন্তু কত অল্প ক্ষণস্থায়ী মানুষের সুখ বা স্বস্তি! অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়ে কত বিচিত্র বেদনা-দায়ক মানসিকতার মধ্যে পড়তে হয়। সুখ-ভোগের সঙ্গে দুঃখভোগটাও সুধার জীবনে যেন নিশ্চিত হয়ে গেছে।

চাকরি পেয়ে সুধা ভেবেছিল তার স্বাধীন জীবনযাত্রার পথে আর কোন বাধা নেই। দুজনের রোজগারে দিব্যি চলে যাবে! নবীন স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্যে সেদিন আর বেশি কিছু বোধহয় কাম্যও ছিল না—বিবাহিত জীবনের সুখ অতঃপর স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবে। সুধার নিজের চাকরিটা সেদিন তাকে অনেক সাহস জুগিয়েছিল, মানসিক স্থৈর্য এনে ছিল। সকল বাধা, প্রতিবাদ তুচ্ছ করার আনন্দ-আবেগে বলেছিল, এইবার? অর্থাৎ আর কে ভাবনী করে! তার স্বাধীনতার ছাড়পত্র এই চাকরি।

হায়, তখন কি সুধা একবারও ভেবেছিল দাম্পত্যজীবনের সঙ্গতি চাকরি দিয়ে বজায় থাকে না? তার মূল্য আর একজনের কাছে এমন তুচ্ছ হয়ে যাবে? হয়তো চাকরির মূল্যে সে আপন মূল্যকে বড় বেশি দাম দিয়েছিল সেদিন।

তার বাবা যেন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, প্রেম্-ম! অনেক দেখা আছে, দু'দিন যাক না তখন বুঝতে পারবে! ভাব করে বিয়ে কখনো টেকে না!

অ-ভাবের বিয়েই যেন টেকে! সুধা মনে মনে ব্যঙ্গ করেছিল। তার অভিভাবক কি বুঝবেন, তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটা কত গভীর! বয়স্ক যাঁরা চিরকাল একই ভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠান চিরাচরিত প্রথায় শেষ করেছেন, তাঁরা ও ছাড়া আর কি বলতে পারেন! নর-নারীর সম্বন্ধের নানা হিসাব তাঁরা কি জানেন, বা অনুভব করেন?

অনেক হিসাবের কথা সুধার বাবা বলেছিলেন। ভালবাসা নাকি দু'দিনের, মোহ কেটে যেতে দেরী হয় না! সুধার বাবার কাছে তাদের পরিণাম যেন অংক ফলের মত প্রত্যক্ষ ছিল।

আশ্চর্য, তা-ই হলো যেন অল্পকালের মধ্যে। কখন কিভাবে কোথায় যে বিরোধ বাধলো সুধা যেন বুঝতেও পারলে না। এই না-বুঝতে পারার ভাবটা শুরু এবং শেষে যেন একই। আজ যদি সুধা নিজেকে প্রশ্ন করে ভাল কেন সে বেসেছিল, কিসে সে ভেবেছিল ভালবাসা তার জীবনে এসেছিল, যথাযথ উত্তর দিতে পারবে না হয়তো।

সুধা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একলা-একলা ঘরে বসে আজ্জা সব এলোমেলো চিন্তা আরম্ভ হয়েছে! পুরনো চিঠি পড়ার মত অতীত ঘটনা মনের মধ্যে ভিড় করছে আজ।

পুরনো ডেরায় আসতে সহকর্মিণীরা সাদর অভ্যর্থনা করলে, এস, এস। খুব যা হোক, ঘর থেকে বেরওই না!

সুধা ওদের মধ্যে বসে বললে, তোমরাও তো কেউ আস না! একঘরে করে দিয়েছ!

ইস-স্! একঘরে তো আমরা! অপর্ণা বললে।

সুধা প্রতিবাদ করলে, আর উল্টো কথা বলো না—তোমাদের মনের কথা আমি জানি!

নীলা তাড়াতাড়ি টাইপরাইটার ঠেলে দিয়ে হুড়মুড় করে সুধার ঘাড়ে এসে যেন পড়ল। দু'হাত দিয়ে বান্ধবীর গলা জড়িয়ে বললে, সত্যি বিশ্বাস কর আমরা তোমার প্রমোশনে খুব খুশি!

সুধা বিশ্বাস করলে না, পরিত্যক্ত একটা টাইপরাইটারে আঙুল টিপে টিপে শব্দ করে বললে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! তোমরা আমাকে ত্যাগ করেছ।

অনুনয়ের সুরে অপর্ণা বললে, প্লিজ্-জ!

সুধা ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলো যেন এতক্ষণ বান্ধবীদের সঙ্গে সে মজা করছিল। সে-ও যেমন সত্যি ভেবে কিছু বলেনি তারাও যেন সত্যি ভেবে কিছু মনে না করে।

কিন্তু তবুও তারপরে গল্প জমল না। সুধা লক্ষ্য করলে, তারা পরস্পরের কাছে বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ছন্দা তার মুখের দিকে চেয়ে কি যে দেখছে সেই থেকে সে-ই জানে।

সুধা জিজ্ঞেস করল, কিরে মিনু, খবর কি?

খবরটা সবার জানা, অনেকদিন থেকে চলছে। সবাই হাসলে। নীলা মুখ গম্ভীর করলে।

সুধা বললে, এখনো কিছু হয়নি? সে কি রে!

নীলা যেন রাগ করে বললে, হবে আবার কি?

নীলার রাগ দেখে সুধা হাসলে, বান্ধবীরাও হাসলে।

অপর্ণা টিপ্পনী করলে, আহা ও গোপন রাখতে চায়, কেন তোমরা ওকে জিজ্ঞেস করচো! আমার গোপন কথাটি সখি—

সুধা বললে, তা হলে আমি দুঃখিত!

নীলা যেন অপ্রস্তুত হল, বললে, না না, তুমি অপর্ণার কথা শুনো না। বলচি, কি শুনবে বল?

সুধা হেসে বললে, কিছু শুনতে চাইনি, আমার শোনা হয়ে গেছে।

দেখাদেখি সবাই হাসলে। বোধহয় ভাবলে, নতুন কিছু শোনবার নেই নীলার ব্যাপারে! ভালবাসায় নতুন কথা কি আর আছে? নীলা একজনকে ভালবেসেছে, সেও নীলাকে ভালবাসায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, সেই একই ফরমূলা—

হঠাৎ সুধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। মনটা যেন তার বিষন্ন হয়ে উঠলো। নীলার

সঙ্গে রহস্য করতে গিয়ে নিজেকেই যেন সে বড় রহস্য করে ফেলেছে। বান্ধবীরা লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই দেখতে পেত সুধার মুখচোখ কেমন যেন বিশুষ্ক হয়ে উঠেছে।

এক সময় অপর্ণা বললে, জান, খুব শিগ্‌গীরই বোধহয় ওদের রেজিস্ট্রী হচ্ছে! নীলা, বল না আর লজ্জা কেন?

মুখ আরক্ত করে নীলা বললে, একটা জিনিসকে নিয়ে তোমরা এমন কর!

সুধা কিছু না বলে কাজের অজুহাতে নিজের ঘরে উঠে গেল।

ওরা বোধহয় তখনো নীলার পিছনে লাগতে লাগল।

"বাচ্চু আজ কিছু করেনি? কান্নাকাটি দুষ্টুমি?" আপিসের জামা-কাপড় ছাড়বার আগেই ঘরে ঢুকে সুধা পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলে।

মতিরমা কোন কথা না বলে দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

সুধা বললে, খুব জ্বালাতন করেছে বোধহয়? কি, কোন কথা বলচো না যে!

মতিরমা যেন ব্যাজার হয়ে বললে, না! রোজ রোজ কি বলচো দিদিমণি।

সুধা চুপ করে ঘরের মধ্যে এসে খাটের ওপর বসল। চারদিকে চেয়ে বেশ বোঝা যায় সারাদিন বাচ্চু খুব শান্ত থাকেনি এবং তার জন্যে মতিরমায়ের কম খোয়ার হয়নি। কান্নাকাটিও বোধহয় খুব করেছে। কেঁদে কেঁদেই ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা।

খানিক ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সুধা যেন কেমন বিমনা হয়ে যায়। খুবই কেঁদেছে ছেলেটা আজ, জোর করে বেচারাকে ঘুম পাড়ান হয়েছে! ঘুমন্ত শিশুর সে প্রশান্তি নেই মুখে!

সমস্ত অন্তরটা সুধার হায় হায় করে ওঠে। মতিরমাকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই; ঝি-চাকরের হাতে ছেলে আর কি করে মানুষ হবে! তবু তো মতিরমা রাজি হয়েছে, আর কাউকে রাজি করান যায়নি! ছেলে-পছার কাজ বললে সবাই না করে। ছেলের মা থাকবেন সারাদিন বাইরে আর সেই ছেলেকে মায়ের মত করে মানুষ করতে হবে, কাজটা তত সহজসাধ্য নয়। বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে মতিরমাকে রাজি করালেও সে যে খুশি নয় বেশ বোঝা যায়। প্রথম প্রথম ছেলের নামে সে অনেক নালিশ করেছে সুধা আপিস থেকে ফিরে এলেই, তারপর কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। যেন সুধা তার কাছে মস্ত অপরাধ করেছে। একটা অন্যায় কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে যা পাচ্ছে তার কোন দামই নেই। মতিরমার এ ভাবটা সুধার খুব ভাল লাগে না, অথচ কিছু নতুন ব্যবস্থা করবার উপায়ও নেই। তার কেউ নেই রাখবার, থাকলেও কারো কাছে যাবারও তার ইচ্ছে নেই। অনেক অভিমানে অনেক গর্বে, অনেক অহঙ্কারে সে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়েছিল নিজের মত নীড় বেঁধে সংসার করেছিল! আজ তা বিস্বাদ আর বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।

'বাচ্চু তুই যদি একটু বড় হতিস রে!' বুকের ভেতরটা সুধার মোচড় দিয়ে ওঠে। 'তোকে নিয়ে আমি কি করি এখন?'

মতিরমা এসে বললে, জলখাবার তৈরী, চা-পাতা ভিজতে দেওয়া হয়েছে।

সুধা আপিসের বেশ পরিবর্তনের কোন লক্ষণই প্রকাশ করলে না। ছেলের মাথার কাছে যেমন বসেছিল তেমনি বসে বললে, চাটা এখানে নিয়ে এস।

মতিরমা বললে, খাবার?

দরকার নেই! সুধা বেশ গম্ভীর হয়ে বললে। সে কেমন যেন আজ রেগে গেছে মতিরমা'র ওপর; তার ধারণা হয়েছে, মতিরমা বাচ্চুর দেখাশোনা ঠিকমত করছে না, দায়-সারা কর্তব্য করতে গিয়ে ছেলেকে অযথা নির্যাতন করেছে, এই অবহেলায় ছেলের ঘুমটা জবরদস্তি পীড়ন ছাড়া আর কিছু নয়।

চায়ের কাপটা নিঃশব্দে শেষ করে সুধা ছেলের বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে এসে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল, মনে হল বাড়িটা যেন মুহূর্তের জন্যে দুলে উঠলো। দেওয়াল ধরে সামলে নিয়ে আর্তস্বরে যেন কাউকে ডাকতে চাইলে। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

সুধা ভাবতে পারে না হঠাৎ তার মনের এ অবস্থা কেন হল। নিজেকে এত অসহায় আর দুর্বল মনে হচ্ছে কেন। এমন একটা শূন্যতা বোধ কেন। মনটা মাঝে মাঝে এমন বিরূপতায় ভরে ওঠে কেন।

আপিসের পোষাক ছাড়তে ছাড়তে সুধা মনকে কড়া শাসন করলে। ছি ছি, এমন ভেঙে পড়ার কোন মানে হয় না! বাচ্চুর জন্যে এত ভাববারই বা দরকার কি— ওকে এখন কোন একটা জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করলেই হয়। আজকাল তো কত হয়েছে! এত ভাবার কি আছে? সেই তো লোকের পিছনে খরচা হচ্ছে, আর না হয় কিছু বেশি খরচা করবে! ছেলেটা ভাল থাকবে! ঝি-চাকরদের খোশামোদ করতে হবে না! পয়সার তার এখন ভাবনা কি? প্রমোশন হয়ে অনেক টাকা মাইনে বেড়েছে —না না, শুধু শুধু ভাবনা!

আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করতে গিয়ে কথাটা যেন সুধার মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হয়ে উঠলো—হুঁ, জব্দ করলেই অমনি হলো! ভেবেছিল সুধা বুঝি দু'দিনেই ভেঙে পড়বে! অত সহজ নয়—

'দেখা যাক!' কথাটা উচ্চারণ করে সুধা যেন নিজের কাছে অপ্রস্তুত হল। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে মতিরমা পিছনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে তাকে যেন ডাকছে।

কি? বেশ বিরক্তির সঙ্গে সুধা জিজ্ঞেস করলে।

বাজারে যেতে হবে না? মতিরমা আজ দিদিমণির মেজাজটা যেন বুঝতে পারছে না। তেমনি বিরক্তির সুরে সুধা জিজ্ঞেস করলে, সারাদিনে বাজারটাও করে রাখতে পারনি?

মতিরমাও মুখে মুখে উত্তর দিলে, কখন করবো, সারাদিন ছেলে সামলাব না, আর কিছু করবো?

আর ছেলে সামলাতে হবে না তোমাকে! সুধা ঝাঁঝের সঙ্গে বললে।

তারপর ঝনাৎ করে ড্রয়ার টেনে বাজারের টাকা বার করে দিলে। সামনে থেকে মতিরমা সরে গেলে যেন সে বাঁচে! সব যেন বড় অকৃতজ্ঞ আর স্বার্থপর। বাজার! বাজার! কেবল টাকা মারার তাল, সুধা কি আর বোঝে না। কেবল দাও, দাও! দাও! দিয়েই যাও সংসারে—

কল-ঘর থেকে বেরিয়ে হাতে মুখে জল দিয়ে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে সুধা! উঃ সারাদিন ধরে কেবল ঝামেলা, আপিস থেকে এসেও নিস্তার নেই! লোক রেখেও শান্তি নেই!

কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ীটা যেন বড় নিস্তব্ধ মনে হল। কোথাও কেউ নেই, সে বড় একা, বন্দিনী যেন এই ফ্ল্যাট-বাড়ীতে! সুধা অস্থির হয়ে এঘর ওঘর করে ক্লান্ত হয়ে এক সময় বাচ্চুর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। এখন বাচ্চু যদি জেগে থাকতো তা হলে সময়টা বেশ কেটে যেত। কোন মিথ্যে ভাবনা হতো না, নিরর্থক মনে হতো না আপন অস্তিত্ব!

...প্রথম দিন ছেলেকে সঙ্গে করে আপিসে আসতে খুবই লজ্জা করেছিল সুধার। কিন্তু ছেলেকে সঙ্গে না নিয়েও উপায় ছিল না; সারাদিন ছেলেকে কোথায় কার কাছে রাখবে? মতিরমা কাজ ছেড়ে চলে গেছে। ঝি-চাকরের মুখে মুখে তর্ক সুধা পছন্দ করে না। তার ওপর ক'দিন যেন একেবারে পেয়ে বসেছিল মতিরমা, সব কাজে ছেলে-ধরার খোঁটা দিত! যেন কাজটা তাকে এমনি করতে বলা হয়েছে। 'বাচ্চু এই করেচে, বাচ্চু তাই করেচে, সারাদিন জ্বালাতন করেচে!' শুনতে শুনতে সুধার বিরক্তি আর রাগ ধরে গিয়েছিল। অত কিসের, মাইনে দিয়ে লোক রেখেছে করবে না মানে, একশ'বার করবে! না, আর কারো খোশামোদ সুধা করবে না। পয়সা দিলে ঢের লোক জুটবে।

কিন্তু মনোমত বিশ্বাসী কোন লোক পাওয়া গেল না। বাচ্চুকে নিয়ে সুধা মুশকিলেই পড়ল। সঙ্গে না নিয়ে গেলে ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবে, সারাদিন কে দেখবে ওকে?

(ক্রমশঃ)

কল্যাণকুমার বসু

(১৬)

সেই ঘর, সেই জানালা। জানালার ধারে হাস্নাহানার ঝাড়টি ঠিক তেমনি গন্ধ ছড়ায় সন্ধ্যার মুখে। কেশরবাগের মোড় ধরে এক্কা-টাঙ্গার তেজী ঘোড়া খুরে আগুনের হল্কা ছুটিয়ে চলে তেমনি। ভোর হতে না হতেই ফুলওয়ালীর দল ফুল বেচে চলে সবজিওয়ালারা তিন চাকার গাড়িতে সবজি বোঝাই করে হেঁকে যায়। সানাই বাজে দূরে ভৈরবীতে... যদিও সবকিছু পরিচিত তবু কেমন যেন অপরিচয়ে মাখা এক অজ্ঞাত রহস্যময় জগতের গন্ধ ভেসে আসে: সত্যি কতগুলো বছর এর মধ্যে পার হয়ে গেছে। হেমকুসুম চোখ মেলে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদকে দেখলেন—প্রৌঢ়ত্বের সবকটি চিহ্ন এখন তাঁর অঙ্গে তবু এখনও যেন তিনি পরিপূর্ণ যৌবনের অধিকারী, উদ্দাম-প্রাণময়তায় ভরপুর।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, তোমার দেখাশোনা, পরিচর্যার জন্যে একজন পরিচারিকা আমি নিযুক্ত করে দিলাম। খাও-দাও বিশ্রাম কর। ডাক্তার যেভাবে চলতে বললেন, সেভাবে চলবে, অসুধপত্র যা যা খেতে বললেন খাবে, বিরক্ত হয়ো না। লখনউর সেরা সেরা ডাক্তাররা তোমায় দেখে যাবেন। অবশ্য আমার মনে হয়, তুমি এখন অনেকটা সুস্থ তোমার মুখ দেখে আমার তাই মনে হয়। তোমাকে আমি নৈনিতাল, আলমোড়া, দেরাদুন, মুসৌরী নিয়ে যাবো। কোন্ শহরটা তোমার পছন্দ বল?

হেমকুসুম চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদকে দেখলেন, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলে মনে হলেও তিনি ঠিক আগের মত নেই, তাঁর শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হেমকুসুম জিজ্ঞাস্য-দৃষ্টিতে চাইলেন।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, আমিও আর আগের মত স্বাস্থ্যযুক্ত নেই হেম-কুসুম। আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাঃ ভাটিয়া নুন কম খেতে বলেছেন কিছুদিন। অত বাধা-নিষেধ ভালো লাগে না।

কিন্তু তাতে তো তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হবে।

কি জান, নিজেকে খুউব অসুস্থ মনে করলেই অসুস্থ মনে হয়। খাও-দাও আনন্দ কর, দেখবে সব রোগ তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ডাক্তাররা অতিরিক্ত সাবধানী।

দিলীপের মুখে কলকাতা থাকতে শুনেছিলাম কোর্টে কাজ করতে করতে খুব অসুস্থ হয়েছিলে।

ও কিছু নয়।

সব কথা আমাকে বল, লুকিও না।

শোন তবে একদিন কোর্টে আরগুমেন্ট করতে করতে শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আরগুমেন্টের মাঝে বার-লাইব্রেরীতে এসে বসেছিলাম, জুনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনা করছি, এমন সময়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল—প্রবল বেগে জ্বর এল। বেহুঁস অবস্থা আমার। জুনিয়ার এডভোকেট-প্লিডার সকলে আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দিল, কেউ কেউ বোধহয় আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল।*

হেমকুসুম বললেন, তারপর!

তারপর আর কি! তুমি ত তখন কলকাতায়, কে আর আমার সেবাশুশ্রূষা করবে। ভাগ্যিস সুবালামাসী ছিলেন এই আউটট্রাম রোডের বাড়িতে, মায়ের মত সেবা-শুশ্রূষায় আমাকে সারিয়ে তুললেন। সুবালামাসী যদি সে সময় লখনউ না থাকতেন, সত্যি তখন আমাকে অসুবিধেয় পড়তে হতো।

সুবালামাসীর কথায় এবং প্রশংসায় হেমকুসুমের মুখ বিকৃত হয়। এখনও হেমকুসুম সহ্য করতে পারেন না অতুলপ্রসাদের মাকে, বোনেদের, মাসীদের, মামাদের।
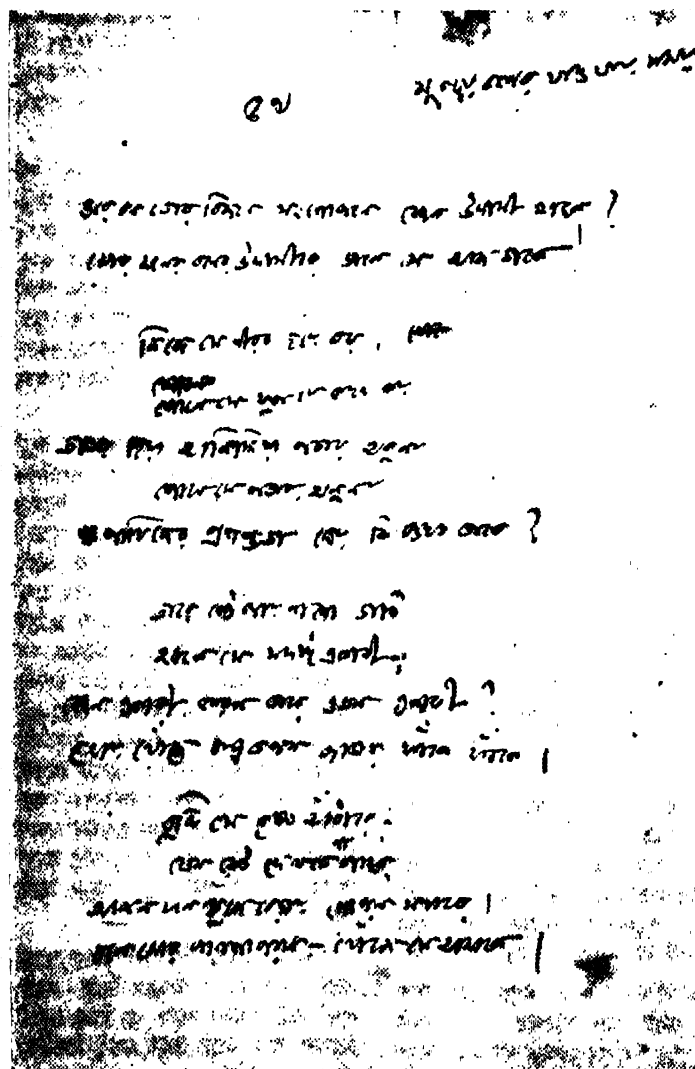
ওরে বন তোর বিজনে..........ডাকে (খসড়া) কবিতার প্রতিলিপি

*ব্যারিস্টার এইচ কে ঘোষের [illegible] অনুসারে।

প্রশংসা এবং নিন্দা কোন কিছু নয়। কোর্টের কাজেকর্মে নানা মক্কেলদের আহবানে মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদকে কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা সব জায়গায় ছুটতে হয়। তাছাড়া তাঁর আরো কত কাজ, মডারেট লিডার এ পি সন সমাজসেবী অতুল সেন তাঁর অনবরতই নানান জায়গা থেকে ডাক আসছে। এই তো সবার একদিনের জন্যে গেলেন এলাহাবাদ, কোর্টের কাজেই উঠলেন তেজবাহাদুর সাপ্রুর অতিথি হয়ে। কাজ শেষ হতে সন্ধ্যারাতে সেদিনই এলাহাবাদ থেকে মোটরযোগে লখনউ যাত্রা করলেন সঙ্গে একস্ট্রিমিস্ট অমল হোম এবং মডারেট নেতা সি ওআই চিন্তামণি। তাঁরা দুজনে মাউন্টট্রাম রোডের বাসায় আনন্দে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেলেন। অমল ও চিন্তামণি দুজনেই বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল এক-সঙ্গে গাড়িতে আসতে।

কেন কেন? হেমকুসুম বললেন।

অমল যে চরমপন্থী আর আমরা—আমি ও চিন্তামণি যে মধ্যপন্থী। চিন্তামণি ত অমলকে দেখেই রেগে আগুন, শেষে অনেক করে বুঝিয়ে শুনিয়ে নানা ঠাট্টা করে ঠাণ্ডা করে তবে নিয়ে এলাম লখনউতে; কয়েকটা দিন আমার এখানে কাটিয়েও গেল দুজনে।*

আমি যখন এখানে থাকি না তখন তোমার এখানে সবসময়ে লোকজন আসে দেখছি। এটা কিন্তু আমি পছন্দ করি না।

অতুলপ্রসাদ হাসেন।

হেমকুসুম বলেন, যাইহোক, তুমি কিন্তু এত পরিশ্রম করো না। তোমার জন্যে আমার বড় ভয় হয়। একদিনে সকালে এলাহাবাদ গিয়ে সারাদিন নানা কাজকর্ম করে ফিরে এলে সেদিন রাত্রে লখনউতে, এত পরিশ্রম ভালো নয়। বয়সও তো হয়েছে! শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখ।

অতুলপ্রসাদ বলেন, আমার শরীরে এখনও আগেকার মতো শক্তি; পরীক্ষা করবে নাকি, আমি বুড়ো হইনি...! সেদিনই না এসে উপায় ছিল! লখনউতে আমার অনেক কাজ যে, এত কাজ ফেলে বেশী দিন অন্য কোথাও থাকতে পারি! আমি দূরে থাকলে লখনউবাসীদের চলবে না। আমিও ওদের ছেড়ে থাকতে পারি না! গরমকাল এল। কোর্ট বন্ধ হতে তখনও দেরী আছে। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে বললেন, যাও তুমি দিলীপকে সাথে নিয়ে দেরাদুন, মুসৌরী ঘুরে এসো। তোমার শরীর ভালো থাকবে শীতের দেশে।

তুমি যেতে পারবে না?

আমার পক্ষে এখন ত যাওয়া হয়ে ওঠবে না হেম। অনেক কাজ—একটার পর একটা কাজ এসে পড়ছে, এ কাজগুলো ছেড়ে কেমন করে যাই হেমকুসুম।

তবে যেও না। অভিমানিনী হেমকুসুম।
অতুলপ্রসাদ হাসলেন।

একদিন শুভদিন দেখে হেমকুসুম ও দিলীপ—মা ও ছেলে দেরাদুন এক্সপ্রেসে ওঠে বসলেন পাহাড়তলির দেশে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। দেরাদুন থেকে চিঠিপত্র লেখে দিলীপ ও হেমকুসুম। তারা দেরাদুনের একখানা বড় হোটেলে ঘর নিয়েছেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেরাদুন, মুসৌরী, হৃষিকেশ, হরিদ্বার। হরিদ্বার-হৃষিকেশের গঙ্গায় স্নান বড় মনমধুকর। প্রাণমন শীতল করে তোলে। হেমকুসুমের যে বেড়াতে ভালো লাগছে একথা জেনেও মন তৃপ্ত হয় অতুলপ্রসাদের। বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কোথায় আছে। বেড়াও আর মানুষ দেখ, মানুষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করো। দেশ-ভ্রমণ ত নয়, মানব-দর্শন, প্রকৃতির হাতে শিক্ষা নাও তোমার মনের উদারতা নেমে আসবে—মনের নীচতা কেটে যাবে, তুমি মানুষ হবে। ভ্রমণ কর, ভ্রমণ কর ... বাইরের অন্তরের চোখ খোলা রেখে বেরিয়ে পড়, ঘুরে বেড়াও চরৈবতি।

হঠাৎ খবর এল টাঙা থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় হেমকুসুম আঘাত পেয়েছেন। আঘাত লেগেছে পায়ে, গুরুতর আঘাত। খবর শুনে অতুলপ্রসাদ সেদিনই রওয়ানা হলেন দেরাদুন। হেমকুসুমের আঘাতের কথা শুনে অতুলপ্রসাদ স্থির থাকতে পারেন? দেরাদুন পৌঁছেই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লখনউ। লখনউর খ্যাতনামা ডাক্তারদের কল দেয়া হল, সকলে একে একে পরীক্ষা করলেন, আঘাত জটিলতর অবস্থার উদ্ভাবনের কারণ হল। শরীর এবং স্বাস্থ্যের জন্যে তাকে পাহাড়ে স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠানো হল। কোথায় সম্পূর্ণ সেরে সুস্থ হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফিরে আসবেন, তা নয়, একি অদৃষ্টের পরিহাস।

অসহ্য যন্ত্রণায় হেমকুসুম কাতরোক্তি করেন। অতুলপ্রসাদ তাকিয়ে দেখেন অসহায়-ভাবে। ভাবনার কারণ ছিল অতুলপ্রসাদের ডাঃ ভাটিয়ার কথায়। ডাঃ ভাটিয়া বললেন, আমার মনে হচ্ছে মিসেস সেনের শরীরে একটা অপারেশন করার দরকার হতে পারে, তাঁর শরীরের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্যে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, ডাক্তার অপারেশনে হেমকুসুমের স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে আসবে?

ডাঃ ভাটিয়া বললেন, চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আপনার ভয় নেই।

তবু অপারেশনের আগে অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করতে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে

---

* শ্রীঅমল হোম লিখেছেন '১৯২০ সালের শেষে আমি 'ট্রিবিউন'-এর কাজে ইস্তফা দিয়ে লাহোর ছেড়ে, এলাহাবাদে মতিলাল নেহেরুর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' কাগজে যোগ দিলাম। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট কাগজের নৌকা তখন একস্ট্রিমিজম্-এর ভরা পাল চড়িয়ে ছুটেছে। বিপিনবাবু সম্পাদক, রঙ্গআয়ার আর আমি তাঁর দুই সহকারী সাব-এডিটররা এক-একজন অগ্নিশলাকা। মডারেটদের মুণ্ডুপাত করা আমাদের নিত্য-কর্ম, বিশেষতঃ ইউ পি'র মডারেট লিডার-দের। তেজবাহাদুর কাশ্মিরী হয়েও পার পান না। জগৎনারায়ণ প্রায়ই খোঁচা খান, তবে চিন্তামণির ওপর রাগটাই আমাদের বেশী, কেননা তিনি লিডারের সম্পাদক। জহরলালজী তবু খুসী নন। প্রায়ই বলেন বড় ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, যেন আরও একটু সুর চড়ালে ভালো হয়। এহেন অবস্থায় একদিন দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছি, জুন মাস, অসহ্য গরম চতুর্দিকে খসখস ভেজানো—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই অগ্নিকুণ্ডে একস্ট্রিমিস্টদের কেল্লায় প্রবেশ করলেন মডারেট লিডার মিস্টার সি ওআই চিন্তামণি। সদাহাস্য বিকশিত সজ্জিতদেহ। সাব-এডিটরেরা বিস্মিত, হতবাক। আমার অবস্থা কাঁচুমাচু, অপ্রস্তুত, কোথায় যেন বাধছে—আমি তাড়াতাড়ি এসে সম্বর্ধনা করে বসালাম। সেদিন সকালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটা মকদ্দমার কাজে তিনি এসেছেন, আজই ফিরে যাবেন, বললেন আজ শনিবার কাল ত তোমার ছুটি। আজ চল আমার সঙ্গে লখনউ, মোটরে যাবো রাত্রিতে। তিনি ডকটর তেজবাহাদুর সাপ্রুর অতিথি। খাওয়া-দাওয়া সেরে সেখানেই গেলুম। তেজবাহাদুর সাপ্রু ঠাট্টা করে বললেন, মডারেটদের বাড়িতে কি ইণ্ডিপেণ্ডেন্টদের আসতে হয়। অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন, তাই ত আমি নিজে গিয়েছিলাম। একটু পরে দেখি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি এসে উপস্থিত। তাকেও অতুলপ্রসাদ লখনউ নিয়ে যাচ্ছেন। আমার ত চক্ষু স্থির। প্রতিদিন যাঁর সম্বন্ধে কটুকাটব্য না করে আমরা জলগ্রহণ করি না, তাঁর সঙ্গে একত্র গমন ও বসবাস—সমস্যা বটে। চিন্তামণি মহাশয় স্বভাবতই গম্ভীর, যে কারণেই হোক আরো একটু গম্ভীর হলেন। আমার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অতুলপ্রসাদ ব্যাপারটা বুঝলেন। গাড়িতে ওঠে চিন্তামণি মহাশয়কে বসালেন আমাদের দুজনের মাঝখানে, তারপর আরম্ভ করলেন গল্প খোশগল্প, আর চিন্তামণি মহাশয়ের মুহুর্মুহু Leg pulling গভীর নিশুতি রাতে মোটর চলছে নীরব পথ মুখরিত হয়ে উঠেছে হাস্যধ্বনিতে, চিন্তামণি না হেসে পারছেন না। এমন করে সমস্তটা সহজ করে দিলেন অতুলপ্রসাদ। যে যে দুদিন আমরা তাঁর বাড়িতে দুজনে ছিলাম কেউ কোন কুণ্ঠাবোধ করিনি। পরস্পরে সহজ মানব সম্বন্ধটাই ফুটে উঠল পোলিটিকাল কোন্দলের উপরে আর সে শুদ্ধু অতুলপ্রসাদের গুণেই।

রূপ দিয়েছেন, ঘষেমেজে যথাসম্ভব নিখুঁত করে তুলেছেন—সে সম্বন্ধে তাঁর যদি বেশ-কিছুটা অহংভাব থেকে যায়, তাহলে তা ক্ষমার চোখেই দেখা শ্রেয়।

হোম্‌স ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। শিল্পীর নেশা আর বৈজ্ঞানিকের জেদ ছিল তাঁর খ্যাতির মূলধন। পেশায় তিনি ছিলেন ডিটেকটিভ, কিন্তু ডিডাকসন ছিল তাঁর নেশা। তাই উদ্ভট না হলে, অসাধারণ না হলে মামুলি মামলা নিয়ে তিনি সময় নষ্ট করতেন না। বরং ব্যঙ্গ করতেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে। এ সব মামলা এমনই জলবৎ তরলম্‌ যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে কোন অফিসারের পক্ষেই নাকি তার সমাধান করা সম্ভব।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে পরবর্তীকালে রচিত প্রায় সব গোয়েন্দা-কাহিনীতেই শার্লক হোম্‌সের প্রভাব আছে। সেই কারণেই বোধ হয় হোম্‌সের মতই পুলিশ গোয়েন্দাকে কটাক্ষ করার রেওয়াজ চলে এসেছে শখের গোয়েন্দাদের মধ্যে।

যাই হোক, 'সায়ান্স অব ডিডাকসন অ্যান্ড অ্যানালিসিস'এর স্রষ্টা শার্লক হোম্‌স্‌ তাঁর প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রেখে গেছেন 'দি স্পেকল্‌ড্‌ ব্যান্ড' কেসে। এই কেসেই হোম্‌স্‌ দেখিয়েছেন তাঁর বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মত ক্ষিপ্র হলেও সবসময়ে তা যুক্তিনির্ভর থাকত এবং সেইভাবেই তিনি সব সমস্যার মীমাংসা করতেন। আবার এই কেসেই তিনি স্বীকার করেছেন, আগাগোড়া ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলেন যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য হাতে না পেয়ে। মৃত্যুপথের যাত্রী এক মহিলা দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় পলকের জন্যে দেখেছিলেন ছোপ-ছোপ দাগওলা একটা ভয়ংকর ফিতে এবং তাই শুনেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন শার্লক হোম্‌স্‌। এবং এই সেই কেস যে কেসে বহু নরহত্যানিবারক শার্লক হোম্‌স নিজেই একটি নরহত্যার কারণ হয়েছিলেন।

অর্থাৎ, মানুষ খুন করেছিলেন শার্লক হোম্‌স্‌!

ঘটনাটা এই রকম :

১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে সাত সক্কালে হোম্‌সের ডেরায় এসে হাজির হল এক যুবতী। বছর তিরিশ বয়স। ফ্যাকাশে মুখ। আতংকবিহ্বল দৃষ্টি।

হোম্‌স্‌ তীক্ষ্ণ তৎপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখছি আজ সকালের ট্রেনেই এসেছেন।"

"আমাকে চেনেন নাকি?"

"না। আপনার বাঁ হাতের দস্তানায় গোঁজা রিটার্ন টিকিটের আধখানা দেখেই কথাটা বললাম। স্টেশনে পৌঁছোবার আগে ডগকার্ট ঘোড়ার গাড়ীতে অনেকটা যাচ্ছেতাই রাস্তাও আসতে হয়েছে আপনাকে।"

দারুণ চমকে উঠল ভদ্রমহিলা।

হোম্‌স্‌ বলল,—"আপনার বাঁ হাতের জামার সাত জায়গায় কাদার ছোপ দেখেই ধরেছি আমি। টাটকা দাগ। ডগকার্ট ছাড়া অন্য কোনো ঘোড়ার গাড়ীতে ওরকম কাদা ছিটকোয় না।"

শুনে একটু থতমত হল দর্শনার্থিনী মহিলা।

বলল, "আমার নাম হেলেন স্টোনার। আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে হবে। কিন্তু আমার শান্তি নেই—সব সময়েই বিভীষিকার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। তাই আপনার পরামর্শ চাই।

"আমি থাকি আমার বি-পিতার সঙ্গে। ইংল্যান্ডের একটা অত্যন্ত প্রাচীন স্যাক্সন পরিবারের তিনি শেষ জীবিত বংশধর। স্টোক মোরানের এই রয়লট পরিবার এক সময়ে খুবই ধনী ছিল। এখন আর কিছু নেই। তাই আমার বি-পিতা ডাক্তারি পাশ করে কলকাতা চলে গেলেন। সেখানে পশার জমল বটে, কিন্তু রাগের মাথায় একদিন বাটলারকে মেরে ফেলায় তাঁর জেল হল, পশারও গেল। ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন তিনি ইংল্যান্ডে।

"ভারতবর্ষে থাকার সময়ে আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মা তখন যমজ মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন। জুলিয়া আর আমি যমজবোন। মা-য়ের প্রচুর টাকা ছিল। সে টাকা তিনি ডক্টর রয়লটকে লিখে-পড়ে দিয়েছিলেন শুধু একটি শর্তে। আমাদের দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেলে প্রতি বছরে কিছু টাকা আমাদের দিতে হবে।

"ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর মা মারা যান।

"স্টোক মোরানের রয়লট বাসভবনে বড় হতে লাগলাম আমরা। বদমেজাজের জন্যে গ্রামের মধ্যে দারুণ অপ্রিয় হয়ে উঠলেন আমার বি-পিতা। দুটো গোলমালের নিষ্পত্তি ঘটল পুলিশ কোর্টে। টাকা দিয়ে ধামাচাপা দেওয়া হল একটার। ভবঘুরে বেদের দল ছাড়া তাঁর আর কোন বন্ধু রইল না। নিজের কয়েক একর কাঁটাভরা জমি আছে। সেইখানেই তাঁবু খাটিয়ে বেদেদের থাকতে দিয়েছিলেন তিনি। উনি নিজেও মাঝে মাঝে ওদের তাঁবুতে থাকেন, টো-টো করে ঘুরে বেড়ান। ভারতীয় জানোয়ারের ওপর ঝোঁক থাকায়, বাগানে একটা বেবুন আর চিতা পোষেন। খোলা বাগানে ঘুরে বেড়ায় তারা।

'এরকম পরিস্থিতিতে বাড়ীতে লোকজন কেউ আসত না, চাকরবাকরও কেউ থাকত না। আমরাও কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতাম না। বছর দুই আগে বড়দিন উৎসবে আমার এক মাসীমার কাছে গেছিলাম দুই বোনে। সেখানে নৌবাহিনীর অর্ধ-বেতনভোগী এক মেজরের সঙ্গে জুলিয়ার আলাপ হয় এবং বিয়ের কথা হয়। জুলিয়া ফিরে এল স্টোক মোরানে। বি-পিতা সব জানতে পারলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। কিন্তু বিয়ের ঠিক পনেরো দিন আগেই মারা গেল জুলিয়া।

"মারা গেল রহস্যজনকভাবে, ভয়ানক-ভাবে। সেই কথাই বলি এবার।

"রয়লট জমিদার-প্রাসাদ খুবই পুরোনো। তাই ভাঙাচোরা। থাকা যায় শুধু একটা অংশে। আমরা শুই নিচের তলায়। প্রথম ঘরে ডক্টর রয়লট, মাঝেরটায় জুলিয়া, তার পরেরটায় আমি। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া যায় না। তবে তিনটে ঘর থেকে একই বারান্দায় আসা যায় এবং তিনটে ঘরের জানলাই খোলে লনের দিকে।

"ভয়ানক সেই রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে গেলেন ডক্টর রয়লট। ইন্ডিয়ান চুরুটের কড়া গন্ধে জুলিয়ার ঘুম আসছিল না বলে এল আমার ঘরে। বেশ বুঝলাম, ডক্টর রয়লট ঘুমোননি—চুরুট খাচ্ছেন। জুলিয়া আমার ঘরে বসে বিয়ের গল্প করতে করতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আমি রাত্রে শিস দেওয়ার শব্দ শুনতে পাই কিনা। ক'দিন ধরে প্রতি রাতে তিনটে নাগাদ মৃদু শিসের শব্দে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল জুলিয়ার।

"শিসের শব্দ পাশের ঘর থেকেও আসতে পারে, আবার লন থেকেও আসতে পারে। হয়ত বজ্জাত বেদেগুলোর নষ্টামি। কিন্তু লন থেকে কেউ দিলে আমিও তো শুনতে পেতাম। কিন্তু আমি পাইনি। হয়ত আমার ঘুমটা মোষের মত—তাই।

"যাই হোক, জুলিয়া ফিরে গেল ওর ঘরে। ভেতর থেকে তালা দেওয়ার শব্দও শুনলাম। বাগানে বেবুন আর চিতা ছাড়া অবস্থায় থাকে বলে তালাচাবি না দিয়ে শুলে ভয়ের চোটে ঘুমই হয় না আমাদের।

"সে রাতে নামল দারুণ বৃষ্টি, সেই সঙ্গে এল প্রলয়ংকর ঝড়। ঝড়ের হুহুংকার ছাপিয়ে আচম্বিতে শোনা গেল নারীকণ্ঠে আর্তনাদ। তীরবেগে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম আমি। শুনলাম, একটা মৃদু শিসের আওয়াজ। আর, ঝন-ঝন করে কে যেন কতকগুলো ধাতুর জিনিস ফেলে দিল। দেখলাম, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে জুলিয়ার ঘরের দরজা। রক্তশূন্য মুখে বেরিয়ে এল জুলিয়া। নিদারুণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। মরবার আগে ককিয়ে উঠে শুধু বললে—হেলেন, ছোপ-ছোপ দাগওলা ভয়ংকর ফিতে। ভয়ংকর ফিতে।

"ডক্টর রয়লট যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, আমার বোন তখন ওপারের পথে যাত্রা করেছে।'"

ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন করে শার্লক হোমস্‌ জানলেন, মৃত জুলিয়ার ডান হাতে একটা দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি আর বাঁ হাতে একটা দেশলাই পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ বিপদ যখন এসেছে, তখন সে কাঠি জ্বালিয়ে চারদিক দেখেছে। ছোপ-ছোপ দাগওলা ভয়ংকর ফিতেটাও চোখে পড়েছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সেকেলে ঝিলিমিলি আর মোটা লোহার গরাদওলা জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ঘরের মেঝেতেও কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। লোহার গরাদ দিয়ে চিমনিরও মুখ বন্ধ ছিল। অর্থাৎ মারা যাওয়ার সময়ে জুলিয়া একাই ছিল ঘরে।

তারপর দু' বছর কেটে গেছে। মাস-খানেক আগে হেলেনের এক পুরোনো বন্ধু বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে তার কাছে। বি-পিতা এবারও কোন আপত্তি জানান নি। ঠিক হল, বসন্তকালে বিয়ে হবে। দিন দুয়েক আগে মেরামতির কাজ শুরু হল বাড়ীতে। হেলেনের শোবার ঘরের দেওয়াল ফুটো করায় বাধ্য হয়ে তাকে সরে আসতে হল জুলিয়ার ঘরে, শুতে হল সেই খাটে

খাটে শেষ শোয়া শুয়েছে তার বোন। পরিস্থিতিটা খুবই অস্বস্তিকর। তাই ঘুম আসছিল না গত রাতে। এমন সময়ে শোনা গেল মৃদু শিসের শব্দ।

শুনেই লাফিয়ে উঠে আলো জ্বালালেন হেলেন।

দেখল, ঘর ফাঁকা।

ভয়ের চোটে সারারাত জেগেই কাটিয়ে দেন। ভোর হতেই চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসে সধে এল শার্লক হোমসের আস্তানায়।

সব শুনে শার্লক হোমস্ বললেন, আপনার বি-পিতার অবর্তমানে ঘরগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাই। সুযোগ হবে?"

"হবে। আজ তিনি লণ্ডনে আসবেন শুনেছি। আপনি বিকেলের দিকে আসুন।"

"আমি আর ওয়াটসন দুজনেই যাব।"

কালো ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিদায় নিল হেলেন।

আর, তার কিছুক্ষণ পরেই দড়াম করে দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল এক বিশাল পুরুষ। হাতে শিকারের চাবুক। রোদেপোড়া প্রকাণ্ড মুখ। ক্রোধারুণ চোখ।

"শার্লক হোমস্ কার নাম?"

"আমার। আপনি কে?" বলল হোমস্।

"ডক্টর রয়লট। আমার সৎ-মেয়ে এখানে কেন এসেছিল? ওহে ছোকরা, আগুন নিয়ে খেলা করো না! শেষ করে দেব তোমায়!" বলেই এক হ্যাঁচকায় চুল্লিখোঁচানোর লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিলেন, বিশাল বাদামী হাতের চাপে বেঁকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

যাবার সময়ে শেষ হুংকার দিয়ে গেলেন —"দেখলে তো? ভাল চাও তো আমার নাগালের বাইরে থেকো।"

মূর্তিমান যমদূতের মতই ডক্টর রয়লট বিদায় হতেই বেঁকানো ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে এক হ্যাঁচকায় সিধে করে রেখে দিলেন হোমস্।

ওয়াটসনকে বললেন—"শক্তিতে আমিও নেহাত কম যাই না।"

যথাসময়ে স্টোক মোরানের শ্যাওলা-ঢাকা পাথরে তৈরী ধূসর প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ওয়াটসন আর শার্লক হোমস্। সঙ্গে হেলেনও রইল।

দেখা গেল, হেলেনের শোবার ঘরের দেওয়ালটা অবশ্যই ভাঙা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ছুতো করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাঝের ঘরে—যেখানে দু' বছর আগে রহস্যজনকভাবে মারা গেছিল জুলিয়া।

ভেতর থেকে জানলা বন্ধ করে বাইরে থেকে হোমস্ পরীক্ষা করে দেখলেন, ছুরি গলানোর ফাঁকও নেই। কব্জাগুলোও বেশ মজবুত লোহায় তৈরী।

অর্থাৎ, জানলা দিয়ে কোনো মানুষের প্রবেশ সম্ভব নয়।

মাঝের ঘরে, মানে যে ঘরে হেলেন এখন রাত কাটাচ্ছে, সেই ঘরে এসে বসলেন হোমস্। একটা মোটা ঘণ্টার দড়ি ঝুলছিল বিছানার পাশে, একটা মুখ পড়েছিল বালিশের ওপর।

হোমসের প্রশ্নের উত্তরে হেলেন জানালে, এ দড়ি থেকে মোটা দড়ির ঘরে—বাড়ীর কাজ দেখাশোনা করে সে। দড়িটা লাগানো হয়েছে মাত্র বছর দুয়েক আগে। অথচ জুলিয়া কোনোদিনই এ দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে কাউকে ডাকেনি। কেননা, নিজের কাজ নিজের হাতেই করা পছন্দ করত জুলিয়া।

হোমস্ তখন ঘণ্টার দড়ি ধরে এক টান মারলেন।

বললেন—"এটা তো দেখছি কোনো কাজেরই নয়।"

"ঘণ্টা বাজছে না বুঝি?"

"কোনোকালেই বাজবে না। দড়িটা তো তারের সঙ্গে লাগানো নেই, বাঁধা রয়েছে ঘুলঘুলির ওপরে একটা হুকের সঙ্গে।"

"আশ্চর্য ব্যাপার তো!"

"আশ্চর্য তো বটে। তা না হলে এ ঘর যে বানিয়েছে, সে দুটো ঘরের মধ্যে বাতাস চলাচলের জন্যে ঘুলঘুলি না করে বাইরের দিকের দেওয়ালে ঘুলঘুলি রাখলেই পারতো —তাহলে বাইরের বাতাস ঘরে আসত।"

"এ ব্যবস্থাও কিন্তু ঘণ্টার দড়ি লাগানোর সময়েই হয়েছে।"

"আশ্চর্য! অদ্ভুত! একে নকল ঘণ্টার দড়ি। তায় ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে না। তোবা! তোবা! চলুন, এবার ডাক্তারের ঘরটা পরীক্ষা করা যাক।"

ডাক্তারের ঘরের আসবাবপত্র অত্যন্ত সাদাসিধে। একধারে একটা সিন্দুক। পাশে এক পিরিচ দুধ।

লেন্সের মধ্যে দিয়ে কাঠের চেয়ারটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন হোমস্। সেই সময়ে চোখে পড়ল একটা কুকুর-মারা চাবুক। ডগাটা কুণ্ডলী পাকানো এবং ফাঁসের মত বাঁধা।

চাবুকটা দেখেই খুশীতে ডগমগ হয়ে হোমস্ বললেন—"ওহে ওয়াটসন, চাবুকটা দেখে রাখো। দেখতে মামুলি হলেও এ চাবুক মামুলি নয়। অনেক কুকাজ করা যায় এ দিয়ে।"

তদন্ত শেষে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেলেন হোমস্।

হেলেনকে বললেন, "আমার কথা যদি না শোনেন, আপনাকেও মরতে হবে। আজ রাতে আমরা আপনার ঘরে শোব—আর আপনি শোবেন পাশের ভাঙা ঘরে। আপনার বি-পিতা শুতে গেলে আপনি দরজার খিল খুলে পাশের ঘরে চলে যাবেন। আমরা তারপর আসব। এখন আমরা চললাম গ্রামের ঐ হোটেলটায়।"

বেরিয়ে এসে ওয়াটসনকে বললেন, "ভায়া, তুমি যা দেখেছ, আমিও তা দেখেছি। দু' ঘরের মাঝে ঘুলঘুলির অস্তিত্ব আমি লণ্ডনে বসেই অনুমান করেছিলাম। আরে, আরে, চমকে যেও না! জুলিয়া নিজের ঘরে বসে চুরুটের গন্ধ পেত—অতএব দু' ঘরের মধ্যে ঘুলঘুলির অনুমান করাটা কি খুব অস্বাভাবিক? মোটেই নয়। কিন্তু অদ্ভুত-বিকটা কি জানো? ঘুলঘুলি তৈরী হল, দড়িও ঝোলানো হল এবং দড়ির নিচে বিছানায় শুয়ে একজন মারা গেল।"

"এর মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি?" অবাক হয়েছেন ওয়াটসন।

"বিছানাটা লক্ষ্য করেছ? খাটটা মেঝের সঙ্গে আংটা দিয়ে লাগানো। এরকম এর আগে কখনো দেখেছ? কারণটা জানো? কেউ যাতে খাট সরিয়ে অন্য জায়গায় শুতে না পারে—তাই। ফলে, ঘুলঘুলি আর দড়ির ঠিক নিচেই থাকবে খাট। আরও মনে রেখো, দড়িটাকে ঘণ্টা বাজানোর জন্যে কিন্তু খাটানো হয়নি।"

"হোমস্! হোমস্! তোমার কি মনে হয় আরও একটা খুন হবে আজ?"

"ভায়া, কোনো ডাক্তার যখন কুপথে যায়, তখন তার মত বিপজ্জনক মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ডক্টর রয়লট জুলিয়া-হেলেনের মায়ের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছেন, তার অনেকটাই চলে যাবে যদি একজনেরও বিয়ে হয়। তাই জুলিয়াকে বিদায় নিতে হয়েছে। এবার হেলেনের পালা।"

রাত্রি।

অভিশপ্ত সেই ঘরে অন্ধকারে গা মিশিয়ে ভূতের মত বসে রইলেন হোমস্ আর ওয়াটসন। হোমস্ সঙ্গে এনেছিলেন একটা সরু বেত। সেটা রইল বিছানার ওপর। পাশে রইল একটা দেশলাই আর মোমবাতি।

রাত যখন তিনটে, তখন আচমকা ক্ষণেকের জন্যে আলোর ঝিলিক দেখা গেল ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে। পোড়া তেলের গন্ধ ভেসে এল। কেউ চোরালণ্ঠন জ্বালিয়েছে নিশ্চয়। পাশের ঘরে কে যেন খুব আলতো পায়ে চলাফেরা করছে। তারপর সব চুপ।

গেল আরও আধঘণ্টা। তারপরেই শোনা গেল একটা অদ্ভুত শব্দ। ঠিক যেন শোঁ শোঁ করে স্টীম বেরুচ্ছে কেটলির মুখ থেকে!

শব্দটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন হোমস্। পরক্ষণেই সপাং সপাং করে পাগলের মত চাবুক হাঁকড়াতে লাগলেন ঝুলন্ত দড়িটার। আতংকে ঘৃণায় মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

আচম্বিতে নিশীথ রাতের নৈঃশব্দ খানখান হয়ে ভেঙে গেল এক ভয়াবহ বিকট আর্তনাদে। আতংক, যন্ত্রণা, ক্রোধ—সবই ছিল সেই রক্তজলকরা আর্ত চীৎকারের মধ্যে। দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে গেল ভীতিবিহ্বল সেই চীৎকার—মিলিয়ে গেল শেষ প্রতিধ্বনি।

শিউরে উঠে ওয়াটসন বললেন— "একী! একী!"

নির্বিকার মুখে হোমস্ বললেন "শেষ হল ডাক্তারের লীলাখেলা। নাও, রিভলবার বাগিয়ে এসো আমার সঙ্গে।"

উদ্যত রিভলবার হাতে ডক্টর রয়লটের ঘরে ঢুকে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য! টেবিলের ওপর রাখা চোরালণ্ঠনের আলো গিয়ে পড়েছে সিন্দুকের ওপর।

সিন্দুকের ডালা খোলা। পাশেই কাঠের চেয়ারে বসে রয়েছেন ডক্টর রয়লট। কোলের ওপর ফাঁসওলা সেই চাবুক। চিবুক ওপরে তোলা, দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাদের কোণে।

আর, ভুরুর ঠিক ওপর দিয়ে মাথা ঘিরে বিচিত্র রঙের একটা পটি। হলদে পটির ওপর ছোপ ছোপ বাদামি দাগ।

ফিসফিস স্বরে হোমস্ বললে, "এই সেই ছোপ-ছোপ দাগওলা ফিতে।"

ওয়াটসন এক-পা এগুতেই নড়ে উঠল বিচিত্র হলুদ প্যাগড়িটা। আর, তারপরেই চুলের মধ্যে থেকে ফণা তুলল একটা বিষধর সাপ।

ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভয়ংকর সাপ! যার ছোবল খাবার দশ সেকেন্ডের মধ্যেই মারা গেছেন মহাপাপী ডক্টর রয়লট।

চট করে কোল থেকে চাবুকটা তুলে নিয়ে ফাঁসটা সাপের গলায় আটকে দিলেন শার্লক হোমস্, কায়দা করে মাথার আশ্রয় থেকে টেনে এনে ছুঁড়ে দিলেন সিন্দুকের ভেতরে, তারপর বন্ধ করে দিলেন ডালা।

ফেরবার পথে হোমস্ বললেন, "বেদের উপস্থিতি আর ছোপ-ছোপ দাগওলা ফিতের কথা শুনে আগাগোড়াই ভুল সিদ্ধান্ত করেছিলাম আমি। তবে একটা বিষয়ে আমি প্রশংসা দাবি করতে পারি। যখনি বুঝলাম, দরজা আর জানলা এই দুই পথেই বিপদ আসা অসম্ভব, তখন আমার মন গেল ঘুলঘুলি আর দড়ির দিকে। দড়িটা অলগা, বিছানা মেঝের সঙ্গে আটকানো, তখন নিশ্চয় ঘুলঘুলি দিয়ে বিছানা পর্যন্ত কোনো কিছুর আসার সেতু হল ঐ দড়ি। ডাক্তার ভারতবর্ষে ছিলেন অনেকদিন। যে বিষ কেমিক্যাল টেস্টে ধরা পড়ে না, তা তিনি জানেন। ভারতবর্ষের জীবজন্তু পোষারও সখ আছে তাঁর। সাপের বিষ কাজ করে তাড়াতাড়ি। চিহ্ন থাকে শুধু দুটো ছোট্ট ফুটো—যা করোনারের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে অতি সহজেই। শিস দেওয়া হত কেন জানো? ভোরের আলোয় যাতে মেয়েটি সাপটাকে না দেখতে পায়, তাই তিনি শিস দিয়ে ফিরিয়ে আনতেন মৃত্যুদূতকে—পিরিচভরা দুধ দেখিয়ে লোভ দেখাতেন। রোজ রাত্রেই তিনি নামিয়ে দিতেন এই যমদূতকে—আবার ডেকে ফিরিয়ে নিতেন। কেননা, সাপটা ছোবল মারতে পারে, না-ও পারে। সাত রাত হয়তো এইভাবেই বেঁচে গেছে জুলিয়া—তারপর এক রাতে সব শেষ হয়ে গেছে।

"চেয়ার পরীক্ষা করে দেখলাম, চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াতেন ডাক্তার। ঘুলঘুলির নাগাল পেতে গেলে এ ছাড়া উপায় নেই। দুধের পিরিচ, ফাঁসওলা চাবুক আর বন্ধ সিন্দুক দেখেই আমার সন্দেহ দৃঢ়মূল হল। জুলিয়ার মৃত্যুর রাতে একরাশ ধাতুর জিনিস পড়ে যাওয়ার ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনেছিল যেলেন। তা হল এই সিন্দুক বন্ধ করার ঝনাৎ শব্দ। সাপটাকে ভেতরে রেখে সিন্দুক বন্ধ করে দিয়েছিলেন ডাক্তার। তাই

"আলোর ঝিলিক দেখা গেল ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে"

চাবুক মেরে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ঘুলঘুলির দিকে, লেলিয়ে দিয়েছিলাম ওরই খুনে মনিবের দিকে। মার খেয়ে খেপে গেছিল সাপটা। তাই মনিবকে সামনে পেয়ে তার ওপরেই ছোবল বসিয়ে উগরে দিয়েছে কালকূট। সেদিক দিয়ে ডাক্তারের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু সেজন্যে আমার বিবেকের কোন দংশন আমি অনুভব

শার্লক হোমসের বিখ্যাত এই কেসের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতেও কিন্তু একটা ভুল থেকে গিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে সাপ শুনতে পায় না। সুতরাং শিসের শব্দ শুনে নিশ্চয় ফিরে আসত না সাপটা, আসত নিয়মিত অভ্যাসের বশে ভোরের আলো ফোটবার আগেই, অথবা দুধের লোভে অথবা ছোবল দেওয়ার পর সহজাত প্রবৃত্তি

তাগিদে।

দিলীপ মালাকার

পণ্ডিত নেহরু কলকাতাকে বলেছিলেন মিছিল নগরী। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কলকাতার রাস্তায় পা বাড়ালেই কোনো না কোনো মিছিল দেখা যাবেই। কলকাতাকে যদি বলা হয় মিছিল নগরী তবে প্যারিসকে বলা উচিত প্রদর্শনী নগরী। প্যারিসের রাস্তায় পা বাড়ালেই একটা না একটা প্রদর্শনী চোখে পড়বেই। এবং সে প্রদর্শনী কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের। প্যারিসে মিছিল বড় একটা দেখি না। ন' মাসে ছ' মাসে একটা কী দুটো মিছিল। তাও আবার নিঃশব্দ। হৈ হট্টগোল নেই।

প্রদর্শনী নগরী প্যারিসে প্রদর্শনীর চূড়ান্ত আয়োজন হয় মে-জুন মাসে। ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু শ্রেষ্ঠ বলেই এ সময়ে যত রকমের প্রদর্শনী। জানুয়ারী থেকে এপ্রিল ঠাণ্ডায় সবাই কাবু। আবার জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর গ্রীষ্মের ছুটীতে সবাই ব্যস্ত। সুতরাং এই দুটো মাসে যত প্রদর্শনীর উপদ্রব। যন্ত্রশিল্পের প্রদর্শনীকে ছাপিয়ে সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী অতিরিক্তভাবে দেখা দিয়েছে। যন্ত্রশিল্পের বিরাট মেলা হয়ে গেল মে মাসে। যার নাম 'ফোয়ার দ্য পারী'। মাইল চারেক জায়গা জুড়ে বসে এই মেলা। এটি বাৎসরিক মেলা। এ যুগের সংসারে যা যা লাগে তারই প্রদর্শনী। একদিন কী দু'দিনে দেখে শেষ করা যায় না। মেলার জায়গা এতই বিরাট যে তার প্রদক্ষিণ করতে পায়ে হেঁটে শেষ করা যায় না, তাই কর্তৃপক্ষ বাসের ব্যবস্থা করে।

বিলাসিতার জন্যে প্যারিস নগরীর সুনাম আছে। বিলাসদ্রব্যের দোকানপাট সর্বত্রই ছড়ান প্যারিসে। কিন্তু নামজাদা বিলাসদ্রব্যের দোকানপাট একটি পাড়ায় নিবদ্ধ। ফরাসী রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের গা ঘেঁসে যে রাস্তা বেরিয়েছে তার নাম ফোবুর্গ দ্য সাঁতওনোরে। ফোবুর্গ দ্য সাঁতওনোরে রাস্তার দুধারে পোশাক, আতর, আর্ট গ্যালারির দোকান মিলে নৈশ সপ্তাহ পালন করে। দোকানের 'শো কেশ'গুলোকে সাজান হয় বিচিত্রভাবে। সব দোকানেই বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব। একটি আতরের দোকানে ভারতীয় সপ্তাহ পালন করা হয়। বিলাসদ্রব্য বেচা এক জিনিস আর দোকানকে অপরূপ করে সাজান আরেক জিনিস। দোকানকে অপরূপ করে সাজাতে শিল্পদৃষ্টি ও রুচির প্রয়োজন। ফোবুর্গ দ্য সাঁতওনোরে নৈশ
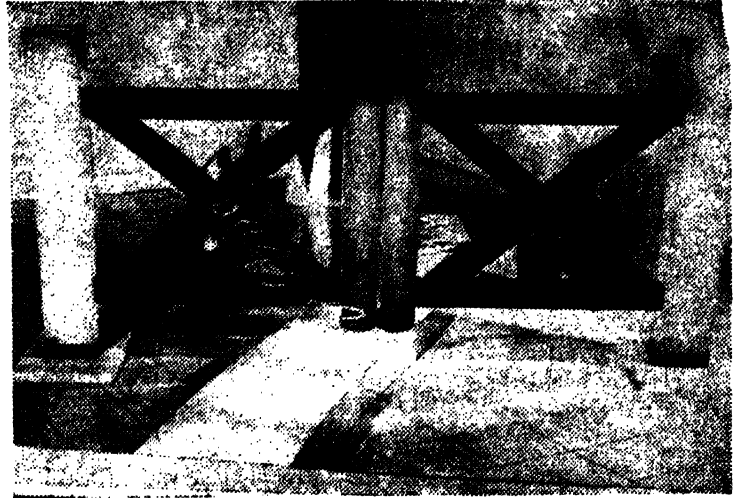
নিওন লাইটের ভাস্কর্য

সপ্তাহ পালনে ওখানকার দোকানদাররা রুচির পরিচয় দিয়েছে।

বিলাসদ্রব্যের দোকানদারদের পয়সা আছে সুতরাং অর্থের বিনিময়ে তারা অনেক কিছু করতে সক্ষম। আর্টিস্ট পাড়ায় আর্ট গ্যালারির দল বাৎসরিক উৎসব পালন করেছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। এটি শুধু প্রদর্শনী নয়। সাংস্কৃতিক উৎসব। সেন্ নদীর বাম প্রান্তে সাঁ জারমা দে প্রে পাড়াকে ইন্টেলেকচুয়াল পাড়া বলা হয়। এখানকার কাফেতে লেখক-শিল্পির আড্ডা জমে। অধিকাংশ প্রকাশকদের দোকানপাটও এখানে। আর্ট কলেজ একই পাড়ায়। তার ওপর অসংখ্য আর্ট গ্যালারির ছড়াছড়ি। গত বছর থেকে এই পাড়ায় উৎসব পালিত

জিওমেট্রিক আর্টের নমুনা

হচ্ছে জুন মাসে। রাস্তাঘাট রঙবেরঙের আলোকমালায় সাজান হয়েছে। প্রতিটি দোকান নতুন সাজসজ্জায় সেজেছে। আর্ট গ্যালারিতে চলেছে নতুন প্রদর্শনী। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এই পাড়ার কোনো ফুটপাথের এক কোণে কবি সভা। ছোট্ট পার্কের কোণে সঙ্গীতচর্চা, আর্ট কলেজের উঠনে ব্যালে নাচ, পার্কের মাঝে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অভিনয়। শুনেছি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের ধারে কবিতা পাঠ ও কবি সম্মেলন হয়। ঠিক তেমনি না হলেও তারই কাছাকাছি কবি সম্মেলন বসে সাঁ জারমা দা প্রে পাড়ার প্লাস্ দ্য ফুর্স্টেনবার্গ রাস্তার ধারে। কবিদের ক্লাব এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করে।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে পেশাদার গায়ক ছাড়া আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে। প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে চলে আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসবমুখর চাঞ্চল্য। প্রথম বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশী আগ্রহ দেখান। কিছু উঠতি আর্টিস্টও ছিল এই উৎসবে। তবে অভিনয়ে কিছু খ্যাতনামা শিল্পী অংশ গ্রহণ করে উৎসবের গুরুত্ব বাড়ায়। সাধারণতঃ উৎসব শুরু হয় প্রতি রাত্র আটটার পর এবং চলে রাত একটা পর্যন্ত। এই পাড়ায় রাত্রিবেলা গাড়ী নিয়ে চলা কষ্টকর। কারণ গাড়ীর ভীড়ে রাস্তা সব সময়ে অবরোধ থাকে।

প্রদর্শনীর আলোচনায় যখন আমরা ব্যস্ত তখন কয়েকটি বিচিত্র চিত্র প্রদর্শনীর উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। আর্ট-এর উদ্দেশ্য কী এ নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব না। সৌন্দর্যের ঔৎকর্ষ সাধনেই শিল্প-চর্চার উদ্দেশ্য। শিল্পচর্চার ইতিহাসে প্রথম যুগে দেব-দেবীকে ঘিরে সৌন্দর্য চর্চা চলত। তারপরের যুগ হোল রাজা-মহারাজাদের নিয়ে। সে যুগ গিয়ে ক্লাসিক যুগে প্রাকৃতিক ও নারীর সৌন্দর্য বিশেষ স্থান লাভ করে। তারপর শুরু হয় রিয়ালাইজম্, সুররিয়ালাইজম, এ্যাবস্ট্রাক্ট ইত্যাদির যুগ। আর্টের অনেকখানি স্থান নিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে। কলকব্জার যুগে

মার্তা বারের 'জেব্রা' ছবি
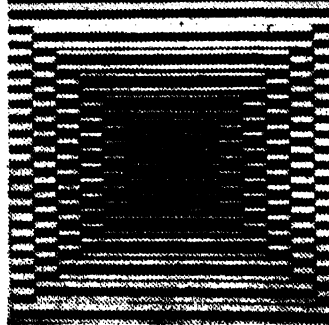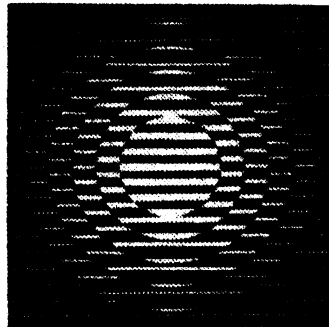
যন্ত্রের প্রভাব দেখা দিয়েছে আর্ট চর্চায়। তারই অনেক প্রদর্শনী চলেছে প্যারিসে। মিউজিয়ম সব মডার্ন আর্টে চলেছে লাইট অ্যান্ড মুভমেন্ট-এর প্রদর্শনী। এর নাম কী হওয়া উচিত জানি না। নানান রকম যন্ত্রের সাহায্যে আলোর লুকোচুরি দেখান হয়েছে। একটি আর্ট গ্যালারিতে দেখান হচ্ছে প্লাস্টিকের তারের ঝরনা তার ওপর ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের আলো। আরেকটি গ্যালারিতে একদল শিল্পী শুধু সাদা ও কালো রেখার সমন্বয়ে জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরী করেছে। এর ওপরেও আলোকের প্রতিফলন দেখান হয়েছে।

আলেকজান্ডার ইয়োল আর্ট গ্যালারিতে বিচিত্র প্রদর্শনী দেখলাম। বলা হয়েছে ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। কিন্তু আসলে ওটা নিওন লাইটের কারসাজি। ভাস্কর্যের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে আর্ট গ্যালারির মালিককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে, যন্ত্রপাতির যুগে নিওন লাইটের ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছে শিল্পী। আলোর বিভিন্ন রঙে চোখকে তৃপ্তি দেবে। দাম শুনে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। মাত্র এক লাখ টাকা।

সবচেয়ে বিস্ময় এনেছে গ্যালারি আরনর শিল্পী মার্তা বারের 'জেব্রা' আর্ট প্রদর্শনী। সাদা ক্যানভাসের ওপর কয়েকটা কালো দাঁড়ি। সাদার ওপর কালো রেখা। এরই নাম অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট। চিরাচরিত প্রথায় শিল্পাঙ্কণ আজকাল আর তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বলেই বোধহয় শিল্পীরা নতুন পথ ধরেছেন।

সবচেয়ে বেশী বিস্ময় এনেছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সালভাডর ডালি। ডালির এক একখানি চিত্রের মূল্য লাখ লাখ টাকা।

দুজন ভারতীয় শিল্পীর একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। 'ওত দু পাডে' আর্ট গ্যালারিতে হয়েছে তরুণ শিল্পী যোগেন চৌধুরীর চিত্রপ্রদর্শনী। খ্যাতনামা ভারতীয় শিল্পী রাজার একক প্রদর্শনী হয় গ্যালারি লারাভ্যাসিতে। রাজার সম্মান আছে প্যারিসে চিত্রসমালোচকদের মধ্যে। বছর পনর ধরে প্যারিসেই আছেন। তাঁকে এখন প্যারিসের শিল্পী বলেই ধরা হয়। ইনি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট শিল্পী।

বর্তমান সামাজিক ও আর্থিক সংকটের মধ্যে বাংলা দেশের শিল্পীদের নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁদের কাজ-কর্মের নিশ্চয়তা, আয়ের নিশ্চয়তা এমন কি ছবি আঁকার মাল-মশলা সংগ্রহের উপায়ের পর্যন্ত কোন স্থিরতা নেই। এই কারণে কলকাতায় শিল্পীদের দুটি সংস্থা তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে গত ২১শে মে দেশপ্রিয় পার্কে শিল্পী নীরোদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, রথীন মৈত্র এবং আরও অনেক নবীন ও প্রবীণ শিল্পী মিলে একটি সভা হয় এবং তাঁরা শিল্পী ও কারু শিল্পীদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং আর্টিস্টস ফেডারেশন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেন এবং শিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেন। সভা শেষে তাঁরা হাজরা পার্ক পর্যন্ত তাঁদের লিখিত দাবীর পোস্টার নিয়ে এক মৌন মিছিল করেন। এ বছরের মধ্যে তাঁরা খরাত্রাণ উপলক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ এবং একটি শিল্প মেলার আয়োজন করবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের দাবী নিয়ে তাঁরা অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমী তাঁদের অনেকগুলি দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন।

৩রা ও ৪ঠা জুন কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে শিল্পী দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও কবি বিষ্ণু দে'র পৌরোহিত্যে পশ্চিমবঙ্গ আর্টিস্টস ইউনিয়নের তরফ থেকে এই ধরনের সমস্যা ও দাবী নিয়ে দুদিনব্যাপী এক সভায় বহু নবীন ও প্রবীণ শিল্পী যোগদান করেন। এ'রাও রঙ তুলি সহজলভ্য করা, স্থায়ী আর্ট গ্যালারী স্থাপন, জনশিক্ষায় শিল্পের স্থান, শিল্পবস্তু বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও নানাভাবে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা ও দাবী জানান। এ'রাও খরাত্রাণ ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। এই উভয় সংস্থা একত্রে যুক্ত হয়ে যদি এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে পারতেন তবে শিল্পীরা তাঁদের দাবী আরও পরিষ্কারভাবে জন-সাধারণের সামনে উপস্থিত করতে পারতেন। আমরা উভয় সংস্থার কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

●

অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির উদ্যোগে সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে ২৭শে মে থেকে ৬ই জুন রুমানিয়ার তরুণ শিল্পী ফ্রাদুত কোভালিউ-এর ৫১ খানি ছবির সুন্দর প্রদর্শনী হল। শিল্পী কোভালিউ-এর ছবি ইতিপূর্বে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর কাজের মধ্যে ইউরোপে আধুনিক রীতির প্রবর্তকদের অনেক দিকপালের বিভিন্ন ধরনের রীতির রোপের বাইজান্টাইন রীতির রেখাধর্মী ডিজাইনের ঐতিহ্য প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত। তাঁর গোড়ার দিকের বহু কতকটা বাদামী রঙের প্রাচুর্যেভরা নিসর্গ দৃশ্যের বাস্তবধর্মী রূপের প্রতিফলনের প্রচেষ্টার পরবর্তী যুগের ছবিগুলিতে এই ঐতিহ্যের প্রভাব অনেকটা বেশী করেই দেখা যায়। ধূসর বাদামী রঙ শিল্পী একে-বারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি, তবে তাঁর প্যালেট অনেক উজ্জ্বল এবং কোমল হয়ে এসেছে, আর ডিজাইনে একটা পরিচ্ছন্নতা দেখা দিয়েছে। তাঁর কতকগুলি রমণীর প্রতি-কৃতির মধ্যে এই রীতি একটা বিশেষ ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রীস, ভেনিস, রুমানিয়া এবং ইতালীর বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি নিসর্গ দৃশ্যের স্থাপত্যসুলভ স্পেস সংগঠন বেশ সুচিন্তিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ লাগল। তাঁর ছোটখাট কয়েকটি স্টিল লাইফও চমৎকার। তাঁর হাল আমলের কাজের মধ্যে ফর্মের অ্যাবস্ট্র্যাকশন এবং রঙের ঔজ্জ্বল্যের আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শিল্পী আরও অনেক দূরে অগ্রসর হবেন বলে মনে হয়।

●

২রা থেকে ১৬ই জুন গ্যালারী এভারেস্টে বর্ধমানের শিল্পী শিবশংকর কুণ্ডুর একক চিত্র-প্রদর্শনী হল। তাঁর ২৩ খানি আধা অ্যাবস্ট্র্যাকট ছবির মধ্যে বিভিন্ন এবং অসমান গুণসম্পন্ন কাজের নমুনা পাওয়া গেল। এর মধ্যে 'এগ সেলার', 'দি বোটস' এবং বিশেষ 'জুয়ে গ্লো অ্যান্ড দি

গ্রাম জীবন — শিল্পী : পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

দিয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'কনসেপ্শেন' এবং 'হেলপলেস রেস্ট' দুটি প্রথাগত প্রতিকৃতি, তবে একটু মোটা কাজ। শ্রীকুণ্ডু বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের শিল্পশিক্ষক এবং সেখানে একটি ছোট আলাদা আর্ট স্কুলও তৈরী করেছেন। এ'দের মত লোকের উৎসাহেই হয়ত একদিন কারুশিল্পের চর্চা রাজধানী-কেন্দ্রিক না হয়ে বাংলা দেশের অন্যান্য শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

●

মাঝে-মাঝে বিদেশী শিল্পীরা এদেশে বেড়াতে এসে অনেক শিল্পকর্ম রচনা করে যান যার নমুনা অনেক সময় আমরা দেখতে পাই না। তবে পোলিশ শিল্পী মিঃ ডবলিউ কোসিয়েলনিয়াক-এর কথা স্বতন্ত্র। ১৯৬৫ সালে তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন। তখন কিছুকাল কলকাতার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের স্টুডিওর এচিং মেশিনে কতকগুলি কাজ করেন। স্বদেশে ফিরে যাবার আগে তিনি তাঁর অনেকগুলি এচিং অ্যাকাডেমীকে উপহার দিয়ে যান, তারই খান-কুড়ি এচিং-এর প্রদর্শনী ২৬শে থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত অ্যাকাডেমীর সামনের গ্যালারীতে করা হয়। গ্রাফিক শিল্পে পোল্যাণ্ড বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। শিল্পী কোসিয়েলনিয়াকের কাজে তাঁর দেশের ঐতিহ্যের অভাব নেই। এই প্রদর্শনীর ছবিগুলি সবই ইলিয়াড এবং অডিসির ইলাস্ট্রেশন হিসেবে করা (দুটি কাঠ খোদাই বাদে)। তাঁর ক্রাফটসম্যানশিপ এবং কল্পনাশক্তির কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেল হেলেন হরণ, থেটিস ও অ্যাকিলিজ, হেকটরের দেহের অপমান এবং হেকটরের দেহভিক্ষা, পেট্রোক্লসের শবদাহ, পলিফিমাসের সঙ্গে যুদ্ধ, সার্সির দেশ, মৃত্যুপুরীতে টাইরেসিয়াসকে রক্ত উৎসর্গ, সাইরেন, পেনেলোপীর পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রভৃতি ছবিগুলিতে। শিল্পীর ডেকরেশনের ক্ষমতার সঙ্গে ক্রাফটসম্যানশিপের শক্তি মিলে কয়েকটি ছবি বেশ রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

●

চিত্রমের পর ল্যান্সডাউন রোডে মোনালিসা গ্যালারি দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারির সংখ্যাবৃদ্ধি করল। এই দুটি গ্যালারিতে পরপর কতকগুলি প্রদর্শনী হয়ে গেল। হাল আমলের চারটি প্রদর্শনী নব-প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায়। ইতিপূর্বে চিত্রমে দক্ষিণ কলকাতার একটি বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখার্জির কয়েকটি মাঝারি ছবির প্রদর্শনী হয়। তাঁর কাজের মধ্যে স্টাইলের বৈচিত্র্য এত বেশী যে, অনেকসময় একহাতের কাজ বলে যেন মনেই হয় না। ভারতীয় ডেকরেটিভ প্রথায় গ্রামজীবনের ওপর এগটেম্পেরার সঙ্গে বিভিন্ন কায়দায় অংকিত অয়েলগুলি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার একটি দৃশ্য এবং নেপালী আয়ার ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর চিত্রমে অনুষ্ঠিত স্বপনেশ চৌধুরীর আশিখানি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কম্পোজিশন শিল্পী সত্যেন ঘোষালের সুকৌশল অনুসরণ বলে মনে হয়। তবে এ'র কাজে কালো রঙের প্রাচুর্য ছবিকে একটু ভারি করে তুলেছে। তাঁর পরে বরুণ মিত্রের পার্বত্য অঞ্চলের ওপর করা ১৫খানি জলরঙের ছবি খুব উঁচুদরের কাজ না হলেও চক্ষুতৃপ্তিকর। কার্শিয়াং, কালিম্পঙ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার কতকগুলি আলোকোজ্জ্বল ছবি ভালই লাগল। মোনালিসার মনোরঞ্জন সাহার পার্বত্য দৃশ্য উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তবে কোহিমা-প্রবাসী শিল্পী রবিন ভট্টাচার্যের নাগা জীবনযাত্রার ওপর ৮-৯খানি পেন্টিং রঙের হার্মনির দিক দিয়ে বেশ ভাল লাগল। বিশেষ করে নাগাদম্পতি, নাগাপরিবার ও নাগা উৎসবের বর্ণাঢ্য ছবিগুলি একটু গগাঁধর্মী রোমান্টিক কাজ হলেও চোখের তৃপ্তিসাধনে সচেষ্ট।

●

জুনের তৃতীয় সপ্তাহে পর পর অনেকগুলি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল। স্টুডিও এভারেস্টে মনু পারেখের পেন্টিং ও গ্রাফিকস-এর প্রদর্শনীর মধ্যে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও 'অপ' ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মনু পারেখ বোম্বাইয়ের জে জে স্কুলের ছাত্র। আমেদাবাদে তাঁর জন্ম। বর্তমানে কলকাতায় উইভার্স সার্ভিস সেন্টারে ডিজাইনারের কাজ করছেন। তাঁর পনেরোখানি ছবির মধ্যে দুটি কাঠের ওপর এনামেল পেন্ট দিয়ে আঁকা। প্রয়োজন মত কাঠ চেঁচে বা তক্তা পুড়িয়ে মতো করে শিল্পীর অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর রঙের ডেকরেটিভ প্রয়োগ মাঝে মাঝে বেশ লাগে। কাগজের কলাজ ও জলরঙে আঁকা কয়েকটি আধা-ফিগারেটিভ কাজ মন্দ লাগল না। চারটি রঙীন লিনোকাটের কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন ডেকরেটিভ ডিজাইন হয়েছে। প্রদর্শনী ২০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত খোলা আছে।

●

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়ন খরা ত্রাণের উদ্দেশ্যে হেদুয়া, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, দেশপ্রিয় পার্ক প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় পথের ওপর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং অতি অল্পমূল্যে ছবি বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। এ'দের উদ্যম প্রশংসনীয়।

১৭ থেকে ২৩ জুন কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে সদ্যবিদেশপ্রত্যাগত ফটোগ্রাফ শিল্পী শ্রীঅজয় দের একটি সুন্দর ফটোগ্রাফের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। অজয় দে লন্ডন এবং পশ্চিম জার্মানীতে ফটোগ্রাফি শিক্ষা করেন এবং গ্রেট বৃটেনের রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির তিনি একজন অ্যাসোসিয়েট সদস্য। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে এবং পুরস্কার লাভ করেছে। কলকাতার প্রদর্শনীতে তাঁর ৮৩ খানি ফটোগ্রাফের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রতিকৃতি, স্থাপত্যের ছবি, বিভিন্ন মিউজিয়ামের শিল্পদ্রব্যের ফটোগ্রাফ, বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পের ছবি প্রভৃতি নিয়ে তাঁর কর্মকুশলতার একটা বিস্তৃত দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব কটি বিভাগেই তাঁর দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া গেল। সাধারণ দর্শকের কাছে তাঁর মিউজিয়াম পীসের ছবি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও প্রতিকৃতিগুলি খুবই ভাল লাগবে। কতকগুলি আধুনিক ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্য-নিদর্শন অতিসুন্দর ডিজাইন ও টোনাল কাজের সঙ্গে তোলা হয়েছে। এ বাবদে কয়েকটি প্রতিকৃতি ও মিউজিয়ামের ভাস্কর্য ও কারুশিল্পের নিদর্শনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীদের প্রদর্শনীতে কোন ট্রিক ফটোগ্রাফি বা ডেভেলপিং বা প্রিন্টিং-এর সময় কোন বিশেষ ধরনের চোখে টান দেওয়া সস্তা এফেক্টের চেষ্টা করা হয়নি সেটা বিশেষভাবে ভাল লাগল।

আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজের উদ্যোগে ২১ তারিখে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে প্যারিস ও ফরাসী দেশের বিভিন্ন স্থানের

জীবনযাত্রা প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্য, বেড়াবার জায়গা ইত্যাদি নিয়ে একটি ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী খোলা হয়। ফরাসীদেশ ভ্রমণের দিকে ভ্রমণকারীদের আগ্রহ বাড়াবার দিকেই এর লক্ষ্য বেশী। অনেকগুলি সুন্দর ভ্রমণপোস্টার এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় পোষাকো সজ্জিত পুতুলের নিদর্শনগুলি আকর্ষণীয় হয়েছিল।

দীর্ঘকাল যাবৎ পার্ক স্ট্রীটের আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীর আমরা কোন কর্ম-ব্যস্ততা দেখতে পাইনি। গত ২১ তারিখে শিল্পী রবীন মণ্ডলের একক প্রদর্শনী দিয়ে এই গ্যালারী আবার প্রদর্শনীর কাজ সুরু করলেন বলে মনে হল। এই প্রদর্শনীতে রবীন মণ্ডল ১৭ খানি পেন্টিং ও ৮ খানি ড্রয়িং উপস্থিত করেছেন। শ্রীমণ্ডলের এবারের কাজ তঁার পূর্বপ্রদর্শিত গথিক স্টেইন্ড গ্লাস অনুপ্রেরিত কাজের পরিণতি বিশেষ বলা চলে। আগের চাইতে তাঁর রঙে অনেক বেশী মাধুর্য এসেছে। ডিজাইন অনেক সুষমবন্ধ। তাঁর 'ইলুমিনেটেড টেম্পল' (১) 'এ ডেকরেটেড ওয়াল', (২) 'পেন্টিং' (১৩) 'ড্রীম' (৬) প্রভৃতি ছবির রঙের বৈচিত্র্য এবং ডিজাইনের সারল্য অনেকখানি ভাল লাগল। তাঁর ফিগারেটিভ ড্রয়িং-এর মধ্যে মানুষের দুঃখবেদনার দিকটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। 'প্রিয়দর্শিনী' গ্যালারীর প্রদর্শনীর পর শ্রীমণ্ডল তাঁর কাজে অনেক দূর এগিয়েছেন এটা বিশেষ আনন্দের কথা।

●

২২ থেকে ২৮ জুন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অ্যাকাডেমির স্টুডিওর মেম্বার তরুণ ভাস্কর অসিতকুমারের কর্ম-যোগী সুভাষচন্দ্রের ওপর একটি মাটির মডেলের-এর মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হল। অ্যাকা-ডেমির নতুন গ্যালারীর দুটি হল জুড়ে ছোট ছোট মাটির পাটার ওপর উঁচু রিলিফে ছেলেবেলা থেকে সুভাষচন্দ্রের জীবনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি নিয়ে এক-একটি ছবি তৈরী করা হয়েছে। সিরিজের শেষ হয়েছে তাইপেতে তাঁর অনির্দিষ্ট যাত্রার জন্যে বিমান আরোহণ দিয়ে। এত-গুলি সুন্দর মডেল সৃষ্টির ব্যাপারে শিল্পীর কাজ প্রশংসনীয়।

●

স্বর্গত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের প্রেরণায় ২৫ থেকে ৩০ জুন চন্দননগর কলেজের দক্ষিণের দেওয়ালে শিল্পী শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পথচিত্র প্রদর্শনী করেছেন। আশা করি তিনি স্থানীয় শিল্পানুরাগীদের সহানুভূতি লাভ করবেন।

●

উড়িষ্যার শিল্পী প্রফুল্ল মহান্তি মাত্র ৩১ বছর বয়সেই লণ্ডনে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়া কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁকে আর্কিটেকট

গির্জা — রবীন মণ্ডল

হতে হয়। ব্রিটেনে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর-পরিকল্পনার কাজে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি ১৯৬৪ এবং '৬৬-তে চিত্রপ্রদর্শনী করে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। ডাক্তার হতে না পারলেও তিনি আর্কিটেক্ট ও নগর-পরিকল্পনার কাজে সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন।

সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলার ইতিহাসের অধ্যাপক আসা ব্রিগস বলেন, ইংলন্ডে এসে এক ভিন্নসমাজের মধ্যে মহান্তি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। সমস্ত ভারতীয় শিল্পীদের মতই তিনি ঐতিহ্যের শক্তি সম্বন্ধে অতি সচেতন। তবু তাঁর স্বভাব এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি আরো কিছু যোগ করতে চান। অনেকরকম মানসিক টানা-পোড়েন তাঁর কাজকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর শিল্পের মূল ভারতের মাটিতেই প্রোথিত এই বিশ্বাস তাঁর আছে এবং একথাও তিনি মনে করেন যে, বিভিন্ন প্রকারের প্রতীক ও ইঙ্গিত দিয়ে এবং সর্বোপরি রঙের বিন্যাসে তিনি তাকে সর্বজনীন করতে চেয়েছেন। তাঁর কাজ-কর্মের মধ্যে অ্যাকাডেমিক কোন ধাঁচ পাওয়া যায় নি। তাঁর ছবিতে একটা আলোছায়ার সম্পাত ও গভীরতার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারত ও পশ্চিম এই দুই জগতকে যিনি জানেন এ ছবি কেবল তাঁর পক্ষেই আঁকা সম্ভব। মহান্তি শৈশবে কোন শিল্পশিক্ষা পাননি ফলে তাঁর মৌলিক প্রতিভা কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনি। কিন্তু তাঁর ছবির উজ্জ্বল কমলা, গোলাপী এবং অন্যান্য বর্ণের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যে একটা একান্ত ভারতীয় ভাব অনেককেই মুগ্ধ করেছে।"

●

গত মে মাসে সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস্ দিল্লীতে তাঁদের গ্রাফিকস এবং ড্রয়িং-এর একটি প্রদর্শনী করেন। তার কিছু অংশ এবং কিছু নতুন ছবি নিয়ে এগারোজন শিল্পীর ৬১টি ড্রয়িং এবং গ্রাফিকস্ ২৩শে জুন থেকে ৬ই জুলাই সাদার্ন-অ্যাভিনিউয়ের বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচারে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীর কাজের মান একটু অসমান তবে নতুন গ্যালারিটি সুন্দর এবং ডিসপ্লেও ভাল ফলে সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি ওপর-ওপর দেখতে ভাল লাগে, শিল্পীদের মধ্যে গণেশ পাইন, শ্যামল দত্তরায় এবং সুহাস রায়ের কাজ ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে ভাল লেগেছে। এঁদের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন হলেও কাজের পেছনে চিন্তা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ড্রয়িং-এর সূক্ষ্মতা এবং কম্পোজিশনের চিত্রধর্মীতার দিক দিয়ে গণেশ পাইনের "ফলিং বার্ড" এবং "আন্ডার দি ফাউন্টেন" অতি চমৎকার হয়েছে। শ্যামল দত্তরায়ের মোটা লাইনের জোরালো কাজ এবং সুচিন্তিত রঙের ব্যবহারের দিক দিয়ে দুটি প্রিন্ট "মিউজিক সোয়ারে" এবং "সীল" ছবির ডেকরেটিভ ডিজাইন ভাল-জাতের ছবি। কতকটা এই গুণে সুহাস রায়ের দুটি লিনোকাটের মধ্যেও পাওয়া যাবে। সুনীল দাসের কাগজ পুড়িয়ে সমান একটু রঙের ব্যবহারে এক ধরণের গভীরতা আনা এবং ব্যক্তিগত প্রতীক ব্যবহারের ঝোঁক দু-একটি ক্ষেত্রে ভাল লাগে। বিকাশ রায় বর্তমান সভ্যতার অন্ধকার দিকে মানুষের অমানুষীকরণের দিক নিয়ে যে ড্রয়িংগুলি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু কাজের মধ্যে একটা শ্রমের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজগুলি একটু যাকে বলে ভারী। এর মধ্যে তাঁর সাদা কালোয় হাল্কা কাজ "থ্রি ফেসেস অব ইভ" ভাল লাগল। মনু পারেখ, শৈলেন মিত্র এবং অনিলবরণ সাহার গ্রাফিক দুটি উল্লেখযোগ্য। সনৎ করের ড্রয়িংগুলি একটু নিষ্প্রভ। অজিত চক্রবর্তীর অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভাস্কর্যের ড্রয়িং-এ উৎসাহিত হবার মত কিছু পাওয়া যায় নি এবং অরুণ বোসের কাছ থেকে এতটা বৈশিষ্ট্যবিহীন কাজ আশা করি নি।

●

গ্যালারি মোনালিসা এবং চিত্রম-এ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্টস্ ইউনিয়নের উদ্যোগে খরা-ত্রাণ উপলক্ষ্যে চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে। প্রকাশ কর্মকার, চিন্তামণি কর ও সি গাঙ্গুলী প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের কতকগুলি সুন্দর কাজের নিদর্শন রাখা হয়েছে। প্রদর্শনী অবশ্য একটু মিশ্র মানের। দেশের দুর্দিনে শিল্পীদের এই সাধ্যমত প্রচেষ্টা সর্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য।

— চিত্ররসিক

মনোরঞ্জন বেতাল

আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু ও জনপ্রিয় ফল —আম, ভারতই আমের জন্মস্থান। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় পলিমাটী অঞ্চলেই বেশী হয়। আমগাছের জন্মস্থান বিচার নেই। বড় বড় বাগান ছাড়াও পথের ধারে, বাস্তু-ভিটার আশে-পাশে, ক্ষেত খামারের ধারে ধারে আমের গাছ দেখা যায়। আমাদের দেশে মোট যত ফলের জমি আছে, তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী জমিতে আমের চাষ হয়।

ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে আমের চাষ হয়। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশের জমির পরিমাণই সব থেকে বেশী। (প্রায় ৮ লক্ষ একর), বিহারে আড়াই লক্ষ একর ও পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ একর আমের জমি রয়েছে। তাছাড়া অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রেও প্রচুর আমের চাষ হয়।

পশ্চিম বাংলায় যে ২ লক্ষ একরে আমের চাষ হয়, তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই মালদহ জেলায়, এর পরেই মুর্শিদাবাদ, তাছাড়া ২৪-পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া এবং হুগলী জেলায়ও প্রচুর আমের গাছ রয়েছে. থানা হিসাবে আমের চাষ সব থেকে বেশী মালদহ জেলার ইংলিশ বাজার থানায় এবং রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক, মালদহ, খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়; মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ, লালগোলা, ভগবানগোলা ও জিয়াগঞ্জ থানায়; নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণগঞ্জ ও করিমপুর থানায়; ২৪-পরগণায় সমগ্র বারাসত মহকুমায় ও বসিরহাট, বাদুড়িয়া, সোনারপুর ও বারুইপুর থানায়; বর্ধমানের পূর্বস্থলী, কালনা আউসগ্রাম, মেমারী, বর্ধমান ও ফরিদপুর থানায় এবং হুগলী জেলার পোলবা, চুঁচুড়া, বলাগড়, চন্ডীতলা ও শ্রীরামপুর থানায়।

সংস্কৃত ভাষায় আমকে আম্র, চুত, রসাল, সহকার, কল্প, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। উত্তর ভারতে ইহা আম, আঁব, আম্বা ইত্যাদি নামে অভিহিত এবং দক্ষিণ ভারতে মামিডি (অন্ধ্রে), মাঙ্গাই (মাদ্রাজে), মাঙ্গু (কেরলে), মাভু (মহীশুরে) ইত্যাদি নামে পরিচিত। তামিল মাঙ্গাই কথাটি থেকে ইংরাজী ম্যাঙ্গো কথাটির উৎপত্তি।

আয়তন, আকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ বৈচিত্র্য ইত্যাদি অনুসারে আমের বহু জাত। কেউ ক্ষুদ্র এক ছটাক ওজনের, কেউ বৃহৎ —দুই-আড়াই সের; কেউ গোল, কেউ ডিম্বাকৃতি, কেউ বা লম্বা; কেউ পাকলেও সবুজ, কেউ হলদে, জর্দা, লাল; কেউ চাঁপার গন্ধবিশিষ্ট, কেউ বেলের বা পেঁপের; কেউ অতিমিষ্ট, কেউ আনারসী টকমিষ্টি; কেউ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে পাকে, কেউ ভাদ্র-আশ্বিনে; কারো শাঁস সাদা, হলদে, কারো বা কমলা লাল।

আমাদের দেশে এক হাজারেরও বেশী জাতের আম আছে। বিভিন্ন আম বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একই আম নানাস্থানে নানা নামে পরিচিত। যেমন উত্তর ভারতের তোতাপুরী দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালোরা নামে পরিচিত। আবার একই নামে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আমও রয়েছে। স্থান মাহাত্ম্যে একই জাতের আম বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হলে স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে কমবেশী পরিবর্তিত হয়। তাই এদের আলাদা করার জন্য আমের নামের সঙ্গে স্থানের নামও থাকে যেমন ল্যাংড়া বেনারস, ল্যাংড়া দ্বারভাঙ্গা, ল্যাংড়া হাজীপুর; সফেদা লক্ষ্ণৌ, সফেদা মালিয়াবাদ; সমরবেহিস্ত আলিবাগ, সমরবেহিস্ত চৌসা সমরবেহিস্ত রামপুর ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার আমের নামগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভারী সুন্দর। অনেক সময় নাম থেকে আমের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, আকার ও ফলনকালের পরিচয় পাওয়া যায়। আনারসী আনারসের মত টকমিষ্টি, কাঁচামিঠে কাঁচা অবস্থায়ও মিষ্টি; সিন্দুরিয়া পাকলে সিঁদুরে লাল, জাফরানী পাকলে জাফরানের রঙ ধরে; গোলাপখাস গোলাপের গন্ধযুক্ত, চম্পা চাঁপাফুলের গন্ধবিশিষ্ট; বেগুনফুলি একজাতের বড় বেগুনের আকৃতিবিশিষ্ট, মোহনবাঁশী বাঁশীর মত লম্বা; ভাদোয়া শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাকে, দোফলা দুবার ফলে, বারমেসে বছরে তিনবার ফলে।

অনেক ক্ষেত্রে স্থানের নামে বা নদীর নামে আমের নামকরণ হয়েছে যেমন মালদহ, বোম্বাই, বাঙ্গালোরা, নয়ামালিয়াবাদ, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি। পদবী বা ব্যক্তিবিশেষের নামেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমের নামকরণ করা হয়েছে, যেমন মহারাজ পছন্দ, নবাবভোগ, রাণী পছন্দ, জাহাঙ্গীর, বিশ্বনাথমুখো ইত্যাদি। তাছাড়া আপাত অর্থহীন নামেরও অজস্র জাতের আম রয়েছে, যেমন ল্যাংড়া, ফজলী, দশেরী ইত্যাদি। প্রবাদ এই যে কাশীর এক খঞ্জ সাধুর বাগানে প্রথম উৎপত্তি বলেই ল্যাংড়া নামটি হয়েছে, আবার কেউ বলেন যে কাশীর নিকটে ল্যাংড়া গ্রামেই এই আমের প্রথম চাষ বলে এর নাম ল্যাংড়া। ফজলী আমটির নাম নাকি আকবর বাদশাহের ওমরাহ আবুল ফজলের নাম থেকেই উৎপত্তি।

কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতের আমের নাম হল :—অতি মধুর, অরুণডেল, আজিজ পছন্দ, আঁধারমানিক, আনারসী, আমীর পছন্দ, আলফানসো, ইনায়েৎ পছন্দ, কপাটভাঙ্গা, কাউন্সিল পছন্দ, কাওয়াসজী প্যাটেল, কালাপাহাড়, কিষেণভোগ, কোহিতুর, ক্ষীরসাপাতি, খাজরী, খানানপছন্দ, খুসুলখাস, খেজুরগুড়, গোপালধোবা, গোপালভোগ, গোলাপখাস, চম্পা, জমাদার, জর্দালু, জালমুরাই, জুলিবান্দা, জাহাঙ্গীর, তাইমুরিয়া, তালাবী, তোতাপুরী, তোরাসেথ, দিলসাদ, নবাবপছন্দ, নাজিমপছন্দ, নীলম, পাঞ্জাপছন্দ, পিটার, পিয়ারী, পেয়ারাফুলি, ফকিরওয়ালা, ফজলী, বিমলি, বিশ্বনাথমুখো, বুম্বুকো কেলোয়া, বৃন্দাবনী, বেগমফুলি বা বেগুনফুলী (দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গান পল্লী), ভবানী চৌরস, ভারতভোগ, ভুতু বোম্বাই, মনোরঞ্জনী, মহারাজ পছন্দ, মাখন, মালগোয়া, মালতী, মিঠুয়া, মোহন ঠাকুর, মোহনবাঁশী, মোহনভোগ, রহমতখাস, রাণীপছন্দ, রোগনী, লস্কর শিকান, লক্ষ্মাত বক্স, ল্যাংড়া, সমরবেহিস্ত, সরবতী সরিখাস, সাদওয়ালা, সাদুক পছন্দ, সাফদর পছন্দ, শাহপছন্দ, সিন্দুরিয়া, সুরথবর্মা, সুলতান পছন্দ, হিমসাগর বা হেমসাগর, হুসনারা।

এই সমস্ত আমের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল, মালদহের ফজলী, মুর্শিদাবাদের জাহাঙ্গীর, ক্ষীরসাপাতি ও কোহিতুর, কাশীর ল্যাংড়া, চৌসার সমরবেহিস্ত, লক্ষ্ণৌর দশেরী, বোম্বাই-এর আলফানসো এবং দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গানপল্লী।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আমের মধ্যে সব থেকে বড় হল ফজলী, ওজনে এক একটি ২½ কিলো পর্যন্ত হয়। বেগুনফুলী ২ কিলো, মালদহ ১½ কিলো পর্যন্ত হয়। কোহিতুর, দিলসাদ, মালগোয়া—এরা ১ কিলো পর্যন্ত, জুলিবান্ধা ¾ কিলো, নবাবভোগ, নাজিমপছন্দ, গোপালধোবা, আঁধারমানিক, অরুনডেল ½ কিলো পর্যন্ত ওজনের হয়। ল্যাংড়া, দশেরী, কিষেনভোগ ১৷৷ পোয়া পর্যন্ত ওজনের হয়, আর গোপালভোগ সমরবেহিস্ত, নীলম—এগুলি এক পোয়া পর্যন্ত হয়। মাখন আম আধ পোয়ার মত। কাঁচামিঠে আরও ছোট।

আমের ফলনকাল জাতি ও স্থানানুসারে ভিন্ন ভিন্ন। পশ্চিমবাংলায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আমের মধ্যে গোলাপখাস পাকে বৈশাখ-

জ্যৈষ্ঠ মাসে, হিমসাগর, গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি, বোম্বাই ও ল্যাংড়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে, এবং ফজলী আম পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। মালাবার উপকূল অঞ্চলে আম পাকে মাঘ থেকে চৈত্রে, পশ্চিম ভারতে চৈত্র-বৈশাখে, দাক্ষিণাত্যে বৈশাখ থেকে আষাঢ়ে এবং উত্তর ভারতে প্রধানতঃ জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাসে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এদেশে অতি প্রাচীনকালেও আমের ব্যবহার ছিল। ৪ হাজার বছরেরও আগে এর চাষ ছিল। তাই এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে আম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে আম্রবনের উল্লেখ রয়েছে। প্রেমের দেবতা মদনের পঞ্চশরের একটি শর আম্রমঞ্জরী। চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি প্রাচীন বৈদ্যদের পুস্তকে আমের ভেষজ গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। বৌদ্ধযুগেও আম্রফলের সমাদর ছিল। বুদ্ধদেবকে একটি আম্রকুঞ্জ দান করা হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-ই সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ভ্রমণ করে বহির্জগতে আমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে পর্তুগীজদের চেষ্টায়ই বিদেশে আমের চাষ শুরু। মুঘল যুগে ভারতে আম যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। মুঘল সম্রাট আকবর দ্বারভাঙ্গার নিকট এক বিরাট আমের বাগান করেন। কথিত আছে, এখানে এক লক্ষ আমের চারা লাগানো হয়। তাই এর নাম হয় লাখ বাগ। বাংলার বাদশাহদের আগ্রহে ও আনুকূল্যে প্রাচীন গৌড় (বর্তমান মালদহ) ও মুর্শিদাবাদে আমের চাষের উন্নতি ঘটে। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের চেষ্টায়ও বহু নতুন জাতের আমের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন আমের নামের সঙ্গে তাই আজও তাঁদের নাম জড়িত।

আম গাছ দীর্ঘদিন বাঁচে। উত্তর ভারতের বহু স্থানে একশ বছরেরও বেশী পুরোন আম গাছ দেখা যায়। পাঞ্জাবে চণ্ডীগড়ের কাছে বুরেল গ্রামে একটি অতিকায় প্রাচীন আম গাছ রয়েছে। এটির কাণ্ডের পরিধি প্রায় ২০ হাত, আড়াই হাজার বর্গগজ এর বিস্তৃতি। এতে বছরে ৪।৫ শত মণ আম ফলে। দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চীপুরমে একাম্রেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণেও একটি বিরাট প্রাচীন আম গাছ আছে। এই গাছের চারিটি বিভিন্ন শাখায় চার প্রকার স্বাদের আম হয়। এটি অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ শত বৎসরের পুরোন। কয়েক বৎসর পূর্বে মালদহের সার্কিট হাউস সংলগ্ন একটি বিশালকায় আম গাছ দেখেছি। সেটির ফলের সময় ২ হাজার টাকা পর্যন্ত নিলামে বিক্রয় হোত।

টাটকা এবং শুকনো, কাঁচা আর পাকা সব অবস্থাতেই আমের বহুবিধ ব্যবহার এদেশে প্রচলিত। আমচুর, আমকাসুন্দী, আমের নানাবিধ আচার, মোরব্বা, চাটনী—কাঁচা আম থেকে এসব ঘরে ঘরে প্রস্তুত হয়। পূর্ববঙ্গে কাসুন্দী প্রস্তুতপ্রণালী তো রীতিমত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়ে। পাকা আম অতি সুস্বাদু। পাকা আম থেকেও আমসত্ত্ব, জেলী, মিষ্টি আচার ইত্যাদি নানা মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হয়। কাঁচা আমের অম্বলও বাঙালীর প্রিয় খাদ্য—বিশেষ করে শোল মাছের আমের অম্বল।

আমাদের হিন্দুদের নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে আমের যোগ রয়েছে। দেবপূজায় ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ঘটের উপর আম্রপল্লব দিতে হয়। বাড়ীর দরজায়, পূজামণ্ডপে আমপাতার মালা সাজিয়ে দেওয়া হয়। মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে অন্যান্য ফুলের সঙ্গে আমের মুকুল ব্যবহারের প্রথা আছে। আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চূত কুসুম সেবনের ব্যবস্থাও আছে। চৈত্র মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে বারুণী স্নানের পর কাঁচা আমের প্রথম ব্যবহার করতে হয়। তাই এর নাম আম্রবারুণী। প্রাচীন ব্যক্তিরা তাই এদিনের পূর্বে আম ব্যবহার করেন না।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না।

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে, তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট A-7 পোস্টবক্স ১২১, বোম্বাই-১।

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

LPE—Ayars S. I. [illegible]

হোমি ভাবা ফেলোশিপ
পাওয়া ছাত্রেরা একদিন
পুরোভাগে দাঁড়াবেন

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১০ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 7th July, 1967. শুক্রবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৭৪ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

বাঙলা সাহিত্য অ্যাকাদেমী

বাংলা সাহিত্য অ্যাকাদেমী সম্পর্কে আপনাদের সাম্প্রতিক আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র (অমৃতঃ ১লা আষাঢ়) সাগ্রহে পাঠ করেছি। এ সম্পর্কে মত-বিনিময়ের সূচনার জন্য আপনাদের এবং তৎসহ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। কিছুদিন ধরেই নানা উপলক্ষে এ বিষয়ে ইতস্ততঃ আলোচনা চলছে। বস্তুতঃ সাহিত্য অ্যাকাদেমীর অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজন সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ-সাধনে এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সন্দেহাতীত।

একদা অনুরূপে মহৎ উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্ম হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পরিষদের অসীম দানের কথা আমরা সকলেই অবহিত আছি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাকাদমীর করণীয় হিসেবে যে কটি প্রস্তাব রেখেছেন, তার অধিকাংশই সাহিত্য-পরিষদের কর্মসূচীতে ছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশনা (উদাহরণঃ বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, জ্ঞানসাগর, সারদা মঙ্গল, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ইত্যাদি), বাংলা ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার, স্মরণীয় সাহিত্য-স্রষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্বর্ধনা সাহিত্য পরিষদ গভীর নিষ্ঠায় ও আগ্রহে সম্পাদন করেছেন। নবীন সাহিত্যিকের সম্বর্ধনা (শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রস্তাব) প্রসঙ্গে সাহিত্য পরিষদের রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জ্ঞাপনের ঘটনাটি এখানে স্মরণ করি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ারও আগে, যখনো তিনি আমাদের সাহিত্যজগতের অবি-সম্বাদিত অধীশ্বর নন, প্রশংসার পরিপূরক নিন্দাও তাঁর অদৃষ্টে জুটেছে, এই সাহিত্য পরিষদই তাঁকে সম্মান জানাতে এগিয়ে এসেছিল।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় কত মূল্যবান প্রবন্ধ, কত গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। এক সময় ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদের আগ্রহে তাঁর কত নিবিড় শ্রমের ফল পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। পরিষদের রমেশ ভবন চিত্রশালার জন্য প্রাচীন মূর্তি, খোদিত লিপি উদ্ধার করেছেন; আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কত মনীষীর নাম ও পুণ্য কর্মের কথা এ সূত্রে স্মরণে আসে। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের কীর্তির সূচীপত্র রচনা এ চিঠির উদ্দেশ্য নয়। আমরা বলতে চেয়েছিলাম, সাহিত্য পরিষদ একদা প্রবল উৎসাহে কাজ শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে কালের গতিতে সে কর্মস্রোত হয়তো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু আর একটি সাহিত্য অ্যাকাদেমী স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে কি? (বিশেষতঃ সাহিত্য অ্যাকাদমীর একটি শাখা এখন কলকাতায়ও আছে।) কোন কোন মনীষী ইতোমধ্যেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, ইতস্ততঃ চোখে পড়েছে। আমারও মনে হয় বাংলা সাহিত্য অ্যাকাদেমী স্থাপন না করে সাহিত্য পরিষদকে তার পূর্ব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা অনেক বেশী কাজের হবে।

মুস্কিল হলো, কোন আলোচনার সূত্রপাত হলে আমরা আড্ডায়, কাগজে, সভা-সমিতিতে কিছুদিন শখের দুঃখ প্রকাশ করি। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহ ও কর্ম-শক্তির মেল বন্ধনে কিছু কিছু কাজও হয়। তারপর হুজুগ থেমে যায়, উৎসাহ নিভে আসে, উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। তখন ইতিহাসের করুণা কুড়োনো ছাড়া সে প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন পরিণাম থাকে না।

শ্যামল সেন
রাঁচী-২।

দুটি সুন্দর আলোচনা

আপনাদের ৮ই আষাঢ়, শুক্রবারের 'অমৃততে' (৭ মার্চ, ১ম খণ্ড ৮ম সংখ্যায়) শ্রীঅভয়ংকরের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির' 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধটি বেশ সুচিন্তিত, মননশীল ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। বিভক্ত ভারতের তথা বিভক্ত বাংলার কুফলগুলির বিষয় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীঅভয়ংকর তার এই প্রবন্ধটির মধ্যে। রাতারাতি দেশ বিভক্ত হোল—বইলো রক্তগঙ্গা, সঙ্গে সঙ্গে মানুষও হোল বিভক্ত। পিতা একদিকে থাকলেন, পুত্র আর একদিকে পড়লেন। কাউকে চেনবার উপায় রইলো না। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল বহু হিন্দু ও মুসলমানের ওপর। জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং উগ্র লীগপন্থী মুসলমান যে যার পথ বেছে নিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান যারা ভারতে থেকে গেলেন এবং যারা পাকিস্থানে চলে গেলেন তারাও যেন হারিয়ে ফেললেন তাদের মনের ভারসাম্য। ভারতের নেতারা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন এই নতুন পরিস্থিতির দিকে। সৃষ্টি হোল সর্বহারা রিফিউজী এক শ্রেণীর মানুষে।

এই সব মনস্তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে আব্দুল হায়াতের 'Musalmans of Bengal পুস্তকে। এই সব কথা ভাবতে গিয়ে বিশেষ করে মনে পড়ে সেই মহাত্মা পাঠান পুরুষ খান আব্দুল গফুর খানকে—যিনি সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত—তিনিও আজ হারিয়ে গেছেন আমাদের মধ্য থেকে। অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য অনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের কথা কি আমাদের স্মরণ আছে? বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলো সবসময়েই, অথচ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীঅভয়ংকরের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় 'আজ ঘটনা থেকে অনেক দূরে সরে এসে নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বিচার করে বলা যায় ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব হয়তো ভারতবর্ষের অবস্থাকে এত নীচে নামিয়ে আনতো না।' শ্রীঅভয়ংকরের যুক্তির সারবত্তা এতই সুন্দর যে একথাটি আমরা প্রকাশ করতে বা চিন্তা করতে আজও ভয় পাই।

এই একই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গানের পথে' আলোচনাটি বেশ ভাল লাগল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। ওঁ শব্দের থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। বৈদিক যুগ থেকেই এই ওঁ শব্দের সুরলহরীর মাধ্যমে প্রাচীন-কালের ঋষারা সৃষ্টি করতেন প্রাণস্পর্শী হৃদয়ের গভীরতম সঙ্গীত। বৈদিক যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাব যে আকাশে-বাতাসে বনে উপবনে গুণী-জ্ঞানীরা গানের মাধ্যমে সৃষ্টি করতেন অপূর্ব সুরলহরী, যার মাধ্যমে আমরা খুঁজে পেতাম আমাদের জীবনের সঙ্গীত। সুন্দরভাবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'গানের পথ হচ্ছে সাধনার পথ। এ সত্য বহুকাল থেকে আমাদের দেশের গুণী-জ্ঞানীরা জানেন।' আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব সঙ্গীতের ভাষা যার মধ্যে খুঁজে পাই আমরা জীবনের নতুন বেদ। মানুষ সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র গানের মাধ্যমেই পৌঁছতে পারে—সেই পরম শক্তির কাছে। প্রত্যেক মানুষের কাছেই কোন না কোন ভাবে সঙ্গীতের আবেদন আছে। এই যান্ত্রিক যুগে আজও আমাদের দেশ থেকে এই গানের মহিমা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই গানই আমাদের সন্ধান দেয় পরম পিতার আশীর্বাদের বাণীর। শেষ করি আজ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থনার সত্য দিয়ে 'গানের পথ আমাদের সামনে সেই পরম শক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিক এই প্রার্থনা করি।'

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১।

আঁধি প্রসঙ্গে

ধারাবাহিকভাবে অমৃত-এ প্রকাশিত শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আঁধি' উপন্যাসটি পড়ে মনে হল বেশ কিছুদিন পর উপন্যাসে নতুনত্বের স্বাদ মিলেছে। 'আঁধি' রচনায় তিনি একটি সুন্দর প্লট বেছে নিয়েছিলেন। লেখকের অপরূপ সৃষ্টি দীপঙ্কর ও মালার চরিত্র দুটি। তার লেখনীতে চরিত্র দুটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ডাঃ নাগ-এর চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি প্রশংসার দাবী রাখেন। নিঃসন্দেহে এই 'আঁধি' উপন্যাসটি প্রশংসাতীত। আশা করি আমার মত আর সব পাঠকও ভবিষ্যতে স্বরাজবাবুর নিকট থেকে এই ধরনের লেখা আশা করেন। স্বরাজবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নরেন ভট্টাচার্য

অমৃত

গানের ভিতর দিয়ে দেখি

এই বিড়ম্বনা মহৎ ব্যক্তিদের জীবনে ঘটে। মৃত্যুর পরেও যে তার শেষ হয় না, দুঃখের কারণ সেটাই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নানাসময়ে দেশবাসীর কাছ থেকে বিরূপ সমালোচনা পেয়েছেন। এই সমালোচনা সাহিত্যবিষয়ক ছিল না সব সময়ে, তাঁর চিন্তা, তাঁর আদর্শ নিয়ে রক্ষণশীলদের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে, রবীন্দ্রনাথ তার জন্য দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কোনোদিন আপস করেননি অসত্য বা খন্ডিত সত্যের সঙ্গে। ভারতবর্ষ যে ভাগ হবে এমন চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল না। তাঁর মৃত্যুর ছ' বছর পর ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ ভাগ হয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজনীতিবিদরা, শিল্পী বা সাহিত্যিকদের কোনো হাত তাতে ছিল না। বাংলাভাষীদের বৃহত্তর অংশ নিয়ে আজকের পূর্ব-পাকিস্থান। সেখানকার সরকার এখন রবীন্দ্রনাথের গান নিষিদ্ধ করতে চাইছেন সরকারী বেতারে। মন্ত্রী বলছেন, এই গান (রবীন্দ্রসংগীত) পাকিস্থানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিরোধী।

এই প্রথমবার রবীন্দ্রসংগীত পাকিস্থান বেতারে নিষিদ্ধ হল না। এর আগে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে একই কান্ড করেছিল পাকিস্থান সরকার। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ঘোষণাটি করেছেন পাকিস্থানের বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রাওয়ালপিন্ডিতে। পূর্ব পাকিস্থানে কিন্তু এর মধ্যেই এই সরকারী ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ঢাকার রাজপথে রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে মিছিল বেরিয়েছে। বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্থানীরা এই ভাষার জন্যে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা বুকের রক্ত দিয়েছেন। সুতরাং, বাংলা ভাষার যিনি অপরিহার্য প্রতীক সেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং গান পূর্ব পাকিস্থানে পড়া হবে কিনা, গাওয়া হবে কিনা, সেটা তাঁরা আমাদের চেয়েও গভীরভাবে অনুভব করেন। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প। এমন দু' চারটে সরকারী ফতোয়ার ভয়ে তাঁরা সেই সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবেন না।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের সরকারী মহল এত বিরূপ কেন? পাকিস্থানী সংস্কৃতির যে ধরতাই বুলি ও'দের মুখে শোনা যায় সেটা নেহাৎ অন্তঃসারশূন্য রাজনীতির কথা। পাকিস্থানের বর্তমান শাসকরা বাঙালীদেরই সন্দেহের চোখে দেখেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে-বৈশিষ্ট্য দেশভাগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করেছে তাকেই পাকিস্থানের শাসকরা তাঁদের ভেদবুদ্ধির শত্রু বলে মনে করেন। এই কারণেই, জনসাধারণের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগরক্ষা বা ভাববিনিময়ে পাকিস্থান সরকার আগ্রহী নন। পশ্চিম বাংলায় যে-সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা যাতে পূর্ব-বাংলার পাঠকরা জানতে না পারে এবং পূর্ব-বাংলার প্রগতিশীল চিন্তাধারার কোনো পরিচয় যাতে ভারতের বাংলাভাষীরা জানতে না পারে তার জন্যই নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে পাকিস্থানের শাসকরা 'সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে'র ধুয়া তুলছেন।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার কথা চিন্তা করা, শেক্সপীয়রকে বাদ দিয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়ার মতো। প্রগতিবাদের শত্রুরাই মানবতাবাদী সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। নাৎসী জর্মনীতে টমাস মানের জায়গা হয়নি, তারা রোমা রলাঁকেও কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, মহামনীষী আইনস্টাইন তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দেশান্তরী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান, পাকিস্থানী শাসকদের এই মূঢ়তা দেখবার জন্য তিনি আর বেঁচে নেই।

তবে এই আঘাত শুধু রবীন্দ্রসংগীতের ওপরেই নয়, এর দ্বারা পাকিস্থানের শাসকরা আরেকবার পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালীদের আবেগের তীব্রতা পরীক্ষা করছেন। কুড়ি বছরে তাঁরা বাঙালিত্ব কতটা বিসর্জন দিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানী তমুদ্দুনের অনুরক্ত হয়েছে সেটা যাচাই করে দেখার জনাই এই সরকারী ফতোয়া। তাঁরা উর্দু চালাতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার অস্বীকার করতে পূর্ব পাকিস্থানীদের রাজী করাতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথের গান নিষিদ্ধ করে পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালীদের প্রাণরসধারার উৎস রুদ্ধ করে দিতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে বাঙালীর কথা আছে, মানুষের কথা আছে, বিশ্বজনীন মৈত্রীর কথা আছে। সর্বোপরি ভাবে ও ভাষায় একটি জাতির পূর্ণবিকাশের দর্পণ হল রবীন্দ্রনাথের গান। তার গীতলতা, চিত্রধর্মিতা, সুর এবং ভাবসঙ্গতি যে কোনো শ্রোতার মনেই শান্তি ও মৈত্রীর প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে ভারত কিংবা পাকিস্থান, বাঙালী কিংবা অবাঙালী, হিন্দু কিংবা মুসলমান, এই ধরনের কোনো ভেদাভেদের স্থান নেই। সেখানে অন্য এক ভুবন, অন্য এক প্রেরণা মানুষকে শান্তি দেয়, সান্ত্বনা দেয়, আশ্রয় দেয়। পাকিস্থানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালিদের কাছ থেকে সেই সান্ত্বনা ও আশ্রয় কেড়ে নিতে চাইছেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দুই বাংলাতেই ধ্বনিত হয়েছে, এটাই সবচেয়ে আশার কথা।

মণি-বউদি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩)

এক বছর পর মণিবউদিকে দেখলাম। দেখে যেন কেমন হয়ে গিছলাম আমি। *মণিবউদিকে চিনতে পেরেও মনে হয়েছিল, না, চিনতে না-পারলেই যেন ভাল হত। সবই সেই, (এক বছরে একটা মানুষের আর কত পরিবর্তনই বা হয় যদি না কোন ব্যাধি থাকে), তবু যেন এমন কিছু ছিল না বা হারিয়েছিল, যাতে তাঁকে না চিনতে পারলেই ভাল হত।*

রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর 'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে ঝরিয়া' ছত্রটি আজ মনে পড়ছে। মণিবউ মৃত অর্থাৎ দল ঝরে-পড়া পদ্মের দশায় তখনও উপনীত হননি; তবে তার কিছুটা আগের দশার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। দলগুলিতে শুকনো একটা স্পর্শ লেগেছে, বৃন্ত শিথিল হয়েছে, গন্ধে বিষণ্ণতা এবং বিকৃতি এসেছে, রঙ বিবর্ণ হয়েছে; মৃদু বাতাসে এমনভাবে দুলছে যে, মনে হয় বাতাসের বেগে একটু ঝড়ো আমেজ লাগলেই দলগুলি ঝরঝর করে ঝরে পড়ে যাবে বা গেলেই ভাল হয়।

মণিবউদি সেই জানালাটার ধারেই একখানা কুশন-দেওয়া চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন; ঠিক পড়ছিলেন না, তিনি বইখানার মধ্যে আঙুল পুরে ধরে বসেছিলেন —আমারই অপেক্ষা করছিলেন।

তার আগে বলে নি, দেখা তাঁর সঙ্গে, তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লীতে আমার হয়নি; দেখা হয়েছিল কলকাতায়। প্রথম টেলিগ্রামের পরদিনই ও'র কলকাতা আপিসের লোক এসে জানিয়েছেন যে, দিল্লী আর আমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না; কারণ, মালিক কলকাতাতেই আসছেন। এসেই উনি আমাকে খবর দিয়েছিলেন।

একখানি ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছিলেন, চিঠিখানা নিয়ে এসেছিল সেই যমুনাপ্রসাদ। যে একদা মণিবউদির মাসীর বাড়ীতে বয়-চাকর ছিল এবং যে-ছেলেটি কিশোর বয়সের আবেগে বা মনোধর্মে একটি কিশোরী মেয়ের নির্যাতন দেখতে না পেরে তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল, আপনার জনের নির্দেশেই সকল খবর পৌঁছে দিয়ে এসেছিল—ঠিক স্থানটিতে অর্থাৎ অমৃতবাবুর কাছে। এবং যে যমুনাপ্রসাদ পরবর্তী জীবনে অমৃতবাবু ও মণিবউদিদের ব্যবসার সংস্রবে থেকে একজন কৃতী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে আজ, সেই যমুনা-প্রসাদ। দিল্লীর কথাপ্রসঙ্গে আমার বলা

প্রসাদকে দেখেছিলাম। চুস্ত পায়জামা এবং দামী শেরওয়ানীতে তাকে শুধু একজন রইস আদমী বলেই মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যমুনাপ্রসাদকে নেতৃত্বের আসনে *বসালেও এতটুকু বেমানান দেখায় না। এবং যমুনা তাতে অপারঙ্গমতার লজ্জায় লজ্জিতও হবে না।*

থাক যমুনাপ্রসাদের কথা থাক।

চিঠিখানায় লেখা ছিল শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে মুছে ফেলে শ্রদ্ধাস্পদেষু সবোধন করলাম। আমি কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। কাজটা দিল্লীতে হয়ে উঠল না; এখানেই আসতে হল। আপনার একটু সাহায্য ভিক্ষা করছি কোন সম্পর্ক ধরে নয়; পরিচয়ের দাবীতে। একখানা দলিলে আপনাকে সাক্ষী হতে হবে। আর কিছু না। বিকেলে একবার দয়া করে এলে খুব খুশী হব। ইতি মণিমালা দেবী।

মণিবউদির বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম— উনি উপরে আছেন এবং আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। দোতলার সেই ঘরে তিনি সেই জানালাটার ধারে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, যেটা দক্ষিণ দিকের জানালা এবং যে জানালাটার ধারে বসে একদা ১৯৪২ সালের ব্ল্যাক আউটের রাত্রিতে তিনি সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে আমাকে তাঁর জীবনের কথা বলেছিলেন। তাঁর পূর্বেষুবতী রুচিবাদিনী শিক্ষয়িত্রী মাসীর সঙ্গে, বয়সে কিশোরী পশ্চিমের দেহাতী রুচিসপন্না তিনি কি বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিলেন তার বিচিত্র কাহিনী বলেছিলেন, ঠিক সেই জানালার ধারেই আজ তিনি যেন যৌবনের পশ্চিম সিংহদ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে অপরাহ্নের লালচে রৌদ্র মেখে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই একটু ম্লান হেসে বললেন—আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি।

চট করে মনের মধ্যে একটা গানের লাইন ভেসে এল—'কালা, তোর তরে কদম-তলায় চেয়ে থাকি। পথের পানে চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার কাজল-পরা জোড়া আঁখি।'—কিন্তু ও'র দিকে তাকিয়ে সে-কথা যেন একটা আঘাত খেয়ে থমকে বোবা হয়ে গেল। ও'র এই ছবিটি আমার মনের পর্দায় ছাপ ফেলতেই কথাগুলি জিভের মধ্যে লজ্জা পেয়ে তখন গুটিয়ে গেল।

তার বদলে মনে পড়ল কথা ও

নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে ঝরিয়া।' আগেই বলেছি যে, আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। ঠিক তেমনি শুকনো শুকনো লাগ-ছিল। অথচ শরীরে শীর্ণা হননি; প্রসাধন বা সাজসজ্জারও যে অভাব ছিল, তা ছিল না। চুলগুলি রুখু, সে শ্যাম্পু-করা রুখু বলেই মনে হল। খসখসে কালো চুলের মধ্যে মধ্যে রুপোলী চুলের দু-চার গাছা বা এক-আধ গুচ্ছ ঝিকমিক করছিল; মুখের উপর পাউডারের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণও ছিল, মণিবউদির গৌরবর্ণের গৌরবের মধ্যেও কোথাও দাগ পড়েনি, তবু যেন একটা ছায়া পড়েছিল কিছুর, সব থেকে শুকনো মনে হচ্ছিল ঠোঁটদুটি, এখানেই অভাব ছিল প্রসাধনের; দেখলাম মণিবউদি লিপস্টিক মাখেননি। শীতকালের শীর্ণ *পদ্মের সঙ্গে মিলটা যেন এইখানেই সবথেকে বেশী ছিল।*

না।

আরও এক জায়গায় ছিল, চোখের চাউনিতে। অর্থাৎ দৃষ্টিতে। হয় বিষণ্ণতা, নয় হতাশা, দুটোর একটা অথবা দুটোই— একসঙ্গে মিলিতভাবে মণিবউদির সেকালের সকল তারুণ্য ও দীপ্তির উৎস তার আয়ত চোখের কালো তারাদুটিকে যেন কেমন নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল।

আমি একটু বিস্মিত হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম।

তিনি বললেন—বসুন। সামনের সোফা-খানা দেখিয়ে দিলেন।

বসলাম। বসে বললাম—এক বছরে—

—হ্যাঁ, অনেক ঝড়জল মাথার উপর দিয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন—সেই মামলা। আপনি যেদিন গিয়েছিলেন দিল্লীর আপিসে, সেদিন কমল আমাকে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। আপনাকে বলেছিলুম বোধহয়।

বললাম—হ্যাঁ।

—তারপর ওরা মামলা দায়ের করেছিল। বেশ কিছুটা দূর এগিয়েও ছিল। তারপর আর ভাল লাগল না।

একটি বিচিত্র হাসি—যে-হাসির মধ্যে কান্নার ইসারা উঁকি মারে, সুখের মধ্যে দুঃখের কথা মনে পড়ায় যে হাসি, এ-হাসি সেই হাসি; তিনি হেসে বললেন—

—সইতে এমনিই পারছিলাম না। তাই মিটমাট করে ফেলছি।

কোন কথা আমি খুঁজে পাইনি কি বলব? মনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক শোনা কথা এবং বিশ্বাস ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছিল, তাদের প্রত্যেকেরই বলবার কথা অনেক ছিল। এই এতদিন অর্থাৎ ১৯৪২ সালের শেষ ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬। '৫৭ সাল পর্যন্ত অমৃতবাবু এবং মণিবউদির ভাগ্য সম্পর্কে ও'দের জীবন সম্পর্কে কম কথা তো রটেনি; সে-সব অনেক কথা। গুজবে কান দিতে নেই কথাটা সদা সত্য কথা বলিবে-র জাতের একটা কথা। গুজবের জন্য কান উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এবং মুখ-রোচক গুজবকে আরও কিছু মুখরোচক করে তোলার কাজটা মনে মনেই হয়ে থাকে। সুতরাং তারপর একেবারে ছী-ছী করে

দিকে তাকিয়ে তখন ভুল করে ফেলা। সেখানে এখন যা সেই মুহূর্তটিতে শুধু বিরক্তা বিতৃষ্ণা কেমনতর তাই ছিল না। আরও কিছু ছিল। যা ছিল, তা অসাধারণ কিছু। একটা কঠিন দৃঢ়তা ছিল। বিশ্ব-সংসারকে উপেক্ষা করার একটা দম্ভতা ছিল। সেটা সেই মুহূর্তে যেন ছ' ব্যাটারী টর্চের আলোর মত জ্বলে উঠেছিল যা কোন মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ-সন্ধ্যায় অন্ধকারে দূর-দিগন্তের বিদ্যুচ্চমকের মত চমকে উঠেছিল ক্ষণেকের জন্য।

ঠোঁটদুটি তাঁর বেঁকে গেল, মুখে চোখে যেন ঘৃণা উপচে পড়ল। বললেন—ঘেন্না হয়ে গেছে আমার। —জানেন, সংসারে দেহের সত্যিকারের দাম বোধহয় শকুনি শেয়াল ছাড়া অন্যে বেশী জানে না। কিন্তু এরাও জ্যান্ত মানুষকে ছিঁড়ে খায় না। মানুষ তার থেকেও জঘন্য, আর সেইজন্যেই যে দেহটার প্রতি যত বেশী অনুরাগ, কুৎসিত কালো কালি তত বেশী করে সেই দেহটার সারা অঙ্গে লেপে দেয়।

হেসে বললেন—এও এক ধরনের পুজো, বুঝলেন না? কিম্বা এক ধরনের ভোগ করার স্যাটিসফ্যাকশন।

এই হাসির সময়টুকুর অবসরে একটি বিচিত্র সত্য আবিষ্কার করলাম : আবিষ্কার করলাম, মণিবউদির সেই সামনের ঈষৎ উঁচু দাঁতদুটি ঠিক তেমনিভাবেই উঁচু এবং চকচকে থাকা সত্ত্বেও সেই দেখনহাসি রূপটি তাঁর চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।

• • •

"অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে কমলকুমার প্রমুখ জনকয়েক বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। দাবী—"অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী বলিয়া বর্ণিত শ্রীমতী মণিমালা দেবী তদীয় স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব হইতেই স্বকীয় ভ্রষ্টাচার ও নীতি-বিগর্হিত আচার-আচরণের জন্য মৃত অমৃতলাল দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। এবং অমৃতলাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একজন ইংরাজ কুমারীকে রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই নতুবা তাহাই করিতেন। এবং প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মণিমালা দেবী ১৯৪০ সাল হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অজুহাতে নানান জনের সহিত মেলামেশা এবং স্বেচ্ছাচার করিয়া আসিতেছেন একেবারে স্বৈরিণীর মত। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কালে সারা পৃথিবী জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইছেন এবং নানান কেলেঙ্কারী করিয়াছেন লিখিত চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে, যাহার প্রমাণ প্রয়োগ সমস্তই বাদীপক্ষের হাতে মজুত আছে। অমৃতবাবু শেষজীবনে এইসব কারণে এই স্ত্রীকে বর্জন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করিয়াও, আকস্মিক মৃত্যুহেতু তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।"

"এইসব কারণে বাদীপক্ষের প্রার্থনা—এই ভ্রষ্টা নারীকে "অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকার হইতে ভ্রষ্টা নারীর জাতিপাত হইয়াছে বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সুতরাং সেই অনুযায়ী ধর্মত্যাগিণী জাতিচ্যুতা বিধায় মৃত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার তাঁহার ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণ এই বাদীগণের অনুকূলে ডিক্রী দেওয়া হউক।"

তার উত্তরে যে-জবাব দেওয়া হয়েছিল, সে-জবাব পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ওখানে বসেই কথাপ্রসঙ্গে এইসব বিবরণ মুখে বলতে বলতে, কি তাঁর ইচ্ছে হল জানি না, তিনি এক সময় বললেন—দাঁড়ান, আসছি, এক মিনিট।

উঠে গিয়ে অন্য ঘর থেকে মামলার নথির নকল এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখুন। মুখে আর কত বলব?

পড়ে দেখে, আগেই বলেছি, স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মুখে তো অনেকটাই বলেছিলেন। কমলকুমারদের দল, ব্যবসায়ের অজুহাতে যে-সব বিদেশীদের সঙ্গে মণিমালা দেবী অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছিলেন এবং যমুনাপ্রসাদের মত যে-সব অনুগতের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন, তাদের নাম মুখে স্বচ্ছন্দে মুখে এনে এই জবাবের বেলায় নথিটা কেন এনে দিলেন তা বুঝতে আমি পারিনি।

নারী রহস্যময়ী। তার চরিত্র তার নিজের কাছেই দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্ভেদ্য, এছাড়া আর কোন কৈফিয়ৎ আমি খুঁজে পাইনি।

জবাবের দুটো দিক ছিল।

প্রথমটা হল এই যে, এই সম্পত্তি একক অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের ছিল না। তাতে মণিমালা দেবী স্বকীয় পৈত্রিক অর্থমূল্যে ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছিলেন। তার বিস্তৃত বিবরণের একটা সারাংশ দেওয়া ছিল। মণিমালার বাপ যে ক্যাশসার্টিফিকেট রেখে গিয়েছিলেন, সেই টাকাটা বিবাহের অব্যবহিত পরেই অমৃতবাবু নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বাজারচলিত সুদ দরেই ধার নিয়ে নিয়োগ করেছিলেন। এবং বৎসরান্তে সুদ হিসাব করে সেই সুদটাকে আসল হিসাবে নিয়োগ করে এসেছিলেন নিয়মিতভাবে। এইভাবে টাকাটা রুদ্ধ বিস্ফোরণ মত মাথা তুলে এবং স্ফীত হয়ে উঠেছিল। যখন যুদ্ধের সময় নতুন করে বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নতুন করে নামলেন অমৃতবাবু তখন সমস্ত নিরাপদ ব্যবসায়গুলির মালিকানি দিয়েছিলেন মণিমালাকে।

জবাবে সেই কথাই বেশ বক্তভাবে ধারালো করে জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল—মণিমালা দেবী এই সকল সম্পত্তিতে অমৃতলালের উত্তরাধিকারিণী স্ত্রী হিসাবে যেমন মালিক, তেমনি মালিক তিনি তাঁর স্বকীয় অধিকারে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছিল—এই সকল ব্যবসায়ের কর্ম-পরিচালনাকল্পে মণিমালা দেবী আজ বারো বৎসর ধরে যে স্বাধীনভাবে নানান জনের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তা স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের কোন আপত্তিরই কারণ ঘটেনি।

আরও অনেক কথা। যার মধ্যে কোন অনাচার বা কদাচার বা জাতিপাতের মত ব্যভিচার তিনি করেননি এই প্রতিবাদটা উচ্চ নয়—উচ্চ হয়ে উঠেছে এই কথাটা যে মণিমালা যা করেছেন, তা অমৃতলালের জ্ঞাতসারেই করেছেন। ওই যে একটি বিদেশিনী মেয়েকে নিয়ে শেষবয়সে অমৃতবাবু মাতামাতি করেছিলেন, তার কথার উল্লেখ করেও যেন বলতে চেয়েছেন যে, একটা বোঝাপড়া করেই যেন এমনটা হয়েছে। যার যা মন চায় সে তা করেছে। জীবনের চুক্তির আসল অর্থ ঠিক এইরকম।

সেই কারণেই অমৃতবাবু উইলের কোন পরিবর্তন করেননি। বন্ধ্যা হলেও তাঁকেই দিয়ে গেছেন তাঁর স্বকীয় সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার।

তার উপর বর্তমানকালে হিন্দু কোড বিলে যে-বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে—সে-বিচারেও এই ধরনের কোন আপত্তিকর দাবী উত্থাপনের অধিকার বাদীদের নেই।

তারপর যথানিয়মে এই মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন এবং সেইসঙ্গে আদালতের সকল খরচ, যা তিনি বাধ্য হয়ে করেছেন, তা বাদীদের কাছ থেকে আদায় করবার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।

কাগজ থেকে মুখ তুলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন না, জানলা দিয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন নিবিষ্টচিত্তে, একেবারে যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি মুখ তুলে তাকালাম, তিনি বুঝতে পারেননি। বাধ্য হয়ে একটু সাড়া দিলাম। তিনি ফিরে তাকালেন। চোখোচোখি হতেই কাগজগুলি সামনে নামিয়ে দিয়ে বললাম—মিটিয়ে ফেলছেন।

একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। তবে সে কম্প্রোমাইজ নয়: দিল্লীতে কমলের দেওয়া যে টার্মসের কথা বলেছিলাম আপনাকে, তা নয়।

এর কোন জবাব দিলাম না চুপ করে রইলাম। কি জবাব দেব?

উনি বললেন—সব ছেড়ে দিচ্ছি ওদের। বড় ঘেন্না করছে—এইসব নিয়ে প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্ন জেরা করতে।

বুঝতে পারলাম। উকীল ব্যারিস্টারের কুটিল প্রশ্নজালের মধ্যে অসহায়া হরিণীর মত পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরণাপন্ন হয়ে উঠেছেন, তা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন।

কিন্তু না। সে-কথা উনিই বললেন—দেখুন ভয় আমি পাইনি। না। ভয় নয়। আমি শেষ বারো বছর তো সারাদুনিয়া চষে বেড়িয়েছি—সব ঘেঁটে দেখেছি। পাপ বলুন পুণ্য বলুন ধর্ম বলুন অধর্ম বলুন এ-সবের কোন শাসনই আমার উপর কেউ খাটাতে পারে না। আমার সব সংস্কারের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি নিজে। শেষটায় তিনি নিজে—

চুপ করে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেন—

রিট্যানিজিমের ঝোঁক ছেড়ে দেওয়া নয়, ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। লনা মেয়েটা এক-পুরুষে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান; মা ওর খাস বিলেতের মেয়ে এদেশে স্বামীর সঙ্গে এসে বিধবা হয়ে একজন অ্যাংলোইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটার রূপ ছিল—তারও ওপরে ছিল, আশ্চর্য একটা চার্ম। মোহ। তার সঙ্গে তাঁর কিছুদিন ধরেই দিনরাত্রি দুই কাটতে লাগল। যুদ্ধের সময়; মেয়েটাকে প্রথমে নিয়েছিলেন টাইপিস্ট হিসেবে, তারপর তাকে করলেন নিজের সেক্রেটারী।

বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন সে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে।

সে-ভঙ্গিতে মানুষ দুটো কারণে ঘাড় নেড়ে থাকে। এক, মনে-মনে বুঝে উপভোগ করে ঘাড় নাড়ে, এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আবার ওদিক থেকে এদিক পর্যন্ত। যতক্ষণ মনে-মনে মানুষ এই উপভোগের রতি ভোগ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলে এই ঘাড়নাড়া। আর এক কারণেও এইভাবে ঘাড় নাড়ে—সেটা হল একটি বেদনার্ত আক্ষেপের কারণে।

মণিবউদি কোন কারণে ঘাড় নেড়েছিলেন তা বুঝতে পারিনি। তবে মনে হয়েছিল আক্ষেপই করছেন। অমৃতদা মোটামুটি এই অধঃপতনের আগে পর্যন্ত একজন সৎমানুষ ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল তাঁর জীবনের দিগন্ত ছিল, যথাসাধ্য সূর্যালোকের দিকেই সামনে ফিরে পথ চলেছেন; দেশসেবার একটি ধর্ম বা পুণ্যে এও তাঁর ছিল এও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই মানুষ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে অকস্মাৎ সব ঝুটে হ্যায় বলে সব ছুড়ে ফেলে দিলেন মাটির ধুলোর মধ্যে; এবং তার পরিবর্তে কুড়িয়ে নিলেন সংসারের রক্তমাংস ক্লেদ আর বস্তুপুঞ্জের মধ্যে থেকে একটি নারী-দেহ ও আসবভাণ্ড। এর জন্য মণিবউদিই আক্ষেপ ছাড়া আর কি করতে পারেন? হয়তো সে আক্ষেপ আরও বেড়েছিল—নিজের কারণে। এরই ধাক্কায় তিনিও—।

বউদি বললেন—জানেন, বুঝতেই পারিনি। উনিও না। আমিও না। যুদ্ধের চাকায় দুনিয়া এমনভাবে পাক খেতে লাগল যে, কে কখন কোন পাতালে পড়ল বা উঁচুতে উঠল তার হিসেব খুব সহজ ছিল না। যুদ্ধের বাজারে এই ব্যবসাটিকে বিরাট একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে গেলাম আমরা। সুযোগ এসে গেল। ওই কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল। বেশ কল্পনা করে প্ল্যান করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আপিস, স্টেনোটাইপিস্ট লনাকে ব্যবহার করবেন টোপ হিসাবে—তার সঙ্গে বললেন—মণি, তুমি শুধু দেখ। তুমি তো বোঝসোঝ। লেখাপড়া জান। অন্ততঃ আমার সঙ্গে একটু-আধটু ঘোরাঘুরি কর। তাই করতে করতে কখন যে পা পিছলে গেল ও'র—।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, মানুষের জীবনে যে সব আমূল পরিবর্তনগুলো হয়, সেগুলো নাটক করে হয় না। আস্তে আস্তে হয়। মানুষ যেমন ভাবে বাড়ে তেমনি ভাবে হয়। লটারীতে টাকা পেয়ে যারা বড়লোক হয়, তাদের কথা ছেড়ে যারাই গরীব থেকে বড়-লোক হয় তারা মানুষকে হকচকিয়ে দিয়ে বড়লোকী চাল ধরে না। মোটা কাপড় থেকে মিলের ফাইন কাপড়, তারপর শান্তিপুরী কাপড় তারপর স্যুটটুট পরে। এবং নিজে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধে তখন আগের দিনের সঙ্গে সেদিনের নিজের গরমিল আনো মনে কোন সাড়াই জাগায় না। ঠিক সেইরকম হল। বারো বছরে উনি সেই পুরনো কালের স্বদেশী আদর্শের মানুষ, এককালে খদ্দরপরা মানুষ, স্যুট ধরলেন, সিগারেট ধরলেন, তার সঙ্গে মদ।

হেসে ফেলে বললেন, মদ ধরলেন কিভাবে জানেন? হঠাৎ শরীর বড় ক্লান্ত হতে লাগল; weakness অত্যন্ত টায়ার্ড। বিজ্ঞাপনের হরলিকসে প্রতিকার হল না। প্রথম প্রথম এক চামচ ব্র্যান্ডি দেওয়া ব্যবস্থা হল। ডাক্তার বললেন, মিঃ মুখার্জি, বয়স তো পঞ্চাশ হল; এখন ইয়ং ম্যানের এনার্জি পেতে হলে আপনাকে সোমরস পান করতে হবে। বুঝেছেন? যখন টায়ার্ড ফিল করবেন তখন এক চামচা দু চামচা ব্র্যান্ডি খান। এ ছাড়া আমি বলি কি, আপনি রাত্রে ডিনারের সময় একটি পেগ পান করে নেবেন।

উনি বলেছিলেন, ভেবে দেখি।

আমি বলেছিলাম, এর আর ভেবে দেখবে কি? এতো ওষুধ।

ডাক্তার বলেছিলেন, এক্স্যাকটলি।

এর পর এক পেগ থেকে দু পেগ, দু পেগ থেকে তিন পেগ; তারপর ডিনার টেবিলে পুরো বোতল রেখে বিলিতী মতে ডিনার; খাবার আসত গ্রেট ইস্টার্ণ গ্র্যান্ড থেকে; যুদ্ধ বিভাগের সাহেব থাকতেন অতিথি। প্রথম প্রথম হোস্টেজের কাজ করে দিত লনা; তারপর করতাম আমি। এই করতে করতে একটু একটু করে পিছলে পিছলেই বলুন, আর ভাসতে-ভাসতেই বলুন একেবারে এইখানে, এই বর্তমান কলঙ্ক মধ্য সমুদ্রে চলে এলাম, যেখানে জীবনসমুদ্রে স্রোত আছে অথচ খুব তরঙ্গ নেই, যেখানে বরফ-জমা হিম শীতলতা নেই, উত্তাপও নেই; এবং আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা হল একালের কালোচিত একটা প্রগ্রেসিভনেস, সমৃদ্ধ বড় বড় বন্দরের একটা সমাবেশ আছে তটে-তটে। ইমোশন-সর্বস্ব জীবনের দিগন্ত বড় অনুর্বর। নির্জন, বড় উদাসীন, বড় নির্বাক। আমাদের বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে সেইটেই তো অভিযোগ ঠাকুরজামাই! সেকালে যারা আপনার দাদার খদ্দরের জামা-কাপড় পছন্দ করে নি, তারাই তাঁর স্যুট পরা দেখে ক্ষেপে উঠল। যারা আমার শিথিল কবরী পছন্দ করতে পারে নি, তারা আমার চুল কেটে ফেলাকে চরম সর্বনাশ মনে করে গাল দিতে লাগল।

যারা আপনার দাদার স্যুট-পরা চেহারা আর আমার ববছাঁটা চুল চেহারা পছন্দ করে না তারা কি খুব প্রগ্রেসিভ নন্দাই?

হেসে ফেললেন মণি-বউদি।

তারপর বললেন, নেহাৎ পুরনো কালের এস্টাবলিশড সাহিত্যিক বলে কাপড়-জামাতে পার পেয়ে গেলেন, নইলে স্যুট কিম্বা হাওয়াই সার্ট আর প্যান্ট পরতেই হত। না হলে প্রগ্রেসিভ হতেন না।

আমি সেইবারই চায়না থেকে ফিরে এসেছি।

বললাম, না বউদি, আমিও এবার প্রগ্রেসিভ বলে প্রমাণ দিয়ে এসেছি। কোট-প্যান্ট অবশ্য গলাবন্ধ প্রিন্সকোর্ট পরে চায়না গিছলাম। এবং ডিনার টেবিলে ওদের সেই অতি প্রাচীন মদ্যও পান করে এসেছি।

বউদির কথাগুলি ভারী ভাল লাগছিল। কথাগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাতে উত্তাপ ছিল না। অবজ্ঞা ঘৃণাও ছিল না। ওই ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেও কোন আক্ষেপও ছিল না। একটা দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে এল সূর্যাস্তের সঙ্গে গেল, তার মধ্যে রৌদ্র হল, মেঘ এল, হয়তো বৃষ্টি হল কিম্বা হল না; ফুল ফুটল, সারাদিনে একটু একটু করে শুকালো, তারপর ঝরে পড়ে গেল। সূর্যাস্ত হল পাখীরা কলরব করল। শেষ হয়ে গেল। জগতের ইতিহাসে এই একটি দিন, এর সঙ্গে অন্য কোন দিনের মিল নেই, আবার সকল দিনের সঙ্গে এক অভিন্ন।

অমোঘ নিয়মে এমনি হয়। তেমনিই হয়েছে বা ঘটেছে তাঁর বেলায়।

আমি অন্ততঃ এই বুঝেছিলাম। তিনি যেন এই বলতেই চাচ্ছিলেন।

• • •

তিনি বলেছিলেন, বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, দেখুন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে, আমার জীবনে যা ঘটেছে তা আমরা ঘটাই নি, তা আপনি ঘটে গিয়েছে, আমাদের বাধা সচেতন চেষ্টা সত্ত্বেও। এ নিয়ে আমরা সুখ-দুঃখ দুই-ই ভোগ করেছি। ফলও খেয়েছি, কাঁটাতে সর্বাঙ্গ ছড়ে গেছে। সাধারণ অবস্থায় দেশে থাকলে হয়তো অনুতাপ দুঃখ অনুভব করতাম বাধ্য হয়ে; সকলে মিলে বাধ্য করতো দুঃখ অনুতাপ বোধ করাতে, কিন্তু তার নাগালের বাইরে ছিলাম তখন। এই এতকালই ছিলাম। এ নিয়ে অনুতাপ আমার নেই। তাই ওই জবাব দাখিল করে লড়ব বলে কোমর বেঁধেছিলাম। এবং আমার জিতবার চান্সই বেশী। ওরাও ঘায়েল হয়ে পড়েছে। তবু আর ভাল লাগছে না। ওদের সব দিয়ে দিচ্ছি মানে একটা ট্রাস্ট করে তার ট্রাস্টি করে দিয়েছি, আর ওদের দিক থেকে সর্ত নিয়েছি যে, আমার অন্তে ওরা আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাপ্ত করবে, খরচের পরিমাণ দেওয়া আছে। ও'র নামে একটা বৃত্তি দেবার কথা আছে। বাকীটা ওরা খাবে। একটা বাড়ী-ভাড়ার আয় শুধু নিজের জন্যে রেখেছি, তা থেকে তিনশো টাকা আসবে। তার থেকেই আমার চলে যাবে। সেটা আমি ওই যমুনাপ্রসাদকে দিয়ে যাব। ওই লোকটা ছেলে বয়েস থেকে এ পর্যন্ত বরাবর আমাকে দিদিজী বলেছে এবং তার মর্যাদা ষোল আনা রেখে এসেছে।

চুপ করলেন বউদি।

আমি নির্বাক হয়ে বসে শুনছিলাম, নির্বাক হয়েই বসে রইলাম। অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে যেন মৌচাক ভাঙার পর উড়ন্ত মৌমাছির মত ঝাঁক বন্দী হয়ে এদিকে-ওদিকে-সেদিকে মনের আকাশ ছেয়ে উড়ে

বেড়াচ্ছিল; আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ওই নারীটি। ওই মণি-বউদির উপর আমি জোলিয়ে দিতে পারি নি। সেটা আমার দুর্বলতা যদি বা হয়, হতেও পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, মণি-বউদি তাতে ভীত ছিলেন না; আক্রমণ করলে তা সহ্যও তিনি করতে পারতেন হাসিমুখে।

বউদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আপত্তি হবে না তো নন্দাই?

ওই নন্দাই সম্বোধনে সঙ্কল্পচ্যুত হলাম। আর থাকতে পারলাম না, অত্যন্ত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত বেঁকিয়ে প্রশ্নটা করে বসলাম উত্তরের ছলে, বললাম, নন্দাই বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার ননদকে ননদ বলে স্বীকার করে লাভ তো শুধু কটু কথা শোনা।

বউদি বললেন, ওটা আমি অস্বীকার কিছুতেই করতে পারব না ভাই ঠাকুরজামাই। আই লাভড্ হিম, আই ওয়ান হিম; আমি ভালবাসার যুদ্ধে মাসীকে হারিয়ে জিতে নিয়েছিলাম। হি ওয়াজ মাই ওন।

হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, আপনি পুরাণের খুব ভক্ত। পুরাণের কথাই বলি, কৃষ্ণ কার? রাধার না রুক্মিণীর। রাধাও বলে আমার, রুক্মিণীও বলে আমার। আমি রাধাই হই, আর রুক্মিণীই হই তিনি আমার! তাঁর উত্তরাধিকারিণী আমি।

• • •

এখানেই শেষ নয়।

আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল কাশীতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর, দাঁড়িয়েছিলেন। স্থির নিস্পলক দৃষ্টিতে গঙ্গাস্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ১৯৬২ সাল শীতকাল।

এক নজরে চেনার উপায় ছিল না। কারণ তখন তার এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, একই ত্রিভুজকে দুই ভিন্ন স্থানে এঁকে না রেখে কোনমতেই দুটিকে এক করে মেলানো গেল না।

এ এক উদাসিনী।

চুলগুলি রুক্ষ, এবার তৈলাভাবে রুক্ষ। এবং ববছাঁটা চুলগুলি বড় হয়ে পিঠ পর্যন্ত ঢেকে ছড়িয়ে আছে, বাতাসে দুলছে। চোখে যেন ছুরির ধার।

সারা সর্বাঙ্গে যেন একটা আশ্চর্য জর-জর ভাব। যার উত্তাপ কেউ কাছে দাঁড়ালেই অনুভব করতে পারে। তিনি বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলেন, কি? কি চাই? সরে যান দু পা। এবং নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত করবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান।

আমি হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে একখানা নৌকা ভাড়া করে শীতের অপরাহ্নে শান্ত গঙ্গা বেয়ে চলেছিলাম মণিকর্ণিকার দিকে। হঠাৎ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এসে মনে হল ঠাণ্ডা যেন বড্ড ঘন হয়ে উঠছে। নৌকা দশাশ্বমেধেই ভিড়িয়ে দিতে বললাম। ঘাটের কাছে এসেই চোখে পড়ল মণি-বউদিকে। এবার সেই পুরনো ঢঙে ঝলমলে ছাঁদে ফিতে পাড় শাড়ী পরে কাঁকে একটা ঝোলা ঝুলিয়ে উনি গঙ্গার বুকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এরই মধ্যে কি করে যে চিনে ফেললাম, ইনিই মণি-বউদি, তা বলতে পারিনে।

ঘাটে নেমে এক পা এক পা করে এগিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘাটের মাথার সেই উঁচুতে এসে সামনে দাঁড়ালাম।

উনি চমকে উঠলেন।

নিস্পলক চোখের স্থির চোখের তারা চকিতে চমকে উঠল, ঠিক সেই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার সন্ধ্যায় দূরদিগন্তে খেলে যাওয়া বিদ্যুৎচমকের আভাসের মত। কপালে কুঞ্চন রেখা জেগে উঠছিল।

আমি বললাম, আপনি মণি-বউদি?

কপালের কুঞ্চনের বেগ শিথিল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। মিলিয়ে গেল ক্রমে।

আমি বললাম, আমি আপনার নন্দাই।

হাসলেন মণি-বউদি।

আশ্চর্যভাবে এতদিন পর সেই দেখন-হাসি মেয়েটিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। ভেবে পেলাম না, কোথায় সে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল।

কথা তাঁরা সঙ্গে অনেক হয়েছিল। সব কথাই পুরনো কথা। নতুন কথার মধ্যে বললেন, ঠাকুরজামাই আর বলব না আপনাকে, তার থেকে দাদা বলব।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মানে?

—মানে? মানে সব গোলমাল হয়ে গেছে দাদা। সব গোলমাল হয়ে গেছে। আজ ভেবে পাচ্ছি না, যাকে পেয়েছিলাম, তাকে চেয়েছিলাম কিনা? এত তো লড়াই করেছিলাম মাসীর সঙ্গে সে কি ওই মানুষটার জন্যে, না মানুষটাকে মাসী চেয়েছিল বলে ওকে কেড়ে নেবার ছুতো করে লড়াই বাধিয়েছিলাম। তাকে যদি না চেয়েছিলাম তো চেয়েছিলাম কাকে?

দাদা—ভিড় করে আসে মানুষের মিছিল।

অকপটে এই গঙ্গার ঘাটে বসে স্বীকার করছি—কাকে চেয়েছিলাম, এই প্রশ্ন যখন নিজেকে নিজে করি, তখন কত মুখ যে ভেসে ওঠে তার আর হিসেব-কিতেব নেই। তার মধ্যে পথিক আছে, ভিক্ষুক আছে, রাজা আছে—

থাক। দাদা ওসব কথা থাক। যাকে চাই তাকে পাই না, তাকে জানি না, তাকে চিনি না। যাকে পাই যে আসে কাছে তাকে চাই না, যদিবা দায়ে পড়ে তার হাত ধরি তো তারপর থেকে পালাবার পথ খুঁজি।

নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেহটা যেন নতুন করে নিয়মকানুন করে নবীন হয়ে উঠল। শরীরে ভাল আছি।

কথাটা মিথ্যে নয়।

হেসে বললেন, নিজেকে বিশ্বাস করি নে। মরণের পথ তাকিয়ে আছি। বড় কৃচ্ছ্রসাধন করে কঠিন করে বেঁধে রেখেছি।

• • •

সেই মণি-বউদি মারা গেছেন।

চিঠি এসেছে।

শ্রাদ্ধ করছে, দলিলের সর্তানুযায়ী অমৃতবাবুর উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমি জানি স্বর্গে থাকলে মণিমালা পিণ্ডের অপেক্ষা না করেই সে স্বর্গে গিয়েছে।

অন্ততঃ নিজের মনে-মনে স্মরণীয় পঞ্চকন্যার নামের সঙ্গে মণিমালার নাম ষষ্ঠ নাম হিসেবে জুড়ে দিয়ে তাঁর তর্পণ করলাম। দু ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল। মণি-বউদি আমার আদরিণী গরবিণী—তিনি স্মরণীয়, তিনি বরণীয়। অন্ততঃ আমার কাছে। স্ফটিকে গড়া নারীমূর্তি, তাঁর গায়ে কালি কাদা কলঙ্ক কোন কিছুর ছিটে লাগে না, দাগ ধরে না। অমলিনা আমার মণি-বউদি।

মধ্যে মধ্যে আর একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারছে।

মণি-বউদি কি আমার ভারতবর্ষ?

কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেবস্থান সাধু দৈবজ্ঞ খুঁজেছেন, আবার লিপস্টিক রুজ মেখে আধুনিকা সেজে পার্টি আলো করে বসেছেন। তারপর স্বাধীনা হয়ে সমস্ত অতীত সংস্কারকে বর্জন করে বিদেশের অভ্যর্থনার আসরে সর্বসংস্কারহীনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন? কিন্তু? শেষটা যে মেলে না।

পরবর্তী কোন কালে আবার একটি সন্ধানের তপস্যা কি তাঁকে প্রণোদিত করবে?

(শেষ)

মনোভূমি সমতল॥ [illegible] বসু

হঠাৎ ঘুঘুর ডাক,
চকিতে স্বদেশ!
কতদূরে এ শহর
দুভাগ বুদা ও পেস্ট
দুয়ে মিলে এক,—
মাঝখানে নদী দানিয়ুব।

নিরালা আপন ঘরে
হোটেল রয়ালে
বেশ আছি একান্তে বিভোর;
দুঃসংবাদ আকাশবাণীর,
সঙ্গে সঙ্গে দুঃসহ আবহাওয়া:
বাইরে ঘুঘুর ডাক,
অকস্মাৎ চিন্তায় ভারত!

আসলে মাটি তো একই
কি দূর-নিকট: আকাশেরই
প্রেমধারা বৃষ্টিতে জীবন—
নবাঙ্কুর মাঠে মাঠে,
সৃষ্টির রহস্য-রূপ একই দেশে দেশে।

মানুষের মনোভূমি
মাটির চেয়েও যেন
আরো সমতল!
তবু কেন পরস্পরে
বন্ধু মোরা নই,
ভিয়েতনামের পর
আরব-ইস্রাইলে
সেই মন কেনবা বিকল?
অথচ পাখির ডাকে
সে মানুষই সর্বত্র চঞ্চল!

তোমার জন্যে॥ শংকর দে

হাতের মধ্যে হাত ধরে কি থাকার সময়
এখন হলো
ছেঁড়া মেঘের মতোই আমি চিঠি পেয়েছি
জলতরঙ্গে
রক্ত যেমন ঝরে পড়ছে বুকের থেকে
হাতের মধ্যে হাত ধরে কি থাকার সময়
এখন হলো

তুমি বললে, চোরাবালির মধ্যে দাঁড়াও
একা আমিই ডুবতে পারি তোমার জন্যে
উড়ো মেঘের মতোই আমি চিঠি পেয়েছি
জলতরঙ্গে
রক্ত যেমন ঝরে পড়ছে বুকের থেকে
হাতের মধ্যে হাত ধরে কি থাকার সময়
এখন হলো

তুমি বললে জঙ্গলেতে থাকো, কাঠের মতোই
এই যে জীবন
ফুলের মতোই পদতলের—দুঃখ যেমন
বুকের কাছে এই পোড়া হাত ধরেই থেকো—
ছেঁড়া মেঘের মতোই আমি চিঠি পেয়েছি
জলতরঙ্গে
রক্ত যেমন ঝরে পড়ছে বুকের থেকে
হাতের মধ্যে হাত ধরে কি দেখার সময়
এখন হলো।

উত্তাপ

দীপক চৌধুরী

ভীষণ গরম পড়েছে। কলকাতার রাস্তা-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও তাপমাত্রা এতো বেশি ওপরে ওঠে নি। ভীষণ গরম! কি করব, কোথায় পালাব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। পাহাড়-পর্বতে ওঠবার মতো আর্থিক অবস্থা আমার সচ্ছল নয়। শুধু টিকিট কেটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেই তো চলবে না। আগে থেকে হোটেলের ঘর ভাড়া করবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আগাম টাকা না পাঠালে বন্দোবস্ত পাকা হয় না। উত্তাপ যত বাড়ছে কলকাতা থেকে পালাবার আকাঙ্ক্ষা তত প্রবল হচ্ছে। একা মানুষ। একটা সুটকেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল।

সময় নষ্ট না করে পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম। শেয়ালদা গিয়ে ফারাক্কার একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে ফেললাম। অসুবিধে কিছু হল না। সন্ধ্যের মধ্যে ফারাক্কা পৌঁছে যাব বলে বার্থ রিজার্ভ করবার দরকার নেই। বসবার জন্য একটা সীট পেলেই হল।

বুকিং-ক্লার্ক হিসেব করে দেখলেন, বসে যাওয়ার মতো সীট মাত্র একটাই আছে। দার্জিলিং মেইল। ভিড় খুব বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো ক্লাসেই তিল ধারণের জায়গা নেই। গাড়ি ছাড়বার আর মাত্র আধ ঘন্টা বাকী।

একটা কুপে কম্পার্টমেন্টে বসবার জায়গা করে দিলেন রেলের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারী। দিনের বেলা তিনজন বসে যেতে পারে। তাতে অন্য যাত্রী দুজন আপত্তি করতে পারেন না। ভেতরে ঢুকে দেখলাম অন্য যাত্রী দুজন তখনো এসে পৌঁছতে পারেন নি। অতএব আমি গিয়ে জানলার ধার ঘেঁষে বসে পড়লাম।

কামাখ্যা যাচ্ছি অতীনের কাছে। অতীন সেখানে নতুন চাকরি নিয়ে গিয়েছে। বাঁধ তৈরি করবার ইঞ্জিনীয়ার সে। ব্যাচিলার মানুষ। ওখানে গিয়ে কয়েকটা দিন থেকে আসবার জন্য বার কয়েক অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল অতীন। লিখেছিল, নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় অতি সুন্দর একটা বাংলোয় বাস করে সে। এখনো ব্যাচিলার। এখনো বন্ধু-বান্ধবদের চব্বিশ ঘন্টা সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ আছে। বিয়ের পরে সঙ্গ দেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে না। প্রায় তিন সপ্তাহ আগে অতীন তার শেষ চিঠি লিখেছিল যে, বিয়ের বাজারে ইঞ্জিনীয়ারদের দাম এখন অনেক। মা কলকাতা থেকে পালাতে চাইছেন। কয়েক-শত পাত্রীর পিতা তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। সেই শেষ চিঠিতেই অতীন লিখেছিল, 'হয়তো দু-এক মাসের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলতে পারি। প্রেমের বিয়ে নয়, সামাজিক বিয়ে। মা নাকি মেয়েটিকে নিজের চোখের সামনে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন। সতী-লক্ষ্মী টাইপের মেয়ে। অতি আধুনিক সমাজে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সীতা-সাবিত্রীর আদর্শের প্রতি গভীর অনুরক্তি। হাতে জরুরী কাজ না থাকলে কয়েকটা দিন এখানে এসে থেকে যা। এখানেও গরম। প্রচণ্ড উত্তাপ। কিন্তু কলকাতার চেয়ে অনেক কম।'

নদীর ধারে বাংলো, উত্তাপ কম হওয়াই উচিত। অতএব অতীনের কাছে দিন সাতেক থাকব বলেই রওনা হয়ে পড়লাম। এর মধ্যে যদি বৃষ্টি না শুরু হয় তাহলে দু সপ্তাহ থেকে যেতে পারি। এই দারুণ গ্রীষ্মে বিয়ে করবার কোন মানে হয় না। কলকাতার যা অবস্থা তাতে মানুষের পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অতীনকে বলব, মেয়েটি যখন সতী-লক্ষ্মী টাইপের তখন সে অনায়াসেই শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। কয়েকটা মাস দেহের উত্তাপ চেপে রাখা অসম্ভব হবে না।

গাড়ি ছাড়বার মিনিট পাঁচেক আগে যাত্রী দুজন এসে উপস্থিত হলেন। মালপত্র আর যাত্রী দুজনকে দেখে মনে হল এঁরা বেশ ধনী। বিলেতী চামড়ার বড় বড় দুটো সুটকেস, শৌখিন ডিজাইনের বেতের বাস্কেট একটা। তার মধ্যে দেখলাম গোটা কয়েক ফল, দু বাক্স পেস্ট্রি-প্যাটিজ এবং টুকিটাকি আরো কয়েকটা জিনিস রয়েছে। ভদ্রলোকটি কামরায় ঢুকেই প্রথমে র‍্যাকেটের মুখে প্রকাণ্ড বড় একটা চামড়ার ফ্লাক্স ঝুলিয়ে রাখলেন। মনে হল ঐ জিনিসটার প্রতিই তিনি সবচেয়ে বেশী সতর্কতা অবলম্বন করছেন। ওতে কি আছে? জল, না অন্য কিছু? কুলিটা চলে যাওয়ার পর ভদ্র-লোকটি বললেন, 'লতু, তোর জলের ফ্লাক্সটা কোথায় রাখলি? মেয়েটি বলল, 'বাস্কেটের মধ্যে আছে, বাবা।'

এঁরা দার্জিলিং যাচ্ছেন। সুটকেসের গায়ে লেবেল লাগানো রয়েছে। ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ হবে। দেখতে মোটাসোটা। মাথায় টাক পড়েছে। সুখী লোক। তিন-চারটে পাখা পূর্ণ গতিতে ঘুরছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গলগল করে ঘামছিলেন। মেয়েটির অবস্থাও তাই। বছর বাইশ কি তেইশ বয়স। লোভনীয় স্বাস্থ্য। হাতকাটা ব্লাউজ পরেছে। কাপড়টা এতো পাতলা যে, অন্তর্বাসটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। গলার চারদিক দিয়ে ঘামের বিন্দু গড়িয়ে পড়ে ব্লাউজের মাঝখানটা ভিজে উঠেছে। লেপ্টে বসে গিয়েছে গায়ের চামড়ার সঙ্গে। বুকের মাঝখানটার রঙ যে হাতের রং-এর চেয়ে বেশি ফর্সা সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হল না।

আদুরে মেয়েটি যে সতী-লক্ষ্মী টাইপের তাতে আর সন্দেহ নেই। সে বলল, 'বাবা, তুমি মাঝখানে বসো।'

'বেশ, বেশ তাই বসছি।' ভদ্রলোকটি সরে এলেন আমার দিকে। আমার আর মেয়েটির মধ্যে বেশ পুরু একটা প্রাচীরের সৃষ্টি হল। নিজেকে যথাসাধ্য গুটিয়ে নিয়ে মেয়েটি সরে বসল উল্টো কোণার দিকে।

'কামাক্ষায় পৌঁছতে ক ঘন্টা লাগবে, বাবা?'

'সাত কি সাড়ে সাত ঘন্টা।'

'তারপর নদী পার হয়ে আবার ট্রেনে চেপে বসতে হবে। কী বোরিং!'

'তোর জন্যই তো প্লেনে চেপে দার্জিলিং চলেছি। এই প্রথম—মন্দ কী, নতুন অভিজ্ঞতা। কেবল পথে খেতে যাবে। হ্যাঁরে লতু, সঙ্গে কোন বই-টই এনেছিস?'

'না, বাবা।'

'যাক, আমি একটা ম্যাগাজিন কিনে এনেছি। সময় কাটাতে হবে তো।' ভদ্র-লোকটি একটু কাত হয়ে বসে প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে একটা ম্যাগাজিন বার করলেন। বাংলা সাপ্তাহিকের একটা বিশেষ সংখ্যা।

কাগজটা দেখতে পেয়েই মেয়েটি নাসিকা কুঞ্চিত করে ঘৃণা প্রকাশের ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'ছি, ছি, এ করেছ কি বাবা?'

'কি করেছি?'

'কী ভীষণ অশ্লীল একটা উপন্যাস আছে এতে!'

'তুই কি করে জানলি?'

'বন্ধুরা আমায় বলেছে। ঐ লোকটা নাকি অশ্লীল লেখা ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারে না।'

'কোন্ লোকটা?'

'অমলেশ মিত্র।'

বাবা আর মেয়ে দুজনেই একসঙ্গে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। হয়ত ভাবলেন যে, ঐ বিশেষ লেখকটির লেখা আমার কাছে ভাল লাগতে পারে। সেইজন্য তৃতীয় ব্যক্তির সামনে বিরূপ সমালোচনা করা উচিত হয় নি।

ভদ্রলোক যখন পত্রিকাটির পাতা ওল্টাতে গেলেন মেয়েটি তখন ফস করে কাগজটা টেনে নিয়ে বলল, 'না বাবা, তুমি পড়তে পারবে না। নর্দমায় ফেলে দাও।'

'এখানে তুই নর্দমা পাবি কোথায়? চলন্ত ট্রেনে হাল্কা জিনিসই পড়তে হয়।'

'এ হাল্কা নয়, অশ্লীল। সংসারে এতো অশ্লীল ব্যাপার ঘটতেই পারে না। দুর্নীতিরও সীমা থাকে।'

'কাগজটা আমায় দে—' মেয়েটি সহজেই কাগজটা এবার ছেড়ে দিল। তার-পর ভদ্রলোকটি বললেন, 'তুই তো এখনো সংসারে প্রবেশ করিস নি, কি করে জানলি?'

'বন্ধুরা বলেছে। তারা জানে।'

'সে সব বন্ধুর সঙ্গে তোর মেশা উচিত নয়, লতু।'

তন্ময় হয়ে উপন্যাস পড়তে লাগলেন ভদ্রলোকটি। খানিকক্ষণ পর তিনি আমার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে বসে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়বার জন্য লতুকে জায়গা করে দিলেন। হেলান দিয়ে বসে লতু ঝিমোচ্ছিল।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলাম আমি। বর্ধমান পার হয়ে এসেছি। খোলা জানলা দিয়ে গরম হাওয়া ভেতরে প্রবেশ করছিল। বর্ধমান পার হয়ে আসবার পরে হাওয়া আরো বেশি গরম হয়ে উঠল। ভদ্রলোকটির কপাল থেকে ঘামের বিন্দু গড়িয়ে পড়ছিল ম্যাগাজিনের ওপর। মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত লতুর দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলাম আমি। সতী-লক্ষ্মী টাইপের মেয়ে হলেও দেখলাম হঠাৎ এক সময়ে ঘুরে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কণ্ঠাস্থির তলায় অনেকটা জায়গা ঘর্মাক্ত। শাড়ির আঁচলটা প্রথমে বুকের ওপরেই ছিল। তার-পর বোধহয় উত্তাপ বাড়ার জন্যই আঁচলটা টেনে ফেলে দিয়েছিল পায়ের দিকে। আমি সুপুরুষ। গর্ব করবার মতো স্বাস্থ্যও

আমার। বোধহয় সেই কারণেই বৌদিকল পর্যন্ত আঁচলটা সে বুকের ওপর ফেলে রাখতে পারে নি।

বোলপুর পার হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি মোড়ামুড়ি দিয়ে কাৎ হয়ে শুলো। বাঁ হাতটা পিতার স্থূল পশ্চাৎ ভাগের পাশ দিয়ে ঠেলে তুলে দিল ওপর দিকে। যেন ওর অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে বাঁ হাতের আঙুলগুলো আমার উরুর মাংসে খোঁচা মারতে লাগল। কাঁরিডোর ট্রেনের কামরাটা ছোট। সেই অনুপাতে বেঞ্চটাকেও ছোট করে তৈরি করা হয়েছে। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে তিনজন যাত্রী কোনরকমে বসে যেতে পারে। কিন্তু একজন শুয়ে পড়লে অপর দুজনের অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক। উপন্যাস পড়তে পড়তে ভদ্রলোকটি এতো বেশি তন্ময় হয়ে গিয়েছেন যে, বোলপুর পার হয়ে যাওয়ার পরেই তিনি ঘর্মাক্ত দেহটার একটা অংশ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় বীরভূমের ফাটা মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না। মাইলের পর মাইল মাঠ পার হয়ে যাচ্ছি। এক গাছা তৃণ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। মাটির তলা থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প বেরুচ্ছে। ভেতরে বাইরে সর্বত্রই উত্তাপ। রামপুরহাট পেঁছিবার আগেই দেখলাম একজন বৃদ্ধ মুসলমান ফাঁকা মাঠে বসে নমাজ পড়ছে। একটা লাঠি আর একটা ছাতা ছাড়া এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এমন কি একটা শুকনো গাছ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

উরুর মাংসে খোঁচা খাচ্ছি আর গায়ের চামড়ায় বীরভূমের ফাটা মাটির উত্তাপ অনুভব করছি। সন্দেহ হল, সতী-লক্ষ্মী টাইপের মেয়েটি বোধহয় ঘুমায় নি। মাটির জ্বালা নিজের দেহেও অনুভব করছে সে। ভদ্রলোকটি তন্ময় হয়ে উপন্যাস পড়ছেন আর মাঝে মাঝে চামড়ার ফ্লাস্ক থেকে জল খাচ্ছেন। ঘণ্টা খানিক জল খাওয়ার পর তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটু আচ্ছন্ন ভাবের সৃষ্টি হল। রামপুরহাট পার হয়ে যাওয়ার পর ভদ্রলোকটি রীতিমতো মাতলামি শুরু করলেন। থুৎনিটা আমার ঘাড়ের ওপর ঘষে দিয়ে অতীব এক সুখানুভূতির ভঙ্গী করে ফিসফিস সুরে তিনি আমায় বললেন 'মশাই, আপনাদের এই অমলেশ মিত্র খাসা উপন্যাস লিখেছে। আমি তার ভক্ত হয়ে গেলাম।'

মদ খেয়ে, না উপন্যাস পড়ে লোকটি নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন আমি তা বুঝতে পারলাম না। চুপ করে বসে রইলাম আমি। এমনভাবে কোণঠাসা হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে যে, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বাথরুমেও যেতে পারছি না। উঠতে গেলে শুধু এই ভদ্রলোকটিকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলেই চলবে না, মেয়েটির আঙুলের খোঁচা থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে হবে। বিচিত্র একটা অবস্থার মধ্যে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম আমি। পিতা আর কন্যার গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। বাইরে থেকে আসছে গরম হাওয়া। গলাটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। অথচ জল খাওয়ার উপায় নেই। বোতলে ভরে আমিও জল নিয়ে এসেছিলাম। উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে বোতলটা আনতে

...মেয়েটি মোড়ামুড়ি দিয়ে কাৎ হয়ে শুলো।

গেলে পিতা আর কন্যা দুজনকেই ধাক্কা মারতে হয়। এঁদের সুখানুভূতির সুন্দর অবস্থাটা যায় ভেঙে। ছোট্ট এই কামরাটার কোণটুকু জুড়ে প্রচুর পরিমাণে উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে। দেহের উত্তাপের ঘনত্বই এখন বেশি। মনে হল ভদ্রলোকটি এখন উপন্যাসের ক্লাইমেক্সের কাছে এগিয়ে এসেছেন। আমার বাঁ হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাংসপেশী কচলাতে লাগলেন তিনি। প্রতিবাদ কিংবা আপত্তি করলাম না। পরিস্থিতিটার মতো আমিও বোধহয় সুখানুভূতির সন্ধান পেয়েছিলাম। মদোন্মত্ত পিতা আর মদালসা কন্যার হস্তচালনায় স্পন্দন অনুভব করতে করতে ক্লাইমেক্সের দিকে এগিয়ে চললাম আমি। বীরভূমের ফাটা মাটির উত্তাপ এখন যেন নিতান্তই জোলো-জোলো ঠেকছে।

হঠাৎ এক সময়ে ভদ্রলোকটি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'উপন্যাসটা পড়েছেন আপনি?'

'না।'

'লোভ সংবরণ করলেন কি করে? খাসা উপন্যাস। অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন উপন্যাস অমলেশ মিত্র লিখতে পারত না। অবিবাহিতা হলেই যে মেয়েরা সেই ব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকবে তার কোনো মানে নেই, মশাই।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'সেই ব্যাপারে — অর্থাৎ —' ঘুমন্ত কন্যার দিকে চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, 'আপনি দেখছি মশাই নেহাতই একটি বালক। বিয়েসাদি করেন নি বুঝি?'

'আজ্ঞে না।'

'সেই চরম ব্যাপারটির স্বাদ পান নি?'

'পেলেই বা আপনাকে বলব কেন?'

'এই তো শিল্পীর মতো কথা। নগ্ন সত্যকে লুকিয়ে রাখতে হবে। লতু—অর্থাৎ লতিকা এসব কথা বুঝতে পারে না। সতী-লক্ষ্মী টাইপের মেয়ে। এক সপ্তাহ পরে বিয়ে হবে। কলকাতার উত্তাপ থেকে এক সপ্তাহের জন্য সরিয়ে নিয়ে এলাম। বিয়ের চারদিন পরেই স্বামীর সঙ্গে বিলেত চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাই বলুন মশাই, উপন্যাসের নায়িকা মধুমিতা সান্যালের সঙ্গে অমলেশ মিত্রের নিশ্চয়ই ইয়ে হয়েছিল। নইলে এ-বই সে লিখতে পারত না। চরম অভিজ্ঞতার একেবারে নিম্নতম প্রদেশে বসে বইটি লেখা—সেই জন্যই লেখাটা অশ্লীল নয়।'

উরুর তলায় পাঁচ আঙুলের নখাগ্র আমার নৈতিক সংযমকে শিথিল করে ফেলবার উপক্রম করল।

'আমি বললাম, ফারাক্কায় পৌঁছতে আর মাত্র ঘন্টা খানিক বাকী। মেয়েকে এবার তুলে দিন। তা ছাড়া প্রায় সাত ঘন্টা ধরে একই জায়গায় বসে রয়েছি। সারা দেহে বাতের ব্যথা অনুভব করছি।'

ভদ্রলোক সরে বসে মেয়েকে ডাকলেন, 'লতু, লতু—ওরে, ফারাক্কায় পৌঁছতে আর মাত্র এক ঘন্টা বাকী। উঠে পড়।'

ফ্লাস্কের শেষ জলটুকু খেয়ে ফেলে বললেন, 'আর মাত্র দুটো পাতা বাকী। শেষ করে ফেলি।'

আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে লতিকা উঠে বসল। চোখ দেখে মনে হল মেয়েটি এক মিনিটও ঘুময় নি। এতক্ষণ ধরে সতী-লক্ষ্মী টাইপের মেয়েটি বোধহয় শুধু ঘুমের ভান করছিল।

হঠাৎ ম্যাগাজিনটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞাসা করল সে, 'বাবা, কোন্ জায়গাটা পড়ছ এখন?'

'শেষ দুটো পাতা।'

'শেষ দুটো পাতা? ছি, ছি ঐ জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি অশ্লীল! না, তুমি পড়তে পারবে না—'

'বিরক্ত করিস নে—সরে বস।'

'দাঁড়াও কলকাতা ফিরে গিয়ে মা-কে বলে দেব।'

'কি বলবি?'

'বলব যে তুমি অশ্লীল উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করেছ। ছি বাবা! শেষের পাতা দুটো তুমি পড়ো না—দাও, দাও বলছি—' ম্যাগাজিনটা চেপে ধরল লতিকা।

'তুই কি করে জানলি যে, শেষের পাতা দুটোই সবচেয়ে বেশি অশ্লীল?'

'জানি, ওখানেই মধুমিতা সান্যাল চরম দুর্নীতির পাঁকে পা দিচ্ছে।—বন্ধুরা আমায় বলেছে।'

কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম আমি। মেয়েটি সত্য গোপন করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা জন্মাল যে, ঐ উপন্যাসটা মেয়েটি শুধু একবার নয় বহুবার পড়েছে।

দুজনেই ম্যাগাজিনটা শক্ত করে ধরে রাখল। দুজনেই টানাটানি করছিল বটে, কিন্তু ভদ্রলোকটি শেষ পাতাটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। লাইনগুলো পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হল, প্রতিটি কথা তিনি চোখ দিয়ে গিলছেন। শেষ লাইনটা পড়ে ফেলবার পর যেন অসীম তৃপ্তিলাভ করলেন। যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হয়ে বন্দরে পৌঁছলেন তিনি।

'দাও বাবা, জানলা দিয়ে ফেলে দিই কাগজটা।'

ছেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। কাগজটার আর কোন দাম নেই তাঁর কাছে। পড়া হয়ে গিয়েছে। এখন এটা শবদেহের মতো প্রাণহীন। সন্তানের পিতা তিনি। দুবার পড়বার দরকার হবে না।

লতিকা কিন্তু কাগজটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল না। আমি দেখলাম, মুড়ে নিয়ে ম্যাগাজিনটা সে নিজের হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে গুঁজে রেখে দিল।

আমার দিকে চেয়ে সহসা প্রশ্ন করল লতিকা, 'আপনি কেন মুখ টিপে টিপে হাসছেন?'

'আপনার সত্য গোপনের হাস্যকর চেষ্টা দেখে।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন—' ভদ্রলোক উঠে-পড়ে বললেন, 'গোপনের মধ্যে যদি মুন্সিয়ানা থাকত তাহলে উনি হাসতেন না। শিল্প-ব্যাখ্যায় আঙ্গিকের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। বুঝলি লতু, অমলেশ মিত্রের মুন্সিয়ানা আমায় মুগ্ধ করেছে। অভিজ্ঞতার আলোয় লুকনো সত্যটি আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি—ও কি করলি?'

'ম্যাগাজিনটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম।'

'ফেলার মধ্যেও মুন্সিয়ানা থাকা চাই। ভদ্রলোকের নাকের ডগা স্পর্শ করে গেল! আঘাত দিলি।'

'কি করব, উনি তো সেই বেলা বারোটা থেকে জানলার ধার ঘেঁষে বসে রয়েছেন। সবটুকু সুবিধা উপভোগ করছেন।'

লজ্জিত বোধ করলাম আমি। বললাম, 'আসুন জানলার ধারে এসে বসুন। এতক্ষণ পর্যন্ত নড়েচড়ে বসবার সুযোগ পাই নি।'

'কেন পান নি? বাধা দিল কে?'

জবাব দিলাম না। মেয়েটির চোখের দিকে শুধু দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলাম।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যা না লতু, জানলার কাছে গিয়ে বসে পড়।'

'না, বাবা। এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কিছুই আর দেখতে পাব না।'

'দিনের বেলাতেও কিছু দেখবার ছিল না। মাটির বুক থেকে শুধু উত্তাপ উঠছিল। জানলার ধারে বসে জ্বালা অনুভব করছিলাম আমি।' আমার কথা শুনে মেয়েটি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

ভদ্রলোকটি দেয়াল ধরে ধরে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবার করি-ডোরের মধ্যে পা ফেলতে গিয়ে বেশ খানিকটা টলমল করে উঠলেন। বাইরে বেরিয়ে বাথরুম পর্যন্ত পৌঁছতে কি যে অবস্থা হবে জানি না। তাঁর টলমল অবস্থাটা মেয়েটিরও চোখে পড়েছিল। করি-

ভোরের মধ্যে অদৃশ্য হওয়ার পর লতিকা আমার দিকে ঘুরে বসল। মনে হল আমার দিকে যেন বেশ খানিকটা এগিয়েও এল। শাড়ির আঁচলটা হঠাৎ কি কারণে যে স্থানচ্যুত হল তাও আমি বুঝতে পারলাম না। বক্ষের সৌন্দর্য চেয়ে দেখবার মতো। কিন্তু আমাকে দেখিয়ে লাভ কি? সাত দিন পরেই তো বিয়ে হয়ে যাবে ওর। স্থানবিশেষে মেয়েদের মনের রাজ্যে নীতি-দুর্নীতির সীমানাটা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? প্রণয়ের ভানের মধ্যে যে দুর্নীতি থাকতে পারে তেমন কথা স্বীকার করে না ওরা।

শাড়ির আঁচলটা পুনরায় যথাস্থানে তুলে দিয়ে লতিকা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবার পা দুটো টলমল করছিল কেন?'

'বোধহয় উপন্যাসটা পড়তে পড়তে নেশা ধরে গিয়েছে।'

'না, এ তো মদ-খাওয়ার নেশা!'

'তাহলে বোধহয় মদই খাচ্ছিলেন।'

গন্ধ পাইনি তো?

'জীন্-মদের গন্ধ নেই।'

'অথচ বাবা বললেন যে, চামড়ার ফ্লাস্কে জল ভরে এনেছেন!'

'বয়স্ক ব্যক্তিদের ধারণা, সত্যকে গোপন করে রাখাটাই হচ্ছে আর্ট। আধুনিক লেখকরা এ-কথাটা পুরোপুরি স্বীকার করেন না।'

'আপনি বুঝি অমলেশ মিত্রের কথা বলছেন? উঃ, কী অশ্লীল উপন্যাসই লিখেছে লোকটা!' মেয়েটি আরো একটু আমার দিকে সরে বসল। দুজনের মাঝখানে ব্যবধানটা একটা সরু সুতোর আকার ধারণ করল। ওর বর্মাক্ত দেহাভ্যন্তর থেকে বিলেতী সেন্টের গন্ধটুকু উড়ে না এলে পকেট থেকে রুমাল বার করতাম আমি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিও কি দার্জিলিং যাচ্ছেন?'

'না। আমার যাত্রা ফারাক্কা পর্যন্ত।'

'আমার ভাবী স্বামী ফারাক্কায় থাকেন।'

'কি করেন?'

'ইঞ্জিনীয়ার। আজ আমাদের সংগে এখানে দেখা করতে আসবেন। কাল চলে যাবেন কলকাতায়। গভর্নমেণ্ট ওঁকে বিলেত পাঠাচ্ছে। অবিশ্যি আমিও সংগে যাচ্ছি। সেখানে দু' বছর থাকব আমরা। আপনি কদিন থাকবেন ফারাক্কায়?'

'ভেবেছিলাম অন্তত সাতদিন থাকব—'

'কোনো কাজে এসেছেন বুঝি?' আরো একটু ঝুঁকে বসতে গেল মেয়েটি, সুতোর মতো সরু ব্যবধানটুকু আর রইল না। শাড়ির আঁচলটাও দ্বিতীয়বার বুকের ওপর থেকে স্থানচ্যুত হল।

আমি সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবধানটুকু বজায় রাখবার উপায় ছিল না আর। জানলার দিকে সিকি ইঞ্চিও জায়গা নেই। এখন ওর বাবা যদি এসে না পড়েন, তাহলে যাত্রা পর্যন্ত ঠিক এমনিভাবে কোণঠাসা হয়ে বসে থাকতে হবে।

ভদ্রলোকটি এলেন না। বোধহয় নেশা কাটাবার চেষ্টা করছেন। নেশা কাটাবার উদ্দেশ্যেই তিনি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ের কাছে ধরা দিতে চান না। কে জানে সারা সংসারটা জুড়েই হয়তো এই ধরনের লুকোচুরির খেলা চলছে। অমলেশ মিত্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বোধহয় তার উপন্যাসের মূল চরিত্র এরাই।

আমি চুপ করে বসেছিলাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু উত্তাপ কমেনি। উত্তাপ শুধু সূর্য-রশ্মি থেকে সৃষ্টি হয় না, দেহ থেকেও সৃষ্টি হয়। তার ওপরে কখন যে হাওয়া চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। বাইরে বোধহয় গাছের পাতাও নড়ছে না। মন আর দেহ এমনভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে যে, সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে তাকাতেও সাহস পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ কোন্ সময়ে যেন পাখাগুলোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড উত্তাপ! প্রতিটি রোমকূপে থকথকে কাদা জমে ওঠার অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি আর নেই। বেচারী অতীন!

মেয়েটি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল, 'এখানে কোনো কাজে এসেছেন বুঝি?'

দমবন্ধ করা আবহাওয়া থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলাম আমি। পথটা খুঁজে দিল লতিকা।

আমি বললাম, 'না, কোনো কাজে আসিনি। কলকাতার গরম আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম বন্ধুর কাছে দিন-সাতেক কাটিয়ে যাব। নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় সুন্দর বাংলো—'

'কি কাজ করেন বন্ধুটি?'

'ইঞ্জিনীয়ার।'

'ইঞ্জিনীয়ার?' কেমন যেন আঁৎকে উঠল মেয়েটি।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

সংগে সংগে মেয়েটি আঁচলটা টেনে তুলে ফেলল ঘাড়ের ওপর। প্রান্তটাকে ঘুরিয়ে এনে ওপরের অংশটাকে দুর্গের মতো সুরক্ষিত করে রাখল। তারপর সরে বসল দূরে। একটুও লজ্জা বোধ করল না। কাজগুলো সে এমন স্বাভাবিকভাবে করে গেল যে, মনে হল, আমার উপস্থিতিটা ওর চোখেই পড়েনি। নীতি-দুর্নীতির সীমানাটা হঠাৎ যেন ওর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। যেন ইঞ্জিনীয়ার ব্যক্তিটি সহসা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। ফারাক্কায় হয়তো আরো অনেক অবিবাহিত ইঞ্জিনীয়ার আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বন্ধুটিকেই সে তার ভাবী স্বামী বলে ভেবে নিল। মেয়েদের সহজাত বুদ্ধিকে তারিফ না করে পারলাম না।

গাড়ির গতি কমে আসতেই ভদ্রলোকটি এসে কামরায় ঢুকে পড়লেন। মুখের ভাঁজে আনন্দের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'লতু, করিডোরের জানলা দিয়ে দেখলাম, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতীন। কখন থেকে অপেক্ষা করছে কে জানে। মাত্র একবার দেখেছে তোকে। চিনতে পারলে হয়। আমি বরং দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই।'

তার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ভেতর থেকে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়ের নামটা কি জানতে পারি?'

'অমলেশ মিত্র।'

'কোন্ অমলেশ মিত্র?' প্রশ্ন করল লতিকা।

জবাব দেওয়ার সময় পেলাম না। গাড়িটা থামবার সংগে সংগে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে পড়লাম নিচে। অতীনের সংগে দেখা না হওয়াই উচিত।

অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম, আমি শুধু ঔপন্যাসিক অমলেশ মিত্র নই, আমি ঐ মেয়েটির ভাবী স্বামীর বন্ধুও বটে।

সতী-লক্ষ্মী টাইপের লতিকা অতীনকে সুখী করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অমৃত বাজার পত্রিকা ও মাহেশের রথ

সুশান্তকুমার মিত্র

মাহেশের রথ বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। দুশো বছরের ঐতিহ্যবাহী এই রথ প্রতি বছরই টানা হয়ে আসছে নিয়মিত। কেবল একটি বছর এই অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। বৃটিশ আমলে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের জেদ ও ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্যে সেদিন বাংলাদেশের ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ ক'রে বহু পুণ্যার্থীকে হতাশ ও নিরাশ করা হয়েছিল। জাগ্রত দেবতার অপমানে সেদিন পরাধীন বাংলাদেশ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যে-সংগ্রাম করেছিল তা ইতিহাসের রথচক্রে হয়তো ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশ কোন দিন সে ঘটনাকে ভুলতে পারবে না। ধর্মের ওপর অত্যাচার ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীকে বেশি করে স্পর্শ করেছিল। এ কথা বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, এই জাতীয় ধর্মীয় অত্যাচার হয়তো উত্তরকালে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ও স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনে অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছিল। ১৮৭৬ সালের এই ঘটনাটি ঐ বছরে ২৯শে জুন (১৬ আষাঢ়, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়।

এই ঘটনাটির একটু ভূমিকা আছে। সেটা জানতে হলে ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। ক্যাম্বেল সাহেব তখন রাজত্ব করছিলেন বাংলাদেশে। কিন্তু রাজকীয় বিষয়ের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রইল না। তিনি এদেশের সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত রীতিনীতির পরিবর্তন করতে চেষ্টা করলেন। প্রতি বছরই রথযাত্রার দিন দুর্ঘটনায় কিছু সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটে। ক্যাম্বেল সাহেবের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হল। তিনি চাইলেন, বাংলাদেশ থেকে রথযাত্রা একেবারে উঠিয়ে দিতে। তাঁর এই ইচ্ছার কথা তিনি জানালেন প্রধান গভর্ণর লর্ড নর্থব্রুককে। নর্থব্রুক এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তবে একটা আদেশ জারী করে ম্যাজিস্ট্রেটকে রথ টানা বা না-টানার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করলেন। আদেশটি হল, রথ টানবার আগে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিস্ট্রেটকে একবার দেখাতে হবে। এর গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করে যদি তাঁরা মনে করেন কোন রকম দুর্ঘটনা বা জীবনহানির সম্ভাবনা আছে, তবে তাঁরা রথ টানা বন্ধ করে দিতে পারেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কায় সেদিন লর্ড নর্থব্রুকের বিরুদ্ধে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই সে শঙ্কা বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

লর্ড নর্থব্রুকের এই আদেশজারীর পর ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে হুগলী ম্যাজিস্ট্রেট মানুষ হত্যার সেই পুরোনো অজুহাত দেখিয়ে রথ টানায় নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কিন্তু মাহেশের রথের তৎকালীন অধিকারী বাবু বিশ্বম্ভর বসু প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার লেসলী সাহেবকে এনে রথ পরীক্ষা করান। লেসলী রথের অবস্থা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন এবং সাবধানতার সঙ্গে রথ টানলে কোন প্রাণহানির সম্ভাবনা নেই বলে সার্টিফিকেট দিলেন। কিন্তু হুগলী ম্যাজিস্ট্রেট সে কথা গ্রাহ্য করলেন না। অবশেষে বিশ্বম্ভরবাবু গভর্ণর জেনারেলের কাছে আবেদন করেন। তিনি লেসলী সাহেবের সার্টিফিকেট দেখে আদেশ দিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট যেন রথ টানায় কোন বাধা সৃষ্টি না করেন। অগত্যা হুগলী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে অনুমতি দিলেন। এইভাবে সে যাত্রায় জগন্নাথের মাহাত্ম্য রক্ষা পায়।

পরের বছর (১৮৭৫) রথ টানার বিরুদ্ধে কেউই কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেন না এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে উৎসব সম্পন্ন হল।

১৮৭৬ সালে তাই সকলেই আশা করেছিল যে এবারও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোন রকম হস্তক্ষেপ করবেন না। পাছে কোন আপত্তি ওঠে তাই রথের গঠনেরও কোন রকম পরিবর্তন করা হল না। উৎসবের জন্যে নিরুদ্বেগে আয়োজন চলছিল। হঠাৎ একদিন হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেব বিশ্বম্ভরবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে রথ সম্পর্কে কয়েকটি পরিবর্তন করতে বলেন। মাহেশের রথ যেন এবার বল্লভপুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, অর্থাৎ রথের কিছু দূরে একখানি লম্বা কাঠ এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে, যাতে চাকার নীচে পড়ে কোন প্রাণহানি না ঘটে। বিশ্বম্ভরবাবু তাতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। চাকার সঙ্গে কাঠের ঘর্ষণে রথের ক্ষতি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এতে হয়তো বড় রকমের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তাতে জীবনহানির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সে কথা তো শুনলেনই না, উপরন্তু রথের যাঁরা অধিকারী তাঁরা কিভাবে রথ পরিচালনা করবেন তার একটা বৃত্তান্ত লিখে শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করলেন। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই
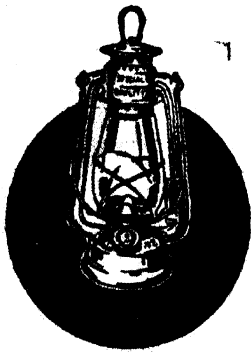
বন্দোবস্ত [illegible] করে এক পরওয়ানা জারি করে মাহেশের রথ টানা বন্ধ করে দিলেন। দিশাহারা হয়ে রথের অধিকারী অবিলম্বে হুগলী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। হুগলী ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং শ্রীরামপুরে উপস্থিত হয়ে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তারপর স্থির হয়, রথের সঙ্গে যদি বাঁশের বেড়া সংলগ্ন করে দেওয়া হয়, তবেই রথ টানতে অনুমতি দেওয়া হবে। বিশ্বম্ভরবাবু এ প্রস্তাবেই সম্মত হলেন এবং বিশ ফুট লম্বা বাঁশের সাহায্যে একটি বেড়া প্রস্তুত করে তা রথ-সংলগ্ন করান।

রথের দিন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রথ পরীক্ষা করতে এলেন। কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তিনি জানালেন, ত্রিশ ফুটের জায়গায় কুড়ি ফুটের বাঁশ দিয়ে বেড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, অতএব রথ টানার অনুমতি দেওয়া গেল না। বিশ্বম্ভরবাবু বল্লেন, কুড়ি ফুটের কথাই তো তিনি শুনেছিলেন। তবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের যখন আপত্তি আছে, তখন তিনি তাঁর আদেশানুযায়ী ত্রিশ ফুট বাঁশের বেড়া অবিলম্বেই করে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। ইতিমধ্যে হুগলী ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে এসে হাজির হলেন এবং রথ পরীক্ষা করে টানার অযোগ্য বলে বিবেচনা করলেন। তখন হাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়। বিশ্বম্ভরবাবু বর্ধমানের কমিশনারের কাছে ছুটলেন শেষ চেষ্টা করার জন্যে। কিন্তু সব শুনে কমিশনার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে হস্তক্ষেপ করতে চাইলেন না। এইখানেই নাটকের যবনিকাপাত হল। রথের দিন অতিবাহিত হয়ে গেল।

বিশ্বম্ভরবাবু লেফটেনেন্ট গভর্ণর টেম্পল সাহেবকে এ সম্বন্ধে টেলিগ্রাফ করেন এবং এই সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তখন দার্জিলিং-এ। তার (wire) মারফৎ উত্তর দিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি জানিয়েছেন কোন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, এ রকম বন্দোবস্ত করে যেন উল্টোরথের দিন রথ টানতে অনুমতি দেওয়া হয়।

এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের প্রাণহানি অপেক্ষা ম্যাজিস্ট্রেটের জেদ বজায় রাখার প্রশ্নটিই ছিল বড়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রজারা অস্থির। তার ওপর আবার ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পরাধীন জনসাধারণকে সেদিন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বহু পুণ্যার্থী সেদিন ভগ্নহৃদয়ে, বিষাদে ও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল। রথের অধিকারীর দোষে উৎসব বন্ধ হলে হয়তো কতকটা সান্ত্বনার কারণ থাকতো, কিন্তু এক স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের এই গর্হিত কাজ বাংলার জনসাধারণ সেদিন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। শত বছরের ঐতিহ্য এবং দেবতার প্রতি অনাচারে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। —"সুসভ্য ম্যাজিস্ট্রেট মনে করিতে পারেন যে একখানি কাষ্ঠ নির্মিত কুৎসিত আকারের যানে প্রস্তর নির্মিত একটি পুতুল উপবিষ্ট করাইয়া তাহা না টানিতে দিলে কিছু রাজকার্য বন্ধ হইবে না।.........আর বাংলার সমুদয় হিন্দু সমাজের মনে এই কষ্ট দেওয়ার ফল কি, অখণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত ম্যাজিস্ট্রেট এমন দূরদর্শী নহেন যে তাহা বুঝিতে পারেন।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বহুবিচিত্র বিপ্লবী কবি

মায়কোভস্কী একদিন উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছেন, স্বরচিত কবিতা, কবিকণ্ঠে অতি মধুর সুরে ধ্বনিত। কবিতা শুনছিলেন ম্যাক্সিম গর্কী, কবিতা শুনতে শুনতে গর্কীর চোখ জলে ভরে এল। কবিতা শুনলেই এমনই ভাবান্তর ঘটত গর্কীর, একথা কিন্তু মায়কোভ্‌স্কী জানতেন না, এই চোখের জল কবির মনে এক অপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করল। এক আশ্চর্য ইন্দ্রজালস্পর্শে যেন তিনি এক মহা-জীবনের সন্ধান পেলেন। তাঁর চোখের সামনে উন্মুক্ত হল এক বিস্ময়কর জীবনের দ্বার। সেই জীবনের আকৃতি অতি ভয়ংকর, অতি-নাটকীয়। এক লেলিহান শিখা যেন সর্বস্ব গ্রাস করতে উদ্যত।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ, চারদিকে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। স্বদেশের আভ্যন্তরীণ মূর্তিও নিদারুণ অশান্তি ও অস্থিরতায় ভরা। এই ঘটনাস্রোত থেকে কবি আপনাকে দূরে রাখতে পারলেন না। তাঁর ককেসীয় বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত হলেও সুখময় স্মৃতি ছিল অন্তরে। কিন্তু এই সুখের মোহে কবি আপনাকে জড়িয়ে রাখতে পারলেন না। বয়ঃসন্ধিকালের কঠিন জীবন মনের গহনে একটা ছাপ রেখে যায়। বিপ্লবের পদধ্বনি কবিকে সচকিত করে তোলে, তারপর কারাজীবনের যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতায় এক মহাকবির জন্ম হল। সুদৃঢ় হল তাঁর প্রত্যয় এবং প্রচন্ড হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যাশা।

কবিতা লিখতে শুরু করলেন মায়-কোভস্কী, উৎপীড়িত, শোষিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত জনগণের জীবনযন্ত্রণার গান কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হল। কিন্তু কোনো সম্পাদক তাঁর কবিতা প্রকাশ করতে নারাজ। পুলিশ সতর্ক হয়ে তাঁর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল। মায়কোভস্কী ছিলেন আর্ট স্কুলের ছাত্র, সেখানকার ডাইরেক্টর একদিন ছাত্রকে বিতাড়িত করলেন।

পথ চলা শুরু হল, দুর্দমনীয় তাঁর আবেগ, কবিতা লেখার বিরাম নেই। মায়-কোভস্কী প্যামফলেট লিখে চলেছেন, নাট্যপ্রযোজনার ' কাজও করছেন, কিন্তু মায়কোভস্কীকে আর সহ্য করা যায় না, সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হল।

জীবন যখন এমনই অকরুণ ভঙ্গীতে প্রায় থমকিয়ে এসেছে, তখনই পাওয়া গেল পুরস্কার। সেই পুরস্কার হোল গর্কীর চোখের জল। মায়কোভস্কীর কাছে এর অর্থ স্বীকৃতি। একজন সংবেদনশীল [illegible] অভিনন্দন।

এমনই এক মুহূর্তে মায়কোভস্কী লিখলেন :

"পৃথিবীর মাথার খুলি
ফাটাবার আজ দরকার।
হাতে পরে নাও
পেতলের ভারী দস্তানা।।"

মায়কোভস্কী এখন একজন চারণ কবি, তিনি নির্ভীক, নির্মম। তাকে সংগ্রাম করতে হবে যত কিছু অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

জর্জীয় গ্রাম বাগদাদীতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন মায়কোভস্কী, তারপর পরিক্রমা শুরু হয়েছে, ককেসাসের মানুষ আর প্রকৃতি তাঁকে মায়াডোরে বেঁধেছিল। এই ককেসসের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ মায়কোভস্কী জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন, জীবনকে ভালোবাসতে শিখে-ছিলেন। যে জীবন নগ্ন ম্রিয়মাণ সেই জীবনকে তিনি দেখলেন :

"সার্টের বাঁধন নেই
নেই জুতার বালাই
কুতাই-এর রোদে পোড়া
জর্জরিত দেহ।।"

মায়কোভস্কীর পিতৃদেব ছিলেন জন-প্রিয় বনরক্ষক। সূর্যোদয়ের মনোহরণ দৃশ্য দেখানোর পুত্র ভ্যাদিমিরকে তিনি অতি-ভোরে উঠিয়ে দিতেন। মায়কোভস্কী অতি-ভোরে উঠে বনপথে বিচরণ করতেন। ককেসীয় পাহাড়ের বিস্ময়কর রূপ দেখতেন কবি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের যেমন সদর স্ট্রীটের বারান্দায় সূর্যোদয়ের সময় "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" মনে জেগেছিল, রবির কর প্রাণের পরে কিভাবে প্রবেশ করে গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান গেয়ে উঠেছিল, তেমনই ভ্যাদিমির মায়কোভস্কী দেখলেন কুয়াশার বক্ষভেদ করে এক অতি-শয় জ্বালাময় আলো উদ্ভাসিত, এ আলো এক ডিউকের রিভেটিং ফ্যাকটরীর আলো। সমগ্র প্রক্রিয়াটি দেখে তিনি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন। তিনি বলেছেন—"সমগ্র প্রকৃতিতে আমার আর একটুকু কৌতূহল রইলো না, প্রকৃতি আজ থেকে আমার চোখে প্রাচীনা হয়ে গেল, তার সেই রূপ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল।"

মানসিকতার এই জাগরণ ঘটেছে অতি অল্পবয়সেই। তারপর ১৯০৫-এ কবির যখন মাত্র বারো বছর বয়স তখন ককেসাস প্রান্তে বিপ্লবের ঝড় উঠল। পথে পথে মার্সাই সংগীতের জয়কীর্তন, দেয়ালের গায়ে বৈপ্লবিক প্রচারপত্র, প্রচন্ড সংগ্রাম চলেছে। কসাকরা এসে যারা প্রচারপত্র বিতরণ করছিল তাদের ধরে ফাঁসির-মঞ্চে নিয়ে চলেছে। ভ্যাদিমিরের মনে জাগল ঘৃণা। প্রথমে কসাকদের তারপর আরো অনেকের ওপর জাগল প্রচন্ড ঘৃণা। পড়া-শোনায় মন বসতো না, নিষিদ্ধ পুস্তক-পত্রিকা সংগ্রহে আর পাঠেই বেশী সময় অতিবাহিত হত। নানা সভাসমিতিতে যোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনতেন। মনে জাগল বক্তা হওয়ার নেশা। রিয়ন নদীর ধারে পাথর সাজিয়ে বক্তৃতা অভ্যাস করতেন, শূন্য মাটির জালার ভেতর মুখ রেখে চলত স্বর-পরীক্ষা। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটল, পরিবারবর্গ চলে এলেন মস্কো, এখানেই তিনি সর্বপ্রথম বলশেভিক দেখলেন। ভ্যাদিমিরের জননী তাঁদের একখানি ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন ওয়াশল্কা কনাভেলাকীকে। সেই ঘরে সর্বদা যাতায়াত ছিল কিশোর মায়কোভস্কীর। তিনি ঘরের এক প্রান্তে বসে শুনতেন বিপ্লবীদের বিতর্ক, কার্লমার্কসের 'ক্যাপিট্যালে'র আলো-চনা, নানা জল্পনা আর পরিকল্পনা। কান-ভেলাকীর সঙ্গে পরে অবশ্য মায়-কোভস্কীর মতান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটে। রাজনীতিতেও তেমন অভিরুচি নেই। তিনি তখন কবিতা নিয়েই ব্যস্ত। কনভেলাকীর সঙ্গে কয়েক বছর পরে তরুণ মায়কো-ভস্কীর দেখা হয়েছিল। তখন ভ্যাদিমির আর সেই লাজুক কিশোর নয়, সে এক আত্মসচেতন কবি। সে আর আগের মত প্রশ্ন করে না। কানভেলাকী বলেছেন : "তখন সে শুধু কবিতা আর কাব্যভাবনায় ব্যস্ত, রাজনীতি থেকে আপনাকে সরিয়ে রাখতে চায়।"

মায়কোভস্কী তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন, সাহিত্যিক রাজনীতির জটিল জালের গ্রন্থি শিথিল করায় তার আগ্রহ। প্রতীক-বাদীদের ধ্বংস করতে হবে, এখন চাই জীবনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগ। বিরাট সমাজনৈতিক পুনর্গঠন। তিনি পরিচিত হলেন প্রত্যয়নিষ্ঠ কবিদের সঙ্গে। কবি বারলুক, খেলবনিকভ, এবং ব্রিকের সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন, আর এর ফলে এক নতুন কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব হল. তাঁরা ভবিষ্যপন্থী বলে আত্মঘোষণা করলেন।

মায়াকোভস্কী প্রসঙ্গে স্তালিন বলেছিলেন :

"আমাদের সোভিয়েত যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভ্যাদিমির মায়কোভস্কী। তাঁর স্মৃতির প্রতি উদাসীনতা অতি ঘৃণিত অপরাধ।"

আনা আখমাটোভা বা বোরিস পাসটার-নাক মায়কোভস্কী সম্পর্কে এই অভিমতই পোষণ করতেন।

সম্প্রতি ন্যু ইয়র্ক থেকে হার্বার্ট মার্শাল সম্পাদিত ও অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে মায়কোভস্কীর কয়েকটি সুনির্বাচিত কবিতা, আর সম্পাদক রচিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা। এছাড়া জীবনীসংক্রান্ত তথ্যপঞ্জী, কয়েকখানি সুন্দর আলোকচিত্র ও অন্যচিত্র। কবি ভ্লাদিমির মায়কোভস্কীর স্বরচিত কবিতা-পাঠের স্মৃতিচারণমূলক বিবরণ এবং পাসটারনেক, আসেইয়েভ, আখমাতোভা, ইভেতুসেংকো রচিত মায়কোভস্কী প্রশস্তি। এছাড়া মার্শালের স্ত্রী ফ্রেডা ব্রিলিয়ান্ট অঙ্কিত ব্রোঞ্জ মূর্তির চমৎকার প্রতিলিপিটি বিশেষ আকর্ষণমূলক। মায়কোভস্কীর কয়েকটি কবিতা যা ইতি-পূর্বে অনূদিত হয়নি তা এই গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে।

মিঃ মার্শাল কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে কবিতায় উল্লিখিত সকল ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা স্থান সম্পর্কেও পূর্বকথা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। স্যার মরিস বোওরা এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন।

রুশ ভাষায় মায়কোভস্কীর নির্বাচিত কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তেরটি খণ্ডে। বহুবিচিত্র প্রতিভাধর কবির কবিতা ভিন্ন রাজনীতি এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্ন ভূমিকা ও বক্তৃতাংশ। তাঁর রচিত চিত্রনাট্য, আঁকাছবি প্রভৃতি নানাবিধ সৃজনশীল নমুনা এই গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হয়েছে। এমনকি রাজনৈতিক শ্লোগান, পোস্টার এবং আন্দোলনধর্মী কবিতাও কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থটি এবং মায়কোভস্কীর জীবন ও কবিতা প্রসঙ্গে আগামীবারেও কিছু আলোচনা করা হবে।

—অভয়ঙ্কর
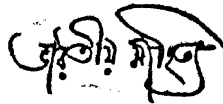
গ্রন্থ বিষয়ক পত্রিকা ॥

'ইণ্ডিয়ান বুক রিপোর্টার' নামক ইংরেজি পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থের সংবাদ পরিবেশনই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন শ্রীরমেশচন্দ্র জৈন এবং প্রভু বুক সার্ভিস, গুরগাঁও, হরিয়ানা থেকে প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রবর্তী দেশেই এই ধরনের পত্রিকার বহুল প্রচলন আছে এবং এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও সকলে স্বীকার করবেন। কিন্তু পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাই বলা হউক না কেন, এখন পর্যন্ত সর্বভারতীয় গ্রন্থ সংবাদ পরিবেশনে পত্রিকাটি সার্থকতা অর্জন করেনি। আশা করা যায়, অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পত্রিকাটি ক্রমশ এই ত্রুটি কাটিয়ে উঠবে।

হিন্দিতে একটি নতুন কাব্য সমালোচনা গ্রন্থ ॥

হিন্দিতে সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীগিরিজাকুমার মাথুর। শ্রীমাথুর একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কাব্য সমালোচনা গ্রন্থ এই সর্ব-প্রথম। মৌলিকত্বের দিক দিয়ে গ্রন্থটি সাম্প্রতিক হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট সংযোজন।

গ্রন্থটির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে, এতে কয়েকটি বিতর্কমূলক রচনা আছে। যেমন, 'হিন্দি সাহিত্যে বীট প্রভাব', "পরীক্ষামূলক কবিতায় নব মূল্যায়ন", "স্বরের মূল্য", "ধ্বনির পর্যায়" ইত্যাদি। মাথুরের রচনা অনেক ক্ষেত্রে কবিত্বময় হয়ে উঠলেও কিন্তু চিন্তার দিক থেকে ভাবিয়ে তোলে। বিশেষ করে "স্বরের মূল্য" এবং "ধ্বনির পর্যায়"—এই প্রবন্ধ দুটি কবিতার আঙ্গিকের উপর যেভাবে আলোকপাত করেছে, তা বিশেষ অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। কবিতার মানবিকতা বিষয়ক প্রবন্ধটিও বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য এবং তাঁর ইতিহাসবোধের পরিচয় বহন করে। যাই হোক, সাম্প্রতিক হিন্দি সাহিত্যে গ্রন্থটির অবদান অসাধারণ।

পাকিস্থানে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ ॥

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় প্রচারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে বলেন যে, পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানে রবীন্দ্র-সংগীত নিষিদ্ধ করে দিচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ভারতীয় ভাবধারা এবং চিন্তার হাত থেকে ঐস্লামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর মতে রবীন্দ্রসংগীত ইস্লামের বিরোধী।

পাকিস্থানের সাহিত্যিক এবং বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতে পারেন নি। সম্প্রতি বাঙলা একাডেমীর উদ্যোগে ঢাকায় ছাত্র ও শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সভা হয়। এই সভায় তারা সরকারকে অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানান। কয়েকজন বক্তা আয়ুব সরকারের তথাকথিত ধর্মীয় মনোভাবের নিন্দা করেন এবং সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, "পূর্ব পাকিস্থানের সংস্কৃতি জীবনের উপর যে কোনও রকম আঘাতই জনসাধারণ রুখবেই। পাকিস্থানে রবীন্দ্র-সংগীত বন্ধ করার অর্থ মহাকবিকে অসম্মান প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে পূর্ব বাংলাকেও অপমানিত করা—যে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অনেক স্মরণীয় দিন কাটিয়েছেন।"

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও সমালোচক ডঃ শহীদুল্লাও এর মধ্যেই সরকারের এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, "এর দ্বারা মনে হয় জনসাধারণকে সরকার সংস্কৃতির দিক দিয়ে বন্দী রাখতে চান, যাতে বাইরের জগতের জীবন ও চিন্তার কোনও ছাপ এসে না পড়ে। রবীন্দ্রসংগীত এবং বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা থেকে এই প্রমাণিত হয়, বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির থেকে সরকার এখানকার মানুষকে অজ্ঞ এবং মূর্খ রাখতে চান।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকেও সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানান হয়। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টির জন্য সমগ্র রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের সিদ্ধান্তও তারা গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সরকার এই বিষয়ে একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। কিন্তু সেই আদেশ অমান্য করেই পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৬৫র শেষ দিকে এই নির্দেশ তুলে নেন। এইবারের এই নির্দেশও আশা করা যায় পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি প্রেমিক সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চাপে, শেষ পর্যন্ত সরকার তুলে নিতে বাধ্য হবেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দি সাহিত্যে নারী সমস্যা ॥

উপন্যাসের নারী চরিত্র সৃষ্টিতে স্বাধীনতার পরবর্তী উপন্যাস কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে "আলোচনা" নামক বিখ্যাত হিন্দি সাময়িকীতে ডঃ দাগমার আন্সারীর একটি সুন্দর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। একথা ঠিক, এখন আর উপন্যাসের নায়িকারা বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ নিয়ে ভাবেন না' কিন্তু জাতিভেদ সমস্যা এখনও কিছু কিছু উপন্যাসের নারীচরিত্র চিত্রণে প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। যেমন অমৃত রায়ের "বীজ", নাগার্জুনের "দুখমোচন", এবং অমৃতলাল নাগরের "বুন্দ আউর সমুদ্র" উপন্যাসে।

ইদানিং উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকাই "লাভ-ম্যারেজ" করেন এবং প্রথাবদ্ধ নায়িকার প্রেম প্রকাশিত হয় জাতিধর্ম বাদ দিয়ে কোনও এক প্রেমিকের দিকে। এই

সমস্ত প্রেমের কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমান্সধর্মী হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ এবং তারপর কিছু টুকরো ঘটনা ও শেষ পর্যন্ত মিলন। কিন্তু ভারতের বর্তমান সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহোত্তর জীবনের বাস্তব সমস্যা একেবারেই অনুপস্থিত থাকে। যশপাল অবশ্য তাঁর উপন্যাসে এই সমস্যাকে কিছুটা ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর "ঝুঠা-সব" উপন্যাসে নারীজীবনের এই প্রশ্নটিকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলমান নারীচরিত্র হিন্দি উপন্যাসে তেমন নেই। হিন্দু মুসলমান বিবাহের দৃশ্যও প্রায় নেই। "ঝুটা-সচ" উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান বিবাহের প্রতি লেখক সমর্থন জানিয়েছেন। গুরুদত্ত রচিত "স্বরাজ্য দান" উপন্যাসেও এই সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকেও অধিকাংশ হিন্দি ঔপন্যাসিক তেমন দৃষ্টি দেন না। তাঁরা এখনও স্ত্রীকে সাবেকী গৃহলক্ষ্মীরূপে দেখতে চান। অজ্ঞেয় রচিত "নদী কী দ্বীপ" উপন্যাসে দেখা যাবে, নারী একটি দুর্বল প্রাণীর মত। পুরুষ বিনা বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। এখানেও পরোক্ষভাবে নারীকে সমান অধিকার দিতে তিনি প্রস্তুত নন বলে মনে হয়। তা ছাড়া নারীজীবনের সমস্যা যে কেবল প্রেম সমস্যা নয়, আরও সমস্যা আছে, সে বিষয়ে অজ্ঞেয়র মত লেখকও যেন কিছুটা এড়িয়ে গেছেন।

যাইহোক, আধুনিক উপন্যাস নিয়ে এই আলোচনাটি খুব বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। আলোচনাটি নিয়ে হিন্দি সাহিত্যে এর মধ্যে খুব হৈচৈ পড়ে গেছে।

সংস্কৃতি পরিষদে কবিতা পাঠ ॥

গত ২৮শে জুন, লেক স্টেডিয়ামে, লেখক সমবায় সমিতির দপ্তরে সংস্কৃতি পরিষদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। সর্বশ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, মানস রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মৃণাল দত্ত, পার্থ রাহা প্রমুখ কবিতা পাঠ করেন। কবিতা বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, শান্তি লাহিড়ী এবং আরও অনেকে।

বিদেশী সাহিত্য

উইলিয়াম ট্রেভরের গল্প সংকলন ॥

উইলিয়াম ট্রেভরের উপন্যাস রচনার খ্যাতি সকলেরই জানা আছে। বিশেষত 'দি ওল্ড বয়েজ', 'দি বোর্ডিং হাউস' এবং 'দি লাভ গেম' এই তিনটি উপন্যাস ইংরেজী সাহিত্যে তাঁকে অমর করে রাখবে। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'দি ডে উই গট্ ড্রাংক অন্ কেক'। তিনখানি উপন্যাসের রচয়িতা হলেও এটি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে এক প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক বলেছেন 'তিনি হচ্ছেন সেই জাতের গল্পকার যিনি কিছু অভিনবত্ব রাখতে জানেন, যার চরিত্রগুলো অতি সংহত এবং এক অতিরিক্ত গভীরতা যার বিস্তার।' সাধারণ সমাজজীবন বা বস্তুজীবন গল্পগুলির পটভূমি। কখনো জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা, হতাশা—কখনো দুর্দমনীয় ও অসহিষ্ণু জীবনপিপাসা চরিত্রগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। ট্রেভরের সংবেদনশীল স্পর্শে প্রতিটি গল্পই এতো প্রাণবন্ত যে পাঠক হিসেবে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এ প্রসঙ্গে বলা চলে উইলিয়ম ট্রেভর তাঁর 'দি ওল্ড বয়েজ' বইটির জন্যে হথর্নডন পুরস্কার পেয়েছেন।

কীট্সের কবিতার উৎস সন্ধানে ॥

ডঃ আয়ান জ্যাক কয়েক বছর আগে কীটসের একটি পুরোনো কবিতা পড়াকালে তাঁর কাব্যপ্রতিভার উৎকর্ষ হিসেবে এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল কীটসের চিত্রপ্রধান কবিতাগুলির অন্যতম একটি উৎস এতোদিন ছিল অবহেলিত। ডঃ জ্যাক অল্পদিনের মধ্যেই একটি গবেষণামূলক অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে গেলেন। তাঁর মতে কীটস বেশ কিছু প্রখ্যাত চিত্রকর, চিত্র ও ভাস্কর্য সমালোচকদের সন্নিধানে এসেছিলেন। এবং এইসব চিত্রকর ও সমালোচক দ্বারা প্রভাবিত ও পরিশীলিত হয়েই তাঁর কল্পনাপ্রতিভা তৈরী হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কীটসের কবিতায় চরণে চরণে যে সব সঙ্গীত ও চিত্রময় বর্ণনা আছে সেগুলিকে বিভিন্ন চিত্রশিল্পের রীতি ও তথ্যের সাহায্যে ডঃ জ্যাক বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে কীটসের কবিতা নিয়ে নতুন গবেষণার আরেকটি রাস্তা খুলে গেল। তথ্য এবং সংগৃহীত ইতিহাস ও কবিতাগুলির নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা কীটসের কবিতার মূল্যায়ন বিষয়ে পাঠকদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিতে পেরেছে বলেই মনে হয়। এবং এই সমস্ত গবেষণামূলক আলোচনাকে একত্র করে যে বইটি তিনি প্রকাশ করেছেন তার নাম "কীটস অ্যান্ড দি মিরার।"

কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥

কবি ডিলান টমাস পরলোকগত হন ১৯৫৩ সালের ৯ নভেম্বর। তাঁর কবিতার অগণিত ভক্তবৃন্দ ডিলানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে তাঁর পরিবারে নিজেদের ব্যক্তিগত শোক কবিতায় পাঠিয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে কবি ইয়েটসের মৃত্যুর পরে এই রকমের শোকের প্রতিক্রিয়া অনেক কবির ভাগ্যেই এতো বিপুল আকারে ঘটেনি। প্রায় ১৫০টির মতো কবিতা এভাবে সংগৃহীত হয়েছিল। সম্প্রতি এই কবিতাগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে সম্পাদনা করেন কবি অস্কার উইলিয়ামস। মোট ৮৪টি কবিতা তিনি সংকলনের উপযুক্ত হিসেবে মনোনয়ন করেন। লিখেছেন ৭৮ জন কবি। তার মধ্যে কয়েকজন নামকরা লেখক ছাড়া অধিকাংশ কবিই নতুন। অথচ প্রত্যেকটি কবিতাই কবি ডিলানের কবিতার বিভিন্ন গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ভক্তরা রচনা করেছেন। এতে করে তাঁর কবিতা পর্যালোচনার একটি সুন্দর দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন কবির রচনায় সুষ্ঠু অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বা শোকগাথা রচনায় যে মামুলি রীতি এককালে ছিল এ কবিতাগুলি তার ব্যতিক্রম। সে কারণেই সংকলনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বইটির নাম 'এ গারল্যান্ড ফর ডিলান টমাস'। নতুন কবিরা ছাড়াও সি ডে লুইস, এডিথ সিটওয়েল, ডি এইচ টমাস, স্টিফেন স্পেন্ডার, ভারনন ওয়টকিন্স, অস্কার উইলিয়ামস, বার্নস সিংয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেযোগ্য।

পুশকিন উৎসব ॥

সম্প্রতি রুশ মহাকবি আলেকজান্দার পুশকিনের ১৬৮তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মস্কো ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে।

উৎসবের উদ্বোধন হয় পুশকিন মিউজিয়ামে। খ্যাতনামা রুশ কবি, শিল্পী, সুরকার বিজ্ঞানী প্রভৃতি অনেকেই এতে যোগ দেন। এই মিউজিয়ামটি এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৫০ হাজার নর-নারী পরিদর্শন করেছেন। পুশকিনের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন দ্রষ্টব্যের মোট সংখ্যা হল ১০ হাজার। পশকভ অঞ্চলের পুশকিনস্কি গোরি গ্রামে জাতীয় পুশকিন কবিতা-দিবস উদযাপিত হয়। এ বছর থেকেই এটি শুরু হয় এবং প্রতি বছরের জুন মাসে তা পালিত হবে।

নবাগত লেখকের উপন্যাস ॥

ডেভিড বোল হালের ইংরেজী সাহিত্যে একেবারেই নবাগত। সাহিত্যের আসরে ছাড়পত্র হিসেবে নিয়ে এলেন তিনি একটি উপন্যাস। নাম 'দি থিকেট'। মিঃ বোল ছিলেন এক তেল কোম্পানীর মার্কেটিং এক্সেকিউটিভ। ঔপন্যাসিক হওয়ার কোন

বাসনাও তাঁর ছিল না। কিন্তু ৩৬ বছর অতিক্রমকালেই জীবনের দীর্ঘ বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে ভেতর থেকে উদ্দীপিত করে তুলতে থাকে। তবে উপন্যাসটি রচনা-কালে ডেভিড তাঁর বাল্যকালের জীবনে ফিরে যান। একটি কিশোরের বড় হওয়া, প্রাক্তন প্রণয় ঘটনা প্রভৃতি যেন আত্মজীবনীর মতোই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রূপান্তর লাভ করে উপন্যাসের কাহিনী-বৃত্তে। বিশেষত, ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রণ অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী। উপন্যাসটির আশাতীত খ্যাতি ও যশলাভের ফলে ডেভিড বোল এবার থেকে লিখেই জীবিকা অর্জন করবেন বলে স্থির করেছেন।

নির্জন দ্বীপের কাহিনী ॥

টম নিয়েল একখানি অনন্যসাধারণ বই লিখেছেন। এক নির্জন দ্বীপে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের বিচিত্র সুন্দর জীবনযাত্রার কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। বইটির নাম 'অ্যান আইল্যান্ড টু ওয়ানসেল্‌ফ।'

টম নিয়েল চিরকালই একটু অ্যাড-ভেঞ্চারপ্রিয়। সুদূরের নির্জন দ্বীপে নিঃসংগ বসবাস আমাদের কাছে যেমন স্বপ্ন হয়ে থাকে টম নিয়েল তাকেই বাস্তবে সত্য করে তুলেছেন। সাউথ পেসিফিকের অত্যন্ত নির্জন জনপ্রাণীহীন এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র-তীরবর্তী বালিয়াড়ির উপর সামান্যতম বসবাসের উপযুক্ত কিছু সরঞ্জাম নিয়ে ১৯৫২ সালে একবার তিনি আস্তানা তৈরী করেছিলেন। দুশো মাইলের মধ্যে কোন জনভূমি কাছাকাছি ছিল না। '৫৪ সাল পর্যন্ত জনমানবহীনভাবে একা একা তিনি কাটিয়েছিলেন। তারপর এক নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় অসুস্থ হওয়ায় শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। আবার ১৯৬১-তে তিনি ওখানে পাড়ি জমান। এবং '৬৩ সন পর্যন্ত আরো তিন বছর সেখানে নিঃসঙ্গ ও আদিম মানুষের মতো উলঙ্গ জীবনযাপন করেন। মোট এই পাঁচ বছরের আদিবাসী মানুষের জীবনযাত্রায় তাঁর কোন বন্ধু ছিল না। সামুদ্রিক মাছ শিকার করে ও অরণ্যের ফল বিশেষত নারিকেল খেয়ে তিনি বেঁচেছিলেন। এই দীর্ঘ কয়েক বছরের জীবনযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী যে কোন পাঠককেই শ্বাসরুদ্ধ করে তুলবে।

নীলকণ্ঠ : ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ

উনিশ শতকের বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যযুক্ত ঘটনা। বাঙালীর ধর্মসাধনার বৈশিষ্ট্য ও নবজাগ্রত বাংলার যুগ-প্রয়োজনের পরি-প্রেক্ষিতে এই ধর্মান্দোলনের পূর্ণাঙ্গ অথচ নিরপেক্ষ ইতিহাস আজো রচিত হয়নি, তাই এঁদের আবির্ভাবের সার্থকতা আজো আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিনি।

বিগত শতকের বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাসের মূলে আছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের সংঘর্ষ ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা। এই শতাব্দীতেই বাংলার বহু মনস্বী সন্তান নিজনিজ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আলোকে সনাতন ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বাংলার এই বরেণ্য সন্তানদের পুরো-ভাগে আমরা পাই রাজা রামমোহনকে, যিনি পৃথিবীর নানা সম্প্রদায়ের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বিভিন্ন ধর্মের মূলগত ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং যিনি সব্যসাচীর মতো যুগপৎ স্বদেশীয় পন্ডিতগণ ও বিদেশীয় ধর্মপ্রচারকগণের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (ইনিই ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক, রাজা রামমোহন নন) 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠা করে এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' স্থাপন করে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রত হন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে নব-নব রসধারায় পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তোলেন। বিভিন্ন ধর্মের ভেতর সমন্বয়-স্থাপনের জন্যে তাঁরই অমোঘ নির্দেশে তাঁর অনুগামিগণ—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, মৌলানা গিরিশ-চন্দ্র সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতি যে দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন, তা'ও অ.জ শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। এযুগে যাঁরা সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করে সনাতন ধর্মের তথা মানবধর্মের যুগোপযোগী তথা বিশ্বজনীন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের ভেতর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ও ভক্ত কবি নবীনচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আবার উনিশ শতকের শেষপাদেই পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী (শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বেদশাস্ত্র-পারদর্শী সত্যব্রত সাম-শ্রমী (চট্টোপাধ্যায়), পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়া-মণি প্রভৃতি মনীষিগণ সনাতন ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তথাপি আমরা বলছি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবি-র্ভাবই উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেই সেকালের শিক্ষিত বাঙালী বুঝেছিল, ধর্ম হচ্ছে উপ-লব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বাংলার শাক্ত সাধনা ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম এক যুগোপযোগী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইষ্টনিষ্ঠার সঙ্গে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের জীবনে।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের পরম সৌভাগ্য এই যে, তাঁর জীবনে বাল্যকাল থেকেই আত্মো-পলব্ধির জন্যে একটা তীব্র ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়েছিল এবং শ্রীবিজয়কৃষ্ণের মতো সদ্‌গুরু লাভ করে ও তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন।

বর্তমান বর্ষে ভারতের নানা স্থানে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর আবির্ভাব শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে যোগিরাজ কুলদানন্দের পুণ্য চরিতকথা ও তাঁর বাণী প্রচারের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের অন্যতম অনুগামী ভক্ত ও 'যোগিরাজ কুলদানন্দ' নামক বাংলা গ্রন্থের লেখক ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী 'নীলকণ্ঠ' নামে যে ইংরেজি গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। লেখকের লিপি-কৌশলগুণে এই চরিতকথা উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে অথচ গ্রন্থখানিতে কোথাও গভীরতার অভাব নেই।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—মামনুস্মর যুধ্য চ, আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। ইহাই ছিল ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের জীবন-বেদ। কুলদানন্দ সংগ্রাম করেছেন বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে নয়, তিনি সংগ্রাম করেছেন একদিকে জৈব প্রবৃত্তির, অপর দিকে সংশয়, অবসাদ ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে। তিনি অনুক্ষণ স্মরণ করেছেন গুরুরূপী শ্রীভগবানকে, গুরুর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তিনি যেন গুড়াকেশ অর্জুনের মতোই বলেছেন, 'শিষ্য-স্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌'। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল আত্মোপলব্ধি বা সত্য-সাক্ষাৎকার, তাই শ্রীভগবান তাঁকে কণ্টকে আকীর্ণ দুর্গম পন্থার ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতারূপ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জার্ এপ্টেইন যা বলেছেন তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

> 'God is not in a hurry: like an artist, he chisels, out of the raw material of our human nature, the masterpiece such as He conceives it. The resistance offered by our human inclinations never discourage Him, for He knows that 'He has made us for Him and that our hearts will be restless until they rest in Him."

কুলদানন্দজীর সাধনা ও সিদ্ধির মর্মে প্রবেশ করতে হলে সনাতন ধর্ম, মানবধর্ম বা আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করতে হয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী

থেকে বিষয়টির আলোচনা না করলে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হতে হয়। তাই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (Hinduism : What it means) লেখক হিন্দুধর্ম অর্থাৎ ভারত-ধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের ভেতর মূলগত ঐক্যের সন্ধান করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (Vaisnavism and Vijoykrisna Goswami) লেখক স্বল্প পরিসরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণের পুণ্য চরিত-কথা ও উনিশ শতকের বাংলায় তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, কেননা, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সাধনার ধারা অনুসরণ করতে হলে শ্রীবিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তাঁর জীবনবেদের অনুধ্যান করতে হবে।

যাঁরা সাধনহীন, তাঁরা কখনো শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা শাশ্বত ভারতকে আবিষ্কার করতে পারেন না। কঠোর সাধনা, তপশ্চর্যা ও তীর্থপরিক্রমার ভেতর দিয়ে পূর্ণতালাভের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ ভারত-আত্মার মর্মবাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় কেমন করে শিষ্য কুলদানন্দ ধীরে ধীরে স্বয়ং সদ্‌গুরু কুলদানন্দে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সে ইতিহাস চরিতকার ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী অত্যন্ত নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর রচিত শ্রীশ্রীসদ্‌-গুরুসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। এক দন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র ন্যায় এই মহাগ্রন্থখানিও বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করত এবং বাংলার তরুণেরা এই গ্রন্থ থেকে চরিত্র-গঠনের প্রেরণা লাভ করত। মনস্বী বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে লিখেছেন—

> 'Everyone can find the true materials of his or her life by going through this remarkable book.

"শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' সম্পর্কে ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ লিখেছেন—

> 'The uniqueness of the Diarry lies in the fact that it is a sort of tape-recording of the psychic and spiritual struggle of a Sadhaka for self-realisation under the constant influence of a great teacher possessed of supernatural power'.

বৈদিক ঋষি বলেছেন—সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্‌, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সমস্ত দুর্গতির মূলে আছে আমাদের আদর্শভ্রংশ। আমরা আজ সত্যের আদর্শ থেকে, ধর্মের আদর্শ থেকে, কুশলের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। তাই দেশের এই দুর্দিনে মহাপুরুষদের পুণ্য জীবনকথা যত বেশী প্রচারিত হয়, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল।

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

* Nilkantha : Bramhachari Kuladananda; Centenary Vol. by Bramhachari Ganganenda; Das Gupta and Co. Pvt. Ltd., 5413 College St., Calcutta-12.

পূর্ব এশিয়ার জীবন

শ্রীসুরেশচন্দ্রনাথ সাহার মালয় থেকে মালয়েশিয়ার অধিকাংশ আলোচনা অমৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক পর্যটক হিসাবে সে দেশের নানান স্থান ভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি পূর্ব এশিয়ার এক বিস্তৃত অঞ্চলের জনপদ, লোকাচার, অর্থনৈতিক অবস্থা, ঐতিহাসিক পরিচিতি, সাংস্কৃতিক জীবন, রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। এই অঞ্চলে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষ বসবাস করছে। তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং সঙ্কট গ্রন্থকার নানানভাবে চিত্রিত করেছেন। মালয়, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, পেনাঙ, কুয়ালালামপুর, জোহোর প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবৎ বহু ভারতীয় বাস করছেন। তাদের জীবন-বৈচিত্র্য এবং এই সমস্ত অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিচয় গ্রন্থকারের গভীর ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে চীনাদের নিয়ে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, গ্রন্থকার তারও ইঙ্গিত দিয়েছে। সম্প্রতিকালে সম্ভবত পূর্ব এশিয়ার এই বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। কয়েকটি চিত্র আছে।

মালয় থেকে মালয়েশিয়া

—(ভ্রমণ কাহিনী)।

—সুরেশচন্দ্র সাহা। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

একটি নতুন পঞ্জিকা

কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর পরিচালনায় "১৩৭৪ সালের গ্লোবের লোকবন্ধু ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা" এই বৎসর প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে বর্ষফল, দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ রাশির ফল, শুভদিনের নির্ঘণ্ট, জ্যোতিষ বচনার্থ, ১৩৭৪ সালের দিনপঞ্জিকা, বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, বাংলা-ইংরেজি অভিধান, ওজন, স্মরণীয় ব্যক্তি, দেশ-বিদেশের নানান জ্ঞাতব্য তথ্য, ভারতবর্ষ পরিচয়, খেলাধূলা, বিশ্ব-পরিচয়, প্রাথমিক চিকিৎসা, ঔষধের গাছ-গাছড়া, কৃষি ও চাষ প্রভৃতি নানান বিষয়ে অসংখ্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র দিন-পঞ্জিকা হিসাবেই নয়, নানান জ্ঞাতব্য তথ্যে বর্তমান পঞ্জিকাটি একটি প্রয়োজনীয় আকর-গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা —গ্লোব নার্সারি। ২৫ রাজধন মিত্র লেন। কলকাতা-৪।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

'কবিপত্র' বাংলাদেশের কবি ও কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি কাগজটি আবার বেরিয়েছে। কবিতা, আলোচনা এবং গ্রন্থ-সমালোচনায় সমৃদ্ধ আলোচ্য সংখ্যাটি নানাদিক থেকেই উল্লেখের দাবি রাখে। এ সংখ্যায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী, সত্যেন্দ্র আচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, বঙ্কিম গুহ, রণজিৎ সিংহ, অতীন রায়চৌধুরী, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

কবিপত্র (১৫শ সংকলন)।। সম্পাদক: তুষার চট্টোপাধ্যায় ১৯।৭, ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিঃ-২৬। দাম: এক টাকা।

●

রায়গঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'অভিযান'-এর বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিরুল ইসলাম, শিশির মজুমদার, রুচিরা শ্যাম, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

অভিযান ।। সম্পাদক—তপনকিরণ রায় ও জয়নারায়ণ সাহা।। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। দাম: এক টাকা।

●

'মধ্যাহ্ন'র বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র গুহ, রত্নেশ্বর হাজরা, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, অশোক এবং আরো অনেকে। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্কেচটি আকর্ষণীয়।

মধ্যাহ্ন (১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা)।। সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯। দাম: ৭৫ পয়সা।

[উপন্যাস]

গোলাপ কেন কালো

বুদ্ধদেব বসু

১৪

দেখছেন, রোদের রং কেমন বদলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে? হলদে, গোলাপি, লালচে : সূর্যদেব পাটে নামছেন। ঐ দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে সূর্য ডোবে আজকাল, আমি ব'সে-ব'সে দেখি, যতক্ষণ না শেষ বিন্দু আলো মিলিয়ে যায়। কিন্তু উটকামণ্ডে সূর্যাস্তের তেমন বাহার নেই, জানেন। মেঘ নেই, তাই রঙের খেলা জমে না; এই গ্রীষ্মেও মাঝে-মাঝে পাৎলা কুয়াশা আঁকড়ে থাকে বাতাসে; এক-একদিন এমন হয় যে আমাদের আকাশের ঐ অগ্নিপিণ্ড, তেজ হারিয়ে, পার্ট ভু'লে গিয়ে, কোনো গোলগাল মুখের বোকাশোকা অভিনেতার মতো, শেষ বক্তৃতাটি অসমাপ্ত রেখেই মুখচোরাভাবে নেপথ্যে চ'লে যায়। কিন্তু তবু—এই পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে মন্দ লাগে না আমার; ঐ জানলার কাচের বাইরে পৃথিবীটাকে মনে হয় এক সাজানো রঙ্গমঞ্চ, পাহাড়গুলো ফাঁপা হ'য়ে যায়, হালকা, যেন থিয়েটারের পট, আর দূরে-দূরে ছড়ানো ঐ বাড়ি ক-টাও যেন সত্যি নয়, কোনো বাসিন্দা নেই, দৃশ্যটিকে ভ'রে তোলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই তাদের। নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ করেছেন সকালের চাইতে বিকেলের আলো বেশি উজ্জ্বল? আসলে নিশ্চয়ই তা নয়, কিন্তু বিকেল এত কোমল হ'য়ে নামে, এমন একটি গোপন দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দেয় তার সৌন্দর্যে, এমন সব শান্ত রং বেছে নেয় যে আমাদের চোখের পক্ষে তারই উজ্জ্বলতা অনেক বেশি দর্শনীয় হ'য়ে ওঠে, অনেক বেশি রমণীয়। বিদায়—অবসান—বেদনা : তার মতো সুন্দর আর-কিছু নেই ব'লেই সন্ধ্যা এমন মায়াবিনী। কিন্তু তারপর? তারপরেই ধূসর—কালো—রাত্রি—আমি একা, কেউ কোথাও নেই, আমার ভয় করে তখন, রাত্রে আমার ভয় করে। আমি ঘুমোতে পারি না, মনেও ঘুম নেই, কিছু নেই আমার—অন্ধকারের বুকের মধ্যে অনেক উঁচুতে যে-সব ফুল ফুটে থাকে তাদের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয় না, অত বিরাট রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার মতো শক্তি নেই আমার চোখের—আমি চাই ঘন দেয়াল, এই ছোটো ঘর, যেখানে এই সোফারটারই ভাঁজ ভেঙে দু-জনের মতো বিছানা পেতে দেয় গায়ত্রী—বা বিছানাও পাতে না, মদে চুর হ'য়ে পরস্পরের গায়ে বিনা চেষ্টায় চ'লে পড়ি আমরা।

না—আপনার যাবার জন্য ইঙ্গিত নয় এটা। বলেছি তো, স্ত্রীলোককে আমার বিতৃষ্ণা আসলে, শুধু রাত্রে একা ভয় করে ব'লেই আমি চাই তাদের। ভয় কেন? নেলিকে ভয়, কাজলকে ভয়, বাঙালিদেশের টেররিস্ট-দের গুলির ভয়। 'সাবধান, রণজিৎ ভুলেও ভেবো না আমাদের প্রতিহিংসা থেকে নিস্তার পাবে,' বলেছিলো বুলবুল কোনো-এক সময়ে—সত্যি কি বলেছিলো, না আমি নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? 'রঞ্জু, আমাকে কখনো ভুলো না,' বলেছিলো কাজল কোনো-এক সময়ে—সত্যি কি বলেছিলো, না আমি নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? বলুন তো, যারা ম'রে যায় তারা কি সত্যি ম'রে যায় একেবারে—চিরকালের মতো? আর কখনো—কখনো—কখনো দেখা হবে না? বলুন তো, মৃত্যু কী? যে ছিলো কোনো-একদিন সবচেয়ে আপন, তারপর যাকে চল্লিশ বছর দেখিনি, দেখলেও চিনতে পারবো না এখন, আজ দেখা হ'লে যাকে মনে হবে অত্যন্ত দূর, মঙ্গলগ্রহের অধি-বাসীর মতো, সে-ও কি মৃত নয় আমার কাছে, তার কাছে আমিও কি মৃত নই? অর্থাৎ, আমরা আংশিকভাবে অনবরত ম'রে যাচ্ছি, অনেক ছোটো-ছোটো মৃত্যুর সমষ্টির নাম দিয়েছি জীবন, আর যখন অন্যদের সঙ্গে একেবারে সব সম্পর্ক চুকে যাচ্ছে, সেই অবস্থাটাকে মৃত্যু বলছি। কিন্তু সেই অর্থে আমি কি জীবিত, এই আমি, যে আপনার সামনে ব'সে আছে, কথা বলছে?...আজ্ঞে? আপনি বলছেন আমারও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, স্মৃতি আছে যেহেতু? তাহ'লে তো যারা ম'রে গেছে তারাও মরেনি, চল্লিশ বছর যাদের চোখে দেখিনি তারা'ও আমার সঙ্গে আছে এখনো, তাহ'লে তো স্মৃতির নামই অমরতা। দেখছি আপনি সবই বোঝেন, আপনি জ্ঞানী—আমারই মতো, জ্ঞানপাপী—আমারই মতো। আমি কৃতার্থ

হবো—সত্যি যাকে কৃতার্থ বলে তা-ই—আপনি যদি আজ রাত্রিটা এখানে কাটাতে রাজি হন। এমনি মুখোমুখি ব'সে, সারা-রাত আমি কথা বলি তাহ'লে। মুখোমুখি, যেন আয়নার সামনে। আপনি আমারই বয়সী, একই সময়ে ঢাকায় ছিলেন, একই পাড়ায়, মুখ দেখে দরদী মনে হয় আপনাকে। বলুন তো, আপনি কি আমাকে চিনতেন না ঢাকায়? হয়তো আপনার জানা কথাই আমি শোনাচ্ছি আবার—শুধু এই তফাৎ, আপনি ভুলে গেছেন, কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলিনি, মিতু যেদিন কলকাতা থেকে ফিরে এলো, তারপর, প্রায় এক মাস ধ'রে, কেমন একটা হাঁপ-ধরা, দম-আটকানো স্নায়ু-ছেঁড়া অবস্থায় আমি কাটিয়েছিলাম। বহুরূপী সেই যন্ত্রণা, ছলনায় ভরা।...অবাক হচ্ছেন? 'আমি অপেক্ষা করবো, তুমি যতদিন বলবে ততদিন,' মিতুর মুখে এই কথা শুনে স্বর্গ হাতে পাওয়া উচিত ছিলো আমার? নিশ্চয়ই। তা আমি পাইনি তা তো নয়, আমারও মনে হয়েছে আমি যেন আর আমাতে নেই, যেন এমন কোনো নেশা করেছি যা চিরস্থায়ী, ভেসে বেড়াচ্ছি মেঘে-মেঘে আকাশে-আকাশে, পেয়ে গেছি আমার কল্পনার সোনার খনি, আমার সাহারায় গোলাপের বাগান, সেই আশ্চর্য কিমিয়ার সূত্র যা দিয়ে জগৎটাকে বদলে দেয়া যায়। কিন্তু হাজার হোক, আমরা তো মরণশীল মানুষ মাত্র, স্বর্গ আমাদের সহ্য হবে কেন? একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো আমার মধ্যে; মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারে, এটা কাজলের কপোলকল্পনা ছাড়িয়ে যখন বাস্তব হ'য়ে উঠলো, এমনকি মনে হলো অনিবার্য, তখনই এই পরিণতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়া যেন কঠিন হ'য়ে উঠলো আমার পক্ষে। কে যেন প্রতিরোধ করছে আমার ভিতরে ব'সে, প্রতিবাদ করছে। অদ্ভুত, যে এক বছর পরে হোক, পাঁচ বছর পরে হোক, মিতুর হাতে আমি বাঁধা প'ড়ে যাবো, সত্যি বলতে আজ থেকেই সেই বাঁধন শুরু হ'লো। অদ্ভুত, আমার প্রেম, যাকে এতদিন আমি ভেবেছি একটি বাতাস, স্নায়ুর কম্পন, হৃদয়ের স্পন্দন, তাকে আজ মেপে নিতে হচ্ছে সাংসারিক ফিতে দিয়ে, যেন তা দর্জির দোকানের একখান কাপড়, যা দিয়ে, কালক্রমে, তৈরি হবে ব্যবহারযোগ্য একটি আচ্ছাদন, যার তলায় মিতু আর আমি, একদিন আগেও যারা ছিলো প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বাধীন, অনন্য (কেননা, কোনো তরুণী মায়ের কাছে তার সন্তান যেমন, তেমনি যুবকের কাছেও তার প্রেম অভূত-পূর্ব ও অতুলনীয়—এ যে এক চির-পুরোনোর পুনরাবৃত্তি তা তাদের ধারণার মধ্যে আসে না)—সেই আমরা রাতারাতি সাধারণ স্বামী-স্ত্রীতে রূপান্তরিত হ'য়ে জগতের কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে মিশে যাবো। কোলের শিশু যখন বড়ো হ'য়ে স্কুলে যায়, প্রেমের উপরে যখন সামাজিক শীলমোহর পড়ে, তখনই অন্যদের সঙ্গে তুলনা আর ঠেকানো যায় না, ছেলে পরীক্ষায় বা স্বামী-স্ত্রী তাদের কর্তব্যে পাছে ফেল হয়, সেই ভাবনা যেন ভালোবাসার বিশুদ্ধ দুধে জল মিশিয়ে দেয়। আপনি অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন আমি মিতুকে সত্যি ভালোবাসিনি, সবই ছিলো ছেলেমানুষি, ভাবোচ্ছ্বাস, গ্যাসে-স্ফীত বেলুন? আমি তর্ক করবো না আপনার সঙ্গে: শুধু এটুকু বলি, মিতুর কথা ভাবতে এখনো আমার বুকের মধ্যে টনটন করে মাঝে-মাঝে, এখনো আমি জানি যে জীবনে সেই একবারই কোনো মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম—একবার, মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আর তাই—যেহেতু নিজের মধ্যে টের পাচ্ছি একটা অনুচিত দ্বিধা, একটা অন্যায় অনিশ্চয়তার দোটানা, এমন কোনো দুর্বলতা আমার মধ্যে যার অস্তিত্ব কখনো সন্দেহ করিনি—তাই আমার কষ্ট। কল্পনা নয়, বানানো গল্প নয়—জীবন, সত্যিকার জীবন এগিয়ে এলো আমার দিকে, কিন্তু আমি তাকে দু-হাত বাড়িয়ে ঝাপটে ধরতে পারছি না কেন? যে-আমি ঈর্ষা করেছি কলকাতার শহর-সুদ্ধ লোকেদের—মিতু ঢাকায় ফেরার আগের দিন পর্যন্ত—সেই আমি কেন এখন ভাবছি যে একটু দূরত্ব, একটু সংশয় না-থাকলে ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না?

আরো একটা কষ্টের কারণ ছিলো আমার আরো বেশি লজ্জার সেটা। মিতু আমারই সঙ্গে থাকবে—একই বাড়িতে—সারাক্ষণ, এই কথাটা মাথায় ঢোকামাত্র যেন দ্বিগুণ বেগে উদ্ধত হ'য়ে উঠলো আমার সত্তার সেই অংশ, যা অতি স্থূল রক্তমাংস দিয়ে তৈরি। মিতু, নিজে না-জেনে, হয়তো কিছু না-বুঝে, আমাকে দীক্ষিত করলো কামনায়, অচরিতার্থ কামনার দহনে। এই আমার প্রথম চোখে পড়লো তার স্তনের বোঁটা দুটি কেমন ফুটে ওঠে মাঝে-মাঝে;—তার ব্লাউজ আর বার-বার টেনে দেয়া আঁচল যতই চাপা দিক, তারা যেন, কৌতুকে আর কৌতূহলে মেশা ভঙ্গিতে, জগতের কাছে জানান না-দিয়ে পারে না যে তারা আছে, তারা প্রস্তুত। এই যেন আমি যেন প্রথম বুঝলাম যে নারীর রূপের উপাদান শুধু মুখ নয়, তার শরীরও। মিতুর সজল ঠোঁটের নড়াচড়ার দিকে তাকিয়ে তার কথার জবাব দিতে আমি ভুলে যাই; সে যখন তার বসার ভঙ্গি বদল করে বা উঠে দাঁড়ায়, বা হেঁটে যায় এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, তখন আমার মনে হয় তার শরীর যেন আঁকাবাঁকা চঞ্চল কয়েকটা রেখার সমষ্টি যা কখনো কখনো তার চারদিকে ছিটিয়ে যাচ্ছে, ছুটে আসছে আমারই দিকে, যেন আমার কাছে কোনো উত্তর দাবি ক'রে। আমার মধ্যে যে কামনার অস্তিত্ব আছে এই উপলব্ধি অবশ্য নতুন নয় আমার পক্ষে; কিন্তু এতদিন তাকে সৌন্দর্যবোধের ঢাকনার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম; কাজলের গলার নেকলেসের উজ্জ্বলতা, সবুজ শাড়িতে জলজ উদ্ভিদের মতো মিতু—এই সব ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি অভিজ্ঞতা, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে, উন্মন করেছে, কিন্তু উত্তাল করেনি। হায় সেই সুন্দর ভাবনা আমার, স্বপ্নের বিলাসিতা, তা কেন আজ ইন্দ্রিয়ের কান্না হ'য়ে উঠলো? এক-এক সময় অসহ্য লাগে আমার, যখন অসহ্য হ'য়ে ওঠে ইচ্ছে—মিতুকে ছুঁতে, বুকে জড়াতে, চুমু খেতে: এমনকি এই পাপিষ্ঠ চিন্তাও মাঝে-মাঝে আমার মনের তলায় ন'ড়ে ওঠে যে সে, মিতু, এখনই আমাকে দেহ দান ক'রে তার ভালোবাসা প্রমাণ করুক। কিন্তু আমি জানি মিতু কত পবিত্র, কত স্পর্শভীরু, সুকুমার, কী মর্মান্তিক আহত হবে সে যদি কখনো কোনো রূঢ় ভঙ্গি দেখতে পায় আমার মধ্যে। 'বাবার সঙ্গে কথা বলবে নাকি একদিন?' তার মানে—মন্ত্রপূত মিলন, অন্তত তার প্রতিশ্রুতি: 'আগে বিয়ে হোক তারপরে সব, কিন্তু তা না-হওয়া পর্যন্ত আমরা দু-জনেই উপোসি থাকবো—' এই সংস্কারের প্রাচীন ডালেই তার ভালো-বাসার সুন্দর ফুল ফুটে আছে, সেখানটায় ঝাঁকুনি দেবার মতো সাহস আমার নেই, না-দেবার মতো বিবেক এখনো অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, তার এই মনোভাব—যা তার বয়স, সময় ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক—তা আমাকে পীড়া দেয় গোপনে, মনে হয় সে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না আমাকে, তার এই অটল ধৈর্যকে আমার মনে হয় সাংসারিক সুবুদ্ধি এমনকি ভালোবাসার অভাব। আবার, এই কামাতুর অবস্থার জন্য নিজেকেও আমি ক্ষমা করতে পারি না, মনে হয় আমি মিতুর অযোগ্য, দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছি, আর মিতুকেও নামিয়ে আনছি আমার আবেগের প্রকাণ্ড আকাশ থেকে একটা ছোট্ট হাঁপ-ধরা কুঠুরির মধ্যে। এমনি ক'রে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ঝাপটে, এক-একটি দিন কেটে যায়, আমি পায়ের তলায় মাটি পাই না, পাই না সেই প্রত্যয়ের মুহূর্ত যার অনুকূল হাওয়ায় জীবনটাকে অন্য তীরের দিকে ভাসিয়ে দিতে পারি। রোজ যাওয়া-আসা করছি, কিন্তু অনাদিবাবুকে বলা হয় না যা বলতে চাই, যা আমাকে বলতেই হবে—যা নিশ্চয়ই তাঁরা অনুমান করতেও পারছেন, কোন না একদিন, আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে, এবং আমাকে লজ্জা দিয়ে, তাঁরাই উত্থাপন করেন প্রসঙ্গটা। মিতুকে বলি," যাক না কিছুদিন, তাড়া কিসের, তুমি আমি নিজের মনে তো নিশ্চিন্ত'—সে জবাব দেয় না, শুধু চোখে চোখ রাখে, আর তার সেই দৃষ্টির সামনে আমার মাথা যেন নিচু হয়ে যায়।

আমার কষ্টের একটি প্রতিষেধক আমাকে জুগিয়ে যাচ্ছিলো বুলবুল। প্রতিষেধক—চিকিৎসা—কিন্তু সেই চিকিৎসাই আবার অন্য একটা অসুখ। বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন এক অসুখ সারাবার জন্য রোগীর দেহে অন্য অসুখ উৎপন্ন করেন—পাগলের নাড়িতে একশো-তিন ডিগ্রি জ্বর, বা হাঁপানির কষ্ট ঠেকাতে গিয়ে একজীমা—কিংবা যেমন দুই বিপরীত বিষের প্রতি-ক্রিয়ায় শরীর মাঝে-মাঝে এক ধরনের ভারসাম্য খুঁজে পায়, আট গেলাশ হুইস্কির পর দু-পেয়ালা কালো কফি গলায় ঢাললে নিজে গাড়ি চালিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি

পৌঁছবার বাধা হয় না—তেমনি দুই উল্টো রকমের ব্যামোতে যেন ভুগছিলাম আমি—কখনো এটা, কখনো ওটা, দুটোই সমান ক্ষতিকর, কিন্তু যে-ক্ষতি একটার দ্বারা হচ্ছে তারই পরিপূরণ করছে অন্যটা। বুলবুল মাঝে-মাঝে আসে আমার কাছে; ঢাকেশ্বরী বাড়ির পিছনকার সেই আমবাগানটা সে বেছে নিয়েছে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য; তার সঙ্গে দেখা হ'লে আমার ভালোই লাগে যেহেতু আমার প্রণয়ের পাত্রী নয় সে, তার কাছে কোনো অবৈধ বা বৈধ চাহিদাও নেই আমার; আমার পক্ষে সে মিতুর মতো প্রয়োজনীয় নয়, বা এমনও নয় যে একমাস তাকে না-দেখলেও তার খোঁজ নেবার জন্য কোনো তাগিদ জাগবে আমার মনে। বুলবুল, একজন মেয়ে, তরুণী (হ'লোই বা সচেতনভাবে নারীত্ববর্জিত), সে যে আমার প্রতি মনোযোগী এটা আমার পক্ষে চাটুকারী ব্যাপার; তার সঙ্গে একা রাস্তায় বেড়াতে পারছি আমি (যে-স্বাধীনতা মিতুর সঙ্গে সম্ভব নয়), পারছি সহজভাবে ঢলোঢোলাভাবে কথা বলতে, এগুলোও নেহাৎ মন্দ লাগে না আমার। তবু—বুলবুলের সংসর্গে আমি যা পাই তা সুখ নয়, শুধু আমার কণ্ট থেকে, আবেগের চাপ থেকে নিষ্কৃতি—তাও ক্ষণিকের জন্য; যেমন রোগশয্যায় পাশ ফিরে হঠাৎ মনে হয় বেশ লাগছে, কিন্তু পরক্ষণেই একই-ভাবে তেতে উঠে বিছানা, টের পাওয়া যায় গাঁটে-গাঁটে ব্যথা, তেমনি বুলবুলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হ'লেই আমার মেজাজ বিগড়োতে দেরি হয় না, পদে-পদে ধরা পড়ে তার সঙ্গে আমার মনের গরমিল। একদিন—মিতুরা তখন সবে ফিরেছে কলকাতা থেকে—বুলবুল হঠাৎ আবার জোন্সের কথা তুললো। জোন্সের সঙ্গে আমার কি দেখা হয়েছে শিগগির? আমি বললাম, 'জোন্স তো দার্জিলিঙে।' 'ফিরে এসেছে জানো না?' 'এসেছে বুঝি? তাহ'লে তো যেতে হয় একদিন। তার কয়েকটা বই অনেকদিন ধ'রে প'ড়ে আছে আমার কাছে।' একটু চুপ ক'রে থেকে বুলবুল খুব নিচু গলায় বললো, 'তোমাকে একটা কথা বলি, রণজিৎ। জোন্সের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দাও। ওর বইগুলো ফেরৎ দিয়ে আসতে পারো, কিন্তু আর কখনো যেয়ো না।' আমি হেসে বললাম, 'বুলবুল, কী ক'রে তুমি এমন কথা ভাবতে পারলে যে তোমার কথা-মতো আমি কিছু করবো বা করবো না?' 'তোমার ভালোর জন্যই বলছি।' আমার মনে প'ড়ে গেলো বকুল-ভিলায় অমূল্য আমাকে যে-পাঁচালি শুনিয়েছিলো জোন্সের বিষয়ে, আর পরমুহূর্তেই তেলতেলে গলায় বলেছিলো, 'আমাকে একটা সুপারিশ জোগাড় ক'রে দেবে?' বললাম, 'থাক, জোন্সের কথা থাক। আমার একটা আর্জি আছে তোমার কাছে।' 'আর্জি? তোমার? আমার কাছে?' বুলবুলের গলার আওয়াজ অন্য রকম শোনালো, বেশি মেয়েলি, যেন কোনো মুহূর্তের অনামনস্কতায় সে তার নারীত্বকে প্রকাশ ক'রে ফেললো। 'বাল্টার কীর্টনের একটা ফিল্ম চলছে এখন—আমার ইচ্ছে তোমাকে আর মিতুকে নিয়ে দেখতে যাই। তুমি রাজি?' 'মিতুকে নিয়ে যেতে চাও—এই তো? তাকে তার বাড়ি থেকে তোমার সঙ্গে একা যেতে দেবে না, তাই একজন শিখণ্ডী দরকার? তা কাজল-মামিকে নিয়ে যাও না।' আমি রূঢ়ভাবে জবাব দিলাম 'কাজল-মামিকে নিয়ে যেতে হ'লে তোমার

অনুমতি দরকার নাকি?' একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো বুলবুল, তারপরেই যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'তুমি মিতুকে নিয়ে যেতে চাইলে আমার সাহায্য দরকার তাও তো আমি নতুন শুনলাম।' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো সে, তার চোখে একটা অস্বাভাবিক হলদে আভা দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। হঠাৎ অন্য একটা কথা ঝিলিক দিলো আমার মগজে, যা এর আগে কখনো ভাবিনি, কিন্তু সে-মুহূর্তে তার চোখের দিকে তাকিয়ে যা নির্ভুল ব'লে জানলাম ঃ জানলাম ঃ মিতুকে সে হিংসে করে, আমি তাকে ভালোবাসি বলে হিংসে করে। আমি একটা টোপ ছুঁড়ে দিলাম বুলবুলকে, 'তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো না যে তুমি গেলে আমার ভালো লাগবে?' আমার কথাটায় কপটতা ছিলো, আসলে বুলবুল ঠিক ধরেছিলো আমার অভিসন্ধি, 'শিখণ্ডী' হিশেবেই তাকে আমি চাচ্ছিলাম. কিন্তু ধরা পড়ে গিয়ে আমাকে এমন ভাব দেখাতেই হ'লো যেন বুলবুল না-গেলে আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আরো বেশি ধরা প'ড়ে গেলো বুলবুল, যখন বললো, "আমি একা গেলেও?" আমার কপটতা আর-এক ডিগ্রি চ'ড়ে গেলো এর উত্তরে, 'মিতু তোমার বন্ধু, আমি ভাবলাম সে থাকলে তুমিও খুশি হবে।' আস্তে মাথা নাড়লো বুলবুল—আর তার চোখে আর গলার আওয়াজে তার অভ্যস্ত নীরস নারীত্বহীনতা সে-মুহূর্তে ফিরে এলো—না রণজিৎ, সিনেমায় আমি যাবো না, আমার সময় নেই। সময় যদি বা থাকে, কোথাও গিয়ে আমোদ করার মতো মনের অবস্থা নেই। তুমি জানো না, আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।' 'তাই তো বলছিলাম, বাস্টার কীটনকে দেখে খুব খানিকটা হাসলে তোমার মন ভালো হ'য়ে যাবে।' 'আমার মন অত সহজে ভালো হবার নয়।' 'তাই বুঝি অন্যদেরও মন-খারাপ ক'রে দাও?' এর উত্তরে কঠিন গলায় বুলবুল বললো, 'এ-দেশে কারো সুখী হবার অধিকার নেই—' তারপর, হঠাৎ নরম সুরে—'তুমি ছাড়া।'

মাঝে অনেকগুলো দিন কেটে গেলো। য়ুনিভার্সিটি খুলে গেছে, দিন ছোটো হ'য়ে এলো, শীত আসতে দেরি নেই। কলেজ, বকুল-ভিলা, কখনো বা জোন্সের সঙ্গে বিকেল কাটানো, বাড়িতে মাঝে-মাঝে কাজলের সঙ্গে গালগল্প—সেই একইভাবে কাটছে আমার সময়, অন্ততপক্ষে বাইরে থেকে দেখলে। বুলবুল আসে মাঝে-মাঝে, বেশিক্ষণ থাকে না, থাকে না ব'লে আমার অবশ্য কোনো আপশোষ নেই। তারপর একদিন, আমি তখন বেরোচ্ছি, বুলবুল এসে বললো, 'তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না, জানি তুমি মিতুর কাছে যাচ্ছো' শুধু একটা কথা বলতে এলাম।" "কী, বলো?' 'তুমি কাল আবার জোন্সের কাছে গিয়েছিলে?' 'কী ক'রে জানলে?' আমার প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে বললো, 'এখনো সময় আছে, এখনো আমার কথাটা রাখো, রণজিৎ, জোন্সের বাড়িতে আর যেয়ো না।' 'তুমি কোনো অন্যায় অনুরোধ করলে তা রাখি কী ক'রে?' 'কিন্তু কেন এ-কথা বলছি তা কি তুমি জানো?' 'অনুমান করতে পারি হয়তো—কিন্তু, বুলবুল, আজ আর তর্ক করবো না তোমার সঙ্গে, সত্যি আজ ব্যস্ত আছি।' 'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারো—দু' মিনিট?' তার দিকে তাকিয়ে আমার করুণ মনে হ'লো তাকে, উশকো-খুশকো চুল, অতি সাধারণ জামা-কাপড়, সাধারণ চেহারা, মনে হ'লো তার ভিতরে কোনো উত্তেজনা চলছে, আমাকে তার অংশ দিয়ে হালকা হ'তে চায়। 'কী হয়েছে?' 'নতুন কিছু হয়নি, রণজিৎ। আমার খুব কষ্ট হয় যখন ভাবি আমাদের দেশের এক শত্রুর সঙ্গে ব'সে তুমি চা-বিস্কুট খাও।' আমি বাঁকা ঠোঁটে বললাম, 'ও-সব বুলি আমার কাছে আউড়িয়ো না।' 'এত অহংকার কেন তোমার যে, যা-কিছু তোমার মনো-মতো নয় তাকেই "বুলি" ব'লে উড়িয়ে দাও? তুমি কি ভেবে দেখেছো জোন্স কেন এত মেলামেশা করে বাঙালি মহলে? কেন বাংলা শিখছে, বাংলা বই পড়ছে,' আসে য়ুনি-ভার্সিটিতে ডীবেট করতে বকুল-ভিলার গানের আসরে? না—আমি জানি তুমি কী বলবে, আমাকে একটু বলতে দাও। হ'তে পারে সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, হ'তে পারে সে গান ভালোবাসে, হ'তে পারে সে চটপটে বিদেশী ভাষা শিখতে পারে, কিন্তু এইসব গুণ সে কোন কাজে লাগাচ্ছে তা কি ভাববে না তুমি? অমনি ক'রে সে ঘরে-ঘরে ঢুকে হাঁড়ির খবর টেনে বের করছে, সর্বনাশ করছে আমাদের! তুমি কি ভুলে থাকবে যে জোন্সই এই দাঙ্গা বাধিয়েছিলো ঢাকায়, তারপর হাওয়া খেতে দার্জিলিঙে চ'লে গিয়েছিলো, তারই জালে আটকে যাচ্ছে আমাদের ছেলেগুলো—সাপের মুখে ব্যাঙের মতো কপ্‌কপ্‌ ধরা প'ড়ে চালান হ'য়ে যাচ্ছে হিজলিতে বকসারে? স্পাই—সাংঘাতিক স্পাই—ধূর্ত, জাঁহাবাজ শয়তান—এ-ই হ'লো তোমার আর্থার জোন্স!' আমি চীৎকার করে ব'লে উঠলাম, 'বিশ্বাস করি না।' "আমরা জানি—আমরা প্রমাণ পেয়েছি।" ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বললো বুলবুল, কিন্তু আমি তার চোখে-মুখে রাগের আগুন দেখতে পেলাম। জবাব দিলাম', "আমরা" বলতে তুমি কী বোঝো জানি না। আমার কাছে কেউ "আমরা" নেই—সকলেই এক-একটি আমি।' '"আমরা" মানে আমরা—দেশের লোক।' 'তাহ'লে তো আমিও তার মধ্যে পড়ি বলে মনে হচ্ছে। সেই আমি বা "আমরা" তোমাকে বলছি যে, "তোমাদের" সব প্রমাণ একেবারে ভুয়ো, আর তোমার এই ধারণা একেবারে মিথ্যে। জোন্স অত্যন্ত খাঁটি মানুষ—আমি জানি—ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের জন্য সে মনে-মনে লজ্জিত, সে যে এই চাকরি নিয়েছে তাও দেশটাকে জানার জন্য, বোঝার জন্য, সে সজ্ঞানে এমন কিছু করতেই পারে না যাতে এ-দেশের কোনো ক্ষতি হবে। ইংরেজ শাসন একটা যন্ত্র, আর জোন্স একজন মানুষ, একজন ব্যক্তি—এ-দুটোর তফাৎ বোঝার মতো বুদ্ধি কি তোমার নেই?' হাসলো বুলবুল আমার কথা শুনে। 'তুমি নিজে ভালো, তাই সকলকে ভালো দ্যাখো। কতটুকু চেনো তুমি জোন্সকে? দু-চারটে বইয়ের কথা বলে, আর তাইতেই তুমি গ'লে যাও। তুমি ভাবের জগতে ভেসে বেড়াও, তাই ভাবতেই পারো না যার মুখে মধু তার মন গরলে ভরা হ'তে পারে!'—আমি বুঝলাম এই তর্ক বৃথা: যা-কিছু আমার কাছে জোন্সের ভালোত্বের প্রমাণ, সেগুলোই তাকে অপরাধী করেছে বুলবুলের চোখে। জোন্স সাহিত্যপ্রেমিক, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করছে, এটা বুল-বুলের মতে তার 'মুখোশ'। সে যে স্বচ্ছন্দে সহজভাবে চলাফেরা ক'রে বেড়ায়, বন্ধু খোঁজে বাঙালিদের মধ্যে—আর তাও এই নটোরিয়াস ঢাকায়, যেখানে এক বছর আগে লোম্যান লোপাট হ'য়ে গিয়েছিলো—এটা বুলবুলের ভাষ্য, তার 'সবচেয়ে কুটিল চালাকি'—অমনি ক'রেই সে ধাপ্পা দিচ্ছে আমার মতো, অনাদিবাবুর মতো ভালো-মানুষদের। সে নাকি দেখাতে চাচ্ছে সে অন্য ইংরেজদের মতো নয়—বডিগার্ড নিয়ে পথে বেরোয় না, একজন 'ভারত-বন্ধু'র ভেক ধরে নিজের কাজ হাসিল ক'রে নেবে, এই তার আসল মতলব।' আমি হঠাৎ বললাম, 'তুমি বলছো জোন্সের কারসাজিতে ঢাকার ছেলেরা সব ধরা পড়ছে। কিন্তু তুমি যে এখনো জেলের বাইরে আছো তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে জোন্স নির্দোষ?' নিঃশব্দে কাটলো কিছুক্ষণ, তারপর বুলবুল খুব নিচু গলায় বললো, 'আর বেশিদিন থাকবো না। সেইজন্যেই, তোমার চোখের বাইরে চ'লে যাবার আগে, এই কথাগুলো তোমাকে বলতেই হ'লো। রণজিৎ, তুমি মিতুকে ভালোবাসো, আর তোমার দেশের এই মানুষগুলো, যারা ইংরেজের বুটের তলায় গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, তাদের কি একটুও ভালোবাসতে পারো না?' আমি হঠাৎ উঠে বললাম, 'আর যা-ই করো, মিতুকে টেনে এনো না এর মধ্যে!' 'কী! আমার মুখে মিতুর নামও তোমার সহ্য হয় না?' আমি আর্তভাবে ব'লে উঠলাম, 'বুলবুল, তোমার সঙ্গে কিছুই মেলে না আমার, তুমি আমাকে রেহাই দাও।' "রেহাই? মানে—আমাকে আসতে বারণ করছো?' আমি কঠিন হ'য়ে বললাম, 'যদি দেখা হ'লে শুধু ঝগড়া বেধে যায়, তাহ'লে তো দূরে-দূরে থাকাই ভালো।' 'ও! এই তোমার মনের কথা?' নিশ্বাস ছাড়লো বুলবুল। 'বেশ, তা-ই হবে।' স্তব্ধতা নামলো আমবাগানে, পাশাপাশি, কেউ কারো দিকে না-তাকিয়ে, আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আর একটিও কথা বললাম না কেউ, আমার বাড়ির মোড়ে এসে আমি বুলবুলের কাছে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়ালাম না।

তারপর—আধঘণ্টার মধ্যে—আমি বকুল-ভিলায়। লগ্ন আমার অনুকূল ছিলো: মিতুকে পেলাম দোতলায় বারান্দায় তার মা-বাবার সঙ্গে, কাছাকাছি আর কেউ নেই। আমি দেরি করলাম না, আমার সব দ্বিধা ঝ'রে প'ড়ে গেলো, সেই বহুজল্পিত কয়েকটি শব্দ খুব সহজে বের করে দিলাম মুখ দিয়ে ঃ "আমি মিতুকে বিয়ে করতে চাই।" ধরা দিলাম সেই বন্ধনে যা আমার মুক্তি, যা আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না কোনোদিন। আমার মন শান্ত হ'লো; সে-রাত্রে অঘোরে ঘুমোলাম। (ক্রমশঃ)

দুর্গদ্বারে আঘাত

প্রাক্তন রাজা-রাজড়াদের ব্যক্তিগত ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্লাটফর্মে সদস্য বিশেষের জেহাদ মাঝে মাঝেই ধ্বনিত হলেও এইবারই তাঁরা সর্বপ্রথম কংগ্রেসের সরকারী কোপের সম্মুখীন হয়েছেন। এবারকার নির্বাচনে রাজন্যরা যে কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তার পরিণতিতে কংগ্রেস কোনো কোনো রাজ্যে যে গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তাতে এই ধরনের একটা সম্মুখ-সংগ্রামের সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। নির্বাচনেরকালে এবং অব্যবহিত পরে রাজন্যদের ভাতা সমেত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে শ্রীঅতুল্য ঘোষের আক্রমণ কংগ্রেসের সরকারী অভিমতে অন্য চিন্তার আভাস দিয়েছিল। অবশ্য এই চিন্তার স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নেই। রাজন্যরা তাঁদের পূর্বতন সম্পত্তি ও ক্ষমতাচ্যুত হলেও ভাতা বাবদ প্রাপ্য বিপুল অর্থ ও বিশেষ সুবিধাদির জন্য এলাকা বিশেষে অত্যধিক প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ। এর আগে তাঁরা রাজনীতি থেকে প্রায় দূরে সরেছিলেন এবং যাঁরা রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরও কার্যকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ ছিলো। গত নির্বাচনেই প্রথম তাঁদের কংগ্রেস-বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেলো, যার ফলে প্রধানত কংগ্রেসকে অনেকগুলো আসন হারাতে হয়েছে। কাজেই উভয়পক্ষের বোঝা-পড়া যে আসন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার কোনো কারণ ছিলো না।

তবুও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে খসড়া প্রস্তাব রচনা ও গ্রহণ করেছিল তাতে রাজা-রাজড়াদের বিশেষ সুবিধাদি লোপ করারই কথা ছিলো, ভাতা সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত ছিলো না। কিন্তু সদস্যদের সকলে রাজন্যদের শুধু অধিকার খর্ব করেই সন্তুষ্ট হতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে মহারাষ্ট্রের মোহন ধারিয়া অধিকারের সঙ্গে ভাতাও জুড়ে দেওয়ার জন্য এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করলে প্রায় নঘন্টাব্যাপী বিতর্কের পর সংশোধনসহ সমগ্র প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

অবশ্য প্রস্তাব গ্রহণ এবং কার্যকরী করা এক নয়। কংগ্রেসের প্লাটফর্মে এর পূর্বে জাতির পক্ষে এর চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রস্তাব গৃহীত বা ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে যা কার্যকরী করার জন্য পরবর্তীকালে কারুর উদ্বেগ দেখা যায়নি। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলও জাতির কাছে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির ভাতায় হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের পরবর্তী-কালে কংগ্রেসের শীর্ষ-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে যে বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছে তাকে তাচ্ছিল্য করার সাহসও হাই-কম্যাণ্ডের ছিলো না। ফলে মোহন ধারিয়ার সংশোধন সম্পর্কে শীর্ষ নেতাদের একটা নির্বিকার ভাব দেখা যায়। বিতর্কের সময়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে শীর্ষ নেতারা কেউ তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেননি। প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট নেওয়ার কালে প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন, চাবন উপস্থিত থেকেও ভোট দেননি। কামরাজ আগাগোড়া একটা নিরুদ্বেগ ভাবের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন। মোরারজী আলোচনার অনেক সময় প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং ভোট নেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে এসে হাজির হন। তিনি অবশ্য ভাতা বিলোপের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দেন।

পূর্বেই বলেছি, ভাতা ও অধিকার বিলোপের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নেই। রাজন্যরা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভাতা হিসাবে পেয়ে থাকেন তার জন্য তাঁদের আয়কর দিতে হয় না, যে সুবিধা ভারতে আর কেউই ভোগ করে না। তাঁরা যে বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার কোনো স্থান নেই। এই সকল সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার দাবী যথেষ্ট যুক্তিসম্মত। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার ব্যাপারে সংবিধান ও অন্যান্য চুক্তিগত যে সব অসুবিধা আছে সেগুলোও বিবেচনা করা দরকার। স্বাধীনতার সময়ে ও পরবর্তীকালে রাজন্যরা যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেন তখন তাঁদের যোগদানের শর্তাদি লিপিবদ্ধ করে একটি চুক্তিপত্র রচিত হয়। রাজন্যরা তাঁদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব ত্যাগের বিনিময়ে মাসোহারা হিসাবে আর্থিক যে খেসারত পাবেন এবং যে সব সুবিধাদি ভোগ করবেন তা এই চুক্তির ৫৯২টি ধারায় মধ্যে বিবৃত আছে। সর্দার প্যাটেল তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে এই ভাবেই রাজন্যদের রাজ্যত্যাগে প্রবৃত্ত করতে পেরেছিলেন। পরে সংবিধান রচিত হলে তার ২৯১ সংখ্যক অনুচ্ছেদে রাজন্যদের প্রাপ্য ভাতা অন্তর্ভুক্ত করে তাকে সুনিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে কংগ্রেস কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা কার্যকরী করতে হলে এই চুক্তি ও সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা উভয়ই সংশোধন করতে হবে। সংবিধান সংশোধনে অবশ্য অসুবিধা নেই, কারণ এর জন্য পার্লামেন্টে যে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দরকার হবে তা প্রায় সুনিশ্চিত। দক্ষিণ-পন্থী দলগুলোর সম্ভাব্য বিরোধিতা সত্ত্বেও বামপন্থীদের এই ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। রাজন্যরা যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকেন তার সংবিধানগত কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু তার জন্য দরকার চুক্তিপত্র সংশোধনের। যে অবস্থায় এই চুক্তিপত্র রচিত হয়েছিল আজ তার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। জনসাধারণ আজ স্বাধীনতা ও বহু-প্রতিশ্রুত সমাজতন্ত্রের ফল দেখতে ব্যগ্র, বিলম্ব শুধু তাদের মানসিক অস্থিরতাকেই দিনের পর দিন অধিক মাত্রায় প্রকট করে তুলেছে। অপর-পক্ষে, প্রাক্তন রাজন্যরাও যখন তাঁদের সংবিধান-প্রতিশ্রুত ও চুক্তি দ্বারা সংরক্ষিত নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে রাজনীতির জনারণ্যে এসে আবির্ভূত হয়েছেন তখন বিশেষ সুবিধার রক্ষাকবচ তাঁরা সঙ্গতভাবেই দাবী করতে পারেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর আইনগত বাধাগুলোও পূর্বাপর বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদি সংবিধান সংশোধন করে রাজন্যদের ভাতা লোপ, হ্রাস বা খণ্ড বা অন্যভাবে প্রদানের ব্যবস্থা হয় তাহলে তা একতরফাভাবে হবে রাজন্যদের মতামত ব্যক্ত করার কোনো অবকাশ থাকবে না। কিন্তু ভাতা উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিরও অন্তর্ভূত এবং বিশেষ সুবিধাদির অবসান ঘটাতে হলে একমাত্র চুক্তিপত্রই সংশোধন করতে হবে। বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজন্যরা বিশেষ সুবিধাদি ত্যাগে যদি সম্মত হনও তবুও ভাতার প্রশ্নে তাঁদের সম্মতি আদায় কতখানি সম্ভব তা বলা কষ্ট। যদি তাঁরা এই বিষয় কোনো বিবেচনায় অসম্মত হন তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে একতরফাভাবে ভারত সরকার কর্তৃক চুক্তি সংশোধন করা যাকে রাজন্যরা চুক্তি লংঘন বলেই ব্যাখ্যা করবেন। চুক্তি যদি একতরফাভাবে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় তাহলে তা আইনের দৃষ্টিতে কতোখানি সমর্থনযোগ্য হবে সে বিষয়ে কংগ্রেসের সরকারী মহলে বোধহয় এখন পর্যন্ত কেউই সুনিশ্চিত নয়। কাজেই, রাজন্যরা যদি স্বেচ্ছায় কোনো রফায় আসতে রাজী না হন তা হলে এই প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ কি তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত না নেওয়া পর্যন্ত কারুর পক্ষেই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

ভারতের পর ব্রহ্মে, কেনিয়ায়

ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক অসদাচরণের কাহিনী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে অন্তর্হিত হতে না হতেই চীন ব্রহ্ম ও কেনিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কে এমন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে যার ফলে এক-দিকে সে ব্রহ্মে আর রাষ্ট্রদূত পাঠাবে না বলে সিদ্ধান্ত করেছে এবং অপরদিকে কেনিয়া সরকার কোনোরকম বাক-বিনিময় ছাড়াই নাইরোবির চীনা রাষ্ট্রদূতকে অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে।

ব্রহ্মের ঘটনা রেঙ্গুনের তিনটি পূর্বতন চীনা স্কুল নিয়ে। গত সপ্তাহের একদিন হঠাৎ এই স্কুল তিনটার চীনা ছাত্ররা মাও সে-তুং ব্যাজ এঁটে হাজির হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অতঃপর ছাত্রদের জানিয়ে দেন যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ব্রহ্ম সরকার অনুমোদিত প্রতীক ছাড়া অন্য কোন প্রকার ব্যাজ ধারণ নিষিদ্ধ। অতঃপর শিক্ষকরা বিদ্যালয়গুলো ঐদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেন। একটি বিদ্যালয়ে চীনা ছাত্ররা নির্বিবাদে চলে যায় কিন্তু অন্য দু' জায়গায় ভীষণ গোলযোগের সূচনা হয়। বাহান বিদ্যালয়ে চীনা ছাত্রদের একাংশ হেডমাস্টারকে ঘেরাও করে নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবী করতে থাকে এবং স্কুলের দরজা বন্ধ করে লাল-রক্ষী-মার্কা ধ্বনি দিতে থাকে। ফলে বর্মী ছাত্রদের সঙ্গে মারামারি লাগে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে শান্তি স্থাপন করে ও হেড মাস্টারকে উদ্ধার করে। কেমেন্ডিন স্কুলেও হাঙ্গামার পর বর্মী ছাত্ররা বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দাবী করে। তাদের দাবী মতো পুলিশ পতাকা উত্তোলন করে, কিন্তু হঠাৎ সেটা কোনভাবে অদৃশ্য হয়।

এরপরে শহরময় যে প্রচণ্ড হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় তাতে চীনা দূতাবাস বর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, রাস্তায় চীনা দোকান-পাটের ওপর জনতা হানা দেয়, দূতাবাসের ও অন্যান্য বে-সরকারী চীনাদের বহু গাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, তিনটা বাড়ী অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। নিউ চায়না সংবাদ এজেন্সীর অফিসও আক্রান্ত হয়। দুহাজার বর্মী যখন চীনা দূতাবাসে হানা দেয় তখন জনতার পক্ষ থেকে এই রকম অভিযোগ করা হয় যে দূতাবাস থেকে তাদের দিকে গুলী ছোড়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনেও শহরে ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা চলতে থাকে এবং দূতাবাসের সামনে আরেক দফা বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় দুজন বর্মী দূতাবাসে প্রবেশ করে দুজন চীনা কর্মচারীকে ছুরিকাহত করে। ফলে একজনের মৃত্যু ঘটে এবং অপর ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়। ব্রহ্ম কর্তৃপক্ষ গোলযোগ দমনে শহরে সৈন্য নামান এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারী করেন।

চীনের পক্ষে অভিযোগ এই যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রায় ৫০ জন চীনা নিহত হয়েছে এবং রেঙ্গুনের ঘটনার জন্য জেনারেল নে উইনই স্বয়ং দায়ী। এই ঘটনার প্রতিবাদে তারা রাষ্ট্রদূতকে আর ব্রহ্মে পাঠাবে না বলেও নে উইন সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে পিকিং-এও বর্মী দূতাবাসকে ঘিরে লালরক্ষীদের বহু-বিপ্রুত বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

কেনিয়ার চীনা রাষ্ট্রদূতকে বিতাড়নের কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্রদূত কর্তৃক কেনিয়ার পরিকল্পনা মন্ত্রী টম এমবোয়ার সমালোচনা। যে কোনো রাষ্ট্রদূতের পক্ষে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু চীনের জঙ্গী বৈদেশিক নীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি সুপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের পন্থা অনুসরণের ফলেই দেশে দেশে ক্রমাগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। সমগ্র ইউরোপে আলবানিয়া ছাড়া তার আর কোনো মিত্র নাই। আফ্রিকায় সে যে বিপুল প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, কূটনীতিকদের হঠকারিতা প্রভৃতির জন্য তাকে সেই প্রতিষ্ঠা খোয়াতে হয়েছে। আরবভূমিতে একমাত্র সিরিয়ার আনুগত্যই তার সম্বল, যেমন সম্বল সমগ্র এশিয়ায় পাকিস্থান। ইন্দোনেশিয়ায় তার যে বিপুল প্রভাব এবং ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে তার যে অত্যধিক সদ্ভাব ছিল, অত্যন্ত রূঢ় আঘাতে তা এইভাবে অন্তর্হিত হওয়ার পরও যদি চীন নিজের বৈদেশিক নীতি সংশোধনের প্রয়োজন বোধ না করে তা হলে তার নেতৃত্বে যে গুরুতর দৈন্য দেখা দিয়েছে সে কথাই প্রতিপন্ন হবে। এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে চীনারা প্রবাসী অথবা নাগরিক রূপে বসবাস করছে তাদের আনুগত্য যদি চীনের এই বিপথগামী নেতৃত্বের প্রতিই অবিচল থাকে তাহলে তাদের জীবনেও মাঝে মাঝেই এই বিপর্যয় আসা অবশ্যম্ভাবী।
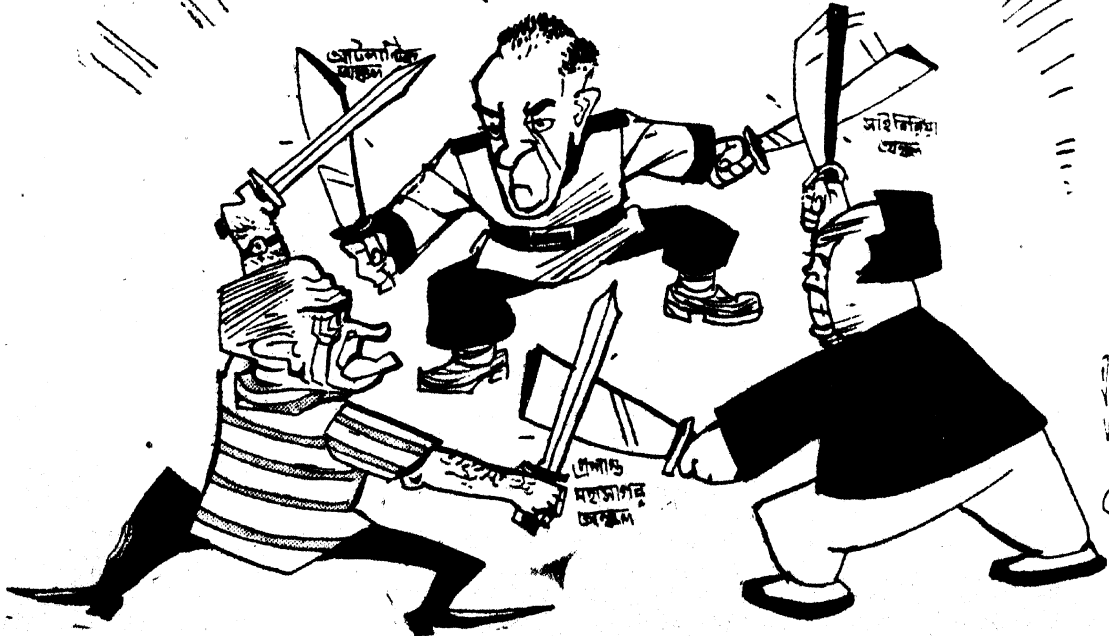
বৈষয়িক প্রসঙ্গ

চূড়ান্ত বাজেট: বৃহত্তর ঘাটতি

সংগ্রাম — ফটো: অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই রাজ্যের জন্যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ১৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন।

শ্রীবসু গত মার্চ মাসে যে সাময়িক বাজেট হিসাব (পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার কর্তৃক রচিত) পেশ করেছিলেন, তাতে ওপ্‌নিং ব্যালেন্স দেখানো হয়েছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। পরে কয়েকটি কারণের জন্যে দেখা গেল ওপ্‌নিং ব্যালান্স ১৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াবে। এই অঙ্ক না ধরলে ১৯৬৭-৬৮ সালের চূড়ান্ত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হত ৩৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা (রাজস্ব খাতে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে ১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা)। এই অঙ্ক ধরে ঘাটতির পরিমাণ এখন দাঁড়াবে ১৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। মার্চের বাজেট হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

মার্চের হিসাবে রাজস্ব খাতে ২০৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা আয় হবে বলে ধরা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, আয় হবে ২০৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ব্যয় ধরা হয়েছিল ২০৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এখন ব্যয় হবে ২২৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

চূড়ান্ত বাজেটে রাজস্ব খাতে এই ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ সরকারী কর্মচারী এবং বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি। এই জন্যে বছরে ১১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বাড়তি বোঝা সরকারকে বহন করতে হবে। এ-বছর খরচা করতে হবে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হল পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি। মার্চ মাসের হিসাবে এই খাতে ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। চূড়ান্ত বাজেটে করা হয়েছে ৬৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। শ্রীবসু বলেছেন, রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় আগেকার বরাদ্দ ছিল খুবই অনুপযুক্ত।

এই ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির মধ্যে কৃষি খাতে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, সেচ খাতে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৮৩ লক্ষ টাকা, শিক্ষা খাতে ১ কোটি ৯৩ কোটি টাকা, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বাবদ ১ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

এছাড়া মূলধনী খাতেও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। মার্চের হিসেবে ২৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। চূড়ান্ত হিসেবে ৩৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই বৃদ্ধির একটা বড় অংশ ব্যয় হবে গৃহনির্মাণ বাবদ।

শ্রীবসু ২৬ জুন বিধানসভায় বাজেট পেশ করে জানান, যুক্তফ্রন্ট সরকার বাজেটের বর্ধিত ঘাটতি অতিরিক্ত কর ধার্য করে মেটাবার চেষ্টা করবেন। কর প্রস্তাব তিনি বাজেটের সঙ্গে পেশ করেননি। পরে করা হবে।

অতিরিক্ত কর ধার্য করার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীবসু এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতার কথা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহৃদয়তার অভাবের কথা উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীবসুর বাজেট বক্তৃতার প্রধান জোরই ছিল কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের প্রশ্নের ওপর। তিনি এই সম্পর্কের পূর্ণ বিবেচনার জন্যে দাবী জানান।

তিনি বলেন, সংবিধানে এই সম্পর্ক যেভাবে নির্দিষ্ট আছে, তাতে অতিরিক্ত কর ধার্যের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। করের কতগুলি সূত্র আছে, যা ধার্য করার ভার কেন্দ্রের ওপর কিন্তু যার আদায়ীকৃত অর্থ রাজ্যের তহবিলে যায়। অন্য কতগুলি সূত্র আছে, যেমন, প্রবেশ-কর এবং কাপড়, চিনি ও তামাকের ওপর অতিরিক্ত আবগারী শুল্ক যেগুলি রাজ্য সরকার ধার্য করতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই উভয় ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি করা যায় কিনা তা জানতে চেয়ে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করছেন।

সেই সঙ্গে কেন্দ্র-প্রদত্ত ঋণ ও সুদ পরিশোধের মেয়াদ, শর্তাবলী ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্যেও প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। শ্রীবসু মনে করেন, এই পরিবর্তনের দ্বারা রাজ্য সরকারের প্রভূত আর্থিক সুবিধা হতে পারে।

কেন্দ্রের সাহায্যের প্রশ্নে শ্রীবসু জানান, তিনি পরিকল্পনা কমিশনের কাছে এই রাজ্যের জন্যে অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা চেয়েছেন। বর্তমান বছরে বিভিন্ন রাজ্যকে কেন্দ্রের সাহায্য বাবদ ৫৯০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। ঠিক হয়েছে এর ৭০ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ৩০ শতাংশ বিশেষ প্রয়োজনের বিচারে বিতরণ করা হবে।

যদি ৭০ শতাংশ—অর্থাৎ ৪১৩ কোটি টাকা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরিত হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ পায় ৩৩ কোটি টাকা। বাকী ৩০ শতাংশের (১৭৭ কোটি টাকা) মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রীবসু মনে করেন এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। "পরিকল্পনা কমিশন কি করে আশা করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশেষ সমস্যা নেই এবং সে বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে ১৭৭ কোটি টাকার মধ্যে ১ কোটি টাকার বেশি পেতে পারে না?"

শ্রীবসু এই প্রসঙ্গে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের অর্থ সাহায্যের সমগ্র বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর প্রস্তাব, এই সাহায্য ব্যবস্থা পরিকল্পনার' জন্যে একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা হোক। শ্রীবসু মনে করেন, অর্থ-কমিশনের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের গ্রহণ করা উচিত নয়। সংবিধানে স্পষ্টই বলা আছে যে, কেন্দ্রীয় অর্থ রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করার ব্যাপারটা সরকারী কর্তৃত্ব-মুক্ত একটি স্বতন্ত্র বিধিবদ্ধ সংস্থার ওপর ন্যস্ত থাকা উচিত।

সাম্প্রতিক * য়োরোপীয় চলচ্চিত্রে *

প্রেম তথা যৌনতা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

মাস কয়েক আগে সাগরপারের এক পত্রিকায় পোল্যান্ডের তরুণ চিত্র-পরিচালক জানুসী লিখেছেন : আর্ট চিরকালই বিদ্রোহী। গতানুগতিকতা নয় — প্রতিবাদ, উত্তেজনা, সুন্দরতর পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা, এই সবের মধ্যে দিয়েই সে বেড়ে ওঠে।

কথাটা নতুন নয়। শিল্পের ইতিহাস বিদ্রোহের ইতিহাস। প্রতিবাদের উত্তেজনা, প্রকাশের ব্যগ্রতা শিল্পীর মনকে কেবলই নাড়া দিতে থাকে, ধাক্কা দিতে থাকে। সেই আন্দোলনে অস্থিরতায় জন্ম নেয় নব সৃষ্টি, শিল্পের চেহারা ও চরিত্র। অন্যদিকে, এই বিদ্রোহের বকলমে অনেক অবাঞ্ছিত বিকৃতিও জমে ওঠে। সেগুলো অবশ্য টেঁকে না, কিন্তু আশ-পাশে মোটা দাগ রেখে যায়।

য়োরোপের ছবির জগতে জীবন, মৃত্যু, হৃদয়, সমাজ, এমন কি ঈশ্বর প্রসঙ্গেও নানা জিজ্ঞাসা নানা দিকে। তার মধ্যে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, নব-মূল্যায়নের, সুর ওতঃপ্রোত। আবার মূল্যায়নের, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের নামে বিকারের নিদর্শনও কম নয়—বিশেষত এবং স্বভাবতই প্রেম ও যৌনতার শিল্প-রূপায়ণের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক য়োরোপীয় চলচ্চিত্রে দুটি ধারাই সমান্তরাল।

এই সেদিন ভারতীয় ফিল্ম সোসাইটি-গুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা ছবি দেখাল : মিলো ফোরম্যানের 'হ্যালো ব্লন্দ' বা 'ব্লন্দস লভ' বা এ ব্লন্দ্ ইন লভ'। বাগদত্তা আন্দুলা তীব্র যৌনাবেশে দেহদান করে পরপুরুষ মিলডার কাছে। সংগমের দৃশ্য নেই; তার পূর্ব ও পর মুহূর্তে দুটি নিরাবরণ দেহ ঘনিষ্ঠ—প্রথমটিতে রতিরসে হাস্যরসের মিশ্রণ, দ্বিতীয়টি যেন চিত্রকর গোয়ার আঁকা ছবি। এক রাত্রির মিলনেই মিলডা তৃপ্ত; কিন্তু আন্দুলার মনে ভালবাসার সঞ্চার হয়। সে একদিন মিলডার বাড়িতে যায়। বাবার আপত্তি নেই; মা ছেলেকে টেনে নিয়ে যায় : এসব শ্লেচ্ছ ব্যাপার এ বাড়িতে চলবে না। অভিসারিকা রতিকামিনী নারী নিঃসঙ্গ কান্নায় ভেঙে পড়ে কঠিন মেঝেয়। পুনশ্চ অভিসারের স্বপ্ন দেখে।

ছবিটি বহুবিতর্কিত, তীক্ষ্ম সমালোচনায় আক্রান্ত। তবু এর অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসাকে এবং তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় নি। এবং তা যায় নি বলেই ওদেশের ইদানীন্তন ছবিতে প্রেম ও যৌনতা বিষয়ক সমস্যাকে নানা দিক থেকে নানা-রূপে ও রীতিতে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।

যেমন : লুক মুলেৎ-এর 'ব্রিজিৎ ও ব্রিজিৎ' (ফ্রান্স)। গ্রাম থেকে দুটি মেয়ে এসেছে প্যারীতে, সর্বোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। দুজনেই চিত্রতারকা ব্রিজিৎ বর্দোর নিখুঁত অনুকরণ—তেমনি সাজ-পোষাক, হাবভাব। অথচ শহর ও শহুরিয়ানার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। তার ওপর, অর্থের টানাটানি: না মেলে বাসা, না মেলে পেট ভরাবার মত খাবার। ফলে ব্রিজিৎ-মার্কা মেয়ে দুটিকে যেসব নতুন-নতুন পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়, তার মাধ্যমে পরিচালক তুলে ধরতে চেয়েছেন ছাত্র-জীবনের কয়েকটি নৈতিক সমস্যাকে।

'বেলে দ্য জুর' চিত্রে ক্যাথারিন দানিয়ুব, জেনেভ পেজ, ফ্রাঁস্কোয়াজ ফেবিন এবং মেরিয়া সোট্যুর।

ফরাসী নবতরঙ্গগোষ্ঠীর অগ্রণী পরিচালক জ্যাঁ-লুক গদার মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং প্রকাশ করেন এক নিজস্ব 'কোলাজ' (বৈষম্যের সমবায়) পদ্ধতিতে। তাঁর 'ম্যাসকুলিন ফেমিনিন'—নামেই বোঝা যায় : নর-নারীর সম্বন্ধ নিয়ে এ ছবি। পরিচালক দেখেছেন : আজকের তরুণ-তরুণীরা আসক্তি বিষয়ে উদাসীন, সেটা বাইরের; ভেতরে-ভেতরে তাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ; এবং এটাই এদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এরা মুখে একক জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করে, কিন্তু দ্বৈত জীবনকে সর্বান্তঃকরণে কামনা করে—তার অভিব্যক্তি মেলে কাজে, বাক্যে, ঘরে, এমন কি ল্যাভেটরীতেও। এই জটিল ও সংগুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে গদার রূপ দিয়েছেন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়; সে ব্যঞ্জনা দৃশ্য-ছবিতে যতটা, তার চেয়েও বেশী, দুটি ফ্রেমের মধ্যবর্তী অবকাশ-ভূমিতে।

দ্বন্দ্ব-দ্বিধা যেমন ব্যক্তির নিজের মধ্যে, তেমনি বাধা-প্রতিরোধ তার চারপাশে। সামাজিক নীতি কুসংস্কার ব্যক্তির বাসনাকে রুদ্ধ, আশাহত করে; নিরুদ্ধ কাম ফুটে বেরোয় দগদগে ঘা হয়ে। এই বিষয় নিয়ে ফরাসী প্রতিভা জ্যাঁ জেনে (যাঁকে সার্ত্র বলেছেন 'সেন্ট' লিখেছেন 'মাদামোয়াজেল'। একটি গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মাদামোয়াজেল—অল্প বয়স, সজাগ ইন্দ্রিয়, স্বাভাবিক যৌনচেতনা। কিন্তু গ্রাম্য সমাজ, তার নীতি ও সামাজিকতা সামান্যতম দাবী পূরণের পথেও প্রবল বাধা। ফলে, বাসনাকে প্রতি মুহূর্তে দমন করতে হয়, ভদ্রসমাজে সভ্যতার মুখোশ পরতে হয়; অবদমন থেকে অসুস্থ বিকৃতি। মাদামোয়াজেল কামতৃপ্তি খোঁজে শ্রমিকদের মধ্যে। ভয় জমা হয় মনে—ধরা পড়ার, চাকরী যাওয়ার, সম্মান হারানোর ভয়। কোমল হৃদয়া লাবণ্যময়ী নারী হয়ে ওঠে হিংস্র নিষ্ঠুর। অবশেষে সমস্ত ভয় ও দ্বিধা দু হাতে ঠেলে ফেলে মাদাম আত্মসমর্পণ করে জনৈকের কাছে; নিরঙ্কুশ দেহ-সম্ভোগ, পরিপূর্ণ আনন্দ। কিন্তু ভোরে বাড়ি ফেরার পথে গ্রামের মহিলাদের মুখোমুখি। আর, ঠিক তখনই মাদামোয়াজেল সব হারানো কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে : 'ও...ও আমার সর্বনাশ করেছে।'

কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়েছেন ইংলণ্ডের টোনি রিচার্ডসন। মাদামের ভূমিকায় জাঁ মোরো।

আর একজন বিশ্বখ্যাত পরিচালক স্পেন-মেক্সিকো-ফ্রান্সের লুই বুনুএল, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাঁর অসীম উল্লাস। স্বগত 'বেলে দ্য জুর' ছবিটিকে তিনি বলেছেন ঃ ধর্ষণকামের এক অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ।' পিয়েরে ও সেভেরিনে নব-বিবাহিত দম্পতি। স্বামী চিকিৎসক, হাসপাতালেই বেশীক্ষণ থাকতে হয়, স্ত্রী ঘরে একাকিনী। স্বামীকে সে ভালবাসে; কিন্তু তাঁর যথেষ্ট পৌরুষের অভাবে তার দৈহিক সুখ আজও অতৃপ্ত। বান্ধবী রেণী ওকে এক ক্লাবের সন্ধান দেয়, যেখানে তার এই অভাব মিটতে পারে। অনেক ইতস্ততঃ ভাবনা, শেষে এক সময়ে মাদাম আনেই-এর ক্লাবে হাজির হয়। পালিয়ে আসে, আবার যায়। মাদাম শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়। সেভেরিনের ঘরে অতিথি আসে, ওর জীবনে প্রথম পর-পুরুষ! পৌরুষে ভরপুর: আপাদ-মস্তক তৃপ্তি। পনেরো দিন সানন্দ স্মৃতিচারণা। আবার ক্লাবে, ক্রমে ঘনঘন। শেষে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সেভেরিনের জীবনে এখন দুটো ভাগ ঃ ঘরে সে স্ত্রী, শান্তস্বভাবা, পতিব্রতা; ক্লাবে সে রমণী, উচ্ছলা, দুরন্ত কামিনী। কোন বিরোধ নেই দুটি সত্তায়, দিন-রাত্রিতে। এমন সময়ে সিরিয়া থেকে এলো এক আশ্চর্যতম পুরুষ, হিপোলিতে। দেহের কামনা হতে চাইল মনের বাসনা। ওদিকে স্বামীও জেনে গেছে অভিসার-কথা। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিপর্যয়; সুখী দাম্পত্য টুকরো-টুকরো হয়ে গেল ভাঙনের মুখোমুখি।

জোসেফ কেসেলের গল্প থেকে বুনুএল 'বেলে দ্য জুর'-এর চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন। ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে সেভেরিনের বাল্য ও ও কৈশোরে গিয়ে তার অস্বাভাবিক যৌন-কামনার উৎস সন্ধান করেছেন। এবং সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে তিনি পেয়েছেন ঃ ধর্ষিতা হবার ইচ্ছা তথা এক বিচিত্র মানসিক ব্যাধির পুনঃপুনরাবৃত্তি, তজ্জাত নৈতিক দ্বন্দ্ব ও অনিবার্য অন্তঃশায়ী নাটকীয়তা।

এই সন্ধিৎসা ফিলিপ দা ব্রোকার 'মিমি গিলোটিন'-এও, যদিও অনেক ছোট আকারে। বিপ্লবের আগুনে ফ্রান্স তখন ঝলসে উঠছে, গিলোটিনে প্রাণ যাচ্ছে অভিজাতদের। তবু মিমি অভিজাত সমাজে বিয়ে করবে। আভিজাত্যের মোহে নয়। ভয়-মৃত্যু-বিভীষিকা, এই সবের মধ্যেই তার প্রেম তথা যৌনতার অপরিসীম পরিতৃপ্তি!

সার্জ বুর্গিই ব্রিজিৎ বার্দোকে নায়িকা করে যে ছবি 'আনন্দিত হৃদয়' তুলেছেন, তার উপজীব্য ঃ অসম যৌনবাসনার সংঘাত ও ফলশ্রুতি। সিসিল কাজ করে মডেলের; স্বভাবে শান্ত, গভীর; প্রেমে অচপল, প্রগাঢ়। কিন্তু তার মনের মানুষ ভিনসেন্ট স্বভাবে দুর্দান্ত, প্রেমে উত্তেজনা-চপল। একবার তিন দিনের ছুটিতে দুজনে এসে ওঠে স্কটল্যাণ্ডের এক নির্জন ভাঙা প্রাসাদে, যেন আদিম আবহাওয়ার মাঝখানে। তিন দিন—কোমল অথচ নিষ্ঠুর, উদ্দাম নির্বাধ আদিম ভালবাসার আগুনে জ্বলে ওঠে দুটি যৌবন-দেহে, ছড়িয়ে পড়ে সিসিলের মনেও। ফিরে আসে ওরা। কিন্তু শান্তস্বভাবা সেই মেয়েটি পুরনো দিনকে মনকে আর যেন তেমন করে ফিরে পায় না; ঝড় এসে দোলা লাগায় মাঝে-মাঝে। কী করবে সে এখন? কী করবে?

আসলে, তিন দিনের উচ্ছ্বসিত বন্য প্রণয়-চিত্রই পরিচালকের লক্ষ্য; প্রশ্নটা তার ওপরে একটা মোলায়েম প্রলেপ মাত্র; তবু এ গল্পেরও একটা অর্থ আছে। কিন্তু দুটি মেয়ে—পালা করে একজন এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি চালায়, অন্যজন তার ভেতরে বাসর-শয্যা পাতে; কিম্বা এক নারী সাতজন পুরুষের মোকাবিলা করে, এ শ্রেণীর কাহিনীর বক্তব্য কি? শুধু অভাবনীয় কর্মে নিষিদ্ধ বস্তুকে লোচনগ্রাহিণী বা বহুজন-প্রলোভনায় চ বিচিত্র রতিবাসনাকে পর্দা-নশীন করা! প্রথম ছবিটি 'লভ ইন ১৯৬৭' তুলেছেন ফ্রান্সেরই ক্লদ অঁত-লারা; দ্বিতীয়টির পরিচালক স্বনামখ্যাত ডি সিকা।

আত্মীয়সম্ভোগলিপ্সা প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকেই য়োরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের ধারাবাহিক ঐতিহ্য। একালেও ঈদিপাস-ইলেকট্রার কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছেন সার্ত্র, ককতো; ছবি তুলেছেন ভিশকন্তি, ক্যাকোইয়ানিস প্রভৃতি। রুমানিয়ার পরিচালক মানোলে মার্কাস এখন যে ছবিটি নিয়ে ব্যস্ত, তার নাম 'ভীগো'; মূল বিষয় ঃ ভাই-বোনের ভালবাসা, অবশ্য অজ্ঞাতে। সুইডেনের ভিলগট সোম্যানের 'মাই সিস্টার, মাই লভ'-এ তিনটি অসামাজিক প্রেমের বৃত্ত ঃ ভাই-বোন; কাকা-ভাইঝি; বাবা-মেয়ে।

ব্রিজিৎ বার্দোর প্রথম স্বামী রজার ভাদিম এ ব্যাপারে চিরকালই রেকর্ড-ব্রেকার। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'দ্য গেম ইজ ওভার'-এর বিষয়বস্তু ঃ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার সং-পুত্রের প্রতি প্রেম; এবং সে প্রেম কামগন্ধ-হীন নয়।

সুইডেনের মাই ৎসেটারলিং একদা হলিউডের অন্যতমা তারকা ছিলেন। পরমায়ুর মধ্যসীমায় এসে হয়েছেন পরিচালিকা। তাঁর প্রথম ছবি 'লাভিং কাপলস' নির্ভেজাল দেহজ প্রেমের রতি-আরতি। দ্বিতীয় ছবি 'নাইট-গেম'—প্রাজ্ঞ সমালোচকদের ভাষায় লজ্জাজনক পর্নোগ্রাফী'; শ্রীমতী ৎসেটারলিং-এর ভাষায় 'সিম্বলী' মাদার-কমপ্লেক্স, ('সিম্বলী' শব্দটা লক্ষণীয়)। ছেলেটি অনেক দিন পরে বেড়াতে এসেছে পুরনো বাড়িতে; মনে পড়ছে অতীতের স্মৃতি, মার সান্নিধ্যে শৈশবের দিনগুলি-রাতগুলি, মাতা-পুত্রের স্পষ্ট-অস্পষ্ট সম্পর্কের দৃশ্যাবলী। অবশ্য ছবির শেষে ছেলেটিকে কমপ্লেক্স থেকে মুক্ত করা হয়েছে—কুয়ো থেকে মার কফিন তুলে ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন 'সিমপল' ব্যাধি, তেমনি তার সরল সমাধান! ফ্রয়েড বেঁচে থাকলে আর্তনাদ করে উঠতেন।

কিন্তু ইতালীর পাওলো স্পিনোলার 'দ্য সামার' দেখে তিনি কী করতেন, আমি জানি না। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন আদ্রিয়ানে নতুন করে মন বাঁধে ধনী সার্জিওর সঙ্গে। ভালবাসায় পাকা রং ধরে, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে

'মেলে দ জন্‌র' চিত্রের দৃশ্য

সেভেন' নামে একটা রকেট এসেছে পৃথিবী-ভ্রমণে। যান্ত্রিক গোলযোগে ফিরতে দেরী হচ্ছে' যাত্রীরা অস্থির; তাদের ভুলিয়ে রাখতে হবে। অতএব আবির্ভাব নায়কের—'লভ টেক্‌নিসিয়ান' : ভালবাসা নামক বিজ্ঞানের দক্ষ কলাকুশলী। নায়ক তথা লভ-এক্‌স্‌পার্ট ইন্টারভিউ নিতে থাকে যাত্রিণী মেয়েদের। বিষয় : প্রেম ; ভাষা : প্রেম; পদ্ধতি : প্রেম! ১নং মেয়েটি ইন্টারভিউ দিল; দেখা গেল—সে প্রেমরতির সব ছলাকলা জানে, কিন্তু বোবা। ২নং মেয়েটি চমৎকার কথা বলে, গভীরভাবে চিন্তা করে, কিন্তু দেহের ভাষা বোঝে না। ইত্যাদি।

বড় ছবি নয়, ছোট শর্ট—'চলচ্চিত্রিকা'। কিন্তু ভেতরের বক্তব্যটা অনেক বড়—মনন-শীলতা ও দেহচেতনার, বুদ্ধিজীবী ও ইন্দ্রিয়জীবীর দ্বন্দ্ব। এ-দ্বন্দ্ব লক্ষ বছর আগের বা হাজার বছর পরের নয়—ইহ-কালের, এই মুহূর্তের, এই পৃথিবীর, পৃথিবীর মানুষ-মানুষীর। পাশাপাশি রাখছি পিয়ের রুসত্যাংগর ছবি : 'দি

সে। কিন্তু কথাটা শুনে সার্জিও আঁৎকে ওঠে : 'বিয়ে? আরে ছি-ছি ওটা বুর্জোয়া সংস্কার। যে প্রেম সত্য পবিত্র, বিশুদ্ধ, তা বিয়েতে নেই, আছে মুক্ত স্বাধীন প্রেমে।' আদ্রিয়ানে দিশাহারা হয়ে যায়; ব্যবধান বেড়ে যায় ; অর্থের প্রশ্নও আছে। মেয়ে এলিজা—ষোড়শ বসন্তের এক গাছি মালা। ওর মিসট্রেস হতে আপত্তি নেই। নির্দ্বিধায় সার্জিওর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মাকে বলে, সান্ত্বনা দেয়। আদ্রিয়ানে প্রথমে অবাক, তারপর বিচলিত, তারপর কয়েকটি বিনিদ্র রাত, অবশেষে হাসিমুখে মেনে নেয়। সংসারে আবার ফিরে আসে সুখ-শান্তি-নিশ্চিন্তি।

শিল্পের নামে আশ্চর্য ভণ্ডামি আর চতুরতা আর বিকৃতি! তবু ও দেশের পরি-

'টু অর থ্রি থিংগস্ আই নো অ্যাবাউট হার' চিত্রে জুলিয়েট এবং তার বান্ধবী

চালক বলে : নাল্পে সুখম অস্তি! তাই আরও পঙ্কিলতা, কুটিলতা, নগ্নতা। এবং ওদের সরব ঘোষণা : এসব ছবি নিছক বাস্তব থেকেই ছেঁকে তুলে আনা।

হায়, এই যদি বাস্তব হয়, তবে অতীত-ভবিষ্যৎ কী? তারও জবাব তৈরী হচ্ছে।

ডন শ্যাফী তুলছেন 'ওয়ান মিলিয়ন ইয়ার বি সি'—আদিম পৃথিবী, নিভন্ত আগ্নেয়গিরি, প্রকাণ্ড জীবজন্তু, প্রচণ্ড জীবনসংগ্রাম, অমিত্র পরিবেশ, আর তাদের মাঝখানে একজোড়া নর-নারীর চমকপ্রদ অ্যাডভেঞ্চার, আধুনিক প্রেমের আদিমলীলা।

দূর ভবিষ্যতে মানব-মানবীর প্রেম কী রূপ নেবে, তার কাল্পনিক ছবি 'লভ ইন টু থাউজেন্ড এ ডি'। রূপকার—জ্যা-লুক গদার। দু' হাজার বছরের সমান বয়সিনী সৌরজগৎ ; সেখান থেকে 'গ্যালাক্সী ইনস্টিটিউট অফ লভ'। এতে দ্রষ্টব্য : কী করে লজ্জা পেরোতে হয়, কেমন করে প্রেম জানাতে হয়, মেয়েদের কাছে কিভাবে এগোতে হয়, মনোরঞ্জন ও চিত্তজয়ের কৌশল, চোখে জল আনার কায়দা, চড় মারার কারিগরি, আদর কাড়ার কারুকাজ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এড়ানোর পথ, সুখী দাম্পত্যের মৌল উপ-করণ। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ বাৎস্যায়নের কামসূত্রের চলমান চিত্ররূপ; অথবা কে বলতে পারে, সচিত্র রতিশাস্ত্র!

তাই বলছিলাম : শিল্পে বিদ্রোহ আছে, বিকারও আছে, জাতশিল্পী আছে, বজ্জাত কারিগরও আছে। যার যেটা ভালো লাগে, যার যেমন রুচি। তবে, শেষপর্যন্ত শিল্পটাই বাঁচে। শুধু বাঁচে না, বারে বারে ফিরে আসে। এবং প্রতিবারই আমাদের হৃদয়কে উজ্জ্বলতর গভীরতর করে দিয়ে যায়।

আজকের কথা ঃ

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধ্যানধারণা (২)

গেল ২৯-এ মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে যে-আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে প্রথম বক্তা ছিলেন নাট্যকার ও বিদগ্ধ নাট্যবিদ দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে যে-পরিকল্পনা পেশ করেন, তাতে মোটামুটি বলা হয়েছে : (১) জাতীয় নাট্যশালা সরকারী অর্থে গঠিত হলেও এটি হবে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা; (২) নাট্যশালাটি কখনও ব্যবসায়-ভিত্তিক হবে না; (৩) এই নাট্যশালাটি হবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর পরিচালনভার থাকবে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী ও নেপথ্যকর্মী, নাট্য-সমালোচক, নাট্য-পরিচালক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগের ও নাট্য-বিষয়ক অধ্যাপক প্রভৃতি নাট্যসেবীদের প্রতিনিধিবৃন্দ দ্বারা গঠিত একটি গণতান্ত্রিক কার্যনির্বাহক সমিতির হস্তে; (৪) কলকাতার রবীন্দ্রসদন হবে জাতীয় নাট্যশালার প্রধান কর্মকেন্দ্র এবং জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে স্থাপিত রবীন্দ্রভবনগুলি হবে এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র; (৫) এই জাতীয় নাট্যশালার উদ্দেশ্য হবে : (ক) বাংলার অতীত নাট্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির পুনর্সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা; (খ) সংস্কৃত এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ধ্রুপদী ও বিখ্যাত নাটকগুলিকে বাংলা ভাষায় তর্জমা করে তাদের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা; (গ) বিদেশের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির বঙ্গানুবাদের অভিনয় করা; (ঘ) বিভিন্ন রীতির নাটক প্রযোজনা করা ও নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং (ঙ) কলকাতার সুপরিচিত নাট্যসংস্থাগুলিকে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মঞ্চে অভিনয় করার ও মফস্বলের নামকরা নাট্যকে দলগুলিকে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে অভিনয় করবার সুযোগ করে দেওয়া; (৬) জাতীয় নাট্যশালার পরিচালনা ব্যয়ভার বহনের জন্যে সরকার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করবেন এবং সেই বরাদ্দীকৃত অর্থ জাতীয় নাট্যশালার পরিচালকবর্গ স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারবেন এবং (৭) নাটক নির্বাচনে, পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়োগে, নেপথ্য-শিল্পী ও কর্মী নিয়োগে ও সাধারণ কার্যক্রম নির্ধারণে সরকার কখনই হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না; পরিচালকবর্গের এ-ব্যাপারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ও নাট্য-সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের খাঁটি জাতীয় নাট্যশালা যাত্রাপন্থী হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, একটি চার-দেওয়াল বেষ্টিত অল্পপরিসর স্থানে কয়েকশত দর্শকের সামনে মঞ্চের ওপর থেকে দৃশ্যপটাদির সাহায্যে যে-অভিনয় ব্যবস্থা, তাকে কখনই বাঙলার জাতীয় রঙ্গালয় বলা সমীচীন নয়। উন্মুক্ত স্থানে হাজার হাজার লোকের মাঝে মাটির ওপর যে-অভিনয় আসর, তাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত জাতীয় রঙ্গালয়। এর মধ্যে কোনো পাশ্চাত্য প্রভাব নেই, নেই কোনো পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ের কৃত্রিমতা। দেশের মাটির বুকের থেকে রস আহরণ করে এই জাতীয় রঙ্গালয় জন্মগ্রহণ করেছে। যুগ যুগ ধরে এই যাত্রারূপী জাতীয় রঙ্গালয় আমাদের দেশের বালক, বৃদ্ধ, যুবানির্বিশেষে সকল নর-নারীকে আনন্দ দিয়ে এসেছে, দেশের সাহিত্য, পুরাণ, দর্শন, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতিকে তাদের সামনে উপস্থিত করেছে, মহাপ্রভু নিমাই পর্যন্ত এই যাত্রারই মাধ্যমে দেশের লোককে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত যাত্রাকে যথা-

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত গড় নাসিমপুর চিত্রের একটি দৃশ্যে দেব মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

"মঞ্চজগতে"র উদ্যোগে বছরের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ কলাকুশলী সংবর্ধনা সভায় সংবর্ধিত এ-বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সীমা রায়চৌধুরী

যথভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে শ্রীমণ্ডিত করার মাধ্যমেই প্রকৃত জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কার্য সুসম্পন্ন হবে বলে ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন।

নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় রঙ্গালয় বলতে নতুন কোনো রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে জাতীয় রঙ্গালয় বলতে 'ওল্ড ভিক' থিয়েটারকেই বোঝায়। ঠিক সেইরকম-ভাবে কলকাতার চলতি সাধারণ রঙ্গালয়-গুলির মধ্যে কোনো একটিকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করে, তাকেই জাতীয় রঙ্গালয়ে উন্নীত করা উচিত, তাকেই সকল রকমে আদর্শস্থানীয় করে তোলবার জন্যে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বারান্তরে আমরা অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ, নাট্যকলাবিদ অশোক সেন, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেশ ভাট, বিশ্বরূপার রাসবিহারী সরকার, নাট্যকার মন্মথ রায় প্রভৃতির 'জাতীয় রঙ্গালয়' সম্পর্কে মতবাদ প্রকাশের আশা রাখি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত নবম বার্ষিক 'বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন'-এ আসছে ১০ই এবং ১১ই জুলাই তারিখে 'জাতীয় নাট্য-শালার সংজ্ঞানির্ধারণ এবং রবীন্দ্রসদনের গঠন ও কর্মসূচীকে আলোচ্য বিষয় করে যে-দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, তাতেও বহু গুণী ও জ্ঞানী এ-বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন এবং বিতর্কেও যোগ দেবেন।

—নান্দীকর

কলকাতা

"আউরং" চিত্রের শুভমুক্তি

জেমিনীর সামাজিক চিত্র "আউরং" এ-সপ্তাহের ৭ জুলাই থেকে প্যারাডাইস, প্রিয়া, লোটাস, গণেশ প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তিলাভ করছে। এস. এস. বাসান পরিচালিত এ-ছবির মুখ্য চরিত্রে অংশ-গ্রহণ করেছেন পদ্মিনী, প্রাণ, রাজেশ খান্না, নাজিমা, ফিরোজ খান, ললিতা পাওয়ার, লীলা চিটনীস, মোহন চোটি, ডেভিড ও ও, পি, রালহান। সংগীত পরিচালনা করেছেন শাকিল বদাউনি।

কালবাঈ চিত্রায়িত হচ্ছে

রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কালবাঈ'কে চিত্রায়িত করছেন জে এস প্রোডাকসন্স। জয়দেব চক্রবর্তী ও শঙ্কর রায়চৌধুরী ছবিটি প্রযোজনা করছেন। বাংলা ও বোম্বাই-এর জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে খুব শীঘ্রই ছবিটির চিত্র গ্রহণ সুরু হবে। পারফেক্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

পি, এম, পিকচার্সের "জীবন-সংগীত"

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর নতুন ছবি পি, এম, পিকচার্সের 'জীবন-সংগীত' চিত্রগ্রহণ নিয়মিত পালন করে চলেছেন। সম্প্রতি দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ছবির কয়েকটি গান গ্রহণ করলেন সংগীত পরি-চালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "এই তীর্থ" অবলম্বনে এ ছবিটির বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রীণা ঘোষ, সন্ধ্যারাণী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার ও সুমন মুখোপাধ্যায়।

আলেয়ার আলো-র চিত্রগ্রহণ শুরু

টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিয়োতে ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইণ্ডিয়া-র প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ "আলেয়ার আলো" ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মঙ্গল চক্রবর্তী, সুরসৃষ্টি করছেন গোপেন মল্লিক। চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেন-গুপ্ত, প্রসাদ মিত্র ও বিশ্বনাথ নায়ক।

চরিত্র-চিত্রণে যাঁরা এপর্যন্ত মনোনীত হয়েছেন তাঁরা হলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, সুমিতা সান্যাল, অনুপ-কুমার, সন্ধ্যারাণী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী ও শেখর চট্টোপাধ্যায়।

বি, পি, ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

"মা ছিন্নমস্তা" ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত!

সুকুমার বসু রচিত ও প্রযোজিত মাতৃ-মন্দির ছায়াচিত্রমের শ্রদ্ধার্ঘ "মা ছিন্নমস্তা" ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। বর্তমানে ছবিটির সম্পাদনা চলছে। বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে পরিচালনা করেছেন সন্তান পরিষদ। সুরসৃষ্টি করেছেন কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ।

ফণী মজুমদার পরিচালিত মা চিত্রে কিশোরকুমার ও কুমকুম

চরিত্র চিত্রণে আছেন—মিহির ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, সবিতা বসু, অসীমকুমার শেখর চ্যাটার্জী, রবীন মজুমদার, বীরেন চ্যাটার্জী, জীবন ঘোষ, গীতা দে, লীলাবতী দেবী, সীমা রায়চৌধুরী, প্রিয় চ্যাটার্জী, গোপ বাগচী, শঙ্করনারায়ণ, মন্মথ মুখার্জী, স্বপনকুমার, ভবতোষ মুখার্জী, শ্যামল ঘোষ ও অশোক মুখার্জী।

রাজরাপ্পায় অধিষ্ঠিতা "মা ছিন্নমস্তা"র মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষিত।

চলচ্চিত্রে 'বাঘিনী':

সমরেশ বসু রচিত 'বাঘিনী' বাঙলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, দুরন্ত আবেগ, বিচিত্র চরিত্র সমাবেশ এবং একটি দুর্বার প্রণয়ের কাহিনী হচ্ছে এই বাঘিনী। চলচ্চিত্রে 'বাঘিনী'কে রূপায়িত করছেন 'মণিহার' চিত্রের প্রযোজক গিরীন্দ্র সিংহ ও পরিচালক বিজয় বসু।

এস এম ফিল্মস্-এর নিবেদন 'বাঘিনী' চিত্রে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যো, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী, শমিতা বিশ্বাস, তরুণকুমার, বাসবী নন্দী, তপতী ঘোষ, ছায়া দেবী, মমতাজ আমেদ, অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, রাখী বিশ্বাস প্রভৃতি শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরসৃষ্টিতে নেপথ্য-সংগীতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, রুমা গুহঠাকুরতা, মান্না দে ও স্বয়ং হেমন্তকুমার। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

বোম্বাই-মাদ্রাজের যুগ্মপ্রয়াস

বম্বের প্রযোজক এন, এন, সিপ্পি এবং মাদ্রাজের প্রযোজক এস, এস, ভাসান মিলিতভাবে একটি হিন্দী চিত্র-নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। ছবির নামকরণ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সম্প্রতি ছবির চিত্রগ্রহণ মাদ্রাজের জেমিনী স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রকুমার ওয়াহিদা রেহমান, শশিকলা, মেহমুদ এবং মনমোহন কৃষ্ণ। ছবিটি পরিচালক এস, এস, ভাসান।

সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

পরিচালক সত্যেন বসুর পরবর্তী ছবি

রাজশ্রী পিকচার্সের পরবর্তী ছবিটি পরিচালনার জন্য মনোনীত হয়েছেন পরিচালক সত্যেন বসু। সম্প্রতি এ সংস্থার কর্ণধার তারাচাঁদ বার্জাতিয়া ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের জনপ্রিয় চিত্র-কাহিনী "জীবন-মৃত্যু" ক্রয় করেছেন। এটিরই হিন্দীচিত্ররূপ দেবেন পরিচালক শ্রীবসু।

"এক শ্রীমান এক শ্রীমতী" চিত্রের সংগীত-গ্রহণ

সম্প্রতি 'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী' চিত্রের প্রথম গানটার সংগীতগ্রহণ করেন সুরকার
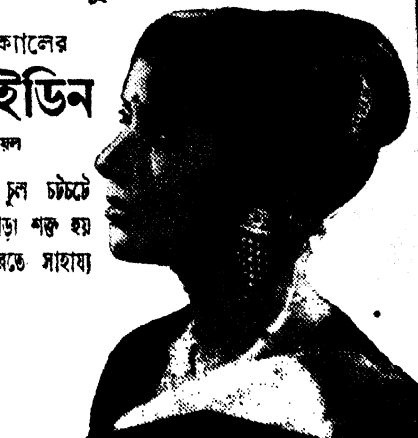
কল্যাণজী-আনন্দজী। কণ্ঠদান করলেন মহম্মদ রফি। যাশ্পি-সোনি পরিচালিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে শশী কাপুর, কবিতা, রাজেন্দ্রনাথ, প্রেম চোপড়া, সুলচনা, মোহন চটি, হেলেন এবং ওমপ্রকাশ।

"তমান্না" চিত্রে বিশ্বজিৎ-মালা সিনহা

কে, এস, পিকচার্সের রঙিন তমন্না চিত্রে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন জনপ্রিয় জুটি বিশ্বজিৎ-মালা সিনহা। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার। কে, পি, আত্মা পরিচালিত এছবির অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন শশিকলা, নাজিমা, দেবেন বর্মা, নাজির হোসেন, অচলা সচদেব, সজ্জন ও অসিত সেন।

পরলোকে হেমেন গুপ্ত

চলচ্চিত্র পরিচালক হেমেন গুপ্ত অকস্মাৎ করোনারী থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল ৩০-এ জুন বোম্বাই শহরে পরলোকগমন করেছেন। চলচ্চিত্রজগতে তিনি প্রথম প্রবেশ করেছিলেন নিউ থিয়েটার্সে সহকারী পরিচালকরূপে; সে হচ্ছে তিরিশ দশকের মধ্যভাগের কথা। স্বাধীনভাবে তিনি প্রথম যে চিত্রটি পরিচালনা করেন, সেটি হচ্ছে বসুধারা বাণীচিত্র প্রযোজিত এবং ১৯৪৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত "অভিযাত্রী"। এর পরে বাঙলার অগ্নি-যুগের সন্ত্রাসবাদীদের কাহিনী অবলম্বনে মনোজ বসু লিখিত "ভুলি নাই"কে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে তিনি দর্শকসমাজের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেন ১৯৪৮ সালে। তাঁর তৃতীয় ছবি "'৪২" চলচ্চিত্র-জগতে ইতিহাস রচনা করে। ১৯৪২-এর মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক আন্দো-

হেমেন গুপ্ত

লনের পটভূমিকায় নির্মিত এই ছবিখানি স্বাধীন ভারতের সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্র সহজে ভোলবার নয়। প্রায় তিন বছর ধরে বহু লেখালেখি, আবেদন নিবেদন, সালিশী সুপারিশের পরে ছবিখানি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হতে পায় ১৯৫১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে। ইতিমধ্যে হেমেন গুপ্ত কলকাতাতেই "তথরার" নামে একখানি হিন্দী ছবি পরিচালনা করেন এবং তারপরে তাঁর কর্মক্ষেত্রকে বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে হিন্দী "আনন্দ মঠ" থেকে শুরু করে "সুভাষচন্দ্র" পর্যন্ত অনেকগুলি ছবি পরিচালনা করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি "অনামী" নামে একখানি বাঙলা এবং আর একখানি হিন্দী ছবি নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। চিত্রজগতে যোগদানের আগে তিনি নানাভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একটি কন্যা এবং একটি পুত্রকে রেখে গেছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

বালুচরী চিত্রে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

ঝর্ণা

সংগ্রামমুখর জীবনের জটিলতম [illegible] দ্বন্দ্ব রূপায়ণে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ঝর্ণা' নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই মঞ্চসফল নাটকটিকে সার্থকভাবে সম্প্রতি অভিনয় করলেন 'ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাবে'র শিল্পীবৃন্দ। অভিনয় অনুষ্ঠিত হোল মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে।

শহর থেকে দূরে একটি গ্রামের কতগুলো মানুষের বিচিত্র জীবনধারায় গড়ে উঠেছে 'ঝর্ণা' নাটকের কাহিনী। এ নাটক রীতা নামে একটি খৃষ্টান মেয়ের নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বকেই ভাষা দিয়েছে এবং এই নিঃসীম হৃদয়যন্ত্রণার গভীরতা ও ব্যাপ্তি দিতে এসেছে আরো অনেক চরিত্র—জোসেফ, সিলু, বুলবুল, প্রদীপ, সুখিয়া, সোনেলাল প্রভৃতি। রীতার যে জীবনধারা উচ্ছলা ঝর্ণার মতো বহুদিকে ব্যাপ্তির স্বপ্ন দেখেছিল, নির্মম বাস্তবের আঘাতে তা হারিয়ে গেল অজানা এক তমিস্রার অতলে।

সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বসমৃদ্ধ এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। অভিনয়ে প্রায় সকলেই প্রাণের স্পর্শ দিতে পেরেছিলেন। নাটকের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় সত্যি অনবদ্য। 'রীতা' চরিত্রের যন্ত্রণাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছেন সুতপা ভট্টাচার্য। সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় বুলবুল চরিত্রে প্রাণ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 'জোসেফ' চরিত্রে শিব-[illegible] কোথাও দৃষ্টিকটু

চিড়িয়াখানা চিত্রে কণিকা মজুমদার।
ফটো : অমৃত

লেগেছে, কিন্তু তাঁর সাবলীল অভিনয়ে এই ত্রুটির কথা মনে থাকেনি। প্রদীপ চরিত্রে তুষার ঘোষের অভিনয় মোটেই জড়তামুক্ত নয়। সোনেলাল ও মঙ্গলের ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন মানস ঘোষ, ভিক্টর ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, অমর বসুমল্লিক, সুরজিত চক্রবর্তী, বিমল রায়।

মৌসুমী শিল্পীগোষ্ঠী

দুর্গাপুরের 'মৌসুমী শিল্পীগোষ্ঠী' স্থানীয় আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে অভিনয় করলেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। রজত রায়চৌধুরী পরিচালিত এই নাটকের অভিনয় দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন কমলেশ গুড়, শ্রীধর আচার্য, রজত রায়চৌধুরী, পরেশ মিত্র, অমল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমীর বসু, সুধীর পাড়ুই, হিমাদ্রি রায়, পি কর, আলপনা মুখোপাধ্যায়, অর্চনা মুখোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ।

জগদম্বা জোকমাতার

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ইয়ং স্টারসের প্রযোজনায় সম্প্রতি এ-বি-টি-এ মঞ্চে পরিবেশিত হোল তরুণ নাট্যকার তাপস দাসের 'জগদম্বা জোকমাতার' নাটক। নাট্যকার স্বয়ং নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন দিলীপ পালিত, সাধন কর, নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেশ দাস, জয়ন্ত চৌধুরী, কাশীনাথ ঘোষ, প্রণব মিত্র, বিমল ঘোষ, প্রবীর মিত্র।

মুরারিপুকুর ওসি

মুরারিপুকুর ওসি তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি অরুণকুমার দে'র 'বাঘনখ' নাটকটি রামমোহন লাইব্রেরী মঞ্চে পরিবেশন করেছেন। এই নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন স্বপন গড়াই (প্রিয়তোষ), স্বপন পাল (আশুতোষ), কমল অধিকারী (সমীর), বাসুদেব সাহা (রঞ্জিত), ধ্রুব কুণ্ডু (নাবালক)। রমেন দাসের নাট্যনির্দেশনায় নিষ্ঠার ছাপ আছে।

শিল্পতীর্থ

প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা শিল্পতীর্থে'র প্রযোজনায় গত ২৩শে জুন হাওড়া টাউন হলে অভিনীত হোল অভিজিৎ রচিত 'রসভাব' নাটক। মানসিক দ্বন্দ্বের একটা সূক্ষ্ম অপ্রত্যাশিত পরিণতি রূপ লাভ করেছে এ-নাটকে এবং এ-বিষয়ে নাট্যকারের সূক্ষ্ম রসজ্ঞান অভিনন্দনযোগ্য। অভিনয়ে যাঁরা প্রকৃত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন, তাঁরা হোলেন মঞ্জু মজুমদার, গোপাল পাল, বিশ্বনাথ পাল, সত্যেন মুখোপাধ্যায়। নাট্যনির্দেশনা ও আবহসংগীত রচনায় ছিলেন সত্যেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকাশীনাথ। অসীম গুহের মঞ্চস্থাপত্য পরিকল্পনায় একটা পরিচ্ছন্ন শিল্পীমনের আভাস পরিস্ফুট হয়েছে।

মুছেও যা মোছেনা

গত ১৭ই জুন হাওড়া ই আর রঙ্গমঞ্চে শিল্পকারে'র শিল্পিবৃন্দ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছেনা' নাটক অভিনয় করলেন। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাপি বসুমল্লিক। অভিনয়

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি চিত্রের সেটে তনুজা ও উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

করেন বাণী পাত্র, মন্দিরা সেন, মানিক সামন্ত, রমনা নাগ, সবুজ সেন, শৈলেন ভট্টাচার্য, অমিয় মিত্র, সুজয় দত্ত, কেশব ছাউল, শংকর মুখোপাধ্যায়, সনাতন পাত্র বাপি বসুমল্লিক।

চারণশিল্পী

'চারণশিল্পী' নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় সম্প্রতি দুটি নাটক অভিনীত হোল। নাটক-দুটির নাম বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' ও শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'ক্যাম্প থ্রী'। নাটকদুটিতে অংশ নিয়েছেন দিলীপ রায়, সুশীল দাস, শিশির ঘোষ, নিমাই পাল, কানু পাল, সুভাষ দাস, অজিত ভট্টাচার্য, সমীর ঘোষ, তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল ঘোষ, রমেন ঘোষ, পূর্ণিমা পাল। দুটি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্ব নেন সুশীল দাস।

কৃষ্ণনগরে নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর এগ্রিকালচারাল রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্রভবনে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' নাটক মঞ্চস্থ করেন। সামগ্রিক নাট্যাভিনয়ে শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা ধরা পড়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেন হেমেন সমাদ্দার, নীতেন চক্রবর্তী, অনিতা ঘোষ, পূর্ণিমা বিশ্বাস, বারীন গাঙ্গুলী, জিতেন চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র নাথ, বসন্ত নন্দী।

জোনাকী

চাকদহের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'জোনাকী'র প্রযোজনায় চাকদহের শিল্পীরা গ্রামে সম্প্রতি জীব গোস্বামী রচিত 'অপথ নিবাস' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন সমীর দাস, সুনীল মুখার্জি, অমর মিত্র, অজিত সরকার, অরুণ [illegible] বিমল চৌধুরী, ভূমিকা ভট্টাচার্য।

আমতুলিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব

কিছুদিন আগে রাণাঘাটের আমতুলিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তিন বছর আগে' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকদুটি অভিনয় করে। এই দুটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন শ্রীধর চ্যাটার্জি, সোমনাথ মুখার্জি, কিশলয় ব্যানার্জি, মণিমোহন চ্যাটার্জি, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, অশোক ব্যানার্জি, গোপীভূষণ মুখার্জি, তারক বিশ্বাস, গায়ত্রী চ্যাটার্জি, মুক্তি রায়, নন্দিতা চ্যাটার্জি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নাট্যনির্দেশনায় স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন রাখতে পেরেছিলেন।

লোকতীর্থ

লোকতীর্থে'র শিল্পিবৃন্দ গত ২৩শে জুন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে তিনটি ভিন্ন স্বাদের একাংকিকা পরিবেশন করলেন। নাটক তিনটি হোল বিমল দে-র 'চিঠি', অরুণ সরকারের 'চুমকী' ও সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'উলু স্টেশন'। ভিন্ন সুরের এই নাট্যত্রয়ীর নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিমল দে এবং নাট্যপ্রযোজনায় বৈশিষ্ট্য থেকে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম রসবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

একটি কৌতুক কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'চিঠি'র নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে উঠেছে। একটি নাটকের পাঠ ভালোভাবে আরম্ভ করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কীভাবে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাই এখানে রূপ দেওয়া হয়েছে। কৌতুক-স্নিগ্ধ এই নাট্য-কাহিনীতে অংশ নেন অশোক দাস, অর্ধেন্দু রায়, বিমল দে, খোকন দাস শুভ্রা দাস।

'চুমকী' একটি চমকপ্রদ ক্রাইমজাতীয় নাট্যসৃষ্টি। তবে একটা কথা এখানে বড় বেশী করে বীভৎস রসের সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছে। নাট্য-কাহিনীতে অনেক শৈথিল্য আছে কিন্তু এই ত্রুটি সুঅভিনয়ের আড়ালে ঢাকা পড়তে পারে। 'চুমকী'র ভূমিকায় সবিতা সমাদ্দার অসামান্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। রহমত ও বিশের ভূমিকায় রতন ভট্টাচার্য ও মণি ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। দেবীপ্রসাদ সেন তাঁর অভিনয়ে 'সর্দার' চরিত্রটিকে ঠিক মঞ্চে পরিস্ফুট করে তুলতে পারেননি।

'উলু স্টেশন' এদের থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ট্র্যাজিক সুরের মূর্ছনা এনেছে। নাটকটির অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডির গতিকে অব্যাহত রাখতে যাঁরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন, তাঁরা হোলেন রঞ্জা দাশগুপ্তা, বিমল দে, সুনীত মুখোপাধ্যায়, মণি ভট্টাচার্য।

[illegible] পরিচিতিলাভ করেছিল। 'রংমহল'-সংস্থা সম্প্রতি [illegible] মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ ভৌমিক, সরোজ রায় প্রমুখদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছেন।

জেমিনীর আউটডোর চিত্রে পদ্মিনী ও প্রাণ

সরকারি ট্রাভেলার্স রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে সরকারি ট্রাভেলার্স রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ 'ঝর্ণা' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সুসংবদ্ধ দলগত অভিনয়, সুচিন্তিত পরিচালনা এবং সুষ্ঠু উপস্থাপনার গুণে সেদিনের সামগ্রিক প্রযোজনা সমবেত দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীবিজলী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে অসিত সিংহরায় (প্রদীপ), ইরা মিত্র (বীতা), দীপা হালদার (সুখিয়ার স্ত্রী)-এর অভিনয় মনে রাখার মত। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন হারাধন মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্য পাল ও বকুল। আবহসংগীত পরিবেশনায় সায়মায়া অর্কেস্ট্রা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে।

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনী

কলকাতার অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনী সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে শচীন সেনগুপ্তের 'জননী' নাটক অভিনয় করেন। সংঘবদ্ধ অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীর নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গোস্বামী, গীতা দে, আশা বোস, জয়ন্তা ব্যানার্জি, রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, সুনীল মুখার্জি, তড়িৎ ভট্টাচার্য, শচীন বসু।

রূপায়ন নাট্যগোষ্ঠী

রূপায়ন নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি এক নতুন বিষয়ের নাটক পরিবেশন করেছেন। নাটকের নাম 'বৌদির চোখে জল'। নাটকটির সুগভীর ব্যঞ্জনা প্রতিটি নাট্যানুরাগীর মনে আবেদন জাগিয়েছে। নাটকের নায়িকা 'সুতপা'র ভূমিকায় মঞ্জু আইচের অবিস্মরণীয় অভিনয় সত্যি বিরল। অন্যান্য ভূমিকায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন সন্তোষ ঘোষ, তন্ময় সান্যাল, সন্তোষ দাস, বিষ্ণু রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

নতুন নাট্যসংস্থা 'রংমহল'

প্রগতিশীল নাট্যান্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারাকে

বিবিধ সংবাদ

যোগী যাদুকর মৃণাল রায়

সম্প্রতি শ্রীশিক্ষায়তন হলে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার খরাত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রযোজনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানে খ্যাতনামা যাদুকর মৃণাল রায় সম্প্রদায় তাঁদের যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীহেমন্তকুমার বসু।

অনুষ্ঠানে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নাটক মাধ্যমে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন 'মায়ামহল'। এ-ধরনের প্রযোজনা বাংলাদেশে একটি অভিনব সংযোজন।

বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন, ১ম বর্ষ:

গেল ২রা জুলাই, সোমবার থেকে বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের

মহাশ্বেতা চিত্রের একটি দৃশ্যে অঞ্জনা ভৌমিক ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

ছ'দিনব্যাপী নবম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়েছে। উদ্বোধন দিবসে মূল সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে : (১) নাটক ও নাটকের মূল্যায়ন, (২) নাটক ও প্রযোজনা—পেশাদার এবং অপেশাদার সম্প্রদায়গুলির নাট্যাভিনয়, (৩) জাতীয় নাট্যশালার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং রবীন্দ্রসদনের গঠন ও কর্মসূচী প্রভৃতি। বাঙলাদেশের বহু নাট্যবিদ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়ার সাহায্যানুষ্ঠান :

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্য-কল্পে ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া অনামিকা সংস্কৃতি পরিষদ ও নৃত্যভারতীর সহযোগিতায় আসছে ২১-এ এবং ২২-এ জুলাই রবীন্দ্রসদনে দুটি অভিনয়-আসর বসাচ্ছেন। প্রথম দিন অনামিকাগোষ্ঠী অভিনয় করবেন 'সতুর মুর্গ' ও দ্বিতীয় দিন নৃত্য-ভারতী মঞ্চস্থ করবেন 'ভানু-সিংহের পদাবলী'। দু'দিনই এই অভিনয়ের সঙ্গে ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের কিশোর-কিশোরীরা 'আলিবাবা' পুতুলনাট্য মঞ্চস্থ করবেন। ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়ার এই শুভপ্রচেষ্টা সার্থক হোক, এই কামনাই করি।

মূকাভিনেতা শ্রীকাশীনাথের ভ্রাম্যমান 'মূক-মেলা'র উদ্বোধন

'চিত্র ও আলোকচিত্র'র মাধ্যমে ভ্রাম্যমান মূকাভিনয় প্রদর্শনীর ('মূক-মেলা'র) প্রচলন এ-দেশে এই নতুন। বিষয় টির প্রবর্তন প্রচেষ্টা খ্যাতিমান মূকাভি-নেতা শ্রীকাশীনাথের। বাংলা ও বিহারে খরার জন্য যে অবস্থা হয়েছে, সেই কথা চিন্তা করে খরা-পীড়িত ভাই-বোনদের সাহায্যের জন্য আগামী ৮ই জুলাই, বাগ-বাজার 'গিরিশ-ভবন'-এ শ্রীকাশীনাথ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করবেন।

অতঃপর প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন শিল্পী তাঁর এই অভিনব ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীটি শহর কলকাতার কয়েকটি নির্বাচিত বিশেষ অঞ্চলে মুক্ত রাজপথের পাশে, মুক্ত অঙ্গনে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রদর্শন করবেন। কেবলমাত্র জুলাই মাসের ৮, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ এই তারিখগুলি খরাত্রাণ এর জন্য অনুষ্ঠান প্রদর্শন করবেন শ্রীকাশীনাথ।

পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত তাসের দেশ গীতিনাট্যের একটি দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

মিতালী বৈঠকের 'ভানু সিংহের পদাবলী'-র অংশগ্রহণকারী শিল্পী

গানের জলসা

উত্তর কলকাতা সংগীত সম্মেলন

উত্তর কলকাতা সংগীত সম্মেলন আয়োজিত যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের এক পরিচ্ছন্ন আসরে দুজন শিল্পীর অনুষ্ঠান শুনতে পাওয়া গেল। একজন উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্যামল চট্টোপাধ্যায় অপরজন স্বনামধন্য ধ্রুপদী নাসির আমিনুদ্দিন দাগর। অনুষ্ঠান স্থান ২২৬।১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।

ওস্তাদ দবীর খাঁর শিষ্য শ্যামল চট্টোপাধ্যায় পুরিয়া কল্যাণ রাগে সেতার বাজান। আলাপের জোড়ের অংশে কুশলী হাতের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ডানহাতের বাজ বাঁহাতের মীড় উভয় অংগই সুআয়ত্ত। বিলম্বিত গতের মুখটিও রামপুর ঘরানার গায়কী অংগের উপযুক্ত গাম্ভীর্য ও মীড়ের কারুকার্যে সুসজ্জিত।

দ্রুত গতের সাপট ও বোলতানের অংশ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু ঝালার অংশ তৈরী হলেও অনুশীলনীর অপেক্ষা রাখে। বন্ধ ও গতির অভাব না থাকলেও অবিনাস্ত ও এলোমেলো ভাব এবং খাপছাড়া তেহাই বাজনাকে সামগ্রিক আবেদন সঞ্চারের প্রসাদগুণে বঞ্চিত করেছে।

কণ্ঠসংগীতের আসরে ধ্রুপদ পরিবেশন করলেন ওস্তাদ নাসির আমিনুদ্দিন দাগর। রাগ সুরদাসী মল্লার। উত্তর ভারতের সর্ববাদীসম্মত শ্রদ্ধেয় ধ্রুপদের ঘরানা হোল দাগার ঘরানা। ধীর বিস্তারে রাগরূপ উন্মোচন এবং লয়কারীর ছন্দ-নৃত্যের উত্তেজনাময় মুহূর্তেও যেভাবে রেখাব ও পঞ্চমের রেশ অনাহত ছিল তা দাগর ঘরানারই উপযুক্ত। ধ্রুপদের অংগে তাঁর কণ্ঠে তেমন সুর লাগেনি তাই কোনো কোনো পর্দায় সুরসংগতির অভাব ঘটেছিল কিন্তু ধামারে তিনি এই অসংগতির ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন। সকল আঙ্গিকে তান ও বোলতানের সবিস্তার পরিবেশন কুশলতা শ্রোতাদের গভীর আনন্দ দিয়েছে। ধামার তালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছন্দ ও লয়কারীর সংগে যোগ্যতার সংগে পাখোয়াজ সংগত করেছেন শ্রীবিঠলদাস গুজরাটী।

ক্যালকাটা ম্যাড্রিগেল গ্রুপ

ক্লারেন্স বার্দের পরিচালনায় গত বুধবার ম্যাক্সমুলার ভবনে ক্যালকাটা ম্যাড্রিগেল গ্রুপের বিবিধ সংগীতানুষ্ঠান নতুনত্ব ছিল। মধ্যযুগীয় সংগীতধারা থেকে সুরু করে হাইণ্ডামিথ অধ্যায় অবধি এঁদের পরিবেশিত বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে অর্কেস্ট্রানুষ্ঠানও ছিল। গতানুগতিকতা বর্জিত উদ্যোক্তাদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্যম অভিনন্দনযোগ্য। অনুষ্ঠানের সূচনা হোল একটি [illegible] [illegible] দিয়ে। প্রথমাংশের পরিসমাপ্তি ঘটল ছন্দসংগীত সামার ইজ ইকুমেন দিয়ে। এরপর শ্রীজয় দত্তর বাঁশী সংগতে অমল চৌধুরী দুটি ফরাসী গীতি শোনালেন। বাঁশী ছাড়াও সংগতিয়াদের মধ্যে পি ভট্টাচার্যর সরোদ এবং সুকেন দাসের সেলো বেশ জমজমাট পরিবেশ রচনা করেছিল। উপযুক্ত মহড়ার অভাবে এই অনুষ্ঠানে ভারসাম্যের অভাব সহজদৃষ্ট। শিল্পীরা আপনাপন একক পরিবেশনায় অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে সামগ্রিক সংহতি ব্যাহত হয়েছে।

পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচীর বেশ কিছু অংশ জুড়েছিল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সুরস্রষ্টাদের রচনা। হাইনরিশ আইজ্যাকের ইনসব্রুক ইস্ মুজ ডিস লাসেন এবং মর্লির ইট ওয়াজ এ লাভার অ্যাণ্ড হিজ ল্যাস' শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রকাশভংগীর বৈশিষ্ট্য ও গায়ন পদ্ধতির ওপর উপযুক্ত নজর দেওয়া হয়েছিলো বলে এই অনুষ্ঠানটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ততায় সুছন্দিত। স্কুটজ, লালি, বাক ও মোজার্টের চারটি সংগীত সংগীতের সংগে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে কথা ও সুরের বিশেষ মাধুর্য ও স্বকীয়তায় পরিবেশিত হোকং সাইটকানানের রচনা।

সিলা ডিসুজা সোপ্রানো এবং ফিলোমেনা ডিসুজার পিয়ানোর পর ব্রামস, ডিস্টলার এবং হিন্দমিথ দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটল।

ক্যালকাটা মিউজিক স্কুলে গঠিত এই ম্যাড্রিগেল গ্রুপ প্রতিষ্ঠান—তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় আমাদের মুগ্ধ করেছেন। পরিচালক ও শিল্পীদের মধ্যে বোঝাপড়াটা আর একটু সুষ্ঠু হলে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সংগীতরসিকের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠবে।

মিতালী বৈঠকে ভানুসিংহের পদাবলী

মিতালী বৈঠক পরিবেশিত ভবানীপুর স্কাউট হলে শ্রীমতী রেবা ঘোষের পরিচালনায় 'ভানুসিংহের পদাবলী' এক উপভোগ্য নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান। সংগীত সংগতে শ্রীমতী রেবা ঘোষ সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। নৃত্য রচনাও মোটের ওপর—একটি মান বজায় রাখতে পেরেছে। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে বোম্বাইয়ের বাসুদেব ভট্টাচার্যকে দেখা গেছে।

সংগীতাসর গীতালি

সম্প্রতি শ্যামবাজারের ললিত মিত্র লেনে সংগীতায়তন গীতালির ৪র্থ মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনে সুনীল সেনগুপ্তের খেয়াল পরিবেশিত হয়। শ্রীশ্যামদাসের গীটারে পাশ্চাত্য সুর লহরী বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। এছাড়া শ্রীকমল ভট্টাচার্যের গীটারে পাশ্চাত্য সংগীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সর্বশ্রী গোরাচাঁদ অধিকারী, মদন পোদ্দার, গোপাল বসাক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন।

সুরেলা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ

উচ্চাংগসংগীতের প্রসার ও তরুণ শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সুরেলা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের এবারের মাসিক অধিবেশন সম্প্রতি পাথুরিয়াঘাটার মন্মথ মল্লিক স্মৃতি-মন্দিরে এক সুন্দর সাংগীতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসরের প্রথম শিল্পী জিয়া মৈনুদ্দীন ডাগর বীণায় পরিবেশন করেন রাগ মিয়া-কি-মল্লার। ধ্রুপদী আলাপের মাধ্যমে পরিবেশিত রাগ রূপের নিখুঁত প্রকাশ ছিল শিল্পীর বাজনার একটি উল্লেখযোগ্য অংগ। চৌতালে নিবদ্ধ গত অংশে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ শিল্পীর শিল্প-প্রতিভার পরিচয়ে চিহ্নিত। পাখোয়াজ সহযোগিতায় বিঠলদাস গুজরাটি শ্রোতাদের কয়েকটি আনন্দমুখর মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। আসরের শেষ শিল্পী এ কানন পরিবেশন করেন মারু বেহাগ ও হংসধ্বনিতে দুটি খেয়াল। এঁর স্বভাবসিদ্ধ গায়নশৈলী উপস্থিত শ্রোতাদের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করে শিল্পীর পরিবেশিত হংসধ্বনি আসর জমিয়ে দেয়। তবলায় আফাক হোসেনের সুন্দর সহযোগিতা সংগীতের মাধুর্য বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীরঞ্জিত মুখার্জি।

সুর বাহারের বার্ষিক উৎসব

দক্ষিণ শহরতলীর নবজাত সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র সুর-বাহারের দ্বিতীয় বার্ষিক মিলনী উপলক্ষে সম্প্রতি কসবার চিত্তরঞ্জন স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে দুদিন ধরে এক মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয় দিনে উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর-বাহারের শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন তাতে প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের শিক্ষা-পদ্ধতির স্বাক্ষর রাখেন।

অতিথি শিল্পীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরেশ রায়, কৃষ্ণা দাশগুপ্তা, শংকর চট্টোপাধ্যায়, বিমলকুমার ও দিলীপকুমার, রবীন্দ্র জৈন, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মুখোপাধ্যায় ও কুমারী ছন্দা। প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যবস্থাপিকা কৃষ্ণা সমদ্দার ও কার্যাধ্যক্ষ সুনীল সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড ॥

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

ভারতবর্ষ: ১৫২ রান (অজিত ওয়াদেকার ৫৭ রান। ব্রাউন ৬১ রানে ৩, স্নো ৪৯ রানে ৩ এবং ডি' ওলিভেরা ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

ও ১১০ রান (কুন্দরন ৪৭ এবং ওয়াদিকার ১৯ রান। ইলিংওয়ার্থ ২৯ রানে ৬ এবং ক্লোজ ২৮ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড: ৩৮৬ রান (ব্যারিংটন ৯৭ এবং গ্রেভনী ১৫১ রান। চন্দ্রশেখর ১২৭ রানে ৫ এবং বেদী ৬৮ রানে ৩ উইকেট)।

প্রথম দিন (জুন ২২):

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৫২ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করে। ব্যারিংটন ৫৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (জুন ২৩):

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫২ (৩ উইকেটে)। গ্রেভনী (৭৪ রান) এবং ডি'ওলিভেরা (২৭ রান) খেলায় অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিন (জুন ২৪):

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রানের মাথায় শেষ হয়। বৃষ্টির দরুণ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয়নি।

চতুর্থ দিন (জুন ২৬):

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১১০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১২৪ রানে জয়ী হয়।

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের ৯ম টেস্ট সিরিজের (১৯৬৭) দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১২৪ রানে জয়-লাভের সূত্রে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। চলতি ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের মাত্র তৃতীয় (শেষ) টেস্ট খেলা বাকি। সুতরাং এই তৃতীয় টেস্ট খেলার আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। তবে ইংল্যান্ড যদি তৃতীয় টেস্ট খেলাতেও জয়ী হয় তাহলে ১৯৫৯ সালের মতই ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ড সিরিজের সমস্ত টেস্ট খেলায় জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করবে। ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই ইংল্যান্ড জয়ী হয়েছিল।

ভারতবর্ষ লিডসের প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ডের কাছে ৬ উইকেটে পরাজিত হলেও তাদের সে পরাজয় অগৌরবের হয়নি। প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের থেকে বিপুল সংখ্যক ৩৮৬ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারত-

টম গ্রেভনী (ইংল্যাণ্ড)

বর্ষের ৫১০ রান সংগ্রহ নিঃসন্দেহে ক্রিকেট খেলায় এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতবর্ষের পরাজয় শোচনীয় ব্যর্থতারই পরিচয়। টেস্ট ক্রিকেট খেলার উপযোগী দলগত সংহতি এবং মনোবলের একান্ত অভাবেই ভারতবর্ষের এই বিপর্যয়।

ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করতে নেমে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রথম একঘণ্টার খেলায় তিনটে উইকেট পড়ে মাত্র ২৯ রান উঠেছিল। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার খেলায় ১৫২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৮২ (৫ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন ওয়াদেকার এবং কুন্দরন। লাঞ্চের পর ১০২ রানের মাথায় এই জুটি ভেঙে গেলে ভারতবর্ষের খেলায় দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়—বাকি চার উইকেটে মাত্র ৫০ রান সংগৃহীত হয়েছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র অজিত ওয়াদেকারের খেলাই যা উল্লেখযোগ্য। তিনি ১১৫ মিনিটে তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর ১৩২ মিনিটের খেলায় দলের সর্বোচ্চ ৫৭ রান (৯টা বাউণ্ডারীসহ) উঠেছিল। স্নোর বলে হাতে দারুণ আঘাত পেয়ে সরদেশাই খেলা থেকে প্রথম দিকে অবসর নিয়েছিলেন এবং ১০২ রানের মাথায় কুন্দরনের আউটের পর পুনরায় খেলতে নেমে দলের ১৪৪ রানের মাথায় ইলিংওয়ার্থের বলে ক্যাচ তুলে উইকেট-কিপার মারের হাতে ধরা পড়ে আউট হন। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে মারের এইটি ৬ষ্ঠ ক্যাচ এবং এই ক্যাচ নেওয়ার ফলে মারে টেস্ট খেলার এক ইনিংসে সর্বাধিক ক্যাচ (৬টি) নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডকে স্পর্শ করেন। এই বিশ্ব রেকর্ডে তাঁর পূর্বসূরী হলেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার ওয়ালী গ্রাউট (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৭-৫৮) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার ডেনিস লিণ্ডসে (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, জোহানেসবার্গ, ১৯৬৭)।

বিশ্বরেকর্ড স্পর্শে ইংল্যাণ্ডের উইকেট-কিপার জন মারের উল্লাস : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ইলিং-ওয়ার্থের বলে সারদেশাই জন মারের হাতে ক্যাচ তুলে খেলা থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান ছিল ৩১ (কোন উইকেট না পড়ে)। প্রথম দিনের খেলার শেষে ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১০৭ (২ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন ব্যারিংটন (৫৪ রান)।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড আরও একটা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১০৭ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে ১৪৫ রান যোগ করে। দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির দরুন পুরো সময় খেলা হয়নি। খেলার শেষে ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ২৫২ (৩ উইকেটে)। এই দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন গ্রেভনী (৭৪ রান) এবং ডি' ওলিভেরা (২৭ রান)। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ঠিক ১০০ রানে অগ্রগামী হয় এবং হাতে জমা থাকে ৭টা উইকেট। লাঞ্চের ১৫ মিনিট আগে চন্দ্রশেখরের বলে ব্যারিংটনের অফ্-স্টাম্প ছিটকে পড়ে। ব্যারিংটন চার ঘণ্টা খেলে তাঁর ৯৭ রানে ১০টা বাউন্ডারী করেছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, তিনি মাত্র তিন রানের জন্যে সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে লিডসের গত প্রথম টেস্টেও তাঁকে এই রকম দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়েছিল। তিনি সেবার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৯৩ রানের মাথায় আউট হয়েছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে ব্যারিংটন আরও দুবার শতরানের নিকটবর্তী হয়ে আউট হয়েছেন—৯১ রান (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, লর্ডস, ১৯৬৫) এবং ৯৩ রান (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ ১৯৬৪-৬৫)।

টেস্টে ব্যারিংটনের ৫৮৩৪ রান

ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯৭ রানের মাথায় ব্যারিংটন আউট হলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর ৫৮৩৪ রান দাঁড়ায়। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ৬ হাজার বা তার বেশী রান করার যে ক্ষুদ্র তালিকা আছে সেখানে ব্যারিংটনের উপরে আছেন মাত্র পাঁচজন খেলোয়াড়—ইংল্যান্ডের ওয়ালী হ্যামণ্ড (৮৫টি টেস্টে ৭২৪৯ রান), অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (৫২টি টেস্টে ৬৯৯৬ রান), ইংল্যান্ডের স্যার লিওনার্ড হাটন (৭৯টি টেস্টে ৬৯৭১ রান), ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রে (৯০টি টেস্টে ৬৩০৫ রান) এবং অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে (৭৯টি টেস্টে ৬১৪৯ রান)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২য় টেস্ট খেলার রান ধরে (জুন ২৬, ১৯৬৭) কেন ব্যারিংটনের টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৭০, ইনিংস ১১৩, নট-আউট ১২, মোট রান ৫,৮৩৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫৬ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ওল্ডট্রাফোর্ড, ১৯৬৪) এবং সেঞ্চুরী ১৬টি। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাঁর টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান (জুন ২৬,১৯৬৭) : খেলা ১৩, ইনিংস ১৯, নট-আউট ৩, মোট রান ১২৬৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২ (কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২) এবং সেঞ্চুরী ৩টি।

দ্বিতীয় দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। লাঞ্চের পরের খেলায় যখন ৬০ রান যোগ হয়েছে এবং ইংল্যান্ডের রান দাঁড়িয়েছে ২৫২ (৩ উইকেটে), এমন সময় বৃষ্টি নামে, ফলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলায় অপরাজিত ছিলেন গ্রেভনী (৭৪ রান) এবং ডি'ওলিভেরা (২৭ রান)।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর ইংল্যান্ড ৪৫ মিনিট খেলেছিল। ৩৮৬ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ইংল্যান্ড ২৩৪ রানে অগ্রগামী হয়। বৃষ্টির দরুণ ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা এইদিনে আরম্ভ করতে পারেনি। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩৫৯ (৫ উইকেটে)। লাঞ্চের পর ৪৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ২৭ রানে ইংলন্ডের বাকি পাঁচটা উইকেট পড়ে যায়। ইংল্যান্ডের শেষ ৬টা উইকেট পড়েছিল ৫২ রানের বিনিময়ে। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ডি'ওলিভেরা এবং গ্রেভনী দলের ১২২ রান যোগ করে-

ঐতিহাসিক 'ফাদার টাইম' লর্ডস মাঠের বয়োজ্যেষ্ঠ নিয়মিত দর্শক।

ছিলেন। টম গ্রেভনী তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে পাঁচ ঘণ্টার পরিশ্রমে ১৫১ রান (২০টি বাউন্ডারী ও ২টি ওভার বাউন্ডারী-সহ) সংগ্রহ করেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই ৯ম সেঞ্চুরী—ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২য়—ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী (১৭৫ রান), বোম্বাই, ১৯৫১-৫২। তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষ তার বোলিংয়ের যথার্থ পরিচয় দিয়েছিল। লাঞ্চের সময় যেখানে পাঁচ উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের ৩৫৯ রান ছিল সেখানে পরবর্তী ৪৫ মিনিটে ৩৮৬ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস পড়ে যায়। চন্দ্রশেখর ১২৭ রানে ৫টা উইকেট এবং বেদী ৬৮ রানে ৩টে উইকেট পান। ডি'ওলিভেরার উইকেট—টেস্ট ক্রিকেটে চন্দ্রশেখরের ৫৩তম উইকেট। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে খেলার শেষে চন্দ্রশেখরের উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫টি। বর্তমানের ভারতীয় ক্রিকেট দলে চন্দ্রশেখরের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বোরদে। বোরদের সংগৃহীত উইকেটের সংখ্যা ৫২টি। কাঁধের ব্যথার দরুণ বোরদে বর্তমানে বল দিচ্ছেন না।

চতুর্থ দিনে চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১১০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ১২৪ রানে জয়ী হয়। লাঞ্চের সময় ৩টে উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ৭৫ রান দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ ৭টা উইকেট মাত্র ৩৫ রান সংগৃহীত হয়। কি শোচনীয় ব্যর্থতা! এই শেষ সাতটা উইকেটের পাঁচটা পান ইংল্যান্ডের অফ-স্পিনার রে ইলিংওয়ার্থ। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—২২'৩ ওভার, মেডেন ১২ এবং ২৯ রানে ৬টা উইকেট। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট-কিপার কুন্দরণের খেলাই যা উল্লেখযোগ্য। আড়াই-ঘণ্টা খেলে তিনি দলের সর্বোচ্চ ৪৭ রান (৬টা বাউন্ডারীসহ) করেছিলেন। আহত সরদেশাই ব্যাট করতে নামেননি।

লর্ডসে স্মরণীয় টেস্ট ম্যাচ

১৯২১ (জুন ১১, ১৩ ও ১৪) : অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী। ইংল্যান্ড : ১৮৭ রান (ফ্র্যাঙ্ক উলী ৯৫) ও ২৮৩ রান (উলী ৯৩ এবং এল এইচ টেনিসন নট-আউট ৭৪)।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪২ রান (বার্ডসলে ৮৮ এবং গ্রেগরী ৫২) ও ১৩১ রান (২ উইকেটে। বার্ডসলে নট-আউট ৬৩)।

'উলীর' ম্যাচ! ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক উলীর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার স্বীকৃত হিসাবে তাঁর নামেই খেলাটি উৎসর্গ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানত দুই ফাস্ট বোলার গ্রেগরী এবং ম্যাকডোনাল্ডের বোলিংয়ে ইংল্যান্ড যখন বিপর্যস্ত তখন একমাত্র ফ্র্যাঙ্ক উলী দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে উভয় ইনিংসে দুই দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৯৫ ও ৯৩ রান সংগ্রহ করেন।

হেডলে ভেরিটি (ইংল্যান্ড) : টেস্ট-ক্রিকেট খেলার একদিনে সর্বাধিক উইকেট (১৪টি) নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেন।

১৯৩০ (জুন ২৭, ২৮, ৩০ ও জুলাই ১): অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী।

ইংল্যান্ড : ৪২৫ রান (দলীপ সিংজী ১৭৩ এবং মরিস টেট ৫৪ রান। ফেয়ারফ্যাক্স ১০১ রানে ৪ এবং ওয়াল ১১৮ রানে ৩ উইকেট) ও ৩৭৫ রান (চ্যাপম্যান ১২১ এবং জি ও এ্যালেন ৫৭ রান। সি ভি গ্রিমেট ১৬৭ রানে ৬ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডন ব্র্যাডম্যান ২৫৪, উডফুল ১৫৫, কিপ্যাক্স ৮৩ এবং পন্সফোর্ড ৮১ রান। হোয়াইট ১৫৮ রানে ৩ উইকেট) ও ৭২ রান (৩ উইকেট)।

ক্রিকেট খেলায় ব্র্যাডম্যান যুগের সূচনা এই সময় থেকেই। ব্র্যাডম্যান ৩৩০ মিনিটে তাঁর ২৫৪ রান করেছিলেন। এই খেলায় মোট রানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৬০১। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে প্রথম খেলতে নেমে ভারতীয় খেলোয়াড় কে এস দলীপ সিংজী সেঞ্চুরী (১৭৩) করার গৌরব লাভ করেন।

১৯৩৪ (জুন ২২, ২৩ ও ২৫): ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৩৮ রানে জয়ী।

ইংল্যান্ড : ৪৪০ রান (লেসলী এমস ১২০, এম লেল্যান্ড ১০৯ এবং সি এফ ওয়াল্টার্স ৮২ রান। ওয়াল ১০৮ রানে ৪ এবং চিপারফিল্ড ৯১ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ২৮৪ রান (ডবলিউ ব্রাউন ১০৫ রান। হেডলে ভেরিটি ৬১ রানে ৭ এবং বাউজ ৯৮ রানে ৩ উইকেট) ও ১১৮ রান (উডফুল ৪৩ রান। ভেরিটি ৪৩ রানে ৮ উইকেট)

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই খেলাটি ইংল্যান্ডের হেডলে ভেরিটির বোলিং সাফল্যের দরুণ তাঁর নামেই উৎসর্গীত। খেলার শেষ দিনে (২৫শে জুন) তিনি মাত্র ৮০ রানে অস্ট্রেলিয়ার ১৪টা উইকেট পান (৩৭ রানে প্রথম ইনিংসের ৬টা এবং ৪৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা)। টেস্ট ক্রিকেট খেলার এক দিনে ভেরিটির এই সর্বাধিক উইকেট (১৪টি) নেওয়ার বিশ্বরেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

১৯৬৩ (জুন ২০-২২, ২৪-২৫) : খেলা ড্র।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৩০১ রান (কানহাই ৭৩ এবং সলোমন ৫৬ রান। ট্রুম্যান ১০০ রানে ৬ এবং স্যাকলটন ৯৩ রানে ৩ উইকেট) ও ২২৯ রান (বুচার ১৩৩ রান। ট্রুম্যান ৫২ রানে ৫ এবং স্যাকলটন ৭২ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যান্ড : ২৯৭ রান (ব্যারিংটন ৮০, ডেকসটার ৭০ এবং টিটমাস নট-আউট ৫২ রান। গ্রিফিথ ৯১ রানে ৫ এবং ওরেল ১২ রানে ২ উইকেট) ও ২২৮ রান (৯ উইকেটে। ব্যারিংটন ৬০ এবং ক্লোজ ৭০ রান। হল ৯৩ রানে ৪ এবং গ্রিফিথ ৫৯ রানে ৩ উইকেট)।

প্রবল উত্তেজনা এবং উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে লর্ডস মাঠে আয়োজিত ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের এই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি শেষ হয়।

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই অমীমাংসিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি প্রবল উত্তেজনা এবং নাটকীয় পরিণতির দিক থেকে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অন্যতম স্থান পাওয়ার যোগ্য। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐতিহাসিক 'টাই' ম্যাচের (ব্রিসবেনের ১ম টেস্ট, ১৯৬০-৬১) থেকে এই খেলাটি কোন অংশে খাটো নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস চতুর্থ দিনের বিকেলের দিকে ২২৯ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের ২৩৪ রানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং খেলাটি ইংল্যান্ডের হাতেই ছিল। কিন্তু পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার শেষ ওভারের চতুর্থ বলে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২৮ রানের মাথায় স্যাকলটন রান-আউট হলেন (৯ম উইকেটের পতন)। হলের বলে আহত কাউড্রে ভাঙা কব্জি নিয়ে দলের এই চরম সঙ্কটকালে পুনরায় ব্যাট করতে নামলেন। তিনি ১৯ রান করে আহত অবস্থায় খেলা থেকে আগে অবসর নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের মন্দের ভাল যে, কাউড্রেকে বোলারের সম্মুখীন হতে হয় নি, কারণ স্যাকলটনের রান-আউটের সময় ইংল্যান্ডের ডেভিড এ্যালেন উইকেট বদল করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলার হলের সম্মুখীন হয়েছিলেন। হলের বাকী দুটি বল খেলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় মাত্র ৬ রান সংগ্রহ করতে এ্যালেন কোন চেষ্টাই করেন নি। তিনি মাটি কামড়ে উইকেট রক্ষা করেছিলেন। খেলার কি নাটকীয় পরিণতি!

ফ্র্যাঙ্ক উলী (ইংল্যান্ড) : ১৯২১ সালে লর্ডস্ মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাটি উলীর নামে উৎসর্গীত।

১৯৫২ সালে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী হলেও ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদের অল্-রাউন্ড ক্রীড়াচাতুর্যের স্বীকৃতি হিসাবে এই খেলাটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয় খেলার পর্যায়ে পড়ে। মানকাদ প্রথম ইনিংসে ৭২ রান (ভারতবর্ষের রান ছিল ২৩৫) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৪ রান (ভারতবর্ষের রান ছিল ৩৭৮) করেন এবং ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৯৭ ওভার বলে ৫টা উইকেট (১৯৬ রানে) পেয়েছিলেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ২৬—জুলাই ১) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ১৪টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ১২টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং দুটি খেলা ড্র।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে ৪-১ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে পরাজিত করে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অটুট রেখেছে—১২টা খেলায় ২২ পয়েন্ট (জয় ১০, ড্র ২)। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২৬টা গোল দিয়ে ৪টে গোল খেয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে বি এন আর—১৪টা খেলায় ২০ পয়েন্ট। আলোচ্য সপ্তাহে বি এন আর ২-১ গোলে ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং ১-০ গোলে বালী প্রতিভাকে পরাজিত করেছে। এরিয়ান্স ক্লাব আছে তৃতীয় স্থানে—১৪টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট। তারা ২-১ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং ২-১ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগানকে পরাজিত করেছে। আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগানের দুটি খেলায় একমাত্র জয় ৩-০ গোলে খিদিরপুরের বিপক্ষে। বর্তমানে তাদের অবস্থা ১০টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট (জয় ৬, ড্র ১ ও হার ৩)।
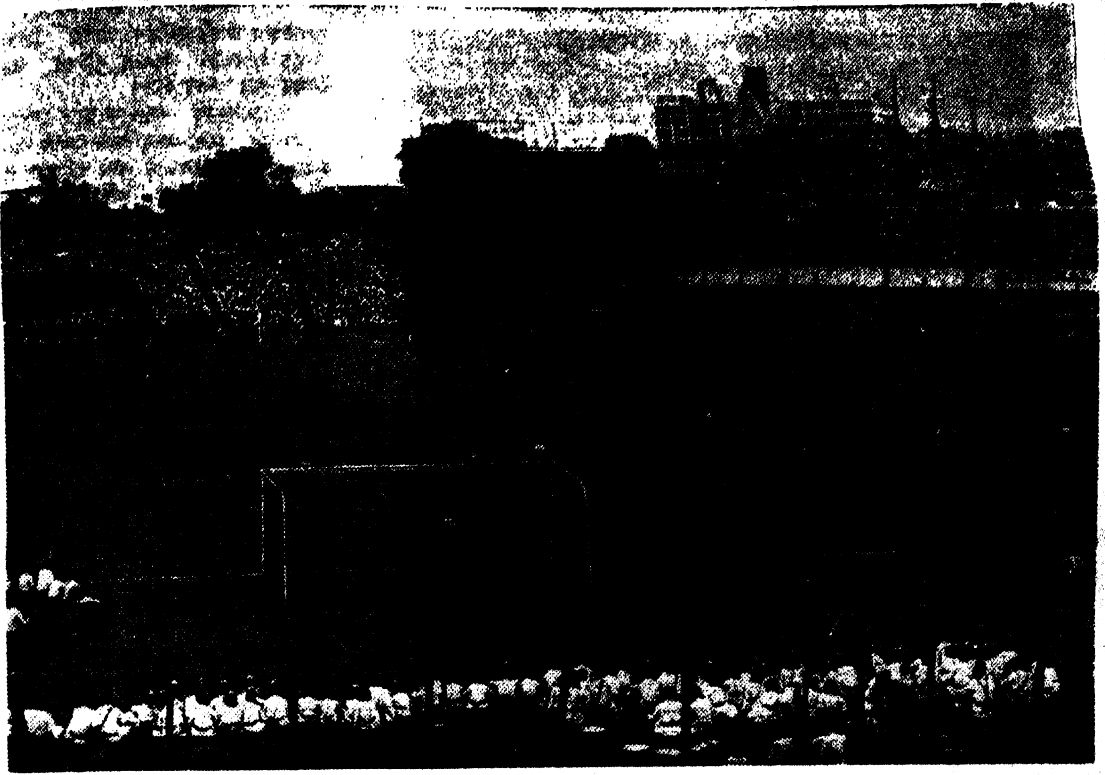
ক্রিকেটের তীর্থভূমি ইডেনে ফুটবল খেলার প্রথম আসর (মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা)।

ইডেনে ফুটবল

কমল ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগেও ইডেনের ক্রিকেট মাঠের অনেক কদর ছিল। মাঠের বাহারে অনেক বিদেশীরই মন কাড়ত। ইডেনের মাঠ যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিল সেবিষয়ে সবাই একমত ছিলেন।

ইডেনের নন্দনকাননের পরিপাটি ছিম-ছাম শোভা দেখে যেমন সবাই মুগ্ধ হতেন, তেমনি তারই পাশে চারিদিক ঝাউ গাছে ঘেরা মনোরম পরিবেশের মধ্যে ইডেনের ক্রিকেট মাঠ দেখে বলতেন—'হাউ ফাইন'। এ গর্ব সাহেবদেরই। শুধু ক্রিকেট মাঠের জন্যে তারা ইডেনকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। তারজন্যে তারা কম কষ্ট স্বীকার করতেন না। সে প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ক্যালকাটা ক্লাবের ক্রিকেট সম্পাদক ল্যাগডেন সাহেব ক্রিকেট খেলার 'ফিকস্‌চার' করতে গিয়ে এরিয়ান ক্লাবের প্রফুল্ল মুখার্জীকে বলেন—"না-না, মুখার্জী। এরিয়ানের সঙ্গে আমাদের খেলা একেবারে সুরুতে হওয়া উচিত নয়। ইডেনের 'পীচ' সম্বন্ধে তোমার কিছু অজানা নেই। আমি চাই না এই খেলা নষ্ট হোক। ক্যালকাটা-এরিয়ানের খেলার গুরুত্ব অনেক। তাই না?" প্রফুল্ল মুখার্জী সাহেবের কথা বুঝলেন। এবং খেলা পিছিয়ে নেওয়া সম্পর্কে আর কোন দ্বিরুক্তি করলেন না। সাহেবের অকাট্য যুক্তির স্বপক্ষে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

ল্যাগডেন সাহেবের যুক্তিটা হল কলকাতার ক্রিকেট মরশুমের আগে খেলার উপযোগী মাঠ তৈরী করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার প্রতিবন্ধক। কলকাতায় অক্টোবর মাসেও বৃষ্টি হয়। এমনকি নভেম্বরেও। ইডেনের মাঠ স্বভাবতঃই নরম। বৃষ্টির জলে মাঠের মাটি আরও পাঁক হয়ে যায়। এছাড়া আরও অনেক কারণ আছে। যেমন ইডেন গার্ডেন একেবারে গঙ্গার ধারে। দ্বিতীয়তঃ মাঠের দুদিকে ঝিল। তার ওপর মনে হয়, ইডেন গার্ডেনের অবস্থান ময়দানের অন্য যেকোন মাঠের তুলনায় একটু নীচুতে। কারণ বৃষ্টি হলে দেখা যায় সাধারণতঃ অন্য কোন মাঠ জলে ভর্তি হবার আগে, ইডেন গার্ডেন অনেক আগে ভর্তি হয়ে যায়। মনে হয়, এই সব কারণে ডিসেম্বরের শেষে কিংবা জানুয়ারীর আগে ইডেন গার্ডেন টেস্ট খেলার উপযোগী হয়ে ওঠে না। সেই কারণেই ডিসেম্বরের শেষে কিংবা জানুয়ারীর প্রথমার্ধে ইডেনে টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসেছে। সে মাঠ কোনরকমে খেলার উপযোগী করে নিয়মমাফিক খেলা সময় কম যায় বটে তবে তাতে মাঠ নষ্ট হয়। খেলাও ভাল হয় না। এ হেন পরিস্থিতিতে সাহেবরা ইডেনের মাঠ নষ্ট করতে চাইতেন না। তাই মরশুমের প্রথম কয়েকটি খেলা বানচাল হয়ে যেত।

সাহেবদের কাছ থেকে হাত বদল হয়ে ইডেনের মাঠ আমাদের হাতে এসেছে। আমরা আকাশের চাঁদ পেলাম। ভাবলাম ইডেনের বুঝি অনেক গুণ। বুঝি ঐশ্বরিক ক্ষমতা তার। তাই প্রয়োজনের তাগিদে আমরা অক্টোবর - নভেম্বরেই ক্রিকেটের বড় আসর পাতলাম। কিন্তু খেলা হল না। হ'ল খেলার নামান্তর। সাহেবেরা অনেক অনুরোধ-উপরোধেও যে ভরসা করতেন না আমরা তাই করে বসলাম। প্রমাণ হ'ল ইডেনের সর্বনাশা মাঠ ক্রিকেটের জন্যে নয়। তবে চেষ্টায় কি না হয়। সে হাতযশ সাহেবদেরই। অনেক পরিশ্রমে, অনেক অর্থব্যয়ে তারা অসাধ্য সাধন করতেন।

অক্টোবর ও নভেম্বরে কলকাতায় যে ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয় সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অস্ট্রেলিয়া সফরের দুদুটি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচই ইডেনে বানচাল হয়ে যায়। প্রথমটি আয়ান জনসনের নেতৃত্বে অক্টোবর মাসে। দ্বিতীয়টি নভেম্বরে ববি সিম্পসনের নেতৃত্বে। বৃষ্টি থামলেই যে খেলা চলে সেটা অন্য কোথাও সম্ভব হলেও ইডেনের মাঠে একেবারেই নয়। খেলা চালু রাখবার জন্যে চেষ্টার অবধি ছিল না। রোলার গরম করে সারা মাঠে কম্বল বিছিয়ে

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত প্রথম ফুটবল খেলার (মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং) একটি দৃশ্য।

জল তুলে নেওয়ার সব চেষ্টাই সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। খেলা হলেও যে সেটা খেলা হয়নি সে দৃশ্য সেদিন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। বোলারদের প্রাধান্য ছিল ত বটেই। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার জিম বার্ক নামকরা বোলার না হলেও সেদিন তাঁর অফ্ স্পিন্ বোলিং যে কি মারাত্মক তা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। ব্যাটসম্যানরা সাহস করে খেলতে পারেননি। বোলাররা ভরসা করে ছুটে বল দিতে পারেননি। ফিল্ডাররা কোনমতেই বল ধরবার চেষ্টা করেননি। এর নাম নিশ্চয়ই ক্রিকেট নয়।

ইংল্যান্ডে বৃষ্টির পরেও ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করেন। বোলাররা হাতে কাঠের গুঁড়ো মাখিয়ে বসের কায়দা দেখাতে কসুর করেন না। শুধু ইংল্যান্ড কেন। ভারতীয় অন্য রাজ্যে বিশেষ করে দিল্লী-বোম্বাইয়ে বৃষ্টির ফলে মাঠ এত ক্ষতি করে না। বাঙলায় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠের চরিত্র সবার থেকে ভিন্ন।

যাক্ সে কথা। ইডেনের মাঠের সে চরিত্র আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অনেক চেষ্টা করেও আমরা ইডেনের সে ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে পারিনি। তার কারণ আছে। বিরাট স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা ইডেনের শোভা নষ্ট করেছি। সেই ঝাউ গাছ আর নেই। গাছ কেটে সেখানে দর্শকদের পাকাপাকি বসবার আসন তৈরী হয়েছে। স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। স্টেডিয়াম নয়। মাঠের একপাশে গড়ে উঠেছে 'কনক্রিট ব্লক'। সেই সঙ্গে আর সেই শেষ। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটে দর্শকদের চাহিদা মেটাতে আমরা এক বিকল্প ব্যবস্থা করে ইডেনের রূপটাকে আরও বিকৃত করে তুলেছি। বলতে গেলে ইডনের ক্রিকেট মাঠের অপমৃত্যু ঘটেছে!

এই পরিস্থিতিতে আজ আমরা আর এক বিরাট প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছি। ইডেনে ফুটবলের আসর বসাতে অনেকেরই ক্ষুণ্ণ হবার কথা। কিন্তু উপায় ত' নেই। ফুটবল মাঠে দর্শকদের চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে ইডেনে ফুটবল খেলার ব্যাপারে আর কেউ মাথা নেড়ে না বলতে পারলেন না। এর বিরোধিতা করা কি সাজবে? যুক্তি দেখিয়ে কর্তৃপক্ষরা একজোট হয়ে রায় দিলেন ইডেনে ফুটবল খেলা না হওয়ার কোন কারণ দেখি না। এমন কথা আগেও অনেকবার উঠেছিল। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সবাই একমত হতে পারেননি। এমনকি ফুটবল আর ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকেরা হাতে হাত মেলাতেও রাজী হননি। তাঁরা চিন্তাও করতে পারেননি ইডেনে ফুটবল আসর কেমন করে সম্ভব হবে।

যুগের সঙ্গে সবাইকে হাত মেলাতেই হবে। এর মধ্যে কোন দ্বিধা রাখলে দ্বন্দ্বই বেড়ে যাবে। আন্দোলন এবং প্রতিবাদ করা যে সমীচীন হবে না সে'কথা বোঝবার মত অবস্থা এখন এসেছে।

ফুটবলের উৎসাহীরা যেমন একবাক্যে বলতে পারছেন জাহান্নমে যাক ক্রিকেট, বৎসরান্তে একবার টেস্ট ক্রিকেট—তারজন্যে মাঠ আটকে রাখা। যেখানে ফুটবলের দর্শকদের এত হাহাকার। খেলা দেখার জন্যে দর্শকদের জীবন-পণ লড়াই। তেমনি ক্রিকেটের গুণীজনরা বলছেন এইবা কেমন কথা ক্রিকেটের এতবড় ঐতিহ্যকে সমূলে বিনষ্ট করবে ফুটবল খেলে।

ক্রিকেট আর ফুটবলের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সবাই একমত হলেন, স্থির সিদ্ধান্তে এলেন ইডেনে ফুটবল খেলা হোক। এটাও একটা পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা।

ইডেনে ফুটবল খেলা যথারীতি হল। অগণিত দর্শক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ছুটলেন মাঠে। খেলা দেখে খুশী হলেন। ক্রিকেটের মাঠে ফুটবলের গড়াগড়ি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এত সুখ সইলে হয়। ইডেনের বৃষ্টি ভেজা মাঠ ফুটবলের এত দাপাদাপি সহ্য করতে পারবে কি? ফুটবলের মাঠে সাধারণতঃ মাটির সঙ্গে বালি মেশান হয়। তাতে মাঠে প্যাচপ্যাচে কাদা হয় না। তাই সংশয়ের কথাটাও বলে রাখি। আমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সে আশংকার আর বেশী দেরী নেই। হয়ত খেলোয়াড়রাই বলবেন এই ইডেনে ফুটবল চলবে না। কেননা অতিরিক্ত কাদা-মাটিতে খেলোয়াড়দের সব কায়দাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মাটিতে বল গড়াবে না। খেলোয়াড়দের পাও ঠিকমত সরবে না। কাজেই ইডেনের মাঠ সেইমত তৈরী রেখে ফুটবল খেলার আসর পাতলেই হয়ত ভাল হত। কিন্তু ক্রিকেট? ক্রিকেট বৎসরান্তে একবার। তার জন্যে আর আক্ষেপ করে লাভ কি?

হতাশ হবার কোন কারণ নেই, পরীক্ষা করে দেখতে আপত্তিটা কি? শোনা যাচ্ছে, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোন টেস্ট ক্রিকেট খেলা আমাদের দেশে নেই। অতএব এই তিন বছর পরীক্ষা করে দেখে নিলে ক্ষতিটা কি? যদি দেখা যায় ফুটবল খেলার পর ইডেনে টেস্ট ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়, তাহলে যেবারে ইডেন গার্ডেনে টেস্ট খেলা হবে সেবারে ফুটবল না খেললেই তো সব গোলমাল মিটে যায়। আসলে আমি বলতে চাই যে, আমাদের দেশে ফুটবল খেলাটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং খেলা দেখার চাহিদা খুব বেশী সুতরাং ইডেন গার্ডেনে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হলে লাভও অনেক আছে বইকি। প্রথমত বেশী লোক খেলা দেখার সুযোগ পাবেন এবং দ্বিতীয়ত দর্শনী বাবদ আয়ের মোট অংশ খেলাধুলোর কল্যাণে খরচ করা হবে।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

বলাই দে

(এরিয়ান)

"আপনার ভুল হয়েছে, আমি কানাই। বলাই ভেতরে ড্রেস করছে।"

সত্যিই বোকা বনে গেলাম, এতদিনের পরিচয় তবু ভুল হয়ে গেল; বলাই-কানাইয়ের তফাৎটা চোখে পড়ল না! আমার অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে কানাই গিয়ে বলাইকে সশরীরে ধরে নিয়ে এলেন। সব শুনে বলাই তো হেসেই অস্থির। 'এমনি ভুল অনেকেই করেন—বলাইকে কানাই এবং কানাইকে বলাই বলে। সংবাদপত্রের ভাষায় —অনিচ্ছাকৃত ভ্রম মার্জনীয়। কানাইয়ের সঙ্গে আমার একটু তফাৎ আছে; ভাল করে দেখলে ধরা পড়ে। এই দেখুন আমার কপালে মস্ত কাটা দাগ, কানাইয়ের ওটা নেই।'

কলকাতার মাঠে মস্ত বড় নাম নিয়ে এসেছিলেন আজকের এরিয়ানের বলাই দে। পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি বলাই দে। অনেক বাধা ডিঙিয়ে বলাইকে এই ঠাঁই করে নিতে হয়েছিল। উগ্র মোল্লাতন্ত্রী রাষ্ট্রে দশটি মুসলমানের পাশে কোন হিন্দুর স্থান হওয়া সহজ কথা নয়। বাধা সেখানে অনেক। কিন্তু সে সমস্ত প্রতিবন্ধককে ডিঙিয়ে বলাই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সহজাত ক্রীড়ানৈপুণ্যকে মূলধন করেই। বলাবাহুল্য বলাইয়ের বৈশিষ্ট্য ঐখানেই। শক্ত সমর্থ শরীর, অফুরন্ত উৎসাহ, চমৎকার পজিসন জ্ঞান, পাখীর মত ছোঁ মেরে নিতে বলাইয়ের দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত।

বলাই যখন হঠাৎ পশ্চিম বাংলায় চলে এলেন, পূর্ব পাকিস্তানে, তথা সারা পাকিস্তানে তিনি তখন খ্যাতির শিখরে। কিন্তু তবু নানা কারণে তাঁকে পাকিস্তান ছাড়তে হোল, অনেক স্বপ্ন ও আশাকে বুড়িগঙ্গা আর ভৈরবের বুকে জলাঞ্জলি দিয়ে, অনিশ্চয়তার দোলায় চেপে। কিন্তু বলতেই হবে বলাইয়ের ভাগ্য ভাল, কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাঁই মিললো ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। থঙ্গরাজ পয়লা নম্বর, দোসরা বলাই। একই ক্লাবে দুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গোলরক্ষক। ইস্টবেঙ্গল শিবিরে থঙ্গরাজের তখন বিরাট ছায়া। তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্বের পাশে তরুণ বলাইয়ের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে অনেক বাধা; তবু বলাইকে আমরা কলকাতার মাঠে ফুটবলের বড় আসরেই দেখলাম, ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগে চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সেদিনের ক্ষণিকের সেই উপস্থিতিতেই তিনি সকলের নজর কাড়লেন, প্রতিষ্ঠিত হলেন — কলকাতা ময়দানে, গড়ের মাঠে।

বলাইয়ের জন্ম ১৯৪৬ সালের ১১ই অক্টোবর ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়; কানাইয়েরও সেই দিন, মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে। যমজ আরও দুটি ভাই-বোন আছে কানাই-বলাইয়ের। ফরিদপুরের লোক হোলেও বলাইয়ের শৈশব কেটেছে খুলনার বাবার কর্মস্থলে। লেখাপড়া এবং খেলাধুলো দুটোরই হাতেখড়ি খুলনা শহরে। সেন্ট

জোসেফ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর বলাই চলে গেলেন ঢাকায় খেলতে এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করতে। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেন তিনি।

খুলনায় থাকার সময় ১৯৬১ সালে স্থানীয় সিনিয়র ডিভিসন লীগে হিরোজ দলের পক্ষে খেলেছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালে খুলনা লীগ এবং জেলা একাদশের পক্ষে খেলেছেন নিয়মিতভাবে এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। ১৯৬৩ সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল মহামেডান স্পোর্টিং-এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এলো বলাইয়ের কাছে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সেই আহ্বানে বলাই সাড়া না দিয়ে পারেন নি, ১৯৬৩-৬৪ সালে এই ক্লাবেই কাটলো তাঁর।

১৯৬৪ সাল, বলাই দে'র ফুটবল জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়। এই বছরই পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে তিনি খেলতে গেলেন চীনে। পাকিস্তান সফরকারী রুশ দলের বিরুদ্ধেও বলাই খেলেছেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, করাচী এবং লাহোরে।

বলাইয়ের গুরু-ভক্তি ভাল। বলাই বলেন—"আমার গুরু, গুরুর সেরা, ওস্তাদের ওস্তাদ।" তারপর দু হাত মাথায় ঠেকিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে ধীরে ধীরে সেই ওস্তাদের নাম করেন—"আমার গুরু হাফিজ রসিদ, যে হাফিজ রসিদের কোন তুলনা নেই। আমি তাঁরই অক্ষম অযোগ্য চেলা, আমি তাঁরই বান্দা, তাঁরই গোলামের গোলাম।"

ভবানী রায়

(মোহনবাগান)

পক্ষকাল আগের ঘটনা। এবারের কলকাতা সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগে মোহনবাগান আর কালীঘাটের খেলা। ময়দানী ভাষায় বলতে গেলে একেবারে "চাবুক টিম" মোহনবাগানের। রক্ষণভাগে কানাই সরকার, দেবনাথ, আলতাফ, সি প্রসাদ, জার্নেল সিং, সামনে যাঁরা তাঁদের নামেও বাংলার গগন ফাটে। কিন্তু এহেন জবরদস্ত দল হয়েও মোহনবাগান "সামান্য" কালীঘাটের বিরুদ্ধে একটি মাত্র গোলও করতে পারছে না দেখে যুক্তিসংগত কারণেই সমর্থকরা ফুঁসছিলেন।

যে যার ঘড়ি দেখছিলেন। মাত্র কয়েক মিনিট বাদেই শেষের বাঁশি বাজবে, মোহনবাগান হারাবে আর একটি পয়েন্ট। ঠিক সেই মুহূর্তে বল পড়ল মোহনবাগান রাইট হাফ ব্যাকের পায়ে; পুরোভাগের সতীর্থদের ওপর আর ভরসা না করে এগিয়ে গেলেন তিনি। পেনাল্টি সীমানার কাছাকাছি এসেই টেনে সট, আর সেই সটেই গোল! এতক্ষণ গোমড়া মুখে যাঁরা বসেছিলেন, হাসি ফুটলো তাঁদের মুখে, জয় হোল মোহনবাগানের। গোল-গোল ধ্বনিতে ময়দান যেন খান খান হয়ে গেল!

সেদিনের এই অমূল্য গোলটি করেছিলেন ভবানী রায়। ছোটখাট চেহারা ভবানীর কিন্তু দম অফুরন্ত। খাটতে পারেন অসাধারণ। প্রতিদ্বন্দ্বীর পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে সেই বলই পুরোভাগকে এগিয়ে দিতে ভবানীর তৎপরতা অসাধারণ। মাথায় বড়ো না হলেও, লাফিয়ে উঠে হেড

নেওয়ার ব্যাপারে রীতিমত ওস্তাদ। মাথার বলে লম্বাদের সংগে সমান পাল্লা সেখানে ভবানীর।

কিন্তু আজকের ভবানী রায় কি কখনও ভেবেছিলেন যে, একদিন তাঁকে ঘিরে বাংলার ফুটবল রসিকদের অনুরাগ সঞ্চারিত হবে? বোধহয় না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাই হোল। কলকাতার মাঠে খ্যাতি হোল, প্রতিষ্ঠা হোল, স্বীকৃতি ঘটলো ভবানীর। ভবানী রায়ের নাম এখন কলকাতা তথা বাংলার ক্রীড়ারসিকদের মুখে মুখে।

বলাবাহুল্য খ্যাতির অঙ্গণে সসম্মানে এসে দাঁড়াতে ভবানী রায়কে বারবার কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটির পর একটি বাধা ডিঙিয়েছেন তিনি স্বীয় নিষ্ঠার সূত্রে। তাই আজ তিনি পাদ-প্রদীপের আলোকের সামনে।

প্রথম পরীক্ষা ল্যাংচাদার (এস মিত্র, কোচ) সামনে। ল্যাংচাদার কাছে ভবানী ফুল মার্কই পেয়েছিলেন। পরেরটি বাঘাদা (টি সোম) ও নিখিল নন্দীর কাছে। মাজা-ঘষার পর সেখানেও স্বীকৃতি। এলেন মোহনবাগানে। মোহনবাগানের অন্যতম কোচ শ্রীঅরুণ সিংহেরও খাঁটি জিনিষ চিনে নিতে দেরী হয় নি। ভবানী এখন মোহনবাগানের মস্তবড় ভরসা।

ভবানী রায় শৈশবে পড়াশুনা করেছেন বালী শান্তিরাম বিদ্যালয়ে। পড়াশুনায় ছিলেন মাঝারী গোছের। ফুটবল মাথায় ঢুকেছে সেই শৈশব থেকেই। বালী শান্তি-রাম বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে ভর্তি হলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে; পড়াশুনা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। মনের দুটি বাসনা ভবানীর সুগভীর। একটি বড় খেলোয়াড় হবেন, আর একটি : বি-এ পাশ করবেন।

কলকাতার মাঠে ভবানী রায়ের সর্ব-প্রথম আবির্ভাব সিনিয়র ডিভিসন ফুট-বলের আসরে বালী প্রতিভার জামা গায়ে দিয়ে ১৯৬২ সালে। এর আগে খেলেছেন বালী নবীন সংঘে, বালী হিন্দু স্পোর্টিং ক্লাবে। ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে বালী প্রতিভার পক্ষে খেলার পর ভবানী রায় যোগ দিলেন ইস্টার্ণ রেলওয়েতে। ক' বছর ধরে সর্বশ্রী তেজেশ সোম, নিখিল নন্দী, সুশীল ভট্টাচার্য, মোহিনী ব্যানার্জি এবং প্রদীপ ব্যানার্জির লালনে, শিক্ষায় এবং সাহচর্যে ভবানীর গড়েপেটা চললো, ছোটখাট ভুল-ত্রুটির সংশোধন ঘটলো; ভবানী রায় এখন নিটোল প্রত্যয়ে গড়া একটি সম্পূর্ণ খেলোয়াড়।

১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে ভবানী রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে সর্ব-ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতি-যোগিতায় খেলেছেন। জুনিয়র বাংলা দলে স্থান হয়েছিল ১৯৬৩ সালে।

ভারত সফরকারী রুশ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ভবানী রায় খেলেছেন পাটনায় বিহার একাদশের পক্ষে। জাতীয় ফুটবলের আসরে ভবানীর প্রথম আবির্ভাব হায়দরা-বাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে রেল দলের প্রতিনিধি হিসেবে।

হায়দরাবাদ থেকে ফিরতে না ফিরতেই ভবানী রায়ের ডাক এলো মোহনবাগান ক্লাব থেকে। শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের সযত্ন লালিত সেই স্বপ্ন সার্থক হোল। বালী, বেলুড় আর হাওড়া পেরিয়ে ময়দানে মোহনবাগান ক্লাবের বিরাট ফটক দিয়ে মাথা উঁচু করে সগৌরবে এসে দাঁড়ালেন ভবানী রায়।

শংকর সরকার

(ইস্টার্ন রেলওয়ে)

হাওড়া চামারিয়া পার্কে ছেলেটির সেদিন জয়জয়কার। একশো, দুশো এবং চারশো মিটার দৌড়ের সবগুলিতেই ফার্স্ট। কালো, রোগা সেই ছেলেটিকে ঘিরে পার্কে উপস্থিত শত শত দর্শকের সে কি উল্লাস!

চামারিয়া পার্কে সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল হাওড়া জেলা অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের। তিন-তিনবার সগর্বে বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে-ছেলেটি স্মিতহাস্যে জনতার মাঝখানে মিশে গিয়েছিল, তাঁকে আবার নতুন ভূমিকায় দেখা গেল কলকাতার ময়দানে—ফুটবলের আসরে। নাম তাঁর শংকর সরকার।

এই শংকর এখন ইস্টার্ন রেলওয়ের রক্ষণভাগের মস্ত এক শক্ত খুঁটি। খেলেন লেফট্ ব্যাক বা লেফট্ হাফ-ব্যাকে। রক্ষণ-ভাগে দাঁড়ালেও খেলার মেজাজটি যেন পুরোপুরি আক্রমণাত্মক, মাঝে মাঝে দস্তুর-মত ফরওয়ার্ডের ভূমিকায় নেন। নিজের

নির্ভেজাল সাধনার মাধ্যমে শংকর সরকার ধীরে ধীরে আজ পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শংকর এখন প্রখ্যাত প্রদীপের পার্শ্বচর। খেলার মধ্যে লম্ফঝম্প কম, মাথা এবং মেজাজটি রাশ-বাঁধা, ভাঙনের মুখেও শংকরের আচরণ ধৈর্য ও সাহসের সুকঠিন ইস্পাতে যেন মোড়া।

স্বীকৃত ফুটবলে প্রথম খেলেছেন শংকর সরকার কলকাতার দ্বিতীয় ডিভিসন ফুটবলে সালকিয়া ফ্রেন্ডসের পক্ষে। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে প্রথম ডিভিসন লীগে হাওড়া ইউনিয়নের পক্ষে। ১৯৬৪ সালে হাওড়া ইউনিয়নের তাঁবু ছেড়ে, রেড রোড পেরিয়ে গিয়ে ভিড়লেন বাঘাদার আস্তায় উয়াড়ী তাঁবুতে। পরের বছর বাটায় এবং ১৯৬৬ সাল থেকে ইস্টার্ন রেলওয়েতে।

শংকর সরকারের জন্ম হাওড়ার দাশ-নগরে। ১৯৫৯ সালে ব্যাঁটরা স্কুল থেকে শংকর স্কুল ফাইনাল পাশের পর নরসিংহ দত্ত কলেজে পাঠ্যাবস্থায় ১৯৬৫ সালে সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলকাতার প্রতি-নিধিত্ব করেন এলাহাবাদ (আঞ্চলিক) এবং মাদ্রাজে (মূল)।

এই বছরই শংকরকে আবার দেখা গেল কটকের জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের আসরে। ১৯৬৬ সালে মাদ্রাজে আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতার পরেই শংকরের জীবনে এলো সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন ম্যানিলা এশীয় যুব ফুটবল খেলাতে। ম্যানিলার সেই আলোক-উদ্ভাসিত মাঠে বার্মার সংগে ভারতের খেলাটির স্মৃতি শংকরের মনে আজও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

—বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। দশ ।।

রঙ্গ-ঠানদিদির একটা বৈশিষ্ট্য, সেকালের হলেও একালের সঙ্গে যোগ-সূত্রটা পুরোমাত্রায়ই রেখে চলেছেন। কত পরিবর্তন তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনের পরিধির মধ্যে, কি বিপুল বৈষম্য সে-যুগ আর এ-যুগের আদর্শে, উৎকট বিরোধই এক-এক জায়গায়। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে, যেন চেনাই যায় না আর। তবু বেশ প্রসন্ন মনেই সবটুকুকে মেনে নিয়েছেন, আত্মসাৎ করে নিয়েছেন বলা যায়। এটা হয়েছে তাঁর ঘুরে ঘুরে অনেক দেখা, অনেক জানার জন্য। মনের কোথাও কূপমণ্ডুকতা এতটুকু জমতে পায়নি। মনটি অতিশয় কাঁচা, সরস, ক্ষমাদ্রব, তাই অতি-প্রাচীনা হয়েও অতি-আধুনিকাকে দেখে এতটুকু নাসিকা কুঞ্চিত হয় না, মনে আসতে পায় না এতটুকু অনাত্মীয়তার ভাব। ও'র মনটা এ-যুগ ও সে-যুগের মাঝে একটি স্বর্ণ-সেতু।

তবে একটা বিষয়ে তিনি এ-যুগের সঙ্গে একেবারেই আপোস করতে পারেন নি। সেখানেও কিন্তু তাঁর মনের ঐ সরসতা, তার সঙ্গে একটা বেদনা। এখানে শুধু আপোস করতে না-পারাই নয়, তাঁর ভাবটা থাকে শত্রুতারই। যদিও, মনের গঠনটাই এমন যে-কোনও বিদ্বেষ থাকে না তাঁর মধ্যে, শুধু হার-জিতের একটা সুমিষ্ট আবরণে সমস্ত ব্যবহারটুকু একটি সরস প্রসন্নতায় থাকে মণ্ডিত। এমনি তাঁর মনের এই পরিচয়টুকু সব ক্ষেত্রেই পাওয়া গেলেও, "করুণাময়ী হোম"-এর ব্যাপারে আরও স্পষ্ট রূপ নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এটি হলো মেয়েদের একটি মেস। জন আষ্টেক মেম্বার, বাড়ে-কমে, তবে ওপর-নীচে নিয়ে মাত্র আটখানি ঘর নিয়ে ছোট একটি বাড়ী, বাড়বার সুযোগ-সম্ভাবনা কমই। এর মধ্যে ওপরের চারটি ঘরে রেগুলার মেম্বাররা থাকে। নীচের একটিতে পাচক-ঠাকুর আর একজন চাকর, একটি রান্না-ঘর, একটিতে খাওয়ার জন্য টেবিল-চেয়ার পাতা ও একটি ভাঁড়ারঘর। ছোট একটি উঠান, তার একদিকে বাথরুম ইত্যাদি।

ছোট, তবে বেশ ছিমছাম। ব্যবস্থাও বেশ আধুনিক রুচিসম্মত। না হয়েই পারে না; মেসের বাসিন্দারাও সব আধুনিকা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ সরকারী দপ্তরে কেরানী, ভালো মাইনেরই। দুজন বিভিন্ন মার্চেন্ট অফিসে স্টেনো। দুজন ছাত্রী। একজন সাধারণ আর্টস্ কলেজের পঞ্চবার্ষিকের, একজন মেডিকেলের তৃতীয় বার্ষিকের। এখানে থেকেই বরাবর পড়াশোনা করেছে এরা। দুজন একটি মেয়েস্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

এই হোলো মেসের যা স্থায়ী কাঠামো। কেউ সীট খালি করে চলে গেলো তো, তার জায়গায় ভর্তি হয়ে এই কাঠামোটা বজায় থেকে যায়।

একটু জোয়ার-ভাঁটাও থাকে লেগে। কারুর যদি গেস্ট এলো, একাধিক কারুর-কারুর, বা কোনো একজনের একাধিক, তো তাদেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। এর ওপর ছুটি-ছাটার দিনেও আড্ডা দিতে আসা আছে; কারুর আত্মীয়া, কারুর বান্ধবী।

মেসের মেম্বাররা সবাই অনূঢ়া। এটা যে নিয়ম, এমন নয়, তবে এই ধারাটাই বরাবর চলে আসছে বলে অলিখিত নিয়ম বললে বিশেষ ভুল হয় না। একটা পরিবারের মধ্যে কুমারী আর বিবাহিতার নানা সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে মিল হওয়ার কোনো বাধাই থাকে না। কিন্তু বাইরে—মেস্-হোস্টেল হোক, কলেজে হোক, কোথায় যেন একটা আড় থেকেই যায়। যার জন্য বেটাছেলেদেরও অনেক ক্ষেত্রে একটু একান্ত হয়ে ব্যাচিলার্স মেস করে নিতে দেখা যায়। একটা যেন সূক্ষ্ম জাতিভেদ, বিবাহিত-অবিবাহিত নিয়ে, তাতে যেন মেলে ভালো।

মেসের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড় কমলা। সাতাশের কাছাকাছি হবে। এম-এ পাস। বৃত্তি হিসাবে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

মেসের পরিচালনা মোটামুটি ভাগাভাগি করেই হয়। মাসে মাসে লোক বদলে, যেমন হয়ে থাকে সাধারণতঃ, তবে বয়সের জন্যেই কমলার আসনটি সবার অভিভাবকের মতো। এছাড়া তিনি মেসের প্রতিষ্ঠাত্রীদের মধ্যেও একজন। জন-তিনেক মিলে করেছিলেন, বাকী দুজন বিদায় নিতে এখন সব দায়িত্বটা ও'র ওপরই এসে পড়েছে। উনি যাবেনও না মেস ছেড়ে, হয়তো কথনই নয়। উনি বাপের বাড়ীর দিকে প্রায় নিঃসঙ্গ এখন। মেয়ে-জীবনের দ্বিতীয় পর্বে ওঁর প্রবেশ লাভ হয় নি। সেখানে নাকি একটা রোমান্স অনেকখানি এগিয়ে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেছে। এবং নাকি শেষও হয়ে গেছে। কি, সেটা সবার নিজের-নিজের আন্দাজ। এদিকে বেশ আহ্লাদে মানুষ। মেসটি প্রাণ, যেন

জীবনের আর সবকিছুকেই বিদায় দিয়ে খালি জায়গাটা শুধু মেসটুকু দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছেন। তাঁর জীবনে যদি থাকেই কোন রোমান্সের ট্র্যাজেডি তো বাইরে কোথাও তার দাগ পড়ে নি। এবং এর জন্যেই কেউ দরদ দেখিয়ে কোনো প্রশ্ন করবার সুযোগ পায় না। এমন কি, অমন যে রঙ্গ-ঠানদিদি, তিনিও নয়।

এবার 'করুণাময়ী হোম'এর সঙ্গে রঙ্গ-ঠানদিদির সম্পর্কের কথাতে আসা যাক।

বাড়ীটা ও'দেরই, আরও যথাযথভাবে বলতে গেলে ঠিক পারিবারিক সম্পত্তি নয়, ব্যক্তিগতভাবে ও'রই। বিবাহে উনি এটা বাপেরবাড়ীর কাছ থেকে যৌতুক পেয়েছিলেন, গহনার মতো স্ত্রী-ধন হিসাবেই। এরপর, প্রায় বছর দশেক পূর্বের কথা, কয়েকটি মেয়ে মিলে মেস প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়, উনি বেশ উৎসাহ দেখিয়েই দিয়ে দেন বাড়ীটা, নামমাত্র একটা ভাড়া নিয়ে। একটা মাত্র শর্ত ছিল। ওরা নাম নিয়ে এসেছিল 'মেডেন হোম', সেটাকে বদলে 'করুণাময়ী হোম' রাখতে হবে। করুণাময়ী ও'র মায়ের নাম। চলে আসছে এই ব্যবস্থা।

এর পরেই যেটাকে বলা হয়েছে রঙ্গময়ীর শত্রুতা সেটা আত্মপ্রকাশ করে। ভাঙ্গন ধরাবার প্রথম ধাপটি শুরু করে দেন।

একালের সঙ্গে মনের একটি সহজ যোগসূত্র ধরে রাখলেও একালের একটা ব্যাপারের সঙ্গে যে একটা আপোস করে রাখতে পারেন নি, এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যে তিনটি মেয়ে ও'র কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ও বয়সে বড় ছিল সুলতা। ধ্যান-ধারণাতেও সবচেয়ে আধুনিকা। রঙ্গ-ঠানদিদি চিরকালই আমুদে আর মজলিসী স্ত্রীলোক—এমন স্ত্রীলোকেরা যেমন হয়ে থাকে, বয়সের বিশেষ বিচার নেই; এতগুলি মেয়ে একসঙ্গে তাই 'করুণাময়ী হোম'এর প্রতিষ্ঠা থেকেই ও'র যাওয়া-আসা ছিল। বেশি দিন নয়, মাস কয়েক পরের কথা; সুলতার কিছু দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সবার মনে কিছু-কিছু কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে, এমন সময় একদিন রঙ্গময়ীর বাড়ীর গাড়ী হর্ণ দিয়ে মেসের সামনে এসে দাঁড়াল। বিকেলে, যখন সবাই উপস্থিত থাকবার কথা। ও'র গাড়ির আওয়াজ পেলেই মেসে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 'ওরে রঙ্গ-ঠানদি এসেছেন!...... রঙ্গ-ঠানদি' রে!'—বলতে বলতে যতক্ষণে কয়েকজন এগিয়েছে বাইরের দিকে ততক্ষণে উনিও গাড়ি থেকে নেমে দরজার ভেতরে এসে গেছেন। আধুনিকাদের কাছ থেকে একটা জিনিস ধার নিয়েছেন রঙ্গময়ী। কতকটা প্রয়োজনে এবং কতকটা কেন তা উনি নিজেই জানেন; একটি বড়সড় ভ্যানিটিব্যাগ। খুব প্লেন, তবে বটুয়া বা ঐ জাতীয় কিছু নয়। কাছে-পিঠে নয়, তবে একটু দূরে গেলেই তার মধ্যে তাঁর পান, জর্দার ডিবে, কিছু পয়সা-কড়ি আর অন্যান্য টুকিটাকি কিছু ভরে নেন; কাউকে কিছু দেওয়ার থাকলেও। শুধু জিনিসটা স্টাইল-অঙ্গের হলেও বহন করবার মধ্যে কোনও স্টাইল থাকে না। স্ট্র্যাপটা আনাড়ির মতো হাতের মধ্যে মুঠিয়ে ধরেই নিয়ে আসেন। আজ একটু ব্যতিক্রম; ওটা একজন আধুনিকার মতোই বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন। একটা হাসি লেগেই থাকে মুখে, মজলিস্ জমাতেই তো আসা, আজ তাতে কৌতুকের ভাবটা যেন বেশী। সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে উনি এলে, ও'র পাশে থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে মনীষা ব্যাগটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল—"যাক, এতদিনে ঠিক হয়েছে। ভ্যানিটিব্যাগও নিতে হবে আমাদের একালের মতন, অথচ সেটাকে বইবেন হরিনামের ঝুলির মতন মুঠোতে ধরে, সে যেন জাত মেরে দেওয়া হচ্ছিল আমাদের ভ্যানিটিব্যাগের।"

একটা কিছু ব'লে ওর মুখের আগল খোলানো। দাঁড়িয়ে পড়লেন রঙ্গময়ী, ভ্রূ কুঁচকে বললেন—"দ্যাখো, জাতের গুমোর করে! আজ তো এর জাত এমনিই গেছে।"

"কেন ঠানদি?...কি ব্যাপার?...জাত গেলো কিসে বলতে হবে।"—যারা সঙ্গে ছিল হৈ-চৈ করে উঠল।

"আজ তো এটা ডাকহরকরার ব্যাগ। কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, তা ফিতেটা তো অত লম্বা নয়,...।"

"ডাকহরকরার ব্যাগ! ...সে আবার কি ঠানদি? আপনি আবার এ চাকরী কবে থেকে নিলেন?...আপনার আবার এ-দুর্ভোগ কবে থেকে?"

ওপরের ঘর থেকে এগিয়ে এলো সবাই। সঙ্গের যারা তারাও রয়েছে, হৈ-চৈটা আরও জোর হয়ে উঠল।

"তা বলতে দিবি তো স্থির হয়ে। চলু ওপরেই আয়।"

—মোটা মানুষ। হাঁটুতে হাত দিয়ে একটু হাঁপাতে-হাঁপাতেই উঠে এসে কমলার ঘরে ঢুকে ও'র বিছানায় বসে পড়লেন। এই ঘরটিই সবচেয়ে বড়, কেউ এলে চারটে পর্যন্ত বিছানা পাতা যায়, কমলার ছাড়া আরও তিনটি চৌকি পাতাই থাকে, তাস বা কোনো কারণে একত্র হ'তে হোলে এই ঘরেই জোটে সবাই।

রঙ্গময়ীর পদ্ধতিই হচ্ছে, যদি তেমন কিছু ব্যাপার হোলো তো একটু রসিয়ে, নাটকীয়ভাবে তার অবতারণা করা। দুটি হাতের ওপর হেলান দিয়ে একটু পেছনে চেপে বসেই বললেন—"বেশ, একটু আন্দাজই কর না দেখি। তেমন জায়গা থেকে চিঠি আসবে সে কপাল তো করিস নি কেউ, অথচ মুকিয়ে আছিস যেন...।"

একটা অসহিষ্ণুতার গুলতান উঠতে, মিটি-মিটি হাসির সঙ্গে ব্যাগের জিভটা টেনে দিয়ে আটখানা চিঠির একটা তাড়া বিছানার ওপর বিছিয়ে দিলেন। খামের ওপর তুলির সঙ্গে একটি কনে-বৌয়ের পদ্মতোলা ছবি; ওরা যতক্ষণে পড়ছে, কেউ বিস্মিত, কেউ কৌতূহলী, কেউ হয়তো নিরাশই, উনি ততক্ষণে হেসে লুটিয়ে যাওয়ার দাখিল।

"এ-যে সুলতাদি'র বিয়ের চিঠি!...কবে ঠিক হোল?...কে ঠিক করলে?"

সোজাই চার্জ করলো—"না ঠানদিদি, বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ আপনারই কাজ, লুকিয়ে রেখেছিলেন আমাদের কাছে।"

"আমি!"—চোখ কপালে তুললেন রঙ্গময়ী। বললেন—"আমার দরকারটা? কেউ আমায় ঘটকালী-বিদেয় দেবে?"

চোখ কপালে তুললেও হাসিটাকে কিন্তু সামলাতে পারছেন না। বিপাশা বলল—"আপনিই, নির্ঘাত আপনি; লিখিয়ে নিন আমার কাছে। ভাঙ্গন ধরাচ্ছেন আমাদের এমন মেসটিতে।"

"তা যদি বললিই তো, বেশ না হয় ধরাচ্ছিই।"—রাগের ভাবই টেনে আনলেন ঠানদিদি এবার। বললেন—"এমন মেস্ রেখে লাভটা কি? আইবুড়ো, ধুবড়ী মেয়ের পাল—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ...।"

"কারুর পেটেই ক্ষিধে নেই আমাদের। কালই আমাদের কথা হচ্ছিল না রে চম্পা যে..."

"হচ্ছিলই তো।" —চম্পা একটু নাকি-সুরে আরম্ভ করল—"এই ঘরেই বসে আমিই তো বললাম, কেমন চমৎকারটি হয় যদি আমরা সবক'টিতে একেবারে শেষ বয়স পর্যন্ত এই মেসে—আপনার মতন বয়সের কথাই বলছিলাম—এমনি স্ফূর্তি করে..."

একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠলেন রঙ্গময়ী। এই রকম অবস্থায় পড়লে ও'র হাতটা যেন আপনিই ডিবে খুলে পান নিয়ে তোয়ের থাকে। মুখে ফেলে দিয়ে উৎকট হাসির মধ্যেই বলে চললেন—"নাও, এ আবার নাকিসুর ধরলে। তাহ'লে তুই আগে নম কাটাবি চম্পা, দেখে নিস্। আমার কাছেই লিখিয়ে নে। বেশ তো, থাক্ না দিদিমণির মতন পাকা চুলে সিঁদুর পরে শেষ বয়েস পর্যন্ত। ফূর্তি তাতে বাড়ে কি কমে পরখ করেই দেখ্না না হয় দিন কতকের জন্য। তোরা তো আইনও পাশ করে নিয়েছিস্, ভয়টা কারে? না পোষায়, তখন তো ডিভোর্স না কি সেই চুলোর ব্যবস্থা রয়েছে।"

—কথাটার মধ্যে কি আছে, প্রায় সবার মুখেই একটু হাসির আমেজ দেখা দিল। মনীষা মুখটা ভার করে নিয়ে বলল—"কাজ নেই পরীক্ষায় বাবা, দিব্যি আছি। তখন আবার তোমরাই যত পাকাচুলে—সিঁদুর-পরার দল ঘোট করবে।—'দেখলে, কি কেলেঙ্কারীটাই না করলে ছুঁড়ি!'"

এমন টেনে মাথা দুলিয়ে প্রবীণাদের ভাবা-ভঙ্গি নকল করে বলল যে, সবাই এবার ভালো করেই হেসে উঠল।

তার জেরটা থামলে রঙ্গময়ী আবার গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা ক'রে বললেন—"তা হলে কি বলিস, মেসে আসাই বন্ধ আমার? পূর্ণে, কমলা তোরা দুজনেই তো চুপ করে আছিস্ দেখছি।"

পূর্ণিমা আর কমলাই বাকী দু'জন যারা সুলতার সঙ্গে মেসটাকে দাঁড় করিয়েছেন। কমলা শুধু একটু হাসলেন, পূর্ণিমা হেসে বললেন—"বাঃ, আসবেন না ...আপনি না এলে..."

চম্পা বলল—"আসবেন, সবই করবেন,

মাথায় করেই রাখবো। শুধু কুনজরটি দেবেন না গরীব মেসটির ওপর, দোহাই!"

এবারও শেষের দিকে হালছাড়া ক'রে এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে বলল যে, সবার মধ্যেই একটা দমকা হাসি পড়ে গেল।

।। এগারো ।।

এসব অনেক আগের কথা। একেবারে প্রায় গোড়ার দিকের। এরপর এই সাত-আট বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে 'করুণাময়ী হোম'এ। বিশেষ করে, মেম্বারের দিকে। সিঁদুর পরেই হোক, বা চুল পাকা পর্যন্তই হোক, কারুরই একটা মেসে কাটাবার সাধ স্থায়ী হ'তে পারে না, বা অবস্থা-গতিকেও সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই সে সময়ের প্রায় সবাই বিদায় নিয়েছে একে-একে, কেউ পড়া শেষের সঙ্গে, কেউ চাকরি ছেড়ে বা অন্যত্র চাকরি নিয়ে, কেউ বা অন্য কারণে। অন্য কারণের মধ্যে মেয়েদের জীবনে যা সবচেয়ে স্বভাবিক, অর্থাৎ বিবাহ, তাইতেই মনীষার ভাষায় 'ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে' মেসের মেম্বার।

তার মধ্যে একজন হোলো চম্পা নিজে।

শুধু একটি মেয়ের যাওয়া "করুণাময়ী হোম'-এর নিষ্কলঙ্ক ইতিহাসে একটা লজ্জা আর বেদনার অধ্যায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। মেয়েটি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই পথ ঠিক করে মেসে এসে উঠেছিল, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে অনুপা নাম নিয়ে। তারপর, মাসখানেক পর সেই পথ ধরে চলে যায়।

বিবাহের ব্যবস্থা করে মেসের জোয়ার-ভাটার স্রোত বজায় রেখে যাওয়ার যশটা প্রধানতঃ রঙ্গ-ঠানদিদির; ওরা অবশ্য বলে অপযশ।

সুলতার পরে তিনি চম্পার সীট্‌টা এই করে খালি করলেন, তারপর পূর্ণিমার। এরপর এই ক'টা বছরে ও'র 'কারচুপিতেই' আর পাঁচটি সীট খালি হয়েছে মেসের; মেম্বারদের ভাষাটাই ব্যবহার করা গেল। 'অনুপা' যাওয়ার পর থেকে উনি যেন আরও তৎপর হয়ে উঠেছেন এ-বিষয়ে।

অবশ্য, 'করুণাময়ী হোম'-এর যথেষ্ট সুনাম আছে। সীট কখনও খালি থাকতে পায় না, বরং একটা ওয়েটিং-লিস্ট বা উমেদারদের তালিকা মজুতই থাকে, সীটু খালি হলেই সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি হয়ে যায়।

এই করে একেবারে গোড়ার দিকের মেম্বারদের মধ্যে এখন মাত্র তিনজন রয়ে গেছে। কমলা, মনীষা আর তন্দ্রা। তন্দ্রা ছিল মেসের কনিষ্ঠতমা মেম্বার, ও পূর্ণিমার বোন, স্কুলের বয়স থেকেই রয়েছে এখানে। স্কুল শেষ করে কলেজ। এখন পাশ করে কোন ভালো অফিসের হিসাব-নিকাশের দপ্তরে প্রবেশ লাভের জন্য একটা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্টান্সের কোর্স নিচ্ছে। তাও প্রায় শেষ হয়ে এলো।

চম্পা যেটাকে রঙ্গময়ীর কুনজর বলেছিল, সেটা শুধু পড়ে নি কমলার ওপর। ওখানে মেসের আর সব মেয়ের মতোই ও'র দৃষ্টি এবং রসনা অচপল। অনেকটা বয়সের জন্যও, তবে প্রধানত ও'র জীবনের রোম্যান্স, যা হয়তো চিরদিনের জন্যই ও'র জীবনটাকে একটা ট্র্যাজেডিতেই পরিণত করে রাখল, সেটাই রঙ্গময়ীর মনেও একটা করুণামিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে রেখেছে। কোথায় কি পেয়েছেন, উনিই জানেন, নয়তো, যেমন আগেই বলা হয়েছে, একালের অনেক জিনিস মেনে নিলেও একালের মেয়েদের স্বৈরাচার সেকালের আপোসহীন তির্যক দৃষ্টিতেই দেখেন।

একটু আশ্চর্য শোনালেও, কমলা আবার এ-বিষয়ে রঙ্গময়ীর সঙ্গেই একমত, দু'জনের দৃষ্টিকোণে কোনও প্রভেদ পাওয়া যায় না। বয়স, মেসের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দিক দিয়ে উনি আর সবারই গার্জেন। সেখানে গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু সাধারণ মেলামেশা গল্প-গুজবে উনি আর সবার মতোই আমুদে। রঙ্গময়ীর সঙ্গে তাঁর এই যে মতের মিল এটা কখনও কথায় প্রকাশ হোতে দেন না। তাই উনি এলেই মেসে একটু হুল্লোড়ের বাতাস ওঠে। সেটা উনিই দেন তুলে—"ওরে রঙ্গ-ঠানদিদির শুভাগমন হয়েছে, সুধী সাবধান!" এরপরেই সবাই ঘিরে বসে রঙ্গময়ীকে—"এবার কার ঘাড় ভাঙ্গাবেন ঠানদিদি?...না ঠানদিদি, এবার কাউকে ধরলে আমরা বলব দাদু পেনসন নিয়েছেন, এবার আপনিই রোজগারে নামলেন......"

"তা কি মিথ্যে বলেছে?—এতদিন তো হাত পাকাচ্ছিলেন ঘটক-বৃত্তিতে..."।

"সত্যিই তো, ক'টা হোল রে শেষ-পর্যন্ত?"

কমলাও যোগ দেন—"কেন, সেই কথটা বল্‌ না, যদি হয় ঠানদিদির। আমাদের কথাই হচ্ছিল, ঠানদি এবার একটা রেজ-লিউশন করব। আপনি আর আমাদের মেস ভাঙ্গাবেন না, আমরাও বসে থাকব না—খেসারৎ হিসেবে ভাড়া বন্ধ করে দেব। তাতেও না মানলে ক্ষতির দায়ে বাড়ি......!"

—"নয়তো বড় আদালতে নালিশ—দাদুর কাছে—সম্পত্তি, না হয় গিন্নী—দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে"...

কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদের আকারেই ঠাট্টাটা আরও তীব্র করে তোলে, বলে—"থাক না রে, আদালত করবে বিচার!! আসামীর ভয়েই থরহরি কম্প—জানা নেই যেন!"

রঙ্গময়ী হাসতে-হাসতে ভারী শরীরটা বিছানায় টেনে তুলে নেন, পান-দোক্তা বের হয়, মুখে ফেলে দিয়ে বললে,—"মরণ, চারপো কলি আর বলে কেন তবে? উপকার করে মরো, যশ নেই তাতে। কোন্‌টার মন্দ হোল র‍্যা? দেখিয়ে দিতে পারিস্‌? ...এবার ভাবছি..."...

হুল্লোড়টা জীইয়ে রাখবার জন্যেই সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে যান। "আমি না!"......'আমার দিকে নয়!'......'ও ঠানদি দোহাই আপনার!'

হাসির ঢেউয়ের দোলা লাগে সবার গায়ে গুটিয়ে যায়, লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে বিছানার ওপর। খোঁপা যায় এলিয়ে, আঁচল পড়ে খসে। নির্ভেজাল মেয়েদের রাজত্ব, পরোয়াটা কার?

এই হোল 'করুণাময়ী হোমের' রূপ-রেখা; মোটামুটি একটা। বাইরের। এছাড়া ভেতরের একটা রূপ আছে; যার খবর শুধু রঙ্গ-ঠানদিদি আর কমলার অর্থপূর্ণ হাসি আর দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে থাকে। এক সময় কোনো একটি মেম্বার দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আর আসে না; একরাশ নিমন্ত্রণের চিঠি এসে হাজির হয় একদিন, যেমন এসেছিল সুলতার বেলায়।

সরস মনের উল্লাসে কেউ-কেউ গঞ্জনা দেয় রঙ্গ-ঠানদিদিকে কেউ তোলে নাকিসুরে অনুযোগের সুর।

কমলা বলেন—"না ঠানদিদি, আর তো আমরা চুপ করে থাকতে পারছিই না..."

এরপর আবার কোনো একদিন দু'জনের নিভৃতে আলোচনা বসে। এ রকম প্রয়োজন হলে রঙ্গময়ী কমলাকে ডেকে নেন। নিজের বাড়ীতে কোনোদিন মেসে এসে। তার আলাদা ইসারা আছে দু'জনের চোখে, হুল্লোড়ের মধ্যে অন্য চোখে ধরা পড়ে না।

।। বারো ।।

সুরবালার সঙ্গে কথা হওয়ার পরের দিনই বিকেলে রঙ্গময়ী "করুণাময়ী-হোমে" এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রায় তিনমাস পরে, এই যে মাস তিনেক ঘুরে এলেন বাইরে থেকে। প্রায় সবাই এসে জুটেছে, কমলার ঘরে ও'রই আলোচনা হ'চ্ছিল, আসবেন আসবেন খবর পাওয়া যাচ্ছে অথচ ফেরবার নামই নেই। সবাই বেশ অধৈর্য হ'য়েই ক'দিন থেকে এই আলোচনা চালাচ্ছে, উনি হাঁটু ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাসলেন—"কৈরে, বড় নাতনী, খবর কি তোদের?"

একটা হৈ-হৈ ক'রতে ক'রতে সবাই বারান্দায় ভিড় ক'রে বেরিয়ে এলো—"ওমা, মেঘ না চাইতেই জল যে!"......ঠানদিদি কবে এলে?......আমাদের যে কি ক'রে কাটছিল! তিনতিন মাস! বাব্বাঃ!..."

একবার সবার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে রঙ্গময়ী একটু নিশ্চিন্তভাবে অভিনয় করে প্রশ্ন করলেন—"তাহ'লে আছিস্‌ তোরা সবাই?"

জয়া বলল—"থাকব না মানে?......আপনি না থাকলে বরং বেশি ক'রেই থাকব যে!"

সবার সঙ্গে ভেতরে এসে গেছেন; উঠে বসতে বসতে ওর দিকে চেয়ে বললেন—"বটে!"

উত্তর জোগাতে দেরী হয় না, ঐটুকুতে জুগিয়ে নিয়ে মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়েছেন, বললেন—"আর আমি যে অন্য রকম শুনে ছুটে এলাম!"

"কী আবার অন্যরকম শুনলেন?......আপনি যা না শোনেন......"

"আমি শুনলাম নাকি রেজিস্ট্রী ম্যারেজের মড়ক ঢুকেছে মেসে, মেস একেবারে খালি....."

"হোল আরম্ভ!"—তন্দ্রা অসহিষ্ণুভাবে বলল—"আপনি আগে ঝুলি ঝাড়ান দিদিমণি, এবার এতদিন, এত জায়গা—কী আনলেন দেখি।"

সবচেয়ে পুরোজন মেম্বার হলেও সব-চেয়ে ছোট, তাছাড়া বড় বোন পূর্ণিমার আওতায় প'ড়ে ওর খানিকটা তটস্থ হ'য়ে থাকার অভ্যাস থেকেই গেছে। একটু ছেলেমানুষী অনুযোগের সুরেই বলল—"বাজে কথায় কেমন যেন একটা অভ্যেসই হ'য়ে গেছে। খুলুন ব্যাগ দিদিমণি।"

ওই এক্কা এই বলে ডাকে রহস্যের অংশটুকু বাদ দিয়ে।

"এনেছি"—একটু স্ফীতোদর ব্যাগটার ওপর বাঁ হাতটা রাখলেন রঙ্গময়ী। বললেন, "এবার অন্য কিছু নয়তো, কেনই বা আনা যিছে? মথুরা বৃন্দাবন গিয়েছিলাম—একছড়া ক'রে তুলসীর মালা নিয়ে এসেছি—ভাবলাম, সোদা আইবুড়োর দল এই নিয়েই থাক্...."

"আমার দরকার নেই বাবা। আমার রেজিস্ট্রারী মারেজই ঠিক হয়ে গেছে একজনের সঙ্গে।"

—জয়া মুখটা বেঁকিয়ে নিয়ে এমন গম্ভীরভাবে বলল যে হঠাৎ হাসিতে ঘরটা একমুহূর্তেই বোঝাই হ'য়ে উঠল।

"মরণ! রঙ্গ দ্যাখো না!"—বলতে বলতে জিভ টেনে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুললেন রঙ্গময়ী। বাইরে গেলেই "হোম"এর জন্য কিছু আনা চাই-ই। এবার এনেছেন রূপার ওপর মিনার কাজ করা, মিনার কাজেই প্রত্যেকের নাম লেখা একটা ক'রে ফেস পাউডারের শৌখিন ডিবে। আলাপ-আলোচনার ধারাটা একটু বদলে গেল। ডিবেগুলোর প্রশংসা—কোথা থেকে কেনা—নাম লেখা যখন, নিশ্চই ফরমাশী জিনিস—এত দাম দিয়ে যে কেন কেনেন ঠানদিদি.........

কৃতজ্ঞ হৃদয়ের মৃদু অনুযোগ। কমলা একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন—"আমার জন্যে অন্তত একটু অন্য কিছু আনলে হোত।"

"কেন বল দিকিন?" ঘুরে একটু থমকেই উঠলেন রঙ্গময়ী। প্রশ্ন করলেন—"ঠানদিদির মতন বুড়ি হয়ে গেছিস্, না?"

হঠাৎ ঘরটা একটু স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। কমলাই সামলাবার চেষ্টা ক'রে আবার একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বললেন—"সকালে মেয়ে দুটো পড়তে আসে তারপর ইস্কুলে, তারপর......"

"থাম, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না?......"

যেন ও প্রসঙ্গটা ওখানেই শেষ ক'রে দেওয়ার জন্য বললেন—"দেখ্ তো, সবাই নিজের নিজেরটাই পেয়েছিস তো?"

সবাই জানাল ঠিক পেয়েছে, তবে এও বুঝল এটা কোনো প্রশ্ন নয়, রঙ্গময়ী বেশ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন, কমলার দিকের এ প্রসঙ্গটা কোন পথে এসে পড়লে কেমন হয়ে যান। একটু অন্যমনস্ক হয়েই বললেন — "আটটাই দিয়েছি তো।...তোরা তো দেখছি সাতজন —তাহ'লে দীপ্তিরটা—কেন করাই হয়নি?"

আবার ব্যাগে হাত সাঁদ করিয়ে দুটো বের করলেন। একটা দেখে নিয়ে বললেন—"এই যে দীপ্তিরটা, এখনও আসেনি কলেজ থেকে?"

কমলাই প্রসঙ্গটা বদলে ফেলার সুযোগ পেয়ে বললেন—"ও, সে কথা যে তোমার বলাই হয়নি ঠানদিদি—ঢুকতেই যা সব চেঁচামেচি ক'রে উঠল! দীপ্তি চলে গেছে মেস ছেড়ে......"

"হঠাৎ?"—কণ্ঠে, দৃষ্টিতে একটু উদ্বেগের ভাবই ফুটে উঠল রঙ্গময়ীর।

"হঠাৎই একরকম। তবে আপনি খুশীই হবেন—তার বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেলো। বেশ ভালোভাবেই তার বাপমাই দেখেশুনে ঠিক করেন। বেশ কুষ্ঠি-ঠিকুজী মিলিয়েই, ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার।

"দ্যাখো কান্ড!"—এরপর, কোথায় যে একটু নৈরাশ্যের ভাব এসেছিল, সেটাকে দাবিয়ে একটু হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে বললেন—"অত বারফট্টকা—রোম্যান্স—রোম্যান্স, সব গেল তো?......তা, হয়েছে ভালোই, শুধু আমি পড়লাম ফাঁক। যা হোক, সুখবরই। এটা ওকে পাঠিয়ে দিবি। না, আমি যাবো না তো—তাগ ক'রেছিলাম, আমিই কোথায় ভাঙ্গব রোমান্সের স্বপ্ন।......তা, তার জায়গায় এল নাকি কেউ? না, খালি আছে সীট্টা?"

সুষমা বলল — "করুণাময়ী-হোম"-এর সীট কখনও খালি থেকেছে?"

"ভর্তি ক'রে ফেলেছিস তো? নাঃ, আমি না থাকলে একটা না একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবিই তোরা; জানি যে।"

আবার রং তামসার ভাবটা ফিরে আসছে দেখে ক'জনে হৈ-চৈ ক'রে উঠল—"বাঃ, অনর্থটা কি দেখলেন ঠানদি?...... অনর্থ নয়? ঠানদিদি যে ভাঙ্গনের ঠাকরুণ—চাইবেন না এক এক কোণে খালি হোক? দোহাই ঠানদিদি, আর দয়া করে শনির দৃষ্টিটুকু দেবেন না......"

"দ্যাখো, সব শুনবে না, বুঝতে চাইবে না—কী জ্বালা বলো তো!"—পান মুখে দিয়ে দোক্তার টিপ আঙুলে নিয়েছেন, চোখ-দুটিতেও কৌতুকের হাসি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বললেন—"আমি কোথায় এ'চে আছি, এবার সীট খালি হোলেই একটি মনের মতন ছেলে এনে ভর্তি করব—সব রোম্যান্স, রোম্যান্স করে, দেখি কত রোমান্স করতে পারে......"

"তবে এ যা এসেছে", টিপটুকু মুখে ফেলে দিয়ে আরও কি বলতে যাবেন, দরজার কাছ থেকেই বেশ একটা নিঃসঙ্কোচ মুক্ত কণ্ঠের আওয়াজ উঠে আসতে লাগল—"হ্যাঁ কমলাদি, নাকি তোমাদের রঙ্গদিদি এসেছেন মেসে? ঢুকতেই পতিতপাবন বললে। বোসো, আসছি হাতমুখ ধুয়ে..."

"তোর আর এসে কাজ নেই, আদু, বিদেয়?" জয়া বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল—"আমাদের অনেক সাধের রোম্যান্স ভেঙে দিয়েছিস—মুখ দেখবেন না ঠানদিদি তোর..."

"আমরাও আজ চাই না ও মুখ দেখতে..."সুষমাও বেরিয়ে এলো বলতে বলতে।

"ব্যাপার কি" বক্তা আর কলের দিকে না গিয়ে সোজাই খট্‌খট্ করে উপরে উঠে এলো। রঙ্গময়ীও কৌতুক আগ্রহে ঘাড় ফিরিয়েছেন, দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই একটু ভ্রূ কুঁচকে থেকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি!...কোথায় যেন দেখলাম কাল তোমায়!......"

"হ্যাঁ, হেমাঙ্গিনী মাসীদের বাড়ীতে।"—সংযতকণ্ঠে উত্তর করল আদ্রা, হঠাৎ অত উচ্ছ্বাসে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে, এগিয়ে এসে রঙ্গময়ীর পায়ের ধুলো নিল।

পুরোনো প্রথায় চিবুকে হাত বুলিয়ে চুম্বন করলেন রঙ্গময়ী। ওর নিজের পাশের খালি জায়গাটুকুর ওপর হাত বুলিয়ে বললেন—"বোস, হেমারা বলছিল বটে, নাকি ভাল তাস খেলতে পার।...বোস? না-হয় হাতমুখ ধুয়েই আসবে?"

আদ্রা বসেই পড়ল শান্তভাবে। ঘরটা আবার স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাধবী বলল—"কিন্তু...যা বলতে যাচ্ছিলাম ঠানদিদি—কেমন ভালোমানুষটির মতন গুটিসুটি মেরে বসল কোল ঘেঁসে, ভাববেন না যেন..."

সুষমা বলল—"ভিজে বেড়াল নামই দিয়েছি আমরা। আদ্রা......"

মাধবী বলল—"আর ভালো তাস খেলার কথাকে বললেন—ওর মতন এক নম্বরের......"

আদ্রা ভ্রূ চেপে চোখের কড়াভাবে চাইতে থেমে গিয়ে বলল—"যাক, দরকারটা কি আমার?আপনি টের পাবেন খন?"

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

শুরুতেই সমস্যা

পরীক্ষার ফলাফল বেরোতে শুরু করেছে। সবগুলি এখনও প্রকাশ পায়নি—সবচেয়ে বড় রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। এবং আশা করা যায় অচিরেই অন্যান্য সব রেজাল্টও মানসিক উত্তেজনাক্রান্ত পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যাবে। সেই-সঙ্গে কলেজ-হোস্টেলে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত সেই বাৎসরিক খেলাটাও চমৎকার জমে উঠবে। সারা দেশ (পশ্চিমবঙ্গ) জুড়ে এবং বিশেষ কলকাতায় এই প্রবেশাধিকার নিয়ে যে পরিমাণ হৈ-চৈ এবং কাগজে লেখালেখি হয় তা সত্যি বিস্ময়কর। এই সমস্যার সঙ্গে সকলকে পরিচিত করানোটা আমাদের সম্বাৎসরিক দায়িত্ব। লেখার চাপে অনেক সংবাদপত্র-লেখকের কলমেই কালির টান পড়ে যায়—যদিও তাঁরা আকণ্ঠ কলমে কলম ভর্তি কালি নিয়েই। কিন্তু পূর্বাপর একই অবস্থা চলে আসছে। সুরাহা করার চেষ্টা হচ্ছে না এমন কথা নিতান্ত দুর্মুখও বলতে পারবে না। চেষ্টা হচ্ছে বৈকি! তবে তা মরুভূমির তপ্ত বালুরাশির বুকে ছিটে-ফোঁটা জলকণা ভিন্ন আর কিছু নয়। ঘটনাপুঞ্জে তাই মনে হয়। তাছাড়া আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও কিছু কম নয়। কলেজ যতই বাড়ুক, ছাত্র সংখ্যাও ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। তাই স্থানাভাব অনিবার্য। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং, পলিটেকনিক প্রভৃতি বৃত্তি-ধারী কলেজগুলিতে আসনসংখ্যা তো একেবারে সীমিত। তাই পরীক্ষায় পাশ করার আনন্দ মিইয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না অভ্যর্থনার বিরাট অ-ব্যবস্থা দেখে। ঘোর কেটে যায় রুক্ষ বাস্তবের প্রাণহীন আয়োজনে। বাস্তবের মুখোমুখি এটাই ওদের প্রথম পরীক্ষা। কলেজ-হোস্টেল ওদের সাদরে গ্রহণ করে না। পরীক্ষায় পাশ করে ওরা যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে। এই অপরাধের বোঝাটা ওদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমরা অনেকেই দিব্য বিলাসে নাকি কান্না জুড়ে দিই। কোন একটি বৃহৎ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমি বলতে শুনেছি, টাকা আমাদের প্রচুর বরাদ্দ হয়ে রয়েছে কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে ছাত্রদের অপরিসর কমনরুমকে সুপরিসর করে উঠতে পারছি না। সেই কলেজে কমন-রুমের অবস্থা বেশ শোচনীয় বলা চলে। কথাটা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এরই সূত্র ধরে জনৈকা হোস্টেল সুপারকে সখেদে বলতে শুনেছি, প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্রীর অভিভাবককে ফিরিয়ে দিতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নেই। এদিকে নতুন হোস্টেলের জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে এবং জমির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কাজ তবু শুরু হচ্ছে না।

পরীক্ষা পাশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এতগুলি সমস্যা। সমস্ত ফিরিস্তি শুনে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা। অভি-ভাবকদের পক্ষে মাথা ঠিক রাখা মুস্কিল। আমাদের কর্তৃপক্ষ মহলকে ধন্যবাদ। তাঁরা পূর্বের মত সহৃদয়তার সঙ্গে সব কথা বিবেচনা করছেন। এত সব সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়েছি আমরা সদ্য পরীক্ষা নামক সমস্যা উত্তীর্ণ ছাত্রদের। আশা করবো, পরে ওরা নিজেদের কষ্ট নিজেরাই বুঝতে শিখবে—তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। এই ভরসায় সাফল্যদীপ্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সাক্ষাৎকার

লীলা মজুমদার

বাংলা সাহিত্যে লীলা মজুমদার একটি প্রখর ব্যক্তিত্ব। লীলা মজুমদারের কথা বলতে গেলেই তাঁর পরিবারের কথা এসে পড়ে। শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতবর্ষে এরকম সৃজনধর্মী সারস্বত পরিবার দুর্লভ। লীলা মজুমদারের চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে বসে কথা হচ্ছিল। পারি-বারিক ঐতিহ্যে গর্বিতা সাহিত্যিকা জানালেন "এ বংশের রক্ত যেখানেই গেছে সেখানেই ছেলেমেয়েরা হয় লেখে নয় ছবি আঁকে নয় মূর্তি গড়ে। খেলাধুলোতেও আমাদের বংশের ছেলেমেয়েরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আমাদের পরিবারের বহু-লোকের লেখা ছাপা হলে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি পেত। যাঁরা লেখেন না তাঁরা গল্প বলেন। এঁদের গল্প বলার গুণে আমাদের আদি নিবাস মশুয়া গ্রাম আমার চোখের সামনে ভাসে। অথচ আমি সেখানে কোনদিন যাইনি।"

জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার লেখক জীবন কবে থেকে শুরু?" উল্টে আমাকে প্রশ্ন করলেন "লেখক জীবনের শুরু বলতে তুমি কি বোঝ। আরম্ভের আগেও শুরু আছে—তা হল খেলার প্রস্তুতি।" স্বীকার করলাম। বললেন, "ছ বছর বয়স থেকে লিখছি। প্রথম লেখা ছাপা হয় সন্দেশে—একটা গল্প লিখেছিলাম আমার বয়স তখন পনেরো। সন্দেশের নাম নিশ্চয় শুনেছ। সম্পাদক ছিলেন বড়দা—সুকুমার রায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার লেখক জীবনে সুকুমার রায় ও উপেন্দ্রকিশোরের প্রভাব কেমন?" বললেন, জ্যাঠামশাই (উপেন্দ্র-কিশোর) আমার সাত বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু আমার জীবনে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব খুব বেশী। আমার মায়ের বাবা সন্ন্যাস গ্রহণ করায় মাকে জ্যাঠামশাই মানুষ করেন। বলতে পার মা জ্যাঠামশায়ের মেয়ের মত। বাবা সবচাইতে ছোট আদরের ভাই। তাই মা-বাবা দুদিক থেকেই জ্যাঠা-মশায়ের প্রভাব আমার ওপর পড়েছে।"

অনুরোধ করলাম, "ছোটবেলার কথা কিছু বলুন।" বললেন, বাবা ছিলেন শিকারী খেলোয়াড়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তাঁকে জীবহত্যা করতে দেখেনি। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার চাকরী নিয়ে বর্মার শান স্টেটে ও ভারতবর্ষের বহু দুর্গম অঞ্চলে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। প্রচুর দুরূহ সার্ভে তিনি করেছেন। তাঁর হাতে আঁকা ম্যাপ দেখলে মনে হত ছাপা। হাতে আঁকা বলে বিশ্বাস হত না। "বনের খবর" বলে বাবার লেখা একটি বইতে অরণ্য জীবনের অনেক খবর পাওয়া যাবে। বাবার ঘোড়া ছিল কালামানিক—কুচকুচে কালো তেজী ঘোড়া। অবসর সময়ে অঙ্ক কষতেন কিংবা গল্প

বলতেন। সুন্দর গল্প বলতে পারতেন তিনি। আমরা আট ভাইবোন। আমার লেখা-পড়া শিলং কনভেন্টে, তারপর ডায়োসেসন স্কুলে ও কলেজে।" এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি বাংলা সাহিত্যে যশস্বিনী লেখিকা লীলা মজুমদার কৃতী ছাত্রী এবং ইংরাজী সাহিত্য ছিল তাঁর বিষয়। সবিনয়ে বললেন, "আমার বাংলার ভিত কাঁচা। ছোটবেলায় মায়ের কাছে বাড়ীতে আখ্যানমঞ্জরী ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ভাগ পড়েছি। তারপর বহুদিন বাংলার ধারেকাছে ঘেঁসিনি। ডায়োসেসনে এসে বাংলায় খারাপ [illegible]

পেলাম। গরমের ছুটিতে উঠেপড়ে লেগে বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে নিলাম।"

বললাম, "বাংলার ভিত আপনার কাঁচা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে ইংরাজী ভাষায় পড়াশুনা করার জন্য বাংলা ভাষায় লিখতে আরম্ভ করার সময় কোন বিশেষ অসুবিধা বা সুবিধা হয়েছিল কিনা।" লীলা মজুমদার বললেন, "সব সাহিত্যসৃষ্টিরই উৎস এক। নিজের অনুভূতিকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দেবার যে ক্ষমতা তাই সাহিত্য। কল্পনা ছাড়া সাহিত্য হয় না। যা দেখছি তাই লিখব কারণ তাইই বাস্তব একথা যাঁরা বলেন তাঁরা ফটোগ্রাফার—শিল্পী নন। সাহিত্যের সত্য বা শিল্পের সত্য আর চোখে দেখার সত্য এক নয়।"

ইংরাজী সাহিত্যে লীলা মজুমদারের আসক্তিও এই মনোভাবকেই ব্যক্ত করে। ক্লাসিকসে তাঁর প্রীতি। সেক্সপীয়ার, ব্রাউনিং, টেনিসন, ডিকেন্স তাঁর প্রিয়। ইয়েটসের পরবর্তী কবিরা তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারেননি। সম-সাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর ভাল লাগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদারের মতে প্রেমেন্দ্র মিত্র একালের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক। ছোটগল্পে, কবিতায় তাঁর সমান কৃতিত্ব। এছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন চক্রবর্তীর লেখা ভাল লাগে। বললেন, বাংলায় ভাল নাটক কেন যে লেখা হচ্ছে না, বোঝা মুস্কিল। কারণ ছোটগল্পে বাঙালী অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আর ছোটগল্প ও নাটকের মধ্যে প্রচুর মিল। মেয়েদের সাহিত্যসৃষ্টির কথা উঠলো। বললেন, "একটা সময় ছিল মেয়ের নাম দেখলে লেখা ছাপিয়ে দেওয়া হত। যোগ্যতার বিচার করা হত না। মনোভাবটা ছিল—খেলায় অংশ নিচ্ছে এটাই বড় কথা, খেলতে পারে কিনা দেখবার দরকার নেই। আজ সে অনুগ্রহের দিন তো চলে গেছেই উপরন্তু আমার মতে মেয়েদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না। তার প্রমাণ হল বাণী রায় যে একজন ভাল কবি তা কজন জানে? সুখলতা রাওয়ের ছড়া ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ কতটা সমাদৃত হয়েছে? জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর "তাক ডুমা ডুমের" নাম কজন শুনেছে? লীলা মজুমদার নিজে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের লেখার অনুরাগিণী।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার নিজের লেখা সম্পর্কে বলুন। আপনি তো মূলতঃ শিশুসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আপনার কি মত?" বললেন, শিশুসাহিত্য লিখব বলে বসে শিশুসাহিত্য লেখা হয় না এবং শিশুদের ভাল লাগলেই তাকে ভাল শিশুসাহিত্য বলা যায় না। ভাল লাগা আর ভাল হওয়ায় পার্থক্য আছে। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা শিশুদের বিচারবোধ নেই। ভাল শিশুসাহিত্য বড়দেরও ভাল লাগবে তবে সংবেদনশীল মন থাকা চাই। অনেকের ধারণা যা খুশী তাই লিখে দিলেই আজগুবি হল। কিন্তু আজগুবির পেছনে অনেক চিন্তা থাকা চাই,—অনেক পরিশ্রম। আজগুবি আজগুবি হবে না। সুকুমার রায় আজগুবির রাজা। তাঁর রচনায় উদ্ভট অপ্রত্যাশিত শব্দের ব্যবহার মিলবে কিন্তু তারা অর্থহীন নয়। যে কথা যেখানে ব্যবহার হয় না গুণী তাই লিখে অর্থ বের করেন।"

বললেন, "লেখা হল জাপানী বাগান। তাতে একটি বাড়তি কথা থাকবে না। সংযম ছাড়া সাহিত্য হয় না। আমি সাহিত্যিক সত্যে বিশ্বাসী। যা কুৎসিত

রাখী ঘোষ

চিন্তার জন্ম দেয়, মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় তাকে আমি সাহিত্য বলি না। অশ্লীলতা আমি পছন্দ করি না। সভ্য সমাজে পোষাক পরাটাই নিয়ম।"

লীলা মজুমদার তাগাদায় লিখে সন্তুষ্ট হননি। উপযাচক হয়ে কোথাও লেখা পাঠান নি। তাঁর লেখারও বিশেষ সময় নেই। লেখা মনের মধ্যে জমা হয়ে থাকে তারপর তিনি একদিন লিখতে আরম্ভ করেন। পুরো গল্পটাই অনেক সময় আমার মনের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে। শুধু লিখে ফেলার অপেক্ষা। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি অপেক্ষা করেন যাতে গল্পটা মনের মধ্যে থিতোবার সময় পায়—তার বাড়তি অনাবশ্যক সবকিছু ঝরে যায়। তাঁর মতে শিশুসাহিত্যে ভালো বই হাতে গোনা যায়। এরই মধ্যে সুনীল সরকারের "কালোর বই" এক ব্যতিক্রম।

কোন বিশেষ সাহিত্যকর্মে হাত দেবার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, "ছোটদের উপেন্দ্রকিশোর" বেরিয়েছে। ইচ্ছে আছে সুকুমার রায়ের জীবনী ও সাহিত্য সমালোচনা লিখে যাবার। অতবড় প্রতিভা অকালে শেষ হয়ে গেল। তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে রেখে যাওয়া উত্তরসূরীদের প্রতি আমার কর্তব্য। এবছর শরৎচন্দ্র বক্তৃতা দেবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডেকেছেন। সুকুমার রায়ের ওপরেই বক্তৃতা দেব ঠিক করেছি।"

দুপুর গড়িয়ে চলেছিল। নমস্কার জানিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে পা বাড়ালাম।

•

২১-৭-৬৭ তারিখের সংখ্যায় **শ্রীমতী প্রতিভা বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।**

আচারের রকমফের

আনারসের আচার—বড় সুপক্ক একটি আনারস, আটশো গ্রাম চিনি।

আনারসটিকে ভাল করে খোলা ছাড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর দু আধখানা কোরে ধুয়ে নিন। এইবার বঁটিটিকে বেশ ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। খোলা ছাড়ানো আনারসটিকে লম্বালম্বিভাবে কেটে নিন। মোট চার ফালা হবে। তারপর একটু মোটা আকারে চাকা চাকা কোরে কেটে যদি চোখ থাকে তাহলে সেগুলিকে বাদ দিন। এরপর ঐ চাকাগুলিকে বেশী সরুও নয় বেশী মোটাও নয় অর্থাৎ মাঝারি সাইজ মত লম্বা লম্বা টুকরো করতে হবে। কলাই করা বাসনে অথবা কাঁচের পাত্রে টুকরোগুলিকে রাখবেন। এমনভাবে কাটুন যাতে একটুও চোখ না লেগে থাকে। ভিতরের বিচিগুলি যথাসম্ভব বেছে ফেলে দেবার চেষ্টা কোরবেন। এইবার অ্যানামেলের পাত্রে চিনি দিন। বড় চা-কাপের তিন কাপ জল দিন। চিনি গলে এলে এইবার আনারসগুলিকে পাত্রের মধ্যে দিয়ে ঢাকা দিন। কলাই অথবা অ্যানামেলের থালা যেন হয়। দশ-পনেরো মিনিট ফোটবার পর পাত্রের মুখের চাপাটি খুলে দিন এবং কলাই-এর চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। আচারটি তৈরীর সময় যাতে তলা ধরে না যায় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তারপর আনারস গলে এলে, রসটি গাঢ় হয়ে এলে নামিয়ে রাখুন। আনারসের টুকরোগুলি আস্ত থাকবে অথচ বেশ গলে নরম হবে এইভাবে পাক করা দরকার। রসটি গাঢ় হয়ে বেশ চটচটে মত হবে। ঠাণ্ডা হলে কাঁচের বোয়ামে তুলে রাখুন। আনারসের আচারে কোন মসলা বা গন্ধদ্রব্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আনারসের নিজস্ব সুগন্ধই অতি চমৎকার। আচারটি তৈরি করার সময় উনানের নরম আঁচে করলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে একটু রৌদ্রে দিলে আচারটি ভাল থাকবে। একটি দরকারী কথা হল আচার তৈরীর পাত্রটিতে মাছ, মাংস, পিঁয়াজ না করাই ভাল। আলাদা আচার তৈরীর পাত্র থাকা দরকার। নইলে যে কোন আচার তৈরী করার সময় পিঁয়াজ এবং মাছ-মাংসের গন্ধ এসে যায়।

করমচার টক আচার—ভাল দেখে লাল-সাদা মেশানো বেশ টাটকা পুরুষ্টু আড়াইশো আন্দাজ করমচা আনিয়ে লম্বাদিকে দু টুকরো কোরে কুটে রাখুন। তারপর মাথার কাঁটা অথবা সরু কিছু কাঁটা দিয়ে ভিতরের বিচিগুলি আস্তে আস্তে বার কোরে জলে ধুয়ে নিতে হবে। কলাই অথবা অ্যানামেলের পাত্রে সামান্য জলে করমচাগুলিকে ভাপিয়ে নিন। অর্থাৎ সামান্য একটু সিদ্ধ করে নিন। খুব বেশী সিদ্ধ যেন না হয়। নরম হবার আগেই পাত্রটিকে উনান থেকে নামিয়ে করমচাগুলিকে জল থেকে তুলে নিতে হবে। এইবার একটি কলাই-এর পাত্রে করমচাগুলিকে রেখে পরিমাণ মত নুন দিয়ে তিন-চারদিন রোদে দিন। রোদে দেবার পর সামান্য সরিষার তেল, খুব সামান্য একটু হলুদ, করমচার পরিমাণ অনুযায়ী চার-পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা কুচি ও পাঁচফোড়ন দিয়ে মেখে কিছু সময় রোদে দিন। পর পর দিন কয়েক রোদ খাওয়াতে থাকুন। তবে খুব বেশীক্ষণ রোদে না দেওয়া ভাল। বেশীক্ষণ রোদ দিতে থাকলে করমচাগুলি সিটে মেড়ে যাবে। এইভাবে চার-পাঁচদিন রোদে দেওয়া হলে তারপর বোয়ামে ভরে রাখুন। তেল এমনভাবে দেওয়া হবে যেন

তেলে বেশ মাখামাখা হয়। ফুটন্ত তেলে দেবার দরকার নেই। বেশ কিছুদিন আচারটিকে রাখার পর খেলে ভাল হয়। তাহলে বেশ মজে উঠবে।

করমচার মিষ্টি আচার—আড়াইশো করমচা, আড়াইশো চিনি, গোটা চারেক কাঁচা লঙ্কা, সামান্য জিরে ভাজার গুঁড়ো। করমচাগুলিকে লম্বালম্বিভাবে কেটে নিয়ে ভিতরের বিচিগুলি কাঁটা দিয়ে বার করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর অ্যানামেলের পাত্রে জল ফুটতে দিন। জল এমনভাবে দেওয়া হবে যাতে করমচাগুলি ডুবতে পারে। ঐ ফুটন্ত জলে করমচাগুলি দিয়ে এক ফুট দিয়ে নামিয়ে জল থেকে তুলে নিন। এইবার ঐ পাত্রের জল ফেলে দিয়ে আড়াইশো আন্দাজ চিনি দিয়ে এক কাপমত জল দিয়ে ফুটতে দিন। ফোটার মুখে করমচাগুলি ছেড়ে দিন। আগে একটু ফুটিয়ে নেওয়ার কারণ হল যে, করমচার মধ্যে একটু কষাভাব থাকে। সেইজন্যে আগে একবার ফুটিয়ে জলটিকে ফেলে দিতে হয়। এইবার ঐ ফুটন্ত রসের মধ্যে যে রসটিতে করমচাগুলি ফুটছে তাতে চারটে কাঁচা লঙ্কা চিরে বিচিগুলি বাদ দিয়ে দিন। মাঝে মাঝে কলাই এর চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে নাড়া দরকার। বেশ কিছুক্ষণ ফুটে যাবার পর দেখা যাবে রসটি ঘন হয়ে চটচটে হয়ে আসছে। এইবার নামিয়ে নিন। ইচ্ছা হলে পঞ্চাশ গ্রাম আন্দাজ কিসমিসও করমচাগুলি ফোটার সময় দিতে পারেন। ঠাণ্ডা হলে সামান্য জিরে ভেজে বেশ মিহি করে গুঁড়িয়ে ঐ আচারটিতে মিশিয়ে নেড়েচেড়ে দিন। চার-পাঁচদিন পরে খেতে দিন। সঙ্গে সঙ্গে কোরেও খাওয়া যায়। তবে কিছুদিন রেখে খেলে আচারটি মজে উঠে, স্বাদ আরও বেড়ে যায়।

—হেমপ্রভা মল্লিক

নৃত্যকলা

দেশ এবং কালভেদে সঙ্গীত-নৃত্যের কদর। যুগ বদলেছে, দিন পালটেছে কিন্তু মানুষের সঙ্গীত-নৃত্য স্পৃহা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কত না বিস্ময়কর পরিবর্তন। তা বলে কোন যুগেই যে মানুষ রুচির পরিচয়ে দীন নয়, একথা মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে বারে বারে। সুর মানুষের চিত্তকে স্পর্শ করে আর নৃত্য ভাবরসে আপ্লুত। সঙ্গীতে যার প্রকাশ নৃত্যে তারই বিকাশ। তাই এরা অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে—একে অপরের অবিচ্ছেদ্য সহচররূপে। কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে এর মাধ্যমে মানুষ নিজের পরিচয় অঙ্কিত করেছে কালের কপোলতলে। মানুষ মুছে গেছে কিন্তু বেঁচে রয়েছে সেই যুগ—সে যুগের শিল্পকলায়। সঙ্গীত-নৃত্য এমনি শিল্প যা মানুষকে টানে রসের প্রাণোচ্ছল প্রবাহে চিত্তকে উদ্ভাসিত করে। নীরসপ্রাণে রসের সঞ্চারে অমরাবতীর সৃষ্টি করে। পার্থিব কোলাহল আর বিদ্বেষের হলাহল তাকে স্পর্শও করতে পারে না। যুগ পেরিয়ে তাই সে কালজয়ী।

কলাশিল্পের এই শাখায় ভারতবর্ষ বিশাল ঐতিহ্য বহন করে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। সঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিলেও নৃত্যে ভারতবর্ষের কুশলতা বিশ্বে পরম শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। এই নৃত্যকলা কোন সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে তার কোন সঠিক হদিশ সম্ভব নয়। মুদ্রা এবং ভঙ্গিমার লালিত্যে এই নৃত্যকলা সকলের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন ঘরানার নৃত্যকলায় ভারতীয় নৃত্য সমৃদ্ধ। এর সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় নৃত্যকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কত্থক, মণিপুরী, ভারত-নাট্যম নৃত্য আজো বৈশিষ্ট্য এবং চিত্ত-চমৎকারিত্বে মনোরম। দেশ-বিদেশের লোক শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমে এই নৃত্যকলার আন্তর সম্পদের স্বীকৃতি জানায়। এছাড়া লৌকিক নৃত্যকলা তো আছে। তারাও বিভিন্ন প্রকরণে ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধশালী। মোট কথা ভারতীয় নৃত্যের যে কোন প্রকরণই উৎকর্ষে বেশ গরবিনী।

বিশ্বের কোন নৃত্যকলাই আজ অবিকৃত রূপে বেঁচে আছে বলা যায় না। বিভিন্ন কলার সঙ্গে অপরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যার যেমন সুযোগ এবং সুবিধা হয়েছে সে তেমনি নিজেকে অপরের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে। নৃত্যে দেহভঙ্গিমার সুনিপুণতা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই কথা স্মরণ রেখেই বলা যায় যে, পশ্চিমী নৃত্যগুলিকে এজন্য যুগের সঙ্গে বিশেষভাবে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। বলডান্সে শিল্পী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নতুন ভাবধারাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আবেগপূর্ণ সব কিছুর সঙ্গে এক্ষেত্রে শিল্পীকে সঙ্গতি রেখে চলতে হয়। বলরুম ডান্সিং-এর চারটি প্রকরণ। এরা হলো: স্টাণ্ডার্ড, লাতিন আমেরিকান, ফোক এবং বীট। এরা প্রকরণে বিভিন্ন হলেও একে অপরকে প্রভাবিত করে থাকে। বলরুম ডান্সিং-এর মধ্যে সারা পশ্চিমে আজ ফোক ডান্স বা লোকনৃত্যের উপর বেশি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। লোক-নৃত্যে যে জিনিষটা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় তা হলো একই প্রকরণে নিত্য নতুন ভাববিলাস। বীট সঙ্গীতের ধারায় লাতিন-আমেরিকান নৃত্য আজ বিশেষভাবে প্রভাবিত। এর সংমিশ্রণে আজ সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ্যে পরিচিত লোকনৃত্য বীট ওয়ালটজ এবং চা-চা-চা। পশ্চিমে আগত আফ্রিকান নৃত্য শনি জার্ক আজকাল বীট পোষাকে পরিবেশন করা হচ্ছে। এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য যে, এতে দেহের প্রতিটি অঙ্গ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘোরা-ফেরা করে। দেহের উর্ধাংশ আবার নিজস্ব প্রক্রিয়া মেনে চলে। দেশে দেশে আজকাল লোকসঙ্গীতের যে বহুল চর্চা দেখা যাচ্ছে এ কয়টি পশ্চিমী লোকসঙ্গীত লেক্ষেত্রে আমাদের আলোক-দানে সক্ষম হবে। লোকসঙ্গীতে ব্যাপক মিশ্রণও এ থেকে সহজেই বোধগম্য হবে—যার ফলে কিনা পুরনো নৃত্যের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে এবং নতুন নৃত্যকলার জন্ম হচ্ছে। নৃত্য শুধু সুকুমার শিল্প নয়—নৃত্যে দৈহিক দক্ষতা এবং যোগ্যতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পশ্চিমীরা এ বিষয়ে বেশ সচেতন। দৈহিক দক্ষতার বিকাশে নিজেকে পুষ্ট করার জন্যও আজকাল নৃত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তবে দৈহিক যোগ্যতার সঙ্গে শিল্পের রসবোধ যুক্ত হলেই শিল্পীর জন্ম হয় এবং সেজন্যই শিল্পী বিশেষ অনন্য।

শংকর পুরস্কার

১৯৬৫ সালের 'শংকর উইকলী' আন্তর্জাতিক শিশু চারুকলা ও সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুরা সম্প্রতি ইণ্ডিয়া হাউসে এসে পুরস্কার গ্রহণ করে।

ভারতের অস্থায়ী হাই-কমিশনার-এর পত্নী শ্রীমতী ডি এন চট্টোপাধ্যায় চার থেকে পনের বছরের শিশুদের মধ্যে এই পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন।

মার্গারেট ডরোথি ভ্যান-হরিক নামক বাকিংহামশায়ারের ওনলে স্কুলের ছাত্রী এই নিয়ে পর পর চার বছর পুরস্কার পেল। সে বলে, 'আমি দুটো কবিতা পাঠাই, দুটোই আমি এগার বছর বয়সে লিখে-ছিলাম। আমি কবিতা লিখতে ভালবাসি এবং এই ধরনের প্রতিযোগিতা সত্যিই এক অপূর্ব ব্যাপার। আমি শেষ যে পুরস্কার লাভ করি তা ছিল রৌপ্য-নির্মিত। আমি সেটি চিরকাল সঙ্গে সঙ্গে রাখব।'

দুজন ব্রিটিশ প্রতিযোগী, চার বছরের সুজান মণ্ডী ও এগার বছরের ক্রিশ্চিন মামফোর্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করে। শ্রীনেহরু 'শংকর প্রতিযোগিতায়' বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে এগারজন, ১৯৬৪ সালে এগারজন ও ১৯৬৩ সালে উনিশজন ব্রিটিশ শিশু পুরস্কার লাভ করে।

১৯৪৯ সালে এই প্রযোগিতার সূচনা থেকে ব্রিটেনের উইমেনস ভোলানটারি সার্ভিস (ডবলিউ-ভি-এস) এর ব্যবস্থা করে আসছেন।

ডবলিউ-ভি-এস-এ জনৈক মুখপাত্র ইণ্ডিয়া হাউসে বলেন, ইতিমধ্যেই এবছরের প্রতিযোগিতার ৫,০০০ আবেদনপত্র ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর স্কুল-গুলিতে পাঠানো হয়েছে।

ভারতীয় শিশুদের আঁকা ছবি ইণ্ডিয়া হাউসে ব্রিটিশ শিশুদের দেখানো হয়। পরে তারা ভারতীয় বন্য প্রাণী বিষয়ে তোলা একটি চলচ্চিত্রও দেখে।

শুভঙ্কর

সুমেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীর সর্ব-উত্তর ও সর্বদক্ষিণ প্রান্তে আছে দুটি রহস্যময় তুষাররাজ্য, যার অনুপম বর্ণনা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারী ব্রত, হিমবস্ত্র পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন।'

পৃথিবীর সর্বউত্তর ও সর্বদক্ষিণ প্রান্তে এই দুটি রহস্যময় রাজ্য ভূবিজ্ঞানের ভাষায় উত্তর মেরু বা 'সুমেরু' এবং দক্ষিণ মেরু বা 'কুমেরু' নামে অভিহিত। বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ আজ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের এই দুটি মেরু অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমিত। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেরু অঞ্চলে গমনাগমনের দুর্গমতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বিশেষত উন্নত ধরনের বিমান ও বরফ ভাঙার আধুনিক যন্ত্রপাতি আজকাল মেরু অভিযানকে আগের তুলনায় অনেকখানি সুগম ও সহজসাধ্য করে তুলেছে। তার ফলে মেরু অঞ্চলের অনেক অজ্ঞাত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

এক সময় সুমেরু ছিল পৃথিবীর সুদূরতম অতিদুর্গম স্থান। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। সুমেরুবৃত্তকে এখন কর্মচঞ্চল ও জনবহুল স্থান বললেও বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তর মেরু থেকে মাত্র ৯০০ মাইল দূরে 'থুলে' (*Thule*) শহরে প্রায় ৮ হাজার (শীতকালে ৪ হাজার) মার্কিন বাস করে। আরও সুদূর উত্তর অঞ্চলে স্থায়ী বাস আছে। শত শত লোক সুমেরুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছে। ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্যই মানুষ ঘন ঘন উত্তর মেরুকে অতিক্রম করেছে আর এই কারণেই পর্যটকদের কাছে 'থুলে' হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। সামরিক কারণেও সুমেরুবৃত্তের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের স্বল্পতম পথ হচ্ছে সুমেরুবৃত্ত। পরমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা যদি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে ভবিষ্যতে হয়তো পৃথিবীর আকাশযানের যোগাযোগ পথ হয়ে সুমেরুবৃত্ত অধিকতর কর্মব্যস্ত ও জনবহুল হয়ে উঠবে। তখন পৃথিবীর এক প্রান্তের যাত্রী অন্য প্রান্তে যাবার সময় হয়তো সুমেরু অঞ্চলে নবগঠিত কোনো এক সুন্দর শহরের মনোরম এক হোটেলে বিশ্রাম গ্রহণ করতে করতে চারদিকের নয়নাভিমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অনাগত দিনের কাব্য রচনার নতুন প্রেরণা পাবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুমেরু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। অনেকের অনুমান সুমেরুবৃত্ত একটি মহাসাগর, অথচ এর আয়তন আতলান্তিক মহাসাগরের ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে সুমেরু হচ্ছে স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা একটি মহাসাগর। এরই উপকূলে রয়েছে আধুনিক পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের বসবাস।

সুমেরু মহাসাগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে নানা গবেষণা চালাচ্ছেন। এই বিষয়ের গবেষকরা অনেক সময় তাঁদের পূর্বসূরীদের, বিশেষত সুদূর অতীতের গবেষকদের, আবিষ্কৃত তথ্যাদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন না। প্রাচীনকালে ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞানীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, ধরাপৃষ্ঠে প্রাণের সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে মেরু অঞ্চলে। এই অভিমত ব্যক্ত করার পক্ষে তাঁদের কাছে কি তথ্যাদি ছিল তা আধুনিককালের গবেষকরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেন না। তবে একটা সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হয়েছেন, একসময় মেরু অঞ্চলে মানুষের বসবাসের উপযোগী আবহাওয়া ও পরিবেশ ছিল।

সুমেরুর সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতে একটা জিনিস বিশেষভাবে রেখাপাত করে, উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে শৃঙ্খলের মতো ছড়ানো অসংখ্য হ্রদের প্রতিসম বিন্যাস। এই হ্রদগুলিকে মূলত প্রাচীনকালের নদীগর্ভের সঙ্গে মিলে যেতে দেখা যায়। সুমেরু অঞ্চলের বহু অভিযাত্রী বহু পূর্বেই এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার উভয় মহাদেশে সুমেরু সাগরের সমগ্র উপকূলে অগণিত বড় বড় নদীগর্ভের নিদর্শন পেয়েছিলেন। তবে সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ান ওব্রুচেভ-ই প্রথম

সুমেরুবৃত্তে জনৈক আবহবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করছেন

সুমেরুর একটি গবেষণাকেন্দ্র

নদীগুলির 'বিপরীত' স্রোত আবিষ্কার করেন। প্রাচীনকালের নদীগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল, কিন্তু বর্তমান-কালের ওব, ইয়েনিসি, লেনা ও অন্যান্য নদীগুলি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত। এ থেকে প্রশ্ন জাগে— সুমেরুবৃত্তের কি বিবর্তন ঘটেছে, প্রাচীন নদীগুলি কেন দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল আর আজই বা কেন বিপরীত দিকে প্রবাহিত?

সুমেরু সাগরের উৎপত্তি সম্পর্কে সংগৃহীত বিবিধ তথ্য পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। জ্বলন্ত পিন্ডরূপে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ধরাপৃষ্ঠ যখন ক্রমান্বয়ে শীতল হয়ে থাকে তখন মেরু অঞ্চলে শৈত্যক্রিয়া সর্বাধিক সাধিত হয় এবং তার ফলে মেরু অঞ্চলেই প্রথম স্থলভাগ দেখা যায়। পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের আদিকালে সুমেরু সাগর বলে কিছু ছিল না এবং উত্তর মেরু মহাদেশ সম্ভবত সমগ্র ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকা নিয়ে গঠিত ছিল। জাপান দ্বীপপুঞ্জও এই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল, এ ধারণা বাতিল করা যায় না। গ্রীণল্যান্ড তখন এই মহাদেশেরই অংশবিশেষ ছিল এবং বর্তমান সুমেরু সাগর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ বৃহৎ পর্বতমালার অন্যতম শিখররূপে বিরাজ করত।

সেই সুদূর অতীতে সেই সকল পর্বত-মালা (যা বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে) থেকে প্রবাহিত জলরাশি সুমেরু অঞ্চলের প্রাচীন নদীগুলি সৃষ্টি করেছিল। ভূতত্ত্ব থেকে আমরা জানি, উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী ভেঙে গিয়ে কালক্রমে সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। তা হলে একসময় যখন আজকের তুষারাবৃত গ্রীনল্যান্ড সত্যসত্যই শ্যামল ভূমি ছিল, তখন সেখানে পৃথিবীতে প্রাণধারণের উপযোগী সমস্ত অনুকূল পরিবেশই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারপর লক্ষ লক্ষ বছর অতীত হয়ে গেছে এবং ধরাপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশ কমে এসেছে। মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা শীতল হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয় যে জলীয় বাষ্পরাশি বৃষ্টি-রূপে ধরাপৃষ্ঠে নেমে আসার পরিবর্তে তুষারে পরিণত হয়। বিরাট তুষাররাশি পরবর্তীকালে ৩-৫ কিলোমিটার ঘন হিমবাহ সৃষ্টি করে। হিমবাহের চাপে সুমেরু মহাদেশের মধ্যাঞ্চল নিম্নভাগে ক্রমশ দোমড়াতে থাকে। এর ফলে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং নদীসমূহের দক্ষিণ-গামিতা রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা এত ব্যাপকভাবে ঘটেছিল যে তার জের সুমেরু মহাদেশের মধ্যাঞ্চল ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই সময়ে মেরু অঞ্চলে উত্তরগামী নদীসমূহের উদ্ভব হয় এবং উষ্ণ জলস্রোত সুমেরুর মধ্যভাগে হিমায়িত অঞ্চলকে উষ্ণ করার জন্যে প্রবাহিত হতে থাকে।

দোমড়ানো মহাদেশের গহ্বরে তুষার গলতে আরম্ভ করে এবং ব্যাপকভাবে গলতে থাকে। দ্রবীভূত তুষারের জল সুমেরু মহাদেশের মেরু-গহ্বর প্রথম প্লাবিত করে, তারপর বারবার অবনমিত স্থান ভাসিয়ে দিয়ে ক্যাসপিয়ান সাগর সৃষ্টি করে। এটাই একমাত্র বিবর্তন নয়। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবর্তন (সম্ভবত সেগুলি আরও বিরাট) ঘটেছিল গ্রীনল্যান্ডের পর্বতমালায় এবং বর্তমানের আরখানগেলসক শহরের অবস্থিত স্থলে। তুষার-গলিত এই বিরাট জলরাশি তৎকালীন সুমেরু মহাদেশের রূপান্তর ঘটিয়ে বর্তমান অবস্থায় এনে দেয়। সম্ভবত এই যুগের স্মৃতিই মানুষের মনে বিশ্বপ্লাবনের ধারণা এবং বিচিত্রভাবে বিলুপ্ত অ্যাটলান্টিশ মহাদেশের কিম্বদন্তী সৃষ্টি করেছে।

আমাদের সাধারণ ধারণা, সুমেরুবৃত্ত চিরতুষারাবৃত দেশ। ওখানে যে প্রচুর তুষার আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমুদ্রের নিকটে উচ্চ পর্বতময় স্থান ছাড়া গ্রীষ্মকালে সমগ্র সুমেরু উপকূলই তুষার-বিহীন থাকে। এমনকি, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি মেরুপ্রান্তেও কদাচিৎ তুষারপাত হয়। সেখানেও বৃষ্টিপাত হয় মাঝে-মধ্যে। গ্রীন-ল্যান্ডের পশ্চিম কূলে সবুজ মখমলের মতো কোমল মনোমুগ্ধকর অনেক বিস্তীর্ণ জমি দেখা যায়।

সুমেরুবৃত্তের কোনোখানেই গাছের চিহ্ন নেই বললেও চলে। কিন্তু জুলাই ও আগস্ট মাসে সতেজ গুল্ম ও পুষ্পে সমস্ত স্থানটি সুশোভিত হয়ে উঠে। বন্য-গুল্ম ও পুষ্পে ভরা এই ভূখন্ডগুলির অপরূপ লাবণ্যসৌন্দর্য পিয়াসীর মনে এনে দেয় এক অবর্ণনীয় অনুভূতি। আর

সুমেরুবৃত্ত প্রাণীহীনও নয়। সেখানে অক, সারস, হাঁস, গাইলিমট, কমন্দোরন ইত্যাদি পাখি দেখা যায়। সুমেরুবৃত্তের অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আছে সিন্ধুঘোটক, সীল, সাদা ভালুক, বল্গা হরিণ, মেরুশেয়াল ও সাদা পেঁচা। সুমেরু অঞ্চলে যত বেশি সিন্ধুঘোটক পাওয়া যায় পৃথিবীর আর কোথাও তত পাওয়া যায় না।

সুমেরুর আবহাওয়া আমরা সাধারণত যতটা প্রতিকূল মনে করি আসলে ঠিক তা নয়। গ্রীষ্মকালে অনেক সময় খালি গায়ে রোদ পোহানো যায়। শীতকালের গড়পড়তা তাপমাত্রা থাকে শূন্য ডিগ্রীর ২৪ ডিগ্রী নিচে। এখানে চার মাসের ওপর একটানা দিন এবং প্রায় চার মাস একটানা রাত্রি। কিন্তু শীতের চন্দ্রহীন রাত্রে কখনও ঘন অন্ধকার হয় না। তুষারে প্রতিফলিত নক্ষত্রের আলোতে অনেক জিনিস প্রায় স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। এছাড়া আছে 'অরোরা বোরেলিস' বা সুমেরুপ্রভা।

সুমেরুর আবহাওয়া সাধারণত বেশ পরিষ্কার থাকে। প্রায় ১০০ মাইল দূর থেকে দেখা যায় সমুদ্রগর্ভ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম উপকূলের বৃহৎ তুষারশৃঙ্গ। চতুর্দিকে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু হিমশৈলের মধ্যে জাহাজকে দেখে মনে হয় যেন একটা ছোট্ট খেলার জিনিস। যেদিকেই দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় সেদিকেই দেখা যায় রজত-শুভ্র ছোট-বড়ো মাঝারি নানা আকারের তুষারস্তূপ। গ্রীনল্যান্ডের হিমশৈল জগতের সকল বিস্ময়কর দ্রষ্টব্যের মধ্যে অন্যতম বললেও বোধহয় অতিরঞ্জন হয় না। আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনে হিমশৈল কোনরকমে যদি দ্রবীভূত হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জল প্রায় ২৪ ফিট উঁচু হয়ে যাবে। আর সেই অসীম জলরাশির মধ্যে পৃথিবীর অনেক বড় বড় বন্দর তলিয়ে যাবে। একারণে সুমেরু অঞ্চলের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের অশেষ গুরুত্ব আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। মার্কিন ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সুমেরুবৃত্তে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানকার ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং আবহাওয়া সম্পর্কে নানা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তত্ত্বগতভাবে বলা যায়, মেরুপ্রদেশ ও বিষুবরেখার ওপর দিয়ে বিমান চলাচল সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ এখানে পরিষ্কার আকাশ ও কুয়াশা-বিহীন আবহাওয়া নির্বিঘ্নে বিমান চলাচলের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। কোনো কারণে মাঝপথে যদি বিমান অবতরণের প্রয়োজন হয় তা হলে আটলান্টিকের অসীম জলরাশির মধ্যে নামার চেয়ে বরফের স্তূপের ওপর নামা অনেক নিরাপদ। বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো দেখতে পাব সুমেরু অঞ্চল মানুষের পূর্ণ আয়ত্তে এসেছে।

(প্রশ্ন)

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাণী রাসমণি—এঁদের পরিচয় জানতে পারলে সুখী হবো।

সুদীপ্তা রায়
কলকাতা-৩।

●

বাংলাদেশে সব থেকে বেশী দিন রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হয়েছে কার নাটক? কতদিন এবং কোন মঞ্চে?

জয়দেব সেন
কুড়াঁমঠা, বাঁকুড়া।

●

সংস্কৃত স্কুল, হিন্দু স্কুল এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের আগে অন্য কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় ছিল?

সুশান্ত হালদার
গড়পার রোড
কলকাতা।

●

(উত্তর)

গত ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় অমৃতাশলী ও শ্যামমোহন ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে, ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সুশান্ত, দুরাভীন সুজিত বসু (জলপাইগুড়ি) যা লিখেছেন, সে সম্পর্কে কিছু জানাতে চাই। চাঁদু বোরদেকে একক ও অবিসম্বাদিতভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটস-ম্যান বলা যেতে পারে কিনা, সে বিষয়ে একটু বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। অধিনায়ক মনসুর আলী খান বর্তমান ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টেস্টে ব্যাটিং অ্যাভারেজে (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত ২য় টেস্টের পরে) শীর্ষস্থানের অধিকারী (৪১-২)। আরও তিনি, গত ১৯৬৬-র ভারত বনাম ওঃ ইণ্ডিজ-এর সিরিজটি বাদে, যে সিরিজেই সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন, প্রত্যেকটিতেই কমপক্ষে একটি করে সেঞ্চুরী উপহার দিয়েছেন, টেস্টে সেঞ্চুরীর সংখ্যা বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁরই সর্বাধিক (২৪টি টেস্টে ৬টি), সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসাবে মাত্র পলি উমরিগড় (১২টি) এবং বিজয় মঞ্জরেকার (৫৫টি টেস্টে ৭টি) তাঁর চেয়ে টেস্টে বেশী সেঞ্চুরী করেছেন। মনসুর আলী খান-এর টেস্ট ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ২০৩ নটআউট, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে। এটিও বর্তমান ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে টেস্টে সর্বোঃ ব্যক্তিগত রান সংখ্যা। সুতরাং বলতে গেলে, মনসুর আলী খান ও চাঁদু বোরদেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদ্বয় বলা উচিত। ধন্যবাদ জানবেন।

কমল চট্টোপাধ্যায়

●

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা অমৃতে 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীবিমলকান্তি সেন আমার উত্তরে বিস্তর ভুল দেখিয়েছেন। ভ্যাটিকান সিটির আয়তন অর্থাৎ পোপ পল-এর প্রাসাদ ও শহরটির আয়তন ২২ বর্গমাইল শহরতলী বাদে। লেনিনগ্রাদের ন্যাশনেল লাইব্রেরীই বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরী (পৃষ্ঠানং—১৪৬, বুক অব নলেজ—সুকুমার রায়, পৃঃ নং ৩০, সাধারণ জ্ঞান, হরিনারায়ণ মজুমদার) শ্রীসেন লিখেছেন 'বোস-ফেমি' সংখ্যায়ন তত্ত্ব বলে তিনি কিছু জানেন না। শ্রীসেন কি প্রখ্যাত ইটালীয়ান বিজ্ঞানী এনরিকো ফেমির কথা ভুলে গেলেন? (যিনি বিজ্ঞানী ওপেন-হাইমারের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অ্যাটম বোমা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। কিছুদিন আগে 'অমৃতে' দুঃখজনক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।) মিঃ ফেমি আলোকবিজ্ঞানে কলয়েড দ্রবণে প্রতিফলন নিয়ে গবেষণাকালে 'ফেমিয়ন' নাম এক ধরনের আলোককণিকা আবিষ্কার করেন তার নামে 'ফেমিয়ন' কণিকা রাখা হয়েছে। মিঃ বোস আবিষ্কার করেন অনুরূপভাবে অন্য এক ধরনের কণিকা যার নাম দেওয়া হয় 'বোসন'—এই দুটি মতবাদকে একত্রে বলা হয় 'বোস-ফেমি' সংখ্যায়ন তত্ত্ব।

A Theoritical Physics by Prof. A. Kamiyanov (U.S.S.R.)

ঐ তত্ত্বের সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে '৬৪-র সমীকরণ' ও বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব।

'বিচ্ছিন্ন' আর 'ভাঙা' কি একই নয়? সাইক্লোট্রন হচ্ছে U-235 এ N-222 atom গোলা সজোরে ছুড়ে U-235 বিচ্ছিন্ন করবার যন্ত্র। 'স্পেকট্রোমিটার' হচ্ছে আলোক-রশ্মি সনাক্ত করবার যন্ত্র অর্থাৎ, The Spectrometer is used to determine the refractive index of a material of a prism and also to produce and study spectra from different sources. Its main arms to catch the rays of a spectrum and rays coming from Solar world.

যদি মিঃ সেন কোন নতুন মতবাদ এখানে দিতে পারেন তবে সুখী হবো। পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল র‍্যাফলেসিয়া আরনলডি (পৃঃ নং—২০৩ বুক অব নলেজ দেখুন)। ইংলণ্ডে নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম কয়লাখনিতে প্রথম ধর্মঘট হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা আমিও পড়ি। ১৭৪১ খৃঃ হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম আভাস। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও পৃঃ নং-৩৭ বুক অব নলেজ দ্রষ্টব্য)।

রাহুল বর্মণ,
৬, রামনগর রোড,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

(১০)

অদ্রীশ বর্ধন

ঘটনাটা ঘটে ওয়াটসনের বিয়ের কয়েক হপ্তা আগে।

ওয়াটসন নিজেও লিখেছেন—'এ ঘটনার রহস্যভেদের ব্যাপারে বন্ধুবর শার্লক হোমসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সেই কারণেই আমার মনে হয়, এই অদ্ভুত কাহিনীর খানিকটা ছবি জনসাধারণের সামনে তুলে না ধরলে তাঁর জীবনালেখ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাসে স্টক-মোরানে গিয়ে 'স্পেকলড ব্যান্ড' রহস্যর সমাধান করেন শার্লক হোমস। তারপর থেকে ১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের আর কোনো রেকর্ড রাখেননি ডক্টর ওয়াটসন।

তার কারণও ছিল। এই সময়ের অধিকাংশ কালই ডক্টর ওয়াটসন ছিলেন আমেরিকায়। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি রওনা হন সানফ্রান্সিসকো অভিমুখে এবং লন্ডনে ফিরে আসেন ১৮৮৬-র আগস্ট মাসে।

আমেরিকা যাওয়ার আগের দিনগুলো ওয়াটসনের চিরকাল মনে থাকবে। বেকার স্ট্রীটের ঘরে বন্ধু হোমসের সঙ্গে তিনি বসে রয়েছেন। এমন সময়ে একটা খাম এল তাঁর নামে। খামের ওপর সাতটা সাগরপারের ডাকটিকিট।

'খারাপ খবর-টবর নেই তো?' জিজ্ঞেস করেছেন শার্লক হোমস?

'আমার ভাইয়ের চিঠি। বেচারী কপর্দকহীন অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে সানফ্রান্সিসকোতে।'

তৎক্ষণাৎ নিজের ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন হোমস। তালা খুলে বার করেছেন নিজের ব্যাঙ্কবুক।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলেছেন—'কারবার আজকাল ভালই চলছে হে।' বলেই ব্যাঙ্কবুকটা ওয়াটসনের সামনে ফেলে দিয়েছেন—'তোমার যা দরকার পড়ে, এই থেকেই নিও। পুরোটাই তোমার।'

কারবার ভাল চলা সম্বন্ধে হোমস কিন্তু সেদিন একটুও বাড়িয়ে বলেননি। কেননা আর্নসওয়ার্থ দুর্গ-রহস্য, ডার্লিংটন কেলেংকারী, মার্গারেটের কেচ্ছা এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজার মামলার নিষ্পত্তি করায় সে সময়ে হোমসের শুধু নাম-যশই বাড়েনি, হাতেও দু পয়সা এসেছিল।

যাই হোক, ১৮৮৪ সালের বসন্তকালে ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল ওয়াটসনের ভাই। ওয়াটসন তখন ভাবতে বসলেন কি করে হোমসের ঋণ শোধ করা যায়। যা ধার করেছিলেন, তার প্রায় সবটাই গেছে ভাইয়ের চিকিৎসায়। যেটুকু ছিল, তাও নেহাত কম নয়।

ভাইয়ের সেবা করতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসন দেখেছিলেন, ডাক্তারী বিদ্যেটা তিনি এখনও ভুলে যাননি। রোগ সারানোর ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা নেহাত কম ছিল না। সুতরাং সানফ্রান্সিসকোতে যদি একবার পশার জমিয়ে তোলা যায়, তাহলে শীগগিরই ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে হোমসের দেনা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

কপাল ভাল ছিল ওয়াটসনের। হাতে সামান্য যা টাকা ছিল, তাই দিয়েই কেনা যায় এমনি একটা ডাক্তারখানার সন্ধান পাওয়া গেল অচিরেই।

কপাল ঠুকে তা কিনে ফেললেন ওয়াটসন। দিন-দিন ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল তাঁর পশার।

এবং রোগীদের প্রথম দলেই এলেন সাতাশ বছরের যুবতী মিস কন্সট্যান্স অ্যাডামস।

ডক্টর ওয়াটসনের বয়স তখন বত্রিশ।

কন্সট্যান্স অ্যাডামস ডানাকাটা পরী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর চেহারা আর কথাবার্তায় এমন একটা কিছু ছিল যা ভাল লাগল ডাক্তারের। কন্সট্যান্সের রূপের বর্ণনা দেওয়া মুস্কিল। কেননা, তেমন একটা আহামরি কিছু তো ছিল না। গোলাকার মুখাবয়ব, বড় হাঁ, বাদামী চুল, নীল চোখ তাতে আবার সবুজের আভা। মুখশ্রী বলতে এইটুকুই সম্বল ছিল কন্সট্যান্সের। কিন্তু তাঁর সদয় ব্যবহার, মিষ্টি স্বভাব, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা, ইত্যাদি মানবিক গুণ দেখেই আকৃষ্ট হলেন ডাক্তার।

বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন ওয়াটসন। এমনকি শার্লক হোমসের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখতে বসেও কলম ফসকে সে প্রশংসা বেরিয়ে গেছে। যেমন, 'দি ম্যান উইথ দি টুইস্টেড লিপ' কেসে আফিংখোর ইসা হুইটনির বউকে তো বলেই বসলেন—'শোকদুঃখে মানুষ কাতর হলেই চিরকালই ছুটে এসেছে আমার স্ত্রীর কাছে—ক্লান্ত পাখী যেমন নীড়ে ফিরে যায়, ঠিক তেমনিভাবে।'

যাই হোক, কন্সট্যান্স ছিলেন যাকে বলে একেবারে গৃহকর্মনিপুণা মেয়ে। সেলাইয়ের কাজ নিয়ে আগুনের ধারে বসে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ ঘটল, তখন তিনি বিষাদময়ী। শীগগিরই ওয়াটসনের চিকিৎসার গুণে তিরোহিত হল বিষাদ, এল হৃদয়ভরা ভালবাসা। ১৮৮৫ সালের এপ্রিলের শেষের তিনি বাগদত্তা হলেন ডক্টর ওয়াটসনের কাছে। যদিও তক্ষুনি বিয়ের কোন আশাই রইল না।

কেননা, ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছিলেন প্রিয়তম ওয়াটসন। সানফ্রান্সিসকোর প্র্যাকটিস বেচে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে হোমসের দেনা মিটিয়ে লণ্ডনে প্র্যাকটিস না জমানো পর্যন্ত বিয়েই করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি।

১৮৮৬ সালের গ্রীষ্মের শেষের দিকে ওকল্যাণ্ডের স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে ভাবী-বধূকে দুবাহুতে বুকে বেঁধে সেই শপথই পুনরুচ্চারণ করলেন ওয়াটসন। সেই সঙ্গে ক্রন্দনরতা প্রেয়সীর চোখ মুছিয়ে আশ্বাস দিলেন, বিয়ের আর দেরী নেই। লণ্ডন এল বলে। কেননা, ১৮৮১ সালে হোমসের কাছে তিনি কথা দিয়েছিলেন, দুই বন্ধু যুগ্মভাবে প্রথম যে মামলায় কাজ করেছিলেন, সে মামলার বিস্তারিত বিবরণ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ তিনি করবেনই—করে দেখিয়ে দেবেন জটিল সেই রহস্য সমাধানের প্রকৃত কৃতিত্ব কার প্রাপ্য।

কন্সট্যান্সকে তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'স্টাডি ইন স্কারলেট'-এর কাহিনী লেখা শেষ হলেই তিনি তাঁকে খবর পাঠাবেন তাছাড়া, ওয়াটসনের বিয়ের পর শার্লক হোমস আবার নিঃসঙ্গ হবেন। সুতরাং তাঁকেও একটু সময় দেওয়া দরকার।

১৮৮৭ সালের ডিসেম্বরে বীটন্স্ ক্রীস্টমাস অ্যানুয়ালে ওয়াটসন রচিত সেই কাহিনী প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৬০ সালে তারই একটা হুবহু প্রতিলিপি যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছিল শার্লক হোমস সোসাইটি অব লণ্ডন এবং বেকার স্ট্রীট ইরেগুলার্স। বলা বাহুল্য, দুটি প্রকাশনাই এখন সমান দুষ্প্রাপ্য।

যাই হোক, বেকার স্ট্রীটে ফিরে এলেন ডক্টর ওয়াটসন। এসেই জড়িয়ে পড়লেন 'রেসিডেন্ট পেসেন্ট'এর জটিল রহস্যজালে।

তার একদিন পরেই অক্টোবরের আট তারিখে শুক্রবারে হাজির হল বনেদী কুমার লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমনের দুরূহ সমস্যা।

এবং এই কেস সম্পর্কেই ওয়াটসন লিখেছেন, শার্লক হোমসের জীবন-স্মৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি কাহিনীটি অপ্রকাশিত থেকে যায় জনসাধারণের সামনে। এই কেসেই দেখা গেছে, উত্তরোত্তর নামযশ বৃদ্ধি সত্ত্বেও হোমস কিন্তু মনে-প্রাণে একজন শিল্পী হয়েই ছিলেন। যে কোনো কীর্তিমান আর্টিস্টের মতই অর্থলোভ-বিরহিত ছিল তাঁর কাজপাগল অন্তর। একদিকে যেমন ছিল তাঁর প্রবল আত্মম্ভরিতা, অপরদিকে তিনি ছিলেন তেমনই বিষয়বুদ্ধিহীন আর খামখেয়ালী। বুদ্ধির দ্বন্দ্বে সাড়া দিত তাঁর মনীষা। কাজ ছিল তাঁর নেশা। এই নেশার অভাব ঘটলেই উগ্রতর নেশা কোকেন দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন নিজেকে। ওয়াটসনকে তিনি বলেওছেন—'মক্কেলের মামলার ব্যাপারেই আমি উৎসুক, তাঁর সামাজিক মর্যাদার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই।' আর এক জায়গায় বলেছেন—'সমস্ত কিছুর বিনিময়েও আমি এই মামলা হাতছাড়া করতে রাজী নই।'

সম্ভ্রান্ত আইবুড়োর সেই কাহিনীই শোনাই এবার।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে স্তূপীকৃত খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসেছিলেন ওয়াটসন। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে। সেইসঙ্গে গর্জন করছে ঝড়ো বাতাস। এমন সময়ে বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলেন শার্লক হোমস।

টেবিলের ওপর রাখা বিরাট সীলমোহর করা মনোগ্রাম আঁকা দামী খামটা তুলে নিলেন তিনি। খাম ছিঁড়ে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে বললেন—'চিঠিটা আসছে ইংলণ্ডের খুব খানদানী পরিবারের একজনের কাছ থেকে। লিখছেন লর্ড সেন্ট সাইমন। তাঁর সাম্প্রতিক বিয়ের ব্যাপারে যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার সঙ্গে উনি পরামর্শ করার জন্যে আজ বিকেল চারটায় আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন।'

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে হোমস বললেন— 'চিঠির তারিখ লেখা হয়েছে গ্রসভেনে প্রাসাদে—লেখা হয়েছে পালকের কলমে। লেখবার সময়ে তাঁর ডানহাতের কড়ে আঙুলের বাইরের দিকটায় একফোঁটা কালিও লাগিয়ে ফেলেছিলেন।'

ওয়াটসন বললেন—'আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তিনি আসছেন তাহলে।'

'হ্যাঁ। সুতরাং তোমার সাহায্য আমার এখন দরকার। বসে বসে কাগজ পড়ছিলে যখন, তখন লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ের ব্যাপারে অনেক খবর তোমার চোখে পড়েছে নিশ্চয়।'

'তা পড়েছে।'

'তাহলে পর-পর সাজিয়ে সেগুলো আমাকে শোনাও দিকি ভায়া।'

'প্রথম বিজ্ঞপ্তিটা বেরোয় কয়েক হপ্তা আগে ব্যক্তিগত কলমে। তাতে লেখা আছে—'গুজব সত্যি হলে, ব্যালমোরালের ছেলে লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমনের সঙ্গে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ার সানফ্রান্সিসকো নিবাসী মিঃ আলয়সিয়াস ডোরানের একমাত্র মেয়ে কুমারী হ্যাটি ডোরানের শীগগিরই বিয়ে হচ্ছে।' তার পরেই সেই সপ্তাহের শেষের দিকে আর একটা কাগজে এই নিয়ে তেড়েফুঁড়ে কলম চালানো হল। লেখাটার সারকথা এই যে একটা সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা উচিত বৃটেনের সব লর্ড ফ্যামিলির ছেলেদের একে-একে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে—আমেরিকার কোটিপতি মোহিনীদের সঙ্গে। এবার পালা এসেছে লর্ড সেন্ট সাইমনের। শোনা যাচ্ছে ইনি বিয়ের যৌতুকস্বরূপ যে টাকা পাবেন তার হিসেব ছয় অংকের কমে করা যাবে

না। অভাবে পড়ে ব্যানমোয়ালের উইক ছবি-টবিও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তা আর কেনা জানে। তারপরের খবরে জানা যাচ্ছে, হ্যানোভার স্কোয়ারের সেন্ট জর্জ গির্জায় খুব অনাড়ম্বরভাবে মাত্র জনাছয়েক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর উপস্থিতিতে বিয়ে হবে। বিয়ের পর সবাই যাবেন ল্যাঙ্কাস্টার স্কোয়ারে মিঃ ডোরানের ভাড়াকরা বাড়ীতে। তারপরের খবর—বিয়ে হয়ে গেছে। 'মধু-চন্দ্রিমা যাপন করার জন্যে বর-কনে যাবেন লর্ড ব্যাকওয়াটারের বাড়ীতে। কনেবউ নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই হল খবর।'

'কিসের আগে পর্যন্ত?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন হোমস।

'ভদ্রমহিলা সরে পড়ার আগে পর্যন্ত।'

'কখন উধাও হলেন তিনি?'

'বিয়ের পরে প্রাতরাশের সময়ে।'

'খুলে বলো।'

'বিয়ে হয়ে গেলে গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব আর নিকট আত্মীয়দের নিয়ে বরকনে যখন মিঃ ডোরানের বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক হামলা করে সেখানে। লর্ড সেন্ট সাইমনের ওপর নাকি তার কিছু অধিকার আছে বলেও দাবি করে। যাই হোক, বাটলার আর বাড়ীর লোক তাকে ভাগিয়ে দেয়। কনেবউ অবশ্য তার আগেই বাড়ীতে ঢুকে গেছিলেন এবং টেবিলে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি শরীর খারাপের অজুহাতে নিজের ঘরে যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁর বাবা খোঁজ নিতে গিয়ে কনের চাকরাণীর কাছে শুনলেন, ঘরে ঢুকেই একটা গরম কোট আর টুপী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেছেন কনে। তারপর থেকে তিনি নিরুদ্দেশ। ফ্লোরা মিলার নামে যে মেয়েটি দরজার কাছে চেঁচামেচি করেছিল, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ফ্লোরা একসময়ে অ্যালেগ্রোতে নর্তকী ছিল এবং লর্ড সেন্ট সাইমনকে সে ভালভাবেই চেনে।'

ঘড়িতে তখন চারটে বাজে। ঘরে ঢুকলেন লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন। কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক অভিজাত চেহারা তাঁর।

খানদানীয়ানা দেখিয়ে আলাপের প্রথমেই হোমসকে তিনি ঠুকলেন—'আমার অনুমান, আমি যে সমাজের মানুষ, সেই মানের সেই সমাজ থেকে এধরনের মামলা এর আগে আপনার কাছে আসেনি।'

দাম্ভিক হোমস সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা দম্ভ ছুঁড়ে মারলেন—'উঁহু, আমি বরং খেলো হয়ে যাচ্ছি। আমার এই ধরনের শেষ মক্কেল ছিলেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজা।'

যাইহোক, ছোট ছোট প্রশ্ন করে শার্লক হোমস যা জানলেন তা এই:

মিস হ্যাটি ডোরানের সঙ্গে লর্ড সেন্ট সাইমনের আলাপ হয় এক বছর আগে সানফ্রান্সিসকোতে। মিস ডোরানের বাবা যখন টাকার কুমীর হন, মেয়ের বয়স তখন কুড়ি হয়ে গেছে। সোনার খনির তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে, বনে-পাহাড়ে বড় হওয়ার জন্যে মিস ডোরানের স্বভাবটিও হয়েছিল তেমনি। প্রাণে ভয়ডর ছিল না, সংস্কারের ধার ধারতেন না, যা মনে করতেন তা না করে ছাড়তেন না। এক কথায় তাঁর প্রকৃতি ছিল বন্য, দুরন্ত, আগ্নেয়গিরির মতই প্রচণ্ড। সব মিলিয়ে লেডী খেতাবের উপযুক্ত ছিলেন তিনি। বিয়ের আগের দিন তিনি লর্ড সেন্ট সাইমনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। বিয়ের দিন সকাল থেকে শুরু করে উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিলক্ষণ উৎফুল্ল ছিলেন।

আর, তারপরেই জীবনে সেই প্রথম তাঁর মেজাজে ছটফটানি লক্ষ্য করেছেন লর্ড সেন্ট সাইমন। অথচ ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ।

বর-কনে যখন সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ কনের হাত থেকে পড়ে যায় ফুলের তোড়াটা। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক। তৎক্ষণাৎ সে স্তবকটি তুলে দিলে কনের হাতে।

গির্জে খোলা থাকলে দু-চারজন লোক সেখানে হাজির থাকবেই। এ লোকটাও তাদের মধ্যে ছিল। চেহারায় সে খুবই সাধারণ। সুতরাং নিশ্চয় কনের পুরোনো বন্ধু নয়।

ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। কিন্তু এই নিয়েই মন খারাপ করে রইলেন কনে। মুখ কালো করে বাড়ী ফিরলেন। ফিরেই আমেরিকান গেঁইয়া ভাষায় দাসী অ্যালিসের সঙ্গে কিছুক্ষণ বক-বক করলেন। অ্যালিসও ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এসেছিল, মনিব-কন্যার সঙ্গে তার খুবই মাখামাখি। কথা-বার্তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝতে পারেননি লর্ড সেন্ট সাইমন। তারপর কনে গেলেন খাবার ঘরে। মিনিট দশেক টেবিলে বসে থাকার পরেই সেই যে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরে আসেননি। বরের ধারণা, হঠাৎ লেডী হয়ে গিয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছেন তাঁর প্রিয়তমা।

মৃদু হেসে হোমস জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা, লর্ড সাইমন, খাবার টেবিলে আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে বাইরের দিকটা দেখা যাচ্ছিল?'

'রাস্তার ওধার আর মাঠটা দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'তাহলে আপনাকে আর ধরে রাখব না।'

লর্ড সাইমন দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন—'এ রহস্যের সমাধান করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে?'

'সমাধান হয়ে গেছে।'

'কী...কী বললেন?'

'সমস্যার সমাধান আমি করে ফেলেছি।'

'তাহলে বলুন আমার স্ত্রী কোথায়?'

'শীগগিরই তা জানাবো আপনাকে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে লর্ড সাইমন বললেন—'দেখছি এ রহস্যের জট ছাড়াতে আপনার চাইতে পাকা মাথার দরকার হবে।'

বলে, বিদায় নিলেন তিনি।

হাসতে হাসতে ওয়াটসনকে হোমস বললেন—'লর্ড সাইমন এঘরে ঢোকার আগেই কিন্তু আমি হেঁয়ালীর সমাধান করে ফেলেছিলাম।'

'কী বলছ, হোমস।'

'ঠিকই বলছি। আরে, আরে লেসট্রেড নাকি? এসো এসো ভায়া। এই নাও গেলাস, এই নাও চুরুট। ব্যাপার কি? মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে আছে কেন?'

'আর বলেন কেন। লর্ড সাইমনের এই অপয়া বিয়েটা নিয়ে বড়ই প্যাঁচে পড়েছি। মাথা মুণ্ডুটা কিছুই বুঝছি না' ব্যাজার মুখে বললে সরকারী গোয়েন্দা লেসট্রেড।

'খুব ভিজেছো দেখছি, জামার হাতাটাও ভিজিয়ে এনেছ।'

'ভিজবো না? সার্পেন্টাইনে জাল ফেলেছিলাম যে।'

'কিসের জন্যে?'

'লেডী সাইমনের লাশ উদ্ধারের জন্যে।'

'তাহলে ট্রাফালগার স্কোয়ারের চৌবাচ্চাটাও বাদ যায় কেন?'

'তার মানে?'

'কেননা দু জায়গাতেই লাশ পাওয়াটা সমান অসম্ভব।'

রেগে তিনটে হয়ে লেসট্রেড বললে—'তাই যদি হয়, তাহলে এগুলো কেন পাওয়া গেল বলুন তো।'

বলে, ব্যাগ খুলে লেসট্রেড মেঝের ওপর রাখল একটা ভিজে সপসপে বিয়ের পোশাক, সাটিনের জুতো, কনের মালা, ওড়না আর একটা নতুন বিয়ের আংটি।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হোমস বললেন—'কোথায় পাওয়া গেল এগুলো?'

'সার্পেন্টাইনে জলের কিনারায় ভাসছিল। পোশাক যখন পাওয়া গেছে, তখন দেহটাও নিশ্চয় কাছাকাছিই থাকবে।'

'অপূর্ব যুক্তি! এই যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের দেহই তার পোশাকের আলমারীর কাছে থাকা উচিত। যাক, এ থেকে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছো তাই শুনি।'

'ফ্লোরা মিলারই লেডী সাইমনকে গায়েব করেছে।'

'বটে! সেটা কিন্তু প্রমাণ করা খুবই শক্ত হবে।'

খেঁকিয়ে উঠে লেসট্রেড বললে—'এটার মানে তাহলে কি?'

বলে, একটা চিরকুট ধরিয়ে দিলে হোমসের হাতে।

'পোশাকের পকেটে কার্ড রাখবার বাক্সে পাওয়া গেছে এই চিরকুটটা। এতে লেখা আছে:

সব ঠিক হয়ে গেলে দেখা করবে আমার সঙ্গে। দেরী করো না।

—এফ এইচ এম।

আমার বিশ্বাস, গির্জেতে ঢোকবার সময়ে চিরকুটটা পাচার করে দেওয়া হয় কনের হাতে। আর না বুঝে ফ্লোরা মিলারের ফাঁদে পা দিয়েছেন লেডী সাইমন। আদ্যক্ষরগুলোর সঙ্গে ফ্লোরা মিলারের নামটা মিলে যাচ্ছে না?'

হাসতে হাসতে হোমস বললেন—'সত্যিই এটা একটা দারুণ দরকারী সূত্র। অভিনন্দন জানাই তোমায়।'

খুশী জেতার আনন্দে উৎফুল্লমুখে হেঁট হয়ে চিরকুটটা নিতে গিয়েই আঁৎকে উঠল লেসট্রেড—'একী! আপনি উল্টোদিকটা দেখছেন যে!'

'মোটেই না। এইটাই ঠিক দিক।'

দেখা গেল, কাগজটা একটা হোটেলের বিলের ছিন্ন অংশ। উল্টোদিকে লেখা রয়েছে, চৌঠা আগস্ট: ঘরভাড়া ৮ শিলিং, ব্রেকফাস্ট আড়াই শিলিং, কাটলেট ১ শিলিং, লাঞ্চ আড়াই শিলিং, এক গেলাস শেরি ৮ পেন্স।

লেসট্রেড বিদায় হতেই শার্লক হোমসও ওভারকোট পরে বেরিয়ে গেলেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই খাবারের দোকান থেকে দুজন লোক এসে পরিপাটি ডিনার সাজিয়ে দিয়ে গেল বেকার স্ট্রীটের ঘরে। যাবার সময়ে ওয়াটসনকে বলে গেল—'দামটা আগেই পেয়েছি।'

পাঁচজনের ডিনার দেখে হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন ওয়াটসন। এসব কি কান্ড আরম্ভ করেছেন শার্লক হোমস? কারা আমন্ত্রিত হয়েছেন রাত্রে?

রাত নটা নাগাদ শার্লক হোমস ফিরতেই জানা গেল সেই তথ্য। ডিনারে আসছেন স্বয়ং লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন এবং আরও দুজন অতিথি।

হোমসের কথা শেষ হতে না হতেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন লর্ড সাইমন। আর তারপরেই এলেন একজন ভদ্রমহিলা আর একজন ভদ্রলোক।

হোমস বললেন—'লর্ড সাইমন, আসুন আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার আর মিসেস ফ্রান্সিস হে মুলটন। ভদ্রমহিলাকে অবশ্য আপনি এর আগেই দেখেছেন।'

আগন্তুকরা ঘরে ঢোকার আগেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কাঠের মত শক্ত দেহে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন লর্ড সাইমন। ভদ্রমহিলা তাঁর সামনে মিনতি-মাখানো চোখে হাত বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি চোখ তুললেন না।

ভদ্রমহিলা বললেন—'রবার্ট, তুমি রাগ করেছ?'

তেতোগলায় লর্ড সাইমন বললেন—'প্লীজ, ক্ষমা চেও না।'

'জানি তোমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি। যাবার আগে তোমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গির্জের মধ্যে ফ্রাঙ্ককে দেখার পর থেকে আমার মাথার ঠিক ছিল না।

সঙ্গের ভদ্রলোক বললেন—'গোড়া থেকেই কাজটা এত ঢেকে ঢেকে না করলেই ভাল হত।'

'তাহলে আমি খোলাখুলিই সব বলছি', বললেন মিসেস মুলটন। '১৮৮১ সালে রকি পর্বতের ধারে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখনি আমরা পরস্পরের কাছে বাগদত্ত হই। কিন্তু তারপরেই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। বাবা নতুন সোনার খনির সন্ধান পেয়ে কুবের হয়ে গেলেন। আর, ফ্রাঙ্কের খনিতে পাথর ছাড়া কিছুই আর না ওঠায় সে গরীব হয়ে গেল। বাবা তখন বিয়েতে অমত করে বসলেন। কিন্তু আমরা গোপনে বিয়ে করলাম। ফ্রাঙ্ক প্রতিজ্ঞা করল, আমার বাবার সমান টাকা রোজগার না করা পর্যন্ত বিবাহিত জীবনযাপন করবে না।

'ফ্রাঙ্ক গেল তার ভাগ্যের খোঁজে। একদিন, খবরের কাগজে পড়লাম, রেড ইন্ডিয়ান গুন্ডারা তাঁবু আক্রমণ করে অনেককে মেরে ফেলেছে। নিহতদের তালিকায় ফ্রাঙ্কের নামও দেখলাম।

'নামটা দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম আমি। অসুস্থ ছিলাম বহু মাস। বছর ঘুরে গেল। ফ্রাঙ্ক আর ফিরল না। বুঝলাম, খবরটা সত্যি।

'এই সময়ে লর্ড সাইমনের সঙ্গে আমার আলাপ হল। বিয়ের কথা হল। বাবা খুব খুশী হলেন। আমিও চেষ্টা করে গৃহিণী হওয়ার জন্যে তৈরী হতে লাগলাম—মনে মনে জানলাম ফ্রাঙ্ককে আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।

'গির্জের মধ্যে ফ্রাঙ্ককে দেখে তাই আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলাম। কাগজে আমার আর গির্জের নাম দেখে ও ছুটে এসেছিল। ফ্রাঙ্ক সমানে আমার দিকে তাকিয়েছিল। পাছে আমি সবার সামনেই কেলেঙ্কারী করে বসি, তাই ঠোঁটে আঙুল রেখে মন্ত্র পড়ার সময়ে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল ও। তারপরেই দেখলাম একটুকরো কাগজে কি লিখছে। বুঝলাম, চিঠি।

'বেরিয়ে আসার সময়ে তোড়াটা ইচ্ছে করেই ওর সামনে ফেলে দিলাম। ও যখন ফের সেটা আমার হাতে তুলে দিল, তোড়ার আড়ালে চিঠিটাও গুঁজে দিলে আমার হাতে। ঐ একটা লাইন পড়েই মনস্থির করে ফেললাম। ফ্রাঙ্কের নির্দেশই আমি মানব।

বাড়ী গিয়ে দাসীকে সব বললুম। ফ্রাঙ্ককে ও চিনত। আমার হুকুমেই কাউকে ও কিছু বলেনি। সবার সামনে লর্ড সাইমনকে একথা বলা সম্ভব ছিল না বলেই বলিনি। ভেবেছিলাম, পরে বলব।

'আমার চিহ্ন লুকিয়ে ফেলার জন্যে ফ্রাঙ্ক বিয়ের পোশাক-টোশাকগুলো কোথায় যেন ফেলে দিয়ে এল। কালই প্যারিস রওনা হচ্ছিলাম আমরা। আজ হঠাৎ সন্ধেবেলা এই ভদ্রলোক, মিস্টার হোমস্, আমাদের কাছে গিয়ে সমস্ত জিনিসটা পরিষ্কার করে দিলেন। জানি না, কি করে তিনি আমাদের ঠিকানা বার করলেন। ওঁর নির্বন্ধেই আজ আমরা এখানে এসেছি, নিরালায় বসে লর্ড সাইমনকে সব বুঝিয়ে বলার জন্যে। রবার্ট, সবই তো শুনলে। আশা করি, এবার আর আমাকে খুব নীচ বলে মনে হবে না তোমার।'

লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। ডিনার টেবিলে হাজির রইলেন শুধু শার্লক হোমস্, ডক্টর ওয়াটসন, মিস্টার এবং মিসেস মুলটন।

অতিথিরা বিদায় নিলে হোমস্ বুঝিয়ে দিলেন ওয়াটসনকে—'প্রথম থেকেই দুটি বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। বিয়েতে ইচ্ছে ছিল ভদ্রমহিলার। অথচ বাড়ী ফিরে আসার পরেই তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন। তাহলে মন পরিবর্তনটা

ঘটেছে নিশ্চয় বিয়ের আসরেই। কেন? নিশ্চয় কাউকে দেখেছেন। এবং এমন কাউকে দেখেছেন যিনি তাঁর বহুপরিচিত—যাঁর দর্শনমাত্রই তাঁর মন বদলে গেছে। সুতরাং সেই লোকটি অবশ্যই আমেরিকান, কেননা ভদ্রমহিলা তো এখানে এসেছেন এই সেদিন। তারপরেই ভোজ্য ফেলে দেওয়ার কাহিনী শুনলাম, বুঝলাম, ভোজ্য যিনি তুলে নিয়েছেন তিনি হয় ভদ্রমহিলার পুরোনো প্রেমিক, না হয় পূর্বপ্রণয়ী।

..."ফ্রাঙ্ককে দেখার পর থেকে আমার মাথার ঠিক ছিল না"

"বাকী রইল ও'দের খুঁজে বার করা। লেসট্রেডের আনা চিরকুটেই সন্ধান পেলাম ঠিকানার।"

"সে কী!"

"ছেঁড়া বিলে দেখলাম চড়া দাম নেওয়া হয়েছে সবকিছুর জন্যে। এমন দামী হোটেল লন্ডনে খুব বেশী নেই। তাই খুঁজে বার করতে দেরী হল না। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আগের দিন ফ্র্যান্সিস এইচ. মুলটন নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। চিঠিপত্র এলে ২২৬ নম্বর গর্ডন স্কোয়ারে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে দেখা পেলাম কপোত-কপোতীর। কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করলাম এবং লর্ড সাইমনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ফেললাম। তারপর তো তুমি দেখলেই কি হল। যাই হোক, ভায়া, বেহালাটা এগিয়ে দাও দিকি। অলস সন্ধ্যেগুলো কাটানো নিয়ে মহাসমস্যায় পড়েছি আমি।"

এর ঠিক চারদিন পরেই বারোই অক্টোবর প্রকাশিত হয় এক আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন "দ্বিতীয় দাগ"এর চাঞ্চল্যকর মামলা। এ মামলা একটা হারিয়ে-যাওয়া চিঠি সম্পর্কে। চিঠিটা লিখেছিলেন এক বিদেশী রাজা। এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই দলিল। এমনই বিরাট তার গুরুত্ব যে, একবার যদি তা প্রকাশ পায়, তাহলে অতি সহজে চরমতম মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে পড়বে সারা ইউরোপ এবং আরও জটিল হয়ে উঠবে তার পরিস্থিতি। এই দলিলটিই খোয়া গেছে এবং নিয়েছে এমন লোকেরা যাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়া।

সুতরাং শরৎকালের সেই সকালে বেকার স্ট্রীটের দীনহীন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ইউরোপ বিখ্যাত দুজন পুরুষ। একজনের রূপবান চেহারা, উন্নত নাক, ঈগল পাখীর মত চোখ এবং সব মিলিয়ে ক্ষমতাবান পুরুষের মত প্রভুত্বময় মূর্তি। দু'দুবার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যিনি, ইনিই সেই স্বনামধন্য লর্ড বেলিঙ্গার। আর একজন রাইট অনারেবল ট্রেলয়ানি হোপ—যিনি ইউরোপ সংক্রান্ত দপ্তরের সেক্রেটারী এবং দেশের উদীয়মান রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁর স্থান সবার আগে।

হেঁয়ালীর গোলোকধাঁধায় পড়ে আবার চোখে সর্ষে ফুল দেখল সরকারী ডিটেকটিভ লেসট্রেড। কিন্তু গোডোলফিন স্ট্রীটের একটা পুরোনো বাড়ীর মেঝেতে দ্বিতীয় দাগটা দেখেই টনক নড়ল শার্লক হোমসের এবং আলোর নিশানা দেখলেন রহস্য তিমিরে।

হারানো দলিল হাতে নিয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে সোল্লাসে বললেন প্রধানমন্ত্রী —"মিঃ হোমস্, মিঃ হোমস্, এ যে অকল্পনীয়, অসম্ভব! আপনি ভেল্কি জানেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক। বলুন দিকি চিঠিটা কি করে ফিরে এল বাক্সের মধ্যে?"

আশ্চর্য দুটি চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে থেকে মুচকি হেসে সরে গেলেন হোমস্।

বললেন—"আমাদেরও তো কিছু কিছু কূটনৈতিক মন্ত্রগুপ্তি আছে।"

অসাধারণ এই মানুষটির অতুলনীয় কার্যপদ্ধতি দেখে দেখে যতই চমৎকৃত হোন না ডক্টর ওয়াটসন, বোধহয় বেকার স্ট্রীটের বসবার ঘরে আর তাঁর মন টিকছিল না। মন উধাও হয়ে গিয়েছিল বহুদূরে— সানফ্রানসিসকোয়। প্রেমে পড়েছিলেন কনস্ট্যান্স অ্যাডামস-এর।

তাই, ১৮৮৬ সালের পয়লা নভেম্বর সোমবারে সেন্ট জর্জ গির্জায় বিয়ে হয়ে গেল তাঁদের।

দীর্ঘকাল পরে বিশ্বের একমাত্র কনসাল্টিং ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের উপাখ্যানগুলোর দীর্ঘ সিরিজটাকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে "দ্বিতীয় দাগের অ্যাডভেঞ্চার" কাহিনী লিখেছিলেন ওয়াটসন এবং শার্লক হোমসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক কেস দিয়েই শেষ করেছিলেন তাঁর আশ্চর্য কীর্তিকলাপের চমকপ্রদ সিরিজ।

দুই গদাধর

(৭)

গদাধর পন্ডিত

চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে মাধব মিশ্রের বাড়ী। তার স্ত্রী রত্নাবতী। তাদের দুই ছেলে—বাণীনাথ আর গদাধর।

মাধব বেলেটি ছেড়ে চলে আসে নবদ্বীপে। আর নবদ্বীপেই গদাধরের জন্ম। গদাধর আশৈশব নিমাইয়ের সংগী।

দুইজনে একসংগে পড়াশোনা করে, ন্যায়চর্চা করে। একসংগেই অদ্বৈতের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

একদিন পথের উপর গদাধরকে ধরল নিমাই।

ন্যায় পড়ে খুব তো পন্ডিত হয়ে উঠেছ, নিমাই বললে, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

তর্কে পরাঙ্মুখ নয়, গদাধর। বললে, বলো।

মুক্তির লক্ষণ কী?

শাস্ত্রগত অর্থ জানা যা আছে, বললে গদাধর।

নিমাই বললে, ঠিক হল না।

আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। গদাধর আবার ব্যাখ্যা করল।

নিমাই সে ব্যাখ্যাও খন্ডন করে দিল। বললে এখন বাড়ি যাও, পরে বুঝবে।

কিন্তু গদাধর এ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না নিমাইয়ের প্রতি অদ্বৈতের স্নেহ কেন চন্দনার চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। তার প্রতি ঈশ্বর পুরীই বা কেন এত সশ্রদ্ধ! নিমাইয়ের বিদ্যাবুদ্ধি বেশি এ কে না স্বীকার করবে, কিন্তু এরা যেন আরো কী অতিরিক্ত দেখেছে ওর মধ্যে। কই গদাধর তো কিছু বোঝে না। পড়ায়-খেলায় সব-সময়ে সে নিমাইয়ের কাছাকাছি আছে বলেই বুঝি এই দৃষ্টির অল্পতা।

নিমাই গয়া থেকে ফিরে একেবারে এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীবাসের বাড়িতে ফুল তুলছে গদাধর। সাজি হাতে শ্রীমান পন্ডিতও এসেছে, তার সমস্ত মুখে হাসির ফুল ফোটানো।

এত হাসি কেন? শ্রীবাস জিজ্ঞেস করল।

কাল নিমাই গয়া থেকে ফিরেছে। শুনে, দেখতে গিয়েছিলাম। সেই উদ্ধত নিমাই কেমন করুণ, কোমল বিনম্র হয়ে গিয়েছে। আনন্দে কেবল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। দেখে আর তাকে মানুষ বলে বোধ হচ্ছে না।

বলো কী? আমাদের মনস্কামনা তাহলে সিদ্ধ হল?

আজ প্রাতে আমাকে, তোমাকে আর সদাশিবকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে যেতে বলেছে। তার মনে কী দুঃখ তা সে ব্যক্ত করবে। ফুল তুলেই যাব সেখানে। তুমিও চলো।

কই গদাধরকে তো নিমাই যেতে বলেনি।

তাই বলে সে কি যাবে না? দেখবে না নিমাইকে? শুনবে না তার কী দুঃখ?

গদাধর গেল বটে কিন্তু শুক্লাম্বরের ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রইল। অঙ্গনে ভক্তসমাবেশে যে তার নিমন্ত্রণ নেই।

দীর্ঘকায় সবল-সুন্দর পুরুষ নিমাই এসে দাঁড়াল অঙ্গনে। বন্ধুদের দেখে হৃত-সর্বস্বের মত কেঁদে উঠল : আমার কৃষ্ণ কোথায় কোন দিকে গেল? এই তো আমার কাছে ছিল কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছ না কেন? কোথায় লুকোল?

সে কী আর্তি! সে কী অশ্রু!

মূর্ছিত হয়ে পড়ল নিমাই।

মূর্ছাভঙ্গের পর নিমাই শুনতে পেল ঘরের মধ্যে বসে কে কাঁদছে।

ঘরের মধ্যে কে? উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করল নিমাই।

শুক্লাম্বর বললে, তোমার গদাধর।

শুধু গদাধর নয়, তোমার গদাধর। বাল্যকাল থেকেই সে নিমাইয়ের পিছে-পিছে ছায়ার মত ফিরছে, বাল্যকাল থেকেই তার সংসার-বিরক্তি।

গদাধরকে ডাকল নিমাই। বললে, গদাধর বাল্যকাল থেকেই তুমি কৃষ্ণ-ভজন করছ, কিন্তু আমার—আমার কী হল? শুধু বৃথা-রসে আমার জীবন গেল। আমি কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, আবার নিজের দোষে সে অমূল্যনিধিকে হারিয়ে ফেলেছি। বলো কোথায় গেলে তাকে খুঁজে পাব?

নিমাই আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

আরেক দিন গদাধরকে নিরালায় পেয়ে নিমাই ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আমার কৃষ্ণ কোথায়?

গদাধর বললে, তোমার কৃষ্ণ তো তোমার হৃদয়েই অধিষ্ঠিত।

দুই হাতের নখে নিমাই তার বুক চিরতে লাগল। গদাধর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত করল। শচীমাতা ছুটে এলেন। গদাধর নিমাইকে রক্ষা করেছে দেখে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন। বললেন, গদাধর, তুমি নিমাইয়ের সর্বক্ষণের সংগী হয়ে থাকো, ও যেন কোনো বাধা না পায়, ওর যেন না কোনো অপঘাত ঘটে।

নবদ্বীপে গদাধরই নিমাইয়ের দেহরক্ষী।

একদিন মুকুন্দ দত্ত এসে বললে, তোমার তো বৈষ্ণব দেখতে ইচ্ছে, চলো তোমাকে অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাব।

সত্যি? এক্ষুনি যাব। গদাধর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

পুন্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে গদাধরকে নিয়ে গেল মুকুন্দ। বললে, এই দেখ।

গদাধর বিনয়-অভ্যাসে নমস্কার করল বটে কিন্তু এ সে কী দেখছে? দেখছে সজ্জিত খাটের উপর সুন্দর শয্যায় চন্দ্রাতপের নিচে বিলাসবেশে কে এক রাজপুত্র বসে আছে, চার পাশে নরম বালিশ, বাটায় পান, তাম্বুলরাগে ঠোঁট দুটি লাল, তাতে আবার হাসি, চাকরের হাতে ময়ূরের পাখায় দিব্যি হাওয়া খাচ্ছে আরামে। শুধু তাই নয়, চুলের পারিপাট্য দেখেছ? তার উপর আবার আমলকী তেলের সুবাস ছেড়েছে।

ভালো বৈষ্ণব দেখতে এসেছি যাহোক! গদাধরের সমস্ত মন কুঁকড়ে গেল। ইনি কে? জিজ্ঞেস করল পুন্ডরীক।

ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর। বললে মুকুন্দ, ইনি ন্যায় পড়েছেন, কিন্তু সেটা এঁর পরিচয় নয়, শিশুকাল থেকেই ইনি ভক্তি-পথের পথিক—এটাই এঁর পরিচয়।

তা এঁর তেজোময় শরীর দেখে বুঝতে পারছি। ইনি আকৃতিতে সুন্দর, প্রকৃতিতেও সুন্দর। পুন্ডরীক সমর্থন করল।

তবু গদাধরের অপ্রসাদ ঘোচে না।

তার মনোভাব বুঝতে পেরেছে মুকুন্দ। ভাবল পুন্ডরীকের আসল রূপ এবার প্রকাশ করে দিই।

ভাগবত থেকে পূতনা-সম্পর্কিত শ্লোকটি সে সুস্বরে আবৃত্তি করল :

আহা, যে রাক্ষসী পূতনা কৃষ্ণকে মারবার জন্যে স্তনে কালকূট মিশিয়ে পান করানো সত্ত্বেও স্বর্গে ধাত্রীগতি পেয়েছে, সেই দয়াময় হরি ছাড়া আর কার আশ্রয় নেব?

শ্লোক শোনা মাত্রই পুন্ডরীকের শরীরে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব ফুটে উঠল, পুলক হুংকার করে চারদিকে হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সে মাটিতে আছড়ে পড়ল। কোথায় গেল তার পানের বাটা, ময়ূরের পাখা, গন্ধজলের ঝারি। নিজের বেশবাস নিজেই দু হাতে ছিঁড়তে লাগল—আর কেশপাশ ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল। আকুলকণ্ঠে কাঁদতে লাগল পুন্ডরীক, কৃষ্ণ, আমার প্রাণ, আমার ঠাকুর, আমাকে তুমি পাষাণ করলে কেন? কবে তুমি আমাকে ভক্তি দেবে? কবে এ পাষাণ বিগলিত হবে?

ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাঁদছে পুণ্ডরীক।

গদাধর ভয় পেল। আমি ভক্তদ্রোহী হলাম। শুধু বসনে-ভূষণে বিচার করলাম। শুধু গেরুয়া-কৌপীন পরলেই ভক্ত হয় না। আর মাথায় গন্ধতেল মেখেছে বলে ভণ্ড বলবে এ ঠিক নয়।

মুকুন্দকে বললে, পরিচ্ছদ দেখে বৈষ্ণবকে বিষয়ী ভেবেছিলাম, তুমিই দেখালে প্রচ্ছন্ন ভক্তকে। কিন্তু আমি যে প্রথমে এঁকে অবজ্ঞা করেছিলাম তার স্খালন হবে কিসে? মুকুন্দ আমি ঠিক করেছি, আমি এঁর থেকে দীক্ষা নেব। এঁর থেকে দীক্ষা নিলে ইনি আমাকে শিষ্যবোধে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

প্রস্তাব শুনে পুণ্ডরীকের আনন্দ আর ধরে না। বললে, বহু পুণ্যে এমন শিষ্য মেলে। আগামী শুক্লা দ্বাদশীতেই দীক্ষা দেব।

নিমাইয়ের কাছে অনুমতি নিতে গেল গদাধর। সব বললে অকপটে। বললে, তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর মার্জনা ক্রয় করে নেব। তুমি কী বলো?

সানন্দে সম্মতি দিল নিমাই। যত শিগগির পারো—যত শিগগির।

পুণ্ডরীকের কাছে দীক্ষা নিল গদাধর।

যার কাছেই দীক্ষা নিক, গদাধর গৌরাঙ্গেরই মর্মসঙ্গী। লীলাকালে গৌরাঙ্গকে গদাধরই তাম্বুল জোগায়, তার শয্যান্তিকে নিজে শয্যা রচনা করে ঘুমোয়। গৌরাঙ্গের যত ভাববিনিময় সব গদাধরের সঙ্গে। চন্দ্রশেখরের ঘরে যখন কৃষ্ণলীলা নাটকের অভিনয় হয়, তখন গৌরহরি নিজে লক্ষ্মী সাজল আর রুক্মিণী সাজাল গদাধরকে।

সেই গদাধরকে নবদ্বীপে রেখে নিমাই চলল সন্ন্যাস নিয়ে।

গদাধর নানা যুক্তি তুলল, কিন্তু কিছুই নিমাইয়ের গ্রাহ্য হল না। ঘরে থেকেও ঈশ্বরব্রতী হওয়া যায় এ যুক্তিও টিকল না। তখন গদাধরকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। যাতে তোমার স্বস্তি, যাতে সকলের স্বাস্থ্য তুমিই তা ভালো বুঝবে।

তবু বুঝি গদাধর আশা করেছিল নিমাই তাকে সঙ্গে নেবে।

কিন্তু না, গদাধর দুঃখের পাষাণভার বুকে নিয়ে পড়ে রইল নবদ্বীপ। কিন্তু গৌরমুখ না দেখে কতদিন দেহে প্রাণ রাখতে পারব? দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করে গৌরাঙ্গ নীলাচলে ফিরলে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে সেও চলল দর্শন করতে। আর সকলে ফিরে গেলেও গদাধর ফিরল না। সে থেকে গেল নীলাচল।

সমুদ্রতীরে যমেশ্বর টোটায় বাসা করে থাকে গদাধর। গৌরহরি প্রত্যহ সেখানে যান, গদাধর তাঁকে ভাগবত শোনায়।

সেদিন বালির উপরে বসে দুজনে কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করছেন হঠাৎ প্রভু বললেন, এ জায়গাটা খোঁড়ো তো।

বালি খুঁড়তে লাগল গদাধর। প্রথমে মোহনচূড়ার অগ্রভাগটুকু দেখা গেল। ক্রমশ পূর্ণ বিগ্রহ আবিষ্কৃত হল। গোপীনাথ দেখা দিলেন।

বিষ্ণুপুরের মন্দির   ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

গদাধরের দুই সঙ্কল্প, ক্ষেত্রসন্ন্যাস আর গোপীনাথ। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্র কোনোদিন ছাড়ব না আর গোপীনাথের সেবা করব।

কিন্তু এ কী, স্বয়ং প্রভু যে নীলাচল ছেড়ে চলেছেন গৌড়পথে, বৃন্দাবনের উদ্দেশে।

গদাধর বললে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

প্রভু বললেন, তুমি তোমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়বে কী করে?

গদাধর বললে, যেখানে তুমি সেখানেই শ্রীক্ষেত্র।

আর তোমার গোপীনাথ?

তুমিই আমার গোপীনাথ।

না, এ ঠিক নয়। প্রভু গম্ভীর হলেন : প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপ।

হয় হোক, আমার হবে, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। বেশ তো ছায়ার মত করে সঙ্গে নিয়ে যেতে না চাও আমি দূরে-দূরে থাকব, একা একা যাব।

কিন্তু যাবে তো আমারই জন্যে।

কে বললে? আমি যাব আমার শচী-মাতাকে দেখতে। গদাধর কেঁদে ফেলল।

কটক পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে পিছে-পিছে চলে এসেছে গদাধর।

প্রভু তাকে কাছে ডাকলেন। একটা কথা শুধু আমাকে বলো।

কী কথা?

তুমি কি আমার সুখ চাও, না, নিজের সুখ চাও?

এই তো শেষ কথা। গদাধর স্তব্ধ হয়ে রইল। কৃষ্ণসুখে সুখী।

প্রভু বললেন, যদি আমার সুখ তোমার কাম্য হয় তবে তুমি নীলাচলে ফিরে যাও। আমার দিব্যি যদি আর কিছু বলো—

গদাধর মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্রভু সার্বভৌমকে বললেন, ওকে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি ভক্তের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হতে দেব না।

সেবার আর প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হল না। গৌড় থেকেই ফিরতে হল নীলাচল। ফিরে এসে বললেন গদাধরকে দুঃখ দিয়েছিলাম বলেই এ যাত্রা আমার বৃন্দাবন-দর্শন হল না।

'গদাধর ছাড়ি গেলাম ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল।।'

গদাধর বললে, প্রভু এবার তুমি আমাকে মন্ত্র দাও।

কেন? তোমার আগের ইষ্টমন্ত্র কী হল?

সে মন্ত্র আমি আরেকজনের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তাই সে মূর্তির ভালো স্ফূর্তি হচ্ছে না।

তা হোক। তুমি আবার সেই পুণ্ডরীকের কাছ থেকেই মন্ত্র নিও। পুণ্ডরীক এসে যাবে নীলাচল।

তাই হল। পুণ্ডরীকের কাছেই আবার দীক্ষা নিল গদাধর।

এবার বল্লভ ভট্ট উলটে দীক্ষা নিতে চাইল গদাধরের কাছে। গদাধর বললে, আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের অধীন। তাঁর আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না।

বেশ, তবে আমার ভাগবতের টীকা শোনো। আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি।

তুমি আমার প্রভুকে শুনিয়েছিলে?

তিনি শুনতে চাইলেন না।

কী বললেন?

বললেন, আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। শুধু এক অর্থ মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। যদি আর কোনো অর্থ থাকেও আমার দরকার নেই। কিন্তু তুমি বলো এ একটা কথা হল?

নীলাচলজন আর কেউ শুনল?

কেউ না। কিন্তু গদাধর, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু শোন। তুমি শুনলেও আমার কিছু মান থাকে। বলে সম্মতির অপেক্ষা না করেই বল্লভ টীকা পড়তে লাগল।

গদাধর মহা ফাঁপরে পড়ল। কেউ জোর করে শোনাতে সুরু করলে কীভাবে তাকে সৌজন্যসহকারে নিরস্ত করা যায় কিছুই ভেবে পেল না।

তুমি সেস্থান ত্যাগ করলে না কেন? কেন কানে আঙুল দিলে না? এ তোমার কেমনতরো শিষ্টাচার? নীলাচলজন রোষ প্রকাশ করল।

গদাধর বুঝল এ প্রভুরই রোষ। কিন্তু সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে কোনো যুক্ত প্রয়োগ করল না। অন্তত এটুকুও বললে না, কেউ জোর করে শোনালে আমি কী করব? তবু যদি আমার দোষ দেখে প্রভু আমাকে রোষ করেন, আমি তাই নেব মাথা পেতে। প্রতিবাদ করতে যাব না। সর্বজ্ঞের শিরোমণি আমাকে যা দেবেন, ক্রোধ বা অনুরাগ, আমি তাই শিরোধার্য করব।

শুধু সারল্য দিয়ে কিনে নিল গৌরাঙ্গকে।

নিজেই এসে কেঁদে পড়ল প্রভুর পায়ে।

কী আশ্চর্য, তোমাকে এত খেপাতে চেষ্টা করলাম, তুমি একটুকুও খেপলে না। শুধু সারল্যকেই ভাবমুদ্রা করলে। প্রভু গদাধরকে আলিঙ্গন করলেন।

তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলেন বল্লভকে। বললেন, গদাধরের কাছে মন্ত্র নিতে চেয়েছিলে না? তার কাছ থেকে নাও কিশোর গোপালের মন্ত্র।

বাণীনাথের ছেলে নয়নানন্দ—গদাধরের ভাই-পো। ভাই-পোকে গদাধরই দীক্ষা দেন। দীক্ষাকালে উপহার দেন নিজের বুকের কৃষ্ণবিগ্রহ আর একখানি গীতা, যাতে প্রভুর নিজের হাতে কটি শ্লোক লেখা।

প্রভু অপ্রকট হবার পর শ্রীনিবাস গদাধরের কাছে ভাগবত পড়তে নীলাচলে এল।

গদাধর বললে, আমার ভাগবতখানা ছিঁড়ে গিয়েছে, তুমি গৌড়ে গিয়ে নরহরির কাছ থেকে একখানা নতুন ভাগবত নিয়ে এস।

গৌড়ে ফিরে গেল শ্রীনিবাস। নতুন ভাগবত নিয়ে নীলাচলে আসছে, পথের মাঝখানে খবর এল, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দেহরক্ষা করেছেন।

(৮)

গদাধরদাস

গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।

এঁড়েদের শঙ্খবণিককুলে জন্ম, নিমাইয়ের নবদ্বীপ লীলায় অংশগ্রহণ করলেও আসলে সে নিত্যানন্দসঙ্গী।

গদাধর পণ্ডিত আর নরহরি সরকার দুজনেই তার বন্ধু। নিমাইয়ের মহাপ্রকাশের দিনে এরা সবাই নিমাইকে সাজিয়েছে, অঙ্গনে মন্দিরে সেজেছে নিমাইয়ের সঙ্গে। সন্ন্যাস নেবার পর নিমাই যখন শান্তিপুরে এল, তখন সেই নর্তন-কীর্তনের ভক্তদের মধ্যে একজন এই গদাধর।

প্রথমবার গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়েছিল গদাধর।

যথাকালে প্রভু সবাইকে বললেন, গৌড়ে ফিরে যাও। গদাধরদাসকে বললেন, যাও, মাঝে-মাঝে আমি যাব তোমাদের কাছে, গোপনে থেকে তোমাদের নাচ দেখব।

প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে গদাধরদাস ফিরে চলল নবদ্বীপ। তার প্রাণকান্তের সুখের জন্যে এই বিচ্ছেদক্লেশ সে হাসিমুখে মেনে নিল। গোপী ছাড়া আর কার এত ত্যাগ, কার এত তিতিক্ষা?

গৌরপ্রেম-পাগলেরা গৌড়েই ফিরে চলল।

সকলকে ভাবময় করে পথ চলছে নিতাই, গদাধরদাসের দেহে রাধাভাব আবির্ভূত হল। কে দই কিনবে, কে দই কিনবে গো—বলে অট্ট অট্ট হাসতে লাগল। নাচতে লাগল বিভোর হয়ে।

গদাধরের ঘরে বালগোপাল প্রতিষ্ঠিত। সে কিসের কী পুজো করবে, সে শুধু গোপীভাবেই তন্মনা। গঙ্গাজলের কলসী মাথায় নিয়ে তার শুধু অবিচ্ছিন্ন ডাক—কে গো-রস কিনবে?

একদিন স্বগণ নিয়ে নিত্যানন্দ এসে উপস্থিত। গোপাল-লীলায় নৃত্য সুরু করে দিল। মাধব ঘোষ দানখণ্ড কীর্তন জুড়ল। নানারঙ্গে নিত্যানন্দ দানখণ্ড নৃত্য করলে।

গদাধরের শরীরে বাহ্যজ্ঞান নেই। সে ব্রজাঙ্গনার আবেশেই সমাহিত।

কিন্তু সেদিন রাত্রে তার অন্যমূর্তি।

সে হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল কীর্তনদ্বেষী কাজীর মোকাবিলা করতে। যে কাজীর ভয়ে সবাই তটস্থ তাকে তার এতটুকু ভয় নেই। সরবে হরিনাম করতে-করতে সে এগোচ্ছে, এগোতে-এগোতে একেবারে কাজীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, কাজী কোথা? তাকে ডাকো, সে আমার মত হরি বলুক, কৃষ্ণ বলুক। সবাই বলছে, সে কেন বাকি থাকে?

অগ্নিশর্মা হয়ে বেরিয়ে এল কাজী। কিন্তু কৃষ্ণাবিষ্ট গদাধরকে দেখেই শান্ত হয়ে গেল। মুখে রোষভাষ এল না। বললে, তুমি কী মনে করে?

চৈতন্য-নিত্যানন্দ জগৎসংসারকে হরি বলাচ্ছে, তুমিই শুধু বাদ পড়েছ। তাই আমি তোমার দুয়ারে এলাম। বলো তুমিও হরি বলো।

কাজী গদাধরকে প্রবোধ দেবার ছলে বললে, 'তুমি আজ যাও, কাল এস, কাল হরিনাম করবো।

আর কাল কেন? হাসল গদাধর : আজই তো এখুনিই তো হরিনাম উচ্চারণ করলে। এই একবার নামোচ্চারণেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে গেল।

নীলাচল থেকে গৌরাঙ্গ গৌড়ে এসেছেন। এসেছেন পানিহাটিতে, রাঘবভবনে। খবর পেয়ে গদাধর ছুটে এসেছে, প্রভুর পায়ের কাছে নত হতেই তিনি তার মাথায় চরণ তুলে দিলেন।

প্রভুর তিরোভাবের পর গদাধর নবদ্বীপে চলে এল। প্রভু যান কিন্তু মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া আছেন। যতটুকু পারা যায় তাঁরই কাছাকাছি থাকব, তাঁরই সেবা করব।

বিষ্ণুপ্রিয়াও যখন অপ্রকট হলেন, তখন নবদ্বীপে তার আর আকর্ষণ রইল না। সে কণ্টকনগরে চলে গেল। সেখানে গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তার সেবার্চনায় বাকি জীবনটুকু নিবেদন করে দিল।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম দিন ছেলেকে নিয়ে আপিসের গাড়িতে না গিয়ে ট্যাক্সি করে সবার আগে সুধা আপিসে গিয়েছিল। সহকর্মিণীদের প্রশ্ন সে এড়াতে চেয়েছিল। মনে মনে ছেলে সঙ্গে করে আপিস আসার অনেক কৈফিয়ৎ তৈরী করেছিল। ছেলেকে কোন স্কুলে ভর্তি করবে, কি কোন ডাক্তার দেখাবে, কি কোন আত্মীয়ের বাড়ী পেঁাছে দেবে ইত্যাদি।

কিন্তু সহকর্মিণীরা সে দিক দিয়েই গেল না। আপিসে সুধার ছেলেটির উপস্থিতি তারা একটা আনন্দের ব্যাপার করে তুললো। অপর্ণা তো নিজের পাশে বসিয়ে নানাভাবে স্নেহার্দ্র হয়ে উঠলো। বাচ্চুও ভারি মজা পেল—এটা ধরে সেটা নেড়ে ওদের মাতিয়ে তুলল। সুধা মাঝে মাঝে এসে শাসন করে যেতে লাগল, বাচ্চু দুষ্টুমি করো না! চুপটি করে বসে থাক!

বেশ ফুটফুটে, সজীব প্রাণবন্ত ছেলে। সে কখনো স্থির হয়ে থাকতে পারে?

অপর্ণারা সুধাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, তুমি যাও তো, আমরা দেখছি।

নীলা তো বাচ্চুকে একেবারে কোলের ওপর বসিয়ে নিয়েছে। ছন্দা চোখের ইশারা করে দেখালে।

মুচকি হেসে অপর্ণা বললে, খুব ভাল লেগেছে নারে? বেশ ছেলে না?

নীলা বাচ্চুকে কোল থেকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে আদর করতে লাগল।

ছন্দা বললে, ভাবনা নেই, তোরও হবে—আর ক'টা দিন সবুর কর।

নীলা গর্জন করে উঠলো, ভারি অসভ্য!

ওরা হেসে উঠলো, বাচ্চুও ওদের মুখের দিকে চেয়ে ছোট ছোট দাঁত বার করে হাসতে লাগল!

ওরা লক্ষ্য করল না, সুধা ওদের এ রহস্য-কৌতুকে যোগ দিলে না। পিছন ফিরে দরজার কাছ থেকে সরে গেল। অনেকটা যেন আহত হয়ে।

"বাচ্চু, তোকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হয়েছে। কি লজ্জায় পড়তে হচ্ছে বল। তুই যদি ঘরে থাকতিস্, তোকে যদি লুকিয়ে ঢেকে রাখতে পারতুম রে!"

সুধা নিজের ঘরে এসে টাইপরাইটারের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসল। বাচ্চুর কান্না যেন কানে বাজতে লাগল—কেঁদে কেঁদে সারা ছেলে একেবারে!

ডিকটেশন দিয়ে বোসসাহেব বললেন, তাহলে তো আপনার খুবই অসুবিধে ছেলেকে সঙ্গে করে আপিসে আনতে হচ্ছে!

সুধা নোট-খাতা নিয়ে উঠতে উঠতে বললে, হাঁ।

বোসসাহেব বললেন, আজকাল একটা সমস্যা—মোটামা অবস্থা আপনাদের। সুধা কথাটা বুঝতে পারলে না, আবার কথার মাঝখানে চলেও যাওয়া যায় না। বেশ অসহায়-ভাবে সাহেবের মুখের দিকে চাইলে।

বোসসাহেব বললেন, চাকরিও করতে হবে আবার ছেলেও দেখতে হবে। আপিস ছাড়বে না, ছেলেও ছাড়বে না।

যেন অপরাধী হিসাবে সমাজ হয়ে সুধা ধর্মাধিকরণে জবাব দিতে এসেছে। বলবার যেন তার কিছু নেই, অপরাধ সে স্বীকার করছে।

বোসসাহেব বললেন, আমাদের আপিসে আবার ছেলে-পড়াবার ব্যবস্থা নেই। শুনেছি গভর্ণমেন্ট আপিসে মা কোথায় ব্যবস্থা হ'চ্ছে—কি বলে যেন টারমুটা?

সুধা মনে মনে রুষ্ট হয়ে ওঠে। 'বস' বলে যে এমনি করে বলবেন তার মনঃপুত নয়। বললেই পারেন, কাল থেকে ছেলেকে আপিসে আনবেন না, খারাপ দেখায় কি কাজের অসুবিধে হয়।

হঠাৎ বোসসাহেব যেন বড় অন্তরঙ্গ হ'তে চান; জিজ্ঞেস করলেন, আগে কি করতেন? কার কাছে ছেলেকে রাখতেন? আপনার স্বামী?

সুধা বেদনাহত মুখটা বোস-সাহেবের মুখের ওপর তুলে বললে, কাল থেকে আর ওকে আনবো না।

না না, আমি তা বলিনি মিসেস ভট্টাচার্জি। আপনার সুবিধে যখন নেই, তখন—বোসসাহেব তাড়াতাড়ি বললেন।

সুধা নিরুত্তরে বললে, আমি এখানে যাই।

হ্যাঁ, কিন্তু দয়া করে কিছু মনে করবেন না যেন। আই মিন নো অফেন্স্!

ততক্ষণে সুধা বোস-সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ইচ্ছে করল, নিজের ঘরে বসে, দরজা বন্ধ করে খানিক কাঁদে। ছেলেকে সঙ্গে করে আপিসে এনে কি অন্যায় কাজ করেছে! ছি ছি, সবার কাছে অদ্ভুতের একশেষ! কি ভাবছে সব, একটা হাসির-খোরাক বটে!

বোস-সাহেবে প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করেন নি—'আপনার স্বামী' বলে চুপ করে গেছেন। আপনার স্বামী? মানে, কি করেন? তিনি ছেলের ব্যবস্থা করতে পারেন না? ইত্যাদি আরো কত প্রশ্ন করতে পারতেন। হয়তো বুঝতে পেরেছেন সুধার বর্তমান একক অবস্থানের কথা! স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিভেদটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন—

বাচ্চু আবার গেল কোথায়? এখানে সঙ্গে করে এনেও কি শান্তি পাওয়া যায়! চুপ করে কিছুতে এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যায় না ছেলেকে। তারপর নতুন মাসীদের আদর আছে। উঃ ছেলেকে নিয়ে এক জ্বালা হয়েছে!

যেন রাগ করে সুধা নিজেকে বললে, যাক, সে আর দেখবে না।

বোস-সাহেবের নোটটা টাইপ করতে করতে হঠাৎ যেন কেমন শিহরিত হ'য়ে ওঠে সুধা। মাথা নিচু ক'রে ডিক্টেশন নিলেও সুধা যেন বুঝতে পেরেছিল, টের পেয়েছিল বোস-সাহেব তার দিকেই ঠায় চেয়েছিলেন। অন্যদিনের ব্যতিক্রম। প্রায় মুখ ফিরিয়ে তিনি ডিকটেশন দেন। ডিকটেশন দেবার সময় কেমন যেন নির্মম-কঠিন মনে হয় বোস-সাহেবকে। কথাগুলো এমনভাবে বলেন যেন রাগ করে বিরক্তির সঙ্গে বলছেন। প্রথম প্রথম সুধার খুব ভয় হ'তো। কি জানি কি শুনতে কি শুনেছে, কি লিখছে। নিজের ঘরে উঠে এলে যেন স্বস্তি। আজ কিন্তু গলার স্বর বলার ভঙ্গি ভিন্ন—মাথা না তুলে সুধা বুঝতে পেরেছিল, বোস-সাহেব তাকে লক্ষ্য করছেন। তাই বুঝি তার ঘরের খবর জানতে চেয়েছিলেন।

আন্তরিক না, কেবল কৌতূহল? সুধা নিজেকে যেন প্রশ্ন করলে, একটা ভুল কথা টাইপ করে রবার ঘসে ঘসে মুছতে লাগল।

সত্যি বাচ্চুকে নিয়ে সে ভারি লজ্জায় পড়েছে! সুধা বোস-সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি, কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিল, সাহেবের মুখটা কেমন কৌতুক-হাস্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাচ্চু যদি না থাকতো, তাহ'লে তাকে আজ এমনি লজ্জায় পড়তে হ'তো না। টাইপ করতে করতে আবার একটা ভুল অক্ষর ছাপা হ'য়ে গেল! ইস-স্—

সুধা টাইপ করা থামিয়ে খানিক চুপ করে বসে রইল। আশ্চর্য দৃষ্টিটা কেমন যেন শূন্য হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়ছে ছবির মত ছেলেবেলায় সেই ইংরেজী কবিতাটা—মেরীর একটা মেষশাবক ছিল, একদিন মেরী তাকে সঙ্গে করে স্কুলে এসেছিল, তারপর কি কৌতুকের সব চিত্র মেরীর মেষ-শাবককে নিয়ে—কুটফুটে, সাদা ধবধবে মেষশাবক, এখানে যায়, ওখানে যায়, উঃ কি কান্ড! হৈ-হুল্লোড় স্কুলের মেয়েদের।

সুধার কানে এখনো যেন কবিতার সেই লাইনটা বাজছে—দ্যাট ওয়াজ এগেনস্ট দ্য রুল! যতই আদরের হোক ভাবলে সঙ্গে ক'রে তুমি তোমার কোন প্রিয়পাত্রকে স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রে আনতে পার না, সেটা নিয়মবিরুদ্ধ—

বাচ্চুকেও সঙ্গে ক'রে আপিসে আনা সুধার উচিত হয়নি। নিয়মবিরুদ্ধ, নীতি-বিরুদ্ধ, লজ্জাকর।

এই লজ্জা—

টাইপরাইটারের চাবিটা যেন আটকে গেছে। অক্ষরটা ওঠে না। খুব কড়া ভাষায় বোস-সাহেব চিঠি লিখেছেন, অনেক দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন।

সুধাও যেন মনে মনে একজনের দোষ-ত্রুটির পর্যালোচনা করে। না, তার বর্তমান অবস্থার জন্যে সে আদৌ দায়ী নয়. সে তার যোগ্য ব্যবহারই করেছে, নিজেকে সে অনেক অবনত করেছে।

মনটা যেন টাটিয়ে ওঠে, একটা অপমান-বোধ ধিক্কার দেয়, ছি ছি! এতবড় ভুল সে করলো কি করে! সহাই বা সে করেছিল কি করে!

বোস-সাহেব চিঠিতে হুমকি দিয়েছেন, কোর্টে যেতে আমরা বাধ্য হ'বো!

কোর্টের কথা তারও মনে হ'য়েছিল, কিন্তু—

ছি ছি, সে আরো বিশ্রী কান্ড! শেষ-পর্যন্ত উভয়ের মতে কোর্টের বাইরে মীমাংসা হয়েছে—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

মুখ তুলে সুধা সামনে চেয়ে দেখলে। মনে হল, নিশ্বাসটা যেন আটকে আসছে। চারদিক বন্ধ একফালি ঘরটা যেন তলো-য়ারের খাপের মত নিস্পন্দ, স্থির কঠিন।

হঠাৎ বাচ্চু ওপাশের স্টেনোগ্রাফারদের ঘর থেকে ছুটে এসে ঘরের পর্দাটা জড় করে মুখ বার ক'রে উঁকি দিলে।

সুধা যেন কেঁপে গেল, ছুটে গিয়ে ছেলের কান ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে পিঠে এক চড় কষিয়ে দিলে। বাচ্চু চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। সুধা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে কান্নার শব্দটা চাপতে চেষ্টা করলে। বড় লজ্জায় পড়লে, ইচ্ছে হল ছেলেটাকে মেরে একেবারে শেষ ক'রে দেয়। কি জ্বালাতন!

ছেলের মুখ চেপে সুধা গর্জন করলে, ফের? আবার কাঁদছিস? অসভ্য ছেলে কোথাকার!

বাচ্চু আরো চীৎকার করতে লাগল। সুধা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলে। উঃ কি মুশকিল ছেলে নিয়ে!

সুধা ক্রন্দনরত ছেলেকে ছেড়ে নিজের আসনে এসে বসল। কাঁদুক ও যত পারে! বলে বলে কিছুতে ছেলেকে একখানে চুপ ক'রে বসিয়ে রাখতে পারা যায় না। সেই ছেলে এঘর ওঘর ক'রে বেড়াবে! যেন নিজের বাড়ীঘর পেয়েছে! হতভাগা কোথাকার!

আশ্চর্য, হঠাৎ বাচ্চুর কান্নাও থেমে গেল। সে মা'কে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে অবাক হ'য়ে গেছে।

বন্ধ দরজায় ঘা পড়ল। সুধা উঠে চোখ মুছে দরজা খুলে দিলে।

কি ব্যাপার? দু'জনেই চোখ মুছছো! অপর্ণা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস ক'রলে

বিরক্তির সুরে সুধা বললে, দেখ না, এমন বজ্জাতি আরম্ভ করেছে ছেলেটা!

অপর্ণা চকোলেটের প্যাকেটটা বাচ্চুর হাতে দিয়ে বললে, না না খুব লক্ষ্মী ছেলে। বাচ্চু সোনা!

সুধা মুখ বিকৃত ক'রে বললে, সোনা না ছাই! তোমরাই ওর মাথাটা খেলে!

অপর্ণা হেসে বাচ্চুর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরে বললে, কি সুন্দর মুখখানা!

কথাটা খচ্‌ ক'রে গিয়ে সুধার বুকে বিঁধলো যেন। কি সুন্দর মুখ? তাদের একলা মেলামেশার কারণ কি? আকর্ষণ কোথায়? কি দেখে তারা—

সুধা নিজেকে বোঝাতে পারে নি। নীরেনের মুখে-চোখে কি যেন একটা ছিল, সুধা বারবার বড় আকর্ষণ বোধ করেছিল। কি ছিল সে-মুখে? কিসের জন্যে সে অমন অস্থির হ'য়ে উঠেছিল।?

আশ্চর্য সে-এক মনের অবস্থা গেছে। এখন বুঝি তাকে বলা যায় মোহ! মনকে কড়া ধমক দিয়ে সুধা বললে, তেমনি শিক্ষা পেয়েছে!

অপর্ণা জিজ্ঞেস করলে, ছেলের কার মত মুখ হ'য়েছে ভাই, তোমার না তাঁর?

সুধার মুখচোখ আরক্ত হ'য়ে ওঠে! মনে হল এখনি রক্ত ঝরবে বুঝি!

অপর্ণা আবার জিজ্ঞেস করলে, বাপের মতন? তোমার মতন নয় কিন্তু!

বাচ্চু কান্না ভুলে চকোলেট খেতে আরম্ভ ক'রলে।

সুধার মনে হল ছেলেটা বাপের মতই হয়েছে. একটুও হায়া নেই। চকোলেটটা কেমন ক'রে ধরে খাচ্ছে দেখ না, সুধারই লজ্জা করছে! হ্যাংলা!

অপর্ণা বললে, বাপকে খুব সুন্দর দেখতে বুঝি?

কেন আমাকে কি খুব খারাপ দেখতে? সুধা হাসবার চেষ্টা ক'রলে।

অপর্ণা বললে, না না, তোমাকেও খুব—

অপর্ণা কথাটা সম্পূর্ণ করলে না, মুখ টিপে হাসতে লাগল। মানেটা, না হ'লে কি আর এমন সুন্দর ছেলে হয়! নিশ্চয়ই উভয়ের সৌন্দর্য উভয়ের কাছে সমানভাবে ঋণী!

সুধা মুখ ব্যাজার করে বললে, সুন্দরে ঘেন্না! বড় হ'য়ে ঐ ছেলে আবার কত জ্বলাবে কে জানে!

অপর্ণা হেসে বললে, কেন, তিনি বুঝি খুব জ্বালান?

সুধা উত্তর দিলে না। তার সহকর্মিণীরা কেউ জানে না তার বর্তমান অবস্থার কথা। সবাই মনে করে দুজনেই চাকরি করে বলে ছেলে নিয়ে মুশকিলে পড়েছে! আত্মীয়-স্বজনের অভাব। এ এক সমস্যা আজকাল। বিশেষ করে যারা আত্মীয়স্বজন থেকে বিযুক্ত হ'য়ে কেবল স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে জোর করে তাদের তো বটেই। হয়তো তিনটা সমক্ষেত্রে এক—সংসারে পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে গেলে পাঁচজনের মতে নিজে রে থাকতে হবে, নয়তো বিরোধ ক'রে স্বাধীন মতে একলা থাকতে হ'বে। ভাল-মন্দ যাই হোক, সব দায়িত্ব নিজেদের।

বাচ্চুকে পাশে বসিয়ে অপর্ণা বললে, কাল নীলা বলছিল বিয়ে করে শেষটা ঝামেলায় না পড়ে!

সুধা জিজ্ঞেস করলে, ঝামেলা আবার কি?

অপর্ণা হেসে বললে, এই আর কি! সব নিজেদের করতে হ'বে! তারপর ভবিষ্যতের ভাবনা!

ইঙ্গিতটা যেন সুধাকে খোঁচা দেয়। ভাবলে, নীলা তার মত বোকা নয়, খুব হুঁশিয়ার!

অপর্ণা বললে, অত ভাবতে গেলে কখনো চলে!

সুধা চুপ ক'রে গেল। ভেবে দেখলে সে বোধহয় এমন ভাবনা করেনি। আর তাই বোধহয় দুঃখ পাচ্ছে। তার নিজেরই অদূরদর্শিতা!

এমন মেয়ে কখনো দেখিনি, ভেবে ভেবে শেষটা না পাগল হ'য়ে যায়! অপর্ণা হাসতে লাগল।

তারপর মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, সব-সময় এমন একটা সিরিয়স ভাব দেখায় যেন ফাঁসির দড়িটা ওর সামনে ঝুলছে!

সুধা বললে, সিরিয়স নয়?

অপর্ণা ঠোঁট উল্টে বললে, সিরিয়স না হাতি! আমি হ'লে কবে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলতুম।

সুধা বললে, বেচারা হয়তো তোমার মত এক্সপিরিয়েনসড্ নয়!

কথাটা অপর্ণা বুঝলে, কিন্তু আমল না দিয়ে বললে, আমি অত ভাবনাচিন্তার ধার ধারি না, হ্যাঁ না বুঝতে কতদিন লাগে? তুমিই বল!

অপর্ণার কথাটা আর স্পষ্ট করে তুলতে চাইলে না সুধা। জানে বেচারা অন্তত তিনবার প্রেমের ব্যাপারে পিছিয়ে এসেছে। খুব ধৈর্য ধরে থাকার মেয়ে ও নয়। সুতরাং চতুর্থবারের জন্যেও ওর আপত্তি নেই।

অপর্ণা বললে, তুমি যদি ওর অবস্থাটা দেখতে! রবি বর্মার শকুন্তলার ছবির মত কেবল গালে হাত দিয়ে ভাবছে!

হঠাৎ সুধা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসলে, দেখতে কেমন রে?

চোখের কোণে হাসি মাখিয়ে অপর্ণা বললে, কে?

সুধাও হাসলে, বললে, কে আবার, যার কথা ভাবছে!

অপর্ণা গম্ভীর হ'য়ে গেল, তারপর যেন বিরক্ত হ'লো। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, আমি কি ক'রে জানবো!

কেন, ভাবনাটা জান আর তার রূপটা জান না? সুধাও মেজাজ দেখিয়ে বললে।

অপর্ণা তেমনি গম্ভীর হ'য়ে বললে, না না, আমি কিছু জানি না, সত্যি দেখিনি—

সুধা মানলে, তা তো বটেই, দেখিয়ে দেখিয়ে কে আর ভালবাসে!

কিন্তু যাবার সময় অপর্ণা সুধার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, মিথ্যে বলবো না, আমি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে রিজেক্ট ক'রে দিতুম! ম্যাগো কি দেখতে! নীলার কি দেখে যে ভাল লাগল কে জানে!

অপর্ণা সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল। সুধার মনে হল দরজায় যেন তার মাথাটা ঠুকে গেল। সব যেন কেমন অন্ধকার-অন্ধকার মনে হল।

তারপর কথাটা নিজের মনে সুধা নাড়া-চাড়া করলে। কি দেখে যে ভাল লাগে—কারণ কিছু বোঝা যায় না। মনে করতে পারে না সে নিজে কি দেখে আকৃষ্ট হ'য়েছিল। কি দেখেছিল, কি শুনেছিল, কি অনুভূতি তার তীব্র হয়েছিল—স্পর্শ না, গন্ধ, না দর্শন? কি মানুষকে ভোলায়?

নীলার প্রণয়ী যদি দেখতে কুৎসিত হয়ও তাতে কি! অপর্ণার মত কেবল দেখে বেড়ালে তো অবিশ্বাসীই হ'তে হয় জীবন-ভোর! রূপ দিয়ে মানুষ কি করবে? না না, খুব রূপবান নীরেন নয়। হয়তো অপর্ণার চোখে নীলার প্রণয়ীর মত দেখতে লাগবে। উঃ খুব বেঁচে গেছে সহকর্মিণী অপর্ণা নীরেনকে কোনদিন দেখেনি! বাচ্চুকে দেখে তার বাবার রূপের আন্দাজ করেছে। খুব সুন্দর!

মুখে অস্ফুট শব্দ ক'রে সুধা বললে, সুন্দর!

কথাটা নিয়ে মনে মনে যেন ব্যঙ্গ করলে।

বাচ্চু, কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে আপিসে আসবে না বলছি! ...বায়না করবে না, না না কিছুতে আসতে চাইবে না!"

বাচ্চু, চুপ করে মার মুখের দিকে চাইলে। সুধা ছেলের হাত ধরে চলতে চলতে বললে, বড় হ'য়েছ এখন, একলা-একলা থাকতে পার না? কত খেলনা কিনে দিয়েছি, না? আপিসে কখনও আসতে আছে! লক্ষ্মীটি এস না, আসবার জন্যে বায়না করো না। কেমন?

বাচ্চু কোন সাড়া করলে না। গুটি-গুটি মার হাত ধরে এগোতে লাগল।

চল আজ তোমাকে আরো খেলনা কিনে দোবো! কি চাই তোমার? সুধা ছেলের হাত ধরে নাড়া দিলে, বল কি চাই তোমার?

বাচ্চু কোন কথা বললে না, সে আজ কেমন যেন মায়ের ব্যবহারে অবাক হ'য়ে গেছে। তার চার বছরের জীবনে মার মুখে এমন কথা সে কোনদিন শোনেনি।

পথচারী কেউ লক্ষ্য করছিল কিনা কে জানে, সুধার কিন্তু মনে হল আশপাশের সবার দৃষ্টি যেন তার দিকেই—সবাই যেন তাকেই দেখছে ঃ ছেলের হাত ধরে বেশ সুন্দর এক দৃশ্য যেন রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ছবির মত দেখত যেন! কৌতূহলী পথচারীর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে সুধা থেকে থেকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়, বিশেষভাবে লক্ষ্য না করে।

সামনের মোড়টায় গাড়ির ভিড় বেশি। অনেকক্ষণ ছেলের হাত ধরে সুধা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। উঃ কত গাড়ি, রাস্তা আর ফাঁকা হয় না! মানুষ! মানুষ! গাড়ি!

গাড়ি! গাড়ি আর মানুষে বুঝি তফাৎ করা যায় না।

বাচ্চু সংগে না থাকলে এতক্ষণে সুধা কখন বাড়ি পৌঁছে যেত। আপিসের গাড়িতে দিব্যি চলে আসতো! ভাবতো তাদের মত ভাগ্য কম চাকুরে মেয়ে-পুরুষের হ'য়েছে। গায়ে এতটকু আঁচ লাগে না, আপিস আসার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে হয় না! এমন কি পোষাকের এতটুকু ভাঁজ নষ্ট হয় না।

ক'দিন বাচ্চুকে সংগে আনা-নেওয়া থেকে সুধা আপিসের গাড়ি চড়া ছেড়ে দিয়েছে। বড় লজ্জা সবার সংগে ছেলে কোলে ক'রে আসা! হোক তারই ছেলে তবু বড় লজ্জা! অপর্ণায়া তার এ-লজ্জার কোন নাকি মানে করতে পারে নি। সুধা শুধু শুধু কষ্ট করছে। লজ্জা পাচ্ছে!

কষ্ট! কথাটা মনে হ'তে সুধা কঠিন হয়ে ওঠে। কষ্ট? কষ্ট কেন হ'তে যাবে? কিসের জন্যে কষ্ট হবে? কেউ তাকে কোন কষ্টই দিতে পারবে না! এই তো কেমন চাকরি করছে, চাকরিতে উন্নতি হ'য়েছে, আরো উন্নতি হবে—

কখন রাস্তাটা ফাঁকা হ'য়ে গেছে। সুধা ছেলের হাত ধরে টান দিয়ে বললে, আয়, আয় শিগ্‌গীর!

রাস্তার মাঝখানে এসে সুধা দাঁড়িয়ে পড়ল, আবার রাস্তা খুলে গেছে, পিছন থেকে গাড়ি ছুটে আসছে। অদ্ভুত একটা অবস্থা রাস্তার মাঝখানে, না পারা যায় এগোতে, না পারা যায় পিছুতে। সামনে পিছনে বিপদ যেন মুখিয়ে আছে। এখন চাপা পড়া কত সহজ—হঠাৎ বড় ভয় পায় সুধা।

"উঠে আসুন, উঠে পড়ুন!"

বোস-সাহেব গাড়ির দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন। আশেপাশে এত গাড়ি যে সুধা কিছু ভাববারই সময় পেল না, প্রায় চোখকান বুজিয়ে বাচ্চুকে নিয়ে বোস-সাহেবের গাড়িতে উঠে পড়ল। আর একটু অপেক্ষা করলে যেন নির্ঘাত চাপা পড়ে যেত।

বোস-সাহেব নিজে গাড়ি চালিয়ে আপিস থেকে ফিরছেন। হ্যাঙ্গারে কোটটা পিছনের সিটে ঝুলছে, বেশ ছিমছাম ফাঁকা গাড়ি, একটা কাপড়ের পুতুল কারের জানলার ওপর ঝুলছে।

বোস-সাহেবের সুন্দর টাইটা হাওয়ায় উড়ছে। সুধা ছেলেকে নিয়ে স্পর্শ বাঁচিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে বসল। মনে হল এক-ডাকে গাড়িতে উঠে পড়ে ভাল করেনি। কেমন কেমন লাগছে, বেশ অস্বস্তি।

একটু ফাঁকায় গাড়ি আসতে বোস-সাহেব বললেন, ট্রামে-বাসে আজকাল খুব ভিড়। আপিসের গাড়িতে ফেরেন না কেন?

সুধা চুপ করে রইল। বলতে পারলে না সঙ্গে ছেলে আছে বলে লজ্জা করে। আপিস তাকে আসা-নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে, তার ছেলেকে তো! অন্যায় সুবিধে কেন সে নেবে!

বোস-সাহেব বললেন, খুব কষ্ট আজ-কাল ট্রাম-বাসে যাওয়া-আসা করা!

সুধা বাচ্চুকে কোলের ওপর চেপে ধরে মাথা নাড়লে। এতদিন বোঝেনি এখন বুঝছে।

বলতো বটে নীরেন, তোমার কি, আপিসের গাড়িতে যাও আপিসের গাড়িতে ফিরে আস, বুঝতেই পার না ঠেলাটা!

ইদানিং রোজ প্রায় আপিস থেকে রক্ত ক'রে বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ হিসাবে নীরেন কথাটা বলতো। তখন কি আর এমনি ক'রে কোনদিন সে-কথা বুঝতে পেরেছে না অনুভব করেছে।

এক একদিন সুধা বলেছে, তুমিও গাড়ি ক'রে আসতে পার!

গম্ভীর হ'য়ে নীরেন বলেছে, হ্যাঁ বাড়ি ভাড়া আর গাড়ি ভাড়ায় মাইনেটা সব খরচ ক'রে দিই!

সুধা খুব একটা যেন হিসাবের কথা বলেছিল, কেন আমার তো লাগছে না, সেইটা তোমার জন্যে খরচ করবে—ট্যাক্‌সি করে আসবে।

নীরেন কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু যান-বাহনের সমস্যা নিয়ে নীরেন অভিযোগ করতো—এক একদিন এমন বিরক্ত হ'য়ে আপিস থেকে ফিরতো সুধার ভাল লাগতো না। একদিন সুধার উদ্বেগ আর আগ্রহের উত্তরে নীরেন বলেছিল, তোমাদের মত তো আর সেজেগুজে গাড়ি চড়ে আপিস যাই না, কি বুঝবে!

দোষের মধ্যে সুধা বলেছিল, এই দেখ, আজও আবার তোমার জামায় কি লেগেছে? কাঁধটা বোধহয় ফেটে গেছে!

কি কথায় কি উত্তর দিয়েছিল নীরেন! সম্প্রতি মেজাজটা তার তিরিক্ষি হ'য়ে উঠেছিল।

বোস-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় থাকেন?

অনেক চেষ্টা করে যেন অস্বস্তিটাকে সুধা কাটাতে পারে, বললে, এস আর দাস রোড, লেকের ধারে।

বোস-সাহেব জায়গাটা তখুনি চিনলেন, সংগে সংগে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, টালিগঞ্জ ব্রীজের এপারে।

অস্থির বাচ্চুকে আরো চেপে কোলের মধ্যে নিয়ে সুধা মাথা নাড়লে।

সদর রাস্তায় ভিড় এড়াবার জন্যে বোস-সাহেবের গাড়িটা মাঠের রাস্তা দিয়ে দিয়ে আসছিল। পায়ে হেঁটে আর গাড়িতে ক'রে এদিকের রাস্তায় চললে যেন মনের ভিন্ন ভাব হয়। কত পরিচিত গাছ-পালা-মাটি-ঘাস যেন চেনাই যায় না।

মা'র কোল থেকে ছিটকে বাচ্চু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, ভিক্‌টোরিয়া! ভিক্‌টোরিয়া!

বোস-সাহেব গাড়ি বেঁধে ফেললেন, সুধা যেন লজ্জায় মরে গেল।

বোস-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এখানে নামবেন নাকি?

সুধার বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। একটা অদ্ভুত ব্যাথায় দেহ-মন যেন অবশ হ'য়ে গেল। সুধা কোন কথা বলতে পারলে না।

বোস-সাহেবও যেন অপ্রস্তুত বোধ করেন। সহকর্মিণীকে বাড়ি পৌঁছে দেবার নাম করে' এ আবার কি প্রস্তাব তিনি করলেন।

বাচ্চুর উৎসাহও কমে গেছে। কোন কিছু ভেবে সে বলেনি। পরিচিত জায়গা বলেই তার উৎসাহ উচকিত হয়েছিল।

সুধা জড়তা কাটিয়ে বললে, চলুন। ও অমনি চেঁচাচ্ছে!

বোস-সাহেব বুঝি হাসলেন। গাড়ি ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালকে পিছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে এল।

এই মুহূর্ত্তে সুধা কিন্তু কিছুতেই ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালকে পিছনে ফেলে আসতে পারছে না। বাচ্চুর ঠিক মনে আছে, সেই শৈশবের যখন তারা একটা ছুটির দিনে দুদিক থেকে দুজনে ছেলের হাত ধরে ঐ স্মৃতিমন্দিরের চত্বরে উঠেছিল। ছেলেকে নিয়ে সেইদিন ওরা ছেলেমানুষের মত অনেক ছোটাছুটি করেছিল। তখন কিন্তু একবারও মনে হয়নি, এই ছুটি, এই খুশি, এই আমোদ আর এই পরিপূর্ণতা একদিন ছুটে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে।

বাচ্চু কেন, তার আগেও তো কতদিন তারা এখানে আশেপাশে আলো-অন্ধকারে এসে বসেছে, দাঁড়িয়েছে, ঘোরাঘুরি করেছে। আশ্চর্য আকর্ষণ বোধ করেছে জায়গাটার প্রতি!

বাচ্চু তখন হয়নি, বাড়িতে তখন তাদের নিয়ে বেশ রাগারাগি, কানাকানি চলছে: কিন্তু এখানে এসে সুধা যেন সব ভুলে যেত —তারা দুজনে ছাড়া জগৎসংসারে যেন আর কেউ থাকতো না। সময় কেটে যেত বড় তাড়াতাড়ি।

একদিন সুধা নীরেনকে দেখালে, দেখ লোকটা বোধহয় আমাদের ফলো করছে। রোজ দেখি আমাদের দিকে চেয়ে কি যেন দেখে!

সুধাকে কাছে টেনে নীরেন বলেছিল দেখে যদি বেচারা সুখ পায় তো পাক না।

সুধা কিন্তু ভয় পেয়েই বলেছিল, না না আমার ভাল মনে হয় না।

নীরেন হেসেছিল। এখানে এ নীরেনও কেমন বেপরোয়া হ'য়ে উঠতো যত ভয়, ভাবনা সুধাই ভোগ করতো কোথায় কে দেখে ফেললো, জেনে ফেললো তবু জায়গাটা যেন বিশেষ নিরাপদ স্থা ছিল।

গাড়ি থামিয়ে বোস-সাহেব বললে এইখানে?

সুধা অস্ফুট হ্যাঁ বলে ছেলেকে নি গাড়ি থেকে নেমে এল। তারপর হাত তু নমস্কার করলে। পিছন ফিরে সুধার মনে বোস-সায়েব যেন তাকে একটু বিশেষভা লক্ষ্য করছিলেন। আপিসের কাজের স ঠিক যেন এমন করে' দেখেন না। তার কয়েকটা প্রশ্ন যেন নিজের মনেই ক'রে ব সুধা—কেন দেখছিলেন? দেখবার কি আর ভেবেছেন বোধহয় বেচারা খুব মুশকি পড়েছে? সহানুভূতি না, অনুগ্রহ? না, কর্মিণীর প্রতি মমতা? অধস্তন করুণা? না।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হ

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

আমারে এ আঁধারে

কল্যাণকুমার বসু

(১৭)

১৯২৩ জানুয়ারী মাসে হঠাৎ সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ আসছেন মার্চ মাসে বম্বে যাওয়ার পথে লখনউতে। অতুলপ্রসাদের বাড়িতে তিন-চার দিন থাকবেন। ১লা মার্চ থেকে সম্ভবত ৪ঠা মার্চ।

ভালো একটা সম্বর্ধনা দিতে হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে। লখনউ-র বিশিষ্ট অধিবাসীরা একত্রিত হলেন।

অতুলদাদার ব্যাণ্ডক্স রোডের বাড়িতে ক্লাবের পাণ্ডাদের একটা জোর সভা হয়ে গেল। সভার প্রোগ্রাম স্থির হল। অতুলদাদা বললেন কবির আগমন উপলক্ষে আমি একখানি গান বাঁধবো। সভার শুরুতে তোমাদের গান গাইতে হবে। তারপর পাহাড়িকে বললেন, তোমাকে গানখানি গাইতে হবে। আমার কাছে এসে খবর নেবে। আমার গানখানি লেখা শেষ হলে তোমাকে শিখিয়ে দেব কেমন।

বঙ্গীয় যুবক সমিতির ছেলেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে ক্লাবঘর পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার জন্যে যাতে কোন খুঁত না থাকে—প্রবাসে এই লখনউ শহরে, তার জন্যে চিন্তিত হলেন। ঘনঘন সভা ডাকা হল।

পাহাড়ি অতুলদার বাড়িতে পৌঁছে গেল। কি অতুলদা রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার জন্য নতুন গানখানা লিখবেন বলেছিলেন লেখা হয়েছে অতুলদা?

অতুলপ্রসাদ যেন কেমন অন্যমনস্ক। শুনেও শোনেন না সেকথা। আপন কাজে ব্যস্ত।

'হবে হবে পরে হবে কাল এসো পাহাড়ি।' অতুলদা বললেন।

পাহাড়ি ফিরে আসে। পরের দিন আবার যায় অতুলদার বাড়ি। অতুলদা বলেন, 'আজ একেবারে সময় পাইনি পাহাড়ি গান লেখা হয়নি। তুমি কাল এসো।' পাহাড়ি চলে যায়। পরের দিনও সেই এক কথা। না, পাহাড়ি—গানটা লেখা হয়ে ওঠেনি, তুমি কাল এসো। গান লেখা হলেই তোমাকে সুরটা তুলে দেবো।

এমনি করে রবীন্দ্রনাথের লখনউ আগমনের দিন এগিয়ে আসে। পাহাড়ি ভাবে অতুলদা কি গান লেখবার কথা ভুলে গেছেন। নানান কাজে অতুলদার মনে থাকছে না বোধহয়। এতদিনেও গান লেখা হল না। অতুলদা গান লিখবেন, গানে সুর দেবেন, আমাকে শেখাবেন, অন্যান্য সংগীদের শেখাবেন, কি করে সম্ভব! রবীন্দ্রনাথের লখনউ আগমনের দিন যে এগিয়ে এল।

দিন সাতেক মাত্র বাকি। অতুলপ্রসাদের মনের মত গান লেখা আর হয় না যে গানখানি ক্লাবের ছেলেরা গাইবে। প্রতিদিন প্রাণপাত চেষ্টা করেন সম্বর্ধনা সভার গানখানি লেখার কিন্তু যোগ্যতম সঙ্গীতটি ধরা পড়ে না। অমনোনীত কবিতাগুলি বাতিল করে খণ্ডরূপে লেখার টেবিলের নীচের বাস্কেটটা উপচে উঠে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের লখনউ আসার কয়েকদিন আগে অতুলপ্রসাদ তার গানের যোগ্যতম কলি খুঁজে পেলেন, লিখলেন :

'চাহরে আজি ভারতমাতার প্রতি'

গানখানি রচনা হলে তাতে সুর সংযোজিত হল। সেই গানখানি ক্লাবের ছেলেদের শিখিয়ে দিলেন তালিম দিয়ে। কবিগুরু লখনউ পৌঁছলে ক্লাবের কোন সভ্যের কি কাজ, কর্তব্য, কর্ম সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন। পাহাড়ির ওপর নির্দেশ হল গান শেষ করে এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলা থেকে ধুলো তুলে নিয়ে আপন মস্তকে স্থাপনের।*

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ লখনউ এলেন প্রায়। অতুলপ্রসাদের কেশরবাগের মোড়ের মাথায় বাঙলো বাড়িখানির রংচংয়ের কাজ শেষ হল। সাজানো গোছান হল বরদোর। রবীন্দ্রনাথ লখনউ-এ যে কটাদিন থাকবেন সেকদিন যাতে ঘরে-বাইরে তাঁর কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। লোকজনের অভাব হবে না—খানসামা বেয়ারা আর ড্রাইভার সব সময়ই তাঁর হাতের ডাকের অপেক্ষায় সারা দিনরাত থাকবে। তাছাড়া বাঙালী যুবক সমিতির সদস্যরাও সবসময়েই সামান্য কর্ম করতে পেলে আনন্দিত হবে। অতুলপ্রসাদ নিজেও রইলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার জন্যে—কোন কিছুরই অভাব নেই—তবু অভাব শুধু একটি মানুষের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ যদি প্রশ্ন করেন—হেমকুসুমকে দেখছি না—তখন কি উত্তর দেবেন অতুলপ্রসাদ।

কিন্তু সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হেমকুসুম দিলীপের হাত ধরে কৈশরবাগের মোড়ের বাংলোখানিতে এসে দাঁড়ালেন। অতুলপ্রসাদ বিস্মিত এবং আনন্দিত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লখনউ আসছেন তাঁর বাড়িতে উঠছেন আর হেমকুসুম তাঁর দেখাশোনা করবেন না।

তুমি যে এসেচ আমি কি যে খুশী হয়েছি হেম...কি যে আনন্দ আজ আমার মনে।

অভিমান ভরা গলায় হেম বললেন তবু তুমি ত আমার খবর দাও নি। —কবি কবে আসছেন?

এসে পড়লেন প্রায়। অতুলপ্রসাদ খুশীভরা গলায় বললেন তুমি এসেছ তুমি লেগে যাও কবির ঘরদুয়ার সাজাতে। মনে রেখো কবি সৌখিন মানুষ।

হেমকুসুম বললেন, আমি যখন ঘরে এসেছি তোমাকে ভাবতে হবে না।

অতুলপ্রসাদ এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদিকে ব্যস্ত হলেন। ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে কবিকে রাজোচিত সম্বর্ধনায় স্টেশান থেকে বাড়িতে মিছিল করে আনয়নের পরিকল্পনা করলেন। 'মহারাজা মহম্মদাবাদের' কাছ থেকে তাঁর ল্যাণ্ডো চাওয়া হল। তাকে ফুল-লতা-পাতা দিয়ে সাজানো হল। লখনউর বিখ্যাত সানাইওয়ালা 'তালিম হোসেন' এবং তাঁর পার্টিকে ডাক দেওয়া হল। ক্লাবের কনসার্ট পার্টি তালিম দিয়ে নিজেদের তৈরী করে নিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যবাজনা সহকারে মিছিলে যোগ দেবে।

কবিগুরু লখনউ এলেন। লখনউর ইস্টিশন জনারণ্য। লখনউর প্রবাসী বাঙালী যুক্তপ্রদেশবাসীরা কবিগুরুকে দর্শন করতে আর মিছিলে যোগ দিতে এগিয়ে এল। ল্যাণ্ডো গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে যুবকেরা কবির গাড়ি নিজেরাই টেনে নিয়ে চলল। কবির যাত্রাপথের দুধারে উৎসুক জনতার ভীড়। পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। গানবাজনা ও কবির জয়ধ্বনিতে লখনউর আকাশবাতাস মুখরিত হল। কবি লাজুককণ্ঠে চুপিচুপি বললেন অতুলপ্রসাদকে 'অতুল এ কি করেছ?'

অতুলপ্রসাদের বাড়ি তীর্থক্ষেত্র হল। শিক্ষিত জনসাধারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। লখনউর প্রবাসী বাঙালীদের তরফ থেকে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হল। অতুলপ্রসাদ এবং হেমকুসুমের আতিথ্যে এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে কবি সন্তুষ্ট মনে বিদায় নিলেন।*

কবি চলে যেতেই খবর এল বাংলাদেশ থেকে বাঙলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আসছেন মে মাসে। মে মাসে দারুণ গরম লখনউ-এ। তাহোক সেই গরমের মধ্যেই কুইন্স স্কুলের মাঠে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন দেয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একখানা মিষ্টান্ন নিবেদন করা হল।

পাহাড়ি সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, ব্রজেন আদিত্য, যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রায়, অখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সকলে বাঙালী যুবক সমিতির কর্মকর্তা ছিলেন।

* শ্রীপাহাড়ি সান্যালের বক্তব্য অনুসারে।

* 'সন্তোকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডায়রি থেকে সংগৃহীত।

তিনি মিষ্টান্নে পরিতোষসহকারে মন দেওয়ার কালে অতুলপ্রসাদ গান ধরলেন ঃ

আ মরি বাংলা ভাষা মোদের গরব
মোদের আশা...

স্যার আশুতোষ মিষ্টি খাওয়া শেষ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এসে অতুলপ্রসাদকে সজোরে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করে 'বজ্রগম্ভীর নিনাদে' বলে উঠলেন, 'ধন্য অতুল, ধন্য লখনউর বাঙালী সমাজ বাংলার এত দূরে থেকেও বাংলা ভাষার এত আদর এত কদর আমার কর্ণকুহর শীতল করে দিল।'

ভাষণ শেষ হলে ছেলের দল স্যার আশুতোষকে একে একে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হল। অভ্যর্থনা সভা শেষ হলে মহাউল্লাসে ছেলের দল তাঁকে গাড়িতে চড়িয়ে শোভাযাত্রা করে অতুলদাদার বাড়ি পোঁছে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল।*

সেবার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইউনিভারসিটিতে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। কয়েকটি সুন্দর দিন অতুলপ্রসাদের বাড়িতে কাটিয়ে স্যার আশুতোষ ফিরে গেলেন কলকাতায় তাঁর কর্মভূমিতে।

(১৮)

সেদিন হাতে গোলাপকাটা কাঁচি নিয়ে, ড্রেসিং গাউন পরে বাগানে বেড়াচ্ছেন অতুলপ্রসাদ। গানের আধখানা চরণের গুঞ্জনধ্বনি হচ্ছে এমন সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদ গিয়ে পড়েছেন।

এই যে এসো কোথায় যে থাকো?

ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন, নতুন গান বুঝি, বড় মিঠে সুর তো, নতুন লিখলেন বুঝি?

হয়নি এখনো।

শোনান!

শুনবে?

এক্ষুনি।

তারপর গলার জড়তা ভেঙে আস্তে আস্তে গাওয়া।

গান গাওয়া শেষ হলে ধূর্জটি বললেন, ভালো হয়েছে।

ভালো হয়েছে?

আরো আছে নাকি গান?

এই সেদিন একটা কেসে মফঃস্বলে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে একটা বাংলোতে থাকতে দিলে তাই থাকতে পারলাম না। না লিখে—

গান লিখে? মক্কেলে টাকা দিলে?

দিলে বৈকি!

নেই বুঝি কবিতা?

ছোট্ট ছেলের মত হাসতে হাসতে দোষ স্বীকার করেন অতুলপ্রসাদ। ধূর্জটিকে সঙ্গে নিয়ে বাগান থেকে বৈঠকখানায়। অফিসঘর থেকে উকিলের ডাইরি নিয়ে এলেন তারই পাতা থেকে গানের খসড়া বেরুল। চলল গান—

চলত গান সম্বন্ধে আলোচনা ধূর্জটি এবং অতুলপ্রসাদের মাঝে।

অতুলপ্রসাদ নিজের গান আসরে ভালো গাইতে পারতেন না। সভায় অতি সহজে নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতেন, মূল সুর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরে অতুলপ্রসাদের গলা খুলত। সবচেয়ে ভালো শোনাতো গুনগুন করে গাইবার সময়ে।

অতুলদা

'আপনি বাংলাভাষায় ঠুংরী এনেছেন। যদিও মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলি শাহের বন্দীজীবনের সময় থেকেই ঠুংরীর ভাবপূর্ণ মধুর তানে বাঙালী অভ্যস্ত হয়ে এসেচে তবুও আপনি বাংলার দূত হয়ে লখনউ প্রবাসী হয়েছেন একেই ইতিহাসের প্রতিশোধ বলে—আপনার লখনউ খাস বাংলাদেশের সঙ্গীতের ইতিহাসের আধুনিক অধ্যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে আপনি যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন, এই যোগসূত্রের সাহায্যে বাউল কীর্তন ভাটিয়ালির মালা গাঁথা আপনার মৌলিকত্ব।'

সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যাখ্যায় অতুলপ্রসাদ সঙ্কুচিত হতেন। ধূর্জটিপ্রসাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, যা মনে ভাবেন তাই মুখে প্রকাশ করেন।

আপনার গানে খুব বেশী মুসলমানি চালের আমেজ আছে তবে সে আমেজ ঠিক ধ্রুপদের নয়।'

অতুলপ্রসাদ বলেন, তবে বোধহয় আমার ছেলেবেলায় শোনা আগ্রা নিবাসী কবি গোবিন্দ রায়ের গানের সুরগুলি প্রভাবিত করেছে। গোবিন্দ রায়ের 'কত কাল পরে ভারত রে' শোননি? ছেলেবেলা থেকেই আমি ঠুংরির ভক্ত হয়ে উঠি, তারপর লখনউতে এসে জাতঠুংরি শোনবার প্রথম সুযোগ হল। তবে আমার ভালো লাগতো, ছেলেবেলা থেকেই বাউল ভাটিয়ালী কীর্তন। আমার ঠাকুরদা গান এবং সুর আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমার বাবা হোলির গান লিখতেন। তাছাড়া খাল-বিলঘেরা আমাদের বাংলাদেশটায় আছে সুরের হাওয়া।

কিন্তু গানই ত আপনার জীবন, গানই ত আপনার প্রাণ। দিলীপকুমার রায় বলতেন, অতুলপ্রসাদকে। ১৯২৩ সালে প্রথম নতুন করে পরিচয় হল দিলীপকুমার-অতুলপ্রসাদের। বিদেশ থেকে দিলীপকুমার এলেন লখনউএ।

অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

ফুলে ও সুরে ভরেছ কবি প্রাণ!
কণ্ঠে তব গায় তো তাঁরি গান।
ধরণী তুমি ধরিলে আদরে।
বরদা তাই উথলে ও স্বরে।

গাইলেন তাঁর পেলব অভিমানী কণ্ঠে। দরদ ঢেলে সুরেলা মধুর কণ্ঠস্বরে। ক'জন বড় গায়কের মধ্যে সে মনোজ্ঞ সুর সে দরদ মেলে? তাঁর মুখে এ গান শুনে কার না ইচ্ছে জাগে তাঁকে এই বলে অর্ঘ্য দিতে। দিলীপকুমার রায় গাইলেন—

সুরে তব প্রাণ আলা—ফুলে ভরা হিয়া
কমনীয় গানমালা গাঁথো তাই দিয়া।
গন্ধে চিনেছ তুমি মলয়ের পথেঃ
সঙ্গীত সুধা ঢেলে চল জয়রথে।

কার না মনে হোত এ প্রাণ বড় বিরল, এ ধ্বনি ধুমের জগতের যার কাছে একথা বলা ঢঙ নয়

কুসুমের গন্ধে রূপে
সে আসে গো চুপে চুপে
মেঘের আড়াল হতে
ডাকে ঃ আয় আয় আয়।
হে মোর অচেনা বঁধু
লুকায়ে থেকে না শুধু,

এসো করি পরিচয় মালায় মালায়

দিলীপকুমার রায় এবং অতুলপ্রসাদ সেনের তখন খুব ঘনিষ্ঠতা আর ধূর্জটিপ্রসাদ তিনজনের রাজযোটক। তখন কেবল গান আর গান। লখনউর যেখানে যে ওস্তাদ তার ঠিকানা শোনা মাত্রই...তলব কর তসরিফ রাখিয়ে।

সেদিন দিলীপকুমার রায়কে অতুলপ্রসাদ বললেন, কাল সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় একখানা গান রচনা করলাম।

সে কি অতুলদা! এতক্ষণ শোনাও নি?

কি জানো একটা কথা...ভাবছি

ভেবো না অতুলদা, ভাবনা করা তোমার মানায় না, তুমি ত গান গেয়ে যাও। মনে নেই তোমার গান

মিছে তুই ভাবিস মন
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা
আজীবন।

অতুলপ্রসাদের গান রচনা করে গাইতে বড় কুণ্ঠা—এত কুণ্ঠা কেন। গান রচনা করেছেন সেও যেন অপরাধ কত সংকোচ প্রচার করতে। অথচ গান রচনা এবং গাওয়ার আগ্রহ পুরোমাত্রায়। অনুপম কবি হারীন্দ্রনাথের এ কুণ্ঠার সমর্থন

"Tell me, my love!
is it not more than wrong
To praise they beauty
as I do, in words!
Is song a sin?
— and yet all life in song
From the huge planets
to the little birds."

লখনউয়ে অতুলপ্রসাদ একাকী। হেমকুসুম যদিও অল্পদূরে লালবাগ মহল্লায় ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে দিলীপকে নিয়ে বাস করছেন। এখানে এই নির্জন বাড়িতে অতুলপ্রসাদ লোকজনের হাতের ওপর নির্ভর। বাবুর্চিবেয়ারা আয়ামালি যেন এদেরই সংসার অতুলপ্রসাদ বাইরের মানুষ—অতিথি। তাঁর এ-গৃহ যেন পান্থশালা —যাত্রীরা দু'দিনের জন্যে আসে আর যায়। দু'দিনের হাসাকাঁদা যার চিরকালের মতো ঘর বেঁধে থাকবার কথা, সে থাকে দূরে।

সুবালামাসি লখনউ এসে পোঁছে গেলেন। এসে অতুলপ্রসাদের সাংসারিক

** বসন্তকুমার বসুর পাণ্ডুলিপি থেকে ঘটনাটি সংগ্রহ ও নানান তথ্য অনুসারে।

তার আপন হাতে তুলে নিলেন। মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিলেন অতুলপ্রসাদের মন।

অতুলপ্রসাদের শরীরে আলস্য নেই। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে দিনরাত কাজে ব্যস্ত। সারা দিনরাত তাঁর দেখা মেলা ভার। সুবালামাসী অনেক সময়ে বলেন, তোমার কাছে এলাম অথচ তোমাকে দেখতে পাই না। বলেছেন, তুমি যখন এত খাটো, তুমি অনেক টাকা উপার্জন কর, কিন্তু এত টাকা তুমি কি করো?

অতুলপ্রসাদ উত্তর দিতেন, 'আমি খাটি এবং যথেষ্ট টাকা উপার্জন করি সত্যি, কিন্তু সব খাটুনিই ত' টাকা উপার্জনের জন্যে করি না। আমার কত কাজ আছে। লোকে সব কাজে আমাকে ডাকে। ডাকলে ত' সাড়া না দিয়ে পারি না।'

হেমন্তশশী যখন লখনউ-এ এসেছেন, তখন অনেকদিন অনুযোগ করেছেন, বাবা অতুল, তুই কিছু টাকা জমিয়ে একটা জমি কেন। বাড়ি কর বাবা। এ-কথা বলে বলে হেমন্তশশী হয়রান। অতুলপ্রসাদ প্রত্যেক-বারই হেসে বলেন, হবে মা বাড়ি হবে। তোমাকে আমার বাড়িতে থাকতে হবে। তোমার নামে তোমার জন্যেই একটা বাড়ি করবো ঠিক দেখো।

কিন্তু অতুলপ্রসাদের ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে যায়, জমি কেনা আর হয় না। টাকা জমানো হয় না। যত আয় তত ব্যয়।

মা রাগ করেন। দাদাভাই সত্যপ্রসাদ রাগ করেন। মা বলেন সত্যপ্রসাদকে, দেখ আমি ত' পারি না সত্য, দেখ তোর কথায় যদি অতুল খরচাপত্র কমায়। নিজের ভবিষ্যৎটুকু ভাবতে হবে না?

দাদা (সত্যপ্রসাদ) যখন মাঝে মাঝে ছুটিছাটাতে লখনউ আসতেন, তখন কত-দিন অনুযোগ করেছেন, তুমি ত' ইচ্ছে করলেই বাজে খরচা কমিয়ে টাকাটা জমিয়ে জমি কিনে বাড়ি করতে পার।

অতুলপ্রসাদ হাসতেন, বলতেন, বাজে খরচ ত' আমি করি না দাদা। মুনসিদের প্রতি অতুলপ্রসাদের নির্দেশ ছিল 'দাদা যখন লখনউ আসবেন, দাদাকে যেন জমা-খরচের খাতা দেখানো হয়।' অতুলপ্রসাদ বলতেন, দেখ দাদা, তুমিই দেখ, কোনটা আমার অন্যায় খরচ। তুমি বল!

কিন্তু তুমি নিজের জন্যে কিছু ভাবো! কিছু ত' সংস্থান কর নিজের জন্যে।

একবার বাংলাদেশে এসে সত্যপ্রসাদকে অতুলপ্রসাদ বললেন, দাদা, এবার একটা জমি কিনবো মনে করছি। কেনার কিছু সুবিধে হতে পারে যে-জায়গাটা দেখেছি, তা লখনউ মিউনিসিপ্যালিটির — স্টেশনের কাছাকাছি ভালো জায়গায়।

সত্যপ্রসাদ খুউ-ব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, জমিটা নিয়ে নাও। বাড়ি আরম্ভ করে দাও। শুরু করলেই শেষ করতে দেরী হবে না।

তোমাকে আর একটা কথা জানাই দাদা। একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমি যেখানে জমিটা কিনবো ভাবছি, সে-জায়গাটার নাম লখনউর পুরজনেরা আমার নামানুসারেই রেখেছে।

কি, কি বললে ভাই।

আর বলছ কেন! সেবার আমি যখন কলকাতায় এসেছিলাম, সেই সময়টিতে আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই লখনউর পুরজনেরা ওই জমিটার মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা বার করে রাস্তাটার নাম দিয়েছে 'এ, পি, সেন রোড'। আমি দাদা এই নামকরণের ব্যাপারে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি।

দাদা বললেন, তোমায় যে লখনউবাসীরা কত ভালোবাসেন, এ তারই নিদর্শন। অসন্তুষ্ট কেন হচ্ছ। না-না, এ-বিষয়ে আর কোন আপত্তি করো না যেন।

নজুলের কাছ থেকে পাঁচ বিঘে জমি নেওয়া হল। দখল নিলেন পরে, সে জমিতে খুঁটি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখলেন। মাকে এর মাঝে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন। মায়ের শরীর রোগে-শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়েছে। মেয়েগুলো বিধবা হল, দুটি নাতনির অকালে মৃত্যু হল—কিরণের মেয়েদুটি। ছোট জামাইটির চাকরীর ক্ষেত্রে ভীষণ গোলমাল পাকিয়ে উঠল—আর একমাত্র পুত্র অতুলের জন্যে সব সময়েই ভাবনা মনটাকে ছেয়ে থাকে। ওর মুখের দিকে বুঝি তাকাতে পারেন না হেমন্তশশী।...শরীর খারাপ হবে না মায়ের ভেবে ভেবে।

অতুলপ্রসাদ বলেন, মা তুমি এত এত ভেবো না, আমি বেশ ভালো আছি। তোমার ত' খুশী হওয়া উচিত। তোমার ছেলের বাড়ি তৈরী শুরু হবে এবার। তোমার ত' অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, চল তোমাকে জমিটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

মা যেন কেমন নিরুৎসাহ বোধ করেন—কেন যে সে-কথা বলা যায় না। অথচ ছেলের বাড়ি তৈরী শুরু হবে মনে ত' আনন্দ থাকা উচিত জমি কেনা হয়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদ খুব উৎসাহের সঙ্গে নিজেই নিজের বাড়ির নক্সা আঁকতে শুরু করে দিলেন। আজ এটা মনের মত হয়ত, কাল ওটা খুঁতখুঁত করে, আবার নতুন করে আঁকেন—আঁকান। বন্ধুবান্ধবদের দেখান, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ইট-সুরকী সিমেন্ট কাঠের দরদস্তুর খোঁজখবর নেন। আর টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করেন। বাড়ি করা কি সহজ কথা! কত কাটখড় পোড়াতে হয়।

অতুলপ্রসাদ বাড়ি তৈরীর সবরকম বন্দোবস্ত করে ফেললেন। বাড়ি শেষ হলে মাকে দিয়ে গৃহপ্রবেশ করাবেন। বাড়ি তৈরী শুরু হবে ভিৎ পুজো করে, মা অসুখে পড়লেন।

মায়ের শরীরটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত যে খারাপ হয়েছে কে ভাবতে পেরেছিল। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবস্থার ক্রমে অবনতি হল। শেষসময়ে মা একবার জ্যাঠাইমাকে* দেখতে চাইলেন। বোনেদের কাছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে জরুরী তার গেল। দূরদেশে অনেকে। ছুটে এলেন। বোনেরা অনেকে শেষসময়ে মাকে দেখতে পেলেন, অনেকের শেষদেখা আর হল না। ১৮ই বৈশাখ ১৩৩২ (ইংরিজি ১৯২৫) মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হেমকুসুম অসুস্থ শরীরে তখন দেরাদুনে। শ্রাদ্ধ-বাসরে দেরাদুন থেকে দিলীপ এল লখনউ-এ। বেদনাহত অতুলপ্রসাদ মাকে হারিয়ে পাগলের মত হলেন। কোর্টের কাজ-কর্ম, দেশের কাজকর্ম, জনসেবা, হাজারো কাজ থেকে মুক্তি চাইলেন। গুণমুগ্ধ দেশের মানুষ, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব সান্ত্বনা দিয়ে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে বেদনাহত অতুল-প্রসাদ প্রার্থনা করলেন:—

"বিশ্বজননী! সংসারে পাইয়াছিও অনেক, হারাইয়াছিও অনেক। কিন্তু এবার সকলের চেয়ে অমূল্য সম্পদ হারাইলাম—মা। তুমি আমাকে অনেক সুখে বঞ্চিত করিয়াছ কিন্তু একটি পরমসুখে একদিনের জন্যেও বঞ্চিত কর নাই, সেটি অপূর্ব মাতৃ-স্নেহ, আজ তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলে। এক-এক সময়ে মনে হয় তখন কি লইয়া থাকিব, কে আমাদের সকল সুখে সুখী, সকল দুঃখে দুখী হইবে। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায়, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্ধক্যে আসিয়া পড়ি-লাম। মার কাছে চিরকাল শিশুই হইয়া রহিলাম। যখন 'মা' বলিয়া ডাকিতাম, আর মা যখন 'অতুল' বলিয়া ডাকিতেন, তখন ভুলিয়া যাইতাম যে এতবড় হইয়াছি। শৈশবে যেমন স্নেহের শাসন পাইতাম, সেদিনও সেইরূপ পাইয়াছি। হায়! আজ তেমন করিয়া শাসন করিবে কে? তেমন করিয়া ভালো-বাসিবে কে? তেমন করিয়া সেবা করিবে কে? এই গৃহ রক্ষা করিবে কে? মাতৃহারা হইয়া নিজেকে নিঃসম্বল মনে হইতেছে বিশ্বজননী তুমি আমার সহায় হও।"

(১৯)

হেমকুসুম এখন অসুস্থ। দেরাদুনে রয়েছে। দেরাদুনে টাঙা থেকে পড়ে সেই যে আহত হয়েছিল, আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাত বুঝি আর সারল না। ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে প্রথমে মা ও ছেলে একাকী বাস করছিলেন, অতুলপ্রসাদ তাদের সকল সুবিধা-অসুবিধা দেখছিলেন। হেমকুসুমের শরীর ক্রমে মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছিল। তাকে চিকিৎসা না করলেই নয়। এমন সময়ে বিহারীলালের পুত্র মেজর জ্যোতিলাল এলেন। জ্যোতিলাল বন্ধু মানুষ, তিনি অতুলপ্রসাদকে বললেন, আমি হেমকুসুমকে দেরাদুনে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রো চিকিৎসা করে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে

* দাদা সত্যপ্রসাদ সেনের মা। অতুলপ্রসাদের 'জেঠীমা'।

পারি। আমার মনে হয়, ইলেকট্রো ট্রিটমেণ্টে হেমকুসুমে ভালো হতে পারে। অতুলপ্রসাদ বললেন, আপনি যদি মনে করেন হেমকুসুম ইলেকট্রো ট্রিটমেণ্টে সুস্থ হয়, তবে তাই ব্যবস্থা করুন। ও'র জন্যে আমি খুব চিন্তিত।

দিলীপকেও ডাকলেন। তোমার একটা কাজকর্ম কিছু শিখতে হবে।

আমার ত' ইচ্ছে বাবা ফারমিং শেখা, তোমাকে এর আগে বলেছিলাম।

আমার মনে আছে, তোমার জন্যে আমি লেখালেখি করে চলেছি।

অবশেষে দিলীপ দেরাদুনে একটা এগ্রিকালচার ফারমে শিক্ষানবীশ হয়ে প্রবেশ করল। ওদিকে অসুস্থ হেমকুসুমের ইলেকট্রো ট্রিটমেণ্ট চলল মেজর জ্যোতিলালের তত্ত্বাবধানে এক্তেন ক্লেজারের নার্সিংহোমে। অজস্র অর্থব্যয় হতে লাগল কিন্তু উন্নতির কোন লক্ষণ বিশেষ দেখা গেল না।...দিলীপের জন্যে ভাবনা, হেমকুসুমের জন্যে ভাবনা, বাড়ি প্রস্তুত সমাপ্তির মুখে, তার জন্যে ভাবনা আরো কত, কত কাজ। হাজারও চিন্তা।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ দেরাদুন রওয়ানা হলেন। হেমকুসুমের অসুস্থতার জন্যে মন খারাপ। মেজর জ্যোতিলালের চিকিৎসাতেও হেমকুসুমের শরীর কিছুমাত্র সারেনি। হেমকুসুমের শরীর স্বাস্থ্য যখন দেরাদুনে সারল না, তখন তাকে দেরাদুনে রাখার কোন প্রয়োজনই নেই, ওকে লখনউ নিয়ে এলেই হয়, লখনউতে এনে স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের দেখিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করলে হয়। তাই মনে মনে ভেবে নিলেন অতুলপ্রসাদ যতশীঘ্র সম্ভব হেমকুসুমকে লখনউতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

দিলীপ তখন দেরাদুনেই কোন একটি এগ্রিকালচার ফারমে ট্রেনিং নিচ্ছে। দিলীপকে দেখতে গেলেন অতুলপ্রসাদ। দিলীপকে দেখে বললেন, কেমন কাজকর্ম হচ্ছে তোমার, কেমন এই বিষয়টিতে মন বসছে তো? মনে মনে ভাবেন অতুলপ্রসাদ, শেষপর্যন্ত এতেও মনস্থির থাকবে তো! তাঁর একমাত্র ছেলের। বড় খামখেয়ালী ছেলে। ওর জন্যে কম চিন্তা!

অতুলপ্রসাদ বললেন, তোমার মায়ের চিকিৎসা এখানে ভালো হল না, তাই ভাবছি তাকে লখনউতে নিয়ে ভালো করে ডাক্তারদের দেখিয়ে আবার নতুন করে চিকিৎসা করাবো।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে নিয়ে লখনউ ফিরে এলেন। উঠলেন আউটট্রাম রোডের বাড়িতে। অসুস্থ হেমকুসুম বড় অসহায় ওকে যেন চেনাই যায় না, বিছানায় মিশে গেছে শরীরখানি।

চারবাগের বাড়ি তখন শেষ হয়নি। বারে বারে বাধা পড়ে কাজে। জমি কিনে কত পরিকল্পনা মনে এঁকে বাড়ি শুরু করলেন অতুলপ্রসাদ, মা হঠাৎ মারা গেলেন। বাড়ির কাজ বুঝি কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রইল। এখন আবার হেমকুসুম অসুস্থ। হেমকুসুমের জন্যে জলের মত অর্থ ব্যয় হতে লাগল। অতুলপ্রসাদ কাজে কাজে ব্যস্ত। হেমকুসুম সারাদিন শুয়ে থাকেন একাকী। অতুলপ্রসাদ যখন হেমকুসুমের পাশে এসে বসেন, হেমকুসুম বলেন, আমি আর চলতে পারবো না কোনদিন, তুমি বল, আমি চলেফিরে বেড়াতে পারবো?

অতুলপ্রসাদ বলেন, কেন পারবে না। তোমাকে ভালো ডাক্তাররা দেখে যাচ্ছেন, তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার জন্যেই ত তাঁদের এখানে আসা। তাঁরা ত' আশা ত্যাগ করেননি।

কিন্তু দেরাদুনে জ্যোতিলাল আমাকে তো ভালো করে তুলতে পারল না!

তুমি মনে জোর আনো হেম, দেখবে তুমি ভালো হয়ে গেছো।

মনে জোর আনতে চাইত কিন্তু শরীরটা।...পারি না

না, মনে জোর আননি, আনলে মুখের চেহারা এমন হোত না।

আমি কোনদিন চলেফিরে বেড়াতে পারবো না। আমার পা-দুটি যেন কেমন অবশ বলে মনে হচ্ছে!

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে সাহস দিয়ে বলেন, তুমি চলতে ফিরতে পারবে বৈকি। এ তোমার মনের ভয়। তুমি এখন অনেক সেরেছ। ডাক্তার তোমাকে সাহস মনে এনে চলতেই বলেছেন। তুমি আমার হাত ধরো। এসো আমার হাত ধরে ধরে চল।

না আমি চলতে পারবো না, আমার ভয় করছে।

কিন্তু তোমাকে চলতেই হবে হেম। তুমি উঠে দাঁড়াও আমার হাত ধর। ...এই তো দাঁড়িয়েছ...সাহস এসেছে ফিরে চল, এগিয়ে চল।

সাহসে ভর করে হেমকুসুম পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন। চলতে গিয়ে ক্লান্ত হন। থরথর কেঁপে সারা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েন। অতুলপ্রসাদ সাহস দেন। সাহস দিয়ে প্রেরণা দিয়ে অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের মনের আস্থা ফিরিয়ে আনেন। নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসায় হেমকুসুম অনেকটা সুস্থ হন। ...কবি অতুলপ্রসাদের মন টানে রবিবারের আসরটি। এই আসরে এসে যখন বসেন তখন তিনি অনাস্বাদে। কোথায় শোক, কোথায় দুঃখ, অসুখ-বিসুখ জর্জরারী এই পৃথিবীটা তখন কেবল গানের, হাসির, আনন্দের। এখানে এলে এই সাহিত্যজগতে সাংসারিক জগৎটা অনেক দূরের বলে মনে হয়। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তাদের অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

...প্রবাসে আমাদের একটা পত্রিকা প্রকাশ করলে কেমন হয় আমাদের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র। বাঙলাদেশে বাংলা সাহিত্যের প্রবাহ চলছে যেমন চলুক। আমরা এখানে আমাদের কথা বলি।

কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে

পত্রিকার ব্যাপারে কাজ করার জন্যে একজন যোগ্যতম কর্মী চাই। সেই সকল ভার নিক আমরা তার সংগে থাকবো। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তখন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। প্রকাশ হয়নি তখনও প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা'র।

এলেন সুরেশ চক্রবর্তী।

সুরেশ চক্রবর্তী?

আপনি বোধহয় চিনতে পেরেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আমাদের প্রভাসজ্যোতি পত্রিকার জন্যে সুরেশ আপনার কাছে গিয়েছিল!'

আত্মপ্রকাশ হল কাশী থেকে উত্তরার। উত্তরা অতুলপ্রসাদের মানসকন্যা।

এদিকে দুটি মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে হেমকুসুম দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়াল ধরে চললেন, তারপর দেয়াল ছেড়ে পা টিপে টিপে। ...তারপর অনেকটা স্বাভাবিক মানুষের মত চলেফিরে বেড়ালেন যেদিন সেদিন মনে কি যে আনন্দ হল বোঝানো কি যায়! তখন অতুলপ্রসাদের কথা একমাত্র মনে হল হেমকুসুমের। কিন্তু কোথায় অতুলপ্রসাদ? এঘর ওঘর ঘুরে..... একতলায়.....দরজা ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন—আসরে অতুলপ্রসাদ তিনি অন্য জগতে—সেখানে শুধু গান হাসি আনন্দ আলোর বন্যা। তাঁকে ঘিরে বসে তরুণ-তরুণীরা। তাদের কণ্ঠে গান—হাসি :

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে,
মোরা নাচি সুরধুনি কুলে কুলে
কখনো চলি বেগে, কভু মৃদু চরণে,
কখনো ছুটি মোরা ফুল ফল হরণে।
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি
তা গেছি ভুলে।

অতুলপ্রসাদ যেখানে মধ্যমণি সেখানে চিরনবীনতা, চিরসজীবতা বিরাজমান। সেখানে চিরবসন্ত। ডাক দাও তাকে :

জাগো বসন্ত, জাগো তবে
মোদের প্রমোদ কাননে
তুমি জাগিলে জাগিবে ফুল
বহিবে মলয় মৃদু-মৃদুল
গাহিবে বিপিনে বিহগকুল
মোহন মধুর ভাষণে।
পরাও সবারে মোহন বাস
জাগায় হৃদয়ে নবীন আশ
হাসুক ধরণী মধুর হাস
তব শুভ আগমনে।

...এলো না শুধু হেমকুসুম।

হেমকুসুম আজ ভালো আছেন। খুব ভালো আছেন। একথা যাকে বলবেন বলে অনেক ঘর ঘুরে অনেক পথের শেষে যার দেখা পেলেন তাঁকে যেন কেমন দূরের মানুষ বলে মনে হল।

হল অভিমান। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হেমকুসুম, কেউ তাঁকে দেখল না! দু' চোখ দিয়ে অভিমান-অশ্রুর বন্যা নেমে এল। একাকী, আউটট্রাম রোডের বাড়িতে অতুলপ্রসাদকে পিছনে ফেলে হেমকুসুম ক্যাণ্টনমেণ্ট রোডের বাড়িতে চলে গেলেন।

আমার দুটি গিন্নী আছেন। না, ঠাট্টা নয়, সত্যিই আছেন। এ দুজনকে আমি বিয়ে করেচি আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ে। প্রথমটিকে ঘরে এনেচি বহুকাল আগে। ১৯৩০ সালে। তখন আমার শরীরে ও মনে উৎসাহ ও যৌবন দুইই ছিলো, তাতে সুর ছিলো, আর সে সুরে প্রাণ ছিলো। কিন্তু যখন ও'কে ঘরে নিয়ে আসি, তখন বোধহয় তিনি বালবিধবা ছিলেন। অন্তত যে ঘটকের কাছ থেকে আমি ও'কে পেয়েছিলাম, তার কথাতেই আমি সেটা বুঝেছিলাম। আর ও'র কাজকর্মের পারিপাট্যেই সেটা আরো টের পেয়েছি পরে। উনি যেন অনেকটা আমার কুড়িয়ে পাওয়া গিন্নী। একটু পুরোনো ছাপও ছিল ও'র অবয়বে।

তারপর আমার জীবনের দীর্ঘ তিরিশ বছর চলে গেল। সে যুগটা আমার জীবন-যুদ্ধের ইতিহাস ও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস।

আমার ছোটগিন্নীকে ঘরে নিয়ে আসি ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে। সোজানয়, দুজনের মধ্যে ৩০ বছরের ব্যবধান! কিন্তু এ সময়েও দেখেচি আমার মনের যৌবন ও তার সংগীত দুইই স্বাভাবিক আছে। শুধু আছে বললেই ঠিক হবে না। এখন আমার মনের চিন্তার বিস্তারশক্তি ও সামর্থ্য যেন অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। অদ্ভুত ধরনের সমস্ত সৃষ্টির ভাব এখন আমার মাথায় এসে জুড়ে বসে। যেগুলো সব দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে যেন কোন্ অজানা নীহারিকার দেশে রূপ নিতে চলে যায়। বাড়ীর অন্যান্যেরা মাঝে মাঝে বলে, মাথা খারাপ হয়েচে আমার। কিন্তু কৈ, সংসারের ব্যাপার আর সুরের সারেগামা সবই তো বেশ টনটনে রয়েচে। কড়িমধ্যম ও কোমল গান্ধারের খেলা বেশ উপভোগ করতে পারি, তবে?

আমার এই পাগলামি যে কোনো সময়ে রূপ নেয়। তবে বেশীর ভাগ সময়েই এ অবস্থাটা উপস্থিত হয় নিশুতি রাতে। যখন প্রতিবেশীদের কলরব সব থেমে যায়। সেই সময়ে আমার দুই গিন্নীই আমার বিছানার দুপাশে এসে শুয়ে থাকেন। পাশ-বালিশের আমার দরকার হয় না। কিছুক্ষণ একজনকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করি। কত উচ্ছ্বাস, কত মূর্ছনা, কত দেশবিদেশের, কত অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের রাগে তিনি গলে পড়েন আমার বুকে। আমার চোখে জল আসে। মাঝে মাঝে জল মুছে ফেলি।

তারপর আবার অন্য গিন্নীকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করি। না, কোনো সতীনের ভাব এ'দের নেই। দুজনেই যেন আদরে আত্মহারা হয়ে পড়েন। বড়গিন্নীর গলার স্বর একটু নরম। বোধ হয় বয়েসের জন্যে। তবে তাতে কিছু আমার এসে যায় না। ঘুমন্ত প্রতিবেশীরা বোধ হয় ভাবে, বাঃ কর্তা বেশ মৌজে আছেন।

মনে পড়ে আমার ৬০ বছর আগেকার কথা। আমার এক বুড়ো দাদামশায়। তাঁর বাসস্থান ছিল বেরেলী, রোহিলখন্দের দেশে। তাঁরও রাত্তিরে এই ধরনের মৌজ এসে যেতো নিশুতির সময়ে, যখন মিল্টন তাঁর Lonely Tower in the Midnight Hour এ বসে IL Penseroso লিখতেন। তাঁরও হোতো একটা রাত ৩টার পর যখন হিন্দোল ও মালকোষের খেলা। বুড়ো খানসামা নসিরুদ্দী 'রায় হাউসে'র দেউড়ীতে দারোয়ান লালার পাশে মাটিতে ঘুমোতো। সে প্রায়ই বলতো 'বুড়া বাবুরে পৈরীতে পাইছে!'

সেটা হলো আমার ঢাকার বাল্যকাল যখন বড় বড় আর্মানী ল্যাজারাস, স্টীফেন, নাহাপিয়েট, কেবাটুর সাহেবদের সঙ্গে বড় বড় ঘরানা মুসলমান নবাব, কাজী, জমিদার-দের ও বর্ধিষ্ণু হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন ছিল। ওঃ, সে একটা যুগ ছিল বটে!

যাক সে কথা। এবার গিন্নী দুজনের কথায় ফিরে আসি। যিনি বয়েসে বড়, তিনি কিন্তু বেশ নরম ও ঠান্ডা। তাঁর গলার সুর কিন্তু খুব চড়া নয়। তবে খুব মিষ্টি। দেখলাম, তিনি ঐভাবেই তৈরী হয়েছেন সারা জীবন ধরে, কেননা তাঁর সঙ্গে সেই ১৯৩০ সাল থেকে ঘর করে বেশ বুঝতে পারছি, তিনি নিশ্চয় বিধবা ছিলেন। আর বোধহয় সেইজন্যেই অনেক কিছু মানিয়ে
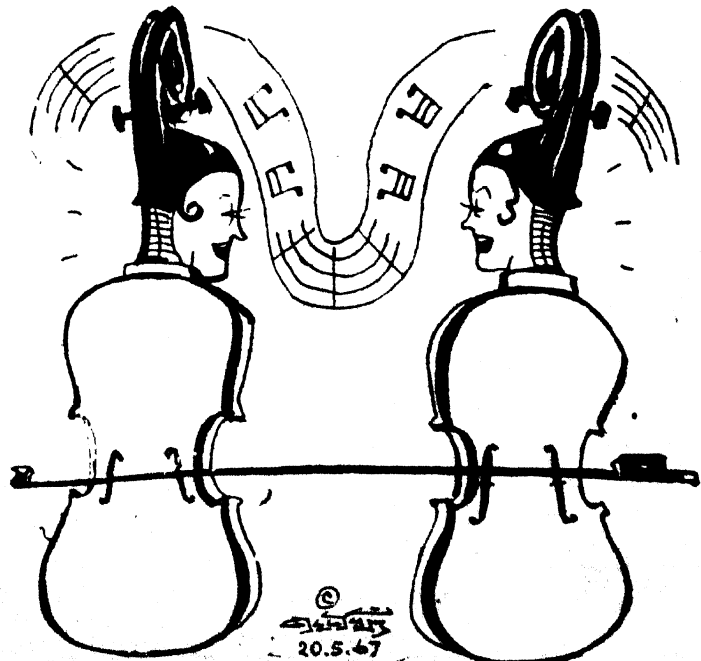
নিয়ে আমার সংগে থাকতে পারেন। যেভাবেই আমি তাঁকে চলতে বলি, সেভাবেই তিনি চলেন। এর মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ নেই। আমার অবশ্য সংযম থাকেই। তাই আমি তাঁকে নিয়ে বুঝেসুঝে চলি। আর তিনি তাতেই খুশি। একটা SELVYT -এর জামা তাঁকে দিয়েচি তাঁকে ঘরে আনার সময়। যার ঘর থেকে ও'কে আমি টাকার প্রথম নিয়ে আসি, সেই আমাকে বলেছিলো, ওকে একটু যত্নে রাখবেন বাবু। মেয়েমানুষ জাতটা বড্ড মেজাজী, যাদের প্রাণ আছে। তবে মেয়েমানুষেরা পুরুষের চাইতে বাস্তববাদী অনেক বেশী। তাই লোকে বলে মেয়েরা যে যেখানে পড়ে ভিন্ন বিধি তাকে গড়ে। এর চাইতে আরো নিষ্ঠুর একটা কথা আছে ওদের:—'পড়েচি ইংরাজের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!'

এই বড়গিন্নীকে নিয়ে আমি কত জায়গায় যে ঘুরেচি, তার শেষ নেই। সর্বদাই থাকেন তিনি আমার সংগে। এর মধ্যে দুই বার তিনি আমার কাছ থেকে হারিয়ে যান। প্রথমবার এটা হয়েছিলো ১৯৩৫ সালের পুজোর ছুটিতে পুরী স্টেশনে। তাঁকে ফেলেই আমি কলকাতা রওনা হচ্ছিলাম এক্সপ্রেসে। হঠাৎ দেখি আমার ট্যাকসীওলা দৌড়ে আসচে তাঁকে সংগে নিয়ে। স্যর, স্যর, আপনি এ'কে গাড়ীতে রেখেই চলে এসেছেন। বেশ ভোলামন আপনি। ধন্যবাদ দিয়ে ও'কে তুলে নিলাম ট্রেনে।

আর একবার ও'কে হারাই ঝাঝা স্টেশনে। সেটা ১৯৩৭ সালের পুজোর ছুটিতে। এখানেও ঐ একই ব্যাপার। ও'কে গাড়ীতে তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মধুপুর পার হয়ে জয়ন্তী ব্রীজের কাছে ট্রেন, দু ধারের glaciation -এর দিগন্তের দৃশ্য উপভোগ করচি, হঠাৎ ভেতরে তাকিয়ে মনে হলো, না, তিনি তো নেই! সারা পথ আর স্বস্তি ছিল না। আসানসোল পৌঁছেই ঝাঝায় একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম আমার বন্ধু গঙ্গাপদ মুখোপাধ্যায়কে। উত্তর এলো ডাকে—'ভাববেন না। আপনার গিন্নী নিরাপদেই আছেন। স্টেশনের একটা ঘরে বসেছিলেন দেখলাম। বাড়ীতে নিয়ে এলাম। আমার এখানেই এখন আছেন। কলকাতায় ফিরে গেলে হাওড়া স্টেশনে আপনি এসে ও'কে নিয়ে যাবেন।'

এরপর থেকেই গিন্নীকে আর সবখানে নিয়ে যাই না। হাজার হোক মেয়েমানুষের শরীর। পথের ধকল, হুড়োহুড়ি, চোর-বাটপাড় এ সব থেকে বাঁচাতে হবে তো। মাঝে মাঝে আবার ডাক্তারও দেখাতে হয়। তবু ভাগ্যিস এটা কলকাতা, তাই ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা এখানেই।

এবার আমার ছোটগিন্নীর কথায় আসা যাক। শিল্পী মানুষের অশেষ দোষ। সে যে কোথায় কীভাবে আটকে পড়ে, লোকেরা তখন তার অবস্থা দেখে হাসে—এই রে, সেরেছে। মহাদেব-পার্বতীর কোন্দল কি সাধে গল্পে ফাঁদতে হয়? শ্রদ্ধেয় অক্ষয় মৈত্রেয় আমাকে একবার একটা পুরাণের গল্প বলেছিলেন। গল্পটি অনেকটা এই ধরনের। পার্বতী তাঁর কর্তাকে একবার বলছিলেন—দ্যাখো, আমার শিল্প শিখতে ইচ্ছা করে। তুমি তো সবই জানো। আমাকে একটু শিখিয়ে দাও না। মহাদেব হেসে বলেছিলেন, শিল্প তো অত সোজা জিনিস নয় গো। সমাধিস্থ হলেই শিল্পের জন্ম হয়—'শিল্প সমাধৌ', যদি ছবি আঁকা শিখতে চাও তবে আগে মূর্তি বানানো শিখতে হবে। মূর্তি তৈরী শিখতে চাও তো আগে সঙ্গীত ও ছন্দ শিখতে হবে। যদি সঙ্গীত ছন্দ শিখতে চাও, তবে সবার আগে নৃত্যশিল্প শিখতে হবে। নৃত্যই হলো আদি শিল্প। পুরুষের নৃত্যকে বলে 'তাণ্ডব' আর মেয়েদের নৃত্যকে বলে 'লাস্য'।

এই সব কারণে ১৯৬০ সালে পাঁচ মাস ধরে আমেরিকা ঘুরে দেখার সময়ে নিউ-ইয়র্ক থেকে আমার এই ছোটগিন্নীকে নিয়ে আসি। তাঁকে পেয়েছিলাম আমি কার্নেগী মিউজিক হলের পাশেই এক বুড়ো জার্মান ঘটকের কাছ থেকে। নাম তার আইসেন্টাইন। আমার এই দ্বিতীয় গিন্নীর জন্যে শখ হয়েছিলো সানফ্রান্সিসকো থেকেই। আহা, কী শহর! আর তার চাইতেও কী সুন্দর মেয়েরা এখানকার, চোখ জুড়িয়ে যায়। কালো চোখ, কালো চুল। আবার দেখচি মাঝে মাঝে তাদের খোঁপায় গোঁজা রয়েছে ফুল। সেখান থেকেই শুরু হলো আমার দ্বিতীয় গিন্নীর খোঁজ। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে অনেক বিদেশীকে জিগ্যেস করেচি, বিশেষত যারা লাতিন তাদেরকে। আমাকে একটা তোমাদের জাতের মেয়ের খোঁজ দিতে পারো ভাই? গিন্নী করে রাখবো। লাতিন ইতালিয়ান ছাড়া আমার মন ওঠে না। তাছাড়া আমাদের বাঙালীর সংগে ওদেরই মেলে ভালো। একটুতেই আহ্লাদে গলে পড়ে। নর্ডিক টিউটনদের মতো উগ্র ও হিংস্র নয়। গ্রান্ড কেনিয়ান এক ইতালিয়ান ঠিকানাও দিয়েছিল। কোথায় ভালো ইতালিয়ান পাত্রী পাওয়া যেতে পারে। সাধে বিশ্বকবি বলেছিলেন—'ওগো রানী, কত কবি এলো চরণে তোমার, উপহার দিলো আনি!'

কিন্তু শেষপর্যন্ত নিউইয়র্কে পৌঁছে আর সাহস হলো না ভালো কাজ জানা ভদ্র ইতালিয়ান মেয়ের খোঁজে রোমের জন্য অপেক্ষা করতে! হাজার হোক, নিউইয়র্কের কাছে রোম তো দরিদ্র। কী জানি, শেষে যদি অভাবের দেশ হয়ে আমাকে একটা অপাঙক্তেয় পাত্রী গছিয়ে দেয়?

ভাগ্য নেহাৎ সুপ্রসন্ন ছিল। আমার হোটেলের ঘরের পাশেই দেখলাম একজন বোস্টনের ছোকরা আমাকে ঐ বুড়োর ঠিকানা দিল। বলল, ঐ বুড়ো ঘটকের কাছে অনেক ভালো ঘরের মেয়ের সন্ধান পাবে। জুটেও গেল ভালই আর একজন সঙ্গিনী।

তবে ইনি একটু অভিমানী। একটু খরখরা, আর গলার স্বরটাও একটু চড়া। স্বর মিষ্টি হলেও পাড়াপ্রতিবেশীরা বেশ বুঝতে পারে ছোটঠাকুরুণ কথা বলচেন। হাজার হোক ও'র বয়েস তো কম! তবে ঐ জার্মান বুড়োটাই বলেছিলো, ভেলভেটের জামা দিয়ে ওকে একটু যত্ন করো। একটু কষ্ট করে তোয়াজ করতে পারলেই দেখবে তুমি কোন স্বর্গে চলে গিয়েছ। সত্যিই এখন বুঝতে পারি, সুখের ঘরে রূপের বাসা। যত্নেই মেয়েরা ভালো থাকে।

●

লেখকের দুটি বেহালার জীবনী। এদের প্রত্যেকটিরই বিবরণ সত্যি। প্রথমটিকে কেনা হয় ঢাকায় যতীন কোম্পানী থেকে, ১৯৩০ সালে, STRADIVARI MODEL 1714: এটি সেকেন্ড হ্যান্ড। তাই এর সুরও মিষ্টি। তখনকার দিনের দাম ৭০্ টাকা।

দ্বিতীয় বেহালাটি GUERNARI MODEL: এটির দাম পড়েচে এখনকার দরে ১০০০্ টাকার কিছু কম। এটির খোঁজ দিয়েছিলেন BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA -র FIRST VIOLIN ছেলেটি, আমার হোটেলের পাশের ঘরের ভদ্রলোক। তাঁদের তখন CARNEGIE MUSIC HALL -এ প্রোগ্রাম ছিল।

বেহালা দুটি তুলনা দিতে গেলে বলতে হয়— STRADIVARI MODEL গুলোর সুর হয় নরমও মিঠে। কিন্তু GUERNARI MODEL গুলোর সুর হয় একটু খরখরে, তবে দরাজ। প্রথমটি যেন বনা-হরিণী, আমাদের অজন্তা গুহার রূপ। আর দ্বিতীয়টি যেন রাজরাণী, যেন ইলোরার রাজসিক ঐশ্বর্য ফেটে পড়েচে।

পুরনো পাতা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হিন্দু স্কুল সংস্কৃত কলেজ এবং কোম্পানীর সেরেস্তার পথ বেয়ে বাঙলা গদ্য যখন স্বাভাবিকভাবে চলবার চেষ্টা করছিল, তখন হয়ত তার মধ্যে ছিল অনেক অসংলগ্নতা, বক্তব্য ছিল অপরিস্ফুট; কিন্তু প্রাথমিক প্রয়াসে সে ছিল এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। তখন সংবাদপত্র প্রকাশিত হোচ্ছে, স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাদি এবং জীবনী রচনার চেষ্টা চলছে। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রচনা আরও কিছু পরবর্তীকালের হলেও বাঙলা গদ্যের সেই গঠনশীল ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে যোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে একটি দায়িত্ব পালন করছে অমৃত। পুরোন দিনের সাহিত্যকৃতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তুলে ধরবার উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান বিভাগটি খোলা হলো। এই বিভাগে উনিশ শতকের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যকারের গল্প কবিতা প্রবন্ধ রম্য-রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হবে।

বাঙলা গদ্যের আদি স্রষ্টাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সব থেকে আগেই মনে পড়ে। বর্তমান সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের বাঙলার ইতিহাস থেকে হেস্টিংস ও নন্দকুমার অংশটি পুনর্মুদ্রিত হোল। নন্দকুমার সম্পর্কে অনেকেই নানা কথা জানেন। মঞ্চেও দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছে নাটক। কিন্তু বিদ্যা-সাগরের সময়ে এই ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যের প্রাচুর্য ছিল না। ঠিক সেই সময়ে এই বিখ্যাত মনীষী কি চোখে এই বিতর্কিত বিষয়টি দেখেছিলেন, তা জানা যাবে বর্তমানে উদ্ধৃতি থেকে। তাছাড়া সে সময়ের বাঙালী জীবনের একটি চিত্রও এর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কার্টিয়ার সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারন হেস্টিংস সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। হেস্টিংস, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে, রাজশাসন সংক্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এদেশে আইসেন এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, এতদ্দেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্টের কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে, গবর্ণরের পদ ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের কর্ম আর ছিল না। যখন বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদপ্রাপ্ত হয়েন, তখন কেবল হেস্টিংস তাঁহার বিশ্বাস-পাত্র ছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেস্টিংস কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর হন। তৎকালে, অন্য সকল মেম্বরই বান্সিটার্ট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তিনিই একাকী তাঁহার মতের পোষকতা করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য, ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে, কলিকাতার গবর্ণরের পদ শূন্য হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে, সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ঐ পদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে, তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদয় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আয় ক্রমে অল্প হইতেছে। অতএব, দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হওয়া, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনা-দের হস্তে লইয়া য়ুরোপীয় কর্মচারী দ্বারা কার্যনির্বাহ করা মনস্থ করিলেন। এই নূতন নিয়ম হেস্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে কৌন্সিলের সম্মতিক্রমে এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, ইংরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্যনির্বাহ করিবেন। যে সকল য়ুরোপীয় কর্মচারীরা রাজস্বের কর্ম করিবেন, তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক। কিছুকালের নিমিত্ত, সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক; আর, কৌন্সিলের চারিজন মেম্বর, প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইঁহারা প্রথমে কৃষ্ণ-নগরে গিয়া, কার্যারম্ভ করিলেন। পূর্বাধি-কারীরা, অত্যন্ত কম নিরিখে, মালগুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদায় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন, তিনি আপন বিষয় পূর্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন; আর, যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে পেনশন দিয়া অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎ-পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া-ইলেন। গবর্ণর স্বচক্ষে সমুদয় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, মালের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে, কলিকাতায় আনীত হইল।

এইরূপে রাজস্বকর্মের নিয়ম পরি-বর্তিত হওয়াতে দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্মেরও নিয়ম পরিবর্তন আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী, দুই বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালত কালেক্টর সাহেব, কাজী, মুফতি, এই কয়-জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর, দেওয়ানী আদালতেও, কলেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত, কলি-কাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে, যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ের বিচার হইত তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে ফৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম নিজামৎ আদালত, রহিল।

এ পর্যন্ত, আদালতে যত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল, প্রাড়বিবাক তাহার চতুর্থ অংশ পাইতেন। এক্ষণে তাহা রহিত হইল; অধিক জরিমানা রহিত হইয়া গেল; মহাজনদিগের, স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া, টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিবারিত হইল; আর দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রবীণ ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইংরেজেরা, আপনাদিগের প্রণালী অনুসারে, বাঙ্গালার শাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্ধারিত করিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই, বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদপ্রাপ্তির দিবস অবধি, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিস্মৃত হয়েন নাই যে, যখন তিনি, মীরজাফরের রাজত্ব সময়ে, ঢাকার নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন; তখন, তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, অধিকতর লাভের প্রত্যাশায়, সমুদায় শস্য একচাটিয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রজা-দিগেরও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম করিতেন, তখন বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন; নায়েব সুবাদার ছিলেন; সুতরাং রাজস্বের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার তাঁহারই হস্তে ছিল, আর নায়েব নাজিম ছিলেন; সুতরাং পুলিশেরও সমুদয় ভার

তাঁহারই হস্তে ছিল। ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যতদিন তাঁহার হস্তে এইরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোনও ব্যক্তি তাঁহার দোষ প্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব, তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদয় কাগজপত্র আটক করিতে হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকটে পঁহুছে। যৎকালে ঐ আজ্ঞা পঁহুছিল, তখন অধিক রাত্রি হইয়াছিল; এজন্য সে দিবস তদনুযায়ী কার্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে, তিনি, মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডিল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে, রেজা খাঁ, সপরিবারে, জলপথে, কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্টন সাহেব তাঁহার কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন, রেজা খাঁ চিৎপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অকস্মাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, একজন কৌন্সিলের মেম্বর তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলেন। আর, হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন, আমি কোম্পানির ভৃত্য, আমাকে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইয়াছে; নতুবা আপনকার সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবেক না, জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এজন্য তিনি কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহা পরীক্ষা অল্পদিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোনও দোষ পাওয়া গেল না; অতএব তিনি মানপূর্বক বিদায় পাইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক, সরকারী কার্যের নির্বাহ বিষয়ে, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছিলেন, প্রধান পদারূঢ় অন্যান্য লোকের ন্যায়, তিনিও অন্যায় আচরণপূর্বক, প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অমর্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানার্থে, কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে, কৌন্সিলের সাহেবরা তাঁহাকে এক মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়াঁ করিলেন। কিন্তু অপরাধ বোধে কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অপমানবোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি একেবারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ইংরেজেরা এপর্যন্ত এতদ্দেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহারা রাজা সিতাব রায়ের সর্বদা সবিশেষ গৌরব করিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, অপরাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা, এবং দোষের আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষা করা, এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া, ঐ মনঃপীড়াতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাটনা প্রদেশে, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের নিমিত্ত, যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহার আদি কারণ। তাঁহার উদ্যোগেই, ঐ প্রদেশে, দ্রাক্ষা ও খরমুজের চাষ আরব্ধ হয়।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিয়াছিল, নন্দকুমার তাঁহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু, দ্বৈবার্ষিক বিবেচনার পর, নির্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু, আর পূর্ব কর্ম প্রাপ্ত হইলেন না। নিজামতে মহম্মদ রেজা খাঁর যে কর্ম ছিল, তিনি পদচ্যুত হইলে পর, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। নবাবকে শিক্ষা দেওয়ার ভার মণি বেগমের হস্তে অর্পিত হইল; আর সমুদয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধানার্থে, হেষ্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত করিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন; কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায়, তাহার পিতাকে নিযুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু, তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হেষ্টিংস তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে, ইংলন্ডে কোম্পানির বিষয় কর্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। ১৭৬৭ সালে লর্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি, ১৭৭২ সালে হেষ্টিংসের নিয়োগ পর্যন্ত, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল ইংলন্ডে ডিরেক্টরদিগের কার্যও তেমনই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে কোম্পানীর দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে, শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে মুনাফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের কার্যের বিলক্ষণ উন্নতি থাকিত, তথাপি তদ্রূপ মুনাফা দেওয়া, কোনও মতে, উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামি করিয়া, ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, ধনাগারে এক কপর্দকও সম্বল নাই। তখন তাঁহাদিগকে, ইংলন্ডের বেঙ্কে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ, টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাইতে হইয়াছিল। এপর্যন্ত, পার্লিমেন্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানির বিষয় কর্মের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে আনিতে মনন করিলেন। কোম্পানির শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটি নিয়োজিত হইল। ঐ কমিটী বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণরূপে নিয়ম পরিবর্তন না হইলে, কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দোষের সংশোধনার্থে, পার্লিমেন্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যতদূর পারেন, আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, পার্লিমেন্টের অধ্যক্ষেরা, তাঁহাদের সমস্ত আপত্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্মের সমুদয় প্রণালী, ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, পরিবর্তিত হইল। ডিরেক্টর মনোনীত করণের প্রণালীও কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত হইল। ইংলন্ডে কোম্পানির কার্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার অনেক সংশোধন হইল। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, প্রতি বৎসর, ছয়জন ডিরেক্টরকে পদত্যাগ করিতে হইবেক। এবং তাঁহাদের পরিবর্তে, আর ছয়জনকে মনোনীত করা যাইবেক। আর ইহাও আদিষ্ট হইল যে, বাঙ্গালার গবর্ণর ভারত-

বর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইবেন, অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতিঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক, গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে, সর্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত; অতএব নিয়ম হইল, গবর্ণর জেনারেল ফোর্ট উইলিয়মের একমাত্র গবর্ণর ও সেনানী হইবেন। গবর্ণর জেনারেল, কৌন্সিলের মেম্বর, ও জজদিগের বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল এজন্য, গবর্ণর জেনারেলের আড়াই লক্ষ, ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আশী হাজার টাকা, বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হইল। ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোম্পানির অথবা রাজার কার্যে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। আর ডিরেক্টারদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজ শাসন সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র আসিবেক, সে সমুদয় তাঁহারা রাজমন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। বিচার নির্বাহ বিষয়ে, এই নিয়ম নির্ধারিত হইল যে, কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে এক বিচারালয় স্থাপিত হইবেক। তথায় বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে, একজন চীফ জাষ্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্তা ও ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা বেতনে, তিনজন পিউনি জজ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারকর্তা থাকিবেন। এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, রাজা স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। আর ঐ ধর্মাধিকরণে, ইংলণ্ডীয় ব্যবহার সংহিতা অনুসারে, ব্রিটিশ সব্জেক্টদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে এই অনুমতি হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্যের নির্বাহ বিষয়ে পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম — নির্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালে ১লা আগস্ট তদনুযায়ী কার্যারম্ভ হইবেক।

হেস্টিংস সাহেব বাঙ্গালার রাজকার্য নির্বাহ বিষয়ে সবিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি গবর্ণর-জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কৌন্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্যে পর্যালোচনার্থে চারিজন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে বারওয়েল সাহেব বহুকাল অবধি এতদ্দেশে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; আর, কর্নেল মন্সন, সর জন ক্লবরিং ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিনজন ইহার পূর্বে, কখনও এদেশে আইসেন নাই।

হেস্টিংস, এই তিন নূতন মেম্বরের মান্দ্রাজে পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন, তাঁহারা খাজরীতে পঁহুছিলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন, এবং তাঁহার একজন নিজ পারিষদও, স্বাগত জিজ্ঞাসার্থে প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইভ ও বান্সিটার্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবামাত্র সতরটা সেলামী তোপ ও তাঁহাদের সংবর্ধনা করিবার নিমিত্ত কৌন্সিলের সমুদয় মেম্বর একত্র হন। তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন, আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই; আমাদের সংবর্ধনা করিবার নিমিত্ত, সৈন্য বহিস্কৃত করা যায় নাই; সেলামী তোপও উপযুক্ত হয় নাই, আমাদের সংবর্ধনা কৌন্সিল গৃহে না করিয়া হেস্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল; আর আমরা যে নূতন গবর্ণমেন্টের অবয়ব স্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহপূর্বক তাহার ঘোষণা করা হয় নাই।

২০শে অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল; কিন্তু বারওয়েল সাহেব তখন পর্যন্ত না পঁহুছিবাতে, সে দিবস কেবল নূতন গবর্ণমেন্টের ঘোষণা মাত্র হইল; অন্যান্য সমুদয় কর্ম, আগামী সোমবারে ২৪শে তারিখে বিবেচনার নিমিত্ত, রহিল। নূতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য কিছুই অবগত ছিলেন না; অতএব, সভার আরম্ভ হইলে, হেস্টিংস সাহেব কোম্পানির সমুদয় কার্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু প্রথম সভাতেই এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে, ভারতবর্ষের রাজশাসন তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। বারওয়েল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষে ছিলেন; অন্য তিন মেম্বর, সকল বিষয়ে সর্বদা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক; সুতরাং গবর্ণর জেনেরল কেবল সাক্ষিগোপাল হইলেন; কারণ, যে স্থলে বহু সংখ্যক ব্যক্তির ওপর কোনও বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মত অনুসারেই, সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল, তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে, হেস্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এবং হেস্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এজন্য হেস্টিংস যাহা করিতেন, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করিয়া, একবারে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন; সুতরাং তাঁহারা যে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

হেস্টিংস সাহেব কিয়ৎ দিবস পূর্বে মিডিল্টন সাহেবকে লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে, নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন; আর হেস্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হেস্টিংস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, এরূপ হইলে সর্বত্র প্রকাশ হইবেক যে, গবর্ণমেন্ট মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণরকে গবর্ণমেন্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে; এক্ষণে তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতাশূন্য দেখিলে, সহজ বোধ করিতে পারে যে, রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা রোষ ও দ্বেষের বশবর্তী হইয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দেশীয় লোকেরা, অল্পকাল মধ্যে কৌন্সিলের এবংবিধ বিবাদের বিষয় অবগত হইলেন, এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, হেস্টিংস সাহেব এতকাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষনে আর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই। অতএব, যে সকল লোক তৎকৃত কোনও কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয় মেম্বরদিগের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহসহকারে, তাহাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের বনিতা, স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই আবেদনপত্র প্রদান করিলেন, আমি, রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানির ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারীদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেস্টিংস সাহেব ১৫০০০৲ টাকা লইয়াছেন। হেস্টিংস বাঙ্গালা ও পারসীতে হিসাব দেখিতে চাহিলেন; কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল; কিন্তু হেস্টিংসের বিপক্ষেরা, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, আপনারা শিশু রাজাকে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, হেস্টিংসের নামে ভুরি ভুরি অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। একজন এই বলিয়া দরখাস্ত দিল যে, হুগলীর ফৌজদার বৎসরে ৭২০০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে তিনি হেস্টিংস সাহেবকে ৩৬০০০৲ টাকা ও তাঁহার দেওয়ানকে ৪০০০৲ টাকা দেন। আমি বার্ষিক, ৩২০০০৲ টাকা পাইলেই ঐ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া সাক্ষ্য লওয়া গেল, হেস্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন,

যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে, ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি, ন্যূন বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু অভিযোক্তার কিছুই হইল না। এক মাস অতীত না হইতেই, আর এই এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন, হেস্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, আমোদ উপলক্ষে ব্যয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেস্টিংস কহিলেন, আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া কোম্পানির দেড় লাখ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেস্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোনীত হইল না।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। এই সুযোগ দেখিয়া নন্দকুমার হেস্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণি বেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে, মুরশিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারকে কৌন্সিলের সম্মুখে আনীত করা যাউক। হেস্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যে সভার অধিপতি, তথায় আমার অভিযোক্তাকে আসিতে দিব না; বিশেষতঃ এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া গবর্ণর জেনেরলের পদের অমর্যাদা করিব না; এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া হেস্টিংস গাত্রোত্থান করিয়া কৌন্সিল গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন; বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কৌন্সিল গৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণি বেগম যখন যাহা ঘুষ দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে, বেগম গবর্ণমেন্টে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; সর জন ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কৌন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেস্টিংসকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতেই, হেস্টিংস নন্দকুমারের নামে, চক্রান্তকারী বলিয়া, সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছুদিন পরেই, কামালউদ্দীন নামে একজন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক, কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনপূর্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন, জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্ধারিত করিয়াছিলেন; জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসি হইল।

যে দোষে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদি তিনি যথার্থই করিয়া থাকেন, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে করিয়াছিলেন; সুতরাং তৎসংক্রান্ত অভিযোগ, কোনওক্রমে সুপ্রীম কোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে, প্রধান জজ সর ইলাইজা ইম্পি, কদাচ উপস্থিত ব্যাপারে, ঐ আইনের মর্ম অনুসারে, কর্ম করিতেন না। কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। ফলতঃ, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড ন্যায়মার্গ অনুসারে বিহিত হইয়াছে, ইহা কোনওক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা, এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে, একবারে হতবুদ্ধি হইলেন, কলিকাতাবাসী ইংরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহারাও অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের একজন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইংরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদিত হইবার পূর্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইংরেজেরাও বিপদে পড়িলে, সময়ে সময়ে, তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ইম্পি ও হেস্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার, হেস্টিংসের নামে, নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেস্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই; অতএব, যে কোনও উপায়ে, উহার প্রাণবধ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনুসারে কামালউদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্মাসনারূঢ় ইম্পি, গবর্ণর জেনারেলের পাদরূঢ় হেস্টিংসের পরিতোষার্থে একবারেই ধর্মাধর্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেস্টিং, তিন-চারি বৎসর পরে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল।

ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, এক সময়ে, ইম্পির আনুকূল্যে আমার সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, নন্দকুমার হেস্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অমূলক নহে; আর সুপ্রীম কোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন, সেই ভয়েই হেস্টিংস, ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া নন্দকুমারের প্রাণবধ সাধন করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার ফলিতার্থের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন, আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরাপরাধ। অতএব, তাঁহারা নবাবের সাংসারিক কর্ম হইতে গুরুদাসকে বহিষ্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কৌন্সিলের সাহেবেরা দেখিলেন তাঁহাদের এমন অবসর নাই যে, কলিকাতার সদর নিজামত আদালতে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। এজন্য পূর্ব প্রণালী অনুসারে পুনর্বার ফৌজদারী আদালত ও পুলিশের ভার একজন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পিত করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে, ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে নীত হইল, এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড

১১শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 14th July, 1967. শুক্রবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

'বালিকা বধূ' ছবি প্রসঙ্গে

শ্রীতরুণ মজুমদার পরিচালিত "বালিকা বধূ" দেখলাম। স্মরণাতীত কালের মধ্যে এমন একখানি স্নিগ্ধ সুন্দর মিষ্টি বাঙলা ছবি আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রতিথযশা পরিচালক শ্রীমজুমদারের শিল্প-প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর "বালিকা বধূ"। তাঁর এই অপূর্ব চিত্র-কাব্যের জন্য বাঙলার চিত্ররসিক দর্শক-সমাজের পক্ষ থেকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

তবে ছবিটিতে কিছু কিছু দোষত্রুটি যে একেবারে নেই তা নয়। এ ব্যাপারে পরিচালক আরও একটু সতর্ক হ'তে পারতেন। ছবিটিতে ইনট্যেলিকচুয়ালিটির মধ্যে মধ্যেও এমন কতকগুলি কমার্শিয়াল জিনিষ আনা হয়েছে সেগুলি যথেষ্ট শিল্পমন্ডিত তো নয়ই—বরং ছবিটির স্নিগ্ধতা অনেকটা নষ্ট করেছে।

প্রথমত, "বালিকা বধূ" যে ছবির নাম সে ছবিতে বিয়ের অংশে শুভদৃষ্টির দৃশ্যটুকু বিশেষত্বের দাবী রাখে। কিন্তু এখানে পুরোহিতকে গুরুত্ব দিয়ে দৃশ্যটির প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, অমলের চরিত্রে বিভিন্ন বয়সের নেপথ্য ভাষ্যের জন্য হেমন্ত মুখার্জি, বসন্ত চৌধুরী ও সৌমিত্র চ্যাটার্জির মত তিনজন স্বনামধন্য শিল্পীর প্রয়োজন হ'ল কেন? যে কোন একজনকে দিয়ে কি হোত না?

তৃতীয়ত, যাত্রার দৃশ্যটি। দৃশ্যটির প্রয়োজন ছিল ঠিকই। কিন্তু জহর রায়কেই নিতে হ'ল কেন? অমলের বিরক্ত হ'য়ে উঠে যাবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু করলেই হোত। কিন্তু এই দৃশ্যে যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলে মনে হ'ল।

চতুর্থত, বহুরূপীর নাচের দৃশ্য। খুব প্রয়োজনীয় অংশ নয়। তবুও রাখা হ'ল। অমল আর রজনীর ধামের আড়ালে লুকো-চুরির দৃশ্যটির জন্য বহুরূপীর নাচ-গানের দৃশ্যটি ভিত্তি করা হয়েছে। কিন্তু ছবিতে বহুরূপীবেশী সন্ধ্যা রায় ও রবি ঘোষের নাচগানের উপর জোর পড়েছে বেশী। এই অংশটির গুরুত্ব এমন কি ছিল? এই দৃশ্যে নতুনতর চিন্তার অবকাশ ছিল।

পঞ্চমত, অমল যখন রজনীর চিঠিটা প'ড়ে রাগ ক'রে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তখন চিঠিটা জলে প'ড়ে খানিকটা জল ছলকে উঠল। কাগজ পাকিয়ে জলে ফেললে ঐরকম হয় কি?

কিন্তু যা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে, তাও বলা দরকার। যেমন প্রথমত, আলোক-চিত্র। শ্রীসৌমেন্দু রায়ের চিত্রগ্রহণ এ ছবির একটি বিশেষ সম্পদ। পরিচালকের অনেক সুন্দর কল্পনার সার্থক রূপ দিয়েছেন শ্রীরায়। ছবির শুরুতে 'টাইটেলের' উপর লতাপাতার স্যাডো দেখানো হয়েছে এবং তখনই মনে হ'ল এ ছবিতে কাহিনীর পটভূমি একটি পল্লীগ্রাম। কয়েকটি নৈশ-দৃশ্য ভোলবার নয়। যেমন জ্যোৎস্না রাতে ট্রেন যাওয়ার দৃশ্যটি। অমল আর রজনীর লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বালু-চরে বসার দৃশ্য। ভোর রাতে মাস্টার-মশাইকে গ্রেফ্‌তার ক'রে নিয়ে যাবার দৃশ্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, প্রতীক ব্যবহার। ফুল-শয্যার রাতে শরৎ রজনীর কাছে হার মানে। নিজেকে সামলাতে গিয়ে শরৎ রজনীকে বলে অমলের সঙ্গে ওর একটা কথা আছে। কথাটি বলবার সময় শরৎ অমলকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়—"তোমার বউটি কিন্তু কুইন ভিক্‌টোরিয়া, খুব সাবধান!" কারণ ও বুঝেছে রজনীর সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। তবে বেশ মুখ ছোটালে কি করতে হবে সেই মন্ত্রও শরৎ অমলের কানে দিয়ে যায়। ধাঁধার সঠিক উত্তর দেওয়ার পরেও যখন রজনী অমলকে কায়দা ক'রে হারাতে চাইছে তখন অমলের হঠাৎ শরতের সেই মন্ত্রের কথা মনে প'ড়ে যায় এবং বস্তা বাহুল্য সে সেই মন্ত্র প্রয়োগ করে—অর্থাৎ রজনীকে আচম্‌কা একটা চুমু দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি জ্বলন্ত বাজী আকাশে উড়ে গিয়ে ফেটে গেল। রজনীর অধরের প্রথম পরশে অমলের রোমাঞ্চ আর আগুনের স্পর্শে আকাশে বাজী ছোটা একাকার! প্রতীকের সাহায্যে উল্লিখিত দৃশ্যটির উপ-স্থাপনায় পরিচালক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, ছবির সঙ্গীত। ছবিতে সঙ্গীতের মেজাজটি যেন ঠিক সেই ১৯০৪—১৯০৫ সালের। অমলের বিয়ের দিনে ব্যান্ডপার্টিতে "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" গানের সুরটি যেন এক ধাক্‌কায় নিয়ে গিয়েছে সেই কালটিতে যে কালের পটভূমিকায় "বালিকা বধূ" কাহিনীর বিন্যাস। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মাস্টারমশাই-এর চরিত্রের সঙ্গে মাস্টার-মশাই-এর বেহালায় "আমার সোনার বাঙলা" গানের সুর বাজানো বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত ও শিল্পসম্মত। মাস্টার-মশাইকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যাবার সময় নেপথ্যে—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" গানের কলি ভেসে আসা, দৃশ্যটিকে অপূর্ব মাধুর্যমন্ডিত করেছে। কোনারকে সূর্যমন্দিরের গায়ে যুগল মূর্তি দেখে রজনী নিজের নারীত্বকে আবিষ্কার ক'রল। তারপর যেদিন তীর্থ থেকে 'বালিকা বধূ' রজনী শুধু 'বধূ' হ'য়ে ফিরে এল অমলের কাছে সেদিন রাতে ওদের দুজনের প্রথম সাক্ষাতের সময়—"আমরাও পরান যাহা চায় তুমি তাই গো" গানের সুরটির প্রয়োগ চমৎকার।

বাবলু দাশগুপ্ত
বাগুইহাটি (?), ২৪-পরগণা।

বাংলা বইয়ের দাম

বই পড়ার সমস্যা মিটলেও বই কেনা বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবিকই বই-এর দাম এত ঊর্ধ্বমুখী যে তা মধ্যবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে কিনে পড়া একরূপ দুঃসাধ্য। 'অমৃত'-এ দেখলাম—'বাঙালীর ইতিহাস' বই-এর দাম ১৮ টাকা। আজকাল লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষও বেশী মূল্যের বই কিনতে পারেন না। অনেক মূল্যবান বই সংগ্রহ করে পড়তে হয়—আমি অনেক বই কিনতে পারিনি অর্থাভাবে। তাছাড়া আজকাল অধিকাংশ লেখকই বৃহদাকার বই লিখছেন। একথা ঠিক প্রকাশক-লেখকদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করা ঠিক নয়, তবুও দরদী পাঠকসাধারণের মুখ চেয়ে অল্পমূল্যে বই প্রকাশ করা জাতীয় কর্তব্য। তাহলে অধিকাংশ উৎসাহী লোকেই বই কেনার প্রেরণা পাবেন। বিদেশে এক-একটা বই প্রচুর বিক্রি হয়—তার কারণ, দাম ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে থাকে। এবিষয়ে সরকারেরও কিছু করণীয় আছে মনে করি। বই এর দাম কমলে প্রকাশকরাও অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। শুধুমাত্র গ্রন্থাগার ছাড়া কজন এত টাকা খরচ করে বই কিনবেন! তাই আমার মনে হয়—এ নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। যাতে করে সহজেই লোকে অল্পদামে বই কিনতে পারে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বা উপহারের জন্য। এবিষয়ে সকলকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। Book-lovers Association গোছের প্রতিষ্ঠান প্রতিটি শহর-শহরতলীতে গড়ে তোলা আবশ্যক। জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ ও সংস্কৃতিচর্চার এমন সুযোগে সকলেই নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন।

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক কাঁচাহাতের কাগজ
রাঁচি-৪।

আমারে এ আঁধারে প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীকল্যাণকুমার বসুর 'আমারে এ আঁধারে' শীর্ষক রচনাটি পাঠ করে বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হয়েছি। শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন সম্পর্কে এই ধরণের রচনা এর আগে অন্য কোন পত্রিকায় দৃষ্টি-গোচর হয়েছে বলে মনে হয় না। লেখকের রচনার মৌলিকতা ও বর্ণনার স্বচ্ছন্দবিহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই রচনার মধ্যে অতুলপ্রসাদের যে কয়টি গানকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলি কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে কবি কর্তৃক উৎসারিত হয়েছে লেখক সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন। কবির ব্যক্তিগত জীবনকে অবলম্বন করে ঐ গানগুলি রচিত হলেও সেগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিমনের না হয়ে সর্বজনীন আবেদনের স্তরে পৌঁচেছে। রচনাটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। লেখকের আগামী রচনার মধ্যে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য এবং বিস্তৃত অনুসন্ধিৎসার উপর আলোকপাত হবে এই আশা রাখছি।

রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়,
উত্তরপাড়া।

অমৃত

ট্রামগাড়ি ও নকসালবাড়ি

দুটি বিষয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা জনসাধারণকে আশ্বস্ত করবে। অশান্তি যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই তা বলা বোধহয় বাড়াবাড়ি। তবে পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর সকলের। এখানকার যুক্তফ্রন্ট সরকার কী করেন, কীভাবে সমস্যা সামলান সে বিষয়ে কৌতূহল, উদ্বেগ ও সংশয় থাকা স্বাভাবিক। আগে কেরল নিয়ে ছিল মাথাব্যথা। আশ্চর্যের বিষয় কেরলে সুপরিচিত কমিউনিস্ট নাম্বুদিরিপাদ মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও গান্ধীবাদী অজয় মুখার্জির দিকেই কিন্তু সকলের নজর। তার কারণ, নানাদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব। এখানে কী হয় এবং এ রাজ্যের রাজনীতির পালে কোন্ হাওয়া লাগে তার প্রতি সকলেরই লক্ষ্য। তবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তো স্পষ্টই বলেছেন, (কংগ্রেস-বিরোধী) সরকার ভাঙা আমাদের কাজ নয়। আমাদের যেমন সাধ্য ও সামর্থ্য সে অনুযায়ী কংগ্রেস অকংগ্রেসনির্বিশেষে সকল রাজ্য সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যাবো। এটা আমার কথা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে।

যে সিদ্ধান্ত দুটির কথা গোড়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রথমটি অর্থাৎ ট্রামগাড়ি বিষয়ক সিদ্ধান্ত সরকারকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম কোম্পানির বিদেশী বড়কর্তারা বিলাতে পাড়ি দিয়ে লন্ডন থেকে সরকারকে তারযোগে জানালেন যে, কোম্পানির ভাঁড় ফাঁকা, সরকার যদি গ্যারাণ্টি হয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ২০ লাখ টাকা তুলে না দেন তাহলে জুলাই মাসে শ্রমিক-কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া যাবে না। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানির এই অন্যায় এবং অযৌক্তিক আবদারে রাজী হননি। পরিবহনমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন যে, সরকার নিজেই কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কর্মীদের মাইনে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, তবে হয়তো দু' একদিন দেরী হবে। কর্মীরা বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁরা সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, মাইনে দু' একদিন পরে পেলেও তাঁরা ট্রামগাড়ি যথারীতি রাস্তায় বের করবেন। কলকাতায় ট্রাম চলছে, যদিও কোম্পানীর বড়সাহেবরা কেউ আর এখানে নেই।

ট্রাম কোম্পানি ভাড়া বাড়িয়ে তাদের লোকসান পুষিয়ে নেবার জন্য জেদ ধরেছিল। সরকার তাতে রাজী হননি। সরকারের বক্তব্য এই যে, ট্রাম কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভাড়া বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে তদন্তের জন্য যে কমিটি বসানো হয়েছে তাঁদের রিপোর্ট না পেয়ে ভাড়া বাড়ানো চলবে না। কোম্পানির কর্তারা এতে অখুশী হয়েই কর্মীদের বেতন না চুকিয়ে দিয়ে বিলাতে পাড়ি দিয়েছেন। এই অবস্থায় সরকারের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সংগত হয়েছে। ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে যাত্রীসাধারণের, শ্রমিকদের এবং সরকারের কারো সম্পর্কই ভাল ছিল না। এই কোম্পানির হাত থেকে ট্রাম পরিচালনার ভার সরিয়ে এনে সরকার ভাল কাজই করতে যাচ্ছেন। তবে এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালের জাতীয়করণ সিদ্ধান্তের অগ্রগামী কিনা তা এখনও জানা যায়নি। মনে হয়, যৌক্তিক কারণেই পরবর্তী সিদ্ধান্তেও সরকারকে আসতে হবে।

অপর সিদ্ধান্ত এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তা হল নকসালবাড়িতে শান্তি স্থাপনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা। কেবিনেটে সর্বসম্মতিক্রমেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নকসালবাড়িতে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ আর সহ্য করা হবে না। সেখানে শান্তি ও শৃংখলা, নিশ্চিতি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। জেলা প্রশাসনকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহের শেষ দিকেই সমস্ত পুলিশবাহিনী নকসালবাড়ির উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ করে তাঁবু ফেলেছে। অবশ্য যতটা সম্ভব রক্তপাত এড়াবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া আছে। উগ্রপন্থীরা যদি পুলিশের মোকাবিলা না করে তবে পুলিশ নিজের থেকে তাদের ওপর হামলা করবে না। কিন্তু যাদের ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তাদের সংখ্যাও হবে ছয়শতাধিক, পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। এই দুইভাবেই, একদিকে শক্তি প্রদর্শন, অন্যদিকে আবেদন, সরকার নকসালবাড়ির জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়েছেন। এটা যে নিছক আইন ও শৃংখলার সমস্যা নয়, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ জড়িত, তা বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলই মোটামুটি স্বীকার করেছেন। সুতরাং শুধুমাত্র বন্দুকের ডগায় এর সমাধান করতে যাওয়া কতটা ঠিক হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। সম্ভবত এই কারণেই সরকার এ সম্পর্কে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে এত সময় নিলেন। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উগ্রপন্থীয় আন্দোলনকারীদের দিক থেকে এই সমস্যার সমাধান হবে না। যাঁরা নকসালবাড়িতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে ভূমিহীন কৃষকদের অযথা এক সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন এবং তাতে যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলবে তা বিপ্লব নয়, বিপ্লবের আতসবাজি। আশা করি সরকার নকসালবাড়ির ভূমিহীন ও ভাগচাষী কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তা উক্ত এলাকার জনসমর্থন পাবে এবং উগ্রপন্থীরা বন্দুক ছেড়ে সহযোগিতার পথে ভূমিসমস্যার সমাধানে রাজী হবেন। কারণ, রক্তপাত, বিশৃংখলা অথবা সশস্ত্র বিদ্রোহ গণতন্ত্রে অচল। তা দমনের জন্য সকারকে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে।

॥ রূপশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ॥

বুদ্ধদেব বসু

বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অবদান স্বতঃসিদ্ধ, তর্কাতীত;—তাঁর কবিতা, তাঁর গদ্যরচনা, তাঁর অনুবাদগুচ্ছ, তাঁর সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা—এই সব-কিছুর সন্নিপাতে তিনি বিশ-শতকী বাংলা সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ। শুধু কবিতার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণীয়, শুধু প্রবন্ধের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর;—মুখ্যত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে আমরা মনে রেখেছি। আর যে-লেখক একাধারে উৎকৃষ্ট কবি, উৎকৃষ্ট গদ্যলেখক এবং প্রায় আদর্শ সম্পাদক, আমাদের মনোযোগ ও স্মরণের উপর তাঁর দাবি তো অলঙ্ঘনীয়।

উপরন্তু, সুধীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজে ভালো লিখতেন তা নয়, অন্যদের ভালো লেখারও কারণ ছিলেন তিনি। 'পরিচয়ে'—অন্তত প্রথম কয়েক বছরের 'পরিচয়ে'—যাঁদের লেখা নিয়মিত বেরোতো তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আনকোরা নতুন অথচ সকলকে যে পাকাপোক্ত তৈরি লেখক মনে হয়েছে, কারো মধ্যেই নবিশির লক্ষণ ধরা পড়েনি, এর পিছনে অনেকখানি ছিলো সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, বিচারবুদ্ধি ও সহযোগিতা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু 'পরিচয়েই' লিখেছেন এবং ঐ পত্রিকার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ছিন্ন হবার পরেই রচনাকর্মে উৎসাহ হারান। মনে হ'তে পারে, যাঁদের লেখনীচালনা বিশেষ একজন ব্যক্তি ও বিশেষ একটি পত্রিকার উপর নির্ভর করে তাঁরা সত্যিকার লেখক নন, কিন্তু—অন্যদিক থেকে দেখলে বোঝা যায়, তিরিশ-দশকের 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর সাধারণ উৎকর্ষের পিছনে কতখানি ছিলো সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও অভিনিবেশ।

তিনি তাঁর পত্রিকার জন্য অনেক লেখক তৈরি ক'রে গিয়েছিলেন, এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে নিজেকেও তিনি, কবি হিসেবে, গদ্যলেখক হিসেবে, রচনা ক'রে নিয়েছিলেন কঠিন নিষ্ঠায়, অবিরাম পরিশ্রমে। কথাটা একটু বিশেষ অর্থে বলছি। যেসময়ে বাংলা কবিতা ছিলো আবেগের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস—অন্তত কবিরা ভাবতেন স্বতঃস্ফূর্ত রচনার সৌষ্ঠবের দিকে অনেক নামজাদা কবিরও তেমন মনোযোগ ছিল না, সেই সময়ে, রবীন্দ্র-বন্যায় রুদ্ধশ্বাসভাবে ভাসমান হ'য়েও, সুধীন্দ্রনাথ নিজের সামনে স্থাপন করেছিলেন এমন একটি আদর্শ যা অরাবীন্দ্রিক শৈলীর দিক থেকে অ-রোমান্টিক (যদিও ভাবের দিক থেকে নয়); যুক্তিনির্ভর ঋজুতা ও সংহতির দিকে উন্মুখ; নিজেকে ভাষাশিল্পী হিসেবে গ'ড়ে তুলেছিলেন এক নিত্যজাগ্রত সমালোচক-চৈতন্যের পরামর্শে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় এই জিনিশটি নতুন, এবং এখানেই সুধীন্দ্রনাথের অসামান্য বৈশিষ্ট্য।

[স্মরণে ।। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সংখ্যা ।। এপ্রিল : ১৯৬৭]

॥ কবি মোহিতলাল ॥

তারকনাথ ঘোষ

মোহিতলাল ধ্রুপদী সাহিত্যকারদের মতো তন্ময় অপিচ গঠন সচেতন হলেও মূলত রোমান্টিক কবি। তাঁর রোমান্টিকতা প্রধানত আত্মগত নয়, বিষয়গত। শব্দার্থের পরিধি বিস্তার করে তাঁর রোমান্টিকতাকে দূরায়ণ বাসনা বলা যেতে পারে—নিপট বাস্তববাদী ছাড়া আর সব কবির রচনার মূলে দূরায়ণ-বাসনা কোনো না কোনো আকারে থাকে। ক্লাসিক কবিও অংশত রোমান্টিক। মোহিতলালের রোমান্টিকতা আত্মকেন্দ্রিক নয়, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার মতো আত্মপ্রসারী তো নয়ই। অবশ্য রোমান্টিক কবিতামাত্রের মূলে রস কবির যে স্বকীয় কল্পনাদৃষ্টি মোহিতলালের কবিতার তার অভাব নেই, বরং এই কল্পনাদৃষ্টি তাঁর কবিতাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

মোহিতলালের রোমান্টিক কল্পনা-দৃষ্টি প্রধানত রূপকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। রূপানুরাগ তাঁর এই সৃষ্টির সঙ্গে মিশে আছে। সোনার তরী বা চিত্রার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্য-দৃষ্টি বা সৌন্দর্য-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর একটি মূলগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চেতনা একটি অখণ্ড অনুভূতি; তিনি বিশ্বের তাবৎ বিষয়কে এক সৌন্দর্যের প্লাবিনীধারায় অভিষিক্ত রূপে অনুভব করেছেন। তার সৌন্দর্য-দৃষ্টি একটি বৃহৎ চেতনার অংশ বলাও হয়তো অসংগত হবে না। কিন্তু মোহিতলালের রূপানুরাগ ঐ সর্বাত্মক চেতনা নয়, তিনি খণ্ডরূপের অনুরাগী। তিনি যদিও রোমান্টিক স্বপ্নের পসরা সাজিয়েছেন, তবুও স্বপ্নের সর্বময় আবেশ তাঁর খুব কম কবিতাতেই আছে। তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নভাবে রূপ-মুগ্ধ চিত্র অংকন করেছেন, অবশ্য তাঁর কবিদৃষ্টি ঐ বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

[সাহিত্য ও সংস্কৃতি : বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪]

ঘোষণা

পাঠকবর্গের আগ্রহে প্রতিধ্বনি বিভাগ পুনঃপ্রবর্তিত হল। আগের মতোই এখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আকর্ষণীয় নানা বিষয়ের নিবন্ধ অংশত সংকলিত হবে।

॥ রবীন্দ্র-সৃষ্টির উৎস সন্ধানে ॥

ভূদেব চৌধুরী

তত্ত্ববোধিনীর আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, জ্ঞান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে যদি কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করে তাতে আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আসলে সেদিনের দ্বন্দ্ব এক সংস্কারের সঙ্গে অপর সংস্কারের, এক 'ডগ্‌মা'র সঙ্গে আর এক 'ডগ্‌মা'র নিছক তত্ত্বগত অভিঘাত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। উদার জ্ঞান-চিন্তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ তাতে প্রতিহত হয়েছিল চিত্তবৃত্তির মুক্তিপথ হয়েছিল নিরুদ্ধ। ফলে রেনেসাঁসের জাগ্রত চেতনাকে সেদিন এক হাতে লড়তে হয়েছে স্বদেশের যুগ-সঞ্চিত সংস্কার অন্ধতার মূলোচ্ছেদ করতে, অপর হাতে প্রহত করতে হয়েছে প্রতীচ্য জ্ঞানের বর্তিকাতলে প্রচ্ছন্ন নবতর সংস্কারের অন্ধ বিস্তার-প্রয়াসকে।

বিপরীত দিকে সংস্কারমুক্ত যে নবীন সারস্বত সম্পদ প্রতীচ্যভূমি থেকে মানস-মুক্তির উদার প্রতিশ্রুতি বয়ে এনেছিল, প্রায় সর্বাংশেই তা ছিল জড়বিজ্ঞান ভিত্তির নিউটনের (১৬৪২—১৭২৭) পরে অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপে প্রগতিশীল প্রায় সকল ভাবনা ও প্রচেষ্টারই মূলে জড় বৈজ্ঞানিকতায় —কোন প্রকারের বিসম্বাদই নয়, অমিশ্র যুক্তিবাদেই ছিল তার একমাত্র নির্ভীক। বাঙালির রেনেসাঁসের ইতিহাসে এই একান্ত যুক্তিশয়তার প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯—৩১)। কিন্তু ঐকান্তিক এই আধিভৌমতা (materialism) ভারতীয় মননের গভীরে আরো এক স্ববিরোধী জটিলতার সৃষ্টি করেছিল স্বাভাবিক কারণেই। ভারতবর্ষ অন্তঃ প্রকৃতিতেই আধ্যাত্মিক, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পূর্বগামী স্বজনেরা তাই বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বর-নিষ্ঠতা আর আধ্যাত্মিকতা অবশ্য সর্বদাই সমার্থক নয়। ঈশ্বর-নিষ্ঠার অন্ধতা এককালে আমাদের দেশে আত্ম-উপলব্ধির অনপেক্ষিত স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রহত করেছিল। বহুলাংশে তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সম-সাময়িক সমস্ত পৌরাণিক ভাবপরি-মণ্ডলের অন্ধতা পরিহারের অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা থেকেই,—উনিশ শতকের নব-জাগ্রত মনন ও জীবন-ধ্যান বৈদান্তিক ধর্ম-বোধের উজ্জীবনে বিচিত্র দিক থেকে সবিশেষ সক্রিয় হয়েছিল। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধর্ম-চিন্তনের একটি ধারা ক্রমশঃ উপনিষদ-প্রণোদিত সাধ্যায়ত্ত সৌন্দর্য-ধ্যানের সঙ্গে নিবিড় অন্বয়ে যুক্ত হয়েছে।

[রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : বৈশাখ, ১৩৭৪]

নিদারুণ অন্নাভাব, অবর্ণনীয় দুর্গতি এই সব নারীদের কোলের শিশুসন্তানসহ খাদ্যের সন্ধানে পথে বের করে এনেছে। সালতোরা ব্লকের বিশজোড় গ্রামে একটা লঙ্গরখানার সামনে এদের খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

কমল চৌধুরী

এ দিনের পটভূমি

অন্ন নেই, নেই তৃষ্ণা মেটাবার জল। অভাবের তাড়নায় মানুষ আজ মৃত্যুর দরজায় উপস্থিত। কোটরগত চোখ, উদর-সম্বল শীর্ণ দেহ, রক্তশূন্য ফোলা অবয়ব নিয়ে লঙ্গরখানার দরজায় দরজায় নারী-পুরুষ-শিশুর দীর্ঘ মিছিল। গৃহপালিত পশু, বন্যপ্রাণী আশ্রয়হীন। সর্বত্র এক অচিন্তনীয় জীবন। দীর্ঘকাল পূর্বে দেখা ভারতের কোন চিত্র নয়। এ হোল আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতেরই সাম্প্রতিকতম দৃশ্য। বিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার পথ বেয়ে সমগ্র ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে যেন মানুষের করুণ ক্রন্দন আর অবলা প্রাণীর আর্ত চীৎকার। খরাপীড়িত অঞ্চলগুলি থেকে মৃত্যুর সংবাদ আসছে। কতলোক অনাহারে মরছে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ সব সময় সম্ভবপর নয়। কিন্তু স্বল্পাহারে, অনাহারে থেকে বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে যে অপুষ্টিজনিত রোগের সৃষ্টি হচ্ছে, এবং ধীরে ধীরে তারা যে মৃত্যুর শিকার হোচ্ছে, তাকে মৃত্যুর কোন গোত্রে ফেলে বিচার করা হবে তা বলাও মুস্কিল।

ভারত আজ গুরুতর বৈষয়িক সংকটের সম্মুখীন। পর পর তিন বছর যাচ্ছে মারাত্মক খরা। বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমছে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ এখনও বর্ষার ওপর নির্ভরশীল। অথচ এই অবস্থাই বহুদিন যাবৎ চলছে। এর সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি।

অভূতপূর্ব খরার জন্যই চলতি বছরে ব্যাপক শস্যহানি হয়েছে। তাই খাদ্যশস্যের দামও অতিদ্রুত মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলে অখাদ্য খেয়ে প্রাণ-ধারণ করতে হচ্ছে—এমন মানুষের সংখ্যা এখন মোটেই নগণ্য নয়। বেশী দামেও খোলাবাজারে কোনরকম খাদ্য মেলে না। ঘটিবাটি, সঞ্চিত অর্থ যা ছিল, সবই নিঃশেষ। বিহারের মানুষ নিদারুণ দুর্ভিক্ষে যে অসহায়তার মধ্যে পড়েছে, অতীতে তা একবার দেখা গিয়েছিল বাংলায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলায় যে-হাহাকার উঠেছিল, ভারতের ইতিহাসে তা এক মর্মান্তিক ঘটনা। আজ অবশ্য বিহারের অনটন তার সামিল হলেও, অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় তখন কোন সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান লঙ্গরখানা খুলে বসেনি, তাই গ্রামের মানুষ দুমুঠো অন্নের জন্য ছুটে এসেছিল শহরে। বিহারে আজ অগুন্তি সরকারি ও বেসরকারী লঙ্গরখানায় অসংখ্য মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলার সেই মন্বন্তরের দিনে জলাভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমান বছরে বিহারের অন্নাভাবের সঙ্গে মিশেছে প্রচণ্ড জলাভাব। আজকের বাংলাদেশেও বিহারের অনুরূপ দৃশ্য দেখা গেছে পুরুলিয়ায়, বাঁকুড়ায়। যেন একই মিছিলের দুটি প্রান্ত। ছায়ামূর্তির মতো নিদারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যু-গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনাহারে ও স্বল্পাহারে থেকে লোকের জীবনী-শক্তি এত কমে গেছে যে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে সমগ্র দেশের সর্বনাশ হবে।

খাদ্য-সমস্যা স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। ইংরেজ

আমলেও এই সমস্যা ছিল। ১৯৪৬ সালে সর্বভারতীয় খাদ্য-সংকটকে দূর করবার জন্য ইংরেজ সরকারকে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে ফসল উৎপন্ন হয়নি। ফলে অনাহার ও দুর্ভিক্ষ-জনিত অবস্থার সৃষ্টি হোত। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ৪০ লক্ষ মানুষ কলকাতার ফুট-পথে অনাহারে পড়ে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে এই সমস্যা আরও তীব্রতর হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন:

> "The problem of agriculture shortages has been intensified by certain special circumstances which arose during recent years namely, the loss on account of Partition of about 20 million acres of irrigated lad and the imparative need since 1949 of reducing the dependence of the jute and cotton industries on imported raw materials".

—তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য সাড়ে ৭ কোটি টন অতিক্রম করে সাড়ে ৯ কোটি টনে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ। বাইরের দেশ থেকে ১৯৫১ খৃঃ আমদানি করতে হয়েছিল ৪৭ লক্ষ টন, ১৯৫৩ খৃঃ ২০ লক্ষ টন এবং ১৯৫৪ খৃঃ দেড় লক্ষ টন। খাদ্য উৎপাদন যখন বৃদ্ধির দিকে পরিকল্পনা কমিশন কিন্তু এই সময়ে ভুল করে গেলেন। তাঁরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিলেন শিল্পের ওপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি খাতে বরাদ্দ ১৫·১ কমিয়ে করা হল ১১·৮ এবং শিল্প খাতে ৭·৬ ভাগ বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হল ১৮·৫। খাদ্যোৎপাদন কমে গেল। মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যা-ভাব এবং পণ্যমূল্য বৃদ্ধি দেশের মধ্যে সংকট ডেকে নিয়ে এল। যদিও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হোল, কিন্তু খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য ১০ কোটি টনে পেঁছান সম্ভব হোল না। উৎপন্ন হোল ৮-৮০ কোটি টন। বলা হয়েছে যে, পরপর খরা এসে উৎপাদনকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু প্রথম থেকে খাদ্যোৎপাদনে কম লক্ষ্য না দিয়ে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে, যদি ফসল বাড়াবার জন্য বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ হোত, এবং যে উদ্যোগ ও আয়োজন কৃষির ওপর দেওয়া হয়েছিল, তা যদি বজায় থাকত তাহলে হয়ত আজ ভারতকে চরম সংকটে পড়তে হোত না।

ভারতের সম্পদপ্রাচুর্য অতুলনীয় এই সম্পদকে সংহত করার জন্য প্রয়োজন সামাজিক কাঠামোর আমূল পরি-বর্তন। কিন্তু ভারতের যোজনাগুলি কখনই এই লক্ষ্য নিয়ে কল্পিত হয়নি। অরণ্য-সম্পদ, খনিজসম্পদ আর ফসলী জমির অভাব নেই। অথচ আজও আমাদের নির্ভর করতে হয় অন্য দেশের ওপর। অরণ্য-সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, খনিজ-সম্পদ খনিতেই থেকে যাচ্ছে। কৃষি জমির বেশীর ভাগই অকর্ষিত অথবা পুরোন ধরনের শস্যবীজ এবং কৃষিপদ্ধতির ফলে স্বল্পফসলী।

খাদ্য-সঙ্কটের-এর জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে যাঁরা কারণস্বরূপ দেখছেন, তাঁদের যুক্তিতে ভ্রান্তি আছে। ভারতে কৃষিযোগ্য জমির অভাব নেই। সেচ ও সারের ব্যবহার

পর পর দু-বছর খরার ফলে পুরুলিয়া জেলায় এক বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য একটু পানীয় জলের জন্য গৃহস্থ পরিবারে হাহাকার পড়ে গেছে। কোন মতে নদীর চরে অথবা বালুর চড়ায় গর্ত করে জল সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে। ছবিতে পুরুলিয়া জেলার বড়কুল গ্রামের একটি গৃহস্থ বধূকে কলসী বালতি নিয়ে চড়ার গর্ত থেকে অল্প অল্প জল সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে।

করে আরো অনেক অকর্ষিত জমিকে চাষের সামিল করা যেতে পারে। ওদিকে গবাদি পশু থেকে প্রাপ্ত সারের শতকরা ৭৫ ভাগই নানাভাবে নষ্ট হয়। অবশিষ্ট যা থাকে, তার সম্পূর্ণ ব্যবহারও করা হয় না, তার থেকে আবার বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এই অবস্থার দ্রুত প্রতিকার উচিত। সাময়িক বিপর্যয় রুদ্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী কৃষি-উন্নয়ন দরকার। কোটি কোটি টাকা রিলিফের দরুণ খরচা হোতে পারে, বিদেশী মানুষ দয়াপরাবশ হয়ে দান দিতে পারে, কিন্তু তাতে কোন সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় না।

বিহারে খরার যে রুদ্রমূর্তি ফুটে উঠেছে, পশ্চিমবাংলার সংকট গুরুত্ব তার থেকে কোন অংশে কম নয়। সংখ্যাতীত জলহীন, অন্নহীন মানুষ প্রকৃতির বিরূপতায় অভিশপ্ত। তবুও দেশের চারদিকে কলকারখানা শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে গিয়ে অরণ্য-সম্পদের বিনাশ ঘটান হচ্ছে। বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমছে। কৃষি উন্নতির কোন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নেই। রাতারাতি তা করাও সম্ভব নয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। ইংরেজ আমলেও কয়েকটি ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ঘটে গেছে। অবশ্য এর পুনরাবৃত্তির প্রতিবিধানে তাদের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের জাতীয় সরকার কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নে যত না কাজ করেছেন, তার থেকেও বেশী হয়েছে পরিকল্পনা। যে-পরিমাণ অর্থ পরিকল্পনা ও প্রচারে ব্যয় হয়েছে, তা দিয়ে কোন একটি বৃহৎ অঞ্চলকে শস্যসম্পদশালী করে তোলা সম্ভব ছিল।

এই নিদারুণ সংকট থেকে পরিত্রাণে রাজ্য সরকারগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলিতভাবে দুর্ভিক্ষত্রাণ-ভাণ্ডার গড়ে না তুললে এই বিপদ থেকে রেহাই পাবার কোন রাস্তা নেই।

বিহার ও অন্যান্য রাজ্য

গত ১৮ এপ্রিল বিহার সরকার দুটি সম্পূর্ণ জেলা এবং অপর পাঁচটি জেলার অংশবিশেষসহ কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেন।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চল ঘোষণা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ঘটনা। দুর্ভিক্ষ ঘোষিত এলাকার মোট পরিমাণ ২৩৪৬১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে এর পরিধি। পরিব্যাপ্ত হয়েছে দুর্দশা আরও অধিক মানুষের মধ্যে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা এই প্রথম।

দুর্ভিক্ষ-ঘোষিত এলাকাগুলি হল : সমগ্র পালামৌ জেলা, সমগ্র হাজারিবাগ জেলা, গয়া জেলা, (আরোয়াল কারপি, ওবরা, হাসপুরা এবং দাউদ নগর ব্লক বাদে), সাহাবাদ জেলার সমগ্র ভাবুয়া মহকুমা, সসারাম মহকুমার শিবসাগর, নোখা

ও চেমারি অঞ্চল, সদর মহকুমার সাহাপুর, বোহিয়া ও জগদীশপুর অঞ্চল এবং বাক্সার মহকুমার সিমরি, বহরমপুর ও বক্সার অঞ্চল, মুঙ্গের জেলা—খড়গপুর, সংগ্রামপুর এবং তারাপুর অঞ্চল বাদে সমগ্র সদর মহকুমা, ভাগলপুর জেলা—বেলহার এবং শম্ভুগঞ্জ অঞ্চল বাদে বাঁকা মহকুমা, কোলগঞ্জ, পীরপৈতি বাদে ভাগলপুর মহকুমার অংশ এবং গোপালপুর, বিহপুর ও নৌগাছিয়া অঞ্চল বাদে সদর মহকুমা, পাটনা জেলা—সমগ্র পাটনা সদর ও বিহার শরিফ মহকুমা এবং বরা মহকুমার মারমেরা, হারণডিথ, ফতোয়া, পণ্ডারক এবং মোকামা অঞ্চল। অবশ্য পরে অন্যান্য অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করলে, সেখানে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ-বিধি চালু করা প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষ-বিধি কার্যকর করার তাৎপর্য হোল অবিলম্বে ভূমি-রাজস্ব এবং ঋণসহ যাবতীয় সরকারী প্রাপ্য টাকা আদায় বন্ধ রাখা। দুর্ভিক্ষ-বিধি অনুসারে জেলা কর্তৃপক্ষ রিলিফ অফিসাররূপে কাজ করবেন এবং দুর্ভিক্ষ এলাকার জন্যে টাকা তুলে সেখানে রিলিফের জন্যে বিতরণ করবেন।

রাজ্যের বহু জায়গায় যখন কর্মোদ্যোগে ভাঁটা দেখা দিয়েছে, ঠিক তখনই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দাঁড়ানোয় বিহার সরকারের পক্ষে দেশের জনগণের ও বিশ্বের নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য ঐসব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করে সেই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

রাজ্যের কতকগুলি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা ভালো। প্রকৃতপক্ষে উত্তর বিহারের কতকগুলি অঞ্চলের অবস্থাও সমান খারাপ। তবে পানীয় জলের ব্যাপারে তাদের অবস্থা সামান্য ভালো।

বিহারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীইন্দ্রদীপ সিংহ সাম্প্রতিক একটি ভাষণে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে বলেছিলেন :

- o রাজ্যে, বিশেষ করে ছোটনাগপুর অঞ্চলে বেপরোয়াভাবে বন কেটে ফেলা,
- o ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা অবহেলা করা, বিশেষ করে দক্ষিণ বিহারে,
- o ছোট ছোট একদল বিবেকহীন ব্যবসায়ী এবং বড় উৎপাদক কর্তৃক খাদ্যশস্যের ব্যবসা একচেটিয়া করে রাখা।

সরকারী প্রেসনোট অনুসারে রাজ্য সরকার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেছেন :

- o দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে খাজনা মকুব,
- o দুর্ভিক্ষ সাহায্য সম্পর্কে সরকারী কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক যন্ত্র দৃঢ় করা,
- o উপযুক্ত ছাত্রদের পরীক্ষা ফী মকুব করা,
- o রিলিফ কমিশনারকে এখন থেকে দুর্ভিক্ষ কমিশনার বলে গণ্য করা এবং সাহায্য তহবিল সম্পর্কে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি,
- o এসব অঞ্চলে অবস্থা মোকাবিলার জন্য রেশনের পরিমাণ বাড়ান।

বিহারে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতাই বড় সমস্যা নয়, জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা কমই হল একটি বৃহৎ সমস্যা। সুতরাং সস্তা দরে খাদ্য বন্টনের খুবই প্রয়োজন আছে। সরকারীভাবে জানান হয়েছে, খাদ্যদ্রব্যের সমান বণ্টনের জন্য সকল প্রকারের সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রায় ১৯ হাজার করা হয়েছে। রেশনের দোকান থেকে গম ও মাইলো সরবরাহ করা হচ্ছে দৈনিক মাথাপিছু আট আউন্স। সর্বত্র সম পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। মানুষের খাদ্য নেই, অর্থ নেই। তাদের দেওয়া হয়েছে মাটি কাটার কাজ। বিনিময়ে মজুরী। তাতে যা পাওয়া যায় সেই সামান্য মজুরীতে খাদ্য কেনা অসম্ভব। মজুরীর পরিবর্তে খাদ্যশস্য সরবরাহ করলে মানুষের আরও বেশী উপকার হোত। তারপর খোলাবাজারে নেই খাদ্যশস্য। সুতরাং শুধু টাকা ঢেলে সমাধান কিছু হোচ্ছে না। যদিও রিলিফের কাজে দৈনিক মজুরী ১ টাকা ৮০ পয়সা হওয়ার কথা। কিন্তু রোজ গড়ে ৫০ থেকে ১০০ পয়সার বেশী কেউ পায় না। এ দিয়ে কোন একটি পরিবারের একদিনের উপযোগী গম বা চাল বা ভুট্টা সংগ্রহ অসম্ভব। বিহারবাসীদের একমাত্র খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকান গম। অন্য অঞ্চল থেকে খাদ্য আনা যাচ্ছে না। কারণ অনেকগুলি রাজ্যেই খরার নির্মম ছায়া নেমে এসেছে। তার ওপর আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর খাদ্যাঞ্চল সম্পর্কিত নিয়ম। অবশ্য কিছুকাল পূর্বে উত্তরপ্রদেশে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ থেকে সামান্য পরিমাণ খেসারি, ভুট্টা, যব পাওয়া গিয়েছিল ব্যবসায়িক সূত্রে।

বিহারের মত আর্তত্রাণের বিপুল আয়োজন আর কোথাও চোখে পড়বে না। তাই অন্নহীন, জলহীন মানুষ শহরে এসে ভিড় করছে না। যা অতীতে বাংলায় দেখা গিয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। রাস্তাঘাটে বুভুক্ষু মানুষ আছে, কিন্তু মৃতপ্রায়ের সকরুণ আর্তনাদ স্বল্পপ্রসূত। এর মূলে আছে কয়েকটি সেবা-প্রতিষ্ঠানের কঠোর সেবাকার্য। গ্রামে গ্রামে খোলা হয়েছে লঙ্গরখানা। হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর মুখে অন্ন, দেহে বস্ত্র তুলে দিয়ে এঁরা নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন।

বিহারের দুর্গত অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা অবশ্য চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে ছোটনাগপুর থেকে প্রায় ৫০ হাজার লোক চলে গেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২০ হাজার।

দিল্লীতে কয়েকমাস আগে মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছিল যে, কেন্দ্র
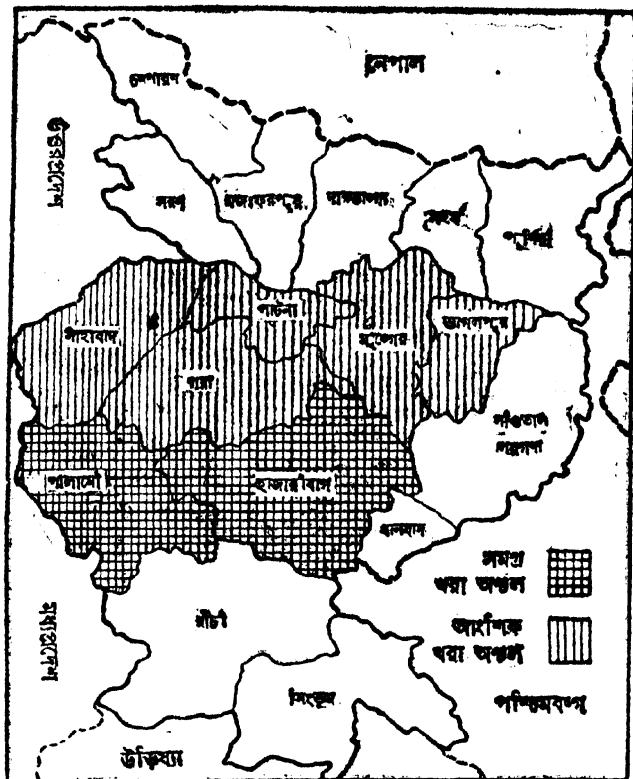
ক্যানিং থানার দাহারাণী গ্রামের মাঠে অভাবী নরনারী ও শিশুর দল মাটি খুঁড়ে চুঁচকোর (একরকম ঘাস) মূল সংগ্রহ করছে। এই মূল দিয়েই এরা এখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র এই দৃশ্য চোখে পড়বে।

থেকে যদি পর্যাপ্ত সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া না যায়, তাহলে বিহার সরকার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করবেন বলে স্থির করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজী হননি। যে-সব অঞ্চলে খরিফ, ভাদই এবং রবি, তিনটি ফসলের উৎপাদন শতকরা পঁচিশ ভাগের কম হয়েছে, কেবল সেইসব অঞ্চলেই প্রথমে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণ করে দেখেছিলেন, বছরে গড়ে যেখানে ৭৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়, সেখানে ১৯৬৬-৬৭ সালে মাত্র ৩০ লক্ষ ১৪ হাজার টন মতো হয়েছে। বিহারে যখন গড় উৎপাদন হয় তখনও তার ১৩ লক্ষ টন ঘাটতি পড়ে।

বিহারের জনগণকে শুধু বেঁচে থাকার মতো খাদ্য দিতে রাজ্যের বাইরে থেকে সর্বনিম্ন কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের তরফ থেকে তারও হিসাব করেছিলেন। হিসাবে দেখা গিয়েছিল, এই সর্বনিম্ন কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ হবে ২৬ লক্ষ টন। এই হিসাব করা হয়েছিল মাথাপিছু ১০৫ কেজির ভিত্তিতে—সারা দেশের মাথাপিছু গড় বরাদ্দ যেখানে ১২৮ কেজি।

বিহারের খেত-খামার শস্যহীন। পর-পর দু বছর গেছে অনাবৃষ্টি-অজন্মা। খাল-বিল, দীঘি, পুকুর-কুয়ো কয়েকটি বড় বড় নদী জলশূন্য। নির্জলা, শস্যহারা, শুষ্ক রিক্ত—সর্বহারা বিহারের এক চরম দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র। রাজ্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ লোক অনত্র চলে গেছে এবং শত শত গবাদিপশু পরি-ত্যক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ তাদের মালিক তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

৫ কোটি লোকের মধ্যে ৪ কোটি লোকই দুর্গতির মধ্যে কালাতিপাত করছে এবং তারা কোনরূপে একবেলা খেয়ে বেঁচে আছে। তার উপর পর্যাপ্ত জল সরবরাহের অভাবে তাদের অবস্থা আরও কাহিল। ১৮ হাজার গ্রাম ভীষণভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে—নদী, নালা ও কূপ-গুলি শুকিয়ে গেছে। পানীয় জলের জন্য জনসাধারণকে ৪।৫ মাইল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে কূপ খনন করা গেলেও পার্বত্য তরাই ও পাহাড়িয়া এলাকাগুলিতে তা দুরূহ ব্যাপার। জলের জন্য হাজার হাজার ট্রাক চাই। সরকার নলকূপ বসানোর জন্য নিবিড় কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাও করতে হবে ব্যাপকভাবে।

রাজ্যের জন্য মাসে মোটামুটি ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্রের নিকট বস্তুতঃ চাওয়া হয় মাত্র ৪ লক্ষ টন। অথচ কেন্দ্র রাজ্যের জন্য মাত্র ২ থেকে আড়াই লক্ষ টন মঞ্জুর করেছেন। রাজ্যে ৬০ হাজার টন বীজের প্রয়োজন। তার মধ্যে বিহার সংগ্রহ করতে পারবে ২০ হাজার টন এবং অনুকূল বৃষ্টি পেলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কিন্তু বরুণদেব কৃপা না করলে কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা অনুমান করাও কঠিন।

গো-মহিষাদি পশুর জন্যও পশু-খাদ্যের প্রয়োজন। এই খাদ্যের অভাবে গো-মহিষাদিও ভয়াবহ হারে ধ্বংস হতে চলেছে। এই অবস্থা চলেছে দীর্ঘদিন। কিন্তু পূর্বতন সরকার অবস্থার মোকাবিলার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করেন নি।

দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের ব্যাপারে সরকারের যে বিধিবন্ধ নিয়ম আছে, তা সর্বত্র পালন করা সম্ভব হয়নি। দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করলে দৈনিক ১২ আউন্স খাদ্য দিতে হয়। দুর্ভিক্ষ ঘোষণার আগে তারা সর্বোচ্চ পরিমাণ খাদ্য দিচ্ছিলেন দৈনিক মাথাপিছু কোন স্থানে ৮ আউন্স, কোন স্থানে ৬ আউন্স এবং কোথাও বা ৪ আউন্স। এছাড়া বহু জায়গায় তারা কিছুই দিতে পারছিলেন না।

আগেকার কংগ্রেস সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণকার্যের ব্যাপারে সাড়ে সতেরো কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু সেই সরকার পুরো অর্ধ খরচ করতে পারেন নি, ফলে বাকি টাকা দিল্লীতে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ঐ টাকা খরচ করতে না পারার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের ওপর আরোপ করতে চাইছেন। রাজ্য সরকার ত্রাণের বিভিন্ন ব্যবস্থাদির জন্য প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করেছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই টাকা মঞ্জুর না করেন, তাহলে ত্রাণকার্য ব্যাহত হবে।

বিহারে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর এলাকায় ১৮ হাজার গ্রামে দেখা দেয় ভয়ংকর জল সংকট। এই গ্রামগুলির লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬ লক্ষের মত। তার মধ্যে ৮ হাজার গ্রাম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। এই ৮ হাজারের প্রতিটি গ্রামে নলকূপ বসাতে হবে। কিন্তু বিহার সরকার এযাবৎ মাত্র ১০০টি রিগ সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং ঐ ১০০টি রিগ দিয়ে তারা মাসে কম

জোর ৪০০ নলকূপ বসাতে পারেন। কিন্তু তাতে জলকষ্ট আর কতটুকু মিটবে? সৈন্যবাহিনীর লোকেরা নলকূপ বসাবার ব্যাপারে খুব প্রশংসনীয় কাজ করছেন। যে সমস্ত গ্রামে জল সরবরাহের অন্য কোন ব্যবস্থাই নেই, সেইসব জায়গায় ট্রেন, ট্রাক, জীপ, ট্রাক্টর ও গরুর গাড়ী করে জল প্রেরিত হচ্ছে। দুর্গত এলাকাগুলিতে, ৪,৩৮৭টি হ্যাণ্ড পাম্প বসানো হয়েছে এবং আরো পাঁচশ পাম্প বসাবার চেষ্টা চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলে ৭৫০টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে, পাঁচ হাজার কুয়ো ড্রিলিং মারফৎ গভীরতর করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সব কিছুরই লক্ষ্য হলো গ্রামে গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ।

আজ পালামৌ জেলার মাটি যেন কোন আধুনিক শিল্পীর আঁকা বিচিত্র বিশাল চিত্রপট। ফেটে চৌচির হয়েছে মাটি। খাল বিল নদী শুকিয়ে গেছে। কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। জল নেই—ঘাস নেই। পশুদের জীবন মানুষের থেকেও করুণ। দিন দিন বাড়ছে ভিখিরির সংখ্যা; স্টেশনে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে, বাসস্ট্যাণ্ডে। চারদিকে দুমুঠো অন্নের জন্য হৃদয়বিদারী আর্তনাদ।

বিহারের সর্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চল পালামৌ-এর চিত্র সবথেকে খারাপ। সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌ ভ্রমণ কথায় একসময় এই অঞ্চলের সুন্দর ছবি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু আজকের পালামৌ-এ দু'চোখ মেলে তাকানো যায় না। এবারে রুদ্ররূপ ভয়ঙ্কর। এর আগে দুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৮৯৭ খৃঃ ও ১৯০০ খৃঃ। খরা গেছে ১৯৫১-৫২ খৃঃ, ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ, ১৯৬১-৬২ খৃঃ। ১৯৬৫ খৃঃ অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে শস্যহানি ঘটে।

এই অঞ্চলে বছরে সাধারণত গড়ে প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। পালামৌ-এর ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৪৪ একর জমির মধ্যে ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৫০ একর জমিই হোল জঙ্গলপূর্ণ। কৃষি জমির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৫৬ একর। বাকি জমি হোল পতিত ও অকৃষিযোগ্য। ১৬ লক্ষ ৬৮ হাজার লোকের ২০ শতাংশই আদিবাসী।

পালামৌ খাদ্যের জন্য চিরকাল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল। এবছর সর্বত্র খরা ও খাদ্যাভাবের জন্য সরবরাহ প্রায় বন্ধ। তাই পালামৌ-এর রূপ আজ ভয়ঙ্কর করুণ। দুর্ভিক্ষ ঘোষণার পর রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। খোলা-বাজারে খাদ্যশস্য দেখা গেলেও কেনবার মত পয়সা কোথায়! দুটি মরশুমে বৃষ্টি নেই। সমস্ত জলাশয় শুকিয়ে কাঠ। ডেহরী-অন-শোন থেকে ট্রেনে করে জল এনে ১৪টি স্টেশনে নামিয়ে সেগুলি ট্রাক গরুর গাড়ী ও মাথায় করে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জল আনবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ কয়েকটি ট্যাংকার দিয়েছেন অসামরিক কর্তৃপক্ষকে। দৈনিক চার লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা হচ্ছে। জলের রেশন প্রবর্তিত হয়েছে। পালামৌ-এর মানুষ ভুলে গেছে খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে জল ব্যবহার করা যায়।

সরকারী ও বেসরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আর্তত্রাণে এগিয়ে এসেছেন। সাড়ে তের লক্ষ লোকের মধ্যে সাড়ে চার লক্ষ লোক বেসরকারী লঙ্গরখানা থেকে নিয়মিত খাদ্য পাচ্ছে। সাড়ে তিন লক্ষ লোককে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হোচ্ছে। আরো সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক কোন না কোন-ভাবে সরকারের রেশন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। কৃষিজীবী ও ক্ষেতমজুর বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। পালামৌ জেলায় টেস্ট রিলিফের কাজে ৬২ হাজার লোক নিযুক্ত রয়েছে। জোয়ান ছেলেরা এই কাজে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করছে। সারা পালামৌ জেলার তিনশ পঞ্চায়েতের প্রতিটিতে একটি করে আছে লঙ্গরখানা।

পালামৌ অঞ্চলে টাটা রিলিফ প্রজেক্ট একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বারওয়াদি ব্লকে এঁরা ১২'টি লঙ্গরখানা খুলেছেন। এটি হোল দশটি পঞ্চায়েতের সমষ্টি। কুয়া খোঁড়া জলাশয় ও বাঁধ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন করছে প্রজেক্ট। মজুরেরা দৈনিক মাথাপিছু প্রায় আড়াই টাকা মজুরী পাচ্ছে এদের কাছ থেকে। তাছাড়া এরা নগদ আর্থিক সাহায্য, কৃষককে লাঙলের শস্য ফলা দান, জামা-কাপড়, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে অজস্র অর্থব্যয় করছেন।

জলের অভাবে পালামৌর বনাঞ্চল থেকে পশুরা চলে গেছে ডেহরী-অন-শোনের বনাঞ্চলে। এই বনাঞ্চলে সরকার শিকার নিষিদ্ধ করেছেন।

এই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের দুর্দশাও উল্লেখ করা যাচ্ছে। সেখান-কার অবস্থা বিহারের মত না হলেও, মানুষকে অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হোতে হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের তেতাল্লিশটি জেলার মধ্যে আটত্রিশটি জেলা চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের কোন কোন অংশের অবস্থা বিহারেরই মতো খারাপ। গত এপ্রিলে কলকাতায় উত্তরপ্রদেশের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঝাড়খণ্ড রায় বলেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে এক কোটি লোক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে বার আনা লোক চাল অথবা গম খেতে পাচ্ছেন না, যব অথবা অন্য ধরনের কিছু খাদ্য খাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিহীন চাষী। খাদ্যাভাব পূরণের জন্য কেন্দ্রের কাছে দুই লক্ষ টন গম ও মাইলো চেয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকার। পেয়েছেন মাত্র সওয়া লক্ষ টন। এখন আরও কিছু খাদ্যশস্য তাদের দরকার। উত্তরপ্রদেশের একমাত্র কানপুরে বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু আছে। রাজ্য সরকার কোনরূপ লেভি ধার্য করেন নি। বিপদ কাটানোর জন্য তাঁরা ছয় লক্ষ টন গম, যব ও ছোলা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। সরকার সংগ্রহমূল্যে কুইন্টাল প্রতি ১৫ টাকা করে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে এজন্য তাঁদের কোনরকম সাবসিডি দিতে হবে না, গমের দাম এক টাকা করে কিলো হবে। এরপর উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অবস্থা আরও চরমে উঠেছে।

রাজস্থানের ৩২,২৪০টি গ্রামের মধ্যে ৯,৫০০টি গ্রাম দুর্ভিক্ষকবলিত। ১৯৬৭-৬৮ সালে রাজ্যের দুর্ভিক্ষ সাহায্য খাতে আট কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। খাদ্যাভাবে পীড়িত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ হবে।

কেরলের খাদ্যাবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় অবস্থার দিকে যাচ্ছে। এপ্রিল মে মাসে কেরল ৩৭,০০০ টন চাউল কম পেয়েছে। এই দু' মাসে বরাদ্দ চালের পরিমাণ ছিল ১৪০,০০০ টন চাউল। কিন্তু সমগ্র পরিমাণ চাল না পাওয়ায় কেরলের রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রতি বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ছ' আউন্স চাল বরাদ্দ ছিল। কেরল রেশন ব্যবস্থা চলছে ১৯৬৪ খৃঃ নভেম্বর থেকে। তখন থেকে ৭০ হাজার টন চাউল ও ২০ হাজার টন গম কেরলের প্রয়োজন হয় প্রতি মাসে। দু' বছর পর পর খরায় চাল উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে কেরলে চাল সরবরাহও বন্ধ হয়েছে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে বাইরের দেশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কথা

প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। দেশবিভাগের ফলে ভাল শস্য উৎপাদনের জমিগুলি পড়ে গেছে পূর্ববঙ্গে। বছরের পর বছর এসেছে উদ্বাস্তু। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে ভয়ঙ্করভাবে। অন্যান্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরা ব্যবসাসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। যারা গমভোজী ছিলেন ক্রমে তারা চালের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন। ফলে চালের প্রয়োজন পড়েছে বেশী, উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়তে পারেনি।

জোতদার ব্যবসায়ীরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। সরকারও কঠোর হাতে এগিয়ে যাননি। এখন পরি-স্থিতি বিবেচনা করে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগের চার বৎসর পর চাল উৎপাদন ছিল
১৯৪৭-৫১ খৃঃ ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার টন
১৯৫১-৫৬ খৃঃ ৪১ লক্ষ ১১ " "
১৯৫৬-৬১ খৃঃ ৪৪ লক্ষ ২৮ " "
১৯৬১-৬৬ খৃঃ ৫০ লক্ষ টন

—কিন্তু চাহিদা ৬৬ লক্ষ টন। এই বৎসরগুলির মধ্যে আলু, গম, ডাল, তেল-

বীজ প্রভৃতির উৎপাদন বেড়েছে। কোনটি কম পরিমাণে কোনটির পরিমাণ বেশী। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে চাল উৎপাদনের লক্ষ ৩০ লক্ষ টনে না পৌঁছান গেলেও কাছাকাছি ২৭ লক্ষ টন উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল।

কৃষি বা খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রথম পরিকল্পনায় ৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবার মত পরিকল্পনা ছিল না প্রথম দিকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ সম্ভবপর হয় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে। যে গতিবেগ ও উৎসাহ কৃষিজীবী মানুষের মনে আছে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করলে খাদ্যঘাটতি অনেক পরিমাণে যে কমবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাছাড়া উন্নত ধরনের বীজ আবিষ্কৃত হচ্ছে। তাইচুন-১, তাইচুন-৬৫, তাইনান, কালিম্পং-১ ধরনের ধানের বীজ ব্যবহারে আশাতীত ফল পাওয়া যাবে। ধান ছাড়া গম ও ভুট্টার চাষ হোতে পারে। এরও উন্নত বীজ পাওয়া যাচ্ছে। যে সময়ে ধান উৎপন্ন হোচ্ছে না, সেই সময়ে গম, ভুট্টা, চীনাবাদাম, সরিষা চাষ সম্ভব।

১৯৬২ খৃঃ চীনা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত খাদ্যোৎপাদনের সংকট ততটা ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পরেনি। ১৯৫৪ সালে কর্ডনিং ও রেশনিং উঠিয়ে নেওয়া হয়। ১০ একরের ওপর জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত ধানের ওপর লেভিপ্রথা চালুর কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে রেশনিং চালু থাকা সম্ভব হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ২ লক্ষ টন চাল এবং চাহিদা অনুযায়ী গম সরবরাহের ফলে। ক্রমে দেশের মধ্যে কন্ট্রোল ও সর্বভারতীয় কর্ডনিংও রহিত হোল। বেশ চলছিল তখন দেশটা। খাদ্যের অভাব থাকলেও সংকট সমাধান হয়েছিল নানান-ভাবে। ৬২' সালের চীন আক্রমণ ও '৬৪ সালের পাক আক্রমণের পর থেকেই ধূর্ত সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ীরা তৎপর হোল। পণ্যমূল্য ভয়ংকর রকম বেড়ে যাচ্ছে এরপর থেকে। মুদ্রাস্ফীতিও এর একটি বড় কারণ। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে পার্লামেন্টের বিতর্কসভায় স্যর পেথিক লরেন্স বলেছিলেনঃ "বেঁচে থাকবার জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তা কেনবার ক্ষমতা অসংখ্য লোকের নেই। মুদ্রাস্ফীতই এই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ। এর জন্য আর কেউ নয়—একমাত্র ভারত সরকারই দায়ী।" মিঃ আমেরিও বলেছিলেন ঃ "সমস্যাটি হোচ্ছে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা। জনসাধারণের হাতে কেনবার মত

মায়ের কোলে মরনোন্মুখ শিশু ঃ দীর্ঘদিন অনাহার ও অপুষ্টিজনিত রোগে ক্ষীণজীবী শিশুদের নিয়ে মাকে সাহায্য কেন্দ্রে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। অকরুণ খরা এলাকা পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে এই দৃশ্য আজ বিরল নয়।

টাকা ছিল না ঠিকই। তাহলে অবস্থাটা আজকের মতো এমন শোচনীয় হয়ে উঠতে পারত না।'

আজকের সরকারের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে খাদ্য ব্যবসায়ীরা দেশের জনসাধারণ ও সরকারের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার ও চরম অসহযোগিতা করেছেন। বাধ্য হয়ে সরকারকে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ করতে হোল। রেশনিং-এর আশ্রয় নিতে হোল সকলকে সমানভাবে খাদ্য বন্টনের জন্য। লেভী চালু হোল, কঠোর কর্ডনিং করে চাল সংগ্রহের চেষ্টা চলল।

পশ্চিম বঙ্গের পূর্ববর্তী সরকারের খাদ্যনীতির কয়েকটি মূল কথা ছিল ঃ

- পাইকারী ধান ব্যবসা নিষিদ্ধ ;
- জোতদার ও কৃষকের ওপর লেভির সাহায্যে ধান এবং মিল মালিকের ওপর লেভির সাহায্যে চাল সংগ্রহের চেষ্টা।
- কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রবর্তন;
- ঘাটতি জেলায় আংশিক রেশনিং;
- একস্থান থেকে আরেক স্থানে ধান-চাল প্রেরণ নিষিদ্ধ করণের জন্য কর্ডনিং প্রবর্তন।

ধানচালের দাম বেঁধে দেওয়া হয়। এবং এই ব্যবসায়ে আংশিক রাষ্ট্রীয়করণ ছিল লক্ষ্য। ধানচাল সংগ্রহে পুলিশী ব্যবস্থা জনগণের সঙ্গে সরকারের বহু দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। ২২ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ, সংশোধিত হয়ে ১৫ লক্ষ টনে গিয়েও ৩ লক্ষ টনের বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ধানচালের পাইকারী ব্যবসা রাখলেন। কিন্তু ৫০ মণের বেশী মজুত করতে হলে লাইসেন্স নিতে হবে। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং থাকল। কর্ডন তুলে নেওয়া হোল না।

উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি জেলার মধ্যে কিন্তু কর্ডন থাকল না। জমির মালিক উদ্বৃত্ত ধান সরকারের কাছে বিক্রয় করবে, তার দামও বেঁধে দেওয়া হয়। উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি জেলায় কর্ডন তুলে দেওয়ায় প্রথম দিকে সমস্ত চাল চলে আসে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে।

পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের নিদারুণ খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ায়, সেখানকার মানুষের প্রায় অর্ধেকই অনাহার ও অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। খাদ্যাভাবের সঙ্গে আছে প্রচন্ড জলাভাব। চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে এক দুশ্চিন্তার পরিবেশ। পরপর দু-তিন বৎসরের খরার অনিবার্য পরিণতি এবং প্রকৃতির বিরূপতায় কাউকেই অভিযুক্ত করা অর্থহীন। এই বিপদকে প্রতিরোধ করাই আজ বড় কথা। আমরা অতীতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি, অনেক কিছু করেছি প্রতিবেশী রাজ্যের জন্য। কিন্তু এই নিদারুণ সংকটে পড়েছে আমাদের প্রত্যেকের পরিবার; সে-কথা মনে রেখেই নিজের ক্ষুধার অন্ন থেকে একমুঠি রেখে দিতে হবে দুর্গতদের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রতিশ্রুতিমত কেন্দ্র থেকে চাল পাওয়া গেলেও, গত চার মাসে ৪০ হাজার টন গম কম পাওয়া গেছে।

এ-বছর পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়েছে। প্রয়োজন ৬০ লক্ষ টনের। ঘাটতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টন। এই ১৫ লক্ষ টন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে চেয়েছিলেন। গত বছরের উৎপাদন-পরিমাণ এ-বছর অপেক্ষা ৭১ হাজার টন বেশি ছিল। গত বছর কেন্দ্র ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার টন চাল দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মে মাসের মধ্যে ৭৭ হাজার টন চাল সংগ্রহ করেন। মজুত উদ্ধার হয় এক হাজার টন।

পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় অন্নাভাব ঘটায় ঐ সব অঞ্চলের দুর্গত লোকদের খাওয়ানোর জন্যে বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন। বিহার, উত্তরপ্রদেশে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কাছে তাদের চাহিদা ১৫ লক্ষ টন চালে সীমাবদ্ধ রাখেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাসে ১৫ হাজার টন চাল এবং ৭৫ হাজার টন গম দিতে রাজী হন। চাল সরবরাহ ঠিকই আছে। বরং তাদের সরবরাহ পরিমাই গত পাঁচ মাসে ৪ হাজার টন বেশি এসেছে—মোট পরিমাণ ৭৯ হাজার টন। কিন্তু গত চার মাসে ৪০ হাজার টন কম গম পাওয়ায় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মে মাসের শেষে ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ হাজার টন। এই ঘাটতি পরিমাণ জুন মাসের মধ্যে সরবরাহের কথা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে চালের ভবিষ্যৎ অবস্থা মোটামুটি ভালর দিকে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ উঠবে আউশ ফসল, তাছাড়া এই সময়ে ব্রহ্মদেশের চালও এসে পৌঁছবে বলে মনে হয়।

গম সরবরাহ কম হওয়ার ফলে ময়দার কল ও বেকারিগুলিতে গম সরবরাহ প্রায় বন্ধ। ময়দার কল ও বেকারীগুলিকে মাসে ২০ হাজার টন গম সরবরাহ করা হোত। বিস্কুট-রুটি তৈরি প্রায় বন্ধের দিকে। যা পাওয়া যায়, তার দামও আকাশছোঁয়া। বেকারীগুলি প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে ছাঁটাইয়ের একটি ভয়ংকর অবস্থা এগিয়ে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্র থেকে বেশী খাদ্যশস্য সাহায্য না পেলে রাজ্য সরকারের সংগ্রহ ও মজুত উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হবে এবং অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ হয়ে পড়বে—এমন আশঙ্কাও রয়েছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে যদি রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তাহলে দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। আর তার প্রতিক্রিয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, পার্শ্ববর্তী বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি যে-সমস্ত অঞ্চল থেকে বহু লোক এখানে কাজ করে জীবিকা চালায়, সেসব জায়গায়ও প্রতিক্রিয়া প্রসারিত হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গে ৯০ হাজার মেঃ টন খাদ্যশস্য (গম ও মাইলো) পাঠাবেন। জানা গেছে, প্রতিশ্রুত খাদ্যশস্যের মধ্যে থাকবে ৭৫ হাজার মেঃ টন বিদেশী গম, ১০ হাজার মেঃ টন দেশী গম এবং ৫ হাজার মেঃ টন মাইলো।

চাল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে জুলাই মাসে আরও ১৫ হাজার মেঃ টন চাল পাঠাবার চেষ্টা করছেন। যদি উড়িষ্যা থেকে কোন চাল না পাওয়া যায়, তাহলে অন্ধ্র প্রভৃতি অন্য কোন রাজ্য থেকে চাল সংগ্রহের চেষ্টা হবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের সংবাদে জানা গেছে, উড়িষ্যা থেকে যে ১৫ হাজার মেঃ টন চাল আসবার কথা ছিল, তার মধ্যে ছ' হাজার টন চাল পাঠান হয়েছে। বাকি চাল অবিলম্বে পাঠাবার ব্যবস্থা হোচ্ছে। চলতি মাসে পশ্চিমবঙ্গে আরো ১৫ হাজার টন চাল পাঠাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। উড়িষ্যায় যে নব্বই হাজার টন ধান আছে, তা এখন ভানতে চান না মিল-মালিকেরা। কারণ, বর্ষা নেমে গেছে। পাঞ্জাব থেকে এ-মাসে দশ হাজার টন গম আসছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঞ্জাব থেকে ১০ হাজার টন খুদ কিনবেন। পাঞ্জাব সরকার তার অনুমতিও দিয়েছেন। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীরা খুদ বিক্রি করতে চাইছেন না।

অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি ২৫ জুন জানান যে, তাঁর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে দশ হাজার টন চাল দেবে। ইতিমধ্যে তিন হাজার টন পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে গেছে।

জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ পাঁচ হাজার মেঃ টন। এই পরিমাণের মধ্যে ৭৫ হাজার মেঃ টন বিদেশী গম, ১০ হাজার মেঃ টন দেশী গম, ৫ হাজার মেঃ টন মাইলো এবং ১৫ হাজার মেঃ টন চাল দেবার কথা ছিল। কিন্তু খাদ্যশস্য পূর্ণ পরিমাণমত এসে পৌঁছায়নি।

জুলাই মাসের মধ্যে চাল এসে না পৌঁছলে চরম সংকটের সৃষ্টি হবে। গত মাসের শেষে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থায় কোন শিথিলতা আনা হবে না। তাছাড়া আংশিক রেশন-ব্যবস্থার এলাকা সম্প্রসারণ করে প্রায় দেড় লক্ষ লোককে মাথাপিছু সপ্তাহে এক কে-জি (সর্বোচ্চ পরিমাণ) করে গম দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে ও-ব্যাপারে স্থানীয় খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলির সুপারিশ অনুযায়ী বণ্টন-কার্য হবে। এই ব্যবস্থা ১ জুলাই থেকে চালু হবে।

গত ২১ জুন চাল ও ধান বিক্রয়ে অতিমুনাফা রোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮-র পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবিরোধী আইনের ৩নং ধারা অনুসারে এক আদেশ জারী করে এই রাজ্যের বিধিবদ্ধ রেশন-বহির্ভূত জেলায় বা এলাকায় খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক চাল ও ধান বিক্রয়ের ব্যাপারে নিম্নলিখিত সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করে দিয়েছেনঃ

জেলা বা এলাকা	কিলোগ্রাম প্রতি চালের সর্বোচ্চ মূল্য (টাকায়)	কিলোগ্রাম প্রতি ধানের সর্বোচ্চ মূল্য (টাকায়)
১। বীরভূম, মেদিনীপুর ও কোচবিহার জেলা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা এবং আসানসোল মহকুমা বাদে বর্ধমান জেলা।	১ টাকা ২০ পয়সা	৭০ পয়সা
২। উপরের (১)-এ বর্ণিত এলাকা এবং বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা বাদে রাজ্যের সকল এলাকায়।	১ টাকা ৩৫ পয়সা	৭৫ পয়সা

কোনও খুচরা বিক্রেতা চাল বা ধান নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে আদেশ অনুসারে দন্ডনীয় হবেন। দু বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় প্রকার শাস্তিই হতে পারে। কিন্তু সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার বাঙলা দেশের মজুতদাররা সরকারী নির্দেশকে উপেক্ষা করে গেছেন। নানা প্রচেষ্টায়ও তাঁদের সজাগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে মজুতদারবিরোধী অভিযান চালিয়ে বহু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছেন।

পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার ৪৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৫ লক্ষই দুর্ভিক্ষকবলিত। পুরুলিয়ার ১৭টি থানার মধ্যে ১৬টি, বাঁকুড়ার ১১টি থানার মধ্যে ১০টি দুর্গত। দুর্গত অঞ্চলগুলিতে চলছে ত্রাণকার্য। পশ্চিমবংগ সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করছেন এই দুরবস্থার প্রতিবিধানে। বিভিন্ন জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান নানান সেবা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু এই সেবাকার্যে কোন সংহতি নেই।

পুরুলিয়ার ১৫ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে ১২ লক্ষ অধিবাসী বর্তমানে এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছেন। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ। ১৬টি দুর্গত থানার মধ্যে চেলিয়ামা, মঠতোর, বড়া, পয়রাচেলি, বড়ামেসিয়া, পুঞ্চা, বাগদা, লাকড়া, তারণা ব্লক, নিতুড়ি, ঝালদা, জয়পুরের অবস্থা খুবই খারাপ। ১নং মানবাজার , পুঞ্চা, রঘুনাথপুর, আরশা, নিতুরিয়া, সাঁতুরী প্রভৃতি থানার অবস্থা চরমে ওঠে। দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে যাত্রা শুরু করেছে। খরাক্লিষ্ট এলাকায় স্ত্রীলোক ও শিশুসমেত শত শত মানুষ জীবন ও মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে। চাষী, ক্ষেতমজুর, বাউরী, বাগদীশ্রেণী অভাবনীয়রূপে দুর্দশাগ্রস্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দু হাজার টন গম সরবরাহ করেছেন ১ লক্ষ ৬৩ হাজারের বেশী মানুষের মধ্যে। মে মাস পর্যন্ত সাড়ে ১৪ লক্ষ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ৮৮টি টেস্ট রিলিফের স্কীম চালু হয়েছে। মোট ১২৯টি স্কীম মঞ্জুর হয়েছে। এই খাতে ব্যয় হবে নয় লক্ষ টাকা। যতদিন পর্যন্ত না পুরুলিয়ায় ভুট্টা ওঠা শুরু হয়, ততদিন পর্যন্ত এই জেলার অধিবাসীদের জন্য প্রতি মাসে ৬ হাজার টন গম দরকার। এছাড়া বর্তমান অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য অন্তত এই জেলার মানুষদের তিন কোটি টাকার দরকার। পুকুর, বাঁধ, ইঁদারা, খাল-বিলগুলি শুকিয়ে অন্নাভাবের সংগে পুরুলিয়ায় চলেছে জলাভাব। সরকার ৩২০০টি কূপ সংস্কার করছেন জল সরবরাহ স্কীম অনুযায়ী। ২২০০টি কূপ সংস্কার হয়েছে। ট্রাকে করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। যেসব লোক আসানসোল-বার্নপুর শিল্পাঞ্চলে দিনমজুরের কাজ করতো, তাদেরও আজ কাজ নেই। সকল ধর্মের মানুষ তাই এক জেলা থেকে আর এক জেলায় চলেছে দুমুঠো অন্নের জন্য। বছরের যে দু-তিনটি মাস পুরুলিয়ায় কষ্টের কাল চলে, ঐ সময়ে এখানকার লোক পার্শ্ববর্তী বর্ধমান, বিহার, বাঁকুড়ার অঞ্চলে চলে যায়। কিন্তু ১৯৬৩ খৃঃ থেকে বৃষ্টি কমছে। অবস্থাও খারাপের দিকে এগিয়েছে। এ-অবস্থায় পুরুলিয়াবাসীরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল হোতে পারেনি, আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। এমনকি গ্রামাঞ্চল থেকে গরু চুরি করা হোচ্ছে। বাসনপত্র গেছে অনেকের, অনেকের গেছে বাস্তুভিটা। অনেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছেড়ে চলে গেছে শিল্পাঞ্চলে কাজের জন্য।

পুরুলিয়ার বহু জায়গায় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। চেলিয়ামা গ্রামের লোকসংখ্যা বারো হাজার। এখানে একটি লঙ্গরখানায় প্রতিদিন একবেলা এক হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। পায়রাচেলিতে বিড়লাগোষ্ঠী যে লঙ্গরখানা খুলেছেন, সেখানে প্রতিদিন হাজার-বারো লোককে এক হাতা খিচুড়ী দেওয়া হয়।

লঙ্গরখানায় দুঃস্থ অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। নারী-পুরুষ-শিশুর দল এসে সারি দিচ্ছে। না খেতে পেয়ে চলার শক্তি নেই এমন মানুষও আছে তাদের মধ্যে।

অনাহারে ও অল্পাহারে নানারকম রোগ দেখা দিচ্ছে। বাগদায় আছে একটি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এখানে প্রতিদিন বহু শোথ-আক্রান্ত রোগী আসছে চিকিৎসার জন্য।

বাঁকুড়ার সাড়ে আঠার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বারো লক্ষ লোকই খরা-কবলিত। পরপর দু-বছর অনাবৃষ্টিতে বাঁকুড়ার ফসলহানি ঘটেছে। ৬৬ শতাংশ আমন আর ৭৫ শতাংশ আউশ ধানের ক্ষতি হয়েছে। কংসাবতী ও ডি ভি সি এলাকা থেকে সামান্য ধান পাওয়া গেছে। উনিশটি থানার মধ্যে গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, শালতোড়া, মেজিয়া, ইন্দপুর, খাতরা, কোতলপুর, জয়পুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী সবথেকে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। ছোট ছোট চাষী, ভূমিহীন কৃষক, তাঁতী, নানা কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীলরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। মানুষ গাছের পাতা, শুকনো শাক, গরুর মাংস ও অন্যান্য অ-খাদ্য খেয়ে জীবনধারণের চেষ্টা করছে।

বাঁকুড়ায় ১৫০টি টেস্ট রিলিফ স্কীমে মে মাস পর্যন্ত ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোককে। বে-সরকারী সংগঠন ২০টি লঙ্গরখানা খুলেছেন এই জেলায়। পুরুলিয়া অপেক্ষা বাঁকুড়ার ত্রাণ-ব্যবস্থা অনেক ভাল। পুরুলিয়ায় লঙ্গরখানার সংখ্যা যেখানে আটটি কি ন'টি, বাঁকুড়ায় সেখানে সংখ্যা দ্বিগুণেরও অনেক বেশি। তাছাড়া ২৫ সরকারী লঙ্গরখানা খোলবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরকারকে পরামর্শ দেন।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে গোপালপুর অঞ্চলে গত ডিসেম্বর মাসে অন্নসত্র খোলা হয়। এখানে দৈনিক প্রায় দেড় হাজার দুঃস্থ পীড়িত মানুষকে খাদ্য দেওয়া হয়। সংঘের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে কুয়ো নির্মাণ, টিউবওয়েল বসানো, কুয়ো সংস্কার প্রভৃতি কাজও চলেছে। জয়পুরে কলকাতা পৌরসভা মেডিকেল ইউনিটসহ একটি লঙ্গরখানা খুলেছেন গত ২৫ জুন। এটি আড়াই মাস খোলা থাকবে। দৈনিক দেড় থেকে দু' হাজার দুর্গত মানুষকে বিনা পয়সায় খাওয়ানো হয় এখানে।

জাতীয় মহিলা সংহতির বাঁকুড়া শাখার উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন খরা-পীড়িত অঞ্চলে ত্রাণকার্য আরম্ভ হয়েছে। গঙ্গাজলঘাটি থানার কাপিষ্ঠা গ্রামে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ চার্চেস থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের সাহায্যে মহিলা সংহতি একটি তিনশত ব্যক্তির জন্য আহার্য বিতরণ কেন্দ্র চালাচ্ছে। উক্ত গ্রামে দুইশতাধিক নতুন বস্ত্রও বিতরণ করা হয়েছে। সংহতি বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত বনকাটি গ্রামে তিনশতাধিক ব্যক্তির জন্য একটি আহার্য বিতরণ কেন্দ্র এবং সদর থানায় নিরীশা গ্রামে প্রত্যেকটিতে ২৫০ শত ব্যক্তিকে খাদ্যশস্য বিতরণ করছে। আহার্য বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন প্রস্তুত খিচুড়ি বিতরণ করা হয় এবং খাদ্যশস্য বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে একদিন মাথাপিছু ১৭৫০ গ্রাম খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। বেলিয়াতোড় গ্রামে সংযুক্ত মহিলা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত আহার্য বিতরণ কেন্দ্রটিতেও সংহতির কর্মীরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছেন। বিষ্ণুপুরে একটি খাদ্যশস্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

বিড়লা ব্রাদার্স বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের আর্ত মানুষের সেবার জন্য বিহারের দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে ১১টি এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় একটি করে মোট তেরটি

বিহার, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার খরা পীড়িত অঞ্চলের দৃশ্য নহে। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার একটি গ্রামের জলাভাবের দৃশ্য। দারুণ খরায় নদীর জল শুকিয়ে গেছে, আশে-পাশেও পানীয় জলের কোন উৎস নেই। তাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোদাল দিয়ে নদীর বালি তুলে, গভীর চুয়া কেটে, গ্রামের বধূরা অল্প অল্প করে কলসীতে জল সংগ্রহ করছে। এইভাবে চুয়ার জলেই গ্রামের লোকেদের স্নানও সারতে হয়।

লঙ্গরখানা খুলেছেন। প্রত্যেকটি প্রতিদিন ৬০০ লোক খাওয়ানো হয়। নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত এগুলি খোলা থাকবে।

টেস্ট রিলিফ, লঙ্গরখানা খুলে মানুষের এই নদারুণ দারিদ্র্য ও অসহায়তাকে দূর করা কতোদূর সম্ভব বলা কঠিন। তাছাড়া বিহারের মত পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় কোন কেন্দ্রীয় রিলিফ সোসাইটি গঠন করা হয়নি। ফলে সমস্ত ত্রাণসংস্থার মধ্যে কোন সংহতি নেই। অথচ বিহারের অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঐ দুটি জেলার কোন কোন অঞ্চলের বিশেষ পার্থক্য নেই। রঘুনাথপুর ব্লকের চেলিয়ামা ও মউতোরে প্রকৃত দুর্ভিক্ষের রূপকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু ত্রাণ-ব্যবস্থার দরকার। তাতে সেবাকার্যের মধ্যে একটি সমন্বয় আসবে। বিহারে নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা হয়েছে, কারণ, এই শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা লঙ্গরখানায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন না। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতেও এই ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ প্রয়োজন। তাছাড়া কৃষিজীবীদের মধ্যে জমিবন্ধকী ঋণ দেওয়াও দরকার।

এই সঙ্গে বাঙলা দেশের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের চিত্র দেওয়া হোল। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার পরই মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর সর্বাপেক্ষা দুর্গত অঞ্চল। অবস্থা সর্বত্র সমান নয়। কোথাও কম কোথাও বেশী।

মালদহ জেলার গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য যদি লঙ্গরখানা খোলা না হয়, তাহলে তাঁদের বাঁচানো যাবে না। কোথাও চাল বা গম নেই। অবস্থা অনুযায়ী খাদ্য-ত্রাণ কমিটি আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পুরোপুরিভাবে ত্রাণকার্য করতে পারছে না। খয়রাতি সাহায্য নির্মমভাবে হ্রাস করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অন্নাভাব এতই বেশী যে, সেখানে মাথাপিছু ৩০০ গ্রাম করে গম নেহাতই কম।

পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে গত ১৮ জুন মধুবনীর হাটে প্রায় দু' শত সশস্ত্র মানুষ হানা দিয়ে হাটের ধান-চাল লুঠতরাজ করে নিয়ে যায়। হানাদারদের মধ্যে সাঁওতাল ও আদিবাসী ছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের দাবীতে চলছে নারী-পুরুষ-শিশুর মিছিল। চাল লুঠ, আলু লুঠ হোচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ক্ষুধার্ত মানুষের দল খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাটে-বাজারে জনতা মজুতদারের মজুত চাল খুঁজে বের করে বণ্টন করছে।

বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার একটি সরকারী গুদাম থেকে ২০ মণ ধান লুঠ হয়েছিল জুন মাসের শেষদিকে। নদীয়া জেলার করিমপুর বাজারে চাল-গম ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান লুঠ হয়।

ট্রেন থামিয়ে খাদ্যশস্য লুঠ ও বিতরণ হোচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের শ্রমিকদের জন্য প্রেরিত খাদ্য বিমানে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ জানান "ট্রাকে ও ট্রেনে করে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়, কারণ লুঠ হচ্ছে। ফারাক্কায় শ্রমিকদের জন্য পাঠানো খাদ্য ইতিমধ্যে পথে লুঠ হয়ে গেছে। যদি দ্রুত খাদ্য না আসে, তাহলে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন স্থানে ট্রেন থামিয়ে খাদ্য লুঠের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার অবস্থা সবথেকে খারাপের দিকে। সুন্দরবন অঞ্চলের চির-দারিদ্র্য আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। এখানে ওখানে গোপন চালের গুদাম যা আছে তার থেকে আসছে চোরাই চালান কলকাতার দিকে। অথচ স্থানীয় লোকেরা খেতে পাচ্ছে না।

তবে এখনো যদি চোরা-কারবারী এবং কালোবাজারী সচেতন হয়, আর সেই সঙ্গে কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আসে খাদ্য সাহায্য, তবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এ বিপদ থেকে হয়তো আমরা অনেকটা উদ্ধার পেতে পারি। কারণ আর মাসখানেকের মধ্যে আউশ ধান উঠবে। এবং তার ফলন নাকি এবার খুবই ভালো।

সদাব্রতর সদ্য-চিকিৎসা

শৈল চক্রবর্তী

দোলগোবিন্দকে দেখতে গিয়েছিলুম।

দোলগোবিন্দ অসুস্থ। ভাবতেও যেন কেমন লাগে। কখনও তার অসুস্থ সংবাদ শুনেছি বলে কই মনে পড়ছে না ত। তবে?

সেইজন্যেই গেলুম দেখতে।

তিনটে বাসরুট চেঞ্জ করে পৌঁছলুম তার বাড়িতে। বাড়ি নয় ফ্ল্যাট। গিয়ে দেখি গোবিন্দও ফ্ল্যাট হয়ে আছে।

ব্যাপার কি? প্রথমেই প্রশ্ন করে বসি।

বলছি ব্যাপারটা, বলেই গোবিন্দ কাত মেরে আমার দিকে ফিরল। তার মাথার আইস ব্যাগটা গড়িয়ে পড়ল।

জ্বর নাকি?

শুধু জ্বর? গায়ে হাতে এমন ব্যথা যে মনে হচ্ছে দেহটা আমার নয়।

খুব বাস জার্নি করেছিস বুঝি? এই ত তোর বাড়ি আসতেই আমার কোমর হাঁটু আর হাতদুটো টন টন করছে।

আরে তা নয়—শোন তবে বলি ব্যাপারটা। সদাব্রত ত্রিপাঠির নাম শুনেছিস?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক্তার ত। কে না জানে তাকে?

সে জানা নয়। হাড়ে হাড়ে জানে কেউ আমার মত? তার ব্রতর গুঁতোতেই আমার এই অবস্থা।

মানে?

তবে গোড়া থেকেই বলি, ওগো দু কাপ চা দিয়ে যাও ত—দোলগোবিন্দ তার গৃহিণীর উদ্দেশেই চা-বার্তা ব্রডকাস্ট করে। সেদিন, মনে শনিবার, বাড়ি ফিরেছি, এসে দেখি আমার গৃহিণী কাতরাচ্ছে। মনে হ'ল সারা বাড়িটাই যেন কাতরাচ্ছে। কি হলো? আমিও কাতরে উঠি। অন্ধকার দেখি চারদিক। জানিস ত অসুখের কথা শুনলে আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ি—

শুধু অসুখের কথা কেন? আমি মন্তব্য না করে পারি না। এমন কিছু আছে কি যা শুনলে তোর চোখ বড় বড় হয়ে না ওঠে? যাক্, তারপর?

তারপর জয়া বললে, মাথাটা ভয়ানক ধরেছে, শরীরটা কেমন করছে। শিগ্গির একটু ওষুধ এনে দাও ত—ঐ মোড়ের মাথায় ডাক্তারখানা থেকে কিছু পিল টিল, ডাক্তারকে বললেই হবে—

আরে সে আমায় বলতে হবে না, আমি এখুনি যাচ্ছি। বলে আমি ধড়চুড়ো না খুলেই ছুটলুম। হাতের ব্যাগটা শুধু ছুঁড়ে ফেললুম টেবলটায় টিপ করে। দাশু খানসামার গলিটা পেরিয়েই ভাবছি, কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়? বাকচি? না, ও বড় কড়া ওষুধ দেয়। গুপ্ত? না, ও বড় দেরি করে অসুখ সারাতে—তার চেয়ে আর একটু এগিয়ে যাই মুরারি বটব্যালের কাছে। লোকটার যেমন নাম ডাক আছে তেমনি পোষাক পরিচ্ছদে টিপ্‌টপ্‌। কিন্তু বেজায় ভিড়, এখন গিয়ে বসলে রাত আটটার আগে মোলাকাৎ হবে কি সন্দেহ? তার আগে তার কাছে ঘেঁষতে গেলে আমায় বক্সিং করতে হবে। তাহলে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঐ ত হার্ডওয়্যারের দোকানটা, কতটা আর পথ, ওটা পেরলেই ডক্টর দয়াল চাকী। খুব ভাল ডাক্তার। রোগ আর রুগি দেখে দেখে কপালের ভুরু পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। যাচ্ছি, হঠাৎ মনে পড়ল, চিকিৎসা ভাল করে কিন্তু বড় বেশি কথা বলে, আর একবার গান বাজনার কথায় এলে হয়—বাব্বা! এককালে নাকি খেয়াল গাইত, শুনেছি।

তারপর গেলে কোথায় তাই বল—হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়েই বললুম।

শোন না। দোলগোবিন্দ চায়ের এক চুমুক সুড়ুৎ ক'রে টেনে বললে, হঠাৎ মনে পড়ল ডাঃ সদাব্রত ত্রিপাঠির কথা। একটু হাঁটতে হবে। তাতে আর কি হয়েছে? মিনিট দশেক প্রায় ছুটেই গেলাম, কেননা বাড়িতে রোগ ফেলে এসেছি তা ত আর ভোলা যায় না।

ত্রিপাঠির প্রকাণ্ড চেম্বার। লোকজন দ্বারোয়ানে যেমন জমজমাট কেতাদুরুস্ত ব্যবস্থাও আছে। বাড়ির নিচে নার্সিং হোম কি না। যাই হোক, ছুটে গিয়ে তখন আমার দাঁড়াবার শক্তি নেই। মনে ভাবছি কষ্ট একটু হ'ল বটে কিন্তু সদাব্রতর মত ডাক্তার পাওয়া ভাগ্যের কথা। কী যত্ন করেই যে দেখেন, তা ত শুনেছি। আর এত চট্‌পটে লোক সারা ইন্ডিয়াতে আছে কি সন্দেহ। রোগীদের বসতেই হয় না। যাবামাত্রই অ্যাটেন্ড করেন—কিন্তু একি?

সিঁড়ি দেখেই মাথা ঘুরে গেল। তিনতলায় উঠতে হবে? ডাক্তার এখন নাকি ওপরেই বসেন, তিনতলার ওপর।

দুর্গা নাম করে লাফ মারলুম, মানে একটা ধাপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উঠব আর কি! আহা, জয়া কত কষ্ট পাচ্ছে! তার কাছে এ আবার কষ্ট!

তিনতলায় ওঠবার পথে স্ট্রেচার-বাহিত একজন মহিলাকে নামতে দেখলুম। তাছাড়া অধোগামী জনতিনেক পুরুষ্টু ভদ্রলোকের সঙ্গে কলিশান হয়নি যে তা নয়। তবে পড়িনি। অতিকষ্টে অধঃপতন সামলে যখন তিনতলায় উঠেছি তখন আমার বাক্‌শক্তি রহিত আর কামারের হাপরের মত হাঁফাচ্ছি।

শুনেছেন, একে বলে ডাক্তার ডাকা! গোবিন্দ-জায়া আমার পিছন থেকেই মন্তব্য করে।

আচ্ছা, আপনি তখন কি করছিলেন বৌঠান? আমি তার উদ্দেশেই বলে ফেলি কৌতূহল বশে।

আমার নিজের মাথা নিয়ে তখন আমি অস্থির, আর কারুর জন্যে মাথা-ব্যথা ছিল না আমার—'

আঃ, দোলগোবিন্দ তীব্র প্রতিবাদে আমাদের সংলাপ স্তব্ধ ক'রে দিয়ে বলে, কী মুস্কিল! আমাকে কাহিনীর অন্তিমে আসতে দাও। তোমরা চালালে আমার আর বলার কি দরকার। তারপর শোন, ঘটনার ত অনেক বাকি এখনও—

হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনি, চালাও তোমার অভিযানপর্ব—তবে বোঠান, আপনার গর্ব করার আছে, কেননা, রোমান্টিক যুগেও প্রিয়তমার জন্যে এতখানি কেউ করেছে কি সন্দেহ। আচ্ছা বল, তারপর?

আমি ত উঠেছি ডাক্তারের ফ্ল্যাটে। ডাক্তা-র বা-বু—আ-ছে-ন...? সামনে এক-জনকে পেয়ে প্রশ্নটা উদ্গীরণ করি প্রায় স্বগতোক্তির মত।

নিশ্চয়ই আছেন, আসুন আসুন—এই ত তাঁর চেম্বার—বলেই টলটলায়মান আমাকে হাত ধরে টান মারল সে। সেই মুহূর্তে একটি বেঁটে খাটো বলিষ্ঠা মহিলা, নার্সই মনে হ'ল, এসে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের অনুসরণ করছে।

একটা ঘরে ঢোকবার মুহূর্তে নার্স বলল, এ ঘরে কেন? দেখে মনে হচ্ছে হার্ট পেশ্যান্ট, কার্ডিওলজির ঘরে নিয়ে চলুন।

নাঃ, ডাক্তারবাবু এরকম পেশান্টকে প্রথমে তাঁর চেম্বারেই দেখবেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে বাগিয়ে ধরেছে তখন।

আজ্ঞে না, বলেই নার্সটিও আমাকে ধরল, আমি বলছি তিন নম্বর ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

কখখনো না, আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি, বলেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সবলে আমাকে টান মারল।

নার্স মহিলা বলেই পরাজয় স্বীকার করবে কেন? তারও অধিকার আছে ত, সেও আমার একটা বাহু বাগিয়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।

টানাটানির মাঝখানে পড়ে আমার অবস্থা কি বুঝতেই পারছিস। আমি অতি কষ্টে বললুম, দেখুন, আমি এসেছি ডাক্তারবাবুর—

বুঝেছি বুঝেছি। চলুন না আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, বলেই অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে একটা ঘরের সামনে নিয়ে হাজির করল, সেখানে লেখা আছে 'সাধারণ রোগীর জন্য' বাকি এমনি একটা কথা।

নার্সটি এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় থেকে এবার তীব্রভাবে আকর্ষণ করে আমায়। শক্তিতে সে কম যায় না—অবলীলাক্রমে সে আমায় টেনে টেনে আর একটি ঘরের দ্বারদেশে এনে ফেলেছে, তিন নম্বরই হবে হয়ত—আমি স্রোতের টানে কুটোর মত ভাসছি, তাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছি। সুতরাং করবার আর কি আছে?

ইতিমধ্যে দুজন দ্বারোয়ান আর কয়েক-জন অপেক্ষমান রোগীদের কথাবার্তা কানে এল। একজন বললে, বুকলে, অ্যাক্সি-ডেন্ট। নির্ঘাৎ অ্যাকসিডেন্ট...মোটর চাপা পড়তে পড়তে...আর একজন বলে উঠল, আরে, নাঃ মৃগী রোগ দেখ নাই? অই রোগ অইছে......

কতক্ষণ যে এভাবে কেটেছে বলতে পারব না। হঠাৎ কার্ডিওলজির ঘরের দ্বারপথ দিয়ে ডাক্তার সদাব্রত উঁকি দিলেন।

ডা-ক্তার-বাবু—আমার ডাকটা আর্ত-নাদের মত বেরিয়ে এল।

সদাব্রতর চশমাটা কপালে তোলা, হাতে স্টেথো গম্ভীর মুখ। আমার সামনে দাঁড়ালেন। আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি।

ডাক্তারবাবু, আমি এসেছিলুম, বাড়িতে—Stop! Don't talk! বজ্র নির্ঘোষ ধ্বনিত হ'ল। চশমাটা ঠিক করে আমার মুখটা ভাল ক'রে দেখে বললেন, চেহারাটা করেছেন কি! মুখের রং যেন ফুলস্কেপ কাগজ ... ব্লাড-লেস ... শিগ্‌গির এ'কে টেবিলের ওপর শোয়াও, আমি আসছি...

ডাক্তারবাবু, আমি রুগি—

আরে চুপ মশাই, কথা বলতে বারণ করলেন না! মাথার শিরাগুলো ছিঁড়বেন নাকি? বলেই দুজনে আমায় একটা টেবিলে চিৎপাত ক'রে শুইয়েছে।

তোমায় শোয়াল আর তুমিও শুয়ে পড়লে, বোঠান ফোড়ন ছাড়লেন।

আরে সে অবস্থায় পড়তে যদি বুঝতে। ওঠবার চেষ্টা যৎপরোনাস্তি করে যাচ্ছি কিন্তু আমার পা-দুটো চেপে আছে একজন খৈনি-খাওয়া চাপরাশি আর কাঁধ দুটো চেপে ধরে আছে সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট মহোদয়।

ডাক্তার সদাব্রত আমার চেয়েও কাঁপছেন, মুখে বিড় বিড় করছেন। এ কেস্ অব হাইপারটেনশান করোনারীর পদক্ষেপ...... এখখুনি ব্যবস্থা করতে হ'বে। শহর ছেয়ে গেল এই অসুখে...শুনুন—না, আপনি বলব না, তোমার চেয়ে আমি অনেক বড়। শোনো, ডাক্তারিটা আমার পেশা নয় এটা আমার ব্রত। রুগিকে promptly attend করা হ'ল আমার motto ...যাও বটুক দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না, প্রেসারটা মাপতে হবে ত, শিগ্‌গির আনো apparatus টা......

ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রী—সর্বশক্তি সঞ্চয় ক'রে বলতে চাই—আমার আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে ডাক্তার হাঁকরে ওঠেন, আরে রাখো তোমার স্ত্রী! আগে নিজে বাঁচো, বুঝলে? আত্মানং সততং রক্ষেৎ আমাদের শাস্ত্রের কথা—হ্যাঁ, এনেছ, লাগাওত ওটা ওর হাতে......আমার হাতের আস্তিন গুটিয়ে রবারের ব্যান্ড পরানো হ'ল...... তারপর রবার বল প্রেস করে আমার প্রেসার দেখা হল।

হুম্, ডাক্তার সদাব্রতর ঐ একটি কথাই শুনলুম। তারপর ফেটে পড়লেন। বুকের বোতামগুলো খোলনি এখনো!

ফড় ফড় ক'রে বোতাম ছিঁড়ে আমার বক্ষোদেশে স্টেথো লাগালেন ডাক্তার ত্রিপাঠি।

'আরে রাখো তোমার স্ত্রী, আগে নিজে বাঁচো'

সেই সুযোগে আমি আর একবার বলতে চেষ্টা করি, আমার স্ত্রীর অ-সু-খ...

আঃ, এই চিন্তাই হ'ল একটা ব্যাধি, বুঝলে। আরে স্ত্রীর অসুখ তা কি হয়েছে? কার স্ত্রীর অসুখ নেই শুনি? হবে হবে, সব হবে, আগেরটা আগে পরেরটা পরে—তবে আর নিজেকে ফার্স্ট পারসন বলে কেন? ইংরেজরা ঠিক বুঝেছে, তারা 'আই'কে করেছে ফার্স্ট পারসন। বাকী সব সেকেন্ড থার্ড......এখানে কিন্তু লেডিজ ফার্স্ট নীতি নয়—বুঝলে?—এই, তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, এখুনি একে নিয়ে যাও, এক্স-রে করতে হবে, বুকের অবস্থাটা দেখতে চাই! কুইক্ কুইক্—

ইতিমধ্যে থারমোমিটারটা আমার মুখে চালান করে দিয়েছেন তিনি।

সেকি? এক্স-রে কি সার? স্তম্ভিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি।

হুঁ, এক্স-রে চাই বইকি। বুক পেট হ'ল ব্যাধির হেড কোয়ার্টার, বুঝলে না? যত ব্যামো গজায় ঐখান থেকে। ঐ দপ্দ-দুলাল, এখন যে বড়গাড়ি হাঁকাচ্ছে, ও জানে কি? শুধু রক্ত দেখেই ছেড়ে

দেয়। আর এখন রক্তে কি আছে। শুধু জল আর জল...আচ্ছা...পেটে কোনো ব্যথা হয় কি?

অতিকষ্টে স্মৃতিসমুদ্র মন্থন ক'রে বললুম, অনেকদিন আগে একবার হয়েছিল—কলিক পেইন

ঐ! যা ভাবছি তাই, ঐ কালকের সূত্র ধরে এগতে হবে। কলিক থেকেই মেটাবলিক গোলমাল। যাও যাও—রুগিকে ডিটেন করো না...আমি আসছি। বটুক, তুমি এখনি ছবিটা ডেভেলপ্ ক'রে আমায় দেবে...তারপর হবে প্রেসক্রিপসন্...যাও, হারি আপ বয়েজ—

আমায় ত চ্যাং-দোলা করে নিয়ে গেল ওরা পাশের ঘরে......সেখানে, ওঃ, যা অমানুষিক কান্ড, তা আর কি বলব? আমার অঙ্গাবাস বুশ সার্ট প্যান্ট জুতো মোজা কে যে কোনদিক থেকে টান মেরে খুলে ফেলল তা বোঝবার মত বুদ্ধি তখন আমার লোপ পেয়েছে। একবার শুধু তাকিয়ে দেখি আমার নিম্নাংগে মাত্র আন্ডারওয়ার বিরাজ করছে...আমার ওপর আলো এসে পড়ল...আর অদ্ভুত ক্যামেরা... চোখ বুজে আছি আর মাঝে মাঝে ওঠবার চেষ্টা করছি, কিন্তু উপায় নেই হাত-পা বাঁধা......

ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ হয়ে যাবার পর মুক্তি পেলুম। ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত অর্ধমৃত আমাকে জড়ো করে অংগে জামা প্যান্ট চড়িয়ে ওরা আমাকে আনল ত্রিপাঠির ঘরে। আমার সর্বাংগ কাঁপছে, পেটের নাড়ি-ভূঁড়ি বুঝি হজম হয়ে গেছে, ক্ষুধা বোধ করার শক্তি পর্যন্ত আছে কিনা বুঝতে পারছি না—

বোসো, প্লেট আসছে—ডাক্তারের বজ্র-নির্ঘোষ শুনলুম।—

তবে কি কিছু খাওয়া জুটবে? আহা, এক প্লেট কারী আর রুটি, কিম্বা একটা মোগলাই...মনে মনে পুলকিত হয়েছি... গলাটাও কখন থেকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে...

কয়েক মিনিট শুধু ঘড়ির টিক্ টিক্ টিক্ শুনছি......

এমন সময় দরজা খুলে একজন সাদা এপ্রনধারীর প্রবেশ—এই যে প্লেট স্যার! সদাব্রতর নাকের সামনে একটা কালো মত ফিল্ম তুলে ধরল।

ও হরি, এই প্লেট! শুকনো গলায় আমার স্বর বেরুচ্ছে না। জীবনের আশাও বুঝি ছাড়তে হ'ল—আমি মরীয়া হয়ে এগিয়ে গেলুম, ডাক্তারের হাঁটুতে দুটো হাত দিয়ে বলে ফেললুম, ডাক্তারবাবু, আমি বাঁ-চ-বো-ত?

কোনো উত্তর নেই।

গম্ভীরভাবে প্লেটটা পরীক্ষা করে ডাক্তারের মুখে যেন একটা হাসির আমেজ লক্ষ্য করলুম। বললেন, শোনো, ভয় নেই। আমি তোমার বুকের যে ভয়াবহ ছবি এঁকেছিলুম এই প্লেট তা বলছে না—

তাহলে?

তাহলে আর কি, পরীক্ষায় পাস করলে হে! ডোন্ট ওরি! তোমার

"ডাক্তারবাবু, আমি বাঁচবো তো...!"

স্বাস্থ্য খুব ভাল, কোনো গলদ নেই। মানে আমি যা সন্দেহ করছিলুম তার কিছুই নেই—গড হ্যাজ্ সেভড্ ইয়ু... ইউ আর অল রাইট ম্যান, মানে অ্যাভারেজ বঙ্গালির চেয়ে তুমি ভাল স্বাস্থ্যের মালিক—

টলতে টলতে বাইরে এলুম, মনে ভাবছি, ডাক্তারের এটা সান্ত্বনা। মোটেই ভাল নই আমি—

এই নিন আপনার বিলটা, অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা কাগজ ধরিয়ে দিল আমার হাতে। দেখি ছত্রিশ টাকা পাঁচ তের পয়সা—পরীক্ষা এক্স-রে নার্স ইত্যাদি জুড়ে একুনে ঐ টাকা।

পকেট হাতড়ে পাঁচটা টাকার মত হ'ল ...তার হাতে দিয়ে বললুম, এর বেশি একটা পয়সাও নেই...

তাতে কি হয়েছে? বাকীটা পরে দেবেন—কি যেন আপনার ঠিকানাটা?

মনে যা এল বলে দিলুম, গলির নামটা ভুল করিনি তবে যদ্দুর মনে হয় নম্বরটা বিলকুল ওলটপালট হয়ে গেছে।

তারপর বাড়ি এলুম কি করে তা বলতে পারব না। তবে যখন বাড়ি পৌছলুম তখনই না এলে এরা থানায় গিয়ে হাজির হ'ত। জয়াকে দেখে মনে পড়ল যে আমার স্ত্রী আছে এবং সাড়ে চার ঘন্টা আগে তার শরীর খারাপ হয়েছিল—

আমায় বললে কি জানেন? জয়া একনাগাড়ে বলতে থাকে, জয়া জ-য়া—হায় হায় হায়, তোমার ওষুধ আনা হল না—আমি বললুম, যাক্‌গে আমি মাথায় ঠান্ডা জল দিয়ে জানলার সামনে হাওয়া লাগাতেই আমার মাথা সেরে গেছে—তোমার একী অবস্থা। তখন ও বললে, সেরে গেছ! ওফ্, তা না হলে আমায় এ্যাটেন্ড করত কে? এখন আমাকে যে সেবা করতে হবে—যাও এখ্খুনি গরম জল চড়াও। বোধহয় জ্বর আসবে এখনি—আমি ঐসব কান্ড শুনে টেনে বললুম, যাক্ ভালই হয়েছে। ডাক্তারের কাছে একবার শরীরটা চেক-আপ হয়ে গেল। তখন ও বললে, কিন্তু মনটা খচ খচ করছে যে, রাগে পড়ে একটা ভুল অ্যাড্রেস দিয়ে এলুম...খরচ করে এক্স-রে তুলেছিল ও—আমি বললুম, তাতে আর কি হয়েছে বাকীটা একদিন গিয়ে দিয়ে এসোখন—

আমি আর থাকতে পারলুম না, বললুম তোদের এত ভাবনার কোনো কারণ দেখি না, গোবিন্দ। ডাক্তার সদাব্রতকে আমি জানি—ও একখানা প্লেট দেখিয়ে এই অভিনয়ই করে বার বার—

আঁ—জয়া আর গোবিন্দ দুজনেই হাঁ হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

সানোঃ সানুমারুহৎ ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

এই পাহাড়ের বন্ধনীর মধ্যে
বৃক্ষবলয় দিয়ে ঘিরে
বিছিয়ে রেখেছি ভালোবাসা গোপন কথা।
মরকত ঘাসে ঢেউ তুলে
জিগজ্যাগ পথ কেটে
পেঁাছে যাবো তোমার কাছে।

চিরতুষার শিখর
মর্যাদা রেখেছে তোমার,
সূর্য উঠতে না উঠতেই
যা প্রথম উদ্ভাসিত।
দড়িপথ বেয়ে ভার উঠে আসে কত নীচে থেকে
উপঢৌকন তোমার জন্য।

এদিকে মেঘের সঙ্গে সূর্যের সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ
দেবতার মুখ কঠিন হয়।
তুমি থাকো খেলাঘর স্টেশন তোমার খেলনার ট্রেন নিয়ে ঃ
কুয়াশার মধ্যে হুইস্‌ল বাজিয়ে রেলগাড়ি যতো না এগোয়
পিছিয়ে আসে তারো বেশি
আমাদের সভ্যতার মতো।
দৌড়ের ঠিক আগে থমথমে রেসকোর্সে
তোমার বিচিত্র ঘোড়াগুলো প্রদক্ষিণ করে জকিদের।

তুমি পাঠাও শেরপাশিশুদের বিদ্যালয়ে—
তারা হাসতে হাসতে যায় চড়াই পেরিয়ে,
ছেলেটার পায়ে জুতো, মেয়েটার নেই।

সময়ের অতিবাহন যেন একটানা জলপ্রপাত
কিম্বা প্রার্থনার চক্র সর্বদা ঘোরানো।
প্রেমহীন রাত্রে
সুখী উপত্যকা ছাড়িয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডের মতো জ্বলজ্বলে বড়ো তারা।
আমি অনুভব করতে পারি
শেষ স্নান সেরে
খুব উচ্চতায় শিবিরের মধ্যে অভিযাত্রী ক'জন
ঘেঁষাঘেঁষি শুয়ে যেন কবরে।

তখন বাজাও
নৈঃশব্দ্যের বুক নিংড়ে
উজাড় করে বিশ্বের সংগীত ঃ
এক-একটা তরঙ্গ অপেক্ষা করছে প্রতিধ্বনির জন্য;
তুমি দাও চরম ঝংকার
যে গানে আকার নেয় বৃক্ষ পাহাড় ঝর্ণা
বিস্মৃতির কুয়াশার ভেতর থেকে সদ্য মুখ
ঝড় বিদ্যুতের মধ্যে সৃষ্টি...
সবাই মিলে কাজ করে
সানোঃ সানুমারুহৎ।

একই গল্প ॥

কবিরুল ইসলাম

আমাদের একই গল্পে ধূলির সংসার
বিরচিত মহাকাব্য ঃ
সূত্রপাত-সমাপ্তির সুতোয় গ্রথিত
আগুন-ভস্মের সহবাস—
কাম ক্রোধ লোভের সাঁড়াশী
আমাদের বিদ্ধ করে
বদ্ধ করে......
ফুলে ফলে বৃক্ষতলে বিস্তর ঘটনা
আমাদের অবিরত আন্দোলিত করে
ক্ষুধা প্রেম আগুনের অনিবার্য আঁচে
ঈশ্বর রচিত একই মঞ্চে আমাদের
যাতায়াত
অবিরাম যাতায়াত শুধু।।

অজিত চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বর্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে এসে গেছে। হয়ত আর কয়েক দিনের মধ্যেই রিমঝিম একটানা বর্ষণ,...গুরু-গুরু মেঘের গর্জন এবং ব্যাঙের একটানা ডাক শুরু হয়ে যাবে। ঘনঘোর বর্ষাসন্ধ্যায় ভিজে বাতাসের সঙ্গে মাঝে-মাঝে আর একটি গন্ধও অলক্ষ্যে আমাদের নাকে এসে পৌঁছায়। সেই ঘ্রাণে বাঙালী মাত্রেরই মন হয় উদ্বেল ও চিত্ত হয় প্রফুল্ল এবং রসনা অজ্ঞাতে সিক্ত হয়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি, বৃষ্টিস্নাত একটি বর্ষাসন্ধ্যার সঙ্গে ইলিশমাছ ভাজার গন্ধের কোথায় যেন একটা সম্বন্ধ যোগাযোগ রয়ে গেছে।

মাছের মধ্যে ইলিশের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্কৃত শ্লোকে লেখা হয়েছে। বাড়িতে রুইমাছ এলে মন হয়তো খুশি-খুশি হবে। বড় সাইজের চিংড়ি পেলে সম্ভাব্য রান্নার কথা ভেবে হয়তো উৎসাহিত হবেন। কিন্তু ইলিশ? গোটা একটা ইলিশমাছ রান্না হবে শুনলে জিভের তলায় জল জমতে দেরি হবে না। সংস্কৃত-শ্লোকে বলা হয়েছে—

সর্বেষামেব মৎস্যানাম ইল্লিশঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে
ভাগীরথী জলে ভাতি নিতাম্ রজতখন্ডবৎ।

অর্থাৎ মৎস্যকুলে ইলিশই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাগীরথীর জলে একখন্ড রৌপ্যের মতো ইলিশ শোভা পায়।

একথা আমাদের সকলের হয়ত জানা নেই যে, ইউনাইটেড নেশনস্-এর খাদ্য এবং কৃষি-বিষয়ক সংস্থার অধীন ইন্ডো-প্যাসিফিক ফিসারিজ কাউন্সিল ১৯৫১ সালে মাদ্রাজে তৃতীয় অধিবেশনে ইলিশমাছ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করে। ব্রহ্মদেশ, পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষের লোকেদের কাছে ইলিশ যে বিশেষ খাদ্য একথা স্বীকার করে কাউন্সিলের সদস্যরা একটি সাবকমিটি গঠন করেন। এই তিনটি দেশের প্রতিনিধিই সাব-কমিটির সভ্য হন। ভারতবর্ষের জীববিজ্ঞানী ডক্টর সুন্দরলাল হোরা এই কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (৪ঠা সেপ্টেম্বর—৬ই সেপ্টেম্বর) কোলকাতায় এই কমিটির অধিবেশন হয়। এই আলোচনাচক্রে ইলিশমাছ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করবার জন্য সমবায় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়েছে।

অবশ্য এই আলোচনা এবং সুপারিশ পর্যন্তই সার। মরশুমের সময় ইলিশের প্রাচুর্য যাতে হতে পারে তেমন কোন প্রচেষ্টা হয় নি। ফলে বাজারে ইলিশের আমদানী নিয়মিতভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে। গঙ্গার টাটকা ইলিশ পাওয়া তো রীতিমত সৌভাগ্যের কথা। আর দেখা পেলেও তা কিনবার ক্ষমতা প্রায় সাধ্যের বাইরে।

সরকারীভাবে ইলিশের উপর দৃষ্টি পড়ে বেশ কিছুদিন আগে। ইংরেজ আমলের কথা। সময়টা উনিশ শতকের শেষভাগ। ফ্রান্সিস ডে সাহেব লক্ষ্য করলেন যে, নদীপথ দিয়ে ইলিশের ঝাঁক যেতে-যেতে হঠাৎ যদি কোন বাঁধ বা অন্য কোন বাধার সম্মুখীন হয় (Dams, Anticuts and Weirs) তাহলে সেই নদীপথে ইলিশের ঝাঁকের গতি ব্যাহত হয়। এর ফল হিসেবে ইলিশের দল ধীরে ধীরে সেই নদীপথে নিশ্চিহ্ন হবে। সরকারকে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, এই প্রতিবন্ধকতার উপযুক্ত সমাধান করে ইলিশের ঝাঁকের গতিপথ সহজ স্বচ্ছন্দ করে দিতে না পারলে নদীর বুকে ইলিশমাছ বিরল হয়ে আসবে। অনুকূল ব্যবস্থা হিসেবে তিনি fish pass বা ইলিশের যাবার পথ রাখবার পরামর্শ দেন। কিন্তু মাদ্রাজ সরকার কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর উপর fish pass ব্যবহার করে দেখলেন যে, দক্ষিণ ভারতের নদীতে fish pass ব্যবহারের দ্বারা ইলিশের ঝাঁকের গতিপথ সহজ ও স্বচ্ছন্দ করা যায় না। ডে সাহেবের তৈরি fish pass -এর একটি মডেল বাকল্যান্ড মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

অবশ্য শুধু দক্ষিণ ভারতের নদী নয়। বাঁধ বা এই জাতীয় কোন প্রতিবন্ধক নদীর উপর রচিত হলেই ইলিশের ঝাঁকের গতিতে ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সিন্ধু নদীতে ইলিশের ঝাঁক (এখানে ইলিশকে পাল্লা বলা হয়) সুক্কুর ব্যারেজ পর্যন্ত যেতে সক্ষম। পাকিস্থানের মৎস্য দপ্তরের এম আর কুরেশী সিন্ধু নদীর এই ব্যারেজটির উপর fish ladder ব্যবহার করবার জন্য তার সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার হিসেবে কেবলমাত্র সিন্ধুনদীতেই প্রতি বৎসর দেড় লাখ থেকে পৌনে দুই লাখের মত ইলিশ ধরা হয়। এর দাম কম পক্ষে তখনই চার লক্ষ টাকা। এবং প্রায় ন'হাজার ধীবর এর সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের গঙ্গা বা ভাগীরথীর উপর ব্যারেজও অনুরূপভাবে ইলিশের আমদানী হ্রাস করতে সহায়তা করবে বলেই আশংকা করা যায়।

ইলিশ প্রকৃতিতে যাযাবর। জীবনের কিছুটা সময় মোহনা কিংবা উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রে কাটাবার পর বর্ষার শুরুতেই ইলিশের ঝাঁক বেরিয়ে পড়ে। পথ অবশ্য বাধাবিঘ্ন ভরা। যে কোন মুহূর্তে প্রাণ হারানোর আশংকা। কিন্তু মৃত্যুভয়ে ইলিশের ক্ষীণ হৃদয় কম্পিত নয়। বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘ এসে আকাশ ঘিরলেই ইলিশের ঝাঁক নদীপথ ধরে উজিয়ে চলে। এই উজান যাত্রার বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্তি। আটশ এমন কি হাজার মাইল পর্যন্ত কোন কোন ইলিশ উজিয়ে চলে। অবশ্যই সকলের এমন গতিবিধি নয়। ইলিশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নিশ্চয় রয়েছে। আর সকলের ক্ষমতা কিছুতেই সমান হতে পারে না। যাই হোক, ইলিশের এই উজিয়ে চলা শুধুমাত্র ভ্রমণ নয়। যেতে-যেতে মা ইলিশ নদীর বুকে ডিম ছাড়ে। আগে মনে করা হত যে, মুঙ্গেরের কাছাকাছি কোন একটা স্থানেই ইলিশের ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র। কিন্তু ১৯৩৮ সালে কোলকাতার কাছে পলতার জলাধারে ইলিশের ডিম ছাড়ার ব্যাপারটি আকস্মিকভাবে ভারত সরকারের প্রাণীবিজ্ঞান দপ্তরের কর্মচারীদের নজরে আসে। তারপর বাংলাদেশের সমুদ্র এবং উড়িষ্যার উপকূলে ইলিশের ঝাঁকের জীবন, যাযাবর ভ্রমণ, ডিম ছাড়া, জন্ম এবং আবার ফিরে আসা—সমস্ত ব্যাপারটি ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়। ফলাফল অবশ্য নিরাশার ইঙ্গিত দিল। দেখা গেল যে ইলিশের সংখ্যা নদীপথে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। পরবর্তীকালে কোলকাতার বাজারে ইলিশের আমদানী তো আরো নৈরাশ্যজনক। ইলিশের আমদানী প্রতি বৎসরই যেন হ্রাস পাচ্ছে এবং গঙ্গার ইলিশ এরই মধ্যে বেশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

ইলিশের এই সংখ্যা হ্রাসের অবশ্য অনেক কারণ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, বৎসরের প্রায় সমস্ত সময় নদীবক্ষে ব্যাপকভাবে ইলিশ মাছ ধরাই ইলিশের আমদানী হ্রাস করছে। মোহনা পেরিয়ে ইলিশের দল যখন স্বচ্ছন্দে উজিয়ে চলে তখন অবাধে নদীবক্ষের সর্বত্রই ইলিশ মাছ ধরা হয়। কিন্তু এর ফলে ইলিশের সংখ্যা হয়ত ততখানি হ্রাস পেত না। ডিম ছাড়া শেষ করে অবশিষ্ট ইলিশের দল যখন শীতকালে সমুদ্রের দিকে ফেরে তখনও ধীবরের জাল তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নদীর যত্রতত্র অপেক্ষা করে রয়েছে। বলা বাহুল্য, মা ইলিশের দল জালে ধরা পড়ে। আবার খোকা ইলিশগুলি খাদ্য সংগ্রহের আশায় মোহনা পেরিয়ে নদীর খানিকটা ভিতরে ঢুকে যায়। ধীবরের জালে খোকা ইলিশগুলিও বন্দী হয়। এইভাবে দেখা যায় যে মা ইলিশ এবং শিশু ইলিশগুলি প্রতি বৎসর শীতকালেও মারা পড়ছে। ফলে

পরবর্তী বৎসরে ইলিশের ঝাঁকে দল ভারী করতে এদের অনেকেই আর হাজির হয় না। এর থেকেই বোঝা যাবে যে বৎসরের সমস্ত সময় ব্যাপকভাবে ইলিশ মাছ ধরাই এর আমদানী হ্রাসের অন্যতম কারণ। অতীতে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ইলিশ ভক্ষণের ব্যাপারে একটি সুন্দর নিয়ম ছিল। একটি সামাজিক প্রথা যা আজকের দিনে অনেকেই মেনে চলেন না। নিয়ম ছিল যে বিজয়া দশমীর পরদিন থেকে শুক্লাপঞ্চমীর পূর্ব পর্যন্ত ইলিশ খাওয়া নিষিদ্ধ। বলা-বাহুল্য ঠিক এই সময়টায় মা ইলিশের দল ডিম ছাড়া শেষ করে আবার সমুদ্রে ফিরে যেত। খোকা ইলিশগুলিও খাদ্য সংগ্রহের আশায় মোহনা পেরিয়ে নদীর ভিতর খানিকটা প্রবেশ করতে সাহসী হত। কিন্তু বর্তমানে এইসব তুচ্ছ সামাজিক অনুশাসন কে আর মেনে চলেন? ফলে নদীর উপর ইলিশের অবাধ শিকার বৎসরের সব সময়ই পূর্ণোদ্যমে চলেছে। সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে—

আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু
দেবী নীরাজনাৎপরম,
ইল্লিশস্তু না ভোক্তব্যো
যাবচ্চাপে তু ভাস্করঃ।

পূর্ব বাংলাতেও হিন্দুদের মধ্যে জাটকা বা খোকা ইলিশ (২ মাস—৫ মাস বয়স্ক) ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল।

আইন করে বৎসরের এই কটি মাস ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করলে হয়ত গঙ্গার ইলিশের এই দুষ্প্রাপ্যতা আজকের মত ঘটতে পারত না। অন্যান্য দেশে অনুরূপ অবস্থায় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাতে ফলও লাভ করা গেছে। নরওয়েতে, সমুদ্রে তিমি শিকার আইন করে বন্ধ করা হয়েছিল। কারণ ধীবরেরা আশঙ্কা করত যে তিমিদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে কড্ এবং হেরিং মাছগুলি ফিয়র্ড এবং সমুদ্রের মুখ পরিত্যাগ করে খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। অবশ্য এ দেশে আইন করলে কতদূর কার্যকরী হত বলা শক্ত। ১৯৪৫ সালে মাদ্রাজে একটি আইন জারী করা হয়। এর দ্বারা নদীর বুকের বাঁধ বা অন্য কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকতার এক মাইল সীমার মধ্যে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে মা ইলিশগুলি এতে স্বচ্ছন্দে ডিম ছাড়তে পারবে এবং ইলিশের বংশবৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। কিন্তু মাদ্রাজের ধীবরেরা এ আইন মানতে রাজী হয়নি। সরকারী কর্মচারীদের সংগে বচসা এবং মারামারি হয়েছে, কোর্টে গিয়ে ধীবরের দল জরিমানা দিয়েছে। কিন্তু ফিরে এসে জাল নামাতে ক্ষান্ত হয়নি।

কোলকাতার বাজারে যে ইলিশের আমদানী হয় তা নানাস্থান থেকে সংগৃহীত। খরিদ্দারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের ইলিশগুলিকে এইভাবে সাজানো যায়—(১) গঙ্গার ইলিশ, (২) কোলাঘাটের ইলিশ (রূপনারায়ণে ধৃত), (৩) পূর্ব বাংলার ইলিশ, (৪) উত্তরপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার ইলিশ, (৫) বোম্বাই, বিহার এবং অন্যান্য স্থানের মাছ।

এদের মধ্যে পূর্ববাংলা থেকে যে মাছ পাওয়া যায়, কোলকাতা বহুলাংশে তার উপর নির্ভরশীল। পূর্ববাংলার বিভিন্ন চালানী কেন্দ্র থেকে কোলকাতার বাজারে মাছ আসে। পশ্চিম বাংলার ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার, কোলাঘাট, লালগোলাঘাট, বিহারের বক্সার এবং রাজমহল; উড়িষ্যার চিল্কা ও বালেশ্বর থেকেও ইলিশের চালান আসে।

পূর্ব পাকিস্থানের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা হয়। পূর্ব উল্লিখিত জেলাগুলিতে বড় নদী না থাকায় ইলিশের ঝাঁক হাজির হয় না। পূর্ববাংলার মেঘনা, পদ্মা ছাড়াও তেঁতুলিয়া, কাজুলিয়া, কালাবদর, আঁধারমাণিক, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতী এবং সুর্মা নদী থেকেও প্রচুর ইলিশ প্রতি বৎসরই ধরা হয়। ব্রহ্মপুত্রে এবং তিস্তায় স্রোতের জোর বেশি হওয়ায় ইলিশের ঝাঁক কয়েকশত মাইলের বেশি আর উজিয়ে যায় না। ইলিশ মাছ ধরবার জন্য বিভিন্ন জাল পূর্ব বাংলার ধীবররা ব্যবহার করে। এর মধ্যে বেড়া জাল, পাতন জাল এবং কোনা জালেরই ব্যবহার বেশি। ১৯৫১—৫২ সালে পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন জেলা থেকে এইরূপ পরিমাণ ইলিশ ভারতবর্ষে চালান করা হয়েছিল।

ঢাকা—৩৯৮৪ মণ, ফরিদপুর—৩০৩১ মণ, ত্রিপুরা—২০৭ মণ, নোয়াখালি—১ মণ, সিলেট—৯০ মণ, পাবনা—৪ মণ, খুলনা—৬২ মণ।

কোন্ সময়ে ইলিশ মাছ জালে উঠবে ধীবররা তা অনুমান করতে পারে। বর্ষার সময় মাঝে মাঝে আকাশে প্রচুর মেঘ থাকে। অথচ জোর বর্ষণ হয় না। গুরু গুরু মেঘ ডাকে এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে। ধীবরদের ধারণা যে, এই সময় ইলিশের ঝাঁক হঠাৎ নদীর উপর ভেসে ওঠে। বলা-বাহুল্য, জাল থেকে জেলেরা যথেষ্ট পরিমাণ ইলিশ সহজেই সংগ্রহ করে। এই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিকেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ইলশে গুঁড়ি' বলে অভিহিত করেছেন। সম্ভবত এই পরিবেশে ইলিশের ভক্ষ্য বস্তুগুলি জলের উপর ভেসে ওঠে এবং তার পিছনে পিছনে ইলিশের ঝাঁকও খেলা করতে করতে জলের উপর হাজির হয়।

আগেকার দিনে ইলিশের বাজার দর কেমন ছিল? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইলিশ ওজন দরে বিক্রি হত না। ১৯২৮ সালে এক কুড়ি ইলিশের দাম ছিল সাড়ে চার টাকা থেকে ছ' টাকা পর্যন্ত। ১৯৩৯ সালে দামটা কমতে শুরু করে। এবং ঐ বৎসর সাড়ে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকার মধ্যেই এক কুড়ি ইলিশ পাওয়া যেত। যুদ্ধ শুরু হবার পর ইলিশের বাজারে আগুন লাগল। প্রথম বৎসরেই এক মণ ইলিশের দাম দাঁড়াল ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। ১৯৪৭ সালে দাম হল পঁচাশী টাকা। আর এখন? সে কথা না বলাই ভাল। ১৯৪৪ সালে অবশ্য দাম একবার কমেছিল। সে বৎসরে বাজারে গেলে যে কোন বাঙালীই অতি সহজে গৃহিণীকে খুশি করতে পারতেন। ইলিশের দর সের প্রতি ছ' আনা কিংবা আট আনা। বাজারের থলি নামিয়ে একটা গোটা ইলিশ হাতে তুলে দিলে কোন ঘরণী না এক গাল হেসে স্বামীর দিকে চাইবেন বলুন?

আগেই বলেছি, মাছের রাজা ইলিশ। অর্থাৎ মৎস্যকুলে ইলিশই শ্রেষ্ঠ। এতে ফ্যাট-এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর লিভারে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-এ রয়েছে। ডাক্তারী মতে বেশি ইলিশ খেলে পেটের গণ্ডগোলের যথেষ্ট সম্ভাবনা। ইলিশের মধ্যে আর্সেনিক থাকায় গ্যাসট্রো এনটেরোইটিস রোগ দেখা দিতে পারে। পূর্ব বাংলার লোকেরা প্রচুর ইলিশ খায় বলে সেখানে একটি প্রবাদ রয়েছে। প্রবাদটি হল—'ইলিশ, কাঁচাকলা দিয়ে গিলিস', কাঁচাকলা সহযোগে রান্না করলে ইলিশের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইলিশ ভক্ষণের কুফল ঘটে না। এর কারণ হল এই যে, কাঁচাকলায় ট্যানিক অ্যাসিড রয়েছে। পূর্ব বাংলায় কাঁচাকলা এবং ইলিশ দুইয়েরই অভাব নেই, আর গরীব লোকেরা কাঁচাকলা দিয়ে ইলিশ খেয়ে সম্ভাব্য পেটের গণ্ডগোল থেকে নিজেদের বাঁচায়।

শুধু স্বাদে ও খাদ্য হিসেবে নয়। বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে ইলিশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। সরস্বতী পুজোর দিন বাড়িতে ইলিশ নিয়ে আসা (জোড়া ইলিশ হলে আরো ভাল) একটি শুভকাজ বলে গণ্য। বাগ্দেবীর পুজো শেষ হলে ইলিশ মাছটিকে সিঁদুর, ধান, দুর্বো দিয়ে গৃহিণী বরণ করেন। উলুধ্বনি সহযোগে মাছটিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হয়।

ভাজা ইলিশের কথা মনে হলেই বাঙ্গালীর জিভে জল আসে। ইলিশের ডিমের তো কথাই নেই। সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, ইলিশের স্বাদ অমৃতকেও হার মানায়।

> 'ইল্লিশঃ জিতপীযূষঃ বাচা বাচামগোচর
> রোহিতো হি হিতঃ প্রোক্ত মদ্গুর
> মদ্গুরো প্রিয়ঃ।'

অর্থাৎ,

> স্বাদে ইলিশ অমৃতকেও হার মানায়,
> বাচা বর্ণনায় অতীত
> রুই মাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর
> (এবং) মাগুর মাছ আমার গুরুর প্রিয়।

ধীবররা মনে করে যে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নদীতে ইলিশের ঝাঁক বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ১৯৩৯, ১৯৪৪ এবং ১৯৪৯ সালে নদী থেকে প্রচুর ইলিশ সংগৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এই আধিক্য দেখা যায় নি।

ইলিশের ডিম থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজননব্যবস্থা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া ইলিশের মধ্যেও দু-একটি ভিন্ন শ্রেণী দেখা দিতে শুরু করেছে, বাজারে মুখ পোড়া নামে পরিচিত এক শ্রেণীর ইলিশ পাওয়া যায়। যথেষ্ট সংমিশ্রণের ফলে হয়ত কোনদিন আসল ইলিশ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

বাজারে ইলিশের আমদানী কম এবং এর দুর্মূল্যতার জন্য নানা কারণ দেখান হয়ে থাকে। প্রথম কারণ ধীবরের জালে যথেষ্ট পরিমাণ ইলিশ আর ওঠে না। ফলে চাহিদা অনুযায়ী আমদানী কম। দ্বিতীয় কারণ, যানবাহনের খরচা বেড়েছে। তৃতীয় কারণ জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি। চতুর্থ কারণ দেশ-ভাগের পর পূর্ব-পাকিস্থান থেকে যথেষ্ট সংখ্যক মৎস্যভোক্তার আগমন। অথচ সেই পরিমাণে বাজারে ইলিশের আমদানী বাড়ে নি। তবে ইলিশের সংখ্যাহ্রাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণটি হল যে, বৎসরের সব-সময় নদীর উপর ইলিশের অবাধ শিকার ইলিশকুলকে দিন দিন নির্মূল করতে সাহায্য করছে। বলা বাহুল্য দেশভাগের পর পূর্ব-বাংলার বহু ধীবর পশ্চিম বাংলায় চলে এসেছে। নদীবক্ষে তাদের জালগুলি পরি-মাণের চেয়েও বেশীসংখ্যক ইলিশ দীর্ঘদিন ধরে এসেছে। ফলে আজকের ইলিশের সংখ্যাহ্রাস কিছুমাত্র অসম্ভব হয়নি।

ভাগীরথীর ইলিশ তো এখনই দুষ্প্রাপ্য। না আসুক, তবু এমন দিনও হয়ত আসবে যখন গঙ্গার ইলিশের স্বাদ আমরা সম্পূর্ণ ভুলতে বসব। হয়তো তখন নাতি-নাতনীর দল দাদু-দিদিমার কাছে বসে রুপোলী ইলিশের গল্প শুনবে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার গঙ্গার ইলিশের গল্প। তাদের সময় এক কুড়ি ইলিশের দাম ছিল পাঁচ টাকা। বাজারে গেলে চার আনায় একটা গোটা ইলিশ পাওয়া যেত। সেই সস্তা গন্ডার দিনের কথা শুনতে শুনতে নাতি-নাতনীরা হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। আর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ঝিমোতে ঝিমোতে দাদু ভাববেন অনেকদিন আগে বাজার থেকে একটি গোটা ইলিশ নিয়ে এলে স্ত্রীর মুখে কেমন মিষ্টি হাসি ফুটে উঠত। মাত্র চার আনায় রজতকান্তি বেশ বড় সাইজের ইলিশ।

হায়! ইলিশের স্বাদেগন্ধে ভরা সেই স্বপ্নময় অতীত আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

পাঠকের বৈঠকে

বহুবিচিত্র বিপ্লবী কবি (২)

১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই মায়কোভস্কী বুঝেছিলেন বিপ্লবের মেঘ চারদিকে পরিব্যাপ্ত, যে কোনো সময়েই ঝড় উঠবে। তিনি লিখলেন :

মানুষের স্বপ্ন যেখানে বিফল,
বুভুক্ষুর মাথায় লেগে স্বপ্ন প্রতিহত,
সেখানেই দেখছি উনিশ শো ষোল,
মাথায় তার বিপ্লবের কণ্টকমুকুট॥

সুতরাং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বপ্ন যখন সম্ভব হল তখন মায়কোভস্কী গেয়ে উঠলেন এই বিপ্লব আমার বিপ্লব। 'আমাদের অভিযান' নামে এক কাব্যগ্রন্থে ধ্বনিত হয়ে উঠল বিজয়ী সর্বহারার গান :

আকাশ অতি ব্যস্ত,
তার সময় কই—
ওরা ছাড়াও আমাদের গান জমবে।
হে সপ্তর্ষিমণ্ডলী!
সজ্ঞানে আমরা পৌঁছাবো ত?

মায়কোভস্কী বলেছিলেন 'ভবিষ্যবাদ সর্বহারার আর্ট'. তাঁর এই উক্তির পিছনে যুক্তি ছিল। বোলশেভিকরা যখন রাষ্ট্রের রশি হাতে ধরলেন মায়কোভস্কী হলেন বিপ্লবের চারণ কবি, মায়কোভস্কীর এই সংকলনের অনুবাদক এবং সম্পাদক হার্বার্ট মার্শাল বলেছেন—

"Mayakovosky became the real troubadour of the Revolution".

সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করলেন, নতুন রাষ্ট্রের স্বপক্ষে চলল জয়গান। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়তেন।

মায়কোভস্কীর কবিতা কাব্যধর্মী এবং প্রেমাত্মক। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি সুদর্শন, রমণীপ্রিয়, নয়নমনোহর মানুষ। রমণী আর প্রকৃতি এই দুই বস্তু কবির অতিশয় প্রিয়। তাঁর আশপাশে যারা তাদের প্রতিও এই আন্তরিক প্রেম ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না মায়কোভস্কীর মনে। মানবিকতার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশেই তিনি সোভিয়েটতন্ত্রে এত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হন। নৃশংসতা, বর্বরতা, ব্যক্তি-জীবনের প্রতি নিষ্ঠুরতা এ সবই তাঁর কাছে অতিশয় বিরক্তিকর বস্তু, তথাপি বিপ্লবের প্রয়োজনে তিনি সে সব সহ্য করেছেন। বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যাশা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় হতাশা তাঁর অন্তরে যে সংঘাত সৃষ্টি করে তার ফলেই তাঁকে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হয়।

মিঃ মার্শাল অবশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে আত্মহত্যার কারণ অসংখ্য। অতি অল্পবয়স থেকেই কবির অন্তরে একটা আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল। গোর্কী একবার তাঁর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে। "রাশিয়ান রুলে"—এক মজার ব্যাপার, পিস্তলের দুটি প্রকোষ্ঠের যে কোনো একটিতে গুলি ভরা হয়, আর ট্রিগার টিপে বুলেট নিয়ে একরকম জুয়োখেলার রুশীয় পদ্ধতি এই রাশিয়ান রুলে।

মিঃ মার্শাল মায়কোভস্কীর প্রথমতম রক্ষিতা লিলি বার্ককে জানতেন। লিলি বার্ক মার্শালকে বলেছেন যে মায়কোভস্কী অনেকগুলি বিদায় কবিতা এবং পত্র লিখেছিলেন, অবশ্য সেইসব কবিতা বা চিঠি লেখার পরও তিনি বেঁচেছিলেন, সত্যি আত্মহত্যা করেন নি। তথাপি, একথা বলা যায় যে মায়কোভস্কীর আত্মহত্যার পিছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ বর্তমান। মিঃ মার্শাল এই গ্রন্থে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ভূমিকাংশে বিপ্লবের এই মহাকবির প্রতি লেনিনের কি মনোভংগী ছিল তার এক চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। লেনিন মায়কোভস্কীর প্রতি বরাবরই বিরূপতা পোষণ করে এসেছেন। কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হলেও মায়কোভস্কী অন্যায়, অসত্য এবং সোভিয়েত ব্যুরোক্রেসীর সম্পর্কে তাঁর মনোভংগী অপ্রকাশ করেন নি। কিন্তু মায়কোভস্কীকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে, মৃত্যুর পরেও তার শেষ হয়নি। মিঃ মার্শাল লিখেছেন :

"His works only appeared in restricted editions, no new works published, he research, no production of his plays, his books and portraits were removed from the Libraries".

এসব ঘটনা স্বয়ং স্তালিন কর্তৃক মায়কোভস্কীর পুনর্বাসন ঘটার পরেও ঘটেছে এবং মায়কোভস্কীর রচনাটি সেন্সার করা হয়েছে। কোনো জায়গায় স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি যে কয়েক লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। স্তালিনের আমলে মায়কোভস্কীর সমস্ত নাটকই সেন্সার করা হয়েছে। ফরেন ল্যাঙুয়েজ পাব্লিশিং হাউস মায়কোভস্কীর কবিতার যে নির্বাচিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তার মধ্য থেকে স্তালিনকেই বাদ হয়েছে সেন্সার করে।

এই গ্রন্থে 'এবাউট দিস' নামে একটি কবিতা আছে। মার্শালের মতে এই কবিতাটি এক আশ্চর্যসুন্দর প্রেমের কবিতা। প্রেমের কোনো উল্লেখ না করেই মানবচিত্তে তার প্রতিক্রিয়ার কথা বলছেন কবি মায়কোভস্কী—

"এ এক বিচিত্র বস্তু!
যা কিছু নীচের চায়
যেতে উর্ধলোকে।
মননের গভীর গহনে
অন্তহীন চলে আলোড়ন।
অবদমনের প্রবল পেষণে
শেষে একদিন—
তব মর্মলোক তীব্রবেগে
চর্ম ভেদী হবে বিস্ফোরিত।।"

মায়কোভস্কীর সমস্ত কবিতার মধ্যে আছে এই জাতীয় সুস্পষ্ট সোচ্চার বক্তব্য। ছন্দের মধ্যে আছে উদ্দীপনা, সজীবত্ব আর বিজয়ীর দীপ্ত ভঙ্গি। এই গভীরতার মধ্যে সর্বত্রই তেমন গুরুগম্ভীর ভঙ্গি নেই, তার কারণ কবির পরিহাসরসিক চিত্ত। রাজ-নৈতিক চেতনার পরিচয় প্রসঙ্গেও এই পরিহাসরঞ্জিত ভঙ্গি বর্তমান। তাঁর প্রকৃতিতে রাজনীতির প্রয়োজন আছে, তবে তাই সব নয়, যথেষ্ট নয়।

স্যার মরিস বৌরা লিখেছেন, "মায়কা-ভস্কী আবৃত্তি করার জনাই লিখে গেছেন, তাঁর রচনা মুদ্রিত গ্রন্থের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ থাকার বস্তু নয়, তাই সেই কবিতা শুধু পঠিত নয় ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন।" এক-জাতীয় কবিতা আছে যা পাঠ করলে কানে বেশ সুর আনে, ছন্দিত মাধুর্য যেন ঝরে পড়ে, কিন্তু ছাপার পৃষ্ঠায় সে যেন এক মৃত বিবর্ণ বস্তু। ধীরে ধীরে পড়লে মনে হবে বস্তু কিছুই নেই।

মায়কোভস্কীর কিছু কবিতা এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তার মধ্যে যে বীরত্ব ও ব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যায় পাঠক বা শ্রোতাকে তা আকুল করে তোলে। কিষাণ কবি সার্জে এসেনিনের মৃত্যুতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মায়কোভস্কী লিখেছেন :

"কত কি যে আছে করিবার
ধাবমান কত কিছু আছে ধরিবার
শুরুতেই
জীবনের
হোক রূপান্তর।

তারপর—
অন্যরূপে, অন্য কোনো রূপে ধরে
হয়ত বা ধরা যাবে
জীবনের গান।।"

সহজ ও সরল ভঙ্গিতে বক্তব্য প্রকাশে মায়কোভস্‌কী অদ্বিতীয়। রচনার মধ্যে গতিময়তা ও লক্ষ্যপথে পৌঁছানোর অতি আশ্চর্য চেতনা কবির বিরাটত্বের পরিচয় দেয়।

মায়কোভস্‌কী বিপ্লবের সন্তান। সেই বিপ্লবই আবার আপন সন্তানের রক্ত পান করে ক্ষুধা মেটায়। যদি তিনি আত্মহত্যা না করতেন তাহলে একদিন অন্য কেউ হয়ত তাঁকে গুলি করে মারত। মায়কোভস্‌কী চরিত্রের বড় কথা যে তিনি কাব্যের চিরন্তন মূল্য সম্পর্কে চিন্তায় অচঞ্চল ছিলেন। হয়ত মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট হয়েছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরে এসেছেন চিরপুরাতন মূল্যবোধে। সর্বদা আনুগত্য বজায় না রাখতে পারলেও শত্রুকে আক্রমণ করেছেন সেই হাতিয়ারে।

মায়কোভস্‌কী সম্পর্কে স্তালিন বলেছেন—"তাঁর সাহিত্যকর্ম ও স্মৃতির প্রতি ঔদাসীন্য অতিশয় অপরাধ।" আবার লেনিন বলেছেন—"আমি কয়েকবার চেষ্টা করেও তিন লাইনের বেশী পড়তে পারিনি। ঘুম এসে গেছে।" তবে একটা কমিটি মিটিং-এর বাহুল্যকে ব্যঙ্গ করে মায়কোভস্‌কী একটি কবিতা লেখেন, সেই কবিতাটি পাঠ করে লেনিন বলেছিলেন : "আমি অবশ্য কবিতার কিছুই জানি না, তবে রাজনৈতিক দিক থেকে বলতে পারি, অতিশয় খাঁটি কথাই লিখছেন কবি।"

মায়কোভস্‌কীর সাধ ছিল একটি কাব্যগ্রন্থ লিখবেন, তা আর হল না। দু' মাস কিছু লেখাই হল না, তারপর একুশ লাইন কবিতা। এই তাঁর শেষ। কবিতায় বিপ্লব নেই, যন্ত্রণা নেই, আছে শুধু লিলি বার্কের কথা। প্রেম আর ব্যথাভরা বেদনার গান।

১৯৩০-এ মায়কোভস্‌কীর আত্মহত্যা সম্পর্কে চলে অনেক জল্পনা, অনেক গবেষণা। তাঁর লিখিত শেষ কথায় মনে হয়, পিছনে ছিল ব্যর্থ প্রেম। বহুবিচিত্র বিপ্লবী কবি জীবনের পথে নিঃসঙ্গ পথিক! তাঁর জীবনের তাই মূলমন্ত্র—একলা চলোরে—"।

মিঃ মার্শাল সম্পাদিত "মায়কোভস্‌কী" গ্রন্থটি কবির অনুরাগী পাঠকদের কাছে বিশেষ মূল্যবান সংযোজন।*

—অভয়ংকর

---

* MAYAKOVOSKY: Translated and edited by Herbert Marshall. Published by Hill & Wang, N.Y. Price: Ten dollars.
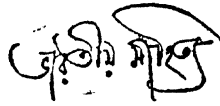
বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির অনুষ্ঠান ॥

"নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির একটি নতুন ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২ জুলাই, রবিবার সকাল ৯টায়, সমিতির দক্ষিণ কলকাতার ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

ডঃ সেন তাঁর ভাষণে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তন করতে গিয়ে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে না পারলে দেশকেও আমরা কোনওদিন ভালোবাসতে পারবো না। এই কারণেই আজ মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি। আমার খুব আশা ছিল, বাংলাদেশ থেকে এ-ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য পাবো। তাই শ্রীকোঠারীকে নিয়ে আমি প্রথমেই এখানে আসি। কিন্তু এখানে এসে আমার মোহভঙ্গ হলো। দেখলাম, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষাবিদদের অনেকেই এর বিরোধী। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এঁদের বিরোধিতার কারণ। আমি কিন্ত এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করি। বাংলাকে স্বীকৃতি দিলেই ক্রমশ পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে। বাংলার সে ক্ষমতা আছে।" পরিশেষে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, "মাতৃভাষাকে আমি উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করবোই।" বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির ভবন নির্মাণ বা অন্যান্য ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে সাহায্য করতে পারেন, এ-বিষয়ে তিনি বলেন, "বাংলাভাষা প্রসার সমিতিকে সাহায্য করলে, অন্যান্য ভাষাভাষীরাও সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। এতে কিছু অসুবিধা হতে পারে।"

সভাপতির ভাষণে শ্রীহুমায়ুন কবীর সাহায্যের ব্যাপারে ডঃ সেনের মতামত খণ্ডন করে বলেন, "বঙ্গভাষা প্রসার সমিতিকে সাহায্য করলে কোনও অসুবিধা হবে না, বরং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কর্তব্য। কেননা, ভারতের জাতীয় ভাষা বর্তমানে ১৬টি। প্রত্যেকটি ভাষাকেই উন্নত এবং সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।" প্রসঙ্গত তিনি জানান, তিনি যখন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে তাঁর এ-বিষয়ে আলোচনা হয়। জওহরলাল নেহরু প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষাকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় ১৯৫৯ সালে ভাষাগুলিকে সাহায্যের পরিমাণ ২ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ হয়। বর্তমানে এই সাহায্যের পরিমাণ ৬৪ লক্ষ। এই পরিকল্পনা অনুসারেই যখন মালয়ালম ভাষায় গীতার অনুবাদ করা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেন। তামিল ভাষাতেও অনুরূপ সাহায্য করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের জন্যও সাহায্য করা হয়েছে। এই সাহায্যের পরিমাণ লোকভিত্তিক। এই হিসেবে হিন্দী পায় মোট সাহায্যের শতকরা ৪০ ভাগ। এইদিক থেকেই বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি বা অনুরূপ প্রচেষ্টাগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবী রাখে।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অবাঙালী এবং বিদেশী, যাঁরা বাংলা শিখেছেন, তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সমিতির অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে ভাষণ দেন।

মধুসূদনের স্মৃতিতে : দিল্লী বিশ্ববিদালয় ॥

ফরাসী দেশের ভার্সাই শহরে মধুসূদন দত্ত তাঁর জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ১৮৬৩-৬৬ এই তিন বছর তিনি ছিলেন ১২ রু দ্য চ্যাটিয়ারে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গত ৩ জুলাই এই গৃহটিকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে এই ঘরে একটি স্মৃতি-ফলক স্থাপন করেন। তাঁদের এই কাজ ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। কিন্তু দুঃখ হয়, এ-ব্যাপারে বাংলাদেশের এবং বিশেষভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্ভব নীরবতার কথা লক্ষ্য করে। ৬, লোয়ার চিৎপুর রোডে মধুসূদন দত্ত যে-বাড়িতে থাকতেন, তাকে জাতীয় সম্পদরূপে সংরক্ষণ এবং মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার্থে এই ঘরটিকে ব্যবহার করার বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই করণীয় নেই। এই বাড়িতে মধুসূদন ১৮৫৯-৬১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এখানে থেকেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গণা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরেজি অনুবাদও এই বাড়িতে থাকাকালেই হয়। কিছুকাল আগে এ নিয়ে কিছুটা প্রচেষ্টা চলেছিল। কিন্তু এখন তার কি হয়েছে, কি অবস্থায় আছে, তা আর জানবার উপায় নেই। শুনেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনের জন্যে যেসব ফার্ণিচার কিনেছিলেন, তা এক জায়গায় সংরক্ষিত

আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এগুলিকে যোগ্যভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন না? আসলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষভাবে বাংলা-বিভাগ এখন একটি বিরাট মিউজিয়াম। নাহলে, দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টা দেখে তাঁরা লজ্জিত হতেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় যা করলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো অনেক আগেই তা করতে পারতেন। আসলে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের অধ্যাপকরা নিজেদের স্মৃতিরক্ষার জন্যই ব্যস্ত। এইসব বাজে কাজে মাথা ঘামাবার তাঁদের সময় নেই।

যাই হোক, বিলম্বে হলেও দিল্লী বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে অগ্রণী হয়ে সাধারণ সাহিত্যপিপাসু ভারতীয়দের বহু-দিনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করলেন। ফরাসী দেশের এই ঘরটিতে থাকাকালেই মধুসূদন শতাধিক সনেট রচনা করেন। সকলেই জানেন, তাঁর এই সনেটগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ ভার্সাই-এর উপর এবং অন্য একটি ভিকটর হ্যুগোকে শ্রদ্ধানিবেদন করে। তিনি ফরাসীদেশ, ফরাসী জাতি এবং ফরাসী ভাষাকে ভালবাসতেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "এই স্থান প্রশ্নাতীতভাবে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ হচ্ছে আমাদের অমরাবতী।" অপর একটি চিঠিতেও তিনি লিখেছিলেন—

"Though I have been unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French I speak it well and write it better."

ফরাসী জনসাধারণের কাছ থেকেও মধুসূদন যে সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তা সত্যই দুর্লভ। এই বাড়ি থেকেই মধুসূদন দান্তের উপর সনেটটি রচনা করেন এবং নিজেই এর ইতালী অনুবাদ করে দান্তের ৬০০তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৮৬৫ খৃঃ ইতালীর সম্রাটকে পাঠান।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

'সোভিয়েত ইনস্টিটিউট' ও ভারতের ইতিহাস ॥

সোভিয়েত ইনস্টিটিউট ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ শুরু করেছেন দীর্ঘদিন থেকে। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' এই নামে তাঁরা যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করছেন সেটি মোট ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ ও বর্তমান যুগ হবে এক একটি খণ্ডের আলোচ্য বিষয়। সম্প্রতি প্রথম দুটি খণ্ড বেরিয়েছে। বাকি দুটি আগামী বছরের মধ্যে বেরুবে বলে জানা গেছে।

বলাবাহুল্য, গ্রন্থটি রচিত হয়েছে রুশ ভাষায়। সম্পাদনা করেছেন ভি ভি বালা-বুশেভি এবং এ এম দিয়াকভ। প্রকাশ করেছেন রুশ বিজ্ঞান আকাডেমি'র ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া এ কন্টেম্পরারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া নামে একটি ইংরেজী ইতিহাসগ্রন্থও এঁরা ভারত থেকে প্রকাশ করছেন। বইটি বিদগ্ধ রুশ ভারতবিদদের রচনায় সমৃদ্ধ। প্রধানতঃ ১৯১৮—২২ সালের সমান্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলন, ১৯২৩—২৭-এর অন্তর্বর্তী-কালীন ভারতবর্ষ, ১৯২৮—৩৩-এর জাতীয় আন্দোলন ও বিশ্ব অর্থনৈতিক সমস্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার ভারতবর্ষ (১৯৩৪—৩৯), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ (১৯৩৯—৪৫), সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৪৫—৪৭) প্রভৃতি এতে আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ অংশ স্বাধীনতাউত্তর ভারতবর্ষ (১৯৪৭—৫৫) বিভাগে ভারতের অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি, নির্বাচনোত্তর ভারত প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে।

একটি অনবদ্য সমালোচনা গ্রন্থ ॥

কবিতার সমালোচনা হিসেবে হার্বার্ট রীডের রচনার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর কয়েকটি সমালোচনা পদ্ধতির একত্র সংকলন। বইটির নাম "পোয়েট্রি অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স"। এতে মোট নয়টি রচনা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে দুটি রচনা একেবারে নতুন মুদ্রণ। সে দুটি রচনা হচ্ছে 'দি ফেস অব এ ক্রিটিক' এবং 'পোয়েট্রি অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স'। দ্বিতীয় আলোচনাটি সমগ্র বইয়ের ভূমিকা হিসেবেও কাজ করেছে। এ বইটি বেরুলে যেমন একদিকে হার্বার্ট রীডের সম্পূর্ণ নতুন দুটি রচনার সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ হয়, তেমনি এর আরেকটি মূল্য আছে। তা হচ্ছে এ বইয়ের অন্তর্গত চারটি আলোচনা "রিজন অ্যান্ড রোমান্টিসিজম' (১৯২৬) গ্রন্থ থেকে নেওয়া। বলাবাহুল্য এই বইটির মুদ্রণ আজ দীর্ঘকাল নিঃশেষিত।

কবিতাগ্রন্থ পুরস্কৃত ॥

প্রতি বছর আমেরিকার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থের জন্য "ন্যাশন্যাল বুক অ্যাওয়ার্ড" ঘোষণা করা হয়। এটি আমে-রিকার একটি জাতীয় পুরস্কার। আলোচ্য বছরে এই পুরস্কারটি পেয়েছেন তরুণ কবি জেমস মেরিল। কাব্যগ্রন্থটির নাম "নাইটস অ্যান্ড ডেজ"। এবারের গ্রন্থ নির্বা-চনের বিচারক ছিলেন কবি অডেন, জেমস ডিকি ও হাওয়ার্ড নেমেরভ।

ইটালো স্যাভোর গল্পগ্রন্থ ॥

ইটালো স্যাভো ইতালীর একজন ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কি স্বদেশে কি বিদেশে স্যাভোর পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত কম। জীবিতকালে নিজের জনপ্রিয়তা দেখে যেতে পারেন নি। ইতি-পূর্বে এই বিভাগে আমরা স্যাভোর সাহিত্যকর্ম বিষয়ে পি এন ফারব্যাঙ্ক রচিত 'ইটালো স্যাভো ঃ ম্যান অ্যান্ড দি রাইটার' বইটি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এই বইটি পড়েই নাকি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেসের এক কর্তাব্যক্তি স্যাভো সম্পর্কে উৎসাহী হন। সম্প্রতি এদের উদ্যোগেই স্যাভোর 'শর্ট সেন্টিমেন্টাল জার্নি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' নামে বইটি ইতালীয় ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তার সৃষ্টি করেছে। মোট চারটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। সমা-লোচকদের মতে প্রতিটি গল্পই রচনার বৈচিত্র্যে ও আধুনিকতার স্পর্শে অক্ষয় হবার মত। বিশেষত "দি কনফেশনস অব জেনো" গল্পটি অনন্যসাধারণ এ ছাড়া "দি হোয়াক্স', 'ডেথ' এবং নাম-গল্প 'শর্ট সেন্টি-মেন্টাল জার্নি' গল্প তিনটিও স্যাভোর আশ্চর্য চরিত্রসৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের সাক্ষ্য রাখে।

পারাবার বিহারিনী গঙ্গে

হিমালয় বাংলা দেশের যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। প্রতি বৎসর বেশ কয়েক মাস তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কাটিয়ে আসেন। হিমালয় বিষয়ে তিনি একজন অধিকারী ব্যক্তি বলা যায়, যে কারণে যাঁরা হিমালয়ের এখানে-সেখানে ভ্রমণে গিয়েছেন এবং যাঁরা যেতে পারেন নি অথচ যাওয়ার বাসনা আছে তাঁরা সর্বদাই উমাপ্রসাদবাবুর কাছে নানাবিধ খবরাখবর এবং পরামর্শাদি গ্রহণ করে থাকেন এই সংবাদ আমরা জানি। উমাপ্রসাদ শুধু একজন পর্যটক নন, তিনি একজন সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ। প্রথম যৌবনে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অকুণ্ঠিত স্নেহও তিনি লাভ করেছিলেন এবং তা এই সাহিত্যপ্রীতির জন্যই প্রধানত। উমাপ্রসাদবাবুর লেখনী তাই সাহিত্যরসসমৃদ্ধ। ১৩৬২ সালে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাত্রার কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'গঙ্গাবতরণ' লিখেছিলেন। পরে ১৩৭০ সালে গোমুখ অতিক্রম করে হিমবাহের তুষারপথে কালিন্দী খালের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে বদরীনাথধাম গিয়েছিলেন উমাপ্রসাদ। এই সব পথে যাত্রী যাতায়াত অতি বিরল। গঙ্গাবতরণ গ্রন্থটির ১৩৬২ সংস্করণের সঙ্গে এই অভিযাত্রার কাহিনী 'কালিন্দী খাল' নামে সংযুক্ত করে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে গঙ্গাবতরণের প্রথম মিত্র-ঘোষ সংস্করণ। গ্রন্থটিকে লেখকের বর্ণিত পথ-চিত্র বা রুটম্যাপ দেওয়া আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র এই গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ।

উমাপ্রসাদবাবু হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে পথের টানে বেরিয়ে পড়েছেন বার বার। আত্মীয়-পরিজন বিস্মিত হয়েছেন তাঁর এই খেয়ালে। তথাপি তিনি নিরাসক্ত মন যুক্তির সঙ্গে ভক্তি মিশিয়ে বার বার গিয়েছেন ভারতের এই তীর্থ-পরিক্রমায়। তিনি বলেছেন কি যে পাই, কত যে পাই—ভাষায় প্রকাশ হয় না, শুধু বুঝি মন ভরে ওঠে—প্রশান্তির প্রদীপ্তিতে পরিতৃপ্তি আনে।' এই তাঁর মর্মকথা। অনুসন্ধিৎসার অনুবীক্ষণে সব কিছু দেখার চেষ্টা থাকলেও লেখকের অন্তরে আছে ভারতবর্ষের ছত্রিশ কোটি মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর্ষণ, সেই ভালো-লাগা এবং ভালোবাসার অপূর্ব অনুভূতি তাঁর রচনায় প্রকাশিত।

গঙ্গাবতরণ : (ভ্রমণ) — উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক : মিত্র ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা।

জীবনীগ্রন্থ

বইখানি শ্রীশ্রীমায়ের মানস-কন্যা (নিবেদিতা) রচিত শ্রীমায়ের সন্ন্যাসিনী কন্যা মাতা দুর্গাপুরী দেবীর জীবনচরিত। লেখক যে আদর্শ চরিত বর্ণনা করেছেন তা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। গল্প মাধ্যমে এই মাতৃচরিত্র পাঠকবর্গের মনোতৃপ্তিকর হবে। মাতা দুর্গাপুরী শ্রীশ্রী সারদা মায়ের কাছে লালিত-পালিত। পঁচিশ বৎসরকাল ধরে শ্রী শ্রীমা তাঁকে আদর্শ মাতারূপে গঠন করে জনকল্যাণে নিয়োজিত করেন।

বইয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অনেক অপ্রকাশিত ঘটনাবলী জানা গেল। এরূপ পুস্তক যে জনসমাজে বিশেষ আদরণীয় হবে সে বিষয় নিশ্চিত। বইখানির বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট অতুলনীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের মানস কন্যা : বি বেটা। প্রাপ্তিস্থান মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ৩-৫০।

॥ কবিতায় নতুন জিজ্ঞাসা ॥

ইদানীং যে সব তরুণ কবি অতি অল্পকালের মধ্যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন গণেশ বসু তাঁদের অন্যতম। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি গণেশ বসুকে এই সাফল্যের পথে অগ্রসর করেছে। বাংলাসাহিত্যে কবির সংখ্যা অনেক, সেই ভীড়ের মধ্য থেকে মাথা উঁচু করে আত্মপ্রকাশ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। গণেশ বসু অনেক ভীড় ঠেলে এলেও সেই জনারণ্যে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ সংশয়হীন চিত্তে দণ্ডায়মান, অনেকের মধ্যে একক। তাই গণেশ বসুর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি' কাব্যজগতের এক আনন্দ সংবাদ। সোনালি গির্জার মোরগচূড়ায় অবরোহণের আশা নেই, নৈরাশ্য এনে দেয় কবির মনে—হয়ত কোনোদিন বুঝি আর পৌঁছানো যাবে না। অন্ধকার সেতুর ওপারে যেখানে রক্তের জলে সূর্য হেসে ভেসে যায়। প্রায় এই সুরে বৃদ্ধের ডায়েরী থেকে জানা যাবে তাঁর মনোবাসনা। যে সোনালি গির্জার মোরগচূড়ায় পৌঁছাতে পারেনি, সে যুবক। যে স্মৃতির ধূসর পথ পার হয়ে ফিরে যেতে চায় যৌবনের স্বপ্নিল শহরে সে বৃদ্ধ। "সকালের পুষ্প ঝরে বনতলে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়", যে ফুল প্রভাতের আনন্দ তা সন্ধ্যার শোক। স্মৃতির ভারে কবির চিত্ত বিষণ্ণ। তাঁর কাছে স্মৃতি আজ বিবর্ণ ধূসর'। "চারিদিকে মুমূর্ষ বাতাস/ ঘোরে ফেরে উন্মাদ স্বভাবে / অযাচিত নীলিমার তলে।।" —প্রেমের সুমহান অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যে। যে অনির্বাণ জ্বালা মর্মমাঝে নিরন্তর বিভীষিকা সৃষ্টি করে তার নাম প্রেম। প্রেম আত্মহননকর, তাই পশ্চাতপানে তাকানো অনুচিত। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান যুগের হতাশা, সংশয়, দ্বন্দ্ব এবং জটিলতা পরিপূর্ণ কবির কাব্যভাবনায় রূপায়িত। তাই চব্বিশ শুরু না হতেই জীবনে নেমে আসে এক ক্লান্তি অবসাদ, চারিদিকে একটা স্বাভাবিক শূন্যতা। কবি তাই বলেছেন : "আলো আর আকাঙ্ক্ষার অজস্র প্রতিমা / রচেছিল স্বপ্ন কতো, তার কোনো সীমা / অন্ততঃ জানেনি নিঃস্ব হৃতরাজ্য যৌবনের আয়ু / এখন জড়তাগ্রস্ত একালের স্নায়ু।" বর্তমানকালের স্নায়ুশিরায় যে জড়তা নেমেছে কবি সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। এই যুগের সামনে কোনো আশা নেই, সকল স্বপ্ন প্রতিহত। নিভৃতে নীরবে যে বাণী কাঁদে তার প্রকাশ কোথায়, রুদ্ধ আবেগে যে নিদারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় কোথায় তার মুক্তি। কবি সখেদে বলেছেন—"অথচ রজনী ছিলো বাকী / ছিলো কতো বন্দরের স্বপ্ন ভবিষ্যৎ / কিন্তু আজ মিথ্যা যেন, প্রতারণা শিল্পের শপথ।" একালের যুবকসমাজ তাই আর্তনাদে মুখরিত। কবির পৃথিবী তাই "অলৌকিক, শূন্যতা বিষাদ"। কবির তাই চিন্তা বিষণ্ণ যুবারা সব কি করে বেঁচে আছে অন্ধকারে / নাস্তিময় শতাব্দীর বিষাক্ত বিবরে / কাটায় উজ্জ্বল দিন / পত্রহীন হেমন্তর বৃক্ষের মতন—"

মাথার ওপর বর্তমান শতাব্দীর শাণিত কৃপাণ সদাই উদ্যত। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে—"এ বিংশ শতকে অবশেষে রবে না হৃদয়?" হৃদয় নামক বস্তুটি বর্তমানে বরবাদ। কবন্ধে সারা পৃথিবী ভরে যাবে। অথচ এক শাশ্বত অমল জীবনই ছিল মানুষের একমাত্র প্রার্থনা। কবি তাই স্মৃতির পদাবলীতে ক্লান্ত। বিষণ্ণতা মানুষকে খালি কাঁদায়। তাহলে কি সবটাই হতাশা। সামগ্রিক অন্ধকারের মধ্যে সবাই শেষপর্যন্ত মিলিয়ে যাব। এই চিন্তাও কবির মনে আলোড়ন আনে। এখন তাই উজ্জীবনের মহামন্ত্র উচ্চারণ করা চাই। এখনো অনেক রঙীন মুখ, অনেক বন্ধ্যা জমিনের বুকে জেগে আছে অনাবাদী উল্লাস। প্রতিরোধ গড়ে তুলে দাঁড়াতে হবে জীবনের মুখোমুখি। কবি এক জীবন্ত জীবনের প্রতীক, তাঁর সেই জীবনই সামগ্রিকভাবে এ যুগের জীবন। সেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই তরুণ কবির মনে জেগেছে প্রশ্ন। একদিন যেমন পৌরাণিক যুগে সদ্যস্নাত ঋষি তরুণের মনে প্রশ্ন জেগেছিল সমুদ্রোত্থিত প্রভাতরবিকে দেখে। জন্মের ঋণ কি হবে না শোধ এই প্রশ্ন এ কালের, এ যুগের মানুষ সূর্য দেখে বিস্মিত হয় না, তার বিস্ময় অন্ধকার দেখে।

গণেশ বসু যন্ত্রণাকাতর পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে বলিষ্ঠ প্রশ্ন তুলেছেন তার জবাব কে দেবে?

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

নিজের মুখোমুখি (কাব্যগ্রন্থ)—গণেশ বসু। বীক্ষণ প্রকাশ ভবন। ১বি, অক্রুর সাহা লেন। কলকাতা—৩। পরিবেশক : সিগনেট বুক সপ—বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

ধর্ম পরিচয়

গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ ও ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় যে সমস্ত ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলি সংকলিত হয়েছে 'ধর্মপরিচয়' প্রথম খণ্ডে। উপনিষদে দক্ষধর্ম, গীতায়

অধিষ্ঠানতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, অবতারবাদ, খৃস্টীয় ভক্তিবাদ, সাকার ও নিরাকার পূজা, এবং ঈশোপনিষদের প্রথম চারটি মন্ত্র থেকে কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বইখানি সুচিন্তিত, সরল ভাষায় রচিত। সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী এই গ্রন্থখানিতে লেখকের ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ধর্ম পরিচয় : (আলোচনা) : প্রথম ভাগ — অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। ২০৩।১।১ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম : দুই টাকা।

চিরন্তন কাব্যের নতুন অনুবাদ

ভাষা সম্পর্কে মানুষের রুচি দ্রুত পরিবর্তনশীল বলেই ধ্রুব সাহিত্যের অনুবাদও প্রতি যুগেই নতুন করে করতে হয়। যে ভাষা কোন বিশেষ যুগে গ্রাহ্য নয় সে ভাষায় অনুবাদও সে যুগে অগ্রাহ্য হতে বাধ্য। কেননা রুচিপরিবর্তনের ফলে সে ভাষার ধার তখন হারিয়ে গেছে, সে আর তখন পাঠকের মনকে তরঙ্গায়িত করে না। ফলে পাঠকমনে ভাবসঞ্চারও বাধাগ্রস্ত হয়। হয়ত প্রধানতঃ সেই কারণেই একই গ্রন্থের বার-বার অনুবাদ করতে হয়। সেই একই কারণে অশোক ভট্টাচার্যের এই নতুন অনুবাদ। মনোযোগী পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে অশোকবাবুর সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তাঁর অনুবাদ শুধুই আধুনিক নয়, স্বচ্ছ এবং কৃতিত্বপূর্ণও। মূল রুবাইয়াৎ নয়, ফিটজজেরাল্ডের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদই অশোকবাবুর অবলম্বন। বইখানির অঙ্গসজ্জা পাঠককে মুগ্ধ করবে।

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুবাদক : অশোক ভট্টাচার্য। প্রকাশক—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলি:-৬। মূল্য—চার টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কবিতা, সংগীত ও সমালোচনার মুখপত্র হিসেবে 'উত্তরসূরী' সুপরিচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যায় লিখেছেন প্রবাসজীবন চৌধুরী, হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, হারাধন দত্ত, অশ্রুকুমার সিকদার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর রহমান, মানস রায়চৌধুরী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মণিদীপা বিশ্বাস, সুনীথ মজুমদার এবং আরো অনেকে।

উত্তরসূরী (৪ বর্ষ : ২য় সংখ্যা)— সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য, ১বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০, দাম : ১·০০।

●

মেয়েদের কাগজের সংখ্যা বাংলা দেশে খুবই কম। যে কটি কাগজ রয়েছে তার মধ্যে 'শ্রীমতী' নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক সংখ্যায় লিখেছেন সীতা দেবী, সৈয়দ মুজতবা আলী, শান্তিদেব ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ, সমরেশ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, গণেশ বসু, জয়ন্তী সেন, তারাপদ রায়, শান্তনু দাস, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

শ্রীমতী (৫ম বর্ষ : ১২ সংখ্যা) প্রধান সম্পাদিকা : আভা চট্টোপাধ্যায়, ২১ ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলকাতা-১। দাম : ২·৫০।

●

প্রগতিশীল কবিতা ত্রিমাসিক 'সীমান্ত' নব পর্যায়ে প্রকাশিত হবার পর থেকেই কাব্য-অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যাটি নানা কারণেই মূল্যবান। এ সংখ্যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি ভাল লাগে? তাঁর কবিতা কি আধুনিক? আলোচনা চক্রটি। এতে যোগ দিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায়, চিত্ত ঘোষ, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও গণেশ বসু। এ ছাড়া রয়েছে প্রবীণ ও তরুণ কবিদের সুনির্বাচিত ষোলটি কবিতা।

সীমান্ত (৫ম সংকলন) সম্পাদক : মৃগাঙ্ক রায়, তরুণ সান্যাল ও প্রসূন বসু, পি-৩০৮, বাঁশদ্রোণী পার্ক বাঁশদ্রোণী, ২৪-পরগণা। দাম : এক টাকা।

●

কিশোরদের মাসিক পত্রিকা আগামী নবপর্যায়ে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছি। সম্প্রতি প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী, বিমল কর, মতি নন্দী, কৃষ্ণ ধর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, অমল দাশগুপ্ত, মিহির সেন এবং আরো অনেকে।

আগামী (১ম বর্ষ : জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) সম্পাদক : কৃষ্ণা দত্ত, প্রসূন বসু, ১৯ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২০। দাম : ৭৫ পয়সা।

●

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লব-ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ শতকের গোড়ার দিকে সে অগ্নিযুগের সূত্রপাত এবং ত্রিশের দশকে তার চরম বিস্ফোরণ। কলিকাতা অনুশীলন ও যুগান্তর নামক দুটি দলের অসংখ্য দুঃসাহসী যুবকের আত্মত্যাগে বাংলার এই গৌরবময় অধ্যায়ের ইতিহাস রচিত। তাঁরা কেউ বা ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে, কেউবা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করে গিয়েছেন। তাঁদের সহযোগী, যাঁরা আজও জীবিত, তাঁদের প্রচেষ্টাতেই এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলার এই উজ্জ্বল অধ্যায়ের একটি মোটামুটি ইতিহাস বিবৃত হয়েছে আর সংযোজিত হয়েছে শহীদ ও বিপ্লবীদের কয়েকটি আলোকচিত্র। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু হবেন, তাঁদের পক্ষে গ্রন্থখানি অপরিহার্য।

যুগান্তর ও যুগান্তর সহযোগী বিপ্লবী গোষ্ঠীর স্মারক গ্রন্থনা। প্রকাশক : পরেশনাথ মৈত্র, ১নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা। সভ্যদের জন্য ২ টাকা মাত্র।

●

কৃন্তন পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর রায়, সাগর চক্রবর্তী, যোগব্রত চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

কৃন্তন (৫ম সংকলন) সম্পাদক : মলয় রায় ও জ্যোতিময় চট্টোপাধ্যায়। বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। দাম : ২৫ পয়সা।

●

বর্ধমানে আয়োজিত বর্ধমান সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে বর্ধমানের সংস্কৃতি, বর্ধমানের সাংবাদিকতা, বর্ধমানের ইতিহাসের কাঠামো, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বর্ধমান রাজ্যের দান, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বর্ধমানের সেকাল ও একাল, বর্ধমান জেলার নদনদী, বর্ধমানের লোক-উৎসব ও লৌকিক দেবদেবী, বর্ধমান সংস্কৃতিতে কাঁকসা, প্রভুপাদ মাণিকচন্দ্র ঠাকুর, বর্গী এলো দেশে প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ সংরক্ষণযোগ্য সংকলন।

বর্ধমান সংস্কৃতি সম্মেলন ১৩৭৪। সম্পাদক সুধীরকুমার অধিকারী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখা থেকে প্রকাশিত।

[উপন্যাস]

(১৫)

আপনার হাতের কাছে ঐ বোতামটা টিপবেন একবার? —ঐ যে, আপনার বাঁ দিকে। ধ্যাংকস। সন্ধে হ'য়ে এলো—আমার হুইস্কি-সন্ধ্যা। বোয়, ড্রিংকস। আপনার? কিছু না? না, না, তা কী ক'রে হয়, একটু কিছু নিন, এক ফোঁটা মিষ্টি শেরি অন্তত। চীয়র্স। আঃ, গলাটা ভিজিয়ে বেশ লাগছে। আসুন তাহ'লে এই সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা জানাই, মদের গ্লাশ নিশেনের মতো তুলে ধ'রে, নির্ভয়ে। রোজ এই সন্ধে-বেলাটাকে আপনার কি মনে হয় না একটা জন্মান্তরের মতো? দিন থেকে রাত্রি, আবার রাত্রি থেকে দিন—কী বিরাট এই বদলগুলো, অথচ কী সহজে মেনে নেয় লোকেরা, হনুমানের মতো এক লাফে সমুদ্রলংঘন ক'রেও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় বড্ড খাটুনি, যেন অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রে তবে পেরোতে পারি এক-একটা সন্ধিক্ষণ, পারি উঠে আসতে রাত্রি থেকে দিনে, তলিয়ে যেতে দিন থেকে রাত্রিতে। শেষরাতে ঘুম পায় আমার, কিন্তু ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও টের পাই যে ঘুমুচ্ছি, টের পাই ভোর হলো, গায়ত্রী উঠে গেলো ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে, আমি পাশ ফিরি, আর হঠাৎ আমাকে অতল ঘুম টেনে নেয়, কিন্তু যতক্ষণ ঘুমোই তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে জেগে উঠতে। মনে হয় যেন সাঁতার কাটছি, ডুবে যাচ্ছি, মাথা তুলে নিশ্বাস নিচ্ছি মাঝে-মাঝে। চোখ মেলে বুঝতে পারি না কোথায় আছি, যে-সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিলুম সেগুলি যেন আঁশের মতো জড়িয়ে থাকে চোখে; কখনো মনে হয় বাঙ্কবাজারের বাড়িতে শুয়ে আছি (পাশের ঘরে কাজল তাও মনে পড়ে), কখনো আথেন্সের জর্জ দি ফিফ্থ্ হোটেলে আধো-ঘুমে মিতুর চুলের গন্ধ, জানলার বাইরে পার্থেনন, মনে পড়ে, কিন্তু চোখ মেলে দেখি যাকে মিতু ভেবেছিলাম সে নেলি। কখনো শুয়ে-শুয়ে ভাবি, এটা কান্, আমি দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি, আমার এখনই ভূমধ্যসাগরের নীলিমার সঙ্গে চোখোচোখি করা উচিত। না—সকাল নয়, গভীর, গভীর রাত্রি, কেউ কোথাও জেগে নেই, আমার মাথার মধ্যে সমুদ্রের তোলপাড়, অন্ধকারে তারার মতো মিতুর চোখ, ফেনায় ভেজা জলকন্যার মতো কাজলের শরীর। কিন্তু ঐ টুংটাং আওয়াজটা কিসের? জব্বলপুরে, নেলির পিয়ানো, আমার কি কোর্টে যাবার সময় হ'লো, ঘড়িটায় কি অনন্তকাল ধ'রে আটটা বাজবে? —এমনি লুকোচুরি খেলে এই ঘরটা সকালবেলায়, আমার মনে হয় আমার জীবনটা যেন হাজার জায়গায় টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দিতে চাচ্ছে এই জেগে ওঠার মুহূর্ত —বড়ো পরিশ্রম—আমি ক্লান্ত—নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাবার চেষ্টায় আমি যেন নতুন ক'রে খানখান হ'য়ে যাচ্ছি। কী এসে যায় আর যদি না জাগি, আমার ঘুমের এখনো যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাইতে গুটিসুটি মুড়ি দিয়ে যদি চ'লে যাই এক অন্ধকার থেকে আর-এক অন্ধকারে? কিন্তু না—যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ সময় থেকে নিষ্কৃতি নেই; আমাকে কফি খেতে হয়, বাথরুমে যেতে হয়, দাড়ি না-কামালেও চলে না, তারপর ঐ পুবের বারান্দায় ব'সে মনে হয় আলো ভালো, আমি আলো চাই, প্রাঞ্জল দিন আমাকে ফিরিয়ে দেয় আমার বেঁচে থাকার সাহস; আমি কে, কোথায় আছি, আজকের তারিখ কত, ক'টা বাজলো, এ-সব বিষয় আর সন্দেহ থাকে না। আর সেই-জন্যেই সন্ধেবেলা আর-এক দফা যুদ্ধ চালাতে হয় আমাকে; অনেকগুলো ঘণ্টা আলোয় কাটাবার পরে অচেনা মনে হয় অন্ধকারকে; জীবনের যে-টুকরোগুলো গুছিয়ে নিয়েছিলাম সেগুলি আবার আলগা হ'য়ে যায়, যেন গলে যায় রাত্রির জোয়ারে—চিরকালের মতো নয় (তাহ'লে কোনো ভাবনাই ছিলো না), মাত্র ক'বারো ঘণ্টার জন্য! তাই আমার ঘুমিয়ে পড়া নিয়ে এত সতর্কতা, আমি জানি একেবারে হারিয়ে গেলে চলবে না, কোনো-একটা কুটো আঁকড়ে থাকতে হবে এমনকি ঘুমের মধ্যেও, যাতে জেগে উঠে, হাৎড়ে-হাৎড়ে, সেই কুটো থেকেই তৈরি ক'রে নিতে পারি এই বাড়ি, এই উটকামণ্ড শহর, এই জগৎ—আর আমার

আমিত্বকে। বলুন তো, জীবনটা এমন কী মনোরম যার জন্য এত খাটুনি খাটা যায়?

কিন্তু না—এ-সব পরিশ্রমের কোনো পুরস্কার নেই তাও নয়। ঐ দুটি সময় আমাদের জীবনে, ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠার আগেকার মুহূর্তে, যখন আমরা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা পাই, প্রায় হাতের মুঠোয় ধরতে পারি অতীতকে—জলবিন্দুর মতো ভঙ্গুর সেই মুহূর্তে, আমরা যার নাম দিয়েছি স্বপ্ন, কিন্তু আসলে যা আমাদেরই স্বরচিত—কোনো আহবান, কোনো উত্তর, কোনো সংলাপ, কোনো পুনরভিনয়। আমাদের হৃদয় স্বচ্ছ চোখে তাকিয়ে থাকে তখন—সব বোঝে, সব ক্ষমা করে। তখন ফিরে আসে তারই একটি সোনালি দিন যখন আমি নিশ্চিত জানি মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার মা-বাবা শিগগিরই আসবেন আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে—আমি সুখী, কিন্তু অধৈর্যহীন, শান্ত, দীর্ঘ, দীর্ঘ বছর ভ'রে আমি অপেক্ষা করতে পারি মিতুর জন্য—আমার জীবনের লক্ষ্য আমি পেয়ে গিয়েছি, আর উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হবে না। আবার মাঝে-মাঝে সেই সোনালি আলোর বৃত্তের মধ্যে কালো একটি বিন্দু ফুটে ওঠে, কালো বড়ো হয় ক্রমশ, ছড়িয়ে পড়ে; আমি দেখতে পাই বুলবুলকে, আমাদের বাড়ির বাইরে, রাস্তায়। 'আমি আবার এলাম—আসতেই হ'লো।' আমি ফিশফিশ ক'রে বলি, 'তোমাকে একটা সুখবর দিই, আমার বাড়িতে কেউ জানে না এখনো।' বিয়ে করছো? মিতুকে? আমি জানি—তোমাকে দেখেই বুঝেছি। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। একটু বেড়াবে আমার সঙ্গে? কয়েক মিনিট?' আমি ভদ্রতা ক'রে বললাম, 'চলো।'

হেমন্তের রোগা-হয়ে-যাওয়া সন্ধ্যা ছিলো সেদিন, পাৎলা শিশিরে ভেজা ঘাস ছিলো পায়ের তলায়, ছিলো আমবাগানে নিথর নির্জনতা, আর গাছগুলির ফাঁকে-ফাঁকে ফালি-ফালি আকাশ—হলদে, নীল, মলিন। বুলবুলে কথা আরম্ভ করলো, 'কার্জন হল-এ আর্থার জোন্সের বক্তৃতা হচ্ছে কাল, তুমি যাবে না?' 'বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে না আমার।' 'আমি যাবো, ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে জোন্স কী বলে শুনতে চাই। তুমিও এসো না—ভারি একটা তামাশা হবে কাল।' 'তামাশা কেন?' 'জোন্স যদি আজ ভারতবর্ষের স্তবগান করে সেটা তামাশা ছাড়া আর কী?' আমি বললাম, 'শোনো বুলবুল, আবার যদি ও-সব বাজে কথা তোলো তাহ'লে আমি আর এক দণ্ড দাঁড়াবো না এখানে।' একটু সময় নীরব রইলো বুলবুল, মাথা নিচু ক'রে; আমি দু-একটা পাখির ডাক শুনলাম। তারপর দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ তুলে খড়খড়ে গলায় ব'লে উঠলো, 'না—আর কথা নয়, এবার কাজ! দেখবে একটা জিনিশ?' হঠাৎ তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বুলবুল বের করলো একটা—একটা—আমি সারা শরীরে কেঁপে উঠলাম, আমার চোখ ঝাপসা হ'লো, যখন দেখলাম সে তার ছোট্ট রোগা হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। 'দেখছো? এটা জোন্সের জন্য।' আমার গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো, 'বুলবুল! কী বলছো তুমি!' 'চুপ! চেঁচিয়ো না!' আমার মুখে হাত চাপা দিলো সে, আমি তার কব্জি মুচড়ে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিলাম। বুলবুল ব'লে উঠলো, 'সাবধান! কার্তুজ পোরা আছে।' কিন্তু আমি কথা বলার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, আমার গলা দিয়ে যেন নিজেরই অজান্তে শুধু একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে, 'না! না! না! না! না! না, বুলবুল! জোন্স না! তুমি না!' হাসি ছড়িয়ে পড়লো বুলবুলের মুখে, বিজয়ের হাসি—উদ্ধত, উজ্জ্বল। 'এখন তো বুঝতে পারছো কেন আমি আবার এসেছি—তুমি বারণ করা সত্ত্বেও। এসেছি বিদায় নিতে। জোন্স ভালো হ'তে পারে, সাধু হ'তে পারে, কিন্তু সে ইংরেজ, ভারতবর্ষকে যারা শ্মশান ক'রে দিচ্ছে তাদেরই প্রতিনিধি, সেইজন্যে—শুধু সেইজন্যেই এটা দরকার। ওদের আর-একবার বুঝিয়ে দেয়া যে আমরা ওদের চাই না—ওরা যে-ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই। প্রতিমা দেবতা নয় কিন্তু আমরা প্রতিমা পুজো করি—এও তেমনি। ছবি মানুষ নয়, কিন্তু ছবিতেও মাইকেল ও' ডায়ারকে দেখলে আমাদের মধ্যে কার না ইচ্ছে করে থুতু ছিটোতে, লাথি মারতে? এও তেমনি। আর জোন্স যদি সত্যি নিরপরাধ হয় সেটা বরং আরো ভালো, তাহ'লে বোঝানো হবে ওরা ভালো হ'লেও ভুলবো না আমরা, আমরা দয়া চাই না, উপকার চাই না, ওদের তাড়াতে চাই, তাড়াতে চাই!' পাথরে ছুরি ধার করার মতো আওয়াজ বেরোলো বুলবুলের গলা দিয়ে, কোনো আহত জন্তুর মতো তার নিশ্বাস। ঝাঁকে-ঝাঁকে কথা উড়ে এসে পোকার মতো আমার মগজের মধ্যে আটকে রইলো, মুখে শব্দ নেই—স্তব্ধ হ'য়ে, সমস্ত শরীর-মন দিয়ে অনুভব করছি এমন এক উত্তেজনা যা আমার কল্পনাতেও ছিলো না কখনো, আমার রক্তে যেন আগুন, লোম-কূপে জ্বালা, আমার চোখ আটকে আছে পিস্তলটাতে, যা আমি হাতে ধ'রে আছি—ঠান্ডা ইস্পাত, কিন্তু বুলবুলের বুকের তাপে এখনো উষ্ণ, ভিতরেও আগুনে পোরা, ঐ বদ্ধ তাপ ছড়িয়ে পড়ছে আমার শিরায়, কোন-এক মায়াবী স্পর্শে আমি জগৎসংসার ভুলে যাচ্ছি। ছোঁয়া দূরে থাক, পিস্তল আমি চোখেও দেখিনি কোনোদিন—সিনেমায় ছাড়া—খুব সম্ভব আমার সাত পুরুষে কেউ দ্যাখেনি—সেইটে আমার মুঠোর মধ্যে এখন, আশ্চর্য যন্ত্র, কী সুন্দর, কী নিটোল গড়ন, সুন্দর চোখা নল বসানো যার মধ্য দিয়ে মারাত্মক বেগে বেরিয়ে আসে বীরের বীর্য, অবরুদ্ধ তেজ, আক্রমণ, লুন্ঠন জয়। আমি যেন মাতাল হ'য়ে উঠলাম এ-কথা ভেবে যে অতখানি শক্তিকে ভ'রে দেয়া যায় ঐটুকু একটা জিনিশের মধ্যে, যা একটি ছোটোখাটো রোগা মেয়ে ব্লাউজের তলায় লুকিয়ে ব'য়ে বেড়াতে পারে, আর যা দিয়ে, নিমেষের মধ্যে, কাউকে কিছু বুঝতে না-দিয়ে, একটা পুরোপুরি জীবন্ত মানুষকে পুরোপুরি মেরে ফেলা যায়। আশ্চর্য, যে আমাদের এই জগতে, যেখানে ভালোবাসা এত দুর্লভ, এত কষ্ট-সাধ্য, এত রকম জটিলতার কাঁটায় ঘেরা, সেখানে হিংসা এমন অসাধারণ সরল, আর এত সহজ সেই হিংসার চরিতার্থতা। আমার যে-চোখ পিস্তল দেখে ধাঁধিয়ে গিয়েছে, সেই চোখ আমি বুলবুলের দিকে ফেরালাম; আধো অন্ধকারে তার চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। সে-মুহূর্তে আমি অন্যরকম দেখলাম তাকে, আরো লম্বা, তার মুখে এক অদ্ভুত, দুর্বার আকর্ষণ, মাটিতে পা রেখে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি এমন যেন তারই হাতে কর্তৃত্ব, দণ্ডনীতি, বিচারের বিধান।

'তুমি কাঁপছো রণজিৎ, ওটা আমাকে দিয়ে দাও।' আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে, খুব কাছে দাঁড়িয়ে নিশ্বাসের স্বরে বললাম, সত্যি?...সত্যি পারবে তুমি?' 'তোমাকে কাল আসতে বলছি তো সেইজন্যেই। দেখবে।' নিজের অজান্তেই তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে জিগেস করলাম, 'আর-কেউ নেই?' 'তাদের ধ'রে নিয়ে গেছে রণজিৎ, কেউ-কেউ ফেরার। তাছাড়া—আমি চাই এটা—এটা আমারই কাজ—আমাকেই করতে হবে। এতেই সার্থকতা আমার জীবনের। আমি কারো স্ত্রী হবো না কোনোদিন, কারো মা হবো না, অন্য কিছুও হবে না আমাকে দিয়ে—আমার সাধ স্বপ্ন আশা ধ্যান যা-ই বলো তা শুধু এই—একটি ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলা : "এই নাও তোমার ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছি!" মুখের কথায় নয়, তার বুকটাকে ফুটো ক'রে দিয়ে।' 'যদি না পারো? ফসকে যায়?' 'তবু—চেষ্টা তো করা যাক। তা-ই বা কম কী? তবু তো জানানো হবে কী চেয়েছিলাম।' 'আর যদি—যদি—' 'আন্দামান? ফাঁসি? ও-সব তো বাঁধা গৎ। কী বা মূল্য আমার জীবনের যার জন্যে তা পুষে-পুষে রাখতেই হবে।' ঠোঁটের কোণে হাসলো বুলবুল, আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। তার কথাগুলো যেন আশ্চর্য মধুর কোনো মর্ফিয়া, আমি অবশ হ'য়ে যাচ্ছি, আমার যেন কিছুই বলার নেই এর উত্তরে;—বুদ্ধির, নীতির বিবেকের যা-কিছু অতি স্পষ্ট পরামর্শ, সব মনে হ'লো অর্থহীন, অবান্তর; রোদ ওঠার পরে লণ্ঠনের মতো আমার সব বুদ্ধি এখন ফ্যাকাশে। আস্তে আমার হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে নিলো বুলবুল, ব্লাউজের মধ্যে ফিরিয়ে রেখে আঁটো ক'রে

আঁচল গ'ুজে দিলো। 'আমার যা বলার ছিলো বললাম। এবার তোমার ছুট।' কেন তোমাকে বললাম জানি না—কিন্তু ইচ্ছে করলো, ভীষণ ইচ্ছে করলো।—রণজিৎ, চলি তাহলে?' আমবাগান থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'তুমি আর এসো না আমার সঙ্গে। আমি চলি।' একটু সময় তাকিয়ে রইলো আমার দিকে; আমার মনে হ'লো তার দৃষ্টি আমার রক্ত-মজ্জা শুষে নিচ্ছে। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো, আমি তাকে বড়ো রাস্তার মোড়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

কিন্তু সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র যেন মূর্ছা থেকে জেগে উঠলাম আমি। এ আমি কী করলাম, তাকে চ'লে যেতে দিলাম? পারতাম না কি আমি তাকে ফেরাতে, এখনো কি পারি না? আমার বুক ফেটে একটা নিঃশব্দ চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো, কুলকুল ক'রে ঘাম নামলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। না—এ আমি ঘটতে দেবো না, এ অসম্ভব! আমি বাড়ি এসে সাইকেল নিলাম, পুরো দমে চালিয়ে প্রথমে গেলাম কায়েৎটুলিতে বুলবুলের বাড়িতে—না, সে ফেরেনি। তারপর রাজার দেউড়িতে বিভাবতীর বাড়িতে। বিভাবতী কলকাতায় গেছেন, বুলবুল সারাদিনের মধ্যে সেখানে আসেনি। সে কি কোনো গোপন জায়গায় কাটাবে আজ রাত্রিটা, কালকেও সন্ধে পর্যন্ত সারাদিন—আমি কি আর তাকে খুঁজে পাবো না? তাহলে আমি কী করি এখন? থানায় খবর দিয়ে আসবো?—ছি! জোন্সের কাছে যাবো?—তাও অসম্ভব! আমাকে বাঁচাতে হবে—শুধু জোন্সকে নয়, বুলবুলকেও। কী তার উপায় তা কে আমাকে ব'লে দেবে? মুহূর্তে আমার সব-কিছু কী-রকম ওলোটপালট ক'রে নিয়ে গেলো বুলবুল! অন্ধের মতো সাইকেল চালাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি জানি না; হঠাৎ একটা মোড় নিতে গিয়ে, আমার চোখে পড়লো আকাশে একটি সোনালি ডিমের মতো চাঁদ। সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বক ক'রে উঠলো আমার বুকের মধ্যে, যাকে এতক্ষণ একেবারে ভুলে ছিলাম, সেই মিতুকে মনে পড়লো।

রাত বেশ এগিয়ে গেছে তখন, লার্মিনি স্ট্রীট নির্জন। পাৎলা কুয়াশায় মেশা জোছনা ছড়িয়ে আছে চারদিকে, ঠান্ডা চাঁদ, ম্লান আকাশ, গাছগুলি চাঁদের আলোয় ঝাপসা—সব শান্ত ও সুন্দর, বিষাদে আর স্তব্ধতায় ভরা। এ-রকম জোছনা দেখলে নিজের মধ্যে খুব গভীরভাবে ডুবে যেতে ইচ্ছে করে আমার, কিন্তু আজ যেন আমাকে নিজের মধ্য থেকে বের ক'রে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি যেন আমার নিজেরই কাছে অনুপস্থিত। চাঁদের আলোয় কোনো সান্ত্বনা পেলাম না আমি; আমার বরং অবাক লাগলো যে আজ রাত্রে, যখন মানুষের জগতে একটি ভীষণ ঘটনা তৈরি হচ্ছে, তখনও চাঁদ আর কুয়াশা এমন নির্বিকার, এমন গতানুগতিক-ভাবে সুন্দর। আমি ব্যাকুলভাবে ছুটে গেলাম না বকুল-ভিলার দিকে, বরং সাইকেলের বেগ কমিয়ে দিলাম, যেন মিতুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর নিটোল নেই, তার কাছে যাবার আমি যোগ্য কিনা সে-বিষয়ে আমি নিজেই সন্দিহান। দু-দিকে বাড়ি, ঘরে-ঘরে নিশ্চিন্ত লোকজন, কেউ কিছু জানে না—কিন্তু আমি—আমাকেই জানতে হ'লো কেন, কেন এই ভীষণ ভার আমারই উপর নেমে এলো, কেন এই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় আমাকে ফেলে গেলো বুলবুল? সত্যি কি আমার সুখী হবার অধিকার আছে, যখন আমারই জীবনের প্রান্ত ঘিরে-ঘিরে জ'মে উঠতে পারে এত বড়ো বিরাট বিষাক্ত বেদনা, ফেটে যেতে পারে অমানুষিক বিস্ফোরণে? প্রাণ—দু-জন মানুষের প্রাণ, আর এমন দু-জন, যারা আমার কাছে অতি বাস্তব, জাজ্বল্যমান—সেই প্রাণ আজ বিপন্ন এ আমি কেমন ক'রে ভুলে থাকবো? হত্যা—ভয়াবহ শব্দ, অকথ্য, অনুচ্চারণীয়! আর তাতে উদ্যত হয়েছে—অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য—কোনো গুন্ডা নয়, ডাকাত নয়, লোভে বা আক্রোশে পাগল-হ'য়ে-যাওয়া কোনো মানুষও নয়, একটি মেয়ে, তরুণী, মিতুর বন্ধু, নিঃস্বার্থ কর্মিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বুলবুল। অথচ এমনও নয় যে তাকে দোষী ব'লে সাব্যস্ত ক'রে নিজের দায়িত্ব এড়ানো যায়,—সে তো তার নিজের জীবনও বিকিয়ে দিচ্ছে; চরম পাপ, চরম ত্যাগ—এই দুটোকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে সে সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনো কথাই নেই এখানে;—আমি কষ্ট পাচ্ছি, বুলবুলের জন্য, জোন্সের জন্য সমান কষ্ট—আমি যদি তাদের বাঁচাতে না পারি তাহলে কোন মুখে আবার দাঁড়াবো মিতুর কাছে, ভালোবাসবো, বিয়ে করবো?

বকুল-ভিলায় বসার ঘরে ঢুকেই মা-মেয়েকে দেখলাম। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে দু-জনে, মুখ থমথমে। আমাকে দেখামাত্র মিতুর মা ব'লে উঠলেন, 'একটা সাংঘাতিক কান্ড হয়েছে, রণজিৎ। ও'র পিস্তলটি চুরি গেছে।' আমার গলা দিয়ে যেন বমি উঠে এলো কথাটা শুনে, ঝাপসা গলায় বললাম, 'কী বললেন?' 'ও'র শিকারের বন্দুক-টন্দুক অনেক আগেই বেচে দিয়েছিলেন, শুধু একটি পিস্তল হাতছাড়া করেননি—ও'র বাবার খুব শখের জিনিশ ছিলো ওটা, তাঁরই স্মৃতি হিশেবে রেখেছিলেন। আমি কতবার বলেছি দিনকাল ভালো না, ও-সব আপদ বিদেয় করো, অন্তত ট্রেজারিতে জমা দিয়ে দাও, কিন্তু—' মিতুর মা-র গলা ধ'রে এলো, কথা শেষ হলো না। আমি জিগেস করলাম, 'সত্যি চুরি হ'য়ে গেছে? কোথাও নেই বাড়িতে?' 'কোথাও নেই। থাকতো ও'র শিয়রে লোহার সিন্দুকে, চাবি নিজের কাছে রাখতেন, কিন্তু উনি তো একটু ভুলো মানুষ, কখনো হয়তো অসাবধানে রেখেছিলেন—কী ক'রে হ'লো কে জানে।' 'আজই ধরা পড়লো?' 'আজই। এই খানিক আগে। উনি গেছেন থানায় রিপোর্ট করতে—ও'কে নিয়েই না পুলিশে টানাটানি করে এখন।' 'মিতু, এক গ্লাশ জল দেবে?' ব'লে আমি তার পিছন-পিছন উঠে এলাম। ঢকঢক ক'রে জলের গ্লাশ খালি ক'রে বললাম, 'এসো এই সিঁড়িতে একটু বসি।' সেই বারান্দা—যেখানে আমার জীবনে নারী-সত্তার প্রথম উপলব্ধি। সেই বাগান, যার গাছপালার ফাঁক দিয়ে মিতুর মুখে সূর্যাস্তের আলো এসে পড়েছিলো। চাঁদের আলোয় এখন কালো দেখাচ্ছে গাছগুলোকে, কুয়াশায় কোমল হ'য়ে আছে রাত্রি। আর মিতু, আমার ভাবী স্ত্রী, যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, যে আমার পাশে ব'সে আছে—তাকে মনে হচ্ছে দূরের কোনো মানুষ, যেহেতু তাকে বলতে পারছি না যা আমি জানি, বলতে পারছি না তার বাবার পিস্তল যে চুরি করেছে সে আর-কেউ নয়, তারই বন্ধু বুলবুল। সুখ, তুমি কি কখনো ফিরে আসবে আবার? সে কোন সোনালি দেশ, স্বপ্নের দেশ, যেখানে ভালো-বাসা সহজ? মিতু বললো, 'আমার ভয় করছে, রঞ্জু। বাবাকে কিছু করবে না তো ওরা?' চেষ্টা ক'রে বললাম, 'কী আশ্চর্য! যাঁর জিনিশ চুরি গেছে, তাঁকে কিছু করবে কেন? শোনো—বুলবুল এসেছিলো নাকি আজ?' 'আমাদের এখানে? না তো। অনেকদিন দেখা নেই বুলবুলের।' 'অনেকদিন? ক-দিন।' 'তা আট-দশ দিন হবে। মাঝে একদিন এসেছিলো, আমরা কেউ বাড়ি ছিলাম না।' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'ও।' 'কী বললে? তুমি কী ভাবছো বলো তো।' 'না, কিছু না। মিতু—' 'কী?' আমার মনের মধ্যে একটি সংকল্প গড়ে উঠছিলো ধীরে-ধীরে, প্রথমে ঐ জোছনা-মাখা কুয়াশার মতো ঝাপসা, তারপর—যেমন কোনো নাম-হীন অস্বস্তি থেকে হঠাৎ একটি ছন্দে-বাঁধা সুন্দর পঙক্তি লাফিয়ে ওঠে কবির মনে, আর তখন তিনি জানতে পারেন যে একটি কবিতাকে তিনি 'পেয়ে গেছেন'—তেমনি আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাকে এখন কী করতে হবে। আমি তাকালাম মিতুর দিকে, আমার বুকের মধ্যে চীৎকার উঠলো, 'মিতু, এসো আমরা অনেক দূরে কোথাও চ'লে যাই, এখানে বুলবুল আমাদের বাঁচতে দেবে না।' কিন্তু না—কিছু বলার উপায় নেই—একটি ছাড়া সব রাস্তা বন্ধ—আমি বোধহয় দম আটকে ম'রে যাবো। মিতু বললো, 'তুমি যেন কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে?' 'না—অমনি ডাকলাম তোমাকে, ডাকতে ভালো লাগলো। মিতু! কী সুন্দর নাম, কী সুন্দর তুমি!' বাইরে গাড়ির শব্দ হ'লো, আমরা বসার ঘরে এলাম। অনাদিবাবু ঘরে ঢোকা-মাত্র মা-মেয়ে একসঙ্গে ব'লে উঠলো, 'কী হ'লো?' 'কী আবার হবে। থানায় ডায়েরি ক'রে এলাম।' 'তারপর? কোনো হাঙ্গামা হবে না তো এ নিয়ে?' 'কী আবার হবে? কে না চেনে আমাকে ঢাকায়? বন্দুকের

লাইসেন্স আমাকে আর দেবে না অবশ্য—তা ভালোই, ও-সব পাপ আর পুষতে চাই না আমি। ছিলো একটা পুরোনো জিনিশ—গেলো।' মিতুর মা খুঁটে-খুঁটে জিগেস করলেন পুলিশের লোকের সঙ্গে কী কথা-বার্তা হ'লো তাঁর, কিন্তু অনাদিবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'থাক এ-সব কথা। এই যে রঞ্জু, কতক্ষণ? তোমরা অত গম্ভীর হ'য়ে আছো কেন সবাই? এবারে একদিন লোকজন ডাকতে হয় বাড়িতে, এখনই কাউকে কিছু বলা হবে না অবশ্য—' একবার মেয়ের দিকে, একবার আমার দিকে চোখ ফেললেন তিনি—'তবে উৎসব এখন থেকেই শুরু হ'তে পারে। জানিস মিতু, কানাই বসাকের চোদ্দ বছরের ছেলেটির নাকি আশ্চর্য তবলার হাত, তোর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য তাকে ডাকবো একদিন।' মা-মেয়ের মন হালকা ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন অনাদিবাবু, কিন্তু থেকে-থেকে একটি লুকোনো মেঘ ভেসে যেতে লাগলো তাঁর মুখের উপর দিয়ে। আমি তাঁর লুকোনো উৎকণ্ঠা টের পেলাম; তিনি—গান্ধীভক্ত, তাঁরই পিস্তল দিয়ে কোনো হত্যাকান্ড সাধিত হ'তে পারে, এই আশঙ্কা তিনি কাটাতে পারছেন না। ঢাকায়, আজকের দিনে, পিস্তল চুরি হওয়ার আর তো কোনো অর্থ নেই। আমার দুরন্ত লোভ হ'লো তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে একটা কথা বলি—কিন্তু না, তিনি অন্তত শান্তিতে ঘুমোন আজ রাত্রিতে, সব জ্বালা আমার, সব কষ্ট আমার হোক। তিনি আমাকে খেয়ে যেতে বললেন, আমি রাজি হলাম—শুধু মিতুর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থাকার জন্য। কিছু খাওয়ার অভিনয় করতে হ'লো আমাকে, কথাও বলতে হ'লো। যখন চ'লে আসি, মিতু আমাকে কম্পাউন্ড পেরিয়ে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। একটু দাঁড়ালাম বেরিয়ে আসার আগে। মিতু বললো, 'কাল এসো কিন্তু।' আমি মনে-মনে বললাম, 'মিতু, আর যদি কখনো দেখা না হয় আমাকে ক্ষমা কোরো।'

বাড়ি এলাম, রাত বাড়লো, ঘরে-ঘরে ঘুমিয়ে পড়লো সবাই। কিন্তু ঘুম আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, ক্লান্তি আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে। আমি শুধু ভাবছি কালকের সন্ধের কথা—যখন আমি কার্জন হল-এ যাবো, চোখে-চোখে রাখবো বুলবুলকে, ঠিক মুহূর্তটিতে বাধা দেবো তাকে। সহজ—এর চেয়ে সহজ আর কী? ফলাফল? যা হয় হোক, আমাকে এটা করতেই হবে। অদৃষ্টের কোনো কান্ডজ্ঞান নেই, নয়তো এই ভার আমারই উপর পড়বে কেন, যে-আমি এর সবচেয়ে অযোগ্য? বার-বার দৃশ্যটিকে সাজাচ্ছি মনে-মনে—এই শুই, এই উঠে বসি, এই পাইচারি করি মেঝেতে; অন্য যা-কিছু ভাবার চেষ্টা করি তাসের বাড়ির মতো ধ্বসে যায় সব। মনে পড়ে আর্থার জোন্সকে—তার সুশ্রী চেহারা, লাজুক ভঙ্গি, অতি নম্র কথা বলার ধরন। মনে পড়ে ছোট্ট রোগা বুলবুলকে, কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে তার মিলিয়ে যাওয়া। সত্যি কি আমি পারবো এ-কাজ? নিশ্চয়ই—পারতেই হবে। তারপর? যদি কোনো বোঝার ভুল হয়, যদি আমাকেও দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়, যদি আইনের প্যাঁচে প্রমাণ হ'য়ে যায় আমিও অপরাধী? যদি এমন হয় যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটে গিয়ে ঠিক জোন্সকেই বিঁধলো? আমি তখন কী ক'রে প্রমাণ করবো যে আমিই খুনে নই? জেল? আন্দামান? ফাঁসি? না—না—আমি পারবো না, আমি পারবো না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, বুলবুল—আমি মিতুকে চাই, আমি মিতুকে ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি কবিতা, ভালোবাসি আকাশ—মেঘ—বইয়ের গন্ধ। আমি বাঁচতে চাই—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, বুলবুল। আমি টেবিলে লন্ঠনটা জেবলে রেখেছিলাম, উশকে দিয়ে একটা বই খুলে বসলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও একটি কথারও মানে বুঝতে পারলাম না। এখনো কি আছে সেই জগৎ, যেখানে লোকেরা কবিতা পড়ে, গান শোনে, কবিতা লেখে, গান গায়? যদি পিস্তলের গুলি আমাকেই ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক এখানটায়, আমার হৃৎপিন্ড ফেটে যাচ্ছে যেখানে? আমি কি ম'রে যাবো? এ-ই কি শেষ রাত্রি আমার জীবনের? আমি ঠেলে দিলাম বইটাকে, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম, হঠাৎ মনে হলো এখনো অনেক সময় আছে, এখনো অনেকগুলো, অনেকগুলো ঘন্টা আমি বেঁচে আছি। আমার কি দু-একটা চিঠি লিখে রাখা উচিত—একটা মিতুর, আর-একটা আমার মা-বাবার জন্য? পরে যদি আর সময় না হয়? শোনো—আমি সব বুঝিয়ে বলছি—আমার উপায় ছিলো না, আর-কোনো উপায় ছিল না। না—আমি বোধহয় বড্ড বাড়িয়ে তুলছি ব্যাপারটাকে; ইচ্ছে করলে—শুধু ইচ্ছে করলেই আমি তো বেরিয়ে আসতে পারি এই আগুনের বেড়া থেকে। কাল বাড়ি ব'সে কাটিয়ে দেবো সারাদিন? চ'লে যাবো সকালের প্রথম লঞ্চে পিসিমার কাছে মুন্সীগঞ্জে? বুদ্বুদ—বুদ্বুদের মতো ভাবনা এ-সব, ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়; জেলখানার কয়েদি যেমন স্বপ্নে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়, এও তেমনি; আমি বাধ্য, কে আমাকে বাধ্য করেছে জানি না; আমি আর স্বাধীন নেই, আমার ইচ্ছেগুলো পাথরের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। যতবার যেদিক থেকেই ভাবি, সেই একই জায়গায় পৌঁছে যাই শেষ পর্যন্ত—কার্জন হল, বুলবুল, আর্থার জোন্স। না—পারি না, আর ভাববো না আমি, আর ভাবতে পারি না—ভগবান, আমাকে দয়া করো!

একট খশখশে শব্দ হ'লো আমার পিছনে, চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি—দরজার কাছে কাজল। কাজল এগিয়ে এসে বললো, 'কী হয়েছে রঞ্জু, তুমি এখনো ঘুমোওনি?' 'এই শুতে যাচ্ছিলাম, তুমি উঠে এলে কেন?' 'হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো, তুমি কি পাইচারি করছিলে একটু আগে? এক্ষুনি একটা গোঙানির মতো শুনলাম যেন।' আমি জবাব না-দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; কাজল বললো, 'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! অসুখ করেনি তো? দেখি—' আমার কপালে, গালে হাত রেখে তাপ অনুভব করলো সে। 'না—জ্বর ব'লে তো মনে হচ্ছে না—কিন্তু কিছু-একটা হয়েছে আমি বুঝতে পারছি, কী ভাবছো—কী ভাবছিলে—এত রাত অবধি জেগে ব'সে আছো কেন?' আমি তাকালাম কাজলের দিকে—ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে আমার সামনে, ফুলে-ওঠা আঁচলে গা ঢেকে, তার মুখে আমার জন্য উৎকন্ঠা, মমতা; যা-কিছু আমি হারাতে বসেছি—আমার অভ্যস্ত জীবন, জীবনের স্বাদ—তারই একটি নিশেনের মতো তাকে আমার মনে হ'লো, যেন ডুবন্ত নৌকো থেকে দেখা কোনো আলোকস্তম্ভ বা যেন আমি যখন অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি, কেউ নৌকো থেকে রশি বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। একটা পাগল ইচ্ছার ঢেউ উঠলো আমার মনে, পাথর ফেটে বেরিয়ে এলো স্রোত : বলবো তাকে আমি সব বলবো, আমার কষ্টের একজন সাক্ষী রাখবো অন্তত, অন্তত একজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবো এই মর্মান্তিক রাত্রিটিকে। নির্বোধ অসহায় শিশুর মতো আমি হ'য়ে গেলাম সেই মুহূর্তে, বিহ্বল কোনো মাতালের মতো; আমি দুই হাতে কাজলকে জাপটে ধ'রে তার কাঁধের উপর মাথা রাখলাম, কেঁপে উঠলাম সারা শরীরে থরথর ক'রে কথা বলতে গিয়ে আটকে গেলো গলা, তারপর আমার চোখ ফেটে বুক ফেটে গলা ছিঁড়ে কান্না নেমে এলো। আরাম—আমি বেঁচে গিয়েছি—আশ্রয় পেয়েছি এতক্ষণে। কাজলের আঙুলগুলি আমার চুলের মধ্যে, আমার কানের কাছে ফাড়িঙের পাখার মতো তার গলার আওয়াজ—'কী? কী? কী হয়েছে রঞ্জু? কী হয়েছে?' আমার কান্নার বেগ ক'মে এলো, আমি মুখ তুললাম, সে হাত দিয়ে আমার চোখের জল মুছে দিলো। 'বলো। আমাকে বলবে না?' কিন্তু ততক্ষণে অন্য এক পিস্তলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে আমার রক্তে, আমি কাজলকে আর দেখতে পাচ্ছি না, তাকে শুধু অনুভব করছি, আমার গালের উপরে তার নিশ্বাস, আমার শূন্যতা ভ'রে তার শরীর। যদি তা-ই হয়, যদি কালকের পরে হারিয়ে যায় আমার চেনা পৃথিবী, তাহ'লে কি আমি কখনো জানবো না নারীর স্বাদ—নারীর প্রেম—ঐ আমার গভীরতম এক বাসনাকে অপূর্ণ রেখেই কি বিদায় নিতে হবে? আমার এতদিনের রুদ্ধ রিরংসা অদম্য হ'য়ে উঠলো, আমি কাজলকে নিয়ে এলিয়ে পড়লাম বিছানায়। 'রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু—' দুর্বলভাবে সে বাধা দিলো আমাকে, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ঝড়ের মতো তার নিশ্বাস, হাতুড়ির মতো বুকের শব্দ, আমার মুখের মধ্যে আগুনের শিখার মতো তার জিভ, আমার ঠোঁটের উপর তার দাঁত ব'সে গেলো, আমি তার বুকের মধ্যে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাচ্ছি। কিছু নেই—জগৎ নেই, দায়িত্ব নেই, যন্ত্রণা নেই—সে আর আমি শুধু—না, আমরাও নেই আর : এরই নাম মুক্তি, নির্বাণ, মৃত্যু।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

থাইল্যাণ্ডের রাজা ও রাণী সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এই সময়ে তাঁদের প্রেসিডেন্ট জনসন এবং মিসেস জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

লাল পুঁথির অভিযান

নকসালবাড়ীর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে চীনের "সামনের পায়ের থাবা" নাকি ইতিমধ্যেই ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছে (চীনা বেতারের মতে), যে-থাবা, আমরা অনুমান করি, ইতিপূর্বে ইন্দোনেশিয়াও তার ছাপ ফেলেছিল। এবং তার পরের ইতিহাস কারুরই বিস্মৃত হওয়ার নয়—যাতে বহু চীনা প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ চীনা, যারা ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে সুখে দিন গুজরান করছিল, ভিটা থেকে উৎসন্ন হয়ে স্বদেশযাত্রায় বাধ্য হয়েছে এবং যারা এখনো রয়ে গেছে তারা এমনকি নিজেদের নাম পর্যন্ত বদলে চৈনিক অস্তিত্ব লোপের চেষ্টা করছে।

অন্য জাতি হলে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা থেকেই যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতো। কিন্তু যারা মাও-এর ছবি ও লাল পুঁথি এই দুই মহাস্ত্র নিয়ে বিশ্বজয়ে নেমেছে তাদের পক্ষে পশ্চাদপসরণ এতো সহজ ব্যাপার নয়। বরং ইন্দোনেশিয়ার ঘটনার মধ্যে চীন নতুন উদ্যমেরই সন্ধান পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অসদাচরণ ও পররাষ্ট্রব্যাপারে হস্তক্ষেপের মধ্যেই জাতীয় বিকাশের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করেছে। পরপর ভারত, ব্রহ্ম ও কেনিয়ায় চীনা কূটনীতির বিপর্যয় এই বিকৃত চিন্তারই অপরিহার্য পরিণতি। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, বন্ধুস্থানীয় রাষ্ট্র নেপালেও চীনের হঠকারিতা এক নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। বলা দরকার করে না, ব্রহ্মের মতো এখানেও সেই মাও-এর ছবিই বিভ্রাটের কারণ জুগিয়েছে। নেপালী পত্রিকার বিবরণে প্রকাশ, রাজা মহেন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে কাঠমাণ্ডুতে যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় তাতে চীনারা একটা প্যাভিলিয়ন খুলেছিল। এই প্যাভিলিয়ন মারফৎ চীনারা নেপালে যে প্রচারকার্য চালাচ্ছিল দর্শকরা তা খুব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। অতঃপর নেপালী ছাত্র ও যুবকরা দাবী করে যে, প্যাভিলিয়নে মাও-এর মতো রাজা মহেন্দ্রের ছবিও রাখতে হবে। প্যাভিলিয়নের চীনা কর্তাব্যক্তিরা নাকি যে ভাষায় এই দাবীর উত্তর দেয় তা কোনক্রমেই ভদ্রজনসম্মত নয়। এই ঘটনার পরিণতিতে এক রীতিমতো যুদ্ধদৃশ্যের অবতারণা হয়। নেপালী ছাত্র ও যুবকরা দলে দলে জমায়েত হয়ে চীনা-বিরোধী ধ্বনি করতে থাকে এবং গুরুতর শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত নেপাল কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

নেপালের গোলযোগের এখানেই সমাপ্তি কিনা জানি না, কিন্তু ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছে। সেখানে বিভিন্ন শহরে চলছে চীনা-বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ, পিকিং-এ বর্মী-বিরোধী বিক্ষোভের পাল্টা জবাবে। চীন সরকারের অভিযোগ ব্রহ্মে শতাধিক চীনাকে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেক মৃতদেহ গায়েব করা হয়েছে। রেঙ্গুনে হাঙ্গামার সময় চীনা দূতাবাসের যেসব লোক জখম হয় সম্প্রতি তাদের দেখবার জন্য রেঙ্গুনের চীনা ভারপ্রাপ্ত দূত সদলবলে হাসপাতালে যান। ভারতে উইলিংডন হাসপাতালের ঘটনার মতো এখানেও চীনা দূত ক্যামেরা বগলে করে হাসপাতালে ঢোকবার চেষ্টা করেন। ফলে ভারতের মতো রেঙ্গুনের হাসপাতালেও তাঁদের হতমান হতে হয় এবং হাসপাতালের নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য করা হয়।

স্বাজাত্যগর্ব যে চীনের একচেটিয়া নয়, অন্য দেশেরও থাকতে পারে এবং আছে, এই সম্পর্কে ভ্রান্তিই চীনকে ক্রমাগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন করছে। এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ যে অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার ও তার ফল ভোগ যে হস্তক্ষেপ-কারীরও করতে হতে পারে, ইন্দোনেশিয়ার দৃষ্টান্ত সামনে রেখেও চীনের এখন পর্যন্ত এই শিক্ষা হয় নি। ফলে পিকিং বেতার মারফৎ নে-উইন সরকার উচ্ছেদের জন্য বর্মী কম্যুনিস্ট পার্টির হাঁক সাড়ম্বরে প্রচার করা হয়েছে। এর পরিণতিতে ব্রহ্মেও ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি হবে কিনা তা অবশ্য এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চীন যে পিছপাও হবে না এ-প্রায় হলফ করে বলা সম্ভব। চীনের অ্যাডভেঞ্চার-ইজমের জন্য ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টরা যদিও প্রায় নিঃশেষ হয়েছে এবং প্রবাসী চীনারা জীবন ও জীবিকার গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তবু মাওয়ের চিন্তা যাদের মনের গভীরে কাজ করছে তারা পশ্চাদপসরণ জানে না। তার কারণ, যদিও রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে তারা হতমান, আফ্রিকায় একমাত্র গিনি ছাড়া অন্য প্রায় সর্বত্র তাদের গৌরব ভূলুণ্ঠিত, এশিয়ার

প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্রেও তারা লাঞ্ছিত, তবুও মাও-এর ভাবধারা নকসালবাড়ীর বিদ্রোহীদের মনের গভীরে যে বিপুল প্রেরণার উৎস রূপে কাজ করছে, পিকিং বেতারের সবিস্তার বিবরণের পর সে কথা কে অবিশ্বাস করবে? ডাঙেগ মাওকে যতোই 'জরাগ্রস্ত বুড়ো' বলে গাল দিন, তাঁর 'লাল-পুঁথি'কে ভ্রান্ত দর্শন বলে আখ্যা দিন তবু নয়াচীন সংবাদ এজেন্সীর ঘোষণা অনুযায়ী, মাও-এর চিন্তাই এখন দুনিয়ার বাজারে সবচেয়ে বেশী বিকোচ্ছে। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬৭ সালের মে মাস পর্যন্ত চীনা প্রকাশকরা পৃথিবীর ১১৭টা দেশে এই 'লাল পুঁথি'র আট লক্ষাধিক কপি চালান দিয়েছে। এবং এই 'লাল পুঁথি'—যা আমরা পিকিং লালরক্ষীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বহু জমায়েতে এবং বিদেশী দূতাবাসের সামনে বহু বিক্ষোভে চীনা ছাত্র ও তরুণদের হাতে আন্দোলিত হওয়ার চিত্র দেখেছি, সেই পুঁথি সমগ্র বিশ্বে যে গভীর আলোড়ন জাগিয়েছে তা একমাত্র মাওয়ের ভাবধারাপুষ্ট নয়াচীন সংবাদ এজেন্সীর অগ্নিগর্ভ ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব। এজেন্সী বলছে, মাও-এর এই চিন্তা 'চতুঃসমুদ্রে ডেকে এনেছে বান, ফুলে-ফেঁপে উঠছে মেঘ আর জল, কম্পমান পঞ্চমহাদেশ, বাতাস আর বজ্র উঠছে গর্জে'।'

সংবাদপত্রের নীরস পৃষ্ঠায় হাসির খোরাক সহজে মেলে না; তবু নয়াচীন সংবাদ এজেন্সির মতো দু-একটা প্রতিষ্ঠান থাকলে রুক্ষ সংবাদের মরুভূমির মাঝে একটু হাসির খোরাক পেয়ে পাঠকরা নিজে-দের হাল্কা করে নেওয়ার অবকাশ পাবেন।

রাষ্ট্রসংঘে আরব-ইসরায়েল

আরব-ইস্রায়েলের যে যুদ্ধ সিনাই, জর্ডান ও সিরিয়ার রণক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রসংঘে স্থানান্তরিত হয়েছিল তাতে এখন এক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। একে প্রকৃতপক্ষে ইস্রায়েলেরই আপাতঃ জয় বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে আফ্রিকা-এশিয়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব হাজির ছিল তাতে এইরকম দাবী করা হয়েছিল যে, ইস্রায়েলকে অবিলম্বে বিনাসর্তে নতুন অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে যুদ্ধপূর্ব সীমানায় চলে যেতে হবে। যুগোশ্লাভিয়া এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার ষোলটি দেশ যুক্তভাবে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিল। অপরপক্ষে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিব সাগর অঞ্চলের একুশটি রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে ইস্রায়েলকে তার সৈন্য মিশর, জর্ডান ও সিরিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং আরবদেরও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মারমুখী জঙ্গী নীতির অবসান ঘটাতে হবে। এই দুটি মূল প্রস্তাব ছাড়া, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাতে ইস্রায়েলী আক্রমণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করে আরব-ভূমি থেকে অবিলম্বে ইহুদী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবী করা হয়েছিল। সোভিয়েট প্রস্তাবের কথা ছেড়ে দিলেও মূল প্রস্তাব দুটির কোনটিরই প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট অর্জনের সম্ভাবনা নেই দেখে ৪ঠা জুলাই ভোট নেওয়া স্থগিত রাখা হয় এবং প্রস্তাবক পক্ষদ্বয়কে পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা আপোষের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপোষের সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় পরদিন ভোট নেওয়া
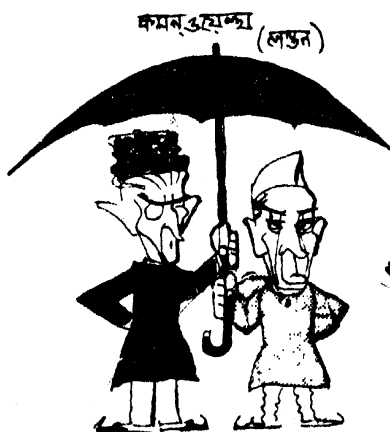
হয়। আফ্রিকা-এশিয়া গোষ্ঠীর প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপিত হলে তার স্বপক্ষে ৫৩ ও বিরুদ্ধে ৪৬ ভোট পড়ে। ২০টি রাষ্ট্র উপস্থিত থেকেও ভোটদানে বিরত থাকে এবং হাইতে ও মালদ্বীপ অধিবেশনে গরহাজির থাকে। আফ্রিকা-এশিয়া গোষ্ঠীর প্রস্তাবটি কার্যত বাতিল হলে ল্যাটিন আমেরিকান প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৫৭ ভোট এবং বিরুদ্ধে ৪৩ ভোট। ২০টি রাষ্ট্র হাজির থেকেও ভোট দেয় না।

এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠীর প্রস্তাবে ভোটের সময় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স ভোট দেয় প্রস্তাবের পক্ষে, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভোট পড়ে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

সোভিয়েট যে প্রস্তাবটি এনেছিল তাতে ইস্রায়েলী সৈন্যাপসরণের সঙ্গে ক্ষতিপূরণেরও দাবী করা হয়েছিল। যে প্যারাগ্রাফে সৈন্যাপসরণের দাবী ছিল সেটি ৪৫-৪৮ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অন্যান্য প্যারাগ্রাফে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট আরো কম পড়ে।

এরপর, আলবানিয়া ইস্রায়েলী সৈন্যাপসরণের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জন্য বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে এবং আরবদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে যে প্রস্তাব এনেছিল সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়। আলবানিয়ার এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ২২টি, বিপক্ষে ৭১টি। ২৭টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

এইদিনকার ভোটে যে প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট অর্জনে সমর্থ হয় সেটি জেরুজালেম সম্পর্কে। জেরুজালেমের জর্ডান-অধিকৃত অংশ দখলের পর ইস্রায়েলী শাসন প্রবর্তন করে ইস্রায়েলের পার্লামেন্টে যে বিল পাশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, জর্ডান-অধিকৃত জেরুজালেম সম্পর্কে ইস্রায়েল যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি পরিস্থিতির ওপর লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে এর কার্যকর হওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন।

প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৯৯টি ভোট, ২০টি রাষ্ট্র উপস্থিত থেকেও ভোট দেয়নি, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও ছিলো। বিপক্ষে কেউ ভোট দেয়নি।

প্রস্তাবগুলোর এই হাল হওয়ার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়েছে। এই অবকাশে বিভিন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে নিজেদের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আপোষ-আলোচনার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।

পূর্বেই বলেছি, রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই মতবিরোধ ও প্রস্তাব নিয়ে অচলাবস্থার ফলে ইস্রায়েলই আপাততঃ লাভবান হচ্ছে। কারণ অধিকৃত এলাকাগুলো নিজের দখলে রেখে আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ দেওয়ার সে পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। ল্যাটিন প্রস্তাবে আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যে মারমুখী জঙ্গী মনোভাবের অভিযোগ করা হয়েছে তার জন্য দায়িত্ব শুধু আরবদের নয়, ইস্রায়েলও সমানভাবেই দায়ী এবং যে সব পশ্চিমী রাষ্ট্র ইস্রায়েলের পিছনে থেকে তাকে সাহস ও শক্তি যোগাচ্ছে তাঁদের দায়িত্বও অস্বীকার করা যাবে না। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা হ্রাস করতে হলে আরবদেরও যেমন ইস্রায়েলের অস্তিত্বকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করে নিতে হবে তেমনি ইস্রায়েলেরও প্রতিবেশীর প্রতি জঙ্গী মনোভাব নিয়ে কেবল পশ্চিমে মিত্রের সন্ধান করলে চলবে না। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যদি সত্যিই সরে দাঁড়ায় তাহলেই কেবলমাত্র পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির উপযোগী আবহাওয়া গড়ে উঠতে পারে।

ঘাটতি ব্যয় ও রাজ্য বাজেট

মোরারজী দেশাই অর্থমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, রাজ্যগুলোর বেহিসেবী খরচের পর রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফট নেওয়াও তিনি বন্ধ করবেন। ঘাটতি ব্যয়ের জন্য বাজারে ফালতু নোটের বোঝা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য যোজনা কমিশনও গোড়া থেকেই রাজ্য পরিকল্পনাগুলোকে নিজ নিজ আর্থিক সামর্থ্য ও কেন্দ্রীয় বরাদ্দের সীমানার মধ্যে রাখার জন্য চাপ দিয়ে আসছে। ওভারড্রাফট বন্ধ করার জন্য মোরারজী কেন্দ্রের চূড়ান্ত বাজেটে কেন্দ্রীয় রাজস্ব থেকে রাজ্যগুলোর প্রাপ্য আরো কিছু বাড়িয়ে দেন। কেন্দ্রের নিজস্ব বাজেটেও ঘাটতির সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্য করবৃদ্ধি দ্বারা আয়ব্যয়ে সাম্য রক্ষা করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে তাকে অন্ততঃ আর না এগুতে দেওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান লক্ষ্য। রিজার্ভ ব্যাংক এই বিপর্যয় সম্পর্কে মাঝে মাঝেই সতর্ক করে দিয়ে আসছে। তবু বিভিন্ন রাজ্যে যে চূড়ান্ত বাজেটগুলো পেশ করা হয়েছে তাতে ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কোনো উদ্যম দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয় না। এবং এই অপরিণামদর্শী ব্যয়ে কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী—সমস্ত সরকারই যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। অভূতপূর্ব খরার ফলে বিহার যে দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে তাতে তার রাজস্বহানি অপরিহার্য এবং কেন্দ্রের অতিরিক্ত সাহায্য সে ন্যায্যভাবেই দাবী করতে পারে। তবুও বিহারের প্রাথমিক বাজেটে যে-ঘাটতি ৪৩ কোটি টাকা হবে বলে ধার্য হয়েছিল, পাকা বাজেটে তা ১০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাওয়া বিস্ময়কর। অথচ দুর্ভিক্ষত্রাণে বিহার কেন্দ্রের কাছ থেকে ৬১ কোটি টাকা সাহায্য পেয়েছে। এই সাহায্য না পেলে বিহারের বাজেটের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে দাঁড়াতো। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর অবশ্য বাজেটের ঘাটতি আরো কমিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-বাজেটে যদি এই ধরনের একটা বিরাট ঘাটতি সামনে রেখে বছরের সূচনা করা হয় তাহলে ব্যয় কমাবার প্রচেষ্টা কতোখানি সফল হবে তা সন্দেহের বিষয়। তা ছাড়া, সরকারের আর্থিক সামর্থ্য যে ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষত্রাণেই সবচেয়ে
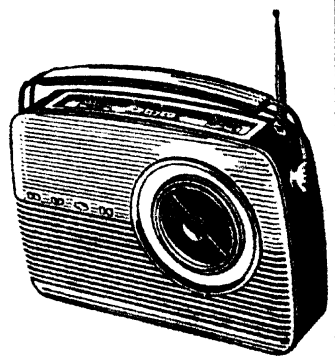
বেশী নিয়োজিত করতে হবে এবং অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ বিশেষ পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে বছরের এই অবশিষ্ট সময়টুকুর জন্য যোজনার ব্যয় ৭৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা থেকে একেবারে ৮৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করারও কোনো অর্থ হয় না। অথচ এই দু বৎসরেই তাঁরা নদী উপত্যকা প্রকল্পের জন্য আরো ৫ কোটি টাকা লগ্নী করার সংকল্প করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পাকা বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে আঠারো কোটি টাকা। এই ব্যয়বৃদ্ধি প্রধানত বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক সমেত সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সমস্যাবহুল রাজ্য। সংক্রামক খাদ্য-ঘাটতি, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারী এবং শিল্প-বাণিজ্যের সাম্প্রতিক মন্দা তার অর্থনীতিকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট ঘাটতি-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে এই টাকা কি দিয়ে পূরণ হবে বাজেটে তার কোনো প্রস্তাব নেই। অর্থমন্ত্রী ঘাটতির টাকা সংগ্রহের জন্য নতুন যে সব করের আভাস দিয়েছেন তারও ক্ষেত্র কতোখানি প্রশস্ত তা আগে থাকতে অনুমান করা সম্ভব নয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত, অন্যান্য অনেক প্রদেশের মতো তার বিশেষ কোনো সমস্যাও নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাজেটে তার যা ঘাটতি দাঁড়িয়েছে তা প্রায় পশ্চিমবঙ্গের মতোই। মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলেও বাজেটে ২২ কোটিরও বেশী টাকার ঘাটতি হওয়ার কোনো সংগত কারণ নেই। উড়িষ্যার ঘাটতি বেশী নয়, ৫ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে উড়িষ্যা অনুদান পেয়ে থাকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। অন্য সমস্ত রাজ্যের তুলনায় বেশী। খাদ্যেও উড়িষ্যা স্বচ্ছল, এমন কি ইচ্ছা থাকলে প্রতিবেশী রাজ্যের খাদ্য ঘাটতিও কিছুটা পূরণে সমর্থ। এই অবস্থায় উড়িষ্যার বাজেটে কোনো প্রকার ঘাটতি দেখা দেওয়ার সংগত কোনো কারণ থাকতে পারে না।

সম্প্রতি বহু রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতা কেন্দ্রীয় কর্মীদের সমতুল্য হারে দেওয়া শুরু হয়েছে। ফলে বাজেটে এই বাবদে ব্যয়ের অঙ্ক বেশ ফেঁপে উঠেছে। এর ওপরে কতকগুলো রাজ্য আবার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাও রহিত করেছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যাই শেষোক্ত ব্যবস্থার অগ্রণী, অবশ্য অন্যান্য রাজ্যও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের 'প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না।

ভূমি-রাজস্ব বিলোপের ফলে উড়িষ্যা সরকারের চতুর্থ যোজনার সময়কালের মধ্যে ১৫ কোটি টাকা রাজস্বহানি ঘটবে। সরকার এই আর্থিক ক্ষতি পূরণের জন্য এক কোটি আঠাশ লক্ষ টাকার নতুন কর ধার্য করবেন। এবং তারপর আছে কেন্দ্র। সরকার আশা করেছেন যে, কেন্দ্র আরো ন' কোটি টাকা

বাজেটে বিরাট ঘাটতি রেখে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বারস্থ হওয়া অথবা জনসাধারণের মাথায় নতুন করের বোঝা চাপানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই, তখন ভূমি-রাজস্বের মতো সরকারের একটা ন্যায়সংগত প্রাপ্যকে স্বেচ্ছায় রহিত করার মধ্যে কি যুক্তি থাকতে পারে তা বোঝা কষ্ট। মাদ্রাজের পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও ভূমি-রাজস্ব বিলোপের সংকল্প করেছিলেন এবং রেভিনিউ বোর্ডের মুখ্য সদস্য শ্রী এস, আর, কাইওয়ারের ওপর ভার দিয়েছিলেন এর পন্থা ও ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে। সম্প্রতি কাইওয়ার যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তিনি খাজনা রহিতের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্বহানি হবে অথচ সেই তুলনায় কৃষকদের যে সুরাহা হবে তা নিতান্ত নগণ্য। কাইওয়ার অবশ্য বলেছেন যে, ভূমিরাজস্ব যদি একান্তভাবেই বিলোপ করতে হয় তাহলে সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত ধানচাষের জমিগুলোর ওপর একর পিছু ৫ থেকে ২৫ টাকা হারে জলকর ধার্য করতে হবে এবং যে সব জমিতে তুলা, নারকোল, তামাক, আখ প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপন্ন হয় সেগুলোয় সেচের জল সরবরাহের জন্য একর পিছু ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা হারে জলকর আদায় করতে হবে।

জমি খাজনামুক্ত হলে কৃষিজীবীরা উৎপাদনে উৎসাহ পাবে বলে যে ধারণা আছে কাইওয়ারের রিপোর্টে তার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এতে চাষীর এমন কিছু সুরাহা হবে না, যাতে উৎপাদন বাড়তে পারে। তা ছাড়া, ভূমি-রাজস্ব বিলোপের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে, শীর্ষস্থানীয় কৃষিপণ্যগুলোকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আয়ত্তে এনে সেই ক্ষতি পূরণ করার প্রস্তাবও তিনি সমর্থন করেননি। কাইওয়ার বলেছেন যে, একমাত্র খাদ্যশস্যই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের আওতায় রাখা যেতে পারে সরকারীভাবে অন্য ফসলের কারবার করে বিশেষ সুবিধা হয় না।

তবুও কয়েকটি রাজ্য সরকারের এই সহজ জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টার ফলে অন্যান্য রাজ্যও কালক্রমে ভূমি-রাজস্ব রহিত করতে বাধ্য হবে। অথচ এই আর্থিক ক্ষতি-পূরণের জন্য হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণের ওপর যে কর চাপানো হবে তা সর্বসময়েই ন্যায়সংগত হবে না। এবং এইভাবেও যাঁরা অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হবে তারা শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আরো ফালতু নোট ছাড়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে পণ্যমূল্যে বৃদ্ধিকে আরো বেগবান করার খোরাক যোগাবে।

সম্প্রতি দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয় তাতেও রাজ্য সরকারগুলোর ব্যয়বৃদ্ধির প্রসঙ্গ নিয়ে আর এক দফা আলোচনা হয়ে গেছে। আলোচনার বিষয় ছিলো গজেন্দ্রগড়কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ। কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হলে কেন্দ্রের ব্যয় বাড়বে ত্রিশ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলোতে যদি এই হারে ভাতা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মোট খরচ পড়বে সত্তর কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীরা সকলেই একযোগে বলেন যে, কেন্দ্রে কর্মচারীদের ভাতা বাড়ালে রাজ্যগুলোরও না বাড়িয়ে উপায় নেই, অথচ এই বাড়তি অর্থযোগানোর সামর্থ্যও তাঁদের নেই। কাজেই, কেন্দ্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত সাহায্য তাঁদের একান্তভাবেই দরকার।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অবশ্য এই দাবী সম্পর্কে তাঁর পূর্বেকার অনড় মনোভাবই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রের পক্ষে শুধু এই অতিরিক্ত অর্থ যোগানো কষ্টকর নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতিরিক্ত অর্থ যা যোগাড় হয়েছে তা ইতিপূর্বেই রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টিত হয়েছে।

আলোচনা এই অবস্থায় এলে স্বভাবতই বিকল্প চিন্তা আসে এবং মূল্য ও বেতন বৃদ্ধির দুষ্টচক্রকে এড়াবার জন্য পণ্যমূল্য, মজুরী ও মুনাফা—সবগুলি বন্ধের জন্য প্রস্তাব ওঠে। এই প্রস্তাবটি অবশ্য সপ্তাহের গোড়ার দিকে উত্তরপ্রদেশের অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভাতেই প্রথম উত্থাপিত ও আলোচিত হয়, এবং সম্মেলনে অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যেও এর বিরুদ্ধে কোনো মত দেখা যায়নি। মোরারজী শেষ পর্যন্ত জানান যে মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধি ও তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মূল্য-মজুরী বৃদ্ধি বন্ধের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হবে।

বৃটেনে মূল্যবৃদ্ধি রোধের দাওয়াই হিসেবে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করে উইলসন সরকার দেশের অর্থনীতিতে অল্পসময়ের মধ্যে যে পরিবর্তন এনেছেন তা বিস্ময়কর। অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে বৃটেনে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, বৈদেশিক লেনদেন বৃটেনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল হয়েছে, পাউন্ডের ভিত্তি আরো পাকাপোক্ত হয়েছে দেশে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এই মুদ্রাসংকোচনের ফলে দেশে বেকারী পূর্বের তুলনায় সামান্য কিছু বেড়েছে, কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিয়েছে তার তুলনায় সেটা নগণ্য।

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি রোধের দাওয়াই হিসেবে পণ্যমূল্য, মজুরী ও ডিভিডেন্ড বৃদ্ধি বন্ধের প্রস্তাব ইতিপূর্বেও আমাদের দেশে উঠেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ—সকলেরই পক্ষে যে কঠোর আত্মশাসনের প্রয়োজন হবে তা এদেশে কতোখানি সম্ভব সে বিষয়ে কেউই নিশ্চিত নয়। এবং এই নিশ্চয়তা না আসা পর্যন্ত এই ধরনের ব্যবস্থায় যে ঝুঁকি আছে তা গ্রহণ করা কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত হবে না।

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধ্যানধারণা (৩)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নাট্যশালা' সম্পর্কে আলোচনাচক্রে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ বলেন, জাতীয় নাট্যশালায় ভারতের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত নাটক অভিনীত হবার সুযোগ থাকা চাই। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হতে পারে না এই কারণেই যে, সেখানে ভারতীয় যে কোনও আঞ্চলিক ভাষায় রচিত নাটকের অভিনয়কে যথাসাধ্যভাবে বিচার করবার দর্শকের অভাব হবে স্বাভাবিক কারণেই; সেখানে হিন্দীতে অভিনীত নাটক যতো আদৃত হবে, তামিল বা তেলেগু ভাষায় অভিনীত নাটকের তেমনি আদর হবার সুযোগ কোথায়? কাজেই ভারতের প্রতিটি রাজ্যে একটি করে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়া উচিত। জাতীয় রঙ্গালয়কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার আর্থিক সহায্য দান করবেন বটে, কিন্তু তা হবে সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত। এই জাতীয় রঙ্গালয়ে বিভিন্ন নাট্য-সংস্থার সামান্য মাত্র ব্যয়ে অভিনয় করবার সুযোগ থাকা চাই— আমাদের রবীন্দ্রসদনে প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্যে যে ১,০০০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করেছেন আমাদের রাজ্যসরকার, তা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্ন রাজ্যের নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী এবং অপরাপর মঞ্চকর্মীরা যাতে এই জাতীয় নাট্যশালা মারফত আর্থিক সুবিধার সঙ্গে উপযুক্ত সম্মান পান, সে বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবহিত হওয়া উচিত।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষ রমেশ ভাট বলেন, জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে প্রধান ধারণা হচ্ছে এই যে, এটি হবে জনগণের জন্যে জনগণ দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (Theatre for the people and of the people. এই নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অর্থ আসবে জনগণের কাছ থেকেই, স্বাভাবিকভাবে এইটেই আশা করা উচিত। কিন্তু আজকে আমাদের সরকার হচ্ছে জাতীয় সরকার—সরকারের অর্থ হচ্ছে জনগণেরই অর্থ; কাজেই জাতীয় নাট্যশালার অস্তিত্ব এবং উন্নতির জন্যে সরকারই দেবেন প্রয়োজনীয় অর্থ। এই নাট্যশালা হবে স্বয়ংশাসিত। এর যথাযোগ্য পরিচালনার জন্যে রাজ্যের নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চকলাকুশলী, নাট্যসমালোচক, - নাট্য বিষয়ক • অধ্যাপক ও নাট্যবিশেষজ্ঞেরা সম্মিলিতভাবে একটি কর্ম-পরিষদ বা পরিচালন-সংস্থা গড়ে তুলবেন। এই পরিচালন-সংস্থার কার্যকাল, পরিচালনব্যবস্থার নিয়মাবলীর খসড়া একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি দ্বারা রচিত হয়ে সাধারণ সভায় সবিশেষ আলোচনার পরে গৃহীত হবে। পরিচালন-সংস্থা জাতীয় রঙ্গালয়ের জন্যে পাঁচ বছরের মেয়াদে শিল্পী, কলাকুশলী এবং অপরাপর কর্মী নিয়োগ করবেন। এই নিয়োজিত শিল্পী ও কলাকুশলীরা তাদের ভিতর থেকেই একজনকে নাট্যপরিচালক রূপে নির্বাচিত করবেন। এই নির্বাচিত নাট্যপরিচালক তখন স্বাধীনভাবে নাটক-নির্বাচন, নিয়োজিত শিল্পীদের মধ্যে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ভূমিকাবন্টন, তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনানুযায়ী দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত এবং নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনার জন্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবেন। একটি বিশেষ নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনিই হবেন তখন সর্বময় কর্তা; তিনি ইচ্ছে করলে কোনো কোনো বিষয়ে বা সব বিষয়েই তার সহকর্মীদের পরামর্শ চাইতে পারেন বটে, কিন্তু পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা বিষয়ে তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকবে। পরবর্তী নাট্যপ্রযোজনার

প্রস্তর স্বাক্ষর চিত্রের নায়িকা সন্ধ্যা রায়। ফটো : অমৃত

হরে কাঁচকী চুড়িয়াঁ চিত্রে বিশ্বজিৎ ও নয়না সাহু

সময়ে আবার নতুন করে পরিচালক নির্বাচিত হবেন। জাতীয় রঙ্গালয়টি সকল রকমে যেন প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামসমন্বিত থাকে এ বিষয়ে পরিচালনসংস্থার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। জাতীয় রঙ্গালয়ের অভিনয় যাতে অধিকাংশ নাট্যামোদী দেখবার সুযোগ পায়, সেজন্যে এই অভিনয়ের প্রবেশমূল্য যথাসম্ভব কম করা উচিত। সব কটি রাজ্যের জাতীয় রঙ্গালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় দফতর থাকতে পারে।

বিশ্বরূপা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও নাট্যপ্রযোজক রাসবিহারী সরকার বলেন, রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করবার কথা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত সরকার চিন্তা করেছিলেন। জাতীয় নাট্যশালার কর্তব্য হচ্ছে, নাট্যশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন। পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালাকে নিশ্চয়ই এই রাজ্যের বিশেষ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলতে হবে, আমাদের দেশের নাট্যশিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতনভাবেই অগ্রসর হতে হবে, আমাদের শতাধিক বর্ষব্যাপী নাট্যঐতিহ্যের সঙ্গে নবনাট্যআন্দোলনের সুষ্ঠু যোগ রেখেই চলতে হবে। আমাদের জাতীয় রঙ্গালয় হবে নাট্যপ্রযোজনা-আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রসদনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে শ্রীসরকার বলেন, এখানে বছরে অন্তত ৪৩৫।৪৪০টি নাট্যানুষ্ঠানের (শোয়ের) ব্যবস্থা করা যায়। ২৪।২৫টি অগ্রগামী নাট্যসংস্থা ও গুটিকয়েক যাত্রাসংস্থার এখানে ১৫।১৬টি করে সার্থক নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে প্রতিটি সংস্থাকে সরকারী তহবিল থেকে ১৫,০০০্ থেকে ২০,০০০্ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হোক। নাট্যসংস্থাগুলিকে এই ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য করা ছাড়া জাতীয় নাট্যশালার পরিচলন-ব্যবস্থা, কর্মীদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি যাবতীয় বাৎসরিক খরচ বাবদ ৩ লক্ষ টাকা দৃশ্যপটাদির সংস্কার বা মেরামতী বাবদ ১ লক্ষ টাকা এবং অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা—একুনে জাতীয় নাট্যশালা খাতে প্রতি বৎসর রাজ্যসরকারের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হবে। অভিনয়লব্ধ অর্থ দ্বারা গঠিত তহবিলের সাহায্যে ভারতের অপরাপর রাজ্যের বিভিন্ন ভাষার নাট্য-[illegible] পারে

রবীন্দ্রসদনে। বহির্ভারত থেকে আগত বিশিষ্ট নাট্যসম্প্রদায়গুলির অভিনয়-ব্যবস্থা এবং তাদের সদস্যদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাখবার ব্যবস্থাও করতে হবে। এছাড়া রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যসম্প্রদায়গুলিকে বহির্ভারতে নাট্যপ্রযোজনার জন্যে প্রেরণেরও বন্দোবস্ত করতে হবে। নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রেও যাতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাই হবে আমাদের জাতীয় নাট্যশালার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

যশস্বী নাট্যবিদ্ ও পরিচালক-অভিনেতা অশোক সেন বলেন, ভারত ইউনিয়নে যতগুলি রাজ্য আছে, ততগুলি জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এবং এই জাতীয় রঙ্গালয় হবে ভারতের ঐতিহ্যবাহী, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিবিমুক্ত একটি জনসাধারণের প্রকল্প (people's project)।

আসচে সংখ্যায় নবম বার্ষিক বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলনে 'জাতীয় নাট্যশালার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং রবীন্দ্রসদনের গঠন ও কর্মসূচী সম্পর্কে গেল ১০ এবং ১১ জুলাই, সোম ও মঙ্গলবার দুদিনব্যাপী যে আলোচনা হয়ে গেছে, তারই চুম্বক তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

শিশুচলচ্চিত্র পর্ষৎ-এর উদ্যোগে
শিশুচলচ্চিত্র উৎসব এবং
আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা :

আজকের পৃথিবীতে শিশুদের মনের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অপরিসীম। সেই কারণে তরুণ মনকে উপযুক্তভাবে গঠন করার কাজে চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বহু প্রগতিশীল দেশে চলচ্চিত্রকে তরুণমনে সুস্থ প্রভাব বিস্তারের কাজে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং শিশু কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়ে তোলবার শুভবুদ্ধি থেকেই বিশ্বব্যাপী শিশু চলচ্চিত্র আন্দোলনের জন্ম।

দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়মে বর্তমান কর্মকেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত রেখে শিশুচলচ্চিত্র পর্ষৎ গেল সাত বছর ধরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিশুচলচ্চিত্র আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের বিদ্যালয়গুলি অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর সামনে দেশ-বিদেশ থেকে আহরিত এমন অসংখ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে আসছে, অনাবিল আনন্দ, শিক্ষা ও সৌন্দর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে তাদের তরুণ মনের উপর যেগুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

শিশুচলচ্চিত্র পর্ষৎ কিন্তু বর্তমান ১৯৬৭ সালে মাত্র ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক শিশুচলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখছেন না। তাঁরা এ-বছর একটি তিন মাসব্যাপী বিস্তৃততর কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এবং এই কর্মসূচী তাঁরা প্রণয়ন করেছেন আমাদের দেশের শিশু-

কিশোর-কিশোরীদের মানসিকতাকে উপযুক্ত-ভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে শিশুচলচ্চিত্র আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে।

এ বছরে গৃহীত কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রথম আন্তর্জাতিক শিশুচলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা। ১লা থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পর্ষৎ আশা করেন যে, অন্তত ৭০টি দেশ থেকে কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্র, কার্টুন, খেলাধুলো সম্পর্কিত চিত্র প্রভৃতি মিলিয়ে ন্যূনকল্পে ২৫০টি শিশু-চলচ্চিত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে। শিশুচলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বিচারক-মণ্ডলীর নেতৃত্ব করবেন সত্যজিৎ রায়। বিচারে যে চিত্রটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, তাকে 'গ্রাঁ-প্রি দেওয়া ছাড়া অন্যান্য উপযুক্ত চিত্রকে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা আছে।

৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ১ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেড় মাস ধরে পূর্ব-ভারতের (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যা) বিভিন্ন রাজ্যের নির্দিষ্ট সিনেমাগৃহগুলিতে। পৃথিবীর ৭০টি দেশ থেকে আহরিত অন্তত ৭০০টি চলচ্চিত্র পূর্বভারতে স্থিত আনুমানিক ১০ লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দেখানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এছাড়া পর্ষৎ একটি শিশুচলচ্চিত্র কমিশন দ্বারা সমীক্ষার বন্দোবস্ত করছেন। ভারতবর্ষে শিশুচলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণের সচেতনতা এবং উদ্যোগের পরিমাণ নির্ণয় ও শিশু-চলচ্চিত্রের প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী ব্যবস্থার সমস্যাবলী নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করা হবে এবং জুলাই মাস থেকেই তার বৈঠক শুরু হবে। এর ওপর শিশু কিশোর-কিশোরীদের মনে তাদের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারও জন্যে একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সবশেষে এই আন্তর্জাতিক শিশু-চলচ্চিত্র উৎসবের অংগ হিসেবে একটি শিশু মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এই মেলা ও প্রদর্শনী রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে ১৬ থেকে ৩০-এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলাতে খেলাধুলো এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছাড়াও যে তিনটি উল্লেখ-যোগ্য বিভাগ থাকবে, সেগুলি হচ্ছে (১) শিশু-সাহিত্য, (২) শিশুচলচ্চিত্র ও (৩) শিশুঅভিনয় বিভাগ। উল্লেখযোগ্য যে, এই মেলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে এর আন্তর্জাতিক বিভাগ। মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্তত ১০,০০০ হাজার কিশোর-কিশোরীকে সংঘবদ্ধভাবে 'মার্চ পাশ' করতে দেখা যাবে। আমরা উদ্যোক্তাদের গৃহীত এই বিরাট কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

—নান্দীকর

'প্রস্তর স্বাক্ষর' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'শিলাপটে লেখা'র কাহিনী নিয়েই 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছবিটি নির্মিত। ছবিটি শীঘ্রই রাধা, পূর্ণ ও শহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করবে বলে জানা গেল। সলিল দত্ত পরিচালিত এ চিত্রের মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, গীতালি রায়, তরুণকুমার, জহর রায়, দিলীপ রায়, গীতা দে ও বনানী চৌধুরী। এস-বি ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

'হরে কাঁচ কী চুড়িয়াঁ' চিত্রের শুভমুক্তি

কিশোর সাহু প্রযোজিত ও পরিচালিত রঙিন ছবি 'হরে কাঁচ কী চুড়িয়াঁ' এ-সপ্তাহে ১৪ই জুলাই থেকে জ্যোতি, বসুশ্রী, বীণা, পূর্ণশ্রী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করছে। এ ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে রূপ-দান করেছেন বিশ্বজিৎ ও নয়না সাহু। সুরসৃষ্টিকার হলেন শংকর জয়কিষণ।

'তিন তরুণ'-এর শুভ মহরৎ:

গেল মঙ্গলবার রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে সুধীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রযোজিত এন দাস প্রোডাকসন-এর প্রথম প্রয়াস 'তিন তরুণ'এর শুভ মহরতের মাধ্যমে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। শুভানুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছেন সর্বভারতীয় চিত্র-সম্পাদক-পরি-চালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় এবং ক্যামেরার 'সুইচ অন' করেন প্রখ্যাত প্রযোজক

সুরেশ রায় পরিচালিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ চিত্রে পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ জবালিয়ে জামসেদপুর রবীন্দ্রভবনের উদ্বোধন করছেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য টেগোর সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এ কে বোস পাশে রয়েছেন।

সুরকার, গায়ক শ্যামল মিত্র। অনুষ্ঠানে বহু খ্যাতনামা শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত নাট্যকার পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এর চিত্রপরিচালনায় এই প্রথম পদক্ষেপ। ছবির মুখ্যভূমিকাগুলিতে আছেন—মাধবী মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, জহর রায়, শেফালী চক্রবর্তী, বঙ্কিম ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও অন্য একজন জনপ্রিয় নায়ক। এই সংগীতবহুল চিত্রটির সুরযোজনার দায়িত্ব দিয়েছেন স্বনামধন্য সুরকার-পরিচালক সলিল চৌধুরী। সম্পাদনা-চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশে আছেন—রমেশ যোশী, মিঠু সিনহা ও প্রসাদ মিত্র।

'ব্রেক' চিত্রের নতুন নামকরণ 'আলেয়া'

নিউ এজ ফিল্মসের 'আলেয়া' ছবিটি বর্তমানে পরিচালনা করছেন বিজলীবরণ সেন। 'ব্রেক' চিত্রটির নতুন নামকরণে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে ও রবি ঘোষ।

গীতছন্দমের 'হংসমিথুন'

দীর্ঘ বিরতির পর গীতছন্দমের 'হংসমিথুন' চিত্রের পুনরায় চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, সবিতা বসু, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, জহর রায় ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সংগীত পরিচালক।

সুনীল দত্ত প্রযোজিত নতুন ছবি 'মন কা মিত'

অভিনেতা সুনীল দত্ত এবারে যে নতুন ছবিটি প্রযোজনা করছেন তার নাম 'মন কা মিত'। এ ছবির নায়ক-নায়িকা মনোনীত হয়েছেন নবাগত সুনীল দত্ত-ভ্রাতা সোম দত্ত, লীনা, বিনোদকুমার ও সন্ধ্যারাণী। এছাড়া পার্শ্বচরিত্রে রয়েছেন ওমপ্রকাশ, রাজেন্দ্রনাথ, আনোয়ার হুসেন, নানা পালসিকর, প্রেমকুমার ও অচলা সচদেব। রবি ছবিটির সুরকার। পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এ সুব্বা রাও।

অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত **পরিশোধ** চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তরুণকুমার। ফটো : অমৃত

রাওয়াল ফিল্মসের নতুন ছবি 'আব্রু'

রাওয়াল ফিল্মসের নতুন ছবি 'আব্রু'র শুভমহরৎ গত ২২ জুন মেহবুব স্টুডিওয় পালিত হল। এই রঙিন ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিমি, দীপককুমার, অশোককুমার রেহমান, নিরুপা রায়, জীবন ও সুন্দর। ছবিটি পরিচালনা করছেন সি-এল রাওয়াল। সংগীত পরিচালক হলেন সোনিক-ওমি।

শশি-শর্মিলা অভিনীত 'ওপরওয়ালা'

প্রযোজক এল বি ঠাকুরের নতুন ছবি 'ওপরওয়ালা' চিত্রের নায়ক নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন শশি কাপুর ও শর্মিলা-ঠাকুর। ছবিটির পরিচালক হলেন অসিত সেন। ইন্দরাজ আনন্দকৃত চিত্রনাট্যে সুরসৃষ্টি করছেন উষা খান্না।

রূপতীর্থ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি কল্পিত কাহিনীর মঞ্চরূপ উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ'। এই নাটক অনেক আগেই বলিষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে সরব স্বীকৃতি পেয়েছে এবং লিটল থিয়েটার গ্রুপের অসাধারণ অভিনয়ে নাট্যানুরাগীবৃন্দ মুগ্ধ হয়েছেন। **এই মঞ্চসফল নাটকের অভিনয় সেদিন** 'বিশ্বরূপায় পরিবেশন করলেন 'রূপতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দ। এই নাটকের বহু জায়গায় প্রচন্ড মুখরতা, অপ্রত্যাশিত কিছু চমক আছে, শিল্পীদের অভিনয়ে তা প্রায় প্রতিমুহূর্তেই মূর্ত হয়ে উঠেছে বলতে হবে।

টিমওয়ার্কের ব্যাপারে 'রূপতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দ উন্নতধরনের বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পেরেছেন। প্রায় অপরিচিত একটি নাট্যসংস্থার কাছ থেকে এ ধরনের সার্থক প্রযোজনা সবসময় আশা করা যায় না। এ ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন নাট্যনির্দেশক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। প্রয়োগের অভিনবত্ব, পরিবেশ গঠনের চমৎকারিত্ব, সবই তাঁর অন্তর নিষ্ঠা আর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের ফসল। 'নীলমণি' চরিত্রে তাঁর অভিনয়ও অনবদ্য। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন সত্য মৈত্র (হিতেন), রেণু ঘোষ (বঙ্গবাসী) শর্মিতা বিশ্বাস (রাধারাণী), হেমেন্দ্র বিশ্বাস (বৃন্দাবন), নিতাই ঘোষ (হরিশ), রমেন মুখোপাধ্যায় (ফাদার ফ্যাগগান), অজিত রায় (প্রকাশ), শান্তি মজুমদার (অশোক), সুনীল মুখোপাধ্যায় (জ্যোতির্ময়)।

দরবেশ

'দরবেশ' নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি মুক্তাঙ্গনে বিনয় লাহিড়ীর 'ডিউটি' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এটা তাঁদের দ্বিতীয় নাট্য-প্রযোজনা। একটি ডিটেকটিভ ধরনের ছোট গল্পকে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। পরিচালনার দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেন নাট্যকার স্বয়ং।

সাউথ ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স স্টাফ ক্লাব

সম্প্রতি সাউথ ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স স্টাফ ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একাদেমী অব ফাইন আর্টস হলে অভিনীত হোল শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে' নাটক। নাটকের অভিনয় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাট্যনির্দেশনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন জিতেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। অভিনয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখেন
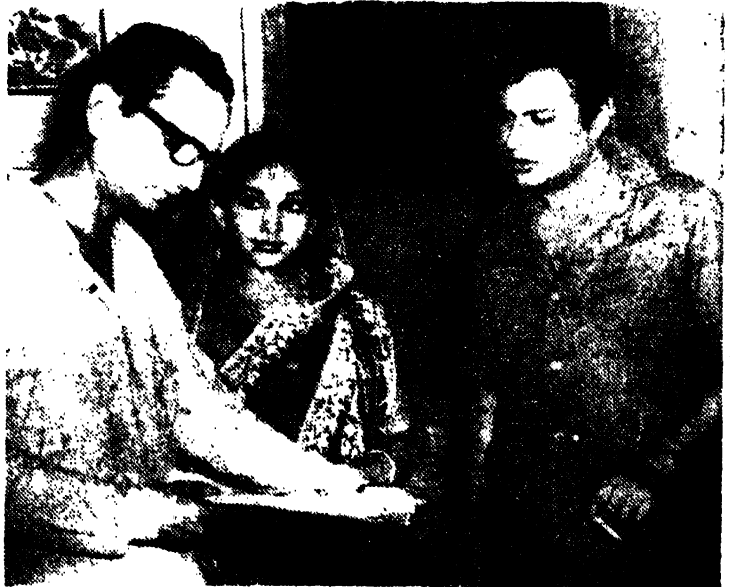
জীবনসংগীত চিত্রের সেটে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

তাঁরা হলেন : নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নগেন পোদ্দার, রবীন্দ্র দত্ত, সুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখা ভট্টাচার্য।

পথিক-গোষ্ঠী

'পথিক গোষ্ঠী'র সাম্প্রতিক নাট্য-প্রযোজনা হোল পরশুরামের 'রামায়ণের বৈরাগ্যে'র নাট্যরূপ। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিল্পীবৃন্দ এর অনেক নাট্যমুহূর্তকেই মঞ্চে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। প্রয়োগ পরিকল্পনায় নতুনতর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। সংঘবদ্ধ অভিনয়রীতির মধ্যেও একটা স্বতন্ত্র্য চোখে পড়ছে। রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুধীর' ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রম্ভা' উল্লেখযোগ্য দুটি চরিত্রসৃষ্টি। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন সনৎ বসু, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন ভট্টাচার্য, সুনীল সুর, অনুপম বাগচী, ভাস্কর ঠাকুরের নাট্য-নির্দেশনা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

'শ্রীকান্ত'

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর এগ্রিকালচারাল রিক্রিয়েশন ক্লাব তাঁদের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' মঞ্চস্থ করেন স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বারীণ গঙ্গোপাধ্যায়, বসন্তকুমার নন্দী, বীরেন্দ্রনাথ দে, গোপাল বিশ্বাস, জিতেন চক্রবর্তী, অনিমা মজুমদার, পূর্ণিমা বিশ্বাস, অনীতা ঘোষ, নমিতা পাত্র, বেলা ঘোষ প্রভৃতি।

চরিত্রহীন

আগামী ১৯শে জুলাই নান্দনিক গোষ্ঠীর প্রযোজনায় 'চরিত্রহীন' অভিনীত হবে। বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পীরা এই নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন। নটশেখর নরেশ মিত্র, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সরযু দেবী প্রভৃতি শিল্পীরা এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

নাট্য প্রতিযোগিতা

ব্যারাকপুর 'যুব সংঘ' আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক নাট্যপ্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 'যাত্রিক গোষ্ঠী' এই প্রতিযোগিতায় তিনটি পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার ছাড়া, এই গোষ্ঠীর নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'স্বপ্নে রোয়া ধান' নাটকটির জন্য পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদা। এই গোষ্ঠীরই শিল্পী নিখিল ভট্টাচার্য পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে 'নান্দনিক' (অভিনয়) ও 'স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ' (অন্ধকারায়)। 'নান্দনিকে'র সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের মর্যাদা। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : মায়া ঘোষ (কল্পরূপ) ও মঞ্জু ভট্টাচার্য (ত্রয়ী)। স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপের কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণব মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত মুক্তি প্রজাপতি চিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী

নির্বোধ

অফিস ক্লাবের অভিনয়ে শুধু আমোদ-প্রমোদেরই কোলাহল, অভিনয়গত কোন বৈশিষ্ট্য সেখানে চিহ্নিত হয় না,—এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অবশ্য এই অভিযোগের সত্যতাকে সবসময়ে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে আজকাল অফিস ক্লাবের কিছু কিছু নাট্যপ্রযোজনায় উন্নত ধরনের নাট্যানুশীলনের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। যেসব অফিস নাট্যসংস্থা এই দিক দিয়ে নাটকের মঞ্চরূপায়ণের আয়োজন করে থাকেন, তারা নিঃসন্দেহে যথার্থ নাট্যানুরাগীর স্বীকৃতি পাবে। সম্প্রতি এমনি একটি নাট্যপ্রযোজনা দেখে অফিস ক্লাবের শিল্পীদের স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত শিল্পবোধ সম্পর্কে আশান্বিত হয়েছি। সংস্থার নাম 'ইউকো ব্যাঙ্ক ফেন্ডস এসোসিয়েশন'। এ'রা অভিনয় করেন পৃথিবী-বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক 'নির্বোধ'। নাট্যরূপ দিয়েছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। নাটকটি কয়েক বছর আগে এক আড়োলনের সৃষ্টি করেছিল। সেই নাটকটিরই নতুনতর প্রয়োগ কল্পনার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এই এসোসিয়েশনের শিল্পীদের অভিনয়ে। রঙমহলে অভিনীত এই নাটকের অভিনয় দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করেছে এবং অফিসের প্রমোদবিভাগীয় শিল্পীদের নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পেরেছে।

সামগ্রিক অভিনয়ের সার্থকতার মূলে রয়েছে প্রতিটি শিল্পীর নিবিড় চরিত্রোপলব্ধি। চরিত্রের অতলে শিল্পী যদি ডুব না দিতে পারেন, তা হোলে চরিত্রচিত্রণ মোটেই সম্পূর্ণ হয় না। এই নাটকের প্রতিটি শিল্পীই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। এ'রা প্রত্যেকেই পরিমিত ও পরিশুদ্ধ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত সুরটিকে অবিকৃতভাবে মঞ্চে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। নাট্যনির্দেশক নাটকের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সেই পরিবেশে অভিনয় অতুলনীয়।

বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সন্তোষ নন্দী, মদন মন্ডল, অমলেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ পাল, ভবতোষ দাস, বিমল মিত্র, নকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, প্রভাত ঘোষ, প্রকাশ দত্ত, প্রবীর চক্রবর্তী, দীপা হালদার, দীপিকা দাস, সবিতা মুখোপাধ্যায়।

ডানলপ অ্যাকাউণ্টস ড্রামাটিক ক্লাব

ডানলপ এ্যাকাউণ্টস্ ড্রামাটিক ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি মঞ্চসফল নাটক 'উল্কা' পরিবেশন করেছেন। সবাই প্রায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন ভূপেন চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, মুরারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণি গুপ্ত, প্রলয় পাল, প্রকাশ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন দে, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণি গোস্বামী, মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন দত্ত, অরুণ দে, গোপাল দত্ত, যয়তী কর, সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়, শাশ্বতী রায়, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, বেবী ভট্টাচার্য অঞ্জলি কর।

বিবিধ সংবাদ

এলিট সিনেমায় প্যারামাউণ্ট-এর বিরাট বাস্তব চিত্র 'ইজ প্যারিস বার্নিং?'

১৩ই জুলাই, বৃহস্পতিবার থেকে স্থানীয় এলিট সিনেমায়, প্যারামাউণ্ট নিবেদিত ও ট্রান্সকন্টিনেন্টাল ফিল্মস-মেরিয়ানে প্রযোজিত 'ইজ প্যারিস বার্নিং?' প্রদর্শিত হচ্ছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্যারিসকে অঙ্গারে পরিণত করবার হিটলারী প্রচেষ্টা কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, তারই এক বিরাট বাস্তব চিত্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রেনে ক্লিমেন্ট পরিচালিত ও চার্লস বোয়ার, লেসলী ক্যারণ, জর্জ চাকিরিস, জাঁ-পল বেলমোন্ডো, কার্ক ডগলাস, গ্লেন ফোর্ড, অর্সন ওয়েলস, অ্যালান ডেলন প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পী অভিনীত "ইজ প্যারিস বার্নিং" ছবিটি সারা ইয়োরোপে দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

মন্ট্রিল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ 'নায়ক':

বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'ইউনিক্রিট' এবং বি-এফ-জে-এ প্রদত্ত বহু পুরস্কার বিজয়ী আর ডি বনশল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নায়ক' ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর কর্তৃক মন্ট্রিল আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্যে মনোনীত হয়েছে। উত্তমকুমার অভিনীত এই ছবিখানি সিডনী ও মেলবোর্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও ভারতের মনোনীত চিত্ররূপে প্রদর্শিত হবে। প্রযোজক বনশল ছবিটিতে ইংরাজী সাব-টাইটেল যোগ করবার ব্যবস্থা করছেন। প্রযোজক, পরিচালক এবং কয়েকজন শিল্পী সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদলও মন্ট্রিল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগদান করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব:

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব কর্তৃক গত ৯ জুলাই 'হার্ট' সিম্পাস' (সোভিয়েট চলচ্চিত্র) প্রদর্শিত হয় এবং আগামী ১৬ ছবি তিনখানি 'টু হাফ টাইমস ইন হেল' (হাঙ্গেরী চলচ্চিত্র) এবং ২৩ 'কার্নিভ্যাল নাইট' (সোভিয়েট চলচ্চিত্র) কলিকাতাস্থ ইন্টালী টকীজে সকাল ৯-১৫ মিনিটে সদস্যদের জন্য প্রদর্শিত হবে।

পরলোকে ভিভিয়েন লে

বিখ্যাত অভিনেত্রী ভিভিয়েন লি তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে গত ৮ জুলাই লণ্ডনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর জন্ম কলকাতায়। ১৯৫০ খৃঃ স্যর লরেন্স অলিভারের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং ১৯৬০ খৃঃ এই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। শ্রীমতী ভিভিয়েন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

ভিভিয়েনের অভিনেত্রী জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে রঙ্গমঞ্চে। এবং ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চেই তার অভিনেত্রী জীবন শুরু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন কখনও কখনও। 'গন উইথ দি উইন্ড' চিত্রে স্কারলেটের চরিত্রে অভিনয় করে অস্কার পুরস্কার পান ১৯৩৯ খৃঃ। দি স্ট্রীট কার নেমড ডিজায়ার চিত্রে অভিনয় করে ১৯৫১ খৃঃ আবার অস্কার পুরস্কার পান।

স্যর লরেন্স অলিভারের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন দীর্ঘকাল। একত্র দুজনের শেষতম অভিনয় হোল নৃত্য অর্কে 'রোমিও জুলিয়েট'। তাছাড়া তিনি আরও কয়েকটি নাটকে এবং চিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছিল।

ছবি স্মৃতি

১৬ জুলাই রবিবার ছোট জাগুলোয় স্বর্গত প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের বাস্তুভিটায় একটি আসরের উদ্বোধন হবে। এর কার্য প্রণালীতে থাকবে খেলাধুলো, নাচ-গান, থিয়েটার, ছবি আঁকা প্রভৃতি। উদ্বোধন করবেন রাজ্য মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেন। সভায় উপস্থিত থাকবেন যুগান্তর সব পেয়েছির আসরের স্বপন বুড়ো।

সন্ধানী ফিল্ম সোসাইটির উদ্বোধন:

আগামী ৩০ জুলাই বারাসাতের 'বিধান' চিত্রগৃহে সকাল ৯টায় একটি হাঙ্গেরীয়ান চিত্রের প্রদর্শনের মাধ্যমে বারাসাত সন্ধানী ফিল্ম সোসাইটির শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা শ্রীমধু বসু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করিবেন।

ক্যালকাটা মিউজিক অ্যান্ড আর্ট সেন্টারের 'বাসবদত্তা'

ক্যালকাটা মিউজিক অ্যান্ড আর্ট সেন্টার গত ১লা জুলাই রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে কবিগুরুর 'অভিসার' অবলম্বনে 'বাসবদত্তা' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করলেন। নৃত্যছন্দে ও অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় নৃত্যনাট্যটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছিল। স্বাতী লাহিড়ীর অভিব্যক্তির প্রকাশ ও ছন্দের মাধ্যমে বেদনার দৃশ্যগুলি মূর্ত করে তোলে। গোপা পালের 'বাসবদত্তা' অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক রূপ দেন সুস্মিতা ঘোষ, মধুছন্দা লাহিড়ী, রোয়েনা রক্ষিত, কাবেরী ঘোষ, পূরবী শেঠ, আরতি পাল, মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী বসু, জ্যোৎস্না কুণ্ডু, কুমারী ওয়েন রাজলক্ষ্মী ও মিতা।

নাট্যরূপ দিয়েছেন সন্তোষকুমার সেন এবং প্রয়োগ পরিকল্পনায় সার্থক রূপ দিয়েছেন পুলিন চক্রবর্তী। পরিচালনায় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন গোপা পাল।

আসানসোল রবীন্দ্রজন্মোৎসব

গত ১৫ জুন আসানসোল রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় ডুরান্ড প্রেক্ষাগৃহে কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী

সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। কুলটি উদয় চক্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীসমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর দরদী কণ্ঠে সংগীত মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শিল্পী চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুনীল মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও কুমারী গোপা দত্ত। পরিশেষে স্থানীয় প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শৈলয'-এর শিল্পীবৃন্দ কবিগুরুর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পরিচালনার কৃতিত্ব শ্রীপরাগ চৌধুরীর।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের আনন্দানুষ্ঠান

গত ২৫ জুন পাথুরিয়াঘাটার মন্মথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে কিশোর কল্যাণ পরিষদের মূল কেন্দ্রের গ্রন্থাগার বিভাগের ছেলেমেয়েরা একটি মনোজ্ঞ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং সবশেষে সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' নাটিকাটি অভিনীত হয়। নাটিকা পরিচালনা করে [illegible] পাল এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন আশিস দাস, গৌতম ভট্টাচার্য, [illegible]কুমার দাস ও উদয় সিংহ।

মূকাভিনেতা শ্রীকাশীনাথের সঙ্গে উজবেক লোকনৃত্যশিল্পী তালিয়া আসরাভোজায়েভ। এই শিল্পী সম্প্রতি কলকাতা পরিভ্রমণ করে গেছেন।

গানের জলসা

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল

অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী এক শান্ত পরিবেশে নবজাত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের প্রথম সঙ্গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হ'লো রবীন্দ্রসদনে। প্রতিষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যে নতুনত্ব ছিল। শ্রোতা অধিকাংশই শিল্পী, সঙ্গীত সমালোচক অথবা সুরসিক সঙ্গীতবোদ্ধা। শিল্পী-সংখ্যা একদিনে তিনের বেশী ছিল না। হেন গুণগ্রাহী আসরে গান-বাজনা আশানুরূপ জমে উঠে শ্রোতাদের হৃদয় ভরিয়ে দেবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তবে আসর আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে যদি শিল্পীসংখ্যা দু-এর মধ্যে সীমিত হয়।

দুইদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অধিকাংশই ছিলেন নবাগত অথবা বহুদিনের অদেখা এবং অশ্রুত শিল্পী। কিন্তু কেউই আমাদের হতাশ করেননি। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সুরু হ'লো মালবিকা কাননের খেয়াল দিয়ে। রাগ পূরিয়া কল্যাণ ও বারোয়া। ইনিই এই আসরের একমাত্র স্থানীয় শিল্পী। আপন শান্ত, ধীর বৈশিষ্ট্যে ইনি শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেছেন।

পরবর্তী শিল্পী শ্রীব্রিজমোহন কাবরা গীটারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে ইতিমধ্যেই ইনি সঙ্গীতমহলে আপন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছেন। কাবরাজী ওস্তাদ আলি আকবরের সুযোগ্য শিষ্য, তারই উজ্জ্বল পরিচয় তাঁর এবারের অনুষ্ঠানে পরিব্যাপ্ত। গীটারের তারের কিছু অদল-বদল ঘটিয়ে তিনি রাগসঙ্গীতের ভাবের অনুকূল করে নিয়েছেন। এঁর পরিবেশিতব্য রাগ ছিল বেহাগ ও মারুবেহাগ। বেহাগের আলাপে বিলম্বিত, জোড়, সমান দক্ষতায় বাজিয়েছেন। আলাপে দীর্ঘবিলম্বিত রেশের মীড় হয়ত এ যন্ত্রের পক্ষে কঠিন নয়। তবে জোড় ও দ্রুতের অংশেও তাঁর কুশলতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। মারুবেহাগের গতে সেতার ও সরোদের সকল অঙ্গ সবিস্তারে দেখানো হয়েছে। তবে কুন্তন ও জমজমা ইত্যাদি অলঙ্কার এই যন্ত্রে বাজানো সহজ নয়। হয়ত সেইজনাই ছন্দ-বৈচিত্র্যের অভাব কিছু একঘেয়েমো এনেছে। অবশ্য গীটারের মতো যন্ত্র যাতে এতদিন শুধুমাত্র লঘুসঙ্গীত ও গান বাজানোর বাইরে কোনোকিছু ভাবা যেত না, সেই যন্ত্রকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত করার গৌরব একান্তই এঁর প্রাপ্য।

উত্তর ভারতের এক অভিজাত ঘরাণার শিল্পী মালিকার্জুন মনসুর। গোয়ালিয়র ও আল্লাদিয়া খাঁর ঘরাণার এই শিল্পী তাঁর শিল্পীজীবনের সায়াহ্নে যে দাপট ও ঐতিহ্য গৌরবকে ব্যক্ত করেছেন, অপসৃয়মান গোধূলিলগ্নের রঙিন আলোর মতই তা

গীতালির ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে সুনীল সেনগুপ্ত গান গাইছেন এবং তবলায় সঙ্গত করছেন শ্রীপঙ্কজ সাহা এবং হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করছেন শ্রীমতী শান্তা সাহা।

শ্রোতাদের মনকে রাঙিয়ে তুলেছে। 'নন্দ' রাগ গতানুগতিক, কিন্তু শিল্পীর বাসন্তী-কেদার মনে রাখবার মন। এই ঘরাণার অতি জনপ্রিয় শিল্পী কেশরী বাঈ-এর প্রাণবন্ততা না থাকলেও আপন ঘরাণার সকল বৈশিষ্ট্য (যেমন বোলের ওপর বিস্তার না করে তান বিলম্বিত থেকে মধ্যলয়ে শান্ত অবস্থিতি) সযত্নে প্রদর্শিত হয়েছিল। এই সুবিন্যস্ত এবং শুদ্ধ আঙ্গিক ইদানীং সহজদৃষ্ট নয়।

জিতেন অভিষেকীর নাম আগে কোনোদিন শুনিনি। কিন্তু গান সুরু হতে না হতেই শ্রোতাদের মনোযোগ তিনি সবলে আকর্ষণ করে নিয়েছেন। ইনি গাইলেন 'ছায়ানট', 'মল্লার' (কোন্ মল্লার সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে) এবং পরে ঠুংরী। শিল্পীর প্রধান সম্পদ হলো তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্য। যখন যে স্বর স্পর্শ করছেন যেন সুরে ভরে উঠছে। আবেগ ও কল্পনাসমৃদ্ধ এই শিল্পী এক নিমেষেই যেন শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু এঁর রাগের অবয়ব শুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতাবর্জিত। বিলায়েত হোসেন খাঁর ঘরাণার শিল্পীর পক্ষে এ অপরাধ অমার্জনীয়। ছায়ানটের বেশ কিছুটা সময় 'জয়জয়ন্তী' ছায়া এসে পড়েছে, কোমল নি কয়েকবার লাগালেও ছায়ানটের চেয়ে ছায়ার অংগই বেশী। যতক্ষণ না রে গা মা পা ধা-র পকড় এসেছেন রাগ চেনা যায় নি। তাছাড়া ওপরের দুই সপ্তকে কণ্ঠ খুবই সুরেলা হলেও নীচের দিকের অংশ কিছু দুর্বল। সুরের ওপর দীর্ঘ স্থায়িত্বের পুনরাবৃত্তিতে ভীমসেন যোশীর প্রভাব সুপরিলক্ষিত। ত্রি-সপ্তকের অনেক তান চিন্ময় লাহিড়ীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এসকল অভিযোগ অনস্বীকার্য হলেও প্রথম থেকে শেষ অবধি শিল্পী আসর জমিয়ে রেখেছিলেন এবং এ শক্তি বড় দুর্লভ। তাই শিল্পীকে তাঁর মর্যাদা দিতেই হবে।

আর এক আকর্ষণ ছিল দক্ষিণ ভারতের সুবিখ্যাত বেহালাবাদক শ্রীগোপাল কৃষ্ণানের অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণানের এক একটি শক্তি-

এ বছর হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজিত নিখিল ভারত সংগীত প্রতি-যোগিতায় রবীন্দ্রসংগীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন শ্রীপার্থসারথি তরফদার।

জিতেন অভিষেকী

শালী ছড়ে লক্ষভেদী তীক্ষ্মতা, প্রতিটি স্বরপ্রযুক্তির সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা এক আশ্চর্য সাংগীতিক অভিজ্ঞতা। মাঝে মাঝে ভাবকে সুপরিস্ফুট ও জোরালো করবার জন্য অন্যান্য তারকে ছড় স্পর্শ করেছে—কিন্তু সংযত, এবং সেইজন্যই অতিনাটকীয়তা

এম এস গোপালকৃষ্ণন
ফটো : অমৃত

বর্জিত। এই পরিমিতিবোধেই তাঁর শিল্পী মনটি উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত। তার পুরিয়া-ভৈরবী ইত্যাদি উত্তরভারতীয় রাগের ওপরই তিনি জোর দিয়েছেন বেশী। এসব রাগ ত উত্তরভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের কাছে হামেশাই শুনে থাকি। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীর কাছে তাঁদের (কৃতি ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্যভরা রাগপদ্ধতি শুনতে পেলে আমরা ওঁদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিছুটা আন্দাজ পেতাম। হয়ত গোপালকৃষ্ণানজী ভেবেছিলেন, উত্তরভারতীয় শ্রোতার কান দক্ষিণ ভারতের দৃঢ়বন্ধ পদ্ধতির রসগ্রহণের অনুকূল নয়।

প্রোগ্রেসিভ আর্ট সেণ্টারের "সীতাহরণ"

মহাজাতিসদনে প্রোগ্রেসিভ আর্ট সেণ্টার পরিবেশিত 'সীতাহরণ' গতানুগতিক নৃত্য-নাট্যগুলির মধ্যে এক বৈচিত্র্যময় ব্যতিক্রম। এতে ঘটেছিল মঞ্চ ও ছায়ানৃত্যের এক অপূর্ব সমন্বয়—।

নাট্যবস্তু পরিচ্ছন্ন এবং প্রধান চরিত্রচিত্রণ মানসম্পন্ন। তবে রামের ভূমিকায় নরেশ-কুমার আর একটু সংযত হতে পারতেন। সীতা ও লক্ষণের ভূমিকায় শ্রীদেবাংশুকুমার এবং ভারতী মজুমদার চরিত্রানুগ। আপনা-পন ভূমিকায় অমৃত চ্যাটার্জি, শম্ভু ভট্টাচার্য ও ডালিয়া মুখার্জি প্রশংসনীয়। ভারতনাট্যম ও কথাকলির মিশ্রণ কিছুটা বেখাপ্পা হলেও বঙ্গেশ্বর মল্লিকের নৃত্যপরিকল্পনা মোটের ওপর ভালই। যন্ত্রসংগীত বড্ড কানে লেগে-ছিল। তাপস সেনের আলোকপাত তাঁর উন্নত মানানুযায়ী। অজয় ঘোষ ও সৌরেন নাগের সহযোগিতায় বলাই দত্তর সংগীত পরিচালনা সুন্দর।

চিত্রাঙ্গদা

১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় 'ত্রিমুকুট' বিজয়িনী শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) সিঙ্গলস জয়ের পুরস্কার হাতে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

দর্শক

উইম্বলেডন লন্ টেনিস্ প্রতিযোগিতা

১৯৬৭ সালের ৮১তম উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় এ বছরের ৩নং বাছাই খেলোয়াড় জন নিউকম্ব পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় উইলহেম বুঙ্গার্টকে (পশ্চিম জার্মানী) পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। গত ৬ বারের চেষ্টায় তাঁর এই প্রথম পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়। তবে তিনি উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৫-৬৬) পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয়ী হন। অপরদিকে তাঁর ফাইনাল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী বুঙ্গার্ট উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৩-৬৪) সেমি-ফাইনালে পরাজিত হন—১৯৬৩ সালের চ্যাম্পিয়ান 'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) এবং ১৯৬৪ সালের চ্যাম্পিয়ান রয় এমার্সনের কাছে। জন নিউকম্বের এই জয়লাভের সূত্রে অস্ট্রেলিয়া গত ১২ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৫৬-৬৭) ৯ বার এবং গত ৭ বছরে (১৯৬১-৬৭) পাঁচবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে। নিউকম্বকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ১০ জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ পর্যন্ত মোট ১৫ বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। বিদেশী টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয়ী হন অস্ট্রেলিয়ারই নরম্যান ব্রুকস, ১৯০৭ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। যুদ্ধোত্তর কালের ২২টি প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬-৬৭) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১০ বার, আমেরিকা ৯ বার এবং একবার করে ফ্রান্স (১৯৪৬), ঈজিপ্ট (১৯৫৪) এবং স্পেন (১৯৬৬)। এই সময়ে মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে আমেরিকা ১৬ বার (উপর্যুপরি ১৩ বার—১৯৪৬-৫৮), ব্রেজিল ৩ বার, অস্ট্রেলিয়া ২ বার এবং ইংল্যান্ড ১ বার (১৯৬১)। হিসাব নিলে দেখা যায়, বিগত ২২ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬-৬৭) পুরুষ বিভাগে কোন একজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হননি—দু'বার করে খেতাব পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ারই তিনজন খেলোয়াড়—লুই হোড (১৯৫৬-৫৭), রড লেভার (১৯৬১-৬২) এবং রয় এমার্সন (১৯৬৪-৬৫)। মহিলা খেলোয়াড়রা কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষদের টেক্কা দিয়েছেন। আমেরিকার দু'জন খেলোয়াড়—কুমারী লুই ব্রাউ (১৯৪৮-৫০) এবং কুমারী মরিন কনোলী (১৯৫২-৫৪) উপর্যুপরি তিনবার করে মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। আরও দু'জন খেলোয়াড় অল্পের জন্যে এই সম্মান হাতছাড়া করেছেন—আমেরিকার কুমারী এ্যালথিয়া গিবসন (১৯৫৭-৫৮) এবং ব্রেজিলের কুমারী মারিয়া বুনো (১৯৫৯-৬০)। আমেরিকার হাতে এখনও আছেন শ্রীমতী বিলি জিন কিং (১৯৬৬-৬৭)।

মহিলা বিভাগের ফাইনালে গত বছরের বিজয়িনী এবং ১নং বাছাই খেলোয়াড় আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং (কুমারী জীবনে বিলি জিন মোফিট) সহজেই ৩নং বাছাই শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করে উপর্যুপরি ২ বার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব এবং সেই সঙ্গে মহিলাদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়লাভের সূত্রে একই বছরের প্রতিযোগিতায় দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান (অর্থাৎ একই বছরের আসরে তিনটি খেতাব জয়) লাভ করেছেন। তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত ৮ জন খেলোয়াড় (তিনজন পুরুষ এবং পাঁচজন মহিলা) এই 'ত্রিমুকুট' সম্মান পেয়েছেন। তাঁর আগে শেষ পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান (১৯৫২)। এখানে উল্লেখযোগ্য, শ্রীমতী কিং এই নিয়ে তিনবার সিঙ্গলস ফাইনালে খেলে উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৬-৬৭) খেতাব পেলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় কোন স্থান না পেলেও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠে ১নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথের হাতে পরাজয় বরণ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের বাছাই তালিকায় ৪র্থ স্থান পেয়ে ফাইনালে ২নং বাছাই এবং তিনবারের (১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬৪) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মারিয়া বুনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন। এই দুটি সিঙ্গলস খেতাব ছাড়া শ্রীমতী সুসম্যানের সহযোগিতায় তিনি দু'বার (১৯৬১-৬২) মহিলাদের ডাবলস খেতাবও পেয়েছেন। 'অঘটনঘটন পটীয়সী' হিসাবে শ্রীমতী কিংয়ের টেনিস মহলে যথেষ্ট সুনাম আছে। ১৯৬৬ সালের কথাই ধরা যাক। খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় তাঁকে ৪র্থ স্থান দেওয়া হয়েছিল। সেমি-ফাইনালে তিনি ১৯৬৩ ও ১৯৬৫ সালের সিঙ্গলস

চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন এবং ফাইনালে তাঁর কাছে পরাজিত হন তিনবারের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ২নং বাছাই খেলোয়াড় মারিয়া বুনো। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সম্মানই বেশী এবং এই জয়লাভ বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ৩নং বাছাই ইংল্যাণ্ডের শ্রীমতী এ্যান হেডন জোন্সের পরাজয় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। শ্রীমতী জোন্সের সত্যিই দুর্ভাগ্য! ইতিপূর্বে তিনি পাঁচবার সেমি-ফাইনাল খেলা থেকে বিদায় নিয়ে এবার প্রথম ফাইনালে উঠেছিলেন। সেণ্টার কোর্টের চোদ্দ হাজার দর্শক এ বছরের সেমি-ফাইনালে তাঁর জয়লাভ উপলক্ষে বিপুল-ভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেন। গত ৩১ বছরের খেলায় ইংল্যাণ্ডের মাত্র দু'জন খেলোয়াড় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—১৯৩৭ সালে কুমারী ডোরথি রাউণ্ড এবং ১৯৬১ সালে কুমারী মর্টিমার।

যে পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক-কালের সাফল্যের উপর নির্ভর করে চিরাচরিত প্রথায় খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকা তৈরী করেছিলেন, তাঁরা এবার খুবই বেকুব হয়েছেন। তাঁদের একমাত্র সান্ত্বনা, পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এবার একজন অবাছাই খেলোয়াড় (পশ্চিম জার্মানীর বুঙ্গার্ট) উঠলেও তিনি অঘটন ঘটাতে সক্ষম হননি। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ গত ৮১ বছরের ইতিহাসে অনেক অঘটন ঘটেছে কিন্তু পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এবার নিয়ে ৪০ বছরে যে ৬জন অবাছাই খেলোয়াড় খেলেছেন তাঁদের কেউ খেতাব জয়ী হননি। এবারের প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি বিভাগে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন তিনটির ফাইনালে—মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে। এই তিনটি অনুষ্ঠানের মধ্যে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড়রা জয়ী হয়েছেন। ৩নং বাছাই খেলোয়াড়রা খেতাব পেয়েছেন পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে। আর ২নং বাছাই জুটির খেতাব মিলেছে পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব (৩নং বাছাই)। একদিকের সেমি ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের রোগার টেলরকে পশ্চিম জার্মানীর বুঙ্গার্ট এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার নিকোলা পিলিককে ৩নং বাছাই নিউকম্ব পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন। বুঙ্গার্টের আগে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে শেষ জার্মান খেলোয়াড় খেলেছিলেন জি ভি ক্র্যাম, ১৯৩৭ সালে; এবং টেলরের আগে শেষ ইংরেজ সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন মাইক স্যাঙ্গস্টার, ১৯৬১ সালে। ১৯৩৮ সালের ফাইনালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজের কাছে ইংল্যাণ্ডের এইচ ডবলউ 'বানি' অস্টিনের পরাজয়ের পর ইংল্যাণ্ডের আর কোন খেলোয়াড় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে উঠতে পারেননি।

গত ২৬শে জুন থেকে ৮১তম উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা (সরকারী নাম—অল্-ইংল্যাণ্ড লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ) সুরু হয়। চিরাচরিত প্রথামত প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের ক্রীড়াকুশলতা বিচার করে বাছাই তালিকা তৈরীও হয়েছিল। পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস তালিকায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) এবং মহিলা বিভাগের সিঙ্গলসের তালিকায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) শীর্ষ-স্থান লাভ করেছিলেন। পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মোট আট-জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজনও আমেরিকার খেলোয়াড় ছিল না—প্রতিযোগিতার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এই প্রথম।

বাছাই তালিকা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১ম ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন), ২য় রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া), ৩য় জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৪র্থ টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া), ৫ম ক্লিফ ড্রিসডেল (দঃ আফ্রিকা), ৬ষ্ঠ কেন ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া), ৭ম জে লেসলি (ডেনমার্ক) এবং ৮ম বিল বাউরে (অস্ট্রেলিয়া)।।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১ম শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা), ২য় মারিয়া বুইনো (ব্রেজিল), ৩য় শ্রীমতী এ্যান জোন্স (ইংল্যাণ্ড), ৪র্থ ফ্রাংকা দুরে (ফ্রান্স), ৫ম নান্সি রিচে (আমেরিকা), ৬ষ্ঠ লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া), ৭ম এ্যানিটি ভ্যান জিল (দঃ আফ্রিকা) এবং ৮ম ভার্জিনিয়া ওয়েড (ইংল্যাণ্ড)।

ভারতবর্ষের খেলা

উইম্বলেডনের বাছাই পর্যায়ের খেলায় ভারতবর্ষের যে চারজন যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র শ্যাম মিনোত্রা তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় জয়লাভের সূত্রে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষের বাকি তিনজন খেলোয়াড়—জি মিশ্র এবং ডি দেওয়ান ১ম রাউণ্ডে এবং আর ভেঙ্কটরমন ২য় রাউণ্ডের খেলায় বিদায় নেন।

মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪, ৪-৬, ৩-৬ ও ৬-৮ গেমে আমেরিকার এম সি রাইসেনের কাছে পরাজিত হন। অপরদিকে শ্যাম মিনোত্রা ২য় রাউণ্ডে যুগোশ্লাভিয়ার নিক্কি পিলিকের কাছে, জয়দীপ মুখার্জি ৩য় রাউণ্ডে স্ট্রেট সেটে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লিফ ড্রিসডেলের কাছে এবং প্রেম লাল ৩য় রাউণ্ডে মাইক স্যাঙ্গস্টারের কাছে পরাজিত হন।

ভারতবর্ষের ডাবলসের জুটি রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৪র্থ রাউণ্ড পর্যন্ত খেলে ৪র্থ বাছাই জুটি রয় এমার্সন এবং কেন ফ্লেচারের (অস্ট্রেলিয়া) কাছে পরাজিত হন। কৃষ্ণান সাধারণত মিকসড ডাবলসে খেলেন না। এবার তিনি ফ্রান্সের কুমারী বুরেলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন এবং ৪র্থ রাউণ্ডে ২নং বাছাই কেন ফ্লেচার এবং মারিয়া বুনোর (ব্রেজিল) কাছে পরাজিত হন।

প্রতিযোগিতায় বৃহত্তম বিপর্যয়

১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের ১ম রাউণ্ডের খেলাতেই গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ১নং বাছাই খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানা (স্পেন) ৮-১০, ৩-৬, ৬-২ ও ৬-৮ গেমে প্রতিযোগিতায় অবাছাই খেলোয়াড় চার্লি প্যাসারেলের (আমেরিকা) কাছে পরাজিত হন। উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার প্রথম রাউণ্ডেই আগের বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই খেলোয়াড়ের পরাজয়ের নজির এই প্রথম।

প্রতিযোগিতার ৪র্থ রাউণ্ডে অবাছাই খেলোয়াড় নিক্কি পিলিকের (যুগোশ্লাভিয়া) হাতে ২নং বাছাই রয় এমার্সনের (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৭-৫, ৩-৬ ও ৪-৬ গেমে পরাজয়—এ বছরের প্রতিযোগিতায় নিঃসন্দেহে বৃহত্তম অঘটন বলা যায়। ১৯৬৭ সালের মরসুমে রয় এমার্সনের অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস খেতাব জয়লাভের ফলে একই বছরে বিশ্বের অন্যতম চারটি সিঙ্গলস খেতাব (অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান খেতাব) জয়ের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা এই পরাজয়ের ফলে নির্মূল হল। ১৯৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ খেতাব বাদে অস্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে রয় এমার্সন অল্পের জন্যে এই 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' হাতছাড়া করেছিলেন। এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড় 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব (একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব) পেয়েছেন—১৯৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ, ১৯৫৩ সালে আমেরিকার কুমারী মরীন ক্যাথরীন কনোলী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী নরম্যান ব্রিঙ্কার) এবং ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার।

পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে অবাছাই জুটি পিটার কার্টিস এবং গ্রাহাম স্টিলওয়েলের (ইংল্যাণ্ড) কাছে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪, ৩-৬ ও ৮-৬ গেমে ১নং বাছাই জুটি জন নিউকম্ব এবং টনি রোচের (অস্ট্রেলিয়া) পরাজয় প্রতিযোগিতায় বৃহত্তম বিপর্যয়ের অন্যতম।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৩নং বাছাই খেলোয়াড় জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—১ ও ৬—১ গেমে অবাছাই খেলোয়াড় উইলহেম বুঙ্গার্টকে (পশ্চিম জার্মানী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : গত বছরের বিজয়িনী এবং ১নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে ৩নং বাছাই শ্রীমতী এ্যান হেডন জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব (বাঁদিকে) এবং বিজিত পশ্চিম জার্মাণীর উইলহেম বুঙ্গার্ট (ডান দিকে)। দুজনেরই হাতে কিন্তু বিজয়ীর পুরস্কার—খেলাধুলার আসরে এক দুর্লভ নজির।

পুরুষদের ডাবলস : ২নং বাছাই বব্ হিউইট এবং ফ্রেড ম্যাকমিলন (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬—২, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে ৪নং বাছাই রয় এমার্সন এবং কেন ফ্লেচারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : ৩নং বাছাই জুটি শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং কুমারী রোজমেরী ক্যাসালস (আমেরিকা) ৯—১১, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে ১নং বাছাই জুটি কুমারী মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং কুমারী ন্যানসী রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ১নং বাছাই জুটি শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং ওয়েন ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া) ৭—৫ ও ৬—২ গেমে ২নং বাছাই জুটি কুমারী মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং কেন ফ্লেচারকে পরাজিত করেন।

ত্রিমুকুট সম্মান লাভ

(১৯১৩-৬৭)

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার বিগত ৫৫ বছরে (১৯১৩-৬৭) মাত্র ৮ জন খেলোয়াড় (মহিলা ৫ এবং পুরুষ ৩) একই বছরের আসরে তিনটি খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন।

এই তালিকায় আছেন আমেরিকার ৬ জন, ফ্রান্সের ১ জন এবং অস্ট্রেলিয়ার ১ জন খেলোয়াড়।

মহিলা খেলোয়াড়

সুজান লেংলেন (ফ্রান্স) **:** ৩ বার (১৯২০, ১৯২২ ও ১৯২৫)
এ্যালিস মার্বেল (আমেরিকা) **:** ১ বার (১৯৩৯)
লুই ব্রাউ (আমেরিকা) **:** ২ বার (১৯৪৮ ও ১৯৫০)
ডরিস হার্ট (আমেরিকা **:** ১ বার (১৯৫১)
বিলি জিন কিং (আমেরিকা) **:** ১ বার (১৯৬৭)

পুরুষ খেলোয়াড়

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) **:** ২ বার (১৯৩৭-৩৮)
ববি রিগস (আমেরিকা) **:** ১ বার (১৯৩৯)
ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া) **:** ১ বার (১৯৫২)

দ্রষ্টব্য **:** উপরের ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র ডোনাল্ড বাজ উপর্যুপরি দু'বার (১৯৩৭-৩৮) 'ত্রিমুকুট' সম্মান পেয়েছেন। তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' সম্মান পান—অর্থাৎ একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান—এই চারটির সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন। উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানের বছরেই 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভের একমাত্র নজির—ববি রিগসের **(১৯৩৯ সালে)।**

এজবাস্টনের টেস্ট ক্রিকেট

বার্মিংহামের এজবাস্টনে ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা শুরু হওয়ার তারিখ ১৩ই জুলাই, বৃহস্পতিবার। ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর এই মাঠে প্রথম। এজবাস্টনে টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয় ১৯০২ সালের ২৯শে মে (ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া)। সেই সময় থেকে ইংল্যান্ড বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে যে ১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তার উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে দেওয়া হল।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণ

ইংল্যন্ডের পক্ষে : ৫৮৩ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৭।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে : ৫১৬ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ)—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬১।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১২১ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ১৯০৯।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে : ৩০ রান—দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯২৪।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ২৮৫ নটআউট—পিটার মে, ১৯৫৭।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে : ১৬১—ও জি স্মিথ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ১৯৫৭।

টেস্ট খেলার ফলাফল
ইংল্যান্ডের

বিপক্ষে	খেলা	জয়	পরাঃ	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	৩	১	০	২
দঃ আফ্রিকা	৩	২	০	১
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২	১	০	১
নিউজিল্যান্ড	২	২	০	০
পাকিস্তান	১	১	০	০
মোট—	১১	৭	০	৪

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দল

ইয়র্কসায়ার : ৩৮০ রান (ফিলসাপে ৫৫, জে ভি হাম্পসায়ার ৭৯, জে সি বল্ডারস্টোন ৮২ এবং রে ইলিংওয়ার্থ ৫৫ রান। সুব্রত গুহ ৭৩ রানে ৫ এবং বেদী ৯৭ রানে ৩ উইকেট)।

ভারতীয় : ১৮৮ রান (সুর্তি ৫৪ এবং ওয়াদেকার ৪৩ রান। ট্রুম্যান ৪৭ রানে ৩ এবং ইলিংওয়ার্থ ৩৭ রানে ২ উইকেট) ও ১৮৬ রান (পাতৌদির নবাব ৭৬ রান। উইলসন ৫ রানে ৩ এবং ইলিংওয়ার্থ ২৮ রানে ৩ উইকেট)

শেফিল্ডে আয়োজিত তিনদিনের খেলায় ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৬ রানে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে—১৯৬৭ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের পঞ্চম পরাজয়।

প্রথম দিনের খেলায় ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি দল ৬টা উইকেট খুইয়ে ৩৪০ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে ৩৮০ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ৫টা উইকেট (৭৩ রানে) পান সুব্রত গুহ। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৮৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইয়র্কসায়ার দলের প্রথম ইনিংসের ৩৮০ রানের থেকে ১৯২ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ভারতীয় দলের একটা উইকেট পড়ে মাত্র ১৬ রান উঠেছে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে তিন ঘন্টা সময় থাকতে ভারতীয় দলের ২য় ইনিংস ১৮৬ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। একমাত্র পাতৌদির নবাব যা খেলেছিলেন। আহত থাকায় বোরদে এবং প্রসন্ন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন নি।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ৩—৮) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ১৪টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ১৩টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং মাত্র একটি খেলা ড্র।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে ২—০ গোলে খিদিরপুরকে পরাজিত করে পরবর্তী খেলায় ১—২ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে পরাজিত হয়। এ-বছরের লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের এই প্রথম পরাজয়। এই পরাজয় সত্বেও ইস্টবেঙ্গল লীগ-তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে—খেলা ১৪, জয় ১১, ড্র ২, হার ১, স্বপক্ষে গোল ২৯, বিপক্ষে গোল ৬ এবং পয়েন্ট ২৪। দ্বিতীয় স্থানে আছে বি এন রেলওয়ে (১৬টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থানে ইস্টার্ণ রেলওয়ে (১৬টা খেলায় ২১ পয়েন্ট)। এরিয়ান্স ক্লাব অপ্রত্যাশিতভাবে ১—৩ গোলে হাওড়া ইউনিয়ন দলের কাছে পরাজিত হলে লীগ তালিকায় তারা চতুর্থ স্থানে নামে (১৬টা খেলায় ২১ পয়েন্ট)। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে (১২টা খেলায় ২২ পয়েন্ট)। লীগের খেলায় বর্তমানে একমাত্র তারাই অপরাজিত আছে। গত বছরের রাণার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাবের আলোচ্য সপ্তাহেও একটা হার হয়েছে ১—২ গোলে বি এন রেলওয়ে দলের কাছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা ১২টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট (জয় ৭, ড্র ১ ও পরাজয় ৪)। সুতরাং লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াইয়ে তারা অনেক পিছনে পড়ে গেছে।

মোহ ভঙ্গ হবে কবে!

শংকরবিজয় মিত্র

ক্রিকেট খেলাতে গেলে, গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, ফলাফল সম্পর্কে সব সময়ে গীতার মহান বাণীটি স্মরণ রাখতে হবে—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন" কারণ কখন কোন ফাঁক দিয়ে যে তোমার পরাজয় হবে, কেউ বলতে পারে না। আমরাও ত ইংলন্ড সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট খেলার পরাজয়গুলোর কারণ ধরতে পারছি না বলে একথা স্মরণ করে আশ্বস্ত হচ্ছি। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অনেক তোড়জোড় করে এবার ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়েছে। তরুণ পাতৌদির নবাব অধিনায়ক হয়েছেন একটি সুনির্বাচিত দলের। দলে এবার তারুণ্যের প্রভাবও মেনে নেওয়া হয়েছে। মনে হয়েছে ব্যাটিং-এর দিক দিয়ে দলটি বিশেষ শক্তিশালী। তবে গোড়া থেকেই সকলে দলের বোলিং-এর শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একজন পেস বোলারও দলে নেই, সম্ভবতঃ টেস্টে খেলতে পারেন এমন কোন বোলারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পেস বোলার বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক খেলার জন্য দল গঠন সম্ভবতঃ ভারতেই সম্ভব। বিশ্বের কোন দেশ আক্রমণে হীনশক্তি নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাত বলে মনে হয় না। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও নির্বাচক মন্ডলী দেশের 'প্রেস্টিজ'-এর কথা একবারও চিন্তা করেছেন কি?

বর্তমানের ক্রিকেট দুনিয়ায় ইংলণ্ড দলের স্থানও এখন তলায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলগুলি ইংলণ্ড দলের চেয়ে শক্তিশালী বলেই বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডের নির্বাচকরাও টেস্ট দল গঠন করবার সময় চিন্তিত হয়ে পড়েন, আগেকার দিনের মত কলজের জোর ইংলণ্ডের নেই যে, নির্বাচকমণ্ডলী বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে পারেন যে, তাঁদের দল এমন শক্তিধর যে, প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলবে। আমাদের নির্বাচকরা হয়ত সেই কথা ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, দলে পেস বোলার না হলেও চলবে, স্পিন বোলার দিয়েই তাঁরা বাজীমাৎ করবেন।

তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভারতীয় দলটির প্রতি সকলেরই একটা আস্থা ও আশা ছিল। অনেকে এমন কল্পনাও করেছিলেন, ইংলণ্ডের মাটিতে যে ভারতীয় দল কখনও টেস্ট ম্যাচ খেলায় জিততে পারে নি এবারের তারণ্য শক্তিসমন্বিত দলটি হয়ত বহু দিনের সেই অতৃপ্ত আকাংখা পূরণ করতে পারবে। হায় দুরাশা! ক্রিকেটের অনিশ্চিত মারটা যে ভারতীয় দলের জন্যেই তোলা ছিল কে তা জানত? এ পর্যন্ত ভারতীয় দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে দুটো টেস্ট ম্যাচ খেলেছে সে দুটোতেই তাদের পরাজয় ঘটেছে। লীডসের হেডিংলে মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ১২৪ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়ে ভারতের অতি বড় সমর্থককেও নৈরাশ্যে ম্লান করে দিয়েছে।

হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ভারতীয় দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে রুখে দাঁড়িয়ে যেভাবে ক্রিকেট খেলেছে তাতে ভারতের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে; হতমান, হৃতগৌরব দলের ব্যাটসম্যানদের ব্যাটের ফলা থেকে মারের যে জৌলুষ ফেটে বেরিয়েছে তাতে ক্রিকেট অনুরাগীরা তৃপ্ত ও বিস্মিত হয়েছেন, পরাজিত দলটিকে তাঁরা বিজয়ীর চেয়েও বেশী সম্মান দিয়েছেন। দর্শক, সমালোচক, সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা একযোগে হেডিংলে মাঠে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসকে ঐতিহাসিক বলে অভিনন্দিত করেছেন। এই তেজ, এই শক্তি এই দক্ষতা বিদ্যুৎদীপ্তের মত মাঝে চমক লাগিয়ে দিলেও অবদমিত হয়ে থাকে কেন

বুঝা শক্ত। এই খেলায় ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ৫৫০ রান করে সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলে ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানরা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ১৬৪ রানে আউট হয়ে যান। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ার ৪২ ও পাতৌদির নবাব ৬৪ রান করে ইংলণ্ডের বোলারদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা ইংলণ্ডের মাঝারী বোলিং-এর সামনে যেভাবে আউট হতে থাকেন তাতে কোন কোন সমালোচক গার্ল গাইডদের ব্যাটিং-এর সঙ্গে তাঁদের খেলার তুলনা করেছেন।

কিন্তু এই বিপর্যয়ের শুরু হয়েছে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস আরম্ভ থেকেই। তরুণ ভারতীয় বোলাররা ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ব্যাটসম্যানেরা দুর্বল বোলিং-এর সুযোগ নিয়ে মারমুখো হয়ে খেলেছে। বয়কট এই ইনিংসে ২৪৬ রান ও ডিলেভিয়ার ১০৯ রান করে ভারতীয় বোলিং-এর নিষ্ফল আক্রমণকে উপহাস করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত চৌকশ ও নামকরা ফার্স্ট বোলারদের অন্যতম বর্তমানে ক্রিকেট সমালোচক কিথ মিলার ভারতীয় দলের বোলিং সম্পর্কে বলেন—'বোলারদের এবার যে আক্রমণ দেখলাম এত খারাপ বোলিং টেস্ট ক্রিকেটে আমি কখনও দেখি নি। ভারতীয় বোলিং-এ কোন ধার ছিল না।'

যা হোক ৩৮৬ রান পেছনে থেকে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। প্রথম জুটির অন্যতম খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনীয়ার অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রহ করলেন ৮৭ রান। তাঁর এই দৃঢ়তা অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের উজ্জীবিত করে তোলে। ফলে ওয়াদেকার করলেন ৯১, পাতৌদি করলেন ১৪৮ এবং হনুমন্ত সিং ৭৩। এঁরা এবার ইংলণ্ডের বোলারদের দাপটে কাবু না হয়ে পাল্টা দাপটে ব্যাট হাঁকালেন। হুড় হুড় করে এলো রান, উঠল ৫১০ রান। ভারতের অধিনায়ক পাতৌদি ও দলের খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা। পরাজয়েও গৌরববোধের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল।

এই খেলার পর ভারতীয় দল সম্পর্কে সকলে আশান্বিত হয়ে ওঠেন। বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভারতীয় খেলোয়াড়েরা না পেয়েছে অনুশীলনের সুযোগ, না পেয়েছে কাউন্টি খেলাগুলোর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে। প্রতিকূল আবহাওয়াতে দুর্দৈব হওয়াটা অনেকে স্বাভাবিক ভেবে ক্ষমার চক্ষে দেখেছেন সমস্ত ত্রুটিকে। হেডিংলের খেলার পর তাই তাঁরা আশা পোষণ করতে থাকেন লর্ডসে ভারতীয় দল ইংলণ্ড দলকে বেগ দেবে এমন কি দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের জয়লাভ করাটাও বিচিত্র নয় বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। টাইগার পাতৌদি কি ভারতের কণ্ঠে জয়-মাল্য প্রথম পরিয়ে দিতে পারবেন ইংলণ্ডের মাটিতে? ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা কি ভারতের অনুকূলে রায় দেবে না? লর্ডসের বিখ্যাত মাঠে আশা-নিরাশার সন্দেহ দোলায় অনেকের কথাই আন্দোলিত হয়েছে কিন্তু এ কি ছলনা! টসে জিতে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে কোনমতে ১৫২ রাণ করে সকলে আউট হয়ে গেল। জন স্নো আর ডেভিড ব্রাউনের পেস বোলিং-এর সামনে ভারতের ব্যাটস্‌ম্যানরা স্কুলের ছাত্রদের মত এলেন আর ফিরে গেলেন। একমাত্র ওয়াদেকার বীরের মত ৫৭ রাণ করে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে মাথা উঁচু রাখতে পেরেছেন। অধিনায়ক পতৌদি সমেত আর সকলের সমস্ত গৌরব লর্ডসের ধূলায় মিশিয়ে গেল। এর উত্তরে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে তোলে ৩৮৬ রাণ। ইংলণ্ডের এই ইনিংসে দুই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ই কৃতিত্বের সবটাই দাবী করতে পারেন। ব্যারিংটনের ৯৭ আর টম গ্রেভনির ১৫১ রান অনবদ্য ব্যাটিং নৈপুণ্য-স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। ভারতের স্পিনবোলার রান সংখ্যাকে সীমিত করতে পারলেও পেস-বোলারদের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। ফাস্ট-বোলাররা থাকলে ইংলণ্ডের পক্ষেও রান তোলা খুব সহজ হতো না।

দেওয়ালে পিঠ রেখে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটস্‌ম্যানরা খেলতে নামেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে উজ্জীবনের সমস্ত প্রত্যাশা চূর্ণ করে মাত্র ১১০ রাণে সকলে আউট হয়ে যান এবং প্রায় দেড় দিন আগেই খেলায় যবনিকাপাত ঘটে। এক ইনিংস ও ১২৪ রানে পরাজয়ের গ্লানি ও রাবার হারানোর দুঃখ বহন করে ভারতীয় দলকে মাঠ ত্যাগ করতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে আগামী ১৩ই জুলাই এগবাস্টন মাঠে ভারতীয় দলকে তৃতীয় টেস্ট প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। এর মধ্যে এই মাঠের টেস্ট-ক্রিকেট খেলার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। ইংলণ্ডের কোন কোন সংবাদপত্রে এই মাঠের অবস্থাকে সাব স্ট্যান্ডার্ড বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। মাঠের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছেন যে, উইকেট ভারতীয় দলের অনুকূলে হবে।

এখন প্রশ্ন কেন এই ব্যর্থতা। ভারতের মত উপমহাদেশে প্রতিভাধর খেলোয়াড়ের অভাবের কথা বললে লোকে হাসবে। পাকিস্থান তার স্বল্প পরিসর দেশে মাত্র বিশ বছরে বিশ্বের যে কোন দলের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। আর শতাধিক বর্ষের ক্রিকেট-ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষ এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়ছে কেন?

বর্তমান ভারতীয় দলের ব্যর্থতার কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমাদের ব্যাটস্‌ম্যানরা ফাস্টবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না। এর মূল কারণ ভারতে ফাস্ট-বোলার তৈয়ার করা হয় না এবং ফাস্ট-বোলিং-এর বিরুদ্ধে খেলার অনুশীলন করা হয় না। দেশে ফাস্টবোলার না থাকলে অনুশীলন কি ভাবেই বা সম্ভব। তাই সর্বাগ্রে ফাস্টবোলার তৈরীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। একথা আজ নতুন নয়। মহম্মদ নিসার, অমর সিং, সুঁটে ব্যানার্জি এবং সাম্প্রতিককালে দাত্তু ফাদকারের পরে ভারতে কোন ফাস্টবলার তৈরী হল না। এর মূল কারণ অক্ষমতা ঢাকবার জন্য ভারতের ক্রিকেট মাঠে ডেড অর্থাৎ প্রাণহীন উইকেট রচনা। ইদানিং এমনভাবে পিচ্‌ হচ্ছে যাতে কোন বোলিংই কার্যকর হতে পারে না। বোলার বা ব্যাটস্‌ম্যান তৈরী করতে হলে এর বিপরীত উইকেট দরকার। তরুণ খেলোয়াড়দের কোচিং দিয়ে উপযুক্ত করে তৈরী করার পরিবর্তে অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টা করে আমরা আজ বিপদ ডেকে এনেছি। আমাদের ব্যাটস্‌ম্যানরা আর ফাস্টবোলিং-এর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে না। আর আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগে যে কোন বিদেশী দল প্রচুর রান তুলে আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়। আমাদের ক্রিকেট কর্তারা এই অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। দেশের মর্যাদার প্রশ্নেও তাঁদের এই নিরুত্তাপ মনোভাব বিস্ময়জনক।

তারা উদাসীন থাকলেও সাধারণ মানুষের মনে ভারতের পরাজয় গভীর রেখাপাত করেছে। তাই লণ্ডনের ভারতীয় জিমখানা দলের চৌকশ খেলোয়াড় ৩৫ বৎসর বয়স্ক দয়াল সাহানী বিচলিত হয়ে তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে স্থান পাবার জন্যে নির্বাচকদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য ভারতীয় দলের হয়ে তিনি ভাল ফল দেখাতে পারবেন।

ভারতীয় দলে আহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আঘাতের ফলে সারদেশাই ইংলণ্ডে বাকী খেলাগুলোতে খেলতে পারবেন না। এদিকে ইয়র্কসায়ারের সঙ্গে খেলায় প্রসন্নর হাতেও চোট লেগেছে। বোরদেও আঘাত পেয়েছেন। তৃতীয় টেস্টে এঁরা খেলতে পারবেন কিনা সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় টেস্টের পর ইয়র্কসায়ারের কাছেও ভারতের এক ইনিংস ও ছ'রানে পরাজয় ঘটেছে। তাছাড়া দুজন খেলোয়াড়ও আহত হয়েছেন। ভারতীয় দলের বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য বিপর্যয়ে ম্রিয়মান হলে চলে না। আজকের বিপর্যয় ভবিষ্যতের শুভ-সূচনা হয়ে উঠতে পারে, যদি আমরা বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু সে প্রবৃত্তি আমাদের ক্রিকেট-কর্তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তবু আবার বলি তাঁরা সজাগ হোন, বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। দেশে সজীব ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুতি রচনা করুন। বোলারদের সহায়ক সজীব উইকেট রচনা করে ফাস্ট-বোলারদের তৈরী করুন। বিদেশ যেতে হলে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি ও অনুশীলনের পর খেলোয়াড়দের না পাঠালে এমনি হতাশার চিত্রই বারবার দেখতে হবে। আমাদের মোহ ভঙ্গ হবে কি?

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

প্রবীর মজুমদার

(ইস্টার্ণ রেল)

"ছেলেবেলায় দাদা বাড়ীর পাশের মাঠে প্র্যাক্‌টিস করতেন, আমি বল কুড়িয়ে দিতুম আর মনে-মনে ভাবতুম আমিও দাদার মত কলকাতায় গড়েরমাঠে খেলবো। দাদার প্র্যাক্‌টিস শেষ হয়ে গেলে আমি বল নিয়ে পড়তুম, যতক্ষণ না মা তাড়া দিয়ে স্কুলে পাঠাতেন; কিন্তু স্কুলে গিয়েও বা কি হবে? মনের মধ্যে তো ঐ একই চিন্তা—বল আর বল!"

বল নিয়ে মাতোয়ারা সে-দিনের সেই ছেলেটিই আজকের ইষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রবীর মজুমদার। প্রবীর ইস্টার্ণের লেফট্ হাফব্যাক। রোগা-পাত্‌লা চেহারা কিন্তু খেলোয়াড়ী মনটি নিটোল প্রত্যয়ে গড়া। প্রবীরের এখনও শেখার আছে অনেক কিন্তু যেটুকু শিখেছেন, সেটুকু নির্ভেজাল। পরিশ্রমে ফাঁকি দেন না, দায়িত্ব গ্রহণে পেছ্‌পা নন কখনও। সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে যেটুকু খেলেন সেটুকু চমক লাগানো না হলেও, কার্যকর। সবচেয়ে বড় কথা প্রবীরের খেলার মধ্যে "বিজ্ঞাপনী"ভাব নেই, নেই 'গ্যালারী শো'।

প্রবীরের যখন জন্ম, তখন ভারতের বুকে দুঃখের আঁধাররাত্রি নেমে এসেছে। সনটা ১৯৪৭, তারিখ ১লা জানুয়ারী। দেশব্যাপী এক রাজনৈতিক ঝড় বয়ে চলেছে তখন। পূর্ব-বাংলার ফরিদপুরেও সে ঝড়ের ঝাপ্‌টা থেকে রেহাই পায় নি। বাবা শ্রীসুধীরকুমার মজুমদার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে ফরিদপুরের সজ্জনকান্দা গ্রামকে পিছনে ফেলে চলে এলেন ভবিষ্যতের অনেক রংগীন আশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর শহীদনগর কলোনীতে।

প্রবীরের শিক্ষারম্ভ যাদবপুর আদর্শ শিক্ষায়তনে। স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন ১৯৬৫ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যামন্দির থেকে। এখন আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র।

ছেলেবেলায় খেলতেন কালীঘাট ব্রাত্যসংঘে, এখন কলকাতা তৃতীয় ডিভিসন লীগের অন্যতম দল। প্রবীরের বন্ধুভাগ্য ভাল। প্রতিবেশী কাজল মুখার্জি তাঁকে নিয়ে এলেন বাঘাদার কাছে। বাঘাদার কাছে পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেলেন প্রবীর। ১৯৬৪ সালে ইস্টার্ণের শিবিরে এলেও সে বছর এবং পরের বছরও তিনি সিনিয়র ডিভিসনে খেলতে পান নি। দু-বছর ধরে বাঘাবাবু, নিখিল নন্দী, সুশীল ভট্টাচার্য বাজিয়ে নিয়েছেন প্রবীরকে। রোভার্স বা ডুরাণ্ডে ইস্টার্ণ রেলওয়ের প্রতিনিধিত্ব করলেও ১৯৬৬ সালের আগে প্রবীর সিনিয়র ডিভিসন খেলার সুযোগ পান নি।

আনন্দমোহন কলেজে পড়ার সূত্রে ১৯৬৬ সালে প্রবীর মজুমদার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় (সগর) চ্যাম্পিয়ন কলকাতা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই বছরই ম্যানিলায় আয়োজিত এশীয় যুব-ফুটবলে ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। ম্যানিলার আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে প্রবীর খেলেছেন সিংগাপুর, ফরমোজা ও জাপানের বিরুদ্ধে। বছরের শেষদিকে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও তিনি ইষ্টার্ণ রেলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রবীরের বিশ্বাস, অনুশীলনই খেলোয়াড়কে নির্ভুল পথে নিয়ে যায়।

দেবী দত্ত

(এরিয়ান)

এই সেদিনের ঘটনা, এরিয়ান-তাঁবু জয়োল্লাসে ভেঙ্গে পড়েছে। ছোট-খাটো জয় নয়—মোহনবাগানকে হারিয়ে ফিরে এসেছে এগারোটি তরুণছেলে। কাঁধে-কাঁধেই এই এগারোজন পৌঁছে গেলেন মোহনবাগান মাঠ থেকে নিজেদের তাঁবুতে।

সেদিনের এই এগারোটি ছেলের মধ্যে দেবীদাস দত্তও একজন। পক্ষকাল আগে মোহনবাগান-বিজয়ী এরিয়ান দলের অন্যতম খেলোয়াড় দেবী। আসর মাৎ করেছিলেন দেবী দিনের শেষ প্রহরে, অন্তিমপর্বে দেবীর সেই হেডটিই শক্তিধর মোহনবাগানকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। হার হোল মোহনবাগানের ১—২ গোলের ব্যবধানে, আগের গোলটি করেছিলেন এরিয়ানের লেফ্‌টআউট অসীম বসু। দেবী সেন্টার ফরওয়ার্ড।

কিন্তু দেবীকে কলকাতা ময়দানের কতজনই বা চেনেন? নাম জানলেও—মুখ চেনেন না। বাড়ন্ত গড়ন দেবীর, ফর্সা টক্‌টকে চেহারা। দুপায়ে সমান সট্, হেড করেন চমৎকার। ঠিক মুক্তঅঙ্গনে হরিণশিশুর মত। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যেই দেবী দত্ত কলকাতার কুলীন ক্লাবগুলির রীতিমত নজরে পড়ে গেছেন।

পড়বেন নাই বা কেন? কঠোর পরিশ্রমী দেবী, খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেবী হাল ছাড়েন না। একটি গোলের সুযোগ নষ্ট করলে দুটি দিয়ে সেই ভুল শুধরে নেবার প্রয়াস পান।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেবীদাস দত্তের জন্ম হুগলী জেলার সিঙ্গুরে। লেখাপড়া করেছেন সিঙ্গুর মহামায়া হাইস্কুলে, গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সে এবং বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্সের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে। দেবী সর্বপ্রথমে নজরে পড়েছিলেন জর্জ টেলিগ্রাফের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীপতি মল্লিকের। সিঙ্গুর ক্লাব থেকে ১৯৬২ সালে এলেন চন্দননগর ন্যাশনাল ক্লাবে, চন্দননগরের এই ক্লাবে খেলার সূত্রে আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি হুগলীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৪ সালে তিনিই ছিলেন চন্দননগর জেলা দলের অধিনায়ক। ১৯৬২ সালে চন্দননগরের হয়ে প্রথম আই-এফ-এ শীল্ডে খেলেন।

ভাণ্ডারহাটিতে একটি ফাইনাল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত কোচ ল্যাংচাদা। পরের বছর (১৯৬৩) দেবীকে তিনি ধরে নিয়ে এলেন বালী প্রতিভায়। ১৯৬৫ সালে খেললেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে। ১৯৬৬ সালে আবার বালী প্রতিভায়, ১৯৬৭ সালে এলেন এরিয়ানে।

দেবী দত্ত কলকাতার বাইরে ১৯৬৬ সালে বালী প্রতিভার পক্ষে রোভার্স কাপে খেলেছেন বোম্বাইয়ে, কলিঙ্গ কাপে খেলেছেন কটকে; তার আগের বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে শিলচর ক্যাপ্টেন এম এম দত্ত ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত অডিট ফুটবল প্রতিযোগিতায়—দেবী এ জি বেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। ফাইনালে দিল্লীর বিরুদ্ধে এ জি বেঙ্গল এক গোলে জিতেছিল এবং দিনের সেই একমাত্র গোলটি দিয়েছিলেন দেবী দত্ত।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের খেলাধুলা

নকুল চট্টোপাধ্যায়

কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষে এল তখন তাদের কাছে খেলাধুলো বা আমোদপ্রমোদের চেয়েও বেশী আকর্ষণের বস্তু ছিল অল্পসময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করা। কিন্তু চিরদিন তো আর সমান যায় না—দিনকাল পাল্টালো, কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি-নীতি পাল্টালো আর পাল্টালো কোম্পানীর কর্মকর্তাও। এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহের পরিবর্তিত রূপও সকলের কাছে কাম্য হয়ে উঠল। আমদানী হলো অবসর বিনোদনের জন্যে নানারকমের খেলাধুলোর।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেকালে প্রচলিত খেলাধুলোর অনেক রমণীয় সংবাদই পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, কোন খেলাধুলোই খুব বেশীদিন ধরে সেকালের ক্রীড়াজগতে রাজত্ব করতে পারেনি। একদিন যে খেলা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তাই আবার পরবর্তীকালে অবহেলিত হয়েছে। কারণ খুব স্পষ্ট। এই জনপ্রিয়তা নির্ভর করত খেলোয়াড়দের ওপর। যখনই কোন বিশেষ ধরনের খেলার রাজ্যে কোন প্রতিভা-সম্পন্ন খেলোয়াড়ের আবির্ভাব হতো সঙ্গে সঙ্গে সে খেলা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতো। আর যদি কোন বিশেষ ধরনের খেলা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সমর্থ হতো তাহলে তো আর কথাই নেই।

রেস : সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল রেসিং বা রেস। বর্তমানে যে ধরনের ঘোড়দৌড় বা রেস হয় তার সঙ্গে অবশ্য সেকালের রেসের অনেক পার্থক্য ছিল। তবে ঘোড়দৌড় যে সেকালের ইংরেজ সমাজে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল তার প্রমাণ মেলে সমসাময়িক পত্রিকার পাতায়। ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র "হিকীর বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, এ সংবাদপত্রে রেসখেলার কয়েকটি চমকপ্রদ সংবাদ ছাপা হয়েছিল। এই সংবাদপত্র থেকেই জানা যায় যে সেকালের ঘোড়দৌড় উপলক্ষে যে ভোজের আয়োজন হতো জনসাধারণের আকর্ষণ তার প্রতিই ছিল বেশী। রেসের মাঠে সেদিন ঘোড়দৌড় ছিল গৌণ, মুখ্যতঃ ছিল খেলার শেষে ভোজ।

যারা রেসের টিকিট কিনত তাদের আগে থেকেই নিমন্ত্রণ জানানো হতো আর সেই নিমন্ত্রণপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকত "গ্রাণ্ড ফিস্টের" কথা। সেই উপলক্ষে যে বলনাচের আয়োজন করা হবে সে কথাও নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ থাকত। এই সমস্ত রেসে সাধারণতঃ টাট্টু-ঘোড়া ব্যবহার করা হতো। বর্তমান কালের মতই অষ্টাদশ শতাব্দীর সংবাদপত্রেও নিয়মিতভাবে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের সংবাদ পরিবেশন করা হতো। প্রসঙ্গতঃ একটি সংবাদপত্রের বিবরণীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

> "After breakfast the Company adjourned to an adjoining tent of very capacious dimensions, handsomely fitted up, and boarded for the purposes of dancing. Country dances commenced in two sets and were kept up with the utmost gaiety till two in the afternoon".

যে সমস্ত টাট্টু-ঘোড়া রেসে যোগদান করতো তাদের দৌড়বার সময় পিঠের উপর নয় স্টোন সাত পাউণ্ড ওজনের কোন জিনিষ নিয়ে দৌড়তে হত। আজকের রেসে দেখা যায়, যে ঘোড়া যত বেশী প্রাইজ পেয়েছে বা বাজী জিতেছে তারই কদর বেশী। সেকালে কিন্তু নিয়ম ছিল অন্য-রকমের। বাজী জেতা বা প্রাইজ পাওয়াটাই ছিল যেন ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন। কারণ অনেক রেসেই যে ঘোড়া কোন বাজী জেতেনি বা প্রাইজ পায়নি তাদেরই মাত্র দৌড়তে দেওয়া হতো। এতে অবশ্য কম শক্তিমান ঘোড়ারাও রেসে দৌড়বার সুযোগ পেত।

রেসের বাজার বলতে সেকালে কলকাতা আর বেনারসই ছিল বিখ্যাত। বেনারসে সাধারণতঃ প্রতিবছরের ৯ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রোজই ঘোড়দৌড় হত।

রেস ও সরকারী মনোভাব :

লর্ড ওয়েলেসলী ছিলেন একটু অন্য-ধরনের মানুষ। তিনি গবর্নর-জেনারেল হয়ে ভারতবর্ষে আসার পর দেখা গেল যে, সরকারী মহলে খেলোধুলো ও আমোদ-প্রমোদের রেওয়াজ কমে আসতে লাগল। তিনি ঘোড়দৌড়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁরই শাসনকালে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্র থেকে অবগত হওয়া যায় যে কলকাতারই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনদিন ধরে "গ্রাণ্ড-স্টাইলে" ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু দিনকাল আবার পাল্টালো। লর্ড ময়রা যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন আবার তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রীড়াজগত মেতে উঠল। সেকালে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হতো সকালবেলা। কিন্তু বেশীদিন যেতে না যেতেই সকালবেলা রেস-খেলার পরিবর্তে সময় পাল্টিয়ে রেসের আয়োজন হলো বিকেলে। সকালবেলা রেস-খেলার অসুবিধার কারণ সংবাদপত্রের বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> "The race stand was covered with straw and a carpet and the spectators were glad to wear their heavy coats to keep out the bitter cold of the morning. But ere the races were over the heat had increased to such an extent as to make the race goer decidedly uncomfortable, and he was glad to return to comparative cool of his bungalow, there to divest himself of all that was not absolutely necessary".

নৌকা-বাইচ

আজকের মত সেকালে রাস্তাঘাট বা যানবাহন এত উন্নত ছিল না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে জলপথেই যাতায়াত করতে হত। অনেক ইংরেজই তাই তাদের জলযানের জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থব্যয় করত। জলযানটিকে সুন্দর ও মনোরম করে সাজাবার দিকে অনেকেরই ঝোঁক ছিল। আর তার ফলস্বরূপ এল "স্নেক-বোট"। যাদের পয়সা ছিল তাদের প্রায় সকলেরই এটি ছিল একটি আবশ্যিক সামগ্রী। এতে করে সন্ধ্যেবেলা গঙ্গার বুকে নৌকা-বিহার চলত। বর্তমানে অবশ্য গঙ্গার বুকে আর সেই স্নেক-বোট বা অন্যরকমের প্লেজার-বোট দেখা যায় না।

এই স্নেক-বোটগুলো অত্যন্ত লম্বা ও সরু। কখনও কখনও দৈর্ঘ্যে ১০০ ফিট হতো কিন্তু প্রস্থে সাধারণতঃ ৮ ফিটের বেশী হত না। বেশীরভাগ স্নেক-বোটই মনোরমভাবে সাজান থাকত আর তার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ও হত। ১৮১৩ সালে কলকাতায় অনেকগুলো নৌকো-বাইচ হয়েছিল আর এই সময় থেকেই নৌকো-বাইচ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উৎসাহী দর্শকরা গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে নৌকা-বাইচ দেখত।

ক্রিকেট ও শিকার :

যে সমস্ত খেলা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছিল তার মধ্যে ক্রিকেট অন্যতম। এ খেলা এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবানদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকেই সেকালে এ খেলায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল যে বিদেশী সম্প্রদায়ও বিস্মিত হতে বাধ্য হয়েছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পত্র-পত্রিকা থেকে জানতে পারা যায় যে আকাশে বেলুন উড়ানো তখন বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট খেলা ও বেলুন উড়ানো ছাড়াও তখনকার বিদেশী সিভিলিয়ানদের যেটি বেশী আকর্ষণ করতো সেটি হচ্ছে শিকার। সেকালে ছুটির দিনে প্রায়ই দেখা যেত বিদেশী সিভিলিয়ানদের শিকার পার্টিতে যেতে।

মুরগীর লড়াই :

মুরগীর লড়াইও ইংরেজদের কাছে কম আকর্ষণীয় ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে "ফ্রায়ার" এ খেলার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

> "They have a breed of cocks as big as Turkeys, which they arm with razors, tied flat under their claws, and faulched two inches instead of gavelocks, with which they slash one another mortally; so that the dispute endures not long, for most an end the first or second blow decided it".

ইংরেজরা প্রথমদিকে আকৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে আর এ খেলার প্রতি খুব মনোযোগ দেয়নি। তবে প্রকাশ্যে এ খেলার পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও অনেকেই গোপনে এ খেলার মাধ্যমে অবসরবিনোদন করতেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তেরো ।।

দীপ্তি মেস ছেড়ে চ'লে গেছে শুনে প্রকৃতই দমে গিয়েছিলেন রঙ্গময়ী, যদিও পরে হাসি মস্করা দিয়ে সে ভাবটা আর প্রকাশ পেতে দিলেন না। দীপ্তি মেয়েটি ছিল যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সবদিক দিয়ে চৌকশ। অথচ সীমা অতিক্রম করে নয়, আপাত-শৈথিল্যের অন্তরালে রঙ্গময়ী আর কমলার সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় সেটা হওয়ারই জো নেই এ মেসে।

ও'র বাছ ই ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল, উনি যে তেমন-তেমনই একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঘটিয়ে সুরবালার ছেলেকে একালের মতো করে দেবেন বলে ভরসা দিলেন সেটা দীপ্তিকেই মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে। তাছাড়া আরও একটা কথা ছিল, হাসি তামাসায় আধুনিকতাকে যতই লাগাম ঢিলে দিন, উনি গোড়ার দিকটা পুরাতনীই, সে কালেরই। হয়তো বাড়াবাড়ির দিকে কোষ্ঠীর গণ-রাশির কথা উঠলে তেমন তেমন অবস্থায় মুখে পান দোক্তা ফেলে দিয়ে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বলেও থাকবেন—"নেঃ, এ-যুগে আর অত ধরলে চলে না"—; কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

মেসের সব মেয়ের পরিচয়ই জানা, দীপ্তিই ছিল সব দিক থেকে উপযোগী। আর একটি আছে, তন্দ্রা। কিন্তু সে শুধু ঐ বিচারের দিক দিয়ে জাতি-গোত্রে। সে বেচারি নিজেই এত লজ্জাতুর, গুটিসুটিমারা [illegible]

আধুনিক যুবকের ছাঁচে গড়ে তুলতে পারবে এ সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

দীপ্তি যেতে তাই বেশ দমে গেলেন রঙ্গময়ী। কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, তারপরেই তাঁর দৃষ্টি পাত্রান্তরে গিয়ে পড়ল। যদিও আপন হ'তে নয়, সুরবালা একদিন ইঙ্গিতটা দিলেন।

প্রথম দিনের সাক্ষাতে আর্দ্রার ভেতরটা দেখবার সুযোগ পেলেন না রঙ্গময়ী। বেশ যেন গায়-পড়া মেয়েটি, প্রণাম করল, শান্ত-ভাবে পাশে এসে বসল; ওরা "ভিজে বেড়াল" বলে পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু তার তো কিছুই দেখলেন না। চেহারাও খানকটা আকৃষ্ট করে, সেদিকেও বেশ শ্রী আছে। বেশ ভালো লাগল। বাইরে থেকে "হোম"-এর জন্য সওগাত কিছু নিয়ে এলে দু'এক খানা বাড়তি আনেন; নূতন কেউ যদি এসে গিয়ে থাকে ও'র অবর্তমানে। এবার একটা বেশি ছিল ভেবে, দিয়ে দিলেন ওকে, বললেন—"রাখো, তারপর খোঁজ নিচ্ছি কোথায় মিনার কাজ করে এখানে, তোমারটাতেও নাম লিখিয়ে দোব।"

এরপর রঙ্গময়ীর তিনমাসের পরিক্রমার গল্প এসে পড়ল একে একে। আর্দ্রাকে ঐ পর্যন্তই রইল দেখা।

দ্বিতীয়বার দেখলেন সনাতনের বাড়ীতে, সেও প্রায় দিন দশেক পরে। কলকাতায় অনেকগুলি আত্মীয়, কুটুম্ব, অনেক-দিন পরে এসেছেন, তাদের বাড়ি একবার করে ঘুরে আসতেই কেটে গেলো কটা দিন। [illegible]

চলছে। এরপরই ভেঙ্গে যাবে। "কৈরে, হেমা—এসুম আমি"—বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন রঙ্গময়ী।

আজ প্রায় একটানা জিতে গিয়েও সব চাতুরী সত্ত্বেও এই হাতটাতে বেশ কোণঠাসা হয়ে গেছে আর্দ্রা, ও'কে দেখে বলে উঠল—"এ যে রঙ্গঠানদি এসে গেছেন! বাব্বাঃ, কদিন পরে ঠানদিদি! "হোম" এও যাননি কতদিন—বোধহয় দু সপ্তাহ—অথচ ওদের মুখে শুনি হপ্তায় দুটো দিন না গেলে নাকি আপনার ভাত হজম হয় না।—আমার আবার সেই একবারটি একটখানির জন্যে দেখা—"।

—একেবারে একরাশ কথা এনে তাদের দিকটা চাপা দিল। তাস ছেড়ে ঘুরেও বসেছে। এত হারের পর সুনিশ্চিত বিজয়ের মুখে ওর এই ধূর্তামিতে সবাই একটু ধাঁধায় পড়ে গেছে, তমাল বলল—"বাঃ, ঘুরে বসলে যে আর্দ্রাদি? হাতটা শেষ ক'রতে হবে না?"

আর্দ্রা একট মৃদু তিরস্কারই ক'রল—'চুপ কর দিকিন, ঠানদি এসেছেন, কোথায় তাঁর সঙ্গে একটু কথা কইব, না, তাস—তাস!... তোমাদের যেমন তাস ধ্যান, তাস জ্ঞান আমার যদি সে রকম না হয়।...বলুন ঠানদিদি?"

"কী ভয়ানক ধূর্ত রে বাবা!—হেরে যাচ্ছেন দেখে, অত বেইমানী করেও..."

"ইস, হেরে যাচ্ছি! তবে দেখবে?"

—যেন আবার শুরু করবারই একটা ভাঁওতা দিতে যাবে, সন্দীপও ছিল আজ, জড়সড় হ'য়ে উঠে পড়ল। ওর এ দুর্বলতা-[illegible]

ঢেকে হেসে ব'লে উঠল "ঐ নাও, দাদাই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন তোমার তার বেলা কিছু নয়, দাদা যে!...চলুন ঠানদি, আপনার গল্প শোনা যাক্, সেদিন শুনে আশ মেটেনি। ...ঐ মাসিমারাও এসেছেন।"

রঙ্গময়ীর গল্প শুষ্ক বিবরণ হয়েই শেষ হয় না। বর্ণনায়, টিকা টিপ্পনীতে সরস করে বলবার বেশ ক্ষমতা আছে, যার জন্য শ্রোতৃদের রসনাও একটু সরস হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। সেদিন মেসে নিরীহ মেয়েটির মতো একমনে শুনেই গিয়েছিল আর্দ্রা, তবে আজ রঙ্গময়ী ওর মুক্ত কথাবার্তার একেবারে মাঝখানে এসে পড়ায় সেই যে সঙ্কোচ খানিকটা ভেঙ্গে গেল, আর বাধল না মাঝে মাঝে নিজের রসনাকে একটু প্রশ্রয় দিতে। ওর ক্ষমতাও আছে। এর ফলে এদিনের গল্পে মাঝে মাঝে হাসির বীচি-ভঙ্গ উঠে শুধুই যে জমে উঠল আসরটা তাই নয়, ওর পরিচয়টাও আরও পূর্ণতর হয়ে উঠল ও'র কাছে। আরও যেন ভালো লাগল ওকে।

এরপর সুরবালার কথায় ওর সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্যও এসে পড়ল, সে ঔৎসুক্যটা নাকি হেমাঙ্গিনী সেদিন সুরবালার মনে জড়িয়ে তুলেছিলেন।

সুরবালার আজও কতকটা সেই ভাব; অন্যমনস্ক, যেন কিছু বলতে চান। ডেকেই নেবেন ঠিক করেছিলেন, তার আগে উনি নিজেই বললেন—"চলো ঠানদিদি, একটু ঘুরে আসি তোমাদের বাড়ি থেকে, সেদিন রাঙ্গা বৌয়ের সঙ্গে ভালো করে কথাই হয়নি। কি সব নিয়ে লিখে পাঠিয়েছেন তা নিয়ে আমার বোঝাপড়াও করবার আছে।"

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, ছাতের ওপর মাদুর পাতিয়ে বসে তুললেন কথাটা, ও'র যেমন একটু ঘুরিয়ে অন্যদিক দিয়ে আরম্ভ করা অভ্যাস।

প্রথমে রঙ্গময়ীই প্রশ্ন করলেন—"আজও যেন কি একটা বলবি মনে হচ্ছিল রে, কি' বল?" —পান-দোক্তা মুখে দিয়ে প্রস্তুত হলেন।

"তেমন কিছু নয় ঠানদি"।—আরম্ভ ক'রে দিলেন সুরবালা—"যা ভাববার সে তো তুমিই ভাবছ। তবে সেই যে তুমি বললে—বেশ একটু চালাক-চতুর মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে—কিযে বলে ভালো, ছেলেরও এ-ভাবটা কেটে যেতে পারে—শুনে অব্দি কথাগুলো মনে যেন খচ্ খচ্ করছে, ভাবছি হ্যাঁ গা, তাই কি হয়? অথচ ঠানদিদি যখন বলছেন, কাটাও তো যায় না কথাটা।..."

একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন রঙ্গময়ী, পান চিবুনো একটু বন্ধ হয়ে গেলো।

"তাই যেন বলছিলে না?—একটি বেশ সেয়ানা দেখে মেয়ে..."

উসকে দিলেন সুরবালা।

"বলেছিলাম বৈকি, তবে......"

আবার চুপ করে গেলেন রঙ্গময়ী। আসল কথা, যে-দীপ্তিতে উপলক্ষ্য ক'রে বলা সে চলে যেতে—তাও বিবাহ হয়ে চলে যেতে ও'র পরিকল্পনাটা আপাতত নিরর্থক হয়ে গেছে। চুপ করে নিয়ে মনে মনে বোধহয় দ্বিতীয় কাউকে খুঁজছিলেন। সুরবালা মনের অধীরতাটুকু চেপে প্রশ্ন করলেন—"তবে ব'লে যে থেমে গেলে ঠানদিদি?"

"তবে বলছিলাম এই জন্যে যে, শুধু সেয়ানা দেখলেই চলবে না তো ভাই। আজকালকার মেয়ে সাবধানেই এগুতে হবে তো?"

"ওমা, তা হবে না?"—একটু শুষ্ক কণ্ঠেই উত্তর করলেন সুরবালা। ও'র উপলক্ষ্য আর্দ্রা, একটু দমে গেছেন, কাথাটা তোলবার মুখেই আজ রঙ্গময়ীর ভাবান্তর দেখে এবং দমে গেছেন বলেই আরও বেশি করেই ও'র সুরে সুর মিশিয়ে বললেন—"বুঝি না কি আজকালকার মেয়েদের মধ্যে বেছে নেওয়া কত শক্ত?"

তারপরই কিন্তু প্রসঙ্গটা চালু রাখবার জন্যই একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বললেন—"তবুও তুমি যে বললে কথাটা সেদিন—তাই কেমন ধোঁকা লাগল কিনা, তাই তুললাম কথাটা। বললাম না?—কেমন যেন খচখচ করছিল মনে কথাগুলো—আর সবাই ছেড়ে রঙ্গঠানদিই একথা বলতে গেলেন কেন—যিনি নাকি এত দেখেছেন—দেখতে-শুনতে আর কিছু বাকি নেই...

"বলেছিলাম—একটি মেয়ে নজরের সামনে ছিল বোন..."

"কে দিদিমণি?"—উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ক'রে মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সুরবালা।

"মেসের একটি মেয়ে, সুরো। কিন্তু সেদিন গিয়ে শুনলাম সে বিয়ে হ'য়ে চলে গেছে—ঠিক যেমনটি চেয়ে ছিলাম চালাক-চতুর বলিয়ে-কইয়ে হয়েও বেহয়া-বাচাল নয়, কিন্তু সে আর ভেবে কি হবে?"

নৈরাশ্যের সুরই বেজে উঠল রঙ্গময়ীর কণ্ঠে। "ঐ নাও, মেসের কথায় আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেলো।"—আর বিলম্ব না ক'রে এক নিঃশ্বাসেই বলে গেলেন সুরবালা—"একটি মেয়ে ঐখান থেকেই আসছে মাঝে মাঝে তাস খেলার শখ—খেলেও মন্দ নয় —এদিকে তুমি যেমন বললে বেশ চালাক-চতুরই তো মনে হয়..."

"আদু বলে যে মেয়েটিকে দেখলাম?" ধক্ করে উঠল সুরবালার বুকটা। একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললেন—"হ্যাঁ, এটিই। ...তা কেমন মনে হোলো ঠানদি?"

এবার যে একটু চুপ করে গেলেন রঙ্গময়ী তা হঠাৎ একরাশ চিন্তা হুড়মুড় করে এসে পড়েছে বলে মাথায়। বললেন—"একটু দেখতে দে ভাই দুটো দিন চুপ করে। ঐ তো বললাম—সেয়ানা হলেই বাচাল-বেহায়া হওয়ারও একটু যেন ঝোঁক থাকে না? —কিন্তু আমাদের ঘরে তো তা চলবে না..."

"চলে কখনও ঠানদিদি; বলো?" —কি করে যে মাঝামাঝি রেখে যাবেন সব কথা, যেন ভেবে পাচ্ছেন না সুরবালা। শেষে ওপথই ছেড়ে দিয়ে বললেন—"তাহলে তোমায় সব কথা বলি ঠানদিদি। আমার নিজের কি নজর গেছে? মুয়ে গেছেন, আমার কি আছেই সে ক্ষমতা? তার ওপর যা এক ভাবনা নিয়ে পড়েছি। আমায় বললেন বড়বৌদি—তাঁর নাকি খুব চোখে লেগেছে। (একবার আড়চোখে চেয়ে নিলেন সুরবালা) আমি বললাম—আজকালকার মেয়ে চেনা যে বড় শক্ত বৌদি—এমনি বাইরে বাইরে মন্দ কি? দেখতে শুনতেও—নিতান্ত 'আহা মরি' না হোক, ছিরি আছে। (আর একবার দেখে নিয়ে) বললাম তবু—আগে রঙ্গঠানদিকে আসতে দাও বাপু—এসবের জহুরি তিনিই এক আছেন—তিনিই দেখুন শুনুন, বুঝুন, তারপর যেমন বলবেন—"

"স্বঘর"? —চিন্তার মধ্যেই প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী অন্যমনস্কভাবে শুনতে শুনতে।

"স্ব-ঘর মানে?" —ভাজের ওপর যেন অধৈর্য—হঠকারিতার দোষটা চাপাবার জন্যই বললেন সুরবালা—"স্বঘর তো বটেই, বৌদি ওদিকে কুষ্ঠী-ঠিকুজী পর্যন্ত মেলাবার জন্যে তোয়ের হয়ে বসে আছেন। তুমি এসে গেছ এবার দেখো ঠানদিদি—বাড়াবাড়ি না করে ফেলেন।"

"সে আমি বলে দেবো খন....."

"না, না, তোমার কিছু বলে কাজ নেই

ঠানদি!"— প্রায় আঁতকেই উঠলেন সুরবালা। বললেন—"তোমার ঐ কেমন একটা রোগ, কথা পেটে রাখতে পার না। শেষকালে বৌদি ভাবনে আমি তুলে দিয়েছি তোমার কানে—লাগুক ননদ-ভাজে, রগড়ে মানুষ, তুমি বসে বসে রগড় দেখো। ...না, আমিই মানা করে দেবো তোমার নাম করে—ঠানদিদি পছন্দ করেন না একেবারে এত বাড়াবাড়ি..."

(চৌদ্দ)

এসব স্বয়ং সুরবালার দিকেরই কথা। উনিই ফন্দিফিকির করে আর্দ্রার পুরো নাম জেনে এবার কি করে বাড়ির পরিচয়-ঠিকানা জোগাড় করে কি করে রাশিচক্রের খোঁজ পাওয়া যায় চিন্তা করছিলেন, ভাজের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বলা। রঙ্গময়ীর মনের ভাবটা জেনে নিয়ে আর অবশ্য এগুলেন না ও-দিকে।

এরপর ওঁর কাজ হোল আরও বেশি করে লক্ষ্য রেখে যাওয়া আর্দ্রার ওপর, আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা রঙ্গময়ীকে। সামনা-সামনি লক্ষ্য রাখায় ওঁর নিজের খানিকটা অসুবিধা আছে—বিশেষ করে যে সময়টা বেশি দরকার, অর্থাৎ যেদিন আর্দ্রা আর সন্দীপ দুজনেই উপস্থিত এবং তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দুজনের মনের ভাবটা বোঝবার সুযোগ বেশি। কিন্তু ছেলে আসলে ওঁর নিজের বলে মন কেমন সায় দেয় না; কেমন যেন লজ্জা-লজ্জাই করে। বিশেষ করে মনে এইরকম একটা গোয়েন্দা-গিরির ভাব থাকে। এরকম অবস্থায় ঐ কাজে-অকাজে বারান্দা দিয়ে যাওয়া-আসা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

যেদিন শুধু আর্দ্রাই থাকে সেদিন অজকাল প্রায় এসে বসেন, কদাচিৎ তাস হাতে করে, নয়তো পাশে বসে শুধু বুদ্ধি জুগিয়ে দেওয়া। তাও খুবই কম। ওঁর মন থাকে—আর্দ্রা কি বলল, তার মধ্যে কতটা রইল বুদ্ধির দীপ্তি কতটা বিদ্রূপ সমালোচনার মাপকাঠিতে বাচালতা বলে মনে হতে পারে।

বিদ্রূপ বা সমালোচক, যা নাকি উনি নিজে নন। ওঁর কেমন যেন সব কিছুই ভালো লাগে আর্দ্রার আচরণে। কোথায় মনের মধ্যে কি করে একটি প্রীতির উৎস খুলে গেছে, ওর তর্ক-বিদ্রূপের শাণিত ভাষা, ওর কপট ক্রোধ—সব কিছুতেই অভিসিঞ্চিত করে দেয়। এক একদিন কি যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে এমন অনামনস্ক হয়ে যান যে অন্যের টিপ্পনীও বর্ষিত হয় ওঁর ওপর—"সুরপিসি কিন্তু ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন তো চেয়েই আছেন—দেখছি কিনা সেই থেকে" "...হাঃ, সুরদিদি আবার আর্দ্রার বিচার করবেন—কি যাদু যে করে দিয়েছে ওঁকে!......"

ওঁর পক্ষপাতিত্বটুকু দিনদিনই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সবার কাছে।

আর্দ্রা হারে না। বলে—"নাঃ, ছেলে খকাহস্ত, তার ওপর উনিও যোগ দিন, না হলে তোমাদের আশ মিটবে কি করে?"

পক্ষপাতিত্বটুকু যখন মনে হয় বড় জাহির হয়ে পড়েছে তখন কখন কখনও ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে সুরবালা বলেন—"নাঃ, এটা তোমার আমি মেনে নিতে পারলাম না আদু"। কিম্বা—"হোক না খেলা, তবু এতটা যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না?"

বিরোধীর দল হৈচৈ করে ওঠে সমর্থন পেয়ে—"ঐ নাও, বাসুকীর টনকও নড়েছে, ...অমন যে সুরপিসি তিনিও আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছেন না।......"

"কপাল মন্দ আমার!" মুখটা ভার করে বলে আর্দ্রা—"যা চাপাচাপি তোমাদের, এতগুলি শত্রুর মধ্যে যাও একজন বন্ধু ছিলেন, তিনিও গেলেন উল্টে!" কিম্বা—"বেশ, আপনিও যখন ঐ দলে তখন আদুরেই দোষ।"

"আদুরীরই দোষ"। আড়ে দৃষ্টি হেনে টিপ্পনী কল কেউ।

"আদুরী বলেই তো এত হিংসে!" —তির্যক দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে মাথা দুলিয়ে উত্তর দেয় আর্দ্রা।

চলে আবার। লক্ষ্য রেখে যান সুরবালা।

বেশি লক্ষ্য রাখার সুযোগ পান রঙ্গময়ী। ওঁর মতো রহস্যপ্রিয় মানুষ—তা সে পুরুষই হোক, স্ত্রীই হোক—বয়সের তারতম্য রক্ষা করে যেতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপরও নয়, বিশেষ করে যদি সেটা নিতান্তই রক্তের সম্বন্ধ না হোল। আলগা মুখ ফসকে যায়ই।

নূতন পরিচয়ের পর্দাটা কয়েকদিন রইল। তারপর ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসতে আসতে একেবারে গেল সরে। আর্দ্রার ক্ষেত্রে এটা যেন একটু তাড়াতাড়িই হোল। তার কারণ ওরও বলা মুখ, উত্তর-প্রত্যুত্তরে জায় ভালো; তাছাড়া ঘেঁটে-ঘুঁটে যখন ভাল করে পরখ করাই উদ্দেশ্য তখন চোখ কান সজাগ রেখে সুযোগ গড়েও তো নিতে হয়।

হয়েও গেল প্রায় মাসখানেক, উনি যে এসেছেন।

একদিনের কথা।

সেদিন আসরটি আবার বেশি গুলজার; খেলাও হচ্ছে বেশ রেষারেষির সঙ্গে, রঙ্গময়ী বাড়ির ভেতরের দিক থেকে কখন পাশে এসে বসেছেন, খেলার ঝোঁকে জানতে পারেনি আর্দ্রা, হঠাৎ কানের কাছে শুনল,—"বাঃ, ওটা কি হচ্ছে শুনি?" —ওর সেই একটা অপচেষ্টারই মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চাইল আর্দ্রা। ও যে ওঁর আসাটা জানতে পারেনি সেটা একেবারেই চেপে গিয়ে একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল—"আমি ভাবছি, রঙ্গঠানদি এলেন, এবার বেশ কানের মধ্যে মন্ত্র দেবেন; না, উল্টে গোয়েন্দাগিরি!"

"দেখছ আস্পদ্দা!" —তিরস্কারের ভঙ্গিতে চোখ দুটো একটু পাকিয়ে তুললেন রঙ্গময়ী, বললেন—"চুরি করবে, আবার দারোগাকেও জড়াবে তার সঙ্গে! কবে তোর কানে ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্র দিয়েছি লা?"

হাসি-মন্তব্যের সঙ্গে একটু গুলতান শুরু হয়ে গেছে, লক্ষ্য আর্দ্রাই। সে ওঁর চেয়েও গম্ভীরভাবে চোখ কপালে তুলে বলল—"বাঃ, তাসের চুরি আবার চুরি নাকি! নতুন জানলাম! ...তাহলে তো—তাহলে তো..."

চোখ ঘুরিয়ে দৃষ্টিটা ওঁর ওপর ফেলেই বলল—"তাহলে তো কোনদিন বলবেন আপনার দোক্তার কৌটটা চুরি করাও চুরিই!"

সঙ্গে সঙ্গে, ওর যেমন অভ্যাস, ওঁর কোলের দিকে হেলে পড়ে বলল—"না, ঠানদি, সত্যি বলছি, এমন মন-মাতানো গন্ধ ছাড়ে আপনার দোক্তায়, হয় লোভ, কোনদিন হয়তো দেখবেন......"

শঙ্কিতভাবে সরে বসেন রঙ্গময়ী। বলেন—"ক্ষ্যামা দাও, আর সে কোনদিনের ওপিক্ষের থেকে কাজ নেই বাছা। তুমি যা মেয়ে, এক্ষুনি লোপাট করে ভানুমতির খেল্ দেখাতে পার। ......সেই পকেটমারের গল্প শুনিসনি তোরা? —'দেখুন, ও আমায় মারতে আসছে' বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলে বাবুটিকে, তাকে খেদিয়ে দিতে এও ছেড়ে গিয়ে যতক্ষণ রাস্তা সাফ হবে, ততক্ষণে এদিকে বাবুর পকেটও সাফ!...... ঢের হয়েছে বাপু, তুমি একটু দূরেই থাক।"

হুল্লোড়ের মধ্যে নিজে আর একটু সরে বসলেন। আর্দ্রা ঠোঁট দুটোকে একটু জড়ো করে বলল—"তা বলে মনিব্যাগ চুরি আর দোক্তার কৌটো চুরি এক একথা মানতেই পারি না। তা হলে তো কুল চুরিও চুরি, ফুল চুরিও চুরি—কতবার যে করেছি ছেলেবেলায়!......"

"এর পরেই হাত পাকাতে পাকাতে..." —হয়তো ঠোঁটে একটু আটকে যায়। কিন্তু তোড় নেমেছে জিভে তখন, বেরিয়েই যায় মুখ দিয়ে রঙ্গময়ীর, একটু দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলেন—"এর পরেই মন চুরি—যা না ঐ পথ ধরে কত এগিয়ে যাবি।"

—বেটাছেলে কেউ আছে কিনা একটু দেখে নিয়ে।

একটু কুঁকড়ে যায়ই আর্দ্রা; কিন্তু হার মানে না। ঘুরে তাসগুলো হাতে সাজিয়ে নিতে নিতে হাসি ঠোঁটে টিপে বলে—"বাবাঃ, মন চুরির এত অলিগলি জানা আছে ঠানদির, পায়ের কাছে বসে ক' বছর শেখা যায়!"

আসরের হাসিটা একটু চেপে গিয়ে ভেতরের দিকে পথ খোঁজে। (ক্রমশঃ)

প্রমীলা
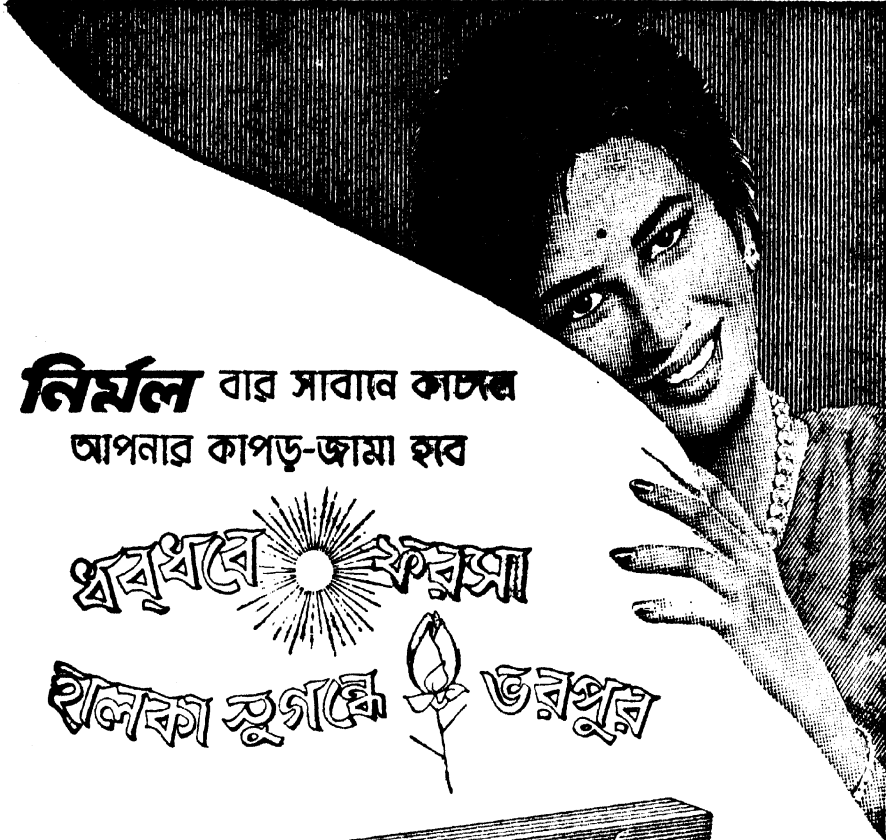
নতুনের সূচনা

আলো-আঁধারির চপল মাধুরীতে বাঁধা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। কখনো আলো আবার কখনো আঁধার। জীবনে অচল শিখরে বাধা পড়ে নেই কোনো কিছু। জীবন এগুচ্ছে আর সেই সঙ্গে উত্থান-পতন, কান্না-হাসিও রূপ বদলাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে দ্রুততালে এই ওঠানামার তরঙ্গ আমাদের দোলায় না, ভাসায় না, চিত্তে চিন্তার তুফান তোলে না। কিন্তু আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত কোন অসচেতন মুহূর্তে মৃদু ঘর্ষণে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তা বেশ উপলব্ধি করা যায়, তবে অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে, অন্তিম-মুহূর্তের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাও সেই সাক্ষ্যই দেবে। কারো ঝুলিতে ব্যতিক্রম যদি কিছু থাকে, তবে তা শুধু নিয়মের স্বপক্ষে জোর ওকালতির জন্যে। অন্য কোন উদ্দেশ্য এর নেই।

মূল লক্ষ্য থেকে আমরা কিছুটা দূরে সরে এসেছি। কিন্তু জীবনের সুপরিসর বৃত্তে যত্রতত্র ভ্রমণ করি না কেন, আবার মূলে ফিরে আসতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অন্তত আগ্রহের অভাব না ঘটলে মূলে ফিরে আসা যায় সহজেই। তাই জীবনে আলো-আঁধারির নিপুণ সমাবেশের আলোচনায় আমরা ফিরে আসতে বিশেষ কোন অসুবিধা অনুভব করছি না। আলোচনা পাল তুলে হালকা হাওয়ায় যেমন ভেসে যাচ্ছিলাম, তেমনি আবার উজান ঠেঙিয়ে ফিরে এলাম নিজস্ব ঘাটে—কষে নোঙর বাঁধলাম। এতক্ষণ যে ফেন উদ্গার করলাম, তা বিচ্যুতি নয়, আলোচনা প্রসঙ্গ পরিক্রমা মাত্র।

জীবনে আলো-আঁধারি আছে। এরই অন্য অর্থ দুঃখ-সুখ। আলোর সংকেত যখন যেদিকে হাতছানি দেবে, তখন সেদিকেই চলতে হবে—প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এরকম মানসিক দৃঢ়তার অভাব আজ আমাদের নিত্য বৈশিষ্ট্য। কি পারিবারিক জীবনে আর কি ব্যক্তিগত জীবনে সর্বত্রই ক্ষণভঙ্গুরতা আমাদের আশ্রয় করেছে। তাই দুঃখের সামান্য স্পর্শে স্বামী-স্ত্রীর সমধুর সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে আবার ব্যক্তিগত জীবনে চলার ছন্দে তাল ভঙ্গ হচ্ছে। দুটোই সমান বেদনাদায়ক—সমান ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আদর্শকে প্রতিবিম্বিত করে। এই বিশাল ক্ষণভঙ্গুরতার রাজত্বে সুদৃঢ় এবং বলীয়ান দৃষ্টান্ত যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ যখন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, সেই মুহূর্তে জাতির জীবনে চরম সংকট ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে আজ তাই সামাল-সামাল রব উঠেছে। এসময় নতুন জোয়ার আসবে। ঘরণী ঘর সামলাবে। ক্ষণিক বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠবে। আলো-আঁধারির সংমিশ্রণে হাস্যমুখর জীবনের মহিমাকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন পথনির্দেশ আসবে যুগের সারথি নারীর কাছে—গৃহাঙ্গনের শান্ত দিগবলয় উদ্ভাসিত করে।

গৃহিণী উবাচ

অন্যান্য অনেককিছুর মত এ-জিনিসটাও একেবারে অপ্রচলিত বলেই মনে হয়। দেশে-দেশে মেয়েদের নিয়ে কত না সমীক্ষার ব্যবস্থা—দেশের গৃহিণীদের সম্পর্কে দেশবাসীর কত না আগ্রহ। সে সবকিছু তারা থরে থরে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। সেজন্য দেশের গৃহিণীদের নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে গৃহিণীর সবচেয়ে কাছের মানুষটিও জানতেন তাঁর স্ত্রীর মনের কথা এবং বুঝতে পারেন দেশের আর দশজন গৃহিণীর সঙ্গে নিজের গৃহিণীর মিল-অমিল কোথায়। এতে যে শুধু কৌতূহল চরিতার্থ হয় তা নয়, গৃহিণীরাও বুঝতে পারেন তাঁরা ঘরের এক কোণে পড়ে নেই, দেশের সবাই তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চায়—শুনতে চায় তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা। দোষত্রুটি শুধরে তরুণরা নতুন সংসার বাঁধায় উৎসাহ পায়। মেয়েরা সংসারের কাজে পায় নতুন প্রেরণা। দেশে গৃহিণীরা যে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এই সমীক্ষা সেদিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

সম্প্রতি ওলন্দাজ গৃহিণীদের সম্পর্কে এরকম এক সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। যে-তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, এদেশের পুরুষদের বর্তমান সপ্তাহে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয় কিন্তু সে-তুলনায় গৃহিণীরা এগিয়ে রয়েছেন। তাঁদের প্রতি সপ্তাহে কাজ করতে হয় মোটামুটি ষাট ঘণ্টা। আমাদের দেশের তুলনায় এদেশের গৃহিণীরা ঘরকন্নার কাজে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আনুকূল্য পান অনেক বেশি কিন্তু খাটুনির পরিমাণ তবু এঁদের একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। এদেশের গৃহিণীদের শতকরা পঁচাত্তর জনের কাপড় ধোলাই করার মেসিন আছে, শতকরা ছিয়ানব্বই জনের আছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, শতকরা ৬৪ জনের বৈদ্যুতিক কফিমিশ্রণকারী এবং শতকরা চল্লিশজনের রেফ্রিজারেটর আছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশি সজাগ বলে বা সাজপোষাক নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর জন্য বা অন্য যে কারণেই হোক, কাপড় কাচার বহরটা এঁদের একটু বেশি। অধিকাংশ বাড়ীতে দিনে তিনবার কাপড় কাচার ব্যবস্থা আছে। এতে দিনের ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় হয়। বাইরে ফিটফাট থাকলেও, ক্লান্তি এবং মাথাধরা সম্পর্কে অভিযোগ হচ্ছে শতকরা পঁয়ত্রিশজন গৃহিণীর। ও'রা ঘুমোন সাধারণত রাত এগারটায় এবং তন্দ্রাজড়িমা কাটিয়ে যখন উঠে বসেন, তখন ঘড়িতে বাজে সাতটা। অবশ্যই সকাল।

এ তো গেল কাজের কথা। এবার কতগুলো অ-কাজের কথাও বলা যাক। শতকরা তেরজন গৃহিণী মোজা রিপু করতে পারেন না, দশ ভাগ কেশচর্চার দোকানে যান না, ত্রিশ ভাগ কোন সময়েই স্বামীদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সময় পান না এবং শতকরা নয়জন ঘর-গেরস্থালির কাজ থেকে একদম ছুটি পান না। আবার শতকরা তেইশজন কোন সময়েই প্রতিবেশী বা পরিচিত পরিবারে বেড়াতে যাননি। এই ফিরিস্তিটা শুনে কি মনে হয় না যে, এদেশের মেয়েরা শুধু রাঁধেন কিন্তু চুল বাঁধার অবসর পান না। আমাদের দেশে কিন্তু দুটোই হয়। যে-মেয়ে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। ছুটকো-ছাটকা বেড়ানো বা আমোদ ফুর্তির ব্যাপারে আমাদের মেয়েদের পটুত্ব অনস্বীকার্য। বেচারারা নাহলে করবেই বা কি! শুধু ঘরকন্নার কাজ নিয়ে কতক্ষণ আর কাটানো যায়। অবশ্য দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে ওলন্দাজ গৃহিণীর তুলনায় আমাদের মেয়েরা অনেক পেছিয়ে আছেন নিঃসন্দেহে। এদেশে মোটে শতকরা তিনজন নিজের শহর বা গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাননি এবং শতকরা পঁচিশজন বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাননি। এদিক থেকে এ'রা সৌভাগ্যবান।

ওলন্দাজ গৃহিণীদের অন্যান্য পটুত্বের মধ্যে শতকরা নব্বইজন সাইকেল চালাতে জানেন, বারজন মোটর চালাতে পারেন এবং শতকরা সাতচল্লিশজন সাঁতার কাটতে পারেন। অর্ধেক বাড়ীতে পোষা জীবজন্তু গৃহিণীদের কিছুটা সময় নেয়। শতকরা ষোলটি বাড়ীতে গৃহিণীরা সাহায্যকারীর সাহায্য পেয়ে থাকেন। শেষের সংখ্যাটির নিশ্চয় আমাদের শহুরে গৃহিণীরা নিজেদের ভাগ্যবান জ্ঞান করবেন।

এবার আসা যাক আরো অনেক তথ্যে। ওলন্দাজ গৃহিণীদের গড়পড়তা উচ্চতা হলো পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি এবং ওজন দশ স্টোন ছয় পাউন্ড। এই ওজনটাকে অনেকেই

বেশি বলে মনে করেন। পঁয়ত্রিশ বছরের নিম্নবয়স্কা মহিলাদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ-জন ধূমপান করেন না। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে শতকরা পঞ্চান্নজন এবং তদূর্ধ্বে শতকরা পঁচাত্তরজন ধূমপান করেন। ধূমপান যাঁরা করেন তাঁরাও স্বাস্থ্য এবং আর্থিক দিকটা বেশ সমঝে চলেন। ধূমপায়ীদের সাপ্তাহিক খরচ পঁচিশটা সিগারেট।

সবশেষের প্রশ্নটিতে মেয়েরা বোধহয় একটু বিব্রত হয়েছিলেন। প্রশ্নটি ছিল—আপনি কতখানি সুখী? শতকরা দশজন এই প্রশ্নটির কোন উত্তর দেননি। শতকরা উনিশজনের উত্তর নেতিবাচক। কিন্তু শত-করা একান্নজন লিখেছেন সুখী এবং বাকি কজন উত্তর দিয়েছেন খুব সুখী। সুখের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে গৃহিণীরা কিন্তু হালে পানি পাননি। বরং বেশ কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করেছেন। শতকরা সাঁইত্রিশজন বলেছেন, সুখী বিবাহিত জীবনের চেয়ে বরং সুস্থ পরিবারই বেশি সুখের। শতকরা চব্বিশজন জানিয়েছেন যে, সুখী বিবাহিত জীবনের সুখ বেশি, উনিশজন বলেছেন, ভালো পারিবারিক জীবন মানেই সুখের জীবন। আবার কেউ চেয়েছেন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক, ভাল খাওয়াপরা, ঘর-গেরস্থালীর কাজ এবং আধ্যাত্মিক জীবন।

ওলন্দাজ গৃহিণীদের মোটামুটি একটা পরিচয় এতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের এরকম পরিচয় দুর্লভ। এরকম সমীক্ষা আমাদের দেশে কি সম্ভব নয়?

পোষাকের বিবর্তন

মানুষ যেদিন সভ্য হল, সে ছিল এক মহাবিপ্লবের যুগ। সেদিন থেকেই সে শিখল ঘর বাঁধতে, শিখল মিলেমিশে বাস করতে। আর সভ্যতার সবচেয়ে বড় যে পরাকাষ্ঠা সে দেখাল তা হল, শারীরিক সভ্যতা। অর্থাৎ একদিন যে মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় পাহাড়-পর্বতের গুহায় ঘুরে বেড়াত, সেই মানুষই শিখল শরীরকে ঢেকে রাখতে। সেদিন এই শরীরাভরণের পিছনে প্রয়োজনের তাগিদ যতটা না ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল লজ্জা নিবারণের চেষ্টা। মানুষের এই লজ্জাবোধ সেদিনের নয়, এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে অনেক কাল আগেই—সেই বাইবেলের যুগে। বাইবেলে আমরা পাই সেই আদম আর ইভের লজ্জাবোধ আর তার ফলশ্রুতির ইতিহাস। সেই লজ্জাই আবার পরবর্তী যুগে প্রচলিত হয়েছে 'নারীর ভূষণ' বলে। সেটা ছিল সভ্যতার শৈশবকাল, যেদিন নারী তার চারপাশের চার দেওয়ালকেই চিনেছিল, কিন্তু চেনেনি সে বাইরের জগৎটাকে।

এরপর বহুযুগ কেটে গেছে—বহু বিবর্তনের ধারা ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে কত বড় বড় বৃক্ষ হেলায় মাটিতে নুয়ে পড়েছে, আর তারই মাঝ থেকে জন্ম নিয়েছে 'নতুন'। সেই নতুনই হল আজকের আধুনিক সমাজ। সভ্যতার শীর্ষে আরোহণ করে আজকের এই সমাজ নাম কিনেছে বিশ্বের দরবারে। কিন্তু এই সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ যে একটা মৌচাক বাসা বেঁধেছে, তা বোধহয় দৃঢ়কণ্ঠেই বলা যায়। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, এমনকি মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও আজ পরানুকরণ প্রবৃত্তির একটা ভয়ঙ্কর নেশা আর সুদৃঢ় আবাস গড়ে নিয়েছে। জাতির এই অশৌচের মুক্তিস্নান কোনদিন হবে কিনা কে জানে। আমাদেরই প্রতিবেশী জাতি আজ তাদের যে-সভ্যতা আর রুচিকে ঘৃণাভরে সমাজের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে, আমরা সেই সভ্যতা আর রুচিকেই পরম আগ্রহ আর যত্নসহকারে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছি—সেটা যেন আমাদেরই জাতীয় সম্পদ। অথচ আপন সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে একটা আলাদা মূল্য আছে, সেই মূল্যবোধটাকেও আজ আমরা একপ্রকার অস্বীকার করতে চলেছি। বাঙালীর এই নকলপ্রিয়তার (বিশেষ করে বাঙালী নারীর) শ্রেষ্ঠ উদা-হরণ বোধহয় পোষাকের মাধ্যমে দিলেই ভাল হবে—সভ্যতার কথা এখন না বললেও চলবে।

পোষাক আমরা ব্যবহার করি দুটি কারণে। প্রথমত শারীরিক উৎকর্ষ এবং সৌন্দর্যলাভের জন্য, এবং দ্বিতীয়ত ঋতু-পরিবর্তন ও বাইরের জীবাণুর হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য। আজ কিন্তু সেই আসল বস্তু চাপা পড়ে গেছে স্তূপীকৃত উপলক্ষের নীচে। পুরুষের কথা ধরলে প্রথমেই চোখে পড়ে, ধুতির স্থানে প্যাণ্ট আজ শুধুমাত্র ফ্যাশানই নয়, একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষিত বাবু আর যাঁরা কল-কারখানার শ্রমিক। কারণ, কলকারখানায় ধুতিপরা সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ। তবে একজনও যে পরেন না এমন নয় এবং যাঁরা পরেন, তাঁরা বোধহয় স্বধর্মের মায়া এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই প্রয়োজনবোধে যদি সকলেই আজ চোঙা প্যাণ্ট পরে, তবে সেটাকেও কি একটা স্টাইল অথবা ফ্যাশান বলতে হবে? আমার তো মনে হয়, এটা ফ্যাশানও নয় আবার স্টাইলও নয়, এটা বিকৃত রুচিরই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই চোঙা প্যাণ্টের সঙ্গে আজ পাল্লা দিয়ে চলেছেন মেয়েরাও।

সর্বসমক্ষে নিজেকেই প্রমিনেণ্ট করার ইচ্ছা সকলের থাকে। আজ কিন্তু ঘটছে ঠিক তার উল্টো। নিজেকে ছেড়ে দেহটাকেই প্রমিনেণ্ট করার ইচ্ছা আজ প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্লাউস আজ বডিসে হয়েছে রূপান্তরিত। তাও আবার এত বেশী স্বচ্ছ যে, পরার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনেই হয় না। দুই-একজন যদিও বা একটু অস্বচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, শোভারক্ষা কিন্তু করতে পারেন না। অনেক সময়ই সেটাকে হাতকাটা নুলো-জগন্নাথ করে তোলেন। এর ওপর অনেক সময় দেখা যায়, তাঁদের পিঠের ওপর কিংবা হাতে বিরাটাকার একটা ঢোলের মত কি যেন ঝুলছে। এইটিকেই তাঁরা তাঁদের একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ এইটিই হল তাঁদের পয়সা রাখার ব্যাগ। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, সে-ব্যাগে শুধু পয়সাই নেই, সংসারের প্রায় অধিকাংশ জিনিসই তাতে বর্তমান। অর্থাৎ সেটাকে ব্যাগের পরিবর্তে একটা ছোটখাট সংসারও বলা যায়। আশ্চর্য! এ-ধরনের রুচির প্রবর্তন কেমন করে হল, তা কোনমতেই ভেবে পাই না। এতদিন শুনে এসেছি যে, প্রয়োজনের খাতিরে হয় বস্তুর সৃষ্টি আজ দেখছি ঠিক তার উল্টো। তাই পোষাক সম্বন্ধে শরৎ-বাবুর কথাটাই বেশী করে মনে পড়ছে। তিনি তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের একস্থানে লিখেছেন "উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকে কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এইসব লোকের সংস্পর্শে না আসিলে এমন করিয়া চোখে পড়ে না।"

এরপর শাড়ীর কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শাড়ীর স্থানে অধুনা প্রচলিত হয়েছে বোম্বে ফিল্ম-স্টারদের অনুকরণে শ্যালোয়ার-কামিজ। পোষাকের ক্ষেত্রে নামের একটু পরিবর্তন ঘটেছে বটে কিন্তু রুচির পরিবর্তন ঘটেনি কোথাও। এখানেও সেই তথৈবচঃ অবস্থা—সেই নগ্নতার কুশ্রী রূপ। এমনই তার ফিটিংস্ যে, একটু জোরে পা চালাতে গেলেই হোঁচট খাওয়ার ভয় পদে পদে। শাড়ী পরলে অনিচ্ছাকৃত-ভাবেও বুকের ওপর আঁচলটা ফেলতে হয় কিন্তু কামিজের বেলায় তার বালাই নেই। নামেই একটা ওড়না থাকে।

আজকের এই পোষাকের কুফল কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, এ হলো সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশেরই কুফল। অনুকরণের এই ভয়ংকর প্রবৃত্তি আজ এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সত্যিকারের মার্জিত রুচির মহিলা আজকের আধুনিকার কাছে নিতান্তই "ব্যাক্‌ডেটেড এডিশান" নামে ধূলিসাৎ হয়ে যান। জাতি যে বড় এবং প্রগতিশীল হয়ে উঠবে, তা একান্তভাবেই জাতির মন আর রুচির ওপর নির্ভর করে। সেই গোড়াতেই যদি চিরন্তন গলদ থেকে যায়, তবে জাতির ভবিষ্যৎ যে কোন্ পথে ধাবমান, তা সহজেই অনুমান করা যায়। শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে মানুষ (বিশেষ করে নারী) আজ কিভাবে যে এই বিকৃত, কুৎসিত রুচির পরিচয় দেয়, তা ভাবতেও লজ্জা বোধ হয়।

বিকৃত পোষাক যে কেবল নারীকেই বিকৃত করে তোলে, তা নয়। প্রত্যেক পোষাকের সঙ্গে মনেরও একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাই বিকৃত পোষাকের জন্য শরীরকে যেমন নগ্ন দেখায়, তেমন মনও হয়ে ওঠে কুৎসিত এবং কদাকার। আজকের নারীজাতির এই অবনতির জন্য নারী যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী বিভিন্ন প্রচার-বিভাগ।

—শিখা রক্ষিত

সমব্যথী

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

দোতলার জানালাতে দাঁড়ালেই ও'দের দেখতে পাচ্ছিল সরমা। শীতের সকাল, তবু খোলা রিক্সাতে বসে ও'রা দু'জন। পারুল আর ও'র বরের নামটা কি যেন, নবনী— নবনীই তো। পারুলের গায়ে একটা লাল রঙের স্কার্ফ। দু'জনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। নবনীর ডান দিকে কিন্তু বিঘৎ-খানেক জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে, অতদূর থেকেও নীল রং-এর গদীটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টি ঠুং ঠুং করে ছোটখাট খানা খন্দলের উপর দিয়ে রিক্সাটা ঠকাশ্ ঠকাশ্ করতে করতে এগিয়ে আসছে। এসে পড়েছে প্রায়। পারুলের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই ও' রিক্সায় বসে কল্ কল্ করে উঠল। এবার না নামলে ভালো দেখায় না। বরটা বোধহয় লাজুক. একবার চোখ তুলেই মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নবনীর বয়সটা অনুমান করবার চেষ্টা করল সরমা। সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর দিয়ে রোগাটে হাড় দোতলা থেকে বেশ দেখা যাচ্ছিল। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি বয়স হবে না বোধহয়।

কড়া নাড়ার দরকার হয়নি। রিক্সার হ্যান্ডেলের ধাতব শব্দটা একটা কর্কশ আওয়াজ তুলে থামবার সংগে সংগে দরজা খুলে বাইরে এল সরমা। মা' আহ্নিক করছিল। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে তসরের থানের আঁচলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বাইরে দাঁড়াল। রিক্সা থেকে নেমে বাঁ হাতে শাড়ী আর স্কার্ফ সামলে পারুল নিচু হয়ে মা'কে প্রণাম করে মাথা নিচু রেখেই কোমর বেঁকিয়ে সরমার পায়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। সরমা ছিটকে এক পা সরে গিয়ে বিব্রতভাবে চাপা গলায় বলল ন্-না থাক্ থাক্। নবনী ততক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈষৎ লজ্জিত গলায় বলল, তা'তে কি। আপনি তো পারুলের থেকে অনেক বড়। গলায় ছেলে-মানুষীর ভাব আছে এখনও। এবার ওকে খুঁটিয়ে দেখল সরমা। রোগাটে চেহারা. দাড়ি-গোঁফ কামান মুখে ব্রণর দু'টো চারটে দাগ এখনও মেলায় নি। চোখ দু'টো কিন্তু

উজ্জ্বল, যেন চাপা কৌতুকে হাসছে। সব মিলিয়ে সরমার ভালই লাগছিল।

রিক্সাওয়ালাটা হটাৎ ঘণ্টিটা ঠং ঠং করে বাজিয়ে উঠতে এতক্ষণের কথা বলা না বলা, নতুন পরিচয়ের জড়তা ভেঙে সবাই যেন সজাগ হয়ে উঠল। নবনী অপ্রতিভভাবে নেমে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে ভাড়া মিটিয়ে রিক্সার পাদানীর উপর থেকে ছোট চামড়ার সুটকেশটা টেনে নিয়ে ডান হাতে সীটের উপর থেকে এক বাক্স সন্দেশ আলগোছভাবে তুলে এনে সুলজ্জভাবে মা'র সামনে ধরল। নতুন কুটুম্ব বাড়ীতে খালি হাতে যেতে নেই, এ বুদ্ধিটা বেশ টনটনে আছে দেখছি, সরমা মনে মনে ভাবল। মুচকি হেসে পারুলের দিকে তাকাতেই ও গল গল করে কথা বলতে আরম্ভ করল, ওমা কি কাণ্ড জানো সরমাদি, সন্দেশ কিনে বাক্সটা তো দোকানের কাউন্টারেই ফেলে রেখে আসছিলুম, শেষ পর্যন্ত রিক্সাওয়ালাটাই কিনা মনে করিয়ে দিলে, মাইজী—। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সরমা এবার পারুলকে দেখল খুঁটিয়ে। বিয়েতে অবশ্য যেতে পারেনি ও'রা, মা' একটা জামদানী শাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাপড়টা সরমাই পছন্দ করে কিনে এনেছিল অফিস থেকে ফেরবার পথে। ওটা পরেই এসেছে আজ। বেশ মানিয়েছে পারুলকে। গা'য়ের রংটা বরাবরই ফর্সা, তবে এমন মসৃণ ছিল না চামড়া। এ ক'দিনেই দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছে পারুল। বছর উনিশ-কুড়ি তো বয়েস। নিজের সংগে চকিতে একবার মিলিয়ে দেখল সরমা। ইদানীং একটু মুটিয়েছে সে। সরমা কালো, গায়ের চামড়াটা খসখসে। ডান হাতের কব্জীর উপরটা একবার বোধ হ'য় চুলকে ছিল, সাদা দাগ হয়ে আছে একটা। পিছনে স্যুটকেশ হাতে নবনী উঠে আসছে। সরমা একটু অস্বস্তি বোধ করল। পিঠের আঁচলটা চট্ ক'রে টেনে দিয়ে খুব সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নবনী মাথা নিচু করে উঠে আসছে।
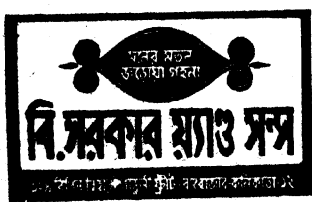
আজকে ওদের সরমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন। খাওয়া দাওয়া করে সারাদিন থেকে বিকেলের দিকে ও'রা চলে যাবে। নবনীদের বাড়ী কোলাঘাটের কাছাকাছি রূপনারায়নপুর না কোথায় যেন। ছ'টার ট্রেন ধরবে ওরা। গিয়ে বাড়ী পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগে প্রায়। নবনী অবশ্য চাকরী ক'রে কোলকাতাতেই একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে। ডেইলী-প্যাসেঞ্জারী করা পোষায় না ব'লে শ্যামবাজারের দিকে কোন মেসে থাকে। ঘরে ঢুকে একটু সংকুচিতভাবেই নবনী ঘুরে ঘুরে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছিল। সরমার কনভোকেশনের ছবিটার দিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে প্রশ্ন করল, এ ছবিটা আপনার কবেকার?

সরমা খাটের উপর সবেমাত্র বসেছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে মৃদু হাফ্ ধরেছিল ও'র। ছবিটা সদ্য বি, এ পাশ করে তোলা, প্রায় সাত আট বছর তো হবেই। নবনীর কৌতুকোজ্জ্বল চোখে নম্রতার মুখোশ দিয়ে ঢেকে সরমার বয়েসের আনুমাণিক হিসেব করতে চায় নাকি? একটু জড়িত আর লজ্জিত গলাতেই সরমা বলল, ও-ওটা অনেক দিন আগেকার ছবি। ফিলসফিতে অনার্স ছিল সরমার, কিন্তু সেটা বলবার প্রয়োজন হ'ল না। নবনী এবার সহজভাবে বলতে লাগল, আপনার কথা অনেক শুনেছি ওদের মুখে। আমি বি, এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিলাম। আবার কলেজে অ্যাডমিশন নেব ভাবছি। আপনি একটু দেখিয়ে টেখিয়ে দেবেন কিন্তু। নবনীর গলায় একটু ছেলেমানুষী আবদারের সুর। বয়সে সরমার থেকে দু'তিন বছরের ছোটই হবে বোধ হয়। মুখটা আরোও ছেলে-মানুষী। পারুল খাটের উপর বসে কথা বলার জন্য উসখুশ করছিল। নবনীর কথা শুনে ফুঁপিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজল। পড়ার যা নমুনা দেখাচ্ছে ক'দিন ধরে। সারাটা রাত্তির ঘুমতে দেয় নাকি! অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছে। দিনের বেলাতেও এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আশে পাশে ঘুর ঘুর করে। পারুলের প্রথমটা খুব লজ্জা করছিল, ছিঃ সবাই কি ভাবে? নবনী পারুলের গাল টিপে দিয়ে কানে কানে বলেছে, সবার ভাবনা ভাবতেই কি বিয়ে করেছি না কি? পারুল ছুটে সরে যাবার আগেই নবনীর লোভী ঠোঁট দাগ এঁকে দিয়েছে ও'র গালে। এখন সরমাদির সামনে খুব ন্যাকা সাজা হচ্ছে। পারুল আর একবার খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল। সরমা পারুলের দ্বিতীয় হাসির ইঙ্গিতটা বুঝলো। নবনীর দিকে তাকিয়ে দেখল মুখ লাল ক'রে মাথা নিচু করেছে ও'। লজ্জা পেয়েছে বেচারী, সরমা মনে মনে ভাবল। পারুলের নির্লজ্জতায় সরমার নিজেরই গা'টা যেন লেপের নিচে ঠাণ্ডা হাত লাগার মত শির শির করে উঠল।

সরমা আর ও'র মা ছাড়া বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। মামুলী দু'চারটে কুশল প্রশ্ন করে মা হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে সকাল থেকে। কাজেই ও'রা তিনজন, মানে সরমা, নবনী আর পারুল গল্পগুজবের মধ্যে নিজে-দের ছড়িয়ে দিয়েছে। সরমা বরাবরই একটু শান্ত, কম কথা বলে। পারুলের ছোঁয়াচটা যেন ওরও লেগে গেছে ইতিমধ্যে। চলতি সিনেমার গল্প থেকে নানা রকম আলোচনা শেষ করে আনছে ওরা।

নবনী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে পিছনের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সিগারেট খেতে। মা নিচে রান্না করছে, হুট করে ঘরে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা নেই। নবনীর শ্রদ্ধার উপলক্ষ সরমা। প্রথমটা মনে মনে হাস'লও সরমা মনে একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তি বোধ করল। নবনীর একহারা ছিপছিপে চেহারা ঘরে বসে দেখা যাচ্ছে। সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত নীলচে ধোঁয়া পাক খেতে খেতে ঘরের দরজার সামনে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এটা আবার বেশী বাড়াবাড়ি, ঘরে বসেই সিগারেট খেতে পারতো নবনী। সরমা ও'র থেকে এমন কিছু বড় নয়। সম্পর্কে বড়। কথাটা মনে মনে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল সরমা। স্কার্ফটা গা' থেকে খুলে রেখে একবার নিচে নেমে রান্নার তদারক করে এসে নবনীকে তাড়া দিল স্নান করতে যাবার জন্য।

ছোটখাট হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করে ও'রা জিরিয়ে নিচ্ছিল একটু। সরমা একটু ইতঃস্তত করেছিল প্রথমে। শোবার ঘর ও'দের একটাই। নিচে কলতলা আর রান্নাঘর। স্নান করতে যাবার আগে ঘরের আলনা থেকে শায়া-ব্লাউজ আর বডিস্ গুছিয়ে আনতে লজ্জাই পাচ্ছিল সে। নবনী সামনে বসে আছে, মাথা নিচু ক'রে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে। বাথ রুমের আধো অন্ধকার ছবিটা চোখের সামনে ভাসল। কাঁচ ভাঙ্গা শার্শীর কোন থেকে কে ও'র অনাবৃত দেহ লক্ষ্য করছে এমন এক অস্বস্তির ঢেউ দু'হাতে সরিয়ে সরমা তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

যাবার সময় নবনী বার বার ক'রে অনুরোধ করে গেল, একদিন যাবেন কিন্তু সরমাদি, আগে চিঠি দিয়ে যাবেন, আমি স্টেশনে থাকবো। না গেলে খুব রাগ করব সরমাদি—গিয়ে দেখবেন এত সুন্দর জায়গা।

বার বার দিদি কথাটা সরমার কানে বিসদৃশ শোনাল। লজ্জা ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ, নবনীর মুখে এখনখই ফুটছে কোলকাতার কোন সিনেমা হলটা সবচেয়ে ভালো, থিয়েটার দেখতে গেলে কোন কোন গুলো সবচেয়ে আরামের, ট্রাম-বাসের ভিড়ে ভিতর মেয়েদের কিভাবে কায়দা করে উঠতে হয়, সব ও'র মুখস্থ। উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন সর্বসময় হাসছে সরমার দিকে তাকিয়ে। নবনীর এক একটা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ও'র প্রত্যাশী দৃষ্টির সামনে সরমা মনে মনে এক মুহূর্তের জন্য কুঁকড়ে গেল দিদি'র বর্মের আড়ালে। পারুল আর নবনী যাবার নিমন্ত্রণের ঐকতানের উত্তরে আশ্বাস দিয়ে দরজা বন্ধ করে শেষ বিকেলের অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে সরমা আবার গা' শির শির করে উঠল। অকারণ পিছনে তাকাল একবার। এতক্ষণ এ

চুল উঠে যাওয়ার জন্য বিব্রত?

আজ থেকে সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চুলের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনুন

বিপদের এই সব সঙ্কেত অবহেলা করবেন না

চুল উঠে যাওয়া। মাথার তালুতে চুলকানি। নির্জীব শুকনো চুল। এই সব লক্ষণ থেকেই বুঝা যায় যে আপনার চুল বেড়ে ওঠার জন্য যে জীবনদায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তার অভাব হচ্ছে। এর ফলে অকালে আপনার মাথায় টাক পড়তে পারে। তাই এই সব লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে আপনার চাই—সিলভিক্রিন—যেটি চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য।

সিলভিক্রিন কি ভাবে কাজ করে?

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, প্রকৃতি তা জোগায়। একমাত্র সিলভিক্রিনেই রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলতত্ত্বের নির্যাস। এটি চুলের গোড়ায় গিয়ে, তাকে খাদ্য জোগায় ও শক্তিশালী করে তোলে ও সুস্থ চুল বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে।

ব্যবহার-বিধি

প্রত্যহ দুমিনিট করে মাথার তালুতে পিওর সিলভিক্রিন মালিশ করুন। চুলের অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করে চলুন। একবার চুলের স্বাস্থ্য ফিরে এলে তাকে অটুট রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে সিলভিক্রিন হেয়ারড্রেসিং মাখুন—এটি পিওর সিলভিক্রিন মেশানো একটি অয়েল বেস্।

বিনামূল্যে 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক পুস্তিকার জন্য এই ঠিকানায় লিখুন—ডিপার্টমেন্ট A-7 পোস্টবক্স ১২১, বোম্বাই-১।

সিলভিক্রিন উৎপাদন পুরুষ ও মহিলা সকলেরই ব্যবহার উপযোগী।

সিলভিক্রিন

চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্য

LPE-Aiyars S. I

উজ্জ্বল আলোর বিন্দু যেন তাকে তাড়া করছিল। সিগারেটের গাঢ় নীলচে ধোঁয়ার মত পাকে পাকে জড়াতে চেয়েছিল তাকে। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি উলের স্কার্ফটা গায়ে জড়িয়ে নিল সরমা।

অফিসের চাকরিটা সরমার অনেক দিনের। বি এ পাশ করে একটা স্কুলে মাস্টারি করেছিল কিছুদিন। তারপর এই সরকারী অফিসের কেরানিগিরি। মাইনেটা আগের তুলনায় কিছু বেশিই বলতে হবে, সিকিউরিটি আছে। আরো কিছু বুঝি ছিল। বেশ কয়েক জোড়া নিষ্প্রভ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল প্রথমটা। মিস্ বোস, এই ফাইলটা কাইন্ডলি, একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন, বলে প্রথম যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই সুধীর খাস্তগীর আজও তেমনি সমান মনোযোগী সরমার প্রতি। চিরদিন থাকবেনও, মৃদু হেসে সরমা একদিন মনে মনে ভেবেছিল। চল্লিশ বছরের ব্যাচেলার। অফিসের নূতন মেয়েদের সুখ-সুবিধের প্রতি ভদ্রলোকের অপরিসীম যত্ন। বিপত্নীক সুরেনবাবুর বেহায়া রসিকতা-গুলো আজকাল আর খারাপ লাগে না। কথাবার্তায় দ্ব্যর্থবোধক ও আদিরসাত্মক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা আছে ভদ্রলোকের। ঐ ছবিটা দেখলেন নাকি মিস্ বোস? দেখে আসুন, দেখে আসুন, স্যাটিস্ফ্যাকশন পাবেন। নিজের চেয়ারের চারপাশের কয়েক জোড়া পুরুষ দৃষ্টির সামনে বসে সরমা প্রথম মাস কয়েক খুব অস্বস্তি বোধ করত। সামান্যতম অঙ্গ সঞ্চালনেও ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত অনেকগুলো চোখ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। আজকাল সহজ হ'য়ে গেছে ব্যাপারটা। কিন্তু তবু যেন সব নয়। মাথা নিচু ক'রে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে করতে সরমা এক সময় বুঝতে পারে দূর থেকে কোন এক জোড়া আসঙ্গাতুর দৃষ্টির আশ্লেষ তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে বার বার। সূক্ষ্ম— অতি সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা ধীরে ধীরে গ্রাস করে তখন সরমাকে। জল ছিটানো খসখসে ঢাকা অফিসের ঘরে ফিকে অন্ধকার। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। তবুও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। আঁচলাগা মোমের মত গলতে থাকে দেহটা, যেন চেয়ার উপচে গড়িয়ে পড়বে এখুনি। একটা হাই তুলে খোঁপা ঠিক করে সরমা তখন উঠে দাঁড়ায়, হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে, যাই টিফিন ক'রে আসি, সবাইকে শুনিয়ে বলে, তারপর জুতোর খট্ খট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়।

চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে দু'চারটে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। মোলায়েম অথচ কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল সরমা। অফিসে কি ধরণের কাজ আপনাকে করতে হয়? অফিস ছুটির পরে কি করেন? তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে সরমা কুঁকড়ে গেছে শামুকের মত। অফিস ছুটির পর কি করেন? কি—জবাব দেবে সরমা? অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম স্টপেজের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দাঁড়াতে হয়েছে এক আধ দিন কয়েক মুহূর্ত। যেন হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল এমনি ভাবে এগিয়ে এসেছে, সুরথ ব্যানার্জি কিম্বা অজিত তালুকদার। বিবাহিত সহকর্মী কেরানি এরা। 'চলুন আপনাদের ও'দিকটা যাবো আজ, একটু কাজ আছে।' প্রথম প্রথম অতটা বুঝতো না সরমা। গল্প করতে করতে এগিয়ে গেছে ট্রাম স্টপ পর্যন্ত। পরে বুঝতে সময় লাগেনি। ও'রা আরও এগিয়ে যেতে চায়। এস্প্লানেডের কোন রেস্টুরেন্টে চা খেয়ে গড়ের মাঠে ঘাসের উপর ফিকে অন্ধকারে বসে গল্প করতে। সুরথবাবু অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল, চারটি ছেলেমেয়ে আছে, তালুকদারও প্রায় তথৈবচ। নূতন চাকরিতে ঢোকা অধিকাংশ ছোকরা কেরানি সরমার থেকে বয়সে ছোট। সব চেয়ে মা লাগে অবিবাহিত পুরোনো ক'জনের উপর। ও'দের বয়সও ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। হাসি ঠাট্টা তামাশার ফাঁকে ফাঁকে ওদের সন্দেহাকুল দৃষ্টি কি যেন খোঁজে সরমার মুখে। অন্তরঙ্গ হ'তে গিয়ে ছিটকে সরে যায় অনেক দূরে। সরমা প্রথমটা মনে আঘাত পেয়েছে। আজকাল বোঝে ও'দের মনের কথা। সরমার সাতাশ বছরের কুমারীত্বকে বিশ্বাস করে না ও'রা। দু'শ টাকা মূলধন নিয়ে ও'দের ভয় পাছে নকল কিনে ঠকে। অঞ্জন ছেলেটা মন্দ নয়, অঞ্জন চৌধুরী। তবে বড় বোকা আর মেরুদণ্ড-হীন। ভালো লাগাটা মুখফুটে বলতে দোষ কি? সরমা আগে প্রায়ই দেখতো দল-ছাড়া হ'য়ে এগিয়ে আসছে একটি মুগ্ধ দৃষ্টি, প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়ে নিজেও ছুতো করে অন্যান্য মেয়েদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে অনেকবার। সাহস করে দু'চার দিন কথাও বলেছে অঞ্জন, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে। কিন্তু সরমার মুখোমুখি তাকাতে পারে নি কোনও দিন, পারবেও না বোধহয়। ওদের সংসারে নাকি বড় অভাব। অবিবাহিত বোনআছে দু'টি। মা'র হাঁপানি ইদানীং বেড়েছে। অঞ্জনের গলাটা কাতর শোনায়। এই কথা বলার জন্যই কি ও' দিনের পর দিন অকারণে সরমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে? সরমার প্রত্যাশী দৃষ্টি অনেকদিন আগেই নিস্পৃহ হ'য়ে উঠছিল, আজকাল ওকে আর আমল দেয় না।

প্রায় মাস ছয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যার দিকে নবনী এল আবার। খাটের উপর কোল-বালিশটা আঁকড়ে ধরে সরমা চুপ করে শুয়েছিল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। প্রথমটা বুঝতে পারেনি ও'। বিস্রস্ত কাপড় সামলে সরমা ধড়মড় করে উঠে বসল।

প্রথমটা রাগই হয়েছিল, মা'রও যেমন বুদ্ধি। নবনীর মুখভাবটা অপ্রস্তুতের মত। সুইচ টিপে উজ্জ্বল আলোটা জ্বালিয়ে সরমা ঘুম ঘুম চোখে চট্ করে একবার আয়নার সামনে ঘুরে এল। ঘরের আধো অন্ধকারের সঙ্গে তার অস্তিত্বটা এতক্ষণ ছড়িয়েছিল দীর্ঘায়িত ছায়ার মত, আলোর সংস্পর্শে এসে সেটা যেন তৎক্ষণাৎ সংকুচিত হ'য়ে গেল। নবনীকে বসতে ব'লে সরমা চা করে নিয়ে এল। কথায় কথায় নবনী সব খুলে বলল। এতোদিন আসতে পারেনি সে নানা ঝামেলায়, বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ চলছে। পারুলের শরীর ভালো নেই। পড়ে গিয়ে ও'র বাবা পা ভেঙেছে আর এক অশান্তি বাধিয়েছে। তবে কাজের ছেলে আছে নবনী। কলেজে নাইটে অ্যাড্মিশন নিয়েছে—বি, এ-তে, এই বছর। সরমার কাছে আসার উদ্দেশ্য অনেকটা এই কারণেও।

নবনীর অপ্রস্তুত ভাবটা কেটে গেছে। খুশিমুখে ঘরের চারপাশ লক্ষ্য করতে করতে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সরমার দিকে তাকাচ্ছে। আপনার চেহারা সুন্দর হয়েছে আগের থেকে, অভিজ্ঞ চোখে একবার দেখে নিয়ে নবনী রায় দিল। কথাটা শুনে একটা চাপা অস্বস্তি ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল সরমার দেহ মনে। নবনী'র মুখে একথা'টা ঠিক মানায় না। নবনীর দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সরমা। মাসের প্রথম দিকের এ সপ্তাহ শরীরটা খুব ভালো যায় না। কেমন যেন জ্বর জ্বর ভাব, হাত-পাগুলোর একটু ফুলো-ফুলো দেখায়, চোখের কোণে কালি পড়ে। মাঝে মাঝে একটা যন্ত্রণা কুন্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে ভিতর থেকে। গায়ে শাড়ীর আঁচলটা ভালো ক'রে জড়িয়ে কুঁজো হয়ে বসে সরমা। নবনী যেন ও'র অজ্ঞাতসারে ঘরে ঢুকে অনেক গোপন কথা জেনে ফেলেছে—এমন একটা ধরা পড়ে যাওয়ার অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ কণ্টকিত সরমার।

ধীরে সুস্থে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নবনী পড়াশোনা নিয়ে কিছু মামুলী আলোচনা করল। রোমান্টিক পোয়েট্রির উপর বাঙ্গেরে কোন নোটটা সব চেয়ে ভালো, সরমার ইকনমিক্স ছিল কেন ওঠবার কোন ব্যস্ততা ছিল না তার মধ্যে। সরমার খারাপ লাগছিল। এই সময় ঘরের সেই ফিকেনীল অন্ধকারেই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। খাটে শোওয়া দেহ একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বড় হ'য়ে যেতে উপচে পড়তে চাইছিল মেঝের উপর। নবনীর রোগাটে চেহারাতে এ ক'মাসে যেন একটা মসৃণতা এসেছে। সদাচঞ্চল চোখ দুটো ঘুরেফিরে পড়ছে সরমার মুখের উপর। ওর অনুৎসাহ ভাবটা বোধহয় লক্ষ করছিল। একটু ইতঃস্তত করে উঠে দাঁড়ায় পরে আবার আসবো, ব'লে বিদায় নিল সেদিন।

অফিসে বসে কাজ করতে করতে সময় একরম কেটে যায়। তারপরেই যেন ঘড়ির কাঁটা থমকে দাঁড়ায় নিস্পৃহ অথর্বের মত। ট্রামের ভিড়ে ঠেলে উঠতে গিয়ে প্রথম প্রথম খুব আড়ষ্ট বোধ করত সরমা। প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় নিয়ে ভিতরে যাবার জায়গা ছেড়ে দিতে দিতে হাওয়াটাকে উদ্দেশ করেই বিরূপ মন্তব্য ক'রে দু'চারজন। আজকাল এসব গা'সহা হয়ে গেছে। পুরুষ দেহের সঙ্গে এ স্বল্পক্ষণের ঘনিষ্ঠতা আজকাল আর চিত্তচাঞ্চল্য জাগায় না। দীর্ঘদিনের পরিচয়ে এটাও পুরোনো হয়ে গেছে। বাথরুমের আধো-অন্ধকারে সারা গায়ে সাবানের ফেনা বুলিয়ে মগের পর মগ জল ঢালতে ভালোবাসে সরমা। দেহের প্রতি'টি রোমকূপ মুখর হ'য়ে ওঠে যেন। খস্খসে তোয়ালে দিয়ে গা' মুছতে অনেকটা সময় নেয়। দেহের আনাচ্‌কানাচ্‌গুলো যেন তোয়ালের

পুরুষালী কর্কশতার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। শায়ার দড়ি শক্ত ক'রে বেঁধে, শাড়ীটা ঘেরাটোপের মত সারা গায়ে জড়িয়ে সাবানের বাক্স হাতে সরমা উপরে উঠে আসে। সিঁড়িতে দোতলায় পাশের ঘরের ভাড়াটে জীবনবাবুর মুখোমুখি পড়ে গেলে মরমে মরে যায় সরমা। ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ের বাবা, জীবনবাবু। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেযেতেও ঘাড় ফিরিয়ে থেমে ওঠে। তবুও সরমা অভ্যাসটা ছাড়েনি। তেমনি শাড়ীর ঘেরাটোপ এঁটে কলতলা ছেড়ে উপরে উঠে আসে রোজ আর প্রায় রোজই এমন লজ্জার বোঝা নিয়ে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে। একটু হাল্কা প্রসাধন শেষ করে বাইরের ঝুল বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ায় সরমা, তখন বাদামী বিকেল অন্ধকারে মিশে গেছে। লাইটপোস্টের আলো জ্বলে উঠছে একটা দুটো করে। আলসের ওপর ঝুঁকে পড়ে অন্যমনস্কভাবে এদিকওদিক দেখেও সরমা।

ছুটির দিনে অবেলায় ঘুমিয়ে উঠে ফোলা-ফোলা চোখে দেখে—তারের উপর চড়ুই পাখির কিচির-মিচির, পাশের বাড়ীর ছাদের আলসেতে পায়রার বকম্ বকম। বসে বসে পায়রার গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে করতে সরমা ভাবে, একটু পরেই আসবে রোঁওয়া ওঠা কাকটা। রোজ এই পড়ন্ত রোদ্দুরের বিকেলে এসে দাঁড়ায় ওটা। বসে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে সরমাকে লক্ষ্য করে। শূন্য মনে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠে সরমা ভাবে কাকটা যেন একটা প্রেতাত্মার মত ওকে পাহারা দিচ্ছে দিনের পর দিন।

কিছুদিন বাদে নবনী এল আবার। সেদিন ছুটি ছিল অফিস। বিকেলের দিকে কলতলা থেকে গা ধুয়ে এসে সরমা অন্যমনস্ক ভাবে পাউডারের পাফটা ঘসছিল গালে। বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দটা যেন দূর-দূরান্ত পেরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল শূন্য-প্রধান রাস্তার উপর দ্রুতগামী ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের মত। আয়নার সামনে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সরমা হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেল। ধীরে-সুস্থে মাদ্রাজী আবিরের টিপ এঁকে কপালে প্রসাধন শেষ করল। ঘরের পর্দা সরিয়ে একটু ইতঃস্তত করেই নবনী ঢুকল। সরমার দিকে একবার নিঃশব্দে তাকিয়ে পরক্ষণেই হৈ-চৈ করে বলতে শুরু করল, "কই সরমাদি, নিন্ তাড়াতাড়ি ক'রে, হাতে একদম সময় নেই, ছটার শো, খুব জোর কপাল, তাই টিকিট পেয়ে গেছি।" বলতে বলতে পকেট থেকে বার করল নীল রঙের দু'খানা থিয়েটারের টিকিট।

বেশ সেজেগুজে এসেছে নবনী আজ। পরণে কোঁচানো ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে সোয়েডের পাম্-সু। আতরের একটা সূক্ষ্ম গন্ধ পেল সরমা। বিনা অনুমতিতে কেউ যেন ওর হাত-ব্যাগটা খুলে ফেলে দেখছে এমন একটা অস্বস্তি বোধ করল সে। কথাবার্তার ফাঁকে ছোটভাই-এর বন্ধু যেমন হঠাৎ কাঁধ আঁকড়ে ধরে, পাড়ার 'পুজোর চাঁদা কিংবা চ্যারিটি শো-এর টিকিটের টাকা আদায় ক'রে তেমনি একটা প্রশ্রয়ের দাবি নবনীর মুখে। তবু সরমা ইতস্ততঃ করল। নবনীর উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে কপালের টিপটা যেন গলতে আরম্ভ করেছে। বিরক্তি মেশান খুশি গলায় সরমা বলল, আমাকে না জিজ্ঞেস করে টিকিট কিনতে গেলে কেন? যদি না যেতে পারতুম? নবনীর উজ্জ্বল দৃষ্টি প্রসারিত হল একবার, যেন সে জানতো সরমা না গিয়ে পারবে না। ঘরে বসে থেকে নাকি বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে সরমা।

রাস্তায় নেমেই ট্যাক্সি ডাকল নবনী, সরমার আপত্তি না শুনেই। চলন্ত ট্যাক্সির মাঝখানে সিটে বসে নবনীর চঞ্চল দৃষ্টি রাস্তার এপাশ ওপাশ ঘুরে সরমার মুখের উপর ন্যস্ত হচ্ছিল। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে নবনী। ভালই লাগছিল সরমার ওর ঐ অস্থির তদারকিটা। থিয়েটারের হলে ভিতরের আলোগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে নবনীর কাঁধ ধরে সামলে নিল সরমা। দোতালার বক্সের গদীমোড়া আসনে তাকে বসিয়ে দিয়ে নিপুণ হাতে পর্দাটা টেনে দিল নবনী। অন্ধকার সমুদ্রের উপর জাহাজের ডেকে রেলিং-এ হাত রেখে বসে থাকার মত অনুভূতিটা সরমার ভালো লাগছিল। পাশে বসা নবনীর দেহের উষ্ণতাটা আতরের সূক্ষ্ম গন্ধের সঙ্গে মিশে যেন হাল্কা ক্লোরোফর্মের মত সরমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করছিল একটু একটু ক'রে।

রেস্টুরেন্টে সেদিন খুব খাইয়েছিল নবনী। চিকেন কবিরাজীর সঙ্গে বিরিয়ানী পোলাও। সরমা মুটিয়েছে আজকাল একটু। অলস নিদ্রালু দেহে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে অন্ধকার সমুদ্রের উপর জাহাজের কথাটা ভাবল আবার। একটা উজ্জ্বল আলোর রশ্মি যেন ঢেউ-এর তালে তালে আলেয়ার মত দুলে দুলে সরে যাচ্ছে সমুদ্রের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। আলোর রশ্মিটা এগিয়ে আসতে আসতে সরমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করল। ধীরে ধীরে সঞ্চারিত এক উষ্ণতার সুখানুভূতিতে তার দেহটা কুঁকড়ে উঠতে উঠতে ঘুমের পাতালপুরীতে তলিয়ে গেল অবশেষে।

'আমাকে না জিজ্ঞাসা করে টিকিট করলে কেন?'

এর মধ্যে অফিস ছুটির পর একদিন ট্রাম স্টপেজের কাছাকাছি দেখা করল নবনী। ক্লান্ত উস্কোখুস্কো চেহারা, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তেমনি উজ্জ্বল। যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এমন একটা সপ্রশংস শ্রদ্ধার ভাব টেনে আনল নবনী। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে গেল অনেকদূর, প্রায় রেস-কোর্সের কাছাকাছি। সরমা মনে মনে ভাবছিল ওঁদের দোতলার ঘরের ফিকে নীল আলো-জ্বলা অন্ধকারের কথা। খাটের চৌহদ্দিতে নিজেকে বন্দী করতে। কতক্ষণে যে ওরা পৌঁছে গেল খেয়ালই ছিল না।

সন্ধ্যার পথে ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিনেবাদাম আর ঝালনুন কিনে আনল নবনী, তারপর জায়গা খুঁজতে লাগল। লাইট-পোস্টের আলো-আটকান একটা গাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নবনী ডাকল সরমাকে।

অন্ধকারে নবনীর মুখের রেখা যেন হারিয়ে গেছে সব। নাক, মুখ, চোখ, কান—সব যেন বৃষ্টির ছাট লাগা রং-ছবির মত লেপটে গেছে। মুখোমুখি বসে থাকতে থাকতে সরমার শম্বুক অস্তিত্বটা নিঃসঙ্গতার বিবরে প্রবেশ করতে গিয়ে আবার টান টন করে মেলে ধরল নিজেকে আস্তে আস্তে। একটু ক্লান্ত গলায় কথা বলছিল নবনী। বাড়ির অসুখবিসুখ, বাবার ভাঙ্গা পা। পারুলের কথা উঠতে নবনী একটু ইতস্ততঃ করল। এর আগে দু'একবার সরমা জিজ্ঞেস করেছিল পারুলের কথা। মুখ লাল ক'রে ভাসা ভাসা উত্তর দিয়েছে নবনী। পারুল কয়েক মাস ধরে অন্তঃস্বত্বা। শরীর ভাল যাচ্ছে না, কিছু খেতে গেলেই ও'র গা বমি বমি করে। শুকনো খসখসে চেহারা হয়েছে। অপরাধীর মত নবনী মাথা নিচু করে। সরমা নবনীর নাুব্জ দেহটা লক্ষ্য করল, মৃদু স্বরে বলল, তোমাদের এবার কিছুদিন কষ্ট হবে তাহলে। লাইটপোস্টের তীর্যক সুতোর মত ক্ষীণ একটা আলোর রশ্মি গাছের পাতার আড়াল থেকে নবনীর চোখের উপর পড়ছিল মাঝে মাঝে। সাপের মত চোখ-দুটো যেন জ্বলে উঠল এবার। টপ্ ক'রে কথাটা লুফে নিয়ে নবনী বলল, কষ্ট মানে রীতিমত যন্ত্রণা সরমাদি, এ ক'মাস তো আছেই, বাচ্চাকাচ্চা হবার পরও অন্তত মাসতিনেক। কথাটা একটা গোঙান আর্ত-নাদের মত শোনাল। সরমা লজ্জা পেয়ে মরমে মরে গেল যেন। এই কথা বলতে চেয়েছে নাকি সে? কিন্তু নবনীর উপর রাগ করতে গিয়েও পারল না সে। চুপচাপ বসে রইল ওরা কিছুক্ষণ। চারপাশের অন্ধকারটা যেন সম-বেদনার মত জড়াতে লাগল ওদের দুজনকে।

অফিসের কাজকর্মের চাপটা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর হ'য়ে উঠতে গিয়েও মন্দ লাগে না সরমার কাছে। নিজেকে বেশ ভারিক্কে মনে হয়। অফিসারদের ঘরে মাঝে মাঝে যেতে হয় জটিল কেস নিয়ে। বড়বাবু টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে গম্ভীর গলায় ডাকে মিস বোস, ডেপুটি সেক্রেটারী গুপ্তসাহেব ডাকছেন, কালকের মিটিংয়ের প্রসিডিংসটা নিয়ে যান। প্রথমদিকে কেরানী-মহলে এটা বেশ মুখোরোচক আলোচনার বস্তু ছিল। আজকাল এ' নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, যেন ডাকাটাই স্বাভাবিক। সরমা বেস অফিসের আর পাঁচটা কেরানীদের মতই একজন হ'য়ে গেছে। তার মেয়েলী অস্তিত্বটা হারিয়ে গেছে ধীরে ধীরে অসংখ্য ফাইলের আড়ালে।

পাশের র‍্যাক্ থেকে কয়েকটা ফাইল তুলতে গিয়ে কতগুলো উইপোকা ঝরে পড়ল টেবিলের উপর। কলমের উল্টো পিঠ দিয়ে দু'একটা পোকা সরমা অন্যমনস্কভাবে নাড়ল। পেট মোটা, বাচ্চা হ'বে বোধহয়। একটা হাই-তুলে সরমা উঠতে যাচ্ছিল টিফিন করতে। এমনসময় বেসুরো গলার আওয়াজ তুলে হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল অফিসের বাচ্চা পিওন, শম্ভু, সরমাদি এই দেখুন কি এনেছি। একটা জলেভেজা চড়ুইপাখি ধরে পায়ের সঙ্গে সুতো বেঁধে দিয়েছে পাখিটাকে ও'র টেবিলে নামিয়ে রেখে বীর-পুরুষের মত সামনে দাঁড়াল ও। সরমা কৌতূহলবশে পাখিটাকে দু'হাতের মুঠোয় আলতো ক'রে চেপে ধরল। একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগল সরমার দেহে, জীবন্ত পাখিটা নরম উষ্ণ একতাল মাংসপিন্ডের মত সরমার হাতের তালুর মধ্যে থরথর ক'রে কাঁপছে পাখিটার হৃৎপিন্ডের ধুকপুকুনিটা অনুভব করল সরমা তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে কিছু-ক্ষণ। হাতের মুঠো আলগা পেয়ে চড়ুই পাখিটা ফুরুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে বসল আর একটা টেবিলে। শিউরে ওঠার অনুভূতিটা সরমা ফিরে পেতে চাইল আবার। পাখিটা দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর নরম গলায় বলল, পাখিটাকে ছে দে শম্ভু, নয়তো ওটা মরে যাবে। তারপ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

অফিস থেকে বেরুবার সময় সরমা দে রোদ্দুরটা উঁচু উঁচু বাড়ির কার্ণিশে মাথ খুঁড়ে আশ্রয় না পেয়ে কোনাকুনি পা জমিয়েছে আকাশের দূরপাল্লার নিশানায় ঘামে ঘামে তেল চটচটে শরীরটা দম যাওয়ায় শুকতে থাকে। কাঁধের কাছে ভে না তাপেতে ব্লাউজটা হাওয়া পেয়ে শুকো থাকে। সরমার মনে হয় এতক্ষণ সে যেন কে সমুদ্রের ধারে বসেছিল। অন্ধকার সমুদ্রে একা একা বসে থাকার নিঃসঙ্গতা নিয়ে স বাড়ি ফিরে আসে। কাপড় না ছেড়েই বাইরে বারান্দায় বসে থাকে কিছুক্ষণ। অন্ধক সমুদ্রের সামনে বসে থাকা। বারান্দার ন লতাপাতা ঘের লোহার রেলিং-এর ফাঁক দি যে আলোর কিছুটা দেখা যাচ্ছে সেটা অন্ধকার সমুদ্রের ওপরে আলোকস্তম্ভে মত ইশারা করছে পথহারা নাবিককে। ভি থেকে মা'র তাড়া খেয়ে সরমার চমক ভা কতক্ষণ এইভাবে বসেছিল সে। শায়া ব্লাউ কাঁধে ফেলে সাবানের বাক্স তোয়ালে হাতে নিচে নেমে বাথরুমে ঢুকল।

সেদিন ছিল রবিবারের দুপুরে। ঝাঁ রোদ্দুর বাইরে। চারপাশের জানালা দর বন্ধ। ঘরে পাখা চালিয়ে দিয়ে সরমা শ শুয়ে একটা মাসিক পত্রিকার পা ওল্টাচ্ছিল। মা ভাড়াটেদের সঙ্গে গে দক্ষিণেশ্বর। সরমা সমস্ত চেতনা দি অনুভব করল কড়ানাড়ার শব্দটা। খট্ খট্। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দি এসে শুয়ে পড়ল আবার। চিঠি দিয়ে সরমা ওকে আসবার জন্য। প্রয়োজন ছি না, তবুও নবনী ঘরে ঢুকে দরজ ভেজিয়ে দিল অভ্যাসবশে।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুই গঙ্গাদাস

(১)

গঙ্গাদাস পন্ডিত

জগন্নাথ মিশ্রের তিরোধানের পর শচীদেবী অকূল পাথারে পড়লেন—নিমাইয়ের লেখাপড়ার কী হবে?

সবাই বললে, গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি করে দাও।

ব্যাকরণে ধুরন্ধর, গঙ্গাদাসের খুব নামডাক। নিমাইয়ের হাত ধরে শচীমাতা গঙ্গাদাসের বাড়ি গেলেন। অন্তঃপুরে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, এই পিতৃহীন বালককে আপনার হাতে সঁপে দিতে চাই। একে আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে দিন।

গঙ্গাদাস সানন্দে সম্মত হল। বললে, নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া মহা ভাগ্যের কথা। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি যথাসাধ্য যত্ন নিয়ে পড়াব নিমাইকে।

ওর বাপ নেই।

তার জন্যে কিছু আটকাবে না।

নিমাই তার ছাত্র হবে এতে গঙ্গাদাস নিজেই যেন পূর্ণকাম।

গুরুকে প্রণাম করল নিমাই।

গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করল, তোমার বিদ্যালাভ হোক।

বারো বছরের ছেলে নিমাই গঙ্গাদাসের টোলে ভর্তি হল। সেখানে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের ছাত্রও কম নেই কিন্তু সকলকে পরাস্ত করে নিমাই সহজেই এগিয়ে গেল। ছাড়িয়ে গেল আলঙ্কারিক কমলাকান্তকে, তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দকে।

'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর'—অধ্যয়ন ছাড়া আর কোনো কথা নেই। বিদ্যার দীপ্তিতে তপ্ত হয়ে যেন পথ চলছে। তর্কে কারু কাছে নত হচ্ছে না। যদি 'হয়' বলো তো 'নয়' করে দিচ্ছে, যদি 'নয়' বল তো 'হয়' এনে বসাচ্ছে। তারপরে সমস্ত খন্ডন করে আবার সমস্ত স্থাপন করছে।

বেশি কলহ, মুরারি গুপ্তের সঙ্গে।

তুমি বৈদ্য, তুমি কেন এসব পড়তে এসেছ? তুমি লতাপাতার খোঁজ করো গে। তোমার রুগীদের উপকার হবে। নিমাই কথার মধ্যে ধরল মুরারিকে।

মুরারির বয়স অনেক বেশি হলেও নিমাইয়ের যখন সে সহপাঠী তখন নিমাই পরিহাস করতে পারে বৈকি।

ব্যাকরণ ছাড়ো, ব্যাকরণে তোমার কফ-পিত্ত-অজীর্ণের কোনো ব্যবস্থা নেই। নিমাই আবার খোঁচা মারল। ব্যাকরণের তুমি জানো কী!

মুরারি রাগ করল না। বললে, তোমার সব প্রশ্নেরই তো উত্তর দিই। বলো না কী জিজ্ঞেস করবে?

বেশ তো, আজ যা পড়লে তার ব্যাখ্যা করো।

মুরারি এক ব্যাখ্যা করে নিমাই আরেক ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। মুরারির সমস্ত ইতিকে নিমাই নিমেষে নেতি করে দেয়। আবার মুরারি যদি 'না'-কে আশ্রয় করে নিমাই পলকে তাকে হাঁ-তে নিয়ে যায় এক পরম অস্তিত্বে।

শেষে তুষ্ট নিমাই মুরারির গায়ে হাত রাখল। একটা নতুন আনন্দে শিহরিত হল মুরারি। ভাবল এ চিদানন্দমূর্তি পুরুষ কে? এ কি সামান্য মানুষ, না, আর কিছু?

গঙ্গাদাস দেখে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

দু বছরে ব্যাকরণ শেষ করে নিমাই গেল ন্যায় পড়তে।

ন্যায়ের টোলে তার সহপাঠী রঘুনাথ। 'দীধিতির' গ্রন্থকার রঘুনাথ।

ছাত্র ভালো হলে কী হবে, রঘুনাথের মনে সুখ নেই। শুনতে পেয়েছে নিমাই ন্যায়ের টিপ্পনী লিখছে। নিমাইয়ের টিপ্পনীর কাছে তার 'দীধিতি' কি স্থান পাবে?

তুমি কি ন্যায়ের টীকা লিখছ? রঘুনাথ একদিন শুধোল নিমাইকে।

এই একটু-আধটু। তুমি কী করে জানলে?

কে যেন বলল।

সেটা তেমন কিছু বলবার কথা নয়। হাসল নিমাই।

তোমার পুঁথি আমাকে একটু পড়তে দেবে?

কেন দেব না? কাল যখন দুজনে নৌকো করে গঙ্গা পার হব তখন আমিই তোমাকে আমার পুঁথি থেকে পড়ে শোনাব।

পরদিন গঙ্গা পার হবার সময় নৌকায় বসে নিমাই তার ন্যায়ের টিপ্পনী পড়তে লাগল।

তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রঘুনাথ।

কতক্ষণ পরে নিমাই তাকিয়ে দেখল রঘুনাথ কাঁদছে।

এ কী, কাঁদছ কেন? নিমাই পড়া বন্ধ করল।

তোমার এ বই থাকতে আমার 'দীধিতি' চলবে না। যা বোঝাতে আমার দশ পৃষ্ঠা লেগেছে তা তুমি দুই ছত্রে প্রাঞ্জল করেছ। রাতদিন খেটে আমি আমার বই লিখেছিলাম, আশা ছিল পান্ডিত্যে অগ্রগণ্য হব কিন্তু আজ আমার সমস্ত আশা জলাঞ্জলি হল।

তুমি এর জন্যে ভাবছ কেন? নিমাই বললে, আমিই আমার পুঁথি জলাঞ্জলি দিচ্ছি।

সে কী? রঘুনাথ চমকে উঠল।

ন্যায় তো অফল শাস্ত্র। এর আবার ভালো-মন্দ কী। যা অফল তার জলেই যাওয়া উচিত। বলে নিমাই তার নিজের পুঁথি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। কে নাম চায়? কে প্রতিষ্ঠার জন্যে কাঙাল?

কত দিন পরে নিমাই নিজেই টোল খুলে বসল। মাত্র ষোল বছর বয়সে নবদ্বীপে কেউ টোল খুলতে সাহস পায়নি। নবদ্বীপে কত সব ডাকসাইটে পন্ডিত কিন্তু ছাত্র বেশি নিমাইয়ের টোলে।

ছাত্র বেশি হবে না কেন? নিমাই যে অল্প কথায় জলের মত বুঝিয়ে দেয়। নিমাইয়ের কাছে পড়তে কারু যে এতটুকু ক্লেশ হয় না।

গঙ্গাদাস তাকিয়ে দেখে গুরুর টোলের চেয়ে শিষ্যের বেশী ঔজ্জ্বল্য। তাই দেখে গঙ্গাদাসের দুচোখ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু গয়া থেকে নিমাই যে ফিরে এল, একেবারে আরেকরকম চেহারা নিয়ে। আগের সেই বিদ্যা-ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই, এখন কেবল বিনয়-বিরক্তি। এখন কেবল কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ! সবাই বলছে, নিমাইয়ের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়েছে। কিন্তু এমন ভক্তি দেখে-শুনে শাস্ত্রও চুপ করে গিয়েছে। এমন ভক্তির কথা শাস্ত্রও ভাবতে পারেনি।

পড়ুয়ারা ঘিরে ধরল নিমাইকে। আমাদের পড়াবেন না?

পড়ুয়াদের দেখে গঙ্গাদাসের কথা মনে পড়ে গেল। নিমাই তখন গঙ্গাদাসের বাড়ি চলল। শিষ্যদের বললে, তোমরাও এস।

গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল নিমাই।

গঙ্গাদাস বললে, তুমি নির্বিঘ্নে পিতৃশ্রাদ্ধ করে এসেছ, তুমি ধন্য। তুমি এবার তোমার ছাত্রদের নিয়ে বোসো।' তোমার যাবার পর ওরা তাদের গ্রন্থে ডোর দিয়েছে। বলে নিমাই পন্ডিত এলে আবার ডোর খুলব।

নিমাই বললে, নবদ্বীপে কত বড় বড় পন্ডিত আছে, তাদের কারু কাছে পড়লেই তো হত।

ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে দেখ না। তারা বলে নিমাইয়ের মত গুরু নেই।

টোলে গিয়ে বসল নিমাই। পড়ুয়ারাও আসন নিল।

হরি-হরি বলে ডোর খুলল পড়ুয়ারা। হরি-হরি বলে পুঁথি মেলল।

কী আশ্চর্য, ওদের মুখে হরিনাম আনল কে? ওরা তো নিমাইয়ের ভিতরের খবর কিছু রাখে না, তবু আপনা-আপনি ঐ নাম ধ্বনিত হল কেন?

আবিষ্ট হয়ে নিমাইও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। সূত্র বৃত্তি টীকা—সমস্তই কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ ছাড়া শাস্ত্র নেই, কৃষ্ণ ছাড়া ব্যাখ্যা নেই। হর্তা কর্তা পালয়িতা সমস্তই কৃষ্ণ।

কতক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতেই লজ্জা পেল নিমাই। ভাবল এ সব আমি কী পড়াচ্ছি? এই কি আজকের ব্যাকরণের বিষয়?

তোমাদের কাছে সূত্রের আজ কী ব্যাখ্যা করলাম?

কিছুই বুঝতে পারলাম না। যে কোনো শব্দ ধরছেন তার মধ্যে কেবল কৃষ্ণ পাচ্ছেন।

হ্যাঁ, আজকের মতো পুঁথি বাঁধো। কাল আবার পড়া হবে।

পরদিন পড়াতে বসেও নিমাইয়ের সেই ভাব। মুখরে-মৌনে সমস্ত শব্দই কৃষ্ণছায়া। কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বলবার নেই শোনবার নেই দেখবার নেই ভালোবাসবার নেই।

আমরা দূরদেশ থেকে এখানে বিদ্যার্জন করতে এসেছি, পড়ুয়াদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ উঠল : আমরা কৃষ্ণকথা শুনতে আসিনি।

নিমাই বললে, কৃষ্ণই একমাত্র বিদ্যা।

পড়ুয়ারা তখন গঙ্গাদাসের কাছে গিয়ে নালিশ করল।

গয়া থেকে ফিরে এসে অবধি নিমাই কী রকম হয়ে গিয়েছে। যা কিছু ধরে, শব্দ বা ধাতু, কৃৎ বা তদ্ধিত, তার শুধু এক ব্যাখ্যা। সে হচ্ছে শুধু-কৃষ্ণ। কৃষ্ণই বিশেষ্য, কৃষ্ণই বিশেষণ, কৃষ্ণই আবার সমস্ত ক্রিয়া—তা সমাপিকাই হোক বা অসমাপিকাই হোক। আমরা কী বিপদে পড়লাম বলুন তো। এ ভাবে চললে আমরা পড়ব কী, শিখব কী। দয়া করে আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

গঙ্গাদাস নিমাইকে ডেকে পাঠাল।

নিমাই এসে প্রণাম করল গুরুকে। আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, ডেকেছি। পড়াতে বসে বাতিরিক্ত অর্থ করো কেন? যতটুকু ন্যায্য শুধু ততটুকুতেই অর্থকে আবদ্ধ রাখবে। অর্থের অপর্যাপ্তি ঘটাবে না।

নিমাই চুপ করে রইল।

যাও, ভালো করে পড়াও গে। ছাত্রদের যেন কোনো অভিযোগ না থাকে।

যাবার আগে গঙ্গাদাসকে আবার প্রণাম করল নিমাই। গঙ্গাদাস আশীর্বাদ করল, বিদ্যালাভ হোক।

কৃষ্ণভক্তিই পরমবিদ্যা। পড়াতে বসে নিমাই আবার শব্দে-অশব্দে দৃশ্যে-অদৃশ্যে কৃষ্ণ দেখতে লাগল। রত্নগর্ভ আচার্য কাছেই বসে ছিল, ভাগবতের একটি কৃষ্ণ-বর্ণনার শ্লোক আওড়াল আর নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

এমন ভাবতরঙ্গ ছাত্ররা কোনোদিন দেখেনি।

কেউ-কেউ ভাবল গঙ্গাদাসকে ডেকে এনে দেখালে হয়! সে এসে দেখুক কাকে বলে বিদ্যালাভ, কাকে বলে বিদ্যাবিলাস।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে ধূলিধূসর নিমাই উঠে বসল। পড়ুয়াদের বললে, তোমাদের কাছে একটি ভিক্ষা চাই, মুক্তি-ভিক্ষা। আমি আর পড়াতে পাচ্ছি না, পড়াতে গেলেই দেখি একটি কৃষ্ণবর্ণ শিশু বাঁশি বাজাচ্ছে, তাকে দেখে আর তার বাঁশি শুনে আমি পাগল হয়ে যাই, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু আমার মুখে আসে না। আমাকে এই পড়ানোর দায় থেকে তোমরা রেহাই দাও। তোমাদের এমনি করে বঞ্চনা করা আমার উচিত হচ্ছে না। তোমরা আর কারুর কাছে গিয়ে পড়ো।

না, না, আমরা আর কারু কাছে যাব না। পড়ুয়ারা বললে, আমরা তোমার কাছে যা দেখলাম, যা শিখলাম তাই আমাদের ঢের।

তবে এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করি। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

সে ধ্বনিতরঙ্গ গঙ্গাদাসেরও কানে গিয়ে ঢুকল। গঙ্গাদাস আর পারল না দূরে থাকতে।

নবদ্বীপলীলায় সেও গোরাঙ্গের সঙ্গী হল।

তারপর এত আকৃষ্ট হল প্রভুকে দেখতে নীলাচলে চলল। শুধু তাই নয় জগন্নাথের রথের সামনে কীর্তনানন্দে নৃত্য করল।

নবদ্বীপে ফিরে এসে আর কোথাও গেল না। প্রভু তাকে বলে দিয়েছিলেন, আমার মাকে দেখো, মায়ের খোঁজ-খবর কোরো। সেই কর্তব্যপালনই ব্রতভক্তি বলে মানল। আজ গুরু শিষ্য, শিষ্যই গুরু।

শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে এসেছেন প্রভু, মাকে দেখতে চেয়েছেন। খবর পাঠিয়েছেন, যেন গঙ্গাদাস মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

গঙ্গাদাস শচীদেবীকে শান্তিপুরে নিয়ে চলল।

একদিন শচীমাতা নিমাইকে গঙ্গাদাসের হাতে সঁপে দিয়েছিল। আর আজ গঙ্গাদাস কি মাকে ছেলের হাতে সঁপে দিতে চলেছে? নিমাইয়ের তো সেদিন বিদ্যার প্রার্থনা ছিল। শচীমায়ের আজ কিসের প্রার্থনা?

মাকে দেখে নিমাই বললে, মা, আমার যেটুকু কৃষ্ণভক্তি সে শুধু তোমার প্রসাদে। তাই তোমাকে যে স্মরণ করবে তার সংসার-বন্ধন থাকবে না।

আইর ভক্তির সীমা কে বুঝিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার জঠরে ।।
প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক আই।
আই-শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।।

সুতরাং শচীমাতাকে কী পৌঁছে দেবে? শচীমাতাই গঙ্গাদাসকে প্রভুর চরণে পৌঁছে দিচ্ছেন। যথাযথ ও ব্যতিরিক্ত সমস্তই প্রভুর পাদপদ্মে।

(১০)

গঙ্গাদাস বিপ্র

নবদ্বীপের আরেক গঙ্গাদাস—গঙ্গাদাস গোসাঁই।

কী কারণে কে জানে রাজরোষে পড়েছে গঙ্গাদাস। ভেবেছে রাত্রিযোগে সপরিবারে পালাবে নৌকো করে। নবদ্বীপ ছেড়ে যাবে জন্মের মত।

গঙ্গাদাস সপরিবারে এল খেয়াঘাটে। দেখল কোথাও একটা নৌকো নেই। চারদিক অন্ধকার। অন্ধকারের উপর অন্ধকার।

কী করবে কোথায় যাবে, যবনের গ্রাস থেকে কী করে পরিবারকে বাঁচাবে, পথ পেল না গঙ্গাদাস। ভগবানকে ডাকতে লাগল। পরিত্যক্ত অসহায়ের মত কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে।

কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। এতটুকু একটু আলোড়ন নেই তরঙ্গে।

গঙ্গাদাস ঠিক করল গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে।

তবু সমস্ত নিথর-পাথর।

তারপর গঙ্গাদাস সত্যি-সত্যি জলে নামল।

ঐ, ঐ একটা নৌকো আসছে না? নৌকোই তো। খালি নৌকো। আর তার দিকেই তো আসছে।

গঙ্গাদাস ডাক দিল।

মাঝি-ভাই আমাদের পার করে দাও।

মাঝি জিজ্ঞেস করলে, কত দেবে?

এক টাকা আর এক জোড়া কাপড়। কী, রাজি?

চলো।

মাঝি গঙ্গাদাসকে সপরিবারে পার করে দিল।

কে এক নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসের ঘরে বিষ্ণুখট্টায় বসে মহাপ্রকাশ করেছে খবর পেয়ে দেখতে গেল গঙ্গাদাস।

তুমিই সেই গঙ্গাদাস না? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

গঙ্গাদাস স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

কী, আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?

গঙ্গাদাস আরো অবাক মানল। কোনোদিন এই দিব্যকান্তি পুরুষকে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে ভাবতে পারল না।
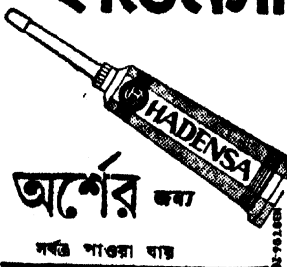
সেদিন সেই নৌকার মাঝিকে মনে নেই?

কোন নৌকো? কে মাঝি?

সেই যে বিপন্ন হয়ে ঘাটে বসে কাঁদছিলে, ডাকছিলে আমাকে, আমার সাড়া না পেয়ে ডুবে মরতে নেমেছিলে নদীর মধ্যে—কী, মনে পড়ছে না? আর আমি অমনি সেই নৌকো নিয়ে হাজির হয়েছিলাম—

আপনি—তুমি, তুমিই সেই?

হ্যাঁ, আমিই সেই জীবনতরীর কর্ণধার। তোমার কান্না শুনে নেমে এসেছিলাম বৈকুণ্ঠ থেকে। কিন্তু শোনো পারের মাশুল অত কম দিতে চেয়েছিলে কেন?

গঙ্গাদাস নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মোটে একটি টাকা আর এক [illegible] বস্ত্র। শোনো আমার আরো বেশি চাই— মনের সমস্তটুকু আকুলতা, প্রাণের সমস্তটুকু অনুরাগ। কী, পারবে না দিতে?

গঙ্গাদাস পারকর্তার পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই থেকে গঙ্গাদাস প্রভুর একান্ত ভক্ত। সেই থেকে গঙ্গাদাস প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার অন্তরঙ্গ সহচর। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের পর প্রভু যখন তাদেরকে নিয়ে বসলেন রুদ্ধ কক্ষে তখন সেখানে গঙ্গাদাস। কীর্তনান্তে [illegible]য় যে জলকেলি হল সেখানে গঙ্গাদাস। [illegible]শেখরের ঘরে যে অভিনয় হল [illegible] গঙ্গাদাস। কাজী দমনের দিন [illegible]নেও গঙ্গাদাস।

তারপর যখন শুনল প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাচ্ছেন তখন গঙ্গাদাস অঝোর চোখে কাঁদতে বসল, হে আমার মানবজন্ম-তরীর মাঝি, আমার খেয়ার কর্ণধার, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

গঙ্গাদাস প্রভুকে ষোল আনা মাশুল দিয়েছে। দিয়েছে সমস্ত প্রাণের আচ্ছাদন।

(ক্রমশঃ)

উত্তর

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত শ্রীউমাপ্রসাদ সেনগুপ্তের উত্তরে জানাই যে (ক) বর্তমানে পৃথিবীর সর্ব কনিষ্ঠ খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার ডন ওয়লটার্স।

ঐ সংখ্যায় প্রদীপ দাশগুপ্তের উত্তরে জনাই যে—(১) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক রাশিয়ার লেভ ইয়াসিন।

প্রশ্ন

(২) গত ২০ বৎসরে কোন দেশ কত বার বিশ্ব কাপ ফুটবল জয় করেছে তা দেওয়া হোল:

১৯৪৯—খেলা হয়নি।
১৯৫০—উরুগুয়ে।
১৯৫৪—পশ্চিম জার্মাণী।
১৯৫৮—ব্রেজিল।
১৯৬২—ব্রেজিল।
১৯৬৬—ইংল্যান্ড।

এস কে রায়, স্বপন ব্যানার্জী
ল্যাংড়াবাগান, কাটিহার।

●

আমি নিম্নলিখিত কবি ও নাট্যকার সম্বন্ধে জানতে চাই।

(ক) ফরাসী কবি—জাঁ ককতো
(খ) রুশ কবি—সার্গেই এসেনিন
(গ) জার্মাণ কবি ও নাট্যকার—বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট।

বের্টল্ট ব্রেহখটের কোন নাটক কি বাংলায় অনূদিত হয়েছে?

মলয় সেন
৯৬, পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।

●

১। এক ওভারে সব থেকে বেশী রাণ সংগ্রহ করেছেন কোন্ ব্যাটস্‌ম্যান এবং কত রাণ?

২। পৃথিবীর কোন্ জুটির রাণ সর্বাধিক?

৩। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ভারতের কোন্ ব্যাটস্‌ম্যান বেশী রাণ করেছেন?

শিশির কবিরাজ
দুবরাজপুর, বীরভূম

●

১। তারকনাথ সেনের জীবনী বিশদ-ভাবে জানতে চাই।

২। সম্প্রতি কাগজে দেখলাম ডঃ জে সি ঘোষ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি বৃত্তি পেয়েছেন—ইনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এ পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি থাকেন লণ্ডনে। তাঁর জীবনী জানতে চাই।

সুনীলকুমার নিয়োগী
আপকার গার্ডেন, আসানসোল

●

১। পদার্থবিদ্যার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে কয়জনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে? বর্তমানে তাঁদের জগতে শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি কি কি?

২। ক্লোরোফরম-এর কাজ কি? এ কে আবিষ্কার করেন? ইথার এবং ক্লোরোফরম-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। চৌকস খেলোয়াড় বলতে কাকে বুঝায়?

৪। বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট মাঠ এবং ফুটবল মাঠ কোন্ দুটি? এবং ঐ দুটি মাঠ কোথায় কোথায় অবস্থিত?

৫। বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ব্যাক এবং সেন্টার ফরওয়ার্ড কে-কে?

৬। বর্তমানে বাংলা আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে?

নৃপেন্দ্রকান্তি ঘোষ।
কার্তিকচন্দ্র রায়।
পঞ্চানন প্রামাণিক।
পাতিহাল, হাওড়া

●

১। বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যা কত? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দেশ-গুলোর নাম কি?

২। বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত কতজন সাহিত্যিক আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন? তাঁদের নাম কি?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসীমাতে যে আনবিক বোমাবর্ষণ

৪। ভারত কত কোটী টাকা বৈদেশিক ধার নিয়েছে, এ পর্যন্ত কোন্ দেশ সব-চাইতে বেশী ধার দিয়েছে এবং তার পরিমাণ কত?

৫। বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বড় স্টেডিয়াম কোন্‌টি, কোথায় অবস্থিত এবং কত লোক বসে খেলা দেখতে পারে?

৬। বাইটন, ডুরাণ্ড ও রোভার্স কাপের ইতিহাস কি?

৭। অ্যাসেজ কি? কত খৃস্টাব্দে প্রচলিত হয়েছিল? এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতি-বৃত্ত কি?

গীতা ও পরিমল বিশ্বাস
দাশ কলোনী
গৌহাটী-১১, আসাম

●

১। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্টেশনটির নামে সবচেয়ে বেশী অক্ষর আছে?

২। পৃথিবীতে মোট কত রকমের ভাষা আছে?

সুব্রত ঘোষ
বাটানগর

১। টেলিপ্যাথি ও টেলিথেরাপি পদ্ধতি কি?

বিজয় চক্রবর্তী
আসানসোল

●

১। বিলিয়ার্ড খেলা কোথায় আবিষ্কৃত হয়?

২। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার প্রচার সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তার সংখ্যা কত?

৩। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কে এবং তিনি কোথাকার অধি-বাসী ও তার বয়স কত?

জয়ন্ত দে, জয়তী দে
নিউ বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া
আসাম

তোতলামি কি সারে? জানতে পারলে উপকৃত হব।

অরুণ বসু
ভুবনেশ্বর।।ওড়িশা

কলকাতায় বসে কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। রবিবারের ভোরবেলায় বিছানা ছাড়ুন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত যৎসামান্য—ফ্লাস্কে চা বা কফি, বোতলে ঠাণ্ডা জল, সিদ্ধ ডিম পাউরুটি, এক ছড়া কলা পিঠে বাঁধুন—বেঁধে পায়ে হাঁটুন পূর্বগামী, দাঁড়ান গিয়ে, উল্টোডাঙ্গি স্টেশনের কাছ বরাবর। গন্তব্য সেখান থেকে মিনিটখানেকের রাস্তায় লবণ হ্রদ। বহু লোককে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। শুনেছি বটে—যাইনি, কোন্ দিকে? দেখার কিছু আছে?

দেখার মানে? পাল্টা প্রশ্ন করি।

দেখার, মানে—এই আর কি? কি জন্যে যেতে বলছো তাহলে?

সত্যিই তো, কী জন্যে যেতে বলছি! স্পষ্ট কোনো উত্তর জোগানো সম্ভব হলো না। আগে, অর্থাৎ বছর কয়েক আগে—রিক্লেমেশন শুরু হবার আগেভাগে যাঁরা এই অঞ্চলে গেছেন (যাবার উপায় ছিলোই না বলতে গেলে), তাঁদের কাছে সম্প্রতি এই দুস্তর বালির সাম্রাজ্য এক বিস্ময়ের বস্তু। আগে ঐ অঞ্চলে মাইল মাইল ব্যাপী ছিলো জলাভূমি—শর আর হোগলা ভরা সবুজ রাজ্য। উইক-এন্ডে পাখি শিকারে আসতেন অনেকেই। পাখি বলতে ডাক পানকৌড়ি টিল আর মেছো বক। তাইই যথেষ্ট। শর বনের আঁধারে—আবছায়ে লুকিয়ে থাকতো শান্তির ডগায় কুড়োনদার। প্রথমে এক ফাঁকা আওয়াজ। তারপরে গান-ভেঙে পাখির দল আকাশে কিরন্দরে যেতে না যেতেই—চতুর্দিকে ওৎ পেতে থাকা বন্দুকের নলগুলি গর্জে উঠতো—ছাড়িয়ে পড়তো রক্তাক্ত পাখনায় পাখি—কুড়িয়ে নৌকো বোঝাই করতো কুড়োনদার ছোকরার দল।

আজ এই দুস্তর মরুভূমির মতো বালির সাম্রাজ্য দেখে সেদিনের সেই পাখি শিকারের মজাদার গল্প কেউ বুঝি আর কল্পনাতেও স্বীকার করবেন না। তবু ছিলো—কলকাতার কাছে এতো বড়ো বাউস-স্যাওকচুয়ারি এককালে ছিলো—এখন আর নেই। দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। তবে সেই সঙ্গে আনন্দেরও—কারণ, সেদিনের সেই পাখির সাম্রাজ্যে মাটি আর বালি ফেলে আজ ভবিষ্যতের মানুষের নতুন এক উপনিবেশ গড়া হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে—কম করেও দশ লক্ষ মানুষের বসের সুযোগ এখানে থাকবে—তার সঙ্গে উচ ফোকড়ারবীতিতে এরই এক অংশে এমন চাষবাস হবে, যাতে করে পুরো কলকাতার কাঁচা সব্জির চিন্তাভাবনা হবে দূর। ভবিষ্যতের কলকাতা বাঁচবে খেয়ে পরে। সেদিনের আর দেরি নেই—স্বপ্নহীন কলকাতার মানুষদের নিদ্রায় আসবে সুখ-স্বপ্ন ভিড় করে নিবিড়। আসুন, আমরা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্য সূর্য ওঠার আগেই প্রদক্ষিণ করে আসি।

রিক্লেমেশনের গোড়ার দিকে করেকবার গিয়েছিলুম। তখনো জলাভূমি মাইল তিনেকের মধ্যে ছিলো। তাই সেইসব সম্প্রতি হারানো পাখির কান্না শুনে তখন বুঝি বা মনে হয়েছিলো, কী লাভ কলকাতার ডান হাত বাড়িয়ে—এভাবে পাখি ও প্রকৃতি শূন্য করে? তখনো পুরো ব্যবস্থার কথা কানে আসেনি। চোখের সামনে এক বিস্তৃত জলাভূমি বুজে আসছে—এই সত্য স্পষ্টাক্ষরে বর্তমান ছিলো। আজ মাইল মাইল বাসযোগ্য জমি দেখে আমাদের সেই অহেতুক রোমান্টিকতা কেটে গেছে—বুঝেছি পাখি-প্রকৃতির চেয়ে মানুষের বাঁচার মূল্য অনেক। রোমান্টিকতার হার এভাবেই বুঝি রিয়ালিস্ট-দের কাছে হয়।

সেদিন বালির সাম্রাজ্য যাতে উড়ে-ভেঙে না যায় হাওয়ায়,—তার জন্যে শিকড়প্রধান দুর্মর ঘাস সুন্দর বনের বাদা অঞ্চল থেকে সহস্র সহস্র মুদ্রা খরচে আনা হচ্ছিলো দেখে বিরক্ত হয়েছিলুম। কেননা এক বর্ষার বৃষ্টিতে যে সাধারণ মুথা ও নালি ঘাস স্বতঃই গজাবে, অন্যান্য শাকসব্জি জাতীয় লতাপাতা উৎক্ষিপ্ত হবে—জানতে পেয়েছিলুম। আজ সেই বাদার ঘাসের নামমাত্র লবণ হ্রদে নেই, তার বদলে বালির সমুদ্রে কী আশ্চর্য সবুজে মসৃণ। কোলকাতায় খাটালের লক্ষ লক্ষ মহিষ গরু ভেড়া সেই উদার মাঠে স্বচ্ছন্দে বিবরণ করছে। তাদের খাদ্যের কোনো টান পড়েনি। কিন্তু এক বিষয়ে আমাদের সরকারী অবহেলার জন্যে দুঃখিত না হয়ে পারছি না—এই বিশাল জমিতে গৃহনির্মাণের আগে পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ ফসল জন্মাতে পারতো, সেদিকে কারও টনক নড়ে না কেন? দিল্লীতে যমুনা নদীর চরে কী বিপুলে তরমুজ-খরমুজ জন্মে তাতো আমরা জানি। সেখান থেকে কলকাতায় বিপুল অর্থব্যয়ে চালান আসে—সেই চালান আজ গত দুতিন বছরের জন্যে বন্ধ করা যেতো। আমাদের এক কৃষিবিদ বন্ধু এই জমিতে আলু বা তন্তুজাতীয় শস্যের উৎপাদন অনায়াসেই সম্ভব বলেছিলেন। সে নিয়ে কাগজে লেখালেখিও করেছিলেন তিনি। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা!

এখানে প্রায় উপনিবেশ গঠিত হতে কম পক্ষে বছর পাঁচ ছয় দেরি আছে। সেই সময়ের মধ্যে আজ এই দারুণ খাদ্যাভাবের সময়ে, কিছু না কিছুর ফলন তো হওয়া সম্ভব। আমরা কর্তৃপক্ষের আশু মনোযোগ আকর্ষণ করছি—এই দুর্ভিক্ষের দেশে অতো বড়ো খাদ্যশস্যের গোলাঘর এমন নিরর্থক শূন্য যেন আগামী বছরে না যায়।

এবারের ভ্রমণে জিপগাড়ি চড়ে বসলাম। সামান্য একটা রাস্তা আছে ইঁট আর বালি মেশা। তার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের গাড়ি এঁকেবেঁকে চলছে। দুপাশের কাছাকাছি পুরোদমে কাজ চলছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড ড্রেনেজ-এর কাজ এতদিনে প্রায় সম্পূর্ণ। কিছুদূরে এগিয়ে আসার পর কর্মরত কুলিকামিন আর তাদের কাজের তদারকে কন্ট্রাক্টরদের লরির দর্শন পাওয়া গেলো না। এদিকে মাঠ একাকী পড়ে আছে। আপনমনে চরে বেড়াচ্ছে মহিষের দল। এক সময় সামনে দেখি কেষ্টপুরের খালের ওপাশেই গ্রাম কেষ্টপুর তার পরে নপুর, মহিষবাথান—পারের পর মাছের ভেড়ি। দূরে সবুজের আভাস। আমরা গাড়ি রেখে সামান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ভেড়ির জলটুঙ্গির দিকে এগিয়ে চলি। চোখের সামনে সেই বিপুল আবরণ, পাখির কান্না আজো এক অংশে অবশিষ্ট। এখান থেকে চতুর্দিকেই কী আশ্চর্য প্যানোরামিক কলকাতা—তার গম্ফাগম্বুজ, প্রাসাদ-মহল, হাওড়াব্রিজ নিয়ে কী বিপুল কলকাতা! দিগন্তের গা ঘেঁষে সরু শাড়ির পাড়ের মতন কি চমৎকার দৃশ্য—ঠিক প্ল্যানেটোরিয়ামের কলকাতার মতন। মনে হয়, না দেখলে এমন এক দৃশ্যের জন্যে হাহাকার সারা জীবনে থেকে যেতো। সামনে অনেক ভেড়ি—আমরা এক তালবীথির ছায়ায় প্রাতঃরাশ মেলে বসলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর মাছধরা, জলে-ঝাঁপাই, নৌকোয় শালতি চড়ায় আহ্লাদ। জনৈক ধীরেন মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ হলো—সে এই মাছের ভেড়ির পাহারাদার। বললো আগে এই ভেড়িটাই সাড়ে সাতশো বিঘে ছিলো। এখন মাত্র সাড়ে চার শো বিঘে। মাছ ওঠে সাত আটশো মণ। পোনাতেই লাভ বেশি—তেলাপিয়ার বা আমেরিকান পোনাতেও লাভ কম নয়।

জিজ্ঞেস করি, তোমার ভালো লাগে এই কাজ?

লাগবে নি বাবু? আমি আছি গিয়ে আট বছর বয়স থিহে—আজ হয় দুকুড়ি সাত—ভাল্ লাগবে নি বাবু? কী যে বলেন!

সে আমাদের নেমতন্ন জানায়। আসচে মাসে আসবেন। মাচ খাইয়ে আশ মেটিয়ে দোবো। এ-মাসে তো ভেড়িতে জাল বন্ধ। মাছ বাড়ার জন্যে একরকম বন্ধ আকছার। তখন ওদেরও মাইনে বন্ধ—শুধু খাওয়া দেন ভেড়ির মালিক। চমৎকার লোকজনের সাহচর্য। চমৎকার জায়গা। এক বেলার জন্যে এক নতুন পৃথিবী! কলকাতায় বসে কলকাতায় ভ্রমণ করে আসা।

—রূপচাঁদ পক্ষী

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

সুধা ঘরে ঢুকতেই বাচ্চুকে নিয়ে পড়ল।
...র হাত ধরে বললে, কাল থেকে
...আপিসে যাবার জন্যে বায়না
...ব না, বুঝলে? একলা একলা নতুন ঝি-
কাছে থাকবে কেমন?

মা'র কথা শুনে বাচ্চু কেমন যেন
...ক হ'য়ে গেল। মুখখানা অদ্ভুত ক'রে মার
...র দিকে চাইলে। বড় করুণ আর অসহায়
...খে।

সুধার চোখে জল এল, সত্যিই তো তার
...র কথা ছেলেকে সে কি ক'রে বোঝাবে,
সে-ই বা বুঝবে কেন! তা বলে ছেলেকে
সে ফেলে দিতে পারে না, নিষ্ঠুর হ'তে
...না।

...ং বাচ্চু যেন সুধাকে আরও লজ্জা
...মুখটা করুণ ক'রে ভয়ে ভয়ে বললে,
...থাকবে?

ছেলের কথায় সুধার মনে হল হঠাৎ
মুখের ওপর দিয়ে এক ঝলক আগুনের
...যেন বয়ে গেল।

সুধা নিজেকে ভোলাতে ছেলেকে ধমক
...বললে, কেন তুমি বড় হ'য়েছো, একলা
...থাকতে পার না?

সুধার ভাগ্য ভাল যে বাচ্চু আর তার
...কথা বললে না।

...দিকে সারারাত শিশুর ছটফট
...সুধা কিছুতে ভাবতে পারলে না,
...পরে হঠাৎ বাচ্চুর তার বাবার কথা
...পড়ল কেন। বেশ তো ভুলে গিয়েছিল!
...থাকতে পারে বাচ্চুর বাবাকে মনে-
...?

...কে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়,
...বাচ্চু, বাবার জন্যে কি তোর সত্যি মন
...? বল, সত্যি করে বল, বাবাকে
মনে পড়ে?

...বাচ্চুকে তার বাবার সঙ্গে যেতে
...হতো। ছেলের জন্যে বাবুর দরদ
...উথলে উঠেছিল! পিতৃত্ব জাগ্রত
...কি তর্ক!—ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে
..., বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিল!
...হয়নি। কেন সে কি ছেলে মানুষ
...পারবে না? অধিকার তারও কম নয়।
...?

...এখন বাচ্চুকে সঙ্গে দিলেই হতো।
...ছেলে সামলানো কি দায়! পিতৃত্বের
...বেরিয়ে যেত। এ তার মা নয় যে,
...কাঁদলে কোলে নিয়ে ভুলিয়ে দেয়।

ইস্-স্ বড্ড যেন ভুল করেছে বোকার
সে ছেলেকে আঁকড়ে রেখেছে। সে যদি
সুধা কেন পারবে না?

...ভেবে দেখলে সত্যিই সে বোকামি করেছে
...গোড়া। তার বাবা যে রাগ করতেন
...না। এখন বুঝছে তাঁদের কথায় মুক্তি
সুধা একটি দিনের জন্যে বাবার কাছে
...পায়নি। বাবা যেন কেমন তুচ্ছ-
...করতেন তাঁদের অনুরাগকে—সাবা-
...না হলে হয়তো মার-ধোরই করতেন।

...ভাবলে মনে হয় ঠিকই করতেন।
...ভুল করেছে, বুঝতে পারেনি পরি-

...ণামটা সত্যিই এমন মর্মান্তিক হবে। এত
সহজে পরস্পরকে তারা ঘৃণা করবে।

সুধা এখন কিছুতে ভাবতে পারে না,
কোনদিন তার মনে কোন সংশয় বা কোন
ভাবনা ছিল কিনা—বরং ভাবতো যেন, যত-
দিন নদী বয়, পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য ওঠে,
গাছে গাছে ফুল ফোটে, পাখী গায়, তত-
দিন তাদের প্রেমও শাশ্বত স্থির—

না, মুখে অবশ্য সে-কথা নীরেনকে সুধা
বলেনি। তার মনে হয়েছে তারা দুজনেই ঐ
একই কথা ভেবেছে। না হলে—

এই শয্যা, এই ঘর এইসব একদিন তাকে
কত অভিভূত ক'রেছিল, সুধা সমস্ত অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ দিয়ে বার বার যেন বলেছিল,
তোমাকে আমি কত ভালবাসি নীরেন, সে
কথা মুখে আর কি বলবো! বার বার কত-
বার কতভাবে সে-কথা সুধা যেন বলেছে!

কিন্তু নীরেন কি কোনদিন তেমন করে
বলেছে না, ভেবেছে? বড় স্বার্থপর, আত্ম-
সুখী নীরেন—

নিজের সব কাজগুলো এখন সুধার
আত্ম-অপমানকর মনে হচ্ছে। দাস্যবৃত্তি
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না—সে-ই কেবল
প্রেমের নামে সেবা করেছে। নীরেন

...র কোন মর্যাদাই দেয়নি, সে যা চেয়েছিল
...পায়নি, নীরেন যা চেয়েছিল তার অতি-
রিক্ত পেয়ে ফেলে ছড়িয়ে গেছে।

নিজের কাছে যেন লজ্জা রাখা যায় না।
...অপমানে দেহ-মন অবসন্ন হয়ে
আসে। অন্ধকার ঘরটা যেন চিন্তার নানা
সরীসৃপ ছেড়ে দিয়েছে, তারা কিলবিল
করছে মনের মধ্যে।

সুধা উঠে আলোটা জ্বালালে। ছেলেটা
কি শান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন কে
বলবে ওকে নিয়ে সুধার কোন ভাবনা
আছে। কি লক্ষ্মী ছেলে!

ইচ্ছে না করলেও সুধার মনে পড়ল,
ঠিক ঐখানটিতে সে শুতো, নিজের জায়গা
বেছে নিতে কোনদিন ভুল হতো না। কি
কাণ্ড করতো যতক্ষণ জেগে থাকতো—

না না, রোমাঞ্চ নয়, গায়ে জ্বালা ধরে
সুধার। ছি-ছি তখন যদি বুঝতো!

'সুধা! সুধা! সুধা!' কি গদগদ ডাক,
যেন গলে যেত সুধা! ইস-স কি ছেলে-
মানুষ ছিল সেদিন সুধা!

পট করে সুধা আলোটা নিবিয়ে দিলে।
চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো।
খাটের ওপর বাচ্চুর আবছা দেহটা অদ্ভুত

ছায়ামূর্তিতে বড় হয়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সুধা চীৎকার করে উঠতে চাইলে। সুধা আবার আলো জ্বাললে। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নাকি?

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢক-ঢক করে খেয়ে নিলে সুধা। জল তেষ্টাই পেয়েছিল। মাঝরাতে উঠে জল খাওয়া তার অনেক দিনের অভ্যেস, দেখা-দেখি নীরেনও অভ্যেস করেছিল, একই সময় দুজনের বড় পিপাসা বোধ হতো।

জানালায় সরে এসে সুধা আলো-অন্ধকারের শহরের দিকে চেয়ে রইল। বুকটা যেন খালি খালি মনে হল। মনে পড়ল, কতদিন সে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, কতদিন মা-বাবা, ভাই-বোন কাউকে দেখেনি, কতদিন যেন তাদের ভুলে আছে! হঠাৎ একটা অদ্ভুত আশ্চর্য বেদনাবোধ সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে মনে সুধা গুমরে ওঠে। তাকে কে যেন এখানে ধরে এনে বন্দিনী করে রেখেছে! এ তার নিজের ঘর নয়।

সুধা অস্ফুটে যেন বললে, ফিরে যাব? ফিরে যাব!......

সুধা লক্ষ্য করেনি, কিছু বুঝতেও পারেনি। গাড়িটা তখন নিঃশব্দে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুধা মুখ তুলে পাশ কাটাবার জায়গা খুঁজতে যেন লক্ষ্য করলে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বোস-সাহেব বললেন, এখানে?

সুধা যেন অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছে না। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে।

বোস-সাহেব বললেন, আজ একলা? ছেলেকে আনেননি?

না, সুধা ইতস্তত করলে।

বোস-সাহেব বোধহয় লক্ষ্য করলেন, কোথায় যাবেন? আসুন না পৌঁছে দিই, ওই দিকেই তে যাব।

না, একটু মার্কেটে যাব, দরকার আছে। সুধা তেমনি ইতস্তত করল।

বোসসাহেব বললেন, আমারও ঐদিকে দরকার আছে. অসুবিধে না হলে—

বোসসাহেবকে কথাটা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে সুধা গাড়িতে উঠে সন্তর্পণে বোসসাহেবের পাশে বসল।

বোসসাহেব গাড়ি চালিয়ে বললেন. ভাগ্যিস আপনি বললেন, আমার একেবারেই মনে ছিল না, মার্কেটে যাওয়া আমারও দরকার ছিল। খুব মনে করিয়ে দিয়েছেন।

মার্কেটের দরজায় পেঁাছে সুধা কিন্তু গাড়ি থেকে নামল না। বোসসাহেব স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে বললেন, কই নামুন!

সুধা তেমনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। চিত্রার্পিত যেন।

বোসসাহেব আবার গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে বললেন, থাক, চলুন তবে—আর একদিন আসা যাবে।

সুধা তেমনি নিশ্চেষ্ট, অবস্থাটা যেন বুঝেও সে বুঝতে পারছে না। লজ্জা, ভয় সঙ্কোচ, দ্বিধা যেন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কি করবে না করবে যেন ভাবতে পারছে না। উচিত অনুচিত বোধও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত সুধা বললে, চলুন।

বোসসাহেব নেমে গাড়ির দরজা খুলে অপেক্ষা করলেন। সুধা খুবই সপ্রতিভ হয়ে বললে, আসুন।

এক সময় মার্কেট ঘুরে বোসসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কই আপনি তো কিছু কিনলেন না? বলছিলেন কি দরকার আছে যেন—

সুধা বললে, আর একদিন কিনবো। চলুন।

বোসসাহেব বললেন, আর একদিন কেন, আজই কিনুন।

সুধা বললে, না থাক! আপনার মার্কেট হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। এই তো কটা জিনিস—সবই প্রয়োজনীয়। কেনা জিনিসগুলো আর একবার যেন দেখাতে যান বোসসাহেব। আপনারও সেরে ফেলুন। কিনবেন বলে এলেন—

সুধা তেমনি সঙ্কোচ বোধ করে বললে, থাক, পাড়া থেকে কিনে নেব।

বোসসাহেব বললেন, আপত্তি কি এখানে কেনার? চয়েস মত জিনিস পেতে পারেন। বলুন না কি কিনবেন?

এমন কিছু না। কটা খেলনা! ওসব জায়গায় পাওয়া যায়।

তা পাওয়া যায়, কিন্তু মনোমত নয়।

বোসসাহেব ছাড়লেন না—এক গাদা খেলনা কিনে ছাড়লেন। সুধাকে পয়সাও দিতে দিলেন না। বললেন, আমি কি কোন শিশুকে উপহার দিতে পারি না? না, আপনার ছেলের খেলনাগুলো নিতে আপত্তি হবে?

সুধা কোন জবাব দিতে পারলে না। বোধহয় এইজন্যেই তার আপত্তি ছিল এক-সঙ্গে মার্কেটে আসার। কিন্তু বোসসাহেব নাছোড়বান্দা।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপহারের সামগ্রী বোস-সাহেব বাচ্চুকে কিনে দিয়েছেন। খেলনাগুলো সত্যি অভিনব। বাচ্চুর সারা-দিনের মন-মরা ভাব কোথায় উবে গেল, খেলনা নিয়ে বেশ মেতে উঠলো ছেলে!

ছেলের এত খুশী-খুশী ভাব দেখে কিন্তু সুধা খুশী হতে পারল না। নিজের মনে সেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। খেলনাগুলো উপহার না হয়ে আর কিছু যেন মনে হতে লাগল। ইচ্ছে করলো, খেলনাগুলো ছেলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ভেঙেচুরে জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। কোন অজুহাতেই ওগুলো ঘরে এনে ছেলের হাতে তুলে দেওয়া সুধার উচিত হয়নি। বাচ্চু কি জানে ও খেলনাগুলো তার মা তাকে কিনে দেয়নি, দিয়েছে যে জন তার সঙ্গে আত্মীয়তার কোন সম্পর্কই নেই তাদের! যেন জিনিসগুলো সুধা চুরি করে এনে ছেলেকে ভোলাচ্ছে।

বাচ্চু খেলনাগুলো নিয়ে খাটের ওপর বসে নিজের মনে খেলতে লাগল। সুধা পাশের ঘরে এসে একটা তোরঙ্গের ডালা খুলে একটা কাপড়ের পুতুল বার ক —ধুলো পড়ে পুতুলটা কেমন যেন বি হয়ে গেছে।

অতি সোহাগ ভরে পুতুলটা নাড়াচা করে সুধা কেমন যেন বিমনা হয়ে পড় অনেকদিন আগে ছেলের কথা ভেবে বে থেকে যেন পুতুলটা নীরেন সংগ্রহ এনেছিল। বলেছিল, রেখে দাও, এক কাজে লাগবে।

আরো খেলনা নীরেন হয়তো এনে করতো, সুধা বারণ করেছিল—কি পা লাম, শুধু শুধু পুতুল কিনলে কেন?

কেনর উত্তর ঐ একরকমই নী দিয়েছিল, রেখে দাও কাজে লাগবে! ছে মেয়ে কি হবে না কোনদিন?

সুধা সেদিন খুব রাগ দেখিয়েছি বলেছিল, হলেও ওই রকম পুতুল ত দেব না।

বাচ্চু হবার অনেকদিন আগে পুতু এনে নীরেন চোখের ওপর ড্রেসিংটেবি ওপর বসিয়ে রেখেছিল। তাদের ঘরে এ শিশুর আগমন সূচনা করেছিল।

সুধা পুতুলটা এনে বাচ্চুর হাতে বললে, দেখ কেমন সুন্দর পুতুল! দেখ—

বাচ্চু একবার মুখ তুলেই চোখ না নিলে, নতুন রঙচং-এ খেলনাগুলো আবার খেলায় মন দিল।

সুধা পুতুলটা বাড়িয়ে ধরে ব নাও, নাও এটাও নাও। তোমার পুতুল

এবার বাচ্চু যেন বিরক্ত হলো, স বললে, বিচ্ছিরি পুতুল!

তবু সুধা জেদ করলে, নাও! না এটা?

বাচ্চু মাথা তুললে না, নতুন খেল মেতে আছে সে।

সুধা হঠাৎ কঠিন হয়ে বললে, বলছি, নাও! বেশ, তা হলে ওগুলো দাও।

বাচ্চু কেঁদে উঠলো। সুধা পুতুল বুকে চেপে ওঘরে পালিয়ে গেল। কারেও ছেলের হাত থেকে বোসসাহে উপহার পুতুলগুলো কেড়ে নিতে পা না।......

মাঠের নির্জন জায়গাটায় ওরা কদিন আসছে। ওদের মেলামেশা বোধ খুব সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অ সব পরিচিত হয়ে উঠেছে।

বোস-সাহেব গাড়িটাকে অনেক রেখে ঘাসের ওপর সুধার মুখোমুখি বললেন, দয়া করে মুখটাকে আর এক

সুধা মুখ ফেরালে, মুখে ম্লান ফুটলো।

ইয়েস, দ্যাট্স্ ইট! বোস-সা গাড়ির চাবিটা নিয়ে যেন খেলা ক লাগলেন।

গাছ-পালা, ঘাস-বন ছাড়িয়ে অ শহরটা আলো আলো হয়ে উঠছে। স পুকুরের জলটা স্থির হয়ে আছে কান্না-মুখের মত!

বোস-সাহেব বললেন, আচ্ছা এ তোমার এত ভাবনার কি আছে? ব্যবস্থা হয়েছে!

সুধা যেন হাসবার চেষ্টা করলে।

সোৎসাহে বোস-সাহেব বললেন, তুমি গিয়ে তো দেখে এসেছো, কি রকম নজমেন্ট! এখন আর ভাবনা কি?

সুধা মাথা নেড়ে সায় দিলে। বাচ্চুকে নে রেখে এসেছে সেখানকার ব্যবস্থা ই ভাল। বোস-সাহেব অনেক করেছেন, তাঁর নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য।

বোস-সাহেব বললেন, কলকাতায় সব-অভিজ্ঞত প্রতিষ্ঠান ফাস্ট ক্লাশ!—ন পরে তুমি নিজের ছেলেকে চিনতেই ব না!

সে-কথাও বোধহয় ঠিক। ওখানকার গুলো কি চটপটে, এতটুকু টুকু ছেলে ত স্বচ্ছন্দ—পোষাকআসাক, ব্যবহার, হয় না বাঙালী কি হিন্দুস্থানী!

বোসসাহেব বললেন, দেখলে তো মেম-আছে। কিছু ভাবনা করো না। ক নিয়ে আর তোমাকে বদারড্ হতে না।

এবার সুধা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, র জন্যেই হল।

বোস-সাহেব বললেন, না, না তোমার ।

থাটার কোন মানে ছিল কি না কে, বোস-সাহেব সুধার একটা হাত টেনে র হাতে নিলেন। সুধা আপত্তি করলে কতক্ষণ কেটে গেল।

সুধা যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। স্থাণু যেন।

বোস-সাহেব আবেগভরে অনেক কথা লাগলেন। কে জানে চিত্রার্পিত নিশ্চল র্তি সুধার কানে সে-সব কথা যাচ্ছে ।

কাছ সরে বোস-সাহেব বুঝি ঘন সান্নি-চাইলেন। এবার সুধা একটু সরে ।

বোস-সাহেব নিজেকে সংযত করে ন, আর কিন্তু তোমার কোন বাধা বা হ থাকতে পারে না! ইউ আর ফ্রি—

সুধা হঠাৎ উঠে পড়ল।

বোস-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কি ? এখনি উঠচো?

সুধা মাথা নাড়লে, হাঁ উঠবো!

বোস-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ভাল ই না? শরীর খারাপ? মাঠ ছেড়ে সুধা চলতে বললে, না।

বোস-সাহেব যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, !

আশ্চর্য-ই! গাড়ির সামনে এসে রাস্তার য় বোস-সাহেব লক্ষ্য করলেন, সুধার যেন জল। কিছু জিজ্ঞেস করবার ই সুধা মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে ল।

গাড়িতে উঠে সহজ সুরে সুধা বললে, টা আমার ভাল লাগে না।

বোস-সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

ত ভিড়—লোকজন! সুধা ততক্ষণে চোখ বেশ স্বাভাবিক করে ফেলেছে। ব্যাগ খুলে প্রসাধনও সেরে নিয়েছে।

তা হলে আর একটা জায়গা সাজেস্ট কর! বোস-সাহেব সাগ্রহে বললেন, হোয়ার শ্যাল উই মিট?

সুধা উত্তর দিলে না। এই শহরে তাদের সাক্ষাতের উপযুক্ত জায়গা আর নতুন করে কোথায় দেখাবে? এখানেই তো সে কতবার এল, কত সংকল্প আর শপথ নিলো, বিরহ-মিলনের কত কারণ ঘটলো!

হঠাৎ স্পর্শটা সুধার নতুন মনে হল। সমস্ত দেহ-মন যেন অবশ হয়ে গেল। এ ধরনের আচরণ বোস-সাহেব এর আগে তার সঙ্গে কোনদিন করেননি। আজ যেন কেমন করছেন। অথচ আপত্তি করবার কোন ইচ্ছেই নেই সুধার। এই কয়েক মাসে বড় অন্তরঙ্গ বড় আপনার জন হয়ে উঠেছেন বোস-সাহেব। সুধার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর দিকে লক্ষ্য রাখছেন।

পরিচারিকা এসে অনেকক্ষণ ডেকে গেছে। সুধা আপিস থেকে ফিরে সেই যে বিছানা নিয়েছে এখনো ওঠেনি। আর কতক্ষণ পরিচারিকা অপেক্ষা করবে? তার বাড়ী-ঘর নেই?

রাত প্রায় দশটা। পরিচারিকা এসে ডাকতে সুধা বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার খাবার নিয়ে তুমি চলে যাও! আমি খাব না।

আজ কদিন সে দেখছে তার মনিবটি যেন স্বাভাবিক নয়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কেমন যেন ইচ্ছে করে অনিয়ম করছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, শরীর আমার ঠিক আছে। তুই যা!

পরিচারিকা ভাবতে পারে না, মানুষের শরীর ঠিক থাকলে খাওয়া-দাওয়ায় এমন বে-নিয়ম হয় কেন—রাতদিন চুপ করে শুয়েই বা থাকে কেন?

তবু দাসী আবার একবার ডাকলে, দিদিমণি ওঠ, যা হোক কিছু মুখে দাও। রোজ রোজ উপোস করা ভাল নয়।

সুধা তেমনি নিশ্চেষ্ট, কোন সাড়া করলে না। বিছানায় শুয়ে রইল।

দাসী বললে, শরীরের তোমার কিছু হয়নি, খাবে না কেন? ওঠ, ওঠ—

সুধা বিরক্ত হয়ে বললে, বললুম তো খাবার ইচ্ছে নেই, তুই তোর খাবার নিয়ে চলে যা।

খাবার নিয়ে দাসী যাবার সময় বললে, এ ভাল কথা নয়, দিদিমণি, তুমি ডাক্তার-বদ্যি দেখিও, রোজ রোজ এমন ধারা করলে শরীর সইবে কেন!

ঝি চলে যেতে সুধা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। ঝি-টা নেহাৎ-ই সরল, ভাল-মানুষ :—সুধা মনে মনে ভাবলে, মনে করে সত্যি, বুঝি অনাহারে তার মনিব মারা যাবে!

কথাটার মধ্যে হাসি নেই, তবু ভেবে সুধার হাসি পেল। প্রথম প্রথম অনেক গল্প করেছে ঝি-টা—কয়েকবার জিজ্ঞেসও করেছে, দিদিমণির দাদাবাবু আছে কিনা? এমন একলা-একলা থাকতে ভয় করে কিনা।

তারপর আবার নিজের মনেই বলেছে, আমাদের মত তো মুখ্যু মেয়েমানুষ নও যে একলা থাকতে ভয় করবে : তোমরা চাকরি করচো, হেথায় হোথায় যাচ্চ, তোমাদের কথা আলাদা!

ছেলের কথাও নতুন ঝি জানে না। বাচ্চুকে দেখেনি সে এসে।

সময় সময় সরলতাটা সুধার কেমন সন্দেহ হয়। মতির মা ছিল, সে এক রকম, এ আর এক রকম। মাঝে মাঝে বড় যেন আত্মীয়তা করে! নিজের গল্পও করে।

পোড়া দুঃখের কথা কি আর বলবো দিদিমণি, কপালে সুখ না থাকলে কে সুখ দেবে? রোজ ভাত বয়ে নিয়ে যাব তবে উনি খাবেন! জোয়ান মদ্দ রাতদিন শুয়ে বসে থাকবে! এদিকে তম্বি কত! মুরোদ নেই এক কড়া—

মাঝে মাঝে সুধাকে থামিয়ে দিতে হত, বলতে বলতে মুখের লাগাম থাকতো না। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়, স্বামী-স্ত্রীর মতই আজ বিশ বছর আছে। বিয়ে করা বরের কথা সারদার মনেই নেই।

খাট থেকে উঠে সুধা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। সত্যিই তার আজ একলা থাকতে ভয় করছে। এখন কেউ যদি এসে তার গলা টিপে দিয়ে যায় তার করার কিছু নেই। কেউ জানতেও পারবে না।

সুধা মনে করলে, না দরজায় খিল তো দিয়েছে, তালাও লাগিয়েছে! না গলা-টিপে কেউ তাকে মারতে পারবে না। ওদিকের ফ্ল্যাটে কোন এক বাড়ীতে এই রকম নাকি খুন হয়ে গেছে কদিন আগে। ঝি খুব উৎসাহ ভরে বর্ণনা দিচ্ছিল, সুধা থামিয়ে দিয়েছে। খুন তো অমন কত জায়গায় কত কারণে হচ্ছে, তাতে তার কি!

নতুন ঝি'র বড় ভয়, না 'দিদিমণি একলা থাকিও না! দিনকাল বড় খারাপ চলতেচে!

সুধা বলেছিল, তা হলে তুই এসে থাক!

ঝি আর কথা বলেনি। বলেছিল অনেক পরে, 'এখানে থাকরো সে তো সৌভাগ্যি দিদিমণি, কিন্তু ও মিনষে কি ছাড়বে? বলে কি জান, আমার একলা থাকতে ভয় করে। পুরুষ মানুষের কি ভয় তোমায় কি বলবো দিদিমণি!'

সুধা মনে মনে নিজেকে নাড়া দিলে। আজ আবার এসব কি চিন্তা করতে সে আরম্ভ করেছে! কোথায় নিজের আশু ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে তা নয়, ঝি, ঝি-এর সংসার নিয়ে ভাবছে!

বাচ্চুকে নিয়ে আর কোন ভাবনা নেই। বেশ ভাল আছে মাদারের কাছে। অন্যদিন বাচ্চু চোখ মুছতো সুধাকে দেখলে আজ তো দিব্যি হাসছিল! বরং বোসসাহেবকে দেখে যেন ছেলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কি দরকার ছিল বোসসাহেবের বাচ্চুকে দেখতে যাবার? বাচ্চু ওর কে হয় যে, উনি আগ্রহ দেখাবেন?

'হ্যাপি হোম' থেকে ফিরতে ফিরতে বোসসাহেব বলেছিলেন, বেশ ভালই আছে
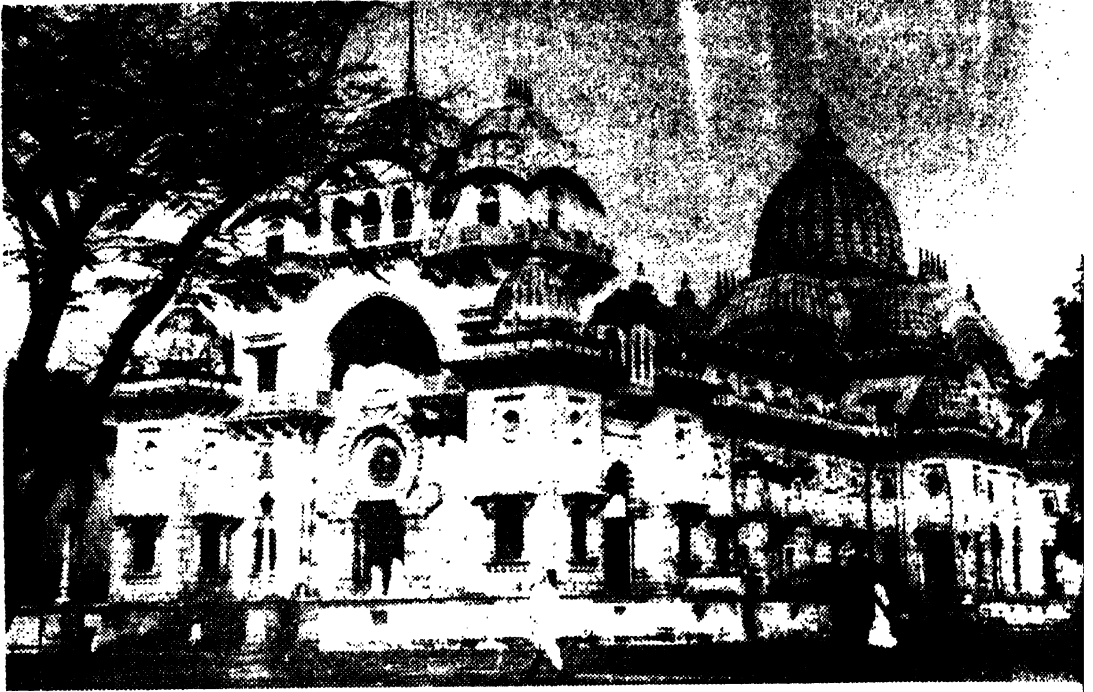
বেলুড় মঠ — ফটো : মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

তোমার ছেলে! অল মোস্ট ন্যাচারাল! কোন গোলমাল নেই, মাদার তো ভাল রিপোর্ট দিলে।

সুধা মাথা নাড়লে। অর্থাৎ বোস-সাহেবের চেষ্টায় তার সমস্ত ভাবনা দূর হয়েছে।

'তা হলে এবার—' বোসসাহেব সুধাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। সুধাও কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

ছি-ছি, কাঁধের ওপর বোসসাহেবের হাতের স্পর্শটা যেন এখনো অনুভব করা যায়। আর একটা নিবিড় স্পর্শানুভূতি যেন সেই সঙ্গে দেহ-মনের কন্দরে ফুঁড়ে সুধা বার করতে পারে! ইঃ ঐ প্রথম স্পর্শসুখ!

সেদিন সুধা কিছুতে রিক্সাতে উঠবে না। নীরেনও ছাড়বে না। সেই উঠলো স্থান সংকুলান নিয়ে কত আপত্তি, অনুযোগ করলো। কিন্তু কে শোনে, নীরেন এমনভাবে আপন দেহ মধ্যে সুধাকে সন্নিবিষ্ট করে নিলে মুহূর্তে তার দেহ-মনের সমস্ত সুখানুভূতি তীব্রতায় অসাড় অবশ হয়ে গেল। তারপর কতদিন রিক্সায় পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি বসে সুধা মনে মনে স্পর্শ-সুখ অনুভব করতে পেরেছে।

সুধা চোখে হাত চাপা দিয়ে জানালার গরাদে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেহটা কেমন দুর্বল মনে হল।

সুধা ঘরের আলো জ্বাললে। টেবিলে বসে লেটার প্যাড বার করে চিঠি লিখতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কি লিখবে, কাকে লিখবে যেন ভাবতে পারলে না। ভাবনার সব ক্ষমতা যেন তার লোপ পেয়েছে।

অনেক ভেবে যেন সুধা লিখলে: আমাকে আরো কিছুদিন ভাববার সময় দিন। আমি এখনি কিছু ভাবতে পারছি না।

তারপর হঠাৎ প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দলা পাকিয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিলে। লেখাপড়ার মধ্যে না যাওয়াই উচিত, বেকামি!

'না না, কোন কারণ ছিল না। এমনি, একদিন ভাল লেগেছিল বলে যে চিরকাল ভাল লাগবে, তার কোন কথা নেই! প্রেম আর ঘৃণার মধ্যে দূরত্ব কতখানি? সুধা টের পেয়েছিল......না-না, তার কোন দুঃখ বা অনুশোচনা নেই! নতুন করে আবার সে বাঁচবে।'

ভোরবেলায় বাইরে ঝি-এর ডাকাডাকিতে সুধা বিছানা ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিক অবস্থাটা ভাববার চেষ্টা করলে। আশ্চর্য, অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঝিটা ভারি জ্বালাতন করে। ভোরবেলায় এসে ঘুম ভাঙাতে!

ঝি ঘরে ঢুকে বললে, দেখ গে নীচে একটা বাবু ডাকচে!

সুধার মুখময় রক্তের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। কি লজ্জা, এই সকালবেলায় ছুটে এসেছেন। কাল কথা দেওয়া সত্ত্বেও কি বিশ্বাস হয়নি? এত তাড়া কিসের?

সুধা মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে, সাক্ষাতে কি বলবে না বলবে। বলবার অনেক কথা আছে।

ঘর থেকে বেরতে গিয়ে সুধার মনে ইস—স্ এ কি বেশে সে তার সামনে যা তারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভেঙেই ছুটেছে বিবস্ত্র আলুথালু হয়

কাপড়চোপড় বদলে, প্রসাধন প্রস্তুত হয়ে সুধা এসে সিঁড়ির স্মিত মুখে দাঁড়াল। নীচে দৃষ্টি প তার বুকটা যেন জমে হিম হয়ে গেল

ততক্ষণে নীরেন এক হাতে বক্সটা নিয়ে দু-এক ধাপ উপরে এসেছে। চোখে চোখ পড়তে বললে, বক্সটা' নিয়ে গেলুম—তাই জানিয়ে য

সুধা তেমনি স্থির হয়ে সিঁড়ির দাঁড়িয়ে রইল—মুখ দিয়ে তার কোন বেরল না।

নীরেন নেমে যেতে যেতে 'অবশ্য তোমার দরকার থাকলে'—

সুধা তেমনি স্থির, নিরুত্তর। চলে গেল। কিন্তু সে যদি উত্তরের অপেক্ষা করতো তা হলে হয়তো স্ত্রীর চোখে অকারণে অশ্রু রেখা পেত।

তারপর সুধা পিছন ফিরে ঘরে আসতে নিজের মনে যেন ব্যঙ্গ করলে

লোকটা কি, সাতসকালে লেটার বাক্স নিয়ে অধিকার খাটাতে কিছু পেলে না!

—শেষ—

অতুলপ্রসাদের জীবনী

আমারে এ আঁধারে

কল্যাণকুমার বসু

(২০)

...ছর শেষ হয়ে গেল। ১৯২৬ সালের ...অর্থাৎ জানুয়ারীতে কবিগুরু রবীন্দ্র-... এলেন লখনউতে সংগীত-সম্মেলনে ...ত হয়ে শিল্পী অসিতকুমার হালদার ...।...

লখনউ সংগীতের জায়গা। লখনউর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ সংগীত ও ... সুরসিক ছিলেন, অনেক গজলের ... এবং সুরকার ছিলেন। মিউটিনির ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে বিন্দাদিন ...জ ঠুংরী গানে এবং কত্থক নাচে খুব করেছিলেন। তাঁর ভাই কালকা মহারাজ ... বাদ্যে চৌখোস ছিলেন। বিন্দাদিন ...ক ঠুংরী গান রচনা করে সুরসংযোগ ...ছলেন যাকে এখন বলা হয় 'লখনউ ...'। বিন্দাদিনের তিন ছেলে—অচ্ছন, ... ও শম্ভু মহারাজ। অচ্ছন মহারাজ ...র নবাবের সভাগায়ক হন। লচ্ছন ... শম্ভু মহারাজ কত্থাকলি নাচে খুব নাম ...। অযোধ্যের তালুকদার রাজা রাজে-... সংগীতজ্ঞ ছিলেন—সমঝদার ছিলেন। ...দিন তাঁর ইচ্ছে হল এই লখনউএ সারা-...তের জ্ঞানীগুণী শিল্পীদের একত্রিত ... সংগীত-সম্মেলন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ... একটি কমিটি করে বসলেন।...সংগীত-...লন যে হবে তার খরচও আছে। রাজা-রাজাদের কাছে এ-বিষয়ে সাহায্য করার ... প্রস্তাব গেল। অনেকে সাহায্য করতে ...য়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ কমিটির একজনা ... নিযুক্ত হলেন। সংগীত-সম্মেলন হবে ...রবাগের ওয়াজিদ আলি শাহের বার-...রীতে। গুণী সংগীতশিল্পীরা একে ... লখনউ এসে পৌঁছলেন। বোম্বাই ...ল থেকে এলেন ভাতখণ্ডের প্রিয় শিষ্য ...ঝনকার গুরু ভাতখণ্ডের সঙ্গে। ...র মহারাজা পাঠালেন তাঁর সভাগায়ক ...বান্দেকে এবং তাঁর জার্মান ব্যান্ড-...রের সঙ্গে স্টেট ব্যান্ডপার্টি। মাইহার ...ক এলেন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর ...র ব্যান্ডপার্টিকে নিয়ে। মথুরা থেকে ...ন মথুরার বিখ্যাত ওস্তাদ চন্দন চৌবে. ...রা এলেন সরোদে হাফিজ আলি খাঁ, ...া হোসেন, বীণায় মোরাদ খাঁ, সেতারে ...য়েত খাঁ। বাঙলা থেকে এলেন রাধিকা-...ন গোস্বামী একজন নামকরা পাখোয়াজ-...কে সঙ্গে নিয়ে। এলেন দিলীপকুমার ... এসে নামলেন তাঁর বন্ধু ধূর্জটি-...দের বাড়িতে। অতুলপ্রসাদের বাড়ি তখন ...রম, ছোট বোন হেটুকি তার ছেলেমেয়ে-... নিয়ে বাঙ্গালোর থেকে এসে উপস্থিত। ...ন হেমকুসুম আর এসেছে সাহানা তার ...পুত্রকে নিয়ে।

মামাতো বোন সাহানাকে কাছে পেয়ে অতুলপ্রসাদ খুব খুশী। সাহানা বড় চমৎকার গান গায়, ভগবদত্ত ক্ষমতা ওর গলায়। তাছাড়া শেখার আগ্রহ কম কি? যেখানে ও সুযোগ পেয়েছে, গানের তালিম নিয়েছে ভাইদার কাছে—দার্জিলিং, কলকাতা, শিমুলেতলায়। যেখানে দেখা হয়েছে গান শেখার আগ্রহ। সঙ্গীতশিল্পী সাহানা দেবী বলেছেন : অতুলদার কাছে আমার প্রথম গান শেখা—'ভব পারে যাব কেমনে হরি'। গানটি শিখি দার্জিলিং-এ ম্যাকেঞ্জি রোডের ওপর ডাক্তার পি কে রায়ের রুবি হল নামে বাড়িতে বসে সেদিন 'বধূ ধর ধর' গানটিও শিখি। অতুলদা সেবার ওই বাড়িতে ছিলেন। অতুলদার কাছে গান শেখার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি... দার্জিলিং পাহাড়ে প্রথম সেই সুযোগ-

কোথায় ভেসে গেছে। স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলুম আমার মনও ডানা মেলল। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন—'গা না বুনু, গা না রে একটা গান।' খানিক দূরে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাক ডান্ডী দিয়ে একটু ওপরে উঠে সুন্দর একটা জায়গা দেখে বসলাম।... সকলের মধ্যে একটা স্তব্ধ ভাব যেন জমাট বেঁধে আছে, সেই সময়ে অতুলদা ধীরে ধীরে গান ধরলেন 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'। প্রাণ ঢেলে তিনি গাইছিলেন। অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল। আমি গাইলাম তাঁর কাছে শেখা তাঁরই গান 'কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়'। চারিদিকে গগনচুম্বী সব ছন্দের দৃশ্য, তার ওপর অতুলদার গাওয়া ওই গান মনকে বেঁধে দিয়েছিল এমন সুন্দর সুরে যে, গান গাইতে গিয়ে দেখি গান আমার আসচে যেন অন্য কোন জগৎ থেকে। সে অভিজ্ঞতা কোনদিন ভুলবার নয়।

হঠাৎ একদিন শুনলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং এসেছেন, আছেন 'আর্সনটুলি' নামক বাড়িতে। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে। সঙ্গে এসেছেন রথীবাবু ও প্রতিমাদি। তাঁরা উঠেছেন হোটেলে।

সেই আসরে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ,

[illegible]
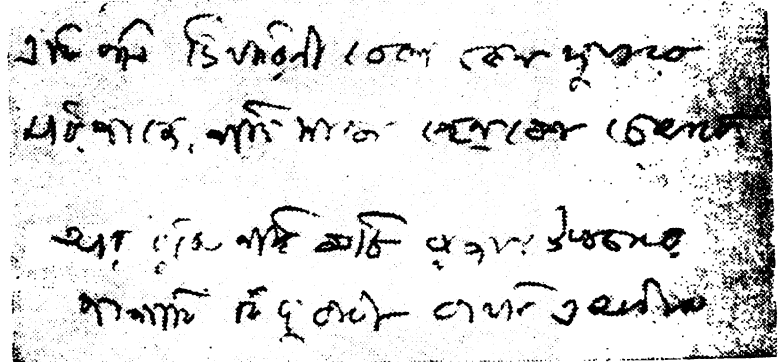
সুবিধে পাওয়া গেল। সাহানা দেবী আর এক জায়গায় বলেছেন: সেবার 'গ্লেন ইডেন' দু নম্বরের বাড়িতে স্যার নীলরতন তাঁর মেয়েরা। অতুলদা ও আমি...আমরা সবাই একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। অতুলদা নানা গল্প করে আমাদের হাসাতেন। নিজেও হাসতেন প্রাণখোলা। এমনিতে তিনি ছিলেন শান্ত ধীর স্থির খানিকটা লাজুক মিষ্টভাষী মোলায়েম প্রকৃতির। মানুষটি ছিলেন মজলিসী মেজাজের। কত গল্পের পুঁজিই যে ওঁর ছিল।

একবার আমরা অনেকে ক্যালকাটা রোড বলে রাস্তাটি দিয়ে চলেছিলাম। এই রাস্তাটা ধরে সোজা গেলে দার্জিলিং-এর আগের স্টেশন ঘুম। ঘুম দার্জিলিং-এর চাইতে আরো উঁচুতে। সর্বদাই কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা...চলতে-চলতে হঠাৎ কানে ভেসে এল মৃদু সুরে গান। চেয়ে দেখি সামনে পাহাড়ের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে অতুলদা গুনগুন করে গাইছেন 'কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর'। মন যেন তাঁর

অতুলদা, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।... একবার স্থির হল 'ঘুম রক' বলে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেখানে বনভোজন খাওয়া হবে। স্যার নীলরতনের মেয়েরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। দলে ছিলেন প্রতিমাদি, রথীবাবু, অতুলদা, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্র ও আমি। ট্রেনে ঘুম পর্যন্ত গিয়ে তারপর হাঁটাপথ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম। প্রতিমাদির জন্যে ডান্ডীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুন্দর চওড়া রাস্তা, মনোরম সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ার পথে উঠতে আরম্ভ করা গেল।...সকলেই দেখি জোঁকের ভয়ে অস্থির ও তটস্থ। কার জুতোয় কখন জোঁক ঢোকে। এ রাস্তাটাতে নাকি অসম্ভব জোঁক। যথাস্থানে যখন উপস্থিত হলাম, দেখা গেল দ্বিজেনবাবু হঠাৎ লাফাচ্ছেন। কি ব্যাপার! ভাইদা হেসে বললেন—ওহে লাফিয়ে আর কি হবে, ছেড়ে

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে,
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে?
[illegible]
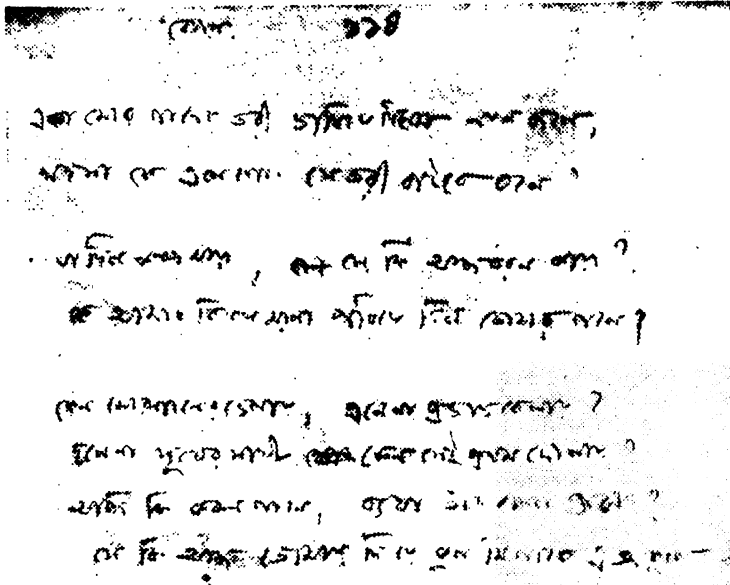
দাও—ছেড়ে দাও। রক্ত খেয়ে আপনিই পড়ে যাবে! তখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। সকলেই হেসে উঠলেও প্রত্যেকেরই যথেষ্ট ভয় ও অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। জিনিসপত্র রেখে আমরা চারিদিকে ঘুরে অবর্ণনীয় শোভা উপভোগ করছিলাম।...তারপর চলল গান গাইবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ...অতুলদা গাইলেন—'মিছে তুই ভাবিস মন'। আকাশিদি (নীলরতন সরকারের মেজ মেয়ে) গাইলেন, আমিও গাইলাম, রথীবাবু গাইলেন রবীন্দ্রনাথের 'তোমার কাছে শান্তি চাব না' গানটি... দার্জিলিং-এ সেবার অতুলদা রবীন্দ্রনাথকে একসঙ্গে পেয়েছিলাম।

এখানে এসেও এই সঙ্গীত-সম্মেলনে এসেও খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছে, কি তন্ময়তা ওর। ঝুনু (সাহানা) তোমাকে কিন্তু লখনউ থেকে সহজে যেতে দেয়া হবে না, বিশেষতঃ তুমি ও দিলীপকুমার যখন লখনউতে এসে গেছো। সাহানাকে নিয়ে সংগীত-সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন অতুলপ্রসাদ। চলল বেশ কয়েকদিন সংগীত-সম্মেলন...সারাক্ষণ সারাদিনরাত সে যে কি পুলক।...সংগীত সমঝদারদের সঙ্গে বসে সংগীত শোনায় এক গভীর আনন্দ আছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে থাকতেন মণ্ডপের মাঝে সংগীতসভা আলো করে। বড় বড় ওস্তাদেরা ওস্তাদী গান গেয়ে সুরের কারুকার্য দেখিয়ে রাজা মহারাজাদের কাছ থেকে গিনির টাকার তোড়া, সোনা-রুপোর মেডেল, শাল-দোশালা পেলেন। রাধিকামোহন বাঙলার মুখ রাখলেন। আলাউদ্দিনের ব্যাণ্ডপার্টি পুরস্কার পেলেন। আলাউদ্দিন শেষে বীরু মিশ্রর তবলার সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন, আলাউদ্দিনের বেহালা বাজনা এবং বীরু মিশ্রর তবলার প্রশংসা লখনউবাসীদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল, সেই আসরে মথুরার বিখ্যাত চন্দন চোবে অপূর্ব মীড়ের কাজে গাইলেন। গুরু ভাতখণ্ডের নির্দেশে প্রিয় শিষ্য রতনঝনকার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে চললেন, চন্দন চৌবের গান শেষ হল, রতনঝনকারের নোট নেওয়া শেষ হল। ভাতখণ্ডে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বললেন, এবার তুমি শুরু কর। রতনঝনকার চন্দন চৌবের গানখানি গাইলেন। গান শেষ হলে রতনঝনকারকে চন্দন চোবে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি এ-গান এত তাড়াতাড়ি কি করে তুললে বাবুসাহেব। আমি যে এ-গান আমার গুরুর কাছ থেকে দু' মাসেও ভালো করে তুলতে পারিনি। তুমি যে আশ্চর্য খেল দেখালে। রতনঝনকার বললেন, এ আমার গুরু ভাতখণ্ডের কৃপায় লাভ। ...ভাতখণ্ডের প্রিয়তম শিষ্যকে দেখে সংগীত-সম্মিলনীর কর্মকর্তাদের মনে একটা সংগীত-মহাবিদ্যালয় করার ইচ্ছে হল। কিছুদিন পরে রাজা রাজেশ্বরবলীর চেষ্টায় এবং আরো অনেকের সাধু ইচ্ছায় 'মরিস কলেজ অফ হিন্দুস্থানী মিউজিকের' প্রতিষ্ঠা হল। রতনঝনকার হলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ।

সেদিন কিন্তু দিলীপকুমার রায় তাঁর সুমিষ্ট সুমধুর কণ্ঠে মিউজিক কনফারেন্সে যখন গান শোনালেন, তখন বাংলার প্রবাসী বঙ্গ-বধূরা বললেন— 'এতক্ষণে যেন কান জুড়োলো'। সংগীত-সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। সংগীত-সম্মেলন শেষ হলেই কি সংগীত শেষ হয়! অতুলপ্রসাদ বললেন, আমাদের আরো কিছুদিন সংগীতের আসর বসুক। ধূর্জটিপ্রসাদ সায় দিলেন এবং আরো অনেকে জোরের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ ধূর্জটিপ্রসাদের প্রস্তাবে মত দিলেন। দিলীপকুমার ও সাহানা দেবীর গান শুরু হল প্রথমে গোকরণ মিশ্রর বাড়ি, তারপর ঘুরে ঘুরে অতুলপ্রসাদের বাড়িতে, নয়তো ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়িতে কিম্বা রাধাকমল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শিল্পী অসিত হালদার, বিনয় দাশগুপ্ত এঁদের কারো-না-কারো বাড়িতে প্রতিদিনই গা[illegible] আসর যত জমে, অতুলপ্রসাদের উৎসা[illegible] বেড়ে যায়, সাহানা-দিলীপকুমারের [illegible] যাওয়ার দিন তত পিছিয়ে যায়। এক স[illegible] 'অতুলদা' ধূর্জটিদার মত সংগীত সমঝ[illegible]দের ছেড়ে সাহানাকে লখনউ ছেড়ে [illegible] যেতে হল।

সংগীত সম্মেলন হয়ে গেল। [illegible] শিল্পীরা একে একে বিদায় নিলেন। [illegible] রোজকার জীবন এল ফিরে, [illegible] কাচারী, মক্কেল মামলা, সওয়াল, [illegible] চিঠিপত্র লেখা। 'উত্তরা' সুরেশ চক্র[illegible] বেশ ভালই চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তরার [illegible] সুরেশ মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে [illegible] দিয়ে পাঠায়। লেখা আর কোথায় [illegible] সময়ই পাওয়া যায় না। মাঝে কয়েকটা [illegible] শরীর স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙে গেল। [illegible] সুস্থ হয়ে দাদা সত্যপ্রসাদকে ১৯শে [illegible] উনিশশো ছাব্বিশ তারিখে একটি [illegible] লিখলেন।

18 Outram R[illegible]
Luckno[illegible]
19.3.26

দাদা,

বহুদিন তোমাকে পত্র লিখি [illegible] অপরাধ ক্ষমা করিও। আমার [illegible] খুউব অসুখ গিয়াছে, এখন অপেক্ষা[illegible] অনেক ভালো আছি, জ্বর হইয়া [illegible] ম্যালেরিয়া কাশি ইত্যাদি। আরো [illegible] ছিল। এখন নাই। শরীর অপেক্ষা [illegible] অবস্থা আরো খারাপ। [illegible] বুঝি হেমকুসুমের অনেক [illegible] হইয়াছে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। [illegible] শরীরের জন্যে অনেক সেবাশুশ্রূষা [illegible] খরচও করা গেল কিন্তু [illegible] ছিল তাহা সারিয়াছে [illegible] পূর্বাপেক্ষা ভালো কিন্তু মনের [illegible] হইল না।

সেদিন রাগ করিয়া আমার [illegible] ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এতদিন [illegible] অন্যত্র ছিল। [illegible] বারাম হওয়ায় কলিকাতায় [illegible] গিয়াছে। আবার এখানেই ফিরিয়া [illegible] ...আবার পুরাতন ইতিহাস...ছবি [illegible] তাহার একটি মেয়ে ও ছেলে এখা[illegible] আছে। তাহারা শারীরিক ভালো। [illegible] স্বামীর এখনও কাজ হয় নাই। [illegible] কলকাতায় তাহার নিজের বাড়িতে। [illegible] ভালোই আছে। হিরণ ও তাহার [illegible] বাঙ্গালোরে। হেমকুসুমের জন্যে [illegible] এখানে আনিবার জো নেই।

আমার বাড়ি সম্পূর্ণ তৈয়ার হইয়ে[illegible] আর দু মাসের মধ্যেই নতুন [illegible] যাইবে। প্রায় ৩৩ হাজার টাকা খরচ হইবে [illegible] ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধার করিতে হইবে [illegible] শীতকালে পারত একবার নিশ্চয়ই আসি[illegible]

আশা করি তোমরা সকলে [illegible] আছো। জেঠীমা ঠাকুরাণীকে আমার [illegible] পূর্ণ প্রণাম দিও। তোমরা আমার [illegible] বাসা নিও। তোমার ভাই

অতুল

(ক্রম[illegible]

পূজার ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

ভয়ঙ্কর বাড়ী

আমার নাম তারক। কলিকাতায় আমি ...ংয়ে থাকি। পূজার সময় বাড়ী ...সয়াছি। আমার নিজের বাড়ী নয়, ...রবাড়ী। মামারবাড়ীতেই আমরা মানুষ ...াছি। আমি ও আমার ভগিনী প্রভা। ...মাসী আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে, ...র মাকেও সে মানুষ করিয়াছিল, ...মাসী সদ্গোপের মেয়ে।
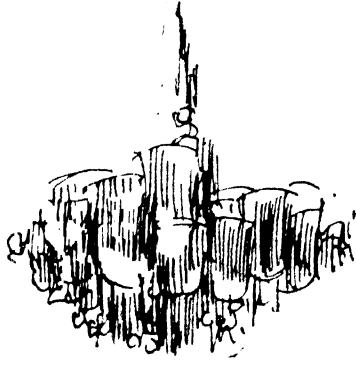
সন্ধ্যার সময় আমরা শামীমাসীকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমি, প্রভা, আর আমার মামাতোভাই ও ভগিণীগণ। আমি বলিলাম,—"শামীমাসী! আজ তোমাকে একটি গল্প বলিতে হইবে। কেমন মেঘ করিয়াছে। দেখ কেমন অন্ধকার হইয়াছে। কেমন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর বাতাসের একবার জোর দেখ। গাছের পাতার ভিতর দিয়া শোঁ-শোঁ করিয়া চলিতেছে। যেন রাগিয়া কি বলিতেছে, এই অন্ধকারে এমন দুর্যোগের সময় ভূত-প্রেত সব বাহির হয়। বাপরে। গা যেন শিহরিয়া ওঠে।"

শামীমাসী বলিল,—"এই পূজার সময় এইরূপ দুর্যোগের সময়, তোমার মাকে লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। এখন সেকথা মনে করিলে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

আমি জিজ্ঞাস করিলাম,—"কি হইয়াছিল শামীমাসী?" শামী উত্তর করিল,—

"না, সেকথা এখন তোমাদিগকে আমি বলিব না। তোমরা ছেলেমানুষ! সেকথা শুনিলে তোমাদের ভয় করিবে।"

আমরা সকলেই বলিলাম,—"সেকথা শুনিলে আমাদের ভয় করিবে না।"

যাহা হউক, অনেক জেদা-জেদের পর শামীমাসী সে গল্প বলিতে সম্মত হইল। শামীমাসী বলিল,—"তারক ও প্রভার মায়ের নাম সীতা ছিল। সীতার মা, অর্থাং তোমাদের মাতামহীর নাম তারামণি ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়া যান, শামী! আমার কাছে তুই সত্য কর যে, সীতাকে তুই কখন ছাড়িয়া যাবি না। সীতা পাঁচ বৎসরের শিশু, পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই।"

সীতাকে আমি দিদিমণি বলিয়া ডাকিতাম, আমি বলিলাম,—"মাঠাকরুণ! দাদাবাবু (অর্থাৎ তোমাদের মার ভাই) ও দিদিমণি যাহাদের কাছে থাকিবে, তাহারা যদি আমাকে ছাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তাহারা যদি আমাকে রাখে, তাহা হইলে তোমার গায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, দিদিমণিকে আমি কখন ছাড়িব না?"

তোমাদের মাতামহীর মৃত্যু হইল, তোমাদের মামা, যাহার এই বাড়ী, তিনি তখন বালক। লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত একজন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন, সীতা তাহার মামারবাড়ীতে গেল। সীতার মামা আমাকে ছাড়াইলেন না। আমি দিদিমণিকে মানুষ করিতে লাগিলাম।

দিদিমণির মামারা একসময়ে খুব বড়-মানুষ ছিলেন। শুনিলাম যে, তাঁহার মাতামহ জগমোহন রায়চৌধুরী একজন দুর্দান্ত লোক ছিলেন। দিদিমণিকে লইয়া আমি যখন তাঁহার বাড়ীতে যাইলাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। দিদিমণির মামাও দেশে থাকিতেন না, পশ্চিমে কোথায় কর্ম করিতেন। দিদিমণিকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি সে স্থানে চলিয়া গেলেন। সে বাড়ী কি ভয়ঙ্কর। তিনমহল বাড়ী, বাহির-বাড়ীতে, মাঝের বাড়ীতে, ভিতর বাড়ীতে, একতলায়, দোতলায় কত যে ঘর, তাহা গণিতে পারা যায় না। কিন্তু সব ভোঁ-ভোঁ, দেখিলেই যেন ভূতেরবাড়ী বলিয়া মনে হয়, বাহিরের বাড়ীতে কি মাঝের বাড়ীতে জন-প্রাণী বাস করে না। এতবড় বাড়ীতে আমরা কেবল ছয়জন রহিলাম; (১) তোমায় মায়ের পিসী অলক ঠাকরুণ, তাঁহার বয়স প্রায় আশী হইয়াছিল, আর তিনি সম্পূর্ণ কালা ছিলেন। (২) আর একজন ব্রাহ্মণী, তাঁহার সহচরী, তাঁহারও বয়স বড় কম হয় নাই, তিনি রন্ধন করিতেন। (৩) একজন চাকর, তাহার নাম পিতেম। (৪) পিতেমের স্ত্রী, তাহার নাম বিলাসী। (৫) তাহার পর আমি ও (৬) তোমাদের মা, আমার দিদিমণি, সীতা। বাড়ীর ভিতর দোতলায় তিনটি ঘরে আমরা ছয়জনে বাস করিতে লাগিলাম। প্রথম অলক ঠাকরুণ ও সহচরীর ঘর, তাহার পার্শ্বে আমার ও দিদিমণির ঘর, তাহার পার্শ্বে পিতেম ও বিলাসীর ঘর। পশ্চিমদিকে এই তিনটি ঘর ছিল! উত্তর ও পূর্বদিকে অনেক ঘর পড়িয়াছিল। বিলাসীর ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর লইয়া আমি দিদিমণির খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। বাটীর চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আঁব, কাটাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি নানা গাছের বাগান ছিল। বাগানের ভিতর চারি পাঁচটি পুকুর ছিল, উত্তরদিক ভিন্ন বাটীর আর চারিদিকে গ্রাম ছিল। কিন্তু সে মিথ্যা গ্রাম, ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে, অনেক লোক ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাটীর উত্তরদিকে মাঠ, যতদূর দেখিতে পাই, ততদূর মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে। শ্মশানের ন্যায় সেই বাড়ীতে গিয়া আমি মনে করিলাম,—"ওমা! এ-বাড়ীতে আমি কি করিয়া থাকিব? ভয়েই মরিয়া যাইব।"

"যাহা হউক, যেখানে আমার দিদিমণি সেখানে সব ভাল,—সেইখানেই আলো,—সেইখানে সুখ। দিদিমণির দৌড়াদৌড়ি, দিদিমণির খেলা, দিদিমণির কথা, দিদিমণির হাসিতে সেই শ্মশানভূমি, যেন স্বর্গতুল্য হইল। এমন যে অলক-ঠাকরুণ, যাহার গোমড়ামুখ দেখিলে ভয় হয়, দিদিমণিকে দেখিলে তাঁহারও মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হইত, তাঁহারও মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিত। দিদিমণির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তেমন ফুটফুটে দুধে-আলতার রং আমি আর কোন মেয়ের দেখি নাই, কেমন পুরুন্ত গাল দুইটি, কেমন ছোট হাটুক। কেমন টুসটুসে ঠোঁট, কেমন পটলচেরা ঢুলঢুলু উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন কাল কাল চক্ষুর পাতা, কেমন সরু-সরু চকচকে রেশমের মত নরমচুল! হা-কপাল! সে দিদিমণিকে ছাড়িয়া এখনও আমি প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর দিদিমণি যখন কথা কহিত, তখন প্রাণ যেন শীতল হইত, প্রাণের ভিতর দিদি আমার যেন সুধা ঢালিয়া দিত।

দিদিমণিকে লইয়া আমি সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। একবার এই সময় ঘোরতর দুর্যোগ করিয়াছিল। বাহিরে বাতাস হু-হু করিয়া বাহিতেছিল। দিদিমণিকে লইয়া আমি শুইয়া আছি। সহসা বাহির-বাড়ীতে বেহালার শব্দ হইল। রাত্রি তখন প্রায় দুই-প্রহর হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, এত রাত্রিতে আমাদের বাহির-বাড়ীতে বেহালা বাজায় কে? বাহির-বাড়ীতে তো কেহ বাস করে না।

পরদিন আমি বাহির-বাড়ীতে গিয়া চারদিক দেখিলাম। জনপ্রাণীকেও সেখানে দেখিতে পাইলাম না। পোড়ো ভাঙাবাড়ীর যেরূপ অবস্থা হয়, বাহির-বাড়ীর সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সেদিন বিলাসীকে একবার একেলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিলাসী, কাল-রাত্রিতে বাহির-বাটীতে বেহালা কে বাজাইতেছিল?"

আমার কথা শুনিয়া বিলাসীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। আমতা-আমতা করিয়া সে উত্তর করিল,—"বেহালা! বেহালা আবার কে বাজাইবে? ও বাতাসের শব্দ।"

বিলাসীর কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করিতেছে।

বিলাসী পুনরায় বলিল,—"মাসী, দিদিমণিকে তুমি সদর-বাড়ীতে যাইতে দিও না।" সাপ-খোপ কি আছে না আছে, কে ওদিকে গিয়া।"

আরও কিছুদিন গত হইয়া গেল। একবার নয়, আরও অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখন রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্যোগ হয়, তখন বাহির-বাড়ীতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা বাজায়। কেবল বেহালা নয় সে বৎসর পূজার সময় মহা-অষ্টমীর রাত্রিতে বাহির-বাড়ীতে আমি শাঁকঘণ্টার শব্দও শুনিয়াছিলাম, ধূপ-ধুনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন একজন ভক্ত বিকট স্বরে মা-মা বলিয়া চীৎকার করে, সে শব্দও শুনিয়াছিলাম। এ-সমুদয় ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে পিতেমকে, বিলাসীকে আমি বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহ আমাকে বলে নাই। "ও কিছু নয়," এই কথা বলিয়া সকলে প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এইরূপে সে স্থানে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। মহাষ্টমীর দিন দুই-প্রহরের সময় দিদিমণি, পিতেম ও বিলাসীর সহিত গ্রামের ভিতর পূজা দেখিতে গিয়াছিল। আমি বিদেশী লোক, আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, সেজন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাই নাই। পূজা দেখিয়া পাঁচটার সময় দিদিমণি ফিরিয়া আসিল। বিলাসী

আমাকে বলিল,—"যদু ভড়ের বাড়ী পূজার এবার খুব ধুম। আহা! কি চমৎকার প্রতিমা করিয়াছে, আর শামীদিদি, ভড়-গিন্নী তোমাকে অনেক করিয়া যাইতে বলিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, বিলাসী! তবে আমি একবার মাকে দেখিয়া আসি। তুই ভাই দেখিস্, যেন দিদিমণি কোথাও না যায়।"

এই কথা বলিয়া আমি ভড়েদের বাড়ী ঠাকুর দেখিতে যাইলাম. ভড়গিন্নী আমাকে অনেক আদর করিলেন। অনেকগুলি খই-মুড়কি, নারিকেল-সন্দেশ, রসকরা— আরও কতকি আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয় না ভাই,

বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। দিদিমণিকে সে-স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

বিলাসী বলিল,—"বোধহয় অলক ঠাকুরুণের ঘরে আছে।" রুদ্ধশ্বাসে সে ঘরে আমি দৌড়িয়া যাইলাম। অলক ঠাকুরুণ ও সহচরী দুইজনেই তখন সে ঘরে ছিল। দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া সহচরীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সহচরী উত্তর করিলেন,—"কৈ! সীতা-ত এ-ঘরে আসে নাই!"

এই কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উড়িয়া গেল। পুনরায় আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিলাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম।

বিলাসী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল,—"এইমাত্র আমার ঘরের বারাণ্ডায় সে খেলা করিতেছিল, ঘরের ভিতর আমি কাজ করিতেছিলাম, বোধহয়, অন্য কোন ঘরে সে খেলা করিতেছে।"

এমন সময় পিতেম আসিয়া উপস্থিত হইল আমার কান্না ও বিলাসীকে ভর্ৎসনার শব্দ শুনিয়া সহচরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, প্রদীপ-হাতে লইয়া সকলে মিলিয়া আমরা বাড়ী আতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম। ভিতর-বাড়ী খুঁজিয়া মাঝের-বাড়ী, তাহার পর সদর-বাড়ীর সকল ঘর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণিকে দেখিতে পাইলাম না। মাথা-খুঁড়িয়া বুক-চাপড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, হয় গহনার জন্য দিদি-মণিকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা পুষ্করিণীতে পড়িয়া সে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী ওলট-পালট করিয়া অব-শেষে আমরা বাগান ও পুকুরের ধার-গুলি মনোযোগের সহিত দেখিলাম, কিন্তু কোনস্থানে দিদিমণির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। শেষে পিতেম আমাকে বলিল,—"তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মন কেমন করিয়াছিল, তোমাকে খুঁজিবার নিমিত্ত নিশ্চয় সে পূজা-বাড়ীর দিকে গিয়াছে, আমি এখনই তাহাকে আনিতেছি।" এই কথা বলিয়া পিতেম গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বাড়ী ও বাগানের উত্তর-দিকে দূর পর্যন্ত মাঠ ছিল। দিদিমণিকে খুঁজিবার নিমিত্ত বিলাসী ও আমি সেই মাঠের দিকে যাইলাম। মেঘ করিয়াছিল, খুব অন্ধকার হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে আমরা একপ্রকার সাদা কি দেখিতে পাইলাম। বিলাসীর বড় ভয় হইল, সে বলিল,—"দিদি, ঐ দেখ একটি শাকচুন্নী আসিতেছে। এখনি আমাদের খাইয়া ফেলিবে। আর গিয়া কাজ নেই। এস, বাড়ী ফিরিয়া যাই। এতক্ষণে দিদিমণি বাড়ী আসিয়া থাকিবে।"

কোন উত্তর না দিয়া বিলাসীর আমি হাত ধরিলাম, আর সেই সাদা জিনিসের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সেও অন্যদিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বিলাসী তাহাকে চিনিতে পারিল। সে আমাদের প্রতিবাসী একজন কৃষক,, কাপড় ঢাকা তাহার বুকের উপর কি ছিল। আমরা কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে বলিল,—"তোমাদের মেয়েটি মাঠের মাঝখানে গাছতলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিয়া সে মাঠের মাঝ-খানে আসিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতে পাইয়া এখন তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

তাড়াতাড়ি দিদিমণিকে আমি তাহার কোল হইতে আপনার কোলে লইলাম। কিন্তু দিদিমণির সর্ব্বশরীরই ঠাণ্ডা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার নাকে ও বুকে হাত দিয়া দেখিলাম, দেখিলাম যে, নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে, আর বুক অল্প অল্প ধুক-ধুক করিতেছে। তাহা দেখিয়া প্রাণে আমার কতকটা আশা হইল। তাড়া-তাড়ি মাঠ পার হইয়া আমরা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, অনেক তাপ-সেক করিতে করিতে দিদিমণির চেতনা হইল। সেই চন্দ্রমুখে মধুর হাসি দেখা দিল, সুধামাখা দুই-একটি কথা দিদিমণির মুখ হইতে বাহির হইল। অল্প গরম দুধ আনিয়া সহচরী তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার সেই পদ্মচক্ষু দুইটি ঘুমে বুজিয়া গেল। সে রাত্রিতে দিদিমণিকে আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দূরে মাঠের মাঝখানে একেলা সে কি করিয়া গিয়াছিল, পরদিন সেই কথা দিদি-মণিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমণি বলিলেন,—"বারেণ্ডায় আমি খেলা করিতে-ছিলাম, তাহার পর যে ঘরে আমার খেলা-ঘর আছে, আমি তাহার ভিতর যাইলাম। সেই ঘরের জানালার ধারে যেই দাঁড়াইয়াছি, আর দেখি না ঠিক তাহার নীচেতে বাগানে একটি মেয়ে রহিয়াছে। মেয়েটি আমার মত বড়, কিন্তু খুব সুন্দর। উপরদিকে আমার পানে চাহিয়া সে বলিল,—"সীতা! নেমে আয়না ভাই, আমরা দুইজনে খেলা করি।" আমি বলিলাম,—"না ভাই! এখন আমি নীচে নামিয়া যাইতে পারিব না। সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন নীচে নামিবার সময় নয়। বিলাসী আমাকে বকিবে, তাহার পর শামী আসিয়া আমাকে বকিবে। কাল সকালবেলা তুমি আসিও, দুইজনে তখন অনেকক্ষণ খেলা করিব।" মেয়েটি বলিল,—"এখনও তেমন সন্ধ্যা হয় নাই, এখনও অনেক বেলা

রহিয়াছে, এই দেখ আমার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবুও দেখ আমি খেলা করিতেছি, আয়-না-ভাই।"

তবুও আমি নামিলাম না। নীচে নামিতে মেয়েটি আমাকে বারবার বলিতে লাগিল। শেষে সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে যাইলাম, কিছুক্ষণ বাগানের ভিতর আমরা দুইজনে খেলা করিলাম। একস্থানে অনেকগুলি রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা আমরা তুলিলাম। সাদা টগর-ফুল ফুটিয়া আর একটি গাছ আলো করিয়াছিল, নীচে হইতে যত পারিলাম, সেই টগর ফুলও আমরা তুলিলাম। কেমন করিয়া জানিনা, তাহার পর বাগান পার হইয়া আমরা মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেমন করিয়া জানিনা, সেই মেয়েটির সংগে অনেক পথ চলিয়া ক্রমে মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটি গাছ ছিল, সেই গাছতলায় একটি মেয়ে-মানুষ বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমার মাকে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে পড়ে। সে মেয়ে-মানুষটি ঠিক আমার মায়ের মত। সেই রকম রং, সেইরকম মুখ, সেইরকম চুল, সেইরকম কথা। আদর করিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন, আমার মুখে তিনি কত চুমা খাইলেন, কোলে বসাইয়া আমার মাথায় তিনি হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর কি হইল, আর আমার মনে নাই।"

তৃতীয় অধ্যায়

বালিকা ভূত

দিদিমণির এই কথা শুনিয়া সহচরী পিতেমকে চক্ষু টিপিলেন। তাহার পর তিনি বিলাসীর গা টিপিলেন। ইহার মানে আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে মেয়েটি কে? সে-তো বড় দুষ্টমেয়ে দেখিতেছি। তাহাকে আর বাগানে আসিতে দেওয়া যাইবে না।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সহচরী বলিলেন,—"এবিষয় অলক-ঠাকরুণকে জানাইতে হইবে। তিনি যেরূপ বলেন, সেইরূপ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া সহচরী সেঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে, ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিদিমণিকে কোলে লইয়া আমি পিতেম ও বিলাসীর সংগে সেই ঘরে যাইলাম। অলক ঠাকরুণ থুড়-থুড়ে বুড়ী হইয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হইয়া সহচরী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অলক ঠাকুরুণ তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, সে মেয়েটি মানুষ নহে। তাহার মা, যাঁহাকে সীতা গাছতলায় দেখিয়াছিল, তিনি অলক ঠাকরুণের ভাইঝি, সীতার মাসী। অনেক দিন হইল, তিনি ও তাঁহার কন্যা অপঘাত মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গতি হয় নাই, এখন তাঁহারা এরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্বদা, বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার দিনে, আর এই পূজার সময়, বাড়ীর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ান। পিতেম, বিলাসী আর তুমি শামী, তোমাদের সকলকে অলক ঠাকরুণ বলিতেছেন যে সীতাকে তোমরা খুব সাবধানে রাখিবে নিমিষের নিমিত্ত তোমরা তাহাকে চক্ষের আড় করিবে না। সে মেয়েটা এবার যদি সীতাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমরা সীতাকে পাইবে না।"।

এই কথা শুনিয়া আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। কি করিয়া মেয়েকে ভূতের হাত হইতে বাঁচাইব, সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তোমার মামার তখনও কর্ম কাজ হয় নাই, এর্কদিন গিয়া দাঁড়াই, এক বেলা এক মুঠা কেহ যে ভাত দেয়, এমন স্থান ছিল না। কাদায় গুণ ফেলিয়া দিদিমণিকে লইয়া কাজেই আমাকে সেই ভয়ানক বাড়ীতে থাকিতে হইল। কিন্তু সেইদিন হইতে দিদিমণিকে আমরা নিমিষের জন্যও চক্ষুর আড় করিতাম না। হয় আমি না হয় বিলাসী, না হয় পিতেম, কেহ না কেহ সর্বদা তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু মাঝে মাঝে জানালায় দ্বারে দাঁড়াইয়া দিদিমণি আমাদিগকে বলিত,—"ঐ সেই মেয়েটি আসিয়াছে, ঐ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শামী, তুই আমাকে সুন্দর বলিস্, কিন্তু ওরপানে একবার চাহিয়া দেখ। আহা! কি চমৎকার রূপ। কেবল ওর পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ দেখ আবার আমাকে ডাকিতেছে। আমি যাইতে না বলিয়া, আহা! মেয়েটি ঐ দেখ, কতই না কাঁদিতেছে। তাহার কাপড় সে আমাকে দেখাইতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে টস্‌টস্ করিয়া তাহার কাপড় হইতে জল পড়িতেছে। এ আবার কি? হাতনিয়া ... আপনার মাথা আমাকে দেখাইতেছে, আহা মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে মাথা হইতে

ল বহিয়া রক্ত পড়িতেছে। শামী! একবার মাকে ছাড়িয়া দে। আমি উহার কাছে ই. উহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনি। ই উহার মাথায় ঔষধ দিয়া দিব। আমার কাপড়খানি আমি উহাকে পাড়তে দিব। ই ভাই যাই!" এইরূপ বলিলে তাড়াতাড়ি মি তোমার মাকে গিয়া কোলে লইতাম। পর হইতে বাগানের দিকে আমি চাহিয়া খিতাম; কিন্তু আমি কিছু দেখিতে ইতাম না। কি করিব! ঘরের দ্বার-জানালা ধ করিয়া, মেয়েকে কোলে লইয়া, ভয়ে ড়সড় হইয়া আমি বসিয়া থাকিতাম।

এইরূপ অতিকষ্টে আমরা সেই বাড়ীতে নপাত করিতে লাগিলাম। পুনরায় পূজার য় আসিল। এই সময় দিদিমণি সেই য়েটাকে ঘনঘন দেখিতে লাগিল। বাগানের কে জানালা এখন আমি সর্বদাই বন্ধ রয়া রাখিতাম। তথাপি দিদিমণি বলিত, ামী! জানালা খুলিয়া দে। মেয়েটি নীচে সিয়াছে, সে আমাকে ডাকিতেছে। শামী! র পায়ে পড়ি. একবার জানালা খুলিয়া একবার তাহাকে আমি দেখি।"

মহাষ্টমীর দিন মেয়েকে লইয়া আমি ই বিব্রত হইলাম। সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ য়াছিল। সীতাকে কোলে লইয়া আমি বসিয়াছিলাম। এখন আর বাহিরে নয়, দন দিদিমণি সেই মেয়েটিকে বাড়ীর তরেই দেখিতে লাগিল। আমি দ্বার করিয়াছিলাম। তথাপি দিদিমণি বলিতে গল.—"ও শামী! মেয়েটি আজ বাড়ীর তর আসিয়াছে, ঘরের বাহিরে আমাদের র নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ছাড়িয়া দে ী। আমি একবার তাহার কাছে যাই। বার তাহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব।"

ই বলিয়া দিদিমণি হাপুস নয়নে দতে লাগিল। কি যে করি, তাহা আমি মতে পারিলাম না। মেয়ে লইয়া ম অলক ঠাকরুণের ঘরে যাইলাম। সে নে সহচরী উপস্থিত ছিলেন। আমি লাম, "আজ বাছা, আমাদের খাওয়া-য়াতে কাজ নাই, সকলে মিলিয়া এস, আমরা মেয়েকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকি। না করিলে দিদিমণিকে আজ আমরা তে পারিব না. সেই দুষ্ট মেয়েটা সয়া দিদিমণিকে নিশ্চয় আজ লইয়া ব।"

সহচরী অলক ঠাকরুণকে সকল কথা লেন, অলক ঠাকরুণ আমার কথায় ত হইলেন। পিতেম ও বিলাসীকে য়া দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া দিদি-কে ঘিরিয়া, সকলে আমরা অলক রুণের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

বলাবাহুল্য যে, ইতিপূর্বে এই বিড়- নিবারণের জন্য অনেক প্রতিকার করা াছিল। গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, ত-স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল. রোজা য়া ঝাড়ান ও ভূত নামানো হইয়াছিল, মণির অষ্টাঙ্গে কবচ, মাদুলি ও নেক-পুটুলি বাঁধা হইয়াছিল। কিন্তু কিছু-কিছু হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

বিষম মহাষ্টমী

সকলে ঘিরিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সেই মহাষ্টমীর সমস্ত দিন দিদিমণি বড়ই ছট্‌-ফট্ করিয়াছিল। "ঐ সেই মেয়েটি আসি-তেছে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; দাও, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহার কাছে যাই," এই বলিয়া দিদি-মণি বার বার কাঁদিতেছিল, আর আমার কোল হইতে উঠিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া বার বার বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করিতে-ছিল। অতি কষ্টে আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পর দিদিমণি ঘুমাইয়া পড়িল, আমি ভাবিলাম যে, এইবার বুঝি আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল, আর বুঝি কোন উপ-

তোর পায়ে পড়ি একবার জানালা খুলিয়া দে

দ্রব হইবে না। কিন্তু আমরা কেহ নিদ্রা যাইলাম না, ঘরে দুইটা আলো জ্বালাইয়া সকলে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এমন সময় সহসা বাহির বাটীতে সেই বেহালা বাজিয়া উঠিল। কেবল বেহালা নহে, তাহার সঙ্গে ঢাক-ঢোল, শাঁক-ঘণ্টা কাঁসর-ঘড়িও বাজিয়া উঠিল। সেই সকল বাজনা ছাপাইয়া বলিদানের সেই ভয়ানক মা মা চীৎকারে আমাদের যেন কানে তালা লাগিতে লাগিল, আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। হতভোম্বা হইয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় ধড়মড় করিয়া দিদিমণি উঠিয়া বসিল। আমরা কিছু বলিতে না বলিতে চোঁচ করিয়া সে দ্বারের নিকট গিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহাকে ধরিতে না ধরিতে রুদ্ধশ্বাসে বাহির-বাড়ীর পূজার দালানের দিকে সে দৌড়িল। "ওমা,

কি হইল, সর্বনাশ হইল।" এই কথা বলিতে বলিতে অলক ঠাকরুণ ছাড়া আর সকলেই আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। দিদি-মণি আমাদের আগে আগে গিয়া বাহির-বাড়ীর পূজার দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা জ্ঞানহারা হইলাম। এখন আর সে ভাঙ্গা জনশূন্য বাড়ী নাই। খুব ধুম-ধামের দুর্গোৎসব হইলে যেরূপ হয়, সে স্থানে এখন সেইরূপ হইয়াছে। দালানের মাঝখানে প্রতিমা নানাসাজে সুসজ্জিত। প্রতিমার চারিদিকে নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার আয়োজন রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিতগণ বসিয়াছিলেন। এক পার্শ্বে একজন চণ্ডী-পাঠ করিতেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। ধূপ-ধুনোর গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া আছে। দলানে উঠানে সকল স্থানে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ফলকথা, এমন ধুমধামের পূজা আমি কখন দেখি নাই।

দিদিমণি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দালান পার হইয়া দালানের পূর্বদিকে চলিয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দালানের পূর্বদিকে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর একজন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। তাহার বামহাতে বেহালা, আর দক্ষিণ হাতে ছড় দিয়া বাজায় তাই ছিল। একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটিতে বসিয়া বৃদ্ধের পা দুইখানি ধরিয়া কি বলিতেছিলেন। সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্বে সাত আট বৎসরের এক বালিকা দাঁড়াইয়া-ছিল।

দিদিমণি বরাবর গিয়া সেই ঘরের দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। খপ করিয়া আমি গিয়া দিদিমণির হাত ধরিয়া ফেলি-লাম। তাহার পর আমরা সকলেই সেই দ্বারে নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে স্ত্রীলোক বৃদ্ধের পা ধরিয়া ছিলেন, তিনি এখন কাঁদ কাঁদ মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা, অপরাধ করিয়াছি সত্য! কিন্তু আমি তোমার কন্যা। শত অপরাধ করিলে, কন্যাকে ক্ষমা করিতে হয়! এই মেয়েটিকে লইয়া আমি এখন কোথায় যাই।"

বৃদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাষায় বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোর আমি মুখ দেখিব না। কালামুখ লইয়া এ বাড়ী হইতে দূর হইয়া যায়।"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন—"বাবা! আমি কোনরূপ দুষ্কর্ম করি নাই, স্বামীর ঘরে গিয়েছি, এই মাত্র।" বৃদ্ধ বলিলেন—"তুই দূর হ আমার সম্মুখ হতে দূর হ।" স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, আমি দূরে হইতেছি, কিন্তু আমার কন্যাটি তো কোন অপরাধ করে নাই! ইহাকে আমি তোমার নিকট রাখিয়া যাই-তেছি। পাতের হাতের দুইটি ভাত দিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিও।"

সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন,—"তোর ঝাড় আমার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। দূরে দূরে, এখনি দূর হ।"

স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সত্বর দূরে হইতেছে না। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া তিনি সেই বেহালার বাড়ী কন্যার মাথায় মারিয়া বসিলেন। কন্যার মাথা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। গাল বাহিয়া সেই রক্ত মাটীতে পড়িল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া সেই স্ত্রীলোক তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু দিয়া তাহার যেন আগুনের ফিন্‌কি বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"বাবা! তুমি একাজ করিলে।। যাহা হোউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িল।"

এই কথা বলিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর দালানের ভিতর দিয়া উঠানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর উঠান পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

যেই তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন, আর বৃদ্ধ ভয়ানক চীৎকার করিয়া সেই তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। সেইসময় ঝাড় লন্ঠন সব নিবিয়া গেল। প্রতিমা, পুরোহিত, লোক-জন সব অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ঢাকঢোলের কলবর সব থামিয়া গেল।

অন্ধকারে আমি পিতেমের কথা শুনিতে পাইলাম। পিতেম বলিল,—"মামা! সীতা তোমার কাছে আছে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, আমি তাহাকে ধরিয়া আছি।"

পিতেম পুনরায় বলিল,—"তবে চল, ঘরে চল।"

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব বিবরণ

সকলে পুনরায় অলক ঠাকরুণের ঘরে যাইলাম। সীতা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের নিদ্রা হইল না। আমরা সকলে বসিয়া রহিলাম। পিতেম তখন আমাকে সকল কথা বলিল। পিতেম বলিল,—

"ঐ যে বৃদ্ধ দেখিলে, উনি বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নাম জগমোহন চৌধুরী। উনি বড় দুর্দান্ত লোক ছিলেন। একবার যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, তা সে ভালই হউক আর মন্দ হউক। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল একটি সখ ছিল। বেহালা বাজাইতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। সময় নাই, অসময় নাই, সর্বদাই তিনি বেহালা বাজাইতেন। বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার রাত্রিতে তাঁহার সখটি কিছু প্রবল হইত, অলক ঠাকরুণ তাঁহার ভগিনী। জগমোহন রায়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র সীতার মামা, যিনি এখন পশ্চিমে কাজ করেন। বড় কন্যার নাম ছিল রামমণি, যাঁহার ভূতকে সীতা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় দেখিয়াছিল। ছোট মেয়ের নাম ছিল তারামণি, তিনি সীতার মা। রায়চৌধুরী বড়মানুষ লোক, কোন পুরুষে কন্যা শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতেন না। কিন্তু রামমণির এক তেজস্বী পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে,—"ঘর জামাই হইয়া আমি কিছুতেই থাকিব না।" আপনার স্ত্রীকে তিনি নিজের বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্বশুরজামাতায় ঘোর বাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে কর্ত্তা একদিন রামমণিকে ডাকিয়া জামাতার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাকে চাও—না আমাকে চাও।" রামমণি উত্তর করিলেন,—"বাবা! তুমি পিতা বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই সর্ব্বস্ব।" এই উত্তর শুনিয়া কর্ত্তা ঘোরতর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"বটে! তবে এখনি আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি তোমার মুখ দেখিব না।" রামমণি শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নয় দশ বৎসর স্বামীর ঘর করিলেন। তাঁহার একটি কন্যা হইল। সে কন্যাটির ভূত সীতাকে মাঠে লইয়া গিয়াছিল। নয়-দশ বৎসর ... রামমণির স্বামীর মৃত্যু হইল। পরি... প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি একটি পয়... রাখিয়া যান নাই। রামমণি ঘোর বি... পড়িলেন।

পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলে... পিতা কোন উত্তর দিলেন না। অবশে... ভাবিলেন, "পূজার সময় লোকের মন ন... হয়। এই পূজার সময় বাবার পায়ে গি... পড়ি, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় ক্ষ... করিবেন।" পূজার সময় কন্যাকে লই... রামমণি পিতার বাটীতে আসিলেন। তা... পর তোমরা এইমাত্র যাহা দেখিলে, অষ্টম... দিন সত্য-সত্যই সেই সমুদয় ঘট... ঘটিয়াছিল। কন্যার হাত ধরিয়া রামম... চলিয়া গেলেন। পক্ষাঘাত রোগ হইয়া ক... তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অ... ক্ষণ পরে তুমুল ঝড় উঠিল, সেই স... মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পর দি... সকলে দেখিল যে, রামমণি ও তাঁহার ক... দুজনেই মাঠের মাঝখানে গাছতলায় মর... পড়িয়া আছেন। কর্ত্তা আরও কয়েক ম... জীবিত রহিলেন, কিন্তু সেই দিন হইতে... আর তিনি কথা কহিতে পারেন নাই, ... উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। সেই তাঁহ... লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। জমিদারী, টাকা-ক... কিরূপে কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহা কে... বলিতে পারে না। ঘরজামাই রাখার অভ্য... সেই সঙ্গে দূর হইল। সেজন্য সীত... মাকে শ্বশুড়বাড়ী পাঠাইতে আর কো... আপত্তি রহিল না। কর্ত্তা রামমণি ... তাঁহার কন্যা—তিন জনেই এখন ভূত হই... আছেন। কতবার গয়াতে পিণ্ড দেও... হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভাবিল... যে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও স্বীকা... তবু সীতাকে লইয়া সে বাড়ীতে আর আ... থাকিব না। সীতার ভাই, তোমার মামা... আমি পত্র লিখিলাম। ভাগ্যক্রমে এই স... তাহার কর্ম হইয়াছিল। তিনি আসি... আমাকে ও সীতাকে তাঁহার নিজের বাড়ী... লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সীত... বিবাহ হইল, তাহার পর তুমি ও প্র... হইলে। কিছুদিন পরে তোমার পিতার ক... হইল। অল্পদিন পরে দিদিমণিও তাঁহ... সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। দিদিমণিকে হারাই... কি করিয়া আমি যে প্রাণ ধরিয়া আছি, তাহ... আশ্চর্য্য। যাহা হউক, তোমাদের দুইজন... পাইয়া আমি শোক অনেকটা নিবারণ করি... পারিয়াছি। মা-দুর্গা তোমাদিগকে আর ... ছেলে-পিলেকে বাঁচাইয়া রাখুন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 21st July, 1967 শুক্রবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৪ 40 Pai

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়

'আজকের কথা' প্রসঙ্গে

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা অমৃতের প্রেক্ষাগৃহে স্তম্ভে "আজকের কথা" পড়লাম। এদেশে চিত্রসাংবাদিকতা সম্পর্কে কয়েকজন ফিল্ম সোসাইটি প্রতিনিধি এবং পরিচালক শ্রীঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি বিরূপ মন্তব্যের তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন নান্দীকার তাঁর আলোচনায়। চিত্রসাংবাদিক-দের বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই যে যথার্থ নয় সে বিষয়ে নান্দীকারের সঙ্গে অনেক পাঠকই একমত হবেন। তবে এ প্রসঙ্গে এ দেশে চিত্র-সাংবাদিকতার মান যে খুবই নীচু একথা না উল্লেখ করে পারছি না এবং এও সত্য যে, দেশে যে তুলনায় নতুন প্রতিভাধর পরিচালক-দের আবির্ভাব ঘটছে সে তুলনায় দক্ষ চিত্র-সমালোচক চোখে পড়ছে না।

প্রথমেই বলব যে কোন ছবির সঙ্গীত, বিভিন্ন টেক্‌নিক্যাল অ্যাসপেকট এবং নানা-রকম আধুনিক প্রয়োগবিধি—যেগুলো এ-যুগের চলচ্চিত্রকে নতুন প্রাণদান করেছে—সেগুলোর যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ করতে প্রায় সমালোচকই অক্ষম। প্রত্যেক ছবির ক্ষেত্রেই তাঁরা গতানুগতিকভাবে লেখেন:

"কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ" হয় "মোটামুটি" নয় তো "প্রশংসনীয়"। "শব্দপুনর্যোজনা" কখনও "মধ্যমানের", কখনও "সংলাপকে শ্রুতিগ্রাহ্য হতে দেয় না" কখনও "একটু বেশী চড়া পর্দায়", আবার কখনও বা "বসুশ্রীর অপারেটর একটু উঁচু ফেডারে ছবিটি চালাবার জন্য সমালোচকের সঠিক বিশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি হয়। সঙ্গীতের বেলায়ও সেই একই ট্রাডিশন: হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে প্রথমে গানের মোট সংখ্যা জানিয়ে দেওয়া হয়—মাঝে মাঝে "সুর-সমৃদ্ধ" বা "সুগীত" অথবা কোনও প্যারেল্যাল কৃত "চড়াপর্দার সুর" ইত্যাদি মন্তব্য করে কখানি গান জনপ্রিয় হতে পারে তার একটা ফোরকাস্ট করে সমালোচনায় ইতি টানা হয়। বাংলা ছবিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত থাকলে, গুরু-দেবের সম্মান রক্ষার্থেই হয়তো দ্বিধাসত্ত্বেও সমালোচক লেখেন "সুপ্রযুক্ত" অথবা "পরিবেশানুগ"। কিন্তু কোন বিশেষ ছবির ক্ষেত্রে সমালোচক যখন লেখেন: "ছবির শেষভাগে "আমার সকল দুঃখের প্রদীপ" গানখানির ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ আছে"—উক্তিটি তাঁর যোগ্যতার অমর্যাদাকেই সূচিত করে না কি? আবহসঙ্গীত হয় "সুষ্ঠু" নয়তো "ঘটনাবলীর অনুকূল" বা "প্রতিকূল" অথচ আবহসঙ্গীত নিয়ে কি বিপুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু বিদেশে নয় এদেশেও হচ্ছে। বিদেশী ছবি বিশেষতঃ ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ছবির আবহ-সঙ্গীত-এর রেকর্ড (যাকে theme বলে) লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিক্রী হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। কয়েক মাস আগে সত্যজিৎ রায় ও তাঁর "নায়ক, চারুলতা, মণিহারা"—ইত্যাদি ছবির theme-এর টেপরেকর্ড আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বাজিয়ে শুনিয়েছেন। শ্রোতামাত্রেই তা উপভোগ করেছেন। এই সব তথ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কী চিত্র-সমালোচকদের নয়? তবে কাদের? "সাইট অ্যান্ড সাউন্ড" প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখ করে নান্দীকার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু ওপরের উদ্ধৃতিগুলো যে তাঁরই সমালোচনার অংশ একথা অস্বীকার করবেন কি করে?

আশিসকুমার দাশগুপ্ত
রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ,
দুর্গাপুর।

(উত্তর)

লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তিনি আমার লেখা বেশ খুঁটিয়ে মন দিয়ে পড়েন বলে। পত্রলেখককে মনে করিয়ে দি, আমরা ছবির ক্রিটিসিজম করি না, করি রিভিউ। এখানে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের উক্তি স্মরণীয়: "আর্ট যেখানে বাণিজ্য, সেখানে রিভিউ। যেখানে সে শিল্প, সেখানে ক্রিটিসিজম্‌। চলচ্চিত্র একটি শিল্প, আবার এক বিরাট ব্যবসায়ও, যেখানে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। চলচ্চিত্র নামক ইন্ডাস্ট্রির অনুগত তাৎক্ষণিক ফিল্ম-রিভিউ, চলচ্চিত্র নামক আর্টে আত্মনিবেদিত ফিল্ম-ক্রিটিসিজম্‌।" আমাদের দেশের বাঙলা বা হিন্দী ছবির আবহ-সঙ্গীত প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব মত হচ্ছে, আমরা এখনও যথার্থ আবহ-সঙ্গীত রচনার পথই খুঁজে বেড়াচ্ছি, লক্ষ্যস্থানে পৌঁছুতে এখনও অনেক দেরী। আর কোনোও গানের ব্যবহার সম্বন্ধে যদি আমার মনে দ্বিধাই জেগে থাকে, তাতে অন্যের আপত্তি করবার কি কারণ থাকতে পারে? সকল লোকের রুচি যে এক হবে, এমন কোনো নির্দেশ কোথাও আছে কি? ইতি—নান্দীকার।

'পুরনো পাতা' প্রসঙ্গে

২২শে আষাঢ়, ১৩৭৪—অমৃত পত্রিকায় একটি নতুন বিভাগ "পুরনো পাতা" চোখে পড়ল। উক্ত বিভাগটি অতীত বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-বিস্মৃত বাঙালী জাতিকে এক নতুন প্রেরণা জোগাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। বর্তমান সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের বাংলার ইতিহাস থেকে হেস্টিংস ও নন্দকুমার অংশটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যাঁরা বিদ্যাসাগরের বাংলার ইতিহাস পড়েননি তাঁরা বুঝতে পারবেন বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতই ছিলেন না—পরন্তু সেই সময়কার বাংলার ও বৃটিশ শাসকদের আভ্যন্তরীণ চরিত্রের ইতিহাস লিখে সার্থক ঐতি-হাসিকেরও পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের চেয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। তিনি সত্যের পূজারী। এ ধরনের "পুরনো পাতা" প্রতিটি পত্রিকার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

আমরা উক্ত বিভাগটি খোলার জন্য অমৃত-কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত, সান্ত্বনা গুপ্তা
রাঁচী—৪

শার্লক হোমস প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত অদ্রীশ বর্ধনের "শার্লক হোমস" আমরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। স্যর আর্থার কানান ডয়েলের শার্লক হোমস সংক্রান্ত প্রায় সব বইই আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু শার্লক হোমস সম্বন্ধে এত তথ্য কোথাও পাইনি। শ্রীযুক্ত বর্ধন কি দয়া করে জানাবেন এসব উনি কোথা থেকে পেয়েছেন? আড্রিয়ান কানন ডয়েলের বইতে কি?

পরিশেষে একটি নিবেদন আছে। গল্পগুলি সরাসরি অনুবাদ করলেই বোধ হয় অনেক সুপাঠ্য হয়। এইভাবে লেখাতে কি কনান ডয়েলের সাহিত্যরস ব্যাহত হচ্ছে না? এই প্রসঙ্গে এই সপ্তাহে প্রকাশিত Study in Scarlet উল্লেখযোগ্য। এই অনবদ্য বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই কি কাম্য ছিলো না?

পার্থ ভট্টাচার্য পত্রলেখা ভট্টাচার্য
কলকাতা—৬

ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে

অমৃতের ৩০শে জুন সংখ্যায় "ভারতীয় সাহিত্য" বিভাগে "একজন তরুণ হিন্দী কবি" রাজকমল চৌধুরী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

রাজকমল চৌধুরী গত ১৯শে জুন পাটনা মেডিকেল হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। কিছুকাল থেকেই তিনি ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বৎসর। তিনি বিহারের সাহারসা জেলার মহেশী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। প্রায়ই গ্রামে চলে যেতেন এবং সেখানেই কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন। রাজকমল হিন্দী সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশ করেন ছোট-গল্প নিয়ে। মৈথিলী ভাষাতেও তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। "নদী বহতী হায়", "কংকাবতী", "মছলী মরী হুই" ইত্যাদি রাজকমলের প্রখ্যাত সাহিত্য-কীর্তি। বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন তিনি। জ্ঞানোদয় ও রাগরংগ পত্রিকা দুটির সম্পাদনা করতেন।

ইদানীং রাজকমল কবিতা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনা লিখলেও তাঁকে "ভূখা পীঢ়ি"র (পীঢ়ি নয়) প্রবর্তক বলা ঠিক হবে না। বীট্‌ ও বাংলার হাংরি জেনারেশান কবি-গোষ্ঠীর সমতুল্য কোন সাহিত্য আন্দোলন হিন্দীতে হচ্ছে কি না তার কোন হদিস এখনই দেয়া যায় না।

জীবনময় দত্ত
পাটনা: ১

অমৃত

পূর্ব সীমান্তে অশান্তি

নয়াদিল্লীতে গত সপ্তাহে আসামের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে আসামের পার্বত্য এলাকার কিছু কিছু নেতা স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবী জানিয়ে আসছেন। নেহরুর জীবদ্দশাতেই এই দাবী ওঠে। তিনি এঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্কটিশ ধাঁচের স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবছেন। এ নিয়ে কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু সমতলের নেতারা তখন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। ইতিমধ্যে নেহরুর মৃত্যু হয়। লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলে আবার পার্বত্য নেতারা তাঁদের দাবীর কথা বলেন। শাস্ত্রীজী এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে রিপোর্ট দেবার জন্য শ্রীপটাশকরের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কমিশনের কাজ শেষ হবার আগেই শাস্ত্রীজীর জীবনাবসান হয়।

পটাশকর কমিশনের রিপোর্টে আসামের পার্বত্যাঞ্চলকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। কমিশন তার পরিবর্তে পার্বত্যাঞ্চলে অধিকতর স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেবার জন্য জেলা কাউন্সিলের ওপর প্রভূত ক্ষমতা দেবার পক্ষপাতী। এই রিপোর্ট সমতলের নেতারা ও পার্বত্য অঞ্চলের নেতারা প্রত্যাখ্যান করেন। সমতলের নেতারা বলেন যে, এর দ্বারা আসাম সরকারের ক্ষমতা খণ্ডিত হবে, পার্বত্যাঞ্চলের শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা প্রবেশ করবে এবং ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতাবোধ শক্তিশালী হবে। পার্বত্য নেতারা বলেন যে, এর দ্বারা পার্বত্য অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের কোনো অধিকারই স্বীকৃত হয়নি। বিক্ষুব্ধ পার্বত্য নেতারা এরূপর সিদ্ধান্ত নেন যে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য গঠন ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব তাঁরা মানবেন না। এর জন্য তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের পর এই সমস্যা সমাধানের জন্য মনোযোগী হন। গত জানুয়ারী মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাম সফর করে এসে পার্বত্য ও সমতলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর প্রস্তাব দেন যে আসামে একটি ফেডারেশন গঠন করা হবে। এই ফেডারেশনের দুইটি স্বয়ংশাসিত ইউনিট গঠিত হবে সমতল অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং পাঁচটি পার্বত্য জেলা নিয়ে পৃথকভাবে। কতকগুলি সমস্বার্থের বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়েই এই ফেডারেল ইউনিটগুলি হবে স্বয়ংশাসিত রাজ্যের মতো। পার্বত্য নেতারা এই প্রস্তাবে রাজী হন। সমতল থেকেও খুব বেশি আপত্তির কথা তখন শোনা যায়নি। পার্বত্য নেতারা এঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেন এবং সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক বৈঠকে স্পষ্টতই বোঝা গেল যে, সমতল আসামের নেতারা এইভাবে আসামকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করতে রাজী নন। পার্বত্য এলাকাতেও একটি ইউনিট গঠন নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। যেমন মতানৈক্য আছে কাছাড়ের অধিবাসীদের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার প্রশ্নে। মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার অধিবাসীরা প্রস্তাবিত ইউনিটে থাকার বিরোধী। মিজোদের বিদ্রোহী অংশ যে এদের সঙ্গে আসবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং খাসি পাহাড় ও গারো পাহাড় এলাকার দাবীকে গোটা পার্বত্য এলাকার দাবী বলে চালানো যায় না। অন্যদিকে নাগাল্যান্ড গঠন করার পরও যেভাবে সেখানে অশান্তি লেগে আছে তা দেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে যে, এইভাবে একটি ফেডারেল শাসনকাঠামো প্রবর্তন করে আসামের সমস্যা মিটবে কিনা।

আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীঅশোক মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন গোটা আসাম পুনর্গঠন সমস্যা আবার পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দেবার জন্য। আগস্টের মধ্যে এই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। স্বভাবতই পার্বত্য নেতারা এতে খুশি হননি। তাঁরা মনে করছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, সমস্যাটা যত সরল বলে তাঁরা মনে করছেন আসলে তা নয়। পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরাই এক ইউনিট গঠনের ব্যাপারে একমত নন। সুতরাং খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং গারো পাহাড়ের দাবী মেনে নিলেই পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের দাবী মিটবে না। তাতে প্যান্ডোরার ঝাঁপিই শুধু খোলা হবে। নাগাল্যান্ডে বিদ্রোহীদের অনমনীয়তা এবং মিজো এলাকার বিদ্রোহীদের তৎপরতা দেখে সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব নয়। বিশেষত আসাম একটি সীমান্ত রাজ্য। তাকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করলে গোটা সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং অশোক মেহতা কমিটির রিপোর্ট না দেখে এই মুহূর্তে সরকারের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। আশা করি, আসামের পার্বত্য নেতারা বাস্তব অবস্থা বুঝে সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন।

রোমাঁ রোলাঁর সংগীতবোধ।। ভাস্কর মিত্র

রোমাঁ রোলাঁ আবির্ভাব-লগ্নের পটভূমিকাটি ফরাসীদেশের ইতিহাসে নানাদিক দিয়ে স্মরণীয়। যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের পর তখন একশো বছরও অতিক্রান্ত হয় নি। সমগ্র য়ুরোপীয় সংস্কৃতি-চেতনা ফ্রান্সকে কেন্দ্র করেই যেন একটা বস্তু রচনাও করে চলেছে। সংগীতের ইতিহাসে ধ্রুপদীযুগের অবসান এবং রোমান্টিক ভাবনার অভ্যুত্থানের যে সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে তারও কেন্দ্রস্বরূপ প্যারিসের গুরুত্ব তখন সর্বজনস্বীকৃত। ১৮২৩-এ হাংগেরী থেকে লিজট্ প্যারিস এলেন শোঁপা পোল্যান্ড থেকে এলেন ১৮৩০-এ, কবি হাইন এলেন উত্তর জার্মানী থেকে ১৮৩১-এ। ভিকটর হুগো, বার্লো-প্রমুখ ফরাসী কবি ও সুরকারদের পাশাপাশি তাঁরা রোমান্টিক চেতনার একটি সার্থক রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়াও ১৮২৭-এ বৃটেনের একটি দল ফ্রান্সে সেকস্পীয়রের যে নাটক পরিবেশন করে তাতে সমগ্র দেশে যথেষ্ট আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। গ্যেটের ফাউস্টের ফরাসী অনুবাদে এবং ওয়েবারের একটি অপেরায় জগৎ এবং জীবনের প্রতি এক নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ল। বীটোভেন যদিও পূর্ববর্তী যুগের প্রতিনিধি, তা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাধারার অভিনবত্বে প্রচন্ড আবেগের অভিব্যক্তিতে আসন্ন ইতিহাসের যুগধর্ম'ও দুর্লক্ষ্য ছিল না এবং প্যারিসের ঘরে ঘরে এই বিরাট প্রতিভার সৃষ্টিনির্ঝর তখন মনোরম সুরের তরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে।

রোঁমা রোলাঁর জন্মলগ্ন এমনই এক তাৎপর্যপূর্ণ কালের পরিণত স্তরে অবস্থিত। রোমান্টিক যুগের সংগীতে, সাহিত্য ও সংগীতের এক অভিনব সমন্বয় ঘটেছিল। বার্লো রোমিও-জুলিয়েটের ভাববস্তু নিয়ে সিম্ফনী রচনা করেছেন, বায়রনের একটি কবিতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন Harold In Italy শীর্ষক ভেয়োলা কনসার্টেতে, পেত্রার্কার সনেট লিজট্কে অনুপ্রাণিত করেছে কয়েকটি পিয়ানের সুর-গ্রন্থনায়। সংগীত ও সাহিত্যের এই সমন্বয়ে যে বিশিষ্ট রূপের প্রবর্তন ঘটল, য়ুরোপীয় সাংগীতিক পরিভাষায় তা 'প্রোগ্রাম সংগীত' বলে অভিহিত হয়েছে। রোমাঁ রোলাঁর প্রতিভা যেন এমনই এক অভিনব শিল্পরূপের জীবন্ত বিগ্রহ। তৎকালীন সংগীত-রচয়িতারা যেমন সাহিত্যকে বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র ঝংকারে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, রোঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ' উপন্যাসে তেমনই পাতায়-পাতায় একটা সংগীতকে ভাবে ও ভাষায় ঝংকৃত করে তোলা হয়েছে। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, 'জাঁ ক্রিস্তফ' যদিও এক অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি, কিন্তু যথেষ্ট সাংগীতিক জ্ঞান ব্যতীত তার রসের পরিপূর্ণ আস্বাদন সম্ভব নয়।

[উত্তরসূরী : কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩]

বাংলার মন্দির।। হিতেশরঞ্জন সান্যাল

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে বাংলা দেশে অসংখ্য আটচালা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অঙ্গ-

বিন্যাসের সর্বতোগ্রাহ্য কোন পরিমাপ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ রূপভেদ এত ব্যাপক যে তাহাদের মধ্যে অঙ্গবিন্যাসের যতগুলি রূপভেদ দৃষ্টিগোচর আসন দৈর্ঘ্যের সমান উচ্চতাবিশিষ্ট দেওয়াল ও সমোচ্চ আচ্ছাদন সম্বলিত মন্দিরদেহ নির্মাণের প্রবণতাটাই অধিক। হরিপালের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে যে সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, কিছুটা পরবর্তীকালে ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের পথে রূপলাভ করিয়া তাহাই হইয়া উঠিল বহু ব্যাপক। চারচালা মন্দিরের ক্ষেত্রেও দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের সীমাবন্ধনও এই একই রূপ। সেখানেও এই রূপটির জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক।

কতকগুলি মন্দিরে স্থপতি আরও একটু বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। দেওয়াল আসনের দৈর্ঘ্যসীমা পশ্চাতে ফেলিয়া উঠিয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর মন্দিরে অবশ্য আচ্ছাদনের উচ্চতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন প্রথা অনুপস্থিত। মন্দির হইতে মন্দিরে আচ্ছাদনের উচ্চতায় দেখিতেছি প্রকারভেদ ঘটিতেছে। বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রামের কুন্ডুপুকুরের তীরবর্তী চতুঃশিবমন্দিরে দেওয়াল ও আচ্ছাদন পরস্পরের সমান উচ্চ। চতুরস্র আসনের উপর মন্দিরের কৃশদেহ দীর্ঘছন্দের সহজ সাবলীলতায় বিকশিত। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার হাটকৃষ্ণনগর গ্রামে কুন্ডুবাড়ীর দামোদর মন্দির ও ময়রাপাড়ার দামোদর মন্দিরে আচ্ছাদন দেওয়াল এমনকি আসন হইতেও হ্রস্ব। সুদীর্ঘ দেওয়ালের উপর খর্ব আচ্ছাদনের অসংগতি স্থপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

আর এক শ্রেণীর মন্দিরে দেখিতেছি প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মত আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দেওয়াল অনেক হ্রস্ব। ইহাদেরও আচ্ছাদন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ নাই। হাওড়া জেলার খড়িয়া গ্রামের খড়গেশ্বর শিবমন্দির (১৬৮১ খৃঃ), রাউতারা গ্রামের ঘোষপাড়াস্থ সীতারাম মন্দির (১৭০০ খৃঃ), চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার গ্রামের কেশবেশ্বর মন্দির (১৭৪৮ খৃঃ), হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দামোদর মন্দির ১৮২২ খৃঃ), শ্রীরামপুর সহরের বল্লভপুরস্থিত রাধাবল্লভ মন্দির (১৭৬৪ খৃঃ), গুপ্তিপাড়া গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির (১৮১০ খৃঃ), গোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীধর মন্দির (১৭২২ খৃঃ), দেওয়াল ও আচ্ছাদন সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। অন্যদিকে রহিয়াছে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি), আঁটপুর গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দির (১৭৮৬ খৃঃ), চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ রায় মন্দির (১৭৮৫ খৃঃ), চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর—খাসবাটীর শিবমন্দিরদ্বয় ও বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল রাজবাটীর শিবমন্দিরটি—ইহাদের ক্ষেত্রে আসনের দৈর্ঘ্য হইতে দেওয়াল হইতে আচ্ছাদন উচ্চতায় হ্রস্বতর। নদীয়া জেলার শান্তিপুর সহরের শ্যামচাঁদ মন্দিরে ১৭২৬ খৃঃ ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। মন্দিরটিতে আচ্ছাদন দেওয়াল হইতে উচ্চতর এবং আসনের দৈর্ঘ্যের সমান। বস্তুতঃ আসনের বিস্তারের মধ্যে মন্দিরদেহ গঠনে যতখানি উচ্চতা অর্জনের সম্ভাবনা নিহিত ছিল এই শ্রেণীর মন্দিরগুলিতে তাহা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। আসন হইতে হ্রস্বতর দেওয়ালের অসংগতি হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় কিন্তু দেওয়াল হইতে হ্রস্বতর আচ্ছাদন রচনার প্রতিটি নিদর্শন পরিমাণবোধের একান্ত অভাবে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছে।

[সমকালীন।। জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৪]

সুধা বসু

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত-শিল্পে বিচিত্র ও নানা অদ্ভুত রূপকল্পনার প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতীয় শিল্পের গোড়ার কথা পর্যালোচনা করলে প্রতীকধর্মী রূপকল্পনার যেমন প্রাচুর্য দেখা যাবে, তেমনি পরিচয় ঘটবে আরও নানা অভিনব ও উদ্ভট সব রূপাকৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সঙ্গে। সিন্ধু-সভ্যতার সুপ্রাচীন ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত কয়েকটি মূর্তি থেকে শুরু করে বৌদ্ধশিল্পের ভাস্কর্য-নাক্ষিতেও প্রতীকবাদী কলানিদর্শনের সংখ্যা সুপ্রচুর। বুদ্ধদেবের চাক্ষুষ মূর্তিপ্রতিমা নির্মিত হওয়ার পূর্ব যুগে বুদ্ধপূজার রীতি বিভিন্ন প্রকারের প্রতীক মধ্যেই ছিল সীমিত।

কালচক্রের গতি যতই এগিয়ে চলেছিল, ভারতীয় কলাকারের কল্পনাপ্রবাহের অভিনবত্বও ততই দ্রুততালে করেছিল বিস্তৃতিলাভ। প্রতীকধর্মী শিল্পের পাশে পাশে আরও কত অদ্ভুত আকৃতির মনুষ্যমূর্তি ও পশুপাখীর রূপ হয়েছিল উদ্ভাবিত। এছাড়া মনুষ্যদেহের সঙ্গে পশুঅঙ্গের হোল সমন্বয় ও সংযোজন। আবার বহুসংখ্যক পশুর দেহকে চমৎকার পদ্ধতিতে এক সূত্রে ছন্দে গ্রথিত করে তাকে রূপান্তরিত করা হোল একটি প্রাণীতে। উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতে যুগে যুগে এই ধরনের মূর্তি রচিত হয়েছে বহুল পরিমাণে।

কিন্তু সমস্ত অভিনব কল্পনাকে পরাস্ত করে এমন আর একটি বিস্ময়কর রূপের প্রচলন হয়েছিল মধ্যযুগীয় ভারতশিল্পে, যার মূল উৎস ও কল্পনা-রহস্যের পুরোপুরি সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই জাতীয় অদ্ভুত ও বিচিত্র রূপসৃষ্টিতে উড়িষ্যার অবদান অসামান্য। সেখানে নারীমূর্তি-মালাদ্বারা অশ্ব, গজ ও নৌকা ও রথের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ শিল্পকলায় চরম উৎকর্ষ প্রকাশলাভ করেছে। নারীমূর্তির সংখ্যা প্রায় সর্বত্রই নয়টি। এই প্রকারে নারীদেহ দ্বারা গঠিত বিভিন্ন পশু, রথ ও নৌকোর রূপরচনা উড়িষ্যার চিত্রশিল্পে একটি সুপ্রচলিত বিষয়বস্তু বা 'মোটিফ'। তার মধ্যে আবার হস্তীরূপ অর্থাৎ 'নব-নারী-কুঞ্জর' এবং রথাকার বা 'কন্দর্প রথের' প্রচলন অত্যধিক। অশ্বের রূপ ও নৌকা মধ্যে মধ্যে রূপায়িত হলেও পূর্বোক্ত দুটির মত সুবিদিত নয়। উল্লিখিত সবকয়টি অদ্ভুত রূপই উড়িষ্যায় কৃষ্ণলীলার সঙ্গে জড়িত ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। কারণ এই নারীদেহ গঠিত পশুমূর্তি ও রথের উপরে সবসময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলার কাহিনী পর্যায়ে নয়টি গোপবালা কর্তৃক এই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে কৃষ্ণসেবার কোন বিশদ বিবরণ নেই। তবে দশম স্কন্ধে বর্ণিত কৃষ্ণ অন্বেষণকারী গোপিকাদের কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব লীলার অনুকরণ করে কেবলমাত্র শকটের রূপ পরিগ্রহণ করেছিলেন এমন ইঙ্গিত সামান্য আছে। কিন্তু উড়িষ্যার 'পঞ্চরাস' নামক সংস্কৃত কবিতায় এর অতি প্রাঞ্জল বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এই 'পঞ্চরাস' কাব্যের রচয়িতা হলেন পণ্ডিত দিবাকর দাস। এতে বর্ণিত পঞ্চমূর্তি হোল কুঞ্জর, তুরগ, তরী, রথ এবং বনভূমিতে বিভিন্ন বৃক্ষলতারূপে নব-গোপিনী। আর এরা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এই জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা উড়িষ্যার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ। ওখানকার পটুয়া[illegible] মধ্যে অনেকের এই রাসলীলা বিষ[illegible] কবিতা কণ্ঠস্থ।

অনুরূপ রীতিতে শ্রীকৃষ্ণকে বহন ক[illegible] চলেছেন এমন গোপীদেহদ্বারা র[illegible] কুঞ্জরমূর্তি অঙ্কনের প্রথা একসময় রা[illegible]স্থানী চিত্রকলায়ও ছিল। বাঁশরী ও সমু[illegible] কমলকলিকা হাতে সুবেশ শ্রীকৃষ্ণ নব-না[illegible] কুঞ্জরে সমাসীন, এরকম চিত্রপটেরও বি[illegible] সন্ধান পাওয়া গিয়েছে রাজস্থানী [illegible] শৈলীতে। উল্লিখিত চিত্রপট কয়েক[illegible] সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের রচনা। [illegible] রাজস্থানী কলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে [illegible] সমৃদ্ধ ও সুন্দর। সম্ভবতঃ রাজস্থানে[illegible] নিজস্ব কোন কৃষ্ণকাহিনীর ধারা রয়ে[illegible] যার আদর্শে সেখানেও এই জাতীয় অভি[illegible] মূর্তি কল্পিত হয়েছে।

বাংলাদেশের দীর্ঘকায় জড়ানো [illegible] চিত্রেও একদা "নব-নারী-কুঞ্জর" মূ[illegible] রূপায়ণের প্রচলন ছিল। বড় বড় র[illegible] দেহ অলঙ্করণের নানা কারুকলায় বি[illegible] বস্তু মধ্যে দারু উপাদানেও নব-নারী-কু[illegible] মূর্তি রচনার রেওয়াজ ছিল। সেই মূ[illegible] গুলি খুব বর্ণাঢ্য হোত। এই প্রসা[illegible] স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের শি[illegible] সংগ্রহের সম্পদ "নব-নারী-কুঞ্জর" চিত্রখ[illegible] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রখানি রং-এ, রেখ[illegible] রূপ কল্পনায় অতি অভিনব ও আকর্ষণ[illegible] সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় হোল এর ব[illegible] আকার। উড়িষ্যার পটে "পঞ্চরাস" আকারে বৃহৎ নয়, রাজস্থানে একেব[illegible] "মিনিয়েচার' ধরনের। কিন্তু বাংলার পটখানি আকারে যেমন বৃহৎ, কল্পনায়

অশ্বরাস— উড়িষ্যারীতি

রূপায়ণে ততোধিক সুবিশাল ও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক।

উপস্থিত আলোচ্য চিত্রপট দুটির একটি মুঘলশৈলীর, দ্বিতীয়টি হোল উড়িষ্যার পটুয়া দ্বারা অঙ্কিত। দুখানি চিত্রেরই মূলবিষয় নয়টি নারীদেহ দ্বারা রচিত অশ্ব-রূপ। উড়িষ্যার পটখানি ভাগবতধর্মীয়। নব-নারীদেহ নির্মিত একটি চঞ্চল গতিশীল অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ সমাসীন। নয়টি নারীর ছয়টি এই অশ্বদেহে সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান। বাকী তিনটি স্ত্রীমূর্তি অশ্বদেহের অদৃশ্য বিপরীত অংশকে গঠন করেছে। এই বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনা শিল্পকৃতিকে করেছে আরও মনোরম ও আকর্ষণীয়। আদর্শবাদী, কল্পনা-প্রধান শিল্পের এ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অশ্বদেহের প্রতিটি নারীমূর্তি ক্রিয়া-চঞ্চল ও তাদের মধ্যে শক্তির ভাব সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিও স্থির নিশ্চল নয়। গোপী-বল্লভ অশ্বচালনায় ব্যাপৃত ও ক্রীড়ামগ্ন। চিত্রখানির রেখারচনা সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অতিমাত্রায় বলিষ্ঠ ও জোরালো ভাবের। অত্যুজ্জ্বল বর্ণসমাবেশ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ঠাস বুনটের নক্সা, কারুকার্য ও অলঙ্করণ, কিন্তু কোন অসামঞ্জস্য বা অপপ্রয়োগ ঘটেনি, অথবা ছন্দসৃষ্টিতে বাধা পায়নি। অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণমূর্তির উন্মুক্তদেহের নিম্নভাগে গোপবালাগণের জমজমাটরূপের জামাপোষাক চিত্রপটে ভার-সাম্য বজায় রেখেছে অতি চমৎকার। পটখানির নিচের দিকে অশ্বপদ চতুষ্টয়, উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণের মাথার মোহন চূড়াও ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করেছে।

উড়িষ্যার কবি দিবাকর দাস রচিত পঞ্চরাস কাব্যে অশ্বরাসের বর্ণনা এইরূপ :

"দ্বিতীয়ং রাসং জানাতি
অশ্বরাসং শুভাশুভম্,
বদরিকা বনে রাসং রচিতম্
কথিতম্ পুরা।
অশ্ব-স্কন্ধে শ্রীমতী চ উদরে
ললিতা তথা,
চতুষ্পার্শ্বে চতুর্বাহং
ব্রজানন্দা বিনোদিনী,
পৃষ্ঠদেশে তু মঞ্জর্যা চামরো
হস্তশোভিতঃ,
অশ্বপুচ্ছধরা গোপী
চন্দ্রভানু কৃশোদরী,
অশ্বপৃষ্ঠে পূর্ণ ব্রহ্ম ত্রিভঙ্গং
বেণু বাদকম্,
নমামি গোপিকানাথং নন্দ
নন্দন মোহনম্।।"

মুঘল-শিল্পীর কল্পনায় কিন্তু নারী-তুরঙ্গম ভিন্নরূপে, স্বতন্ত্র অর্থে রূপায়িত হয়েছে। এখানে রূপারোপ বাস্তবানুগ। অশ্বদেহের একটি দিকেই নয়টি নারীর সমাবেশ। বিপরীত অংশের জন্য কোন কল্পনার অবকাশ রাখেননি রূপকার। স্থূলদেহ তুরঙ্গমের গতি ধীর, মন্থর। দেহের গড়ন ও আকৃতি কোমল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যথোচিত ছন্দলীলার প্রকাশ হয়নি। প্রতিটি নারীর হাতে বাদ্যযন্ত্র, চামর

মুঘল-শৈলী

ইত্যাদি। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ, দেহভঙ্গী ও সমগ্র রূপ সবই মামুলী মুঘল রীতির। এখানে অশ্বপৃষ্ঠে রয়েছে ডানাওয়ালা কোন পরী বা দেবকন্যার প্রতিমূর্তি। ডানাদুটি বিচ্ছিন্ন করলে একে অনায়াসে কোন মুঘল রাজদুহিতা বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হোল, মুঘল-শিল্পে এই 'মোটিফের' প্রবর্তন হয়েছে কি প্রকারে ও কি উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণলীলার কাহিনীতে গোপীদের এই প্রকারে দেহ, আত্মা দুই সমর্পণ করে কৃষ্ণসেবা স্বাভাবিক ও সম্ভব-পর। সর্বস্ব ত্যাগ না করলে, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন করতে না পারলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা। সেই লজ্জা, এমনকি জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে কৃষ্ণসেবায় আত্মসমর্পণ করতে পারলেই সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ কৃষ্ণ-পদ প্রাপ্তি হতে পারে। তাই ব্রজবালারা নিজেদের দেহ, আত্মা দুই-এর দ্বারা কৃষ্ণসেবার এই অভিনব পন্থা হয়ত উদ্ভাবন করেছিলেন সিদ্ধি-লাভের জন্যই। তাঁরা নরদেহকে সার্থক করলেন, পবিত্র করলেন স্বয়ং ভগবানকে নিজেদের দেহোপরি স্থান দিয়ে ও বহন করে। ভক্ত কবি, শিল্পীর সুগভীর কল্পনায় গোপীদের কৃষ্ণসংগলাভ ও ভগবৎসেবার এ একটি বিশিষ্ট উপায়স্বরূপ হয়েই সম্ভবতঃ কাব্যে ও কলায় স্থানলাভ করেছে।

কিন্তু মুঘলচিত্রেও এর প্রবর্তন দেখে মনে হয় রাজস্থানী শিল্পে এই প্রথায় কৃষ্ণ-লীলার রূপায়ণ দেখে দেখে মুঘলচিত্রীরা প্রথমে হয়ত কৌতূহলবশেই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে পারসিক কাব্য-কাহিনীর আখ্যান ও অলৌকিক ঘটনার রূপায়ণকালে অপ্রাকৃতভাব সৃষ্টির সহায়ক হিসেবেও হয়ত এই মোটিফের প্রবর্তন হয়েছিল। পাশ্চাত্য প্রথার ডানাওয়ালা পরী বা এঞ্জেলের নানাপ্রকার চিত্র-রূপও মুঘল-কলায় স্থান পেয়েছে বহুবিধ প্রসংগে ও বিচিত্র সব ঘটনার রূপায়ণে।

বৈষ্ণব পটে ও মুঘলচিত্রে অশ্ব-নারীর রূপবিন্যাস ও বিষয়বস্তুর মূলকথা মোটা-মুটি এক হলেও ভাবের অভিব্যক্তি ও আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব-চিত্রে নারী মূর্তিগুলি ভক্তিনম্রভাবে আনত ও আত্ম-সমর্পণের ভাবে সমৃদ্ধ। আত্মবুদ্ধিবর্জিত হয়ে আত্মবিলোপই সেখানে বড় কথা। আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণপদে দেহ ও আত্মা দুইকে বিলীন করার দুরূহ চেষ্টার প্রকাশ।

কিন্তু মুঘলশৈলীর নারীমূর্তিতে কোন উচ্চভাবের প্রকাশ নেই। পটের ছবি সাধারণ রমণীয় রূপমাত্র। যেন একটি উৎসাহ উদ্দীপনাহীন প্রমোদযাত্রা। বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি-সহকারে দেবকন্যাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন কোন গন্তব্য স্থানে। তবে কম্পো-জিশন অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন কলাশৈলীতে এই জাতীয় বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যও ভাবাভিব্যক্তি পৃথক হলেও মূল পরিকল্পনা সর্বত্র প্রায় এক পদ্ধতিতে চলেছে। যেমন, পশুর লেজটি সবক্ষেত্রেই রচিত হয়েছে একটি নারীর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ দ্বারা। মুখাবয়ব সৃষ্টি হয়েছে পুরো একটি নারীদেহকে প্রয়োজনমাফিক আরোপ করে। গজমূর্তির ক্ষেত্রেও এই প্রথাই হয়েছে অনুসৃত।

বিভিন্ন চিত্ররীতিতে যে পার্থক্য, তার মূল কারণ হোল চিত্ররচনার প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্যই ভিন্ন। উড়িষ্যা ও রাজস্থানের চিত্র ধর্মবিষয়ক, আর মুঘলচিত্র সাধারণ সামাজিক। বৈষ্ণবচিত্রের রমণীরা হলেন কৃষ্ণসেবাপরায়ণা গোপবালা। অভিনব পন্থায়

কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করে দুরূহ কৃচ্ছ্রতার জীবন করেছেন তাঁরা। আর মুঘলচিত্রের নারীরা হলেন সাধারণ পেশাদার গায়িকা ও নর্তকী শ্রেণীর। সুতরাং বৈষ্ণবচিত্রের মত অত গভীর ভক্তিনম্রভাব মোগলাই তস্‌বীরে আশা করা যায় না।

গায়িকা ও নর্তকীদের মধ্যে এই জাতীয় শক্তিসম্পন্না নারী যে মুঘল যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল, তার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক বর্ণনা দিয়েছেন ফরাসী পর্যটক তাভার্ণিয়ে তাঁর ভারত বিবরণীতে। তিনি মুঘল যুগে শাহজাহান ও ঔরংজীবের রাজত্বকালে কয়েকবারই ভারতভ্রমণে এসেছিলেন ব্যবসায়ীরূপে। তিনি তাঁর গোলকুণ্ডা ভ্রমণ প্রসংগে এই জাতীয় নারী-সমাজের একটি বর্ণনা দিয়েছেন বিশেষ আকর্ষণীয়ভাবে।

তাভার্ণিয়ে গোলকুণ্ডায়ও যাতায়াত করেছেন অনেকবার। বিবরণটি তিনি দিয়েছেন ১৬৪৫ সালের ভ্রমণ প্রসংগে। গোলকুণ্ডায় গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সেই শহরে ও শহরতলী অঞ্চলে অসংখ্য বারাঙ্গণার বসতি রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই সেই জীবিকা গ্রহণের অনুমতি ছিল না এবং সুলতানকে তারা কোন করও প্রদান করত না। তাদের অনেকে দলবদ্ধ হয়ে জনৈকা নেত্রীর পরিচালনায় প্রতি শুক্রবারে সুলতানের সম্মুখে হাজির হতো নৃত্য প্রদর্শনের জন্য। এদের অনেককে আবার নিযুক্ত করা হোত সৈন্যবাহিনীতে সেনাপতি ও ওমরাহদের পশ্চাতে থেকে লম্ফঝম্ফ ও নৃত্য করতে করতে চলার জন্য। তাছাড়া এদের গৃহে 'তাড়ি' বা দেশীয় মদ্য বিক্রয়ের জন্য বিপণি খোলার অনুমতি ছিল। সেখানে বিক্রীত 'তাড়ি' থেকে সুলতান প্রচুর রাজস্ব পেতেন। এই কারণেই মাদকের দোকানগুলি এদের গৃহে খুলবার নীতি হয়েছিল অনুমোদিত।

পরবর্তী বর্ণনা আরও অদ্ভুত এবং আলোচ্য চিত্র প্রসংগে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। তাভার্ণিয়ে বলেছেন যে, সেই নারীরা এত অধিক কর্মঠ ও তৎপর প্রকৃতির যে, গোলকুণ্ডার সে-সময়ের সুলতান যখন একবার মসুলীপত্তন ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন এদের মধ্যে নয়জন মিলিত হয়ে নিজেদের দেহ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন একটি হস্তীর রূপ। চারজন হয়েছিলেন হাতীর চারটি পা, চারজন মিলে করেছিলেন হাতীর দেহ গঠন। বাকি একজনার দ্বারা রচিত হয়েছিল শুঁড়টি। নর-নারী দের দ্বারা গঠিত সেই হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপিত একখানি সিংহাসনে বসেই সুলতান সেদিন প্রবেশ করেছিলেন মসুলীপত্তনে (তাভার্ণিয়ে, ভারতবিবরণ, ১ম খণ্ড)।

প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণ থেকে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করা যায় যে, সে-যুগে সমাজে এক শ্রেণীর নারী ছিলেন, যাঁরা সংগীত-নৃত্যের সংগে শরীরচর্চা ও মল্লক্রীড়ায়ও নৈপুণ্য অর্জন করতেন এবং নানাভাবে সেই দক্ষতা প্রকাশ করে রাজা-বাদশাহদের সেবা ও মনোরঞ্জন করাই ছিল তাঁদের জীবনবৃত্তি। সুতরাং মুঘল যুগের ভারতীয় শিল্পীরা নিছক খেয়ালের বশে অথবা, পৌরাণিক কাব্যকাহিনীর প্রভাবেই কেবলমাত্র মানুষমূর্তি দ্বারা এইরকম পশু-মূর্তি রচনা করেননি। এ তাঁদের সমকালীন সমাজ-জীবনে প্রচলিত একটি বিশেষ কর্ম-প্রণালীরই প্রত্যক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ রূপ-চিত্র। তখনকার সমাজের বাস্তব ঘটনার তা প্রতিচ্ছবি মাত্র।

কিন্তু বৈষ্ণব চিত্রপটে ভক্তিমান বৈষ্ণব কবির প্রেমভক্তির গভীরতা ও আবেগের আতিশয্যে রচিত কৃষ্ণলীলার কাহিনী অবলম্বনেই গোপিকাকুলের এই অভিনব রূপাবলী উদ্ভূত হয়েছে। এ অকুণ্ঠ কৃষ্ণ ও সেবার মূর্ত রূপ; অপরিমেয় কৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাসে ও রসাবেশে পরিপ্লুত। মুঘল যুগের চিত্রে তা সুগভীর ভাবক ও সুউচ্চ আদর্শের অলৌকিক রাজ্য নেমে এসেছিল মাটি মাড়ানো জগতে। তা নিয়োজিত হয়েছিল রাজা-বা সন্তুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উদ্দে পক্ষান্তরে বৈষ্ণবশিল্পে তা হোল দেহ দেহাতীতের সাধনার প্রতীক, গোপীব কৃষ্ণপদে চরম আত্মোৎসর্গের ফলশ্রু চাক্ষুষ রূপ-চিত্র। কিন্তু মুঘল-চিত্র সম বিপরীতপন্থী; ভিন্ন আদর্শ ও অন্যভ প্রতিচ্ছবি!

অন্তর্গত ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত সৈকত জুড়ে আন্দোলিত দীর্ঘ ছায়া তার
একাকী সতর্ক সৌরকরোজ্জ্বল কস্তির পাহারা,
সে যেন লবণরৌদ্রে পোড়াবালি তৃষ্ণাপিপাসার
তটলীন সজল উদ্ধার।

হঠাৎ-সমুদ্র-দেখা ছুটি...হাওয়া, হোটেলের বাড়ি
ট্রেন আসে সারাদিন, সারাবেলা স্নানে যায় কারা!
কুসুম, তরঙ্গে যাও তোমার শরীরে দেব পাড়ি
এখন কোনার্কে যাবে গাড়ি।

এমনকি চিল্কায় সেই একই ছায়া সটান আকাশে
যেন স্বপ্নে জাগরণে ভূমণ্ডল নিয়েছে ইজারা—
সকলে ভ্রমণলিপ্সু, কেউ লক্ষ্য করে না বাতাসে
তাহার নিশ্বাস ভেসে আসে।

হে প্রিয় দিনান্তবেলা ॥

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে প্রিয় দিনান্তবেলা, তুমি একদণ্ড ঐ রাস্তার বাঁকের গাছতলায়
পসরা নামাও, যত আনত হৃদয় তুমি বয়ে নিয়ে যাও ঝাঁকা ভরে—
যত রক্তহীন অনিবার্যতাবিহীন স্রোতাপন্ন সফরীর ,
অভিমান, সব নিয়ে একদণ্ড ডালপালার নীচে তোমার ঐ
অপরূপ ক্লান্তির মুখোশখানি খুলে সত্যিকারের উই-লাগা
ক্লান্ত অপরূপতর মুখশ্রী মোচন করে ব'সো।

হে প্রিয় দিনান্তবেলা, তুমি আমার ঐ আঙিনার মধ্যে ঢুকে
অক্লেশে গজিয়ে ওঠা জঙলা ভাটিবন ভরে তোমার ঝাঁকার শস্যকণা—
তোমার ঐ সাজানো বিষাদ--তার অণিমা কেবল রেখে যাও।
তুমি চলে যাও, শুধু সব কিংবদন্তী থেকে
রুপোলি জরির কিছু সুতো
দৈবকরুণার মতো আমাদের সকলের অজানিত রাতে
রেখে যাও।

তারপর বিদায় হও, আমাদের বাসনার ঐ অস্তাচক্রবাল ভরে
একপ্রহরের মতো সারি সারি লণ্ঠন সাজিয়ে রাখো :
আপনা থেকে যারা জ্বলে উঠে
আমাদের সচকিত করে দেয়, আর শূন্য থেকে ঝুলে
নেমে আসে মাথার উপরে
সারি সারি রাত্রিপরিবাস ছায়া—শুধু, মসীস্নাত,
অপেক্ষমান স্মৃতির মতো কৃট—
যারা অতর্কিত রাতে শুধু স্মৃতি নয়
স্বপ্নহননেরও সুযোগ অপেক্ষা করে থাকে।

বিষহরি

পরেশ সাহা

শ্যামদাসী প্রথম যখন চর গোবিন্দপুরে আসে, তখন কেউ তাকে ভালো চোখে দেখেনি।

তখন তার উঠতি বয়েস, অঢেল যৌবন। গায়ের রং তেমন একটা কিছু না হলেও, তার বড় বড় দুটি চোখের দৃষ্টি মর্মস্পর্শী। মুখের হাসি ধারালো। হরকথায়, নয়-কথায় সে যেন হেসে হেসে ঢলে পড়তো।

চর গোবিন্দপুরের লোকে তাই বলতো ঢলানি. শ্যামদাসীর স্বভাবচরিত্তির ভাল নয়। অমন লোককে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

শ্যামদাসীর কিন্তু তাতে মন খারাপ হতো না। এ প্রসঙ্গে কেউ কথায় টান দিলে শ্যামদাসী হেসে হেসেই জবাব দিতো, যা মন চায় কওনা বাপু, শ্যামদাসীর গায় তো তাতে ছ্যাকা লাগবো না। তার ঘরও পুড়বো না। তোমাগোর মুখের কথা মুখেই থাকবো।' তারপর এ-দিক সে-দিক তাকিয়ে গলাটাকে আরও খাটো করে শ্যামদাসী বলতো, "ক্যানগো, তোমার মোনের মাইনষের মোন

ধইরা টান দিচি নাকি যে তোমার মেন টনটনাইয়া উঠচে? শ্যামদাসীকে তোমার ভয়?" নিজের কৌতুকে শ্যামদাসী নিজেই আবার খল্‌খল্‌ করে হেসে উঠতো।

চর গোবিন্দপুরের পূর্বদিকে যে ছোট্ট একটি খাল, চর ফটনগরের খাল, সেই খালের পাড়েই ঘর করেছিল শ্যামদাসী। ঘর শুধু নামেই, আসলে তা ডেরা। মাথায় শন, চারপাশে হোগ্‌লা-কঞ্চির বেড়া।

তা হোক, শ্যামদাসী সেই ঘরকেই নিকিয়ে-পুছিয়ে ফটফটা করে রাখতো।

লোকে বলতো, "ভাঙ্গা নায়ে মখমলের নিশান, ছিঁড়া কাঁথায় রেশমী সুতার ফোঁড়।" শ্যামদাসী হাসতো।

হেসে বলতো, 'হউক আমার ভাঙ্গা ঘর আর হোগলার বেড়া, ঐ ঘরই আমার গয়া-কাশী-বৃন্দাবন। ঐ ঘরেই য্যান্‌ শ্যামরায়ের মতন চউক বুজবার পারি।'

বলতে বলতে শ্যামদাসীর দুটি চোখের দৃষ্টি আবার যেন কোন্‌ গভীরে ডুবে যেতো।

এই ঘরেই 'থান' করেছিল শ্যামাদাসী। মা বিষহরির 'থান'। ঘরের এক কোণে একটি আসন। আসনের উপর একটি মাটির ঘট। তার উপর আমপল্লব। মা বিষহরির 'থান।'

এই 'থানে'-ই শ্যামদাসী দু সন্ধ্যে পুজো দিত। সপ্তাহে একদিন বেরুতো সে পাড়ায়। কপালে টুকটুকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা। কাঁখে মস্ত একটি ধামা।

গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় গিয়ে সে হাঁক দিত, 'মা বিষহরির সিধা দ্যাও গো মা।'

প্রথম প্রথম কেউ বড় একটা আমল দেয়নি শ্যামদাসীকে। তবুও সিধে তারা দিয়েছে। থালায় চালটা, বেগুনটা সাজিয়ে ঢেলে দিয়েছে শ্যামদাসীর ধামায়। নদী-নালার দেশে বাস করে কে মা বিষহরিকে অশ্রদ্ধা দেখাবে? কার অমন বুকের পাটা? শ্যামদাসীকে তাই তারা শুধু হাতে ফেরাতে পারেনি। তার ধামায় চাল ঢালতে ঢালতে তারা বলেছে, 'দেখিস্‌ শ্যামী, আবার শাপ-মনি্য করিস্‌ না য্যান, পোলাপান লইয়া ঘর করি, কে জানে আবার কিসে কি হয়!

শ্যামদাসী জিভ কেটেছে।

বলেছে, "ছিঃ ছিঃ..ও কি কথা কও বৌ, শাপ-মণ্যি করুম ক্যান? শাপ-মণ্যি করুম ক্যান্‌? তোমারে নি আমি মণ্যি দিবার পারি? ষাইট, ষাইট, বাইচা থাকুক তোমার যাদুরা, লক্ষ্মী ঘরে বান্দা থাকুক। মা বিষুরির বরে ধনে-জনে তোমার ঘর ভরুক।'

দিনে দিনে দিন ফিরলো শ্যামদাসীর। তার পসার জমলো। চাল-কলার বিনিময়ে শ্যামদাসী তাবিজট-কবজটা, তেলপড়া-জল-পড়া দিতে আরম্ভ করলো।

ঝড়ে বক মরলেও ফকিরের কেরামতি বাড়ে।' শ্যামদাসীর ক্ষেত্রেও বুঝি তাই হলো।

চর গোবিন্দপুরের লোকেরা তার তাবিজ-কবচের আশ্চর্য গুণ লক্ষ্য করলো। তাদের মনে হলো, শ্যামদাসীর উপর নিশ্চিত মা বিষহরি ভর করেছেন। নইলে আর এমন হয়! তার কবচে মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে?

এর পর থেকেই শ্যামাদাসী চর গোবিন্দ-পুরের 'বিষুরি' মা। বা বিষহরি মা।

আজকাল শ্যামদাসীকে আর কারো বাড়ী ছুটতে হয় না। বরং শ্যামদাসীর বাড়ীতেই লোক আসে। শুধু চর গোবিন্দ-পুর থেকেই নয়, লোক আসে শ্যামপুর, কানাইনগর, নয়াপাড়া আরও দূরে দূরে গ্রাম থেকে।

দু-একখানা নাও প্রতিদিন চর-ফটু-নগরের খালে বাঁধাই থাকে।

'বিষুরি মা', 'বিষুরি মা', 'বিষুরি মা' এ কথার গুঞ্জন সব সময়ই শ্যামদাসীর কানে বাজে।

লোকের কথায় কেমন যেন হয়ে যায় শ্যামদাসী। শরীরে একটা আশ্চর্য উত্তাপ অনুভব করে সে। ঢেউ-ভাঙ্গা ধলেশ্বরীর মতো মনও তার তোলপাড়।

সে চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে। চেয়ে চেয়ে সে যেন কোথায় হারিয়ে যায়। ভাবে, আর ভাবে সে। তার ভাবনায় যেন কূল-কিনারা নেই।

লোকে ডাকে, 'মা, বিষুরি মা।'

চমকে ওঠে শ্যামদাসী। দুটি ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে তাকায়।

বলে, 'অ্যা, অ্যা, কিছু কও?'

'বিষুরি মা।'

বিষুরি মা? বিষুরি মা ডাকটি শ্যাম-দাসীর বুকে যেন কল্লোল তোলে। তবে—তবে সত্যি কি সে বিষুরি মা! সত্যি কি মা বিষহরি তার উপর ভর করেছে?

হয়তো করেছে। এতো লোকে বলছে সে কি মিছে হতে পারে? নইলে এতো লোকই বা আসবে কেন? এতো মানতই বা করবে কেন?

দিনে দিনে শ্যামদাসীর মনেও এমনি একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

সে নিজেও ভাবে, হ্যা সে বিষুরির মা। তার উপর মা বিষহরির ভর।

শ্যামদাসী নিজের মনে কেমন যেন একটা জোর অনুভব করে। তার মনে আবার সেই ঢেউ-ভাঙ্গা ধলেশ্বরীর মতো তোলপাড়।

'হ, হ, হ। আমি পাইচি। যারে আমি চাই, তারে পাইচি। মা বিষুরিরে আমার ঘরে বান্‌চি। তরা উলু দে গো, উলু দে। মা বিষুরি আমার ঘরে বান্‌ধা পড়চে, তরা উলু দে'। মেয়েদের উলুধ্বনিতে চর গোবিন্দপুরের এ দিককার বাতাস ছন্দিত, মন্দ্রিত হয়ে ওঠে।

আজকাল শ্যামদাসী বড় একটা কথা কয় না কারো সঙ্গে। চুলে তেল দেয় না। দেয়না চিরুনি। চুলগুলি সব জট পাকিয়ে উঠেছে।

বাড়ীর পিছনেই চর ফটুনগরের খাল। খাল গিয়ে পড়েছে ধলেশ্বরীতে। সারা বছরই খালে জল থাকে।

কিন্তু শ্যামদাসী তবু বড় একটা স্নান করে না। স্নান না করে করে গা-মুখ তার খড়ি উঠেছে। ডাগর ডাগর চোখ দুটি সব সময়ই লাল। সেই লাল চোখের উপরে কপালের ঠিক মাঝখানে টকটকে লাল একটি সিঁদুরের ফোঁটা দেয় শ্যামদাসী। লাল পেড়ে শাড়ী পরে।

শ্যামদাসীকে দেখলে আজকাল কেমন যেন ভয় ভয় করে। শ্যামদাসী আর আগের মতো নেই। আজ সে একেবারে আলাদা মানুষ।

তা হোক। শ্যামদাসীর এই পরিবর্তনে চর গোবিন্দপুরের লোক খুশিই হয়েছে। শ্যামদাসীর উপর তাদের শ্রদ্ধা বেড়েছে। আগে যারা আসতো না, শ্যামদাসীর নামে যারা মুখ বিকৃত করতো, আজকাল তারাও শ্যামদাসীর বাড়ীতে ভিড় করছে।

শ্যামাদাসী আজ গোটা চর গোবিন্দপুরের 'বিষুরি' মা। বিপদে-আপদে আজকাল সবাই তার শরণ নেয়। সব বাড়ীতেই তার জল-পড়া তেল-পড়া যায়। তার নামে সবাই মাথা নত করে।

শ্রাবণ সংক্রান্তির বড় উৎসব। উৎসব শুধু চর গোবিন্দপুরের নয়, আশে-পাশের আরও দশটি গাঁয়ের।

এ সময় চর ফটুনগরের খালে প্রতি বছরই দশ-বিশখানা নৌকো বাঁধা থাকে। নৌকোয় আসে দূরে দূরে গাঁয়ের লোক। তারা নায়ে করে চাল-ডাল সব নিয়ে আসে।

এ সব তারা উৎসবে দেয়।

উৎসব চলে তিনদিন।

প্রথম দিন মা বিষহরির পূজো। পরদিন বেহুলার মেলা। তার পরদিন ভাসান।

সতী বেহুলা তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে এনেছিল। তার স্মরণেই বেহুলা মেলা।

মেলার দিন সকাল সকাল পাড়ায় বেরোয় শ্যামদাসী।

মাথায় একটি হাঁড়ি। হাঁড়িতে জল।

জীয়ন কলসীর জল। এ জল গৃহস্থ বাড়ীতে পড়লে নাকি গৃহস্থের সব অমঙ্গল দূর হয়। ধনে-জনে ঘর ভরে ওঠে।

এই জল নিয়ে শ্যামদাসী তাই বাড়ী বাড়ী যায়। নাচে। গান গায়। গান গেয়ে গেয়ে গৃহস্থ বাড়ীতে জীয়ন কলসীর জল ছড়ায়।

বাড়ীর লোকেরা 'জয় মা বিষহরি' 'জয় মা বিষহরি'—বলে ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

সে বছর অসুখ লেগেছিল চর গোবিন্দ-পুরে।

গাঁয়ে অসুখ লাগলে যেন লোকেদের ভক্তি বাড়ে। মা বিষহরির বাড়ী যাতায়াত বাড়ে। মা বিষহরির পূজায় পারিশ্রমিকও সে বছর অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়।

উৎসবের ঘটাও সেবারে খুব বেশী। সে বছর জোর জমেছিল উৎসব। শহর থেকে সার্কাস এসেছিল। বসেছিল 'নাগর-দোলা'। বাঁশী-ভেঁপুর শব্দে চর গোবিন্দ-পুরের বাতাস মুখর।

প্রথম দিন পূজো। দ্বিতীয় দিন মেলা।

মেলার দিন সকাল সকাল পাড়ায় বেরুলো শ্যামদাসী।

পায়ে রূপোর খাড়ু। হাতে রূপোর বালা। পরনে অর্গ্যাণ্ডি কাপড়ের পুরনো একটি ঘাগড়া। কপালে সিঁদুরের লাল ফোঁটাটি কিন্তু ঠিকই আছে। বরং আজ সেটি আরও বড় হয়েছে। আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

জীয়ন কলসী মাথায় নিয়ে শ্যামদাসী চর গোবিন্দপুরের একটি বাড়ীর দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালো।

উলু-লু-লু-লু......
উলু-লু-লু-লু......
উলু-লু-লু-লু......

পর পর তিন ঝাঁক 'জোকার' দিয়ে শ্যামদাসী নাচ সুরু করলো। গানে টান দিল:

এই না ব্যাশে আইচো পদ্মা,
যাবা কার বাড়ীরে,
জনমাই বর, পরমাই বর
দিতে য্যানে মন চায়রে।

বাড়ীর মালিক মধু কর্মকার। শ্যাম-দাসীর গলা শুনে ঘর থেকে দৌড়ে বেরুলো মধু কর্মকারের স্ত্রী মোক্ষদা। আলুথালু বেশে সে শ্যামদাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়লো: 'মা বিষহরি, আইচস্ মা, আইচস্? আমার গোপালেরে তুই বাঁচিয়ে দে। তবে আমি জোড়া পাঁঠা দিমু। গাছের আম খাওয়ামু। আমার গোপালেরে বাঁচাইয়া দে মা, আমার গোপালেরে তুই বাঁচাইয়া দে।' বলতে বলতে মোক্ষদা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

গান থামলো শ্যামদাসীর। লাল লাল দুটি চোখ মেলে সে মোক্ষদার দিকে তাকালো।

বললো, 'ক্যান্? কি হইচে তর গোপালের?'

'আমি তা কি কইয়া কই? সেই রাইত থিকা চক্ষু বুইজা আছে। বুকটা হাপরের নাগাল হাপাইবার লইচে। তুই বাঁচাইয়া দে মা, গোপালের আমার বাঁচাইয়া দে। আমার গোপাল না বাঁচলে আমিও বাঁচুম না মা বিষহরি।'

মাথা থেকে জীয়ন কলসীটি মাটিতে রাখলো শ্যামদাসী। মোক্ষদাকে তুললো।

বললো, 'মাকে ডাক মুক্ষি, মাকে ডাক। মা চাইলে, তর গোপালের ক্যাডা কি করবে?'

'ভাড়াইস না, আমারে তুই ভাড়াইস না। তুই-ই আমার বিষহরি মা। তুই মন করলেই গোপাল আমার বাঁচবো।' মোক্ষদা আবার শ্যামদাসীর হাত দুটি শক্ত করে চেপে ধরে বললো, "ক ক", গোপালরে তুই বাঁচাইয়া দিবি। ক, আমারে তুই কথা দে।'

শ্যামাদাসী এখন যেন পাথর। পাথরের মতোই সে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বুজে কি যেন ভাবছে।

মোক্ষদা আবার ডাকলো, 'মা বিষহরি মা।' শ্যামাদাসী এবার চোখ খুললো। সেই লাল লাল দুটি চোখের দৃষ্টি মোক্ষদার মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।

বললো, 'ল। ঘরে ল।'

শ্যামদাসী চর গোবিন্দপুর থেকে ফিরলো অনেক বেলায়।

বেহুলার মেলা তখন জমেছে। অনেক লোক হয়েছে। দেশ-বিদেশের লোক।

কিন্তু শ্যামাদাসী আজ আর মেলায় গেলো না। মোক্ষদার জলভরা দুটি চোখ এখনও যেন তার মনে জেগে আছে। মোক্ষদার আকুতি এখনও যেন তার কানে বাজছে।

কি একটা গভীর ব্যথায় যেন তার মনটা টনটন করে উঠলো। শ্যামদাসী সোজা ঘরে চলে গেলো।

লোকে ডাকলো, 'মা, বিষুরি মা!' কিন্তু আজ আর সে কথার উত্তর দিল না শ্যামদাসী। শ্রাবণ সন্ধ্যার মেঘ যেন তার মনে থমথম করছে। তার ছায়া পড়েছে মুখে। তার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

চর গোবিন্দপুরের লোক তা দেখে বিপদ ঘটলো।

চর গোবিন্দপুরের উপর না জানি কি বিপদ নেমে আসছে। বিষুরি মা তা বুঝি জানতে পেরেছেন। তাই তাঁর মুখ ভার।

তারা এসে ভীড় করলো শ্যামদাসীর দরজায়।

ধ্বনি দিল, 'জয় মা বিষুরি! জয় মা বিষুরি।'

বললো, বাঁচা মা বাঁচা, অপরাধ যদি কিছু কইরা থাকি, নিজ গুণে ক্ষমা কর মা।'

শ্যামদাসী উঠে এসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রাত বাড়ছে।

বেহুলার মেলা ভেংগে গেছে অনেকক্ষণ। লোকজনও চলে গেছে। শুধু চরফুট-নগরের খালের নৌকোগুলি থেকে মাঝে মাঝে লোকের হাঁকডাক শোনা যায়।

মেলায় যারা এসেছিল, বোধ হয় তারা ঘরে ফিরছে।

শ্যামদাসীর চোখে ঘুম নেই। মোক্ষদার জলভরা দুটি চোখ এখনও তার মনে লেগে আছে। মোক্ষদার আকুতি এখনও তার কানে বাজছে। শ্যামদাসীকে পাগল করে তুলছে।

মেঝেতে একটি 'পাতুনি' পেতে শুতে গিয়েছিল শ্যামদাসী। শুতে পারলো না। পাতুনির সুতোগুলি যেন তার পিঠে সাপের মতো ছোবল মারলো।

শ্যামদাসী উঠে বসলো।

একবার এগিয়ে গেলো মা বিষহরির 'থানে'র দিকে। শুধুমাত্র একটি ঘট। একটি আমপল্লব। চারপাশে ছড়ানো কটি ফুল। শুধু এই। এর বেশী কিছু আর চোখে পড়লো না শ্যামদাসীর। তার বুকের একটা পাশ যেন শূন্য হয়ে গেলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। একবার তার মনে হলো, বিষহরির 'থান'টিকে উঠিয়ে নিয়ে সে চর ফুটনগরের খালে ডুবিয়ে দিয়ে আসে।

...মুক্ষি ঘুমাইচস্ ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করলো না শ্যামদাসী।

সে উঠলো। 'তাক' থেকে একটি 'কুপি' নামালো। জ্বালালো। কুপি হাতে বাইরে বেরুলো।

আকাশে মেঘ করেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

তার মধ্যেই উঠোনে নামলো শ্যামদাসী। রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। পা কাঁপছে তার। হাত কাঁপছে। 'কুপি'র আলোটাও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'নিম্! নিম্! নিম্!'

পাশের আম গাছটার ডালে বসে একটি নিম্‌পক্ষী ডাকছে।

নিম্‌পক্ষীর ডাক অশুভ।

সে শুধু যেন 'নিমু, নিমু, নিমু' এই একটি কথাই শুনতে পেলো শ্যামদাসী। তার বুকটা একেবারে দাপিয়ে উঠলো। মোক্ষদার সেই জলভরা দুটি চোখ আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

'কুপি'টি বা হাতে নিয়ে ডান হাতে একটি ঢিল তুললো শ্যামদাসী। ছুঁড়ে মারলো আম গাছের দিকে : 'মর শালা মর্, তর পোড়া মুখে আগুন পড়ুক।'

কিন্তু জোরে ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে একটা ঝাঁকুনিতে 'কুপি'টি হাত থেকে পড়ে গেলো শ্যামদাসীর। মাটিতে পড়ে 'কুপি'টি নিভে গেল।

অন্ধকার।

সামনে-পিছনে, ডাইনে-বায়ে সর্বত্র অন্ধকার। সে অন্ধকারে শ্যামদাসীর নিজেকে যেন প্রেতের মতো বীভৎস বলে মনে হলো।

'থু-থু-থু।'

মুখ থেকে খানিকটা থু-থু ফেললো শ্যামদাসী। নিজের প্রতি নিজের মনেই যেন একটা তীব্র ঘৃণা জমে উঠেছে। ঘৃণায় গা'টা তার যেন গুলিয়ে উঠলো।

কিন্তু তবুও ঘরে ফিরলো না শ্যামদাসী। এগিয়ে চললো। মধু কর্মকারের বাড়ীতে এসে দরজায় সে বার কয়েক টোকা দিল।

ডাকলো, 'মুক্ষি ঘুমাইচস্ ?'

'কে? বিষুরি মা?' বলতে বলতে মোক্ষদা ঘরের দরজা খুলে দিল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শ্যামদাসী বললো, 'মিছা, মিছা, সব মিছা। আমি বিষুরি নই। আমার কোন ক্ষামতা নাই। কোন ক্ষমতা নাই। তুই এক কাজ কর। গুরুদাস ডাকতরকে খপর দে।'

শ্যামদাসীর কথায় মোক্ষদা প্রায় কেঁদে উঠলো।

বললো, 'মা, বিষুরি মা!'

'না, না। মা নই মা নই। আমি শয়তানী। আমি রাক্ষুসী। এ্যাদ্দিন মাইনষেরে ভুলাইয়া আইচি। মিছা কথা কইচি। সব ভুল। সব ভুল।' বলে দৌড়ে বাইরে এলো। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। প্রবল বাতাসে গাছ গাছালির মাথাগুলি উথাল-পাথাল করছে।

মোক্ষদা তার পিছু পিছু এসে ডাকলে 'মা, বিষুরি মা।'

শ্যামদাসী দূর থেকেই চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'না না। সব মিছা। সব মিছা। গুরুদাস ডাকতররে তুই খপর কর' তর গোপালরে তুই বাঁচা' বলতে বলতে শ্যামদাসী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তার পা টলছে। মাথা ঘুরছে। হয়তো একটু দূরে গিয়েই সে পড়ে যাবে।

পাঠকের বৈঠক

সর্বজনপ্রিয় লেখক নরেন্দ্র দেব

সর্বজনপ্রিয় নরেন্দ্র দেব মহাশয় বিগত ২৩শে আষাঢ় আশী বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে তাঁর পৈত্রিক বাসগৃহ ঠনঠনিয়ায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বহু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এই উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রীতি, শুভকামনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আমরাও এই সূত্রে বরেণ্য লেখক নরেন্দ্র দেবকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

নরেন্দ্র দেব ছোট বড় সকলের 'নরেনদা' নামেই পরিচিত। সকলের তিনি দাদা, এবং শুধু নামে নয় অগ্রজের দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক আরো অনেকে আমাদের মধ্যে আছেন কিন্তু নরেন্দ্র দেবের মত ধনী ও দরিদ্র, প্রখ্যাত ও অখ্যাত, সবাইকে সমান চোখে দেখার শক্তি সকলের নেই। আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র দেবের যে দীপ্ত পুরুষোচিত মূর্তি দেখেছিলাম আজ পরিণত বয়সে পৌঁছে অশীতিপর নরেন্দ্র দেবকে ঠিক সেই মূর্তিতেই দেখছি। সদা-হাস্যময় পরিহাসরসিক নরেন্দ্র দেব। উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানে যিনি উপস্থিত থাকেন তিনিই বন্ধু। নরেন্দ্র দেব এই সংজ্ঞার সঙ্গে আশ্চর্য মিলে যান। শেষ-জীবনে প্রায়বিস্মৃত দরিদ্র সাহিত্যিকের শ্রাদ্ধবাসরে এই সেদিনও একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হিসাবে নরেন্দ্র দেবকেই দেখলাম। বিবাহসভায় নরেন্দ্র দেব নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার জন্য কোনোদিন গরহাজির নন। আশ্চর্য সামাজিকতা বোধ, পরিশীলিত রুচি ও পরিমিতিবোধ নরেন্দ্র দেবকে এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে একালের মানুষদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। এই বিষয়ে নবীন লেখক বা ডাঁসা গবেষক অধ্যাপক উভয়ের জ্ঞানই প্রায় সমান। তাঁরা কেউ বলেন 'কল্লোলে' ছিল বিদ্রোহ, কেউ বলেন কল্লোল যুগ ছিল ব্যর্থ সাহিত্যপ্রয়াস, মধ্যবিত্তসুলভ মনোভংগী ইত্যাদি। শোনা কথাই বেশীর ভাগ। কারণ, এত আবোল-তাবোল উক্তি সত্ত্বেও কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা আজো সজীব এবং সক্রিয় আছেন। এবং এই সজীবত্ব কল্লোলীয় প্রাণ-শক্তির পরিচায়ক।

'কল্লোলে'র লেখকরা তাঁদের পূর্ব-সূরীদের শ্রদ্ধা করতেন, উত্তরসূরী-দের অভিনন্দন জ্ঞাপনে বিমুখ হন নি। এমনই একটা যোগাযোগের ফলে 'কল্লোল' পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি 'ভারতী' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকবৃন্দও সসম্মানে স্থান পেয়েছেন। নরেন্দ্র দেব এই 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় যে উপন্যাস লিখেছিলেন সম্ভবত তার নাম 'যাদুঘর'। এই উপন্যাসটিতে অনেক সাহসিক উক্তি ছিল, যার ফলে সেকালের নীতিবাগীশরা উপন্যাসটিকে অশ্লীল মনে করতেন। নরেন্দ্র দেবের উপন্যাসে যে দুঃসাহসিক উক্তি ছিল তার কারণ বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনিই বার্নার্ড শ'র রচনাবলীর প্রথমতম অনুবাদক। পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও আংশিকভাবে তিনি বার্নার্ড শ'র অনেক বিখ্যাত নাটকের বাংলা পরিচয় দিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে।

নরেন্দ্র দেব প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যুগে' লিখেছেন :

"সবার চেয়ে নিকট ছিলেন নরেনদা। প্রায় জলধর-দাদারই দোসর, তাঁরই মত সর্বতোভদ্র, তাঁরই মত নিঃশত্রু। আর-আরবা কল্লোল আপিসে কদাচিৎ আসতেন, কিন্তু নরেনদাকে অমনি কালে-ভদ্রের ঘরে ফেলা যায় না।" অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন যে, "নরেনদা পরিহাস-প্রসন্ন, যে পরিহাস সর্ব অবস্থায়ই মাধুর্যমাজিত।"

ব্যক্তিগত জীবনেও নরেনদা একটি দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন সেই কালে। কবি রাধারাণী দত্তকে তিনি সামাজিক অনুশাসন না মেনে বিবাহ করেন। কন্যা সম্প্রদান করেন বৃদ্ধ জলধর সেন। বিশেষ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, নরেন্দ্র দেব কিন্তু অচল অটল। লিলুয়ার 'দেবালয়ে' কবির বাসভবনে তাই সেকালের ছোটবড় সবরকম সাহিত্যিকই হাজির হয়েছিলেন।

মানুষকে গভীরভাবে দেখেছেন নরেন্দ্র দেব। তিনি যে 'ভারতী' যুগের অন্যতম, সেই ভারতী যুগের মধ্যে সম্ভবত তিনজন মাত্র আজো জীবিত, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব ও সুধীরচন্দ্র সরকার। সেদিনের এই সব উৎসাহী তরুণের সাহিত্য প্রচেষ্টায় অনেক রকম বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা ছিল, তথাপি তাঁদের দুর্দমনীয় আবেগ, সুদৃঢ় মনোবল ও এ যুগে বিরল গোষ্ঠীপ্রীতি তাঁদের এমন এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যা এ যুগের ঈর্ষার বস্তু।

নরেন্দ্র দেব কখনও কাউকে বিমুখ করেছেন বলে শুনিনি। তাঁর সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় কখনো কারও সম্পর্কে নিন্দাবাদ শুনিনি। কোথাও কারো রচনা পড়ে আনন্দ পেলে তাকে উৎসাহিত করার প্রথা একালে উঠে গেছে বলা যায়। কিন্তু এই আশীতে পৌঁছেও নরেন্দ্র দেব সেই কাজ করে চলেছেন।

আর দুঃসাহস! দুঃসাহস তাঁর অসীম। এই সেদিন ফাইন আর্টস একাডেমী ভবনে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভায় নরেনদা আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আধুনিক সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন ছিল সেই লেখায়। সভায় সেদিন ঝড় উঠেছিল। কিন্তু লেখক নরেন্দ্র দেব শান্ত, মুখে তাঁর মৃদু হাসি।

অনেকেই হয়ত জানেন যে রবীন্দ্রনাথ এই কবি দম্পতিকে অশেষ স্নেহ করতেন। আবার শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের নিত্য সঙ্গী ছিলেন এই কবি দম্পতি। উভয়ের মধ্যে এমন এক চারিত্রিক মাধুর্য ও শালীনতা বর্তমান যা সবরকম মানুষকেই স্বভাবত আকৃষ্ট করে।

নরেন্দ্র দেব গল্প বলতে পারেন চমৎকার। একবার একসঙ্গে ট্রেন ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। এই পরিণত বয়সে হাস্যপরিহাসে, খোশগল্পে দুটি রাত তাঁর সহযাত্রীদের তিনি জাগিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

আমরা অনেক সময় তাঁকে একান্তে পেয়ে তাঁর কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। সে সব কথা শরৎ-চন্দ্রের মুখ থেকে যেমন জেনেছেন, তেমনই আবার দীর্ঘদিনের পরিচয়ে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এত বেশী কথা, বিশেষত শেষ জীবনের কথা বেশী লোকের জানা নেই।

ছোটদের জন্য 'মৌচাকে' লিখছেন অজস্র নরেন্দ্র দেব। আবার নিজে ছিলেন 'পাঠশালা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'পাঠশালা'র পুরাতন সংখ্যা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের স্মরণে থাকা সম্ভব সম্পাদক নরেন্দ্র দেব কিভাবে পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। এ ছাড়া আরো কিছু কিছু সাময়িক পত্রাদির সংগে তিনি সম্পাদনা সূত্রে জড়িত ছিলেন।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন অজস্র। তিনি কবি, গল্প লেখক, উপন্যাসকার, প্রবন্ধ লেখক এবং অনুবাদক। কান্তি ঘোষের রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম যেমন সর্বজনপ্রিয়, নরেন্দ্র দেবের অনুবাদও তেমনই সমাদর লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাস, গল্প, কবিতা যেমন পাঠকমহলের প্রশংসা লাভ করেছে তেমনই আবার সিনেমার কলাকৌশল ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি 'সিনেমা' নামে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থও রচনা করে সমাদর পেয়েছেন।

আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে বৈশাখ ১৩৩৪ সালে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কাব্য-দীপালী'। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মানচিত্রে স্থাপিত করলেও কবিতার তেমন সমাদর ছিল না সেই যুগে। নরেন্দ্র দেবের বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকার এই বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এবং 'কাব্য-দীপালী'র একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সমুদ্রিত গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ, চারু রায়, নন্দলাল বসু, দেবী-প্রসাদ, যতীন্দ্রকুমার সেন, বিনয় বসু, সমরেন্দ্র গুপ্ত, অরবিন্দ দত্ত, সমর দে প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দের অনেকগুলি বহুবর্ণ চিত্র সংযুক্ত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় নরেন্দ্র দেব সেদিন লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আমি একেবারে আজকের দিনের সদ্য সমাগত কয়েকটি তরুণ কবির সুন্দর রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর নামকরণ করে দিয়ে আমাকে আশাতীত অনুগৃহীত করেছেন।"

সেদিনের নবীনতম কবি দলে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, জসীমউদ্দীন, উমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতি।

'প্যালগ্রেভের' গোল্ডেন ট্রেজারী' জাতীয় এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তা বর্ধনে সহায়িতা করেছে। একালে অনেক কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে যুগে এই জাতীয় গ্রন্থ পরিকল্পনা করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ ছিল।

পরিণত বয়সে নরেন্দ্র দেব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপ পরিভ্রমণ করে এসেছেন একান্ত স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ কোন ডেলিগেশনের আওতায় নয়, এবং তার মনোজ্ঞ ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন।

নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে এই নিবন্ধ লিখিত হয় নি। এ যুগে বিরল শালীনতার অধিকারী একজন অগ্রজ সাহিত্যিকের অশীতি পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। গত বছর নরেন্দ্র দেবের ভবনে অনুষ্ঠিত জন্মবাসরে তুষারকান্তি ঘোষ উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন—"নরেনদা একালের বাংলা সাহিত্যের চলমান ইতিহাস, তিনি শতায়ু হোন।" অমৃত পত্রিকার সূচনা থেকেই নরেন্দ্র দেব এই পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট। আমরা তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ও উজ্জ্বল স্বাস্থ্য কামনা করি।

—অভয়ংকর
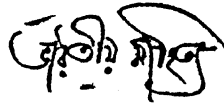
নেপালে রবীন্দ্র জন্মোৎসব ॥

রবীন্দ্রনাথের ১০৬তম জন্মদিবস উপলক্ষে সম্প্রতি কাঠমান্ডুতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী সূর্য বাহাদুর থাপা রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "একটি প্রাচীন সভ্যতার পুনর্জাগরণে রবীন্দ্র প্রতিভার যে ব্যাপক প্রকাশ, তা কোনও বিশেষ দেশের গন্ডীতে আবন্ধ থাকা সম্ভব নয়—তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরে। তিনি মানুষের কাছে বহন করে এনেছিলেন শান্তির স্বর্গীয় সংবাদ। প্রকৃতির ভেতর দিয়ে তিনি ভগবানের ঐশ্বর্যকে লক্ষ্য করেছিলেন। এই কারণেই তাঁকে "গুরুদেব" আখ্যাদান খুবই যুক্তিযুক্ত। তিনি ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সভ্যতাকে পশ্চিমের জগতের সামনে তুলে ধরেন এবং প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। এই কারণেই সমগ্র এশিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল। শুধু তাই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন।" বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানবতার আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-প্রেমিক কবি।

নেপালের যোগাযোগ ও পরিবহনমন্ত্রী শ্রী কেদার মন ভেথিদস্ত রবীন্দ্রনাথের মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবন শুধু মানবতারই সেবা করেছেন। ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিকে জন্ম দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে গৌরবান্বিত করেছে।

নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রীমন নারায়ণ তাঁর ভাষণে বলেন, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এখন বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছে।" রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রী এম রামুন্নিও সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে নেপালের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন।

"ত্রিভুবন" বিশ্ববিদ্যালয়েও সম্প্রতি রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাটি নেপালের বুদ্ধিজীবী মহলের বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এতে অংশগ্রহণ করেন শ্রী বালকৃষ্ণ শামা, ডঃ দেবব্রত দাশগুপ্ত, শ্রী এম রামুন্নি, অধ্যাপক খাদগা মন মাল্ল, অধ্যাপক আর এন চ্যাটার্জি, ডঃ অমিতা রায় এবং অধ্যক্ষ সূর্য বাহাদুর শাক্য। এই দুইটি অনুষ্ঠানের দ্বারা নেপালে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হিন্দি প্রচার সভার অনুষ্ঠান ॥

গত ৩০শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত দিল্লিতে দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সভার পঞ্চম অখিল ভারতীয় ভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে একটি সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। এতে যোগদান করেন উর্দুর সাগর নিজামী, আসামের নবকান্ত বড়ুয়া, গুজরাটির রাজেন্দ্র শাহ, ওড়িয়ায় নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কাশ্মীরীর শম্ভু-নাথ ভট্ট হলীম, তেলেগুর রাজ-শেখর রায়প্রোল, হিন্দির রামধারী সিং দিনকর, পাঞ্জাবীর প্রভজ্যোৎ কউর, মালয়ালমের বৈলোপিল্লি শ্রীধর মেনন, তামিলের নন্দস্বামী জুবৈরন, কানাড়ির কে এস নরসিংহ স্বামী, মারাঠীর পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে এবং বাংলার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এই ধরনের অনুষ্ঠান জাতীয় সংহতির দিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলিকে দাবিয়ে হিন্দিকে সুকৌশলে প্রচার হয়, তাহলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বিশেষ করে অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষা মহাদেবী ভার্মার উক্তিতে এই কথাই প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সমস্ত ভাষার সমান অধিকার এবং বিকাশের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তাই এখন সর্বাধিক।

মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে আলোচনা ॥

২৫শে জুন হাওড়া পণ্ডিত সমাজের উদ্যোগে খুরুট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন হলে মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাকবির প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলার বিচারমন্ত্রী শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, সংস্কৃত আমাদের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। সরকার মহাকবির বিভিন্ন রচনা প্রকাশে উৎসাহী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় পৌরোহিত্য করেন। পণ্ডিত মুরারীমোহন শাস্ত্রী, দণ্ডস্বামী শ্রীদিব্যশরণ মহারাজ, শিবশংকর শাস্ত্রী, কালিপদ দে প্রমুখও অংশ গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার সম্বন্ধে সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন। এবার তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। এই তিনটি পুরস্কারের মধ্যে একটি দেওয়া হবে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য, আর একটি দেওয়া হবে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রচনার জন্য এবং তৃতীয়টি দেওয়া হবে বাংলা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উপর লেখা বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের জন্য। প্রতিটি পুরস্কারই বিগত পাঁচ বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের ভিত্তিতে হবে। এই পুরস্কারের জন্য বর্তমান বছরে (১৯৬৭-৬৮) যাঁরা অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁদের শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর থেকে আবেদনপত্র নিয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এই আবেদন, লেখক বা প্রকাশক - যে কেউ পাঠাতে পারবেন। এ ছাড়াও কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা দুজন পরিচিত লেখকও কারও সম্পর্কে আবেদন পাঠাতে পারেন। রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য সরকারের এই নতুন প্রচেষ্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর যে সব বিদেশীরা গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছেন, তাঁদের কাছে সরকারের এই আবেদনপত্র পাঠাবার সংবাদ নাও পৌঁছাতে পারে। অথচ তৃতীয় পুরস্কারটির অর্থ এই সব লেখককে উৎসাহিত করা। সরকার এই ক্ষেত্রে যদি এই বিজ্ঞপ্তিটি পৃথিবীর সর্বত্র—যেখানে যেখানে "ভারত বিভাগ" আছে, পাঠান, তাহলে এই সমস্যার আশু সমাধান হতে পারে বলে আশা করা যায়।

কবিতা সংকলন ॥

সৈয়দ আমানুদ্দিন সম্পাদিত "পোয়েট্রি ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট" নামে একটি কবিতা-সংকলন হায়দরাবাদ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় সম্পাদক জানিয়েছেন, এতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের তরুণ কবিদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি পাঠ করবার পর এই ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। অত্যন্ত দুর্বল কিছু কিছু কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অথচ এই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তরুণ কবিদের কাব্য-প্রচেষ্টা কত বলিষ্ঠ। বাংলা দেশ থেকে যিনি এই সংকলনে স্থান পেয়েছেন, তাঁর নাম এর আগে শুনেছি বলে মনে হয় না। এই সব সংকলন সাহিত্যের সাহায্য করে না, বরং ক্ষতি করে। অথচ এই ধরনের সংকলন ইদানিং প্রায় ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।
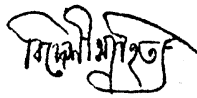
মস্কোয় আন্তর্জাতিক লেখক-সভা ও কবিতা-উৎসব ॥

অক্টোবর মহাবিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সোভিয়েত সাহিত্যের অনুবাদকদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মস্কোতে। একটি আন্তর্জাতিক পুস্তকপ্রদর্শনী এবং অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন কবির কবিতা-সংকলনও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হবে। একটি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবও অনুষ্ঠিত হবে।

এই লেখকসভার প্রস্তুতিতে বার্লিনে গত ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বিভিন্ন লেখক সংস্থাগুলির এক কো-অর্ডিনেশান সভা বসে। মস্কোয় সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির লেখকসভা বসবে। সভার আলোচ্য বিষয় হবে নবজীবন গড়তে কবিতার ভূমিকা। এছাড়া সমকালীন উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি বিষয়েও বসবে বিভিন্ন আলোচনাচক্র।

সোভিয়েত ও আফ্রিকা-এশিয়ার লেখক-দের আলোচনাসভাও এই আন্তর্জাতিক উৎসব প্রস্তুতি-কর্মসূচীর অন্তর্গত। ইতি-মধ্যে ঐ বিষয়ে দুটি আলোচনাচক্র হয়ে গেছে। বিষয়বস্তু ছিল ছোটগল্পের ভূমিকা ও বিভিন্ন দেশের জাতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

সোভিয়েত তাজিক প্রজাতন্ত্রের রাজ-ধানী দুশানবেতে ফার্সী-উর্দু কবিতা সম্পর্কে যে কবি-উৎসব ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভারত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি দেশের কবি ও লেখকরা যোগদান করবেন।

একটি আলোড়নকারী মার্কিন উপন্যাস ॥

ফিলিপ রথ আমেরিকার একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। কিন্তু লেখেন ভীষণ কম। প্রধানত গুরুতর সামাজিক সমস্যাই তাঁর উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর আরেকটি অনবদ্য উপন্যাস—হোয়েন শী ওয়াজ গুড। এতে বর্তমান আমেরিকার এক নিপুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সবচেয়ে যা বৈচিত্র্যময় তা হোল রথ এর কাহিনীর নির্মাণে মন-স্তত্ত্বসম্মত ও মনস্তত্ত্বনির্ভর মানুষের জীবনের অপরিসীম অসহায়তাকে সুস্থ জীবনযাত্রার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আকস্মিক বিপর্যয় ও উন্মত্ত মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচ্য উপ-ন্যাসের মূল ঘটনা যাকে নিয়ে চিত্রিত সেই লুসি নেলসন এমনই একটি স্বপ্নকল্প ও বিকৃত বাস্তব চরিত্র। চরিত্রসৃষ্টি যদিও উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য তবু এক অভিনব ও সম্পূর্ণ নতুন রীতির স্বাদ এর আরেকটি অন্যতম উপলক্ষ্য।' বলেন একজন বিদগ্ধ সমালোচক।

পরলোকে দুই মহিলা সাহিত্যিক ॥

প্রখ্যাত মহিলা লেখিকা ডরোথি পার্কার বিগত ৭ জুন পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। সংখ্যার খুব বেশী গ্রন্থের রচয়িতা না হলেও পার্কারের সরস ও বিশ্লেষণপ্রবণ তীক্ষ্ম ব্যঙ্গমূলক রচনা ও সমালোচনাগুলো এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মৃত্যুকালে পার্কার তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি একটি উইলের মাধ্যমে দান করে গেছেন প্রখ্যাত নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথারের নামে। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথারের আন্দোলনকে আরো জোরদার ও সার্থক করে তোলার জন্যই এই দানপত্র তিনি লিখে গেছেন। আরেকজন মহিলা লেখিকা পামেলা ফ্র্যাংকাউরের মৃত্যুও সাহিত্য-প্রেমিকদের মর্মাহত করেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৯ বছর। মোট ২০টি উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। 'দি উইলো কেবিন' এবং 'রোড থ্রু দি উডস' তাঁর দুটি প্রখ্যাত উপন্যাস।

ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডস্ ১৯৬৭ ॥

পুরস্কারের মূল্যমানের দিক থেকে পুলিৎজার ও ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড সমমূল্যের। বছরে যিনি সেরা বই লিখবেন সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই এই সম্মানের অধিকারী হবেন। আলোচ্য বছরে ইতিহাস সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের শ্রেষ্ঠ লেখকদের এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

বার্নার্ড ম্যালামড এর 'দি ফিক্সার' পেয়েছে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সম্মান। ম্যালামড ১৯৫৯ সালেও 'দি ম্যাজিক ব্যারেল' গল্পগ্রন্থের জন্য এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে 'দি ফিক্সার' এযুগের জনুষের মুক্তির, আত্মবিশ্বাসের ও সততার একটি অনন্যসাধারণ কাহিনী।

শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী রচনার জন্য জাস্টিন ক্যাপলানের 'মিঃ ক্লিমেন্স অ্যান্ড মার্ক টোয়েন' বইটি নির্বাচন লাভ করেছে। এন-বি-এ-র বিচারকরা এই বইটিকে বলেছেন 'সত্যিকারের মৌলিক ও সৃজনশীল প্রচেষ্টা।'

ইতিহাস ও গবেষণা গ্রন্থের জন্য পিটার গে-র 'দি এনলাইটেনমেন্টঃ অ্যান ইন্ট্রোডাকশান' শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। ঈশ্বর, মানুষ ও সমাজ এই তিনের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনের কাছে আমাদের ঋণের কথা অধ্যাপক গে অত্যন্ত মননশীলভাবে আলোচনা করেছেন। (কবিতাগ্রন্থের জন্য জেমস মেরিলের কথা আমরা পূর্ববর্তী সংখ্যায় আলোচনা করেছি)।

এন-বি-এ এবছর সাহিত্যের জন্য আরেকটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তা হচ্ছে অনুবাদ শাখা। শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্মের জন্য দুটি গ্রন্থকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদের জন্য অন্যটি সমকালীন সাহিত্যের জন্য। অনুবাদশাখার জন্য এই পুরস্কার ঘোষণার কারণ হিসেবে উদ্যোক্তারা বলেছেনঃ 'অনুবাদ একটি মহৎ কর্ম'। আন্তর্জাতিক পৃথিবীকে নিকটতর করা ও ভাষা-সাহিত্যের ভাববিনিময়' একমাত্র অনুবাদের মাধ্যমেই সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেন।' এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যকে স্বীকৃতিদানই এর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন সাহিত্যের জন্য উইলার্ড ট্রাস্ক ও সমকালীন সাহিত্যের জন্য গ্রেগরী রাবাসা নির্বাচিত হন। প্রথমজন অনুবাদ করেছেন ফরাসী লেখক কাসানোভার 'দি হিস্ট্রি অব মাই লাইফ' দ্বিতীয়জন স্প্যানিশ লেখক জুলিও কোর্টাগারসের 'হপসকচ্'।

বীট্ জেনারেশানের কাহিনী ॥

গত কয়েক বছরে সারা পৃথিবীতে 'বীট' সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকদের প্রভাব ও দৌরাত্ম্য কতখানি গড়িয়েছিল তার অনেক খবরই অনেকের জানা। কিন্তু কি এদের উদ্দেশ্য, কেন তাদের এই আন্দোলন' এই আন্দোলনের হোতা কারা এবং তাঁদের চরিত্র সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়েই অনেকের কৌতূহল আছে। সম্প্রতি জন ক্লেলন হোমস 'নাথিং মোর টু ডিক্লেয়ার' বইটিতে বীট জেনারেশন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেগম্যান, ল্যান্ডসম্যান, গীন্সবার্গ, জ্যাক কারুয়াক প্রভৃতি বীট কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই এ বইটিতে আছে। এছাড়া এই আন্দোলনের উপযোগিতা, জনসাধারণে৷ ও লেখকের নিজের জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাগুলি তথ্যনির্ভর ও গুরুত্বপূর্ণ। ...'সেই সময়কার উত্তেজনা, নৈতিক প্রবণতা ও কন্ঠস্বর এতো নিখুঁতভাবে এর আগে আলোচিত হয়নি অন্য কারো আলোচনায়'—বলেন প্রখ্যাত সমালোচক এডমান্ড উইলসন।

বেদ, উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণের সার সংগ্রহ হোল মহাভারত। মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল মহাভারত একখানি অপূর্ব বিশ্বকোষ। কি নেই এর মধ্যে—'অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ। কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাদনাথিতবুদ্ধি না।' এ একদিকে যেমন 'ইতিহাস মহাপুণ্যঃ' অপর দিকে তেমনি 'উত্তমং পুরাণম্'। মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চমবেদ। 'বিজ্ঞেয়ঃ স চ বেদানাং পারগো ভারতং পঠন'—যে মহাভারত পড়বে তাঁকে আর অন্য বেদ পড়তে হবে না। তাছাড়া মহাভারত হোল মানব সভ্যতার সমস্ত প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও চিন্তার আকর। মানব চরিত্রের এক বিচিত্র চিত্রশালা মহাভারত।

মহাভারতের এই সুবৃহৎ কলেবর কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল না। দীর্ঘ দিনে এই আকারে গড়ে উঠতে হয়েছে। আদিপর্বে উল্লেখ আছে 'আচখ্যু কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে। আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।'—ব্যাসদেব একাই মহাভারত লেখেন নি। তার আগেও মহাভারত লেখা হয়েছিল। 'আখ্যানচক্র' ও 'নারাশংসীর' সংযোগে মহাভারত ক্রমশঃ বিপুলায়তন লাভ করেছে। ৮,৮০০ শ্লোক থেকে লক্ষ শ্লোকে পরিণত হয়েছে। ব্যাসদেবের পাঁচজন শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন যে পাঁচখানি মহাভারত রচনা করেছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বেদাধ্যাপয়মাস মহাভারত পঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব
স্বম্ আত্মজম্।। ৮৮
প্রভূর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেবচ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথকত্বেন ভারতস্য
প্রকাশিতাঃ।। ৮৯

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে এবং আকৃতির বিশালতায় অতুলনীয় গ্রন্থ এই মহাভারত বাঙলা ভাষা সংস্কৃতি ও জীবনধারায় এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে দীর্ঘকাল যাবৎ।

১৫১০—২৫ খৃঃ নসরৎ শাহের রাজত্বকালে শ্রীকরনন্দী প্রথম বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর উৎসাহে রচিত বলে পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত হয়। আদি থেকে আরম্ভ করে অশ্বমেধপর্বে সমাপ্ত। বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতটি পরাগলী মহাভারতেরই সংক্ষিপ্তসার। ভাষা উভয় মহাভারতে একই। এমন কি সঞ্জয়ী মহাভারতের সঙ্গে পরাগলী মহাভারতের বিশেষ পার্থক্য নেই। গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্ব রচনা করে এর সঙ্গে জুড়ে দেন। আকারে বড় সঞ্জয়ী মহাভারতে অনেক বেশী কথা আছে।

কবিচন্দ্র সংস্কৃত মহাভারতের অনুঅনুসরণে উদ্যোগপর্ব, বনপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব ও গদাপর্বের কথা রচনা করেন। নিত্যানন্দ ঘোষ সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন ছন্দে। কিন্তু সব পুঁথি পাওয়া যায় নি। ষষ্ঠিবর সেনও সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন। কিন্তু স্বর্গারোহণপর্ব ছাড়া আর কোন পর্ব পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ, ষষ্ঠিবর এবং তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস সেন অনুবাদে পরাগলী মহাভারতকে অনুসরণ করেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ বসু, নিতাই দাস, বল্লভ দেব, ভৃগুরাম দাস, দ্বিজ অভিরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র খান, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস, দ্বিজ ভারত পণ্ডিত, গোপীনাথ দত্ত, এবং আরও অনেকে সম্পূর্ণ মহাভারত অথবা অংশবিশেষ অনুবাদ

করেন। এর পরই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাসের নাম উল্লেখ্য। তাঁর অনূদিত শ্লোক সংখ্যা ৩৬,০০০। পয়ারে লেখা। তিনি অনুবাদের জন্যে যেমন সংস্কৃত, তেমনি কয়েকখানি বাংলা মহাভারতের ওপর নির্ভর করেছিলেন। ভক্তিরসে অভিষিক্ত, ভাষাবৈচিত্র্য, নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি মূলের অনুবর্তী হলেও, মধ্যে উপাখ্যানকে অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে মহাভারত রচনা করেছেন। এর পর আরও বহু মহাভারত অনূদিত ও প্রচারিত হয়েছে। গদ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের সুবিশাল অনুবাদ প্রকাশ করেন। চিৎপুর অঞ্চল থেকেও মহাভারতের নানান সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। সম্প্রতিকালে রাজশেখর বসুর সারানুবাদই অধিক জনপ্রিয়। অবশ্য ছোটদের জন্যে উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতও সর্বাধিক উল্লেখ্য।

ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্রাদি সংমিশ্রিত এই মহাকাব্যের চরিত্রাবলীর সঙ্গে বাস্তব জগতের মানুষের চরিত্র ধর্মের বহু সাদৃশ্য বর্তমান। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের জটিল রহস্য ও বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। আজকের চোখে হয়তো অনেক কিছুই অসংগতিপূর্ণ এবং অসমঞ্জস মনে হবে। কিন্তু মানুষের নীচ প্রবৃত্তি থেকে দেবত্ব লাভ পর্যন্ত যে বিচিত্র জগৎ এর মধ্যে রয়েছে—তাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নানান দিক আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাভারতের নরনারীর চরিত্র অবলম্বনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ দীর্ঘকাল আলোচনা করে আসছিলেন। পূর্বে তাঁর অসামান্য গবেষণাগ্রন্থ 'মহাভারতের সমাজচিত্র' বিপুল সমাদর লাভ করে এবং গ্রন্থখানি পুরস্কৃতও হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তিনি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, বিবিধ পুরাণ সম্পর্কে তাঁর তুল্য জ্ঞান সম্প্রতিকালে একান্তই দুর্লভ। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী সংকলন করে সম্প্রতি 'মহাভারতের চরিত্রাবলী' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এর অনেকগুলি প্রবন্ধ অমৃত পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

মূল মহাভারতের উদ্ধৃতিসহ শান্তনু, দেবব্রত (ভীষ্ম), শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেব), চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, দুর্যোধন (সুযোধন), দুঃশাসন, বিকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একশত পুত্র এবং এক কন্যা, যুযুৎসু, বসুষেণ (কর্ণ), যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, পরিক্ষিৎ, জনমেজয়, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, শকুনি, জয়দ্রথ, শল্য, যজ্ঞসেন (দ্রুপদরাজ), শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, বিরাট পুত্রগণ, কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা, গঙ্গা, সত্যবতী, অম্বিকা ও অম্বালিকা, গান্ধারী, পৃথা (কুন্তী), মাদ্রী, দেবিকা, কৃষ্ণা (দ্রৌপদী), সুভদ্রা, অন্যান্য পাণ্ডব ভার্যা ও কৌরব ভার্যাগণ, উত্তরা, সুদেষ্ণা চরিত্রগুলি মানবোচিত চরিত্র বিকাশ এবং দেব সাহচর্য সব মিলিয়ে জীবন্ত মানুষের প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নানান চরিত্রের অসঙ্গতিও তুলে ধরেছেন। মূল মহাভারতের উদ্ধৃতি এবং প্রমাণ সহযোগেই তিনি চরিত্রগুলিকে চিত্রিত করেছেন। পাত্রপাত্রীদের চেহারারও যথাসম্ভব নিখুঁত বর্ণনা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। যে সাধনা, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য থাকলে সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা সম্ভব তা একালে সহজে চোখে পড়ে না। আশা করি শাস্ত্রী মহাশয়ের কঠোর পরিশ্রমসাধ্য রচনার যোগ্য সমাদর জানাতে বাংলার সংস্কৃতিপরায়ণ পাঠক কৃপণতা করবেন না।

—কমল চৌধুরী

মহাভারতের চরিতাবলী : (আলোচনা) —সুখময় ভট্টাচার্য। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ১৮·০০ টাকা।

নতুন ফর্মুলায় তৈরী গয়া। আপনার
কল্পলোকের মনোমোহিনী ট্যাল্কম্।
কুয়াশার মত মিহি-মৃদুল,
অন্য যেকোনো ট্যাল্কমের চেয়ে
ঢের বেশী সুচারু, ঢের বেশী
লঘুভার।
গয়া-র শিল্পীদের সৃষ্টি
এই মধুগন্ধ পাউডার
আপনাকে সারাদিন সুরভিত
সারাদিন তাজা রাখবে।
ভিন্‌দেশী ব্ল্যাক রোজ,
টাটকা ফুলের গার্ডেনিয়া
আর মনমাতানো পাসপোর্ট—
যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।
মনে রাখবেন, তিন রকম পাউডারই
পাবেন নতুন দীর্ঘাকার আধারে।
এগুলি বেশীদিন চলবে।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ
(ইংলন্ডে সমিতিবদ্ধ)

নতুন দীর্ঘাকার
আধারে
নতুন ফর্মুলায়
মিহি-মৃদুল ট্যাল্কম

দুই মুরারি

(১১)

মুরারি গুপ্ত

মুরারির জন্ম শ্রীহট্টে, বৈদ্যবংশে। পরে নবদ্বীপবাসী। নিমাইয়ের চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু সহাধ্যায়ী। গঙ্গাদাসের টোলে দুজনে পড়ে একসঙ্গে। নম্র, নির্বিরোধ। পড়তে বসে নিমাইয়ের কত 'আটোপটঙ্কার', মুরারি প্রত্যুত্তর করে না। স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে। ভাবে নিমাইয়ের একখানা চরিত-কথা লিখলে কেমন হয়।

কিন্তু নিমাই যখন বালক তখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি মুরারি। সে তখন জ্ঞান-মার্গের পথিক। অদ্বৈতবাদী। তার মন্ত্র তখন 'নাহং' নয়, তার মন্ত্র তখন সোঽহং। আমি কেউ নই, আমিই সেই।

তর্কেই তখন তার প্রতিষ্ঠা, অনুগতিতে নয়।

আর তর্ক করতে-করতে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে যখন একা-একা পথ চলে তখনো কাল্পনিক প্রতিপক্ষের উদ্দেশে হাত নাড়ে, মুখ নাড়ে, শাস্ত্রব্যাখ্যা আওড়ায়।

পথের মধ্যে হঠাৎ সেদিন পিছন থেকে কে হেসে উঠল।

মুরারি তাকিয়ে দেখল, নিমাই। তার অঙ্গ-ভঙ্গির নকল করে খুব হাত-মুখ নাড়ছে আর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে অর্থহীন প্রলাপ বকছে।

এ কী হচ্ছে শুনি? মুরারি তেড়ে গেল।

জ্ঞানমার্গ হচ্ছে। বলেই নিমাই ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দলও উধাও।

জগন্নাথের ঘরে দেখি এক অপদার্থ জন্মেছে। মুরারি দারুণ বিরক্ত হল।

দাঁড়াও তোমার জারিজুরি গুঁড়ো করে দিই।

দুপুরে খেতে বসেছে মুরারি, হঠাৎ কে গম্ভীর কণ্ঠে তার নাম ধরে ডেকে উঠল।

মুরারি ভাবল কোনো সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় ব্যক্তি বুঝি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হয়তো বা কোনো শাস্ত্রব্যাখ্যার সূত্র জানতে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল মুরারি। দেখ তো কে এল।

আর দেখতে হল না। বালক নিমাই এসে উপস্থিত।

এ কী [illegible]? মুরারি অবাক হয়ে গেল। এ বালক অমনি গম্ভীর কণ্ঠে তাকে ডেকে উঠল নাম ধরে! এ কি পরিহাস, না তিরস্কার?

তুমি এখানে কী করতে এসেছ? তবু একবার গর্জে উঠল মুরারি।

কী করতে এসেছি? তোমার ভোজনের অন্ন নষ্ট করে দিতে এসেছি। দেখি কোন ব্রহ্ম তোমাকে রক্ষা করে। বলে চোখের পলকে ভোজনের থালা অশুচি করে দিয়ে ছুট দিল নিমাই।

ধর ধর—কেউ নিমাইকে ধরতে পেল না।

দূর থেকে বালক পরুষ স্বরে বললে, ও সব হাত-নাড়া মাথা-নাড়া ছাড়ো। জ্ঞানকাণ্ড ফেলে দাও, ছেড়ে দাও কুটতর্ক। জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ করো। ধরো ভক্তির পথ, অনুগতির পথ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুরারি। তাকে ভাবনায় ধরল।

মুরারির মনে ভক্তিরস সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে বলছেন গৌরহরি, অধ্যাত্ম-ভাবনায় রসুনের গন্ধ তাতে লেগে আছে। নইলে কিনা এখনো তার যোগবাশিষ্ঠে আগ্রহ!

অধ্যাত্মযোগের দোষ কী? জিজ্ঞেস করলেন অদ্বৈত।

যার ভগবান হরিতে ভক্তি আছে সে তো অমৃতের সাগরে খেলা করে, তার আবার খালের জলে সাঁতার কাটার দরকার কী।

ক্রমে-ক্রমে নিমাইয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে থেকে মুরারির মধ্যে জাগল দাস্যভাব। ভগবানই সেব্য, আমি তাঁর সেবক, ভগবান প্রভু, আমি তাঁর ভৃত্য—এই ভাবই দাস্যভাব। জীবের স্বরূপগত ভাবই দাস্যভাব। 'এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।'

কিন্তু মুরারির দাস্য শ্রীরামচন্দ্রে।

একদিন মুরারির গৃহে গৌরাঙ্গ কীর্তন করতে এলেন। বললেন, মুরারি, তোমার রঘুনাথের প্রশস্তি শোনাও।

নিজেই রঘুবীরাষ্টক লিখেছে মুরারি। মুরারি তো ভাষ্যকার বা বৈয়াকরণ নয়, প্রভুর প্রভাবে মুরারি তো কবি।

নিজের লেখা রামস্তোত্র পড়ে শোনাল মুরারি।

গৌরাঙ্গ বললেন, মুরারি, তুমি রাম-দাস। বলে মুরারির কপালে 'রামদাস' কথাটি লিখে দিলেন স্বহস্তে।

মুরারি ভাবল, প্রভুই তার ইষ্টদেব, নবদূর্বাদলশ্যামঃ রাম।

কিন্তু হঠাৎ প্রভুর এ কী নির্দেশ!

মুরারি, কৃষ্ণ ভজনা করো। কৃষ্ণচিন্তাই জীবের একমাত্র চিন্তা।

কী বলছ? মুরারি স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাল প্রভুর দিকে। কৃষ্ণ?

হ্যাঁ, কৃষ্ণই ভগবান। কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। তাকে ধরো।

তুমি এই কথা বলছ? মুরারির ঘোর কাটে না। শেষকালে কৃষ্ণকে ধরব?

হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিনা ধ্যান নেই। কৃষ্ণ বিনা উপাসনা নেই।

তুমি যখন বলছ তখন তোমার বাক্য শিরোধার্য করব। মাথা পেতে আদেশ মেনে নিল মুরারি। আমি তোমার দাস, তোমার বাক্য লঙ্ঘন করি কী করে?

মুখে রাজি হয়ে এল বটে কিন্তু মুরারির মনে সুখ নেই। তার হৃদয়ের ধন রঘুনন্দনকে সে ছাড়বে কী করে?

হে রাম, আমার রঘুনাথ, তোমাকে আমি কেমন করে বিসর্জন দেব? তোমার জায়গায় আর কাকে এনে বসাব? তোমাকে যদি ছাড়তে হয় তা হলে এই অসার দেহ থেকে আমার প্রাণও আজ ছেড়ে যাক।

সমস্ত বিনিদ্র রাত্রি কেঁদে-কেঁদে ক্ষয় করল মুরারি।

প্রভাত হলে প্রভুর পায়ে এসে পড়ল। বললে, তোমার আদেশ অমান্য করি আমার এমন সাধ্য নেই কিন্তু আমি যে আমার রামের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, তাকেও ছাড়তে পারি না। না, কিছুতেই না। এখন এর উপায় কী বলো?

তুমিই বলো। প্রভুর মুখে মৃদু-মৃদু হাসি।

এর একমাত্র উপায় আছে। সে উপায় মৃত্যু। মুরারি প্রভুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমাকে কৃপা করো। আমাকে তোমার সামনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও। 'তবে মোরে এই কৃপা করো দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়।।'

প্রভু মুরারিকে ধুলোর থেকে বুকে তুলে নিলেন। বললেন, মুরারি, কেন তুমি তোমার রামকে ছাড়বে? তোমার ভাবনিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যেই তো কৃষ্ণভজনের প্রস্তাব করেছিলাম। তুমি যে আমার কথাতেই তোমার রামকে ছেড়ে দাওনি, তোমার এই ভজন-দৃঢ়তাকে প্রশংসা করি। রাম—রামই তোমার শ্যামমূর্তি।

এর পর মুরারি আর ফিরল না, গৌরাঙ্গের পায়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দিল।

প্রভু, আমাকে তোমার চরণ থেকে ছাড়িয়ে দিলেও আমি যেন তোমার চরণ না ছাড়ি, আমাকে দাও সেই সেবাশক্তি।

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু বললেন, মুরারি, আমার রূপ দেখ।

মুরারি দেখল বীরাসনে রামচন্দ্র বসে আছেন। বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ। বানরদল চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তব করছে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মুরারি।

প্রভু বললেন, মুরারি, বর চাও।

জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে রতি থাকে। যেখানে-যেখানে তোমার সপার্ষদ অবতার হবে সেখানে-সেখানে যেন তোমার দাস হয়ে থাকতে পারি।

প্রভু বললেন, তাই হবে।

শ্রীবাস মন্দিরে সেদিন আবার চতুর্ভুজ মূর্তি ধরলেন প্রভু। হুঙ্কার দিয়ে ডাকলেন গরুড়কে। কই আমার বহন গরুড় কই?

আমিই তোমার বাহন, আমিই তোমার গরুড়। মুরারি ছুটে এল। দুই হাতে ধরে প্রবল শক্তিতে প্রভুকে কাঁধে তুলে নিল। সমস্ত অঙ্গন ঘুরে বেড়াল পাক দিয়ে।

আর কিছু নয়, শুধু দাস্যশক্তিতে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াব। সমস্ত জীবন তুমি আমার দাস্যের উপর দৈন্যের উপর আরোহণ করে থাকবে।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাই।।

বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে বললে, খেতে দাও।

স্ত্রী থালায় করে অন্ন পরিবেশন করল স্বামীকে।

কিন্তু মুরারির এ কী আচরণ! ঘি দিয়ে ভাত মেখে সে নিজে মুখে তুলছে না, মাটিতে ফেলছে আর বলছে, কৃষ্ণ খাও।

স্ত্রী তার স্বামীকে চেনে। তার স্বামী মহাভাগবত, চৈতন্যবিহ্বল। তাই থালায় যত ভাত কম হয় তত আবার সে পরিবেশনে পূরণ করে।

সকাল বেলা গৌরাঙ্গ এসে হাজির।

বলো কী করতে হবে? সেবাতৎপর মুরারি উন্মুখ হয়ে দাঁড়াল।

ওষুধ দাও।

কেন, কী হয়েছে?

অজীর্ণ।

সে কী, কী খেয়ে তোমার অজীর্ণ হল?

রাশি-রাশি ভাত খেয়ে। ঘিয়ে মাখা ভাত।

এত ভাত খেলে কোথায়?

তুমি জানো না কোথায় খেলাম। তোমার না হয় বাহ্যজ্ঞান ছিল না কিন্তু তোমার পতিব্রতা স্ত্রী জানে। যত ভাত তুমি কৃষ্ণ খাও বলে মাটিতে ফেলছিলে তত ভাত আমাকে নির্বিকারে খেতে হয়েছে। তোমার দেওয়া অনুরাগের অন্ন ফেলি কী করে? এখন দাও, ওষুধ দাও।

কী ওষুধ! কী ওষুধে তোমার অজীর্ণ সারবে?

শুধু জলে। ভক্তিরসে। কই তোমার জলের কলসী কোথায়?

প্রভু কলসীর সব জল খেয়ে নিলেন। তোমার কলসী ভক্তিরসে ভরা, সেই ভক্তিই একমাত্র ওষুধ।
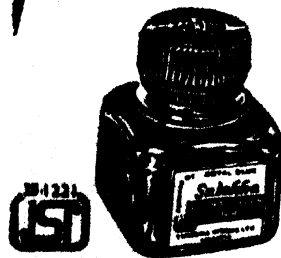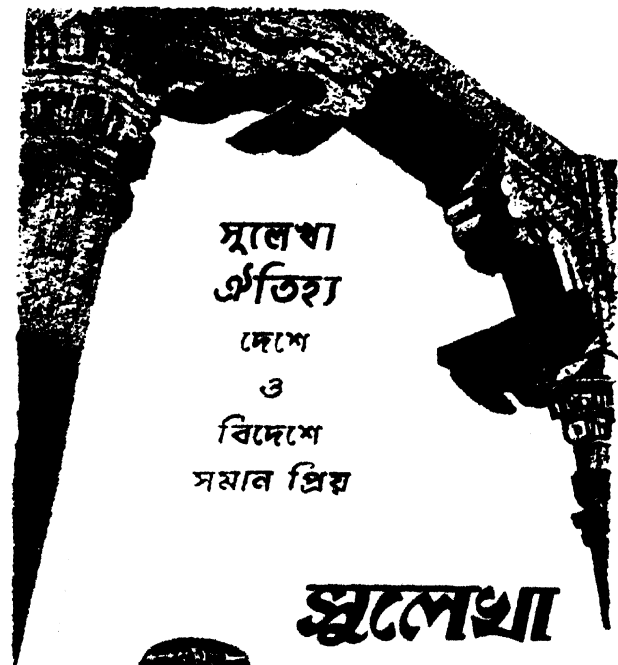
যার অন্নে অজীর্ণ তার জলেই আবার মহৌষধ। অন্ন আর জল দুই-ই ভক্তিতে সুস্বাদু, ভক্তিতে সুশীতল।

'না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কী করে।' এই গড়ে তুলছে এই আবার ভেঙে দিচ্ছে। এই ভরতে-ভরতে শূন্য করে দিচ্ছে এই আবার সর্বশূন্যকে উদ্বেল করে তুলছে। যে সীতার জন্যে রাবণকে সবংশে মারছে, সেই সীতাকেই আবার ফিরে পেয়ে পাঠাচ্ছে বনবাসে। কখন তার আবির্ভাব হবে, কখন বা তিরোভাব, কেউ বলতে পারে না। আমাদের প্রভুই বা কবে অন্তর্ধান করবেন কে বলবে।

কিন্তু প্রভুর অন্তর্ধানের পরেও বেঁচে থাকব এ অসহ্য। তাঁর জীবদ্দশায় আমার মৃত্যু ঘটুক।

মুরারি একটা ধারালো কাটারি তৈরি করাল। ঘরের মধ্যে রেখে দিল লুকিয়ে। রাত হলেই গলায় বসাব।

রাত হতে পারল না। তার আগেই সর্বভূত-হৃদয় বিশ্বম্ভর মুরারির দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

মুরারি, আমার একটা কথা রাখবে?

সে আবার একটা কথা! নিশ্চয়ই রাখব। আমার কাটার দেহ? শুধু তোমার জন্যে।

ঠিক বলছ?

পরীক্ষা করে দেখ।

তোমার কাটারিখানা দাও।

কাটারি? মুরারি আকাশ থেকে পড়ল।

আত্মহত্যা করবার জন্যে যে কাটারিখানা গড়িয়ে এনেছ সেইখানা।

এ সব বাজে কথা তোমাকে কে বললে? মুরারি চাইল পাশ কাটাতে।

এমন কথা নেই যা আমি না জানি। কে তোমাকে গড়িয়ে দিয়েছে তাও বলতে পারি। কাটারিখানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাও আমার জানা।

বলে প্রভু নিজেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। কোথায় কোন অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল, বার করে নিয়ে এলেন। এই সেই কাটারি।

কিন্তু, গুপ্ত, এ তোমার কেমনতরো ব্যবহার? এ বুদ্ধি তুমি কার কাছে শিখলে? তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে খেলব?

মুরারি কাঁদতে লাগল।

গুপ্ত, আমাকে একটি ভিক্ষে দাও।

কী দেব? আমার কি কিছু অদেয় আছে?

এই মৃত্যুবুদ্ধি ভিক্ষে দাও। যেন আর কোনোদিন তোমার মৃত্যুতে না মতি হয়। শুধু মন নয়, দেহও বিকিয়ে দাও আমাকে।

তাই দেব। বাঁচব তোমার জন্যে। যতদিন বাঁচব ততদিন তোমার নামগান করব। তোমার নামগান করবার জন্যেই টিঁকিয়ে রাখব দেহকে।

প্রভুকে দর্শন করতে নীলাচলে গেল মুরারি। কিন্তু নরেন্দ্র সরোবর পর্যন্ত গিয়ে আর এগুলো না, বসে পড়ল।

তার সঙ্গী ভক্তবৃন্দ বললে, কী হল, বসে পড়লে কেন?

আপনাদের দয়ায় এতদূরে এসেছি, আমি আর যেতে পারছি না। আমি দীন-দুঃখী, মহাপাপী। জগন্নাথ দর্শনে আমার সাহস নেই। আপনারা যান। আমার কথা প্রভুকে গিয়ে বলুন।

কী কথা?

আমার অক্ষমতার কথা।

প্রভুরই আদেশ, সর্বাগ্রে জগন্নাথদর্শন করবে, পরে আর সমস্ত। সেই অনুসারে— জগন্নাথদর্শন সেরে ভক্তদল প্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন। প্রভু কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, মুরারি কই? মুরারি কই?

সে নরেন্দ্র সরোবরের পারে বসে আছে।

তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। বলো আমি তাকে ডেকেছি।

নরেন্দ্র সরোবরের পারে মুরারির কাছে খবর পৌঁছুল। ত্বরা করো। প্রভু তোমাকে ডেকেছেন, তোমাকে তাঁর দরকার।

নয়নজলে ভাসতে-ভাসতে তৃণগুচ্ছ মুখে নিয়ে মুরারি গৌরচন্দ্রের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। পরনের কাপড়ের অর্ধাঞ্চল গলায় জড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল প্রভুকে।

মুরারির আগে গৌরাঙ্গ-দর্শন পরে জগন্নাথ-দর্শন।

প্রভু তাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে বাহু বাড়ালেন।

মুরারি বললে, আমি অধম পামর, আমার পাপদেহ তোমার স্পর্শযোগ্য নয়।

প্রভু বললেন, মুরারি, দৈন্য ছাড়ো। তোমার দৈন্য দেখলে আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়।

নিজেই তাকে বুকে করলেন। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন হাত দিয়ে।

মুরারিই গৌরাঙ্গের আদি চরিতকার। তাঁর কড়চার নামও 'শ্রীচৈতন্যচরিত'। নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষবর্ণন।

হে চৈতন্যচন্দ্র, তোমার পাদপদ্ম দর্শন করেও যারা তোমাতে পরমেশবুদ্ধি করে না তারা তোমার বৈভবমায়ায় বিমোহিত।

মুরারির প্রতি সর্ব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্বভূতে কৃপালুতা মুরারির চরিত।।
যেতে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়।।

(১২)

মুরারিচৈতন্য দাস

'মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা। ব্যাঘ্র গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা।।'

কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে থাকেন।

তার সর্বভূতে ভগবান-দর্শন।

তাই তার বাঘে-সাপে ভয় নেই। আর যার প্রাণে কৃষ্ণপ্রেমের অমলধারা নিত্য বয়ে চলেছে তার হিংসা কোথায়?

যদি চেতনায় হিংসা নেই তবে কোনো চেতন পদার্থেও হিংসা নেই।

দিব্যি বাঘ তাড়িয়ে বনে গিয়ে ঢোকে মুরারি। যেন বাঘেরই ভয় পাবার কথা। বাঘ দূরে সরে যেতে চাইলে মুরারিই বাঘকে ডাকে। বাঘ কাছে এলে দিব্যি তার পিঠের উপর চড়ে বসে। 'কখনো চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে।।'

শুধু তাই নয়, সাপ কোলে নিয়ে বসে থাকে মুরারি। যে-সে সাপ নয়, বিষধর অজগর। যখন মুরারির সমস্ত সত্তাই কৃষ্ণপ্রেম তখন জগতে বিষ কোথায়?

মুরারিচৈতন্য কোথায়? তিন দিন ধরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা গেল জলের নিচে ডুবে আছে মুরারি।

তার কাছে বুঝি জল-স্থলেরও প্রভেদ নেই।

সমস্তই নিত্যানন্দের শক্তিতে। মুরারি-চৈতন্য নিত্যানন্দের গণ। ব্রজের সখারাই নিত্যানন্দের গণ।

মুরারিচৈতন্যের তাই সব সময়েই কৃষ্ণ-কথা। সব সময়েই আনন্দময়তা। লীলারস-মাধুর্য।

যার গায়ে মুরারির বাতাস লাগে সেই কৃষ্ণ পেয়ে যায়। 'যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত।।'

(ক্রমশঃ)

শুভংকর

কম্প্যুটার নিয়ন্ত্রিত অভিনব কৃত্রিম মানুষ

শোনা যায়, পৌরাণিক যুগে ঋষি বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন। আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা অনেকটা বিশ্বামিত্রের মতোই। প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ কৃত্রিম উপায়ে নানা বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে আছে মানুষের দেহের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পরিধেয়ের কৃত্রিম বস্তু, কৃত্রিম খাদ্যবস্তু ও আরও কত কি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে এমন 'মানুষ' কি সৃষ্টি করতে পারেন যার আচার-আচরণ হবে জীবন্ত মানুষেরই অনুরূপ?

'সিম ওয়ান' নামে অভিহিত কৃত্রিম মানুষের ওপর চিকিৎসা পদ্ধতির ফলাফল কম্প্যুটারের সাহায্যে নির্ণয় করা হচ্ছে।
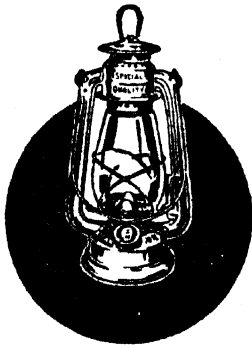
হ্যাঁ, এমনই এক 'মানুষ' মার্কিন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবিক মানুষের মতো এই কৃত্রিম মানুষেরও চোখ কান নাক মুখ সবই আছে এবং তার আচরণ বহুলাংশে জীবন্ত মানুষেরই মতো। ফাইবার গ্লাস ও ইস্পাতের তৈরী এই কৃত্রিম মানুষ কম্প্যুটার নিয়ন্ত্রিত। মার্কিন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই অভিনব কৃত্রিম মানুষের সাহায্যে ভেষজ ও শল্যচিকিৎসার জটিল কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করছেন। তার হৃদস্পন্দন, নাড়িস্পন্দন ও রক্তচাপ সবই স্বাভাবিক মানুষের মতো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তারও বুক ওঠানামা করে। তার চোখ যেমন বিস্ফারিত হয়, তেমনি অর্ধনিমীলিতও হয়। স্বাভাবিক মানুষের মতো তার দেহেও পেশী সংকোচন দেখা যায় এবং দেহত্বকের আকৃতি-প্রকৃতিও একরকম। সে স্বাভাবিকভাবেই মুখ খুলতে ও বন্ধ করতে পারে। তার মুখগহ্বর ও কণ্ঠনালীতে জীবন্ত মানুষের মতো সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আছে, যেমন দাঁত, জিব, স্বরগ্রন্থি ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন ভেষজ প্রয়োগে স্বাভাবিক মানুষের দেহে যেসব প্রতিক্রিয়া হয়, এই কৃত্রিম মানুষের শরীরেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এই কৃত্রিম মানুষ 'প্রথম সিম' (সিমিউলেটর ওয়ান) নামে অভিহিত। 'প্রথম সিম' কথাটি থেকে উপলব্ধি করা যায়, পরবর্তীকালে এই ধরনের আরও কয়েকটি মডেল প্রস্তুতের পরিকল্পনা আছে। এই মডেল তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অবেদনিক ভেষজ প্রয়োগকারীদের (অ্যানীসথেটিসট) শিক্ষণ।

রোগীর শ্বাসনালীতে একটি নল প্রবেশ করিয়ে কিভাবে অবেদনিক গ্যাস প্রয়োগ করতে হয় যাতে সেই গ্যাস সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছতে পারে তা শিক্ষা করার পক্ষে এই কৃত্রিম মানুষ বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতি বেশ জটিল। আগে এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি আয়ত্ত করতে চিকিৎসকদের কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগত। কিন্তু 'প্রথম সিম'-এর সাহায্যে এখন দুদিনের মধ্যে এই প্রয়োগপদ্ধতি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে। বড় বড় শল্যচিকিৎসায় এই পদ্ধতি এখন অবলম্বিত হচ্ছে।

কৃত্রিম মানুষের ওপর প্রয়োগ করে পদ্ধতি অনুসরণের মস্ত সুবিধা হচ্ছে, শিক্ষাদাতা চিকিৎসক শিক্ষার্থীকে এবিষয়ে শিক্ষা দেবার সময় যে কোনো মুহূর্তে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তিনি ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে কোনো সময়ে যতক্ষণ ইচ্ছে এই পদ্ধতি বন্ধ করে রাখতে পারেন, আবার কথা শেষ হবার পর সেই পর্যায় বা একেবারে গোড়া থেকে পদ্ধতিটি চালু করতে পারেন। জীবন্ত মানুষের ওপর প্রয়োগ করে এইভাবে ইচ্ছামাফিক যখন-তখন কার্যক্রম চালু বা বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

জীবন্ত মানুষের ওপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে বিভিন্ন পর্যায়ে যে রকম সাড়া পাওয়া যেত, কৃত্রিম মানুষও তার

ওপর কার্যক্রম অনুসরণের আগাগোড়া সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে একইভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। যথানির্দিষ্ট বোতাম টিপে পরিচালক কৃত্রিম মানুষের হৃদস্পন্দনের হার, রক্তচাপ বা শ্বাসক্রিয়া বাড়াতে বা কমাতে পারেন। কৃত্রিম মানুষকে বমি করানো, হৃদস্পন্দন বন্ধ করানো, আঘাত পাওয়ানো বা অন্যান্য আকস্মিক সংকটের সম্মুখীন করানো যায়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এই ধরনের আকস্মিক সমস্যার কদাচিৎ সম্মুখীন হন। কিন্তু কৃত্রিম মানুষের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এই রকম ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে এ সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন।

কৃত্রিম মানুষের ওপর কার্যক্রম অনুসরণের শেষে অথবা যে কোনো সময়ে যা কিছু ঘটেছে তার একটা মুদ্রিত বিবরণ কম্প্যুটারের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। এই বিবরণী দেখে চিকিৎসক তাঁর পরীক্ষার ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীও শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই তার নিজের পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি হাসপাতালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিন-এর কর্তৃপক্ষ এখন 'প্রথম সিম'কে কাজে লাগিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যন্ত্রবিদদের সহযোগিতায় এই কৃত্রিম মানুষের মডেলটি প্রস্তুত করেছেন। ভবিষ্যৎ উন্নততর মডেল রক্ত ও ঘর্মমোক্ষণ এমন কি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে পারবে।

বিজ্ঞানসেবী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্বর্ধনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলেও শুধু নিজের আগ্রহে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এবং আপন হাতে পরীক্ষা ও গবেষণা করে বিজ্ঞানী হওয়া যায়, এমন মানুষের উদাহরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগতে বিরল নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন বিজ্ঞানী নিতান্তই বিরল। এই বিরল সংখ্যকদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞানী জীবন বৈচিত্র্যময়। আনুমানিক ১৯১৬-১৭ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁকে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা কাজে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানান। জগদীশচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁর প্রেরণায় গোপালচন্দ্র কীট-পতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ বিদেশে ও এদেশে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৯৮ সালে ফরিদপুরে (পূর্ব পাকিস্থান) জেলায় অন্তর্গত লোনসিং গ্রামে গোপালচন্দ্রের জন্ম। ১৯১৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে তিনি যোগদান করেন, কিন্তু কলেজের পাঠক্রম শেষ করার আগেই তাঁকে ঘটনাচক্রে কলকাতায় চলে আসতে হয়।

গোপালচন্দ্র তাঁর জীবনে নানা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। কলকাতা আসার আগে তিনি স্বগ্রামে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে পাটকল অফিসে টেলিফোন অপারেটরের কাজ করেন। সরকারী আর্ট কলেজে তিনি কিছুদিন চিত্রাঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। ব্লক নির্মাণ ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যাতেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাকার্যে যোগদান করে গোপালচন্দ্রের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন থেকে বিজ্ঞানসেবাই তাঁর একমাত্র বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানী হিসাবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। কীট-পতঙ্গের আচার-আচরণ বিরহ-মিলন, ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে তিনি নানা আশ্চর্যজনক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এই আকর্ষণীয় গবেষণার বিবরণ এদেশের ও বিদেশের নানা বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখনও পরিণত বয়সে তিনি এই সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

গোপালচন্দ্রের আর একটি কৃতিত্বময় পরিচয় বিজ্ঞান-লেখক হিসাবে। সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞানচেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল থেকে তিনি নানা বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, বিশেষত কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে, আকর্ষণীয় নিবন্ধ লিখে আসছেন। তাঁর এই নিবন্ধগুলি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদার লাভ করেছে। বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য
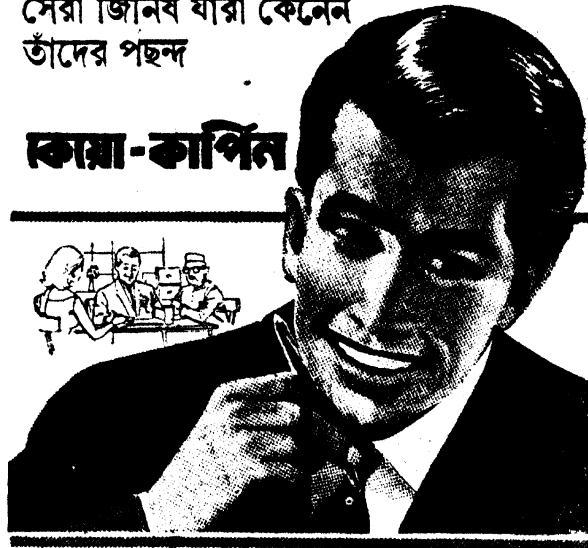
পরিষদ প্রকাশিত 'ভারত-কোষ' গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি অন্যতম।

সম্প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবনের পক্ষ থেকে গোপালচন্দ্রকে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপক ডঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়।

চাষীর সাহায্যে জীবাণু

আমরা জানি, গাছের পুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেন একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণত চাষী ক্ষেতে সার ছড়িয়ে গাছকে নাইট্রোজেন জোগায়। মাটিতে যেসব জীবাণু থাকে, তারা গাছকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সরবরাহের ব্যাপারে চাষীর কাজে আসতে পারে। মাটির এই ক্ষুদ্র বাসিন্দারা যদি কোনো পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবে গাছপালাকে নাইট্রোজেন জোগাতে পারে, তাহলে সার ব্যবহার বাবদ চাষীর খরচ অনেক কমে যাবে। ব্রিটেনের সয়েল ফার্টিলিটি ডানস লিঃ নামে একটি কৃষি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ঠিক এমনি এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।
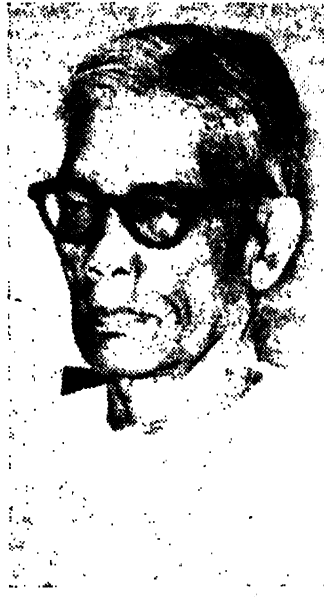
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

এই পদ্ধতিতে শতকরা ২৯ ভাগ নাইট্রোজেনযুক্ত অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া (জলীয় পদার্থ) প্রয়োগ করা হয় এবং তা ২ থেকে ৪ ইঞ্চি মাটির নিচে চলে গিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশে যায়। মাটির অনেক নিচে চলে যায় বলে এতে অঙ্কুরের কোনো ক্ষতি হয় না। শীতের সময় তো ক্ষতির কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

মাটির মধ্যে যেসব জীবাণু থাকে তারা অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে। কিন্তু এর জন্যে মাটি যথেষ্ট গরম থাকা চাই। শীতের সময় জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ যদি নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্ষেতে এই জলীয় অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয়, তা হলে তা অবিকৃতই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী ফাঃ না হয়। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রীতে পৌঁছলে জীবাণুগুলির কাজ শুরু হয়ে যায় এবং তখন প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট পাওয়া যায়। ঠিক সেই সময়েই গাছপালার পক্ষে নাইট্রেটের প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। এভাবে শীতের সময় একবার মাত্র জলীয় অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করে বসন্তকালে তা থেকে কাজ পাওয়া যায়।

অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া ট্র্যাক্টরের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। টাইন ও ডিসকগুলি যখন মাটি ভাঙে, তখন ইনজেকশন টিউবের সাহায্যে জলীয় অ্যামোনিয়া মাটিতে অনুপ্রবেশ করে। ফলে ব্যয় অনেক কম হয়। প্রতি একরে প্রায় এক পাউন্ড বা ২১ টাকার মতো খরচ হয়। গুঁড়ো বা শক্ত সার ব্যবহারের জন্যে যে সব স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, পরিবহণ ইত্যাদির প্রয়োজন, এতে তার কিছুই লাগে না বলে ব্যয় অনেক কম হয়।

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন যন্ত্র

ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিস্টি হসপিটালে ও হলট রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে ৫০০,০০০ পাউন্ড ব্যয়ে যে নতুন ল্যাবরেটরীটি খোলা হয়েছে সেটিতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বিজ্ঞানীগণ ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণা করবেন।

বহু নতুন যন্ত্রের সমাবেশ হয়েছে এই গবেষণাগারটিতে, যন্ত্রগুলি নিঃসন্দেহে ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেবে। এগুলির মধ্যে আছে ভিকার্স প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গবেষণাগারের কর্মিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত একটি লিনিয়ার অ্যাকসিলেরেটর ও রেডিয়ো অ্যাকটিভ কোবাল্ট ইউনিট।

ইউরোপে এই ধরনের ইউনিট এই প্রথম ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে; ইউনিটটি অন্য দেশের ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে। ফেডারেল জার্মানী থেকে একটি অর্ডারও ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে।

"পাল্‌স্‌ রেডিওলিসিস"

যন্ত্রটি এক সেকেন্ডের ১০০,০০০,০০০ ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে রেডিয়েশনের একটা বড় রকমের 'ডোজ' দিয়ে দিতে পারে। এতে রেডিয়েশনের ফল মুহূর্তে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়—দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করে না থেকে। নির্দিষ্ট ডোজ দেবার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করে থাকলে অনেক সময় ফলাফল পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার এই ব্যবস্থাটিকে বলা হয়ে থাকে 'পালস রেডিয়োলিসিস' (Pulse Radiolysis) প্রধানত ম্যাঞ্চেস্টারে এটির উদ্ভাবন।

নতুন গবেষণাগারটির নাম হয়েছে প্যাটার্সন ল্যাবরেটরিজ—ডাঃ র‍্যালস্টন প্যাটার্সন ও তাঁর সহধর্মিণী ডাঃ এডিথ প্যাটার্সনের নামানুসারে। ১৯৩০-এর দশকের প্রথমদিকে হাসপাতালের প্রথম গবেষণা কেন্দ্রটি এঁরাই স্থাপন করেছিলেন।
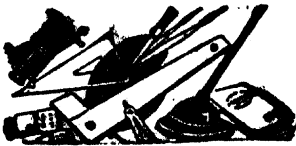
(১৬)

দেখলেন, এরই মধ্যে রাত ভারি হ'লো, অন্ধকার। অচেনা এক জগৎ বাইরে। কিন্তু— আমি নিশ্চিন্ত। দেখুন কেমন ছোটো আমার ঘর। দেয়ালে ঘেরা, আলো জ্বলছে, ভারি পর্দা জানালায়। প্রচুর মদ আছে আমার, গায়ত্রী আছে। আমার ভয় নেই। গুর্খা দরোয়ান, অ্যালসেশান দুটো সারা রাত টহল দেয়। আমার ভয় নেই।...আজ্ঞে? আমার মদ্যপানের ক্ষমতা দেখে অবাক হচ্ছেন? থ্যাঙ্কিউ, ও-বিষয়ে সত্যি আমি ছোটোখাটো একটি চ্যাম্পিয়ন। আপনি চিন্তিত হবেন না তাই ব'লে। কিছু হয় না আমার। দেখুন, পরীক্ষা ক'রে দেখুন, যে-কোনো কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে বলুন, জিগেস করুন বানান, ভূগোলের প্রশ্ন, ইতিহাসের তারিখ—যা আপনার ইচ্ছে। কী? এই ফিকিরে জেনে নিতে চাচ্ছেন পুরোনো কথা, গোপন কথা? আপনি তো ভারি চালাক লোক মশাই; যা জানেন, বহুদিন ধ'রে জানেন, তা-ই আবার বলিয়ে নিতে চান আমাকে দিয়ে? কেন, আপনি কি ছিলেন না সেদিন কার্জন হলে এ দূর থেকে কি দেখছিলেন না আমাকে, বুলবুলকে—এতক্ষণে সব কি আপনার মনে প'ড়ে যায়নি? একেবারে সামনের সারিতে ব'সে আছে বুলবুল, আমি দাঁড়িয়ে থামের আড়ালে ক'রিডরে, বুলবুল আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার চোখে একমাত্র দৃশ্য এখন আর্থার জোন্স, যেমন আমার চোখে—সে। আমি আমার চোখ দুটোকে আটকে রেখেছি বুলবুলের উপর— ভীষণ, ভীষণ মনোযোগে। ঝাপসা আওয়াজ—জোন্সের বক্তৃতা— হাওয়ার শব্দ, পাতার শব্দ, অর্থহীন। ঝাপসা অন্য সব মুখ, অস্তিত্বহীন। পাখির মুণ্ডটি ছাড়া আর-কিছু দেখতে পায়নি অর্জুন, তেমনি খেলা বুলবুলের আর আমার। আমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, এক-একটি মিনিটকে মনে হচ্ছে অনন্তকাল। তারপর—ঐ বুলবুল উঠলো, তার হাত নেমে এলো ব্লাউজের দিকে—আমি ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেছি। একটা প্রচণ্ড শব্দ, ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ, লোকজনের চীৎকার।

আচ্ছা, আমি কয়েকদিন হাজতে ছিলাম —তা-ই না? ঠিক মনে আছে আপনার? তারপর?...ও, হ্যাঁ। বেরিয়ে এসে শুনলাম, জোন্স অনেক ধরাধরি করেছিলো আমার হ'য়ে, কিন্তু তার চেষ্টাও মিতুকে বাঁচাতে পারেনি। মিতু এখন ডেটিনিউ, আপাতত আছে ঢাকা জেলে, শিগগিরই বদলি হবে অন্য কোথাও। দেখা করার অনুমতি চাইলাম, পেলাম না। তারই বাবার পিস্তল, তারই বন্ধু বুলবুল; অতএব তাকে আটকে না-রাখলে পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্য নাকি টেকে না। বিভাবতী ধরা পড়লেন কলকাতায়; জোন্স বদলি হ'লো রাজসাহীতে। আমি দু-মাস পরে চাঁদপালঘাটে 'সিটি অব ক্যালকাটা' জাহাজে উঠলাম। বিলেতে আমাকে যেতেই হ'লো। দেশে থাকলে পুলিশের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। অবিলম্বে আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিলে আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে—এমনি একটা আশ্বাস নাকি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছিলেন আমার বাবাকে। তাছাড়া— বেনামী চিঠিও পাচ্ছিলাম মাঝে-মাঝে : 'আর্থার জোন্সকে তুমি বাঁচালে, কিন্তু ভেবো না আমাদের প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।' 'বুলবুল তোমারই জন্য ধরা পড়লো, আমরা তোমাকে নিস্তার দেবো না!' একদিকে পুলিশ, আর-একদিকে বুলবুলের 'আমরা'। কোথাও সুবিচার নেই, মশাই! কাজল তার যে-সব গয়না স্বামীর জন্যে হাতছাড়া করেনি, সেগুলি সে বন্ধক দিলে আমার জন্য; সেই টাকায় এক হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্তিরে ইংলণ্ডের মাটি ছুঁলাম।

আমার কি কষ্ট হয়েছিলো দেশ ছেড়ে যখন চ'লে আসি? একটুও না। জাহাজ ছেড়ে দিলো, আমার চোখ থেকে মিলিয়ে গেলো মা বাবা, বাংলাদেশের মাটি, আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম আমার চোখে এক ফোটা জল নেই—বুলবুল, কাজল, মিতু—এমনকি মিতুও—সব যেন ছায়া হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে। যে-দেশে যাচ্ছি তার জন্যেও কোনো ঔৎসুক্য নেই আমার; যদি বঙ্গোপসাগরে লাফিয়ে পড়ি তাতেই বা কী এসে যায়। কিন্তু সে-রকম [illegible] দস্যুর মতো উদ্দামও আমার

অবশিষ্ট নেই; আমি নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছি বিধ্বস্ত। কত ভাগ্যে কেউ জখম হয়নি, কোনো শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি, শুধু কার্জন হল-এর জমকালো সীলিঙ থেকে চাক-চাক সীমেন্ট চুন খ'সে পড়েছিলো। কিন্তু আমি ম'রে গিয়েছিলাম একুশ বছর বয়সে—সেদিনের সেই সন্ধেবেলায়। আমার স্বভাবের যেটা প্রাণকেন্দ্র, যাকে ঘিরে-ঘিরে গ'ড়ে উঠছিলো আমার জীবন, সেই কেন্দ্র থেকে ছিটকে খ'সে পড়েছি: আমাদের পৃথিবী যদি সৌর-মন্ডল থেকে বেরিয়ে যায় তাহ'লে যেমন এক ফালি ঘাসও আর জন্মাবে না, আমার সত্তার পক্ষে এও যেন তেমনি। লন্ডনের নতুন পরিবেশে মনে হ'লো আমার পুরোনো জীবন ফুরিয়ে গেছে, অথচ কোনো নতুন জীবনও শুরু হ'লো না—শুধু কোনো ভুতুড়ে কন্ঠস্বরের মতো অন্য কোনো আধো-চেনা আঁধার মহাদেশের বার্তার মতো, মাঝে-মাঝে মার চিঠি পেঁছয়। একদিন দুটো চিঠি এলো একসঙ্গে : একটা মা-র, আর-একটাতে হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের ছাপ মারা। মিতু—মিতুর চিঠি। বকুল-তিলার মিতু। সোনালিকণ্ঠী গায়িকা। হোমিওপ্যাথ অনাদিবাবুর কন্যা। আমার প্রেমিকা। আমার ভাবী স্ত্রী। শেষ কথা লিখেছে, 'দুঃখ কোরো না, আবার দেখা হবে।' বৃষ্টির শব্দে, বা ভোরের হাওয়ায়, বা কোনো নতুন ওষুধের অস্থায়ী প্রভাবে, মুমূর্ষুরও যেমন মনে হয় সে সেরে উঠছে, তেমনি, মিতুর চিঠি প'ড়ে আমিও মুহূর্তের জন্য ফিরে পেয়েছিলাম আমার বাঁচার ইচ্ছা, মনে হয়েছিলো আবার জীবন নতুন ক'রে শুরু হ'তে পারে। কিন্তু মা-র চিঠি প'ড়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না কী লেখা আছে তাতে। 'হত-ভাগিনী তার পাপের বোঝা নিয়ে আমাদের ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।' কে?...কী পাপ?... কোথায় চ'লে গিয়েছে? ভীষণ শীত, ছুরির মতো হাওয়া, বেগে বরফ পড়ছে, আমি বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়, মাইলের পর মাইল হাঁটছি, হাঁটছি আর মনে-মনে বলছি, 'কাজল ম'রে গেছে, তার গর্ভে সন্তান ছিলো—স্বামী কাছে নেই তবু সন্তান—তাই গলায় দড়ি দিয়েছিলো কাজল।' বিরাট শহর, কাউকে চিনি না; বিরাট পৃথিবী, কাউকে চিনি না; শবের মতো ঠান্ডা এই রাত্রি, আমার হাত-পা অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। আমি গরম হবার জন্য একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লুম—সেই আমার মদের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা—সে-রাত্রে কেমন ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম, ঘুমিয়েছিলাম কিনা, কিছু মনে নেই।

আপনার কি কষ্ট হচ্ছে কাজলের জন্য? চেপে যান, ও-সবের কোনো মানে হয় না। আমাকে দোষ দিচ্ছেন? কী আশ্চর্য, আমি কি কাজলকে ম'রে যেতে বলেছিলাম?... জানেন, একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো মা-কে সব খুলে বলি, লম্বা চিঠি লিখি একটা—ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে সামলে যাবার মতো সুবুদ্ধি হ'লো। কাজলকে ভালোবাসতেন আমার মা, শোকার্ত আছেন, তার উপর আবার আর-এক দুঃখ কেন চাপাই, কেন তাঁকে জানতে দিই তাঁর যোগ্য পুত্রের আসল চেহারাটি কী। কাজলের নাম আর বেরোয়নি তাঁর কলম থেকে, কি মুখ থেকে—আমিও ছিলাম নিঃশব্দ। কেউ জানে না কাজলকে ঐ ভ্রূণটি কে উপহার দিয়েছিলো—জানবে না কোনোদিন—আমি ছাড়া—আর আপনি ছাড়া। আপনি তো জানেন কেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় ওটা ঘ'টে গিয়েছিলো—হঠাৎ এক বিপুল আবেগের ঝোঁকে—পাঁচ মিনিট আগেও ভাবেনি সে, ভাবিনি আমি—আমার সেই মুহূর্তের অশান্তিকে করুণা করেছিলো কাজল, চেয়েছিলা তার ক্ষুধিত নারীত্বের হৃদয়লব্ধ মমতা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতে, আর তাই সে হারিয়ে ফেলেছিলো কান্ডজ্ঞান, অত সহজে সাড়া দিয়েছিলো আমার কামনায়। কেনই বা দেবে না বলুন—কী পেয়েছিলো সে জীবনে, কী পেয়েছিলো তার স্বামীর কাছে নির্লজ্জ অবহেলা ছাড়া—সে কি মানুষ নয়, তারও কি মন নেই শরীর নেই, অধিকার নেই জীবনের কাছে একবার অন্তত ক্ষতি-পূরণ ছিনিয়ে নেবার? আর আমি—আমিও তার মরুভূমিতে বৃষ্টি নামিয়েছিলাম; পারস্পরিক সান্ত্বনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলাম দু-জনে সেই রাত্রে। আপনি তো সব জানেন, সব বুঝে নিয়েছেন এতক্ষণে : আপনি কি বলবেন এটা অপরাধ?

সত্যি যদি কেউ দোষী হ'য়ে থাকে সে কে জানেন? বুলবুল। সে মেয়ে ব'লে, আর বয়স অত অল্প ব'লে, হাইকোর্টের জজেরা তাকে দয়া করেছিলেন, চোদ্দ থেকে আট বছরে নেমে এসেছিলো তার কারাদন্ড : কিন্তু তার সত্যিকার বিচার কখনো হ'লো না—এই আমারই মনের মধ্যে ছাড়া। 'মিতুকে তুমি এত ভালোবাসো আর তোমার দেশের লোককে তুমি একটুও ভালোবাসতে পারো না?'—এই কথাটার অর্থ বুঝতে কি এক মিনিটও সময় লাগে আপনার কি আমার মতো অভিজ্ঞ লোকের? বুলবুল ভালোবেসেছিলো আমাকে, কিন্তু নিজের কাছে তা কিছুতেই স্বীকার করেনি, তাই চালিয়ে দিয়েছিলো তার আবেগটাকে অন্য এক ভয়াবহ রাস্তায়। চেয়েছিলো হত্যা করতে—জোন্সকে নয়, আমার ভালোবাসাকে; প্রতিশোধ নিতে, ইংরেজের নয়, মিতুর আর আমার উপরে, যেহেতু আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলাম। তার আসল লক্ষ্য নির্ভুলভাবে তার হিংসার গুলি সে বিঁধিয়েছিলো—একেবারে বুল্‌স আই! তা-ই যদি না হবে তাহ'লে কেন সে আমার কাছে ফাঁস করেছিলো তার ভীষণ অভি-সন্ধি? ও-রকম কাজে যে এগিয়ে যায় সে কি তার প্রাণের বন্ধুকেও বলে সে-কথা? 'দ্যাখো এবার— কী বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিলাম তোমার উপর—আর কি তুমি তোমার ভাবের জগতে প্রেমের জগতে বন্দি হ'য়ে থাকতে পারবে।' আপনিই বলুন, এ কি নয় জুলুম, ব্ল্যাকমেইল, নিষ্ঠুরতা, মানুষের হৃদয়ের উপর অকথ্য অত্যাচার?...আজ্ঞে? আমি ভুল বলছি, আপনার মনে হয়? তার দেশপ্রেম? তার মৃত্যুপণ? আরে মশাই আমার কথাই আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? আমি তো মানছি আমার মাথা ঘুরে গিয়ে-ছিলো তার হাতে পিস্তল দেখে, আমি অভিভূত হয়েছিলাম ঐ ছোট্ট রোগা মেয়েটির ত্যাগে ও বীরত্বে, মুহূর্তের জন্য নিজেকে ছোটো মনে হয়েছিলো তার তুলনায়, মুহূর্তের জন্য প্রায় একমত হয়েছিলাম তার সঙ্গে যে আর্থার জোন্স এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস নেবার যোগ্য নয়। না—বুলবুলকে দোষ দিয়ে কী হবে, আমারই দোষ, বোকামি—বোকামি—যাকে বলে ডাহা বোকামি, তা-ই। বুঝিনি আমি, কত সহজ হ'তো আমার পক্ষে তাকে ফেরানো, শুধু একটি কথা তাকে বলতাম যদি—'বুলবুল, তোমার জীবন আমারও কাছে মূল্যবান, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'—কিন্তু না, আমি তা কী ক'রে বলি, আমি যে সাধু, সত্যবাদী, আমি যে মিতুকে ভালোবাসি—বুলবুলকে নয়। ঐ একটি ছোটো মিথ্যে ব'লে আমি পিস্তলটি রেখে দিতে পারতাম আমার কাছে, পারতাম তা অনাদিবাবুকে ফিরিয়ে দিতে—কী অগাধ সুখের না সমাপ্তি হ'তে পারতো এই কাহিনীর। আর, যদি তা নাও করেছিলাম, তবু পরে ঐ হিমালয়তুল্য বোকামির ভূত কেন নামাতে পারলাম না কাঁধ থেকে—কেন ছুটে গেলাম পরোপকার করতে, প্রাণ বাঁচাতে? ফোপরদালালি, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো, অনধিকারচর্চা! কী-দায় পড়েছিলো আমার—বুলবুল,

আর্থার জোন্স এরা আমার কে? কেউ নয়—মিতুর তুলনায় কেউ নয়। কেন ভাবতে পারিনি : যে যার পথে যাক না, আমার কী এসে যায়? ওদের বাঁচাতে গিয়ে কাজলকে আমি মেরে ফেললাম। ধ্বংস ক'রে দিলাম আমার জীবন, মিতুর জীবন। হাঃ!

না, মিতুর সেই চিঠির আমি জবাব দিইনি, আমার আবেগের সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ হরণ ক'রে নিয়েছিলো কাজল। দেশে ফিরেও মিতুর খোঁজ করিনি আর। মাঝে-মাঝে তার খবর পাই আমার মা-র মুখে—নিঃশব্দে শুনে যাই, কোনো মন্তব্য না-ক'রে। চার বছর পরে ছাড়া পেয়েছিলো মিতু, বাড়ি ফিরে তার মা-কে দেখতে পায়নি। মনের কষ্টে ভেঙে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা, খেতেন না, পেটে টিউমার হ'লো। হয়তো অপারেশন করলে বাঁচানো যেতো, কিন্তু অনাদিবাবুর জেদে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মতে মারা গেলেন—মিতু ফিরে আসার মাত্র মাসখানেক আগে। অনাদিবাবু প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন, তাঁর জীবনের স্প্রিং ফেটে গেলো। মিতু, যার রোদে বেরোলে মাথা ধরতো, রাতে মা-র সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোতো যে, সেই মিতু তার রূপ যৌবন গানের গলা হারিয়ে ফিরে এলো এক নিষ্ক্রিয় নির্জীব বুড়ো-হ'য়ে-যাওয়া নিঃশব্দ বাবার কাছে। তার প্রাক্তন গৌরবের সম্মান রেখে তাকে বিয়ে করলে—কে জানেন? বলিষ্ঠ, বোকাসোকা, বদ রসিকতায় ওস্তাদ সেই অমূল্য। সে-ও ধরা পড়েছিলো মিতুর সঙ্গে একই সময়ে; বক্স র ক্যাম্পে প্রচুর খেয়ে, প্রচুর ঘুমিয়ে স্বাস্থ্য আরো ভালো ক'রে ফিরেছিলো।...আপনি অবাক হচ্ছেন? কেন? মা নেই, বাবা অথর্ব, বিয়ে না-ক'রে উপায় কী মিতুর? আমি? আরে মশাই যে ততদিনে রতনদাসের জামাই হয়েছি, তা কি আর জানতে বাকি ছিলো কারো? তা ভাববেন না অমূল্য একটা ফ্যালনা লোক। কলকাতায় কোন্ অমূল্যচরণের নাম শোনেননি? 'আধুনিক' গানের নক্ষত্র, রবীন্দ্রনাথের গায়ের উকুন হ'য়ে যে 'গান রচনা' করে? যার কণ্ঠনিঃসৃত ন্যাকামির বন্যায় বাংলাদেশের চিরন্তন বালকবালিকারা হাবুডুবু খাচ্ছে? সেই অমূল্য। গাড়ি-হাঁকানো, 'ফাংকশন'-জমানো, তরুণী-মজানো অমূল্যচরণ, ফিল্মের প্লে-ব্যাকে নামজাদা মধুক্ষরা মজুমদারের সঙ্গে যার বিয়ের খবর শুনে অনেকেই খুশি হয়েছিলো কলকাতায়। তার প্রথম স্ত্রী নাকি যোগ্য ছিলো না তার, বড্ড সাধারণ ছিলো। আজ্ঞে? না, বিপত্নীক হবার মতো সৌভাগ্য হয়নি অমূল্যর, ডিভোর্স হয়েছিলো। তারপর? জানি না, কিছুই জানি না, কোনো বাতাসে মিতুর নাম আর ভেসে আসেনি আমার কানে।

বেশ মজার ব্যাপার—তা-ই না? যে-আবর্তে অনেক জীবন ডুবে গেলো, তা-ই থেকে লক্ষ্মী উঠে এলেন অমূল্যর জন্য। আর আমার ফটিক-মামা, তাকে মনে আছে তো আপনার? যে তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছিলো অন্য পুরুষের আলিঙ্গনে, আত্মহত্যায়—সেও পুরস্কৃত হ'লো। বিলেতে আমার প্রথম বছর পোরার আগেই একটি সুখবর দিয়েছিলেন মা। ফটিকের ব্যাবসা জ'মে উঠেছে এতদিনে, তার জর্মান বৌকে আর মেয়েকে সে আনিয়ে নিয়েছে কলকাতায়. ভালো আছে, বৌটির চুল কালো, চোখ কালো, ভারী সুশ্রী। হঠাৎ একটা গরম হলকা ব'য়ে গিয়েছিলো আমার বুকের মধ্যে, তারপরেই ভাবলাম : আমারই জন্যে অন্তত একজন মানুষ ইহুদী নাৎসিদের কবল থেকে মুক্তি পেলো—তা মন্দ কী। পৃথিবীতে অবিমিশ্র অমঙ্গল ব'লে কিছু নেই।

আপনি উঠতে চান? একটু, আর-একটু বসুন। বড্ড নিঝুম এই উটকামণ্ডের রাত—শীত বাইরে, সন্ধের পরে কারোরই কিছু করার থাকে না, যে যার গর্তে ঢুকে পড়ে। শুনছেন স্তব্ধতার আওয়াজ, কানের মধ্যে, ঝিঁঝির মতো? অসহ্য লাগে আমার—আসুন আমরা কথা ব'লে ব'লে স্তব্ধতার ঝিঁঝিগুলোকে ডুবিয়ে দিই। ভাবছেন আমার কথা শেষ হয়েছে? না। আমি সারারাত ধ'রে বলতে পারি, চিরকাল ধ'রে বলতে পারি। কিন্তু আপনি কিছু বলুন এবার, কিছু বলুন। আমার কাছে জবাবদিহি চাইবেন না? জিগেস করবেন না কেন আমি মিতুর কাছে ফিরে যাইনি? কেন তার দুঃখের দিনে আমি দাঁড়াইনি তার পাশে গিয়ে? কেন অমূল্যর স্ত্রী হ'তে তাকে বাধ্য করেছিলাম? ঠিক বলেছেন, এ তো সোজা কথা—এ আবার জিগেস করতে হয় নাকি? বাধা ছিলো—প্রকাণ্ড বাধা : কাজল। আর তাছাড়া সেই আমি তো আর ছিলাম না। আমি তখন অন্যভাবে তৈরি করছি নিজেকে। আবেগে আমার ঘেন্না, ভালোবাসায় আমার ঘেন্না; মহত্ত্ব, বীরত্ব, আদর্শ—এই বিখ্যাত কথাগুলোতে আমার ঘেন্না। আমি বুঝে নিয়েছি, ওগুলো এক-একটা রঙিন মোড়ক,

যার তলায় লুকিয়ে আছে বিষ, ছোরা, আগুন, সর্বনাশ। বুঝে নিয়েছি, তারাই ধন্য, যারা শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকে। তারাই জ্ঞানী, যারা ভালোবাসে না, করুণা করে না, মাথা ঠান্ডা রাখে সব সময়, সব সময়। আমি তো সেইভাবেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলাম, প্রাণপণ, প্রাণপণ চেষ্টায়। তারই জন্য তিলে-তিলে মেরে ফেললাম আমার স্ত্রীকে, হ'য়ে উঠলাম নারীমাংসের বনেদি খদ্দের; আমার অপ্রেমকে, প্রতিশোধকে চরমে টেনে নিয়ে গেলাম। তবু—পারলাম কই? তবু ভোলা গেলো না, জানেন। ফিরে যাইনি, কিন্তু ফিরে যে যাইনি তা এখনো কেন ভুলতে পারি না? এই কি আমার শাস্তি তাহ'লে? শাস্তি কেন? আমি তো কোনো দোষ করিনি, শুধু ভালো করতে চেয়েছিলাম, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। সেটাই অপরাধ? না কি যথেষ্ট ভালোবাসতে পারিনি, তাই কষ্ট? বলুন, যাবার আগে কিছু ব'লে যান আমাকে। আমি দোষী? আমি দুর্ভাগা? কোনটা? আমি ঘৃণ্য? আমি প্রেমিক? কোনটা? আসামির জবানবন্দি শুনলেন, এবারে একটা রায় দেবেন না ...কী? কথা নেই কেন মুখে? আপনি নিজে কী, মনে প'ড়ে' গেছে? আচ্ছা, আসুন তাহলে, আর আপনাকে আটকে রাখবো না। আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। নমস্কার। কাল আবার আসবেন।

শেষ
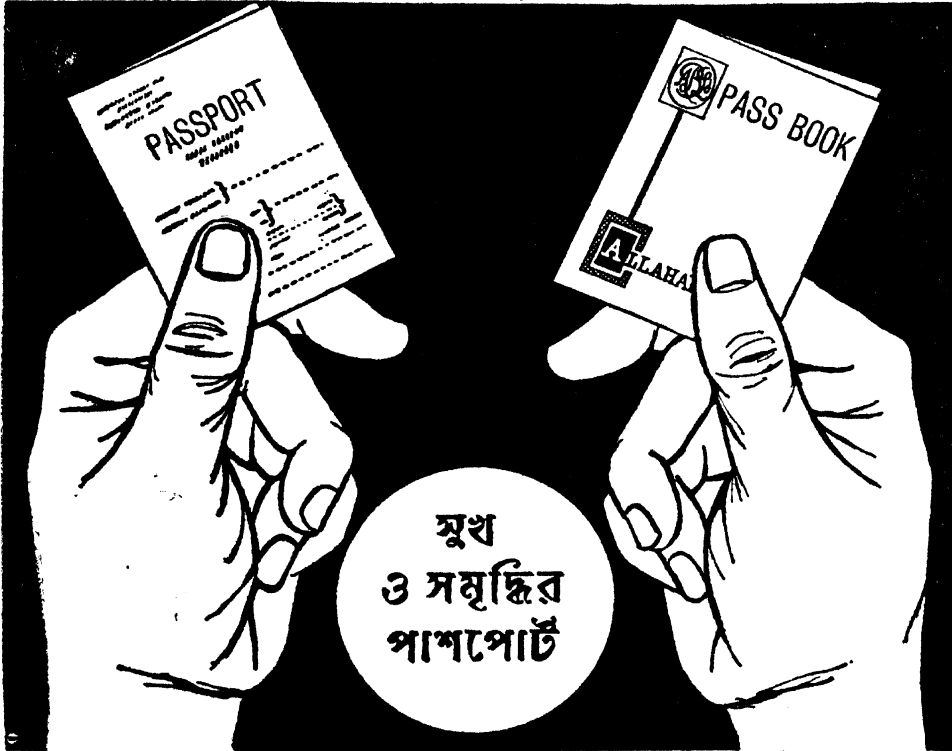
সরকারী পরিচালনায় ট্রাম

শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রামওয়ের পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ১৪ই জুলাই বিধানমণ্ডলীর উভয় সভায় যে বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো তাতে তিন বছরের জন্য ট্রামওয়ের পরিচালন-দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপর অর্পিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে বিলের কপি ইতিপূর্বেই পাঠানো হয়েছে এবং পরিবহন-মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু দিন-কয়েক আগে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনাও করে এসেছেন। ফলে আশা করা যায়, বিলটি দু-এক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করবে। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হলেই বিল কার্যকরী হবে।

যেভাবে এবং যে অবস্থার মধ্যে রাজ্য সরকারকে ট্রাম কোম্পানীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করতে হলো সেই প্রসঙ্গও এখানে স্বতঃই উঠবে। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে ট্রাম কোম্পানীর যে চুক্তি হয় তাতে এই শর্ত ছিলো যে ট্রাম কোম্পানী সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামগুলোকে প্রথম শ্রেণীর কোচে রূপান্তরিত করবেন এবং তারপর প্রতি পর্যায়ের ভ্রমণের জন্য উভয় ক্লাসে একই রূপ ভাড়া (১০ পয়সা) প্রবর্তন করবেন। এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর যে অতিরিক্ত আয় হবে তা থেকে বাড়তি খরচ মেটানোর পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা হলে তা রিজার্ভ তহবিলে রাখতে হবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেলো যে কোম্পানী তার পক্ষে পালনীয় শর্তগুলো কার্যকরী করার কোনো অভিপ্রায় না দেখিয়েই, অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো রকম উন্নতি না করেই হঠাৎ গত ২৪শে মার্চ মাত্র একদিনের নোটিশে ট্রামের উভয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণীর কোচে রূপান্তরিত করার পূর্ব-শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব নয় বলে কোম্পানী যে যুক্তি দেখালেন তা চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর মাত্র। এই অবস্থায় ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে এক আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্ট এই ব্যাপারে ইনজাংশন জারী করে। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্পর্কে এক অর্ডিনান্স জারী করেন এবং ভাড়া বৃদ্ধির দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশ করার ভার দিয়ে একটি তদন্ত কমিশনও নিয়োগ করেন।

রাজ্য সরকারের এই অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে ট্রাম কোম্পানী হাইকোর্টে সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী এক আবেদন করেন। ট্রাম কোম্পানীর বক্তব্য এই যে, ট্রাম কোম্পানী রেলওয়ের সমগোত্রজ কাজেই রাজ্য সরকারের ট্রাম সম্পর্কে কোনপ্রকার আইন প্রবর্তনের অধিকার নেই। তা ছাড়া, কোম্পানীর কার্যক্রমের ওপর এইভাবে বাধানিষেধ জারী কোম্পানীর পরিচালন কর্তৃত্ব আংশিকভাবে গ্রহণেরই সমতুল্য এবং বিনা ক্ষতিপূরণে সম্পত্তি দখলের নামান্তর। এই ধরনের কাজে রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন নেওয়া দরকার অথচ তা নেওয়া হয়নি। কাজেই, এই অর্ডিনান্স বাতিল বলেই ঘোষিত হওয়া উচিত। শুক্রবার হাইকোর্টে এই আবেদনের শুনানী হয়। হাইকোর্ট রুলিং মুলতুবী রাখেন।

অর্ডিনান্সের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে ট্রাম কোম্পানীর আবেদনে হাইকোর্টের রুলিং-এর ওপরই রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ভর করছে। তবে সরকার অর্ডিনান্স জারী করার পর ট্রাম কোম্পানী অকস্মাৎ যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা বিচিত্র। জুলাই মাসের সূচনাতেই কোম্পানী হঠাৎ সরকারকে জানান যে কর্মচারীদের সাত তারিখের মধ্যে মাইনে দেওয়ার মতো অর্থ তার নেই। সরকার যদি ২০ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফ্ট নেওয়ার জন্য গ্যারান্টি দেন তাহলেই তার পক্ষে মাইনে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়, কোম্পানীকে ভাড়া বৃদ্ধির জন্যও অনুমতি দিতে হবে। বিস্ময়ের বিষয় যে, এই ঘোষণার পূর্বে ট্রাম কোম্পানী রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। এমন কি, রাজ্য সরকার যাতে পরামর্শের কোনো সুযোগ না পান, সেজন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা রাতারাতি লণ্ডনে সরে পড়েন। দরিদ্র কেরানী ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার মত অর্থ তাঁদের না থাকলেও যাওয়ার আগে তাঁরা পদস্থ কর্মচারীদের বেতন মিটিয়ে দিয়ে যান।

কোম্পানীর এই সুস্পষ্ট অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তাঁকে বর্তমান দায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ১১ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে সম্মত হন। কিন্তু কোম্পানী তাতে সম্মত নন। এই অবস্থায় কোম্পানীর পরিচালন-ভার রাজ্য সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ান্তর ছিলো না। ট্রাম যদি অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যেতো তাহলে নগরীর বর্তমান অপর্যাপ্ত পরিবহণ-ব্যবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতো। অপর পক্ষে, ট্রামে কার্যরত এতগুলো কর্মচারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁরা নীরব থাকতে পারেন না। কাজেই রাজ্যের বাজেটের সংকটজনক অবস্থা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের তিন বছরের জন্য ট্রাম কোম্পানীর পরিচালন-ভার নিজেদের হাতে গ্রহণের সিদ্ধান্ত করতে হয়।

এর পরই ট্রাম কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ ই এইচ গ্যাসকেল হঠাৎ লণ্ডন থেকে বুধবার কলকাতায় ফিরে আসেন। ঐ দিনই কলকাতাস্থ বৃটিশ ডেঃ হাইকমিশনার মিঃ জি ম্যাকেঞ্জি শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ট্রাম কোম্পানীর পরিচালন-ভার রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রহণের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের একখানি স্মারকলিপি পরিবহণ-মন্ত্রীকে দেন। স্মারকপত্রে মোটামুটিভাবে যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে তা এই : রাজ্য সরকার যে ভাবে ও অবস্থায় ট্রাম কোম্পানীর পরিচালন কর্তৃত্ব নিচ্ছে চলেছেন তাতে বৃটিশ সরকার উদ্বিগ্ন, রাজ্য সরকার ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সরকারের অনুমতিসাপেক্ষ করে যে অর্ডিনান্স জারী করেছেন তা কোম্পানী চুক্তিভঙ্গের সামিল বলে গণ্য করে, এবং তৃতীয়তঃ এই প্রচ্ছন্ন হুমকী যে, এই বৃটিশ কোম্পানীর প্রতি যে ভাবে আচরণ করা হচ্ছে তা বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং হয়তো পশ্চিমবঙ্গে বৃটিশ লগ্নী এর ফলে ব্যাহত হবে।

বলা বাহুল্য, এই হুমকী সরকার এবং বিরোধী দল কারুর পক্ষেই হজম করা সম্ভব ছিলো না। পরিবহণমন্ত্রী বলেন যে, ট্রাম কোম্পানী তার কর্মচারীদের যে অবস্থার মধ্যে ফেলেছিল, জনসাধারণকে তারা যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্মুখীন করেছিল তা যদি বৃটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তা হলে বৃটেনের গণতান্ত্রিক জনমতের কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ থাকবে বলে তিনি মনে করেন না।

বিলটি যেদিন বিধানমণ্ডলীতে উত্থাপিত হয়, সেদিন সরকার পক্ষ বা বিরোধী দল কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিলেন না। কংগ্রেস আমলের পরিবহণমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন, আমরা সকলে একযোগে এই ব্যবস্থা সমর্থন করছি। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অপরি-

হার্য হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রাম কোম্পানীর জাতীয়করণই হয়তো প্রয়োজন হয়ে পড়বে। অবশ্য এই প্রসংগে তিনি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৫১ সালের চুক্তি অনুযায়ী, ট্রাম জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করলে কোম্পানীকে ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিলো যা ডিভ্যালুয়েশনের পর সাড়ে নয় কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া, ট্রাম কোম্পানীর পরিচালন-ভার নিলেই শুধু হবে না, যাত্রীদের সুখ-সুবিধা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য সরকারকে নজর দিতে হবে।

ট্রাম কোম্পানীর পরিচালন-ভার রাজ্য সরকার নিলে বৃটিশ জনসাধারণ আতঙ্কিত হবে বলে বৃটিশ সরকারের স্মারকলিপিতে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সমস্ত ঘটনার পটভূমিকায় এই কথা কতখানি যুক্তিসংগত তা তর্কের বিষয়। মিঃ ম্যাকেঞ্জিও জ্যোতি বসুর সংগে আলোচনার কালে স্বীকার করেছেন যে তিনি সমস্ত ঘটনা জানতেন না। যে শিল্পের সংগে জনস্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সরকার কখনো নীরব থাকতে পারেন না। এর আগে দেশীয় শিল্পের বহু ক্ষেত্রেও এই হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছে। ইতিপূর্বে কংগ্রেসী আমলে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকেও এইভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর বৃটিশ মালিকানাভুক্ত হলেও তার বিপুলসংখ্যক অংশীদার ছিলো এদেশীয়। কাজেই এখানে বিদেশী মালিকানায় হস্তক্ষেপ সরকারের লক্ষ্য নয়, দেশের জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যে কোনো প্রকার আশঙ্কা বা হুমকি সত্ত্বেও তাদের পক্ষে এ ব্যাপারে পেছপাও হওয়া সম্ভব নয়।

সিকিমের দিকে মাও-এর মুখ

মাও এর মুখ সিকিমের সিকে ফেরানো রয়েছে।

ভুটান, সিকিম সীমান্তে চীনাদের তৎপরতার খবর নতুন নয়, মাঝে মাঝেই আমরা বিভিন্ন সূত্রে এই সংবাদ শুনে আসতে অভ্যস্ত। কিন্তু এবারকার সংবাদের বিশেষত্ব এই যে, খাস মস্কো বেতারে এই খবর প্রচারিত হয়েছে যাকে সরকারী সূত্র ছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মস্কো বেতারের এই খবরে প্রকাশ, চীন, ভুটান ও সিকিম সীমান্তে এক ডিভিসন পার্বত্য সৈন্য পাঠিয়েছে যারা গেরিলা যুদ্ধ ও নাশকতামূলক কাজে দক্ষ। এরা প্রতিদিনই এই দুটি পার্বত্য রাজ্যের সীমান্তে মহড়া চালাচ্ছে। ভুটান ও সিকিমে এই ব্যাপার নিয়ে বেশ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সিকিম সীমান্তে নাকি যেসব সীমানা স্তম্ভ আছে তাতে মাওএর ছবি লটকে দেওয়া হয়েছে, এমনকি, সিকিমের দিকেও মাও-এর ছবি ঝোলানো হয়েছে। সংবাদে সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, ভুটান ও সিকিমের কাছে চীন যে ভূমি দাবী করে, তা আদায়ের জন্য সে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বরণ সিং অবশ্য লোকসভায় বলেছেন যে, তিনি ভুটানের কাছ থেকে এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো আভাস পাননি এবং সিকিম সীমান্তে চীনের নতুন কোনো সৈন্য সমাবেশের খবরও অবগত নন।

তবুও লাটিটিলা-ডুমাবাড়ী অঞ্চলে আসামের চারটি গ্রাম পাঁচ বছর পাকিস্থানের কুক্ষিগত থাকার পর অকস্মাৎ যেভাবে খবরটি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সামান্য আশ্বাসে দেশবাসী সন্তুষ্ট হতে পারে না। সোভিয়েট সরকার ভারত-চীন সীমান্তের ব্যাপারে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সংযম অবলম্বন করেছিলেন, অকস্মাৎ তা ভঙ্গ করে তাঁদের এই ঘোষণার তাৎপর্য নিশ্চয়ই একেবারে তাচ্ছিল্য করার নয়।

চীন-ভারতের সীমান্তকে বিপন্ন করার জন্য যে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা অনস্বীকার্য। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে সিনকিয়াং থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত যে পাক-চীন মৈত্রী সড়ক কয়েক বছর আগে নির্মিত হয়েছে, তা ঐ অঞ্চলে ভারতের নিরাপত্তা ব্যাহত করেছে। গত মাসে তিব্বত ও নেপালের মধ্যে সংযোগ হিসাবে চীনাদের দ্বারা নির্মিত যে কাঠমাণ্ডু-কোডারি রোড উন্মুক্ত হলো, তা-ও ভারতের পক্ষে শুভ ঘটনা নয়। এবং পার্লামেন্টে সদস্যরা এই সম্পর্কে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি। যদিও প্রধানমন্ত্রী গান্ধী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাগলা তাঁদের এই বলে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে, পার্লামেন্টে এই ধরনের বিতর্ককে নেপাল তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করেও, এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কোডারির অবস্থিতি তিব্বত থেকে মাত্র চার মাইল দূরে, যেখানে চীন তার বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে এবং সে-সমাবেশের লক্ষ্যও ভারতের অজ্ঞাত নয়। ভবিষ্যতে ভারত-চীন সম্পর্ক নতুন কোনো পর্যায়ে উপনীত হলেও এই ব্যাপারে নেপালের কতখানি সহযোগিতা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে ভারত সরকারের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এবং একক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি পার্লামেন্টে ভারত-রক্ষা ও নেপালের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদনের যে-প্রস্তাব উঠেছিল, নেপাল সরকার সরাসরিই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কাজেই, ভারতের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য তৎপর হওয়াই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং এর ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যে-কোনো প্রতিক্রিয়াকেই গৌণ ব্যাপার বলে গণ্য করতে হবে।

অন্তহীন অন্নচিন্তা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকটের কালো মেঘে আশার আলোক রেখা শীঘ্র দেখার সম্ভাবনা নেই। ১২ জুলাই বিধানসভায় খাদ্য নীতি সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তর দেবার সময় খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরাসরিই জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী চার মাসে সংকট তীব্রতর হবে।

চার মাস পরেও যে অবস্থার খুব একটা সুরাহা হবে তেমন কোন ইঙ্গিত ডঃ ঘোষ দিতে পারেননি। বরং তিনি সাবধান হওয়াকেই প্রচার শ্রেষ্ঠাংশ বলে ধরে নিয়েছেন। বলেছেন, আগামী বছরে অবস্থা আরো গুরুতর আকার ধারণ করবে।

সেই সঙ্গে আরো দুটি সংবাদ তিনি পরিবেশন করেছেন যা বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বিগ্ন করবে। তাদের ছাটাই রেশন একেই আরো ছাটাই করা হয়েছে এবং বর্তমান সরবরাহ বজায় রাখাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এখন বলা হচ্ছে চিনির পরিমাণ আরো কমানো হবে এবং যারা আয়কর দেয় (এই শ্রেণীর মধ্যে যারা রয়েছে তারা সংসার নির্বাহে আর কারো চেয়ে কম নাজেহাল নয়) তাদের চালের দাম বেশি দিতে হবে।

এদিকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আংশিক রেশনের নামে যেটুকু ব্যবস্থা সেখানে চালু ছিল তাও প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। সাধারণের ঘরে এক মুঠো বাড়তি চাল নেই। খোলা বাজারে চাল সব জায়গায় ও সব সময় পাওয়া যায় না। যেখানে ও যখন পাওয়া যায় তার দাম আড়াই টাকার নীচে নয়। জোর করে চাল আটক এবং লুটপাটের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর ফলে বাজারে আরো অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা ভরসা করে চাল বাজারে ছাড়তে সাহস পাচ্ছে না।

এই দ্বিবিধ চাপের মুখে রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি আজ ভীষণভাবে বিপন্ন।

পশ্চিমবঙ্গ এমনিতেই ঘাটতি রাজ্য, তার ওপর এবার উৎপাদন হয়েছে কম, মাত্র ৪৫ লক্ষ টন। অথচ প্রয়োজন ৬০ লক্ষ টন।

এই ঘাটতি অনেকাংশে মেটানো সম্ভব হত যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুত ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করতেন। এখন পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টনের বেশি পাওয়া যায়নি। এটা কেন্দ্রের দুরভিসন্ধি না হতে পারে কিন্তু এটা রাজ্যের পক্ষে খুব সহায়ক নয়।

বিপদকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের ব্যর্থতা। মাঝ-বৎসরের অনটন উত্তীর্ণ হবার জন্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গত মার্চ মাসে ১৫ জুনের মধ্যে ২ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের আশা ব্যক্ত করেছিলেন। এই পরিমাণ চাল সংগৃহীত হলে নতুন ফসল ওঠার সময় পর্যন্ত কোন রকমে চলে যেত। কিন্তু সে আশা আদৌ পূর্ণ হয়নি। ডঃ ঘোষ ১২ জুলাই বিধানসভায় জানিয়েছেন যে, ১০ জুলাই পর্যন্ত মাত্র ১৭০৭ হাজার টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

সংগ্রহের ব্যর্থতার জন্যে কয়েকটি কারণ একসঙ্গে কাজ করেছে। প্রথমত, রাজ্য সরকার যখন সংগ্রহের কাজে নামেন তখন সংগ্রহের উপযুক্ত মরশুম প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্তঃজেলা কর্ডন তুলে দেওয়ায় মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা চাল ও ধান সরিয়ে ফেলবার অবাধ সুযোগ পেয়েছে। তৃতীয়ত, লেভি প্রথা তুলে নেওয়ায় উৎপাদকদের ওপর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। চতুর্থত, প্রথম দিকে মজুতদার ও জোতদারদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে অনেক সময় নষ্ট করা হয়েছিল।

এই বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজ্য সরকার সম্প্রতি মজুতদার ও জোতদারদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই অনুসারে নিবর্তনমূলক আটক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ সত্ত্বেও অবস্থার হেরফেরের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত ২৭২ জনকে আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে অনেকেই সমাজ-বিরোধী শ্রেণীভুক্ত লোক, ও বেশ কিছু মাঝারি ও ছোট জোতদার ও চালকল মালিক। বড় জোতদার ও কল মালিকের সংখ্যা সামান্যই।

রাজ্য সরকারের সামনে একটা বড় ভরসা ছিল আউশ ধানের সংগ্রহ। এবার আউসের ফলন হয়েছে সাড়ে ৫ লক্ষ টন। তার মধ্যে অন্তত লাখখানেক টন সংগ্রহ করা যাবে এই আশা সরকারের ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাজার টনের বেশি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

আর অন্য রাজ্য থেকে সংগ্রহের আশাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। কারণ উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি কিছুতেই নিজেদের চাল ছাড়তে রাজী হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত কেবল পাঞ্জাব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় পরিমাণের বাইরেও ৫ হাজার টন ক্ষুদ্র রাজ্য সরকারকে দিতে চেয়েছেন। ডঃ ঘোষের কথায়, এ এক অদ্ভুত অবস্থা :

সড়ক সৌধ কানাগলি

সকালবেলা থেকেই আকাশে ঝকমকে রোদ্দুর ছিলো। মেঘের লেশমাত্র ছিলো না কোথাও। হঠাৎ দুপুরবেলা মন্থর হয়ে এলো আকাশ। চমৎকার বৃষ্টি নামলো একটানা বিকেল পর্যন্ত। আজ যে রথের মেলা বসবে—একথা মনেই ছিল না। আবহমানকাল এই রথের দিন বৃষ্টি অনিবার্য। দু-এক পশলা বৃষ্টি হতেই হবে। নতুবা অশুভের ইঙ্গিত—বছর ভালো যাবে না বলে সংস্কারমুখর হয়ে ওঠে মন আমাদের। বিজ্ঞানসম্মতভাবেও আষাঢ়েই যে বৃষ্টির শুরু হওয়া উচিত, নচেৎ চাষবাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়—সেই সত্য কিভাবে আমাদের সংস্কারময় জীবনযাপনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে।

ছেলেবেলার সেই রহস্যময় রথযাত্রা হয়ে গেলো রবিবার। ছেলেবেলার বলছি কেন? পুরীর জাঁকজমকপূর্ণ ভিড়ে ভিড়াকার রথযাত্রা দেখলে কি আর ছেলেবেলার কথা মনে হবে? তা হবে না মোটেই। এ শুধু কলকাতা শহরের, শহরতলির কথা বলছি। সারা কলকাতা শহরে এদিনে শিশুদেরই আনন্দ। সেই আনন্দে বড়োরাও এসে যোগ দেন। বাড়িতে সেই ক্ষুদে রথ ফুলে-পাতায় সাজানো হয়। টর্চএর ব্যাটারি থেকে ডুম সরিয়ে ব্যবস্থা হয় আলোকমালার। চূড়ায় কোথাও বা বেঁধে দেওয়া হয় তেরঙ্গা পতাকা। কোথাও বা লাল শালুর টুকরো—যার যেমন জোটে। বাঁধাধরা নিয়মকানুন নেই কিছু। মায় পুজো-আচ্চা পর্যন্ত নেই—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট আমোদ। বাড়ির শিশু রথ সাজিয়ে তোলার পর আর কিছুতেই বাড়ি থাকবে না, পথে বেরিয়ে পড়বে—রথের রশি ধরে টানতে-টানতে গলি থেকে রাজপথে নেমে আসবে। সেকি হৈ-চৈ, চিৎকার চেঁচামেচি, অনবরত জোকারধ্বনি—জয় জগন্নাথদেবকি জয়—গর্জে ওঠে কণ্ঠের সম্মেলন। রথ এগোয়, সামনে পিছনে অপোগণ্ড নতুন পান্ডার দল। শাঁখ বাজে, ওঠে সমানে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল। উত্তর কলকাতার দিকে এই রথযাত্রা একবার না একবার গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে প্যান্ডা পড়ে বিস্তর। সাধারণ পথচারী হাত তুলে এই খেলার রথের দেবতাত্রয়ীর উদ্দেশে প্রণাম জানায়। প্রণামী দেয়। বাচ্চার দল হৈ-চৈ করে ওঠে। সাধারণ টিন বা কাঠের রথে দেবতার অধিবেশন এভাবেই শুরু হয় খেলাচ্ছলে। বড়োরাও বুঝি আর অবহেলা জানাতে সাহস করেন না, তাঁদের একরকম সমীহবোধ হতে থাকে; কে জানে বাবা সত্যকারের দেবতাই হয়তো এদের কাছে এসে হাজির। দেবদেবতার খেয়াল-খুশির কথা তো সর্বজনবিদিত। তাঁরা এই নতুন তন্ময় ভক্তের দলকে রথসুদ্ধু পথ থেকে ঘরে তোলার জন্যে তাড়া দেন। রাত কম নয়। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে? বিহ্বল ভক্তের দল তাঁদের এই ধরার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠেঃ জয় বাবা জগন্নাথ দেব কি—জয়।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সম্ভবত আজকের দিনের স্কুল-কলেজের ছেলেরা কেউই পড়েননি অথচ ফ্যানী হিল-এর নাম নখদর্পণে! যাক, সেই হুতোমের কলকাতায় এক মাতাল হঠাৎ রঙ্গ ভেঙে রথ দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলো। সেপাইপেড়ে ধুতি পরে, কোমরে রংদার রুমাল বেঁধে সর্বোত্র চিৎপুরের রাস্তায় ছেলের দল যখন রথ নিয়ে হৈ-হৈ-এ মত্ত, মাতাল ভিড় ঠেলে কোনোরকমে এগিয়ে এসেছিলো। রথকে মাতৃ-সম্বোধনে ভূষিত করে সে যে তৎক্ষণাৎ ছড়া রচনা করেছিলো তা ভারি কৌতূহলোদ্দীপক। সে তারস্বরে গান ধরে ঃ

কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুর ঘুরালি!
মা তোর সামনে দুটো কোটো ঘোড়া
চূড়োর ওপর মুকপোড়া
চাঁদ চামরে ঘণ্টা নাড়া
মধ্যে বনমালী!

আদৎ কলকাতার সেই সাবেকি ছবি আজ অনেকটা পানসে। দিনকাল বড়ো কঠিন—সেই আমোদ-আহ্লাদের রেশ কোথাও বজায় রাখা ভারি শক্ত। তবুও গোটা কলকাতা ছাড়িয়ে বেশ কয়েকটি ছোটো-বড়ো মেলা বসে বরাহনগর থেকে শুরু করে বেহালা সিদ্ধেশ্বরীতলার মেলা পর্যন্ত, মধ্যে জমজমাট শিয়ালদা। সে মেলায় নাগরদোলা থেকে শুরু করে মৃত্যুকূপ, মাস্টার জগুর চিত্তহারী কায়দা-কারদানি, পা দিয়ে তবলায় লহরা তোলা এসব তো আছেই, সেই সঙ্গে পোড়া তেলের গন্ধে মন্থর বাতাসে ভেসে বেড়ায় কলের গানের বিধ্বস্ত হিন্দী কণ্ঠ। কোনো মেলাই এখন আর আলাদা কিছু নয়। শহরে বিশিষ্টতা বজায় রাখা ভারি শক্ত। পুজো-আচ্চা আজ এক ধরনের বৈশিষ্ট্যবিহীন উপলক্ষ। তাকে কেন্দ্র করে একদিকে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি পসরা সাজিয়ে বসা, শাক-সব্জি, ফুল-ফলের গাছের সমারোহ, লাল-নীল মাছ, পাখি পশু জীবজন্তু—ছোটোখাটো সার্কাসের তাঁবু পাতা দিন কয়েকের জন্যে। রথের মেলা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী। উল্টোরথের দিন পর্যন্ত এই মেলা—সপ্তাহব্যাপী জাঁক-জমকের আয়োজন কলকাতার এক সাময়িক আকর্ষণ।

অন্যান্য বছরের তুলনায় মেলা—বিশেষ করে, শিয়ালদার বড়ো মেলা এবারে বেশ নিষ্প্রভ; মোটেই জমেনি। তেমন পসরা সাজিয়ে আসেনি গ্রামাঞ্চল থেকে বিক্রেতার দল। আমোদ-আহ্লাদের ভাগও এবারে যথেষ্ট স্বল্প। যা এসেছে তার দামও আকাশছোঁয়া, হাত দেওয়ার উপায় নেই। তবু তারই মধ্যে ঘর-গেরস্থালির টুকরো-টাকরা জিনিস বিক্রি হচ্ছে নিয়মিত। শস্যের আর রবি ফসলের বীজ, গাছপালা বিক্রি হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে। এই তো সুযোগ—গাছপালা টবেই লাগান বা মাটিতে—বর্ষার দু-এক পশলা পেলেই শিকড় বসাতে দেরি হবে না। রথের মেলা তাই প্রকৃতপক্ষে ফুল-ফলের গাছের মেলা, লাল-নীল মাছের মেলা, পায়রা-পাখির মেলা—মেলার চরিত্রে, এককথায়, বাল-ভোলানো ভাবটা আছে কিনা দেখুন।

—রূপচাঁদ পক্ষী

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

অনিবার্য কারণে 'আজকের কথা' স্তম্ভে গেল তিন হপ্তা ধরে পর্যায়ক্রমে আলোচিত 'পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধ্যানধারণা' প্রবন্ধটির ৪র্থ স্তবকটি এবারে প্রকাশিত না হয়ে আসচে সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। —নান্দীকর

চিত্র-সমালোচনা

হরে কাঁচ কী চুড়িয়াঁ (হিন্দী) : কিশোর সাহু প্রোডাকসন্স (প্রাঃ) লিমিটেড-এর নিবেদন; ৪,৪০৩·৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, পরিচালনা ও প্রযোজনা : কিশোর সাহু; সঙ্গীতপরিচালনা : শঙ্কর জয়-কিষণ; গীতরচনা : শৈলেন্দ্র ও হসরৎ জয়পুরী; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : কে, এইচ, কাপাডিয়া; শব্দানুলেখন : নাসির; সঙ্গীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক; শব্দ-পুনর্যোজনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সন্ত সিং; নৃত্যপরিচালনা : পি এল রাজ; সম্পাদনা : কান্তিলাল, পি, শুক্লা; নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : আশা ভোঁসলে, মোহাম্মদ রফী ও শার্দা; রূপায়ণ : বিশ্বজিৎ, শিবকুমার, রাজেন্দ্রনাথ, নাজির হোসেন, সপ্রু, এস-এন বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়না সাহু, হেলেন, মৃদুলা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ললিতা পাওয়ার, সুমতি গুপ্তে, মীনা, টুনটুন, মাস্টার পাপ্পু প্রভৃতি। মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ১৪ই জুলাই, শুক্রবার থেকে জ্যোতি, বসুশ্রী, বীণা, নাজ, মেনকা, পূর্ণশ্রী, ইন্টালী, চিত্রপুরী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

"বর্তমানে ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যে বহু স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের তরুণ-তরুণীদের উপযুক্তভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যৌনশিক্ষা দেওয়া হয় না এবং যৌনমিলনের দায়িত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত করা হয় না বলে বহু ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ অনেক তরুণতরুণীর জীবন থেকে সুখ-শান্তির স্বপ্ন চিরতরে অন্তর্হিত হয়। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় থেকে মুক্তিলাভের জন্যে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায় না; তিনি বলেন : ভ্রূণহত্যা মহাপাপ।" —এই সমস্যাকে সামনে রেখেই কিশোর সাহু প্রোডাকসন্স-এর সুদীর্ঘ ইস্টম্যান কলার চিত্র "হরে কাঁচ কী চুড়িয়া" নির্মিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য ছবিটিতে যে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের ঘটনা ঘটেছে, সেটি কিন্তু একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষালাভের প্রত্যক্ষ ফল নয়। কারণ নায়ক রবির সঙ্গে নায়িকা মোহিনীর প্রেম সঞ্চার হয়েছে প্রথম দর্শনেই,

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত **প্রতিদান** চিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা।

যখন রবি আরও ছজন বন্ধুর সঙ্গে দেশে ফিরেছে বড়দিনের (খ্রীস্টমাসের) ছুটি উপভোগ করতে এবং বন্ধু বিপিন বসুকে তার বাড়ীতে নামাতে এসে তার প্রতি-বেশিনী মোহিনীকে সামনে পেয়েছে। ছুটি শেষ হবার আগেই ওরা নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং ওদের দৈহিক মিলনও ঘটেছে। দেশত্যাগ করবার আগে নায়ক নায়িকার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যায়, তিন মাস যেতে না যেতে পরীক্ষা দেবার পরে সে দেশে ফিরবে নায়িকার জন্যে সবুজ রঙের কাঁচের চুড়ি নিয়ে এবং সাদা ঘোড়ায় চেপে বরবেশে তার কাছে এসে নিজের হাতে তার হাতে ঐ সবুজ কাঁচের চুড়ি পরিয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসবে। ওদের সমাজের প্রথাই হচ্ছে, নববধূকে বর নিজের হাতে সবুজ কাঁচের চুড়ি পরিয়ে দেয়। মোহিনী ভবিষ্যতের এই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে; কিন্তু যেদিন হঠাৎ প্রকাশ পায়, ও মা হতে চলেছে, সেদিন থেকে ওর দুঃখের অবধি থাকে না। রবির বাপ মোহিনীকে বধূরূপে গ্রহণ করে তার কলঙ্কমোচনের প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অগ্রাহ্য করে এবং রবি কোনো কিছু জানবার আগেই তাকে

মিথ্যে অছিলায় আমেরিকা নিয়ে যায়। এদিকে মোহিনী নির্বিঘ্নে পুত্রসন্তান প্রসব করে তাকে সযত্নে লালনপালন করতে থাকে। তার চারিত্রিক মাধুর্য ও দৃঢ়তা দেখে আগে যারা তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল, তারাই ক্রমে তার সম্বন্ধে প্রশস্তির প্রতি-যোগিতা শুরু করে দিল। বছর তিনেক বাদে রবি দেশে ফিরেই তার বাপের মুখ থেকে শুনল, চরিত্রহীনা মোহিনী তার প্রতিবেশী বিপিনের অঙ্কশায়িনী হয়ে কুমারী অবস্থায় সন্তানের জন্ম দিয়েছে। মোহিনী বিশ্বাসঘাতিনী শুনে রবি প্রথমে উন্মনা হয়ে উঠল, পরে তার পিতৃনির্বাচিত কন্যা পুষ্পার সঙ্গে বিবাহে স্বীকৃতি দান করল। এর পর যখন সে বরবেশে বাদ্য-সহকারে শোভাযাত্রা করে বিবাহবাসরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন যে-আকস্মিক উপায়ে তার চোখের সামনে থেকে মিথ্যার আবরণ সরে গিয়ে সে প্রকৃত তথ্যের মুখোমুখি হল, তাই নিয়েই ছবির উত্তেজক এবং আবেগপূর্ণ শেষাংশ রচিত হয়েছে।

অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে বিষয়বস্তুরূপে অবলম্বন করে আজ পর্যন্ত যতগুলি হিন্দী চলচ্চিত্র দেখেছি, যতদূর মনে পড়ে, তার সব-গুলিতেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা নায়কের সঙ্গে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায়ে লাঞ্ছিত কুমারী নায়িকার সমাজসম্মত বিবাহ ঘটিয়ে। কিন্তু সকলেরই জানা আছে, বাস্তব জীবনে অত সহজে সমস্যার সমাধানে পৌঁছোনো ক্বচিৎই ঘটে থাকে। মাত্র সম্ভোগলিপ্সার বশবর্তী হয়ে তরুণীদের সর্বনাশ সাধন করার পরেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, এমন যুবকের অভাব নেই পৃথিবীর সকল সমাজেই। কিন্তু এ ছাড়া ছবির নায়ক-নায়িকার মতোই পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমে আসক্ত হবার পরে পূর্বাপর বিবেচনা ও বিবাহের জন্যে অপেক্ষা না করে যদি কোনো তরুণ-তরুণী দৈহিক সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং তার ফলে তরুণীটি সন্তানসম্ভবা হয়, তাহলে সেই বিশেষ ক্ষেত্রেও কখনো কখনো দেখা যায় যে, হয় তরুণটির চিন্তাধারার সহসা পরিবর্তন ঘটে কিংবা বিশেষ শক্তিশালী বিরুদ্ধ পরিস্থিতির কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং তরুণীটিকে শেষপর্যন্ত বিবাহ করে না। অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের এইসব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হবার সাহস ও শক্তি অল্প কাহিনীকারেরই আছে এবং সেই কারণে 'যা পদ্য মিলে যা' গোছের সমাধান ছাড়া অন্য কিছু হিন্দী ছবির মাধ্যমে দেখবার আশা করাই অন্যায়।

সাম্প্রতিককালের বোম্বাই-নির্মিত হিন্দী ছবিতে এই ধরনের কোনো-না-কোনো সমস্যার অবতারণা করা একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু ছবির সামগ্রিক গঠনে কোনো বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ মেলে না; কিছুটা মেলোড্রামা, নাচগান ও মিথ্যা আবেগভরা কিছুটা প্রেমের দৃশ্য, পিকনিক পার্টি ও ক্লাবের দৃশ্য এবং অশালীন হাস্যকৌতুক ও ভাঁড়ামির দৃশ্য—এদেরই একটা জগাখিচুড়ি হচ্ছে বর্তমানের বোম্বাই-মার্কা ছবি। বলা বাহুল্য, "হরে কাঁচ কী চুড়িয়াঁ"ও এর ব্যতিক্রম নয়।

ছবির অভিনয়াংশের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, নায়িকা মোহিনীর ভূমিকায় নয়না সাহুর কথা। এই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ হলে তজ্জনিত জড়তা তাঁর অভিনয়ে কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি; অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে তিনি তাঁর ভূমিকাটিকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর চোখ দুটি সুন্দর ও ভাবপ্রকাশক এবং তিনি ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী; তাঁর মুখাবয়ব আরও ক্যামেরাগ্রাহ্য (ফোটোজেনিক) হলে ভালো হত। নায়করূপে বিশ্বজিৎ হিন্দী চিত্রের ধর্মানুসারে স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন; ঠিক এই একই ভূমিকায় তাঁকে আমরা দেখেছি ক'দিন আগে সত্যেন বসু পরিচালিত 'আসরা' ছবিতে। মোহিনী বিশ্বাসঘাতিনী, এই কথা শোনবার এবং পথের মাঝে সেই মোহিনীর মুখ থেকে কিছু রূঢ় ভাষণ শোনবার পরে বাড়ীতে ফিরে রবির কিছুক্ষণের জন্যে উন্মনা এবং আত্ম-বিস্মৃতের ভাব তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। নাজির হোসেন বর্তমান ছবিতে হয়েছেন অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কলঙ্কলিপ্ত নায়িকার অধ্যাপক-পিতা; একদিকে পিতৃস্নেহ এবং অবিমৃষ্যকারী কন্যার প্রতি সহানুভূতি এবং অপরদিকে সমাজের নিগ্রহে সম্পূর্ণ অসহায়তাব তিনি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। রবির বাঙালী বন্ধু বিপিন বসুর ভূমিকায় শিবকুমার মোহিনীর প্রতি নিরুচ্চার প্রেম ও সহানুভূতিকে সুন্দররূপে রূপায়িত করেছেন। বিপিনের বাপ-মা বেশে যথাক্রমে এস-এন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতা পাওয়ার সুন্দর দুটি টাইপ সৃষ্টি করেছেন। রবির প্রতি কামনালুব্ধ পুষ্প মালহোত্রার ভূমিকায় হেলেন নাচে-গানে-ভাবে-ভঙ্গীতে চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। অপরাপর ভূমিকায় রাজেন্দ্রনাথ (জিমি), সপ্রু (রবির পিতা অমরচাঁদ), সবিতা চট্টোপাধ্যায় (জুলি), মাস্টার পাপ্পু (বালক অজয়), মীনা (রবির ভগ্নী মঞ্জু) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির ছ'খানি গানে শংকর-জয়কিষণ কৃত সুর উপভোগ্যতা সৃষ্টি করলেও কোনো রকম অভিনবত্ব অনুভূত হল না। নৃত্যে নয়না সাহু পারদর্শিতা দেখিয়েছেন; বিশেষ করে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তাঁর ব্যালে নৃত্যের অনুরূপ সুষমামণ্ডিত পদক্ষেপ উচ্চ-প্রশংসার দাবি রাখে।

কিশোর সাহু কৃত "হরে কাঁচ কি চুড়িয়াঁ" হিন্দী ছবির দর্শকদের প্রীত করবে।

●

আউরৎ (হিন্দী) : জেমিনীর নিবেদন; ৪,৪৭৫·৪৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : এস-এস ভাসান ও এস-এস বালান; সংলাপ : কিশোর সাহু; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি; গীত-রচনা : শকীল বাদাউনী; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : কমল ঘোষ; চিত্রগ্রহণ : এম, একাম্বরম্ এবং এস, সদয়ন; শব্দানুলেখন-পরিচালনা : সি, ই, বিগস্; শব্দানুলেখন : এস, সি গান্ধী; শিল্পনির্দেশনা : এম, এস জানকীরাম; সম্পাদনা : এম, উমানাথ, নৃত্য-পরিচালনা : পি, এস, গোপালকৃষ্ণ ও জে, কৃষ্ণ; রূপায়ণ : পদ্মিনী, ললিতা পাওয়ার, লীলা চাটনিস, অচলা সচদেব, নাজিমা, রেবতী, প্রাণ, ফিরোজ খান, রাজেশ খান্না, কানহাইয়ালাল, মোহন চোটি, ডেভিড, নানা পালসীকর, ও-পি রলহন, মাস্টার শহীদ, মাস্টার রাজু, বেবীরাণী, মাস্টার রানু প্রভৃতি। জগৎ এন্টারপ্রাইজেস্-এর পরিবেশনায় গেল ৭ই জুলাই, শুক্রবার থেকে প্যারাডাইস, গণেশ, লোটাস, প্রিয়া, মিত্রা, ছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

গরীব মায়ের সাতটি মেয়ে এবং এক ছেলে। বড় মেয়ে পার্বতীর স্কন্ধেই সংসারের জোয়াল। পাঁচ বাড়ীতে ঠিকে-ঝিয়ের কাজ করে সে অর্থের সংস্থান করে। ভাই সুরেশকে সে ডাক্তার করবে, এই তার সংকল্প এবং এই সংকল্পকে কার্যে পরিণত
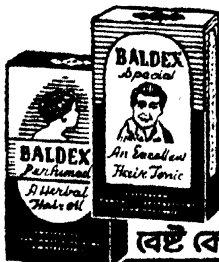
করতে সে নিজের ভালোবাসার পাত্র আনন্দকে উপেক্ষা করে ছ'টি সন্তানের জনক ধনী বিপত্নীক মনোহরলালকে বিবাহ করে এই শর্তে যে, মনোহর তার ভাই সুরেশের ডাক্তারী পড়ার ও তার মা-বোনেদের সংসার চালানোর খরচ যোগাবে। অল্পকালের মধ্যেই সকলে পার্বতীকে বাড়ীর লক্ষ্মী জ্ঞান করতে লাগল; নিজের চরিত্রমাধুর্যে সে নিজের শাশুড়ী, ননদ আশা ও সপত্নী-সন্তানদের প্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু গোল বাধাল আশা ও সুরেশ পরস্পরের প্রেমে পড়ে; এটা মনোহরলালের বরদাস্ত হল না—সে পার্বতীকে করল অপমান, সুরেশের পড়ার ও পার্বতীর মা-বোনেদের খরচ দিল বন্ধ করে। এই সময়ে মনোহরলালের দিলখোলা, ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাই রতনলাল এগিয়ে এল তার বৌদির সাহায্যকারী হয়ে। তারই বুদ্ধি-পরামর্শে আশা কোত্থেকে যেন টাকা এনে যোগাতে লাগল সুরেশকে। কিন্তু এরই ফলে আশার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পার্বতী পর্যন্ত তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত কি করে সকল সন্দেহের অবসান ঘটে আবার শান্তি ফিরে এল এবং কাহিনীর সুষ্ঠু সমাপ্তি ঘটল, তাই দেখানো হয়েছে ছবির শেষাংশে।

কাহিনীটিকে বিশ্বাস্যের পর্যায়ে রাখবার জন্যে পার্বতীকে বাড়ীর ঠিকে-ঝি হিসেবে না দেখিয়ে ক্যানভাসার, গানের শিক্ষক বা ঐ ধরনের একটা কিছু কাজে নিযুক্ত দেখালে ভালো হত। স্বীকার করা ভালো যে, যে ঝিয়ের কাজ করে, সেও মানুষ এবং তারও মনের মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে ঠিকে-ঝিয়ের কাজ করে বিধবা মা ও ছ'টি বোনকে প্রতিপালন করবার পরে ভাইয়ের ডাক্তারী পড়ার খরচ যোগানোর স্বপ্ন দেখাও কারুর পক্ষে অসম্ভব নয় কি?

নায়িকা পার্বতীর ভূমিকায় পদ্মিনী অভিনয় করেছেন ভালোই, কিন্তু ঠিকে-ঝি রূপে কি চেহারা, কি পোশাক-পরিচ্ছদ, কোনো দিক দিয়েই তাঁকে মানায় নি তাঁকে সবসময়েই সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে বোধ হয়েছে। প্রেমিক নায়ক আনন্দরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ফিরোজ খান। প্রথম দৃশ্যেই অনাবৃতভাবে তাঁর স্থূল বপু প্রেমিক-নায়ক সম্পর্কে আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করেছে। এবং ছবিটিতে তাঁর করণীয়ও কিছু নেই। প্রাণকে সাধারণত আমরা খল-চরিত্রে দেখতে অভ্যস্ত। "শহীদ" ছবিতে তার স্মরণীয় ব্যতিক্রম ঘটেছিল এবং তারপর দেখছি এই ছবির মনোহরলালের ভূমিকায়। অবশ্য এই ভূমিকায় তিনি বিশেষ কোনো নিটোল চরিত্রচিত্রণের সুযোগ পাননি; তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন, চরিত্রটি কামপীড়িত, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্কীর্ণমনা ও স্বেচ্ছাচারী। বরং মনোহর-লালের ভাই, দিলখোলা ট্যাক্সিড্রাইভার বেশে ও, পি রালহান আমাদের সামনে একটি চমৎকার উপভোগ্য চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। পার্বতীর ডাক্তারীপড়া ভাই সুরেশের ভূমিকায় রাজেশ খান্না চরিত্রটির গোপন-প্রেমিক রূপটি বেশী পরিস্ফুট করেছেন। নাজিমাও ঠিক তাঁর বিপরীতে আশার প্রেমিকা রূপটি সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। মনোহরলালের ছেলে-মেয়েদের ভূমিকাগুলি শিশু-শিল্পীদের দ্বারা অত্যন্ত উপভোগ্যভাবে চিত্রিত হয়েছে। অপরাপর ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার (শাশুড়ী), লীলা চিটনিস (মা), রেবতী (পার্বতীর মূক ভগ্নী কমলা), ডেভিড, নানা পলসীকর, মোহন চোটি, কানহাইয়ালাল প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবিটি সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীতে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও এর কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি সাধারণ মান রক্ষা করবার প্রয়াস দেখা যায়। ছবির ছ'খানি গানের মধ্যে "মেরী গাড়ী উড়ন খটোলা" এবং "হমে তুম সে মোহব্বৎ হৈ মগর হম কহ্ নহী সকতে" গান দু'খানি উপভোগ্য।

জেমিনীর "আউরৎ" একটি প্রায়-অবিশ্বাস্য আদর্শবাদী চিত্ররূপে চিহ্নিত হবে!

—নান্দীকর
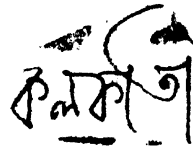
'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রের সংগীত গ্রহণ

এফোর্ব ফিল্মসের 'মহাবিপ্লবী অর-বিন্দ' চিত্রের সংগীত গ্রহণ গত ১৩ জুলাই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওয় গ্রহণ করলেন সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দেশাত্মবোধক গান ছাড়াও সুনীলবরণ রচিত দুটি গানে কণ্ঠদান করেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এছাড়া আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি গান গৃহীত হয়। এ কে ব্যানার্জি প্রযো-জিত এই মহান জীবনী-চিত্রটি পরিচালনা করছেন দীপক গুপ্ত। নাম-ভূমিকায় রয়েছেন দিলীপ রায়।

'খেয়া' মুক্তি-প্রতীক্ষিত

শ্যামল মিত্র প্রযোজিত ও সুরকৃত রূপক গোষ্ঠীর 'খেয়া' শীঘ্রই বীণা, বসুশ্রী প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। গীতা সেন রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রূপ-দান করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায় ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আসন্ন মুক্তিপথে 'প্রতিদান'

জীবন-যুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যে মানুষটি অপরের ঘর বেঁধে দিল, নিজের ক্লান্তি দিয়ে যে মানুষটি ভাই-এর চলার পথে আলো জেলে দিয়েছিল, সেই দাদা-ভাই-এর গল্প এম-বি প্রোডাকসন্সের 'প্রতিদান' আসন্ন মুক্তিপথে। জয়দেব বসু ও শচীন ঘোষ প্রযোজিত এই চিত্রসুরের ঘরোয়া ছবির কাহিনী রচনা করেছেন পরি-চালক অজিত গাঙ্গুলী স্বয়ং। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কালী বন্দ্যো-পাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, সুখেন দাস, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কালী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, রুমা গুহ-ঠাকুরতা অনুভা ঘোষ, সুচেতা বন্দ্যো-পাধ্যায়, মলিনা দেবী, কাজল গুপ্তা আরও অনেকে।

সংগীতপরিচালনা, সম্পাদনা ও চিত্র-গ্রহণে আছেন, যথাক্রমে শৈলেন মুখো-পাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত। প্রধান কর্মসচিব কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক—চারুলতা ফিল্মস ও খেয়ালী পিকচার্স।

'দিবারাত্রির কাব্য'-র চলচ্চিত্রায়ণ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রচনা 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-র চলচ্চিত্রায়ণ শুরু করেছেন পরিচালক বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শ্রেষ্ঠ চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, অঞ্জনা ভৌমিক, অনুভা গুপ্তা ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

'প্রস্তর স্বাক্ষর' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'প্রস্তর স্বাক্ষর' অনতিবিলম্বে রাধা, পূর্ণ প্রভৃতি প্রেক্ষা-গৃহে মুক্তিলাভ করছে। আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের এই জনপ্রিয় কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক সলিল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপ-কুমার, তরুণকুমার, দীপ্তি রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুনা চৌধুরী। এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'সুয়োরাণীর সাধ' চিত্রগ্রহণ চলছে :

হীরেন নাগ পরিচালিত চিত্ররূপের 'সুয়োরাণীর সাধ' ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ

এগিয়ে চলেছে। শ্রীনাগ ইতিমধ্যেই পঞ্চজালেরও বেশী একটানা শুটিং করে ছবির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাজ শেষ করে ফেলেছেন। আশাপূর্ণা দেবী রচিত এক মর্মস্পর্শী সমাজআলেখ্য আলোচ্য ছবির বিষয়বস্তু। চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। ছবিখানা প্রযোজনা করছেন দুলালী চৌধুরী ও বরুণ মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সুমিতা সান্যাল, ছায়া দেবী, বিদ্যা রাও, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, সমর মল্লিক, বংকিম ঘোষ প্রভৃতি।

'পহেচান' চিত্রের শুভমহরৎ

প্রযোজক-পরিচালক শোহনলাল কানোজার তাঁর রঙিন ছবি 'পহেচান'র শুভমহরৎ গত ৫ জুলাই রূপতারা স্টুডিওয় পালন করলেন। ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মনোজকুমার ও ববিতা। সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শংকর জয়কিষণ।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'জবাল' চিত্র

পরিচালক মণি ভট্টাচার্যের 'জবাল' চিত্রটি আগামী মাসে সর্বভারতে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ছবিটির মুখ্য কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন মালা সিনহা, বিশ্বজিৎ, জনি ওয়াকর, সুজিত-কুমার, তরুণ বসু, অসিত সেন, হেলেন ও নিরুপা রায়। ছবিটির সুর সৃষ্টি করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

মহাশ্বেতা। নামের সঙ্গে এমন চেহারা এবং চরিত্রের মিল বড় একটা দেখা যায় না। মহাশ্বেতার বিয়ের ব্যাপারটা আকস্মিক হলেও পাত্রটি কিন্তু নিতান্তই প্রৌঢ়। তার ওপর দোজবরে। প্রথম পক্ষের ছেলের বউ পর্যন্ত আছে। তবু এ বিয়েতে কোন প্রতিবাদ করেনি মহাশ্বেতা। সে নিজে তো মত দিয়েছে। মানুষটাকেও দেখেছে। তাহলে মহাশ্বেতার কথায় বলি—'মানুষটির মুগ্ধ দৃষ্টি, তার মধ্যে সম্ভ্রম, শুচিতা, সংকোচ সব জড়িয়ে এমন কিছু, যা আমি এর আগে কোন পুরুষের চোখে দেখিনি। যার কাছে আপনা থেকেই মাথা নুইয়ে পড়ে। চক্ষু যদি হৃদয়ের দর্পণ হয়, আমি সেদিন আমার মুখের উপর ক্ষণেকের তরে প্রসারিত সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁর হৃদয়ের রূপটিও দেখে নিয়েছিলাম। ঐটুকুই আমার সম্বল। 'ঐটুকু' কেন বলছি? ওর চেয়ে বড় সম্বল ওর চেয়ে বৃহত্তর আশ্রয় মেয়েদের কাছে আর কী আছে? কিন্তু আমার সমবয়সী বন্ধুরা কেউ আমাকে সমর্থন করেনি। তারা দেখেছে দোজবরে প্রৌঢ় বর, দুজনের বয়সের দুস্তর ব্যবধান। প্রথম পক্ষের বড় বড় ছেলেমেয়েরা যারা কখনই আমাকে প্রীতির চোখে দেখবে না। গঞ্জনা দেবে, অপমান করবে। আমি প্রতিবাদ করিনি। মনে মনে শুধু বলেছি, এসব একদিকে, আরেক দিকে একজন হৃদয়বান পুরুষ যার কাছথেকে আমার ভিতরে যে নারী আছে সে প্রথম সম্মান পেয়ে ধন্য হল। ওঁর ছায়ায় বসে আমি পৃথিবীর সমস্ত অসম্মানের বিরুদ্ধে লড়তে পারব।'

মহাশ্বেতার সেই হৃদয়বান পুরুষ-স্বামীটির নাম সতীনাথ। বিরাট মনোহারী দোকানের মালিক। তিনি ওষুধ-পত্রের অংশটা দেখতেন আর তাঁর ছেলে রতিনাথ মনোহারীর দিকটার ভার নিয়েছিল। তবে বিশ্বস্ত কর্মচারীরাই আসল ঝুঁকিটা সামলাতো। বিশেষ করে ওষুধের দোকানটা বন্ধ দীনুকাকাই চালাতেন। পৈত্রিক ব্যবসা বলেই সতীনাথের তেমন পরিশ্রম করতে হ'ত না। দিব্যি ব্যবসা চলে যাচ্ছে। তবে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সতীনাথ কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। দীনুকাকার ওপর সবকিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সতীনাথ বৃন্দাবনবাসী পিসিমার কাছে গিয়ে উঠেছিলেন। এবং সেখানে গিয়েই তো এই গন্ডগোল। শেষবয়সে পিসিমার পীড়াপীড়িতে মহাশ্বেতাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন সতীনাথ।

মহাশ্বেতাকে নিয়ে ফিরলেন সতীনাথ। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি সতীনাথের এই বিয়ের ব্যাপারটা। শেষে রতিনাথের বউ ধাতস্থ হবার পর শ্বশুরমহাশয়ের এই বিবাহ-সংবাদ পৌঁছতে পৌঁছতে হাঁপিয়ে উঠলো। শেষে রীতিমত একটা কৌতূহলী জনতা বাড়ুজ্যে বাড়ির ঘর, উঠোন সব মাথায় করে তুললো। শুরু হয়ে যায় বধূবরণের পালা।

স্বামীর হৃদয়-বর্ম ছাড়া আরো একটা আচ্ছাদন ছিল মহাশ্বেতার। তার নিজের মনের দৃঢ়তা, এখানকার সবকিছুর জন্যে তার প্রস্তুতি। একে একে আত্মীয়-কুটুম্বের নিন্দা এবং অপবাদ হজম করে যেতে হল মহাশ্বেতার। কোনরকম প্রতিবাদই সে করেনি।

সতীনাথের মধ্যেই নিজেকে পূর্ণ করে পেয়েছিল মহাশ্বেতা। স্বামীর সেবা-যত্ন, আরাম-বিরামের ব্যবস্থা করেই তার সময় চলে যেত। বিয়ের কয়েক বছর পর মহাশ্বেতার কোলে প্রথম সন্তান এলো। ছেলের মধ্যে একদিন মহাশ্বেতা পূর্ণতর হল। এর মধ্যে সতীনাথের পরিচিত উকিল বন্ধু নির্মল গাঙ্গুলীর সঙ্গে মহাশ্বেতার পূর্ব পরিচয় আবিষ্কৃত হল। ফলে এই নির্বান্ধব পুরীতে এক পরিচিত জনের আগমনে মহাশ্বেতা কিছুটা সঙ্গ পেল। মহাশ্বেতার নিঃসংগ জীবনে নির্মলের আগমনটা সতীনাথের কোন দৃষ্টিকটু মনে হয়নি। কিন্তু বাইরের লোকেরা এ নিয়ে কথা তুললো। মহাশ্বেতার ধৈর্যের বাঁধ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছিল।

সতীনাথ নিজেই এসবের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু বাইরের লোকেরা কিছুতেই তা সহজভাবে মেনে নিল না। শেষে এই দুর্নামের জেরটা আর এক দুর্ঘটনাকে ডেকে আনে।

তখন সতীনাথ বেঁচে নেই। হঠাৎ ক্যানসার রোগে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি সমান ভাগে তাঁর সম্পত্তি স্ত্রী

'শাজাহানের কাটা'র মহরতে তৃপ্তি ঘোষ, বাসবী নন্দী, সীতা মুখোপাধ্যায়, কানন দেবী, সুলতা চৌধুরী ও পরিচালক মঞ্জু দে। —ফটো : অমৃত

এবং দুই ছেলেকে উইল করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত রতিনাথ সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার জন্য মহাশ্বেতার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ঠুকে দিল। ফলে মামলা চললো। মহাশ্বেতার পক্ষে ওকালতি চালালো নির্মল। শেষে মহাশ্বেতারই জয় হল। কিন্তু রতিনাথ শেষ প্রতিশোধ নিল মহাশ্বেতার সংগে নির্মলের অবাধ মেলা-মেশার কুৎসা রটিয়ে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মহাশ্বেতার একমাত্র ছেলের হাতেই রতিনাথকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

মহাশ্বেতার জীবন নিয়ে এ কাহিনী রচিত বলেই গল্পের নামকরণও 'মহাশ্বেতা'। জরাসন্ধ রচিত এ কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। বি কে প্রোডাকসন্সের এ ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান চরিত্র-গুলিতে অভিনয় করছেন : মহাশ্বেতা—অঞ্জনা ভৌমিক, সতীনাথ—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মল—অনিল চট্টোপধ্যায়, রতিনাথ—আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মেনকা—শমিতা বিশ্বাস, দিনুকাকা—জহর গাংগুলী, পিসিমা—মলিনা দেবী, ভজার মা—গীতা দে এবং মহাশ্বেতার মা—ছায়া দেবী।

অনামিকা কলাসংগম নিবেদিত 'অদাকার' নাট্যগোষ্ঠীর "চাই আথর প্রেমকা" :

স্বাধীন ভারতে নাট্য আন্দোলন যে শুধু বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী-দের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করছে, এ তথ্য সম্পর্কে আমরা যত শীঘ্র অবহিত হই, ততই মঙ্গল। এমন কি, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষায় রচিত নাটক কি পরিমাণে অভিনীত হয় এবং সেইসব অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যধারণা—চিন্তা-রুচি, অভিনয় রীতি ও কৌশল, নাট্যপ্রযোজনায় ব্যবহৃত আঙ্গিক, মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা প্রভৃতি সম্পর্কিত অগ্রগতির কি বিচিত্র নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ওয়াকিবহাল হওয়ার যথেষ্টই প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি। নইলে একদিন আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করব, খরগোসকে কচ্ছপ অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। উন্নাসিক আত্মতুষ্টির ভাব আমরা অচিরে যত বেশী পরিহার করতে পারি, ততই ভালো।

এই বছর জানুয়ারী মাসে 'অদাকার' নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের প্রথম নাট্য নিবেদন 'আওয়াজ' (জে. বি. প্রিস্টলে রচিত 'অ্যান ইনস্পেক্টর কল্‌স্'-এর হিন্দী রূপান্তর) মঞ্চস্থ করে রসিক দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। "চাই আথর প্রেমকা" এঁদের তৃতীয় নিবেদন। এটি মারাঠী লেখক বসন্ত কানেট্‌কর রচিত মূল নাটক থেকে বসন্তদেব দ্বারা হিন্দী ভাষায় অনূদিত। তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকটির সংঘটনস্থল হচ্ছে প্রোফেসার মার্তণ্ড বর্মার বসবার ঘর। তাঁর মেয়ে বাবলী বাজ্জা নামে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছে এবং তাঁর ছেলে বাচ্চু ঠিক কোন্ মেয়ের প্রেমে পড়া যায়, তারই জন্যে মাথা ঘামাচ্ছে। বাবলীর একাগ্রতা আছে; সে চট্ করে বাজ্জাকে বিয়ে করে ফেলল। কিন্তু বিয়ের পরেই দুজনেরই ধারণা হল, তারা ভুল করেছে। প্রেম এক জিনিস, আর বিয়ে করে সংসার করা সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। প্রোফেসর তাদের বোঝালেন আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমেই জীবন-তরণী বাইবার চেষ্টা করা উচিত এবং তিনি তাঁর নিজের দাম্পত্যজীবনের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে তুলে ধরলেন। ওদের একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে ওদের সমস্যার সমাধানের পথ সহজ করে দিল। কিন্তু বাচ্চুর বিয়ে করাই হল না, অনেক ভেবে-চিন্তে সে যাকে বিয়ে করবে বলে প্রস্তাব করতে উদ্যত হল, সে বিন্দুমাত্রও কিন্তু না করে তাকে জানিয়ে দিলে—সে বাকদত্তা এবং বিবাহ করতে চলেছে।

"চাই আথর প্রেমকা" প্রধানত হাসির নাটক এবং বেশীর ভাগই সংলাপনির্ভর। কিন্তু রসালো সংলাপ উপভোগ করবার লোকের অভাব ছিল না ১২ই জুলাই সন্ধ্যায় হিন্দী হাইস্কুলের প্রেক্ষাগৃহে। প্রোফেসর, পণ্ডিতজী, বাবলী ও বাজ্জার ভূমিকায় যথাক্রমে পরিচালক কৃষ্ণকুমার, আত্মানন্দ, সুষমা সায়গল ও রবি যাজ্ঞিক সারা প্রেক্ষাগৃহকে প্রায় সারাক্ষণ হাসির হুল্লোড়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন। অপর তিনটি ভূমিকায় সুশীলা মিশ্র, সুশীল কেজরীওয়াল ও নির্মলা সিংহও উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

অত্যন্ত কৌশলে ও শিল্পসম্মতভাবে মঞ্চপরিকল্পনা করেছেন নির্মল গুহরায়। অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে প্রযোজিত হয়েছে নাটকটি পরিচালক কৃষ্ণকুমার দ্বারা।

"পারবে না এদের সংগে"

নবনাট্য আন্দোলনের অংশীদার হয়ে যেসব নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চরূপায়ণে সুগভীর সমাজচেতনা ও জীবনের নির্মম সত্যের রূপকে স্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 'চতুরঙ্গে'র নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক নাট্যানুশীলন ও নাট্যাভিনয়ের গভীরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁদের সংগে 'চতুরঙ্গে'র নাট্যপ্রযোজনা রীতির একটা নিবিড় পরিচিতি আছে নিশ্চয়ই। এই সংস্থার শিল্পিবৃন্দের নাট্যচর্চা শুধুমাত্র আবেগ-বিলাস মাত্র নয়, বাস্তবজীবন উপলব্ধির একটা প্রোজ্জ্বল প্রচেষ্টা। তাই এঁদের সবকটি নাটকেই রূপলাভ করেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযন্ত্রণা আর সুস্থ-সুন্দর

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চিড়িয়াখানা চিত্রে উত্তমকুমার। —ফটো : অমৃত

জীবনের আলো পাওয়ার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষক ও শহর থেকে দূরে গ্রাম্য-জীবনের অতলেও এ'দের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। এ'দের সাম্প্রতিক নাট্য-প্রযোজনা সতীনাথ ভাদুড়ীর 'পারবে না এদের সংগে' নাটকেও সমাজ-জীবনের একটা বিশিষ্ট দিক মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'পারবে না এদের সংগে' সংজ্ঞা বিচারে একটি উপভোগ্য মনোরম কৌতুক নাটক। কৌতুকের আড়ালে উদ্ঘাটিত হয়েছে সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের কথা, মুনাফা যাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। মুনাফার মানদণ্ডেই সবকিছু এদের কাছে বিচার্য, নীতিবোধ, মানবতাবোধ, মর্যাদা-বোধ কিছুই এদের অভিধানে লেখা নেই। এই মুনাফাখোর শেঠজীকুলের এক বাস্তব জীবন শ্লেষাত্মক ভংগিমায় রূপলাভ করেছে এ-নাটকে। নির্দেশক বরুণ দাশগুপ্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে এবং সমাজসচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে এই নাটকটি মঞ্চে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। বলতে কোন দ্বিধা নেই, অন্যান্য নাটকের মতো, এই প্রচেষ্টাতেও তিনি সফল হয়েছেন।

নাটকের প্রতিটি দৃশ্য প্রায় সুগ্রথিত এবং শিল্পীদের ভাবভংগিমায় এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাতেই নাটকের তীব্র ব্যঙ্গ প্রাণোচ্ছল ধারায় উৎসারিত হয়েছে এবং তাতেই দর্শকদের অন্তরের অন্দরমহলে অন্তর্নিহিত বক্তব্য পেঁাছে গিয়েছে। এই নাটকের প্রায় প্রতিটি কথাতেই দর্শক হাসবেন, কিন্তু অবিরাম হাসির প্লাবনে প্রচ্ছন্ন সত্য কখনো হাল্কা হয়ে ভেসে যায়নি। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়-সৌকর্যই হোল এই সার্থকতার ভিত্তিভূমি। সুজন সেনগুপ্তের 'শেঠজী'র ভূমিকায় অভিনয় একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। শিল্পীর অসামান্য অভিনয়-প্রতিভা স্বাক্ষরিত হয়েছে এই চরিত্রাভিনয়ে। অভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন শেঠগিন্নীরূপে গীতা প্রধান। কথায় ও ভংগীতে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য তিনি এনেছেন যার ফলে সমগ্র নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন অনিমেষ চক্রবর্তী, জয়শ্রী কর, সুধাময় গৌতম, ধীরাজ চ্যাটার্জি, অরুণ সেনগুপ্ত, সলিল সেন।

।।চতুর্মুখ ।।

গত ৬ই জুলাই ইউনাইটেড স্টেট ইন-ফরমেশন সারভিস শ্রীশিক্ষায়তনে একটি সফল নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। নাটক ছিল চতুর্মুখে'র 'জনৈকের মৃত্যু'। নাটকটি আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ এ সেলসম্যানে'র অনুবাদ। এক সেলসম্যানের স্বপ্নের অপ-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ-নাটকের ভিত্তিভূমি। উপস্থাপনায় আমাদের দেশের পরিবেশকে অটুট রাখা হয়েছে।

সেলসম্যান শশধর স্বপ্ন দেখতো তার সংসারের সীমাহীন সুখসমৃদ্ধির, স্বপ্ন দেখতো দুই ছেলের সোনালী ভবিষ্যৎ। আশা করতো তার প্রতিটি স্বপ্ন নতুন রঙে নতুন আলোয় রূপ পাবে, কিন্তু রূঢ় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শেষপর্যন্ত আজন্মলালিত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। স্বপ্ন-ভাঙার নিঃসীম যন্ত্রণাকে সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করলো। নির্দেশক অসীম চক্রবর্তী অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে নাটকটিকে একটি সংহত রূপে মঞ্চে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনায় বেশ কিছু জায়গায় একটা উন্নত ধরনের শিল্পচিন্তার আভাস ফুটে উঠেছে।

মঞ্চে অনেক নতুন আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়েছে এবং এতেই নাটকের গতি

একটা স্বতন্ত্র রীতিতে প্রবাহিত হয়ে পরিণতির সীমা ছুঁয়েছে। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাতের বিভিন্ন কাজ সত্যি সুন্দর। স্বপ্নের দৃশ্যের অবতারণায় নাট্য-নির্দেশকের সূক্ষ্ম মানসিকতা ধরা পড়েছে। শিল্পীদের দলগত অভিনয় সত্যি প্রশংসা করার মতো। প্রায় প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়ই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। অসীম চক্রবর্তীর 'শশধর সামন্ত' দর্শকদের ভালো লেগেছে। শেফালী চরিত্রে চিত্রা মণ্ডলের সংবেদনশীল অভিনয় সত্যি প্রশংসা করার মতো। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন : জিতেন ঘোষ, লোকনাথ দে, পিন্টু চট্টোপাধ্যায়, বারীন মুখোপাধ্যায়, বাবু সরকার, সত্য দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর দে, রণজিত চক্রবর্তী, মোহর মুখোপাধ্যায়, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন রায়, রেণু ঘোষ, কালিপদ ঘোষ, রাধা ভট্টাচার্য।

।। প্রতিযোগিতা ।।

চন্দননগরের নাট্যসংস্কৃতি পরিষদ পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটকের অভিনয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই। যোগাযোগের ঠিকানা—সুরপাড়া, বাগবাজার, চন্দননগর।

।। নাট্যতীর্থ শিল্পীগোষ্ঠী ।।

'নাট্যতীর্থে'র প্রযোজনায় সম্প্রতি মঞ্চস্থ হোল তরুণ নাট্যকার সুনীত মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'দৃষ্টান্ত'।

সাম্প্রতিক কালের সমাজ ও মানুষের বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রদীপ্ত এক বিশ্বাসের কথা ঘোষিত হয়েছে এ-নাটকে। নাট্যকার দুটি পরিবারের স্বতন্ত্র চিন্তাধারার অবিরাম সংঘর্ষকেই নাটকের প্রাণবস্তুরূপে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। প্রতিটি শিল্পী অভিনয়ের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে এই সংঘর্ষকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, সবাই এই চেষ্টায় সফল না হোলেও নাটকের গতি মোটামুটি অব্যাহতই থেকেছে। নাট্য-নির্দেশনায় সূক্ষ্ম মানসিকতার পরিচয় দেন গোপাল দাস। কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য, তপন দত্ত, সুনীল মোদক, বিশ্বনাথ দে, তপন রায়-চৌধুরী, সীমা গুহঠাকুরতা।

।। উত্তরপাড়া থিয়েটার কর্ণার ।।

'উত্তরপাড়া থিয়েটার কর্ণারে'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেছেন বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি'। অভিনয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে বাধা পায়নি। শম্ভু চ্যাটার্জির নির্দেশনায় যে কজন শিল্পী সার্থক অভিনয় করেন, তাঁরা হোলেন জগৎজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় (রতন), বিশ্বনাথ ঘোষ (চন্দ্রমাধব), সনৎ চট্টোপাধ্যায় (হর্ষনারায়ণ)।

।। দিল্লীতে নাট্যোৎসব ।।

দিল্লীতে জাতীয় নাট্যবিদ্যায়তনের প্রযোজনায় পক্ষকালব্যাপী নাট্যোৎসব সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এতে সাফল্যের সঙ্গে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের আঙ্গিকে, বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্যে প্রায় প্রতিটি নাটকই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দুটি নাটক 'অন্ধযুগ (পূর্ণাঙ্গ) ও 'চক্র' (একাংক), হিন্দী ভাষায় অভিনীত হয়। অন্যান্য কয়েকটি নাটকের মধ্যে ছিল বাংলা একাংক অন্তিম সংলাপ, স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' এণ্টিগণ,, স্ট্রিণ্ড-বার্গের 'দি স্ট্রংগার' প্রভৃতি।

সম্রাটের মৃত্যু

সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট ড্রামাটিক ক্লাবের শিল্পী সভায়া মঞ্চে উপস্থাপনা করলেন শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু'। সুন্দর পরিবেশনা ও দলগত অভিনয় সর্বাধিক প্রশংসার দাবী রাখে। মঞ্চস্থাপত্য, আবহসঙ্গীত ও পরিচালনায় অরূপ বসু স্মরণযোগ্য। পরিচালনায় পরিচালকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের একটি বিশেষ চরিত্রে তাঁর অভিনয়ও সুন্দর। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যাঁরা সেদিন অভিনয় মুহূর্তটি প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন তাঁরা হলেন সুবর্ণ কান্তি বসু, প্রকাশ ভদ্র, প্রভাত বসু, আলোক চৌধুরী, অসীম মুখোপাধ্যায়, সুবল বসু, ফণি পাল, তরুণ-তপন বসু, শঙ্কর ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী,

খেয়া চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ ও তরুণকুমার

প্রণব চক্রবর্তী, মুরারী চক্রবর্তী ও পল্লব ধর। স্ত্রী ভূমিকার শিল্পী ছিলেন বেলা রায় ও রীতা হালদার।

।। তিনসুকিয়ায় নাট্যাভিনয় ।।

আসামের তিনসুকিয়াতে রেলওয়ে সপ্তাহ উপলক্ষে তিনটি নাটক অভিনীত হয়। নাটক তিনটি হোল: 'গেটম্যান', 'ঊনপঞ্চাশ নম্বর মেস', 'ইহ'তেও জিয়াই থাকে' (অসমীয়া)। প্রথম নাটক দুটি পরিচালনা করেন বৈতালিক গোষ্ঠী'। অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখেন দিলীপ বক্সী, প্রদ্যোৎ লাহিড়ী, অমল সরকার, অরুণ ঘোষ, জিতেন চক্রবর্তী, মন্মথ সরকার, তরুণ চক্রবর্তী, কাজল আইচ, বিমল ঘটক, দীপ্তি ভট্টাচার্য।

০ নতুন নাটক ০

'নক্ষত্রে'র শিল্পীবৃন্দ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুসংবাদের' সফল নাট্য-প্রযোজনার পর এবার মঞ্চস্থ করতে চলেছেন একই নাট্যকারের নাটক 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকান্ড' (মৃত্যুসংবাদের দ্বিতীয় পর্যায়)। মুক্ত অংগনে এ-নাটক অভিনীত হবে আগামী ২৬শে জুলাই। নির্দেশনা, মঞ্চপরিকল্পনা ও আলোকসম্পাতে রয়েছেন যথাক্রমে শ্যামল ঘোষ, তাপস বসু, স্বরূপ মুখার্জি।

•

'কলাপী' নাট্যসংস্থা 'হাঙ্গর' অভিনয় করে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এবার এ'রা অভিনয় করবেন রঞ্জিত দত্তের নতুন নাটক 'ওরা ঘুরছে'। মানসিক রোগের একটি হাসপাতালের প্রেক্ষাপটে এ-নাটক গড়ে উঠেছে। নাট্যকার স্বয়ং এ-নাটক পরিচালনা করবেন।

• • •

'শুভময় গোষ্ঠী' তরুণ নাট্যকার রতন ঘোষের 'ফেরা' নাটক কিছুদিনের মধ্যেই মঞ্চস্থ করবেন। এই নাটকে জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো আজকের সভ্যতার একটা ভাবী রূপ ভাষা পেয়েছে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ।

• • •

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'অন্বেষা'র আগামী নাটক 'নহ মাতা'। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও নীলের 'ডেজায়ার আন্ডার দি এলমস্' অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন গঙ্গাপদ বসু।

।। একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান ।।

তরুণ বেতারশিল্পী দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি তাঁদের বাসভবনে একটি মনোরম সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই ছোট্ট গানের জলসা শিল্পী-দম্পতির 'তুমি আলোর হাসি এসো আমার ভুবনে' দ্বৈত-সংগীত দিয়ে শুরু হয়। অপূর্ব সেই গানের সুর, স্বতস্ফূর্ত আবেগ যেন প্রাণের মূর্ছনা তোলে। এর পরে আরো ক'টি গানের মধ্য দিয়ে এ'দের প্রাণোচ্ছল ভংগিমা ভাষা পায়। শেষের দিকে আরো দু-একজন শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রীতিস্নিগ্ধ এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটির কথা বহুদিন মনে থাকবে।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

১৯শে ও ২০শে জুলাই নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক যথাক্রমে 'ইয়াসিন গোলকীপার', 'দি হাই ওয়াল' ও 'লেনিন ইন পোল্যান্ড' সদস্যদের জন্য প্রদর্শিত হয় এবং আগামী ২৩শে জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় ছায়া চিত্রগৃহে 'স্কাইমাক' চিত্রটি প্রদর্শিত হবে।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'ছুটি'

ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি' নিমন্ত্রিত হয়েছে। আগস্ট মাসের শেষে উৎসব শুরু হচ্ছে।

গানের জলসা

ক্রিয়েটিভ ক্লাবে উপভোগ্য ঠুংরী

ঠুংরী সাধারণ সংগীত সম্মেলনের চেয়ে মাইফেল বা জলসায় রসোচ্ছল হয়ে ওঠে। কারণ এখানে প্রকৃত সঙ্গীতপিপাসু শ্রোতৃচিত্তের সংবেদনশীলতার উত্তাপ শিল্পীর কাছ থেকে রস আদায় করে নিতে পারে। ক্রিয়েটিভ ক্লাব আয়োজিত প্রবীণ শিল্পী শ্রীসুনীল বসুর ঠুংরী এই সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল গত সপ্তাহের এক সংগীতাসরে।

শ্রীবসু ৺গিরিজাবাবুর শিষ্য। ঠুংরীর সাচ্চা বস্তুর তালিম ইনি গুরুর কাছে পেয়েছেন। গাইবার মেজাজটিও শিল্পীসুলভ এবং শ্রোতৃদলে সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই শিল্পী এবং সুরসিক শ্রোতা। এ হেন পরিবেশে মেঘলা সন্ধ্যায় কাজরীর আসর যে জমে উঠবে এতে আশ্চর্যের কি আছে?

পূরব অঙ্গের ঠুংরীর ঢং লক্ষ্ণৌ, বেনারস এবং গয়ায় বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু ঢং যাই থাক এর রঙবাহারের সৌন্দর্য নির্ভর করে শিল্পীর পরিবেশনভঙ্গী ও মেজাজের ওপর। ঠুংরীতে রসসঞ্চার করতে পারে সৃষ্টিশীল শিল্পীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বোধ ও অনুভব গাঢ়তা। শ্রীসুনীল বসু

আশ্রমিক সংঘের ভানু সিংহের পদাবলী গীতিনাট্যের একটি দৃশ্য। ফটো: অমৃত

এই দুই বস্তুর অধিকারী ত বটেই তার সংগে মিশেছে উপযুক্ত শিক্ষা।

ঠুংরী লঘুসংগীত নয়। ভাবপ্রধান সংগীত হলেও ঠুংরীর নিজস্ব 'বাড়ত' ও বোল বিস্তার আছে। ধাপে ধাপে ভাব-বিস্তারের সুশৃংখল পদ্ধতি দ্বারা আবেগের শিল্পসম্মত প্রকাশরীতি আছে। ঠুংরীর এই ধর্মটি শ্রীবসুর আয়ত্তাধীন। তাই তাঁর বোল বানানা অংগ মুর্কী, খটকা, কান, জমজমার সুষ্ঠু প্রয়োগে অলংকৃত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে স্পন্দতানের বিদ্যুৎ স্পর্শ আবেগকে তীব্র অথচ সুন্দর করে তুলেছিলো। ঠুংরী শেষ হলো 'কাজরী' নিয়ে। ভরা বাদরের উদাস সন্ধ্যা বিরহিণী নায়িকার বিয়োগ-কাতর চিত্তের আর্তিতে মিলনের দুনির্বার আবেগে শিহরিত। এই বিরহ-বেদনা, ঔৎসুক্য ও ব্যাকুলতার রোমাঞ্চ রস ও মাধুর্য শ্রীবসুর গানে শুধু ধ্বনিত নয় চিত্রায়িত। এই অনুভব গভীর সন্ধ্যায় স্মরণীয়।

আসর সুরু হয়েছিল সুব্রত রায়-চৌধুরীর সেতার দিয়ে। রাগ বাগেশ্রী। আলাপ দীর্ঘায়িত, গৎও বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে বিশ্লেষিত। মীড়ের সমন্বয় ঝটকা ও তানের অনেক অংশে এখনকার সুপ্রতিষ্ঠিত সেতারীদের প্রভাব সুপরি-লক্ষিত হয়েছে। পৃথকভাবে বিচারে সেগুলি সুশ্রাব্য, রেওয়াজী হাতের উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু সাম্মিলিতভাবে দানা বেঁধে মনের মধ্যে সামগ্রিক ছাপ কতোদূর রাখতে পেরেছে বলা শক্ত। ওপরের দিকের অনেক পর্দা সুরে লাগেনি। লয়জ্ঞান প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু তানে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের অভাব ছিল।

অনিল ভট্টাচার্য প্রাণবন্ত সম্পত শ্রোতাদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে।

আশ্রমিক সংঘের তাসের দেশ গীতিনাট্যের একটি দৃশ্যে দোলনচাপা দাশগুপ্তা, জয়া ভট্টাচার্য ও স্বাতী রায়। —ফটো : অমৃত

রবীন্দ্র সদনে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের নৃত্যনাট্য

কলারসিকদের অন্যতম আকর্ষণ শান্তি-নিকেতন-আশ্রমিক সংঘ প্রযোজিত এ'দের বার্ষিক উৎসব নৃত্যনাট্য। পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে আমরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবাহী এই সংঘের কাছে একটি উচ্চমান সৃষ্টির আশা করেছিলাম। কিন্তু গতানুগতিকতার এক-ঘেঁয়েমো থেকে এ'রাও মুক্ত নন। নৃত্যনাট্য-গুলি দেখে সেই কথাই মনে হলো। নতুনত্বের মধ্যে গায়িকা সুচিত্রা মিত্রকে নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় উপস্থাপন। গানের যাদুতে যিনি অনুষ্ঠানটিকে চিত্তহারী করে তুলতে পারতেন—তাঁর নৃত্যে অবতরণ, নৃত্যাভিনয়ে কোনো রস ত সৃষ্টি করতে পারেইনি, উপরন্তু সংগীতের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রচ্যুত হওয়ার সংগীতরসোপভোগের ন্যায্য দাবী থেকেও শ্রোতাদের বঞ্চিত করেছে। এটা কি উচিত হলো? এক-এক সময় এমন হয়েছে নৃত্য ও সংগীত দু-পথে ধাবিত। কারো সংগেই কারো মিল নেই, যার ফলে কবিগুরুর নাট্যকাব্যের ভাববস্তু দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। এই ছন্দপতনের অসংগতি দর্শকদের পীড়া দিয়েছে।

'মায়ার খেলা' ছাড়াও এ'দের পরি-বেশিতব্য ছিল 'তাসের দেশ', 'ভানু-সিংহের পদাবলী', 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'চিত্রাংগদা'।

'মায়ার খেলা'র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় (অমল) ছিলেন অশোকতরু বন্দ্যো-পাধ্যায়। গানের সংগে সংগে মাইকের কাছে গিয়ে মরীয়াভাবে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি যেন অস্থিরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কণ্ঠ-শিল্পীকে নাট্য রূপায়ণের ভূমিকায় অভিনয় করালে তাঁকে কী পরিমান বিপদে ফেলা হয়।

'ভানুসিংহের পদাবলী'তে শ্রীরাধার প্রেমের বিভিন্ন স্তরপর্যায়ের মধ্য দিয়ে ভাব-সম্মিলনে পেঁছবার মর্মস্পর্শী কাব্যসৌন্দর্য সুরে ছন্দে রূপময় হয়ে উঠবে এই আশাই আমরা করেছিলাম। কিন্তু কয়েকটি গান ছাড়া উপভোগ্য কিছুই ছিল না।

'চিত্রাংগদা'য় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ কারণ এই নাট্য এবারের নতুন অবদান। কিন্তু এখানেও পূর্ণিমা ঘোষ ছাড়া সবাই আমাদের হতাশ করেছেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা' কিছুটা জমে উঠেছিল দস্যুদলের প্রাণবন্ত নৃত্য ও অভিনয় গুণে।

শিল্পীদের মধ্যে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পূর্ণিমা ঘোষ। ইনি প্রতিভার অধিকারিণী। নৃত্যসুষমা সৃষ্টির উপযুক্ত দেহভংগীর বিন্যাসজ্ঞানও এঁর আছে। উপযুক্ত পরিচালনা শৈলীর প্রয়োগে এঁকে আরো আকর্ষণীয় করা যেত। বেশ-ভূষায় রুচির পরিচয় ছিল তবে 'তাসের দেশ'এর রুইতনের সাজে সবুজ ও নীলের সমন্বয় দৃষ্টিকে পীড়া দিয়েছে। আলোক-পাত যথাযোগ্য।

—চিত্রাংগদা

মোহনবাগান বনাম বি এন আর দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার একটি দৃশ্য ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষ

তৃতীয় টেস্ট

ইংল্যান্ড : ২৯৮ রান (জন মারে ৭৭ এবং কেন ব্যারিংটন ৭৫ রান। প্রসন্ন ৫১ রানে ৩, চন্দ্রশেখর ৯৪ রানে ৩ এবং বেদী ৭৬ রানে ২ উইকেট)।

ও ২০৩ রান (ব্রায়ান ক্লোজ ৪৭ এবং ডেনিস এ্যামিস ৪৫ রান। প্রসন্ন ৬০ রানে ৪, চন্দ্রশেখর ৪৩ রানে ৩ এবং বেদী ৬০ রানে ২ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৯২ রান (ইঞ্জিনীয়ার ২৩ রান। ব্রাউন ১৭ রানে ৩, হবস ২৫ রানে ৩, ইলিংওয়ার্থ ১৩ রানে ২ এবং স্নো ২৯ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৭৭ রান (অজিত ওয়াদেকার ৭০ এবং পতৌদি ৪৭ রান। ক্লোজ ৪ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪ উইকেট)।

প্রথম দিন (জুলাই ১৩) :
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৯৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৯ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিন (জুলাই ১৪) :
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস মাত্র ৯২ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ড ভারতবর্ষকে 'ফলো-অন' থেকে ছাড়ান দিয়ে নিজেরাই দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ২০৩ রানের মাথায় আউট হয়ে যায়।

তৃতীয় দিন (জুলাই ১৫) :
খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পূর্বে ২৭৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হলে ইংল্যান্ড ১৩২ রানে জয়ী হয়।

বার্মিংহামে ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের এজবাস্টন মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের দশম টেস্ট সিরিজের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ১৩২ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ফলে ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড তিনটি খেলাতেই জয়ী হয় এবং ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের কাছে ০-২ খেলায় (ড্র ৩) পরাজয়ের ফলে যে রাবার হাতছাড়া করেছিল তা একটি টেস্ট সিরিজ (১৯৬৪) অপেক্ষার পর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উভয় দেশের ১০টি টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যান্ডের জয় ৭, ভারতবর্ষের জয় ১ এবং ড্র ২ (১৯৫১-৫২ এবং ১৯৬৪)। এই ১০টি টেস্ট সিরিজের মোট ৩৭টি খেলার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১৮, ভারতবর্ষের জয় ৩ এবং ড্র ১৬।

ভারতবর্ষের কপাল খুবই খারাপ ছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকায় গুহ এবং সুর্তি দলভুক্ত হননি এবং ভারতবর্ষ টসে হেরে যায়। ইংল্যান্ড ব্যাট করার প্রথম সুযোগ পেয়ে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। লাঞ্চের ঠিক আগের ওভারের শেষ বলে ডেনিস এ্যামিস আউট হন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১১২ (৪ উইকেটে)। চা-পানের বিরতির সময় তাদের রান ছিল ৮ উইকেটে খুইয়ে ২০৬। দলের সংকটের মুখে কেন ব্যারিংটন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৭৫ রান করেছিলেন। চা-পানের পর খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন উইকেটকিপার জন মারে। তিনি দলের সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন। তাছাড়া ৯ম উইকেটের জুটিতে স্নোর সহযোগিতায় দলের ৫০ রান এবং হবসের সঙ্গে ১০ম উইকেটের জুটিতে দলের অতি মূল্যবান ৫৭ রান সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ শেষ দুটি উইকেটের জুটিতে তিনি দলের ১০৭ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডের বিপদের সময় পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ৬৩ রানের মাথায় ১ম এবং ১৮২ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। খেলাভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে ২৯৮ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ২০ মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ৯ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডকে আউট করে ভারতবর্ষ খেলায় যে প্রাধান্যলাভ করেছিল তা বজায় রাখতে পারেনি।

দ্বিতীয় দিনের খেলাটি ছিল বোলারদের। এইদিন মোট ২০টা উইকেট পড়ে—ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৯২ রানের মাথায় এবং ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৩ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের আগেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। এই নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে একশত রানের নীচে ভারতবর্ষের ইনিংস শেষ হল ১০ বার—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ বার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ বার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১ বার এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১ বার। টেস্টের পুরো এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের সর্ব-নিম্ন রানের রেকর্ড : ৫৮ রান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২) এবং ৫৮ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮)।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ ভারতবর্ষকে 'ফলো-অনে' বাধ্য করেন নি। খেলাভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাত মিনিট আগে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৩ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ এদিন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে নি। খেলায় জয়লাভের জন্যে বিপুল সংখ্যক ৪১০ রানের প্রয়োজন এবং হাতে তিন দিনের খেলা জমা—এই অবস্থায় ভারতবর্ষ মাঠ ত্যাগ করে।

তৃতীয় দিন লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৮৬ (১ উইকেটে)। চা-পানের

বিরতির সময় দেখা গেল স্কোরবোর্ডে ভারতবর্ষের রান ১৭৮ (৩ উইকেটে)। এই সময় খেলায় অপরাজিত ছিলেন ওয়াদেকার (৬৭) এবং পতৌদি (৩৩)। চা-পানের বিরতির পর ভারতবর্ষের খেলায় ভাঙ্গন ধরে। ওয়াদেকার আর মাত্র ৩ রান করে তাঁর ৭০ রানের মাথায় আউট হন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং পতৌদি দলের মূল্যবান ৮৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন। চা-পানের পরবর্তী ৫০ মিনিটের খেলায় মাত্র ২৯ রানের বিনিময়ে ভারতবর্ষের ৪টি উইকেট পড়ে গেলে ভারতবর্ষের জয়লাভের আশা নির্মূল হয়ে যায়। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগে ২৭৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। বাকী দু দিনের খেলা মাঠে মারা যায়।

উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ইংল্যান্ডের বয়কট—গড় ১৩৮·৫০। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন — পতৌদির নবাব (মোট রান ২৬৯ এবং গড় ৪৪·৮৩)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান সংগ্রহ করেছেন ইংল্যান্ডের কেন ব্যারিংটন—৩২৪ রান (গড় ৬৪·৮০)। বয়কটের রান ২৭৭।

বোলিংয়ে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট এবং তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ইংল্যান্ডের রে ইলিংওয়ার্থ—২৬৬ রানে ২০ উইকেট (গড় ১৩·৩০)। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ের তালিকায় সর্বাধিক উইকেট এবং শীর্ষস্থান পেয়েছেন—বি চন্দ্রশেখর—৪৩৫ রানে ১৬ উইকেট এবং গড় ২৭·১৮।

সেগুরী

ইংল্যান্ড (৩) **:** জিওফ বয়কট নট আউট ২৪৬ (লিডস): বি ডি' ওলিভেরা ১০৯ (লিডস) এবং টম গ্রেভনী ১৫১ রান (লর্ডস)।

ভারতবর্ষ (১) **:** পতৌদির নবাব ১৪৮ (লিডস)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ১০—১৫) অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ১২টি খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল **:** ৮টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৪টি খেলা ড্র। বৃষ্টির দরুণ ১১ই জুলাই তারিখের নির্দিষ্ট খেলা দুটি হয়নি।

লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল আলোচ্য সপ্তাহে দুটি ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা ১-০ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত করে বি এন রেল দলের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করে। বর্তমানে তারা লীগ তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে—১৬টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে আছে বি এন আর—১৮টা খেলায় ২৬ পয়েন্ট এবং তৃতীয় স্থানে মহমেডান স্পোর্টিং—১৪টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট। লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের লড়াইয়ে বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং। গত বছরের রানার্স আপ মোহনবাগান লীগ তালিকার মাঝে রয়েছে—১৪টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট।

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান দলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার একটি দৃশ্য। ফটো : অমৃত

উইম্বলেডন টেনিস

বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা অল-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাব। ১৮৬৯ সালে লন্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম শহরতলী উইম্বলেডনে চার একর জমির উপর যে অলইংল্যান্ড ক্রোকেট ক্লাব স্থাপিত হয় তারই পরিচালনায় ১৮৭০ সালের জুন মাসে প্রথম ক্রোকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। ১৮৭৫ সালে অল-ইংল্যান্ড ক্রোকেট ক্লাবের মাঠে লন টেনিস খেলার পৃথক ব্যবস্থা হয়। ফলে নতুন নামকরণ হয়—অল-ইংল্যান্ড ক্রোকেট এ্যান্ড লন টেনিস ক্লাব। পরবর্তীকালে ১৮৮৩ সালে ক্রোকেট কথাটা ক্লাবের নাম থেকে চিরকালের মত বাদ দেওয়া হয়। সেই সময় থেকেই অল-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাব। মাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেলা নিয়ে উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের উদ্বোধন হয় ১৮৭৭ সালে। ১৮৭৯ সালে পুরুষদের ডাবলস, ১৮৮৪ সালে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ১৯১৩ সালে মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেলা প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২২ সালে চ্যালেঞ্জ রাউন্ড খেলার প্রথা বিলুপ্ত হয় ফলে খেতাব জয়ী খেলোয়াড়দেরও প্রথম রাউন্ড থেকে খেলতে হয়। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে তাঁদের নামের বাছাই তালিকা প্রকাশের প্রচলন হয় ১৯২৪ সালে।

বিবিধ রেকর্ড

সিঙ্গলসের একটি খেলায় সর্বাধিক গেমস : ৯৩টি। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় জে ড্রবনি (ইজিপ্ট) ৮—৬, ১৬—১৮, ৩—৬, ৮—৬ এবং ১২—১০ গেমে যখন জে ই প্যাটিকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন তখন এই রেকর্ড স্থাপিত হয়।

ডাবলসের একটি খেলায় সর্বাধিক গেমস : ৯৪টি। ১৯৫০ সালের কোয়ার্টার ফাইনালে জে ই প্যাটি এবং এম এ ট্রাবার্ট (আমেরিকা) ৬—৪, ৩১—২৯, ৭—৯ ও ৬—২ গেমে যখন কে ম্যাকগ্রেগর এবং এফ এ সেজম্যানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন তখন এই রেকর্ড স্থাপিত হয়।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে সর্বাধিক গেমস : ১৯৫৪ সালে জে ড্রবনি (ইজিপ্ট) ১৩—১১, ৪—৬, ৬—২ ও ৯—৭ গেমে যখন কে আর রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন তখন এই রেকর্ড স্থাপিত হয়।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে সর্বাধিক গেমস : ৪৪টি। ১৯১৯ সালে কুমারী সুজান লেংলেন ১০—৮, ৪—৬ ও ৯—৭ গেমে যখন শ্রীমতী ল্যামবার্ট চেম্বার্সকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন, তখন এই রেকর্ড স্থাপিত হয়।

সর্বাধিক খেতাব জয় : ১৯টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)—মহিলাদের ডাবলস ১২টি এবং মিক্সড ডাবলস ৭টি।

সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব জয় : ৮টি—শ্রীমতী হেলেন উইলস-মুডী (আমেরিকা)।

সর্বাধিক পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয় : ৭টি—উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)।

সর্বাধিক পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয় : ৮টি—আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (ইংল্যান্ড)—দুই সহোদর।

সর্বাধিক মহিলাদের ডাবলস খেতাব জয় : ১২টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ন (আমেরিকা)।

সর্বাধিক মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় : ৭টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

পুরুষ বিভাগ

উপর্যুপরি ৩ বার সিংগলস খেতাব জয় : ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড পেরী (১৯৩৪-৩৬)।

মহিলা বিভাগ

সুজান লেংলেন (ফ্রান্স)—৫ বার (১৯১৯-২৩), হেলেন উইলস মুডি (আমেরিকা) —৪বার (১৯২৭-৩০), লুই ব্রাউ (আমেরিকা)— ৩বার (১৯৪৮-৫০), মরিণ কনোলি (আমেরিকা)—৩বার (১৯৫২-৫৪)।

উইম্বলেডনের টুকিটাকি

অল-ইংল্যাণ্ড টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের (যা উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস নামে সুপরিচিত) উদ্বোধন ১৮৭৭ সালে।

বিদেশী খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রথম পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয় করেন ন্যাটা খেলোয়াড় নরম্যান ব্রুকস (অস্ট্রেলিয়া) ১৯০৭ সালে।

বিদেশী খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রথম মহিলাদের সিংগলস খেতাব পান—কুমারী মে সাটন (আমেরিকা), ১৯০৫ সালে।

মিক্সড ডাবলস ফাইনালে স্বামী-স্ত্রীর খেতাব জয়ের একমাত্র নজির—শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা এল এ গডফ্রি (১৯২৬)।

প্রথম যোগদানের বছরেই এই চারজন খেলোয়াড় খেতাব জয়ী হন কিন্তু প্রতিযোগিতায় আর কখনও যোগদান করেন নি —পি ই হাডো (১৮৭৮), আর এল রিগস (১৯৩৯), কুমারী পি এম বেট্‌জ (১৯৪৬) এবং এফ আর সক্রোডর (১৯৪৯)।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে দুই বোনের খেলার একমাত্র নজির—লিলিয়ান এবং মাউড ওয়াটসন (১৮৮৪)। এই খেলায় মাউড ওয়াটসন জয়লাভ করেন।

পুরুষদের কনিষ্ঠতম সিংগলস চ্যাম্পিয়ান—উলফ্রেড ব্যাডেলে। ১৮৯১ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে যখন তিনি সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন।

পুরুষদের বয়োজ্যেষ্ঠ সিংগলস চ্যাম্পিয়ান—আর্থার ওয়েণ্টওয়ার্থ গোর। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি যখন তাঁর তৃতীয় সিংগলস খেতাব জয় করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর ৬ মাস।

১৮৮৭ সালে কুমারী কারলোট ডড্ (লোটি ডড নামে সুপরিচিত) মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম সিংগলস খেতাব জয় করেন। তিনি মোট ৫ বার সিংগলস খেতাব পান এবং খেলায় অপরাজিতা থাকেন।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা

প্রদীপ বিশ্বাস

(এরিয়ান)

জর্জ টেলিগ্রাফ তাঁবু থেকে বেরিয়ে, রেড রোড পেরিয়ে যেদিন এরিয়ান তাঁবুতে এসে উঠ্‌লো ছেলেটি—সেদিন অনেকেই ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন। এমন রোগা লিক্‌লিকে চেহারা, সত্তর মিনিট খেলতে পারবে কি? দু-এক দিন যেতে না যেতেই প্রদীপ প্রমাণ করলেন যে, সত্তর মিনিট খেলার সামর্থ্য রাখেন তিনি।

প্রদীপ বিশ্বাস এরিয়ানের ইনসাইড লেফটে খেলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খেলা, হৈ-হাঙ্গামায় নেই। যেটুকু খেলেন বুদ্ধি দিয়ে, মাথা ঘামিয়ে, ভেবে-চিন্তে, হিসেব করে আউটসাইড আর সেন্টার ফরওয়ার্ডকে বল যোগান, পরিশ্রম করেন পিছিয়ে পড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর চাপের মুখে। ডিস্ট্রিবিউসন দেখবার মত, গতি ক্ষিপ্র, পরিকল্পনা স্বচ্ছ।

এ জি বেঙ্গলের কর্মী, এরিয়ানের প্রদীপ বিশ্বাসের জন্ম ১৯৪৯ সালের ৩রা জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলায়। প্রদীপের স্কুল-জীবন কেটেছে আড়িয়াদহ হাইস্কুলে। ফুটবল খেলা সুরু করেন দক্ষিণেশ্বর মেঘনাদ ক্লাবে এবং পরবর্তী-পর্বে দক্ষিণেশ্বর ওয়াই এম এ-তে। ১৯৬৩ সালে শ্রীশম্ভু মুখার্জি ধরে নিয়ে এলেন জর্জ টেলিগ্রাফে। এর ভেতর প্রদীপ আন্তঃস্কুল, আন্তঃ কলেজ, রাজ্য জুনিয়র এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অঙ্গনাই পেরিয়ে এসেছিলেন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছেন ১৯৬৪ সালে মাদ্রাজে এবং ১৯৬৭ সালে সগরে। আন্তঃ রাজ্য (জুনিয়র) ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছেন ১৯৬৬ সালে কটকে।

প্রদীপ এখন বি এ পড়ছেন বিদ্যাসাগর কলেজে। চাকরী করেন এ জি বেঙ্গলে। প্রদীপের সবচেয়ে বড় গুণ—তাঁর হাসি-হাসি মুখ, চমৎকার মেজাজ। হার-জিৎ উভয় ক্ষেত্রেই হাসি মুখে লেগেই আছে।

মন্টু কর্মকার

(মোহনবাগান)

১৯৬৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী, বেলা চারটে, হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামের খেলোয়াড়দের সাজঘরের একটি দৃশ্য। খর্বকায়, প্রিয়দর্শন একটি ছেলের কাঁধে হাত রেখে দীর্ঘকায় রেলওয়ে অধিনায়ক পিটার থঙ্গরাজ সস্নেহে কি যেন বলছেন।

এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়ালাম। শুনলাম প্রাক্তন সৈনিক থঙ্গরাজ ইংরেজী আর বাংলা দুটো মিলিয়ে বলছেন: "মন দিয়ে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিরথা সিংকে নজর রেখো, অবস্থা সামলাতে না পারলে বল "কল" করে আমায় ঠেলে দিও, ভয় নেই, হিম্মৎ সে খেলো, কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং"। মাথা নীচু করে যে তরুণ ছেলেটি অধিনায়কের উপদেশ শুনছিলেন তাঁর নাম মন্টু কর্মকার।

সন্তোষ ট্রফির ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় (৫ই ফেব্রুয়ারী) সার্ভিসেস দলকে রেলওয়ে হারিয়ে দিয়েছিল পরিষ্কার দু গোলের ফারাকে। আর নিজেদের গোল অক্ষত রাখতে মন্টু এবং থঙ্গরাজ দুজনে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামের পঁচিশ হাজার লোক সম্ভবতঃ তা দীর্ঘদিন মনে রাখবেন।

কলকাতার মাঠে মোহনবাগানের হাফব্যাক মন্টু কর্মকার ঠিক এই মুহূর্তে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ঠিকমত জায়গা আগলে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের ধার ভোঁতা করে দিতে মন্টুর দক্ষতা অসাধারণ। কিন্তু রক্ষণভাগের খেলোয়াড় হলেও ক্রীড়ারীতি সুস্পষ্টরূপে আক্রমণাত্মক মেজাজে গড়া। প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতিকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে দিনের পর দিন সাফল্যের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন মন্টু কর্মকর।

কিন্তু না চিনলে কেই বা বলবেন যে মন্টু ফুটবল-খেলোয়াড়? মিষ্টি, লাজুক-লাজুক চেহারা, টানাটানা চোখ, সযত্ন-লালিত কুঞ্চিত কেশদাম, হাসি-হাসি মুখ।

১৯৪৪ সালে পূর্ব বাঙলার ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে মন্টুর জন্ম। দেশ খণ্ডিত হওয়ার পর মন্টুরা চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে, যাদবপুর এলাকায়। বাবা শ্রীমাখনলাল কর্মকার একজন কৃতী ইঞ্জিনীয়ার কর্মস্থল বোম্বাইয়ে। মন্টু পড়াশুনা করছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, চাকরী রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশনে। ফুটবলে প্রথম হাতেখড়ি

যাদবপুরে অগ্রগামী ক্লাবে শ্রীসুহৃদ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে।

যাদবপুর অগ্রগামীতে খেলার সময় বেঙ্গল সকার লীগের সূত্রে কলকাতা ময়দানের সঙ্গে মণ্টু কর্মকারের প্রথম পরিচয়। ১৯৬১ সালে খেললেন মোহনবাগানের পক্ষে পাওয়ার লীগে। ১৯৬২ সালে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাঙলা দলের হয়ে খেলেছেন। পরের বছর গেলেন উয়াড়ীতে। ধীরে ধীরে মণ্টু পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে এসে দাঁড়াতে লাগলেন। ১৯৬৪ সালে জুনিয়র বাঙলা দলের নেতৃত্বের ভার পড়ে তাঁর ওপর। ১৯৬৫ সালে সগরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন কলকাতা দলের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। এই বছরই উয়াড়ীর পক্ষে খেলেন কটকে কলিঙ্গ কাপে। ১৯৬৬ সালে আবার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতার হয়ে খেলে চ্যাম্পিয়ন আখ্যা অক্ষুন্ন রাখলেন কুরুক্ষেত্রের আসরে। ইতিমধ্যে মণ্টু সর্বভারতীয় দলেও স্থান পেলেন ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশীয় যুব ফুটবল উপলক্ষে। এই বছরই স্বদেশে লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মৃতি ট্রফি বিজয়ী হোল মণ্টু কর্মকারের অফিস, রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন দল।

মোহনবাগানে মণ্টু এলেন ১৯৬৭ সালে। ব্যাংককে আয়োজিত এশীয় যুব ফুটবলে যোগদানকারী ভারতীয় দলে আবার ডাক পড়লো তাঁর। মোহনবাগানের পক্ষে ছাড়পত্রের স্বাক্ষরের কালি শুকোতে না শুকোতেই—বোম্বাই থেকে রোভার্স কাপ নিয়ে এলো মোহনবাগান। ভাগ্যবান মণ্টু তখন মোহনবাগানের শক্ত খুঁটি।

অসীম বসু

(এরিয়ান)

"বড় কষ্ট করে, অনেকদিনের সযত্ন-লালিত স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, এ সুযোগ হেলায় হারাবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি যেন দলের সহযোগীদের পাশে যোগ্যভাবে দাঁড়াতে পারি।"

এরিয়ান ক্লাবের লনে বসে সেদিন এই কথাই বলছিলেন লেফটআউট অসীম বসু। সদ্য মোহনবাগান জয়ী অসীমের গা থেকে তখন ঘাম শুকোয় নি। তখনও হাঁপাচ্ছেন, উত্তেজনায় কাঁপছে হাত-পা। চারদিক ঘিরে একদল লোক তারিফ করছিলেন দেবী দত্তের, অসীম বসুর। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেদিনের দুটি অমূল্য গোল দুজনেরই।

রোগা, কালো, অতিসাধারণ চেহারা অসীমের, কিন্তু তাই গড়েপিটে নিয়েছেন এরিয়ানের কর্মকর্তারা। সবার চোখ এখন লেফটআউট অসীমের ওপর। ১৯৪৪ সালে হুগলী জেলার হরিপালে অসীমের জন্ম। বাবা এবং মা অসীমকে ছোটবেলা থেকেই উৎসাহ দিয়েছেন ফুটবলে, পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে। অসীমরা তিন ভাই, চার বোন।

ছেলেবেলায় স্কুলে ফুটবল খেলার সময় শিক্ষক শ্রীগোবর্ধন মল্লিক সযত্নে অসীমের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিতেন। হরিপাল স্কুলে পড়ার সময় শেওড়াফুলি বি এস পার্ক দলের হয়ে খেলেছেন হুগলী জেলায় এবং আশেপাশে। ১৯৫৭ সালে প্রাণকৃষ্ণবাবু শেওড়াফুলি বি এস পি অ্যাণ্ড এস এ ক্লাবে টেনে নিয়ে আসেন অসীমকে। ১৯৬১-৬২ সালে আন্তঃজেলা ফুটবলেও অসীম খেলেছেন। ১৯৬৩ সালে এলেন কলকাতার মাঠে, বালী প্রতিভার জামা গায়ে দিয়ে। দু বছর খেললেন বালীতে। ১৯৬৫ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়নে এবং পরের বছর এরিয়ানে। স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলার সময় হেরম্বচন্দ্র কলেজের ছাত্র হিসেবে খেলেছেন কলকাতার হয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে পাটনা এবং কুরুক্ষেত্রে। এরিয়ানে এসেও বাইরে খেলেছেন গোহাটিতে বরদলৈ ট্রফি এবং রাজধানীতে ডুরাণ্ড কাপে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরী নিয়েছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায়। সেখানে ভাল লাগলো না, এলেন শ্যামনগরে এক ব্যাটারীর ফ্যাক্টরীতে, সেখানেও না—শেষ পর্যন্ত এ জি বেঙ্গলে এসে স্থির হয়ে বসেছেন অসীম।

তপন দাস

(এরিয়ান)

এক কথায় এঁদের ফুটবল-ফ্যামিলিই বলা যায়। বড় ভাই বৈদ্যনাথ দাস এক সময় কলকাতা মাঠে নাম কিনেছিলেন এরিয়ান এবং রাজস্থানের সেন্টার-ফরওয়ার্ড এবং পরবর্তী পর্বে কোচ হিসেবে, পরের ভাই খেলোয়াড় এবং তারপরেই তপন। তপনও বড় ভাই বৈদ্যনাথের মত সেন্টার-ফরোয়ার্ডে খেলছেন।

ভ্রাতৃপরিচয় যাই থাকুক না কেন, তপন কিন্তু কলকাতার মাঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, নিজের অধ্যবসায়ে। মাথায় খাটো তপনকে দলের সেন্টারফরওয়ার্ড করতে অনেকেরই ছিল আপত্তি। তাঁদের ধারণাকে সরিয়ে দিয়ে তপন আজ দস্তুরমত প্রতিষ্ঠিত।

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে তপনের জন্ম খড়গপুরে, লেখাপড়া খড়গপুর রেলওয়ে হাইস্কুলে। তপনরা ৫ ভাই, ৫ বোন। দাদাদের পদাংক অনুসরণ করে ১৯৬৩ সালে খড়গপুর ট্রাফিক ক্লাবে বুটপায়ে ফুটবল খেলা সুরু করেন। ১৯৬৫ সালে এলেন কলকাতায় খিদিরপুরের হয়ে খেলতে, খিদিরপুর দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হোল। ১৯৬৬ সালে প্রথম ডিভিসনে খিদিরপুরের হয়ে খেললেন, লীগের প্রথম পর্বে কালীঘাটের বিরুদ্ধে হ্যাট্‌ট্রিক করলেন তপন দাস। এই বছরই হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি শীল্ডে আই এফ এ দলে স্থান হোল তাঁর।
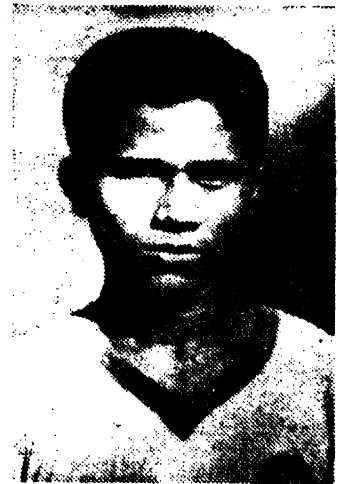
জীবনে সেদিনের সেই খেলাটিই তপনের সবচেয়ে স্মরণীয়, ফলাফল, গোলশূন্য। প্রদীপ ব্যানার্জি, এ্যাণ্টনী, লায়েনেল এবং কে বি শর্মার পাশে খেলেছিলেন সেদিন তিনি। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বেলঘরিয়া ডিপোর কর্মী তপন দাস এরিয়ানে এসেছেন ১৯৬৭ সালে।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালো গুঁড়ো চায়ের মধ্যে সেরা

লিপটন হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট চা

দেখতে দেখতে এই চা থেকে আপনি পাবেন কাপের পর কাপ স্বাদে গন্ধে ভরপুর রংদার লিকার। নিজে খান। অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়ান। খেয়ে তৃপ্তি। খাইয়ে তৃপ্তি। লিপটন হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট চায়ের জুড়ি নেই।

লিপটন বলতেই ভালো চা

LIPTON

LHGC-3 BEN

॥ পনের ॥

সুরবালা বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলিঙে ভর দিয়ে। ওঁর মুখে যে একটু হাসি ফুটল সেটা উত্তরটুকুর প্রত্যুৎপন্নতায় না ফুটে উপায় ছিল না বলেই। আস্তে-আস্তে সরে গেলেন উনি।

এখন ওঁদের তিনজনে বসে পরামর্শ হয়। আদুরীকে নিয়ে, আদুরী-সন্দীপের পারিস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে।...ওদের কথাবার্তা-আচরণের মধ্যে যায় কি পাওয়া কোন ইঙ্গিত যাতে ওঁদের দিকের পরিকল্পনা সমর্থন পায়? সংশয়টা সুরবালার। হেমাঙ্গিনী আর রঙ্গময়ীর ধারণা একেবারে সুনিশ্চিত।

সুরবালার সংশয়ও অবশ্য বিশ্বাসের দিকেই বেশি প্রবণ, তবু প্রশ্ন করে সেটাকে আরও পাকা করে নিতে চান। বলেন—"তোমরা তো বলছ, কিন্তু ছেলের তো সেই স্বভাব। যা কিছু—মুখ খোলাই বল, বা হুটপটে হওয়াই বল—শুধু যেন এই তাসের আড্ডাতেই। ওদিকে হাবুল-পটলরা অত করে সাধ্যি করছে, অথচ..."

হেমাঙ্গিনী চটে যায়। বলেন—"বড় অধৈর্য তুমি, কতবারই বলতে হয়েছে কথা। বাইরে হ'চ্ছে কি না হ'চ্ছে সে তুমি বাড়ির ভেতর কি করে জানবে?"

"ধরে নিলাম হচ্ছে, না"।—পানদোক্তা মুখে দিয়ে তর্ক করেন রঙ্গময়ী, বলেন—"তোর কথাই যদি ধরা যায় তো আমার এর উত্তরটা দে দিকিন। অত করেও বাইরে ওরা রাজি করতে পারছে না অথচ যেই তাস নিয়ে বসল—পাশে আদু, অমনি ছেলে আর সে-ছেলে নয়, মুখে তড়বড় ক'রে খই ফুটছে। হেতুটা কি বলতে পারিস আমায়?"

মুখটা একটু উজ্জ্বলই হয়ে উঠে সুরবালার, তবু তর্কই চালিয়ে যান—"আমি যদি বলি সন্দু খেলে ভালো, আদুর ওসব বরদাস্ত করতে পারে না—হেরে গেলেও আরও যায় চটে—সওয়াল, জবাব চলে। ছেলে তো আমার বোকা নয় যে..."

"ছেলে তো তোমার ছেলেমানুষও নয়; একথা বুঝতে পারছ না কেন মা হ'য়ে? ঝগড়াটেও তো নয় ছেলে, মিনমিনেরা তো হয়ও না। তবে ছেলে তোমার যেখানে চুরি, হার, ঝগড়া সেখানে জোটেই বা কেন এসে? ...কাকে বোঝাচ্ছি বল্ দিকিন হেমা?"

"সেদিন নিজেও তো দেখলাম"—হেমাঙ্গিনী সায় দিলেন—"কি একটা বড় খেলা মাঠে, হাবুল এসে ডাকলে—বলল—'তুমি যাও দাদা, আজ বড্ড বাড়িয়েছেন এঁরা, না হারিয়ে উঠব না।'

ঐ নাও; খেলার রস, আর তাসের রস। কোথা থেকে হয় এটা ঠাকরুণ, আমায় একটু বুঝিয়ে বলতে পার? আজ সারাটা জীবন একটা মানুষের সঙ্গে নিত্যি ঝগড়া করে কাটিয়ে এলাম, আমি বুঝব কেন?...তোর ডিবেটা দেখি হেমা।"

হেমাঙ্গিনীর জর্দা। ডিবেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"আর ঠাকুরঝির নিজের কথা?"

"উনিই যেন বাদ যান!"—তির্যক দৃষ্টি হানেন সুরবালা ভ্রাতৃজায়ার দিকে; তারপর আবার আলোচনার অন্য দিকটা ধ'রে প্রশ্ন করেন—"তাহলে কি বল? করব চেষ্টা বিয়েরই? কিন্তু তোমাকেও যে বাদ দেয় না। বুঝলাম না হয় বেশ চালাক-চতুরটি, কিন্তু যারা বয়সে এত বড়, গুরুর তুল্যি, তাদেরও ছেড়ে কথা কইবে না? তা হ'লেই বলব না বাচাল পণ হচ্ছে?"

—ভ্রু চেপে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

"তোর কথায় দেয় অমন কাটা কাটা উত্তর?"—প্রশ্ন করেন রঙ্গময়ী।

"তা যেন দেয় না"—উত্তর করেন সুরবালা।

"বেশ। হেমার কথার ওপর দেয়?"

'তাও তো কখনও শুনিনি।

হাত ওদিকে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, ডিবেটা খুলে এক টিপ জর্দা মুখে ফেলে দিয়ে যেন জ্বালাতন হ'য়ে হেমাঙ্গিনীর পানে চেয়ে বললেন—"আমি যে খুঁচিয়ে ঘা করছি, ভেতরটা কোন গলদ আছে কিনা—তাই নাতনীর সম্বন্ধটাই ধরেও আছি—একটু ও হারী যদি না বোঝে তো তার ওষুধ কি বল্ তো হেমা? বিয়ের পর এ সম্বন্ধটা থাকবে?—এখন যেমন শ্বাশুড়ীও নাতনী, বৌও নাতনী। সেই যে সিদিন বললে—ঠানদিদির মন-চুরি করার কত অলিগলি জানা আছে—খোঁচাটুকু দিলাম—তাই না উলটে বললে?"

"একটা ঠাট্টাই তো"।—মন্তব্য করেন হেমাঙ্গিনী। একটু হাসি টিপে বলেন—"তা নয়তো, ঠানদি নাকি মন-চুরি করবার

জনাই সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমন করে ?"

হাসিটুকুতেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মুখের ওপর ফেলেছিলেন রঙ্গময়ী, বললেন—"মরণ! উনি আবার দাঁও বুঝে ঠাট্টার সঙ্গে নিজের ঠাট্টা না জুড়ে নিয়ে থাকতে পারলেন না"।

তিনজনেই উঠলেন হেসে। এরপর আবার গম্ভীর হ'য়ে উঠে বলে চললেন রঙ্গময়ী—মস্করা ছেড়ে শোন যা বলি, রঙ্গঠানদির চাল ধরতে তোদের এখনও দেরি আছে। এক ঝলকে বুঝে নেওয়া গেলো। মনের ভেতরটা পরিষ্কার বলেই না বের করতে পারল কথাটা, নৈলে তো একটা আস্পর্দাই। এই রকম করে সুবিধে পেলেই যা দিয়ে দেখে না নিলে চলবে ?"

সংশয়টা কেটে গিয়ে মনের ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে ঠাট্টাই আসে বেরিয়ে। সুরবালা বলেন—"তুমি যে মস্ত বড় সিভিল-সার্জেন সে কথা অস্বীকার করছে কে? আমিও সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি—তা হলে বল তো তোড়জোড় করি ওদিকে, সামনে বোশেখ মাসটা রয়েছে..."

"নাও, হোল তো আর তর সয় না, একেবারে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে!"—একটু ধমক দিয়েই ওঠেন রঙ্গময়ী, বলেন—"বোশেখ তো একেবারেই শিয়রে, পরশুই তো সংক্রান্তি। ছেলেটা ফ্যালনা?—যে-কোনো রকমে দায়সারা ক'রে দু'হাত এক করে দিলেই নিশ্চিন্তি। এর পর জষ্টি মাস, জেষ্ঠ ছেলের দেবে না বিয়ে। এর পর আষাঢ়, শ্রাবণ রয়েছে। না হয় আরও তিনটে মাস টপকে অঘ্রাণেই গেলি। ততদিন দেখাই যাক না রয়ে-ব'সে একটু। তা নৈলে ম্যারি ইন' হেস্টো—কি যে সেই বলে ইংরাজীতে, অত মনেও থাকে না বাছা..."

দু'জনের মুখে হাসি ওঠে। চলতি ইংরাজী প্রবাদটা জানা আছে সুরবালার, জুগিয়ে দেন—"রিপেণ্ট অ্যাট লিজার"।

"ঐ রকমই যেন হবে—তোদের দাদু যে প্রায় খোঁচা দেয়—একেবারে সেই আঠারো বছর বয়েসে সাত তাড়াতাড়ি পিঁড়ের উঠে বসেছিল কিনা—বলে হ্যাংলা ভাত খাবি? না-পাত্ত পাতব কোথায়?..."

হঠাৎ প্রসঙ্গ ছেড়ে স্মৃতির বাতায়ন খুলে যেতে কেমন একটা লজ্জা নেমে আসে। রঙ্গঠানদিদি সুরবালার দিকে একটু চোখ পাকিয়ে চেয়ে সামলে নেন। চাহনির সঙ্গে একটু হাসি মিশিয়ে বলেন—"তাহলে বলব, তোরও নাতজামাইয়ের কাছে খেতে হয় খোঁচাটা মাঝে মাঝে, নৈলে জানলি কি করে কথাটা ?"

"হ্যাঁ, দেয় খোঁচা, তুমি কান পেতে শোন গিয়ে!"—উত্তর দেন সুরবালা। লজ্জা জিনিসটা সংক্রামক, এর পরই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ফেলতে গিয়ে, আদিনাথের উল্লেখে বোধ হয় তাঁর কথাই মনে পড়ে যায়, একটু মুখ ভার করেই বলেন—"তোড়জোড় করার কথা বলছিলাম—ঐ এক মানুষ, আঠার মাসে যার বছর, তাকে তেমনি সময় হাতে রেখে জানিয়ে দিতে হবে তো। মিলিয়ে নাও না—এই যে একটা মানুষ তিন মাস এসে বসে রয়েছে...আমি না হয় মানুষের মধ্যেই নয়, ছেলেটা তো রয়েছে—তা একবারটি এসে ..."

"হুকুম হলেই এসে পড়েন..."

—টিপ্পনী করলেন হেমাঙ্গিনী।

"চুপ করো গো ঠাকরুণ!"—মুখ নাড়া দিয়ে ওঠেন সুরবালা, বলেন—"আঁচলে বেঁধে বসে আছ নিজেরটিকে, সবাই যে হুকুমের দাস নয় তা বুঝবে কোথা থেকে ?"

হেসে ওঠেন রঙ্গময়ী, দোক্তার দরকার হয়, মুখে এক টিপ ফেলে দিয়ে বলেন—"তা বলগে না তোড়জোড় করতে, বিয়ে তো এক কথায় হওয়ারও নয়। আমি বলছিলাম—ত্দ্দিন আয়, ভালো করে দেখে যাই নেড়েচেড়ে..."

"ও ঠানদি, দ্যাখো, বলি বলি করে বলা হয় নি তোমায়!"—একটা যে কথা বহুদিন থেকেই বলবেন কিনা আগুপিছু করছিলেন, যেন আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এইভাবে একটু উৎসুক হয়েই বলে উঠলেন সুরবালা—"বলছিলাম, একদিন তোমার 'করুণাময়ী হোমটা' গিয়ে দেখে আসব। শুনেছি নাকি বড় চমৎকার।...তুমি গিয়েছ কখনও বড়বৌদি ?"

"একবার অনেক আগে কবে যেন গিয়েছিলাম। বেশ সব।"

"নিয়ে চলো তাহলে একদিন ঠানদি। লক্ষ্মীটি।"

"বেশ তো, চল্ না। সবার মধ্যে আর্দ্রাকে দেখাও হবে ভালো করে আরও।"

"সে আমি বুঝি না।"—এটাও যে উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে, সেটুকু চেপে যান সুরবালা। কেমন যেন মনে হয়, রঙ্গময়ীকে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়তো। বলেন—"সে তোমার কাজ তুমিই বুঝবে। আমি একলা থাকলেই বড় বুঝি, আবার দলের মধ্যে থেকে বুঝে নোব!"

॥ খোঁজ ॥

এই রকম হয় বৈঠক মাঝে মাঝে তিনজনের; উপলক্ষ্য আর্দ্রাই, তারপর নিজেরাও মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়েন তার সঙ্গে, হাসিতে ঠাট্টায়, তিনজনের পরস্পরের সম্বন্ধটুকু তো রস-ঘনিষ্ঠ, বেশ দানা বাঁধে রসের। নেপথ্য থেকে টানেন যে—যাঁর দোসর তাঁদের,—সনাতন, আদিনাথ, রঙ্গময়ীর দোসর বটুকেশ্বর; মানে, অভিমানে, কপট-অমর্ষে। ফিরে আসে আলোচনা আর্দ্রাতেই।... নেওয়ার মতোই মেয়ে বৈকি, রাজযোটক হবে একেবারে। সন্দীপের একেবারে উপযোগীটি করেই বিধাতা ওকে গড়ে পাঠিয়েছেন।

এরপর একদিন গেলেন তিনজনে "করুণাময়ী হোম"-এ। দিন এবং সময় বেছে। রবিবার, বেলা যখন তিনটে। সবাই থাকবে, কারুর বেরুতে হোলেও সে বিকালে বা সন্ধ্যায়।

উপস্থিত মেসের যারা অধিবাসী—কমলা, দয়া, মীনাক্ষি, সুষমা, নিরুপা, মাধবী, তন্দ্রা, আর্দ্রা—কমলা আর তন্দ্রাকে বাদ দিয়ে সবাই ছিল। রবিবার, বাইরেরও তিনটি মেয়ে এসেছে, কমলার ঘরে সবাই গল্পগুজব করছে—"কৈ রে বড় নাতনী!" বলে হাঁটু ধরে উঠে এলেন রঙ্গময়ী, পেছনে সুরবালা আর হেমাঙ্গিনী, বাড়ির গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ায় আজ ট্যাক্‌সিতেই এসেছেন, হর্ণটা আর দেওয়া হয়নি। অভ্যর্থনা থেকেই রহস্যের সূত্রপাত। উনি এলে, বিশেষ করে যদি দেরি হোল, যা এবার হয়েছেই খানিকটা—ঠাট্টা মুখে করেই বেরিয়ে আসছিল সবাই, পেছনে এঁদের দুজনকে দেখে চুপ করে গেল। আর্দ্রাই এল এগিয়ে, ওঁদের চেনে বলে। মুখটা খুশিতে রাঙা হয়ে উঠেছে; বলল—"ওমা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি, কাকিমা আর পিসিমাও যে! আসুন ভেতরে! ঠানদিদি আসুন।"

প্রণাম করল তিনজনকে, ওরা সবাইও করল। দু'তিনজন মেয়ে চৌকিগুলোর বিছানা, কার্পেট যা অগোছ হয়ে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি হাতের টানে ঝেড়ে গুছিয়ে ঠিক করে দিল। রঙ্গময়ী অভ্যাস মতো কমলার বিছানাতেই বসে ওঁদের দু'জনকেও পাশে বসিয়ে নিলেন। তারপর একবার সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কমলাকে দেখছি না যে? বাড়ি গেছে না কি?"

আর্দ্রাই বলল—"কমলাদি তন্দ্রাকে নিয়ে একটা ইণ্টারভিউ ঠিক ক'রে আসতে গেছেন।"

"পাস করল তন্দ্রা?"

"হ্যাঁ, এই দিন চারেক হোল রেজাল্ট বেরিয়েছে। আফিসের একজন ভালো কর্মচারী, বেশ খানিকটা উঁচুতে, তাঁর একটি মেয়ে কমলাদি'র কাছে পড়ে। সেই সূত্রে কমলাদি নিয়ে গেছেন তন্দ্রাকে।"

"আশা আছে?"

কথাটা যেন চালু রাখবার জন্য প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী, অন্যমনস্কভাবে ঘরে এটা-ওটার ওপর দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে।

"আশা তো বিশেষ নেই। তারা চায় বেশ চটপটে, স্মার্ট্—তন্দ্রা আবার যা মুখচোরা লাজুক ▪

ন্যাখ্যাদেবীর মন্দির

ফটো : মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

"একদিনেই তোয়ের হয়ে যাবে? পাস রার সঙ্গে সঙ্গে?"

"এ-মেসে থেকেও যখন এতদিনেও..."

—জয়ার নিশ্চয় জিভ চুলকা চ্ছল এতক্ষণ মের মধ্যে থেকে। আর্দ্রা চোখের শাসনে য়ে দিল একটু আড়ে চেয়ে।

এই ধরনের কথাবার্তাই চলল কিছুক্ষণ। ন হয়ে থাকে। আলোচনার সূত্র ধরে সঙ্গ বদলে বদলে যাচ্ছে, সবাই কিছু-না-ছু যোগ দিচ্ছে, হেমাঙ্গিনী পর্যন্ত বাদ লেন না, যোগ দিলেন না শুধু সুরবালা। নি একেবারেই নীরব, শুধু বিস্মিত, একটা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন। ষ্টিটা ঘুরছে অবশ্য এমুখ—ওমুখের দিকে, বার্তার সঙ্গে, তবে লক্ষ্য বেশি করে দ্রাই। চোখো-চোখি হতে একটু অপ্রতিভই য় ঘুরিয়ে নিলেন দৃষ্টি।

ও'র বিস্ময়, সনাতনদের বাড়িতে তাসের খার সে-আর্দ্রাকে যেন এ-আর্দ্রার মধ্যে জেই পাচ্ছেন না; না কথার মধ্যে, না গের মধ্যে। নিজের সমস্ত সত্তাটুকুকে ন কষে লাগাম ধ'রে সংযত ক'রে রেখেছে দ্রা। অথচ এত সহজভাবে যে, আসল র্দ্রা কোন্‌টি তা বুঝে নেওয়া শক্ত।

এরই মধ্যে এক সময় নীচে স্টোভ লার সোঁ সোঁ শব্দ উঠতে একটু চঞ্চল য় উঠে অনির্দিষ্টভাবে—"তোরা বোস্‌, মি আসছি।"—ব'লে উঠে পড়ল চৌকি ড়ে।

"কেন বল্‌তো?"—প্রশ্ন করে উঠলেন ময়ী। বললেন—"আমরা এলাম একটু গুজব করতে, ও কখন্‌ লোক পাঠিয়ে ভ জ্বালিয়েছে! কেন বলতো?—খাতির?"

"বাঃ, একটু চাও হবে না?"

"হতে হয়, তার সময় আছে। তুই বোস্‌। ঠাকুর চা করতে পারে না।"

ওর এরূপটা উনিও দেখেন নি বলে একটু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। বাধ্যভাবে বসল আর্দ্রা খানিকক্ষণ, কিন্তু বেশ অন্যমনস্ক; কেমন যেন তাল কেটে কেটে যাচ্ছে। ভেতরকার এ-চঞ্চলতাটুকু এত ধরা পড়ে যেতে লাগল যে, এক সময় সেটাকে যেন স্বীকার করে নিয়েই একটু হেসে উঠে পড়ল আর্দ্রা।

"এখুনি আসছি, তোরা গল্প কর্‌।"

"এত খাতির, আসা তাহলে বন্ধ করতে হবে আদু!"—

শাসালেন রঙ্গময়ী।

"বাঃ, আমিই যেন করছি!"—থমকে একটু যেন বিব্রত হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল আর্দ্রা; বলল—"কমলাদি নেই, শেষকালে ঝাঁটা মারবেন আমায়।"

জয়া বলল—"না হয় তুই বোস না, আমি যাচ্ছি।"

"বাঃ, অমনি যোগ দিলেন!"—তিরস্কারের দৃষ্টি নিয়ে চাইল আর্দ্রা ওর দিকে, তারপর—"না, এতে আমি কাউকে ভাগ বসাতে দিচ্ছি যেন।"—ব'লে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। অনুযোগ করল—"আহা, কত যেন আসছেন সব! এতদিন রয়েছি আমরা, এই তো সবে ঘুম ভাঙল কাকিমা-পিসিমার।"

সিঁড়ির দু'ধাপ নেমেও আর একবার ঘুরে দাঁড়াল। হেমাঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে বলল—"আর জানেন কাকিমা?—সেকথাটাও বলে দিই—উনিও যে কত দিন আসা বন্ধ করেছেন—অথচ আপনাদের ওখানে তো কামাই নেই দিব্যি, প্রায় রোজই......"

"হিংসে করছ আমাদের?"—হেসে বললেন হেমাঙ্গিনী।

"হতে নেই যেন! এতদিন থেকে পড়ে আছি মেসে—এতগুলি মেয়ে......"

—বলতে বলতেই গটগট করে নেমে গেল।

একটু পরে—"যাই, দেখি একটু" বলে মীনাক্ষিও গেল নেমে। তার আধঘণ্টাটাক পরেই চাকর পতিতপাবনের হাতে চা আর খাবারের প্লেট সাজিয়ে উঠে এল দুজনে।

এরপর একটা টেবিল সামনে বসিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে জুতো পড়ে ওঠার খটখট শব্দ উঠল, একটু মন্থর। সুষমা—"কমলাদি এলো?"—বলে বেরিয়েছে, কমলাও উঠে এলেন, পেছনে তন্দ্রা; বললেন—"নাঃ, নো চান্‌স্‌"।

এরপর ক্লান্তভাবেই আরও দু'পা এগুতে রঙ্গময়ীর ওপর নজর পড়ল, সুষমা নাম ধরে উঠে আসতেই উনিও ঘুরে চেয়েছেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—"ওমা, ঠানদিদি যে! কখন এলেন?"

উনি উত্তর দেওয়ার আগেই, চৌকাঠ ডিঙোবার সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনী আর সুরবালার ওপর নজর পড়ল। প্রশ্ন করলেন—"এ'রা?"

॥ সতের ॥

পরিচয় পেয়ে কমলার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন—"কী ভাগ্যি আমাদের আজ। শুনিই আপনার কাছে, দেখিনি

তো কখনও। নিন, চা যে ঠান্ডা হয়ে যাবে, খাবারটুকুও।"

"বাঁচলাম কমলাদি, আপনি এলেন!"—অনুযোগ করল আর্দ্রা। বলল, "এবার চার্জ নিন আপনি, ঐটুকু করবার জন্যে ঠানদিদির কথা শুনতে হয়েছে—খাতির—আর আসা চলবে না!..."

হেসে ফেলল।

"মিছে বলেছে ঠানদিদি!"—বলে উঠলেন রঙ্গময়ী। তারপর হাত দুটো একটু গুটিয়ে নিয়ে বললেন—"তা হয়েছে ভালই। তোরা আগে নে দুটো প্লেট তুলে, শুকিয়ে রয়েছিস।...হোল না তো কিছু তন্দ্রার?"

চপলভাবেই খিল খিল ক'রে হেসে উঠল আর্দ্রা, কমলা উত্তর দেওয়ার আগেই। রঙ্গময়ী বললেন—"বেমুক্ল রূপ মেয়ের এতক্ষণে! কমলাদিকে চার্জ দিয়ে দিলাম, আর কি? অন্যায়টা কি বলেছি আমি? আগে ওদেরই..."

"চার্জ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে প্লেট, কাপ সব তুলে নেবেন কমলাদি?"—আবার এক ঝোঁক হেসে, পাশেই নিরুপোর কাঁধে মুখটা লুকিয়ে ফেলল। অসামঞ্জস্যটা ধরা পড়ায় সবাইকেই একটু হেসে উঠতে হোল। রঙ্গময়ী হাসতে হাসতেই মুখ ভার ক'রে বললেন—"ডেঁপোমি ছেড়ে দে বলছি!"

হাত বাড়িয়েছেন তুলে নেওয়ার জন্য, জয়া একটু এগিয়ে এসে বলল—"দাঁড়ান্। আমি একটা ফয়সালা করে দিচ্ছি।"

"কি ফয়সালা, বলুন জজ সাহেব?"—থেমে গিয়ে বললেন রঙ্গময়ী।

জয়া তুলেই নিল ও'র কাপটা। "নে ধর",—বলে জোর করেই তন্দ্রার হাতে দিয়ে, হেমাঙ্গিনীটার দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বলল—"ঠিক করতে করতে জুড়িয়েও যাবে চা'টা।...নাও কমলাদি!...আর, খাবার তো হাত-মুখ না ধুয়ে খাবেনও না বলুন?"

শেষেরটা রঙ্গময়ীকেই বলল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল—"ঠাকুরকে আপনাদের চা'র কথা বলে আসি।"

কমলা বললেন—"সবার কথাই বলে দেবে জয়া।"

রঙ্গময়ী গলা বাড়িয়ে বললেন—"আর সবার খাবারের কথাও।"

"দেরি হয়ে যাবে না?"—কমলা বললেন।

হোক একটু। কি করতে এলাম, এক খাবারের হাঙ্গামা করে বসে রইল। ততক্ষণ এ টেবিলটাও সরিয়ে রাখ। পারে কখনও খেতে কেকে? ছেলেমানুষদেরই হাত বন্ধ।...ছাড় ও-কথা, যা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তোকে—হোল না কাজটা ওর?"

কমলা মীনাক্ষিকে টেবিলটা সরিয়ে রাখতে ইংগিত ক'রে বললেন—"কাজ তো নয় ঠানদি, কাজের জন্যে ইনটারভিউ ঠিক করা। অফিসের একজন বড় কর্মচারী..."

আর্দ্রা বলল—"সে-কথা বলেছি ও'কে।"

"তাহলে তো শুনেছেনই সব। তিনি তো বললেন—চিঠিটা বের করিয়ে দিতে পারবেন, তবে ও যা মেয়ে, পারবে কি?"

"কেন, কি হোল?"—প্রশ্ন করলেন রঙ্গময়ী।

"খা লাজুক! উনি দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, রেঙে, ঘেমে অস্থির। তবু বাড়িতে বসে, ঘরোয়া দু-একটা প্রশ্ন। আমিও সঙ্গে রয়েছি। আর, সে একটা অফিস। ইন্টারভিউ নেবেনও উনি নয়, খোদ কর্তা..."

তন্দ্রা এসে একটা চৌকির এক পাশে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। একটা ধকল গেছে, তার ওপর দুজন অপরিচিতার সামনে কমলার এই ব্যাখ্যানে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়তে আবার নূতন করে উঠল রেঙে।

"কি লো?"—এমনিই একটু টুকলেন রঙ্গময়ী ওর দিকে চেয়ে।

"দরকার নেই আমার"—কথাটা বলে একটু অপ্রতিভভাবে হেসে ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিতে কমলা বললেন—"দরকার নেই তো বুঝলাম, কিন্তু ওদিকে..."

এইখানেই গেলেন থেমে, যেন কথা বাড়াতে গেলে পারিবারিক কিছু এসে পড়ে।

রঙ্গময়ীই উলটে দিলেন, বললেন—"দরকার নেই, ষাবিমি, তার জন্যে হয়েছেটা কি? সব মেয়েকেই চাকরি করতে হবে?"

পান-দোক্তায় জিভ শানিয়ে নিয়ে একটু নাক সিঁটকে বললেন—"পৃথিবীর স্বাবং মেয়েগুলো কাছাকোঁচা এঁটে চাকরি করতে বেরুক আর পুরুষগুলো ঝান্ডা হাতে করে 'জিন্দাবাদ!' ক'রে বেড়াক, তাহলেই সংসার চলে যাবে! কত র‍্যালা সে দেখলুম!...নে তুই মুখ-হাত ধুয়ে আয় তো আগে; তুইও যা কমল। আমরা ততক্ষণ গল্প করি একটু।... মিনসেদের..."

—হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বললেন—"অ! তোদের সামনে বুঝি আবার 'মিনসে' বলা চলবে না? এতেও মাথায় করে রাখবি তো হবে না কেন?—ভোগ্!"

সবাই হেসে উঠল, ঘরের হাওয়াটাই হালকা হয়ে গেল। কমলা উঠে দোরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন—"তুইও আয় তন্দ্রা।"

ফেরবার সময় ট্যাক্সি খানিকটা বেরিয়ে এলে রঙ্গময়ী বললেন—"সুরো এলি ঝোঁক করে, কিন্তু কৈ একটা কথাও তো বললিনি কিছু? হেমাও তো তাই একরকম।"

"আমি......"

একটা টান দিয়ে হেমাঙ্গিনী চুপ করে গেলেন। তারপরেই আবার বললেন—"আমি আদুকে দেখছিলাম ঠানদি। সে মেয়েই নয় যেন!"

"দেখলি তো? ঐ জন্যেই আমি আরও নিয়ে এলাম তোদের দুজনকে। সুরো কেমন দেখলি?"

"ভালোই বৈকি"—সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু সুরবালা দিলেনও অনেকটা অন্যমনস্ক-ভাবেই। তখনই আবার বেশ সচেতন হয়ে পড়ে উৎসাহের সঙ্গেই বললেন—"বল-ছিলাম—বেশ ভালই। সত্যিই সব অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে....."

"শুধু লোক-দেখানো মানিয়ে নেওয়াই নয়......"

"হ্যাঁ, তা বৈকি......"

"যেমনটি বলা, করা দরকার..."—হেমাঙ্গিনী বললেন।

"আমিও তাই লক্ষ্য করছিলাম..."—সায় দিলেন সুরবালা।

এরপর আবার নিস্তব্ধতাই এসে পড়ল। বেশ খানিকটা আবার এগুবার পর সুরবালা মুখ খুললেন, একটু কাঁচুমাচু হয়েই—"একটা কথা বলি ঠানদি?"

"কি বল না। মনে তো হচ্ছে, পেটে যেন কি একটা লুকিয়ে রেখেছিস।"

"বলছিলাম" ... স্খলিতকণ্ঠেই আরম্ভ করলেন সুরবালা—"বলছিলাম, তন্দ্রা বলে ঐ মেয়েটি কে?...তুমি তো জান মেসের সব মেয়েকে।"

"জানি বৈকি, নাড়িনক্ষত্র সব জানি।"—যেন এ-প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন রঙ্গময়ী। বলে চললেন—"তোদের স্বঘরই, তা কি? লোভ হল অমনি? কিন্তু ঐ তো শুনলে, দেখলেও নিজের চোখে। তোমার যা উদ্দেশ্য—পারবে ও মেয়ে তোমার ছেলেকে সাবালক করে তুলতে?"

"না, তা যেন......"

চুপ করে গেলেন। তারপর আবার একটু এগিয়ে—

"পোড়ারমুখোরা যে আইন করে বন্ধ করে দিলে, তা না হলে আমি ছাড়তাম না!"

"আর আদু? যার জন্যে এত!"—বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে চাইলেন রঙ্গময়ী।

ফুক করে হেসে ওঠবার আগেই নিজেকে সামলে নিলেন রঙ্গময়ী। চাপা হাসির মধ্যেই বললেন—"শুনে রাখ হেমা, পরিষ্কার মেয়ে দেখলেই টেনে নিয়ে সতীনের ডাই জড়ো করত ও ছেলের ঘাড়ে! সর্বনেশে আহিংকেটা শুনে রাখ একবার। আইন করে বাঁচিয়েছে ওরা মেয়েগুলোকে এ-রাহুর দৃষ্টি থেকে। আর আমায় হাসাবিনে বলছি সুরো পথের মাঝখানে...কী শুভাকাঙ্ক্ষী মা রে বাবা!

চাপতে হচ্ছে বলে হাসিটা আরও যেন লুটিয়ে দিতে চায় গাড়ির মধ্যে।

চুপচাপই গেল এরপর। উনি শুধু থেকে থেকে কথাটা মনে পড়ে দুলে দুলে উঠছেন।

ও'র বাড়িটা আগে পড়ে। গাড়িটা গলিতে প্রবেশ করবার মুখে হেমাঙ্গিনী বললেন—"আমারও একটা কথা ছিল ঠানদিদি।"

"বলে ফেলো; দুঃখ থাকে কেন? ননদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে?"

চাপা হাসিটা আবার ছলকে উঠতে যাচ্ছে, হেমাঙ্গিনী একটু বিষণ্ণভাবেই হেসে বললেন—"না, না, ও-কথা নয়, একেবারেই ও-কথা নয় আমার। আমি জিজ্ঞেস করছি ...থাক, বলবখন পরে। আর একটু ভালো করে মনে করে নিই।"

(ক্রমশঃ)

প্রমীলা

উত্তরণের পর

সেদিন আর ফিরে আসবে না। অতীতের বুকে সে পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কখনো তার সুরভিটুকু আমাদের স্মৃতি-চারনার পথ দেখায়। আবার বেদনাটুকু বর্তমান আনন্দে আরও প্রতিজ্ঞা কঠোর করে। সংহত বেদনার ভাষাই-তো আমাদের আজকের মহিমান্বিত পথ-পরিক্রমা :—পরিক্রমা শুরু হয়েছিল সেই কবে কিন্তু তার জের শেষ হয়নি আজও। বারবারই মনে হয় নতুন পটভূমিকায় এই পথ-পরিক্রমা শুরু হচ্ছে নতুন করে। আমরা সেই নতুন যুগের সারথি মাত্র—এই সারথ্যের দায়িত্বটুকু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার অবসানে নতুন উষার রক্তিম প্রকাশে এই সারথির দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি নতুন হাওয়া বইয়ে দিয়ে গেলেন—রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে আলোকরশ্মির পরশে আমাদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে গেলেন। সেই আলোক-বন্দনা আমাদের অব্যাহত রয়েছে। আলোকরশ্মিকে আমরা পূর্ণ আলোকবৃত্তে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি। অতীত-প্রচেষ্টার বিচার হয় বর্তমানের নিরিখে আর বর্তমান সাধনার বিচারপর্ব নিষ্পন্ন হবে ভবিষ্যতের কষ্টিপাথরে।

যুগ থেকে যুগান্তরে আমরা প্রবেশ করবো কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার সূচনাকাল আমাদের স্মৃতিতে চির-ভাস্বর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রী সংগ্রহে আপ্রাণ প্রচেষ্টা নমস্য ঘটনা—সমগ্র জাতির এবং জাতীয় জীবনের। বিদেশী সন্তান বেথুন সাহেবের স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আগ্রহ এবং আন্তরিকতা তুলনারহিত। শত-সহস্র বিরোধিতার মুখে সেদিন এঁদের পার্শ্বচর এবং সহচরদের মনোবল যদি অক্ষুণ্ন না থাকতো তাহলে কালের চাকা ঘুরলেও আজ কি হতো বলা অসম্ভব। সেদিন তাঁরা অসাধ্য-সাধন করে গেছেন। আজ আমরা তার ফসল তুলছি। একান্ত নির্বিবাদে এবং পরম সুখে। এজন্য কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন আর আমাদের হতে হচ্ছে না।

বনশ্রী অমিতার সঙ্গে আর একটি নাম যুক্ত হলো শ্যামলী। এবার অনেক অসাফল্যের বেদনাকে কাটিয়ে শ্যামলী একটি উজ্জ্বল নাম। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ও স্থান প্রথমে। বছর দুয়েক আগে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষাতেও এমনি গৌরব বহন করে এনেছিল শ্রীমতী বাসন্তী। বেদনার শতদলে এঁদের রাগরক্তিম প্রকাশ নতুন প্রেরণার বাণী বহন করে এনেছে। সত্যি বলতে এবার মেয়েদের সাফল্য অন্যান্যবারের তুলনায় কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে। তবু মন্দের ভালটুকু বজায় রেখেছে বনশ্রী-অমিতা অন্যান্য এবং সর্বোপরি শ্যামলীর সাফল্য। সকলের সাফল্যই আমাদের প্রেরণা জোগায়—সেক্ষেত্রে এদের সাফল্য আদর্শের স্মারকচিহ্ন হয়ে উত্তর আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বলে শোভায় দীপ্যমান। নতুন দিনে সাফল্যের দীর্ঘায়ত ইতিহাস রচিত হবে সেদিন ভবিষ্যৎ সদ্য-সমাপ্ত বর্তমান বা কালের কপোলতলে লয়প্রাপ্ত অতীতকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাবে গভীর শ্রদ্ধায়।

সাক্ষাৎকার (৩)

শ্রীমতী প্রতিভা বসু

মিষ্টি প্রেমের গল্প লেখায় প্রতিভা বসু সিদ্ধহস্ত। ঢাকা জেলায় তাঁর জন্ম। শৈশব ও যৌবন সেখানেই কেটেছে। এই জীবনকে জানবার সুযোগ হয়েছিল বলেই বোধহয় তাঁর লেখায় তৎকালীন স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত জীবন বা মফস্বলবাসী ও কলকাতাপ্রবাসী জীবনের চিত্রই বার-বার দেখা যায়।

মনের উৎসাহে তাঁর লেখা সুরু। প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত লেখা হল একটি গল্প। এটি আত্মশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর বহুদিন তিনি গল্প লেখায় হাত দেননি। কবিতাই লিখতেন এবং প্রকাশিত হত। ১৯৩৪ সালে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহ হয়। এরপর বহুদিন কিছু লেখেননি। প্রতিভা বসু হেসে বললেন, "বোধহয় লেখকের সঙ্গে বিবাহের জন্য লিখতে সংকোচ এসেছিল।" এরপর হুমায়ুন কবীর-বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত চতুরঙ্গের জন্য একটি গল্প লেখেন।

তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস মনোলীনা। কুড়ি বছর বয়সে লেখা এটির চিত্ররূপের নাম ছিল "মনের ময়ূর"। তাঁর লেখক-জীবনে পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন লেখকের প্রভাব পড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "খ্যাতনামা লেখকের স্ত্রী হিসাবে বাংলা দেশের বহু বিখ্যাত লেখকের সান্নিধ্যে এসেছি এবং তাঁদের বন্ধু হিসাবে পেয়েছি। অন্নদাশংকর প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু এদের শ্রদ্ধা করি। তবে এঁদের কারো প্রভাব বোধহয় আমার লেখায় নেই।

তাঁর নিজের লেখায় কোন বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "কালের প্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে চলেছি। বিশেষ কোন সাহিত্য-কর্ম করে যাওয়ার কোন ইচ্ছা আমি পোষণ করি না। বলতে পার আমি ফরমাসী লেখা লেখি। লেখা ধরতে আমার অসম্ভব আলস্য। নেহাৎ তাগাদায় না পড়লে ধরি না। তবে একবার লিখতে শুরু করলে খুবই আনন্দ লাগে। অর্থোপার্জনের জন্যই আমার লেখা। নিজে টাকা রোজগার করার মধ্যে আনন্দ তো আছেই। তাছাড়াও স্বাধীন উপার্জনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ঠিক অন্যের উপর নির্ভর করে থাকা যায় না। এই যে বাড়ীঘর দেখছ এ আমার স্বোপার্জিত টাকায় তৈরী।"

প্রতিভা বসুর সহজ ও দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি শুনে সত্যই মুগ্ধ হলাম। টাকার জন্যই লিখি এ কথা স্বীকার করার মত সততা কজন লেখকের আছে? কিন্তু শতকরা নব্বই জন লেখকই কি লেখাকে একটি পেশার মতই দেখেন না?

সম-সাময়িক লেখকদের মধ্যে কার লেখা বিশেষভাবে প্রিয় জিজ্ঞেস করাতে বললেন, "সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এ ছাড়াও অনেক নতুন লেখক উঠছেন। সবার নাম বলা সম্ভব নয়।"

সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণ প্রসঙ্গে বললেন সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। বেশ কজন বিদেশী সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু বিদেশী সাহিত্য বিশেষ পড়া নেই।

আমেরিকা প্রবাসে প্রথম চেকভ ও মোপাসা পড়েছেন। শুনে একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ বুদ্ধদেব বসুর দেশী-বিদেশী সাহিত্যে বিচরণ অনেকেরই শ্রদ্ধার ও ঈর্ষার বস্তু। প্রতিভা বসু সরলভাবে বললেন, "আমার স্বামী পণ্ডিত মানুষ। পড়া ও লেখা তাঁর জীবন। ও ছেড়ে তিনি বাঁচতেই পারবেন না। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা। খুব সকালে তিনি লিখতে বসেন আর দুপুর গড়িয়ে গেলে টেবিল ছেড়ে ওঠেন। আমার সংসার আছে মনটা সর্বত্র ছড়ানো। আমার সময়ই বা কোথায়? তবে ওঁদের

অনেক আলোচনাই কানে আসে এই পর্যন্ত। চিরকাল সংসারের সব দায়িত্ব আমিই বহন করেছি। ওকে দৈনন্দিন খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত হতে দিইনি। সংসারের ফাঁকে যখন সময় পাই তখনই লিখি। হাজার গোলমালেও এখন আর অসুবিধা হয় না। আমি খুব দ্রুত লিখি।"

পারিবারিক প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন প্রতিভা বসু। ছোট মেয়ে সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছে। বড় মেয়ে এখনও সেখানে। ছেলে আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছে। কথায় কথায় বললেন, "সাহিত্য অতি বিচিত্র বস্তু ও কার হবে এবং কার হবে না বলা কঠিন। তোমরা বল বিদগ্ধ মনই সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমি মস্তবড় একজন লেখককে চিনতাম তিনি পড়াশুনার ধার দিয়েও যেতেন না। বললেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন।" কৌতূহল হলো। লেখকের নাম জানতে চাওয়ায় প্রতিভা বসু বললেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু অভিজ্ঞতা এবং বাঙালী জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতার পুঁজিতে কতদূর যাওয়া যায় এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ ছিল কিন্তু বিতর্কে আমার আগ্রহ ছিল না।—

আবার বিদেশ ভ্রমণ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কথা উঠলো। প্রতিভা বসু বললেন, "এক মুঠো ভাষা এই বাংলা ভাষা। কতটুকুই বা এর প্রসার। কিন্তু কি এতে নেই বল? কত মিষ্টি ও কত সুন্দর এই ভাষা। একে দাবিয়ে রাখার কত চেষ্টা। হিন্দীর পরাক্রমে আজ বাংলা কুণ্ঠিত তবুও এর কত ঐশ্বর্য বিদেশীরা জানে না। আমাদেরই যেন গরজ একে জানানোর। কই জার্মান ফরাসী ইংরাজী ভাষায় রচিত সাহিত্য তো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তর্জমা হতে দেরী হয় না। আমরাই বা কেন সেধে তাদের ভাষায় তর্জমা করে আমাদের সাহিত্য তাদের কাছে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করব? আর সে অনুবাদ যথার্থ অনুবাদই বা হবে কি করে। একজন ইংরেজ যদি বাংলা শিখে বাংলা সাহিত্য ইংরাজিতে তর্জমা করে তবেই সেই তর্জমা সাবলীল হবে। আমার স্বামীকে আমেরিকায় অনেকেই বলেছেন নিজের লেখা ইংরাজিতে তর্জমা করতে। কিন্তু উনি বলেন লেখকের ধর্ম সৃষ্টি করা। অনুবাদের কাছে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যয় করতে পারেন না। যেদিন তাঁদের মধ্যে সত্যিকার জানার আগ্রহ জাগবে সেদিন তাঁরা নিজেরাই অনুবাদের কাজে ব্রতী হবেন। এতো গেল বিদেশে। দেশের দিকে তাকিয়ে দেখো। কি বিচিত্র এই দেশ। আমরা একই দেশে থাকি। কিন্তু কতটুকু মিল আছে আমাদের মধ্যে? কতটুকুই বা আমরা পরস্পরকে বুঝি বা বোঝার চেষ্টা করি।"

জিজ্ঞাসা করলুম "আপনার লেখার দেশে বা বিদেশে কোন অনুবাদ হয় নি?" বললেন, "কচা রোদ" বলে একটি গল্পের ফরাসী অনুবাদ হয়েছিল এবং "সংসারের" ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে। তবে হিন্দীর ব্যাপারে সারিকা, ধর্মযুগ এরকম দু-একটা পত্রিকায় দু-একটা অনুবাদ চোখে পড়লেও ঠিক বলতে পারব না। কারণ তারা তো অনুমতি নেয় না—নাম প্রকাশেরও কোন প্রয়োজন বোধ করে না।"

বিকেল হয়ে আসছিল। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম। একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল না। সেটি হল আপনার লেখা আপনার স্বামীর কি রকম লাগে? **—রাখী ঘোষ**

বহির্বঙ্গে বাঙ্গালী মহিলা

ব্যক্তিগত কোন কারণে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় এঁর অপেক্ষায় বসেছিলাম, শোনা ছিল "বাসন্তীদির কাছে যান তিনি হয়তো আপনাকে এ সম্বন্ধে সাহায্য করতে পারবেন।" খানিকটা সংশয়, কিছুটা ভয় নিয়েই এঁর দরবারে হাজির হলাম ফিরে আসার সময় ভয়-ভাবনার ছিঁটেফোটা নিঃশেষ করে একটা আত্মীয়তার আস্থা নিয়ে ফিরে এলাম যে আত্মীয়তার যোগ-রক্তের সঙ্গে নয়, আত্মার সঙ্গে। নামটি সুন্দর "বাসন্তী রায়" তাঁর থেকেও সুন্দর ব্যবহার। বললেন "এই স্কুল থেকে ফিরলাম, অনেকক্ষণ কষ্ট করছেন তো? বললাম "না আপনি একটু বিশ্রাম করুন-- পরে কথা হবে। শুনলেন না পাশের চেয়ারটায় বসে বললেন—"আরে না বলুন, এখানে বসেই বিশ্রাম হবে।" আমার কথা শুনলেন, সেদিনকার কথায় ফিরে যাবে না, পাশের ঘরে অসুস্থ ছিলেন কেউ বার-বার উঠে দেখে আসছিলেন, শ্রীমতি রায়ের শ্বশুর। অসুস্থ বৃদ্ধকে শিশুর মতো করে যত্ন করছিলেন। বললেন "বাবামণির শরীর খারাপ, আপনাকে বসিয়ে রেখে দেখতে যাচ্ছি। প্রত্যেকটি কথায় উনি যেন আমার জন্যে ভাবছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটির পরে আরো দেখা হয়েছে আরো অনেকবার গেছি, কখনো দেখেছি, রান্না করতে করতে ব্যস্ত হয়ে আমাকে বসতে দিয়েছেন, কখনো দেখেছি শ্বশুরকে সেবা করছেন, কখনো বা সামাজিক কাজের কোন গভীর সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। ১৯৩৯ সালে হাইস্কুল পাশ করেন, ১৯৪১ সালে আই-এ পাশ করেছেন। ১৯৪২ সালে এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৪৩ সালে কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে ইংরিজিতে এম-এ পাশ করেন। এতো হোল শিক্ষার ধারাবিবরণী, সাধারণী শ্রীমতি রায়ের শিক্ষার বিশেষত্ব তাঁর মনুষ্যত্বের শিক্ষা, আচার-ব্যবহারের শিক্ষা, সহানুভূতির শিক্ষা, সমবেদনার শিক্ষা, যার দুর্লভতা আজকাল আমাদের মেয়েদের মধ্যে বিরল। ব্যক্তিগত জীবনে যখন ওঁকে দেখি মনে হয় অনেক সহনশীলতার শিক্ষা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। একান্ত অক্ষম শ্বশুরকে ফেলে রেখে স্বামীর কর্মস্থানে যেতে পারেননি। দীর্ঘ তের বছর সেবা করেছেন শয্যাশায়ী শ্বশুরকে। মৃত্যুদিনে দেখলাম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অন্তিম কাজ করে গেলেন, শব-যাত্রার পর শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। তাঁর ঐকান্তিক সেবা দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করেছিলেন "আপনার মেয়ে এখানেই থাকেন।" ভুল শুধরে বাবামণি বলেছিলেন "মেয়ে নয়—বৌমা।" কথাচ্ছলে একদিন বলেছিলেন "আমার বাবার সহনশীলতার পরিধি ছিল না, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও বাবা আমাদের বলতেন কোন কষ্ট নেই।" মনে হয় সেই সহনশীলতার একাংশই যেন শ্রীমতি রায়ের মধ্যে বিদ্যমান। পারিবারিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পড়াশুনার একাগ্র বাসনা। চার বছর রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় গবেষণা করেছেন, বিষয়বস্তু কিন্তু পারিবারিক কারণে সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এ সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনে গেছেন। ভবিষ্যতে নতুন করে এগোবার ইচ্ছে রাখেন। আনন্দোৎসবে শিশুর মতো হাসতে পারেন, আবার দুঃখদুর্দশায় শক্ত মাঝির মতো হাল ধরতে পারেন। বিবাহ-বাসরে পিঁড়ি, বহনডালা সাজাতে আর স্ত্রী-আচারের বিশদ খুঁটিনাদি নিপুণ হাতে করে যান। ভাঁড়ারের চাবিটা আঁচলে নিয়ে গৃহ-কর্তার মুখরক্ষায় বাসন্তীদি এগিয়ে আসেন। কে বলবে তখন উনি আর্যকন্যা ইন্টার-মিডিয়েট কলেজের দক্ষ অধ্যাপিকা। কোন ছাত্রীটি অসুস্থ অবস্থায় প্রার্থনা সভায় দাঁড়িয়ে আছে তাকে বসিয়ে আসা, আবার কোন্ দুঃস্থ মেয়েটি এবার ফীসের অভাবে পরীক্ষা দিত পারছে না তার ব্যবস্থাও বাসন্তীদি করবেন। বিস্মিত হয়েছিলাম এই সাধারণীর মধ্যে অসাধারণ নারীত্বের মহিমা দেখে। এরই মধ্যে গুরুভার সামাজিক কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহিলা—বিদ্যামন্দিরের কোষাধ্যক্ষার দায়িত্ব—অসংখ্য কাজের ভিড় এতটুকু ক্লান্ত নয়। সকলের সব কাজকে নিজের মনে করে, সব সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করে কখনো বিচলিত হতে দেখেছি কখনো চিন্তান্বিত হতে দেখেছি, ছেলে "বাবু"র জন্যে চিন্তা করেছেন, আবার সেই সঙ্গে আমাদের কথাও ভেবেছেন, সকলকে এক করে নেবার "ব্রত" এমন করে সাধন করার মধ্যে অসাধারণত্ব আছে, যা আমরা সহজে স্বভাবগুণে লাভ করতে পারি না। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মানবিকতায় বাসন্তীদি বরনীয়া। তাই "বাসন্তীদির" কথা সবটুকু বলা গেল না, বোঝান যায় না কোন শব্দের মাধ্যমে, এর জন্যে সান্নিধ্য চাই, সেই সান্নিধ্য কখনো দূরে থেকে অনুভব করেছি, কখনো কাছে গিয়ে। পরিশেষে এই কথাই মনে হয়, শ্রীমতি রায় যেন একালের আর সেকালের নারীত্বের "সেতু"।

—ইলা বসু

বার্চ বনের ছায়ায়

পারিজাত মজুমদার

এইখানে এই নির্জন পাহাড়ের কোলে দীর্ঘ বার্চবনের মাঝখানে, আমি একা।

কাছাকাছি কোনো লোক বসতি নেই। শুধু আমার বাংলোর বাগানের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়ালে গাছ-গাছালির ফাঁকে-ফাঁকে চোখে পড়ে অনেক নীচে পায়ে-চলা বনপথের ধারে গোটা কয়েক কাঠের খুপরি, ওখানে বাস করে কয়েক ঘর পাহাড়ী। তারও নীচে পাহাড়ের পদতল ঘেঁষে চলে গেছে যে পাকা সড়ক তার ধারে আছে একটা তিব্বতী চায়ের স্টল, একটা কসাই-খানা, আর ডাল-তেল-আনাজের একটা মাল্টিপারপাস দোকান। কিন্তু সেসব কিছুই এখান থেকে দেখা যায় না।

এখানে—আমার এই নির্জন বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে শুধু ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া বন্য বার্চের সারি, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কিছু সীডার, কিছুবা পাইন। যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে আসে ঐ দীর্ঘ, আকাশমুখী গাছের মাথায় মাথায়, যখন দূরে পাহাড়ী পথের বাঁকে আবছা-হয়ে-যাওয়া ঝাউবন ঘিরে অন্ধকার ছমছম করে, যখন আমার এই নিঃসঙ্গ কাঠের বাংলো আর বাগানের চারদিক ঘিরে ঝাঁপিয়ে পড়া জঙ্গলের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে সন্ধ্যার হঠাৎ-উঠা বাতাসে, তখন মনে হয়, এই অরণ্য, এই পাহাড়-ঘিরে-আসা অন্ধকারের মাঝখানে আমি একা—আমি একা।

তবে দিনেরবেলা এই একাকিত্ব ততটা অনুভব করতে পারি না। তখন সকালবেলার সোনালী রোদ্দুর ঝলমল করে বার্চবনের পাতায় পাতায়, বাংলোর সামনেকার বাগানে হলদে হাসির ফোয়ারা জাগে অজস্র মেরি-গোল্ডের দলে। পাখীর ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে ওঠে বাংলোর গা-ঘেঁষে চলে যাওয়া পাহাড়ী বনপথ। ......তাই সকালবেলাটা তত শূন্য লাগে না। নটার সময় বেরিয়ে পড়ি শহরের উদ্দেশে—যেখানে আমার আপিস। সারাটা দিন কাটে সেখানে নানান কাজের ব্যস্ততায়, নানান লোকের মাঝখানে। কিন্তু তারপর?

দিনের শেষে কোনো বাঙালী হোটেলে সন্ধ্যার খাওয়া সেরে আবার ফিরে আসি এই নিভৃত আস্তানায়—রুক্ষ নির্জন পাহাড়ী পথ বেয়ে।

বাংলোয় ফিরে কখনো ঘুমোই, কখনো বা ঘুমোই না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি বাইরে শরতের খেয়ালী বাতাস সশব্দে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে বাড়ীটার জানলায় জানলায়, দরজায় দরজায়। মনে পড়িয়ে দিচ্ছে এই অক্টোবরের রাতে, যখন রুপোলী চন্দ্রালোক বয়ে চলেছে মিলনের স্বপ্ন ঘুমন্ত শারদ-ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, তখন আমার এই নির্জন গৃহের একক শয্যায় শুয়ে আমি একা—আমি একা।

......দেখতে দেখতে অক্টোবর চলে যাচ্ছে। ফুলের পাপড়ি খসে পড়ছে একটি-একটি করে। ঝরে পড়ছে গাছের পাতা।

এমনি এক পাতা-ঝরানো দিনে বেরিয়ে পড়লুম পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটবে।

সেটা ছিলো ছুটির দিন কোনো কাজ ছিল না হাতে। তাই অলসভাবে হাঁটছিলুম এদিক-ওদিক, পায়ের তলায় মচমচিয়ে উঠছিল ঝরা পাতার দল।

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল একটি পাহাড়ী মেয়ে গাছের তলা থেকে শুকনো, ঝরে-পড়া ডাল কুড়িয়ে জড়ো করছে এক জায়গায়।

বুড়ি নয়, তরুণী মেয়ে। সুতরাং ইচ্ছে করলেও উদাসীন হতে পারলুম না। বরং কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম একটা দেবদারু গাছের আড়ালে। যাতে মেয়েটিকে ভালো-ভাবে লক্ষ্য করতে পারি, কিন্তু সে আমাকে দেখতে না পায়।

গোলাপের মত গায়ের রং মেয়েটির। স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে। কোমরে একটা শাদায়-লালে ডোরাকাটা শাড়ী ঘাগরার মত করে জড়ানো, গায়ে একটা লাল ব্লাউজ। অপরাহ্নের রাঙা আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছে মেয়েটির মুখের ওপর,

মাথার চুলে। সব মিলিয়ে একটি মনোরম ছবি।

নিজেকে আর একা মনে হচ্ছে না এখন। এই দেবদারু বীথির ছায়ায় ঐ মেয়েটি আর আমি— আমরা দুয়ে মিলে দুজন। অচেনা হয়েও আমরা চিরকালের চেনা। ও নারী, আর আমি পুরুষ। শুধুমাত্র এইটুকু সত্যের মাঝেই স্তব্ধ হয়ে আছে সৃষ্টির অনাদিকালের ইতিহাস—অনেক অনাগত ভবিষ্যতের আশ্চর্য সম্ভাব্যতা...

ওর সঙ্গে কি পরিচয় করা যায় না?

যায় না বলা দুটো সামান্য ঘরোয়া কথা?

ওদের ভাষা আমি জানি না। কিন্তু ওর পক্ষে বাংলা জানা তো অসম্ভব নয়। এখানকার পাহাড়ীরা তো বেশীর ভাগই অল্প-বিস্তর বাংলা জানে দেখেছি। ও যদি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা দু-চারটে কথাও বলতে পারে—সেও কি কম? নারীকন্ঠের সেই সুধাসঞ্চয়-টুকু তো আজ রাত্রিটার মত অন্তত সঙ্গ দেবে আমাকে।

অদম্য ইচ্ছার টানে এগিয়ে গেলুম আমি—মেয়েটির দিকে। কি বলা যায় ঠিক ভেবে পেলুম না। তাই বিনা সম্বোধনেই হঠাৎ বলে উঠলুম, 'গাছের ডাল কুড়োচ্ছো, ও দিয়ে কি হবে?'

মেয়েটি চমকে মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু পাহাড়ী মেয়ে বলেই হয়তো বিস্ময়-টুকু চেপে নিয়ে খুব সপ্রতিভভাবেই হাসলো। হেসে বললো, 'সামনেই শীত আসছে, তখন তো রোজ রাতে আগুন করতে হবে। তাই এখন থেকে কাঠ জমাচ্ছি।'

'এত ভালো বাংলা শিখলে কি করে?' পুলকিত কন্ঠে বলে উঠলুম আমি।

'দু বছর বাঙালী বাড়ীতে কাজ করেছি, বাবু।'

'তুমি থাকো কোথায়?'

'স্টেশনের কাছে।'

'স্টেশন? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এতদূর থেকে এখানে এসেছ কাঠ কুড়োতে?'

'না বাবু।'

মুখ তুলে এবার বেশ ভালো করেই হাসলো মেয়েটা। বড় মিষ্টি হাসি। তারপর বললো, 'এই পাহাড়ের নীচের বস্তিতে আমার মাসী থাকে। মাসীর বাড়ী বেড়াতে এসেছি—এখন কিছুদিন থাকবো এখানে।... আপনি তো এই পাহাড়ের মাথায় বাংলো-বাড়ীতে থাকেন, না বাবু?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। কাঠ কুড়োনো শেষ হয়েছে মেয়েটির। টুকরিতে সব তুলে নিয়ে এবার উঠে দাঁড়ালো সে। কিন্তু তখনি চলে গেল না। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বললে, 'এখানে কতদিন এসেছেন, বাবু?'

'তা প্রায় মাস তিনেক হল।'

'মাসীও ঐরকমই বলছিল। ...এ জায়গা ভালো লাগছে?'

'মন্দ নয়। ...তোমার নাম কি?'

'আমার নাম?' দুষ্টুমির হাসি হাসলো মেয়েটা, তারপর বললো, 'আমার নাম—নিমা।'

'নিমা?'

'হ্যাঁ।'

সূর্যাস্তপূর্বের রঙে সারা পশ্চিমাকাশ এখনো রঙিন। এখনো রাত্রির কালো অবগুন্ঠন নামেনি পৃথিবীর বুকে। এখনো যৌবনের দূতীর মত নিমা দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। কিন্তু আরেকটা পরেই?...

আরেকটুখানি সময় কি ওকে ধরে রাখা যায় না? কিন্তু কি ভাবে?

নিমা বোধহয় আমার মুখের ভাব দেখে কিছু একটা অনুধাবন করলো। তারপর বললো, 'আজ যাই বাবু। কাল আবার আসবো এদিকে কাঠ কুড়োতে।'

কাল আবার আসবো! এতবড় সান্ত্বনার বাণী কি আর কখনো উচ্চারিত হয়েছে এ পৃথিবীতে?......

নিমা চলে যাচ্ছে। ধীর মন্থর গতিতে। ওর সুঠাম দেহের গতিভঙ্গিমায় কি অপরূপ ছন্দ। আমার তৃষ্ণার্ত চোখ দিয়ে ঐ ছন্দ-মাধুর্যটুকু আমি নিঃশেষে পান করে নিতে চাইলুম।

কিছু দূর গিয়ে পাহাড়ী পথের বাঁকে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

আর ওকে দেখা যায় না। ও যেখানটায় উবু হয়ে বসে কাঠ কুড়োচ্ছিলো একটু আগেও, সেখানটায় তাকালুম। ঝরা পাতার দলে এখনো ওর স্পর্শ ছড়িয়ে আছে......

সূর্য ডুবে গেল। আসন্ন রাত্রির অন্ধকার তার নীরবতা গ্রাস করছে জনহীন, পাহাড়ী পথ। আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

• • •

পরদিন আপিস ছুটি হতেই বাসার পথ ধরলুম।

অন্যদিন আপিসের পর একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে বেড়াই। কখনো কোনে সহকর্মীর বাড়ী আড্ডা দিয়ে আসি। তারপর রাতের খাওয়া সেরে হাঁটাপথ ধরে বাসায় ফিরি। কিন্তু আজ আর সেসব কিছু নয়। হোটেল থেকে কিছু চিকেন-স্যান্ডউইচ কিনে নিয়ে ধরলুম একটা ট্যাক্সি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে পৌঁছলুম আমার গন্তব্যস্থলে।

পাহাড়ের পায়ের কাছে নেমে উঠতে লাগলুম রুক্ষ বনপথ ধরে। বেশীদূর যেতে হল না। খানিক গিয়েই দেখা মিললো নিমার।

নিমা কাঠ কুড়োচ্ছে আজও, ঠিক আগের দিনের মতই। আজও ঠিক তেমনি সন্ধ্যাপূর্বের রাঙা আলো এসে পড়েছে ওর মুখে আর চুলে—গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে। আজও ওর গায়ে সেই কালকের দেখা ঘোর লাল ব্লাউজ আর লাল ডুরে কাটা শাড়ী।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম ওকে। মনে হচ্ছে না, মাত্র কাল পরিচয় হয়েছে ওর সঙ্গে। মনে হচ্ছে, ও যেন আমার কতকালের চেনা—আমার জন্ম-জন্মান্তরের সাথী। কত সহস্র জীবনের বীথিপথে চলতে চলতে আমি কতবার তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি ওর কাছে। আর ও আমার হাতে তুলে দিয়েছে অমৃতের পেয়ালা......

'বাবু!'

নিমা হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো। ওর মুখে বিস্মিত আনন্দের উজ্জ্বলতা।

'কখন এলেন?'

একটি সলজ্জ প্রশ্ন।

'এইমাত্র।' হাসিমুখে উত্তর দিলুম।

'আপনার হাতে ওটা কি, বাবু?'

সোজা সরল প্রশ্ন। কোনো কুন্ঠা নেই। কোনো শিক্ষিত, সভ্য, শহুরে মেয়ে কি অনায়াসে এমন প্রশ্ন করতে পারতো—এত অল্প পরিচয়ে?

'এটা হচ্ছে চিকেন-স্যান্ডউইচ। রাতের খাবার।'

'আপনি একজন লোক রাখেন না কেন বাবু, যে আপনার রান্নাবান্না করে দেবে? হোটেলের খাবার আর কতদিন খাবেন?'

'লোক? লোক পাচ্ছি কোথায়? পেলে তো রাখবো।'

'লোক পাচ্ছেন না?'

মাথা নীচু করে নিমা যেন একটু কি ভাবলো। তারপর বললো, 'আচ্ছা, আমি দেখবো।'

আজ নিমার মাথার চুলে একগুচ্ছ ছোট-ছোট জংলা ফুল, শাদায়-ভায়োলেটে মেশানো।

কি নাম ঐ ফুলগুলোর? জানি না।

আচ্ছা, নিমার ঐ কাঠ কুড়োনোর কাজে লাগলে কেমন হয়? ভারী সুন্দর কাজ। কোনো রাজকন্যার মালঞ্চের মালাকর হওয়ার চেয়ে কম লোভনীয় নয়।

চিকেন-স্যান্ডউইচের প্যাকেটটা নামিয়ে রেখে আমি লেগে গেলুম শুকনো ডাল কুড়োতে।

'ও কি করছেন বাবু? এসব কি আপনাদের সাজে? এ আমাদের কাজ।'

'আমাদের কাজ তোমাদের কাজ বলে কিছু নেই, নিমা।'

নিমার চোখ দেখে বুঝলুম এমন কথা শুনে ও অবাক হয়েছে। খুশীও হয়েছে। মাথা নীচু করে বলে উঠল,—

'আপনি খুব ভালো লোক, বাবু।'

কথাটা শুনে হাসি পেলো। বললুম,

'মানুষের একটা দুটো কাজ কিংবা কথা দিয়ে কি বোঝা যায় সে ভালো লোক না মন্দ লোক?'

'না, তা যায় না অবশ্য। কিন্তু মানুষকে খারাপ ভাবার চাইতে ভালো ভাবতেই আমার ভালো লাগে। যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখছি একটা লোক খারাপ, ততক্ষণ তাকে ভালো ভাবাই ভালো নয় কি? কাউকে খারাপ বলে জানা মানেই তো নিজে কষ্ট পাওয়া?'

কাউকে খারাপ বলে জানা মানেই তো নিজে কষ্ট পাওয়া! তুমি বলছ কি নিমা? আমরা তো জানি, কাউকে মন্দ বলে জানাতেই আমাদের সব চাইতে বড় আনন্দ। সব চাইতে গভীর আত্মতৃপ্তি! পরের খুঁত বার করে নিজের অহংকে তৃপ্ত করতে তো আমাদের শহুরে সভ্য মন সর্বদাই সচেষ্ট!

নিমা আর আমি শুকনো গাছের ডাল কুড়োচ্ছি। সন্ধ্যার শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে গিরিশ্রেণীর চূড়ায় চূড়ায়। নীড়ে ফেরা পাখীদের পাখার ঝটপটানি কখনো বা শোনা যায় ছায়া-মেলা সাঁড়ার বনের আড়াল থেকে।......সাবিত্রী-সত্যবানের কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে শুধু আজ নয়, যেন এমনি করেই আমরা কাঠ কুড়োচ্ছি জন্ম-জন্মান্তর—এই পাহাড়ী গাছের তলায় তলায়—এমনি করেই দিনান্তের ছায়া নেমেছে চির দিন আমাদের দুটি মুগ্ধ সত্তাকে ঘিরে...

'অন্ধকার হয়ে এল, এবার যাই বাবু। না হলে মাসী ভাববে।' বলতে বলতে টুকরি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিমা।

'চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।'

অন্ধকার পাহাড়ী পথ ধরে নামতে লাগলুম নীচে, নিমার পাশে-পাশে।

কত কাছে কাছে হাঁটছি আমরা!

হাত দুয়েকের ব্যবধানও বোধহয় নেই আমাদের মধ্যে। তবু নিমা আমার থেকে কত দূরে। ওর হাতটুকু ধরার অধিকার পর্যন্ত আমার নেই।

পাহাড়ের নীচে এসে আমরা দাঁড়ালুম। নিমা আমার দিকে তাকালো। মনে হল ও যেন কিছু শুনতে চায়।

আমিও তো বলতেই চাই। কিন্তু কি বলতে চাই?

অনেক কথা মনে এল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু একটা কথাই বলতে পারলুম,

'কাল আবার আসবে তো?'

নিমা নীরবে ঘাড় নাড়লো। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল পাহাড়ী বস্তির দিকে।

আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়ী পথের দুপাশ ঘেঁষে ওঠা আরণ্য-তরুর ছায়া হয়ে উঠেছে নিবিড়, ছমছমে। সেই ছায়ায় ছায়ায় রুক্ষ নির্জন পথ বেয়ে আমি ফিরে চললাম—নিঃসঙ্গ, একক। পায়ে পায়ে লাগে আস্তীর্ণ নুড়ির কঠিন স্পর্শ। সামনে ঝুঁকে পড়া বনলতার ডাল কখনো বা শর-শরিয়ে ওঠে আমার গায়ে লেগে। সেই শব্দে চমকে ওঠে চারদিকের জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা আর অন্ধকার।

বাংলোর বাগানের গেট ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকলুম। রুপোলী চাঁদের আলোয় মেরিগোল্ডের দল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে দূরে তাকালুম। শহরের আলোকমালা যেন অন্ধকার পাহাড়ের বুকে সাজানো সহস্র তারার মত দেখাচ্ছে। আরো দূরে অন্যান্য পাহাড়ী শহরগুলির আলো দেখা যায়—নক্ষত্রের মালার মত। অন্তহীন পার্বত্য অরণ্যানীর কোলে কোলে ওরা যেন একেকটি ছোট ছোট স্বপ্নরাজ্য—রূপকথার মায়াপুরীর মত হাতছানি দিয়ে ডাকছে মুগ্ধ, পথভ্রান্ত পথিককে! ...আরেক দিকে তাকালুম। এদিকে কোনো পাহাড়ী শহরের আলো চোখে পড়ে না। যতদূর চাই, শুধু দিগন্ত-বিসর্পিত উত্তুঙ্গ শৈল-মালা প্রসারিত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে যেন অনাদিকালের প্রহরী—

ঐ গিরিশৃঙ্গমালার ওপরে উপুড় হয়ে পড়েছে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ। ঐ জ্বল-জ্বলে তারাদের আলোর পথ বেয়ে আজ ঝরছে আনন্দের ঝর্ণা মর্তলোকের দিকে।

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা......

আনন্দ! আনন্দ! কোথা থেকে এল এত আনন্দের প্লাবন?

নিমার মুখখানা ভাসছে আমার সামনে। ভাসছে তার চোখ দুটোও। টানা টানা, তারাদের মত উজ্জ্বল দুটি চোখ!

সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা পার হয়ে ঘরে এলুম। এসে সব আলো জ্বেলে দিলুম।

প্রাসাদোপম বাড়ী। চারদিকে আলো না থাকলে মনে হয় যেন ভূতের বাড়ী, আর তার মাঝখানে আমি একা।

ডাইনিং হলের প্রকাণ্ড কার্পেটটা গুটোনো পড়ে আছে একধারে—ধুলোয় ধুলোময়। ডাইনিং টেবিলটার অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। ঘরের কোণে-কোণে ঝুলছে মাকড়সার জাল।

আর কেউ হলে কি এমনি অবস্থায় থাকতে পারতো? নিশ্চয় লোকজন ডেকে ঘরদোর পরিষ্কার করাতো। কিন্তু আমি? আমি অদ্ভুত—আমি অসামাজিক। এমন আসবাবপত্রওয়ালা বাড়ীর সদ্ব্যবহার করছি না আমি! ভদ্রলোকের মত থাকার এমন চমৎকার সুযোগ পেয়েও থাকছি ইতরজনের মত। আচ্ছা, এমনি এলোমেলো, অগোছালো-ভাবে থাকতেই কি আমার ভালো লাগে? কিন্তু সাজানো-গোছানো বাড়ী দেখলেও তো মনটা খুশী হয়ে ওঠে দেখি। কি জানি, বোধহয় দুই-ই ভালো লাগে। বিশ্বের সৌন্দর্য কোথাও সুশৃঙ্খলতায় প্রকাশিত কোথাও বা বিশৃঙ্খলতায়। সেখানেই জীবনের বৈচিত্র্য!

আচ্ছা, নিমার সঙ্গে আমার এই পরিচয়-টুকু কোথায় কতদূরে গিয়ে পৌঁছবে? কোনো একটা নিশ্চিত পরিণতির দিকে কি একে নিয়ে যেতে চাইছি আমি? না, তা চাইছি না। তার মধ্যে আনন্দ নেই।

সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মানেই যেন একটা বন্ধন। অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে স্বাধীনতা, আছে মুক্তি, আছে কল্পনাবিস্তারের অবাধ সুযোগ। কাল কি হবে জানি না। কি কথা কইব, সে কি উত্তর দেবে, এমন কি কাল সে আসবে কিনা—সবই অনিশ্চিত, অজানা।

এই তো অ্যাডভেঞ্চার! অ্যাডভেঞ্চার অব দি সোল। নিত্য নতুন দুরারোহ গিরি-শৃঙ্গে উঠবার মতই রোমাঞ্চময়, আশ্চর্য!

নিমা! সে কি শুধু একটি মেয়ের নাম?

না। সে একটা রূপকথা। যে রূপকথার অন্তর্লোকে এখনো আমি পৌঁছইনি। শুধু তার দরজাটা খোলা পেয়েছি মাত্র। সেই দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিচ্ছি দুরুদুরু বুকে! সেখানে কোন অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে—জানি না। জানি না! জানি না......

(দুই)

'লোক পাওয়া গেল না, বাবু। এতদূরে কেউ আসতে চায় না।'

এক ছুটির দিনের সকালবেলা খবরটা আমাকে জানালো নিমা। সেই দেবদারু গাছেরই তলায়।

আমি অবশ্য এর জন্যে প্রস্তুতই ছিলুম। শহর থেকে এতদূরে কাজ করতে আসতে চাইবে কে?

কিন্তু তার জন্যে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। লোক না পেয়েও চলে তো যাচ্ছে। তাছাড়া, অফিসের সবাই আমায় আশ্বাস দিয়েছে, সহজে না মিললেও লোক একদিন তারা জোগাড় করে দেবেই দেবে। ততদিন পর্যন্ত সবুর আমার সইবে।

আজ নিমার সঙ্গে কাঠ কুড়োবার টুকরিটা দেখছি না। তার পরিবর্তে দেখছি ওর হাতে একটা ছোট ডালি ভর্তি একরাশ ফুল।

কয়েকটা ফুল আমার চেনা। ক্রিসেনথিমাম, কসমস, জেরেনিয়াম, গোলাপ। বাকীগুলো চিনি না।

'এ কি পুজোর ফুল নাকি?' ফুল-গুলোর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললুম আমি, 'নাকি, তোমাদের বাড়ীতে আজ কোনো উৎসব আছে?'

'না। আপনার জন্যে এনেছি।'

একটি সলজ্জ হাসি ফুটলো নিমার মুখে।

'আমার জন্যে?'

সত্যিই বিস্মিত হলুম আমি।

মাত্র কদিনের পরিচয়ে একটি মেয়ে আমাকে ফুল দিচ্ছে—এ যে অবিশ্বাস্য!

ফুল ভালোবাসার প্রতীক। সর্বদেশে সর্বকালে।

নিমা কি তবে ফুলের ভাষায় বলতে চাইছে, 'আমি ভালোবাসি!'

না। তা হতে পারে না।

সভ্য সমাজের মানুষ যে ভাষায় যে কথা বলে, ওর কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। ও যে পাহাড়ী মেয়ে! ফুল ওর কাছে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, সহজ
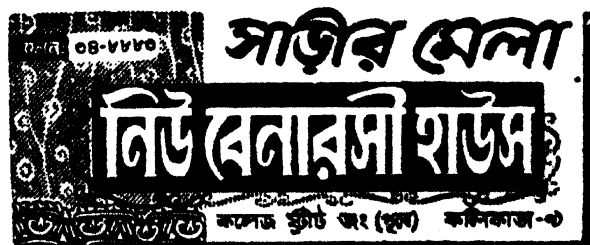
আনন্দের প্রতীক। আর কিছু নয়। তাই ও এত সহজে ফুল এনেছে আমার জন্যে।

'কিসে করে দেবো ফুলগুলো, বলো তো?' জিজ্ঞেস করলুম ওকে।

একটু ভেবে নিমা বললো, 'চলুন, আপনার ঘরে গিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিয়ে আসি ফুলগুলো।'

'ফুলদানি? ফুলদানি তো নেই।'

'ফুলদানি নেই?'

একটু হতাশ হল নিমা। তারপর কি ভেবে নিয়ে বললে,

'আচ্ছা, কাচের গেলাস আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'ওতেই হবে। চলুন।'

নিমাকে নিয়ে এলুম আমার বাংলোয়। চারদিকের চেহারা দেখে ওর মনে কি ভাব হচ্ছে কে জানে। মুখ দেখে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

রান্নাঘর থেকে নিজেই কাচের গেলাস খুঁজে নিয়ে এল ও। বাথরুমে গিয়ে সেটাকে ধুয়ে জল ভরে আনলো। তারপর জলভরা গেলাস আর ফুলের ডালি হাতে নিয়ে ঢুকে গেল শোবার ঘরে।

খানিক পরে আমায় ডাকলো নিমা। গিয়ে দেখি আমার খাটের মাথার কাছে ছোট্ট টিপয়টির ওপর ফুল সাজিয়েছে ও। এমন চমৎকারভাবে সাজিয়েছে যে গেলাসটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

'ভারী সুন্দর হয়েছে!' সপ্রশংস গলায় আমি বললুম, 'তোমার বেশ রুচি আছে দেখছি।'

'রোজ ফুল আনবো আপনার জন্যে?' সরল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো ও।

'এনো।'

'আপনার ঘরদোর ঝাড়ু দিয়ে দেবো? বড্ড ধুলো জমেছে।'

'না না, তুমি কেন করবে!' কুণ্ঠিত হলুম আমি। 'ওসব তোমায় করতে হবে না। বাগানে চলো, আমার সঙ্গে একটু গল্প করবে।'

বিনা প্রতিবাদে নিমা চলে এল বাগানে।

কিন্তু কয়েকটা কথার পরই আবার বললে, 'আচ্ছা বাবু, যে ক'টা দিন এখানে আছি সে কটা দিন তো আপনার একটু কাজ করে দিতে পারি আমি। বিকেলবেলা রোজ এসে রাতের রান্নাটা করে দিয়ে যাবো।'

নিমার হাতের রান্না! সে কেমন জানি না, তবু লোভ জাগলো মনে। কিন্তু লোভ সংবরণ করে বললুম,

'না, থাক। কেন তুমি মিছিমিছি কষ্ট করবে আমার জন্যে? মাসীর বাড়ী দু'দিন বেড়াতে এসেছ, বিশ্রাম নিতে এসেছ, আমি কি তাতে বাদ সাধবো? তাছাড়া, দু'দিন তোমার রান্না খেয়ে অভ্যেস বদলে যাবে। তখন আর হোটেলে গিয়ে খেতে ভালো লাগবে না।

নিমা নতমুখে চুপ করে আছে। আমার কথাটা ওর মনঃপূত হয়নি বেশ বোঝা যাচ্ছে। দেখে হেসে বললুম, 'দেখ তুমি যদি বরাবরের জন্যে আমার রান্না করে দিতে পারতে তো আলাদা কথা ছিল। কিন্তু তা তো আর তুমি পারবে না!'

'পারবো না কেন? আপনি ইচ্ছে করলে তাও হতে পারে। কাজ তো আমায় করতেই হবে কোথাও না কোথাও। আপনি যদি রাখেন, তবে আপনার কাছেই বরাবরের জন্যে কাজ করবো।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। নিমাকে কাজের জন্যে রাখলে ভালোই হয়। কিন্তু—মানস-সুন্দরীকে আমার কাজে বহাল করবো? কাজটা বড় আনরোমান্টিক, বড় গদ্যময় হবে না কি? মন খুঁত-খুঁত করছে।

নিমা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মনে হল যেন আমার ঠোঁটের একটা হ্যাঁ কি না-এর ওপর ওর এই মুহূর্তের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা দুলছে।

কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বললুম, "ঠিক আছে, তুমিই আমার কাজ করো।"

নিমার মুখে হাসি। চোখে কৃতজ্ঞতা। বললে—"তাহলে আজ থেকেই কাজ শুরু করি?"

"করো।"

নিমা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। বাগানে বেতের চেয়ারে বসে আমি পড়ছি বিদেশী উপন্যাস। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আজ এবেলা অবশ্য রান্নাবান্না আর সম্ভব হবে না। কারণ বাসনপত্তর কিছুই নেই। আজ এবেলাটা যাবে ওসব কিনতে। ওবেলা থেকে রান্নার ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘন্টা দেড়েক বাদে নিমা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। "বাব্বা, এতক্ষণ? কি করছিলে?" হাসলুম আমি।

"এই প্রথমদিন। রোজ তো আর এত সময় লাগবে না। যা জঞ্জাল হয়েছিল!"

"চলো দেখি, কেমন ঘর সাজালে তুমি!" বলে আমি উঠলুম চেয়ার ছেড়ে।

গিয়ে দেখি, চেয়ার টেবিল সোফা-কোচ থেকে আরম্ভ করে খাট আলমারী, মায় ঘরের দেয়াল পর্যন্ত নতুন চেহারা ধারণ করেছে। কে বলবে এই বাড়ীরই সীলিং থেকে একটু আগে পর্যন্তও দীর্ঘ মাকড়সার জাল ঝুলছিল প্রায় মেঝে পর্যন্ত।

সমস্ত বাড়ীটাকেই কতো অল্প সময়ের মধ্যে আপনার করে নিয়েছে নিমা। মনে হচ্ছে না, আমি এবাড়ীর কর্তা আর নিমা এখানে আয়া মাত্র! মনে হচ্ছে, ওই এ বাড়ীর কর্ত্রী, আর আমি এখানে শুধু অতিথি। কি আশ্চর্য!

"বাজার করে আনবো, বাবু?" বললে নিমা, "ঘরে তো আর কিছু করবার নেই।"

"বাজার? তা মন্দ নয়। চলো আমিও যাই। ওই পথে হোটেলে খেয়েও নেবো।"

নিমা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম।

উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটছি—রোদ-ঝলমল গাছের তলায় তলায়। কি ভালো যে লাগছে! সমস্ত পৃথিবীটাকেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে।

অপরূপ। অপরূপ সুন্দর আজকের এই সকালটি। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, জীবনের যেন কোনো একটা অর্থ আছে।

মাঝে মাঝে আড়চোখে নিমাকে লক্ষ্য করছি আমি। আজ ওর পরনে আকাশী রঙের শাড়ী, বাঙালী মেয়েদের মত করে পরা। ওর সুডৌল বুকের ওপর দিয়ে নীল আঁচল উঠে গেছে কাঁধ পর্যন্ত, তারপর কাঁধ পেরিয়ে নেমে গেছে পিঠ বেয়ে। বোধহয় শাড়ীর রঙের সঙ্গে মিলিয়েই আজ ও হাতে পরেছে নীল কাচের চুড়ি, আর মাথায় পরেছে একগুচ্ছ নীল ফুল। কি সুন্দর যে ওকে দেখাচ্ছে!

গল্প করতে করতে আড়াই মাইল পথ পেরিয়ে এলুম প্রায় অজান্তে। শহরের গোলমাল এবার কানে যাচ্ছে, দু'ধারে চোখে পড়ছে দোকান আর বাজার। এখন কাছাকাছি একটা হোটেল খুঁজে নিতে হবে। যে হোটেলে রোজ খাই সেটা অনেক নীচে। এখান থেকে যাওয়া সুবিধে হবে না।

খানিক এগোতেই চোখে পড়ল একটা সিন্ধি হোটেল। সিন্ধী রান্না আমার বেশ ভালো লাগে। সুতরাং ওখানে ঢুকে পড়াই সমীচীন।

নিমাকে বললুম, "এসো, আজ এখানেই খাওয়াটা সেরে নেয়া যাক্।"

নিমা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বললো, "না বাবু, আপনি যান। আমি বরং ততক্ষণ কিছু সওদা করে আসি। কতক্ষণ লাগবে আপনার খেতে? আধ ঘন্টা?"

আমি একটা ধাক্কা খেলুম। নিমা আমার সঙ্গে হোটেলে বসে খেতে চায় না। কেন?

"তুমি খাবে না কেন? কারণটা কি?"

স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলুম নিমার চোখের দিকে তাকিয়ে।

মাথা নীচু করলো নিমা। শাড়ীর আঁচলের খুঁট নিয়ে একবার পাকালো বুড়ো আঙুলের চারদিকে, আবার খুলে ফেললো। বুঝতে পারলুম কিছু একটা ওর মনে আছে। সেটা বলতে ইতস্তত করছে।

"বলো, বলে ফেলো। না বললে হাজার রকম ভাববো। সেটাই কি ভালো হবে?"

এবার মুখ খুললো নিমা। মাথা তুলে বললে, "আমি আপনার আয়া, আপনি বাঙালী বাবু। আমার সঙ্গে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করলে এখানকার যত বাঙালী সব আপনার বদনাম করবে। আমি তা চাই না।"

তাই তো বটে! এখানেও তো বাঙালী আছে। তাদেরও তো আছে সমাজরক্ষা আর পরচর্চার দায়িত্ব!

"আমি গ্রাহ্য করি না। যা বলে বলুক!" বলে উঠলুম আমি।

নিমা আমার মুখের দিকে তাকালো। ওর চোখে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়।

"এসো। আমি কাউকে ভয় করি না।"

আমার গলার স্বরে বিদ্রোহ ঘোষিত হল।

নিমা আর প্রতিবাদ করলো না। নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করলো। আমার দৃপ্ত পৌরুষের কাছে ওর নারীমন সহজেই আত্ম-সমর্পণ করলো।

ভাত, মাছের ঝোল, আর চাটনি।

মাছের ঝোলটা খুবই ভালো হয়েছে। যে কোনো বাঙালী হোটেলের থেকে ভালো।

নিমা কিন্তু ভালো করে খাচ্ছে না। মনে হয়, আমার সামনে খেতে ও লজ্জা পাচ্ছে।

"তোমার দেখছি আজ পেট ভরে খাওয়া হল না আমার জন্যে!" বললুম ওকে।

নিমা লজ্জা পেলো। মৃদু হেসে বললো, "কেন, এই তো বেশ খাচ্ছি।"

"ঐ কি পাহাড়ী মেয়ের খাওয়া? তোমার অমন সুন্দর স্বাস্থ্য কি ঐ পাখীর মত খাওয়া খেয়েই বানিয়েছ? বললেও বিশ্বাস করবো না।"

খাওয়া শেষ হলে পর দুজনে চললুম জিনিসপত্তর কেনাকাটা করতে। কি কি লাগবে, জিজ্ঞেস করলুম ওকে। হাঁড়ি, কড়াই, স্টোভ্, বালতি, আরো অনেক কিছুর ফিরিস্তি দিলে ও। কিনলুম সবকিছুই। কিনে চাপিয়ে দিলুম এক কুলীর মাথায়। এবার কয়লা, কেরোসিন আর আনাজপাতি নেওয়া করতে হবে। তাও হল। কিন্তু চাল? চালের কি ব্যবস্থা হবে? আমার যে রাশন্ কার্ড করানো হয়নি!

"চালের জন্যে ভাববেন না।" আমাকে আশ্বাস দিলো নিমা, "আমার বোন এক হোটেলে কাজ করে, সেখানেই খায় ও। ওর কার্ডটা বাড়ীতে এমনিই পড়ে আছে। ওটাতেই আপনার হয়ে যাবে। আর আমার তো নিজেরই কার্ড্ আছে।"

কিন্তু এখন? এখন আপাতত কি ব্যবস্থা হবে?"

"আপনি এই ডিমওয়ালীর কাছে দাঁড়ান, আমি এখুনি ছুটে বাড়ী থেকে কার্ড দুটো নিয়ে আসছি। আজ এখনো দোকান বন্ধ হয়নি। র‍্যাশান পাওয়া যাবে।"

নিমার কথামত দাঁড়ালুম ডিমের দোকানের সামনে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম কখন ও আসে।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ফিরে এল নিমা। পাহাড়ী পথ ভেঙে নেমেছে, উঠেছে, তাই এখনো হাঁফাচ্ছে। দুগাল হয়ে উঠেছে আরক্তিম।

নিমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম মুদীর দোকানে। দরকারী জিনিস সব কিনে নিয়ে ধরলুম বাসার পথ।

বাংলোয় পৌঁছতে বেলা বারোটা বেজে গেল। এখন আর কোনো কাজ নয়। শুধু বিশ্রাম।

নিমা আর আমি মুখোমুখি বসলুম এসে বারান্দায়। কথার স্রোত বয়ে চললো দুজনের মাঝখানে। শুধু অর্থহীন কথা আর হাসির বন্যা।

আজ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হল। এখন থেকে শুধু রাত্তিটা ছাড়া আর কোনো সময়েই একলা থাকতে হবে না আমাকে।

(তিন)

শীতের সন্ধ্যা নামছে হিমালয়ের কোলে। হিম কুয়াশা জমাট বাঁধছে আমার ফুল-ঝরা বাগানের পত্রহীন গাছগুলোকে ঘিরে—পাহাড়ী পথের দুপাশে ছাওয়া বার্চবনের অন্ধকারে। অক্টোবর চলে গেছে তার সোনালী আলো আর রঙিন ফুলের সমারোহ নিয়ে। এখন এসেছে নভেম্বর—তার মেঘঢাকা দিন আর তুষারস্পর্শ রাত্রির বিষণ্ণ আলিঙ্গনে সমস্ত পৃথিবী ঘিরে। আমার ওভারকোটের পুরু আস্তরণের ভিতর থেকেও সে আলিঙ্গন আমি অনুভব করছি।

রান্নাঘরে কাজ করছে নিমা। বারান্দা থেকে বাসনের টুংটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কলকাতার কথা মনে পড়ছে। শরীরটা খারাপ বলেই হয়তো।

পায়ের আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত কেমন একটা শিরশিরানি অনুভব করছি। শির-শিরানিটা ক্রমেই বাড়ছে দেখছি। নাঃ, বারান্দায় আর বসে থাকা গেল না। সদর-দরজা বন্ধ করে দিয়ে শোবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।

জ্বরটর আসছে নাকি? এত শীত করছে কেন? কাল সন্ধ্যেবেলা কোট্-টোট্ না পরেই বাগানে পায়চারি করেছিলুম। তাই কি ঠান্ডা লেগে গেল? কাজটা ঠিক হয়নি, এখন বুঝতে পারছি।

খানিক বাদে নিমা এল। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললে, "কি ব্যাপার, কম্বল মুড়িশুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন যে? একটু আগেই তো দেখলুম বারান্দায় বসে আছেন।"

"বড্ড শীত করছে। জ্বরটর এল নাকি বুঝতে পারছি না।"

"কই, গা দেখি।"

এগিয়ে এসে নিমা আমার কপালে হাত রাখলো। একখানি ছোট, নরম হাতের স্পর্শ। এই প্রথম। প্রথম স্পর্শ কি মধুর!

"গা তো বেশ গরম দেখছি।" হাত সরিয়ে নিলো নিমা—"থার্মোমিটার আছে?"

"না।"

"এখন তো আবার ডাক্তারও পাওয়া যাবে না।"

চিন্তান্বিত দেখালো নিমাকে।

"দু-এক দিন তো দেখা যাক। কাল ঠান্ডা লাগিয়েছিলুম, এ হয়তো তারই জের। এমনিই হয়তো সেরে যাবে।"

"এমনি সারে তো ভালোই। কিন্তু আপনি কলকাতার লোক। ওখান থেকে এসে অনেকেই এখানকার শীত সহ্য করতে পারে না। নানারকম অসুখ বাধিয়ে বসে।"

একটু চিন্তা করে নিমা বললো, "তোলা উনুন থাকলে ঘরে এনে রেখে দিতাম। হটারও তো নেই। হট্‌ব্যাগ আছে?"

"হট্‌ব্যাগ? না তো।"

"কেন, আপনাকে কেউ বলেনি? এখান-কার লোকে বেশীরভাগই হট্‌ব্যাগ রাখে বিছানায় শীতকালের রাত্তিরে। অবিশ্যি যাদের পয়সা আছে ওসব কেনার মত।"

"কত করে দাম?"

"এই পাঁচ-সাত টাকা হবে।"

"তাই নাকি? কালই কিনে নিয়ে এসো তবে গোটা দুই তিন।"

"আনবো। কিন্তু আজ? আজ কি করা যায়? আপনি যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন!"

সত্যিই ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি আমি। হিমের স্রোত যেন বইছে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। হাত-পা বরফের মত ঠান্ডা মনে হচ্ছে।

"আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আজ আমি বাড়ী যাই কি করে?" আপনমনেই যেন বললো নিমা।

"আজ রাতটা তুমি থাকতে পারো না এখানে?"

পাহাড়ী মেয়েদের জীবনের অবাধ স্বাধীনতার কথা অনেক শুনেছি বলেই একথা বলতে সাহসী হলুম।

"থাকতে পারি।"—একটু ভাবলো নিমা—"তবে বাড়ীতে বলে আসতে হবে।"

"তাহলে যাও এখুনি বলে এসো, আর দেরী কোরো না।"

"হ্যাঁ, এই যাবো আর আসবো। ততক্ষণ আপনি একা থাকতে পারবেন তো?"

"তুমি আমায় কি ভাবো বলো তো, নিমা?" হেসে ফেললুম আমি।

কিছু না বলে নিমা আমার দিকে তাকালো। মা যেমন পরম মমতায় তার শিশুর দিকে তাকায়, ঠিক তেমনি করে।

"দরজাটা বন্ধ করে দিন।" বলে নিমা বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেলই। সময় আর কাটে না। প্রতিটি মুহূর্ত একেকটি যুগ মনে হয়।

অনেকক্ষণ পর দরজার বাইরে কলিং বেল্ বেজে উঠল। উঠে দোর খুলে দিলুম।

"বাব্বাঃ, এত দেরী। গেলে তো গেলেই একেবারে!"

"দেরী!"—আকাশ থেকে পড়লো নিমা—"বলছেন কি? গেছি, মাসীকে বলেছি, আর চলে এসেছি।"

"কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছিল অনেক-ক্ষণ গিয়েছ।"

"শরীর খারাপ, তার ওপর একলা ছিলেন, তাই ওরকম মনে হচ্ছিল।" দরজা বন্ধ করতে করতে জবাব দিলো নিমা।

খানকয়েক পাতলা রুটি, পেঁপের তর-কারী, আর দুধ। এই আমার আজকের রাতের বরাদ্দ। এই খেয়েই আমাকে শুয়ে পড়তে হল আবার।

লোহার কড়াইয়ে কাঠ কয়লার আগুন করে নিয়ে এল নিমা। এনে আমার হাতে-পায়ে সেক দিতে বসল।

নিমার এই সেবা গ্রহণ করতে কেমন সঙ্কোচ জাগছে মনে। কিন্তু আবার ভালোও যে লাগছে সেকথা অস্বীকার করি কি করে—নিজের মনের কাছে?

সেক দিতে দিতে গল্প করছে নিমা। ওর মা-বাবার কথা, ওর বোনের কথা, ওর চেনাশোনা লোকদের কথা। ওর নাকি কে এক দূরসম্পর্কের পিসী আছে, সে বিয়ের নামে একেবারে খাপ্পা। অল্প বয়েস থেকেই সে নাকি পুরুষদের কাছে ঘেঁষতে দেখলেই একেবারে চটে যায়।

"তোমার পিসীর মত তো জানলুম। তোমার মতটা কিরকম? তুমিও কি বিয়ের নামে একেবারে খাপ্পা নাকি?" জিজ্ঞেস করলুম ওকে।

নিমার মুখ লাল হয়ে উঠল। ঘাড় নীচু করেও সেক দিতেই থাকলো, আমার কথার কোনো জবাব দিলো না।

"আচ্ছা নিমা, তুমি কখনো কাউকে ভালোবাসোনি?" জিজ্ঞেস করে ফেললুম আমি।

নিমা একেবারে চুপ। কথার স্রোত বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার কৌতূহল আরো তীব্র হল :

"বলো না, কখনো কাউকে ভালো-বেসেছ? বলতে আপত্তি আছে?"

এবার হঠাৎ মুখ তুললো নিমা। বললো "যদি বেসেই থাকি, সেকথা শুনে আপনার

সেকালের একালের কলকাতা

ফটো : স্নীলচন্দ্র পোদ্দার

কি লাভ? আপনারা বড়লোক, আপনাদের কাছে আমাদের মত জংলী মেয়ের সুখদুঃখ ভলোবাসার দাম কতটুকু?"

"অন্যদের কথা বলতে পারিনে; তবে আমার কথা বলতে পারি। তোমাদের কোনোদিন আমি ছোট মনে কিরিনি। আমার ব্যবহারে কি কোনোদিন তোমার মনে হয়েছে, তোমায় আমি অবজ্ঞা করছি, তোমায় আমি মানুষ বলে মনে করছি না? বলো, সত্যি করে বলো, কোনোদিন কি তোমার মনে হয়েছে এমন কথা?"

"না।"

"তবে?"

এবারে আর কোনো উত্তর দিতে পারলো না ও। চুপ করে রইলো।

খানিক নীরবতার পর আমি বললুম, "তোমার জীবনের কথা যদি আমায় না বলতে চাও, বোলো না। জোর করে কারো গোপন কথা শুনতে চাইনে আমি।" বলে বিছানায় পাশ ফিরলুম।

নিমা কি বুঝলো, কি ভাবলো, জানি না। নীরবে সেক দিতে লাগলো আগের মতই আমার পায়ে। আর তার মাঝখানে কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম জানতেও পারলুম না।

ঘুম ভাঙলো একেবারে পরদিন সকালে।

উঠে বসতে গিয়ে দেখি সর্বাঙ্গে ব্যথা। বুকে সর্দিও বসেছে। কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে।

নিমা চা নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে দুটি মুরগীর ডিম সেদ্ধ আর জ্যাম-মাখানো চার স্লাইস্ রুটি।

"আজ কেমন আছেন?" জিজ্ঞেস করলো নিমা।

"ভালো নেই। এখন গুরুতর কিছু না হলেই বাঁচি।"

"আপনি শুয়ে থাকুন, আমি ডাক্তার ডেকে আসছি।"

"কোন্ ডাক্তারকে ডাকবে?"

"ডাক্তার মিশ্রকে।"

"ও'র ডিস্পেন্সারি কোথায়?"

"বাজারের কাছে।"

"কত করে ফী?"

"আট টাকা।"

"ঠিক্ আছে। যাও, ডেকে নিয়ে এসো।"

নিমা ডাক্তার মিশ্রকে ডাকতে গেল। ফিরলো মিনিট চল্লিশেক পরে।

বাজার তো এখান থেকে কম দূরে নয়। প্রায় আড়াই মাইলের মত হবে। যাবার সময় হেঁটেই গিয়েছে। সুতরাং সময় তো লাগবেই।

নিমার পিছন পিছন ডাক্তার মিশ্র এসে ঘরে ঢুকলেন।

ডাক্তারের বয়েস বেশী নয়। তিরিশও হবে বলে মনে হয় না। চেহারায় অবাঙালী ছাপ থাকলেও বাংলা কিন্তু ভালোই বলেন। সেটা বোঝা গেল তাঁর প্রথম কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই। সমান্য যে একটু বাঁকা টান আছে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মিশ্র বললেন—"নিমার কাছে শুনলুম আপনি এখানে একা থাকেন, বাড়ীর লোক সব কলকাতায়। তাই অন্য কেশ অ্যাটেন্ড না করে আপনার কাছেই সব আগে এলুম।"

"আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।" বললুম ও'কে।

"ক্যাল্কাটা মেডিক্যাল্ কলেজ থেকে পাশ করেছি। বাংলা না জেনে উপায় আছে?"

স্টেথিসকোপটা গলায় লাগাতে লাগাতে হাসলেন ডাক্তার মিশ্র।

"মেডিক্যাল্ কলেজ্ থেকে পাশ করেছেন? তবে তো আপনি কলকাতাকে ভালোরকমই জানেন।"

"তা জানি।"

চোখ-মুখ-বুক-পিঠ সব পরীক্ষা করে ডাক্তার মিশ্র রায় দিলেন—নিমোনিয়া।

সেইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যেতে। এখানে একটি মাত্রই হাসপাতাল। সেখানে তাঁর জানাশোনা আছে, বেডের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন, এও জানালেন।

"হাসপাতালে ভর্তি হবার দরকার আছে কি?"

জিজ্ঞেস করলুম একবার।

"আপনার আত্মীয়স্বজন কাছে থাকলে বলতুম না। কিন্তু এখানে তো আপনার কেউ নেই দেখাশোনা করার মত।'

একেবারেই কি কেউ নেই দেখাশোনা করার মত? চকিতে একবার চোখ পড়লো নিমার দিকে। কিন্তু ওর কথা বলতে পারলুম না ডাক্তারকে।

"নিমা, আমার ঐ টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারটা খুলে দেখো তো, ওর মধ্যে টাকা আছে। ওর থেকে আটটা টাকা বার করে ডাক্তারবাবুকে দাও।'

টেবিলের ড্রয়ার খুলে আট টাকা ফীজ, ডাক্তার মিশ্রের হাতে গুণে দিলো নিমা।

"আচ্ছা, তাহলে এখন আসি। নমস্কার।"

হাসিমুখে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার মিশ্র। (ক্রমশঃ)

কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী

কল্যাণকুমার বসু

(২১)

চার বাগে এ. পি. সেন রোডে অতুলপ্রসাদের বাড়িখানি শেষ হল। ৩৩ হাজার টাকা খরচ করে সুরম্য অট্টালিকাখানি। তিনদিকে বাগিচা। লোহার ফটক থেকে লাল সুরকী-ঢালা পথখানি এগিয়ে এসেছে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত। ফটকের পাশে শাদা পাথরে খোদাই করে লেখা 'হেমন্ত নিবাস' —এ-বাড়ির নাম। মায়ের স্মৃতি ঘিরে রইল এ-বাড়িখানি।

১৯২৬ মে মাসের মাঝামাঝি কিম্বা শেষের দিকে অতুলপ্রসাদ তাঁর নতুন বাড়িতে 'জাঁকজমকে গৃহপ্রবেশ' করে উঠে এলেন। কিন্তু এখানেও হেমকুসুম অনুপস্থিত। হেমকুসুমের বাবার খুব বাড়াবাড়ি অসুখের জন্য তখন তিনি কলকাতায়।

হেমকুসুমের এবারের চলে যাওয়াই শেষ যাওয়া. এরপর আর কোনদিন হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদ একসঙ্গে বাস করেননি। হেমকুসুমের অভাব সবসময়েই জাগে কিন্তু নানান বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের আগমনের মধ্যে দিয়ে সে অভাব পূর্ণ হয়। অতুলপ্রসাদের বাড়ি ছিল যেন আনন্দ-ভবন। "বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেহ না কেহ সকল সময়েই তাঁর বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহাদিগকে আনন্দে রাখিবার জন্যে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। পত্নী গৃহত্যাগী, ভগ্নীরা পতিহারা, তদুপরি পুত্রশোকাতুরা, অপরজন কন্যাপাগলিনী-প্রায়, স্নেহময়ী জননী এত সাধের ভবন প্রস্তুত হইবার পূর্বেই চলিয়া গেলেন। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য হারায় নাই। সর্বদা হাসিমুখ ধীর স্থিরভাবেই সবই সহ্য করিয়াছেন আর গাহিয়াছেন 'তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।'"*

দাদা সেদিন লিখলেন, তুমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে আমার কাছ থেকে বেড়িয়ে যাও। আমরা দুই ভাই চল একবার দেশে আমাদের গ্রাম থেকে ঘুরে আসি। কতদিন দেশে যাওয়া হয়নি। তুমিও তো দেশে যাওনি অনেক দিন। মনে পড়ে তোমার আমাদের গাঁয়ের সেই নদীটি, কাজলদীঘি, হোগলাবন, পীরের সিন্নি, গাজির গান আর ওই করিমভাইয়ের ভিটে? মনে পড়ে না—

"দেশের মাঠে খেতে-ভরা সব ধান,
পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান,
তরুণ চাষীর করুণ বাঁশির তান
আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।"

দাদা লিখলেন দেশকে তুমি কেমন করে ভুলে আছো। এসো একবারটি ছুটি নিয়ে এসো। আমার কাছে চলে এসো ভাই। তোমার জন্যে আমার বড় মন কেমন করে সব সময়ে, তোমায় কতদিন দেখিনি।

প্রবাসী মন দেশের জন্যে কেঁদে সারা কিন্তু অবসর কোথায়।

অতুল লিখলেন দাদাকে তুমি আমার কাছে ডিসেম্বরে এসো...তুমি এলে আমি খুউব খুশী হবো। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি...কতদিন যে......

A. P. Sen Road,
Charbagh,
Lucknow.

দাদা,

ডিসেম্বর মাসে ছুটি নিয়া এখানে আসিবে শুনিয়া খুউব সুখী হইলাম।

আমি x মাসের ছুটিতে দিন সাতের জন্যে দিল্লী যাইবো। নতুবা ডিসেম্বর জানুয়ারী এখানেই থাকিবো। তুমি কিন্তু নিশ্চয়ই আসিবে। আর আমার নতুন বাড়ি হইয়াছে না আসিলে চলিবে না। তোমরা সকলে আমার ভালোবাসা লও। আশা করি তোমরা ভালো। আমি একরকম ভালো আছি। শেষাদ্রির—ছুটকীর স্বামীর এখনও কাজ হয় নাই। হিরণ ছুটকীরা বাঙ্গালোরে। কিরণ কলকাতায়।

ইতি তোমার ভাই
অতুল

দাদার ডিসেম্বরে লখনউ আসা হল না। সুবালামাসি এলেন মেয়ে ঊষাকে নিয়ে। ঊষার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল জল-হাওয়ার পরিবর্তনে শরীরটা সারবে এই আশায় সুবালা এলেন লখনউএ। ... ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অথবা শেষ সপ্তাহে দিলীপকুমার রায়ের আমন্ত্রণে শিমুলতলায় কয়েকটা দিন ছুটি কাটাতে এলেন অতুলপ্রসাদ। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬ অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপকুমার রায় শিমুলতলা থেকে সটান বোলপুরে উপস্থিত হলেন।

সকালবেলা কবির ওখানে পৌঁছতেই অতুলপ্রসাদ খুশী হয়ে কবিকে বললেন, 'আপনার শরীরটা খুব ফিরেছে দেখছি।'

কবি সহাস্যে বললেন, চুপ চুপ ও কথা বলনা। কালকেই এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমাকে সভাপতি করতে কোমর বেঁধে মরিয়া হয়ে এসেছিলেন। তাঁকে বহু কষ্টে বিশ্বাস করিয়েছি যে আমি মরণাপন্ন। আচমকা আমি ভালো আছি জানলে তিনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠবেন যাবেন আমাকে টেনে নিয়ে। তখন তাঁর স্ত্রীর জন্যে প্রকাশ্য সভায় চোখের জল না ফেলে আমার আর উপায় থাকবে না।

অতুলপ্রসাদ হেসে বললেন। তাকে বিশ্বাস করালেন কি করে?

কবি কৌতুক করে হেসে বললেন, 'জানা চাই হে জানা চাই। আটঘাট বেঁধেছি কি কম! পাছে ফস্কে যায় এই ভয়ে ওঁকে ঘটা করে বুঝিয়েছি যে এরূপ ক্ষেত্রে যিনি পতি তাঁরই সভাপতি হওয়া উচিত।'

এরপর বসল গানের আসর। কবি শ্রীমতী রমা মজুমদারের সঙ্গে গাইলেন।

'তোমার বীণা আমার মন মাঝে'

অতুলপ্রসাদ গাইলেন তাঁর নিজের লেখা গান।

আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো
আমি দেখতে নারি ধরতে নারি বুঝতে

* * *

পরের দিন ২রা জানুয়ারী, ১৯২৭। কথায় কথায় সেদিন এল মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কবি বললেন, 'ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মরলে ফের জন্মাতে হয়...মৃত্যুর পরে আমাদের চৈতন্য লোপ পায় না।' কবি চিন্তিতভাবে বললেন, 'তবে আমাদের সে চৈতন্য এ চৈতন্যের জের টেনে চলে না।'

অতুলপ্রসাদ বললেন, পরিষ্কার করে বলুন কথাটা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কি রকম জান, আমাদের জীবনে কি অনেক সময়েই অদল-বদল হয়ে যায় না কোনো অভাবনীয় কিছু একটা ঘটলে। একটা নড়চড় ভাঙচুর হলে যেমন সমস্ত দৃশ্যটা থাকে অথচ আগাগোড়া বদলে যায় অনেকটা তেমনি। অর্থাৎ হয়তো আমাদের মনোভাব প্রাণের সাড়া দেয়ার ভঙ্গি, হৃদয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুর মধ্যেই একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটে। এ যদি জীবনের ভূমিকম্পেই ঘটে তাহলে মৃত্যুর ভূমিকম্পে আরো ঘটবে। এই ত মনে হয় বেশী করে......যেমন ধরো এটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত মনে রেখো—ধরো এমনও হতে পারে যে মৃত্যুর পরে আমাদের পক্ষে প্রিয়জনের দূরে থাকা ও কাছে আসার মধ্যে আর কোন তফাৎ থাকবে না। তাই মৃত্যুর পরে চৈতন্য রইল বলতে আমি বুঝি না যে সেটা হল এই চৈতন্যেরই সম্প্রসারণ। আমার মনে হয় যে খুব সম্ভব সে চৈতন্যের মধ্যে একটা মূল ছন্দ যায় বদলে।

আরো বলেছেন......প্রতি মানুষকেই বিধাতা আলাদা আলাদা রূপে গড়েছেন আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই করে। কিন্তু কয়েকটা আধার বেশী উৎরে গেল। এদের চরিত্রে একটু অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের অভিজ্ঞতার গঠন প্রকৃতি ও গুণসমাবেশ, ঘটনার যোগাযোগ সবেরই পিছনে যেন রয়েছে একজন অদৃশ্য কারিগরের, কি বলব design মতলব। তবে আমি এ ধরনের কথা বলতে অহংকার করতে চাইনি বিশ্বাস কর। বরং উল্টো। কেননা আমি একথা বলছি আমার আমিত্বকে ফাঁপিয়ে তুলতে নয়—এই সব যোগাযোগকেই বড় করে ধরতে।

অতুলপ্রসাদ বললেন, আপনি এত সংকুচিত হচ্ছেন কেন এসব কথা বলতে? আপনি পাঁচজনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে

*জাঠতুত দাদা ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে।

চললেও তারা যে কাঁধে আপনার সমান নয় একথা কি কারো চোখে ধরা না পড়ে পারে? *

• • •

১৯২৭ ১০ জানুয়ারী দাদা সত্যপ্রসাদ সেন সোদপুর থেকে লখনউ যাত্রা করলেন তার কয়েকদিন আগেই অতুলপ্রসাদ বোলপুর থেকে কলকাতা হয়ে লখনউ ফিরে এলেন।

সত্যপ্রসাদ কাটিহারে এসে রাত কাটালেন। ডাইরিতে লিখলেন "১১ই জানুয়ারী সমস্ত দিন গাড়িতে চললাম। সোনপুর পোল ও স্টেশান খুব বড়। বি, এন, ডাবলু, আর, এর স্টেশানগুলি বেশ সুন্দর ও খাবার বেশ পাওয়া যায়। ছাপরায় নেমে কাশী যাওয়া যায়।"

"১২ই জানুয়ারী। Arrived Lucknow found Subala& her daughter Usa Atuls place স্টেশনে কোন লোক ছিল না। বড় ভাবনা হল অতুলের শরীরের জন্যে। পরে দেখি অতুল আমার চিঠি পায়নি। এই চিঠি চার পাঁচ দিন পরে এসেছিল। মিঃ চিন্তামণি ইউ, পির মিনিস্টার তাঁকে দেখলাম অতুলের অতিথি। আজ বিদায় গ্রহণ করলেন। অতুল বড় সুন্দর বাড়ি করেছে, নাম দিয়েছে 'হেমন্ত নিবাস' অর্থাৎ খুড়িমার নামে। লখনউতে জ্ঞান রায়কে দেখলাম। তাঁকে দেখে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ল। ঢাকাতে আমাদের মধ্যে আমার অতুলের ও জ্ঞানের খুব বন্ধুত্ব ছিল। জ্ঞানবাবুর (নমুবাবু) বাবা গোপীবাবুই খুড়োমহাশয়ের মৃত্যুর পর অতুলের টাকা কোথায় কি আছে বন্দোবস্ত করেন।

১৪ই জানুয়ারী ।। দিলীপ এল কলকাতা থেকে। হেমকুসুম ছয় সাত মাস হল কলকাতায় স্যার কে জি গুপ্তের বাড়িতে। স্যার কে, জি, গুপ্ত পরলোকগমন করেছেন। বাবা মারা যাওয়ায় হেমকুসুম খুউব কাতর। স্যার কে, জি, গুপ্ত হেমকুসুমকে ১৫ হাজার টাকা দান করে গেছেন।

সত্যপ্রসাদ দিলীপকে বললেন, তুমি ত ট্রেনিং নিলে ফার্মিং-এ এবার কি করবে বল?

দিলীপ জানায় এবার একটা পোলট্রী করবো ভাবছি জ্যাঠামশাই। ভাবছি কোথায় করা যায়!

তা এক কাজ কর না তুমি বরং আমার সঙ্গে পূর্ব-বাঙলায় চল ওসব অঞ্চলে পোলট্রী করতে পারলে তোমার প্রচুর লাভ হবে।

দিলীপ সরাসরি অস্বীকার করল, 'না জ্যাঠামশাই অতদূরে আমি যাবো না।'

অতুলপ্রসাদ বললেন, তোমার জ্যাঠামশাই যা বলেন দিলীপ মন দিয়ে শোন। উনি যখন বলছেন ওখানে তোমার সুবিধে হবে তখন নিশ্চয়ই সুবিধে হবে বলেই বলছেন, আমারও বিশ্বাস ওখানে পোলট্রী করতে পারলে তোমার লাভ হবে। তোমার বাবা এবং জ্যাঠামশাই নিশ্চয়ই তোমার ভালো চাইবেন একথা মনে রাখছ না কেন। তোমার ভালোর জন্যেই তোমরা জ্যাঠামশাই বলেছেন ওঁর কি লাভ!

১৫ই জানুয়ারী ।। অতুলপ্রসাদের বাড়িতে চমৎকার এক সঙ্গীতের আসর হল। সেদিন সেখানকার বিখ্যাত তবলা, হারমোনিয়াম ও সরোদ বাজনা শোনা হল।

২০ জানুয়ারী দাদা লখনউ থেকে বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি অতুল। সেদিন আমাদের দেশের গ্রামখানি থেকে কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা গ্রামে আমাদের দেশে যাতে একখানা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। আমার কাছে এসেছিলেন কিছু অর্থ-সাহায্যের কামনা নিয়ে। আমি তোমার নামও বললাম। আমরা সকলে সাহায্য করলে বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়।

অতুলপ্রসাদ বললেন, সাধু উদ্দেশ্য তাঁদের। আমি নিশ্চয়ই তাঁদের টাকা দেব। তোমাকেই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব তুমি ওদের হাতে টাকা দিয়ে দিও।

বেশ তাই পাঠিও।

কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদ দাদা সত্যপ্রসাদকে চিঠি লিখলেন।

Hemanta Nibas
Charbagh, Lucknow

দাদা,

আজ তোমার নামে স্কুলের জন্যে ১০০২ টাকার একখানি চেক পাঠাইতেছি। স্কুলের নামের যে প্রস্তাব করিয়াছ "ভক্ত তামটা, নিগু, কাঞ্চনপাড়া গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন মগরা" তাহা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। এত বড় নাম কখনই হয় না। নামটা একেবারেই শ্রুতিমধুর নয়, বরং হাস্যকর। আমি এ নামে রাজী নই।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে নামটি দিতে চাহেন সেটি দেশ। 'পঞ্চপল্লী গুরুরাম হাইস্কুল'। আশা করি এ নামটি সকলের মনঃপুত হইবে। টাকা পাঠাইতে দেরী হইল। ছেলেরা যে চিঠি আমাকে দিয়াছিল সেটি এখনও পাইতেছি না। কাহাকে লিখিতে হইবে জানাইও উত্তর দিব।

আশা করি তোমরা ভালো আছ। আমি একরকম আছি। ব্লাডপ্রেসারটা এখনো বেশ আছে বলিয়া মনে হয়।

তোমরা আমার ভালোবাসা নাও।

তোমার অতুল।

অতুলের শরীর ভাল নেই, ওকে দেখার জন্যে কেউ নেই। ওর জন্যে সবসময়ে মনটা ভাবনায় থাকে। সত্যদাদা পরপর অনেকগুলি চিঠি লিখলেন। কোন উত্তর নেই। এবার চিঠি লিখলেন অভিমানভরে সত্যপ্রসাদ।

অতুলপ্রসাদ লিখলেন

Hemanta Nivas
Charhagh
Lucknow
3.11.27

পরম সুহৃদ দাদা আমার,

বাস্তবিক আমার বড় অন্যায় হয়েছে এতদিন চিঠি লিখি নাই। তাই বলে মনে করো না আমাদের হৃদয়ের বন্ধন এতটুকু শিথিল হয়েছে।

আজ তোমাকে ৫০০ টাকার একখানা চেক পাঠাচ্ছি। দেশের জন্যে যে ভাবেতে খরচ করা উচিত মনে করিও। আর কত আমাকে দিতে হবে তাও জানিও।

জেঠীমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ ভালোবাসা জানিও। তোমরা সকলে আমার ভালোবাসা নিও। হিরণ সীতা এখন আমার কাছে আছে। সরলামাসীর অবস্থা মুমূর্ষু। আজ টেলিগ্রাম এসেছে condition serious তিনি এখন কলকাতায় আছেন।

আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভালো আছে। শেবাদ্রির এখনও কাজ হয় নাই, তবে আশা করছে শীঘ্রই দু' এক মাসের মধ্যে হবে। হলেই রক্ষা। ওদের ওপর দিয়ে বড় পরীক্ষা যাচ্ছে। কিরণ কয়েকদিনের জন্যে ছুটকির কাছে গিয়াছে, তারা শারীরিক ভালো আছে।

আজ আসি।

তোমার ছোটভাই অতুল।

'অতুল' দাদাকে এর পরের চিঠি লিখলেন লখনউ থেকে ২৩।৩।২৮ তারিখে। নানা কাজে অতুলপ্রসাদ ব্যস্ত, সময় তাঁর কম কিন্তু দু' কলম কি লিখে দাদাকে সুখী করতে পারেন না। অতুল তুমি আমাকে আমাকে ত্যাগ করতে চাও। জান না অতুল তোমার জন্যে তোমার শরীরের জন্যে দিনরাত আমি কত ভাবনা করি। তুমি আমার কথা ভুলে গেছ!

তাই কি হয়

অতুলপ্রসাদ লিখলেন।

দাদা, প্রিয় বন্ধু আমার,

তোমার স্নেহপূর্ণ চিঠিখানি পেয়েছি। আমি কি এত বড় পাষাণ হয়েছি যে তোমাদের ত্যাগ করবো। আমি চিঠি লেখা সম্বন্ধে খুউবই অপটু এবং সেই জন্যে আমাকে অনেকে ভুল বোঝে কিন্তু আমার অন্তর ত তুমি জান। ক্ষমা করো।

দাদা, দিলীপের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বলে ঢাকা বড় দূরে। অত দূরে যেতে চায় না, এদিকে সুবিধে হতে পারে কিনা পোলট্রী ফারম এবং ভেজিটেবেল গার্ডেন খোলবার তা একবার দেখতে চায়। এ নিয়ে তার প্রতি আমি খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছি। সে হয়তো তোমার কাছে একবার শীঘ্র যাবে। তুমি তাকে বুঝিয়ে আবার বলো। তাকে নিয়ে আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। আমি বলেছি হয় আমি আর তুমি যা পরামর্শ দেব তা করবে নতুবা নিজের চেষ্টা দেখবে, আমি কিছু করবো না। আর এও বলেছি যে লখনউর কাছে কোন ফার্ম খুলবো না ইহা নিশ্চয়ই। এ কাছে থাকলে আমার ভগ্নস্বাস্থ্য একেবারেই যাবে। এ কদিনে বেশ সেরে এসেছি সবাই বলে যে আমাকে খুউব ভালো দেখায়, অনেকদিন এমন সুস্থ চেহারা দেখেনি; আবার দিলীপের সাথে সাক্ষাৎ করলে যেটুকু লাভ হয়েছে সবটুকু যাবে। আমার ব্লাডপ্রেসার ২·১৮ হয়েছিল তাত জান। কলিকাতার শেষে ১৭০ হয়েছে। হেলথটাও কিছু ইমপ্রুভ করেছে ডাক্তারেরা বললেন।

আমি গরমের ছুটিতে একবার চাঁদপুর যাব আর জেঠীমার সঙ্গে দেখা করবো।

* শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থংকর' অনুসরণে।

পরে জানাবো ঠিক কবে যাব। আশা করি তোমরা ভালো আছ।

রাঁচীতে জায়গা পাওয়া যায় ১০০ টাকা বিঘা সেলামীতে। প্রায় ৩০ বিঘা পেতে পারি। সেখানে গেলে ফল খুউব ভালো হয় এবং তাতে নাকি লাভও আছে। আর সেখানে পোলট্রীও চলতে পারে। সেখানে স্কুল কলেজও আছে।

রাঁচি সম্বন্ধে তোমার কি মত জানিও।
তোমরা আমার ভালোবাসা নিও
তোমার ভাই অতুল।

রাঁচিতে কিছু জায়গা জমি ক্রয় করার ইচ্ছে ছিল অতুলপ্রসাদের। এবং হয়তো ইচ্ছে ছিল রাঁচিতে ছোট একখানি বাংলোবাড়ি তৈরী করেন। রাঁচির আবহাওয়া ভালো, হেমকুসুমও সেখানে থাকতে পারে। ওর শরীরটা সেখানে ভালো থাকবে। দিলীপেরও একটা পোলট্রী করা যেতে পারে। দিলীপের জন্যে সারাক্ষণ একটা ভাবনা। ওর বয়স ত হল এখন একটা কিছু করা দরকার কিন্তু কোন কিছুতেই ওর যেন মন বসে না। আজ এটা ভাবে কাল ওটা। ও কোন কথা শুনতে রাজি নয়। কোন কথা মানতে রাজি নয়, ওর দ্বারা বোধহয় কোন কাজকর্ম হবে না। মনটা মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদের বড় বিষাদে ভরে যায়—একটিমাত্র ছেলে। ...... শেষ জীবনটা নানা ভাবনায় ভাবনায় গেল। একদিকে হেমকুসুমের ভাবনা অন্যদিকে দিলীপের ভাবনা...দিলীপের একটা কিছু করে দিয়ে তারপর বিশ্রাম, সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

(২২)

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ দুটি বছর পার হয়েছে অতুলপ্রসাদের কর্মময় জীবনের যাত্রা তেমনি ধারায় এগিয়ে চলেছে। চলেছে ব্যারিস্টারী তেমনি মক্কেলদের ভীড়, কোর্ট-কাছারি, গানরচনা, সুরসংযোজনা, সাহিত্যিক-শিল্পী গুণীজনদের আসা-যাওয়া। ডাক পড়ে নানা সভাসমিতি থেকে, উত্তরপ্রদেশের মডারেট নেতা মিঃ এ পি সেন। ডাক পড়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বঙ্গ সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে প্রায় প্রতি বছর। ডাকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তারা। তাঁকে না হলে চলে না আয়ুধে সেবা-সমিতির, রামকৃষ্ণাশ্রম, বালিকা বিদ্যালয় এংলো-সংস্কৃত কলেজ। আছেন দিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন সান্যাল, সাহানা দেবী রেণুকা দাশগুপ্তা, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, পাহাড়ি সান্যাল, টুলু সেন, হরেন চট্টোপাধ্যায়, সোমেন গুপ্ত, সতী ঘোষ, বীণা চক্রবর্তী, কনক দাস, মঞ্জু গুপ্ত আরো অসংখ্য অতুলপ্রসাদের গানের গায়কগোষ্ঠী। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে অতুলপ্রসাদের গান ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে—অতুলপ্রসাদের গান বড় প্রিয় বড় অন্তরঙ্গ হৃদয়ের কাছাকাছি। বাঙলা দেশ তাঁকে ডাক দেয় বাঙালী তাঁকে ডাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতুলের সঙ্গ কামনা করে অধীর হন। বলেন তুমি আমার কাছে মোটেই আস না। এসে চলে যাও বড় তাড়াতাড়ি। বল কবে আসছ? কবে আসবে আবার?

"হবে হবে দেখা হবে" বলেন অতুল ঘনিষ্ঠ উত্তপ্ত আলিঙ্গনে।

হবে দেখা কবে? বলেন রবীন্দ্র।

গোমতীর জলধারা বহে চলে। স্রোত সময়কে এগিয়ে নিয়ে চলে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের পট পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কত প্রাণ বিসর্জন হল। এলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নতুন 'সত্যাগ্রহ' অস্ত্র হাতে নিয়ে। ধীরে ধীরে দেশের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। জাতির পিতারূপে স্বীকৃত হলেন। ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড। পরিচালনা করলেন চম্পারন সত্যাগ্রহ, যোগদান করলেন খিলাফৎ আন্দোলনে, প্রতিষ্ঠা করলেন সবরমতি আশ্রম ইয়ং ইন্ডিয়া নবজীবন পত্রিকা... দণ্ডিত হলেন ছয় বছর কারাদণ্ডে, হলেন বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি।...

১৯২৩ থেকে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হবার পর। গান্ধীজী ডান্ডিতে লবণ আইন অমান্য করতে চললেন, দেশের এই অবস্থায় অতুলপ্রসাদকে দেশ ছেড়ে যেতে হল দূরে বিদেশে।

দাদাকে লিখলেন।

Calcutta
13.5.30

দাদা বন্ধু আমার,

...আজ বিলেত যাবার পথে বম্বে যাচ্ছি। বিলেতে পৌছে তোমাকে চিঠি লিখবো। আমায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখ।

A. P. Sen
C/o. Messrs Thomas Cook & Son
Berkely Street
Piccadilly
London

আমি সেপ্টেম্বরের শেষে দেশে ফিরবো। দেশেরও এখন যা অবস্থা। বিধাতার কি অভিপ্রায় জানি না।

আজ তাড়াতাড়ি
তোমার ভাই অতুল।

এবার কোর্টের কাজে সুদূর ইংল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা। প্রিভি কাউন্সিলে একটি মামলার তদারকীতে তাঁকে যাত্রা করতে হল। ঠিক এই সময়ে তাঁর দেশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা ছিল না। শরীরটা ঠিক আগের মত জুৎসই নেই, বারে বারে নানা রোগের আক্রমণে তাঁকে কিছুটা দুর্বল করে তুলেছিল। ১৯২২ থেকে মাঝে মাঝে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় তখন কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। চিকিৎসকের কড়া নির্দেশ তখন কাজকর্ম কিছুদিন বন্ধ রাখুন। শুয়ে থাকুন।...কিন্তু কে শোনে কার কথা। শুয়ে বসে থাকলেই কি চলে, তাঁর ওপর কতকগুলি মানুষের জীবন এবং জীবিকা নির্ভর করছে, মুখ চেয়ে বসে আছে।

যদিও এই বয়সে দূরপথে যাত্রায় কিছু কিছু ভাবনা আসছিল। তবু যৌবনের দিনগুলির কথা স্মরণ করে যৌবনের দেখা লন্ডনে ফিরতে উৎসাহই জাগছিল। পরিচিত মানুষদের একবার খুঁজে দেখলে কেমন হয়...সে দেশটা কি এখনও সেই রকমই আছে। হয়তো সময় হাতে থাকবে না। হয়তো দেখা হবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না তাদের। চেনার সম্ভাবনাও নেই এ পরিণত বয়েসে, দৃষ্টি বদলিয়ে গেছে। বাহির অন্তরের রূপের মুখ ফিরেছে, দৃষ্টি বদলেছে, হয়তো সেই পরিচিত জগৎটাকে আর চেনা যাবে না।

বেশ তো তাহলে না হয় নেসেশে ফিরে সে দেশের নবীনতাকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাবে।

গোলডার্স গ্রীন' পাড়ায় মিসেস লোকেস পালিতের বাড়ীতে এসে নামলেন। মিসেস পালিত এখন এখানেই বাস করছেন।

মিসেস পালিত আগ্রহের সঙ্গে অতুলপ্রসাদকে এনে তাঁর বাড়িতে রাখলেন। মিসেস পালিতের কটেজের একখানি কামরা সুসজ্জিত ছিল অতুলপ্রসাদের জন্যই।

আপনি আসবেন আমি জানতুম। তাই এই ঘর সাজিয়ে রেখেছিলুম। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

আপনি কেমন আছেন? অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল মিসেস পালিত।

আপনাকে অনেক দিন পর দেখলাম মিঃ সেন। কত দিন! আপনাকে যেন কিছু রোগা দেখাচ্ছে...আপনার অসুস্থতার খবর পেয়েছিলাম, ভাবনা হয়েছিল, আপনার মত প্রতিভা হয় না, একাধারে ব্যারিস্টার, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, কবি।...

...ভারতবর্ষের কি খবর?...ভারতবর্ষের জনসাধারণের... আমাদের রবীন্দ্র...রবীন্দ্রনাথ কেমন আছেন? ও'র কথা বলুন!

বিদেশী মহিলার কণ্ঠে অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা এবং ভারতপ্রেম ধরা পড়ে।

অতুলপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে জড়িমা জড়িয়ে হাসি মুখে কথা শেষ করেন। দেশের কথায় দুজনে মশগুল হয়ে পড়েন।

• • •

প্রবাসী ভারতবাসীরা এসে ঘিরে ধরে লিবারেল নেতা মিঃ এ পি সেনকে বাঙালীরা তাদের প্রিয় গীতিকার কবি অতুলপ্রসাদকে। 'উইক এন্ডে' কোথায় কোনি সমুদ্রবেলায় যাওয়া হয়। নয়তো মিসেস পালিতের কটেজেই সঙ্গীতের আসর বসে যায়। কিছু কিছু সঙ্গীত-পাগল ছাত্র বলে আপনাকে যখন কাছে পেয়েছি, আপনার কাছেই আপনার গান শিখবো। আপনি আপনার গান শোনান, আমাদের শেখান।

সুরেলা দরদী গলায় অতুলপ্রসাদের গান শুরু হয়—

"তব অন্তর এত মন্থর আগে তা জানি কি"

"মনরে আমার
তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
হালে যখন আছেন হরি
তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়।
যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে—
মনরে আমার—
তুই টানিস আরো পরান পণে
যখন পালে লাগবে হাওয়া
সময় পাবি যে জিরোবার
মাঝির সেই গানের তানে
মনরে আমার মনরে আমার—

মনে পড়ে যায় সেই শ্যামল বাঙলা দেশ, পাড়ভাঙা নদী-কূল। মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে। মনে পড়ে যায় পাখির গান। সেই খোলা মাঠ। বকুল ফুল হরির-লুটের বাতাসা, স্নিগ্ধ মাটির গন্ধ মায়েদের ভালোবাসা — সেই মিষ্টি দেশ সকলের সামনে এসে দাঁড়াল, প্রাণের মাঝে ডাকলে। মনে হল ভুলি নি ভুলি নি ভুলি নি। দূরদেশে থেকে মায়ের টান যেন বড় বেশী। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে বাংলা দেশের প্রবাসী মানুষদের মন হঠাৎ বুঝি দেশের জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা।

ছাব্বিশ ইঞ্চি সুটকেশ অক্লেশে হাতে নিয়ে দীর্ঘ জ্যোতিষ্মান পুরুষটি লণ্ডনের আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে এসে উঠলেন। ফিরছেন 'গ্রীনউড'। ট্রেনে এসে উঠল একজন ভারতীয় ছাত্র। চিনতে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলাপ শুরু করল ছাত্রটি। কথায় কথায় বললে আমি আপনার গান গেয়ে থাকি। আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে!

কি নাম তোমার?

রণজিৎ সেন। যদিও টুলু সেন বলে আমাকে অনেকে জানেন। রণজিৎ আবার বললেন, আপনার গান আমি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এবং সাহানা দেবীর কাছ থেকে শিখেছিলাম। কিন্তু আজকে কি সৌভাগ্য আমার এইভাবে এই পরিবেশে এত দূরে দেশে যখন আপনার সঙ্গে দেখা এবং আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য যখন ঘটল তখন একটা আর্জি আছে!

কি বল ত?

আমি আপনার গান আপনার গলায় শুনতে ইচ্ছা করি, তাতে আপনার গানের সঠিক সুর সম্বন্ধে উপকৃত হবো এবং আমাকে আপনার কয়েকটি গান শেখাতে হবে।

বেশ ত। তুমি এখানে কোথায় থাক। চল না হয় আমার সঙ্গে গোলডার্স গ্রীনে। তোমার ইচ্ছার জয় হোক।

পিকাডেলী স্টেশনে ট্রেন বদল করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আর একটা ট্রেন ধরতে হবে। অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজের সুটকেশটি হাতে তুলে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এলেন সঙ্গে রণজিৎ। (অতুলপ্রসাদ বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে সুটকেশ হাতে সিঁড়িতে উঠছিলেন। বয়েসে তিনি প্রবীণ এবং সম্মানীয়) নবীন যুবকের চোখে ভদ্রতাবোধ জাগল, বিনীত সুরে রণজিৎ বললেন, আপনার সুটকেশটা আমার হাতে দিন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, তুমি নিতে পারবে না রণজিৎ, সুটকেশটা খুব ভারী।

না না আমার হাতে দিন, আপনি কেন কষ্ট করবেন আমি সামনে থাকতে।

বেশ নাও, দেখ।

পিছন ফিরে অতুলপ্রসাদ দেখলেন রণজিৎ সেন তাঁর সুটকেশটি বেশ কষ্টকর ভঙ্গিতে তুলে আনছেন। তাঁকে দেখে হেসে বললেন অতুলপ্রসাদ বৃদ্ধের শরীরে এখনও তাহলে শক্তি আছে কি বল! সুটকেশটা আমার হাতে দাও।

না না ঠিক আছে চলুন।

লজ্জিতভাবে রণজিৎ পা বাড়ালেন।

যে কটা মাস লণ্ডনে ছিলেন অতুলপ্রসাদ সে দিনগুলি কাটছিল মনের আনন্দে। মিসেস পালিতের আতিথ্যে অতিরিক্ত সুখ-সাচ্ছন্দ্য-সৌজন্যতায় মাঝে মাঝে বিব্রত-বোধও করছিলেন। এই দূরবিদেশেও সঙ্গীত সাহিত্যের আসর বসে যায়। যেখানেই অতুলপ্রসাদ সেখানেই মজলিশ। একদিন ইণ্ডিয়া হাউসে ফ্রেসকো অংকনরত চারজন তরুণ চিত্রশিল্পী রণদা উকিল, ধীরেনদেব বর্মা, ললিতমোহন সেন, সুধাংশু রায়চৌধুরীদের আমন্ত্রণে ইণ্ডিয়া হাউসে দেয়ালচিত্র দেখতে গেলেন। তাঁদের ফেসকো চিত্র দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তাঁরা তখন বললেন, আমাদের পেনিওয়ান রোডের বাসাতে আপনাকে আসতে হবে। বলুন কবে আসবেন সেদিনই আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ।

অতুলপ্রসাদ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বললেন যাবো, নিশ্চয়ই যাবো, যাবো বৈকি।

কয়েক দিনের মধ্যে চার-আঁকিয়ের পেনিওয়ান রোডের ঘরে অতুলপ্রসাদ এলেন। চার বন্ধু অতুলপ্রসাদ আসবেন বলে চিত্র-শিল্পীদের চিরাচরিত অগোছাল ঘরখানি ঝাড়পোঁচ করলো, সাজালো গোছালো। ফুল-দানিতে ফুল রাখলো, ধূপ জ্বালালো। ফুলের গন্ধে ধূপের গন্ধে ভারতীয় পোষাকে মেজাজে, হাসিতে-খুশীতে ভরপুর হয়ে প্রবাসী কবির প্রতীক্ষায় রইল ওরা। চার বন্ধু স্থির করে চায়ের আসরের শেষে একটা গান-বাজনার আসর বসাতে হবে।

চায়ের আসর শেষ হয়েছে চিত্রশিল্পী ধীরেনদেব বর্মা তাঁর এসরাজে ছড় টানলেন। মুগ্ধ সকলে অকস্মাৎ ধীরেনের ছড়ের টানে এসরাজে অতুলপ্রসাদের গানের সুর ভেসে এল। * বড় মধুর মনমাতান সুর, হৃদয়ের গভীর তল থেকে বুঝি উঠে এলো বড় করুণ সুর—ভেসে বেড়ালো। ধ্যানগম্ভীর পর্বতশিখর থেকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-তরঙ্গে। সমুদ্র-সফেনে, বালুকাবেলায়। আলোড়িত হল মন অব্যক্ত বেদনা মুক্তি চাইল কণ্ঠে। ধীরেনের এসরাজের সঙ্গে একের পর এক অনেকগুলি গান গাইলেন অতুলপ্রসাদ।

গান থামিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, অনেক রাত হল, এবার আমি বিদায় নিই। চার বন্ধু বললে, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

(২৩)

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি বা অক্টোবরের প্রথমদিকে লন্ডন থেকে অতুলপ্রসাদ ফিরলেন। বোম্বাই থেকে সোজা লখনউ—তাঁর কর্মভূমিতে। শীতের দেশে শরীরটা ভালই ছিল। ভারতবর্ষে ফিরে আসতে না আসতেই নানা রোগের আক্রমণ শুরু হল। গাউটের ব্যথা, ব্লাডপ্রেসার, হজমের গোলমাল, সর্দি-কাশি একের পর এক ঘিরে ধরল। শারীরিক অস্বস্তিতে সারাক্ষণ মানসিক অস্বস্তিও প্রবল। স্ত্রী হেমকুসুম পক্ষাঘাতে পঙ্গু। চলচ্ছক্তিহীন। প্রায় দিনই ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে হেমকুসুমকে দেখে আসেন। অতুলপ্রসাদের বলতে সাধ জাগে কেন তুমি এখানে একাকী বাস করছ, চল তুমি আমার সঙ্গে চারবাগে তোমার বাড়িতে। কিন্তু বলতে পারেন না কোথায় যেন একটা দ্বিধা। পাহাড় প্রমাণ দ্বিধা এবং সংশয় তাঁদের দুজনের মাঝখানে তা অতিক্রম করে দুজনের মধ্যে স্বাভাবিক কথাবার্তা স্বাভাবিক মানুষের মত ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব। অথচ একাকী হেমকুসুমকে রেখে যেতে ভরসা জাগে না। হেমকুসুম শারীরিক বড় অসহায়, একাকী নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মগুলি সম্পাদনেরও শক্তি নেই।

দিলীপকে বারে বারে সাবধান করেন অতুলপ্রসাদ বলেন, তোমার মায়ের ওপর দৃষ্টি রেখো মা যেন পড়ে না যায় দেখো। আয়াকে থাকতে বলো তাঁর কাছে সব সময়ে। নিজেও পরিচারিকাদের নির্দেশ দিয়ে যান।

মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে বুঝি আসতে পারেন না। শরীর বাধ সাধে। এর ওপর খাটুনির কি শেষ আছে, বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজ মুলতুবী ছিল। জ্ঞান চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ এসে নিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাকক্ষে, সেবা সমিতির থেকে ডাক আসে। বয়স্কাউট এসোসিয়েশন থেকে ডাক আসে, ডাক আসে নানা বিদ্যালয় কলেজ নানান প্রতিষ্ঠান থেকে সেখানকার তিনি সভাপতি কর্ণধার। এলেন বেঙ্গলী ক্লাব এবং ইয়ংম্যান এসোসিয়েশনের কর্ণধার-কর্মীরা সত্যকুমার সুচারু, সান্যাল ভাইরা আরো অনেকে। ওরা বলে চলুন অতুলদাদা, ক্লাবে চলুন। আমাদের নতুন প্লে হবে দেখবেন চলুন। আপনি এসে আমাদের মধ্যে বসলে আমরা খুউব শক্তি পাই।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তোমাদের কি নতুন প্লে শুরু করলে বলত? তোমরা প্লে করবে আর আমি যাব না এ হতে পারে।

এদিকে শরীরটা সত্যি আর চলে না। এত ছোটাছুটি, এত খাটাখাটি, এত চারদিক থেকে টানাটানি তবু তিনি হঠাৎ ছুটি নিয়ে বসতে পারেন না। তাঁর ওপর নির্ভর কতকগুলি পরিবার তাদের রুজি-রোজগার তাঁর হাতেই। তিনি যদি কোরটের কাজকর্ম থেকে বিশ্রাম নেন তাঁর ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলি অন্নকষ্টের সম্মুখীন হবে। আসলে তিনি যে একটি প্রতিষ্ঠান। তবু তিনি কিছু কোরটের কাজ থেকে হালকা হলেন। কোরটের কাজে দূরে দূরে যাতায়াত কমিয়ে আনলেন। কাজের ভার তাঁর দুই জুনিয়ার ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ এবং এস আর দাশ মহাশয়ের হাতে কিছুটা চাপিয়ে দিলেন। গুরুপাক খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অফিসের কাজ সেরে ফিরে এসে শুয়েই থাকতেন সবসময়ে।

গুণগ্রাহী মানুষেরা আসেন দূর থেকে সেনসাহেবের অসুস্থতার খবর পেয়ে, ভগবানের কাছে ঈশ্বরের কাছে, খোদার কাছে সুস্থতার প্রার্থনা জানিয়ে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করেন। আত্মীয়স্বজনরা অসুস্থতার খবর পেয়ে অস্থিরচিত্ত হন। বড় বোন হিরণ বলেন, দাদা আমার কাছে বাঙ্গালোরে এসো। জায়গা পরিবর্তনে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কলকাতা থেকে মেজ বোন কিরণ লেখে, ভাইদা কলকাতায় এসে তোমার একজন ভালো ডাক্তার দেখান উচিত। দাদা লেখেন তুমি আমার কাছে চলে এসো। পূর্ববাংলায় দেশের খোলা হাওয়ায় শরীর তোমার ভালো হয়ে যাবে।

অতুলপ্রসাদ মনে করলেন, কলকাতায় কিরণের বাড়ী গিয়ে ভালো ভালো ডাক্তার দিয়ে শরীরটাকে পরীক্ষা করালে মন্দ হয় না। সব সময়ে মাথার যন্ত্রণা, বেদনা শরীরে অস্বস্তি আর ভালো না। আর দেরী করা উচিত নয়।

সেদিন কোরট থেকে অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন লালবাগ মহল্লায়, ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়িতে হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করে আসতে।

হেমকুসুম শুয়ে ছিলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কেমন আছো হেমকুসুম?

হেমকুসুম তাঁর গলার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালেন। তাঁর দু চোখ দিয়ে অভিমান অশ্রুধারা বইলো। অনেকক্ষণ পর বললেন, তুমি অনেক দিন আস নি। আমার অনেক দিন কোন খোঁজ-খবর নাও নি।

তোমার শরীর এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন?

ভালো নেই হেম। কাজকর্ম আজকাল বিশেষ আর করতে পারি না। কোরট থেকে ফিরে শুয়ে থাকি বিছানায়। ভাবছি দু-এক দিনের মধ্যে কলকাতায় যাবো। ডাক্তার নীলরতন সরকারকে দিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করাবো।

আমি যখন এখানে থাকবো না, তখন তোমার এবং দিলীপের যাতে কোন কষ্ট না হয় তার সব ব্যবস্থা আমি সেরে রেখেছি। ডাক্তারবাবু ঠিক সময়ে সময়ে আসবেন, তুমি নিয়মিত অসুধ খেও। সাবধানে থেকো। বুঝলে হেম।

দিলীপ দিলীপ।

দিলীপকে ডাকলেন অতুলপ্রসাদ। বললেন, শোন আমি সম্ভবতঃ কাল বা পরশু মেলে কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তোমার মাকে দেখো কেমন। সময়মত অসুধ খাইয়ো। টাকার দরকার হলে মুনসিজীর কাছ থেকে চেয়ে নিও, ঘোষকাকাকে বলতে পার। তিনি তোমাদের সবরকম সাহায্য করবেন।

চারবাগের বাড়ি ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ। মিঃ এইচ কে ঘোষ এবং মিঃ এস সি দাশ তাদের যে মামলাগুলি চলছিল সে সম্বন্ধে নানান উপদেশ দিলেন।

লখনউর পরিচিত মানুষেরা বন্ধুরা একে একে এলেন। বিদায় জানাতে, তাঁরা বললেন, এই ভালো আপনি ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আসুন। আপনার শরীরটা সত্যি বড় ভেঙে পড়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী, চিন্তামণি, নির্মল সিদ্ধান্ত, আদিত্য সত্যকুমারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে বসলেন। অতুলপ্রসাদ ক্লান্ত শরীরে মনে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। স্টেশনে অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন শরীরের অবস্থা দেখে তাঁরা চিন্তিত হলেন।

এখানে তোমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কোন সভা-সমিতি নয়, কোন গানের আসর নয়, কেউ যদি তোমাকে কোন সভায় সঙ্গীতের আসরে ডাক দিয়ে যায় দেখবো তাকে কিরণ বলে। বলে দেবো, তোমার কারো সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি কারো সঙ্গে দেখা করবে না।

অতুলপ্রসাদ হাসেন।

না ভাইদাদা তুমি হেসো না। তোমার শরীরটা আগে। ওদের সঙ্গে বকবক করে গান গাইয়ে তোমায়...ওদের ত কিছু হবে না? তোমার শরীরটা যাবে আমার ভাইদাদার শরীর খারাপ হবে...তোমায় কোথাও যেতে দেব না। এবার তুমি আমার হাতে। আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও আমার বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না!"

কিরণের চোখ দুটি বোধহয় ছলছল করে। কয়েক বছর আগে ও তার স্বামীকে হারিয়েছে, মেয়েদের হারিয়েছে, বড় দুঃখিনী!

কিরণ কল দেয় ডাঃ নীলরতন সরকারকে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। ও'রা অতুলপ্রসাদকে ভালো করে পরীক্ষা করেন। বিশ্রামগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। অতুলপ্রসাদ বিশ্রাম করেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা শোনা কি তাঁর ধাতে সয়। আবার অত্যাচার।

কিরণের বাড়িতে একদিন অমল হোম এলেন।

অতুলদা আপনার আসার খবর আমি কয়েক দিন আগেই শুনেছি। তখন থেকেই একটা চিন্তা এসেছিল মনে এবারে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় আপনাকে কিছু বলতে হবে। আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

---

* ঘটনাটি চিত্রশিল্পী শ্রীরণদা উকিলের স্মৃতি থেকে।

চুপ চুপ বলছ কি?

কেন? কি হল?

হেসে বললেন, অতুলপ্রসাদ যদিও আমার শরীরটা অনেকটা ভালো এখন তবু কিরণ—আমার বোনটি যদি শোনে তুমি আমাকে কোন সভায় বক্তৃতা দিতে বা গান গাইতে নিয়ে চলেছ তাহলে...

তাহলে কি অতুলদা?

বলে দিতে হবে!...শোন শোন নিশ্চিত থাকো আমি যাবো, যাবো কিরণকে লুকিয়ে।

না অতুলদা থাক, আপনার অসুস্থ শরীর।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় আমি যাবো না, কি বললে এ হতে পারে?

সত্যি ত রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত থাকবেন না এ কি কখনও হতে পারে। যতই অসুস্থ হন না কেন, রবীন্দ্র জন্মোৎসবে অতুলপ্রসাদকে উপস্থিত থাকতেই হবে। সেদিনের সভায় অতুলপ্রসাদ সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন আর বন্দনা করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—

গাহো রবীন্দ্র-জয়ন্তী বন্দন,
ভকত জনে আনো পুষ্পচন্দন
বরো বরণ্যো, জগত মাণ্যো।
মুখর যাঁর গানে কাব্যকানন।
সাহিত্য-আকাশে ভাতে যত রবি,
ইন্দু সবাকার, তুমি ওহে কবি,
গৌড় গৌরবে তোমার সৌরভে,
বিশ্ব বিমোহিত, মুগ্ধ গুণীজন।
হে অমর কবি, থাকো মরলোকে
বর্ষ বহু আরো মোদের সম্মুখে;
বঙ্গবীণা আরো বাজাও গুণী
মহান মোহন বাণী কহো শুনি।
রচো এ ভুবনে 'শান্তিনিকেতন'।
পূর্ণ হউক তব পুণ্যসাধন।

১৯৩১-এর গরমের কালটা—মে-জুন মাসটা কলকাতায় চিকিৎসায় চিকিৎসায় গেল। এখন অনেকটা সুস্থ। চিকিৎসক অনুমতি দিলেন এখন কাজকর্ম করতে পারেন তবে বেশী পরিশ্রম নয়।

অতুলপ্রসাদ লখনউ ফিরে এলেন তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে। আবার কাজের মাঝে ডুব দিলেন। লখনউ পেঁছে দু মাস পরে দাদার চিঠি পেলেন, দাদা লিখেছেন তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে সাধনার বিয়ে। বিয়ে হবে ২৫শে নভেম্বর। অতুলের নিশ্চয়ই আসা চাই। তুমি না এলেই নয়। এখন কেমন আছ অতুল।

অতুলপ্রসাদ সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

Charbagh
Lucknow
9.10.31

দাদা,

আজ বিকেলে তোমার চিঠি পেলাম। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ আমি বারে বারে গাউট-এ ভুগছি। আর ইদানীং ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি, কাশিটাও আছে তবে পূর্বাপেক্ষা একটু ভালো আছি। মোট কথা প্রায় ছয় মাস ধরে ভুগছি, এর ওপর কাজ করতে হচ্ছে, অনেকগুলি প্রাণীর জীবিকা আমার ওপর নির্ভর করে কিনা।

শিবুর বিবাহ ২৫শে নভেম্বর হবে শুনে বড় সুখী হলাম। শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকলে নিশ্চয়ই যাব। শিবুকে আমার আশীর্বাদ দিও। বৌঠানকে আমার প্রণাম দিও। জেঠীমাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠিও। তুমি ছোট ভাইয়ের ভালোবাসা নও। আশা করি সকলে ভালো আছো।

তোমার স্নেহের ভাই
অতুল

কিন্তু শরীর বাদ সাধলো।

১৫-১১-৩১ তারিখে চারবাগ হেমন্ত নিবাস কুঠী থেকে দাদাকে পরের চিঠি লিখলেন।

দাদা,

বারবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়াতে আমি এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আর ব্লাডপ্রেসার এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। এখানকার ডাক্তারদের দেখিয়েছিলাম, তাঁরা কিছু করতে পারছিলেন না। ডেনহাম হোয়াইট যখন দেখলেন তখন আমার ব্লাডপ্রেসার ২১৪ খুবই হাই। কাশিটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। এখনও তবে পূর্বাপেক্ষা একটু কম। মাঝে মাঝে জ্বর হত সেটা এখন হয় না। ব্লাডপ্রেসারটা হয়তো সামান্য কম। দেখি নি। লিভারের এ্যাকসান ভালো হচ্ছে না, রং সাদা ছিল। এখন একটু ভালো হয়েছে, তবে ঠিক স্বাভাবিক হয় নি। ডেনহাম হোয়াইট চিকিৎসক ও ডায়েট-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেইমত চলছি। কিছু উপকার পেয়েছি। এখন সামান্য কাছারীর কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করি না। কাছারীর কাজ না করলে ওদিকে চলে না—তারপর যতটা সম্ভব রেস্ট করি ও শুয়েই থাকি। বড় দুর্বল বোধহয়।

শিবুর বিয়েতে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় যেতে পারব না। জানি তুমি খুব দুঃখিত হবে, আমিও সত্যি ভয়ঙ্কর দুঃখিত। ছোট ভাইকে স্নেহ এনে তার শরীরের অবস্থা ভেবে ক্ষমা করো।... শরীরটা ভালো থাকলে ভাবতাম না...আমি বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করি, তারা সুখে থাকুক, সকলকে খুশী করুক।

তোমরা আমার ভালোবাসা নিও।
তোমার ছোট ভাই অতুল

১৫ই নভেম্বর খুব দুঃখিত মনে দাদাকে চিঠি লিখলেন অতুলপ্রসাদ যে, তাঁর প্রিয় ভাইঝি শিবু বা সাধনার বিবাহে যেতে পারলেন না। কিন্তু ডিসেম্বরে তাঁকে লখনউ ত্যাগ করতে হল অসুস্থতার জন্যেই। আবার কলকাতায় কিরণের বাসায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় ধরাবাঁধায় রইলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ধরাকাট শুরু হল। ঘোরাঘুরির পরিশ্রম নয়। আত্মীয়স্বজনদের রক্তচক্ষুর হাত এড়িয়ে কোন মানুষের প্রবেশ নিষেধ। কিরণের বাড়িতে তাঁর স্নেহের বন্দী জীবন শুরু হল।

ইদানীং অতুলপ্রসাদ প্রায়ই চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্যে কলকাতায় আসতেন। লখনউর কর্মক্ষেত্রে একমুহূর্ত তাঁর বিশ্রামের অবসর থাকতো না। কলকাতায় এলেই কি বিশ্রাম হত? তাঁর বাসস্থানে গানের জলসা বসে যেত। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আসতেন সংগীতে তাঁর সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিতেন। একবার বোন কিরণের বাসায় কবি রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করলেন। দিলীপকুমার রায়ও নিমন্ত্রিত হলেন আর একটি সর্ত সমেত গান গাইতে হবে। গান গাইলেন দিলীপকুমার রায়।

লখনউ যখন ফিরতেন প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদ আত্মীয়স্বজনদের কেউ না কেউ তাঁর সংগী হতেন। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রেমপূর্ণ ছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন অনুভব করেছেন সে কথাটি। বোনেরা বিপদে দুঃখে তাঁর আশ্রয়ে এসেছে। তিনি স্নেহময় ভাইয়ের কর্তব্য পালন করেছেন। ভাগনে-ভাগনিরা পিতৃহারা হয়ে তাঁর কাছে পিতৃস্নেহ পেয়েছে। তিনি তাদের পিতার অভাব কোনদিন বুঝতে দেন নি। তিনি তাদের কাছে এনে রেখে সস্নেহে তাদের সব অভাব ভরে দিয়েছেন। হিরণের একমাত্র ছেলে লন্ডনে পড়তে গিয়ে ভীষণ অসুস্থ হল। হিরণ ভেবে আকুল।

ঘোষ তুমি যাও হিরণকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখে এসো যদি খুব অসুস্থ হয়ে থাকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে এসো। যত খরচখরচা হয় আমি দেবো।

হিরণের ছেলে মারা গেল ফিরতিপথে। জাহাজ থেকে তাদের নামিয়ে দেয়া হল কোন দ্বীপে। হিরণের মন কেঁদে সারা। অতুলপ্রসাদ সান্ত্বনা দিলেন বোনকে।

ছোট বোন ছুটকির (প্রভা) স্বামী মিঃ শেষাদ্রী আয়াঙ্গারের চাকরীর ক্ষেত্রে চক্রান্ত, গোলযোগ, চাকরীহীনতা, দুশ্চিন্তা, অশান্তি। মিঃ আয়াঙ্গারকে সান্ত্বনা দিলেন তুমি ত সৎপথে আছো, কোন ভয়ভাবনা করো না। আমি তোমায় সাহায্য করবো। কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ছোট বোন এবং তার ছেলেমেয়েকে এনে রাখলেন তাঁর চারবাগের বাড়িতে। তোমাদের কোন ভাবনা নেই আমি ত আছি। আমি—অতুলপ্রসাদ সেন, সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব—আচ্ছাদনের নীচের সে আশ্রয়টুকুর কি কম মূল্য।

হেমকুসুম শুধু বুঝল না। হেমকুসুম প্রথম থেকেই জেদী। 'আপনাকে' ঘিরে তাঁর জগৎ! তার বাইরে পা বাড়াতে তিনি রাজী নন। বোনেদের জন্যে, আত্মীয়স্বজনদের জন্যে এই যে এত ভাবনাচিন্তা, এত খরচখরচা—এ কেন হবে? কেন তুমি ওদের বিলেত পাঠাবে? কেন তুমি ওদের বিবাহের কথা ভাববে? ওদের নিয়ে কেন তুমি এত মত্ত আমি বুঝি না!

ওরা সকলেই আমার আপনার, যেমন তুমি। ওদের জন্যে আমার ভাবনা হয়, যেমন

তোমার জন্যে, দিলীপের জন্যে আমার সবসময়ে ভাবনা হয়। ওরাও আমাকে বড় আপন বলে মনে করে। ওদের দুঃখকষ্টের দিনে, আনন্দের দিনে আমি যদি না দাঁড়াই, আমার যথাসাধ্য সাহায্য না পায় ওরা কার কাছে দাঁড়াবে। কাকে কাছে পাবে।

আজ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩২। ভাগিনী রমলার বিবাহ। সকালবেলা থেকেই ওর বাবার কথা মনে পড়ে। ওর বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো অনেক ঘটা করে বিবাহ দিতেন। ওর বাবা নেই, তাই বলে কি ওর বিবাহের উৎসব-অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি থাকবে। চারবাগের বাড়ি আজ আনন্দমুখর। আত্মীয়স্বজনে ভরা। সারা বাড়িখানি আলোয় আলোয় হাসির বন্যা বহা। হিরণের একটি মাত্র মেয়ে রমলার বিয়ে—এইটুকু সেই রমলা।

আজ সকাল থেকে একজনের কথা মনে পড়ে বড় বেশী—সে হেমকুসুম। আর একজন রমলার বাবা—বোন হিরণের স্বামী মিঃ আয়েঙ্গার। রমলার বাবা বেঁচে থাকলে দিনটা কি আনন্দের হোত। কিন্তু তিনি, অতুলপ্রসাদ তো আছেন। আর একজনকে মনে পড়লো। কলম তুলে নিয়ে দাদা সত্যপ্রসাদকে লিখতে বসলেন।

দাদা, ২৫, ১, ৩২

আজ ভাগিনেয়ী রমলার বিবাহ। তোমার ভালোবাসা ও শুভাশীর্বাদ চাই। ভেবেছিলাম খুবই সংক্ষেপে কাজটা সারবো তা হল না। রমলা তোমার প্রেরিত টাকা পেয়ে খুউব খুশী হয়েছে।

তোমরা আমার ভালোবাসা নিও। আমি আজ একটু ভালো আছি। কিরণ সুবালা টেও বার্লিন ও তাহার স্বামী প্রফুল্ল এসেছে। পরে জানাবো বিবাহ অনুষ্ঠান।

আশা করি ভালো আছো।

তোমার ভাই অতুল

১৯৩২ সাল থেকে অসুস্থতার কাল শুরু হল। মাঝে মাঝে শরীর ভালো থাকে আবার আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। চারদিক থেকে আক্রমণ, বাতের আক্রমণ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথার যন্ত্রণা, কিডনির অসুখ। কোর্টে যাওয়া মাঝে মাঝে স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু যাদের উপার্জন আত্মনির্ভর—যিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান তাঁর পক্ষে প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তা নাহলে দিন চলা হয় ব্যাহত। (অস্নকষ্টে পড়তে পারে অধীনস্থরা। দুহাতে যার উপার্জন তার ব্যয়ের আধিক্যও অত্যধিক—

বিশেষতঃ অতুলপ্রসাদ, হৃদয় যাঁর প্রশস্ত অন্তরীক্ষসম।)

'লাগে টাকা দেবে অতুল সেন।'

অমুক লোকটা আমায় ঠকিয়েছে হে, ওকে আর এক পয়সা দেব না!

তখনই দেখা গেছে অতুলপ্রসাদ তাঁকে ৫০০ টাকা দিয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদরা বলাবলি করছেন। ইতিপূর্বে মন ... হয়েছে অই নিজের দুর্বলতা লুকোতে ব্যস্ত।

'লখনউতে একজন পাগলী আছে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখন অদ্ভুত টোরী আর ভৈরবী গায়।' অতুলপ্রসাদ শুনেই সংবাদদাতাকে পাঁচটাকা দিলেন, বললেন 'তাকে নিয়ে এসো।' তাকে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত দেয়ার সময়ে বললেন, 'ওতো তোমার কাছেই থাক, যখন খুঁজে পাবে ধরে এনো।' এটা বোধহয় সুখবরের পুরস্কার। রাজকুমারের গজমতির মালাদান, না হয় সংবাদদাতাকে সাহায্য। যে খবর দিয়েছিল সে ছিল বিদেশী সংগীত শিক্ষার্থী। ......ছোটো মুখে—ওয়াজিদ আলি শাহর দরবারের শেষ গায়ক এসে জুটেছিল অতুল সেনের বৈঠকখানায়।

তালিম হোসেন লখনউর শেষ বিখ্যাত সানাইয়া কৈশরবাগে থাকতে ভোরবেলা ভোঁরো আর টোরী বাজাতো দূরে থেকে অতুল সেন সুর শুনতে শুনতে উঠতেন।

'ইয়াসুফের সেতারের হাত মিঠে রাখলে হয় না!'

'বরকতের ছড়ের টান ভালো। নিয়ে এসো তাকে।'

চল হে ধূর্জটি এক ওস্তাদের গান শুনে আসি। চললেন কোন পর্ণকুটীরে বৃদ্ধ ওস্তাদের ঠুংরী শুনতে। বৃদ্ধ ওস্তাদ ও কোপে অস্থির সেন সাহেবকে কোথায় বসাবেন। সেই ছেঁড়া ভাঙা খাটিয়ার ওপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনলেন বেলা বারোটা হল। ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানি নোট গুঁজে দিলেন। পরে 'কিসী রোজ তসরীফ' নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন।

গুণীদের কদর জানতেন অতুলপ্রসাদ। কদরদান বলতে যে কথাটি আছে তার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত অতুলপ্রসাদ। দুহাতে যাঁর রোজগার, চার হাতে তাঁর দান। তাঁর কাছে ঋণী আউধ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণাশ্রম, হরিমতী বালিকা বিদ্যালয়, বাঙালী যুবক সমিতি আরও কত প্রতিষ্ঠান। অর্থসাহায্য এবং পরিচালনা কোনটাকে তারা অস্বীকার করবে......আজ অসুস্থতার জন্যে অতুলপ্রসাদ তাঁর আপন কর্মচারীদের জন্যে মাঝে মাঝে চিন্তিত হন।

১৯৩২-এর মে, জুন মাস, কোর্ট বন্ধ। অতুলপ্রসাদ কলকাতা হয়ে কার্শিয়াং বেড়াতে গেলেন। প্রত্যেক বছরেই গরমের ছুটিতে কোথাও না কোথাও নৈনিতাল, সিমলা, আলমোড়া, দারজিলিং, কার্শিয়াং বেড়াতে যান। কার্শিয়াং থেকে যখন কলকাতায় ফিরলেন, তখন একটু সুস্থ। দাদা তখন চাঁদপুরে ফিরে গেছেন। মনে আশা ছিল দাদার সঙ্গে দেখা হবে অনেকদিন দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি।

লখনউ ফিরে কিছুদিন সময় গেল, যখন অবসর পেলেন অর্থাৎ আগস্টের প্রথম সপ্তাহে (৩।৮) দাদাকে লিখলেন দাদা, অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাইনি। বৌঠান ও তোমরা কেমন আছো শীঘ্র জানিও। আশা করি বৌঠান সেরে উঠেছেন। আমি [illegible] ফিরলাম [illegible] তোমরা চাঁদপুর ফিরে গেছ। ...লখনউতে

এক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত ভয়ঙ্কর গরম ছিল এখন বৃষ্টি নেমে ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি মোটের ওপর ভালোই আছি। তবে ব্লাডপ্রেসারটা মাঝে মাঝে বাড়ে। বিশেষ কোন গ্লানিবোধ করি না।......পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও এবং তোমরা সকলে কেমন আছো জানিও।

তোমরা আমার ভালোবাসা লও। তোমার ছোটভাই অতুল।

• • •

সেবার বড়দিনের ছুটিতে গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে মূল সভাপতিরূপে অভিষিক্ত করা হল।...... লখনউর কর্মবহুল জীবনের কর্মভার থেকে একফাঁকে ছুটি নিয়ে এলাহাবাদ এলেন নির্জনে সম্মেলনের অভিভাষণ লিখবেন এই মনে করে। এলাহাবাদের গঙ্গার তীরের নির্জনে বসে ছেলেবেলার চেনা পদ্মাপারের গ্রামটির কথা মনে করে লিখতে বড় ভালো লাগে। মনে পড়ে কত কথা—পদ্মানদীর ধার, সেই খেলার মাঠ, পাখির গান, বকুলফুল, হরির লুটের বাতাস, মায়েদের ভালোবাসা, ছেলেবেলার কত হাসি কত খেলা।

'আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে, আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভালো করে মনে হল আমি ভুলিনি, ভুলিনি সেই দেশম তাকে। যদিও প্রায় কত বৎসর যে সে গ্রামখানিতে যাই নি। দূরে দেশে থাকলে কি হবে মায়ের টান বড় টান।'

দেশের জন্যে বুঝি মন কেমন করে দূরে দেশে শ্যামল মাটির টানে বাঙালি কবির মন।

'প্রবাসী চলরে দেশে চল'

'এ যেন প্রাণের প্রতিষ্ঠান। এমন মর্মস্পর্শী সুর কোথায় শোনা যায়। হৃদয় যেন কেমন করে ওঠে। মানুষ যৌবনে কর্মক্ষেত্রে জীবনোপায় পদ-প্রতিষ্ঠা খুঁজতে বিত্তার্জনে দেশে দেশে বেরিয়ে পড়ে, তার উদ্দাম আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে সাহস দেয়, শক্তি যোগায়। সে যেখানে বাসা বাঁধে—ক্লাব, লাইব্রেরী, থিয়েটার ফাঁদে, ক্রমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে বিদ্যায়তন গড়ে তোলে। তার সকল উৎসাহ তখন সেইমুখী হয়ে তাকে আনন্দে রাখে। দেশ ঘরবাড়ি ক্রমে গৌণ হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক। কিন্তু বয়স যখন অন্তর দিকে হেলে পড়ে তখন দেশ একে একে তার প্রাপ্য আদায় করতে থাকে—সেই ভিটা, সেই ঘরবাড়ি, সেই পারিপার্শ্বিক—বাল্যের খেলাধুলো থেকে উৎসব আনন্দ বিচরণ স্থান নদীনালা বৃন্দকুঞ্জ—বকুল গাছটি পর্যন্ত চোখের সামনে ফুটতে থাকে। সেখানে কত কথা কত গল্প, কত সরল সহজ ভালোবাসা, কত স্নেহস্পর্শ ছড়ানো আছে। সেই বিস্মৃত দিনের কত কথাই মধুর হয়ে উদয় হয়। তাদের ফিরে পাবার ইচ্ছে জাগায়। তাদের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলায়—যেন এখনো সেথায় গেলে সে দেখতে পায়।' কিন্তু যৌবনের কর্মক্ষেত্রকে ভুলতে পারা যায় না। জন্মভূমি না হলেও ও অন্নভূমি। এদেশও [illegible] নানা কাজে এদেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি।

এদেশের লোককেও বড় আপনার মনে হয়। তাদের স্নেহ করি। তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই, হয়তো এ-দেশেই ছাইটুকু রেখে যাবো।

কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসমাপ্ত অভিভাষণ মুখেমুখে বলেছেন, তাঁর একটি আত্মীয়া তা লিখে নিয়েছেন। অধিবেশনের কিছুদিন আগে থেকেই অতিরিক্ত রক্তচাপ দেখা দিল। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখনও অভিভাষণের শেষঅংশ লেখা হয়নি। আত্মীয়া বললেন, কাজ নেই আপনার অভিভাষণ লিখে!

কিন্তু তাই কি হয়। রোগশয্যা থেকেই অসমাপ্ত

অভিভাষণ মুখে মুখে বলা সাঙ্গ হল। এবং শুধু তাই নয়, ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দুর্বল শরীরে রেলপথের শতকষ্ট অগ্রাহ্য করে সেই শীতে গোরক্ষপুরের অধিবাসীদের ডাকে সাড়া দিতে সেখানে পৌঁছলেন। সম্মেলনের কর্মকর্তারা সবাই তাঁর শরীরের জন্যে শঙ্কিত। তিনি বলেছেন, কিছু ভাবনা নেই, আমি বেশ ভালো আছি, বেশ ভালো। চলুন, আমায় অভিভাষণ দিতে হবে।

অভিভাষণ দিলেন।

প্রিয় সুহৃদবর্গ,

ডাক্তারের অনুশাসন পালন করলে আমার আসা হত না কিন্তু এতবার নানা কারণে এ-সম্মেলনের উৎসবে অনুপস্থিত হয়েছি যে, এবারে লজ্জার খাতিরেও আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণে উপেক্ষা করতে পারলাম না, এসে হাজির হয়েছি। আমার সভাপতিত্বের ও অভিভাষণের ত্রুটি মার্জনা করবেন ও আশা রাখি বলেই আসতে সাহসী হয়েছি।

যদি বলি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাহলে একটা মামুলি প্রথার কথা বলা হবে, যদিও কথাটা অতি সত্য। এর চেয়ে সত্যি কথা হবে আমি আমার পাতানো ভাইবোনেদের প্রাণের ভালোবাসা জানাচ্ছি, আর যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের সহস্র সহস্র শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। আমি আপনাদের কাছে আসতে পেয়ে আপনাদের আনন্দে ও সাহিত্যসেবায় যোগ দিতে পেয়ে বড় সুখী হয়েছি।

যে উচ্চাসন আজ আপনারা আমায় দিলেন, তার যোগ্য আমি নই তা আমি জানি, আপনারাও জানেন। আর যদি তা না মানেন, তাহলে মানতে বেশী বিলম্ব হবে না। আমি যে আসন গ্রহণ করেছি, তা সম্মানের উচ্চাসন বলে নয়, স্নেহের আসন বলে। সম্মানের সিংহাসনের চেয়ে স্নেহের কোল উঁচুতে। আজ আপনারা আমাকে দেশবাসীর কোলে স্থান দিয়েছেন, মাতৃভাষার অঙ্কে বসিয়েছেন, তাই আমার এত গর্ব। বাঙলা আমাকে সম্বোধন করে আমি লিখেছিলাম, 'মা তোমার কোলে তোমার বোলে কত শান্তি ভালোবাসা।' প্রাণের কথাই লিখেছিলাম। যাক, ভূমিকা সংক্ষেপেই শেষ করি।

আমরা যে বাঙলার বাইরে এতগুলি বাঙালী প্রতি বৎসর একত্রিত হই এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানের বাঙালীদের এ-অনুষ্ঠানে আহ্বান করি এবং তাঁদের নেতৃত্ব কামনা করি, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা সকলে মাতৃভূমি বাংলাদেশের সঙ্গে এবং মাতৃ-সাহিত্যের যোগসূত্র রাখতে চাই এবং সে-বন্ধন আরো দৃঢ়তর করতে চাই। যদিচ আমরা বাংলাদেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বলতে আমি সংকোচ বোধ করি। ভারতে বাস করে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি করে বলবো। সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই 'প্রবাসী' আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কথা হয়, তিনিও প্রবাসী নামের পক্ষপাতি নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বাহির বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন' বললে কেমন হয়? তিনি বলেছিলেন, বেশ ভালো কথা 'বহিরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বলতে পার অথবা 'বঙ্গেতর সাহিত্য সম্মেলন বলতে পার। যদিও যদিও আমাদের এই সম্মেলনের একাধিক বার নাম পরিবর্তন হয়েছে, তবে আমি এ-বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে এ-কথা বলতেই হবে 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাসী নামের যতকিছু আপত্তি উত্থাপন করি না কেন এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। বাংলাদেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এই সম্মেলন যেন আমাদের এ-কথা নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। এ-দেশকে আমরা দেশ বলে মনে করবো, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়েও আপন, তা ভুললে চলবে কেন। তাতে এ-দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে মা বলে সম্বোধন করি, তবে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায় কিন্তু যে-মা পেটে ধরেছে, সে-মা কিন্তু অন্য মায়ের চেয়ে একটু পৃথক, সে জননী, শুধু মা নয়।

বাংলাদেশ আমাদের জননী এ-কথা মনে রাখা বড় দরকার। এ-সম্মেলনে প্রতি বৎসর আমরা যেন আমাদের সেই সুজলা সুফলা মাটিকে স্মরণ করি।

সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাকে তাঁদের নবজাত পত্রিকার জন্যে একটি কবিতা পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, পাখির গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালোবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমায় চোখের সামনে আমায় প্রাণের সকলে ডাকতে লাগল। ভালো করে মনে হল। আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে, যদিও প্রায় কত কত যে বছর সে-গ্রামখানিতে যাইনি। দূরে দেশে থাকলে কি হবে মায় টান বড় টান। তাই মনে করে একটি কবিতা অল্পদিন সেই দেশের পত্রিকার জন্যে লিখে পাঠিয়েছিলুম, তা উদ্ধৃত করলে বেশী অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে-গানটিতে নিজেকে প্রবাসী বলেই উল্লেখ করেছিলাম। ক্ষমা করবেন।

প্রবাসী চলরে দেশে চল
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া
এমন গাঙের জল।
যখন ছিলি এতটুক,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা
ঘুম পাড়ানো বুক;
সেথাই পেলি সাথির সনে বাল্যখেলার সুখ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই প্রাণের শতদল।
চলরে দেশে চল্।
হরির লুটের বাতাসা,
আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি গাজির গান,
আর ওই করিমভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ
লাগছে কত মিঠা!
শিউলি বেলী কদম-চাঁপা
এমন কোথায় বল্।
চলরে দেশে চল্।

মনে পড়ে দেশের মাঠে খেতভরা সব ধান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুলগাছের গান,
মনে পড়ে তরুণ চাষীর করুণ বাঁশির তান
মনে পড়ে আকাশভরা মেঘ ও পাখির দল।
প্রবাসী, চলরে দেশে চল্।

যদিও এদেশ আমাদেরই দেশ, এদেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এদেশেই অনেকে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এদেশের লোককেও বড় আপন মনে হয় তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই। হয়তো বা এদেশেই ছাইটুকু রেখে যাবো* তবু, সেই সে বড় নদীর দেশ, বর্ষা ও ঝড়ের দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট আমার ভাই-বোনগুলি, সেই যে ভাটিয়ালী বাউল ও কীর্তন গান, সেই যে ভাবপ্রধান মা তিনি, আর সেই যে আমার অতিমিষ্ট বাংলা কথা ও বাংলাভাষা সে যে আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি। তাকে ভুলতে পারি না। দূরে থাকলেও সে-দেশ তো আমারই, সে-দেশের অধিবাসীরা আমারই ভাইবোন, এ-কথাটি আমাদের মনে রাখতেই হবে।

বহুকাল পূর্বে ছাত্রাবস্থায় বিলেতে অদ্বিতীয়া গায়িকা ম্যদাম পেটের মুখে একটি গান শুনেছিলাম Home sweet home তা এখন আমার কান ও প্রাণে মধুবর্ষণ করে।

তবে একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এদেশও আমাদের দেশ। এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্মভূমি, অন্নভূমি। অনেক বাঙালী আছেন যাঁদের এদেশ জন্মভূমি। এদেশ আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। এদেশের অধিবাসীরা

আমাদের ভাইবোন। ভাইবোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। এদের অন্তরের ভালোবাসা দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এদেশের লোকেদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদের হীনতা বা অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন 'উদার চরিতানাম বসুধৈব কুটুম্বকম'—মনে রাখবার কথা, জীবনে পালন করবার কথা।

...এই গোরক্ষপুরের সন্নিকটেই দেবদেব বুদ্ধদেবের জন্ম ও মহাপ্রস্থানের স্থান। এই অতি পবিত্র দেশে দাঁড়িয়ে আমি আজ মানব-প্রীতির ও অহিংসার অবতার সেই মহাত্যাগীকে স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করি। তাঁর উপদেশ জীবে প্রীতি জীবে দয়াকে এদেশের বাঙালীরা কখনও ভোলেনি। সিদ্ধার্থের জন্মভূমি আজ আমাদের এই কথাই বলিতেছে, 'বাঙালীমানবমাত্রকেই প্রীতির চক্ষে দেখিও। অহিংসা বিশ্বপ্রীতি জনসেবাই মানবের পরমধর্ম।' হয়তো অনেকেই জানেন না যে, একসময়ে আমাদের বাংলাদেশ বৌদ্ধরাজগণের অধীন ছিল। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি প্রভাব ও প্রসার ছিল। জানি না আমার মনে হয়, যদি বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে অপসৃত না হোত, তাহলে হয়তো এদেশে এত দুর্গতি হোত না। বৌদ্ধধর্মের সাম্য ও জাতীয়তা হয়তো ভারতবাসীকে এত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দিত না। যে-সাধনার উপায়গুলি বুদ্ধদেব নির্দেশ করে গিয়েছিল, তা আজ আবার মনে করবার দিন এসেছে—সংদৃষ্টি, সংসংকল্প, সংকার্য, সংব্যবহার, সদুপায় জীবিকা অর্জন, সংচেষ্টা, সংস্মৃতি। আমি আমাদের বাঙালী ভাইবোনেদের বিশেষ করে আজ এই উপদেশটি মনে রাখতে অনুরোধ করি। তাহলে আমরা এদেশীয়দের সঙ্গে সখ্যভাব রক্ষা করে চলতে পারবো।

এখন আমাদের নিজেদের কথা দু-একটা বলি। প্রথম কথাই হচ্ছে প্রবাসবঙ্গ বাঙালীদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন। এ-মিত্রতার অভাব আমরা বেশ মাঝে মাঝে অনুভব করি। এ নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। দলাদলি এদেশের বাঙালীদের মধ্যে বিস্তর দেখতে পাই। বিজয়ার সাম্বৎসরিক আলিঙ্গন বাঙালীকে এ-অনিষ্টকরণ হতে মুক্তি দিতে পারে নাই। বড় দুঃখ হয় দেখলে যেখানে মুষ্টিমেয় বাঙালী, সেখানেও মৈত্রীর অভাব, সেখানেও দলাদলির সৃষ্টি। যেখানে দুইশত বাঙালী, সেখানে হয়তো দুটি ক্লাব, তিনটি থিয়েটার দল। এ যে অত্যন্ত অশোভন সকলেই স্বীকার করবেন। এতে বিভেদ ত হয়ই, বলক্ষয়ও হয়। আমরা যদি একত্র দলবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে থাকি, তাহলে আমরা বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় আরো ভালো করে আত্মরক্ষা করতে পারি। এ স্থলে কথাটি ভুলে যাওয়া আমাদের আমাদের পক্ষে নিতান্ত হানিকর। আমি আমার বাঙালী ভাইদের বিশেষ করে মিনতি করি। (ক্রমশঃ)

প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদ ভাষণের পাণ্ডুলিপিতে এই অংশে স্বহস্তে দাগ দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, যা অল্পদিনের মধ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হল।

আরেক্‌সিস : আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টির মনোবৈজ্ঞানিক সূত্রবাদ

অসীম বর্ধন

আমরা কিভাবে জ্ঞান অর্জন করি, সে-সম্পর্কে যেসব মনোবৈজ্ঞানিক সূত্রাদি রচনা করেছেন মনোবিজ্ঞানী চার্লস স্পীয়ারম্যান, সেগুলির চেয়েও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন তিনি মানুষের ভাব-আবেগ প্রক্ষোভ, বিশেষ করে ইচ্ছাসৃষ্টির রহস্যময় বৈজ্ঞানিক সূত্র সন্ধানের প্রচেষ্টায়।

বৈজ্ঞানিক সূত্র বলতে শুধু একটা সংজ্ঞা নয়—'সায়েন্টিফিক ল' গড়তে হলে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সামর্থ্য, ধারাবাহিকতা, অপরিবর্তনীয়তা এবং ব্যাপকভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকা চাই। জ্ঞান অর্জনের সূত্র বা নোইজেনিসিস উদ্ভাবন করতে গিয়ে যেমন এই সর্তগুলি মানতে হয়েছিল, তেমনি আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টির সূত্র বা অরেক্সিস উদ্ভাবনের উদ্যোগেও সেগুলি মনে রাখতে হয়েছিল।

সাধারণ লোকের কাছে মনে হবে, আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টির মনোবৈজ্ঞানিক সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টাটাই বাতুলতা। কিন্তু হার্টলী অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করেছিলেন, আবেগ-ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট সমস্ত অভিজ্ঞতাই একান্তভাবে ভালবাসা ও ঘৃণার তাড়না থেকে উদ্ভূত—আর সে-তাড়নার সৃষ্টি 'তৃপ্তি ও বেদনা' থেকে। হার্টলীর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতার মতো আবেগ-ইচ্ছার অভিজ্ঞতাগুলিকেও এইভাবে সুস্পষ্টরূপে সূত্রবদ্ধ আয়ত্তে বিধৃত করা যায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে অনুষঙ্গের যে-সূত্র (ল অভ অ্যাসোসিয়েশন) আছে, আবেগ-ইচ্ছার সূত্র মূলতঃ সেইরকমই, কারণ আবেগ-ইচ্ছা জাগে বিভিন্ন চিন্তা-অনুভূতির অনুষঙ্গের ফলেই।

কিন্তু হার্টলীর এই ধারণাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ-বিচার করলে বোঝা যায়, এ ধারণা থেকে বৈজ্ঞানিক সূত্র রচনার সব উপাদান পাওয়া যায় না; কারণ তিনি যা মনে করেন, মোটামুটিভাবে চিন্তা-অনুভূতির অনুষঙ্গ বললে যা বোঝায়, সেটি আকস্মিকভাবেই ঘটে যায়; সুস্পষ্ট পদ্ধতি-ধারা বা সংগঠনের কোনো সূত্রের নিশানা তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। সুতরাং তা দিয়ে বৈজ্ঞানিক সূত্র হতে পারে না।

স্প্রাংগার এবং পলহ্যাম নামে দুজন প্রখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তিও এ নিয়ে সর্বজনীন সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে শ্যানড্‌ নামে এক মনোবিজ্ঞানী যে-কতকগুলি সূত্র রচনা করেন, সেগুলিই সত্যি অনুধাবনযোগ্য। তাঁর রচিত একটি সূত্র এইরকম : "মানসিক কর্মক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে নির্জ্ঞানতঃ, পরে সংজ্ঞানতঃ, পদ্ধতি-ধারা ও সংগঠন সৃষ্টি এবং সেটিকে স্থায়ী করে রাখার প্রবণতা থাকে। চরিত্র সম্পর্কিত সকল সূত্রের মূল সূত্র এইটিই মনে হয়।"

এই মূল সূত্রের পরিপূরক ও বিস্তার রূপে শ্যানড্‌ কতকগুলি অবসূত্র (সাব-ল) প্রণয়নও করেছেন। প্রথম অবসূত্রটি হচ্ছে : "প্রত্যেকটি প্রাথমিক আবেগ-তাড়না (ইম্‌পালস্‌)-এর সঙ্গে ভয়, রাগ, আনন্দ ও দুঃখের পদ্ধতি-বিধি এমনভাবে সংবদ্ধ যে, বাধাপ্রাপ্ত হলে রাগ হয়, তৃপ্তি পেলে আনন্দ; ব্যর্থ হলে দুঃখ, এবং ব্যর্থতার আশংকায় ভয় জাগে।" আবেগ-সংগঠনের এই অবসূত্রটি উদ্ভাবনে তিনি বিভিন্ন ভাববোধ বা সেন্টিমেন্টের পদ্ধতি-বিধির কথাও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শ্যানড্‌সের আর-একটি অবসূত্র হলো : "চরিত্র-বিকাশের ক্ষেত্রে, ভাববোধ (সেন্টিমেন্ট) গুলি ক্রমশই ভাব-আবেগ-প্রক্ষোভ (ইমোশান) ও ভাবতাড়না (ইম্‌পালস্‌) গুলিকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। চরিত্র-সুনিয়মের ক্ষেত্রে, ভাবআবেগ-প্রক্ষোভ ও ভাবতাড়নাগুলি ক্রমশই সফলভাবে স্বাধীনতা আয়ত্ত করতে থাকে।" অর্থাৎ, আবেগ-প্রক্ষোভ-ভাবতাড়নাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, একথা ঠিক; কিন্তু সুনিয়ম (ডিসিপ্লিন) জনিসৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত আবেগ-প্রক্ষোভের স্বাধীন সুষ্ঠু অভিপ্রকাশ, একথাটাই অবসূত্রটির প্রতিপাদ্য বিষয়।

যদিও শ্যানড্‌সের সূত্রগুলি বিষয়-বস্তুর দিক থেকে নতুন তেমন কিছু নয়, তবুও এগুলিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে এবং সূত্রগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে উপস্থাপন করা যায় :

"কোনো বস্তুর প্রতি কোনো আবেগ-ইচ্ছার মনোভাব থেকে অন্যান্য বস্তুর প্রতি সহায়ক মনোভাব উদ্বুদ্ধ করার প্রবণতা জাগে।"

কিন্তু এই সূত্রটি তত্ত্ববিচারে সঠিক এবং বাস্তবক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টির চরম সর্বাঙ্গীণ সূত্র উদ্ভাবিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

কেউ সন্তানের ক্ষতি করতে এলো, মায়ের সন্তান-স্নেহ থেকে রাগ জন্মে। এখানে, শিশুর কল্যাণের ইচ্ছা থেকে ক্ষতিকারক সবকিছুকে দূরে রাখার ইচ্ছা

কন্যাকুমারীকায় সূর্যোদয় ফটো : অমিতাভ মিত্র

আবেগ-ইচ্ছা বা অরেক্সিস সৃষ্টির মূল উৎস নির্ধারণে কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র বা 'ল' উদ্ভাবনের পথে প্রবলতম বাধার মতো হয়ে আছে একটি জিনিস, তাহলো এই যে, অরেক্সিসের মধ্যে কেবলমাত্র ইচ্ছা অভিপ্রায় থাকে না, অনুভূতিও থাকে; এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, সুখানুভূতিও সরাসরি প্রত্যক্ষণ বা চিন্তার দ্বারা প্রবল হয়ে ওঠে কি না। অর্থাৎ সুখ নামে অনুভূতিটা কি কেবল চিন্তা করলেই সৃষ্টি হয়? কিন্তু অনেক গবেষণা করেও এবিষয়ে একমত হতে পারেননি মনো-বিজ্ঞানীরা। মানুষের প্রবণতাকে বৈজ্ঞানিক সূত্রের আয়ত্তে আনার কাজ তাই এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে মনে হয়।

স্পীয়ারম্যান 'ইচ্ছার সূত্র' (ল অভ উইল্) উদ্ভাবনের দুঃসাহসও করেছিলেন এবং লোৎজের তত্ত্ব অনুসরণ করে মোটামুটি একটা সূত্র খাড়া করেও ছিলেন। সেটি এইরকম : "আবেগ-তাড়না নামক অভিজ্ঞতাগুলির কোনোটির ওপর কোনো অনুমোদন বা গ্রহণসিদ্ধান্ত আরোপিত হলে, সেই আরোপকরণ প্রক্রিয়াটিকে সাধারণ ভাষায় ইচ্ছাকর্ম বলা হয়।"

এইসব মূল আবেগ-ইচ্ছার সূত্রগুলি ছাড়াও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুসম্ভূত (সেকেণ্ডারী) সূত্রও আছে। শ্যানড্ নিজেই এরকম প্রায় ১৪৩টি সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর পদ্ধতির নতুনত্ব ছিল। তিনি কোনো নতুন সূত্র নিয়ে সেটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা না করে, কেবলই সেটি সংশোধন করে চলতেন। এইভাবে উদ্ভাবিত তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র এইরকম :

"ত্রুটি এবং হীনতা এই দুটিই অহঙ্কারের ভাববোধ (সেণ্টিমেণ্ট) জাগায় এবং মনে হয়, সে-ভাববোধ সংশোধনের অযোগ্য, এবং যাদের ঐসব ত্রুটি ও হীনতা নেই, তাদের প্রতি আমাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে ঐ ভাববোধ।"

এসব সূত্র বৈজ্ঞানিক সূত্রের পর্যায়ে আসতে পেরেছে বলা যায় না, তবু এগুলি থেকে প্রচুর চিন্তাসম্পদ আমরা পাচ্ছি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার উৎসাহ নিশ্চয়ই পাচ্ছি।

অরেক্সিস বা আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টির অত্যন্ত দুরূহ জটিল জগতে বৈজ্ঞানিক সূত্রের রাজত্ব প্রসারিত করার চেষ্টা সর্বাঙ্গীণ সফল হয়নি। তবে এই চেষ্টা থেকে খুব দরকারী একটা তথ্য পাওয়া গেছে যে, আবেগ-ইচ্ছামূলক আচরণগুলি জ্ঞানসম্পদ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত নোইজেনিসিস বা জ্ঞান অর্জনের মনোবৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সত্যিকারের আবেগ-ইচ্ছার ধর্মবিশিষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক সূত্র হলো ইচ্ছা এবং আবেগতাড়নার সূত্রগুলি, কিন্তু আজও পর্যন্ত সেগুলোর রহস্য এমনি অস্পষ্ট হয়ে আছে এবং এতো মতভেদ সৃষ্টি করে আছে যে, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক সূত্রাদির মর্যাদা স্তরে উন্নীত করা যাচ্ছে না।

সৃষ্টি হয়। এই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জ্ঞানের কিছু উপাদান নিশ্চয়ই থাকে। মাকে দুটি জিনিসের জ্ঞানলাভ করতে হয়— এক, সন্তানের কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনটি, এবং দুই, ক্ষতিকারক বিষয়টি দূর করলে আশংকা কাটবে কি না। মায়ের আবেগ-ইচ্ছামূলক অভিজ্ঞতাটির মূলে এই দ্বিমুখী জ্ঞানটুকু অবশ্যই থাকে। মা এই দুটি জ্ঞান-কণিকার মধ্যে 'সম্পর্কভিত্তিক জ্ঞানের সূত্র' (ল অভ রিলেশ্যনাল কগনিশ্যন) অনুসারে সম্পর্ক উপলব্ধি করেন বলেই বিশেষ আবেগ-ইচ্ছার সৃষ্টি হয়।

এই কারণেই স্পীয়ারম্যান বলেছেন, আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টি সমস্ত প্রক্রিয়াটিই জ্ঞান-ভিত্তিক। মনঃসমীক্ষা বা সাইকো-অ্যানালিসিসের 'মানসিক প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া' (ডিফেন্স রিঅ্যাকশ্যন), 'মানসিক ক্ষতিপূরণ' (কমপেনসেশ্যন) এবং 'যুক্তি-অভ্যাস' (র‍্যাশনালাইজেশ্যন) এগুলোকেও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এবং বলেছেন, এ সবের মধ্যেও পূর্বজ্ঞানের ভিত্তি আছে। পূর্বজ্ঞানজনিত স্বরূপ মনোভাব থেকেই ঐসব মনোভঙ্গীর অভিপ্রকাশ ঘটে। কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যেই ঐ ধরনের মনোভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সেগুলি সবই জ্ঞানভিত্তিক এবং অরেক্সিস বা আবেগ-ইচ্ছার সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যার চেয়ে নোইজেনিসিস বা জ্ঞান অর্জনের সূত্র দিয়ে এগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাই ভালো। কারণ স্পীয়ারম্যান মনে করেন, সম্পর্কভিত্তিক জ্ঞান (রিলেশ্যনাল কগনিশ্যন) এবং জ্ঞানের অনুবন্ধ ফল (কোরিলেটস্)—এই দুটির ফলেই রকমারি আবেগ-ইচ্ছা জাগে।

স্পীয়ারম্যান 'আবেগতাড়নার সূত্র' (ল অভ ইমপালসেস) উদ্ভাবনের চেষ্টাও করেছেন। এই প্রসঙ্গেও তিনি বলেছেন, ভাব-আবেগের সংগঠন, ভাববোধ (সেণ্টিমেণ্ট) সৃষ্টি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে কেবল পর পর কতকগুলি আবেগ-ইচ্ছামূলক বা অরেক্সিস-মূলক প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে থাকে বলেই ভাব হয়ে থাকে, এর মধ্যে জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার কথা প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়নি। অতএব, আবেগ-ইচ্ছা বা অরেক্সিসের সূত্রগুলি উদ্ভাবন করতে হলে জ্ঞান অর্জনের কথা আগে ভাবতে হবে; পরে আবেগ-ইচ্ছা সৃষ্টি কিভাবে হয়, তা পর পর ব্যাখ্যা করতেই হবে। তবে বোঝা যাবে, আবেগ-তাড়না (ইমপালস্) কেন জাগে, কিভাবে জাগে।

অ্যাভেলিং একটি উঁচুদরের তত্ত্ব উদ্ভাবন করে 'সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ইচ্ছার নীতি' রচনা করেছেন; তাতে তিনি বলেছেন, পারশেপশ্যন বা প্রত্যক্ষণের পর্যায়ে বিবর্তিত এবং উন্নত সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই বিশেষ কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রবণতা জাগে, এবং সেই প্রবণতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক উদ্দীপকের সুসংগতি থাকলে প্রাণীর কর্ম-উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এই নীতিটিকে আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, প্রাণীর সমস্ত কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি হয়, কাজ করবার ইচ্ছা জাগে, কোনো-না-কোনো প্রত্যক্ষণ বা কোনো লক্ষ্যের চিন্তা থেকে।

কিন্তু চিন্তাজাত বা প্রত্যক্ষণজাত ভাবরূপের প্রকৃতি সম্পর্কেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যার অভাব থাকায় অ্যাভেলিংএর থিয়োরী অনেকখানি অস্পষ্ট এবং ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে প্রায় অচল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কাজের ইচ্ছা জাগে চিন্তা থেকে, কিন্তু চিন্তার 'ইচ্ছা' জাগে কেমন করে, তা আগে জানতে পারলে তবেই অ্যাভেলিংএর "প্রিন্সিপল অভ ইন্টেণ্টিভ কোনেশ্যন" কাজে লাগবে।

লঙ্কায় সীতাদেবীর বন্দিনীদশার কালনির্ণয়

সুখময় ভট্টাচার্য

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে
বাল্মীকিকোকিলম্॥

জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের আসন অতি উচ্চে। মাধুর্যগুণবিশিষ্ট করুণরসের যে পূত মন্দাকিনী মহর্ষির উদার হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তার পুণ্যসলিল পান করে প্রত্যেক ভারতবাসী কৃতার্থ হয়েছেন।

কালিদাস ভবভূতি প্রমুখ কবিরা আদিকবি বাল্মীকির নিকট যে কিরূপ ঋণী, তা তাঁদের কাব্যপাঠেই জানা যায়। এই আর্ষ রামায়ণই ভারতের আদি কাব্য। মহাভারত রামায়ণের অনেক পরের গ্রন্থ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে মহাভারতে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রস্তুত প্রবন্ধে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতার অবস্থানের সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। বাল্মীকির রামায়ণই প্রবন্ধটির উপজীব্য।

বিশ্বামিত্র-মুনি রাক্ষস বধের নিমিত্ত মহারাজ দশরথের নিকট থেকে রাম ও লক্ষ্মণকে যখন নিয়ে যান, তখন দশরথ বলেছেন—আমার কমললোচন রামের বয়স মাত্র পনর বৎসর। সে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য নহে। (১।২০।২)

অন্যত্র (৩।৩৮।৬) দেখা যাচ্ছে, সেই সময়ে রামচন্দ্রের বয়স ঊনদ্বাদশবর্ষ, অর্থাৎ এগার বৎসর। ঊনদ্বাদশবর্ষ পাঠটিই সমীচীন বোধ করি। পরে এই বিষয়ে বিচার করা যাবে।

বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কিছুকাল কেটেছে। এই সময়ে তাড়কাবধ, প্রসন্ন বিশ্বামিত্র থেকে বহুবিধ অস্ত্রপ্রাপ্তি, মুনি থেকে অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ ও সংহরণের উপদেশ গ্রহণ, মুনিকৃত যজ্ঞের রক্ষণ, অনেক রাক্ষসকে নিধন—ইত্যাদি কর্মে রামচন্দ্র আত্মনিয়োগ করেছেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্রপ্রমুখ মুনি-ঋষিদের আদেশে তাঁদের সঙ্গে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনকের যজ্ঞ এবং রাজর্ষিগৃহে হরদত্ত 'সুনাভ'-নামক অদ্ভুত ধনুখানি দেখবার নিমিত্ত উভয় ভ্রাতাই গিয়েছেন।
(১।৩১ সর্গ)

মিথিলার উপবনে মহামুনি গৌতমের আশ্রমে শাপগ্রস্তা অহল্যাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের শিষ্যরূপে গুরুর সঙ্গে জনকপুরীতে প্রবেশ করেন। সেখানে হরধনু ভঙ্গ করে জনকনন্দিনী সীতাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন।

রামসীতা বার বৎসর পরম আনন্দে অযোধ্যায় বাস করেছেন। তারপর দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার আয়োজন করেন।

জনস্থানের পঞ্চবটীবনে কুটীরবাসিনী সীতা ব্রাহ্মণবেষধারী অতিথি রাবণের জিজ্ঞাসার উত্তরে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—তা থেকে জানা যায়, বিবাহের পর তিনি বার বৎসর শ্বশুরগৃহে বাস করেছেন ও ত্রয়োদশ বর্ষে পতির সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, অরণ্যযাত্রার সময় তাঁর পতির বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর এবং তাঁর নিজের বয়স ছিল আঠার বৎসর (৩।৪৭ সর্গ)

সীতার এই উক্তি থেকে জানা যায়—বিবাহকালে তাঁর বয়স ছিল (১৮—১২) ছয় বৎসর এবং রামচন্দ্রের বয়স ছিল (২৫—১২) তের বৎসর। আরও জানা যায় যে, গুরু বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রামচন্দ্র প্রায় দুই বৎসর যাপন করেছেন। সুতরাং রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের নিকট রামচন্দ্রকে ঊনষোড়শবর্ষ বলতে পারেন না। তাতে অরণ্যযাত্রাকালে রামচন্দ্রের বয়স দাঁড়ায় (১৫+২+১২) ঊনত্রিশ। কিন্তু সীতা বলছেন—পঁচিশ। অতএব 'ঊনদ্বাদশবর্ষ' পাঠই সমীচীন বোধ করি।

রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন হয় চৈত্র মাসে। দশরথ মন্ত্রীদের বলছেন—
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য
সর্বমেবোপকল্প্যতাম্॥ (২।৩।৪)

তিনি রামচন্দ্রকেও বলছেন—পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভলগ্নে তুমি যৌবরাজ্য লাভ কর—তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।
(২।৩।৪১)

চান্দ্র চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চিত্রা নক্ষত্রের যোগ হয়। পুষ্যা হচ্ছে অষ্টম নক্ষত্র। সাধারণতঃ চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমী থেকে নবমীর মধ্যে বাসন্তী পূজোর সময় এই নক্ষত্র পড়ে। পরে দেখা যাবে যে, শুক্লা অথবা সপ্তমী তিথিতে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন।

অতএব অনুমিত হয়—চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠীতেই রামচন্দ্র অরণ্যযাত্রা করেন, আর তখন রামের বয়স পঁচিশ ও সীতার বয়স আঠার।

বনবাসের তেরো বৎসর পূর্ণ হওয়ার কিছুকাল পূর্বে, সম্ভবতঃ মাঘ মাসের শেষ ভাগে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েছেন। এই অনুমানের হেতু আছে।

অরণ্যকাণ্ডের ষোড়শ সর্গে দেখছি—শস্যমালিনী পৃথিবী ও তুষারমলিনা জ্যোৎস্না রামসীতার পরম প্রীতি উৎপাদন করছে। লক্ষ্মণ বলছেন—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারাবৃতমণ্ডলঃ।
নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥

এ হেমন্তের অর্থাৎ সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসের বর্ণনা। এই হেমন্ত কালেই রাবণের মাসতুতো ভগিনী দুঃস্বপ্নরূপিণী শূর্পণখা পঞ্চবটীতে এসেছিল। রামকে পতিরূপে লাভ করবার নিমিত্ত এই রাক্ষসী সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তার নাক ও কান কেটে দেন। এই ঘটনা ঘটেছে অগ্রহায়ণে বা পৌষ মাসের প্রথম ভাগে।

শূর্পণখার ভ্রাতা খর ও দূষণ ভগিনীর এই দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারে নি। চৌদ্দ হাজার রাক্ষস-সৈন্য নিয়ে তারা রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেছিল। সকলেই যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

জনস্থানের রাক্ষসদের নিধন সংবাদ লঙ্কায় রাবণের কর্ণগোচর হতে অধিক বিলম্ব হয় নি। তিনি অবিলম্বে জনস্থানে উপস্থিত হয়ে তাড়কার পুত্র মারীচের নিকট সীতাহরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মারীচ রাবণের অলৌকিক শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করে এই প্রকার কুলক্ষয়কর অভিসন্ধি ত্যাগের অনুরোধ করলে পর রাবণ লঙ্কায় ফিরে যান। বিরূপিতা শূর্পণখার আর্তনাদ ও ভর্ৎসনাবাক্যে অপমানিত ও উত্তেজিত শূরমানী রাবণ পুনরায় জনস্থানে এসে তাঁর দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণের নিমিত্ত মারীচের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। এবার অহঙ্কারী রাবণ মারীচের কোন বাধাই শুনলেন না। অনন্যোপায় মারীচকে সোনার হরিণ সাজতে হল। এই ঘটনাও ঘটে মাঘ মাসে।

সম্ভবতঃ সৌর মাঘ মাসের কোন অশুভ মুহূর্তে রামপত্নী জনকনন্দিনী অপহৃতা হয়েছিলেন। রাবণ তাঁকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে অশোকবন নামক একটি উদ্যানে রেখে দিলেন। নানাবিধ অনুনয়-বিনয় এবং ভয় প্রদর্শনেও সীতা তাঁর বশীভূতা না হওয়ায় ক্রুদ্ধ রাবণ সীতাকে বলছেন—হে সুন্দরি, তোমাকে বার মাস সময় দিচ্ছি। সংবৎসর মধ্যে আমার অনুগতা না হলে তোমাকে হত্যা করব। (৩।৫৬।২৪) বিকটাকৃতি রাক্ষসী চেড়ীরা এই দেবীপ্রতিমার পাহারায় নিযুক্ত হল।

এদিকে সীতার অন্বেষণে ভ্রমণশীল উন্মত্তপ্রায় রাম ও লক্ষ্মণের মুমূর্ষু জটায়ুর সাক্ষাৎলাভ, রাবণকর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ, কবন্ধ-রাক্ষসকে নিধন করে তার শাপমোচন, শাপমুক্ত কবন্ধের পরামর্শে সুগ্রীবের অনুসন্ধান, পম্পা সরোবরের তীরে মতঙ্গমুনির আশ্রমে শ্রমণী শবরীকে তাঁর তপস্যার ফলপ্রদান প্রভৃতিতে এক মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। যেহেতু এই সকল ঘটনার পরেই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে পম্পা সরোবরের শোভাদর্শনের সময় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন—

সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ।

তখন চৈত্র মাস। এই চৈত্র মাসেই সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিত্রতা স্থাপন, ও বালিবধের প্রতিজ্ঞা হয়। বালী ও সুগ্রীবের চেহারা ঠিক একই রকমের বলে যুদ্ধকালে সুগ্রীবকে চেনবার নিমিত্ত রামের আদেশে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলায় পুষ্পিত গজপুষ্পী লতার মালা পরিয়েছেন। গজপুষ্পী সম্ভবতঃ [illegible] জাতীয় লতা। গজপুষ্পী বর্ষাকালেই প্রস্ফুটিত হয়।

আষাঢ় মাসের শেষভাগে রামচন্দ্র বালীকে বধ করেন। বালীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরে রাম সুগ্রীবকে বলছেন—হে সৌম্য, এখন থেকে চারি মাস বারিবর্ষণের কাল। বর্ষার প্রথম মাস শ্রাবণ আরম্ভ হয়েছে। এই সময়ে সীতার উদ্ধারের চেষ্টা করা সম্ভবপর নয়।

কার্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত
৪।২৬।১৭

রাম ও লক্ষ্মণ মাল্যবান পর্বতের গুহায় বর্ষাকাল যাপন করেছেন। কিষ্কিন্ধা-কাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গে মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে বর্ষার যে রুদ্রগম্ভীর বর্ণনা করেছেন, তা অতুলনীয়। শোকাচ্ছন্ন বিরহী রাম যেন অতি কষ্টে বর্ষাকাল কাটিয়েছেন।

এবার জ্যোৎস্নানুলেপনা শারদী রজনীর আবির্ভাবে সীতার বিরহে রামচন্দ্র সর্বাধিক ব্যথিত। লক্ষ্মণের সুমধুর সান্ত্বনাবাণীতেও তাঁর অশান্ত চিত্ত যেন স্থির হচ্ছে না। গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবকে নিরুদ্যম দেখে তিনি লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠিয়ে-ছেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের বচনে প্রকৃতিস্থ হয়ে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত সকল দেশের বানরদের কিষ্কিন্ধায় আহ্বান করেন।

দশ দিনের ভিতরেই সকল বানর কিষ্কিন্ধায় সমবেত হয়েছেন। অনুমান করা যায়—আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে, অর্থাৎ চান্দ্র আশ্বিনের প্রথম ভাগে বানররা কিষ্কিন্ধায় আসলে পর সুগ্রীব তাঁদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেশে দেশে সীতার অন্বেষণে পাঠিয়েছেন। পাঠাবার সময় সুগ্রীব সকলকে সম্বোধন করে বলেছেন—

উর্দ্ধং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্
বধ্যো ভবেন্মম॥ ৪।৪০।৭০

—এক মাসের মধ্যে সকলকে ফিরে আসতে হবে। যে না আসবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।

সুগ্রীব দক্ষিণ দিকে যাঁদের পাঠালেন, তাঁদের মধ্যে হনুমান অন্যতম। সুগ্রীব ও রামচন্দ্র উভয়ই হনুমানের শক্তি ও কর্ম-কুশলতা সম্পর্কে সর্বাধিক আস্থা রাখেন। সীতার অভিজ্ঞানের নিমিত্ত রামচন্দ্র স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি হনুমানের হাতেই দিয়েছেন।

নানা স্থানে সীতাকে অনুসন্ধান করতে করতে এক মাস কাল অতীত হয়েছে। বানররা যাত্রা করেছিলেন চান্দ্র আশ্বিনের প্রথম ভাগে, এবার চান্দ্র আশ্বিন অতীত হল। অর্থাৎ তখনও সৌর কার্তিক চলছে। অঙ্গদ বলছেন—

বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যা ব্যবস্থিতাঃ।
প্রস্থিতাঃ সোঽপি চাতীতঃ কিমতঃ
কার্য্যমুত্তরম্॥ ৪।৫৩।৯

—এক মাস সময়ের নির্দেশ দিয়ে কপিরাজ আমাদের আশ্বিন মাসে পাঠিয়ে-ছিলেন, সেই আশ্বিন তো শেষ হয়েছে। আমাদের এখন কর্তব্য কি? তীক্ষ্ণচরিত্র সুগ্রীব আমাদের ক্ষমা করবেন না।

এই সময়ে সম্পাতির সঙ্গে হনুমান অঙ্গদ প্রমুখ বানরদের দেখা হল। সম্পাতির মুখে তাঁরা লঙ্কাপুরীতে অবরুদ্ধা সীতার খবর জানলেন। গরুড়ের ন্যায় সম্পাতিরও বহু দূর পর্যন্ত দেখবার শক্তি ছিল। এই হেতু সাগরের উত্তর তীরে থেকেও তিনি দক্ষিণতীরস্থ লঙ্কাপুরীর প্রত্যেকটি বস্তু দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলছেন—

ইহস্থোঽহং প্রপশ্যামি
রাবণং জানকী তথা।৪।৫৮।২১

এবার বানররা পরম উৎসাহে বুক বাঁধলেন। হনুমান মহেন্দ্র পর্বত থেকে লঙ্কায় যাত্রা করেছেন। সেখানে পৌঁছিয়ে বহু অন্বেষণের পর অশোকবনে শুক্লা প্রতিপদের চন্দ্রকলাসদৃশী উপবাসকৃশা সীতার দর্শন লাভ করে হনুমান কৃতার্থ হয়েছেন। সীতা সমীপে সমাগত কামোন্মত্ত রাবণের মুখে তিনি শুনতে পেলেন, রাবণ সীতাকে বলছেন—

দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে
যোঽবধিস্তে ময়াকৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং
বরবর্ণিনি॥ ৫।২২।৮
দ্বাভ্যামূর্দ্ধন্তু মাসাভ্যাং ভর্ত্তারং
মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি
খণ্ডশঃ॥ ৫।২২।২৯

—হে সুন্দরি, তোমাকে আমি যে সময় দিয়েছিলাম, তার দুই মাস অবশিষ্ট রয়েছে। এই সময়টুকু অপেক্ষা করব। অতঃপর যদি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ না কর, তবে পাচকরা আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলবে।

রাক্ষসীদের দ্বারা ভর্ৎসিতা সীতার বিলাপেও হনুমান শুনেছেন—

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া
মাসৌ চিরায়াভিগামিষ্যতো দ্বৌ॥
৫।২৮।৭

হনুমানের সঙ্গে পরিচয়ের পরেও সীতা হনুমানকে বলছেন যে, তাঁর বন্দিনী-দশার দশম মাস চলছে। আর দুই মাস পরেই তিনি আত্মহত্যা করবেন—

বর্ত্ততে দশমো মাসো দ্বৌ
তু শেষৌ প্লবঙ্গম। ৫৩৭।৮
উর্দ্ধং দ্বাভ্যান্তু মাসাভ্যাং
ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্। ৫।৩৩।৩১

হনুমানের এই দৌত্যকর্ম সম্ভবতঃ সৌর কার্তিকের শেষাংশে ঘটেছে। পরে হনুমান ফিরে এসে যখন রামচন্দ্র ও সুগ্রীবকে সীতার খবর জানিয়েছেন, তখন আরও প্রায় এক মাস অতীত হয়েছে। যেহেতু হনুমান তখন রামের নিকট সীতার উক্তিরূপে তাঁর জীবন ধারণের ম্যাদ সম্বন্ধে বলছেন—

জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
উর্দ্ধং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং
বশমাগতা॥ ৫।৬৫।২৫

সীতা হনুমানকে বলেছিলেন — দুই মাস কাল বাকী, পরন্তু হনুমান রামকে বলছেন—এক মাস কাল বাকী আছে। এতেই অনুমিত হয়, সীতার প্রথম দর্শন লাভের পর হনুমানের প্রায় এক মাস কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। সম্ভবতঃ সৌর অগ্র-হায়ণের মধ্যভাগে হনুমান রামচন্দ্রকে সীতার খবর দেন।

হনুমানের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেই রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলছেন—এখনই আমরা যুদ্ধযাত্রা করব। এখন দিবসের দ্বিপ্রহরে 'অভিজিৎ' মুহূর্ত। কিষ্কিন্ধা থেকে লঙ্কা অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই বিজয়মুহূর্তে যাত্রা মঙ্গলজনক হবে। তিনি আরও বলছেন—

উত্তরা ফল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন
যোক্ষ্যতে। ৬।৪।৫

—আজ 'উত্তরফল্গুনী' নক্ষত্র, আগামী-কল্য 'হস্তা' নক্ষত্র হবে।

কর্কট রাশি এবং পুনর্বসু নক্ষত্রে মর্ত্যলোকে রামচন্দ্রের আবির্ভাব। সুতরাং জ্যোতিষের গণনায় উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র তাঁর সাধক তারা, আর হস্তানক্ষত্র হচ্ছে বধতারা। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁর পক্ষে যাত্রায় শুভসূচক উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে তিনি অভিযান করতে চান। আরও অনুমান করা যায় যে, সেই ক্ষণে চন্দ্র ছিলেন কন্যা রাশিতে। এক একটি রাশির ঘটক সোয়া দুই নক্ষত্র। অশ্লেষা নক্ষত্রেই কর্কটস্থ চন্দ্রের স্থিতিকাল সমাপ্ত হয়েছে। মঘা, পূর্ব-ফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীর এক পাদের সমাপ্তিতে চন্দ্র সিংহ রাশিকেও অতিক্রম করেছেন। তখন চন্দ্র আছেন কন্যা রাশিতে। কন্যা হচ্ছে রামচন্দ্রের তৃতীয় রাশি। তৃতীয় চন্দ্র যাত্রা শুভপ্রদ। এইজন্যই বোধ করি—রামচন্দ্র তখনই যুদ্ধযাত্রার শুভক্ষণ মনে করছেন।

সৌর অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা তিথিতে মৃগশিরা নক্ষত্রের যোগ হয়। তার পূর্বভূত উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র, চান্দ্র কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষে হওয়ার কথা এবং তখনও সৌর অগ্রহায়ণ মাসই চলছে।

কিষ্কিন্ধা থেকে সমুদ্রতীরে গমন, সেতুবন্ধনের উদ্যোগে প্রভৃতিতেও কিছু সময় গেছে। বিশ্বকর্মার তনয় নলের অধ্যক্ষতায় মাত্র পাঁচ দিনে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মিত হল। তারপর সসৈন্য রাম-চন্দ্রের লঙ্কাপ্রবেশ, সৈন্যস্থাপন ও যুদ্ধারম্ভ। কত দিন ধরে সেই ভীষণ যুদ্ধ চলেছিল, তা ঠিক জানা যায় না। রামায়ণ পাঠে অনুমিত হয় যে, পনেরো দিনের কম নয়।

চান্দ্র অগ্রহায়ণের অমাবস্যা তিথিতে, অর্থাৎ সৌর পৌষের মধ্যভাগ অথবা শেষ ভাগে হতবান্ধব রাবণ স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করেছেন। রাবণের অন্যতম অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে বলছেন—

অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী।
কৃত্বা নির্য্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায়
বলৈর্বৃত॥ ৬।৯২।৬৭

—মহারাজ, আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। আজই যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে আগামী-কাল অমাবস্যায় বিজয়ার্থ সৈন্যসহ যাত্রা করবেন।

পরদিন অগ্রহায়ণের অমাবস্যা তিথিতে সমরাঙ্গণে রামের ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণের ভবলীলা সাঙ্গ হল।

রাবণ বধের সময় রামচন্দ্রের বয়স ছিল আটত্রিশ বৎসর নয় মাস, আর সীতার বয়স প্রায় বত্রিশ বৎসর। আলোচনায় বোঝা যায়—

সীতা দেবী প্রায় এগার মাস কাল লংকায় বন্দিনী ছিলেন।

এখনও চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে তিন মাস অবশিষ্ট রয়েছে। রামচন্দ্রের পাদুকা গ্রহণের সময়ই ভরত বলছেন—

চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহহনি রঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বান্তু প্রবেক্ষ্যামি
হুতাশনম্ ॥ ২।১১২।২৫

—হে রঘুশ্রেষ্ঠ, যে দিন চৌদ্দ বৎসর সম্পূর্ণ হবে, তার পরদিনই যদি তোমার দর্শন না পাই, তবে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেব।

অতএব সম্ভবতঃ চৈত্রের শুক্লা ষষ্ঠী কিম্বা সপ্তমীতেই রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় উপস্থিত হতে হবে। সেই শুক্লা নবমীতেই রামচন্দ্রের বয়স ঊনচল্লিশ পূর্ণ হবে।

রাবণ বধের পর বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতিতে আরও কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে। তারপর পুষ্পক বিমান আরোহণ করে রাম-সীতার অযোধ্যা যাত্রা, পথিমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় অবতরণ ও কিছুদিন যাপন ইত্যাদি।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো
মুনিম্ ॥ ৬।১২৪।২

—চতুর্দশ বৎসর প্রায় পূর্ণ হলে পঞ্চমী তিথিতে রামচন্দ্র (প্রয়াগে) মুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সংযতচিত্তে মুনিকে প্রণাম করলেন।

সেখান থেকে রামচন্দ্র শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদাধিপতি গুহ এবং অযোধ্যায় ভরতের নিকট তাঁদের কুশল সংবাদ দিবার নিমিত্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন। রামচন্দ্র মুনির আশ্রমে এক রাত্রি যাপন করে পরদিন শৃঙ্গবেরপুরে গুহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। সেই দিন ছিল—ষষ্ঠী তিথি ও পুষ্যানক্ষত্র। যেহেতু হনুমান ভরতকে বলছেন—

অবিঘ্নং পুষ্যযোগেনে শ্বো রামং
দ্রষ্টুমর্হসি। ৬।১২৬।৫৪

চৌদ্দ বৎসর পূর্বে চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমীতে অথবা ষষ্ঠীতে পুষ্যা নক্ষত্রে রামচন্দ্র অরণ্যযাত্রা করেন, আর চৌদ্দ বৎসর পরে চৈত্রের শুক্লা ষষ্ঠীতে বা সপ্তমীতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগে তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।

কবি জীবন সন্ধানে

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

জীবনচরিতে ব্যক্তিবিশেষের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে। আমরা তা থেকে ব্যক্তিজীবনের ঘরোয়া কথা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সফলতা বিফলতা, সমসাময়িক ইতিহাস ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারি। সাল তারিখ ও ঘটনাবলীর ভিড়ে ব্যক্তি-বিশেষের কর্মজীবনটা ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠে। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত ত খুবই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

কিন্তু, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।' কথা এই যে, কবির জন্মের স্থান-কাল, পূর্বপুরুষের ইতিবৃত্ত সমসাময়িক ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি বিবরণের মাধ্যমে কবির আসল পরিচয়টা না মিলতে পারে। কেননা, সাধারণত জীবনচরিতে প্রাধান্য লাভ করে ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী, তাঁর চিন্তাভাবনা বা তাঁর উপলব্ধি নয়। কর্মজীবনটা ত কবির আসল পরিচয় নয়?—আসল পরিচয় হল তাঁর কবি-পরিচয়। জীবনেতিহাসের পাতা থেকে তাই কোনো মহাকবিকে সম্যক জানা, তাঁর জীবনাদর্শ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কবির সম্বন্ধে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হলে তাঁর জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ তথ্যের তালিকা ঘেঁটে তা করা চলে না। তা আহরণ করতে হবে তাঁর সৃজিত কাব্য থেকে।

অথচ, আমরা ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি জানবার জন্যেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে থাকি। সমালোচকরাও অনেক-সময় কাব্য সমালোচনা করতে গিয়ে আসলে কবির ব্যক্তিজীবনের সমালোচনাতেই লিপ্ত হন, এবং এমন সব বিষয়ের অবতারণা করে থাকেন যার সঙ্গে কবির কাব্যের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবির পূর্বপুরুষ ও ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি তাঁর কাব্যোপলব্ধির পক্ষে মূল্যবান ও অত্যাবশ্যক এমন না হতে পারে। বাল্মীকি ও ব্যাস-এর কথাই ধরুন। আমাদের কাছে এই দুটি নামের ত অপার মহিমা। কিন্তু দেখুন, এঁদের রচিত মহাকাব্যের বাইরে আমরা ত এঁদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানি নে। শুধু নাম বলতে দুটো নাম। অথচ রামায়ণ মহাভারত পড়ে আমরা জ্ঞান লাভ করছি, আনন্দে আমাদের মনপ্রাণ মুগ্ধ ও পুলকিত হচ্ছে। শেক্সপীয়রের জীবন সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তা ইতিহাসের কথা। ঐসব না জানলেও তাঁর কাব্যের শ্বাশ্বত সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে, তাঁর হ্যামলেট নাটকের রস উপভোগ করতে পাঠকের অসুবিধা হবার কথা নয়। এক সমালোচক ব্রাউনিং-এর কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ওঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে এত নোটস্, ডায়েরী ইত্যাদি রয়েছে যে, তাঁর কাব্যানুশীলনের পক্ষে তা বিষম অন্তরায়। শেক্সপীয়র সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা ওয়েলকম। হি ইজ অল থিংস্ টু অল মেন। এতে করে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে না। র‍্যাঁবোর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস ত আপনারা জানেন। পচা, নিকৃষ্ট ধরনের জীবন। অথচ কবি হিসাবে পৃথিবীতে ওঁর মতো কীর্তিমান কজন? মধ্যযুগের সর্ব-শ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি ভিলনও যাচ্ছেতাই জীবনযাপন করেছিলেন। যত পাজী বদমাস লোকের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্ব। চুরি, ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি যত রকমের বদকর্মে লিপ্ত ছিলেন তিনি। কারাদন্ড ভোগ করতে হয়েছিল বারকয়েক। শেষপর্যন্ত ফাঁসির হুকুম হয়,—কিন্তু সম্রাট একাদশ লুই দয়া করে তাঁর অপরাধ মার্জনা করেন তাঁর কবি-প্রতিভার জন্যে। আর, আমাদের দেশের চোর-কবি বিহ্লন? নানা দুষ্কর্মের দরুণ তাঁর প্রতি প্রাণদন্ডের আদেশ হয়েছিল কিন্তু তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা—'চৌর-পঞ্চাশিকা' রচনা করেছিলেন বলে রাজা তাঁর প্রাণদন্ড মকুব করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ওঁরা ওঁদের কাব্যের মধ্যেই বেঁচে আছেন, জীবনেতিহাসের মাধ্যমে নয়। আসলে, ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি, সমসাময়িক ইতিহাস, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি পাঠকের মনকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করে তোলে মাত্র, কবির কাব্যানুশীলনের পক্ষে সহায়ক হয় না।

কবি কালিদাস সম্বন্ধে কত কত অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আমরা যদি সেগুলো স্রেফ অবিশ্বাস করি তাতে কিছু এসে যাবে না। ওঁর জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমরা যে কিছুই জানি নে সেটা ভালই হয়েছে। তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য, রূপ ও রস উপভোগে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হচ্ছে না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কালিদাস সম্বন্ধীয় আলো-চনায় কী বলেছেন দেখুন :

"Who Kalidas was, what was his personal as distinguisned from his poetical individuality, what manner of man was the great King whose patronage he enjoyed, who were his friends, who his rivals and how he dealt with either or both, whether or not he was a lover of wine and woman in practice as well as in imagination, under what special surroundings he wrote and who were the minds by whom he was most influenced, all this the natural man clamours to know; and yet all these are things we are very fortunate not to know. The historical method is certainly an attractive one and it leads to some distinct advantages, for it decidedly aids those who are not gifted with fine insight and literary discrimination, to understand certain sides of a poet's work more clearly and intelligently. But while it increases our knowledge of the workings of the human mind, it does not in the end assist or improve our critical appreciation of poetry it obstructs our clear and accucate impression of the work and its value. The supporters of the historical method put the cart before the horse and placing them-

selves between the shafts do a great deal of useless though heroic labour in dragging both. They insist on directing that attention to the poet which should be directed to the poem. After assimilating a man's literary work and realising its value first to ourselves and then in relation to the eternal nature and scope of poetry, we may or indeed must attempt to realise to ourselves an idea of his poetic individuality from the data he himself has provided for us; and the idea so formed will be the individuality of the man so far as we can assimilate him, the only part of him therefore that is of real value to us".

কথা এই যে, কবির ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস তাঁর কাব্যের রসাস্বাদনে এবং সঠিক বিচার ও মূল্যায়নে সহায়তা করে না, বরং ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আমরা যদি কবির কাব্যপাঠ ও আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবনের ঘটনাপুঞ্জকেই বেশি প্রাধান্য দিই তবে ত কাব্যপাঠ এগোবে না? আর, কাব্যপাঠ করে আমাদের মনে যে অনুভূতি জাগে—আনন্দ, বিস্ময়, বেদনা, অনুকম্পা ইত্যাদি নানাভাবের উদয় হয়, তাও বাধা পাবে। কর্মজীবন ত ফুটিয়ে তোলে কেবল বাইরের দিকটা, ওটা খোলস, কবির অন্তর্জীবনকে পরিস্ফুট করে না। আসল হল কবির বাণী। তার প্রকাশ তাঁর কাব্যে। কবি সার্থক তাঁর কাব্যে। কবিকে চেনাজানা যাবে, সমগ্রভাবে পাওয়া যাবে তাঁর সৃজিত কাব্যে।

যাঁরা কর্মবীর কিংবা যে সকল কবির বাণী, জীবনানুভূতি তাঁদের কাব্যে বচন লাভ করেনি তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত উপভোগ্য হতে পারে। বসওয়েল কৃত ডক্টর জনসনের জীবনীর কথা ধরুন। জনসনের জীবন প্রকাশ পায়নি তাঁর রচিত সাহিত্যে, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কথোপকথনের মাধ্যমে। বসওয়েল কৃত জীবনী তাই জনসনের সাহিত্যকর্মকে ছাড়িয়ে গেছে।

(২)

'রবীন্দ্রজীবনী' * সম্পর্কে কবি নাকি একদা বলেছিলেন, 'ঐ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের জীবনী নহে, উহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী'।

কবি বলতে চেয়েছেন, ঐ জীবনচরিতে তাঁর আটপৌরে জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যেতে পারে, ব্যক্তিজীবনের পরিচয় মিলতে পারে, কিন্তু তাঁর কবিজীবনকে পাওয়া যাবে না। সাধারণত জীবনীতে ব্যক্তিবিশেষের পারিবারিক, সাংসারিক ও কর্মজীবনের পরিচয়টাই ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠে। কবির তাই আশঙ্কা সাংসারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবিমানসের, তাঁর জীবনবোধের সম্যক পরিচয়টা জীবনীতে না পাওয়ারই সম্ভাবনা। কেননা, সুখদুঃখ, সম্পদ, ব্যর্থতা, সফলতা, খ্যাতিপ্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ে যে-জীবন সীমাবদ্ধ, সে জীবন ত তাঁর নয়? কবির আসল পরিচয় তাই জীবনবৃত্তান্তের মাধ্যমে মিলবে না।

রবীন্দ্রনাথের কথা হল তিনি যে মূলত কবি সেই প্রধান পরিচয় সাধারণ জীবনের সালতারিখ ও ঘটনাবলীর ভিড়ে ধরা পড়বে না। 'কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য—তাহা তো সর্বসাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে—আবার জীবনের কথা কেন?' রবীন্দ্রনাথের জীবন ত আর সাধারণ একজন কর্মীর জীবন নয় যে কর্মবৃত্তান্তের ঠাসবুনুনিতে পূর্ণতালাভ করবে? তাই 'জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।'—'কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।'

অথচ কবি নিজেও তাঁর জীবনচরিত লিখেছেন। তবে কেবল কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে নিজের জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তিনি তা-ই লিখেছেন। জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তটা বাদ দিয়েছেন। এবং একটা স্টেজে এসে ছেদ টেনেছেন, বিদায় গ্রহণ করেছেন 'খাসমহালের দরজার কাছে' এসে। তাঁর মতে ঐ জীবনচরিত নিছক জীবনবৃত্তান্ত নয়। 'ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র'। সাহিত্যের সামগ্রী।

কবির জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর কাব্যের যোগাযোগ হয়ত ঈষৎ আছে। কিন্তু সেটাকে বেশি বড় করে দেখাটা রেওয়াজ হয়েছে। কবির কাব্যগত জীবন ছেড়ে দিয়ে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের উপরে জোর দিচ্ছি। সাধারণ ক্ষেত্রে, যেমন স্কুলকলেজে বিদ্যাভ্যাসকালে জীবনেতিহাসের প্রয়োজন হয়ত আছে। কিন্তু কবিমনের ঐশ্বর্য, কাব্যের রস ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কবির ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত জানা দরকার—এই থিওরী অচল। আসলে যে জীবনবৃত্তান্তে সালতারিখের ছড়াছড়ি, এবং প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা, সুখদুঃখ গ্লানি, সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ সেটা কবিকে জানবার মাপকাঠি নয়। ওতে তাঁর জীবনাদর্শের সন্ধান মিলবে না। আমরা যদি কবির প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাই তবে ত কবির কাব্যপাঠে, কাব্যানুশীলনে আমাদের মনঃসংযোগ বিঘ্নিত হবে, অনুভূতি নষ্ট হবে? অবশ্য, অন্তরঙ্গ তথ্য ও ঘটনাবলী কিংবা কবে কখন কোন পরিবেশে কবি কোন্ গান কোন্ কাব্য রচনা করেছেন তার হদিস জীবনী থেকে মিলতে পারে। কিন্তু ওসব না জানলেও কবির গানের সুর তেমনি মিষ্টি, তাঁর কাব্যের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে পাঠকের চিত্ত তেমনি মুগ্ধ!

রবীন্দ্রনাথ কবি, ধনী ও জমিদার। কিন্তু সর্বোপরি তিনি কবি। এটা ভুললে চলবে না। তাঁর জীবন সেই দিক থেকেই বিবেচনা করতে হবে। বাঁধাধরা নিয়মশৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে ও পরিবেশে তাঁকে চেনাজানা যাবে না। ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া জীবনের পরিধির মধ্যে কবির আসল সত্তার পরিচয় মিলবে না, উপলব্ধি করা যাবে না তাঁর জীবনদর্শন। কোনো একটি বিশেষ দিক থেকে বিচার করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সাধনার রূপ উপলব্ধি করা কিংবা তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার পরিমাপ করাও সম্ভব নয়।

হাঁ, মূলত তিনি কবি। তিনি যে অন্তরলোকে বিরাজমান ছিলেন, যে ভাবরাজ্যে তিনি বিচরণ করতেন, গানে-কাব্যে যে-ঊর্ধ্বলোকে তাঁর মনকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাঁর জীবনের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ধরা পড়ার কথা নয়। কবির মনের গহন গোপনতলে ছিল ভিন্ন এক জগৎ। তার হদিস মিলবে না ইতিহাসে। সেটা উপলব্ধি করা যাবে তাঁর কাব্যের মারফতে। কবির মনে কত প্রশ্ন জেগেছে, কত ছবি ভেসে উঠেছে, কত শত কল্পনার ঢেউ খেলে গেছে। এ সবের পরিচয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের সীমার মধ্যে, জীবনবৃত্তান্তের ঘটনাবলীর মধ্যে কোথায়? 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' কবির চিত্তপটে যে-রেখা প্রতিফলিত হয়েছে—হাঁ রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ছিল পট যাতে রেখারা পড়তে বাধ্য হত—তাঁর কাব্যসাহিত্যের ভিতর দিয়ে কথায় সুরে রঙে-রেখায় যে ছবি ফুটে উঠেছে, যে বিচিত্রগামী জীবনানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকেই জানা যাবে কবিকে, উপলব্ধি করা যাবে তাঁর সাধনা, তাঁর গানের সুরের ধর্ম, 'সীমার মাঝে অসীমের সহিত মিলন সাধনের ধর্ম'।

কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত—এইসব শিল্পসৃষ্টিই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান ও একমাত্র কর্ম। তাঁর সমগ্র জীবনে এই শিল্পবোধটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এমনকি ধর্মবোধও প্রকাশ পেয়েছে কাব্যের ভিতর দিয়া। অতএব, তাঁর কাব্যের রসগ্রহণ করতে হলে তার বৈশিষ্ট্যের মারফতেই করতে হবে, জীবনবৃত্তান্তের খুঁটিনাটি বিচার করে নয়।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে তাঁর ভাবনায়, সাধনায় ও ধ্যান-ধারণায়। এ সবই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে, তাঁর সৃষ্টিতে। কাব্যই তাঁর প্রকৃত জীবনী। তাঁর জীবনটাই একটানা কাব্য। জীবনের উৎস কবিতা। কবি-পরিচয়টাই তাঁর যথার্থ পরিচয়। আজীবন তিনিও তা-ই মনে করতেন। 'জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপ লাভ করিয়া থাকে—যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে—যাহা অশরীরভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।'

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

সঞ্জীবকুমার ঘোষ

প্রচণ্ড গরমে শরীর যখন আইঢাই করে তখন প্রকৃতিদেবীর কাছে আমরা যে জিনিসের জন্যে মনে মনে সকাতর আবেদন জানাই তা হল, নিদেনপক্ষে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। একটানা রৌদ্রদহনের পর বৃষ্টিপ্রসূ এক টুকরো কালো মেঘের আশায় আকাশ পানে সতৃষ্ণ চোখে আমরা তাকাই। আকাশ-জুড়ে কালো মেঘ যখন সত্যি সত্যিই আসে, আর সেই মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি যখন সত্যিই নামে তখন যেন দেহ-মন জুড়িয়ে যায়। কৃষাণের কপাল থেকে চিন্তার রেখা মিলিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয়, যদি ক্রমান্বয়ে বৃষ্টিবিহীন দিন আমাদের যাপন করতে হয় তাহলে দুর্গতির আর অন্ত থাকে না। প্রকৃতির খেয়াল সত্যিই বিচিত্র। কোথাও লোকে একটু বৃষ্টির জন্যে হা-হুতাশ করে মরে আবার কোথাও অতি বৃষ্টি জীবন-হানির কারণ হয়। যেমন হয়েছিল তাইওয়ানে এই সেদিন ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে সেখানে কয়েক ব্যক্তির জীবনদীপ নিভে যায়। আর বৃষ্টিহীনতা ত মানুষের কাছে প্রকৃতির মস্তো এক চ্যালেঞ্জ। অবিশ্যি সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যে মানুষের চেষ্টারও অন্ত নেই। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কখনো কায়দা-কৌশল প্রয়োগ করে আবার কখনো দেবতার তুষ্টিবিধান করে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করেছে। সত্যি বলতে কি, বৃষ্টি 'তৈরীর' আইডিয়াটা মোটেই নতুন নয়। বহু আগে লোকের প্রতীতি ছিল, মন্ত্র তন্ত্র বা যাগ-যজ্ঞ করলে বৃষ্টির দেবতা তুষ্ট করার দায়িত্ব থাকত 'বৃষ্টি-উৎপাদক' বলে কথিত প্রভাবশালী একশ্রেণীর লোকের ওপর। সবাই এদের মানতো। দেবতার কাছে আবেদন পৌঁছে দেবার জন্যে এই সব বৃষ্টি-উৎপাদক অদ্ভুত সব পদ্ধতি অবলম্বন করত। কখনো তারা উঁচু কোনো জায়গায় উঠে খানিক জল ছিটিয়ে দিত আবার কখনো মেঘের মতো কালো ধোঁয়া সৃষ্টি করত এবং ঝড়ের সময় যে সোঁ-সোঁ আওয়াজ হয় তার অনুকরণ করত। ঝড়-বাদলের পূর্বেকার প্রকৃতির অনুকারী পরিবেশ রচনা করলে আপনা থেকেই বৃষ্টি ঝরে পড়বে এই ছিল তাদের ধারণা। এতেও কাজ না হলে আরো কঠোর পন্থার আশ্রয় নেওয়া হত যেমন, একটি গর্ত খুঁড়ে বৃষ্টি-উৎপাদক একটি কুকুরকে ধরে এনে সেই গর্তে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিত; এমন-ভাবে দিত যেন কুকুরটির মাথাটি বাইরে থাকে। তারপর কুকুরটির কানে ঢালা হত তপ্ত তেল বা জল। যন্ত্রণাকাতর জীবের আর্তনাদ দেবতার করুণা উদ্রেক করবে এবং করুণাপরবশ হয়ে দেবতা বৃষ্টিদান করবেন, এই ছিল প্রচলিত প্রত্যয়।

সভ্যতা এবং বিজ্ঞানের রথ যতো এগিয়ে চলল, বৃষ্টি নামানোর এই সব প্রচেষ্টাও কতকটা বৈজ্ঞানিক পথ ধরল। এরপর থেকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর দরকার বা ইচ্ছে হলে মেঘের দিকে তাক করে কামান ছোঁড়া হত আবার কখনো বা নানা রাসায়নিক পদার্থ ওপরদিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত, এই আশায় যে, কামানের গোলার ধাক্কা খেয়ে বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় মেঘ বৃষ্টিরূপে মাটিতে ঝরে পড়বে। এসব প্রচেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থতায় পর্য-বসিত হত তা বলা চলে না। এধরনের ক্রিয়া চলাকালে বা অনুষ্ঠান অন্তে সময় সময় আকাশ ভেঙে সত্যি সত্যিই বৃষ্টি নামত। বলা বাহুল্য, সে বৃষ্টি প্রকৃতির আপন নিয়মেই হত, ঐ সব ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। যদিও বৃষ্টি-উৎপাদকরা অন্য রকম ভাবত। তারা ভাবত, তাদেরই প্রচেষ্টার জন্য ঐ বৃষ্টি। বৃষ্টি-উৎপাদক সেকথাই বুঝিয়ে বলত আর পাঁচজনকে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, এর ফলে বৃষ্টি-উৎপাদকের প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যেত।

বৃষ্টি সম্পর্কে সংস্কার আজকের দিনেও যে নেই তা নয়। এ ব্যাপারে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন সংস্কার প্রচলিত। শুকিয়ে-যাওয়া নদীতে গাইকে নিয়ে দোহন করলে বৃষ্টি নামবে এমন বিশ্বাস কেউ কেউ করেন। কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা অনাবৃষ্টির সময় অনাবৃষ্টির প্রতীক হিসেবে মাটির মূর্তি তৈরী করে, তারপর সকলে মিলে মূর্তিটিকে শোভাযাত্রাসহকারে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। এক সময় আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা ছিল, মাটি শুকিয়ে যে জলটুকু বাতাসে মিলিয়ে যায় সেই জলটুকু থেকেই বৃষ্টি উৎপত্তি লাভ করে। মাটিতে সঞ্চিত জলের পরিমাণ যদি বাড়ে, পরিশেষে তাহলে বৃষ্টির পরিমাণও বাড়বে। তাই সমস্ত মাটিকে কর্ষণ করলেই লাভ। কর্ষিত মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী, কাজে কাজেই মাটি কর্ষণ করলে বৃষ্টিও হবে বেশী।

বৃষ্টি কোথাও মঙ্গলের আবার কোথাও অমঙ্গলের প্রতীক। আরবের রুক্ষ-শুকনো মরু অঞ্চলে প্রচলিত ধারণানুযায়ী স্বপ্নে বৃষ্টিদর্শন সৌভাগ্য এবং মঙ্গলের দ্যোতক। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে কেউ স্বপ্নে বৃষ্টি দেখলে তার অমঙ্গল আসন্ন ধরে নেওয়া হয়।

এটা বিজ্ঞানের যুগ। প্রাচীনকালের বৃষ্টি-উৎপাদকদের ভূমিকা গ্রহণ করলেন আধুনিককালের বিজ্ঞানীরা। এরা প্রকৃত অর্থেই বৃষ্টি-উৎপাদক। আধুনিককালে এটা প্রমাণিত হয়েছে, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানো সত্যিই সম্ভব। অর্থাৎ বৃষ্টি তৈরী অসম্ভব নয়। অবিশ্যি মেঘ থাকলে তবেই বৃষ্টি নামানো যায়। মেঘের অনুপস্থিতিতে বৃষ্টি তৈরী যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। আবার বিশেষ মেঘ ছাড়া যে কোনো মেঘেই বৃষ্টি তৈরী করা যায় না। আগামী দিনে অবিশ্যি তাও সম্ভব হতে পারে। এ সম্পর্কে দেশে দেশে এখন গবেষণা চলছে।

মেঘকে জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত রূপ বলা যায়। হ্রদ-নদী, সাগর-মহাসাগর থেকে নিরন্তর উত্থিত জলীয় বাষ্প যতোই ওপরে ওঠে ততোই ঠাণ্ডা হয়। ওপরে উঠলে তাপমাত্রা এমনিতেই কমে, এর ওপর আবার ওপরে উঠে প্রসারিত হওয়ার দরুন জলীয় বাষ্পের তাপমাত্রা আরো কমে যায়। জলীয় বাষ্প এভাবে ঠাণ্ডা হয়ে এক সময় ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়ে ভাসমান ধূলিকণা ইত্যাদিকে ঘিরে ভাসতে থাকে। ভাসমান এই জলকণারাশিই মেঘ রচনা করে। মেঘের জলকণা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আকার এবং ওজনে বাড়লে বৃষ্টিরূপে নীচে পড়ে।

সে ১৯৩১ সালের কথা। ভেরার্ট নামে হল্যান্ডবাসী জনৈক ভদ্রলোক একদিন এরো-প্লেনে চড়ে মেঘের ওপর উঠে গিয়ে কিছু 'শুকনো বরফ' মেঘের ওপর ছড়িয়ে দেন। এতে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে বলে ভেরার্ট দাবিও করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার 'শুকনো বরফ' হল কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কঠিনীভূত রূপ। জিনিসটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ভেরার্ট তাঁর এই পরীক্ষা ব্যাপকভাবে চালানোর জন্যে তাঁর সরকারের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন করেন। কিন্তু সরকার তাঁর এই আবেদন নামঞ্জুর করেন। এর কয়েক বছর বাদে, ১৯৪৬ সালে একটি কোম্পানীর তরফ থেকে ভিনসেন্ট শেফার নিউইয়র্ক শহরের কাছে বার্কসায়ার পাহাড়ের ওপরকার মেঘের ওপর একইভাবে উঠে ছ পাউণ্ডের মতো 'শুকনো বরফের' টুকরো ছড়িয়ে দেন। দেখতে দেখতে নীচে ছড়িয়ে থাকা মেঘ ছোটো-ছোটো বরফের টুকরোয় পরিণত হয়ে নীচে পড়তে শুরু করল। এরপর থেকেই শুরু হয়ে গেল কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা।

আগেই বলা হয়েছে, 'শুকনো বরফ' অত্যন্ত ঠাণ্ডা জিনিস। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের মেঘের ওপর এ জিনিসটি ছড়িয়ে দিলে তাপমাত্রা বরফ-শীতেরও বেশ কয়েক ডিগ্রী নীচে নেমে যায়। এর ফলে মেঘ থেকে জন্মলাভ করে ঝাঁকে-ঝাঁকে তুষার-কণিকা নীচের দিকে পড়তে থাকে। মাটিতে পড়বার আগে তুষারকণিকা দ্রবীভূত হয়ে

জলবিন্দুতে পরিণত হয়। এই হল নকল বৃষ্টি। শুকনো বরফের পরিবর্তে সিলভার আয়োডাইড নিলেও চলে। অপেক্ষাকৃত বেশী এলাকা জুড়ে বৃষ্টি নামাতে হলে অনেক সময় নীচ থেকে সিলভার আয়োডাইডের ধোঁয়া উৎপন্ন করে ওপরদিকে ছাড়া হয়। এই ধোঁয়াকে ওপরে মেঘ পর্যন্ত পোঁছে দেয়। উর্ধগামী বায়ুস্রোত। ধোঁয়ার মধ্যেকার সিলভার আয়োডাইডের সূক্ষ্ম কণিকাকে কেন্দ্র করে বরফ দানা বাঁধে।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর যে পদ্ধতির কথা বলা হল তা যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার এটা ধরে নেওয়া যায়। আর এতে বৃষ্টির পরিমাণও যে বেশী হয় তা নয়। তাছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ ধরনের মেঘ এবং অনুকূল অবস্থা না হলে বৃষ্টি তৈরী করা যায় না।

নকল বৃষ্টির ব্যাপারে কতকগুলো অসুবিধে দেখা দিতে পারে। ধরা যাক, অনাবৃষ্টির জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কৃষাণ তার ক্ষেতের ফসলের জন্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে বৃষ্টি কামনা করছে, কবে বৃষ্টি হবে সেই আশায় দিন গুনছে। এমন অবস্থায় তার কানে গেল, নিকটবর্তী এলাকায় বেশ খানিকটা নকল বৃষ্টি তৈরী করা হয়েছে। একথা শুনে কৃষাণটি যদি এই কথা বলে বৃষ্টি-উৎপাদকদের ওপর দোষারোপ করে যে তাঁরা নকল বৃষ্টি নামাতে না গেলে সেখানকার ঐ মেঘের খানিকটা উড়ে আসত এবং তার ফলে তাঁর এলাকায়ও স্বাভাবিক বৃষ্টি নামত তাহলে সেই কৃষাণের দোষারোপ অযৌক্তিক, এমন কথা বিজ্ঞানীরা বলতে পারেননি। আবার এমনও হতে পারে, মেঘকে প্রভাবিত করে প্রয়োজনীয় নকল বৃষ্টি নামানো হল আর বায়ুতাড়িত হয়ে সেই প্রভাবিত মেঘ নিকটবর্তী কোথাও যাওয়ার ফলে সেখানে অনাবশ্যক কিছু বৃষ্টি আর সঙ্গে বরফের টুকরো পড়ে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হল।

কিন্তু অসুবিধে সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, নকল বৃষ্টি স্বর্ণসম্ভাবনাময় এবং এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তাঁরা পূর্ণোদ্যমে কাজ করে চলেছেন।

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

কসাই, আমিনী, চিজ, নিখুঁত, খেতাব, জাঁগ, আশমান, জিলাপি, কঞ্জুষ, দাঁড়-কাক—শব্দগুলি কোন কোন ভাষা থেকে বাঙলায় এসেছে?

জয়ন্তী রায়
বর্ধমান

●

১। যশোর রোড কোন বৎসর তৈরি হয়? কোথা থেকে কোন পর্যন্ত বিস্তৃত?

২। কলকাতা থেকে হাঁটাপথে দিল্লী যাওয়া কি সম্ভব?

৩। রাঢ় অঞ্চল কাকে বলত?

৪। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর, বেহালা—নামকরণের পিছনে কোন ইতিহাস আছে কি?

প্রভাত মান্না
মেদিনীপুর

●

১। কোন্ ক্রিকেটার সর্বাপেক্ষা কম বয়সে টেস্ট ক্রিকেটে অন্তর্ভুক্তি লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

২। কোন্ ক্রিকেটার টেস্ট ক্রিকেটে শতরাণ করতে সর্বাপেক্ষা বেশী সময় নিয়েছেন?

৩। টেস্ট ক্রিকেটে নবম ও দশম উইকেট-জুটির বিশ্বরেকর্ড কত?

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
খালিহাটী, মুর্শিদাবাদ

●

১। হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত—মনসা, কার্তিক, গণেশ, লব ও কুশ, পঞ্চপাণ্ডব এবং কর্ণ, দ্রোণাচার্য, শকুন্তলা ও সীতার জন্ম-বৃত্তান্তের সামাজিক ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক রহস্য জানতে চাই।

২। মহাভারত-যুদ্ধে কাকে সবচেয়ে বড় বীর আখ্যা দেওয়া যায় এবং কেন?

৩। আজ পর্যন্ত গীতা, পৃথিবীর কোন্ কোন্ ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত,
সান্ত্বনা গুপ্তা,
রাঁচী—৪।

●

১। মধ্যপ্রাচ্যে রাজ্যসংখ্যা কত? তাদের রাজধানী কি?

২। বিমানে কলকাতা থেকে লণ্ডন, কলকাতা থেকে নিউইয়র্ক, কলকাতা থেকে মস্কো যেতে কত সময় লাগে?

বাঙলাদেশের সব থেকে প্রাচীন ও বৃহৎ গ্রন্থাগার কোনটি?

বিভূতি দাশগুপ্ত
দক্ষিণপাড়া
বারাসাত

●

(১) টাইপরাইটার, টেপ-রেকর্ডার ও ও ক্যামেরা কে আবিষ্কার করেছেন?

(২) বাংলাদেশে সাময়িক পত্র-পত্রিকা কতগুলো প্রকাশিত হয়? তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর ঠিকানা কি?

(৩) চিত্র-পরিচালক আইজেনস্টাইন কতগুলো চিত্র-পরিচালনা করেছেন? সে-গুলোর নাম কী কী?

(৪) কলম্বো প্ল্যানে কতগুলো রাষ্ট্র আছে তাঁদের নাম কী?

সুরজিৎ রায়
আসাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
গৌহাটী—১৩
(আসাম)

●

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানতে চাই?

সুভাষচন্দ্র দাস
নিউ গ্লেনকো চা-বাগান।। ডুয়ার্স

১। কোন্ দেশে প্রথম ফুটবল খেলা হয়?

২। পৃথিবীর বৃহত্তম ফুটবল ময়দানের নাম কি?

উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ঝরিয়া।। ধানবাদ

(উত্তর)

১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত শিশির কবিরাজের প্রশ্নের উত্তরে জানাই—

১। ইংল্যান্ডের জে সি লেকারের এক ওভারের খেলায় মোট রান ওঠে ২১ রান (১, ২, ২, ৪, ৬, ৬)। অস্ট্রেলিয়ার এম জি বার্নেস প্রথম রানটি বাদে বাকী ২০ রানই করেন। প্রথম রানটি করেন ডন ব্র্যাডম্যান। এটিই এক ওভারে সর্বাধিক রান।

২। ডবলউ জে এডরিচ এবং ডেনিস কম্পটন (ইংল্যান্ড), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৪৭ সালে ৩য় উইকেটে ৩৭০ রান করেন। এটিই জুটির খেলায় বিশ্বরেকর্ড।

এই সংখ্যারই গীতা ও পরিমল বিশ্বাস-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাই।

৭। ১৮৮২-৮৩ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ৩য় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দল পরাজিত হয়। এতে ইংল্যান্ড সমর্থকরা অত্যন্ত ক্ষেপে যায়। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একদল মহিলা ক্রিকেট অনুরাগী ঐ খেলায় ব্যবহৃত উইকেটগুলি পোড়ান। এই চিতাভস্ম তাঁরা একটি মৃৎপাত্রে সংগৃহীত করে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আইভো ব্লিগকে উপহার দেন। এরপর থেকে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার খেলায় টেস্ট সিরিজে যে দল জেতে তাঁরাই এর অধিকারী হন। আর ঐ সংগৃহীত ভস্মকেই অ্যাসেজ বলা হয়।

রত্না ঘোষ,
কলিকাতা—৪।

●

৭ম বর্ষ ১১ সংখ্যায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্র-কান্তি ঘোষ, কার্তিকচন্দ্র রায় ও পঞ্চানন প্রমাণিকের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাক আলতাফ আহমেদ, পি সিন্হা ও সি প্রসাদ এবং শ্রেষ্ঠ সেন্টার-ফরওয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি ও ভূপিন্দর সিং আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাই বাংলা আধুনিক গানে হেমন্তকুমার সর্বশ্রেষ্ঠ।

চণ্ডীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ঝরিয়া (ধানবাদ)।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং রাজবর্ত্ম সকল পরিপাটীরূপ না থাকাতে বণিক-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তথাকার রাজাদিগের কর্তব্য প্রজার স্থানে সুবর্ণ রজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। এইরূপ না করিলে প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অল্পমূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত অঞ্চলে কৃষিপ্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবজী এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তাহার ভাগধেয় প্রদান করিবে। এই নিয়মানুসারে তাঁহার পার্বতীয় দুর্গ-সন্নিহিত প্রজাগণ ঐ দুর্গস্থিত তৃণ ও পর্ণ-কুটীর সকল নির্মাণার্থে তদুপযোগী পত্র-তৃণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিত; তাহাদিগের স্থানে আর অন্য করাদান ছিল না। পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মানুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া দুর্গমধ্যে একপ্রকার বাজার বসিত।

মুসলমান সৈন্যাপতি তাঁহার অধিকৃত দুর্গের সকল কুটীর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রজাদিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করিলেন। তাঁহার মানস ছিল ঐ দুর্গে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত রাখেন, অতএব এককালে অনেক কুটীর নির্মাণের আদেশ করিয়া যাবৎ তৎসমুদয় সমাপন না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘোষণানুসারে দুর্গজয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে শতাধিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যজাত লইয়া দুর্গসন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশিত হইল তাহার সহিত একজন মোগল যোদ্ধার এইরূপ কথোপকথন হয় এবং সেই অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। মোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, 'কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল—তেমনি একবারে জাহান্নামে গিয়াছে।' মহারাষ্ট্র কহিল, 'হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী নাকি মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যিনিই রাজা হউন, উচিত কর দিব রাজ্যে বাস করিব; আমাদিগের ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বল দেখি শিবজী মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাঁহার শব দেখিয়াছ?' 'বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে কিরূপে দেখিব।' 'তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে?' 'আমরা সেই রাত্রিতে মসাল জ্বালিয়া সকল জায়গা পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না পরদিন গড়ের মূর্চার উপর উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপাড়িয়া গিয়াছে—আর বালিতে পায়ের দাগও পড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমকহারাম আমাদিগকে এই গড়ে আনিয়া ছিল সেই ঐ পায়ের দাগ দেখিয়া কহিল শিবজীই এইখান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন। মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই নিমকহারাম এখন কোথায়?—তাহার কি হইয়াছে কিছু বলিতে পার?' মোগল দুর্গ জয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দ-মগ্ন অন্তকরণ হইয়াছিল বলিয়াই জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও সন্দিহানমনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, 'সে এইখানেই আছে, কিন্তু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের সকলকেই সেইরূপ করি।' মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, আমরা তোমাদের কি করিয়াছি।' 'তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস।' মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, 'রে বিধর্মি মুসলমান, তুই মনে করিয়াছিস শিবজী মরিয়াছেন, এই তাঁহাকে সম্মুখে দেখ।' এই বলিতে বলিতে কৃষীবল-বেশধারী শিবাজী আপন আনীত তৃণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে তীক্ষ্নধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত মোগলের শিরশ্ছেদন করিলেন। আর আর মহারাষ্ট্র সকলেও ঐরূপে নিজ নিজ অস্ত্র বাহির করিয়া 'শিবজীর জয়। শিবজীর জয়!' এই শব্দ সহকারে মোগলদিগকে বলপূর্বক আক্রমণ করিল। মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়াছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর

পরবর্তী সংখ্যায়

রাজাবলি

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

হইল, তাহারাও সুশিক্ষিত মাওলীগণ কর্তৃক স্বল্পপ্রয়াসেই পরাজিত হইল।

এইরূপে শিবজী নিজ দুর্গ পুনর্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই বিশ্বাস-হন্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় অনু-চরকে প্রেরণ করিলেন। পরে যথানিয়মে লোক নির্দিষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ দুর্গের আরক্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। তাহা করিতে করিতে দুর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখেন একটি ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নতুন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং চতুর্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বন্ধ হইয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া দেখেন, কেবল তন্মধ্য-ভাগে একটি ছিদ্র মাত্র আছে। আর সর্বদিক সর্বপ্রকারে বন্ধ, অন্য কি, বায়ু গমনা-গমনেরও পথ নাই। তখন স্মরণ হইল, মোগল বলিয়াছিল সেনানীর জীবৎ সমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই বুঝি এই হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার উন্মুক্ত করণের অনুমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানান্তরিত হইলে সেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে একটা মৃতকল্প মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন না। পরে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যেরূপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে, ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহমধ্যে স্থালী স্থালী পূর্বা শোণিত সংহত হইয়া তিমির বর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসহ মাংস খণ্ড সকল চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্রী সেনানীর শীর্ণ এবং পাংশুবর্ণ শরীর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃতকল্প শরীর বহির্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্বার রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবাজী কহিলেন, 'এখনও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল আনিয়া উহার মুখে সেচন কর।' কেহ বারম্বার ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, 'আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না! —আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!' সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, 'অনুমান হয়, দুরাত্মা মুসলমান কর্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয় নাই, অতএব

তাহাই পান করিবে না কহিতেছে।' পরে কহিলেন, 'বোধহয়, পাপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহমধ্যে দর্শন করিলাম, হায়! ভারত-ভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে?' তিনি এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষু রুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্বার অচেতন হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্বার সচেতন হইয়া চক্ষু রুন্মীলন পূর্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন 'মহারাজ। তবে কি আমি সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম? তবে কি আমি আপনার বিশ্বাসঘাতী নহি? —আমি কি মুসলমানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই? —আমি কি আপনার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই? —না, না, সে সকল স্বপ্ন নহে। আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্তস্বর করিয়াছিল তাহা এইক্ষণেও আমার কর্ণকুহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আর আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা নহে।'

শিবজীর নিজ সেনানীর প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, 'তুমি এইক্ষণে আর সেইসকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জলপান কর, পরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তারে শ্রবণ করিব।' সেনানী কহিল, 'মহারাজ! আর আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন।' এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদশাহী সৈন্যে মিলিত হইয়াছিলেন এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদায় ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—'মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অবশিষ্ট জীবিতকাল তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া দুরাত্মা মুসলমান সৈন্যপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্যে রুষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না, বিদায়-প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হন্তা বলিয়া আমায় বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, 'তুই মুসলমান হইয়া বাদশাহের সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হ।' তাহার ভর্ৎসনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন? যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্যপতি তখন কতিপয় অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি। চতুর্দিক অন্ধকার সমুদয় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। জল! জল! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা, ভবানী দেবী ঘোরবেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন, 'রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মি শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশে সমুদায় জল গোরক্ত এবং সকল ভক্ষ্য-বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহার কর্'—মহারাজ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই।'

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্বার প্রায় চৈতন্য-শূন্য হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহারাষ্ট্র সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ। ভগবান রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।' পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহাস্যমুখ, বিভূতি-ভূষণ এবং আরক্ত বহির্বাস পরিধান ও ত্রিশূল-হস্ত সাক্ষাৎ মূর্তিমান সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষাগুরুর দর্শন লাভ মাত্র একাকী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন, গুরু আশীর্বাদ সহকারে কহিলেন, 'বৎস তোমার মঙ্গল হউক! আমি যে যে কর্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদয় সুসিদ্ধ হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকির বেশে শত্রু সৈন্যে গিয়াছিল, সে এইমাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গবিজয়ের কোন সংবাদ যায় নাই, আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব-স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, কর—আমি তোমার স্বস্থান প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি।' শিবজী উত্তর করিলেন, 'গুরো! আপনি প্রসন্ন আছেন আমার অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ হইয়াছিল সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুসৈন্য পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করিবার উপায়ান্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ দুর্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি। পরন্তু, যাহা যাহা কর্তৃক আমার কৌশল সমুদয় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্মি শত্রু তাহারাই প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার কার্যসাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তজ্জন্য একপ্রকার কার্যসিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে।' এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—'আগামী যুদ্ধে অবশ্য বিজয়লাভ হইবে।' পরে শিবজীকে বলিলেন, 'তোমার ঐ সেনানীকে অদ্য রাত্রি আমার সমীপে আসিতে কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না,—এক্ষণে যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর।'

মনুষ্য মাত্রেই স্ব-স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্যন্ত নিরূপণ করাই মনুষ্যের আপনার হাত, কর্মের ফলাফল মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে, তাহা সর্বনিয়ন্তা জগৎ-পিতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা সফল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতিসামান্য বুদ্ধির কর্ম করিয়াও জনগণ সুমহৎ ফল-ভোগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তিরা সর্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ না করিয়া আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম সমুদয় নির্বাহ করিয় থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য সফল হইলেও গর্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, এবং সফলচেষ্ট হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের দুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঙ্গেবের শাঠ্য-জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঙ্গেবের ও আপনার দুর্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে যে প্রকার অনুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতে তাঁহার যে প্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথাটি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। সে সময় বাদশাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিকা প্রবিষ্ট হইয়া রোসিনারার স্থানে পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ পরে বাদশাহ, যে ব্যক্তিকে জয়সিংহের বিনাশার্থে প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদশাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরদিগের এমত রীতি ছিল না যে, স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্মের জন্যই তাঁহাদিগের সমীপে দুজন প্রধান ওমরা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরঙ্গেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্তী সকলেরই অনুভব হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রধান কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদশাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া হাস্যবদনে

নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সত্বরে সভার কার্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আরঙ্জেব কখনই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্বিবয়ীয় কার্য সমাপন করিয়া স্ব-স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদশাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্জেব নিজ কন্যার আরক্ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষ মুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতিপূর্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি জন্য রোদন করিতেছিলে?' রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে শিবজীর সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যে কখনও পাইবেন এমত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আস্পদ হইয়াছিলেন, অতএব বাদশাহ হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দুঃখে একান্ত অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোকসূচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আরঙ্জেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদশাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্বার কহিলেন—'তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার দুঃখ উপস্থিত করিয়াছ—ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্যাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম—সে যাহা হউক, যদি এক্ষণও তোমার দুর্বুদ্ধি গিয়া থাকে তবে পারস্য-রাজতনয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্ধারণ করি— কিছু উত্তর করিলে না যে? —তবে বোধহয় তোমার অসম্মতি নাই।' রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, 'পিতঃ। আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—এই বংশীয় কন্যাগণের চিরকৌমার্য-পন্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও তাহাই হউক—অন্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন।' আরঙ্জেব সর্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের অন্যথা করিতে চাহিলে বৈরক্তির পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় আসিয়াছিলেন, অতএব বাদশাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আঃ পাপীয়সি! তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস্, তাহার জীবনসত্ত্বে তোর এই দুর্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই। অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্নমস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব—তোর দোষেই সে নিহত হইবে।" রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র পিতার পাদমূলে নিপতিতা হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন, "তাত! ক্ষমা করুন—আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথির প্রাণবধ করিবেন না। তাহাকে স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যতকাল বাঁচিব, ভুলিয়াও আপনার মতের বিপরীতাচরণ করিতে চাহিব না।" আরঙ্জেব বিকট হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "তবে তুমি পারস্যরাজ-তনয়ের ধর্মপত্নী হইতে স্বীকার করিলে?" —"আমি সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি অপরাধ করিয়া থাকি, আমারই দণ্ড-বিধান করুন, আমার দোষে অপরের দণ্ড করিবেন না।" নিষ্ঠুর আরঙ্জেব কন্যার এই সকল বচনে কিছুমাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া উত্তর করিলেন—"শুন রোসিনারা! তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার কথা বড় নয়, সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ দেখিতে হইবে এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে।" বাদশাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচেতনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আরঙ্জেব আত্মজাকে তদবস্থ রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলেন।

বাদশাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পূর্বাহ্নে নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল। বাদশাহ তাহাকে সরোষ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আরঙ্জেব ক্ষণকাল সেইখানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—"আর কি! আমারও সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার আদেশানুসারে বিদ্রোহের ভান করিয়া সকলের অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সে আর কখনও কাহারও বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল। অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাতে আমার পাপ কি? বিদ্রোহীকে কোন্ রাজা দণ্ড না করিয়া থাকেন—বিষ দ্বারাই হউক আর বধ্যভূমিতে ঘাতকের শস্ত্র দ্বারাই হউক, জীবন বিনাশ একই পদার্থ—আর এতক্ষণে শিবজীরও নিধনসাধন হইল। সে-ব্যক্তি পূর্বাবধিই আমার শত্রু আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার্হ—আরঙ্জেব! তুমি এতদিনের পর সত্য সত্যই দিল্লীশ্বর বাদশাহ হইলে, এতদিনে তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল।" দিল্লীশ্বর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এবং তাদৃশ গুরুতর পাপসমস্তজনিত প্রবল অনু-তাপাগ্নিতে মনে মনে ব্যর্থ যুক্তিরূপ বারি-কণা দ্বারা নির্বাণ করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন। এমত সময়ে নগরপাল ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া বাদশাহের পদতলে নিপতিত হইল। আরঙ্জেব নগরপালের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই আপনার মন্ত্রণার বৈফল্য অনুভব-করত যে কি পর্যন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন, তাহা কথনীয় নহে। কিন্তু দিল্লীশ্বর অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। ইচ্ছা করিলেই দুঃখ ক্রোধ ভয়াদি নিবারণ করিয়া সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিতেন। অতএব বাদশাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নগরপালকে সমীপবর্তী একজন সেনাপতির হস্তে সমর্পণকরত স্বয়ং অশ্ব-পৃষ্ঠাবলম্বনে শিবজীর বাসাবাটীর প্রত্যভি-মুখে ধাবমান হইলেন। অমাত্যবর্গও বাদশাহের সমভিব্যাহারী হইল এবং মহারাষ্ট্রপতির পলায়নবার্তা প্রচার হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহা-কোলাহলপুরঃসর সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল।

বাদশাহ কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন। এমত সময় দেখিতে পাইলেন, নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছে। বাদশাহ দূর হইতে ঐ ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন সেই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল লোক নিকটবর্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বারা বোধ হইল যে, সে শিবজী নহে। পরে সে-ব্যক্তিও বাদশাহ সমীপে আনীত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়না করিতেছে।" পরে প্রকাশ হইল যে, ঐ ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অনুচর, শিবজীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাঁহার খট্টায় শুইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, নগরপাল তাহাকে মহা-রাষ্ট্রপতির খট্টায় শয়ান দেখিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আপনি তৎক্ষণাৎ বাদ-শাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরঙ্জেব এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"অনুমান হয়, এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্তনান্তর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অধিক দূর যাইতে পারে নাই, তাহাকে ধৃত করিতে হইবে, নচেৎ—আমার অন্য কোন হানি নাই। কেবল যথাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে বাদশাহী পদের অগৌরব হয়—তোমরা কেহ বলিতে পার, সে কি জন্য এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল? আমার অনুভব হয় যে, সে সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিয়া-ছিল, অতএব রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে লিপি আসিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয়—এই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে—যাহা হউক, এক্ষণে রাজা জয়সিংহ তাহার নিকট

কিছু প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কিনা তাহা প্রমাণ করিবারও আর উপায় নাই—অন্য এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা জানিলাম আমার পরম হিতকর চিরসুহৃৎ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—হায়! তাঁহার ন্যায় আমার হিতকারী আর কে হইবে?" কপটমতি আরঙ্গেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

আরঙ্গেব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের ভাবসকল গোপন করত ভৃত্যাদিগের উপর যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথিমধ্যে পুনঃপুনঃ তাঁহার এই ভাবনা হইতে লাগিল—"হায়! যদি শিবজী ধরা না পড়ে তবে সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কেনই বা জয়সিংহকে হনন করিলাম! কেনই বা এই দুর্বহ পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম। জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, আর কিছুদিন হইলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিত—হায়! তাদৃশ সেনাপতিই বা আর কোথায় পাইব।"

সেইদিন নিশীথসময়ে পূর্বোক্ত বারাঙ্গনা একাকিনী সেতুদ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দিক প্রাচীন দিল্লী, অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে এক্ষণকার অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। ঐ স্থানে একটি মনুষ্যেরও গমনাগমন নাই। কেবল স্থানে স্থানে শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরই উপদ্রব আছে। যাহা হউক ঐ স্ত্রী একাকিনী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করত কিয়দ্দূর অন্তরে একটি ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সম্ভাষণ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি? অথবা, সংবাদই আর কি জিজ্ঞাসা করি—তুমি একাকিনী আসিয়াছ—তবে আমার সকল যত্নই বিফল হইয়াছে।" বার-নারী উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ! আপনার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়া আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় অবগত হউন।" শিবজী ব্যস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই অঙ্গুরীয় যে রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"তবে বাদশাহপুত্রীর সহিত তোমার সন্দর্শন হইয়াছে—তিনি কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই কি চিনিতে পারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? আর তাঁহার আগমনেরই বা কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদয় একেবারে বল।" স্ত্রী উত্তর করিল, "মহারাজ! সেই বাদশাহপুত্রীর ন্যায় উদার-চরিত্রা কামিনী কখনও দেখি নাই শুনি নাই—যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্বীক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন"—এই বলিয়া বারবনিতা সমুদায় বর্ণন করিলে শিবজী চমৎকৃত হইলেন, পরে বহুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন, "রোসিনারা অন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন—যদি তাঁহার নিমিত্ত আমার রাজ্যবিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম—তাদৃশ সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্যবাসেও অসুখ নাই।" বার-যোষা কহিল, "মহারাজ! যাহা বলুন কিন্তু বাদসাহপুত্রী উচিত কর্মই করিয়াছেন এবং তিনি উচিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সমুদায় গুণ আপনার অনুভূত হইতেছে!"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি দুই একদিন সেইখানেই থাকিয়া রোসিনারাকে আনয়নার্থ পুনর্বার যত্ন করিবেন এমত পরামর্শ করিতেছেন। এমত সময়ে শ্রীমান রামদাস স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। অতএব ঐ বার-বণিতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়বোধ হইল। শিবজী শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণবন্দন পূর্বক কহিতে লাগিলেন "মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে একটি কর্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই—আর আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সংক্ষেপে রোসিনারা সম্বন্ধীয় তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন। রামদাস স্বামী তৎশ্রবণে ঈষৎ কোপযুক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি মহারাষ্ট্রে ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম—তথায় কেহ কেহ এমত কথাও কহিত যে, তুমি স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে তাদৃশ উৎসাহশীল নহ। অর্থাৎ যদি আরঙ্গেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাঁহার অন্তলেশ্বর হইতেও তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা নাই। তখন ঐ সকল কথায় আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় নাই। —কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোকপ্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না—এমত উদার-প্রকৃতি হইয়াও যে স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে। —বাদসাহপুত্রী যে, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিলেন না ইহাই ক্ষেমঙ্কর করিয়া মানি।" শিবজী এই সকল কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন, রামদাস স্বামী ঐ বার-বধূর স্থানে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া অতি আশ্চর্য বোধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি অন্যায় করিয়াছি বাদসাহ-পুত্রীর যেরূপ বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় [illegible] তিনি সামান্যা স্ত্রী নহেন এবং [illegible] জন্যই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হই[illegible] তজ্জন্য তোমার নিন্দা করিয়া [illegible] নাই—যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহ[illegible] পত্রী পাঠ করিয়া শ্রবণ করাই।" তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র গুরুদেবের হস্তে [illegible] করিলেন এবং তিনি সেই স্থানে [illegible] অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিয়া পত্র পা[illegible] লাগিলেন।

"হে মহারাষ্ট্ররাজ! হে প্রিয়[illegible] কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন ক[illegible] কি লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে [illegible] —তুমি আমার মন জান কি না ব[illegible] না—কিন্তু আমি তোমার মন জানি[illegible] আমি যে জন্য তোমার সমভি[illegible] হইলাম না, তাহা ব্যক্ত করিয়া [illegible] বুঝিতে পারিলে এবং আমার প্রী[illegible] হইবে। আমি আর অধিক কি ব[illegible] আমার স্বামী, তাহার চিহ্নস্বরূপ[illegible] হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়[illegible] বিনিময় করিলাম অতএব [illegible] আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল [illegible] আমি তোমার সমভিব্যাহারিণ[illegible] তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মান[illegible] হওনের অনেক প্রতিবন্ধক [illegible] ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামিস[illegible] বঞ্চিত করিলাম! যদি বল, আম[illegible] রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত [illegible] সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস ন[illegible] মনে করিয়া দেখ, সুদ্ধ রাজ্য [illegible] তোমার মনের মানস নহে। —অ[illegible] যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃ[illegible] তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত[illegible] তেমনি তুমিও স্বজাতিবাৎসল্য প্র[illegible] জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক [illegible] ক্ষমতা নাই—একান্ত অধীনা রো[illegible]

রামদাস স্বামী এই পত্রপাঠ[illegible] চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে [illegible] "মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ[illegible] চরিত্রাকামিনী আছে তাহা আমি [illegible] না। মহারাজ! যাঁহারা প্রাণ বিস[illegible] পতিব্রতা রক্ষা করেন তাঁহারাও [illegible] পতিপরায়ণী নহেন। মহারাজ [illegible] অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ [illegible] গ্রহণ করুন—এবং যদি শাস্ত্র সত্য[illegible] পরজন্মে এই বাদসাহ কন্যাই [illegible] সহধর্মিণী হইবেন ইহার সন্দেহ ন[illegible]

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' [illegible] অংশবিশেষ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।